চিত্র-সূচী

রঙীন চিত্র

একবর্ণ চিত্র

লেখকগণ ও তাঁহাদের রচনা

বিষয় সূচী

বিবিধ প্রসঙ্গ

প্রবাসীর পুস্তকাবলী

মহাভারত (সচিত্র) ৺রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়	৯৲
সচিত্র বর্ণপরিচয় ১ম ভাগ— রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়	৶০
সচিত্র বর্ণপরিচয় ২য় ভাগ—ঐ	৵০
চাটার্জির পিক্‌চার এল্‌বাম (১, ৪, ৫, ৮ ও ৯ বাদে) প্রত্যেক	৪৲
চিরন্তনী (শ্রেষ্ঠ উপন্যাস)—শ্রীশান্তা দেবী	৪৷৹
ঊষসী (মনোজ্ঞ গল্পসমষ্টি)— ঐ	২
সোনার খাঁচা— শ্রীসীতা দেবী	২৷৹
আজব দেশ (ছেলেমেয়েদের সচিত্র) ঐ	১৲
বজ্রমণি (শ্রেষ্ঠ গল্পসমষ্টি) ঐ	২৲
উদ্যানলতা (উপন্যাস)—শ্রীশান্তা ও সীতা দেবী	২৷৹
কালিদাসের গল্প (সচিত্র)—শ্রীরঘুনাথ মল্লিক	৪৲
গীত উপক্রমণিকা—(১ম ও ২য় ভাগ) প্রত্যেক	১৷৹
জাতিগঠনে রবীন্দ্রনাথ—ভারতচন্দ্র মজুমদার	১৷৹
কিশোরদের মন—শ্রীদক্ষিণারঞ্জন মিত্র মজুমদার	
চণ্ডীদাস চরিত—(৺কৃষ্ণপ্রসাদ সেন) শ্রীযোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধি সংস্কৃত	২৷৹
মেঘদূত (সচিত্র)—শ্রীযামিনীভূষণ সাহিত্যাচার্য্য	৪৷৹
হিমালয় পারে কৈলাস ও মানস সরোবর (সচিত্র)— শ্রীপ্রমোদকুমার চট্টোপাধ্যায়	৪৲
পাথুরে বাঁদর রামদাস (সচিত্র)— শ্রীঅসিতকুমার হালদার	১৷৹
জননা—শ্রীহেমলতা দেবী	১৷৹
খেলাধূলা (সচিত্র)—শ্রীবিজয়চন্দ্র মজুমদার	১৷৹
বিলাপিকা—শ্রীযামিনীভূষণ সাহিত্যাচার্য্য	১৵০
ল্যাপল্যাণ্ড (সচিত্র)—শ্রীলক্ষীশ্বর সিংহ	১৷৹

ডাকমাশুল স্বতন্ত্র।

প্রবাসী কার্য্যালয়

১২০।২, আপার সার্কুলার রোড, কলিকাতা।

BOOKS AVAILABLE

	Rs.	A.
Chatterjee's Picture Albums—Nos. 1 to 17 (*No. 1, 4, 5, 8 & 9 out of Stock*). each No. at	4	0
History of Orissa Vols. I & II —R. D. Banerji each Vol.	25	0
Canons of Orissan Architecture—N. K. Basu	12	0
Dynasties of Mediæval Orissa— Pt. Binayak Misra	5	0
Eminent Americans: Whom Indians Should Know— Rev. Dr. J. T. Sunderland	4	8
Emerson & His Friends— ditto	4	0
Evolution & Religion— ditto	3	0
Origin and Character of the Bible ditto	3	0
Rajmohan's Wife—Bankim Ch. Chatterjee	2	0
Prayag or Allahabad—(*Illustrated*)	3	0
The Knight Errant (*Novel*)—Sita Devi	3	8
The Garden Creeper (*Illust. Novel*)— Santa Devi & Sita Devi	3	8
Tales of Bengal—Santa Devi & Sita Devi	3	0
Plantation Labour in India—Dr. R. K. Das	3	8
India And A New Civilization— ditto	4	0
Mussolini and the Cult of Italian Youth (*Illust.*)—P. N. Roy	4	8
Story of Satara (*Illust. History*) —Major B. D. Basu	10	0
My Sojourn in England— ditto	2	0
History of the British Occupation in India —[*An epitome of Major Basu's first book in the list.*]—N. Kasturi	3	0
History of the Reign of Shah Alum— W. Franklin	3	0
The History of Medieval Vaishnavism in Orissa—With introduction by Sir Jadunath Sarkar.—Prabhat Mukherjee	6	0
The First Point of Aswini—Jogesh Ch. Roy	0	8
Protection of Minorities— Radha Kumud Mukherji	0	4
Indian Medicinal Plants—Major B. D. Basu & Lt.-Col. K. R. Kirtikar—Complete in 8 Vols. [Authoritative Work with numerous Superb Plates]	320	0

Postage Extra.

The Modern Review Office

120-2, Upper Circular Road, CALCUTTA

পোষা পাখী
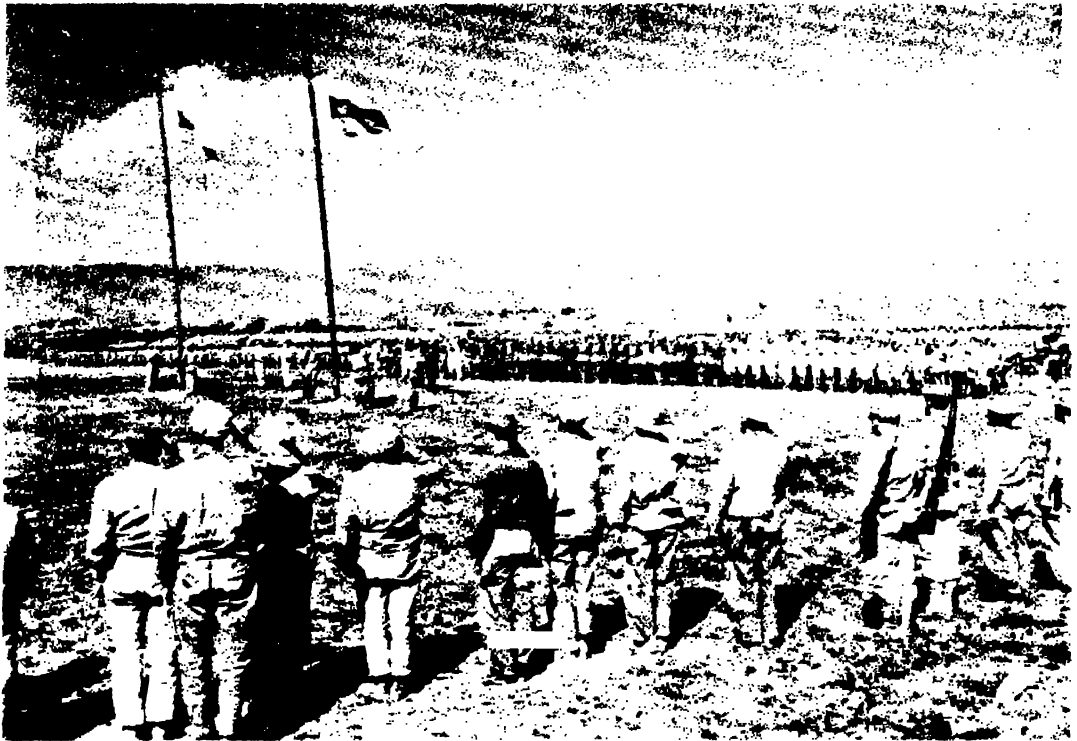
প্রবাসী প্রেস, কলিকাতা

শ্রীদেবীপ্রসাদ রায়চৌধুরী

নিউ দিল্লীতে সাংবাদিক সম্মেলনে ব্রিটিশ মন্ত্রী-মিশনের সদস্যত্রয়

ষ্টিলওয়েল রোডের পাশে মিউস অধিত্যকায় চীনদেশ এবং যুক্তরাষ্ট্রের পতাকা অভিবাদনরত

"সত্যম্ শিবম্ সুন্দরম্
নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ"

৪৬শ ভাগ
১ম খণ্ড

বৈশাখ, ১৩৫০

১ম সংখ্যা

বিবিধ প্রসঙ্গ

বর্ষশেষ ও নববর্ষ

বাঙালীর দুর্ব্বহ ও দুঃসহ জীবনের আর একটি বৎসর অতিক্রান্ত হইল। জাপানী যুদ্ধের আরম্ভ হইতে বাঙালীর দৈনন্দিন জীবনযাত্রা অসহনীয় ও কষ্টসাধ্য হইয়াছে, গত বৎসর যুদ্ধ থামিবার পরও তাহার কোন উন্নতি হয় নাই, অদূর ভবিষ্যতে হইবার কোন লক্ষণও নাই। অন্ন বস্ত্র এখনও দুর্লভ, এক দুর্ভিক্ষের জের মিটিতে না মিটিতে আর এক ভয়াবহ দুর্ভিক্ষের আগমনবার্ত্তা ঘোষিত হইয়াছে। অনশনে মৃত্যু সুরু হইয়া গিয়াছে। ইংরেজের রাজনৈতিক চক্রান্তের ফলে গত দুর্ভিক্ষের সৃষ্টি ও পুষ্টি হইয়াছিল বলিয়া এবার জননায়কেরা দুর্ভিক্ষ নিবারণের দায়িত্ব গ্রহণের পূর্ব্বে রাজনৈতিক ক্ষমতা ভারতবাসীর হাতে অর্পণের দাবী করিয়াছেন। ইংরেজ তাহা মানিয়াও মানিতে পারে নাই, আজও সে ভারতবাসীর অন্ন ও বস্ত্রের উপর অপ্রতিহত প্রভুত্ব বজায় রাখিতে ব্যস্ত।

ঔষধের অভাব, বাসস্থানের অভাব, রেলে, স্টীমারে, ট্রামে, বাসে ভ্রমণের দুর্দশা আজও অব্যাহতই আছে। ব্ল্যাকমার্কেট অবাধে সরকারের চোখের উপর তাঁহাদের পূর্ণ সমর্থন লাভ করিয়া চলিতেছে। বহু উচ্চপদস্থ সরকারী কর্ম্মচারীর বাড়ী ঘুষ ও চুরির টাকার সন্ধানে খানাতল্লাসী হইয়াছে। কিন্তু কোন অজ্ঞাত কিন্তু অনুমানসাধ্য কারণে ইহারা সকলেই যথাপূর্ব্ব রহিয়াছে কাহারও নামে মামলা হয় নাই। ইহাদের বিরুদ্ধে কোন প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে কিনা এবং পাওয়া গিয়া থাকিলে কেন মামলা করা হয় নাই তার দাবীও সংবাদপত্রে উঠিয়াছে। কিন্তু গবর্মেণ্ট ইহাতে কর্ণপাত করেন নাই। ফলে অসৎ কর্ম্মচারীর দল আরও বেপরোয়া হইয়া আরও প্রকাশ্যে চুরি করিবার ক্ষমতা লাভ করিয়াছে।

গত এক বৎসরে মিঃ কেসির গবর্মেণ্ট অত্যাচার অবিচার ও দুর্নীতির জন্য যে কুখ্যাতি অর্জ্জন করিয়াছে কোম্পানীর আমলের প্রথম দিকের সহিত তাহার তুলনা মেলে। সরকারী কর্ম্মচারীদের অবাধে চুরি করিবার ও ঘুষ লইবার সুযোগ দেওয়া হইয়াছে, সে সুযোগের পূর্ণ সদ্ব্যবহার তাহারা অনেকেই করিয়াছে। রাজনৈতিক আন্দোলন দমন করিবার জন্য পুলিশ ও মিলিটারীকে গুলী চালাইবার নিরঙ্কুশ অধিকার দেওয়া

তদন্তে পুলিশের বিরুদ্ধে অভিযোগ সত্য প্রমাণিত হওয়ায় কর্পোরেশনের তদন্ত বন্ধ করা হইয়াছে। তার নিষ্ঠার পরিচয় দেওয়ার জন্য করোনার মিঃ হককে অপসারিত হইতে হইয়াছে। ছাত্র ও তরুণের রক্তে কলিকাতার রাজপথ রঞ্জিত হইয়াছে। ইহাদের পূর্ব্বে মিঃ কেসি বিক্রয়-কর বৃদ্ধির আদেশ দেওয়ায় সারা বাংলাব্যাপী তীব্র আন্দোলনের সৃষ্টি হয়, তিন সপ্তাহব্যাপী হরতালের পর বাংলা সরকার সে আদেশ প্রত্যাহার করিতে বাধ্য হন।

মিলিটারীর উপদ্রব সমানই রহিয়াছে। মিলিটারী লরীর চক্রতলে পিষ্ট হইয়া প্রাণহানি বা অঙ্গহানি এখনও দৈনন্দিন ঘটনা। নারীর সন্ধানে মিলিটারী কর্ত্তৃক লোকের বাড়ী চড়াও হওয়া, বাধা দিতে গেলে নরহত্যা একাধিকবার হইয়াছে, অল্প কয়েক দিন আগেও হাওড়ায় হইয়াছে। গবর্মেণ্ট ইহা বন্ধ করিবার যথোপযুক্ত চেষ্টা করেন নাই। এই শ্রেণীর নরপশু ধরা পড়িয়া আদালতে দণ্ডিত হইলে হাইকোর্টে তাহাদের দণ্ড লাঘব করিয়াই দেওয়া হইয়াছে। অনেকে ধরাও পড়ে নাই। চট্টগ্রামের একটি গ্রামে একই কারণে চড়াও হইয়া গ্রাম পোড়াইয়া ও লুঠ করিয়া ইহারা যে অত্যাচার করিয়াছে জনমতের চাপে বাধ্য হইয়া গবর্মেণ্ট তাহাদিগকে গ্রেপ্তার করিয়া বিচারের ব্যবস্থা করিয়াছেন। পুলিস কর্ত্তৃক গ্রাম চড়াও, বাড়ী চড়াও, সম্পত্তি নাশ প্রভৃতির অভিযোগও হইয়াছে, প্রতিকার হয় নাই। এক কথায় বাংলার শাসনযন্ত্র প্রায় অচল হইয়া এক অরাজক অবস্থার সৃষ্টি করিয়াছে। দুষ্টেরা অত্যাচারের সর্ব্ববিধ সুযোগ পাইয়াছে, শিষ্টেরা পদে পদে লাঞ্ছিত হইতেছে।

আট বৎসর পর বাংলার ব্যবস্থা পরিষদের নির্ব্বাচন হইয়াছে। হিন্দু-আসনে কংগ্রেস ও মুসলমান-আসনে লীগ প্রার্থীরা নির্ব্বাচিত হইয়াছেন। মাত্র চারিজন জাতীয়তাবাদী মুসলমান নির্ব্বাচিত হইয়াছেন। কংগ্রেস মনোনয়ন যে ভাবে দেওয়া হইয়াছে তাহাতে দূরদর্শিতা বা আদর্শনিষ্ঠার পূর্ণ পরিচয় পাওয়া যায় নাই। ইহার ফল শুভ হইবে কিনা সে সম্বন্ধে সংশয় থাকিয়া যাইতেছে। মনোনয়ন দানের ভার যাঁহাদের হাতে ছিল আট বৎসর পূর্ব্বে মন্ত্রিমণ্ডল

প্রভাবের সময় তাঁহারা দূরদর্শিতার পরিচয় দিতে পারেন নাই, তাঁহাদের একদেশদর্শী কার্য্যে বাঙালীর প্রভূত ক্ষতি হইয়াছে। লীগ ও সিভিলিয়ানতন্ত্রের ক্ষমতা যেখানে অপ্রতিহত, কংগ্রেস যেখানে দুর্ব্বল সেই অবস্থায় নববর্ষের শুভপ্রভাতকে অভিবাদন জানাইয়া বরণ করিয়া লইবার জন্য আশার আলোকের প্রতীক্ষাই আমরা করিতেছি।

বাংলার সমস্যা

বাংলার সম্মুখে দুইটি বৃহৎ সমস্যা উদিত হইয়াছে, একটি পাকিস্থান, অপরটি মন্ত্রিমণ্ডল গঠন। বাংলা দেশকে পাকিস্থানের অন্তর্ভুক্ত করিবার জন্য মিঃ জিন্না দাবি করিয়াছেন এবং বলিয়াছেন বাংলার বর্ত্তমান সীমানা লইয়াই তিনি সন্তুষ্ট থাকিবেন। মিঃ সহীদ সুরাবর্দী তাহাতেও সন্তুষ্ট নন, তিনি মানভূম, সিংভূম সাঁওতাল পরগণা ও পূর্ণিয়া জেলা প্রত্যর্পণ দাবি করিয়া উহাদিগকেও পাকিস্থানের অন্তর্ভুক্ত করিতে চাহিয়াছেন। বিভিন্ন স্থানে দিল্লীর যে সংবাদ প্রকাশিত হইয়াছে তাহাতে মনে হয় বাংলাকে খণ্ডিত করিয়া ঢাকা, চট্টগ্রাম ও রাজসাহী ডিভিসন এবং খুলনা ও চব্বিশ পরগণা বাদে প্রেসিডেন্সি ডিভিসন লইয়া পাকিস্থান গঠনের কথা চলিতেছে। ইহা সত্য হইলে বর্দ্ধমান ডিভিসন, কলিকাতা, খুলনা ও চব্বিশ পরগণা লইয়া ভবিষ্যৎ বাংলাদেশ গঠিত হইবে।

মিঃ সুরাবর্দী পশ্চিম বঙ্গের লোক, পূর্ব্ব ও উত্তর-বঙ্গ লইয়া পাকিস্থান গঠিত হইলে সেখানে তাঁহার প্রভুত্ব খাটিবে না। হিন্দু বাংলায় ত কোন স্থানই থাকিবে না। জীবনে এই প্রথম তিনি নিরঙ্কুশ রাজনৈতিক ক্ষমতা ছলে-বলে-কৌশলে করায়ত্ত করিয়াছেন, সমগ্র বাংলার উপর কর্ত্তৃত্ব বজায় রাখিবার চেষ্টা তিনি করিবেন ইহা স্বাভাবিক। সিংহভূম, মানভূম, সাঁওতাল পরগণা প্রভৃতি জেলা হাতে পাইলে খনিজ সম্পদও আসিবে, তথাকার কোল-সাঁওতাল প্রভৃতিকে জোর করিয়া মুসলমান করিয়া অথবা সেন্সাস রিপোর্টে মুসলমান বলিয়া লিখাইয়া মুসলমান সংখ্যা বৃদ্ধিরও চেষ্টা হইতে পারিবে।

অখণ্ড বা খণ্ডিত কোন বাংলাকেই বাঙালী পাকিস্থানের অন্তর্ভুক্ত হইতে দিতে পারে না। বাংলা বাঙালীর দেশ, বাংলায় হিন্দু-মুসলমান উভয়েরই ভাষা এক ও অভিন্ন, শুধু ধর্মে বা আচার ব্যবহারে কিছু পার্থক্য আছে বলিয়াই উভয়কে ভিন্ন জাতি মনে করিবার কারণ নাই। বাংলার মুসলমানের প্রায় সকলেই ধর্মান্তরিত হিন্দু, বাংলার মূল অধিবাসী, বাঙালী। বেশী দিনের মুসলমানও ইহারা নয়, ইহাদের অধিকাংশেরই পূর্ব্বপুরুষের নাম খুঁজিলে হিন্দু নামই বাহির হইবে।

বাংলা পাকিস্থানে পরিণত হইলে বাঙালী হিন্দুর অস্তিত্ব ধরাপৃষ্ঠ হইতে মুছিয়া যাইবে। ভারতের বিভিন্ন প্রদেশে বাঙালীর বিরুদ্ধে কংগ্রেস মন্ত্রিদের পূর্ব্বে ও পরে যে মনোভাব দেখা গিয়াছে তাহাতে পাকিস্থানের অন্তর্ভুক্ত বাঙালী হিন্দুকে বাঁচাইবার জন্য কেহ অগ্রসর হইবে না ইহা নিঃসন্দেহে অনুমান করা চলে। বাংলার প্রতি বর্ত্তমান কংগ্রেসের এক দলের মনোভাব বাঙালীর পক্ষে অনুকূল নয় ইহার বহু পরিচয় পাওয়া গিয়াছে, অপ্রীতিকর হইলেও ইহা আজ স্বীকার করা দরকার। একমাত্র মহারাষ্ট্র বা যুক্তপ্রদেশের কোন কোন স্থান ভিন্ন বাঙালীর পক্ষে পলাইয়া আত্মরক্ষা করিবারও স্থান থাকিবে না। বাঙালীর অপরাধ বাঙালী চিরকাল বিপ্লবী, রাষ্ট্রে সমাজে শিক্ষায় ও জীবনের সর্ব্বস্তরে প্রয়োজন হইলেই বাঙালী নূতনকে গ্রহণ করিতে জানে। বাঙালী তরুণ, বিদেশী শক্তি বা অবাঙালী প্রাধান্য কখনও মাথা নত করিয়া সহ্য করে না। সাহসে, শৌর্য্যে ও জ্ঞানে বাঙালী বহুদিন ভারতে নেতৃত্ব করিয়াছে। পরের দয়ায় বা কূট রাজনৈতিক কৌশলের সাহায্যে অন্যায় পথে বাঙালী শক্তি সংগ্রহের চেষ্টা করে নাই, ত্যাগ শৌর্য্য ও শোণিত মূল্যে বাঙালী সারা ভারতে নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠা করিয়াছিল। ইংরেজ বাঙালীকে ভয় করে, তাই বাঙালীকে শিক্ষায় ও স্বাস্থ্যে পঙ্গু করিয়া তাহাকে আত্মবিস্মৃত ও আত্মবীতশ্রদ্ধ করিয়া রাখিবার জন্য তাহার চেষ্টার অন্ত নাই। অপর প্রদেশবাসীর নিকটও বাংলা শোষণ-ক্ষেত্রে পরিণত হইতে চলিয়াছে, তাই বাঙালীকে দাবাইয়া রাখিবার জন্য তাহাদের প্রয়াসও বহু ক্ষেত্রে প্রতিভাত হইতেছে। বাঙালী হিন্দুকে ধ্বংস করিতে পারিলে অবাঙালী শোষকের লাভ, এই শোষণ ক্ষেত্রে ইয়োরোপীয়, মারবাড়ী বা বিদেশী মুসলমানে কোন ভেদ নাই। আত্মরক্ষার জন্য বাঙালী হিন্দু আজও যদি মাথা তুলিয়া না দাঁড়ায় তাহা হইলে আত্মবিনাশের পথই সে প্রশস্ত করিবে। আমরা দুঃখের সহিত লক্ষ্য করিতেছি যে বাঙালী হিন্দু এই মহা বিপদ সম্বন্ধে আজও সজাগ হয় নাই, বাংলাকে পাকিস্থানের অন্তর্ভুক্ত করিবার বিরুদ্ধে যে তীব্র প্রতিবাদ বাংলার প্রত্যেক সংবাদপত্রে ও সভা-সমিতিতে হওয়া উচিত ছিল তাহার কিছুই হয় নাই।

বাংলার প্রশ্ন প্রাদেশিক, সুতরাং উহার আলোচনা করিলে প্রাদেশিকতার প্রশ্রয় দেওয়া হইবে এমনই একটা কুসংস্কার অনেকের মধ্যে আছে। আত্মবিলোপের দ্বারা বাংলাদেশকে অপর দেশ বা প্রদেশের শোষণ-ক্ষেত্রে পরিণত হইতে দেওয়া কোন্ শ্রেণীর মহানুভবতা আমরা তাহা বুঝিতে অক্ষম। ব্যক্তি শক্তি সংগ্রহ করে পরিবারের কল্যাণের জন্য, পরিবার সুগঠিত হইলে গোষ্ঠীর শক্তি বৃদ্ধি হয়, গোষ্ঠী শক্তি সঞ্চয় করিলে জাতীয় ভিত্তি দৃঢ় হয় ইহাই সমাজ-বিজ্ঞানের মূল সূত্র। অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক ক্ষেত্রে বাঙালী শক্তিমান ও আত্মনির্ভরশীল হইলে সারা ভারতের যে অশেষ কল্যাণ সে করিতে পারিবে, দুর্ব্বল বাঙালী তাহা পারিবে না। কাজেই বাঙালীর আত্মপ্রতিষ্ঠা ও স্বাবলম্বনের প্রয়াসকে প্রাদেশিকতা বলিয়া উড়াইয়া দিলে মহা ভ্রম করা হইবে, সাম্রাজ্যবাদী, সাম্প্রদায়িকতাবাদী, প্রাদেশিকতাবাদী যে কূট-কৌশলে বাঙালীকে ধ্বংসের পথে পরিচালিত করিতেছে সেই অতল গহ্বরের দিকেই তাহাকে ঠেলিয়া দেওয়া হইবে।

তারপর মন্ত্রিমণ্ডল গঠনের প্রশ্ন। ১৯৩৭ সালে কংগ্রেস লীগকে কোণঠাসা করিয়া প্রজাদলের সহিত কোয়ালিশন না করিয়া যে ভুল করিয়াছিল এবার লীগের সহিত কোয়ালিশন করিতে চলিয়া ঠিক সেই ভুলেরই পুনরাবৃত্তি করিতে উদ্যত হইয়াছে। সেদিন কংগ্রেসের অসহযোগ ও নিষ্ক্রিয়তা বাংলায় তথা সারা ভারতে লীগকে প্রচণ্ড শক্তি সঞ্চয়ের সুযোগ করিয়া দিয়াছে, আজ কংগ্রেস লীগের সহিত মিলিয়া তাহার সকল

দুষ্কর্মের অংশীদার হইয়া তাহাকে আরও শক্তি সংগ্রহের পথ করিয়া দিতে চলিয়াছেন। লীগের দুর্নীতি সুবিদিত। লক্ষ লক্ষ টাকা ব্যয় করিয়া যাহারা লীগ টিকিটে নির্বাচিত হইয়াছে তাহারা মাসিক দেড়শত টাকা বেতন ও পরিষদ অধিবেশনের সময়ের দৈনিক সাড়ে বার টাকা ভাতায় আশায় আসে নাই। এই টাকা সুদে আসলে তুলিবার চেষ্টা তাহারা করিবেই। সুতরাং লীগ মন্ত্রিদে এবার আরও প্রবলভাবে দুর্নীতি চলিবে। রোলাণ্ড কমিটির সুপারিশ অনুসারে সিভিল সার্ভিস ও পুলিসের উপর মন্ত্রিমণ্ডলের ক্ষমতা হ্রাস করিবার সকল আয়োজন সম্পূর্ণ হইয়া গিয়াছে। রাজনৈতিক ক্ষমতা অতঃপর সম্পূর্ণরূপে থাকিবে শেতাঙ্গ সিভিলিয়ানদের হাতে, মন্ত্রীদের যথেচ্ছ দুর্নীতির দ্বারা পোষাইয়া লইবার সুযোগ দেওয়া হইবে। এই অবস্থায় কংগ্রেস মন্ত্রিমণ্ডলে যোগদান করিলে দেশের কোন উন্নতি করিতে তো পারিবেনই না, নিজেরাও সেই দুর্নীতির অংশভাগী হইয়া পড়িবেন। এবার কংগ্রেস মনোনয়ন যাঁহাদিগকে দেওয়া হইয়াছে তাঁহাদের মধ্যে সকলেই কিছু সন্দেহের অতীত নহেন, কয়েকজনের অতীত কার্য্যকলাপে দুর্ব্বলতার ছাপ আছে। কর্পোরেশনে এই শ্রেণীর কংগ্রেসওয়ালাদের যে কার্য্যকলাপ দেখা গিয়াছে মন্ত্রিমণ্ডলে প্রবেশাধিকার পাইলে তাহা হইতে ভিন্ন রূপ ইঁহারা ধারণ করিবেন কি করিয়া, তাহা আমরা বুঝিতে পারিতেছি না। কংগ্রেসের কর্ম্মীদের উপর দেশবাসীর যেটুকু আস্থা আজও আছে, লীগের সহিত মন্ত্রিমণ্ডলে যোগ দিলে তাহাও নিঃশেষ হইবে ইহাই আমাদের আশঙ্কা। কংগ্রেস বিরোধী দলে থাকিয়া কংগ্রেস কমিটিগুলির সাহায্যে লীগের দুর্নীতি প্রকাশ এবং আদালত ও সংবাদপত্রের সহায়তায় প্রতিকারের চেষ্টা করিলে অধিকতর সুফল লাভের সম্ভাবনা ছিল কিনা তাহাই নেতৃবর্গের বিবেচ্য।

ক্যাবিনেট মিশনের মীমাংসা প্রয়াস

গত কয়েক সপ্তাহ যাবৎ দিল্লীতে ক্যাবিনেট মিশন যে নেতৃবৃন্দের সহিত আলোচনা চালাইতেছেন তাহা প্রধানতঃ হিন্দু-মুসলমান সমস্যা লইয়াই চলিতেছে বলিয়া মনে হইতেছে। বিভিন্ন সূত্রে যে সব সংবাদ পাওয়া গিয়াছে তাহাতে জানা যায় তাঁহাদের প্রস্তাব মোটামুটি ভাবে এইরূপ: (১) মিঃ জিন্নার পাকিস্থানের দাবি মূলতঃ মানিয়া লওয়া হইবে, (২) হিন্দুস্থান ও পাকিস্থানের জন্য দুইটি পৃথক কেন্দ্রীয় গবর্মেণ্ট থাকিবে, (৩) উভয় কেন্দ্রীয় গবর্মেণ্টের উপর দেশরক্ষা ও বৈদেশিক নীতি নিয়ন্ত্রণের জন্য একটি সিকিউরিটি কাউন্সিল থাকিবে এবং (৪) শাসনতন্ত্র রচনার জন্য গণপরিষদ একটিই হইবে বটে, তবে উহাতে দুইটা খোপ থাকিবে, গণপরিষদের হিন্দু সদস্যেরা হিন্দুস্থানের এবং মুসলমানেরা পাকিস্থানের শাসনতন্ত্র রচনা করিবেন। এই অপূর্ব্ব তিনতলা রাষ্ট্রবিধির প্রস্তাব সত্য হইলে উহা গ্রহণযোগ্য বলিয়া আমরা মনে করি না। তবে মিঃ জিন্নার মুখরক্ষা হিসাবে (face saving dovicc) এরূপ প্রস্তাব আলোচিত হইতেছে ইহা বিশ্বাস করিবার কারণ আমাদের আছে।

পাকিস্থান মানিয়া লওয়ায় আমরা ঘোর বিরোধী। সব মুসলমান পাকিস্থান চায় না, একটা দল-বিশেষ উহার দাবি তুলিয়াছে। মুসলীম লীগ কনভেনশনে লীগ-নেতাদের বক্তৃতায় যে মনোভাব প্রকাশিত হইয়াছে তাহাতে পাকিস্থানের অন্তর্ভুক্ত সংখ্যালঘু হিন্দুরা যে অল্পদিনের মধ্যেই নিঃশেষে ধ্বংস হইবে তাহা নিঃসন্দেহ। আর্য্যসমাজের ধর্মগ্রন্থে মুসলমান ধর্ম সম্বন্ধে বিরূপ মন্তব্য দিল বলিয়া উক্ত গ্রন্থ লইয়া তুমুল আন্দোলন যাহারা করিয়াছে, লীগ কনভেনশনে তাহারাই হিন্দু ধর্ম এবং হিন্দু সমাজ-ব্যবস্থাকে কটূক্তি করিয়া সেই কটূক্তি প্রস্তাবের অঙ্গীভূত করিতেও দ্বিধা করে নাই। নিম্ন শ্রেণীর হিন্দু হইতে ধর্মান্তরিত হইয়া যাহারা মুসলমান হইয়াছে তাহারা নিজেদের শাসক জাতি এবং শাসন ক্ষমতায় শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপন্ন করিবার জন্য জোর গলায় বক্তৃতা করিতে কুণ্ঠিত হয় নাই। এই কনভেনশনে মিঃ জিন্না, মিঃ সুরাবর্দী, মিঃ খালিকুজ্জমান এমন কি বেগম শাহ্ নওয়াজ পর্য্যন্ত যে মনোবৃত্তির পরিচয় দিয়াছেন আমরা জানি না ভদ্র ইংরেজ তাহা পরিপাক করিয়া কেমন করিয়া আবারও ইহাদের জন্য face saving device-এর কথা তুলিবে।

পাকিস্থানের দাবি প্রথমে সুরু হয় ধাপ্পা হিসাবে ১৯৪০ সালে। তারপর উহা দরকষাকষির একটা অস্ত্র হিসাবে ব্যবহৃত হয়। এখন পাকিস্থান না হইলে মিঃ জিন্নার অনুচরবৃন্দ ধুলায় প্রাণ লুটাইয়া দিবেন বলিয়া শপথ করিতে আরম্ভ করিয়াছেন। দাঙ্গার ভয় দেখাইয়া পাকিস্থান আদায়ের এই চেষ্টায় হিন্দু ভীত হইবে না, হয়ও নাই, কিন্তু এই অছিলার সুযোগে ইংরেজ মন্ত্রিমিশনের যৌক্তি ব্যর্থ করে কি না তাহাই বর্তমানে দ্রষ্টব্য। দেশের বিচক্ষণ রাজনীতিবিদ সর তেজবাহাদুর সপ্রু স্পষ্টই বলিয়াছেন, মিঃ জিন্নার সহযোগিতা যদি পাওয়া যায় ভাল, নতুবা তাঁহাকে বাদ দিয়াই অস্থায়ী কেন্দ্রীয় গবর্মেণ্ট গঠনে প্রবৃত্ত হইতে হইবে এবং ঐ গবর্মেণ্টের হাতেই ভাবী শাসনতন্ত্র রচনার ভার ছাড়িয়া দিতে হইবে। বিলাতে মিড্‌লটন মারের ন্যায় মনীষীও ঠিক এই কথাই বলিয়াছেন। মুসলমানদের ধর্ম, সংস্কৃতি, শিক্ষা, প্রভৃতি সমস্ত বিষয়ের জন্য উপযুক্ত রক্ষা-কবচের ব্যবস্থা করিতে হিন্দু সর্ব্বদা প্রস্তুত আছে, কিন্তু কয়েকটি শর্ত্তে তাহা করিতে হইবে: (১) ভারতবর্ষ কোনরূপে খণ্ডিত হইবে না, (২) সমগ্র ভারতবর্ষে একটিমাত্র কেন্দ্রীয় গবর্মেণ্ট থাকিবে, (৩) একটিমাত্র গণপরিষদ ভাবী শাসনতন্ত্র রচনা করিবে এবং (৪) যুক্ত নির্ব্বাচন-প্রথা সকল স্তরের ও সর্ব্বশ্রেণীর নির্ব্বাচনে পুনঃপ্রবর্ত্তিত হইবে।

কংগ্রেস-নায়কদের কাহারও কাহারও উক্তিতে প্রকারান্তরে ইহার নাম না করিয়া পাকিস্থান দাবি মিটাইবার ইচ্ছা লক্ষিত হইতেছে। ইহার মধ্যে পণ্ডিত জবাহরলালের ১৫ পার্সেণ্ট পাকিস্থান মিটাইবার অভিপ্রায় সর্ব্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য। ক্যাবিনেট মিশনের যে প্রস্তাবের কথা পূর্ব্বে উল্লিখিত হইয়াছে তাহার সহিত পণ্ডিতজীর ১৫ পার্সেণ্টের বিশেষ অমিল নাই। সর্দার প্যাটেল পাকিস্থানের বিরুদ্ধে মত প্রকাশ করিয়াছেন কিন্তু ধর্মের ভিত্তিতে মুসলমান প্রধান অঞ্চলগুলির সীমানা পুনর্নির্ধারণ করিতে তিনিও সম্মত আছেন। গান্ধীজী পাকিস্থান দাবি করা পাপ বলিয়াছেন কিন্তু রাজাগোপালাচারীর যে প্রস্তাব

সর্দার প্যাটেল গ্রহণযোগ্য বলিয়াছেন সেই ধরণের modified পাকিস্থানের বিরুদ্ধে তিনি কিছু বলেন নাই, পূর্ব্বে রাজাগোপাল-প্রস্তাব তিনিও সমর্থনই করিয়াছিলেন। তাহার ভিত্তিতে প্রদেশের সীমা নির্দ্ধারণ যুক্তিসঙ্গত কিন্তু ধর্ম্মের ভিত্তিতে উহা করিতে গেলেই পাকিস্থানের মূলনীতি স্বীকার করিয়া লওয়া হইবে। কংগ্রেস-নেতাদের কথায় বাঙালী হিন্দুর আশ্বস্ত হইবার কারণ আছে বলিয়া আমরা মনে করিতে পারিতেছি না। লীগকে ব্রিটিশ গবর্মেণ্ট এতদিন যে সাহায্য ও সহানুভূতি করিয়া আসিতেছেন এবং কংগ্রেস যে ভাবে উহাকে তোষণ করিয়াছেন তাহা বর্জ্জন করিলে অল্প দিনের মধ্যেই লীগ নেতারা প্রকৃতিস্থ হইবার সুযোগ পাইবেন। প্রাদেশিক নির্ব্বাচনে পাকিস্থানের ধুয়া তুলিয়া লীগ অধিক সংখ্যায় নির্ব্বাচিত হইয়াছে বলিয়াই সব মুসলমান পাকিস্থানের অর্থ বুঝিয়াছে বা সত্যই উহা চায় ইহা মনে করিবার কারণ আমরা খুঁজিয়া পাইতেছি না। ব্ল্যাকমার্কেটের টাকা, গুণ্ডামি, সরকারী সাহায্য এবং ধর্ম্মান্ধতার প্রশ্রয় দান এই চারিটি কারণেই লীগ এত অধিকসংখ্যক প্রতিনিধি নির্ব্বাচিত করিতে পারিয়াছে। একদল নবাব, জমিদার প্রভৃতি প্রভুত্ব-লোভী লোকের রাজনৈতিক অভিসন্ধি এবং কোটি কোটি ধর্ম্মান্ধ অজ্ঞ ও নিরক্ষর লোকের ভোটের অর্থ ও উদ্দেশ্য এক ইহা মনে করা যায় না।

আজ আমাদের একথা ভুলিলেও চলিবে না যে ক্যাবিনেট মিশন এদেশে স্বেচ্ছায় আসে নাই, বাধ্য হইয়াই আসিয়াছে। কংগ্রেসের পিছনে আজ যে 'ভাংসন' আছে, যে গণ-সহানুভূতি আছে, তাহার শক্তি অপরিমিত। কংগ্রেসের হাতে অস্ত্র নাই, কিন্তু যে গণ-শক্তি আছে তাহাকে উপেক্ষা করিবার উপায় নাই। সৈন্য ও পুলিসের সাহায্যে ভারতবাসীকে পদানত রাখা আর সম্ভব নয়, ইংরেজ ইহা গত কয়েক বৎসরের ঘটনায় ভাল করিয়াই বুঝিয়াছে। ১৯৪২-এর আন্দোলন, ভারতের বাহিরে সুভাষচন্দ্র কর্ত্তৃক আজাদ হিন্দ ফৌজ ও স্বাধীন ভারত গবর্মেণ্ট প্রতিষ্ঠা এবং ভারতে সৈন্য ও পুলিসের মধ্যে চঞ্চলতার দ্বারা প্রমাণিত হইয়াছে যে ভারতবাসী আর ইংরেজের অধীনে পশুজীবন যাপন করিতে প্রস্তুত নয়। কংগ্রেসের নির্দ্দেশে ও পরিচালনাধীনে এই বিপুল গণ-শক্তির অভ্যুত্থান ঘটিলে তাহা রোধ করিবার ক্ষমতা ইংরেজের নাই। এই শক্তি সম্বন্ধে কংগ্রেসেরও সচেতন হওয়া দরকার। ক্যাবিনেট মিশন বলিয়াছেন ভারতবর্ষের স্বাধীনতা তাঁহারা স্বীকার করিয়া লইয়াছেন। স্বীকার করিতে তাঁহারা বাধ্য, কিন্তু এই স্বীকারোক্তি যদি আন্তরিক ও সহজাত হয় তবে এখনও হিন্দু-মুসলমানের সাময়িক বিরোধের সুযোগে তাঁহারা কূট কৌশল প্রয়োগে ব্যস্ত কেন? কংগ্রেস আত্মশক্তিতে বিশ্বাসী হইলে ইঁহাদের সকল কূট কৌশল ও চক্রান্ত ব্যর্থ হইয়া যাইবে।

বাংলার বাজেট

করদাতার টাকা অপচয়ের পরিণাম কি হইতে পারে ১৯৪৬-৪৭ সনের বাংলার বাজেট তাহারই প্রমাণ। এই বাজেট প্রকাশ করিতে গিয়া গবর্ণর বিগত কয় বৎসরের লোকসানের যে হিসাব দিয়াছেন তাহা নিম্নরূপ:

১৯৪৩-৪৪	২,৭৩,৬৭,০০০৲
১৯৪৪-৪৫	৪,৭৩,১৪,০০০৲
১৯৪৫-৪৬	৭,৪৫,৫৮,০০০৲
১৯৪৬ ৪৭	৯,৪৬,৩৫,০০০৲
	২৪,৩৮,৭৪,০০০৲

বিবরণ এইখানেই শেষ নহে। ১৯৪৪-৪৫ সালের ঘাট্‌তি মিটাইতে কেন্দ্রীয় সরকার যে ৭ কোটি টাকা বাংলা-সরকারকে দিয়াছিলেন তাহাও ইহার মধ্যে ধরিতে হইবে। কাজেই দেখা যাইতেছে এই চার বৎসরে (বর্ত্তমান বৎসর লইয়া) বাংলা দেশে ৩১ কোটি টাকারও বেশী লোকসান হইয়াছে। খাজা নাজিমুদ্দিনের নেতৃত্বে লীগ মন্ত্রিমণ্ডল যে দুর্নীতি কায়েম করিয়াছিল দুই বৎসর লীগ মন্ত্রিত্বের পর ৯৩ ধারার আমলেও তাহার অবসান ঘটে নাই। লীগ মন্ত্রিসভা দুই বৎসর ধরিয়া দেশবাসীকে মৃত্যুর দিকে লইয়া গিয়াছে, আর সিভিল সার্ভিসের কর্ম্মচারীরা বাকী এক বৎসরে সেই মৃত্যুকে আরো নিকটে টানিয়া আনিয়াছে।

১৯৪৬-৪৭ সালের যে বাজেট গবর্ণর বারোজ প্রকাশ করিয়াছেন তাহাতে দেখা যায় এই বৎসরের ঘাট্‌তি হইবে সাড়ে নয় কোটি টাকা। আয়ের অঙ্ক মোটামুটি একচল্লিশ কোটি টাকা এবং ব্যয়ের পরিমাণ পঞ্চাশ কোটি টাকারও বেশী।

এখন প্রশ্ন যে এই ব্যয়ের বরাদ্দ কোন্ কোন্ কাজের জন্য হইয়াছে। বাজেটে পুনর্গঠনের পরিকল্পনাগুলিকে সাড়ম্বরে প্রচার করা হইয়াছে। এই বরাদ্দের ব্যবস্থা ও পরিমাণকে একটু ভাল করিয়া বিশ্লেষণ করিলেই বাংলা-সরকারের অপচয়ের ব্যাপার ধরা পড়িবে। যে সব কাজে কণ্ট্রাক্টরী করিয়া অসদুপায়ে কাঁচা পয়সা পাওয়া যায় সেই সব কাজেই টাকা বেশী বরাদ্দ হইয়াছে। মাত্র কয়েকটি বিষয় আলোচনা করিলেই ইহা পরিষ্কার হইবে।

দেশের বিরাট্ সমস্যা সর্ব্বগ্রাসী ম্যালেরিয়া। অথচ ম্যালেরিয়া নিবারণের জন্য বরাদ্দ হইয়াছে মাত্র তিন লক্ষ টাকা। ঠিক একই নীতিতে প্রসূতি ও শিশুমৃত্যু নিবারণের জন্য বরাদ্দ হইয়াছে মাত্র দেড় লক্ষ টাকা। অথচ পুলিসের বাড়ি তৈরির জন্য ত্রিশ লক্ষ টাকা এবং জল পুলিসের মোটর-বোট কিনিবার জন্য সাড়ে উনিশ লক্ষ টাকা বরাদ্দ হইয়াছে।

দামোদর-পরিকল্পনার জন্য ১০ লক্ষ টাকা বরাদ্দ করা হইয়াছে এবং ছোটখাট সেচ-ব্যবস্থার জন্য ৬০ লক্ষ টাকা। প্রথমটি সম্পর্কে আমরা বিশেষ কোন আপত্তি করিতেছি না, কিন্তু খাল, কূপ, পুকুর প্রভৃতি পরিষ্কারের নামে সাধারণতঃ যে ভাবে অপচয় হয় এই ষাট লক্ষ টাকা সেই ভাবে নষ্ট না হইলেই আমরা খুশী হইব। আমাদের আশঙ্কা এই সব সেচ-ব্যবস্থার নামে টাকাই জলের মত খরচ হইবে, জল আর পাওয়া যাইবে না।

সর্ব্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য বরাদ্দ হইয়াছে হরিণঘাটার গরু লইয়া গবেষণা এবং প্রজনন-কেন্দ্র স্থাপনের জন্য। বাড়ী তৈরি বাবদ পঁয়তাল্লিশ লক্ষ টাকা এবং অন্যান্য কাজের জন্য ষোল লক্ষ ষাট হাজার টাকা বরাদ্দ হইয়াছে। গবেষণার নামে এই পরিহাসের অর্থ কি হইবে? হরিণঘাটা পল্লীর পরিবারবর্গকে ভিটামাটি

ছাড়িয়া অসহায় হইতে হইবে এবং সেইখানে নবনির্ম্মিত প্রজনন কেন্দ্রে রাজনৈতিক ও সাম্প্রদায়িক কারণে এক দল অপদার্থ কর্ম্মচারীর অন্ন-সংস্থানের ব্যবস্থা হইবে।

এই বৎসরের শেষে গবর্ণমেণ্টের দেনার পরিমাণ থাকিবে বিপুল। এই দেনার আছে জনসাধারণের নিকট ট্রেজারী বিল বাবদ সাড়ে সাত কোটি টাকা, ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্কের নিকট প্রায় ২০ কোটি টাকা এবং ভারত-সরকারের নিকট প্রায় ১০ কোটি টাকা। বর্ত্তমান বাজেট অনুসারে কাজ হইলে আগামী বৎসরান্তে দেনার পরিমাণ অনেক বাড়িয়া যাইবে, কারণ ট্রেজারী বিলের পরিমাণ বাড়িয়া সাড়ে পনর কোটি টাকায় দাঁড়াইবে। এই টাকা খরচ হইয়াছে গবর্ণমেণ্টের ধান চাউল লবণ চিনি ও নৌকার ব্যবসায়ে। বাংলা-সরকার আশা করেন যে গুদামজাত এই সব জিনিষ বিক্রয় করিয়া অধিকাংশ টাকাই উঠিয়া আসিবে। আমাদের কিন্তু আশঙ্কা হয় যে এই টাকার অনেক অংশই পাওয়া যাইবে না। গুদামের রক্ষণব্যবস্থার যেরূপ তথ্য এই পর্য্যন্ত প্রকাশিত হইয়াছে এবং যে পরিমাণ খাদ্য এই পর্য্যন্ত পচিয়া নষ্ট হইয়া গিয়াছে তাহাতে ভবিষ্যতে গুদামজাত দ্রব্যের অবস্থা অনুমান করা কঠিন নয়।

বাংলা দেশে ট্যাক্স ধার্য্য করিবার যে রীতি তাহাতে দরিদ্র জনসাধারণের সর্ব্বনাশ ক্রমশঃই নিশ্চিত হইতেছে এবং তাহাদের অবস্থা আরও শোচনীয় হইতে চলিয়াছে। বাংলা দেশের প্রাদেশিক ট্যাক্স ১৯৩৯-৪০ সালের ৯ কোটি টাকা হইতে ১৯৪৫-৪৬ সালে ২৪৷ কোটি টাকায় দাঁড়াইয়াছে, এবং এই বৃদ্ধির মূলে রহিয়াছে দরিদ্র জনসাধারণকে শোষণ। কেন্দ্রীয় সরকার হইতে সাহায্য ছাড়া বাংলার প্রয়োজন মিটিবে না। বাংলা দেশের প্রতি সুবিচার করিতে হইলে ভারত-সরকারের বেশী অর্থ-সাহায্য করা নিতান্তই প্রয়োজন। বাংলার আর্থিক দুর্দ্দশার একটা বড় কারণ যুদ্ধ এবং এই যুদ্ধের প্রধান দায়িত্ব কেন্দ্রীয় সরকারের এ কথা ভুলিলে চলিবে না।

নির্ব্বাচন প্রহসন

কেন্দ্রীয় ব্যবস্থা-পরিষদের নির্ব্বাচনের সময় হইতেই বাংলায় মুসলিম লীগ গুণ্ডামির চূড়ান্ত শুরু করিয়াছিল এবং সরকারী কর্ম্মচারিগণ নির্লিপ্ত দর্শকরূপে দাঁড়াইয়া থাকিয়া লীগ গুণ্ডাদের প্রশ্রয় দিয়া আসিতেছিলেন। প্রাদেশিক নির্ব্বাচনের সময় এই গুণ্ডামি একেবারে চরমে উঠিয়াছিল এবং কোন কোন ইংরেজ ও মুসলমান সরকারী কর্ম্মচারীর বিরুদ্ধে প্রকাশ্যে পক্ষপাতিত্বের অভিযোগ হইয়াছিল।

সম্প্রতি মৌলানা আবুলকালাম আজাদ এক বিবৃতিতে বলিয়াছেন যে নির্ব্বাচনে লীগের গুণ্ডামি ও সরকারী কর্ম্মচারীদের পক্ষপাতিত্ব কোন প্রদেশবিশেষে সীমাবদ্ধ ছিল না; জাতীয়তাবাদী দলগুলির বিরুদ্ধে সীমান্ত প্রদেশ হইতে বাংলা দেশ পর্য্যন্ত ভারতবর্ষের সকল স্থানেই লীগ ও সরকারী কর্ম্মচারীদের মধ্যে লীগকে জয়যুক্ত করিবার জন্য যেন একটা আন্তঃপ্রাদেশিক ষড়যন্ত্র হইয়াছিল। বাংলার নির্ব্বাচন সম্বন্ধে মৌলানা সাহেবের বিবৃতি প্রকাশের পর মিঃ শহীদ সুরাবর্দ্দী তাহার প্রতিবাদ করিয়াছেন কিন্তু সে প্রতিবাদে কোন যুক্তি নাই, আছে মিথ্যা কটূক্তি। মিঃ সুরাবর্দ্দী বলিয়াছেন নির্ব্বাচনে পক্ষপাতিত্ব যে সব সরকারী কর্ম্মচারী করিয়াছে তাহারা মুসলমান নয়, হিন্দু—কংগ্রেসের হইয়া তাহারা কাজ করিয়াছে। নির্ব্বাচনের সময় মুসলমান কর্ম্মচারীদের পক্ষপাতিত্ব সম্বন্ধে প্রকাশ্য অভিযোগ হইয়াছে, অনেকের বিরুদ্ধে লাট-সাহেবের নিকট টেলিগ্রাম প্রভৃতিও গিয়াছে, কিন্তু কোন হিন্দু কর্ম্মচারীর নামে এরূপ প্রকাশ্য অভিযোগ হয় নাই। দেশের সমস্ত সংবাদপত্রে লীগদলের গুণ্ডামির অসংখ্য সংবাদ একটি একটি করিয়া প্রকাশিত হইয়াছে, লীগ মুখপত্রগুলিতে জাতীয়তাবাদীদলের বিরুদ্ধে কোন গুরুতর অভিযোগ প্রকাশিত হয় নাই, দুই-চারিটা সামান্য ঘটনা ফলাও করিয়া জাহির করা হইয়াছে এই মাত্র মিঃ সুরাবর্দ্দীর বিবৃতির প্রতিবাদ করিয়াছেন তিন জন—মৌলবী ফজলুল হক, মৌলানা আমেদ আলী এবং মৌলবী আশরাফউদ্দীন আমেদ চৌধুরী। ইঁহারা সকলেই লীগের গুণ্ডামির অনেক দৃষ্টান্ত দিয়াছেন। মিঃ সুরাবর্দ্দীকে সমর্থন করিয়া দৈনিক আজাদ ২৫শে চৈত্র তারিখে যে সম্পাদকীয় প্রবন্ধ লিখিয়াছেন তাহাতে তাঁহারাও বাংলা দেশে লীগের বিরুদ্ধে কংগ্রেসের বা জাতীয়তাবাদী মুসলমানদের নামে গুণ্ডামির একটি অভিযোগও আনিতে পারেন নাই।

লীগের বিরুদ্ধে বাংলাদেশে প্রধানতঃ অভিযোগ হইতেছে (১) নেতাদের উপর আক্রমণ, (২) ভোটারদের এবং জাতীয়তাবাদী মুসলমানদের সাহায্যকারীদের উপর আক্রমণ, (৩) বলপ্রয়োগে সভাভঙ্গ এবং (৪) গৃহদাহ। সরকারী কর্ম্মচারীদের, বিশেষতঃ পুলিস ও ম্যাজিষ্ট্রেটদের, বিরুদ্ধে অভিযোগ এই যে (১) তাঁহারা এই গুণ্ডামি বন্ধ করিবার কোন চেষ্টা করেন নাই, (২) সামান্য অছিলায় লীগ বিরোধী মুসলমানদের উপর গুলী চালাইতেও দ্বিধা করেন নাই, (৩) জাতীয়তাবাদী নেতাদের আক্রান্ত হইতে দেখিয়াও নিষ্ক্রিয় ছিলেন এবং (৪) ভোট গ্রহণ কেন্দ্রের গোপনতা রক্ষা করেন নাই। মৌলবী আশরাফউদ্দীন চৌধুরী তাঁহার বিবৃতিতে বলিয়াছেন যে পুলিসের সম্মুখে লীগ গুণ্ডারা মৌলানা হোসেন আমেদ মাদানীকে আক্রমণ করিলে তাহাদের বাধা দেওয়া হয় নাই। জেলা কংগ্রেস কমিটির সম্পাদক ডাঃ নৃপেন্দ্রনাথ বসু এক গুণ্ডাকে হাতে হাতে ধরিয়া তাহাকে পুলিসের হস্তে সমর্পণ করিলেও পুলিস কিছু করে নাই। ইতিপূর্ব্বে মৈমনসিংহ জেলার নকলা-গাঁওয়ের ঘটনায় দেখা গিয়াছে পুলিস সামান্য অছিলায় কৃষক-প্রজা দলের লোকের উপরে গুলি চালাইয়াছে এবং লীগের সভা যাহাতে নির্ব্বিবাদে হইতে পারে সেজন্য সভামণ্ডপ পাহারা দিয়াছে। প্রকাশ্য দিবালোকে চট্টগ্রামে মৌলানা মণিরুজ্জমান ইসলামাবাদীর ঘরে আগুন দেওয়া হইয়াছে, পুলিস আজ পর্য্যন্ত গুণ্ডাদের ধরিবার কোন চেষ্টা করে নাই। লীগ-বিরোধী মুসলমান নেতাদের উপর আক্রমণের বহু ঘটনার উল্লেখ করা হইয়াছে এবং তার একটিরও প্রতিবাদ লীগ নেতারা করিতে পারেন নাই।

ভোট গ্রহণ কেন্দ্রে যাহা ঘটিয়াছে, মৌলবী আশরাফউদ্দীন তাহার বিবরণ দিয়াছেন। তিনি বলিতেছেন যে ভোট গ্রহণের দিন প্রায় প্রত্যেক কেন্দ্রে ভারপ্রাপ্ত কর্ম্মচারীরা লীগের সহিত সহযোগিতা করিয়াছে। ভোট গ্রহণের গোপনতা আদৌ

রক্ষিত হয় নাই। পর্দা তুলিয়া, পর্দায় ছিদ্র করিয়া অথবা বেড়ার উপর চড়িয়া কে কোন্ দিকে ভোট দেয় তাহা লক্ষ্য করা হইয়াছে। লীগের বিরুদ্ধে ভোট দিয়া ধরা পড়িলে গুণ্ডার হাতে প্রহার, অঙ্গহানির ভয় তো আছেই তার চেয়েও বড় ভয় অন্নবস্ত্রে বঞ্চিত হওয়ার আশঙ্কা। মফস্বলে প্রায় সমস্ত ফুড কমিটি লীগ কর্তৃক অধিকৃত এবং অন্নবস্ত্র বিতরণের ভার ইহাদের হাতে। লোকে জানে লীগের বিরুদ্ধে ভোট দিয়া ধরা পড়িলে গ্রামে আর অন্নবস্ত্র মিলিবারও উপায় থাকিবে না।

মৌলানা আজাদ নির্বাচনে গুণ্ডামির অভিযোগগুলির সত্যাসত্য যাচাই করিবার জন্য একটি নিরপেক্ষ ও প্রকাশ্য তদন্তের ব্যবস্থা করিতে বলিয়াছেন। লীগের বিরুদ্ধে যে সব অভিযোগ উঠিয়াছে এরূপ তদন্ত ভিন্ন লোকে তাহা অবিশ্বাস করিবে না। বাংলা-সরকার এই তদন্তে রাজি হইবেন বলিয়া আমরা মনে করিতে পারিতেছি না। মেদিনীপুরের ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ গাঁর বিরুদ্ধে অতি গুরুতর অভিযোগ থাকা সত্ত্বেও হার্কার্টের গবর্মেণ্ট প্রকাশ্য তদন্তে সম্মত হন নাই। এ ক্ষেত্রেও সরকারী কর্মচারীদের কীর্ত্তিকলাপ প্রকাশ হইয়া পড়িবার আশঙ্কায় বাংলা সরকার তদন্তে বাধা দিবেন বলিয়াই আমাদের বিশ্বাস।

কুইনাইন

বিদেশী বণিকের স্বার্থরক্ষার জন্য ভারত-সরকার এ দেশের লোককে মৃত্যুর মুখে ঠেলিয়া দিতেও যে কুণ্ঠিত হন না তার প্রকৃষ্ট দৃষ্টান্ত কুইনাইন। ওলন্দাজ কিম্বা যুরোপীয় স্বার্থরক্ষার জন্য এদেশে কুইনাইন উৎপাদন সর্ব্বদা দাবাইয়া রাখা হইয়াছিল, ভারতবর্ষে প্রচুর পরিমাণে কুইনাইন উৎপাদনের সর্ব্ববিধ সুযোগ থাকা সত্ত্বেও ভারতবাসীকে ম্যালেরিয়ার এই মহৌষধের জন্য ডাচ ইষ্ট ইণ্ডিজের দিকে তাকাইয়া থাকিতে হইত। জাপান এই দ্বীপপুঞ্জ অধিকার করিবার পর ভারত-সরকার ভারতবর্ষে কুইনাইন উৎপাদন বৃদ্ধির চেষ্টা করিতে বাধ্য হন, কিন্তু ইহাতে তাঁহাদের মন ছিল না বলিয়া ভারতীয় কুইনাইনের পরিমাণ বিশেষ বাড়ে নাই। জনমত প্রবল হইয়া উঠিতে দেখিয়া মংপুর কুইনাইন উৎপাদন কেন্দ্র কতকটা বাড়ান হয় কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে অন্য দিক দিয়া ডাচ ও ইংরেজ বণিকদের কুইনাইনের ব্যবসায় সচল রাখিবার উপায় আবিষ্কৃত হয়। যুদ্ধের সময় কুইনাইনের অভাব যখন অত্যন্ত তীব্র হইয়া উঠিয়াছিল তখন কুইনাক্রিন, মেপাক্রিন প্রভৃতি বিদেশী ঔষধ আমদানী শুরু হয় এবং বাংলা-সরকার লক্ষ লক্ষ টাকার ঐসব ঔষধ কিনিয়া বিদেশী বণিকদের সাহায্য করেন। দুর্ব্বল ও অনশনক্লিষ্ট দেহে কুইনাক্রিন ও মেপাক্রিন প্রয়োগের ফলাফল শুভ হইবে কিনা এ সম্বন্ধে সকল চিকিৎসক একমত হইতে না পারা সত্ত্বেও বাংলা-সরকার পরম উৎসাহে ঐগুলি কিনিয়া কতক বিনামূল্যে বিতরণ করিতে ও কতক বিক্রয় করিতে শুরু করিলেন।

এই সব বিদেশী ঔষধ চালাইবার জন্য সরকার দেশে কুই-নাইন উৎপাদন কমাইবার উদ্দেশ্যে সম্প্রতি আর এক কৌশল অবলম্বন করিয়াছেন। শোনা যাইতেছে যে, মংপুর কুইনাইন কারখানায় ১৯৪৫-৪৬ সালে প্রায় ১১৫ হাজার পাউণ্ড কুইনাইন উৎপন্ন হয়, কিন্তু তাহার মধ্যে মাত্র ৪১ হাজার পাউণ্ড বিক্রয় হয় অবশিষ্ট ৭৫ হাজার পাউণ্ড মংপুতেই পড়িয়া থাকে। কলিকাতায় গবর্মেণ্টের কুইনাইন ডিপোতেও হাজার হাজার পাউণ্ড কুইনাইন ক্রমেই জমিয়া চলিতেছে। এদিকে বৎসরে প্রায় দশ কোটি লোক ম্যালেরিয়ায় ভোগে এবং প্রায় এক কোটি এই রোগে মরে। চিকিৎসকেরা হিসাব করিয়া দেখিয়াছেন গবর্মেণ্টের হাতে এক লক্ষ পাউণ্ড কুইনাইন জমিয়া থাকায় অর্দ্ধ তিন কোটি রোগীর চিকিৎসা বন্ধ হওয়া।

বিদেশী বণিকদের হাতে যত দিন দেশের রাজনৈতিক ক্ষমতা থাকিবে তত দিন এই অসহনীয় অবস্থার উন্নতির কোন আশা নাই। ভারতবর্ষে বিলাতী কাপড় চালাইবার জন্য দেশী কাপড় উৎপাদন ও বিতরণ সম্বন্ধে যে কৌশল অবলম্বন করা হইয়াছে, কুইনাইনের বেলায়ও কি সেই প্রকার ব্যাপারই চলিতেছে?

কলিকাতায় মিলিটারী লরীর উপদ্রব

মিলিটারী লরীর উৎপাতে কলিকাতার রাজপথে চলাচলের বিপদ যুদ্ধাবসানে শেষ হওয়া দূরের কথা আরও বাড়িয়াই চলিয়াছে। যুদ্ধের সময় এই সব লরী যেরূপ বেপরোয়া গতিতে ধাবিত হইত এখন যেন তাহা আরও বাড়িয়াছে। গত কয়েক সপ্তাহের মধ্যে অনেকগুলি লোক লরী চাপা পড়িয়া নিহত হইয়াছে। গত চার বৎসর যাবৎ গবর্মেণ্ট এই ধরণের হত্যাকাণ্ড বন্ধ করিতে পারেন নাই ইহা লোকে দেখিয়াছে। ২২শে মার্চ একটি বালক লরী চাপা পড়িয়া নিহত হইলে পরে উত্তেজিত জনতা সেই লরীটিকে আটকাইয়া উহা পোড়াইয়া দেয়। এ সম্পর্কে গবর্মেণ্ট নিম্নলিখিত ইস্তাহারটি প্রকাশ করেন:

"গবর্মেণ্ট পরিষ্কার করিয়া বুঝাইতে চাহিতেছেন যে, এই ধরণের দুর্ঘটনার জন্য দায়িত্ব কাহার, তাহা স্থির করিবার জন্য গবর্মেণ্ট ও সামরিক কর্ত্তারা সর্ব্বদাই সচেষ্ট থাকিবেন। তাঁহারা প্রতিশ্রুতি দিতেছেন যখনই তাঁহাদের অনুসন্ধানের ফলে কোন সিভিলিয়ান বা মিলিটারী ড্রাইভার দুর্ঘটনার জন্য দায়ী বলিয়াই জানা যাইবে, তখনই অযথা কালবিলম্ব না করিয়া ফৌজদারী দণ্ডবিধি আইন অনুসারে তাহাকে গ্রেপ্তার করিয়া বিচারার্থ প্রেরণ করা হইবে। সঙ্গে সঙ্গে গবর্মেণ্ট ইহাও স্পষ্ট করিয়া জানাইতেছেন যে, এইরূপ ঘটনায় উত্তেজিত হইয়া দায়িত্বহীন জনতা যদি প্রতিষ্ঠিত আইনের অপেক্ষায় না থাকিয়া নিজেদের হাতে দণ্ডদানের অধিকার গ্রহণ করে অথবা অন্য কোন যানবাহনের ক্ষতি করে তাহা হইলে গবর্মেণ্ট কোন মতেই তাহা সহ্য করিবেন না।"

এই ইস্তাহার প্রকাশের পরদিনই রাত্রে লরী চাপা পড়িয়া একটি ভদ্রলোক নিহত হন। লরীটি বেপরোয়া গতিতে ছুটিতে-ছিল এবং দুর্ঘটনার সঙ্গে সঙ্গেই উহার পিছনের আলো নিবাইয়া দেওয়ায় কেহ উহার নম্বর পড়িতে পারে নাই। আজ পর্য্যন্ত এই লরী-চালক আবিষ্কৃত বা গ্রেপ্তার হইয়াছে বলিয়া কোন সংবাদ পাওয়া যায় নাই। ইহার চারি দিন পর ২৮শে মার্চ কেশব একাডেমির প্রধান শিক্ষক ধীরেন্দ্রনাথ সেন লরী চাপা পড়িয়া নিহত হন। তাঁহাকে চাপা দিয়াই লরীটি তীব্রবেগে অদৃশ্য হইয়া যায়। ঐ দিনই আর একটি লরী বার বছরের এক বালককে চাপা দিয়া মারিয়া ফেলিয়া নিশ্চিন্তে পলায়ন করে। ৩১শে মার্চ সকালে একটি লরী

এক বৃদ্ধ ভদ্রলোক ও তাঁহার ভৃত্যকে চাপা দেয়, অপরাহ্নে একটি বালককে সাইকেল হইতে ধাক্কা মারিয়া ফেলিয়া তাহাকে চাপা দিয়া হত্যা করে। এই ঘটনার পর সরকারী ইস্তাহারের উপর আস্থা রাখা আর লোকের পক্ষে সম্ভব হয় নাই, জনতা পুনরায় লরীটিকে আক্রমণ করিয়া পোড়াইয়া দেয় ও উহার ড্রাইভারকে প্রহার করে। ইহাই শেষ নয়, ইহার পর আরও অনুরূপ দুর্ঘটনা ঘটিতেছে।

গবর্ণেণ্ট "মব-রুল" সহ্য করিবেন না বলিয়া শাসাইয়াছেন কিন্তু গবর্ণেণ্ট যেখানে প্রজার প্রাণ রক্ষায় চূড়ান্ত অক্ষমতা দেখাইয়াছেন সেখানে লোকে হত্যাকারীর শাস্তিবিধানে অগ্রসর হইলে তাঁহারা তাহাদিগকে বাধা দিবেন কি বলিয়া? যুদ্ধ শেষ হইয়াছে এখন তীব্রবেগে শহরের উপর দিয়া লরী চালাইবার কোন কারণই নাই। লরী চাপা পড়িবার দোষ গবর্ণেণ্ট বরাবর পথচারীদের ঘাড়ে চাপাইবার চেষ্টা করিয়াছেন। এই জন্য তিন সপ্তাহ ব্যাপী পথ চলা শিক্ষাদানের আয়োজনের মাঝে বহু টাকাও তাঁহারা নষ্ট করিয়াছেন। কিন্তু ঐ তিন সপ্তাহের পূর্ব্বে দুর্ঘটনার সংখ্যা যাহা ছিল, উহার মধ্যেও তাহা কমে নাই, বরং ত বাড়িয়াছেই। ট্রাম কোম্পানী অনেক বার বলিয়াছেন যে, মিলিটারী লরীর ধাক্কায় তাঁহাদের এত গাড়ী নষ্ট হইয়াছে যে পূর্ণসংখ্যক ট্রাম গাড়ী চালু রাখা অসম্ভব; দিবা দ্বিপ্রহরের আলোয় প্রশস্ত রাজপথের মাঝের আলোর থাম, এমন কি ফুটপাথের উপরের দশ ফুট উচ্চ বাতির থাম তো মিলিটারী লরীর ধাক্কায় শত শত বার নষ্ট হইয়াছে, অথচ লোক চাপার জন্য দায়ী পথচারী, কিবা অপরূপ বিচার! আমরা বিশ্বাস করি যে পথচারীদের অত্যধিক সতর্কতার জন্যই দুর্ঘটনার সংখ্যা তবু কিছু কম হইতেছে। মোটরযানের সংখ্যার সহিত পথের দুর্ঘটনার অনুপাত করিয়া দেখিলে বোধ হয় দেখা যাইবে যে ইংলণ্ড ও আমেরিকার তুলনায় কলিকাতায় পাঁচ হইতে দশ গুণ অধিক লোক আহত ও নিহত হইতেছে।

কলিকাতার রাস্তায় ঘণ্টায় পনর মাইলের অধিক বেগে লরী চালাইবার কোন কারণই এখন আর নাই। মিলিটারী লরী পরিচালনার ভার যে সকল দায়ীত্বশূন্য সামরিক কর্ম্মচারীর হাতে ন্যস্ত আছে, এই সব দুর্ঘটনায় তাঁহাদের অযোগ্যতা সম্পূর্ণরূপে প্রমাণিত হইয়াছে। ইঁহাদের অবিলম্বে পদচ্যুত করিয়া কোর্ট মার্শাল করা উচিত; রাস্তায় যে সব স্থানে ঘণ্টায় ২৫ মাইল বেগে লরী চালাইবার নির্দ্দেশ রহিয়াছে সেই সব স্থানেও উহার দ্বিগুণ বেগে লরী ছুটিতে দেখা যায়। কেন্দ্রীয় ব্যবস্থা-পরিষদে এই সব দুর্ঘটনা সম্পর্কে একটি মূলতুবী প্রস্তাব আনীত হইলে সমর বিভাগের সেক্রেটারী বলিয়াছেন যে, লরী চালনায় সতর্কতা সম্বন্ধে যথাযোগ্য "উপদেশ" দেওয়া হইয়াছে। এই সব উপদেশ দেওয়া হইলেও তাহা প্রতিপালিত হয় না তাহা ভাল করিয়াই দেখা যাইতেছে। অথচ এই সব মর্ম্মান্তিক দুর্ঘটনা বন্ধ করা অত্যন্ত সহজ। যোগ্য লোকের হাতে লরী চালকদিগের ভার দিলে ও গতিবেগ ১৫ মাইলে বাঁধিয়া দিলে এবং উহার বেশী বেগে কাহাকেও ছুটিতে দেখিলেই তৎক্ষণাৎ তাহাকে গ্রেপ্তার করিয়া কঠোর দণ্ডে দণ্ডিত করিলে অতি অল্পদিনের মধ্যেই এই হত্যাকাণ্ড নিবারিত হইতে পারে। মিলিটারীর এই অবাধ হত্যা নিবারণ করিবার কোন সত্যকারের চেষ্টা গবর্ণেণ্ট কেন করিবেন না আমরা তাহা বুঝিতে অসমর্থ। গবর্ণেণ্টের এই অক্ষমতা গণ-বিক্ষোভের প্রকৃত কারণ, "মব-রুল" বন্ধ করিতে হইলে গবর্ণেণ্টকে কঠোর হস্তে এই হত্যাকাণ্ডের অবসান ঘটাইতে হইবে, শুধু হুমকী দিয়া ইস্তাহার বাহির করিলে ফল হইতে পারে না।

বাংলায় চিনির বরাদ্দ হ্রাস

এ বৎসর চিনির উৎপাদন কিছু কম হইয়াছে, এই কারণে ভারত-সরকার বাংলাদেশের জন্য বরাদ্দ চিনির পরিমাণ শতকরা ১৩ ভাগ কমাইয়া দিয়াছেন। বাংলা-সরকার তদনুসারে চিনির বরাদ্দ শতকরা ১৩ ভাগ কমাইতে পারিতেন, কিন্তু তাহা না করিয়া তাঁহারা কমাইয়াছেন শতকরা ২৫ ভাগ। ৮ই এপ্রিল হইতে বৃহত্তর কলিকাতা ও অন্যান্য যে সকল স্থানে পূর্ণাঙ্গ রেশন ব্যবস্থা প্রবর্ত্তিত আছে, সেখানে চিনির রেশন বরাদ্দ প্রতি সপ্তাহে জনপ্রতি আট আউন্স (চার ছটাক) হইতে কমাইয়া ছয় আউন্স (তিন ছটাক) করা হইয়াছে।

জেলা, মহকুমা সদর ও দশ হাজার বা ততোধিক লোকের বসতিসম্পন্ন শহরে জনপ্রতি প্রতি সপ্তাহে ছয় আউন্স পাইবে এবং অন্যান্য শহরে প্রতি সপ্তাহে জনপ্রতি চার আউন্স (দুই ছটাক) করিয়া বরাদ্দ করা হইয়াছে। পল্লী অঞ্চলে প্রত্যেকে প্রতি মাসে দুই আউন্স (এক ছটাক) করিয়া পাইবে। অন্যান্য ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠানের চিনির বরাদ্দ শতকরা ২০ ভাগ কমাইয়া দেওয়া হইবে।

বাকি চিনিটা বোধ হয় ব্ল্যাকমার্কেটে পাঠাইবার ব্যবস্থা হইবে। ব্ল্যাকমার্কেটের সৃষ্টি ও পুষ্টি সম্বন্ধে বাংলার সিভিল সাপ্লাই বিভাগ যে খ্যাতি অর্জ্জন করিয়াছেন তাহাতে দেশের লোকের মনে এই বিশ্বাস হওয়াই স্বাভাবিক।

ইউরোপে ও ভারতবর্ষে যুদ্ধকালীন রেশনিং

ইউরোপের যুদ্ধ বিধ্বস্ত দেশগুলিতে প্রচণ্ডতম যুদ্ধের মধ্যেও লোকের খাদ্যাভাব কিভাবে মেটানো হইয়াছে নিম্নোদ্ধৃত তুলনামূলক তালিকা হইতে তাহা বুঝা যাইবে। গম, ভুট্টা বা চাউলই তাহাদের একমাত্র সম্বল ছিল না, ঐ সঙ্গে তাহারা আলু, চিনি, মাংস, দুধ, তেল ও মাখন, মাছ এবং ডিমও বেশ ভাল পরিমাণেই পাইয়াছে। আমাদের দেশে সরকারের কৌলতে যে রেশন ব্যবস্থা চলিতেছে তাহাতে শুধু চাউল চিনি ও তেলের বরাদ্দই করা হইয়াছে, মাছ, মাংস, ডিম প্রভৃতি তো চোখে দেখাই অধিকাংশ লোকের পক্ষে দুষ্কর। হিসাবগুলি সবই কিলোগ্রামে দেওয়া হইল। এক কিলোগ্রাম ৩৫ আউন্স অথবা আমাদের কিঞ্চিদধিক ১৭ ছটাকের সমান।

জার্মানী

	যুদ্ধের আগে	১৯৪৩-৪৪
গম প্রভৃতি	১৪৪	১৪০
আলু	১৭৬	১৭৫
চিনি	২৪	২৩
মাংস	৪৪	৩১
দুধ	১১২	৬৫
তেল ও মাখন	২৫	১৫
মাছ	১২	৮
ডিম	১২২টি	৭০টি

রুমানিয়া

	যুদ্ধের আগে	১৯৪৩—৪৪
গম প্রভৃতি	১০৪	১২৮
আলু	৫০	৬৭
চিনি	৫	৭
মাংস	১৬·৮	১৫
দুধ	৭০	৬৮
তেল ও মাখন	৬·৭	৮·৪
মাছ	১·২	১·৬
ডিম	৮৫টি	৭০টি

ফ্রান্স

গম প্রভৃতি	১৬০	১১৭
আলু	১৬৭	১৬৮
চিনি	২২	১৪
মাংস	৪৭·৭	২১·২
দুধ	১০৩	৭৪
তেল ও মাখন	১৩	৫·৬
মাছ	৯·১	২
ডিম	১৫৪টি	৭০টি

পোলাণ্ড

গম প্রভৃতি	১৬০	১৪৩
আলু	৩০০	৩০০
চিনি	১১	১২
মাংস	২১·২	১৩·৬
দুধ	১০৭	৬৭
তেল ও মাখন	৮·৮	৬·৩
মাছ	১·৫	×
ডিম	৭০টি	৪৮টি

অষ্ট্রিয়া

গম প্রভৃতি	১৬৫	১৪০
আলু	৮৫	১৭৫
চিনি	২৪	২৩
মাংস	৫০	৩১
দুধ	২০০	৬৫
তেল ও মাখন	১৬	১৫
মাছ	১	১
ডিম	১১০টি	৭০টি

ইটালি

		১৯৪২ ৪৩
গম প্রভৃতি	১৫৮	১৪০
আলু	৪১	৪১
চিনি	৭·৬	৮·৮
মাংস	১৬·৪	১৩·৮
দুধ	৬৫	৪৭
তেল ও মাখন	১১	৮·২
মাছ	৬·৫	৩
ডিম	১৩০টি	১০০টি

আর আমাদের দেশে? বাংলা দেশে রেশনের দৌলতে লোকের খাদ্য দাঁড়াইয়াছে নিম্নোক্তরূপ—

চাউল	১২৮
চিনি	৪·৫
তেল	৬

মাছ মাংস দুধ সব্জী প্রভৃতি লোকের যে পরিমাণ খাওয়া দরকার তার শতাংশের একাংশও সাধারণ লোকের জোটে না। ভারতবর্ষে কুনুরে পুষ্টিকর খাদ্য সম্বন্ধে গবেষণার জন্য একটি লেবরেটরী আছে। এই লেবরেটরীর হিসাবে দৈনিক এক পাউণ্ড চাউল বা গম যাহারা খায় তাহাদের পুষ্টির জন্য ইহার উপর প্রতিদিন আট আউন্স দুধ, তিন আউন্স ডাল, ছয় আউন্স আলু, দুই হইতে চার আউন্স সব্জী দুই আউন্স ফল এবং দুই আউন্স তেল ও মাখন খাওয়া উচিত। গরিব ত দূরের কথা বড়লোকের ভাগ্যেও এই খাদ্য জোটে না, সাধারণ লোকে ভাতের বা রুটির সঙ্গে সামান্য কিছু ডাঁটা চচ্চড়ি সংগ্রহ করিতে পারিলেই ধন্য হয়। তার পরে পরিমাণের কথা। কুনুরের গবেষণা-কেন্দ্র চাউল বা রুটির যে পরিমাণকে অপর পুষ্টিকর খাদ্যের সহিত না খাইলে অপর্য্যাপ্ত মনে করেন, গবর্মেণ্ট তাহাকেও কমাইয়া এক পাউণ্ডের স্থলে ১২ আউন্স করিয়াছেন এবং তাঁহারা জানেন যে ভাত বা রুটি ভিন্ন লোকের আর কোন খাদ্য নাই। তেলের পরিমাণ এই হিসাবে পাওয়া উচিত—মাসে সাড়ে তিন সের, কিন্তু সরকারী রেশনের কল্যাণে পাওয়া যায় মাত্র আধ সের। ইউরোপে হিটলার কর্ত্তৃক অধিকৃত দেশগুলি পর্য্যন্ত যে খাদ্য পাইয়াছে, ভারতবর্ষে সুসভ্য ইংরেজশাসনাধীনে মানুষের ভাগ্যে তাহা জোটে নাই। ক্যালরির দিক দিয়া দেখিলে অবস্থাটা আরও পরিষ্কার হইবে। ইউরোপের যে দেশগুলির নাম উপরে দেওয়া হইল তাহাদের এবং ভারতবাসীর ভাগ্যে কত ক্যালরি খাদ্য প্রতিদিন জোটে তাহার হিসাব নিম্নে দেওয়া হইল:

ক্যালরি—(১৯৪৩-৪৪ সাল)

জার্ম্মানী—২৫০০
রুমানিয়া—২৬০০
ফ্রান্স—২০৫০
পোলাণ্ড—২২০০
অষ্ট্রিয়া—২৫০০
ইটালি—২১৫০

ভারতবর্ষ—হওয়া উচিত ২৪০০, কিন্তু সর রামস্বামী মুদালিয়ারের মতে ১২০০ পাইতেছে কি না সন্দেহ।

অনাহারে মৃত্যু

কলিকাতায় দুঃস্থগণের সংখ্যাবৃদ্ধি এবং অনাহারে মৃত্যুর সংবাদে আসন্ন বিপদের পূর্ব্বাভাস পাওয়া যাইতেছে। ৩রা এপ্রিলের সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয় যে মার্চ্চের শেষ সপ্তাহে কলিকাতায় তেইশটি অনশনক্লিষ্ট মৃত্যুর খবর পাওয়া গিয়াছে এবং তাহার মধ্যে পাঁচটি অনাহারে মৃত্যু বলিয়া জানা গিয়াছে। এই খবরের দুই-তিন দিন পরে বাংলা গবর্ণমেণ্ট একটি প্রেসনোটে এই সম্পর্কে এক বিবৃতি দিয়াছেন। এই প্রেস নোটে বলা হইয়াছে যে উপরোক্ত সংবাদটি সরকারপক্ষ হইতে প্রচারিত হয় নাই, এবং উল্লিখিত সপ্তাহে অনাহারজনিত মৃত্যুর সংখ্যা দুইটি।

প্রেসনোটে আরও বলা হইয়াছে যে কলিকাতায় দুঃস্থদের সংখ্যাবৃদ্ধি পাওয়ার যে সমস্যার উদ্ভব হইয়াছে গবর্ণেণ্ট তাহার প্রতিকারের চেষ্টা করিতেছেন। প্রথমতঃ দুঃস্থগণ যাহাতে কলিকাতার পথে পথে ঘুরিয়া না বেড়ায় তাহার জন্য সরকারী দুঃস্থাবাসসমূহে যথেষ্ট স্থানের ব্যবস্থা করা হইয়াছে। উপরন্তু দুঃস্থগণ যাহাতে নিকটবর্ত্তী গ্রামাঞ্চল হইতে কলিকাতাভিমুখে আসিতে না আরম্ভ করে তাহার প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা গৃহীত হইতেছে। বিশেষ করিয়া চব্বিশ পরগণা এবং হাওড়ায় রিলিফ ব্যবস্থা নানা ভাবে চালু করা হইয়াছে। গবর্ণেণ্ট চেষ্টা করিতেছে যাহাতে খাদ্যাভাব যেখানে প্রথম দেখা দিবে সেখানেই ইহার প্রতিকারের ব্যবস্থা হয়। ইহার পরেও যে সকল দুঃস্থ কলিকাতার দিকে রওনা হইবে তাহাদিগকে পথের মাঝে সন্ধান করিয়া পার্শ্ববর্ত্তী দুঃস্থাবাসে স্থান দিতে হইবে। এই সব ব্যবস্থা সত্ত্বেও যদি কোন দুঃস্থ কলিকাতায় পৌঁছে তাহাদের জন্য কলিকাতায় ব্যবস্থা করা হইবে।

এই গেল বাংলা-সরকারের সাফাই। কেন্দ্রীয় পরিষদে শ্রীযুক্ত শশাঙ্কশেখর সান্যাল এই সম্পর্কে মুলতুবী প্রস্তাব উত্থাপন করিতে চাহিলে খাদ্য বিভাগের সেক্রেটারী মিঃ বি, আর, সেন যে বিবৃতি দিয়াছেন তাহাতেও প্রায় একই ধরণের অজুহাত পাওয়া গিয়াছে। অনেক ভূমিকার পরে তিনি স্বীকার করিয়াছেন যে দুইটি অনাহারজনিত মৃত্যু সত্যই ঘটিয়াছে। তিনি স্থানীয় কর্ত্তৃপক্ষের নিকট হইতে আশ্বাস পাইয়াছেন যে কলিকাতার পার্শ্ববর্ত্তী অঞ্চলে প্রচুর খাদ্যসম্ভার মজুত আছে; তাহা সত্ত্বেও যে কেন অনাহারে লোক মারা গেল তাহার সঠিক কারণ তিনি জানেন না। তাহা ছাড়া বিষয়টি প্রাদেশিক সরকারের বিবেচনাধীন এবং কেন্দ্রীয় সরকার শুধু ইহা জানিয়াই নিশ্চিন্ত যে কলিকাতা ও তৎসন্নিহিত স্থানসমূহে পর্য্যাপ্ত খাদ্যশস্য মজুত আছে। খাদ্যবিভাগের সেক্রেটারী নিশ্চিন্ত থাকিলেও আমরা এই বিষয়ে বিশেষ উদ্বেগ বোধ করিতেছি।

বাংলার খাদ্য বিভাগের ডিরেক্টর জেনারেল জানাইয়াছেন বাংলায় দুর্ভিক্ষের আশঙ্কা নাই, এখানে খাদ্য-সামগ্রীর এত অভাব পড়ে নাই যে কোন আতঙ্কের সৃষ্টি হইতে পারে। তাঁহার মতে এ বৎসর যে পরিমাণ চাউল সংগৃহীত হইতে পারে তাহার সহিত সরকারের হাতে যে চাউল মজুত আছে তাহা যোগ করিলে চাউলের যে পরিমাণ দাঁড়ায় প্রয়োজনের পক্ষে তাহা পর্য্যাপ্ত। গত দুর্ভিক্ষে নাজিম-শহীদ মন্ত্রীসভার পুরানো বুলি আওড়াইয়া তিনিও বলিয়াছেন যে জরুরী প্রয়োজন মিটাইবার যে ক্ষমতা সরকারের আছে সেই সম্বন্ধে জনসাধারণের আস্থা বজায় রাখাই সর্ব্বাপেক্ষা প্রয়োজনীয় কার্য্য।

গত দুর্ভিক্ষের ন্যায় আগামী দুর্ভিক্ষের বেলায়ও বাংলা-সরকারের কার্য্যকলাপ ধাপে ধাপে মিলিয়া যাইতেছে। খাদ্যের অভাব জানিয়াও তখন খাদ্য রপ্তানী করিতে দেওয়া হইয়াছে, এবারও হইতেছে। বাংলার বাহিরে চাউল রপ্তানীর সংবাদ প্রকাশিত হইয়াছে। বিভিন্ন জেলা হইতে বাহিরে চাউল পাঠানোর সংবাদও প্রায়ই আসিতেছে। এক দিকে কর্ত্তারা বলিতেছেন চাউলের অভাব নাই। অপর দিকে মানুষের অপর্য্যাপ্ত চার সের বরাদ্দের এক-তৃতীয়াংশ কমাইয়া দেওয়া হইয়াছে। অযোগ্য অপদার্থ কর্ম্মচারী চালিত গবর্মেণ্টের উপর আস্থা ফিরাইয়া আনার জন্য তখন যে প্রচারকার্য্য হইয়াছিল এখনও ঠিক তাহাই চলিতেছে। সেবারও সরকার যখন অভাব নাই এই কথা উচ্চ কণ্ঠে ঘোষণা করিয়াছেন তখনই অনশনে মৃত্যুর সংবাদ আসিয়াছে; এবারও ঠিক তাহাই ঘটিতেছে।

সেবারও সরকারী ভাবে দুর্ভিক্ষ ঘোষণা করা হয় নাই, এবারও হইতেছে না, কারণ ইহাতে সরকারের প্রত্যক্ষ দায়িত্ব বাড়ে।

বাঁকুড়ায় দুর্ভিক্ষ

বাঁকুড়ার অবস্থা সম্পর্কে নিম্নলিখিত সংবাদটি দৈনিক কৃষকে প্রকাশিত হইয়াছে:

> বিশ্বস্ত সূত্রে জানা গিয়াছে যে, বাঁকুড়া জেলা হইতে প্রচুর পরিমাণে চাউল দৈনিক জেলার বাহিরে চালান দেওয়া হইতেছে। বিশেষতঃ আরামবাগ ও হুগলী জেলা হইয়া কলিকাতার শিল্প-অঞ্চল প্রভৃতি স্থানগুলিতে প্রেরণ করা হইতেছে। সরকারী কর্ত্তৃপক্ষ একথা স্বীকার করিতে বাধ্য হইয়াছেন যে, গত ১৮ই মার্চ্চ হইতে শিল্পাঞ্চলে রেশন প্রভৃতি কমিয়া যাওয়ায় চোরাকারবারীদের বেশ সুবিধা হইয়াছে এবং তাহাদের মধ্যে উৎসাহ ও আনন্দ দেখা দিয়াছে। জেলা হইতে চাউল রপ্তানী বিষয়ে কর্ত্তৃপক্ষ কি সতর্কতা অবলম্বন করিতেছেন তাহা অজ্ঞাত। বাঁকুড়া জেলায় নাকি খুব চাউল আমদানী করিবার ব্যবস্থা করা হইতেছে। জেলা হইতে চাউল রপ্তানীর কারণ খুঁজিয়া পাওয়া যাইতেছে না। স্থানীয় প্রসিদ্ধ ব্যবসায়ী শ্রীযুক্ত মোহনলাল গুপ্ত কোন এক সরকারী গুদামের এক লক্ষ বাইশ হাজার মণ অখাদ্য চাউল আট টাকা মণ দরে ক্রয় করিয়াছেন। তিনি উক্ত অখাদ্য চাউল ইন্দপুর ও অন্যান্য থানার অন্তর্গত গ্রামগুলিতে আট টাকা মণ দরে বিক্রয় করিতেছেন। এসব অঞ্চলে ভীষণ ভাবে কলেরা ও বসন্ত রোগ দেখা দিয়াছে।

বাংলা দেশের খাদ্য বিভাগের সর্বনিযুক্ত ডিরেক্টর-জেনারেল কার্য্যভার গ্রহণ করিয়া এক বেতার বক্তৃতায় বলিয়াছেন যে বাংলা দেশে এ বৎসর চাউলের অভাব শতকরা ৮ ভাগের মত হইবে। এই হিসাব সত্ত্বেও রেশনের পরিমাণ এক-তৃতীয়াংশ কমাইয়া দেওয়া হইয়াছে। কঠিন শারীরিক পরিশ্রম যাহারা করে তাহাদের পক্ষে সপ্তাহে ৪ সের চাউলই অপর্য্যাপ্ত ছিল,

বর্ত্তমান বৎসরে তাহাদের আধপেটা খাওয়াইয়া রাখিবার ব্যবস্থা হইয়াছে। সিভিল সাপ্লাই এবং রেশন কর্তৃপক্ষের বহু কাজের দ্বারা নব নব ব্ল্যাক মার্কেট সৃষ্টি হয় এবং প্রচলিত ব্ল্যাক মার্কেট চালু থাকে। অন্যায় ও অনাবশ্যক ভাবে চাউলের বরাদ্দ কমাইয়া দেওয়ায় চাউলের ব্ল্যাক মার্কেট আবার সৃষ্টি হইয়াছে এবং বাঁকুড়া জেলা এখনই তাহার দুর্ব্বিষহ ফল ভোগ করিতে আরম্ভ করিয়াছে। গত দুর্ভিক্ষে সিভিল সাপ্লাইয়ের সহযোগিতায় মিল মালিকেরা গ্রামাঞ্চল হইতে চাউল কিনিয়া শ্রমিকদের জন্য মজুত রাখিয়াছিলেন, তখন যুদ্ধ ছিল, কাজেই গরজ ছিল বেশী। এবার দেখা যাইতেছে এই কার্য্যের ভার ব্ল্যাক মার্কেটের চোরাকারবারীদের হাতে প্রথম হইতেই অর্পিত হইয়াছে।

বাঁকুড়া জেলায় দুর্ভিক্ষ কি ভাবে ক্রমশঃ ঘনীভূত হইয়া আসিতেছে তাহার কথা আমরা বহু বার আলোচনা করিয়াছি। শ্রীমতী রেণুকা রায় অবস্থা পর্য্যবেক্ষণ করিয়া নিজ অভিজ্ঞতা জানাইয়া সরকারের কর্ত্তব্যজ্ঞান উদ্রেক করিবার চেষ্টাও যথাসাধ্য করিয়াছেন; কিন্তু ফল কিছুই হয় নাই। সরকারের ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্ম্মচারীদের সহিত ব্ল্যাক মার্কেটের যোগাযোগ যত দিন থাকিবে তত দিন প্রতিকার হইবার সম্ভাবনাও নাই।

বাঁকুড়ায় বস্ত্র-সঙ্কট

সম্প্রতি মাড়োয়ারী রিলিফ সোসাইটি বাঁকুড়ায় বস্ত্রসঙ্কট সম্পর্কে যে সংবাদ দিয়াছেন তাহাতে সরকারী বস্ত্র-বিতরণ-ব্যবস্থার গলদ নূতন করিয়া ধরা পড়িয়াছে। এই সংবাদে প্রকাশ যে ইন্দপুর, সদর থানা প্রভৃতি এলাকায় প্রত্যেক পরিবারই বস্ত্রাভাবে কষ্ট ভোগ করিতেছে। অবস্থা এমন দাঁড়াইয়াছে যে পরিবারের দুই-তিন জনের হয়ত একখানা করিয়া ছিন্ন বস্ত্র অবশিষ্ট আছে; কিন্তু বাকী পরিজনবর্গ প্রায় অর্দ্ধনগ্ন অবস্থায় কালাতিপাত করিতেছে। রিলিফ সোসাইটি বলিতেছেন যে, "বয়স্ক বালক-বালিকা উলঙ্গ হইয়া থাকিতে বাধ্য হইতেছে এবং এই সকল দুর্গতির দৃশ্যে প্রত্যেকেই নিরতিশয় ব্যথিত ও লজ্জিত হইতেছেন।"

এই ঘটনার উপরে মন্তব্য করিতে পর্য্যন্ত আমরা লজ্জা ও বেদনা অনুভব করিতেছি। দেশের যে সকল দুর্গত নরনারী বিগত দুর্ভিক্ষ ও বস্ত্রসঙ্কটের দুর্য্যোগ অতিক্রম করিয়া সুদিনের আশায় চাহিয়া আছে তাহাদের পক্ষে এই অবস্থা এক ভয়াবহ সমস্যা। এই সম্পর্কে সরকারপক্ষ হইতে অনেক আশ্বাস দেওয়া হইয়াছে এবং বলা হইয়াছে যে ভাল করিয়া নিয়ন্ত্রণ ও বিতরণ ব্যবস্থা কায়েম হইলে এই রকম বস্ত্রাভাব পুনরায় দেখা দিবার সম্ভাবনা নাই। তাহার পরে আমরা অনেক কাল প্রতীক্ষা করিয়াছি। কলিকাতার অভিজ্ঞতা সকলেই অবগত আছেন। কন্ট্রোলের দোকানে ঘণ্টার পর ঘণ্টা অপেক্ষা করিয়া যখন প্রবেশাধিকার পাওয়া গেল তখন দেখা গেল প্রয়োজনীয় এবং পরিধানযোগ্য বস্ত্র নাই। গ্রামাঞ্চলের অবস্থা আরও শোচনীয়। নিষ্ক্রিয় দুঃস্থ কমিটিগুলি আকাশের দিকে চাহিয়া বসিয়া থাকে যদি সরকার দয়া করেন। ইহার উপরে আছে চোরাবাজারের কীর্ত্তিকলাপ এবং সরকারী কর্ম্মচারীদের দুর্নীতি। এখনো কলিকাতার এক শ্রেণীর লোকের পক্ষে ভাল কাপড় নিয়ন্ত্রিত এবং প্রয়োজনাতিরিক্ত ভাবে পাওয়া মোটেই কঠিন হইতেছে না। কেন্দ্রীয় সরকারের ভুল নীতি, প্রাদেশিক সরকারের অযোগ্যতা, ব্যবসায়ীদের চোরাবাজার এবং স্থানীয় কর্মচারীদের দুর্নীতি—এই সকলে মিলিয়া দেশের বস্ত্র অদ্ভুত পথে উধাও হইতেছে। ফলে লোকের দুর্গতি চরমে পৌঁছিতেছে; বাঁকুড়ার ঘটনা মাত্র একটি প্রমাণ।

বস্ত্র নিয়ন্ত্রণের অযৌক্তিকতা

আহমদাবাদ মিল মালিক সঙ্ঘের সভাপতি শেঠ শঙ্করলাল বালাভাই সমিতির বাৎসরিক অধিবেশনে বলিয়াছেন যে তাঁহারা আশা করিয়াছিলেন যে, যুদ্ধের পর বস্ত্র নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা ধীরে ধীরে তুলিয়া লওয়া হইবে। তাহা হইলেই কাপড়ের কলগুলি আবার স্বাভাবিক অবস্থা ফিরিয়া পাইয়া পূর্ব্বের ন্যায় দেশের বস্ত্রাভাব মিটাইতে পারিবে। কিন্তু সম্প্রতি ভারত-সরকারের টেক্সটাইল কন্ট্রোলার জানাইয়াছেন যে আরও প্রায় দেড় বৎসর বস্ত্র নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা চালু থাকিবে। ইহার প্রতিবাদে মিল মালিকদের পক্ষ হইতে শেঠ বালাভাই বলেন, "আমাদের তরফ হইতে ইহাই বলিবার আছে যে, বর্ত্তমানে যুদ্ধের অর্ডার প্রায় বন্ধই হইয়াছে এবং রপ্তানীর পরিমাণও যৎসামান্য; অন্য দিকে উৎপাদনের পরিমাণ বহুগুণে বাড়িয়া রহিয়াছে। এমতাবস্থায় দেশের লোকে কেন যে বস্ত্রাভাবে দিন কাটাইবে তাহার কারণ ভাবিয়া পাওয়া দুষ্কর! আমরা মনে করি এ বিষয়ে উপযুক্ত অনুসন্ধান প্রয়োজন রহিয়াছে, কেননা বর্ত্তমান বস্ত্রবণ্টন-ব্যবস্থা অত্যন্ত অসন্তোষজনক; তদুপরি বিভিন্ন সীমান্ত অঞ্চল দিয়া প্রভূত পরিমাণ বস্ত্র অন্যত্র চলিয়া যায় বলিয়াও আমরা আশঙ্কা করি। তবে বিভিন্ন প্রদেশে জনপ্রিয় মন্ত্রিমণ্ডলী গঠিত হওয়ায় আমরা বিশেষ আনন্দিত হইয়াছি।"

বস্ত্র নিয়ন্ত্রণের কারসাজির মূল উদ্দেশ্য দেশী কাপড় উৎপাদন ও বণ্টনে যথাসম্ভব বাধা দিয়া বিলাতী কাপড় আমদানীর পথ খুলিয়া রাখা ইহা বহু পূর্ব্বেই লোকে সন্দেহ করিয়াছে। আমরাও এ সম্বন্ধে মন্তব্য করিয়াছি। বিলাতের কাপড়ের কারখানাগুলি সচল করিতে আরও অন্ততঃ দেড় বৎসর লাগিবার কথা, সুতরাং ততদিন বস্ত্র নিয়ন্ত্রণ বহাল রাখিবার চেষ্টা হইবে ইহা নিঃসন্দেহ।

খানাকুল থানায় বোরো ধানের চাষ

এ দেশের গবর্ণমেণ্ট জনসাধারণের স্থায়ী কল্যাণকর কোন কাজ নিজেরাও করেন না, দেশবাসীকেও নিজ হাতে উহা করিতে দেন না। হুগলী জেলায় বোরো ধানের চাষ বৃদ্ধির জন্য স্থানীয় কংগ্রেসকর্ম্মীদের চেষ্টায় যে সব ব্যবস্থা অবলম্বিত হইয়াছিল তাহার বিবরণ এই সংখ্যায় অন্যত্র প্রকাশিত হইয়াছে। সরকারের অপেক্ষা না রাখিয়া দেশের লোক নিজেদের কাজ নিজেরা করিয়া লইতেছে জেলা কর্তৃপক্ষের ইহা সহ্য হইল না, তাঁহারা কংগ্রেসকর্ম্মীদের কাজ করিতে না দিয়া জলসেচের ভার স্বহস্তে গ্রহণ করিলেন। ফল যাহা হইবার তাহাই হইয়াছে, সাধারণের টাকা খরচ হইয়াছে অথচ সময় মত ক্ষেতে জল মিলে নাই। ১৯৪৪-৪৫ সালে কংগ্রেস কর্ম্মীরা ২২৫০৬

টাকা ব্যয়ে ১৫টি (খুব ছোট বাঁধ লইয়া মোট ২০টি) বাঁধ নির্মাণ করিয়া ৫০টি গ্রামে এগারো হাজার বিঘার অধিক জমিতে ঠিক সময়ে সেচের জল দিয়াছিলেন। বর্ত্তমান বৎসরে সরকারী চেষ্টায় মাত্র ৫টি বাঁধ নির্ম্মিত হইয়া মাত্র আড়াই হাজার বিঘা জমিতে জল দেওয়া হইয়াছে কিন্তু অসময়ে এবং বহু বিলম্বে এই জল আসায় কাজ বিশেষ কিছু হয় নাই। প্রকাশ, এই ৫টি বাঁধ বাঁধিতে গবর্ণমেণ্টের ২১০০০ টাকা খরচ হইয়াছে। গবর্ণমেণ্ট বোরো চাষের জন্য শুধু পশ্চিম অঞ্চলে কানানদীর দিকে জল দিয়াছেন। পূর্ব্ব অঞ্চলে মুণ্ডেশ্বরী নদীতে তাঁহারা উদনার প্রধান বাঁধ বাঁধেন নাই—ফলে বোরো চাষের পূর্ব্ব অঞ্চল সেচের জল পায় নাই। অথচ এই পূর্ব্ব অঞ্চলেই বোরো চাষ হয় বেশী এবং বোরো ধানের উপর লোকের নির্ভরও বেশী।

বর্ত্তমান বর্ষে গবর্ণমেণ্ট উদনার বাঁধ না বাঁধায় দুই-তিনটি গ্রামের লোক উৎসাহী হইয়া নিজ ব্যয়ে ঐ বাঁধ বাঁধিয়াছিল। কিন্তু গোপালনগরের সর্ব্বপ্রধান বাঁধ গবর্ণমেণ্ট ঠিক সময়ে বাঁধিতে না পারায় নদীতে জল সঞ্চয় এত কম হইয়াছে যে উদনা অঞ্চলে জলসরবরাহ হইতেছে না। ফলে ঐ অঞ্চলের আবাদের ধান মরিতে বসিয়াছে। ইহা ছাড়া গত বৎসর কংগ্রেসকর্ম্মীরা জল-সরবরাহ করায় ঐ সব স্থানে প্রায় হাজার বিঘা জমিতে পেঁয়াজ, আলু, আখ প্রভৃতি রবিশস্য প্রচুর পরিমাণে উৎপন্ন হইয়াছিল। এই বৎসর গবর্ণমেণ্ট জল দিতে না পারায় ঐ সব ফসল শুকাইয়া মরিতেছে। খানাকুল থানায় কংগ্রেসকর্ম্মীদের হাতে যে কার্য্য সফল হইয়াছিল গবর্ণমেণ্টের হাতে সেই কার্য্য ব্যর্থ হইয়াছে।

যে গবর্ণমেণ্ট দেশবাসীর অন্ন যোগাইতে অক্ষম, সেই গবর্ণমেণ্ট জনসাধারণকে নিজেদের অন্ন নিজেরা সংগ্রহ করিতে দেখিলে বাধা দেয় কেন তাহা আপাতদৃষ্টিতে দুর্ব্বোধ্য মনে হইলেও উহার প্রকৃত কারণ অনুমান করা দুঃসাধ্য বা কঠিন নহে। আবার এক ভয়াবহ দুর্ভিক্ষ আসন্ন জানিয়াও গবর্ণমেণ্ট চাষ পণ্ড করিবার জন্য বিনা কারণে অগ্রসর হয় নাই। বোরো চাষ উপলক্ষে খানাকুল থানার চাষীরা চারানীর টাকা শোধ করিয়া যে স্বাবলম্বন ও কংগ্রেসের সহিত সহযোগিতার ভাব দেখাইয়াছিল, গবর্ণমেণ্ট হস্তক্ষেপে তাহা ফুটিতে পারিল না। কৃষকদের সমবায় আন্দোলনকে গবর্ণমেণ্ট কখনও স্বাবলম্বনের পথে পরিচালিত করেন নাই। প্রথমাবধি উহাকে সরকারের উপর নির্ভরশীল করিয়া রাখিয়া স্বাবলম্বন ও পারস্পরিক সহযোগিতার মূলে কুঠারাঘাত করিয়াই আসিয়াছেন। এই কারণেই গবর্ণমেণ্ট কখনও সমবায় আন্দোলনকে হাতছাড়া করেন নাই। কৃষকদের মধ্যে পারস্পরিক সহযোগিতা ও স্বাবলম্বনের ভাব অর্থোপার্জ্জনের ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠিত হইলে জীবনের অন্যান্য ক্ষেত্রেও তাহা সঞ্চারিত হইবে ইহা বুঝিবার মত কূটবুদ্ধি বিদেশী গবর্ণমেণ্টের আছে। যে শ্রেণীর ভারতীয় কর্ম্মচারীর সহায়তা ইংরেজ গবর্ণমেণ্টের স্বার্থসিদ্ধির জন্য প্রয়োজন হয় তাহার অভাব এখনও এদেশে হয় নাই। যুদ্ধের সময় যে এদেশীয় সিভিলিয়ানটি সরকারী দপ্তরখানার প্রেস এডভাইসার এবং ন্যাশনাল ওয়ার-ফ্রন্টের ভারপ্রাপ্ত কর্ম্মচারীরূপে এদেশে বিদেশীর স্বার্থ সাধন করিয়া গিয়াছেন, হুগলীর জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট রূপেও তিনি সেই কাজই করিতেছেন। খানাকুল থানার প্রশংসনীয় কাজটি পণ্ড করিবার মূলেও এই ব্যক্তিরই উৎসাহ ও উদ্যম প্রধান। সিভিল সার্ভিসের কর্ম্মচারীদের হস্তে যে অসাধারণ ক্ষমতা অর্পিত হইয়াছে তাহা দেশের কি পরিমাণ ক্ষতি করিতে পারে, কেমন করিয়া কৃষকের দৈনন্দিন জীবনকে পর্য্যন্ত প্রত্যক্ষ ভাবে আঘাত করিতে পারে, হুগলীর এই ঘটনা তাহার একটি নিদর্শন মাত্র।

গ্রামবাসীদের বাস্তুভিটা প্রত্যর্পণ

"ডায়মণ্ড হারবার মহকুমা কংগ্রেস কমিটির সভাপতি নিম্নলিখিত বিবৃতি দিয়াছেন :

ডায়মণ্ড হারবার মহকুমার অন্তর্গত মগরাহাট থানার দেউলা-নাজরা প্রভৃতি যে দশটি গ্রাম হইতে গত ১৯৪২ সালে যুদ্ধের কারণে লোকাপসারণ করা হইয়াছিল সেই সকল গ্রাম এখন অধিবাসীদিগকে ফিরাইয়া দিতে আরম্ভ করা হইয়াছে। এখন প্রধান সমস্যা এই যে, এখন কেমন করিয়া ঐ সকল হতভাগ্য গ্রামবাসীরা তাহাদের পুনঃপ্রাপ্ত বাস্তুতে তাহাদের বাসগৃহ নির্ম্মাণ করিয়া লইবে। সামরিক দখলকালীন ঐ সকল গ্রামের প্রায় সকল গৃহই নষ্ট করিয়া ফেলা হইয়াছিল। অধিকাংশ ক্ষেত্রে এখন তাহাদিগকে মাত্র শূন্য ভূমি ফিরাইয়া দেওয়া হইতেছে। ইহা অবশ্য সত্য যে, অপসারিত গ্রামবাসীদিগকে তাহাদের বাসগৃহাদির জন্য ক্ষতিপূরণ (পর্য্যাপ্ত হউক বা নাই হউক) দেওয়া হইয়াছিল। উহাদের অধিকাংশ দরিদ্র ক্ষুদ্রচাষী বা ভূমিহীন মজুর, বাসগৃহের জন্য ক্ষতিপূরণ-স্বরূপ তাহারা যাহা পাইয়াছিল তাহা বহুপূর্ব্বে নিঃশেষ করিয়া ফেলিয়াছে। গত দুর্ভিক্ষের সময় ও দুর্ম্মূল্যের বাজারে তাহাদের পরিবারবর্গের ভরণ-পোষণের জন্য তাহারা ঐ অর্থ ব্যয় করিতে বাধ্য হইয়াছিল। যদি এখন গবর্ণমেণ্ট তাহাদিগকে গৃহাদি নির্ম্মাণের জন্য পর্য্যাপ্ত অর্থ না দেয় তবে ঐসব হতভাগ্য ব্যক্তি তাহাদের নিজগ্রামে আর কখনও ফিরিয়া আসিতে পারিবে না। গৃহাদির জন্য তাহাদিগকে এক বার ক্ষতিপূরণ দেওয়া হইয়াছে এই অজুহাতে গবর্ণমেণ্ট যেন তাঁহাদের গুরু দায়িত্ব এড়াইবার চেষ্টা না করেন। তাহাদিগকে যে ক্ষতিপূরণ দেওয়া হইয়াছিল তাহা তখনকার বাজারদরের হিসাবে তখনকার তুলনায় গৃহনির্ম্মাণের সরঞ্জামের মূল্য ও মজুরির হার অন্ততঃ তিনগুণ বৃদ্ধি পাইয়াছে।

জলের ব্যাপার আরও এক সমস্যা। সামরিক দখলের সময় ঐ সব গ্রামের সব পুষ্করিণীর জল নষ্ট হইয়া গিয়াছে। পুকুরগুলির জলের অবস্থা এত শোচনীয় হইয়াছে যে, উহা ধোয়ার কাজেরও অযোগ্য হইয়াছে। সরকারের খরচে ঐসব গ্রামে টিউব-ওয়েলের ব্যবস্থা করিয়া দেওয়া উচিত। উপরন্তু প্রতি গ্রামে অন্ততঃ কয়েকটি করিয়া পুকুর সংস্কার করাইয়া দেওয়া আবশ্যক।

গ্রামগুলির জল নিকাশের ব্যবস্থাও নষ্ট হইয়াছে। গ্রামের অভ্যন্তরে নূতন নূতন রাস্তা নির্ম্মাণ করা হইয়াছে কিন্তু তাহাতে কোন কালভার্ট (পুল) রাখা হয় নাই। উপরন্তু ড্রেনের উপর স্থানে স্থানে মাটি ফেলা হইয়াছে বা অন্যরূপে ড্রেন নষ্ট করা হইয়াছে। গ্রামগুলির জল নিকাশের পথের পুনরুদ্ধারের ব্যবস্থা গবর্ণমেণ্টকে করিতে হইবে।"

এই আবেদন সম্পূর্ণ যুক্তিসঙ্গত। "রিহাবিলিটেশনে"র

নামে বাংলা সরকার বহু টাকা অপচয় করিয়াছেন অথচ কাজ কিছুই হয় নাই। এ ক্ষেত্রে কিছু টাকা সাহায্য করিলে এই লোকগুলি নিজ নিজ বাস্তুভিটায় পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হইতে পারে।

ভারতে বিলাতী মূলধন

ভারতে বিলাতী মূলধনের অবস্থা স্বাধীন ভারতে কি দাঁড়াইবে তাহা লইয়া লণ্ডনের বণিক মহলে গবেষণা সুরু হইয়া গিয়াছে। এ সম্বন্ধে দৈনিক 'ভারতে' (২১শে চৈত্র) যে সম্পাদকীয় মন্তব্য প্রকাশিত হইয়াছে তাহার কতকাংশ নিম্নে উদ্ধৃত হইল:

> ইংরেজ বণিকদের হিসাবে ভারতবর্ষে বিলাতী মূলধনের পরিমাণ প্রায় ৩০০ কোটি টাকা। শিল্প-বাণিজ্যে এই টাকা খাটাইয়া ব্রিটেন ভারতবর্ষ হইতে সুদে ও লভ্যাংশে প্রায় দশ কোটি টাকা উপার্জন করে। এই অর্থ উপার্জনের জন্য ইংরেজ বণিকেরা ভারত-শাসন আইনে অনেকগুলি রক্ষা-কবচ বিধিবদ্ধ করাইয়া এতদিন ভারতীয় শিল্প-বাণিজ্যের প্রতিযোগিতার বিরুদ্ধে দুর্ভেদ্য দুর্গ রচনা করিয়া বসিয়াছিল।
>
> ভারতবর্ষে ইংরেজ বণিকদের অন্যায় প্রতিযোগিতায় ভারতীয় বৃহৎ শিল্পগুলি আজ পর্যন্ত মাথা তুলিতে পারে নাই। বিলাতী জাহাজওয়ালাদের স্বার্থরক্ষার জন্য এদেশে জাহাজের কারখানা প্রতিষ্ঠায় বিবিধমতে বাধা দেওয়া তো হইয়াছেই, অধিকন্তু অধিকাংশ দেশী জাহাজ কোম্পানীর পক্ষে ইহাদের অন্যায় ও অসাধু প্রতিযোগিতার ফলে আত্মরক্ষা করা দুষ্কর হইয়াছে। কোন সভ্য দেশ দেশীয় কোম্পানীর সহিত বিদেশীর "রেট-ওয়ার" বা অন্যায় ভাবে ভাড়া কমানোর প্রতিযোগিতা সহ্য করে না, এদেশে তাহাও ঘটিয়াছে। বিলাতী ইঞ্জিন আমদানির পথ খোলা রাখিবার জন্য ভারতবর্ষে ইঞ্জিন নির্মাণে বাধা দেওয়া হইয়াছে। দুই মহাযুদ্ধে বিলাতী লোহা আমদানি বন্ধ না হইলে টাটা কোম্পানী মাথা তুলিতে পারিত কিনা সন্দেহ। আমাদের কয়লা ইংরেজ বণিকের করতলগত। শুধু যে ভাল ভাল কয়লার খনিগুলিই ইহারা দখল করিয়া বসিয়া রহিয়াছে তাহা নহে, ইহাদের অপচয়ে খনিগুলি নষ্ট হইতেছে এবং কয়লা সরবরাহ নিয়ন্ত্রণ করিয়া ইহারা বহু ভারতীয় কোম্পানীর সর্বনাশ সাধন করিয়াছে। যে সব কারখানা বিলাতী কারখানার সহিত প্রতিযোগিতা করে, ইহাদের হাত হইতে কয়লা বাহির করিতে না পারায় তাহাদেরই ক্ষতি হইয়াছে সবচেয়ে বেশী। ভারতবর্ষের সমস্ত পেট্রল ইংরেজ বণিকের হাতে। গত কয়েক বৎসরে দেশের বিভিন্ন স্থানে যে সব নূতন পেট্রলের খনির সন্ধান পাওয়া গিয়াছে, সেগুলিরও লাইসেন্স ইংরেজ বণিকদেরই দেওয়া হইয়াছে। যুদ্ধের সময় অভ্র, ম্যাঙ্গানিজ, ক্রোমিয়াম প্রভৃতি যে সকল মূল্যবান খনিজ পদার্থের প্রয়োজন, তার সমস্ত খনি ইংরেজ বণিকের মুষ্টিগত। কৃষি-সম্পদের মধ্যে চা এবং পাট ইংরেজ বণিকের সম্পূর্ণ আয়ত্তে থাকিবার ফলে, চা-বাগানের কুলি এবং পাটচাষীর দুর্দশার চূড়ান্ত হইয়াছে।
>
> ভারতে ব্রিটিশ আর্থিক সম্পদ টাকা দিয়া মাপিলে চলিবে না, উহার গূঢ় অভিসন্ধি ভাল করিয়া দেখিতে হইবে। দেশের কয়লা, পেট্রল, খনিজ সম্পদ এবং পাট ইহাদের হাতে আছে বলিয়া ইহারা আমাদের বৈষয়িক জীবনের বহুক্ষেত্রে খবরদারী করিবার সুযোগ পায়। প্রত্যেক স্বাধীন দেশ যে সব আর্থিক সম্পদ মূল সম্পদ মনে করিয়া কখনও বিদেশীর হাতে ছাড়িয়া দেয় না, এদেশে ইংরেজ বণিকেরা সেই সবগুলিই দখল করিয়া বসিয়া আছে। এই সব ক্ষেত্র হইতে ইহাদিগকে হটাইতে না পারিলে দেশীয় শিল্প-বাণিজ্যের উন্নতিসাধন স্বাধীন ভারতেও কঠিন হইয়া উঠিবে।
>
> ভারতে বিলাতী মূলধন ৩০০ কোটি টাকা; ইহা বলিলেও সম্পূর্ণ বলা হয় না। ইংরেজ বণিকেরা ভারতবর্ষে —পরের টাকায় ব্যবসা করিয়া তাহার চোদ্দ আনা লাভ পকেটে ফেলিবার অপূর্ব কৌশল—ম্যানেজিং এজেন্সি নামক যে বস্তুটি সৃষ্টি করিয়াছেন, পৃথিবীর অন্য কোনও দেশে তাহার তুলনা নাই। এই ম্যানেজিং এজেন্সির ক্রিয়া ও প্রক্রিয়া জানা থাকিলে ভারতের বৈষয়িক জীবনের উপর ইহাদের ক্ষমতা কত সুদূরপ্রসারী, তাহা বোধগম্য হইবে। ভারতবর্ষের চটকলগুলির শতকরা ৬০ ভাগেরও বেশী মূলধন ভারতবাসীর হাতে আসিয়াছে কিন্তু উহাদের পরিচালন ব্যাপারে সামান্যমাত্র ক্ষমতাও ভারতীয় অংশীদারেরা পায় নাই। বার্ষিক সভায় আনা যাইবে এমনই ধরণের পরিচিত বন্ধুবান্ধবের হাতে শতকরা ৩০।৪০ ভাগ শেয়ার থাকিলে যে কোন কোম্পানীর কর্তৃপক্ষের কর্তৃত্ব হারাইবার কোন আশঙ্কাই থাকে না। এই কারণে বিলাতী ম্যানেজিং এজেন্টরা যে সব কোম্পানী পরিচালনা করেন, তাহার শতকরা ৬০ ভাগ শেয়ার নিশ্চিন্ত মনে বাজারে ছাড়িয়া দেন। সুতরাং এদেশে বিলাতী মূলধনের পরিমাণ ৩০০ কোটি টাকার আসল অর্থ এই যে, অন্ততঃ ৮০০ কোটি টাকার মূলধনের উপর ইহাদের ক্ষমতা অপ্রতিহত।

ভারতবর্ষের কোন কোন বিলাতী ব্যবসা স্বেচ্ছায় হস্তান্তরিত হইতেছে বটে, কিন্তু অনেক ক্ষেত্রে শতকরা ৬০ ভাগ শেয়ার বাজারে ছাড়িয়া রাখিয়া নিজেদের খুশীমত কারবার চালানো ইংরেজ বণিকদের পক্ষে ক্রমে দুরূহ হইয়া উঠিয়াছে। যুদ্ধের সময় ষ্টার্লিং সিকিউরিটি জমা রাখিয়া যে ১২০০ কোটি টাকার নোট বাজারে ছাড়া হইয়াছে তার অধিকাংশই অল্প কতকজন ভারতীয় বণিকদের হাতে আসিয়া গিয়াছে। এই টাকার জোরে ইহারা বহু কোম্পানীর শেয়ার আটকাইয়া ফেলিয়া ম্যানেজিং এজেন্টদের কোণঠাসা করিবার আয়োজন করিতেছে। ইহাদের মধ্যে একদল ইংরেজ বণিকদের দলে জুটিয়া তাহাদের সহিত ভাগে কারবারে লিপ্ত হইতেছে। বিড়লার সহিত নুফিল্ড এবং টাটার সহিত ইম্পিরিয়াল কেমিক্যালের চুক্তি এই প্রসঙ্গে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। ইহার ফলে বেশী দামে বিলাতী জিনিষ বিক্রয়ের পথ পরিষ্কার হওয়া আশ্চর্য্য নয়। আর একদল বিলাতী ম্যানেজিং এজেন্টদের বিতাড়িত

করিয়া ইহাদের কারবার দখলের চেষ্টা করিতেছে। এই প্রসঙ্গে বড় বড় মিলমালিকদের দ্বারা ভারতীয় বড় বড় বিলাতী সংবাদপত্রের স্বত্ব ক্রয় ও নূতন সংবাদপত্র প্রকাশ লক্ষণীয়। গত যুদ্ধের পর বিলাতে ও আমেরিকায় কোটিপতি মিলমালিকেরা ছোট ও মাঝারি কারখানাগুলি কিনিয়া লওয়ার সঙ্গে সঙ্গে জনমতের কণ্ঠরোধ করিবার জন্য যে ভাবে সংবাদপত্রের স্বত্ব দখলের আগ্রহ দেখাইয়াছিল, এই যুদ্ধের পর ভারতবর্ষে ঠিক তাহারই পুনরাবৃত্তি ঘটিতেছে। সুতরাং ইহাদের দ্বারা ইংরেজ বণিক বিতাড়িত হইলেও ক্রেতাসাধারণ ধনতান্ত্রিক বিষম শোষণ হইতে রেহাই পাইবে কিনা সে বিষয়ে গভীর সন্দেহ রহিয়াছে।

ভারতরক্ষা আইনের অপপ্রয়োগ

নাগপুর হাইকোর্টের উকীল ও ভবিতব্য পত্রিকার সম্পাদক ডাঃ দেশপাণ্ডেকে অবিলম্বে "মুক্তিদানে"র আদেশ নাগপুর হাইকোর্ট দিয়াছেন, সরকার পক্ষ তাহার বিরুদ্ধে প্রিভি কাউন্সিলে আপীল করিয়াছেন। যুদ্ধ পরিচালনা ও জনসাধারণের নিরাপত্তা রক্ষার নামে কি ভাবে ভারতরক্ষা আইনের প্রয়োগ হয় এই মামলায় তাহার দৃষ্টান্ত পাওয়া গিয়াছে। মামলার বিবরণে প্রকাশ, ডাঃ দেশপাণ্ডেকে মধ্যপ্রদেশের পুলিসের ডেপুটি ইন্সপেক্টার ১৯৪৪ সালের ২১শে আগষ্ট ভারতরক্ষা আইনের ১২৯ ধারা অনুসারে গ্রেপ্তার করেন। ভারতরক্ষা আইনের উক্ত ধারায় এইরূপ অধিকার প্রদত্ত হইয়াছে যে, ব্যক্তি-বিশেষের কার্য্য যদি কোনও পুলিস কর্ম্মচারীর মনে যুক্তিসঙ্গত সন্দেহের উদ্রেক করে এবং যদি তিনি মনে করেন যে, উক্ত ব্যক্তির কার্য্যকলাপ জনসাধারণের নিরাপত্তা ও সাফল্যজনক ভাবে যুদ্ধপরিচালনার পরিপন্থী তাহা হইলে তিনি গ্রেপ্তারী পরোয়ানা ব্যতিরেকেই উক্ত ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করিতে পারেন। ডাঃ দেশপাণ্ডের গৃহ তন্ন তন্ন করিয়া তল্লাসী করা হয়। তাঁহার স্ত্রী ও আত্মীয়স্বজনের বহু আবেদন সত্ত্বেও ডাঃ দেশপাণ্ডের বিরুদ্ধে সরকার পক্ষের অভিযোগ কি তাহা তাঁহাদিগকে জানান হয় নাই অথবা তাঁহাদিগকে তাঁহার সহিত সাক্ষাৎকারের অনুমতি দেওয়া হয় নাই। অতঃপর তাঁহার স্ত্রীর পক্ষ হইতে নাগপুর হাইকোর্টে হেবিয়াস কর্পাস দরখাস্ত করা হইলে হাইকোর্ট তাঁহার মুক্তির আদেশ দেন। রায়ে হাইকোর্ট মন্তব্য করেন যে, ডাঃ দেশপাণ্ডেকে আটক রাখা অবৈধ ও অনুচিত হইয়াছে এবং যেহেতু যুক্তিসঙ্গত কারণ বর্ত্তমান না থাকায় গ্রেপ্তার করা হইয়াছে, সুতরাং উহাকে ভারতরক্ষা আইনের জালিয়াতি বলা চলে।

সরকার পক্ষ হইতে হাইকোর্টের রায়ের বিরুদ্ধে প্রিভি কাউন্সিলে আপীলের আবেদন করা হইলে কতকগুলি কঠোর শর্ত্ত সাপেক্ষে উহা মঞ্জুর করা হয়। শর্ত্তগুলি এইরূপ :

ডাঃ দেশপাণ্ডেকে পুনর্ব্বিচার সম্পর্কিত কোন কারণেই পুনরায় গ্রেপ্তার করা চলিবে না এবং আপীলে আত্মপক্ষ সমর্থনে তাঁহার যে ব্যয় হইবে তাহা সরকার পক্ষকে বহন করিতে হইবে।

লাহোর দুর্গে রাজবন্দীদের উপর অত্যাচার

লাহোর দুর্গে রাজনৈতিক বন্দীদের উপর অমানুষিক অত্যাচার করা হইয়াছে, মুক্ত রাজবন্দীদের নিকট হইতে দেশবাসী ইহা জানিতে পারিয়াছে। সর্দ্দার শার্দ্দুল সিং কবিশের প্রবীণ ব্যক্তি এবং দেশের একজন সর্ব্বজনশ্রদ্ধেয় নেতা। তিনিও লাহোর দুর্গ হইতে মুক্তিলাভ করিয়া তথাকার কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে গুরুতর অভিযোগ করিয়াছিলেন। কেন্দ্রীয় ব্যবস্থা-পরিষদে ইহা লইয়া আলোচনা উত্থাপিত হইলে স্বরাষ্ট্র-সচিব সাফ জবাব দেন যে, লাহোর দুর্গের ভারপ্রাপ্ত পুলিস কর্ম্মচারীদের বিরুদ্ধে যে সব অভিযোগ হইয়াছে তাহা হয় মিথ্যা নয় অতিরঞ্জিত।

স্বরাষ্ট্র-সচিবের উক্তির প্রতিবাদে সর্দ্দার শার্দ্দুল সিং তাঁহার অভিযোগের পুনরুক্তি করিয়া বিবৃতি প্রকাশ করিয়াছেন এবং বলিয়াছেন যে, অধস্তন কর্ম্মচারীদের সত্যবাদিতায় স্বরাষ্ট্র-সচিবের যদি অটুট বিশ্বাসই থাকিয়া থাকে, তবে সর্দ্দারজীকে আদালতে অভিযুক্ত করিবার সাহসও তাঁহার থাকা উচিত। সর্দ্দারজী আরও বলিয়াছেন যে, লাহোর দুর্গ হইতে তাঁহাকে ক্যাম্বেলপুর জেলে স্থানান্তরিত করিবার পর তিনি লাহোর দুর্গের ভারপ্রাপ্ত পুলিশ কর্ম্মচারীদের নামে মামলা করিবার জন্য ভারত-সরকারের অনুমতি প্রার্থনা করেন। ইহার পর তিন বৎসর অতীত হইয়া গিয়াছে, আজও সে অনুমতি আসে নাই। ব্যাপারটা আদালতে টানিয়া লইবার জন্য সর্দ্দারজী বহু চেষ্টা করিয়াছেন, কারণ আদালতে মামলা উঠিলে সত্য প্রকাশের একটা সুযোগ অন্ততঃ ঘটিবে। কিন্তু ভারত-সরকার কিছুতেই আদালতের পথ মাড়াইতে চান নাই। সর্দ্দারজী শেষ পর্য্যন্ত এমনও বলিয়াছেন যে, গবর্ণমেণ্ট তাঁহার নামে মামলা করিলে সেই মামলার ব্যয়ভার বহনে তিনি রাজী আছেন, তৎসত্ত্বেও স্বরাষ্ট্রসচিব আদালতে আসিবার সাহস পান নাই।

কারাপ্রাচীরের অন্তরালে রাজবন্দীদের উপর যুদ্ধের কয়বৎসরে যে অত্যাচার চলিয়াছে তাহা বহুলাংশে নাৎসী বন্দীশিবিরের সহিত তুলনীয়। প্রাচীরঘেরা জেলের মধ্যে বন্দীদের উপর গুলী ও লাঠি চালাইবার কি প্রয়োজন থাকিতে পারে দেশবাসী তাহা বুঝিতে অক্ষম; অথচ বহু বন্দীশিবিরে এরূপ ব্যাপার ঘটিয়াছে। অন্য অসংখ্যবিধ অত্যাচার তো চলিয়াছেই। কারাকর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে বহু অভিযোগ আসিয়াছে কিন্তু গবর্ণমেণ্ট তার প্রতিকারও করেন নাই, নিরপেক্ষ তদন্ত কমিটি বসাইয়া সত্যাসত্য যাচাই করিবারও চেষ্টা করেন নাই। যাহাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ তাহাদেরই কৈফিয়ৎ বেদবাক্যরূপে শিরোধার্য্য করিয়া তাঁহারা সকল অভিযোগ চাপা দিবার চেষ্টা করিয়াছেন। সর্দ্দার শার্দ্দুল সিং ব্যাপারটা আদালতে টানিয়া আনিবার চেষ্টা করিয়াও ব্যর্থ হইয়াছেন।

চট্টগ্রামে পুলিসের অত্যাচার

'স্বাধীনতা'র প্রকাশিত একটি সংবাদে প্রকাশ, গত ২৪শে মার্চ্চ সকালে একদল পুলিস এবং আবগারী বিভাগের কর্ম্মচারী হাসিমপুর গ্রামের ৫টি মুসলমান কৃষকের বাড়ী চড়াও করে। তাহারা ৮০ বৎসরের এক বৃদ্ধের দাড়ি ধরিয়া টানিতে টানিতে

উঠানে ফেলিয়া বেদম প্রহার করে এবং অনৈক মুসলমান গৃহস্থের স্ত্রী ও তাঁহার পরিবারের অপর দুই জন মহিলাকে মারপিট করে।

প্রকাশ, পুলিসের সহিত বাকি কাহারপাড়ার কয়েকজন মাদকাবা লাঠিকে দেখা যায়।

চার ঘণ্টা পুরাদমে আক্রমণ চালানোর পর দুর্বৃত্তেরা ফিরিয়া যাইবার সময় ট্রাঙ্ক, চেয়ার, কাপড়, সুপারির বস্তা, তামাক, নগদ টাকা এবং সোনার অলঙ্কার ইত্যাদি গাড়ীতে বোঝাই করিয়া লইয়া যায়। ফলে, মোট ক্ষতির পরিমাণ দাঁড়াইয়াছে ৫,৪২০ টাকা।

যাহাদের উপর আক্রমণ করা হইয়াছে, তাহাদের মধ্য হইতেই ৫ জনকে পুলিস গ্রেপ্তার করিয়াছে।

ঘটনার বিবরণে প্রকাশ, আবগারী বিভাগের লোকেরা এই পাড়ায় কৃষকদের কাছে তামাকের ট্যাক্স আদায় করিতে গেলে উভয় পক্ষে বচসা হয়। বচসার ফলে, পিওনের সহিত কৃষকদের মারামারি হয়। পর দিন প্রতিশোধ গ্রহণ করার জন্য পুলিস দলবল জুটাইয়া এই কৃষকপাড়া আক্রমণ করে। যে সমস্ত কৃষকের বাড়ী আক্রান্ত হয়, তাহাদের নাম তজু মিঞা, বসুরত আলি, আমির জুমা, আবুর আলি ও আহম্মদ মিঞা। ইহারা সকলেই তামাক-চাষী।

রংপুর জেলার বৈডেরবাজার গ্রামেও অনুরূপ অত্যাচার ঘটিয়াছে বলিয়া সংবাদ আসিয়াছিল। গবর্মেণ্ট উহার প্রতিবিধান না করিয়া চাপা দিয়াছিলেন। এক্ষেত্রে হয়ত তাহাই ঘটিবে। পুলিস ও মিলিটারীর অত্যাচার গ্রামাঞ্চলে কি ভাবে বাড়িয়াছে এই সব ঘটনা হইতেই তাহার পরিচয় পাওয়া যায়।

প্রস্তর নিক্ষেপে চৈতন্যোদয়

এসোসিয়েটেড প্রেস কর্তৃক প্রচারিত নিম্নলিখিত সংবাদটি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য :

কলিকাতা, ১লা এপ্রিল—কালীগঙ্গা খালের উপরস্থ অস্থায়ী পুলটি রাসবিহারী এভিনিউ ও চেতলা রোডকে সংযুক্ত করিয়াছে। অদ্য সকালে এই পুলটি ভাঙিয়া ফেলিবার কালে অল্পসংখ্যক বালক পুলিস ও বাংলা-সরকারের সেচবিভাগের কতিপয় মিস্ত্রির প্রতি ইষ্টক নিক্ষেপ করে। সরকার যুদ্ধকালীন প্রয়োজনের নিমিত্ত পুলটি তৈয়ার করিয়াছিলেন। স্থানীয় বালকগণ এই কারণে আপত্তি জানায় যে, তাহাদের বিদ্যালয়ে যাইবার পক্ষে পুলটি সুবিধাজনক। কিন্তু তাহাদের প্রতিবাদ নিরর্থক হইলে তাহারা প্রস্তর নিক্ষেপ করিতে সুরু করে এবং খোলা তক্তাগুলি লইয়া চলিয়া যায়। পুলিস ঘটনাস্থলে উপস্থিত হইলে তাহাদের প্রতিও ইট-পাটকেল নিক্ষেপ করা হয়।

সরকারের নিকট হইতে অতিরিক্ত আদেশ না পাওয়া পর্য্যন্ত ইহার কার্য্য আপাততঃ স্থগিত রাখা হইয়াছে।—এ.পি.

যুদ্ধের সময় যে সব রাস্তা ঘাট পুল প্রভৃতি নির্মিত হইয়াছে তাহার নির্মাণের সমস্ত ব্যয়ভার বহন করিয়াছে দেশের লোক। যুদ্ধের পর এগুলি সাধারণের কাজে লাগিলে এই অর্থব্যয় সার্থক হইবে। তাহা না করিয়া কোন্ কর্মচারীর আদেশে উপরোক্ত পুলটি ভাঙিবার ব্যবস্থা হইয়াছে তাহা প্রকাশিত হওয়া দরকার। এই পুলের যতখানি ভাঙা হইয়াছে তাহা মেরামত করা দরকার এবং যে কর্মচারী উহা ভাঙিবার আদেশ দিয়াছে মেরামতের ব্যয় তাহার নিকট হইতে আদায় করা উচিত।

বিশ্ববিদ্যালয় ও ছাত্রসমাজ

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বি-এসসি পরীক্ষায় ফিজিক্সের দ্বিতীয় প্রশ্নপত্র অতিশয় কঠিন হইয়াছে বলিয়া প্রায় এক হাজার ছাত্র কলিকাতায় পরীক্ষাগৃহ হইতে উঠিয়া আসিয়াছে। বাঁকুড়া কেন্দ্রের ছাত্রেরাও উত্তর দিতে না পারিয়া ধীরে ধীরে উঠিয়া যায়। ইহা লইয়া অনেক প্রকার মন্তব্য হইয়াছে, সংবাদপত্রে সমালোচনাও হইয়াছে। ছাত্রদের উপর দোষারোপের ভাবটাই যেন একটু বেশী। ছাত্রদের পক্ষাবলম্বনের ইচ্ছা আমাদের নাই, কিন্তু কতকগুলি অসুবিধার কথা উল্লেখ করা আমরা প্রয়োজন বোধ করিতেছি। পাঠ্যতালিকা নির্দ্ধারণ এবং কলেজে অধ্যাপনা, প্রশ্নপত্র রচনা এবং পরীক্ষার খাতা দেখা ইহাদের কোনটির সহিত কোনটির বিশেষ কোন সম্বন্ধ নাই ইহা গত কয়েক বৎসর যাবৎ লক্ষ্য করা যাইতেছে। ম্যাট্রিকের পাঠ্যতালিকা অনাবশ্যক দীর্ঘ, এ অভিযোগ অনেক হইয়াছে। ইণ্টারমিডিয়েটের ইংরেজীর পাঠ্য যেভাবে নির্দিষ্ট হইয়াছে তাহাতে ছাত্রদের ইংরেজী জ্ঞান বাড়িবার সহায়তা হয় নাই, অনেক অভিজ্ঞ অধ্যাপকও এই ধারণা পোষণ করিতেছেন। জনৈক ইংরেজী পরীক্ষকের নিকট শুনিয়াছি তাঁহার নিকট যে সব খাতা আসিয়াছে তার মধ্যে অর্দ্ধেক ছাত্র পাস করিয়াছে; যাহারা ফেল করিয়াছে তাহাদের মধ্যে দশ-পনর জন বাদে অপর সকলেই পাঠ্যবস্তু বেশ ভাল করিয়া বুঝিয়াছে কিন্তু ইংরেজী ভাষা শুদ্ধ করিয়া লিখিতে পারে নাই বলিয়া পাসের নম্বর পায় নাই। এখানে গলদ রহিয়াছে গোড়ায়। আগে ম্যাট্রিকের ছেলেরা কোন পাঠ্যপুস্তক না থাকা সত্ত্বেও যে ইংরেজী শিখিত, আজকাল ইণ্টারমিডিয়েটের ছাত্রেরাও তার অর্দ্ধেক শেখে না। আগে স্কুলে ম্যাট্রিকের ছেলেদের অনুবাদ, রচনা-পদ্ধতি ও ইংরেজী ব্যাকরণ ভাল করিয়া শিখান হইত, ফলে তাহারা ভাষাটা শিখিত। এখন নির্দিষ্ট দীর্ঘ ইংরেজী পাঠ্যতালিকা শেষ করিতেই বৎসর চলিয়া যায়, ব্যাকরণ ও ভাষা শেখানর ঝোঁক থাকে কম। ম্যাট্রিক ক্লাস হইতে ছেলেরা ইংরেজীতে কাঁচা হইয়া আসে এবং পরে প্রতি পরীক্ষায় বিপন্ন হয়। ইংরেজী বই গেলানোর চেয়ে ভাষা শেখানোর দিকে বেশী মন দিলে বাঙালী ছেলে সহজেই উহা আয়ত্ত করিতে পারিবে। ইংরেজের ছেলে মাতৃভাষার সঙ্গে জর্মান ও ফরাসী দুইটি ভাষায় যদি যুগপৎ দক্ষ হইতে পারে, তবে বাঙালী ছেলেও অনায়াসে মাতৃভাষার সঙ্গে ইংরেজী ও সংস্কৃত শিখিতে পারিবে। বর্ত্তমান জগতে ইংরেজী ভাষা শেখার প্রয়োজন আছে, ইংরেজী বাদ দেওয়া চলিবে না।

তারপর বিজ্ঞানের ছাত্রদের কথা। বিজ্ঞান শিক্ষার দুইটি পথ আছে,—প্রথম, বৈজ্ঞানিক নিয়ম ও প্রণালী সম্বন্ধে সাধারণ জ্ঞান অর্জন; দ্বিতীয়, গণিতের ভিত্তিতে বিজ্ঞান-শিক্ষা;

কলেজে বি-এসসি শ্রেণীতে পূর্ব্বোক্ত প্রণালীতে পড়ান হইলে এবং দ্বিতীয় প্রণালীতে প্রশ্নপত্র রচিত হইলে গোলযোগ ঘটিবেই। আমাদের বিশ্বাস এবারকার বি-এসসি পরীক্ষাতেও এইরূপই কিছু ঘটিয়াছে। ছাত্রদের মধ্যে কমকতক দুর্বিনীত সব সময় থাকে, কিন্তু সকল ছাত্র উচ্ছৃঙ্খল ইহা আমরা বিশ্বাস করিতে প্রস্তুত নহি। যে কোন পরীক্ষায় তো তাহারা গোলমাল করে না। ম্যাট্রিকের সব পরীক্ষা ছাত্রেরা শান্ত ভাবে দিয়াছে, গোল হইয়াছে শুধু ভূগোলের দিন। বি-এস-সি পরীক্ষার অন্যান্য দিন কোন কিছু হয় নাই, বিশৃঙ্খলা ঘটিয়াছে শুধু ফিজিক্সের দ্বিতীয় প্রশ্নের দিন।

বি-এসসি, এম-এসসি প্রভৃতি বিজ্ঞানের ছাত্রদের এবং বি-এ অনার্স এবং এম-এর ছাত্রদের বইয়ের অভাবে গত কয়েক বৎসর যে অসুবিধা ও ক্লেশ সহ্য করিতে হইতেছে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ সে দিকে বোধ হয় লক্ষ্য রাখেন না। লাইব্রেরীর একপ্রস্থ বই নকল করিয়া ইহাদিগকে পরীক্ষার জন্য প্রস্তুত হইতে হয়। বইগুলি পাওয়াও অতিশয় দুষ্কর। ইহা দেখিয়াও বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষ বই আনাইবার আয়োজন বা এখানে উপযুক্ত বই লিখাইয়া তাহা প্রকাশের ব্যবস্থা করিবার চেষ্টা করেন নাই। তাঁহাদের পুস্তক প্রকাশ বিভাগ আছে, ইংরেজী বাংলা প্রভৃতি 'সিলেকশন' প্রকাশ করিয়া উহার একটি বা দুইটি রচনা বদলাইয়া দিয়া প্রতি বৎসর তাঁহারা নূতন পুস্তক কিনিতে ছাত্রদের বাধ্য করেন। এই ব্যবসায় বুদ্ধির একটা অংশ ছাত্রদের জন্য প্রয়োজনীয় পুস্তক সংগ্রহে ব্যয়িত হইলেও কিছু কাজ হইত। যে সব বই পাওয়া যায় না, সেগুলি পাঠ্যই বা করা হয় কেন? শুধু প্রশ্নপত্র রচনা বা পরীক্ষা গ্রহণেই বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্ত্তব্য শেষ হয় না। ভাল বই সরবরাহও বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্যতম দায়িত্ব। অক্সফোর্ড, কেম্ব্রিজ, হার্ভার্ড, কলাম্বিয়া প্রভৃতি বিশ্ববিদ্যালয় কর্ত্তৃক প্রকাশিত পুস্তক কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদের পড়িতে হয়। আমাদের বিশ্ববিদ্যালয় কি এরূপ পুস্তক প্রকাশ করিতে পারেন না? কলেজে ঠিক মত পড়া হয় কি না তৎপ্রতি লক্ষ্য রাখাও বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্ত্তব্য।

প্রশ্নপত্র রচনায় বহু ত্রুটি আছে সিণ্ডিকেট কর্ত্তৃক নিযুক্ত একটি কমিটি তাহা বলিয়াছেন। প্রশ্নপত্রের উন্নতি সাধনের অন্যতম উপায় প্রশ্নকর্ত্তাদের পারিশ্রমিক বৃদ্ধি তাহাও ঐ সঙ্গে বলা হইয়াছিল। প্রশ্ন রচনার পারিশ্রমিক ৩২ টাকার স্থলে ৪৮ টাকা করিলে উহা আরও ভাল হইবে, এই ইঙ্গিতও অনুচিত। হাজার হাজার ছাত্র-ছাত্রীর ভবিষ্যৎ যে প্রশ্নকর্ত্তার উপর নির্ভর করিতেছে তিনি যদি ছেলেদের কথা না ভাবিয়া টাকার কথাই বড় করিয়া দেখেন তবে আমাদের মতে তাঁহাকে এই কার্য্য হইতে অব্যাহতি দেওয়াই সঙ্গত।

সর্ব্বশেষে আমাদের বক্তব্য এই যে ছাত্রেরা তাহাদের অভিযোগ কিভাবে জানাইলে বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্ত্তারা সন্তুষ্ট হইবেন? গত ইণ্টারমিডিয়েট পরীক্ষার সময় কলিকাতায় আন্দোলনের জন্য ইংরেজী বাংলা পরীক্ষা হইতে পারে নাই। ছাত্রেরা চাহিয়াছিল সব পরীক্ষা শেষ হইবার পর তাহাদিগকে তিন দিন সময় দিয়া ইংরেজী পরীক্ষা লওয়া হউক। ছাত্র প্রতিনিধিরা ভাইস-চ্যান্সেলার এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্যান্য কর্ত্তৃপক্ষের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া তাহাদের অসুবিধার কথা জানাইলে তাঁহারা আশ্বাস দেন সিণ্ডিকেটের সভায় তাহাদের অভিযোগ বিবেচিত হইবে। প্রায় দুই সপ্তাহের মধ্যে এই সভা তাঁহারা আহ্বান করিতে সময় পান নাই। অবশেষে ভাইস-চ্যান্সেলারের উপর কতিপয় ছাত্র দুর্ব্ব্যবহার করিলে তার ১৪ ঘণ্টার মধ্যে সিণ্ডিকেটের অধিবেশন আহূত হয়। ছাত্রদের এইরূপ আচরণ অতিশয় নিন্দনীয় ও গর্হিত ইহা আমরা তখনও বলিয়াছি, এখনও বলিতেছি। কিন্তু যত দিন তাহারা শান্তভাবে অভিযোগ জানাইয়াছে তত দিন তাহাদের উপেক্ষা করিয়া এই অপ্রীতিকর ঘটনা ডাকিয়া আনিতে কি বিশ্ববিদ্যালয় কর্ত্তৃপক্ষও সাহায্য করেন নাই? তাহাদের অভিযোগ বিশ্ববিদ্যালয় প্রত্যাখ্যান করিয়াছিলেন। ঐ ঘটনার পর তাহা প্রত্যাখ্যান না করিয়া উপায়ও ছিল না; কিন্তু ছাত্রদের দাবি কি সত্যই যুক্তিহীন ছিল? যথাসময়ে সিণ্ডিকেটের সভা ডাকিয়া বুঝিবার চেষ্টা করিলে কর্ত্তৃপক্ষ জানিতে পারিতেন যে ইণ্টারমিডিয়েটের ইংরেজীর পক্ষে সবচেয়ে কঠিন ও দীর্ঘ বলিয়া পরীক্ষার তিন চার দিন আগে ছাত্রেরা আর সব বই রাখিয়া শুধু ইংরেজী পড়ে। বর্ত্তমান পরীক্ষা গ্রহণ ব্যবস্থা বজায় থাকিতে ছাত্রদের পক্ষে এই কয়দিন সময়ের প্রয়োজন আছে। সুতরাং মাঝে সময় না দিয়া অন্য পরীক্ষা শেষ হইবার সঙ্গে সঙ্গে ইংরেজী পরীক্ষা গ্রহণের ব্যবস্থা করিলে ছাত্রদের প্রতি অবিচার করা হয়। "তোমাদের পরীক্ষার মাঝে মাঝে যে ফাঁক পাও তাহা দৈবক্রমে ঘটে, ইহার উপর তোমাদের কোন দাবি নাই"—একথা বলিলে ন্যায়সঙ্গত কথা বলা হয় না।

মাঝে কিছুদিন ছাত্রদের মধ্যে যে ভাবে উচ্ছৃঙ্খলতা বাড়িয়াছিল তাহার জের কিছু কিছু রহিয়া গিয়াছে, পরীক্ষা গ্রহণ কেন্দ্রে উচ্ছৃঙ্খলতা: ভণ্ডামি এখনও মাঝে মাঝে ঘটিতেছে, কিন্তু মোটের উপর বাংলার ছাত্রসমাজ ধীরে ধীরে যথেষ্ট শৃঙ্খলাবোধ কর্ত্তব্যজ্ঞান ও দায়িত্বজ্ঞানের প্রয়োজন বুঝিতেছে ইহা আমরা মনে করি। ধর্ম্মঘট ও হট্টগোল, দুর্বিনীত ব্যবহার বা বিশ্ববিদ্যালয়ের চেয়ার টেবিল নষ্ট করা অতিশয় গর্হিত কাজ ইহা ছাত্রসমাজ নিজেরাই স্বীকার করিয়াছে, কয়েকজন ছাত্রের এই সব অন্যায় আচরণের জন্য দুঃখ প্রকাশ করিয়াছে। আমরা আশা করি ভবিষ্যতে এরূপ যাহাতে আর্দৌ ঘটিতে না পারে তার জন্য তাহারাই যথাযোগ্য ব্যবস্থা করিতে এবং দুষ্কর্ম্মকারী ছাত্রদের শাস্তিবিধানের ভারও তাহারাই লইতে পারিবে। কিন্তু আমরা মনে করি বিশ্ববিদ্যালয়ের ত্রুটি ও অদূরদর্শিতা এই অপ্রীতিকর ঘটনাগুলির জন্য কম দায়ী নয়।

বিহারে বাঙালী

১৯৩৭ সালে বিহারে কংগ্রেসী মন্ত্রীদের বাঙালী বিরোধী কার্য্যকলাপের ফলে বিহার বাঙালী সমিতির জন্ম হয়। ১৯৪৬ সালে পুনরায় বিহারে কংগ্রেসী মন্ত্রিসভা গঠিত হওয়ায় বাঙালী সমিতির নূতন উদ্যমে কাজ করিবার সময় আসিয়াছে। বিহারে বাঙালী সমিতির হিসাব-নিকাশ দেখাইয়া ২৪শে চৈত্রের 'যুগান্তরে' শ্রীনির্ম্মাল্য দাশগুপ্ত লিখিত যে প্রবন্ধটি প্রকাশিত

হইয়াছে তৎপ্রতি সকল বাঙালীর দৃষ্টি আকৃষ্ট হওয়া দরকার। প্রবন্ধটি দীর্ঘ, উহার কতকাংশ নিম্নে প্রদত্ত হইল :

বাঙালী সমিতির মূল লক্ষ্য ছিল ত্রিবিধ : (১) বিহার-প্রবাসী বাঙালীর কৃষ্টির উন্নতি, (২) অর্থনৈতিক উন্নতি, (৩) প্রাদেশিকতার মনোভাব দূর করা।

প্রথম ও দ্বিতীয় লক্ষ্য ব্যর্থতায় পর্য্যবসিত হইয়াছে। তৃতীয় লক্ষ্যে সমিতি কিছুদূর অগ্রসর হইয়াছিল। ডোমিসাইল সার্টিফিকেটের বিরুদ্ধে জোরাল প্রতিবাদ চলিয়াছিল এই সমিতিরই উদ্যোগে। শ্রীযুক্ত পি, আর, দাশ কংগ্রেসী কর্তৃপক্ষদের কাছে লিখিত আবেদন পেশ করিয়াছিলেন যে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের অন্তর্গত প্রদেশে এইরূপ সার্টিফিকেট প্রথা শাসনতন্ত্রের বিধি-বহির্ভূত। কংগ্রেসী কর্তৃপক্ষগণ শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্রপ্রসাদের নিকট এই আবেদন পাঠাইয়াই ক্ষান্ত হইয়াছিলেন। কাজ আর অগ্রসর হয় নাই।

সমিতির উদ্যোক্তা শ্রীযুক্ত পি, আর, দাশ বিহার-প্রবাসী সমগ্র বাঙালী জাতিকে পরস্পরের সহিত যোগসূত্রে বাঁধিতে চাহিয়াছিলেন। তাঁহার আসল উদ্দেশ্য অবশ্য ছিল আরও উচ্চে। প্রাদেশিকতা পরিহার করিয়া আন্তর্জাতিকতা প্রচারই ছিল লক্ষ্য। তবে, প্রাদেশিকতার প্রকোপে পড়িয়া বাঙালী সম্প্রদায় যাহাতে ক্ষতিগ্রস্ত না হয় সেইজন্য তিনি বিশেষভাবে বাঙালী সমাজের উন্নতির জন্য আগ্রহান্বিত হইয়াছিলেন। তাঁহার মনোভাব এই ছিল যে, প্রদেশের বিভিন্ন স্থানে সমিতি ও তাহার বিভিন্ন শাখার সাহায্যে সামাজিক ও কৃষ্টিগত উন্নতি সাধিত হইবে। এই প্রস্তাব কার্য্যে পরিণত হয় নাই। কংগ্রেসী আমলে জনগণের নিরক্ষরতা দূর করার জন্য যে অভিযান হয় তাহাতে বাংলা ভাষাকে বর্জ্জন করা হইয়াছিল। হিন্দী ভাষার সাহায্যে শিক্ষা দেওয়া হইত। মানভূম, সিংভূম, পূর্ণিয়া প্রভৃতি বাঙালীবহুল স্থানেও ইহার ব্যতিক্রম হয় নাই। ইহাতে বাঙালীদের শিক্ষার প্রসার ও বাংলা ভাষার প্রচারে বাধার সৃষ্টি হইয়াছিল। শ্রীযুক্ত দাশ এই অসুবিধা দূরীকরণার্থে একটি কার্য্যবিধি প্রস্তুত করিয়াছিলেন। সেই কার্য্যবিধির মর্ম্ম এই যে, বিভিন্ন গ্রামে শিক্ষাকেন্দ্র খুলিয়া সপ্তাহে দু-তিন বাংলা ভাষায় শিক্ষা দিতে হইবে। এক-একটি লোকের বা দলের হাতে তিনটি গ্রামের ভার লইতে হইবে। বিনামূল্যে বহু পুস্তক পাওয়া গিয়াছিল। এই ব্যবস্থায় সমগ্র বিহারে মাসে হাজার টাকা ব্যয় হইত। টাকার অভাব হইত না, বস্তুতঃ টাকার সম্বন্ধে প্রতিশ্রুতিও পাওয়া গিয়াছিল কিন্তু কর্ম্মী ও উৎসাহের অভাবে চার-পাঁচ মাসের বেশী এই শিক্ষাদান চলিতে পারে নাই।

কংগ্রেসী মন্ত্রীদের কার্য্য-তালিকা তাঁহাদের বুদ্ধি ও বিবেচনা অনুযায়ী স্থির হইবে। বাঙালী সমিতি স্বয়ং এ অবস্থায় কি করিতে পারে তাহার আলোচনা করিয়া শ্রীযুক্ত দাশগুপ্ত বলিতেছেন :

প্রথমতঃ শিক্ষার দিকে বিশেষ দৃষ্টি দিতে হইবে। যে সব স্থানে বাংলা ভাষায় শিক্ষা দিবার ব্যবস্থা নাই সে সব স্থানে দৈনিক অন্ততঃ এক ঘণ্টা করিয়া বাংলা ক্লাস খুলিতে হইবে। ইহাও অসম্ভব হইলে সপ্তাহে দুই দিন। এই সব স্থানে যাঁহারা ভাল বাংলা জানেন তাঁহারাই পড়াইবার ভার লইবেন। ইহাতে ব্যয় অতি সামান্যই হইবে। অথবা কেহ ইচ্ছুক হইলে অবৈতনিক কাজও করিতে পারেন। মাঝে মাঝে বড় বড় লোক বা মনীষীদের আনাইয়া বক্তৃতার আয়োজন করাও আবশ্যক। পূজাপার্ব্বণাদিতে রচনা, আবৃত্তি প্রতিযোগিতা, অভিনয় ইত্যাদির সাহায্যে বাংলা ভাষার প্রচার হইবে। লাইব্রেরির ব্যবস্থা করাও অবশ্য কর্ত্তব্য। সকল স্থানে লাইব্রেরি স্থাপন করা আপাততঃ সম্ভব না হইলে 'চলন্ত লাইব্রেরি'র ব্যবস্থা করিতে হইবে।

মেয়েদের জন্যও এইরূপ ব্যবস্থার প্রয়োজন; দরিদ্র মেয়েদের হাতের কাজ শেখানো ও সেই সব দ্রব্য বিক্রী করিবার ভারও লইতে হইবে। ছেলেদের শুধু স্কুল কলেজের শিক্ষা দিলেই চলিবে না। যাহাতে তাহাদের কেবলমাত্র চাকুরীর দিকেই না তাকাইয়া থাকিতে হয়, সে উদ্দেশ্যে নানাপ্রকার অর্থকরী বিদ্যাশিক্ষা দেওয়া একান্ত আবশ্যক।

বাঙালী সমিতির একটি প্রচেষ্টার কথাও এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করিতে পারি। বিহারের সমস্ত শহরে বিভিন্ন শ্রেণীর বাঙালীর সংখ্যা সঠিক ভাবে জানিবার আগ্রহ ইহাদের ছিল। কিন্তু ইহাও কার্য্যে পরিণত হয় নাই। দেখা যাইতেছে যে, বাঙালী-সমিতির আদর্শ উচ্চ ছিল, আইডিয়া ভাল ছিল, ছিল না শুধু তাহা কাজে লাগাইবার উৎসাহ ও কর্ম্মী।

বিহার-প্রবাসী বাঙালীর এই তো মোটামুটি হিসাব। তবে, এই সঙ্গে ইহাও মনে রাখিতে হইবে যে, বিহারীদের সঙ্গে যোগ রাখিয়া তাহাদের চলিতে হইবে—নতুবা প্রাদেশিকতা ক্রমেই বাড়িয়া চলিবে। এই যোগ নানাভাবে হইতে পারে :

(১) স্কুল কলেজে ছাত্রছাত্রীদের আন্তরিক মেলা-মেশায়, (২) ক্লাবে, (৩) পূজাপার্ব্বণ ও বিবাহাদি উৎসবে পরস্পরের আমন্ত্রণে, (৪) বিহার-প্রবাসী বাঙালীগণ যাঁহারা নানাভাবে বিহারের সেবা করিয়াছেন তাঁহাদের কার্য্যধারা ও জীবনী বাংলা, হিন্দী ও ইংরেজী ভাষায় প্রচার, (৫) হিন্দী অক্ষরে বাংলাভাষায় পুস্তক রচনা, (৬) বিপদে-আপদে বিহারীদের সাহায্য করা।

বিহারে, বিশেষতঃ সিংভূম, মানভূম, পূর্ণিয়া ও সাঁওতাল পরগণায় বাঙালীর সংখ্যা, তাহাদের বর্ত্তমান আর্থিক ও সামাজিক অবস্থা সম্বন্ধে সঠিক তথ্য নির্দ্ধারণ একান্ত প্রয়োজনীয়। আমরা বিশ্বাস করি বিহারী বাঙালী সমিতি চেষ্টা করিলে ইহা করিতে পারেন। বাংলার সহিত এই চারিটি জেলার পুনর্মিলনের দাবি অবিলম্বে খুব জোরের সহিত তোলা দরকার। এখানে বাঙালীর ভাষা, সংস্কৃতি ও অর্থনৈতিক জীবন পঙ্গু করিবার জন্য গত কয়েক বৎসর যাবৎ যে চেষ্টা হইতেছে তাহার আনুপূর্ব্বিক বিবরণ প্রকাশিত হওয়া দরকার। এ সম্বন্ধে তথ্যাদি আমাদের নিকট পাঠাইলে তাহার সদ্ব্যবহারের জন্য আমরা যথাসাধ্য চেষ্টা করিব।

কবি নবীনচন্দ্রের দেশপ্রেম

শ্রীকালিকারঞ্জন কানুনগো

১

আমি কবি, ভাবুক কিংবা কথাশিল্পী নহি। লোকে বলে, পুঁজি না থাকিলেও ঐতিহাসিক পরের ধনে পোদ্দারী করিয়া থাকে। প্রথম কথা, সর্ব্বসাধারণ অবগত আছেন বাংলা-সাহিত্যের শাহান্ শাহ্ বঙ্কিমচন্দ্র কমলাকান্তের মারফৎ ফরমান্ জারি করিয়া গিয়াছেন বাঙালী নিঃসম্বল হইলেও সমালোচক হইতে পারিবে; যেহেতু মাদ্রাজী না হইলেও সমালোচক জাতীয় জীব—আরবী তমর্-ই-হিন্দ্ (হিন্দুস্থানের খেজুর), বিলাতী tamarind এবং এতদ্দেশীয় তেঁতুলধর্ম্মী। বলা বাহুল্য, সুবে বাংলায় সমালোচনা কার্য্য এ যাবৎ উক্ত বঙ্কিমশাহী ফরমান্ মোতাবেক চলিয়া আসিতেছে। দ্বিতীয় কথা, যে চট্টলপ্রকৃতির ক্রোড়ে নবীনচন্দ্র মানুষ হইয়াছেন, কবিতার প্রেরণা পাইয়াছেন সে চট্টলপ্রকৃতি আমাদিগকে নবীনচন্দ্রের কবিতায় অনুরাগ জন্মাইয়াছে; আমরা তাঁহার "রঙ্গমতী"-দর্পণে মায়ের ছবি দেখিয়া থাকি। চন্দ্রনাথ পাহাড়ে চড়িয়া—

"অদ্রির উপরে অদ্রি অদ্রি তদুপরি"

আমরা যত বার দেখিয়াছি নবীনচন্দ্রের মত ভাল ছেলের সেই অবকাশ কোথায়? কবি সারি গান গাহিয়াছেন; দাঁড় টানিয়া আমাদের হাতে কড়া পড়িয়াছে। জুমিয়া-জীবন দেখিতে দেখিতে আমাদের পাড়ার একজন ফাঁদে পর্য্যন্ত পড়িয়া গেল, তবুও আগে পরে একটা কবিতা বাহির হইল না। পূর্ণিমার উষা অধীর আনন্দে পল্লীজননীর বুকে নামিয়া বিষাদে ভোরের উষায় মুখ লুকাইয়াছে কৈশোরের প্রতি কোজাগর পূর্ণিমায়। নবীনচন্দ্র চট্টলজননীর যে অনুপম রূপ শতবর্ষ পূর্ব্বে দেখিয়াছিলেন উহার নৈসর্গিক জ্যোতিঃ আজিও ম্লান হয় নাই। তিনি যাহা দেখিয়াছিলেন আমরাও উহা দেখিয়াছি। কিন্তু কবির দৃষ্টির মধ্যে ছিল ক্যামেরার "অদ্ভুতরশ্মি," কণ্ঠে ছিলেন বাগীশ্বরী—সুতরাং তাঁহারই মাতৃদর্শন সার্থক হইয়াছে।

যাঁহাদের মন তত্ত্বজিজ্ঞাসু, যাঁহারা ভবপারের খেয়াঘাটে "সোনার তরী"র অপেক্ষা করিতেছেন, নবীনচন্দ্র মুখ্যতঃ তাঁহাদের জন্য কবিতা লিখেন নাই,—শেষ বয়সে চেষ্টা করিয়াছিলেন বটে, কিন্তু উহাতেও দেখিতে পাই, "রাজনীতি-মরু"-র তপ্তশ্বাস, এবং "বীরের শোক" হরিনাম-কে ছাপাইয়া উঠিয়াছে। নবীনচন্দ্রের কাব্যলক্ষ্মী আশ্রমপালিতা চকিতা হরিণী "শকুন্তলা", মুগ্ধা "মালবিকা" কিংবা দুর্ব্বারগতি দানবনন্দিনী "প্রমীলা" অথবা জ্বালাময়ী 'ঐন্দ্রিলা' নহেন; তিনি আমাদেরই পাহাড়ী মেয়ে; সরলা, সবলা, স্বচ্ছন্দবিহারিণী রহস্তময়ী বনবালা।

শুনিতেছি, পাঠশালার ছেলেরা মাইকেল-হেম-নবীনকে কবি হিসাবে দ্বিতীয় শ্রেণীতে নামাইয়া দিয়াছে, এবং কেহ কেহ রবীন্দ্রনাথকেও ধরিয়া টানাটানি শুরু করিয়াছে। ভাবগতিক দেখিয়া মনে হয় কবিগুরুকে আজি হইতে শতবর্ষ পর্য্যন্ত রাজত্ব করিতে হইবে না। অদূর ভবিষ্যতে মজদুরমাহাত্ম্য, চোঙ্গা সনেট, চরকাগীতি, মিল-সংহার জাতীয় কাব্য বাংলার সাহিত্যের ময়দানে কুরুক্ষেত্র ঘটাইবে। ভবিতব্যের প্রচণ্ড বিস্ফোরণে গোটা উনবিংশ শতাব্দী হয়ত মহাশূন্যে উৎক্ষিপ্ত হইবে; বিংশ শতাব্দী উত্তমাঙ্গ হারাইয়া জনগণতাণ্ডব আরম্ভ করিবে এবং ইংরেজ এই কবন্ধের ভয়ে প্রাচ্যভূমি হইতে তল্পিতল্পা গুটাইবে। আশ্চর্য্য হইবার কোন কারণ নাই; কল্পান্তে ইন্দ্রের ইন্দ্রত্বও লোপ পায়।

২

সম্প্রতি "দেশ" "দেশ" করিয়া দেশে হাহারব পড়িয়া গিয়াছে; ভারতমাতা বলিতে অনেকেই অজ্ঞান। যে দেশ আকারে মহাদেশতুল্য, একাধিক নরগোষ্ঠী (race) ধর্ম্ম এবং ভাষা যে দেশে প্রাধান্য লোলুপ, অতীত ইতিহাস বিকৃত হইয়া যে দেশে বিরোধের বহ্নিতে নিয়ত ইন্ধন যোগাইতেছে সে দেশে দেশাত্মবোধ এত সহজলভ্য বস্তু নহে। যে প্রেমের আগুনে দ্বৈধীভাব ঈর্ষা অবিশ্বাস কপটতা পুড়িল না সে প্রেম প্রেম নহে। প্রেমের গলি অতি সংকীর্ণ; উহার মধ্যে দুই জনের ঠেলাঠেলি করিবার জায়গা হয় না; যে হৃদয়ে দেশপ্রেমের উদয় হইয়াছে সে হৃদয়ে আমার অহংভাব, আমার ব্যক্তিগত স্বার্থ এবং অভিমান থাকিতে পারে না। ইংরেজ শাসনে ভারতসন্তান সাবালক হইয়া উঠিয়াছে; তাহারা তাহাদের দাবি কড়ায়-গণ্ডায় বুঝিয়া লইতে চায়। কিন্তু দ্বিতীয় শৈশবের শোচনীয় দশা প্রাপ্ত ভারতমাতার ভার কে গ্রহণ করিবে? "অনাথাশ্রম" না "এতিমখানা" এই বিষয়ে আমরা একমত হইতে পারি নাই বলিয়া তাঁহাকে বিলাতী আতুরাশ্রমে রাখিতে অনেকে অনিচ্ছুক নহেন। এদেশে দেশের উপর দাবিদার অনেক; তাঁহাদের মামলা-মীমাংসা করিতে হইলে সোলেমান কিংবা নশিরবান্-বাদ্শার* বিচক্ষণবুদ্ধি এবং ন্যায়নিষ্ঠতার প্রয়ো-

---

* কথিত আছে, দুইজন স্ত্রীলোক একই সন্তানের মাতৃত্ব দাবী করিয়া সোলেমান বাদশার কাছে সুবিচার প্রার্থনা করিয়াছিল, সাক্ষ্যপ্রমাণের দ্বারা কোন পক্ষের দাবী একচুলও হাল্কা হইল না। বাদশাহ্ শিশুটিকে সমান দুই ভাগ করিয়া উভয় পক্ষের দাবী মিটাইবার হুকুম দিলেন। ফরিয়াদী স্ত্রীলোক বলিয়া উঠিল, "শাহেনশাহ বে-নজীর কানুন ইনসাফ করিয়াছেন।" অপর জন বিবর্ণ মুখে বলিল, "দোহাই আল্লা হজরত।

জন। এদেশে এক প্রকার নাটকীয় সাম্প্রদায়িকতা রাজনীতিক্ষেত্র হইতে সাহিত্যের মজলিসে সংক্রামিত হইয়াছে। ঊনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্দ্ধে মাইকেল-হেমচন্দ্র, নবীন-বঙ্কিম-রমেশচন্দ্র যে অপূর্ব্ব সাহিত্যসৃষ্টি করিয়া গিয়াছেন, আমাদের দেশের একশ্রেণীর লেখক ঐ সাহিত্যকে মুসলমান-বিদ্বেষপ্রসূত হিন্দুসাহিত্য ভ্রম করিয়া মুসলমানের জন্য পৃথক্ মুসলমান সাহিত্য সৃষ্টির চেষ্টা করিতেছেন। ইতিহাসে আমরা দেখিতে পাই সপ্তদশ এবং অষ্টাদশ শতাব্দীতে মহারাষ্ট্র, রাজপুতানা, বুন্দেলখণ্ড এবং পঞ্চনদ প্রদেশে হিন্দু জাগরণের প্রতীক-স্বরূপ একশ্রেণীর দরবারী হিন্দু সাহিত্য হিন্দী ভাষায় আত্মপ্রকাশ করিয়াছিল—যথা ভূষণ-রচিত "শিবরাজভূষণকাব্য", মানকবির "মানপ্রকাশ" বা রাজসিংহচরিত্র, লালকবির "ছত্রপ্রকাশ", কবি সূদন-কৃত "সুজানচরিত" ইত্যাদি। বাংলাদেশে রাজা গণেশের মৃত্যুর পর মুসলমান রাজত্বে কোন হিন্দু অভ্যুত্থান ঘটে নাই; বাংলা ভাষায় কোন হিন্দু সাহিত্যও সৃষ্টি হয় নাই। ইংরেজের আমলে হিন্দুরা কোন্ পাণিপথের লড়াই ফতে করিয়া মুসলমান পতনের উল্লাসে ঊনবিংশ শতাব্দীতে এই তথাকথিত "হিন্দু সাহিত্য" সৃষ্টি করিল? বঙ্কিমচন্দ্র বঙ্গজননীর "দ্বিসপ্ত কোটিভুজ" কোথায় পাইলেন? ইহার মধ্যে অন্ততঃ সাত কোটি হাত যে মুসলমানের, উহা সরকারী আদমসুমারীর খাতায় লেখা আছে। নবীনচন্দ্রের পলাশীর যুদ্ধে "বাঙালির আন্তরিক রোদন" কাহার জন্য? হিন্দুর জয়ডঙ্কা বাজাইবার মতলব থাকিলে, কিংবা কেবল হিন্দুর জন্য কান্নাকাটি করিবার ইচ্ছা থাকিলে তিনি অনায়াসে প্রতাপাদিত্য, শিবাজী, বাজীরাও কিংবা "ভাউ" সাহেবকে কোন মহাকাব্যের নায়কত্বে বরণ করিতে পারিতেন। সেকালে ভোটাভুটি ছিল না; বাঙালী নিজের নাক কাটিয়া পরের যাত্রাভঙ্গ করিত না। সুতরাং বঙ্কিম-নবীন হিন্দু মুসলমান, উৎকল দ্রাবিড় পঞ্জাব সিন্ধু সম্বন্ধে আদৌ সচেতন ছিলেন না; ধর্মনির্বিশেষে সকলকে এক মায়ের পেটে পুরিয়াছেন।

আসল কথা, এই যুগে আমরা আর মুসলমান আমলের ইলিয়স-হুসেন 'বাঙালী', ছুটী খাঁ-পরাগল খাঁ নহি। বঙ্কিম-নবীনের সময় পর্য্যন্ত বাদশাহী আমলের ধারা বজায় ছিল। মর্লে সাহেবের কৃপায় অধিকাংশ বাঙালী "মুসলমান" হইয়া গিয়াছে; বাদ বাকী "অমুসলমান"-গণের মধ্যে আবার "বর্ণ হিন্দু" এবং "তপশিলী" মার্কা আছে। বিংশ শতাব্দীতে (সাহিত্যে দেড় শত বৎসরে এক শতাব্দী) বাঙালীর সৃষ্টি-প্রতিভা এবং রসবোধে ভাটা পড়িয়াছে; সুতরাং ঊনবিংশ শতাব্দীর সাহিত্যকে এই যুগে কসরৎ করিয়া বুঝিতে হইবে। আপন খেয়ালে কবি আপন সৃষ্টিতে নিজের স্বরূপ দেখিয়া থাকেন। স্বয়ং খোদাতালা এই সখের খেয়ালে দুনিয়া সৃষ্টি করিয়া উহার মাঝে নিজের রূপ নিজেই দেখিতেছেন—আপু হি আপু রূপ নেহারহি।

ইহা যদি সত্য হয় নবীনচন্দ্রের দেশপ্রেমের প্রতিবিম্ব তাঁহার কাব্যের মধ্যে নিশ্চয়ই পড়িয়াছে, দৃষ্টিদোষে আমরা ঠিক ধরিতে পারিতেছি না। প্রথমতঃ দেখা যাক, নবীনচন্দ্রের দেশ কোথায়? চট্টগ্রাম, বাংলা না ভারতবর্ষ?

৩

"অবকাশ-রঞ্জিনী"র কবি ফেণী নদী পার হইলেই মনে করিতেছেন দেশ ছাড়িয়া নির্ব্বাসনে চলিয়াছেন, চট্টলার শৈলমুকুট, "কাঞ্চী"র কণ্ঠহার, "শঙ্খে"র বলয়, জননীর চরণ-চুম্বন-চঞ্চল বঙ্গবারিধিকে দেখিতে না পাইয়া অবকাশের অন্তরালে আকুল স্মৃতির দীর্ঘশ্বাস ফেলিতেছেন। পলাশীর যুদ্ধ কাব্যের নবীনচন্দ্র মনে-প্রাণে বাঙালী হইয়া গিয়াছেন; পিতৃভূমি ভারতবর্ষের ছায়া কবির মনে সবেমাত্র ভাসিয়া উঠিয়াছে; এই কাব্যে ব্যাপক অর্থে দেশপ্রেম দানা বাঁধা শুরু করিয়াছে। প্রাণ খুলিয়া পলাশীর যুদ্ধের সমালোচনা করিতে পারেন নাই বলিয়া বঙ্কিমচন্দ্র "বঙ্গদর্শনে" অন্তঃরুদ্ধবীর্য্য সর্পের মত ফোঁস ফোঁস করিতেছেন (বঙ্গদর্শন, কার্ত্তিক ১২৮২ সাল), কারণ কবি এবং সমালোচক দুজনাই ডেপুটি; এই যুগে বাঙালী হৃদয়ের অনির্ব্বাণ চিতানল,—পলাশীর যুদ্ধের আগুন উস্কাইলে তাঁহারা ডেপুটিগিরি হারাইয়া detenue হইতেন। বঙ্কিমচন্দ্র এই জন্য উপসংহারে লিখিয়াছেন, "পলাশীর যুদ্ধের আমরা রাখিয়া ঢাকিয়া পরিচয় দিয়াছি। যদি তাঁহারা [পাঠকগণ] ইহার যথার্থ পরিচয় লইতে ইচ্ছা করেন, আদ্যোপান্ত স্বয়ং পাঠ করিবেন। যে বাঙালী হইয়া বাঙালীর আন্তরিক রোদন না পড়িল তাহার বাঙালী জন্ম বৃথা।"

দেখা যাক্ পলাশীর যুদ্ধ কাব্যে কবির মনের সন্ধান কোথায় পাওয়া যায়; স্বয়ং কবি কাহারও ভূমিকায় নামিয়াছেন কিনা। প্রথম সর্গে শেঠজীর বাড়ীতে গুপ্ত মন্ত্রণাকক্ষে মন্ত্রীর উক্তি। উহাতে দেখা যায় মন্ত্রী পাপ-পুণ্যের ভয় রাখেন; সিরাজ অত্যাচারী হইলেও তাঁহার প্রতি প্রাণের দরদ আছে; নিমকহারামি করিতে তিনি নারাজ। মন্ত্রির উপদেশ মাতৃযোচিত:

"সাজহ সমর সাজে কি কাজ কৌশলে?"

বৃদ্ধ বিচক্ষণমন্ত্রী নির্ভয়ে কৃত্রিম সাহস প্রদর্শন করিয়াছেন;

আমি জাহধানা শিশু এসব করি নাই। প্রাণে না মারিয়া শিশুটি উহাকে দেওয়ায় হুকুম হোক।" বাদশাহ ব্যাপার বুঝিতে পারিয়া যথোচিত বিচার করিলেন।

কারণ তিনি ভালরকম জানেন কৃষ্ণচন্দ্র-রাজবল্লভ, বাণিয়া জগৎশেঠ, মীরবক্সী মীরজাফর আদৌ মনুষ্য নহে। আশ্চর্য্যের বিষয়, মধ্যযুগে গৌড়ের সুলতানী সেরেস্তার দেওয়ানজী, বাঙালী "বড়বাবু"র এই উজ্জ্বল ঐতিহাসিক চিত্র কেমন করিয়া কবির ধ্যানস্থ হইল। বাবরের দিনচর্য্যা (Tuzuk-i-Baburi) কয়েক বৎসর পূর্ব্বে ইংরেজী ভাষায় অনুবাদ না হইলে আমরাও ফাঁপরে পড়িতাম। মুসলমান আমলে বাঙালীর একটা রাজভক্তির অভিমান ছিল। বাবর বাদশাহ্ লিখিয়াছেন, "...Bengalis are loyal to the throne." এদেশে গৌড়ের শাহী মসনদে কে বসিলেন, কোন্ হতভাগ্য সুলতানের মাথা কাটিয়া বসিলেন, তিনি ভাল কি মন্দ এই সমস্ত লইয়া সরকারী দপ্তরখানার দেওয়ান হইতে হরকরা পর্য্যন্ত, কিংবা জমিদার চাষা কেহ মাথা ঘামাইত না। প্রজা সাধারণের মনোভাব কবি ঐতিহাসিক অপেক্ষা অন্যত্র ভালই বিশ্লেষণ করিয়াছেন—

"এক রাজা যাবে পুনঃ অন্য রাজা হবে
বাঙ্গালার সিংহাসন শূন্য নাহি রবে।"

রাজাও প্রজাদের নিকট বিশেষ কিছু প্রত্যাশা করিতেন না:

"যার যাবে নব রাজা আমি হব হত,
প্রজার কি দুঃখ তাহে হইবে অন্তরে?"

মন্ত্রী ইত্যাদি পৌরুষহীন পুরুষবর্গের মধ্যে নবীনচন্দ্র নাই। "সাধে কি বাঙালী মোরা চিরপরাধীন" ইত্যাদি বাঙালী চরিত্রের দুর্ব্বলতা অবাঙালী জগৎশেঠের মুখে আমাদিগকে না শুনাইয়া কৃষ্ণচন্দ্রের মুখে শুনাইলে ক্ষোভের কারণ থাকিত না। ফতেচাঁদ, জগৎশেঠ, উমিচাঁদ, মাণিকচাঁদ বাঙালী নয়, মাড়োয়ারী ও পঞ্জাবী ক্ষেত্রী সাতপুরুষ বাংলাদেশে থাকিলেও বাঙালী হয় না। "বাঙালীর মন্ত্রণায়" সিরাজের পতন হয় নাই; কারণ প্রকৃত ষড়যন্ত্রকারীদের মধ্যে ফতেচাঁদ, উমিচাঁদ অবাঙালী; মীরজাফর মীরণ পশ্চিমী মুসলমান। ফতেচাঁদ আলিবর্দ্দীর সহিত ষড়যন্ত্র করিয়া নবাব সুজাউদ্দীনের পুত্র সরফরাজ্ খাঁকে রাজ্যচ্যুত করিয়াছিলেন, তিনি বাংলাদেশের ইহুদী। "সজীব বচন" বাণিয়ার মুখে অস্বাভাবিক, যেহেতু ভিজা কাঁথা আগুনে গরম হয় না। চামুণ্ডারূপিণী রাণী ভবানীর রণহুঙ্কার শুনিয়া আশঙ্কা হয় হিন্দু কবি বুঝি এইবার একটা যবন-সংহারিণী কালী আসরে নামাইলেন। নবীনচন্দ্রের মধ্যে নাটকীয় কিছু ছিল না; নাটক লিখিলে তিনি বিপাকে পড়িতেন। বেচারা মীরজাফর বাংলার মসনদের লোভে পড়িয়া রাত্রির দুর্য্যোগে হিন্দুর দ্বারস্থ হইয়াছেন। পর্দ্দার আড়াল হইতে, "কিছু দিন পরে মহারাষ্ট্রপতি হবে ভারত-ভূপতি,"—এই আকস্মিক অশনিসম্পাতে বৃদ্ধের হৃৎপিণ্ডের ক্রিয়া বন্ধ হইলে পলাশীর যুদ্ধ লিখিবার বিবরবস্তু থাকিত না। মীরজাফরকে ইংরেজ কিছুদিন কাঠের পুতুলের মত নাচাইয়া আরাম আয়েশ করিবার অবকাশ দিয়াছিল। কিন্তু বর্গীর হাতে পড়িলে বল্লমের উপর চড়িয়া দীর্ঘ দাড়ি গোঁফ সমেত খাঁ সাহেবের মাথাটা নাগপুর হইয়া সরাসরি পুণায় পৌঁছিত, এবং মহাপাপী ফতেচাঁদ-জগৎশেঠের ভিটায় দ্বিতীয়বার পুকুর খোঁড়া হইত। রাণী ভবানীর অহেতুক উপস্থিতি ঘটাইয়া কবি কাঁচা কাজ করিয়াছেন। "রাণীর কি মত?" জিজ্ঞাসা করিয়া রাজা কৃষ্ণচন্দ্র গালে চড় খাইলেন—সমস্তই বানচাল হওয়ার উপক্রম। প্রস্তাবের বিরুদ্ধে রাণী আর এক দফা বক্তৃতা আরম্ভ করিবেন, এমন সময় আবার অশনি পতন; রুষ্টা বহিঃপ্রকৃতি বা নিয়তি রাণীকে নিরস্ত করিলেন। বঙ্কিমচন্দ্র বলিয়াছেন, "রাণীর উক্তি দৈববাণীর ন্যায়", কিন্তু দেবতা কোথায় তিনি ইঙ্গিত করেন নাই। নারী-দেবতার সন্ধানে আলেয়ার পশ্চাতে ছুটিয়া লাভ নাই। কবি বলিতেছেন—

...শূন্যদৃষ্টি, দুনয়ন স্থির;
এইরূপে বঙ্গমাতা বসি শূন্য মনে।

রাণী ভবানী এই দৃশ্যে মানবী নহেন। তিনিই স্বয়ং বঙ্গমাতা।

কবি দৈববাণীর দুর্ব্বল আশ্রয় না লইয়া বঙ্গমাতার মুখে নিজের কথা শুনাইয়া ষড়যন্ত্রের উপর যবনিকাপাত করিয়াছেন। এই স্তবে কবি নবীনচন্দ্রের দেশপ্রেম, রাণী ভবানীর উক্তি এবং পরে বাঙালীর গৌরব সেনাপতি মোহনলালের উক্তির দ্বারা বিচার করিতে হইবে। বঙ্কিমচন্দ্র লিখিয়াছেন,

"যদি উচ্চৈঃস্বরে রোদন, যদি আন্তরিক মর্ম্মভেদী কাতরোক্তি, যদি ভয়শূন্য তেজোময় সত্যপ্রিয়তা, যদি দুর্ব্বাসাপ্রার্থিত ক্রোধ, দেশবাৎসল্যের লক্ষণ হয়—তবে সেই দেশবাৎসল্য নবীনবাবুর..."

৪

পলাশীর যুদ্ধে মুসলমান এবং ইংরেজ উভয়ের প্রতি ঐতিহাসিক সুবিচার করিয়াছেন। নবাব আলিবর্দ্দী খাঁর আশ্রিত, অথচ নিরপেক্ষ এবং স্বাধীনচেতা ঐতিহাসিক গোলাম হোসেন রচিত সায়ের-উল্-মুতাখ্খিরিন পুস্তকের প্রায় দেড় শত বৎসর পূর্ব্বে হাজী মোস্তাফা-কৃত ইংরেজী অনুবাদ হইতে খুব সম্ভবতঃ সিরাজ, মীরজাফর এবং মীরণ চরিত্রের উপাদান কবি সংগ্রহ করিয়াছেন। এই তিনটি চরিত্রের কাল ও নবীনবাবুর কাব্যে সিরাজের স্বপ্ন অংশটি বাদ দিলে—মুসলমান ইতিহাসের মসীবর্ণ হইতে অনেক হাল্কা মনে হইবে। সিরাজের লাম্পট্য এবং নৃশংসতা মীরজাফর মীরণের কেলেঙ্কারীর তুলনায় কিছুই নয়। ইংরেজ আমলে পূর্ণিয়ার পাপিষ্ঠ দেবীসিংহের পৈশাচিক অত্যাচারের তুলনায় সিরাজরাজত্ব রামরাজ্য বলিয়া মনে হয়। ঐতিহাসিক গোলাম হোসেন সত্যের খাতিরে সিরাজের দুষ্কর্ম

গোপন করেন নাই। স্বদেশপ্রেম, হিন্দু মুসলমানের প্রতি অপক্ষপাতিত্ব এবং হতভাগ্য সিরাজের প্রতি যে গভীর সহানুভূতি অন্তঃসলিলা ফল্গুধারার ন্যায় তাঁহার ইতিহাসে আত্মগোপন করিয়া রহিয়াছে, পলাশীর যুদ্ধের প্রতি সর্গে কবির সেই সহানুভূতি, তিরস্কারের অন্তরালে প্রাণের দরদ লোকপাবনী জাহ্নবীধারার মত বঙ্গভূমি প্লাবিত করিয়াছে। বাস্তবিক পক্ষে ভারতবর্ষে কদাচিৎ কোন হিন্দু কবি এবং মুসলমান ঐতিহাসিক এইভাবে সুর মিলাইতে পারিয়াছেন। পলাশীর যুদ্ধের পরিণাম, ভারতবর্ষের ইতিহাসে উহার বিপ্লবকারী সুদূর প্রতিক্রিয়া, নবীনচন্দ্র যাহা গভীর অনুভূতির দ্বারা প্রত্যক্ষ করিয়াছেন, সে যুগের কোন ইংরেজী ইতিহাসে উহা লিপিবদ্ধ ছিল না, এমন কি গোলাম হোসেনের সূক্ষ্ম ঐতিহাসিক দৃষ্টিতেও উহা ধরা পড়ে নাই।

আমাদের এই সিদ্ধান্ত হয়ত অনেকের মনঃপূত হইবে না। নিছক সাম্প্রদায়িক মনোভাব লইয়া পলাশীর যুদ্ধ কিংবা রঙ্গমতী পড়িলে ধৈর্য্যচ্যুতির সম্ভাবনা আছে। যথা,

(১) রে মূর্খ যবন!

(২) স্বাধীন অপক্ষপাতী আর্য্য রাজ্য পরে
তেমতি যবন রাজ্য স্বজাতিপ্রবণ"

ইত্যাদি।

এক পক্ষের অভিযোগ নবীনবাবু হিন্দুস্থানী মুসলমানকে আরবী খেজুরের চারা না বলিয়া হিন্দুর অশ্বত্থ গাছের ঝুড়ি বলিয়াছেন, আর্য্যরাজ্যকে মধ্যাহ্ন এবং মুসলমান আমলকে গোধূলি বলিয়াছেন; মুসলমান রাজত্বের প্রতি তাঁহার শ্রদ্ধা এবং প্রীতি নাই—

পশিয়া পিঞ্জরান্তরে বনবিহঙ্গীর
কিবা সুখ কি অসুখ সমান অধীন।

অন্য পক্ষের উত্তর—'রে মূর্খ যবন!" গালাগালিতে চটিবার মত কিছুই নাই, পলাশীর আমবাগানে যুদ্ধের আগুন দাউ দাউ করিয়া জলিয়া উঠিয়াছে; মুসলমান হতভম্ব; হাত-পা তাহার পেটের ভিতর গিয়াছে—'বাপ-জান্' 'মিঞাসাহেব' বলিয়া তোয়াজ করিবার সময় উহা নয়, যে আগুনে মুসলমানের মতিমহল পুড়িয়াছে, সে আগুনে গরীব হিন্দুর চালাঘরও পুড়িয়া ছাই হইয়াছে। পলাশীর যুদ্ধ "পরের কেবলমাত্র লৌকিক রোদন" কিনা, একবার পড়িয়া দেখিলেই হয়। মুসলমান যুগ ভারতবর্ষের স্বাধীনতার অপরাহ্নই বটে; দুপুরের পর অপরাহ্নের গোধূলি না ডিঙাইয়া দাসত্ব-সন্ধ্যা ঘনাইয়া আসে না। অপর পক্ষ বলিবেন,

(১) যে বীর জাতির এই দৃঢ় সিংহাসন,
ছিল পঞ্চশত বর্ষ হিমাদ্রি যেমন
অচল অটল রাজবৈতিক সাগরে।

অথবা—

(২) ছিল না ঐশ্বর্য্য বীর্য্যে এই ধরাতলে
সমকক্ষ যবনের, বীর পরাক্রম
অস্তাচল হৈতে খ্যাত উদয় অচলে।

ইহা রাখিয়া ঢাকিয়া প্রশংসা কে বলিবে? যদি হিন্দু-মুসলমানকে ভারতের সহিত অভিন্ন মনে না করিতেন তাহা হইলে পলাশী প্রভাতে, "পোহাইল ভারতের সুখের রজনী" এই বেদনা কবিকে ব্যথিত করিত না। দাসসুলভ সাম্প্রদায়িক মনোভাব থাকিলে নবীনচন্দ্র উদীয়মান ইংরেজ ভাস্করকে "ওঁ নমো কাশপুষ্প-ধবলং" মন্ত্রে বন্দনা করিতেন।

এইরূপ বাদানুবাদ কাব্য বিচার নহে, ঐতিহাসিক গবেষণাও নহে।

৫

"রঙ্গমতী"র সমালোচনা প্রসঙ্গে সঞ্জীবচন্দ্র লিখিয়াছেন, "পলাশীর যুদ্ধে নবীনবাবু যখনই মাতৃভূমির দুঃখ ভাবিয়া রোদন করিয়াছেন তাঁহার কবিতা গৈরিকনিস্রববৎ তীব্র উদ্দীপনা উদ্গীর্ণ করিয়াছে। সেই মর্ম্মভেদী রোদন, "রঙ্গমতী"র অস্থি পঞ্জর ...." বৃদ্ধেরা যেখানে ক্রন্দন শুনিয়াছেন তরুণ সেখানেই শুনিতে পাইয়াছে দাসত্বপুষ্ট সভ্যতার সহিত আদি মানব-প্রকৃতির শাশ্বত সংগ্রামের বাণী—"বীরেন্দ্র! দাসত্ব হতে দস্যুত্ব উত্তম"।

এই কাব্যে কবির দেশবাৎসল্যের কেন্দ্র নির্ণয় করা কিছু কঠিন। নায়ক বীরেন্দ্র মোগল সম্রাটের আনুগত্য ত্যাগ করিয়া শিবাজীর অঙ্গুলি-সংকেতে "পূরবে চট্টলাচল পশ্চিমে গান্ধার" তাঁহার পিতৃভূমি বলিয়া চিনিয়াছেন; এবং গুরুর নিকট হইতে ভারত উদ্ধার ব্রত গ্রহণ করিয়াছেন। কিন্তু গুরুর তীক্ষ্ণ অন্তর্ভেদী দৃষ্টিতে নবদীক্ষিত বীরশিষ্যের দুর্ব্বলতা ধরা পড়িল; বীরেন্দ্রের জ্ঞান জন্মিয়াছে, কিন্তু জ্ঞান প্রেমে পরিণত হয় নাই। আদর্শবাদে উদ্বুদ্ধ হইয়া তিনি ভারতবর্ষকে চিনিতে পারিয়াছেন; কিন্তু তাঁহার প্রেম ক্ষুদ্রতর বঙ্গভূমি এবং ততোধিক ক্ষুদ্র পিতৃরাজ্য "পূরব চট্টল"কে অতিক্রম করিয়া আসমুদ্রহিমাচল হিন্দুস্থানকে অভিষিক্ত করিতে পারে নাই। এইজন্য মহারাষ্ট্রপতি বাংলাদেশকে শিষ্যের কর্ম্মস্থান নির্দ্দিষ্ট করিয়া দিলেন।

ঐতিহাসিকের মনে স্বভাবতঃই সন্দেহ উপস্থিত হয় শিবাজী-বীরেন্দ্র সাক্ষাৎকার কি নিছক কবিকল্পনা, মনোরম "স্বপ্ন" না বাস্তব ইতিহাসের ছায়া? বাঙালীর উপর নজর রাখিয়া মুসলমান যুগের ইতিহাস পড়িয়াছি; কিন্তু দাক্ষিণাত্য যুদ্ধে কোন বাঙালী বীরের সন্ধান মিলে নাই। অবশ্য বাঙালী যুদ্ধ করে নাই এমন কথা নহে; তাহারা সুলতান হাজি ইলিয়সের "বঙ্গাল" সৈন্য নেপাল জয় করিয়া কাঠমণ্ডু পোড়াইয়া দিয়াছে; সুলতান সিকেন্দর শাহের

পদাতিক বাহিনীর সেনাপতি "সহদেব বজালী" দিল্লীশ্বর ফিরোজ তোগলকের তুর্কী রিসালাকে হটাইয়াছে। মোগল সম্রাটের অধীনে বাঙালী জমিদার বাংলাদেশে লড়াই করিয়াছে, কিন্তু বাহিরে নহে; উনবিংশ শতাব্দীর বাংলা উপন্যাসের বাঙালী বীরগণ মনগড়া মনসবদার; বাদশাহী মনসবদারের তালিকায় সুবজ এবং চন্দ্রকোণার রাজা ছাড়া তৃতীয় বাঙালীর উল্লেখ নাই। যাহা হউক, লালকবি প্রণীত মহারাজ ছত্রসাল বুন্দেলার জীবন-চরিত হিন্দী "ছত্রপ্রকাশ" কাব্যের সহিত "রঙ্গমতী" মিলাইয়া পড়িলে সন্দেহ হয় নবীনচন্দ্র যেন শিবাজী-ছত্রসাল সাক্ষাৎকার বিষয়ক অধ্যায়ের ছায়ায় শিবাজী-বীরেন্দ্র চিত্রিত করিয়াছেন। নবীনচন্দ্রের পূর্ব্বে "ছত্রপ্রকাশ" অবলম্বন করিয়া ইংরেজী ভাষায় বুন্দেলখণ্ডের ইতিহাস রচিত হইয়াছিল। সাধারণতঃ আমরা যতটুকু অনুমান করিয়া থাকি বঙ্কিম-নবীন উহার চেয়ে ঢের বেশী ইতিহাস পড়িয়াছিলেন।

জাগ্রৎ অবস্থা অপেক্ষা সুষুপ্তি এবং স্বপ্নের মধ্যে মানুষের আসল রূপ নিজের কাছে ধরা পড়ে বলিয়া মনস্তত্ত্ববিদ্‌গণ মনে করেন। আমরাও দেখিতেছি "রঙ্গমতী"র 'বিজন কানন স্বপ্নে" নবীনচন্দ্র ধরা পড়িয়া গিয়াছেন। চট্টলের নিভৃত অঙ্কে 'কাঙ্কী' তীরে কল্পনার "রঙ্গমতী" বীরেন্দ্র তথা নবীনচন্দ্রের ক্ষুদ্রদেশ—রাজ্য না হইলেও রায়-বংশের সুবিস্তৃত জমিদারী। মুসলমানের প্রতি যে বিদ্বেষ শিবাজী বীরেন্দ্রের মনে জাগাইয়াছিলেন দেশে ফিরিবার পর উহা বাংলার মাটিতে মিলাইয়া গেল। বীরেন্দ্র প্রথমতঃ দ্বিধায় পড়িয়াছিলেন, একদিকে গুরুর নিষেধ, "যবন সপক্ষে অসি করিতে ধারণ।" অন্য দিকে চিন্তা, "আর্য্য অরি নহে কিহে মঘ পর্ত্তুগীস্?" বাঙ্গালা দেশ তখন আরাকানী মঘ এবং সমুদ্রতস্কর পর্ত্তুগীসগণের অত্যাচারে জর্জ্জরিত, বীরেন্দ্রের পিতৃরাজ্য দস্যুকবলিত। দেশপ্রেম না থাকিলে তিনি বিদেশী আক্রমণকারীগণের নেতৃত্ব গ্রহণ করিয়া অন্ততঃ নিম্নবঙ্গে মুসলমান-অধিকার লোপ করিতে পারিতেন; এবং বিদেশীর হস্তে পুরস্কার-স্বরূপ পিতৃরাজ্য অনায়াসে সম্পূর্ণ লাভ করিতে পারিতেন। কর্ত্তব্য নির্ণয়ে বীরেন্দ্র ভুল করিলেন না। এই সময় মোগল সুবেদার শায়েস্তা খাঁ ফেণী তীরে শিবির সংস্থাপন করিয়াছেন। বাংলার হিন্দু মুসলমান নির্ব্বিশেষে প্রজাসাধারণের ধনপ্রাণ নিরাপদ করিবার জন্য তাঁহার এই অভিযান। ছদ্মবেশী বীরেন্দ্রের রণ কৌশলে মঘ পর্ত্তুগীস পরস্পর কাটাকাটি করিয়া মরিল; যবন-বিদ্বেষ বাঙালীর দেশপ্রেমের নিকট পরাজয় মানিল। "ছিল না জননী মম ছিল জন্মভূমি"—বীরেন্দ্রের এই আন্তরিক রোদন ভারতবর্ষ কিংবা বাংলার জন্য নহে। পল্লীজননীর জন্য স্বয়ং কবির এই করুন ক্রন্দন। কবি নায়ক বীরেন্দ্রের মৃত্যু ঘটাইয়াছেন সীতাকুণ্ডের পাহাড়ে; স্বয়ং দেহরক্ষা করিলেন চট্টগ্রাম শহরে রহমতগঞ্জের বাড়ীতে, এবং তাঁহার পবিত্র চিতা ভস্ম মিশিয়াছে স্বগ্রামে পিতৃপিতামহের শ্মশানে।

৬

কবি নবীনচন্দ্রের দেশাত্মবোধের ক্রমবিবর্ত্তন, আর্য্য-যবনের মধ্যে মনোরাজ্যে আদর্শবাদের সংগ্রাম অত্যন্ত স্বাভাবিক ধারায় চলিয়াছে, ভাবের ঘরে কোথায়ও লুকোচুরি নাই। শিবাজীর সভাকবি ভূষণ-কৃত "শিবরাজভূষণ কাব্য" এবং নবীনচন্দ্রের "রঙ্গমতী" কাব্যে একই ভাবপ্রবাহ প্রবহমান। মধ্যকালীন দুই শত বৎসর ধরিয়া সমস্ত উত্তর-ভারত এবং দাক্ষিণাত্যে সপ্তদশ শতাব্দীর বিরাট্ হিন্দু-জাগরণের জোয়ার-ভাটা চলিয়াছে। কবি ভারতচন্দ্রের কাব্যে দেখিতে পাই পুরুষোত্তম ধামে হিন্দুধর্ম্মের উপর অত্যাচারের প্রতিশোধ গ্রহণের জন্য রঘুজী ভোঁসলার প্রতি মহাদেবের স্বপ্নাদেশ। বঙ্কিম-নবীনের যুগে হিন্দু-মুসলমান একই খাঁচার পাখী; ইংরেজের দাপটে বাঘে গরুতে এক ঘাটে জল খাইতেছে। তখন হিন্দুর সমাজ, ধর্ম্ম এবং সংস্কৃতি বিপন্ন হইয়াছিল; মুসলমানের হাতে নহে, নাস্তিক ইহকাল সর্ব্বস্ব পাশ্চাত্ত্য সভ্যতার আক্রমণে। এই সঙ্কট হইতে পরিত্রাণ পাওয়ার একমাত্র উপায় ছিল শিক্ষিত হিন্দুর মনে স্বদেশ, স্বজাতি এবং স্বধর্ম্মের প্রতি শ্রদ্ধা ও অনুরাগ সৃষ্টি। নবগোপাল মিত্রের "হিন্দু-মেলা" সংস্থাপন, রাজনারায়ণ বসু কৃত "হিন্দুধর্ম্মের শ্রেষ্ঠত্ব" জাতীয় বাংলা সাহিত্যের মূলে ছিল হিন্দুর এই আত্মরক্ষার প্রেরণা; মুসলমান বা খ্রীষ্টান বিদ্বেষ নয়। জাতির প্রকৃত সত্তার উপর বহু শতাব্দী ধরিয়া যে জঞ্জালের স্তূপ পড়িয়া ছিল উহাকে হয় তীব্র উদ্দীপনার আগুনে পুড়াইতে হইবে; না হয় প্রবল বন্যায় ভাসাইয়া লইতে হইবে। সাহিত্য আগুন জ্বালাইতে পারে; কিন্তু মহাপ্লাবন একমাত্র ধর্ম্মের খাতে প্রবাহিত হয়। বাংলা সাহিত্য হিন্দুর অতীত ইতিহাস এবং সংস্কৃতিকে বাহন করিয়া যে জাতীয় উদ্দীপনা এবং উন্মাদনা সৃষ্টির প্রয়াস পাইয়াছিল উহাতে আর্য্যাভিমানের ছাপ নিশ্চয়ই পড়িয়াছে; কিন্তু উহা নিন্দুকের উপহসিত "আর্য্যামি" নহে।

৭

কবি নবীনচন্দ্রের 'রৈবতক" এবং "কুরুক্ষেত্র" কাব্যের বিষয়বস্তু ইতিহাসের পাল্লার বাহিরে পড়িয়া গিয়াছে। মহামনীষী হীরেন্দ্রনাথ "সাহিত্য" পত্রিকায় এই কাব্যদ্বয় সমালোচনা করিয়া ঐতিহাসিকের অন্ধ চক্ষুকে দৃষ্টি দিয়াছেন; তাঁহার কৃপায় নবীনচন্দ্রের "উনবিংশ শতাব্দীর মহাভারত" রৈবতকাদি কাব্যত্রয় বাঙালী বর্ত্তমানে না হইলেও ভবিষ্যতে বুঝিতে পারিবে। তিনি বলিয়াছেন, "চারি

সহস্র বৎসর পূর্ব্বে মহাভারত পূর্ণাদর্শ নয়নের সম্মুখে রাখিয়া আর্য্য জাতির যে প্রয়োজন সিদ্ধ করিত, দেশ কাল এবং পাত্রভেদে কুরুক্ষেত্র-রৈবতকও সেই প্রয়োজন সিদ্ধ করিবে। সেই দিন আর কতদূরে ?" ভারতবর্ষের এই যুগসন্ধিক্ষণে দাঁড়াইয়া ভাবিতেছি গভীর দূরদৃষ্টিপ্রসূত এই আকুল ভবিষ্যবাণী হয়ত অদূরভবিষ্যতে পূর্ণ হইবে। নবীনচন্দ্রের মহাকাব্যের "ঊনবিংশ শতাব্দীর মহাভারত" আখ্যা একাধারে গুণগ্রাহী সমালোচকের প্রশংসা এবং শাস্ত্রনিষ্ঠ নিন্দুকের শ্লেষ। শুনা যায়, রৈবতক-কুরুক্ষেত্র প্রকাশিত হইবার পরে ধর্ম্মপ্রাণ সনাতনপন্থী আর্য্যগণের মধ্যে কিঞ্চিৎ ক্ষোভ এবং চাঞ্চল্য উপস্থিত হইয়াছিল ; কারণ তাঁহারা বুঝিতে পারিলেন কবি মহাভারতের নামে তাঁহাদের জন্য ব্যাসকাশী সৃষ্টি করিয়াছেন ; "ঋষি দুর্ব্বাসা" পলাশীর যুদ্ধের কবি নবীনচন্দ্র নহেন—নাগরাজের পরিত্যক্ত নির্ম্মোক, প্রতিক্রিয়াশীল আর্য্যাভিমানের শোচনীয় অথচ সুনিশ্চিত পরিণাম। আমরা দেখিতে পাই কবির দেশাভিমানের ক্ষুদ্র পর্ব্বতনির্ঝরিণী রৈবতকের পাদদেশে নির্ম্মল উদার দেশপ্রেমের গঙ্গাপ্রবাহে পরিণত হইয়াছে ; কুরুক্ষেত্র পরিক্রমা করিয়া প্রভাস-সৈকতে এই প্রেম মহামানব সমুদ্রে নির্ব্বাণ খুঁজিতেছে।

কাব্য বুঝিবার আস্পর্দ্ধা আমাদের নাই ; তবে স্থূল ঐতিহাসিক দৃষ্টিতে উক্ত কাব্যত্রয় কাব্যও নয়, মহাভারতও নয়—উহা ভারতের রাজনৈতিক ভবিষ্যপুরাণ—ভাবী মহাভারতের পূর্ব্বগামিনী ছায়া। সংস্কৃত মহাভারতে অনুদার বর্জ্জন-নীতি নাই ; প্রাচীন ভারতে জাতি এবং বর্ণবৈষম্য দূর করিবার জন্য বেদব্যাস ইতিহাসকে মনের মত ভাঙিয়া-চুরিয়া নিজের প্রয়োজন সিদ্ধ করিয়াছেন—ইহার একটি প্রমাণ যযাতির বংশ-তালিকা। ভবিষ্যতের মঙ্গলের জন্য নবীনচন্দ্রও উহা করিয়াছেন এবং বেদব্যাসের কমণ্ডলুর জল ছিটাইয়া আর্য্য অনার্য্য "অপবিত্রঃ পবিত্রো বা" সকলকেই কালোপযোগী ফলপ্রসূ দেশপ্রেম মন্ত্রে দীক্ষা দিয়াছেন। রৈবতক-কুরুক্ষেত্রের কবি অনার্য্যের প্রতি আর্য্যের ঘৃণা এবং অবিচার, অনার্য্য হৃদয়ে উহার তীব্র প্রতিক্রিয়া এবং প্রতিশোধস্পৃহা যে ভাষায় বর্ণনা করিয়াছেন, বর্ত্তমান রাজনীতিক্ষেত্রে ইতিহাস উহার প্রতিধ্বনি শুনিতেছে। হিংসা, লোভ যুদ্ধ এবং কূটনীতির মধ্য দিয়া ইতিহাসের প্রারম্ভ হইতে বর্ত্তমান কাল পর্য্যন্ত জাতির উত্থান-পতন ঘটিয়াছে ; হয়ত ভবিষ্যতেও ঘটিবে। কিন্তু সর্ব্বহারা হইয়াও ভারতের অন্তর-আত্মায় ধ্বনিত হইতেছে অহিংসার সুর, প্রেম ও মৈত্রীর বাণী, কে কাহার পাকা ধানে সুদূর অতীতে মই দিয়াছে, মন্দির ভাঙিয়াছে, কি মসজিদ ভাঙিয়াছে—হিসাব নিকাশের প্রয়োজন নাই ; মন্দির মসজিদ গীর্জ্জা যেগুলি আছে উহাও কয়দিন থাকিবে কেহ বলিতে পারে না। কবি বলিয়াছেন, "সংহার স্রষ্টার নীতি", সময়-স্রোতে সবই ভাসিয়া যাইবে। আমরাও মনে করি, ভাঙাগড়া খোদার মর্জ্জি, হিন্দু মুসলমান ইংরেজ নিমিত্ত মাত্র। শেষ পর্য্যন্ত জাতির মনকে এই স্তরে উন্নীত করিতে না পারিলে দেশ-প্রেম কুলাভিমান বা Communalism-এর ঊর্দ্ধে উঠিবে না ; ভারতের ভিতরে কিংবা বাহিরে শান্তি স্থাপিত হইবে না।

নবীনবাবুর কুরুক্ষেত্র পড়িয়া হীরেন্দ্রনাথ লিখিয়াছেন,

"এই বুঝি সেই প্রাচীন ঐতিহাসিক কৃষ্ণচরিত্র,......বঙ্কিমবাবুর কল্যাণে কৃষ্ণচরিত্রের আবর্জ্জনা পরিষ্কৃত হইয়াছে। এখন নবীনবাবুর কাব্য কৃষ্ণভক্তিপ্রচারে মহাভারতের স্থানীয় হউক।"

কিন্তু পাষণ্ড ঐতিহাসিক এই কাব্যের মধ্যে অতীত ইতিহাস কিংবা কোন ঐতিহাসিক চরিত্র খুঁজিয়া পায় না ; অথচ আধুনিক ইতিহাস যিনি পড়েন নাই, ভারতবর্ষের ভাবী রাজনৈতিক সমস্যা যাঁহার ধ্যানের বিষয়ীভূত হয় নাই তিনি রৈবতক-কুরুক্ষেত্রের শ্রীকৃষ্ণচরিত্র কখনও এমন চমৎকার ভাবে ফুটাইয়া তুলিতে পারিতেন না। মনে হয় শিবাজীর মাবলী সৈন্যই যেন কৃষ্ণের "গোপসেনা", কংস বধ যেন আফজল খাঁ-বধ কিংবা মোগল কবলিত পুণা নগরী উদ্ধারের জন্য বরযাত্রীর ছদ্মবেশে শায়েস্তা খাঁ-র শিবিরে শিবাজীর প্রবেশ এবং অতর্কিত নৈশ আক্রমণ। যাহা হউক, অন্ততঃ বহি পড়িয়া বিনাযুদ্ধে প্রবীণ সৈনিক হইতে না পারিলে বঙ্কিম, নবীনের মত চমৎকার যুদ্ধবর্ণনা মামুলি কবি বা উপন্যাসলেখকের সাধ্যের অতীত।

কুরুক্ষেত্র বাধাইয়া শ্রীকৃষ্ণ নিরপেক্ষতার অজুহাতে স্থির করিলেন নিজে অস্ত্রধারণ করিবেন না ; অথচ ক্ষুদ্র কুলাভিমানী নীতিহীন শৌর্য্যদৃপ্ত ক্ষাত্র-শক্তি ধ্বংস না হইলে তাঁহার জীবনব্রত পূর্ণ হইবে না ; বিষ্ণুচক্রে খণ্ডীকৃত সতীদেহের ন্যায় সাম্রাজ্যচক্রান্তে খণ্ডশঃ বিভক্ত ভারতমাতার দেহে প্রাণের স্পন্দন ফিরিয়া আসিবে না ; তাঁহার বুকে "এক জাতি, এক রাজ্য" প্রতিষ্ঠিত হইবে না। এইজন্যই নিষ্কাম, নির্লিপ্ত, নির্ম্মম মহাকাল তাঁহার বিরাট্ মূর্ত্তি সংহার করিয়া প্রাকৃত মানবের ন্যায় কুরুক্ষেত্রে পার্থ সারথীর ভূমিকা অভিনয় করিয়াছিলেন। হয়ত তিনি মহা-ভারত সৃষ্টির কামনায় নরদেহে আবার আসিবেন কিংবা আসিয়াছেন ; আমরা যেন নবীনচন্দ্রের মত দেখিতে পাইতেছি—

"নিরস্ত্র বসিয়া কৃষ্ণ অর্জ্জুনের রথে,
সাধিছেন স্থিরচিত্তে ক্ষত্রির বিনাশ।"*

* কবি নবীনচন্দ্র-জন্মশতবার্ষিকীর চট্টগ্রাম অধিবেশনের জন্য লিখিত।

নতুন পরিচয়

শ্রীপরিমল গোস্বামী
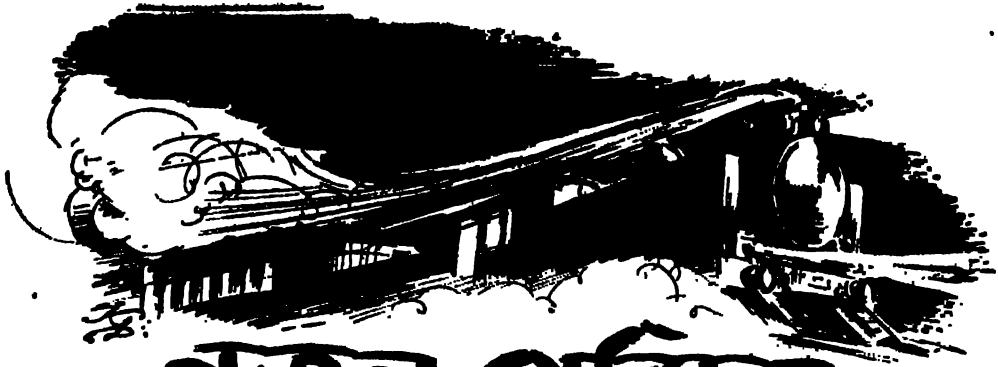
ট্রেনে চলছিলাম কলকাতার বাইরে।

আজ সাত বছরের শহুরে একঘেয়ে জীবনে অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছি। কিন্তু সেটাই কি একমাত্র সত্য কথা?

চলছিলাম গয়া, ভাবী শ্বশুরের একমাত্র কন্যাকে দেখতে। রূপযাত্রাও বলতে পারেন।

কটা বছর নিজের সম্বন্ধে কিছু ভাববারই সময় পাই নি, অথচ চুলগুলো আমার অপেক্ষা না করেই পেকে উঠছে, দাঁতও অনেকগুলো স্থান ত্যাগের নোটিস্ দিয়েছে। বয়সটা যে চলছে সে কথাটা বুঝতে হঠাৎ বেশি অনুভব করছি। আর দুটো বছর পার হ'লেই চল্লিশে গিয়ে উত্তীর্ণ হব, সুতরাং আর বিলম্ব করা যায় না।

মনে একটা সন্দেহ জেগে উঠেছে। অন্তরে আমি যাই হই বাহিরটা কি ইতিমধ্যেই পরিণয়-কার্যের প্রতিকূলে সাক্ষ্য দিচ্ছে না? শুধু সন্দেহ নয়, ভয়ও জেগেছে মনে। নিজের সম্বন্ধে সঙ্কোচ বেড়ে গেছে। এখন কি ক'রে আমার ভাবী শ্বশুরকে বোঝাব যে আমার অন্তর-বাহির এক নয়? আমার এই অকাল-পক্বতাই বা কে বিশ্বাস করবে? আমার অন্তর-বাহির এক নয়, এবং আমি অকালপক্ব, এই দুটি কথা আমার সম্পর্কে আজ পর্যন্ত কেউ বলে নি ব'লে আমার একটা গর্ব ছিল। অথচ আজ সমস্ত মনপ্রাণ দিয়ে আমি এই প্রার্থনাই করছি—আমার ভাবী শ্বশুর-কুল যেন ঐ দুটি কথা আজ আমার সম্পর্কে বিশ্বাস করেন।

সুতরাং বলা বাহুল্য যে আমি খুব নিশ্চিন্তচিত্তে ট্রেনে উঠি নি। তা ছাড়া গন্তব্য স্থানটি প্রেতলোকের সঙ্গে যোগা-যোগের একটি প্রধান স্টেশন, সেখানে অভিপ্রেতের সন্ধানে যাওয়াটাই কেমন যেন একটা নিরুৎসাহজনক ব্যাপার। সে জন্যেও মন ভাল নেই।

সেকেণ্ড ক্লাসের উপরের একটা বার্থ রিজার্ভ করে চলেছি। গাড়ি হাওড়া ছাড়বার মুখে আমাদের কামরায় মোট যাত্রী সংখ্যা হলাম পাঁচ। আমার বিপরীত দিকে এক জন ইউরোপীয় ভদ্রলোক। আমার নীচে মোটা শাল জড়ানো এক বাঙালী বস্তহীন বৃদ্ধ। মাঝখানে আর এক বাঙালী বৃদ্ধ, গায়ে কালো কোট, গলায় কম্ফর্টার। ইউরোপীয় ভদ্রলোকের নীচে পশ্চিমদেশীয় পুষ্টকায় এক ভদ্রলোক। দুর্দান্ত শীত। সবাই বিছানা বিছিয়ে শোবার বন্দোবস্ত করছেন। আমি আগেই শুয়েছি।

কেউ কারো পরিচিত নন, সুতরাং কারো মুখেই কোনো কথা নেই। ইউরোপীয় ভদ্রলোক শুয়ে পড়ে একখানা বই পড়তে লাগলেন। তার পরেই লেপচাপা দিলেন পশ্চিমা ভদ্রলোক। দুই বৃদ্ধ বাঙালী তখনও ইতস্ততঃ করছেন। কিন্তু বেশিক্ষণ অপেক্ষা করতে পারলেন না, শীতে হাড়সুদ্ধ কাঁপিয়ে তুলছে সবারই।

ট্রেন তখন চলতে শুরু করেছে।

কিছুক্ষণ বেশ নিশ্চিন্ত মনেই কাটল। কিন্তু কয়েক মিনিট পরেই দেখি কালো-কোটধারী বৃদ্ধ উস্‌খুস্ করছেন। আমার নীচের বৃদ্ধ ভদ্রলোকটিকে দেখতে পাচ্ছি না, কিন্তু মনে হ'ল তিনিও জেগে আছেন।

কালোকোট লেপ মুড়ি দিয়েছিলেন, কিন্তু সুবিধা হ'ল না, মাথা বের করে হাই তুললেন।

এতক্ষণ পরে শালধারী প্রথম কথা বললেন। জিজ্ঞাসা করলেন, "মহাশয়ের ঘুম আসছে না বুঝি? আমারও তাই।"

"না তা ঠিক নয়।" ব'লে কালোকোট চিন্তান্বিত হলেন।

শালধারী প্রশ্ন করলেন, "মহাশয়ের কতদূর যাওয়া হবে?"

কালোকোট বললেন, "গয়া।"

গয়া শব্দটি আমাকে বিচলিত করল। এঁদের আলাপে যোগ দেবার ইচ্ছে হয়েছিল, কিন্তু চেপে গেলাম। কে জানে, ইনিই যদি আমার ভাবী শ্বশুরের পদ অলঙ্কৃত করেন? নানা রকম সন্দেহে মন চঞ্চল হয়ে উঠল। লেপটা মুখের উপর আরও টেনে দিয়ে কৌশলে চোখ দুটো বের ক'রে স্থিরভাবে দৃষ্টি নিবদ্ধ করলাম কালোকোটধারীর উপর। ভদ্রলোক যেন দাগী আসামী, আর আমি যেন ডিটেকটিভের লোক।

ইনিও পাল্টা প্রশ্ন করলেন, "আপনি কতদূর?"

সংক্ষিপ্ত উত্তর এল, "ধানবাদ।"

ইতিমধ্যে কালোকোট উঠে বসেছেন। এইবার কি তবে আলাপ ভাল করে জমবে? কথায় কথায় কি কন্যার বিবাহের কথাটাও উঠবে না? উঠলে যে বাঁচি। ভাবী জামাতা সম্বন্ধে

তাঁর মতামত স্পষ্ট বোঝা যাবে। কিন্তু আমার ভাবী শ্বশুর এ সময়ে কলকাতা আসবেন কেন? কিছুই বলা যায় না, হয় তো আমার সম্পর্কে অনুসন্ধান নিতে এসেছিলেন গোপনে। হয় তো গত কাল ফিরে যেতে চেয়েছিলেন, কোনো কারণে যাওয়া হয়নি তাই আজ চলেছেন। মনের সন্দেহ আমার দূর হ'ল না, বরং ক্রমশই ধারণা হতে লাগল যে কাল এঁকেই গিয়ে সশ্রদ্ধ নমস্কার নিবেদন করতে হবে। সুতরাং আমার কৌতূহলের চেয়েও অস্বস্তি বোধ হতে লাগল খুব বেশি।

কালোকোটের মনে কি আছে কে জানে?

কিন্তু তিনি ও কি করছেন? ব্যাগ খুলছেন কেন? সবিস্ময়ে চেয়ে দেখলাম ব্যাগ থেকে চওড়া-মুখ তরল পদার্থপূর্ণ একটা বেঁটে শিশি বের করলেন। তারপর শিশির কর্ক খুললেন। তারপর কপ ক'রে তাঁর বাঁধানো দাঁত দুপাটি খুলে সেই শিশিতে পুরলেন এবং পুনরায় কর্ক এঁটে সেটি ব্যাগের মধ্যে রেখে দিলেন।

শালধারী বলে উঠলেন, "আপনার তো মশাই সব বন্দোবস্তই বেশ পাকা। ভাল করেছেন দাঁত খুলে রেখে।"

কালোকোটের মুখের চেহারা সম্পূর্ণ বদলে গেল। ছিলেন প্রায় ষাট বছরের, এখন আশী বছরের মতো হলেন। তাঁর উচ্চারণও সঙ্গে সঙ্গে বদলে গেল, বললেন, "মশাই, বাধ্য হয়ে বন্দোবস্ত করতে হয়েছে।"—দাঁত খুলে দেওয়াতে দন্ত্য উচ্চারণগুলো আর হ'ল না।

শালধারী বললেন, "বাধ্য হয়ে কি রকম?"

"শীতে বড় কষ্ট পাই, দাঁত ঠক্ ঠক্ করতে থাকে, এই যুদ্ধের বাজারের চতুর্গুণ দামে কেনা বাঁধানো দাঁত ঠক্ ঠক্ করিয়ে লাভ কি?" বলে বিষণ্ণ হাসি হাসলেন।

শালধারী বললেন, "দামের কথা যদি বললেন, তা হলে দাঁতে আমার যা লোকসান হয়েছে সে আর বলবার নয়।"

কোট সে কথা জানবার জন্তে উৎসাহিত হলেন।

শালধারী বললেন, "আর বলেন কেন! সস্তার বাজারে কিছু সোনা কেনা ছিল, তাই দিয়ে দুপাটি দাঁত করিয়ে নিলাম যুদ্ধের বাজারে। খরচ একই পড়ল, কারণ বাজারের দাঁতের দামও তখন সোনার মতোই। গত মাসে এই গাড়ির মধ্যেই ঘুমন্ত অবস্থায় আমার মুখ থেকে সে দাঁত চুরি হয়ে গেছে, তাই এখন বিনা দাঁতেই কাটাচ্ছি।"

"বলেন কি! এ তো সাংঘাতিক চুরি।"

"সাংঘাতিক ব'লে সাংঘাতিক!"

মিনিট তিনেক চুপচাপ কাটল। কালোকোট ব'লে উঠলেন, "দুঃখ করবেন না মশাই, শুধু বিনা দাঁতে তো নয়। যা দিনকাল পড়েছে, বিনা অন্নে, বিনা বস্ত্রে, বিনা বহু জিনিষে কোনো রকমে টিকে থাকা মাত্র।"

এ কথা শুনে আমার মনটা কেন যেন খারাপ হয়ে গেল। শুনেছি আমার ভাবী শ্বশুর শ্রীযুক্ত অমদা মজুমদার খুব ধনী ব্যক্তি। কলকাতায় বাড়ি আছে, দেশে বাড়ি আছে, দেশের বাইরে পশ্চাতে বাড়ি আছে—এবং কন্যা মাত্র একটি। তথাপি এ কি কথা? "কোনো রকমে টিকে থাকা" তো কোনো ধনী ব্যক্তিরই কথা হতে পারে না। ওঁর দিকে করুণ দৃষ্টি মেলে এই সব কথা ভাবছি—হঠাৎ লক্ষ্য পড়ল ব্যাগের উপরকার দুটি অক্ষরের উপর। ইংরেজী এ, এম, দুটি অক্ষর। আর সন্দেহ রইল না লোকটি কে। আমি কিংকর্তব্যবিমূঢ় ভাবে লেপের মধ্যে ভাল ভাবে আত্মগোপন ক'রে রইলাম। ক্রমশই আমার মনে নৈরাশ্যের সঞ্চার হতে লাগল আমার নিজের চেহারা সম্পর্কে। আমার পাকা চুলই আমাকে পরাভূত করবে এ বিষয়ে আর সন্দেহ নেই। তা ছাড়া ভাবী শ্বশুর যদি ধনী না হন তা হলে অযথা এ পরীক্ষার মধ্যে যাদি কেন? তার চেয়ে এখনই আত্মপ্রকাশ করা ভাল নয় কি?

কিন্তু অবুঝ মন আশা ছাড়তে চায় না।

শালধারী বললেন, "মশাই ছত্রিশ বছর ভারতের মধ্যেও যে সব ঘটনার স্থান হয় না, তার চেয়েও বেশি ঘটনা ঘটে গেল এই ছটা বছরের মধ্যে।"

"ঠিকই বলেছেন আপনি।"—কোট উৎসাহিত হয়ে বললেন। "ঠিক ভুবড়ি বাজির মতো। এক-আঙুল খোলের মধ্যে এমন সব জিনিষ ঠেসে পুরে বের যার মুক্তি পেতে জায়গা লাগে পঞ্চাশ হাত।"

"তবেই দেখুন কি ভয়ানক ব্যাপার! ছত্রিশ বছরের জীবন ছ-বছরের খোলের মধ্যে কাটানো কি সোজা কথা?"—ব'লে শালধারী ঐ কথার প্রতিধ্বনি করলেন।

হাহুতাশের হাওয়ায় আলোচনা হুতাশনের মতোই জ্বলে উঠতে লাগল।

কোট বললেন, "মশাই ভেবে দেখুন ১৯০৯ থেকে আমাদের মার্কের উপর মিনিটে দশটা ক'রে হাতুড়ির ঘা পড়েছে কি না?"

শালধারী বললেন, "আপনার মতো ভাষায় জোর নেই, কিন্তু আপনি খাঁটি কথা বলেছেন। দুর্ভাবনায় দুশ্চিন্তায় চব্বিশ ঘণ্টা কাটাতে হয়েছে।"

"শুধু দুশ্চিন্তা? দুশ্চিন্তা করতে গেলেও তো মনের খানিকটা সক্রিয়তা দরকার হয় ৮ এ যে একেবারে বেঁধে মারা! মন কিছু ভাববার সময়ই পায় নি—পড়ে পড়ে কেবল মার খেয়েছে। যুদ্ধের প্রথম বছরখানেক অতটা বোঝা যায় নি, কিন্তু এই মার খাওয়া অসহ হয়ে উঠেছে ১৯৪১-এর মাঝামাঝি সময় থেকে।"

"ঠিক কোন্ সময়টার কথা বলছেন?"

"বলছি যখন থেকে আলো-ঢাকা শুরু হ'ল। অন্ধকারে গুঁতো খেতে খেতে পথ চলতে হ'ল।"

শালধারী একটু চিন্তা করে বললেন, "কিন্তু আপনি একটা বড় কথা বাদ দিচ্ছেন। জিনিষপত্রের দাম তার আগে থেকেই বাড়তে শুরু করেছে।"

"বাদ দেব না কিছুই—সবই বলছি একে একে"—ব'লে কোটধারী লেপটা গায়ে জড়িয়ে বেশ ভাল ভাবে বসলেন।

কি সর্বনাশ, এই ছ-বছরের দুঃখের ইতিহাস শুনতে হবে পড়ে পড়ে! কিন্তু আর তো কোনো উপায় নেই। রাত্রি ক্রমশ বেড়ে চলেছে। আর-দুজন যাত্রী বহুক্ষণ ঘুমিয়ে পড়েছেন। আমার ভাবী শ্বশুরকে এতক্ষণ ঐ শালধারী উৎসাহ দিয়ে দিয়ে এমন একটা বিষয়ের মধ্যে টেনে এনেছেন যা মনে হ'ল তাঁর অত্যন্ত প্রিয়। নানা রকম উপমা দিয়ে যে রকম জ্বলাও ক'রে

তিনি এ সম্পর্কে দু-চারটে কথা এতক্ষণ বলেছেন তাতে স্পষ্টই বোঝা গেল যুদ্ধজনিত দুর্দশাকে তিনি নিপুণ বৈজ্ঞানিকের মতোই আপন মনে বিশ্লেষণ করে এসেছেন এতদিন। এ সম্বন্ধে তাঁর উৎসাহ একটু বেশিই মনে হ'ল। তা না হলে তিনি ঘুরে ফিরে আলোচনাটা এর মধ্যেই টেনে আনতেন না। তা ছাড়া রাত্রি গভীর। চলন্ত ট্রেনের একটানা শব্দ, চারিদিকের অন্ধকারের বুকে একমাত্র শব্দ। এই শব্দের পটভূমিতে, এমনি গভীর রাত্রে, এমন সহানুভূতিশীল শ্রোতার সম্মুখে যে-কোনো লোকেরই মর্ম-বেদনা আপনা থেকেই উদ্ঘাটিত হতে থাকে। এ ক্ষেত্রেও তার ব্যতিক্রম হ'ল না। আমি স্পষ্ট লক্ষ্য করলাম কোটবাসী বৃদ্ধ আর নিজেকে ধরে রাখতে পারছেন না। তাঁর মাথার উপর ছ-বছর ধরে মিনিটে দশটা করে হাতুড়ির ঘা পড়েছে, এই ছ-বছরে স্প্রিংএর মতো তাঁর মনের চারদিকে যে শ্বাসরোধ-কারী কঠিন পাক পড়েছে তা তিনি আজ একে একে খুলবেন এ বিষয়ে সন্দেহ রইল না। সুতরাং আমাকেও বাধ্য হয়ে প্রস্তুত হতে হ'ল তাঁর কথা শোনবার জন্যে।

শালধারীকে তিনি প্রশ্ন করলেন, "শুনবেন সব ?"

শালধারী জোর গলায় বললেন, "শুনব না মানে ? নিশ্চয় শুনব। এ সব কথা যত শোনা যায় ততই মনটা হাল্কা হয়। তা ছাড়া দুঃখ-দুর্দশা তো শুধু আপনার একার নয়, আমাদের সবার, এবং ব'লে আপনি যত আরাম পাবেন, আমরা শুনে ঢের আরাম পাব।"

"সে তো বটেই। কিন্তু সব শেষে এমন একটা কথা প্রকাশ করব যা শুনে হয় তো আপনি চমকে যাবেন—আর হয় তো কেন, আমার বিশ্বাস আপনি নিশ্চয় চমকে যাবেন।"

শালধারী চমকে যাবার আগে আমি চমকে গেলাম এই কথাটি শুনে। আমার সন্দেহ হ'ল উনি সর্বশেষ যে বিস্ময়ের কথা বলবেন সেটি নিশ্চয় আমারই সম্পর্কে। বলবেন—"ছ-বছরের দুর্দশা কাটিয়ে যদি বা আলোর মুখ দেখা গেল, যদি বা কন্যাটির বিবাহ দিয়ে নিশ্চিন্ত হতে চাইলাম, কিন্তু প্রথমেই যে পাত্রটিকে পেয়ে খুশি হব ভাবলাম সে একটি অপাত্র। একে-বারে বুড়ো, আমারই বয়সী ; এই ভাবে মশাই ধাক্কার পর ধাক্কা, আঘাতের পর আঘাত খেয়ে চলেছি।" অথবা এই কথাই অন্য ভাষায় বলবেন।

এই কাল্পনিক অপমানে আমার অন্তরাত্মা বিদ্রোহী হয়ে উঠল। সে বেঁকে দাঁড়াল। আমি পত্রপাঠ না ঠিক করে ফেললাম। পাত্তাড়াটা গেল, যাকগে। বিয়ে যদি করতে হয়, ঘরে বসে করব। আরও অনেক রকম শপথ করলাম মনে মনে।

শালধারী একটুক্ষণ চিন্তা করলেন। বোধ হয় এই যুদ্ধের কয়েকটি বছরের মধ্যে চমকে যাবার মতো কিছু আছে কি না খুঁজে দেখলেন, কিন্তু পেলেন না। বললেন, "বলুন না আপনার কথা—খুবই অদ্ভুত কথা না কি ?"

"একেবারে আরব্য উপন্যাসের মত অদ্ভুত। দাঁড়ান দাঁত লাগিয়ে নিই আগে—নইলে বড্ড অসুবিধা হচ্ছে।" ব'লে ব্যাগ থেকে দাঁত বের করতে লাগলেন।

কথা আরম্ভ হ'ল। শুরু হ'ল ১৯৩৯ সালের যুদ্ধের প্রথম দিন থেকে। কি রকম দিনের পর দিন আতঙ্ক বাড়তে লাগল, কি ভাবে আলোক নিয়ন্ত্রণ শুরু হ'ল, জাপানী আক্রমণের

আশঙ্কা হ'ল, তার পর জাপানীরা যুদ্ধ ঘোষণা করল—সব একে একে বললেন। এর প্রত্যেকটি ঘটনা, প্রত্যেকটি খবর কি ভাবে মানুষের নার্ভের উপর ঘা মেরেছে তা শোনালেন। তার পর জিনিসের দাম বেড়ে যাওয়া—জিনিস দুষ্প্রাপ্য হওয়া —লোকের দুর্গতির কথা, শোনালেন। দুর্গতি ক্রমশ বাড়তে লাগল। জাপানীরা বর্মা প্রবেশ করল, কলকাতার লোক শহর ছেড়ে পালাল, আবার ফিরে এল, তারপর '৪২ সালের ২০ ডিসেম্বর কলকাতায় প্রথম বোমা পড়ল, দ্বিতীয় বার শহর ছেড়ে পলায়ন শুরু হ'ল। এইভাবে শহরবাসীরা নানা ভাবে নাজানাবুদ হতে লাগল। জাপানীরা আন্দামান দখল করল। যখন তখন কলকাতা আক্রমণের ভয়। এই অবস্থায় আবার একে একে শহরে ফিরে আসা এবং দ্বিতীয় বার সর্বস্বান্ত হওয়া—এই সব কথা একটি একটি করে তাতে অতি ভয়ঙ্কর রং ফলিয়ে তিনি তাঁর শ্রোতাকে স্তম্ভিত করতে লাগলেন।

বলা বাহুল্য আমিও স্তম্ভিত হয়ে শুনছিলাম। এ রকম বিভীষিকা বিশ্লেষণ আমি আর ইতিপূর্বে দেখি নি। তাই তাঁর একটানা একটি পর্বের বক্তৃতা শেষে যখন তিনি হঠাৎ তাঁর শ্রোতাকে প্রশ্ন করলেন, "শুনছেন ?"—তখন আমিই হঠাৎ আত্মবিস্মৃত হয়ে আগে বলে উঠলাম, "খুব মনোযোগের সঙ্গে শুনছি।"

আমার নিতান্ত সৌভাগ্য যে ঠিক সেই সময় শালধারীও উত্তেজিত ভাবে বলে উঠলেন, "নিশ্চয় শুনছি—আপনি থামবেন না।" তাই আমার কণ্ঠ চাপা পড়ে গেল। আমি কখন যে এই কাহিনীর মধ্যে ডুবে গিয়েছিলাম বুঝতেই পারি নি।

আধ মিনিট বিরামের পরেই কোটধারী আবার তাঁর কাহিনী শুরু করলেন। এ কাহিনীর মধ্যে নতুনত্ব কিছুই নেই—এর প্রত্যেকটি অংশের সঙ্গে আমাদের প্রত্যেকেরই প্রতিটি দিন ওতপ্রোতভাবে জড়িত—এর প্রত্যেকটি মিনিটের অভিজ্ঞতা আমাদের সবার অভিজ্ঞতা, কিন্তু তিনি যেভাবে সব কিছুর ব্যাখ্যা করছিলেন, এবং বুঝিয়ে দিচ্ছিলেন কি ভাবে এতলো

আমাদের স্নায়ুর উপর আঘাতের পর আঘাত দিয়ে চলেছে—তা আমার কাছে অন্ততঃ সম্পূর্ণ নতুন। যুদ্ধ যে এমন ভয়ঙ্কর ভাবে আমাদের সর্বনাশ করে গেছে তা এই প্রথম উপলব্ধি করে আমি হতবুদ্ধি হয়ে পড়েছি।

১৯৪০-এর ১৬ জানুয়ারি তারিখের বোমার আক্রমণটা তিনি বর্ণনার ভঙ্গীতে আবার বাস্তব করে তুললেন। এত দিন পরে তা শুনে আমার বুক কাঁপতে লাগল। তার পর নিপুণ-ভাবে ব্যাখ্যা করে বুঝিয়ে দিলেন প্রথম শহর ছেড়ে পালানোর স্নায়ুর উপর যে পরিমাণ ঘা লেগেছিল, দ্বিতীয় বারের পলায়নে তার চেয়ে অন্তত দশগুণ বেশি ঘা লেগেছে। উপরন্ত এ অবস্থাতেও যখন ৩০ মার্চ তারিখে গোটা বাংলা দেশকে বিপজ্জনক এলাকা ঘোষণা করা হ'ল তখন থেকে শহরের কোনো মানুষই আর স্বাভাবিক জীবন যাপন করতে পারে নি—সহজভাবে কেউ আর নিশ্বাসও নিতে পারে নি।

বৃদ্ধের বলবার ভঙ্গি সত্যই অতি চমকপ্রদ। যখন কথা শুরু করেন তখন কণ্ঠ কিছু ক্ষীণ থাকে। তার পর সে কণ্ঠ ধাপে ধাপে চড়তে থাকে এবং কথার পর কথা চলতে থাকে অবিরাম গতিতে। তিনি না থামা পর্যন্ত মাঝখানে আর কারও কিছু বলবার অবসর থাকে না। তাই এতক্ষণ আমরা মন্ত্রমুগ্ধবৎ তাঁর কথা শুনে গিয়েছি, কখনও বিরক্তি বোধ করিনি—তাঁর কথায় পুনরাবৃত্তি এক মুহূর্তের জন্যেও একঘেয়ে লাগেনি।

বৃদ্ধ দ্বিতীয় বার একটু থামতেই শালধারী নিতান্ত বৈচিত্র্য সৃষ্টির জন্যেই তাঁর কতকগুলো কথা নিজেরই কথা বলে আবৃত্তি করতে লাগলেন এবং জানালেন দুবার শহর ছেড়ে পালানোর ব্যাপারে তিনিও প্রায় সর্বস্বান্ত হয়েছেন।

কোটধারী আবার অনুপ্রাণিত হয়ে বলতে লাগলেন, "হতেই হবে, কারোই নিস্তার নেই। কিন্তু এই দুশ্চিন্তা আতঙ্ক আর ছুটোছুটিতেই তো সব শেষ নয়, শুধু কাল্পনিক ভয় তো নয়, বিভীষিকা মূর্তি ধরে এল একেবারে চোখের সম্মুখে। ডাইনে বাঁয়ে নিরন্নের হাহাকার—ডাইনে বাঁয়ে মৃত্যু দৃশ্য। পথ চলতে হচ্ছে মৃতদেহ ডিঙিয়ে ডিঙিয়ে। মানুষের এমন মৃত্যু তো কখনও দেখি নি, কখনও ভাবি নি। এ রকম নিষ্ঠুর করুণ মৃত্যু, এমন অসহায় নীরব মৃত্যু!—শত শত নরনারী শিশু বালক বৃদ্ধ যুবক যুবতী—শূন্য দৃষ্টি মেলে ধুঁকে ধুঁকে মরছে চোখের সামনে—এ কি দেখা যায়? চোখ খুললে এই বেদনার দৃশ্য, চোখ বুজলে গভীর আতঙ্ক। পায়ের নীচে যেন মাটি নেই, আশ্রয় নেই। অন্ধকারে দম বন্ধ হয়, আকাশে চাঁদ উঠলে বোমার ভয়ে বুক কাঁপতে থাকে। এমনি অবস্থাতেই তো মানুষ পাগল হয়ে যায়, পাগল হইনি এ খুব আশ্চর্য মনে হয়, কিংবা হয়েছি কি না কে জানে!"

শালধারী বললেন, "এমন কি খবরের কাগজ খুললেও কেবলই বীভৎস সব ছবি দেখতে হয়েছে—জাপানীদের অত্যা-চারের সব ছবি।"

"ঠিক কথা। এইভাবে শহরের লোকের হাত পা বেঁধে দু-বছর ধ'রে তার উপর যেন লাঠি চালানো হয়েছে। মনে আতঙ্ক, চোখে বিভীষিকা, কানে করুণ ক্রন্দন—এতদিন ধ'রে কোনো মানুষের পক্ষে সহ্য করা সম্ভব? কিন্তু আজও কি মুক্তি পেয়েছি? যুদ্ধ শেষে যে মুক্তি আশা করেছিলাম, সে আশা আবার অন্ধকারে মিলিয়ে গেছে। এখন শুধু সাইরেন নেই, কিন্তু আর সবই আছে। আরও কতদিন থাকবে কে জানে?"

এই পর্যন্ত ব'লে বৃদ্ধ চুপ করলেন। তাঁর দৃষ্টি বেদনাচ্ছন্ন, উদাস। যেন ভবিষ্যৎ কালের অনিশ্চয়তার মধ্যে আরও একবার সে দৃষ্টি চালনা করবার চেষ্টা করছেন কিন্তু পারছেন না, দৃষ্টি প্রতিহত হয়ে ফিরে আসছে।

আমি একদৃষ্টে তাঁর চোখের দিকে চেয়ে আছি। এতক্ষণ তাঁর কথাগুলো অত্যন্ত মনোযোগের সঙ্গেই শুনেছি এবং আমিও যে এমনি একটা ভয়াবহ অবস্থার মধ্যে দিয়ে এই দুটি বছর কাটিয়ে এসেছি তা এই মুহূর্তে উপলব্ধি করে স্তম্ভিত হয়ে পড়েছি। আমি ভুলে গিয়েছি আমি কোথায় চলেছি, কেন চলেছি। এমন সময় শালধারীর কণ্ঠ থেকে প্রশ্ন কানে এল "আপনি সর্বশেষ কোন্ কথাটি বলতে চেয়েছিলেন?"

এই প্রশ্নটি আবার আমাকে বিহ্বল ক'রে তুলল। নিশ্বাস রোধ ক'রে অপেক্ষা ক'রে রইলাম সেই কথাটি শোনবার জন্যে, যেন এইবার আমার মৃত্যুদণ্ডের আদেশটি শুনতে পাব।

কিন্তু যা শুনলাম সে তো মৃত্যুদণ্ডাদেশ নয়। অত্যন্ত সাধা-রণ একটি কথা এবং তার সঙ্গে আমার কোনো সম্পর্কই নেই। বললেন, "মশাই শুনলে বিশ্বাস করবেন না, আমি এই শক কাটিয়ে উঠতে পারি নি।"

তা হ'লে কি বৃদ্ধ উন্মাদ? কে জানে। হয় তো তাই। কারণ তিনি উন্মাদের মতোই পলকহীন দৃষ্টিতে শালধারীর দিকে কিছুক্ষণ চেয়ে রইলেন। তারপর হঠাৎ তাঁর দিকে ঝুঁকে পড়ে বললেন, "এই দেখছেন চুল? এর একটিও কালো নেই। এই দেখছেন মুখ? মুখের চামড়া ঝুলে পড়েছে। দাঁতের কথা তো আগেই জানেন। কিন্তু কেন আমার এই দুর্দশা? এই যুদ্ধের আঘাতে, স্নায়ুর উপর অবিরাম ধাক্কায়। আমার আয়ু শেষ করে দিয়েছে এই দুটি বছর। আমি—আমি সম্পূর্ণ অকালে একেবারে বুড়ো হয়ে পড়েছি—সম্পূর্ণ অকালে, আপনি বিশ্বাস করুন।"

শালধারী মাত্র একটি বিস্ময়সূচক শব্দ করলেন, তাঁর মুখ থেকে কিছুক্ষণ আর কোনো কথা শোনা গেল না। আমার মনে সহসা নতুন আলোকপাত হ'ল। আমি এই সুযোগে একেবারে উঠে বসলাম। বৃদ্ধের কথা আমার পক্ষে একেবারে ব্যর্থ হয়নি। তাঁর কথায় আমারই আত্মপক্ষ সমর্থনের যুক্তি মিলে গেল, হয় তো মুক্তিও এতেই মিলবে। এখন একমাত্র ভাবনা রইল, ভাবী শ্বশুরের কন্যাকে কি ব'লে ভোলাব? শুধু পকেট থেকে ডায়েরি বের করে কয়েকটা পয়েন্ট নোট করে নিতে লাগলাম।

এমন সময় আমার সমস্ত আশা নির্মূল ক'রে কোটধারী বলে উঠলেন, "মশাই বিশ্বাস করতে পারেন আমার বয়স আটত্রিশ বছর? বিশ্বাস করতে পারেন, চব্বিশ ঘণ্টা ধ'রে কি অমানুষিক বেদনায় একখানি কাঁচা মন ব'য়ে বেড়াচ্ছি একখানা পাকা দেহের মধ্যে?"

আমার আর ভাববার ক্ষমতা ছিল না। এঁর যদি বয়স

আমার সমান হব, তাহলে ইনি যে আমার ভাবী শ্বশুর নন সে কথা ভেবে তৎক্ষণাৎ আমার কিছু আরাম বোধ করা উচিত ছিল, কিন্তু এতক্ষণ ধরে যাঁকে অন্তর থেকে পূজনীয় করে তুলেছি—মনে হ'ল তিনি যেন আজ আমাকে নানাভাবে ঠকাবার জন্যেই উদ্যত হয়েছেন। হঠাৎ একটা আশাভঙ্গের বেদনার চেয়েও নিজের অনুমানশক্তির এতখানি দারিদ্র্য উপলব্ধি করে বেশি বেদনা পেলাম। সমস্তই কেমন যেন একটা ধাঁধা বলে বোধ হতে লাগল। যেন গাড়ির মধ্যে একটা ভৌতিক ক্রিয়া চলছে—যেন সমস্তই অবাস্তব, সমস্তই মায়া।

সে বিশ্বাস আরও দৃঢ় হ'ল যখন শালধারী বললেন, "মশাই কে কাকে অবাক করবে তাই ভাবছি। আমার বয়স কত মনে হয়? বিশ্বাস করবেন, আপনার চেয়ে আমি মাত্র দু-বছরের বড়? বলিনি এতক্ষণ, কারণ দরকার হয়নি। কাউকেই বলি না, চুপ করে থাকি, কৌতুক বোধ করি মাঝে মাঝে নিজেকে বুড় মনে করে।"

কোটধারী একেবারে হো হো ক'রে হেসে উঠলেন এই কথা শুনে। হাসতে হাসতেই বললেন, "তাহলে দেখছি আমার নিজের কথা সত্যিই সবার কথা হয়ে দাঁড়াচ্ছে! এ যুদ্ধের বাজারে তা হলে ক্ষীণজীবী সব বাঙালী যুবকেরই এই দশা ঘটেছে!—আমি একা অনুকূল মুখুজ্জেই শুধু বুড়ো হইনি!"

শালধারী তড়িংগতিতে দাঁড়িয়ে উঠে অনুকূল মুখুজ্জেকে জাপটে ধরলেন, এবং গলা কাটিয়ে উচ্চারণ করলেন, "তুই অনুকূল? তুই আমাকে চিনতে পারছিস না? আমি সন্তোষ!"

এইবার আমার পালা। আমার হাত-পায়ে প্রকৃত যৌবন-শক্তি ফিরে এল, আমি এক লাফে নীচে পড়ে দুজনকে একসঙ্গে জড়িয়ে ধরলাম—"আর আমি যে বিনয় রে! চিনতে পারছিস তোরা?"

এর পর যা ঘটল তা অকথ্য। চলল বেপরোয়া চীৎকার। তিন অকালবৃদ্ধের কোলাহলে ইউরোপীয় ভদ্রলোক রক্তচক্ষু খুলে কর্কশ কণ্ঠে হাঁকলেন "হোয়াট্স আপ-রোর?"

"নাথিং সাহেব, উই ওল্ড ফ্রেণ্ডস্ মীট আণ্ডার স্টিউ সার-কমস্ট্যান্সেস্"—বলে আমি সাহেবকে আশ্বস্ত করলাম। সাহেব পাশ ফিরে শুলেন।

সাহেবকে সত্য কথাই বলেছিলাম। আমরা তিন জনেই সহপাঠী অন্তরঙ্গ বন্ধু—মাত্র ছ-সাত বছর আমাদের দেখা হয়নি।

এত কোলাহলেও পঞ্চম যাত্রীটির কোনো অসুবিধা হয় নি। তাঁর চেহারা দেখে মনে হ'ল বহু বাঙালীকে মেরে ইনি সম্প্রতি স্ফীত হয়েছেন, তাই তাঁর নাক-ডাকা একইভাবে চলতে লাগল।

জাগে

শ্রীকমলরাণী মিত্র

যুগের প্রহরী বিনিদ্র-চোখে জাগে,
জাগে চির-শর্বরী;—
আকাশের ভালে জ্বলে ওঠে দুর্যোগ,
ঝড়ের ঝাপটে মহা-প্রলয়ের বাণী!
মসীমাখা মনে চেয়ে জেগে আছি আজো,
জেগে আছে শর্বরী
যুগের প্রহরী বিনিদ্র-চোখে জাগে।

প্রাণের আবেগে মাটিতে করুণা জাগে
তাম-সুষমার শ্যামল করুণাখানি,
মানুষের প্রাণ সে তাম পরশে জাগে
—অনুরাগ-রাঙা প্রেমের মন্ত্রবাণী—
আলোভরা মনে চেয়ে জেগে আছি আমি—
জাগে চির-শর্বরী
যুগের প্রহরী বিনিদ্র-চোখে জাগে।

ক্ষুদ্র বিশ্ব ও বিশ্বতত্ত্ব

শ্রীঅতসী বসু

(আমাদের এই বিশাল ব্রহ্মাণ্ডের কি আকৃতি, এর প্রসারণ ও সংকোচন কি ভাবে হয় এবং তার পরিণামই বা কি এই সব পদার্থবিজ্ঞানের ভাষায় বোঝাতে গেলে সকলে পরিষ্কার ভাবে বুঝতে সমর্থ নাও হতে পারেন। সাধারণকে সহজে যাতে বোঝানো যায়, লেখক এক কল্পিত ছোট বিশ্বের অবতারণা করা হয়েছে। এই বিশ্বের (আমাদের বিশ্বের তুলনায় সামান্য খেলনার মতই) সবচেয়ে বেশী প্রসারণের সময় ব্যাস প্রায় ১০০ মাইল। আলোর গতির বেগ এই বিশ্বে বড়, আমাদের বৃহৎ বিশ্বে তার দশ কোটি গুণ বেশী। মাধ্যাকর্ষণ এই ক্ষুদ্র বিশ্বে সহস্র কোটি গুণ বেশী এবং পাহাড় ইত্যাদির ওজন আমাদের পাহাড়েরই সমান। প্রসারণ থেকে সংকোচন সুরু হবার সময় এই ছোট বিশ্বে দু ঘণ্টা মাত্র। বিজ্ঞানী গল্প ও কথোপকথনের ছলে বিশ্বতত্ত্ব সরল ভাবে বোঝাতে প্রয়াস পেয়েছেন।)

সেদিন বিজনবাবু বড় ক্লান্ত বোধ করছিলেন। বৈচিত্র্যহীন কেরাণীর জীবন। সারাদিন একঘেয়ে কাজ করে মনটা ক্লান্ত হয়ে পড়েছে, একটা কিছু নূতন আমোদ না হলে আর যেন চলে না। খবরের কাগজটা উল্টে পাল্টে দেখে দর্শনযোগ্য কিছুই চোখে পড়ল না—শুধু সিনেমার বিজ্ঞাপন দেখে দেখে অরুচি ধরে গেছে। হঠাৎ বিজনবাবু খবরের কাগজটার এক কোণে দেখলেন স্থানীয় বিশ্ববিদ্যালয়ে ধারাবাহিক ভাবে আধুনিক পদার্থ-বিজ্ঞানের (Modern Physics) উপর কয়েকটি বক্তৃতার ব্যবস্থা হয়েছে এবং আজকের বক্তব্য বিষয় 'বিশ্বতত্ত্ব, ব্যোম ও সময়' (Space, Time and Cosmology)। বিজনবাবুর মন নূতনের স্বাদ পেয়ে মেতে উঠল। এই ত ঠিক তিনি যা চাইছিলেন। অস্পষ্ট ভাবে তাঁর স্মরণে এল কিশোর বেলায় তিনি একবার কোন বইয়ে পড়েছিলেন, এক জন জ্যোতির্বিদ বেলুনে চড়ে দূরে অনেক দূরে গ্রহ তারার মধ্যে বিচরণ করেছিলেন। বিজনবাবু স্থির করলেন এই বক্তৃতা শুনতে যাবেন।

বিজনবাবু যখন বিশ্ববিদ্যালয়ের বৃহৎ হলটিতে পৌঁছলেন বক্তৃতা শুভক্ষণে সুরু হয়ে গেছে। আলোকিত প্রকাণ্ড ঘরটি লোকে গম গম করছে। দর্শকদের বেশীর ভাগই অল্পবয়সী ছাত্র। সবার দৃষ্টি একই দিকে নিবদ্ধ—ব্ল্যাকবোর্ডের কাছে সাদা দাড়িওলা দীর্ঘকায় লোকটির উপর।

অধ্যাপক বক্তৃতার মাঝে বোর্ডে এক লাইন কি একটা অঙ্ক লিখলেন, বিজনবাবুর কাছে এত মজার ও অদ্ভুত লাগল প্রথম বা শেষ কিছুই বুঝতে পারলেন না তার। বিজনবাবুর গণিতশাস্ত্রের দখল যোগ বিয়োগ গুণ ভাগ এই চার প্রণালীর ভিতরই সীমাবদ্ধ ছিল, তাও তিনি প্রথম দুটিতেই বেশী অভ্যস্ত, রোজকার কাজে দরকারে লাগে বলে। বিজনবাবু আশা করছিলেন অধ্যাপক যতই এই সব অদ্ভুত অঙ্ক লিখুন না কেন শেষে হয়ত এমন দুচারটি বিষয়ে বলবেন যা বুঝতে পারা যাবে। কিন্তু অধ্যাপক সে রকম কিছুই বললেন না এবং বারংবার উচ্চারিত "আমরা যে বিশ্বে বাস করি তা বক্র ও বদ্ধ এবং অবিরত প্রসারিত হচ্ছে" লাইনটি ছাড়া আর কিছুই বিজনবাবুরও মাথায় প্রবেশ করল না। কিন্তু এই কথাগুলি তাঁর মনে গভীর ভাবে দাগ কাটলে। যদিও বিশেষ কিছুই কল্পনা করতে পারলেন না বা বুঝতে পারলেন না। নাঃ, কি ভুলই করেছেন এই বৈজ্ঞানিক বক্তৃতা শুনতে গিয়ে, বিজ্ঞান তাঁর জন্য নয় এটা তাঁর আগেই বোঝা উচিত ছিল। এই রকম মনের ভাব নিয়ে গভীর অবসাদ ও ক্লান্তিবশতঃ অবশেষে ঘুমিয়ে পড়লেন।

বিজনবাবু হঠাৎ জেগে উঠে অনুভব করলেন তিনি যেন একটি শক্ত জিনিষের উপর শুয়ে রয়েছেন। চক্ষু মেলে দেখলেন যে তিনি একটি প্রকাণ্ড পাহাড়ের উপর রয়েছেন, কিন্তু পাহাড়টি শূন্যে ঝুলছে অথচ কোথাও কোন অবলম্বন নেই। সারা পাহাড়টি সবুজ শেওলায় ঢাকা এবং কোথাও কোথাও ছোট ছোট ঝোপও রয়েছে। পাহাড়ের চারি ধার এক রকম আলোতে আলোকিত এবং চারিদিকে বড় ধুলা। হাওয়ায় এত ধুলা তিনি কখনও দেখেন নি এর আগে। ধুলা থেকে পরিত্রাণ পাবার আশায় বিজনবাবু তাঁর রুমালটি বেশ ভাল করে নাকের উপর দিয়ে বেঁধে নিলেন ও অনেকটা আরাম বোধ করলেন। কিন্তু চারি ধারে ধুলার চেয়েও বিপজ্জনক ও ভয়াবহ জিনিস দেখতে পেলেন। প্রায় বিজনবাবুর মাথার সমান, এমন কি আরো বড় পাথরের টুকরা ইতস্তত নিক্ষিপ্ত হচ্ছে। আর পাহাড়ের গায়ে লেগে একটা অদ্ভুত রকমের চাপা শব্দ করছে। বিজনবাবুর ভয় হতে লাগল তাঁরই মাথায় একটা ঐ প্রকাণ্ড পাথর না আঘাত করে। দূরে দৃষ্টি নিক্ষেপ করে দেখলেন আরও দু-একটি বড় পাহাড় শূন্যে ভেসে ভেসে বেড়াচ্ছে। বিজনবাবু এতক্ষণ প্রাণপণে পাহাড়ের একটা কোণ আঁকড়ে ছিলেন—সর্বক্ষণ তাঁর ভয় হচ্ছিল কখন পড়ে যাবেন ঐ ধূলিময় অতল গর্তে। কিন্তু কিছুক্ষণ পরে তাঁর মনে সাহস সঞ্চার হ'ল, দেখলেন যে পড়ে যাবার বিশেষ ভয় নেই তাঁর ওজন তাঁকে পাহাড়ের দিকে ঠেলে আটকে রাখছে। এদিক-ওদিক চেয়ে দেখতে দেখতে অস্পষ্ট আলোতে বিজনবাবু হঠাৎ আবিষ্কার করলেন সেই অধ্যাপককে, যিনি গতকাল বক্তৃতা দিয়েছিলেন—সেই সাদা দাড়ি দীর্ঘ দেহ—তিনি যেন মাথা নীচু করে ছোট একটি নোট বইয়ে কিছু লিখছেন।

বিজনবাবুর চোখের সামনে থেকে ধীরে ধীরে যেন একটা পর্দা সরে গেল তিনি যেন বুঝতে সুরু করেছেন। মনে পড়ল বাল্যবয়সে স্কুলে পাঠকালে শিখেছিলেন যে পৃথিবী একটি প্রকাণ্ড গোলাকার পাহাড়ের মত সূর্যের চারি ধারে বিনা বাধায় শূন্যে ঘুরে বেড়ায়। হাঁ, এই পাহাড় সব কিছুই নিজের দিকে আকর্ষণ করছে। বিজনবাবু স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললেন, যাক পড়ে যাবার ভয় তা হলে নেই। পাহাড়টিতে বিজনবাবু ও

অধ্যাপক মাত্র দুটি প্রাণীই ছিলেন। বিজনবাবু অধ্যাপক মহাশয়কে "সুপ্রভাত" বলে অভিবাদন করলেন।

অধ্যাপক এই প্রথম মোটা বই থেকে মুখ একটু তুলে বললেন—কিন্তু এখানে কোন প্রভাত নেই, কোন সূর্য্য নেই, এমন কি এই বিশ্বে একটি অলন্ত তারা পর্য্যন্ত নেই। ভাগ্য-ক্রমে এই যে মৃদু আলো দেখা যাচ্ছে এ এক প্রকার রাসায়নিক ক্রিয়ার প্রভাবে, নতুবা আমি এই বিশ্বের প্রসারণ পর্য্যবেক্ষণ করতে সমর্থ হতাম না।—বলে তিনি আবার তাঁর মোটা বইটিতে মনঃসংযোগ করলেন।

বিজনবাবু বড়ই হতাশ বোধ করলেন, এই বিশ্বে একমাত্র প্রাণী সেও এত উদাসীন, কি করা যায় তা হলে? কিন্তু হঠাৎ অপ্রত্যাশিত ভাবে একটি পাথর এসে ধাক্কা মেরে অধ্যাপকের হাত থেকে মোটা বইটি ছিনিয়ে নিয়ে গেল। বইখানি বেগে বিজনবাবুদের ছোট গ্রহ থেকে চলে যেতে লাগল। বইখানি ক্রমেই ক্ষুদ্র থেকে ক্ষুদ্রতর হয়ে শূন্যে উড়ে যেতে লাগল। তাই দেখে বিজনবাবু অধ্যাপককে বললেন, বইখানি আপনি আর দেখতে পাবেন না। অধ্যাপক বললেন—না ঠিক তার বিপরীত। আমরা এখন যেখানে আছি সেই ব্যোম সীমাহীন, সর্ব্বপ্রবিস্তৃত নয়। হ্যাঁ জানি, স্কুলে তোমাদের পড়ানো হয়েছিল ব্যোম অসীম এবং দুটি সরল রেখা মেলে না। কিন্তু তা সম্পূর্ণ ভুল ধারণা—আমাদের এই বিশ্বের বেলাতেও তা সত্য নয় বা সমস্ত মহব্যোম জুড়ে যে বিশ্ব তার বেলায়ও নয়। অবশ্য সমস্ত মানব যে বিশ্বে বাস করে সে খুবই বৃহৎ, কিন্তু অসীম নয়। বৈজ্ঞানিকেরা বলেন তার বর্ত্তমান আয়তন প্রায় ১০,০০০,০০০,০০০,০০০,০০০,০০০,০০০ মাইল, সাধারণ ভাবে প্রায় অসীমই বলা চলে। আমার বই যদি ঐ বিশ্বে হারিয়ে যেত তা হলে ফিরে পেতে অসম্ভব রকমের দেরি হ'ত, কিন্তু এখানকার ব্যাপার অন্যরকম। যে মুহূর্তে আমার হাত থেকে বই ছিনিয়ে নিয়ে গেল সেই মুহূর্তে আমি কষে দেখে-ছিলুম এই বিশ্বের ব্যাস পাঁচ মাইলের বেশি নয় যদিও এই বিশ্ব দ্রুতবেগে প্রসারিত হচ্ছে। আমি আশা করছি আধ ঘণ্টার মধ্যেই বইখানি ফিরে পাব।

বিজনবাবু সাহসে ভর করে জিজ্ঞাসা করলেন, সে কি রকম করে সম্ভব হতে পারে? আমি ত এমন কোন প্রক্রিয়া ভেবে উঠতে পারছি না বা কল্পনা করতে পারি না যা বইখানি আপনার পায়ের কাছে এনে দেবে।

অধ্যাপক বললেন, তুমি যদি জানতে চাও কি করে এ সম্ভব হতে পারে তা হলে প্রাচীন গ্রীকদের কথা ভাব। পৃথিবী যে একটি গোলাকার বলের মত এ কথা তাঁদের অজ্ঞাত ছিল। মনে কর এক জন প্রাচীন গ্রীক কাউকে সোজা উত্তর দিকে যেতে বললেন কোনও দিকে না বেঁকে। কল্পনা কর, সেই গ্রীক ভদ্রলোক কি রকম আশ্চর্য্য বোধ করলেন যখন সেই লোকটি দক্ষিণ দিক থেকে তাঁর কাছে ফিরে এল।

প্রাচীন গ্রীকটির পৃথিবীর চারধারে বেড়াবার কোনও রকম ধারণা ছিল না এবং নিশ্চিন্ত ভেবে নিলেন যে, তিনি যাকে চলতে বলেছেন সে নিশ্চয়ই পথ হারিয়ে ফেলে মোড় ঘুরেছে এবং তবেই ফিরে আসতে সমর্থ হয়েছে। কিন্তু প্রকৃত পক্ষে লোকটি সর্ব্বক্ষণই নাক-বরাবর সোজা চলছিল এবং সমস্ত পৃথিবী পরিভ্রমণ করে অবশেষে বিপরীত দিক থেকে ফিরে এল। আমার বইয়ের বেলাতেও ঠিক তাই ঘটবে যদি না অন্য কোন প্রস্তরখণ্ড আবার ধাক্কা দিয়ে সোজা পথ থেকে সরিয়ে দেয়। এই নাও, দূরবীক্ষণ দিয়ে দেখ বইখানি এখনও দেখতে পাও কিনা।

বিজনবাবু দূরবীক্ষণটি ভাল করে চোখে পরলেন এবং ধূলার ভিতর দিয়ে যত দূর দৃষ্টি চলে দেখবার চেষ্টা করলেন। দেখলেন অধ্যাপকের মোটা বইখানি দূরে, বহুদূরে সরে যাচ্ছে এবং আশ্চর্য্য হয়ে আরও দেখলেন যে দূরে সকল বস্তুই এমন কি বইখানিও লাল রঙের দেখাচ্ছে। কিছুক্ষণ পরে বিজনবাবু চেঁচিয়ে উঠলেন, আপনার বই ফিরে আসছে, এখন আগের চেয়ে অনেক বড় দেখাচ্ছে।

অধ্যাপক বললেন, না, এখনও দূরেই যাচ্ছে। তুমি আকারে বড় দেখছ তার কারণ গোলাকার ও বদ্ধ এবং অদ্ভুত রকম ত্রি-বিস্তৃত-বক্র ব্যোমের প্রভাব আলোর রশ্মির উপর পড়াতেই বইটি বড় দেখাচ্ছে। দেখ, বইটির ছায়া এখন খুব কাছেই এসে গেছে। এখন বোধ হয় তুমি বুঝতে পারছ, তুমি যা দেখছ এ শুধু বইটির ছায়া—যে আলো বিশ্বের অর্দ্ধেক পরি-ভ্রমণ করেছে সেই আলোর রশ্মি তারাকে বেঁকে-চুরে দিয়েছে। যদি বিশ্বাস না হয় তা হলে দেখ পাথরের টুকরাগুলি বইয়ের পাতার ভিতর থেকে দেখতে পাওয়া যাচ্ছে।

বিজনবাবু বইখানি ধরবার চেষ্টা করলেন কিন্তু তাঁর হাত বইয়ের ছায়ার ভিতর দিয়ে চলে গেল, কোথাও এতটুকু বাধা পেল না। অধ্যাপক বললেন, আসল বইখানি এখন বিশ্বের বিপরীত মেরুর খুব কাছে পৌঁছেছে, বইটির দুটি ছায়া, একটি তোমার পিছনে রয়েছে, যখন দুটি ছায়া মিলে যাবে তখন বইটি ঠিক বিপরীত মেরুতে থাকবে। বিজনবাবুর কানে বিশেষ কিছু প্রবেশ করল না, কিন্তু অধ্যাপকের কাছে জানতে চাইলেন ব্যোম-বক্র কেন হয় এবং বক্র ব্যোমের দ্বারা এ রকম অদ্ভুত সব ব্যাপার ঘটে কেন।

অধ্যাপক বললেন, পদার্থের উপস্থিতিই এর কারণ। নিউটন যখন প্রথম মাধ্যাকর্ষণ আবিষ্কার করেন তখন সাধারণ আকর্ষণ বলেই জানতেন। কিন্তু আইনষ্টাইন প্রথম পরিষ্কার ভাবে দেখান যে পদার্থের উপস্থিতির প্রভাব ব্যোমকে বক্র করেছে এবং যেহেতু ব্যোম বক্র, যে-কোন বস্তু এই ব্যোমে ভ্রমণ করলে তার চলার পথও গুরুত্ব আকর্ষণের জন্য বক্র হবে। কিন্তু আমার মনে হয় গণিত-বিদ্যা যথেষ্ট আয়ত্ত না থাকায় তোমার পক্ষে এসব বোঝা বড় কঠিন হবে।

বিজনবাবু বললেন, সে কথা ঠিক, কিন্তু যদি কোন পদার্থ না থাকত তা হলে কি আমরা যে জ্যামিতি স্কুলে পড়েছিলুম আমাদেরও সেই ব্যাপার হ'ত, এবং দুটি সমান্তরাল রেখাও একত্র হ'ত না?

অধ্যাপক বললেন, না, তা হ'ত না কিন্তু তাদের বাধা দিতে কোন বস্তুও থাকত না।

বিজনবাবু আলোচনাচ্ছলে বললেন, হয় ত ইউক্লিডের

নিজেরই কোন অস্তিত্ব কখনও ছিল না, তাই তিনি যে জ্যামিতি রচনা করেছেন সে শুধু একেবারেই শূন্য ব্যোমের জন্যে যেখানে কোন পদার্থ নেই।

কিন্তু অধ্যাপকের এই দার্শনিক আলোচনায় যোগ দেবার বিশেষ আগ্রহ দেখা গেল না। ইতিমধ্যে বইখানির ছায়া প্রথমে যে দিকে গিয়েছিল সেই দিকেই আবার অনেক দূরে চলে যেতে লাগল এবং একটু পরেই দ্বিতীয় বার ফিরে আসতে লাগল। বইটিকে এখন আরও বেশী বাঁকাচোরা দেখাতে লাগল, চিনতেই পারা যায় না সহজে—অধ্যাপকের মতে এখন আলোকরশ্মির বিশ্বকে সম্পূর্ণ পরিভ্রমণ করার ফলেই বইটিকে ওরূপ দেখাচ্ছে।

তিনি বিজনবাবুকে বললেন, চেয়ে দেখ আমার বইটি সমগ্র বিশ্ব ভ্রমণ করে ফিরে আসছে, এবার আর ছায়া নয়, আসল বই। এই বলে তিনি হাত বাড়িয়ে বইটি নিয়ে পকেটে রেখে দিলেন। তারপর বলতে লাগলেন, এই বিশ্বে এত ধুলা ও পাথরের টুক্‌রা রয়েছে যে, আমরা চারি ধার দেখতে সমর্থ হই না। চতুষ্পার্শ্বে এই যে কিম্ভূতকিমাকার ছায়াগুলি দেখছ হয়ত এসব আমাদের ও আমাদের সঙ্কোর পাথরের ছায়া, কিন্তু চেনা যায় না কোন্‌টা কিসের ছায়া।

আমাদের সেই বৃহৎ বিশ্বে যেখানে আমরা আগে বাস করতাম সেখানে কি এই রকম সব ঘটনা ঘটে না ?—বিজনবাবু জানতে চাইলেন।

অবশ্যই ঘটে, কিন্তু সে বিশ্ব এত বড় যে, আলোকরশ্মি এক বার সম্পূর্ণ পরিভ্রমণ করতে সহস্র কোটি বৎসর সময় নেয়। তুমি তোমার মাথার পশ্চাদ্‌ভাগের চুল কি রকম কাটা হয়েছে দেখতে পেতে কিন্তু পরামাণিকের কাছে বসবার সহস্র কোটি বৎসর পরে, আর সে ছায়াও অত্যন্ত অপরিষ্কার দেখাত ধুলার জন্যে। প্রবাদ আছে, একজন ইংরেজ জ্যোতির্ব্বিদ রসিকতা করে বলেছিলেন, আমরা আকাশে যত নক্ষত্র দেখতে পাই তার অনেকগুলিই শুধু ছায়া, বহু বহু দিন আগেকার নক্ষত্রের ছায়া।

অধ্যাপকের এই সব ব্যাখ্যা ও বর্ণনা শুনে বোঝবার বৃথা চেষ্টা করে বিজনবাবু শুধু ক্লান্তিই বোধ করতে লাগলেন। পরে চারদিকে ভাল করে চেয়ে দেখে একেবারে আশ্চর্য্য হয়ে গেলেন। আকাশের ছবি সম্পূর্ণ বদলে গেছে। ধুলা অনেক কমে গেছে দেখে নাক থেকে রুমাল খুলে ফেললেন।

ছোট ছোট পাথরের টুকরাগুলি অনেক কমে গেছে, অনেক পরে পরে তারা পাহাড়কে আঘাত করছে এবং তাদের শক্তিও আগের চেয়ে কমে গেছে।

বিজনবাবু স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে বললেন, যাক্ এবারে বেশ আরাম বোধ হচ্ছে। আমার সর্ব্বদাই ভয় করছিল কখন ঐ পাথরের টুকরা এসে আমার শরীরে আঘাত করে। কিন্তু দৃশ্যপট এ রকম বদলে যাবার কারণ কি, আপনি কি বলতে পারেন ?—বিজনবাবু অধ্যাপকের দিকে জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে চেয়ে বললেন।

অতি সহজেই। আমাদের ক্ষুদ্র বিশ্ব এখন দ্রুতবেগে প্রসারিত হচ্ছে। আমরা প্রথম যখন এখানে আসি তখন যদি এর আয়তন পাঁচ মাইল থাকে, এখন তাহলে এক-শ মাইল। আমি এখানে এসেই প্রসারণ লক্ষ্য করেছিলুম, দূরের জিনিসগুলিকে লাল রঙের দেখাচ্ছিল সেই থেকে।

বিজনবাবু বললেন, আমিও দেখেছি দূরের বস্তু সব লাল হয়ে যাচ্ছে কিন্তু তাতে প্রসারণ কি করে বোঝায় ?

অধ্যাপক সুরু করলেন, তুমি কি কখনও লক্ষ্য করেছ যখন কোন ট্রেন দূর থেকে ষ্টেশনে আসে তার বাঁশী কি রকম তীক্ষ্ণ শোনায়। কিন্তু যখন ট্রেন দাঁড়িয়ে থাকে, তার বাঁশী অনেক কম তীক্ষ্ণ শোনায়, অবশ্য তুমিও যদি স্থির থেকে শোন। তুমি জান বোধ হয় শব্দ হাওয়াতে তরঙ্গ রূপে ভ্রমণ করে। শব্দের উৎস (এখানে যেমন ট্রেন) যখন দর্শকের কাছে আসে তখন তার আবৃত্তি (frequency) বেড়ে যায়, আর আবৃত্তি বাড়ায় ঐ শব্দ তীক্ষ্ণ শোনায়। কিন্তু শব্দের উৎস যখন দূরে চলতে থাকে, যেমন ট্রেন যখন ষ্টেশন ছেড়ে যায়, তার বাঁশী মোটা শোনায়। এরই নাম প্রসিদ্ধ ডপলার-সিদ্ধান্ত (Doppler Effect)। অতএব আমরা শব্দের পরিবর্ত্তিত আবৃত্তি থেকে বলতে পারি তার উৎস কত বেগে দূরে যাচ্ছে বা কাছে আসছে। কিন্তু শূন্যে নীহারিকাদের কাছে আমাদের শব্দ তো পৌঁছবে না, এখানে আলোর ঊর্ম্মিমালাই আমাদের সাহায্য করবে, কারণ আলো শব্দের মতই তরঙ্গরূপে ভ্রমণ করে।

যখন সমগ্র ব্যোম প্রসারিত হয়, প্রত্যেক বস্তু দর্শকের কাছ থেকে তাদের দূরত্বের অনুপাত গতিতে ধাবিত হয়, সুতরাং সেই সব বস্তু থেকে যে আলো বিচ্ছুরিত হয় তাহা ক্রমেই লোহিত হয়ে যায়,—আলোর লোহিত হয়ে যাওয়া আর শব্দের তীক্ষ্ণতা কমে যাওয়া একই পর্য্যায়ে পড়ে, দুইয়েরই কারণ ঢেউয়ের আবৃত্তি কমে যাওয়া। যে বস্তু যত দূরে আছে তাদের সরে যাবার গতিও তত বেশী এবং ততই আমাদের চোখে লাল দেখায়। আমাদের সেই পুরনো প্রকাণ্ড বিশ্বে জ্যোতির্ব্বিদেরা নীহারিকাদের দূরত্ব কষে বার করেছেন শুধু এই আলোর লোহিত হয়ে যাওয়া থেকে ; এবং তাদের দূরত্ব এত বেশি যে আলোকরশ্মির সেখানে যেতে আট লক্ষ বৎসর লাগে।

বর্ত্তমানে প্রসারণের হার শতকরা ০'০০০,০০০,০১ প্রতি বৎসরে। সুতরাং প্রতি সেকেণ্ডে বিশ্বের ব্যাস এক কোটি মাইল বেড়ে যাচ্ছে। আমাদের এই ক্ষুদ্র বিশ্বের প্রসারণের হার অনেক কম, এর আয়তন শতকরা এক ভাগ বেড়ে যাচ্ছে প্রতি মিনিটে।

বিজনবাবু জিজ্ঞাসা করলেন, এই প্রসারণ কি কখনও থামবে না ?

অধ্যাপক উত্তর দিলেন, নিশ্চয়ই থামবে এবং তার পরেই সংকোচন সুরু হবে। প্রত্যেক বিশ্ব একটি খুব ছোট ব্যাস ও খুব বড় ব্যাসের মধ্যে স্পন্দমান। আমাদের সেই বিশ্বের কাল—প্রসারণ থেকে সংকোচন সুরু হওয়ার মধ্যেকার সময় —অনেক, প্রায় সহস্র কোটি বৎসর, কিন্তু আমাদের এই বিশ্বে প্রসারণ থেকে সংকোচন সুরু হতে মাত্র দু-ঘণ্টা লাগে। এখন প্রসারণের গতি সবচেয়ে বেশি, খুব ঠাণ্ডা বোধ হচ্ছে নাকি ?

প্রকৃতপক্ষে প্রথমে তাপরশ্মির দ্বারা বেটুকু-গরম ছিল, এখন

ব্যোম অনেক বেড়ে যাওয়াতে সেই আমাদের রশ্মি গরম রাখতে অসমর্থ হয়েছিল, এবং প্রায় জমে যাবার মত ঠাণ্ডা বোধ হচ্ছিল।

অধ্যাপক বললেন, আমাদের ভাগ্য ভাল, প্রথমেই যথেষ্ট তাপরশ্মি ছিল, তাই এখনও আমাদের কিছু গরম রয়েছে, নয়ত এত ঠাণ্ডা হয়ে যেত যে, আমাদের চারদিকের হাওয়া জমে ঘন হয়ে যেত ও আমরা তাতে জমে মরে যেতুম। কিন্তু সংকোচন ইতিমধ্যেই সুরু হয়ে গেছে এবং শীঘ্রই আবার সব গরম হবে।

আকাশের দিকে চেয়ে বিজনবাবু দেখলেন দূরের বস্তুগুলি লাল থেকে বেগনি রঙে পরিবর্তিত হয়েছে, অধ্যাপকের মতে এর কারণ বস্তুগুলি এবারে তাঁদের দিকেই ধাবিত হয়েছে। বিজনবাবুর মনে পড়ল অধ্যাপকের দেওয়া সেই ট্রেনের বাঁশীর উপমা, যখন কাছে আসে তখন তার শব্দ তীক্ষ্ণ থেকে তীক্ষ্ণতর হয়—ভয়ে কেঁপে উঠলেন।

অত্যন্ত চিন্তিত হয়ে অধ্যাপককে জিজ্ঞাসা করলেন, এখন যদি সব কিছুই সংকুচিত হতে সুরু হয়ে থাকে তা হলে বিশ্বের যত বড় বড় পাহাড় সব একীভূত হয়ে যাবে, আর আমরা তাদের মধ্যে পড়ে পিষে মারা যাব, এ আশঙ্কা কি আমাদের নেই?

শান্ত ভাবে অধ্যাপক উত্তর দিলেন, অবশ্যই আছে, কিন্তু তারও অনেক আগে তাপ এত বেড়ে যাবে যে আমরা দু-জনেই অণু-পরমাণুতে বিভক্ত হয়ে যাব, কিছুই আর অবশিষ্ট থাকবে না। আমাদের সেই বৃহৎ ব্রহ্মাণ্ডেরও এই পরিণাম—সব কিছুই মিশে যাবে একাকার হয়ে এক তপ্ত গ্যাসের মাঝে এবং আবার নূতন প্রসারণের সঙ্গে বিশ্বে নূতন জীবন সুরু হবে।

বিজনবাবু হতাশার স্বরে বললেন, আহা, সেই বিশ্বের এই পরিণাম হতে অনেক অনেক দেরি, আপনার মতে ত প্রায় সহস্র কোটি বৎসর দেরি আছে, কিন্তু এখানে যে বড়ই শীঘ্র আমার এই ধুতি পাঞ্জাবীতেও গরম বোধ করছি।

অধ্যাপক নির্লিপ্ত কণ্ঠে বললেন, ওগুলো খুলে ফেললে কোনই লাভ হবে না, সুতরাং ও সব না খুলে শুয়ে পড় এবং যতক্ষণ পার পর্য্যবেক্ষণ কর, একটু পরেই ত সবকিছুর সমাপ্তি।

বিজনবাবু কোন কথা না বলে চুপ করে রইলেন। হাওয়া এত গরম বোধ হচ্ছে যে প্রায় অসহ্য হয়ে উঠেছে। ধুলা এত বেড়ে গেছে যে, তাঁর চারিপাশে ঘন হয়ে ধুলা জমেছে এবং তিনি অনুভব করলেন যেন একটি গরম কম্বলে তাঁকে জড়ানো হচ্ছে। নিজেকে মুক্ত করবার ও বাঁচাবার প্রাণপণ চেষ্টা করতে লাগলেন। হঠাৎ তাঁর একটি হাতে যেন ঠাণ্ডা হাওয়া লাগল। বিজনবাবু প্রথমে ভাবলেন বোধ হয় তিনি ঐ বিশ্বে—সেই ভয়ঙ্কর বিশ্বে একটি ছিদ্র করেছেন এবং তাতেই এই ঠাণ্ডা হাওয়া প্রবেশ করছে। ভাবলেন অধ্যাপককে এই বিষয়ে জিজ্ঞাসা করবেন, কিন্তু তাঁকে কোথাও দেখা গেল না। তৎপরিবর্তে ভোরের আলোতে তিনি নিজের শয়ন-কক্ষের অতি-পরিচিত আসবাবপত্রের আবছা দেখতে পেলেন। দেখলেন তিনি নিজের বিছানায় শুয়ে আছেন এবং গরম কম্বলটিতে জড়িয়ে গেছেন, মাত্র একটি হাত মুক্ত করতে পেরেছেন কোন মতে।

বিজনবাবু ভাবলেন বৃদ্ধ অধ্যাপকের কথা মনে করে—"প্রসারণের সঙ্গে সঙ্গে নূতন জীবনের সূচনা"—ভগবানকে ধন্যবাদ, আমরা এখনও প্রসারিত হচ্ছি।*

* Gr. Gamow's *Mr. Thomkins in the Wonderland*'-এর ছায়া অবলম্বনে।

রাতের কাহিনী

শ্রীকরুণাময় বসু

মেঘের পরীরা রাঙা ওড়নায় ছেয়েছে নীলাম্বর,
উড়ে উড়ে যায় অলকতায় বেশে;
পাখীর পালকে ভেসে আসে বুঝি সাগরের মর্ম্মর,
অজানার বাণী এনেছে স্বপ্নে সে।
এনেছে ভোরের বকুলবনের ভাষা,
দিবসের কূলে নিশীথের ভালোবাসা;
গহন পথের প্রান্তে রেখেছে মায়া-দীপালীর শিখা,
এনেছে চোখের সজল কাহিনী স্নেহ-মমতায় লিখা।

ভুলিতে পারি নি বন্ধু, তোমার স্নিগ্ধ যুগল আঁখি,
মনে পড়ে আজো কাজল সন্ধ্যাকূলে;
সাথে কি এনেছ জন্মান্তের ভুলে-যাওয়া সেই রাখী,
স্মরণ-প্রদীপ রেখেছ কি বেদীমূলে?

মাথায় লিখনে রচেছ যে আলিপনা,
আমার জীবনে কখনো তা মুছিব না;
তোমারে হেরিয়া শিশির-শীতল শিথিল কুসুম চুমি'
নদীর ওপারে উতলা পবন ফিরে গেল বনভূমি।

ফাগুন এনেছে সোনার সন্ধ্যা, পথিকের পথ চাওয়া,
বেলা শেষ হ'লে কূলে ভিড়িবার গান;
মুদিত কমল কুমারী-কোরক বক্ষে কি ফিরে পাওয়া,
চৈতালি রাত হয়নিক' অবসান?
বৈকালী বেলা কুসুম-কুঞ্জতলে
মালিকা গলায় কোন সে বালিকা চলে,—
মাঠের কিনারে আলের ওধারে চলেছে তেপান্তরে,
সারা জনমের কাহিনী লিখিনু সেই সে পথের 'পরে।

হুগলীতে বাঁধকার্য্য

শ্রীরতনমণি চট্টোপাধ্যায়

সোদপুরে অবস্থানকালে গান্ধীজী হুগলীতে বাঁধকার্য্যের কথা ঐ জেলার কোন কংগ্রেস-কর্মীর নিকট শুনিয়াছিলেন। প্রসঙ্গক্রমে তিনি ঐ কার্য্য সম্পর্কে প্রশ্নাদিও করিয়াছিলেন। বাঁধকার্য্য সম্বন্ধে গান্ধীজীর মন্তব্যের প্রতিলিপি দেওয়া হইল। হিন্দুস্থানী ভাষায়

গান্ধীজীর মন্তব্যের প্রতিলিপি

তিনি লিখিয়াছেন, "হুগলীমেঁ জো বাঁধকাম হুআ, উসসে লোগোঁকো বড়া ফায়দা পহুঁচা উসে মৈঁ রচনাত্মক কার্য্যকা হিস্সাহি সমঝতা হুঁ। ঔর ঐসী শোধক শক্তি সব সেবকমে হোনী চাহিয়ে।" অর্থাৎ হুগলীতে যে বাঁধকার্য্য হইয়াছে, যাহাতে লোকের বড় উপকার হইয়াছে, সেই কার্য্যকে গঠনমূলক কর্ম্মের অংশ বলিয়াই আমি বুঝি। আর এইরূপ শোধক শক্তি সব সেবকের মধ্যেই হওয়া চাই।

১৯৪৪ সালের ২২শে অক্টোবর তারিখে সেবাগ্রাম হইতে গান্ধীজী গঠনকর্ম্ম সম্বন্ধে একটি বিবৃতি দেন। অন্যান্য কথার মধ্যে ঐ বিবৃতিতে তিনি বলেন,

"The detailed constructive programme is to be found in my pamphlet on it and Dr. Rajendra Prasad's which is a running commentary on it. It should be remembered that *it is illustrative, not exhaustive.* Local circumstances may suggest many more items not touched in the printed programme. These are beyond the scope of a treatise on an All-India programme. *They are necessarily for local workers to find out and do the needful.*" (Italics are ours)

অর্থাৎ গঠনকর্ম্মের বিস্তৃত তালিকা আমার ও ডক্টর রাজেন্দ্রপ্রসাদের পুস্তিকায় দেওয়া হইয়াছে। ডক্টর রাজেন্দ্রপ্রসাদের পুস্তিকাখানি আমার পুস্তিকারই ব্যাখ্যা-স্বরূপ। একথা মনে রাখা দরকার যে আমাদের প্রদত্ত তালিকার দৃষ্টান্ত হিসাবে কয়েকটি কাজের উল্লেখ করা হইয়াছে মাত্র, আমরা যে সব রকম কাজেরই কথা বলিয়াছি তাহা নয়। স্থানীয় অবস্থা অনুসারে এই মুদ্রিত কর্ম্মতালিকায় উল্লিখিত হয় নাই এমন অনেক কাজের কথা মনে হইতে পারে। স্থানীয় কর্ম্মীদিগকে এই সকল কাজ খুঁজিয়া বাহির করিতে হইবে এবং ইহা করিবার জন্য সমুচিত ব্যবস্থা করিতে হইবে।

ঘটনাক্রমে ঐ ২২-১০-৪৪ তারিখেই হুগলী জেলা বন্যা-সাহায্য-সমিতির পক্ষ হইতে আরামবাগ মহকুমার রাজহাটী গ্রামে "খানাকুল থানা বোরো-বাঁধ কমিটি" গঠিত হয়। পরে গান্ধীজীর উপরোক্ত বিবৃতি পাঠ করিয়া আমরা আশা করিয়াছিলাম যে এই বোরো-বাঁধ কমিটির কৃত কার্য্য রচনাত্মক কার্য্য বলিয়া গ্রাহ্য হইবে। আমাদের সে আশা সফল হইয়াছে।

গত মাঘ মাসের 'ভারতবর্ষ' পত্রিকায় এই বাঁধকার্য্য সম্বন্ধে উল্লেখ করা হইয়াছে। ফাল্গুনের 'প্রবাসী'তে এই কার্য্য সম্বন্ধে সবিস্তার উল্লেখের মধ্যে বলা হইয়াছে, "অন্নের জন্য ইংরেজ সরকারের উপর ভরসা করিয়া বসিয়া থাকিলে দুর্ভিক্ষে মরাই সার হইবে এই কথা বুঝিয়া বাঁচিবার ইচ্ছা থাকিলে এখন হইতেই ফসল উৎপাদন সম্বন্ধে বাঙালীকে সম্পূর্ণরূপে স্বাবলম্বী হইতে হইবে। গবর্ণমেন্ট যেখানে পদে পদে অক্ষমতা দেখাইয়াছেন, কংগ্রেসকর্ম্মীরা সেই ঘন অন্ধকারে আশার আলো প্রতিফলিত করিয়া দেশকে বাঁচিবার পথের সন্ধান দিয়াছেন এজন্য বাঙালী তাঁহাদের নিকট চিরকৃতজ্ঞ থাকিবে।"

এই বাঁধকার্য্য সম্বন্ধে কয়েকটা মূল কথা বলা এই প্রবন্ধের উদ্দেশ্য।

১৯৪৪ সনের সেপ্টেম্বর মাসের প্রথম দিকে দ্বারকেশ্বর নদীতে বন্যার ফলে আরামবাগের দক্ষিণে কয়েকখানি গ্রাম বিধ্বস্ত হয়। বানের তোড়ে নদীতীরের বাঁধ ভাঙিয়া নদীগর্ভ হইতে উৎক্ষিপ্ত বালুকারাশি চাষের মাঠে পড়ে দুই ফুট ঘন হইয়া ছড়াইয়া পড়ে। ফলে ঐ অঞ্চলটা যেন এক টুকরা মরুভূমিতে পরিণত হয়। বন্যার কারণে দামোদর নদীর দুই তীরে এরূপ দৃশ্য যত্রতত্র দেখা যায়। বন্যা-সঙ্কট এই অঞ্চলে—এই অঞ্চলে কেন বাংলায় কোথাও নূতন নয়। সংবাদ পাইয়াই হুগলীর কংগ্রেসকর্মীরা আগের মত ছুটিয়া গিয়া বন্যাক্লিষ্ট লোকদের যথাসাধ্য সাহায্য করিতে আরম্ভ করিয়া দিলেন।

এবার বন্যার আঘাতের মধ্যে পরাধীনতার পাপ যেন নূতন করিয়া তাঁহাদের চোখে পড়িল। ইহা যেমন বেদনাদায়ক তেমনি অবসাদকর। কর্মীরা দেখিলেন দুর্ভিক্ষের সময় লঙ্গরখানার জোয়ার-কচুসিদ্ধ খাইয়া, আর বন্যার সময় হাত পাতিয়া পাতিয়া দান লইয়া দেশের লোক ভিখারী-কাঙালে পরিণত হইয়া গেল। দেহে মনে মানুষ বলিতে আর তাহাদের কিছু বাকি রহিল না।

এই সব কংগ্রেসসেবক প্রধানতঃ গ্রামের কর্মী। গ্রামের শ্মশানে মানুষ আবার সকল রকমে স্বাধীন মানুষ হইয়া দাঁড়াইবে এই স্বপ্ন ইহারা দেখেন। বেণ্টলী-উইলকক্স-মুখুজ্জে-মজুমদারের লেখা পড়িয়া, ততোধিক শহুরে মনকে গ্রামমুখী করিয়া ও গ্রামে গ্রামে কংগ্রেসের বাণী বহন করিয়া ইহারা বুঝিয়াছেন যে নদীমাতৃক বাংলায় নদীই আমাদের গতি। আমাদের স্বাস্থ্যসম্পদ, কৃষিশিল্প, আমাদের দেহমনের সর্ব্বাঙ্গীণ কল্যাণের উৎস হইল নদী। বৈজ্ঞানিক বিধি অনুযায়ী এই নদী-মাতার সেবা করিতে পারিলে মা প্রসন্না হইয়া বর দিবেন।

পশ্চিম বাংলায় নদীর গতিই এই যে বর্ষাকালে ছোটনাগপুর পার্ব্বত্য অঞ্চলের জল নামিয়া নদী হঠাৎ খুব স্ফীত হইয়া উঠে। তখন নদীর বাঁধে কোথাও কোথাও হানা পড়ে, আর এক একটা অঞ্চলের বহু গ্রাম বন্যায় ভাসিয়া গিয়া লোকে ধনেপ্রাণে মারা যায়। এই সুবিপুল জলরাশি বহু সুরক্ষিত ও অগভীর নদী-নালা-খালের মুখে প্রবাহিত করিয়া দিয়া সারা দেশকে স্নান করাইয়া দিতে পারিলে তাহা দেশের মুক্তিস্নানের মতই হয়। সমস্ত দেশে ছড়াইয়া গিয়া জলের বেগ কোন বিশেষ স্থলে অতিশয় প্রবল হয় না, ফলে বন্যার প্রকোপ প্রায় বন্ধ হয়। আর প্রবাহিত জল মাঠে মাঠে পলি রাখিয়া গিয়া দেশে সর্ব্বত্র উর্ব্বরতা সাধন করে, খানাডোবা ধুইয়া গিয়া ম্যালেরিয়ার মশক-কীট ধ্বংস হয়, জলাশয়ে মাছ বাড়ে, আর গাছে ফল বাড়ে। কিন্তু পাহাড় ও সমতল, নদীনালা ও জলপ্রবাহ, চাষের মাঠ ও মানুষের বসতির মধ্যে সম্পর্কের সামঞ্জস্য সাধন করিয়া দেশজোড়া সেই বৈজ্ঞানিক ব্যবস্থা করিবে কে? পরাধীন দেশে সে ত "নিশার স্বপন সম"!

সে যাহা হউক, তখন শীতের ঠাণ্ডা হাওয়া সুরু হইয়াছে। নদীর বেগ স্তিমিত, জল কমিয়া গিয়াছে। কর্মীরা নদীতে এপার-ওপার বাঁধ বাঁধিয়া জল আটক করিয়া সেই জল মাঠে মাঠে চালাইয়া দিয়া বোরো ধান উৎপন্ন করিবার স্বপ্ন দেখিলেন। দেশে তখন রকমারি রাজপুরুষের দলে Grow More Food-ঐকতানবাদনের রেশটুকু বেশ রহিয়াছে—যদিও কোটি কোটি টাকা ব্যয়ে তাঁহারা কয়টা কাঁচকলা ফলাইয়াছেন তাহার সঠিক হিসাব সাধারণে জানে না।

বোরো অঞ্চলের নক্সা
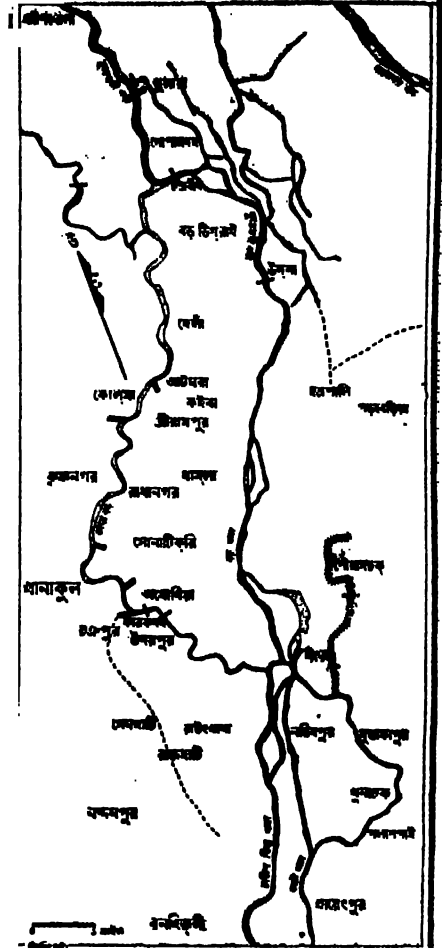
দামোদর নদের প্রধান শাখা মুণ্ডেশ্বরী নীচের দিকে খানাকুল থানার মধ্য দিয়া প্রবাহিত হইয়া রূপনারায়ণে পড়িয়াছে। কর্মীরা এই অঞ্চলে নদীর আশীর্ব্বাদ পাইবার আয়োজন করিতে লাগিলেন। মুণ্ডেশ্বরীর দক্ষিণ তীরে প্রধান শাখা কানা নদী। এই নদীর ধারে রাধানগর গ্রামে রাজা রামমোহন রায়ের বাড়ী এখনও রহিয়াছে। কানা নদী শীতকালে একেবারে শুকাইয়া যায়। কানা যেখান হইতে বাহির হইয়াছে তাহার আন্দাজ এক শত হাত নীচে মুণ্ডেশ্বরীর উপর এপার-ওপার বাঁধ দিয়া জল আটক করিতে হইবে। এই স্থানটির নাম গোপালদহ। ইহার দেড় মাইল উত্তরে নদীর উপর দিকে ভুয়েড়া নামক স্থানে মুণ্ডেশ্বরীর বাম তীর হইতে একটি শাখা বাহির হইয়াছে। ঐ শাখার মুখেও একটা এপার-ওপার বাঁধ দিতে হইবে। তাহা হইলে মুণ্ডেশ্বরীর জল আটক পড়িয়া ঐ অঞ্চলে নদীগর্ভে জলের বিপুল ভাণ্ডার সঞ্চিত হইবে। আর সেই জল কানা নদী ও অন্য বিভিন্ন প্রণালী দিয়া মাঠে মাঠে লইয়া গিয়া সেচ দিতে হইবে।

মুণ্ডেশ্বরী নদী সম্বন্ধে কর্মীদের কোন জ্ঞান ছিল না। বিভিন্ন ঋতুতে নদীর গতি, জলের প্রবাহ ও হ্রাসবৃদ্ধি, নদীগর্ভের আকৃতি

গোপালদহ বাঁধ—দৈর্ঘ্য ৭৭৫ ফুট [সম্মুখ হইতে
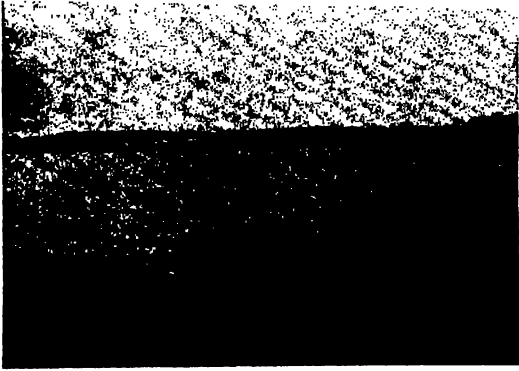
গোপালদহ বাঁধ—পিছন হইতে

ও নদীতীরের প্রকৃতি প্রভৃতি সম্বন্ধে পর্য্যবেক্ষণ-লব্ধ তথ্যাদি তাঁহারা কোথায় পাইবেন? তাঁহাদের এঞ্জিনিয়ারিং যুক্তি ও যন্ত্রপাতিও ছিল না। বাঁধ বাঁধিবার সময় কোন রাশভারি রাজপুরুষ অথবা জ্ঞান-গম্ভীর এঞ্জিনিয়ারের শুভ পদার্পণও সেখানে হয় নাই। কর্ম্মীদের পুঁজি ছিল কেবল—করিয়া তুলিবার আগ্রহ ও সঙ্কল্প, আর ছিল একটা বলিষ্ঠ কল্পনা যাহা ভবিষ্যৎ বাংলার বাঁচিবার পথের রেখাটি দেশের একটি ক্ষুদ্রতম অংশেও একটি বার স্পষ্ট করিয়া দেখিতে চায়।

মুণ্ডেশ্বরীর চরে গঙ্গাপূজা করিয়া বাঁধকার্য্য আরম্ভ হইল। গোপালদহ ও ভুরেড়ার নদীতীর কর্ম্মমুখর। মাটিকাটারা মাটি কাটিয়া তুলিতেছে। যুদ্ধের কারণে গ্রামে বাঁশ পাওয়া দুষ্কর। তাই বিভিন্ন গ্রাম হইতে বাঁশ সংগ্রহ করা হইতেছে। ক্রোশ দুই দূর হইতে সারি সারি গরুর পিঠে কেশে বোঝাই হইয়া আসিতেছে, খড় আসিতেছে। পাশাপাশি খড়ের দড়ি পাতিয়া তাহার উপর কেশে বিছাইয়া ও মাটি ছড়াইয়া প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড 'হেত্তে' পাকানো হইতেছে। বাঁশ কাটিয়া শত শত শূলো তৈয়ারী হইতেছে। শূলো পুঁতিয়া হেত্তে পাতিয়া আর নদীর দুই তীর হইতে ত্রিশ ফুট চওড়া ও আট দশ ফুট উঁচু মাটি ফেলিয়া আসিয়া, নদীর মাঝে উপযুক্ত স্থানে বাঁধের দুই মুখ মিলাইয়া 'মুখমুদ' করিয়া বাঁধ সম্পূর্ণ করা হইবে।

জলপ্রবাহ কি সহজে বাঁধা পড়িতে চায়? তবু কর্ম্মীদের নিরত আগ্রহ ও তৎপরতার মধ্যে ক্রমে গোপালদহ ও ভুরেড়ার বাঁধ দুইটি ২৯শে পৌষ ১৩৫২, ইংরেজী ১৩ই জানুয়ারী ১৯৪৪ তারিখে সম্পূর্ণ হইল। পৌষ-সংক্রান্তির সময় মাঠে মাঠে বোরো চাষের প্রথম জল চলিয়া গেল।

এই অঞ্চলে দুই রকম বোরো-আবাদের চলন আছে—কাল-পিনে আবাদ ও চটা আবাদ। খুব নীচু মাঠে প্রয়োজনমত ছোট ছোট বাঁধ দিয়া বর্ষার জল ধরিয়া রাখা হয়। এই জল শীতকালে ধীরে ধীরে শুকাইয়া উঠে, কিন্তু জমি নরম রাখে। পৌষ মাসের মাঝামাঝি এই নরম জমিতে বোরো ধান রোয়া হয়। ইহাকে কালপিনে আবাদ বলে। ইহা ছাড়া চটা আবাদ আছে। চটা আবাদে ধান রুইবার জন্য পৌষ-সংক্রান্তি বরাবর এক সপ্তাহের মধ্যে জল চাই। তারপর আরও দুই বার জল দিতে হয়, এক বার মাঝে ও আর এক বার শেষের দিকে। এই মাঝের জল ও শেষের জল চটা ও কালপিনে উভয় আবাদেই প্রয়োজন হয়। আমরা বাঁধ বাঁধিয়া চটা আবাদের প্রথম জল ঠিক সময়েই দিতে পারিলাম।

মাত্র কয়দিন পরে ১৬ই জানুয়ারী তারিখে ছোট নাগপুর পাহাড় অঞ্চল হইতে জল নামিয়া নদী হঠাৎ খুব ফুলিয়া উঠিল। এই সময়ে নদীজলের এত স্ফীতি কচিৎ দেখা যায়। কর্ম্মিগণ গোপাল-দহে মুণ্ডেশ্বরীর চরে 'কেশের' কুঁড়ে বাঁধিয়া বাস করিতেছিলেন। কল্যাণকৃৎ কর্ম্মিগণের ইহা কল্পবাসের মত। নিদারুণ শীত। ছোট কুঁড়ের মধ্যে রান্না, খাওয়া, শোওয়া-বসা, আপিস-করা সবই চলিত। নদীতে ভয়ানক বান দেখিয়া সকলে প্রমাদ গণিলেন। জল ফুলিয়া ফুলিয়া ক্রমে বাঁধ ছাপাইয়া গেল। নিরুপায় নিঃসহায়ভাবে দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া তাঁহারা নদীর এই নিষ্ঠুর লীলা দেখিতে লাগিলেন। তারপর উন্মত্ত জলপ্রবাহে গোপালদহের প্রকাণ্ড বাঁধ ভাঙ্গিয়া গেল। ভুরেড়ার বাঁধেরও সেই দশা হইল।

কর্ম্মিগণ যখন বাঁধের কাজে হাত দেন তখন বুদ্ধিমানদের জিজ্ঞাসা করেন নাই পাছে তর্কের তোড়ে বাঁধার আগেই বাঁধ ভাসিয়া যায়, পণ্ডিতদেরও পরামর্শ লন নাই পাছে ব্যঙ্গের মধ্যে বাঁধের সমাপ্তি ঘটে। এখন কিন্তু বাঁধা বাঁধ সত্যই ভাঙিয়া গিয়া বেহিসাবী কাজের হিসাব-নিকাশের সময় আসিল। তাঁহারাও প্রস্তুত হইতে লাগিলেন।

আজ পর্য্যন্ত বাঁধের কাজে ১৩ হাজার টাকা ব্যয় হইয়াছে। এই টাকা কর্ম্মীরা নিজ দায়িত্বে দিয়াছেন। এখন সব টাকাই জলে ভাসিয়া গেল। দুই-চারিদিন অবসন্ন থাকিবার পর তাঁহাদের ভিতরের পাগল জাগিয়া উঠিল। পুনরায় হাজার দশেক টাকা যোগাড় করিয়া তাঁহারা প্রধান অপ্রধান সব বাঁধগুলি একে একে বাঁধিয়া ফেলিলেন। আর তার উপর কংগ্রেসের ধ্বজা তুলিয়া দিয়া পরমানন্দে আকাশ পানে চাহিলেন।

বোরো অঞ্চলের নক্সা দেখিলে বুঝা যাইবে যে মুণ্ডেশ্বরী ও কানা নদী প্রায় দশ মাইল ধরিয়া পাশাপাশি প্রবাহিত—মধ্যে ব্যবধান গড়ে প্রায় আড়াই মাইল। বোরো চাষের পূর্ব্ব অঞ্চল মুণ্ডেশ্বরীর দিকে, আর কানা নদীর দিকে পশ্চিম অঞ্চল। পূর্ব্ব অঞ্চলে চিংড়া ইউনিয়ন ও তাহার সন্নিহিত স্থানে আমন ধান্য হয় না বলিয়া বোরোর উপর নির্ভর বেশী। তাই গোপালদহের চাষ
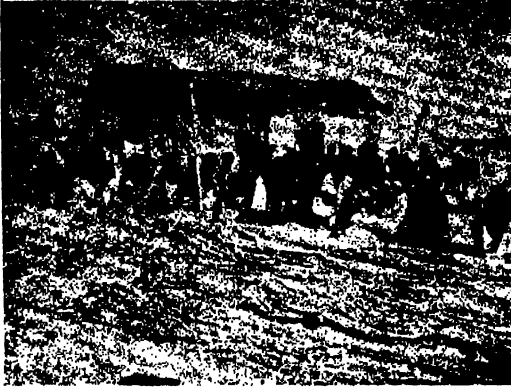
গোপালদহে নদীর চরে 'কেশের কুঁড়ে'। ইহাই কর্ম্মীদের বাসস্থান ও আপিস

ভুরেড়া বাঁধ—দৈর্ঘ্য ৩৮০ ফুট, সম্মুখ হইতে
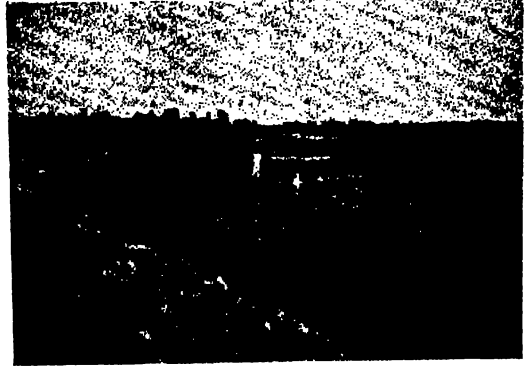
মাইল নীচে উদনা নামক স্থানে মুণ্ডেশ্বরীর উপর আড়াআড়ি আর একটি বড় বাঁধ বাঁধিতে হয়। ভুরেড়া বাঁধের পঁচিশ-ত্রিশ হাত নীচে একটি বড় 'উখোড়' রাখা হয়। ঐ উখোড় বা প্রণালীর মধ্য দিয়া জল বহিয়া গিয়া গোপালদহের প্রায় এক ক্রোশ নীচে পুনরায় মুণ্ডেশ্বরীতে গিয়া পড়ে। উদনার বাঁধে এই জল ধরা পড়ে এবং পূর্ব্ব অঞ্চলে সেচের কাজ হয়।

ভুরেড়ার প্রথম বাঁধ হইতে কানা নদীতে কারকদহের শেষ বাঁধ পর্য্যন্ত নদীপথে ব্যবধান প্রায় ১০ মাইল। গোপালদহ, ভুরেড়া ও উদনার প্রধান তিনটি বাঁধ দৈর্ঘ্য, প্রস্থ ও উচ্চতায় যথাক্রমে ৭৭৫´×৩০´×১০´, ৩৮০´×৩০´×৮´ এবং ৪৫০´×৩০´×১০´ ফুট। ইহা ছাড়া মাঝারি ও ছোট বাঁধ আরও ১৭টি তৈয়ারী করা হয়। তাহাদের নাম হরপাল, কারকদহ, সোনা-রাস্তা, আটঘরা-পীরতলা, কলমে প্রভৃতি। সমস্ত বাঁধ বাঁধিতে ৭০০১০০ ঘনফুট মাটি, ২৬৬৮১ আঁটি কেশে, ৪০৮২ খানা বাঁশ, ১২ কাহন খড় ও বিবিধ অন্যান্য জিনিস লাগে। বাঁধ বাঁধিবার সময় যে সকল পরিভাষার চলন দেখা যায় তাহাদের মধ্যে কয়েকটির নাম—'হেতে' (এঁজে হেতে, চাল হেতে, নাগরী হেতে) 'শূলো' মুখমুদ' 'উখোড়' 'কামড়ী' 'মোকাম' 'খোড়া' 'কিং' ইত্যাদি।

কর্ম্মী যখন গোপালদহের বাঁধ ভাঙিবার পর পুনর্নির্ম্মাণের কথা গান্ধীজীকে বলিতেছিলেন তখন গান্ধীজী হিন্দীতে প্রশ্ন করেন,

"বাঁধ-বাঁধার কৌশল কোথায় পাইলে?"

"গ্রামের লোকের যতটুকু জানা আছে। এঞ্জিনীয়ারিং জ্ঞান বা অভিজ্ঞতা আমাদের এক তিলও নাই। কোন এঞ্জিনিয়ারের সাহায্যও আমরা পাই নাই। গোপালদহের বাঁধ ভাঙিয়া গেলে আমরা সরকারী পূর্ত্তবিভাগে পরামর্শ চাহিয়া চিঠি দিয়াছিলাম। কোন জবাব আসে নাই।"

গান্ধীজী জিজ্ঞাসা করিলেন, "ঐ জ্ঞানটুকুই বা কোথা হইতে আসিল?"

"পরম্পরাগতভাবে, একদম দেশী।"

তুষ্ট হইয়া বাপুজী বলিলেন, "দেহাতী হৈ।"

তখন গঠনকর্ম্ম সম্বন্ধে গান্ধীজীর নিম্নলিখিত কথাটি মনে পড়িয়া গেল—

"It means a wholesale Swadeshi mentality, a determination to find all the necessaries of life in India and *that too through the labour and intellect of the villagers.* (*Italics are ours.*)

অর্থাৎ ইহা ত পুরাপুরি একটা স্বদেশী মনোভাব, জীবন-যাত্রার প্রয়োজনীয় সকল বস্তু দেশের মধ্যেই পাইবার সঙ্কল্প, আর সে-পাওয়া গ্রামের লোকের বুদ্ধি ও পরিশ্রমের জোরে।

গান্ধীজী যখন শুনিলেন বাঁধের জলে সেচের ফলে ঐ অঞ্চলের ৫০খানি গ্রামের মাঠে মাঠে প্রায় ১৫ হাজার বিঘা জমিতে ৮০ হাজার হইতে এক লক্ষ মণ ধান হইয়াছে এবং তাহাতে ৪৭০০ পরিবার উপকৃত হইয়াছে, তখন জিজ্ঞাসা করিলেন, "উঁহাদের মধ্যে মুসলমান পরিবার আছেন কি না।"

কর্ম্মী বলিলেন, "হাঁ, অনেক মুসলমান পরিবারও উপকৃত হইয়াছেন। আর বাঁধ কমিটিতে প্রায় চৌদ্দ-পনর জন মুসলমান আছেন।"

ইহার পর আরও কয়েকটি কথা গান্ধীজীর গোচরে আনা হইল। কর্ম্মী যাহা বলিলেন তাহার মর্ম্ম এই:—হাত পাতিয়া ভিক্ষা লইয়া লইয়া দেশের লোকের মনুষ্যত্ব খর্ব্ব হইয়া যাইতেছে। কিন্তু আমাদের বাঁধকার্য্য ভিক্ষাদানের ব্যাপার হয় নাই। প্রায় লক্ষ মণ ধান যখন চাষীদের ঘরে উঠিতেছিল তখন কর্ম্মীরা তাঁহাদের কাছে 'চাঁদানী'র কথা বলেন। বিঘা-করা কমপক্ষে ৫ মণ ফলন ধরিলে ৮ টাকা মণ হিসাবে এক বিঘায় ৪০ টাকা মূল্যের ধান হইয়াছে। অতএব প্রতি বিঘায় চাষী ভাইরা ২৷০ টাকা চাঁদানী দিন এই প্রস্তাব করা হয়। এমতে প্রায় ২১০০০৲ (একুশ হাজার টাকা) চাঁদানী আদায় হইয়াছে। চাষীরা তাঁহাদের দেয়টুকু শোধ করিয়া নিজ কর্ত্তব্য করিয়াছেন। তাঁহারা বলিয়াছেন ইহা কংগ্রেসের খাজনা। ইহাতে ঐ অঞ্চলে সহযোগিতার নূতন পথের সন্ধান পাওয়া গিয়াছে এবং আমরা নিজের জোরে করিতে পারি—আত্মশক্তির এই সন্ধানও লোকে সমষ্টিগত ভাবে পাইয়াছেন। সুকৌশল কাজের মধ্য দিয়া এই অভিজ্ঞতার একটি বলিষ্ঠ পরিণতির সম্ভাবনা দেখা যাইতেছে।
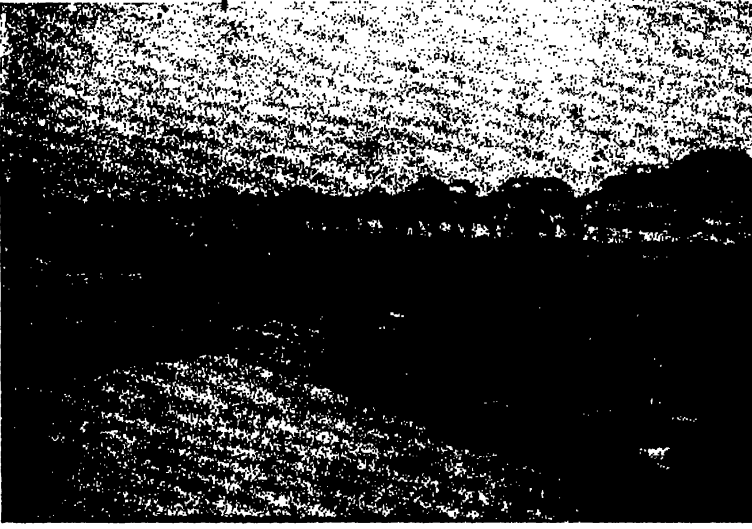
উজনা বাঁধ—নির্মাণকালে

করিতে ডাকিলেন, আর গ্রহণের অযোগ্য শর্ত দিয়া কমিটির নিকট সহযোগিতা চাহিলেন। যে কর্মীরা দারুণ শীতে নদীর তীরে কেশের কুঁড়েতে মাসের পর মাস বাস করিয়া নূতনের স্বপ্ন দেখিয়াছেন আর সেই স্বপ্নকে বাস্তবে রূপ দিতে দিতে প্রার্থনা করিয়াছেন,

"আত্ম-অবিশ্বাস তার নাশ কঠিন ঘাতে,
পুঞ্জিত অবসাদভার হান অশনিপাতে।"

তাঁহাদের প্রতি মোটা মাহিনার সরকারী চাকরের এই অবজ্ঞার চাহনি অসহ্য ও উপভোগ্য দুই-ই বটে!

দুর্ভিক্ষ আবার দেশের সম্মুখে। বাঁধের কাজ কর্মীদের হাতে থাকিলে গত সনের অভিজ্ঞতা খুবই কাজে লাগিত। এক লক্ষ মণের স্থলে তাঁহারা দুই লক্ষ মণ ধান্য উৎপাদনে

কর্মী আরও বলিলেন, "চাষীরা জানিতেন যে কংগ্রেসের লোক চারানীর টাকা আদায়ের জন্য আদালতে যাইবে না অথবা জমিদারের মত তাঁদের ঘরে পাইক-পেয়াদা পাঠাইবে না। তথাপি কয় মাসে ২১০০০৲ আদায় হইয়া গেল। আমাদের এই জোরটুকু মাত্র সেবা-কার্য্যের জন্য, moral position এর জোর।"

বাপুজী তাঁর হাস্যসমুজ্জল সস্নেহ দৃষ্টি কর্মীর মুখে রাখিয়া তাহার কথা শুনিতে লাগিলেন।

"আমরা ঋণ করিয়া বাঁধকার্য্য করিয়াছিলাম। এখন সে ঋণ প্রায় সবটা শোধ করিতে পারিয়াছি। বাকিটা শীঘ্রই শোধ হইবে আশা করিতেছি। আমরা বাঁধকার্য্যের পরীক্ষিত হিসাব প্রকাশ ও প্রচার করিয়াছি।"

উজনা বাঁধ—দৈর্ঘ্য ৪৫০ ফুট, সম্মুখ হইতে

সমস্ত ব্যাপারটি গান্ধীজীকে শুনাইয়া ও তাঁহার সমর্থন পাইয়া কর্মী সেদিন খুব আনন্দলাভ করিয়াছিলেন।

১৩ই ডিসেম্বর বাঁধের কথা গান্ধীজীকে জানান হয়। ২৩শে ডিসেম্বর সোদপুরে বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেস কর্মী-সম্মেলনে তিনি প্রসঙ্গক্রমে এই বাঁধকার্য্যের উল্লেখ করেন এবং কর্মিগণকে গ্রাম অঞ্চলের অবস্থা বুঝিয়া ঐরূপ কার্য্য করিতে বলেন।

বর্ত্তমান বর্ষে (১৯৪৫-৪৬) বাঁধ বাঁধিবার জন্য কমিটি ঠিক সময়ে প্রস্তুত হইয়া বাঁশ কেশে প্রভৃতি ক্রয় করিতেছিলেন এমন সময় গবর্ণমেণ্ট কার্য্যহস্তারক হইলেন। নিজমতে কাজের ভার লইয়া তাঁহারা বাঁধ কমিটির সম্পাদককে 'পে-মাষ্টার' এর তাঁবেদারী সাহায্য করিতে পারিতেন, আর আক, তিল, পিঁয়াজ, আলু প্রভৃতি শীতের শেষের ফসল সেচের জলে অনেক বেশী উৎপন্ন হইতে পারিত একথা জোর করিয়াই বলা যায়। কিন্তু অন্ধ রাজপুরুষ দুর্দ্দিনের মাঝেও আমাদের তাহা করিতে দিলেন না এবং নিজেরাও করিতে পারিলেন না। তাই ভাবি, এঁরা কি সত্যই আমাদের লোক?

গান্ধীজীর ইচ্ছা ছিল যে এই বাঁধকার্য্য আমরা প্রতি বৎসরই করি। তিনি এই সম্পর্কে আমাদের উপদেশ দিয়াছিলেন। আর এই কাজ যাহাতে আমাদের হাতে থাকে তার জন্য সরকারী মহলে অনুরোধ জানাইয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহার সে অনুরোধ ব্যর্থ হইয়াছে।

আমরা বলিয়াছি যে বেহিসাবীর দল এই কাজে হাত দিয়াছিলেন তাঁহারা সমস্ত কাজটির আয়ব্যয়ের পরীক্ষিত হিসাব প্রকাশ করিয়াছেন। পরাধীন দেশে বাঁচিবার পথের সন্ধান করিতেই তাঁহাদের আগ্রহ। তাঁহারা জানেন দেশ স্বাধীন হইলে সুবৃহৎ পরিকল্পনায় এই সকল কার্য্য বুদ্ধিমান ও পণ্ডিতগণই হিসাব করিয়া তথ্য বুঝিয়া সম্পন্ন করিবেন। কর্ম্মিগণ তখন এই সব অনধিকারচর্চ্চা(?) ছাড়িয়া অন্য গঠনকর্ম্মের মধ্যে গ্রাম-সেবায় আত্মনিয়োগ করিতে পারিলে ধন্য হইবেন।

ভয়

শ্রীরামপদ মুখোপাধ্যায়

১

প্রথম যখন যুদ্ধ বাধে—অনাদির আনন্দের আর অবধি ছিল না। ঘাড় নাড়িয়া সহকর্ম্মীদের প্রায়ই বলিত, দেখিস—এবার যদি জার্ম্মেনী না জেতে তো কি বলেছি।

সে বিষয়ে সহকর্ম্মীদের অবশ্য মতদ্বৈধতা ছিল না। চাকরি একটা মাঝারি-গোছের সদাগরী আপিসে। আপিসটা ইংরেজের। পার্টনার—সিনিয়র জুনিয়র দুই দলই অত্যন্ত কড়া মেজাজের। নিয়ম-শৃঙ্খলার একটু এদিক-ওদিক হইলেই ওরা কর্ম্মচারীদের ধমক দেয়, মাহিনা কমায়। দশটা-পাঁচটার পরও দুই-এক ঘণ্টা খাটাইয়া সে অনিয়মের শোধ তোলে। আবার মাহিনা বৃদ্ধির বেলাতেও ওদের ঔদাসীন্য অপরিসীম। যুদ্ধ বাধিবার সঙ্গে সঙ্গেই কিছু জিনিসপত্রের দাম বাড়ে নাই, তবু গত মহাযুদ্ধের সময় কোন্ আপিসে কত ওয়ার-অ্যালাউন্স বা গ্রেড বাড়িয়াছিল তাহার হিসাব-নিকাশে বেশ খানিকটা তর্ক-বিতর্ক প্রত্যহই হয়। সকলেই আশা করে যুদ্ধটা দীর্ঘস্থায়ী হইলে আয়ের অঙ্কটা বৃদ্ধি পাইবে। কাজেই যুদ্ধ সম্বন্ধে সকলেরই উৎসাহ দিন দিন বাড়িয়া উঠে।

অনাদির সংসার নেহাৎ ছোট নহে। বিধবা মা, অবিবাহিতা বোন, বউ এবং ছেলেমেয়ে লইয়া মোট আট জন। নব্বইটি টাকা মাহিনাও পুরা হাতে আসে না। শহরতলীর পৈত্রিক ভিটা না থাকিলে সংসার চালান কঠিনই হইত। এখনও সংসার চলে কোন রকমে। মায়ের সুগৃহিণীত্বের গুণে ধারকর্জ্জ হয় না বটে, তবে আহারে-বসনে কৃচ্ছ্র-সাধন না করিয়া উপায় নাই। ইহার উপর যুদ্ধের উৎসাহে নগদ এক আনা খরচ করিয়া একখানা দৈনিক বাংলা কাগজ কিনিতে আরম্ভ করিল। পরের কাগজ চাহিয়া আনিয়াছে ভাবিয়া প্রথম দিন-দুই মা কিছু বলিলেন না। মাস-কাবারে সংসার-খরচের টাকা কম পাইয়া তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, হাঁরে অনাদি, দুটো টাকা কম দিলি যে?

ঢোক গিলিয়া অনাদি বলিল, মাসে একখানা কাগজ নিচ্ছি কিনা এ মাস থেকে।

মা বলিলেন, কাগজ নিয়ে কি হবে! ও দুটো টাকা থাকলে যে কোলের মেয়েটার দুধ কিছু বেশি করে দেয়া যেত।

সে কথার উত্তর না দিয়া অনাদি বলিল, ঠিক দু'টাকা তো নয়, পুরোনো কাগজ বেচলেও হেসে-খেলে একটা টাকা হবে। পাছে মা আরও কিছু বলেন—এই ভয়ে সে কাজের অছিলা করিয়া তাড়াতাড়ি চলিয়া গেল।

দুটি টাকার অভাব ছিদ্রগ্রস্ত সংসারে খুব বেশি বলিয়া বোধ হয় না। এদিকে জার্ম্মেনী দেশের পর দেশ জয় করিয়া যুদ্ধের উত্তেজনা বাড়াইয়া দিল। সেই সঙ্গে জিনিষের দামও কিছু কিছু চড়িতে লাগিল।

অবনী জিজ্ঞাসা করে, চা'লের দর আজকাল কত ক'রে যাচ্ছে হে?

ভূষণ বলে, পাঁচ টাকা।

অনাদি কাগজ খুলিয়া হাসি মুখে বলে, হু—হুঁ বাবা—আর ক'টা দিন সবুর কর। পাঁচ ছাড়ালেই ওয়ার-অ্যালাউন্স দিতে পথ পাবেন না বাছাধনেরা। এই দেখ কি লিখেছে।

অনাদির কথাই সত্য হইল। কিছুদিন পর চা'লের দাম সাতে উঠিতেই ওয়ার-অ্যালাউন্স মঞ্জুর হইল।

তারপর আসিল পঞ্চাশের দুর্ভিক্ষ। ইতিমধ্যে যুদ্ধ-ভাতা কিছু বাড়িলেও—সে প্রাপ্তিতে আনন্দ বোধ সকলের কাটিয়াছে। আর যুদ্ধের উৎসাহ কাটাইয়া দিল পঞ্চাশের মন্বন্তর।

সেদিন অনাদি আপিসে আসিতেই সহকর্ম্মীরা বলিল, কই হে—কাগজ কই?

অনাদি বলিল, ছেড়ে দিলাম কাগজ নেওয়া। যুদ্ধের খবর কি দিচ্ছে ওরা, যে পড়ে সুখ পাব।

রতন বলিল, সে কি হে, জার্ম্মেনী তো একটু একটু করে হটছে।

ছাই—। সব চাপা খবর, বলিয়া অনাদি মুখ ফিরাইল।

তা জার্ম্মেনী জিতলেই বুঝি খবরটা সত্যি হ'তো?

এই শ্লেষে অনাদি জ্বলিয়া উঠিয়া বলিল, থোক তো কচু! একদিনও কিনলে না একখানা কাগজ, মেলা ক্যাচ ক্যাচ করো না বলছি।

সকলে চোখ টেপাটেপি করিয়া হাসিল, আর কিছু বলিল না।

দুর্ভিক্ষ কাটিয়া গেল—লোকের দুঃখতার লাঘব হইল না, বরং তা দিন দিন বাড়িয়াই চলিল।

আগে বড় বড় যুদ্ধজাহাজ ডুবিলেই কাগজ খুলিয়া অনাদি চীৎকার করিয়া উঠিত, ওহে—আজও দুখানা পটোল তুলেছে। এই নিয়ে মোট_হ'ল—

তারপর টিনের হিসাব চলিত।

আজকাল কেউ জাহাজডুবির খবর দিলে বলে, তারি ত!—লাভ তো এই—ওষুধটা আর মিলবে না। পাচ্ছ হরলিক্‌স্? অভলিভার?

২

এমনি টাল-বেটালের মধ্যে একদিন জার্মেনী আত্মসমর্পণ করিল। তিন মাসের মধ্যে পরমাণবিক বোমার ঘায়ে জাপানও ধরাশায়ী হইল। আপিসে দুই দিন করিয়া ছুটিও হইল এই উপলক্ষ্যে।

অবনী বলিল, যাক্‌, বাঁচা গেল! এবার মানুষ খেয়ে-পরে বাঁচবে।

অনাদি বলিল, ওয়ার-অ্যালাউন্স এইবার তুলে দেবে। উল্টে মাইনে থেকে না কাটে।

ভূষণ বলিল, ইস্—কাটলেই হ'লো! এই মাগ্যির বাজারে কাটুক না দেখি মাইনে থেকে।

কিন্তু হেভি রিট্রেঞ্চমেন্ট হবে।

পোস্টওয়ার প্ল্যানে ত বলেছিল—কারও চাকরি যাবে না শীগ্‌গির।

আরে ওসব আমাদের জন্যে আর কি!

অনাদি বলিল, তা যাদের চাকরি এই যুদ্ধের সময় হয়েছে—তাদের যদি ছাড়িয়েই দেয় তো তোমার-আমার কি!

বাঃ রে—তোমার আমার বাড়ির আর কমে যাবে না—তা হ'লে? ছেলেরা কাজ করছে না?

তা আর কি হবে। তোমার বাড়ি-তৈরির জন্য যে রাজ-মিস্ত্রীকে মজুরি দিয়ে খাটাও—বাড়ি শেষ হ'লে তাকে মজুরি দিতে পার?

কিসে আর কিসে! হরিপদ রুখিয়া উঠিল। বাড়ি তৈরি আর যুদ্ধ বাধান এক? আমরা বাধিয়েছি যুদ্ধ?

এই কথায় সকলে খানিকক্ষণের জন্য চুপ করিল।

ভূষণ বলিল, শুনছি নাকি পঁচিশ বছরের ওপর যাদের চাকরি হয়েছে তাদের ছাঁটিয়ে দেবে।

তাই নাকি? কোথায় শুনলে?

সকলের আগ্রহকে ক্ষুণ্ণ না করিয়া ভূষণ গম্ভীরভাবে বলিল, আমার দাদার এক বন্ধু কাজ করেন গবর্ণমেন্ট আপিসে। তাঁর এক বন্ধু কাজ করেন দিল্লীর দপ্তরে। সেখানকার কন্‌ফিডেন্সিয়াল খবর—

সুতরাং গোপন কথাটি লইয়া সারা আপিসে আলোচনা শুরু হইল। নিজের বয়স ও চাকরির বয়স হিসাব করিয়া কেহ বিমর্ষ কেহ বা পুলকিত হইল।

অবনী বলিল, যাক্—আমার ভয় নেই। এই সবে চলছে।

ভূষণ দাঁত-মুখ খিঁচাইয়া কহিল, তবে আর কি! তুমি বাঁচলেই আমরা চতুর্ভুজ হব!

৩

এই সব গুজবের ভেলায় ভাসিয়া উনিশ শ পঁয়তাল্লিশ কোন রকমে পার হইয়া গেল। কূল এখনও বহুদূরে। ইতিমধ্যে তুফান উঠিল। ওই লোক-ছাঁটাই লইয়া প্রথম সূত্রপাত; বেতন বৃদ্ধির দাবিও পরে সংযুক্ত হইল। একটি ইউনিয়ন এই আপিসেও ছিল। কার্য্যকরী কতকগুলি প্রস্তাব কাগজে লিপিবদ্ধ করিয়া তাহার কর্ত্তব্য সে এ যাবৎ যথানিয়মে সুসম্পন্ন করিয়াছে। যুদ্ধের সংঘাতে মাগ্‌গি ভাতা বৃদ্ধির আন্দোলনে প্রায় চার বছর আগে প্রথম সে গা ঝাড়া দিয়া উঠে। তার পর ঐ জাতীয় অনেকগুলি আপিস ইউনিয়ন একতাসূত্রে বদ্ধ হয়। এখন সাধারণ ইউনিয়নের শক্তি বহুগুণ বাড়িয়া গিয়াছে।

সমস্ত ইউনিয়ন সমস্বরে দাবি জানাইল যুদ্ধপূর্ব্ব পুরাতন গ্রেডের পরিবর্ত্তন চাই। জীবনধারণের মান বহুগুণ বাড়িয়াছে। পুরাতন বেতনে পোষ্য পরিবারবর্গ লইয়া মানুষ কোন প্রকারে বাঁচিতে পারে না। পৃথিবীর চারি দিকে বাঁচিয়া থাকার সমস্যাই প্রবল হইতেছে। অবশেষে ইউনিয়নের ব্যবস্থায় প্রত্যেক আপিসেই মাহিনা বৃদ্ধির আবেদন ঊর্দ্ধতন কর্ম্মচারীদের কাছে প্রেরিত হইল।

ভূষণ বলিল, তুমিও যেমন! মাইনে বাড়াও বললেই বাড়াচ্ছে আর কি!

হরিপদ বলিল, আলবৎ বাড়াবে। যুদ্ধের বাজারে লাখ লাখ টাকা কামিয়েছে কোম্পানী।

অবনী বলিল, যদ যদি মাইনে না বাড়ায়?

হরিপদ টেবিল ঠুকিয়া কহিল, স্ট্রাইক করব।

অনাদি বলিল, কেরাণী স্ট্রাইক করে সাক্‌সেসফুল হয়েছে কোন দিন?

হরিপদ বলিল, হয়নি বলে কখনও হবে না? সবাই এক হলে ক'দিন লাগে এদের শায়েস্তা করতে!

অবনী বলিল, তা যদি হয় তো কার না ইচ্ছে স্ট্রাইক করতে।

অনাদি বলিল, স্ট্রাইক-পিরিয়ডে আমাদের সংসার চলবে কি করে?

হরিপদ বলিল, সে ব্যবস্থাও ইউনিয়ন করবে। মাসে মাসে চাঁদা দিচ্ছ কিসের জন্য?

অনাদি লাফাইয়া উঠিল, কুছ পরোয়া নেই, চালাও স্ট্রাইক। মাইনে বাড়াবে না—ইয়ার্কি আর কি!

হরিপদ বলিল, স্ট্রাইক বললেই স্ট্রাইক হয় না—বড় শক্ত জিনিষ। যত উপায় আছে—সব না দেখে স্ট্রাইক করা চলে না।

ভূষণ বলিল, তা কত দিন চলবে স্ট্রাইক?

সে কেউ বলতে পারে? কর্ত্তার ইচ্ছায় কর্ম্ম। ওরা ইচ্ছা করলে কিছুই হবে না। কোটি কোটি টাকা যাদের রিজার্ভ ফাণ্ডে জমা—তারা আমাদের দুঃখ বোঝাতে পারে না?

অনাদি উত্তেজিত হইয়া কহিল, ওদের সঙ্গে কোন রকম শর্ত্ত নয়—স্ট্রাইকই উপযুক্ত ঔষধ।

কিন্তু স্ট্রাইক-পিরিয়ডে সকলকেই ত্যাগ করতে হবে—কষ্ট স্বীকার করতে হবে—সেটা মনে রাখবে।

অনাদি বলিল, এমনিই কি কষ্ট স্বীকার করছি না আমরা!

এর চেয়েও কষ্ট। যদ ইউনিয়ন থেকে পুরো মাইনে না-ও পেতে পার। আধা মাইনের—

অনাদি ও একসঙ্গে অনেকগুলি লোক খাঁকাই উঠিল—তা কি করে হবে!

হরিপদ অল্প হাসিয়া বলিল, একটি কিংবা দুটি মাস—এ কষ্ট স্বীকার করতেই হবে। বলিয়া গুন্‌গুন্ করিয়া সুর ধরিল।

"দুখ বিনা সুখ লাভ হয় কি মহীতে!"

৪

আবেদন-নিবেদনে কোন ফল না হওয়ায় সর্ব্বসম্মতিক্রমে স্থিরীকৃত হইল—

কিন্তু স্থিরীকৃত হইলেই সঙ্গে সঙ্গে ধর্ম্মঘট করার নিয়ম নাই। এক মাসের নোটিশ দিয়া তবে এই সঙ্কল্প কার্য্যে পরিণত করা সম্ভব। প্রধান ইউনিয়ন আপিস ইউনিয়নগুলির মত চাহিল। আপিসের সঙ্ঘগুলি আবার প্রত্যেক কেরাণীর সম্মতির জন্য দাবী্ জারি করিল।

তিন দিনের মধ্যে প্রত্যেকের মতামত জানাইতে হইবে।

হরিপদ একখানি ফরম লইয়া অনাদির কাছে আসিতেই সে জিজ্ঞাসা করিল, এটা কি?

হরিপদ বলিল, একটা সই করে দাও। আমরা ষ্ট্রাইক করব ঠিক করলাম।

হঠাৎ অনাদির বুকের ভিতরটা শুকাইয়া উঠিল। বলে কি হরিপদ? এত শীঘ্র?

বিস্ময় বাক্যে রূপান্তরিত হইতে-না-হইতে হরিপদ বলিল আরে ভাবছো কি—সবাই সই করে দিয়েছে। এই দেখ।

হরিপদর হাতে এক তাড়া কাগজ দেখিয়া অনাদি আশ্বস্ত হইল। শুক ভাবটা বুক হইতে গলায় উঠিয়া আসিল। কহিল বড়বাবু সই করেছেন?

দূর বোকা—ও সব ঘুঘু লোক কখনও সই করে!

তবে! শুক ভাবটা আবার বুকের দিকে নামিতেছে বোধ হইল।

হরিপদ বলিল, উনি বললেন—তোমরা সবাই সই করগে। জান তো, আমরা তোমাদের পেছনে আছি।

অনাদি বলিল, আজ থাক ভাই। কাল না হয়—

হরিপদ হাসিয়া উঠিল, বউয়ের পরামর্শ নেবে বুঝি! কিন্তু আর সময় নেই—আজ বিকেলে কাগজ দাখিল করবার শেষ দিন। তবু অনাদি হাত উঠায় না দেখিয়া সে একরূপ ধমক দিয়া কহিল, দাও—দাও ঢের হয়েছে। বলি তোমার মাইনে বাড়লে আমাদের তার ভাগ দেবে? ন্যাকা!

ভূষণ বলিল, লিখির বেলায় যে খুব এগিয়েছিলে হে—এখন কোঁৎকায় ভয়ে পিছোও কেন?

বিদ্রূপ-বাণ বর্ষণের মধ্যে অনাদি কখন সই করিয়াছে মনে নাই। কিন্তু সই করার সঙ্গে সঙ্গে মনে হইল মাতা বসুমতী বাসুকীর ফণা হইতে নামিবার কৌশল আয়ত্ত করিতেছেন। মাথাটা হঠাৎ ঘুরিয়া উঠায় টেবিলে মাথা রাখিয়া সে খানিকক্ষণ চুপ করিয়া পড়িয়া রহিল। বহুক্ষণ পরে বড় গ্লাসের এক গ্লাস জল খাইয়া তবে তার গলার শুকতা ঘুচিল।

দূর হইতে অবনী বলিল, দাদা ঢক্ ঢক্ করে অত জল খাচ্ছ কেন গো?

আর এক জনের কণ্ঠস্বর কানে আসিল, সই করার মেহন্নৎ তো কম নয়।

৫

আপিস হইতে শিয়ালদহ ষ্টেশন—প্রায় দুই মাইল। তার পর ট্রেনে এক ঘণ্টা। ওদিকে ষ্টেশন হইতেও বাড়ি এক মাইল হইবে। মাতা বসুমতী সেই যে দুলিতে আরম্ভ করিয়াছেন—তার আর নিবৃত্তি নাই। রাণাঘাটের যে দলটি ট্রেনে চাপিয়াই বৃথা সময় নষ্ট না করিয়া হাঁটুতে ঝাড়ন বিছাইয়া তাস খেলিতে বসেন ও নানাবিধ মন্তব্য করেন—তাঁহারাও অনাদির দৃষ্টি ও শ্রুতিকে আজ আকর্ষণ করিতে পারিলেন না। বাম পাশের কোণে হেলান দিয়া যে আধবুড় লোকটি সংবাদপত্র পড়িবার সঙ্গে সঙ্গে পেন্সিল দিয়া বিশেষ তথ্যগুলিতে দাগ দেন এবং কেহ জিজ্ঞাসা করিলে আন্তর্জাতিক রাজনৈতিক ঘটনাগুলির ব্যাখ্যা করিতে বসেন তিনিও আজ অনাদির চোখে লুপ্ত। ভিখারীদের চানাচুর-বিক্রেতাদের মর্ম্মভেদী চীৎকার অথশূন্য ভাবে কানে আঘাত করিতেছে। কেবলই মনে হইতেছে—সংসার সুনিয়মে মন্থর গতিতে চলিতেছে। কাহারও সামনে কোন সমস্যা নাই—কোন চিন্তা নাই, সেই শুধু নির্ব্বুদ্ধিতা-বশতঃ যে কাজ এইমাত্র করিয়াছে তাহার খালন বুঝি কিছুতেই হইবে না। এ নির্ব্বুদ্ধিতার পরিণতি যতই ভাবিতেছে অনাদি ততই বাসুকীর ফণা হইতে মাতা ধরিত্রী নামিয়া পড়িবার আয়োজন করিতেছেন।

মেজ ছেলে কেষ্ট ধুলা মাখিয়া পথে খেলা করিতেছিল। অনাদির ক্লান্ত মন্থর গতি চোখে পড়িতেই ছুটিয়া আসিয়া তাহাকে জড়াইয়া ধরিয়া আদরের স্বরে বলিল, আমার রেল গাড়ি কই বাবা?

অনাদি সম্বিৎ ফিরিয়া পাইয়া দেখিল—ছেলের আলিঙ্গনে—কাল সাবান দিয়া কাচা জামাটা পূর্ব্ব অবস্থা প্রাপ্ত হইয়াছে। ওর ঘ্যানঘেনে আবদারটাও মাথায় আগুন জ্বালিয়া দিল! সজোরে গোটা দুই চড় তার গালে বসাইয়া দিয়া খিঁচাইয়া উঠিল, রেলগাড়ি! তারি বাপের জমিদারি তালুক রেখেছে—না? দু'মুঠো ভাতও যে জুটবে না!

কেষ্ট তারস্বরে চীৎকার করিতে করিতে অনাদির আগেই বাড়ি গিয়া ঢুকিল।

অনাদির স্ত্রী গোভার বয়স পঁচিশের মধ্যেই। কিন্তু চারিটি সন্তানের জননী হইয়া ইতিমধ্যে সে বয়স নির্ণয়ের গণ্ডী ছাড়াইয়া গিয়াছে। দেহে যেমন যৌবন নাই—মেজাজেও তেমনি স্থিরতা নাই। অভাবী সংসারে ছেলেমেয়েদের দিবারাত্রি দেহি দেহি রবে তিক্ত বিরক্ত হইয়া সে প্রতিদিন প্রকাশ্যে নিজের ও সন্তানদের মৃত্যু কামনা করে। এই লইয়া শাশুড়ী বউয়ে বকবকাবকি প্রতিদিনই হয়, অথচ প্রতিদিন এই 'হা অন্ন' রব ও কলহ তর্ক না জমিলে মনে হয়—সংসারের ছন্দ কোথায় ব্যাহত হইল।

ছেলের কান্নার হেতু না বুঝিয়াই সে তাহার পিঠে আরও গোটা কয়েক চাপড় কষাইয়া দিয়া কহিল, মর মর তোরা, আমি হাত পা ছড়িয়ে নিশ্চিন্দি হই।

অনাদির মা বাড়ি ছিলেন না। কেষ্ট উঠানে গড়াগড়ি দিয়া বাড়ি ফাটাইতে লাগিল।

অনাদি কোন কথা না বলিয়া ছেলের পাশ কাটাইয়া রোয়াকে উঠিল। ছোট মেয়েটি হামা টানিয়া তাহার দিকে অগ্রসর হইতে হইতে আধ আধ স্বরে কহিল, বাব্বা—বাব্বা—

তার বড় মেয়েটির কয়দিন হইতে জ্বর। সাগু মিছরি আজকাল অমিল বলিয়া বার্লির সঙ্গে চিনি মিশাইয়া খাইতে দেওয়া হইতেছে। কিন্তু ছোট মেয়েদের রুচিবোধ যথেষ্ট। খাইবার সময় সে প্রত্যহই বায়না ধরে, এবং মায়ের চপেটাঘাত ছাড়া কিছুতেই ওই তরল পদার্থ গলাধঃকরণ করিতে চাহে না। আজ আপিস যাইবার সময় শোভা বলিয়াছিল—দু'খানা বিস্কুটও তো আনতে পার—কি একটা কমলালেবু।

অনাদি কথা দিয়াছিল আনিবে।

মেয়েটি কাছে আসিয়া বলিল, বাবা বিস্কুট দে।

অনাদি কথা না কহিয়া ঘরের মধ্যে গেল। মেয়েটি ঘর মাথে তুলিয়া কান্নার মহলা দিতে লাগিল, দেবু দে, বিস্কুট দে।

অনাদির সহ্য হইল না, তাহাকেও একটা চড় বসাইয়া দিল। ব্যস! তারপর পাঁচ দিনের উপবাসী মেয়ের কণ্ঠ হইতে যে সুতীক্ষ্ণ চীৎকার-ধ্বনি বাহির হইল—তাহাতে ব্রহ্মরন্ধ্র না হউক, কর্ণরন্ধ্র ফাটিয়া যাওয়া আশ্চর্য্যের নহে।

শোভা ছুটিয়া আসিয়া কহিল, রোগা মেয়েটাকে মারলে তো?

হাঁ, মারলাম। ঘ্যান্‌-ঘ্যান্‌ খাই-খাই ভাল লাগে না।

ভাল লাগে না তো সংসার করতে গিয়েছিলে কেন? ঝাঁজালো কণ্ঠে শোভা জবাব দিল।

অনাদিও ঝাঁজালো কণ্ঠে কহিল, বক্‌মারি। না হ'লে মানুষ জেনে শুনে এমন অধর্ম্ম করে।

অতঃপর শোভাও ছেলেদের সঙ্গে গলা মিশাইয়া বাড়ি ফাটাইতে লাগিল। পাড়া বেড়াইয়া আসিয়া মা-ও যোগ দিলেন এই গোলমালে। অনাদির মনের উষ্ণতা এই সম্মিলিত উষ্ণতার চাপে ক্রমশই নীচে নামিতে নামিতে সন্ধ্যার পর কোথায় মিলাইয়া গেল।

ভাল করিয়া ভাত না খাইয়া সে শুইয়া পড়িল।

খানিক পরে শোভা ঘরে আসিয়া এটাওটা নাড়াচাড়া করিতে করিতে আড়চোখে অনাদির ভাবভঙ্গি লক্ষ্য করিয়া দেখিল, সে চোখ বুজিয়া পড়িয়া আছে। হঠাৎ তার মনে হইল, অসুখ নয় তো?

কাছে আসিয়া সে যথাসম্ভব মোলায়েম স্বরে কহিল, আজ ভাল করে খেলে না কেন? আমাদের ওপর রাগ হয়েছে বুঝি?

এই সন্ধি-মূলক স্বর অনাদির অপরিচিত নহে। তাহার মন মুহূর্ত্তে অত্যন্ত কোমল হইয়া উঠিল। হঠাৎ বিছানায় উঠিয়া বসিয়া সে খপ্‌ করিয়া শোভার একখানি হাত টানিয়া বুকের উপর চাপিয়া ধরিল। চোখ দিয়া তার হু-হু করিয়া জল গড়াইয়া পড়িল।

রাত্রি তখন ন'টা। মাত্র অনাদির আহার হইয়াছে—ছেলেদের পাট সারিতে এখনও ঘণ্টা দুই লাগিবে। এ সময়ে বিছানায় বসিয়া অনাদির বিক্ষুব্ধ মনের ইতিহাস সবটা খুঁটাইয়া শুনিবার অবসর নাই, অথচ অনাদির এই কান্না শোভাকে কম বিস্ময়ান্বিত করিল না। সে কহিল, কাঁদ কেন?

এই কথার জবাব না দিয়া অনাদি আরও খানিকক্ষণ ফোঁপাইয়া ফোঁপাইয়া মনের ভার লাঘব করিল। শোভাও অধীর কণ্ঠে বার বার জিজ্ঞাসা করিতে লাগিল, আঃ কাঁদ কেন? কি হয়েছে বলই না ছাই।

ভিতরকার বাষ্প কিছু বাহির হইয়া গেলে অনাদি বলিল, আমি আজ সর্ব্বনাশ করেছি। তোমাদের পথে বসিয়েছি।

অ্যাঁ—বল কি! শোভা আঁতকাইয়া উঠিল। ইন্সিওরের টাকাটা এবার ছাড় নি বুঝি?

ওগো, সে সব কিছু নয়। আমি, বলিয়া সে পুনরায় ফোঁপাইতে লাগিল।

শোভা কৌতূহলের ভারে প্রায় ভাঙিয়া পড়িবার মত হইয়াছে। আর কত সহ্য হয়। হ্যাঁচকা টানে হাত ছাড়াইয়া সে কহিল, আর আদিখ্যেতায় কাজ নেই, কি হয়েছে তাই বল।

শোভার হ্যাঁচ্‌কা টানে অনাদি হকচকাইয়া গিয়াছিল, কিন্তু বুদ্ধি তাহার একেবারে লোপ পায় নাই। যে ঘটনাটি আজ আপিসে ঘটিয়াছে তাহার পরিণামফল ওর মানস চক্ষে জল্‌ জল্‌ করিতেছে।

অনাদি সাদা গলায় বলিল, আজ সই করে দিয়ে এলাম আপিসে—মাইনে বাড়াতে হয় বাড়াও, নইলে রইল তোমার চাকরি।

বল কি গো! চক্ষু কপালে তুলিয়া শোভা খানিকক্ষণ হ্যাবলের মত রহিল। তারপর সেই দৃষ্টি তীক্ষ্ণ করিয়া অনাদিকে বিদ্ধ করতঃ কহিল, সত্যি বলচ?

অনাদি সরিয়া আসিয়া শোভার গায়ে হাত দিয়া বলিল, সত্যি—সত্যি—সত্যি।

শোভা অকস্মাৎ কাঁদিয়া উঠিল, ওগো, এমন দুর্ম্মতি তোমার কেন হ'লো! আমাকে হাড়ে মাসে জ্বালাবার জন্যেই কি বিয়ে করেছিলে তুমি! আমি তোমার সঙ্গে কি এমন শত্রুতা করেছিলাম যে—

রান্নাঘর হইতে মা ছুটিয়া আসিয়া কহিলেন, কি হ'লো বউমা, কাঁদচো কেন?

শাশুড়ীর সামনে মাথায় ঘোমটা দিবার কথা শোভার মনেই হইল না। কাঁদিতে কাঁদিতে সে বলিল, আপনার ছেলে চাকরিতে জবাব দিয়ে এসেছে মা। আমরা পথে বসলাম।

মা-ও এই সংবাদে স্তম্ভিত হইয়া শুষ্ক স্বরে বলিলেন, হাঁরে ও বুদ্ধি তোকে কোন্‌ শত্রু দিলে? চাকরি গিয়ে আমাদের গতি কি হবে বলতে পারিস?

অনাদি বলিল, ছাড়িনি এখনও—তবে সে ছাড়ারই সামিল।

মা রোয়াকে বসিয়া পড়িয়া কহিলেন, সব খুলে বল বাবা, আমার বুক ধড়ফড় করছে।

সমস্ত শুনিয়া তিনি দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া উঠিয়া বলিলেন, তোদের বড়বাবু—বালিপাড়ায় থাকে না? যা বাবা—এখনই তার কাছে একবার ছুটে যা—

অনাদি বলিল, এত রাত্তিরে এক মাইল পথ—

মা বলিলেন, চল বাবা, তোর সঙ্গে না হয় আমিও যাচ্ছি।

এই কাচ্চাবাচ্চাগুলোর সর্বনাশ করতে কিছুতেই দেব না আমি।

অনেক কষ্টে তাঁহাকে বুঝাইয়া অনাদি পথে বাহির হইয়া পড়িল।

৬

পথে পা দিয়াই মনে হইল—এতক্ষণ সে বুঝি দুঃস্বপ্ন দেখিতেছিল। ধুলা-কোমল পথে পা ফেলিয়া এত তৃপ্তি সে বহু কাল পায় নাই। পথের দু'পাশে ঘন ঝোপ অন্ধকারে মাখামাখি হইয়া ওকে সান্ত্বনা দিতে দিতে আগাইয়া চলিয়াছে। আকাশের কোমল নীল আস্তরণে নক্ষত্রেরা আজ বেশি উজ্জ্বল হইয়া ফুটিয়াছে। শীতল বাতাসে ক্লান্ত মস্তিষ্ক বহুক্ষণ হইল জুড়াইয়া গিয়াছে। আশ্চর্য্য পথ—আর আশ্চর্য্য আকাশ। ন'টার গরম ভাত মুখে গুঁজিয়া ন'টা আঠারোর ট্রেন ধরিবার জন্য ছুটিবার কালে এ পথ উদ্বেগে কোথায় আত্মগোপন করিয়া থাকে। ছ'টার সময় বাড়ি ফিরিবার কালে ক্লান্ত দেহে এত আলস্য জমা হয় যে সন্ধ্যামুখী আকাশের বর্ণবিলাস ওর দৃষ্টিকে প্রলুব্ধ করিতে পারে না। ক্লান্তির ভারে পথকে মনে হয় দীর্ঘ—আকাশকে মনে হয় অনন্ত। কিন্তু আজ এই মুহূর্ত্তে, মনে এত উদ্বেগ সত্ত্বেও, কোথায় পট পরিবর্ত্তন সুরু হইয়াছে কে বলিবে। যে চিন্তা এতক্ষণ মর্ম্মান্তিক ভাবে মর্ম্মকে চাপিয়া ধরিয়াছিল—সে শীতল বাতাসে ভর করিয়া কোন্ ঊর্দ্ধলোকে উধাও হইয়া গেল।

ওই না বড়বাবুর বিতল প্রাসাদ দেখা যায়? ঘরের খোলা জানালা দিয়া আলোর রেখা পথের ধুলায় মূর্চ্ছিতের মত পড়িয়া আছে। কোলাহলহীন নিস্তব্ধ বাড়ি। শান্ত প্রকৃতির সঙ্গে অদ্ভুত সামঞ্জস্য বাড়িটার। এই পরিবেশে নিজের দীনতা কি উদ্‌ঘাটন করা চলে? আজ থাক্। কাল দিনের বেলায়—সকলের অগোচরে আপিসেই না হয়—

এই চিন্তাও অসহ্য বোধ হইতেছে। সত্যই ত তার চাকরি যায় নাই। কল্পনায় আতঙ্ক সৃষ্টি করিয়া সে ভাঙিয়া পড়িতেছে কেন? সকলের যে দশা তাহারও না হয় সেই গতিই হইবে? সকলকে বাদ দিয়া কিছু আপিস চলে না, আপোষ-রফা একটা করিতেই হইবে।

বহুদিন পরে অনাদি গুন্ গুন্ করিয়া একটা গান ধরিল।

মা জিজ্ঞাসা করিলেন, হাঁরে কি বললেন বড়বাবু?

অনাদি ইতস্তত না করিয়া বলিল, বললেন ভয় নেই—সব ঠিক হয়ে যাবে।

৭

আজ আপিস যাবে তো? খোকা পা ঠেলিয়া ডাকিতেছে।

হ্যাঁ—আপিস যাব না কেন!

না—তাই বলচি। আজ একটু বেলা হয়ে গেল—ভাল আর চড়াব না। বলিয়া খোকা বাহির হইয়া গেল।

জানালা খোলাই ছিল। শেষ রাত্রির জ্যোৎস্নায় প্রভাত স্পষ্ট প্রত্যক্ষ নয়—সৌন্দর্য্যহীন। এমনই সৌন্দর্য্যহীন প্রভাত প্রতিদিন তাহাকে কর্ত্তব্যের পথে আহ্বান জানায়। কি কর্কশ রূঢ় সে আহ্বান!

কোনমতে স্নানাহার সারিয়া ঊর্দ্ধশ্বাসে ছুটিতে হয় ষ্টেশনে। গাড়িতেই কি বিশ্রামের জো আছে! প্রায়ই গলদ্‌ঘর্ম অবস্থায় দাঁড়াইয়া এর কনুয়ের গুঁতো ওর বিড়ির ধোঁয়া খাইয়া এবং গাড়ির দোলাতে এধার-ওধার কাত হইয়া চাপাচাপিতে কোন রকমে কলিকাতায় পৌঁছিয়া যায়। তারপর অসংখ্য গাড়ি-ঘোড়ার পাশ কাটাইয়া ফুটপাথে মানুষের স্রোতে গা ঢালিয়া পায়ে পায়ে আগাইয়া যাওয়া। আপিসে প্রায়ই লেট হয় এবং বড়বাবুর গরম গরম বাক্যগুলি হজম করিয়া মোটা লেজারের অঙ্ক সমুদ্রে 'জয়কালী' বলিয়া সে ডুব দেয়। সৌন্দর্য্যহীন প্রভাত এই ভাবের রসকষহীন দিনের মাঝে তাহাকে ঠেলিয়া দিবার ইঙ্গিত জানায়।

কাল রাত্রির পথ ও আকাশ রাত্রির সঙ্গেই নিঃশেষ হইয়াছে। মনে অল্পে অল্পে জাগিতেছে ভয়।

ট্রেনের কামরায় বড়বাবুর সঙ্গে দেখা হওয়া সম্ভব নয়। কেননা উঁরা তৃতীয় শ্রেণীর যাত্রী নন। ষ্টেশনের পথে দেখা হওয়ার সম্ভাবনা ছিল, কিন্তু প্রাত্যহিক কাজগুলি এমন ঠাস-বুননে ভরা যে ন'টার আগে কোনমতেই বাড়ির চৌকাঠ ছাড়ান যায় না। ডালটা না হইলেও চলে, কিন্তু অন্ন উদরে না গেলে—

হুই—হুই—হুই।

ট্রেন আসিয়া গেল হুস্‌হুস্ শব্দে। যথানির্দ্দিষ্ট কামরায় হাঁপাইতে হাঁপাইতে উঠিতেই কয়েকটি কণ্ঠে ধ্বনিত হইল, এই যে ব্রাদার, পান খাওয়াও।

পান চিবাইতে চিবাইতে এক জন বলিল, কাল তো 'জয় কালী' বলে ঝুলে পড়লাম—দেখা যাক কি হয়।

তোমাদের আপিসেও বুঝি—

অনাদির কথায় বাধা দিয়া সে বলিল, সব আপিসেই হবে ব্রাদার। ষ্ট্রাইক কোথায় না হচ্ছে। অমন যে কোটিপতির দেশ আমেরিকা সেখানেও—

এইসব আলোচনায় মনে সাহস সঞ্চার হয়—ভবিষ্যতের কালো মেঘের ফাঁকে রূপালী আভাস দেখা দেয়।

ওই প্রসঙ্গে গাড়ি সরগরম হইয়া উঠিল।

শহর কিন্তু ভ্রূক্ষেপহীন।

আপিস আরও নিস্তব্ধ। আসন্ন ঝড়ের আগে থমথমে প্রকৃতির মত। কাগজের উপর কলমের খস্‌খস্ শব্দ স্পষ্ট শোনা যায়। দশটা বাজিয়া কয়েক মিনিট হইয়াছে।

বড়বাবু চশমার মধ্যে অন্তর্ভেদী দৃষ্টি হানিয়া বলিলেন, এ মাসে ক'দিন লেট হ'ল?

ট্রেনের আলাপ-আলোচনার খানিকটা নরিয়া-ভাব অনাদির মনে তখনও অবশিষ্ট ছিল। সে সাদা গলায় বলিল, ট্রেন দেরিতে এলে আমাদের কি দোষ বলুন।

আগের ট্রেনে এলেই পার। আমরা আসি না?

এমন সৎ দৃষ্টান্তের উল্লেখেও অনাদির মন গলিল না। মনে

মনে বড়বাবুকে একটা অকথ্য সম্বোধনে সম্বোধিত করিয়া কহিল, আপনাদের কথা আলাদা স্যার।

বড়বাবু বলিলেন, বটে। আমরা মানুষ নই ?

অনাদি মনে মনে বলিল, কোন কালেই নয়। প্রকাশ্যে কোন কিছু না বলিয়া নিজের জায়গায় গিয়া বসিল।

চেয়ারে বসিয়াই মনে হইল, ইস্—কি ভুলটাই না হইয়া গেল। ট্রেনের উষ্ণতা অতখানি পথ বাহিয়া এই আপিসে আনিবার কি আবশ্যকতা ছিল ? যে কথা বলা তার উচিত—সে কথা না বলিয়া—

অত্যন্ত চঞ্চল মনে বার-দুই সে লেজার খুলিল, বার-দুই বন্ধ করিল। দাঁতে কলম কামড়াইয়া বার-কতক মাথা নাড়িল।

সামনের সীটের রতন বলিল, কি দাদা, সকালে দুর্গা নাম না লিখে কলম কামড়ে ধরলেন যে ?

অনাদি অপ্রস্তুত হইয়া লেজার খুলিয়া কাজে মনোনিবেশ করিল।

৮

মন অত্যন্ত বেয়াড়া। বড়বাবুর কাছে যতক্ষণ না নিজেকে উদ্ঘাটিত করিতে পারিতেছে—ততক্ষণ অনাদির শান্তি নাই। নানাভাবে আলোচিত হইতেছে আসন্ন ধর্ম্মঘটের কথা—অনাদি মন নিবিষ্ট করিতে পারিতেছে না।

এক সময়ে রতন বলিল, শুনেছেন দাদা—আপিস থেকেও ফরম ছাপা হচ্ছে—কিনা বণ্ড গোছের।

কিসের বণ্ড ?

রতন বলিল, প্রত্যেক কেরাণীকে ওরাও নাকি সই করিয়ে নেবে—কারা কাজ করবে—কারা কাজ করবে না। রেকর্ড রাখতে চায় ওরা।

তা হলেই তো—

অনাদির শুষ্ক স্বরে রতন হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিল, রাখুক না রেকর্ড যত পারে। আমরা তো ডুবেছি না—ডুবতে আছি।

রতনের হাসিতে অনাদির বুক গুর গুর করিয়া কাঁপিয়া উঠিল। তাড়াতাড়ি লেজার বন্ধ করিয়া সে উঠিয়া দাঁড়াইল।

বড়বাবুর ঘরে আজ বেশি ভিড়। এক জন লোক বাহিরে আসে তো এক জন ভিতরে যায়। ওরাও কি চাকুরি রক্ষার জন্য একান্তে অনুনয় করিতে আসিয়াছে ? ষ্ট্রাইকটা সর্ব্বসম্মতি-ক্রমে স্থিরীকৃত হইলেও সকলের মন মুখ এক আছে তো ? না এ দলে সম্মতি দিয়া ও দলে ভিড়িয়া রহিয়াছে ? সাপের ও ব্যাঙের গালে প্রকাশ্যে ও গোপনে চুমা দেওয়ার লোকের অভাব তো নাই আপিসে। দ্বৈত নীতি না থাকিলে কোন্ কালে তাহারা অভাব-অভিযোগের বহু ঊর্দ্ধে উঠিয়া যাইত।

একটা ফাইল বগলে চাপিয়া অনাদি বড়বাবুর ঘরের দিকে অগ্রসর হইল।

চাপরাশী জানাইল—বড়বাবু সাহেবের খাস কামরায়। ফিরিতে ঘণ্টাখানেক দেরি হইবে।

অনাদির বুক আবার গুর গুর করিয়া উঠিল। এই সারিয়াছে! তাহাদের চাকরি লোপের ব্যবস্থা পাকা না করিয়া উনি কি নিজের ঘরে ফিরিয়া আসিবেন!

৯

আজও অদ্ভুত রাত্রির সঙ্গে অদ্ভুত পথ মন জুড়িয়া বসিল। আহারের পর 'একটু বেড়িয়ে আসি' বলিয়া অনাদি বড়বাবুর বাড়ি অভিমুখে চলিয়াছে। সারাদিন চিন্তার পর সে দৃঢ়-প্রতিজ্ঞ হইয়াছে—একটা হেস্তনেস্ত এ বিষয়ে আজ করিতেই হইবে। তাহার চাকরির সূতার ঝুলিয়া আছে এত বড় সংসার। কর্ত্তব্য বল—দায়িত্ব বল সবই একা অনাদির। এ কর্ত্তব্যে অবহেলা করিলে কি না ঘটিতে পারে। তেরশো পঞ্চাশের ভ্রূকুটি এত শীঘ্র সে ভোলে নাই। ভোলা যায় না।

তবু চিন্তার সঙ্গে পথ ও আকাশ অনুসরণ করিতেছে। বায়ু উত্তপ্ত মস্তিষ্কে স্নিগ্ধ স্পর্শ রাখিয়া অন্য এক জগতে টানিতেছে মনকে। বহুদিন আগেকার জগতে। সদাগরী আপিসের সঙ্কীর্ণ ঘরে সে জগৎ আবদ্ধ ছিল না; জীবনধারণের দুশ্চিন্তায় ছিল না ভারগ্রস্ত।

পুরাতন আকাশের ওরা অনাদি কালের নক্ষত্র। ওরা ত জানে মানুষ বহু বার বদল করে দেহ; মনে লাগে পরিবর্ত্তনের ছাপ। চিন্তার আচ্ছন্ন হয় দূরের বস্তু—দূরের লক্ষ্য। ভীরু সংশয় আর অলস শান্তির বর্ম্মে দেহ ঢাকিয়া সেই জগৎকে—পুরাতনকে ভুলিবার চেষ্টাই চলে অহরহ।

বড়বাবুর খোলা জানালার আলোর রেখা আজও মূর্চ্ছিত হইয়া পথের ধূলায় লুটাইতেছে। আজও ও বাড়িতে অটল গাম্ভীর্য্য। ও গাম্ভীর্য্য ভেদ করিবার সাহস অনাদির নাই। দণ্ডখানেক নিঃশব্দে উন্মুক্ত বাতায়নের আলোক-রেখার পানে চাহিয়া সে ফিরিয়া চলিল।

১০

এইভাবে অনাদির রাত্রি আর দিন পরস্পর হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া গেল। যে আলোয় জগৎ জীবনলাভ করিয়া নবীন আনন্দে হাসিয়া উঠে—সেই আলোই অনাদিকে চিন্তার জগতে টানিয়া লইতেছে। আশঙ্কা—সন্দেহ—ভীরুতার জগতে। দিন যাপনের উৎকণ্ঠা—অন্ধ প্রত্যাশার এই দুর্ব্বিষহ বেদনা ও আর বহিতে পারিতেছে না।

হরিপদ বলিল, দিন দিন শুকিয়ে যাচ্ছ কেন হে—মনে বল আন।

অনাদি বলিল, ইউনিয়ন কি ষ্ট্রাইকের দিন ধার্য্য করেছে ?

হাঁ—পরশু নোটিশ দেওয়া হবে। একমাস পরে ষ্ট্রাইক।

সায়েবরা কিছু বলছে না ?

বলছে বইকি—আমাদের কাছে ভাঙছে না কিছু। আর তো প্রেষ্টিজ বড় বালাই।

অন্য সব আপিস ঠিক আছে ত ?

নিশ্চয়। পরশু শনিবার—ওই দিন নোটিশ দেওয়া হবে—আর সব আপিস মিলিয়ে একটা প্রসেশন বার করা হবে। থাকবে সবাই।

প্রসেশন বার করে কি হবে ?

পাবলিক নিরপ্যাথি জু না করলে ষ্ট্রাইক কখনও সাক্সেস-ফুল হয়।...সবাই থাকবে মনে থাকে যেন। বলিয়া হরিপদ মাথা নাড়িল।

সকলে চলিয়া গেলে অনাদি হরিপদর জামায় মৃদু টান দিয়া চাপা গলায় কহিল, শোন।

সে ফিরিলে বলিল, আচ্ছা—সেদিন যে সই করিয়ে নিলে—আমরা কাজ করবো কি করবো না—তার কিছু শুনলে?

হরিপদ হাসিয়া কহিল, বিলেতে রিপোর্ট গেছে স্ট্রাকের নামে। আমাদের ফাঁসি হবে।

অনাদি শুষ্ক কণ্ঠে কহিল, এটা হাসির কথা হ'ল?

হরিপদ বলিল, ছেলেবেলায় কথামালায় সেই বেতের গোছা ভাঙার গল্প মনে আছে ত? বাস। সবাই এক থাকলে ওদের সাধ্য কি—

অতঃপর হরিপদ বহু শপথ ও কড়া মন্তব্য করিল।...

অনাদির লুপ্ত সাহস কিন্তু ফিরিয়া আসিল না।

১১

সৌভাগ্যক্রমে আজ বড়বাবু বাহিরের বৈঠকখানায় ইজি-চেয়ারে শুইয়া গড়গড়ায় মৃদুমন্দ টান দিতেছিলেন। শুক্লপক্ষ-ঘেঁষা কি একটা তিথি; মেটে জ্যোৎস্নায় পথ স্পষ্ট দেখা যায়। সেই পথে দণ্ডায়মান একটি লোককে বহুক্ষণ এই বাড়ির ফিতরের পানে চাহিয়া থাকিতে দেখিয়া তিনি সন্দিগ্ধ স্বরে প্রশ্ন করিলেন, কে—কে ওখানে?

বৈঠকখানা ঘরে আলো জ্বালা ছিল না; অনাদি এ দিকে লক্ষ্য করে নাই: বড়বাবুর কণ্ঠস্বরে ওর চমক ভাঙিল। এ অবস্থায় বিনা বাক্যব্যয়ে আর ফেরা চলে না, পলায়নে সঙ্কট বৃদ্ধি:

গুটি গুটি রোয়াকের ধারে আগাইয়া আসিয়া অনাদি বলিল, আজ্ঞে—আমি।

বড়বাবু বলিলেন, আমি কে?

অনাদি।

ওঃ! আশ্বস্ত বড়বাবু দুয়ার খুলিয়া গড়গড়া হাতে রোয়াকে আসিয়া দাঁড়াইলেন। তা তুমি এত রাত্তিরে আমার বাড়ির সামনে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কি করছিলে?

আজ্ঞে—আপনাকে ডাকব কিনা ভাবছিলাম।

কেন—কি দরকার?

মাথা চুলকাইয়া অনাদি বলিল, আজ্ঞে আপিসে কি হচ্ছে না হচ্ছে—

বড়বাবু বলিলেন, তোমরা ত যা লিখবার লিখে দিয়েছ।

আজ্ঞে তাই ত বলছি। সায়েবরা—

ওরা খুব চটে গেছে। আর চটবে না-ই বা কেন! তোমার বাড়ির চাকরেরা যদি বলে, হুজুর মাইনে বাড়িয়ে দিন তো দিন নইলে দেখাব মজা। তুমি তাদের সন্দেশ খেতে দেবে?

অনাদি করুণ কণ্ঠে বলিল, আপনিই বলুন না সার—এত কম মাইনেয় ছেলেপুলে নিয়ে সংসার চলে?

না চলে যদি ত চাকরি নিয়েছিলে কেন? চাকরিই যদি নিলে ওদের চোখ রাঙাচ্ছ কোন্ সাহসে?

আপনারা তো—

যাও—যাও। বড়বাবু ধমক দিলেন। আমরা বলেছিলাম—বাইরের ইউনিয়নে যোগ দাও। একটু থামিয়া বলিলেন, প্রজার পাপে রাজা নষ্ট। আজ বিলেত থেকে কি খবর এসেছে জান? হয় ওরা দাবি প্রত্যাহার করুক—নয় আপিস তুলে দাও। আপিস উঠলে করো ধর্মঘট। খেয়ো চামটে হাতে।

বড়বাবু ক্রোধের বশে কাঁপিতে কাঁপিতে গড়গড়ায় টান দিলেন। কলিকার আগুন বহুক্ষণ নিভিয়া গিয়াছিল। সে টানে কতকগুলি ছাই উড়িয়া পড়িল শুধু।

ওড়া ছাইয়ের মত অত্যন্ত হালকা দেহে অনাদি বাড়ি ফিরিয়া আসিল। পৃথিবী পুনরায় প্রবল বেগে ঘুরিতে আরম্ভ করিয়াছে।

১২

শনিবার। আপিসে সাজ সাজ রব পড়িয়াছে। এই মাত্র ইউনিয়ন মারফৎ লিখিত ধর্মঘট ঘোষণা করা হইয়াছে। আসল দাবির এক চুলও এদিক-ওদিক হইলে কর্মীরা কাজ করিবে না।

ইউনিয়নের নির্দেশে আজ বেলা দুইটার পর সমস্ত আপিসের কর্মীরা মিলিয়া বিরাট একটি মিছিল বাহির করিবে। একজন বিখ্যাত শ্রমিক নেতা মিছিল পরিচালনা করিবেন।

আজ খাতায় দুর্গা বা কালী নাম লেখা হয় নাই, লেজারের পাতায় কেহ মনোনিবেশ করে নাই। ধর্মঘট ঘোষণা করা হইয়াছে—কার্য্যকরী হইবে এক মাস পরে। কিন্তু ঘোষণার মুহূর্ত্ত হইতে কাজের সঙ্গে সকলেই বুঝি অসহযোগ করিয়া বসিল। অনাদির বুকটা বারকয়েক কাঁপিয়া উত্তেজনায় প্রথম ধাপটা অতিক্রম করিয়াছে। এখন সে উত্তেজনা মাথায় উঠিয়া স্নায়ুতে—মজ্জাতে—রক্তে ক্রমশঃ ছড়াইয়া পড়িয়াছে। আনন্দ নয়—বেদনাও নয়—সন্দেহ বা ভবিষ্যৎ-চিন্তা কিছুই নয়—এ এক তৃতীয় অবস্থা। ভাবিবার সময় উত্তীর্ণ হইয়া এখন ঢেউয়ের টানে ভাসিয়া চলার আবেগ সঞ্চারিত হইতেছে। সে তো আর একা নয় আর একটিমাত্র আপিসেই এই ব্যাপার ঘটে নাই।

বেলা বারটায় বড়বাবুর মারফৎ সার্কুলার জারি হইল—সমস্ত কর্ম্মচারীকে অনুরোধ করা যাইতেছে, তাঁহারা যেন আজ বেলা পাঁচটা পর্য্যন্ত আপিসে হাজির থাকেন। বিলাত হইতে জরুরি কাজ আসিয়াছে—আজই সেটা শেষ করা চাই। অবশ্য এই উপরি থাকার জন্য উপরি মাহিনার ব্যবস্থাও হইবে।

হরিপদ এবং আরও অনেকে সার্কুলার সহি করিল না।

হরিপদ ক্রুদ্ধ কণ্ঠে বলিল, এ শুধু ভাঁওতা! আমরা যাতে মিছিলে যোগ দিতে না পারি তার জন্য এই কৌশল!

ছুটির কয়েকখানা দরখাস্ত পড়িল এবং সঙ্গে সঙ্গে নামঞ্জুর হইয়া ফেরত আসিল।

ভূষণ বলিল, কি করা যাবে হরিপদ ?

কি আবার করব—ছুটো বাজলেই খাতাপত্তর গুটিয়ে নব। খবরদার কেউ আপিসে থাকবে না।

রাজপথে বিরাট মিছিল চলিয়াছে। ভুখা মিছিল। নানা জাতির নানা বয়সের লোক। নানা বর্ণের পতাকা ও স্লোগানে ভরা পোস্টার আন্দোলন করিয়া চীৎকার করিতেছে অপরিমিত। যত অভাব যত দুশ্চিন্তা অভাবের প্রতিকার প্রার্থনা—সঞ্চিত ক্ষোভ ও বিদ্বেষের জ্বালা সমস্তই চীৎকারে ভরিয়া দিক্‌-বিদিকে ছড়াইয়া দিতেছে—এই ভুখা মিছিল।

আপিসের দুয়ারে মিছিল আসিতেই কেহ আর বাধা মানিল না—পথে বাহির হইয়া পড়িল।

অনাদি দুয়ারে দাঁড়াইয়া ভাবিতেছে কি করিবে। পিছন হইতে বড়বাবু ডাকিলেন, অনাদি।

অনাদি পিছনে চাহিল।

ফিরে এস। মিছিলে যোগ দিলে চাকরি থাকবে না।

অনাদি দাঁড়াইল।

হরিপদ পিছন হইতে তাহাকে ধাক্কা দিয়া কহিল, দাঁড়ালে যে ?

বড়বাবু বলিলেন, পাগলামি কর না তোমরা, চাকরি বজায় রাখতে চাও ত পথে পা দিও না।

হরিপদ কোন কথা না বলিয়া ব্যঙ্গের হাসি হাসিয়া অনাদিকে পাশ কাটাইয়া চলিয়া গেল।

তথাপি পথে পা দিতে অনাদির সাহস হইল না। ওদের পায়ের শব্দে ও চীৎকারে রৌদ্র-প্রখর মধ্যাহ্ন কাঁপিয়া কাঁপিয়া উঠিতেছে। সেই সঙ্গে কাঁপিতেছে অনাদির বান্ধব-ভীরু মন।

দুয়ার হইতে সরিয়া সে ঘরের মধ্যে আসিল। প্রকাণ্ড ঘর শূন্যতায় খাঁ খাঁ করিতেছে—জনপ্রাণী কেহ নাই। বুকের মধ্যে দুরুদুরু কম্পন বাড়িয়া উঠিল। এই বিরাট শূন্যতার মুখোমুখি দাঁড়াইয়া নিজেকে অত্যন্ত অসহায় মনে হইল তার। যে ভয় তাহাকে আপিসের ঘরে এতক্ষণ আটকাইয়া রাখিয়াছিল সেই ভয়ই তাহাকে মিছিলের দিকে টানিতে লাগিল।

ছুটিয়া সে ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল।

নবীনচন্দ্র

শ্রীশৈলেন্দ্রকৃষ্ণ লাহা

স্তব্ধ রণভূমি, শান্ত পলাশী-প্রান্তর,
বিশ্রান্ত গঙ্গার জলে ওঠে না কল্লোল,
যুগান্তে নীরব সেথা সব কণ্ঠস্বর,
থেমে গেছে, থেমে গেছে নবাবের ঢোল,
স্বাধীনতা-সূর্য্য সেথা হ'ল অস্তগত।
দেখিলে কি অন্ধকার-যবনিকা তুলে
রাজদণ্ড বণিকের হ'ল হস্তগত ?
সেই আম্রবনে বসি' সেই গঙ্গাকূলে
বঙ্গলক্ষ্মী কাঁদে আজো। আঁকিলে সে ছবি
হৃদয়ের রক্ত দিয়ে পলাশীর কবি !

১

মেঘমন্দ্র-সুগম্ভীর শ্রীমধু'র বীণ।
অমিত্র-উপাসক তোমরা দু'জন
দীপকে বরিলে সুর হেম ও নবীন।
দেশের আহত আত্মা করে কি ক্রন্দন ?
কাব্য না এ হৃদয়ের গৈরিক-নিঃস্রাব,—
যে হারালো স্বাধীনতা সে হারালো সব।
বল কবি পূর্ণ হবে কবে সে অভাব ?
শতবর্ষ পরে করি তব জন্মোৎসব।
জীবন ও মরণের এ যে সন্ধিক্ষণ,
এ সন্ধ্যার করি তাই তোমারে স্মরণ।

হে স্রষ্টা, দেখিলে তুমি কেটে গেল ঘোর :
বাজালে নূতন তন্ত্রী কি আশ্বাস লভি'
মহা-ভারতের স্বপ্নে ব্যাকুল বিভোর
রৈবতক কুরুক্ষেত্র প্রভাসের কবি !
রচিলে কি ভারতের নব ভবিষ্যৎ ?
ড্রামের বর্ব্বর আর পশে না শ্রবণে।
কোন্ পথে ছোটে পার্থ-সারথির রথ ?
পাঞ্চজন্য বাজে ওই গভীর নিঃস্বনে।
দেশবাসীশ্রদ্ধা অর্ঘ্য আজি আনিলাম,
হে বীর গ্রহণ কর, হে কবি প্রণাম !

৪

নবভাবমত্ত ঋষি' ভারতের বনে
সুধার সকরে পাত্র ভরিলে অমর।
উদ্বোধিনী বাণী কাব্য জাতির জীবনে,
কবিতা অমৃত আর কবিরা অমর।
যুগে যুগে থাকে লোক যার প্রতীক্ষায়,
তুমি কি শুনেছ কবি, তার আগমনী ?
সে কবে আসিবে বল, দিন চলে যায়,
তারা দিন গণে আর আমি দিন গণি।
অতীত মহিমা হবে ভবিষ্যতে লীন,
তুমি রবে, হে নবীন, চির-নবীন।

[নবীনচন্দ্রের শতবার্ষিক জন্মোৎসব উপলক্ষে
সেনেট হলে পঠিত]

সঙ্গীতমকরন্দ ও শিক্ষাকার নারদ

স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ

নারদ দেবর্ষি, মুনি, মন্ত্রদ্রষ্টা ঋগ্বেদের ঋষি ও গন্ধর্ব এতগুলি নামে পরিচিত। ঋগ্বেদ, রামায়ণ, মহাভারত, হরিবংশ, আঠার পুরাণ ও ভাগবত প্রভৃতিতে নারদকে আমরা 'মহাতেজা', 'মুনি' 'গন্ধর্ব' বা বীণাবহনকারী ঋষি ব'লেই উল্লিখিত দেখেছি। বিশেষ করে পুরাণগুলিতে নারদের চরিত্র আরও বিচিত্র। ঋগ্বেদের ৮ম মণ্ডলের ১১ সূক্তে দেখা যায়, ইন্দ্র দেবতা, আর কণ্বগোত্রীয় ঋষি নারদ সেখানে ইন্দ্রের স্তব ক'রে ৩৩টি মন্ত্র রচনা করেছেন। আজকাল অনেক পণ্ডিতের অভিমত যে, ঋগ্বেদের ঐ নারদকেই পরে রামায়ণ, মহাভারত আর পুরাণগুলির অন্তর্ভুক্ত করে নেওয়া হয়েছে। আর একথা মিথ্যাও নয়। অনেকের মতে আবার নারদ নিছক এক জন 'Mythical person'। তবে মতভেদ বা অভিমত যা-ই হোক না কেন, রামায়ণে দেখা যায়: "নারদ পর্বতশ্চৈব গৌতমশ্চ মহাযশাঃ"১, "নারদশ্চ মহাতেজা"২, ইত্যাদি ব'লে নারদের প্রশংসাও করা হয়েছে। নারদ সেখানে ঋষিই। রামায়ণের অযোধ্যাকাণ্ডে (৪৬ শ্লো°) নারদকে আবার "গন্ধর্বরাজ" বলা হয়েছে। যেমন ভরতের আগে আগে গায়ক, বাদক ও অপ্সরারা যাচ্ছেন আর তাঁদের ভেতর প্রধান ছিলেন নারদ ও তুম্বুরু: "নারদস্তুম্বুরুর্গোপঃ * *। এতে গন্ধর্বরাজানো ভরতস্যাগ্রতো জগুঃ॥"৩ মহাভারতের আদিপর্বে (৬৫ শ্লো°) দেখা যায়, কশ্যপের পত্নী মুনির গর্ভে নারদ জন্মগ্রহণ করেছেন; ও তাঁর ভাগিনেয়ের নাম 'পর্বত'। মহাভারতের অনুশাসনপর্বে নারদ (৪ শ্লো°) আবার বিশ্বামিত্রের পুত্র। কিন্তু মার্কণ্ডেয়পুরাণে নারদকে একেবারে গন্ধর্বপঙ্‌ক্তিরই অন্তর্ভুক্ত করে নেওয়া হয়েছে; যেমন,

"ততো হাহাহুহুশ্চৈব নারদস্তুম্বুরুস্তথা।
উপগায়িতুমারব্ধা গান্ধর্বকুশলা রবিম্।
ষড়্‌জমধ্যমগান্ধারগ্রামত্রয়বিশারদাঃ।"

হাহা, হুহু, তুম্বুরু এঁরা গন্ধর্বদের ভেতর প্রধান। নারদকেও সে প্রধানদের অন্যতম ব'লে বর্ণনা করা হয়েছে। ভাগবতের ৬ স্কন্ধে (১৫ শ্লো°) নারদ যে পূর্বজন্মে উপবর্হন নামে এক জন গন্ধর্ব ছিলেন তাও বলা হয়েছে। মার্কণ্ডেয়পুরাণে পরিষ্কারই স্বীকার করা হয়েছে যে, তুম্বুরু প্রভৃতির মতন নারদও গান্ধর্ব সঙ্গীতে বিচক্ষণ ও তিন গ্রামে বিশারদ ছিলেন। বৃহন্নারদীয়-পুরাণে "নারদেন গীতং" কথা দু-বার বলা হয়েছে, কিন্তু "গীতং" মানে সেখানে "কথিতং"—সঙ্গীত নয়। বায়ুপুরাণে নারদকে ষোলজন মৌনেয় গন্ধর্বদের ভেতর অন্যতম বলা হয়েছে। নারদ ও পর্বতকে সেখানে আবার মহর্ষি কশ্যপের পুত্র আখ্যাও দেওয়া হয়েছে। মহাভারতে পর্বত ছিলেন নারদের ভাগিনেয়। ভাগবতে নারদ হলেন বিষ্ণুর তৃতীয় অবতার। বৈষ্ণবদের প্রামাণিক গ্রন্থ নারদপঞ্চরাত্রের রচয়িতা আবার 'ঋষি' নারদ।৪ নারদপঞ্চরাত্র একখানি শ্রেষ্ঠ বৈষ্ণবতন্ত্র। তাতে শুকদেবের প্রশ্নের উত্তর দিতে গিয়ে বেদব্যাস 'ভগবান' ও 'যোগীন্দ্র' নারদকে আবার নিজের আচার্য ব'লেই স্বীকার করেছেন,৫ এবং নারদ যে জীবন্মুক্তদের এক জন এ কথাও পঞ্চরাত্রকার সেখানে স্বীকার করতে কুণ্ঠাবোধ করেন নি। বেদব্যাস শ্রীকৃষ্ণ, নারদ ও শম্ভুকে প্রণাম ক'রে 'মুনি' নারদকে মহাদেবের শিষ্য৬ এবং ব্রহ্মার পুত্র৭ ব'লেও আবার সম্বোধন করেছেন। অহির্বুধ্ন্যসংহিতায় নারদ শিব, দুর্বাসা ও ভরদ্বাজ মুনি সকলে একত্র হয়েছেন দেখা যায়। নারদ সেখানে সকলেরই প্রশংসার পাত্র, কেননা অসুর কালনেমির সঙ্গে বিষ্ণুর যুদ্ধ হবার সময়ে বিষ্ণুর সুদর্শনচক্রের শক্তি তিনি প্রত্যক্ষ করেছিলেন।

সংস্কৃত সাহিত্য ও সঙ্গীতশাস্ত্রে কোথাও কোথাও নারদ 'গন্ধর্ব' ব'লে পরিচিত হলেও বেশীর ভাগ জায়গায় কিন্তু 'মুনি' নামেই তিনি উল্লিখিত হয়েছেন; যেমন, "নারদো মুনিরব্রবীৎ।"৮ কিন্তু এ সকল ইতিহাস ও উপাখ্যানের কথা নিয়ে আলোচনার করবার স্থান ঠিক এ প্রবন্ধ নয়। এখানে আমাদের উদ্দেশ্য হ'ল সঙ্গীতশাস্ত্রের ভেতর 'মকরন্দ' গ্রন্থ যিনি রচনা করেছেন আর বেদের শিক্ষাসমুচ্চয়ের ভেতর 'নারদীশিক্ষা' যিনি প্রণয়ন করেছেন তাঁরা দু-জন ঠিক একই লোক বা ভিন্ন লোক কি-না তা আলোচনা ক'রে দেখা। আর সেজন্যে নারদ আসলে আবার 'historical person'-ই কি-না সে সবও মীমাংসা করবার দায়িত্ব এখানে নেবার আমাদের কোন প্রয়োজন নেই। তবে এটাও ঠিক যে, 'মকরন্দ'-কার ও 'শিক্ষা'-কার নারদ এই দু-জন নারদের 'historical oxistonce' অবশ্যই ছিল।

সঙ্গীতমকরন্দের৯ সুযোগ্য সম্পাদক শ্রদ্ধেয় মঙ্গেশ রামকৃষ্ণ তেলাঙ্গ মহাশয় শিক্ষাকার ও মকরন্দকার নারদ এক অথবা দুই কি-না এ নিয়ে আলোচনা করবার চেষ্টা করেছেন। তিনি স্বীকার করেছেন: "It is difficult to say anything with cortainty about Narada's lifo and timo." শিক্ষাকার নারদের কথাও তিনি তুলেছেন। সঙ্গীত-মকরন্দ

১। রামায়ণ, উত্তরকাণ্ড ২০ সর্গ ৫ শ্লো°

২। ঐ ঐ ২৭ শ্লো°

৩। মার্কণ্ডেয়পুরাণ, ১০৬ তম অধ্যায়। ভরতের নাট্যশাস্ত্রেও নারদকে "গন্ধর্ব" বলে বর্ণনা করা হয়েছে; যেমন "নারদাদ্যাশ্চ গন্ধর্বা"—নাট্যশাস্ত্র ১।৫১

৪। নারদপঞ্চরাত্র, ১ম রাত্র ১ম অ° ৫৮–৫৯ শ্লো°

৫। ঐ ঐ ১।৩১ শ্লো°

৬। ঐ ঐ ১।৪২ ,,

৭। ঐ ঐ ১।১০

৮। এটি মতঙ্গ প্রণীত বৃহদ্দেশীর শ্লোক। বৃহদ্দেশীকার মতঙ্গ ছাড়াও ভরত, দত্তিল, পার্শ্বদেব, শার্ঙ্গদেব, অহোবল ও দামোদর এঁরা সকলেই নারদকে 'মুনি' ও 'মহামুনি' ব'লেই উল্লেখ ক'রে গেছেন।

৯। গাইকোয়াড় ওরিয়েন্টাল সিরিজে প্রকাশিত।

গ্রন্থটি আবার বেদ ব'লে এক জন পণ্ডিতের রচনা১০ এ ধরণের মতও প্রচলিত আছে, কিন্তু শ্রদ্ধেয় তেলাঙ মহাশয় বেদকে মকরন্দের রচয়িতা ব'লে স্বীকার করেন নি। তা ছাড়া ছাড়গ্রন্থ-কর্ত্তা ব'লে প্রচলিত নারদ এক জন কি দু-জন এ সম্বন্ধেও সুনির্দ্দিষ্ট সিদ্ধান্ত ঠিক তিনি করতে পারেন নি। তবে এইমাত্র তিনি বলেছেন যে, মকরন্দ শার্ঙ্গদেবের রচিত রত্নাকরের অনেক আগেকার বই; কেননা রত্নাকরের অনেক জায়গায়ই মকরন্দ থেকে শ্লোক প্রমাণ রূপে তুলে দেখান হয়েছে।

শ্রদ্ধেয় তেলাঙ মহাশয়ের যুক্তি হ'ল এই যে, সঙ্গীতরত্নাকরে বার বার "নারদো মুনিঃ", "নারদোঽব্রবীৎ" প্রভৃতি কথাগুলি পাওয়া যায়। শুধু তাই নয়, গান্ধারগ্রামের উল্লেখ মকরন্দে আছে এবং শার্ঙ্গদেব যখন ঐ গান্ধারগ্রামের কথা আলোচনা করেছেন তখন পরিষ্কারই তিনি স্বীকার করেছেন: "গান্ধার-গ্রামমাচষ্টে তথা তং নারদো মুনিঃ।" শ্রদ্ধেয় তেলাঙ মহাশয় সুস্পষ্টভাবেই তাই বলেছেন, রত্নাকরকার শার্ঙ্গদেব মকরন্দ থেকে গান্ধারগ্রামের শ্রুতিসংস্থান ও নামের তালিকা হুবহু নকল করেছেন, আর এর প্রমাণপঞ্জীও তিনি উক্ত গ্রন্থ থেকে তুলে দেখিয়েছেন।১১ কাজেই রত্নাকরে "তথা তং নারদো মুনিঃ" কথাগুলিতে মকরন্দকার নারদকেই শার্ঙ্গদেব লক্ষ্য করেছেন এ কথাই বলতে হবে। তারপর ডাঃ রাঘবনের অভিমত হ'ল: 'Scholars opine that Narada referred to as holding the *Gandhaargram,* is the author of the *Sangitamakaranda* which has that *Grama*."১২

কিন্তু দেখা যায়, শার্ঙ্গদেব তাঁর রত্নাকরে যে গান্ধারগ্রাম সম্বন্ধে বলেছেন তার বর্ণনা মকরন্দের সঙ্গেই মেলে, নারদী-শিক্ষার সঙ্গে নয়। নারদীতে গান্ধারগ্রামের কোন শ্রুতির বিভাগ করা হয়নি, শ্রুতির ভাগ করা হয়েছে একমাত্র সাম-স্বরেরই। তারপর সামস্বরের পাঁচ শ্রুতিকে অবলম্বন ক'রেই প্রথমে মকরন্দকার বাইশ শ্রুতির বিভাগ ও নামকরণ করেছেন, যেমন দিপ্তা, প্রভাবতী, কান্তা ইত্যাদি। রত্নাকরকারও ঠিক তারপর সেই পদ্ধতিই অনুসরণ করেছেন শ্রুতিভাগের বেলায়, তবে নামকরণের কিছু পার্থক্য করেছেন এইমাত্র। এখন লক্ষ্য করবার বিষয় যে, মকরন্দ যে শ্রুতিভাগ করেছেন লৌকিক স্বরের "যথা ধনিশ্রুতি ষড়্‌জে মধ্যমে তু চতুঃশ্রুতিঃ" ইত্যাদি ব'লে, তার সঙ্গে রত্নাকরেরই ঠিক মিল পাওয়া যায়।

শুধু তাই নয়, গান্ধারগ্রামের সাতটি মূর্চ্ছনাকে লক্ষ্য ক'রে দেখলে দেখা যায়, শার্ঙ্গদেব মকরন্দকারকেই যেন অনুসরণ করেছেন; কেননা ষড়্‌জগ্রামের মূর্চ্ছনাগুলির বর্ণনারীতি সব ভিন্ন ভিন্ন। নারদীকার স্বরগুলিকে আবার আরোহণ-ক্রমে বর্ণনা করেছেন আর নাট্যশাস্ত্রকার ভরত করেছেন অবরোহণ-গতিতে। বৃহদ্দেশী, মকরন্দ, রত্নাকর ও এমন কি ভরতের সমসাময়িক দত্তিলও অবরোহণ-ক্রমে ঐ ষড়্‌জগ্রামের মূর্চ্ছনা সাতটির নামোল্লেখ করেছেন। গান্ধারগ্রামের কথা দত্তিল, ভরত, মতঙ্গ ও শার্ঙ্গদেব এঁরা কেউই বিশেষ কিছু বলেন নি। নাট্যশাস্ত্রে ভরত "অথ দ্বৌ গ্রামৌ" কথা স্পষ্ট ক'রে বলেছেন মাত্র। দত্তিল১৩ ও তারপর মতঙ্গ বরং গান্ধারগ্রাম যে পৃথিবীলোকে লোপ পেয়েছে, স্বর্গেই একমাত্র প্রচলিত এ কথাই বলেছেন। মোটকথা মকরন্দে ও রত্নাকরে গান্ধারগ্রামের মূর্চ্ছনা লক্ষ্য করলে দেখা যায়, রত্নাকর পুরোপুরি মকরন্দকেই অনুসরণ করেছেন। যেমন,

১০। ডাঃ ভি. রাঘবন তাঁর পাণ্ডিত্যপূর্ণ *Later Sangita Literature* প্রবন্ধে এ সম্বন্ধে আলোচনা করেছেন। ডাঃ রাঘবন উল্লেখ করেছেন—তাঞ্জোর লাইব্রেরির ক্যাটালগে ও বিকানীর ক্যাটালগে 'বেদ' প্রণীত একখানি মকরন্দের সন্ধান পাওয়া যায়। সেখানে পরিষ্কারই নাকি দেওয়া আছে: "ইতি শ্রীসঙ্গীত মকরন্দে বেদকৃতৌ নৃত্যাধ্যায়ঃ সমাপ্তঃ"—*Vide* Tanjore Burnell Cat., p. 60 (a), Bek. Cat., p. 520. No. iii এবং S. R. Bhandarkar's Cat. of MS in Rajputana and Central India (1904-5 to 1905-6), p. 51.

এখানে আরও একটি উল্লেখ করবার বিষয় যে, ঐ ক্যাটালগ অফ্‌ ম্যানুস্ক্রিপ্টেই আবার আছে: "স জয়তি মকরন্দ * * শ্রীশাহস্য প্রবীণস্য নৃপে বেদেন নির্মিতঃ।" কিন্তু বরোদা থেকে প্রকাশিত সংস্করণে আছে: "ভগবন্নারদো মুনিরব্রবীৎ" এবং "ইতি শ্রীনারদকৃতৌ সঙ্গীতমকরন্দে * *।" শ্রদ্ধেয় এম. কৃষ্ণমচারিয়ার মহাশয়ও তাঁর *History of Classical Sanskrit Literature* পুস্তকের ৮৩১ পৃষ্ঠায় এই সমস্যা নিয়ে আলোচনা করেছেন। তিনি মকরন্দের সময় নির্দ্দিষ্ট করেছেন 11th Century A. D. এবং বেদ প্রণীত মকরন্দের সময় দিয়েছেন "early in 17th Century A. D." শ্রদ্ধেয় তেলাঙ মহাশয়ও মকরন্দের সময় নির্ণয় করেছেন "Between 7th to 11th Century A. D." অধ্যাপক কৃষ্ণমাচারিয়ার বেদকে মহারাষ্ট্রপতি শিবাজীর পুত্র শ্রীসাহাজীর সভাকবি ব'লে উল্লেখ করেছেন। শ্রীসাহাজী মহারাষ্ট্র-সমাজে 'মকরন্দভূপ' নামে সুপরিচিত ছিলেন। তিনি বলেন এই উপাধি থেকে "সঙ্গীত-মকরন্দ" নাম হওয়া কিছু বিচিত্র নয়। কেননা বেদ হয়তো মহারাষ্ট্রপতি শ্রীসাহাজীর নামের সম্মান রাখ্‌বার জন্যেই তাঁর সঙ্গীতগ্রন্থের নামকরণ করেছিলেন 'মকরন্দ'।

১১। মকরন্দ ১।৪৪-৫৬ শ্লোকগুলির সঙ্গে রত্নাকরের "যথা দ্বিশ্রুতিঃ" ইত্যাদি শ্লোকগুলির সম্পূর্ণ মিল আছে।

১২। Vide *The Journal of the Music Academy* (1932), Vol. iii, Nos. 1 & 2, p. 16.

১৩। দত্তিল যে ভরতের সমসাময়িক সে কথা পরিষ্কারই বোঝা যায়; কেননা ভরত তাঁর নাট্যশাস্ত্রের ১।২৬ শ্লোকে কোহল ও দত্তিলের নামই করেছেন: "শাণ্ডিল্যং চাপি বাৎস্যং চ কোহলং দত্তিলং তথা।" দত্তিলের নাম ভরত 'দত্তিল' ব'লেই উল্লেখ করেছেন। তবে দত্তিল বা দন্তিল ভরতের চেয়ে বয়সে অনেক বড় ছিলেন।

(১) মকরন্দে—

"সংরা বিশালা সুমুখী চিত্রা চিত্রাবতী শুভা।[১৪]

আলাপা চেতি গান্ধারগ্রামে স্যুঃ সপ্তমূর্ছনাঃ।"

(৩) রত্নাকরে—

"নন্দা বিশালা সুমুখী চিত্রা চিত্রাবতী সুখা।

আলাপা চেতি গান্ধারগ্রামে স্যুঃ সপ্তমূর্ছনাঃ।"

এ ছাড়া মকরন্দের সঙ্গে রত্নাকরের পাঠের মিল অনেক জায়গায়ই পাওয়া যায়। যেমন মকরন্দকার উল্লেখ করেছেন 'সামবেদাদিদং গীতং জগ্রাহ পিতামহঃ * * হি সাধনম্" (১।১৮ ২৪), রত্নাকরেও ঠিক তাই পাওয়া যায়; কেবল পার্থক্য হ'ল, মকরন্দকারের 'জগ্রাহ'-এর বেলায় শার্ঙ্গদেব ব'লেছেন 'সংজগ্রাহ'। শুধু তাই নয়, রত্নাকরের পদার্থসংগ্রহ-রূপ প্রথম অধ্যায়ের ২৫-৩০ পর্যন্ত শ্লোকগুলিও ঠিক মকরন্দেরই অনুরূপ। তারপর নারদীশিক্ষা, দত্তিল, নাট্যশাস্ত্র, বৃহদ্দেশী, মকরন্দ ও রত্নাকর এসব গ্রন্থের তুলনামূলক আলোচনা করলে দেখা যায়, ১৮ জাতি সম্বন্ধে দত্তিল ও ভরত যা বলেছেন, নারদী ও মকরন্দের সঙ্গে তার মিল থাকলেও নারদীতে অন্তত যে-সব বিষয় নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে, শার্ঙ্গদেব যদি হুবহু সেগুলিকেই অনুসরণ করতেন তা হলে প্রথমেই তিনি রত্নাকরের অবতরণিকায় বৃহদ্দেশী বা মকরন্দের অনুযায়ী আহত ও অনাহত নাদ, প্রাণবায়ুরূপী অগ্নি, বাদী সম্বাদী, বর্ণ ও রস এসবের কথা উল্লেখ করতেন না।[১৫] কাজেই এসব দিক থেকেও আমাদের অনুমান করা অসঙ্গত হবে না যে, শার্ঙ্গদেব তাঁর রত্নাকরে যেখানে নারদের কথা উল্লেখ করেছেন সেখানে প্রায়ই মকরন্দকারের কথাই বলতে চেয়েছেন।

এবার আমরা মকরন্দ থেকেই কিছু কিছু কথা তুলে দেখতে চেষ্টা করব যে, মকরন্দকার নারদ প্রকৃতপক্ষে শিক্ষাকার নারদই কি-না? যেমন মকরন্দকার বলেছেন (ক) "সঙ্গীতকো নারদ" (১।২)। প্রথমেই দেখা যায় মকরন্দকার "ব্রহ্মা তালধরো হরিশ্চ পটহী" ইত্যাদি ব'লে সঙ্গীতের কৌলিন্য ও প্রাচীনত্ব দেখাবার চেষ্টা করেছেন। তারপর "শম্ভোর্নৃত্যকরস্তু" ইত্যাদি পর্যায়ে "সঙ্গীতকো নারদঃ" কথাগুলি থাকায় এটাই বুঝতে হবে যে, এই নারদ আদি শিক্ষাকার নারদই হবেন। এই নারদকেই এমন কি নাট্যশাস্ত্রকার ভরত পর্যন্ত উল্লেখ করেছেন যেমন: "নারদাদ্যাশ্চ গন্ধর্বা নাট্যযোগে নিয়োজিতাঃ" (১।৫১), যদিও নারদ সেখানে মুনি বা ঋষির পরিবর্তে গন্ধর্ব ব'লেই পরিচিত। তা ছাড়া ভরতের সমসাময়িক নন্দিকেশ্বরও তাঁর 'অভিনয়দর্পণে' (১।১১) নারদের নাম উল্লেখ করেছেন, যেমন "জহার নারদাদীনাং।" মকরন্দকার এ রকম ক'রে ১।১৮ শ্লোকেও "তদ্গীতঃ নারদাদ্যৈব" ব'লে সেই আদি নারদের কথাই বলেছেন।

(খ) "নারদেন কৃতং" (১।৩)। এখানে নারদ বলতে মকরন্দকারকেই বুঝতে হবে। মকরন্দকার নিজের নাম এ রকম ক'রে অনেক জায়গায়ই উল্লেখ ক'রে গেছেন। গ্রন্থে রচয়িতার নিজের নাম উল্লেখ করার রীতি বরাবরই ছিল। নাট্যশাস্ত্রেও আমরা দেখি: "তং ভরতং নাট্যকোবিদম্" (১।২), "মুনীনাং ভরতো মুনিঃ" (১।৬)। সঙ্গীতরত্নাকরে শার্ঙ্গদেবও সেই রীতি অনুসরণ করেছেন; যেমন: "প্রচুর-তত্ত্ববিবেকঃ শার্ঙ্গদেবোঽয়মেকঃ" (১।১০), "নির্বধ্য শ্রীশার্ঙ্গদেব সারোদ্ধারমিমং ব্যধাৎ" (১।২১), প্রভৃতি।

(গ) "নারদাদিভিঃ" (১।১৮)। এই নারদ মকরন্দকার কি-না তা আলোচনা ক'রে দেখার বিষয়। মকরন্দের ১।১৭-১৮ শ্লোক চারটি আবার হুবহু দত্তিলের ১।৩০-৩১ শ্লোক চারটির অনুরূপ যদিও সামান্যই তাদের ভেতর পাঠভেদ দেখা যায়। সুতরাং তা থেকে সহজেই অনুমান করা যায় যে, মকরন্দকার দত্তিলকেই অনুসরণ করেছেন। অথবা নারদীর সঙ্গে মকরন্দের রচয়িতাকে যাঁরা একই লোক বলতে চান তাঁরা সিদ্ধান্ত করবেন, দত্তিলই প্রকৃতপক্ষে শ্লোক চারটি মকরন্দ থেকে ধার করেছেন। কিন্তু এ সিদ্ধান্তের সার্থকতা আমরা দেখি না; কেননা নারদীকার ও মকরন্দকার যদি ভিন্ন ভিন্ন লোক না হয়ে একই লোক হন তবে দুটি বইয়ের আলোচনা ও বিষয়বস্তুর ভেতর এত প্রভেদ থাকবে কেন? আমরা জানি যে, উর, কণ্ঠ ও শির এই তিন জায়গা হতে মন্দ্র, মধ্য ও তার (উচ্চ) স্বরের উৎপত্তি। উদাত্ত, অনুদাত্ত, স্বরিত বা আর্চিক, গাথিক, সামিক প্রভৃতি বৈদিক স্বর নিয়ে শিক্ষাকার নারদ যতটুকু ও যেভাবে আলোচনা করেছেন ততটুকু বোধ হয় আর কেউই করেন নি—একমাত্র অন্যান্য শিক্ষা-গ্রন্থ ছাড়া। তারপর নারদী যে ভাবে কেবল সাত স্বরেরই দেবতা, ঋষি, পিতৃ ও গন্ধর্বাদির অধিষ্ঠাতৃ দেবতাদের নামোল্লেখ করেছেন সে রকম এমন কি নাট্যশাস্ত্র, দত্তিল, বৃহদ্দেশী, মকরন্দ বা রত্নাকর প্রভৃতি কেউই ওই নিয়ে বেশী মাথা ঘামান নি। নারদীতে সামগানের নির্দেশ যথেষ্ট আছে। নারদীর তুলনায় অপরাপর শিক্ষা যেমন, যাজ্ঞবল্ক্য, গোতমী, লোমশী ও এমন কি অথর্ববেদীয় মাণ্ডুকীও তত বেশী আলোচনা করেন নি। নাট্য-শাস্ত্রের কথা তদ্রূপই। গানের কত রকমের গুণবৃত্তি?—এ নির্ণয় করতে গিয়ে নারদী বলেছেন—"দশবিধা"।[১৬] যাজ্ঞবল্ক্য বা অপরাপর শিক্ষায় এ সকলের আলোচনা নেই। নাট্যশাস্ত্রের কথাও তাই, তবে নাট্যশাস্ত্র, দত্তিল এঁরা মাগধী, অর্ধমাগধী, সম্ভাবিতা ও পৃথুলা ব'লে গীতিলক্ষণের নাম করেছেন।[১৭]

১৪। 'শুভা'-মূর্ছনার জায়গায় শার্ঙ্গদেব বলেছেন 'সুখা' এই যা প্রভেদ।

১৫। অবশ্য সাত স্বরের বর্ণ, জাতি, কুল সম্বন্ধে নারদী-শিক্ষাকারও আলোচনা করেছেন। তারপর রাগ ও রাগিণী-দের জাত ও নির্দিষ্ট নামের কোন উল্লেখ না থাকলেও নারদী 'রাগ' শব্দ এক জায়গায় ও তৎপরবর্তী ভরতও দু'জায়গায় 'রাগ' এই কথা উল্লেখ করেছেন।

১৬। "গানস্য তু দশবিধা গুণবৃত্তিস্তদ্যথা রক্তং পূর্ণমলঙ্কৃতং প্রসন্নং ব্যক্তং বিক্রুষ্টং শ্লক্ষ্ণং সমং সুকুমারং মধুরমিতি গুণাঃ।"—নারদী ১।৩।১

১৭। নাট্যশাস্ত্র ২৯।৭৬-৭৭ দ্র°

বৃহদ্দেশীকার মতঙ্গ ভরতকেই অনুসরণ করেছেন। কিন্তু আশ্চর্যের কথা, মকরন্দে এ সবের কিছুরই উল্লেখ নেই।

তারপর আরও একটি আসল বিষয় নিয়ে বিচার করা দরকার। সেটি হচ্ছে, রাগ ও রাগিণীদের ক্রমবিকাশ, নাম ও বিভাগ। নারদী 'রাগ' এই শব্দ এক বার দু-বার মাত্র উল্লেখ করলেও রাগ ও রাগিণী—এ রকম পুরুষ ও স্ত্রী ভেদে তাদের বর্ণনা, নাম বা প্রকৃতির বিচার মোটেই করেন নি। দত্তিল এবং নাট্যশাস্ত্রেও ভরত 'রাগ' এই শব্দ দু-জায়গায় উল্লেখ করেছেন। ভরতের আগে ও ভরতের পরবর্তী মতঙ্গ পর্যন্ত "জাতয়োষ্টাদশঃ" কথাই বলেছেন, আর তা থেকে জাতিসঙ্গীতের কথাই মাত্র বুঝা যায়। রামায়ণে পর্যন্ত জাতি-গানের উল্লেখ স্পষ্ট আছে। তবে এ কথা ঠিক যে, দত্তিল ও ভরত এঁরা 'জাতি' কি রকম ও কি কি রসে তাদের গাইতে হয় সে সম্বন্ধে উল্লেখ করেছেন। মকরন্দে তার উল্টো। মকরন্দকার রাগের কথা তো বলেছেনই, তা ছাড়া রাগের স্ত্রী, পুরুষ, নপুংসকত্ব নির্ণয়ও করেছেন। বৃহদ্দেশীতে রাগ সম্বন্ধে যতটুকু অস্পষ্টতা ছিল, মকরন্দে তা সুস্পষ্টভাবেই ফুটে উঠেছে একথাই বলা যায়। কাজেই এ থেকে সিদ্ধান্ত করা অসমীচীন হবে না যে, মকরন্দকার শুধুই নারদীকারেরই নয়, ভরত, বৃহদ্দেশীকার ও মতঙ্গেরও অনেক পরবর্তী।

(খ) "নারদতুম্বরুশ্চৈব" (১।৩৭)। এখানে আর একটি সমস্যা আমাদের সামনে এসে দাঁড়ায়। কেননা মকরন্দকার যে নারদের কথা এখানে উল্লেখ করেছেন তিনি মকরন্দকার নারদ মোটেই নন। নারদ ও তুম্বুরুর নাম প্রায় একসঙ্গেই সর্বত্র পাওয়া যায়। দত্তিল থেকে আরম্ভ ক'রে সকলেই তুম্বুরুর নামের সঙ্গে নারদের একসঙ্গেই উল্লেখ করেছেন। রামায়ণ, মহাভারত, হরিবংশ, পুরাণের সকলগুলিতেই তাই। কাজেই এই নারদ প্রবীণ নারদই হবেন। তবে এই নারদই নারদীকার নারদ কি-না সেকথা বলা দুরূহ।

এ ছাড়া মকরন্দে আরও এক জায়গায় (২।১৯) আছে: "চণ্ডী ব্যালশ্চ শার্দুলো নারদস্তুম্বুরুস্তথা।" মকরন্দকার ভরত ও নন্দীকেশ্বরের নামও উল্লেখ করেছেন। যেমন ১।৭৪ শ্লোকে তিনি "ভরতেন চ চর্চিতাঃ" বলেছেন,১৮ আর সঙ্গীতাধ্যায়ের দ্বিতীয় পাদের ১৮-২০ শ্লোকে মকরন্দকার স্পষ্টই আবার উল্লেখ করেছেন:

"হরির্ব্রহ্মা হরিশ্চৈব মতঙ্গঃ কশ্যপো মুনিঃ।
বিশ্বকর্মা হরিশ্চন্দ্রো ভরতঃ কমলাত্মকঃ।
চণ্ডী ব্যালশ্চ শার্দুলো নারদস্তুম্বুরুস্তথা।
বায়ুর্বিশাবসুঃ সৌমিত্রাঞ্জনেয়োঽঙ্গদস্তথা।
মধুপো ভৃঙ্গিবেতেন্দ্রঃ কুবেরঃ কুশিকো মুনিঃ।
মাতৃগুপ্তো১৯ রাবণশ্চ নন্দিকেশ্চ সরস্বতী।"

এখানে দেখা যাচ্ছে, মকরন্দকার সঙ্গীতের প্রধান প্রধান আচার্যদের নাম করতে গিয়ে মতঙ্গ, কশ্যপ, ভরত, ব্যাল, নারদ, তুম্বুরু এঁদের কথাও বাদ দেননি। মতঙ্গ নাট্যশাস্ত্রকার ভরতের পরবর্তী আচার্য। মতঙ্গ বৃহদ্দেশী রচনা করবার সময়ে স্বীকারই করেছেন যে, রাগের বিভাগ একমাত্র তিনিই প্রথমে করলেন। মকরন্দে রাগ ও রাগিণীদের মূর্তি পরিপুষ্ট, সুতরাং মকরন্দকার রাগ-রাগিণীদের বিভাগের রীতি যে মতঙ্গের কাছ থেকেই পেয়েছেন একথা সহজেই বোঝা যায়।

শুধু তাই নয়, আরও একটা কথা এই যে, নারদীকার ও মকরন্দকার যদি একই লোক হবেন তবে মকরন্দে তিনি ভরত, মতঙ্গ, বিশাবসু, তুম্বুরু বা মাতৃগুপ্ত এসব পরবর্তী গ্রন্থকারদের নামোল্লেখ করলেন কেন? এজন্য অধ্যাপক এম. কৃষ্ণমাচারিয়ারও স্পষ্টই বলেছেন: "Bharat follows the views of Narada in Samasvara that * *, Siksha is an ancient work entitled to priority over the extent *Natyasastra*" Fox Strangways সাহেবও নারদীশিক্ষাকে "undated" ব'লে তাকে প্রাচীনতার সম্মান দেখিয়েছেন।২০ সুতরাং নারদীশিক্ষা যদি নাট্যশাস্ত্রের চেয়ে প্রাচীন হয় এবং মকরন্দকার ভরত ও এমন কি ভরতের পরবর্তী গ্রন্থকার মতঙ্গের নাম আচার্যদের তালিকায় উল্লেখ ক'রে শ্রদ্ধা প্রদর্শন করেন তখন এ কথাই নিঃসংশয়ে বলা অসঙ্গত হবে না যে, মকরন্দকার নারদ শিক্ষাকার নারদের অনেক পরবর্তী লোক, আর সেজন্যেই "নারদস্তুম্বুরুস্তথা" ব'লে মকরন্দকার শিক্ষাকার নারদের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করেছেন।

কশ্যপের কথাও তাই। মকরন্দকার নারদ "কশ্যপো মুনিঃ" ব'লে আচার্য হিসাবে কশ্যপের নাম করেছেন তা আগেই বলেছি। মতঙ্গের বৃহদ্দেশীতে কিন্তু এই কশ্যপের নাম সাত বার করা হয়েছে। কশ্যপ নাট্য ও অলঙ্কার সম্বন্ধে বই লিখেছিলেন উল্লেখ পাওয়া যায়, কিন্তু তাঁর কোন বই এখনও ছাপা হয়েছে কি-না আমাদের জানা নেই। মোট কথা, বৃহদ্দেশীতে মতঙ্গ কশ্যপের নাম করেছেন, আর মতঙ্গ মকরন্দকারেরও আগেকার বা সমসাময়িক আচার্য, কেননা মকরন্দকার মতঙ্গের নাম নিজেই করেছেন; সুতরাং এ থেকেও সিদ্ধান্ত করা কঠিন হবে না যে, মকরন্দকার শিক্ষাকার নারদ মোটেই নন। আঞ্জনেয়ের কথা বিচার করলেও ঐ একই সিদ্ধান্ত করতে হবে।

(ঙ) "নারদস্য বচঃ শ্রুত্বা ব্রহ্মা লোকপিতামহঃ" (৩।৭)। এখানে দেখা যাচ্ছে "লোকপিতামহঃ ব্রহ্মা"—যিনি ভরতের নাট্যশাস্ত্রে 'দ্রুহিণো' ও 'ব্রহ্মা' নামে উল্লিখিত হয়েছেন তিনি নাট্যসঙ্গীতের আবিষ্কর্তা সে কথা ভরত ও তৎপরবর্তী গ্রন্থকারেরা যেমন শার্ঙ্গদেব, অহোবল প্রভৃতি একবাক্যে স্বীকার ক'রে গেছেন।২১ কাজেই পিতামহ ব্রহ্মা যদি নারদের বিষয় অবগত থাকেন ও সেই নারদ যদি মকরন্দকারই হন তা হলে মকরন্দকার নারদ অবশ্যই ব্রহ্মারই সমসাময়িক হবেন এ কথা

১৮। নন্দিকেশ্বরের নাম মকরন্দকার "নন্দিকেশ্বরকল্পিতম্" ব'লে নৃত্যাধ্যায়ের তৃতীয় পাদে দ্বিতীয় শ্লোকে উল্লেখ করেছেন।

১৯। এর শুদ্ধপাঠ 'মাতৃগুপ্ত'-ই হবে।

২০। M. Krishnamachariar: *History of Classical Sanskrit Literature.*

২১। "সামবেদাদিদং গীতং সংজগ্রাহ পিতামহঃ।"—রত্নাকর ১।২৫

মেনে নিতে হবে। কিন্তু তা মোটেই সমীচীন নয়। কেননা ভরত নিজেও ব্রহ্মার কথা উল্লেখ করেছেন, আর মকরন্দকার তাঁর বইয়ে তিন বার অন্তত ভরতের নাম নজির ব'লে তুলেছেন। কাজেই এটাই সিদ্ধান্ত করতে হবে যে, "নারদস্ত বচঃ শ্রুত্বা" কথাগুলির ভেতর এই নারদ অবশ্যই আদি নারদই হবেন, তা তিনি শিক্ষাকারই হন বা অন্ত কোন প্রাচীন নারদই হন; মোটকথা মকরন্দকার নারদ তিনি মোটেই নন। তারপর একথাও ঠিক যে, নারদ একজনই ছিলেন না, নারদ নাম নিয়ে বহু মনীষীই আবির্ভূত হয়েছিলেন। কাজেই নারদ নামের যে-কোন বই দেখলেই যে সেই সনাতন এক জন নারদই সবার গ্রন্থকর্তা হবেন এ সিদ্ধান্তের কোন অর্থ নেই।

তারপর আরও কয়েকটি বিষয় আলোচনা ক'রে দেখলে দেখা যায়, মকরন্দকার অন্তত শিক্ষাকার নারদ মোটেই নন। তাঁর একটি হ'ল এই যে, মকরন্দকার 'সঙ্গীত কাকে বলে?' বলতে গিয়ে দু'জায়গায় বলেছেন: "গীতং বাদ্যং চ নৃত্যং চ ত্রয় সঙ্গীতমুচ্যতে"; অর্থাৎ গীত, বাদ্য ও নৃত্যের সমবেত রূপই হ'ল 'সঙ্গীত'। কিন্তু এ ধরণের নারদী, দত্তিল, নাট্যশাস্ত্র, বৃহদ্দেশী কেউই 'সঙ্গীত' বলে গীতিকলার পরিচয় দেন নি। এঁরা সকলেই ব্যবহার করেছেন 'গীতি' 'গান' ও 'গন্ধর্ব' ব'লে। তবে নাট্যশাস্ত্রে অবশ্য গীত, বাদ্য ও নাট্য এ তিনটির একসঙ্গে উল্লেখ আছে। মনে হয় 'সঙ্গীত' শব্দটির বীজ ও ধারণা পরবর্তী সঙ্গীত-গ্রন্থকারেরা ভরতের ঐ গীত, বাদ্য ও নাট্য কথাগুলির ভেতর থেকেই পেয়েছেন। তারপর সঙ্গীতের গ্রন্থ যতগুলি অন্তত আজকাল ছাপা পাওয়া যায় তাদের মধ্যে মকরন্দের ভেতরই সর্বপ্রথমে এই 'সঙ্গীত' শব্দটির ব্যবহার ও নৃত্য, গীত ও বাদ্যের সমবেত রূপ—এ ধরণের পরিচয় পাওয়া যায়। মকরন্দের পরে আর সমস্ত গ্রন্থই মকরন্দকে অনুসরণ করেছে। শার্ঙ্গদেব তো বটেই। সুতরাং বলা যায় 'সঙ্গীত' শব্দটি যার আমদানী হয়েছে নবম থেকে দ্বাদশ শতাব্দীর ভেতর অর্থাৎ মকরন্দকার নারদের সময়েই। নারদীকার, ভরত, মতঙ্গ এঁরা মকরন্দকারের চেয়ে অনেক প্রাচীন। এঁরা 'সঙ্গীত' শব্দটি মোটেই ব্যবহার করেন নি।

তারপর দ্বিতীয় বিষয় হ'ল, রত্নাকরের টীকাকার সিংহভূপাল তাঁর সুধাকরটীকায় "গ্রামমূর্ছনাক্রমতান" নামক অধ্যায়ে রত্নাকরের ৩১ শ্লোকের ভাবকে পরিস্ফুট করবার জন্যে নারদের একটি মত তুলেছেন। সেটি হ'ল এই,

"আর্চিকো গাথিকশ্চৈব সামিকশ্চ স্বরান্তরঃ।

* * *

সংপূর্ণঃ সপ্তভিশ্চৈব বিজ্ঞেয়ো গীতযোক্তৃভিঃ॥"

এখন সহজেই জিজ্ঞাসার বিষয় হইতে পারে যে, এই নারদ কে? কেননা সিংহভূপাল যখন নারদের কথা নজির ব'লে তুলেছেন তখন স্বীকার করতেই হবে—এ নারদ সঙ্গীত-জগতের একজন প্রামাণিক লোক। তারপর নারদের তৈরি ব'লে যতগুলি বইয়ের নাম[22] আমরা পাই তার ভেতর নারদী-শিক্ষায় (১।২।৩) শ্লোকগুলি এই,

"আর্চিকং গাথিকং চৈব সামিকং চ স্বরান্তরং।

কৃতান্তে স্বরশাস্ত্রাণাং প্রযোক্তব্যং বিশেষতঃ॥

একান্তরস্বরো হ্যৃক্ষু গাথাসু দ্ব্যন্তরঃ স্বরঃ।

সামসু ত্র্যন্তরং বিদ্যাদেতাবৎ স্বরতোন্তরম্॥"

এখানে তুলনা করলে দেখা যায়, টীকাকার সিংহভূপাল যে শ্লোকগুলির নজির তুলেছেন তাদের ভেতর প্রথম "আর্চিকং গাথিকং" লাইনটির মাত্র মিল আছে, বাকি কোথাও আর মিল পাওয়া যায় না। তারপর ঔড়ব, ষাড়ব বা সম্পূর্ণের কথাও নারদীশিক্ষাকার যে ভাবে বলেছেন সিংহভূপাল তেমনটি বলেন নি।

তিনি উল্লেখ করেছেন যে, বেদের শাখাভেদে স্বর-সংখ্যার সব পরিবর্তন হত।[23] কাজেই বলা যায়, সিংহভূপাল তাঁর প্রামাণিক শ্লোকগুলি ঠিক নারদীশিক্ষা হতে উদ্ধার করেন নি, করেছেন মকরন্দ থেকেই। কিন্তু মকরন্দেও আবার পাঠভেদ আছে। কেননা মকরন্দের সঙ্গীতাধ্যায়ের চতুর্থ পাদে যেখানে "গীতযোষা:"-র কথা বলা হয়েছে সেখানেই (৫৩-৫৫ শ্লোকে) গ্রন্থকার বলেছেন: "ষাড়বৌড়বসংপূর্ণরাগঃ স্যাত্রিবিধাস্তথা", কিন্তু আর্চিকাদির নামগন্ধও তিনি করেন নি। কাজেই এ থেকে অনুমান করা যেতে পারে যে, সিংহভূপাল নারদীকার ও মকরন্দকার থেকে ভিন্ন একজন নারদের কথা তুলে দেখিয়েছেন। অবশ্য সেই তৃতীয় নারদের কোন বই-ই আমরা এখনও পাই নি। তবে এটা অতি সম্ভব যে, নারদীর বা মকরন্দের পাঠে যথেষ্ট অদল-বদল হয়েছে এবং তা হওয়াও কিছু বিচিত্র নয়।[24] অথবা আরও অনুমান করা যায় যে, নারদের এখনও অপ্রকাশিত বই 'নারসংহিতা'রও ঐটি উদ্ধৃত-অংশ হতে পারে।

কিন্তু এটা ঠিক যে, উদ্ধৃতি বা প্রমাণ যে কোন বই থেকেই হোক না কেন, নারদ তাঁর নারদীতে আর্চিকাদি স্বরের কথা বলেছেন, কিন্তু মকরন্দ এসবের আলোচনা মোটেই করেন নি, করেছেন কেবল "ষাড়বৌড়বসংপূর্ণরাগঃ স্যাত্রিবিধাঃ" ঐ তিনটিরই উল্লেখ। এখন ধরেই যদি নেওয়া যায় যে, নারদীকার ও মকরন্দকার একই লোক তা হলে অনায়াসেই সংশয় উঠতে পারে যে, একই লোকের সিদ্ধান্তে ও প্রতিপাদ্য বিষয়ের এত বৈষম্য দেখা যায় কি ক'রে? কাজেই হয় বলতে হবে যে, নারদীশিক্ষা বইখানি রচনা করবার সময়ে দেশের সমাজ ও রুচি পদ্ধতি যে রকমের ছিল, মকরন্দ বই রচনার সময়ে দেশের রুচি ও অবস্থা অনেক পাল্টে গিয়েছিল। আর সেজন্যেই নারদ আর্চিকাদির কথা শিক্ষার যুগে আলো-

---

২২। (১) নারদী শিক্ষা, (২) রাগনিরূপণ, (৩) নারসংহিতা। এদের ভেতর, 'নারদীশিক্ষা' ও কিছুদিন আগে 'রাগনিরূপণ' ছাপা হয়েছে। কিন্তু 'রাগনিরূপণ' বইটি সম্বন্ধে যথেষ্ট আমাদের বলবার আছে, কেননা তার গোড়াকার বেশী অংশই রত্নাকর থেকে ধার নেওয়া হয়েছে ব'লে আমাদের বিশ্বাস। এ সম্বন্ধে পৃথকভাবে বৈশাখ সংখ্যা (১৩৫২) প্রবর্তক পত্রিকায় আমরা আলোচনা ক'রেছি।

২৩ নারদীশিক্ষা (কাশী সং), পৃ. ৩১৭-৩১৮ দ্র°

২৪ এর প্রমাণও আমরা যথেষ্ট পেয়েছি। কারণ মূল রত্নাকরে বা কল্লিনাথ ও সিংহভূপালের টীকায় মাঝে মাঝে যেখানে মকরন্দ থেকে বিষয়বস্তু তুলে দেখান হয়েছে সেখানে এটা সত্যি যে, মূল ও উদ্ধৃতির ভেতর যথেষ্টই পাঠভেদ আছে।

চনা করেছিলেন, কিন্তু মকরন্দের সময়ে তা করার কোন সার্থকতাই ছিল না। কিন্তু এসব যুক্তিও মোটেই সমীচীন নয়। কারণ নারদীতে বিষয়-বস্তু ও আলোচনার উল্লেখ-পদ্ধতির সঙ্গে মকরন্দকারের প্রকাশভঙ্গীর মোটেই মিল পাওয়া যায় না। সুতরাং এসব নানান দিক থেকে সংক্ষেপে বিচার ক'রে দেখলেও আমরা সিদ্ধান্ত করতে বাধ্য হব যে, নারদীশিক্ষাকার নারদ ও সঙ্গীতমকরন্দকার নারদ সম্পূর্ণ ভিন্ন দু-জন লোক, ভিন্ন ভিন্ন সময়ে এসে তাঁরা তাঁদের গ্রন্থ রচনা করেছিলেন।[২৫]

২৫। অবশ্য ডাঃ রাঘবনও এ সম্বন্ধে বিস্তৃত কোন আলোচনা না করলেও স্বীকার করেছেন: "We have at least two Naradas, one the author of the *Siksha* and the other, the author of the *Sangita-Makaranda*" —Vide *J. M. A*, Vol. III, p. 16

কৃপা

শ্রীবিমলাচরণ দেব

নীট্‌শে (Nietzsche, *Will to Power*, 1, § 368)-এ পড়লুম—

"Pity is a waste of feeling, a moral parasite which is injurious to the health; it cannot possibly be our duty to increase the evil in the world . . . Pity does not depend upon maxims, but upon emotions. The suffering we see infects us; pity is an infection."

মনে হ'ল, মানবিকতা তথা সামাজিকতার ভিত্তি একটা ঘা পেলে। কারণ উভয়েরই ভিত্তি সহানুভূতি বা সমানুভূতি—পরস্পরের আনন্দে আনন্দ বোধ; কেহ কষ্টে পড়িলে তাহাতে কষ্ট বোধ। এই কষ্ট বোধ "ধার করা কষ্ট" বা "প্রতিফলিত কষ্ট", ইহাকেই কৃপা, অনুকম্পা বলে। ইহাই ইংরেজী pity.

এই অনুভূতি যে সমাজের, একমাত্র না হউক, প্রধানতম বন্ধনীশক্তি, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। এই অনুভূতি যদি বাদ দেওয়া যায়, সমাজের সমাজত্ব থাকে না, সমাজ সমাজ হয়ে পড়ে।

কথাটা বোধ হয় ভুল নয়। কিন্তু নীট্‌শে তাঁর *Dawn of Day*, § *137*তে এই কৃপা সম্বন্ধে যা বলেছেন, তাও ভাববার জিনিস—

"Pity, taking as its principle of action, the injunction, 'suffer the misfortune of another as much as he himself,' would lead the point of view of the ego with all its exaggerations and deviations to become the point of view of the other person, the sympathiser: so that we should have to suffer at the same time from our own ego and the other's ego."

সংসারে এক জন কষ্ট বা অশান্তি ভোগ করছে। তা দেখে যে কৃপা ক'রলে, সেও সেই কষ্ট ও অশান্তি পেলে,—নেহাৎ ধার করা। সংসারে কষ্ট ও অশান্তি দ্বিগুণ হ'ল। কৃপাকারীর সংখ্যা যত বাড়বে, সেই অনুপাতে সংসারের মোট কষ্ট ও অশান্তি বাড়বে। সংসারে দুঃখ কষ্ট ত যথেষ্ট আছে, এ ভাবে বাড়িয়ে কি লাভ?

এই সমস্ত বিবেচনা করেই নীট্‌শে বলেছেন—

"Except by a few philosophers, pity has always been placed very low in the scale of moral feelings, and rightly so."—(*Human All Too Human,* I, § 103)

বড় হৃদয়হীনতার কথা ব'লে মনে হয়। কিন্তু বস্তুতান্ত্রিকতার দিক থেকে দেখলে, খুব ঠিক।

এই বস্তুতান্ত্রিকতার দিক থেকে কৃপার বিচার নীটশেই যে প্রথম করেছেন, তা নয়। এ সম্বন্ধে বিবেচন মহাভারত ১২, ১৬৩, ২০তে আছে—

"কৃপণান্ সত্ততং দৃষ্ট্বা ততঃ সঞ্জায়তে কৃপা"

"কৃপণ অর্থাৎ দুর্গত হওয়ার দরুণ যে লোক কৃপার পাত্র হয়ে পড়েছে, তাকে দেখলে "কৃপা"র উদ্রেক হয়। অর্থাৎ তার কষ্টটা দর্শক নিজেতে আরোপিত করে এবং ঐরূপে সে কষ্ট সেও ভোগ করে।

এতে ফল হয় এই—কৃপাকারীর সমস্ত সত্তা ভীষণ ভাবে নাড়া পায়। সে নাড়ার কাঁপুনি বহুক্ষণ থাকে। তাতে তার সমস্ত চিত্ত, অর্থাৎ বিচারশক্তি ও তার সহিত তার ক্রিয়াশক্তি বেশ কিছু কালের জন্য বিপর্য্যস্ত হয়ে যায়। কৃপা করলে কৃপাকারীর লাভ এই। নীট্‌শে যথার্থই বলেছেন—Pity weakens the soul

এই কথাই নীলকণ্ঠ তাঁর টীকাতে এইখানে বলেছেন—

"কৃপাপি চিত্তোন্মাথকরীতি দ্বেষবদ্ধেয়া",

অর্থাৎ দ্বেষ যেমন চিত্ত ওলটপালট ক'রে দিয়ে মানুষকে কিছু কালের জন্য কাজের বা'র করে দেয়, কৃপাও ঠিক তাই করে। কাজেই, দ্বেষ যেমন ত্যাজ্য, কৃপাও সেই রকম সর্ব্বতোভাবে ত্যাজ্য।

এ রকম চিত্তোন্মাথ বা চিত্তবিক্ষোভ হয়, কৃপাপাত্রের মনের সহিত "সঙ্গ" হওয়ার দরুণ। কাজেই ঐ "সঙ্গ" ত্যাগ অত্যন্ত আবশ্যক, যদি নিজের চিত্তের স্থৈর্য্য রাখিতে চাও। এই "সঙ্গ"ই নীট্‌শে কথিত infection বা আমা-

দের দর্শনের "জপাস্ফটিকবৎ" অবস্থা। এই "সঙ্গ" হইতে সাবধান থাকিতে বলিতেছেন মহাভারত ১২.২১৫.৪. "অথবা মনসঃ সঙ্গং পশ্যেদ্ ভূতানুকম্পয়া"। অর্থাৎ অনুকম্পা করিলেই মনের "সঙ্গ" হয়, ইহা লক্ষ্য করিও, নজর রাখিও। যদি এ বিষয়ে অনবহিত হও, চিত্তবিক্ষোভ অনিবার্য্য, অবশ্যম্ভাবী; তার ফল কতদূর খারাপ, ব'লে শেষ করা যায় না।

ব্যবহারিক জগতে প্রত্যহই দেখা যায় যে, মানুষের সমস্ত সত্তার মধ্যে চিত্তই প্রধানতম ও শ্রেষ্ঠতম অংশ। "চিত্ত" না থাকিলে তাহার সমস্ত সত্তাই বৃথা। এ কথাই বেশ জোরের সঙ্গে ছান্দোগ্যোপনিষৎ ৭.৫.২এ বলা আছে:

"তস্মাদ্ যত্যপি বহুবিদ্‌চিত্তো ভবতি নায়মস্তীত্যেবৈনমাহুর্যদয়ং বেদ যদ্বা অয়ং বিদ্বান্নেত্থমচিত্তঃ স্যাদিত্যথ যত্যল্পবিচ্চিত্তবান্ ভবতি তস্মা এবোত শুশ্রূষন্তে।"

অর্থাৎ যদি কোনও লোক বহুবিৎ হইলেও তাঁহার চিত্ত না থাকে, তাহা হইলে লোকে বলে "ও না থাকার সমান, ওর বিদ্যাও না থাকার সমান।" আর যদি কোনও লোক অল্পবিৎ হয় কিন্তু তাহার চিত্ত থাকে, তাহা হইলে লোকে তাহার কথা শুনিবার জন্য আগ্রহ প্রকাশ করে। চিত্তের মাহাত্ম্য এত।

এখন, এই "চিত্ত" জিনিসটা ঠিক কি? ছান্দোগ্যোপনিষদের এই খণ্ডে শাঙ্কর ভাষ্য বলেছেন—

চিত্তং চেতয়িতৃত্বং প্রাপ্তকালানুরূপবোধবত্ত্বমতীতানাগতবিষয়প্রয়োজননিরূপণসামর্থ্যং চ।

অর্থাৎ দুইটি জিনিস লইয়া এই "চিত্ত" গঠিত—(১) প্রাপ্তকালানুরূপবোধবত্ত্ব এবং (২) অতীতানাগতবিষয়প্রয়োজননিরূপণসামর্থ্য।

প্রথমটি, প্রাপ্তকালানুরূপবোধবত্ত্ব-প্রাপ্তকালের অর্থাৎ বর্ত্তমান সময়ের অনুরূপ বা উপযোগী শক্তি যার দ্বারা বর্ত্তমান অবস্থাটা সম্পূর্ণরূপে যথাযথভাবে উপলব্ধি করা যেতে পারে। কোনও কারণে কোনও রূপে যদি চিত্তবিক্ষোভ হয়, তা হলে এই শক্তি থাকে না, উল্টো ব্যাপার হয়—রজ্জুতে সর্পভ্রম, ঝোপে ভূত বা বাঘ দেখা।

তারপর এই বর্ত্তমান অবস্থার সম্পূর্ণ ও যথাযথ উপলব্ধি হলেও কাজ শেষ হ'ল না, কারণ তার ঠিক পরেরই কথা হচ্ছে—কি কর্ত্তব্য?

এইখানেই "চিত্ত"র দ্বিতীয় অংশ, অতীতানাগতবিষয়প্রয়োজননিরূপণসামর্থ্য।

এই ইতিকর্ত্তব্য স্থির করতে হলেও চিত্তস্থৈর্য্যের অত্যন্ত আবশ্যক। কারণ বর্ত্তমান অবস্থা থেকে অনুমান করে ঠিক করতে হবে অনাগতকালে কি দাঁড়াবে। তার প্রতিবিধানের জন্য আবার অতীতের কথা ভাবতে হয়। অতীতে হয়ত কখনও না কখনও ঐ রকমের অবস্থা হয়েছিল এবং কি করে সে অবস্থায় কি ব্যবস্থা করে সফল হওয়া গিয়েছিল।

উদাহরণ দিই—রোগীকে দেখতে চিকিৎসক এলেন, তাঁর প্রথম কাজ রোগনির্ণয় অর্থাৎ বর্ত্তমান অবস্থার লক্ষণগুলি সম্পূর্ণ ও যথাযথভাবে উপলব্ধি করা। তা না হলে রোগটা কি ঠিক নির্দ্ধারণ হবে না। এই হ'ল চিত্তের প্রথম অংশ।

তার পরই—চিকিৎসক ভেবে দেখবেন, বর্ত্তমানের এই অবস্থা ভবিষ্যতে কি দাঁড়াবে। আর—অতীতে ঠিক বা প্রায় ঠিক এই রকম কোন রোগীর চিকিৎসা করেছিলেন, তাতে কি ব্যবস্থা অবলম্বন করেছিলেন ও ফল কি হয়েছিল এবং সে রোগী ও এ রোগীর মধ্যে পার্থক্য ও সাদৃশ্য বিবেচনা করে কি করা উচিত তার নির্দ্ধারণ অর্থাৎ ঔষধাদি ব্যবস্থা। এই হ'ল "চিত্ত"র দ্বিতীয় অংশ।

এখন চিত্তবিক্ষোভের দরুণ যদি এই সমস্ত কাজ ঠিক ঠিক না হয়ে কোনও রকম ভুল হয় তা হলে বিপদ, বলা বাহুল্য।

চিত্তস্থৈর্য্য থাকলে তবে এ সমস্ত ঠিকভাবে হয়, নতুবা নহে।

এই জন্যই দত্তাত্রেয় প্রণীত অবধূতগীতাতে আছে—

চিত্তাক্রান্তং ধাতুবদ্ধং শরীরং চিত্তে নষ্টে ধাতবো যান্তি নাশম্।
তস্মাচ্চিত্তং সর্বতো রক্ষণীয়ম্ স্বস্থে চিত্তে বুদ্ধয়ঃ সম্ভবন্তি।

অর্থাৎ সপ্তধাতু দ্বারা গঠিত শরীরকে "চিত্ত"ই ধরে রেখে দিয়েছে। "চিত্ত" যদি নষ্ট হয়ে যায় তা হলে বাঁধন চলে যাওয়ার দরুণ সপ্তধাতু এলিয়ে পড়ে ও শরীর নাশ হয়ে যায়। এইজন্য চিত্তকে সর্ব্বতোভাবে রক্ষা করবে। চিত্ত যদি স্বস্থ (নিজেতে নিজে, স্থিরভাবে) থাকে, তা হলে বুদ্ধির আবির্ভাব হয়—অর্থাৎ চিন্তা, বিচারশক্তি এ সব কাজ করে।

তা হলে দেখা যাচ্ছে—"কৃপণ"কে কৃপা বা অনুকম্পা করলে তার ক্লিষ্ট মনের "সঙ্গ" বা infection দ্বারা তোমার চিত্তবিক্ষোভ হবে, আর তাতে তোমার কি বিপদ হবে। এখন—সংসারে ত "কৃপণ" চিরকাল আছে ও থাকবে। এই "মনসঃ সংজ্ঞম্", এই চিত্তোন্মাথ বা চিত্তবিক্ষোভ থেকে বাঁচি কি করে?

এ সম্বন্ধে মহাভারত বাঁচবার উপায় বলে দিয়েছেন—১২.২১৫.৪ "তত্রাপ্যুপেক্ষাং কুর্বীত"। উপেক্ষা করবে। খুব ঠিক, উপেক্ষা করলে কৃপণের ক্লিষ্ট মন তোমার মনকে ছুঁতে পারবে না। কিন্তু উপেক্ষা করবে, বলা সহজ, করা সহজ নয়। কি করে করা যায়?

কি করে উপেক্ষা করা যায় এ বিষয়ে মহাভারত দুই স্থানে বলেছেন—পূর্ব্বধৃত ১২.১৬৩.২০র ২য় পঙ্‌ক্তি—

"ধর্ম্মনিষ্ঠাং যদা বেত্তি তদা শাম্যতি সা কৃপা" আর পূর্ব্বধৃত ১২.২১৫.৪এর সম্পূর্ণ ২য় পংক্তি—

"তত্রাপ্যুপেক্ষাং কুর্বীত জ্ঞাত্বা কর্ম্মফলং জগৎ।"

একই কথা, কেবল একটু আলাদা ভাবে বলা।

প্রথমটি (১২.১৬৩.২০), তোমার মনে কৃপা এসেছে বটে, তোমার বিপদের কথা। কিন্তু যদি তুমি "ধর্ম্মনিষ্ঠা" জানতে পার তা হলে ঐ কৃপা ঠাণ্ডা হয়ে, নিবৃত্ত হয়ে যাবে।

এখন এই "ধর্ম্মনিষ্ঠা"টা কি? 'ধর্ম্ম' বলে যে পদার্থ তার "নিষ্ঠা" অর্থাৎ শেষ পরিণতি বা পরিণাম।

আবার তা হলে "ধর্ম্ম" পদার্থটা কি? "ধর্ম্ম" পদার্থটা কি, বলেছেন মহাভারত ১২.১০৯.১১—

ধারণাদ্ ধর্ম্মমিত্যাহুর্ধর্মেণ বিধৃতাঃ প্রজাঃ।

অর্থাৎ ধারণ করে থাকে, সমস্ত সৃষ্টিকে ধরে থাকে; অবসন্ন হতে, নাশ হতে দেয় না, সেই ধর্ম্ম।

The law eternal, which upholds all creation.

যাকে অতিক্রম করলে থাকা অসম্ভব, কারণ Nothing is that errs from law

তার কোনও রকম ব্যতিক্রম করলে দণ্ড পেতেই হবে

এই নিয়মের অনুবর্ত্তী হয়ে চললে বা (বিপরীতে) এর ব্যতিক্রম করলে যথাযথ ব্যবস্থা হবেই। এ কথা পাই ঈশাবাস্যোপনিষদের—"যাথাতথ্যতোঽর্থান্ ব্যদধাচ্ছাশ্বতীভ্যঃ সমাভ্যঃ," অর্থাৎ অনন্ত কাল ধরে যথাযথভাবে অর্থের (অর্থাৎ নিয়মানুবর্ত্তিতায় পুরস্কার ও নিয়মব্যতিক্রমে তিরস্কার) ব্যবস্থা হয়ে আসছে। এর ছাড়ান-ছিড়েন নেই।

তা হলেই—যখনই দেখব কেউ "কৃপণ" হয়ে পড়েছে, তখনই বুঝব এই লোক "ধর্ম্মনিষ্ঠা"র একটি উদাহরণমাত্র, অর্থাৎ ধর্ম্মের কোনও না কোনও প্রকার ব্যতিক্রম নিশ্চয়ই করেছে, তাই "ধর্ম্ম" তার স্বাভাবিক অপ্রতিহত গতিতে অপরাধীকে এই "নিষ্ঠা"য় অর্থাৎ পরিণতিতে উপস্থিত করেছে। তখন মনে হয়—"তুমি ধর্ম্মের ব্যতিক্রম করেছ এবং সেইজন্য নিজ কর্ম্মের ফল, এই দণ্ড, ভোগ করছ, নিষ্কৃতির উপায় নেই।" এ অবস্থায়, কর্ম্মফল ভোগের মধ্যে কৃপার অবকাশ নেই। "কৃপণ"কে দেখে দর্শকের মনে যে "কৃপা" উঁকি মেরেছিল, তা এখন ঠাণ্ডা হ'ল, নিবৃত্ত হ'ল।

দ্বিতীয়টি (১২.২১৫.৪)—সারা জগৎ যে একটা বিরাট্ কর্ম্মফল, অর্থাৎ যে ব্যক্তি ভাল, আনন্দের অবস্থায় আছে, সে ভাল কর্ম্মের ফল ভোগ করছে। আর, যে কষ্টে আছে, সে খারাপ কর্ম্মের ফল ভোগ করছে। এটা উপলব্ধি হলে "উপেক্ষা" এসে পড়ে। "কৃপা" ফিরে যায়।

এই কর্ম্ম ও তার অনিবার্য্য ফলের কথা আছে ছান্দোগ্যোপনিষৎ, ৫.১০.৭এ—

"তদ্ য ইহ রমণীয়চরণা অভ্যাশো হ যৎ তে রমণীয়াং যোনিমাপদ্যেরন্ ব্রাহ্মণযোনিং বা ক্ষত্রিয়যোনিং বা বৈশ্যযোনিং বাঽথ য ইহ কপূয়চরণা অভ্যাশো হ যৎ তে কপূয়াং যোনিমাপদ্যেরন্ শ্বযোনিং বা সূকরযোনিং বা চণ্ডালযোনিং বা"

কর্ম্মের ফল যে শুধু অনিবার্য্য, তা নয়, পেতে দেরি লাগে না, "অভ্যাশঃ", ক্ষিপ্রম্।

এই কথাই কৌষীতকী ব্রাহ্মণ উপনিষদে (৩.৯)—

এষ এব সাধু কর্ম্ম কারয়তি যমেভ্যো লোকেভ্য উন্নিনীষতে এষ উ এবাসাধু কর্ম্ম কারয়তি যমধো নিনীষতি।

ভাল কাজ করলে উর্দ্ধগতি, খারাপ কাজ করলে অধোগতি—Promotion, demotion।

অর্থাৎ জগৎসমষ্টির প্রত্যেক ব্যষ্টি তাহার নিজ নিজ কর্ম্মের দরুণ "ধর্ম্মনিষ্ঠা"র (অর্থাৎ তার কর্ম্মের পরিণতির বা ফলের) মূর্ত্তরূপ। কর্ম্মবৈচিত্র্যের জন্যই সৃষ্টির বৈচিত্র্য। যে যেমন কর্ম্ম করেছে, ভাল হোক, মন্দ হোক, সে তেমনই ফল পাচ্ছে। "যেমন কর্ম্ম তেমনি ফল"। সমস্ত জগৎটাই এইরূপ ব্যষ্টির সমষ্টিরূপ কর্ম্মফল। এই তত্ত্ব সম্যক্ বোধ হলে "কৃপা" বা "অনুকম্পা"র অবকাশ কোথায়? কৃপণ দেখলে "কৃপা"র বন্ধন দর্শকের ঘাড়ে প্রায় এসে পড়ে বটে, কিন্তু "ধর্ম্মনিষ্ঠা"র জ্ঞান হলে "জ্ঞানান্মুক্তিঃ"। "কৃপা"র স্থলে "উপেক্ষা" আসে।

এইরূপ "ধর্ম্ম" ও তাহার অবশ্যম্ভাবী নিষ্ঠা বা ফল জেনেই মহাভারত ১২.২৬২.১১এ তুলাধার বলছেন—

"নাহং পরেষাং কৃত্যানি প্রশংসামি ন গর্হয়ে"

অর্থাৎ যে যা করছে, আমি তার প্রশংসাও করি না, নিন্দাও করি না। ভাল হোক, মন্দ হোক, যেমন কাজ করছে, তেমন তার ফল পাবে। উপেক্ষা।

ঐ রকম ভাগবত ১১.২৮.১এ শ্রীভগবান বলছেন—

পরস্বভাবকর্ম্মাণি ন প্রশংসেন্ন গর্হয়েৎ

অর্থাৎ যে যার নিজ স্বভাবে কাজ করে—কাক কা-কা ডাকে, কোকিল কুহু কুহু ডাকে, তার প্রকৃতিই তাই। তার নিন্দাই কর, প্রশংসাই কর, বদলাবে না। দুই-ই নিরর্থক, কাজেই উপেক্ষা।

তা হলে—শেষটা কি এই দাঁড়াল—সমাজে থেকেও সমাজভুক্ত কোন লোককে যদি দুর্গত দেখি, কিছুই করব না? তা নয়। তার কষ্ট মোচনের চেষ্টা করব। কিন্তু ভাবালুতা মনে ঢুকতে দিব না। এই কথাই নীট্‌শে বলেছেন (*Human All Too Human*, I, §. 50)

"Certainly we should *exhibit* pity, but take good care not to *feel* it.

এ কথার মর্ম্ম বুঝতে পার্‌ছি, কিন্তু বোধ হয় কথাটা তত পরিষ্কার ভাবে বলা হয় নি, যেমন পরমহংস রামকৃষ্ণদেব বলেছেন তাঁর সহজ স্পষ্ট ভাষায়—"দয়া করো, মায়া করো না"। অর্থাৎ সংসারে মুখ চেয়ো, দুর্গতকে যথাসাধ্য সাহায্য করো, কিন্তু "ধর্ম্মনিষ্ঠা"র কথা, মনের "সঙ্গ" হওয়ার বিপদ, ভুলো না। নিজের সুস্থ মনের ভিতর "কৃপণ"এর ক্লিষ্টভাব সংক্রামিত ক'রে নিজের চিত্তস্থৈর্য্য হারিয়ে নিজের তথা সমাজের গভীর অনিষ্ট করো না।

ভাবালুতা বা ভাবপ্রবণতায় ব্যক্তি বা ব্যষ্টির কি বিপদ বললুম। সমাজ তথা জাতির বিপদ সম্বন্ধে ইতিহাস কি সাক্ষ্য দেয়, বারান্তরে বলব।

গোঁসাইথান

কাঠমাণ্ডো

শ্রীসুনীলকুমার পাল

নগরীর প্রান্তে নাতিউচ্চ পাহাড়ের মাথায় স্বয়ম্ভূনাথের মন্দিরের স্বর্ণ-চূড়ায় সকালবেলার স্নিগ্ধ আলো এসে পড়েছে, দূরে গোঁসাই-গিরির অমল-ধবল তুষার ঝলমল করছে। জ্যোতির্ময় কম্পন যেন ভেসে বেড়াচ্ছে উপত্যকার আকাশে-বাতাসে। ত্রিপুরেশ্বরের মন্দিরে ঢং-ঢং, ঢং-ঢং ক'রে ঘণ্টা বাজছে, যেন কোন্ সুদূর মহাকালের মন্দির থেকে উত্থিত হচ্ছে এই প্রভাত-বন্দনা। শান্ত-সৌম্য নবীন উষার কাঠমাণ্ডোর সঙ্গে এই আমার প্রথম পরিচয়। বিশ্বনাথের সৃষ্টি আর মানুষের কীর্তি এ দুয়ের এক অপূর্ব্ব সমন্বয় ও বিকাশ দেখলাম এই অনন্তপ্রসারিত উপত্যকাভূমিতে। রাত্রির অন্ধকারে কাঠমাণ্ডোয় এসে পৌঁছেছি, কিছুই চেনা যায় নি তখন; সারারাত প্রভাত-আলোর কামনা করে কাটিয়েছি। প্রথম পরিচয়ে এত বিলম্ব কেন? জানি যে, জননী-জঠরে আঁধার-মগ্ন শিশুর চেতনায় আলোর জন্যে এমনিধারা আকুতি জাগে কিনা! রাত পোহাল, আমার রাতের প্রতীক্ষা দিনের আলোয় জীবনের নূতন কূলে পৌঁছে সার্থক হ'ল। রূপের অমরাবতী যে আমারই চারপাশে যামিনীর অন্ধকার আবরণে আচ্ছন্ন ছিল তা টের পাই নি। দিনের আলো ফুটতেই অভিনব রূপলোকসমূহ একটি দুটি করে জেগে উঠল নীল সরোবরে কমল-কলিকার মত।

উৎসনাচ

নেপাল উপত্যকার সুবিস্তীর্ণ সমভূমির মাঝখানটিতে কাঠমাণ্ডো জনপদ। চারিদিককার হরিৎ-হিরণ্যের মধ্যস্থলে জন-কোলাহলমুখর বসতিগুলো যেন অসীম নিস্তব্ধতার বুকে প্রাণ-চাঞ্চল্যের প্রকাশ। এক দিকে গোদাবরী, চন্দ্রগিরি, অন্য দিকে নাগার্জুন, শিবপুরী—এ চারটি পর্ব্বত বৃত্তাকারে নেপাল উপত্যকাকে বেষ্টন করে রয়েছে। গিরিগাত্রনিঃসৃত অগণিত নদী-নির্ঝরিণীর স্নেহধারাপুষ্ট সমস্ত উপত্যকা ফলে-শস্যে শ্যামশোভায় পরিপূর্ণ। শিবপুরী শিখর থেকে মহাদেবের জটানিঃসৃত জাহ্নবী-ধারার মত নেমে এসেছে বাগমতী, বিষ্ণুমতী আর মনোহরা। সূর্য্যালোকে নদী-মেখলা নেপালের প্রান্তর রজতহাস্যে ঝলমল করে, রাত্রে চন্দ্র-তারকার দ্যুতিতে সে হাসি আরও মধুর। এই সমস্ত খণ্ড-খণ্ড রূপমাধুরীর পশ্চাতে অখণ্ড, অনন্ত বিরাট্ হিমালয়ের মৌন প্রশান্তি।

হিমালয়ের সান্নিধ্যে এসে এই কথাটাই বার বার মনে জাগল যে, পশ্চিমের উন্মুক্ত দ্বার দিয়ে ভারতের সব মহিমা, সব বৈভব একে একে সাগরপারে অন্তর্হিত; কিন্তু উত্তরে হিমালয়ের এই দুর্গম উপত্যকার গোপন ভাণ্ডারখানি একেবারে নিঃশেষিত হয়ে যায় নি। মনে হ'ল এই নেপালে দেশমাতৃকার মঙ্গল-প্রদীপখানি অম্লান মহিমায় আজও প্রজ্জ্বলিত; তারই আলোয় যেন ভারতের গৌরবোজ্জ্বল অতীতকে এক বার প্রত্যক্ষ করে ধন্য হতে পারি।

নেপালের পুরাকাহিনীতে রাজায় রাজায় যুদ্ধবিগ্রহ হানা-হানি দ্বেষ-হিংসা—এই সমস্ত কথা হয়তো ফলাও করে লেখা

আছে, কিন্তু সে কেবল ইতিবৃত্ত, একটা জাতির সমগ্র ইতিহাস নয়। একদা এই উপত্যকার অধিবাসীরা জীবনের নব নব বৈচিত্র্যের আস্বাদ পেয়েছিল, সেদিন ছিল তাদের উচ্ছ্বসিত প্রাণ-প্রাচুর্য্য। জীবনকে তারা ভোগ করেছে পরিপূর্ণভাবে, ফেলে-ছড়িয়ে,—কৃপণের মত সঞ্চয়-ভাণ্ডারকে আগলে বসে থাকে নি। বেঁচে থাকা আর টিঁকে থাকা যে এক নয় এ তারা মনেপ্রাণে উপলব্ধি করেছিল। জীবনের এ মন্ত্র আহরণ করেছিল তারা শিল্প থেকে। সৃজনী প্রতিভা যারা তুচ্ছকে মহৎ করে, সাধারণকে অসাধারণে পরিণত করে, তাদের প্রাত্যহিক জীবনের প্রতিটি অনুষ্ঠানকে শ্রীমণ্ডিত করে তারা লাভ করেছিল অপরিসীম তৃপ্তি। তাদের তৃপ্তির সে ইতিহাস পাঠ করেছি তাদের রেখে-যাওয়া শিল্পকর্মের অশেষ ব্যঞ্জনায়। এই যে সার্থক জীবন-পরিচয় এ ত শুধু কমকতক রূপকারের চেষ্টায় সম্ভব হবার নয়, এ যে একটা অখণ্ড সমগ্র জাতির সম্মিলিত সাধনা, এ যে সকলের পরিপূর্ণ শ্রদ্ধাবিমিশ্রিত আত্মনিবেদন। সেদিন সমস্ত জাতটার মধ্যেই জাগ্রত হয়েছিল সৌন্দর্যবোধ আর শিল্পানুরাগ। সৌন্দর্যের সৌরভ তারা সর্ব্বত্র পরিব্যাপ্ত করে দিয়েছিল। ঘরবাড়ী, দরজা-জানালা, পথ-ঘাট, বসন-ভূষণ সর্ব্ববস্তুকে শ্রীমণ্ডিত করে তবে তারা কাজে লাগিয়েছে, প্রয়োজনের খাতিরে সৌন্দর্যবোধকে বিসর্জন দেয় নি। শিল্পের পথ বেয়ে মহত্ত্বের বিকাশ একদা নেপাল উপত্যকায় পরিপূর্ণভাবে হয়েছিল। নিজেদের চারি-পাশে তারা সৃজন করেছিল মহাজীবনের স্পর্শপূত সৌন্দর্যের স্বর্গলোক। নেপালের বিগত দিনের গৌরবময় অধ্যায়টি আমি শ্রদ্ধার সঙ্গে অনুশীলন করার চেষ্টা করেছি, কিন্তু অতীতের পানে পিছু ফিরে তাকিয়ে তাকে সম্যক্‌ভাবে পর্য্যবেক্ষণ করা আজ সাধ্যাতীত বলেই মনে হয়েছে।

যাদুঘর

কাঠমাণ্ডো নগরীর ঠিক মাঝখানটিতে কাষ্ঠনির্ম্মিত একটি প্রকাণ্ড মণ্ডপ আছে, শুনেছি, মাত্র একটি গাছের কাঠ দিয়ে ওরা নির্ম্মাণ করেছিল এই মন্দির। মাঝখানে মন্দির—চারপাশে নগরীর হর্ম্ম্যশ্রেণী। মন্দিরকে কেন্দ্র করে চতুষ্পার্শ্বে মানুষের হাসি-কান্না কোলাহলমুখরিত লোকালয়। মাঝামাঝি ছাঁদে, পরিপাটি ভাবে ইট-বিছানো অনতিপ্রশস্ত পথ। পথের দুই ধারে ছোট ছোট টালিতে ছাওয়া লাল ইটের শ্রেণীবদ্ধ ঘরবাড়ী। গৃহের প্রবেশদ্বার, বিচিত্র নক্সায় মণ্ডিত।

কাঠমাণ্ডো

নাগার্জ্জুন

গৃহদ্বারের এই অপূর্ব্ব মনোহর শোভা খুব কম জায়গায়ই বোধ করি দেখতে পাওয়া যায়। প্রবেশ-পথের দুই পার্শ্ব ও শীর্ষদেশ দেবদেবীর মূর্ত্তি বা চিত্র দ্বারা সুশোভিত। দরজার পাশে বহির্বাটীর দিকে আচ্ছাদিত উঁচু বেদী পথিকদের বিশ্রামের জন্য সযত্নে রক্ষিত। কারুকার্য্যখচিত দ্বিতলের অলিন্দ ও গবাক্ষের শিল্পনৈপুণ্য অপূর্ব্ব। নেপালের শিল্পে গবাক্ষের অলঙ্করণ একটা বিশিষ্ট স্থান অধিকার করে আছে। এই জানালার ধারে উন্মনা বধূদের উদাস দৃষ্টি বিদেশী পথচারীর চোখে বিস্ময়ের সৃষ্টি করে। পথের এখানে-ওখানে অগণিত ছোট-বড় মন্দির। হাতে ফুল নিয়ে, প্রদীপধারিণী মেয়েরা ধূপের সুবাস বিতরণ করে ধীর পদক্ষেপে সন্তর্পণে দেবালয়ে চলেছে; নিরুদ্বেগে মানুষ চলা-ফেরা করছে, মাঝে মাঝে অশ্বক্ষুরের শব্দে সচকিত জনতা সওয়ারকে পথ ছেড়ে দেয়। দিনের এ কোলাহল রাত্রের প্রথম প্রহরেই স্তব্ধ হয়ে যায়, কেবল মাঝে মাঝে মন্দিরসংলগ্ন নাটমন্দির থেকে উত্থিত ভজন-গানের উদাত্ত সুর ঊর্দ্ধাকাশে যেন কার অন্বেষণ করে বেড়ায়।

কাঠমাণ্ডো, পাটন, ভাতগাঁও, কীর্ত্তিপুর এই পুরাতন নগরী-গুলির ভিতরে ও বাইরে হিন্দু ও বৌদ্ধ দেবদেবীর সংখ্যাতীত মন্দির। উপত্যকার এখানে-ওখানে সর্ব্বত্র দেব-স্থান, নানা পার্ব্বণে যাত্রীরা ঘুরে তীর্থ করে আসে। নেপালের সমাজে জাতিভেদের কলঙ্করেখা থাকলেও মন্দির-প্রাঙ্গণে সে গণ্ডী টেনে নিজেদের সীমা নির্দ্দেশ করা হয় নি। প্রকাণ্ড প্রাঙ্গণকে মাঝে রেখে তার চারধারে কাঠমাণ্ডোর জনপদবাসীরা সারি সারি বাসা বেঁধেছে। একই আঙিনায় এসে যে যার ঘরে ওঠে। এই এক প্রাঙ্গণেই শিশুদের খেলা, মেয়েদের কাপড় কাচা, ধান শুকানো, রোদ পোহানো ইত্যাদি সংসারের খুঁটিনাটি যাবতীয় কাজ। এমনি একটা সবার-জন্যে-খোলা আঙিনার চৌদিকে বাসা বাঁধার কল্পনার বাস্তবরূপ আজও নেপালে দেখা যায়। এক আঙিনায় একত্রে ওঠাবসা, একসঙ্গে ছেলেবেলা থেকে মানুষ হওয়া, এ যেদিন তাদের শেষ হবে, নেপালের পুরনো সমাজ থেকে সেদিন তারা একেবারে নির্ব্বাসিত হবে। হয়ত এর আর দেরি নেই; বর্ত্তমান যুগের সুখ-সুবিধার মোহ এদের চোখে নেশা লাগাতে সুরু করেছে। কিন্তু এখনো এই মুমূর্ষু জাতির ভিতর প্রাণরস একেবারে শুকিয়ে যায় নি, বহু উৎসবে রক্তে তাদের যে দোলা লাগে তারই চাঞ্চল্যে আজও তারা সঞ্জীবিত। উৎসবের তাদের শেষ নেই, একটার পর একটা পার্ব্বণ নতুন করে তাদের মাতিয়ে দিয়ে যায়। সে উৎসবে স্ত্রী পুরুষ বাঁশীর সুমধুর তানে চারদিক মুখরিত করে আনন্দের উপচার নিয়ে কোন-না-কোন দেবপীঠে দল বেঁধে চলতে সুরু করে। কখনও দেখেছি নগরীর বাইরে উন্মুক্ত শ্যামল প্রান্তরে বহু দূর হতে বাঁশীর সুর ভেসে আসছে। বিবিধ সজ্জায় ভূষিত এক দল মানুষের ধীর মন্থর গতি; মাঠের মাঝে উৎসবের কল-কোলাহল,—এ সমস্ত আমার মনকে এক অপার আনন্দলোকে টেনে নিয়ে গেছে। উৎসব নেপালের জীবনের অঙ্গ, তাদের সমাজে বিবিধ পূজাপার্ব্বণ উপলক্ষে উৎসবের আর অন্ত নেই, এই উৎসবই আজও তাদের জীবনকে মধুময় করে রেখেছে।

নব-সন্ন্যাস

শ্রীবিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়

১

নূতন হেডমাষ্টার যিনি আসিলেন তাঁহার বয়স চল্লিশ হইতে পঁয়তাল্লিশের মধ্যে। গৌরবর্ণ, শীর্ণ, মাথায় বড় বড় চুল। গোঁফদাড়ির বড় নয়, আলস্যের বা অবহেলার বড়, কেননা চিরুনির সহিত তাহাদের কখনও দেখা-সাক্ষাৎ নাই; হেড মাষ্টার মশাই স্নানের পর মাথাটা মুছিয়া দশটি আঙুলকে একটু বাঁকাইয়া চুলের মধ্যে দিয়া কয়েকবার টানিয়া দেন; নিশ্চিন্ত।

লোকটি কথা বলেন অল্প, অন্তত কথা বলার জন্য লোক খোঁজেন না। তবে কথা অল্প বলিলেও সরস করিয়া বলেন। কথা বলার সঙ্গে হাসার অভ্যাস থাকায় সাদা কথাও সরস শোনায়। মাষ্টার মশাইয়ের এটা প্রত্যক্ষ দিক; খানিকটা আবার নেপথ্যে আছে, সেখানে যা-সব আলাপ আলোচনা মন্তব্য হয় তাহার বক্তাও উনি, শ্রোতাও উনি।

জায়গাটি রাণীগঞ্জ—বরাকরের এলাকায়। চারি দিকেই কয়লার খনি, তাহারই লোকজনের সমাবেশে একটি মাঝারি সাইজের গঞ্জ গড়িয়া উঠিয়াছে; নামটাও গঞ্জভিত্তিক। স্কুলটা মাইনার স্কুল; বাড়িটা একটু বাহিরের দিকে একটা টিলার উপর। পাশেই খানিকটা সরিয়া হেড মাষ্টারের বাসা।

আসার কয়েকদিন পরে এইখানে একদিন টুনুর সঙ্গে মাষ্টার মশাইয়ের পরিচয় হইল।

বাসার সঙ্গে নিচু দেয়াল দিয়া ঘেরা বেশ খানিকটা জায়গা, তাহার মধ্যেই একদিকে আর একটি উঁচু ঢিবির উপর একটি কাঞ্চন ফুলের গাছ, বেশ ঝাঁকড়া ঝাঁকড়া, বেগুনে ফুলে ভরা। এই প্রায়—নিরস্তপাদপদেশে গাছটি চোখে পড়ে খুব বেশি করিয়া। স্কুল বন্ধ হইবার পর যখন একটু ঠাণ্ডা পড়ে, মাষ্টার মশাই তাহার নিচেটিতে গিয়া বসেন। সামনে প্রায় পোয়া মাইলটাক দূরে মজুরদের বস্তিটা। আর একটু দূরে, বাঁদিকে বাজার। আরও বেশ খানিকটা দূরে খনির মালিক, কর্মচারী প্রভৃতির বাড়ি ও কোয়ার্টার। এর পরেই বোধ হয় পনর-ষোল মাইলের পরিধি লইয়া রাণীগঞ্জ—বরাকর অঞ্চলের একটা বিরাট খনিচক্র—এখানে-ওখানে, কাছে দূরে, আরও দূরে অন্তর্বিক্ষুব্ধ ধরিত্রীর অভিশাপের মতো ধোঁয়ার কুণ্ডলী উঠিয়া আকাশ মলিন করিয়া তুলিতেছে; পায়ের নিকট হইতে দিকচক্রবলয়িত সমস্ত বৃত্তটা এক নজরে দেখা যায়; খুব দূরে বাঁদিকে ওতনিয়া পাহাড়ের নীল রেখা। মাষ্টার মশাই একদৃষ্টে চাহিয়া বসিয়া থাকেন। এক এক সময় বোধ হয় নিজে হইতেই কিছু বলিয়া ওঠেন, তাহার উত্তরও নিজেই দেন কখনও কখনও।...অন্ধকার একটু জমিয়া উঠিলে আবার বাসায় ফিরিয়া যান।

স্কুলের দেওয়ালের পাশ দিয়া একটা রাস্তা উঠিয়া আসিয়াছে, টিলার গা বাহিয়া আবার অন্য দিকে নামিয়া গেছে; লোক চলাচল খুব কম। এক দিন টুনু সেই রাস্তায় আসিয়া মাষ্টার মশাইয়ের সামনে দাঁড়াইয়া করজোড়ে নমস্কার করিল। অচেনা লোক, সপ্রশ্ন নেত্রে চাহিতে বলিল—"ইয়ে—ক'দিন দূর থেকে আপনাকে দেখেছি—কেন ঠিক বলতে পারি না, কেমন একটা শ্রদ্ধা হয়, ইচ্ছে হয় আলাপ করি, তাই—"

মাষ্টার মশাই কয়েক সেকেণ্ড স্থির দৃষ্টিতে চাহিয়া রহিলেন, তাহার পর হাসিমুখে বলিলেন—"চাঁদা টাঁদা আমার দ্বারা হবে না, এখনও গুছিয়ে বলতেই পারি নি..."

টুনু একটু বিপর্য্যস্ত ভাবে বলিল—"আজ্ঞে, চাঁদা নয়।"

"ইনসিওরেন্সের প্রিমিয়াম্‌ও আমি নিয়মিত ভাবে জুগিয়ে উঠতে পারি নি—কিম্বা শেয়ারের কল্—অনেক গচ্চা গেছে।"

"আজ্ঞে, এজেন্ট নয় আমি।"

"তবে?"

"মানে, কত বার মনে হয়েছে...মানে..."

টুনু ব্যাকুল ভাবে এক বার সামনের দিকে চাহিল, এক বার উপরের দিকে চাহিল, তাহার পর চুপ করিয়া গেল।

মাষ্টার মশাই হাসিয়াই বলিলেন—"বোস'; অসুবিধে হবে মাটির ওপর বসতে? ঘাস নেই তেমন।"

"আজ্ঞে, ঘাস নেই তো কি হয়েছে? আপনি নিজে যখন বসে রয়েছেন..."

—বলিয়া একেবারেই ঘাস নাই এমন একটা জায়গা দেখিয়া টুনু বসিয়া পড়িল। পাশেই একটা আধপোঁতা পাথরের চাঁই ছিল, তখনও বেশ তপ্ত, কিছু বলিলে বোধ হয় বিনয়ের আতিশয্যে সেইটার উপরই গিয়া বসিবে এই ভাবিয়া বসা সম্বন্ধে মাষ্টার মশাই আর কিছু মন্তব্য করিলেন না। তবে হাসিটা মিলাইয়া যাইবার পূর্ব্বে আবার এক বার স্পষ্ট হইয়া উঠিল।

আগন্তুকই আগমনের উদ্দেশ্যটা বলিবে এই আশায় মাষ্টার মশাই একটু প্রতীক্ষা করিয়াই রহিলেন, শেষে স্তব্ধতাটা বেশ অস্বস্তিকর হইয়া ওঠায় যেন একটা কথা পাড়িবার জন্যই হাসিয়া বলিলেন—"কিছু মনে করলে না তো?...ও-রকম গৌরচন্দ্রিকা এর আগে অনেক শুনিয়েছে। তাই..."

"না, আপনি বলবেন তার জন্যে মনে করব কি?...তা ভিন্ন, তোপায় বৈ কি ওরা—"

প্রশ্ন হইল—"এখানে কোথায় থাক তুমি? কর কি?"

টুনু বলিল—"এখানে থাকি না আমি, নতুন এসেছি। বাজারে কাকার একটা স্টেশনারি দোকান আছে—স্টেশনারি আর ড্রাগস্—সব চেয়ে বড় সেটা—ব্যানার্জ্জি অ্যাণ্ড কোম্পানি, দেখে থাকবেন।"

"সেই দোকানে বসো?"

"আজ্ঞে না, ওসব দিকে টেষ্ট নেই।'

"তবে? মাইন্‌-এ কাজ খুঁজছ?"

"আজ্ঞে না, ওসব কিছুই ভাল লাগে না।"

মাষ্টার মশাই একটু মুখের দিকে চাহিলেন, প্রশ্ন করিলেন—"পড়েছ কত দূর?"

উত্তর পাইতে একটু বেশি বিলম্ব হইতেছে দেখিয়া প্রশ্নটার আর পুনরুক্তি করিলেন না।

নাম জিজ্ঞাসা করিলেন। কথাবার্তার মোড় ফেরায় টুলু যেন একটু খুশী হইল, বলিল—"আজ্ঞে, আমার নাম নিতাইপদ বন্দ্যোপাধ্যায়, আমাদের বাড়ি রাজসাহী, বাবা সেখানে ওকালতী করেন—বেশ বড় উকিলই এক জন। আমার কিন্তু আই-এ পাশ দেওয়ার পর আর পড়তে ভাল লাগলো না—কি হবে পড়ে বলুন?—এই তো দেখছি। ইচ্ছে হয় কিছু কাজ করি, কিন্তু ঠিক মনের মতন কাজ পাচ্ছি না।"

প্রশ্ন হইল—"কি ধরণের কাজ চাও তুমি?"

টুলু একটু চুপ করিয়া ভাবিল, তাহার পর প্রশ্ন করিল… "আপনি স্বামী ভূমানন্দ মহারাজের নাম শুনেছেন বোধ হয়?"

"না, নামটা নতুন নতুন ঠেকছে; একটু বেশি 'অ্যাম্বিশাস'ও।

টুলু আবেগের মাথায় মন্তব্যটা আর খেয়াল করিল না, বলিয়া চলিল—"সেই এক মহাপুরুষ দেখেছিলাম। রাজসাহী থেকে কয়েক মাইল দূরে পদ্মার ধারে আশ্রম করে ছিলেন। ছ'ফুট তিন ইঞ্চি লম্বা, তেজ যেন ফুটে বেরুচ্ছে। সমাধির মধ্যেই কথা কইতেন, এক জন লিখে রাখত, তার পর সমাধি ভাঙলে সবাইকে বুঝিয়ে দিতেন…"

মাষ্টার মশাই তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে চাহিয়া শুনিয়া যাইতেছিলেন; শেষ হইলে ঠোঁটের কোণটা যে একটু কুঞ্চিত হইয়া উঠিয়াছিল সেটাকে মিলাইয়া লইয়া প্রশ্ন করিলেন—"তুমি সেই আশ্রমভুক্ত হয়ে ছিলে বুঝি?"

"হব-হব মনে করছি—মানে, হাঁটা-হাঁটি করে একটু কৃপালাভ হয়েছে বলে মনে হচ্ছে, এমন সময়…"

টুলু হঠাৎ চুপ করিয়া গেল। একটু অপেক্ষা করিয়া মাষ্টার মশাই প্রশ্ন করিলেন—"চুপ করলে যে?"

কুণ্ঠাটাকে কাটাইয়া উঠিয়া টুলু বলিল—"অমনধারা লোক কখনও দাগি আসামী হতে পারে বলে আপনার বিশ্বাস হয়? …ছ'ফুট তিন ইঞ্চি লম্বা, আর তেমনি…"

মাষ্টার মশাই আরও একটা হাসিকে অনেক কষ্টে মিলাইয়া লইলেন, বলিলেন—"আমি সাত ফুট আড়াই ইঞ্চি পর্য্যন্ত দাগি আসামী দেখেছি।…এক দিন বুঝি হঠাৎ আর তাঁকে দেখা গেল না?"

একটু বেদনাতুর দৃষ্টিতে চাহিয়া টুলু বলিল—"আজ্ঞে, ওঁরা এমনিই থাকতে চান না লোকালয়ে, তার ওপর এই সব লুকোচুরি ব্যাপার—জানেনই তো পুলিসকে।…আমরা কয়েকজন শিষ্য মিলে তাঁর আদর্শটা প্রচার করব ভেবেছিলাম—সেখানেও পুলিস…"

"আদর্শটা ছিল কি তাঁর?"

টুলু একটু চিন্তা করিয়া বোধ হয় সেটা গুছাইয়া বলিতে যাইতেছিল, এমন সময় দেখা গেল স্কুলের সেক্রেটারি গেট খুলিয়া স্কুলে প্রবেশ করিতেছেন। মাষ্টার মশাই উঠিয়া বলিলেন—"আচ্ছা, আর এক দিন শোনা যাবে।…হ্যাঁ, তোমার নামটা কি বললে?"

টুলু বিনীত ভাবে মাথাটা এক দিকে একটু ঝুঁকাইয়া বলিল—"আজ্ঞে, নিতাইপদ বন্দ্যোপাধ্যায়। সবাই টুলু বলে ডাকে, আপনিও তাই বলেই ডাকবেন।"

দুই জনে কাঁকনতলা থেকে ধীরে ধীরে একসঙ্গে নামিলেন। ফটকের বাহির হইয়া টুলু গঞ্জের উল্টা দিকে মুখ ফিরাইল। মাষ্টার মশাই একটু বিস্মিত হইয়াই প্রশ্ন করিলেন—"ও দিকে যে?"

টুলু মুখটা নীচু করিয়া দাঁড়াইল। দ্বিতীয় বার প্রশ্নে একটু কুণ্ঠিত ভাবে বলিল—"বালিয়াড়িতে এক জন নাকি সিদ্ধ পুরুষ এসেছেন শুনে…"

মাষ্টার মশাই এবার বিস্ময়ে একেবারে সিধা হইয়া উঠিলেন, বলিলেন—"তাতে কি!…আর বালিয়াড়ি—সে তো প্রায় দু'কোশ এখান থেকে—সন্ধ্যে হয়ে এল, নির্জ্জন পথ!…"

টুলু মুখটা তুলিয়া লজ্জিতভাবে হাসিল। হাসিটা সলজ্জ হইলেও মাষ্টার মশাই লক্ষ্য করিলেন তাহাতে একটা অটল প্রতিজ্ঞা ওতপ্রোত হইয়া রহিয়াছে। এই প্রথম বার চেষ্টা করিয়াও তিনি নিজের মুখের অত সহজ হাসিটা টানিয়া আনিতে পারিলেন না। টুলু ঢালু পথ দিয়া ধীরে ধীরে নামিয়া চলিল, একবারও ফিরিয়া চাহিল না, যেন টের পাইয়াছে মাষ্টার মশাই ঠিক সেই জায়গাটিতে দাঁড়াইয়া আছেন, ফিরিলেই আবার লজ্জায় পড়িতে হইবে।

নীচের বস্তি থেকে কি একটা কলরব উঠিল—ওঠে মাঝে মাঝে ওরকম—হয়তো মাতলামি, হয়তো এ ওর ঘরে চুরি করিতে গিয়া ধরা পড়িয়াছে, হয়তো চুরির চেয়েও বীভৎস কিছু।—মাষ্টার মশাইয়ের দৃষ্টিটা ধীরে ধীরে বিরাট খনি-চক্রের দিক-রেখার উপর দিয়া ঘুরিয়া আসিল—এই একটি মাত্র বস্তি নয় তো—এমন কত শত। ধরিত্রীর সমস্ত অঙ্গ বিষাক্ত ক্ষতে যেন ভরিয়া উঠিয়াছে। তাহার পর টুলুর উপর নজরটা ফিরিয়া গেল—দৃঢ় পদক্ষেপে সাধুসঙ্গমে চলিয়াছে—দেশের এক জন সক্ষম যুবা।

সেপথ্যের মাষ্টার মশাই বড় একটা হাসেন না, কথাটাকে যেন চিবাইয়াই বাহির করিলেন—"ভক্তি!—মানুষ না পাওয়া যায়, অমানুষের পায়েই লুটিয়ে পড়বে, ভক্তি ঢালা চাই-ই—হাজার বছর ধরে শুধু তো এই জমা করলে, রাখে কোথায়?—যতই অত্যাচার বেড়েছে ততই জমেছে যে ভক্তি—"

স্কুলের চাকরটা আসিয়া পিছনে দাঁড়াইয়া বলিল—"সেক্রেটারি বাবু এলেন আজ্ঞে।"

কথাটা কানে গেল না; মাষ্টার মশাই টুলুর দিকেই চাহিয়া বলিলেন—"আমার চাই; ওই তপস্যা, ওই দৃঢ় গতি আমি উল্টো দিকে ফেরাবই—"

চাকরটা আবার বলিল—"সেক্রেটারি বাবু এলেন আজ্ঞে।"

ফিরিয়া চাহিয়াও কথাটা বুঝিতে মাষ্টার মশাইয়ের একটু বিলম্ব হইল; চাকরটা আবার সেই একভাবে চারিটি কথার পুনরুক্তি করিল। মাষ্টার মশাই বলিলেন—"চেয়ার বের করে দিয়েছিস?—চল্।"

কয়েক পা গিয়া আবার একটু বাধা পড়িল; টুলুর গলা—তর একটু দাঁড়ান।

ফিরিয়া দেখেন হন-হন করিয়া উঠিয়া আসিতেছে। কাছে আসিতে আসিতে বলিল—পায়ের ধুলো দেওয়া হয় নি…

ঝুঁকিতে যাইবে, মাষ্টার মশাই তাহার কাঁধ দুইটায় হাত দিয়া সোজাই খাড়া করাইয়া রাখিলেন, মুখের দিকে স্থির দৃষ্টিতে চাহিয়া বলিলেন—এসে যেমন করেছিলে তেমনি সোজা হয়েই নমস্কার কর টুনু।…অন্ততঃ একটা মান রেখে যাও অত ভক্তির যোগ্য কিনা এই নতুন লোকটি।…যাও এবার, নমস্কার।

ওর অভিবাদনের আগেই প্রত্যভিবাদন করিয়া আবার স্কুলের অভিমুখী হইলেন।

২

এর পর টুনুই মাষ্টার মশাইয়ের সমস্ত মনটা অধিকার করিয়া রহিল—একেবারে নিদ্রা না হওয়া পর্যন্ত, বরং বেশ খানিকটা বাধাও দিল নিদ্রায়। ছেলেটি আসিয়াছে তাঁহার আকর্ষণে—তাহার মূলে নিশ্চয় তাঁহার ঐ কাঞ্চন-তলাটির মৌন-বিলাস; আসিয়াই কিন্তু সেও মাষ্টার মশাইকে আকৃষ্ট করিয়া লইল।

টুনু যে আই-এ পাস করিয়াছে বলিল, সে নিশ্চয় অনেক পূর্বের কথা, এখন তাহার বয়স প্রায় পঁচিশ-ছাব্বিশ বছর। বেশির ভাগ বাঙালী যুবকের মত ধর্মপ্রাণ ও আদর্শবাদী। মনে হয় বাড়িতে একটু আদর পাইয়া আসিয়াছে বেশি; এই আদর ও আদর্শের সমন্বয়ে তাহাকে বয়সের অনুপাতে অনেক বেশি ছেলেমানুষ দেখায়। এইখানে টুনু মায়া জন্মাইয়াছে একটা।…এদিকে টুনু একটা আশা লইয়া আসিয়াছে—ওকে কোন গুরুত্বপূর্ণ বাণী দিতে হইবে—নিশ্চয়ই আধ্যাত্মিক; কোন গভীর আধ্যাত্মিক রহস্য উদ্‌ঘাটন করিয়া ধরিতে হইবে ওর চোখের সামনে; ওকে কোন আধ্যাত্মিক পথে পরিচালিত করিতে হইবে। দুর্গানন্দের সম্বন্ধে বিদ্রূপে টুনু পীড়া অনুভব করিয়াছিল, সিদ্ধ পুরুষের উল্লেখে হইয়াছিল লজ্জিত। তবুও এই যে দৃশ্যশক্তি বিষয়ে মাষ্টার মশাইয়ের ঔদাসীন্য এতে টুনুকে বিচলিত করিতে পারে নাই। ও বরং এটাকে মহাপুরুষের লক্ষণ বলিয়াই ধরিয়া লইয়াছে,—ওঁরা ত এইভাবেই আত্মগোপন করেন, গা ঢাকা দেন।

এইখানে আকর্ষণের মধ্যে আছে আশঙ্কা।—যদি উহাকে স্পষ্ট করিয়া বলা যায় অলৌকিক কোন-কিছুর বিন্দুবিসর্গও ওর মধ্যে লুকান নাই ত টুনুর বিশ্বাস আরও পাকা হইয়া উঠিবে, এবং ও হয়ত তখন খোলাখুলিই তপস্যা আরম্ভ করিয়া দিবে। এরা আবার মহাত্মা বলিয়া চারি দিকে ঘোষিত করিয়া অনেক সময় অতিষ্ঠ করিয়াও তোলে। চিন্তার বিষয় বইকি।

এসব চিন্তার পাশেই সেই ছবিটি ফুটিয়া উঠে—অন্ধকার সম্মুখে রাখিয়া সুদূর নির্জন পথে দৃঢ় পদক্ষেপে টুনু সাধুসঙ্গে চলিয়াছে।

আকর্ষণে-বিকর্ষণে টুনু মাষ্টার মশাইয়ের একটা অশান্তি হইয়া উঠিল। কিন্তু সব-কিছুর মধ্যেই ঐ কথাটা ধরিয়া রহিলেন—টুনুকে চাই-ই।

ধর্মের বিলাস শেষ হইয়াছে, এখন ঐ প্রতিভার দরকার অন্য দিকে। হাজার বৎসরের ধর্মাবেগকে কাজে ফিরাইতে হইবে।

কিন্তু এমন ভাবে কথাটা পাড়িতে হইবে যাহাতে ওর "কৃপালাভ"-এর আশাটা একেবারে ধূলিসাৎ না হইয়া যায়, তাহা হইলে ভড়কাইয়া যাইবে। প্রথম নম্বর—ভাষাটা হওয়া চাই আধ্যাত্মিক-ঘেঁষা।

পরদিন টুনু আসিলে বলিলেন—টুনু, মনের খুব গভীরে আমার এক সময় একটা ইয়ে হচ্ছে—এক ধরণের সঙ্কেত পাচ্ছিই বলতে পার, যে তুমি আধ্যাত্মিক কিছু একটা পাবার জন্যে হাতড়ে বেড়াচ্ছ…

ভাষাটি নিজের কানেই বেশ চমৎকার লাগিল, "হাতড়ে বেড়াচ্ছ"টা আবার একেবারে আধুনিক।

টুনু উল্লসিত হইয়া উঠিল, হাত দুইটা কচলাইতে কচলাইতে বলিল—আপনি যে সেটা একদিন-না-একদিন টের পাবেনই তার, আমার এটা দৃঢ় বিশ্বাস ছিল। আপনি মুখে যাই বলুন, কিন্তু আমি ত অনেক জায়গায় ঘুরলাম, অনেক সাধুসঙ্গ করলাম…

খুব সূক্ষ্ম একটা আধ্যাত্মিক হাসি ঠোঁটে অল্প একটু ফুটাইয়া মাষ্টার মশাই বলিলেন—কিন্তু একটা কথা টুনু, ছাদে উঠতে চাইছে একটা লোক, অর্থাৎ এমন জায়গায় পৌঁছুতে চাইছে যেটা তার বাড়ির শেষ—এক হিসেবে তার ঐহিক যা কিছু তার পরিসমাপ্তি;—অতটা যদি না-ই স্বীকার কর—তার ঘরকন্না যেখানে গিয়ে মুক্ত আকাশের সঙ্গে মিশে গেছে—যে আকাশ অনন্তেরই একটা প্রতীক; স্বীকার কর ত?

টুনু নড়িয়া-চড়িয়া গুছাইয়া বসিল।

মাষ্টারমশাই বলিলেন—কিন্তু একটা কথার উত্তর দাও, সে এক লাফে যদি উঠবার চেষ্টা করে…

টুনুর মুখটা উজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছে। কথাটা কাড়িয়া লইয়া একটু ব্যঙ্গের হাসির সঙ্গেই বলিল—তা হলে বুঝতে হবে তার, তার একেবারে আদি পুরুষের বুদ্ধি আবার মাথায় ঢুকে পড়েছে।

ডারউইনের মতবাদ টুনু যে এমন চমৎকার রসিকতায় খাটাইবে মাষ্টার মশাই সেটা আশা করেন নাই, বেশ দুলিয়াই হাসিয়া উঠিলেন। তার পর আবার গম্ভীর হইয়া বলিলেন—স্বীকার করছ ত? তার মানে তাকে ধাপে ধাপে সিঁড়ি বেয়ে উঠতে হবে। এখন এই সিড়ি জিনিষটাকে বোঝবার চেষ্টা কর: এ এমন একটা জিনিষ যা আমরা পা দিয়ে মাড়াই অর্থাৎ যা নিম্ন স্তরের অথচ যা মাড়াবার সঙ্গে সঙ্গেই আমাদের খানিকটা করে তুলে দেয়।

টুনু মুগ্ধ দৃষ্টিতে মুখের পানে চাহিয়া রহিল; পাশে একটা ফুল ঝরিয়া পড়িতে অন্যমনস্ক ভাবেই সেটা তুলিয়া লইয়া দুই হাতের মধ্যে করিয়া কতকটা ভাগবত শোনার মত হইয়া বসিল।

মাষ্টার মশাই বলিলেন—তা থেকে দাঁড়াচ্ছে কি?—এই নয় কি যে আমরা কোন জিনিষকেই ছোট বলতে পারি না?—শুধু তাই নয়—কোন বড় কাজ করতে হলে, কোন বড় সাধনায় সিদ্ধি পেতে হলে আমাদের ছোট থেকেই আরম্ভ করতে হবে…?

তুলনার মধ্যে সাপ ব্যাঙ যাই থাক। ফল হইল। টুনু

একেবারে অভিভূত হইয়া পড়িল, বলিল—আগে এ-বি, তারপর ত বি-এ, এম্-এ ভয়।

মাষ্টার মশাই বলিলেন—আমি জানতাম তোমায় বোঝাতে বেগ পেতে হবে না আমায়।···ঠিক এইজন্যে আমাদের দেশের মুনিঋষিরা আধ্যাত্মিক লাভের আগে রেখেছেন সেবা-ধর্ম, কেননা চিত্তশুদ্ধি করতে সেবা-ধর্মের মতন কিছুই নেই, আর চিত্তশুদ্ধি না হলে···

টুনুর চোখের দীপ্তি হঠাৎ একটু নিষ্প্রভ হইয়া গেল যেন, বলিল—কিন্তু গুরুদেব—অর্থাৎ স্বামী ভূমানন্দ বলতেন ওসব আজকালকার মিশন-সন্ন্যাসীদের হুজুগ, ও দিয়ে আত্মার কিছুই লাভ হয় না ভয়।

মালাই-মালপোয় গড়া ছ' ফুট তিন ইঞ্চির লাস—সে সন্ন্যাসী আর অন্যবিধ কি বলিবে; মাষ্টার মশাই সে কথা অবশ্য টুনুকে বলিলেন না এবং যদিও একটু ধাক্কা খাইলেন, নিরুৎসাহ হইলেন না; কহিলেন—তোমার গুরুদেব ঠিকই বলেছেন টুনু—হয়ত তোমার একটু বোঝবার ভুল হয়েছে,—লোকে সেবার নেশাতেই পড়ে থেকে সব নষ্ট করে যে। কথা হচ্ছে—সিঁড়িটা যেমন উদ্দেশ্য নয়, উদ্দেশ্য ছাদ, সেবাটাও তেমনি সাধন মাত্র, উদ্দেশ্য আত্মিক উন্নতি। এখন তুমি যদি সিঁড়ি আঁকড়ে পড়ে থাক—পারবে কি উঠতে ছাদে?

আবার চোখের দীপ্তিটা ফিরিয়া আসিল, বরং মনে হইল বেশ একটু বেশি করিয়াই, টুনু বলিল—কি করতে আপনার আদেশ হয় বলুন।

মাষ্টারমশাই হঠাৎ মৌন হইয়া পড়িলেন। শুষ্ক, পাণ্ডুর মুখটা স্থানে স্থানে রক্তিম হইয়া উঠিল। নেপথ্যে কে যেন তাগাদা দিতেছে—সে তাহার নিজের ভাষায় কি বলিতে চায়; প্রবঞ্চনার ভাষা নয়—স্পষ্ট অনুভূতির সঙ্গে সে ভাষায় শক্তির যোগ। তবু সংযত ভাবেই আরম্ভ করিলেন—

যার সেবা করছ, তার অবস্থাটা যত হীন, সে যত দুঃস্থ, যত পতিত, সেবার স্কোপটা ততই বেশি, আর তাই থেকে চিত্তশুদ্ধির সুযোগটাও তত বেশি এটা নিশ্চয় স্বীকার করছ। তা হলে ঐ বস্তির দিকে চেয়ে দেখো—রোগ, দারিদ্র্য, দুর্নীতি—মানুষকে টেনে পশুর স্তরে নামিয়ে ফেলতে যা-কিছু দরকার সে সবের এক জায়গায় অমন সমাবেশ আর দেখতে পাবে না টুনু। সর্বনাশের কথা এই যে ওরা যে কত নেমে গেছে, উঠতে পারলে মানুষ হিসেবে ওদের যে কত ওঠবার সম্ভাবনা ছিল—সেটা পর্য্যন্ত ওরা আর টের পায় না। আরও সর্বনাশের কথা ওরা সুখে আছে। হয়ত বলবে সুখই যখন সবার চরম লক্ষ্য তখন কাজ কি ওদের অশান্তি বাড়িয়ে। কিন্তু কথা হচ্ছে যে অবস্থায় কুকুর, ছাগল, এমন কি নর্দমার পোকা সুখে থাকে সে অবস্থায় যদি মানুষও সুখে থাকে তো সে যে একটা মস্ত বড় অপচয় ভগবানের রাজ্যের টুনু, অতখানি মনুষ্যত্বই যে বিলীন হয়ে গেল সৃষ্টি থেকে। মানুষের দারিদ্র্য হবে ইচ্ছাকৃত ত্যাগ থেকে উৎপন্ন—সে দারিদ্র্য মানুষের তপস্যা, সে মানুষের মস্তই বিরাট্। ঠিক এই এখন আমার চোখের সামনে সে দারিদ্র্যের ছবি ভেসে উঠছে স্মার্ত রঘুনন্দনের জীবনে—তেঁতুলপাতার শাক আর অন্ন—প্রতিদিন প্রতি তেঁতুলপাতাটি তাঁর মধ্যে মনুষ্যত্বের তেজ পূর্ণ করে তুলছে—রাজা দান দিতে চাইলে, এই অকিঞ্চন পৃথিবীতে তিনি নেবার মত কিছুই খুঁজে পেলেন না।···ওই দারিদ্র্যকে বুঝি; তার মধ্যে হীনতা কিছু নেই, ভগবানের শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি মানুষের আত্মারই একটি বিকাশ সে দারিদ্র্য। কিন্তু চারদিকের অর্থগত বিলাসের মধ্যে, চারদিকের ভূরি ভোজের টেঁকুরের মধ্যে লোলুপ দৃষ্টিতে চেয়ে চেয়ে স্ত্রী-পুত্র-কন্যা নিয়ে ঐ যে তিলে তিলে মরা, তারপর এই তারতম্যের—অর্থাৎ এই অভাবের বোধটুকুও আস্তে আস্তে অসাড় হয়ে যাওয়া—একে একে যতরকম পাপ সবকে পাথেয় করে নিয়ে—অমৃতের পুত্র বলে যাদের সম্বন্ধে বড়াই করি তাদের এই নরকের দিকে তীর্থযাত্রা—এ দারিদ্র্য আমি বুঝি না টুনু। যদি কিছু করতে চাও ত এদের বাঁচাও, তার চেয়ে বড় কাজ কিছুই নেই। সত্যি কথা বলতে কি, তুমি হয়ত ভাব বিকেলে এই নির্জন কাঞ্চনতলাটিতে বসে আমি আত্মার স্বরূপ উপলব্ধি করবার চেষ্টা করি কিম্বা পরমেশ্বরের ধ্যান করি। জায়গাটি বড্ড মনোরম—একেবারে চরম সত্যেরই আরাধনা করবার মতন, হয়ও ইচ্ছে এক এক সময়, কিন্তু পারি না। বড্ড বাধা দেয় আমায় ঐ বস্তি, আর, তারই অন্ন খেয়ে তারই দিকে উদ্ধত অবজ্ঞার দৃষ্টিতে চাওয়া ঐ রং-করা বাড়িগুলো।···আমার উপায় নেই—কেন তা হয়ত এক দিন তোমায় বলব; এখন জেনে রাখ—পরের দাস, সময় অল্প, তার ওপর অন্নচিন্তা চমৎকারা।—তুমি নেমে এস এইখানে,—তোমার বয়স আছে, উৎসাহ আছে, টাকা আছে। আর সব চেয়ে বড় কথা আছে অবসর, তুমি···

হঠাৎ মনে পড়িল একটু ঝোঁকে পড়িয়া গেছেন, আবেগের মাথায় যা-কিছু বলিয়া গেলেন, সেগুলা টুনুকে না বিচলিত করিবারই কথা। ওর মাথা খাইয়াছে ধর্ম—ধর্মের বিকারই বলা সমীচীন, যাহাতে ছ' ফুট তিন ইঞ্চির একটা ভোগপুষ্ট দুর্বৃত্তকেও ত্রাণকর্তা গুরু বলিয়া মানিয়া লইতে বাধে না।··· চুপ করিয়া গেলেন।

টুনু মুখের উপর চোখ তুলিয়া শুনিতেছিল, চুপ করিতে দৃষ্টি নত করিল। মাষ্টার মশাই চুপ করিয়াই রহিলেন; যখন প্রকাশ হইয়াই গেছে মনের আবেগটা, হাসি বা প্রবঞ্চনার ভাষা দিয়া আর ঢাকিবার চেষ্টা করিলেন না; উত্তরটা কি হয় শুনিবার জন্য নীরবে প্রতীক্ষা করিয়া রহিলেন।

এক ভাবেই থাকিয়া টুনু অনেকক্ষণ ভাবিল, তাহার পর মুখটা তুলিয়া প্রশ্ন করিল—আপনার বিশ্বাস হয় আমার দ্বারা হবে?

নম্র ভাবালু দৃষ্টিতে কোথায় যেন একটু দীপ্তি আসিয়াছে। ঐ ধরণের ছেলেদের মধ্যে এটা অনেক বারই দেখিবার সুযোগ হইয়াছে—চেনা জিনিস, বড় একটা টেঁকে না; তবু নিরুৎসাহ করিলেন না মাষ্টার মশাই, অর্থাৎ নিরুৎসাহ হইলেন না, বলিলেন—এক দিনেই ত কোন জিনিষ হয় না টুনু।

টুনু একটু সন্দিগ্ধ কণ্ঠে প্রশ্ন করিল—কিন্তু এই পথে গেলে পাব ত সে জিনিষ, স্যর যা খুঁজছি?

মাষ্টার মশাই বলিলেন—পথটা তো আমার নয় টুনু, মুনিঋষিদের সৃষ্টি, আগেই ত বলেছি সে কথা তোমায়।

টুনু আবার দৃষ্টি নত করিয়া একটু ভাবিল, তাহার পর বলিল—তাই করব না হয়, চিত্তশুদ্ধি হয়ে যখন আধ্যাত্মিক উন্নতির কথা বলছেন…

সেই দীপ্তি এইটুকুতেই মলিন হইয়া আসিয়াছে,—মনের উপর সংশয়ের চাপটা আর সহ্য করিতে পারিতেছে না টুনু।

আজ এই পর্য্যন্তই রহিল; মাষ্টারমশাই প্রসঙ্গান্তর আনিয়া ফেলিলেন, বলিলেন—হাঁা, ভুলেই গিয়েছিলাম,—তুমি যার দর্শনে গিয়েছিলে কাল—কি হ'ল—এসেছেন?

—না, বোধ হয় দেরি হবে ভয়, টপ করে তো পাওয়া যায় না ওঁদের।

মাষ্টার মশাই বলিলেন—ভালই হ'ল টুনু, তুমি বরং তত দিন খানিকটা এগিয়ে থাক…হুট করে অত বড় একটা মহাপুরুষের সামনে হওয়া…

হাসিয়া বলিলেন—যাক্‌, হাইস্কুলের আগে তুমি আমায় মাইনারের কোর্সটা শেষ করে দাও।

ক্রমশঃ

নবীনচন্দ্র সেনের গ্রন্থাবলী

শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

নবীনচন্দ্র যে-সকল গ্রন্থ রচনা করিয়া গিয়াছেন, সংক্ষিপ্ত পরিচয় সহ সেগুলির একটি কালানুক্রমিক তালিকা প্রদান করিতেছি। তালিকায় বন্ধনী-মধ্যে পুস্তকের সন তারিখ-যুক্ত যে ইংরেজী প্রকাশকাল দেওয়া হইয়াছে, সেগুলি বেঙ্গল লাইব্রেরি-সঙ্কলিত মুদ্রিত পুস্তকের তালিকা হইতে গৃহীত।

১। **অবকাশরঞ্জিনী**—১ম ভাগ (খণ্ড কাব্য)। ১লা বৈশাখ ১২৭৮। পৃ. ১৭১।

ইহাই কবির প্রথম গ্রন্থ। ইহার অন্তর্ভুক্ত কবিতাগুলি তাঁহার আঠার হইতে তেইশ বৎসর বয়সের মধ্যে লিখিত।

২। **পলাশির যুদ্ধ** (কাব্য)। ১লা বৈশাখ ১২৮২ [১৫ এপ্রিল ১৮৭৫]। পৃ. ১৭৩+পরিশিষ্ট ৵০।

ইহার একটি 'বিদ্যালয়-পাঠ্য' সংস্করণও প্রকাশিত হইয়াছিল।

৩। **ভারত-উচ্ছ্বাস** (কবিতা)। [২০ ডিসেম্বর ১৮৭৫]। পৃ. ১৩।

ইহা ২য় ভাগ 'অবকাশরঞ্জিনী'র ১২৯৫ সালে প্রকাশিত সংস্করণে পুনর্মুদ্রিত হইয়াছে।

১৮৭৫ খ্রীষ্টাব্দের শেষ ভাগে প্রিন্স অব ওয়েলস্‌ ভারতে আগমন করেন। সেই উপলক্ষে 'ভারত উচ্ছ্বাস' রচিত হয়।

৪। **ক্লিওপেট্রা** (কাব্য)। ১ ভাদ্র ১২৮৪। পৃ. ৫১।

ইহা ১২৯৫ সালে মুদ্রিত 'অবকাশরঞ্জিনী'র ২য় ভাগে পুনর্মুদ্রিত হইয়াছে।

৫। **অবকাশরঞ্জিনী**—২য় খণ্ড। (কাব্য) মাঘ ১২৮৪ [২৯ জানুয়ারি ১৮৭৮]। পৃ. ২২২।

১২৯৫ সালে প্রকাশিত (পৃ. ২৮৭) ইহার একটি সংস্করণে কয়েকটি কবিতা বেশী আছে; সেগুলি—ক্লিওপেট্রা, ভারত-উচ্ছ্বাস, বক্তৃতা ও বিদায়, প্রত্যাখ্যান, কীর্ত্তিনাশা, মেঘনা, একবর্ষ, প্রতিকৃতি, কবির উপহার, নবজীবন, প্রকৃতির গীত।

৬। **রঙ্গমতী**—(কাব্য)। [১৫ জুলাই, ১৮৮০]। পৃ. ২৪৬+।০ শুদ্ধিপত্র।

৭। **রৈবতক** (কাব্য)। ১লা ভাদ্র ১২৯৩ [২ ফেব্রুয়ারি, ১৮৮৭]। পৃ. ৩৮০।

৮। **মার্কণ্ডেয় চণ্ডী** (পদ্যানুবাদ)। [১৩ সেপ্টেম্বর ১৮৮৯]। পৃ. ২০৪।

৯। **শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা** (পদ্যানুবাদ)। [ইং ১৮৮৯]। পৃ. ২২৪।

ইহার আখ্যাপত্রে প্রকাশকাল দেওয়া নাই। নবীনচন্দ্রের 'আমার জীবন' (৪র্থ ভাগ, পৃ. ১৭০-৭১) পাঠে জানা যায়, ১৮৮৯ খ্রীষ্টাব্দের শেষ ভাগে 'শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা' প্রকাশিত হয়। ১৩০০ সালের অগ্রহায়ণ সংখ্যা 'জন্মভূমি'তে ইহা সমালোচিত হইয়াছিল।

১০। **খৃষ্ট** (কাব্য)। ১২৯৭ সাল। [৪ মার্চ্চ ১৮৯১]। পৃ. ৬৭।

"মেথু প্রণীত খৃষ্ট-মাহাত্ম্য হইতে সংক্ষেপে খৃষ্টদেবের সরল ভক্তিপ্রাণ জীবনী ও ধর্ম্ম উদ্ধৃত; কবিতায় অনুবাদিত, করিয়া প্রকাশ করিলাম।"

১১। **প্রবাসের পত্র**—ভারতের ভ্রমণ বৃত্তান্ত। আশ্বিন ১২৯৯। পৃ. ১১৮।

১২। **কুরুক্ষেত্র** (কাব্য)। ৩০ বৈশাখ ১৩০০। পৃ. ৩৪৪।

'কুরুক্ষেত্র' স্বতন্ত্র কাব্য হইলেও ইহার উপাখ্যান-ভাগ কিঞ্চিৎ পরিমাণে 'রৈবতকে'র সঙ্গে গাঁথা। ইহার অনেক চরিত্রের উন্মেষ 'রৈবতকে'। অতএব 'রৈবতক' না পড়িলে 'কুরুক্ষেত্রে'র সম্যক্ কাব্যরস উপলব্ধি হইবে না।

১৩। **অমিতাভ** (কাব্য)। ২৯ আষাঢ় ১৩০২। পৃ. ।৵+২০১।

ইহার বিষয়—বুদ্ধলীলা।

১৪। **প্রভাস** (কাব্য)। [১৭ ডিসেম্বর ১৮৯৬] ?
পৃ. ২৪৫+৬ পরিশিষ্ট।

"রৈবতক কাব্য ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের আদিলীলা, কুরুক্ষেত্র কাব্য মধ্যলীলা, এবং প্রভাস কাব্য অন্তিমলীলা লইয়া রচিত। রৈবতকে কাব্যের উন্মেষ, কুরুক্ষেত্রে বিকাশ, এবং প্রভাসে শেষ।"

১৫। **শুভনির্ম্মাল্য** (নাটিকা)। [২৭ জানুয়ারি ১৯০০]। পৃ. ২০।

চট্টগ্রামে পুত্র নির্ম্মলের বিবাহ উপলক্ষে নবীনচন্দ্র কুমিল্লা হইতে ইহা প্রকাশ করিয়াছিলেন।

১৬। **ভানুমতী** (উপন্যাস)। ২৫ মার্চ্চ ১৯০০। পৃ. ১৭৯।

১৭। **আমার জীবন** (আত্মজীবনী) প্রথম ভাগ। ১৩১৪ সাল। [১২ ফেব্রুয়ারি ১৯০৮] ।পৃ. ২৬২+২ নিবেদন।

দ্বিতীয় ভাগ। শ্রাবণ ১৩১৬। পৃ. ৪২৭।

তৃতীয় ভাগ। অগ্রহায়ণ ১৩১৭। পৃ. ৫১৪।

চতুর্থ ভাগ। চৈত্র ১৩১৮। পৃ. ৪৭৯।

পঞ্চম ভাগ। আশ্বিন ১৩২০। পৃ. ৫২৩।

১৮। **অমৃতাভ**—অগ্রহায়ণ ১৩১৬। পৃ. ২২৪।

ইহাই কবির শেষ কাব্য। 'অমৃতাভ' কাব্যের বিষয় চৈতন্য-লীলা। কবি ইহা অসম্পূর্ণ অবস্থায় (১২শ সর্গ পর্য্যন্ত) লিখিয়া রাখিয়া যান। তাঁহার মৃত্যুর পর হীরেন্দ্রনাথ দত্তের ভূমিকা সহ ইহা প্রকাশিত হয়।

গ্রন্থাবলী—১৩১১ সালে হিতবাদী কার্য্যালয় হইতে 'নবীনচন্দ্রের গ্রন্থাবলী' দুই খণ্ডে প্রকাশিত হয়। 'অমৃতাভ' 'শুভনির্ম্মাল্য', ও 'আমার জীবন' ছাড়া নবীনচন্দ্রের সকল পুস্তকই ইহাতে স্থান পাইয়াছে। পরে বসুমতী-কার্য্যালয় হইতেও নবীনচন্দ্রের গ্রন্থাবলী প্রকাশিত হইয়াছে।

জাহানকোষার জীবন জাগ্রত হ'ল

শ্রীঅপূর্ব্বকৃষ্ণ ভট্টাচার্য্য

ক্লান্তসন্ধ্যা কেঁদে ওঠে দিগন্তের অস্তগিরি হতে
পল্লবের দীর্ঘশ্বাসে জনশূন্য ছায়াচ্ছন্ন পথে
আম্রের মঞ্জরী ঝরে মৃত্তিকায় চৈত্র সমীরণে
অরণ্যের অন্তরালে অশ্রুপ্লুত খোসবাগে তুমি
এ বঙ্গের রাজ্যলক্ষ্মী সুপ্ত কেন সমাধি-ভবনে।
লুৎফুন্নেসা। চেয়ে দেখ সর্ব্বহারা মোর জন্মভূমি।

সমাধি-বন্দনা-দীপ দিনে দিনে প্রজ্জ্বলিত করি',
কুসুম ছড়ায়ে হোথা সিরাজের ছিন্ন বক্ষোপরি
রক্ত অবগুণ্ঠনের প্রান্তে বসি তীব্র আর্তনাদে
বক্ষে তব করাঘাত করিতে যে তমসার মাঝে।
বিরহের সান্ত্বনায় কোন গীতি মৃত সন্ধ্যারাতে
পারে কি ভুলাতে কভু বেদনার স্মৃতি চিররাতে।
পরাধীনা দীপ্তিহীনা কলস্বনা বহে বক্রগতি,
পূর্ব্বগৌরবের গাথা নির্ম্মাল্য করেছে ভাগীরথী।

ছিন্নমূলা ব্রততীর মত আজো হারায়ে নয়ন
লুৎফুন্নেসা। রাজপথে কাঁদে মাতা আমিনা বেগম।
পলাশী প্রান্তরে চলো আর এক বার,—বিদ্যুল্লতা
যাবে দূরে, নবযুগ প্রভাতের শোনো আগমনী।
বিধাতার মহাকাব্যে রচিবে যে অদৃষ্ট-দেবতা
তোমার মুকুটোৎসব ভাবী দিনে আনি জয়ধ্বনি।

আজ তুমি জেগে ওঠ লুৎফুন্নেসা,—জাহানকোষার
জীবন জাগ্রত হ'ল। ঐ শোনো ফকির দানাশার
কৃতঘ্নতা দুর্গে বন্দী, শৃঙ্খলিত মোহাম্মদীবেগ,
মীরজাফরের মৃত্যু ঘনায়ে এসেছে অন্ধকারে।
জয় হিন্দ, জিন্দাবাদ গরজিছে বিপ্লবের মেঘ,
তারুণ্যের কণপ্রভা অন্বেষণ করিছে তোমারে।

মহিলা-সংবাদ

ডক্টর শ্রীমতী রমা চৌধুরী, এম-এ, ডি-ফিল (অক্সন্) রয়্যাল এসিয়াটিক সোসাইটি অব বেঙ্গলের সর্বপ্রথম মহিলা ফেলো নির্বাচিত হইয়াছেন। ডক্টর চৌধুরী কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কৃতী ছাত্রী; তিনি আই-এ পরীক্ষায় দ্বিতীয় স্থান এবং দর্শনশাস্ত্রে বি-এ অনার্স ও এম্-এ পরীক্ষায় প্রথম শ্রেণীতে প্রথম স্থান অধিকার করেন। তিনি লেডী ব্রাবোর্ণ কলেজের দর্শন শাস্ত্রের প্রধান অধ্যাপিকা। ডক্টর চৌধুরী-রচিত নিম্বার্ক দর্শনমূলক তিন খণ্ড দর্শনগ্রন্থ রয়্যাল এসিয়াটিক সোসাইটি অব বেঙ্গল কর্তৃক প্রকাশিত হইয়াছে। তাঁহার রচিত সুফী ও বেদান্তদর্শনমূলক গ্রন্থ সুধীসমাজে বিশেষ সমাদর লাভ করিয়াছে। ডক্টর রমা চৌধুরী ৺আনন্দমোহন বসু মহাশয়ের পৌত্রী এবং প্রেসিডেন্সী কলেজের অধ্যাপক ডক্টর যতীন্দ্রবিমল চৌধুরীর পত্নী।
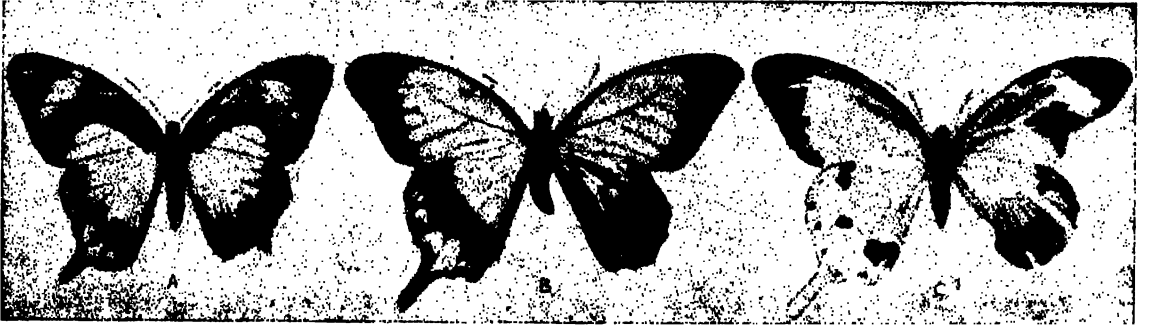
বিভিন্ন জাতীয় প্রজাপতি। একই দেহে স্ত্রী ও পুরুষের আংশিক বৈশিষ্ট্য সম্মিলিত

যৌন-পরিবর্ত্তন

শ্রীগোপালচন্দ্র ভট্টাচার্য্য

গত ৯ই ফেব্রুয়ারী ১৯৪৬ ইউ, পি'র খবরে কলিকাতা মেডিক্যাল কলেজের একটি অদ্ভুত রোগীর কথা প্রকাশিত হইয়াছিল। রোগীটির বয়স চৌদ্দ বৎসর, সে নদীয়া জেলার গ্রামাঞ্চলের এক চাষী পরিবারের ছেলে। ছেলেটির শরীরে নারীত্বের লক্ষণ প্রকাশ পাইতেছে। বিশেষজ্ঞেরা মনে করেন হয়তো শীঘ্রই সে বালিকায় রূপান্তরিত হইয়া যাইবে। তারপর আবার ২২শে মার্চ্চ '৪৬ তারিখে ইউ, পি'র খবরে ময়মনসিংহ জেলায় শ্রীপুর কুমারিয়া গ্রামের অনুরূপ আর একটি ঘটনার কথা প্রকাশিত হইয়াছে। সেখানে সাহেদুল্লা নামক ১৮ বৎসরের একটি মুসলমান যুবক গুরুতর টাইফয়েড রোগ হইতে আরোগ্য লাভের পর তাহার শরীরে নাকি নারীত্বের লক্ষণ ফুটিয়া উঠিতেছে। উক্ত যুবকটি বর্ত্তমানে নান্দিনা চেরিটেবল ডিসপেন্সারীতে চিকিৎসাধীন রহিয়াছে।

ঘটনাগুলি বিস্ময়কর হইলেও অভিনব নহে; কারণ অহরহ না ঘটিলেও এরূপ অদ্ভুত ঘটনার কথা মাঝে মাঝে শুনিতে পাওয়া যায়। অভিনব না হইলেও অহরহ ঘটে না বলিয়াই এরূপ যৌন-পরিবর্ত্তনের ঘটনায় লোকের কৌতূহল ও বিস্ময়ের অন্ত নাই। একটু বিশেষভাবে লক্ষ্য করিলেই দেখা যাইবে প্রকৃতির রাজ্যে ক্ষেত্র বিশেষে যৌন-নিয়ন্ত্রণ, যৌন-পরিবর্ত্তনের ব্যাপারগুলি নিয়মিতভাবেই সংঘটিত হইতেছে। পুরুষ, রাণী ও শ্রমিক—এই তিন শ্রেণীর প্রাণী লইয়া মৌমাছি, পিপীলিকা প্রভৃতির সমাজ গঠিত। শ্রমিকদের সংখ্যাই ইহাদের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা বেশী। পিপীলিকারা বাচ্চাগুলিকে অতি শৈশবাবস্থায় বিভিন্ন পরিমাণে বিশেষ একরকম পদার্থ খাওয়াইয়া পুরুষ অথবা রাণীতে পরিণত করে। এই বিশেষ পদার্থ অতি অল্প মাত্রায় অথবা না খাওয়াইবার ফলেই অবশিষ্ট অধিকাংশ বাচ্চাই শ্রমিকে পরিণত হয়। শ্রমিকেরা না পুরুষ, না স্ত্রী। তবে মোটের উপর ইহাদিগকে অপরিণত স্ত্রী বলা যাইতে পারে। পুরুষ ও রাণীরা কেবলমাত্র প্রজননের উদ্দেশ্যেই জীবনধারণ করে। শ্রমিকরা পুরুষ ও রাণীর সেবা, তাহাদের সন্তান প্রতিপালন এবং সমাজ-রক্ষার জন্য অন্যান্য যাবতীয় কাজে আত্মনিয়োগ করিয়া থাকে। কাজেই সমাজ-রক্ষার প্রয়োজনে পিপীলিকারা সংস্কার বশেই যৌন-নিয়ন্ত্রণ করিয়া বহুসংখ্যক শ্রমিক উৎপাদন করে। রাণীরা আবার যৌন-মিলন না ঘটিলেও ডিম পাড়িতে পারে। এরূপ ডিম হইতে যে বাচ্চা উৎপন্ন হয় তারা সকলেই হয় পুরুষ। মৌমাছিদের সমাজেও স্ত্রী, পুরুষ ও শ্রমিক—এই তিন শ্রেণীর প্রাণী দেখা যায়। চাকের মধ্যে এই তিন শ্রেণীর প্রাণীদের জন্য বিভিন্ন আয়তনের কুঠরি থাকে। মৌমাছিরা রাণীর কুঠরিতে প্রচুর পরিমাণে "রয়েল জেলী" নামে এক প্রকার পদার্থ সঞ্চিত করিয়া রাখে। দেখা গিয়াছে রাণীর কুঠরির বাচ্চা শ্রমিকের কুঠরিতে রাখিয়া দিলে সে রাণী না হইয়া শ্রমিকে পরিণত হয় এবং শ্রমিকের কুঠরির বাচ্চা রাণীর কুঠরিতে রাখিলে সে রাণীরূপেই পরিণতি লাভ করে। ইহা হইতেই দেখা যায়—ডিম হইতে বাচ্চাগুলি স্ত্রী অথবা পুরুষের পার্থক্য লইয়াই জন্মগ্রহণ করে না। হয়ত স্ত্রী ও পুরুষ উভয় বৈশিষ্ট্যই বাচ্চার মধ্যে অন্তর্নিহিত থাকে। বিশেষ কোন খাদ্য প্রভাবেই হউক বা সংশ্লিষ্ট অন্য কোন কারণেই হউক ইহাদের কোন একটি বৈশিষ্ট্য প্রবল হইলেই তাহার বহিঃপ্রকাশ ঘটে। এই অন্তর্নিহিত বৈশিষ্ট্য জৈবস্বত্ব বা ক্রোমোসোম-সংশ্লিষ্ট। নিষিক্ত ডিম প্রথম বিভাজনের সময় এই জৈবস্বত্ব বিপর্য্যস্ত হইলে দেহের অর্দ্ধাংশ স্ত্রী এবং অপরাংশ পুরুষরূপে অথবা অন্য কোন রকমের আংশিক বৈষম্যও আত্মপ্রকাশ করিতে পারে। পিপীলিকা, প্রজাপতি প্রভৃতি প্রাণীদের মধ্যে এরূপ অর্দ্ধাঙ্গ স্ত্রী এবং অর্দ্ধাঙ্গ পুরুষ অথবা আংশিক বিপরীত লক্ষণযুক্ত প্রাণী অনেক দেখিতে পাওয়া যায়। পুত্তলিতে রূপান্তরিত হইবার সময় কোন কোন প্রজাপতির বাচ্চাকে আন্দোলিত করিলে বা কোন রকমে আঘাত দিলে পরিণত অবস্থায় তাহার মধ্যে যুগপৎ স্ত্রী, পুরুষ উভয় বৈশিষ্ট্যই আত্মপ্রকাশ করে।

মানুষের খাত একজাতীয় ঝিনুকের মধ্যে যৌন-সম্পর্কিত এক অদ্ভুত ব্যাপার দেখিতে পাওয়া যায়। যৌবনের প্রারম্ভে
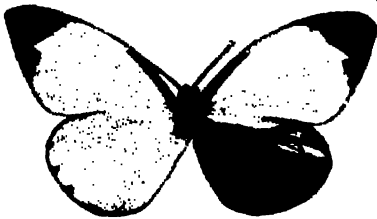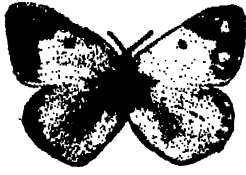
বিভিন্ন জাতীয় প্রজাপতি। একই দেহে স্ত্রী-পুরুষ সম্মিলিত

ইহারা থাকে—পুরুষ, তারপর আবার স্ত্রীতে পরিবর্ত্তিত হয়; এবং সারা বৎসর ধরিয়া নির্দ্দিষ্ট নিয়মে অতি ধীরে ধীরে বাৎসরিক ধারায় এরূপ পরিবর্ত্তন ঘটিতে থাকে। বিভিন্ন উপায়ে ব্যাঙাচির ক্রোমোসোম সংস্থানের বিপর্য্যয় ঘটাইয়া ইচ্ছামত স্ত্রী অথবা পুরুষ ব্যাঙ উৎপাদন করা যাইতে পারে। একটা ব্যাঙ যতগুলি ডিম পাড়ে তাহা হইতে সাধারণতঃ শতকরা ৫০টি স্ত্রী ও ৫০টি পুরুষ ব্যাঙ জন্মগ্রহণ করে। কিন্তু ডিমগুলিকে বেশী জলে না রাখিয়া কেবল ভিজা অবস্থায় রাখিলে তাহার অধিকাংশ হইতে স্ত্রী-ব্যাঙ জন্মগ্রহণ করিয়া থাকে। অতি শৈশবাবস্থায় ব্যাঙাচিকে অম্লাত্মক জল অথবা উচ্চ তাপে রাখিলে তাহা পুরুষ ব্যাঙেই পরিণত হয়। উপযুক্ত সময়ের তিন-চার দিন পর ডিম ছাড়িবার ব্যবস্থা করিলে দেখা যায়—অতিরিক্ত সময় গর্ভাশয়ে অবস্থানের ফলে নিষিক্ত ডিম হইতে কেবল পুরুষ-ব্যাঙই জন্মগ্রহণ করে। অবশ্য নিম্ন স্তরের কীটপতঙ্গের এই সকল ব্যাপারের সহিত মানুষের যৌন-পরিবর্ত্তনের যথেষ্ট পার্থক্য রহিয়াছে। কারণ মানুষের যৌন-ক্রোমোসোমের মত এই জাতীয় প্রাণীদের যৌন-ক্রোমোসোমের মধ্যে পরিস্ফুট কোন পার্থক্য লক্ষিত হয় না। ইহাদের ক্ষেত্রে দেহ-সংগঠন প্রক্রিয়ার সময় স্থানীয় প্রভাবসমূহই বেশী ক্রিয়া করিয়া থাকে।

হাঁস, মুরগী প্রভৃতি গৃহপালিত পাখীদের মধ্যেই বোধ হয় যৌন-পরিবর্ত্তনের ঘটনার প্রাবল্য দেখা যায়। ৪৭২ বৎসর

বামে—মোরগ, ডানদিকে—সব মুরগী। বামে—প্রথমটি সাধারণ মোরগ, দ্বিতীয়টির অণ্ডকোষ কাটিয়া ফেলা হইয়াছে, তৃতীয়টির অণ্ডকোষের পরিবর্ত্তে ডিম্বকোষ বসানো হইয়াছে। ডানদিকে—উপরেরটির ওভারির বদলে অণ্ডকোষ বসানো হইয়াছে।

পূর্ব্বে একটি অদ্ভুত ঘটনার কথা লিপিবদ্ধ আছে। ১৪৭৪ সালে বালে নামক সুইচ টাউনের বিচারালয়ে এক অদ্ভুত মামলার বিচার হইয়াছিল। এই মামলার আসামী ছিল একটা মোরগ। মোরগটির বিরুদ্ধে অভিযোগ ছিল এই যে, পুরুষ হইয়াও সে এক দিন একটা ডিম পাড়িয়া বসে। তখনকার ডাইনী-ডাকিনী প্রভাবাধীন আমলে কোন অস্বাভাবিক বিস্ময়কর ঘটনা ঘটাইলে তাহা গুরুতর অপরাধ বলিয়া গণ্য হইত। কাজেই মোরগটার এই অস্বাভাবিক কাজের জন্য তাহাকে ডাইনী বলিয়া আদালতে অভিযুক্ত করা হয়। এক তরফা হইলেও, আনুষ্ঠানিক বিচারে

মোরগটা দোষী সাব্যস্ত হওয়ায় প্রকাশ্য স্থানে তাহাকে জীবন্ত অবস্থায় পোড়াইয়া মারা হয়। মুরগীর এরূপ যৌন-পরিবর্তনের ব্যাপার অনেকেই লক্ষ্য করিয়াছেন। এক একটা মুরগী বরাবর নিয়মিত ভাবে ডিম পাড়িয়া আসিতেছে—হঠাৎ দেখা গেল সে ডিম পাড়া বন্ধ করিয়া দিয়াছে, মোরগের মতই তাহার মাথায়

প্রথমাবস্থায় এটা ছিল মোরগ। তার পরে মুরগীতে রূপান্তরিত হইয়া যায় এবং ডিম পাড়িতে থাকে

ঝুঁটি গজাইতেছে এবং মোরগের মতই ডাকিতে সুরু করিয়াছে। এমন কি কিছুকাল পরেই সে মুরগীর পিছনে ছুটাছুটি আরম্ভ করিয়া দিয়াছে। অধ্যাপক ক্রু তাঁহার পরীক্ষাধীন তিন বৎসর বয়স্ক একটি মুরগীর কথা বলিয়াছেন। মুরগীটি নিয়মিত ভাবে বরাবর ডিম পাড়িয়া আসিতেছিল। ডিম হইতে তাহার অনেক-গুলি বাচ্চাও হইয়াছিল। হঠাৎ সে ডিম পাড়া বন্ধ করিয়া দেয়। ধীরে ধীরে তাহার ঝুঁটি ও অন্যান্য পুরুষের লক্ষণ প্রকাশ পাইতে থাকে এবং মোরগের মতই ডাকিতে আরম্ভ করে। পরের বৎসরে সে পালক পরিবর্তন করিয়া পুরাপুরি মোরগে রূপান্তরিত হয়। তখন নূতন একটা মুরগীর সঙ্গে তাহাকে এক কুঠরিতে রাখিয়া দেওয়া হয়। কিছুকাল পরে এই পরি-বর্তিত মুরগীটার সহিত যৌন-মিলনের ফলে নূতন মুরগীটা ডিম পাড়ে এবং সেই ডিম হইতে সম্পূর্ণ স্বাভাবিক বাচ্চাও জন্মগ্রহণ করে। পরিবর্তিত মুরগীটার মৃত্যুর পর তাহার শরীর ব্যবচ্ছেদ করিয়া দেখা যায় কোন অদ্ভুত রোগ-প্রভাবে তাহার ওভারি অর্থাৎ ডিম-কোষ প্রায় স্বাভাবিক আকৃতির টেস্টিস্ অর্থাৎ অণ্ড-কোষে রূপান্তরিত হইয়া গিয়াছে। এই গ্রন্থি-নিঃসৃত হর-মোনের প্রভাবেই নির্দিষ্ট স্থানের পেশীতন্তুগুলিও পরিবর্তিত হইয়া গিয়াছিল। পরিবর্তনের কারণ যাহাই হউক না কেন মোটের উপর গরম রক্ত সমন্বিত মেরুদণ্ডী প্রাণীদের মধ্যে শৈশব কিংবা যৌবনে এরূপ যৌন-পরিবর্তন ঘটা মোটেই অসম্ভব নহে।

কেমন করিয়া পুরুষ, স্ত্রীতে অথবা স্ত্রী, পুরুষে পরিবর্তিত হইতে পারে সে কথা বুঝিতে হইলে সাধারণ স্ত্রী ও পুরুষ সন্তানের উৎপত্তি রহস্য সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ আলোচনার প্রয়োজন। প্রত্যেক স্ত্রী ও পুরুষের দেহ-কোষের অভ্যন্তরে অতি সূক্ষ্ম ৪৮টি সূতার মত পদার্থ জোড়ায় জোড়ায় অবস্থান করে। এই পদার্থ-গুলিকে বলা হয় ক্রোমোসোম। এই ২৪ জোড়া ক্রোমো-সোমের সাহায্যে পিতামাতার বৈশিষ্ট্যসমূহ সন্তানে পরিচালিত হইয়া থাকে। এক এক জোড়ায় যে দুইটি করিয়া ক্রোমোসোম থাকে সেগুলি সর্বাংশে প্রায় একই রকমের। পুরুষের ২৪ জোড়া ক্রোমোসোমের মধ্যে এক জোড়া কেবল বিসদৃশ। এই কারণে পুরুষের ক্রোমোসোমকে বলা হয় XY; কিন্তু স্ত্রী-দের ২৪ জোড়া ক্রোমোসোমের কোনটাতেই বৈসাদৃশ্য নাই। কাজেই এইগুলিকে বলা হয় XX. "রিডাক্‌সন্ ডিভিসনের" প্রক্রিয়ায় যৌন-ক্রোমোসোম পৃথকীকৃত হয়। এই যৌন-ক্রোমোসোম বিভাজনের সময় পুরুষের শুক্রকীটের ৫০ ভাগের মধ্যে যায় X আর বাকী ৫০ ভাগের মধ্যে যায় Y. স্ত্রীদের ওভারি হইতে যে ডিম নিঃসৃত হয় তাহাদের প্রত্যেকের মধ্যেই X যৌন-ক্রোমোসোম থাকে। কারণ তাহাদের সাধারণ এবং যৌন ক্রোমোসোম সবগুলিই XX. কাজেই দেখা যায়—যৌন-মিলনের পর যদি X শুক্রকীট স্ত্রী ডিমের মধ্যে প্রবেশ করে তবে সন্তান হইবে স্ত্রী। আর যদি Y শুক্রকীট স্ত্রী ডিমে প্রবেশ করিতে পারে তবে সন্তান হইবে পুরুষ। কিন্তু ক্রোমোসোম কর্তৃক স্ত্রী বা পুরুষ বৈশিষ্ট্য নির্ধারিত হইয়া গেলে মানুষ যখন ভ্রূণরূপে আত্মপ্রকাশ করে তখন তাহাকে স্ত্রী ও বলা যায় না বা পুরুষও বলা যায় না। তাহাতে উভয় অঙ্গেরই

সাড়ে-তিন বছরের বালিকা। কিন্তু ইহার পুরুষের মত দাড়িগোঁফ বাহির হইয়াছে

প্রাথমিক চিহ্ন বর্তমান থাকে। এই হিসাবে প্রকৃত প্রস্তাবে তাহাকে Hermaphrodite অর্থাৎ দ্বি-লিঙ্গী বা উভ-লিঙ্গী বলা যাইতে পারে। অর্থাৎ ভ্রূণ স্ত্রীও বটে পুরুষও বটে। যৌন-যন্ত্র প্রথমে এক জোড়া গোনাড (Gonad) রূপে আত্মপ্রকাশ করে। এই গোনাডই পরিশেষে ডিম-কোষ বা অণ্ডকোষে পরিণত হয়। গোনাড যদি অণ্ডকোষে পরিণত হয় তবে পুং জননেন্দ্রিয় ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইতে থাকে এবং স্ত্রী জননেন্দ্রিয় অপরিণত অবস্থায়ই থাকিয়া যায়। গোনাড ডিম-কোষে পরিণত হইলে স্ত্রী-জননেন্দ্রিয় পরিপুষ্টি লাভ করে আর পুং-জননেন্দ্রিয় অপুষ্ট অবস্থায় রহিয়া যায়। কাজেই অস্পষ্ট বা অপরিণত হইলেও পুরুষ-দেহে স্ত্রী-লক্ষণ এবং স্ত্রী-দেহে পুরুষ-লক্ষণ বিদ্যমান থাকে। টেস্টিস্ এবং ওভারি হইতে হরমোন নামে এক প্রকার যৌন-রস নিঃসৃত হয়। এই রসই যৌন-যন্ত্রের বৃদ্ধি এবং যৌন-ক্রিয়ার পরিপোষক। টেস্টিস্-নিঃসৃত রসের আধিক্য হইলে পুং-জননেন্দ্রিয় এবং ওভারি-নিঃসৃত রসের আধিক্যে স্ত্রী-জননেন্দ্রিয় প্রাধান্য লাভ করে। টিস্যাক এবং

অপরাপর বিশিষ্ট বৈজ্ঞানিকেরা বিভিন্ন জীব-জন্তুর উপর বহুবিধ পরীক্ষা করিয়া এ বিষয় সুস্পষ্টভাবে প্রমাণিত করিয়াছেন।

এ বিষয়ে পরীক্ষার ব্যাপারে স্টিন্যাকই ছিলেন প্রথম পথ-প্রদর্শক। বহু রকমের বাদ-প্রতিবাদ সত্ত্বেও স্টিন্যাকের পরীক্ষার ফলসমূহ আজ পর্য্যন্ত নির্ভুল বলিয়াই প্রমাণিত হইয়াছে। অস্ত্রোপচারে তিনি বাচ্চা গিনিপিগের টেষ্টিস্ অপসরণ করিয়া দেখিলেন, সে সম্পূর্ণরূপে নপুংসকত্ব প্রাপ্ত হয়। গিনিপিগটা অস্ত্রোপচারের পর পুরুষের মতই বর্দ্ধিত হয় বটে, কিন্তু তাহার পুরুষত্বব্যঞ্জক যাবতীয় প্রবৃত্তি লোপ পায়। কিন্তু ঐরূপ অস্ত্রোপচারের সময় যদি স্ত্রী-গিনিপিগের ওভারি কাটিয়া লইয়া সে স্থলে জুড়িয়া দেওয়া যায় তাহা হইলে সে স্ত্রী-গিনিপিগরূপেই বর্দ্ধিত হইতে থাকে। মূলতঃ পুরুষ হইলেও এ অবস্থায় তাহার আচার-ব্যবহার সম্পূর্ণ বদলাইয়া যায় এবং স্ত্রী-লক্ষণসমূহ আত্মপ্রকাশ করে। যথাসময়ে স্তনপরিপুষ্ট হয় এবং রীতিমত দুগ্ধ ক্ষরণ হইয়া থাকে। অন্ত কাহারও বাচ্চা কাছে দিলে মায়ের মতই তাহাকে দুগ্ধ পান করায়। পুরুষ হইতে স্ত্রীতে পরিবর্ত্তিত এরূপ প্রাণীরা অবশ্য সন্তান প্রসব করিতে পারে না। কারণ আভ্যন্তরীণ অঙ্গপ্রত্যঙ্গ পূর্ব্ব হইতেই যেভাবে গঠিত হইয়াছে তাহার সম্পূর্ণ পরিবর্ত্তন সম্ভব নয়।
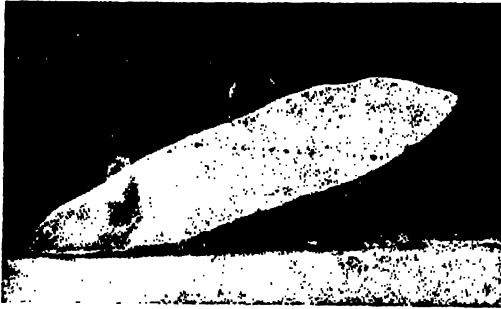
অ্যাক্সলোটল—এরূপ আকৃতি লইয়াই ইহারা বরাবর জলের মধ্যে বিচরণ করিয়া থাকে

অনুরূপ পরীক্ষার প্রত্যেক ক্ষেত্রেই মুরগীকে মোরগে এবং মোরগকে মুরগীতে পরিণত করা সম্ভব হইয়াছে। এমন কি মুরগীর দেহে যে কোন স্থানে মোরগের টেষ্টিস্ সংলগ্ন করিয়া দেখা গিয়াছে—তাহার ফলে তাহার আকৃতি-প্রকৃতি মোরগের মতই হইয়া যায়। গিনিপিগের দেহে ওভারি এবং টেষ্টিস্ উভয়ই সংযোগ করিয়া স্টিনাক আশ্চর্য্য ফললাভ করিয়াছেন। উভয় গ্রন্থি একই শরীরে সংযোজনের ফলে প্রাণীটা কিছুকাল স্ত্রী এবং কিছুকাল পুরুষের ন্যায় ব্যবহার করিতে থাকে। অস্ত্র বিদ্যায় কিছু নৈপুণ্য থাকিলে যে কেহ এই রকমের—পরীক্ষায় পুরুষকে স্ত্রী এবং স্ত্রীকে পুরুষে রূপান্তরিত করিতে পারেন।

বৈজ্ঞানিক যুক্তিবলে মানুষ যেমন স্ত্রীকে পুরুষ এবং পুরুষকে স্ত্রীতে রূপান্তরিত করিতে পারে, প্রকৃতিও যেন সেরূপ মাঝে মাঝে খেয়ালখুশীমত দুই-একটা পরীক্ষা করিয়া আমাদিগকে তাক্ লাগাইয়া দেন। বালক, বালিকায় অথবা বালিকা, বালকে পরিবর্ত্তিত হইয়া গিয়াছে—বৈজ্ঞানিক উপায়ে পরীক্ষিত এরূপ প্রায় দুই হাজারেরও বেশী ঘটনার বিবরণ প্রামাণিক গ্রন্থাদিতে লিপিবদ্ধ আছে। আমাদের দেশেও বর্ত্তমান ঘটনা ছাড়া এই ধরণের অন্যান্য বিবরণ সাময়িক পত্রাদিতে মাঝে মাঝে প্রকাশিত

থাইরক্সিন প্রয়োগে জলচর অ্যাক্সলোটল স্থলচর গিরগিটিতে রূপান্তরিত হইয়াছে

হইয়াছে। ইহাদের অধিকাংশ ক্ষেত্রেই পরীক্ষার ফলে দেখা গিয়াছে, বাহ্যিক যাবতীয় লক্ষণ হিসাবে সুস্পষ্ট ভাবেই তাহারা ছিল বালক অথবা বালিকা। কিন্তু এরূপ বালিকাদের শরীরের অভ্যন্তরে টেষ্টিস্ এবং বালকদের তলপেটে ওভারি লুক্কায়িত ছিল। পরে কোন কারণে দেহাভ্যন্তরের টেষ্টিস্ বা ওভারি হইতে নিঃসৃত হরমোনের প্রভাব বৃদ্ধি পাওয়ার ফলেই এরূপ যৌন-পরিবর্ত্তন সংঘটিত হইয়াছিল।

এ ছাড়া অনেক সময় স্ত্রীদের গোঁফ, পুরুষের উন্নত বক্ষ, মেয়েদের পুরুষোচিত স্বভাব বা পুরুষের মেয়েলি স্বভাব প্রভৃতি বহু রকমের ব্যাপার দেখিতে পাওয়া যায়। রক্তের মধ্যে আংশিক ভাবে বিপরীত প্রকৃতির হরমোন নিঃস্রাবের ফলেই হয়তো এরূপ ব্যাপার ঘটিয়া থাকে।

কলিকাতা মেডিক্যাল কলেজ ও মানিকা চেরিটেবল ডিস্পেন্সারীর রোগী দুইটির ক্ষেত্রেও হয়তো অনুরূপ ঘটনাই ঘটিয়াছে। বিভিন্ন কারণে সুপ্ত গ্রন্থি সক্রিয় হইয়া উঠিতে পারে অথবা নিঃসৃত হরমোনের হ্রাসবৃদ্ধি ঘটিতে পারে। তাহার ফলে এরূপ পরিবর্ত্তন ঘটা কিছুমাত্র আশ্চর্য্য নহে। মেক্সিকোর অ্যাক্সোলোটল নামক প্রাণীদের কথা বোধ হয় অনেকেই

প্রথমটি—পুং গিনিপিগ, ২য়—স্ত্রী, ৩য়—স্ত্রী-জন্মের পরেই ইহার ওভারি কাটিয়া দেওয়া হয়। এর কোন যৌন আকাঙ্ক্ষা নাই। ৪র্থ স্ত্রী, কিন্তু ইহার ওভারি কাটিয়া অণ্ডকোষ বসানো হইয়াছে। ফলে এটি সম্পূর্ণরূপে পুরুষে পরিবর্ত্তিত হইয়াছে।

জন্মিয়াছেন। ইহারা জলচর জীব। বংশানুক্রমে জলেই বিচরণ করিয়া আসিতেছে। একমাত্রা থাইরক্সিন খাওয়াইয়া দিলেই—ইহারা স্থলচর সিরসিটি জাতীয় প্রাণীতে পরিবর্ত্তিত হইয়া যায়। আলোচ্য রোগী দুইটির দেহাভ্যন্তরে হয়তো ডিম্ব-কোষ লুক্কায়িত রহিয়াছে। এতদিন পর্য্যন্ত তাহাদের টেস্টিস্-নিঃসৃত হরমোনের প্রভাবে পুরুষের যাবতীয় লক্ষণই প্রকাশ পাইয়াছিল। কোন বিশেষ রোগ বা খাদ্য, তাপ, আলোক প্রভৃতি পারিপার্শ্বিক অবস্থা পরিবর্ত্তন-জনিত প্রভাবে অথবা কোন আকস্মিক আঘাতের ফলে এখন তাহাদের ওভারি বিশেষ-ভাবে কার্য্যকরী হইয়া উঠিয়াছে এবং তাহা হইতে নিঃসৃত হরমোনের আধিক্যে স্ত্রী-লক্ষণসমূহ প্রকাশ পাওয়া মোটেই বিচিত্র নহে।

আমেরিকার বাণিজ্য-সরণী মিসিসিপি নদী

শ্রীনলিনীকুমার ভদ্র

পূর্ব্বে আপলাচিয়ান পর্ব্বত এবং পশ্চিমে রকি পর্ব্বতের মধ্যবর্ত্তী সমগ্র যুক্তরাষ্ট্রের বিস্তীর্ণ ভূভাগের ভিতর দিয়া যে সমস্ত নদী প্রবহমান তন্মধ্যে মিসিসিপিই প্রধান। উপনদীসমূহ লইয়া ইহাই সমগ্র পৃথিবীর মধ্যে দেশাভ্যন্তরস্থ, (inland) বৃহত্তম জল-পথ। এই বিশাল জলস্রোত ২৪৫৩ মাইল অতিক্রম করিয়া সমুদ্রে গিয়া পড়িয়াছে। ইহার বুকের উপর দিয়া তেল,

ভিক্সবুর্গের নিকটে কোনো জলপথ-পরীক্ষণ ষ্টেশনে মিসিসিপি নদীর একটি মডেলের একাংশ

ময়দা, শস্য, সয়াবীন, চিনি, কফি, চাল ইত্যাদি খাদ্য-সম্ভার এবং ইস্পাত, গন্ধক, লোহা প্রভৃতি দেশের সম্পদ ও লরহি বৃদ্ধির উপকরণাদিতে বোঝাই জাহাজসমূহ অনবরত যাতায়াত করিয়া থাকে।

উত্তর যুক্তরাষ্ট্রের মিনেসোটা ষ্টেটের একটি তুষার-হ্রদ মিসিসিপি নদীর উৎপত্তি-স্থান। ১৫৪২ খ্রীষ্টাব্দে ডি সটো নামক জনৈক স্পেনীয় কর্ত্তৃক মার্কিন জনপদের ভিতর দিয়া প্রবাহিত উক্ত নদীর জলধারা প্রথম আবিষ্কৃত হয়। মিসৌরী, ওহিও প্রভৃতি চল্লিশটি উপনদী সম্বলিত মিসিসিপি নদীর জল-পথের বিস্তৃতি ১৫,০০০ মাইল—এই সুদীর্ঘ জলপথের সমস্তটাই বাণিজ্য ব্যপদেশে নৌ-বহর চলাচলের পক্ষে সম্পূর্ণ উপযোগী। যুদ্ধের সময় মিসিসিপি নদীপথে মিত্রপক্ষের বিশেষ কর্ম্মতৎপর-তার সাড়া পড়িয়া গিয়াছিল। ইহার উপর দিয়া বাণিজ্য নৌ-বহরের চলাচলের তো বিরাম ছিলই না, তদুপরি রণতরী এবং ল্যাণ্ডিং ক্রাফ্ট সমূহ অনবরত নদীর বুকে ভাসিয়া বেড়াইত।

মিসিসিপি বক্ষে ভাসমান অগণিত বাষ্পীয় তরীর (steam-boat) সমাবেশে যে বিচিত্র সৌন্দর্য্যের সৃষ্টি হইত সম্প্রতি তাহা আর দৃশ্যমান হয় না বটে; কিন্তু উত্তরে কানাডার সীমা-রেখা হইতে দক্ষিণে মেক্সিকো উপসাগর পর্য্যন্ত প্রসারিত, উর্ব্বর মিসিসিপি উপত্যকার ভিতর দিয়া প্রবহমান এই নদীটির উভয় তীরে আজও দৃশ্য-বৈচিত্র্যের অন্ত নাই। উত্তর অঞ্চলের মিনে-সোটা ষ্টেটে মিসিসিপি বিরাট্ শিল্প-নগরী মিনিপলিসকে পিছনে ফেলিয়া সুদূরপ্রসারিত গোধূমক্ষেত্রের ভিতর দিয়া বহিয়া চলিয়াছে। তৎপরে আরো একটু দক্ষিণবাহিনী হইয়া ইহা 'টম সয়ের' এবং 'হাকলবেরি ফিন' নামক গ্রন্থদ্বয়ের বিশ্ববিখ্যাত লেখক, হাস্যরসস্রষ্টা মার্ক টোয়েনের (সামুয়েল ক্লেমেন্স) আদি নিবাস হানিবল, মিসৌরীর সমতল ক্ষেত্রকে আসিয়া চুম্বন করিয়াছে। "লাইফ অন দি মিসিসিপি" (মিসিসিপি নদী-বক্ষে নামক আর একখানি পুস্তক মার্ক টোয়েনের শ্রেষ্ঠ গ্রন্থ-সমূহের অন্যতম। তাহাতে নদীপথে তাঁহার অভিযান-কাহিনীর চিত্তাকর্ষক বর্ণনা আছে।

মিসিসিপি নদীজলধারাপুষ্ট উইস্কনসিন ষ্টেটের সুন্দর গোচারণভূমিসমূহ নয়নানন্দকর। ইহার নিম্নভাগস্থ অঞ্চল শস্যশ্যামল, তাহার পরেই সুরু হইয়াছে সুবিস্তৃত তামাকের ক্ষেত। তাম্রকূট উৎপাদনে এই অঞ্চলই সমগ্র পৃথিবীতে শীর্ষ-স্থান অধিকার করিয়া আছে। তামাকের ক্ষেতের দক্ষিণে বিস্তীর্ণ ভূভাগে বিপুল পরিমাণে তুলা উৎপন্ন হয়। নদীটি ক্রমশঃ প্রশস্ততর হইয়া নিম্ন-উপত্যকার পরিপুষ্ট ঘনসবুজ বেতসবন এবং হরিদ্বর্ণ ধান্য-ক্ষেত্রের ভিতর দিয়া শান্ত ভাবে বহিয়া চলিয়াছে। মেক্সিকো উপসাগরের পথে ইহা জলাভূমিপরিপূর্ণ পলিমাটি-

পড়া সমতলক্ষেত্রের উপর দিয়া প্রবহমান। এই অঞ্চলে প্রচুর মাছ পাওয়া যায়।

মেক্সিকো উপসাগরের ১০৭ মাইল উত্তরে বিখ্যাত নিউ অরলিয়েন্স বন্দরের নীচে মিসিসিপি দুই তটভূমিকে প্লাবিত করিয়া প্রবাহিত। প্রচুর তলানি পড়িয়া প্রতি বৎসর এই অঞ্চলে নদীর উভয় পার্শ্বে পলিমাটিপূর্ণ উর্ব্বরাভূমি সৃষ্টি হইতেছে। এই বিরাট্ নদীতে জলযান-চলাচল-ব্যবস্থাকে চালু রাখিবার জন্য সরকার প্রতি বৎসর চল্লিশ লক্ষ ডলার খরচ করিয়া থাকেন।

১৮১২ খ্রীষ্টাব্দে প্রথম বাষ্পীয়-তরীর (Steamboat) আবির্ভাবের সঙ্গে সঙ্গেই মিসিসিপি উপত্যকার রুদ্ধদ্বার উদ্ঘাটিত হইয়া বহির্জগতের সঙ্গে ইহার ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক স্থাপিত হইল। উক্ত জলযানসমূহ তখন প্রবল স্রোতের অনুকূল এবং প্রতিকূল উভয় দিকেই চলাচল করিতে পারিত। ফলে উৎপন্ন দ্রব্যসমূহ সত্বর বন্দরে বিভিন্ন স্থানের গঞ্জগুলিতে চালান দেওয়া সম্ভব হইত। চালানী কারবারের মালিকেরা প্রচুর অর্থ লাভ করিয়া বিলাসোপকরণে সুসজ্জিত যাত্রী জাহাজে চড়িয়া নদীবক্ষে বিহারপূর্ব্বক আনন্দ উপভোগ করিত। প্রদর্শন-তরণীসমূহে (Show-boat) অনুষ্ঠিত নাট্যাভিনয় গ্রামবাসীদের চিত্তে পুলকসঞ্চার করিত। মাঝে মাঝে প্রতিদ্বন্দ্বী কাপ্তেনগণ প্যাকেট জাহাজ চালনার প্রতিযোগিতায় প্রবৃত্ত হইতেন।

মিসিসিপির এই গৌরবময় যুগের অবসান হইল রেলপথের প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে। কিন্তু বাণিজ্যিক ব্যাপারে এই নদীর গুরুত্ব যে কতদূর তাহা সুস্পষ্ট রূপে উপলব্ধি হইল প্রথম মহাযুদ্ধে (১৯১৪-১৮)—কেননা তখন রেল ষ্টেশনসমূহে স্তূপীকৃত বহু টন সমরোপকরণ মিসিসিপি নদীপথে যথাস্থানে প্রেরণ করিবার ব্যবস্থা অবলম্বিত হওয়ায় মাল-সরবরাহ সম্পর্কিত গুরুতর সমস্যার সমাধান সম্ভবপর হইয়াছিল। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে এই নদীর গুরুত্ব আরও বেশী করিয়া উপলব্ধি করা গিয়াছে। যুদ্ধকালে প্রতি বৎসর লক্ষাধিক টনেরও অধিক পরিমাণ মালপত্র ষ্টীমার-চালিত ইস্পাতের বজরায় করিয়া, পৃথিবীর সর্ব্বত্র বিভিন্ন স্থানে পাঠানো হইয়াছিল, তন্মধ্যে অধিকাংশই ব্যবহৃত হইয়াছিল মিত্রশক্তির ভিন্ন ভিন্ন রণাঙ্গনে।

মিসিসিপি নদী মাতৃস্নেহে আমেরিকাবাসীদিগকে প্রতিপালন করিতেছে, তাহাদের জীবনও 'নদীর পালিত জীবন'।

বস্ত্র রেশনিং ও বাঙালী সংসার

জনৈকা বাঙালী গৃহিণী

অন্নসমস্যা কিছুদিন যাবৎ আমাদের এমন বিব্রত করিয়া রাখিয়াছে যে বস্ত্রসমস্যার কথা প্রায় ভুলিতে বসিয়াছিলাম। বিশেষতঃ কুপনগুলি সংগ্রহ করা হইয়াছে, এখন সুবিধা-মত এক এক করিয়া আত্মীয়-পরিজনের বস্ত্র ক্রয় করা চলিবে ইহাই ছিল ধারণা। কিন্তু কয়েকদিন আগেকার সরকারী বিজ্ঞপ্তি আমাদের সচকিত ও উদ্বিগ্ন করিয়া তুলিয়াছে।

বাংলাদেশে জনপিছু কুড়ি গজ কাপড় বরাদ্দ হইয়াছে। আবার শিশুদের (বার বৎসরের নিম্নবয়স্ক) জন্য ইহার অর্দ্ধেক মাত্র বরাদ্দ। এই সামান্য বরাদ্দ হইতেও আবার প্রথম কোয়ার্টারের কুপনগুলি বাতিল হইয়া যাইবে, যদি না জুন মাসের মধ্যে কাপড় ক্রয় করা হয়। এই ব্যবস্থার কথা শুনিলে হঠাৎ মনে হইতে পারে যে ইহার মধ্যে অসঙ্গতি কি আছে? যে কাপড় ছয় মাস না কিনিয়াও পরিবারের প্রয়োজন মিটিল, তাহা সপ্তম মাসে আর কেন প্রয়োজন হইবে? সুতরাং এক কোয়ার্টারের পাঁচ গজ কাপড় বাতিল হইলে ক্ষতি কি?

ক্ষতি যে কি, এবং দরিদ্র পরিবারের পক্ষে তাহার ফলাফল যে কিরূপ শোচনীয় তাহা যাঁহারা বাংলাদেশের নিম্ন-মধ্যবিত্ত ও মধ্যবিত্ত পরিবারের জীবনযাত্রা-প্রণালী তলাইয়া না দেখিয়াছেন তাঁহারা বুঝিতে পারিবেন না। আর, এই যুদ্ধের পরোক্ষ প্রভাবে, এই মুদ্রা-স্ফীতির ফলে এবং সর্ব্বোপরি খাদ্য ও বস্ত্র-রেশন ব্যবস্থা হইয়া অবধি এই শ্রেণীর আবাল-বৃদ্ধ-বনিতাকে যে প্রকার দুর্গতির ভিতর দিয়া কাল কাটাইতে হইতেছে তাহা বলিয়া শেষ করা যায় না, ইহার উপর আবার তাহাদের ঘাড়ে নূতন করিয়া বোঝা চাপানো কিছুতেই সঙ্গত বলিয়া মনে হয় না।

ইংরেজী বৎসরের গোড়ার দিক হইতেই হিসাব করিয়া দেখা যাক যে, দরিদ্র বাঙালী প্রত্যেক মাসের আয়ের দ্বারা কি ভাবে তাহার গ্রাসাচ্ছাদনের ব্যয় নির্ব্বাহ করে। এ সম্বন্ধে আলোচনার ফলে বৎসরের কোন্ সময়ে বাঙালী গৃহস্থের পক্ষে পরিবারস্থ লোকদের জন্য নগদ মূল্যে বস্ত্র ক্রয় সম্ভবপর হয় তাহাও বুঝিতে পারা যাইবে।

যাঁহারা সরকারী কর্ম্মচারী হিসাবে অল্প মূল্যে সরকারী খাদ্য-রেশন পান, তাঁহাদের পরিবারস্থ লোকসংখ্যা যতই হোক্ না কেন, চারি জনের অধিক আত্মীয়-পরিজন এক পরিবারভুক্ত বলিয়া ধরা হয় না। কিন্তু বাঙালীর সংসারে আত্মীয়স্বজন-বর্জ্জিত এই চুলচেরা হিসাব মানিয়া চলা একান্তই অসম্ভব। ভরসা করি সরকারী নির্দ্দেশ অনুসরণ করিতে গিয়া বাঙালী কোনও দিন পিতামাতা ও ভ্রাতা ভগিনীদিগের প্রতি দায়িত্বজ্ঞানহীনতার পরিচয় দিবে না। যাই হোক্, ধরা করিয়াই ধরিয়া লইলাম এক এক জন উপার্জ্জনক্ষম ব্যক্তি অন্ততঃ ছয়-সাত জন পোষ্য প্রতিপালন করেন।

জানুয়ারী মাসে ছেলেমেয়েরা পরীক্ষায় প্রমোশন পাইয়া উপরের শ্রেণীতে উঠে, কাহাকেও বা স্কুলে ভর্ত্তি করিতে হয় এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষার্থী যদি কোন ছেলে থাকে তবে ত কথাই নাই। তাহার বই কেনা, ফিস দেওয়া, নূতন খাতাপত্রের ব্যবস্থা করা ইত্যাদির দরুণই পিতা বা অভিভাবকের হাত

খালি হইয়া যায়। তখন তাঁহাদিগকে পরবর্তী মাসের প্রতীক্ষায় থাকিতে হয়, কখন আবার হাতে নগদ টাকা আসিবে। শুধু চাকুরীজীবীরই নহে, উকীল, মোক্তার, ডাক্তার, দোকানদার সকলেরই জানুয়ারী মাসে এক অবস্থা। এ মাসে কাহারও নূতন কাপড় কেনার কথা উঠিতেই পারে না।

ফেব্রুয়ারী মাসেও নূতন খাতা এবং বইয়ের জের কিছু চলে। পরীক্ষার্থীর কোচিং ক্লাস বা গৃহ-শিক্ষকের মাহিনা (সারাবৎসর রাখা চলে না, তবে পাস করাইবার জন্য তিন মাস রাখিতে হয়) দিতে হয়, সরস্বতী পূজার চাঁদা দান করিয়া হোক বা অন্য রকমে হোক, কিছু খরচ হয়। এ মাসে স্কুলের পড়ুয়া ছেলেমেয়ের এক একটা জামা না হইলেই নয়, তাহাদের বরাদ্দ দশ গজের মধ্যে হয়ত পাঁচ গজ বহু কষ্টে কেনা হইল। অনেক হিসাব করিয়া কাটিয়া-ছাঁটিয়া তদ্দ্বারা একটা ফ্রক, একটা সার্ট ও একটা পাজামাও হয়ত হইল।

মার্চ্চ মাসে কোনও বাড়্তি খরচই সম্ভব নহে। চৈত্র মাসে দালভাবামি হইবে। লোকে বার দের বলিয়াই ত আমরা শ্রেণীর ভাগই ভদ্রতা বজায় রাখিয়া টিকিয়া আছি, উত্তমর্ণকে নূতন খাতার আগে কিছু দিতেই হইবে। মুদী, গোয়ালা কেহই ছাড়িবে না, সুতরাং এ মাসেও কাহারও জন্য বস্ত্র ক্রয় করা সম্ভব নহে।

এপ্রিল মাসে কলেজগামী ভ্রাতা বা পুত্রের কলেজের পুরা দুই মাসের মাহিনা দিয়া হাতে উদ্বৃত্ত কিছু থাকে না। মে মাসেও একই অবস্থা, পুত্রকন্যার দুই মাসের স্কুলের মাহিনা একসঙ্গে দিতে হয়, তাহার উপর বৈশাখ জ্যৈষ্ঠ মাসে যদি কোনও নিকট-আত্মীয়ের পুত্রকন্যার বিবাহ থাকে, তাহা হইলে ত ঋণগ্রস্ত হওয়া ছাড়া উপায় নাই। আমাদের মধ্যবিত্ত সমাজের এমন অবস্থা যে, আমরা প্রাণ অপেক্ষা মান বাঁচাইতে বেশী ব্যস্ত। যাহাতে আমাদের অবস্থার স্বরূপ কেহ বুঝিতে না পারে, তাহার জন্য আমাদের প্রয়াসের অন্ত নাই। এইরূপে মে মাস পর্য্যন্ত কাটে।

জুন মাসে প্রথম, নির্দ্দিষ্ট আয়ের সাধারণ শিক্ষিত বাঙালী পরিবারের পক্ষে দুই-এক জোড়া কাপড় কিনিবার সামর্থ্য হয়। হয়ত এ মাসে দশ-পনর টাকার অধিক ব্যয় করিবার সাধ্য নাই, কিন্তু এই মাসের মধ্যে যদি প্রথম কোয়ার্টারের সব কুপনগুলি না ব্যবহার করা হয় তবে তাহা বাতিল বলিয়া গণ্য হইবে। পরিবারে যদি ছয় জন লোকও থাকে, তিন জন বয়স্ক, তিন জন শিশু, তাহা হইলেও তিনখানা কাপড় ও সাড়ে সাত গজ ছিট, এক মাসেই একসঙ্গে কেনা কাহারও সামর্থ্যে কুলাইবে না। আমাদের যতদূর অভিজ্ঞতা, তাহাতে দেখিয়াছি যে, চাকুরীজীবী মধ্যবিত্ত ও নিম্ন-মধ্যবিত্ত বাঙালী-সম্প্রদায় অল্পে অল্পে জুন জুলাই আগস্ট ও সেপ্টেম্বরেই যাহা কিছু পরিধেয় বস্ত্রাদি ক্রয় করেন। পূজার সময়ে ক্রেতার সংখ্যা সর্ব্বাপেক্ষা অধিক এবং পূজার পর হইতে পরবর্তী জুন পর্য্যন্ত আবার বস্ত্রের দোকানের সঙ্গে বাঙালী পরিবারের বিশেষ সম্পর্ক থাকে না।

খাদ্য রেশনে এক সপ্তাহ রেশন না লইলে পরবর্তী সপ্তাহে তাহা লওয়া চলে না, তাহা বুঝি, ডবল খাওয়া ত সম্ভব নয়। কিন্তু ছয় মাস ধৈর্য্যের সহিত ছিন্নবস্ত্র সেলাই করিয়া পরিয়া যেই নববস্ত্র কিনিবার ক্ষমতা হইল, অমনি তাহা পাওয়া যাইবে না, এ কেমন কথা? যখন মোট প্রাপ্য কুড়ি গজই, (মফস্বলে ইহা অপেক্ষা কম) তখন বৎসরের যখন ইচ্ছা ক্রেতা কিনিবে, তাহাতে বস্ত্র-রেশন বিভাগের আপত্তির কারণ কি? নগদ মূল্য দিয়া জিনিস কেনা হইবে, ধারাকের অভিরিক্তও নহে, ইহা হইতে জনসাধারণকে বঞ্চিত করিবার কারণ আমরা বুঝিতে পারি না।

কলিকাতা ভিন্ন অন্যান্য মফস্বল শহরে যে যে স্থানে রেশনিং চালু হইয়াছে, সেখানে এখনও ক্লথ-কোটার বিতরণ করা হয় নাই, লোকে কুপনও পায় নাই। জনসাধারণও জানে না যে তাহারা বাস্তবিক কত গজ কাপড় বৎসরে পাইবে,- কর্ত্তৃপক্ষও সে বিষয়ে স্পষ্ট করিয়া কিছু বলিতে পারেন না। কাগজে দেখা যায় বিশ গজ, কর্ত্তৃপক্ষ বলেন, বোধ হয় বার গজ এবং যাঁহারা অত্যুৎসাহী,—নিজেরা বিশেষ ভাবে উদ্যোগী হইয়া দরখাস্ত করিয়া কুপন পাইয়াছেন, তাঁহারা বলেন, একটা করিয়া কুপন (৫ গজ বা এক জোড়া কাপড়) ত পাইয়াছি, আর পাইব কি না জানি না।" দুই-তিনটি মফস্বল শহরের কথা জানি, যেখানে গত বৎসর মার্চ্চ মাস (১৯৪৫) হইতে এই মার্চ্চ পর্য্যন্ত এই একই অবস্থা রহিয়াছে। কেহই জানে না, কত গজ পাইবে, কোথায় পাইবে, কাহার কাছে দরবার করিলে সহজে একজোড়া কাপড়ের কুপন মিলিবে। কত পল্লী-বাসিনীর কথা জানি যাঁহারা শহরে আসিয়া খই মুড়ি ভাজিয়া বা ধান ভানিয়া জীবিকার্জ্জন করিতেন আজ বস্ত্রাভাবে তাঁহাদের রোজগারের পথ বন্ধ হইবার উপক্রম হইয়াছে। কাপড়ের টিকিট করিয়া দিবার জন্য তাহাদের কাকুতি-মিনতি শুনিয়া বিচলিত হইয়াছি। রেশন-কার্ড আছে কিনা জিজ্ঞাসা করিয়া জবাব পাইয়াছি, যে গ্রামে তাহারা বাস করে সেখানে ত রেশন-ব্যবস্থা চালু হয় নাই, কাজেই কার্ডও নাই, এবং কার্ড না থাকায় তাঁহারা দরখাস্ত করিয়াও কুপন সংগ্রহ করিতে সমর্থ হন নাই। ইউনিয়ন বোর্ডের তত্ত্বাবধানে রেশন তালিকা-ভুক্ত বহু জিনিসপত্র ও বস্ত্রাদি গ্রামে বিক্রয় করিবার স্কীমও আছে শুনিয়াছি, ফুড কমিটিও আছে এ সকল ব্যাপারে সাহায্য করিবার জন্য, কিন্তু তাহাদের ক্ষমতা কতটুকু? আমার ধারণা এই যে, ফুড কমিটি পরামর্শ দিতে পারে কিন্তু তাহা গ্রহণ করা-না-করা রেশন বিভাগের ইচ্ছাধীন। তাঁহাদের পরিকল্পনা-গুলিকে কেহ সমালোচনা করিলেই তাঁহারা আগুন হইয়া উঠেন। কাগজপত্রে হিসাব ঠিক থাকে, আপিসে কাজকর্মও পুরাদমে চলিতে থাকে, কিন্তু সরবরাহ বিভাগের গোড়ায়ই গলদ, আসল প্রয়োজনই তাঁহাদের দ্বারা সিদ্ধ হয় না, তাঁহারা সাধারণকে জিনিসপত্র সরবরাহ করিয়া উঠিতে পারেন না।

মফস্বলে কুপন নামক দুর্লভ বস্তুটি সংগ্রহ করিয়াছেন এমন সৌভাগ্যবান্ যাঁহারা, তাঁহারাও কিন্তু ঈর্ষার পাত্র নহেন। আমি একটি পরিবারের কথা জানি, হঠাৎ মার্চ্চ মাসের তৃতীয় সপ্তাহে তাঁহাদের পরিবারভুক্ত দশ জনের জন্য দশখানি কুপন পাওয়া গেল, রেশন কার্ডগুলিতেও যথারীতি সহি এবং কুপন নম্বর প্রভৃতি লেখা হইল। গৃহিণী খুব খুশি, কিছু কিছু শাড়ী ধুতি, জামার কাপড় ছিট ইত্যাদি কেনা

যাইবে। প্রথমে চাকর দোকানে দোকানে ঘুরিয়া আসিল, কোনও দোকানেই মাল নাই, পরবর্ত্তী সপ্তাহে আসিবে। চার-পাঁচ দিন পরে পুনরায় লোক প্রেরিত হইল, দোকানদার বলিল—খুব ভালো সার্ট পাঞ্জাবী ইত্যাদির কাপড় আসিয়াছে কাল গাঁট খোলা হইবে, ভয়েলও আসিয়াছে। পরদিন গৃহকর্ত্রী নিজেই গেলেন, পছন্দ করিয়া কাপড়-চোপড় কিনিবার বাসনা।...গাঁট খোলা হইয়াছে, কিন্তু সার্টিঙের গাঁটে আছে ছাতার কাপড় এবং ভয়েলের গাঁটে আছে সালু। ধুতি যাহা আছে, তাহা ৯ হাত বিয়াল্লিশ ইঞ্চি, এবং শাড়ী ১২ হাত কিন্তু বহর ৪২ ইঞ্চি। তাও আবার অত্যন্ত বেলো। কিন্তু তাই বলিয়া দাম কম নহে, শাড়ী প্রায় পাঁচ টাকা একখানা, (আগে এই দামে দশখানি শান্তিপুরী কাপড় পাওয়া যাইত) ধুতিও দুই টাকা বার আনা। অগত্যা কিছুই কেনা হইল না; কুপনগুলির মেয়াদ ছিল ৩১শে মার্চ্চ পর্য্যন্ত সুতরাং তাহা বাতিল হইল। ইহা একটিমাত্র দৃষ্টান্ত নহে, এরূপ ঘটনা ঘটিতে আমি স্বচক্ষে বহু বার দেখিয়াছি। বস্ত্র রেশন বিভাগ জানেন না, দোকানদারকে কি সরবরাহ করা হইতেছে, দোকানদার জানে না গাঁইটে কি আছে, আর ক্রেতা-সাধারণ আসল ব্যাপারটি বুঝিবার আগেই তাহার কুপন বাতিল হইয়া যায়।

জেলা রেশন কর্ত্তৃপক্ষ আবার কলিকাতার আপিসকে দোষ দেন। তাঁহারা নাকি তাঁহাদের চাহিদামত জিনিষ সরবরাহ করেন না। মহকুমা কর্ত্তৃপক্ষ বলেন, গ্রামে যে সকল জিনিস চলে না তাহাই গাঁটের পর গাঁট মহকুমায় আসিয়া উপস্থিত হয়। গ্রামবাসী পাতলা ভয়েল, মিহি ধুতি এবং ভাল কোটের কাপড় দেখিয়া ও তাহার দাম শুনিয়া মুখ ফিরাইয়া চলিয়া যান, মহ-কুমায় জিনিষ জমা হইয়া থাকে কিছুদিন, তাহার পর আবার গুদামজাত হইয়া থাকে কিনা, তাহা সরবরাহ বিভাগই জানেন। কোন্ প্রকার কাপড় কি কাজে লাগে, তাহার নাম কি এবং চাহিদা কি রকম বস্ত্ররেশনের ভারপ্রাপ্ত কর্ম্মচারীদের এ সম্বন্ধে খুবই অস্পষ্ট ধারণা। "সার্টিং" "কোটিং" "লংক্লথ" এবং ধুতি শাড়ী মোটামুটি ইহাই তাঁহারা বুঝেন। কিন্তু সার্টিং অর্থে ছাতার কাপড় হইতে দোসুতী, এমন কি সোফা কুশন পর্দা কোচিং ও ড্রিল জিন প্রভৃতি সকল রকমের মোটা কাপড়ই যে বুঝাইতে পারে তাহা তাঁহারা অবগত নহেন। লংক্লথের বেলা ভুল হয়ত হয় না, কিন্তু 'মার্কিন' কি চিজ্ তাহা অনেকেই জানেন না। কোরা জিনিসমাত্রেই "গ্রে"। সাদা ড্রিল আছে কিনা খোঁজ করিলে রেশন বিভাগ বলিবেন—নাই। কিন্তু দোকানে দেখা যাইবে যে "গ্রে ড্রিল" বলিয়া সাদা কোরা ড্রিল বিক্রয় হইতেছে।

জেলায় রেশন বিভাগের কর্ত্তা হইয়া যে সকল শেতাঙ্গ-পুরুষ বস্ত্রসমস্যা সমাধানে নিযুক্ত আছেন তাঁহাদের আবার বাঙালীর পরিধেয় সম্বন্ধে জ্ঞান আরও চমৎকার। গত বৎসরে এক বার একটি মহিলা-পরিচালিত আশ্রমের দুঃস্থ মেয়েদের জন্য ষ্ট্যাণ্ডার্ড কাপড় ক্রয়ের জন্য 'পারমিট' চাওয়া হইয়া-ছিল। মহিলা সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট দরখাস্ত করিয়াছিলেন বার-খানি কাপড় চাহিয়া, তাহার মধ্যে আটখানি শাড়ী এবং চার-খানি ধুতি। ধুতিগুলি বিধবাদের জন্য। সেই জেলায় যে সাহেবটি রেশন বিভাগের সর্ব্বোচ্চ পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন তিনি পারমিট নামঞ্জুর করিলেন, লিখিলেন, মেয়েদের আশ্রমে শাড়ী চাওয়া হইয়াছে তাহার অর্থ বুঝি কিন্তু ধুতি দেওয়া হইবে কেন তাহা বোধগম্য হইতেছে না। বলা বাহুল্য শেতাঙ্গ কর্ম্মচারীটি পারমিট দিলেন না। আশ্রমের ভারপ্রাপ্তা মহিলা বিস্তারিত পত্রে বাংলাদেশের হিন্দু বিধবাদিগের ধুতি অথবা থান পরিবার প্রথা সম্পর্কে তাঁহাকে ওয়াকিবহাল করিবার জন্য সাধ্যমত চেষ্টা করিয়া পুনরায় পারমিটের জন্য আবেদন করিলেন, কিন্তু তাঁহার সকল চেষ্টা ব্যর্থ হইল, সাহেবও যেন জেদ করিয়া বসিলেন কিছুতেই তিনি বুঝিবেন না। শেষ পর্য্যন্ত ধুতি তো পাওয়া গেলই না, শাড়ীর জন্য পারমিটও মিলিল না। বিধবা মহিলাগণ অগত্যা শাড়ী পরিতেও রাজী হইয়াছিলেন কিন্তু বস্ত্র রেশন বিভাগের শেতাঙ্গ বড়কর্ত্তার বিধানে তাঁহাদের ভাগ্যে তাহাও জুটিল না। এক মাড়োয়ারী কাপড়ের পারমিট পাইয়া ষ্ট্যাণ্ডার্ড কাপড় বিতরণ করিতেছিলেন, আশ্রম কর্ত্তৃপক্ষকে তাঁহার নিকট হইতে ভিক্ষা করিয়া আনিয়া মেয়েদের বস্ত্র-সমস্যা মিটাইতে হইল।

সাদা থান কাপড় এখনও খুব কমই পাওয়া যায়, সরু পাড় দশ হাত ধুতিও বড় একটা মেলে না, আবার সাড়ে নয় হাত নয় হাত ধুতিতে মেয়েদের কুলায়ও না। এ কথা নিঃসন্দেহে বলা চলে যে, বস্ত্র-রেশন-ব্যবস্থা বাঙালী মেয়েদেরই বেশী অসুবিধায় ফেলিয়াছে। বছরে কুড়ি গজ অর্থাৎ চারখানা শাড়ীতে কষ্টে-সৃষ্টে চলে বটে, কিন্তু শেমিজ-জামার কি ব্যবস্থা? আড়াই গজ হিসাবে ধরিয়া চারটি শেমিজের জন্য অন্ততঃ আরও দশ গজ কাপড় শহরবাসিনীদের প্রয়োজন হয়। বার বছরের নীচে ছেলেমেয়েদের দশ গজ বরাদ্দ। ইহাদের দশ গজে বড় জোর খুব হিসাব করিয়া কাটিয়া ছাঁটিয়া বাড়ীতে তৈয়ার করিলে তিনটি হাফপ্যাণ্ট, তিনটি সার্ট হইতে পারে কিন্তু অধিকাংশ ছেলেরই তিনটি প্যাণ্টে বছর কাটে না, বাড়ন্ত মেয়েদের শাড়ী পরিবার বয়সে ত দশ গজে কোনমতেই হয় না, ছোট ছোট মেয়েদের তিনটি ফ্রক ও তিনটি পাজামা ও একটি শেমিজ দশ গজে (বড় বহর না থাকিলে) হয় কিনা সন্দেহ। গৃহকর্ত্তাদের ত কুড়ি গজ বরাদ্দে চলা অসম্ভব; ধুতি ছাড়া সার্ট পাঞ্জাবীরও প্রয়োজন হয়। ইহা ছাড়া বিছানার চাদর, বালিশের ওয়াড় ইত্যাদি শতপ্রকারের প্রয়োজনীয় জিনিস রহিয়াছে যাহার কথা রেশন করিবার সময়ে কর্ত্তৃপক্ষ চিন্তাও করেন নাই।

ইহার মধ্যে একটি বিষয় আমরা মেয়েরা নিজেদের মধ্যে অনেক সময়ই আলোচনা করিয়া থাকি। সকলেই জানেন শিশু জন্মিলে তাহার জন্য স্বতন্ত্র বস্ত্রের কোনও ব্যবস্থা নাই। অথচ এ কথা প্রত্যেকেরই জানা আছে যে বর্ত্তমানে বস্ত্রাভাবের জন্য নবজাতশিশুর শয্যা ও জামা-কাপড় ইত্যাদি একটা সমস্যা হইয়া দাঁড়ায়। পুরাতন কাপড় দিয়া আগে কাঁথা প্রভৃতি করা হইত, এখন জননীরই যথেষ্ট কাপড় জোটে না, ত শিশুর জন্য পুরাতন কাপড় আসিবে কোথা হইতে? একটি শিশুর জন্য কাপড়ের প্রয়োজন বড় কম নহে, কাঁথার অভাবে আট-দশখানি চাদর, কিছু জামা বালিশ বিছানা কোন্ জিনিষটা না হইলে চলে? নবজাত শিশু ও তাহার জননীর জন্য কি বিশ গজ কাপড় বরাদ্দ

করা খুব বেশী? বিলাতে ভাবী জননীর জন্য বিশেষ কুপনের ব্যবস্থা আছে। প্রসূতি শিশুর জন্মের আগেই অবসর সময়ে তাহার প্রয়োজনীয় বস্ত্রাদি তৈয়ারী করিয়া লয়। আমাদের দেশে যদি শিশুদের জন্য উপযুক্ত পরিমাণ মার্কিন বা লংক্লথ কিনিতে পাওয়া যায় তবে জননীরা অনেক হাঙ্গামা পোহানোর হাত হইতে রক্ষা পাইতে পারেন।

আর মায়েদের ঝঞ্ঝাট কি কম? গৃহকর্ম আছে, চারি বেলা বহু রেশনে ও বহু আয়ে কি খাইতে দেওয়া যাইতে পারে সে চিন্তা আছে, সব কাজ যদিই বা সারিয়া উঠিতে পারেন, হাতের সূচ-সুতার আর বিরাম নাই।

রেশন বিভাগের বন্দোবস্তে অন্নবস্ত্র আজকাল দুষ্প্রাপ্য হইয়াছে, পাওয়া কঠিন বলিয়া সেগুলি সংগ্রহ করিতে সময়ও অধিকাংশ বাঙালীরই নষ্ট হয় প্রচুর। আবার প্রয়োজন অপেক্ষা কম পাওয়া যায় বলিয়া ফাঁকি দিয়া কিংবা বেশী দাম দিয়া ব্ল্যাক মার্কেটে কিনিতেও অনিচ্ছুক নহেন। দিন দিন আমাদের ন্যায় অন্যায় বোধ যে কমিয়া যাইতেছে তাহা কি আমরা অনুভব করিতেছি না? চোরা কারবারীদের আমরা মুখে ঘৃণা করিতেছি কিন্তু কোনও কারবারী যদি খাতির করিয়া আমাকে সামান্য লাভ রাখিয়া দশ সের চিনি বা দশ গজ কাপড় দিতে চায় আমি প্রলুব্ধ হইব না কি?

অথচ চোরা কারবারীদের নিকট হইতে দ্রব্যাদি ক্রয় করিবার প্রবৃত্তি জনসাধারণের হৃদয় হইতে নির্মূল করা কঠিন নহে। জনসাধারণকে প্রয়োজনানুযায়ী খাদ্য ও বস্ত্র না দিলে তাহারা বাকিটুকু যোগাড় করিবার জন্য চোরা কারবারীর দ্বারস্থ হইবেই, কিন্তু তাহাদের জন্য উপযুক্ত পরিমাণ খাদ্য ও বস্ত্রের যথাযথ ব্যবস্থা যদি করা যায় তবে তাহাতেই তাহাদের অভাব মিটিবে, চোরাকারবারও সঙ্গে সঙ্গে কমিয়া আসিবে।

কিন্তু অন্নবস্ত্রের এরূপ অভাব কতদিন আমরা সহ্য করিব তাহাই ভাবি। আশু এ অবস্থার প্রতিকার না হইলে বাঙালী জাতির আর বাঁচোয়া নাই।

রবীন্দ্রনাথের কাব্যে সৃষ্টির রূপ

শ্রীযোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত

রবীন্দ্রনাথের কাব্যে সৃষ্টিরহস্য বা বিবর্তনবাদ সম্বন্ধে অনেক কবিতা আছে। তাঁহার কাব্যে তিনি জননী বসুন্ধরার জন্মের ইতিহাস সম্বন্ধে এবং তাহার সহিত আমাদের কি নিগূঢ় সম্বন্ধ রহিয়াছে তাহাও বেশ সুন্দর ভাবে বুঝাইবার ও বুঝিবার চেষ্টা করিয়াছেন। কেমন করিয়া এই বিশ্বজগৎ গড়িয়া উঠিল, আকাশের গ্রহ তারা-নক্ষত্র, সূর্য্য, চন্দ্র, উল্কা, ধূমকেতু আরও কত কি, অনন্ত আকাশ—এই যে বিশ্বনিখিল তাহার কি ভাবে সৃষ্টি হইল, কোন্ সে নিয়ামক তাহা গড়িয়া তুলিলেন—সেই গভীর সৃষ্টি-রহস্যের সন্ধানে তাঁহার কবি-চিত্ত যে উন্মুখ হইয়া উঠিল তাহা তাঁহার কাব্যে নানা ভাবে প্রকাশিত হইয়াছে।

মানুষ পৃথিবীকে বরাবরই মাতৃরূপে বন্দনা করিয়া আসিতেছে। তাই বৈজ্ঞানিক বলেন: "Unsophisticated Early man, wiser in his simplicity than some of his posterity, spoke of the Earth as the Great Mother." কেন পৃথিবীকে মাতা বলি? কেননা আমাদের এই দেহ, জীবজন্তুর দেহ, তরু-লতা-গুল্ম যাহা কিছু ব্যবহার্য্য সব কিছুই মাতা বসুমতীর অঙ্গ হইতেই আমরা পাই, তাঁহারই স্নেহরসে আমরা সঞ্জীবিত। কিন্তু কেমন করিয়া এই পৃথিবী গড়িয়া উঠিল? সৌরজগতের সৃষ্টি হইল? বিশ্বব্রহ্মাণ্ড রূপ পাইল, তাহা কে জানে? পৃথিবীর সৃষ্টি হইতে এই সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয় লইয়া হিন্দু, বৌদ্ধ, জৈন, খ্রীষ্টান, ইসলাম সকল ধর্ম্মই আলোচনা করিয়াছেন তাঁহাদের বিরচিত ধর্ম্ম গ্রন্থ ও পুরাণের মধ্য দিয়া। সে কাহিনী সে উপাখ্যান বিজ্ঞান মানে না। না মানিলেও তাহার মধ্যেও এক বিরাট কল্পনা ও এক বিরাট অনুভূতি রহিয়াছে। সৃষ্টিতত্ত্ব সম্বন্ধে পুরাণকারেরা যে সব কথা বলিয়াছেন তাহা যে কেহ আলোচনা করিলেই ঐ সকলের মধ্য হইতে কল্পনার বৈচিত্র্য অনুভব করিতে পারিবেন।

কবি রবীন্দ্রনাথ সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়ের কথা বলিতে গিয়া বলিতেছেন:—

দেশ শূন্য, কাল শূন্য, জ্যোতিঃ শূন্য মহাশূন্য 'পরি
চতুর্ম্মুখ করিছেন ধ্যান,
সহসা আনন্দ-সিন্ধু হৃদয়ে উঠিল উথলিয়া,
আদিদেব খুলিলা নয়ান।
চারিমুখে বাহিরিল বাণী,
চারিদিকে করিল প্রয়াণ।
সীমাহারা মহা অন্ধকারে,
সীমাশূন্য ব্যোম-পারাবারে,
প্রাণপূর্ণ ঝটিকার মতো,
আশাপূর্ণ অতৃপ্তির প্রায়,
সঞ্চারিতে লাগিল সে ভাষা।
আনন্দের আন্দোলনে ঘন ঘন বহে শ্বাস,
অষ্ট নেত্রে বিস্ফুরিল জ্যোতি।
জ্যোতির্ম্ময় জটাজাল কোটি সূর্য্য প্রভা বহি'
দিগ্বিদিকে পড়িল ছড়ায়ে।
জগতের গঙ্গোত্রী-শিখর হ'তে
শত শত স্রোতে
উচ্ছ্বসিল অগ্নিময় বিশ্বের নির্ঝর,
স্তব্ধতার পাষাণ-হৃদয়
শত ভাগে গেল বিদীরিয়া।

তার পর কি হইল ?

মহা অগ্নি উঠিল জ্বলিয়া
জগতের মহা চিতানল ।
খণ্ড খণ্ড রবি শশি, চূর্ণ চূর্ণ গ্রহ তারা
বিন্দু বিন্দু আঁধারের মতো বরষিছে চারিদিক হ'তে,
অনলের তেজোময় গ্রাসে মুহূর্ত্তেই যেতেছে মিশায়ে ।
সৃজনের আরম্ভ সময়ে আছিল অনাদি অন্ধকার
সৃজনের ধ্বংস-যুগান্তরে রহিল অসীম হুতাশন ।
অনন্ত আকাশগ্রাসী অনল সমুদ্র মাঝে
মহাদেব মুদি' ত্রিনয়ান
করিতে লাগিলা মহাধ্যান ।

এইখানে কবি পুরাণের কল্পনার সহিত বিজ্ঞানের আদর্শকে একাকীভূত করিয়াছেন । পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে মানুষ যুগের পর যুগ সৃষ্টি-রহস্য সম্বন্ধে কল্পনা ও গবেষণা করিয়া আমাদের জন্ত তাঁহাদের চিন্তার দ্বারা সঞ্চারিত করিয়া রাখিয়া গিয়াছেন । এই সব কাহিনীর মূলে সর্ব্বত্র একটা সত্য রহিয়াছে, তাহা এই যে এই বিরাট্ জগৎ একজন living creator অর্থাৎ স্রষ্টার দ্বারা সৃষ্ট হইয়াছে, সেই স্রষ্টার কল্পনা বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন রূপ দেখিতে পাওয়া যায় । কোথাও এক বিরাট্ পক্ষী ; কোথাও কোন বিরাট্ জন্তু, কোথাও এক বৃদ্ধ ব্যক্তি, কোথাও ব্রহ্মা, তাঁহাদের দ্বারাই নানা রূপে এই বৃহৎ জগৎ সৃষ্টি হইয়াছে । কিন্তু যেমন মানুষের জ্ঞানের প্রসার হইল, চিন্তাশক্তি বৃদ্ধি পাইল, তখন তাঁহারা কল্পনার রাজ্য হইতে আসিলেন নূতন চিন্তাধারার মধ্যে—প্রকাশ পাইল বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গী ।

রবীন্দ্রনাথের 'সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়' কবিতাটি 'প্রভাত সঙ্গীতে' প্রকাশিত হইয়াছিল । সে অনেক আগের কথা । কাজেই এ কবিতাতে সর্ব্বত্র বৈজ্ঞানিকগণের সিদ্ধান্ত অনুসৃত হয় নাই কিন্তু তবু কবিত্বের মাধুর্য্যে এই বৈজ্ঞানিক কবিতাটিকে আমরা The Birth of the world revealed by Astronomyর অন্তর্ভুক্ত করিতে পারি ।

সমুদ্রের প্রতি কবিতায় কবি বলিতেছেন :—

"হে আদি জননী, সিন্ধু, বসুন্ধরা সন্তান তোমার,
একমাত্র কন্যা তব কোলে । তাই তন্দ্রা নাহি আর
চক্ষে তব । তাই বক্ষ জুড়ি' সদা শঙ্কা, সদা আশা,
সদা আন্দোলন ।"

রবীন্দ্রনাথের একখানা চিঠিতে আছে ;—

"আমি বেশ মনে করতে পারি, বহু যুগ পূর্ব্বে তরুণী পৃথিবী সমুদ্রস্নান থেকে সবে মাথা তুলে উঠে তখনকার নবীন সূর্য্যকে বন্দনা করছেন—তখন আমি এই পৃথিবীর নূতন মাটিতে কোথা থেকে এক প্রথম জীবনোচ্ছ্বাসে গাছ হ'য়ে পল্লবিত হয়ে উঠেছিলাম । তখন পৃথিবীতে জীবজন্তু কিছুই ছিল না, বৃহৎ সমুদ্র দিন রাত্রি দুলচে—এবং অবোধ মাতার মত আপনার নবজাত ক্ষুদ্র ভূমিকে মাঝে মাঝে উন্মত্ত আলিঙ্গনে একেবারে আবৃত করে ফেলচে । তখন আমি এই পৃথিবীতে আমার সর্ব্বাঙ্গ দিয়ে প্রথম সূর্য্যালোক পান করেছিলাম, নব শিশুর মত একটা অন্ধ জীবনের পুলকে নীলাম্বর তলে আন্দোলিত হয়ে উঠেছিলাম । এই আমার মাটির মাতাকে এই আমার সমস্ত শিকড়গুলি দিয়ে জড়িয়ে এর স্তনরস পান করেছিলাম ।" কবির এই কল্পনায় রূপটি সম্পূর্ণ বৈজ্ঞানিক ভাবে অনুপ্রাণিত ।

আমি পৃথিবীর শিশু ব'সে আছি তব উপকূলে,
শুনেতেছি ধ্বনি তব । ভাবিতেছি, বুঝা যায় যেন
কিছু কিছু মর্ম্ম তা'র,—বোবার ইঙ্গিত ভাষা যেন
আত্মীয়ের কাছে । মনে হয় অন্তরের মাঝখানে
নাড়িতে যে-রক্ত বহে, সেও যেন ওই ভাষা জানে,
আর কিছু শেখে নাই । মনে হয়, যেন মনে পড়ে—
যখন বিলীন ভাবে ছিনু ওই বিরাট্ জঠরে
অজাত ভুবন-ভ্রূণমাঝে—লক্ষ কোটি বর্ষ ধ'রে
ওই তব অবিশ্রাম কলতান অন্তরে অন্তরে
মুদ্রিত হইয়া গেছে । সেই জন্ম—পূর্ব্বের স্মরণ—
গর্ভস্থ পৃথিবী-'পরে সেই নিত্য জীবনস্পন্দন
তব মাতৃহৃদয়ের, অতি ক্ষীণ আভাসের মতো
জাগে যেন সমস্ত শিরায়, শুনি যবে নেত্র করি' নত
বসি' জনশূন্য তীরে ওই পুরাতন কলধ্বনি ।
দিক্ হ'তে দিগন্তরে যুগ হ'তে যুগান্তর গণি ।

'সমুদ্রের প্রতি' কবিতাটি পড়িলেই মনে হয় কবি পৃথিবীর জন্মরহস্য সম্বন্ধে সম্পূর্ণ অভিজ্ঞ । তিনি পৃথিবীর সৃষ্টিরহস্যের কথাও যেমন জানেন, সেই প্রলয় পয়োধি জলের মধ্য হইতে কেমন করিয়া জননী ধরিত্রীর সৃষ্টি হইল, কেমন করিয়া প্রথম জীবনের সৃষ্টি বা অনুভূতি আসিল—সবই তিনি সুপরিজ্ঞাত । তাই বলিতেছেন :—

আমার পৃথিবী তুমি
বহু বরষের । তোমার মৃত্তিকাসনে
আমারে মিশায়ে লয়ে অনন্ত গগনে
অশ্রান্ত চরণে, করিয়াছ প্রদক্ষিণ
সবিতৃমণ্ডল, অসংখ্য রজনীদিন
যুগ-যুগান্তর ধরি' ; আমার মাঝারে
উঠিয়াছে তৃণ তব, পুষ্প ভারে ভারে
ফুটিয়াছে, বর্ষণ করেছে তরুরাজি
পত্রফুলফল গন্ধরেণু ।

কবি আদিজননী সিন্ধুর গর্ভ হইতেই যে পৃথিবীর উৎপত্তি এই বৈজ্ঞানিক সত্যটিকে প্রকাশিত করিয়াছেন অতি সুন্দর ভাবে । যথা—

গর্ভস্থ পৃথিবী 'পরে সেই নিত্য জীবন স্পন্দন
তব মাতৃহৃদয়ের ।

* *

তখন আছিলে তুমি একাকিনী অখণ্ড অকূল
আত্মহারা, প্রথম গর্ভের মহারহস্য বিপুল
না বুঝিয়া ।

* *

প্রতি প্রাতে ঊষা এসে
অনুমান করি' যেতো মহাসন্তানের জন্মদিন,
নক্ষত্র রহিত চাহি' নিশি নিশি নিমেষবিহীন
শিশুহীন শয়ন-শিয়রে । সেই আদিজননীর
জনশূন্য জীবশূন্য স্নেহচঞ্চলতা সুগভীর,

আজও প্রতীক্ষাপূর্ণ সেই তব জাগ্রত বাসনা,
অগাধ প্রাণের তলে সেই তব অজানা বেদনা
অনাগত মহা ভবিষ্যৎ লাগি' ; হৃদয়ে আমার
যুগান্তর-স্মৃতি সব উদিত হ'তেছে বারবার।

'ছিন্নপত্রে' কবি বলিয়াছেন, "পৃথিবীতে যখন মাটি ছিল না, সমুদ্র একেবারে একলা ছিল, আমার আজকেকার এই চঞ্চল হৃদয় তখনকার সেই জনশূন্য জলরাশির মধ্যে অব্যক্তভাবে তরঙ্গিত হ'তে থাকত সমুদ্রের দিকে চেয়ে তার একতান কল-ধ্বনি শুনলে তা যেন বোঝা যায়।" কবি সমুদ্রকে আদিজননী বলিয়াছেন বৈজ্ঞানিকদের মতবাদেরই অনুসরণ করিয়া।

বাংলা সাহিত্যে আরও অনেক কবি পৃথিবীর উপর কবিতা লিখিয়াছেন, কিন্তু কেহই বৈজ্ঞানিক তত্ত্বকে কাব্যের ভিতর প্রকাশ করেন নাই। মাইকেল মধুসূদন দত্তের লিখিত পৃথিবী নামক সনেটটি এখানে উদ্ধৃত করিতেছি। তাহা পাঠ করিলেই পাঠক বুঝিতে পারিবেন যে ঐ কবিতায় মানুষের সাধারণ সহজাত ভাবের মাত্র প্রকাশ রহিয়াছে। মধুসূদন বলিতেছেন :—

"নির্ম্মি গোলাকারে তোমা আরোপিলা যবে
বিশ্বমাঝে স্রষ্টা, ধরা, অতি হৃষ্ট মনে।
চারিদিকে তারা-চয় সুমধুর রবে
(বাজায়ে সুবর্ণ বীণা) গাইলা গগনে—
কুলবালা দল যবে বিবাহ-উৎসবে
হুলাহুলি দেয় মিলি বধূ দরশনে।
আইলেন আদি প্রভা হেম ঘনা-সনে,
ভাসি ধীরে শূন্যরূপ সুনীল অর্ণবে,—
দেখিতে তোমার মুখ! বসন্ত আপনি
আবরিলা শ্যাম-বাসে বর-কলেবরে ;
আঁচলে বসায়ে নব ফুলরূপ মণি,
নবফুলরূপ মণি, কবরী উপরে
দেবীর আদেশে তুমিলা নব রমণি
কটিতে মেখলা-রূপে পরিলা সাগরে।"

ইহাতে কোনও বৈচিত্র্য বা নূতনত্ব নাই। মধুসূদনের এই কবিতাটিতে মূলতঃ সৃষ্টির কল্পনার দিক দিয়া কোনও অভিনবত্বই নাই। সেই পুরাতন কথা। আমাদের দেশের বেদ, পুরাণ, খ্রীষ্টানদের বাইবেল, আসিরিয়া, ব্যাবিলোনিয়ার সৃষ্টিতত্ত্বের ইতিহাসের ভিতর আমরা একই কথার আভাস পাই। বাই-বেলে আছে—আদিতে ঈশ্বর আকাশমণ্ডলের ও পৃথিবীর সৃষ্টি করিলেন। পৃথিবী ঘোর অন্ধকার ও শূন্য ছিল, এবং অন্ধ-কার বারিধির উপরে ঈশ্বরের আত্মা বিলীন ছিলেন। Deluge বা প্লাবনকাহিনী সকলের পরিজ্ঞাত। আমরা আদিজননী কবি-তার মধ্যে নিম্নলিখিত বিষয় কয়টি লক্ষ্য করি। প্রথমতঃ বাংলা মায়েরই মত সিন্ধুর স্নেহব্যাকুলতা অতি সুন্দর ভাবে প্রকাশিত হইয়াছে। দ্বিতীয়তঃ প্রকৃতির সহিত মানব-জীবনের একটি গূঢ় সম্বন্ধ, স্নেহ অত্যাচার, নিপীড়ন, আকুলিব্যাকুলিভাব— প্রথম শ্লোকে সুপ্রকাশিত। উদাহরণ-স্বরূপ দুইটি পংক্তি মাত্র উদ্ধৃত করিলাম :

জননী যেমন জানে জঠরের গোপন শিশুরে,
প্রাণে যবে স্নেহ জাগে, স্তনে যবে দুগ্ধ উঠে পুরে।

দ্বিতীয় বৈজ্ঞানিক তত্ত্বের দিক দিয়া কিংবা পুরাণতত্ত্বের দিক দিয়া আলোচনা করিলেও অবশেষে সেখানে সম্পূর্ণভাবে বৈজ্ঞানিক তত্ত্বকেই অনুসরণ করিতে হইবে, কিন্তু কবির নূতনত্ব ধরা পড়িল তাহার কল্পনার মাধুর্য্যে ও বৈশিষ্ট্যে। সমুদ্রের প্রতি কবিতায় শব্দসম্পদ, বিশ্ব-প্রকৃতির সহিত মানব প্রকৃতির অখণ্ড পরিচয়, এই কবিতায় দেদীপ্যমান। কবি বলিতেছেন,—

আমারো চিত্তের মাঝে তেমনি অজ্ঞাত ব্যথা ভরে,
তেমনি অচেনা প্রত্যাশায়, অলক্ষ্য সুদূর তরে
উঠিছে মর্ম্মর স্বর। মানব-হৃদয়-সিন্ধুতলে
যেন নব মহাদেশ সৃজন হ'তেছে পলে পলে
আপনি সে নাহি জানে। শুধু অর্দ্ধ অনুভব তারি
ব্যাকুল করেছে তা'রে, মনে তা'র দিয়েছে সঞ্চারি'
আকার-প্রকার হীন তৃপ্তিহীন এক মহা আশা
প্রমাণের, অগোচর, প্রত্যক্ষের, বাহিরেতে বাসা।
তর্ক তা'রে পরিহাসে, মর্ম্ম তা'রে সত্য বলি জানে,
সহস্র ব্যাঘাত মাঝে তবুও সে সন্দেহ না মানে।

এই ভাবে আমরা কবির কল্পনায় নূতনত্ব, দার্শনিকত্ব এবং ভারতবর্ষের আধ্যাত্মিকতার মহত্ত্ব ও আন্তরিক সহানুভূতি দেখিতে পাই সৃষ্টি-রহস্যের মধ্যে যেমন—

হে জলধি, বুঝিবে কি তুমি
আমার মানব ভাষা। জান কি তোমার ধরাভূমি
পীড়ায় পীড়িত আজি ফিরিতেছে এ পাশ ও পাশ,
চক্ষে বহে অশ্রুধারা, ঘন ঘন বহে উষ্ণশ্বাস,
নাহি জানি কী যে চায়, নাহি জানি কিসে ঘুচে তৃষা,
আপনার মনোমাঝে আপনি সে হারায়েছে দিশা
বিকারের মরীচিকা-জালে! অতল গম্ভীর তব
অন্তর হইতে কহ সান্ত্বনার বাক্য অভিনব
আষাঢ়ের জলদ মন্দ্রের মতো। স্নিগ্ধ মাতৃপাণি
চিন্তাতপ্ত ভালে তা'র তালে তালে বারবার হানি',
সর্বাঙ্গে সহস্রবার দিয়া তা'রে স্নেহময় চুমা,
বলো তা'রে "শান্তি শান্তি" বলো তা'রে
"ঘুমা, ঘুমা, ঘুমা"।

ওমরখৈয়াম, হাফিজ, তোগরে, নিজামি, আত্তার জেলাল উদ্দীন রুমি প্রভৃতির কবিতায়ও সৃষ্টিরহস্য সম্বন্ধে কবিতা আছে। পাশ্চাত্য কবিদের মধ্যে বায়রন টেনিসন এবং আরও অনেকে সমুদ্রের উপর কবিতা লিখিয়াছেন। ইংরেজ কবিদের মধ্যে লর্ড টেনিসন বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব সম্বন্ধে অনেক কবিতা লিখিয়াছেন। রবীন্দ্রনাথের অনেক কবিতাও বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব লইয়া লিখিত হইয়াছে। এই কবিতায় এক দিকে জড়বাদ অন্য দিকে কল্পনার অপূর্ব্ব বিকাশ ভাবরাজ্যে এক নূতন আলোকসম্পাত করিয়াছে। বাংলা সাহিত্যেও ঊনবিংশ ও বিংশ শতাব্দীর কোন কোন কবি সমুদ্রের প্রতি কবিতা লিখিয়াছেন। মেঘনাদ-বধ কাব্যে সমুদ্র সম্বন্ধে স্থানে স্থানে গাম্ভীর্য্য পূর্ণ বর্ণনা আছে। তাহার আদর্শ স্বতন্ত্র, সাধারণভাবের বর্ণনা মাত্র।
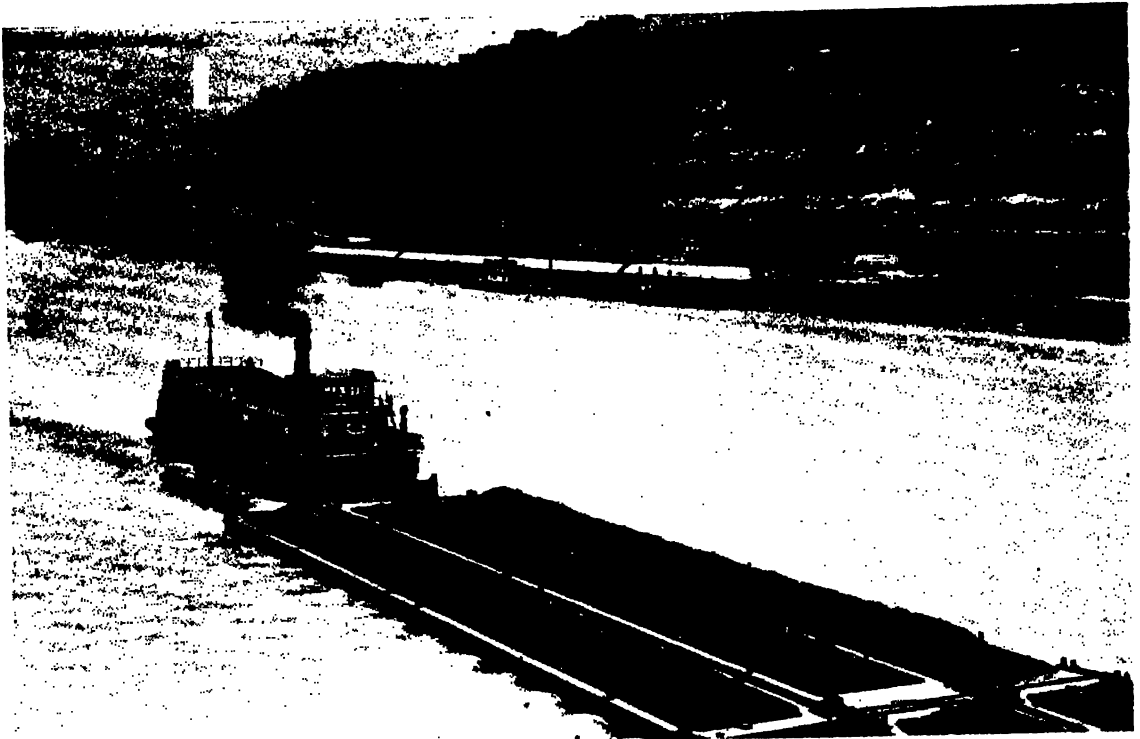
ইস্পাতের বজরা মিসিসিপির উপর দিয়া বন্দরাভিমুখে চলিয়াছে

পিট্সবুর্গ, পেনসিলভানিয়া। ওহিও নদীর পোল

মিসিসিপি নদীর তীরে গমের ক্ষেত
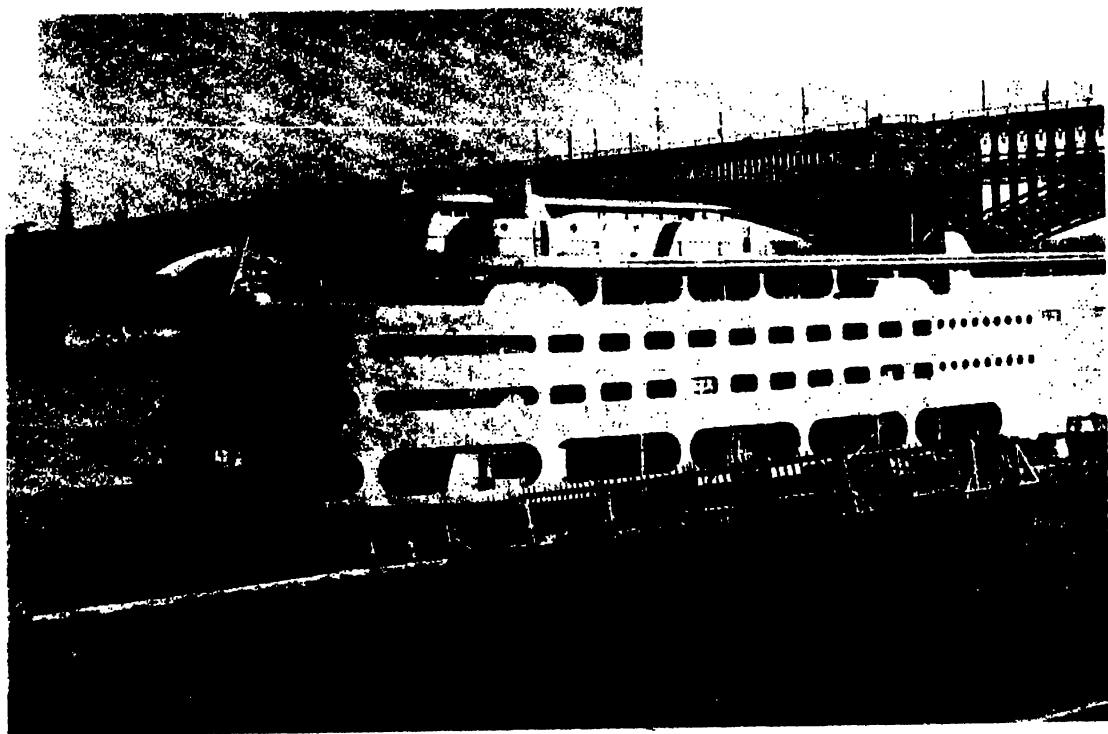
সেণ্ট লুইয়ে মিসিসিপি নদীর উপরকার ইড্‌স ব্রিজের নীচে একটি আধুনিক খেয়া নৌকা

পৃথিবীর প্রথম জন্মদিনের 'আদি মন্ত্রটি' রবীন্দ্রনাথ নানা বয়সে, নানা সময়ে তাঁহার কাব্যে প্রকাশ করিয়াছেন। সেই সব পদ্য ও গদ্য রচনার মধ্যে কবির বৈজ্ঞানিক মন সৃষ্টির রহস্য-জাল ছিন্ন করিয়া তাহার মূল-রহস্য জানিবার জন্য ব্যাকুলতা প্রকাশ করিয়াছে। এখানে দৃষ্টান্ত দিতেছি। পত্রপুটের 'পনের' শীর্ষক অসম ছন্দের কবিতায় কবি বলিতেছেন :—

পৃথিবীর প্রথম জন্মদিনের আদি মন্ত্রটি
পেয়েছি আপন পুলক কম্পিত অন্তরে,
আলোর মন্ত্র।
পেয়েছি নারকেল শাখার ঝালর-ঝোলা
আমার বাগানটিতে।
ভেঙে-পড়া শ্যাওলা-ধরা পাঁচিলের উপর
একলা ব'সে।
প্রথম প্রাণের বহ্নি-উৎস থেকে
নেমেছে তেজোময়ী লহরী,
দিয়েছে আমার নাড়ীতে
অনির্ব্বাচনীয়ের স্পন্দন।
আমার চৈতন্যে গোপনে দিয়েছে নাড়া।
অনাদিকালের কোন অস্পষ্ট বার্ত্তা,
প্রাচীন সূর্য্যের বিরাট বাষ্পদেহে বিলীন
আমার অব্যক্ত সত্তার স্ফুরণ।
হেমন্তের রিক্তশস্য প্রান্তরের দিকে চেয়ে
আলোর নিঃশব্দ চরণ ধ্বনি'
শুনেছি আমার রক্ত-চাঞ্চল্যে।
সেই ধ্বনি আমার অনুসরণ করেছে
জন্ম পূর্ব্বের কোন পুরাতন কাল যাত্রা থেকে।
বিস্ময়ে আমার চিত্ত প্রসারিত হয়েছে অসীম কালে
যখন ভেবেছি
সৃষ্টির আলোক-তীর্থে
সেই জ্যোতিতে আজ আমি জাগ্রত
সেই জ্যোতিতে অযুত নিযুত বৎসর পূর্ব্বে
সুপ্ত ছিল আমার ভবিষ্যৎ।

তারপর আবার এক স্থানে বলিয়াছেন :—

সৃষ্টির ঝরণা বেয়ে যে-রস নামছে আকাশে আকাশে
তাকে জেনে নিয়েছি আমার দেহে মনে।
সেই রঙীন ধারায় আমার জীবনে রঙ লেগেছে
যেমন লেগেছে ধানের ক্ষেতে,
যেমন লেগেছে বনের পাতায়,
যেমন লেগেছে শরতে বিবাগী মেঘের উত্তরীয়ে।
এরা সবাই মিলে পূর্ণ করেছে আজ্‌কে দিনের বিশ্বছবি।"

সৃষ্টির সহিত মানুষের জীবনের যে অখণ্ড সংযোগ রহিয়াছে যাহা আমরা অনুভব করি অথচ প্রকাশ করিতে পারি না তাহাই কবি প্রকাশ করিতে চাহিতেছেন। কবি বলিতেছেন—সৃষ্টির আলোকতীর্থে গ্রহতারকা মণ্ডল মধ্যে সৌর জগতে যে আলোক-তীর্থ বিরাজিত, তাহারই জ্যোতিঃ প্রভায় কবির অন্তর জাগিয়া উঠিয়াছে। যে আলোকে পৃথিবী হাসে, যে আলোকে ধরণীর জীবজন্তু প্রফুল্ল হয়, যে আলোকে সর্ব্বলোককে আনন্দময় করিয়া তুলে সেই সৃষ্টির আলোকতীর্থে সেই জ্যোতিতে কবির অন্তর উদ্ভাসিত হইয়া উঠিয়াছে। ইহারই প্রতিধ্বনি শুনিতে পাই কবির বিভিন্ন কবিতায়, বিভিন্নরূপে কিন্তু মূল সুর সেই একই ভাবে গুঞ্জরিত হইতেছে।

"এই তো তোমার আলোক-ধেনু সূর্য্য তারা দলে দলে,
কোথাও ব'সে বাজাও বেণু চরাও মহা-গগনতলে।
তৃণের সারি তুলছে মাথা, তরুর শাখে শ্যামল পাতা,
আলোয়-চরা ধেনু এরা ভিড় করেছে ফুলে-ফলে।"

আবার শুনিতেছি,

"আলোর জোয়ার বেয়ে তোমার তরী আসে আমার ঘাটে।

'দিনান্তের' গানে শুনিতে পাই আবার সেই সুর—সেই মূলতত্ত্ব (key-note)

এই জীবনের আলোকেতে, পারি তোমায় দেখে যেতে,
পরিয়ে যেতে পারি তোমায় আমার গলার মালা।"

কবি পৃথিবীর সৃষ্টিরহস্য, আলোকতীর্থের সহিত যে যোগ পরিচয় দিয়াছেন, তাহা নানারূপে প্রতিভাত হইয়াছে।

'বসুন্ধরা' কবিতা ২৬শে কার্ত্তিক ১৩০০ সালে লিখিত এবং 'সোনার তরী'তে প্রকাশিত হইয়াছিল। কবির 'জীবনস্মৃতি'তে তাঁহার 'ছিন্নপত্রে' কবি কবিতার মূল সত্যটুকু নিজেই প্রকাশ করিয়াছেন। তাঁহার বালকবয়সে সৃষ্টিরহস্য সম্বন্ধে বৈজ্ঞানিক গ্রন্থাদি পড়িয়া যে সত্যটি অন্তর মধ্যে প্রভাবান্বিত হইয়াছিল সে কথা তিনি সর্ব্বদা ভাবেন, বিশ্বের পরিচয় লাভের জন্য ব্যাকুল হইয়া অবশেষে বৈজ্ঞানিক বিবর্ত্তনবাদকেই গ্রহণ করিয়াছেন, কিন্তু কতটুকুই বা আমরা জানিতে পারি।

এ কথা অতি সত্য, কিন্তু তবুও তত্ত্বান্বেষী মন নানাভাবে সৃষ্টিরহস্য জানিবার জন্য ব্যাকুল হইয়া থাকে। এ প্রশ্ন চিরন্তন। এ ভাব এ চিন্তা ও তাহার সমাধান করিবার জন্য অনাদিকাল হইতেই মানুষের চিত্ত ব্যগ্র হইয়াছে। কিন্তু উত্তর মিলে নাই। কবি মনে মনে যে একটি সংযোগসূত্রে আপনাকে সৃষ্টির অব্যক্ত এবং অপরিজ্ঞাত সত্তার সহিত বাঁধিয়া রাখিতে চাহেন, একটি অনুভূতি বোধ করিতেছেন, তাহার মূলে রহিয়াছে বিজ্ঞান। বিজ্ঞানের বিবর্ত্তনবাদকেই কবি গ্রহণ করিয়াছেন। সেই সৌরজগতের সৃষ্টি, সেই আলো, সেই সূর্য্য, সেই গ্রহতারাময় অনন্ত আকাশ আর এই শ্যামলা ধরণী, সকলের মধ্যেই যে জীবন বিজড়িত ছিল, সেই জীবন নানা ভাবে নানা রূপে নানা অবস্থান্তরের মধ্য দিয়া জগৎকে প্রাণীপূর্ণ করিয়াছেন। মানব তাঁহার শ্রেষ্ঠ অভিব্যক্তি। 'বসুন্ধরা' কবিতায় সেই যে অভিব্যক্তিবাদ তাহাই অতি সুন্দর ভাবে ব্যাখ্যাত হইয়াছে। এখানে কবি শুধু কবি নহেন, বৈজ্ঞানিকের সৃষ্টিতত্ত্বও তিনি কাব্যের ভিতর দিয়া প্রকাশ করিয়াছেন :

ওগো মা মৃন্ময়ি,
তোমার মৃত্তিকা মাঝে ব্যাপ্ত হ'য়ে রই,
দিগ্বিদিকে আপনারে দিই বিস্তারিয়া
বসন্তের আনন্দের মতো। বিদারিয়া
এ বক্ষ-পঞ্জর, টুটিয়া পাষাণ-বন্ধ
সঙ্কীর্ণ প্রাচীর, আপনার নিরানন্দ

অন্ধ কারাগার। হিল্লোলিয়া, মর্ম্মরিয়া,
কম্পিয়া, স্খলিয়া, বিকিরিয়া, বিচ্ছুরিয়া,
শিহরিয়া, সচকিয়া আলোকে পুলকে
প্রবাহিয়া চ'লে যাই সমস্ত দ্যুলোকে
প্রান্ত হ'তে প্রান্ত ভাগে।...

এইখানে 'হিল্লোলিয়া', 'মর্ম্মরিয়া', 'কম্পিয়া', 'স্খলিয়া', বিকিরিয়া','বিচ্ছুরিয়া','শিহরিয়া', 'সচকিয়া','প্রবাহিয়া' প্রভৃতি ক্রিয়াপদগুলির মধ্যে একটা অশ্রান্ত ব্যাকুলতা পরিলক্ষিত হয়। বি যেন আপনার প্রাণকে প্রকৃতির সবকিছু বৈচিত্র্য, সবকিছু 'ভি-ভঙ্গীর মধ্যে বিলাইয়া দিতে চাহিতেছেন।

রবীন্দ্রনাথ সৃজনীশক্তির মূলে একটি যোগসূত্র লক্ষ্য করিয়াছেন। কবি বলিয়াছেন, "এক সময়ে যখন আমি এই পৃথিবীর ঙ্গে এক হয়েছিলাম, যখন আমার উপর সবুজ ঘাস উঠত, রতের আলো পড়ত, সূর্য্যকিরণে আমার সুদূরবিস্তৃত শ্যামল দের প্রত্যেক রোমকূপ থেকে যৌবনের সুগন্ধ উত্তাপ উত্থিত তে থাকত আমি কত দূরদূরান্তর, দেশদেশান্তরের জলস্থল ব্যাপ্ত রে উজ্জ্বল আকাশের নীচে নিস্তব্ধভাবে শুয়ে পড়ে থাকতেম, খন শরৎ সূর্য্যালোকে আমার বৃহৎ সর্ব্বাঙ্গে যে একটা আনন্দ-স, যে একটি জীবনীশক্তি অত্যন্ত অব্যক্ত অর্দ্ধচেতন এবং অত্যন্ত কাণ্ড বৃহৎভাবে সঞ্চারিত হতে থাকত—তাই যেন খানিকটা নে পড়ে। আমার এই যে মনের ভাব এ যেন এই প্রতিনিয়ত, ঙ্কুরিত, মুকুলিত, পুলকিত, সূর্য্য-সনাথ আদিম পৃথিবীর ভাব। ন আমার এই চেতনার প্রবাহ পৃথিবীর প্রত্যেক ঘাসে এবং ছের শিকড়ে শিরায় শিরায় ধীরে ধীরে প্রবাহিত হচ্ছে, সমস্ত চক্ষেত্র রোমাঞ্চিত হয়ে উঠছে, এবং নারকেল গাছের প্রত্যেক তা জীবনের আবেগে থর থর করে কাঁপছে।"

"এই পৃথিবীটি আমার অনেক দিনকার এবং অনেক যকার ভালবাসার লোকের মতন চিরকাল নতুন। * * গতের সৌন্দর্য্যের মধ্য দিয়া প্রিয়জনের মাধুর্য্যের মধ্য দিয়া গবানই আমাদিগকে টানিতেছেন অপর কাহারও টানিবার মতাই নাই। পৃথিবীর প্রেমের মধ্য দিয়াই সেই ভূমানন্দের রিচয় পাওয়া, জগতের এই রূপের মধ্যেই সেই অপরূপকে ক্ষাৎ প্রত্যক্ষ করা ইহাকেই ত আমি মুক্তির সাধনা বলি। গতের মধ্যে আমি মুগ্ধ, সেই মোহেই আমার মুক্তিরসের স্বাদন।"

রবীন্দ্রনাথ কাব্যে সৃষ্টির রূপ ও তাহার অন্তর্নিহিত নিগূঢ়তত্ত্ব বিষ্ণু সুমধুর সুরগুঞ্জনে প্রকাশ পাইয়াছে :

"বৈরাগ্য সাধনে মুক্তি, সে আমার নয়।
অসংখ্য বন্ধন-মাঝে মহানন্দময়
লভিব মুক্তির স্বাদ। এই বসুধার
মৃত্তিকার পাত্রখানি ভরি বারবার
তোমার অমৃত ঢালি' দিবে অবিরত
নানা বর্ণগন্ধময়। প্রদীপের মতো
সমস্ত সংসার মোর লক্ষ বর্ত্তিকায়
জ্বালায়ে তুলিবে আলো তোমারি শিখায়
তোমার মন্দির মাঝে। ইন্দ্রিয়ের দ্বার
রুদ্ধ করি' যোগাসন, সে নহে আমার।
যে কিছু আনন্দ আছে দৃশ্যে গন্ধে গানে
তোমার আনন্দ র'বে তা'র মাঝখানে।

তাই কবি বলিতেছেন :

কোটি কোটি যাত্রী ওই যেতেছে চলিয়া—
আমিও চলিতে চাই উহাদেরি সাথে।
যে পথে তপন শশী আলো ধরে আছে
সে পথ করিয়া তুচ্ছ, সে আলো ত্যজিয়া,
আপনারি ক্ষুদ্র এই খদ্যোত আলোকে
কেন অন্ধকারে মরি পথ খুঁজে খুঁজে।

কবি জলে-স্থলে আকাশে-বাতাসে সর্ব্বত্র একটা আনন্দের ধারা প্রবাহিত হইতেছে উপলব্ধি করিয়াছেন, তিনি তৃণ, মাটি, জল সর্ব্বত্রই অনুভব করিয়াছেন প্রাণের পুলক-শিহরণ। সেজন্যই বলিতে পারিয়াছেন :

হই যদি মাটি, হই যদি জল,
হই যদি তৃণ, হই ফুল ফল,
জীবসাথে যদি ফিরি ধরাতল
কিছুতেই নাহি ভাবনা।
যেথা যাব সেথা অসীম বাঁধনে
অন্তবিহীন আপনা!
* * *
তৃণ রোমাঞ্চ ধরণীর পানে
আশ্বিনে নব আলোকে
চেয়ে দেখি যবে আপনার মনে
প্রাণ ভরি উঠে পুলকে!
মনে হয় যেন জানি
এই অকথিত বাণী,
মূক মেদিনীর মর্ম্মের মাঝে
জাগিছে যে ভাবখানি!
এই প্রাণে ভরা মাটির ভিতরে
কত যুগ মোরা যেপেছি
কত শরতের সোনার আলোকে
কত তৃণে দোঁহে কেঁপেছি।

কবি তাঁহার কাব্যের মধ্য দিয়া সৃষ্টির গভীর রহস্যের সন্ধান পাইয়াছেন, তিনি অনুভব করিতেছেন অনাদি অতীত ও অনন্ত ভবিষ্যতের সৃষ্টিধারা;—সৃষ্টির প্রথম প্রভাতের রূপটিও কবির নিকট প্রত্যক্ষ।

লক্ষ বরষ আগে যে প্রভাত
উঠেছিল এই ভুবনে,
তাহার অরুণ কিরণ কণিকা
গাঁথ নাকি মোর জীবনে?
কি মূরতি মাঝে ফুটালে আমারে
সেদিন লুকারে প্রাণে?
হে চির পুরাণো, চিরকাল মোরে
গড়িছ নূতন ক'রিয়া।
চিরদিন তুমি সাথে ছিলে মোর
রবে চির দিন ধরিয়া।

Evolution বা ক্রমবিকাশের মধ্যেই রহিয়াছে সৃষ্টিরহস্যের

প্রকৃত তত্ত্ব। কবি এ কথাটি নানাভাবে প্রকাশ করিয়াছেন। সেইজন্যই নিখিল ভুবনের সর্ব্বত্র একটা যে যোগসূত্র অনুভব করিতেছেন তাহা এই :

তৃণে পুলকিত যে মাটির ধরা লুটায় তোমার সামনে,
সে আমায় ডাকে এমন করিয়া কেন যে, কব তা কেমনে!
মনে হয় যেন সে ধূলির তলে
যুগে যুগে আমি ছিনু তৃণে জলে
সে দুয়ার খুলি' কবে কোন্ ছলে বাহির হোয়েছি ভ্রমণে ;
সেই মূক মাটি মোর মুখ চেয়ে লুটায় আমার সামনে।
নিশার আকাশ কেমন করিয়া তাকায় আমার প্রাণে সে,
লক্ষ যোজন দূরের তারকা মোর নাম যেন জানে সে।
যে ভাষায় তারা করে কানাকানি
সাধ্য কি আর মনে তাহা আনি,
চির দিবসের ভুলে যাওয়া বাণী কোন্ কথা মনে আনে সে।
অনাদি উষায় বন্ধু আমার তাকায় আমার পানে সে।

*

বদ্ধ যে আমি অনন্তকাল, বদ্ধ আমার ধরণী,
বদ্ধ এ মাটি, বদ্ধ সুদূর তারকা হিরণ বরণী।
যেথা আছি আমি আছি তাঁরি দ্বারে,
নাহি জানি ত্রাণ কেন বল কারে।
আছে তাঁরি পারে তাঁরি পারাবারে বিপুল ভুবন-তরণী
যা হয়েছি আমি ধন্য হয়েছি ধন্য এ মোর ধরণী।

কিন্তু এই যে আত্মীয়তা, এই যে একপ্রাণতা, তাহার মূলতত্ত্বের আবিষ্কারে কবির বৈজ্ঞানিক মন ব্যাকুল এইজন্যই রবীন্দ্রনাথ বিশ্বপ্রকৃতির উদ্ভব, নীহারিকার আবির্ভাব, সৌরজগতের প্রকাশ, আমাদের জননী বসুন্ধরায় সৃষ্টির ক্রমবিকাশের ইতিহাস অনুসন্ধান করিতেছেন। কোন অন্ধকার যুগ হইতে, কি ভাবে প্রকাশ পাইল অনন্ত আকাশের ব্যবধানের অপরূপ সৃষ্টিলীলায় ক্রমবিকাশমান দ্যুতিমান সূর্য্য এবং কি ভাবে তরুলতা ও প্রাণিজগতের বিবিধ প্রাণীর আবির্ভাব হইল, যে সৃষ্টি যুগে যুগে পুনঃ পুনঃ অবিশ্রান্ত ভাবে জগতের শাশ্বত রক্ষা করিয়া চলিয়াছে সমভাবে সৃষ্টি ও ধ্বংস দ্বারা। সে রহস্যের আবরণ-উন্মোচনপ্রয়াসী কবি বলিয়াছেন :

পদে পদে তুমি ভুলাইলে দিক্,
কোথা যাব আজি নাহি পাই ঠিক
ক্লান্ত হৃদয়, ভ্রান্ত পথিক
এসেছি নূতন দেশে,
কখনো উদার গিরির শিখরে
কভু বেদনার তমো গহ্বরে
চিনি না যে পথ সে পথের পরে
চলেছি পাগল বেশে :
তাই দূর সুরে দৃষ্টি রাখি আমার উদাস আঁখি
এ বেলার গূঢ় গান গাহে!

কবি জীবনে যে বিশ্বপ্রেম, সর্ব্বজাতির মধ্যে অনন্ত ঐক্যের মূলমন্ত্র লাভ করিয়াছিলেন তাহাই হইতেছে কবির মহামিলনের বাণী :

"সব ঠাঁই মোর ঘর আছে, আমি সেই ঘর মরি খুঁজিয়া,
দেশে দেশে মোর দেশ আছে, আমি সেই দেশ লব যুঝিয়া।"

আবার বলিতেছেন,

ইচ্ছা করে, আপনার করি
যেখানে যা কিছু আছে। নদীস্রোতোনীরে
আপনারে গলাইয়া দুই তীরে তীরে
নব নব লোকালয়ে ক'রে যাই দান
পিপাসার জল, গেয়ে যাই কলগান
দিবস নিশীথে।
* * * ইচ্ছা করে মনে মনে
স্বজাতি হইয়া থাকি সর্ব্বলোক সনে
দেশে দেশান্তরে। উষ্ট্রদুগ্ধ করি পান
মরুতে মানুষ হই মানব সন্তান
দুর্দ্দম স্বাধীন। তিব্বতের গিরিতটে
নির্লিপ্ত প্রস্তরপুরীমাঝে, বৌদ্ধমঠে
করি বিচরণ। দ্রাক্ষাপায়ী পারসিক
গোলাপকাননবাসী, তাহার নির্ভীক
অশ্বারূঢ়, শিষ্টাচারী সতেজ জাপান,
প্রবীণ প্রাচীন চীন নিশিদিনমান
কর্ম্ম অনুরত, সকলের ঘরে ঘরে
জন্মলাভ ক'রে লই হেন ইচ্ছা করে।

রবীন্দ্রনাথ জগতের রূপ রস গন্ধ ও বর্ণে মুগ্ধ ছিলেন পৃথিবীকে শত রূপে শত ভাবে ভালবাসিয়াছিলেন তিনি বিশ্বস্রষ্টা জীর্ণ দেবতার উদ্দেশে অঞ্জলি দিয়া বলিতেছেন,

এই জীর্ণ দেবতার ধরণীর মন্দির-প্রাঙ্গণে
যে পূজার পুষ্পাঞ্জলি সাজাইনু সযত্ন চয়নে
সায়াহ্নের শেষ আয়োজন, সে পূর্ণ প্রণামখানি
মোর সারাজীবনের অন্তরে অনির্ব্বাণ বাণী
জ্বালায়ে রাখিয়া গেনু আরতি সন্ধ্যা-দীপ মুখে,
সে আমার নিবেদন তোমাদের সবার সম্মুখে
হে মোর অতিথি যত। তোমরা এসেছ এ জীবনে
কেহ প্রাতে, কেহ রাতে, বসন্তে, শ্রাবণ বরিষণে।
কারো হাতে বীণা ছিল, কেহ বা কম্পিত দীপশিখা
এনেছিলে মোর ঘরে, দ্বার খুলে দুরন্ত ঝটিকা
বারবার এসেছে প্রাঙ্গণে। যখন গিয়েছ চ'লে
দেবতার পদ-চিহ্ন রেখে গেছ মোর গৃহতলে।
আমার দেবতা নিল তোমাদের সকলের নাম।
রহিল পূজায় মোর তোমাদের সবার প্রণাম।

কবি রবীন্দ্রনাথ বিশ্বপ্রকৃতি ও মানবপ্রকৃতির উভয়ের মধ্যেই জগতের নিত্য লীলা প্রত্যক্ষীভূত করিয়া সকলের মাঝখানেই 'চিত্তের স্থাপন' করিয়াছিলেন। সৃষ্টির প্রারম্ভ হইতে যে চিরন্তন রহস্য অজ্ঞাতরূপে মানব-মনকে বিচলিত করছে সেই সৃষ্টির লীলা-সন্ধানী কবি নানাভাবে ভৎসম্বন্ধে কখনও কল্পনায়, কখনও বৈজ্ঞানিক গবেষণায়, কখনও বা পুরাণ ও শাস্ত্রমতানুসারে আলোচনা করিয়া যে সত্যকে উপলব্ধি করিয়াছেন তাহা

অতুলনীয়, রবীন্দ্রনাথের হৃদয়ের উদারতা এই সব কবিতার মধ্য দিয়া কি সুন্দর ভাবেই না প্রকাশ পাইয়াছে।

মহাপ্রাণ কবির কণ্ঠে কণ্ঠ মিলাইয়া বলি :—

জগতের মহা বেদব্যাস,
গঠিলা নিখিল উপন্যাস,
বিশৃঙ্খল বিশ্ব নীতি লয়ে
মহাকাব্য করিলা রচন।
চক্রপথে ভ্রমে গ্রহ তারা
চক্রপথে রবি শশি ভ্রমে,
শাসনের গদা হস্তে লয়ে
চরাচর রাখিলা নিয়মে।
মহাছন্দ মহা অনুপ্রাস
দ্যূতে দ্যূতে বিস্তারিল পাশ।

কবি প্রাণের অশ্রান্ত গতিবেগের মধ্য দিয়াই সৃষ্টির রূপের পূর্ণ অভিব্যক্তি প্রকাশ করিয়াছেন। 'নৈবেদ্যে' প্রকাশিত তাঁহার 'প্রাণ' কবিতাটিতে তাহা স্পষ্ট রূপে প্রতিভাত হইয়াছে। আমরা এখানে সেই কবিতাটি উদ্ধৃত করিতেছি।

এ আমার শরীরের শিরায় শিরায়
যে প্রাণ তরঙ্গমালা রাত্রিদিন ধায়
সেই প্রাণ ছুটিয়াছে বিশ্ব-দিগ্বিজয়ে,
সেই প্রাণ অপরূপ ছন্দে তালে লয়ে
নাচিছে ভুবনে, সেই প্রাণ চুপে চুপে
বসুধার মৃত্তিকার প্রতি রোমকূপে
লক্ষ লক্ষ তৃণে তৃণে সঞ্চারে হরষে,
বিকাশে পল্লবে পুষ্পে বরষে বরষে,
বিশ্বব্যাপী জন্মমৃত্যু সমুদ্র-দোলায়
দুলিতেছে অন্তহীন জোয়ার-ভাটায়
করিতেছি অনুভব, সে অনন্ত প্রাণ
অঙ্গে অঙ্গে আমারে করেছে মহীয়ান্।
সেই যুগযুগান্তর বিরাট স্পন্দন
আমার নাড়িতে আজি করিছে নর্তন।

পৃথিবীর কোন দেশের কোন কবি রবীন্দ্রনাথের ন্যায় বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব ও বিবর্তনবাদ লইয়া ব্যাপকভাবে মনোজ্ঞ কবিতা রচনা করেন নাই—একথা এই প্রসঙ্গে সগৌরবে উল্লেখ করিতে পারি।*

* রবিবাসরের উদ্যোগে রবীন্দ্রনাথের মৃত্যুর পরে অনুষ্ঠিত প্রথম সভাধিবেশনে রবীন্দ্রনাথের বিচিত্রা ভবনে এই প্রবন্ধ পঠিত হইয়াছিল।

বাঙালীর বাংলা

শ্রীবিজয়বিহারী মুখোপাধ্যায়

বাংলার কবি আশীর্বচন উচ্চারণ করেছিলেন :

বাংলার মাটি বাংলার জল
বাংলার বায়ু বাংলার ফল
পুণ্য হউক পুণ্য হউক
পুণ্য হউক হে ভগবান।
বাঙালীর প্রাণ বাঙালীর মন
বাঙালীর ঘরে যত ভাইবোন
এক হউক এক হউক
এক হউক হে ভগবান।

কিন্তু বাঙালী আত্মবিস্মৃত জাতি, সে বারবার ভুলে যায় তার ইতিহাস, তার অতীত, তার কীর্ত্তি; সে অন্যমনা হয়ে যায় তার ভবিষ্যতের সম্ভাবনার প্রতি। বাংলার বৈশিষ্ট্যের, তার ভাষার, তার ভাবসম্ভারের, তার কৃষ্টি বৈচিত্র্যের, তার ভাব-প্রেরণার, তার কল্পনা-সম্ভারের সূত্রপাত কোন শুভদিনে হয়েছিল ইতিহাস তার কোন নির্দিষ্ট তারিখ নির্দেশ করে না।

মেগাস্থিনিসের পর্য্যটন-কাহিনীর ভিতর তাম্রলিপ্তির (আধুনিক তমলুক) প্রধান স্থান ও প্রাচীন সাহিত্যের মধ্যে অঙ্গ, বঙ্গ, কলিঙ্গের একত্র বিবরণ অন্ততঃ ইহা প্রমাণ করে যে ইতিহাস-বিস্মৃত যুগ হতে বাংলা বিহার ও উড়িষ্যার বহু সম্বন্ধ ও বহু আদানপ্রদানের বিনিময় কেবলমাত্র সম্ভব ছিল না, সুনিশ্চিত ছিল। পাল ও সেনবংশীয় নৃপতিগণ পাটলিপুত্র ও গৌড়ের সঙ্গে বহু স্নেহবন্ধনে দেশবাসীদের আবদ্ধ করেছিলেন তার বিশ্বাসযোগ্য প্রমাণ অপ্রতুল নয়। মগধ মিথিলা নবদ্বীপের পূর্ব্ব ইতিহাস, নালন্দার রাজগৃহের পূর্ব্ব বিবরণ এ বিশ্বাস সম্পূর্ণ ভাবে সমর্থন করে। বিদ্যাপতির পদাবলী বাংলা ও মিথিলার ভাষা সাদৃশ্য উভয় দেশের সংস্কৃতির সাম্য প্রমাণ করে। পাশ্চাত্য মনস্তত্ত্ববিদরাও আজ সিদ্ধান্ত করেছেন যে ভাবসাম্যই প্রকৃত সাম্য আনে। (Cf. Gerald Heard's Sub-conscious Cohesives.)

মুসলমান সাম্রাজ্যের বিস্তারকালে বাংলা, বিহার ও উড়িষ্যার ভাগ্যবিপর্য্যয় ভিন্ন ভিন্ন রূপে সংঘটিত হয় কিন্তু এ কথা ইতিহাস নির্দেশ করে যে ষোড়শ শতাব্দীর প্রায় প্রারম্ভেই বাংলা, বিহার ও উড়িষ্যা একই শাসনতন্ত্রের সমষ্টিরূপে একই গণ্ডীর অন্তর্গত বলে পরিগণিত হয়েছিল। "সুবা" বাংলা, বিহার, উড়িষ্যা সেই সময় হতে একই গণ্ডীরূপে পলাশীর যুদ্ধের পর ইংরেজের অধিকারে আসে। ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর শাসনভার গ্রহণকাল হতে সুবে বাংলা, বিহার, উড়িষ্যা একই শাসনভারের অন্তর্ভুক্ত সমষ্টিরূপে পরিচালিত হয়। বাংলা প্রদেশ শাসনের প্রথম সাংবৎসরিক সমালোচনা (First Administration Report of the Province of Bengal

of 1855-56) প্রকাশিত হয় সর ফ্রেডারিক হ্যালিডের আমলে। লর্ড ডালহৌসি বাংলাকে হাঁটকাট করে তার যে রূপ দিয়েছিলেন এই রিপোর্টে তাই দেখা যায়। বাংলা প্রদেশের অন্তর্ভুক্ত বলে নিম্নলিখিত স্থানগুলি দেখান হয়:

বিহার	৪২০০০	বর্গমাইল
বাংলা	৮৫০০০	”
উড়িষ্যা	৭০০০	”
উড়িষ্যার করদ মহাল	১৫৫০০	”
ছোটনাগপুর	৬২০০০	”
আসাম	২১৫০০	”
আরাকান	১৪০০০	”
মোট—	২৫৩০০০	”

আরাকান অল্পদিনের মধ্যেই ব্রহ্মদেশের অন্তর্ভুক্ত হয়। আসাম ১৮৭৪ সালে পৃথক্ চীফ কমিশনারের প্রদেশে পরিণত হয়। এই শাসন-ব্যবস্থা নির্বিবাদে ১৯০৪-৫ সাল পর্যন্ত পরিচালিত হয়। ১৯০৩-৪ সালে সাম্রাজ্যবাদী দুরভিসন্ধিসম্পন্ন লর্ড কার্জন বাংলার অঙ্গচ্ছেদের প্রস্তাব করেন। ১৯০৩ সালের ৩রা ডিসেম্বর তারিখের এক পত্রে [পরে ইহা পার্লামেন্ট কমান্ড ২৬৫৮ (১৯০৫)-এর অন্তর্ভুক্ত হয়ে প্রকাশিত হয়] বলেন যে, "বাংলার শাসনতন্ত্র লোকবৃদ্ধি এবং ব্যবসা-বাণিজ্যের বহু প্রশ্ন উত্থাপনের জন্য জটিল হয়ে উঠেছে" এবং "এই কারণে এই শাসনভার লঘু করতে হলে বাংলাকে খণ্ডিত করা ভিন্ন উপায় নাই।" বাংলার এই অঙ্গচ্ছেদ প্রস্তাব দেশের স্বাধীনতা-সংগ্রামের এক চিরস্মরণীয় ঘটনা। কুপল্যাণ্ড সাহেবের নব প্রকাশিত ভারতীয় রাষ্ট্রিক প্রশ্নের সমালোচনায় কিন্তু ইহার উল্লেখ পর্য্যন্ত নাই। এই আন্দোলনে বাঙালী প্রথম বুঝে যে শাসকদের ব্যক্ত অভিপ্রায় যাই হোক না কেন, এর পিছনে আছে বাংলার শক্তিকে ব্যাহত ও খর্ব্ব করার প্রয়াস ও অভিসন্ধি। হিন্দু বাঙালীর বুদ্ধি বিদ্যা ও প্রগতি ইংরেজ সাম্রাজ্যবাদী কখনও সহানুভূতির চোখে দেখেন নাই। বঙ্গবিচ্ছেদ সম্বন্ধে তদানীন্তন এক বিশিষ্ট ব্যক্তি বলেছিলেন, "বেশ বুঝা যায় সরকারের ব্যক্ত উদ্দেশ্য যাই হোক না কেন তাঁদের মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল বাঙালীর সঙ্ঘশক্তি খর্ব্ব করা, কলিকাতার প্রভাব ও বৈশিষ্ট্য নষ্ট করা এবং বাংলার শিক্ষিত হিন্দুদের দমন করবার জন্ত পূর্ব্ববঙ্গের মুসলমানদের সাহায্যে ইংরেজের সুবিধাজনক শক্তি সংগঠন।"

এই সময় হতেই ইংরেজের মুসলমানপ্রীতি উগ্র হয়ে ওঠে। মুসলমানেরা সরকারের দুয়োরাণী বলে পরিচিত হন। ১৮৭২ সালের সেন্সস রিপোর্টে বলা হয়েছিল যে বাংলার মুসলমান প্রধানতঃ বাংলার নিম্নস্তরের হিন্দুরই সন্তান, মুসলমান ধর্ম্মে দীক্ষিত হয়ে মুসলমান বলে পরিচিত হয়েছে। আধুনিক ইংরেজ কর্ম্মচারী ও ইংরেজ ঐতিহাসিক এ সব জেনেও মুসলমানকে আরবনিবাসী বিজেতা ও হাল সাকিম বাংলা বলে প্রচার করতে কুণ্ঠিত হলেন না। ঊনবিংশ শতাব্দী পর্য্যন্ত কোন সরকারী বা বেসরকারী রিপোর্টে হিন্দু-মুসলমান-দ্বন্দ্বের উল্লেখমাত্র না থাকা সত্ত্বেও হিন্দুর অত্যাচারে মুসলমানের প্রগতি বন্ধ হয়েছে এই কথা প্রচার করতেও এঁরা লজ্জাবোধ করলেন না। এঁদের প্রচারকার্য্যের ফলে বাংলার মুসলমান বিশ্বাস করতে শিখল যে তারা আরবের লোক, তারা বিজেতা, হিন্দুদের দ্বারাই বাধা পেয়ে তারা অগ্রসর ও উন্নত হতে পারে নাই। ঢাকার নবাব সলিমুল্লা অকর্ম্মণ্যতার ফলে বিনষ্টপ্রায় জমিদারী রক্ষার জন্য সরকারী তহবিল হতে অর্থ সাহায্য পেয়ে মুসলিম লীগ প্রতিষ্ঠা করে তার প্রতিদান দিলেন।' তাঁর চেয়ে অনেক শোচনীয় অবস্থাতেও অন্য কোন জমিদারের ভাগ্যে সরকারী তহবিলের সহায়তা লাভের সৌভাগ্য হয় নাই। মুসলিম লীগ সৃষ্টি, লর্ড মিণ্টোর সঙ্গে দলবদ্ধ সাক্ষাৎ, পৃথক্ নির্ব্বাচন ও অবশেষে অশ্রুতপূর্ব্ব সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারা ও সেই বাঁটোয়ারা-নিয়ন্ত্রিত মন্ত্রিমণ্ডলীর দ্বারা সমস্ত জাতীয় জীবনকে সাম্প্রদায়িক বৈরাগ্নিতে আচ্ছন্ন করার ইতিহাস সুবিদিত। বিদ্যায় প্রশ্রয় দানের ফল ইংরেজের কাছেই হয়েছে সবচেয়ে মর্ম্মান্তিক। আজ ভারতে ইংরেজ রাজত্ব আছে কিন্তু সম্ভ্রম নাই, রাষ্ট্রতন্ত্র আছে কিন্তু আনুগত্য নাই, রাজা আছেন কিন্তু প্রজা বিদ্রোহী ও প্রজাহীন।

বঙ্গ ভঙ্গ আন্দোলনের ফলে ১৯১২ সালে আবার বাংলার সীমা পরিবর্ত্তন করা হ'ল। এই পরাজয়ে বাঙালীর উপর ইংরেজের বিদ্বেষ আরও বাড়ল। বঙ্গ বিচ্ছেদ রহিত হ'ল বটে কিন্তু বাংলার পশ্চিম প্রান্তের সমস্ত জেলাগুলিকে কেটে বাদ দেওয়া হ'ল। মানভূম, ধলভূম, জামতাড়া, রাজমহল, পাকুড় প্রভৃতি বহু অঞ্চল যাহা বাঁকুড়া, বীরভূম ও মেদিনীপুর জেলার অন্তর্ভুক্ত ছিল ও যাদের ভাষা, সমাজ পদ্ধতি, আর্থিক ব্যবস্থা ও ভাবসম্ভারের সঙ্গে বাংলার কোন অমিল নাই তাদের জোর করে বিচ্ছিন্ন করা হ'ল। সঙ্গে সঙ্গে বিভিন্ন প্রদেশে বাঙালী বিদ্বেষের প্রশ্রয় দিয়ে বাঙালীকে আঘাত করার চেষ্টা চলল। সর্ব্বপ্রকার ন্যায়বিগর্হিত, যুক্তিবিগর্হিত ও নীতিবিগর্হিত পদ্ধতির দ্বারা বাঙালী হিন্দুকে দুর্ব্বল করবার চেষ্টা চলতে লাগল। দুঃখের বিষয় এই ব্যাপারে নেতাদের কাহাকেও কাহাকেও যোগ দিতে দেখা গেল।

ভাষার ভিত্তিতে প্রাদেশিক সীমা নির্দ্ধারণ কংগ্রেসও সমর্থন করেছেন এবং এই ভিত্তিতে প্রদেশ গঠনই সব চেয়ে ভাল। ভাষার ভিত্তিতে বাংলার সীমা পুনর্নির্দ্ধারণের আন্দোলন আমাদের অবিলম্বে আরম্ভ করা দরকার। খণ্ডিত বাংলার যে অংশগুলি যথা মানভূম, ধলভূম, রাঁচি, হাজারিবাগের একাংশ জামতাড়া, পাকুড়, সাহেবগঞ্জ, সাঁওতালপরগণা প্রভৃতি বিহারের সঙ্গে জুড়ে দেওয়া হয়েছে তাদের ফিরিয়ে আনা প্রয়োজন। দ্বিতীয়তঃ, আদিবাসীদের যে সব অঞ্চল বহু দিন বাংলার সঙ্গে ছিল এবং যেগুলি বাংলার নদী সংস্কার ও সেচ পরিকল্পনার সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত বাঙালী ও আদিবাসী উভয়েরই কল্যাণের জন্ত সেগুলিকে বাংলায় ফিরিয়ে আনা দরকার। তৃতীয়তঃ, বাঙালীর স্বার্থ ও কল্যাণ বিরোধী যে সব হুকুমনামা বিভিন্ন প্রদেশে প্রণীত হয়েছে সেগুলি পরীক্ষা করে অন্যায় আদেশগুলির উচ্ছেদ সাধনেরও সময় এসেছে। চতুর্থতঃ, ভিন্ন প্রদেশবাসী বাঙালীদের মধ্যে ঐক্য আনয়ন ও বাঙালীর সংস্কৃতিকে পূর্ণভাবে জাগ্রত রাখবার জন্য সমবেত চেষ্টাও আবশ্যক।

পেশাদার জুয়াড়ী বা দ্যূতকার

শ্রীমন্মথনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

চরিত্র ও প্রকৃতিতে, মানুষের পরস্পরের সঙ্গে, অল্প-বিস্তর প্রভেদ আছে। এক এক জন এক একটি বিষয় আশ্রয় ও অনুধাবন করে ও তা থেকে সুখ পেতে চেষ্টা করে। ভিন্নরুচির্হি লোকাঃ। বায়োস্কোপ বা থিয়েটার দেখা, ক্রিকেট বা ফুটবল ম্যাচ দেখা, পুরাতন টিকিট সংগ্রহ করা. নভেল পড়া, ঘুড়ি উড়ান, মাছ ধরা, শিকার করা, সাঁতার কাটা, তাস, দাবা বা পাশা খেলা, নাচ গান বাজনা, ছবি আঁকা, জিম্‌ন্যাষ্টিক বা কুস্তি করা, গল্প করা, আড্ডা দেওয়া, বৃথা ঘুরে বেড়ানো, যাত্রা বা থিয়েটারে অভিনয় করা, স্কাউট হওয়া, দরিদ্রনারায়ণের সেবা করা, দেশোদ্ধারের জন্য দল বেঁধে কোনও মতবাদ প্রচার করা প্রভৃতি কাজে আগ্রহ, বিভিন্ন মানুষের মধ্যে দেখতে পাওয়া যায়। এই সব ব্যাপারের আগ্রহকে 'সখ' বলা হয়, সখের মাত্রা বেশী হলে তাকে ঝোঁক এবং মাত্রা আরও অতিরিক্ত হলে নেশা বলা হয়। বহু লোকের মধ্যে কোনও বিষয় বা ব্যাপার সম্পর্কে অতিরিক্ত প্রবণতা, উৎসাহ বা তন্ময়তা দেখা যায়। সাধারণতঃ সখের সঙ্গে জীবিকার চেষ্টা বা সম্পর্ক দেখা যায় না।

এই সব সখ, প্রবণতা ঝোঁক বা নেশা, যে কেন জন্মায়, তা মনোবিদের বিচার্য্য। সখের উৎপত্তির কতকগুলি কারণ সকলের বোধগম্য। আনন্দ লাভ করা এক প্রধান উদ্দেশ্য—আনন্দ প্রাপ্তি'-এরই কাম্য। লোকে যে ভাবে মানুষ হয়, যাদের কার্য্যকলাপ অহরহ দেখে, যাদের উপর ভালবাসা বা উচ্চ ধারণা তাদের থাকে এবং যাদের সঙ্গে মেশে, তাদের অনুকরণ করতে শেখে। অভ্যাসের ফলে, ক্রমে ক্রমে অনেক সময়ে সখ ও ঝোঁকের মাত্রা বেড়ে যায়। নেশা বেড়েই চলে, তাকে ছাড়া যায় না। ক্রমে নেশা সর্ব্বনাশা হয়। সর্ব্বনাশা নেশাকে শাস্ত্রকারেরা "ব্যসন" বলেন। ব্যসনীকে লোকে নিন্দা করে।

সর্ব্বম্ অত্যন্তম্ গর্হিতম্। কতক প্রকারের ঝোঁক, নেশা বা ব্যসন আছে যা সমাজের পক্ষে তত অনিষ্টকর নয়।

আবার এমন অনেক নেশা বা ব্যসন আছে, যেগুলি সমাজে বিশেষ ভাবে নিন্দিত হয়, মাত্রা ছাড়ালে এগুলি "অপরাধে"র মধ্যে গণ্য হয়। যেসব মনোবিদ্ নির্জ্ঞান মনের আলোচনা করেন, যাঁরা সাইকোয়্যানালিষ্ট বা মনঃসমীক্ষক বলে পরিচিত, তাঁরা অতিরিক্ত ঝোঁক বা নেশাকে—যার সম্বন্ধে প্রথম বলব—মানসিক রোগের পর্য্যায়ে গণ্য করেন। সাদা কথায় তাঁরা ঐগুলিকে 'মানস-বিকার' বলে বিবেচনা করেন। এই শ্রেণীর ঝোঁক বা নেশার উদাহরণ দিতে গেলে, সিদ্ধি, গাঁজা, কোকেন, আফিং ও মদের নেশা এবং পণ্য-স্ত্রী ও দ্যূত-ক্রীড়ার আসক্তির কথা প্রথমে মনে আসে।

'নির্জ্ঞান মনে'র সম্বন্ধে দু'চার কথা না বললে, বিষয়টি পরে সহজে বোঝানো যাবে না। মনের যতটুকু আমরা জানি বা জানতে পারি, তা অতি সামান্য; আমাদের মনের বেশীর ভাগ খবরই আমরা সাধারণতঃ জানি না; এই অংশকে নির্জ্ঞান মন বলা হয়, মানুষের মনের জ্ঞাত অংশকে তার দেহের বাইরের দৃশ্যমান অংশের সহিত তুলনা করা যেতে পারে। শরীর যেমন তার ভিতরের অদৃশ্য যন্ত্রের ক্রিয়াতে রক্ষিত ও চালিত হয়, মানুষের জ্ঞানগোচর মনও সেইরূপ নির্জ্ঞান মনের দ্বারা বহুল পরিমাণে চালিত ও নিয়ন্ত্রিত হয়। নির্জ্ঞান মন জ্ঞাত মন অপেক্ষা আয়তনে অনেক গুণ বেশী। নির্জ্ঞান মন সুখ এবং আনন্দ লাভের বহুবিধ কামনা ও যৌন ইচ্ছার উপর প্রতিষ্ঠিত। পরস্পরবিরোধী, বহুবিধ সুখলাভের এই সকল ইচ্ছা নির্জ্ঞান মনে একত্র বাস করে। আমরা এই সকল ইচ্ছার বিশেষ কোন খবর জানি না। পরিবারের মধ্যে মাতাপিতা, ধাত্রী, আত্মীয়-পরিজন, ভ্রাতা ভগ্নী প্রভৃতির সহিত মেলামেশার ফলে শৈশবে মানুষের আদিম, মৌলিক স্বার্থপর প্রবৃত্তিগুলি, নির্জ্ঞানে নির্ব্বাসিত হয়; ক্রমে অপরের দিকটা ভেবে লৌকিক ব্যবহারের জ্ঞান ও বিবেকের উদ্ভব হয়। উহা বাহ্য জগতের সম্পর্কের ফলে তার প্রতীক রূপে উড়ে এসে জুড়ে বসে। যে বাধা-নিষেধ, কর্ত্তব্য-অকর্ত্তব্য জ্ঞান, প্রথমে শৈশবে বাইরের ব্যাপার বলে বিবেচিত হ'ত, তা অন্তঃপ্রবিষ্ট হয়ে বিবেক-জ্ঞানে পরিণত হয়।

এবার জুয়াড়ী বা দ্যূতকারের প্রসঙ্গে আসা যাক। শেয়ার-ব্যবসায়ীর ও জুয়াড়ীর মনোবৃত্তির মধ্যে প্রভেদ অতি সূক্ষ্ম। শেয়ার-ব্যবসায়ীরা যেমন ভবিষ্যতে দর চড়বে কি, নামবে, এই অনিশ্চিত ব্যাপার সম্বন্ধে চিন্তাযুক্ত হন বা মনে মনে আলোচনা করে থাকেন, জুয়াড়ীরাও সেইরূপ অনিশ্চিত ব্যাপারের উপর, পণ বা বাজি রেখে, অর্থ-লাভের চেষ্টা করে। অধিকন্ত, জুয়াড়ীর যে দুশ্চিন্তা তার সঙ্গে প্রধানত কোন না কোন প্রকার খেলার সম্বন্ধ থাকে। শেয়ার ব্যবসায়ী ও জুয়াড়ীর কাজে আর একটি মিল আছে। উভয়েরই মনোবৃত্তিতে, প্রভূত লাভের আশা, বহু ক্ষতি বা সর্ব্বনাশের সম্ভাবনাকে দাবিয়ে অগ্রাহ্য করতে সাহস দেয়। উভয়েরই সংশয়-দোলাতে দোলবার অভ্যাস হয়ে যায়।

অক্ষক্রীড়া বা জুয়াখেলা খুব প্রাচীন; এর উল্লেখ মহাভারত পুরাণ ইত্যাদিতে কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রে, এমন কি বেদে পর্য্যন্ত পাওয়া যায়। কুরুপাণ্ডবদের মধ্যে এবং নলোপাখ্যানে অক্ষক্রীড়া বা পাশাখেলায়, রাজ্য এবং স্ত্রী পর্য্যন্ত পণ রাখার কথা সকলেই জানেন। অক্ষ বা পাশাতে প্রথমে বহেড়া গাছের ফল এবং তারই কাঠের তৈরি পাশা দিয়ে খেলা হ'ত। বাজি রেখে দাবা তাসখেলা প্রভৃতি ছাড়া, ফুটবল ম্যাচ, কোন্ দল জিতবে, বৃষ্টি আজ হবে কি না, যদি হয়, তবে কখন হবে—সোনার দর, পাটের দর, তুলার দর, শেয়ারের দর বাড়বে কি কমবে, এই সকলের উপরও গুপ্ত আড্ডায় বাজি খেলা হয়। প্রকাশ্যে হ'লে শাস্তির বিধান আছে। বৈদিক যুগ থেকে ঘোড়দৌড়ের খেলা প্রচলিত আছে এবং ঘোড়-দৌড়ের বাজি নিয়ে জুয়া প্রায় সর্ব্বদেশে ও সর্ব্ব সমাজে, সর্বকালীন তার নিন্দনীয় নয়। কুকুর-দৌড়েও বাজি হয়।

তেমনি আবার মোরগ ও বুলবুলির লড়াইয়ে বাজি খেলা হয়। এ ছাড়া এমন কোন অনিশ্চিত ভবিষ্যৎ ঘটনা নাই যা নিয়ে লোকে বাজি রাখে না; আর এইরূপ বাজি ঘরে ঘরে কথায় কথায় হয়, একে ঠিক জুয়া নাম দেওয়া চলে না। এই বাজিতে ছেলেমেয়ে, পুরুষ-স্ত্রীলোক, সকলেই কখন না কখনও লিপ্ত হয়ে থাকে। বালক-বালিকার খেলায় তার বাজি রাখার ঝোঁকও কতক পরিমাণে মানুষের স্বাভাবিক বলা যেতে পারে। কিন্তু বাজিখেলা যখন ব্যসনে পরিণত হয় তখন তার বিষময় ফল লক্ষ্য করেই জুয়া বা বাজি সমাজে গর্হিত ব'লে বন্ধ করার চেষ্টা হয়ে থাকে। আবার নিরুদ্ধ প্রবৃত্তিকে পরিতৃপ্ত করবার জন্য কখনও কখনও আনন্দ-উৎসবের দিনে শাস্তির উপর কড়াকড়িটা শিথিল করে দিয়ে বাজিখেলার প্ররোচনা দেওয়া হয়। যেমন উত্তর-ভারতে হিন্দুদের মধ্যে কোথাও কোথাও কোজাগরী পূর্ণিমার রাত্রিতে অক্ষ-ক্রীড়ার বিধান আছে। নেপালে আবার কালীপূজার দিন কোন না কোন প্রকার জুয়াখেলার রীতি আছে। এই রকমের আর একটা উদাহরণ—হোলিখেলা। ইহাতে কাদা-মাটি ঘাঁটা হয় এবং অশ্লীলতার সাময়িক প্রশ্রয় দেওয়া হয়। কালীপূজাতে যে দ্যূতসবাজির খেলা হয়—তাতেও মানুষের রুদ্ধ ইচ্ছা আগুন দিয়ে খেলাতে তৃপ্তিলাভ করে।

জুয়াড়ী বা দ্যূতকারের মনোবৃত্তির অনুসন্ধান করতে গেলে আরও কয়েকটি বিষয় বিবেচনা করা উচিত। একটি দল না হলে জুয়া খেলা হয় না। প্রকৃত জুয়াড়ী সামাজিক "অপরাধী" (criminal) না হলেও অপরাধীদের মধ্যে যারা উগ্র বা গুণ্ডা প্রকৃতির তাদের অনেকেই দস্তুরমত জুয়াড়ী। সাধারণতঃ যৌবনোদ্গমের বয়স থেকে আরম্ভ করে ৫০।৬০ বছর বয়স পর্য্যন্ত লোকে জুয়াতে লিপ্ত থাকে। এটা লক্ষ্য করতে পারা যায় যে, পুরুষের পক্ষে এই বয়সের মধ্যেই কামের ইচ্ছা সাধারণতঃ সজাগ থাকবার কথা। জুয়াড়ীরা অনেক স্থলে, মদ ভাঙ প্রভৃতি নেশা করে, বেশ্যাসক্ত হয় এবং পোষ্যগণের টাকা বাবুয়ানা করে নেশায় ওড়ায়। দ্যূতকারদের মধ্যে, অধিকাংশ স্থলেই, স্ত্রী পুত্র, কন্যা, পিতামাতা, ভাই-ভগিনী প্রভৃতির প্রতি অর্থাৎ পারিবারিক আকর্ষণ অত্যন্ত কমে যায়। অনেক জুয়াড়ীর বিশেষ অন্য কোন উপার্জন বা জীবিকার বৃত্তি থাকে না। তারা বাল্যসুলভ অলসতায় সময়ক্ষেপ করে, এবং বিনা পরিশ্রমে অনায়াসে প্রভূত অর্থ উপার্জনের বাঞ্ছা করে। তারা প্রায়ই খুব কুসংস্কারাচ্ছন্ন হয়; স্বার্থসিদ্ধির জন্য দৈবজ্ঞের কাছে আনাগোনা করে এবং ঠাকুরের কাছে মানত করে। Obsessional বা Compulsion neurotic-দের মত কতকগুলি চিন্তা ও কাজ এবং সঙ্গে সঙ্গে তাদের বিপরীতগুলিও না করে তারা থাকতে পারে না। আবার দেখা যায়, পিতামাতা বা পূর্ব্বপুরুষের যে সব দোষ থাকলে সন্তান মানসিক বিকারগ্রস্ত হয় বা অপরাধী হয় বা আনুষ্ঠানিক বর্ষবাতিকগ্রস্ত হয়, জুয়াড়ীর পিতামাতা বা পূর্ব্বপুরুষগণের মধ্যে সেই সমস্ত দোষ প্রায়ই দেখা যায়। জুয়াড়ীদের মানসিক বিকার কতকটা আছে, বুঝতে হবে।

মনঃসমীক্ষকদের মতে নির্জ্ঞান-নিরুদ্ধ অজানা ইচ্ছাগুলিই আমাদের প্রায় সব কাজই করিয়ে থাকে; সুতরাং জুয়াড়ীর কার্য্যকলাপ ও মনোবৃত্তিতে অজ্ঞাত ইচ্ছার কার্য্যকলাপের অনুসন্ধান করা আবশ্যক। হিন্দুশাস্ত্রকারগণ ব্যসনকে কাম-চেষ্টার প্রতিনিধি বা প্রতীক বলেছেন। ব্যসন তাঁদের মতে কামজ ও কোপজ; আমরা দেখেছি, জুয়াড়ীর ব্যবহারে কামের সহিত সম্পর্ক আছে। ঐ কাম সরল সহজ বা সাধারণ পন্থায় প্রকাশিত হতে না পেয়ে অন্য উপায় অবলম্বন করে। কামের যে চেষ্টা বন্ধুতে পরিণত হয় তাকে মূলতঃ সমলৈঙ্গিক কামিতা বা সমকামিতা বা Homosexuality বলে। উহা জুয়াড়ীর মধ্যে বিশেষরূপে প্রকট।

আমাদের মনের জ্ঞাতসারে যে সব ইচ্ছা পরিস্ফুট হয়, নির্জ্ঞানে ঠিক তার বিপরীত ও প্রতিযোগী ইচ্ছা রুদ্ধ হয়ে থাকে; জুয়াড়ীর অর্থলালসা বিষয়ে এই বিপরীত ইচ্ছা দুটি সাধারণ মানুষের চেয়ে অধিকতর বলবতী। সুতরাং জুয়াড়ীর নির্জ্ঞান মনের অর্থক্ষয় ও সর্ব্বনাশের ইচ্ছাই তাকে সর্ব্বস্ব পণ করতে বাধ্য করে। কেউ কোন দোষ করলে তাকে অর্থদণ্ড শাস্তিস্বরূপ দিতে হয়, যখন রাজা দণ্ড না দেন, তখন ধর্ম্মশাস্ত্র-বেত্তারা প্রায়শ্চিত্তস্বরূপ অর্থক্ষয় করান। প্রায়শ্চিত্ত করা অবার মানুষের স্বভাব। দ্যূতকার সর্ব্বস্ব নষ্ট করে অপরাধের শাস্তি দিতে চেষ্টা করে, কিন্তু নিজে তা জানে না।

জুয়াখেলায় টাকাই বাজি ধরা হয়। টাকাই লক্ষ্যবিষয়। টাকা যেখানে অন্যের কাছ থেকে অনায়াসে পাওয়া যায়, সেখানে নির্জ্ঞান মনের ছেলে পাবার ইচ্ছা অর্থাৎ মাতৃত্বের ইচ্ছা, অন্য কথায় বলতে গেলে, স্ত্রীজনোচিত ইচ্ছার পরিতৃপ্তি হয়। আবার টাকা জোর করে আদায় করা ঠিক যেন তার উল্টো, অর্থাৎ পুরুষ যেমন তার স্ত্রীর কাছ থেকে ছেলে পায়, ঠিক সেই রকম ব্যাপার। মানুষের মধ্যে স্ত্রী পুরুষ উভয়েরই ভিতর পুরুষোচিত ও স্ত্রীজনোচিত দুই ইচ্ছাই বর্ত্তমান থাকে। এই উভয় ইচ্ছা পর্য্যায়ক্রমে দ্যূতক্রীড়ায় পরিতৃপ্ত হয়।

জুয়াড়ীরা মদ ভাঙ আফিং সিদ্ধি প্রভৃতি মাদক দ্রব্য ব্যবহার করে থাকে; মাদক জিনিস লোককে অভিভূত করে ফেলে। ঐগুলি পিতৃবীর্য্যের প্রতীক। সুতরাং ঐ সকলের সেবায় দ্বারা স্ত্রীজনোচিত ইচ্ছার পরিতৃপ্তি হয়।

এই প্রসঙ্গে ঋগ্বেদের ১০ম মণ্ডলের ৩৪ সূক্তের ১৪টি ঋকের কথা বলে উপসংহার করছি। ঐ সূক্তের ঋষি কবষ অক্ষ ও দ্যূতকার তাদের দেবতা বা প্রসঙ্গের বিষয়। এই সূক্তটি অক্ষসূক্ত নামে প্রসিদ্ধ। এটা কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কর্ত্তৃক প্রকাশিত, বৈদিক সূক্ত সঙ্কলনের মধ্যে মুদ্রিত আছে। সম্প্রতি অধ্যাপক শ্রীযুক্ত ক্ষিতীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মহাশয় ঐ পুস্তক আমূল সংস্কার করেছেন। তিনিই প্রথম আমার দৃষ্টি এই সূক্তের প্রতি আকর্ষণ করেন। আমি উহা পড়িয়া বিস্মিত হইয়াছি, ইহাতে জুয়াড়ীর খেদ মর্ম্মস্পর্শী ভাষায় সুন্দররূপে বর্ণিত আছে। "অক্ষ" বোধ হয় স্ত্রীর প্রতীক। অক্ষসূক্তের বিশ্লেষণ করলে জুয়াড়ীদের মনোবৃত্তির সুন্দর আভাস পাওয়া যায়। জুয়াড়ীদের মনঃসমীক্ষণের ফল, এই অক্ষসূক্তে উল্লিখিত মনঃসমীক্ষণের সঙ্গে অনেকাংশে মিলবে, এটা আমার বিশ্বাস।*

---

* অল ইণ্ডিয়া রেডিও কলিকাতা কেন্দ্রে প্রদত্ত বক্তৃতা।

কুমারী

শ্রীআদিত্য ওহ্‌দেদার

আজ সুমিতা তার মনের আনন্দকে ধরে রাখতে পারছে না। তার ছোট্ট বুকে এত আনন্দ কি করে সে ধরে রাখবে! সে আনন্দ যেন গিরি-কন্দরে লুকিয়ে থাকা ঝর্ণার মত ফুলে-ফেঁপে ঢেউয়ের সঙ্গীতে ছুটে আসতে চায়। কিন্তু কাকেই বা সে জানাবে?—এ কি বলা যায়! সুমিতা শান্ত হতে চেষ্টা করে। তবু কি পারে সে! এত আনন্দ সারা আকাশও যে ধরে রাখতে পারে না!

তিন বছরের ছোট্ট ভাইটি এল তার সামনে। সুমিতা অমনই তার গলা জড়িয়ে ধরলে দু হাতে; সস্নেহ চুমু খেয়ে বললে, মণি, ভাইটি আমার! তারপরই হঠাৎ তার গালে সুমিতা বসিয়ে দিলে এক চড়। রাগ দেখিয়ে বললে, পাজী, দুষ্টু কোথাকার! যাঃ তোকে চাই না!

বিস্ময়ের ঘোরটা কাটতেই মণি অভিমানে মুখ ফিরিয়ে ফুঁপিয়ে উঠল। চীৎকার করে কাঁদলে না। কেননা, অত ভাল দিদির ওপর সে ত রাগ করতে পারে না, অভিমানই করতে পারে; আর অভিমান, সে ত নিজের প্রাণের গোপন ব্যথা, অন্যকে ত তা জানান যায় না। মণি তাই নীরবে অশ্রু ফেলে দিদির হাত ছাড়িয়ে নিয়ে চলে যেতে চাইলে!

—ওরে আমার সোনামণি! এত রাগ দিদির ওপর? সুমিতা মণিকে বুকে চেপে ধরলে। আমার এমন ভাইটিকে কি মারতে পারি! সুমিতা হাসতে গিয়ে কেঁদেই ফেললে।

নিজের কাছেই সুমিতা অবাক মানে। সে কি পাগল হ'ল নাকি?

খানিক পরে সুযোগ বুঝে সুমিতা এল তার বাবার শোবার ঘরে। বিছানার নীচে থেকে সেই খামখানা বের করে আনলে সন্তর্পণে লুকিয়ে। নির্জনে চিঠিখানা খুলে সেই লাইন ক'টা পড়লে—কথাটা আমার মনও ছুঁয়েছে। সুমিতাকে তার ভারী পছন্দ। অবিশ্যি জানি না কতদূর কি হয়। তবে এদেরও আগ্রহ আছে। আমার জা ত সুমিতাকে দেখেছে, সুমিতার মত মেয়ে কেন না মনে ধরবে। একটা ফটো যত শীঘ্র পার পাঠিয়ে দাও। অত ভাসুর খুড়শ্বশুরদের দেখাতে হবে। আমার ত মনে হয় এই যোগেযোগেই কাজ হয়ে যেতে পারে। এখন ভগবানের হাত।

চিঠি লিখেছেন সুমিতার পিসিমা। সুমিতার পিসিমা পড়েছেন বড় ঘরে। যেমন টাকা-পয়সা তেমনই কুলশীল। সেই সেবার, তখন সুমিতার বয়স এগার-বার, সুমিতা গিয়েছিল তার পিসিমার শ্বশুরবাড়ি। যেমন বিরাট বাড়ি, তেমনই লোকজনে ভরা; আর সকলকেই দেখতেও বা কি সুন্দর! যেমন তার পিসিমার ভাসুর-দেওররা সুন্দর, তেমনই জায়েরাও সব এক-একটি যেন রূপের ডালা সাজান! সেই বাড়ির সুমিতা হবে 'বৌ'—কথাটি মনে মনে উচ্চারণ করতেও লজ্জা পেল সুমিতা।

পিসিমার ননদকে সুমিতার এত ভাল লাগে। এখনও দেখতে কি সুন্দর! অথচ বয়স হয়েছে, বিধবা মানুষ; কোন যত্নই ত নেন না শরীরের। সুমিতাকে তিনি কি বুঝে এত পছন্দ করলেন! সুমিতার ভারি অবাক লাগে। কিন্তু আনন্দও কি কম!

আর সুমিতার মনে পড়ছে তার কথা। তার কথা ত কত আগে থেকেই আসতে চাইছে সুমিতার সারা মন জুড়ে—পাখায় রামধনু আঁকা সাদা পাখীর ঝাঁকের মত। কিন্তু সুমিতা ইচ্ছে করে সে চিন্তাকে জোর করে ঠেলে রাখতে চেয়েছে এতক্ষণ। মানুষের মনের নীচে বোধ হয় আর একটা মন আছে;—সুমিতার ত তাই মনে হয়। সেই নীচের মনটা যেন মণিকোঠা। যত ভাল-লাগা স্মৃতি তার মধ্যে বন্ধ থাকে। সে মণিকোঠা কি আর যখন-তখন খোলা যায়। কিন্তু আশ্চর্য্য, সেই মণিকোঠার ভেতর থেকে কি সব যেন ধাক্কা দিয়ে বেরিয়ে আসতে চায়। সুমিতার বুক বুঝি তাই ঢিপ ঢিপ করছে। কিন্তু না, সুমিতা কিছুতেই এখন খুলবে না সে মণিকোঠার দুয়ার! এখুনি তাকে মার কাছে যেতে হবে যে রান্নাঘরে।

সুমিতা কাজের তাড়ায় লঘু হয়ে উঠল। চিঠিখানা তার বাবার বিছানার তলায় যেমন ছিল, ঠিক তেমনই ভাবে রেখে দিয়ে সে এল মার কাছে। খোলা চুল দু-হাতে জড়িয়ে একটা এলো খোঁপা বাঁধলে।

নীলিমা বললেন, এখনও চুল বাঁধিস নি সুমি। সন্ধ্যে যে গড়িয়ে এল। কি করছিলি এতক্ষণ? যা, চুল বেঁধে আয়। উনি যে বলছিলেন আজই ফটো তুলতে যাবেন।

সুমিতা দেখলে তার মার সারা চোখে-মুখে একটা পরিতৃপ্ত আনন্দের দীপ্তি। মার মুখের দিকে দ্বিতীয় বার চাইতে সুমিতার কেমন লজ্জা লাগল। নতমুখে 'এই যাই মা' বলে সুমিতা এল আয়নার সামনে।

আয়নার সামনে সুমিতা নিজেকে চেয়ে দেখলে। পিসিমার ননদ সুমিতাকে পছন্দ করেছেন! সে কি সত্যি অরুণদার যোগ্য!

অরুণদা? এরই কথা ত সুমিতা এতক্ষণ চেপে রেখেছিল। আশ্চর্য্য, কে ভেবেছিল অরুণদার সঙ্গেই সুমিতার বিয়ের সম্বন্ধ আসবে। অরুণদা? না, এখন আর অরুণদা নয়, এখন অরুণ সে। সুমিতার সারা দেহে আনন্দের রোমাঞ্চ জাগে।

এই ত বছর-দুই আগের কথা। অরুণদা এসেছিল তাদের বাড়ি বেড়াতে। অরুণ এম-এ পাস করেছে সবে। সুমিতার মনে পড়ে খুঁটিনাটি সেই দশ দিনের কথা;—অরুণদা মাত্র দশ দিন ছিল। মনে পড়ে অরুণ প্রথমেই তাকে বলেছিল: তোমায় ত সেবার দেখেছিলাম, তখন ফ্রক ছেড়েছ সবে। এখন ত নাম ধরে ডাকতে অনুমতি চাইতে হয়। সুমিতা বলে ডাকতে পারি ত?

মুখে তার দুষ্টুমি-ভরা হাসি। ঐ হাসিটা সুমিতার এত ভাল লাগে! আজও সুমিতার চোখের সামনে সেই হাসি যেন খোদাই করা রয়েছে। আর তার মুখখানি? —জগতে অমন সুন্দর আর কেউ আছে নাকি?

সুমিতা আবেশে চোখ বোজে।

অরুণের সে কথার উত্তরে সুমিতা কি জবাব দিয়েছিল, সুমিতার বেশ মনে আছে। বলেছিল, অনুমতি নেবার আগেই ত ডেকে নিলেন!

হেসে উঠেছিল অরুণ: এই ত হারাবার চেষ্টা দেখি! কেনই বা তা না হবে? ম্যাট্রিকে ফার্স্ট ক্লাস! কিন্তু আমি তোমায় ত ডাকি নি, তোমার নামটা যে মনে আছে তাই জানিয়ে দিলাম।

সুমিতা ছাড়ে নি। বলেছিল, স্মরণশক্তি যে আপনার উত্তম, তা জানি। সব পরীক্ষায় স্কলারশিপ এমনিই পান নি।

—স্মরণশক্তির কথা যখন তুললে, তখন স্বীকার করছি আমার সেটা আছে; আর সেই স্মরণশক্তির নজির টেনেই বলছি যে এত সম্মান ত সেদিন পাই নি। তখন ত তুমিটাই বেশ চলত।

—এখন যে আপনি মিষ্টার অরুণকুমার বোস, রিসার্চ-স্কলার!

—ও, তাই নাকি? বেশ। অতি গম্ভীর হয়ে দুই হাত জোড় করে সে-এক অদ্ভুত ভঙ্গী করে অরুণ বলেছিল, সুমিতা দেবী, আমার ধৃষ্টতা মাপ করবেন।

সে ভঙ্গীতে হাসি কি চাপা যায়! সুমিতা হেসে ফেলে বলেছিল, ভাল হবে না বলছি, অরুণদা; আর এমন বলবে?

—I win, your Majesty! কেমন, পথে এসেছ এবার?—তারপর সারা ঘর কাঁপিয়ে সে কি বিরাট হাসি!

উঃ, কি হাসাতেই না পারে। প্রতি কথায় হারাতে চায়। তার কাছে হারতেও কি ভালই না লাগে। কত কি যে পড়েছে আর কত কি যে জানে তার ঠিক নেই। কিন্তু অহংকার নেই একেবারে—সুমিতার তাই এত ভাল লাগে। পাড়ার সুরেন ছেলেটিও ত ইউনিভারসিটির ভাল ছাত্র; কিন্তু বাব্বা! কি দেমাকে লোক! সব কথায় জানাবে, সেই যা জানে তাই জানার চরম। জগতের যত বই সেই যেন সব গিলে খেয়েছে! আর কখনও কি হাসতে জানে! এত মুখ গোমড়া করে থাকলে সুমিতার ভারি হাসি পায়।

সেই দশটি দিনের সব কথা, সব টুকিটাকি ঘটনা সুমিতা কিছুই ত ভোলে নি! সবই মনের তলে চাপা ছিল! সুমিতা ভেবেছিল বুঝি বা সে ভুলেই গেছে। মনে পড়ে অরুণরা চলে যাবার পর দু-তিন দিন মনটা একটু খারাপ ছিল—অরুণের কথা, অরুণের মার কথা, অরুণের দিদিমার কথা মনে পড়ত।

কিন্তু সেদিনের অরুণ আর আজকের অরুণ সুমিতার কাছে কত যে আলাদা। খোঁপায় কাঁটা গুঁজতে গুঁজতে সুমিতা চুপ করে তার মুখখানা ভাল করে দেখতে লাগল। সুমিতাই যেন আজ নূতন হয়ে উঠেছে।

এই কথা অরুণও নিশ্চয় জানতে পেরেছে। আচ্ছা, কি ভাবছে সে! সুমিতার এত আনন্দের খানিকটাও কি তার হচ্ছে না? সুমিতাকে অরুণের ভাল কি লাগে নি? সুমিতার মন বলে নিশ্চয়। মনে পড়ে সেদিনের কথা। সুমিতা পরেছিল কলসা রঙের শাড়িটা। অরুণের সামনে পড়তেই অরুণ বলেছিল, বাঃ, তোমায় কি সুন্দর লাগছে সুমিতা। আর্টিষ্ট হলে আমি এঁকে নিতাম।

কথাটা যখন অরুণ বলেছিল, তখন কাছে কেউ ছিল না। যেমন ভালও লেগেছিল, তেমনই লজ্জাও পেয়েছিল সুমিতা। কিন্তু লজ্জাটা ঢাকতে হয়েছিল পরিহাস দিয়ে। বলেছিল, খুব বাড়িয়ে বলা স্বভাবটা তোমার এত বিশ্রী।

এ কথার উত্তরে অরুণ অন্য সময় হলে বেশ পরিহাস করে কিছু বলত—ধারাল বুদ্ধি দিয়ে ঘষা। সুমিতা ত তারই প্রতীক্ষা করেছিল। কিন্তু সুমিতাকে আশ্চর্য্য করে দিয়ে অরুণ বলেছিল, সত্যি বলছি, কিছুমাত্র বাড়িয়ে বলি নি সুমিতা। তুমি সত্যি ভারি সুন্দর। নিজের কথায় অরুণ যেন লজ্জা পেয়েই বাইরে চলে গেল।

পুরুষের কণ্ঠে সে ভাষা মেয়েদের মন দোলায়।

দশ দিনের সকল কথাবার্তায় অরুণের কণ্ঠে সুমিতা সেই সেদিন সেই ক'টি পরিহাসমুক্ত কথা শুনেছিল।

আজ সেই কথায় এত স্বপ্ন, এত ভাল-লাগার জাল বোনা।

আজ সুমিতা ফটো তুলতে যাবে সেই কলসা রঙের শাড়িটি পরে।

শোনা গেল মার গলা: সুমি, একেবারে কাপড়-চোপড় পরেই আয়। উনি ত এখুনি আসবেন।

সুমিতা বাক্স খুলে শাড়ির তলে সেই কলসা রঙের শাড়িটা খুঁজতে লাগল।

রাত্রে সুমিতা শুনলে মা বলছে বাবাকে: আমাদের এমন ভাগ্য কি হবে? এ যে বিশ্বাস করা যায় না। এত বড়লোক, তাতে অরুণের মত অমন ছেলে। তবে এক সময় ওরা ঠাকুর-ঝিকে যেমন শুধু রূপ দেখেই নিয়েছিল, সেইরকম সুমিকেও যদি নেয়। কি বল?

বাবা বললেন, হাঁ। তবে বড়লোকের মেজাজ, কিছু বলা যায় না। যদি হয় সুমিতার ভাগ্য।

সুমিতার ভাগ্যই বটে। এত সৌভাগ্য বুঝি কোন মেয়েরই হয় না। কিন্তু সে কি অরুণরা বড়লোক বলে? সুমিতা নিজে ত জানে, অরুণরা যদি গরীব হ'ত, অতি গরীব, তা হলেই বা কি এসে যেত! অরুণকেই তো সে জানে, তার সম্পদকে ত জানে না সুমিতা।

আবার শুনতে পেলে মা বলছে—কিন্তু এদিকে সুরেন বাবুরাও তো এক রকম রাজী—মেয়ে ত পছন্দই হয়েছে। তাদেরকে কি বলা যায় এখন।

বাবা বললেন, হুঁ। তাই ভাবছি।

এই সুরেনবাবুর ছেলে সুরেশের সঙ্গে সুমিতার সম্বন্ধের কথা চলছে। সুমিতাকে নাকি তাদের পছন্দ হয়েছে। বিশেষ কিছুই দাবী তাদের নেই। কিন্তু অরুণের পাশে সুরেশ? সুরেশ যে কতো কালো সুমিতা এখন বুঝতে পারে। তা ছাড়া কেমন বোকা-বোকা চেহারা লোকটার! নিতান্তই যেন গোবেচারি! তাই বলে সুরেশকে কি আর ঘৃণা সুমিতা করছে! বরং সে প্রার্থনা করছে সুরেশের সঙ্গে যেন সুমিতার চেয়ে অনেক ভাল মেয়ের সম্বন্ধ হয়।

সুমিতার বিছানার পাশে ছোট জানলাটি দিয়ে দেখা যায় দূর নীল আকাশের তারা—ঝলমলে, হাসি-ভরা।

বড় ভাল লাগে তারাটি। যেন কোন আনন্দলোকের হাতছানি!

বড় ভাল লাগে অরুণ নামটি। বিশ্বের মাধুর্য্য যেন ঐ নামে!

নাঃ, সুমিতার এ অন্যায়। এখনও তো পাকাপাকি কিছুই হয় নি। শুধু একটি সম্ভাবনা মাত্র। কিন্তু সুমিতার মন যে বলছে—এইখানেই, আর কোথাও নয়।

হায় রে কুমারী মন! সাত দিন পরে বাবার টেবিলে রাখা তার পিসিমার নতুন চিঠি পড়ে জানা গেল অরুণের বিয়ের সম্বন্ধ ঠিক হয়েছে অন্য জায়গায়। কথাবার্ত্তা পাকাপাকি হয়ে গেছে। মেয়ে বি-এ পাশ। বড়ঘরের মেয়ে, দেখতে খুবই সুশ্রী। অরুণও খুব রাজী তাকে বিয়ে করতে।

চিঠিটা সত্যই সুমিতার সামনে। সুমিতাকে ঘিরে স্পষ্ট দিনের আলো—দুঃস্বপ্ন বলে সান্ত্বনা পাবার কিছু নেই।

বেশ ত, কি আর হয়েছে। অরুণদার বিয়ের সম্বন্ধ হয়েছে খুব ভাল ঘরে। ভালই ত।

রাত্রে শুনলে মা বলছে—তখুনি জানতাম, এমন কপাল কি আর আমাদের! বামন হয়ে চাঁদে হাত বাড়ানো কেন?

বাবা বললেন, সুরেনবাবুকেই কথা দিয়ে দিই। এই বৈশাখেই কাজ সারি।

সুরেশ! সুমিতার মনে হ'ল সুরেশের মুখখানি বেশ নম্র, একটা কোমল সরলতায় ভরা। পলকে সুরেশকে সে যা দেখেছিল, তাইতে এই পরিচয়ই তো সুমিতা পেয়েছে। আগামী বৈশাখে সে-ই হবে তার স্বামী!

ছি, ছি। অরুণদাকে নিয়ে কি যা তা সে ভেবেছে ক'দিন! কুমারী সে, এ ত তার পাপ!

সুমিতার চোখে জল এল। হে ভগবান, এই জলে তার মনের ময়লা যেন ধুয়ে যায়। আকাশে জলজলে তারা—একান্ত করুণ দৃষ্টি। সুমিতা সেই দিকে চাইতে চাইতে ঘুমোবার জন্যে চোখ বুজলে।

মহাত্মা গান্ধী—শিল্পী শ্রীঅনিলকুমার মাইতি

মহাত্মা গান্ধী, শায়িত অবস্থায়—শিল্পী শ্রীঅনিলকুমার মাইতি

বড়ই ত যেন না শরীরের। সুমিতাকে তাম। ক ধুকে অত ।বন
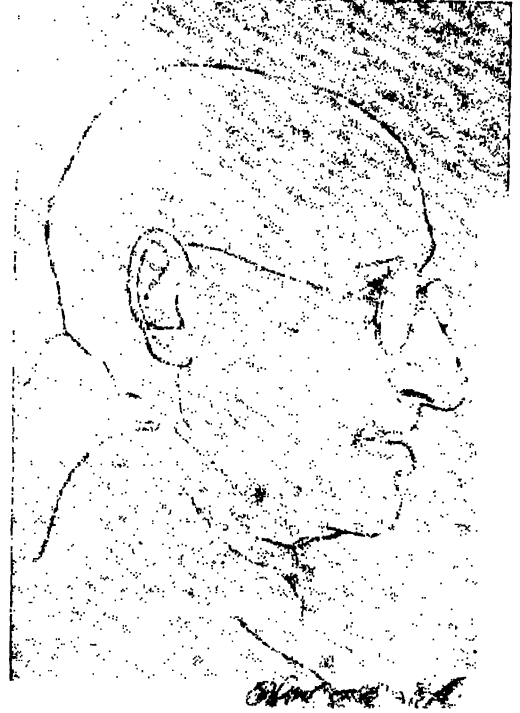
বিদ্যালয়ে দলগত ধর্ম্মশিক্ষা ও তার প্রভাব

শ্রীনারায়ণচন্দ্র চন্দ

বাণিজ্যের পসরা নিয়ে এশিয়ার নূতন হাটে বেচাকেনা করতে এসে বিলাতের বণিকপুত্রেরা রাজকন্যা আর অর্দ্ধেক রাজত্ব নয়, ক্রমে গোটা ভারত সাম্রাজ্যের অধিপতি হয়ে বসল। রাজ্য লাভ হলেও তারা মনোবৃত্তিতে বণিকই থেকে গেল। ভারতরূপ কামধেনু দোহন করতে ভারতীয় শিক্ষিত 'মজুরদের' সহায়তার প্রয়োজন হওয়ায় বিদেশী বণিকভাবাপন্ন রাজতন্ত্রের প্রয়োজনের তাগিদে এ দেশে ইংরেজী শিক্ষার সূত্রপাত। প্রকৃত রাজার মত শাসন করতে হলে প্রজার শিক্ষা, স্বাস্থ্য, আর্থিক সমৃদ্ধি প্রভৃতি সকল দিকেই তাঁদের সুব্যবস্থা করতে হ'ত। কিন্তু যেখানে শাসনের আসল উদ্দেশ্য নিজ দেশজাত পণ্যদ্রব্যের জন্য বাজার দখল করা সেখানে প্রজার প্রতি রাজার কর্ত্তব্য যদি কিঞ্চিৎ আদর্শভ্রষ্ট হয় তাতে আর আশ্চর্য্য কি? তদুপরি শাসক সম্প্রদায় এ দেশের ভাষা, সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যের প্রতি মোটেই শ্রদ্ধাশীল ছিলেন না। মাননীয় মেকলে সাহেব প্রাচ্য এলেম আর পাণ্ডিত্যের প্রতি শ্লেষ এবং বিদ্রূপ বর্ষণ করেই ক্ষান্ত হন নি. তাঁদের সকল জ্ঞান এবং আরবি ও সংস্কৃত গ্রন্থের সকল সার ইংরেজী ভাষার মারফৎ এক গণ্ডূষে পান করে তিনি রায় দিলেন: প্রাচ্য ভাষা শিক্ষার অযোগ্য, প্রাচ্যের সাহিত্য দর্শন কুসংস্কার আর বাজে মালে ভরা, সুতরাং বর্জ্জনীয়। তাঁর উদ্দেশ্য হ'ল ইংরেজী শিক্ষা বিস্তার দ্বারা এমন এক ভারতীয় সম্প্রদায় গড়ে তুলতে হবে যারা শুধু রক্তে ও চামড়ার রঙে হবে দেশী কিন্তু রুচিতে, আচার-ব্যবহারে, নীতিতে বুদ্ধিতে হবে ইংরেজ "(Indian in blood and colour, but English in tastes, in opicions, in morals and intellect.")

ইংরেজী শিক্ষা প্রবর্ত্তনের ফলে দেশের শিক্ষাব্যবস্থায় এক বিপর্য্যয় উপস্থিত হ'ল। মুষ্টিমেয় মধ্যবিত্ত ও অর্থশালী লোক ইংরেজী শিক্ষার আওতায় এসে দেশের জনসাধারণ থেকে ক্রমে দূরে সরে পড়তে লাগল। পাঁচালি, মঙ্গলগান, কথকতা প্রভৃতির মধ্য দিয়ে লোকশিক্ষার যে ধারা আবহমান কাল চলে আসছিল, ক্রমে তা রুদ্ধ হয়ে গেল। রামায়ণ মহাভারতের কাহিনী, সাধুসন্তদের আধ্যাত্মিক জীবনকথা, সাংসারিক জীবের পক্ষে নানা উপদেশপূর্ণ আখ্যায়িকা সুললিত কণ্ঠে গীত হয়ে চিত্তবিনোদনের সঙ্গে কত নিরক্ষর নরনারীকে জীবনাদর্শের সন্ধান দিয়েছে। ক্রমে এ সব বন্ধ হয়ে গেল। শিক্ষার এক-মাত্র প্রতিষ্ঠান রইল ইস্কুল কলেজ। ধর্ম্ম বা নীতি শিক্ষাকে ইস্কুল-কারিকুলামে বিশিষ্ট স্থান দেওয়া হ'ল না। বিজ্ঞানের নব নব আবিষ্কারের সঙ্গে সঙ্গে মানুষের মন সংস্কারমুক্ত হবার আগ্রহাতিশয্যে নীতিধর্ম্মকে কোণঠাসা ক'রে বিজ্ঞানকেই বড় করে তুলল।

আণবিক শক্তির যুগ

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের শেষ পর্ব্বে আণবিক বোমা আবিষ্কৃত হওয়ায় মানুষের যে সৃষ্টিধ্বংসকারী পাশুপত অস্ত্রলাভ হয়েছে তা সামলাতে জগতের মঙ্গলকামী ব্যক্তিদের দুশ্চিন্তার অন্ত নাই। মানুষ যদি আণবিক বোমা যুদ্ধাস্ত্ররূপে ব্যবহার করে তবে ধরাপৃষ্ঠ থেকে মানব জাতির বিলোপ নিশ্চিত। মানুষের কল্যাণবুদ্ধি জাগ্রত করে পরস্পরের মধ্যে সম্প্রীতির ভাব বৃদ্ধি করা ব্যতীত জগতের মঙ্গল আশা করা যায় না। এক জন মানবহিতৈষী লিখেছেন—

> A deeper faith in God and therefore in man as a child of God and a more sacrificial effort to make brotherhood a guiding principle of society alone offer real hope that atomic rockets can be kept under control, and the new energy be put to the service of human needs.

ঈশ্বরে দৃঢ় বিশ্বাস এবং মানুষের প্রতি প্রীতির ভাব— বর্ত্তমানের বিক্ষুব্ধ জগতে এরই সবচেয়ে বড় প্রয়োজন। ঈশ্বর ভাব বা মানবপ্রীতি এক দিনে আসে না। আজ যারা ছাত্র দু-দিন পরে তারাই হবে সমাজ ও রাষ্ট্রের নায়ক। ভবিষ্যতের বিশ্বশান্তির জন্য তাদেরই মনোভাবের পরিবর্ত্তন আবশ্যক। অনুকূল পরিবেশের মধ্যে শিশুর মনে ধর্ম্ম ও মানবতার ভাব সঞ্চার করে সযত্নে বিকশিত করে তুলতে হবে। এই উদ্দেশ্যে কোন কোন যুক্তরাষ্ট্র দেশে বিদ্যালয়ে ধর্ম্ম শিক্ষাদানের জন্য আন্দোলন চলছে। ভারতবর্ষেও তার সূচনা হয়েছে। বর্ত্তমান ভারতের সামাজিক ও রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে ইস্কুলে ধর্ম্ম-শিক্ষার কিরূপ সুফল আশা করা যায় এ সম্বন্ধে আলোচনা হওয়া দরকার।

দলগত ধর্ম্মশিক্ষা জাতীয় ঐক্যের পরিপন্থী

ভারতবর্ষ এক মহাদেশবিশেষ। এখানে বহু ভাষাভাষী, বহু ধর্ম্মসম্প্রদায়ের বাস। এখানকার ইস্কুলে বিভিন্ন ধর্ম্মাবলম্বী ছাত্র একত্র অধ্যয়ন করে। ভিন্ন ভিন্ন ধর্ম্মসম্প্রদায়ের জন্য পৃথক্ ভাবে ধর্ম্মশিক্ষা দিবার ব্যবস্থা করা হলে ভারতবাসীর এক-জাতীয়তার আদর্শ কি ক্ষুণ্ণ করা হবে না? বিশেষত বর্ত্তমান রাজনৈতিক অবস্থায় যখন কাশ্মীর থেকে কুমারিকা, পশ্চিম সাগর হতে পূর্ব্ব সাগর পর্য্যন্ত বিপুল জাগরণের সাড়া জেগেছে ভারতবাসীর মনে? শিক্ষার উদ্দেশ্য মানুষকে উদার, সহিষ্ণু, ন্যায়নিষ্ঠ, অপরের প্রতি শ্রদ্ধাশীল ও সহানুভূতিসম্পন্ন করে গড়ে তোলা। বহু জাতির মিলনতীর্থ এই ভারতে একতা ও পরস্পরের প্রতি প্রীতির ভাব বিশেষ ভাবে কাম্য, কেননা ভার-তের সংস্কৃতি মিলনের ভিত্তিতেই রচিত এবং এর সার্থকতা তখনই হবে যখন দেশবাসী কবির কথায় 'বিভেদ ভুলিবে জাগায়ে তুলিবে একটি বিরাট হিয়া'। নইলে কাজী নজরুল

ইসলামের তীক্ষ্ণ প্রেম কশাঘাত ভারতের অদৃষ্টে চিরন্তন হয়ে থাকবে :

"এই ভারতের মহামানবের সাগর-তীরে" হে ঋষি,
তেত্রিশ কোটি বলির ছাগল চরিতেছে দিবানিশি।
গোঠে গোঠে আত্মকলহ অজাযুদ্ধের মেলা,
এদের রুধিরে নিত্য রাঙিছে ভারত-সাগর বেলা।
পশুরাজ যবে ঘাড় ভেঙে যায় একটারে ধরি' আসি'
আরটা তখনো দিব্যি মোটারে হ'তেছে খোদার খাসি।
শুনে হাসি পায় ইহাদেরও নাকি আছে গো ধর্ম জাতি,
রাম-ছাগল আর ব্রহ্ম-ছাগল আরেক ছাগল পাতি।
মৃত্যু যখন ঘনায় এদের কসা'য়ের কল্যাণে,
তখনো ইহারা লাঙল উচায়ে এ উহারে গালি হানে।

ভারতের জাতীয় শিক্ষার আদর্শ সাম্প্রদায়িক মিলন, মানুষের সঙ্গে মানুষের প্রীতির সম্বন্ধ স্থাপন। বিভিন্ন ধর্মের বহিরঙ্গ আচার বা রীতিনীতিগত পার্থক্যকে বড় করে তুলে পরস্পরের মিলনের অন্তরায় সৃষ্টি করা নয়, সহনশীলতা ও পরস্পরের প্রতি শ্রদ্ধার ভাব পোষণ করে ভারতের বৃহত্তর কল্যাণের জন্য সমবেত হয়ে এক মহাজাতি গড়ে তোলা। শিক্ষায়তনে সাধারণ শিক্ষক দ্বারা সম্প্রদায়গত (sectarian) ধর্মশিক্ষার ব্যবস্থায় বিভিন্ন ধর্মাবলম্বী ছাত্রদের অপরিণত মনে পরস্পরের প্রতি যে বিদ্বেষ ও ভেদবুদ্ধি জাগ্রত হওয়ার সম্ভাবনা ভাবী ভারতীয় নাগরিকের পক্ষে তা কখনই কল্যাণপ্রদ হবে না।

ইংলণ্ডে সম্প্রদায়গত ধর্ম শিক্ষাদানের দাবি গবর্ণমেণ্ট মেনে নেন নি। অধুনা যে নূতন শিক্ষা-আইন রচিত হয়েছে তাতে শিক্ষাবোর্ডের প্রেসিডেণ্ট মিঃ বাটলার সাধারণ শিক্ষার সঙ্গে দলগত ধর্মশিক্ষার কোন ব্যবস্থা করতে রাজী হন নি। শিক্ষা বিলে বলা হয়েছে :

. . . the State, concerned though it is to ensure a sound religious basis for all children, cannot take on itself the full responsibility for fostering the teaching of formularies distinctive of particular denominations designed to attach children to particular worshipping communities. (*Educational Reconstruction*, 1943, p. 15)

বিলাতে একই মূলধর্মের বিভিন্ন শাখা, যথা, ক্যাথলিক, প্রোটেস্ট্যাণ্ট, পিউরিট্যান, মেথডিষ্ট প্রভৃতির জন্য ভিন্ন ভাবে ধর্মশিক্ষার ব্যবস্থা জনসাধারণ মেনে নেয় নি। আমাদের দেশের অবস্থা এর চেয়ে বহু গুণে জটিল। জাতীয় পরিকল্পনা সমিতির (National Planning Committee) মতামত এ বিষয়ে সুস্পষ্ট : বিদ্যালয়ে ধর্মশিক্ষার স্থান দেওয়া হবে না। সমিতি বলেছেন :

Religious Instruction : State education should take no responsibility for religious instruction. Religious instruction is the concern of the individual, the home, the family and the religious group concerned.

Note : Shri Ambalal Sarabhai, Prof. M. N. Saha, Shri A. K. Saha and Shri K. T. Saha were of opinion that religious instruction should be the concern of the individual alone. (*Handbook of National Planning Committee*, 1946, p, 137)

রাশিয়ায় বিভিন্ন ধর্মসম্প্রদায় ও বিভিন্ন জাতির বাস। তা সত্ত্বেও সেখানে এক মহাজাতি গড়ে তোলা অসম্ভব হয় নি। দলগত ধর্মের সংকীর্ণতা ও ভেদবুদ্ধিকে সমূলে উচ্ছেদ করে সকল সম্প্রদায়কে এক নূতন রাষ্ট্রিক ও সামাজিক কাঠামোর মধ্যে একত্রিত করা সোভিয়েট রাষ্ট্রের পক্ষে কম গৌরবের বিষয় নয়। যে ধর্ম ও মনোবৃত্তি মানুষে মানুষে মিলনের অন্তরায়, সামগ্রিক কল্যাণের পরিপন্থী তার সম্বন্ধে ষ্টালিনের মন্তব্য নির্মম কঠোর। তিনি বলেছেন :

Petrified religious rites and fading psychological relics cannot replace the living social, economic and cultural environments which surround a people. (Quoted in K. M. Munshi's *Zonal Divisions of India*, p. 14).

কোন দেশের অর্থনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক পরিবেশের সঙ্গে জনসাধারণের জাগতিক উন্নতি অবনতি এক অবিচ্ছেদ্য সূত্রে গাঁথা। এই পরিবেশকে উপেক্ষা করে এর পরিবর্তে পচা ধর্মের বিধান আর ক্ষীয়মাণ মনস্তত্ত্বের অবশেষ নিয়ে মানুষ বাঁচতে পারে না।

ভারতবর্ষ রাশিয়া নয়। ধর্ম ভারতের মজ্জাগত। আমরা ধর্ম ও নীতিবর্জ্জিত শিক্ষার পক্ষপাতী মোটেই নই। ধর্মের সঙ্গে মানুষের প্রাণের সম্বন্ধ। ধর্মকে শুধু পোশাকি জামার মত ব্যবহার করা নয়, প্রতিদিবসের প্রতি কর্ম্মে, মননে ও আচরণে ধর্মকে মূর্ত করে তুলতে হবে। এ শিক্ষা দেওয়া আর নেওয়া উভয়ই কঠিন।

ধর্ম্মশিক্ষা দিবেন কে ?

What India Thinks গ্রন্থের এক স্থানে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন :

There are truths, which are of the nature of information, that can be added to our stock of knowledge from outside. But there are other truths, of the nature of inspiration which cannot be used to swell the number of our accomplishments. These latter are not like food, but are rather the appetite itself, that can only be strengthened by inducing harmony in our bodily functions. Religion is such a truth. . . . It cannot be doled out in regulated measure, nor administered through the academic machinery of education. It must come immediate from the burning flame of spiritual life in surroundings suitable for such life.

এক প্রকার সত্য আছে যা বাইরে থেকে আহৃত হয়ে আমাদের জ্ঞানের পরিধি বিস্তৃত করে। আর এক প্রকারের

সত্য আছে যা সংবাদের শ্রেণীভুক্ত নয়, যা আমাদের জ্ঞানের পরিধি বাড়ায় না। এ বাইরের জিনিষ নয়, এ ভিতরের জিনিষ ; এ খবর নয়, অনুপ্রেরণা, মনের খাত নয়, মনের ক্ষুধা, ধর্ম এই প্রকারের সত্য। ইস্কুলের রুটিন-বাঁধা পরিমাণে শিক্ষা-যন্ত্রের মারফৎ ধর্মশিক্ষা দেওয়া বিড়ম্বনা মাত্র। রবীন্দ্রনাথ অন্যত্র বলেছেন :

"বায়ু যেমন সমস্ত শরীরকে জুড়িয়া আছে, ধর্মও তেমনই মানুষের সমগ্র প্রকৃতিগত।

"বায়ুকে টাকাপয়সার মত হাতে তুলিয়া দেওয়া যায় না কিন্তু আনুকূল্যের দ্বারা ভিতরের দিক হইতে তাহাকে জাগাইয়া তোলা যায়। তেমনই মানুষের প্রকৃতিনিহিত এই অনন্ত বোধকে তাহার এই ধর্মপ্রবৃত্তিকে ইতিহাস ভূগোল অঙ্কের মত ইস্কুল কমিটির শাসনাধীনে সমর্পণ করা যায় না। ইনস্পেক্টরের তদন্তজালে তাহার উন্নতির পরিমাপ ধরা পড়ে না, এবং পরীক্ষকের নীল পেন্সিলের মার্কা দ্বারা তাহার ফলাফল চিহ্নিত হওয়া অসম্ভব। কেবল সর্বপ্রকার অবস্থার মধ্যে রাখিয়া তাহার সর্বাঙ্গীণ পরিণতি সাধন করা যাইতে পারে, তাহাকে বাঁধা নিয়মে বিদ্যালয়ে দেওয়া-নেওয়ার ব্যবসায়ের জিনিস করা যাইতে পারে না।" (সঞ্চয়—রবীন্দ্র-রচনাবলী ১৮শ খণ্ড পৃ. ৩৮১)

বেদ উপনিষদ বা গীতার কতকগুলি শ্লোক কণ্ঠস্থ করলেই ধার্মিক হওয়া যায় না। ধার্মিক হওয়ার পথ এত সহজ হলে ধার্মিক লোকে দেশ ছেয়ে যেত। ধর্মগুরু হওয়াও বড় সোজা কথা নয়। যিনি উপদেশ দিবেন তাঁকে সেই উপদেশের উদাহরণস্থল হতে হবে। তাঁর ব্যক্তিগত আচরণে ও উপদেশে যদি সামঞ্জস্য না থাকে তাঁর কথা কার্যকরী হতে পারে না, তখন তাঁর ছাত্র ইমার্সনের কথায় বলবে :

"I cannot hear what you say, because what you are is shouting at me."

'আপনার কথা শুনতে পাচ্ছি না, কারণ আপনার আচরণ চিৎকার করে আত্মপ্রকাশ করছে।'

ধর্মশিক্ষা দান বড়ই দুরূহ ব্যাপার ; ধর্মগুরুও দুর্লভ। যিনি সত্যদ্রষ্টা, যিনি ধর্মকে উপলব্ধি করেছেন, তিনিই সত্যের সন্ধান দিতে পারেন। এক অন্ধ অপর দৃষ্টিহীনকে পথের সন্ধান দিতে পারে না। সত্যদর্শী, চক্ষুষ্মান, সহানুভূতিশীল গুরুর সঙ্গলাভই ধর্মজীবন উন্মেষের সর্বশ্রেষ্ঠ সহায়ক। এ বিষয়ে কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের অভিমত উদ্ধৃত করি :

"আমরা অন্যকে ধর্মশিক্ষা দিব এই বাক্যই যেখানে প্রবল সেখানে ধর্মশিক্ষা কখনই সহজ হইবে না। যেমন, অন্যকে দৃষ্টিশক্তি দিব বলিয়া দীপশিখা ব্যস্ত হইয়া বেড়ায় না, নিজে সে যে পরিমাণে উজ্জ্বল হইয়া উঠে সেই পরিমাণেই স্বভাবতই অন্যের দৃষ্টিকে সাহায্য করে। ধর্মও সেই প্রকারের জিনিস, তাহা আলোর মত, তাহার পাওয়া এবং দেওয়া একই কথা, তাহা একেবারে একসঙ্গেই ঘটে। এইজন্যই ধর্মশিক্ষার ইস্কুল নাই, তাহার আশ্রম আছে,—যেখানে মানুষের ধর্ম-সাধনা অহোরাত্র প্রত্যক্ষ হইয়া উঠিতেছে, যেখানে সকল কর্মই ধর্মকর্মের অনুরূপে অনুষ্ঠিত হইতেছে সেইখানেই স্বভাবের নিয়মে ধর্মবোধের উদ্বোধন হয়। এইজন্য সকল শাস্ত্রেই সাধুসঙ্গকেই ধর্মলাভের সর্বপ্রধান উপায় বলা হইয়াছে।"

বর্তমানের যন্ত্রপ্রধান যুগে ব্যবসা-বাণিজ্যকে কেন্দ্র করেই যত কিছু হানাহানি, শোষণ, উৎপীড়ন ও বিশ্বব্যাপী অশান্তির বহ্নি জ্বলছে। ব্যবসায়বুদ্ধি আমাদের জীবনের সঙ্গে ওতঃপ্রোত ভাবে জড়িয়ে গেছে। বিদ্যাভবনও হয়েছে ছোটখাট এক ব্যবসা-প্রতিষ্ঠান। কোথায় সেই শান্ত পরিবেশপূর্ণ বিদ্যায়তন যেখানে গুরু নিজের ধর্মজীবনকে শতদল পদ্মের মত বিকশিত করে তুলেছেন যার সংস্পর্শে এসে শিষ্যের অন্তরও রাঙিয়ে উঠবে ? উপযুক্ত পরিবেশ ও পারিপার্শ্বিকের প্রতি লক্ষ্য না রেখে ইস্কুলে ধর্মশিক্ষা দিবার ব্যবস্থা করা হলে তা প্রহসনে পর্যবসিত হতে বাধ্য।

শিক্ষার উদ্দেশ্য মানুষের প্রতি মানুষের সদ্ভাব সৃষ্টি করা, জাতিধর্ম বা সম্প্রদায়নির্বিশেষে সকলের প্রতি সকলকে প্রীতি-ভাবাপন্ন করা, হৃদয়ের উদারতার দ্বারা সকলকে আপন করে নেওয়া। দলগত ধর্মের সংকীর্ণ গণ্ডীর মধ্যে চিরদিন আবদ্ধ থাকলে মনের উদারতা লাভ আশা করা যায় না। এরূপ ক্ষেত্রে শুধু দলগত ধর্মশিক্ষা বিদ্যাশিক্ষার আদর্শের পরিপন্থী হয়ে পড়ার সম্ভাবনা। পক্ষান্তরে, ছাত্রদের সম্মুখে এক উদার সার্বজনীন ধর্মের আদর্শ তুলে ধরলে তাদের মনের প্রসারতা সম্পাদন সহজ হয়ে আসে। স্বামী অভেদানন্দ *Ideal of Education* পুস্তকে বলেছেন :

Any education that separate mortals from mortals, that disunites brothers from brothers is not uplifting and should not be the ideal.

যে শিক্ষা মানুষ হতে মানুষকে ভাই থেকে ভাইকে বিচ্ছিন্ন করে তা কখনই মহান্ নয়, তা কখনই আদর্শ হতে পারে না। উদার-চরিত মানুষের কাছে বসুধৈব কুটুম্বকম্—সমগ্র বিশ্ববাসীই আত্মীয়তুল্য।

সহনশীল এবং উদার মন নিয়ে শ্রদ্ধা সহকারে সন্ধান করলে সকল ধর্মমতের মধ্যেই সত্যের সাক্ষাৎ পাওয়া যায়। সকল ধর্মপ্রবাহের গতিপথ ধরে উৎস সন্ধানে বের হলে একই মানস-তীর্থে গিয়ে উপনীত হতে হয় যেখানে সব ধর্মমতের সমন্বয় হয়েছে একই সত্যের উপত্যকায়। বিদ্যালয়ে সার্বজনীন ধর্মশিক্ষা সম্বন্ধে স্বামী অভেদানন্দের অভিমত প্রণিধানযোগ্য। দলগত ধর্মের পরিবর্তে তিনি উদার বিশ্বজনীন ধর্মের সমর্থন করে বলেছেন :

Among all special religions there is undercurrent of true religion which is nameless and formless, and that nameless and formless religion should be brought forward. . . . education should be based upon universal principles and not upon sectarian religious ideals. (Pp. 31-32).

জগতের সকল দলগত ধর্মের ভিতরেই অন্তঃসলিলা ফল্গুর স্রোতধারার মত একটি নামহীন, আকারহীন সত্যধর্মের প্রবাহ বর্তমান আছে। ইহা সর্বধর্মের মূলভিত্তি, সর্ব কালের সর্ব মানবের পক্ষেই চিরন্তন সত্য। এখানে কোন বিরোধ নাই। সকল ধর্মের অন্তর্নিহিত ঐক্য ও সত্য লাভ বিশ্বমানবের আদর্শ বলে গ্রহণ করা হলে মানুষের এক বিরাট অখণ্ড সত্তাকে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশে ভাগ করে নেবার হাস্যকর প্রয়াস হয়ত বন্ধ হবে; সংকীর্ণমনা মানুষ অন্তহীন আকাশে খুঁটি পুঁতে সীমানা-চৌহদ্দি মেপে নেবার অন্ধ চেষ্টার ব্যর্থতা বুঝতে পারবে।

১৮৯৩ খ্রীষ্টাব্দে শিকাগো ধর্মমহাসম্মেলনে স্বামী বিবেকানন্দ এই বিশ্বজনীন ধর্মের সম্ভাব্যতা সম্বন্ধে বলেছিলেন:

"খ্রীষ্টিয়ানকে হিন্দু বা বৌদ্ধ হইতে হইবে না কিম্বা হিন্দু বা বৌদ্ধকে খ্রীষ্টিয়ান হইতে হইবে না—কিন্তু প্রত্যেক ধর্মই অন্যান্য ধর্মের সারভাগগুলিকে ভিতরে গ্রহণ করিয়া তদ্দ্বারা পুষ্টিলাভ করিয়া আপনার বিশেষত্ব রক্ষাপূর্বক নিজের প্রকৃতি অনুসারে পরিবর্ধিত হইবে।...পবিত্রতা, চিত্তশুদ্ধি ও দয়া দাক্ষিণ্য জগতের কোন একটি বিশেষ ধর্মের সম্পত্তি নয়; প্রত্যেক ধর্মই অতি মহানুভব উদারচরিত্র নরনারী প্রসব করিয়াছে।" (শিকাগো বক্তৃতা পৃ ৪৬)

উদারতা ভারতবাসীর মজ্জাগত। বিজ্ঞানজগতে পাশ্চাত্য দেশসমূহ পরাধীন ভারতকে বহু পিছনে ফেলে এগিয়ে গেলেও অধ্যাত্মরাজ্যে ভারত সকলের শীর্ষস্থানে—অতীতে ছিল, ভবিষ্যতেও থাকবে। এদেশের আউল বাউল দরবেশ সম্প্রদায় সর্বধর্মগ্রাহ্য একমেবাদ্বিতীয়মকে উপলব্ধি করার আনন্দে ভিন্ন ধর্মমতের মনগড়া গণ্ডি ভেঙে ফেলে সরল ও সহজ পথ বেছে নিয়েছে। বিভিন্ন ধর্মের আচার নিষ্ঠার উপর অধিক গুরুত্ব আরোপ করতে গেলে ধর্মের প্রাণ ছেড়ে খোলস নিয়ে পড়ে থাকতে হয়। বাউল কবির নদেয়ে-পাওয়া গানটির মধ্যে এই সুরই সুস্পষ্ট। রবীন্দ্রনাথের অনুবাদ:

The cult of the *One* dies in the conflict of the many.
The door to it is closed by many a lock of Koran,
Puran and Rosary.

একের তত্ত্ব বহুর দ্বন্দ্বের চাপে মারা পড়ে। কোরাণ, পুরাণ আর জপমালার বহুসংখ্যক তালায় এর দরজা হয়ে আছে রুদ্ধ। এই রুদ্ধ দরজায় আরো নূতন তালা না লাগিয়ে বরং সেগুলো খুলে ফেলে সকলের জন্য নির্মল সত্যের প্রকাশকে অবারিত সহজ সুন্দর করে দেওয়ার চেষ্টাতেই ধর্মশিক্ষার সার্থকতা; এই সার্বজনীন ধর্মবোধের উদ্বোধনই বিদ্যালয়ে নীতিশিক্ষার কাম্য আদর্শ।

সাংস্কৃতিক ঐক্য সমস্যা

ভারতে ইতিহাসের অন্তর্নিহিত বৈশিষ্ট্য unity in diversity—বিভিন্নতার মধ্যে ঐক্য। বিভিন্ন সম্প্রদায় স্মরণাতীত কাল থেকে এখানে নিজ নিজ সংস্কৃতি গড়ে তোলবার কাজে ব্যাপৃত আছে; ভাষা, ধর্মমত, আচারনিষ্ঠা, পরিচ্ছদ প্রভৃতি বিষয়ে পরস্পরের মধ্যে অনৈক্য থাকলেও উচ্চ আদর্শ ও সংস্কৃতির সূত্রে সকলেই একত্র গ্রথিত। আপাতদৃষ্টিতে হিন্দু-মুসলমান, বৌদ্ধ-খ্রীষ্টান, জৈন-শিখ প্রভৃতির ধর্মমতের বহিরঙ্গে প্রভেদ দেখা যাবে। বৈচিত্র্যই জগতের নিয়ম। প্রকৃতির বৈচিত্র্যের মধ্যেও যেমন ঐক্য বিদ্যমান তেমনি এই সকল ধর্মমতের গভীর তত্ত্বের মধ্যে প্রবেশ করলেও এক মহাসত্যের উৎসে গিয়ে পৌঁছতে হয়। বিভিন্ন ধর্মের দেশ এই ভারতের সাধকমণ্ডলী—কবীর নানক থেকে রামমোহন, পরমহংস রামকৃষ্ণ, কেশব সেন পর্যন্ত—সকলেই এই ধর্মের উৎসমুখে পৌঁছে ঘোষণা করে গেছেন: মূল এক। অনুরাগ থাকলে সবরকম সাধনপদ্ধতি দিয়েই ঈশ্বরকে উপলব্ধি করা যায়। যত মত তত পথ।

তবে প্রশ্ন হবে সকল ধর্মই যদি মূলত এক তা হলে ধর্মকে কেন্দ্র করেই এত বিরোধ কেন? সাম্প্রদায়িক বা ধর্মানৈক্য-জনিত বিরোধ প্রকৃত ধার্মিক ব্যক্তির সৃষ্ট নয়। স্বার্থসন্ধ চতুর জনের ব্যক্তিগত বা দলগত—পারমার্থিক নয় জাগতিক সিদ্ধি লাভের উদ্দেশ্যকে ধর্মের মুখোসে সাজিয়ে রাজনৈতিক রঙ্গমঞ্চে নামানো হয়েছে। প্রকৃত ধার্মিক ব্যক্তির মনে এর জন্য কোন পরিবর্তন আসে নি। কিন্তু দেশের বিভিন্ন সম্প্রদায়ের জনসাধারণ যারা গভীর তত্ত্ব না বুঝেও চিরকাল একত্র ভ্রাতৃভাবে পরস্পরের সহযোগিতায় বাস করে এসেছে এবং একত্রই যাদের বাস করতে হবে—তাদের মন বিষিয়ে গেলে ভারতের মুক্তি ও জাতীয়তার আকাঙ্ক্ষা ব্যাহত হবার আশঙ্কা।

এই প্রসঙ্গে সর্ রোডস রাধাকৃষ্ণের মন্তব্য উল্লেখযোগ্য। *The Cultural Problem* পুস্তকে তিনি বলেছেন:

The gospel which can unite all human souls under one standard of universal religion is the gospel of Humanity. It will not be a religion in the ordinary sense of the term. It will not be a revealed religion. It will have to be evolved by the combined effort and co-operation of men of goodwill on earth, . . . Not by political pacts, nor by constitutional devices, but by the acceptance of this larger and nobler conception of religion may man hope to overcome the differences that divide people. (Pp. 38-39)

মানবতার ধর্মই যাবতীয় লোককে এক বিশ্বজনীন ধর্মের পতাকাতলে সমবেত করতে পারে। ইহাকে ঠিক ধর্ম আখ্যা দেওয়া চলে না। ইহা অপৌরুষেয় ধর্ম নয়, পৃথিবীর মহানুভব ব্যক্তিদের সম্মিলিত চেষ্টা ও সহযোগিতা দ্বারা এর উদ্বোধন করতে হবে। রাজনৈতিক চুক্তি বা শাসনবিধির মারপ্যাঁচে নয়, সকল ধর্মের উদার মূল ঐক্যবোধকে স্বীকার করার মধ্যে দিয়েই মানুষ পরস্পরের প্রতি বিদ্বেষ ও অনৈক্য মুছে ফেলতে পারে। ইস্কুলে ভবিষ্যতের নাগরিক তৈরি করার সময় এই কথাগুলো আমাদের বিশেষ ভাবে স্মরণ রাখতে হবে নতুবা আমাদের গণতন্ত্র ও জাতীয়তার স্বপ্ন চিরদিন স্বপ্নই থেকে যাবার সম্ভাবনা।

আর একটি কথাও শিক্ষাব্রতীদের সর্ব্বদা মনে রাখতে হবে যে, স্বাধীনতার জন্য প্রস্তুত করে তোলাই পরাধীন দেশে শিক্ষার প্রধান উদ্দেশ্য, কেননা স্বাধীনতা ব্যতীত অর্থনৈতিক, সামাজিক আধ্যাত্মিক কোন উন্নতিই সম্ভবপর নয়। পরাধীনতা মানুষের আত্মোন্নতির প্রধান অন্তরায়; এর গুরুভারে জাতির মেরুদণ্ড ভেঙে যায়; সমাজ-জীবনে সংকীর্ণতা ও ভেদবুদ্ধির ফলে মানুষ ক্রমে মনুষ্যত্বহীন আত্মসম্মানজ্ঞানবর্জ্জিত ক্রীতদাসে পরিণত হয়। স্বাধীনতার অনুকূল আবহাওয়ায় মানুষ তার অন্তর্নিহিত প্রতিভার সম্ভাবনাকে সর্ব্বপ্রকারে বিকশিত করে তুলতে পারে, কাজেই স্বাধীনতা লাভের জন্য দেশবাসীকে প্রস্তুত করাও ধর্ম্মেরই অঙ্গস্বরূপ।

কি-বা চাই ?

শ্রীশৌরীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য

আমি কি-বা চাই ?
যাহা চাই পৃথিবীতে আজি তাহা খুঁজে নাহি পাই ?
পেয়েছিনু এক দিন অফুরন্ত স্বাস্থ্য ও যৌবন,
পরিপূর্ণ ভোগ আর নিষ্পাপ জীবন,
পদতলে সুন্দরী ধরণী,
মোরা দু'টি অমৃতের তরুণ-তরুণী,
দাঁড়ায়ে পবিত্র হয়ে
গেয়েছিনু আনন্দের ছন্দে বেদগান,
সারা বিশ্বে সেই দিন দেখেছিনু পরিপূর্ণ প্রাণ।
এতটুকু মিথ্যা কভু পশে নি জীবনে,
ধরণী-মা আশীর্ব্বাদ করি,
উল্লাসেতে শস্য দিত আমাদের প্রতি গৃহ ভরি'।
বিশ্বেতে বিছানো ছিল আমাদের সুখ-আস্তরণ,
ভগবানে ছিল এই চিত্ত নিবেদন,
চন্দ্র-সূর্য্য-গ্রহগণ ঊর্দ্ধে থেকে দিত আশীর্ব্বাদ,
ঝরিয়া পড়িত শিরে দেবের প্রসাদ;
পৃথিবীর পশুপক্ষী গাছপালা তাই
সকলে মোদের ছিল ভাই।
গোটা বিশ্বে বাঁধা ছিল এক পরিবার,
সবে মিলে একটি সংসার ?
আজ হায়, দেখিতেছি কারো সাথে কারো মিল নাই,
ছিন্নভিন্ন হয়েছে সবাই।
ধরণী হইতে আজ মুছে গেছে প্রেম,
মানুষে মানুষে ঐক্য নাই,
বক্ষ থেকে ভগবান নিয়েছে বিদায়।
সারা পৃথিবীটি আজি হয়ে গেছে মাংসের দোকান,
মাছি শুধু করে ভন্ ভন্,
পূতিগন্ধে ভ'রে গেছে বিষাক্ত পবন,
আকাশেতে ভূতের তাণ্ডব,
নীচেতে প্রেতের উপদ্রব,
এই প্রেত-উৎসবের মাঝে
কেহ কেহ বলে হায়—মোরা বেশ আছি।
যারা বলে, তারা পশু-নর,
এ সমাজ এ সভ্যতা নহে মানবের,
সভ্যবেশী ইহা বর্ব্বরের।
স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে শান্তির লাগিয়া আজি তাই,
প্রাণ চাহে যাইতে সেথায়,
বিষাক্ত হয় নি পাপে যেখানেতে মানুষের ভীড়,
আমি চাহি সেই পৃথিবীর
একখানি পরিপূর্ণ আনন্দের কোল,
এক খণ্ড ক্ষুদ্র শস্য ক্ষেত,
তারি পাশে নীলাকাশে আনন্দের দোল,
সেই আকাশের নীচে ক্ষুদ্র এক স্রোতস্বতী-তীর,
তারি কোলে বাঁধিয়া কুটীর,
সুন্দরী তরুণী এক তার দুটি প্রেমভরা আঁখি,
তার হাতে দুটি হাত রাখি,'
প্রাণ করি' পরিপূর্ণ ছন্দে আর গানে,
মোর সাথে বাঁধি ভগবানে,
বলিব—পেয়েছি শান্তি, লভিয়াছি অমৃত-অভয়,
এই চাহি এর চেয়ে বেশী কিছু নয়।

গ্রীষ্মের ফল—আম

অধ্যাপক শ্রীমুরারিপ্রসাদ গুহ

প্রচুর ব্যবহার, সুমিষ্ট স্বাদ ও অন্যান্য গুণের জন্য আমকে 'গ্রীষ্মমণ্ডলের আপেল' এবং ফলের রাজা বলা হয়। এশিয়ার গ্রীষ্মমণ্ডলের গাছ হওয়া সত্ত্বেও পৃথিবীর গ্রীষ্মমণ্ডলের সর্ব্বত্রই একে পাওয়া যায় নানান জাতীয় ফলের বাগানে লাগানো গাছ হিসাবে। একদম পুরোপুরি আমবাগানও কম জায়গাতে দেখা যায় না। আমগাছের প্রয়োজনবোধ বিশেষ করে গ্রীষ্মমণ্ডলেরই উপযুক্ত এবং সামান্য তুষারপাতও এরা সহ্য করতে পারে না। এই কারণে আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রের কেবলমাত্র দক্ষিণ-ফ্লোরিডায় এবং ক্যালিফোর্ণিয়ার অল্পবিস্তর এর চাষ সম্ভবপর। যদিও শতাধিক বৎসর পূর্ব্বে ফ্লোরিডাতে এর প্রথম আমদানি হয়েছিল তবুও গত পঁচিশ বৎসরেই সে দেশে এর চরম উৎকর্ষ সাধিত হয়েছে এবং আম সেখানে বর্তমানে প্রচুর পরিমাণে জন্মানো হচ্ছে।

প্রায় ত্রিশটি জাতির গাছকে নিয়ে সৃষ্টি হয়েছে *Mangifera* শ্রেণীর। ভারতবর্ষে আমের শত শত উপজাতি আছে এবং এই সংখ্যাধিক্যের জন্যই তাদের সঠিক সংখ্যা এবং স্থানীয় নাম বলা সম্ভবপর নয়। তবে ভারতীয় কৃষি-গবেষণা বিভাগ এই বিষয়ে বর্তমানে সচেষ্ট এবং আমের একটি Monogram তাদেরই পরিচালনায় দিল্লীতে তৈরি হচ্ছে।

দক্ষিণ-টেনাসেরিমে ফলের জন্য চাষ-করা ব্রহ্মদেশীয় 'লামুত' (*M. foetida*), আমের চেয়ে অনেক নিকৃষ্ট। আম[1] বা আঁব সাধু ভাষায় অম্র বা আম্র নামে পরিচিত। এ ছাড়া পুরনো সংস্কৃত পুঁথিতে এর বহু নামের ব্যবহার দেখা যায়।

যদিও এশিয়ার উষ্ণমণ্ডলের অথবা ইন্দো-মালয়ের জন্মস্থান গাছ, তবুও শত শত বৎসরে পুরাতন এবং নবীন পৃথিবীর উষ্ণমণ্ডলে এবং তারই নিকটবর্ত্তী অঞ্চলে আমের খুব বেশী রকম চাষ সুরু হয়েছে। বর্তমানে পূর্ব্ব এবং পশ্চিম ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জ, সুদান, আরব, চীনদেশ, ব্রেজিল এমন কি ইতালি এবং আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রের কোন কোন অঞ্চলেও এর প্রচুর চাষ হয়ে থাকে।

হিমালয়ের উষ্ণমণ্ডল; সমুদ্রপৃষ্ঠের ১-৩০০০ ফুট উঁচুতে পর্য্যন্ত কুমাউন থেকে ভুটান পাহাড়, বিহারের উপত্যকা, খাসিয়া পাহাড়, ব্রহ্মদেশ, অযোধ্যা, পশ্চিম উপদ্বীপের খান্দেশ থেকে দক্ষিণ মুখে এবং পূর্ব্বে বাংলা থেকে সিংহল পর্য্যন্ত এরা আপনা হতেই জন্মাত এবং এখনও জন্মে। দাক্ষিণাত্যের দক্ষিণ অংশে কাতাপ্পার পাহাড়েও প্রায় বন্য অবস্থায় আমগাছ দেখতে পাওয়া গেছে। ভারতের যে সব স্থানে আবহাওয়া উপযুক্ত এবং জমির অবস্থা বেশ ভাল, সেই সব স্থানে এর প্রচুর চাষ হয়। তা ছাড়া ভারতের সমতল ভূমির প্রায় সমস্ত বনেই আমগাছ পাওয়া যায় এবং এখানে সেখানে যে সব গাছ পাওয়া যায় তারা জন্মায় পরিত্যক্ত আঁটি থেকে।
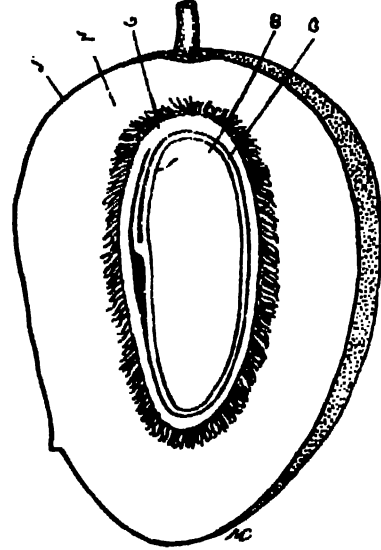
আমের দেশ—(১) বহিস্ত্বক্ (২) মধ্যত্বক্ (৩) অন্তস্ত্বক (৪) বীজ ও (৫) বাজাবরক দেখা যাইতেছে

আমের গাছগুলো সাধারণতঃ ২৫-৩০ হাত উঁচু হয়, তবে প্রায় ৬০ হাত পর্য্যন্তও উঁচু হতে পারে। শহরের বাইরে গ্রামাঞ্চলের রাস্তাগুলির দুই ধার দিয়ে আমগাছ খুব বেশী করে লাগান উচিত। যে সমস্ত আঁটি থেকে বীথি বা বাগিচার গাছ তোলা হয় সে সমস্তই বাছাই করা আমের টাটকা আঁটি পুঁতে তৈরি হয়। এদের অঙ্কুর বের হয় বেশ তাড়াতাড়ি এমন কি অনেক সময় ১০-১৫ দিনের মধ্যেই। গাছগুলি চারার বাগানে জন্মান যেতে পারে যদিও টব অথবা ঝুড়ি ব্যবহার করাই সঙ্গত, কারণ গাছটির প্রধান শিকড় খুব লম্বা এবং প্রতিরোপণের সময় এই শিকড় জখম হতে পারে। শুকনো মাটিতে গাছগুলিকে জল সেচন করতে হয় অনেক দিন পর্য্যন্ত। সাধারণতঃ প্রায় ৬-১০ হাত পর্য্যন্ত যখন উঁচু হয় তখনও, কিন্তু ঐ সব অঞ্চলে আমগাছ না লাগানই ভাল। অন্যজায়গায় পুঁতলে সূর্য্যের আলোতেও ছোট চারা গাছের ক্ষতি হতে পারে।

ভাল জাতের গাছগুলি তোলা হয় জোড়কলম এবং গুলকলম থেকে। প্রায় সর্ব্বত্রই আজকাল জোড়কলম-পদ্ধতি প্রচলিত এবং এই পদ্ধতিতেই পুরোপুরি সাফল্য দেখতে পাওয়া যায়। গুলকলম এবং চারা তোলবার অন্যান্য পদ্ধতিতে শতকরা ২৫-৮০ ভাগ সাফল্য লাভ করা যায়। আঁটির গাছ বেশ বড় ও সতেজ হয় কিন্তু কলমের গাছ তেমন হয় না।

---

১ হিন্দিতে এর নাম আম; দরিয়াম—আসামী, জেগাছু, ঘোহো—গারো; মার্কা—গোন্দী; উলি—কোল; উল—সাঁওতালী; অম—উড়িয়া; আম্বা—মহারাষ্ট্রী; মা, মাঙ্গ—তামিল; মামাদি, মামিদ—তেলেগু; মাডু—মালয়ালম; তেয়েডি—বর্ম্মী।

আঁটির গাছের চেয়ে আগে ইহার ফলন হয় এবং ফলের সংখ্যাও অনেক বেশী হয়ে থাকে। শুধু তাই নয় জোড়কলমের সাহায্যে প্রয়োজন মত উন্নত ধরণের গাছ আমরা জন্মাতে পারি—যাতে ফলের এবং ফলনের অনেক উন্নতি দেখা যায়।

আমাদের দেশে বর্ষার শেষ দিকটাই চারা লাগাবার প্রশস্ত সময়।

বিভিন্ন জাতির গাছের মধ্যে ফল ধরবার সময়ের তারতম্য খুব বেশী। আগেই বলেছি কলমের গাছে আঁটির গাছের চেয়ে আগে ফল ধরে। কলমের গাছে ফল ধরতে ৪-৯ বৎসর সময় লাগে। তবে সাধারণতঃ পঞ্চম বৎসর থেকেই ফল ধরতে আরম্ভ করে যদিও জমির সার এবং সেচের উপর ফলন অনেকটা নির্ভর করে। আমগাছে প্রতি বৎসর এক বার মাত্র ফুল ফোটে এবং তা থেকেই ফলের সৃষ্টি হয়। শুধু তাই নয়, গবেষণার ফলে জানা গিয়েছে যে আমগাছে ফলনেরও সাময়িক বিশেষত্ব (periodicity) আছে, প্রচুর ফলনের পরবর্তী বৎসরে ফলন কম হয় এবং পর্য্যায়ক্রমে ফলন এই ভাবেই হতে থাকে।

আমাদের দেশে বিশেষ করে এই দেশের দক্ষিণাংশে পৌষ মাসের শেষে আমের মুকুল বের হতে আরম্ভ করে এবং মাঘ মাসে মুকুল মঞ্জরিত হওয়া প্রায় কোন গাছেই বাকী থাকে না। আমের মুকুল যখন মঞ্জরিত হয় তখন ভারতের প্রায় সকল অঞ্চলেই অল্পবিস্তর বৃষ্টি হয়ে থাকে। কিন্তু এই বৃষ্টিই আমের ফলনের প্রচুর পরিমাণে অনিষ্ট করে। ফুল ফোটার পর বৃষ্টি হলে সেই জল ফুলের পরাগ এবং গর্ভ-কেশরের মধ্যে জমে ব্যবধান সৃষ্টি করে এবং সেইজন্য গর্ভমুণ্ড নিষিক্ত হতে পারে না। শুধু তাই নয় জলের সংস্পর্শে এসে পরাগ-কেশর পচে যায়। প্রায় দশ দিন পর্য্যন্ত তাজা থাকবার পর অনিষিক্ত অবস্থায় শুকিয়ে যায় অর্থাৎ ফলন আর হয় না।

দেখা গেছে এই ভাবে অসময়ে বৃষ্টি হবার জন্য শতকরা প্রায় ৭০-৯০ ভাগ আমের ফলন ক্ষতিগ্রস্ত হয়। ফুল যদি বৃষ্টির পরে ফোটে অথবা বৃষ্টির পর বেশ রোদ এবং বাতাস হয় তা হলেও বৃষ্টির জল শুকিয়ে যাবার দরুণ তেমন কোন ক্ষতি হতে পারে না। তবে এই ক্ষতির হাত থেকে শতকরা ৫০-৭০ ভাগ আম রক্ষা করা যায় যদি বৃষ্টি হবার পরই গাছের ডাল-গুলিকে খুব জোরে ঝাঁকুনি দিয়ে ফুলের ভেতরকার জল বের করে দেওয়া যায়। এতে ফুলগুলি শুকনো অবস্থায় থাকে এবং কেশর পচে যায় না বলে ফলনের বিশেষ কোন ক্ষতিই হতে পারে না।

ফুল ফোটবার এক পক্ষকাল মধ্যে ফল ধরে এবং এইগুলিই যখন ছোট ছোট গুটির আকার ধারণ করে তখন তাকে আমরা 'কড়া' বা 'কড়েয়া' বলি। মাঘ মাসের শেষে এবং ফাল্গুন মাসে ছোট ছোট আম ধরে। জ্যৈষ্ঠ মাসের শেষে প্রায় সমস্ত আমই পেকে যায়। কিন্তু ভাগলপুর, মালদা থেকে পশ্চিমের সব জায়গাতেই মাঘ ফাল্গুন মাসে ফুল ফোটে এবং আষাঢ় মাসে আম পাকতে আরম্ভ করে। ভারতের উত্তর এবং পশ্চিম প্রদেশ-গুলিতে আষাঢ় মাসেই আম পাকে। সেখানে বাংলা-দেশের চেয়ে অনেক পরে আম পেকে থাকে। কোন কোন ক্ষেত্রে শ্রাবণ মাসেও আম পাকে। শুধু তাই নয় মাদ্রাজ অঞ্চলের কোন কোন গাছে সমস্ত বৎসরই ফল ধরে। আমাদের দেশেও এই জাতীয় গাছের দৃষ্টান্ত বিরল নয়। জ্যৈষ্ঠ আষাঢ় মাসেই পাকা আম সর্ব্বত্র প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায়। দশ বৎসরের একটি গাছে প্রায় ৫০০ আম ধরতে পারে এবং ৩০-৪০ বৎসরের গাছে ১৫০০ আম ধরতে পারে। তবে ৩০০০-এর চেয়েও বেশী আম একটা বড় গাছে অনেক সময় ধরতে দেখা যায়।

সামান্য লবণাক্ত সরস জমিতে আম গাছ খুব জোরালো হয়, তবে নীরস বেলে ও কাঁকরযুক্ত মাটিতেও এরা জন্মে থাকে ভিজা আবহাওয়ায় ও কাল মাটিতে আম সব চেয়ে ভাল জন্মায় এবং মাকড়া পাথুরে মাটিতেও মন্দ জন্মায় না। ৩০"-১০০" বৃষ্টিপাত আমগাছের পক্ষে বিশেষভাবে উপযোগী।

ভাঙা প্রাচীরের মাটি এবং শুকনো পাঁক মাটি আম গাছের গোড়ায় দিলে গাছ খুব জোরালো হয়ে ওঠে।

১৬ সের গোবর সার, /২। সের হাড়ের গুঁড়ো এবং /৫ সের ছাই মিশিয়ে আম গাছের উপযোগী সার তৈরি করা যায়। চুণও ব্যবহার করা যেতে পারে। সার ব্যবহার করা ভাল কিন্তু নাইট্রোজেনের পরিমাণ অতিরিক্ত হলে এর প্রতিক্রিয়ায় ফুলফলের পরিবর্তে ডাল-পালাই খুব বেশী হতে থাকে। সেইজন্যই মাঝে মাঝে অকেজো অথবা বন্ধ্যা ডাল-পালা বাদ দিয়ে দেবার জন্য গাছ ছাঁটাই করা হয়। খুব বেশী ছাঁটাই কিন্তু ক্ষতির কারণ হতে পারে।

আকারে গাছগুলি খুব বড় হওয়ার দরুণ যতটা সম্ভব দূরে দূরে চারা লাগান দরকার, ২০ হাতের কম ত নয়ই। সিন্ধু প্রদেশে ১২-১৭ হাত অন্তর গাছ লাগান হয়ে থাকে। এইভাবে আমের বাগান করতে যুদ্ধের আগে প্রতি একর জমিতে প্রায় আড়াই শ টাকা খরচ পড়ত।+

দশ বৎসরের বেশী দিনের বাগান, যেগুলির গাছের শিকড় সমস্ত জমির ভেতরই ছড়িয়ে পড়েছে, তাতে সার দিতে হলে সম্পূর্ণ জমিতেই প্রতি একরে ১০ গাড়ী কৃষিক্ষেত্রের আজিনার আবর্জ্জনা, গোবর ইত্যাদি পচানো সার দিতে হয় অগ্রহায়ণ, পৌষ মাসে যখন বাগানগুলোতে অন্য ফসলের চাষও করা হয়ে থাকে।

নূতন বাগানগুলোতে প্রত্যেকটি গাছে আলাদা সার দিতে হয়। ১-৪ বৎসরের গাছগুলিতে ১০-১৫ সের, এবং ৫-১০ বৎসরের গাছগুলিতে ২০-৪০ সের পচান সার প্রতি গাছে দিতে হয়। গাছগুলির ডালপালার গণ্ডীর ঠিক বাইরের দিক দিয়ে খানা কেটে এই সার দিতে হয়। খানাটি চওড়া হবে ২-৩ ফুট এবং গভীর হবে ৪-৬ ইঞ্চি।

+ চারা লাগানোর পর থেকে ফলধরা পর্য্যন্ত যে অবকাশটুকু পাওয়া যায় সেই সময় আমাদের দেশে, সিন্ধু নবাবশা প্রদেশ এবং অন্যান্য জায়গাতেও নানান জাতের কতকগুলি ফসলের, যেমন লঙ্কা, বেগুন, পেঁয়াজ, বার্লি প্রভৃতির চাষ করা হয়। এমন কি গরু-ছাগলকে খাওয়ানোর জন্য গ্রীষ্মকালে জোয়ারেরও চাষ করা হয়।

কোন বৎসর গ্রীষ্মকালে কোন গাছে যদি যথেষ্ট নূতন ডাল-পালা না জন্মায় তবে বর্ষার ৩।৪ সপ্তাহ আগে জ্যৈষ্ঠের শেষের দিকে 'এমোনিয়া সালফেট' দিতে হয়। ৬-৮ বৎসর বয়সের গাছে /২৷৷০ এবং এইভাবে হিসাবমত ২০ কিংবা তার চেয়েও বেশী বয়সের গাছে /৫ সের পর্য্যন্ত সার (প্রতি গাছে) দিতে হয়। সার দেবার পর দু-এক বার ভালভাবে সেচের ব্যবস্থা করা উচিত।

বাগানের মাটিতে যখন অধিক পরিমাণ 'পটাশ' এবং 'ফস্ফরাসের অভাব পরিলক্ষিত হয় এবং ভাল ফলনের জন্ত গাছগুলির সেই অভাব পূরণ দরকার হয়ে পড়ে তখন হাড়ের গুঁড়ো অথবা 'সুপারফস্ফেট' এবং কাঠের ছাই দিতে হয়। হাড়ের গুঁড়ো অথবা 'সুপারফস্ফেট'র পরিমাণ হচ্ছে: ১ বৎসরের গাছে /২৷০ সের এবং প্রতি বৎসরে /৷০ সের করে বাড়িয়ে /৭৷০ সের পর্য্যন্ত প্রতি গাছে দিতে হয়। সেই ভাবেই কাঠের ছাই ১ বৎসরের গাছে /৫ সের প্রতি বৎসরে /১ সের করে বাড়িয়ে প্রতি গাছে /১৫ সের পর্য্যন্ত। এ সব সুবিধামত আশ্বিন-পৌষের মাঝামাঝি যে-কোন সময় দেওয়া যায়।

আমের ফলের স্বাদেরই যে শুধু তারতম্য দেখা যায় তা নয় আকার এবং আয়তনেরও প্রচুর প্রভেদ দেখা যায়—ছোট কুলের আকার থেকে আরম্ভ করে বিরাট 'ফজলি' ইত্যাদি সকল প্রকার আমই পাওয়া যায়।

আম ইত্যাদি শাঁসালো ফলের ত্বক (Pericarp)কে তিনটি অংশে বিভক্ত করা যায়—প্রথমে, বহিত্বক্ (epicarp) তারপর মধ্যত্বক্ (mesocarp) এবং অন্তত্বক্ (endocarp)। এই জাতীয় ফলের বৈজ্ঞানিক নাম হচ্ছে 'ড্রুপ' (Drupe)। আমের বহিত্বক হচ্ছে খোসা, মধ্যত্বক হচ্ছে ফলের শাঁস—যা আমরা খাই, এবং অন্তত্বক হচ্ছে আঁটি যার ভেতর বীজ থাকে।

শাঁসের স্বাদ-গন্ধের উপরই ফলের দাম কম বেশী হয়ে থাকে। শাঁসের রং সাধারণতঃ বেশ চমৎকার সোনালী অথবা লালচে বা লালে-হলুদে মেশানো হতে পারে।

মোলায়েম এবং পাতলা খোসা, গোলঠোঁট, এবং হলদে থেকে লাল রঙের ফলগুলিই সব চেয়ে দেখতে সুন্দর এবং আকর্ষণীয়। বাছাই-করা জোড়কলমের গাছের ফলের সঙ্গে সাধারণ কড়া গন্ধওয়ালা ফলের মিল করলে ভুল করা হবে। প্রথমগুলো মূল্যবান, মিষ্টি এবং সুগন্ধযুক্ত, শাঁস চমৎকার মোলায়েম এবং আঁশশূন্য। শেষোক্তগুলো যদিও খাবার উপযুক্ত তবুও গন্ধ তার্পিনের মত উগ্র এবং এমন আঁশওয়ালা যে খেতে বিরক্তি লাগে। ফলের চেহারায় এবং আকারেও অনেক তারতম্য আছে। সাধারণতঃ আঁটির গাছের ফল আকারে ছোট হয় কিন্তু ভাল কলমের ফলের ওজন /১৷০ সের পর্য্যন্ত হতে পারে, এমন কি এর চেয়েও বেশী। পাকা ফলে ইক্ষু শর্করার পরিমাণ শতকরা ১১-১৯ ভাগ থাকে, শতকরা অর্দ্ধ-১ ভাগ,

রূপ চর্চ্চায়-
অপরিহার্য্য.
C.R. DAS'S
RANGAJAVA
TOILET POWDER
RANGAJAVA
SNOW
সি, আর, দাশের
রাঙ্গাজবা
স্নো ও
পাউডার
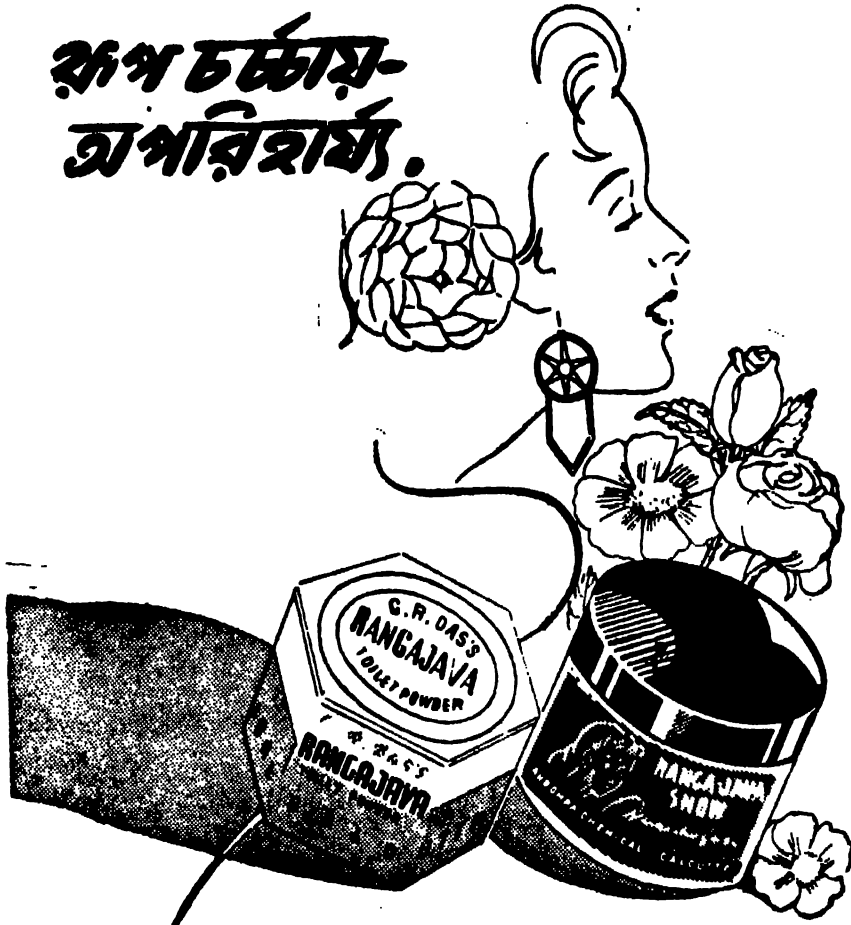
'প্রোটিন', যেটুকু খুব কম অথবা থাকেই না এবং খাদ্যপ্রাণ 'ক' এবং 'খ' বেশ থাকে। তা ছাড়া কাঁচা আমে 'গ্যালিক এসিড' প্রচুর পরিমাণে থাকে। পাকা আমের গুণ অনেক। জলখাবার হিসেবে পাকা আম খুবই মূল্যবান, উপাদেয় এবং পুষ্টিকর।

নামকরা হাজারো উপজাতির ভেতর আমাদের দেশে বোম্বাই-এর 'আলফোন্সো', গোয়ার 'ফার্ণাণ্ডিন্', মাদ্রাজের 'মালগোবা', মালদহের 'ফজ্‌লি', 'গোপালভোগ', 'ক্ষীরসাপাত' এবং বিহারের 'ল্যাংড়া' আম খুব বিখ্যাত। এখন নানান জায়গায় এই সব আমেরই চাষ করা হয়ে থাকে বর্তমান বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে। পূর্ব্ববঙ্গের 'অমৃতকুটির' উপজাতীয় আম খুব ভাল। বাংলাদেশে একমাত্র উত্তর বঙ্গে আম প্রচুর পরিমাণে জন্মে এবং এই অঞ্চলের আমই সর্ব্বোৎকৃষ্ট।

আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রের 'ফ্লোরিডা'তে যে সব আম জন্মানো হয় তার ভেতর বিশেষ করে 'হ্যাডেন', 'পাকেন্তী', 'ক্যাম্বোডিয়ানা', 'সিসিল', 'পিকো', 'সন্দের্শ', 'ল্যাংড়াবেনার্সি' এবং 'আমিনি' ইত্যাদি খুব বিখ্যাত। তবে এর মধ্যে 'হ্যাডেন' জাতীয় গাছই খুব বেশী লাগানো হয় তার কারণ হচ্ছে এর ফলের স্বাদ খুব ভাল, আকার বড় এবং রং খুব চমৎকার।

আম পাকলে গাছ থেকে পেড়ে ঘরে রাখলে কয়েক দিনেই পচে যায় কারণ এর সুমিষ্ট রসে নানান জাতীয় ছত্রাক সহজেই জন্মাতে পারে, যারা আমটিকে পচিয়ে দেয়। পূর্ব্ব বঙ্গের এবং আসামের নানা জায়গায় আম পাকবার সময় তার ভেতর এক রকম কীট জন্মায়, এই সব পোকা জন্মানোর জন্য সম্পূর্ণ আমটিই নষ্ট হয় না। কিন্তু আর এক প্রকার ক্রিমির মত খুব ছোট ছোট কীট জন্মে—পাকা আমে তারা কিল্‌বিল্‌ করে নড়তে থাকে। এই সব কীট জন্মালে সে আম আর খাওয়া যায় না। আম যখন কচি অবস্থায় থাকে তখন একপ্রকার পরাঙ্গপুষ্ট পতঙ্গ ফলটির ভেতর গর্ত করে ঢুকে তার মধ্যে ডিম পেড়ে বেরিয়ে যায়। তারপর আমটিও বড় হয়ে পাকে, সেই সঙ্গে ডিম থেকে সেই পতঙ্গের শূককীটের সৃষ্টি হয় এবং এই শূককীট-গুলোকেই আমরা পাকা আমে কিলবিল করে নড়তে দেখি। এ ছাড়াও নানা রকম ব্যাধি আমের হয়ে থাকে কতক বা ছত্রাক বা ব্যাকটিরিয়ার জন্য, কতকগুলি আবার নানা-প্রকার কীটপতঙ্গের দরুন। যেমন ডালের ডগা শুকিয়ে যাওয়া; ফুল ঝরে যাওয়া, শেকড় পচে যাওয়া, ডাল পচে যাওয়া ইত্যাদি। *Baci lus mangifera* কচি ডাল আক্রমণ করে। আমকে অনেক প্রকার কীটপতঙ্গের অত্যাচার সহ্য করতে হয়, তবে এর ভেতর কতকগুলি আবার মানুষের কাজেও লেগে থাকে যেমন আসামের 'উঝুরি' অথবা 'এ্যাম্পটিনি' গুটিপোকা (*Cricula tri-fenestrata*, Helfer)। এরা আমের পাতা খেয়ে বেঁচে থাকে, কিন্তু এদের নিকট থেকেও অতি অল্পপরিমাণ রেশমই পাওয়া যায়। সাদা মোমের পোকা (*Ceroplastes ceriferous*, Sign)কেও অনেক সময় এর উপর দেখা

যায়। আমের লাফানো পোকা (*Idiocerus* sp.) মুকুল এবং কচি ডালপালা আক্রমণ করে। 'সোডিয়ম সোপ কম্পাউণ্ড' দিয়ে এদের হাত থেকে রক্ষা পাওয়া যায়। শস্কচূর্ণবৎ পোকা (*Monophlebus stebengii*) কচি ডাল, মুকুল এবং ফল আক্রমণ করে। বৃক্ক-ভেদক কীট (*Engnapptus marginatus*) পাতা, এবং ছোট ডালপালা কেটে দেয়, বীজ নষ্ট করে দেয় এবং পাকা ফল আক্রমণ করে। ডালপালা শাখাপ্রশাখার ছিদ্র করে; গাছের ছালের নীচ দিয়ে সুড়ঙ্গ ইত্যাদি করে এরা গাছের অনেক ক্ষতি করে। দুই পাখাওয়ালা পতঙ্গের (*Dacus ferrageneus, D. persicol*)' আক্রমণে ফল নষ্ট হয়ে যায়। এ ছাড়াও আমের আরও নানাপ্রকার শত্রু আছে, বিশেষ করে নানা জাতের রাত-প্রজাপতি।

ফ্লোরিডাতে লাল মাকড়সা এবং কয়েক প্রকার আঁশ-ওয়ালা পোকাই গুরুতর ক্ষতির কারণ হয়ে থাকে। যন্ত্র-পাতির তেল এবং জল ১ ভাগে ৭০ ভাগ এবং তার সঙ্গে 'নিকোটিন সালফেট' মিশিয়ে শীতের সময় দু-এক বার গাছে লাগালে এই সব পোকা-মাকড়ের হাত থেকে রক্ষা পাওয়া যায়। ফলের কীট গ্রীষ্মমণ্ডলে খুব দেখা যায়, আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রে কিন্তু এদের উৎপাত একদম নেই।

প্রায় পেকে গেছে এমন আম গাছ থেকে পেড়ে খড় অথবা আম কিংবা ঐ জাতীয় কোন গাছের পাতার মধ্যে রেখে দেওয়া হয়—চালানও দেওয়া যেতে পারে। তা ছাড়া শেওলা, কাঠকয়লার গুঁড়ো, খবরের কাগজ অথবা 'অয়েল পেপার' দিয়ে মুড়েও চালান দেওয়া যেতে পারে—এতে ঠাণ্ডা এবং শুকনো আবহাওয়াতে তাপ এবং আর্দ্রতা ঠিক বজায় থাকে। সযত্নে এবং সাবধানে পাঠালে ছোট চারাগাছও দূর দেশে চালান দেওয়া সম্ভবপর।

কাঁচা আম এক মাস কি তার সামান্য বেশী সময় টিন বন্দী করে রাখা যায়।

আজকাল ভাণ্ডারজাত করবার নানা প্রকার বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি হওয়াতে উপযুক্ত বাজারের এবং জাহাজের অভাব হলেও বিশেষ কিছুই আসে যায় না। দেওয়ালের জন্য ধানের তুষ, তাপমাত্রা নামানোর জন্য 'এমোনিয়া', রবারের ঢাকা দেওয়া কাঠের দেওয়াল, এবং 'এ্যালবেস্টস্' ঢাকা দেওয়া ইত্যাদি সুবিধা আধুনিক জাহাজের ঠাণ্ডা ঘরে থাকে।

পরীক্ষাদ্বারা দেখা গেছে যে ৩৬° ফার্ণহিট তাপপরিমাণের ঠাণ্ডা ঘরে যদি সম্পূর্ণ পরিপক্ব অথচ সবুজ আম রাখা যায় তবে তা অন্ততঃপক্ষে ১৮ দিন পর্য্যন্ত ভাল অবস্থায় থাকে।

যে সব আম স্বাভাবিক ভাবে পাকে না, ৩৫ দিন পরে তাদের গায়ে ইস্পাত-ধূসর রঙের ছোপ প্রকাশ পায়—আম অনেক দিন জলের মধ্যে থাকলেও এই রংটি প্রকাশ পেতে দেখা যায়।

১ মণ নির্বীজিত জলে প্রায় /৷ সের নুন দিয়ে তৈরী আরকে পাকা আম বোতলজাত করা যায়।

হ্যানোভার, ক্যানাডা, এবং আমাদের ভারতবর্ষের বিহার, মুজাফর গড়, রত্নগিরি, দিল্লী, কলিকাতা, কাঁচড়াপাড়া প্রভৃতি যায়গায় আম টিনজাত করবার ব্যবসায় আছে।

আমাদের দেশে কাঁচা আমকে সরু সরু করে কেটে অনেকেই শুকিয়ে রাখে—তাকে আমরা 'আমচুর' বা 'আমসী' বলি। পাকা আমের রস পাতলা করে শুকিয়ে 'আমসত্ব' তৈরি হয়। ভাল করে রোদে দিয়ে রাখলে আমচুর এবং আমসত্ব বারমাস থাকে এবং তাতে পোকা লাগতে পারে না। কিন্তু আমচুরে হলুদ এবং নুন না মেশালে বর্ষা কালে পোকায় নষ্ট করে ফেলতে পারে।

আঁশহীন কাঁচা আম লম্বা করে কেটে দিয়ে অল্প ভেজে চিনির রসে জ্বাল দিলে মোরব্বা তৈরি হয়। এই জাতীয় আমই জলে সেদ্ধ করে তার পর চালুনিতে ছেঁকে নিয়ে চিনির রসে জ্বাল দিয়ে তৈরি হয় জেলী। এ সব তৈরির পক্ষে 'ফজলি' আমই সব চেয়ে উপযোগী।

যেখানে আম জন্মায় সে সমস্ত দেশেই আম দিয়ে আচার চাটনী ইত্যাদি তৈরি করবার রীতি আছে।

শুধু যে ফলের শাঁসই আমাদের কাজে লাগে তা নয়, গাছের ছাল এবং শুকনো আঠা (Resin) নানা প্রকার ওষুধ তৈরির জন্য দরকার হয়। আঁটির ভেতরকার সাদা শাঁস শুকিয়ে রেখে প্রয়োজন মত তরকারি হিসেবে খাওয়া হয় এবং অনেক সময় গুঁড়ো করে রাখা হয় ভবিষ্যতের ব্যবহারের জন্য। আম-কাঠ যদিও খুব শক্ত এবং মজবুত নয় ও সহজেই নষ্ট হয়ে যাওয়ার ভয় আছে তবুও গৃহস্থালীর জিনিসপত্র তৈরি করাতে এর প্রয়োজন আছে প্রচুর।

দেশ-বিদেশের কথা

কৃতী বাঙালী

বিখ্যাত রাসায়নিক শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রমোহন সাহা, এম-এসসি, সম্প্রতি বেলজিয়ামের অন্তর্গত ব্রুসেলসের 'ইণ্টার এলাইড্ রিপেরা-রেশুনস্ এজেন্সী'র রসায়ন-বিভাগের ডেপুটি ডিরেক্টর নিযুক্ত হইয়াছেন। প্রতিষ্ঠানটির এই একটি মাত্র পদই এক জন ভারত-বাসীকে দেওয়া হইয়াছে।

শ্রীযোগেন্দ্রমোহন সাহা

যোগেন্দ্রমোহন কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে একজন তীক্ষ্ণধী ছাত্ররূপে পরিচিত ছিলেন। ছাত্রজীবনে সকল পরীক্ষায়ই কৃতিত্বের সহিত উত্তীর্ণ হইয়া তিনি বিবিধ বৃত্তি এবং পদক ইত্যাদি লাভ করেন। পোষ্ট-গ্রাজুয়েট শ্রেণীতে অধ্যয়ন করিবার সময় তিনি আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্রের অধীনে গবেষণা করিতেন। অবশেষে যোগেন্দ্রমোহন চিনি-শিল্প বিষয়ক গবেষণায় যোগদান করেন এবং ভারতবর্ষ ও যুক্তরাজ্যে শিক্ষালাভ করিয়া উক্ত বিষয়ে এক জন বিশেষজ্ঞ হইয়া উঠেন। অতঃপর ফেডারেল পাবলিক সার্ভিস কমিশন কর্ত্তৃক তিনি নিউ দিল্লীতে কেন্দ্রীয় আবকারী এবং লবণ-বিভাগের রাসায়নিক পরীক্ষক নির্ব্বাচিত হন। এই পদে থাকা কালে তিনি যোধপুর রাজ্যের দিহুয়ানা নামক স্থানে বিশুদ্ধ সোডিয়াম সালফেটের এক বিরাট্ উৎস আবিষ্কার করেন। এই অঞ্চলে তাঁহার আবিষ্কৃত সোডিয়াম সালফেটের পরিমাণ আন্দাজ ৮০ লক্ষ হইতে এক কোটি মণ। ইহাদ্বারা আগামী ত্রিশ হইতে চল্লিশ বৎসর পর্য্যন্ত সমগ্র ভারতবর্ষের চাহিদা মিটানো যাইবে। এই আবিষ্কারের জন্য যোধপুর-সরকার তাঁহাকে পুরস্কার-স্বরূপ ৮৫,০০০৲ প্রদান করিয়াছেন বলিয়া জানা গিয়াছে। কাগজ, কাচ, বস্ত্ররঞ্জন-শিল্প এবং ঔষধাদিতে সোডিয়াম সালফেট প্রচুর পরিমাণে ব্যবহৃত হয়। চামড়া ইত্যাদি লোমশূন্য করিবার জন্যও ইহা ব্যবহার করা হয়। শ্রীযুক্ত সাহার আবিষ্কারের পর সম্ভবতঃ বিদেশ হইতে সোডিয়াম সালফেট আমদানি করা আর আবশ্যক হইবে না।

যে সমস্ত বাঙালীর প্রতিভা দেশ-বিদেশে সর্ব্বত্র সমাদৃত হইয়াছে যোগেন্দ্রমোহন তাঁহাদের অন্যতম।

শ্রীকানাইলাল মণ্ডল

সিটি কলেজের রসায়নশাস্ত্রের অধ্যাপক শ্রীকানাইলাল মণ্ডল বিশুদ্ধ রসায়নের গবেষণার জন্য কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে ডি-এস্‌সি ডিগ্রি প্রাপ্ত হইয়াছেন। শ্রেষ্ঠ সাময়িক পত্রিকাদিতে প্রকাশিত তাঁহার বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধসমূহ তাঁহাকে সাধারণের নিকট সুপরিচিত করিয়াছে।

শ্রীআনন্দ আশ্রম দাতব্য চিকিৎসালয় ও অবৈতনিক সেবা-সদন

কয়েক বৎসর হইল স্বামী জ্যোতির্জীবন প্রমুখ কয়েকজন সন্ন্যাসী দরিদ্রনারায়ণের সেবার আদর্শে উদ্বুদ্ধ হইয়া সাঁওতাল পরগণার অন্তঃপাতী সাহেবগঞ্জের নিকটবর্ত্তী মির্জ্জাচৌকি নামক স্থানে উপরি-উক্ত আশ্রম এবং তৎসংশ্লিষ্ট একটি দাতব্য চিকিৎসালয় স্থাপন করেন। উক্ত অঞ্চলের বাসিন্দা সাঁওতাল এবং দরিদ্র চাষীদের মধ্যে শিক্ষার বিস্তার এক প্রকার নাই বলিলেই চলে। ইহারা এত গরীব যে, রোগের উপযুক্ত চিকিৎসা এবং পথ্যাদির ব্যবস্থা করিবার ক্ষমতাও ইহাদের নাই। এই দুর্গতদের দুঃখ মোচনকল্পে আনন্দ আশ্রমের কর্ত্তৃপক্ষ বিগত কয়েক বৎসর যাবৎ বিনামূল্যে ইহাদের চিকিৎসাদির ব্যবস্থা করিয়া সমাজের প্রভূত হিতসাধন করিয়া আসিতেছেন। ১৯৪৪ খ্রীষ্টাব্দের জুন মাস হইতে ১৯৪৫ খ্রীষ্টাব্দের ডিসেম্বর পর্য্যন্ত ৪২০০ জনের অধিক নূতন রোগী এবং ১৪,৮০০ জন পুরাতন রোগী আশ্রমের চিকিৎসা-বিভাগ কর্ত্তৃক চিকিৎসিত হইয়াছে, তন্মধ্যে ১৩০০ জন সাঁওতাল প্রভৃতি আদিবাসী। ৮০ জন রোগীর উপর অস্ত্রোপচার করা হইয়াছে এবং কালাজ্বর, ম্যালেরিয়া প্রভৃতি ব্যাধিতে আক্রান্ত ২০০ জন রোগীকে বিনামূল্যে ইঞ্জেকসন দেওয়া হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত আশ্রমের কর্ত্তৃপক্ষ বসন্ত, কলেরা, টাইফয়েড প্রভৃতি সংক্রামক ব্যাধিতে আক্রান্ত ২৫ জন রোগীকে আশ্রমে স্থান দিয়া নিজেরাই তাহাদের সেবা-শুশ্রূষার ব্যবস্থা করিয়াছিলেন।

এই জনহিতকর প্রতিষ্ঠানটি যাহাতে উপযুক্ত অর্থানুকূল্য লাভ করিয়া আরও ব্যাপকভাবে আর্ত্ত মানবতার সেবায় আত্মনিয়োগ করিতে পারে সে বিষয়ে সকলেরই অবহিত হওয়া আবশ্যক। গৃহাদি নির্ম্মাণ, ঔষধপত্র এবং সাজসরঞ্জাম ইত্যাদি ক্রয় করিবার জন্য প্রচুর অর্থের প্রয়োজন। সকলেরই সাধ্যমত সাহায্য করিয়া এই শিশু-প্রতিষ্ঠানটিকে পুষ্ট করিবার চেষ্টা করা উচিত। টাকাকড়ি নীচের ঠিকানায় পাঠাইতে হইবে।

স্বামী জ্যোতির্জীবন
সম্পাদক—শ্রীআনন্দ আশ্রম
পোঃ—মির্জ্জাচৌকি
(সাঁওতাল পরগণা) ই, আই, লুপ।

নিখিল-ভারত রবীন্দ্র-স্মৃতিরক্ষা সমিতির সাধারণ সম্পাদকের আবেদন

নিখিল-ভারত রবীন্দ্রনাথ স্মৃতিরক্ষা সমিতির সাধারণ সম্পাদক শ্রীযুক্ত সুরেশচন্দ্র মজুমদার নিম্নলিখিত মর্ম্মে এক বিবৃতি প্রচার করিয়াছেন :

"আগামী ৮ই মে (২৫শে বৈশাখ) কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের জন্মবার্ষিকী। এই দিবস যতই নিকটবর্ত্তী হইতেছে, ততই আমাদের একথা বিশেষ করিয়া মনে পড়িতেছে যে, জাতীয় কবির নিকট আমাদের ঋণ অপরিশোধিত রহিয়া গিয়াছে। কবিগুরুর স্মৃতিরক্ষাকল্পে প্রতিষ্ঠিত অর্থভাণ্ডারে গত ১৫ই মার্চ্চ পর্য্যন্ত মাত্র ১২১৯১১৬।/১০ পাই সংগৃহীত হইয়াছে। নিখিল-ভারত রবীন্দ্রনাথ স্মৃতিরক্ষা সমিতির পরিকল্পনা কার্য্যে পরিণত করিবার পক্ষে এই অর্থ আদৌ যথেষ্ট নহে।

এযাবৎ যে অর্থ সংগৃহীত হইয়াছে উহা আশানুরূপ নহে। অধিকাংশ সাহায্যই দরিদ্র জনসাধারণের সামান্য সামান্য দানে

সংগৃহীত হইয়াছে। এমন কি, দুই আনা, এক আনা চাঁদাও তন্মধ্যে আছে। অপেক্ষাকৃত অবস্থাপন্নদের নিকট হইতে এখন পর্য্যন্ত তেমন উৎসাহজনক সাড়া পাওয়া যায় নাই। যদি অর্থা-ভাববশতঃ আমরা যথোপযুক্তভাবে কবিগুরুর স্মৃতিরক্ষার ব্যবস্থা করিতে সমর্থ না হই, তাহা হইলে উহা গভীর পরিতাপের বিষয় হইবে। কবিগুরুর আগামী জন্ম-দিবসের পূর্ব্বে ২৫ লক্ষ টাকা সংগ্রহ করাই আমাদের সঙ্কল্প। সকলের সংযোগিতা পাইলে ঐ পরিমাণ অর্থ সংগ্রহ করিতে পারিব বলিয়া এখনও আমরা আশা করি। এই মহান্ উদ্দেশ্য যাহাতে সফল হইতে পারে, তৎকল্পে মুক্তহস্তে অর্থসাহায্য করিবার জন্য আমরা দেশবাসীর নিকট পুনরায় আবেদন জানাইতেছি।

সমস্ত দান নিম্নলিখিত ঠিকানায় সাদরে গৃহীত হইবে :

সাধারণ সম্পাদক, নিখিল-ভারত রবীন্দ্রনাথ স্মৃতিরক্ষা সমিতি, ৬।৩ নং দ্বারকানাথ ঠাকুর লেন, কলিকাতা অথবা ১নং বর্ম্মণ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।"

সুশোভন দত্ত

সুশোভন দত্ত কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন কৃতী ছাত্র ও অধ্যাপক ছিলেন। তিনি পদার্থ বিদ্যায় এম্-এস্‌সি পাশ করিয়া প্রেমচাঁদ রায়চাঁদ বৃত্তি পান এবং সিটি কলেজ ও প্রেসিডেন্সি কলেজে অধ্যাপনা করেন। ভারত-সরকারের Assistant Industrial Adviser এর পদে বিশেষ কৃতিত্বের সহিত কার্য্য করিতেছিলেন। গত ১লা মার্চ্চ তারিখে হঠাৎ দিল্লীতে তাঁহার প্রাণবিয়োগ হয়। তিনি মডার্ণ রিভিউ, প্রবাসী ও সায়ান্স এণ্ড কালচার পত্রিকায় চিন্তাপূর্ণ প্রবন্ধ লিখিতেন। বিশ্বভারতীর বিশ্ববিদ্যা-সংগ্রহ-গ্রন্থমালার অন্তর্গত "বিশ্বের ইতিকথা" সুন্দর রচনা। ইহাও তাঁহার লেখা। যে সমস্ত দুঃস্থ পরিবার রোগের

সুশোভন দত্ত

চিকিৎসা ও পথ্যের ব্যবস্থা করিতে পারে না তাহাদের সাহায্যার্থে মৃত্যুকালে তিনি দশ হাজার টাকা কলিকাতা সাধারণ ব্রাহ্ম-সমাজের হাতে দান করিয়া গিয়াছেন।

পুস্তক-পরিচয়

শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় : জীবনী ও পত্রাবলী—সাহিত্য-সাধক-চরিতমালা—৫২। শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়। বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষৎ, ২৪৩/১ আপার সারকুলার রোড, কলিকাতা। মূল্য বার আনা।

রবীন্দ্রনাথের যুগে শরৎচন্দ্রের আবির্ভাব এক আশ্চর্য্য ব্যাপার। শরৎচন্দ্র নিজেই নিজের প্রতিষ্ঠার আসন সংগ্রহ করিয়া লইয়াছেন। সাহিত্য-ক্ষেত্রে স্থান করিয়া লইতে তাঁহাকে কাহারও প্রশংসাপত্র আদায় করিতে হয় নাই। আত্মকথা বলিতে গিয়া শরৎচন্দ্র নিজেই বলিয়াছেন, "বাংলা দেশে বোধ হয় আমিই একমাত্র সৌভাগ্যবান লেখক যাকে কোন দিন বাধার দুর্ভোগ ভোগ করতে হয় নি।" ১৮৭৬ খ্রীষ্টাব্দের সেপ্টেম্বর মাসে হুগলী জেলার অন্তর্গত দেবানন্দপুর গ্রামে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া এফ-এ পড়িবার সময় সাংসারিক দুর্য্যোগে তাঁহাকে পড়া ছাড়িতে হয়। তারপর তিনি একদিন নিরুদ্দেশ হন। তিন বৎসর পরে ১৯০৩ সালে পিতার মৃত্যুসংবাদ পাইয়া তিনি ফিরিয়া আসেন। সংসার কিন্তু তাঁহাকে বাঁধিয়া রাখিতে পারে নাই। কাহাকেও কিছু না বলিয়া এবার শরৎচন্দ্র ব্রহ্মদেশ যাত্রা করেন। সেখানে তিনি একাউন্টেন্ট-জেনারেলের আপিসে কাজ করিয়া বার-তের বৎসর কাটাইয়া দেন। তারপর সাহিত্যক্ষেত্রে তাঁহার ডাক পড়িল। বন্ধুদের নির্ব্বন্ধাতিশয্যে তিনি লিখিতে আরম্ভ করিলেন। "যমুনা"র 'রামের সুমতি', 'পথ-নির্দ্দেশ' ও 'বিন্দুর ছেলে' বাহির হইবামাত্র দেশময় সাড়া পড়িয়া গেল। তখনও তিনি ব্রহ্মদেশে। তার পর বন্ধুদের আহ্বানে এবং শারীরিক অসুস্থতার দরুণ তিনি বাংলাদেশে ফিরিয়া আসিলেন, এবং "ভারতবর্ষ" প্রভৃতিতে ধারাবাহিকভাবে তাঁহার লেখা চলিতে লাগিল। শরৎচন্দ্র বাংলার অন্যতম শ্রেষ্ঠ ঔপন্যাসিক রূপে পরিগণিত হইলেন। বাষট্টি বৎসর মাত্র বয়সে লেখার পূর্ণ জোয়ারের সময় তিনি পরলোকগমন করেন। শরৎচন্দ্র শুধু সাহিত্যসেবী ছিলেন না, স্বদেশের সেবাও তাঁহার জীবনের ব্রত ছিল। কংগ্রেসের সহিত তিনি ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত ছিলেন। নানা বন্ধুবান্ধবকে লিখিত তাঁহার পত্রগুলির মধ্যে তাঁহার জীবন-চরিতের বিশিষ্ট উপকরণ পাওয়া যায়। এই অমূল্য পত্রাবলী একত্রে সংগ্রহ করিয়া ব্রজেন্দ্রনাথ শরৎ-জীবনীর উপর প্রচুর আলোকপাত করিয়াছেন। সাময়িক পত্রে লিখিত কিন্তু পুস্তকাকারে অপ্রকাশিত অনেকগুলি প্রবন্ধ পরিশিষ্টে সন্নিবিষ্ট করিয়া গ্রন্থকার শরৎচন্দ্রের রাজনৈতিক মতামত পাঠকবর্গের নিকট সুগোচর করিয়াছেন। চরকা, মহাত্মা, দেশবন্ধু, সুভাষচন্দ্র এবং অন্যান্যের সম্বন্ধে তাঁহার মন্তব্য সম্বলিত রচনাগুলি সম-সাময়িক রাজনৈতিক ইতিহাসের একটা দিক উদ্ভাসিত করিবে। শরৎচন্দ্র সম্বন্ধে জ্ঞাত ও অজ্ঞাত তথ্যপূর্ণ এই জীবন-চরিত পাঠকের বহুতর কৌতূহল চরিতার্থ করিবে।

শ্রীশৈলেন্দ্রকৃষ্ণ লাহা

নাগপাশ—শ্রীপ্রভাতকুমার গোস্বামী। এম, সি, সরকার অ্যাণ্ড সন্স লিমিটেড। ১সি কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা। মূল্য দুই টাকা। পৃষ্ঠা ১৩১।

বাংলা কথা-সাহিত্যে লেখক নবাগত। তাঁহার উপন্যাসখানি আমাদের ভাল লাগিয়াছে।

সমাজের বিরুদ্ধে দাঁড়াইয়া অষ্টম বর্ষীয়া কন্যার বৈধব্যকে অস্বীকার করিবার সাহস সরকারী চাকরে অচ্যুতবাবুর ছিল না। অথচ এত অল্প বয়সে মেয়েকে ব্রহ্মচর্য্যব্রতে দীক্ষা দিতেও তাঁর বাধিল। এই নিষ্ঠুর শাস্তির কবল হইতে কন্যাকে মুক্তি দিবার প্রয়াসে তিনি বাংলা ছাড়িয়া এলাহাবাদে আসিয়া বাসা বাঁধিলেন এবং তাহার জীবনকে নূতন করিয়া গড়িবার ব্যবস্থা করিলেন। নূতন পরিবেশে, নূতন জীবনে যেসব ঘটনা ও সমস্যার সমাবেশ লেখক করিয়াছেন তাহাতে পূর্ণাঙ্গ একটি কাহিনী পাওয়া যায়। রোমান্স, সমাজতত্ত্ববাদ প্রভৃতির বিশ্লেষণের মধ্যে গল্পের সূত্রটি কোথাও হারাইয়া যায় নাই বলিয়া গল্পটি বেশ জমিয়াছে।

এবার অবগুণ্ঠন খোল—শ্রীঅন্নপূর্ণা গোস্বামী। দি সিটি বুক কোম্পানী। ১৫, বঙ্কিম চ্যাটার্জ্জি ষ্ট্রীট, কলিকাতা। মূল্য—২।০ টাকা। পৃ. ১৪৩।

এই উপন্যাসটিতে পাত্রপাত্রীর মুখে লম্বা লম্বা বক্তৃতা ও উপদেশ আছে। অনেকগুলি গান আছে কিন্তু গল্পাংশ বলিতে বিশেষ কিছু নাই।

শ্রীরামপদ মুখোপাধ্যায়

মৃত ও অমৃত—শ্রীরমেশচন্দ্র সেন। পূরবী পাবলিশার্স, ৩৭।৭ বেনেটোলা লেন, কলিকাতা। পৃ. ১৬৩; মূল্য আড়াই টাকা।

মৃত ও অমৃত গল্পের বই। ডোমের চিতা, বিয়োগান্ত, অন্তর-বাহির, তারা তিন জন প্রভৃতি বারোটি ছোট গল্প আলোচ্য গ্রন্থখানিতে স্থান পেয়েছে। ডোমের চিতাকে ঠিক গল্প আখ্যা দেওয়া যায় না,—এটি একটি নক্‌সা, বাকী এগারটি নিপুণ শিল্পীর হাতের সার্থক গল্প। দৃষ্টিভঙ্গী প্রশংসনীয়।

প্রমীলার সংসার—শ্রীপ্রবোধকুমার সান্যাল। রূপশ্রী পাবলিশার্স, ২১, ডবলু. সি. ব্যানার্জ্জি ষ্ট্রীট, কলিকাতা। পৃ. ১৪৮। মূল্য দুই টাকা।

প্রমীলার সংসার একখানি ছোট উপন্যাস। প্রবোধবাবুর ভাষার খ্যাতি আছে। তাঁর সেই মনোজ্ঞ ভাষায় প্রমীলার সংসার এক বেপরোয়া সৃষ্টি,—শুধু বেপরোয়া নয়,—অদ্ভুতও। প্রমীলার স্বামী বাসুদেবের কথাবার্ত্তা শুনে মনে হয় না—সে বোকা, গোবেচারী ভালমানুষ। গ্রন্থের প্রারম্ভে এক জায়গায় বলা হয়েছে এই 'স্বামী-স্ত্রীর সম্বন্ধটা ভারি মধুর' (৭ পৃ.), অন্যত্র (১০ পৃ.) বলা হয়েছে 'স্বামীর উপর ভক্তি এবং দয়া প্রমীলার অসীম',—তবু স্বামীর বন্ধু জহরের জন্য তার চিত্ত তৃষিত। প্রমীলা 'দূরের আকাশের দিকে চেয়ে মাঝে মাঝে উত্তপ্ত দীর্ঘনিশ্বাসকে চেপে রাখতে পারে না।' স্বপ্ন দেখে জহরের সঙ্গে সে পালিয়ে যাচ্ছে, 'এল এক মরুভূমির প্রান্তে, তৃষ্ণায় ছাতি ফেটে যাচ্ছে, মরণপথের দুটি যাত্রী শুধু বলছে—জল, জল।' জহরের প্রেম কিন্তু একনিষ্ঠ নয়। সে যোগার্স'র 'বে-নাদি',—এখানে ওখানে মেয়েদের পরখ করবার ছলে তাদের চিত্ত হরণ করে বেড়ায়। রূপশিল্প, কলা-নৈপুণ্য প্রভৃতি যেসব সম্পদের জোরে পুরুষ নারীচিত্ত জয়ে সক্ষম হয় জহরকে সে সকল গুণের অধিকারী করে কোন নারীর কাছেই উপস্থাপিত করা হয় নি, তবুও তারা তার কাছে আত্মনিবেদনে উন্মুখ। জহর অবশ্য ধনী জমিদার কিন্তু সে কথা এক প্রমীলা ছাড়া আর সকলের কাছেই অপ্রকাশিত,—তবুও আগুনের মুখে পতঙ্গের মত ঝাঁপ দিয়ে পড়ছে তারা সবাই।

মাধবীর প্রেম করুণ ও মধুর, কিন্তু তার দিদি রাগিণী দেবীর কামনা জয়াবহ,—বাস্তব জীবনে এরূপ চরিত্র বড় বেশি মেলে না,—তাই রক্ষা।

শ্রীতারাপদ রাহা

ঝুরি ভাজা—শ্রীঅরবিন্দ মুখোপাধ্যায়। ভারতী-ভবন, কলিকাতা। দাম আট আনা।

কোন্ শ্রেণীর কাব্য, নামেই তাহার পরিচয় আছে।

জল-ডম্বরু পাহাড়—শ্রীঅশোকবিজয় রাহা। মডার্ণ বুক ডিপো, শ্রীহট্ট। দাম আট আনা।

কবিতাগুলিতে কবিমনের স্বাতন্ত্র্যস্পর্শ আছে।

কবিতা : ১৩৫০—শামসুদ্দীন। চয়নিকা পাবলিশিং হাউস। ৪২, সীতারাম ঘোষ ষ্ট্রীট, কলিকাতা। দাম বারো আনা।

ঈগল, শকুন, নৈর্ব্যক্তিক, আত্মকেন্দ্রিক প্রভৃতি আধুনিক কবিতায় মুদ্রাদোষ সত্ত্বেও রচনার মাধুর্য আছে।

সায়াহ্নিকা—প্রভাময়ী মিত্র। গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স। ২০৩।১।১, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা। দাম এক টাকা।

'পরিচায়িকা'য় শ্রীযুক্ত কালিদাস রায় রচনার "লালিত্য, সৌকুমার্য, ছন্দের বৈচিত্র্য এবং পারিপাট্যের" প্রশংসা করিয়াছেন। সে প্রশংসা সঙ্গত।

সুর-সন্ধান—শ্রীমিহিরকুমার সেন। ভারতী ভবন, ১১, বঙ্কিম চাটুজ্যে ষ্ট্রীট, কলিকাতা। দাম আট আনা।

অপরিণত রচনা দু-একটি আছে সন্দেহ নাই, কিন্তু কবি সুরানুরাগী।

শ্রীধীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়

চার পুণ্যস্থান—শ্রীজ্যোতিষচন্দ্র ঘোষ। মহাবোধি সোসাইটি, ৪এ বঙ্কিম চ্যাটার্জ্জি ষ্ট্রীট, কলিকাতা। পৃষ্ঠা ডবলক্রাউন ।৶০+৯৪। মূল্য—৸০, বাঁধানো ১৲ টাকা।

গৌতমবুদ্ধের আবির্ভাব, তিরোভাব, বুদ্ধত্বলাভ ও ধর্ম্মপ্রচারের পবিত্র স্মৃতিবিজড়িত লুম্বিনী, কুশীনগর, বুদ্ধগয়া ও সারনাথ এই চারিটি প্রসিদ্ধ বৌদ্ধ তীর্থস্থানের বিবরণ এই গ্রন্থে সংকলিত হইয়াছে। স্থানগুলি সমগ্র পৃথিবীর বৌদ্ধসম্প্রদায়ের নিকট বিশেষ সমাদৃত ও সুপরিচিত হইলেও ইহাদের সম্বন্ধে সাধারণ ভারতবাসীর জ্ঞান নগণ্য। ভারতীয় প্রত্নতত্ত্ব বিভাগ ও বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান এবং বদান্য ব্যক্তিবর্গের প্রচেষ্টায় এই সকল তীর্থ ক্রমশঃ জনসাধারণের অধিকতর দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছে। আলোচ্য গ্রন্থের রচয়িতা এই সকল প্রচেষ্টার উল্লেখ করিয়াছেন সঙ্গে সঙ্গে প্রাচীন গ্রন্থ হইতে ইহাদের কিছু ইতিবৃত্ত সংগ্রহ করিয়া দিয়াছেন। এই গ্রন্থ এই সব স্থান সম্বন্ধে সাধারণের অজ্ঞতা দূর করিতে যথেষ্ট সহায়তা করিবে।

শ্রীচিন্তাহরণ চক্রবর্ত্তী

মুক্তি সংগ্রামে জনসেনা—শ্রীদ্বিজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়। -মিত্রালয় ১০, শ্যামাচরণ দে ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

যুগোস্লাভিয়া, ফ্রান্স, পোলাণ্ড, গ্রীস, ইতালি, এস্তোনিয়া, লিথুয়ানিয়া চীন, ব্রহ্মদেশ, আরাকান, মালয়, ফিলিপিন এবং ইন্দোনেশিয়া এই সকল দেশের জনসেনা বা গরিলা বাহিনীগুলির অপূর্ব দেশভক্তি ও ত্যাগের কাহিনী যতদূর সম্ভব সংগ্রহ করিয়া লেখক এই গ্রন্থখানিকে পূর্ণাঙ্গ করিতে প্রয়াস পাইয়াছেন। বিভিন্ন দেশের অন্নহীন, অর্থহীন, গৃহহীন নিঃস্ব এই সমস্ত জনসেনা কিরূপে অপরিসীম অত্যাচারী ফ্যাসিস্টশক্তিকে পরাজয়ের পথে ঠেলিয়া দিল তাহা সত্যই বিস্ময়কর।

ফ্যাসি অত্যাচার-কাহিনীর বহু সংবাদ মিত্রশক্তির প্রচারপত্র হইতে গ্রহণ করিতে লেখক বাধ্য হইয়াছেন, কিন্তু ইহাদের সম্বন্ধে সন্দেহের অবকাশ রহিয়াছে। যুদ্ধের সময় যুধ্যমান জাতিসমূহ পরস্পরের বিরুদ্ধে মিথ্যা অভিযোগ উত্থাপিত করিবে ইহা কিছু অসম্ভব নহে, বিশেষতঃ পরাজিত শত্রুর প্রতি যে কোন দোষ আরোপ করা আরও সহজ। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধকে এক কথায় ফ্যাসিবাদী ও সাম্রাজ্যবাদীর যুদ্ধ বলা যাইতে পারে এবং ইহাদের কেহই বিশ্বপ্রেমিক নহে। পুস্তক রচনাকালে লেখক এই দিকে লক্ষ্য রাখিলে ঐতিহাসিক তথ্য ও ও সত্য নিষ্ঠার পরিচয় দিতেন। যাহা হউক, পুস্তখানির বহুল প্রচার হইবে আশা করি।

শ্রীঅনাথবন্ধু দত্ত

জার্মানীর সেরা গল্প—শ্রীশৈলবিহারী ঘোষ অনূদিত। বুক ষ্টাণ্ড, ১।১।১এ বঙ্কিম চ্যাটার্জ্জি ষ্ট্রীট, কলিকাতা। ১৮৬ পৃ., মূল্য তিন টাকা।

বইটিতে প্রাক্‌যুদ্ধের জার্মানীর কয়েকজন শ্রেষ্ঠ সাহিত্যিকের ছোট গল্প স্থান পাইয়াছে। হাউপ্‌টম্যান, সুডারম্যান, ওয়াসারম্যান, ষ্টিফেন জাইগ, রুকে, স্নিজ্‌লার এবং কোয়নার এই কয়জনের বাছাই-করা এক একটি গল্প অনুবাদ করিয়া অনুবাদক ইউরোপের এক শ্রেষ্ঠ জাতির রসসাহিত্য বাঙালী পাঠককে উপহার দিয়াছেন। অনুবাদের ভাষা স্বচ্ছ ও সাবলীল, রচনায় কোথাও আড়ষ্টতা ধরা পড়ে না এবং মৌলিক গল্পের রসাস্বাদন কোথাও ব্যাহত হয় না। কিন্তু কয়েকটি কারণে পাঠকের চিত্তে অতৃপ্তি থাকিয়া যায়। প্রথমতঃ প্রস্তাবনায় জার্মান সাহিত্যের একটি মোটামুটি পরিচয় দেওয়া উচিত ছিল, দ্বিতীয়তঃ অনূদিত সাহিত্যরথিগণের একটি সংক্ষিপ্ত পরিচয়পঞ্জী পাঠকের কৌতূহল উদ্দীপ্ত ও আংশিকভাবে নিবৃত্ত করিতে পারিত, তৃতীয়তঃ গল্পের সংখ্যা আরও দু-একটি বৃদ্ধি করা যাইতে পারিত। ভূমিকায় ডক্টর অমিয় চক্রবর্তী ইউরোপীয় সাহিত্যের সহিত বর্তমান বাঙালী পাঠকের ঘনিষ্ঠ যোগাযোগের বিষয় উল্লেখ করিয়া অনুবাদকের রসরুচির প্রশংসা করিয়াছেন।

বীরপূজা—শ্রীলা দেবী। পরাগ পাবলিশার্স, ১৬৯, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা। মূল্য দেড় টাকা।

প্রথমে কয়েকজন দেবতা ও অবতারগণ হইতে আরম্ভ করিয়া ধর্মগুরু, রাষ্ট্রগুরু এবং অন্যান্য শ্রেষ্ঠ মহাপুরুষ ও সাহিত্য-দিক্‌পালগণের কীর্তিকথা স্মরণ করিয়া কবি তাঁহাদের উদ্দেশে হৃদয়ের শ্রদ্ধাঞ্জলি অর্পণ করিয়াছেন। কবিতাগুলি অসম ছন্দ ও মিলের সমন্বয়ে রচিত। কবিতাগুলির সহজ সরল অমার্জিত বাহুল্য কাব্যামোদীগণের পূর্ণ তৃপ্তি সাধন করিতে পারিবে না বটে, কিন্তু গভীর ভাবাবেগ ও অন্তঃপূর্ণ অকৃত্রিম শ্রদ্ধাপ্রীতির অভিব্যক্তিরূপে সাধারণ পাঠকের আনন্দবিধান করিবে।

টাক্ ডুমাডুম্ ডুম্—শ্রীজ্ঞানদানন্দিনী দেবী। বিশ্বভারতী গ্রন্থালয়, ২ বঙ্কিম চাটুজ্যে ষ্ট্রীট, কলিকাতা। মূল্য এক টাকা।

রবীন্দ্রনাথের মেজদাদা সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুরের সহধর্মিণী জ্ঞানদানন্দিনী দেবী তাঁহার আদরের বড় নাতির মনোরঞ্জনের জন্য এই পুরানো গল্পটিকে নাটকাকারে রূপ দিয়াছিলেন। ভারতের প্রথম সিভিলিয়ানের স্ত্রী হইলেও তিনি আধুনিকভাবে উচ্চশিক্ষিতা ছিলেন না, কারণ তাঁহার অষ্টমবর্ষে গৌরীদান বিবাহ হইয়াছিল এবং তিনি পল্লীগ্রামবাসী গৃহস্থের কন্যা ছিলেন। কিন্তু ঠাকুরবাড়ীর উন্নত পারিবারিক পরিবেশে পরে তিনি নিজের চেষ্টায় যথেষ্ট লেখাপড়া শিখিয়াছিলেন এবং উত্তরকালে স্বামীর সহিত বোম্বাই প্রবাসে দীর্ঘকাল যাপন করিয়াছিলেন, পরে তিনি একলাই ছেলেমেয়েদের লইয়া বিলাত পর্যন্ত ঘুরিয়া আসিয়াছিলেন। তাঁহার 'সাত-ভাই চম্পা'র পরিচয় পাঠক পূর্ব্বে পাইয়াছেন, এই দুখানি বই তাঁহাকে বাংলা শিশুসাহিত্যে সুপ্রতিষ্ঠিত করিবে। শিল্পাচার্য্য নন্দলাল বসু পুস্তকের ছবিগুলি আঁকিয়াছেন। একখানি রঙীন ও অনেকগুলি পূর্ণপৃষ্ঠা হাফটোন ছবি, প্রচ্ছদপটের উভয় পৃষ্ঠায় দুইরঙা ছবি দুটি, উৎকৃষ্ট কাগজ, ছাপা ও বাঁধাই বইটিকে চমৎকার উপহারোপযোগী করিয়াছে। নাটিকাটি অভিনয় করিয়া ছেলেরা প্রচুর আমোদ লাভ করিবে।

যত রাজ্যের রূপকথা—শ্রীধীরেন্দ্রলাল ধর। এম্. সি. সরকার এণ্ড সন্স, ১৪ বঙ্কিম চ্যাটার্জ্জি ষ্ট্রীট, কলিকাতা। ১৭৩ পৃষ্ঠা, মূল্য ১৷৽।

রূপকথা সকল দেশের ছেলেমেয়েরাই ভালবাসে। ইংলণ্ড, ফ্রান্স, স্পেন, জার্মান, রুশ, চীন, জাপান, আফ্রিকা, এস্কিমো, রেড ইণ্ডিয়ান, মায় হাওয়াই দ্বীপ প্রভৃতি যত রাজ্যের এক একটি রূপকথা এক একটি রেখাচিত্রে সজ্জিত করিয়া লেখক এই রূপকথার বিচিত্র ডালি ছেলেদের হাতে উপহার দিয়াছেন। রূপকথার উপযোগী ঝরঝরে ভাষা ও সরস বর্ণনাভঙ্গী বইটিকে উপাদেয় করিয়াছে। ভারতবর্ষের কোন রূপকথা এই বইটিতে স্থান পায় নাই। ছেলেরা এই বইটি শেষ করিয়া সেগুলির শীঘ্র প্রকাশের আশায় উদ্‌গ্রীব হইবে।

শ্রীবিজয়েন্দ্রকৃষ্ণ শীল

অস্তগামী চাঁদ—জন্ ষ্টেইনবেক্। অনুবাদক—শ্রীপশুপতি ভট্টাচার্য্য। মডার্ণ পাবলিশার্স, ৬নং বঙ্কিম চাটার্জ্জী ষ্ট্রীট, কলিকাতা। মূল্য আড়াই টাকা।

সমালোচ্য পুস্তকখানি দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের বিষয়বস্তু অবলম্বনে লেখা জন্ ষ্টেইনবেকের "The Moon is Down" নামক উপন্যাসের তর্জমা। অনুবাদক শ্রীযুক্ত পশুপতি ভট্টাচার্য্য বাংলা সাহিত্যে সুপরিচিত। মূল গ্রন্থখানি বর্তমান যুগের অন্যতম শ্রেষ্ঠ উপন্যাস বলিয়া সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ জহুরীগণকর্ত্তৃক স্বীকৃত হইয়াছে, ইহার চিত্রকপারূপ পৃথিবীর নানা দেশের দর্শকমণ্ডলীকে বিমুগ্ধ করিয়াছে। যুদ্ধের প্রকৃত স্বরূপ বোধ করি আর কোনো উপন্যাসে এমন পরিপূর্ণভাবে উদ্‌ঘাটিত হয় নাই। উপন্যাসের কাহিনীটি মোটেই ঘোরালো নহে। যুদ্ধের গোড়ার দিকে আক্রমণকারীরা ছোট একটি শহর দখল করিয়া সেখানে জাঁকিয়া বসিল। নিজেদের প্রভুত্ব বজায় রাখিবার জন্য সুরু করিল তাহারা অধিকৃত দেশের অধিবাসীদের উপর অমানুষিক অত্যাচার-উৎপীড়ন, কিন্তু স্বাধীনতাপ্রিয় বিজিত জাতির মুক্তি-কামনাকে দীর্ঘকাল দাবাইয়া রাখা বিজেতাদের পক্ষে সম্ভবপর হইল না, জাতির প্রাণশক্তির অগ্নিস্ফুলিঙ্গ হইতে সেই সামান্য শহরে প্রজ্বলিত হইয়া উঠিল প্রচণ্ড দাবানল। আক্রমণকারী জাতির জয়ের পেছনে যে কত বড় নৈতিক পরাজয় ও ব্যর্থতার বেদনা লুকানো থাকে, অন্তদৃষ্টিসম্পন্ন লেখক উপন্যাসের ছত্রে ছত্রে তাহাই অপূর্ব্ব নৈপুণ্যে ফুটাইয়া তুলিয়াছেন। অত্যাচারীর হত্যাকাণ্ডে আক্রান্ত দেশের লোক মরে, কিন্তু জাতির প্রাণশক্তি নিঃশেষিত হয় না—এই একটি মাত্র মূল সুর উপন্যাসের কাহিনীটির মধ্যে আগাগোড়া অনুস্যূত রহিয়াছে। এই আশ্বাসবাণী পরাধীন দেশের লোকের মনে আশার সঞ্চার করে।

'অস্তগামী চাঁদ' বাংলা অনুবাদ-সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করিয়াছে।

শব ও স্বপ্ন—শ্রীমন্মথকুমার চৌধুরী। নভার্ণ বুক ডিপো, শ্রীহট্ট। প্রাপ্তিস্থান—ডি. এম. লাইব্রেরী, ৪২ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা। মূল্য দুই টাকা।

শ্রীমন্মথকুমার চৌধুরী ইতিপূর্ব্বে 'হে বীর পূর্ণ করো' নামক নাটকখানা লিখিয়া এক জন শক্তিমান নাট্যকাররূপে বাংলাদেশে পরিচিতি লাভ করিয়াছেন। "শব ও স্বপ্ন" তাঁহার দ্বিতীয় নাটক। ইহার বিষয়বস্তু নির্ব্বাচনে নাট্যকারের সমাজ-সচেতনতা, উন্নত আদর্শবাদ, জাতীয় জীবনের আশা-আকাঙ্ক্ষার প্রতি ঐকান্তিক সহানুভূতি এবং সর্ব্বোপরি দরদী শিল্পীমনের পরিচয় পাই। ১৯৪২ সনের আগষ্ট আন্দোলনের বিপ্লব-বহ্নিতে বাংলার নরনারীর আত্মাহুতির মধ্যে তিনি যে অভাবিতপূর্ব্ব গণজাগরণের অগ্র-সূচনা দেখিয়াছেন তাহাই তাঁহার রস-কল্পনাকে উদ্দীপ্ত করিয়া এই নাটক রচনার প্রেরণা জোগাইয়াছে।. সেই জাগ্রত গণদেবতার বন্দনাগানই অসহযোগী ইন্দ্রজিৎ, বিপ্লবপন্থী সূর্য্যশঙ্কর, হিমাদ্রি, উজ্জ্বলা প্রমুখ নাটকের বিভিন্ন পাত্রপাত্রীর সংলাপের ভিতর দিয়া উদাত্ত সুরে ধ্বনিত হইয়া উঠিয়াছে। পরাধীনতার অভিশাপে অভিশপ্ত জাতির অন্তর্গূঢ় মর্ম্মবেদনা মন্মথকুমার সমস্ত অন্তর দিয়া উপলব্ধি করিয়াছেন এবং নাটকের উপকরণ আহরণ করিয়াছেন তিনি বর্ত্তমান দুর্গত বাংলার রাষ্ট্রীয় আন্দোলন এবং বিপর্য্যস্ত সামাজিক জীবন হইতে, কিন্তু দৃষ্টি তাঁহার প্রসারিত সুদূর ভাবী-কালে। সেই সত্যদৃষ্টি গভীর ব্যাপক ও সুদূরপ্রসারী। লেখকের বেদনাবোধ এত তীব্র যে, একটা সমগ্র জাতির মর্ম্মন্তুদ দুঃখদুর্দ্দশা যথাযথভাবে তাঁহার রচনায় প্রতিফলিত হইয়াছে। নাটকের পাত্রপাত্রীদের দুঃখবেদনা এবং ব্যক্তিগত জীবনের ট্র্যাজেডিকে ছাপাইয়া একটা জাতির সমষ্টিগত বেদনাই মুখ্য হইয়া উঠিয়াছে, কিন্তু তাই বলিয়া চরিত্রগুলি ব্যর্থ সৃষ্টি হয় নাই বা কতকগুলি মতবাদের বাহনমাত্র হইয়া দাঁড়ায় নাই। নাট্যকারের সংলাপ বাস্তবিকই স্থানে স্থানে চমক লাগাইয়া দেয়, তাহা স্বতস্ফূর্ত্ত, সংযত, বাহুল্যবর্জ্জিত অথচ পাঠক ও দর্শকচিত্তে ভাবাবেগ সঞ্চারিত করিবার পক্ষে সম্পূর্ণ উপযোগী।

নাটকের চরম সার্থকতা অভিনয় সাফল্যে। আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস যে, শব ও স্বপ্ন মঞ্চ-সফলতা লাভ করিবার পক্ষে সম্পূর্ণ উপযোগী। এই নাটকের অভিনয় ব্যাপকভাবে জাতীয়তাবোধ জাগ্রত করিয়া গণ-আন্দোলনের ব্যাপ্তি ও পরিপুষ্টির পক্ষে বিশেষভাবে সহায়ক হইবে। অত্যাচারজর্জ্জরিত জাতির দুঃখদৈন্যময় বর্ত্তমান গলিত শবদেহের ন্যায় ক্রমশঃ বিলীয়মান, আর সেখানে ধীরে ধীরে গড়িয়া উঠিতেছে স্বপ্ন দিয়া তৈরি গৌরবোজ্জ্বল দীপ্ত ভবিষ্যৎ। জাতীয় রঙ্গমঞ্চে নাট্যকারের এই মহান্ কল্পনার সার্থক রূপায়ন দেখিবার জন্য আমরা সাগ্রহে প্রতীক্ষা করিব।

শ্রীনলিনীকুমার ভদ্র

গ্রাহকগ্রাহিকাদের প্রতি

প্রবাসী বাংলা মাসের ১লা তারিখে প্রকাশিত হয়। যথা সময়ে প্রবাসী না পৌঁছিলে, সেই মাসের ১৫ তারিখের ভিতর স্থানীয় ডাকঘরের রিপোর্ট ও নির্দ্দিষ্ট গ্রাহকনম্বর সহ পত্র লিখিতে হইবে। ডাকঘর হইতে প্রতি মাসেই বিস্তর প্যাকেট অপহৃত হয়, এ বিষয় অবহিত হইয়া সকলকেই যথোচিত প্রতিকার ব্যবস্থা অবলম্বন করা কর্ত্তব্য।

পুরাতন গ্রাহক-গ্রাহিকাগণ, তাঁহাদের চাঁদা যেসংখ্যার সহিত নিঃশেষ হইবে, সেই সংখ্যা পাইবার পর ২০ দিনের ভিতর চাঁদা বা প্রবাসী লইতে অনিচ্ছাজ্ঞাপক পত্র না পাঠাইলে, তাঁহারা পরবর্ত্তী সংখ্যা ভিঃ পিঃতে লইয়া চাঁদা দিতে ইচ্ছুক এই বিশ্বাসে ভিঃ পিঃ প্রেরণ করা হয়। চিঠিপত্র বা টাকা পাঠাইবার সময় গ্রাহক-নম্বর উল্লেখ না করিলে কার্য্যসাধনে গোলমাল অবশ্যম্ভাবী।

কর্ম্মাধ্যক্ষ—প্রবাসী

মুদ্রাকর ও প্রকাশক—শ্রীনিবারণচন্দ্র দাস : প্রবাসী প্রেস, ১২০।২ আপার সারকুলার রোড, কলিকাতা
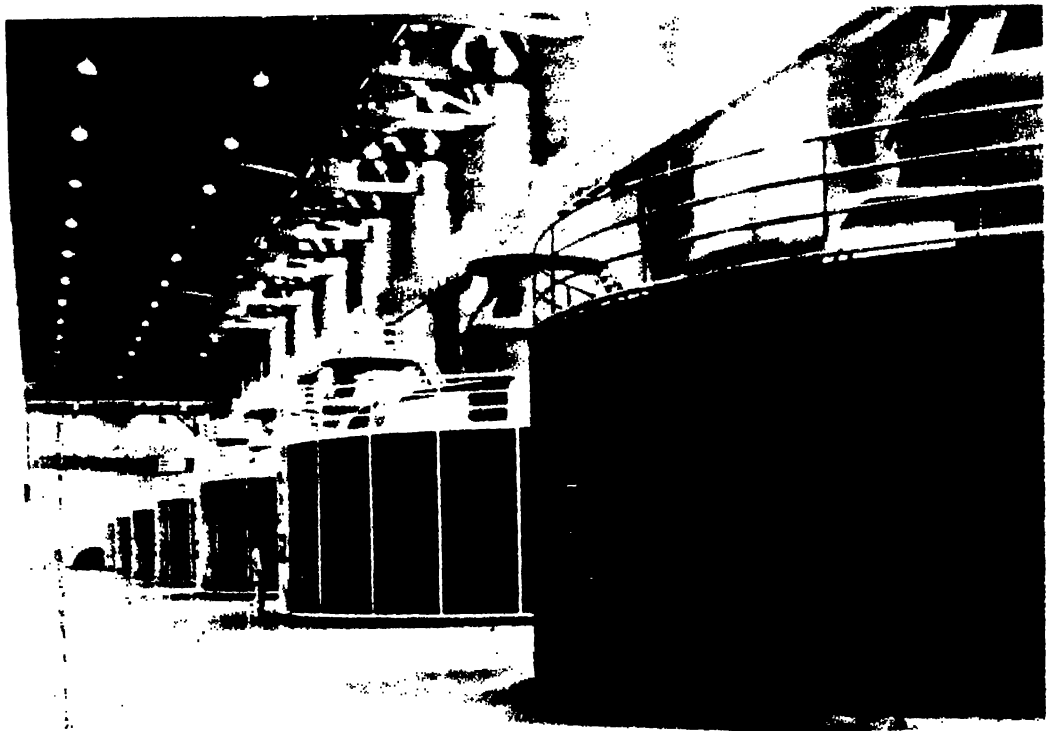
"সত্যম্ শিবম্ সুন্দরম্
নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ"

৪৬শ ভাগ ১ম খণ্ড | জ্যৈষ্ঠ, ১৩৫৩ | ২য় সংখ্যা

বিবিধ প্রসঙ্গ

সিমলার পর

সিমলায় বৈঠকে কোন নিষ্পত্তির আশা আমাদের কোন দিনই ছিল না, সুতরাং তাহা ভাঙ্গিয়া যাওয়ায় নিরাশ হওয়ার কোনও কারণ আমরা পাই না। বরং আমাদের নেতৃবর্গ যে মিঃ জিন্নার সঙ্গে সন্ধি-সমঝোতা করার জন্য আলেয়ার পশ্চাদ্ধাবন করিয়া আর কালক্ষেপ করিতে চাহেন নাই ইহাতেই আমরা আশার আলোক দেখিতেছি। কংগ্রেসের মূলমন্ত্র এখন "কুইট ইণ্ডিয়া" অর্থাৎ "ভারত হইতে বিদায় হও"—অথচ ইংরেজ বিদায় ঘটিলে মিঃ জিন্নার মৃগ-তৃষ্ণিকা সঙ্গে সঙ্গে হাওয়ায় মিলাইয়া যায়। সুতরাং তাঁহার সহিত সমঝোতের অর্থ কংগ্রেসের ঐ মূলমন্ত্রকে এবং তাহার সঙ্গে বহু অন্য আদর্শকে জলাঞ্জলি দেওয়া। এইরূপ পরিস্থিতিতে কোন প্রকারেই বর্তমান সমস্যার পূরণ হওয়া সম্ভব নহে।

হইতে পারে যে এই দেশ ও এদেশবাসীর সম্মুখে আরও অনেক বিপদ আপদ আছে এবং ইহা নিশ্চিত যে স্বপ্রতিষ্ঠ হইয়া পূর্ণ স্বাধীনতা ভোগ করিবার যোগ্যতা অর্জনের জন্য এদেশবাসীর আরও অনেক ত্যাগ ক্ষতি স্বীকার করিতে হইবে, অনেক বিষয়ে শিক্ষা ও অভিজ্ঞতা লাভ করিতে হইবে, কিন্তু তাহার জন্য প্রথমেই ইতোভ্রষ্ট স্ততোনষ্ট হইলে লাভ কি হইতে পারে? যে ব্যবস্থার মূলে অসত্য তাহার অন্তে সর্বনাশ নিশ্চিত ইহা ১৭৫৭ সাল হইতে অদ্যাবধি প্রায় দুই শতাব্দীর ইতিহাস আমাদের পদে পদে শিক্ষা দিয়াছে এবং লক্ষ্ণৌ প্যাক্ট হইতে "র‍্যামজে ম্যাক্‌ডোনাল্ড এওয়ার্ড" তাহারই অন্য এক রূপ দেখাইয়াছে। সুতরাং লক্ষ্যভ্রষ্ট হইলে স্থায়ী-অস্থায়ী কোনই লাভের সম্ভাবনা নাই। সিমলায় সেরূপ কোনও সিদ্ধান্ত না হওয়ায় দেশবাসীর আনন্দিত হওয়াই উচিত।

বিদেশে প্রবাদ আছে যে, "সৌভাগ্যের আশা রাখো, কিন্তু দুর্ভাগ্যের জন্য প্রস্তুত হও।" ইহা আমাদের দেশের প্রত্যেক ব্যাপারেই প্রযোজ্য। দেশের নূতন রাষ্ট্রপতিকে এ বিষয়ে স্মরণ করাইবার প্রয়োজন নাই। তাঁহার এদেশের ও বিদেশের অভিজ্ঞতায় তিনি সত্যের সঙ্গে ও স্বাতন্ত্র্যের সঙ্গে আপোষ রফার কি বিষময় ফল ফলিতে পারে তাহা বিলক্ষণ জানেন। এইজন্য তাঁহাকে অভিনন্দন জ্ঞাপনের সঙ্গে আমরা এইটুকুই বলিব যে, দেশ তাঁহার সঙ্গে দুর্গমতম পথে চলিতে প্রস্তুত আছে।

বাস্তবিকই চরম মীমাংসা এক দিনে হইতে পারে না, যদিও দিন ঘনাইয়া আসিতেছে। আমরা এ কথা বলি না যে আপোষ অসম্ভব বা দেশ সরলতর পথে গন্তব্য স্থানে পৌঁছাইতে পারে না। কিন্তু আপোষ সম্ভব হয় তখন, যখন দুই পক্ষই সমান সততার সহিত তাহার জন্য ইচ্ছুক থাকে এবং সালিশ যাহারা, তাঁহারা যখন সম্পূর্ণ নিরপেক্ষ থাকেন। সে অবস্থা যেদিন আসিবে সেদিন মীমাংসা হওয়াও সহজ হইবে। তত দিন পর্যন্ত দৃঢ়চিত্তে নিজের লক্ষ্যের উপর স্থির দৃষ্টি রাখিতে হইবে।

উপযুক্ত শিক্ষা বিস্তার সাম্প্রদায়িকতা দূর করিবার শ্রেষ্ঠ উপায়

সীমান্ত গান্ধী খাঁ আবদুল গফুর খাঁ নয়া দিল্লীতে জাতীয়তাবাদী মুসলমানদের এক বৈঠকে শিক্ষিত মুসলমানেরা স্বসমাজের উন্নতিকল্পে আত্মনিয়োগ না করায় তাহাদিগকে ভর্ৎসনা করেন এবং দেশের বর্তমান দুরবস্থার জন্য প্রধানতঃ তাহাদিগকেই দায়ী করেন। তিনি বলেন যে, ভারতের মুসলমানেরা সামাজিক দিক দিয়া জগতের অন্যান্য মুসলমানদের অপেক্ষা অনেক উন্নত, কাজেই তাহাদিগকে শিক্ষিত করিতে বিশেষ বেগ পাইতে হইবে না। এ দেশে ইংরেজের শিক্ষা প্রবর্তনের পর মুসলমানেরা বহু দিন উহা বর্জন করিয়া চলিয়াছিলেন। কিন্তু গত কয়েক বৎসর যাবৎ তাঁহারা নিজেদের শিক্ষা শুধু মাদ্রাসার মধ্যে সীমাবদ্ধ না রাখিয়া আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞান শিখিতে অগ্রণী হইয়াছেন এবং এ বিষয়ে অল্প দিনের মধ্যেই অনেক অগ্রসরও হইতে পারিয়াছেন। মুসলমান সমাজে

ব্যাপক ভাবে আধুনিক শিক্ষা বিস্তার ঘটিতে থাকিলে আত্মস্বার্থসর্বস্ব সাম্প্রদায়িকতাবাদী নবাব জমিদারদের প্রভুত্ব বজায় রাখা কঠিন হইবে ইহা তাহারা বুঝিয়াছে, কাজেই মুসলমান জনসাধারণের শিক্ষা লাভের পথে অন্তরায় সৃষ্টিতে ইহাদের উৎসাহের অভাব নাই। বাংলাদেশেই আমরা দেখিতেছি লীগ মন্ত্রিত্বের আমলেও এখানে প্রাথমিক শিক্ষা বিস্তারের কোন চেষ্টা হয় নাই এবং মাধ্যমিক শিক্ষা সর্বতোভাবে সঙ্কুচিত করিবার জন্য বিল আনিয়া উহা পাস করিবার জন্য বিধিমতে চেষ্টা চলিতেছে। স্কুলের সংখ্যা কমান এবং বর্তমান ব্যয়বহুল শিক্ষাকে আরও ব্যয়সাধ্য করিয়া তোলা এই বিলের প্রধান লক্ষ্য।

নবাব জমিদার ও খেতাবধারীরা মুসলমান সমাজের যে ক্ষতি করিতেছে তাহা বর্ণনা করিয়া খাঁ আবদুল গফুর খাঁ বলেন, "যাহারা নিজেদের অস্তিত্ব ও সম্পত্তি রক্ষার জন্যই ব্রিটিশের মুখাপেক্ষী, তাহারা কখনও ইসলামের রক্ষক হইতে পারে না। আমাদের এই হতভাগা দেশে বিদেশীদের কতকগুলি এই সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষ সৃষ্টি করিয়া সামাজিক অবস্থা বিষময় করিয়া তুলিয়াছে। মুসলমান জনসাধারণের প্রকৃত কল্যাণকামীদিগকে তাহাদের শত্রু বলিয়া প্রচার করিয়া বিদেশী সাম্রাজ্যবাদীর দালালরা নিজদিগকে মুসলমান সমাজের বন্ধু বলিয়া জাহির করিতেছে। দরিদ্র ও মূর্খ মুসলমানগণ প্রতিপদে বিপথে পরিচালিত হইয়াছে। এই দেশের প্রত্যেক নরনারীর কর্তব্য অজ্ঞ মুসলমানদিগকে ঠিক পথে চলিতে সাহায্য করা। পৃথিবী অবিরাম পরিবর্তনশীল, সে মুসলমানের জন্য অপেক্ষা করিবে না।"

বাংলার সমস্যা

বাঙালীর সম্মুখে ভবিষ্যতের সমস্যা ক্রমশই তীব্র হইয়া উঠিতেছে। বাংলায় মুসলিম লীগ রাজনৈতিক ক্ষমতা হাতে পাওয়ার পর হইতে বাঙালী হিন্দু ধ্বংস সাধনের কাজ পূর্ণ উদ্যমে চলিতেছে। বিপ্লবী বাঙালী হিন্দুর উপর ইংরেজের বিদ্বেষও বড় কম নয়, তাই লীগের এই কার্যে ইংরেজ সর্বপ্রকারে সহায়তা করিতেছে। স্যর্ জন হার্বার্ট লীগের সাহায্যে হিন্দুর সর্বনাশ সাধনের যে পথ দেখাইয়া গিয়াছেন, ইংরেজ সিভিলিয়ান ও পুলিস সাহেবেরা সেই পথেই অগ্রসর হইতেছেন। বাংলার যে সব স্থানে হিন্দু সংখ্যালঘু, সেই সব স্থানে হিন্দুর ধনপ্রাণ সম্পত্তির সকল নিরাপত্তা অন্তর্হিত হইয়াছে; স্ত্রীপুরুষনির্বিশেষে হিন্দুর উপর মুসলমান গুণ্ডা কর্তৃক দলবদ্ধ অত্যাচার নির্বিবাদে চলিতেছে। শাসন-বিভাগের ভারপ্রাপ্ত ইংরেজ ও মুসলমান কর্মচারীরা উদাসীন, হিন্দু কর্মচারীরা অসহায়। বাংলার স্থানে স্থানে কি ভয়াবহ গুণ্ডারাজ চলিতেছে অন্যত্র তাহার পরিচয় দেওয়া হইল। ভারতবর্ষের অন্য কোন প্রদেশে বাঙালী হিন্দুর উপর এই ঘোর অত্যাচারের বিরুদ্ধে কোন প্রতিবাদ উঠে নাই। মিঃ জিন্না কথায় কথায় শাসাইয়া থাকেন যে, হিন্দু-গরিষ্ঠ প্রদেশে মুসলমানের উপর অবিচার হইলে তিনি মুসলমান-গরিষ্ঠ প্রদেশে হিন্দুর উপর অত্যাচার করিয়া তাহার শোধ লইবেন। মুসলমানের উপর হিন্দুর অত্যাচারের কাল্পনিক কাহিনী অবলম্বন করিয়াও তিনি যে তাহা পারেন বাঙালী হিন্দুর উপর যে বর্বরতা চলিতেছে তাহাদ্বারাই উহা প্রমাণিত হয়। কিন্তু হিন্দু উহা পারিবে না। পূর্ববঙ্গের হিন্দুর উপর অত্যাচারের পাল্টা জবাব পশ্চিম-বঙ্গের হিন্দু দিতে পারে নাই। পারিবেও না। হিন্দুর শালীনতা বোধ অনেক উন্নত, একের অপরাধে অপরের উপর প্রতিশোধ গ্রহণ করিতে হিন্দু পারিবে না। মুসলমান হিন্দুর এই দৌর্বল্য বুঝিয়া লইয়াছে, তাহার সাহসও তাই অনেক বাড়িয়া গিয়াছে।

পাকিস্থানের যে দাবি মিঃ জিন্না ধরিয়া বসিয়া আছেন তাহা গ্রহণ করা অসম্ভব বলিয়া কংগ্রেসের সহিত লীগের মিলন হইল না। বাংলা ও আসাম লইয়া পূর্ব পাকিস্থান গঠনের দাবি লীগ তুলিয়াছে। হিন্দু ও আরবী সংস্কৃতির সংমিশ্রণে উদ্ভূত ভারতীয় মুসলমানের আধা হিন্দু আধা মুসলমান সংস্কৃতি রক্ষার জিদ মিটাইবার জন্য বাংলা ও আসামের সমস্ত হিন্দুকে মুসলমানের পদানত হইয়া থাকিতে হইবে, পাকিস্থানের ইহাই মর্মার্থ। অথচ বাংলা ও আসাম যোগ করিলে মুসলমানের সংখ্যা হিন্দুর চেয়ে অনেক কম হয়। তবুও এই দাবি উঠিয়াছে। মিঃ শহীদ সুরাবর্দী প্রমুখ আর এক দল লীগওয়ালা শুধু বাংলাকে পাকিস্থানে পরিণত করিতে চান এবং মানভূম, সিংহভূম, পূর্ণিয়া, সাঁওতাল পরগণা প্রভৃতি বাংলাভাষাভাষী অঞ্চলসমূহকেও উহার অন্তর্ভুক্ত করিতে চান। মিঃ সুরাবর্দীর আশা তাঁহার হিন্দু বন্ধুরা ইহা অনুমোদন করিবেন। ভাষার ভিত্তিতে বাংলার সীমা পুনর্গঠিত হইলে মুসলমান সংখ্যাগরিষ্ঠ থাকে বটে, তবে এই সংখ্যাধিক্য শতকরা দুই-তিন ভাগের বেশী হইবে না। কাহারও কাহারও ধারণা এত কম মেজরিটি লইয়া মুসলমানেরা বাংলাদেশ কুক্ষিগত করিয়া রাখিতে পারিবে না, হিন্দু যেমন করিয়া হউক প্রাধান্য পুনরায় অর্জন করিবেই, সুতরাং বাংলা অবিভক্ত থাকাই ভাল। এই যুক্তিতে যথেষ্ট ত্রুটি আছে। এ কথা ভুলিলে চলিবে না যে বাংলাকে পাকিস্থান বলিয়া স্বীকার করার অর্থই হইবে সম্প্রদায় হিসাবে মুসলমানের হাতে দেশকে তুলিয়া দেওয়া। মিঃ জিন্না স্পষ্টই বলিয়া রাখিয়াছেন যে পাকিস্থানের শাসনতন্ত্র মুসলমানেরা রচনা করিবে, উহাতে হিন্দুদের কোন হাত থাকিবে না। সুতরাং বাংলা পাকিস্থান হইলে বাংলার ভবিষ্যৎ রাষ্ট্রবিধি রচনা করিবে মুসলমান লীগওয়ালারা, হিন্দুর কোন কথা বলিবারও অধিকার থাকিবে না। ফাসিষ্ট শাসনতন্ত্রের ভার বঙ্গীয় ব্যবস্থা-পরিষদের সমগ্র আসনের দুই-তৃতীয়াংশ শতকরা ৫২ জন মুসলমানের জন্য সংরক্ষিত রাখিয়া বাকি ৪৮ ভাগ হিন্দুর জন্য দয়া করিয়া এক-তৃতীয়াংশ আসন ছাড়িয়া দিলে

হিন্দুকে তাহা লইয়াই সন্তুষ্ট থাকিতে হইবে। পাকিস্থানে উর্দু রাষ্ট্রভাষা হইবে, হিন্দুর ছেলে এখনই প্রাথমিক স্কুলে "ভোর হইয়াছে, সূর্য্য উঠিয়াছে"এর পরিবর্তে "ভোর হইয়াছে মুয়োজ্জিন আল্লাহ আকবর, আল্লাহ আকবর বলিয়া আজান দিতেছে" পড়ে; পাকিস্থানী স্কুলে হিন্দুর ছেলেকে পড়িতে হইবে, "বেরাদর বরখিজ, আফতাব বরআমদ!" বিহারে কংগ্রেসী মন্ত্রিসভার আমলেই বাঙালীকে তাহার নিজস্ব ভাষা ভুলাইবার জন্য বাংলাভাষী অঞ্চলসমূহে বলপূর্ব্বক হিন্দী চালাইবার যে চেষ্টা চলিতেছে তাহা হইতেই বাংলায় পাকিস্থানী রাজত্বে বাঙালী হিন্দুর ভাষা ও সংস্কৃতির কি অবস্থা ঘটিবে তাহা সহজেই অনুমেয়। প্রদেশের সমস্ত উচ্চপদে তখন মুসলমান কর্মচারী নিযুক্ত হইবে, উহার ফল কি হইবে বাঙালী হিন্দু এখনই তাহা মর্মে মর্মে অনুভব করিতেছে।

ব্যবসায় বাণিজ্যের লাইসেন্স দেওয়ার ব্যাপারে এখনই যাহা ঘটিতেছে, পাকিস্থানে তাহার সহস্রগুণ অধিক পক্ষপাতিত্ব ঘটিবে। মানভূমের কয়লা ও সিংভূমের লোহা একবার পাকিস্থানের হাতে আসিলে বাংলার লীগনেতারা দুর্জয় শক্তির অধিকারী হইবে। ৪৮ পার্সেন্ট হিন্দুর পক্ষে ৫২ পার্সেন্ট মুসলমানের অত্যাচারে বাধা দেওয়াও তখন সহজ হইবে না, কারণ সরকারের হাতে অস্ত্র থাকিবে এবং সাড়ে তিন কোটি মুসলমান পুলিসের কাজ করিবে।

ইঁহাদের ভরসা হিন্দুস্থানের অন্যান্য প্রদেশ বাঙালী হিন্দুকে সাহায্য করিবে। আমরা এ ভরসা রাখিতে পারিতেছি না। বিহারে বাঙালী হিন্দু সহানুভূতি পাইবে না ইহা সুস্পষ্টভাবে প্রমাণিত হইয়াছে। মাদ্রাজ, বোম্বাই, উড়িষ্যা, আসাম প্রভৃতিরও অবস্থা অনুরূপ। একমাত্র মহারাষ্ট্র ও যুক্তপ্রদেশের কোন কোন স্থানে কিছু আনুকূল্য হইলেও হইতে পারে। বাঙালীর বিপদে সাহায্যের জন্য যে কেহ অগ্রসর হইবে না, গত দুর্ভিক্ষে তাহাও প্রমাণিত হইয়াছে। ভারতবর্ষের প্রত্যেকটি প্রদেশ বাঙালীর নিকট নানা ভাবে ঋণী, কোন কোন বাঙালী কোথাও কোথাও ইংরেজের পক্ষ হইয়া অন্যায় করিয়াছে সত্য, কিন্তু সমগ্রভাবে দেখিতে গেলে বাঙালীর দান ভারতীয় রাষ্ট্রনীতি ও শিক্ষাক্ষেত্রে অতুলনীয়। ভারতবর্ষের মধ্যে একমাত্র প্রদেশ বাংলা যেখানে প্রাদেশিকতা আজও প্রবেশ করে নাই।

অপরের আশায় বসিয়া না থাকিয়া বাঙালী হিন্দুকে আজ স্বাবলম্বী হইয়া বাঁচিয়া থাকিবার পথ আবিষ্কার করিতে হইবে। গত দুই শতাব্দীর মধ্যে এক দল লোক মুসলমান ধর্ম্ম অবলম্বন করিয়া নানা কারণে আজ সংখ্যাগরিষ্ঠ সম্প্রদায়ে পরিণত হইয়াছে বলিয়াই বাঙালী হিন্দুর সহস্র সহস্র বৎসরের ঐতিহ্য মুসলমানের হাতে তুলিয়া দিতে হইবে, ইহা নির্বোধ, উন্মাদ ও স্বার্থান্ধ লোক ভিন্ন আর কেহ বলিতে পারে না। বাঙালী হিন্দুর ভবিষ্যৎ পাকিস্থানওয়ালাদের হাতে সমর্পণ করিবার অধিকার কাহারও নাই, কংগ্রেস বা হিন্দুস্থান উহা করিতে গেলেও বাঙালী স্বীকার করিবে না; যথাশক্তি বাধা দিবে।

এই প্রসঙ্গে পুনরায় বঙ্গভঙ্গের কথা উঠিয়াছে। লীগদলের এক মুখপত্র "আজাদ" দাবি তুলিয়াছে যে ঢাকা, চট্টগ্রাম, রাজসাহী ও প্রেসিডেন্সি ডিভিসন এবং কলিকাতা লইয়া পাকিস্থান গঠিত হউক। তাঁহাদের মতে শুধু বর্ত্তমান বিভাগ লইয়াই বাঙালী হিন্দুর সন্তুষ্ট থাকা উচিত। বঙ্গভঙ্গের কথা আমাদিগকে আজ পুনরায় বিবেচনা করিতে হইবে এবং এবার ভাবাবেগ বর্জ্জিত হইয়া উহা করিতে হইবে। মুসলমান যদি হিন্দুর সঙ্গে কোনমতেই না থাকিতে চায় তবে বঙ্গভঙ্গ প্রয়োজন হইতে পারে। একত্রে থাকিয়া নিত্য বিরোধের চেয়ে পৃথগন্ন হইয়া শান্তিতে বাস করা ভাল। কিন্তু এই নূতন সীমা নির্দ্ধারণ কিরূপে হইবে? আজাদের দাবি অন্যায় ও অযৌক্তিক ইহা বলাই বাহুল্য। সর্বপ্রথমে আমাদের বক্তব্য এই যে বঙ্গ বিভাগ করিতে গেলে সকলের আগে গণ-ভোট গ্রহণ করিয়া বাংলার হিন্দু মুসলমান সমস্ত অধিবাসীকে এ বিষয়ে মত প্রকাশের সুযোগ দিতে হইবে। প্রত্যেক জেলার, প্রত্যেক মহকুমার ও থানার লোকদেরও জিজ্ঞাসা করিতে হইবে তাহারা পশ্চিম বাংলায় কিম্বা পূর্ব বাংলায় থাকিতে চায়। নদীয়া, মুর্শিদাবাদ, মালদহ, দিনাজপুর প্রভৃতি অনেক জেলায় সমগ্র ভাবে মুসলমানের সংখ্যা অধিক হইলেও উহাদেরই কোন কোন মহকুমায় হিন্দু যথেষ্ট সংখ্যাগরিষ্ঠ। দ্বিতীয়তঃ, শতকরা কতজন মুসলমান এক স্থানে থাকিলে তাহাকে মুসলমান-প্রধান বাংলার অন্তর্ভুক্ত করা চলে তাহা নির্দ্ধারণ করিতে হইবে। আমাদের মতে এই আনুপাতিক হার ৭০-এর নীচে হওয়া উচিত নহে। যে সব অঞ্চলে মুসলমানের সংখ্যা শতকরা ৭০-এর বেশী, সেগুলিকেই শুধু পূর্ব বঙ্গের অন্তর্ভুক্ত করা চলে। কলিকাতা, ২৪ পরগণা ও খুলনা কোনক্রমেই মুসলমান বাংলার অন্তর্ভুক্ত হইতে পারে না।

মুসলমান-প্রধান পূর্ব ও উত্তর বঙ্গের সহিত পশ্চিম বাংলাকে জুড়িয়া রাখিলে ঐ দুই স্থানের হিন্দুর যদি কোন লাভ হইত তাহা হইলে বঙ্গ-বিচ্ছেদের প্রস্তাবের বিরোধিতা করা যুক্তিসঙ্গত হইত। কিন্তু ইহাতে কোন লাভ তো নাই-ই অধিকন্তু সমগ্র বাঙালী হিন্দুর স্বাধীনতা, ধর্ম্ম ও কৃষ্টি ইহা দ্বারা নষ্ট হইবার আশঙ্কা আছে। কলিকাতা ও পশ্চিম বঙ্গ যদি আলাদা হয় এবং মানভূম, ধলভূম ও সাঁওতাল পরগণা যদি বাংলায় ফিরাইয়া আনা যায়, তাহা হইলে হিন্দু বাংলার শক্তি বড় কম হইবে না। পূর্ব বঙ্গের হিন্দু এখানে আসিয়া নির্বিবাদে বসবাস করিতে পারিবে। মুসলমানের অত্যাচারে ইঁহাদের অনেককে এখনই বাড়ীঘর বেচিয়া ফেলিয়া কলিকাতায় বা শহরতলীতে বাড়ী করিতে হইতেছে। পশ্চিম বাংলা আলাদা হইলে ইঁহাদের সুযোগ আরও প্রশস্ত হইবে, অন্যথায় সকল বাঙালীর সমূলে বিনাশেরই পথ পরিষ্কার করা হইবে।

বাংলায় পাকিস্থানের নমুনা

বাংলার পাকিস্থানকামী মন্ত্রিমণ্ডল ১৯৪৩ সালে সর জন হার্বার্টের দৌলতে দেশের অনিষ্টসাধনের যে নিরঙ্কুশ ক্ষমতা হাতে পাইয়াছিলেন তাহার পূর্ণ সদ্ব্যবহার তাঁহারা করিয়া গিয়াছেন। ইঁহারা ইংরেজের স্বার্থ বোল আনা বজায় রাখিয়া চলিয়াছেন বলিয়া ইংরেজ গবর্ণর, ইংরেজ সিভিলিয়ান ও ইংরেজ পুলিস সুপারিন্টেণ্ডেন্টরা ইহাদের অন্যায় কার্যে কোন বাধা দেয় নাই। সাম্রাজ্যবাদী স্বার্থের খাতিরে লীগকে বড় করিয়া রাখিবার যে নীতি অদূরদর্শী সাম্রাজ্যবাদীরা অনুসরণ করিয়া চলিয়াছেন ইহা তাহারই বিষময় ফল। যে সব অঞ্চলে হিন্দুরা সংখ্যালঘু, সেই সব স্থানে তাহাদের ধন-প্রাণ-সম্পত্তি ও নারীর সম্মান কি ভাবে পদে পদে বিপন্ন হইতেছে তাহার সংবাদে মনে হয় যেন বাংলার মুসলমান-প্রধান অঞ্চলগুলিকে পাকিস্থানের নামে গুণ্ডার দলের হাতে সমর্পণ করা হইয়াছে। ঊর্দ্ধতন কর্তৃপক্ষ ইহার প্রতিকার আজও করেন নাই। এই ব্যাপক লুঠতরাজ ও স্ত্রী-পুরুষনির্ব্বিশেষে হিন্দুর উপর অত্যাচার বন্ধ করিবার কোন আন্তরিক চেষ্টাও তাঁহারা করেন নাই। এই সম্পর্কে যে দুইটি সংবাদ প্রকাশিত হইয়াছে সে দুটিই যথেষ্ট উদ্বেগজনক। কোন সভ্য গবর্ণমেণ্ট উহার প্রতিকার না করিয়া পারিত না।

দৈনিক 'ভারতে' প্রকাশিত (৫ই মে) কিশোরগঞ্জের সংবাদটি নিয়ে প্রদত্ত হইল। বাংলা-সরকারের প্রতিবাদ-তৎপর প্রচার বিভাগ সপ্তাহাধিক কালের মধ্যেও ইহার কোন প্রতিবাদ করেন নাই।

> ভৈরববাজার, ৩রা মে—কিছুকাল ধরিয়া ময়মনসিংহ জেলার কিশোরগঞ্জ মহকুমা ও তাহার নিকটবর্তী অঞ্চলে দলবদ্ধ গুণ্ডামির ফলে লোকের ধনপ্রাণ বিপন্ন হইয়া উঠিয়াছে। ব্রহ্মপুত্রের এক তীরে কুলিয়ারচর ও সরারচর হইয়া কিশোরগঞ্জ হইতে ভৈরববাজার পর্যন্ত সমস্ত অঞ্চল, অপর তীরে গফরগাঁও হইতে কাওরাইদ পর্যন্ত, ঢাকা সদর মহকুমার কিয়দংশ এবং নারায়ণগঞ্জ মহকুমার কতকাংশ অবাধ লুঠতরাজের ফলে এক অরাজক ভূখণ্ডে পরিণত হইয়াছে।
>
> গত নির্বাচনের সময় যেভাবে সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষ প্রচার করা হইয়াছিল তাহাতে এই অঞ্চলের অবস্থা এমন হইয়া দাঁড়াইয়াছে যে, সাধারণ হিন্দুর ধন-প্রাণ ও মান-সম্মান সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষে উন্মত্ত গুণ্ডাদের খামখেয়ালের বস্তুতে পরিণত হইয়াছে।
>
> পূর্বোক্ত ত্রিকোণাকৃতি অঞ্চলটাতে পূর্বে কয়েকবার হিন্দু-মুসলমান সংঘর্ষ হইয়া গিয়াছে। মুসলীম লীগের কার্যকলাপে ঐ অঞ্চলের হিন্দুদের অবস্থা অত্যন্ত সঙ্কটজনক হইয়া পড়িয়াছে। বাংলা-আসাম রেলওয়ের ট্রেনগুলি গুণ্ডাদের দ্বারা আক্রান্ত ও আটক হওয়া নিত্যনৈমিত্তিক ব্যাপারে দাঁড়াইয়াছে। যাত্রীবাহী ট্রেন ও মালগাড়ি হইতে হিন্দুদের এবং ব্যবসায়ীদের মালপত্র লুঠ হওয়ায় ফলে রেল-কোম্পানীকে আজ পর্যন্ত সাত লক্ষ টাকা ক্ষতি-পূরণ দিতে হইয়াছে বলিয়া সংবাদ পাওয়া গিয়াছে। লুঠতরাজের উদ্দেশ্যে ট্রেন আক্রমণ বহুদিন যাবৎ অবাধে চলিতেছে। এই অঞ্চল হইতে প্রায়ই নারীহরণের সংবাদও পাওয়া যায়। অনেক ক্ষেত্রে রেল-ষ্টেশনের বিশ্রাম কক্ষ হইতে পর্যন্ত নারীহরণ হইয়াছে।
>
> শান্তিপ্রিয় গ্রামবাসিগণ এই অঞ্চলটিকে সম্পূর্ণ অরাজক জানিয়া যত দূর সম্ভব পরিহার করিয়া চলে। ব্যবসায়ী ও অন্যান্য যাহাদের আর্থিক সামর্থ্যে কুলায় তাহারা সকলেই পৈত্রিক ভিটার মায়া ত্যাগ করিয়া এই অঞ্চল ছাড়িয়া চলিয়া যাইতেছে।
>
> ভৈরববাজারে কতকগুলি লোক নিজেদের মুসলিম লীগের কর্মী বলিয়া পরিচয় দিয়া হিন্দু দোকানদারদের নিকট হইতে জোর করিয়া টাকা-পয়সা আদায় করিতেছে। অবস্থার পাকে পড়িয়া হিন্দুগণ পুলিসের উপরও সকল আস্থা হারাইয়াছে। স্থানীয় অধিবাসীদের অভিমত হইল যে, এক দল লোক পিছন হইতে গুণ্ডাদের উস্কাইয়া দিয়া হিন্দুদের সর্বনাশ করিতেছে। প্রকাশ যে, পুলিস বিভাগের কয়েকজন লোক ইঞ্জিন চালকদের সহিত ষাট করিয়া এমন সমস্ত স্থানে ট্রেন থামায় যাহাতে নাকি গুণ্ডারা বিনা বাধায় লুঠতরাজ চালাইবার যথেষ্ট সুযোগ-সুবিধা পায়। অসামরিক সরবরাহ বিভাগ ও তাহার সহিত সংশ্লিষ্ট অন্যান্য বিভাগের কর্মচারিগণই নাকি এই সমস্ত লুঠতরাজ ও জুলুমের বুদ্ধি ও পরামর্শ দিয়া থাকেন :
>
> ১৯৪৪ সালের শেষ তিন মাসে ট্রেন ডাকাতি, ডাকাতি প্রভৃতি লইয়া ৯৪টি ঘটনার সংবাদ পাওয়া যায়। ১৯৪৫ সালের শেষে অনুরূপ ঘটনার সংখ্যা বাড়িয়া ১০৯টিতে দাঁড়ায়। বর্ত্তমান বৎসরের প্রথম তিন মাসে ট্রেন-ডাকাতির সংখ্যা প্রচণ্ড ভাবে বাড়িয়া ১৩২ হইয়াছে।
>
> একটি বিস্তৃত অঞ্চলের গ্রামে সাধারণ মানুষের বসবাস অসম্ভব হইয়া দাঁড়াইয়াছে। খাদ্যাভাবে লোক অশ্বের বিষ্ঠা হইতে পর্যন্ত ছোলা সংগ্রহ করিয়া খাইতেছে। দেশের এই সঙ্কটজনক অবস্থাতেও নেতাদের চৈতন্য হইতেছে না। তাঁহারা ব্যবস্থা-পরিষদের জাঁকজমক লইয়াই মশগুল হইয়া দিন কাটাইতেছেন। ইঁহারাই যদি দেশের দণ্ডমুণ্ডের কর্ত্তা হন আর বর্ত্তমান অবস্থা যদি ইঁহাদের শাসন-ব্যবস্থার নমুনা হয় তাহা হইলে বুঝিতে হইবে যে, বাংলাদেশের নরকে ডুবিতে আর বিশেষ দেরি নাই।
>
> —সংবাদদাতা

যশোহরে নিম্নলিখিত ঘটনাটির আনুপূর্বিক বিবরণ ৭ই মে তারিখের অমৃতবাজার পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছে :

২৫শে এপ্রিল রাত্রি প্রায় ১১টার সময় ত্রিশ জনের অধিক সংখ্যক এক ডাকাত দল আগ্নেয়াস্ত্র এবং অন্যান্য মারাত্মক অস্ত্র লইয়া রাজাপুর থানার অন্তর্গত সুশীলকুমার দাসের বাড়ীতে হানা দেয় এবং সুশীল দাস, তাহার মাতা ও পরিবারস্থ অন্যান্য স্ত্রীলোকদের আহত করিয়া সোনারূপার অলঙ্কার প্রায় ৩০০০ টাকা, নগদ ৮০০ টাকা ও তৎসহ বাসনপত্র জামা কাপড় সমস্ত লুণ্ঠন করে। ডাকাতেরা উহাদের বিছানাপত্রে আগুন ধরাইয়া দেয় এবং পরিবারস্থ একটি স্ত্রীলোকের উপর পাশবিক অত্যাচার করে বলিয়া সংবাদ পাওয়া গিয়াছে।

ঐ দলই পার্শ্ববর্তী আরও দুইটি বাড়ীতে হানা দেয়। উহার একটির অধিবাসী কালীপ্রসন্ন দাস নামক এক ব্যক্তি ভীষণ ভাবে আহত হইয়াও দৌড়াইয়া থানায় গিয়া সংবাদ দেয়। থানা ঘটনাস্থল হইতে মাত্র ৫০০ হাত দূরে। রাত্রি ৩টার সময় পুলিস আসে, ইতিমধ্যে কালীপ্রসন্নের সমস্ত সম্পত্তি লুণ্ঠিত হয়।

ডাকাতেরা অতঃপর যোগেশ দাসের বাড়ীতে হানা দিয়া তাহার সর্বস্ব লুঠ করে। উহারা যোগেশের এক আত্মীয়ার উপর পাশবিক অত্যাচারও করে।

পুলিস আসিবার আগে প্রায় ৫০০ গ্রামবাসী একত্র হইয়া সশস্ত্র ডাকাত দলকে বাধা দিবার চেষ্টা করে। লুণ্ঠিত দ্রব্যাদি লইয়া পলায়নের সময় ডাকাতেরা পথে নবাব আলি হাজির বাড়ীতে হানা দিয়া তাহারও নগদ ১১০০ টাকা লুঠ করে।

পরদিন রাত্রে ঐ থানারই তারাবুনিয়া গ্রামের রহম চাপরাশীর বাড়ীতে ডাকাতেরা হানা দেয়। গ্রামবাসীরা আবার বাধা দেয়। এই সংঘর্ষে দুই জন গ্রামবাসী আহত হইয়া পরে মারা যায় এবং পুটিয়াখালীর সেহাজুদ্দীন নামক এক ডাকাত মারাত্মক ভাবে আহত হয়। সে ব্যক্তিও পরে মারা যায় কিন্তু মৃত্যুর পূর্বে এক স্বীকারোক্তি করে।

পুলিস তদন্ত চলিতেছে।

প্রকাশ, গত চার মাসে এই একটি মাত্র থানার অধীনে ৭২টি ডাকাতি হইয়াছে। থানার ভারপ্রাপ্ত দারোগা জয়নাল আবেদিন প্রায় সবগুলি ঘটনা সম্বন্ধেই যথারীতি রিপোর্ট দিয়াছেন কিন্তু কোন ক্ষেত্রেই অপরাধীরা ধরা পড়ে নাই, দণ্ডিতও হয় নাই।

ময়মনসিংহের পরবর্তী এক সংবাদে প্রকাশ, একটি গ্রাম হইতে ছয়টি স্ত্রীলোককে উদ্ধার করা হইয়াছে। ইহারা প্রায় সকলেই রেলগাড়ী বা রেল-ষ্টেশন হইতে অপহৃতা।

মুসলমান দুর্বৃত্তের দল এইরূপ দলবদ্ধ ভাবে নানা স্থানে যে অরাজক অবস্থার সৃষ্টি করিয়াছে, কর্তৃপক্ষ তৎপ্রতি সম্পূর্ণ উদাসীন। সরকার তাহাদের কার্যে বাধা দিবে না এ বিষয়ে কতদূর নিশ্চিন্ত হইলে ইহারা থানার ৫০০ হাতের মধ্যে সদলবলে হানা দিয়া নিশ্চিন্ত মনে ডাকাতি করিতে ও নারীর উপর পাশবিক অত্যাচার করিবার সাহস পায় তাহা সহজেই অনুমেয়। থানার বড় দারোগা মুসলমান, চার মাসের মধ্যে ৭২টি ডাকাতি তাহার এলাকায় ঘটিয়া যাওয়ার পর সে শুধু রিপোর্টই দিয়াছে, একটি লোককেও গ্রেপ্তার করে নাই, দুর্বৃত্তদলের পক্ষে ইহার চেয়ে শুভ সংবাদ আর কিছু হইতে পারে না। এই সব রিপোর্ট পাইয়াও জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট বা পুলিস সুপারিন্টেণ্ডেণ্টও কোন উচ্চবাচ্য করেন নাই এবং ইহার দ্বারা প্রকারান্তরে দুর্বৃত্তদলের অপকার্যে প্রশ্রয়ই দিয়াছেন।

কিশোরগঞ্জের ট্রেন লুঠ বা বরিশালের ডাকাতির সঙ্গে রাজনীতির গন্ধমাত্র থাকিলেও ইহারা অত্যন্ত কর্মতৎপর হইয়া উঠিত, সারা বাংলা তোলপাড় করিয়া সন্দেহক্রমে হাজার হাজার যুবককে গ্রেপ্তার করিত, যাহাদের বিরুদ্ধে প্রমাণ পাইত তাহাদিগকে মামলায় দায়ের করিয়া অবশিষ্ট সকলকে বিনা বিচারে আটক রাখার ব্যবস্থা করিত। অথচ আজ হিন্দুর সর্বস্ব লুণ্ঠিত হইতে দেখিয়া ইহারা নীরব, মাতৃজাতির উপর পাশবিক আক্রমণের সংবাদ পাইয়াও ইহাদের কর্তব্যবুদ্ধি জাগ্রত হয় না।

মুসলমান মন্ত্রী, মুসলমান ম্যাজিষ্ট্রেট, মুসলমান পুলিশ সাহেব, মুসলমান দারোগা ও মুসলমান গুণ্ডার মনোভাব প্রায় একই রূপ হইয়া দাঁড়াইয়াছে, দেশের পক্ষে ইহা গভীর বেদনার বিষয়। হিন্দুর সর্বস্ব লুণ্ঠন ও হিন্দু নারীর সর্বনাশে ইহাদের মধ্যে একজনও বিবেকের দংশন অনুভব করে না, ইহা সকলেই লক্ষ্য করিতেছে। ময়মনসিংহের যে অতিরিক্ত জেলা ম্যাজিষ্ট্রেটটি লীগের প্রতি প্রকাশ্যে অহেতুক পক্ষপাতিত্ব দেখাইয়াছেন, অকারণে যে ব্যক্তি কৃষক-প্রজা দলের লোকদের উপর গুলি চালাইয়াছেন, নির্বাচনের সময় যে ব্যক্তি লীগ প্রার্থীদের জয়ী করিবার জন্য ছল চাতুরীর আশ্রয় লইয়াছেন বলিয়াও যাঁহার বিরুদ্ধে অভিযোগ হইয়াছে, সেই ব্যক্তিকে স্বরাষ্ট্র বিভাগের ভারপ্রাপ্ত প্রধান মন্ত্রী তাঁহার প্রাইভেট সেক্রেটারী নিযুক্ত করিয়াছেন। ইহা দ্বারা মুসলমান কর্মচারীরা কি এই ইঙ্গিতই পাইবে না যে লীগ দলের গুণ্ডাদের সর্ববিধ প্রশ্রয় দিয়া পাকিস্থান কায়েম করিতে সাহায্য করাই তাঁহাদের প্রোমোশনের শ্রেষ্ঠ উপায়?

নারীর সম্মান নষ্ট করিয়া রেহাই পাওয়া এ দেশে ইংরেজ রাজত্বের বিশেষত্ব। ইংরেজ সৈনিকেরা ভদ্রলোকের গৃহে হানা দিয়া অস্ত্র দেখাইয়া লোকজন সরাইয়া রুগ্না নারীর উপর পাশবিক অত্যাচার করিয়াছে। দায়রা জজ ইহাদিগকে কতকটা কঠোর দণ্ডে দণ্ডিত করিলেও হাই কোর্টের ইংরেজ জজেরা তাহাদের দণ্ড অনেক লঘু করিয়া দিয়াছেন। যুদ্ধের সময় এরূপ বহু সৈনিক ভারতীয় নারীদের উপর অত্যাচার করিয়াছে

ইংরেজ কর্তৃপক্ষ তাহাদের কাহাকেও বা ভর্ৎসনা করিয়া বা সামান্ত শাস্তি দিয়াই কর্তব্য শেষ করিয়াছেন। ইহা দ্বারা নারী-নির্যাতনকারীকে রীতিমত প্রশ্রয় দেওয়া হইয়াছে। আজিকার লাঞ্ছনা তাহারই প্রত্যক্ষ ফল। আজ মুসলমান দুর্বৃত্তেরাও ইংরেজ গুণ্ডাদের দেখাদেখি নারীর সম্মান নষ্ট করিতে বেপরোয়া হইয়া উঠিয়াছে। মুসলমান মন্ত্রী ও ইংরেজ সিভিলিয়ান ইহাতে বিন্দুমাত্র উদ্বেগ অনুভব করেন না। আমেরিকার নারীর উপর অত্যাচারের শাস্তি মৃত্যু। এ দেশে এই ব্যবস্থা কেন প্রবর্তিত হইবে না তাহা আমরা বুঝিতে অক্ষম। বর্তমান আইনেও নারী নির্যাতনকারীর যে দণ্ডের বিধি আছে তাহাই বা কেন পূর্ণভাবে প্রযুক্ত হইবে না? মাতৃজাতির লাঞ্ছনা নিবারণে দেশের সমগ্র রাষ্ট্রশক্তি যেখানে দুর্বার গতিতে নিয়োজিত হওয়া উচিত ছিল আমাদের শাসকেরা সেখানে পরম উপেক্ষাভরে এত বড় মহাপাপ ও মহা অপরাধের প্রতি উদাসীন।

বাংলাদেশের ফুড কমিটি

বাংলা দেশের প্রায় প্রতি ইউনিয়নে একটি করিয়া ফুড কমিটি গঠিত হইয়াছে। ইহাদের অধিকাংশই স্থানীয় লীগ-মাতব্বরদের করতলগত। গত নির্বাচনের পর এই সব ফুড কমিটি জাতীয়তাবাদী মুসলমানদের পক্ষে রীতিমত ভয়ের কারণ হইয়া দাঁড়াইয়াছে। যাহারা লীগের বিরুদ্ধে ভোট দিয়াছে তাহাদিগকে নানা অছিলায় ফুড কমিটির নিকট হইতে প্রাপ্য দ্রব্যাদিতে বঞ্চিত করা হইতেছে। শুধু যে রাজনৈতিক কারণেই দ্রব্যাদি বণ্টনে বৈষম্য চলিতেছে তাহা নহে, কর্তৃপক্ষের নিজেদের ও দলের লোকের স্বার্থসিদ্ধির জন্যও এরূপ ঘটিতেছে। এই সব অনাচারের বিরুদ্ধে ঊর্দ্ধতন কর্তৃপক্ষের নিকট অভিযোগ জানাইয়া কোন প্রতিকার পাওয়া যায় না। ইহার কারণও দুর্বোধ্য নহে। গোড়া হইতে শেষ পর্যন্ত সিভিল সাপ্লাই ও ফুড কমিটি একই ছাঁচে ঢালা। ইহারা কি ভাবে জনসাধারণের নিকট নিষ্পেষণ-যন্ত্রে পরিণত হইয়াছে তাহার সামান্য পরিচয় ২৬শে বৈশাখের "কৃষক" পত্রিকায় প্রকাশিত নিয়োদ্ধৃত পত্রখানি হইতে বুঝা যাইবে:

> কুষ্টিয়া মহকুমার মিরপুর থানার অধীন চিথলিয়া ইউনিয়ন ফুড কমিটি যেভাবে জনসাধারণের উপর অত্যাচার ও অবিচার করিতেছে, তাহা সাধারণের সহ্যের সীমা লঙ্ঘন করিয়াছে। ইউনিয়ন বোর্ডের প্রেসিডেন্ট বিভিন্ন উপায়ে স্থানীয় ভারপ্রাপ্ত অফিসারগণকে হাত করিয়া ইচ্ছামত নিজ স্বার্থসংশ্লিষ্ট ও স্বার্থপর ব্যক্তিদিগকে লইয়া গ্রাম্য ফুড কমিটিগুলি গঠনপূর্বক ইউনিয়ন ফুড কমিটিতে নিজের অবাধ ক্ষমতা প্রতিষ্ঠা করিয়া লইয়াছেন। উক্ত কমিটির সেক্রেটারী তাঁহার বোর্ডের কেরাণী। কমিটির সভ্যদিগের কাহাকেও রেশন দোকান, কাহাকেও বিভিন্ন দ্রব্যাদি অত্যধিক দাম করিয়া হাত করিয়া বিভিন্ন স্বার্থসিদ্ধি এবং ব্যক্তি বা দলগত ও রাজনৈতিক বিদ্বেষ চরিতার্থ করিতেছেন। বিভিন্ন দ্রব্যাদি দিবার প্রলোভন দেখাইয়া কিংবা না দিবার ভীতি প্রদর্শন করিয়া নানারূপ অর্থ ও দ্রব্যাদি সংগ্রহ করিতেছেন। অধিকাংশ দ্রব্যই উক্ত সভ্যগণ এবং তাঁহাদিগের আত্মীয় অনুগত এবং প্রিয়পাত্রগণই আত্মসাৎ করিতেছেন। উক্ত সভ্যগণের বা তাঁহাদিগের প্রিয়পাত্রগণের মধ্যে বিভিন্ন রেশন কার্ডে বা স্পেশাল স্লিপে অতিরিক্ত দ্রব্যাদি দেওয়া হইতেছে। পক্ষান্তরে বিশেষ প্রয়োজনে জনসাধারণ নিম্নতম প্রয়োজনানুরূপ দ্রব্যাদিও 'ষ্টকে নাই' এই অজুহাতে পায় না। এসম্বন্ধে স্থানীয় মহকুমা কন্ট্রোলারের নিকট বহু আবেদন করিয়া প্রতিকার-প্রার্থনা করা হইয়াছে কিন্তু দরখাস্তকারিগণ উক্ত কমিটি কর্তৃক নির্যাতন ব্যতীত কোন ফলই পায় নাই। মহকুমা কোর্টে দরখাস্ত দেওয়া হইয়াছিল, তাহাও কোর্ট হইতে অপহৃত হইয়াছে। পরে পুনরায় দরখাস্ত করা হইয়াছে।

বাংলায় অন্ন বস্ত্রের অবস্থা

বাংলার গ্রামাঞ্চলে অন্ন-বস্ত্র সংগ্রহ করা কিভাবে ক্রমাগত দুঃসাধ্য হইয়া উঠিতেছে তাহার বিবরণ প্রায়ই অপ্রকাশিত থাকে। আমরা দেখিয়া সুখী হইলাম দৈনিক 'নবযুগ' এরূপ সংবাদ সংগ্রহ করিয়া মাঝে মাঝে প্রকাশ করিতেছেন। ইহা দ্বারা মফস্বলের লোকদের দুর্দশার অন্ততঃ খানিকটা অনুমান করা সম্ভব হইবে। অন্যান্য দৈনিক পত্রগুলিও এবিষয়ে মনোনিবেশ করিলে দেশের যথার্থ উপকার করা হইবে। এই সমস্ত বিবরণ এখন হইতেই প্রকাশিত হওয়া দরকার। ১৫ই বৈশাখের 'নবযুগে'র রিপোর্টগুলি উদ্ধৃত করিবার প্রয়োজন অনুভব করিতেছি বলিয়া নিম্নে উহা প্রদত্ত হইল:

> চৌমোহিনীর (নোয়াখালী) বেগমগঞ্জ থানার অধীন কুতুবপুর গ্রামনিবাসী ভারতচন্দ্র নাথ নামে এক ব্যক্তি অনশনের জ্বালা সহ্য করিতে না পারিয়া উদ্বন্ধনে আত্মহত্যা করিয়াছে। আরও প্রকাশ, গত দুই-তিন মাস হইতে তিনি বস্ত্রবয়নের সূতি মোটেই পাইতেছিলেন না এবং স্ত্রী ও ছেলে-মেয়েসহ প্রায়ই অনশনে দিন কাটাইতেছিলেন।...
>
> ভারত-সেবাশ্রম সঙ্ঘের যুগ্ম-সম্পাদক স্বামী যোগানন্দজী বাঁকুড়ার কয়েকটি গ্রাম পরিদর্শন করিয়া বাঁকুড়ার খাদ্যসঙ্কট সম্পর্কে জানাইয়াছেন:—"বাঁকুড়ার কেঁজিয়াকুড়া গ্রামের গরীব লোকেরা ৮৲ টাকা মণ দরে যে চাউল ক্রয় করিতেছে তাহা মানুষের খাদ্যের অযোগ্য।...সলদিহা গ্রামে প্রায় তিন শত পরিবারের বাস। ইহাদের সকলেরই একদিন চাষের জমি ছিল। কিন্তু গত দুর্ভিক্ষের সময় সমস্ত জমি বিক্রি করিয়া ফেওয়ার ফলে তাহারা এখন সম্পূর্ণ নিঃস্ব হইয়া পড়িয়াছে।...গ্রামের একজনের স্ত্রীকে কোন

প্রকারে লজ্জা নিবারণ করিতে দেখিলাম। কঙ্কালসার লোকগুলি এমন জীর্ণ বস্ত্র পরিধান করিতেছে যে, তাহা ভাষায় বর্ণনা করা যায় না।…

ভারত-সেবাশ্রম সঙ্ঘের যুগ্ম-সম্পাদক সম্প্রতি মেদিনীপুর জেলা পরিদর্শন করিয়া তথাকার দুর্ভিক্ষের অবস্থা প্রসঙ্গে বলিয়াছেন যে, পার্ব্বতীপুর উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয় ও সুতাহাটা থানার অধীনস্থ অন্ত পঁচিশটি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ছাত্রদের মধ্যে অনুসন্ধান করিয়া জানা গেল যে, তাহাদের শতকরা পঁচিশ জনকে কোন কিছু না খাইয়াই শিক্ষালয়ে আসিতে হয়। অনেক পরিবারে প্রায়ই দিনের পর দিন এক মুষ্টি খাদ্যও মিলে না। অন্নাভাবে জনসাধারণ হতাশ হইয়া কলিকাতা অভিমুখে ছুটিতেছে।…

নালিতাবাড়ী সরকারী এজেন্টের গুদামে বর্ত্তমানে তিন হাজার চার শত মণ আউশ ও বোরো চাউল পচিয়া মানুষের ব্যবহারের অযোগ্য হইয়া গিয়াছে।…

কিশোরগঞ্জের কটিয়াদী ও পাকুন্দিয়া থানায় চাউলের দর হইয়াছে ১৮৲ টাকা। গ্রামে গ্রামে উপবাস সুরু হইয়াছে।…

হাওড়া জেলায় উলুবেড়িয়া ও সদর মহকুমায় আট হাজার মণ খারাপ চাউল সস্তা দরে বিক্রয়ের ব্যবস্থা করা হইয়াছে।…

বাঁকুড়া জেলার খবরে প্রকাশ যে, ইন্দপুর, সদর, ছাতনা, গঙ্গাজলঘাটি, বড়জোরা এবং ওন্দা—এই ছয়টি মাত্র থানায় সাড়ে চার লক্ষ লোকের মধ্যে প্রায় দুই লক্ষ লোক দুর্ভিক্ষের কবলে পড়িয়াছে। প্রায় পঁচিশ হাজার লোক ইতিমধ্যেই এই অঞ্চল হইতে জেলার বাহিরে পলাইয়াছে।…

চাঁদপুর মহকুমার পল্লী অঞ্চল হইতে দ্রুত চাউলের মূল্য বৃদ্ধির সংবাদ পাওয়া যাইতেছে। বর্ত্তমান গ্রামাঞ্চলে চাউলের মূল্য প্রতিমণ ১৯৲ টাকা হইতে ২০৷৹ টাকা। দুঃস্থ গ্রামবাসীরা খাদ্য ভিক্ষায় বাহির হইয়াছে।…

কুষ্টিয়া মহকুমার পল্লী অঞ্চলে বস্ত্রের অভাব অত্যন্ত তীব্র হইয়া উঠিয়াছে। গত সপ্তাহে পল্লী অঞ্চলের সহস্রাধিক লোক কুষ্টিয়া শহরে দল বাঁধিয়া উপস্থিত হয় এবং বস্ত্র দাবি করিতে থাকে। পরে এক বিরাট জনসভায় বস্ত্রহীন পল্লীবাসীদের নিদারুণ দুর্দশার কথা বিশদভাবে বিশ্লেষণ করা হয়।…

বাঁকুড়া জেলার ইন্দপুর থানার অন্তর্গত ব্রজরাজপুর গ্রামে দীনবন্ধু মাল গত ১৯শে এপ্রিল অনাহারে মারা গিয়াছে বলিয়া এখানে সংবাদ আসিয়াছে। প্রকাশ, ইউনিয়ন বোর্ডের প্রেসিডেন্ট মহাশয় দীনবন্ধুকে রিলিফ অফিসারের নিকটে কাজের জন্ত পাঠাইয়া দেন কিন্তু রিলিফ অফিসার তাহাকে কার্যে নিযুক্ত না করায় সে ব্যর্থ হইয়া গৃহে ফিরিয়া আসে ও অনাহারে দিনযাপন করিতে থাকে। পরে উক্ত তারিখে তাহার মৃত্যু হয়। উক্ত গ্রামে বহু ব্যক্তি কাজের অভাবে অনাহারে দিন যাপন করিতেছে।

তমলুকে আসন্ন দুর্ভিক্ষ

মেদিনীপুর জেলার তমলুকের অবস্থা সম্বন্ধে তমলুক মহকুমা কংগ্রেস কমিটির সভাপতি শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র সামন্তের যে বিবৃতি প্রকাশিত হইয়াছে (ভারত, ২৫শে বৈশাখ) তাহা হইতে ঐ স্থানের জনসাধারণের আসন্ন বিপদের সম্ভাবনা বেশ বুঝা যায়। এ সম্বন্ধে দেশের নেতাদের নিষ্ক্রিয়তা বস্তুতঃই বেদনাদায়ক। মেদিনীপুরের এই অধিবাসীরাই দেশের সেবা করিতে নামিয়া সর্বস্ব বলিদানেও কুণ্ঠিত হয় নাই। নীরব উপেক্ষা ভরে ইহাদিগকে দুর্ভিক্ষের করাল গ্রাসে পড়িতে দেওয়া চূড়ান্ত কৃতঘ্নতার কাজ হইবে। গত আগষ্ট আন্দোলনে মেদিনীপুরের দান চিরস্মরণীয়; সেই আন্দোলনের বাহবা যাঁহারা কুড়াইতেছেন ইহাদের সাহায্যে তাঁহাদেরই সর্বাগ্রে অগ্রসর হওয়া কর্তব্য। বিবৃতিটি এই :

> তমলুক মহকুমায় ছয়টি থানা—নন্দীগ্রাম, সুতাহাটা, মহিষাদল, ময়না, তমলুক, পাঁশকুড়া—সর্ব্বত্রই দারুণ অন্নাভাব ঘটিয়াছে। গত ঝটিকার সময় এই মহকুমার জনসাধারণ সর্বস্বান্ত হইয়াছিল। সেই সময়ই জমিজমা, অস্থাবর সম্পত্তি বিক্রয়, বিভিন্ন রিলিফ কমিটির সাহায্য ও সরকারী সাহায্যের দ্বারা কোনক্রমে জীবনধারণ করে। এই সময়ে সাত লক্ষ লোকের মধ্যে প্রায় ৬০ হাজার লোক মৃত্যুমুখে পতিত হয়। দুর্ভিক্ষের পরবর্তী সংক্রামক রোগের প্রাদুর্ভাব এখনও মিটে নাই। বিভিন্ন স্থানে কলেরা, বসন্ত, ম্যালেরিয়া জনসাধারণের জীবনীশক্তি খর্ব করিতেছে। এই বৎসরও সারা মহকুমায় ফসল মোটেই হয় নাই। নন্দীগ্রাম, সুতাহাটা থানার সমুদয় অঞ্চল, মহিষাদল থানার কিয়দংশে লোনা জল প্রবেশ করায় পানীয় জলের একান্ত অভাব ঘটিয়াছে। জমিগুলি লবণাক্ত ও ফসল জন্মানোর অনুপযুক্ত।
>
> পাঁশকুড়া থানার ১৭টি ইউনিয়নের মধ্যে ২।৩টি বাদে অন্যগুলিতে গড়ে একর পিছু ৪/ মণের বেশী ধান হয় নাই। তমলুক থানার অবস্থা ঐরূপ। মহিষাদল থানায় ২।৩টি ইউনিয়ন বাদে অন্যান্য ইউনিয়নে গড়ে ৪/ মণের বেশী ধান হয় নাই। নন্দীগ্রাম থানার ১৫টি ইউনিয়নের মধ্যে ৩।৪টি ইউনিয়ন বাদে বাকিগুলিতে একর প্রতি ২/ মণের বেশী ধান হয় নাই। ময়না থানায় ৩।৪টি ইউনিয়ন বাদে বাকীগুলিতেও ৩/ মণের বেশী ধান হয় নাই। সুতাহাটা থানার কোন কোন অঞ্চল সর্বাপেক্ষা ভয়াবহ। এই থানার ১১টি ইউনিয়নের মধ্যে ১টি ইউনিয়ন বাদে অন্যগুলিতে একর পিছু ৸০ ত্রিশ সের হইতে ৪/ মণ পর্য্যন্ত ফসল হইয়াছে। ২নং ইউনিয়নের অবস্থা অত্যন্ত

শোচনীয়। এই ইউনিয়নে গড়ে ৮০ ত্রিশ সেরের বেশী ফসল হয় নাই। এই ইউনিয়নের পার্বতীপুর গ্রামের বিপিন দাস (৫২) অন্নাভাবে সংসারযাত্রা নির্বাহ করিতে না পারিয়া গলায় দড়ি দিয়া আত্মহত্যা করিয়াছে। ইহার পরিবারে ৮জন লোক রহিয়াছে, কিন্তু তন্মধ্যে একজন মাত্র সক্ষম ব্যক্তি। এই স্থানগুলিতে অবিলম্বে সাহায্যের ব্যবস্থা না করিলে বহুলোক মৃত্যুমুখে পতিত হইবে।

এই মহকুমার জনসাধারণ জ্যৈষ্ঠের প্রথম হইতে একেবারে অন্নাভাবে পতিত হইবে। সরকারী ও বে-সরকারী ঋণের জন্ত শতকরা ৯৫ জন লোকের জমি বাঁধা পড়িয়াছে। অস্থাবর সম্পত্তি, থালা, বাটি ইত্যাদি কিছুই নাই বলিলেই হয়। গরু, বাছুর ইত্যাদিও গ্রামের মধ্যে অত্যন্ত অল্প। এ রকম অবস্থায় ব্যাপক সাহায্যের ব্যবস্থা না করিলে অচিরে এই মহকুমার বহু অংশ জনহীন প্রান্তরে পরিণত হইবে।

মোটরগাড়ীর কারখানায় জন্য জমি সংগ্রহ

দৈনিক 'ভারতে' ২৫শে বৈশাখ তারিখে নিম্নোদ্ধৃত মন্তব্যটি প্রকাশিত হইয়াছে :

কোন্নগরের সন্নিহিত ভদ্রকালী, কোতরং, ছোট বহেড়া, মাখলা প্রভৃতি গ্রামের চাষীদিগের যে ভিটা বাড়ী ও আবাদী জমি একটি সুবৃহৎ মোটর নির্মাণের কারখানা স্থাপনের জন্য সরকারী ল্যাণ্ড অ্যাকুইজিশন আইনের বলে গ্রহণ করা হইতেছে, উহা গ্রহণ করিবার কোনও সঙ্গত হেতু নাই; তথাপি জমি দখলের যে পদ্ধতি সচরাচর অবলম্বিত হয় তাহা গ্রহণ না করিয়া "নিতান্ত আবশ্যক" বলিয়া জরুরী বিধি প্রয়োগ করিয়া অতি অল্প সময়ের নোটিশেই এই সমস্ত অতি দরিদ্র ব্যক্তিদের গৃহহারা করা হইতেছে। এই জমিতে একটি মোটর গাড়ীর কারখানা স্থাপিত হইবে। দেশময় যে সময়ে খাদ্যাভাব অত্যন্ত উগ্র হইয়া উঠিয়াছে, সেই সময়ে আবাদী জমির আবাদ বন্ধ করিয়া কারখানা স্থাপনের কোনও যুক্তিযুক্ত কারণ নাই। যুদ্ধের প্রয়োজন বলিয়া সরকার বহু লক্ষ বিঘা আবাদী ও আবাদযোগ্য ভূমি অ্যাকুইজিশন আইনের বলে দখল করিয়াছিলেন, কিন্তু তাহার অনেক জমিই যুদ্ধের কোনও প্রয়োজনেই আসে নাই। মেমারি অঞ্চলে এক লপ্তে সাড়ে তিন হাজার ও অপর এক লপ্তে আড়াই হাজার বিঘা এরূপ আবাদী ও আবাদযোগ্য ভূমি সরকার কাড়িয়া লইয়া কোনও প্রয়োজনে না লাগাইয়া আজও ফেলিয়া রাখিয়াছেন। এ জমিতে আবাদ হইলে প্রচুর খাদ্যশস্য উৎপন্ন হইত। তাহা করা যদি নাও সম্ভব হয়, তবে এখানেও কারখানা স্থাপন চলিতে পারিত। পানাগড়ে মার্কিন সামরিক প্রয়োজনে প্রায় দুই লক্ষ বিঘা জমি এরূপে দখল করা হয়। তন্মধ্যে আড়াই লক্ষ বিঘা জমি আবাদী ছিল। যুদ্ধের পরে উহা ফেরত দিবার প্রতিশ্রুতি ছিল। কিন্তু এখন তাহা ফেরত না দিবার ব্যবস্থা করা হইতেছে; এখানেও কয়েকটি বৃহৎ কারখানা হইতে পারে। কাঁকিনাড়া অঞ্চলে এই ভাবে সংগৃহীত বহু জমি আছে। সেগুলি না লইয়া নূতন করিয়া আবাদী জমি গ্রহণে সরকারের এত উৎসাহ কেন?

বিড়লা-নুফিল্ড কোম্পানীর কারখানার স্থান সংগ্রহ করিয়া দিবার জন্য হুগলীর যে জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট এরূপ অতিরিক্ত উৎসাহ দেখাইতেছেন, তিনি তাঁহার কার্য্যকাল পূর্ণ হইবার বহু পূর্ব্বে চাকুরী হইতে অবসর গ্রহণের জন্য আবেদন করিয়াছেন কি না 'ভারত' তাহা জানিতে চাহিয়াছেন। আই-সি-এসের পদ পরিত্যাগ করিয়া ইতিপূর্ব্বে কেহ কেহ মোটা বেতনে বণিক বা শিল্প-প্রতিষ্ঠানে চাকুরী লইয়াছেন। সরকারী ক্ষমতার সুযোগ লইয়া কোম্পানী বিশেষকে অতিরিক্ত সুবিধা দিয়া তাহার প্রতিদান-স্বরূপ মোটা বেতনের চাকুরী লওয়ার পথ বড়লাট লর্ড লিনলিথগো দেখাইয়া গিয়াছেন। হুগলীর জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট তাঁহারই পদাঙ্ক অনুসরণ করিতেছেন কিনা সে রহস্য উদ্ঘাটিত হওয়া দরকার।

২৪-পরগণা জেলা প্রাথমিক শিক্ষক সম্মেলন

২৪-পরগণা জেলা প্রাথমিক শিক্ষক সম্মেলনের সভাপতি-রূপে বঙ্গবাসী কলেজের অধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত প্রশান্তকুমার বসু প্রাথমিক শিক্ষকদের দুর্দশা ও উহার কারণ সম্বন্ধে যে আবেগ-পূর্ণ মন্তব্য করিয়াছেন, তাহা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। উহার পরদিন নিখিল-বঙ্গ প্রাথমিক শিক্ষক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হইয়াছে। উহার সভাপতি ছিলেন নবনিযুক্ত ভাইস-চ্যান্সেলর শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়; উদ্বোধন করিয়াছেন প্রধানমন্ত্রী মিঃ সুরাবর্দী এবং শিক্ষকদের প্রতি সরকারী শিক্ষাবিভাগের মনোভাব জ্ঞাপন করিয়াছেন শিক্ষাসচিব খাঁ বাহাদুর মোয়াজ্জেমুদ্দীন হোসেন। সভাপতি দেখাইয়াছেন যে প্রাথমিক শিক্ষকদের উন্নতি বিধানের জন্য যে টাকা দরকার তাহা ব্যয় করিতে গেলে বাংলার রাজস্বে কুলাইবে না, প্রধানমন্ত্রী জানাইয়াছেন বেশী গোল করিলে তিনি সমস্ত প্রাথমিক স্কুল তুলিয়া দিবেন এবং শিক্ষা সচিব তাঁহাদিগকে সেল্‌স ট্যাক্স বৃদ্ধিতে সাহায্য করিতে বলেন। তিন জনের বক্তৃতার কোন অংশে আমরা শিক্ষকদের দুরবস্থার প্রতি লেশমাত্র দরদের পরিচয় পাইলাম না এবং বিশেষ ভাবে এই কারণেই শ্রীযুক্ত প্রশান্তকুমার বসুর অভিভাষণ আমাদের বিশেষ ভাল লাগিয়াছে। বে-সরকারী কলেজের অধ্যক্ষ তিনি, শিক্ষকদের উন্নতি সাধনের ক্ষমতা তাঁহার নাই—কিন্তু সম্মেলনে শিক্ষকদের প্রতি সম্মান ও সহানুভূতি প্রদর্শনে এবং ইঁহাদের দুর্দশার প্রকৃত কারণ নির্দেশে তিনি কার্পণ্য বা দ্বিধা করেন নাই। তাঁহার অভিভাষণের একাংশ নিম্নে প্রদত্ত হইল :

একথা প্রত্যেককেই স্বীকার করতে হবে যে, প্রাথমিক শিক্ষাই শিক্ষার ভিত্তিস্থানীয়। অথচ প্রাথমিক শিক্ষার অবস্থা ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষের দিকে যেমন ছিল বিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে এসেও ঠিক তেমনই আছে। এদেশে প্রাথমিক শিক্ষা যেভাবে অবজ্ঞাত ও অবহেলিত হয় পৃথিবীর কোনো সভ্যদেশেই তার তুলনা খুঁজে পাওয়া যাবে না। কোনও একটা নির্দিষ্ট পরিকল্পনা বা স্পষ্ট আদর্শ এর পশ্চাতে নেই। আমাদের পাঠশালাগুলো নিঃস্বশালার চেয়েও অধম। অর্ধভগ্ন জীর্ণ কুটির; না আছে শিক্ষার কোন উপাদান, না আছে কোন সুচিন্তিত পদ্ধতি। গুরু মহাশয়ের দশা ভিক্ষুকের চেয়েও হীন। ভিক্ষুকের তবু একটি বেপরোয়া স্বাধীনতা আছে। কিন্তু প্রাথমিক স্কুলের শিক্ষকগণের স্কন্ধে বিরাট্ দায়িত্বের ভার চাপানো আছে, অথচ পদে পদে তাঁরা সমাজের ও উপরওয়ালাদের কাছে লাঞ্ছিত ও উৎপীড়িত। পরিদর্শকের ভয়ে তাঁরা ভীত। সমাজ ও রাষ্ট্র তাঁদের কাজ নির্দিষ্ট করে দিয়েছে, কিন্তু সে কাজ করবার জন্যে তাঁরা কি খেয়ে বেঁচে থাকবেন সে কথা চিন্তা করবার প্রয়োজন মনে করে নি। যে দেশের সমাজ ও রাষ্ট্র জাতিগঠনের সবচেয়ে গুরু কর্তব্যে এমনিভাবেই ফাঁকি দিয়ে চলেছে সে দেশের শিক্ষার কোন রকম উন্নতিই কেউ কখনো আশা করতে পারেন না।

অথচ দুই শত বৎসর পূর্বেও আমাদের দশা এমন শোচনীয় ছিল না। যে দিন অভিশপ্ত ঈস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী বণিকের মানদণ্ড হাতে নিয়ে এদেশে উপস্থিত হয়ে দেখতে দেখতে আমাদের দণ্ডমুণ্ডের বিধাতা হয়ে উঠল সেদিন থেকেই আরম্ভ হ'ল আমাদের সর্বনাশ। আমাদের দেশের পল্লীসভ্যতার ভিত্তি পড়ল ভেঙে, নিরক্ষরতা হয়ে উঠল সর্বব্যাপী; চতুষ্পাঠী ও মক্তবগুলো দ্রুত নিশ্চিহ্ন হয়ে যেতে লাগল। ঈস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর আবির্ভাবের সময় এক বাংলাদেশেই আশি হাজার পাঠশালা ও মক্তব ছিল। শোষণ ও শাসন যন্ত্র চালাবার জন্য কোম্পানীর প্রয়োজন হয়েছিল বেয়ারা, আরদালী, কেরানী, মুৎসুদ্দি আর আপিস-বাবুদের। ফলে চাকুরীর অনুপাতেই নির্ধারিত হ'তে লাগল, শিক্ষার গতি ও প্রকৃতি। এদেশের বিদেশী সরকার তাদের সাম্রাজ্যরক্ষার জন্যে সামরিক ও পুলিসবাহিনী এবং মাথাভারি আমলাতান্ত্রিক ঠাট বজায় রাখবার জন্যেই সমস্ত অর্থ নিঃশেষ করে দেউলে হয়ে বসে থাকে, শিক্ষার ভিক্ষার ঝুলিতে দান করবার মত কিছুই আর অবশিষ্ট থাকে না।

বাংলাদেশে সুপারির ব্যবসা

যুদ্ধের পূর্বে সুপারির দর ছিল দর আনা সের। এ বৎসর কেন্দ্রীয় সরকারের অর্থসচিব উহার উপর এগার আনা সের হিসাবে আমদানী-শুল্ক বসাইয়াছেন। সঙ্গে সঙ্গে দেশে উৎপন্ন সুপারির উপরও উৎপাদন-শুল্ক চাপিয়াছে। নিত্যব্যবহার্য কোন দ্রব্যের উপর মূল্যের দ্বিগুণ হারে আমদানী শুল্ক ও উৎপাদন-শুল্ক কোন সভ্য দেশে আছে কিনা আমরা জানি না। দরিদ্রের নিত্যব্যবহার্য দ্রব্যের উপর এত চড়া হারে কর ধার্য করা সভ্য রীতিবিগর্হিত বলিয়া আমরা মনে করি। গরীবের প্রতিনিধিত্বের দাবি লইয়া যে সব বড়লোক কেন্দ্রীয় ব্যবস্থাপরিষদে গিয়াছেন তাঁহারা ইহাতে সম্মতি দিয়াছেন ইহা আরও দুঃখের বিষয়। কেন্দ্রীয় সরকারের এই কার্যের ফলে বাংলায় সুপারির ব্যবসায় কি ভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হইবে, 'আর্থিক জগৎ' পত্রিকা তাহার বিবরণ দিয়াছেন। উহার কতকাংশ নিম্নে উদ্ধৃত হইল :

> সুপারির উৎপাদন এবং সুপারির ব্যবসায়ে সমগ্র ভারতবর্ষে বাংলাদেশের স্থান সর্বপ্রধান। বাংলায় প্রতি বৎসর যে পরিমাণ সুপারি উৎপন্ন হয় ভারতের অন্য কোন প্রদেশে কিংবা দেশীয় রাজ্যে তাহার সমপরিমাণ সুপারি উৎপন্ন হয় না। সুপারি আমদানী এবং রপ্তানীর ব্যাপারেও বাংলার স্থান সর্বশ্রেষ্ঠ। বাংলা, আসাম, বিহার এবং উড়িষ্যা—এই কয়টি প্রদেশেই সুপারির চাহিদা অপেক্ষাকৃত বেশী। আসাম, বিহার এবং উড়িষ্যায় প্রতি বৎসর যে পরিমাণ সুপারি আমদানী হয় তাহা প্রধানতঃ বাংলা হইতেই রপ্তানি হইয়া থাকে। এতদ্ব্যতীত সংযুক্তপ্রদেশ, মধ্যপ্রদেশ, এমন কি, বোম্বাই প্রদেশেও বাংলা হইতে সুপারি রপ্তানি হয়। বিদেশ হইতে সমগ্র ভারতবর্ষে প্রতি বৎসর যে প্রায় কুড়ি লক্ষ মণ সুপারি আমদানী হয় তন্মধ্যে একমাত্র বাংলাদেশেই কলিকাতা এবং চট্টগ্রাম বন্দরের মারফতে চৌদ্দ-পনর লক্ষ মণ সুপারি আসিয়া থাকে। ইহা হইতে আমরা মোটামুটি এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে পারি যে, উৎপাদন-শুল্ক আমদানী-শুল্ক দ্বারা সুপারির ব্যবসায় হইতে ভারত-সরকারের মোট যে পরিমাণ অর্থ আয় হইবে তাহার শতকরা ৫০ ভাগেরও বেশী অর্থ সংগৃহীত হইবে বাংলাদেশ হইতে।

বাংলার সকল জেলাতেই অল্প-বিস্তর সুপারির চাষ আছে। কিন্তু বাখরগঞ্জ এবং নোয়াখালী জেলা, খুলনা জেলার বাগেরহাট মহকুমা এবং ত্রিপুরা জেলার কতকাংশে যে সুপারির চাষ হয় তাহাই বিশেষ উল্লেখযোগ্য। অন্যান্য জেলায় যে পরিমাণ সুপারি উৎপন্ন হয় তাহাতে স্থানীয় চাহিদা মিটে না। বাখরগঞ্জ, নোয়াখালী, খুলনা এবং ত্রিপুরা জেলা হইতে প্রতি বৎসর দশ লক্ষ মণেরও বেশী পরিমাণ সুপারি বিভিন্ন স্থানে রপ্তানী হইয়া থাকে। ইহার অর্ধেক রপ্তানী হইয়া থাকে কলিকাতায়। কলিকাতা হইতে পশ্চিম বঙ্গের বিভিন্ন জেলা, বিহার, উড়িষ্যা,

সংযুক্তপ্রদেশ, মধ্যপ্রদেশ এবং বিভিন্ন দেশীয় রাজ্যে এই সমস্ত সুপারির কতকাংশ চালান হইয়া থাকে।

বাংলা হইতে ভারতবর্ষের বাহিরে যে সমস্ত স্থানে সুপারি রপ্তানী হইয়া থাকে তন্মধ্যে ব্রহ্মদেশ বিশেষ উল্লেখযোগ্য। কলিকাতা এবং চট্টগ্রাম হইতে প্রতি বৎসর ব্রহ্মদেশে প্রায় দুই লক্ষ মণ সুপারি রপ্তানি হইয়া থাকে। ব্রহ্মদেশ ব্যতীত অল্প পরিমাণ সুপারি সিংহল, এডেন, আফ্রিকা, ব্রিটিশ গায়না এবং আমেরিকাতেও রপ্তানী হয়।

বহির্ভারত হইতে বাংলায় প্রায় চৌদ্দ-পনর লক্ষ মণ সুপারি আমদানী হয়। ষ্ট্রেটস্ সেটেল্‌মেণ্ট এই সুপারি আমদানীর সর্বপ্রধান কেন্দ্র; ষ্ট্রেটস সেটেলমেণ্ট হইতে বাংলায় সুপারি আমদানীর পরিমাণ সাধারণতঃ দশ লক্ষ মণেরও উপর। আমদানীর দ্বিতীয় প্রধান কেন্দ্র নন্-ফেডারেটেড মালয় ষ্টেটস্। এখান হইতে বাংলায় রপ্তানির পরিমাণ প্রায় উনআশি হাজার মণ। জাভা, সুমাত্রা, ফেডারেটেড মালয় ষ্টেটস্, শ্যামদেশ, চীন, জাঞ্জিবার, আন্দামান দ্বীপপুঞ্জ এবং ব্রহ্মদেশ হইতেও সামান্য পরিমাণ সুপারি আমদানী হইয়া থাকে। ভারতবর্ষের অভ্যন্তরে একমাত্র কোচীন এবং মধ্যপ্রদেশের গোণ্ডিয়া অঞ্চল হইতে অল্প পরিমাণ সুপারি কলিকাতা, মেদিনীপুর এবং বাঁকুড়া জেলায় আমদানী হইয়া থাকে।

যুদ্ধের দরুণ সুপারি আমদানী বন্ধ হইয়া গিয়াছিল। পুনর্বার উহা আরম্ভ হইয়াছে। আগামী কয়েক বৎসর যদি দশ লক্ষ মণ সুপারিও বাংলাদেশে বহির্ভারত হইতে আমদানী হয় তাহা হইলে প্রতি সের এগার আনা আমদানী-শুল্কের দরুণ দেশে সুপারির মূল্য হ্রাস পাইবে না। সুপারির চাহিদাও আরও হ্রাস পাইবে। উৎপাদন-শুল্ক এবং কেন্দ্রীয় আবগারী বিভাগের জটিল নিয়মকানুনের জন্য বাখরগঞ্জ, খুলনা, নোয়াখালী প্রভৃতি হইতে সুপারি চালান দেওয়া ব্যবসায়ীদের পক্ষে কষ্টসাধ্য হইয়া উঠিতেছে ইহাও এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য। বাংলার এই একটি বড় ব্যবসা কেন্দ্রীয় সরকারের কর্তাদের খামখেয়ালীর বশে নষ্ট হইতে বসিয়াছে, এ সম্বন্ধে যথেষ্ট আন্দোলন হওয়া উচিত।

দামোদর ক্যানেল-কর বৃদ্ধি

বর্ধমান অঞ্চলে দামোদর ক্যানেলের কল্যাণে সেখানকার কৃষকদের অবস্থা সামান্য একটু ভাল হইয়াছে এই সুযোগে বাংলা-সরকার ক্যানেল-কর দ্বিগুণেরও বেশী বাড়াইয়া দিয়াছেন। ইহার বিরুদ্ধে অনেক আন্দোলন হইয়াছে কিন্তু সরকার উহাতে কর্ণপাত মাত্র করেন নাই। ক্যানেল-কর বৃদ্ধিতে সরকারের হয়ত কয়েক হাজার টাকা আয় বাড়িবে কিন্তু তদনুপাতে কৃষকদের ক্ষতি হইবে অনেক বেশী। এ সম্বন্ধে দৈনিক কৃষকে (১৮ই বৈশাখ) একটি পত্রে সমস্ত অবস্থা বিবৃত হইয়াছে। তৎপ্রতি দেশবাসীর দৃষ্টি আকৃষ্ট হওয়া উচিত। বাংলা-সরকার স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া ইহার প্রতিকার করিবেন এতটা ভরসা করা কঠিন, কিন্তু কর-বৃদ্ধি বন্ধ করিবার জন্য তাঁহাদিগকে বাধ্য করিবার চেষ্টা হওয়া উচিত। পত্রটি এই:

১৯৪৫-৪৬ সাল হইতে দামোদর ক্যানেল-করের হার একর প্রতি ২৸৹ আনা হইতে বৃদ্ধি করিয়া ৫৷৹ টাকা ধার্য করা হইয়াছে। এই কর বৃদ্ধির প্রতিবাদে ক্যানেল অঞ্চলের কৃষক সাধারণ ইতিমধ্যে গবর্ণর সকাশে বহু আবেদনপত্র প্রেরণ করিয়াছে। গ্রামে গ্রামে সভা করিয়া এ বিষয়টির সমস্ত দিক আলোচনা করা হইয়াছে। অনাবৃষ্টি এবং তজ্জনিত অজন্মার বিরুদ্ধে ক্যানেলের প্রয়োজনীয়তা ও উপযোগিতা সম্বন্ধে কৃষক সাধারণের কোনরূপ ভুল ধারণা নাই। ক্যানেল কৃষি-জলের সমস্যার সমাধান করিয়াছে। উপযুক্ত হারে ক্যানেল-কর দিতে কৃষকদেরও বিন্দুমাত্র আপত্তি নাই। অধিকন্তু ক্যানেল-বহির্ভূত এলাকার কৃষকরাও আজ আরও ক্যানেল খননের দাবি করিতেছে। একমাত্র ক্যানেল-করের হার অন্যায় ভাবে বৃদ্ধি করায় ফলেই সর্বত্র হাহাকার উঠিয়াছে। বর্তমানে ধান্যের দর অপেক্ষাকৃত বাড়িয়াছে, কিন্তু তথাপি চাষীর আয়ের অঙ্ক বাড়ে নাই এবং তাহার জীবনযাত্রার মান উন্নততর হয় নাই। ধান্যের দর পূর্বাপেক্ষা তিন গুণ বৃদ্ধি পাইয়াছে সত্য, কিন্তু সেই সঙ্গে খইল, বলদ প্রভৃতি চাষের নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিষগুলির মূল্য ছয় গুণ বাড়িয়াছে। সকল জিনিষ মহার্ঘ হইয়াছে এবং চাষীর জীবনযাত্রা-প্রণালী দিন দিন নিম্নস্তরে যাইতেছে।

বাংলা ও আসাম কলেজ অধ্যক্ষ সম্মেলন

বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস-চ্যান্সেলর শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের সভাপতিত্বে বাংলা ও আসামের কলেজসমূহের অধ্যক্ষদের এক সম্মেলন হইয়া গিয়াছে। সম্মেলনে যে সব সিদ্ধান্ত গৃহীত হইয়াছে তাহার মধ্যে এই কয়টি আমরা সমর্থন করিতে পারিতেছি না—(১) ছাত্র বেতন বাড়াইয়া নিম্নতম বেতন ৮৲ টাকা করা; (২) যে সব ছাত্র আপিসে চাকুরী করিয়া কলেজগুলির সান্ধ্য বিভাগে কমার্স পড়ে তাহাদিগকে দুই বৎসরের পরিবর্তে তিন বৎসর পড়িতে বাধ্য করা এবং (৩) প্রতি কলেজে ছাত্রসংখ্যা সীমাবদ্ধ করা। ছাত্রসংখ্যা সীমাবদ্ধ হওয়ার জন্য কোন কলেজের আর্থিক অবস্থার ক্ষতি হইলে বিশ্ববিদ্যালয় ঘাটতি টাকা ঐ কলেজকে নিজে দিবেন না, বাংলা-সরকারের নিকট হইতে পাওয়াইয়া দিবার জন্য দরবার করিবেন।

ব্রিটিশ রাজত্বের গোড়া হইতেই আমাদের দেশে শিক্ষা-বিস্তার যাহাতে ব্যাপকভাবে না হইতে পারে তৎপ্রতি ইংরেজ তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখিয়াছে। প্রাথমিক, মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা তিনটির ক্ষেত্রকেই ইংরেজ সরকার বিধিমতে সঙ্কুচিত করিবার চেষ্টা করিয়াছে। স্কুলগুলিকে ভাল করিবার নামে স্কুল

কমানো ও প্রতি স্কুলে ছাত্রসংখ্যা সীমাবদ্ধ করিবার দিকে ইংরেজ সরকার সর্বদা নজর রাখিয়াছে। ইংরেজের স্বার্থবাহী লীগদলও শিক্ষাক্ষেত্রে এই একই নীতি অনুসরণ করিয়া চলিয়াছে। এই কারণেই প্রাথমিক শিক্ষা-বিস্তারের জন্য জনমত তীব্র হইয়া উঠিলে সর্বাগ্রে সেস ও ট্যাক্স আদায়ের ব্যবস্থা হয়, স্কুল প্রতিষ্ঠা অনেক পিছনে পড়িয়া থাকে। বইয়ের দাম ক্রমাগত বাড়াইয়া, বছর বছর বই বদলাইয়া এবং অন্য সহস্রবিধ উপায়ে শিক্ষাকে যত দূর সম্ভব ব্যয়সাধ্য করিয়া তোলা হইয়াছে। যে মাধ্যমিক শিক্ষা বিল পাস করাইবার জন্য লীগওয়ালাদের এত আগ্রহ, শিক্ষা-সঙ্কোচে উহা এক ব্রহ্মাস্ত্র-স্বরূপ হইবে।

এই অবস্থায় সর আশুতোষের বিশ্ববিদ্যালয় এবং সর আশুতোষের জামাতাকে শিক্ষা-সঙ্কোচের সমর্থক হইতে দেখিয়া আমরা বিস্মিত ও দুঃখিত হইয়াছি। সরকারী বাধা অতিক্রম করিয়া শিক্ষার প্রসারে সর আশুতোষের দান চিরস্মরণীয়। উচ্চশিক্ষা সহজলভ্য করিয়া কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় দেশের এক মহৎ উপকার করিয়াছেন।

আলিগড় হাঙ্গামা

আলিগড়ের সাম্প্রতিক হাঙ্গামা সম্পর্কে আগ্রা বিভাগের কমিশনার ও পুলিসের ডেপুটি ইনস্পেক্টর-জেনারেলের যে রিপোর্ট প্রকাশিত হইয়াছে তাহাতে আসল তথ্যসমূহের কিছু কিছু প্রকাশ পাইয়াছে। মিঃ জনষ্টন ও মিঃ সুইফট্‌কে দুইটি বিষয় সম্পর্কে বিশেষ অনুসন্ধান করিয়া বিবৃতি দিতে বলা হইয়াছিল; প্রথমতঃ, কল্যাণগঞ্জ থানায় কাহারা আগুন লাগাইয়াছিল এবং দ্বিতীয়তঃ, স্থানীয় পুলিস কর্মচারীরা নিষ্ক্রিয় ছিল কিনা।

প্রথম প্রশ্ন সম্পর্কে এই রিপোর্টে বলা হইয়াছে যে, "কল্যাণগঞ্জ বাজারে এক দল মুসলমান আগুন লাগাইয়াছে বলিয়া আমরা মনে করি; শহরের মুসলমান ও ছাত্রগণও এই ঘটনার সহিত নিশ্চিত জড়িত ছিল। কল্যাণগঞ্জের দোকানদারগণ প্রহৃত ও লুণ্ঠিত হইয়াছে বলিয়া ধারণা করিবার যথেষ্ট কারণ আছে।"

হাঙ্গামার মূল কারণ সম্পর্কে আলোচনা করিতে গিয়া বলা হইয়াছে যে, বাজারের জনৈক বস্ত্রবিক্রেতার সঙ্গে কলহ হইতেই গোলমালের সূত্রপাত হয়। বস্ত্রবিক্রেতা কৃষ্ণবিহারী লাল রেশন কার্ড ছাড়া কাপড় বিক্রয় করিতে অস্বীকৃত হইলে ছাত্রগণ গোলমাল আরম্ভ করে, এবং পরে মহেন্দ্র পাল নামক আর এক জন ব্যবসায়ীর দোকানেও অনুরূপ গোলমাল হয় এবং ইহার পরেই অসংযত এবং উত্তেজিত জনতা ও ছাত্রগণ বাজার আক্রমণ করে। বিবৃতিতে এই মত প্রকাশ করা হইয়াছে যে, এই হাঙ্গামা পূর্ব হইতে পরিকল্পিত ছিল না।

প্রাপ্ত সংবাদসমূহ বিশেষভাবে বিশ্লেষণ করিলে বুঝা যায় যে, এই হাঙ্গামার অন্তরালে পূর্ব হইতে একটি পরিকল্পনা রচনা করা হইয়াছিল এবং তদনুসারে আয়োজন করা হইয়াছিল। স্থানীয় সংবাদ হইতে জানা যায় যে ঘটনার পূর্ব দিনে বিশ্ববিদ্যালয়ের দেওয়ালগুলিতে ছাত্রদিগকে হিংসাত্মক কার্যে উত্তেজিত করিয়া প্রাচীর-পত্র টাঙানো হইয়াছিল। এই সমস্ত প্রাচীর-পত্রে ছাত্রগণকে পাকিস্তান-বিরোধী কংগ্রেসের বিরুদ্ধে সঙ্ঘবদ্ধ ভাবে আক্রমণ চালাইবার জন্য উৎসাহিত করা হইয়াছিল। কংগ্রেস-আন্দোলন এবং দেশের রাজনৈতিক ব্যবস্থাকে অচল করিবার জন্য এবং তদুদ্দেশে যানবাহন, বেতার এবং অন্যান্য সংযোগ ব্যবস্থাকে বিনষ্ট করিবার জন্য একটি গুপ্ত সংগঠনের আভাসও এই সঙ্গে দেওয়া হইয়াছিল।

সরকারী রিপোর্টে বলা হইয়াছে যে এই ধরণের পরিকল্পনার কথা ভিত্তিহীন। যদি ইহা সত্যই অমূলক হয় তবে ঘটনার এক সপ্তাহ পূর্বে আলিগড় শহরে বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদের প্রবেশ সম্পর্কে একটি নিষেধাজ্ঞা কেন জারি করা হইয়াছিল? আর এই নিষেধাজ্ঞা জারি করা সত্ত্বেও কেন ইহাকে কার্যকরী করিবার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থাদি অবলম্বন করা হয় নাই? রিপোর্টে বলা হইয়াছে যে কোন আশঙ্কা বা অশান্তির সময়ে ছাত্রদের শহরে প্রবেশ করিতে না দেওয়া অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। ইহা বুঝিয়াও কেন কর্তৃপক্ষ ছাত্রগণকে বাজার আক্রমণ করিবার সময়ে বাধা দিতে পারেন নাই? এই সকল প্রশ্নের কোন সদুত্তর পাওয়া যায় নাই। রেশন কার্ড ছাড়া বস্ত্র বিক্রয় অসম্ভব একথা আলিগড়ের ছাত্ররা জানে না ইহা বিশ্বাসযোগ্য নহে সুতরাং তাহারা দাঙ্গা করিতেই আসিয়াছিল এ কথা বিশ্বাস করিতে আপত্তি কি?

রিপোর্টে বিভিন্ন অগ্নিকাণ্ডের কথা ও অশান্তি দমনে সরকারী কর্মচারীদের তৎপরতার কথা উল্লেখ করিয়া বলা হইয়াছে যে, সরকারী কর্মচারীদের বিরুদ্ধে নিষ্ক্রিয়তার অভিযোগ ভিত্তিহীন। সরকারী বিবৃতিতে সরকারী কর্মচারীদের অক্ষমতাকে যে অস্বীকার করা হইবে ইহাতে আশ্চর্য হইবার কিছু নাই। অথচ এই কর্মচারিগণ যে এই হাঙ্গামা দমন করিবার জন্য কি ব্যবস্থা অবলম্বন করিয়াছিলেন তাহার কোন বিবরণই মিঃ জনষ্টন ও মিঃ সুইফটের বিবৃতিতে নাই। বিপদের পূর্বাভাস পাইয়াও পুলিশ কর্তৃপক্ষ উপযুক্ত সতর্কতা অবলম্বন করেন নাই। রিপোর্টে বলা হইয়াছে—"হাঙ্গামার সময় ছাত্রদের শহরে প্রবেশ বন্ধ করা সম্পর্কে জেলা ম্যাজিস্ট্রেট যে অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন তাহা আমরা সমর্থন করি। আলিগড়ের ছাত্রদের মধ্যে তীব্র সঙ্ঘবদ্ধ মনোভাব বর্তমান; বলপ্রয়োগ দ্বারা ইহাদের থামাইতে হইলে যথেষ্ট শক্তি নিয়োগ করিতে হইবে বলিয়া ম্যাজিস্ট্রেট যে মত প্রকাশ করিয়াছেন তাহার সহিতও আমরা একমত। ছাত্রদের উত্তেজনা দেখিয়া জেলা ম্যাজিস্ট্রেট মনে করেন যে ইহাদের শান্ত করিবার জন্য গুলি চালাইতে হইলে বেপরোয়া ব্যাপক গুলিবর্ষণের প্রয়োজন এবং ফলে এক শত অথবা দুই শত লোকের মৃত্যু হইত। ম্যাজিস্ট্রেটের এই ধারণা সম্পর্কে আমরাও দ্বিমত নহি।"

আশ্রপক্ষ সমর্থনের জন্ত এই যুক্তি শুধু হাস্তকর নহে, ইহা বিশেষ অর্থপূর্ণ। বিক্ষুব্ধ জনতাকে শান্ত করিতে গিয়া বেপরোয়া গুলিবর্ষণ করিতে সরকারী কর্তৃপক্ষ অনেকস্থলেই পশ্চাৎপদ হন নাই। ভারত-সরকারের এই কর্মচারীরাই কলিকাতায় শান্ত ছাত্র-শোভাযাত্রার উপরে নির্বিচারে বেপরোয়া গুলি চালাইয়াছিল এবং এই ধরণের বেপরোয়া গুলিবর্ষণের ইতিহাস অন্ত প্রদেশেও বিরল নহে। অবশ্য আমরা এই কথা বলিতে চাহি না যে আলিগড়ের ছাত্রদের উপরে গুলিবর্ষণ করাই এক-মাত্র সঙ্গত কাজ হইত। আমরা শুধু জানিতে চাই সরকারী কর্মচারীদের বিবেচনায় এই তারতম্য কেন? ইহা কি হঠাৎ অহিংসা নীতির পরিগ্রহণ না প্রচ্ছন্নভাবে লীগের বিদ্বেষ-নীতির সমর্থন? লাঠি অথবা কাঁদুনে গ্যাসের ব্যবহার সম্পর্কেও পুলিস কর্তৃপক্ষ হঠাৎ এত বিবেচনাসম্পন্ন হইয়া উঠিলেন কেন? ইহার গূঢ় মর্ম কি তাহা জানা বিশেষ প্রয়োজন।

যদি আমরা মনে করিতে পারিতাম যে এই হাঙ্গামা একটা সাময়িক উত্তেজনার ব্যাপার মাত্র তবে আমাদের এত উদ্বিগ্ন হইবার কারণ ছিল না। কিন্তু এই ঘটনা সম্পর্কে লীগ প্রতি-নিধিরা যে মনোভাব গ্রহণ করিয়াছেন তাহাতে আমাদের আশঙ্কা হয় এই ধরণের দাঙ্গাবাজি মুসলীম লীগের অনু-মোদিত কর্মতালিকার অন্তর্ভুক্ত। চৌধুরী খালিকুজ্জমান কংগ্রেস মন্ত্রিসভাকে শাসাইয়াছেন যে আলিগড়ের ব্যাপারে কোনরকম হস্তক্ষেপ করা চলিবে না। ভাইস-চ্যান্সেলার ডাক্তার জিয়াউদ্দিন নাকি গবর্ণরের নিকট সাহায্যের আবেদন করিয়া-ছেন। উচ্ছৃঙ্খল, অসংযত, বিকৃতরুচি ছাত্রদের সংযত করিবার চেষ্টা না করিয়া তাহাদের জন্ত লীগ ও বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের এই দরদ একান্ত দুঃখের বিষয়। আর ছাত্রদের এইরূপ বর্বরো-চিত আচরণও নূতন নহে। ট্রেনের যাত্রীগণ, রেলওয়ে কর্মচারী, দোকানদার এবং এমনকি রাস্তা-ঘাটে নারীদের উপর ইহাদের অশিষ্ট এবং অসংযত আচরণ সম্পর্কে বহুবার অভিযোগ শুনা গিয়াছে। আলিগড়ের সমস্যা বিশেষ গুরুতর এবং রিপোর্টে ঠিকই বলা হইয়াছে যে ইহা সরকারের নীতি সংক্রান্ত। আশা করি যুক্তপ্রদেশের গবর্মেণ্ট এই বিষয়ে যথোচিত ব্যবস্থা অবলম্বন করিতে কুণ্ঠিত হইবেন না।

বিভিন্ন শিল্প সরকারী কর্তৃত্বাধীনে আনয়নের জন্য আসাম সরকারের উদ্যম

আসামের এক সরকারী বিজ্ঞপ্তিতে প্রকাশ যে, আসাম-সরকার কতকগুলি শিল্প জাতীয়করণের বিষয় বিবেচনা করিতেছেন। যে সকল শিল্প জাতীয়করণের প্রস্তাব করা হইয়াছে তাহা হইতেছে: ১। জলস্রোত নিয়ন্ত্রণপূর্বক উৎ-পাদিত বৈদ্যুতিক শক্তির ব্যাপক গঠন, ২। বস্ত্রশিল্প, ৩। শর্করা ও সুরা, ৪। পাট, ৫। কাগজ, তুলা, পেষ্টবোর্ড প্রভৃতি ৬। রংশিল্প ও সেলুলয়েড, ৭। কাঁচ শিল্প, ৮। হাল্কা ধরণের যন্ত্রপাতি উৎপাদন, ৯। কষ্টিক সোডা ও আলকাতরা ইত্যাদি। ইহাদের মধ্যে বস্ত্রশিল্পের জন্য ভারত-সরকার ইতিমধ্যেই আসামের জন্য একটি অংশ বরাদ্দ করিয়াছেন। অন্যান্য শিল্পের জন্য বরাদ্দ যথাসময়ে করা হইবে। সরকারী বিজ্ঞপ্তিতে বলা হইয়াছে সরকারী প্রস্তাবের মর্মার্থ হইতেছে এই যে, এই সমস্ত শিল্পের বিস্তার ও উন্নতির সর্বপ্রকার প্রচেষ্টা রাষ্ট্রের বিষয়াধীনই হইবে—কোনরূপ ব্যক্তি বা গোষ্ঠীগত সম্পদ হইতে পারিবে না। সরকারী বিজ্ঞপ্তিতে আরও বলা হইয়াছে যে, আসাম-সরকার উপরোক্ত শিল্পগুলি ছাড়া অন্যান্য কতকগুলি চালু শিল্প যথা—সিমেণ্ট, দেশলাই, পেট্রল, প্লাইউড ও করাতকল এবং চর্মশিল্প প্রভৃতিকেও জাতীয়-করণের বিষয় বিবেচনা করিতেছেন। এই উভয়বিধ শিল্প ব্যতীত অন্য যে কোন নূতন শিল্প প্রতিষ্ঠান গঠন বা চালু কোন শিল্পের প্রচারের জন্য যাহাতে দশ লক্ষ টাকার অধিক মূলধন খাটানো হইবে তাহাই রাষ্ট্র কর্তৃক পরিচালিত হইবে। আসাম-সরকার এই সমস্ত শিল্প সম্বন্ধেই তাঁহাদের অবলম্বনীয় নীতি শীঘ্রই ঘোষণা করিবেন। সরকারী বিজ্ঞপ্তিতে ইহাও স্পষ্ট ভাবে বিবৃত হইয়াছে যে, এই বিজ্ঞপ্তি প্রচারের পর প্রতিষ্ঠিত যে কোন শিল্প প্রতিষ্ঠানই গবর্মেণ্ট প্রয়োজন মনে করিলে আংশিক বা সম্পূর্ণভাবে রাষ্ট্রের আয়ত্তাধীন করিতে পারিবেন।

আসামের যে জিনিষটি সর্বাগ্রে সরকারের হাতে আনা উচিত ছিল, উপরোক্ত বিজ্ঞপ্তিতে সেইটিই বাদ দেওয়া হইয়াছে। ইহা অনিচ্ছাকৃত ত্রুটি নহে, জানিয়া শুনিয়াই চা-বাগানগুলিকে তালিকার ধরা হয় নাই। ইংরেজ বণিকদের স্বার্থে হস্তক্ষেপ না করায় তাঁহাদের মুখপত্র সন্তোষ প্রকাশ করিয়াছেন। কিন্তু দেশবাসী বিস্মিত হইয়া ভাবিবে এই প্রহসনের কি প্রয়োজন ছিল? তালিকায় যে সব কারখানার নাম করা হইয়াছে আসামে তাহাদের সংখ্যা ও আয়তন উভয়ই নগণ্য। সেখান-কার অর্থনৈতিক জীবনের সর্বপ্রধান কেন্দ্র চা-বাগান এবং এখানেই শ্রমিকদের উপর অন্যায় ও অবিচার হয় সবচেয়ে বেশী। চা-বাগানের আয়ের কোটি কোটি টাকা প্রতি বৎসর বিদেশে চলিয়া যায় এবং এই বাগানগুলির মালিকানা স্বত্বের বলে ইংরেজ মালিকেরা আসামের রাজনৈতিক জীবনে হস্ত-ক্ষেপ করিবার সাহস পায়। চা-বাগানগুলিকে রাষ্ট্রীয় সম্পত্তিতে পরিণত করিবার ক্ষমতা কংগ্রেসের আছে জনসাধারণ ইহা বিশ্বাস করিত। এ বিষয়ে বরদলৈ মন্ত্রিসভা অত্যন্ত দুর্বলতার পরিচয় দিয়াছেন।

খাদ্যসঙ্কট ও ভারতের খাদ্যবরাদ্দ

কিছুকাল যাবৎ পৃথিবীর খাদ্যসমস্যা এবং বিশেষ করিয়া ভারতবর্ষের জন্ত খাদ্যবরাদ্দ ব্যবস্থা সম্পর্কে অভিজ্ঞ মহলে তীব্র বাদবিতণ্ডা চলিতেছে। এই উত্তর-প্রত্যুত্তরের অভিনয়ে আমে-রিকান কর্তৃপক্ষ ও ভারতীয় খাদ্য প্রতিনিধি দলই বিশেষ ভাবে যোগদান করিয়াছেন। অবশ্য ইংরেজ প্রভুরাও মাঝে মাঝে মত-

প্রকাশ করিতে বিরত হন নাই। এক দিকে যখন দুর্ভিক্ষ ও মৃত্যুর করাল ছায়া ভারতবর্ষকে ঢাকিয়া ফেলিতেছে তখন এই সকল মুখর ভাষণের গতিপ্রকৃতি পর্যালোচনা করিলে আন্তর্জাতিক রাজনীতি এবং পারস্পরিক মনোভাবের ধারাটা বুঝিতে পারা যাইবে।

প্রথমেই আরম্ভ করা যাউক কিছুকাল আগের ভারতীয় খাদ্য ডেলিগেশনের আমেরিকা যাত্রা হইতে। তাঁহারা গিয়া সম্মিলিত খাদ্য সমিতির (Combined Food Board) নিকট ভারতের প্রয়োজনের কথা জানাইলেন। ডেলিগেশনের অন্যতম সদস্য সর রামস্বামী মুদালিয়র ফিরিয়া আসিয়া জানাইলেন যে তাঁহারা খাদ্য সমিতির নিকট হইতে ভারতের জন্য ১,৪০০,০০০ টন গম বরাদ্দের ব্যবস্থা করিয়া আসিয়াছেন।

চতুর্দিকেই যখন খাদ্যাভাব সম্বন্ধে উদ্বেগ দেখা যাইতে লাগিল তখন প্রেসিডেন্ট ট্রুম্যান ঘোষণা করিলেন যে তিন মাসের মধ্যে খাদ্যসঙ্কট দূর হইয়া যাইবে। খাদ্যাবস্থা সম্পর্কে এই আশ্বাস দেওয়ার মূলে ছিল খাদ্যসঙ্কট সম্পর্কে ইচ্ছাকৃত অথবা অনিচ্ছাকৃত ভ্রান্ত ধারণা। কারণ ইহার কিছু দিন পরেই যুক্তরাষ্ট্রের কৃষি বিভাগের সেক্রেটারী মিঃ এণ্ডারসন এক বিবৃতি প্রসঙ্গে বলিলেন যে এই বৎসরের ভারতীয় খাদ্যসঙ্কট গতবারের বাংলাদেশের দুর্ভিক্ষের মত ভয়াবহ হইবে না।

এই ধরণের অবাস্তব আশাবাদের প্রতিবাদ নানা দিক হইতেই করা হইল। পূর্ব-এশিয়ার পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণ করিয়া ফিরিয়া আসিয়া আন্তর্জাতিক সঙ্কটত্রাণ সমিতির ডেপুটি ডিরেক্টর-জেনারেল মিঃ হেনড্রিকসন সংবাদপত্রে এক বিবৃতি প্রসঙ্গে বিশেষ জোরের সহিত বলিলেন যে বর্তমান বৎসরের ভারতীয় খাদ্য-পরিস্থিতি পূর্বেকার দুর্ভিক্ষ হইতেও গুরুতর এবং পশ্চিম দেশসমূহ হইতে খাদ্য না পাইলে ভারতবর্ষে গত বার অপেক্ষা এই বার আরও বেশী লোক মৃত্যুমুখে পতিত হইবে। তিনি আরও বলিলেন যে চল্লিশ লক্ষ টন খাদ্য সংগ্রহ করিতে না পারিলে অল্পকালের মধ্যেই পঞ্চাশ লক্ষ হইতে দেড় কোটি লোক প্রাণ হারাইবে। প্রেসিডেন্ট ট্রুম্যান এবং মিঃ এণ্ডারসনের উক্তি সম্পর্কে ব্রিটিশ সরকারী মহল হইতেও তীব্র সমালোচনা শোনা গেল; ইণ্ডিয়া অফিসের এক উচ্চপদস্থ কর্মচারী মন্তব্য করেন যে ওয়াশিংটন হইতে প্রাপ্ত বিবৃতিসমূহ রীতিমত হাস্যকর। ব্রিটিশ মহল হইতে আরও জানা গেল যে মে এবং জুন মাসে যদি ভারতবর্ষ আমেরিকা হইতে গম পায় তবে তাহা খুবই সামান্য এবং সম্ভবতঃ এই দুই সঙ্কটপূর্ণ মাসে আমেরিকা হইতে গম একেবারেই ভারতবর্ষে যাইবে না।

আমেরিকার সাহায্য সম্পর্কে যখন এই সকল নিরাশার কথা শুনা যাইতেছে তখন প্রেসিডেন্ট ট্রুম্যান তাঁহাদের সাহায্যব্যবস্থার পরিমাণ এবং নীতি জানাইয়া বলিলেন যে তাঁহারা এইবার কথাবার্তার অধ্যায় ছাড়াইয়া আসল কাজ আরম্ভ করিয়াছেন। তিনি জানাইলেন যে বর্তমান বৎসরের প্রথমার্ধে যুক্তরাষ্ট্র গবর্মেণ্ট ইউরোপ এবং এশিয়ার দুর্ভিক্ষ-প্রপীড়িত নরনারীর জন্য মাসে ১,০০০,০০০ টন গম রপ্তানী করিবার চেষ্টা করিতেছেন। এই ঘোষণার উত্তরে সঙ্কটত্রাণ সমিতির ভূতপূর্ব ডিরেক্টর-জেনারেল মিঃ লেহম্যান স্পষ্ট ভাষায় বলিলেন যে যুক্তরাষ্ট্রের এই সাহায্যব্যবস্থা মোটেই যথেষ্ট নহে এবং ইউরোপ ও এশিয়ার পঞ্চাশ কোটি লোকের পক্ষে মাসে দশ লক্ষ টন খাদ্য কিছুতেই পর্যাপ্ত নহে।

খাদ্যসঙ্কট সম্পর্কে আমেরিকার মতামত এবং সাহায্য-ব্যবস্থার কঠোর সমালোচনা করিয়া সোভিয়েট কাগজ 'নিউ টাইমস্'এ মিঃ এ. ডায়াকভ খোলাখুলি ভাবেই লিখিলেন যে ভারতবর্ষে যে বার বার দুর্ভিক্ষ ঘটে ইহার কারণ প্রাকৃতিক বিপর্যয়ই শুধু নহে। ভারতবর্ষকে সাহায্য করা সম্পর্কে ইঙ্গ-মার্কিন সংবাদপত্রসমূহে যে প্রচার হইতেছে সেই সম্পর্কে লেখক বলেন যে প্রস্তাবিত রিলিফ ব্যবস্থা জনসাধারণের দুঃখ-দুর্দশার সমুদ্রে একটি বিন্দুর বেশী আর কিছু নহে।

নানা দিক হইতে এই সকল সমালোচনা শুনিয়া প্রেসিডেন্ট ট্রুম্যান কিছু সচকিত হইলেন। তিনি বলিলেন যে, বিশ্বের খাদ্যসঙ্কট অত্যন্ত গুরুতর এবং এই সঙ্কট ইতিহাসের সর্বাপেক্ষা ভয়াবহ অনাহার ও দুর্ভিক্ষের আশঙ্কা লইয়া উপস্থিত হইয়াছে। এতকাল পরে যদিওবা যুক্তরাষ্ট্রের কর্তাদের কিছুটা বাস্তবজ্ঞান ফিরিয়া আসিল, কিন্তু এই সময় হইতে আন্তর্জাতিক রাজনীতির ঘোলাটে জল আসিয়া এই বাস্তবজ্ঞানকে বিকৃত করিয়া দিল। ফল হইল এই যে, ইহার পরে ট্রুম্যান এবং অন্যান্য আমেরিকান প্রতিনিধিগণ যে সকল বিবৃতি দিয়াছেন, সর্বত্রই ভারতবর্ষের সঙ্কটকে ধামাচাপা দিয়া ইউরোপের পরিস্থিতির উপরে বেশী জোর দেওয়ার প্রয়াস দেখা যায়। মিঃ হার্বার্ট হুভার যখন কায়রো হইতে ভারতাভিমুখে রওনা হইবার আয়োজন করিতেছিলেন তখন প্রেসিডেন্ট ট্রুম্যান সহসা তাঁহাকে দেশে ফিরাইয়া লইবার জন্য ব্যগ্র হইয়া উঠিলেন। এই আগ্রহের অর্থ অত্যন্ত পরিষ্কার। মুখে তিনি বলিলেন যে ইউরোপের পরিস্থিতির গুরুত্বের বিবেচনায় মিঃ হুভারের দেশে ফেরা প্রয়োজন। আসল উদ্দেশ্য এই যে ভারতবর্ষের খাদ্যাবস্থা মিঃ হুভার না দেখিলেই ভাল। মিঃ হুভার অবশ্য ভারতবর্ষে আসিলেন। কিন্তু আসিয়াই মামুলী সুরে বলিলেন, যে, ভারতের খাদ্যসঙ্কট ইউরোপের খাদ্যসঙ্কটের মত গুরুতর নয়। উপরন্তু আরও বলিলেন যে, বর্তমানে ভারতবর্ষে কোন দুর্ভিক্ষ নাই, তবে খাদ্য চালান না পাইলে অবশ্য দুর্ভিক্ষ হইবে। হুভার সাহেবকে ভারতবর্ষের বর্তমান এবং আসন্ন দুর্ভিক্ষের প্রমাণ দেওয়ার মত অনেক তথ্যই রহিয়াছে; কিন্তু যাহা হউক হুভার সাহেব নিজেও কয়েক দিন ভ্রমণ করিয়া কিছু অভিজ্ঞতা লাভ করিলেন এবং যুক্তরাষ্ট্রে এক তার করিয়া জানাইলেন যে, ভারতবর্ষ এক চরম বিপদের সম্মুখীন

হইয়াছে এবং অবিলম্বে ভারতকে সর্বতোভাবে সাহায্য করা প্রয়োজন।

ইহা সত্ত্বেও আমেরিকার নীতির কোন লক্ষণীয় পরিবর্তন ঘটে নাই এবং ভারতবর্ষের অবস্থা সম্বন্ধে আমেরিকার উদাসীনতা পূর্ববৎই আছে। ইউরোপের জন্ত আমেরিকার দরদের সীমা নাই, অথচ ভারতবর্ষের দুর্দশা সম্পর্কে এই উদাসীনতার কারণ কি? প্রথম কারণ চিরাচরিত এবং তাহা এই যে, ইংরেজ বা আমেরিকানরা মুখে যাহাই বলুক ভারতবর্ষের অন্নে স্ফীত হইয়া ভারতের ক্ষতি সাধন করিতে কেহই কম যায় না। ইহা ছাড়া ইউরোপের জন্য অপরিসীম দরদের অন্য কূটনৈতিক কারণও অবশ্য আছে। ইউরোপে আজ ইঙ্গ-মার্কিন প্রভাব ক্রমশই ক্ষীণায়মান এবং সোভিয়েটের ক্রমবর্দ্ধমান প্রতিপত্তি পুঁজিবাদী ইঙ্গ-মার্কিন মহলের বিশেষ উদ্বেগের বিষয়। পোল্যাণ্ড আর ফ্রান্সে যে রাজনৈতিক প্যাঁচকষাকষি সুরু হইয়াছে তাহা এই খাদ্যসাহায্যকে আশ্রয় করিয়াই ঘনাইয়া উঠিতেছে। সাম্যবাদের বিভীষিকাকে দূর করিবার জন্য আমেরিকা ও ব্রিটেন যে ভারতবর্ষকে ভুলিয়া ইউরোপের দুঃখে গলিয়া যাইবে ইহা আর বিচিত্র কি? আর এই আমেরিকাই আন্তর্জাতিক সঙ্কটত্রাণ সমিতির কর্ণধার!

এই প্রসঙ্গেই মনে পড়ে ভারতের খাদ্যবরাদ্দ লইয়া সাম্প্রতিক বাদবিতণ্ডার কথা। আমরা রামস্বামী মুদালিয়রের কথামত ১,৪০০,০০০ টন গমের আশায় দিন গুনিতেছিলাম। হঠাৎ গত ১৮ই এপ্রিল তারিখে বিখ্যাত লেখিকা এবং "ইণ্ডিয়া ফেমিন এমারজেন্সী কমিটির" সভানেত্রী পার্ল বাক্ এক চাঞ্চল্যকর বিবৃতি প্রকাশ করিলেন। তিনি জানাইলেন যদিও সংবাদপত্রসমূহে প্রচারিত হইয়াছে যে কম্বাইণ্ড ফুড বোর্ড হইতে ভারতবর্ষ ১,৪০০,০০০ টন গম আগামী ছয় মাসে পাইবে, উল্লিখিত কমিটি জানিতে পারিয়াছেন যে এই ধরণের কোন বরাদ্দই এই পর্যন্ত ফুড বোর্ড কর্তৃক হয় নাই।

ইহার পরে আমেরিকার ইণ্ডিয়া লীগের সভাপতি মিঃ জে. জে. সিং ভারতীয় খাদ্য-প্রতিনিধি দল সম্পর্কে এক অতীব গুরুতর অভিযোগ করেন। প্রথমতঃ তিনি বলেন ১লা জুলাইয়ের মধ্যে ১,৪০০,০০০ টন গম পাইবার আশা ভারতবর্ষ কোন রকমে করিতে পারে না। খুব বেশী হইলে বড় জোর ৮০০,০০০, টন খাদ্য ঐ তারিখের মধ্যে ভারতে পৌঁছিতে পারে। তিনি আরও বলেন যে ভারতীয় খাদ্য-প্রতিনিধি দল যদিও প্রকাশ্য বিবৃতিসমূহে ২,০০০,০০০ টন গমের দাবি জানান, কিন্তু ব্যক্তিগত আলাপ-আলোচনায় তাঁহারা এই মত প্রকাশ করেন যে ভারতবর্ষের আসল প্রয়োজনীয়তা ইহা অপেক্ষা অনেক কম।

ভারতের খাদ্য-প্রতিনিধি দলের এই চমকপ্রদ কীর্তিকলাপ যে বিশেষ লজ্জাকর সন্দেহ নাই। ভ্রান্ত ধারণা বশতঃ অথবা অসাবধান কথাবার্তার ফলে যদি এই ব্যাপার ঘটিয়া থাকে তবে তাহাও কোনোক্রমেই মার্জনীয় নহে। অবশ্য এই দলের মুখপাত্রগণ আত্মপক্ষসমর্থনের জন্য অনেক কথাই বলিয়াছেন।

প্রথমেই প্রতিবাদ আসে সর্ জে. পি. শ্রীবাস্তবের নিকট হইতে। তিনি বলেন যে, খাদ্য-প্রতিনিধি দলের বিবৃতিতে কোন ভুল নাই এবং ব্রিটিশ খাদ্য-মন্ত্রী সর্ বেন স্মিথই এই ১৪,০০,০০০ টন বরাদ্দের কথা জানান। সর্ এস. ভি. রামমূর্তি এক বিবৃতি প্রসঙ্গে বলেন যে, সর্দার জে. জে. সিঙের মন্তব্য একেবারেই ভ্রান্ত সংবাদের উপরে প্রতিষ্ঠিত এবং সর্দার সিঙের উচিত ছিল এই সকল ভ্রান্ত সংবাদ প্রচার না করিয়া সম্পূর্ণ অবজ্ঞা করা। সর্ রামস্বামী মুদালিয়রও এক বিবৃতিতে উল্লিখিত অভিযোগের প্রতিবাদ করেন এবং বলেন যে, মিঃ সিঙের সংবাদ যেখান হইতেই আসুক, উহা একটি দুষ্ট মিথ্যা প্রচার মাত্র। এই মন্তব্যের উত্তরে সর্দার জে. জে. সিং বলেন যে, সর্ রামস্বামীর উচিত ছিল তাঁহাকে আক্রমণ না করিয়া এই অভিযোগ সম্পর্কে যথোচিত প্রতিবিধানের ব্যবস্থা অবলম্বন করা।

শেষ পর্যন্ত ওয়াশিংটন হইতে প্রাপ্ত এক সংবাদে জানা গেল যে কম্বাইণ্ড ফুড বোর্ড হইতে ১,৪০০,০০০ টন বরাদ্দ সম্পর্কে যে বিবৃতি খাদ্য-প্রতিনিধি দল প্রদান করিয়াছেন তাহার মূলে কোন সরকারী স্বীকৃতি নাই এবং প্রাথমিক আলাপ-আলোচনার উপরে ভিত্তি করিয়াই খাদ্য-প্রতিনিধি দল এই মন্তব্য করিয়াছেন।

এখন ক্রমাগত চেষ্টা হইতেছে ভারতের খাদ্যবরাদ্দ কমাইয়া আনিবার জন্য। কম্বাইণ্ড ফুড বোর্ডের কর্তারা এবং যুক্তরাষ্ট্রের তথাকথিত ভারত-বন্ধুগণ ক্রমশই চেষ্টা করিতেছেন কি করিয়া ভারতবর্ষকে ঠকাইয়া সমস্ত খাদ্য অন্যত্র চালান দিয়া রাজনৈতিক স্বার্থ বজায় রাখা যায়। সর্ মনিলাল নানাবতী সত্যই বলিয়াছেন যে আমেরিকার আচরণ লজ্জাকর। তিনি আরও জানাইয়াছেন যে আমেরিকাবাসিগণ মনে করে যে ভারতবর্ষে দুর্ভিক্ষ যখন নিত্যনৈমিত্তিক ঘটনা তখন এই বৎসর আর একবার দুর্ভিক্ষ ঘটিলেও কিছু আসে যায় না।

আন্তর্জাতিক সঙ্কটত্রাণ সমিতি এবং কম্বাইণ্ড ফুড বোর্ডে এখনও আলাপ-আলোচনা চলিতেছে। ডাঃ ভি. কে. আর. ভি. রাও যে দাবি জানাইয়াছেন তাহা আমরা পূর্ণভাবে সমর্থন করি। তিনি বলিয়াছেন যে মে মাসের জন্য ৫ লক্ষ টন খাদ্য-বরাদ্দকে যদি কোনক্রমে কমানো হয় তবে জুনের তৃতীয় সপ্তাহের মধ্যে ভারতের রেশন-ব্যবস্থা প্রায় অচল হইবে এবং এক আঘাতে ভারতের অন্ততঃ ১০০,০০০,০০০ লোককে অনাহারে দিন যাপন করিতে হইবে।

যথেষ্ট খাদ্যবরাদ্দের জন্য আমাদের এই দাবি ভিক্ষা নয়। বরাদ্দের সমুদয় খাদ্যই আমরা টাকা দিয়া কিনিব। যে সঙ্কটত্রাণ সমিতিতে ভারতবর্ষ প্রথম বারেই ৮ কোটি টাকা দান

করিয়াছে সেই সমিতির এই উদাসীনতা লক্ষ্য করিবার বিষয় বটে। যে আমেরিকায় হাজার হাজার সৈন্যকে ভারতবর্ষ খাদ্যসম্ভার দিয়া ভারতবর্ষের মাটিতে আশ্রয় দিয়াছে সেই আমেরিকা আজ তাহার সর্বনাশ করিতে বিন্দুমাত্র কুণ্ঠাবোধ করিতেছে না। ইংরেজ আমেরিকার পরমমিত্র, কাজেই ইংরেজের শত্রু ভারতবর্ষকে মরণের মুখে ঠেলিয়া দিতে আমেরিকা দ্বিধা বোধ করিতেছে না।

রেল ধর্মঘটের নোটিশ

ভারতীয় রেলওয়ের সমস্ত কর্মচারী ২৭শে জুন হইতে ধর্মঘট করিবার সঙ্কল্প করিয়াছেন এবং তদনুসারে কর্তৃপক্ষকে নোটিশও দিয়াছেন। বেতন ও ভাতাবৃদ্ধি ইঁহাদের সর্বপ্রধান দাবি। রেলওয়ে বোর্ড প্রত্যুত্তরে জানাইয়াছেন যে কর্মচারীদের দাবি পূরণ করিতে গেলে যত টাকার প্রয়োজন তত টাকা পাওয়া সম্ভব নহে। এখানে কর্মচারীদের সহিত বিরোধ রেলওয়ে বোর্ডের, উভয়েই এই বিরোধে সংশ্লিষ্ট পক্ষ। রেলওয়ে বোর্ডের বিচারের উপরও দেশের লোকের আস্থা নাই। সুতরাং কর্মচারীদের দাবির উত্তরে তাঁহাদের বক্তব্যকেই লোকে চূড়ান্ত বলিয়া মানিয়া লইতে পারিবে না। এখানে নিরপেক্ষ সালিশী নিয়োগের একান্ত প্রয়োজন আছে, এরূপ সালিশী ভিন্ন বর্তমান বিরোধের সুমীমাংসা হইতে পারে না।

রেলওয়ে কর্মচারীদের সম্পর্কেও আমাদের কিছু বক্তব্য আছে। যুদ্ধের কয় বৎসরে ইঁহারা শুধু যে সর্বপ্রকারে ইংরেজের সহায়তা করিয়াছেন তাহা নহে, যাত্রীদের উপর যে অত্যাচার ইঁহারা করিয়াছেন তাহা ভুলিয়া যাওয়া খুব সহজ নহে। দুর্ভিক্ষের সময় সামান্য কিছু চাউল কোন প্রকারে যাহারা সংগ্রহ করিয়া রেলে চড়িবার দুঃসাহস করিয়াছে বহু রেল কর্মচারী তাহাদিগকে পুলিসে দিবার ভয় দেখাইয়া এই সব দুর্ভিক্ষপীড়িত লোকের নিকট হইতে ঘুষ আদায় করিতে দ্বিধা করে নাই। স্টেশনে টিকিট ফুরাইয়া যাওয়া রেল পরিচালনার এক অঙ্গ হইয়া দাঁড়াইয়াছিল, এখনও উহা চলিতেছে। টিকিট কিনিতে গিয়া না পাইয়া যাহারা বিনা টিকিটে রেলে চড়িতে বাধ্য হইয়াছে, তাহাদের নিকট হইতে ঘুষ বাবদ যথার্থ মাশুলের চেয়ে অনেক বেশী আদায় করা হইয়াছে। মালের ভাড়া চার্জ করিবার নামে ঘুষ আদায় ত নিত্যনৈমিত্তিক ব্যাপার ছিল। তা ছাড়া সিভিল সাপ্লাইয়ের লোকেরা যাত্রীদের বোঁচকা খুলিয়া চিনি, চাউল প্রভৃতির তল্লাস করিয়া যখন তাহাদের উপর অত্যাচার করিয়াছে ও ঘুষ লইয়াছে, রেল কর্মচারীদের তখন অগ্রসর হইয়া যাত্রীদের সাহায্য করিতে তো দেখাই যায় নাই, বরং ভাগ আদায়ের আগ্রহই দেখা গিয়াছে। স্টেশনে কুলির উৎপীড়নের কোন প্রতিকার ইঁহাদের নিকট হইতে পাওয়া যায় নাই। ধর্মঘট করিতে গেলে যাত্রীদের সহানুভূতি একান্ত প্রার্থনীয় ইহাতে সন্দেহমাত্র নাই। ট্রাম ধর্মঘট প্রভৃতি ব্যাপারে আমাদের এই অভিজ্ঞতা হইয়াছে যে ধর্মঘটী কর্মচারীরা ধর্মঘটের সময়টুকুই শুধু যাত্রীদের নিকট নরম থাকে, ধর্মঘট মিটিবার সঙ্গে সঙ্গে আবার তাহাদের পুলিসী মেজাজ ফিরিয়া আসে। রেল কর্মচারীদের বেলায় ইহা চলিবে না। কারণ এত বড় ও ব্যাপক সর্বভারতীয় ধর্মঘট যাত্রী সাধারণের আন্তরিক সহানুভূতি ভিন্ন কিছুতেই সফল হইতে পারে না। সুতরাং ধর্মঘট করিবার আগে এখন হইতেই যাত্রীদের প্রতি সহানুভূতিসম্পন্ন ব্যবহার করিয়া পূর্বকৃত অন্যায়ের কথঞ্চিৎ প্রায়শ্চিত্তও সুরু হওয়া উচিত।

রেল ধর্মঘট যে সময়ে আরম্ভ হইবে বলিয়া জানান হইয়াছে আমাদের মতে তাহাও সমীচীন হয় নাই, ইহাতে কয়েক লক্ষ কর্মচারীর সুবিধা হইতে পারে কিন্তু দেশের কোটি কোটি লোকের সমূহ বিপদের এমন কি প্রাণহানির আশঙ্কাও রহিয়াছে। যুদ্ধের সময় ধর্মঘট করিলে ইঁহারা সকল দাবি আদায় করিতে পারিতেন ইহা আজ সর্বজনস্বীকৃত সত্য। বোম্বাইয়ের শ্রমসচিব শ্রীযুক্ত গুলজারীলাল নন্দ বলিয়াছেন যে যুদ্ধের সময় ধর্মঘট না করা রেল কর্মচারীদের পক্ষে খুব ভুল হইয়াছে। ইংরেজের যুদ্ধে ইংরেজকে ব্যতিব্যস্ত না করিবার জন্য যাঁহারা সেদিন ধর্মঘট করেন নাই, তাঁহারা এক ভয়াবহ দুর্ভিক্ষের মুখে ধর্মঘট করিয়া কোটি কোটি মানুষের জীবন বিপন্ন করিতে কেন অগ্রসর হইয়াছেন ইহা লোকে স্বভাবতঃই জিজ্ঞাসা করিতে পারে। ইংরেজের যুদ্ধে রেল বন্ধ হইলে দেশবাসীর লাভ ছাড়া কোন লোকসান ছিল না; কিন্তু ২৭শে জুন ধর্মঘট সুরু হইলে দেশের লোকেরই মহা বিপদ হইবে, ইহাতে ইউরোপের কিছুমাত্র লোকসান নাই, দুর্নামেরও ভয় নাই। রেল ধর্মঘটের জন্য খাদ্য চলাচল বন্ধ হইয়া দুর্ভিক্ষে লোক মরিলে তার দায়িত্ব ইংরেজের ঘাড়ে ততটা চাপিবে না, যতটা চাপিবে কর্মচারীদের নিজেদের উপর। এই ধর্মঘটের তারিখ নিশ্চিত ভাবে প্রকাশিত হইবার সঙ্গে সঙ্গে চোরাকারবারীদের সুবিধা হইবে, খাদ্যশস্য আটকাইয়া ইহারা দশ গুণ দরে বিক্রয় করিবার সুযোগ পাইবে। যুদ্ধের মুখে রেলকর্মচারীদের যে সব নেতা ধর্মঘটের পরামর্শ দেন নাই, দুর্ভিক্ষের সময় রেল বন্ধ করিবার পরামর্শ দিয়া তাঁহারা যে সর্বনাশ করিতে চলিয়াছেন এখনও তাহা ভাবিয়া দেখিবার সময় আছে।

কেন্দ্রে জাতীয় সরকার প্রতিষ্ঠার সম্ভাবনা এখনও দূর হয় নাই, উহার যথেষ্ট সম্ভাবনা এখনও রহিয়াছে। যুদ্ধের পাঁচ বৎসর যাহারা অপেক্ষা করিতে পারিয়াছেন, তাঁহারা আর কয় মাস অপেক্ষা করিতে পারেন না ইহা মনে করা কঠিন। ভারতীয় রেল-পরিচালন ব্যবস্থায় গুরুতর গলদ আছে। আমাদের দেশের রেল পরিচালনার সকল পরিকল্পনা ইংরেজের প্রয়োজন বুঝিয়া প্রস্তুত হইয়াছে। কর্মচারীদের বেতনও সেই হিসাবেই নির্দিষ্ট হইয়াছে। এ দেশে ইঞ্জিন, মালগাড়ী প্রভৃতি নির্মিত হইলে এবং অত্যাবশ্যক সরঞ্জাম বাজার

যাচাই করিয়া যেখানে সস্তায় মিলিবে সেখান হইতে কেনা হইলে প্রতি বৎসর রেলের বহু কোটি টাকা বাঁচিয়া যাইবে ইহা নিশ্চিত। এইভাবে রেলের খরচের সমস্ত দিক ভাল করিয়া অনুসন্ধান করিলে জাতীয় সরকারের পক্ষে নিম্ন-বেতনের কর্মচারীদের বেতন বৃদ্ধির জন্য টাকা বাহির করা খুব কঠিন নয় বলিয়াই আমরা মনে করি। এই কারণেই আমাদের বিশ্বাস মৌলানা আজাদের আবেদন শিরোধার্য করিয়া রেল কর্মচারীদের পক্ষে আরও কিছুকাল ধৈর্য ধারণ করা উচিত। দুর্ভিক্ষের মুখে ধর্মঘট চূড়ান্ত অপরিণামদর্শিতার কাজ হইবে।

শ্রীনিবাস শাস্ত্রী

শ্রীনিবাস শাস্ত্রী পরিণত বয়সে পরলোকগমন করিয়াছেন। যদিও শাস্ত্রীজি দীর্ঘ ও সার্থক জীবন যাপন করিয়া লোকান্তরিত হইয়াছেন তথাপি দেশের এই চরম সন্ধিক্ষণে তাঁহার ন্যায় শক্তিমান পুরুষের অভাব বিশেষ ক্ষতির বিষয়।

শাস্ত্রীজি ছিলেন গোপালকৃষ্ণ গোখলের উপযুক্ত শিষ্য এবং এই শিষ্যত্বের মর্যাদা তিনি কোনো কালেই ক্ষুণ্ণ করেন নাই। যে শিক্ষকতার ব্রত তিনি প্রথম জীবনে গ্রহণ করিয়াছিলেন, সেই ব্রতের অনির্বাণ দীপশিখা তাঁহার সুদীর্ঘ জীবনের প্রতিটি মুহূর্তকে উদ্ভাসিত করিয়াছে। দেশের শিক্ষাব্যবস্থার সঙ্গে তাঁহার সংযোগ কোনো কালেই ছিন্ন হয় নাই; মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্তও তিনি আন্নামালাই বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস-চ্যান্সেলরের পদ অলঙ্কৃত করিয়াছিলেন।

১৯০৭ সনে শাস্ত্রীজি "সার্ভেন্ট অব্ ইণ্ডিয়া সোসাইটি"তে যোগ দেন। ১৯১৫তে এই সমিতির সভাপতিরূপে তিনি কাজ করিতে আরম্ভ করেন এবং ১৯২৭ পর্যন্ত এই দায়িত্বপূর্ণ কাজ তিনি বিশেষ যোগ্যতার সহিত পরিচালনা করেন। ভারতের শাসনতান্ত্রিক আলোচনায় তাঁহার ডাক পড়িত সর্বাগ্রে। কারণ তাঁহার তীক্ষ্ণ বিবেচনাশক্তি, প্রগাঢ় দূরদৃষ্টি এবং গভীর মানসিক সংযম এই সকল আলোচনার পক্ষে অমূল্য বলিয়া পরিগণিত হইত। শাস্ত্রীজি তাঁহার দীর্ঘ জীবনে বহুকাজ সম্পন্ন করিয়া গিয়াছেন এবং সর্বত্রই তাঁহার মনীষা ও চরিত্রবলের ছাপ রাখিয়া গিয়াছেন। মাদ্রাজ ব্যবস্থা-পরিষদের সদস্য হিসাবে, প্রিভি কাউন্সিলের সদস্য হিসাবে, বিভিন্ন ডোমিনিয়নে ভারত-সরকারের প্রতিনিধি হিসাবে, দক্ষিণ আফ্রিকায় ভারতীয় এজেন্ট হিসাবে তাঁহার কর্মনিপুণতার ইতিহাস তাঁহার অক্লান্ত কর্মশক্তির পরিচায়ক।

রাজনৈতিক ক্ষেত্রে শাস্ত্রীজি ছিলেন 'লিবার্যালিজমের' কর্ণধার। উদারনৈতিক দলের বিশিষ্ট নেতা হিসাবে তাঁহার নাম ভারতের রাজনৈতিক ইতিহাসে স্মরণীয় হইয়া থাকিবে। বিপ্লবী ভাবাদর্শের যে প্লাবন সমগ্র দেশকে নাড়া দিয়াছিল, শাস্ত্রীজির লিবার্যাল বিশ্বাসে তাহা ভাঙন ধরাইতে পারে নাই। দেশের সামাজিক বিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে ভাবাদর্শের পরিবর্তন ঘটিয়াছে। শাস্ত্রীজির রাজনৈতিক বিশ্বাস বর্তমান সময়ে হয়ত যথেষ্ট প্রগতিশীল বলিয়া মনে হইবে না। কিন্তু এই কথাও মনে রাখিতে হইবে যে তিনি নিজেও আগষ্ট-আন্দোলনের পর হইতে তাঁহার রাজনৈতিক মতামতে অনেক অগ্রসর হইয়াছিলেন।

শাস্ত্রীজির জীবন ছিল অশ্রান্ত সাধনা, একনিষ্ঠ আদর্শবাদ, তীক্ষ্ণ বুদ্ধিমত্তা এবং অম্লান চরিত্রবলের প্রতীক। তাঁহার জীবনের আদর্শ যে সত্যনিষ্ঠার সঙ্গে গ্রথিত ছিল সেই সত্য-নিষ্ঠার প্রেরণা ভারতবাসীকে দুঃখের দিনে আশার সন্ধান দিবে।

ভুলাভাই দেশাই

শাস্ত্রীজির মৃত্যুর অল্পকালের মধ্যেই ভারতের আর এক বিশিষ্ট রাজনীতিজ্ঞের লোকান্তর ঘটিয়াছে। ভুলাভাই দেশাইর পরলোকগমনে ভারতের রাজনৈতিক জীবন বিশেষভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে। আইন শাস্ত্রের গভীর পাণ্ডিত্যে, তীক্ষ্ণ বুদ্ধিমত্তায় এবং ব্যক্তিত্বের প্রখরতায় ভুলাভাই ভারতবর্ষের রাজনৈতিক ও সামাজিক ক্ষেত্রে এক জন বিশিষ্ট ব্যক্তি ছিলেন। ছেলেবেলা হইতেই তাঁহার প্রখর বুদ্ধির পরিচয় পাওয়া যায় এবং এম. এ. পাস করিবার পর তিনি ইতিহাস ও অর্থনীতির অধ্যাপক হিসাবে কাজ আরম্ভ করেন। দুই বৎসর পরেই অধ্যাপনা ছাড়িয়া তিনি আইন-ব্যবসায়ে প্রবেশ করেন এবং অতি অল্পকালের মধ্যেই একজন প্রতিভাসম্পন্ন আইনজ্ঞ বলিয়া পরিচিত হন। তাঁহার জীবনে রাজনৈতিক আন্দোলনের ঢেউ আসিয়া আঘাত করিল বারদৌলি কিষাণ সত্যাগ্রহের সময়। ১৯২৮ এবং ১৯৩১ সনে তিনি কিষাণদের পক্ষ সমর্থনকালে তাঁহার গভীর আইনজ্ঞানের পরিচয় দেন। ইহার পর হইতেই তাঁহার জীবন কংগ্রেস আন্দোলনের সঙ্গে একসূত্রে গ্রথিত হইয়া যায়। কংগ্রেস-মহলের নেতৃবৃন্দ তাঁহাকে অত্যন্ত শ্রদ্ধার চোখে দেখিতেন, এবং দেশাই-লিয়াকৎ আলী চুক্তির ফলে অনেকের সঙ্গে তাঁহার মতভেদ ঘটিলেও কংগ্রেসের নেতৃবৃন্দের সঙ্গে তাঁহার নিবিড় সম্পর্ক কোনো কালেই ছিন্ন হয় নাই।

আজাদ হিন্দ ফৌজের বিচারে যখন সমগ্র দেশ আলোড়িত হইল তখন কংগ্রেস পক্ষ হইতে আজাদ হিন্দ ফৌজের সমর্থনের নেতৃত্ব গ্রহণ করিলেন ভুলাভাই। আজাদ হিন্দ ফৌজের বিচারের কালে তিনি যে সুগভীর আইন-প্রতিভার পরিচয় দিয়াছেন তাহা যে-কোন আইনজ্ঞের পক্ষে গৌরবের বস্তু।

ভুলাভাই নানা প্রকারে দেশের সেবা করিয়া গিয়াছেন। কংগ্রেসের জটিল গবেষণাসমূহে তাঁহার দান, কংগ্রেস পার্লামেণ্টারী দলের নেতা হিসাবে তাঁহার বাগ্মিতা, এবং সর্বোপরি আজাদ হিন্দ ফৌজের সমর্থনকালে তাঁহার যুক্তিশীলতা দেশের ইতিহাসে তাঁহাকে অমর করিয়া রাখিবে।

আমরা ভারতের এই বিখ্যাত জননায়কের আত্মার কল্যাণ কামনা করি এবং তাঁহার শোকসন্তপ্ত পরিবারবর্গকে সহানুভূতি ও সান্ত্বনা জানাই।

শাহজাদা দারাশুকোর জীবন-কাহিনী

শ্রীকালিকারঞ্জন কানুনগো

প্রথম অধ্যায়

বাল্য ও কৈশোরের ঐতিহাসিক পটভূমিকা

১

১৬১৫ খ্রীষ্টাব্দের বসন্তকাল। আকাশে-বাতাসে মোগল সাম্রাজ্যে আনন্দের অধীর স্পন্দন, জাঁহাগীর-রাজত্বের দশম বার্ষিক "নওরোজে"র ঈদ্ আগতপ্রায়—সূর্য্যদেবের মেষ-রাশিতে প্রথম সংক্রমণের মুহূর্ত্তে উৎসবের বাদ্য বাজিয়া উঠিবে। আজমীর শহরের যে রাস্তা দিল্লী দরওয়াজা বামে রাখিয়া পুষ্কর তীর্থে চলিয়াছে উহার নিম্নভূমির উত্তর দিকে "অন্নাসাগর"-সরোবরের বিপুল জলরাশি। সরোবরের পূর্ব্বতীরে নগরীর পশ্চিম উপকণ্ঠে বাদশাহী ডেরা—একটি সুপরিকল্পিত মনোরম তাঁবুর শহর। দার্-উল্-সুলতানত্ আগ্রা নগরী আজকাল দার্-উল-বরকত্ আজমীরের সৌভাগ্যে ঈর্ষান্বিতা। রাজধানী ছাড়িয়া প্রায় তিন বৎসর যাবৎ শাহান্ শাহ্ জাঁহাজীর মিবার অভিযান পরিচালনার জন্য আজমীরে শিবির স্থাপন করিয়া আছেন। আজমীর শরিফের খ্বাজা সাহেবের বরকতে আকবর বাদশাহ বিশাল ভারত সাম্রাজ্যের অধীশ্বর হইয়াও ক্ষুদ্র মিবা'র রাজ্য জয় সম্পূর্ণ করিতে পারেন নাই। শাহজাদা খুর্‌রম-কে মহারাণা অমরসিংহের বিরুদ্ধে প্রেরণ করিয়া জাঁহাজীর পীরের দরগায় পুত্রের বিজয় প্রার্থনা করিতেছিলেন। খেয়ালী বাদ্শাহ্ ভক্তির আবেগে গত বৎসর (১৬১৪ খ্রীঃ) কর্ণভেদ করিয়া চিশ্‌তী-র কান-ফোঁড়া গোলাম হইয়াছিলেন। এই জন্য দরবারী মুসলমান আমীরগণের মধ্যে কান ছিদ্র করিবার হিড়িক পড়িয়া গেল। মক্‌বরার উঠানে যে অতিকায় ডেগ্-যুগল এখনও আকবর-জাঁহাঙ্গীরের পুণ্যস্মৃতি বহন করিয়া যথাস্থানে বিরাজ করিতেছে উহার মধ্যে বড় সওয়া শ' মণী ডেগ্‌টা আগ্রায় তৈয়ার করাইয়া বিগত বৎসরে সম্রাট্ জাঁহাজীর মহাসমারোহে আজমীরে উৎসর্গ করিয়াছিলেন। ঐ দিন সকালবেলা স্বয়ং নুরজাহান বেগম নিজের হাতে উনুন ধরাইয়া বড় ডেগে খিচুড়ী পাক করিয়াছিলেন। রাজরাজেশ্বরীর এই অন্নপূর্ণা রূপ জাঁহাজীর ব্যতীত আর কেহ দেখিতে না পাইলেও তিন বৎসর পরে সর টমাস রো গল্প শুনিয়াছিলেন। পাক শেষ হইবার পর মইয়ের সাহায্যে আলা হজরত সর্ব্বপ্রথম এক থালা খিচুড়ী নামাইয়া গরিবদিগের পাতে পরিবেশন করিলেন—সেইদিন পাঁচ হাজার কাঙাল খিচুড়ী প্রসাদ পাইয়াছিল।

বিজয়ী খুর্‌রম কুমার করণকে সঙ্গে লইয়া ১০২৪ হিজরী মহরম মাসের ২০ তারিখ (ফেব্রুয়ারি, ১৬১৫ খ্রীঃ) দরবারে উপস্থিত হইলেন। অপরাজের প্রতাপের পুত্র অমরসিংহ শাহজাদা খুর্‌রমের বীরত্ব, কূটনীতি এবং সর্ব্বোপরি সহৃদয়তার নিকট নতি স্বীকার করিয়া দুই মাস পূর্ব্বে কুমার করণকে সন্ধির প্রস্তাবসহ মোগল শিবিরে প্রেরণ করিয়াছিলেন। মিবারের বিজিত ভূমি চিতোর দুর্গ সহ মহারাণা ফিরিয়া পাইলেন; কিন্তু শিশোদিয়া রাজলক্ষ্মী চিরদিনের মত বন্দিনী রহিলেন মোগল কারাগারে। এই বিজয় উৎসবের আনন্দ ও উন্মাদনার স্রোতে ভাটা না পড়িতেই ভরা বসন্তে (মার্চ্চ, ১৬১৫) আসিল "নওরোজে"র নূতন জোয়ার। "নওরোজ"-দরবারের নয় দিন পরে অমাবস্যায় রবিবারে পূর্ণগ্রাস সূর্য্যগ্রহণের ছায়ায় প্রতিবিম্বিত হইল হিন্দুকুল-সূর্য্য শিশোদিয়া বংশের ভাগ্যবিপর্য্যয়। পরের দিন সোমবার রাত্রি ১২ দণ্ড ৪২ পল গতে (২৯শে সফর ১০২৪ হিঃ ২০শে মার্চ্চ, ১৬১৫ খ্রীঃ) মমতাজমহল বেগম কন্যা জাহানারার জন্ম সম্বৎসর অতীত না হইতেই রাহুমুক্ত সূর্য্যের ন্যায় এক পুত্র সন্তান প্রসব করিলেন,—শাহী গোলাপবাগে প্রথম কোরক প্রস্ফুটিত হইয়া সম্রাটের বসন্তোৎসব দ্বিগুণ সার্থক করিল।

খুর্‌রমের প্রথম পুত্রের জন্ম-সংবাদ পাইয়া আলা হজরতের খুশীর পেয়ালা বে-সামাল হইয়া পড়িল। বাদশাহ্ হুকুম দিলেন এইবার তিনি বাবা খুর্‌রমের দৌলতখানায় "নবাগত অতিথি"র শুভ-কামনা করিয়া ডবল ঈদ মানাইবেন। অন্নাসাগরের তটভূমিতে শাহজাদার তাঁবু পড়িয়াছিল। সেইস্থানে পরের দিন সম্রাটের অভ্যর্থনার আয়োজন হইল। উৎসব মণ্ডপের তোরণদ্বারে দিল্লীশ্বরের উপর প্রাচীন ভারতের "লাজবর্ষণ" প্রথার অনুকরণে "নিসার"* বা মাঙ্গলিক রৌপ্যমুদ্রা বর্ষিত হইল। শাহান্‌শাহ সভা অলঙ্কৃত করিবার পরেই শাহজাদা খুর্‌রম হাজার আশরফী কদম মোবারকে নজর রাখিয়া শিশুর নামকরণের প্রার্থনা জানাইলেন। আলা হজরত নজর মাপ† করিয়া পৌত্রের নাম রাখিলেন সুলতান দারাশুকো।

---

* প্রকৃতপক্ষে "নিসার" কোন চলিত মুদ্রা নহে; "খৈ" অপেক্ষা কিঞ্চিৎ ভারী পাতলা রূপার ছোট ছোট পাত, উপরে টাকশালের ছাপ। মোট যত তোলা রূপা নিসারে ব্যয় হইত উহার দাম ধরিয়া হিসাব হইত এত হাজার টাকার নিসার।

† নজর মাপ করার অর্থ বাদশাহ উহা হইতে একটি আশরফী স্পর্শ করিয়া উঠাইয়া রাখিলেন,—গ্রহণ না করিয়া দাতাকে উহা বকশিশ করিলেন ইহাই অভিপ্রায়।

২

দারার জন্মের ত্রয়োদশ মাসে শাহ্‌জাদা খুর্‌রমের প্রথম সন্তান, জাহানারার জ্যেষ্ঠা ভগিনী হুর্‌ উন্নিসা আজমীর শহরে তিন বৎসর এক মাস বয়সে অকালে অন্তর্ধান করিলেন। ইহার এক মাস পরে দ্বিতীয় পুত্র শুজাকে কোলে পাইয়াও (১৩শে জুন, ১৬১৬ খ্রীঃ) মমতাজ জীবনের প্রথম শোক ভুলিতে পারেন নাই। সম্রাটের অন্তঃপুরে লালিত-পালিত শিশুপুত্র শুজা জাঁহাগীর বাদশাহ্‌-র পিয়ারের নাতি হইয়া উঠিলেন; পিতার স্নেহের অংশ জাহানারা এবং দারা ভাগাভাগি করিয়া লইলেন। তাঁহারা উভয়ের প্রতি পিতৃস্নেহের পক্ষপাতিতায় ঈর্ষান্বিতা হইয়াই যেন শুজার চৌদ্দ মাস পরে হাজির হইলেন কুমারী রোশনারা (জন্ম বুরহানপুর, ২৪শে আগষ্ট ১৬১৭ খ্রীঃ)। গুণ ও স্বভাবে রোশনারার জুড়ি এবং প্রিয়তম ভ্রাতা আওরঙ্গজেব ভূমিষ্ঠ হইলেন রোশনারার পিঠে ঠিক চৌদ্দ মাস পরে (২৪শে অক্টোবর, ১৬১৮ খ্রীঃ)। দারার জীবন-নাট্যের কনিষ্ঠতম প্রতিনায়ক মুরাদ-বক্‌শ পিতৃদ্রোহী খুর্‌রমের চঞ্চল বিদ্রোহী রক্ত লইয়া অবতীর্ণ হইয়াছিলেন আওরঙ্গজেবের ছয় বৎসর পরে বিহারের রোহ্‌তাশ দুর্গে (২৮শে সেপ্টেম্বর, ১৬২৪ খ্রীঃ);—তবে উভয়ের মধ্যে ব্যবধান রহ্‌য়াছ্‌ আরও দুই ভাই এবং এক ভগ্নী।

শাহজাহানের তৃতীয় পুত্র সুলতান আওরঙ্গজেব "বাহাদুর" যখন মাতৃগর্ভে পূর্ণতা লাভ করিতেছিলেন, সেই সময়ে জাঁহাগীরের তৃতীয় পুত্র ভাগ্যবান্‌ খুর্‌রম তাঁহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা হতভাগ্য খসরু-কে হত্যা করিয়া নিজের ভবিষ্যৎ নিষ্কণ্টক করিবার জন্য মমতাজের পিতা আসফ খাঁ এবং পিসী-শাশুড়ী নুরজাহান বেগমের সহিত নিন্দনীয় ষড়যন্ত্রে গভীর ভাবে লিপ্ত। অধিকন্তু ঐ সময়ে সম্রাজীর অসীম অনুগ্রহের বিনিময়ে কৃতজ্ঞতা এবং পিতার অনাবিল স্নেহ ও একান্ত নির্ভরতার প্রতিদান-স্বরূপ বিদ্রোহের পরিকল্পনাও তাঁহার মনের গোপন কোণে দানা বাঁধিতে সুরু করিয়াছে। খসরুর প্রতি খুর্‌রমের আক্রোশ সম্বন্ধে জাঁহাগীর সচেতন ছিলেন এবং কিঞ্চিৎ দৃঢ়তার সহিত এই পর্য্যন্ত খসরুকে নূরজাহান, আসফ খাঁ এবং খুর্‌রমের নাগালের বাহিরে রাখিয়াছিলেন; অনীরায় সিংহদলন নামক* সুবিশ্বাসী রাজপুত বীরের হেফাজত হইতে নজরবন্দী খসরুকে সরাইবার জন্য "নূরজাহান চক্র" অনেক কাণ্ড করিয়াছিলেন। একদিন দুপুর রাত্রে বাদশাহী মোহরযুক্ত এক জরুরী হুকুমনামা সহ একজন ওমরাহ্ কয়েকজন সিপাহী লইয়া অনীরায়ের কাছে হাজির হইল;—বাদশাহের হুকুম তাহাদের সঙ্গে খসরুকে অবিলম্বে শাহী মহলে পাঠাইতে হইবে; গোঁয়ার রাজপুত সাফ জবাব দিয়া বসিল, সূর্য্যাস্তের পর শাহান্‌শাহের হুকুমনামায় কোন কাম হয় না। পরের দিন সকালে অনীরায় বন্দী খসরুকে দরবারে হাজির করিয়া পূর্ব্ব রাত্রির ঘটনা হুজুরে নিবেদন করিলেন। নূরজাহান বেগমের কড়া শাসনে দিনের বেলায় সাধারণতঃ আলা হজরত প্রকৃতিস্থ থাকিতেন; সুতরাং আসল ব্যাপারটা বুঝিতে তাঁহার বিলম্ব হইল না। তিনি অনীরায়ের কার্য্যের প্রশংসা করিয়া খসরুকে তাঁহার জিম্মায় থাকিবার হুকুম দিলেন।

রাজত্বের দ্বিতীয় বর্ষে জাঁহাগীর তাঁহার বিদ্রোহী জ্যেষ্ঠ-পুত্রের চক্ষুদ্বয়ে একপ্রকার গাছের বিষাক্ত সাদা রস [আকন্দ পাতার ক্ষীর] প্রয়োগ করিয়া অন্ধ করিবার হুকুম দিয়াছিলেন। হুকুম তামিল হওয়ার পর অনুতপ্ত হইয়া পুত্রের দৃষ্টিশক্তি পুনর্লাভের জন্য তিনি ব্যাকুল হইলেন। কিছুকাল পরে যখন জানিতে পারিলেন খসরু কিছু কিছু দেখিতে পায় তখন তাঁহার আনন্দের সীমা রহিল না। কুমার খসরু রাজা মানসিংহের ভাগিনেয়, খান্‌-ই-আজম্‌ মীর্জা আজিজের জামাতা এবং ঐ সূত্রে খান্‌-খানান্‌ আবদুর রহিমের নাত-জামাই। রাজা মানসিংহ পরলোকগত হইলেও পরাক্রান্ত কচ্ছবাহ-কুল ভাগিনেয় জ্ঞানে মনে মনে কুমার খসরুর পক্ষাবলম্বী ছিল। অপর পক্ষে কুমার খুর্‌রম যোধপুরের দৌহিত্র; রাঠোরের লাখ তলওয়ার সর্ব্বদাই কচ্ছবাহ-কুলের প্রতিস্পর্দ্ধী। অধিকন্তু তিনি পরাজিত মহারাণাকে সম্মান-জনক শর্ত্তে দিল্লীশ্বরের সহিত সন্ধি ব্যাপারে সহায়তা করিয়া

---

*রাজত্বের পঞ্চম বর্ষে অনুপরায় ব্যাঘ্রের কবল হইতে সম্রাটের প্রাণ রক্ষা করিয়া "অনীরায় সিংহদলন" উপাধি পাইয়াছিলেন।

সংক্ষেপে ঘটনাটি এই :—

টিলায় তাড়াইয়া জাহাঙ্গীর বাদশাহ্‌ একটি বাঘকে গুলী করিয়াছিলেন। বাঘ বাদশার উপর হামলা করিল, আলা হজরত চিৎ হইয়া পড়িয়া গেলেন, অনুচরবর্গের মধ্যে দুই তিন জন তাঁহার বুকের উপর দিয়াই দৌড়াইল। অনুপরায় দুইহাতে বাঘের মাথায় এক ডাণ্ডা মারিলেন। বাঘ তাঁহাকে আলিঙ্গন করিয়া ডাণ্ডা সহ হাত দুইখানা কামড়াইয়া ধরিল। ইহার পর বাঘে রাজপুতে কুস্তী—মাটিতে লুটোপুটি। ইতিমধ্যে অন্যান্য কয়েকজন বাঘকে তলোয়ারের কয়েক ঘা দিতেই বাঘ অনুপরায়কে ছাড়িয়া চলিয়া যাইতেছিল, রাজপুত গা ঝাড়া দিয়া আবার বাঘের মুখে মারিল দুই তিন ঘুষি, আবার বাঘে মানুষে যুদ্ধ। কিছুক্ষণ পরে অনুপরায় তলোয়ার বাহির করিবার সুযোগ পাইয়া প্রহারোদ্যত বাঘকে এক কোপ মারিলেন। ঐ কোপে ভুরুর উপরের চামড়া কাটিয়া বাঘের চোখ দুইটির উপর ঝুলিয়া পড়িল। ইত্যবসরে অন্যান্য বাহাদুরগণ হাজির হইয়া অর্দ্ধমৃত ব্যাঘ্রকে নিপাতিত করিলেন।

জাহাঙ্গীর বাদশাহ্‌ নিজের খাস তরবারি উক্ত উপাধির সঙ্গে অনুপরায়কে উপহার দিয়াছিলেন—মোগল ও রাজপুত খুব খুসী হইল।

(*Memoirs of Jahangir* i. p. 185-7.)

শিশোদিয়াগণের কৃতজ্ঞতাভাজন হইয়াছিলেন; মহারাণা করণের কনিষ্ঠ ভ্রাতা ভীম শিশোদিয়া শিকারী চিতাবাঘের মত তাঁহার প্রতি অনুরক্ত। জাহাঙ্গীরের দ্বিতীয় পুত্র শাহজাদা পরবেজকে খুর্‌রম হিসাবের মধ্যেই গণ্য করিতেন না; তিনি চিররোগী, অকর্ম্মণ্যতার জন্য পিতার অপ্রিয়ভাজন, নিজের পায়ের উপর দাঁড়াইবার শক্তি তাঁহার ছিল না। পরবেজের দাবি জাহাঙ্গীর পরোক্ষে একরকম বাতিল করিয়া দিয়াছিলেন—প্রমাণ খুর্‌রমের ত্রিশ হাজারী মনসব, "শাহ্ বুলন্দ ইকবাল" উপাধি, সরকার হিসাবের জায়গীর ইত্যাদি। সুতরাং দিল্লীর মসনদের উপর বদ্ধদৃষ্টি শাহজাদা খুর্‌রম, তাঁহার শ্বশুর আসফ খাঁ এবং নুরজাহান বেগম বন্দী খসরুকে যথাশীঘ্র পরলোকে প্রেরণ করিবার জন্য ষড়যন্ত্র করিতে লাগিলেন। এই সময়ে সুপ্রসিদ্ধ মালিক অম্বর বিজাপুর ও গোলকণ্ডার অর্থ ও সৈন্য সাহায্যে দাক্ষিণাত্যে মোগল অধিকার লোপ করিবার উপক্রম করিল। অম্বরকে দমন করিবার মত বাহাদুর সিপাহ্‌সালার খুর্‌রম ব্যতীত আর কেহ ছিল না। ১৬১৬ খ্রীষ্টাব্দের শরৎকালে শাহজাদা খুর্‌রম মালিক অম্বরের বিরুদ্ধে অভিযান করিবার আদেশ পাইয়া সম্রাটকে জানাইলেন, আসফ খাঁর হাতে তাঁহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা খসরুকে সমর্পণ না করিলে তিনি এই অভিযানের ভার গ্রহণ করিবেন না। অন্য কাহারও এইরূপ আপত্তি বিদ্রোহ বলিয়াই গণ্য হইত; কিন্তু এই ক্ষেত্রে ইহা বাবা: খুর্‌রমের * আব্‌দার। অক্টোবর মাসের শেষ সপ্তাহে (১৬১৬ খ্রীঃ) অনীরায়ের হেফাজত হইতে "কতিপয় কারণে" খসরুকে আসফ খাঁর হাতে তুলিয়া দিতে তিনি বাধ্য হইলেন। স্বীয় আত্মচরিতে সত্য কথা লিখিবার সৎসাহস পর্য্যন্ত জাঁহাঙ্গীরের হয় নাই; প্রথম কথা, বাদ্‌শার উপরে বাদ্‌শাহ্, নুরজাহান বেগমের রোষকষায়িত কটাক্ষের ভয়; দ্বিতীয় কথা, তুজুক পড়িলেই মনে হয় ঐ পুস্তক (শেষ অংশ বাদ) নুরজাহান এবং বাবা খুর্‌রমের প্রতি বাদ্‌শাহের ভালবাসা ও অনুগ্রহের কিরিস্তি। সত্য ঘটনার গুপ্ত দিনচর্য্যা হইলে তুজুক-ই-জাঁহাঙ্গিরীর ঐতিহাসিক মূল্য তুজুক-ই-বাবরী অপেক্ষা এত কম হইত না। যাহা হউক, দুর্ব্বলচিত্ত, অসহায় সম্রাট জানিয়া শুনিয়া অর্দ্ধমৃত অন্ধপুত্রকে মৃত্যুরূপী আসফ খাঁর কবলে প্রেরণ করিবার পূর্ব্বে পিতৃস্নেহের নিদর্শন-স্বরূপ একখানা খাসা শাল খসরুকে উপহার দিয়াছিলেন। ১৬২১ খ্রীষ্টাব্দের ২২শে ফেব্রুয়ারী রাত্রির অন্ধকারে বুরহানপুর শহরে খসরুর অন্তঃপুরে সাক্ষাৎ কৃতান্তের ন্যায় প্রবেশ করিয়া সিংহাসনের লোভে উন্মত্ত খুর্‌রম স্বহস্তে গলা টিপিয়া জ্যেষ্ঠ ভ্রাতাকে হত্যা করিলেন। কেহ যেন কোন প্রকার সন্দেহ করিতে না পারে সেই জন্য পরের দিন যথারীতি শহরের মধ্য দিয়া চলিল শবানুগমনের বিরাট মিছিল। খুর্‌রম পিতার কাছে দুঃখের সহিত জানাইলেন, পিত্তশূল রোগে (কাঃ কুলঞ্জ) ভুগিয়া ভাই সাহেব স্বর্গবাসী হইয়াছেন। জাঁহাঙ্গীর প্রকৃতই বিশ্বাস করিয়াছিলেন কিনা খোদাতালা জানেন; তবে "তুজুকে" তিনি উক্তরূপ সংবাদ লিখিয়া গিয়াছেন। কিন্তু ধর্ম্মের ঢোল কিছু দেরিতে হইলেও বাতাসে একদিন বাজিয়া উঠে। আলমগীরশাহী আমলে বৃদ্ধ ঐতিহাসিক মহম্মদ সালেহ কাম্বো তাঁহার আমল-ই-সালেহ গ্রন্থে শাহজাহানের দুষ্কার্য্যসমূহ সবিস্তার লিখিয়া গিয়াছেন।

আধুনিক মনোবিজ্ঞানবিদ্‌গণ নাকি স্বীকার করেন, পিতামাতার কার্য্য, চিন্তাধারা এবং মনোভাব গর্ভস্থ সন্তানের বুদ্ধি ও স্বভাবকে প্রভাবান্বিত করিয়া থাকে। ইহা সত্য হইলে বলিতে হয় ১৬১৬ খ্রীঃ হইতে ১৬২৪ খ্রীষ্টাব্দ পর্য্যন্ত শাহজাদা খুর্‌রমের যে সমস্ত সন্তান ভূমিষ্ঠ হইয়াছিল তাহারা মাতৃগর্ভেই কূটনীতি, শাঠ্য, নৃশংসতা ও পিতৃদ্রোহের পাঠ আয়ত্ত করিয়াছিল;—পরবর্ত্তী ইতিহাস ইহার সাক্ষী। দারার দুর্ভাগ্যকে নিয়তির হাতে ছাড়িয়া না দিয়া ঐতিহাসিক সন্দেহ করিতে পারেন "মরে পুত্র জনকের পাপে"—শুজা-আওরঙ্গজেব মুরাদ শুধু নিমিত্ত মাত্র। শাহজাহান্ মমতাজের গর্ভে বিদ্রোহীর বীজক্ষেপণ করিয়া পিতৃভক্ত, রাজভক্ত, ভ্রাতৃবৎসল পুত্র কেমন করিয়া প্রত্যাশা করিতে পারেন?—"যবাঃ প্রকীর্ণাঃ ন ভবন্তি শালয়ঃ"; ক্ষেতে যব ছিটাইয়া আমন ধানের ফসল কেহ পায় নাই।

* আকবর বাদশাহ শাহজাদা সেলিমকে আদর করিয়া ডাকিতেন, 'শেখু-বাবা'। বিদ্রোহের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত জাহাঙ্গীর তৃতীয় পুত্রকে বরাবর 'বাবা' খুর্‌রম বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। অন্য কোন পুত্রকে তিনি 'বাবা' বলেন নাই। আজকাল দিল্লী অঞ্চলে বাপ ও ছেলেকে 'ভাইয়া' এবং পিতামহকেই বাবা বলিতে শুনা যায়।

সমাধান

(নাটিকা)

শ্রীকুমারলাল দাশগুপ্ত

পাত্র-পাত্রী—মোহিত ও শোভা, যুবক-যুবতী—সম্বন্ধ স্বামিস্ত্রী।
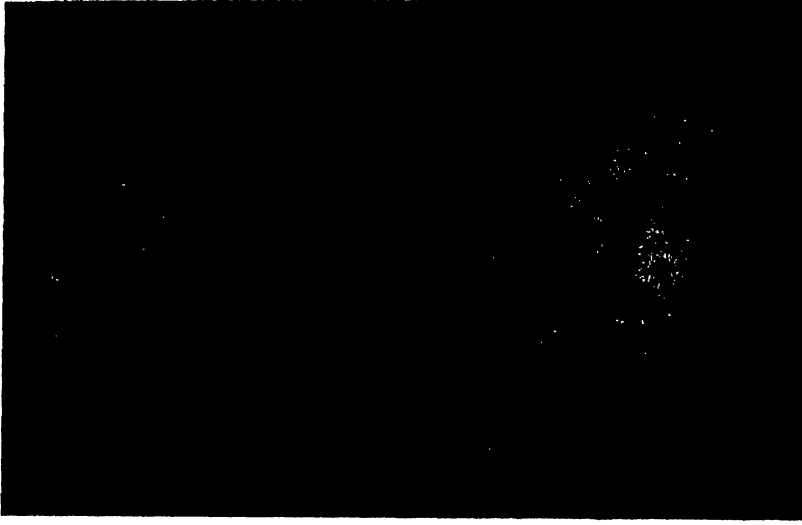
স্থান—মোহিতের লাইব্রেরি।

কাল—রাত দশটার পরে।

পাঠরত মোহিতকে দেখা যায়। কিছুক্ষণ পরে বই ফেলে দিয়ে উঠে সে জানালার ধারে গিয়ে দাঁড়ায়, একটু বাদে আবার এসে চেয়ারে বসে, বই খুলে পড়বার চেষ্টা করে, কিন্তু বেশীক্ষণ পড়া হয় না, বই বন্ধ করে গালে হাত দিয়ে বসে—এমন সময় প্রবেশ করে শোভা, ঘরের ভিতর ধীরে ধীরে একটা চক্র দিয়ে—

শোভা—রাত এগারটা বাজতে চলল।

মোহিত—ও—তাই ত, রাত অনেক হ'ল।

শোভা—চমৎকার হাওয়া বইছে।

মোহিত—হুঁ, জানালার পর্দাটা সরিয়ে দাও।

শোভা—(জানালার ধারে গিয়ে পর্দা সরিয়ে দিয়ে) চামেলির গন্ধও আসছে খুব, তুমি যে লাগিয়েছিলে সেই গাছটায় ফুল ফুটেছে।

মোহিত—বেশ বড় হয়েছে তা হলে, আমি ত ভুলেই গিয়েছিলাম।

শোভা—(বাইরের দিকে কিছুক্ষণ চেয়ে থেকে) জোৎস্নাও উঠেছে বেশ।

মোহিত—(চুলের মধ্যে আঙুল চালিয়ে) তাই নাকি—আজকে কি পূর্ণিমা ?

শোভা—(একটু হেসে) আজকে নয়—কালকেও নয়, পূর্ণিমার দেরি আছে।

মোহিত—তাই হবে, ঠিক খেয়াল নেই।

শোভা—তোমার শরীরটা বোধ হয় ভাল নেই।

মোহিত—না, শরীর ত ভালই আছে, তবে ঘুমটা যেন ঠিক হচ্ছে না।

শোভা—ওটাও একটা রোগ।

মোহিত—তেমন গুরুতর কিছু নয়।

শোভা—আমার মনে হয় তোমার একটা চেঞ্জ দরকার।

মোহিত—চেঞ্জ ! কথাটা শুনতে বেশ।

শোভা—কাজেও বেশ। আমি বলছি নে যে তুমি শিমলা বা রামেশ্বর যাও। এ ঘর থেকে ও ঘরে গেলেও চেঞ্জ হতে পারে।

মোহিত—কিন্তু তার উপকারিতা কতখানি !

শোভা—খুব। এই ধর যদি তুমি পুরোনো শোবার ঘরে না শুয়ে তেতলার ঘরে বা এক তলার একটা ঘরে শোবার ব্যবস্থা কর তা হলে আবার সুনিদ্রা হবে।

মোহিত—ঘুম হবে বলছ।

শোভা—আমি ভেবে দেখেছি হবে।

মোহিত—আমার নিদ্রার কথা ভেবে তোমার নিদ্রার ব্যাঘাত কর না কিন্তু।

শোভা—ভাবুক বলে খ্যাতি আমার কোন কালেই নেই, আমার ঘুম ঠিকই হচ্ছে।

মোহিত—তা হলে যাও, শুয়ে পড়গে।

শোভা—নিশ্চয় যাব। তুমি কি মনে করেছ জ্যোৎস্না দেখে রাত-দুপুরে তোমার সঙ্গে প্রেমালাপ করতে এসেছি?

মোহিত—ছিঃ, অমন কথা আমি ভাবতে পারি? তোমার সম্বন্ধে ধারণা আমার অত ছোট নয়।

শোভা—আমার সম্বন্ধে তোমার ধারণা তা হলে যথেষ্ট বদলেছে?

মোহিত—হ্যাঁ বদলেছে, কারণ তুমি যথেষ্ট বদলেছ।

শোভা—বদলেছি বইকি, বিয়ের পরে বয়েস বেড়েছে তিন বছর।

মোহিত—শুধু বাইরে নয়, ভিতরেও।

শোভা—সেটা স্বাভাবিক, বয়সের ছাপ মনের উপর পড়বেই।

মোহিত—সেই ধারণাই এতকাল আমার ছিল, কিন্তু তোমার দেখছি উল্টোটা—শরীরের বয়েস বেড়ে যাচ্ছে কিন্তু মনের বয়েস কমে আসছে।

শোভা—এ তোমার কল্পনা।

মোহিত—কল্পনা! সকাল নেই, বিকেল নেই, সময় নেই, অসময় নেই এই যে হয় রাগ আর ছত্রিশ রাগিণী শুনতে পাই, এটাও কি কল্পনা? এতে গায়িকার মনের খুকীত্ব প্রমাণ হয় না কি?

শোভা—গান আমি গাই, তবে সময় অসময় বুঝে গাই। তা ছাড়া গান গাইলে কেউ খুকী হয় না।

মোহিত—আমার ধারণা তাই।

শোভা—তোমার ওরকম ধারণা হবার মানে তুমি গান বোঝ না।

মোহিত—না, সত্যাই বুঝি না, বলতে আমার কিছুমাত্র লজ্জা হচ্ছে না যে আমি একজন সঙ্গীত-বিশারদ নই।

শোভা—গান আমার ভাল লাগে, গান আমি বরাবর গাই; তোমার সঙ্গে বিয়ে হবার আগেও গাইতাম, বিয়ে হবার পরেও গেয়েছি, এখনও গাই।

মোহিত—সেটা আমাকে জব্দ করবার জন্যে।

শোভা—তোমাকে জব্দ! এমন কথা তুমি কেমন করে বললে?

মোহিত—কেমন করে বললাম? আমি বাড়ী ফিরলেই যেমন করে তুমি গান গাইতে বসো!

শোভা—আগে তুমি আমার কাছে যতটা আসতে আজকাল ততটা আস না—সেই ফাঁক আমার পূরণ করি গান গেয়ে।

মোহিত—কিন্তু সেগুলো ঠিক বিরহ-সঙ্গীত নয়।

শোভা—আমি ভেবে পাই না গানে এত অরুচি তোমার কবে থেকে হ'ল। এমন এক সময় গেছে যখন গান শোনবার উৎসাহ তোমার খুবই ছিল। তখন সময়-অসময়ের বিচারও যে খুব করতে তা মনে হয় না।

মোহিত—গান যদি এক সময়ে ভাল লাগত এবং যদি এখন আর ভাল না লাগে তা হলে সেটা উন্নতির লক্ষণ।

শোভা—তোমার উন্নতি যে হয়েছে তা অস্বীকার করছি নে, যথেষ্ট উন্নত হতে না পারলে অতি-আধুনিক সাহিত্যের রসিক হওয়া যায় না।

মোহিত—অতি-আধুনিক বাংলা সাহিত্য তুমি বোঝ না, পড়ও নি।

শোভা—সত্যিই, আমি পড়িও না অতএব বুঝিও না, তুমি পড়েও যে বোঝ সে বিষয়ে আমার সন্দেহ আছে।

মোহিত—থাক, সাহিত্য-আলোচনার সময় এটা নয়, আমি স্বীকার করে নিচ্ছি ও বিষয়ে আমাদের মতের অতিশয় গরমিল। শুধু সাহিত্য বিষয়ে কেন, কোন বিষয়েই আমাদের মত এক নয়।

শোভা—মানুষে মানুষে প্রভেদ থাকবে না, এ কেমন কথা!

মোহিত—আর সেই প্রভেদকে সব সময় মনে করিয়ে দেবার জন্যে লালঝাণ্ডা উড়িয়ে বেড়াও।

শোভা—(হেসে গোলাপী রঙের শাড়ীর আঁচল নাড়তে নাড়তে) এটা লাল নয় গোলাপী, এতেও আপত্তি। গোলাপী রং আমার পছন্দ, তা ছাড়া রংটা তো অসুন্দর নয়, আমার মতে খুবই সুরুচিসঙ্গত।

মোহিত—আমি জানতাম তুমি বলবে আমার সুরুচিও নাই, সৌন্দর্য্যবোধও নাই। ও সব তোমার একচেটে।

শোভা—সৌন্দর্য্যবোধ তোমার নেই তা বলতে চাই নে কিন্তু আমার চেয়ে যে কম এ কথা সত্যি।

মোহিত—তাই বুঝি অধুনা খুব সৌন্দর্য্য-চর্চ্চা চলছে? ওর যে একটা খরচের দিক আছে বোধ হয় সেটা ভুলে গেছ।

শোভা—কাপড়-জামায় অনাবশ্যক খরচ আমি করি নে। তবে একথা ঠিক যে সৌন্দর্য্য-চর্চ্চা বিষয়ে আমি উদাসীন নই, এক সময়ে তুমিও যথেষ্ট উৎসাহ দিয়েছ।

মোহিত—কিন্তু কোন সময়েই আমি লাল রংকে সুন্দর বলি নি।

শোভা—এ লোহিতাতঙ্ক তোমার কবে থেকে? এ শাড়ীখানা যে তুমিই এক সময়ে কিনে দিয়েছিলে।

মোহিত—তা হলে প্রমাণ হচ্ছে সে এক সময়ে আমার কিছু পছন্দ ছিল, কিন্তু বলতে পার এখন আমার পছন্দ এত অপছন্দ হয় কেন?

শোভা—অনেককাল তোমার পছন্দের কোন পরিচয়ই পাই নি, আমার সঙ্গে দোকানে তো যেতেই চাও না, নিজেও কিছু কিনে আন না।

মোহিত—যথেষ্ট অবসর যখন ছিল তখন তা কাটাবারও অনেক ফন্দি করেছি। এখন এমন অবসর নেই যে একটা কাল্পনিক গোলাপী রঙের তাড়াই গজ কাপড় কিনতে সারা কলকাতা ঘুরে বেড়াই।

শোভা—হাঁা, সত্যিই তোমার অবসর নেই। যার এত বড় একটা কারখানা সামলাতে হয় তার অবসর কোথায়? হল-ঘরে কাঠের গাদা ক্রমশঃ উঁচু হচ্ছে, বারান্দায় করাত কাত হয়ে আছে, এখানে হাতুড়ি ওখানে বাটালি—আমাদের মত অকেজো লোকের চলাফেরাই দায়। আর সৃষ্টি যা হচ্ছে তা—(হেসে) থাক সে কথা।

মোহিত—সৃষ্টি যা হচ্ছে তা আর যাই হোক সঙ্গীতের মত শূন্যময় নয়, তা দেখাও যায় ছোঁয়াও যায়।

শোভা—হাঁা, তা অনেকখানি জায়গা জুড়ে থাকে এবং ভারীও খুব। শখ লোকের অনেক রকম থাকে কিন্তু এমন কঠিন শখ—

মোহিত—সচরাচর দেখতে পাওয়া যায় না, এই তো! অসাধারণ বলেই এতে আমার আনন্দ।

শোভা—সাধারণ জিনিষে আর তোমার আনন্দ নেই, এই যেমন আমি ইত্যাদি।

মোহিত—আর অসাধারণ জিনিষে তোমারও আনন্দ নেই যেমন আমি ইত্যাদি। দেখ, আর লুকোচুরি চলে না, এর একটা সমাধান দরকার হয়ে পড়েছে।

শোভা—এবং সেটা যত শিগগির হয় ততই বোধ হয় ভাল। (ঘরের আর এক প্রান্ত পর্য্যন্ত গিয়ে আস্তে আস্তে আবার জানালার ধারে ফিরে এসে) আমারও সেই কথা, মা্নিকবে না তাকে জোড়াতালি দেবার মত বিড়ম্বনা আর নেই।

মোহিত—আমরা এত তফাতে সরে গেছি যে আর ফিরে আসা সম্ভবই নয়।

শোভা—(বেশ কঠিনভাবে) ফিরে আসবার ইচ্ছেও নেই। যদি চাও আরো দূরে সরে যাব, আমি তার জন্তে প্রস্তুত হয়ে আছি।

মোহিত—সরে যাবার কথা হচ্ছে না, সরে না গিয়েও ব্যবস্থা হতে পারে।

শোভা—না, সরে যাওয়া ছাড়া অন্য ব্যবস্থা হতে পারে না। আমি যখন কোন ভাবেই তোমাকে সন্তুষ্ট করতে পারছি নে তখন কেন আর মিথ্যা অভিনয়? মনে করো না এ কথা আমি অভিমান করে বলছি, খুব ভেবেচিন্তেই বলছি।

মোহিত—অভিমান করার বিষয়ও এটা নয়। এতদিনে প্রমাণ হয়েছে যে তোমার আমার পথ ভিন্নমুখী।

শোভা—তা হলে ভিন্নমুখেই চলা যাক। আত্মসম্মান বজায় রেখে এ বাড়ীতে বাস করা আর আমার পক্ষে সম্ভব নয়।

মোহিত—সম্মান-অসম্মানের কথা কেন তুলছ? কথা হচ্ছে মিল-অমিলের।

শোভা—অত চুলচেরা বিচার আমি করতে জানি নে, সহজভাবে আমি এই বুঝি যে যেখানে মিল নেই, সেখানে মিলনও নেই; অতএব তুমি তোমার অসাধারণত্ব নিয়ে এখানে থাক, আমি আমার সাধারণত্ব নিয়ে বিদেয় হই।

মোহিত—তোমার মীমাংসা এক দিক দিয়ে যেমন সহজ অন্য দিক দিয়ে তেমন সহজ নয়, এখান থেকে চলে যাওয়াটা লোকের চোখে ভাল দেখাবে না।

শোভা—মিয়ামিতে এর চেয়েও সামান্য বিষয়ে ডাইভোর্স হতে পারে।

মোহিত—প্রথম কথা আমরা মিয়ামিতে নাই, দ্বিতীয় কথা আমরা হিন্দু।

শোভা—গরমিলটা কিন্তু হিন্দু-মুসলমান, পার্শী-খ্রীষ্টান নির্ব্বিশেষে।

মোহিত—তবুও একটা স্যুটকেশ হাতে করে তুমি বাড়ী থেকে বেরিয়ে যাবে সেটা ঠিক শোভন হবে না।

শোভা—ওঃ, বেরিয়ে যাওয়াটা শোভন করতে হবে?

তথাস্ত। এই বর যদি আমি ছেলের অজুহাতে নিলেও আমার মাসীর বাড়ী চলে যাই, সেখানে কিছুদিন থেকে শেষে যাই সাহারাণপুরে মামার কাছে তা হলে আশা করি শোভন হবে।

মোহিত—প্রস্তাবটা সত্যিই ভাল, অবশ্য মাসে মাসে আমি—

শোভা—(থামিয়ে দিয়ে) তারও দরকার হবে না, বাবা যা লেখাপড়া শিখিয়েছিলেন তাতে একটা মাষ্টারী জুটে যাবে।

মোহিত—কিন্তু, দেখ—

শোভা—আবার কিন্তু কেন? তোমার জীবনে যাতে আর 'কিন্তু' না আসে তারই ব্যবস্থা তো করছি। যা করব তা পাকা করেই করব।

মোহিত—অবিশ্যি তোমার মতামতের উপর আমার বলবার কোন অধিকার নেই।

শোভা—নিশ্চয় নেই, আমি এখন স্বাধীন, আমি যখন খুশি গান গাইতে পারি, যেমন খুশি বই পড়তে পারি, যতখুশি গোলাপী রঙের শাড়ী কিনতে পারি।

মোহিত—তা পার।

শোভা—আর তুমিও যা খুশি করতে পার, অর্গ্যানটা বেচে দিয়ে ডজন কয়েক র‍্যাঁদা কিনতে পার, আর শোবার ঘরে কারখানা খুলতে পার আর সন্ধ্যাবেলা আমি যখন পূরবী গাইতাম তখন তুমি আনন্দে করাত চালাতে পার।

মোহিত—অর্গ্যানটা অবশ্য অনাবশ্যক।

শোভা—তা হলে অত্যাবশ্যক হাতুড়ি দিয়ে অনাবশ্যক অর্গ্যানটা ভেঙে ফেল।

মোহিত—আমি বলি ওটা তুমি নিয়ে যাও।

শোভা—ধন্যবাদ, আমি এ বাড়ীর কিছুই নিতে পারি না—নেব না।

মোহিত—আমি জোর করতে পারি না কারণ—

শোভা—কারণ আবিষ্কার হয়ে গেছে। এবার আমাদের সভা ভঙ্গ হোক, আমার অনেক কাজ আছে, কিছু জিনিষপত্তর গুছিয়ে নিতে হবে।

মোহিত—এত রাত্তিরে? কাল পোহালেও চলবে।

শোভা—সময় যথেষ্ট নেই, কেননা ভোর সাড়ে সাতটার গাড়ীতে রওনা হব ঠিক করেছি। তুমি হয়ত অত ভোরে উঠতে পারবে না, আমার যা বলবার আছে এখনই বলে যাই। টাকাকড়ি আমার কাছে যা ছিল তা প্রায় সবই দেরাজে আছে, তোমার দেওয়া গহনা-পত্তর সব রেখে যাব। আর কিছু বলবার নেই, (ধীরে ধীরে দরজার কাছ পর্য্যন্ত গিয়ে আবার ফিরে এসে) একটা কথা, ছোট সুটকেসটা নিয়ে যাব সেটাও বলে রাখি, (আবার দরজার কাছে গিয়ে ফিরে এসে) ভুলে যাচ্ছিলাম, আর একটা কথা, তেমন কাজেরও নয়—বলে যাই, ছেলেই হোক্ আর মেয়েই হোক্ সে আমার কাছে থাকবে।

মোহিত—(চমকে উঠে) কি বললে?

শোভা—বললাম ছেলেই হোক্ আর মেয়েই হোক্ সে আমার কাছে থাকবে।

মোহিত—কার ছেলেমেয়ে?

শোভা—আমার।

মোহিত—(হেসে) তামাশা করবার সময়টা ঠিক হ'ল না।

শোভা—তামাশা করছি নে।

মোহিত—(উঠে দাঁড়িয়ে) তুমি সত্যি বলছ?

শোভা—মিছে কথা বলা আমার অভ্যাস নেই।

মোহিত—একথা এত দিন তুমি কেন বলনি?

শোভা—শোনবার অবসর ছিল তোমার? যাক্ সেকথা, আমার যা কিছু বলবার ছিল সব বলা হয়ে গেছে, এবার আমি চলি।

(দরজার দিকে এগিয়ে যেতে মোহিত শোভাকে বাধা দিয়ে)

মোহিত—তুমি কি যাবেই?

শোভা—এ কেমন প্রশ্ন? এতক্ষণ ধরে এত বিচার-বিশ্লেষণ করে কি ঠিক হ'ল?

মোহিত—কিছুই ঠিক হ'ল না—সব গোলমাল হয়ে গেল।

শোভা—বেশ, তুমি নির্জ্জনে বসে চিন্তা কর, আমার আর এখানে থাকবার দরকার নেই।

মোহিত—(শোভার সামনে এসে) তোমার যাওয়া চলবে না।

শোভা—(কঠিন ভাবে) তুমি কি এখনও মনে কর আমার যাওয়া-না-যাওয়া তোমার খুশির উপর নির্ভর করে? আমাকে যেতেই হবে।

মোহিত—আমি যেতে দেব না।

শোভা—একটু আগে তুমিই না বলছিলে তোমার আমার পথ ভিন্নমুখী।

মোহিত—একটু আগে কি বলেছিলাম তা আর আমার মনে নেই।

শোভা—আমার মনে আছে। আমাকে আর বাধা দিও না, যেতে দাও।

[চলে যাবার চেষ্টা]

মোহিত—তোমাকে যেতে দেব না।

শোভা—আমি যাবই।

মোহিত—আমি এমন চেঁচাব যে আশপাশের বাড়ী থেকে লোক ছুটে আসবে।

শোভা—সেটা বুঝি অশোভন হবে না? থাক্, তুমি আর চেঁচিও না, আমি জানি প্রতিবেশী পুরুষেরা তোমাকেই সমর্থন করবে। (ফিরে জানালার ধারে এসে) কিন্তু কেন তুমি আমাকে বাধা দিচ্ছ, আত্মসম্মান বজায় রেখে আমি আর তোমার বাড়ীতে থাকতে পারি নে।

মোহিত—(এক পা এগিয়ে এসে) আমি তোমার সম্মান তো ক্ষুণ্ণ করি নি।

শোভা—যে বাড়ীতে আমার স্বাধীনতা নেই সে বাড়ীতে আমার সম্মানও নেই। যেখানে আমি যখন খুশি গান গাইতে পারব না সেখানে আমি থাকতেও পারব না।

মোহিত—আমি কিন্তু কোনদিনই গান গাইতে তোমাকে বাধা দিই নি।

শোভা—স্থূল ভাবে লাঠি নিয়ে তাড়া করো নি সত্য, কিন্তু মর্মান্তিক বিদ্রূপবাণ নিক্ষেপ করতে কসুর কর নি।

মোহিত—(আর এক পা এগিয়ে এসে) ওটা তোমার কল্পনা। দৃষ্টিভঙ্গীটা একটু বদলে নিলে দেখতে পেতে বাণে বিষও ছিল না ধারও ছিল না।

শোভা—তা ছাড়া প্রাণ গেলেও আমি এই লাল রঙ্গা (আঁচল নেড়ে) ছাড়তে পারব না।

মোহিত—ওটা লাল নয়, গোলাপী।

শোভা—দৃষ্টিভঙ্গী অনেকখানি বদলে গেছে দেখছি।

মোহিত—(আর এক পা এগিয়ে এসে) চমৎকার চাঁপার গন্ধ আসছে।

শোভা—চাঁপা নয়, চামেলি।

মোহিত—জ্যোৎস্নাও উঠেছে বেশ।

শোভা—জ্যোৎস্না কোথায়? চাঁদ যে অনেকক্ষণ ডুবে গেছে, দৃষ্টিভঙ্গীর কি অদ্ভুত পরিবর্ত্তন!

মোহিত—(শোভার খুব কাছে এসে) শোভা!

শোভা—নামটা তা হলে মনে আছে!

মোহিত—(শোভার হাত ধরে) শোভা, তুমি আশ্চর্য্য!

শোভা—ওকি, প্রেমালাপ নয় তো?

মোহিত—(শোভাকে বুকের কাছে টেনে নিয়ে) আমি বলছি কি যে, তোমার অর্গ্যানটা অত্যন্ত পুরোনো হয়ে গেছে, একটা নতুন আর বড় অর্গ্যান কিনলে হয় না?

শোভা—আর নতুন অর্গ্যান কিনে দরকার নেই, পুরোনো জিনিষেই আমার বেশী প্রীতি। (পটক্ষেপ)

মোহিত—রাত্রে এ গোলাপী রঙের শাড়ী পরলে তোমাকে চমৎকার দেখায়, কাল একবার দুজনে দোকানে গিয়ে কয়েকখানা গোলাপী শাড়ী কিনে আনব—কি বলো?

শোভা—ও আমার ঢের খানেক আছে, তার জন্যে তোমাকে ব্যস্ত হতে হবে না।

মোহিত—আমি ভাবছিলাম কি অতি-আধুনিক সাহিত্যের বোঝাটা পুড়িয়ে ফেলি—আপদ যাক্।

শোভা—(হেসে) নাইবা পোড়ালে। কয়েকখানা বই বেশ ভালই আছে, আমি চুপি চুপি পড়েছি।

মোহিত—আর, আর একটা কথা। ঐ অনাবশ্যক হাঁড়ি বাটিগুলো পুরোনো লোহার দরে কালকেই বেচে দেব।

শোভা—(মোহিতের বুকের কাছে ঘনিয়ে এসে) বেচবে কেন? হাঁড়ি বাটির আবশ্যকতা আমি আবিষ্কার করেছি, আমাকে একটা জিনিষ তৈরি করে দিতে হবে।

মোহিত—হুকুম কর।

শোভা—একটা দোলনা।

প্রহেলিকা

শ্রীসুধীন্দ্রনারায়ণ নিয়োগী

এই কি বুঝিতে হবে যা দিয়েছ সে কিছুই নয়?
তোমার সোহাগ যত মত্ত এক মুহূর্তের খেলা?
রত্নসম স্মৃতি যাহা সযতনে করেছে সঞ্চয়
নীরব ঔদাস্য দিয়ে বোঝিছ তা মৃত্তিকার ঢেলা!

স্ফুরিত অধরে তব, বিস্ফারিত হরিণ-নয়নে
সঘন স্পন্দিত বক্ষে, কণ্ঠলগ্ন বাহুলতিকায়,
এলায়িত কেশদামে, গদগদ মধুর বচনে
দেখেছি সুধার স্রোত ছলকি ছলকি বহি যায়।

তুমি কি বলিতে চাও সে আমার অলীক স্বপন?
ছিল না আত্মার দীপ্তি, মোহ অন্ধ তনুর বিলাসে?
কোন্ মন্ত্রে দ্বিধাভিন্ন করেছিলে দেহ আর মন?
এই বঞ্চনাই সত্য হয়ত ভাগ্যের পরিহাসে!

মৃন্ময় দেহের পাত্রে যে সুরা ঢেলেছ সুবদনা
চিন্ময় আধারে তাই সুধা হয়ে আজো আছে জমা।

জেট ও রকেট

অধ্যাপক শ্রীজিতেন্দ্রচন্দ্র মুখোপাধ্যায়

বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারের দ্বিবিধ রূপ আছে। কোন কোন আবিষ্কার হয়ত সম্পূর্ণ আকস্মিক; অচিন্তিত এক প্রাকৃতিক সত্য কোনও সূত্র ধরিয়া সহসা বিজ্ঞানীর কাছে ধরা দেয় এবং তারই ফলে অভাবনীয় সম্ভাবনা বিশ্বমানবের সম্মুখে বিরাট বিস্ময়রূপে

V-2 রকেট বোমা ও তাহার আবিষ্কর্তা

আত্মপ্রকাশ করে। রঞ্জেন রশ্মি, পেনিসিলিন প্রভৃতির আবিষ্কার এই পর্যায়ে পড়ে। আবার এক জাতীয় বৈজ্ঞানিক সিদ্ধান্ত আছে যেগুলির মূল তথ্য শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরিয়া হয়ত মানুষের সম্মুখে নিত্য প্রকটিত রহিয়াছে কিন্তু তাহাদের ব্যবহারিক সার্থকতা বা তন্মধ্যে লুক্কায়িত বিরাট সম্ভাবনা বহুদিন মানুষের দৃষ্টি এড়াইয়া গিয়াছে। এমনি খুব সাধারণ ও সর্বজনবিদিত অথবা বহুকালাবধি বিজ্ঞানীদের নিকট পরিচিত নৈসর্গিক ঘটনা অবলম্বন করিয়া অনেক বড় আবিষ্কার হইয়াছে। বেতারবার্তা, ষ্টীম এঞ্জিন প্রভৃতির আবিষ্কার এমনই ধরণের। এই জাতীয় আবিষ্কারের অন্যতম দৃষ্টান্ত জেট-চালিত এরোপ্লেন।

বহুকাল ধরিয়া মানুষ হাউই বাজির স্বরূপ দেখিয়া আসিয়াছে। অগ্নিসংযোগে যে হাউই ঊর্দ্ধে ছুটিয়া চলে সে ত বালকের হাতের ক্রীড়নক বই অন্য কিছু নহে। বৈজ্ঞানিক অনেক আবিষ্কারের সূত্রপাত এমনি খেলাঘরেই। সামান্য খেলনা জাইরোস্কোপ অধুনা যন্ত্রদানবের মস্তিষ্কের কার্য্য করিতেছে। যে কারণে হাউই ঊর্দ্ধে ছোটে বহুকাল পূর্ব্বেই বিজ্ঞানের কাছে তাহা ধরা পড়িয়াছিল। কিন্তু সেই সত্যকে কাজে লাগাইবার সকল প্রচেষ্টাই এতাবৎকাল ব্যর্থতায় পর্য্যবসিত হইয়াছে। হাউইয়ের অন্তর্নিহিত শক্তিভাণ্ডারকে গ্রহণ করিয়া চন্দ্রলোকে পৌঁছিবার বা মঙ্গলগ্রহে অভিযান করিবার পরিকল্পনা নূতন নহে, কিন্তু এখনও তাহা কার্য্যকরী হয় নাই।

অগ্নিসংযোগের সঙ্গে সঙ্গে হাউই বাজি আকাশে অস্থির হইয়া ছুটিয়া চলে কেন? হাউইয়ের খোলের ভিতরে বিস্ফোরক বারুদ ভরা থাকে, নীচের দিকে আছে একটা ছিদ্র। আগুনের স্পর্শে বারুদের বিস্ফোরণ হইয়া থাকে, অর্থাৎ রাসায়নিক পরিবর্ত্তনে সামান্য পরিমাণ বারুদ হইতে প্রভূত গ্যাস উৎপন্ন হয় যাহার জন্য বিরাট বিস্তৃতি দরকার, হাউইয়ের ছোট খোলের ভিতর তাহার স্থান সংকুলান হয় না। এই গ্যাসরাশি প্রভূত চাপযুক্ত হইয়া খোলের গায়ে ভিতরের দিক হইতে চাপ দেয় ও বাহিরে আসিবার পথ খোঁজে। বলিতে পারি আভ্যন্তরীণ গ্যাসের কণিকাগুলি চাপ ও তাপের প্রভাবে প্রচণ্ডবেগ প্রাপ্ত হইয়া খোলের দেওয়ালে আঘাত করিতে থাকে, অথবা কল্পনা করিতে পারি যে ভিতরে অবস্থান করিয়া কোন অশরীরী হস্ত যেন চতুর্দ্দিকের দেওয়ালে প্রচণ্ডবেগে অগণিত ঢিল ছুড়িতেছে। ঢিলের আঘাতে কোন বস্তু বেগপ্রাপ্ত হইবার কথা কিন্তু এই প্রকার আভ্যন্তরীণ গ্যাসের ঢিলে চতুর্দ্দিকে বদ্ধ খোলটি সাধারণতঃ বেগপ্রাপ্ত হয় না কারণ খোলের সবদিকের দেওয়ালেই সমান সংখ্যক ঢিল পড়ে। কিন্তু যদি

V-2 রকেট বোমা (বিস্ফোরণের জন্য প্রস্তুতি)

খোলের এক দিকে একটি ছিদ্র থাকে তবে সেই পথে কতকগুলি গ্যাসের কণিকা বাহিরে আসিতে সমর্থ হয় এবং ঐ

দিককার দেওয়ালের আঘাতটা ব্যর্থ হয়। সেইজন্য ছিদ্রের বিপরীত দিকে খোলের অপরাংশে যে সকল কণিকা আঘাত করে তাহাদের ধাক্কায় হাউই সম্মুখে ছুটিয়া চলে। যে পর্য্যন্ত ভিতরের গ্যাস ছিদ্রপথে বাহির হইয়া আসিতে থাকে ততক্ষণ

রকেটে ডাক চলাচল

উহা চলিতেই থাকে। বন্দুকের ভিতর হইতে গুলী বাহির হইয়া গেলে বন্দুক যে পিছনে ধাক্কা খায় তাহাও অনুরূপ কারণেই। বিস্ফোরণের ফলে উদ্ভূত গ্যাসের আয়তন খুব বেশী হয় বলিয়াই এই প্রকার গতির উৎপত্তি সম্ভব।

পেট্রোল বা ষ্টীম চালিত সাধারণ এঞ্জিনের সঙ্গে হাউইয়ের শক্তি জোগাইবার প্রক্রিয়ার মৌলিক পার্থক্য খুব বেশী নাই। ষ্টীম এঞ্জিনে বয়লারে জলকে বাষ্প করিয়া আনিয়া সিলিণ্ডারে প্রবেশ করিতে দেওয়া হয়। জল বাষ্প হইলে আয়তনে বৃদ্ধি পায় যাহার ফলে বাষ্পের চাপে সিলিণ্ডারের পিস্টন বেগপ্রাপ্ত হইয়া থাকে। আবার পেট্রোল এঞ্জিনে সিলিণ্ডারের ভিতরেই পেট্রোল পুড়িয়া গ্যাস উৎপন্ন হয়, এই গ্যাসের চাপ পিস্টনকে ঠেলিয়া দেয়। সঙ্কুচিত অবস্থায় থাকিলে গ্যাস স্বতই আয়তনে বর্দ্ধিত হইতে চায়। হাউই কিম্বা ষ্টীম বা পেট্রোল এঞ্জিনে গ্যাসের এই সম্প্রসারণশীলতাকেই কাজে লাগানো হয়। কিন্তু হাউইয়ের অগ্রসর হইবার প্রণালী ও ষ্টীম-পেট্রোল চালিত যানবাহনের অগ্রগতির পন্থা ও রীতি এক নহে।

একটি নৌকাকে জলের উপর চালাইতে হইলে আমরা দুই প্রকার ব্যবস্থা করিতে পারি। পাড়ে দাঁড়াইয়া নৌকাকে পিছনের দিক হইতে ঠেলিয়া দিলে নৌকা অগ্রসর হইয়া থাকে আবার নৌকায় বসিয়া দাঁড় টানিলেও নৌকা চলে—এখানে দাঁড়ের আঘাতে জল কাটিয়া নৌকা আগাইয়া যায়। ঠেলিয়া নৌকা চালাইতে হইলে এককালে বেশী শক্তি প্রয়োগ করিতে হয়, কিন্তু দাঁড় বাহিয়া নৌকা চালাইবার সময় অপেক্ষাকৃত কম শক্তি হইলেও চলে অবশ্য শক্তি প্রয়োগ করিতে হয় বারংবার। বরফের উপর দিয়া 'স্কেটিং' করিয়া অগ্রসর হওয়া যায় আবার 'হাঁটি হাঁটি পা পা' করিয়াও আগাইয়া যাওয়া যায়। এই দুই প্রকার গতির মধ্যে পার্থক্য আছে। দাঁড় বাহিয়া নৌকা চালানো বা পা বাড়াইয়া পথ চলা উভয় ক্ষেত্রেই গতির জন্য মাধ্যমের সাহায্য দরকার—প্রথম ক্ষেত্রে জল, দ্বিতীয় বারে মাটি প্রত্যক্ষভাবে গতি-উৎপত্তির জন্য দায়ী। কিন্তু 'স্কেটিং' করিয়া যাওয়া বা ঠেলা দিয়া নৌকা চালনা ইহাদের ব্যাপারে গতিপ্রাপ্ত পদার্থই মাধ্যমের ভিতর দিয়া চলে, মাধ্যম সেই গতিতে প্রতিরোধ সৃষ্টি করে; ভিন্ন সাহায্য করে না। আমাদের পরিচিত পেট্রোল এঞ্জিনে যখন এরোপ্লেন চলে তখন 'প্রপেলার' করে দাঁড়ের কাজ, এ যেন পা পা করিয়া পথ চলা; কিন্তু বিস্ফোরকের জোরে যখন হাউই ছোটে সে চলে পিছনের ঠেলায়। প্রপেলার সম্বলিত এরোপ্লেনের জন্য বায়ু-সমুদ্র দরকার। যেখানে বায়ু নাই এরোপ্লেন সেখানে পঙ্গু—কিন্তু হাউয়ের গতি বায়ুশূন্য প্রদেশে আরও বেশী। পেট্রোল এঞ্জিনে গ্যাস অবস্থায় পেট্রোলের যে আয়তন বৃদ্ধি হয় হাউইয়ে সে অনুপাতে আয়তন বৃদ্ধি
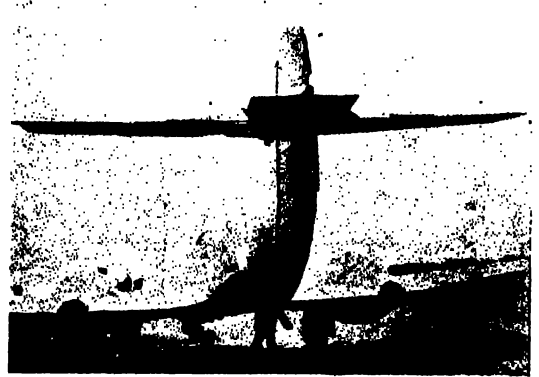
জেট-চালিত এরোপ্লেন। (লেজের বৈশিষ্ট্য লক্ষণীয়।) জেট-যন্ত্র উভয় পাশে

অনেকটা বেশী, তাই বেগ উৎপত্তির জন্য এবং বাতাসকে ঠেলিবার জন্য পিস্টন ও প্রপেলারের মধ্যবর্ত্তিতার প্রয়োজন হয় না। হাউই বা রকেটের ক্রিয়াকে মোটর গাড়ীতে ব্যবহার করিবার জন্য যন্ত্রবিদেরা একদা চেষ্টা করিয়াছিলেন। কিন্তু রকেটের জোরে গাড়ী চালাইবার কাজে অনেক প্রকার কার্য্যকরী বাধা আসিয়া দেখা দিয়াছিল বলিয়া এতদ্বিষয়ক চেষ্টা তদানীন্তন কালে পরিত্যক্ত হইয়াছিল।
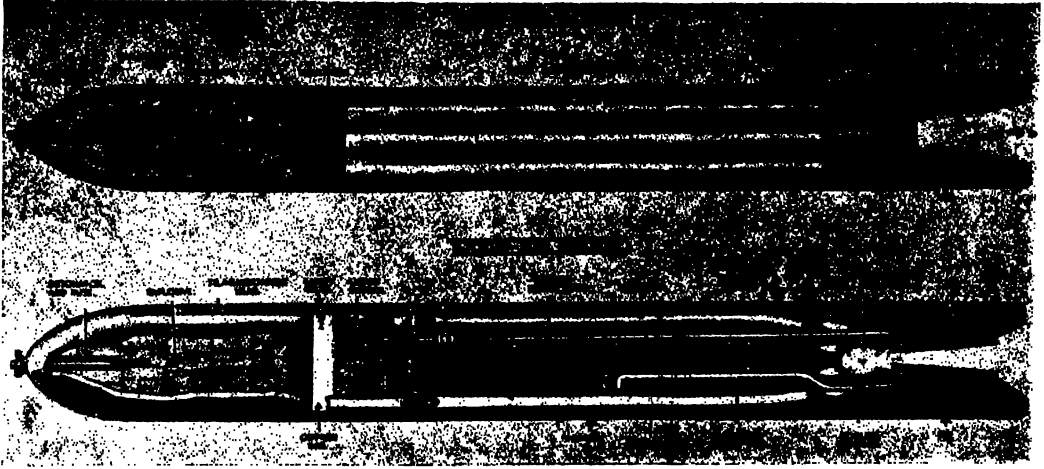
রকেট সেলের নির্ম্মাণকৌশল

ওপেল প্রমুখ কর্ম্মিগণ রকেট গাড়ী নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। মোটরের এঞ্জিনের পরিবর্ত্তে এই সকল গাড়ীতে গোটাকয়েক বিস্ফোরকপূর্ণ রকেট দেওয়া থাকিত। একটার পর একটা রকেট স্বয়ংক্রিয় ব্যবস্থায় বিস্ফোরিত হইলে গাড়ী অবিরাম গতিতে চলে। কিন্তু এই প্রকার গাড়ীকে ব্যবহারোপযোগী করিয়া তুলিবার পথে দুইটি প্রধান অন্তরায় ছিল। প্রথমতঃ, গাড়ীর অমিত বেগ, দ্বিতীয়তঃ, উপযুক্ত জ্বালানি বা বিস্ফোরক যাহা গাড়ীকে অবিরাম গতি দিতে পারে তাহার অভাব।

ওপেলের একটি গাড়ীতে ছই সেকেণ্ডের ভিতর ঘণ্টায় ৬০ মাইল বেগ উৎপন্ন হইয়াছিল, এই বেগ ক্রমে বর্দ্ধিত হইয়া এত বেশী হয় যে তাহার ফলে মোটর গাড়ী উল্টাইয়া যায়, রেল গাড়ী লাইনচ্যুত হয়। এই বেগকে আয়ত্তে আনা সাধ্যাতীত বলিয়াই এতদ্বিষয়ক প্রচেষ্টা বেশীদূর অগ্রসর হয় নাই। কিন্তু এই প্রকার প্রচণ্ডবেগ উৎপন্ন করিবার চাবিকাঠি হাতে পাইয়াই একদা মানুষ মঙ্গলগ্রহে পাড়ি জমাইবার স্বপ্ন দেখিতেছিল। পৃথিবী হইতে কোন বস্তুকে ঊর্দ্ধে ছুড়িয়া দিলে মাধ্যাকর্ষণের টানে সে আবার নীচে নামিয়া আসে। কিন্তু যদি কোন বস্তুকে ঊর্দ্ধে ছুড়িবার সময় মাধ্যাকর্ষণের টানের চেয়ে বেশী শক্তি নিয়োজিত করা হয় তবে সে পদার্থ আর মাটিতে নামিয়া আসিবে না। সেকেণ্ডে সাত মাইল বেগে যদি কোন বস্তু উপরে উঠিতে থাকে তবে উহা আর মাধ্যাকর্ষণের টানে পৃথিবীতে ফিরিয়া আসিবে না। রকেটের সাহায্যে এই প্রকার বেগ উৎপন্ন করা অসম্ভব নয়, কিন্তু বায়ুমণ্ডলের ভিতর দিয়া এই বেগে কোন পদার্থ চলিতে আরম্ভ করিলে বায়ুর সহিত সংঘর্ষে উহা অতিমাত্রায় উত্তপ্ত হইয়া উঠিবে।

১৯৩১ খ্রীষ্টাব্দে অষ্ট্রিয়ার ফ্রেডরিক স্মিডেল রকেটকে মানুষের কাজে প্রয়োগ করিয়াছিলেন। গ্রাজের নিকটবর্ত্তী পার্ব্বত্য অঞ্চলে সোকেল ও রেডগাড নামক দুইটি ছোট শহর আছে। শহর দুইটি যদিও মাত্র দুই মাইল দূরবর্ত্তী কিন্তু উহাদের মধ্যে উচ্চ পর্ব্বতের ব্যবধান। এক শহর হইতে অন্য শহরে ডাক চলাচলের জন্য ফ্রেডরিক রকেট ব্যবহার করিয়াছিলেন। এই ডাক-ব্যবস্থা রাষ্ট্র কর্ত্তৃক অনুমোদিত ছিল এবং অদ্যাপি এই ডাকের টিকেট উচ্চ মূল্যে ষ্টাম্প সংগ্রাহকগণ কর্ত্তৃক সংগৃহীত হইয়া থাকে। দুই বৎসর পরে জুকের নামক এক ব্যক্তি হার্জ পর্ব্বতের উপর দিয়া অনুরূপ ডাক-ব্যবস্থার প্রচলন করিয়াছিলেন। এই রকেটে বারুদ জাতীয় চূর্ণ পদার্থই ব্যবহৃত হইত। তদানীন্তন কালে অন্যপ্রকার বিস্ফোরক আবিষ্কৃত হয় নাই। বারুদ জাতীয় বিস্ফোরকের কয়েকটি অসুবিধা আছে। ইহা অতিমাত্রায় দাহ্য বলিয়া খুবই বিপজ্জনক পদার্থ। তদুপরি ইহা খুবই দ্রুত পুড়িয়া যায় এবং বিস্ফোরক দ্রব্য পুড়িয়া নিঃশেষ হইলেই রকেটের চালনা বন্ধ হয়। টিলিং নামক এক ব্যক্তি এই প্রকার বিস্ফোরক দ্বারা রকেটকে এক মাইল পর্য্যন্ত ঊর্দ্ধে পাঠাইতে সমর্থ হইয়াছিলেন কিন্তু পরীক্ষাকার্য্যে নিয়োজিত অবস্থায় তিনি ও তাঁহার তিন জন সহকর্ম্মী বিস্ফোরণের ফলে মৃত্যুমুখে পতিত হন।

অতঃপর চেষ্টা হইয়াছিল অন্যপ্রকার বিস্ফোরক পদার্থ সন্ধান করিবার যাহা শক্তিমত্তায় ম্লান না হইয়াও অপেক্ষাকৃত নিরাপদ, বারুদের মত দ্রুত পুড়িয়া শেষ হয় না এবং যাহার ক্রিয়া মানুষের আয়ত্তে রাখা যায়। তরল বাতাস, অক্সিজেন, হাইড্রোজেন ইত্যাদি তরলীকৃত গ্যাসও এই কার্য্যের উপযোগী বলিয়া জানা গেল। এই সব তরল পদার্থ যখন তাপের প্রভাবে সহসা তরল অবস্থা হইতে গ্যাসীয় অবস্থায় রূপান্তরিত হয় তখন উহারা বহুলাংশে আয়তনে বর্দ্ধিত হয় এবং এইজন্য ইহারা বিস্ফোরক হিসাবে কার্য্য করিতে সক্ষম। মনে রাখিতে হইবে বিস্ফোরণের মূলকথা—কোন পদার্থের মুহূর্ত্ত মধ্যে আয়তনের বিপুল বৃদ্ধি। তরল বাতাসের প্রচণ্ড বিস্ফোরণ-ক্ষমতা

জেট-যন্ত্রের কার্য্যপ্রণালী

কয়েক বৎসর আগে টাটার লৌহের কারখানার পরীক্ষায় প্রমাণিত হইয়াছিল। এই প্রকার তরল জ্বালানি বিস্ফোরক হিসাবে ব্যবহার করিবার বিশেষ সুবিধা এই যে ইহাদিগকে নির্দ্দিষ্ট পাত্রে ভরিয়া লইয়া পরে ইচ্ছামত বিস্ফোরণ কার্য্যে ব্যবহার করা সম্ভব। সাধারণত ইহারা মোটেই বিপজ্জনক নয়। প্রয়োজনানুযায়ী ইহাদিগকে নির্দ্দিষ্ট প্রকোষ্ঠে কম-বেশী চালান করিয়া বিস্ফোরণ ঘটান যাইতে পারে। বারুদ জাতীয় বিস্ফোরককে এমনই ভাবে নিয়ন্ত্রণ সম্ভব নহে। জার্মানীর বৈজ্ঞানিকগণ এই বিষয়ে গবেষণা আরম্ভ করিয়া রকেটকে ধ্বংসকার্য্যে ব্যবহার করিয়াছেন। জার্মানীর প্রসিদ্ধ V-2 রকেট বোমা এই প্রচেষ্টার ফল। অধ্যাপক ভার্ণার ফন ব্রাউন ইহার আবিষ্কর্ত্তা।

V-2 বোমার দীর্ঘাকৃতি রকেটের মাথার দিকে থাকে মারাত্মক বিস্ফোরক বোমার সরঞ্জামাদি ও পশ্চাতে থাকে রকেট বিস্ফোরণ-ব্যবস্থা এবং নির্দ্দিষ্ট দিকে চলিবার ও চালাইবার জন্য পিছনের দিকে লেজের মত অঙ্গ ও সম্মুখে রেডিও-যন্ত্র। জার্মানীতে রকেট বিস্ফোরণের জন্য পূর্ব্বোক্তরূপ তরল জ্বালানি ও দ্রুত দহনশীল বারুদ জাতীয় পদার্থ উভয়ই ব্যবহৃত হইত। লক্ষ্যস্থলের দূরত্বের হিসাব করিয়া রকেটের বিস্ফোরক পদার্থের পরিমাণ ও রন্ধ্রপথের পরিধি স্থিরীকৃত হইয়া থাকে। যে কোণ করিয়া উহারা ঊর্দ্ধে উৎক্ষিপ্ত হয় তাহার উপরেও উহাদের পাল্লা নির্ভর করে। রকেট শেল বায়ুমণ্ডলের স্তর স্তর দিয়া চলিত এবং ইহার গতি শব্দের গতির চেয়েও বেশী ছিল (ঘণ্টায় ৭৫০ মাইল)। এইরূপ প্রচণ্ড বেগে চলে বলিয়া ইহাদিগকে অনেক দূরে পাঠানো যাইত। রকেটের শক্তি দ্বারা কোন বস্তুকে বেশীক্ষণ ধরিয়া চলমান করা সম্ভব নহে, কারণ বিস্ফোরক পদার্থ নিঃশেষিত হইয়া গেলেই রকেট থামিয়া যাইবে। রকেটের সাহায্যে এরোপ্লেন চালাইতে হইলে উহাতে যে পরিমাণ জ্বালানি পদার্থ লওয়া দরকার তাহাতে এরোপ্লেনের বর্ত্তমান আকৃতিতে মোটেই স্থান সংকুলান হইবে না। জার্মানীর উড়ন্ত বোমা রকেট চালিত এরোপ্লেনই ছিল বটে। কিন্তু এই পদ্ধতিতে দূরের পাল্লার যাত্রীবাহী এরোপ্লেন চালানো সহজ নহে। জার্মানী Me-163 নামে পরিচিত জঙ্গী বিমানে রকেট ব্যবহৃত হইয়াছিল বলিয়া জানা গিয়াছিল। ইহাতে তরল অক্সিজেন, নাইট্রোজেন ও গ্যাসোলীন ব্যবহার করা হইত। এই বিমানে এক জন মাত্র আরোহী যাইতে পারিত এবং ইহা মাত্র পনর মিনিট আকাশে বিচরণ করিতে সমর্থ ছিল কারণ তদতিরিক্ত চলিবার মত জ্বালানি লওয়া যাইত না।

রকেটের মূল পদ্ধতির সম্প্রসারণ দ্বারাই জেট চালনা ব্যবস্থার উদ্ভব হইয়াছে। রকেটে গতি উৎপন্ন করিবার মূল কথা—কোন পাত্রে আবদ্ধ বেশী চাপের গ্যাসকে ক্ষুদ্র রন্ধ্রপথে নির্গত হইতে দেওয়া। বেশী চাপের গ্যাস উৎপন্ন করিবার জন্যই বিস্ফোরক প্রয়োজন কিন্তু অন্য উপায়েও এই কার্য্য করা সম্ভব।

একটি খেলনা রবারের বেলুনে বাতাস ভরিয়া দিলে উহা ফুলিয়া উঠে এবং ভিতরে খানিকটা উচ্চ চাপের বাতাস আবদ্ধ হয়। এক্ষণে এই বেলুন ছাড়িয়া দিলে উহার নল দিয়া বাতাস বাহির হইয়া আসিবে এবং তাহারই ফলে বেলুনটি বিপরীত দিকে চলিতে থাকিবে। এখানে বিস্ফোরণের কোন ব্যাপার নাই, কেবলমাত্র উচ্চ চাপের বাতাসকে ক্ষুদ্র রন্ধ্রপথে নির্গত হইতে দিয়াই বেলুনকে গতিশীল করা হইতেছে। জেট-চালিত এরোপ্লেনের মূল তথ্য এই বেলুন চালাইবার কৌশলের অনুরূপ।

জেট-চালিত এরোপ্লেন। গতি মিনিটে দশ মাইল

বিস্ফোরক পদার্থ না লইয়াও অন্য কোন উপায়ে উচ্চ চাপের গ্যাস সৃষ্টি করিয়া ক্ষুদ্র ছিদ্রপথে তাহার নির্গমন ব্যবস্থা করা যাইতে পারে। জেট-চালিত এরোপ্লেনের সম্মুখ ভাগে বায়ুমণ্ডল হইতে বাতাস টানিয়া একটি নলের ভিতর লইবার ব্যবস্থা থাকে। এই বাতাসকে তারপর যন্ত্রের সাহায্যে খুবই সঙ্কুচিত করা হয়। সঙ্কুচিত বাতাসকে পশ্চাৎ দেশ দিয়া বাহিরে যাইবার পথ করিয়া দিলে উহা বেগে বাহির হইয়া যাইবে এবং তাহারই ক্রিয়ায় এরোপ্লেন সম্মুখে গতি পাইবে। কিন্তু বাহিরে যাইবার পূর্বে এই সঙ্কুচিত বাতাসকে আরও বেশী চাপযুক্ত করিবার ব্যবস্থা করা হইয়া থাকে। সঙ্কুচিত বাতাসকে বাহির হইবার পূর্বে আর এক স্থানে চালান করা হয়। উহার নাম দহনপ্রকোষ্ঠ (Combustion Chamber)। এই প্রকোষ্ঠে প্রবেশ করিবার মুখে বাতাসের সঙ্গে পেট্রোল মিশ্রিত করা হয় এবং অতঃপর বৈদ্যুতিক স্ফুলিঙ্গের সাহায্যে পেট্রোল পোড়ানো হইয়া থাকে। পেট্রোল নিজে গ্যাসে পরিণত হয় ও বাতাসের তাপমাত্রা বাড়িয়া যায়। এই দুই কারণে দহন-প্রকোষ্ঠের বাতাস ও পেট্রোল গ্যাসের ধোঁয়া খুব বেশী চাপযুক্ত হয়। এই প্রচণ্ড চাপের গ্যাস অতঃপর পশ্চাৎ দিক দিয়া নির্গত হয় এবং এরোপ্লেন চলিতে থাকে। বায়ুমণ্ডল হইতে বাতাস টানিবার জন্য ও বাতাসকে সঙ্কুচিত করিবার জন্য যে যন্ত্র ব্যবহৃত হয় উহাকে চালু রাখিবার জন্যও এই গ্যাসই ব্যবহৃত হয়। দহনপ্রকোষ্ঠ হইতে নির্গমনকালে গ্যাসরাশি একটি চাকাকে ঘুরাইয়া থাকে এবং এই চাকার ঘূর্ণনেই পূর্বোক্ত যন্ত্র কাজ করে। ইহাই জেট-চালন ব্যবস্থার মূলকথা।

রকেটের সঙ্গে জেটের মৌলিক সাদৃশ্য থাকিলেও পার্থক্য অনেক আছে। রকেটের মত জেটকে চালু করিবার জন্য বিস্ফোরক পদার্থ বহন করিবার প্রয়োজন নাই। কোনপ্রকার বিস্ফোরণের ব্যাপার না থাকায় ইহা নিরাপদ ও যথেচ্ছ নিয়ন্ত্রণযোগ্য। যে বাতাসকে টানিয়া লওয়া হইবে বা যে পরিমাণ পেট্রোল পোড়ানো হইবে উহার হ্রাস বৃদ্ধি করিয়া এরোপ্লেনের গতি নিয়ন্ত্রণ করা যায়। জেট-চালিত এরোপ্লেনে 'প্রপেলার' বা 'এয়ার স্ক্রু'র প্রয়োজন নাই। এইজন্য এরোপ্লেন চালাইবার কার্য্য অনেক সহজ হইয়াছে। প্রপেলারের ঘূর্ণনে বাতাসে যে আবর্ত্তের সৃষ্টি হয় উহা পাখা ও লেজে আটকাইয়া এরোপ্লেনের স্বচ্ছন্দ গতিকে মন্দীভূত করে। জেট-চালিত এরোপ্লেনে এই রকম অসুবিধা নাই। তবে জেট-নির্গত বাত্যা-প্রবাহ যাহাতে পেছনের হাল ও লেজে না লাগে সেইজন্য জেট-চালিত এরোপ্লেনের লেজ খাড়া ভাবে নির্ম্মিত হয়। এই জাতীয় এরোপ্লেনের গতি ঘণ্টায় ৬০০ মাইল পর্য্যন্ত পৌঁছিয়াছে। প্রপেলার সংবলিত এরোপ্লেনে চলিবার সময় কম্পন অনুভূত হয়, জেট-চালিত এরোপ্লেনে কাঁপুনি নাই। এই প্রকার এরোপ্লেন সম্বন্ধে আরও একটি সুবিধার কথা বলা হয়। পৃথিবী হইতে দশ-বার মাইল ঊর্দ্ধে বায়ুমণ্ডলের স্তব্ধস্তর (Stratosphere)—বায়ু সেখানে হালকা বলিয়া প্রপেলার সেখানে ভাল কাজ করে না। একথা পূর্ব্বেই উল্লিখিত হইয়াছে যে, প্রপেলার বায়ুকে কাটিয়া কাটিয়া অগ্রসর হয়—তাই বায়ু যেখানে স্বল্প প্রপেলারের কার্য্যক্ষমতা সেখানে কমিয়া যায়। তাই স্তব্ধস্তরে সাধারণ এরোপ্লেন চলিতে পারে না কিন্তু জেট-চালিত এরোপ্লেনের গতির জন্য বায়ুর সাহায্যের কোন প্রয়োজন নাই বলিয়া এই এরোপ্লেনগুলি স্তব্ধস্তর দিয়া অনায়াসে যাইতে পারে। শুধু তাই নয় বায়ুর প্রতিরোধ সেখানে কম সেজন্য গতিবেগও বেশী হইয়া থাকে।

স্তব্ধস্তরের ভিতর দিয়া আকাশ-ভ্রমণ নানাকারণে সুবিধাজনক হইবে বলিয়া মনে করা হয়। সেখানকার বায়ুতে বিক্ষোভ নাই—নিশ্চল বায়ুসমুদ্র। কিন্তু কতকগুলি বাধা আছে বলিয়া এখন পর্য্যন্ত অত উঁচু দিয়া চলাচল সম্ভব হয় নাই। স্তব্ধস্তরের বাতাস খুবই ঠাণ্ডা, কোন কোন স্থানে তাপমাত্রা ৬০° ডিগ্রী। তদুপরি যে বায়ুর স্বল্পতা এরোপ্লেনের গতি-বৃদ্ধির কারণ তাহাই আবার মানুষের জীবনের পক্ষে দুঃসহ ও বিপজ্জনক। সমুদ্রপৃষ্ঠে বায়ুর চাপ প্রতি বর্গ ইঞ্চিতে পনর পাউণ্ড, সাড়ে তিন মাইল ঊর্দ্ধে এই চাপের পরিমাণ ইহার অর্দ্ধেক এবং দশ মাইল ঊর্দ্ধে বায়ুর চাপ প্রতি বর্গ ইঞ্চিতে প্রায় দেড় পাউণ্ড। এই স্বল্প চাপের বায়ুতে মানুষের শ্বাসযন্ত্র কার্য্য করিতে পারে না। আমরা প্রতিবার শ্বাস গ্রহণের সঙ্গে প্রায় এক পাইণ্ট বাতাস গ্রহণ করি, ফুসফুসের ৪০ কোটি কোষ এই বায়ুর জন্য বুভুক্ষিত হইয়া থাকে। দশ মাইল ঊর্দ্ধে নির্দ্দিষ্ট পরিমাণের মাত্র এক-দশমাংশ বায়ু গ্রহণ করিয়া ফুসফুসের কাজ চলা সম্ভব নহে। অধিকন্তু কম চাপের বায়ু ফুসফুসের ভিতরকার সকল স্থানে প্রবেশ করিতে পারে না।

তাই এই রকম আবহাওয়ায় গেলে মানুষ অস্বস্তিবোধ করে, শ্বাস ও নাড়ীর গতি দ্রুত হয়। বিশেষ ভাবে নির্ম্মিত উচ্চ চাপ সম্বলিত প্রকোষ্ঠে আবদ্ধ হইয়া থাকিলে শুন্যস্তরে চলাচল করা সম্ভব। এই বিষয়ে প্রচেষ্টা চলিতেছে।

বৈদিক আর্য্য ও আবেস্তিক আর্য্য

শ্রীননীমাধব চৌধুরী

ইউরো-এশিয়ার সীমা নির্দ্দেশক উরল পর্ব্বতমালার দক্ষিণে উত্তর-পশ্চিম কিরগিজ অঞ্চল বা দক্ষিণ-পূর্ব্ব রুশিয়ার আদিবাস-ভূমি হইতে আর্য্যজাতির কতকগুলি গোষ্ঠী বিভিন্ন সময়ে পশ্চিম মুখে চলিতে চলিতে য়ুক্রাইনের কাল মাটির অঞ্চল অতিক্রম করিয়া পোলাণ্ড অভিমুখে অগ্রসর হয় এবং ইউরোপের নানা-ভাগে ছড়াইয়া পড়ে। কয়েকটি দল বিভিন্ন সময়ে সম্ভবতঃ দারবেণ্ড গিরিপথে ককেশাস অতিক্রম করিয়া আজের-বাইজানের মধ্য দিয়া পূর্ব্বদিকে অগ্রসর হইতে থাকে। মধ্য এশিয়ার পথে বা মেসোপটেমিয়ার পথে ইহাদের কয়েকটি গোষ্ঠী ইরাণে উপনীত হয়। ইরাণ হইতে পূর্ব্বদিকে অগ্রসর হইয়া হিন্দুকুশ অতিক্রম করিয়া অথবা শিস্তানের মরুভূমি পার হইয়া বেলুচিস্থানের পথে ইহাদের কতকগুলি দল সিন্ধু উপ-ত্যকায় প্রবেশ করে। ইহারাই বৈদিক আর্য্যজাতি। আর্য্য-জাতি কর্ত্তৃক ভারত আক্রমণ ও বিজয়ের প্রচলিত কাহিনীর সংক্ষিপ্ত বিবরণ এইরূপ।

কোন কোন নৃতত্ত্ব-বিজ্ঞানী এই বৈদিক আর্য্যজাতি ব্যতীত আর একটি অবৈদিক আর্য্যগোষ্ঠীর ভারতবর্ষে প্রবেশের কথা বলেন। এই অবৈদিক আর্য্যজাতি আসিয়াছেন মধ্য এশিয়ার পূর্ব্বাঞ্চল হইতে; কিন্তু অনুমান করা হয় পূর্ব্ব-ইরাণ হইতে পামীর হইয়া অতি প্রাচীনকালে ইহারা পূর্ব্বদিকে প্রস্থান করিয়াছিলেন। প্রাচীন সুগদা বা বোখারার পার্ব্বত্য অঞ্চল পামীরের পর্ব্বতমালার সঙ্গে মিশিয়াছে। এইখানে কারা-টেগিন উপত্যকার মধ্য দিয়া গিরিপথ আলাই উপত্যকায় পড়িয়া কাশগরের দিকে চলিয়া গিয়াছে। প্রাচীনকালে কুয়েন-লুন পর্ব্বতের খনি হইতে প্রাপ্ত জেড-এর বাণিজ্য ও চীনের রেশম-বাণিজ্য এই পথেই পশ্চিম এশিয়া ও ইউরোপের সঙ্গে সংযোগ রক্ষা করিত। চীনের রেশম-বাণিজ্য চলিবার আর একটি পথ দক্ষিণে আনিচর পামীরের মধ্য দিয়া পশ্চিমে প্রসারিত ছিল এইরূপ বলা হয়।

পামীরের পর্ব্বত-গ্রন্থি হইতে শৃঙ্গের পর শৃঙ্গ উঠিয়া দক্ষিণে হিন্দুকুশের সঙ্গে মিলিত হইয়াছে। পূর্ব্বদিকে দুইটি পর্ব্বতশ্রেণী, তিয়েনসান (চীন পর্ব্বত) ও কুয়েনলুন উত্তর ও দক্ষিণে পূর্ব্বদিকে প্রসারিত। তিয়েনসান ও কুয়েনলুনের মধ্যে তারিম অববাহিকা তাকলা মাকান ও লপ মরুভূমি। মধ্য এশিয়ার এই অঞ্চল হইতে অবৈদিক আর্য্যজাতির কতকগুলি গোষ্ঠী অক্সাস উপত্যকা হইয়া, অথবা পামীর হইতে হিন্দুকুশ অতিক্রম করিয়া অথবা কারাকোরাম গিরিপথ হইয়া ভারতবর্ষে প্রবেশ করিয়া-ছিল। এই অবৈদিক আর্য্যগোষ্ঠী সম্বন্ধে আলোচনা এখানে করা হইবে না। ভারতবর্ষে বৈদিক আর্য্যজাতি বলিতে যাহাদের বুঝায় তাহারা ছাড়া অন্য গোষ্ঠীভুক্ত আর্য্যজাতিও আসিয়াছে, এই মতবাদের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করিবার জন্য এখানে ইহাদের উল্লেখ করা হইল।

উত্তর-পশ্চিম কিরগিজ অঞ্চল বা দক্ষিণ রুশিয়া হইতে আসিয়া যে বৈদিক আর্য্যজাতি ভারতবর্ষ আক্রমণ করিয়াছিল কোন কোন নৃতত্ত্ববিজ্ঞানী পণ্ডিত তাহাদের নাম দিয়াছেন প্রোটো-নর্ডিক (Proto-Nordic)। এই কথাটি আবিষ্কার করিয়াছেন সুপ্রসিদ্ধ ইংরেজ নৃতত্ত্ববিজ্ঞানী ডাঃ হেডন। ইহার অর্থ এই যে ইহারা ইউরোপের নর্ডিক আর্য্যজাতির পূর্ব্বপুরুষ-দিগের সমগোষ্ঠীয়। সে যাহা হউক, এই প্রোটো-নর্ডিক অথবা বৈদিক আর্য্যজাতি কর্ত্তৃক। খ্রীঃ পূঃ ২০০০-১৫০০ ভারতবর্ষ আক্রমণ ও বিজয়,—এই সুপরিচিত মতবাদের একটি অংশ এই রূপ যে ঋগ্বেদের অধিকাংশ স্তোত্র বা বহুস্তোত্র ভারতবর্ষের বাহিরে রচিত হইয়াছিল। কেহ বলেন এই সকল স্তোত্র রচিত হইয়াছিল মেসোপটেমিয়ায়, কেহ বলেন ইরাণে। পূর্ব্বের এক প্রবন্ধে ("বৈদিক আর্য্যগণ কি সেমিটিক?"—প্রবাসী, পৌষ ১৩৫২) আর্য্য ভাষাভাষী ও আর্য্যদেবতার উপাসক মেসোপটে-মিয়া ও সিরিয়ার কয়েকটি প্রাচীন জাতির সহিত বৈদিক আর্য্য-দিগের সম্পর্ক বিষয়ে যে আলোচনা করা হইয়াছে তাহাতে দেখা গিয়াছে, বৈদিক ধর্ম্ম ও ঋগ্বেদের স্তোত্র সম্বন্ধে এই মত-বাদের ভিত্তি—ঐ সকল জাতির কোন কোন প্রাচীন লেখনে ইন্দ্র, বরুণ, মিত্র, নাসত্য, সূর্য্য ও মরুৎ এই কয়েকটি দেবতার নামের উল্লেখ। যুক্তি কতকটা এইরূপ: এই সকল বৈদিক দেবতার নাম যখন পাওয়া যাইতেছে তখন যে ঋগ্বেদে ইহাদের নাম পাওয়া যায় তাহাও অবশ্য মেসোপটেমিয়ায় রচিত হইয়া-ছিল। ইন্দ্র, নাসত্য, মিত্রের নাম জেন্দাবেস্তায় পাওয়া যায়। সুতরাং জেন্দাবেস্তাও মেসোপটেমিয়ায় রচিত হইয়াছিল, ঐ প্রকার যুক্তির বলে একথাও বলা চলে; কিন্তু তাহা বলা হয় না। অর্থাৎ প্রাচীন পার্সীদিগের বর্ণনায় জেন্দাবেস্তা ইরাণে

রচিত বটে, কিন্তু প্রাচীন ভারতীয়দিগের ধর্ম্মশাস্ত্র ঋগ্বেদ মেসোপটেমিয়ায় রচিত !

পশ্চিম এশিয়ার যে সকল প্রাচীন লেখনে বৈদিক দেবতাদিগের নাম পাওয়া যায় তাহা খ্রীঃ পূঃ পঞ্চদশ শতকের রচনা।

মেসোপটেমিয়া হইতে ভারতবর্ষে আসিবার পথ ইরাণ হইয়া এবং সমুদ্রপথে পারস্য উপসাগর হইয়া। অধিকাংশ মেসোপটেমিয়া-পন্থী ও মধ্য এশিয়া-পন্থী পণ্ডিত সমুদ্রযাত্রার বিপক্ষে, তাঁহাদের উভয় দলের মত আর্য্যজাতি ইরাণে ডেরা বাঁধিয়াছিলেন। এই পর্য্যন্ত উভয় দলের মিল থাকিলেও আর্য্যজাতির ভারতবর্ষে প্রবেশ করিবার সময় সম্বন্ধে স্বভাবতঃই মতানৈক্য দেখা যায়। মেসোপটেমিয়া-পন্থীগণ খ্রীঃ পূঃ পঞ্চদশ শতকের পরে আরও তিন চার শতক হাতে রাখিয়া আর্য্যজাতির ভারতবর্ষে প্রবেশের সময় নির্দ্দিষ্ট করেন খ্রীঃ পূঃ দশম হইতে নবম শতকের মধ্যে। তিন-চার শতক হাতে রাখিতে হয় মেসোপটেমিয়া হইতে ইরাণে পৌঁছিয়া সেখানে আর্য্যজাতিকে বসবাস করিবার সময় দিবার জন্য। মধ্য এশিয়া-পন্থীগণ আর্য্যজাতির ভারতবর্ষে প্রবেশ করিবার সময় আরও পিছাইয়া দেন। তাঁহাদের (ম্যাকডোনেল, কীথ, মরগান প্রভৃতির) মতে খ্রীঃ পূঃ পঞ্চদশ শতকে আর্য্যজাতি ভারতে প্রবেশ করেন। পণ্ডিত কোনো ও উইনটারনিট্জের মতে আর্য্যজাতির ভারত প্রবেশের কাল খ্রীঃ পূঃ ২৫০০-২০০০ বৎসর।

বলা বাহুল্য আর্য্যজাতির ইরাণ হইতে ভারতবর্ষে আসিবার কাল মোটামুটি খ্রীঃ পূঃ ২০০০-১৫০০ বৎসরের মধ্যে ধরিলেও মেসোপটেমিয়া প্রভৃতি দেশের খ্রীঃ পূঃ পঞ্চদশ শতকের লেখনে উল্লিখিত দেবতাদিগের সঙ্গে তাঁহাদের যোগাযোগ নির্ণয় করা সমস্যার বিষয় রহিয়া যায়। তাহা ছাড়া ঋগ্বেদের সহিত আবেস্তার সম্বন্ধের ব্যাখ্যা লইয়াও সমস্যার উৎপত্তি হয়। এ সম্বন্ধে পরে বলা হইতেছে।

মধ্য এশিয়া-পন্থীগণ ঋগ্বেদের রচনা-কাল ও রচনা-স্থান সম্বন্ধে কিরূপ মত প্রকাশ করিয়াছিলেন দেখা যাউক। ব্লুমফিল্ডের মতে ঋগ্বেদের রচনা আরম্ভ হয় খ্রীঃ পূঃ ২০০০ অব্দে, উইন্টারনিট্জের মতে খ্রীঃ পূঃ ২৫০০ হইতে ২০০০ অব্দের মধ্যে ঋগ্বেদের রচনা আরম্ভ হয় ও খ্রীঃ পূঃ ৭০০ অব্দের মধ্যে উহা শেষ হয়। ম্যাক্সমুলারের মতে ঋগ্বেদের রচনাকাল খ্রীঃ পূঃ ১২০০, কীথের মতে খ্রীঃ পূঃ ৮০০ অব্দের মধ্যে ঋগ্বেদের রচনা সমাপ্ত হয়। দেখা যাইতেছে যে, আর্য্যজাতির ভারতবর্ষে প্রবেশ ও ঋগ্বেদের রচনা সমসাময়িক, এইরূপ মত প্রবল। ম্যাকডোনেল বলেন যে, প্রাচীন ইরাণীয় আর্য্যগোষ্ঠিসমূহ হইতে বিচ্ছিন্ন হইবার পরে অল্পকালের মধ্যে বৈদিক সাহিত্য রচনার সূত্রপাত হয়। অর্থাৎ তাঁহার মতে খ্রীঃ-পূঃ ১৫০০ অব্দের আগে ইরাণ হইতে বৈদিক আর্য্যগণ ভারতবর্ষের দিকে রওনা হন। এই সময় নির্দ্দেশ স্মরণ রাখিতে হইবে।

ঋগ্বেদের রচনা-স্থান সম্বন্ধে মধ্য এশিয়া-পন্থীদের মধ্যে Hille Brandt-এর মতে ঋগ্বেদের ষষ্ঠ মণ্ডল আরাকোশিয়ায় অর্থাৎ কান্দাহার অঞ্চলে রচিত হইয়াছিল। ম্যাকডোনেলের মতে ঋগ্বেদের প্রাচীনতম অংশ পূর্ব্ব আফগানিস্থানে রচিত হইয়াছিল। অন্যত্র তিনি বলিতেছেন,

"The people by whose poets the Rigveda was composed were settled in the north-west of India from Kabul to the Jumna".

অর্থাৎ ঋগ্বেদীয় আমলে আর্য্যজাতি কাবুল হইতে যমুনা অর্থাৎ গাঙ্গেয় উপত্যকার পশ্চিম সীমানা পর্য্যন্ত বিস্তৃত অঞ্চলে বাস করিতেন। ইরাণীয় আর্য্যগোষ্ঠি হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া বৈদিক আর্য্যদিগের কাবুল উপত্যকা হইতে সিন্ধু উপত্যকা ও পূর্ব্বে যমুনা পর্য্যন্ত আসিতে অবশ্য দীর্ঘ দিন লাগিয়াছিল। এই দিকে লক্ষ্য রাখিয়া ঋগ্বেদের রচনাকাল খ্রীঃ-পূঃ ১৫০০ হইতে ৮০০ অব্দ পর্য্যন্ত নির্দ্ধারিত করা হইয়াছে। Hille Brandt-এর মতে ষষ্ঠ মণ্ডল আরাকোশিয়ায় রচিত হইয়াছিল বলা হইয়াছে। এই মণ্ডল ভরদ্বাজ-কুলের রচনা। এই মতের প্রধান ভিত্তি কয়েকটি নামের ব্যাখ্যা : হরিয়ুপিয়া — হরিয়াব বা আলিয়াব ; সরস্বতী — হরখৈতি ; দাস = দাহি (Dahae) ; পণি — পারনিয়ান ইত্যাদি। এই সকল নাম প্রাচীন ইরাণীয় ইতিহাসে পরিচিত।

দেখা যাইতেছে যে ঋগ্বেদের রচনার স্থান পণ্ডিতগণের মতে যে ভাবে নির্দ্ধারিত হইয়াছে তাহাতে ঋগ্বেদ ভারতবর্ষের বাহিরে রচিত হইয়াছে বলা যায় না। আরাকোশিয়া, পারোপানিসাদি ও আরিয়া, অর্থাৎ কান্দাহার, কাবুল ও হিরাট প্রদেশ মৌর্য্য সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল, গেড্রোশিয়া বা বেলুচিস্থানও ঐ সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল। মৌর্য্য আমলে শুধু এই সকল অঞ্চল নহে পরন্তু বালখ (ব্যাকট্রিয়া), সুগদা (সগডিয়ানা) প্রভৃতি অঞ্চল লইয়া সমগ্র পূর্ব্ব ইরাণ বৌদ্ধধর্ম্মের প্রবল বন্যায় প্লাবিত হইয়াছিল। বালখ জরাথুস্ত্রের জন্মস্থান। আবেস্তা প্রাচীন বালখি ব্যাকট্রিয়ান ভাষায় রচিত। আবেস্তার সঙ্গে ঋগ্বেদের বহু বিষয়ে সাদৃশ্য আছে। সুতরাং মেসোপটেমিয়ার প্রসঙ্গ ত্যাগ করিয়া এইবার ইরাণের বা আবেস্তিক আর্য্যগণের সঙ্গে বৈদিক আর্য্যগণের সম্পর্কের প্রসঙ্গে আসা যাইতে পারে।

আবেস্তিক আর্য্যগণের সঙ্গে বৈদিক আর্য্যগণের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক সম্বন্ধে কোন সন্দেহ নাই। ভাষা, দেবদেবী, সোমরসের ব্যবহার, অগ্নি উপাসনার প্রাধান্য, হোমাদি যজ্ঞক্রিয়া ইত্যাদি বহু বিষয়ে আবেস্তা ও বৈদিক সাহিত্যের মধ্যে সাদৃশ্য আছে। এ বিষয়ে পণ্ডিতগণের আলোচনার ফলে যে-সকল তথ্য আবিষ্কৃত হইয়াছে তাহার সারমর্ম্ম এইরূপ যে, আবেস্তিক আর্য্য ও বৈদিক আর্য্য-- জাতিতে, ভাষায় ও ধর্ম্মে ঘনিষ্ঠভাবে সম্পর্কিত।

এ বিষয়ে আলোচনায় অগ্রসর হইবার পূর্ব্বে প্রাচীন ইরাণীয় বা জোরোষ্ট্রিয়ান ধর্ম্মসাহিত্য সম্বন্ধে সংক্ষেপে দুই-একটি কথা বলা দরকার।

প্রাচীন ইরাণের সহিত ভারতবর্ষের রাজনৈতিক সম্পর্কের প্রথম ঐতিহাসিক উল্লেখ দেখা যায় খ্রীঃ-পূঃ পঞ্চম শতকের প্রথম ভাগে। তখন শিশুনাগ বংশীয় রাজা, সম্ভবতঃ অজাতশত্রু, (খ্রীঃ-পূঃ ৫০২) মগধের সিংহাসনে অধিষ্ঠিত। কোশল, কাশী ও লিচ্ছবীদিগের রাজ্য জয় করিয়া অজাতশত্রু পূর্ব্বভারতীয় সাম্রাজ্যের ভিত্তি প্রতিষ্ঠিত করিতেছেন। হাকামণিবংশের প্রথম দারিয়ুস বা দারায়াবাহু (খ্রীঃ-পূঃ ৫২১—৪৮৫) তখন পারস্যের প্রবল প্রতাপান্বিত সম্রাট্। মিডিয়া, ইরাক, মিশর, সিরিয়া, এশিয়া মাইনর, গ্রীসের থ্রেস, মাসিডন, পূর্ব্বদিকে সুগদা বালখ ও হিরাট হইতে কাবুল উপত্যকা পর্য্যন্ত বিস্তৃত তাঁহার সাম্রাজ্য। সমগ্র সিন্ধু উপত্যকা হাকামণি সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হইয়া গেল দারিয়ুসের গ্রীক সেনাপতি সিকলাক্সের সিন্ধু অভিযানের সাফল্যে। ভারতবর্ষের সহিত ইরাণের এই সংযোগের ফলে কৃষ্টিমূলক আদান-প্রদান কিরূপ হইয়াছিল তাহার বিশেষ বিবরণ মিলে না, কিন্তু হাকামণি সম্রাটগণের সাম্রাজ্য বিস্তার ও সাম্রাজ্য রক্ষার প্রয়োজনে ভারতীয় প্রদেশ (Indian Satrapy) কিরূপ অর্থ ও লোকবল যোগাইয়াছিল তাহার কিছু কিছু বিবরণ পাওয়া যায়। তারপর সংঘটিত হইল গৌগামেলার যুদ্ধে তৃতীয় দারিয়ুসের পরাজয়, আলেকজাণ্ডার কর্ত্তৃক সমগ্র পারস্য সাম্রাজ্য অধিকার এবং পঞ্জাব আক্রমণ। ইহা খ্রীঃ-পূঃ ৩৩১ হইতে ৩২৬ এর মধ্যেকার ঘটনা।

জোরোষ্ট্রিয়ান ধর্ম্মের প্রবর্ত্তক জরাথুষ্ট্র প্রথম দারিয়ুসের পিতা হিষ্টাসপেসের (Hystaspes) সমসাময়িক বলিয়া একটা মত প্রচলিত আছে। ষষ্ঠ শতাব্দীর এক জন গ্রীক লেখক বলেন—এখনকার পারসীকগণ মনে করেন যে, ধর্ম্মপ্রচারক জোরোয়াষ্টার হিষ্টাসপেসের সময়ে আবির্ভূত হইয়াছিলেন কিন্তু এই হিষ্টাসপেস দারিয়ুসের পিতা কিনা তাহা জানিবার উপায় নাই। জরাথুষ্ট্রের আবির্ভাব-কাল সম্বন্ধে বিতর্কের বিস্তারিত আলোচনা এখানে অনাবশ্যক। এ সম্বন্ধে মোটামুটি দুইটি মত দেখা যায়। একটি মতানুসারে জরাথুষ্ট্রের আবির্ভাব-কাল আলেকজাণ্ডারের ২৮০ বা ২৮৮ বৎসর পূর্ব্বে, অর্থাৎ খ্রীঃ-পূঃ ৬১০ বা ঐরূপ সময়ে। ঐ সময়ে সিআকসজারেস (Cyaxares) মিডিয়ার সম্রাট্, হাকামণি রাজবংশের তখনও অভ্যুদয় হয় নাই। এই কিম্বদন্তীর উল্লেখ করিয়াছেন প্রসিদ্ধ আরবী লেখক ও পর্য্যটক মাসুদী এবং ইহার ভিত্তি পারসীকদিগের প্রাচীন গ্রন্থ বুন্দাহিশ (Bundahish) এবং তাহাদিগের মধ্যে প্রচলিত বিশ্বাস। দ্বিতীয় মতানুসারে জরাথুষ্ট্রের আবির্ভাব-কাল খ্রীঃ-পূঃ ১০০০ হইতে ১২০০ বৎসরের মধ্যে। পণ্ডিত মার্টিন হগ ও আরও অনেকে এই মত গ্রহণ করিয়াছেন। হগের মত এই যে, জরাথুষ্ট্রের আবির্ভাব-কাল খ্রীঃ-পূঃ ১০০০ বৎসরের পরে হইতে পারে না। সংক্ষেপে বলা যায় যে খ্রীঃ-পূঃ ১২০০—১০০০ জরাথুষ্ট্রের আবির্ভাব-কাল ও আবেস্তা সাহিত্যের প্রাচীনতম অংশের রচনাকাল বলিয়া মনে করা যাইতে পারে। এই সময় নির্দ্দেশ মনে রাখা প্রয়োজন।

আবেস্তা সাহিত্যের প্রাচীনতম অংশের কথা বলা হইয়াছে। প্রাচীন ইরাণীয় ধর্ম্মশাস্ত্র জেন্দাবেস্তা জরাথুষ্ট্রের রচনা বলিয়া পরিচিত। কিন্তু জেন্দ ও আবেস্তা একই বা দুইখানি পৃথক গ্রন্থের নাম নহে। জেরোয়াষ্ট্রিয়ান ধর্ম্মসাহিত্যের একটি সংক্ষিপ্ত বর্ণনা উদ্ধৃত করা যাইতেছে: "জেরাথুস্তের (জরাথুষ্ট্র) রচিত আদি গ্রন্থের নাম আবেস্তা। পারসীকগণ উহা বুঝিতে অসমর্থ হওয়ায় জেরাথুস্ত একটি ভাষ্য রচনা করিলেন। উহার নাম দেওয়া হইল জেন্দ। এই ভাষ্যের আর একটি ভাষ্য তিনি রচনা করিলেন। উহার নাম দেওয়া হইল পাজেন্দ (Pazend)। জেরাথুস্তের মৃত্যুর পরে পারসীকগণ এই নূতন ভাষ্যের একটি ভাষ্য রচনা করিলেন এবং উল্লিখিত সকল গ্রন্থের ব্যাখ্যা প্রস্তুত করিলেন। উহার নাম হইল ইয়াজদহ (Yazdah)। এই বর্ণনা হইতে জানা যাইতেছে যে, জেন্দ আবেস্তার ভাষ্য। পঞ্জাবীতে জেরোয়াষ্ট্রিয়ান ধর্ম্মগ্রন্থের নাম ***Avistak va Zand***। আবেস্তা বলিতে গোড়ায় জরাথুস্ত্র ও তাঁহার সাক্ষাৎ শিষ্যগণের রচিত ধর্ম্মশাস্ত্র বুঝাইত, জেন্দ বলিতে শিষ্যগণের একই ভাষায় রচিত উহার ভাষ্য বুঝাইত। এই ভাষা ক্রমে সাধারণের অবোধ্য হওয়ায় সাসানীয় যুগে পঞ্জাবী ভাষায় মোয়াবেদগণ (সাসানীয় আমলে জেরোয়াষ্ট্রিয়ান ধর্ম্মের পুরোহিতশ্রেণী) ইহার অনুবাদ করেন। ইহাই সাধারণতঃ জেন্দ নামে পরিচিত।

সে যাহা হউক, সমগ্র প্রাচীন ধর্ম্মগ্রন্থ জরাথুষ্ট্রের রচনা বলিয়া দাবি করা হইলেও আবেস্তার প্রাচীনতম অংশমাত্র তাঁহার রচনা এইরূপ বলা হয়। আবেস্তার এই প্রাচীনতম অংশ ইয়স্না (Yasna, Sk. Yajna)। ইয়স্নার প্রথম অংশ জরাথুষ্ট্রের রচিত কয়েকটি গাথা। অন্যান্য অংশ তাঁহার শিষ্যগণের রচনা বলিয়া মনে করা হয়। গাথাগুলির ভাষা আবেস্তার অন্যান্য অংশের ভাষা হইতে ভিন্ন ও প্রাচীন। এইগুলি বিভিন্ন ছন্দে রচিত, পাঁচটি ভাগে বিভক্ত প্রার্থনা ও স্তোত্র প্রভৃতির সংগ্রহ। এইরূপ মত প্রকাশ করা হইয়াছে যে, গাথাগুলি সমগ্র জেন্দাবেস্তার প্রাচীনতম অংশ এবং ইয়স্নার পরবর্ত্তী অংশগুলি, বিসপরদ ও ভেন্দিদাদ (Visparad, Vendidad), রচিত হইবার সময়ে এই গাথাগুলি প্রাচীন ধর্ম্মশাস্ত্র বলিয়া পরিগণিত ও সম্মানিত হইত।

এই গাথাগুলির সঙ্গে বৈদিক সাহিত্যের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক প্রমাণিত হইয়াছে। প্রথমে ভাষার কথা বলা যাইতে পারে। গাথার ভাষা পূর্ব্ব ইরাণীয় বা ব্যাকট্রিয়ার ভাষা। ব্যাকট্রিয়ার ভাষার দুইটি স্তর লক্ষিত হয়। প্রথম স্তর গাথাগুলির—ইহাকে Gatha dialect বলা হয়। দ্বিতীয় স্তর লক্ষিত হয় আবেস্তার অপরাংশে। এই স্তরের নাম দেওয়া হইয়াছে ব্যাকট্রিয়ান বা Classical Avestan language। ইহা লক্ষ্য করিতে হইবে, আবেস্তা যে ভাষায় রচিত সে ভাষার কোন নাম নাই—উহা Avestan language বলিয়া পরিচিত। বৈদিক সংস্কৃতের সহিত ক্লাসিকাল সংস্কৃতের বহু পার্থক্য

বৃহত্তম অণুবীক্ষণ
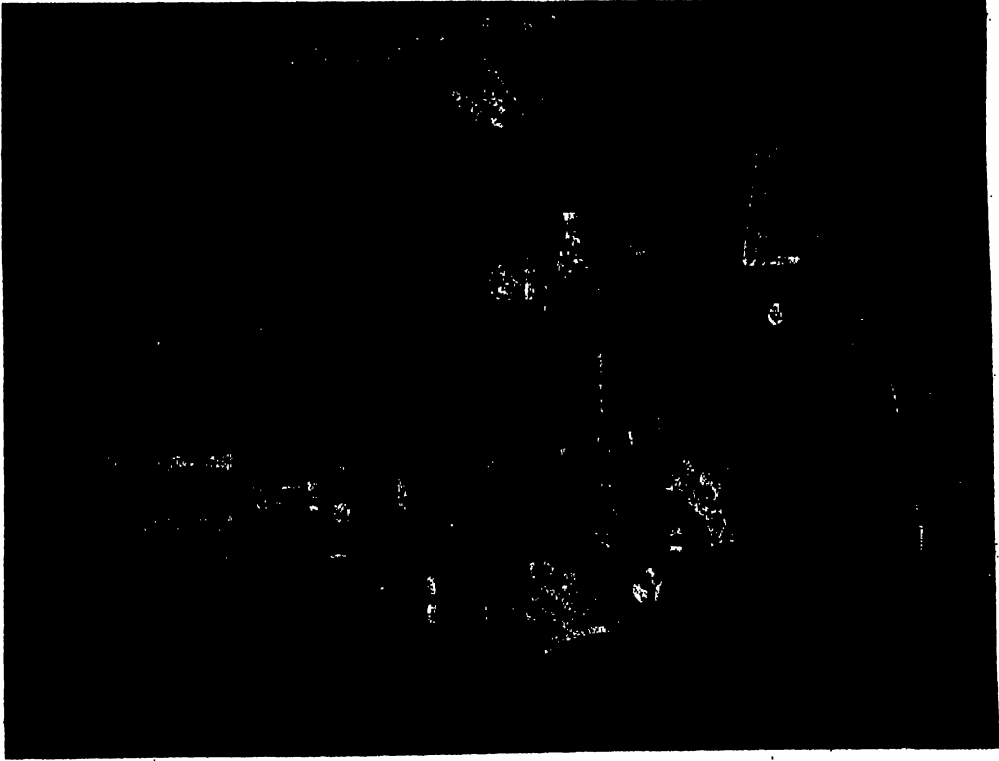
আমেরিকার উদ্ভাবিত দুইটি বৃহৎ ও সূক্ষ্ম ইলেকট্রন অণুবীক্ষণযন্ত্র। এই উভয় যন্ত্রের ভিতর দিয়াই পদার্থের আকৃতি লক্ষগুণ বর্ধিত দেখায়

বৃহত্তম জাহাজ

নিউ ইয়র্কের পথে ১৫৫২৬ জন মার্কিন সৈন্যবাহী জাহাজ 'কুইন মেরী'

প্রেসিডেন্ট ট্রুম্যানের জন্ম-শহর ইণ্ডিপেণ্ডেন্স, মিসৌরীর পুরনো ধাঁচের রেল-ষ্টেশন

আধুনিক পরিকল্পনায় নির্মিত যুক্তরাষ্ট্রের একটি রেল-ষ্টেশন
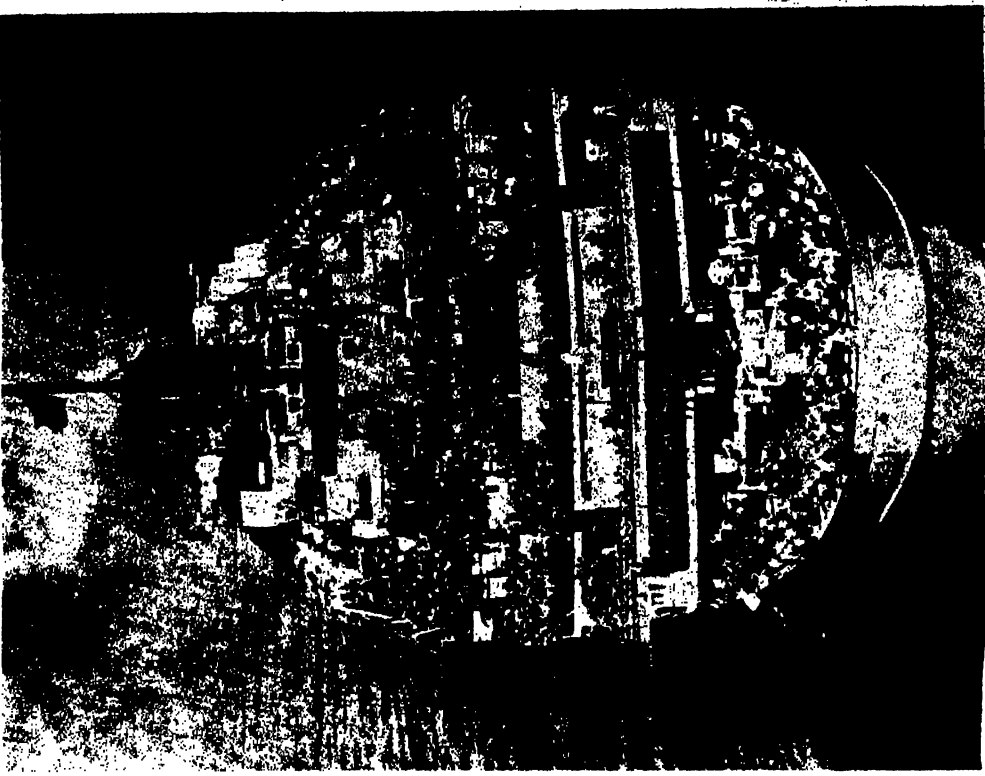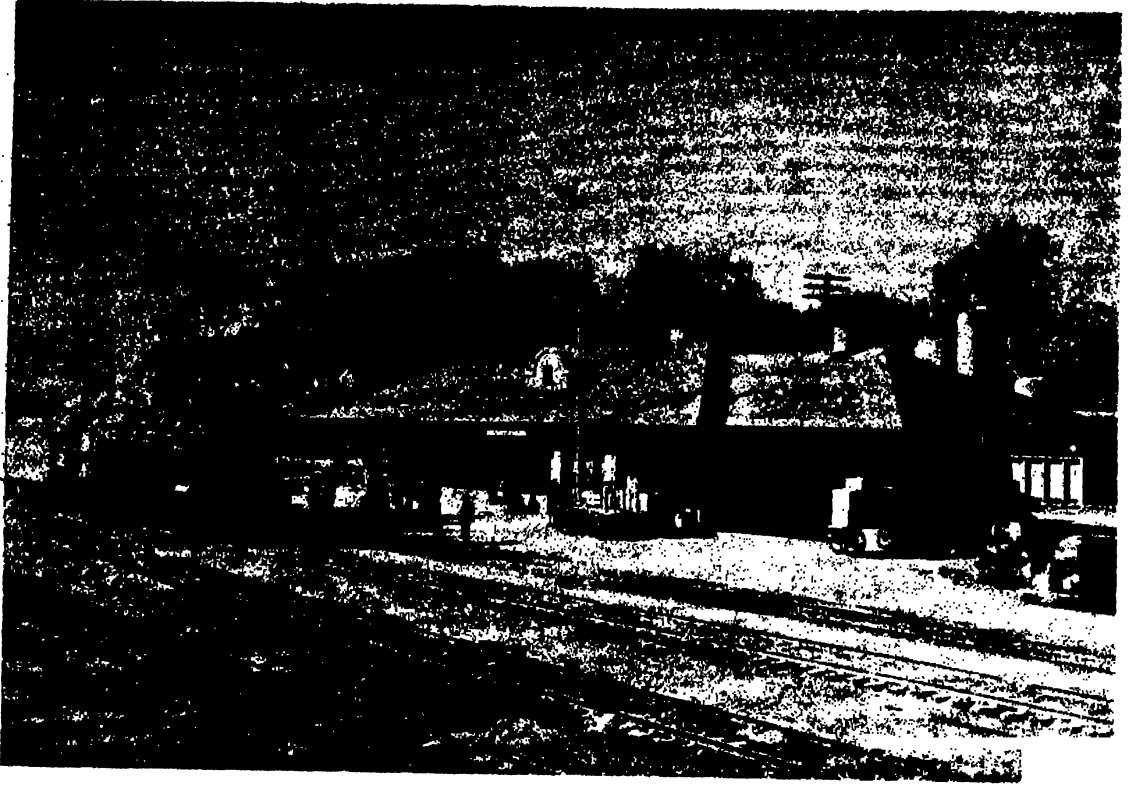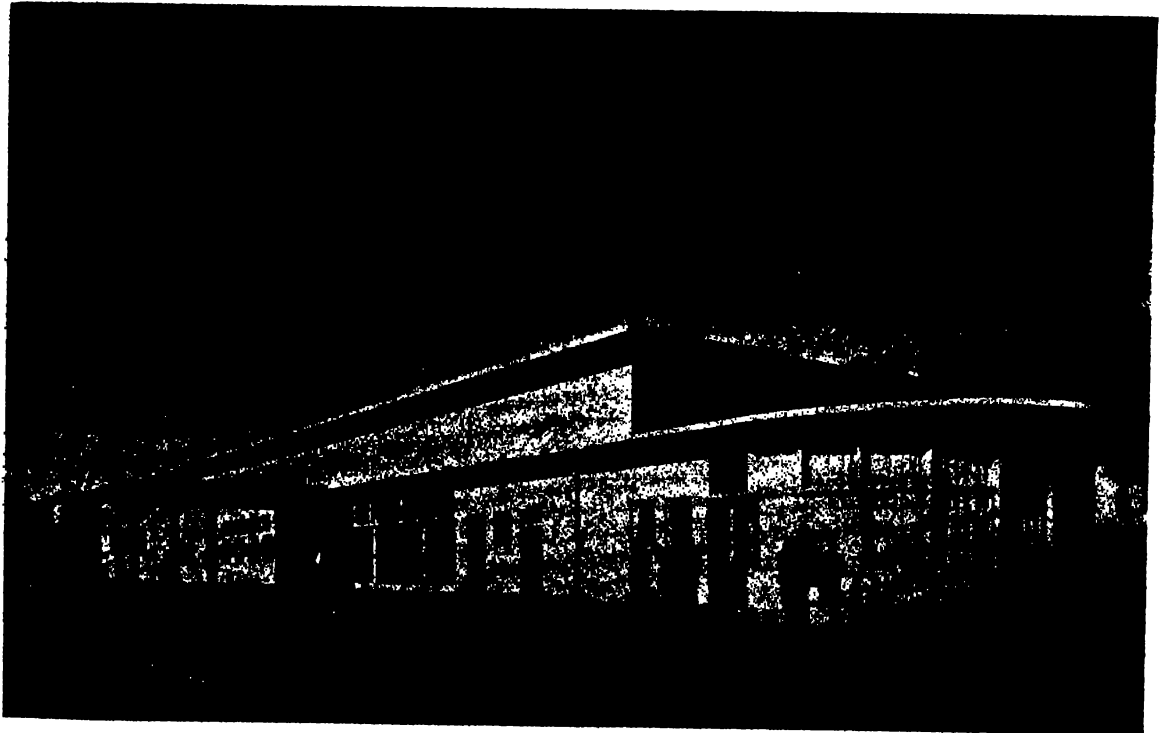
থাকিলেও উহা সংস্কৃত ভাষা। কিন্তু আবেস্তার ভাষা খ্রীঃ পূঃ তৃতীয় শতকে লুপ্ত হইয়া যায়। হাকামণি বংশের বেহিসতুন (হামাদানের নিকটবর্ত্তী) লেখনের ভাষার সহিত ব্যাকট্রীয়ান ভাষার সাদৃশ্য থাকিলেও উহার ভাষা আবেস্তার ভাষা নহে এইরূপ বলা হইয়াছে। বৈদিক সংস্কৃত ও আবেস্তার (গাথার) ভাষার মধ্যে সাদৃশ্য সম্বন্ধে বলা হইয়াছে—"The two languages are only dialects of two separate tribes of the same race;" অর্থাৎ "এক জাতির দুইটি পৃথক গোষ্ঠীর ভাষা বৈদিক ভাষা ও আবেস্তার ভাষা।" ব্যাকরণে এই দুই ভাষার পার্থক্য খুব কম, বেশী পার্থক্য উচ্চারণের নিয়মে ও শব্দগঠনে। পণ্ডিত হগের মতে জার্মান ও ডাচ ভাষার মধ্যে যেরূপ পার্থক্য বৈদিক ভাষা ও আবেস্তার মধ্যে পার্থক্য তাহার বেশী নহে। গাথাগুলির ছন্দ বৈদিক সূক্তগুলির ছন্দের অনুরূপ। প্রথম গাথা অহুনাবৈতির ছন্দ গায়ত্রী ছন্দের ন্যায়। দ্বিতীয় গাথার ছন্দ বৈদিক ত্রিষ্টুভ ছন্দের ন্যায়। তৃতীয় গাথার ছন্দ খাঁটি ত্রিষ্টুভ। এইরূপ মত প্রকাশ করা হইয়াছে যে, সামবেদের সঙ্গে গাথাগুলির বিষয়বস্তুর এবং ইয়স্নার অপর অংশগুলির সহিত যজুর্ব্বেদের তুলনা করা যাইতে পারে।

পিতম জরাথুষ্ট্রের জন্মস্থান ব্যাকট্রিয়া বা বাল্খ বলিয়া অনুমান করা হয়, কিন্তু বাল্খের কোন্ নগরে তিনি জন্মিয়াছিলেন তাহা জানা নাই। গাথা উষ্টাবৈতিতে বাল্খের (berekdha) গৃহ ও সম্পত্তির উল্লেখ পাওয়া যায়। এইরূপ মত প্রকাশ করা হইয়াছে—যে পাঁচটি গাথা তাঁহার রচনা তাহা তাঁহার নিজের নগরে প্রচলিত ভাষায় লিখিত। এই ভাষা আবেস্তার অন্যান্য অংশ রচনার সময়ে প্রায় অপ্রচলিত হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। গাথা ভাষা সম্বন্ধে আরও বলা হইয়াছে যে, ইহাতে মূল ভাষা হইতে খানিকটা অবনতির লক্ষণ দেখা যায়। ("We find her no longer in the prime of life, she appears rather in her declining age.") মূল ভাষা হইতে গাথার ভাষায় এই পরিবর্ত্তন ঘটিতে অনেকটা সময় লাগিয়াছিল এরূপ অনুমান সহজে করা চলে। জরাথুষ্ট্রের আবির্ভাব-কাল যদি খ্রীঃ পূঃ ১২০০ হইতে ১০০০ বৎসরের মধ্যে হয় তাহা হইলে গাথার ও পরবর্ত্তী আবেস্তার ভাষায় এই পরিবর্ত্তন ঘটিতে দুই শত বৎসর অতিবাহিত হওয়া সম্ভব। বৈদিক ভাষাকে মূল ভাষার অধিকতর নিকটবর্ত্তী বলিয়া মনে করা হইলে উহার এই অবিকৃত অবস্থা গাথার রচনা-কাল হইতে আরও দুই শত বৎসরের পূর্ব্বেকার ব্যাপার এরূপ অনুমান করা চলে।

ভাষা, ছন্দ প্রভৃতিতে বৈদিক সাহিত্য এবং আবেস্তার মধ্যে সাদৃশ্যের কথা বলা হইল। ঋগ্বেদে আর্য্য, আর্য্যবর্ণ, আর্য্যব্রত প্রভৃতি পদের বহু ব্যবহার দেখা যায়। আবেস্তায় এইরূপ কয়েকটি পদ পাওয়া যায়। একটি পদ *airyao danhavo*—ইহার অর্থ করা হইয়াছে Aryan countries এবং 'পারস্ত মিডিয়া ও বাল্খ, এইগুলি আর্য্যদিগের দেশ এইরূপ ব্যাখ্যা করা হইয়াছে। পার্শ, ফার্স বা পারস্তের ও মিডিয়ার ভাষা পশ্চিম ইরাণী শাখাভুক্ত এবং পূর্ব্ব ইরাণী শাখা হইতে ভিন্ন। এই পশ্চিম ইরাণী শাখা হইতে আধুনিক ফার্সী ভাষা উদ্ভূত হইয়াছে। জরাথুষ্ট্র নিজে বাল্খের লোক। পূর্ব্ব ইরাণী শাখার ভাষা যে সকল অঞ্চলে প্রচলিত ছিল—যথা, সুগদা, হারোয়া (হিরাট) প্রভৃতি অঞ্চল কি ভাবে *airyao danhavo* হইতে বাদ যায় তাহার কৈফিয়ৎ দেওয়া হয় নাই। লক্ষ্য করিবার বিষয় যে, ভেন্দিদাদে অহুর-মাজদা যে সকল শ্রেষ্ঠ অঞ্চল আর্য্যদিগের বা জোরোষ্ট্রিয়ান মতে বিশ্বাসীদিগের বাসের জন্য সৃষ্টি করিয়াছেন বলা হইয়াছে তাহার মধ্যে ফার্স বা পারস্ত ও মিডিয়ার উল্লেখ নাই। তারপর যে পদ পাওয়া যায় তাহা হইতেছে *Airyana-Vaejo*—ইহার অর্থ করা হইয়াছে আর্য্যদিগের স্বর্গ বা পৃথিবীর স্বর্গ। এইরূপ মত প্রকাশ করা হইয়াছে যে, উত্তরের শীতপ্রধান যে অঞ্চলকে স্বর্গ বলা হইয়াছে তাহাই আর্য্যজাতির আদিম বাসস্থান। এই দুইটি পদ ব্যতীত আরও দুইটি পদ পাওয়া যায় *Airyama* ও *Airyaman*.—Airyama পদের অর্থ করা হইয়াছে কৃষক। Airyaman বেদের অর্য্যমন যিনি আবেস্তায় ও বেদে বিবাহের অধিষ্ঠাতৃ-দেবতা।

এখন বৈদিক ধর্ম্ম ও আবেস্তার ধর্ম্মের প্রসঙ্গে আসা যাইতে পারে। জরাথুষ্ট্রের আবির্ভাব-কাল ও মূল ভাষা হইতে বৈদিক ভাষার তুলনায় গাথার ভাষায় ও আবেস্তার ভাষার পরিবর্ত্তনের লক্ষণ সম্বন্ধে উপরে যাহা বলা হইয়াছে তাহা নিম্নের আলোচনা-প্রসঙ্গে স্মরণ রাখা প্রয়োজন।

বৈদিক ধর্ম্ম ও আবেস্তার ধর্ম্মের মধ্যে কিছু সাদৃশ্য আছে, আবার অনেকখানি বৈষম্যও দেখা যায়। প্রথমে সাদৃশ্যের কথা বলা হইতেছে।

ইন্দ্র, মিত্র, অর্য্যমন, নাসত্য, শর্ব (যজুর্ব্বেদে রুদ্রের নাম), যম, অরমতি, ত্রিত, ত্রৈতন, সোম, বায়ু, ভগ প্রভৃতির নাম বৈদিক সাহিত্যে ও আবেস্তায় দেখা যায়। ইন্দ্র ঋগ্বেদে বৃত্রহা, আবেস্তায় বেরেথ্রঘ্ন (বেহরাম), মিত্র আবেস্তায় মিথ্র, নাসত্য—নাওনহৈথ্য, শর্ব—শৌর্ব, যম আবেস্তায় যিম, অরমতি—অরমৈতি, ত্রিত—থ্রিত, ত্রৈতন—থ্রৈতন, সোম—হোম বা হাওমা, বায়ু—বায়ু, ভগ—বঘ, বৈবস্বত—বৈবান্ হো ইত্যাদি। দেব, দানব, অসুর প্রভৃতি পদ ঋগ্বেদ ও আবেস্তায় দেখা যায়। অগ্নির নরাশংস নাম নৈরিয়োশংহ রূপে আবেস্তায় দেখা যায়। নৈরিয়োশংহ অহুর মাজদার দূত, অগ্নিকে ঋগ্বেদে দেবগণের দৌত্যকার্য্যে নিযুক্ত দেখা যায়। দুই খণ্ড কাষ্ঠ (ঋগ্বেদের অরণি) ঘর্ষণ করিয়া অগ্নি উৎপাদন, যজ্ঞে পশুবলি, সোম যাগ প্রভৃতি বৈদিক ধর্ম্ম ও আবেস্তার ধর্ম্মের অঙ্গ। জরাথুষ্ট্র হোমকে (সোম) জিজ্ঞাসা করিতেছেন, তোমাকে কে প্রথম প্রস্তুত করিয়াছিলেন ও কি পুরস্কার তিনি পাইয়া-

ছিলেন? উত্তরে হোম বলিতেছেন, বিবাংহো প্রথমে হোমরস প্রস্তুত করিয়াছিলেন। পুরস্কারস্বরূপ তাঁহার যিম ক্ষয়েতো নামে পুত্র জন্মিয়াছিল। তারপর অথ্বয়া হোমরস প্রস্তুত করিয়াছিলেন। তাঁহার অহিদাহক বিনাশকারী থৈ্‌তন নামক পুত্র জন্মিয়াছিল। তারপর থ্রি্‌ত হোমরস প্রস্তুত করিয়াছিলেন। তাঁহার উর্বক্ষয় ও কেরেসাস্পা নামক দুই পুত্র জন্মিয়াছিল। তারপর পৌরুষস্পা হোমরস প্রস্তুত করিয়াছিলেন। তাঁহার পুত্র তুমি জরাথুষ্ট্র জন্মগ্রহণ করিয়াছ। তুমি আইরিয়ানা বেজোতে (Airyana-Vaejo) বিখ্যাত হইয়াছ। জরাথুষ্ট্র হোমের স্তুতি করিতেছেন,—

"Then spake Zarathustra. Reverence to Homa! Good is Homa, well created is Homa, rightly created, of a good nature, healing, well shaped, well-performing, succesful, goldencoloured, with hanging tendrils, as the best for eating and the most lasting provision for the soul." (Haom yasht.)

হোম পীতবর্ণ পর্ব্বতচূড়ায় জন্মেন, হোম স্বাস্থ্য, বল, ভোগ, সামর্থ্য, বিদ্যা দান করেন, পুত্রহীনদিগকে বীরপুত্র ও কুমারীদিগকে স্বামী দান করেন। হোম বিজেতা ও শত্রুধ্বংসকারী। হোম রোগ দূর করেন। ঋগ্বেদের একমাত্র নবম মণ্ডল হইতে সোমের সম্বন্ধে অনুরূপ বর্ণনার সবগুলিই উপস্থিত করা যাইতে পারে।

আবেস্তার কবি করপান (Karpan), উশিক (Usiksh), অথ্‌বন পুরোহিত শ্রেণীর নাম। করপানের কার্য্য বৈদিক শ্রোত্রীয়ের অনুরূপ বলা হইয়াছে। উশিক বৈদিক উশীজ। ঋগ্বেদে উশীজপদ অঙ্গিরাগণের সম্পর্কে প্রযুক্ত হইয়াছে। কবিপদ ঋগ্বেদে ঋষি, স্তোতা, অগ্নি, ইন্দ্র প্রভৃতি দেবতার সম্বন্ধে প্রয়োগ করা হইয়াছে। অথ্‌বন আবেস্তার অগ্নির পুরোহিত, ঋগ্বেদে অথর্বন-মূল অগ্নি-উপাসনার প্রবর্ত্তক।

বৈদিক ধর্ম্ম ও আবেস্তার ধর্ম্মের মধ্যে সাদৃশ্যের এই পরিচয় এখানে যথেষ্ট মনে করা যাইতে পারে। এখন বৈষম্যের পরিচয় দেওয়া প্রয়োজন।

ঋগ্বেদের দেবদেবী আবেস্তার ঘৃণিত অপদেবতা, দুষ্ট শত্রু, পিশাচ প্রভৃতির শ্রেণীভুক্ত। তাহারা সকল প্রকার কুৎসিত, ঘৃণ্য বস্তুর ও অপবিত্রতার হেতু। তাহারা মৃত্যুর হেতু। ধার্ম্মিক ব্যক্তিদের গৃহ ও ক্ষেত্রসমূহ ধ্বংস করিয়া তাহারা আনন্দ লাভ করে। আবর্জ্জনা ও পুরীষপূর্ণ স্থানে তাহারা বাস করে। ইন্দ্র, শর্ব, নাসত্য, ইহারা সকলেই ঘৃণিত দয়েব (daeva) বা দেব। ঋগ্বেদের অন্যান্য দেবদেবীর মধ্যে মিত্র, অর্যমণ যম, ভগ ও অরমতি আবেস্তার সম্মান লাভ করিয়াছেন। বায়ু আবেস্তার সর্ব্বত্র সঞ্চরণশীল spirit, ত্রিত ও ত্রৈতনের বিরুদ্ধে আক্রমণ করা হয় নাই। ঋগ্বেদে পৃথিবীকে যে স্থান দেওয়া হইয়াছে আবেস্তার অরমতিকে অরমৈতি রূপে সেই স্থান দেওয়া হইয়াছে।

দেখা যাইতেছে যে প্রাচীন ঋগ্বেদীয় দেবতাদিগের মধ্যে কয়েকজনকে জাতিচ্যুত করিয়া অপদেবতার শ্রেণীতে নামাইয়া দেওয়া হইয়াছে এবং কয়েকজনকে ঋগ্বেদে দেবতার উচ্চ স্থান না দিলেও সম্মানের আসন দেওয়া হইয়াছে। কিন্তু লক্ষ্য করিতে হইবে যে, এই সম্মানের স্থান তাঁহারা পাইয়াছেন গাথার পরবর্ত্তী আবেস্তা সাহিত্যে। গাথাগুলিতে অহুর মাজদা ব্যতীত অন্য কোন উপাস্য দেবতা নাই। ইয়স্নার শেষের অংশে ও তাহার পরবর্ত্তী আবেস্তা সাহিত্যে মিত্রাদি দেবতাকে দেবদূত (Yazatas) রূপে দেখা যায়। কিন্তু আবেস্তার সর্ব্বত্র দেবধর্ম্ম অহুরা-ধর্ম্মের প্রতিদ্বন্দ্বী। অহুর বা অসুর আবেস্তার প্রধান দেবতা; ঋগ্বেদের প্রথম দিকে ইন্দ্র, বরুণ, মিত্র, অগ্নি, সবিতা প্রভৃতিকে অসুর আখ্যা দেওয়া হইয়াছে, পরে অসুর আখ্যা দাস ও দস্যুদিগকে, দেবগণের শত্রুশ্রেণীকে দেওয়া হইয়াছে দেখা যায়।

যে প্রেরণা হইতে ইন্দ্রাদি দেবতাকে শত্রু ও পিশাচরূপে চিত্রিত করা হইয়াছে সেই প্রেরণা হইতে আবার সোমযাগ প্রভৃতি ক্রিয়াকে আক্রমণ করা হইয়াছে। দেব-ধর্ম্মের পুরোহিত ও সোম অভিষবকারীকে আক্রমণ করা হইয়াছে। এই সঙ্গে প্রতিমা-পূজকদিগকেও আক্রমণ করা হইয়াছে। ১। হে দেবগণ হে অপদেবতা, তোমাদের নীচ মন, নীচ বাক্য, নীচ কার্য্যের দ্বারা অসৎ ব্যক্তিকে ক্ষমতা দান করিয়া মনুষ্য-জাতির ইহলৌকিক ও পারলৌকিক অনিষ্ট সাধন করিয়াছ। (Yas, xxxii. 5) ২। হে দেবগণ, (সোমপানে) প্রমত্ত অপদেব হইতে তোমরা জন্মিয়াছ; মনুষ্যগণকে প্রবঞ্চিত ও বিনষ্ট করিবার বিবিধ ছলাকলা তোমরা তাহার নিকট শিক্ষালাভ করিয়াছ; এই সকলের জন্য তোমরা সর্ব্বত্র পরিচিত। (Yas, xxx. 3.) ৩। হে মাজদা, কখন বীর্য্য ও সাহসযুক্ত ব্যক্তিগণ আবির্ভূত হইয়া মত্ততাজনক রস (সোম) কলুষিত করিবে? এই ঘৃণিত ক্রিয়া (সোমযাগ) প্রতিমাপূজকদিগকে দাম্ভিকতায় পূর্ণ করে এবং অপদেবতা এই দম্ভে ইন্ধন যোগ করে। (Yas. xlviii. 10.)

জরাথুষ্ট্র রচিত গাথা হইতে উপরের সূক্তগুলি উদ্ধৃত করা হইল। ইয়স্নার পরবর্ত্তী অংশে, হোমা ইয়াষ্টে, একটি কৌতূহলজনক ব্যাপার দেখা যায়। সোমরস দেবদেবীগণের উপর পতিত হইয়া তাহাদিগকে ধ্বংস করুক এই প্রার্থনা করা হইতেছে। একবিন্দু সোমরস সহস্র দেবগণের বিনাশের পক্ষে যথেষ্ট এইরূপ বলা হইতেছে। (Yas. x. 1, 6.)

উপরে আবেস্তিক ধর্ম্ম ও সাহিত্য সম্বন্ধে যাহা বলা হইয়াছে তাহা হইতে এই অনুমান করা যায় যে, এই ধর্ম্মের ক্রমবিকাশের মধ্যে কয়েকটি পর্য্যায় আছে। প্রথম পর্য্যায়ে আবেস্তিক ধর্ম্ম ও বৈদিক ধর্ম্ম মিলিত এক মূল ধর্ম্ম ছিল এইরূপ অনুমান করিতে হইবে। সবগুলি না হউক অন্ততঃ প্রধান কয়েকজন ঋগ্বেদীয় দেবদেবীর উপাসনা, সোমযাগ ইত্যাদি এই মূল ধর্ম্মের

অঙ্গ ছিল। দ্বিতীয় পর্য্যায়ে জরাথুস্ত্রের ধর্ম্ম-সংস্কারের আন্দোলন আরম্ভ হইল। ইন্দ্রাদি কয়েকজন দেবতাকে জাতিচ্যুত করিয়া দানব বা অপদেবতার শ্রেণীতে নামাইয়া দেওয়া হইল, সোম-যাগাদি বর্জ্জন করা হইল। মঙ্গলময় ঈশ্বর রূপে অহুর মাজদার উপাসনা প্রচলিত হইল, সকল অমঙ্গলের হেতু আহরিমান তাঁহার প্রতিদ্বন্দ্বীরূপে কল্পিত হইল। অহুর মাজদার প্রতীকরূপে অগ্নির উপাসনা প্রচলিত হইল। গাথা অংশে উপাস্য বা ভক্তিভাজন আর কেহ নাই। তারপর তৃতীয় পর্য্যায়ে প্রধান দেবদূতগণের (Fravshis), অমর মানব-হিতৈষী-গণের (Amesha Spentas), পৃথিবীর ও অন্যান্য স্ত্রী-দেবতার (gena) সদ্‌গুণসমূহের (Asha Vahumano) ভক্তি আরম্ভ হইল, প্রাচীন সোমযাগ সংস্কৃত হইয়া পুনরায় দেখা দিল। ডাঃ হগের মতে "There is an attempt to conciliate *Paoiryo traesho*, men of the old creed, who were unwilling to forsake the ancient polytheistic religion and its time-honoured rites and ceremonies" অর্থাৎ পুরাতন বহু-ঈশ্বরবাদী ধর্ম্মের অঙ্গস্বরূপ ক্রিয়া ও অনুষ্ঠান বর্জ্জন করিতে অনিচ্ছুক প্রাচীন ধর্ম্ম-পন্থী-দিগকে তুষ্ট করিবার একটা প্রয়াস দেখা যায়।

এই প্রাচীন বহু-ঈশ্বরবাদী ধর্ম্মকে মূল ধর্ম্ম বলিয়া অনুমান করা যাইতে পারে। জরাথুস্ত্রের ধর্ম্মসংস্কার এই প্রাচীন ধর্ম্মের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা। এই ধর্ম্ম সংস্কারের আন্দোলনের ফলে বৈদিক আর্য্যগণ ইরাণ বা বালখ ত্যাগ করেন এইরূপ মতপ্রকাশ করা হইয়াছে। ডাঃ হগের মতে বৈদিক আর্য্যগণের বালখ ত্যাগ করিবার সময় ইন্দ্র তাঁহাদের প্রধান উপাস্য দেবতা ছিলেন এবং এই সময়ে অধিকাংশ ঋগ্বেদীয় সূক্ত রচিত হইয়াছিল।

এই মতানুসারে দাঁড়ায় যে, বৈদিক আর্য্যগণ জরাথুস্ত্রের সময়ে ইরাণ বা বালখ ত্যাগ করিয়া ভারতবর্ষ অভিমুখে প্রস্থান করেন। ইহা খ্রীঃ পূঃ ১২০০-১০০০ বৎসরের ঘটনা।

এই মত মানিয়া লইলে কতকগুলি প্রশ্ন উঠে। জরাথুস্ত্রের সময় পর্য্যন্ত ইরাণীয় আর্য্য ও বৈদিক আর্য্য একত্র বাস করিতেন যদি এই কথা স্বীকার করিতে হয়, তাহা হইলে মূল ভাষা হইতে জরাথুস্ত্রের রচিত গাথার ভাষার যে পরিবর্ত্তন এবং বৈদিক ভাষা ও গাথার ভাষায় যে পার্থক্য দেখা যায় তাহার সন্তোষ-জনক ব্যাখ্যা পাওয়া যায় না। বৈদিক আর্য্য বলিতে যাহাদের বুঝায় তাহারা জরাথুস্ত্রের আবির্ভাবের বহুপূর্ব্বেই বালখের প্রাচীন ইরাণীয় গোষ্ঠিসমূহ হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া গিয়াছিলেন এইরূপ অনুমান করা অপরিহার্য্য হইয়া দাঁড়ায়। বৈদিক ভাষা ও গাথা ভাষার পার্থক্য যদি জার্ম্মাণ ও ডাচ ভাষার পার্থক্যের অনুরূপ হয় এবং বৈদিক আর্য্য ও আবেস্তিক বা ইরাণীয় আর্য্য যদি একই জাতির (race) দুইটি পৃথক গোষ্ঠী হয় তাহা হইলে জরাথুস্ত্রের কাল পর্য্যন্ত তাহারা এক বাসভূমিতে একসঙ্গে বাস করিত এরূপ অনুমান করা সম্ভব নহে। ভৌগোলিক ব্যবধান না থাকিলে গোষ্ঠির পার্থক্য ও ভাষার পার্থক্য গড়িয়া উঠিতে পারে না। আবেস্তায় দেব-ধর্ম্মীদিগের ও দেব-ধর্ম্মের পুরোহিতদিগের প্রতি আক্রমণ হইতে বৈদিক আর্য্যগণ জরাথুস্ত্রের সময়ে ভারতবর্ষে প্রস্থান করেন এরূপ অনুমান করা অপরিহার্য্য নহে। জরাথুস্ত্রের ধর্ম্মসংস্কারের আন্দোলনের পূর্ব্বে যে প্রাচীন বহু-ঈশ্বরবাদী ধর্ম্মের অস্তিত্বের কথা বলা হইয়াছে, সম্ভবতঃ তাহার তিরোধানের পরে যাহা পুনরায় প্রভাব বিস্তার করিতে আরম্ভ করে, তাহা অবশ্য প্রাচীন ইরাণীয় সমাজের কোন কোন অংশের মধ্যে রহিয়া যায়। ইহারাই প্রাচীন মতাবলম্বী, কিন্তু কেহ যদি এইরূপ মত প্রকাশ করেন, যে দেবধর্ম্মকে গাথায় ও আবেস্তায় আক্রমণ করা হইতেছে তাহা বৈদিক আর্য্য ও ইরাণীয় আর্য্যের বিচ্ছিন্ন হইবার পূর্ব্বের বা সেই সময়কার ব্যাপার নহে, এই ধর্ম্ম ভারতবর্ষ হইতে পূর্ব্ব ইরাণ অভিমুখে অগ্রসর হইয়াছিল ও জরাথুস্ত্রের আন্দোলন এই ভারতীয় ধর্ম্মের বিরুদ্ধে, এবং ঘন ঘন প্রতিমাপূজকদিগের উল্লেখ হইতে মনে করা যায় যে, এই ভারতীয় ধর্ম্ম ঋগ্বেদের অনেকটা পরবর্ত্তীকালের ব্যাপার, তাহা এক কথায় উড়াইয়া দিবার মত নহে। প্রতিমাপূজক ও প্রতিমাপূজকদিগের অতিশয় দাম্ভিক পুরোহিতদিগের উল্লেখ ব্যতীত এই সম্পর্কে আর একটি বিষয়ের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করা যাইতে পারে। Travardin yasht-এর একস্থানে বলা হইতেছে, "That ingenuous man (Zarathustra) who spake such good words, who was the source of wisdom, who was born before Gotam…" গৌতম বুদ্ধ নির্ব্বাণ লাভ করিয়াছিলেন অনুমান খ্রীঃ পূঃ ৪৮৭ অব্দে। আলেকজাণ্ডারের পঞ্জাব আক্রমণের সময়ে বৌদ্ধধর্ম্ম পূর্ব্ব আফগানিস্থানে প্রচারিত হইয়াছিল প্রাচীন গ্রীক ও রোমান লেখকদিগের বিবরণ হইতে ইহা জানা যায়। অর্দ্ধ শতাব্দীর অপেক্ষা অল্পকালের মধ্যে উহা হিন্দুকুশ অতিক্রম করিয়া বালখ, সুগদা ও পূর্ব্ব দিকে বহুদূর প্রসারিত হয়। জেন্দাবেস্তার yasht অংশকে খ্রীঃ পূঃ ৪০০ অব্দের রচনা বলা হইয়াছে। দেখা যাইতেছে যে, গ্রীক আক্রমণের বহুপূর্ব্বে বুদ্ধদেবের নির্ব্বাণ লাভের এক শতাব্দীর মধ্যে জরাথুস্ত্রের প্রসঙ্গে গৌতমবুদ্ধের নাম উল্লেখ করা প্রয়োজন হইয়াছিল। স্মরণ করা যাইতে পারে যে অনেকের মতে খৃঃ পূঃ ৬১০ অব্দ জরাথুস্ত্রের আবির্ভাবকাল। প্রাচীন ভারতীয় ধর্ম্মের মধ্য এশিয়ামুখী গতির বিস্তর প্রমাণ আছে।

নব-সন্ন্যাস

শ্রীবিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়

৩

মানুষ যে কাজটা করিতে চায় না, অথচ যেটা না করিয়া উপায় নাই, সব ছাড়িয়া আগে সেই কাজটা ধরে। আনন্দ আছে এমন কাজ মানুষ জিয়াইয়া রাখে, ধীরে-সুস্থে একটু একটু করিয়া স্বাদ লইয়া সম্পন্ন করে, যে কাজে বিতৃষ্ণা-বিরক্তি সেটা তাহার কাঁধের বোঝা, কোন রকমে তাড়াতাড়ি ঝাড়িয়া না ফেলা পর্য্যন্ত তাহার নিষ্কৃতি নাই।…বস্তির সেবায় টুলুর তাহাই হইল।

সেবাটা যে ঠিক কাহার হইবে, কি আকারের হইবে সে সম্বন্ধে মাষ্টার মশাইয়ের সঙ্গে একটা পরামর্শ করিবার ধৈর্য রহিল না টুলুর। সে যেন কোন রকমে তাঁহাকে একটা রিপোর্ট আনিয়া দিলে বাঁচে—এই আমি গিয়াছিলাম, এই আমার কাজ, এই আমি ফিরিয়াছি। কাজ শেষ করিবার তাড়াহুড়ার মধ্যে কাজটা যে কি সেটা ভাবিয়া দেখিবার ফুরসত হইল না।

বস্তি সম্বন্ধে বিশেষ কোন ধারণাও নাই। চিরকাল আশ্রম ঘাঁটিয়াই বেড়াইয়াছে, নদীর তীর, কিম্বা উন্মুক্ত প্রাঙ্গণ, তাহার পর বৃক্ষলতাগুল্মের স্নিগ্ধ ছায়ার আশ্রম—ছাদই হোক, খড়ের চালই হোক, তকতকে ঝকঝকে ক'টি ঘর, গেরুয়ায় ছোবানো বস্ত্র-উত্তরীয়-পরা শান্ত দৃষ্টি, স্মিতহাস আশ্রমবাসীর দল—বাড়ীর বাহিরের জীবন সম্বন্ধে টুলুর এই ধারণা। এই নিশ্চিন্ত, সত্ত্বগুণাশ্রিত জীবনের সঙ্গে যাহা খাপ খায় না টুলু তাহা কখনও খোঁজে তো না-ই, বরং সব রকমে এড়াইয়াই আসিয়াছে। গন্ধভিহি আসিয়াও সে আকৃষ্ট হইয়াছে এর বাহিরের সৌন্দর্য্যে, এর দূরের রূপে কি যে এর বেদনা, কি যে গ্লানি, কাছে গিয়া দৃষ্টি নত করিয়া দেখিবার না হইয়াছে প্রবৃত্তি, না অবসর। পাকেচক্রে এখন সেইটাই হইয়া পড়িয়াছে প্রয়োজন।

স্কুলের টিলা হইতে খানিকটা নামিয়া রাস্তাটা ভাগ হইয়া গেছে—একটা গেছে গঞ্জের দিকে সোজা, একটা একটু ডান দিক দিয়া ঘুরিয়া বস্তির দিকে। এটা সরু একটা কালি গোছের, বস্তির যে কয়টি ছেলে স্কুলে পড়িতে আসে তাহাদের পায়ে পায়ে গড়িয়া উঠিয়াছে। মাষ্টার মশাইয়ের নিকট হইতে ফিরিয়া টুলু এই পথই ধরিল। রাত্রি হইয়াছে; দূরে নিচের দিকে বস্তিটা—স্পষ্ট দেখা যায় না, তবে একটা চাপা চঞ্চলতা অনুভব করা যায়, মৌমাছির চাকের মত। মাঝে মাঝে একটা শব্দও উচ্চকিত হইয়া উঠিতেছে। দূরত্বের জন্য আর চারি দিকের ধোঁয়ার জন্য আলোকবিন্দুগুলা অস্পষ্ট। অপরিচিত, রহস্যময় কর্ম্ম—তবু একটা অমোঘ আকর্ষণে টানিতেছে বস্তিটা। টুলু অগ্রসর হইতে লাগিল; ঢালু, পাথরে রাস্তার উপর এক একবার পা হড়কাইয়া যাইতেছে। যতই অগ্রসর হইতে লাগিল ততই একটা প্রশ্ন মনে স্পষ্ট হইয়া উঠিতে লাগিল—কি করিতে হইবে তাহাকে? বস্তি ত এই কাছে আসিয়া পড়িল, তাহার কাজ কি? আরও কাছে আসিয়া মনে হইল সময়টাও ঠিক বাছা হয় নাই; এত রীতিমত রাত্রি, একটা অজানা জায়গায় এ সময় সেবার কাজ কি করা যাইতে পারে?

তবুও আগাইয়া চলিল। কর্মক্ষেত্রটা যতই স্পষ্ট হইয়া আসে, ততই কর্ম্মের একটা স্পষ্ট রূপ দেখিতে চায়।…এক সময় টুলুর হঠাৎ মনে পড়িল—কেন, মাতব্বর দেখিয়া ইহাদেরই এক জনকে জিজ্ঞাসা করা যাক না—ইহারা কি চায়, কি ইহাদের অভাব-অভিযোগ; তাহা হইলেই তো কর্মপন্থা আপনি বাহির হইয়া আসে।…"অভাব-অভিযোগ!"—বাঃ, চমৎকার মনে পড়িয়া গেছে।…কথাটা টুলু মাঝে মাঝে খবরের কাগজে দেখে; কৌতূহল না থাকায় নিতান্ত ঐহিক, নিম্নস্তরের জিনিষ মনে হওয়ায় এতদিন ও-লইয়া মাথা ঘামায় নাই; এখন কাজের সূচনা হিসাবে টুলু কথাটাকে ধরিয়া রহিল। গিয়া একজনকে জিজ্ঞাসা করিলেই হইবে—"তোমাদের অভাব-অভিযোগটা কি বল দিকিন।"

একটা অবলম্বন পাইয়া যেন কতকটা আশ্বস্ত হইল। এখন, একেবারে বস্তিতে না প্রবেশ করিয়া বাহিরেই যদি কাহারও দেখা পাওয়া যাইত ত বেশ হইত; মাতব্বরগোছের হইলে ভালই, না হোক, মাতব্বরের নামধামটা দিতে পারে এমন কেহ।

তাহাও পাওয়া গেল।

রাস্তাটা বস্তিকে চক্রাকারে ঘিরিয়া, পিছনে রাখিয়া গঞ্জের দিকে অগ্রসর হইয়াছে। মাঝামাঝি ডান দিক থেকে একটা রাস্তা আসিয়া এই রাস্তাটার উপর দিয়া সোজা বস্তির দিকে চলিয়া গেছে। এটা খনি আর বস্তির যোজক। খনির দিক হইতে দুই জন লোক আসিতেছিল, আগাগোড়া এত কালো যে মনে হয় একটি অন্ধকার যেন ঘেঁষাঘেঁষি দুই জায়গায় জমাট হইয়া সচল হইয়া উঠিয়াছে। কাঁধের উপর এক একটা কি. কেলা, খুব সম্ভবত খনির কোন হাতিয়ার, এক জনের মুখে পুরাদমে-টানা একটা বিড়ির মত কি দুই বার জ্বলিয়া উঠিয়া মুখের বিকৃতিটা স্পষ্ট হইয়া উঠিল।…দেখিলে ভয় হয়, সেই সঙ্গে বেশ খানিকটা ঘৃণাও। তবুও একটা হাতে পাওয়া সুযোগ, টুলু দাঁড়াইয়া প্রতীক্ষা করিতে লাগিল।

চৌমাথায় আসিয়া উহাদেরই একজন প্রশ্ন করিল—"তু কাকে চাস্?"

মনে হইল টুলুকে লইয়া উহাদের মধ্যেও এতক্ষণ কিছু আন্দাজের চেষ্টা চলিতেছিল। এই প্রশ্নের উপরই দ্বিতীয়

ব্যক্তি দুই পাটি সাদা দাঁত বাহির করিয়া হাসিয়া বলিল—"আমি জানচি রে তু কাকে চাস্।"

—সাদা সাদা চোখ দুইটা ঘুরাইয়া এমন ভাবে মাথাটা নাড়িতে লাগিল যেন মস্ত বড় একটা কৌতুক আছে সমস্ত ব্যাপারটার মধ্যে।

কেমন একটা অস্বস্তির মধ্যেই টুলু বলিল—"এ বস্তির মাতব্বর কে?"

মুখ চাওয়াচাওয়ি করিয়া এবার দু'জনেই হাসিয়া উঠিল, দু'জনেই জড়াজড়ি করিয়া মাথা দুলাইয়া দুলাইয়া বলিল—"জানচি রে জানচি, তু চরণদাসকে চাস্; বাবুটি আচিস তু বটে।"

একজন আলাদা করিয়া বলিল—"জোয়ানটি আচিস বটে।"

হাসিটা আবার উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিল। কথা আর বিকৃত হাসির ভঙ্গিতে গা-টা ঘিন্‌ঘিন্ করিতেছে,—ব্যাপারখানা কি? ...টুলু কিন্তু রহস্য সমাধানের দিকে গেল না। একটা কথা ঠিক—চরণদাস একজন সর্দার-গোছের কেহ, নামটাও বাঙালী-বাঙালী; টুলু প্রশ্ন করিল—"চরণদাসের বাসাটা কোথায়?"

"ঐ হুথা, একাশি নম্বর ঘর। তু যাবি আমাদের সাথে? —আয়।"

—হাসি তেমনি চলিতেছে, প্রতি কথাতেই। টুলু এক বার সামনের বস্তিটার পানে চাহিল। গা-টা ছমছম করিতেছে, একটু কি ভাবিয়া বলিল, "না, আজ রাত হয়ে গেছে। একাশি নম্বর বাসা ত? কাল আসব দিনের বেলা।"

"কাল আসবে! বাবুটি কাল আসচে! চল খবরটি দিই।" —বাংলার এই পর্যন্ত বুঝা গেল, তাহার পর নিজেদের ভাষায় কি বলিতে বলিতে, আরও উৎকট ভাবে হাসিতে হাসিতে লোক দুইটা বস্তির পানে চলিয়া গেল। টুলু স্তব্ধ ভাবে আরও একটু দাঁড়াইয়া রহিল। কোন জিনিষই স্পষ্ট নয়—বস্তিও নয়, এদের কথাবার্ত্তাও নয়, তবু সেই অস্পষ্টতার অন্তরালে যে জগৎটার আভাস পাওয়া যায় সেটা টুলুর পক্ষে সম্পূর্ণ এক নূতন জগৎ। তাহার সামনে দাঁড়াইতে সাহস বা অভিরুচি হইতেছে না বলিয়াই এত কাছে আসিয়াও, এমন একটা সুযোগ পাইয়াও টুলু আপাতত এক দিন বিলম্ব করিল। বস্তিটা পরিক্রমা করিবার সময় অনেক বারই ফিরিয়া ফিরিয়া দেখিল—এদিকটা পিছন দিক, আবর্জনার উপর অন্ধকারের চাপ, সামনের দিক হইতে একটানা কোলাহল ভাসিয়া আসিতেছে, এক জায়গায় যদি একটু নরম হইল ত আর এক জায়গায় একেবারে দ্বিগুণ চতুর্গুণ জোর। কিসের ভারে টুলুর মনটা যেন নুইয়া পড়িতেছে, গতিটা হইয়া পড়িতেছে আরও মন্থর। বাড়ী পৌঁছিতে রাত্রি হইয়া গেল; আহার করিল না, একটা ছুতা করিয়া শয্যা আশ্রয় করিল।

সমস্ত রাত নিদ্রাও হইল না, পাশেই কোন্ বাড়ীতে একটি শিশু ভূমিষ্ঠ হইয়াছে; নবজাতের বেদনায় সে সমস্ত রাত আর্ত্তনাদ করিয়া কাটাইল; টুলুও তাহার সঙ্গে জাগিয়া রহিল।

নিদ্রা নাই হোক, সকালে যখন উঠিল, মনটা অনেকটা দৃঢ় হইয়াছে। দিনের বেলা কেন সে চরণদাসের ওখানে যাইবে? যাইতে হয় ত রাত্রেই, রহস্যটার সম্মুখীন হইতে হইবে। দেখার মধ্যে যদি খানিকটা বাকিই রহিয়া গেল ত সে দেখার সার্থকতা কি?...কাল ভুল হইয়াছিল।

টুলু আর দিনের বেলা মাষ্টার মশাইয়ের কাছে গেল না। কেন, তাহা নিজেই ঠিক বুঝিতে পারিল না, বুঝিবার বিশেষ চেষ্টাও করিল না; শুধু এইটুকু বুঝিতে পারিল যে এর আগে, যাওয়ার চিন্তাতেই যে একটা আনন্দ পাওয়া যাইত সেটা নাই। অথচ শ্রদ্ধাও যে কিছু কমিয়াছে এমনও তো নয়।

বাসা থেকে বস্তিটা মাইলখানেকের কাছাকাছি। টুলু সন্ধ্যার একটু আগে বাহির হইল; যখন বস্তির সামনে পৌঁছিল হালকা একটু অন্ধকার নামিয়াছে।

লম্বা টানা খোলার চালের নিচে দুই সার বাসা, দেওয়াল-গুলা এবড়ো-খেবড়ো পাথর দিয়া তৈয়ারী। অনেক জায়গায় চালের প্রান্ত ভাগের খোলা পড়িয়া গিয়া বাঁশ ও বাতা বাহির হইয়া পড়িয়াছে। প্রত্যেক বাসার সামনে একটি ছোট্ট দাওয়া, তাহার এক কোণে একটি করিয়া উনুন; দাওয়ার পিছনেই পর পর দুইটি করিয়া ঘর, খুপরি বলিলেই ভাল হয়। বাসার লাইন দুইটা সমান্তরালে দাঁড়াইয়া আছে, মাঝখানে হাত কুড়ি চওড়া একটা খালি জমি, ইট দিয়া বাঁধানো, দুই দিক হইতে ঢালু হইয়া আসিয়াছে, মাঝখানে একটা নর্দমা একেবারে এমুড়ো-ওমুড়ো চলিয়া গেছে। সমস্ত জায়গাটা ব্যাপিয়া একটা তুমুল অরাজকতা—উলঙ্গ, অর্দ্ধ-উলঙ্গ ছেলে-মেয়েদের দল; ছাগল, কুকুর, হাঁস, মুরগী, তাহাদের ছানা, সব একসঙ্গে মিশিয়া গেছে। মেয়ে-পুরুষেরাও প্রায় সবাই জীর্ণ বস্ত্র পরিহিত, তাহার উপর গায়ে-কাপড়ে কয়লার ছোপ। এ জিনিষটা কোথাও বাদ নাই, হাঁসটাকেও পর্যন্ত হাঁস বলিয়া চেনা যায় না।

বাসার সামনে এক একটা করিয়া খাটুলি, তাহাদের দড়ি ঝুলিয়া প্রায় মাটি পর্যন্ত নামিয়া গেছে। একটাতে একটা কুলি ধনুকাকার হইয়া নির্জীবভাবে পড়িয়া আছে, একটাতে কয়েক জন ছেলেমেয়ে পড়িয়া হুটোপুটি করিতেছে, একটাতে একটা কচি শিশু শোয়ানো—পরিত্রাহি চিৎকার জুড়িয়া দিয়াছে। জানোয়ার, পাখী, মানুষ—ধাড়ি, কচি সবার কণ্ঠ হইতে একটা মিশ্র কলরব উঠিয়া বাতাসটাকে ভারাক্রান্ত করিয়া দিয়াছে। একটা জলের কল, কলসী, বাল্‌তি, ডেকচি, গামলা—আরও নানারকম পাত্রে বোঝাই; মেয়ে-পুরুষের ঝগড়া, ইতর গালা-গালিতে কানপাতা যায় না। ওদিকেও গোটা তিনেক কল, এই রকম জটলা।

প্রতিপদেই নূতন অভিজ্ঞতা, টুলু তবুও অগ্রসর হইয়া চলিল, কেমন একটা জিদ ধরিয়া গেছে। শুধু শব্দ আর দৃশ্যই নয়, কতকগুলা দাওয়ায় রান্না আরম্ভ হইয়াছে, মাংস পোড়ার একটা উৎকট গন্ধ নর্দমার গন্ধের সঙ্গে মিশিয়া একেবারে নূতন ধরণের একটা তীব্র গন্ধ সৃষ্টি করিয়াছে। দুইটা বাসার মাঝের দেওয়ালের গায়ে আলকাতরা দিয়া ইংরেজীতে বাসার নম্বর লেখা, সেই গুলাও দেখিয়া দেখিয়া টুলু আগাইয়া চলিল। দু-এক জন কৌতূহলী হইয়া প্রশ্নও করিল, টুলু বলিল—চরণদাসের বাসায় যাব। দু-এক জন দেখাইয়া দিল, দু-এক জন অবহেলাভরে চুপ করিয়া রহিল, কেহ কেহ একটু বক্র হাসির সহিত মুখটা ঘুরাইয়া লইল; যাহারা দেখাইয়া দিল তাহারাও একটু হাসিয়া মুখ ঘুরাইল।

একাশি নম্বর বাসাটা এ লাইনের একেবারে শেষ বাসা। এইখানে আসিয়া একেবারে চরণের সহিত সাক্ষাৎ হইল।

বাসার নিচেই পাঁচ-ছয় জন লোক নেশা করিয়া জটলা করিতেছে। একজন মাঝবয়সী লোক, মুখে খোঁচা খোঁচা গোঁফ-দাড়ি, মাথায় বাবরি, একেবারে বেসামাল হইয়া নর্দমার ধারে পড়িয়া আছে। এক জন বোধ হয় তাহাকে তুলিতে গিয়া তাহার পিঠে মাথা ঠেকাইয়া চুপ করিয়া বসিয়া আছে। মাতাল আর পাগলের মত ছেলেমেয়েদের কৌতুক উদ্রেক করিতে আর কেহই পারে না। এদের ঘিরিয়া বেশ একটি দল জুটিয়াছে, নাচিয়া কুঁদিয়া, ছড়া আওড়াইয়া, নানা রকম প্রশ্ন করিয়া খেপাইয়া তুলিতেছে; তাড়া খাইয়া, কুৎসিত গালাগালি খাইয়া প্রবল উল্লাসে হাততালি দিতে দিতে ছড়াইয়া পড়িতেছে, আবার জড়ো হইতেছে। টুলু একটু স্তম্ভিত হইয়া দাঁড়াইল বিষবায়ুর মধ্য দিয়া আসিতে আসিতে তাহার মনটা নিস্তেজ হইয়া পড়িতেছিল, এখানে আসিয়া যেন একেবারেই অসাড় হইয়া গেল। তাহার ছাব্বিশ বৎসরের জীবনে এ ধরণের অভিজ্ঞতা হয় নাই, এর কাছাকাছিও কিছু নয়, খানিকটা তাহার বাকস্ফূর্তিও হইল না। তাহার পর একটু সম্বিৎ হইলে বাসাটার পানে ঘুরিয়া চরণদাসকে ডাকিতে যাইবে, মনে হইল কে যেন তাড়াতাড়ি ঘরের মধ্যে চলিয়া গেল; তাহার শরীরের ঊর্ধ্বভাগটা ঘরের অন্ধকারে অদৃশ্য হইয়া গেছে, নিচের ময়লা কাপড়ের যতটুকু নজরে পড়িল তাহাতে মনে হইল স্ত্রীলোক। টুলু ডাকিল—চরণদাস আছ? ঘর হইতে কোন উত্তর আসিল না, উত্তরটা আসিল পিছন থেকে। এক জন নেশার গাঢ় স্বরে বলিল "চরণদাস ওখানে কোথায়?"

টুলু ফিরিয়া দেখিল দলের মধ্যে এক জন তাহার দিকে মুখ তুলিয়া চাহিয়া রহিয়াছে। টুলু প্রশ্ন করিল—কোথায় চরণ দাস?"

আরও যাহাদের একটু সাড় ছিল পিট-পিট করিয়া টুলুর পানে বোধহীন দৃষ্টিতে চাহিয়া রহিল। লোকটা কোন উত্তর না দিয়া টলিতে টলিতে উঠিয়া নর্দমার ধারে সেই প্রৌঢ়টার কাছে উপস্থিত হইল। সে লোকটা পিঠে মাথা ঠেকাইয়া বসিয়াছিল, তাহাকে একটা ঠেলা দিয়া বলিল—তুলতে পারলিক নি বুড়োকে?

প্রৌঢ়ের পিঠেই গোটাদুই ঠেলা দিয়া বলিল—অ্যাই, নতুন মিস্‌পিক্‌টার সায়েব; উঠ্‌।

কথাটায় দলের আর সবার মধ্যে একটু সাড় আসিল, যে যেমন ভাবে পারিল হাতটা কপালে ঠেকাইয়া অভিবাদন করিল। এক জন উঠিয়া ছেলেমেয়েগুলাকে পর্যন্ত তাড়া করিয়া জায়গাটা পরিষ্কার করিল। তাহার পর চোখে-মুখে মাতালের গাম্ভীর্য ফুটাইয়া সকলে চরণদাসকে তুলিবার চেষ্টা করিতে লাগিল। টুলুর যে মনটা অসাড় হইয়া গিয়াছিল তাহাতেই যেন একটা নেশার অদ্ভুত চৈতন্য জাগিয়া উঠিতেছে।

অনেক ঠেলাঠেলির পর চরণদাসের একটু হুঁস হইল, বাঁ হাতে ভর দিয়া, সামান্য একটু সোজা হইয়া বসিয়া ব্যাপারটা বুঝিবার চেষ্টা করিল। হাতটা কিন্তু পোতা ছিল নর্দমাটার একেবারে ধারে, হঠাৎ পিছলাইয়া গিয়া চরণদাস এবার নর্দমার মধ্যেই হুমড়ি খাইয়া পড়িল।

মাথায় কোথাও চোট লাগিয়া থাকিবে, এবার আগের চেয়ে অল্প ডাকেই চৈতন্য হইল—যদিও অতি সামান্যই। সেটাও বিকৃত হইয়াই দেখা দিল; মাতালের অনিশ্চিত মনে সম্ভ্রমের বদলে আসিয়া পড়িল ক্রোধ; গা ঝাড়া দিয়া উঠিয়া পড়িবার চেষ্টা করিয়া উগ্র দৃষ্টিতে চাহিয়া জড়িত কণ্ঠে বলিল—নেকালো! মিস্‌পিক্‌টারি চরণ দাসের কাছে?—নিস্‌পিক্‌টারি মিসপিক্‌…

—এইবার টলিয়া বেশ ভালো করিয়াই নর্দমায় গড়াইয়া পড়িল।

এ সময় আরও একটা ব্যাপার হইল, বস্তির ঘরে ঘরে এক যোগে বৈদ্যুতিক আলো জ্বলিয়া উঠিল। এও এক অদ্ভুত পরিহাস, জাতি-সংঘের আদেশ পালন—শ্রমিকদের আলো চাই একেবারে সেরা। তা নহিলে নরক গুলজার হয় কিসে?

সেই গুলজার নরকের গায়ে, তাদের সঙ্গেই মানাইয়া, আরও একটি দৃশ্য যাহা টুলু কোন জন্মেই কল্পনায় আনিতে পারিত না। একাশি নম্বর বাসার ঘরের ভিতরে চৌকাঠ ধরিয়া একটি মেয়ে দাঁড়াইয়া আছে, বেশ পরিপাটি করিয়া একখানি পরিষ্কার শাড়ী পরা, সযত্নে পরিষ্কার করা মুখে বিদ্যুতের আলো গিয়া পড়িয়াছে। টুলুর দৃষ্টি পড়িতেই চৌকাঠ ডিঙাইয়া দাওয়ায় আসিয়া দাঁড়াইল, একটু হাসিয়া বলিল—"এখন বাবার নাকি সাড় থাকে?—কারই বা আছে? আপনাকে তো নোতুন ইনিস্‌পিক্‌টার-ই করে দিলে!"

—শেষে হাসিল একটু তরল শব্দ তুলিয়াই।

৪

বস্তির এ দিকটাও খোলা, একটা পায়ে হাঁটা রাস্তা

সামনের দিকে চলিয়া গেছে; টুনু আর বস্তির মধ্যে না গিয়া এই দিক দিয়া বাহির হইয়া আসিল, তারপর হন্ হন্ করিয়া অনেকটা ঘুরে চলিয়া গিয়া দাঁড়াইয়া পড়িল, হোটে নাই তবু হাঁপাইতেছে। গঞ্জভিহির এটা এদিককার শেষপ্রান্ত, একেবারে ফাঁকা, সবচেয়ে নিচুও; এখান থেকে সমস্ত জায়গাটা এক নজরে দেখা যায়—একেবারে দূরে ঐ কর্তাদের কর্মচারীদের বাড়ী-কোঠা, অনেকগুলা দোতলা, আলোর ঝলমল করিতেছে—পাড়াটার নামও পড়িয়াছে কর্তাপাড়া। তাহার নিচে খানিকটা আসিয়া বাজার; একেবারে এদিকে, বাঁ-দিকে গঞ্জভিহির সবচেয়ে উঁচু জায়গায় ঐ স্কুলটা, তাহার পরেই মাষ্টার মশাইয়ের বাসা, অন্ধকারে লিপ্ত ঐ কাঞ্চনগাছটা দেখা যাইতেছে। টুনুর মনে অদ্ভুত একটা আনন্দের জোয়ার ঠেলিয়া উঠিতেছে, সেটা যে শুধু ঐ নরককুণ্ড হইতে বাহির হইয়া আসিবার জন্যই তাহা নয়, তাহার মধ্যে আরও একটা বৃহত্তর মুক্তির উল্লাস রহিয়াছে। বস্তি যে কি নরক পণ্ডিতমশাই সেটা নিশ্চয় সম্পূর্ণ জানেন না; এবার টুনুর এ দায়িত্ব হইতে নিষ্কৃতি।

নিচের এই উন্মুক্ত প্রাঙ্গণ আর উপরের অসীম আকাশের সঙ্গে সুর মিলাইয়া টুনু অনেকক্ষণ স্থির ভাবে দাঁড়াইয়া রহিল, যেন নিজের জগতে ফিরিয়া আসিয়াছে।...তবু সদ্য অভিজ্ঞতার কথাটা আগাগোড়া আর একবার মনে পড়িয়া গেল,—সব শেষে সেই মেয়েটি। টুনু বেশ বুঝিতে পারিল ও-ই তাড়াতাড়ি ভিতরে চলিয়া গিয়াছিল, তাহার পর যথাসাধ্য বেশভূষা করিয়া বাহির হইয়া আসিল। কাল থেকে আজ পর্যন্ত চরণদাসের বাড়ি খোঁজা লইয়া যত বিদ্রূপ, বক্র হাসি, বাঁকা চাহনি, এতক্ষণে সমস্তরই অর্থ বুঝা গেল। সমস্ত শরীরটা বার বার সিড়সিড় করিয়া উঠিতে লাগিল। তবু সব ছাপাইয়া একটা আনন্দ, একটা বোঝাপড়া হইয়া গেছে, আর কি? টুনু বেশ ভাল করিয়া সমস্ত জায়গাটার একটা আন্দাজ করিয়া লইয়া স্কুলের দিকে পা বাড়াইল। রাস্তা নাই এখান থেকে, তবে সোজাসুজি গেলে একটা না একটা পাইয়া যাইবে নিশ্চয়।

স্কুলের দিকটায় বিদ্যুতের আলো নাই, উঁচু-নীচু ভাঙিয়া যখন পৌঁছিল তখন বেশ অন্ধকার হইয়া গেছে। মাষ্টার মশাই কি এতক্ষণ কাঞ্চনতলায় থাকিবেন?...টিপিটার দিকে যাওয়ার আগে টুনু বাসার সামনে দাঁড়াইয়াই একটা হাঁক দিল, "স্যার বাসাতেই আছেন?"

"কে? দাঁড়াও আসি।"

খড়ম পরিয়া আসিতেছেন, আসিতে আসিতেই প্রশ্ন করিলেন, "টুনু নাকি?"

দুয়ার খুলিয়া বলিলেন, "তাইতো দেখছি। অনেকক্ষণ কাঞ্চনতলায় অপেক্ষা করে ভাবলাম—যাঃ, দিলাম বুঝি ভড়কে টুনুকে; মনটা এত খারাপ হয়ে গেছল!"

উঠানের ওদিকে রান্নাঘর, উনানে আগুন জ্বলিতেছে, উপরে কি একটা চড়ানো।

টুনু অতিমাত্র বিস্মিত হইয়া প্রশ্ন করিল, "রাঁধছিলেন স্যার?—আপনি রান্না করছিলেন!"

"মনটা খারাপ হয়েছিল বটে টুনু, তা বলে কি এত খারাপ হয়েছিল যে রান্না-খাওয়া ছেড়ে দোব?"

—বেশ জোরেই হাসিয়া উঠিলেন মাষ্টার মশাই।

টুনু একটু অপ্রতিভ ভাবে বলিল, "না, বলছিলাম নিজের হাতেই রাঁধেন আপনি?"

মাষ্টারমশাই আবার হাসিয়া উঠিলেন, বলিলেন, "এবার তুমি সত্যি হাসালে টুনু,—তোমায় আমি পরের সেবা করবার উপদেশ দিচ্ছি, আর এদিকে আমার নিজের হাতই আমার নিজের পেটের সেবা করবে না?"

দুয়ারটা একটু ঠেলিয়া ধরিয়া বলিলেন, "ভেতরে এস; কি খবর? এত দেরি হ'ল যে?"

দুয়ারটা বন্ধ করিয়া পাশের ঘরের দিকে অগ্রসর হইতে হইতে বলিলেন, "বরং অন্যভাবেই জিগ্যেস করি,—এতটা দেরি হয়ে গেল, তবুও এলে যে?...এস বারান্দায় ঐখানটায় বসি, তুমি ঘর থেকে ঐ চেয়ারটা বের করে নিয়ে এস। না, কাঞ্চনতলাতেই যাবে?"

টুনু একটু সঙ্কুচিত ভাবে বলিল, "রান্না চড়ানো রয়েছে স্যার, আপনি ভুলে যাচ্ছেন সেটা।"

মাষ্টার মশাই আবার একটু হাসিয়া উঠিলেন, বলিলেন, "তুমি এলে, আর রান্না তোলবার মতনও আনন্দটুকু হবে না আমার—টুনু?"

টুনু আরও লজ্জিতভাবে হাসিয়া বলিল, "আমার এত সৌভাগ্য স্যার?"

"যার আনন্দ, সৌভাগ্য ত তারই টুনু। বেশ, এইখানেই বসা যাক।...দাঁড়াও বরং, ভাতের হাঁড়িতে দুটো আলু ফেলে দিয়ে আসি। তুমি যাওয়ার পর আমার আনন্দও থাকবে না, তার ওপর যদি আবার আলুভাতেটুকুও না থাকে..."

হাসিতে হাসিতে চলিয়া গেলেন। ফিরিয়া আসিয়া চেয়ারে পা তুলিয়া গুছাইয়া বসিলেন; প্রশ্ন করিলেন, "তার পর, কি খবর বল।"

টুনু বলিল, "হ'ল না স্যার।

—চেষ্টা সত্ত্বেও বিফলতার উল্লাসটা চোখে-মুখে ঠেলিয়া আসিয়াছে।

মাষ্টার মশাই মুহূর্ত করেক বিস্মিতভাবে মুখের পানে চাহিয়া থাকিয়া প্রশ্ন করিলেন, "কি হ'ল না টুনু?"

টুনু একটু ভূমিকার সহিতই আরম্ভ করিল এবং তাহার আন্তরিকতা যে কত বেশী সেটা বুঝাইবার জন্য ভূমিকায় প্রচুর কল্পনার সাহায্য লইল—কৃপালাভ করিতে হইলে মন জোগাইয়া চলিতে হইবে তো আবার? বলিল—যখন

থেকে আপনার কাছে জানতে পারলাম যে সেবা-ব্রতই সব চেয়ে বড় ব্রত, সেবাই আত্মশুদ্ধির একমাত্র উপায়, তখন থেকে কাজে নেমে পড়বার জন্তে মনটা বড়ই অস্থির হয়ে রইল তার। এখান থেকে ফিরতি সোজাই বস্তিতে নেমে গেলাম, ভাবলাম শুভস্য শীঘ্রম্, তাহলে আর দেরি করা কেন? ওদের অভাব-অভিযোগটা কি জানবার জন্তে খোঁজ নিয়ে বুঝলাম ওদের সর্দার হচ্ছে চরণদাস। চরণদাসের সঙ্গে কিন্তু দেখা হ'ল না কাল। মনটা যে কি খারাপ হয়ে রইল সমস্ত রাত! কাজটা আরম্ভ করে আপনার কাছে মুখ দেখাতেও পারছি না এদিকে⋯

মাষ্টারমশাই স্থির দৃষ্টিতে চাহিয়া শুনিতেছিলেন, প্রশ্ন করিলেন⋯কিন্তু কি আরম্ভ করতে টুলু?—তোমার কোন রকম একটা ধারণা দিয়েছিলাম বলে তো মনে পড়ছে না।

টুলু মাষ্টার মশাইয়ের তীক্ষ্ণ দৃষ্টির সামনে বেশ একটু থতমত খাইয়া গেল, তাহার পর বলিল—সেইটেই ঠিক করবার জন্তে আজ সন্ধ্যের সময় চরণদাসের বাসায় গিয়েছিলাম—একাশি নম্বরের বাসা—সেইখান থেকে সোজা আসছি।

প্রমাণ হিসাবে বাসার নম্বরটা পর্যন্ত বলিয়া দিয়া টুলু চুপ করিয়া মাষ্টার মশাইয়ের মুখের পানে একটু চাহিয়া রহিল, কোন পরিবর্তন লক্ষ্য না করিয়া বলিল—জিগ্যেস করতে গিয়েছিলাম—তাদের অভাব-অভিযোগটা কি—মানে, অভাব-অভিযোগগুলো না জানতে পারলে তো আর⋯

"কমিশন বসানো চলবে না!"

—মাষ্টার মশাই কথাটা বলিয়া হাসিয়া উঠিলেন। হাসিতে হাসিতেই আবার বলিলেন—তোমার কথাগুলো রাতারাতি আমাদের বিলিতি কর্তাদের মতন কি করে হয়ে উঠল ভেবে সারা হচ্ছি টুলু⋯অভাব-অভিযোগ, তারপর কমিশন, তারপর রিপোর্ট, তারপর অর্থাভাব সবশেষে সেই কল্কিকার—আবার যথাপূর্বং তথা পরম্ দেড়শ বছরের এই ইতিহাস। অভাব-অভিযোগের কথা জিগ্যেস করতে গিয়েছিলে—সমুদ্রকে যদি জিগ্যেস করা হয় কোনখানটা তার নোনা তো কি তার উত্তর হবে টুলু?

এক একটা হাসি একেবারে অন্তস্তলে গিয়া হানা দেয়; টুলু বেশ একটু অপ্রতিভ হইয়া পড়িয়াছিল, শেষের কথাটায় মুখ তুলিয়া চাহিল। ভূমিকা করিতে যাওয়াটাই ভুল হইয়াছে মাষ্টার মশাইয়ের কাছে, তাহার আসল বক্তব্যটায় আসিয়া পড়ায় যেন বাঁচিল, একবার আরম্ভ করিয়া মাঝপথে কোথাও আর থামিলও না; বলিল—

"সেই কথাই বলছিলাম তার, কত যে দুঃখ ওদের, কত রকম গ্লানিতে ভরা যে ওদের জীবন তার আর হিসেব হয় না। চালে খড় নেই, কোমরে কাপড় নেই বললেই চলে। অন্নের বদলে ওদের যা খেতে হয় তাতে অন্নপ্রাশনের ভাত উঠে আসে; নেশাভাঙ তো মেয়েছেলেদের মধ্যে পর্যন্ত গিয়ে ঢুকেছে; দুখানা টাকা চালার খুপরির মধ্যে এমন জাত নেই যা পাওয়া যায় না। ভাষা বুঝা না গেলেও ওদের কথায় মাত্রাই যে অতি কুৎসিত গালাগাল তাতে আর সন্দেহ থাকে না। বস্তিতে ঢুকেই আর এক পা এগুতে প্রবৃত্তি হয় না তার, তবু আমি মনের সমস্ত জোর দিয়ে এগিয়ে চলেছি—এই পথেই যখন কর্তব্য তখন চোখ-কান বুজে এগিয়ে যেতেই হবে—দু-পা এগুতেই আরও কদর্য একটা কিছু যেন পথ আগলে দাঁড়ায়—ছেলেমেয়েরা খেলা করছে কি মেয়ে-পুরুষে কলতলায় জল নিতে এসেছে—একই রকম ব্যাপার—যেমন কুৎসিত তেমনি নোংরা, তেমনি মুখের ভাষা—নরক যেন পাতাল ঠেলে উঠে এসেছে। গ্রামের মধ্যেও মানুষের দুঃখ-কষ্ট দেখেছি, কিন্তু এরা যেন মানুষের স্তর থেকেই নেমে গেছে। যাক্ তবুও এগিয়েই চললাম আমি⋯আপনি বলেছেন অবস্থা যতই হীন সেবার স্কোপটা ততই বেশী—সেই নরককুণ্ড ঠেলে কোন রকমে চরণদাসের বাসার সামনে এসে পড়লাম; একটা দস্তুরমতো অভিযান, কোথা থেকে যে মনের জোর পেলাম নিজেই বুঝতে পারি না। সেখানে এসে দেখি একেবারে চরম, কোনও উপায় নেই, একেবারে শিবের অসাধ্য রোগ।

চরণদাস নেশায় চুর হয়ে বস্তির নর্দমার কাছে পড়ে রয়েছে। সঙ্গে আরও পাঁচ-ছ জন, সবার অবস্থাই প্রায় ঐ রকম, তবে চরণদাস একেবারেই বেহুঁস। আমি অমন দৃশ্য কখনও দেখিনি তার, না দেখলে কল্পনার মধ্যেও আনতে পারতাম না যে, মানুষ নিজেকে একেবারে অমন করে ভুলতে পারে। অসহ্য হয়ে উঠেছিল, তবু রইলাম একটু দাঁড়িয়ে, যখন এসেছি শেষ দেখেই যাই। ওরা আমায় নতুন ইনস্পেক্টার বাবু বলে ঠাউরেছে, যাদের একটু হুঁস ছিল তারা বোধ হয় ভয় পেয়ে চরণদাসকে তোলবার চেষ্টা করলে। একবার উঠতে গিয়ে চরণদাস নর্দমার মধ্যে মাথা গুঁজড়ে পড়ল, তারপর দ্বিতীয় বার চেষ্টা করে সোজা হয়ে বসে কটমটিয়ে আমার পানে চেয়ে রইল—চুলে নর্দমার পাঁক লেগে জট পাকিয়ে গেছে, জামাতে কাপড়ে নর্দমার পাঁক, তার ওপর আপাদমস্তক কয়লার কালিতে ঢাকা। মুখে খোঁচা খোঁচা দাড়ি-গোঁফ, আর মুখের হাড়গুলো এতখানি করে বেরুনো; আর সে কী চোখ!—নেশায় টকটকে লাল, এতখানি করে গর্তের মধ্যে ছুটো আগুনের ভাঁটার মতন জ্বলছে, নেশার জন্তেই স্থির নয়, এক একবার নরম হয়ে এক একবার দ্বিগুণ চতুর্গুণ জ্বলে উঠছে। ইন্সপেক্টার এসেছে শুনে আমার দিকে একটু চেয়ে থেকে আস্তে আস্তে মাথা দোলাতে লাগল, তারপর হঠাৎ তেড়েফুঁড়ে চিৎকার করে উঠল—'মেকালো! নিকপিকৃটারি চরণদাসের কাছে!'⋯সে রকম অদ্ভুত বিকৃত গলার আওয়াজ আমি কখনও শুনিনি তার—গলাটা যেন ওর চৌচির হয়ে ফেটে গেছে। তারপরই নিজেকে আর সামলাতে না পেরে একেবারে তালগোল পাকিয়ে আবার নর্দমার মধ্যে পড়ে গেল। আমি জ্যান্ত নরক দেখে এই ফিরছি তার।"

টুলু একটু থামিল। মুখটা কুঞ্চিত হইয়া গেছে, বলার গ্লানিতেই তাহার সমস্ত শরীরটা যেন ক্লেদাক্ত। মাষ্টার মশাই কি বলিতে যাইতেছিলেন, টুলু আবার স্মৃতির আলোড়নে যেন নূতন করিয়া শিহরিয়া উঠিল, বলিল—হ্যাঁ, এইখানেই শেষ নয়, এর চেয়েও একটা কুৎসিত ব্যাপার স্যার, কিন্তু সে আপনার সামনে আমি মুখ দিয়ে বের করতে পারছি না···"

মাষ্টার মশাই এক দৃষ্টে টুলুর পানে চাহিয়া রহিলেন, তাঁহার মুখের রেখায় কি যেন একটা পাঠোদ্ধার করিতেছেন। একটু পরে প্রশ্ন করিলেন—"চরণদাসের মেয়ে চম্পা ?"

এবার টুলুর চাহিয়া থাকিবার পালা, তাহার দৃষ্টিতে বিস্ময়ের যেন অন্ত নাই।

প্রশ্ন করিল—"আপনি জানেন ?"

"বস্তির সব চেয়ে বড় ট্র্যাজেডির কথা জানব না ?"

"এর পরে আমায় কি করতে বলেন তাহলে ?"

"আগে যা বলেছিলাম তাই—অর্থাৎ সেবা করতে।"

টুলু একটা মস্ত বড় ধাক্কা খাইল। সে নিজের যুক্তি সম্বন্ধে কৃতনিশ্চয় হইয়া আসিয়াছিল, এত ব্যাপারের পরও যে আবার তর্ক করার দরকার হইবে এটা ভাবিতেই পারে নাই। একটু স্তম্ভিত হইয়া থাকিয়া বলিল, "কিন্তু সেবা নেবে কে বলুন ? চরণদাস—ওদের সর্দার—যার ভরসায় আমার যাওয়া তার নিজের অবস্থাই ত আপনাকে বললাম।"

মাষ্টার মশাই হাসিলেন, বলিলেন—"তুমি কি সেবা করতে গিয়েছিলে টুলু ? কথাটা এই জন্যে জিগ্যেস করছি তুমি যে সব সাহচর্য খুঁজে বেড়িয়েছ এ পর্যন্ত তার অনেক ক্ষেত্রে সেবা কথাটার মানে হচ্ছে পা টেপা আর গাঁজা সেজে দেওয়া। আমায় শপথ করিয়ে নাও, এ ধরণের কোনটাতে চরণদাস তোমায় অমন করে চোখ রাঙিয়ে উঠত না।···দাঁড়াও, আসছি ভাতের হাঁড়ি বড়বড়ানি লাগিয়েছে।"

ফিরিয়া আসিয়া টুলুর চেয়ারের পাশে দাঁড়াইলেন, তাহার কাঁধে নরম হাতের স্পর্শ দিয়া বলিলেন—"কথাগুলো আমার একটু কড়া হয়ে পড়ল, না ? 'কিছু মনে ক'রো না বলে সান্ত্বনা দোব না টুলু। তোমার যত দূর যা মনে করবার করো, তার পরেও যদি মাষ্টার মশাইকে অন্তরের সঙ্গে নিতে পার, সেই নেওয়াই আসল নেওয়া।···এইবার কাজের কথায় আসা যাক্—তুমি কাল থেকে প্রাণপণে চেষ্টা করছ যাতে বস্তির কাজে তোমায় নামতে না হয়।···কথাটা বড় আশ্চর্য বোধ হচ্ছে না ? কাল থেকে তুমি এ হাঙ্গামটা কোন রকমে চুকিয়ে আমার কাছে একটা জবাবদিহি তোয়ের করবার জন্যে এত ব্যস্ত আছ যে মনের প্রবঞ্চনাটা ধরবার অবসর পাও নি। লুকোচুরিতে মনের মতন অত বড় খেলোয়াড় আর নেই টুলু; আজ হাঙ্গাম চুকেছে, বাড়ী গিয়ে স্থির হয়ে নিরপেক্ষ ভাবে ভেবে দেখ, দেখবে আমি মিথ্যে বলছি না। কাজ কিভাবে করতে হবে সে সম্বন্ধে আমিই তোমায় রাস্তা বাৎলে দিতাম, আর সেটা নিশ্চয় চরণদাসের বাসার রাস্তা হ'ত না। তবুও, অভিজ্ঞতা একটা যখন হ'লই, সেটাকে জীবন থেকে বাদ দেওয়ার পক্ষপাতী আমি নই। চরণদাস বস্তি-জীবনের একটা টাইপ ত বটে; তুমি ওকে কি রকম দেখবে আশা করেছিলে ?"

"অন্তত এত খারাপ দেখব এ ধারণা ছিল না; মানুষের বাইরে গিয়ে পড়েছে। সমস্ত বস্তিটাই তাই মনে হ'ল। সেবা মানুষের করতে পারা যায়, কিন্তু···"

মাষ্টার মশাই মৃদু হাসিয়া টুলুর কাঁধে একটা হাল্কা চাপ দিয়া তাহার উচ্ছ্বাসটা বন্ধ করিলেন, বলিলেন—"চরণদাস ঠিক এই রকমই হবে, এক চুল এদিক-ওদিক হওয়া সম্ভব নয়; বস্তির আর সবাইয়ের সম্বন্ধেও ঐ একই কথা। তুমি তাড়াতাড়ি সেবায় নামতে গিয়ে যে পরিণামটা দেখে শিউরে উঠেছ, তার কারণটা দেখনি বলেই। ওদের যা জীবন, যে অস্বাভাবিক অবস্থার মধ্যে, যে ভীষণ অবিচার-অত্যাচারের মধ্যে যা অমানুষিক ওদের খাটুনি, তাতে নেশা না করলে ওরা এক দিনও বাঁচবে না।···তুমি বাঁচা আর নেশা না করার মধ্যে কোনটাকে বড় বল টুলু ?"

"নেশা না করা স্যার, এতে আর মতামত কি থাকতে পারে ?"

"আমি কিন্তু বলি বেঁচে থাকা।"

"ঐ রকম নেশাখোর হয়ে বেঁচে থাকার দরকার কি স্যার ?"

"দরকার এই যে বেঁচে থাকলে এক সময় ভাল করে বেঁচে থাকবার সম্ভাবনা রয়েছে, সৃষ্টি-পরিকল্পনায় সে সম্ভাবনা যে একটা বিরাট জিনিষ। মরে গেলে যে সবই গেল শেষ হয়ে।··· যাক্, এ কথাটা একটু অবান্তর এসে পড়ল। আমাদের কথা হচ্ছিল চরণদাস তার অবস্থার স্বাভাবিক পরিণতি। তা যদি হয় ত দোষটা ত ওর নয়। আর এটা যদি স্বীকার করো ত সেই অবস্থার পরিবর্তন ঘটানো কি স্বীকার করো না ?"

"অবশ্য জিনিষটা তো আবস্ট্রাক্ট কিছু নয় স্যার, তার পরিবর্তন ঘটানো মানে ত ঐ ধরণের মানুষের মধ্যে গিয়ে কাজ করা।"

"আজ সেটা যত কদর্য বলে মনে হচ্ছে, একটু অভ্যেস হয়ে গেলে ততটা নাও হতে পারে।"

"মন যদি কোন সময় এমন কদর্যতাকে গায়ে না মাখে তো সেটা মনের অবনতি নয় কি স্যার ?"

"কথাটা তোমার একেবারে ফেলে দেওয়া যায় না টুলু। কিন্তু কাউকে তোলবার জন্যে যদি একটু ঝুঁকতে হয় তো উচিত নয় কি খোকা ?···কিন্তু তর্ক এখন থাক্। যদি চরণদাসকেই এখানকার বস্তি-জীবনের উদাহরণ বলে ধরে নেওয়া হয় তো যে-কোন মহাপুরুষই এই অবস্থার মধ্যে পড়লে চরণদাস হয়ে যেতে বাধ্য কিনা সেটা একবার খতিয়ে নিলে হয় না ?···আজ রাত হয়ে গেছে, তুমি···"

মাষ্টার মশাই মনে মনে একটু হিসাব করিয়া লইয়া বলি-

লেন—"পরশু রবিবার আছে, তুমি বেলা তিনটের সময় একবার এসো আমার কাছে।"

৫

দিন সাতেক টুলুর আর একেবারে দেখা নাই। মাষ্টার মশাই কাঞ্চনতলাটিতে আসিয়া নিয়মিত ভাবে বসেন। এক এক দিন নিজের সঙ্গে নিজের আলাপ বড় বেশি জমিয়া উঠে। একটা শিকার হাতের মধ্যে আসিয়া আবার ছাড়িয়া গেলে হিংস্র জন্তর যেমন অবস্থা হইয়া উঠে, মাষ্টার মশাইয়ের অবস্থাও হইয়া পড়ে অনেকটা সেই রকম। চাপা আক্রোশে গর্জাইতে থাকেন—'ও ভেবেছে আমার কাছ থেকে ওর নিষ্কৃতি আছে—পালিয়ে পালিয়ে বেড়াবে—ওর ধর্ম ওকে আমার কাছ থেকে ছিনিয়ে নেবে! ধর্ম—সে এবার সরে দাঁড়াক আসর ছেড়ে, মুখোস ফেলে দিয়ে, নইলে এই টুলুকেই মাঝে রেখে আমাদের বোঝাপড়া আরম্ভ হবে, আর এটাও ঠিক যে সে বোঝাপড়ায় আমি হারব না।'...এক এক সময় একেবারেই নিশ্চুপ হইয়া বসিয়া থাকেন সামনে যে-কোন একটা জায়গায় দৃষ্টি ফেলিয়া, কিন্তু যেন সমস্ত দৃশ্যপটটাকে চোখের মধ্যে ভরিয়া লইয়া; একটি স্নিগ্ধ মমতায় চোখ দুইটি নরম হইতে হইতে সিক্ত পর্যন্ত হইয়া উঠে, মাষ্টার মশাই যেন সবার কান্না নিজের বুকে জমা করিয়া লইয়াছেন। এ ভাবটা কিন্তু স্থায়ী হয় না; আবার আসে জ্বালা, আবার টুলু, আবার তাহার ধর্মের সঙ্গে বোঝাপড়া করার প্রতিজ্ঞা।

অন্ধকার হয়ে গেলেও ওঠেন না। স্কুলের বুড়া চাকর বনমালীকে ডাকিয়া বলিয়া দেন তাহার হাঁড়িতেই চালটা ছাড়িয়া দিতে। তাহার পর সে রান্নার পাট সারিয়া উপস্থিত হইলে তাহার সঙ্গে বস্তির গল্প হয়। লোকটা চরণদাসের বাবা; আগে কি রকম ছিল বলা যায় না, তবে এখন যেন একটু মাথা খারাপ হইয়া গেছে। নিজে হইতে কথা কয় কম, তবে দম দিয়া যাইতে পারিলে নিঃসাড়ে বক বক করিয়া বকিয়া যাইতে পারে—ঠিক একটা গ্রামোফোনের মতোই—স্মৃতির রেকর্ড একখানি করিয়া তুলিয়া দিলেই হইল, বনমালী আওড়াইয়া যাইবে; চম্পার কথাও বলে—যেন তাহার নাতনি নয়, যেন কোন সম্পর্কই নাই তাহার সঙ্গে।

চরণদাসের আগে বনমালীই ছিল একাদশি নম্বর বাসায়, কাজ ছাড়িয়া ছেলের সঙ্গেও অনেক দিন ছিল; বস্তি-জীবনের একটি বিশ্বকোষ।

মাষ্টার মশাইয়ের একটা বিশেষত্ব টিলা ছাড়িয়া কখনও নিচে নামেন না। নিম্নতম সীমা স্কুল, ঊর্ধ্বতম সীমা কাঞ্চনতলা, এর মধ্যে তাঁহার দিনযাত্রা। এবারে কিন্তু সাত দিনের দিন তিনি নামিলেন। ঐ শিকারের উদাহরণই দিতে হয়—সে যখন এ তল্লাট ছাড়িয়াছে তখন নিজের ঘাঁটিটুকু আগলাইয়া বসিয়া থাকিলে চলিবে না তো।

সন্ধ্যা একটু গাঢ় হইলে মাষ্টার মশাই নামিলেন। বাজারে ব্যানার্জি এণ্ড কোম্পানির ঔষধবিভাগ, ষ্টেশনারি বিভাগ লইয়া বেশ বড় দোকান। টুলু নাই। মাষ্টার মশাই অবশ্য রাস্তা হইতেই প্রচ্ছন্ন ভাবে দেখিলেন, কেন না টুলু আবার দেখিয়া ফেলে এটা তাঁহার অভিপ্রেত ছিল না। টুলু থাকিলে তিনি আশেপাশে অপেক্ষা করিতেন, তাহার পর বাহির হইলে ধরিতেন এই ছিল শিকারের প্ল্যান। দোকানে না পাইয়া একটু ইতস্তত করিয়া বাড়ি পর্যন্ত ধাওয়া করিলেন, কর্তাপাড়ার এক প্রান্তে টুলুর কাকার বাড়ি। ঐ প্রচ্ছন্ন ভাবেই সন্ধান লওয়া; টের পাওয়া গেল সেখানেও টুলু নাই। আক্রোশে নিজের প্রতিদ্বন্দ্বী—অর্থাৎ টুলুর ধর্মের সঙ্গে বাগ্‌যুদ্ধ করিতে করিতে মাষ্টার মশাই টিলার দিকে ফিরিলেন। সে-ই জিতিয়াছে, তবে এটা যেন সে অবধারিত সত্য জানে, তাহার জয়, তাহার এ উল্লাস ক্ষণিক।

টিলার নিচেটিতে আসিয়াছেন, দেখেন তাঁহার বাসা হইতে একটি ছায়ামূর্তি বাহির হইয়া নামিয়া আসিতেছে, পরক্ষণেই বুঝিতে পারিলেন—টুলু। একটু কাছাকাছি হইতে বলিলেন—"তুমি এখানে? এদিকে তোমার জন্যে আমি সারা গঞ্জ ঢিঢি এক করে বেড়াচ্ছি! একেবারে হপ্তাকে হপ্তা দেখা নেই যে?"

টুলু মুহূর্ত মাত্র ইতস্তত করিয়া, মাষ্টার মশাই নিবারণ করিবার আগেই ঝুঁকিয়া তাঁহার পদ স্পর্শ করিয়া হাতটা মাথায় ঠেকাইল, বলিল—"এবার আর মানা মানলাম না স্যার, বড় একটা শুভ খবর নিয়ে এসেছি।"

অন্ধকার হইলেও বুঝা যায় তাহার মুখটা রাঙা হইয়া উঠিয়াছে, গলার স্বরও একটু আবেগকম্পিত।

প্রশ্ন করিলেন "খবরটা কি টুলু?"

একটু হাসিয়া বলিলেন—"শুভ বলছ অথচ ফল—অবাধ্যতা!"

"আমার খোঁজার পালা শেষ হয়েছে স্যার, এতদিনে আমি যা খুঁজছিলাম তা পেয়েছি। আমি বিদায় নিতেও এসেছিলাম, কেননা আমার আর এখানে থাকা একেবারে অনিশ্চিত; তা ভিন্ন বড় ইচ্ছে ছিল আপনিও যদি একবার তাঁর সঙ্গে দেখা করতেন..."

দারুণ নিরাশায় অন্ধকারের মধ্যে মাষ্টার মশাইয়ের চোখ দুইটা একবার জ্বলিয়া উঠিল, প্রশ্ন করিলেন "দেখা! দেখা কার সঙ্গে টুলু—কোন্..."

আর একটা উগ্রতর কি মুখ দিয়া বাহির হইয়া পড়িতেছিল, নিজেকে সংযত করিয়া লইলেন এবং টুলু অন্ধকারে ভাল করিয়া বুঝিবার পূর্বেই মুখটা একটু ফিরাইয়া লইয়া চোখের দৃষ্টিটা শান্ত করিয়া লইলেন, বলিলেন—"ভেতরে চল টুলু; বড্ড ঘুরিয়েছ, ভাল খবর একটু ভাল ভাবে নেওয়ার মতন অবস্থাটা ক'রে নি।"

বনমালীকে ডাক দিলেন, বাহির হইলে বলিলেন—“চাল ডাল বের করে নিয়ে আসবি চল্‌, তোর হাঁড়িতেই ফুটিয়ে দিস্‌।”

টুলু বিস্মিত ভাবে মুখের পানে চাহিল; মাষ্টার মশাই প্রশ্ন করিলেন—“কি ?”

“কিছু না তো।” তাহার পর যেন অশোভন জানিয়াও প্রশ্নটা কোনমতে চাপিতে পারিল না, এইভাবে বলিল—“মানে, ওর রান্না খাবেন আপনি ?”—নাসিকাটা একটু কুঞ্চিত হইয়া উঠিয়াছে।

মাষ্টার মশাই হাসিলেন, বলিলেন—“নিজের হাতে রাঁধব তাতে আপত্তি, বনমালী রেঁধে দেবে তাতে আপত্তি—তা হ'লে ?”

টুলুও লজ্জিত ভাবে হাসিল, বলিল—“না স্যার, সে কথা বলছিলাম না। আর সত্যিই ত, আপনাদের মতন যাঁরা উঁচুতে উঠে গেছেন, তাঁরাও যদি এটুকু সংস্কারমুক্ত না হতে পারেন তো…”

দু-জনে আসিয়া বারান্দায় চেয়ার লইয়া বসিলেন। টুলুকেই আরম্ভ করিবার একটু সময় দিয়া মাষ্টার মশাই বলিলেন—“তারপর ? তোমার কথার ধাঁচে মনে হচ্ছে এবার তুমি সত্যিই এক জন বড় মহাপুরুষের সাক্ষাৎ পেয়েছ। সমস্ত হপ্তাটা তাঁর কাছেই ছিলে নাকি ?”

“না, তিনি কুলো পরশু এসেছেন।”

“এখানে ?”

“এসব জায়গায় তো তাঁদের পায়ের ধুলো পড়বার নয় স্যার—দেখতেই পাচ্ছেন ত জায়গার শ্রী। তিনি এসেছেন বালিয়াড়িতে।”

“সিদ্ধ বাবা তা'হলে ?”

টুলুর মুখটা সার্থকতায় উজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছে, বলিল—“আজ্ঞে হ্যাঁ; পরশু এসেছেন। এই পাঁচ-ছয় দিন নাগাড়ে ঘুরেছি স্যার। প্রথমটা শুনলাম বরাকরে আবির্ভাব হয়েছেন, নদীর ধারে আস্তানা গেড়েছেন। ছুটলাম সেখানে; গিয়ে শুনলাম ঘণ্টা-কয়েকের দেরি হয়ে গেছে, এক মাড়োয়ারী শিষ্যের ওখানে উঠেছিলেন, কিছুক্ষণ আগেই মুলুটিতে এক শিষ্যকে কৃপা করতে গেছেন। ছোট সেখানে;—সে আবার বিট্‌কেল জায়গা, পথের ঠিক সন্ধান না পাওয়ায় একটু ঘুরপাকের মধ্যে পড়ে যেতে হ'ল। পৌঁছে জানতে পারলাম একটা দিন ছিলেন, সেখান থেকে এসেছেন পিরুলিতে, বাবার এক জমিদার শিষ্যের ওখানে,—তারই মোটর গিয়ে নিয়ে এসেছে। পিরুলি এসে শুনলাম তিনি সেইদিনই বালিয়াড়িতে চলে এসেছেন, গঙ্গাডিহির সাহাদের বাগানবাড়ীতে। পিরুলি থেকে বালিয়াড়ি বাড়া সতের মাইল। একটা মোটর সার্ভিস ছিল, তাও সাত দিন থেকে তেলের অভাবে বন্ধ। যা পরিশ্রমটা হ'ল স্যার, কিছুদিন মনে থাকবে।”

মাষ্টার মশাই যেন দম বন্ধ করিয়া শুনিতেছিলেন, প্রশ্ন করিলেন—“হাঁটলে সতের মাইল ? ঐ ঘোরাঘুরির পর !”

তৃপ্ত হাসিতে টুলুর মুখটা একটু এলাইয়া পড়িল, বলিল—“একটু না ঘুরিয়ে তো ওঁরা দেখা দেবার পাত্র নন স্যার—খানিকটা পাপক্ষয় হওয়া চাই ত ?”

মাষ্টার মশাই মুখটা ফিরাইয়া লইলেন, বেদনায় কুঞ্চিত হইয়া উঠিয়াছে, নিরুপায় ভাবে একটা বিরাট অপচয় দেখিলে যেমন হয়। “উস্‌ !” করিয়া চাপা একটা শব্দও বাহির হইয়া পড়িল মুখ দিয়া। টুলু প্রশ্ন করিল “কি হ'ল স্যার ?”

“কিছু না, মাঝে মাঝে একটা বেদনা ওঠে না ?…তক্ষুনি ভ্যানিশ করে যায়।”

হাসিয়া বলিলেন “তোমার কত পাপ ছিল টুলু ? যে রকম ঘুরতে হয়েছে এই পাথুরে জায়গায় তাতে ত পাপ-পুণ্যি সুদ্ধ, সমস্ত দেহটাই ক্ষয় হয়ে যাওয়ার কথা।…বেশ, তার পর—কি রকম দেখলে ?”

“ও রকম দেখি নি স্যার, অপূর্ব—একেবারে অপূর্ব !…আপনার তন্ত্রশাস্ত্রে বিশ্বাস আছে ?”

“অবিশ্বাসের কথা কখনও শুনেছ ?”

“সিদ্ধবাবা তন্ত্রসিদ্ধ মহাপুরুষ, বেশীর ভাগ সময়ই সমাধিতে থাকেন, আমার বরাত জোর, পরশু এসে সজ্ঞ অবস্থাতেই পেলাম। সব শুনে একটু মুচকে হাসলেন, বললেন—'তোর তপস্যা আছে, পরশু বিকেলে আসিস।'…আজ গিয়েছিলাম, বিকেলের একটু আগেই। নির্বিকল্প সমাধি-রূপ কথাতেই শুনেছিলাম, আজ প্রত্যক্ষ করলাম। কোথায় আছেন, কি হচ্ছে চারিদিকে, কিছুমাত্র জ্ঞান নেই। নদীর ধারে চমৎকার বাগান-বাড়ী সাহাদের, দোতলাতেই থাকেন বাবা। নীচে কি করতে নেমেছিলেন, বারান্দার পাশে যেখানে ছাদের নলটা নর্দমার উপর নেমে এসেছে সেইখানে সমাধিস্থ হয়ে পড়েন। আমি যখন পৌঁছলাম, দু-জন শিষ্য ঘিরে বসে আছে, কখন সমাধি ভাঙবে সেই প্রতীক্ষায়—বিরক্ত করবার হুকুম নেই কিনা। সে রকম নোংরা নালা না হোক, তবু ত অত বড় বাড়ীটার নানা জায়গার জলনিকাশের পথ, খানিকটা খানিকটা নোংরা আছেই তা ভ্রূক্ষেপ মাত্র নেই দেওয়ালে ঠেস দিয়ে, নালার উপর দিয়ে পা দুটো বাড়িয়ে বসে আছেন, রক্তবস্ত্র-পরা, পঞ্চমুখী রুদ্রাক্ষের মালায় সমস্ত বুকটা ভরে আছে। কাপড়ের খানিকটা নর্দমার মধ্যে লুটিয়ে পড়েছে—ভ্রূক্ষেপ নেই, খানিকক্ষণ পরে কেলে নিজেও গড়িয়ে পড়লেন—একেবারে নির্বিকার—তিনি যে কে, আর রয়েছেন যে কোথায় একেবারে চৈতন্য নেই। বসে আছি ত বসেই আছি: প্রায় ঘণ্টা দুয়েক পরে চোখ খুললেন—কি অপূর্ব মূর্তি ! দীর্ঘ জটা, এই বিশাল শরীর, রক্তচেলির মধ্য দিয়ে জ্যোতি যেন ফুটে বেরুচ্ছে মুখখানা রাঙা টকটকে, তার ওপর কারণ-বারিতে গোলাপী দুটি চোখ। আকর্ণ-বিস্তৃত কথাটা বইয়েই পড়েছিলাম, আজ

চাক্ষুষ করলাম, যেন করুণার ঢুলঢুল করছে। আর কি যে তার চাউনি!—অপার্থিব কথাটাও কানেই শোনা ছিল, সে চাউনিও যেন এ পৃথিবীর নয়, চোখ ফিরিয়ে নেয় কার সাধ্যি! আমার দিকে চেয়ে থেকে থেকে অনেকক্ষণ দেখলেন, তারপর একবার হঠাৎ বলে উঠলেন—"বেরিয়ে যা এখান থেকে।—মেকালো!" …শিষ্যেরা আগেই আমায় সাবধান করে দিয়েছিল—দাবড়ানি, ধমকানিতে ঘাবড়ালে চলবে না, ওঁর ঐ রীত, ঐ পরীক্ষা—আমি হাত জোড় করে প্রণামীর টাকা কয়টি সামনে রেখে বললাম—"

মাষ্টারমশাই টুলুর কাঁধে হাতটা চাপিয়া বলিলেন—"আর পারছি না টুলু, থাম এবার।"

দুই জনে উঠানের দিকে মুখ করিয়া পাশাপাশি বসিয়াছিলেন। আলোটা ঘরের মধ্যে, বিলম্বিত জ্যোৎস্নার একটা ক্ষীণ আভা বারান্দার এক পাশ দিয়া মাষ্টার মশাইয়ের মুখের একদিকে আসিয়া পড়িয়াছিল, কথাটা বলিবার জন্ত ফিরিতে ছায়ায়-আলোয় সেই আভা মুখের সামনেটা স্পষ্ট করিয়া দিল। মাষ্টার মশাইয়ের মুখটা শীর্ণ, রেখাবহুল, কিন্তু বরাবরই তাহার উপর একটা প্রসন্নতার আচ্ছাদন দেখিয়া আসিয়াছে, এমন বিকৃত কখনও দেখে নাই টুলু, শঙ্কিত ভাবে প্রশ্ন করিল—"বেদনাটা বাড়ল নাকি স্যার?"

সঙ্গে সঙ্গে কি করিয়া বুঝিতে পারিল এটা কোন দৈহিক বেদনার অভিব্যক্তি নয়; একটু চিন্তিত ভাবে মুখের পানে চাহিয়া ধীরে ধীরে প্রশ্ন করিল—"আপনি তন্ত্রশাস্ত্রে বিশ্বাস করেন না স্যার?—সিদ্ধবাবা আবার শুনেছি এদিকে পরম বৈষ্ণবও।"

মাষ্টার মশাই বলিলেন—"বিশ্বাসের কথা নয়, প্রয়োজনের কথা টুলু। হাজার বছর ধরে ত নর্দমায় মুখ গুঁজড়ে পড়ে আছি, আরও দরকার আছে?"

একটু বিরতি দিয়া বলিলেন—"কেন এই ভাবে পড়ে থাকা সেটা ভেবে দেখবার কি এখনও সময় হয় নি টুলু? ধর্মের ব্যভিচারকে আমরা আর কত দিন এই করে ধর্মের মর্যাদা দিতে থাকব?" (ক্রমশঃ)

মূক-বধিরের শিক্ষা

শ্রীনৃপেন্দ্রমোহন মজুমদার

পৃথিবীর সভ্য সমাজে একটি বৃহৎ অংশ কোন্ সুদূর অতীত হইতে সমাজের গলগ্রহস্বরূপ নিগৃহীত হইয়া নিতান্ত উপেক্ষিত

স্পর্শ দ্বারা স্বর শিক্ষা

ও ঘৃণিত ভাবে জীবনধারণ করিয়া আসিতেছে, ইতিহাস তাহার সুনির্দিষ্ট সংবাদ দিতে অক্ষম। অথচ জগতের যাবতীয় ধর্মশাস্ত্র, পুরাণ এবং প্রাচীন ও নবীন ইতিহাস এই প্রকার এক শ্রেণীর অক্ষম মানবের অস্তিত্ব ঘোষণা করিয়া আসিতেছে, কিন্তু তাহার প্রতিকারকল্পে কখনও কোনও উদ্যোগ হইয়াছিল কিনা তাহার তেমন কোনও প্রকৃষ্ট নিদর্শন পাওয়া যায় না।

বৈজ্ঞানিকগণ মানবজাতির শিক্ষাকল্পে যত প্রকার প্রণালী ও পন্থা আবিষ্কৃত করিয়াছেন তন্মধ্যে মূক-বধিরদিগের ভাষা-শিক্ষা-পদ্ধতিও একটি অতি আশ্চর্য্যজনক ও আবশ্যক আবিষ্কার তাহাতে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। মুষ্টিমেয় কর্ম্মবীরদের আবিষ্কারের ফলে আজ সমাজের বিকল একাংশ ঘৃণিত জীবনের ধারাকে সম্পূর্ণরূপে উন্নতির পথে পরিচালিত করিতে সমর্থ হইয়াছে।

বর্ত্তমান যুগে মূক-শিক্ষার নানাবিধ পন্থা ও প্রণালী প্রচলিত থাকিলেও মৌখিক প্রণালী (oral method) সকলের শীর্ষস্থান অধিকার করিয়াছে। মূক-বধিরের ভাষা বলিতে এখনও অনেকে তাহাদের ইসারা বা ইঙ্গিতের কথাই ভাবিয়া থাকেন; তাহারা যে যত্ন ও অভ্যাস দ্বারা তাহাদের শ্রুতিশক্তিসম্পন্ন ভ্রাতাদিগের ন্যায় কথা বলিতে ও অন্যের কথিত ভাষা বুঝিতে পারে, ইহা তাঁহাদের ধারণার অতীত। অনেকেই মনে করেন মূক-বধিরগণ বাক্‌শক্তিহীন হইয়াই জন্মগ্রহণ করে ও বাক্‌শক্তির অভাববশতঃ কালক্রমে তাহাদের শ্রবণশক্তিও বিলুপ্ত হইয়া যায়। কিন্তু ইহা নিতান্ত ভিত্তিহীন ধারণা। অনেকের এমনও ধারণা আছে যে, "কোনও বাগ্‌যন্ত্রের অভাবে বা দোষে

মূক হইয়া থাকে।" ইহাও সম্পূর্ণ ভ্রান্তিমূলক। মূক-বধিরদের বাগ্‌যন্ত্রের কোনই অভাব বা দোষ পরিলক্ষিত হয় না। সামান্য মাত্র অনুশীলন দ্বারা ইহাই প্রতিপন্ন হইয়া থাকে যে, জন্ম বা বাল্য-বধিরতাই তাহাদের মূকত্বের একমাত্র কারণ। কোনও

ওষ্ঠ-পাঠ

মূক-বধিরকেই কণ্ঠস্বরবিহীন দেখা যায় না এবং তাহাদিগকে নানাবিধ অব্যক্ত ধ্বনি করিতে দেখা যায়। শ্রবণশক্তির অভাবের জন্যই ইহারা কোন ভাষা আয়ত্ত করিতে সমর্থ হয় না। কথা আমাদের জন্মগত নহে; ইহা শিক্ষাসাপেক্ষ। আমরা আশৈশব পিতামাতা ও নিকটস্থ ব্যক্তিদিগকে যে ভাষায় বাক্যালাপ করিতে শ্রবণ করি তাহাই আমরা অনুকরণ দ্বারা আয়ত্ত করিয়া লই। এইজন্যই বাঙালীর সন্তান বাংলা, ইংলণ্ড-বাসীর সন্তান ইংরেজী ও ভারত-প্রবাসী ইংরেজের সন্তান ইংরেজী ও ভারতীয় ভাষা যুগপৎ শিক্ষা করিয়া থাকে। বধির শিশু শৈশবাবধি কোনও ভাষাই শ্রবণ করে না, সুতরাং কোনও ভাষাতেই কথা কহিতে পারে না। কাজেই জন্ম-বধিরগণ অথবা জন্মের পর ভাষা শিক্ষার পূর্ব্বে যাহারা কোন অসুখের জন্য বধিরত্ব প্রাপ্ত হয় তাহারা মূক হইয়া থাকে।

মূক-বধিরদের উচ্চারণ-শিক্ষার পূর্ব্বে নানাবিধ প্রক্রিয়া-দ্বারা উহাদের দৃষ্টিশক্তি ও স্পর্শশক্তির উৎকর্ষ সাধন করানো হয়। কোন শব্দ উচ্চারণকালীন শ্বাসযন্ত্রস্থ বায়ু নির্গত হইবার সময় উহা স্বর-তন্ত্রীদ্বয়ে (vocal cords) আঘাত করে। আঘাতপ্রাপ্ত তন্ত্রীদ্বয় সেতারের তারের ন্যায় কম্পিত হইয়া উঠে। শব্দ বায়ুর ক্রিয়া ব্যতীত আর কিছুই নহে। ইহা উচ্চারণকালীন যে কম্পন সৃষ্টি হয় তাহা বক্ষে বা চিবুকে হস্তার্পণ করিলে অনুভব করা যায়। মূক-বধির স্পর্শেন্দ্রিয়ের সাহায্যে নিজ বক্ষে বা চিবুকে অনুরূপ কম্পন সৃষ্টি করিতে যত্নবান হয় এবং পুনঃপুনঃ অভ্যাস দ্বারা ইহা আয়ত্ত করিতে সমর্থ হয়। শব্দ উৎপত্তির পর বর্ণ উচ্চারণকালীন মুখ, ওষ্ঠ ও জিহ্বার যে বিভিন্ন প্রকার পরিবর্ত্তন হয় উহার প্রতি শিক্ষার্থীর মনোযোগ ও দৃষ্টি বিশেষভাবে আকৃষ্ট করা হয়, উপরন্তু ছাত্র একটি আয়নার সাহায্যে তাহার মুখ, ওষ্ঠ ও জিহ্বার সঠিক স্থান নির্ণয় করিয়া লইতে পারে। যেমন, "পা" এই বর্ণ উচ্চারণে ওষ্ঠদ্বয় পরস্পর সংযুক্ত হয়, বহির্গামী বায়ু ওষ্ঠদ্বয়ের সংযোগ বিচ্ছিন্ন করিলে "পা" এই বর্ণ উচ্চারিত হয়। "কা" বর্ণের উচ্চারণে জিহ্বার পশ্চাদ্ভাগ বক্র হইয়া উপরের দিকে উঠে এবং তালুর পশ্চাদ্ভাগের সহিত সংযুক্ত হয়। বহির্গামী বায়ু জিহ্বা ও তালুর সংযোগ বিচ্ছিন্ন করিলেই 'কা' এই বর্ণ উচ্চারিত হয়। দৃষ্টি ও স্পর্শের সাহায্যে এক একটি বর্ণ এবং ক্রমে পদ ও বাক্য শিক্ষা দেওয়া হইয়া থাকে।

সাধারণ শিশু যেমন ভাষা ব্যবহারের পূর্ব্বে প্রথমে কতক-গুলি নিত্য প্রয়োজনীয় কথা ও ক্রমে ভাষা বুঝিতে পারে মূক-বধির শিশুকেও বর্ণ উচ্চারণের ও ভাষা শিক্ষার পূর্ব্বে দৃষ্টিশক্তির সাহায্যে অন্যের কথা বুঝিতে শিক্ষা দেওয়া হয়। কথা বলার সময় বক্তার ওষ্ঠ, জিহ্বা প্রভৃতি বাগ্‌যন্ত্রের এবং মুখাবয়বের যে বিভিন্ন গতি হয় উহা লক্ষ্য করিয়া মূক-বধিরগণ
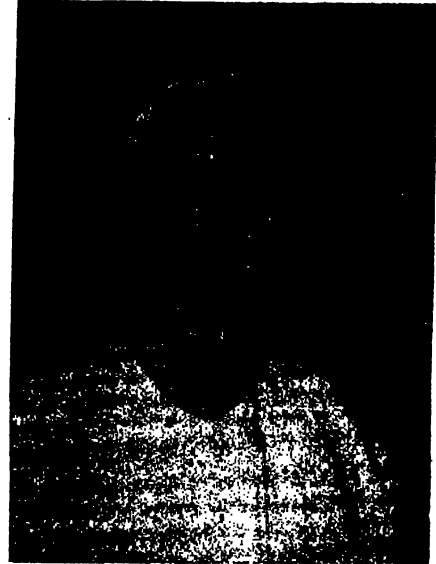
মোহিনীমোহন মজুমদার

অপরের কথা বুঝিতে পারে। যেমন 'পাত,' এই পদটির উচ্চারণকালীন জিহ্বা ও মুখের যে রূপ হয় 'টাকা' বলিতে তদনুরূপ হয় না। এই পরিবর্ত্তন লক্ষ্য করিয়াই মূক-বধির গণ বক্তার কথা বুঝিতে সক্ষম হয়। ইহাকে "ওষ্ঠ-পাঠ" বলা হয়। শিক্ষার কৌশলে ক্রমে দৃষ্টিকুশলতা অত্যন্ত বৃদ্ধি পায়। মূক-বধিরগণ উপযুক্ত শিক্ষাপ্রাপ্ত হইলে সহজেই সাধারণের কথা বুঝিতে সমর্থ হয়। কতকগুলি শব্দ আছে যাহাদের উচ্চারণ-কালীন ওষ্ঠের ও মুখের আকার একই রূপ দেখায় অথবা পার্থক্য এত সামান্য যে সহজে বোধগম্য হয় না। ইহাদিগকে সমরূপস্থান শব্দ বলা হয়। যেমন—আতা-আদা; পালা-মালা; ডালা-থালা; পেয়ারা-পেয়ালা ইত্যাদি। মূক-বধিরের বর্ণন ভাষা-

জ্ঞান জন্মায় তখন এই সমদৃশ্যমান শব্দ বুঝিতে কোন অন্তরায় উপস্থিত হয় না। কারণ আমরা সাধারণতঃ কি প্রকারে অন্যের কথা বুঝি? আমরা কখনও কি বক্তার প্রত্যেকটি বর্ণ মনোযোগদ্বারা শ্রবণ করি? উপযুক্ত ভাষাজ্ঞান থাকায়

ভূগোল শিক্ষা

অন্যের কথা বুঝিতে কোন অসুবিধা হয় না। বধিরদের মধ্যেও যাহাদের ভাষা-জ্ঞান জন্মিয়াছে, তাহারা "আত মিষ্টি" বলিলে কখনই "আদা মিষ্টি" বুঝিবে না। মূক-বধিরদের শিক্ষা অত্যন্ত সময়সাপেক্ষ এবং ব্যয়সাপেক্ষও বটে। সাধারণ দৈনন্দিন জীবনের ভাষাজ্ঞান জন্মাইতে প্রায় দশ বৎসর কাল আবশ্যক হইয়া থাকে। কেবলমাত্র ভাষাশিক্ষা দ্বারাই ইহাদের শিক্ষা সমাপ্ত হয় না, ভবিষ্যৎ জীবনে স্বাবলম্বী ও উপার্জনক্ষম হইবার নিমিত্ত ইহাদিগকে উপযুক্ত শিল্পশিক্ষা দেওয়াও একান্ত প্রয়োজন।

আমাদের দেশে ইংলণ্ড ও আমেরিকার ন্যায় মূক-বধিরদের শিক্ষার সম্প্রসারণ না হইলেও মুষ্টিমেয় কর্ম্মিগণের চেষ্টায় ইহা কথঞ্চিৎ বিস্তারলাভ করিয়াছে।

১৮৮৪ খ্রীষ্টাব্দে বোম্বাই প্রদেশের প্রধান ধর্ম্মযাজক ডাঃ লিউ মিউরণ মহোদয়ের প্রযত্নে বোম্বাই শহরে একটি মূক-বধির বিদ্যালয় সংস্থাপিত হয়। ইহাই ভারতের প্রথম মূক-বধির বিদ্যালয়। ইহার কিছুকাল পরেই ১৮৯৩ খ্রীষ্টাব্দে বঙ্গদেশে বাঙালীর যত্নে ও সম্পূর্ণরূপে বাঙালীর কর্তৃত্বাধীনে কলিকাতা মূক-বধির বিদ্যালয় সংস্থাপিত হয়। বাংলার মূক-বধিরদের দুঃখে দয়ার্দ্রচিত্ত হইয়া উঁহাদিগের দুঃখ-যন্ত্রণা লাঘবের জন্য স্বর্গীয় শ্রীনাথ সিংহ তদানীন্তন সিটি কলেজের অধ্যক্ষ পরলোকগত উমেশচন্দ্র দত্ত মহাশয়ের বিশেষ সহযোগিতায় সিটি কলেজ ভবনে মাত্র দুইটি ছাত্র লইয়া একটি ক্লাস খোলেন। কিছুকালের মধ্যেই মোহিনীমোহন মজুমদার ও যামিনীনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় শ্রীনাথ বাবুর এই সাধু প্রচেষ্টায় যোগদান করেন। এই তিন জন যুবকের অক্লান্ত চেষ্টা-যত্নে এবং উমেশ বাবুর সহযোগিতায় ১৮৯৪ খ্রীষ্টাব্দে উক্ত ক্ষুদ্র ক্লাসটি কলিকাতা মূকবধির বিদ্যালয় নামে অভিহিত হয়। উমেশচন্দ্র এই বিদ্যালয়ের প্রথম অবৈতনিক সম্পাদক নিযুক্ত হন। যামিনীনাথ প্রথমতঃ বোম্বাই বিদ্যালয় হইতে মূক-বধিরদের শিক্ষা-প্রণালী শিখিয়া আসিয়া তদীয় অন্যতম সহযোগী-প্রতিষ্ঠাতা শ্রীনাথ সিংহ ও মোহিনীমোহন মজুমদার মহাশয়দ্বয়ের সাহায্যে এখানকার শিক্ষা-কার্য্যে ব্রতী হইয়া অল্পকাল মধ্যেই ইহা বুঝিতে পারিলেন যে, ইউরোপ বা আমেরিকায় গিয়া বিশেষরূপে উন্নত প্রণালীতে শিক্ষালাভ করিতে না পারিলে স্কুলের যথোপযুক্ত উন্নতিসাধনের আশা সুদূরপরাহত। যামিনীনাথ বিদ্যালয়ের তদানীন্তন কার্য্যনির্ব্বাহক সভা ও সম্পাদক-উমেশবাবুর নিকট বিলাত ও আমেরিকা যাত্রার প্রস্তাব উপস্থিত করেন। সুখের বিষয় কার্য্যনির্ব্বাহক সভা যামিনীনাথের প্রস্তাব গ্রহণ করেন এবং অল্পকাল মধ্যেই বিদেশ যাত্রা উপলক্ষে উপযুক্ত অর্থ সংগৃহীত হয়। এই ক্ষেত্রে প্রেসিডেন্সি কলেজের অধ্যক্ষ এফ. জে. রো এবং তদীয় পত্নীর অর্থ সংগ্রহ-কালীন একান্ত চেষ্টা বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

মূকবধিরদের ছাপাখানার কাজ

যামিনীনাথ কুলীন ব্রাহ্মণ-সন্তান, ইংলণ্ড হইতে প্রত্যাগত হইলে সমাজে তাঁহার কি প্রকার লাঞ্ছনা ও দুরবস্থা ঘটিতে পারে, তৎপ্রতি দৃষ্টিপাত না করিয়া বাংলা—বাংলা কেন সমগ্র ভারতের প্রায় দুই লক্ষ অসহায় মূক-বধিরের নীরব মর্ম্ম-বেদনার প্রতি লক্ষ্য করিয়া ১৮৯৪ খ্রীষ্টাব্দে ইংলণ্ড যাত্রা করেন। যামিনীনাথ ইংলণ্ড, আয়র্লণ্ড ও আমেরিকায় প্রায় দুই বৎসর অবস্থান করিয়া এবং মূক-বধির শিক্ষা বিষয়ে বিশেষ পারদর্শিতা লাভ করিয়া ১৮৯৬ খ্রীষ্টাব্দে স্বদেশে ফিরিয়া আসেন এবং এই শিশু-প্রতিষ্ঠানটির অধ্যক্ষ পদে নিযুক্ত হন। এই সময় হইতে শিক্ষায়তনের কার্য্য তাঁহার তত্ত্বাবধানে সুনিয়ন্ত্রিত রূপে পরিচালিত হইতে থাকে।

ইতিমধ্যে বিদ্যালয়ের কার্য্যে আকৃষ্ট হইয়া কলিকাতার বহু গণ্যমান্য ব্যক্তি, গবর্ণমেণ্ট ও কলিকাতা কর্পোরেশন অর্থসাহায্য দ্বারা বিদ্যালয়ের কার্য্যে সহযোগিতা করেন। ক্রমশঃই বিদ্যালয়ে ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা বৃদ্ধি পাইতে থাকে। ১৯০৩ খ্রীষ্টাব্দে কার্য্যকরী সভার সভাপতি মাননীয় সি. ডবলিউ. বোল্টন সাহেবের অক্লান্ত যত্ন ও চেষ্টায় শিশু-প্রতিষ্ঠানটির

জন্য বর্ত্তমান ২৯৩ নং আপার সারকুলার রোডস্থ ৫ বিঘা জমি ক্রয় করিয়া সুরম্য অট্টালিকা নির্ম্মিত হয়। নবনির্ম্মিত গৃহে প্রবেশ করার অল্প কালের মধ্যেই ১৯০৫ খ্রীষ্টাব্দে বাংলার প্রথম মূক-বধির-শিক্ষক এবং বিদ্যালয়ের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা শ্রীনাথ সিংহ মহাশয় পরলোক গমন করেন। তাঁহার এই অপ্রত্যাশিত ও অকাল মৃত্যুতে বিদ্যালয়ের প্রভূত ক্ষতি হইয়াছিল।

শুধু কথা কহিতে শিখিলেই মূক-বধিরদের শিক্ষা সমাপ্ত হয় না — ভবিষ্যৎ জীবনে স্বাবলম্বী ও উপার্জ্জনক্ষম হইবার উপযোগী শিল্প শিক্ষায়ও তাহাদের পারদর্শী হইতে হইবে। বিদ্যালয়ের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা মোহিনীমোহন মজুমদার মহাশয়ের সুচিন্তিত পরিকল্পনা ও তাঁহারই প্রচেষ্টায় এই বিদ্যালয়ে নানাবিধ শিল্প-শিক্ষার জন্য একটি আদর্শ কারখানা স্থাপিত হইয়া ছাত্রছাত্রীদিগের শিল্প-শিক্ষার সুবন্দোবস্ত হইয়াছে। প্রতি বৎসর বহু মূক-বধির এই বিভাগ হইতে কোনও একটি নির্দ্দিষ্ট বিষয়ে পারদর্শিতা লাভ করিয়া সাধারণ কারখানায় অথবা স্বাধীনভাবে কার্য্য করিয়া জীবিকা উপার্জ্জন করিতে সক্ষম হইতেছে। মোহিনীবাবু কেবলমাত্র বিদ্যালয়ে শিল্প-বিভাগ প্রতিষ্ঠা করিয়াই ক্ষান্ত হন নাই উপরন্তু তিনি মূক-বধিরদের সম্বন্ধে নানা বিষয় বিশ্লেষণপূর্ব্বক "মূক-শিক্ষা" নামক একখানি অতি প্রয়োজনীয় পুস্তক প্রণয়ন করিয়া দেশের প্রভূত কল্যাণ সাধন করিয়াছেন।

বিদ্যালয়ের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা ও প্রথম অধ্যক্ষ যামিনীনাথের স্বার্থত্যাগ ও কর্ম্মপ্রচেষ্টার ফলে আজ বিদ্যালয়টি ভারতের শ্রেষ্ঠতম মূক-বধির শিক্ষায়তনে পরিণত হইয়াছে। সম্মানিত করেন। অত্যন্ত দুঃখের বিষয় যামিনীনাথ দীর্ঘকাল এই বিদ্যালয়ের কার্য্য করিতে সক্ষম হন নাই। অতিরিক্ত পরিশ্রমের ফলে তাঁহার স্বাস্থ্যভঙ্গ হয় এবং তিনি ১৯২১ খ্রীষ্টাব্দে ৫২ বৎসর বয়সে ইহলোক ত্যাগ করেন।

অধুনা বিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ রায় সাহেব শ্রীযুক্ত পটলচাঁদ চট্টোপাধ্যায়। ইনিও ১৯১৩ খ্রীষ্টাব্দে পাশ্চাত্য দেশ হইতে মূক-বধির শিক্ষা প্রণালীতে বিশেষ অভিজ্ঞতা লাভ করিয়া আসিয়াছেন। তাঁহার সুপরিচালনায় বিদ্যালয়ের কার্য্য ক্রমশঃই নানা ভাবে উন্নতি লাভ করিতেছে।

এই বিদ্যালয়ে মূক-বধিরদের লেখাপড়া ও শিল্প-শিক্ষার ব্যবস্থা ব্যতিরেকে আরও একটি বিশেষ প্রয়োজনীয় বিভাগ আছে। বিভাগটি শিক্ষক ট্রেনিং বিভাগ (Teacher's Training Department)। এই বিভাগে প্রতি বৎসর ভারতের বিভিন্ন দেশ হইতে শিক্ষিত যুবক ও মহিলাগণ আসিয়া অধ্যয়ন করিয়া মূক-বধিরদিগের শিক্ষকতা-কার্য্যে বিশেষ পারদর্শী হইয়া থাকেন। মূক শিক্ষার প্রণালীতে বিশেষরূপে জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা না থাকিলে মূক-বধিরদের শিক্ষাকার্য্যে ব্রতী হওয়া সম্ভব নয়। ভারতবর্ষের মহীশূর, বরোদা, আমেদাবাদ, দিল্লী, এলাহাবাদ, পাটনা, রাঁচী প্রভৃতি স্থানের ও বাংলার প্রায় সমস্ত বিদ্যালয়ের শিক্ষকগণই এই বিভাগ হইতে উপযুক্ত শিক্ষা প্রাপ্ত হইয়াছেন।

প্রোজ্জ্বল ছাত্রের কারখানা। কাঠের খেলনা রং করা হইতেছে

ইউরোপ ও আমেরিকায় মূক-বধিরদিগের জীবন-ধারায় যে রূপান্তর আসিয়াছে, তাহা আজও এদেশে সম্ভব হয় নাই। শিক্ষার গুণে স্বাবলম্বী হইয়া তাহারা জীবনের ন্যায্য দাবি আদায় করিতে সমর্থ হইয়াছে। কিন্তু দুঃখের বিষয় আমাদের দেশে জনসাধারণ, এমন কি উচ্চশিক্ষিত এমন অনেক ব্যক্তি আছেন যাঁহারা কল্পনাও করিতে পারেন না যে যত্ন ও চেষ্টায় মূক মুখর হইতে পারে! আজ আমাদের দেশে যখন শিক্ষার সর্ব্বাঙ্গীণ প্রসার হইতেছে তখন শিক্ষিত সমাজকে মূক-বধিরদের শিক্ষার দাবি বিশেষ রূপে চিন্তা করিতে হইবে। দেশের ও সমাজের মঙ্গলের জন্য ইহাদের দাবি উপেক্ষা করা সমীচীন নয়।

বাংলাদেশে মূক-বধিরদিগের সংখ্যা ৩৫,০০০। ইহাদের শিক্ষার নিমিত্ত ৫০ বৎসরের প্রচেষ্টায় মাত্র ১১টি শিক্ষায়তন সংস্থাপিত হইয়াছে এবং এই সমস্ত শিক্ষায়তনে শিক্ষাপ্রাপ্ত হইতেছে মাত্র ৩৫০ জন মূক-বধির। কলিকাতা মূক-বধির বিদ্যালয় ব্যতীত অন্যান্য জেলার শিক্ষায়তনগুলির অবস্থা অত্যন্ত শোচনীয়। শিক্ষায়তনগুলির অস্তিত্ব বজায় আছে শুধু মুষ্টিমেয় নিঃস্বার্থ কর্ম্মীদের প্রাণপণ চেষ্টায়। এই সমস্ত জনহিতকর মানবতার কার্য্যে শুধু কর্ম্মীদের উপর নির্ভর করিয়া থাকিলে চলিতে পারে না; প্রয়োজন জনসাধারণের উৎসাহ, অর্থসাহায্য ও সহযোগিতা। গবর্ণমেণ্ট, ডিষ্ট্রিক্ট বোর্ড ও মিউনিসিপ্যালিটিগুলিরও এই সম্বন্ধে যথেষ্ট দায়িত্ব আছে।

১৯২৫ খ্রীষ্টাব্দে লোকশিক্ষা ও প্রচার-কার্য্যের বিশেষ প্রয়োজন বিধায় নিখিল-ভারত মূক-বধির শিক্ষক-সম্মেলন নামে একটি সম্মেলন প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। এই সম্মেলন মূক-বধিরদিগের উন্নতির জন্য নানা ভাবে চেষ্টা ও যত্ন করিতেছেন। সম্মেলন আশা করেন জনসাধারণের আন্তরিক সহযোগিতা এবং সহানুভূতি লাভ করিয়া শীঘ্রই ইহা উন্নততর কার্য্য করিতে সক্ষম হইবে।

সাম্য

শ্রীঅশোক চট্টোপাধ্যায়

১

মানুষের মনে সাম্য লইয়া যে সকল চিন্তার ধারা প্রবাহিত হয় অধিকাংশ স্থলেই তাহার মূলে রহিয়াছে সংসারের অপরাপর লোকের তুলনায় নিজের পাওনা কম হওয়ার দুঃখ ও নৈরাশ্য। নিজের প্রতি প্রীতি না থাকিলে মানুষ বাঁচে না ও তাহার মনুষ্যজীবন ব্যর্থ হইয়া যায়। ইহা শুধু যে মানুষের সম্বন্ধেই সত্য তাহা নহে; সকল জীবের বাঁচিবার ও বাঁচিয়া থাকিয়া নিজ জাতীয় অপরাপর জীবের প্রজননে জাতির অস্তিত্ব রক্ষা করিয়া চলার মূলেও রহিয়াছে ঐ আত্মপ্রীতি। এই কারণে নিজ গুণ, নিজ অধিকার ও নিজ কর্মের নিন্দা বা অনিষ্টকর কোন কিছু মানুষ সহজে মানিয়া লইতে রাজী হয় না। নতুবা এই সাম্যের বিচারে ক্রমাগতই শুধু পাওনা-গণ্ডার কথা উঠে কেন? "উহার কেন বড় বাড়ী, আমার কেন ছোট? উহার বেতন তিনশ টাকা, আমার কেন একশ টাকা। উহার মুখে সিগারেট আমার মুখে বিড়ি, উহার গায়ে রেশম আমার মার্কিন, উহার হাতে ওমেগা আমার হাতে রেলওয়ে রেগুলেটর এবং ও যায় নিজের মোটরে আমি চড়ি ট্রামে-বাসে। এই সকল সাম্যবর্জ্জিত ব্যাপার কখনও ন্যায় হইতে পারে না। কেননা, আমি কাহারও অপেক্ষা হীন অক্ষম অথবা নির্বোধ নহি। সুতরাং ইহা একটা বিরাট ষড়যন্ত্রের বাহ্য লক্ষণ ও আমার কর্ত্তব্য এই ষড়যন্ত্র ভাঙিয়া নিজের পাওনা-গণ্ডা ঠিকমত বুঝিয়া লওয়া।" অর্থনৈতিক সাম্যবাদের মনস্তত্ত্ব বিচারের এই এক দিক।

অপর দিকে রহিয়াছে যাহাদের উত্তরাধিকারসূত্রে অধিক জুটিয়াছে ও যাহারা বর্ত্তমান অর্থনৈতিক বিলিব্যবস্থার সুযোগে নিজ বুদ্ধি, কর্ম্ম বা কপালগুণে প্রাচুর্য্যের মালিক হইয়া বসিয়াছে। তাহারা বলে, "মানুষ উপায় করে সন্তানসন্ততির আরাম ও সুবিধার জন্য। সুতরাং আমার পিতা বা অপর কোন পূর্ব্বপুরুষ আমায় যে সম্পত্তি দিয়া গিয়াছেন তাহাতে আমারই অধিকার। ইহা আমার পিতা বা অপর কাহারও স্বাধীন অধিকারপ্রসূত ও ইহাই মানব-স্বাধীনতার একটা চিররক্ষণীয় আদর্শ। ব্যক্তিগত সম্পদ যদি অর্জ্জন, উপভোগ বা দান করিবার ক্ষমতা মানুষের না থাকে ত স্বাধীন মানব ও দাসের মধ্যে পার্থক্য কি রহিল? আমি যাহা উপার্জ্জন করি তাহাতে আমার পূর্ণ অধিকার ও তাহা কেমন করিয়া ভোগ করিব অথবা সঞ্চয়-ব্যয় করিব তাহা আমার স্বাধীন ইচ্ছার উপর নির্ভর করা প্রয়োজন।" যাহারা এই মতবাদে বিশ্বাস করেন তাঁহারাও ঐ নিজ সুবিধার মার্গেই রহিয়াছেন। কারণ যাহার যতটা আছে সে ততটাই বজায় রাখিয়া অধিকের অন্বেষণে ছুটিয়াছে এবং আরও অধিক পাইবে এই আশায় জীবন কাটাইয়া দিতেছে।

সাম্য কথাটার সোজা অর্থ যাহা তাহাই যদি একটা উচ্চ আদর্শ হইত তাহা হইলে মানুষ সর্ব্বঘটে সকল কিছুকে সমান আকার দান করিবার চেষ্টা করিত। সুকণ্ঠ গায়কদিগকে জেলে বন্ধ করিয়া, সুন্দরী স্ত্রীলোকদিগকে আন্দামানে পাঠাইয়া, সুলেখকদিগের হাত ভাঙিয়া দিয়া সংসারে কণ্ঠস্বর, সৌন্দর্য্য ও সাহিত্যক্ষমতার ক্ষেত্রে সাম্য-প্রতিষ্ঠার চেষ্টা চলিত। সকল ঘরবাড়ী এক মাপের ও এক আকৃতির হইত, সকল জামা-কাপড় এক ধরণের ও এক বর্ণের হইত এবং অস্ত্র-চিকিৎসার সাহায্যে সকল ব্যক্তিকে ক্রমশঃ এক চেহারার করিয়া ফেলা হইত— অঙ্কে বিভিন্ন সংখ্যা, রসায়নে বিভিন্ন দ্রব্য, প্রকৃতি-বিজ্ঞানে বিভিন্ন গ্রহতারকা ও শক্তি এবং পৃথিবীতে রূপ-রস-গন্ধ-বর্ণের বৈচিত্র্য অস্বীকার করিয়া একটা নিদারুণ ও উৎকট ধর্ম্মমত গড়িয়া উঠিত। সেই ধর্ম্মমতাবলম্বিগণ অবশ্য সকল বৈচিত্র্য উচ্চকণ্ঠে মহা পাপ বলিয়া প্রচার করিয়া নিজেদের রচিত কল্পনার অনন্তসাম্যের ক্ষেত্রে ইতস্ততঃ প্রয়োজনমত পাপ করিয়া বিচরণ করিতেন। কিন্তু আসল কথা তাহা নহে। আসল কথা এই যে, মানুষ সাম্যের আদর্শটাকে সম্পূর্ণই অর্থের ক্ষেত্রে আবদ্ধ রাখিয়াছে। চেহারায়, শক্তিতে, বুদ্ধিতে, কল্পনায়, ভোগে, ত্যাগে, নীচতায়, মাহাত্ম্যে, কর্ম্মে, অপকর্ম্মে, ধর্ম্মে, অধর্ম্মে; সকল কিছুতে কম-বেশীর স্থান থাকিতে পারে; শুধু পারে না "আমার পাওনায়"। তাও বিশেষতঃ কমের ক্ষেত্রে; বেশী হইলে আপত্তি নাই। কিন্তু বেশী যাহাদের আছে তাহারাও হেনরি ফোর্ড ও হায়দ্রাবাদের নিজামের নিদারুণ সমালোচক।

এই যে স্বার্থান্ধভাব ইহার দ্বারা কোন সামাজিক সমস্যার সমাধান সম্ভব নহে। কয়েক শতাব্দী হইতেই কম যাহারা পায় তাহারা বেশী পাইবার জন্য আবহাওয়া বিক্ষুব্ধ করিয়া রাখিয়াছে; কিন্তু তাহাদের মধ্যেই যাহারা বেশী পাইয়া ফেলিল তাহারা আবার নিজ নিজ কড়াগণ্ডা সামলাইবার তাড়নায় পূর্ব্ব আদর্শ ভুলিয়া স্বার্থের পথ অবলম্বন করিয়া ফেলিল। এইরূপে সংসার চলিয়া চলিয়া অবশেষে ১৯১৭ খ্রীষ্টাব্দে রুশিয়া মুলুকে একটা মহা ওলটপালট ঘটিয়া গেল। জার্ম্মান সেনার হস্তে রুশিয়ার সম্রাটের ফৌজ যখন ট্যানেনবার্গে মার খাইয়া বিধ্বস্ত হইল, রুশিয়ার কমভোগীরা তখন সুবিধা পাইয়া বেশী ভোগীদিগকে পাড়িয়া ফেলিল। অতঃপর যে রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হইল তাহাতে নিয়ম করা হইল (সাম্যবাদের নির্দ্দেশ অনুযায়ী) যে-সকল মানবকে "যথাশক্তি" কাজ করিয়া রাষ্ট্রের সম্পদতার

বৃদ্ধি করিতে হইবে ও সকল মানবকে রাষ্ট্র "যথাপ্রয়োজন" সেই সম্পদের অংশ দান করিয়া রাষ্ট্রীয় সংসার নির্ব্বাহ হইবে। কিন্তু এ ব্যবস্থা টিকিল না। কেন ?

কারণ এই যে, "যথাশক্তি" ও "যথাপ্রয়োজন" কথা দুইটি শুনিতে সহজ হইলেও কর্ম্মক্ষেত্রের পাটিগণিতে "যথাশক্তি" হইতে "যথাপ্রয়োজন" ওজনে বেশী বলিয়া প্রমাণ হইয়া গেল। অর্থাৎ "যথাশক্তি" কাজ করিয়া এক ব্যক্তি এক সের প্রমাণ সম্পদ উৎপাদন করিয়া "যথাপ্রয়োজন" অনুসারে ১।০ সের প্রমাণ সম্পদ ভোগ করিতে চাহিল। ফলে দেখা গেল যে, সমগ্র জাতীয় উৎপাদনশক্তি প্রযুক্ত হইয়া যে পরিমাণ ভোগ্যবস্তু উৎপন্ন হইল যথাপ্রয়োজন ভোগের জন্য তাহা অপেক্ষা অনেক অধিক দ্রব্যসম্ভারের দরকার। আর একটি মুশকিল এই হইল যে, যখন "যথাপ্রয়োজন" পাওয়া যাইবে জানা গেল তখন সকলেরই "যথাশক্তি"র শক্তিটা ক্রমশঃ হ্রাস পাইতে আরম্ভ করিল। বেশী দিন এই ব্যবস্থা চলিল না, কারণ আয় অপেক্ষা ব্যয় অধিক ব্যক্তিবিশেষের চলিলেও একটা সমগ্র জাতির পক্ষে চলে না। বিশেষ করিয়া যে জাতি জগতের অপরাপর জাতির নিকট ঋণ করিবার রাস্তা উন্মুক্ত রাখে নাই। রুশিয়াকে অগত্যা অর্থনৈতিক সাম্যবাদের মূলমন্ত্রটা বাস্তব অর্থনীতির প্রাচীন রীতি অনুযায়ী শোধন করিয়া লইতে হইল।

অতঃপর ষ্টালিনি মতে আইন হইল যে, সকল ব্যক্তিকে যথাশক্তি কার্য্য করিতে হইবে এবং পাওনার বেলায় "যথাকর্ম্ম" অর্থাৎ কর্ম্মপ্রসূত উৎপন্ন বস্তুর হিসাব করিয়া পাওনা মিলিবে। ফলে অনেকের কর্ম্মশক্তি অকস্মাৎ বাড়িতে আরম্ভ করিল এবং বহু লোকেই ভোগের রাশ টানিয়া, প্রয়োজনের কথা ভুলিয়া নিজ নিজ অবস্থা অনুযায়ী ভোগের পথ অবলম্বন করিলেন। রুশিয়াও দেউলিয়া হইবার পথ ছাড়িয়া অর্থনৈতিক অসাম্য অবলম্বনে জাতীয় শক্তি ও সম্পদ বাড়াইতে আরম্ভ করিল।

বর্ত্তমানে রুশিয়ার অবস্থা আলোচনা করিয়া মার্চ্চ মাসের "রোটেরিয়ান" পত্রিকায় শ্রীযুক্ত ওয়াল্টার ডুর্যান্টি একটি সারগর্ভ প্রবন্ধ লিখিয়াছেন। এই প্রবন্ধ হইতে জানা যায় যে,

১। যদিও ১৯১৭ খ্রীষ্টাব্দে রুশিয়া একাধারে গৃহ ও পরিবার, ধর্ম্ম ও গির্জ্জা এবং অর্থ ও সম্পত্তিকে রুশীয় রাষ্ট্র হইতে সম্পূর্ণ উচ্ছেদ করিবার জন্য বদ্ধপরিকর হইয়াছিল এবং এই সকল প্রতিষ্ঠানে পুরাতন বিষাক্ত ভাব আজকাল সম্পূর্ণ লুপ্ত হইয়াছে, তথাপি একথা মানিতেই হইবে যে, বর্ত্তমান রুশিয়ায় গৃহপরিবার, ধর্ম্মপ্রতিষ্ঠান ও অর্থসম্পত্তি পূর্ণ মাত্রায়ই বজায় আছে ও অতঃপর চিরকালই থাকিবে বলিয়া মনে হয়।

২। রুশিয়ায় বিবাহ ও বিবাহ নাকচ করিবার পদ্ধতি আমেরিকা হইতে অনেক অংশে কঠিন করিয়া গড়া হইয়াছে এবং বর্ত্তমানে রুশিয়ায় কোন দম্পতির মধ্যে কাহাকেও দিনান্তে বিকালে বাড়ী ফিরিয়া একটি নূতন পতি বা পত্নীর সহিত পরিচিত হইবার আশঙ্কায় থাকিতে হয় না। বিবাহ, ধর্ম্মমত বা ব্যক্তিগত অর্থ-সম্পদকে একটা মহাজনী ষড়যন্ত্রের অঙ্গ বলিয়া আধুনিক রুশিয়ান আর প্রচার করে না এবং সে নিজে স্বীকার করে যে এগুলি মানুষের বহু সহস্র বৎসরের সামাজিক জীবনযাত্রার অভিজ্ঞতার ফল। মানুষের হৃদয় ও আত্মার স্বভাবজাত আবেগ ও আকাঙ্ক্ষার ভিতর হইতে বিবাহ ও ধর্ম্মের উৎপত্তি। মানুষ যেমন সাহিত্য, চিত্রকলা, দেশভক্তি, মতবাদ প্রচার প্রভৃতি ক্ষেত্রে অপর সকল মানবের সহিত সংযোগ আকাঙ্ক্ষা করে এবং সেই কারণে রীতি অনুযায়ী লিখন চিত্রণ, বক্তৃতা, আলোচনা ইত্যাদি করিয়া থাকে; পত্নীপ্রেম ও পরিবার গঠনে কিম্বা আত্মা ও পরমাত্মার সম্বন্ধ বিচারেও সে তেমনি সামাজিক অনুষ্ঠানের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করে ও এই অনুভূতি হইতেই বিবাহ এবং ধর্ম্ম-প্রতিষ্ঠানের উৎপত্তি হয়।

৩। রুশিয়া ঠেকিয়া শিখিয়াছে যে সকলকে এক বেতনে কার্য্য করাইলে সকলেরই কার্য্যে উৎসাহ চলিয়া যায়। আজ তাই রুশিয়ায় যে মজুরি ও বেতন-ব্যবস্থা করা হইয়াছে তাহাকে কম্যুনিজম কোন মতেই বলা চলে না। সে ব্যবস্থা মহাজনী মতেই করা হইয়াছে; শুধু মহাজনের পরিবর্ত্তে আছে রাষ্ট্র। ব্যক্তি যথাশক্তি ও যথাইচ্ছা আয়-ব্যয় করিতে পারে। শুধু টাকা দিয়া টাকা টানিবার পথ নাই। ব্যক্তিগত কারবার করা নিষিদ্ধ। বড় বড় কর্ম্মচারীরা বেশী বেশী বেতন পাইয়া থাকেন। পদোন্নতির সহিত বেতন বৃদ্ধি হয়। অধিক কর্ম্ম-শক্তি দেখাইলে অধিক মিলে। বৎসরান্তে ভাল কাজ হইলে পর বোনাস প্রাপ্তি ঘটে ও অধিক সময় কাজ করিলে অতিরিক্ত পাওনা হয়। উপার্জ্জিত অর্থ যেমন খুশী ব্যয় করা চলে। বাড়ী কেনা যায়, শুধু জমির ৪৯ বৎসরের প্রজাস্বত্ব। বাড়ীঘর সন্তানকে দিয়া যাওয়া যায়। মোটরগাড়ী ক্রয় করা যায়, চাকর রাখা যায় এবং যাহা বাজারে পাওয়া যায় তাহা ক্রয়ে কোন বাধা নাই।

৪। রুশিয়ায় ডিমোক্র্যাসি বা সাধারণের স্বাধীন মতবাদের উপর রাষ্ট্র গঠন করিবার চেষ্টা হয় নাই। লেনিনের মতে রুশিয়ার মত দেশে সাধারণ মানুষের মধ্যে ডিমোক্র্যাসির উপযুক্ত স্বাধীন মতবাদ গঠিত হইতে তিন পুরুষ লাগিবে। ১০০ বৎসর পূর্ব্বেও রুশিয়ায় জমির সহিত চাষীও বিক্রীত হইত। তাহার এ দাসত্ব মনিবের জন্য চাষ করিবার দাসত্ব ছিল। রুশিয়ার শতকরা ৮০ জন লোক এইরূপ দাস বা সার্ফ ছিল। আমেরিকার নিগ্রো ক্রীতদাস হইতে এইটুকুই তাহাদের পার্থক্য ছিল যে রুশীয় সার্ফকে জমি-ছাড়া করা যাইত না ও তাহার পরিবারও অখণ্ড থাকিত।

৫। রুশিয়ায় কম্যুনিষ্ট অর্থে শিক্ষিত রাষ্ট্রীয় কর্ম্মচারী জাতীয় লোক বুঝায়। অতি অল্পসংখ্যক লোকই কম্যুনিষ্ট ও তাহারা সাধারণের শ্রদ্ধার পাত্র। তাহাদের কাজ জনসাধারণকে উপযুক্ত শিক্ষাদান করিয়া রুশিয়াকে ক্রমশঃ আরও শক্তিমান করিয়া

তোলা। পূর্ব্বে রুশিয়ার শতকরা ১০ জন লেখাপড়া জানিত, এখন জানে ৯৫ জন। পূর্ব্বে রুশীয়েরা খুবই কদর্য্যভাবে জীবন-যাত্রা নির্ব্বাহ করিত। চাষীদের একমাত্র আমোদ ছিল শনিবার করিয়া রাত্রে মাতাল হইয়া পত্নীকে প্রহার করা। এখন তাহারা নানা প্রকার খেলাধুলা করে ও রেডিও চালাইয়া নিজে শুনে ও পরিবারস্থদের শুনায়। বর্ত্তমান কালে রুশীয়েরা জগতের অপরাপর জাতিদের সমকক্ষ হইয়া উঠিয়াছে এবং তাহাদের বিজ্ঞান ও যন্ত্রশিল্প কাহারও হইতে নিকৃষ্ট নহে।

এই বিরাট পরিবর্ত্তনের মূলে ছিল সুচিন্তিত কার্য্যপদ্ধতি ও বৈজ্ঞানিক বিচার-বুদ্ধি। প্রায় দীর্ঘ ২৫ বৎসর ধরিয়া রুশীয়েরা প্রমাণ ও সুবিচার ব্যতীত কোন কিছুতে হাত দেয় নাই। গলাবাজি ও বুক চাপড়াইয়া চিৎকার করিয়া মিথ্যাকে সত্য বা সত্যকে মিথ্যা প্রমাণ করা সেদেশে চলে নাই। শত শত বৎসরের পুরনো বস্তাপচা আদর্শ বা বিশ্বাসকে সত্য বা অভ্রান্ত বলিয়া গায়ের জোরে প্রমাণ করা তাহাদের মধ্যে সম্ভব হয় নাই। চিন্তা, কর্ম্ম ও বিচারশক্তির উপরেই রুশীয় রাষ্ট্র গড়িয়া উঠিয়াছে।

২

অর্থনৈতিক সাম্য তাহা হইলে রুশিয়ার নবরাষ্ট্রে চেষ্টা সত্ত্বেও শিকড় বসাইতে পারিল না। ইহার কারণ শুধু এই যে, অর্থনৈতিক ভাগবাটোয়ারা যে সকল নিয়মের বশবর্ত্তী সে সকল নিয়মকে কোন উচ্চ আদর্শের খাতিরে উল্টাইয়া দিয়া সংসারে কাজকারবার চলে না। যথা, একটা নিয়ম এই যে, কোন জাতি অথবা জনসংঘের পক্ষে নিজ উৎপাদিত সম্পদের অধিক ভোগ করিবার অধিকার পাইতে হইলে কয়েকটি উপায়ে তাহা পাওয়া সম্ভব। যথা, ঋণ করিয়া, অপরের নিকট দান গ্রহণ করিয়া, লুঠ বা চুরি করিয়া, ঠকাইয়া ইত্যাদি। সরল ও সততার পথে থাকিয়া কাহারও পক্ষে নিজ পরিশ্রমার্জ্জিত সম্পদের অধিক ভোগ করা সম্ভব নহে। সুতরাং যাহার কর্ম্মশক্তি অধিক সে অধিক অর্জ্জন করিবে এবং সে কর্ম্মশক্তি দৈহিক, মানসিক অথবা সৌভাগ্যজাত হইতে পারে। অর্জ্জনের আশা বা ভোগের আকাঙ্ক্ষাই কর্ম্মের প্রধান প্রেরণা এবং পাইবার আশা না থাকিলে কেহ পরিশ্রমে রাজী হয় না। এই কারণে উপার্জ্জনের ক্ষেত্রে সাম্যবাদ প্রচার করিলে অধিকাংশ লোকই কম পরিশ্রম করিবার চেষ্টা করে এবং তাহাতে সামাজিক সম্পদের পরিমাণ ক্রমশঃ কমিতে আরম্ভ করে। ভাল করিয়া কাজ করিলে ও নিত্য নূতন উপায়ে সম্পদ বৃদ্ধি করিলে, সমাজের নিকট পুরস্কার পাইবার আশা থাকিলে মানুষের কর্ম্মপ্রচেষ্টা সতত প্রাণবান ও জাগ্রত থাকে; সে পুরস্কারের অভাবে মানুষ ক্রমশঃ নিষ্কর্ম্মা হইয়া অবশেষে বেকার হইয়া পড়ে।

অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে যেমন সকলের উপার্জ্জন-শক্তি সমান নহে সেইরূপ সকলের পাওনাও সমান হইতে পারে না। ভোগের ক্ষমতাও তেমনি সকলের সমান হয় না। কেহ পুস্তক পাঠে আনন্দ পায়, কেহ পায় গঞ্জিকা সেবনে। কেহ চিত্রকলা ও সঙ্গীতের রসগ্রাহী, কেহ বা ২২ জনে একটা বায়ুস্ফীত চর্ম্মগোলককে পদাঘাত করিতেছে ইহা দেখিয়াই তৃপ্ত হয়। কেহ চার প্রকার তরিতরকারী হইতে পঞ্চ ব্যঞ্জন রন্ধন করিয়া আহার করে, কেহবা শুধু ছাতু খাইয়াই আনন্দে দিন কাটায়। কাহারও ভ্রমণস্পৃহা আছে, কাহারও বা বসিয়া বসিয়া তাস খেলিবার আগ্রহই প্রবল। কেহ বাসস্থান, আসবাব ও পরিধেয় বসনের শ্রী ও পরিচ্ছন্নতার জন্য বহু কষ্ট স্বীকার করে, কেহ আবার স্বর্ণ রৌপ্য আহরণ করিয়া তৈলচিহ্নিত গদির উপর ভারপোকাবহুল জীবনযাপন করিয়াই আনন্দলাভ করে। কাহারও মনের গতি ধর্ম্ম, দর্শন, জনহিত ও বিজ্ঞানের দিকে, কাহারও বা নীচপ্রবৃত্তির অনুসরণেই চিত্ত চির আকৃষ্ট। সুতরাং ভোগশক্তির দিক দিয়া মানুষের অর্থনৈতিক সমস্যার সমাধান সম্ভব নহে। জমা-খরচের মিলন স্থাপনার্থে উপার্জ্জনের দিকটাই ভাল করিয়া দেখা দরকার এবং উপার্জ্জনশক্তিহীনকে জীবনধারণের অতিরিক্ত ভোগের ব্যবস্থা করিয়া দিলে কোন জাতির অর্থনীতিই সে ধাক্কা সামলাইয়া উঠিতে পারে না। অবশ্য সকল জাতিরই কর্ত্তব্য অসহায়কে বাঁচাইয়া রাখা ও শক্তিহীনকে খাওয়াইয়া শিখাইয়া শক্তিমান করিয়া তুলিবার চেষ্টা করা। সে কার্য্য কোন্ ক্ষেত্রে কতদূর পর্য্যন্ত করা সম্ভব তাহা বিচারসাপেক্ষ এবং সমাজের পুঁজি দেখিয়া করা কর্ত্তব্য। এই আদর্শ রক্ষা করিতে গিয়া যে সকল লোকের উপার্জ্জনশক্তি যাচাই করিয়া প্রমাণ হইয়া গিয়াছে তাহাদের ন্যায্য পাওনা হইতে বঞ্চিত করিয়া অজানা লোকের খোরাক বাড়ানো অর্থনীতিবিরুদ্ধ।

যাহা হউক অর্থনৈতিক সাম্যের পথে বহু বিঘ্ন আছে ইহা ইতিহাস হইতেই প্রমাণ হয়। তাহা হইলে সাম্য কাহাকে বলে? এই সুবিশাল সৃষ্টির মধ্যে যে বস্তুনিচয় লক্ষিত হয়, তাহাদের মধ্যে আকারপ্রকারগত কোন সাম্যই ত আমরা দেখিতে পাই না; তাহা হইলে সাম্যবাদ কি উন্মাদের কল্পনা অথবা অসংযত দৃষ্টির পটে প্রতিফলিত মরীচিকা মাত্র? আসল কথা, সাম্যবাদ একটা সুপ্রতিষ্ঠিত দীর্ঘকালস্থায়ী অন্যায়ের প্রতিবাদ মাত্র। যেমন জগতে শতকরা একশত প্রমাণ সাম্যেরও কোন সত্যকার অস্তিত্ব নাই, তেমনি এই পৃথিবীতে মানুষ বহু সম্বন্ধ, প্রতিষ্ঠান বিলিব্যবস্থা ও পারস্পরিক ব্যবহারের মধ্যে একটা অন্যায় অসমান ভাবের সৃষ্টি করিয়া রাখিয়াছে যাহার মধ্যে সত্য কোথাও নাই ও যাহা বহুল অংশে মিথ্যা ও বুজরুকির উপর প্রতিষ্ঠিত। যে যাহা উপার্জ্জন করিতেছে তাহাকে হয়ত তদনুপাতে দেওয়া হইতেছে না। কেহ হয়ত কিছুই উপার্জ্জন করিতেছে না অথচ পাইতেছে প্রচুর। কেহ বঞ্চনা করিয়া লইয়া বলিতেছে, "ইহা আমার ন্যায্য পাওনা।" কেহ দৈহিক শক্তিটা সম্পদ উৎপাদনে না লাগাইয়া অপরের উৎপন্ন সম্পদ জোর করিয়া লুটিয়া লইতে

নিয়োগ করিতেছে। অর্থনীতির ক্ষেত্রেও এই জাতীয় মিথ্যা প্রবল প্রতাপে প্রতিষ্ঠিত। কেহ বড়, কেহ ছোট। কাহারও রক্ত নীল, কাহারও বা সাক্ষাৎ ভগবানের সহিত রক্তসম্পর্ক। সকলেই কাহারও না কাহারও তুলনায় দেবতুল্য অথবা ঘৃণ্য। অর্থাৎ সমস্ত ব্যাপারটার মধ্যে মিথ্যার অংশটা এত অধিক যে সত্য কোথায় তাহা খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। ইহার উপর রহিয়াছে বিভিন্ন পর্য্যায়ের সত্য মিথ্যা মিশানো অহঙ্কারের এক দীর্ঘ তালিকা ও তজ্জাত ঔদ্ধত্য ও দম্ভের ফিরিস্তি। কেহ ব্রাহ্মণ নয় বলিয়া হুঁকা পাইল না, কেহবা আরবি খানদানের অভাবে চাকরি পাইল না। কেহ জমিদারের সম্মুখে জুতা পায়ে দাঁড়াইবার অপরাধে জুতাইত হইল, কেহ পূর্ব্বপুরুষের দৌলতে কূপের জল নিজ হস্তে উত্তোলন করিয়া খাইতে পারিল না। এই নিদারুণ মিথ্যার অভিনয়ে নিজ নিজ প্রকৃতিদত্ত পালায় কেহ নামিতে পারে না, সকলেরই একটা একটা মিথ্যার মুখোস আছে। পৃথিবীব্যাপী এই মিথ্যার অভিনয়ের প্রতিবাদের অপর নাম সাম্যবাদ।

পণ্ডিত ও পূজনীয় যে, শ্রদ্ধার দাবি যাহার সত্যকার, সে যদি সকলের নিকট প্রণাম পায় তাহাতে কাহার আপত্তি? পয়দা করিয়া যে কয়দা লুঠিতেছে তাহাকেও কে বাধা দিতে চায়, যদি না সে অপরের লোকসান করিয়া সেই কাজ করে? সত্যকার বংশমর্য্যাদা যাহার তাহাকে সে গৌরব হইতে কেহ বঞ্চিত করিতে পারে না। চটা মারিয়া ঘটা করিয়া পাওনার অতিরিক্ত দাবি করাতেই আমাদের আপত্তি। যে বিশেষত্বের মূল্য যাহা, শুধু সেইটুকুই তাহাতে আরোপ করা চলে। গাছে চড়িতে পারে বলিয়া কেহ পুকুরের মৎস্য দাবি করিতে পারে না। বিশেষ কোন আঁতুড় ঘরে জন্মাইয়াছে বলিয়া কেহ প্রণম্য হইতে পারে না। গুতনি অথবা ব্রহ্মতালুতে কেশোদ্গম করাইলে তজ্জন্য কাহাকেও বিশেষ ভাবে সম্ভ্রম দেখাইতে হইবে ইহা ন্যায্য কথা নহে। বিশেষ বিশেষ তকমা লাগাইয়া ঘুরিয়া বেড়াইলে কাহাকেও মহাকর্ম্মী বলিয়া মানিয়া লইতে হইবে ইহাও স্বীকার্য্য নহে। এক কথায় সকল প্রকার দাবি ও দম্ভের সত্যতা বিচার করিবার অধিকার বর্ত্তমান জগতের মানুষ আর পুরাতন রীতিনীতি, ইতিহাস ও গতানুগতিকের উপর ছাড়িয়া দিতে প্রস্তুত নহে। স্বাধীনতা অর্থে দড়ি-ছেঁড়া গরুর মত ছুটিয়া বেড়ানো নহে, সাম্য অর্থেও সকল কিছুকে কাটিয়া ছাঁটিয়া সমান করিয়া দেওয়া নহে। উভয়ের অর্থই সত্য মিথ্যা বিচার করিয়া সকলের ন্যায্য অধিকার, ন্যায্য দাবি ও যথার্থ পাওনা মানিয়া লইয়া মিটাইবার সুব্যবস্থা করা।

সাম্যবাদের সাম্য তাহা হইলে নিজত্বের বা ব্যক্তির সত্যরূপের সহিত তাহার সামাজিক, অর্থনৈতিক বা রাষ্ট্রীয় অধিকারের সত্য, ন্যায্য ও সুপরিমিত সম্বন্ধস্থাপন মাত্র। যে যতটা পণ্ডিত, ধার্ম্মিক, উপার্জ্জনক্ষম, ন্যায়বান বা কোন কিছুতে পারদর্শী, তাহাকে সত্যের মাপকাঠিতে তৌল করিয়া উপযুক্ত স্থানে বসাইয়া দিলেই সাম্যের আদর্শ সুরক্ষিত হইবে। চার ফুট মানুষকে আট ফুট বলাও চলিবে না, আবার তিন ফুট বলাও বারণ। চার টাকার মালিককে আট টাকার অথবা আট আনার মালিক বলিবার প্রয়োজন নাই। ঘৃণ্যকে প্রণাম করিতে কেহ বাধ্য থাকিবে না এবং অনুপযুক্তকে শ্রেষ্ঠ বলিয়া স্বীকার করিতেও হইবে না। সকলের সত্যকার দাবি যে-সমাজে বা রাষ্ট্রে পূর্ণরূপে স্বীকৃত ও প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে সেইখানেই সাম্যের আদর্শ জীবন্তরূপে স্থাপিত হয়। যে জাতির প্রত্যেক ব্যক্তিতে, প্রত্যেক পরিবারে, সকল গ্রামে, নগরে, জেলায় ও দেশে ব্যক্তিগত ও সমষ্টিগতভাবে নৈতিক, সামাজিক, আর্থিক ও রাষ্ট্রীয় সকল প্রতিষ্ঠানে এই সাম্যনীতি কার্য্যত সুপ্রতিষ্ঠিত নহে সে জাতির পক্ষে সাম্যবাদের আস্ফালন না করাই শ্রেয়ঃ। বড় বড় কথার সহিত ছোট ছোট কাজের সংমিশ্রণ জগতের নিকট হাস্যাস্পদ হইবার একটা সহজ উপায়।

নেতাজী

শ্রীসুবোধ রায়

ওষধি-গুল্ম-অরণ্যমাঝে সুবিশাল মহীরুহ
গগনচুম্বী শির তুলি' করে সূর্য্য-নমস্কার,
সংখ্যাবিহীন আকাশচারীর রচে আশ্রয় ব্যূহ,
হাসিমুখে বহে নিরাশ্রয়ের আশ্রয়-দায়-ভার।

ঝর্ণা ছুটেছে আপনার বেগে পাষাণের বুক চিরে,
একটি সজল স্নিগ্ধ প্রবাহে পাষাণের পরাজয়;
তৃষ্ণা নিবারে, প্রাণ করে দান, দেশে দেশে তীরে তীরে,
পাষাণের চেয়ে সত্য যে সে-ই, দেয় তা'র পরিচয়।

মরু-বিজয়ের সঙ্গীত যথা শ্যামল মরূদ্যানে,
বিশাল ঊষর অত্যাচারের বিদ্রোহী শ্যাম শিখা।
লক্ষ ভীরুর মাঝারে যে বীর অরিরে আঘাত হানে,
বন্দী দেশের ললাটে সে আঁকে মুক্তির ললাটিকা।

তোমারে স্মরিলে নয়নেতে জাগে এ ছবি উজ্জলতম,
বিরাট্, বিশাল, বন্ধনহারা বিদ্রোহী বীর মম।

বাংলাদেশের নদী-সমস্যা ও তাহার প্রতিকার

নছিমউদ্দিন আহমদ, এম. এস-সি.

বাংলাদেশের নদীগুলিকে প্রধানতঃ তিন ভাগে বিভক্ত করা যায়, যথা :—(১) সম্বৎসরব্যাপী নদীসমূহ (Perennial Rivers)। এই নদীগুলিতে সারা বৎসরই জলপ্রবাহ চলে, তবে বর্ষাকালে জলপ্রবাহের প্রখরতা বৃদ্ধি পায়। গঙ্গা ও তাহার শাখা, প্রবাহিকাসমূহ (Spill chann ls), তিস্তা সহ ব্রহ্মপুত্র এবং মেঘনা—এই নদীগুলি এই শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত।

(২) খরস্রোতা নদীসমূহ (Torrential Rivers)। এই নদীগুলি প্রধানতঃ ছোটনাগপুর ও সাঁওতাল পরগণার নীচু পর্ব্বত হইতে উৎপন্ন হইয়া বর্দ্ধমান বিভাগের উপর দিয়া প্রবাহিত হইয়া ভাগীরথী অথবা হুগলী নদীর সহিত মিলিত হইয়াছে। অজয়, মোর, দামোদর, কাঁসাই প্রভৃতি নদী এই শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত। বর্ষাকালে এই নদীগুলিতে বন্যা দেখা দেয়; বন্যায় স্থায়িত্ব খুবই অল্প, প্রায় দুই-তিন দিনের বেশী সাধারণতঃ স্থায়ী হয় না। তারপর নদীগুলি আবার সঙ্কুচিত হইয়া পড়ে। শুষ্ক ঋতুতে নদীগুলিতে জল প্রায় থাকে না বলিলেই চলে। ত্রিপুরা ও চট্টগ্রাম জেলার নীচু পর্ব্বত হইতে যে সমস্ত নদী উৎপন্ন হইয়াছে যথা—গোমতী, কর্ণফুলী, হালদা ইত্যাদি, সেগুলিকেও এই শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত করা যাইতে পারে; তবে এই নদীগুলি বর্ষাকালে খরস্রোতা হইলেও অন্য সময়ে একেবারে শুষ্ক হইয়া পড়ে না; কিছু কিছু জলধারা শুষ্ক ঋতুতেও বহন করে।

(৩) জোয়ার-ভাটা-বিশিষ্ট নদীসমূহ (Tidal Rivers)। প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণীর নদীগুলির শেষাংশসমূহ প্রধানতঃ এই শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত। সমুদ্রের সঙ্গে মিলিত হওয়ায় অথবা সমুদ্রের সহিত যোগ থাকায় এই অংশগুলিতে সারাবৎসর জোয়ার-ভাটা চলে। এই জোয়ার-ভাটার ফলে দেশের বিস্তর উপকার সাধিত হয়।

বাংলাদেশে বর্ত্তমানে নদীগুলির অবস্থান বা অবস্থা যেরূপ দেখা যায় অতীতে সেরূপ ছিল না। এই অবস্থা-পরিবর্ত্তনের কারণ ও গতি অনুধাবন করিতে হইলে প্রথমতঃ জানা দরকার নদী কি ভাবে প্রকৃতিতে আপনাকে জীবিত ও পরিপুষ্ট রাখে। নদীর জীবন তাহার অববাহিকার (Catchment basin) সম্বৎসর যে বৃষ্টিপাত হয় তাহারই উপর প্রধানতঃ নির্ভর করে। কিন্তু বৃষ্টিপাত সারা বৎসর একরূপ হয় না, বিশেষতঃ গ্রীষ্মপ্রধান দেশগুলিতে অধিকাংশ বৃষ্টিপাত মৌসুমী ঋতুর দুই-তিন মাসের মধ্যেই হইয়া থাকে, আর বাকী বৎসর বৃষ্টি হয় না বলিলেই চলে। এই মৌসুমী ঋতুতেও যে বৃষ্টিপাত প্রতিদিন সমানভাবে হয় তাহাও নহে। কয়েকদিন হয়ত প্রবল বৃষ্টিপাত হইল তারপর হয়ত কয়েকদিন ধরিয়া মোটেই বৃষ্টি নাই। বৃষ্টির জল যদি সমস্তই গড়াইয়া নদীপথে প্রবাহিত হইয়া যাইত তাহা হইলে আমরা নদীতে শুধু বর্ষাকালেই জল দেখিতে পাইতাম, আর অন্য সময়ে কোন জল থাকিত না; নদী শুষ্ক হইয়া পড়িয়া থাকিত। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তাহা হয় না। অন্য ঋতুতে জলপ্রবাহের প্রখরতা কম হইলেও নদী একেবারে জলশূন্য হইয়া যায় না। ইহার কারণ নদীর অববাহিকা বৃষ্টির জলের কিয়দংশ আপন স্তরে শুষিয়া সঞ্চিত করিয়া রাখে। সেই জলই শুষ্ক ঋতুতে স্তর চুয়াইয়া নদীতে আসে এবং শুষ্ক ঋতুতে তাহাই নদীর পুঁজি। বাংলাদেশের মত সমতল ও নরম জমিতে বৃষ্টির জলের বহুলাংশ মৃত্তিকাস্তরে সঞ্চিত হয়। কিন্তু পার্ব্বত্য অঞ্চলে যেখানে বৃষ্টিপাত খুবই বেশী এবং যাহার উপরই নদীর জলপ্রবাহ বা জীবন প্রধান ভাবে নির্ভর করে সেখানে মৃত্তিকা কঠিন হওয়ায় তাহার জলশোষণের ক্ষমতা খুবই কম; কাজেই ভূস্তরে অতি অল্প পরিমাণ জল সঞ্চিত থাকার ও অধিকাংশ জল নদীপথে গড়াইয়া আসার কথা, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তাহা হয় না। পার্ব্বত্য অঞ্চল বনজঙ্গলে ও তৃণভূমিতে পূর্ণ। এই সমস্ত গাছপালা ও তৃণের শিকড়ের দরুণ ভূমি সচ্ছিদ্র থাকায় জল অনেক পরিমাণে আটকা পড়িয়া ভূস্তরে শোষিত হয় ও প্লাবনের প্রখরতা প্রশমিত করে এবং শুষ্ক ঋতুতে স্তর চুয়াইয়া নদীতে আসিয়া নদীর জীবন রক্ষা করে। এই শুষ্ক ঋতুর প্রবাহ নদীর জীবনধারণের পক্ষে এবং মানুষের প্রয়োজনের পক্ষে বিশেষ আবশ্যক। বর্ষাকালে নদীতে অনেক সময় প্রবল বন্যা ঘটিয়া থাকে, তখন নদী উপকার না করিয়া বরং অসুবিধাই ঘটাইয়া থাকে। কাজেই নদী যাহাতে সারা বৎসর মানুষের উপকার করিতে পারে সেইজন্য এই শুষ্ক ঋতুর প্রবাহ বজায় রাখিতে হইবে; তজ্জন্য নদীর অববাহিকার বিশেষ করিয়া পার্ব্বত্য অঞ্চলের মৃত্তিকার জল শোষণের ক্ষমতা যাহাতে হ্রাস না পায় সেদিকে আমাদের বিশেষ লক্ষ্য রাখা উচিত।

এক্ষণে আমাদের আলোচ্য বিষয় নদী বাংলাদেশের কি উপকার সাধন করিয়াছে। বাংলাদেশ মোটামুটি ব-দ্বীপাকার। এই বিস্তীর্ণ ভূখণ্ডের উৎপত্তি, বৃদ্ধি ও পুষ্টি সাধিত হইয়াছে শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরিয়া ইহার নদীশ্রেণীবাহিত পলিমৃত্তিকা দ্বারা। যদিও এবিষয়ে পার্ব্বত্য অঞ্চলে উৎপন্ন সমস্ত নদীরই কিছু-না-কিছু দান রহিয়াছে কিন্তু গঙ্গা নদী ও তাহার শাখা প্রবাহিকার দানই এই বিষয়ে সর্ব্বাপেক্ষা উল্লেখ যোগ্য। পার্ব্বত্য অঞ্চলে এবং অববাহিকার অন্যান্য অংশে প্রবল বৃষ্টিপাতের ফলে বর্ষাকালে নদী সমস্ত অববাহিকা হইতে বৃষ্টির জলের সহিত মাটি, প্রস্তরচূর্ণ, নানাবিধ ধাতব পদার্থ ধৌত করিয়া নদীপথে প্রবলবেগে বহন করিয়া আনে। সাগরসঙ্গমে

গতি বাধাপ্রাপ্ত হওয়ায় নদীবাহিত দ্রব্যাদি স্তূপীকৃত হইয়া জমিয়া উঠিতে থাকে। গঙ্গা নদী প্রথম বাধাপ্রাপ্ত হইলে উত্তর কালে ক্রমশঃ বিভিন্ন পথে সাগরের সহিত মিলিত হইতে থাকে। বর্ষাকালে প্লাবনের ফলে এই সব প্রণালীর দুকূল ছাপাইয়া জল সর্ব্বত্র ছড়াইয়া পড়ে; ফলে নদীবাহিত পলিমৃত্তিকা ব্যাপকতর ক্ষেত্রে সঞ্চিত হইতে থাকে। হাজার হাজার বৎসর ধরিয়া এইরূপ সংঘটনের ফলে ব-দ্বীপের জন্ম ও বৃদ্ধি হইয়াছে। ব-দ্বীপ উন্নত ও বাসোপযোগী করিতে সমুদ্রের জোয়ার-ভাটা ব্যাপকভাবে সাহায্য করিয়াছে। বঙ্গোপসাগরের আকার 'কানেলে'র মত হওয়ায় এই জোয়ার-ভাটার শক্তি প্রবল। জোয়ার-ভাটার ফলে প্রতিদিন দুই বার নদীর পার্শ্ববর্ত্তী অঞ্চল প্লাবিত হয়। তাহার ফলে সাগরসঙ্গমে নদীবাহিত পলি-মৃত্তিকাদি ভাসমান অবস্থায় থাকিয়া প্রতিদিন নদীপথে কিয়দ্দূর পর্য্যন্ত যাতায়াত করে এবং পার্শ্ববর্ত্তী ভূখণ্ডকে ক্রমশঃ উন্নত ও বাসোপযোগী করিয়া তোলে। এই পলিমৃত্তিকার উর্ব্বরতাশক্তি খুবই বেশী, ফলে দেশ ক্রমশঃ উর্ব্বর হইতে থাকে।

বঙ্গোপসাগরের আকার কানেলের (Funnel) মত হওয়ায় ব-দ্বীপের প্রসার ক্রমশঃ বাধাপ্রাপ্ত হইয়াছে এবং অতি ক্ষীণ গতিতে প্রসারিত হইতেছে; ফলে নদীবাহিত দ্রব্যাদি বর্ষাকালে প্লাবন ও সমস্ত বৎসর জোয়ার-ভাটা দ্বারা ব-দ্বীপের সর্ব্বত্র অধিকতর ভাবে বিস্তৃত হইয়া দেশকে ক্রমশঃ উন্নত করিতেছে।

বঙ্গদেশের এই সমস্ত নদীর উপর দেশের আর্থিক উন্নতি, জনস্বাস্থ্য, জমির উর্ব্বরতা— এক কথায় দেশের সমস্ত সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য নির্ভর করে। নদীগুলির অবস্থা বর্ত্তমানে স্থানে স্থানে বিশেষতঃ উত্তর-বঙ্গ, পশ্চিম-বঙ্গ এবং মধ্য-বঙ্গে শোচনীয় হইয়া পড়িয়াছে। ফলে বাংলাদেশ তার প্রাচীন গৌরব, সমৃদ্ধি ও জনস্বাস্থ্য হারাইয়া ফেলিয়াছে।

নদীগুলির এই শোচনীয় অবস্থা তথা দেশের জনস্বাস্থ্য ও সমৃদ্ধি তিরোধানের মূলে রহিয়াছে প্রধানতঃ দুইটি কারণ— (১) প্রাকৃতিক পরিবর্ত্তন, (২) মানুষের অপরিণামদর্শিতা ও আপাতস্বার্থের মোহ।

প্রকৃতির রীতি অনুসারে যে পথে বাধা অল্প সেই পথেই নদী ধাবিত হয়। বৎসরের পর বৎসর একই পথে প্রবাহিত হওয়ার ফলে সে অঞ্চল ক্রমশঃ পলিমৃত্তিকা দ্বারা উন্নত হইতে থাকে; নদীর দুকূল ও পার্শ্ববর্ত্তী অঞ্চল উঁচু হইয়া যায়। কিন্তু যদি নদীর স্বাধীন প্রবাহে অথবা অববাহিকায় কোনরূপ হস্ত-ক্ষেপ করা না হয় তাহা হইলে নদীর তলদেশও সমভাবে উন্নত হইতে থাকে, ফলে নদীর গভীরতার বিশেষ কোন পরিবর্ত্তন হয় না। এইজন্য বৎসরের পর বৎসর প্রায় একই পথে চলিয়া নদী দুকূলের সমৃদ্ধি বজায় রাখিতে পারে। কিন্তু বহু শতাব্দী পর তলদেশ কূলের সহিত তাল রাখিতে পারে না। কূল অত্যধিক উঁচু হইয়া পড়ে, ফলে নদীপ্রবাহ কূলে বাধাপ্রাপ্ত হয় এবং কালক্রমে কূল ভাঙিয়া ভিন্ন পথে প্রবাহিত হয়। এইভাবে গঙ্গা, ব্রহ্মপুত্র প্রভৃতি নদী অধুনা যে অঞ্চল দিয়া প্রবাহিত হইতেছে অতীতে সেই অঞ্চল দিয়া প্রবাহিত হইত না। শত শত বৎসর পর তাহারা গতিপরিবর্ত্তন করিয়া ভিন্নপথে প্রবাহিত হইতেছে। ইহাই নদীর প্রাকৃতিক পরিবর্ত্তন।

মানুষ, জীবজন্তু প্রভৃতির ন্যায় নদীরও স্বাধীনতা ও স্বাধীন রাজ্য আছে। অববাহিকাই তাহার স্বাধীন রাজ্য; তাহারই উপর তাহার জলপ্রবাহ নির্ভর করে। এই স্বাধীনতায় বা স্বাধীনরাজ্যে হস্তক্ষেপ করিলে তাহার শক্তি ক্রমশঃ হ্রাস পাইতে থাকে। শক্তি-হ্রাস হয়ত বর্ত্তমান মুহূর্ত্তে অনুভূত না হইতে পারে। কিন্তু কালক্রমে তাহা অনুভূত না হইয়া পারে না। দেশের জনবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে মানুষের প্রয়োজনও বাড়িয়া চলিয়াছে, কাজেই বাধ্য হইয়া এবং অনেক ক্ষেত্রে সাময়িক লাভের বশবর্ত্তী হইয়া সে নদীর স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ করিয়াছে। পার্ব্বত্য অঞ্চল ও অববাহিকার অন্যান্য অঞ্চলে বনজঙ্গল ও তৃণভূমি মানুষ প্রয়োজনবোধে অথবা লোভের মোহে কাটিয়া ফেলিয়াছে। অনেক জনধ্যুষিত স্থান কৃষি-কার্য্যের জন্য ব্যবহার করিতেছে। তাহার ফলে অববাহিকার জল শোষণের ক্ষমতা কমিয়া গিয়াছে; ইহাতে নদীগুলি ক্রমশঃ শুষ্ক ঋতুতে জলশূন্য হইয়া পড়িতেছে এবং বর্ষাকালে প্লাবনের প্রখরতা বৃদ্ধি পাইতেছে। স্থানে স্থানে ভবিষ্যতের প্রতি দৃষ্টি না রাখিয়া শুধু সাময়িক সুবিধার জন্য নদীর দুকূলে উঁচু বাঁধ বাঁধিয়া প্লাবন রক্ষা করা হইতেছে। নদীর জলধারা বলপূর্ব্বক নির্দ্দিষ্ট পথে চালিত করা হইতেছে। তাহা ছাড়া বিভিন্ন স্থানে জলসেচনের জন্য নদীর জল সেচপ্রণালী দ্বারা পর্য্যাপ্ত পরিমাণে ব্যবহার করিয়া নদীর জল বাহনের ক্ষমতা হ্রাস করিয়া ফেলা হইয়াছে। এই ভাবে বহু বৎসর ধরিয়া নদীর স্বাধীনতা ও স্বাধীন রাজ্যে হস্তক্ষেপ করায় নদীগুলি দুর্ব্বল হইয়া পড়িয়াছে এবং বিভিন্ন অঞ্চলে দেশের পক্ষে অনর্থের কারণ ও সম্পূর্ণ অনুপযোগী হইয়া পড়িয়াছে।

প্রাকৃতিক কারণে নদীর বৃহত্তর গতি পরিবর্ত্তনের জন্য বঙ্গ-দেশে যে সমস্ত অঞ্চল ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে তন্মধ্যে উত্তর-বঙ্গ, মধ্য-বঙ্গ এবং ময়মনসিং ও ঢাকা জেলার বিভিন্ন অঞ্চল উল্লেখ-যোগ্য।

১৭৬৪ হইতে ১৭৭৭ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে সার্ভে করিয়া রেনেল (Rennel) বাংলাদেশের যে মানচিত্র প্রস্তুত করিয়াছেন তাহাই বাংলাদেশের সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীন নির্ভরযোগ্য মান-চিত্র। এই মানচিত্রে দেখা যায় তিস্তা উত্তর-বঙ্গের ভিতর দিয়া করতোয়া, আত্রেয়ী, পূর্ণভবা প্রভৃতি বিভিন্ন শাখায় প্রবাহিত হইয়া নিম্নদেশে মহানন্দা নদীতে পতিত হইয়াছে। অতঃপর একত্রে হুরাসাগর নাম ধারণ করিয়া বর্ত্তমান গঙ্গা-যমুনার সঙ্গমস্থলের অনতিদূরে জাফরগঞ্জ নামক স্থানে গঙ্গার সহিত

মিলিত হইয়াছে। অতি প্রাচীনকালে উত্তর-বঙ্গের এই নদী-শ্রেণী সম্ভবতঃ বর্ত্তমান ধলেশ্বরী-বুড়ীগঙ্গাপথে প্রবাহিত হইয়া বঙ্গোপসাগরে মিলিত হইত। হুরাসাগর অদ্যাবধি রহিয়াছে তবে বর্ত্তমানে উহা বরাল (গঙ্গানদীর একটি প্রবাহিকা), যমুনেশ্বরী, আত্রেয়ী এবং করতোয়া নদীর নির্গমন প্রণালী এবং গঙ্গা নদীতে মিলিত না হইয়া বর্ত্তমান গোয়ালন্দ হইতে কয়েক মাইল উপরে যমুনা নদীতে মিলিত হইতেছে। পূর্ণভবা বর্ত্তমানেও মহানন্দায় পড়িতেছে এবং মহানন্দা গোদাগাড়ি নামক স্থানে গঙ্গার সহিত মিলিত হইতেছে। মহানন্দা বর্ত্তমানে উত্তর-বঙ্গের সর্ব্বাপেক্ষা পশ্চিমে অবস্থিত নদী। প্রাচীনকালে তিস্তা নদী ও তাহার বিভিন্ন শাখা প্রবাহিকা সহযোগে উত্তর-বঙ্গ গড়িয়া উঠিয়াছিল এবং স্বাস্থ্য ও সমৃদ্ধিশালী হইয়াছিল। ইহা ছাড়া কোশী নদী যাহা বর্ত্তমানে ভাগলপুরের সন্নিকটে গঙ্গার সহিত মিলিত হইতেছে তাহাও প্রাচীনকালে উত্তর-বঙ্গের ভিতর দিয়া প্রবাহিত হইয়া পূর্ব্ববর্ণিত তিস্তামণ্ডলীর সহিত মিলিত হইয়াছিল। অতএব কোশী নদীও উত্তর-বঙ্গের দক্ষিণাঞ্চল গঠনে যথেষ্ট সহায়তা করিয়াছে। ইহা ছাড়া অতি প্রাচীন কালে ময়মনসিংহ জেলার ভিতর দিয়া প্রবাহিত হইবার পূর্ব্বে ব্রহ্মপুত্র নদীও সম্ভবতঃ উত্তর-বঙ্গের ভিতর দিয়া প্রবাহিত হইত। ষোড়শ শতাব্দীর প্রথম ভাগ হইতে গঙ্গানদী পদ্মা নদীর ভিতর দিয়া প্রবাহিত হইতে থাকে। তদবধি পদ্মানদী উত্তর-বঙ্গের দক্ষিণাঞ্চল উন্নত করিতেছে।

বাংলা ১১৯৪ সালে (১৭৮৭ খ্রীষ্টাব্দে) তিস্তা নদীতে এক প্রবল বন্যা হইয়া বহু স্থানের বিশেষতঃ রংপুর জেলার ভীষণ ক্ষতি সাধন করে। সেই সময়ে তিস্তানদী হঠাৎ পূর্ব্ব পথ পরিত্যাগ করিয়া তাহার এক প্রাচীন পরিত্যক্ত পথে দক্ষিণ-পূর্ব্বদিকে প্রবাহিত হইয়া বাহাদুরাবাদের নিকট ব্রহ্মপুত্রের সহিত মিলিত হয়। তিস্তার এই দিকপরিবর্ত্তনের ফলে তাহার শাখা-প্রশাখা ও অন্যান্য প্রবাহিকাগুলি (spill-channels) ক্রমশঃ দুর্ব্বল হইয়া পড়ে। হিমালয় হইতে তিস্তা নদীবাহিত পলিমৃত্তিকা হইতে ইহারা বঞ্চিত হইতে থাকে। এই সব অতি প্রয়োজনীয় পলিমৃত্তিকা তিস্তানদীপথে যমুনায় আসিয়া বৃথা নষ্ট হইয়া যাইতেছে এবং যমুনার দুকূল ও পার্শ্ববর্ত্তী অঞ্চলের মৃত্তিকার ক্রমশঃ ক্ষয় সাধন (erosion) করিতেছে। তিস্তানদীর জলধারা যমুনানদীর উত্তরপার্শ্বে প্লাবনের প্রখরতা বৃদ্ধি করিতেছে। পার্ব্বত্য অঞ্চলের প্রবাহের চাপের অভাবে তিস্তার শাখা প্রবাহিকাগুলি গঙ্গা বা যমুনার সহিত সঙ্গমস্থলে এই নদীদ্বয়ের জলপ্রবাহের চাপের ফলে পলিমৃত্তিকা দ্বারা ক্রমশঃ ভরাট হইয়া যাইতেছে এবং জল নিকাশনের পক্ষে অনুপযোগী হইয়া পড়িতেছে। এই সমস্ত কারণে কালক্রমে উর্ব্বর সমৃদ্ধিশালী উত্তর-বঙ্গ অনুর্ব্বর স্বাস্থ্যসমৃদ্ধিহীন হইয়া পড়িয়াছে। চলন বিল এবং ইহার চতুষ্পার্শ্বস্থ স্থান অতি নীচু; তিস্তা সরিয়া গেলে উপরের পলিমৃত্তিকা হইতে বঞ্চিত হইয়া সম্ভবতঃ এই নীচু অঞ্চলের সৃষ্টি হইয়াছে। বর্ষাকালে এই অঞ্চলের অবস্থা অত্যন্ত শোচনীয় হইয়া দাঁড়ায়। সমস্ত স্থান জলে প্লাবিত হইয়া যায় এবং বহু দিন ধরিয়া জল আবদ্ধ থাকিয়া কৃষি ও স্বাস্থ্যের সমূহ অনর্থ ঘটায়। আবদ্ধ ও পচা জল মশার উৎপত্তিস্থল; কাজেই ম্যালেরিয়ার প্রকোপ এই অঞ্চলে খুব বেশী। শীতকালে এবং অন্য শুষ্কঋতুতে এই অঞ্চলের জল শুকাইয়া যায় এবং ভূগর্ভে বহুদূর পর্য্যন্ত খনন করিয়াও জলের সাক্ষাৎ পাওয়া যায় না। ভূগর্ভের এত নীচে জল চলিয়া যায় কেন তাহা ভাবিবার বিষয় এবং এ বিষয়ে ব্যাপক গবেষণার প্রয়োজন।

যাহা হউক, এই অঞ্চলের তথা উত্তর-বঙ্গের স্বাস্থ্য ও উর্ব্বরতা ফিরাইয়া আনিতে হইলে এই নদীগুলিকে পুনরুজ্জীবিত করা দরকার। তিস্তার জলধারা পূর্ব্বের পথে প্রেরণ করিতে পারিলে সমস্যার অনেকাংশে সমাধান হইবে। সম্প্রতি জলপাইগুড়ির নিকটে তিস্তানদীতে জলপ্রবাহরোধক বাঁধ (barrage) বাঁধিয়া এবং হিমালয়ের সন্নিকটে জলাধার (reservoir dam) নির্ম্মাণ করিয়া জলপ্রবাহ প্রয়োজনমত নিয়ন্ত্রণ করিয়া এই সমস্যা সমাধানের পরিকল্পনা চলিতেছে। ইহাতে উদ-বিদ্যুৎ (hydro-electricity) পাওয়া যাইবে। এই পরিকল্পনা কার্য্যকরী হইলে সকল লাভের সম্ভাবনা আছে।

ব্রহ্মপুত্র প্রথমে একটি ক্ষুদ্র নদী ছিল; পরে ডিহাং নদী দ্বারা তিব্বতের সানপো নদীর সঙ্গে যুক্ত হইয়া আকারে ও আয়তনে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়। অতীতে ব্রহ্মপুত্রের প্রধান শাখা ময়মনসিংহের ভিতর দিয়া প্রবাহিত হইত। বর্ত্তমান যমুনা তখন একটি ক্ষুদ্র নদী ছিল। ১৭৮৭ খ্রীষ্টাব্দে তিস্তানদী ব্রহ্মপুত্রের সহিত মিলিত হইলে ব্রহ্মপুত্রের পক্ষে সমস্ত জল ধারণ করা অসম্ভব হইয়া পড়ে। কাজেই উক্ত ধীরে ধীরে বর্ত্তমান যমুনার ভিতর দিয়া পথ করিয়া লয়। বর্ত্তমানে ইহা খুবই বড় এবং শক্তিশালী নদী। ইহার দৈর্ঘ্য প্রায় ১৮৪০ মাইল এবং ইহার অববাহিকার আয়তন প্রায় ৩৬১০০০ বর্গমাইল। বর্ত্তমানে গোয়ালন্দে গঙ্গা ও যমুনা বা ব্রহ্মপুত্র মিলিত হইয়াছে। ব্রহ্মপুত্র নদী বর্ত্তমানে গঙ্গার প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বী এবং গঙ্গার জলপ্রবাহকে প্রবলভাবে বাধাপ্রদান করিতেছে।

ব্রহ্মপুত্র নদীর এই দিকপরিবর্ত্তনের ফলে প্রাচীন অর্থাৎ ময়মনসিংহ জেলায় প্রবাহিত ব্রহ্মপুত্র নদীর অবস্থা অত্যন্ত শোচনীয় হইয়া পড়িয়াছে। বর্ষাকালে পূর্ব্বে ইহা যে পরিমাণ জল বহন করিতে পারিত বর্ত্তমানে তাহার তুলনায় অনেক কম পরিমাণ জল বহন করিতে পারে এবং অন্য সময়ে ইহা উর্দ্ধতন শাখা হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া যায় ও প্রায় শুষ্ক হইয়া পড়ে। ময়মনসিংহ ও ঢাকা জেলার পূর্ব্বাংশ এই নদীর অবদান; ইহার দ্বারাই এই সমস্ত অঞ্চল বর্দ্ধিত ও উর্ব্বর হইয়াছিল। বর্ত্তমানে নদীর এই শোচনীয় অবস্থার ফলে এই সমস্ত অঞ্চলের জল ভাল

ভাবে নিষ্কাশিত হয় না এবং উর্ব্বর পলিমৃত্তিকার অভাবে এই সমস্ত অঞ্চল ক্রমশঃ অনুর্ব্বর ও স্বাস্থ্যহীন হইয়া পড়িতেছে। নদীটিকে পূর্ব্বের অবস্থায় ফিরাইয়া আনা একরকম অসম্ভব ব্যাপার বলিলেই চলে। তথাপি এই নদীর সংস্কারসাধন এবং সংশ্লিষ্ট পরিবাহক প্রণালীগুলির (drainage) উন্নতি-সাধন সম্ভবপর, তাহাতেও এই অঞ্চলের অধঃপতিত কৃষি ও ম্যালেরিয়াপ্রপীড়িত জনস্বাস্থ্যের অনেক উন্নতি সাধিত হইবে। সম্প্রতি ব্রহ্মপুত্র ও যমুনার বিয়োগ স্থানের নিম্নদেশে অদূরে জলপ্রবাহরোধার্থ বাঁধ বাঁধিয়া জল নিয়ন্ত্রণ করিয়া ময়মন-সিংহে ব্রহ্মপুত্র ও তাহার প্রবাহিকাগুলির উৎকর্ষ সাধনের পরিকল্পনা চলিতেছে। জনস্বার্থের প্রয়োজনে পরিকল্পনা আশু কার্য্যকরী হওয়া প্রয়োজন।

মধ্যবঙ্গ—পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষভাগ পর্য্যন্ত ভাগীরথী নদী গঙ্গার প্রধান শাখা ছিল; অতঃপর যখন গঙ্গা পদ্মাকে প্রধান শাখা হিসাবে গ্রহণ করে তখন হইতে ভাগীরথী ক্রমশঃ ক্ষীণ হইতে থাকে। নিম্নদেশে হুগলী হইতে কয়েক মাইল উপরে ত্রিবেণী নামক স্থানে ভাগীরথী তিনটি শাখায় বিভক্ত হইয়াছিল। পশ্চিমদিকের শাখার নাম সরস্বতী, পূর্ব্বদিকের শাখার নাম যমুনা এবং দক্ষিণে ভাগীরথী উহা নিম্নদেশে হুগলী নাম ধারণ করিয়াছে। পদ্মার পথে গঙ্গার গতি পরিবর্ত্তনের পূর্ব্বে এই সব নদী সজীব ছিল; কিন্তু গঙ্গা যখন তাহাদিগকে পরিত্যাগ করিল তখন হইতে তাহারা ক্রমশঃ ক্ষীণ হইতে থাকে। সরস্বতী এবং যমুনা অধুনা মৃতা। ভাগীরথীও বর্ষাকাল ছাড়া অন্যসময়ে প্রায় জলশূন্য হইয়া পড়ে। নিম্নদেশে ভাগীরথী কতকটা সজীব রহিয়াছে। তাহার কারণ পশ্চিম বঙ্গের কতক-গুলি নদী ইহার সহিত মিলিত হইয়াছে এবং সমুদ্রের জোয়ার-ভাটা নিম্নদেশে প্রতিদিন প্রবাহিত হয়। ভৈরব নদীও তৎকালে গঙ্গার একটি প্রধান শাখা ছিল কিন্তু গঙ্গার দিক্ পরিবর্ত্তনের ফলে উহাও বর্ত্তমানে মৃতপ্রায়; বর্ত্তমানে উহা মধ্যপথে যথাক্রমে জলাঙ্গী এবং মাথাভাঙ্গা নদীদ্বারা কর্ত্তিত হইয়াছে। উল্লিখিত নদীগুলি ও তাহাদের বহু প্রবাহিকা যথা কোবা-ডাক, চিত্রা, নবগঙ্গা, বেতনা, কোদলা ইত্যাদি যাহা দ্বারা সমস্ত মধ্য-বাংলায় অতীতে জল ও পলিমৃত্তিকা সরবরাহ হইত সেগুলিও বর্ত্তমানে পূর্ব্বোক্ত কারণে নিষ্ক্রিয় ও মৃতপ্রায়।

গঙ্গা এবং তাহার এই সমস্ত শাখা-প্রবাহিকাপথে প্রবাহিত পলিমৃত্তিকা দ্বারাই অতীতে মধ্য-বাংলা গড়িয়া উঠিয়াছে। উহারাই তৎকালে এই অঞ্চল উর্ব্বর কৃষি-উপযোগী, বাসোপযোগী এবং সমৃদ্ধিশালী করিয়া তুলিয়াছিল। কিন্তু গঙ্গা দিক পরিবর্ত্তনের ফলে ইহারা যখন ক্রমশঃ মৃতপ্রায় হইয়া পড়ে তখন এ অঞ্চলে ব্যাপক সঙ্কট দেখা দেয়। জল নিষ্কাশনের পথ রুদ্ধ হওয়ায় জল আবদ্ধ হইয়া পচিয়া মশার উৎপত্তিস্থল হইয়া উঠে এবং কালক্রমে এই অঞ্চল ম্যালেরিয়ার আবাসভূমিতে পরিণত হইয়াছে। জনস্বাস্থ্য ক্রমশঃ শোচনীয় হইয়া উঠিয়াছে, জমি উর্ব্বরতা হারাইয়া ফেলিয়াছে, ফলে কৃষির অবস্থাও শোচনীয়।

এই নদীগুলি নিম্নদেশে সাগরসঙ্গমে জোয়ার-ভাটা বিশিষ্ট। প্রতিদিন এই নদীসমূহের নিম্ন অংশগুলিতে জোয়ার-ভাটা চলে। সমুদ্রে চন্দ্র-সূর্য্যের আকর্ষণের ফলে জোয়ারের উৎপত্তি। জোয়ারের সময় প্রবলবেগে জল নদীনালা পথে ঊর্দ্ধমুখে ধাবিত হয় এবং দুকূল প্লাবিত করিয়া জলবাহিত পলিমৃত্তিকা পার্শ্ববর্ত্তী অঞ্চলে ছড়াইয়া দেয়। অতঃপর পলিবিচ্যুত পরিস্রুত জল ভাটার সময় নদীগর্ভে পতিত পলিমৃত্তিকা কুড়াইয়া লইয়া সাগরে ফিরিয়া আসে। কিন্তু ভাটার সময় জলের বেগ অনেক প্রশমিত হওয়ায় নদীতলদেশ সম্পূর্ণ পলিশূন্য হইতে পারে না, কাজেই আস্তে আস্তে উহা ভরাট হইয়া উঠে এবং কালক্রমে সম্পূর্ণ ভরাট হইয়া যায়; জোয়ার-ভাটাও সে পথে চিরতরে বন্ধ হইয়া যায়। যেহেতু দেশ গঠন, উন্নত, উর্ব্বর ও বাসোপ-যোগী করার জন্য জোয়ার-ভাটা একান্ত প্রয়োজনীয়, কাজেই উহা বন্ধ হওয়া দেশের পক্ষে সমূহ ক্ষতির কারণ। নিম্নবঙ্গে অনেক স্থানে মানুষ প্রয়োজনের তাগিদে অথবা লোভ ও স্বার্থের বশে নদীর দুই ধারে বাঁধ বাঁধিয়া জঙ্গল পরিষ্কার করিয়া জমিগুলিকে কৃষিকার্য্যের জন্য ব্যবহার করিতেছে কিন্তু এই বাঁধ বাঁধার ফলে নদীগুলি দ্রুতগতিতে ভরাট হইয়া যাইতেছে, কারণ জোয়ার-বাহিত পলিমৃত্তিকা বাহিরে যাইতে না পারিয়া নদীর তলদেশেই সঞ্চিত হইতেছে। এই ভাবে দীর্ঘদিন চলিলে দেশের অশেষ অকল্যাণ ঘটিবে। সুতরাং জোয়ার-ভাটাকে কিছুতেই বন্ধ হইতে দেওয়া চলিবে না—ইহাকে চালু রাখিতে হইবে।

ভাটার সময় জলের বেগ বর্দ্ধিত করিয়া দিতে পারিলে এই সমস্যার সমাধান হয়; কারণ তাহা হইলে উহা নদীর তলদেশ সম্পূর্ণ পলিশূন্য করিয়া ফিরিতে পারিবে এবং নদী ভরাট হইয়া উঠিবে না। নদীর ঊর্দ্ধতন প্রদেশ হইতে বাহিত জলধারা ভাটার বেগ বর্দ্ধিত করে। নদীতে সমস্ত বৎসর পর্য্যাপ্ত জল-প্রবাহ থাকিলে সারা বৎসরই ভাটা বেগবান্ ও সক্রিয় থাকে। গঙ্গা পদ্মার পথে প্রবাহিত হওয়ায় মধ্য-বাংলার এই সমস্ত নদী ও প্রবাহিকাগুলি শুষ্ক ঋতুতে গঙ্গার জলপ্রবাহ হইতে বঞ্চিত হইতেছে। ফলে জোয়ারের লবণাক্ত জল ঊর্দ্ধদেশে বহু দূর পর্য্যন্ত অগ্রসর হইতেছে এবং নদীগুলি নিম্ন দেশে ক্রমশঃ ভরাট হইয়া উঠিতেছে; প্রয়োজনানুরূপ ধৌত হওয়ার অভাবে মৃত্তিকা ক্রমশঃ লবণাক্ত হইতেছে, তাহাতে কৃষিকার্য্যের অত্যন্ত ক্ষতি হইতেছে। এই জোয়ার-ভাটাবিশিষ্ট নদীগুলি দেশের নৌচলাচলের পক্ষে বিশেষ উপযোগী এবং প্রয়োজনীয়, কাজেই এইগুলি নষ্ট হইয়া যাওয়া নৌচলাচলের পক্ষেও বিশেষ ক্ষতিকর।

গঙ্গা নদীর দিক্‌পরিবর্ত্তনের ফলে যে সুদূরপ্রসারী

সমস্তার উদ্ভব হইয়াছে তাহার সমাধান অত্যন্ত জটিল। সম্প্রতি একটু আশার আলো দেখা যাইতেছে। মাথাভাঙা, জালাঙ্গী ও ভাগীরথী অধুনা মধ্য-বাংলায় গঙ্গার প্রধান শাখা নদী। গঙ্গার জলপ্রবাহ বর্ত্তমানে গোয়ালন্দে যমুনার জলপ্রবাহ কর্ত্তৃক প্রবল বেগে বাধাপ্রাপ্ত হইয়া এই সব শাখা-প্রবাহিকা পথে পুনরায় নির্গমনের চেষ্টা করিতেছে। ইতিমধ্যে গড়াই নদী শুষ্ক, শীর্ণ প্রবাহ হইতে বৃহদাকার নদীতে পরিণত হইয়াছে এবং নৌচলাচলের উপযোগী হইয়াছে। মাথাভাঙা নদীর উৎপত্তিস্থলে যে বিরাট চর ছিল তাহা প্রায় লুপ্ত হইয়া গিয়াছে এবং নদীটি ক্রমশঃ সজীব হইয়া উঠিতেছে। ভাগীরথী ও জালাঙ্গীর উৎপত্তি স্থলও ক্রমশঃ উৎকর্ষ লাভ করিতেছে।

প্রকৃতির এই সাহায্যের উপর নির্ভর করিয়া থাকিলে আশু ফললাভের সম্ভাবনা নাই। তাহার এই সাহায্য কাজে লাগাইয়া অর্থ ও বিজ্ঞান প্রয়োগে এই সমস্ত শাখা-প্রবাহিকা-পথে গঙ্গার জলধারা প্রয়োজনানুরূপ প্রেরণ করিয়া উহাদের উৎকর্ষ সাধন করা প্রয়োজন; নতুবা অচিরেই এই প্রাচীন সভ্যতার লীলাভূমি বনজঙ্গল ও জলাভূমিতে পরিণত হইয়া মনুষ্যবাসের সম্পূর্ণ অনুপযোগী হইয়া উঠিবে।

ইদানীং গোদাগাড়ীর নিকটে জলপ্রবাহ রোধার্থ বাঁধ (barrage) বাঁধিয়া একটি নির্দ্দিষ্ট নালাপথে গঙ্গার জলধারা নিয়ন্ত্রণ করিয়া মধ্য-বাংলার নদী ও প্রবাহিকাগুলির উৎকর্ষ-সাধনের পরিকল্পনা চলিতেছে। পূর্ব্বেও এই ধরণের পরিকল্পনা হইয়াছিল। স্যর উইলিয়ম উইলকক্স প্রমুখ ইঞ্জিনীয়ার বহুদিন পূর্ব্বে এই ধরণের পরিকল্পনা প্রস্তুত করিয়াছিলেন। এই ধরণের পরিকল্পনা কার্য্যকরী করিতে বহু অর্থ ও ধৈর্য্যের প্রয়োজন। ইহাতে যে মঙ্গললাভ ঘটিবে তাহা অর্থব্যয়ের তুলনায় সাময়িকভাবে অতি অল্প হইলেও ভবিষ্যতে মধ্য-বাংলায় ইহার সুদূরপ্রসারী সুফললাভ ঘটিবে। নদীগুলি উৎকর্ষ ও সজীবতা লাভ করিলে জোয়ারের লবণাক্ত জল ক্রমশঃ নীচে সরিতে থাকিবে এবং অধিকতর ক্ষেত্র কৃষি-উপযোগী হইবে। বিল প্রভৃতি নীচু জমিতে পূর্ব্ববঙ্গের ন্যায় দীর্ঘ ধানগাছ অথবা অনুরূপ শস্য বপন করিলে এবং বাড়ীঘর উঁচু ভিটিতে নির্ম্মাণ করিলে বর্ষাকালে সাধারণ প্লাবনে শস্য ও ঘরবাড়ীর ক্ষতি হইবে না। এই ভাবে সকলে সমভাবে নিঃস্বার্থভাবে মনোনিবেশ ও সহযোগিতা করিলে মধ্য-বাংলায় স্বাস্থ্য ও সমৃদ্ধি আবার ফিরিয়া আসিবে।

পশ্চিম বঙ্গ—পশ্চিম বঙ্গের নদীগুলির কোনটিরই অববাহিকার আয়তন খুব বেশী নহে। এই নদীগুলির মধ্যে দামোদর নদীই সর্ব্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য। ইহার অববাহিকার আয়তন প্রায় ৭২০০ বর্গমাইল। এই নদীগুলির অববাহিকার সর্ব্বত্র একসঙ্গে সমান বৃষ্টিপাত হয়। ফলে মৌসুমী ঋতুতে কয়েকদিন ক্রমাগত সমান বৃষ্টিপাত হইলেই নদীগুলিতে প্লাবন দেখা দেয়। আবার যখন বৃষ্টি থামিয়া যায় তখন সর্ব্বত্র একই সঙ্গে থামে, কাজেই প্লাবনও তিন-চার দিনের বেশী স্থায়ী হয় না। প্লাবন কমিয়া গেলে নদীগুলি সঙ্কুচিত হইয়া পড়ে এবং এমন কি বর্ষাকালেও অনেক সময় ক্ষুদ্র ধারায় পরিণত হয়। শুষ্ক ঋতুতে নদীগুলি প্রায় শুকাইয়া যায়। এই নদীগুলির অববাহিকা ভারতের প্রাচীন ভূখণ্ডের অন্যতম। হাজার হাজার বৎসর ধরিয়া বৃষ্টির জলে ধৌত হওয়ায় পার্ব্বত্য অঞ্চলে মৃত্তিকা অনেক পরিমাণে ক্ষয় হইয়া গিয়াছে; ফলে উহার জল শোষণ করিয়া সঞ্চিত করিয়া রাখিবার ক্ষমতা অনেক হ্রাস পাইয়াছে। তাহা ছাড়া পার্ব্বত্য অঞ্চলে বনজঙ্গল ও তৃণভূমি অনেক পরিমাণে কর্ত্তিত হওয়ায় ভূমি অনাবৃত হইয়া পড়িয়াছে। এই সমস্ত কারণে পশ্চিম বঙ্গের নদীগুলি মৌসুমী কালে খরস্রোতা এবং শুষ্ক ঋতুতে প্রায় জলশূন্য ক্ষুদ্রধারায় পরিণত হয়।

পশ্চিম বঙ্গের পূর্ব্বাংশ ব-দ্বীপাকার এবং এই সমস্ত নদী (বিশেষতঃ মেদিনীপুর জেলায় কাঁসাই নদী এবং বর্দ্ধমান জেলায় দামোদর এবং অজয় নদী) বাহিত পলি-মৃত্তিকাদ্বারাই এই ভূখণ্ড গড়িয়া উঠিয়াছে। কিন্তু মানুষ নদীগুলিকে তাহাদের কার্য্যসমাধানের পূর্ণ সময় দেয় নাই; ভূমিগুলি যথোপযুক্ত উন্নত ও উর্ব্বর হওয়ার পূর্ব্বেই তাহারা নদীকূলে বাঁধ (embankment) বাঁধিয়া জমিগুলি চাষ-আবাদ এবং বসবাসের কার্য্যে লাগাইতে আরম্ভ করে। ব্রিটিশ অধিকারের পূর্ব্বেই এই অবিমৃষ্য কার্য্যের সূচনা। তৎকালে জমিদারগণ এই সমস্ত বাঁধ যথোপযুক্ত ভাবে রক্ষা করার কোনই চেষ্টা করিতেন না। ফলে মধ্যে মধ্যে বাঁধ ভাঙিয়া প্লাবন ঘটিত, ইহাতেও সুফল লাভ হইত। কারণ মধ্যে মধ্যে নদী-বাহিত পলিমৃত্তিকা পাইয়া জমি উর্ব্বর এবং উন্নত হইয়া উঠিত।

কালক্রমে ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্ট বাঁধরক্ষার কার্য্য স্বহস্তে গ্রহণ করেন এবং খুবই যোগ্যতার সহিত বাঁধ রক্ষা করিতে থাকেন। তখন ভাঙন আর ঘটিত না বলিলেই চলে; যদিও কদাচিৎ ঘটিত, সঙ্গে সঙ্গে তাহা বন্ধ করিয়া দেওয়া হইত; ফলে জমিগুলি মাঝে মাঝে যে উর্ব্বর পলিমৃত্তিকা পাইত তাহা হইতেও বঞ্চিত হইয়া ক্রমশঃ উর্ব্বরতা হারাইতে লাগিল। এদিকে নদীবাহিত পলিমৃত্তিকা নদীগর্ভে সঞ্চিত হওয়াতে নদীগর্ভও ক্রমশঃ উঁচু হইতে লাগিল; ফলে প্লাবন রক্ষা করিবার জন্য পার্শ্ববর্ত্তী বাঁধসমূহও উত্তরোত্তর উঁচু করিতে হইল। এইভাবে কালক্রমে কোন কোন স্থানে বাঁধের উচ্চতা ২০ ফুট পর্য্যন্ত হইয়াছে। কিন্তু কতদিন এইভাবে বাঁধ উঁচু করিয়া বন্যা রোধ করা সম্ভবপর? অতি উঁচু বাঁধ তৈয়ারী করা এবং রক্ষা করা ব্যয়সাধ্য ও কঠিন ব্যাপার; কোনক্রমে তথায় ভাঙন ঘটিলে ভয়াবহ বেগে নদীর জল গ্রামে প্রান্তরে প্রবেশ করিয়া দেশের ভীষণ অনর্থ ঘটায়। প্রকৃতপক্ষে বাঁধ
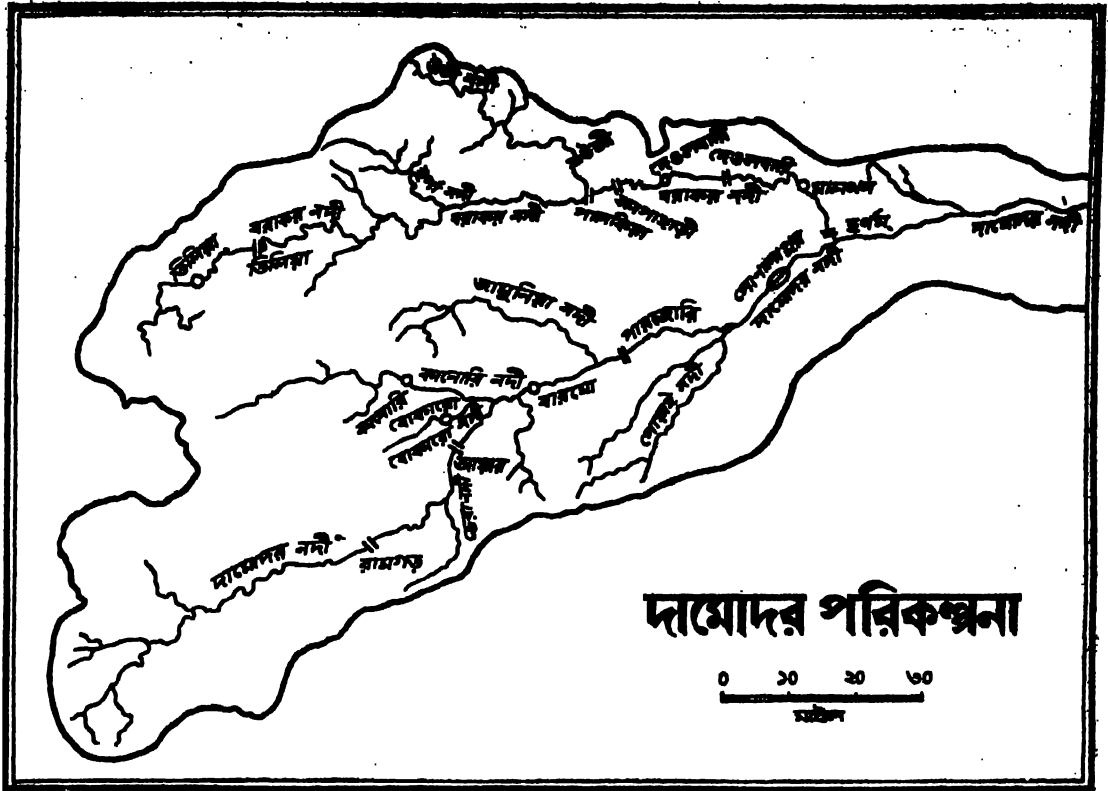
কখনও বন্যার স্থায়ী প্রতিরোধক নহে, ইহা শুধু সাময়িক প্রতিকার মাত্র এবং ভবিষ্যতে মানুষের অশেষ দুঃখের কারণ হয়। অতীতে পশ্চিম বঙ্গ স্বাস্থ্য ও সমৃদ্ধিশালী ছিল। বর্ত্তমানে যে কৃষি, স্বাস্থ্য ও নদীসমস্যা দেখা দিয়াছে তাহা প্রধানতঃ এই বাঁধগুলির জন্য। অতীতের পূর্ব্বপুরুষদের অবিমৃষ্য কার্য্যের দুর্ভোগ বর্ত্তমান পুরুষকে ভোগ করিতে হইতেছে।

বাঁধের ফলে নদীগর্ভ ক্রমশঃ উঁচু হইয়া উঠিতেছে এবং কোন কোন স্থলে পার্শ্ববর্ত্তী অঞ্চল হইতেও উঁচু হইয়া পড়িতেছে, কারণ আস্তে আস্তে বৃষ্টির জলে ক্ষয় হইয়া পার্শ্ববর্ত্তী জমিগুলি নীচু হইতেছে। প্রধান নদীর সহিত সংশ্লিষ্ট প্রবাহিকাগুলিও নদী হইতে নিয়মিত প্রয়োজনীয় জল সরবরাহের অভাবে মৃতপ্রায় হইয়া পড়িয়াছে এবং বৃষ্টির জল নিষ্কাশনের সম্পূর্ণ অনুপযোগী হইয়াছে। স্থানে স্থানে নদীগর্ভ পার্শ্ববর্ত্তী অঞ্চল হইতে উঁচু হইয়া পড়ায় খাল কাটিয়া নদীতে সেই সমস্ত অঞ্চলের জল নিষ্কাশন সম্পূর্ণ অসম্ভব হইয়া পড়িয়াছে। ফলে জল বহুদিন আবদ্ধ থাকায় এই সমস্ত অঞ্চল ভয়াবহ ম্যালেরিয়ার আবাসভূমি হইয়া উঠিয়াছে। নদীগুলি পূর্ব্বে অনেক দূর পর্য্যন্ত নাব্য ছিল। অধুনা বর্ষাকালে খরস্রোতা ও অন্য সময়ে শুষ্ক থাকায় নৌচলাচলের সম্পূর্ণ অনুপযোগী হইয়া পড়িয়াছে। তাহা ছাড়া বর্ষাকাল ব্যতীত অন্য সময়ে ঊর্দ্ধতন প্রদেশ হইতে যথোপযুক্ত জলের চাপের অভাবে দামোদর নদী সঙ্গমস্থলে প্রতিদিন জোয়ার বাহিত পলিমৃত্তিকা দ্বারা ক্রমশঃ ভরাট হইয়া উঠিতেছে। অন্যান্য নদীগুলিও ভাগীরথীর সহিত মিলনস্থলে (ভাগীরথীর প্রবাহের পার্শ্বচাপের ফলে) পলিমৃত্তিকাদ্বারা ক্রমশঃ ভরাট হইয়া উঠিতেছে। এইভাবে নদীগুলি মৃতপ্রায় হইয়া পড়িতেছে এবং ইহাদিগকে রক্ষা করা ও কার্য্যকর করিয়া তোলা জটিল সমস্যা হইয়া দাঁড়াইয়াছে।

সুখের বিষয় এই যে আধুনিক বিজ্ঞান এই জটিল সমস্যারও সমাধান করিতে সমর্থ হইয়াছে। সোভিয়েট রাশিয়া এবং আমেরিকায় এই ধরণের নদীসমস্যা রাষ্ট্রের প্রচেষ্টায় এবং বিজ্ঞানের প্রয়োগে চিরতরে দূরীভূত হইয়াছে। আমেরিকায় টেনেসী নদী পশ্চিম বঙ্গের নদীগুলির অনুরূপ, কয়েকদিন প্লাবনের পর নদী মাত্র ২।৩ ফুট গভীর জলে পরিণত হইত। শুষ্ক ঋতুতে প্রায় জলশূন্য হইয়া পড়িত এবং নৌচলাচলের সম্পূর্ণ অনুপযোগী হইয়া যাইত। বর্ত্তমান শতাব্দীর প্রথম হইতে এই নদীর সমস্যা সমাধানের প্রচেষ্টা চলিতেছিল। যে সব রাষ্ট্রের ভিতর দিয়া নদীটি চলিয়া গিয়াছে তাহাদের পরস্পর-বিরোধী উদ্দেশ্য এবং নদী-অধিবাসীদিগের উদ্ভূত অন্যান্য বহুবিধ বিপরীত স্বার্থের সংঘাতে প্রচেষ্টা সুদীর্ঘদিন ফলবতী হয় নাই। অবশেষে প্রেসিডেন্ট রুজভেল্টের প্রভাবে সমস্ত বাধা-বিরোধ

সুর হয় এবং কেন্দ্রীয় সরকারের ষ্টেটের সমস্ত ক্ষমতা এই বিষয়ে প্রয়োগ করা সম্ভবপর হয়।*

দামোদর নদী আকারে টেনেসী নদী অপেক্ষা ছোট হইলেও উহার প্রকৃতি ও সমতা টেনেসী নদীর প্রকৃতি ও সমতার অনুরূপ। এই নদীতে সাধারণ প্লাবন ছাড়াও মধ্যে মধ্যে ভয়ানক বন্যা দেখা দেয়। ১৯১৩, ১৯৩৫ এবং সম্প্রতি ১৯৪৩ সালের সর্ব্ববিধ্বংসী বন্যা এ বিষয়ে উল্লেখযোগ্য। ১৯৪৩ সালের বন্যার পর বাংলা-সরকার কয়েকজন বৈজ্ঞানিক ও বিশেষজ্ঞ লইয়া একটি 'দামোদর বন্যা অনুসন্ধান কমিটি' (Damodar Flood Enquiry Committee) গঠন করেন। এই কমিটি অনেক অনুসন্ধান ও পর্য্যবেক্ষণের পর এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন যে টেনেসী নদীর অনুকরণে দামোদর ও তাহার শাখা বরাকর নদীর স্থানে স্থানে কতকগুলি তোয়াধার (reservoir dams) ও নদীর নিম্নদেশে কতকগুলি জলপ্রবাহরোধার্থ বাঁধ (barrage) নির্ম্মাণ করিলে দামোদর নদীকে আয়ত্তে আনা সম্ভবপর। তাঁহারা তোয়াধার নির্ম্মাণের স্থানও নির্দ্দেশ করিয়া দিয়াছেন। (তোয়াধারগুলির অবস্থান সংশ্লিষ্ট ম্যাপে দেখান হইল। চিহ্নিত)। নিম্নলিখিত স্থানগুলি তাঁহারা তোয়াধার নির্ম্মাণের জন্য অনুমোদন করিয়াছেন :--(১) পারজোরী, (২) আয়ার, (৩) রামগড়—ইহারা দামোদর নদীতীরে অবস্থিত; (৪) হর্দস, (৫) দেওলবাড়ী, (৬) পাঞ্চিয়া অথবা সন্নিকটস্থ বলপাহাড়ী, (৭) তিলিয়া—এই কয়টি বরাকর নদীর তীরে অবস্থিত; (৮) উস্রী—ইহা উস্রী নদীর তীরে অবস্থিত। ইহা ছাড়া দামোদরের অন্যান্য উপনদীতে এবং দামোদর ও বরাকরের সঙ্গমস্থান ও পারজোরীর মধ্যে আরও কতিপয় স্থানে তোয়াধার নির্ম্মাণ সম্ভবপর। এই সমস্ত তোয়াধার নির্ম্মাণ করিতে বেশ বেগ পাইতে হইবে, কারণ অনেক স্থানে নদীর তলদেশ ৫০।৬০ ফুট পর্য্যন্ত বালুপূর্ণ; শক্ত, প্রস্তরময় স্থান ও কাটলপূর্ণ। কিন্তু টেনেসী নদীতে ইহা অপেক্ষা অসুবিধাজনক স্থানেও তোয়াধার নির্ম্মাণ সম্ভবপর হইয়াছে, কাজেই দামোদর নদীতেও সম্ভবপর হইবে।

তোয়াধারগুলি অতি ধীরে ধীরে বালু ও পলিমৃত্তিকা দ্বারা পূর্ণ হইতে থাকে। তথাপি তোয়াধারগুলি ২০০ বৎসর পর্য্যন্ত অনায়াসে জীবিত থাকিবে। তাহা ছাড়া বালু ও পলি উদ্ধারের অনেক বৈজ্ঞানিক কৌশল আছে যাহা টেনেসী নদীর তোয়াধারগুলিতে ব্যবহৃত হইতেছে। তদনুরূপ ব্যবস্থা অবলম্বন করিলে তোয়াধারগুলির আয়ুষ্কাল আরও বর্দ্ধিত হইবে।

* প্রবাসী—জ্যৈষ্ঠ ও আষাঢ় ১৩৫২ সংখ্যায় শ্রীযুত কমলেশ রায় "টেনেসী নদীর কথা" শীর্ষক প্রবন্ধে এ বিষয়ে বিশদ আলোচনা করিয়াছেন।—প্রবাসীর সম্পাদক।

কমিটি হিসাব করিয়াছেন যে তাঁহাদের দামোদর পরিকল্পনা কার্য্যকরী করিতে হইলে ২৫।৩০ কোটি টাকার দরকার। পরিকল্পনা ফলবতী হইলে উৎপন্ন উদ-বিদ্যুৎ (hydro-electricity) হইতেই প্রতি বৎসর গড়ে দুই কোটি টাকা আয় হইবে; তাহা ছাড়া দেশের আরও কত যে উপকার হইবে তাহার ইয়ত্তা নাই। কাজেই প্রয়োজনীয় ব্যয় করিতে সরকারের দ্বিধাবোধ করা উচিত নহে।

সম্প্রতি সেণ্ট্রাল টেকনিক্যাল পাওয়ার বোর্ড তাঁহাদের দামোদর পরিকল্পনা প্রকাশ করিয়াছেন (Preliminary Memorandum on the unified Development of the Damodar River by the Central Technical Power Board, Printed at the Govt. of India Press, Calcutta, 1946)। এই পাওয়ার বোর্ডে টি.ভি.এ.র (টেনেসী ভ্যালি অথরিটি) বিশেষজ্ঞ ভুরডুইন (W. L. Voorduin) হাইড্রো-ইলেকট্রিক মেম্বার। তিনি এককালে টি.ভি.এ-র (T. V. A) দ্বিতীয় প্ল্যানিং অফিসার ছিলেন। এই বোর্ডের পরিকল্পনা ও অনুমোদন পূর্ব্বোক্ত 'দামোদর বন্যা অনুসন্ধান কমিটি'র পরিকল্পনারই অনুরূপ। তাঁহারা আটটি তোয়াধার এবং নদীর নিম্নদেশে একটি জলরোধার্থ বাঁধ নির্ম্মাণ অনুমোদন করিয়াছেন। (তাঁহাদের অনুমোদিত তোয়াধারগুলিও ম্যাপে দেখান হইল ০ চিহ্নিত)। তাঁহারা নিম্নলিখিত স্থানে তোয়াধার নির্ম্মাণ অনুমোদন করিয়াছেন—(১) আয়ার, (২) কোনার (কোনার নদীতে), (৩) বোকারো (বোকারো নদীতে), (৪) বার্মো, (৫) সোনালাপুর, (১), (৪), (৫) দামোদর নদীতে অবস্থিত; (৬) তিলিয়া, (৭) দেওলবাড়ী, (৮) মাইথন, এই কয়টি বরাকর নদীতে অবস্থিত। পূর্ব্বোক্ত পরিকল্পনার ন্যায় ইহাও বহুমুখী পরিকল্পনা। বন্যা নিরোধ, উদ-বিদ্যুৎ উৎপাদন, কৃষি ও নৌচলাচলের উৎকর্ষ বিধান এই পরিকল্পনাদ্বয়ের উদ্দেশ্য। এই পরিকল্পনা অথবা পূর্ব্বোক্ত পরিকল্পনা—যে কোন একটি আশু কার্য্যকরী হওয়া প্রয়োজন; তাহাতে অশেষ মঙ্গল সাধিত হইবে, দামোদর বিধ্বস্ত অঞ্চলের পূর্ব্ব সমৃদ্ধি আবার ফিরিয়া আসিবে, উদ্ভূত উদ-বিদ্যুৎ ব্যবহার করিয়া এই অঞ্চলে বহু বিরাট বিরাট শিল্প-প্রতিষ্ঠান গড়িয়া উঠিবে। তাহা ছাড়া কয়লার ব্যয় কমিয়া যাওয়ায় আমাদের এই অতি অল্প পরিমাণ জাতীয় সম্পদ ভবিষ্যতের জন্য এবং অতি প্রয়োজনীয় কার্য্যের জন্য মজুত থাকিবে, ম্যালেরিয়া চিরতরে বিদায় লইতে বাধ্য হইবে, বন্যা চিরতরে দূরীভূত হইবে, কৃষির বিপুল উন্নতি সাধিত হইবে, জমিসমূহের উর্ব্বরতা ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইবে, নদী বহু দূর পর্য্যন্ত সুনাব্য হইয়া ব্যবসা-বাণিজ্যের অশেষ কল্যাণ সাধন করিবে।

'টেনেসী ভ্যালী অথরিটি'র অনুকরণে 'দামোদর ভ্যালি অথরিটি' গঠিত হওয়া প্রয়োজন। তাহারই উপরে সমস্ত ভার

ন্যস্ত করিলে অল্প সময়ে এবং সহজেই পরিকল্পনা কার্য্যকরী হইবে।

পূর্ব্ব বঙ্গ—পূর্ব্ব বঙ্গের নদীগুলির মধ্যে ব্রহ্মপুত্র এবং মেঘনাই প্রধান। ব্রহ্মপুত্রের কথা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে। মেঘনা নদীর বিশেষ কোন পরিবর্ত্তন হয় নাই। এই নদীটির জলধারণের ক্ষমতা খুবই বেশী এবং বর্ষাকালে প্রবল বন্যাতেও ইহার জলের উচ্চতা খুব বেশী হয় না। শুষ্ক ঋতুতেও ইহা জলভরা থাকে, কাজেই সারা বৎসরই ইহা নৌ-চলাচলের উপযোগী। বস্তুতঃ ভারতবর্ষের নদীগুলির মধ্যে ইহাই সর্ব্বোৎকৃষ্ট নদী। ইহার অববাহিকার চেরাপুঞ্জী অবস্থিত, তথায় পৃথিবীর মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক বৃষ্টিপাত হয়। সুতরাং মেঘনা-বাহিত জলের পরিমাণ খুব বেশী। ইহা যে পলিমৃত্তিকা বহন করে তাহার বেশীর ভাগই 'সিলেট বিল' পূরণে ব্যয় হইয়া যায়। এই সিলেট বিল নামক নীচু বিশাল অঞ্চলটি সিলেট হইতে ময়মনসিংহ ও ত্রিপুরা জেলার ভিতর পর্য্যন্ত (ভৈরব বাজার পর্য্যন্ত) প্রসারিত। অতঃপর যে জলধারা নীচে বহিয়া আসে তাহা প্রায় পলিমৃত্তিকাশূন্য।

সম্প্রতি পাহাড়ী অধিবাসীরা মেঘনার অববাহিকার বনজঙ্গল পরিষ্কার করিয়া স্থানে স্থানে বসতি স্থাপন করিতেছে। ইহাতে মেঘনা নদীর ভবিষ্যতে ক্ষতিগ্রস্ত হইবার সম্ভাবনা আছে। কাজেই এই বিষয়ে এখন হইতেই ব্যবস্থা অবলম্বন করা দরকার।

পূর্ব্ব বঙ্গে ত্রিপুরা ও চট্টগ্রামের নিম্ন পার্ব্বত্যভূমি হইতে উৎপন্ন নদীগুলির মধ্যে গোমতী, কর্ণফুলী ও হালদা প্রধান। এই নদীগুলি খরস্রোতা নদীর অন্তর্ভুক্ত হইলেও শুষ্ক ঋতুতে ইহারা একেবারে জলশূন্য হয় না। তাহার কারণ এই অঞ্চলে শুষ্ক ঋতুতেও কিছু কিছু বৃষ্টিপাত হইয়া থাকে এবং পার্ব্বত্য অঞ্চলে বন জঙ্গল এখনও ব্যাপকভাবে কাটিয়া পরিষ্কার করা হয় নাই।

এই খরস্রোতা নদীগুলিতেও তোয়াধার নির্ম্মাণ করিয়া জল নিয়ন্ত্রণের পরিকল্পনা চলিতেছে। কর্ণফুলী নদীতে তোয়াধার নির্ম্মাণ করিয়া নিম্নদেশকে বন্যার হাত হইতে রক্ষা করা যাইতে পারে এবং উদ্ভূত উদ-বিদ্যুৎ কাষ্ঠশিল্প (forest industry) স্থাপন এবং প্রসারে ব্যবহার করা যাইতে পারে। গোমতী নদীতেও জলপ্রবাহ রোধার্থ বাঁধ বাঁধিয়া জল নিয়ন্ত্রণ করিয়া পার্শ্ববর্ত্তী অঞ্চল জল প্লাবন হইতে রক্ষা করার পরিকল্পনা চলিতেছে।

এই সমস্ত অঞ্চলে প্লাবন তথা নদীসমস্যা তত কঠিন নহে বরং ইহাদের অববাহিকা ও স্বাধীন প্রবাহে কোন হস্তক্ষেপ না করিলেই নদীগুলির অবস্থা ভাল থাকিবে এবং বহুদিন দেশের সেবা করিতে পারিবে। বস্তুতঃ নদীকে বাধাপ্রদান না করিয়া নদীর সহিত সহযোগিতা করিয়া চলিলে যে দেশের স্বাস্থ্য ও সমৃদ্ধি অটুট থাকে পূর্ব্ব বঙ্গই তাহার উদাহরণ। পূর্ব্ব বঙ্গে বর্ষাকালে নদী কূল ছাপাইয়া পার্শ্ববর্ত্তী অঞ্চল প্লাবিত করে। এই বর্দ্ধিত জলের হাত হইতে রক্ষা পাইবার জন্য লোকে উঁচু টিপিতে ঘরবাড়ী তৈয়ার করিয়া বসবাস করে এবং এক প্রকার দীর্ঘ ধান গাছ বপন করে যাহা জলের সঙ্গে সঙ্গে বাড়িয়া উঠে। কাজেই বর্ষাকালে ঘরবাড়ী ও শস্যের কোন ক্ষতি হয় না। জল স্বাধীনভাবে বাড়িয়া চলিয়া আবার স্বাধীনভাবেই অল্পদিনের মধ্যে উন্মুক্ত অব্যাহত নদীনালা পথে সরিয়া যায়; কাজেই জল আবদ্ধ থাকিয়া ম্যালেরিয়া ও অন্যান্য রোগের আবাসভূমি সৃষ্টি করে না। এইজন্য পূর্ব্ববঙ্গের (ময়মনসিংহ ও ঢাকা জেলার কিয়দংশ ব্যতীত) স্বাস্থ্য বাংলাদেশের অন্যান্য স্থানের তুলনায় অনেক ভাল। জমি পলিমৃত্তিকা পর্য্যাপ্ত পরিমাণে পাইয়া অধিকতর উর্ব্বর হইয়া উঠে এবং প্রতিবৎসর প্রচুর ধান ও অন্যান্য শস্য উৎপাদন করে। এইজন্য পূর্ব্ব বঙ্গের অধিকাংশ স্থান স্বাস্থ্য ও সমৃদ্ধিশালী এবং উত্তরোত্তর অগ্রগতির পথে।

বঙ্গদেশের নদীসমস্যা ও তাহার প্রতিকারের কথা মোটামুটি আলোচনা করা হইল। এই সম্পর্কে বিশেষভাবে মনে রাখিতে হইবে যে নদীগুলির প্রত্যেকটি প্রত্যেকটির সঙ্গে প্রত্যক্ষে অথবা পরোক্ষে সংশ্লিষ্ট। কাজেই কোন স্থায়ী প্রতিকার করিতে হইলে সর্ব্বত্র সম্বন্ধ ব্যাপক প্রচেষ্টার প্রয়োজন এবং শুধু প্রাদেশিক প্রচেষ্টাই যথেষ্ট নহে; সংশ্লিষ্ট অন্যান্য প্রদেশ ও দেশীয় রাজ্যগুলিকেও যুগপৎ প্রচেষ্টা ও সহযোগিতা করিতে হইবে।

REFERENCES :—

1. *Rivers of the Bengal Delta*—S. C. Majumdar, C.I.E., I.S.E., M.I.E. (Ind.), (University of Calcutta publication, 1942).
2. *Science & Culture*, Vol. IX, No. 10, p. 418.
3. *Science & Culture*, Vol. X, No. 11 p. 20.
4. *Science & Culture*, Vol. XI, No. 10, p. 513.
5. Lectures by Dr. N. K. Bose, Director, River Research Institute, Bengal, on 'River System of Bengal and Her Rehabilitation' in the hall of the Indian Association for the Cultivation of Science, 210, Bowbazar Street, Calcutta, on 12th March, 18th March, 1st April and 8th April, 1946.

যুক্তরাষ্ট্রের পল্লী-মেলা

শ্রীনলিনীকুমার ভদ্র

আমেরিকার গ্রাম্য মেলা একাধারে পণ্যদ্রব্য ক্রয়-বিক্রয়ের ও আমোদ-প্রমোদের স্থান, এবং কৃষিজীবীদের অন্যতম শিক্ষাকেন্দ্র। যুক্তরাষ্ট্রের কৃষিপ্রধান পল্লী-অঞ্চলে এই মেলার অনুষ্ঠানই সমগ্র বৎসরের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার বলিয়া বিবেচিত হইয়া থাকে।

যুক্তরাষ্ট্রের ডারসেট ষ্টেটের মেলা-প্রাঙ্গণে 'ফেরিস হুইল' নামক চক্রযান

মেলা-প্রাঙ্গণে নির্ম্মিত তাঁবুগুলিতে আমেরিকার গ্রাম্য-জীবনের বিভিন্নমুখী কর্ম্মপ্রচেষ্টার সঙ্গে পরিচিত হইবার সুযোগ দর্শকদের হয় এবং কৃষি, শিল্প ইত্যাদি নানা দিক দিয়া পল্লীবাসীরা কিরূপ দ্রুত উন্নতির পথে আগাইয়া চলিয়াছে তাহাও সুস্পষ্টরূপে হৃদয়ঙ্গম হয়।

প্রতিযোগিতায় কৃতিত্ব প্রদর্শন এবং জয়লাভ করিবার স্পৃহা আমেরিকাবাসীদের প্রকৃতিগত। মেলা-ক্ষেত্রেও ইহার প্রমাণ

দক্ষিণ-পশ্চিম যুক্তরাষ্ট্রের একটি মেলায় মহিলাদের সূচিকর্ম্ম ও হস্ত-শিল্প প্রদর্শনী

পাওয়া যায়। চাষবাস এবং জমিজেরাৎ সংক্রান্ত অতি সাধারণ ব্যাপারাদিও এমন সুষ্ঠুভাবে প্রদর্শিত হয় যে, দর্শকদের নিকট তাহা পরম চিত্তাকর্ষক বলিয়া গণ্য হইয়া থাকে।

মেলার অন্যতম প্রধান আকর্ষণ পল্লীবাসীদের পুরস্কারপ্রাপ্ত (prize) পশু প্রদর্শনী। ছোট-বড় সকল জোতদারের নিকট হইতেই সুস্থ ও সবল গো-মহিষ, ভেড়া, শূকর প্রভৃতি জন্তু-সমূহকে মেলাক্ষেত্রে আনয়ন করিয়া সেখানে পুনরায় তাহাদের স্বাস্থ্য পরীক্ষা করা হয় এবং সুবিধামত নিকটবর্ত্তী অঞ্চলের কৃষিকর্ম্মকারীদের সমক্ষে সেগুলি প্রদর্শিতও হয়। যুক্তরাষ্ট্রের উত্তর এবং দক্ষিণ উভয় অঞ্চলের প্রত্যেক মেলাতেই, সযত্নে রক্ষিত এবং সুসজ্জিত উৎকৃষ্ট ফলমূল তরি-তরকারী এবং শস্যাদির প্রদর্শনী এক দেখিবার জিনিষ। অন্যান্য দ্রষ্টব্য জিনিষের মধ্যে স্ত্রীলোকদিগের সূচিকর্ম্ম এবং নানাপ্রকার হাতের কাজ, ছুরিকা দ্বারা কাঠের উপর স্কুলের ছেলেদের বিবিধ সূক্ষ্ম কারুকার্য্য এবং ছাত্রীদের চিত্রকলা ইত্যাদি আমেরিকাবাসীদের বিচিত্র এবং বিভিন্নমুখী সৃজনী ক্ষমতার পরিচায়ক।

মেলায় প্রতিযোগিতায় প্রবৃত্ত হইবার উদ্দেশ্যে জনপদবধূরা সারা বৎসর অবসরসময়টুকু সূচিকর্ম্ম এবং ফলমূলাদি টিনজাত করা ইত্যাদি কাজে ব্যয়িত করে। তাহাদের স্বামীরা, যে-সমস্ত গরু-বাছুর ইত্যাদি গৃহপালিত জন্তুকে প্রদর্শনীক্ষেত্রে উপস্থিত করিতে হইবে সেগুলির পরিচর্য্যায় এবং ফলমূল,

পশুাদি ও উৎপন্নকারীর উন্নত ফলনের জন্ত বিশেষভাবে যত্নবান হয়। যুক্তরাষ্ট্রের সর্ব্বত্র পল্লীবাসীমাত্রেই নিজ নিজ অঞ্চলে অনুষ্ঠিত প্রত্যেক মেলায় একান্ত আগ্রহ সহকারে যোগদান করিয়া থাকে। আমেরিকার পল্লী-অঞ্চলের ছেলে-বুড়া সকলেরই একথা জানা আছে যে, মেলায় যেমন প্রচুর আমোদ উপভোগ করা যায় তেমনই ভিন্ন ভিন্ন গ্রামবাসীদের পরস্পরের মেলা-মেশার দরুন নানা বিষয় শিখিবারও সুযোগ পাওয়া যায়।

গোড়ার দিকে মেলা অনুষ্ঠিত হইত বিশেষ একটা নির্দ্দিষ্ট সময়ে, বিভিন্ন জেলায় উৎপন্ন দ্রব্যের ক্রেতা এবং বিক্রেতাদের পারস্পরিক সাহচর্য্যের সুযোগ-সুবিধা

টেক্সাস ষ্টেটের সান এন্টোনিও মেলায় জনসমাগম। পিছনে বাঁদিকে 'নারী-সদনে' মহিলাদের সূচিকর্ম্ম এবং টিনজাত খাদ্যদ্রব্যাদির প্রদর্শনী
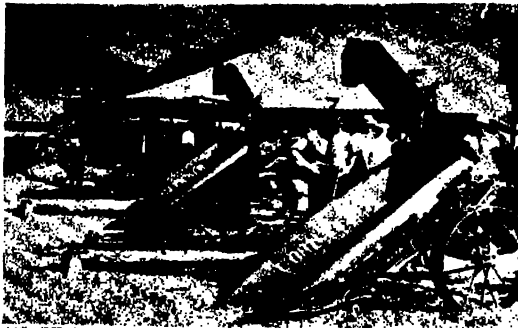
আইওবা ষ্টেটের মেলায় একটি নূতন ধরণের শস্ত-সংগ্রাহক যন্ত্র

করিয়া দিবার উদ্দেশ্যে। যুক্তরাষ্ট্রের বিভিন্ন ষ্টেট এবং 'কাউন্টি' বা জেলার মেলাসমূহ এলাহী কাণ্ড। এগুলি আসলে কৃষি, উত্তান-রচনা, গার্হস্থ্য-বিজ্ঞান, শিক্ষা, কলাবিত্তা, যানবাহন চলাচল-ব্যবস্থা ইত্যাদি বিভিন্নবিষয়ক বিরাট্ প্রদর্শনী বিশেষ। যুক্তরাষ্ট্রের অধিকাংশ ষ্টেটেই প্রতি বৎসর ব্যবস্থা-পরিষদের উত্তোগে মেলার অনুষ্ঠান হয়। পরিষদ আংশিকভাবে বার্ষিক মেলার ব্যয় নির্ব্বাহ করিয়া থাকেন এবং মেলা-প্রাঙ্গণে স্থায়ী ভাবে গৃহাদি নির্ম্মাণের ব্যবস্থাও হয়। কাউন্টি বা জেলার মেলাগুলি অনুষ্ঠিত হয় জোতদার এবং কারবারীদের সম্মিলিত প্রচেষ্টায়। সাকল্যে বায়ান্নটি প্রতিষ্ঠান বিরাট্ মার্কিন মেলা এবং প্রদর্শনী মহাসঙ্ঘের অন্তর্ভুক্ত। যুদ্ধের আগেকার বৎসরে আন্দাজ পাঁচ কোটি পল্লীবাসী আনুমানিক দুই হাজার মেলায় যোগদান করিয়াছিল।

আমেরিকার পল্লী-মেলা কিন্তু সম্পূর্ণ ভিন্নধর্ম্মী—আসলে ইহা একটি পুরাপুরি গ্রামীণ বিচিত্র অনুষ্ঠান। বিভিন্ন অঞ্চলে ইহার আবার ভিন্ন ভিন্ন রূপ। উত্তর আটলান্টিকের উপকূল-ভাগস্থ অঞ্চলের ক্ষুদ্র পল্লীসমূহের উপকণ্ঠে অনুষ্ঠিত মেলায় পুরনো ধাঁচের নাচ হইয়া থাকে। মধ্য-পশ্চিম ষ্টেটের মেলায় সাজ-পরা অশ্বসমূহের মধ্যে দৌড়ের প্রতিযোগিতা হয়। দক্ষিণ-পশ্চিম অঞ্চলের মেলায় মেক্সিকো অঞ্চলের সঙ্গীত-সম্বলিত রেড ইণ্ডিয়ান নৃত্য পরম উপভোগ্য হইয়া থাকে।

সর্ব্বত্রই মেলায় দর্শকদের সামনে নাটকীয় এবং বিচিত্র দৃশ্তসমূহের অবতারণা করা হয়। আমেরিকার প্রত্যেক পল্লী-অঞ্চলে অনুষ্ঠিত মেলায় আর একটি বিশেষ দ্রষ্টব্য জিনিষ হইতেছে 'ফেরিজ হুইল'। এই চক্রখানে মেলা-প্রাঙ্গণে পরি-

উত্তর আটলান্টিকের উপকূল অঞ্চলস্থ মেলায় দুইটি ষাঁড়ের মধ্যে ভারবহন প্রতিযোগিতা

টেক্সাস ষ্টেটের গঞ্জালেস 'কাউন্টি'-মেলায় স্বহস্ত-প্রস্তুত, পাত্রজাত খাদ্যবস্তুর প্রদর্শনীর সম্মুখে দণ্ডায়মান অনৈকা বৃদ্ধা মহিলা

ভ্রমণ বিশেষ আমোদজনক। যুক্তরাষ্ট্রের সর্বত্র পল্লীবালকেরা যখন দেখে যে, কেরিজ হুইলগুলি সহরতলীর পথে চলিয়াছে তখনই তাহারা আসন্ন মেলার পূর্ব্বাভাস পায়।

মেলায় কৃষকদের মধ্যে উত্তম ফসল উৎপাদন-প্রণালী এবং কৃষক-বনিতাদের মধ্যে টিনজাত খাদ্যদ্রব্যাদি সংরক্ষণ বিষয়ে প্রতিযোগিতা হয়। যুদ্ধের সময় মেলায় পুরস্কারপ্রাপ্ত উৎপন্ন দ্রব্যসমূহ,—অনেক উৎপাদক সর্ব্বোচ্চ মূল্যে যুক্তরাষ্ট্রের 'ওয়ার বণ্ড' ক্রেতার নিকট বিক্রী করিয়াছিল, এমনিভাবে তাহারা মিত্রপক্ষের সমরোপকরণ সরবরাহ-ভাণ্ডারকে পরিপুষ্ট করিবার পক্ষে সহায়তা করিতে সমর্থ হইয়াছিল।

রবি-প্রণাম

শ্রীসুধীরকুমার নন্দী

পঁচিশে বোশেখ এল, তোমার জন্মের দিন,
হে কবি-সম্রাট্,
নব জন্ম লও কবি আমাদের ঘরে ঘরে ;
এ নবজাতক
বাঁধুক আবার বীণা, ভরে দিক্ সুরে সুরে
আমার আকাশ,
ভরে দিক্ বনবীথি, ভরে দিক্ ছায়াতল
পথ, ঘাট, মাঠ।
তোমার সুরের মায়া ছুঁয়ে যাক্ বারবার
আমার ভুবন,
মাটিতে প্রণাম করি, জানি না ও যায় কি না
সে সূর্য্য-প্রণাম—
না যায় নাই বা গেল, থাক্ হেথা প'ড়ে থাক্
অভিযোগ নাই,
ধরায় দুলাল ছেলে, মাটির ধরায় এস,
থাক কিছুক্ষণ।
না দাও, নাই বা দিলে, কিছু আর চাহি নাকো
দিয়েছ অনেক—
আজ শুধু একবার, একবার নেমে এস,
দূরেতে কি কাজ
কত ঝড় বয়ে গেল, কত মেঘ উড়ে এল,
তবু ভুলি নাই,
পঁচিশে বোশেখ এল, তুমি ত' এলে না কবি,
এলে না ক্ষণেক।

পঁচিশে বৈশাখ

এ এন এম বজলুর রশীদ

বৈশাখের তপ্তবায়ু চঞ্চলিয়া শালের মঞ্জরী
মালতীর লতাকুঞ্জে মর্ম্মরিয়া উঠিল গুঞ্জরি ;
শ্যামলীর শূন্য ঘরে উদীচীতে দিয়ে গেল ডাক,
মহাকাল তরঙ্গের প্রান্ত হতে পঁচিশে বৈশাখ।
সে ত নাই যে পথিক সুখে-দুখে ধ্যানে-জাগরণে,
বর্ষণমুখর রাতে ফাল্গুনের সমীরণে,
প্রদোষের লগ্নে ভাঙি অন্তরের অবরুদ্ধ কারা,
সুন্দরের সুরে তার বাজাইয়া গেছে একতারা।
সুদূরপিয়াসী কবি—অন্তহীন দিগন্তরেখায়,
শালতাল শিরীষের বনশীর্ষে পত্রের লেখায়
পেয়েছে দূরের ডাক—সে বাউল বীণাতারে তার
বিচিত্র ছন্দের গানে অন্তরের শত উপচার
নিবেদন করে গেছে। দেখেছে সে সূর্য্যের উদয়
তমসার পার হতে। পুষ্পগুচ্ছে পূর্ণ জ্যোতির্ম্ময়
'আদিত্যবর্ণম্' যিনি—শিবশান্ত নয়নাভিরাম,
তাঁর লাগি রেখে গেছে পরিপূর্ণ একটি প্রণাম।

রবীন্দ্র-সঙ্গীতসার

শ্রীইন্দিরা দেবী চৌধুরাণী

গত ১৩৫২ সালের জ্যৈষ্ঠ মাসের প্রবাসীতে আমি, কবিবর রবীন্দ্রনাথের অসংখ্য গানের মধ্যে তাঁর স্বকৃত শ্রেণী-বিভাগ অনুসারে শ্রেষ্ঠ শত গান নির্ব্বাচন করে আমাকে যেন শ্রাবণ মাসের মধ্যে পাঠানো হয়, পাঠকদের কাছে এই রূপ একটি আবেদন করেছিলুম। ভাষাটা ঠিক পরিষ্কার হয়েছিল কি না মনে নেই, কিন্তু মনোভাব এই ছিল যে, গানগুলি এমন জনপ্রিয় এবং অবশ্য শিক্ষণীয় হয় যাতে শিক্ষক ও ছাত্র উভয়েরই উপকার হয়।

দুঃখের বিষয় আশানুরূপ ফললাভ করি নি। প্রথম ধাক্কায় খানচারেক মাত্র জবাব পেয়েছিলুম, তারও একটিতে নির্দ্দিষ্ট সংখ্যা পূর্ণ হয় নি। হতে পারে আমার আমন্ত্রণের তেমন জোর নেই, আমার রবীন্দ্র-সঙ্গীতের তেমন বহুল প্রচার নেই। মাঝে বিশ্বভারতীর মিউজিক বোর্ডের সম্পাদক আমাকে লিখেছিলেন ওরকম ভাবে সাধারণ্যে আবেদন না করে, বিশিষ্ট রবীন্দ্র-সঙ্গীতজ্ঞের একটি তালিকা প্রস্তুত করে তাঁদের স্বমত আহ্বান করাই ভাল; নইলে গ্রামোফোন, সিনেমা ও রেডিয়ো প্রচারিত সঙ্গীতই নির্ব্বাচিত হবার সম্ভাবনা। তাঁর প্রস্তাবটি সমীচীন, কিন্তু সময়মত আমি তা কার্য্যে পরিণত করি নি, সেটি আমারই দোষ। আসল কথা আজকাল সকলেই নিজের নিজের চরখায় তেল দিতে এত ব্যস্ত যে, সব দিক সাম্‌লে উঠতে পারে না। আমি অতি সম্প্রতি কতকটা তাঁর প্রস্তাবিত পন্থা অবলম্বন করেছি। অর্থাৎ গীতালি, গীতবিতান এবং সঙ্গীত-ভবনের কর্তৃপক্ষের অভিমত জানবার চেষ্টা করেছি। তবে শেষ মুহূর্ত্তে আংশিক সাফল্য মাত্র লাভ করতে পেরেছি।

এই কয়েকটি তালিকা তুলনাপূর্ব্বক তার মধ্যে যে কয়টি গান দুয়ের বেশি ভোট পেয়েছে, তাদের স্বতন্ত্র তালিকা করেছি। তার পর আমার নিজকৃত তালিকার সঙ্গে সেটি মিলিয়ে শেষ তালিকা প্রস্তুত করেছি। আমার মুশ্‌কিল হয়েছে এই যে, নতুন গান আমি খুব কম জানি; অথচ কেবল পুরনো গান দিয়েও উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয় না। তা ছাড়া একমাত্র নিজের মতও জারি করতে চাই নে, "আপনারা পাঁচ জনে কি বলেন", তাই জানতে চাই।

যখন এ কার্য্যে হস্তক্ষেপ করেছিলুম, তখন ভাবিনি যে কাজটি সুসম্পন্ন করা এত দুরূহ হবে। এ বিষয় একজন পত্রপ্রেরক যা লিখেছেন, তা এস্থলে তুলে দেওয়া অপ্রাসঙ্গিক হবে না:

"কোনও গানের শ্রেষ্ঠত্ব কয়েকটি বিষয়ের উপর নির্ভর করে, যথা:—

(১) কবিতা হিসাবে গানের কথা ও ছন্দের সার্থকতা ও আন্তরিকতা।

(২) সুর হিসাবে তাহার চমৎকারিত্ব ও অভিনবত্ব।

(৩) এ দুইটির পরস্পরের সহিত সামঞ্জস্য, অর্থাৎ বিষয়ের উপযুক্ত সুর হইয়াছে কি না।

এই তিনটি সূত্র দিয়া পরীক্ষা করিয়া দেখিলে দেখা যাইবে যে, রবীন্দ্রনাথের অন্ততঃ ৫০০ গান এ পরীক্ষায় সহজেই উত্তীর্ণ হইবে। তখন কাকে ফেলে কাকে রাখা—এই এক বিষম সমস্যা হইয়া দাঁড়াইতে বাধ্য।"

আর এক জন বিশিষ্ট রবীন্দ্র-সঙ্গীত-ভক্তের কথাও প্রণিধানযোগ্য। তিনি লিখছেন "সুরের দিক থেকে (শুধু কাব্য হিসাবে নয়) যেগুলো সবচেয়ে ভাল লাগে তা লিখতে গেলে দেখছি, গানের শ্রেণী বিভাগ করে প্রত্যেক শ্রেণীতে সমান সংখ্যক গান বসানো চলে না। কারণ "পূজা" বা "স্বদেশ", "প্রকৃতি"র মধ্যে এক "বর্ষা"র সঙ্গেই পাল্লা দিতে পারে না—"বিবিধ" নামক শ্রেষ্ঠ গানের বিপুল ভাণ্ডারের সঙ্গে ত দূরের কথা।"

এইখানে বলে রাখি যে, প্রত্যেক বিভাগে সমান সংখ্যক গান নির্ব্বাচন করতে হবে। এমন অভিপ্রায় আমার আদৌ ছিল না; উপরন্তু অভিপ্রায় ছিল যে, সেকাল একাল দুই কালেরই গান দিতে হবে। তবে জানি নে তাড়াতাড়িতে সে কথা বিজ্ঞপ্তিতে ভালরূপ প্রকাশ করতে পেরেছি কি না।

উল্লিখিত কৈফিয়ৎ থেকে অন্ততঃ এই কথাটি পরিষ্কার ভাবে ব্যক্ত হয়েছে আশা করি যে, গানগুলির ভোট কতক ব্যক্তিবিশেষ এবং কতক সঙ্গীত-সভা থেকে সংগৃহীত (তাও শেষটা ব্যক্তিতেই গিয়ে দাঁড়ায়), এবং অবশেষে আমার নিজের মতে নির্ব্বাচিত। এতে কতটা গণমত পাওয়া গেছে বলতে পারি নে; তবে ভোট-সংখ্যার তারতম্যে অন্ততঃ জনপ্রিয়তার তারতম্য সামান্যভাবে নির্দ্ধারিত হয়েছে এবং অবশ্যশিক্ষণীয় শত গানেরও একটা মোটামুটি আন্দাজ পাওয়া গেছে, যেটা আমার অন্যতম উদ্দেশ্য ছিল। প্রথমে মনে করেছিলুম এই আলোচনার নাম দেব "শ্রেষ্ঠ শত রবীন্দ্র-সঙ্গীত"। তার পরে ভাবলুম দুটি বিশেষণেই আপত্তি উঠতে পারে। কেউ হয় ত বলবেন যে, —'শ্রেষ্ঠ' কার মতে? যথেষ্ট ব্যাপক ও সুনিয়ন্ত্রিত ভাবে

ত জনমত সংগ্রহ করা হয় নি। এ আপত্তির যৌক্তিকতা মেনে নিচ্ছি। তার পর 'শত' সংখ্যার মধ্যে যে কিছুতেই তাঁর শ্রেষ্ঠ সঙ্গীত আবদ্ধ করা যায় না তাও শতবার স্বীকার্য্য। সুতরাং বর্ত্তমান নামটি অপেক্ষাকৃত নির্ব্বিবাদী বলে মনে করলুম।

এই কাজ করতে করতে আমার হঠাৎ মনে হ'ল যে এক রবীন্দ্র-সঙ্গীতের মধ্যেই পঞ্চ প্রধান শিল্পকলার উদাহরণ বা উপমা পাওয়া যেতে পারে। তাঁর কোন সঙ্গীত যেন স্থাপত্যধর্মী, যথা :—"মোরা সত্যের পরে মন", "সবার মাঝারে তোমারে স্বীকার," "ভুবনেশ্বর হে", "জনগণ মন" প্রভৃতি বড় বড় একই সুরবৃত্ত গানগুলি যেন পাথরের উপর পাথর গেঁথে এক একটা ইমারত গড়ে তুলেছে; আবার কোন সঙ্গীত যেন চিত্রধর্মী, যথা :—"শেফালি বনের মনের কামনা", "এস নীপ বনে" ইত্যাদি—একেবারে রঙ রেখায় যেন ছবি এঁকে দিয়েছে; আবার কোনটি কাব্য-ধর্মী, যথা : "হৃদয় বেদনা বহিয়া", "এমন দিনে তারে বলা যায়" "তুমি একটু কেবল বসতে দিও" "তোমার গোপন কথাটি" প্রভৃতি গভীর মধুর অন্তরঙ্গ ভাবের গানগুলি। যেখানে সবই সঙ্গীত, সেখানে গীতধর্মী আর কাকে বাদ দিয়ে কাকে বলব; তবে হিন্দী-ভাঙা গানগুলিকে যদি তা বলা যায়, সুরের প্রাধান্য হিসেবে—বিশেষতঃ হিন্দী টপ্পা ভাঙা কয়টি। আর সবই যখন রূপক, তখন ভাস্কর্য্য ও স্থাপত্যকে স্বতন্ত্র আসন দেওয়া অসম্ভব না হলেও কঠিন। চার কলির গান-গুলিকে 'ক্ষীণ মধ্যা' মূর্ত্তি বলে কল্পনা করা যেতে পারে। কিন্তু উপমার উপর বেশি জোরজবরদস্তি করা কিছু নয়। হয় ত আমার এ-সব পরিকল্পনার ভিত্তি কথার উপরেই স্থাপিত; কিন্তু রবীন্দ্র-সঙ্গীতের কথা আর সুর আলাদা করবে কে?—Those whom God hath joined, let no man put asunder!

ভোটের বিষয় বক্তব্য এই—যে গানগুলি খুব কম মার্কা পেয়েছে, সেগুলি আমারই প্রায় একলার সমর্থিত ধরতে হবে। হয় ত তার এক কারণ এই যে, আমাদের কালের পুরণো গান খুব কম লোকেই জানে। দ্বিতীয় কারণ, ভিন্ন রুচির্হি লোকাঃ। আমি নিজেই হয় ত চেপে ধরলে বলতে পারি নে এই কোণঠাসা গানগুলি দেবার মূলে আছে ছেলেবেলার সংস্কার না পরিণত বয়সের বিচার।

পরিশেষে বক্তব্য এই যে, এই নির্ব্বাচনের অসম্পূর্ণতা সম্বন্ধে আমার চেয়ে কেউ বেশি সচেতন নয়। যদি বল —তবে লোক সমক্ষে প্রকাশ করলে কেন?—তার সহজ উত্তর হচ্ছে এই যে, এক বৎসর হয়ে গেল, এখনো যদি প্রকাশ না করি ত কবে করব?—বিশেষতঃ যখন আমাদের খুব বেশি দূর ভবিষ্যতের জন্ত অপেক্ষা করবার সময় নেই।

যে উদ্দেশ্য নিয়ে কাজ আরম্ভ করেছিলুম, তা অন্ততঃ কিছুদূর অগ্রসরও করে দিয়েছি। এখন "নূতন যুগের ভোরে" অন্তান্ত উপযুক্ত লোক এই কার্য্যভার গ্রহণ করুন, চালিয়ে যান, এই প্রার্থনা।

	ভোট সংখ্যা
১। অন্ন লইয়া থাকি	৩+১
২। তোমারি ইচ্ছা হউক পূর্ণ	৩+১
৩। ওহে জীবন বল্লভ	৬
৪। প্রভু আমার প্রিয় আমার	১+১
৫। তোমার আমার এই বিরহের	৬+১
৬। আমার সকল দুখের প্রদীপ	৪+১
৭। সমুখে শান্তি পারাবার	১+১
৮। আনন্দ লোকে	৩+১
৯। সন্ধ্যা হল গো	২+১
১০। দুঃখের তিমিরে	৩+১
১১। সুধা সাগর তীরে	১+১
১২। শুধু তোমার বাণী নয় গো	২+১
১৩। ভুবনেশ্বর হে	৩+১
১৪। মোর হৃদয়ের গোপন বিজন	৪+১
১৫। যদি প্রেম দিলে না	১+১
১৬। মোরা সত্যের পরে মন	২
১৭। রাঙিয়ে দিয়ে যাও	৩+১
১৮। এবার নীরব ক'রে	৬+১
১৯। ভোরের বেলায় কখন	২+১
২০। হিংসায় উন্মত্ত পৃথ্বী	৬+১
২১। তোমার অসীমে	৬+১
২২। তাঁহারে আরতি করে	৫+১
২৩। ওহে সুন্দর মরি মরি	৫+১
২৪। অন্ধ জনে দেহ আলো	৭+১
২৫। ঐ আসন তলে	১+১
২৬। অনেক দিনের শূন্যতা মোর	২+১
২৭। আলোকের এই ঝরণা ধারায়	৬+১

প্রেম

	ভোট সংখ্যা
১। তবু মনে রেখো	৪+১
২। আজি যে রজনী যায়	৩+১
৩। তুমি যেয়োনা এখনি	৪+১
৪। ওহে সুন্দর মম গৃহে আজি	২+১
৫। মরিলো মরি	১+১

৬। মম যৌবন নিকুঞ্জে	৮+১
৭। ওগো কাঙাল আমারে	৬+১
৮। যে ছিল আমার স্বপনচারিণী	৩+১
৯। আমার পরাণ যাহা চায়	২+১
১০। মরণরে তুঁহু মম শ্যাম সমান	৫+১
১১। আমার পরাণ লয়ে	১+১
১২। বড় বিস্ময় লাগে	১+১
১৩। তুমি রবে নীরবে	৩+১
১৪। দীপ নিভে গেছে মম	৬+১
১৫। তোমার গোপন কথাটি	২+১
১৬। আমারে কর তোমার বীণা	[illegible]+১
১৭। মায়াবন বিহারিণী হরিণী	২+১
১৮। ওগো বধূ সুন্দরী	৩+১

প্রকৃতি

	ভোট সংখ্যা
১। এস হে বৈশাখ	[illegible]+১
২। এমন দিনে তারে	৩+১
৩। তিমির অবগুণ্ঠনে	২+১
৪। বহু যুগের ওপার হতে	৭+১
৫। শ্রাবণের ধারার মত	২+১
৬। বাদল মেঘে মাদল বাজে	১+১
৭। ঝর্ ঝর্ বরিষে	২+১
৮। ওগো আমার শ্রাবণ মেঘের	৩+১
৯। হৃদয় আমার	৩+১
১০। যেতে যেতে একলা পথে	১+১
১১। যেতে দাও গেল যারা	১+১
১২। আজি শরত তপনে	১+১
১৩। শরৎ তোমার অরুণ আলোর	১+১
১৪। ওগো শেফালি বনের	৪+১
১৫। আজ ধানের ক্ষেতে	১+১
১৬। কার বাঁশী নিশি ভোরে	২+১
১৭। আমার নয়ন ভুলানো এলে	২+১
১৮। হিমের রাতে ওই গগনের	৬+১
১৯। শীতের হাওয়ায় লাগল নাচন	৭+১
২০। এস এস বসন্ত ধরাতলে	১+১
২১। আজি বসন্ত জাগ্রত দ্বারে	[illegible]+১
২২। একি আকুলতা ভুবনে	৬+১
২৩। মোর বীণা ওঠে	৭+১
২৪। চিত্ত পিপাসিত	২+১
২৫। ওগো কিশোর আজি	৪+১
২৬। আজি দখিন দুয়ার খোলা	২+১
২৭। বাজো রে বাঁশরী বাজো বাজো	২+১
২৮। মধু গন্ধে ভরা	৩+১
২৯। এস শ্যামল সুন্দর	২+১
৩০। ওগো দখিন হাওয়া	২+১

স্বদেশ

	ভোট সংখ্যা
১। জনগণ-মন অধিনায়ক	১০+১
২। দেশ দেশ নন্দিত করি	১০+১
৩। অয়ি ভুবন মনোমোহিনী	৯+১
৪। সার্থক জনম আমার	৮+১
৫। জননীর দ্বারে আজি ওই	৬+১
৬। হে মোর চিত্ত	৭+১
৭। আগে চল্ আগে চল্	২+১
৮। আজি বাংলা দেশের হৃদয় হতে	১+১
৯। বাংলার মাটি, বাংলার জল	৫+১
১০। আমার সোনার বাংলা	৮+১
১১। তোর আপন জনে ছাড়বে তোরে	৭+১
১২। যদি তোর ডাক শুনে	৭+১
১৩। সঙ্কোচের বিহ্বলতা	৭+১
১৪। বিধির বাঁধন কাটবে তুমি	২+১
১৫। এবার তোর মরা গাঙে	৪+১

বিবিধ

	ভোট সংখ্যা
১। গ্রাম ছাড়া ঐ রাঙা মাটির পথ	৭+১
২। আহা জাগি পোহাল বিভাবরী	২+১
৩। যখন পড়বে না মোর পায়ের চিহ্ন	৮+১
৪। আমি চঞ্চল হে	৮+১
৫। তোমার হল সুরু	৬+১
৬। আমাদের শান্তিনিকেতন	৪+১
৭। আমার ক্ষমো হে ক্ষমো	৪+১
৮। হে নূতন	৬+১
৯। ভরা থাক্ ভরা থাক্	৭+১
১০। এ শুধু অলস মায়া	২+১

'শেয়ার'-ব্যবসায়ী

শ্রীসুহৃৎচন্দ্র মিত্র

বৈচিত্র্য যে এই বিশ্বজগতের একটি প্রধান বৈশিষ্ট্য এ-কথা মেনে নিতে সৃষ্টিতত্ত্ব সম্বন্ধে গভীর গবেষণা করবার কারও দরকার হয় না। জীবনের এক দিনের অভিজ্ঞতার দিকে একটু মনোযোগ দিলেই কথাটির সত্যতা উপলব্ধি হয়। আকাশে কত রঙের খেলাই না আমরা দেখি, বাতাসে কত সুরের ঝঙ্কারই না শুনি। কত বিচিত্র রূপ ও রসের বিভিন্ন গন্ধ ও স্পর্শের, বিবিধ শব্দলহরীর মাধুর্য্য ও মহিমার কথা যুগের পর যুগ কবিরা গেয়েছেন, বৈজ্ঞানিকেরা ব্যাখ্যা করবার চেষ্টা করেছেন। সে বর্ণনায়, সে ব্যাখ্যায় শেষ আজও হয় নি। জীবজগতেও বৈচিত্র্যের অভাব নেই। ক্ষুদ্রতম প্রাণী থেকে আরম্ভ করে মানুষ পর্য্যন্ত কত বিভিন্ন গঠনের বিভিন্ন প্রকৃতির জীব জগতে বিচরণ করে কে তার সংখ্যা সঠিক নির্ণয় করতে পারে? আবার জড় ও প্রাণি-জগতের মত মনোজগতেও বৈষম্যের বিরলতা নেই। ঠিক একই ধরণের মানসিক গঠনসম্পন্ন দুইটি ব্যক্তি কোথাও মেলে না। বুদ্ধি, Emotion বা প্রক্ষোভ, কর্ম্মতৎপরতা প্রভৃতি বিবিধ বৃত্তি এবং দয়া-দাক্ষিণ্য নিষ্ঠুরতা প্রভৃতি গুণাগুণ প্রত্যেকের মধ্যেই কিছু-না-কিছু আছে ধরে নেওয়া যায়। কিন্তু এই সমস্ত মিলে মিশে অবশেষে যে ব্যক্তিত্ব উৎপন্ন হয় তা প্রত্যেকেরই বিভিন্ন। তাই আমরা দেখি কেহ স্বভাবতই শান্ত ধীর, কেহ সর্ব্বদাই চঞ্চল-অস্থির, কেহ বা অভ্যাসের দাস আবার অনভ্যাসই কারও অভ্যাস, কেহ প্রত্যেক পয়সাটি পর্য্যন্ত হিসাব করে খরচ করেন, কেহ অতিমাত্রায় বেহিসাবী অপব্যয়ী। কেহ স্বল্পভাষী, প্রত্যেক কথাই যেন ওজন করে বলেন, আবার কেহ নিজের কণ্ঠস্বর শুনতে যেন খুব ভালবাসেন তাই অনবরত কথাস্রোত চালিয়ে যান। একটু চিন্তা করলেই আরও অনেক প্রকৃতির মানুষের কথা আপনাদের মনে আসবে। এই বিভিন্নতা শুধু পুরুষের মধ্যেই আবদ্ধ নয়, যুক্ত পরিবারে যাঁরা বাস করেন—বাড়ির গৃহিণীদের, বধূদের কাজকর্ম্মের ধারা, পরস্পরের সঙ্গে ব্যবহার প্রভৃতি পর্য্যবেক্ষণ করবার চেষ্টা করলেই বহু প্রকার বৈলক্ষণ্যের সন্ধান তাঁরা পাবেন।

এই বিভিন্ন ধরণের মনোভাবসম্পন্ন লোকদের ভেতর এক শ্রেণীর লোক আছেন যাঁদের অস্বাভাবিক বলা নিশ্চয়ই যায় না, কিন্তু কোন কোন বিষয়ে, বিশেষ করে অর্থ-সংক্রান্ত ব্যাপারে, তাঁদের কার্য্যকলাপ স্বাভাবিক লোকের মতও ঠিক নয়। যেন 'নিশ্চিন্তে'র চেয়ে 'অনিশ্চিন্তে'র আকর্ষণটাই বেশী মাত্রায় অনুভব করেন এবং উপভোগও করেন। তাই অবশ্যম্ভাবী লাভের পথ ছেড়ে অনিশ্চিত হয় লাভ, না-হয় ক্ষতির পথে চলতে তাঁরা সব সময়েই বেশী পছন্দ করেন। একটি দৃষ্টান্ত দিলে কথাটা সহজে বুঝা যাবে। ধরুন, কোন মধ্যবিত্ত গৃহস্থ যদি দৈবানুগ্রহে এক হাজার টাকা অপ্রত্যাশিত ভাবে পান (অবশ্য হাজার টাকার একখানা বা পাঁচশত টাকার দুইখানা নোট নয়, ছোট ছোট নোট এবং নগদ টাকা) তা হ'লে স্বতঃই তাঁর চেষ্টা হবে টাকাটা এমনভাবে কোথাও গচ্ছিত রাখতে যাতে সেটা নিরাপদে থাকে আর তিনি প্রতি বৎসর বা প্রতি ছ'মাস অন্তর ডিভিডেণ্ড বা সুদ হিসাবে নিয়মিত কিছু পেতে পারেন। কিন্তু যে শ্রেণীর লোকের কথা আমরা বলছি তাঁদের কেউ যদি ঐ টাকা পান তা হলে তিনি তৎক্ষণাৎ সোজা ফাটকা-বাজারে অথবা শেয়ার মার্কেট ষ্টক এক্সচেঞ্জে গিয়ে কেনা-বেচা আরম্ভ করে দেবেন। নিশ্চিত লাভের কথা, গৃহে অর্থের অসচ্ছলতার কথা বা অন্য কোন কথাই তাঁর মনে উদয় হবে না। বন্ধু-বান্ধবের সুপরামর্শ, আত্মীয়-স্বজনের নিষেধ কিছুই তাঁকে বাধা দিতে পারবে না। হয়ত ঐ কেনা-বেচায় তিনি প্রচুর অর্থ সংগ্রহ করতে সমর্থ হবেন। আবার সমস্ত টাকাটা সম্পূর্ণ লোকসান করে হয়ত বা আরও কিছু দেনা করেও তিনি ফিরতে পারেন। লোকসান হ'ল বা ধার করতে হ'ল বলে তিনি যে ঐ কাজ থেকে ভবিষ্যতে বিরত হবেন তা মনে করবেন না। আবার হাজার টাকা পেলে ঐ পথেই তিনি যাবেন, কারণ ঐ পথই তাঁর একমাত্র পথ, অন্য পথের কোন আকর্ষণ তাঁর নেই। এখন বোধ হয় বুঝতে পারছেন কোন্ প্রকৃতির লোকের কথা আমরা বলছি। এ ধরণের লোক নিশ্চয় আপনাদের অপরিচিত নন। আপনাদের আত্মীয়-স্বজন বন্ধু-বান্ধবের মধ্যে ধরে নেওয়া যায় একাধিক ব্যক্তি এই প্রকৃতির আছেন। কারণ এঁদের সংখ্যা খুব কম নয়। এঁরা ব্যবসায়কর্ম্মে অত্যন্ত ঝুঁকি নেন ও হঠকারিতার সঙ্গে কাজ করেন। এই 'অনিশ্চিতের পিয়াসীদে'র ইংরেজী ভাষায় বলে, 'The speculators.'

অভিধানে 'speculate' শব্দটির যে দু'টি অর্থ দেওয়া আছে সে দু'টিতেই এই অনিশ্চিতের ইঙ্গিত পাই। কোন একটি কার্য্যের কারণ কি, বা কোন কারণের কার্য্য কি হতে পারে, নিশ্চিতভাবে জানা না থাকায় সম্ভব কারণ ও কার্য্যসমূহ সম্বন্ধে কল্পনা করার নাম 'speculate' করা। আর ব্যবসায়-ক্ষেত্রে অনিশ্চিত অধিক লাভে বিক্রয় করবার

আশায় দ্রব্যাদি ক্রয় করা বা ধরে রাখাকেও speculate করা বলে। যিনি ঐরূপ কল্পনা বা ঐরূপ কাজ করেন তিনি speculator—এখন কথাটির অর্থ এবং ব্যঞ্জনা একটু বিশদভাবে আলোচনা করা যাক।

অনিশ্চিত সম্বন্ধে কল্পনা এবং সেই কল্পনা-নির্দ্দিষ্ট পথে কাজে অগ্রসর হওয়া এই অর্থে যদি speculate কথাটি নেওয়া যায় তা হলে বলতেই হয় যে মানুষ মাত্রই speculator. কারণ এই পৃথিবীতে সর্ব্বজ্ঞ কে আছেন? সমস্ত কারণের কার্য্য এবং কার্য্যের কারণ জ্ঞাত হওয়া মানুষের পক্ষে সম্ভব নয়। সুতরাং কিছু পরিমাণ অজ্ঞাত, অনিশ্চিত ঘটনার ওপর নির্ভর করে সকলকেই চলতে হয়। ভবিষ্যতে ফললাভের আশায় যে-কোন কাজই আমরা করি সে সবই speculation-প্রসূত। কারণ ভবিষ্যৎ যে অতীতের মতই হবে এ-ত অনাগত অজ্ঞাত বিষয় সম্বন্ধে একটি কল্পনা মাত্র। আমাদের দৈনন্দিন ছোটবড় অভ্যস্ত অনভ্যস্ত সমস্ত কাজের মূলে এই speculation বিদ্যমান আছে। আজ পর্য্যন্ত যা ঘটে এসেছে কালও তা ঘটবে এ বিশ্বাস যদি না রাখি তা হলে আমরা একপদও এগোতে পারি না। কালও সূর্য্য উঠবে, আহারে ক্ষুন্নিবৃত্তি, পানীয়ে তৃষ্ণার অবসান হবে, এ সব আমরা ধরেই নি, এ সম্বন্ধে কোন প্রশ্নই আমাদের মনে জাগে না। সুতরাং আমরা অনবরতই speculation করছি।

আপনারা হয়ত বলবেন কথাটি ঠিক নয়। কল্পনা আর বৈজ্ঞানিক সত্য এ দু'য়ের মধ্যে যথেষ্ট প্রভেদ আছে। আমাদের কথাটা মেনে নিলে সে প্রভেদ অস্বীকার করা হবে। কাল সূর্য্যোদয় হবে, পানীয়ে তৃষ্ণা নিবারণ হবে এগুলো কল্পনা নয়, বৈজ্ঞানিক সত্য। সুতরাং ঐগুলির ওপর ভিত্তি করে কাজে এগনো speculate করা নয়। আমরা উপস্থিত প্রশ্ন করব না, বৈজ্ঞানিক সত্য কাকে বলে। শুধু এখন যে principle of indeterminism সম্বন্ধে খুব আলোচনা বৈজ্ঞানিক মহলে চলবে তার কথা আপনাদের একবার স্মরণ করতে বলব। এ বিষয়ে অবান্তর আলোচনা করবার এখানে আমাদের দরকারও নেই, কারণ আমরাও স্বীকার করি যে, মানুষ মাত্রই স্পেকুলেটর (speculator) নয়। তা হলে স্পেকুলেটর বলতে একটি বিশেষ কোন শ্রেণীর লোক বোঝাত না।

অনিশ্চিত সম্বন্ধে কল্পনা মাত্রকেই speculation বলব না। কল্পনাটির বাস্তব হবার সম্ভাবনা কত পরিমাণ আছে তার বিচার করে তবে নির্ণয় করব কল্পনাটি speculation মাত্র, না যুক্তিযুক্ত চিন্তা বলতে মনোবিদ্‌রা যা বোঝেন তাই। সম্ভাবনার পরিমাণ নির্ণয় করবার পদ্ধতি অঙ্কশাস্ত্রের ব্যাপার। কোন একটি বিশেষ ঘটনা ঘটবার বা না ঘটবার সম্ভাবনা কতটুকু সম্ভাব্য-গণিতের বিবিধ সূত্র অনুসারে অঙ্ক কষে বার করা যায়। যা হোক, আমরা সকলেই অঙ্কশাস্ত্রবিদ্ নই কিন্তু ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে কল্পনা সকলেই করে থাকি এবং সেই কল্পনা অনুযায়ী কাজও করে যাই। সম্ভব-অসম্ভবের একটা মানদণ্ড নিজেদের অজ্ঞাতসারেই আমরা ঠিক করে নিই। শতকরা পঞ্চাশ বার যে ঘটনা পূর্ব্বে কোন একটি অবস্থায় ঘটেছে ভবিষ্যতে সেই অবস্থায় সেই ঘটনা ঘটবে কিনা সঠিক বলা যায় না, ঘটবার বা না ঘটবার সম্ভাবনা সমান সমান। কিন্তু যে ঘটনা শতকরা ৬০ বার ঘটেছে ভবিষ্যতে না ঘটবার অপেক্ষা তা ঘটবার সম্ভাবনাই কিছু বেশী। সেই রকম শতকরা যত বেশী বার পূর্ব্বে কোন ঘটনা ঘটে ভবিষ্যতে তা ঘটবার সম্ভাবনা ততই বেশী হয়। সূর্য্য এ যাবৎ প্রত্যহই উঠেছে, সুতরাং কালও তার উঠবার সম্ভাবনা খুবই বেশী। এই খুব বেশী সম্ভাবনাকেই আমরা নিশ্চিত বলে ধরে নিই। বৈজ্ঞানিক সত্য এই বেশী সম্ভাবনাই প্রকাশ করে। কারণ পুরোপুরি নিশ্চিত জ্ঞানলাভ, নিরপেক্ষ নিরঙ্কুশ সত্যের উপলব্ধি মানুষের ক্ষমতার বাইরে।

আমাদের বক্তব্য এই যে, পূর্ব্বোক্ত হিসাব অনুসারে যে ঘটনা না ঘটবার সম্ভাবনাই বেশী সেই ঘটনা ঘটবে, অথবা যা ঘটবার সম্ভাবনা বেশী তা ঘটবে না—এরূপ আশা করে যিনি কাজে, বিশেষ করে অর্থ সংক্রান্ত ব্যাপারে প্রবৃত্ত হন তিনিই স্পেকুলেটর। স্পেকুলেটারদের সাক্ষাৎ তাই শেয়ার মার্কেট এবং তদনুরূপ স্থানেই বেশী পাওয়া যায়। স্পেকুলেটরদের নিজেদের যে কোন অঙ্কের হিসাব থাকে না তা নয়—তবে তাঁদের হিসাব সাধারণ লোকের সহজ হিসাব থেকে তফাৎ হয়ে যায়। সাধারণে যা বিশ্বাস করে না তাঁরা তা করেন। বিশ্বাসের এই বিকৃতি কেন ঘটে?

প্রথমেই বলা যায় তাঁদের প্রবল ইচ্ছাই অঘটন ঘটবে এই বিশ্বাসের মূল। Their wish is father to their thought. কিসের এই প্রবল ইচ্ছা? আপাতদৃষ্টিতে মনে হয় এই ইচ্ছা অধিক অর্থ লাভের ইচ্ছা। কিন্তু অধিক অর্থ লাভ ত অন্য উপায়েও হতে পারে? অর্থলোভই যদি স্পেকুলেটরদের ব্যবসায়ের একমাত্র কারণ হয় তা হলে লোকসান হলে তাঁরা বিরত হন না কেন? বিরত হতে হয়ত কখনো কখনো বাধ্য হন কিন্তু তা বাইরের কোন কারণে, হয়ত উপস্থিত হাতে টাকা নেই বলে, কিন্তু মন থেকে তাঁদের সে ভাব যায় না। উপরন্তু প্রভূত অর্থ অন্য ভাবে পেলেও ত তাঁরা নিবৃত্ত হন না। তাঁদের ব্যবহারে আরও দেখা যায় যে, প্রথমে তাঁরা নিজেরা কিছু অর্থ ব্যয় করতে চান এবং বিনিময়ে প্রচুর অর্থ পেতে চান। মনোবিদ্যার দিক থেকে দেখলে কিন্তু অর্থ লাভটাই মুখ্য

উদ্দেশ্য বলা যায় না, কারণ অর্থনাশও যে হতে পারে এবং হয়ত তা তাঁরা বিলক্ষণ বোঝেন। তা হলে এই সিদ্ধান্তই করতে হয় যে, এই পাওয়া-না-পাওয়ার অনিশ্চয়তা হেতু আশা-উদ্বেগ মিশ্রিত মনের যে একটি চাঞ্চল্যকর উত্তেজনাময় অবস্থার সৃষ্টি হয়, সেই অবস্থাটাই তাঁদের কাম্য। তাঁরা নিজেরা এ কথা নিশ্চয়ই স্বীকার করবেন না এবং আপনারাও হয়ত স্বীকার করতে দ্বিধা বোধ করছেন। মনে করছেন ইচ্ছা করে কে আবার মনে উদ্বেগের সৃষ্টি করতে চায়? এখানে মনোজগতের একটি তথ্যের কথা আপনাদের স্মরণ করতে অনুরোধ করি। আমাদের সব কাজই আমাদের জ্ঞাত ইচ্ছানুসারে হয় না, অনেক কাজের উৎসই নির্জ্ঞানস্থিত ইচ্ছা (unconscious wish)। নির্জ্ঞানস্থিত ইচ্ছাই স্পেকুলেটরদের ঐ অবস্থায় আসতে বাধ্য করে। মনঃসমীক্ষণ (psycho-analysis) বলে স্পেকুলেটরদের নিকট অর্থ সুধু অর্থ নয় অন্য জিনিষের প্রতীক, যেমন কৃপণদেরও। মৃত্যুকাল পর্য্যন্ত কৃপণতা করে এক ব্যক্তি অর্থ সঞ্চয় করেই গেল, কোন দিন অর্থের ব্যবহার দ্বারা সুখ ভোগ সে করলে না। তার এই সঞ্চয়ের কোন সঙ্গত কারণ খুঁজে পাওয়া যায় না যদি না অর্থকে তার নির্জ্ঞানস্থিত কোন জিনিষের প্রতীক হিসাবে দেখি। স্পেকুলেটরদেরও তদ্রূপ। অর্থ ব্যয় করার বিনিময়ে অর্থ পাওয়া প্রভৃতি স্পেকুলেশন সংক্রান্ত সব কাজই নির্জ্ঞানস্থিত ইচ্ছার সহিত ঘনিষ্ঠ ভাবে বিজড়িত। সম্পূর্ণ ব্যাখ্যা করতে হলে তাই নির্জ্ঞান-স্তরে পৌঁছানো প্রয়োজন হয়।

নির্জ্ঞানের দিক থেকে দেখতে গেলে স্পেকুলেটরের অর্থ পাবার ইচ্ছা যেমন আছে, অর্থ নষ্ট করবার ইচ্ছাও তেমনি আছে। এজন্যই তিনি এমন কাজ বেছে নেন যাতে অর্থনাশের সম্ভাবনাই অধিক অথচ যাতে মনকে প্রবোধ দিতে পারা যায় যে, এই কাজে অধিক অর্থ লাভ হবে। ঝুঁকিযুক্ত কারবারে এই অর্থ লাভ এবং অর্থ নষ্ট করা উভয় ইচ্ছাই তৃপ্ত হয়। স্পেকুলেটর যেন বাধ্য হয়েই তাঁর ক্ষতিকর কাজে নামেন।

গভীর মনোবিশ্লেষণে দেখা যায় যে, অর্থলাভ ও অর্থ-নাশের ইচ্ছাদ্বয়ের প্রকৃত স্বরূপ যথাক্রমে অর্থ পাওয়া বা আদায় করা এবং অর্থ দেওয়া বা ঠকা। মনোবিদ্ দেখেছেন যে, অর্থ পাওয়ার পশ্চাতে স্ত্রীসুলভ সন্তান পাওয়ার ইচ্ছা বর্ত্তমান। অর্থ আদায়ের পশ্চাতে সন্তানের জন্ম দিয়া তাহার পিতা হবার পুরুষসুলভ ইচ্ছা বর্ত্তমান। এক্ষেত্রে অর্থ সন্তানের প্রতীক। অর্থ দান পুরুষসুলভ ইচ্ছা এবং ঠকবার ইচ্ছার পশ্চাতে স্ত্রীভাব বা passive homosexuality বা ভোগযুক্ত সমকামিতা বর্ত্তমান। অর্থ যেমন সন্তানের প্রতীক সেইরূপ অর্থ বীর্য্যেরও প্রতীক। শিশুমনে আবার অর্থ মলের প্রতীক। নর-নারীনির্ব্বিশেষে প্রত্যেকের ভেতরই অল্পবিস্তর স্ত্রীসুলভ ও পুরুষসুলভ উভয় প্রকৃতিই বর্ত্তমান। আবার পরিণত-বয়স্ক ব্যক্তিরও নির্জ্ঞানমনে শিশুসুলভ মলপ্রীতি দেখা যায়। এ সব কথায় হঠাৎ হয়ত কারুর বিশ্বাস হবে না, কিন্তু মনঃসমীক্ষণদ্বারা বহুক্ষেত্রেই এর যাথার্থ্য প্রতিপন্ন হয়েছে। বিশেষ বিশেষ কারণে এবং শৈশবের বিশেষ বিশেষ পরিগমে পুরুষ-প্রকৃতি, স্ত্রীপ্রকৃতি, সমকামিতা প্রভৃতি যৌন লক্ষণের স্বাভাবিক পরিণতির ব্যাঘাত ঘটে আর তখনই নানা প্রকার মানসিক বিকারের বীজ রোপিত হয়। পরবর্ত্তীকালে এই বীজ নানা ভাবে পরিণতি লাভ করে। কখনও এই কারণে মানসিক রোগ উৎপন্ন হয় কখনও বা ব্যক্তিত্বের অস্বাভাবিক বিকৃতি ঘটে। কেহ বা কৃপণ হয়, কাহারও বা স্পেকুলেটর হবার আগ্রহ জন্মায়। স্পেকুলেটরের মনোবৃত্তির উৎপত্তি-ব্যাপার অতিশয় জটিল। একটি বাস্তব উদাহরণের সাহায্যে কতকটা বুঝাবার চেষ্টা করছি। 'ক' বাবু পিতামাতার জ্যেষ্ঠ সন্তান। শৈশবে তিনি মাতার বহু তাড়না ভোগ করেছেন এবং পিতার অতিরিক্ত আদর পেয়েছেন। ছেলেবেলায় পাঁচ-ছয় বছর বয়সে তাঁর কতকগুলি বৈশিষ্ট্য দেখা গেল। তিনি থুথু গিলতে ভয় পেতে লাগলেন। তাঁর মনে হতে লাগল থুথু গিললে যেন বিষ খাওয়া হবে। তাঁর আরও একটা ভয় দেখা গেল বুঝি বা পেছন থেকে কে তাঁকে আক্রমণ করলে।

বয়ঃসন্ধিকালে পুরুষের স্ত্রীলোকের প্রতি যে স্বাভাবিক আকর্ষণ দেখা যায় তা তাঁর মধ্যে মোটেই দেখা গেল না। তিনি অপর বালকের সঙ্গে প্রেম-সম্বন্ধের জন্য আগ্রহান্বিত হলেন। লেখাপড়ায় তিনি বরাবরই ভাল। বি-এ পরীক্ষা পাস করার পর পিতামাতা তাঁর বিবাহের চেষ্টা করলেন, কিন্তু তিনি তাতে রাজি না হয়ে সংসার ত্যাগ করে এক আশ্রমে ধর্ম্মজীবন যাপন করবেন ঠিক করলেন। কিন্তু সেখানে গিয়ে তাঁর এক অদ্ভুত প্রবৃত্তি দেখা দিল। পুরুষ বা স্ত্রীলোক কেহ শৌচে বসলেই তাদের দেখবার তাঁর দুর্দ্দমনীয় আগ্রহ হতে লাগল। নানা যৌগিক প্রক্রিয়ার সাহায্য নিয়েও তিনি মনকে ফেরাতে পারলেন না, অবশেষে আশ্রম ত্যাগ করে সংসারে এলেন। প্রথমটা দিনকতক শিক্ষকতা করলেন পরে তিনি ফাটকায় প্রবৃত্ত হলেন। ফাটকার উত্তেজনায় নেমে তাঁর যৌন-বিকারের লক্ষণগুলি সেরে গেল ও তখন তিনি বিবাহ করলেন। দুঃখের বিষয় তিনি তাঁর স্ত্রীকে পুরোপুরি ভালবাসতে পারেন না এবং স্ত্রীর সঙ্গে মনোমালিন্য ঘটলেই পিছু দিক থেকে কেউ তাঁকে

আক্রমণ করবে বাল্যকালের সেই ভয় পুনরায় তাঁর মনে দেখা দেয়। পশ্চাৎ হতে আক্রান্ত হবার ভয় ভোগবৃত্তি সমকামিতার ইচ্ছার রূপান্তর। ফাটকায় নেমে লোকসান হলে সমকামিতার ইচ্ছা গৌণভাবে চরিতার্থ হয়। আবার এই ইচ্ছাকে দমিত রাখবার জন্য কর্ম্মবৃত্ত পুরুষভাবকে অতিরিক্ত মাত্রায় জাগাতে হয় তাতে অপরের নিকট হ'তে টাকা আদায়ের ইচ্ছা ও পরকে ঠকাবার ইচ্ছা মনে জাগে, ফাটকায় জিতলে এই ইচ্ছা তৃপ্ত হয়। স্মরণ রাখতে হবে যে, সকল ফাটকা-কাজের নির্ব্বাচনের মনোবৃত্তি এক প্রকারের নয়—এখানেও বৈচিত্র্যের অভাব নেই। এই আলোচনায় ফাটকা-কাজের নির্ব্বাচন মনের এক অংশ মাত্র দেখাবার চেষ্টা করা গেল।*

---

* অল-ইণ্ডিয়া রেডিও কলিকাতা কেন্দ্রে প্রদত্ত বক্তৃতা।

সেতু

শ্রীহেমেন্দ্র মল্লিক

১

সপ্তাহব্যাপী গৃহ-সম্মিলন সমাপ্ত হইল। শেষদিনের প্রার্থনা-সভা অনেক রাত্রে ভাঙিল। রাত্রি সাড়ে এগারটার সময়ে সভা ভঙ্গ করিয়া আমরা চ্যাপেলের প্রশস্ত বারান্দায় আসিলাম। আকাশে চৈত্রের শুক্লা চতুর্দ্দশী অতি মনোমুগ্ধকর বিজ্ঞাপনের আয়োজন করিয়াছিল। তিন-চার ঘণ্টা একটানা ধর্ম্ম-বিষয়ক আলোচনার পরে এ দৃশ্যে সকলেরই মনে একটা অপূর্ব্ব আবেশের সৃষ্টি করিয়াছিল।

নৈশ আহারের দুর্ভাবনা ছিল না। রাত্রি নয়টার অর্দ্ধ ঘণ্টার বিরতির সময়েই আমাদের সকলের আহারাদি হইয়া গিয়াছিল।

চন্দ্রালোকিত বারান্দায় আসিয়া অধিকাংশ সভ্যই চেয়ারে, বেঞ্চে ও দীর্ঘ সিঁড়ির ধাপের উপরেই বসিয়া পড়িলেন। ফরক্কাবাদ হইতে আগতা তিনটি তরুণী মিশনরী স্বপ্ন-সদৃশ এই চৈত্র-পূর্ণিমাকে আর এড়াইতে পারিলেন না। পরিষ্কার সুললিত কণ্ঠে, "মুনলাইট সোনাটা" আরম্ভ করিয়া দিলেন। বারান্দার চেয়ার হইতে আর একজন মাউথ-হারমোনিয়ামে তাঁহাদের গানের সঙ্গে যোগ দিলেন। দেখিতে দেখিতে গান রীতিমত জমিয়া উঠিল।

আমরা চার-পাঁচ জন সম্মুখের উদ্যানে পায়চারি করিতেছিলাম। সুগায়ক ও সুকবি সত্যেন থাকিতে না পারিয়া কহিল, মেম-সাহেবদের গান শেষ হলে রবিবাবুর একটা গান ধরে দেব, তুমি ভাই যোগ দিও!

বুঝিলাম, এমন কবিত্বময় চাঁদিনী নিশীথে হাজার মধুকণ্ঠ-নিঃসৃত হইলেও ইংরেজী গানে তাহার গায়ক-চিত্ত তৃপ্ত হইতে পারিতেছে না।

কিন্তু তাহার বাসনা পূর্ণ হইল না। বারান্দার অপর প্রান্ত হইতে একটি হিন্দুস্থানী সভ্য বলিয়া উঠিলেন, কাল সকালের গাড়ীতে আমাদের সঙ্গে ফিরতে চান কেউ? ভোর রাত্রে ট্রেন ছাড়বে। কানপুরে থামব আমরা শহর দেখবার জন্ত!

ইতিমধ্যে মেম-সাহেবদের গান শেষ হইয়াছিল। আমরা একত্রিত হইয়া দেশে ফিরিবার আলোচনায় প্রবৃত্ত হইলাম। দেখা গেল, সম্মিলনে যোগদানকারী পঁয়তাল্লিশ জনের মধ্যে আমাদের সঙ্গী হইবার মত ছিলেন প্রায় ত্রিশের কাছাকাছি।

ফিরিবার পথে কয়েক স্থানে থামিয়া বিভিন্ন শহর দেখিয়া লইবার সিদ্ধান্তই গৃহীত হইল। অবশেষে হাসাহাসি, বিদায়-গ্রহণ ও করমর্দ্দনের পালা শেষ করিয়া আমরা যখন নিজ নিজ নির্দ্দিষ্ট কক্ষে ফিরিয়া আসিলাম, তখন রাত্রি বারটা বাজিয়া গিয়াছে।

রয়্যাল রি-আর্মামেণ্ট অভিযানের কল্যাণে ভারতবর্ষের বিভিন্ন জেলা ও শহর হইতে আগত বিভিন্ন জাতীয় পঁয়তাল্লিশ জন নরনারীর প্রার্থনা-সম্মিলন আমাদের অতিশয় আন্তরিকতা, প্রীতি ও সহৃদয়তার মধ্যেই সমাপ্ত হইল। সাত দিন যাবৎ লক্ষ্ণৌ শহরের এই সুদৃশ্য বাগানবাড়ীতে আমাদের এই গৃহ-সম্মিলনী— বহু গুরুতর ও জটিল বিষয়ের আলোচনা হইয়াছে। রাত্রে স্মরণ করিয়া ইহারই বিষয় চিন্তা করিতে করিতে আমরা ঘুমাইয়া পড়িলাম।

২

পরদিন প্রাতঃকালে কানপুর সেন্‌ট্রাল ষ্টেশনে যখন আমরা গাড়ী হইতে অবতরণ করিলাম তখন বেলা সাড়ে-সাতটা।

প্রাতঃকৃত্য গাড়ীতেই সমাধা হইয়াছিল। নানাপ্রকার হর্ষধ্বনি ও কোলাহল করিয়া আমরা আটাশ জন কেলনারের দুইখানি প্রকাণ্ড বেঞ্চে বসিয়া পড়িলাম।

সে এক অপূর্ব্ব দৃশ্য!

দশ-এগার জন ইউরোপীয় তরুণ-তরুণী, দুই জন মাদ্রাজী, চার-পাঁচ জন হিন্দুস্থানী এবং বাকি দশ জন আমরা বাঙালী। আমাদের দশ জনের মধ্যেও তিন জন মহিলা ছিলেন। কোট-প্যাণ্ট, পাগড়ী-আচকান, শাল-আলোয়ান, ফ্রক-শাড়ী এবং পায়জামা ও ধুতির এই অদ্ভুতপূর্ব্ব সংমিশ্রণ এবং তাহাও

মাত্র দুইখানি বেঞ্চের মধ্যেই কানপুর ষ্টেশনে ইতিপূর্ব্বে কখনও ঘটিয়াছে বলিয়া মনে হইল না। ঘটিলে এত অল্প সময়ের মধ্যে আমাদের ঘিরিয়া কৌতূহলীদের এত বড় ভীড় জমিত না।

একটি ভদ্রলোক আমাদের দলের পুরোবর্ত্তী এক জনকে অতি বিনীত ভাবে প্রশ্ন করিলেন—আমরা কে? কংগ্রেসী নিশ্চয়ই নহি, কেননা, সেক্ষেত্রে সঙ্গে সাহেব-মেম থাকা সম্ভব নয়। কোনপ্রকার পতাকা বা পরিচয়-জ্ঞাপক কোন চিহ্নও নাই। আমরা তাহা হইলে কে? কানপুরে আমাদের কি প্রয়োজন?

কাছাকাছি এক জন সহাস্যে জবাব দিলেন, আমরা খ্রীষ্টান। খ্রীষ্টের শিষ্য বলেই এত ভাষাভাষী ও ভিন্ন দেশীয় হয়েও আমাদের এই সম্মিলন সম্ভব হয়েছে। কেবল কানপুর নয়, পৃথিবীর সর্ব্বত্রই সহযোগিতা ও ভ্রাতৃত্বের মতবাদকে প্রচার করাই আমাদের ব্রত।

চায়ে চুমুক দিতে দিতে আমারও বার বার এই কথাটিই মনে জাগিতে লাগিল। বাস্তবিক! জাতি-বর্ণ-সামাজিক রীতি-পদ্ধতি ও বাসস্থান নির্ব্বিশেষে জগতের সমস্ত নরনারীকে এক সূত্রে ও এক বন্ধনে বাঁধিবার এত বড় সহজ উপায় ত আর কেহ কোন দিন দেখাইতে পারিলেন না? পৃথিবীর ইতিহাসে ত সেরূপ একটি চরিত্রেরও উল্লেখ পাওয়া যায় না?

আমার সর্ব্বদেহ রোমাঞ্চিত হইয়া উঠিল। কত বড় মীমাংসা, কত বড় ঐশ্বর্য্য আমাদের হাতে আছে—অথচ, এই মহাসঞ্জীবনী মন্ত্র, ক্ষত-বিক্ষত মানব জাতির এই অমোঘ শান্তি-প্রলেপের অধিকারী হইয়াও আজ পৃথিবীর অধিকাংশ দুর্গতি ও দুঃখের জন্য দায়ী এই খ্রীষ্টীয় জগৎ! সর্ব্বাপেক্ষা মহান্ দায়িত্ব যাহাদের উপরে, তাহারাই আজ হীনতম ও নিকৃষ্টতম অপকার্য্যে ব্যাপৃত!

চা খাওয়া শেষ হইল।

কেলনারের কর্ম্মচারী সিগারেটের একটি সুদৃশ্য টিন আমাদের সম্মুখে রাখিয়া গেল। দামী ও উৎকৃষ্ট সিগারেট হইলেও টিনটি পড়িয়াই রহিল। দলের কেহই আমরা ধূমপান করি না। অন্ততঃ সাত-আট মাস পূর্ব্বে অভিযানে নাম স্বাক্ষর করিবার দিন হইতেই ও বস্তুটি আমরা পরিত্যাগ করিয়াছি। প্রবল ইচ্ছাশক্তি ও মানসিক দৃঢ়তার বলেই ইহা সম্ভব হইলেও এ কথা আমরা কেহই অস্বীকার করি না যে, ঈশ্বরে গভীর বিশ্বাস ও আস্থার বলেই এই কঠিন পরীক্ষায় বহু দুর্ব্বল মুহূর্ত্তকেও আমরা অনায়াসে পরাজিত করিতে পারিয়াছি।

আমরা উঠিয়া পড়িলাম।

আটাশ-ত্রিশ জনের এক জনও একটি সিগারেট ধরাইলাম না দেখিয়া একবার মনে হইল যেন কেলনারের সব কয়টি কর্ম্মচারী, মায় ষ্টেশনের বহু লোকও আমাদের দিকে অবিশ্বাসের দৃষ্টিতে চাহিয়া রহিল!

৩

মিউটিনি মেমোরিয়াল!

ঐতিহাসিক গুরুত্বপূর্ণ এই স্মৃতিস্তম্ভটির সম্মুখে দাঁড়াইয়া সহসা আমার মন যেন কি অব্যক্ত আশঙ্কায় একবার দুলিয়া উঠিল।

সিপাহী বিদ্রোহের ইতিহাস জানে না এমন কেহই ছিল না আমাদের মধ্যে। বিদ্রোহের সময়ে উত্তেজিত ও ক্ষুব্ধ দেশীয় সৈন্যদের হাতে যে সকল ব্রিটিশ কর্ম্মচারী প্রাণ দিয়াছিলেন তাঁহাদের স্মৃতির উদ্দেশ্যেই এই স্তম্ভটি রচিত।

স্তম্ভটি এক দিকে যেমন গভীর পরিতাপ ও ক্রোধের সঞ্চার করে, অন্য দিকে ভারতীয় অন্তরেও তেমনই আর এক প্রকারের পরিতাপ ও ক্রোধের উদ্রেক করে। এক জন ভারতীয় ও এক জন ইংরেজের মধ্যে গভীর ঘনিষ্ঠতা ও বন্ধুত্ব থাকিলেও এই স্মৃতিস্তম্ভের সম্মুখে দাঁড়াইয়া অবিচলিত থাকা ও সেই মধুর সম্পর্কের সম্মান অক্ষুণ্ণ রাখা অতিশয় কঠিন ব্যাপার! নিজের অজ্ঞাতেই মনে মনে প্রার্থনা উচ্চারণ করিতেছিলাম, হে ঈশ্বর, হে সর্ব্বদর্শী মঙ্গলময় জগদীশ্বর, এই দুরূহ পরীক্ষায় তুমি শান্তি ও সম্প্রীতির সহিত আমাদের উত্তীর্ণ করিয়া দাও!

কিন্তু সর্ব্বশক্তিমান ভগবান্ নিজেই বোধ হয় ফলাফল দেখিবার জন্য এই কঠিন পরীক্ষাটির আয়োজন করিয়াছিলেন। পর মুহূর্ত্তেই ইহার শোচনীয় প্রমাণ পাওয়া গেল!

গত রাত্রের গায়িকা, ফয়জাবাদ মিশনের তরুণী তিন জন নিতান্ত অকস্মাৎই উচ্ছ্বসিত ও গর্ব্বিত কণ্ঠে আমাদের পরীক্ষাকে রীতিমত অগ্নিপরীক্ষায় পরিণত করিয়া গান ধরিলেন,—

> "Rule Britannia,
> Britannia rules the waves……"

মিউটিনি মেমোরিয়াল স্থাপিত করিবার সময়ে নির্ম্মাণ-কর্ত্তাদের মনে কি ছিল জানি না, তবে যুগ যুগ ধরিয়া ভারতবর্ষ ও ব্রিটেনের মধ্যে রেষারেষি ও শত্রুতার সম্পর্ককে জিয়াইয়া রাখিবার জন্য নিশ্চয়ই নহে। তাহা হইলে শান্তি ও সদ্ভাবের সহিত এদেশ শাসন করিবার এই যে সদিচ্ছার কথা তাঁহারা প্রচার করেন—তাহা মিথ্যা হইয়া যায়!

গানের প্রথম লাইন শেষ হইবার আগেই দেখা গেল, আমাদের সম্মিলিত দলের মধ্যে ধীরে ধীরে একটা অদৃশ্য প্রাচীর গড়িয়া উঠিল। মাথা নত করিয়া আমরা যেন কি এক অদৃশ্য শক্তির আকর্ষণে দলের এক দিকে আসিয়া দাঁড়াইলাম। রুল ব্রিটানিয়ার উচ্চ প্রাচীরের অপর দিক হইতে যেন ঐ আট-দশ জন ইংরেজ তরুণ-তরুণীর গর্ব্বোদ্ধত গানের ঢেউ ভাসিয়া আমাদের দিকে আসিতে লাগিল!

গভীর বেদনায় আমার সমস্ত অন্তরখানি যেন মুচড়াইয়া উঠিতে লাগিল। স্বাধীনতা-সংগ্রামের প্রথম প্রতীক এই স্মৃতি-

স্তম্ভের সম্মুখে দাঁড়াইয়া কোন ভারতীয়ের পক্ষেই 'রুল ব্রিটানিয়া'কে বরদাস্ত করা সম্ভব নয়।

ওদিকে ভ্রান্ত উত্তেজনায় মাতিয়া উহারা সকলেই ক্রমে যেন অধিকতর উৎসাহ ও উদ্দীপনার সহিত উহাদের জাতীয় ঔদ্ধত্যের বিজ্ঞাপন দিতে বদ্ধপরিকর হইল। সমধর্ম্ম ও ভ্রাতৃত্বের মধুর সম্পর্কের কথা উহারা যেন ক্ষণকালের জন্য সম্পূর্ণরূপে বিস্মৃত হইল!

সকলেই সংযতমনা হইলেও অপমান ও বেদনায় আমরা অস্থির হইয়া উঠিলাম! মুহূর্ত্তের জন্য আমার মনে হইল, সুদূর দ্বীপবাসী এই উদ্ধত ও গর্ব্বিত শ্বেত জাতি কিসের অধিকারে আজ আমার মাতৃভূমির বক্ষে দাঁড়াইয়া আমাকে সাক্ষী রাখিয়া এই সঙ্গীত গায়? আমার ধর্ম্মভাব ও প্রীতির সুযোগ লইয়া এত বড় হীনতা ও নির্ব্বুদ্ধিতার পরিচয় উহারা কেন দেয়?

দাঁতে দাঁত চাপিয়া নিজেকে সংযত করিবার চেষ্টায় অন্য দিকে দৃষ্টি ফিরাইলাম। দেখি, কবিভাবাপন্ন সত্যেন রুমাল দিয়া ঘন ঘন চোখ মুছিয়াও যেন স্থির হইতে পারিতেছে না।

৭

গান থামিল।

প্রকাশ্য ভাবে অপমানজনক প্রহার স্থগিত হইলেও নিদারুণ অসম্মান ও বেদনার পীড়ন যেন কিছুতেই ভুলিতে পারিতেছিলাম না।

সত্যেনের গায়ক কণ্ঠ অকস্মাৎ আত্মপ্রকাশ করিল। এতক্ষণের পরিতাপ ও লাঞ্ছনা ভোগের পরে আর থাকিতে না পারিয়া সে এই অভিনব উপায়ে তাহার ও আমাদের সকলের অপমানিত আত্মমর্য্যাদার পুনঃপ্রতিষ্ঠা করিতে চাহিল। দেখিতে দেখিতে সকলেই গানে যোগ দিলাম,

"জনগণমন অধিনায়ক জয় হে,
ভারতভাগ্যবিধাতা।..."

পনর-ষোলটি তরুণ কণ্ঠের সম্মিলিত সঙ্গীতে আর একবার প্রভাতী আবহাওয়া মন্ত্রিত ও প্রকম্পিত হইয়া উঠিল!

জীবনে বহুবার ঐ গানে যোগ দিয়াছি, কিন্তু সেদিন প্রাতে, সেই বেদনাক্ষুব্ধ হৃদয় ও পদদলিত আত্মমর্য্যাদাকে বক্ষে লইয়া যে গান করিলাম, সঙ্গীতশাস্ত্রে তাহার স্থান যেখানেই হোক, সান্ত্বনা ও তৃপ্তির দিক হইতে সে স্মৃতি আজও আমি ভুলিতে পারি নাই। মনে হয়, সেদিনের সেই গানে আমাদের ষোল জন তরুণ-তরুণীর কণ্ঠের মধ্যে যেন অপমানিত ও উৎপীড়িত সমগ্র ভারতবর্ষ ও তাহার অসংখ্য সন্তানের প্রতিবাদধ্বনি ঝঙ্কৃত হইতেছিল।

কিন্তু গানের মধ্যেই সর্ব্বদর্শী বিধাতা যেন এইবার তাঁহার কৃপা ও আশীর্ব্বাদের মঙ্গলবারি বর্ষণ করিলেন।

সর্ব্বাপেক্ষা বয়োজ্যেষ্ঠ ইংরেজ যুবকটি মাথার টুপি খুলিয়া ও মাথা নীচু করিয়া আমাদের পাশে আসিয়া দাঁড়াইলেন এবং অনভ্যস্ত কণ্ঠে আমাদের গানে যোগ দিলেন!

দেখা গেল এই এক জনের দৃষ্টান্তেই বাকি কয়জনেরও যেন সম্বিৎ শুভবুদ্ধির পুনরুদ্রেক হইল। একে একে সকলেই তাহারা টুপি খুলিয়া আমাদের কাছে আসিয়া দাঁড়াইল।

গানের সমস্তটা কাহারও জানা ছিল না। দুইটি অন্তরা গাহিয়া গান সমাপ্ত হইল। বয়ঃপ্রবীণ ইংরেজ বন্ধুটির দৃষ্টান্তেই সেদিনকার অপ্রীতিকর পরিস্থিতিটির শুভ সমাপ্তি ঘটিল! ফরজাবাদের সেই তরুণী যেন তিনটি সর্ব্বাগ্রে আসিয়া আমাদের সহিত করমর্দ্দন করিয়া বিনীত কণ্ঠে কহিলেন, আমাদের ক্ষমা করুন বন্ধুগণ—আমরাই অপরাধী!

"সুখে আছি"

শ্রীশঃ

১৯৪৬ খ্রীষ্টাব্দের কথা—কাহিনী নহে। দূর-সুদূরান্তেও না—বাংলার চট্টগ্রামে, যাকে পাকিস্তানীরা এছলামাবাদ বলেন। মফঃস্বলের এক মহকুমা হইতে বন্ধুবর জানিতে চাহিলেন—কেমন আছি। পত্রোত্তরে লিখিলাম—সুখে আছি, পরম সুখে। বন্ধুটি কৌতূহলী হইয়া লিখিলেন, সরবরাহ কি ঐ রকমের কোনো একটা দপ্তরে নিশ্চয়ই আপনি কোনো key postএ আছেন, এই দুর্দ্দিনে আমার যদি কোন একটা···। বন্ধুটি খুব সরলপ্রাণ, অমায়িক মানুষ—প্রাণটা বিলাইয়া দিবার নিমিত্ত হাত দুইখানি সর্ব্বদাই প্রসারিত করিয়া আছেন। প্রত্যুত্তরে লিখিলাম, বন্ধু হে! সরবরাহ বিভাগের কর্ম্মচারীরাই আজ বাদে কাল সুবার্ত্তের তকমা পরিয়া বাহির হইবার জন্য প্রস্তুত হইয়া আছেন। এ সময়ে আসবেন না, মাথা-গুণতি রেশন—আবার বরাদ্দও কমিয়া গিয়াছে, আতিথেয়তার পুণ্য সঞ্চয় করাও চলিবে না।

কবি লিখিয়াছিলেন, "রাতে মশা দিনে মাছি, তাই নিয়ে কলকাতায় আছি।" থাকি আমি দূরে মফঃস্বলে—মশামাছির খোঁজ-খবর করিবার ফুরসত আমার নাই। তবে বর্ত্তমানে নিকর্ম্মা হইয়াও খুবই কর্ম্মব্যস্ত আর শশব্যস্ত আছি। জীবনযাত্রা নির্ব্বাহের জন্য বেশ অবিরাম খাটিয়া-খুটিয়া—চলিয়াছি—যাহা কর্ম্ম-জীবনেও অনাস্বাদিত ছিল।

ধারাবাহিক ভাবে আমার সুখের পর্য্যালোচনা করিব এবং আমার এই অনাস্বাদিতপূর্ব্ব সুখের পশ্চাতে যে ইতিহাস রহিয়াছে তাহাও নিবেদন করিব। সুখ আমার হাতে সঙ্কটে দাঁড়াইয়াছে—সেই সুখ-সঙ্কট সর্ব্বত্র, সর্ব্বধারায়।

বর্তমানে সুখ-সঙ্কটের দ্বন্দ্ব সাধনায় যে চতুর্বর্গ ফললাভ করিয়াছি তাহাই এই প্রবন্ধের আলোচ্য বিষয়।

১। গৃহ-সুখ-সঙ্কট

ভদ্রাসন বাড়ীখানি বহুকাল যাবৎই হাতছাড়া—ভারতরক্ষা আইনের নাগপাশে মিলিটারী কর্তৃপক্ষের কবলগত। যুগ-যুগান্ত প্রবাস-বাসের পর তখন সবেমাত্র ফিরিয়া আসিয়াছি একমাত্র আশ্রয়স্থল ভদ্রাসন বাড়ীতে; সঙ্গে সঙ্গেই উচ্ছেদসাধন! পুরুষানুক্রমে সঞ্চিত তল্পিতল্পা গরু বাছুর লইয়া কক্ষচ্যুত গ্রহের মত ছুটিয়া পড়িলাম একেবারে তেপান্তরের মাঠে—সপরিবারে! তার পর কয়েকটা বৎসর চাকুয়ো ভাইয়ের পান্থশালায় ঘেঁসাঘেঁসি ঠাসাঠাসির ভিতর সহিষ্ণু জন্তুর মত চালাইয়া দিলাম। বিজয়-দুন্দুভি যখন বাজিয়া উঠিল, তখন কত না ভরসা, কত না আনন্দ বুকে করিয়া ফিরিয়া আসিলাম আমার জন্মভূমিতে—নিরাশ্রয় জনের আশ্রয় মিলিবে নিজেদের ভদ্রাসনবাড়ীতে এই বিপুল উৎসাহে। কিন্তু, কাণা মেঘের বৃষ্টি, সর্ব্বত্র নহে বৃষ্টি—আশ্রয় কোথাও জুটিল না; অগত্যা শরণ লইলাম Admin. Comdt. প্যাটন সাহেবের। তিনি আমার দুর্দশার কাহিনী শুনিয়া দয়ার্দ্রচিত্ত হইলেন, কিন্তু আমার ভদ্রাসন বাড়ীখানি অচিরকালমধ্যে কবলমুক্ত করিতে পারিবেন না, তাহাও বলিলেন। সামরিক বিভাগের ইংরেজ হইলে কি হয়—বড় ভাল মানুষ লেঃ কর্ণেল প্যাটন সাহেব; আর তাঁহাদের সংস্পর্শে যাঁহারা আসিয়াছেন তাঁহারা অবশ্যই জানেন, ইংরেজ মাত্রেই মন্দ নহেন—অতি সজ্জন, মহানুভব ও উদারচিত্ত মানুষও তাঁহাদের মধ্যে অনেক আছেন। তিনি এবং তাঁহার S. S. O. আমাকে আশ্রয় দান করিতে চেষ্টার ত্রুটি করেন নাই। এমনকি, এক দিন আমাকে তাঁহার মোটর গাড়ীতে লইয়া ঘুরিয়া ঘুরিয়া ১৩০।১৩১ এবং ১৫৮ নং হোল্ডিংয়ের বাড়ী তিনখানা দেখিয়া আসিয়া ঐগুলি কবলমুক্ত করিবার ব্যবস্থাও করিলেন, অধিকন্তু ১৬ই জানুয়ারী ২০০।৯।৪।২৬ নং চিঠিতে স্থানীয় ডিষ্ট্রিক্ট ম্যাজিষ্ট্রেটকে লিখিলেন,

"... Every assistance be given to him. His case has been investigated by this H. Q. and it is strongly recommended. ... The **holdings** under reference have been put up for de-requisitioning by this H.Q. and if you can arrange for one of these properties to be rented by him until his own can be released, it would be greatly appreciated."

ভাবিলাম, ভগবান বুঝি সদয় হইয়া এতদিনে অগতির গতি করিলেন, কিন্তু ভগবানের উপরও যে আমলাতন্ত্রের ভাগ্যনিয়ন্তারা বিরাজ করিতেছেন, তাহা প্যাটন সাহেবের হয়ত জানা ছিল না। বাড়ীগুলি মিলিটারী-কবলমুক্ত হইবার সঙ্গে সঙ্গেই সেগুলিতে ভাগ্যবানেরা সুপ্রতিষ্ঠিত হইলেন! ১৮ই ফেব্রুয়ারী Land Acquisition আপিসে গিয়া জানিলাম, প্যাটন সাহেবের চিঠিখানা ঐ আপিসে আসিয়াছিল বটে, কিন্তু সম্প্রতি নিখোঁজ। সুদীর্ঘ কর্মজীবনে বৈষ্ণবোচিত বিনয়ে এবং ঐকান্তিক নিষ্ঠায় রাজপুরুষের ভক্তাগ্রগণ্যই ছিলাম—অদ্যাপি তাঁহাদের অনেকেরই কৃপা হইতে বঞ্চিত হয় নাই। আমার কপালেই যখন অষ্টরম্ভা, অন্যে পরে কা কথা?

২। খাদ্য-সুখ-সঙ্কট

শহরের খাদ্য রেশনিং সম্পর্কীয় ২নং বিজ্ঞপ্তিতে সর্ব্বপ্রথম ১লা ফেব্রুয়ারী অবগত হইলাম যে, গবর্ণমেণ্ট নিযুক্ত রিটেল দোকানে ২৯শে জানুয়ারী হইতে নূতন রেশনকার্ড রেজেষ্টারী হইতেছে, তখনই নূতন রেশনকার্ডের জন্য আর্জি পেশ করিলাম। রেশনিং বিভাগের জনৈক কর্মচারী আমার প্রতিবেশী ছিলেন, কাজেই দু-টাকা গাড়ী ভাড়া দিয়া ১২ই তারিখে তাঁহার আপিসের দপ্তরখানা হইতে কার্ড কয়খানা সদ্য প্রস্তুত করিয়া আনিতে হইল। অতঃপর ঐ দিনই যথাকালে আমার বর্তমান নির্জ্জলা ও নিষ্প্রদীপ বাসস্থানের সন্নিকটে সাব্-এরিয়ার রেশন দোকানে দোকানীর শ্রীহস্তে কার্ডগুলি রেজেষ্টারী করাইবার বাসনায় অর্পণ করিলাম। তিনি সন্ধ্যা ৬॥ ঘটিকা পর্য্যন্ত আড়াই ঘণ্টা কাল আমাকে তীর্থের কাকের মত তাঁহার খাস কামরায় দাঁড় করাইয়া রাখিয়া পরদিন সকাল ৮টার পর হাজির হইতে আদেশ করিলেন। বলা বাহুল্য কার্ডগুলি তিনি নিজের জিম্মায় রাখিলেন। "যে আজ্ঞা" বলিয়া সেই দিনের মত বিদায় লইয়া আসিলাম এবং তৎপর দিবস যথাকালে তাঁহার এজলাসে হাজির হইলাম; কিন্তু, আমার দুর্ভাগ্য, কার্ডগুলি তিনি রেজেষ্টারী না করিয়াই আমাকে প্রত্যর্পণ করিলেন। নিরুপায় হইয়া শেষে অর্দ্ধ মাইল ব্যবধানে অবস্থিত আর এক গবর্ণমেণ্ট নিযুক্ত দোকানে কার্ডগুলি রেজেষ্টারী করিয়া লইতে হইল। টাউন রেশনিং অফিসারের নিকট অভিযোগ করিয়াছিলাম বটে, কিন্তু অপর অপর ক্ষেত্রে যাহা হইয়া আসিতেছে, এক্ষেত্রেও তাহার অন্যথা হইল না।

তার পর খাদ্যদ্রব্য তো বরাদ্দ মাফিক ঘরে আনিলাম, কিন্তু কয়লা আর জোটে না, নির্দ্দিষ্ট আড়তে কয়লা ছিল, কিন্তু দপ্তরখানায় মুদ্রিত ছাড়পত্রের অভাব হইয়া পড়িল।

৩। বস্ত্র-সুখ-সঙ্কট

বস্ত্রের কুপন আদায় করিতে গলদ্ঘর্ম হইতে হইয়াছিল। গত অক্টোবর মাস হইতে আমাদের বস্ত্র আর সংগ্রহ করিতে পারি নাই। যাহা হউক, গত ১৭ই ফেব্রুয়ারী তারিখে স্থানীয় সাব্-এরিয়া আপিসের দপ্তরখানা হইতে কায়ক্লেশে ৬৬১৪৬-৬৬১৪৭ নম্বরের কুপন সংগ্রহ করিলাম বটে, কিন্তু লাগে তীর না লাগে তুকো! দোকানে দোকানে ঘুরিয়া

হয়রাণ হইলাম—না জুটিল ধুতি না জুটিল শাড়ী। শুনিয়াছিলাম যে গত জুলাই মাসে কর্তৃপক্ষ একটি ফতোয়া জারি করিয়া নির্ব্বাচিত বস্ত্রব্যবসায়ীদের উপর এই নির্দ্দেশ দিয়াছিলেন যে তাঁহারা যেন তাঁহাদের দোকানে কত মাল মজুত আছে, সে সম্বন্ধে কোন খবর ওয়ার্ড কমিটিগুলিকে না দেন; কিন্তু এই খবর তো পাই নাই যে কর্তৃপক্ষ নিজেরাও সেই খবর লাভের সৌভাগ্য হইতে স্বেচ্ছায় বঞ্চিত হইয়া আসিতেছেন! স্থানীয় রেলওয়ে কো-অপারেটিভ সোসাইটিতে মিহি ও ভাল শাড়ী এবং ধুতি ও ছিটের বস্ত্র দেওয়া হইয়াছিল, তন্মধ্যে ন্যূনাধিক ১৫০ জোড়া Superfine texture-এর ধুতি ও ঐ পরিমাণের শাড়ী পুলিস বিভাগের কর্মচারীর জন্য বরাদ্দ করিয়া রাখা হইয়াছিল বলিয়া শুনিয়াছি; তারপর সর্ব্বসাধারণ্যে যে কুপন দেওয়া হইয়াছিল ঐগুলি সেখানে একেবারে অচল। Special permit ক্ষেত্র ও পাত্র বিশেষে দেওয়ার ব্যবস্থা হইয়াছিল এবং ঐ ধরণের special permit কেহ কেহ দুই-তিন টাকা দিয়া প্রাপকের নিকট হইতে ক্রয় পূর্ব্বক চাহিদা মিটাইতেছে দেখিয়াছি। ঐ পারমিটে শাড়ী সংগ্রহ করিয়া এক একখানা শাড়ী চোরাবাজারে দশ টাকায় বিক্রয় হইয়াছে।

৪। তৈল-দুঃখ-সঙ্কট

খাটি সর্ষপ তৈলের কথা বলিতেছি না—ঐ দুর্লভ জিনিষটি এখন ভাগ্যবানদের করায়ত্ত এবং উহার উপযুক্ত প্রয়োগে ইষ্টসিদ্ধি হইতেছে, সুতরাং এক্ষণে চাহিদাও বেশী। আমি কেরোসিন তৈলের কথাই বলিতেছি। প্রায় দুই মাস হাঁটাহাটি করিয়াও যথোপযুক্ত ছাড়পত্র একখানি সংগ্রহ করা দুঃসাধ্য হইয়া পড়িয়াছিল। কর্ত্তারা মুখভঙ্গী করিয়া বলেন—ছাপানো ফরম্ নাই। তথাস্তু! পরিবর্ত্তনশীল সাময়িক কুপনে কাজ চালাইয়া আসিতেছিলাম তাহাও মাসে পনর দিন আকাশে বিধাতার আলো বা রাজধর্ম্মের বৈদ্যুতিক আলোর উপর একান্তভাবে নির্ভর করিয়াই রাত্রিযাপন করিতে হইয়াছিল। কেন? ১৮।২।৪৬ ইং তারিখে ৭২৫ নং পারমিট তো বহুকষ্টে একখানি সংগ্রহ করিলাম—দু-তিন দিন ছয় মাইল পথ পদব্রজে যাতায়াত করিয়া। C. R. Stores-এ কেরোসিন ক্রয় করিবার ডিক্রী লাভ করিলাম বটে, কিন্তু দশ দিন যাবৎ দুই মাইল হাঁটাহাটি ও দুর্ভোগের পরও নির্দ্দিষ্ট স্টোর্সে তৈল ক্রয় করা সম্ভব হইল না। দোকানী থাকে তো তৈল থাকে না আর তৈল থাকে তো দোকানী থাকে না। অগত্যা ২৭শে ফেব্রুয়ারী আবার সাপ্লাই আপিসে ধন্না দিলাম—কর্তৃপক্ষ দয়াপরবশ মকবুল আলীর দোকান হইতে তৈল ক্রয় করিবার সংশোধিত ছাড়পত্র মঞ্জুর করিলেন। আমার বর্ত্তমান আবাসস্থল হইতে উপরোক্ত দোকান তিন মাইল ব্যবধানে অবস্থিত। /২।০ সের কেরোসিন তৈল ৸৵০ আনায় ক্রয় করিলাম বটে, কিন্তু কুলীকে মজুরি দিতে হইল ।০ আনা! অনেকে হয়ত বলিতে পারেন কেন? তৈলের টিনটি নিজে হাতে করিয়া কিংবা চাকরের মারফতে আনিলেই হইত? হ্যাঁ, এই দুইটার যে কোনটাই সম্ভব হইলে ভালই হইত সন্দেহ নাই; সোজা কথা হইতেছে যে, আমি তো দেশপূজ্য বিদ্যাসাগর নহি আর বয়সও হইয়াছে ষাটের উপর! তারপর চাকর? "ভৃত্য" বা "চাকর" শব্দটি আর সরল বাংলা অভিধানে এখন নাই—যুদ্ধের পরিস্থিতিতে তাহাদের অজাতশত্রুরা মিলিটারী ক্যাসানের কোর্ত্তা পেণ্টুলুন আর জুতা মোজা পরিয়া চোখে চশমা আঁটিয়া সিগারেট ফুঁকিতে ফুঁকিতে যত্র-তত্র স্থানে-অস্থানে বিচরণ করিতেছে, আয়াসলব্ধ কুঞ্চিত কেশের বাহার পাছে নষ্ট হয় তাই টুপির সঙ্গে অসহযোগ স্থাপন করিয়া সর্ব্বত্র don't careism-এর সাধনা করিতেছে আর যাহারা বিধাতার নিদারুণ কার্পণ্যে সেই সৌভাগ্য হইতে বঞ্চিত হইয়াছে তাহারা আপিসে আপিসে পাখাটানার আভিজাত্য লাভ করিয়া মোটা মাহিনার মুরুব্বীদের বশংবদ হইয়াছে। অবশিষ্ট যাহারা অপাংক্তেয় তাহারা হয়ত যক্ষ্মারোগী নয়ত বাতব্যাধিগ্রস্ত, মাসমাহিনা ত্রিশ টাকার নীচের কোঠায় আর পা দিতেছে না।

সুখে আছি বই কি—পরম সুখে!

পূর্ণিমার রাত্রি যেন

শ্রীকরুণাময় বসু

পূর্ণিমার রাত্রি যেন উর্বশীর শাড়ীর সংকেত,
মদির সৌন্দর্য স্বপ্নে রেখাঙ্কিত সোনালী আলপনা,
জ্যোৎস্নার জরির কাজ বহুদূরে বর্ণশস্যক্ষেত
কুয়াশা-গুণ্ঠন টানি রাত্রি জাগে বিধুর উন্মনা।

নিস্তব্ধ সোনার রাত্রি, শুধু দূর পতঙ্গের ডাক
অপূর্ব রহস্যভরা রচিতেছে শান্ত পরিবেশ;
করুণ কুঁড়িতে আঁকা হেমন্তের শিশিরের দাগ,
হঠাৎ দেখিনু তোমা সেইক্ষণে একটি নিমেষ।

মনে হ'ল সে ত নয়, তুমি যেন আর এক জন,
দৈনন্দিন জীবনের কেন্দ্র ছাড়ি' ঊর্দ্ধলোকে তুমি;
আমার চৈতন্য মাঝে কি আনন্দ, এ কি শিহরণ,
মুদিত প্রাণের বৃন্ত অকস্মাৎ উঠেছে কুসুমি।
মাঠের আলের ধারে আঁকাবাঁকা রাঙামাটি-পথ,
বিশীর্ণা নদীর ধারা গ্রামান্তরে ক্লান্ত সুরে চলে;
দু-জনে রয়েছি বসে, যেন এক অদৃশ্য জগৎ
সোনালী স্বপ্নের সুরে জীবনের কত কথা বলে।
তোমার আমার মাঝে স্বপ্ন ছিল, ছিল কিছু ফাঁক,
মায়াময় এ মুহূর্ত রেখে গেল অনন্তের দাগ।

মালাক্কার পথে একদিন

শ্রীগৌরমোহন দাস দে

দু-চারদিন আগে থেকেই জল্পনা-কল্পনা করছিলাম যে, আশ-পাশের প্রায় সব জায়গাতেই ত ঘোরা গেল, মালাক্কায়ও একদিন ঘোরা যাক। অনেকের কাছে শুনতে পাই যে এই শহরটি মালয় দেশের সবচেয়ে পুরনো শহর। পোর্ট ডিকসন (আমরা যেখানে আছি) থেকে বেশী দূর নয়। মোটের ওপর
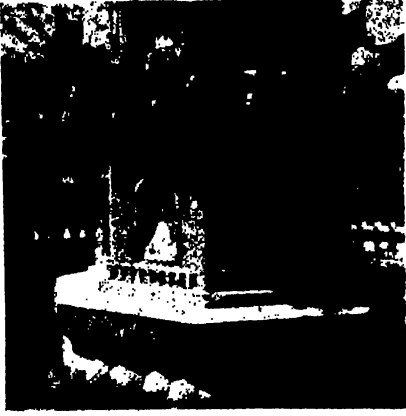
বৌদ্ধ মন্দির, আনসন রোড

সাতার মাইল হবে—যদি আমরা মালাক্কা প্রণালীর ধার দিয়ে যাই। অনেকে বললেন, এ রাস্তাটা মোটে ভাল নয়—কোন রকমে যাওয়া যেতে পারে, তবে যদি সেরানবানের রাস্তা দিয়ে যেতে পারি তা হলে ভাল ও বেশ চওড়া পিচ ঢালা রাস্তা পাব। এই পথ দিয়ে সিঙ্গাপুরে যেতে হয়। এই পথে কেনডং কাম্পঙের (গ্রাম) মাইল তিন-চার ছাড়িয়ে দুটো রাস্তা দুদিকে গেছে—একটা বাঁয়ে ও একটা ডাইনে। বাঁয়ের রাস্তা সিঙ্গাপুরের দিকে গেছে, আর ডাইনের রাস্তা 'আলোর গাজা' শহরের ভেতর দিয়ে মালাক্কার পথে মিশেছে। এখান থেকে মালাক্কার দূরত্ব প্রায় পঁচিশ মাইল হবে। সেরানবান হতে পোর্ট ডিকসনের দূরত্ব আন্দাজ কুড়ি মাইল। আমাদের কিন্তু অত ঘুরপথে যেতে মন চাইল না। আমরা মালাক্কা প্রণালীর পাশ দিয়ে যাব স্থির করলাম। যুদ্ধ শেষ হয়েছে, সেজন্ত রবি-বার দিন ইউনিটের লোকদের ছুটি দেওয়া হয়। সেদিন তারা একটু আমোদপ্রমোদ করে, আমাদের আপিসের কাজ আর লেবরেটরীর কাজ ছাড়া আর কিছু করবার থাকে না।

আমরা ৭ই অক্টোবর রবিবার যাত্রার দিন স্থির করলাম। আগের দিন (শনিবার) রাত্রে বেঙ্গল এষ্টেটের ম্যানেজার গুপ্ত মশায়ের বাড়িতে পরামর্শ করে ঠিক করলাম, পরদিন সকাল আটটায় তাঁকে নিয়ে আমরা মালাক্কার পথে পাড়ি দেব। একটা কথা আগে থেকেই বলে রাখা ভাল যে, অক্টোবর নবেম্বর ও ডিসেম্বর এই তিন মাস এখানে বর্ষাঋতুর প্রাবল্য—তবে কোন কোন সময় জানুয়ারী মাসের শেষ পর্য্যন্তও বেশ বৃষ্টি হয় অবশ্য সারা বছর অল্পবিস্তর বৃষ্টি লেগেই আছে। শীতের প্রকোপ এখানে নেই বললেই চলে। সেদিন ভোরের দিকে বেশ বৃষ্টি পড়ছিল, মনে হচ্ছিল হয়তো যাওয়া হবে না। তাই বিছানায় পড়ে রইলাম সাড়ে সাতটা পর্য্যন্ত। তখনও অল্প অল্প বৃষ্টি পড়ছিল—আকাশও বেশ মেঘলা। চাকর দুটো সকাল থেকেই ঘুর-ঘুর করছে। আগের দিন রাত্রে তাদের বলা হয়েছিল যে, সকাল সাতটায় আগে যেন তারা আমাদের ডেকে দেয়।

তাড়াতাড়ি প্রাতঃকৃত্যাদি সেরে আমরা জলযোগ করলাম। চাটুজ্যেমশায় একটু আপিসের কাজ করতে গেলেন। তাঁর দেরি হচ্ছে দেখে গুপ্তমশায়কে আনতে গেলাম। বেলা তখন নয়টা বেজে গেছে। গিয়ে দেখি ভদ্রলোক আমাদের জন্ত অস্থির হয়ে পড়েছেন, একটা টিফিন-কেরিয়ার হাতে নিয়ে তখনই বেরিয়ে পড়লেন। টিফিন-কেরিয়ারে কি আছে জিজ্ঞাসা করে জানতে পারলাম যে ভদ্রলোক তাঁর মেয়েদের দিয়ে কিছু খাবার করিয়ে নিয়ে যাচ্ছেন। আমি একটু ভোজন-

আরব মসজিদ
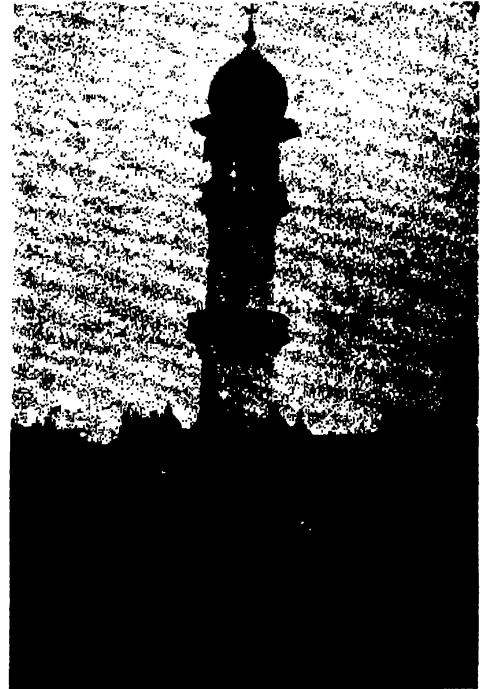
বিলাসী তাই এ আয়োজনে খুশী হয়ে উঠলাম। এতদিন এখানে এসে ক্যাম্পে থেকে ব্রিটিশ মহাপ্রভুদের শুধু 'কম্পো'* খেয়ে কোনোমতে পৈতৃক প্রাণটা বাঁচিয়ে রেখেছিলাম, বাংলার মা-বোনদের হাতের রান্না যদি এই বিদেশ-বিভূঁইয়ে এসে মেলে তবে সেটা ভাগ্যের কথা। বেলা প্রায় দশটায় আমরা আমাদের গন্তব্য পথে রওনা হলাম। আমরা থাকতাম পোর্ট ডিকসন হতে সাড়ে-চার মাইল দূরে মালাক্কা

সমুদ্র-তীরে জেনারেল পোস্ট আপিস
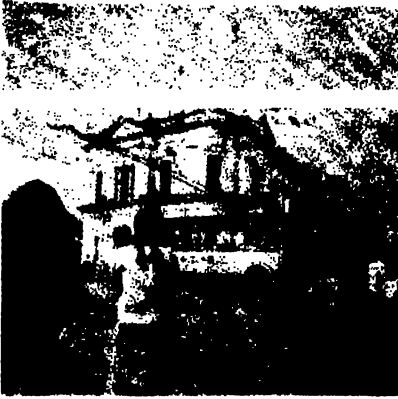
যাবার পথে তার শ্বশুরমশাই থাকতেন পোর্ট ডিকসন শহরের মধ্যে।

মালাক্কা প্রণালীর ধার দিয়ে আমাদের জীপ গাড়ী ছুটল। জীপ-চালক স্বয়ং চাটুজ্যে-মশাই চালান ভালই, কিন্তু তিনি গাড়ীর গতি কখনও মন্থর হতে দেন না যদি না পথের মধ্যে বাঁক থাকে। ডান দিকে সুবিস্তীর্ণ মাঠ ধূ ধূ করছে।

দূরে মালাক্কা প্রণালী অগণিত জাহাজ ভাসছে। বালুময় তীরের ওপর প্রণালীর ঢেউয়ের নিষ্ফল আঘাতের ছলাৎ ছলাৎ শব্দ ও তার সঙ্গে বাতাসের কোঁসকোঁসানি আমাদের বেশ আনন্দ দিচ্ছিল। মাঝে মাঝে রাস্তায় ঢেউয়ের জল উঠে আমাদেরও ভিজিয়ে দিয়ে গেল। প্রণালীর ধারে ধারে খোলা জায়গায় কোথাও সাপ্লাই আপিস, কোথাও কারখানা রয়েছে। তার মধ্যে বেশ ছোট ছোট কয়েকটি সুন্দর বাংলো দেখলাম, সবই ইট-কাঠের তৈরি। বাঁ-দিকে সারি সারি রবার গাছ দাঁড়িয়ে আছে পাহাড়ের গা ঘেঁষে। এখানে কতকগুলো সুড়ঙ্গ দেখলাম। এগুলো জাপানীরা তৈরি করে গেছে—সৈন্যেরা এখানে লুকিয়ে যুদ্ধ চালাবে বলে। এই সুড়ঙ্গগুলোর মধ্যে ঢুকতেই ভয় করে, পাহাড়ের ভেতরে অনেক দূর পর্য্যন্ত চলে গেছে। এই পাহাড়ের ওপরে আগে মালয় সৈন্যদের 'হেড কোয়ার্টার' ছিল। বেশ সুন্দর সুন্দর বড় বড় বাংলো রয়েছে। কিছুদূর গিয়ে দেখলাম ব্রিটিশ সৈন্যদের কুচকাওয়াজ হচ্ছে। আমরা এ সব ছেড়ে এগিয়ে চললাম। রাস্তাটি মন্দ নয়, বেশ চওড়া ও পিচঢালা; তবে মাঝে মাঝে পিচের সঙ্গে পাথর উঠে গর্ত্ত হয়েছে দেখতে পেলাম। শুনলাম কিছুদিন আগে রাস্তাটি খুব ভাল ছিল, কিন্তু ব্রিটিশ মহাপ্রভুদের চলমান বড় বড় ট্যাঙ্ক আর বুলডোজার* এর দফা একেবারে সেরে ফেলেছে। কিছু দূরে ডান দিকে একটা খোলা মাঠ রয়েছে, সেখানে আগে নারকেল গাছ লাগানো হ'ত। কোন কারণে সেগুলোকে কেটে ফেলেছে—গুঁড়িগুলো এখনও রয়েছে দেখলাম। খানিকটা এগিয়ে দেখি প্রণালীর ধারে বড় বড় জাহাজ থেকে ট্যাঙ্ক, জীপ, বুলডোজার, ট্রাক ইত্যাদি একে একে বেরিয়ে আসছে। বেশ মজা লাগল দেখতে। মালয় অধিকারের জন্য এত সৈন্যসামন্ত ও এত যুদ্ধের সরঞ্জাম এরা এখানে আনবে, এদের মধ্যে থেকেও আমরা তা বুঝতে পারি নি। বাঁ-দিকে পাহাড় ও রবারের বন চলেছে একটানা—মাঝে মাঝে আতপ পাতা দিয়ে ছাওয়া মালয়ীদের ছোট ছোট বাড়ী। প্রণালীর ধারে বড় বড় বাংলো রয়েছে। এগুলো সবই ছিল ব্রিটিশদের অবস্থানের জন্য।

রেস কোর্স

যুদ্ধের আগে ভারতীয় কিংবা মালয়ীদের এখানে আসবার অধিকার ছিল না; এখন সেখানে সবাই বাস করছে—ভারতীয় অফিসার থেকে সিপাহী পর্য্যন্ত।

মাইল দশেক আসবার পর দু-ধারে বেশ ঘন ও বড়

---

*কম্পো—প্যাসিফিক কম্পো।

আমরা এসেছিলাম এখানে আক্রমণকারী সৈনিকদের সঙ্গে—যুদ্ধ লাগলে আমাদের আগুন জ্বালানো নিষেধ ছিল। সেজন্য 'কম্পো'র মধ্যে টিনের ভিতর হরেক রকম তৈয়ারি খাবার ছিল। সে সব খেতে হ'ত। প্রথম কিছুদিন আমরা এই খেয়েই ছিলাম। এ সমস্তই আমেরিকার জিনিষ। লবণ থেকে সিগারেট পর্য্যন্ত এর মধ্যে থাকে।

* বুলডোজার—পাহাড় কেটে রাস্তা তৈরি করবার জন্যে এই যন্ত্র ব্যবহৃত হয়, দেখতে অনেকটা ট্যাঙ্কের মত।

রবার গাছের বন দেখা গেল। গাছগুলোর মধ্যে বেশ ফাঁক রয়েছে, আমাদের জীপ অনায়াসে ভেতর দিয়ে চলে যেতে পারে। গাছগুলো সরু হয়ে উঠে গেছে কতকটা নারকেল গাছের মত। ডান দিকে একটা সাইন-বোর্ড রয়েছে "Rifle Range"। এদিকে জাপানী সৈন্যদের

মালাক্কার প্রাচীন দুর্গ তোরণ

রাইফেল চালানো শিক্ষা দেওয়া হয়। এদিকে বেশ ঘন রবার-বন রয়েছে। মাঝখান দিয়ে সরু রাস্তা চলে গেছে সোজা রাইফেল রেঞ্জের দিকে আর একটা পথ বাঁ-দিকে গেছে রবার-বনের মধ্যে—এই নতুন রাস্তাটা জাপানীরা তৈরি করেছে Cape Rachad তে যাবার জন্যে। পাহাড়ের ওপর দিয়ে চলে গেছে আঁকাবাঁকা সরু পথ, জীপের মত ছোট্ট গাড়ী অনায়াসে যেতে পারে। একটা পাহাড় পার হয়ে আর একটা পাহাড়ে উঠতে হয়। এখানকার রাস্তা ভয়ানক খারাপ, পাহাড়ের জল এসে রাস্তার মধ্যে নালা করে দিয়েছে। এই পাহাড়ের মাথার ওপর একটা Light-house (দীপ-গৃহ) রয়েছে। এর প্রায় সবটাই ভেঙেচুরে গেছে। এখানে একটা দূরবীন্‌ও ছিল—সেই দূরবীন্ দিয়ে সুমাত্রার তীর দেখতে পাওয়া যেত। কিছু নীচে একটা মন্দির আছে—সকল দেশের মানুষ সেখানে গিয়ে পুজো দেয়। বড় পাহাড়ের মাথায় যেতে হলে পায়ে হেঁটে যাওয়াই ভাল না হলে বিপদের আশঙ্কা আছে। আমি অতি কষ্টে এই পথ দিয়ে গাড়ী নিয়ে গিয়েছিলাম।

মালাক্কার পথে আরও দুই মাইল এগিয়ে যাবার পর মাঝে মাঝে কতকগুলো রবার-বন সমূলে বিনাশপ্রাপ্ত হয়েছে দেখা গেল। এই সব জায়গায় মালয়ীরা কিছু কিছু শস্যের আবাদ করেছে দেখতে পেলাম। এখানে জাপানীরা খুব চেষ্টা করেছিল ফসল উৎপাদন করবার জন্যে কিন্তু বিশেষ ফললাভ করতে পারে নি। ফসলের মধ্যে টেপিয়োকা-ই বেশী ফলত। গাছগুলো ঢেঁড়স গাছের মত দেখতে। পাঁচ থেকে সাড়ে ছয় ফুট উঁচু হয়। এগুলো শেকড় থেকে গজায় মিষ্টিআলুর মত। এগুলো খেলে শুধু পেটই ভরে—শরীরের বিশেষ উপকার হয় না। জাপানী আমলে প্রথম দিকে এই এক কাঠির (আড়াই পোয়ার) দাম ছিল পাঁচ থেকে দশ ডলার; শেষের দিকে ১০০ থেকে ২০০ ডলার পর্য্যন্ত উঠেছিল।* তখন এখানকার লোকেরা বলতে গেলে ভাত তো চোখেই দেখতে পেত না। অবশ্য ধনীদের কিংবা যাঁরা ধান-চাল গুদামজাত করে রেখে দিতেন তাদের কথা আমি বলছি না। জাপানীরা সরকারী রেশন কার্ডের বন্দোবস্ত করেছিল কিন্তু সেটা মনে হয় লোক দেখাবার জন্যে, তাতে লোকের একবেলাও পেট ভরত না। এই রকম করে এখানকার লোকের দিন চলত। এখানে চীনারা বেশী ধনী, তারাই সব ব্যবসা একচেটে করে রেখেছিল। তারা জাপান-সরকারকে মোটা চাঁদা দিয়ে রেহাই পেত। ব্রিটিশদের আমলে এ ধরনের কষ্ট এদেশের লোকেরা পায় নি। ব্রিটিশরা এদেশে পা দিয়েই গ্রামে গ্রামে বিনি পয়সায় চাল বিলিয়েছে। আগেকার দিন ফিরিয়ে আনবার জন্যে প্রাণপণ চেষ্টা এরা করেছে। শুধু করে নি বাংলায় যেখানে পঞ্চাশ লক্ষ লোক ক্ষুধার জ্বালায় তিলে তিলে শুকিয়ে মরল।

চাটুজ্যে মশায় গাড়ী চালিয়েই চলেছেন, থামবার নাম নেই। কিছুদূর গিয়ে গুপ্তমশায় একটা বাগানের কাছে গাড়ী থামাতে বললেন। বাগানটা এক বাঙালী ডাক্তার ভদ্রলোকের। এর মধ্যে ছোট একটা বাংলো আছে- আগে ইনি এখানে থাকতেন। এখন আর এদিকে থাকেন না। বাংলাদেশের তাল আম, চালতা, শিউলি ফুলের গাছ সবই রয়েছে। ভদ্রলোক তামিল ভাষায় বেশ কথাবার্তা বলতে পারেন। প্রায় তিন মাইল যাবার পর আমরা একটা গ্রামে এসে ঢুকলাম। এর নাম পাসার পাঞ্জাং, রাস্তার দু-ধারে দোকান-পাট রয়েছে। সব মালয়ী ও চীনা এখানকার অধিবাসী। তবে এখানকার চীনারা সকলেই প্রায় ধনী। এখানে চীনারাই দোকান ক'রে বসে আছে—মালয়ীরা বাজারে মাছ ও তরকারী বিক্রী করছে দেখা গেল। গ্রামে ঢোকবার মুখে একটা প্রকাণ্ড 'Victory Gate' (বিজয়-তোরণ) রয়েছে।

* জাপানীদের আমলে একটা সিগারেটের দাম ১০০ ডলার পর্য্যন্ত উঠেছিল। ৭০০০ ডলারের কম কেউ একটা ছোটখাটো সংসার প্রতিপালন করতে পারত না। চোরা-বাজারের উপর নির্ভর করেই সংসার চালাতে হ'ত। চাকরীর ২০০।৩০০ ডলারে কুলোত না। গরুর গাড়ীর গাড়োয়ানের মাইনে ২০০০ ডলার ছিল। জাপানীরা তখন এসমস্ত নিয়ন্ত্রিত করতে পারে নি। এ সব ঘটেছিল আত্মসমর্পণের কিছু আগে। এখন প্রত্যেকের কাছে প্রায় ১০ হাজার থেকে ১০০ হাজার পর্য্যন্ত জাপানী ডলার আছে। এখন এর কোন মূল্য ব্রিটিশ গবর্ণমেন্ট দিচ্ছে না।

সব জাতের পতাকা দিয়ে এটাকে সাজিয়েছে—কিন্তু পরাধীন ভারতের পতাকা উড়তে দেখলাম না। এদেশের চীনারা সকলেই সাম্যবাদী; তাদের কি ঘরে, কি বাইরে, কি মোটরে —সব জায়গায়ই একটা করে সাম্যবাদী পতাকা উড়ছে। ছোট

রেক্স নাট্য-গৃহ

ছোট চীনা ও মালয়ী ছেলেমেয়েরা আমাদের দেখে মিলিটারী কায়দায় সেলাম করলে। আমরাও তাদের প্রত্যভিবাদন করলাম। এদিকে মিলিটারী গাড়ী মোটেই দেখতে পাওয়া গেল না। এক বাঙালী ভদ্রলোক থাকেন একটু দূরে, তাঁর সঙ্গে দেখা ক'রে আমরা এগিয়ে চললাম।

দু-পাশে সারি সারি রবারের বন চলেছে। মাঝে মাঝে মাঠ, জলা জায়গা, রবারের কাটা গাছ তাতে ভাসছে। মালয়ী ছেলেরা ছিপ ও জাল দিয়ে মাছ ধরছে। তার মধ্যে জাপানী কৃষি-বিভাগের তত্ত্বাবধানে নির্ম্মিত আতপ-গাছের পাতায় ছাওয়া কতকগুলো ভেঙে-পড়া কাঠের বাড়ী, তাও জলে হাবুডুবু খাচ্ছে দেখলাম। আমরা কিছুদূর যাবার পর পেঙ্গাল কেমাপাস নামক গ্রামে ঢুকলাম। পোর্ট ডিক্সন থেকে পেঙ্গাল কেমাপাসের দূরত্ব ২১ মাইল, এখানেও চীনা ও মালয়ী বস্তি, ভারতীয় এখানে খুব কম। চীনা মেয়েরা খুব প্রগতিশীলা। প্রত্যেকেরই প্রায় একটা করে সাইকেল আছে। সকলেই রাস্তায় সেজেগুজে বেড়াতে চলেছে। মালয়ী মেয়েরা, কি গরীব কি ধনী সকলেই একটা করে লুঙ্গির মতন বাহারে ছাপ দেওয়া কাপড় পরে। সেই রকমই ছাপ দেওয়া একটা করে হাঁটু পর্য্যন্ত লম্বিত বড় কোট গায়ে দেয়। বেশীর ভাগ মালয়ী মেয়েরা মাথায় ঘোমটা দেয় না। খোঁপার বাহার দেখবার জিনিষ। কেউ তাতে ফুল গুঁজে, কেউ বিলিতি রঙ-বেরঙের ফিতা দিয়ে খোঁপাটিকে মনের মত করে সাজায়। এরা সকলেই মুসলমান সম্প্রদায়ভুক্ত, দেখতে অনেকটা বাঙালী মেয়েদেরই মত— কিন্তু নাক চেপ্‌টা। শরীর এদের খুব মজবুত। এখান কার বাজারের পাশ দিয়ে ছোট একটি নদী বয়ে যাচ্ছে— রাস্তার দু-ধারে মালয়ী ও চীনাদের বাড়ী। গ্রামে নারকেল গাছ, কলা গাছ, পেঁপে গাছ ও কাঁটাল গাছ প্রচুর দেখলাম অনেকটা লিচুর মত দেখতে এক রকম ফল আছে যার নাম 'রম্বুতান', এখানে খুব ফলে। 'ডোরিয়ান' ফল কাঁটালের মত দেখতে; বিশ্রী গন্ধ, কাছে যেতে পারা যায় না। ফল পাকলে খেতে বেশ মিষ্টি লাগে, কিন্তু মুখে গন্ধ লেগে থাকে— ধুলেও যায় না। আনারস প্রচুর হয়।

মাইল ছয়েক গিয়ে আমরা একটা মোড়ের মাথায় এলাম। রাস্তাটি সোজা চলে গেছে সেরামবানের দিকে, আর ডান দিকের রাস্তাটা গেছে মালাক্কার দিকে। এখানে একটা ছোট গ্রাম দেখলাম। এখানকার বাসিন্দা সবাই মালয়ী। একটা পচা খাল পাশ দিয়ে চলেছে। এটা পার হয়ে আমরা ডানদিকে চললাম। একটু এগিয়ে দু-দিকে বেশ ধানের ক্ষেত রয়েছে দেখলাম, এর মাঝে মাঝে আতপ গাছগুলো সারি বেঁধে দাঁড়িয়ে রয়েছে। দু-দশ ঘর মালয়ী ও চীনা এদিকেও রয়েছে—সবাই চাষ ক'রে জীবিকা নির্ব্বাহ করে। মাইল-চারেক যাবার পর আমরা নেগ্রি সেম্বিলান ও মালাক্কার সীমান্তে এসে পৌঁছলাম। এখানে ফেডারেটেড মালয় ষ্টেটের একটা শুল্ক আদায়ের আপিস রয়েছে। কয়েকটি

ক্রাভান রোড

বাংলোও আছে, সব জলে ডোবা। এর পরেই একটা ছোট খাল—পোলের ওপর দিয়ে পার হতে হয়। বর্ষাকাল ব'লে বৃষ্টির জল মাঠ ছাপিয়ে রাস্তাটাকে ডুবিয়ে দিয়েছে। আস্তে আস্তে পার হয়ে আমরা একটা বাজারের মধ্যে এসে পড়লাম। এর নাম লাবুচিনা পাসার,—পাসার মানে বাজার। বাজারটি ছোট, বড় নোংরা। শুটকী মাছের মধুর গন্ধে বাজারটি আমোদিত হয়ে রয়েছে!

একটু এগিয়ে দেখতে পেলাম দু-দিকে ধানের ক্ষেত সমান ভাবে আমাদের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে চলেছে। এদিকটায় ধান মন্দ হয় না। ঠিক যেন বাংলাদেশেই আছি বলে ভ্রম হয়। রাস্তা সব জলে ডুবে গিয়ে মাঠের সঙ্গে মিশে

গেছে। এদিকটায় খুব নীচু জমি। মাইলতিনেক অতিক্রম করে দেখি আবার সেই ঘন পাহাড়ী জঙ্গল ও রবারের ক্ষেত চলেছে সার দিয়ে। এদিকে আসতে লোকে এখনও ভয় পায়, কারণ চীনা ও জাপানী গরিলা সৈন্য পথে-ঘাটে

ফাউণ্টেন গার্ডেন
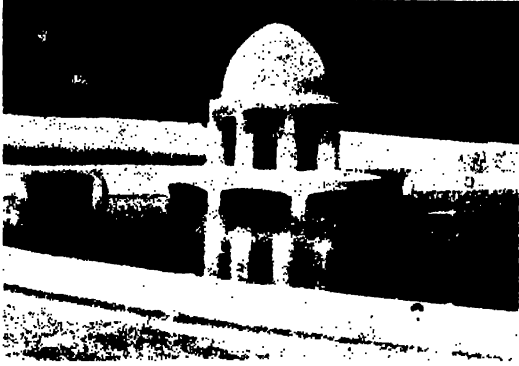
লুকিয়ে আছে শুনতে পাওয়া যায়। বনের পাশে মালয়ীদের আতপ পাতায় ছাওয়া কুটির মাঝে মাঝে দেখতে পাওয়া যায়। ধনীই হোক আর গরীবই হোক এরা একটু পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন থাকবার চেষ্টা করে। বাড়ীর আশপাশ তকতকে ঝকঝকে, একটুও নোংরা দেখলাম না। বাড়ীর সামনে এরা ছোট ছোট বাহারে ফুল গাছ পুঁতেছে। কারও কারও বাড়ীর ভেতর ছোট-বড় ঢোলক ঝুলছে, এরা সঙ্গীতপ্রিয়। কিছু দূর যাবার পর আবার সেই শ্যামল ধানের ক্ষেত ও নারকেল বাগান, আতপের সারি। এখানে পাহাড়ের ওপর ছবির মত ছোট একটি সুন্দর বাড়ী রয়েছে। তার পাশ দিয়ে একটা রাস্তা চলে গেছে। আর মাইল এগিয়ে আমরা একটি ছোট শহরের মধ্যে এসে পড়লাম। এ শহরটির নাম মসজিদ টানা। এখানে 'ইট-কাঠে' তৈরি বাড়ী চোখে পড়ল। এই শহরের দুটো রাস্তা দু-দিকে গেছে। বাঁ-দিকের রাস্তা ধরলে আমরা আলোর গোজা শহর দিয়ে মালাক্কার পৌঁছাতে পারি। লোকের মুখে শোনা যায় যে আলোর গোজার পর থেকে রাস্তা খুব ভাল। আমরা সোজা রাস্তা ধরে চললাম। এদিকে গ্রাম ছাড়বামাত্রই রাস্তার দু-ধারে সুরু হ'ল কোথাও ধানক্ষেত, কোথাও বন, কোথাও বা রবারের ক্ষেত। প্রায় পাঁচ মাইল যাবার পর আমরা সুঙ্গি উডাং গ্রামে এসে পড়লাম। গ্রামে ঢুকতেই একটা থানা নজরে পড়ল, একটি মালয়ী বন্দুক ঘাড়ে করে পাহারা দিচ্ছে। এ গ্রামে আছে ধানের ক্ষেত আর নারকেল বাগান। এখানে পাকা বাড়ী দেখলাম না। একটু এগিয়ে একটা মালয়ী স্কুল দেখতে পেলাম। সবই পাতলা কাঠের বাড়ী, কিন্তু বেশ বড়। এর পরেই বাজার, বাজারটি পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন নয়। কেউ কেউ দোকানে বসে গুড়গুড়ি টানছে। এখানে সবই মালয়ী তবে দু-এক জন চীনাও দেখলাম। এখানকার ছোট ছোট বাচ্চারা আবার জাপানী কায়দায় সেলাম দেয়। এদিককার গ্রামে বেশ লোকজন আছে। এখান থেকে মালাক্কা শহর প্রায় তের মাইল হবে।

তিন-চার মাইল এগিয়ে যাবার পর আর একটা গ্রামে এসে পড়লাম। এর নাম হচ্ছে টাঙ্গু বাটু, এখানে একটা বড় স্কুল দেখলাম। এদিকটা বেশ পরিষ্কার। মসজিদ প্রায় সব গ্রামেই একটা ক'রে আছে। এগুলো কোঠাবাড়ী তবে ছাদগুলো বড় টালি দিয়ে ছাওয়া। ভেতরে গিয়ে দেখলে বাংলার মসজিদের মত মনে হয়। বড় বড় ঢোলক একটা করে সব মসজিদেই আছে। এদিকটায় বেশ ধানক্ষেত দেখলাম। এখানকার ছেলেমেয়েরা পর্যন্ত বেশ চালাক ও পরিশ্রমী। চীনারা বাংলাদেশের জমিদারদের মত এদেশীয়দের শোষণ করছে।

(আগামী বারে সমাপ্য)

* UDANG—চিংড়ি মাছ, Sungi—নদী। বোধ হয় এখানকার নদীতে খুব চিংড়ী মাছ পাওয়া যায় তাই এই গ্রামের নাম Sungi udang.

আমাদের আয় ও খাদ্যদ্রব্যের মূল্য

জনৈকা বাঙালী গৃহিণী

বাংলার বাহিরে বাঙালীর ভোজনবিলাসী বলিয়া দুর্নাম আছে। আমরা নাকি শুধু ডাল রুটি অথবা ছাতু গুড় ও কাঁচা ফলমূল খাইয়া জীবনধারণের কথা ভাবিতে পারি না। আমাদের যে পাঁচপদ মাছ তরকারি ও ভাত না হইলে চলে না তাহা আমরা গর্ব্বের সঙ্গে প্রতিবেশীর নিকট প্রচার করি আর সর্ব্বদাই দেখাইতে চাই যে আমরা ভোজন ও রন্ধন ব্যাপারে খুব রক্ষণশীল ও পারতপক্ষে খাওয়া-দাওয়ার ধরণধারণ পরিবর্ত্তন করিতে ইচ্ছুক নহি। কথাটা হয়ত কতক পরিমাণে সত্য। এ কথা স্বীকার করিতে হইবে যে বাঙালী মেয়েদের বেশীর ভাগ সময়টাই রন্ধনশালায় ও ভাণ্ডারগৃহে কাটে এবং নানা রকম জিনিষ রান্না করিবার শখও তাঁহাদের বড় কম নহে। কিন্তু আজকালকার দিনে বাঙালীর সম্বন্ধে ভোজনবিলাসী কথাটা প্রযোজ্য হইতে পারে কি না ভাবিয়া দেখিবার বিষয়। সাধারণ বাঙালী সংসারের আজকাল যাহা আয়

তাহাতে মেয়েদের পক্ষে কি রন্ধন করা সম্ভব এবং আমাদের ছেলেমেয়েরা আজকাল বাস্তবিক কি খায় তাহা একবার খতাইয়া দেখা মন্দ নহে।

চাষী গৃহস্থ, বড় চাকুরীয়া ও ধনী ব্যবসায়ীর কথা আমাদের আলোচ্য নহে; যদিও শহরাঞ্চলে খাদ্য-রেশন সকলের পক্ষেই সমান। ধনীর পক্ষে অন্য সকল প্রকার খাদ্যবস্তুই সুলভ এবং চাষী গৃহস্থেরও তরিতরকারি এবং চিঁড়া মুড়ি চাউল ইত্যাদির জন্য বাজারের উপর নির্ভর করিতে হয় না। কাজেই জীবনযাত্রা অচল হইয়া পড়িয়াছে সর্ব্বশ্রেণীর চাকুরীজীবীর, সে চাকুরী সরকারী বেসরকারী, যে প্রকারেরই হউক না কেন। ব্যয় যে পরিমাণে বৃদ্ধি হইয়াছে আয় সেই অনুপাতে বাড়ে নাই, এবং খাদ্যবস্তুর মূল্য বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে জীবনযাত্রার মান নামিতে নামিতে নিম্নতম স্তরে আসিয়া পৌঁছিয়াছে। অনেকে বলেন যে রেশন-ব্যবস্থা হইয়া তবু কতকটা রক্ষা হইয়াছে, ইহা কতদূর সত্য জানি না। আমার মনে হয় যে, যে দরে খাদ্য-রেশন পাওয়া যায়, তাহাও বহু পরিবারের ক্রয়-ক্ষমতার বাহিরে। খাদ্যশস্য রেশন দোকানে পাওয়া গেলেই ত খাদ্য-সমস্যার সমাধান হয় না, ক্রেতার সে রেশন ক্রয় করিবার মত সামর্থ্য থাকাও দরকার। চাকুরীজীবীর যাহা আয় তাহাতে এই নিম্নতম স্কেলে বাঁধা দুর্ম্মূল্য রেশন কিনিতেও কত টাকা মাসে খরচ হয় এবং কতই বা উদ্বৃত্ত থাকে তাহা দেখিলে আমাদের জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করা যে কিরূপ দুষ্কর হইয়াছে বুঝা যাইবে।

প্রতিজনের সাপ্তাহিক রেশন	প্রতিজনের চারি সপ্তাহের রেশন	সরকারী বাঁধা দরে চারি সপ্তাহের রেশনের মূল্য
চাউল—/২৷৶০	সাড়ে দশ সের	৩৸৶০
চিনি—/৶০	বার ছটাক	৷৶১০
লবণ—/৷	ষোল ছটাক	৶০
তৈল—/৶০	আধ সের	৷৶০
		৫৶১০

প্রতি পরিবারে পাঁচ জন করিয়া লোক ধরিলে পাঁচ জনের চারি সপ্তাহের রেশন ক্রয় করিতে ব্যয় হয় ৫৶১০ × ৫ = ২৬/১০। ইহার মধ্যে ডাল মশলাপাতি বা তরিতরকারি নাই। ঐ সকল জিনিষেরই বা বর্ত্তমান বাজার দর কি তাহা দেখা যাক। কলিকাতা ও মফস্বলে দরের সামান্য তারতম্য আছে, তবে তাহা উল্লেখযোগ্য নহে এবং বাংলার সর্ব্বত্র শহরাঞ্চলে দর প্রায় একই রকমের বলিলেই হয়। শুধু মাত্র মাছের মূল্যেই কিছু তফাৎ দেখা যায়, তাহারও কারণ প্রাকৃতিক।

খাদ্যবস্তু প্রতি সের	তরকারি, যে কোন প্রকার প্রতি সের
কাঁচা মুগ—৷/০	শাক—৷৶০ হইতে ৷০
মসুর—৷০	কুমড়া—৶০
ছোলা—৷০	আলু—৷০ হইতে ৷৶০
অড়হর—৷০	মিষ্টি আলু—৶০—৷০
গুড়—৸০	কচু—৷০—৷৶০
চিঁড়া—৸০	পটল—৸০
মুড়ি—১৲	ঝিঙা—৷/০—৷৶০
লঙ্কা—১৸০	পেঁয়াজ—৷০
সরিষা—৸০	ঢেঁড়স—৷০
ধনিয়া—১৷০	কাঁচা কলা—৴৫ একটি
হলুদ—১৲	বেগুন—৷০ হইতে ৷৶০
জিরা—২৲	পাকা কলা—৴১০ একটি
বেসম—৸৶০	টোমাটো—৷/০
ছাতু—৷৶০ হইতে	জ্বালানী—২৷০ মণ

উপরি-উক্ত দরে ন্যূনতম পরিমাণ ডাল ও একটা তরকারি খাইতে হইলে চারি সপ্তাহের জন্য পাঁচ জনের সংসারে কমপক্ষে আড়াই টাকার ডাল /৫ ও এক টাকার মশলা ও দৈনিক তিন-চার আনার তরকারি না কিনিলে জীবনধারণ করা কঠিন। তাহা হইলে মোট খরচ দাঁড়ায়,

রেশন—	২৬/১০
ডাল—	২৷০
মশলা—	১৲
তরকারি—	৭৷০
জ্বালানী—	৩৲
	৪০/১০

ইহা শুধু দৈনিক দু-বেলা খাওয়ার খরচ। ইহা ভিন্ন শিশুর দুধ, বালক-বালিকার জলখাবার, পরিধেয় বস্ত্র, বাড়ী ভাড়া, স্কুলের মাহিনা এই হিসাবে ধরা হয় নাই। আর যে সকল জিনিষ দুর্ম্মূল্য যথা— মাছ, মাংস, ডিম, ফল ও দুধ—ইহা চাকুরীয়া শ্রেণীর ক্রয়ক্ষমতার বাহিরে বলিয়া তাহার হিসাব করা হয় নাই। ইহা ব্যতীত যে সকল জিনিষ ও ঔষধপত্রাদি নিয়মিত ভাবে ব্লাকমার্কেটে ক্রয় করিতে হয় তাহারও দর ধরা হয় নাই।

কিন্তু বৈশাখের প্রবাসীর সম্পাদকীয় স্তম্ভে দেখিতেছি যে, আমরা যাহা দুর্লভ ও দুর্ম্মূল্য বলিয়া খাদ্যতালিকা হইতে বাদ দিয়াছি, সেই সকল খাদ্যদ্রব্য যথা—মাংস, দুধ, মাখন, মাছ, ডিম ও আলু ইংলণ্ড, ফ্রান্স, জার্ম্মানী, পোলাণ্ড, রুমানিয়া, অষ্ট্রিয়া, ইটালী প্রভৃতি দেশ দারুণ যুদ্ধের মধ্যেও সর্ব্বসাধারণ রেশন ব্যবস্থায় উচিত মূল্যে পাইয়াছে এবং রুটির ত রেশনই হয় নাই। সম্প্রতি ভারতবর্ষ, ইউরোপের অধিকৃত দেশসমূহ ও চীন, জাপানে অন্নাভাব ও গমের অভাব হওয়ার ফলে এত দিন পরে পাউরুটি রেশন হইবে কি-না অথবা রুটি কম করিয়া খাওয়া উচিত কিনা তৎসম্বন্ধে ইংলণ্ড ও আমেরিকাবাসিগণ চিন্তা ও বিবেচনা করিতেছেন। শেষ পর্য্যন্ত রুটির রেশন করিতে

তাঁহাদের সাহসেও কুলায় নাই, অথচ আমাদের দেশে এক কলমের খোঁচায় প্রধান ও একমাত্র খাদ্য চাউল ও আটা শতকরা ২৫ ভাগ কমান হইল ও তাহার মূল্য আমাদের ক্রয়-ক্ষমতার বাহিরেই রহিল। পুষ্টিকর দ্রব্য ত রেশনে সস্তায় পাইবার উপায়ই নাই।

আমাদের দেশে পাঁচজন পোষ্যবিশিষ্ট পরিবারের উপযোগী ন্যূনতম খাদ্য ও তাহার মূল্য উপরে দেখান হইয়াছে।

বলা বাহুল্য সরকারী বেসরকারী যে প্রকারের চাকুরীয়াই হউন না কেন, পরিবার প্রতিপালন করিতে হইলে উপরি-উক্ত পরিমাণ খোরাকী খরচ তাঁহার পক্ষে অপরিহার্য্য। সামাজিক স্তর ভেদ বা জীবনযাত্রার মাপকাঠি ভিন্ন বলিয়া তাঁহাদের জন্য রেশনের বা সব্জীর বিশেষ সুবিধাজনক কোনো দর বাঁধা নাই। দু-বেলা ভাত তরকারি বা ডাল ভাত খাইতে হইলে এই খরচ অনিবার্য্য। কাজেই একজন ঝাড়ুদার, চাপরাশী হইতে কেরাণী, শিক্ষক বা দোকান-কর্ম্মচারী পর্য্যন্ত সকলের পক্ষে ন্যূনতম খাদ্য-সংস্থানের সমস্যা আজকাল সমান জটিল হইয়া দাঁড়াইয়াছে। মহাত্মা গান্ধীর সঙ্গে জনৈক পত্রপ্রেরকের কংগ্রেসী মন্ত্রিমণ্ডলীর বেতনের হার পরিবর্ত্তন সম্পর্কে যে আলোচনা হইয়াছিল এই প্রসঙ্গে তাহার উল্লেখ করা যায়। মন্ত্রিদের বেতনের হার যখন পাঁচ শত হইতে বাড়াইয়া পনর শত করিবার প্রস্তাব চলিতেছে, তখন এক জন চাপরাশী বা কেরাণীর বেতনও তিন গুণ করা উচিত—ইহাই ছিল পত্রপ্রেরকের বক্তব্য। মহাত্মা গান্ধী তাঁহার স্বভাবসিদ্ধ আন্তরিকতা ও ধৈর্য্য সহকারে উত্তর দিয়াছেন: "হাতীর প্রচুর খাবার চাই, কিন্তু পিঁপড়ার এককণা হইলেই কুলাইয়া যায়। ইহা কেন হয়? ঈশ্বর যাহাকে যেমন প্রয়োজন তাহাকে তেমনই দেন। হাতী এবং পিঁপড়ার প্রয়োজনের পার্থক্য যেমন সহজে বুঝা যায় মানুষ এবং মানুষের প্রয়োজনের পার্থক্যও যদি তেমনই সহজে বুঝা যাইত, তাহা হইলে কোনও কথাই ছিল না। সমাজে প্রয়োজনের পার্থক্য আছে তাহা আমরা দেখিতেই পাইতেছি।" তাহার পর এ কথাও বলিয়াছেন, "চাপরাশীর পক্ষে ঘুষ না লইয়া ১৫৲ টাকায় পরিবার প্রতিপালন করা কি সম্ভব? তাহাকে এমন বেতন কি দেওয়া উচিত নয় যাহাতে তাহার ঘুষ লওয়ার লোভ না হয়?"—এই উক্তি দ্বারাই মহাত্মাজী আসল সমস্যা সমাধানের ইঙ্গিত করিয়াছেন কিন্তু ন্যূনকল্পে কত বেতন দিলে এই তথাকথিত নিম্নস্তরের কর্ম্মচারীদের জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ সহজ হইবে তাহা বলেন নাই।

বর্ত্তমান গবর্ণমেণ্ট ও বেসরকারী প্রতিষ্ঠানসমূহ নিম্নপদস্থ কর্ম্মচারীদের কত বেতন ও মাগ্‌গীভাতা দেন এবং তাহা তাহাদের জীবনধারণের পক্ষে পর্য্যাপ্ত কি না দেখা যাক। আর এই বেতন তিন গুণ করিলেও কাহারও কাহারও পক্ষে পরিবার প্রতিপালন করা সম্ভব কি না তাহাও বিচার্য্য। এক শত টাকার বেশী যাঁহারা পান, এই হিসাবের মধ্যে তাঁহাদিগকে ধরিলাম না এবং উপরে দেওয়া হিসাব অনুযায়ী পাঁচ জনের শুধু খাওয়ার খরচ চল্লিশ টাকা ধরা গেল।

সরকারী চাকুরিয়া	বেতন	মাগ্‌গী ভাতা	মোট বেতন	পাঁচজনের নিম্নতম ক্ষেত্রে খাওয়ার খরচ	উদ্বৃত্ত
ঝাড়ুদার	১২৲	২০৲	৩২৲	৪০৲	৮৲ ঋণ হয়
চাপরাশী বা পিওন	১৩৲	২৪৲	৩৭৲	৪০৲	৩৲ "
মালী	১৩৲	২৪৲	৩৭৲	৪০৲	৩৲ "
কেরাণী (Civil ও Criminal Court)	৩৫৲	২৭৲	৬২৲	৪০৲	২২৲ বাঁচে
পোষ্ট্যাল কেরাণী	৩৮৲	২৯৲	৬৭৲	৪০৲	২৭৲ "
পোষ্ট্যাল পিওন (শহরে)	২০৲	২৪৲	৪৪৲	৪০৲	৪৲ "
পোষ্ট্যাল পিওন (গ্রামে)	১৮৲	২৪৲	৪২৲	৪০৲	২৲ "
পিওনরা "গুড কণ্ডাক্টে"র জন্য অতিরিক্ত ১০৲ পায়।					
শিক্ষক (ইংরেজী)	৭৫৲	২৭৲	১০২৲	৪০৲	৬২৲ "
শিক্ষক (বাংলা)	৫০৲	২৭৲	৭৭৲	৪০৲	৩৭৲ "
শিক্ষক (মৌলবী বা পণ্ডিত)	৬০৲	২৭৲	৮৭৲	৪০৲	৪৭৲ "
প্রাইমারী স্কুল :—					
প্রধান শিক্ষক	১৬৲	৩৲	১৯৲	৪০৲	২১৲ ঋণ হয়
প্রথম শিক্ষক	১৪৲	৩৲	১৭৲	৪০৲	২৩৲ "
দ্বিতীয় শিক্ষক	১২৲	৩৲	১৫৲	৪০৲	২৫৲ "
তৃতীয় শিক্ষক	১০৲	৩৲	১৩৲	৪০৲	২৭৲ "
মেয়েদের স্কুল :—					
সহকারী শিক্ষয়িত্রী	৭৫৲	২৭৲	১০২৲	৪০৲	৬২৲ বাঁচে
বাংলা শিক্ষয়িত্রী	৫০৲	২৭৲	৭৭৲	৪০৲	৩৭৲ "
ক্ল্যাসিকাল শিক্ষয়িত্রী	৬০৲	২৭৲	৮৭৲	৪০৲	৪৭৲ "
সরকারী মোটর ড্রাইভার	৫০৲	২৭৲	৭৭৲	৪০৲	৩৭৲ "
একজন সিপাহী	১৭৲	—	—	নিজ খাওয়ার খরচ নাই	১৭৲ "

ইহা ভিন্ন রেল ইত্যাদি বিভিন্ন বিভাগের সরকারী কর্ম্মচারী আছেন যাঁহাদের মাহিনার সামান্য তারতম্য আছে, কিন্তু জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিবার পক্ষে কোনও বিভাগের কর্ম্মচারীদের বেতনই পর্য্যাপ্ত নহে। সরকারী বেতনের যে স্কেল তাহাতে একটি লক্ষ্য করিবার বিষয় যে অশিক্ষিত ঝাড়ুদার ও অল্প লেখাপড়া জানা চাপরাশী পিওন অপেক্ষা ম্যাট্রিক পাস বা ট্রেনিং পরীক্ষায় উত্তীর্ণ প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকের বেতন অনেক কম এবং পরিবার প্রতিপালনের জন্য পূর্ব্বোক্তদের যেখানে তিন টাকা ঋণ করিতে হয় সেখানে এক জন শিক্ষক তাহার নয় গুণ ঋণগ্রস্ত হন।

বেসরকারী প্রতিষ্ঠানসমূহের বেতনের স্কেল ও মাগ্‌গী ভাতার পরিমাণ নীচে দেখান গেল :—

বেসরকারী চাকুরিয়া	বেতন	মাগ্‌গী ভাতা	মোট বেতন	পাঁচজনের নিম্নতম স্কেলে খাওয়ার খরচ	উদ্বৃত্ত
দোকান কর্ম্মচারী	২০৲	৩৲	২৩৲	৪০৲	১৭৲ ঋণ হয়
দারোয়ান বা পিওন	১৫৲	৫৲	২০৲	৪০৲	২০৲ "
সর্ব্বপ্রকার কেরাণী	৩০৲	১০৲	৪০৲	৪০৲	—
কম্পাউণ্ডার	২০৲	—	২০৲	৪০৲	২০৲ "
মোটর ড্রাইভার	৫০৲	—	৫০৲	৪০৲	১০৲ বাঁচে
এডেড স্কুলের শিক্ষক ও শিক্ষয়িত্রী :—					
প্রধান শিক্ষক	১০০৲	৫৲	১০৫৲	৪০৲	৭০৲ "
ইংরেজী শিক্ষক	৬০৲	৫৲	৬৫৲	৪০৲	২৫৲ "
বাংলা শিক্ষক	৩০৲	৫৲	৩৫৲	৪০৲	৫৲ ঋণ হয়
ক্ল্যাসিকাল শিক্ষক	৪০৲	৫৲	৪৫৲	৪০৲	৫৲ বাঁচে
বেসরকারী আন্‌ এডেড স্কুলে শিক্ষক-শিক্ষয়িত্রী					
প্রধান শিক্ষক	৬৫৲	৩৲	৬৮৲	৪০৲	২৮৲ "
ইংরেজী শিক্ষক	৫০৲	৩৲	৫৩৲	৪০৲	১৩৲ "
অন্যান্য শিক্ষক	৩০৲	৩৲	৩৩৲	৪০৲	৭৲ ঋণ হয়

বেসরকারী প্রতিষ্ঠানের কর্ম্মচারীদের বেতনের নির্দ্দিষ্ট কোন স্কেল নাই। তদুপরি তাঁহারা যাহা সহি করেন সেই পরিমাণ টাকাই সকল ক্ষেত্রে পান তাহাও নহে। তবু গড়পড়তা ধরা যায় যে, কেরাণীকে ত্রিশ টাকা, পিওনকে পনর টাকা ও শিক্ষকগণকে ত্রিশ হইতে পঞ্চাশ পর্য্যন্ত বেতন দেওয়া হয়। ইহা ভিন্ন ছাপাখানার কম্পোজিটার হইতে মোটর মেকানিক, হোটেল ও দোকানের কর্ম্মচারী, বাসার চাকর, খানসামা, মেথর, রাঁধুনী, মালী প্রভৃতি কাহারও বেতন কুড়ি হইতে চল্লিশের বেশী নহে বরং কাহারও কাহারও তদপেক্ষাও কম। কিন্তু ইহাদের সকলকেই একই দামে রেশন কিনিতে হয় ও কম-সে-কম চার-পাঁচ জনকে প্রতিপালন করিতে হয়। পাঁচ জনের শুধু রেশনই ক্রয় করিতে যখন লাগে ২৬/১০, তখন নিম্নতম বেতনের স্কেল যে তাহার অনেক উপরে বাঁধা উচিত, এ বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ নাই।

এদিকে তো যুদ্ধ শেষ হইবার সঙ্গে সঙ্গেই সরকারী বেসরকারী বিভিন্ন বিভাগে ব্যয় কমাইবার জন্য লোক ছাঁটাই করিবার ব্যবস্থা হইতেছে। ওদিকে কিন্তু মোটা মাহিনার কর্ম্মচারীদের মোটা মাগ্‌গী ভাতা দেওয়ার পর্য্যন্ত বিরাম নাই। রেশন ও খাদ্যবস্তু সুলভ করিবার কোনও ব্যবস্থা নাই অথচ অল্প বেতনের কর্ম্মচারীদের মাগ্‌গী ভাতা বন্ধ করা যায় কি না সে বিষয়ে গুরুতর গবেষণা চলিতেছে।

মাগ্‌গী ভাতার ব্যবস্থা থাকায় শুধু ভাতে ভাত বা সামান্য তরকারি ভাত খাইয়া অনেক পরিবারের লোকেরা কোনও মতে দিন গুজরান করিতেছে কিন্তু আসলে তাহাদের মাহিনা বার, পনর বা ত্রিশ-চল্লিশের বেশী নহে ; সুতরাং মাগ্‌গী ভাতা বন্ধ হইলে যখন উপবাস করিবার ষোল আনা সম্ভাবনা, তখন পূর্ব্বাহ্নেই দাবি উপস্থিত করা দরকার। আর সে দাবি স্বীকৃত না হইলে রেশনের দর যাহাতে অন্ততঃ তিন ভাগের এক ভাগ হয় সেজন্য আন্দোলন চালান প্রয়োজন। ইহা ভিন্ন পুষ্টিকর খাদ্যও অল্প দামে জনসাধারণ যাহাতে পাইতে পারে, সে-ব্যবস্থা করাও একান্ত প্রয়োজন। বিলাতে রেশন-ব্যবস্থা হইয়াছে বিশেষ করিয়া পুষ্টিকর খাদ্যের জন্যই। শিশুদের জন্য সে দেশে বিশেষ বিশেষ খাদ্যের রেশন-ব্যবস্থা আছে। যুদ্ধোত্তর কালে এবং খাদ্য-সঙ্কটের সময় আমরা যাহা রক্ষন করি তাহার সঙ্গে বিলাতের গৃহিণীদের রক্ষিত দ্রব্যের আকাশ-পাতাল তফাৎ। প্রতি সপ্তাহে পাঁচ জন বয়স্ক লোকের জন্য তাঁহারা যে রেশন পান তাহা দেখাইতেছি : দুধ—সাড়ে বার পাইণ্ট (এক পাইণ্টে আড়াই পোয়া), চিনি—আড়াই পাউণ্ড বা পাঁচ পোয়া, মাখন দশ আউন্স বা পাঁচ ছটাক, মার্জারিন—কুড়ি আউন্স বা দশ ছটাক, চর্ব্বি বা তেল—পাঁচ আউন্স, বা আড়াই ছটাক, বেকন—পনর আউন্স, জেলী প্রভৃতি—সওয়া এক পাউণ্ড, কল ত্রিশটি, ডিম—পাঁচটি। রুটি যত ইচ্ছা।

ওদেশে আয়ের অঙ্ক আমাদের অপেক্ষা বহুগুণ বেশী। দরিদ্রতম বিলাতী পরিবারও এই রেশন কিনিতে পারে এবং পেট ভরিয়া খাইলেও সপ্তাহে পৌনে দুই পাউণ্ডের বেশী খাবাপিছু খরচ হয় না।

আমরা উপরোক্ত পুষ্টিকর খাদ্যগুলি কি দামে পাই আর পাইলেও ক্রয়ক্ষমতা আছে কিনা সেটাও দেখা মন্দ নহে। কলিকাতার কথা স্বতন্ত্র। কিন্তু মফস্বলে মোটামুটি এক প্রকার বাঁধা দর আছে, তাহা সর্ব্বত্রই প্রায় নিম্নোক্তরূপ। মাংস—দুই টাকা সের, মাছ—বাঁধা দর নাই, গড়ে দুই টাকা সের। ডিম—ছ-পয়সা দু-আনা একটি। দুধ—টাকায় দু-সের। ফল—বাঁধা দর নাই। ঘৃত—৬৲ টাকা সের। মাখন—২৸৶০ পাউণ্ড। চিনি—(ইহা রেশনে পাওয়া যায়) ৷১০ সের। ইহা ভিন্ন সরিষার তৈল ২৲ টাকা সের দরে ব্ল্যাক-মার্কেটে পাওয়া যায় শুনিয়াছি, চাউলও রেশনের ঘাটতি পুরাইবার জন্য কুড়ি টাকা মণ দরে বিক্রয় হয় শুনিয়াছি।

বিলাতী রেশনের স্কেলে যদি এদেশের পাঁচ জন পোষ্য বিশিষ্ট একটি পরিবারের লোকদের খাদ্যের ব্যবস্থা করিতে হয় তাহা হইলে কম পক্ষে দুই শত টাকা মাসে খরচ হইবে তাহাতে সন্দেহ নাই।

আমরা এতক্ষণ শুধু একটি পরিবারের দুই বেলা ডাল-ভাত খাওয়ার খরচই দেখাইয়াছি। কিন্তু খাদ্য-সমস্যার অন্যান্য দিক সম্বন্ধেও চিন্তা করা দরকার। অনেক পরিবারের উপার্জনক্ষম ব্যক্তিকে কার্য্যস্থলে একা মেসে থাকিতে হয়। তাঁহাদের কি রকম খরচ পড়ে ও নিজের খাওয়ার ও থাকার খরচ কুলাইয়া তাঁহাদের পক্ষে পরিবার প্রতিপালন করা সম্ভব কি না তাহাও খতাইয়া দেখা প্রয়োজন।

নিম্নে পূর্ণবয়স্ক পুরুষ চাকুরিয়াদের একটি মেসের খাদ্য-তালিকা ও খরচের হিসাব এবং স্কুলের শিক্ষয়িত্রীদের একটি মেসের খাদ্যতালিকা ও খরচের হিসাব দিলাম।

পুরুষদের এই মেসের লোকসংখ্যা দশ জন, ইহাদের প্রত্যেকের বেতন ৫০৲+২৭৲। এই মেসে সপ্তাহে এক দিন বা দুই দিন একবেলা মাছের ব্যবস্থা আছে। প্রত্যেকেই শারীরিক পরিশ্রমকারী তালিকায় পড়ে একজন সপ্তাহে ⁄৩৷ সের চাউল রেশন পায়।

খরচ :—চাউল—৫ মণ	৬৭৷০
সরিষার তৈল—৭৷ সের—	৫৷৶০
লবণ—১০ সের—	১৸৶০
কাঠ ও কয়লা—১৫ মণ—	২৫৲
বাজার খরচ—২৲ দিন—	৬০৲
	১৫৫৲

প্রত্যেক মেম্বারকে ১৫৷⁄ দিতে হইয়াছে। ইহা ভিন্ন চা ও জলখাবারও কিনিয়া খাইতে পড়ে ৯৷৶০ প্রত্যেকের খরচ গিয়াছে। মোট খরচ ২৫৲। ইহারা সরকারী চাকুরিয়া হিসাবে সরিষার তৈল সস্তাদরে ৸০ করিয়া পাইয়াছে। চাউল নূতন স্কেলের পূর্ব্বের কিছু উদ্বৃত্ত ছিল, তা নহিলে নূতন স্কেলে চারি সপ্তাহে সাড়ে তিন মণে ইহাদের পুরা খাওয়া হইত না। চাকরের মাহিনা গবর্ণমেণ্ট দেয়।

মেয়েদের উপরি-উক্ত বোর্ডিংয়ে খাদ্যব্যবস্থা নিম্নলিখিতরূপ : সকালে চা ও একখানি করিয়া বিস্কুট, বেলা দশটায় ভাত ডাল মাছ ও তরকারি। বেলা একটায় ⁄০ মূল্যের খাবার অথবা চা। বৈকালে সাড়ে চারিটায় রুটি তরকারি ও চা। অথবা মুড়ি মিষ্টি ও চা। রাত্রে ভাত ডাল ও তরকারি। মেম্বার ছয় জন সাকুল্যে মাথাপিছু পঁচিশ টাকা খরচ পড়ে। প্রভিডেণ্ট ফণ্ডে জমা দিতে হয় বলিয়া প্রত্যেকে পুরা বেতনটা হাতে পান না।

পঁচিশ টাকা খরচ করিয়া শারীরিক পরিশ্রমকারী এবং মস্তিষ্ক চালনাকারী যে খাদ্য গ্রহণ করেন তাহা শারীরিক পুষ্টিসাধনের পক্ষে পর্য্যাপ্ত কিনা তাহা নিম্নস্থ আদর্শ খাদ্য তালিকা (ভারতীয়দের জন্য) দেখিলেই বুঝা যাইবে।

খাদ্যদ্রব্য	নিরামিষাশী	আমিষাশী	খাদ্যের দর
চাউল বা আটা	দশ ছটাক	দশ ছটাক	৶১৫
ডাল	দেড় ছটাক	দেড় ছটাক	৲১৫
সব্জী (কাঁচা ও মূলজাতীয়)	ছয় ছটাক	চারি ছটাক	৶—৶০
তৈলজাতীয়	১ ছটাক	আট ছটাক	৲১০—৲১৫
দুধ	১ পোয়া	১ পোয়া	৶০
চিনি	এক ছটাক	এক ছটাক	৲১০
মাংস মাছ ও ডিম		দুই ছটাক	০—৶০
ফল	এক ছটাক	এক ছটাক	⁄০

প্রত্যেকের দৈনিক খরচ ৸১০—৸⁄১৫

উপরি-উক্ত আদর্শ খাদ্যতালিকা "Your Food হইতে উদ্ধৃত।

নিরামিষাশীর শুধু খাদ্যদ্রব্য ক্রয় করিতে দৈনিক ব্যয় ৸১০ হিসাবে মাসে খরচ হয় ২৩৷৶। ইহাতে জ্বালানী বা মশলার হিসাব ধরা হয় নাই। যিনি আমিষভোজী তাঁহাকে দৈনিক ৸⁄১৫ ব্যয় করিতে হয়, মাসে খরচ হয় ২৫৸১০। ইহাও জ্বালানী প্রভৃতি অন্যান্য খরচ বাদে। মেসে থাকিয়াই হউক অথবা নিজ গৃহে বাস করিয়াই হউক, বার, পনর, পঁচিশ, ত্রিশ বা পঞ্চাশ টাকা বেতনের চাকুরিয়ার পক্ষে তিন-চারিটি পোষ্যের উপযুক্ত খাদ্যের সংস্থান করা সম্ভব কিনা, তাহা বুঝিতে গণিতশাস্ত্রে বিশেষ ব্যুৎপত্তির আবশ্যক করে না।

এখন যে অবস্থা দাঁড়াইয়াছে তাহাতে মনে হয়, ভবিষ্যতে হয়ত বা মারোয়াড়ী ভ্রাতাদের দৃষ্টান্ত অনুসরণ করিয়া ছাতু-গুড় খাইয়াই আমাদিগকে কোনমতে পৈতৃক প্রাণ রক্ষা করিতে হইবে।

দার্শনিক

শ্রীফণিভূষণ চক্রবর্ত্তী

সুলতা বসে থাকে জানালার ধারে। অদূরে রূপনারায়ণ বয়ে চলেছে তার অফুরন্ত রূপরাশি ছড়িয়ে। ভেসে আসছে কলোচ্ছ্বাস—বেলার বুকে আছড়ে-পড়া ঢেউয়ের শব্দ ছলাৎছল্ ছলাৎছল্। ওপারের বনভূমির মুখে ফুটে উঠেছে বেলাশেষের ক্ষীণ হাসি। কর্ম্মমুখর পৃথিবী ঝিমিয়ে আসছে অবসাদে।

অনেক কথাই আজ ভাবছে সুলতা বিকেল থেকে, বিশেষ করে তার স্বামী মোহনের কথা। কি অদ্ভুত মানুষ! সংসারের কোন খবরেরই ধার ধারে না সে। উদাসীন, নির্বিকার। সুলতার অনেক কথাই পৌঁছে না তার কানে। নিজের খাওয়া-পরা এমন কি চুল আঁচড়ানটি পর্যন্ত তাকে তাগিদ দিয়ে করাতে হয়। সুলতা এই নিয়ে কতদিন অভিযোগ করেছে তার কাছে, বারে বারে পেয়েছে একই উত্তর—'ধরা বাঁধা জীবনের মতো অভিশাপ বোধ হয় আর কিছু নেই সুলতা।"

স্বামি-স্ত্রীর সংসার। আর কেউ নেই বালকভৃত্য গুপী ছাড়া। বছরখানেক হ'ল বিয়ে হয়েছে ওদের। বিয়ের পূর্বে সুলতার স্বপ্ন ছিল তার শ্বশুরবাড়ী হবে পাড়াগাঁয়ে। স্বামী হবে বিদ্বান্ কিন্তু চাকুরে নয়। পৈতৃক বিষয়-সম্পত্তি কিছু থাকবে তার, তাতে করেই কোনরকমে দিনগুলো কাটবে ওদের হাসিখেলায় মধুর দাম্পত্য-প্রেমে। অতীত স্বপ্নের সঙ্গে বর্ত্তমান বাস্তবকে মিলিয়ে দেখে সুলতা—যা চেয়েছিল সবই পেয়েছে সে। উপরন্তু একটা বেশী আশীর্ব্বাদ পেয়েছে বিধাতার কাছ থেকে—তার পিছনে সদাসর্ব্বদা টিকটিক করে বেড়াবার মতো জটিলা-কুটিলার বালাই নেই। কিন্তু তবু সে যেন কিছুই পায় নি। মোহন হয়ত তাকে ভালবাসে না। সে ভালবাসে ওই রূপনারায়ণকে, তার এস্রাজকে আর ঘরের কোণে আলমারী-ভরা এই বইগুলোকে। আর কাউকে কিনা কে জানে? ঘন মেঘাচ্ছন্ন আকাশের বুকে মাঝে মাঝে ক্ষণিক আলো জেলে যাওয়া বিদ্যুতের মত সে আসে সুলতার কাছে। প্রশংসা করে তার গান শুনে আদর ক'রে করে রঙ্গ-পরিহাস। কিন্তু কতটুকু সে? সে চায় মোহনকে সর্বদা কাছে পেতে; চায় এমন একটি ছবি, যা আঁখির সুমুখে ভেসে বেড়ায় সারাক্ষণ; এমন একটি গান যা থামে না কোন দিন—দিনরাত বেজে চলে একটানা সুরে। কিন্তু কোথায়? মোহন তার ব্যথা বোঝে না। সে যে একা, বড় একা! দীর্ঘশ্বাস পড়ে সুলতার। মোহন নদীতীরে বটতলায় বসে এস্রাজ বাজাচ্ছে। হাওয়ায় দুলছে তার দীর্ঘ কেশ। বড় ভাল লাগল সুলতার। তার স্বামী সুন্দর, খুব সুন্দর। সে স্থির করল আর থাকবে না সে একা একা। পারবে না মোহন আর তাকে দূরে দূরে সরিয়ে রাখতে। সেও যাবে, হ্যাঁ সেও যাবে।

তুমি এলে যে সুলতা। মোহনের চোখে বিস্ময় দৃষ্টি।

হ্যাঁ, কিন্তু কার উদ্দেশ্যে এমন করুণ সুরে এস্রাজ বাজানো হচ্ছে শুনি?

তার আগে তুমিই বল তো, কেষ্টঠাকুর কদমতলায় কার জন্যে বাঁশী বাজাতেন।

শ্রীমতীর জন্যে।

এক্ষেত্রে শুধু শ্রীমতী নয়, একটা নামও জড়িত আছে তার সঙ্গে।

শুনতে পাই কি সে নামটা?

তার আগে বল তো সে বাঁশী শুনে দৌড়ে যেত কে।

শ্রীমতী আর গোপিনীরা।

এক্ষেত্রে যে এল, তারই উদ্দেশ্যে বাজানো হচ্ছিল অনায়াসে ধরে নিতে পার।

মিথ্যে কথা!

খাঁটি সত্যি কথা!

সুলতা বসল মোহনের খুব কাছ ঘেঁসে। মোহন ওর একটা হাত মুঠোয় নিয়ে মৃদু চাপ দিতে দিতে বলল—তুমি আর একা থাকতে পারলে না, নয় সুলতা? সুলতা নীরব। তন্ত্রীগুলোয় জেগে ওঠে অভিমানের কম্পন, উত্তর দেয় তার সুন্দর নিটোল গণ্ড বেয়ে গড়িয়ে-পড়া দু-ফোঁটা তপ্ত অশ্রু—ঠিক যেন ক্ষতস্থানে সমাজ আঘাত লেগে রক্তবিন্দুপাতের মত।

কি হ'ল তোমার সুলতা? মোহনের কণ্ঠস্বরে আবেগ।

কিছুই হয় নি—ভারী গলা, উদাস দৃষ্টি সুলতার।

তবে, তোমার চোখে জল যে। লুকিয়ো না, সত্যি করে বল লক্ষ্মীটি!

তুমি আমায় এমন করে দূরে সরিয়ে রাখ কেন?

মোহন নীরব, গম্ভীর। চঞ্চল বাতাস বাড়িয়ে তুলেছে ঢেউয়ের মত্ততা। রূপনারায়ণের আনন্দ ধরে না, সুর চড়িয়ে গাইছে কল্‌কল্ ছল্‌ছল্!

মোহন বলল—'তুমি জান না সুলতা, দূরত্বের মাধুর্য্য কত। ওই যে দেখছ ওপারের তরুলতা, ওই যে শ্যামল চর, কেন এত ভাল লাগে জান? ওরা দূরে আছে ব'লে। এপারেও তরুলতার অভাব নেই, অভাব নেই চরের শ্যামলিমার; কিন্তু কই, অত ভাল লাগে না তো। আবার যদি ওপারে যাই, তখন এপারের এরাই চোখে ধরা দেবে কত সুন্দর হয়ে, আর ওরা হয়ে যাবে ম্লান, নিষ্প্রভ। পুরাতনকে নূতন ক'রে পাওয়া যায় দূরে, আর নূতন কাছে এসে পুরাতন হয়ে যায় সুলতা।' একটু ভেবে নিয়ে সুলতা বলে—

'কিন্তু মন তো মানে না সে-কথা।'

'মনের ওই না-মানাই তো মধুর সুলতা। তৃষ্ণা না থাকলে জলের আস্বাদ পাওয়া যাবে কেন। অন্ধকার না থাকলে আলোর মূল্য হ'ত কতটুকু? এপারের বন থেকে কপোতী চাইছে ওপারের বনের কপোতকে, আর ওপারের বন থেকে কপোত চাইছে এপারের বনের কপোতীকে; ভাবতেও ভাল লাগে। এর বেশী কি চাই? পাওয়ার চেয়ে চাওয়াটাই যে বড় সে কথা তোমার কি ক'রে বোঝাই ভেবে পাই নে সুলতা।' শান্তির প্রলেপ নিয়ে নেমে আসে শান্তিময়ী সন্ধ্যা। ঘরে ঘরে শঙ্খ উচ্চরবে গায় তার আগমনী। সুলতা শশব্যস্তে উঠে পড়ে—'যাই, সন্ধ্যে দিতে হবে। তুমি আমার একটা কথা রাখবে?'

'কি ব'ল।'

'সারাবেলা তো নদীর ধারে কাটালে, এবার ঘরে চল। আমি সন্ধ্যে দেখিয়ে রাঁধতে বসব, তুমি গল্প করবে, কেমন?'

বেশ,—মোহন আপন মনে আবৃত্তি করতে করতে চলল—

> "লও তার মধুর সৌরভ
> দেখ তার সৌন্দর্য্য বিকাশ
> মধু তার ক'র তুমি পান
> ভালবাসো, প্রেমে হও বলী
> চেয়োনা তাহারে।
> আকাঙ্ক্ষার ধন নহে আত্মা মানবের।
> শান্ত সন্ধ্যা, স্তব্ধ কোলাহল
> নিবাও বাসনা-বহ্নি নয়নের নীরে
> চলো, ধীরে ঘরে ফিরে যাই।"

সুলতা পেরে ওঠে না মোহনের স্বরূপ নির্ণয় করতে। তার সম্বন্ধে কোন একটা পাকা ধারণা করা চলে না। মোহন সাধারণতঃ উদাস, গম্ভীর প্রকৃতির। কিন্তু এক এক সময় সে এমন হাল্কা হয়ে পড়ে যে তাকে তখন নেহাত ছেলেমানুষ ছাড়া আর কিছুই মনে হয় না। কি দুষ্টুমিই না জানে আর কি হাসাতেই না পারে, বাপস্।

দুপুরে মোহন বই পড়ছে শুয়ে শুয়ে। সুলতা ওর চুলে আঙুল দিতে দিতে বলল—'একটা কথা জিজ্ঞেস করব?' বইয়ের পাতায় নিবদ্ধদৃষ্টি মোহন বলে—'করো।'

'আগে বই বন্ধ কর।'

'আচ্ছা নাও' মোহন পাতার মধ্যে আঙুল রেখে বই বন্ধ করে।

'আমি বলছি, তুমি কি এত ভাবো দিনরাত। তোমায় দেখলে মনে হয় যেন কিসের একটা অভাব বোধ কর তুমি সারাক্ষণ। আমার কাছে লুকিয়ো না, বল তোমার সে অভাবটা কি।'

'আমি নিজেই তা জানি না সুলতা। কিছুরই অভাব নেই, পেয়েছি জীবনের প্রশান্ত অবকাশ, বাধাহীন আলো, আকাশ-বাতাস, দিগন্ত-বিস্তৃত উন্মুক্ত ময়দান আর চতুর্দ্দিকে সবুজের মেলা। পেয়েছি পাখীর গান, বাড়ীর সম্মুখেই রূপনারায়ণের কলতান আর পেয়েছি তোমার মত সহধর্ম্মিণী। পেয়েছি সবই কিন্তু তবু, কোথায় যেন কিসের একটা অভাব আছে। যেন কি পাই নি, তুমি ওইটে শোনাও না সুলতা, রবীন্দ্রনাথের ওই 'কী পাইনি' গানটা।

সুলতা গায়। নীরব নিস্পন্দ মোহন অনেকক্ষণ দেয়ালের পানে অপলকনেত্রে তাকিয়ে থেকে বলে—'এই চাওয়ার এই খোঁজার শেষ নেই সুলতা। তৃপ্তি কোথায়? আমরা তো অল্প কিছু নিয়ে তৃপ্ত হতে পারি না। আচ্ছা সুলতা, বলতে পার তুমি কাকে চাও?' একটু নীরব থেকে মৃদুকণ্ঠে সুলতা বলে—'তুমি কি জানো না?'

'না।'

'বেশ, তা হলে জেনেও লাভ নেই।'

'রাগ ক'রো না সুলতা, বলই না তুমি কাকে চাও।'

'তোমাকে, শুধু তোমাকে।'

হোঃ হোঃ করে হেসে ওঠে মোহন। সুলতা আঁৎকে ওঠে—'তার মানে?'

'আমি বলব ভুল। তুমি চাও তোমাকে।'

'আমি চাই আমাকে। আর তুমি?'

'একই উত্তর, আমিও চাই আমাকে। শুধু তুমি আমি কেন সুলতা, পৃথিবীর সবাই চায় যে যার নিজেকে।'

'না না, কিছুতেই বিশ্বাস করতে পারব না তোমার কথা। আমি তো জানি, আমি সত্যিই তোমাকে চাই কিনা।'

'তুমি ঠিকই জান সুলতা। শুধু একটু পার্থক্য আছে। আচ্ছা শোন—আয়নাতে তোমার প্রতিকৃতি দেখে তুমি খুশি হলে, তোমার খুব ভাল লাগল। এখন বলত, ভাল লাগল কাকে—আয়নাকে না তোমার নিজেকে?'

'আমার নিজেকে। কিন্তু মানুষ তো আর আয়না নয়, তবে মানুষ মানুষকে ভালবাসে কেন?'

'তার মধ্যে নিজেরই আদর্শ দেখতে পায় ব'লে। তুমি ইচ্ছে করলেই পরীক্ষা ক'রে দেখতে পার যার কথার সঙ্গে তোমার কথার খাপ খায়, যার মনের সঙ্গে তোমার মন মেলে, তাকে তোমার নিশ্চয় ভাল লাগবে।' সুলতা অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকে মোহনের মুখের পানে। মোহন ব'লে যায়—

'আবার রহস্য এই যে, তুমি যাকে চাও, আমিও তাকে চাই আর পৃথিবীর সবাই ঠিক তাকেই চায়।'

'বিশ্বের এই নানা বৈচিত্র্যের মধ্যে, বহুর মধ্যে আমি সেই একেরই সত্তা অনুভব করি সুলতা।' মোহন থামে।

'তা হলে কি এসব মিথ্যা? শুধু স্বপ্ন?'—সুলতার কণ্ঠে প্রকাশ পায় উত্তেজনা।

'স্বপ্ন ছাড়া আর কি সুলতা। জগতের সব মহাপুরুষই তা প্রত্যক্ষ ক'রে বলে গেছেন।'

'কিন্তু চোখের সামনে যা ঘটছে, যা দেখছি, অনুভব করছি প্রাণে, তাকে মিথ্যে বলে ভাবা যায় কেমন ক'রে?'

'আমরা যখন স্বপ্ন দেখি, তখনকার মতো সে ঘটনাগুলোকে কি সত্যি বলে মনে হয় না? এও ঠিক সেই রকম সুলতা। তফাৎ শুধু সময়ের। সে-স্বপ্ন কয়েক ঘণ্টার আর এ-স্বপ্ন কয়েক বছরের। সে একটা রাত্রির, আর এ একটা জীবনের। কিন্তু থাক্, আজ আর নয়। এখন এস্রাজটা দাও দিকিন বটতলায় যাই।'

'আমিও যাব তোমার সঙ্গে'—সুলতা বায়না ধরে।

'বেশ এস।'

সুলতা যায় ওর পিছু পিছু। বর্ষার রূপনারায়ণ ফেটে পড়ছে অব্যক্ত রূপে। ভরা যৌবনের উন্মাদনায় দিশেহারা হয়ে ছুটে চলেছে টলমল করতে করতে। দূরে বান ডাকার গর্জন। উদ্দাম জলরাশি হুহুংকারে তেড়ে আসে সর্বগ্রাসী লেলিহান জিহ্বা প্রসারিত ক'রে। সুলতা আঙুল বাড়িয়ে দেখায়—'দেখ দেখ, কেমন বান ডেকে জোয়ার আসছে!'

'দেখছি সুলতা।'

'কি ভাবছ।'

'ভাবছি, কতক্ষণের জন্যে ওর ওই বিপুল সমারোহ। কত শীগ্‌গিরই না ওকে ম্লান হয়ে যেতে হবে কালের ভাঁটায়! আশ্চর্য, সুলতা আশ্চর্য!'

'এর মধ্যে তুমি আশ্চর্যের কি পেলে শুনি? জোয়ারের পর ভাঁটা, দিনের পর রাত, সুখের পর দুঃখ আছেই এ তো জানা কথা।'

'ওই জানার মধ্যেই যে এক বিরাট্ অজানা লুকিয়ে থাকে সুলতা। দেখ, আপেল মাটিতে পড়ে চিরকাল সকলে জেনে এসেছে। কিন্তু ওই জানার মধ্যেই ত লুকিয়ে ছিল অদ্ভুত মাধ্যাকর্ষণ শক্তি, যা এক দিন ধরা দিল সত্যসন্ধানী নিউটনের প্রাণে। মানুষ চিরদিন মরে, চিরদিনই পৃথিবীতে আছে শোক, দুঃখ, হাহাকার। এই জানার মধ্যেই ত লুকিয়ে ছিল অমৃতময়ী সর্ববন্ধনবিমুক্তি, মহানির্বাণ, যা ধরা দিল কুমার সিদ্ধার্থের কঠোর সাধনায়। শুধু জানা নিয়েই যারা সন্তুষ্ট থাকে, অজানার আভাস তারা কোনদিনই পায় না সুলতা।'

সুলতা কি উত্তর দেবে? আপাততঃ ও-প্রসঙ্গের নির্বাণ লাভ করাই সমীচীন বোধ ক'রে বলল—'তুমি সে দিনের সেই সুরটা বাজাও একবারটি, বড় ভাল লাগে আমার।'

মৃদু হেসে মোহন বলল—'সে সুর ত এখন বাজবে না সুলতা। বিরহের সুর মিলনে বাজতে যাবে কোন্ দুঃখে?'

'তবে তোমার যেটা ভাল লাগে বাজাও।'

* * *

রাত্রি অনেক। মেঘে মেঘে সারা আকাশ ছাওয়া। ঠাণ্ডা বাতাস দিয়ে যায় আসন্ন বৃষ্টির বার্তা। মোহন নিঃশব্দে বসে থাকে বাইরের দাওয়ায়। নিদ্রাদেবীর অনুগ্রহ ওর ওপর বড় একটা নেই। সুলতা বিছানায় বসে ঢুলতে থাকে মোহনের প্রতীক্ষায়। প্রদীপটার বুক পুড়ে যায়।

'শুনছ? অনেক রাত হ'ল যে, ঘুমবে না?'—সুলতা এসে দাঁড়ায় ওর পিছনে।

'সবাই ঘুমোবে সুলতা, তুমি আমি সবাই। তবু, যতক্ষণ জেগে থাকা যায়, তার পূর্ণ ব্যবহার ক'রে নেওয়াটাই কৃতিত্ব।'

'সব তাতেই তোমার ওই হেঁয়ালী!'

'অতি সহজ সত্যই আমাদের কাছে হেঁয়ালী ঠেকে সুলতা।'

'বেশ গো, তাই। পায়ে পড়ি তোমার, চল, আর রাত জেগো না অসুখ করবে যে!'

'আচ্ছা, চল।' মোহন ওঠে।...

ভারতে সমাজতন্ত্র

শ্রীনগেন্দ্রনাথ চন্দ

কমিউনিজম মতবাদ সোশালিজম বা সমাজতন্ত্রবাদেরই এক উগ্র সংস্করণ মাত্র। সোশালিষ্টরা চায় ধনের উৎপাদন, পরিবেশন ও বিনিময়ের যন্ত্র সরকারের হাতে আনিতে; আর কমিউনিষ্টরা চায় তদুপরি ব্যক্তিগত সম্পত্তি উচ্ছেদ করিতে। জার্মানীর কার্ল মার্ক্সের (১৮১৮–৮৩) উদ্ভাবিত এই কমিউনিষ্ট নীতির দার্শনিক ভিত্তি হইল জার্মান দার্শনিক হেগেলের ডায়লেক্‌টিসিজম্ (দুই বিরুদ্ধ ভাবের উচ্চতর স্তরে সমন্বয়), এবং ইংরেজ অর্থনীতিবিদ রিকার্ডোর ধনতন্ত্রবাদ। ইহার মূল অর্থ এই যে, মালিকানা প্রথাই (thesis) আত্মস্বার্থে বহু কলকারখানা করিয়া বহু-শ্রমিক প্রথা সৃষ্টি করে (anti-thesis) এবং এই দুইয়ের স্বার্থসংঘাতে শেষে বিজয়ী-শক্তি হিসাবে শ্রমিক-ধনতন্ত্র (synthesis) প্রতিষ্ঠিত হয়। মার্কস্ বলিয়াছেন "ব্যক্তিগত ক্ষমতার পরিবর্ত্তে ব্যক্তিগত প্রয়োজনের" নীতি মানিয়া লওয়াই হইল সামাজিক আদর্শ। ইহার মর্ম্ম এই যে, মজুররাই অর্থ সৃষ্টি করে; অর্থশালীরা উহাদিগকে অল্প বেতনে খাটাইয়া লভ্যাংশ (theory of surplus profit) নিজেরা আত্মসাৎ করিয়া ক্রমে বৃহৎ হইতে বৃহত্তর কলকারখানা স্থাপন করিতেছে এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে মালিকেরা যেমন ফাঁপিয়া উঠিতেছে মজুররা তেমন নিঃস্ব হইতেছে। এমতাবস্থায় বিদ্রোহের জোরে মজুরদিগকে সরকারী কর্তৃত্ব হাত করিয়া কলকারখানাসমূহ আত্মকর্তৃত্বে সর্ব্বসমীকরণের আদর্শে পরিচালিত করিতে হইবে। গণতান্ত্রিক ভাবে গণভোটাধিক্যে আইন-সভা দখল করিয়া তৎসাহায্যে এই শ্রমিকরাজ প্রতিষ্ঠার চেষ্টা হইলে তাহা তত আপত্তিকর হয় না। কিন্তু এই বিষয়ে এই জোরজবরদস্তির নীতির জন্যই কমিউনিষ্ট সঙ্ঘ বে-আইনী বলিয়া বিঘোষিত হইতেছে। জবরদস্তি জবরদস্তিই সৃষ্টি করে।

এই কমিউনিষ্ট মতবাদ মেক্সিকোতে আংশিকভাবে ও রুশদেশে অনেকাংশে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। স্পেনে ও ফ্রান্সে সাময়িকভাবে বামপন্থী বা অগ্রগামী বিরুদ্ধবাদীদের মিলিত সরকার (popular front) গঠিত হইয়াছিল এবং বর্ত্তমানে ইংলণ্ডে প্রায় সমাজতান্ত্রিক সরকার গঠিত হইয়াছে। মুসোলিনী-প্রচলিত ফ্যাসিজম ব্যক্তিগত সম্পত্তি রাখিতে দিত, কিন্তু উহা রাষ্ট্রের কর্তৃত্বাধীনে থাকিত। ইহাতে শ্রেণী-সংগ্রাম ও শ্রমিক-মালিক বিরোধ নিরুদ্ধ হইয়াছিল; ফ্যাসিষ্ট কর্তৃত্বাধীনে শ্রমিক-সঙ্ঘ ও মালিক-সঙ্ঘ যুক্তসঙ্ঘে গ্রথিত হইত। নাৎসী জার্ম্মানীর ন্যাশনাল সোশালিজম অনর্জ্জিত আয় রদ, যুদ্ধকালীন লাভ বাজেয়াপ্তি, সঙ্ঘ ব্যবসায়সমূহ সরকারীকরণ ও পাইকারী লাভ দূর করার নীতি গ্রহণ করে। কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত উপরোক্ত ফ্যাসিষ্ট মতবাদই জার্ম্মেনীতে গৃহীত হয়। ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসও (কংগ্রেস নির্ব্বাচনপ্রার্থীদের অনুসরণীয় ১১-১২-৪৫ তারিখের পত্রে) বলিয়াছে যে প্রধান শিল্পাদি, খনিজ সম্পদ, রেল জাহাজাদি যানবাহন, মুদ্রা, ব্যাঙ্ক, ইনসিওর‍্যান্স ইত্যাদি জনস্বার্থে সরকারী কর্তৃত্বাধীনে পরিচালিত হইবে। ব্যক্তিগত সম্পত্তি রাখিতে দেওয়া হইবে, কিন্তু সরকার ও প্রজাভূম্যধিকারীর মধ্যবর্ত্তী জমিদারী স্বত্ব ন্যায্য ক্ষতিপূরণ দিয়া উঠাইয়া দেওয়া হইবে। শ্রমিকদের বেকারত্ব দূর, সর্ব্বনিম্ন বেতন ধার্য্য, সুষ্ঠু জীবনযাত্রা প্রচলন ও মালিক-শ্রমিক বিরোধ মীমাংসার যন্ত্র স্থাপন ইত্যাদি সরকারী কর্ত্তব্যরূপে গণ্য হইবে।

রুশেও ইহা পূর্ণভাবে প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে নাই। প্রথমে ১৯২২-২৭ সন পর্য্যন্ত তথায় "নেপ" নীতিতে দেশে-বিদেশে ব্যক্তিগত কারবারাদি চালাইতে দেওয়া হয়; তৎপরে পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় সরকারী কর্তৃত্বে কলকারখানা পরিচালিত হইতে থাকে। বর্ত্তমানে কলকারখানা ও রেল ষ্টীমার ইত্যাদি প্লানিং কমিশনের নির্দ্দেশমত সরকারী কর্তৃত্বে চালানো হয় কিন্তু কৃষি হয় যৌথ কৃষিপ্রথায় পরিচালিত। কৃষকেরা উপরোক্ত যৌথ কৃষিতে তাহাদের প্রাপ্যাংশ ব্যতীত নিজেরাও দুই-এক একর জমি, দুই-একটি গরু এবং বাড়ী রাখিতে পারে। কাজেই ব্যক্তিগত সম্পত্তি উচ্ছেদ এত চেষ্টায়ও সম্ভব হয় নাই। এতদ্ব্যতীত যে ধনসাম্যের জন্য এত হৈ-চৈ সেই ব্যবস্থাও দুঃস্বপ্নেই পরিণত হইতে যাইতেছে। উপরোক্ত সব যৌথ কৃষিকার্য্যের ম্যানেজারদের বেতন সাধারণ শ্রমিকের প্রায় ৮০ গুণ অধিক। উচ্চতম ও নিম্নতম বেতনে ভারত-সরকার ব্যতীত সম্ভবতঃ আর কোন সরকারেরই এত পার্থক্য নাই। এই ম্যানেজারগণ এখন তাহাদের উদ্বৃত্ত অর্থ ব্যক্তিগত আয়ের জন্য দেশ-বিদেশে খাটাইতে ব্যস্ত হইয়া পড়িয়াছে। কাজেই ইহার ফলে তথায় কমিউনিজিমের মূলোচ্ছেদও হইতে পারে। রুশে এই কমিউনিজমের শেষ পরীক্ষা এখনও হয় নাই। রুশের শ্রেণীহীন সমাজ মার্ক্সীয় আদর্শমত সরকারহীন সমাজে রূপান্তরিত হইতেছে না, বরং দৃঢ়তর অতিলোভী কেন্দ্রীয় সরকার সৃষ্টি করিতেছে। ট্রটস্কির আশঙ্কা মতই রুশে কমিউনিজম-বিরোধী আমলাতন্ত্র দেখা দিয়াছে। রুশ ইতিমধ্যেই ইংলণ্ড, আমেরিকা প্রভৃতি পুঁজিবাদী রাষ্ট্রের মতই সাম্রাজ্য বিস্তারে উঠিয়া পড়িয়া লাগিয়াছে। এই সাম্রাজ্যবাদ লাটভিয়া, এস্তোনিয়া, ফিনল্যাণ্ড ও পোলাণ্ডের একাংশ গ্রাসের পর এখন আবার মাঞ্চুরিয়া, কোরিয়া, পারস্য, তুরস্ক ও বলকান প্রদেশ গ্রাসে উদ্যত। পরশোষণ দ্বারা আত্মভোগ বৃদ্ধিই ইহার মূল প্রেরণা। তাই এই রু-সাম্রাজ্যবাদও

আর্থিক সাম্রাজ্যবাদই রুশীয় কমিউনিজমের কবরখানায় পরিণত হইবে বলিয়া মনে হয়।

ভাষা ও সংস্কৃতিগত জাতিত্ব উঠাইয়া দিয়া এক বিশ্বশ্রমিক জাতি গঠনের। যদিও তদ্দ্বারা বহু কমিউনিষ্ট রাষ্ট্রের উদ্ভব ও তাহাদের স্বার্থসংঘাত নিবারিত হইতেছে না) মার্কসীয় আদর্শ ও বাস্তবতার রূপ লাভ করিতে পারিবে বলিয়া মনে হয় না। ১৯১২ সনে শ্রমিকদের দ্বিতীয় ইন্টারন্যাশনাল বলিয়াছিল যে, মালিকরা জাতিগত যুদ্ধ আরম্ভ করিলে উহা সর্ব্বদেশে শ্রমিক বিদ্রোহ ঘটাইবে। কিন্তু ১৯১৪ সনে যুদ্ধারম্ভে সকল দেশের শ্রমিকই শেষে নিজ নিজ দেশের যুদ্ধে আত্মনিয়োগ করে। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধেও এই নীতির ব্যতিক্রম হয় নাই। মস্কোর ১৯২০ সনের তৃতীয় ইন্টারন্যাশনালের বিশ্বশ্রমিক-বিপ্লবের ট্রট্‌সকি পরিপোষিত মূল কমিউনিষ্ট নীতি মিত্র-শক্তির চাপে রুশ প্রকাশ্যেই পরিত্যাগ করিয়াছে। যদিও তলে তলে কমিউনিজম ছড়াইবার রুশীয় চেষ্টায় মনে হয় যে এই ঘোষণাও তাহার জাপ বিশ্বাসঘাতকতারই দ্বিতীয় সংস্করণ মাত্র, তবু কার্য্যতঃ ইহা ফলপ্রসূ হইবে বলিয়া মনে হয় না। কারণ এই বিশ্বশ্রমিকবাদই বিশ্বমালিকবাদ সৃষ্টি করিতেছে। এই কমিউনিষ্ট মতবাদ অন্যত্র ছড়াইবার বিরুদ্ধে ১৯৩৭ সনে জার্ম্মাণী, ইটালি ও জাপান যে এন্টি-কমিন্টার্ণ প্যাক্ট করে তাহার আদর্শেই বর্ত্তমানে ইংলণ্ড ও আমেরিকা তাহাদের বৈদেশিক নীতি পরিচালিত করিতেছে। ইহার ফলে পারস্য, বলকান ও চীনে ব্যক্তিস্বাধীনতাই থাকিবে কি সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হইবে তাহা লইয়া ইঙ্গ-মার্কিন দল ও রুশের মধ্যে প্রতিযোগিতা চলিতেছে। এই চাপে শেষ পর্য্যন্ত স্পেনের মত রুশেও রাষ্ট্ররূপ পরিবর্ত্তিত হইতে পারে। ডায়লেক্‌টিসিজম বা ভাঙা-গড়ার নীতি বিশ্বের অনন্ত অবিশ্রান্ত নীতি (যেমন নীহারিকার গ্রহ-উপগ্রহে এবং গ্রহউপগ্রহের নীহারিকায় পরিণতি) বলিয়াই মনে হয়। রাজনীতিতে শ্রমতন্ত্রেই উহার শেষ নয়, উহার পরবর্ত্তী পদক্ষেপ সাম্রাজ্যবাদে ও ব্যক্তিতন্ত্রে। রুশের উপরোক্ত অগ্রগতি কি তাহাই সূচনা করিতেছে?

কমিউনিজমের মূল তথ্যটি (dialectic materialism) কেবল আর্থিক স্বার্থের ঘাত-প্রতিঘাতের উপর প্রতিষ্ঠিত। হেগেল বলিয়াছিলেন যে মানসিক ধারণা (idea) বাস্তবতার (real) রূপ লাভ করে। কিন্তু মার্কস বলিয়াছেন যে বাস্তবতাই বিভিন্ন ধারণা সৃষ্টি করে এবং আর্থিক পরিস্থিতিই ইতিহাস (ঘটনাস্রোত) আইন ও ধর্ম্মাদির বিভিন্ন স্বরূপ সৃষ্টি করে। এই ভোগলালসাবাদ নিম্ন মনোবৃত্তিকে কিয়দ্দূর পরিচালিত করিলেও শেষে মানুষের অন্তর্নিহিত আধ্যাত্মিকতাই ইহার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করে। তারপর মানুষ যন্ত্র নহে, নৈতিক জীব। বিবেক ও স্বাধীন কর্ম্ম-প্রেরণা (conscience and free-will) তাহার বৈশিষ্ট্য। ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য বিরোধী হওয়ায় কমিউনিজম কতকটা এই মূল মনুষ্যধর্ম্ম-বিরোধী। এই মূল মনুষ্যচরিত্র বদলানো অসম্ভব বলিয়া স্থায়ী কমিউনিজম অসম্ভব। ইহার শ্রেণী-সংগ্রামের নীতি সমাজের সর্ব্বস্বার্থেরও উপর প্রতিষ্ঠিত নহে। কমিউনিষ্ট মেনিফেষ্টো বলিয়াছে "তথাকথিত রাজশক্তি এক শ্রেণীর অপর শ্রেণীকে অত্যাচারের সুগঠিত শক্তি।" কিন্তু শ্রমিক-মালিকের শ্রেণীস্বার্থের বাহিরে মনুষ্যত্বের আদর্শে রাষ্ট্রগঠনের নীতি কখনও আদর্শরূপে গৃহীত হয় নাই কি? পাণ্ডবদের সপ্ত-অক্ষৌহিণী ও নেতাজীর অমর বাহিনী কোন্ শ্রেণীস্বার্থে আত্মবলি দিতে গিয়াছিল? ইহাদের আদর্শ ছিল কি শ্রেণীস্বার্থ না সর্ব্বস্বার্থ সমন্বয়? বিত্তহীনের বিত্ত, ক্ষুধিতের অন্ন থাকাই দরকার। ইহার প্রতিকার বিত্তহীনের বিত্ত আহরণে, বিত্তশালীর বিত্ত হরণে নহে। শিক্ষিতকে অশিক্ষিত করিয়া অশিক্ষিতের শিক্ষাসাম্য সাধিত হইবে কি? ইহা সামাজিক আদর্শ হইতে পারে না। সর্ব্বসমীকরণ প্রচেষ্টায় ব্যক্তির শারীরিক ও মানসিক উন্নতি-প্রচেষ্টা যেমন বন্ধ করা যায় না তেমনি তাহার অর্থ আহরণ প্রচেষ্টাও সম্পূর্ণ রুদ্ধ করা যায় না। অপর সকলেরও লেজকাটায় এই বুদ্ধি সর্ব্বদা পরিহার্য্য। বাস্তবিক সর্ব্বসমীকরণ নৈসর্গিক নিয়মবিরুদ্ধ ও অসম্ভব। আজ সকলকে এক অবস্থাপন্ন করিলেও বিভিন্ন মানব তাহাদের শারীরিক ও মানসিক বিভিন্নতার জন্য কালই বিভিন্নরূপ উন্নতি সাধন করিবে।

মানব-সভ্যতা শারীরিক ও মানসিক শ্রমেরই ফল সত্য এবং কারখানাজাত সম্পদ সৃষ্টিতে বহুসংখ্যক লোকের শ্রমও অপরিহার্য্য সন্দেহ নাই। কিন্তু ইহাতে ভূমি, মূলধন ও পরিচালন-প্রচেষ্টাও অঙ্গাঙ্গিভাবে যুক্ত। এই মূলধন ও পরিচালন-প্রচেষ্টার অভাবে খনি চালু হয় না, কারখানা গড়িয়া উঠে না, এমন কি গঠিত কারখানাও অচল হয়। এই শ্রমশক্তি প্রায় তড়িতাদি নির্জ্জীব শক্তিরই পর্য্যায়ভুক্ত। ইহাকে কাজে লাগানোর ভিতরেই সম্পদসৃষ্টির রহস্য। কাজেই মূলধন ও পরিচালন-শক্তিকে তার প্রাপ্যাংশ দিতেই হইবে; শ্রমিকের সর্ব্বগ্রাস অসম্ভব। এমনও দেখা গিয়াছে যে নিজ মালিক হইতে স্বীয় প্রাপ্যাংশ বৃদ্ধিতে অতি উৎসাহী শ্রমিকই নিজ ভৃত্যের প্রাপ্যাংশ হ্রাসে যত্নবান, এমন কি সে নিজেই শ্রমিকশোষক মালিকের স্থান অধিকারে উদ্যোগী। ইহা কি সমীকরণ না স্বার্থ? পারিবারিক জীবন, ব্যক্তিগত বৈশিষ্ট্য ও ভোগেচ্ছা (নিজে ও পুত্রাদির ভিতর দিয়া) মানুষের স্বভাবগত। তাই ধন আহরণে ব্যক্তিগত প্রচেষ্টা ও অর্জ্জিত ধনের উত্তরাধিকারিত্ব একেবারে রোধ করা অসঙ্গত ও অসম্ভব।

মার্কস্ পুঁজিবাদে যত অনর্থ দর্শাইয়াছেন বর্ত্তমানে তাহা নাই। বর্ত্তমান প্রজাতন্ত্র সামাজিক চুক্তি ছাড়া আর কিছুই নহে। অধিকাংশের স্বার্থেই ইহা পরিচালিত। গণভোটের বাধায় মুষ্টিমেয় মালিকের স্বার্থেই ইহা পরিচালিত হইতে পারে না। বস্তুতঃ প্রায় সকল পুঁজিবাদী রাষ্ট্রই

শ্রমিকের হিতার্থে অত্যধিক সুব্যবস্থা করিয়াছে। ভারতে ১৯০১ সনের ইণ্ডিয়ান মাইনস্ এক্ট, ১৯১১ সনের ফ্যাক্টরী এক্ট, ১৯২৩ সনের ওয়ার্কমেনস্ কম্পেনসেসন এক্ট, ১৯২৯ সনের ট্রেড ডিস্‌পুট্‌স এক্ট ও ১৯৩৬ সনের পেমেন্ট অব ওয়েজেজ এক্ট (এই সকল এক্টেরই অত পর্য্যন্ত বহু সংস্কার হইয়াছে) দ্বারা ভারতের শ্রমস্বার্থ সংরক্ষিত ও সংবর্দ্ধিত হইয়াছে। রুশিয়ার জারের স্বৈরাচারে লোকের যে কষ্ট হইয়াছে ইংলণ্ড-আমেরিকার প্রজাতন্ত্রে (তথায় বেকারদিগকে কাজ দেওয়ার দায়িত্ব রাষ্ট্রেরই) তত হয় নাই এবং এই জন্যই কমিউনিজম শ্রমিক-প্রধান ইংলণ্ডে না হইয়া হইয়াছে ব্যক্তিগত সম্পত্তিপ্রধান রুশিয়ার। রুশিয়ার বর্ত্তমান কমিউনিষ্ট জারের স্বৈরাচারও অবশ্য ভূতপূর্ব্ব রাজতন্ত্রী জারের স্বৈরাচারেরই জাতি। ট্রট্স্কির উচ্ছেদ, "জি পি-ই উ" সন্ত্রাস ছাড়িয়া দিলেও ১৯৩৬-৩৭ সনের মতো পার্জ্জের (বিরুদ্ধবাদী উচ্ছেদ) মত কাজ গণতন্ত্রে অসম্ভব। তারপর রুশিয়ার কমিউনিষ্ট ব্যতীত কাহারও নির্ব্বাচনে দাঁড়ানোই নিষিদ্ধ। অপর দলের (সংখ্যাল্পতা বা সংখ্যাধিক্য) কথা যেখানে প্রকাশিতও হইতে পারে না কত ভয়াবহ সে স্থান! সংগঠনের ফলে সংখ্যাল্পও অনেক সময় অসংবদ্ধ সংখ্যাধিককে দাবাইয়া রাখিতে পারে। ইহা গণতন্ত্রও নহে, মনুষ্যত্ব বিকাশের অনুকূলও নহে। ইহার সংস্কার না হইলে মনুষ্য-ধর্ম্ম বিকাশের এই স্বৈরাচারী নিরঙ্কুশতার বিরুদ্ধে তত্রত্য মনুষ্য-ধর্ম্ম এক সময়ে বিদ্রোহ করিবেই। জবরদস্তিই যদি রাজ্যশাসনের নীতি হয় তবে রুশিয়ায়ও শ্রমিকরা না হইয়া সৈন্যেরাও রাজ্যেশ্বর হইয়া বসিতে পারে।

কিন্তু ব্যক্তিগত সম্পত্তি ও ব্যক্তিগত স্বাধীনতা (ধন আহরণে) অপরিহার্য্য হইলেও শ্রমস্বার্থে ও জনস্বার্থে উহার কিঞ্চিৎ সঙ্কোচ প্রয়োজন। ব্যক্তির ধন আহরণ তার বায়ুসেবনের মত অন্যনিরপেক্ষ হইলে ইহার প্রয়োজন হইত না। কিন্তু সমাজে ধন আহরণের সাধারণ বাজার সীমাবদ্ধ এবং শ্রম ও শিল্পাদির পারস্পরিক ক্রয়-বিক্রয়সম্ভূত। এমতাবস্থায় বিশেষ যোগ্যতার ফলে অল্প কয়েকজন সমস্ত কৃষি-শিল্প অধিকার করিলে (দেশ-বিদেশের বাজার সীমাবদ্ধ বলিয়া) অপরের আত্মবর্দ্ধনের সম্ভাবনা কোথায়? এতৎ সমাধানার্থে আমাদের প্রস্তাব এই যে, অর্থ আহরণের কোন ক্ষেত্রেই যেন ব্যক্তিবিশেষের একাধিকারে আসিতে দেওয়া না হয়।

বৃহৎ শিল্পাদি মাত্র কোম্পানী প্রথায় পরিচালিত হইলে এবং ব্যক্তিবিশেষের এক বা একাধিক কোম্পানীর অধিক শেয়ার ক্রয় নিরুদ্ধ হইলে (যেমন রিজার্ভ ব্যাঙ্কের শেয়ারে কতকটা হইয়াছে) এবং এই শিল্পাদির আয়ের ভাগ্যাংশ (টকিঙে শিল্পাদি হইতে শ্রমিকাংশ কম হইবে) শ্রমিকের মধ্যে বণ্টনের আইন হইলে সর্ব্বস্তরে ধন বণ্টন অনেকটা সংসাধিত হইতে পারে। কুটীর-শিল্প এই বৃহৎ শিল্পের অনুপূরকভাবে (কিন্তু মহাত্মা গান্ধী-কথিত উপায়ে উহাকে বাদ দিয়া নহে)* পরিচালিত হইতে পারে। অধিক ভূসম্পত্তিও একহস্তে ন্যস্ত না হওয়ার আইন হওয়া প্রয়োজন। তারপর জনস্বার্থে প্রয়োজন বোধে অধিক অর্থশালীদের সম্পত্তির উপর পাবলিক সার্ভিস ট্যাক্স (কার্য্যতঃ ইহা ওয়েল্‌থ টেক্স) ও বর্ত্তমান অধিক আয়ের উপর একস্ট্রা প্রফিট ট্যাক্স বসাইয়া জনহিত ও আংশিক ধনসাম্য সাধিত হইতে পারে। এই সব কৃষি শিল্পের উপর সাধারণ সরকারী তত্ত্বাবধান থাকিবেই এবং তৎসাহায্যেই জনস্বার্থে ইহার প্ল্যানিংও (কার্য্যতঃ ব্যষ্টিশিল্পেও প্ল্যানিং সুরু হইয়াছে যদিও উহা নিজস্বার্থে, জনস্বার্থে নহে) হইতে পারে। ইহাই হইবে আসল কৃষি-মজুর-প্রজা রাজ। ভারতীয় কংগ্রেসের উপরোক্ত প্রস্তাব মহাত্মাজীর ব্যষ্টিশিল্প ও জবাহরলালজীর সমাজতন্ত্রবাদের মিশ্রণ বলিয়াই প্রকাশিত হইয়াছে। কিন্তু এই মিশ্রণ আদর্শগত নহে, মনোগত। ব্যষ্টিশিল্পের নীতি যদি থাকিলই তবে উহার একাংশ সরকারী হাতে নেওয়ার অর্থ কি? উহা সমাজতান্ত্রিক, সর্ব্বনাশে সমুৎপন্নে অর্দ্ধং ত্যজতি পণ্ডিতঃ—এই নীতি নয় কি? শাসন-সংরক্ষণের প্রয়োজনীয়তার অজুহাতে যদি পোষ্ট আপিস ও রেল-ষ্টীমারাদির মত কোন বিষয় সরকারী হাতে রাখা হয় তবে সে ভিন্ন কথা। কিন্তু কংগ্রেস-পরিকল্পনাটি তদাদর্শে পরিকল্পিত নহে। অনুন্নত দেশে সরকারকেই শিল্পাদিতে হাত দিতে হওয়ার নীতিও স্বাধীন ভারতে খাটিবে না।

কমিউনিজম ব্যক্তিগত সম্পত্তির মত ধর্ম্মেরও উচ্ছেদসাধন করিয়াছে। হেগেল বলিয়াছেন যে শেষ আদর্শ উন্নতিমূলক হইলে পাপাচারে দোষ নাই। মার্কস তদুপরি বলিয়াছেন যে, নৈতিকতা শ্রেণী স্বার্থানুসারে পরিকল্পিত। কেবল ধর্ম্ম পরস্বগ্রাসে অন্যতম বিঘ্ন বলিয়া নহে, পরন্তু রুশিয়ার ধর্ম্ম-যাজকেরা জারের সহায়ক ছিল বলিয়া তথায় কমিউনিষ্টদের মধ্যে ধর্ম্মবিরুদ্ধতা দেখা দেয়। ভারতে ঐরূপ জনস্বার্থবিরোধী যাজক না থাকিলেও পরস্বগ্রাসের সুবিধার জন্যই কি ভারতীয় কমিউনিষ্ট কর্ত্তৃক ধর্ম্মবিরুদ্ধতা অনুসৃত হইতেছে? এই ধর্ম্মোচ্ছেদ বিশেষ করিয়া ভারতীয় শান্তি-সভ্যতার বিরোধী।

এই কমিউনিজমের মূল উৎস মজুর সমৃদ্ধি। কিন্তু ইংলণ্ডাদির মত অভিজাতপ্রধান দেশ ব্যতীত ভারতের মত বহু মধ্যবিত্তশালী দেশে কমিউনিজম সম্ভব নহে। ভারতের ৩৯ কোটি লোকের মধ্যে ১৯৩৯ সনে বিভিন্ন ফ্যাক্টরিতে ১৭৫১১৩৭ শ্রমিক ছিল। ইহার বাহিরের শ্রমিকও সংখ্যায় খুব বেশী নহে। এখানে সিণ্ডিক্যালিষ্ট মতানুযায়ী শ্রমিক-সঙ্ঘ সংশ্লিষ্ট কারখানার

---

* মহাত্মাজীর বৃহৎ শিল্পের পরিবর্ত্তে কুটীর-শিল্প ও স্ব-পরিবেশিত গ্রাম-সঙ্ঘের নীতি রুশিয়ার ক্রোপট্‌কিন (১৮৪২-১৯২১) হইতে গৃহীত, যেমন তাঁহার অহিংসা-নীতি রুশিয়ার টলষ্টয় (১৮২৮-১৯১০) হইতে পরিগৃহীত।

কর্তৃত্ব হস্তগত করিতে চেষ্টা করিতে পারে। কিন্তু ক্ষুদ্র বিত্ত-শালীর ভারতীয় রাষ্ট্র উহা বরদাস্ত করিবে কি? ভারতে ভূমিত-সাম্য যথেষ্ট বিদ্যমান, সম্পূর্ণ বিত্তহারার সংখ্যা সামান্য যদিও ভারতীয়দের গড়ে বাৎসরিক আয় কিঙলে সিরাজের মতেও ১০৭ টাকার (উহার কারণ শ্রমবিমুখতা ও বৈজ্ঞানিক কৃষি-শিল্পে অভাব) বেশী নয়। ভারতে খাঁটি কমিউনিষ্ট যাঁহারা আছেন তাঁহারা এতদ্দৃষ্টে ভারতে কমিউনিজমের সম্ভাবনা সম্বন্ধে সচেতন হইবেন কি? অবশ্য গোপনস্থ কারণে কমিউনিষ্ট গান্ধবারী জনবুদ্ধ ও পাকিস্থান সঙ্ঘ ইহাতে বিরত হইবে আশা করা যায় না।

স্মৃতি

আশ্‌রাফ সিদ্দিকী

থাম থই থই মাঠের কিনার, ফুল টুপটুপ্ সরোবর—
মনে আছে সেই ময়নামতীর চর?
তার পাশে এক ছোট্ট পাতার ঘর?
ঝিমঝিম যার সবুজ ধানের খি মউ মউ সুরভি—
রাখালী বাঁশীর মন-কেমনের পূরবী!
দু'টি মুখ কাঁপে স্বচ্ছ জলের পর—
মনে আছে সেই ফুল টুপটুপ সরোবর?

ঢেউ ছলছল পদ্মার পারে রোদ থমথম দুপুরে—
মনে পড়ে সেই হুহু কোকিল কুহরে?
আলোর নাচন ঝাপসা দূরের চরে?
ঝুপ ঝাপ ঝাপ পানসী মিলায়: স্বচ্ছ আকাশ-সরসী—
তুমিও তখন ঢেউ-ছলছল যোড়শী!
মালা গেঁথেছিলে বনকুসুমের থরে—
মনে পড়ে সেই হুহু কোকিল কুহরে?

রাত থমথম, নিঝুম ধরণী, জল ঝমঝম্ বরিষণ,
মনে আছে সেই পাগলা হাওয়ার শিহরণ?
লক্ষ্মী নদীর নূপুর ঝনর ঝন্?
রোদ ঝলমল দিনের পেছনে ঝড় গমগম অজগর-
লুটালো কখন স্বপ্ন-ফুলের ঘর···
তবু তারা মোর রাঙাবে মনের বন।
মনে আছে সেই জল ঝমঝম বরিষণ?

মহিলা-সংবাদ

শ্রীমতী তৃপ্তা রায় এই বৎসর সঙ্গীতে সুরশ্রী উপাধি পরীক্ষার প্রথম স্থান অধিকার করিয়াছেন। ইনি মুর্শিদাবাদ কাঞ্চনতলা-নিবাসী ৺মোহিনীমোহন রায়ের কন্যা এবং সঙ্গীতজ্ঞ শ্রীযুক্ত জিতেন্দ্রমোহন সেনগুপ্তের ছাত্রী। ওস্তাদ দবীর খাঁ সাহেব, ওস্তাদ আলাউদ্দীন খাঁ সাহেব, শ্রীযুক্ত বীরেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী ও শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র দত্ত (দানীবাবু) প্রমুখ বিশিষ্ট সঙ্গীতজ্ঞগণ পরীক্ষক নিযুক্ত হইয়াছিলেন। তাঁহারা শ্রীমতী তৃপ্তার সেতার বাজনায়, বিশেষতঃ, আলাপ অংশের বিশেষ প্রশংসা করেন।

শ্রীতৃপ্তা রায়

প্রেমধর্ম্ম

শ্রীনবীন চৌধুরী, এম্‌-এ

মহাপ্রভু কর্ত্তৃক যে ধর্ম প্রচারিত, তাহাই গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্ম নামে খ্যাত। এই ধর্মের মূলে প্রেম। সেইজন্য এই ধর্মকে প্রেমধর্ম আখ্যাও দেওয়া হইয়া থাকে। শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভুর আবির্ভাবের পূর্বেও ভক্তিবাদ এদেশে প্রচলিত ছিল—গীতায় এবং পুরাণগুলিতে ভক্তিমাহাত্ম্য কীর্ত্তিত হইয়াছে; কিন্তু মহাপ্রভুর অলৌকিক জীবন এবং অসামান্য প্রতিভার ফলেই এদেশে ভক্তিধর্মের এত ব্যাপক প্রচার। ভক্তি গাঢ় হইতে গাঢ়তর হইয়া পরিপক্কতা লাভ করিয়া তবেই প্রেমে পরিণত হয়। ভক্তিকে প্রেমে পরিণত হইতে হইলে যে সোপানাবলী অতিক্রম করিতে হয়, এই প্রবন্ধে আমরা তাহারই আলোচনা করিব। প্রসঙ্গক্রমে বলা যাইতে পারে যে মহাপ্রভু স্বয়ং জ্ঞান ও কর্মকে ভক্তির অঙ্গরূপে গ্রহণ করেন নাই। "জ্ঞান বৈরাগ্য ভক্তির কভু নহে অঙ্গ"।১

"Rupa Gosvamin himself establishes later on that karman itself is not an anga or means of Bhakti, nor is Jnana or Vairagya."২

অবশ্য এখানে কর্ম বলিতে শাস্ত্রবিহিত দান, ব্রত, যজ্ঞাদি কর্ম বুঝিতে হইবে। সেই সমস্ত কর্মকেই বুঝিতে হইবে যাহা শ্রীকৃষ্ণবিষয়ক নহে এবং জ্ঞান বলিতে অদ্বৈতমার্গের নির্বিশেষ ব্রহ্মজ্ঞানকে বুঝিতে হইবে।

গীতায় শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছেন—"পুরুষ স পরঃ পার্থ, ভক্ত্যা লভ্য স্বনন্যয়া"—সেই পরমপুরুষকে অনন্যভক্তির দ্বারা লাভ করা যায়। কিন্তু ভক্তি কি? ভক্তি কাহাকে বলে?

শ্রীরূপ গোস্বামী ভক্তিরসামৃত সিন্ধু গ্রন্থের পূর্ববিভাগে ভক্তিধর্ম সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনা করিয়াছেন। তাঁহার মতে অন্য সকল প্রকার বাসনা হইতে মুক্ত হইয়া ও একান্ত কৃষ্ণৈকনিষ্ঠ হইয়া সকল ইন্দ্রিয়ের দ্বারা শ্রীকৃষ্ণের সেবা করাকে ভক্তি বলে।৩ অবশ্য এখানে উত্তমা বা শুদ্ধা ভক্তির সংজ্ঞা দেওয়া হইয়াছে।

"কৃষ্ণভক্তি-জন্ম-মূল হয় সাধু সঙ্গ"।৪ শ্রীকৃষ্ণের প্রতি শ্রদ্ধা অর্থাৎ অটল বিশ্বাস হইতে সাধুসঙ্গ লাভ হয় এবং শ্রদ্ধার পরিপাকে জন্মে ভক্তি। ভক্তির উদয় সম্বন্ধে তাই বলা হইয়াছে 'আদৌ শ্রদ্ধা'।

ভক্তি ভক্তভেদে ত্রিবিধ—উত্তমা বা শ্রদ্ধা, মধ্যমা এবং কনিষ্ঠা।

"শাস্ত্র-যুক্ত্যে সুনিপুণ দৃঢ় শ্রদ্ধা যার।
উত্তম অধিকারী সেই তারয়ে সংসার।
শাস্ত্র-যুক্তি নাহি জানে, দৃঢ় শ্রদ্ধাবান।
মধ্যম অধিকারী সেই মহাভাগ্যবান।
যাহার কোমল শ্রদ্ধা সে কনিষ্ঠ জন।
ক্রমে ক্রমে তেঁহো ভক্ত হইবে উত্তম।"৫

যিনি শাস্ত্র ও শাস্ত্রানুগত সিদ্ধান্তগুলিতে সুপণ্ডিত এবং শ্রীকৃষ্ণে বিশ্বাস যাঁহার দৃঢ় তিনিই উত্তম অধিকারী। উত্তমা ভক্তির লক্ষণ, শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের মধ্যলীলার ঊনবিংশ পরিচ্ছেদে এই ভাবে লিপিবদ্ধ হইয়াছে—

"অন্য বাঞ্ছা অন্য পূজা ছাড়ি জ্ঞান কর্ম।
আনুকূল্যে সর্বেন্দ্রিয়ে কৃষ্ণানুশীলন।"

এখানে আনুকূল্যে অর্থে বুঝিতে হইবে শ্রীকৃষ্ণ প্রীত হন এইরূপ ভাবে। উত্তমা ভক্তির অধিকারী ত্রিজগৎ উদ্ধারে সমর্থ। মধ্যমা ভক্তির অধিকারীর শাস্ত্রে তেমন নিপুণ না হইলেও চলিবে, কিন্তু ইহার শ্রীকৃষ্ণে বিশ্বাস দৃঢ় হওয়া চাই। আর যাঁহার শ্রীকৃষ্ণে বিশ্বাস বা শ্রদ্ধা তেমন দৃঢ় নহে, তিনিই কনিষ্ঠ ভক্ত। কনিষ্ঠ ভক্তও ক্রমে ক্রমে উত্তম ভক্তে পরিণত হইতে পারেন। কৃষ্ণভক্তে কৃপালুতা, অকৃতদ্রোহতা৬, সমতা৭, নির্দোষতা, বদান্যতা ইত্যাদি গুণগুলি বর্ত্তমান। কৃষ্ণভক্তকে বৈষ্ণব-আচার পালন করিতে হয় অর্থাৎ কৃষ্ণাভক্ত (কৃষ্ণের অভক্ত) প্রভৃতি অসৎসঙ্গ পরিত্যাগ করিতে হয় এবং বর্ণাশ্রমধর্ম, গৃহ, স্ত্রী পুত্রগণ, বিষয়াদি ত্যাগ করিয়া কৃষ্ণৈকশরণ হইতে হয়। গীতায় শ্রীকৃষ্ণের উক্তি, "সর্বধর্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ।"

উত্তমা ভক্তি তিন প্রকারের—সাধন-ভক্তি, ভাব-ভক্তি, এবং প্রেম-ভক্তি।

সাধন-ভক্তি দুই প্রকারের—বৈধী সাধন-ভক্তি এবং রাগানুগা সাধন-ভক্তি। শাস্ত্রবাক্যের অনুরোধে যে শ্রীকৃষ্ণভজন, অথচ শ্রীকৃষ্ণের প্রতি রাগ অর্থাৎ প্রগাঢ় ভালবাসাজনিত প্রবল আকর্ষণ নাই, তাহাই বৈধী-ভক্তি। এক্ষেত্রে ভজন অনেকখানি নরকাদির ভীতিতে—প্রাণের সে ঐকান্তিক টান এখানে নাই। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে বলা হইয়াছে।

"রাগহীন জনে ভজে শাস্ত্রের আজ্ঞায়।
বৈধী ভক্তি বলি তারে সর্ব শাস্ত্রে গায়।"৮

শ্রীরূপ গোস্বামী গুরুপাদাশ্রয়, দীক্ষা, গুরুসেবা ইত্যাদি চৌষট্টি প্রকারের ভজনকে বৈধী-সাধন-ভক্তি লাভের অঙ্গ বা উপায় বলিয়াছেন। এই চৌষট্টি ভজনাঙ্গের মধ্যে শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে পাঁচটিকে মুখ্য স্থান দেওয়া হইয়াছে। এইগুলি যথাক্রমে সাধু-সঙ্গ, নাম-কীর্ত্তন, ভাগবত-শ্রবণ, মথুরাবাস এবং শ্রীমূর্ত্তির সশ্রদ্ধ সেবা। শ্রীকৃষ্ণ-প্রাপ্তির নিমিত্ত ভাগবতেও নবলক্ষণা ভক্তির অনুষ্ঠানকে স্বীকার করা হইয়াছে।৯ এই চৌষট্টি প্রকারের ভজনাঙ্গের মধ্যে একাঙ্গ ভজনের দ্বারাও বৈধী ভক্তি লাভ করা যায়। পরীক্ষিৎ শ্রবণ, শুকদেব কীর্ত্তন, অর্জ্জুন সখ্য—এমনি ভাবে একাঙ্গ ভজনের দ্বারা ইঁহারা প্রত্যেকে ফললাভ করিয়াছিলেন। অনেকাঙ্গ সাধনা

১। চৈতন্য চরিতামৃত—মধ্যলীলা, ২২ পরিচ্ছেদ।

২। Susil Kumar De—*Vaisnava Faith and Movement*, page 127.

৩। "সর্বোপাধি বিনির্মুক্তং তৎপরত্বেন নির্মলং।
হৃষীকেণ হৃষীকেশ-সেবনং ভক্তিরুচ্যতে।"
(ভক্তিরসামৃত সিন্ধু—পূর্ববিভাগ, প্রথম লহরী)

৪। চৈতন্যচরিতামৃত মধ্য ২২ পরিচ্ছেদ।

৫। ঐ

৬। অকৃতদ্রোহতার অর্থ কাহারও অনিষ্ট না করা।

৭। সমতা অর্থে সর্বত্র সমদৃষ্টি এবং সকলের প্রতি সমান ব্যবহার।

৮। মধ্যলীলা ২২ পরিচ্ছেদ।

৯। "শ্রবণং কীর্ত্তনং বিষ্ণোঃ স্মরণং পাদসেবনম্।
অর্চনং বন্দনং দাস্যং সখ্যমাত্মনিবেদনম্।"

রূপ চর্চ্চায়-
অপরিহার্য্য.
C.R. DASS'S
RANGAJAVA
TOILET POWDER
RANGAJAVA
RANGAJAVA
SNOW
সি, আর, দাশের
রাঙাজবা
স্নো ও
পাউডার

দ্বারাও বৈধী ভক্তি লাভ হয়। অম্বরীষ প্রমুখ ইহার প্রকৃষ্ট উদাহরণ। কিন্তু কি একাঙ্গ সাধন, কি অনেকাঙ্গ সাধন—উভয় প্রকারের ভজনেই নিষ্ঠা অত্যন্ত প্রয়োজনীয়।

"রাগাত্মিকা ভক্তি মুখ্যা ব্রজবাসিজনে"১০—শ্রীকৃষ্ণের প্রতি রাগময়ী ভক্তি প্রধানতঃ ব্রজবাসিগণের মধ্যে বিদ্যমান। রাগের স্বরূপ হইতেছে 'ইষ্টে গাঢ়তৃষ্ণা' এবং উহার ফলে 'ইষ্টে আবিষ্টতা'।

"Raga is defined as the natural, deep and inseparable absorption in the desired object, namely, Krisna." ১১

ব্রজবাসিগণের এই রাগময়ী ভক্তির নাম রাগাত্মিকা ভক্তি। এই রাগাত্মিকা ভক্তির প্রতি যদি কোন ভাগ্যবানের লোভ জন্মে, তবে তিনি ইহা পাইবার জন্য নিজ অভিলাষানুযায়ী ভাবযুক্ত কোনও ব্রজবাসীর অনুগত হইয়া তাঁহার ভাবটি গ্রহণ করেন। তিনি দাস্যভাবের নিমিত্ত উদ্ধবাদি শ্রীকৃষ্ণ-দাসগণের, সখ্যভাবের নিমিত্ত শ্রীদামাদি সখাগণের, বাৎসল্যভাবের নিমিত্ত নন্দাদি গুরুজনগণের এবং মধুরভাবের নিমিত্ত ললিতাদি সখীগণের অনুগত হন। এই ভাগ্যবান সাধক নিজ ভাবোচিত লীলা-বিলাসকারী শ্রীকৃষ্ণ এবং নিজ অভীষ্টমত কৃষ্ণপরিকরকে স্মরণপূর্ব্বক তাঁহাদের লীলাকথায় অনুরক্ত হইয়া সর্ব্বদাই ব্রজে বাস করেন (কুর্য্যাৎ বাসং ব্রজে সদা)। সশরীরে ব্রজবাসে অসমর্থ হইলে অগত্যা মনের দ্বারাও ব্রজবাসী হন।১২

এ সম্বন্ধে ডক্টর স্বশীলকুমার দে বলেন,

"One desirous of this way of realisation will adopt the particular Bhaba (*e.g.*, Radha-bhava, Sakti-bhava, etc.) of the particular favourite of Krisna according to his or her Lila, Vesa and Svabhava, and live in the ecstasy of that vicarious enjoyment." ১৩

এই ভাগ্যবান ব্যক্তির ভক্তিই রাগানুগা ভক্তি।

স্মরণই রাগানুগমার্গের সাধনের মুখ্য অঙ্গ। তবে সাধনের প্রথমাবস্থায় স্মরণে তেমন অধিকার জন্মে না বলিয়া শ্রবণ কীর্ত্তনাদি ভজনাঙ্গগুলিকে আশ্রয় করিতে হয়। কিন্তু ভজনের পরিপক্ব অবস্থায় স্মরণই কর্ত্তব্য।

"The devotee by his ardent meditation not only seeks to visualise and make the whole Vrindavana-Lila of Krisna live before him, but he enters into it imaginatively, and by playing the part of a beloved of Krisna, he experiences vicariously the passionate feelings which are so vividly pictured in the literature." ১৪

শ্রীরূপ গোস্বামী রূপমঞ্জরীর ভাব গ্রহণ করিয়াছিলেন এবং তিনি রূপমঞ্জরীর অবতার বলিয়া প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন।

প্রসঙ্গক্রমে বলা যায় যে, মহাপ্রভু ও তাঁহার অনুগত গোস্বামিগণের ভজন-প্রণালী রাগমার্গীয়।

১০। চৈতন্যচরিতামৃত—মধ্যলীলা, ২২ পরিচ্ছেদ।

১১। S. K. De—*Vaisnava Faith and Movement*, page 130.

১২। শ্রীজীব গোস্বামী বলিয়াছেন—"সামর্থ্যে সতি ব্রজে... শরীরেণ বাসং কুর্য্যাৎ। তদভাবে মনসাপীতি।"

১৩। *Vaisnava Faith and Movement*, page 131.

১৪। ঐ

রাগানুগা ভক্তি দুই প্রকারের—কামানুগা এবং সম্বন্ধানুগা।

ভক্তিরসামৃত সিন্ধুতে শ্রীরূপ গোস্বামী সাধন-ভক্তিকে 'কৃতি-সাধ্যা' অর্থাৎ ইন্দ্রিয়সাধ্যা বলিয়াছেন। উভয়া ভক্তিই ইন্দ্রিয়গণের সাহায্যে শ্রবণ, কীর্ত্তনাদির দ্বারা সাধন-ভক্তিতে পরিণত হয়। পুনরায় সাধন-ভক্তির উভয় শ্রেণীই বাহ্য উপায় দ্বারা লভ্য—যেহেতু ভজন, কীর্ত্তন দ্বারা বৈধীভক্তি লাভ হয় এবং স্মরণের সাহায্যে রাগানুগা ভক্তি অর্জ্জন করা যায়। রাগানুগা ভক্তি সাক্ষাৎভাবে শাস্ত্রবোধ হইতে অর্জ্জিত না হইলেও, রাগাত্মিকা ভক্তির প্রতি লোভ হইতে ইহার জন্ম এবং স্মরণ ও অভীষ্ট ব্রজপরিকরের অনুসরণ দ্বারা ইহার পুষ্টি—সুতরাং ইহা ভক্ত-হৃদয়ের স্বতোৎসারণ নহে। সুতরাং ভক্ত হৃদয়ের স্বতোৎসারিত যে ভক্তি, যাহাকে ভাব-ভক্তি আখ্যা দেওয়া হয়, তাহার সহিত রাগানুগার পার্থক্য স্পষ্ট।

বৈধী-ভক্তিতে শাস্ত্রানুযায়ী ভজন-পূজনই যথেষ্ট,[১৫] কিন্তু রাগানুগার প্রয়োজন হইলে শাস্ত্রও লঙ্ঘিত হইতে পারে। রাগানুগা ভক্তি ভক্ত-হৃদয়ের অকৃত্রিম স্বতোৎসারণ না হইলেও, ইহাতে সাধক-হৃদয়ের ঐকান্তিক টানের পরিচয় আছে এবং এই মার্গের ভক্তিতে কল্পনা ও হৃদয়াবেগের স্থানও বর্ত্তমান। কারণ রাগানুগা-মার্গের সাধক কল্পনার দ্বারাই অভীষ্ট পরিকরের সহিত পরিশেষে অভিন্ন হইয়া যান এবং এইভাবে বৃন্দাবন-লীলা উপভোগ করেন।

ভক্তিরসামৃতসিন্ধুর পূর্ব্ববিভাগের তৃতীয় লহরীতে ভাবভক্তির আলোচনা করা হইয়াছে। ভাবভক্তির অন্ত নাম রতি। এই ভাব বা রতি সাধন-ভক্তির পরিপক্ক অবস্থা। অবশ্য শ্রীকৃষ্ণ এবং তাঁহার ভক্তগণের কৃপাদ্বারাও[১৬] এই ভাব-ভক্তি লাভ করা যায়—যদিও তাহা দুর্লভ। সুতরাং ইহাকে তিন শ্রেণীর বলা চলে—

(১) সাধনাভিনিবেশ—ইহা আবার বৈধী ও রাগানুগা ভেদে দ্বিবিধ। (২) কৃষ্ণপ্রসাদজ। (৩) কৃষ্ণভক্তপ্রসাদজ।

ভাবভক্তি সাধক-হৃদয়ের অকৃত্রিম স্বতোৎসারণ। হৃদয়াবেগ বা emotion হইতে ইহার জন্ম। কিন্তু ইহা প্রেম নহে, প্রেমের অঙ্কুর মাত্র।

"It may be born of Sadhana-bhakti, but it is not the direct result of extraneous ways and means, and arises spontaneously as a personal feeling, although this feeling has not yet ripened into Prema-bhakti." [১৭]

এই ভাবভক্তির উদয়ে ভক্তের মনে ক্ষান্তি, অব্যর্থকালত্ব, বিরক্তি। মানশূন্যতা, আশাবন্ধ, সমুৎকণ্ঠা, নামগানে সদারুচি, শ্রীকৃষ্ণগুণ-কথনে আসক্তি, শ্রীকৃষ্ণের বসতিস্থলে অর্থাৎ শ্রীবৃন্দাবনাদি স্থান-সমূহে প্রীতি প্রভৃতি নয়টি অনুভাবের জন্ম হয়।

ভক্তিরসামৃতসিন্ধুর পূর্ব্ববিভাগের চতুর্থ লহরীতে প্রেমভক্তি আলোচিত হইয়াছে। ইহা বৈধী ভাবভক্তি এবং রাগানুগা ভাব-ভক্তির পরিণত অবস্থা। শ্রীকৃষ্ণপ্রসাদেও প্রেমভক্তি লাভ করা যায়। পুনরায়

"The grace may be either pure, that is, not dependent on any other circumstance (Kevala), or the result

১৫। এখানে শাস্ত্রানুযায়ী বলিতে অবশ্য শ্রীমদ্ভাগবত ও অন্যান্য বৈষ্ণব শাস্ত্র বুঝিতে হইবে।

১৬। 'কৃষ্ণ কৃপয়া তদ্ভক্ত কৃপয়া বা'—ভক্তিরসামৃতসিন্ধু, পূর্ব্ববিভাগ, ভাবভক্তি-লহরী।

১৭। S. K. De—*Vaisnava Faith and Movement*, page 123.

of the knowledge of his greatness (Mahatmya-Jnana), the former being Raganuga and the latter following the Vaidhi Marga." ১৮

শ্রীরূপ গোস্বামী প্রেমভক্তির সংজ্ঞা এইভাবে দিয়াছেন—

"সম্যঙ্‌মসৃণিত-স্বান্তো মমত্বাতিশয়াঙ্কিতঃ।
ভাবঃ স এব সান্দ্রাত্মা বুধৈঃ প্রেমা নিগদ্যতে॥"

চিত্ত মসৃণকারী, অতিশয় মমতাসম্পন্ন যে ভাব বা রতি বা প্রেমাঙ্কুর, তাহা গাঢ়তা প্রাপ্ত হইয়া বুধগণের দ্বারা প্রেম নামে অভিহিত হয়।

প্রেমভক্তির জন্মকথা এইভাবে সংক্ষেপে বিবৃত করা যায়—প্রথমে জন্মে শ্রদ্ধা অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণে অটল বিশ্বাস। অটল বিশ্বাস হইতে সাধু-সঙ্গে ইচ্ছা। সাধুসঙ্গ হইতে ভজনক্রিয়া। শ্রবণ-কীর্তনাদি সাধন-ভক্তির ভজনাঙ্গসমূহের যাজন করিতে করিতে অনর্থ-নিবৃত্তি হয়। যাহা ভক্তির ব্যাঘাত করে, তাহাই অনর্থ—কৃষ্ণ বিনা অন্যত্র আসক্তি মাত্রেই অনর্থ বলিয়া। অনর্থ-নিবৃত্তি হইলে ভজনে নিষ্ঠা বা আগ্রহ জন্মে এবং এই আগ্রহ হইতে শ্রবণাদিতে রুচি হয়। রুচি হইতে ভজনাদিতে প্রচুর আসক্তি লাভ হয়, অর্থাৎ ভজনাদি না করিয়া থাকা যায় না। আসক্তি হইতে ভাব বা রতির জন্ম এবং রতি গাঢ় হইলে প্রেম আখ্যা লাভ করে।

১৮। ঐ " ১৩৪ পৃষ্ঠা।

"প্রেম বৃদ্ধি-ক্রমে নাম—স্নেহ, মান, প্রণয়।
রাগ, অনুরাগ, ভাব, মহাভাব হয়॥"১৯

প্রেম বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইতে হইতে পরিশেষে মহাভাবে পরিণত হয়। মহাভাব একমাত্র ব্রজগোপীগণের মধ্যেই বিদ্যমান। শান্ত-রতিতে শুধু প্রেম পর্য্যন্ত হয়, দাস্যে রাগ পর্য্যন্ত হইতে পারে। সখ্য-রতিতে অনুরাগ পর্য্যন্ত লাভ হয় এবং বাৎসল্যে অনুরাগের শেষ-সীমা প্রাপ্ত হওয়া যায়, কিন্তু মধুর রতিতেই একমাত্র মহাভাব পর্য্যন্ত লাভ হইতে পারে। মধুর রতিই এইজন্য সর্ব্বশ্রেষ্ঠ (অবশ্য এখানে মধুর রতি বলিতে ব্রজগোপীগণের মধুর রতি বুঝিতে হইবে)।

মধুর রসের ভক্তগণের মধ্যে আবার ব্রজগোপীগণের তুলনা নাই। দ্বারকার ও মথুরার মহিষীগণের এবং বৈকুণ্ঠের লক্ষ্মীগণের রতি 'ঐশ্বর্য্যজ্ঞানমিশ্রা'—ব্রজগোপীগণের রতি 'কেবলা' অর্থাৎ শুদ্ধ মাধুর্য্যময়ী।২০। এইজন্য ব্রজগোপীদের মধুর রতি তুলনাহীন এবং একমাত্র ইহাতেই মহাভাবের উদয় সম্ভব। দ্বারকাদি ধামের মহিষীগণের মধুর রসে মহাভাবের পূর্ব্বাবস্থা পর্য্যন্ত লাভ হয়, তাহার অধিক নহে; একথা বিস্মৃত হইলে চলিবে না।

১৯। চৈতন্যচরিতামৃত—মধ্যলীলা, ১৯ পরিচ্ছেদ।
২০। "গোকুলে কেবলা রতি ঐশ্বর্য্যজ্ঞানহীন।
পুরীদ্বয়ে বৈকুণ্ঠাদ্যে ঐশ্বর্য্য প্রবীণ॥"
—চৈতন্যচরিতামৃত, মধ্য, ১৯ পরিচ্ছেদ।

পুস্তক-পরিচয়

ধর্ম্ম ও সমাজ—শ্রীবসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়, এম্-এ। প্রাপ্তিস্থান, ৩, শম্ভুনাথ পণ্ডিত ষ্ট্রীট, কলিকাতা, গ্রন্থকারের নিকট এবং অন্যান্য বাংলা পুস্তকালয়। মূল্য ২৸০ আনা।

ধর্ম্ম ও সমাজ সম্বন্ধে কতকগুলি প্রবন্ধের সমষ্টি। নিম্নলিখিত কয়েকটি বিষয় এবং অন্যান্য বিষয় আলোচিত হইয়াছে: বেদ কি? হিন্দুধর্ম্মের বিশেষত্ব কি? জাতিভেদ ও তাহার ফল, বর্ণাশ্রমধর্ম্ম, বেদান্ত, বাল্যবিবাহ, বিবাহ সমস্যা, স্ত্রীশিক্ষা, বিধবা বিবাহ ইত্যাদি।

ড.

আনন্দ মঠ, কপালকুণ্ডলা—সংক্ষেপিত বঙ্কিমগ্রন্থমালা। সম্পাদক—শ্রীবিজনবিহারী ভট্টাচার্য্য। প্রকাশক আশুতোষ লাইব্রেরী, ৫নং কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা। মূল্য প্রত্যেকখানি ১৲ টাকা। সুন্দর প্রচ্ছদপট।

সংক্ষেপিত বঙ্কিমগ্রন্থমালা সম্বন্ধে সম্পাদক মহাশয় এক জায়গায় বলিয়াছেন, দেশে শিক্ষার প্রসার যে পরিমাণে বাড়িতেছে বঙ্কিমের পাঠক সংখ্যা সে অনুপাতে বাড়িতেছে না বরং কমিতেছে। ইহার কারণ নির্ণয় করিতে গিয়া তিনি জানাইয়াছেন, প্রাচীন সাহিত্য-পাঠের অনুকূল আবেষ্টনের অভাব হওয়াতেই বর্ত্তমান দুরবস্থার উদ্ভব। পিতামাতা অভিভাবক শিক্ষক ইঁহাদের কাহারও সময় নাই। সকলেই আপন আপন কাজে ব্যস্ত। তাহা ছাড়া গ্রন্থের আয়তনও প্রচারের একটা প্রবল অন্তরায়। ইংরেজি অনেক গ্রন্থের সংক্ষিপ্ত সংস্করণ আছে, বাঙ্গালায় সেরূপ বেশী হয় নাই। যাহা হইয়াছে তাহারও অধিকাংশ মূলের সহিত সম্পর্ক রহিত।

এই অভাব দূরকরণার্থে সংক্ষেপিত বঙ্কিম-গ্রন্থমালা প্রকাশের আয়োজন। সম্পাদকের ভাষায়, এই সংস্করণের বিশেষত্ব এই যে, ইহা মূল অপেক্ষা অনেকাংশে ছোট। মূলের রস বজায় রাখিয়া যতটা কমানো যায়, কমানো হইয়াছে, গ্রন্থকারের ভাষার উপর হস্তক্ষেপ করা হয় নাই।

পারম্পর্য্য রক্ষার জন্য সম্পাদকীয় সংযোজন অংশ ছোট অক্ষরে স্বতন্ত্রভাবে মুদ্রিত হইয়াছে।

সংক্ষেপিত আনন্দমঠ ও কপালকুণ্ডলা পড়িয়া সম্পাদনার নিষ্ঠা ও কৃতিত্বকে আমরা অভিনন্দন জানাইতেছি। ক্ষুদ্রতর পরিধিতে বৃহত্তর মূলগ্রন্থের রস সুষ্ঠুভাবেই পরিবেশিত হইয়াছে এবং এই ধরণের গ্রন্থ পাঠে গ্রন্থকারের প্রতিভা ও সৃষ্টি-ক্ষমতার পরিচয় পাঠকমনে মূলগ্রন্থ আস্বাদনের আগ্রহ সঞ্চার করিবে। অল্পকালের মধ্যে সংক্ষেপিত আনন্দমঠ ও কপালকুণ্ডলার কয়েকটি সংস্করণ প্রকাশিত হওয়ায় এই ধরণের গ্রন্থ প্রকাশের প্রয়োজনীয়তা আমরা বুঝিতে পারি।

মাটি আর পাথর—প্রবোধকুমার সান্যাল। প্রকাশক—ইণ্ডিয়ান বুক ক্লাব, ৭নং ওয়েলিংটন স্কোয়ার, কলিকাতা। মূল্য ২।০ আনা।

এই সংগ্রহের মধ্যে অনেকগুলি গল্প আছে। লেখকের সাহিত্য-সাধনার প্রথম অধ্যায় হইতে পূর্ণতর বিকাশের ধারা এই গল্পগুলিতে

পাওয়া যায়। গল্প হিসাবে প্রত্যেকটি সুলিখিত এবং কয়েকটি গল্পে বিচিত্র ধরণের টাইপ সৃষ্টিতে লেখকের কৃতিত্বের পরিচয় পাওয়া যায়। কিন্তু এই সুলিখিত গল্পগুলির মধ্যে একটি সিনেমার গল্প (বস্তু) নিতান্তই অনধিকার প্রবেশ করিয়াছে। সাধারণত সিনেমা-গল্পের মধ্যে গতিটা প্রধান বলিয়া অবাস্তব অসম্ভব কতকগুলি ঘটনার সমাবেশে রসসৃষ্টি অবহেলিত হয়। এই ধরণের সাহিত্য-মূল্যহীন গল্প এই সংগ্রহে স্থান না পাইলেই ভাল হইত।

রাণা প্রতাপ সিংহ—শ্রীনারায়ণচন্দ্র চন্দ, এম-এ। আশুতোষ লাইব্রেরী, ৫নং কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা। মূল্য ৶৹ আনা।

রাজপুতকুলগৌরব রাণা প্রতাপ সিংহের অসীম শৌর্য্যমহিমা-মণ্ডিত চরিত্রের সঙ্গে ইতিহাস পাঠক মাত্রেই পরিচিত। স্বাধীনতার বেদী মূলে সর্ব্বস্ব বিসর্জ্জন দিয়াও তিনি ছিলেন দৃঢ় অনমনীয়। এই সংঘাতময় ও বৈচিত্র্যপূর্ণ জীবনী যত বার পাঠ করা যায় তত বারই নূতন অনুভূতিতে ও প্রেরণায় চিত্ত চঞ্চল হয়, দেশাত্মবোধ জাগ্রত হয়। লেখক অত্যন্ত দরদের সঙ্গে কিশোরদের জন্ত এই মহান্ জীবনীকথা বর্ণনা করিয়াছেন। তাঁর ভাষায় আবেগ এবং শক্তি আছে। বর্ণনভঙ্গীও মনোরম। কিশোর চিত্তে এই নিঃস্বার্থ বীরের জীবনী যে গভীরভাবেই রেখাপাত করিবে সে বিষয়ে আমরা নিঃসন্দেহ।

এই দেশেরই মেয়ে—শ্রীধীরেন্দ্রলাল ধর। প্রকাশক—এম, সি, সরকার এ্যাণ্ড সন্স লিঃ। ১৪, বঙ্কিম চ্যাটার্জ্জী ষ্ট্রীট, কলিকাতা। মূল্য ৶৹ আনা।

বৈদিক যুগ হইতে আধুনিক যুগ পর্য্যন্ত যে সব ভারতীয় মহিলার শিক্ষা সংস্কৃতি ও শৌর্য-বীর্য্যের মহিমা সভ্য জগতের বিস্ময় হইয়া আছে তাহারই সংক্ষিপ্ত পরিচয় ইহাতে লিপিবদ্ধ হইয়াছে। কিশোরদের জন্ত লিখিত হইলেও ইহা অনুসন্ধিৎসু পাঠকের মনোরঞ্জন করিবে। মৈত্রেয়ী, গার্গী প্রভৃতি মহীয়সী মহিলার জীবন-কথার মধ্য দিয়া আমরা জানিতে পারি পাঁচ হাজার বছর আগেকার ভারতীয় মহিলারা শিক্ষা সংস্কৃতিতে জগতে শীর্ষস্থান অধিকার করিয়াছিলেন। এইরূপ পুস্তকের বহুল প্রচার বাঞ্ছনীয়।

শ্রীরামপদ মুখোপাধ্যায়

শ্রীকান্ত প্রথম পর্ব্বের ভূমিকা—শ্রীমাখনলাল মুখোপাধ্যায়, এম-এ, পি-আর-এস্। পাইওনিয়ার বুক কোং। ১৮, শ্যামাচরণ দে ষ্ট্রীট, কলিকাতা। মূল্য ১।০।

ঘটনা বিশ্লেষণের সঙ্গে সঙ্গে লেখক প্রধান চরিত্রসমূহের বৈশিষ্ট্যের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছেন। 'আলোচ্য উপন্যাসের আঙ্গিক রূপের' আলোচনায় তাঁহার চিন্তাশীলতা এবং সাহিত্যবোধের পরিচয় পাওয়া যায়।

সব্যসাচী—শ্রীরণজিৎকুমার সেন। বেঙ্গল পাবলিশার্স। ১৪, বঙ্কিম চাটুজ্যে ষ্ট্রীট, কলিকাতা। মূল্য ১৲ টাকা।

কিশোর পাঠ্য উপন্যাস। গল্পটি চিত্তাকর্ষক। আজকালকার এই জাতীয় অনেক উপন্যাসে লেখকগণ কেবল রোমাঞ্চকর ঘটনাসৃষ্টির দিকে লক্ষ্য রাখেন, কিশোর মনের স্বাস্থ্য ও প্রয়োজনের দিকে দৃষ্টি দেন না। এখানি সেরূপ নহে।

লঘুছন্দী—শ্রীমণীন্দ্র গুপ্ত। বেঙ্গল পাবলিশার্স। ১৪, বঙ্কিম চাটুজ্যে ষ্ট্রীট, কলিকাতা। মূল্য ১৲ টাকা।

'মুখরা চাঁদ' 'ভাবুক চাঁদ' 'অসতী চাঁদ' 'ভীরু চাঁদ' 'ভবী চাঁদ'

ঘোলাটে চাঁদ' 'উলতা চাঁদ' 'ঠাণ্ডা চাঁদ' স্বপ্নকীতা কুমারী চাঁদ' 'চাঁদের মেঘ' 'চাঁদের চুল',—চাঁদকে লইয়া কবি খুব কিলে পড়িয়াছেন, তাহার মোহন বাণে মুর্ছিবা তিনি 'আহত'। আবার 'ঘুমে পড়া দিন' 'সাদাটে রাত' 'অসুস্থ দুরাশা' 'উদারী রাত' ইহাদের লইয়াও কি কম বিভ্রাট? "উট পাখী আর খেজুরের লাল আকর্ষণে শূন্তকে যারা শোনাতে চেয়েছে মনকার"—'আকর্ষণে মনকার শোনানো'—আমরাও নূতন শুনিলাম।

কাশবনের কন্যা—শ্রীফাল্গুনী মুখোপাধ্যায়। প্রিমিয়ার পাবলিশিং হাউস ৮, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা।

পল্লীজীবনের একখানি সুন্দর কাহিনী-কাব্য। চমকপ্রদ কিছুই নাই, গ্রাম্য প্রকৃতির মতই সরল ও অনাড়ম্বর, কিন্তু তেমনি মনোরম ও তৃপ্তিকর। ছাপা ও বাঁধাই সুদৃশ্য।

শ্রীধীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়

চন্দ্রশেখর ও রাজসিংহ—সংক্ষেপিত বঙ্কিমগ্রন্থমালার তৃতীয় ও চতুর্থ গ্রন্থ। সম্পাদক—শ্রীবিজনবিহারী ভট্টাচার্য্য। আশুতোষ লাইব্রেরী, ৫, কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা। মূল্য প্রত্যেকখানির ১৲ টাকা, পৃষ্ঠা যথাক্রমে ১০০ এবং ১৪২।

সাহিত্যসম্রাট্ বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসের নূতন করিয়া পরিচয় দিবার প্রয়োজন নাই। চন্দ্রশেখর ও রাজসিংহ তাঁহার শ্রেষ্ঠ উপন্যাসসমূহের মধ্যে গণ্য। যাঁহারা বাংলাদেশের ক্লাসিক রচনার সহিত পরিচিত হইতে চান, অথচ সময়াভাবে পারেন না এই সংক্ষেপিত গ্রন্থদ্বয় পাঠে তাঁহাদের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইবে। আবার অনেক উচ্চশ্রেণীর উপন্যাসও বিশেষ বিশেষ বর্ণনার জন্য অসঙ্কোচে তরুণ পাঠক-পাঠিকাদের হাতে তুলিয়া দেওয়া যায় না,—এরূপ যে যে অংশ তরুণ-মনের অনুপযোগী সেই সেই অংশ সম্পাদক কর্তৃক পরিবর্জিত অথবা পুনর্লিখিত ও পরিমার্জিত হইয়া প্রকাশিত হইয়াছে। সংক্ষিপ্ত আকারে গ্রন্থদ্বয়ের মূল রস কোথাও ক্ষুণ্ণ হয় নাই।

শ্রীতারাপদ রাহা

তবুও মানুষ—শ্রীজ্ঞানেন্দ্রনাথ দে। শ্রীরাধারমণ চৌধুরী, প্রবর্ত্তক পাবলিশার্স, ৬১, বহুবাজার স্ট্রীট, কলিকাতা। মূল্য দুই টাকা।

উপন্যাসক্ষেত্রে এই নবাগত লেখককে স্বাগত জানানো যাইতে পারে। যে অবস্থা-বিপাকের মধ্যে তিনি অশোক এবং মালাকে লইয়া গিয়া তাহাদের চরিত্রের ছবি আঁকিয়াছেন তাহা প্রশংসনীয়। তা ছাড়া মানবতা এবং সাহিত্যের প্রতি সজাগ মনোবৃত্তি এই লেখকের অন্যতম বৈশিষ্ট্য।

শ্রীফাল্গুনী মুখোপাধ্যায়

বিবাহ ও প্রেমকলা—শ্রীরমেন্দ্রনাথ দে। আর এন এণ্ড কোম্পানী, মালাকারটোলা, ঢাকা। মূল্য তিন টাকা।

প্রসিদ্ধ পাশ্চাত্ত্য যৌনতত্ত্ববিদ হ্যাভলক এলিস বলিয়াছেন—"জীবনের মূলে রহিয়াছে যৌন-প্রবৃত্তি এবং যৌনতত্ত্বকে সম্যক্‌রূপে না বুঝা পর্য্যন্ত জীবনের প্রতিও আমাদের প্রকৃত শ্রদ্ধার উদ্রেক হইতে পারে না।" প্রাচীন ভারতে জীবনের এই মূল রহস্য সম্বন্ধে কিরূপ বিজ্ঞানসম্মত গবেষণা হইয়াছিল তাহার প্রমাণ বাৎস্যায়নের 'কামসূত্র'। এই অমূল্য গ্রন্থ সম্বন্ধে বিখ্যাত প্রাচ্যতত্ত্ববিদ্ সর্ রিচার্ড বার্টন বলিয়াছেন, 'ইহা বাৎস্যায়নকে অমরত্বের আসনে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছে'। রমেন্দ্রবাবু বিশেষ ভাবে বাৎস্যায়নকে অনুসরণ করিয়াই "বিবাহ ও প্রেমকলা" নামক পুস্তকখানি রচনা করিয়াছেন। এতদ্ব্যতীত ডাঃ মেরি ষ্টোপসের Married Love এবং মিসেস এচ.এ. হর্ণিব্রুকের পুস্তক হইতেও তিনি কিছু কিছু

উপকরণ সংগ্রহ করিয়াছেন। পাশ্চাত্ত্য যৌনতত্ত্ববিদ্গণ দম্পতির যৌন জীবনের উপর অতিরিক্ত প্রাধান্য দিতে গিয়া অন্যান্য দিকের উপর তেমন গুরুত্ব আরোপ করেন নাই। কিন্তু মনে রাখিতে হইবে, বিবাহের প্রকৃত উদ্দেশ্য বিস্মৃত হইলে শুধু যৌন-পরিতৃপ্তি দ্বারাই বিবাহিত জীবনে চরম সার্থকতা লাভ করা যায় না। পণ্ডিত জবাহরলাল নেহরু তাঁহার সম্প্রতি প্রকাশিত The Discovery of India নামক পুস্তকে problem of human relationships নামক নিবন্ধে বলিয়াছেন :

"Marriage was an odd affair, and it has not ceased to be so even after thousand years of experience. We saw around us the wrecks of many a marriage . . ."

দাম্পত্য জীবনে ও অন্যান্য মানবিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে ভারতের প্রাচীন আদর্শই যে ব্যক্তির পক্ষে কল্যাণকর ছিল পণ্ডিতজী উক্ত নিবন্ধে সেই ইঙ্গিত করিয়াছেন। এই আদর্শ বিস্মরণই হয়তো বর্তমানের অনেক পরিবারের শোচনীয় পরিণতির জন্য দায়ী। রমেশবাবু হিন্দু বিবাহের মহান্ উচ্চ আদর্শের বিশ্লেষণ করিয়া বলিতেছেন—"হিন্দুর বিবাহ স্ত্রী-পুরুষ সংযোগের কেবলমাত্র একটি সামাজিক রীতি নহে ;···ইহা একটি কঠোর যজ্ঞ, হিন্দুজীবনের একটি মহাব্রত ও চিরজীবনের অবিচ্ছেদ্য দৃঢ়তম বন্ধন"। বস্তুতঃ হিন্দু-বিবাহ যে দম্পতির মধ্যে দৈহিক মানসিক ও আত্মিক মিলনের ভিত্তিভূমির সোপানস্বরূপ তাহা "বধ্নামি সত্যগ্রন্থিনা মনশ্চ হৃদয়ঞ্চ তে" এই মন্ত্রেই সুপরিস্ফুট। শাস্ত্রোক্ত, বিবাহবিষয়ক বিবিধ তত্ত্বের বর্ণনা বিশ্লেষণ ও ব্যাখ্যা আলোচ্য পুস্তকটিকে বাজারে প্রচলিত যৌনতত্ত্ববিষয়ক গ্রন্থসমূহ হইতে বৈশিষ্ট্য দান করিয়াছে। পুস্তকের ভাষা সংস্কৃতবহুল। পরবর্তী সংস্করণে শব্দাড়ম্বর বর্জন করিয়া ভাষা একটু প্রাঞ্জল ও সহজবোধ্য করিলে সাধারণ পাঠক-পাঠিকাদের বুঝিবার পক্ষে সুবিধা হইবে। প্রচ্ছদপটের ছবিটি অত্যন্ত খেলো এবং ওঁচা। পুস্তকটি হইতে 'শিষ্টজনানুমোদিত নয়' এমন কতকগুলি বিষয়ের বর্ণনা বাদ দিলেই ভাল হইত। এ বিষয়ে আবুল হাসানাৎ সাহেবের 'যৌন-বিজ্ঞান'ই উক্ত বিষয়ক পুস্তক লেখকদের আদর্শ হওয়া উচিত।

শ্রীনলিনীকুমার ভদ্র

রণ ও রাষ্ট্র—শ্রীদিগিন্দ্রচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়। কমলা বুক ডিপো, ১৫, বঙ্কিম চাটুজ্জে ষ্ট্রীট, কলিকাতা, পৃষ্ঠা ২৭০, মূল্য ৪৲ টাকা।

রাষ্ট্র সম্বন্ধে আলোচনায় গ্রন্থকার আদিম সমসমাজ ব্যবস্থা, দাসতন্ত্র, সামন্ততন্ত্র, পুঁজিবাদ, ফ্যাসিবাদ ও সাম্যবাদ সম্বন্ধে উল্লেখ করিয়াছেন। সভ্যতার বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে সমর-বিজ্ঞান ও যুদ্ধপদ্ধতির বিপুল পরিবর্তন হইয়াছে ও হইতেছে। আদিম কালের যুদ্ধের সহিত এ কালের বিরাট যুদ্ধের কোন তুলনাই হইতে পারে না। লেখক স্থল-বাহিনী ও নৌ-বাহিনীর আলোচনা করিতে গিয়া এই সকলের ক্রমবিকাশ বর্ণনা করিয়াছেন। বিমানবাহিনী আধুনিক হইলেও অল্প দিনের মধ্যে ইহার বিস্ময়কর উন্নতি হইয়াছে। ব্যবসা-বাণিজ্য ও যাতায়াতে সর্বত্র বিমানের ব্যবহার প্রচলিত হইতেছে। যুদ্ধকৌশলও বিভিন্ন কালে বিভিন্ন রকম দেখা যায়। প্রত্যেক বড় যুদ্ধেই ইহার পরিবর্তন ও বিকাশ পরিলক্ষিত হইয়াছে। পৃথিবীব্যাপী বিগত দুইটি মহাযুদ্ধের বহু শিক্ষণীয় ও জ্ঞাতব্য বিষয় লেখক সুন্দর ভাবে আলোচনা করিয়াছেন। আজিকার দিনে সৈনিক এবং রাষ্ট্রনায়কদের চেয়ে সাধারণ লোকই যুদ্ধদ্বারা বেশী ক্ষতিগ্রস্ত হয়। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে সামরিক লোক অপেক্ষা বেসামরিক লোকেরাই বেশী মরিয়াছে ও ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে। আণবিক বোমার আবিষ্কারের ফলে ভবিষ্যতে যুদ্ধ যে আরও ভয়ঙ্কর হইবে ইহাতে আর সন্দেহ নাই। পৃথিবীর অল্প কয়েকজন মাতব্বর ব্যক্তি যুদ্ধ বাধাইলেও বহুদেশের বহুলোক মিলিয়া—অর্থাৎ জনগণের সাহায্য ছাড়া যুদ্ধ চলিতে পারে না। জন-স্বার্থ যুদ্ধের সহিত জড়িত বলিয়াই সর্বসাধারণের আধুনিক যুদ্ধ সম্বন্ধে জ্ঞানের প্রয়োজন আছে। বাংলা ভাষায় রণ ও রাষ্ট্রনীতি সম্বন্ধে এজাতীয় বিশ্লেষণমূলক গ্রন্থ নাই বলিলে হয়। ইহা পাঠ করিয়া বাঙালী পাঠক যুদ্ধ-সংক্রান্ত মোটামুটি প্রায় সকল বিষয়ই জানিতে পারিবেন। যুদ্ধে তৈল, বেতার, পদাতবাহিনী, রেড-ক্রশ, আলোক-চিত্র প্রভৃতির ব্যবহার পাঠকের চোখ নানাদিকে খুলিয়া দিবে। পুস্তকের শেষে যুদ্ধের নির্ঘণ্ট ইহার ঐতিহাসিক মূল্য বৃদ্ধি করিয়াছে।

শ্রীঅনাথবন্ধু দত্ত

সুভাষ-বাহিনী—শ্রীসুধীরকুমার সেন। প্রকাশক—এস, কে মিত্র এণ্ড ব্রাদার্স, ১২ নারিকেল বাগান লেন, কলিকাতা। ১৩৮ পৃষ্ঠা, মূল্য ২।০ টাকা।

ক্যাপ্টেন মোহন সিং ও রাসবিহারী বসুর নেতৃত্বে আজাদ হিন্দ ফৌজের উৎপত্তি ও সংগঠন আরম্ভ হইলেও উহা শেষ পর্য্যন্ত কার্য্যকরীভাবে গড়িয়া উঠিতে পারে নাই। নেতাজী সুভাষচন্দ্রের সিঙ্গাপুরে আবির্ভাবের সঙ্গেই তাঁহার নেতৃত্বে উহা যথাযথ সামরিক কায়দায় পুনর্গঠিত হইয়া ভারতের স্বাধীনতা-যুদ্ধের ইতিহাসে এক অমরত্বপূর্ণ গৌরবময় পৃষ্ঠার সূচনা করিল। এইজন্যই গ্রন্থকার জাতীয় বাহিনীর সুভাষ-বাহিনী নামকরণ করিয়াছেন। আজাদ হিন্দ ফৌজের সঙ্গে আজাদ হিন্দ সরকার, আজাদ হিন্দ ব্যাঙ্ক ও লেঃ কর্ণেল লক্ষ্মীর নেতৃত্বে ঝাঁসির রাণী-বাহিনী প্রভৃতি বিবিধ প্রতিষ্ঠানের পরিচালক এবং 'জয় হিন্দে'র অভিবাদন প্রথা ও 'দিল্লী চলো' অভিযান-বাণীর স্রষ্টা হিসাবে নেতাজী সর্ব্বাংশে সর্ব্বাধিনায়ক হইবার উপযুক্ত ছিলেন। হিন্দু-মুসলমান নির্ব্বিশেষে সকল শ্রেণীর জনগণের শ্রদ্ধার পাত্র হইয়া তিনি যে আজাদ হিন্দ ফৌজের রূপ দিয়াছিলেন, ভবিষ্যতের স্বাধীন ভারতের সমরবাহিনীর উহা আদর্শ হইয়া থাকিবে। বিধির বিধানে উহার ব্যর্থ পরিণতি ঘটিলেও ব্রহ্ম, মালয় ও সিঙ্গাপুরে বেসামরিক অসহায় ভারতবাসীর ধনপ্রাণের নিরাপত্তা সাধনে উহার কৃতিত্ব অবশ্যই স্বীকৃত হইবে। গ্রন্থকার এই গ্রন্থে কয়েকটি সুলিখিত অধ্যায়ে আজাদ হিন্দ ফৌজ সংক্রান্ত বহু জ্ঞাতব্য তথ্য বিবৃত করিয়াছেন। নেতাজী ও অন্যান্য সমরনায়কদের কয়েকখানি প্রতিলিপি দেওয়া হইয়াছে, আরও কয়েকখানি ছবি দিলে ভাল হইত। দিল্লীর লালকেল্লায় সেনানায়কগণের বিচার-কাহিনী শেষ অধ্যায়ে সংক্ষিপ্তভাবে বর্ণিত হইয়াছে। আজাদ হিন্দ ফৌজ সম্বন্ধে বিস্তৃত তথ্যপূর্ণ এই গ্রন্থ বাংলাভাষায় প্রণয়ন করিয়া গ্রন্থকার বাঙালী পাঠকের ধন্যবাদভাজন হইয়াছেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ—শ্রীযামিনীকান্ত সোম। প্রকাশক—মিত্র ও ঘোষ, ১০, শ্যামাচরণ দে ষ্ট্রীট, কলিকাতা। ১৬৯ পৃষ্ঠা, মূল্য সাত সিকা।

যুগাবতার শ্রীরামকৃষ্ণ সম্বন্ধে ভক্তগণ কর্ত্তৃক লিখিত গ্রন্থের অভাব নাই। কিন্তু সাধারণ পাঠক ও ছেলেদের জন্য একখানি সুলিখিত জীবনকাহিনীর অভাব ছিল। 'ছেলেদের রবীন্দ্রনাথে'র যশস্বী লেখক সেই কার্য্য সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করিয়াছেন। এমন মধুর ভাষায় ও হৃদয়গ্রাহীভাবে রামকৃষ্ণদেবের শিক্ষা দীক্ষা সাধনা ও 'কথামৃত' এবং তাঁহার যথাযথ ভক্তগণের কাহিনী তিনি বর্ণনা করিয়াছেন যে পড়িতে বসিলে বইখানি শেষ না করিয়া থাকা যায় না এবং পড়িবার পর হৃদয় এক অপূর্ব্ব দিব্যভাবে আপ্লুত হয়। বইখানিতে বিস্ময়কর নৈপুণ্যের সহিত শ্রীরামকৃষ্ণ সম্বন্ধে জ্ঞাতব্য সকল প্রধান ঘটনাই উল্লিখিত হইয়াছে। ছেলেরা ইহা পড়িয়া এই মহাপুরুষের সম্বন্ধে বিস্তৃতভাবে জানিবার জন্য বিশেষ আগ্রহশীল হইয়া উঠিবে।

শ্রীবিজয়েন্দ্রকৃষ্ণ শীল

দেশ-বিদেশের কথা

রামকৃষ্ণ মিশন ষ্টুডেন্টস্ হোম

২০ নং হরিনাথ দে রোডস্থ শ্রীরামকৃষ্ণ মিশন ষ্টুডেন্টস্ হোমে মেধাবী দরিদ্র ছাত্রদিগকে বিনা খরচে রাখিয়া কলেজে পড়ান হয়। সম্পূর্ণ বা আংশিক ভাবে নিজ ব্যয় বহন করিয়াও কতক ছাত্র এখানে থাকিতে পারে। এ বৎসর যাহারা কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রবেশিকা পরীক্ষা দিয়াছে, শুধু তাহাদেরই আবেদন বিবেচিত হইবে। অবিলম্বে সেক্রেটারীর নিকট টেষ্টের নম্বর ও তিন পয়সার ডাক টিকিটসহ আবেদন করিতে হইবে।

বাঁকুড়া মঠে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের মর্ম্মর-মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠা

বিগত ২৫শে চৈত্র হইতে ২৮শে চৈত্র পর্য্যন্ত বাঁকুড়া শ্রীরামকৃষ্ণ মঠে দিবসচতুষ্টয়ব্যাপী শ্রীরামকৃষ্ণদেবের মর্ম্মর-মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠা-উৎসব অনুষ্ঠিত হইয়াছে। শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের সাধারণ সম্পাদক শ্রীমৎ স্বামী মাধবানন্দজী মহারাজ ও মায়াবতী অদ্বৈত আশ্রমের অধ্যক্ষ শ্রীমৎ স্বামী পবিত্রানন্দজী মহারাজ শ্রীরামকৃষ্ণদেবের জীবনী ও উপদেশাবলী সম্পর্কে সারগর্ভ বক্তৃতা প্রদান পূর্ব্বক উৎসব-ক্ষেত্রে সমবেত নরনারীর হৃদয়ে ধর্ম্মভাবের সঞ্চার করেন। এতদুপলক্ষে অনুষ্ঠিত পূজা, হোম ও চণ্ডীপাঠ, আশ্রমস্থ ছাত্রগণ কর্ত্তৃক "গুরুদক্ষিণা" নাট্যাভিনয় এবং শ্রীদুর্গা ব্যায়াম সমিতি কর্ত্তৃক ব্যায়াম প্রদর্শন সমাগত ভক্তমণ্ডলীকে আনন্দ দান করে।

নিখিল-বঙ্গ-শিক্ষক-সম্মেলন

চতুর্বিংশ অধিবেশন (১৯৪৬)—দিনাজপুর

(১) ডাক্তার মেঘনাদ সাহা—সভাপতি; (২) শ্রীনিশীথনাথ কুণ্ডু—অভ্যর্থনা-সমিতির সভাপতি; (৩) অধ্যক্ষ দেবপ্রসাদ ঘোষ—সম্মেলনের উদ্বোধক; (৪) ডাক্তার নীহাররঞ্জন রায়—সাহিত্য শাখার সভাপতি; (৫) শ্রীরামগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায়—সাধারণ সম্পাদক; (৬) শ্রীলোকানন্দ মজুমদার—যুগ্ম-সম্পাদক অভ্যর্থনা-সমিতি।

কৃষিতত্ত্ববিদ্ দ্বিজদাস দত্ত

বিগত ৫ই এপ্রিল সুপ্রসিদ্ধ কৃষিতত্ত্ববিদ, কৃষি-বিভাগের প্রাক্তন ডেপুটি ডিরেক্টর ও ইকনমিক বোটানিষ্ট দ্বিজদাস দত্ত মহাশয় ৮৩ বৎসর বয়সে পরলোকগমন করিয়াছেন। তাঁহার মৃত্যুতে বঙ্গমাতার একজন সুসন্তান, নিষ্ঠাবান পণ্ডিত, দেশপ্রেমিক, সর্ব্বোপরি অগ্রণী কৃষিতত্ত্ববিদ ও শিক্ষাব্রতীর তিরোধান হইল।

দ্বিজদাস দত্ত

ময়মনসিংহ জেলার চাকী গ্রামের প্রসিদ্ধ দত্ত বংশে দ্বিজদাস জন্মগ্রহণ করেন। বিশেষ মেধাবী ছাত্র বলিয়া পাঠ্য জীবনে তাঁহার খ্যাতি ছিল। বিশ্ববিদ্যালয়ের সকল পরীক্ষায়ই তিনি বৃত্তি লাভ করিয়াছিলেন। ১৯০৩ সালে প্রেসিডেন্সি কলেজ হইতে বি-এস্‌সি পাস করিয়া তিনি শিবপুর এঞ্জীনিয়ারিং কলেজের তদানীন্তন "কৃষি-বিভাগে" শিক্ষা গ্রহণ করেন। তৎপর কৃষিবিজ্ঞানে অধিকতর ব্যুৎপত্তি লাভার্থ ১৯০৬ সালে সরকারী বৃত্তি লইয়া যুক্তরাষ্ট্রে গমন করেন। তথায় কর্ণেল বিশ্ববিদ্যালয় হইতে কৃতিত্বের সহিত এম. এস এ ডিগ্রি লাভ করেন। গবেষণাক্ষেত্রে তাঁহার অধ্যবসায় ও কৃতিত্ব অধ্যাপকমণ্ডলীর বিশেষ দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছিল। দেশে ফিরিবার পূর্ব্বে তিনি আমেরিকার বিভিন্ন ষ্টেটে ও গ্রেট ব্রিটেনে প্রসিদ্ধ কৃষিগবেষণাগারসমূহের কার্য্যাবলী প্রত্যক্ষ করিবার মানসে ব্যাপকভাবে ভ্রমণ করেন এবং বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের কোর্সে যোগদান করেন। স্বদেশে প্রত্যাবর্ত্তনান্তে নিজের অধীত বিদ্যা ও অভিজ্ঞতাকে দেশের ও দশের কাজে লাগাইবার উদ্দেশ্যে সরকারী চাকুরি প্রত্যাখ্যান করিয়া চট্টগ্রাম অঞ্চলে ভূমি সংগ্রহপূর্ব্বক, "আদর্শ গো-পালন ও কৃষি গবেষণাগার" প্রতিষ্ঠা করেন। এদেশের কৃষি-বিজ্ঞান বিষয়ক উন্নতির ইতিহাসে এরূপ ব্যক্তিগত প্রয়াস বোধ হয় এই প্রথম। কিন্তু বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে কৃষির চর্চ্চাদ্বারা তাঁহার দেশসেবার প্রয়াসকে তখন লোকে অহেতুক সন্দেহের চক্ষে দেখিয়াছিল। অবশেষে দ্বিজদাস বুঝিলেন, সরকারের সহানুভূতি ও সাহায্য ব্যতীত ব্যক্তিবিশেষের পক্ষে বৈজ্ঞানিক কৃষির চর্চ্চা দুরূহ ব্যাপার। ১৯১২ সনে তিনি ঢাকার জগন্নাথ কলেজে রসায়নের অধ্যাপক নিযুক্ত হন। পরে কিছুকাল চট্টগ্রাম কলেজেও অধ্যাপনা করেন। ১৯১৩ সনে বঙ্গীয় কৃষি-বিভাগ পুনর্গঠিত হইলে তিনি ইহাতে যোগদান করেন এবং মাধ্যমিক কৃষিবিদ্যালয় স্থাপনে গবর্ণমেণ্টকে প্রণোদিত করেন। এইরূপে ঢাকার বর্ত্তমান "এগ্রিক্যালচার ইনষ্টিটিউটে"র গোড়াপত্তন হয়। তৎপর তিনি গবর্ণমেণ্টের "ইকনমিক বোটানিষ্ট" নিযুক্ত হন। বাংলার শস্য, ডাল, জলীয় ধান, গোখাদ্য ও তুলা সম্পর্কে বহু মূল্যবান গবেষণা তিনি করিয়া গিয়াছেন। নেপিয়ার ঘাসের ফলন ও প্রচলন এদেশে তিনিই প্রথম করেন। লম্বা উৎকৃষ্ট জাতীয় কার্পাস যে এদেশের আবহাওয়ায়ও হইতে পারে, ইহা তাঁহার গবেষণা দ্বারাই প্রথম প্রমাণিত হয়। বঙ্গীয় কৃষি-বিভাগ তাঁহার গবেষণালব্ধ বহুবিধ কার্য্য দ্বারা সমৃদ্ধ হইয়াছে।

শ্রীযুত দত্ত কলিকাতা, ঢাকা ও হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশ্নকর্ত্তা ও পরীক্ষক ছিলেন। আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্রের তিনি একজন প্রিয় ছাত্র ছিলেন। তাঁহার দানশীলতা গোপনে আচরিত হইত। তেজগাঁওস্থিত তাঁহার পল্লীভবন "ইন্দিরা-নিলয়" অন্নসত্রে পরিণত হইয়াছিল এ কথা বলিলে অত্যুক্তি হয় না। নিরন্ন কখনও সেখান হইতে বিমুখ হইয়া ফিরিত না। বহু গরীব ছাত্রের শিক্ষার ব্যয় তিনি নীরবে বহন করিয়াছেন।

দেশের শিক্ষা-সংস্কারে তাঁহার অনন্যসাধারণ আগ্রহ ছিল। তাঁহারই উদ্যোগে তেজগাঁওস্থিত "পলিটেকনিক্ হাইস্কুল" প্রতিষ্ঠিত হয়। পূর্ব্ববঙ্গে এই ধরণের ইহাই প্রথম ও একমাত্র প্রতিষ্ঠান। ইহাতে শিল্প-বিদ্যা শিক্ষাদানের সঙ্গে প্রবেশিকা পর্য্যন্ত পড়াইবার ব্যবস্থা আছে। স্ত্রীজাতির উচ্চশিক্ষার তিনি একজন উৎসাহী সমর্থক ছিলেন। নিজের কন্যাদিগকে তিনি উচ্চ-

শিক্ষায় শিক্ষিতা করিয়াছিলেন। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের নানা ভাষায় তাঁহার ব্যুৎপত্তি ছিল এবং ন্যায় ও দর্শন-শাস্ত্রে তিনি সুপণ্ডিত ছিলেন। তাঁহার এই সহজাত জ্ঞানস্পৃহা জীবনের শেষ পর্য্যন্ত বর্ত্তমান ছিল। যাঁহারাই তাঁহার সংস্পর্শে আসিয়াছেন, তাঁহারাই তাঁহার অমায়িক ব্যবহারে মুগ্ধ হইয়াছেন। পারিবারিক জীবনে বিজদাস বহু শোক ভোগ করেন। জ্যেষ্ঠা কন্যা ইন্দিরার মৃত্যুর পর তিনি "গৃহী-সন্ন্যাসী"র মত জীবন যাপন করিতেন।

দেবেন্দ্রনাথ মিত্র

মেসার্স এম, এল বসু এণ্ড কোম্পানী লিমিটেডের (লক্ষ্মীবিলাস) ম্যানেজিং ডিরেক্টর দেবেন্দ্রনাথ মিত্র মহাশয় ৫৩ বৎসর বয়সে গত ১৭ই বৈশাখ মঙ্গলবার তাঁর কলিকাতা বাসভবনে পরলোকগমন করিয়াছেন। তিনি কলিকাতা হাইকোর্টের সলিসিটর ছিলেন। সুদীর্ঘ পঁচিশ বৎসরকাল তিনি উক্ত কোম্পানী কৃতিত্বের সহিত পরিচালনা করিয়াছিলেন। তাঁর মধুর স্বভাব ও অমায়িক ব্যবহার সকলকে আকৃষ্ট করিয়াছিল। ধনীর সন্তান বলিয়া তাঁর কোন অহঙ্কার ছিল না, উচ্চ নীচ সকলের সহিত তিনি সমানভাবে মেলামেশা করিতেন। দরিদ্র ছাত্রদের লেখাপড়ায়, বিধবার কন্যাদায়ে সাহায্য-দান, অনাথ-আতুরের সেবায় আশ্রম-মন্দির প্রতিষ্ঠা ইত্যাদি বহু সৎকার্য্যে তাঁর দান ছিল অপরিসীম। কয়েক বৎসর যাবৎ তিনি ক্রীড়ায় স্পোর্টিংক্লাবের সম্পাদক হিসাবে উৎকৃষ্টতর ক্রীড়ানৈপুণ্য প্রদর্শন করেন। আমরা তাঁর শোকসন্তপ্ত পরিবারবর্গের প্রতি সমবেদনা জানাইতেছি।

দেবেন্দ্রনাথ মিত্র

চিত্র পরিচয়

রাগিণী ধনাশ্রীঃ

দুর্ব্বাদলশ্যামতনুর্মনোজ্ঞা
কান্তং লিখন্তী বিরহেণ দুনা।
শ্বেতে কপোলে দধতী দৃগম্বু
—নিরন্তনির্বৈতকুচা ধনাশ্রীঃ।

দুর্ব্বাদলশ্যাম, মনোজ্ঞদেহা বিরহখিন্না ধনাশ্রীঃ কান্তের আলেখ্য চিত্রিত করিতেছেন। তাঁহার নয়নজলে শ্বেত কপোল এবং কুচযুগ প্লাবিত হইতেছে।

সংগীতদর্পণম্—
শ্রীদামোদরমিশ্রেণ
প্রণীতম্।

মুদ্রাকর ও প্রকাশক : শ্রীনিবারণচন্দ্র দাস, প্রবাসী প্রেস, ১২০।২ আপার সারকুলার রোড, কলিকাতা।

বিরহিণী

প্রবাসী প্রেস, কলিকাতা]

শ্রীতিলক বন্দ্যোপাধ্যায়

আধুনিক ইটালীর একটি মোটর-রাস্তা
(প্রাচীন রোমকগণ পৃথিবীর সর্ব্বশ্রেষ্ঠ পথ-নির্ম্মাতা বলিয়া বিখ্যাত ছিল

ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের একটি বিশিষ্ট রাজপথ গবেষণাগার। সম্মুখস্থ বৃত্তাকার পথের উপর দিয়া

"সত্যম্ শিবম্ সুন্দরম্
নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ"

৪৬শ ভাগ
১ম খণ্ড
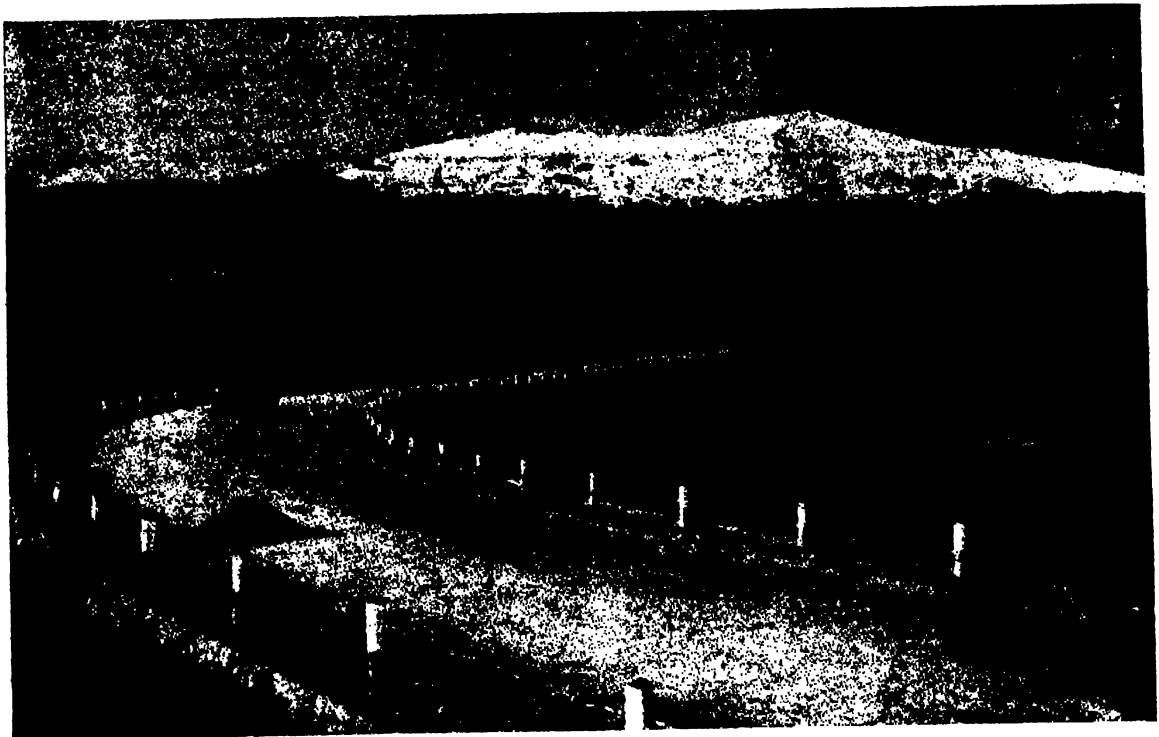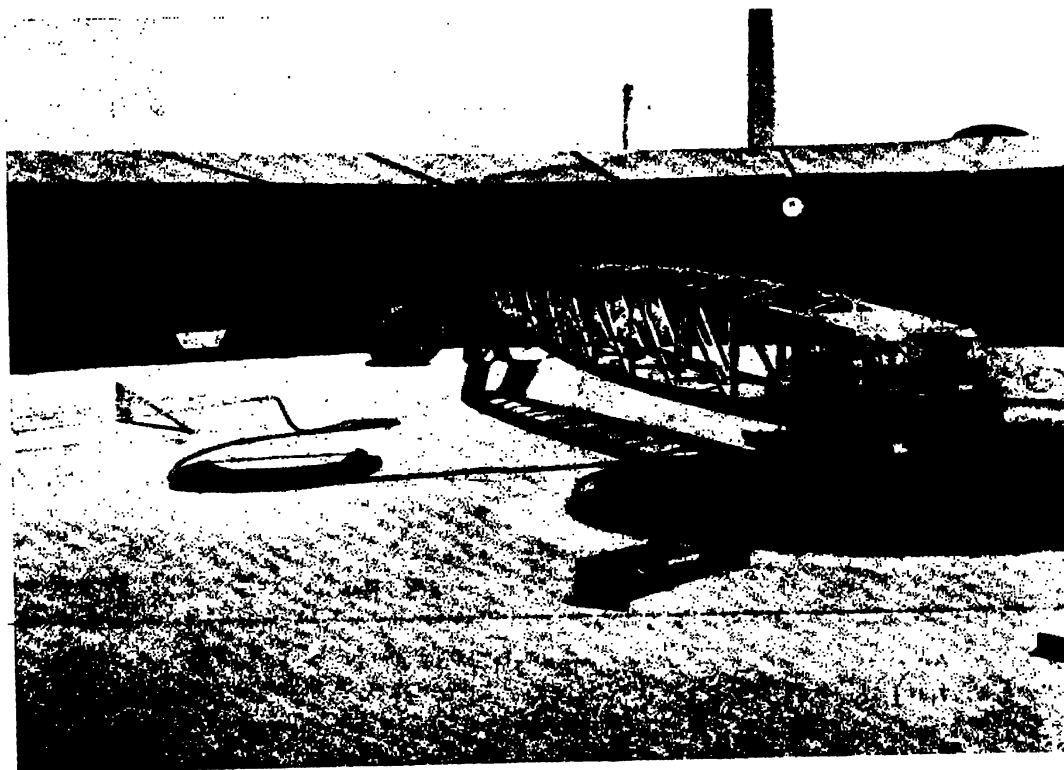
আষাঢ়, ১৩৫৩

৩য় সংখ্যা

বিবিধ প্রসঙ্গ

মন্ত্রী-মিশনের প্রস্তাব

ভারতবর্ষের শাসনতন্ত্র রচনার জন্য মন্ত্রী-মিশন যে প্রস্তাব করিয়াছেন তাহা সমগ্রভাবে এই সংখ্যায় প্রকাশিত হইল। প্রস্তাব সম্পর্কে গুরুত্বপূর্ণ সরকারী ব্যাখ্যা এবং কংগ্রেস ও লীগের অভিমতও ঐ সঙ্গে দেওয়া হইল। লিখিবার সময় পর্যন্ত (৩১শে জ্যৈষ্ঠ) কংগ্রেসের শেষ সিদ্ধান্ত প্রকাশিত হয় নাই। তবে ইহা জানা গিয়াছে যে ত্রুটি-বিচ্যুতি সত্ত্বেও কংগ্রেস এই প্রস্তাব অবলম্বন করিয়া ভারতের ভবিষ্যৎ শাসনতন্ত্র গঠন করিতে সম্মত আছেন। গান্ধীজীর অভিমত এই যে প্রস্তাবের ভিতর স্বাধীনতার বীজ আছে, উহাকে অঙ্কুরিত করিয়া তোলার দায়িত্ব আমাদের। বর্তমানে কংগ্রেসের সহিত মন্ত্রী-মিশন ও বড়লাটের আলোচনা চলিতেছে দুইটি বিষয় সম্পর্কে। মিঃ জিন্না অন্তর্বর্তী কেন্দ্রীয় সরকারে লীগ ও কংগ্রেস সদস্যদের সংখ্যা সমান হউক বলিয়া দাবি করিয়াছেন এবং বাংলা ও আসামের ব্যবস্থা-পরিষদের ইংরেজ সদস্যেরা গণ-পরিষদ গঠনে ভোটদানে বিরত হইতে অনিচ্ছা প্রকাশ করিয়াছেন। কংগ্রেস এই উভয় দাবির বিরোধী। মিঃ জিন্নার দুই-জাতি থিওরী মন্ত্রী-মিশন তাঁহাদের প্রস্তাবে সরাসরি অগ্রাহ্য করিয়াছেন, ইহার পর কেন্দ্রীয় শাসন-পরিষদে হিন্দু মুসলমান সংখ্যাসাম্যের দাবি কোন মতে টিঁকিতে পারে না। গত নির্বাচনের ফল অনুসারে মিঃ জিন্না সব মুসলমানের প্রতিনিধি বলিয়া তর্কের খাতিরে ধরিয়া লইলেও ভারতীয় সংখ্যার মাত্র এক-চতুর্থাংশ তাঁহার অনুযায়ী, আর কংগ্রেসের অনুগত বাকী তিন-চতুর্থাংশ। সুতরাং এককে তিনের সমান বলিয়া গণ্য করিবার দাবি সম্পূর্ণ অসঙ্গত ও অযৌক্তিক বলিয়া কংগ্রেস উহা অগ্রাহ্য করিয়াছেন।

মন্ত্রী-মিশনের প্রস্তাবের প্রধান বিশেষত্ব এই যে, তাঁহারা সাম্প্রদায়িক বাটোয়ারা বর্জন করিয়াছেন, গণ-পরিষদ নির্বাচন ব্যবস্থায় কোনরূপ সাম্প্রদায়িক পক্ষপাতিত্ব না করিয়া জন-সংখ্যার অনুপাতে প্রতিনিধি সংখ্যা স্থির করিয়াছেন এবং সাম্প্রদায়িক কোন বড় সমস্যা লইয়া মতভেদ হইলে উভয় সম্প্রদায়ের প্রতিনিধিদের অধিকাংশের মতানুসারে তাহার সমাধান হইবে বলিয়া বলিয়াছেন। এই গণতন্ত্রসম্মত নীতি অনুসরণ করিলেই কেন্দ্রীয় সরকার গঠনে অসুবিধা হইত না। অন্তর্বর্তী শাসন-পরিষদ গঠনের বেলায় কেন এই নীতি প্রয়োগ করা হইতেছে না তাহা এখনও দুর্বোধ্য রহিয়াছে।

অন্তর্বর্তী কেন্দ্রীয় সরকার গঠিত হওয়ার পর গণ-পরিষদ আহ্বানের আয়োজন আরম্ভ হইবে। প্রত্যেক প্রদেশের ব্যবস্থা-পরিষদ নির্দিষ্ট সংখ্যক প্রতিনিধি নির্বাচন করিবেন। কোন্ প্রদেশ কত জন প্রতিনিধি পাঠাইবেন তাহা প্রস্তাবে স্থির করিয়া দেওয়া হইয়াছে; মোটামুটি প্রতি দশ লক্ষ লোকের জন্য একজন করিয়া প্রতিনিধি থাকিবেন। ভোট দেওয়ার অধিকার থাকিবে শুধু ব্যবস্থা-পরিষদের, যে সব প্রদেশে ব্যবস্থাপক সভা আছে তাহার সদস্যরা ভোট দিতে পারিবেন না। গণ-পরিষদের জন্য ব্যবস্থা-পরিষদের সদস্য বা তাহার বাহিরের লোকেরাও প্রার্থী হইতে পারিবেন। পরিষদের মুসলমান সদস্যেরা মুসলমান, শিখেরা শিখ এবং অপর সকলে জেনারেল সদস্য নির্বাচন করিবেন। সিঙ্গেল ট্রান্সফারেব্‌ল ভোটের দ্বারা এই নির্বাচন হইবে বলিয়া বাংলার জাতীয়তাবাদী মুসলমান সদস্যেরা তেত্রিশ জনের মধ্যে একজন সদস্য নির্বাচন করিতে পারিবেন। ইংরেজ সদস্যদের সংখ্যা পঁচিশ এবং মন্ত্রী-মিশন-প্রস্তাব অনুসারে ইঁহাদের ভোট দেওয়ার অধিকার আছে। গণ-পরিষদের প্রার্থী হইবার অধিকার ইঁহাদের আছে কি না সে সম্বন্ধে মতভেদ হইয়াছে। প্রতি দশ লক্ষ লোকের জন্য একজন

প্রতিনিধি নির্বাচিত হইবেন এই নীতি অনুসারে কোন ইংরেজ প্রার্থী হইতে পারেন না। গান্ধীজীর মত এই এবং কলিকাতার ইংরেজ মুখপত্র ষ্টেটসম্যানও এই কথাটি লিখিয়াছেন। সাধারণ লোকের ধারণা ইঁহাদের ভোট দেওয়ার অধিকার যখন আছে তখন ইঁহারা দাঁড়াইতেও পারিবেন। বিষয়টি এখনও মন্ত্রী-মিশনের বিবেচনাধীন।

গণ-পরিষদের নির্বাচিত প্রতিনিধিবৃন্দ দিল্লীতে সমবেত হইবেন। প্রথম বৈঠকে চেয়ারম্যান নির্বাচিত হইবেন, একটি এডভাইসরি কমিটি গঠিত হইবে এবং গণ-পরিষদের কার্যক্রম নির্ধারিত হইবে। অধিকাংশের ভোটে চেয়ারম্যান নির্বাচিত হইবেন বলিয়া যদি ধরিয়া লওয়া যায়, কংগ্রেস-মনোনীত ব্যক্তিই এই পদ লাভ করিবেন। চেয়ারম্যানের ক্ষমতাও প্রচুর। কোন আলোচ্য বিষয় সাম্প্রদায়িক সমস্যার অন্তর্ভুক্ত কিনা, সে প্রশ্ন উঠিলে চেয়ারম্যানের অভিমত চূড়ান্ত বলিয়া গৃহীত হইবে। চেয়ারম্যানের মতের সহিত কোন সম্প্রদায়ের সদস্যদের মতের পার্থক্য হইলে তাঁহারা চেয়ারম্যানকে ফেডারেল কোর্টের মত লইবার জন্য অনুরোধ করিতে পারিবেন। চেয়ারম্যান ফেডারেল কোর্টের অভিমত অগ্রাহ্য করিতে পারিবেন না এমন কোন কথা নাই।

সমস্ত সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের প্রতিনিধিদের লইয়া এডভাইসরি কমিটি গঠিত হইবে। এই কমিটিতে ভারতীয় খ্রীষ্টান, এংলো-ইণ্ডিয়ান, ইংরেজ প্রভৃতির প্রতিনিধি যেমন থাকিবেন তেমনই যুক্তপ্রদেশ, বিহার প্রভৃতি হিন্দুপ্রধান প্রদেশের মুসলমান এবং বাংলার হিন্দু ও পঞ্জাবের হিন্দু শিখ প্রভৃতিও থাকিবেন। এডভাইসরি কমিটি গণ-পরিষদের পূর্ণ অধিবেশনে তাঁহাদের সুপারিশ উপস্থিত করিবেন। কোন প্রদেশের সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের কোন অভিযোগ থাকিলে প্রস্তাবের আকারে এই কমিটি তাহা গণ-পরিষদে উপস্থিত করিবেন এবং অভিযোগ সাম্প্রদায়িক হইলে গণ-পরিষদের পূর্ণ অধিবেশনে অর্থাৎ সমগ্র ভারতীয় প্রতিনিধিদের উভয় সম্প্রদায়ের অধিকাংশের সম্মতি না পাইলে কোন সিদ্ধান্ত হইবে না। এই ব্যবস্থার সুবিধা এই যে বি বা সি গ্রুপের লীগ সদস্যেরা হিন্দু বা শিখের স্বার্থবিরোধী শাসনতন্ত্র খাড়া করিতে চাহিলে মুসলমানপ্রধান প্রদেশসমূহের হিন্দু ও শিখ সদস্যেরা এডভাইসরি কাউন্সিল মারফৎ গণ-পরিষদের পূর্ণ অধিবেশনে উহার প্রতিকার দাবি করিতে পারিবেন। নিয়মতান্ত্রিক আইনের দিক হইতে এই কমিটির গুরুত্ব খুব বেশী, সাংবাদিক সম্মেলনে আইনজ্ঞ স্যর ষ্টাফোর্ড ক্রিপস্ উহার প্রতি সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছিলেন।

চেয়ারম্যান নির্বাচন, এডভাইসরি কমিটি গঠন ও কার্যক্রম নির্ধারণের পর গণ-পরিষদ 'এ', 'বি' ও 'সি' এই তিন ভাগে বিভক্ত হইবে। 'এ' বিভাগে থাকিবে যুক্তপ্রদেশ, বোম্বাই, মান্দ্রাজ, মধ্যপ্রদেশ, উড়িষ্যা ও বিহার। এই ছয়টি প্রদেশের প্রতিনিধিরা মিলিয়া ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশের শাসনতন্ত্র রচনা করিবেন। 'বি' বিভাগে থাকিবে পঞ্জাব, সিন্ধু, সীমান্ত প্রদেশ ও বেলুচিস্থান। এই চারিটি প্রদেশের প্রতিনিধিরা মিলিয়া ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশের শাসনতন্ত্র রচনা করিবেন। 'সি' বিভাগে থাকিবে বাংলা ও আসাম। এই দুই প্রদেশের প্রতিনিধিবৃন্দ একত্র মিলিয়া বাংলার ও আসামের শাসনতন্ত্র প্রণয়ন করিবেন। প্রাদেশিক শাসনতন্ত্র রচনা সমাপ্ত হইবার পর এই তিন বিভাগের প্রতিনিধিবৃন্দ নিজেরা মিলিয়া গ্রুপ গঠন করিবেন কি না তাহা বিবেচনা করিবেন। এখানে প্রদেশ হিসাবে মত লওয়া হইবে। আসামের প্রতিনিধিদের অমত হইলে বাংলা ও আসাম গ্রুপ গঠন হইতে পারিবে না। প্রাদেশিক শাসনতন্ত্র প্রণয়নের জন্য তিন ভাগে বিভক্ত হওয়া বাধ্যতামূলক, কিন্তু গ্রুপ গঠন বাধ্যতামূলক নয়। পঞ্জাব, সিন্ধু, সীমান্তপ্রদেশ, বেলুচিস্থান, বাংলা ও আসাম লইয়া পাকিস্তান গঠনের যে প্রস্তাব মিঃ জিন্না করিয়াছিলেন, এই গ্রুপ গঠনের প্রস্তাবের দ্বারা তাহাই মানিয়া লওয়া হইয়াছে বলিয়া অনেকে মনে করিয়াছেন। আমাদের মতে এই আশঙ্কা ভুল। প্রথমেই বাংলা ও আসামকে আলাদা করিয়া দিয়া ব্যবস্থা করা হইয়াছে যে, পশ্চিমাঞ্চলের চারিটি মুসলমান প্রদেশের সঙ্গে এই দুটিকে জুড়িয়া দেওয়া চলিবে না। বাংলা ও আসামকে 'সি' বিভাগে ফেলিয়া প্রাদেশিক শাসনতন্ত্র রচনার জন্য একত্র করিয়া দেওয়ায় বাংলারই লাভ হইবে বেশী। গণ-পরিষদে বাংলায় প্রতিনিধি সংখ্যা নির্দিষ্ট হইয়াছে সাধারণ ২৭, মুসলমান ৩৩। আসামে সাধারণ ৭, মুসলমান ৩। উভয়ে একত্র মিলিলে সাধারণ সদস্য ৩৪ ও মুসলমান হইবে ৩৬। সাধারণ আসনগুলি কংগ্রেস দখল করিতে পারিবে আমাদের আশা আছে, ৩৬টি মুসলমান আসনের একটি জাতীয়তাবাদীরা পাইবেন। গ্রুপ গঠন করা-না-করা প্রদেশগুলির ইচ্ছাধীন কিন্তু একবার গ্রুপে ঢুকিলে দশ বৎসরের মধ্যে বাহিরে আসা চলিবে না।

প্রাদেশিক শাসনতন্ত্র রচনার পর পুনরায় গণ-পরিষদের পূর্ণ বৈঠক বসিবে। এই বৈঠকে কেন্দ্রীয় শাসনতন্ত্র রচিত হইবে। কেন্দ্রীয় সরকারের হাতে দেশরক্ষা, বৈদেশিক নীতি ও যানবাহনের ভার থাকিবে। আপাত দৃষ্টিতে কেন্দ্রীয় সরকার দুর্বল হইবে মনে হইলেও প্রকৃতপক্ষে তাহা হইবে না। এ সম্বন্ধে মুসলিম লীগ প্ল্যানিং কমিটির সম্পাদকের বিবৃতি পরে প্রকাশিত হইল। উহা হইতেই দেখা যাইবে যে, কেন্দ্রীয় সরকার যথেষ্ট ক্ষমতাশালী হইবে। কংগ্রেসের হাতে ছয়টি বৃহৎ প্রদেশ এবং সমগ্র ভারতের সৈন্যদল, বৈদেশিক নীতি এবং রেল, ষ্টীমার, জাহাজ, পোষ্টাফিস, টেলিগ্রাম, টেলিফোন, বেতার প্রভৃতি থাকিলে পাকিস্তানী ভেদনীতি বেশী দূর অগ্রসর হইবার পথ থাকিবে না। কোন প্রদেশের পক্ষে কেন্দ্রীয় ইউনিয়ন হইতে বাহিরে যাওয়ার চেষ্টাও বাতুলতার

পর্যবসিত হইবে। দেশীয় রাজ্যগুলির পক্ষেও অখণ্ড ভারতবর্ষের অন্তর্ভুক্ত হইয়া কেন্দ্রীয় সরকারের ক্ষমতা নত মস্তকে স্বীকার করিয়া লওয়া ছাড়া গত্যন্তর থাকিবে না।

মন্ত্রী-মিশনের প্রস্তাবানুসারে কাজ হইলে অখণ্ড ও শক্তিশালী ভারত প্রতিষ্ঠার পথ খুলিয়া যাইবে ও সাম্প্রদায়িকতার অবসান ঘটিবে ইহা আমাদের বিশ্বাস। তবে সাফল্য সম্পূর্ণরূপে নির্ভর করিবে কংগ্রেস-নেতাদের দৃঢ়তা, সততা, দূরদর্শিতা ও বুদ্ধিমত্তার উপর।

ফরিদকোট ও কাশ্মীর

ফরিদকোট ও কাশ্মীরের সাম্প্রতিক ঘটনাবলী ভারতের দেশীয় রাজ্যসমস্যার উপরে এক নূতন আলোকপাত করিয়াছে। যে রাজকীয় নিপীড়ন ও বিক্ষুব্ধ গণজাগরণ এই দুই দেশীয় রাজ্যকে আলোড়িত করিয়া তুলিয়াছে ভারতের বর্তমান ইতিহাসে তাহার অর্থ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এই ঘটনাবলী পর্যালোচনা করিলেই দেখা যাইবে যে জাতীয় জীবনের এই সন্ধিক্ষণেও দেশীয় রাজ্যের শাসক সম্প্রদায়ের মনোবৃত্তি চিরন্তন প্রতিক্রিয়াশীল পথ ধরিয়াই চলিতেছে।

ফরিদকোটে গোলযোগ আরম্ভ হয় এক মাসেরও বেশী সময় পূর্বে। জনসাধারণ জাতীয় পতাকা উত্তোলন করিতে চাহিলে স্টেট পুলিস তাহাতে বাধা দেয়। রাজ্যে ব্যাপক হরতাল এবং পরে সত্যাগ্রহ দমন করিবার জন্য পুলিস সকল ব্যবস্থাই অবলম্বন করে। প্রজামণ্ডলের কর্মিবৃন্দ অন্যায় ভাবে লাঞ্ছিত হন, এমন কি প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটি কর্তৃক নিযুক্ত তদন্ত কমিটিকে পর্যন্ত রাজ্যে প্রবেশ করিতে দেওয়া হয় নাই। যাহা হউক, শেষ পর্যন্ত পণ্ডিত জবাহরলাল নেহরু ১৪৪ ধারার অনুশাসন উপেক্ষা করিয়া নিজে ঘটনাস্থলে উপস্থিত হন এবং এক বিরাট জনসমাবেশে বক্তৃতা প্রদান করেন। সঙ্গে সঙ্গেই অচল অবস্থার অবসান হইয়া গেল, ফরিদকোটের রাজার সঙ্গে পণ্ডিত নেহরুর আলোচনার ফলে সমস্যার একটি শান্তিপূর্ণ সমাধান বাহির করা হইল। ১৪৪ ধারার অনুশাসনের অবসান ঘটিল, বন্দীমুক্তির প্রতিশ্রুতি দেওয়া হইল এবং অদলীয় তদন্ত কমিটি নিয়োগের ব্যবস্থা করা হইল।

কাশ্মীরের ঘটনাবলী ইহা অপেক্ষাও গুরুতর। ন্যাশনাল কন্‌ফারেন্সের সভাপতি শেখ আবদুল্লার "কাশ্মীর ছাড়" আন্দোলনের পূর্বতন ইতিহাস যাহাই হউক না কেন এ কথা অস্বীকার করিবার উপায় নাই যে এই আন্দোলনের বর্তমান রূপ সম্পূর্ণ জাতীয় এবং প্রগতিশীল। কাশ্মীরের বর্তমান রাজবংশ ঈষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর নিকট হইতে ৭৫ লক্ষ মুদ্রার বিনিময়ে এই রাজত্ব লাভ করেন এবং তার পর হইতে আজ পর্যন্ত এই মুসলমান-প্রধান রাজ্যে এই হিন্দু রাজবংশ শাসন করিতেছেন। বর্তমান মহারাজের অধীনে কাশ্মীরের যে কি দুর্গতি হইয়াছে তাহা ন্যাশনাল কন্‌ফারেন্স কর্তৃক প্রদত্ত স্মারকলিপিতে বিশেষভাবে পরিস্ফুট হইয়াছে। আজ যখন সমগ্র দেশে ইংরেজ শাসক সম্প্রদায়কে 'ভারত ছাড়' বলা হইতেছে তখন কাশ্মীর রাজ্যের প্রতিক্রিয়াশীল রাজবংশকে কাশ্মীর ছাড়িতে বলা হইলে বিস্মিত হইবার কিছু নাই; বিশেষ করিয়া যখন এই রাজত্বের ভিত্তি ঈষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর এক খেয়ালের উপরে গড়িয়া উঠিয়াছে। অনেকে বলিতেছেন যে বর্তমান রাজবংশের বিরুদ্ধে ন্যাশনাল কন্‌ফারেন্সের এই আন্দোলন সাম্প্রদায়িক এবং ব্যক্তিগত স্বার্থপ্রসূত। কিন্তু ঘটনাবলী বিশেষ ভাবে বিশ্লেষণ করিলে দেখা যায় যে শেখ আবদুল্লা পরিচালিত 'কাশ্মীর ছাড়' আন্দোলনের উদ্দেশ্য সাম্প্রদায়িক অভীষ্ট সিদ্ধি নহে।

যাহাই হোক্, কাশ্মীরের ঘটনাবলী সম্পর্কে নিরপেক্ষ তদন্ত হওয়া একান্ত প্রয়োজন। রাজ্যের শাসনগোষ্ঠী অত্যাচার ও নিপীড়নের সকল অস্ত্রই অবলম্বন করিয়াছিলেন। পণ্ডিত নেহরু এক বিবৃতিতে বলিয়াছেন যে এই অশান্তির সময় সরকারী সিপাহী পথিকদিগকে উষ্ণীষ খুলিয়া রাস্তা পরিষ্কার করিতে বাধ্য করিয়াছে, তাহাদিগকে রাস্তায় স্বাভাবিক ভাবে চলিতে বাধা দিয়াছে, সঙ্গীন উদ্যত করিয়া "মহারাজ কি জয়" বলিতে বাধ্য করিয়াছে, অশান্তির মূল কারণ যাহাই হউক এই ধরণের মধ্যযুগীয় দমননীতি লইয়া বিংশ শতাব্দীতে রাজ্যশাসন করা চলিবে না। এই সব ব্যাপারের তদন্ত ও প্রতিবিধান না করিয়া শেখ আবদুল্লার বিচার করা শুধু অন্যায় নয় বিপজ্জনকও।

ফরিদকোট ও কাশ্মীরের শাসকবৃন্দ ভুল করিয়াছেন। যুগের অগ্রগতির ধারা কোন্ দিক দিয়া প্রবাহিত হইতেছে তাহা লক্ষ্য করিবার মত বাস্তবদৃষ্টি তাঁহাদের নাই। কিন্তু এই মোহগ্রস্ত মন লইয়া স্বৈরাচারের খেলায় মাতিয়া থাকিলে বিস্ফোরণের তীব্রতাসহ গণশক্তি জাগিয়া উঠিবে; এবং সেই বিদ্রোহের আগুনকে নির্বাপিত করিবার ক্ষমতা স্টেট পুলিসের থাকিবে না। ফরিদকোটের মহারাজ তাঁহার ভ্রান্তি বুঝিয়াছেন। কাশ্মীরের মহারাজকে আমরা সতর্ক করিতে চাই যে গণতান্ত্রিক ভাবধারার আলোকে ঘটনাবলীকে বিচার করিতে না পারিলে এই রাজবংশের ধ্বংস সুনিশ্চিত।

মুসলিম লীগ প্ল্যানিং কমিটির দৃষ্টিতে মিশনের প্রস্তাবের অর্থনৈতিক ফলাফল

মুসলিম-লীগ প্ল্যানিং কমীটির যুগ্ম সম্পাদক সম্প্রতি এক বিবৃতিতে ক্যাবিনেট মিশনের প্রস্তাবাবলী সম্পর্কে মতামত প্রকাশ করিয়াছেন। এই বিবৃতির সারাংশ নিম্নে দেওয়া হইল :

ক্যাবিনেট মিশনের প্রস্তাবানুযায়ী প্রস্তাবিত ভারতীয় ইউনিয়ন বৈদেশিক সম্পর্ক, দেশরক্ষা এবং যানবাহনের ভার গ্রহণ করিবে। ইহা ছাড়া এই ইউনিয়ন এই সব কার্য সম্পাদনের নিমিত্ত প্রয়োজনীয় অর্থও সংগ্রহ করিবার অধিকারী

হইবে। এই বিষয়গুলিকে প্রস্তাবিত ইউনিয়নের অধীনে রাখার অর্থনৈতিক ফলাফল নিম্নরূপ হইবে :

বৈদেশিক সম্পর্ক :—যে কোন দেশের বৈদেশিক সম্পর্কের সঙ্গে সেই দেশের বৈদেশিক বাণিজ্য বিশেষ ভাবে জড়িত। দেশের বৈদেশিক নীতি নিয়ন্ত্রণে বাণিজ্যিক স্বার্থের স্থান বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। কেন্দ্রীয় ইউনিয়ন তাহার বৈদেশিক নীতি দ্বারা প্রদেশগুলির বৈদেশিক বাণিজ্যের পরিমাণ, প্রকৃতি এবং ধারাকে অনেকাংশে নিয়ন্ত্রণ করিতে সক্ষম হইবে।

দেশরক্ষা :—সাধারণ রাজস্ব ব্যয় করিবার ভারপ্রাপ্ত কর্তৃপক্ষ সমষ্টির আর্থিক জীবনকে বিশেষভাবে প্রভাবিত করিতে পারে এবং প্রভাবিত করিবেও। দেশরক্ষার জন্ত ব্যয়-ব্যবস্থা সাধারণত রাষ্ট্রিক ব্যয়ের একটা বড় অংশ অধিকার করে। প্রস্তাবিত ব্যবস্থা অনুযায়ী দেশরক্ষার জন্ত ব্যয়ের ভার থাকিবে কেন্দ্রের উপরে। কাজেই এই ভাবেও প্রদেশগুলির অর্থনৈতিক জীবন কেন্দ্রদ্বারা বহুলাংশে নিয়ন্ত্রিত হইবে।

প্রত্যেক দেশের দেশরক্ষা বিভাগ সেই দেশের সবচেয়ে বড় নিয়োগকর্তা। এই বিভাগকে প্রত্যক্ষভাবেই সৈন্তদল প্রভৃতিতেও বহু লোককে নিয়োগ করিতে হয়। পরোক্ষভাবে এই বিভাগকে যে লোক নিয়োগ করিতে হয় তাহার সংখ্যাও কম নহে। কারণ দেশরক্ষার প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি প্রস্তুত করিবার জন্ত বহু কারখানা প্রতিষ্ঠা করিতে হয় এবং তাহার জন্তও অনেক লোক দরকার। এই সব নিয়োগই কেন্দ্রীয় সরকার-কর্তৃক নিয়ন্ত্রিত হইবে।

দেশরক্ষার জন্ত প্রয়োজনীয় দ্রব্যের মধ্যে নিম্নলিখিত জিনিষগুলি পড়ে :—লৌহ ও ইস্পাত, সাধারণ ইঞ্জিনীয়ারিং, বিদ্যুৎশক্তি উৎপাদন, রাসয়নিক দ্রব্য, সিমেণ্ট, চামড়া, কাপড়, চিনি, কাগজ, দিয়াশলাই, সাবান ইত্যাদি।

ইহাদের মধ্যে প্রথম পাঁচটি মৌলিক শিল্প, কারণ ইহাদের উৎপন্ন দ্রব্যগুলি অন্তান্ত শিল্পের জন্ত একান্ত আবশ্যক। এই সকল শিল্পের অবস্থান প্রধানত রাষ্ট্রনৈতিক প্রয়োজনীয়তা এবং দেশের অর্থনৈতিক উন্নতির উপর নির্ভর করে। এই সকল বিষয়ে সিদ্ধান্ত করিবে কেন্দ্রীয় সরকার, কাজেই কেন্দ্রীয় সরকার অনায়াসেই বিভিন্ন বিভাগের অর্থনৈতিক উন্নতি বা অবনতি নির্ধারণ করিতে পারিবে।

দেশরক্ষা বিভাগের প্রয়োজনাদি সুষ্ঠুভাবে মিটাইবার জন্য বিশেষ অর্থনীতিক পরিকল্পনার দরকার হইবে। বিশেষ করিয়া উল্লিখিত শিল্পগুলির বিস্তারের পরিকল্পনা কেন্দ্রীয় সরকারকে করিতে হইবে। ইহার ফলে প্রদেশমণ্ডল এবং বিভিন্ন প্রদেশ উভয়েরই অর্থনৈতিক পরিকল্পনা বিষয়ে স্বাধীনতা প্রভূত পরিমাণে হ্রাস পাইবে। কেন্দ্রীয় পরিকল্পনার সঙ্গে যাহাতে তা াদের আংশিক পরিকল্পনাগুলি খাপ খায় ইহা দেখা ছাড়া আর কোনও অধিকার প্রদেশগুলির থাকিবে না। কাজেই দেখা যাইতেছে যে দেশরক্ষার জন্য পরিকল্পনার দ্বারা কেন্দ্রীয় সরকার বিভিন্ন প্রদেশের আর্থিক জীবনকে নিয়ন্ত্রিত করিতে সমর্থ হইবে।

যানবাহন :—দেশের আর্থিক জীবনে যানবাহনের গুরুত্ব কম নহে। শিল্প ও বাজারের সংস্থান, কৃষিজাত দ্রব্য উৎপাদনের প্রকৃতি এবং বিভিন্ন প্রদেশের অর্থনৈতিক উন্নতি—এই সবই নির্ভর করিবে মালপত্র চলাচলের সুবিধা এবং ভাড়ার উপরে। একই দূরত্ব এবং মালের জন্য সর্বত্র রেলের এক ভাড়া হইতে পারে না। বৈষম্যমূলক ভাড়ার প্রয়োজন অর্থনৈতিক কারণেও হয়। এই বৈষম্যমূলক ভাড়া নির্ধারণের অধিকার রেল কর্তৃপক্ষের হাতে থাকিলে কোনও বিশেষ অঞ্চলের অর্থনীতিকে ক্ষতিগ্রস্ত করিবার ক্ষমতাও তাহাদের থাকিবে।

অর্থ :—কেন্দ্রীয় বিষয়গুলির জন্য অর্থসংগ্রহের ক্ষমতা কেন্দ্রীয় সরকারের থাকিবে। এই অর্থ কি ভাবে আদায় হইবে তাহা জানান হয় নাই। ইহা করিবার দুইটি উপায় আছে :—(১) কোনও চুক্তি অনুসারে অংশগুলি কেন্দ্রীয় সরকারকে অর্থ দিতে পারে ; অথবা (২) কেন্দ্রীয় সরকার নিজস্ব শক্তিতে অর্থ আদায়ের জন্য কর বসাইতে পারে।

প্রস্তাবিত গণ-পরিষদই যখন এই বিষয় নির্ধারণ করিবে তখন এই কথা অনায়াসেই ধরিয়া লওয়া যাইতে পারে যে পরিষদের অধিক সংখ্যক সদস্য দ্বিতীয় প্রথার পক্ষপাতী হইবে। কেন্দ্রের জন্ত অর্থ এইভাবে আদায় করায় অর্থনৈতিক ফলাফল অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

কেন্দ্রের রাজস্ব আদায়ের যে সব পথ আছে তাহার মধ্যে এইগুলি প্রধান :—শুল্ক, কেন্দ্রীয় আবগারী বিভাগ, আয়কর, মুদ্রানীতি। রাজস্ব আদায়ের জন্ত আমদানী ও রপ্তানী শুল্ক ধার্য করার সঙ্গে আর একটি বিষয় বিশেষভাবে জড়িত। তাহা হইতেছে বিশেষ শিল্পকে সাহায্য করিবার জন্ত সংরক্ষণ শুল্কের ব্যবস্থা। একটি যাহাতে অপরটির উদ্দেশ্য ব্যাহত না করিতে পারে তাহা দেখা প্রয়োজন। উভয়ের যথাযথ সমন্বয় এবং নিয়ন্ত্রণের ভার একই জায়গায় থাকা দরকার। স্বভাবতই এই ভার থাকিবে কেন্দ্রীয় সরকারের হাতে এবং কেন্দ্রীয় সরকার এই অধিকারের মারফত শিল্প সংরক্ষণ নীতি নিয়ন্ত্রণ করিবে।

আমদানী ও রপ্তানী শুল্কের ফল রাজস্বের জন্তই হউক অথবা সংরক্ষণের জন্তই হউক, সব লোকের জন্ত এক হইতে পারে না। বিভিন্ন জায়গায় ইহার অর্থ বিভিন্ন রূপ হইবে, যেমন পাটের উপর শুল্কের চাপ প্রায় সমস্তটাই পূর্ববঙ্গের মুসলমান চাষীদের উপরই পড়িবে। আবার চিনির উপর সংরক্ষণমূলক শুল্ক ধার্য করার ফল হইয়াছে এই যে মুসলমানগণ এবং অন্তান্ত লোকেরা চিনি ব্যবহার করিবার জন্ত বেশী টাকা দিতেছে এবং যুক্তপ্রদেশ বিহারের হিন্দু আখচাষীগণ এবং অমুসলমান চিনির কলের মালিকগণ লাভবান হইতেছে। এই ধরণের আরও উদাহরণ দেওয়া যাইতে পারে। মোটামুটি

এই কথা প্রমাণিত হইতেছে যে আমদানী ও রপ্তানী শুল্ক ধার্য করার কর্তৃপক্ষ দেশের লোকের মধ্যে অর্থের পুনর্বন্টন এবং লাভ ও ক্ষতির দ্বারা নিয়ন্ত্রণ করিতে পারিবে।

কেন্দ্রীয় আবগারী বিভাগ :—সর্বত্র সমান হারে আবগারী শুল্ক ধার্য করা চলে না। মাত্র কয়েকটি জিনিষের উপরেই শুল্ক ধার্য করা হয় এবং এই শুল্কগুলির হারেও তারতম্য ঘটে। উপরন্তু এই আবগারী শুল্কের ফলে বিভিন্ন লোকের বিভিন্ন ফলাফল হয়। কাজেই এই ব্যাপারের ফলে কেন্দ্রীয় সরকার লোকের ব্যয়ের বোঝা বাড়াইতে বা কমাইতে পারে।

আয়কর একটি প্রত্যক্ষ কর। এই কর ধার্য করিয়া কেন্দ্রীয় সরকার দেশের লোকের সকল প্রকার অর্থনৈতিক প্রচেষ্টা নিয়ন্ত্রণ করিতে পারিবে। প্রত্যক্ষ ভাবে যে কর্তৃপক্ষ কর ধার্য করে তাহার সঙ্গেই লোকের সম্পর্ক বেশী। এই কারণেই প্রত্যেকে দেশের ফেডারেশনে আংশিক মণ্ডলগুলি প্রত্যক্ষ কর ধার্য করিবার ক্ষমতা নিজেদের হাতে রাখিয়া পরোক্ষ করের ভার কেন্দ্রের হাতে দিতে চাহিয়াছে। কিন্তু কেন্দ্রীয় সরকারের ক্রমবর্ধমান প্রয়োজনের ফলে প্রদেশগুলির প্রত্যক্ষ কর ধার্য করিবার অধিকারে হস্তক্ষেপ করা হইয়াছে এবং ফলত তাহাদের ক্ষমতা হ্রাস পাইয়াছে।

মুদ্রানীতি :—মুদ্রানীতি দ্বারাই প্রয়োজনাতিরিক্ত অর্থ সংগ্রহ করা হয়। যুদ্ধ প্রভৃতি সংকট সময়ে মুদ্রাপ্রচলন ব্যবস্থাই হইতেছে কেন্দ্রীয় অর্থ সংগ্রহের প্রধান উপায়। যদি একবার মানিয়া লওয়া হয় যে কেন্দ্রীয় সরকার প্রদেশগুলির অর্থ সাহায্য ব্যতীত কর ধার্যের দ্বারা অর্থ সংগ্রহ করিতে পারিবে তবে মুদ্রানীতির উপরে কেন্দ্রের কর্তৃত্ব বিশেষ ভাবে বাড়িয়া যাইবে।

মুদ্রানীতি ও ব্যাঙ্কিং পরস্পর ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত এবং উভয়ের সমনিয়ন্ত্রণ অর্থনীতিক কারণে বিশেষ প্রয়োজন। ইহার অর্থ এই যে ব্যাঙ্কিংও কেন্দ্রীয় কর্তৃত্বের অধীনে আসিবে। কেন্দ্রীয় সরকার ট্যাক্স তুলিয়া খরচ চালাইবার অধিকার লাভ করিলে মুদ্রানীতি তাহাদের হাতে যাইবেই এবং মুদ্রানীতি গেলে ব্যাঙ্কও যাইবে।

রক্ষাকবচ :—মিশনের প্রস্তাবে বলা হইয়াছে যে প্রধান সাম্প্রদায়িক বিষয়গুলি সম্বন্ধে সিদ্ধান্তের জন্য উভয় সম্প্রদায়ের প্রতিনিধিদের অধিকাংশের মত দরকার হইবে। ইহার ফলে মুসলমানদের সাংস্কৃতিক এবং ধর্মমূলক স্বার্থে অযথা হস্তক্ষেপের প্রতিবিধান হইতে পারে। কিন্তু এই ধরণের হস্তক্ষেপের প্রয়োজন নাও হইতে পারে। কারণ কোন সম্প্রদায়ের সংস্কৃতি বা ধর্মকে ধীরে ধীরে এবং অলক্ষ্যে বিনষ্ট করিবার একটি উপায় অর্থনৈতিক প্রভাব বিস্তার এবং ইহার বিরুদ্ধে কোন রক্ষাকবচ নাই। কারণ অর্থনীতিক সমস্তাগুলিকে "প্রধান সাম্প্রদায়িক সমস্তা" বলিয়া আখ্যা দিতে গেলে কেহ শুনিবে না।

সিদ্ধান্ত :—কোন সম্প্রদায়ের অর্থনৈতিক জীবনকে নিয়ন্ত্রিত করিবার জন্য কয়েকটি প্রধান বিষয় হইতেছে :—

১। বৈদেশিক বাণিজ্য
২। সংরক্ষণমূলক ব্যাঙ্ক
৩। সাধারণ ব্যয় (ইহার মধ্যে দেশরক্ষার জন্য ব্যয় একটি প্রধান অংশ অধিকার করে)
৪। আয়কর
৫। অর্থনৈতিক পরিকল্পনা
৬। মৌলিক শিল্প
৭। মুদ্রানীতি
৮। ব্যাঙ্কিং।

প্রায় সব বিষয়ই কোন-না-কোন কারণে কেন্দ্রীয় সরকারের কর্তৃত্বাধীন হইবে এবং এই সরকার বাস্তবত একটি অখণ্ড হিন্দুস্থান কেন্দ্রীয় সরকারই হইবে। প্রদেশগুলি দেখিতে পাইবে যে তাহাদের প্রধান প্রধান প্রায় সব বিষয়ের নীতি নিয়ন্ত্রিত হইবে কেন্দ্রীয় সরকার দ্বারা, এবং তাহাদের কাজ হইবে এই নীতি অনুসারে কাজ করিয়া যাওয়া। এই কথা বলিলে অত্যুক্তি হইবে না যে, এই ব্যবস্থা অনুসারে প্রদেশ ও প্রদেশ মণ্ডলগুলি কতকগুলি সাধারণ মিউনিসিপ্যালিটির বৃহত্তর সংস্করণমাত্র হইবে।

দুর্ভিক্ষের প্রথম পর্যায়

গত এক মাসের বাংলার খাদ্যপরিস্থিতি আলোচনা করিলে বুঝা যাইবে যে দুর্ভিক্ষ আর আমাদের কাছে এখন দূর সম্ভাবনা নহে। খাদ্যাভাবের করাল ছায়া সমগ্র বাংলাদেশকে আচ্ছন্ন করিয়াছে। এক সপ্তাহ পূর্বে যখন কলিকাতায় অনাহারে মৃত্যুর খবর শোনা গেল তখন বুঝিতে পারা গেল যে আমাদের আশঙ্কা অমূলক ছিল না। কিছুকাল পূর্বের অনাহারে মৃত্যুর সংবাদকে নানাভাবে ব্যাখ্যা করিয়া সরকার লোকের মনের মিথ্যা সন্দেহকে দূর করিতে চাহিয়াছিলেন। কিন্তু এই প্রচেষ্টা সফল হয় নাই। সমগ্র বাংলায় আজ যে খাদ্যাভাবের বিপদ ঘনাইয়া আসিয়াছে তাহাকে তো অমূলক ভীতিপ্রসূত বলিয়া উড়াইয়া দেওয়া চলিবে না। গত এক মাসে কি রকম ভাবে চাউলের মূল্য বাড়তির দিকে চলিয়া কোন কোন স্থানে চল্লিশ-পঞ্চাশ টাকায় আসিয়া দাঁড়াইয়াছে তাহা আলোচনা করিলেই অবস্থার গুরুত্ব বুঝা যাইবে। দেখা যাইবে ১৯৪৩-এর পুনরাবৃত্তির সূচনা আরম্ভ হইয়া গিয়াছে এবং পুনরাবৃত্তির ফলাফলও নিশ্চিত ও সুস্পষ্ট।

বৈশাখ মাসের শেষ সপ্তাহের একটি সংবাদ হইতে আরম্ভ করা যাক। কিশোরগঞ্জে চাউলের দর ১৭ টাকা হইতে ২০ টাকা, রংপুরে সর্বোচ্চ দর ২০ টাকা, ঢাকার গ্রামাঞ্চলে ২০ টাকা। জ্যৈষ্ঠ মাসের প্রথম সপ্তাহের শেষদিকে 'ভারত' জানাইতেছেন মুন্সীগঞ্জে চাউলের দর ২৯ টাকা। নারায়ণগঞ্জে

৩৫ টাকা এবং বিক্রমপুরের গ্রামে ২৩৷২৪ টাকা। তিন চার দিন পরে এ.পি. জানাইতেছেন জামালপুরে চাউলের দর সহসা বাড়িয়া ১৩ টাকা হইতে ২০ টাকা হইয়াছে। এই সময় অর্থাৎ ৯ই ১০ই জ্যৈষ্ঠ তারিখে চাউলের দাম বিভিন্ন জায়গায় ছিল নিম্নরূপ :

বগুড়া—২৫৲
চাঁদাইল—৩০৲
মুন্সীগঞ্জ—৩০৲
সিরাজগঞ্জ—২০৲
নোয়াখালী—২০৲ হইতে ২৫৲
মাদারিপুর—২২৲
নেত্রকোণা—২০৲
ফেনী—১৯৲
চাঁদপুর—২৬৲
বরিশাল—১৯৲
চরমুগুরিয়া—২৪৲

জ্যৈষ্ঠ মাসের মধ্যভাগে অর্থাৎ উপরোক্ত সংবাদের প্রায় এক সপ্তাহ পরে চাউলের দাম কি ভাবে বাড়িয়া গেল তাহা নিম্নলিখিত দরগুলির দিকে দৃষ্টিপাত করিলে বুঝা যাইবে :

বরিশাল—২০৲ হইতে ২৪৲
মাদারীপুর—৩৫৲
ফরিদপুর—৩০৲
মুন্সীগঞ্জ—৩২৲
পাবনা—১৭৲ হইতে ২০৲

ইহার প্রায় এক সপ্তাহ পরে, ২১শে জ্যৈষ্ঠ তারিখের 'ভারতে' সেই সময়কার চাউলের দরের নিম্নলিখিত তালিকা প্রকাশিত হয়। এক সপ্তাহের দরবৃদ্ধি দিয়াই অবস্থার গুরুত্ব বুঝা যাইবে।

সিরাজগঞ্জ—৪০৲
ঐ (গ্রামাঞ্চল)—৩২৲
ময়মনসিংহ—৩৭৲
পিনাং (ময়মনসিংহ)—২৩৲
বজ্রযোগিনী (ঢাকা)—৩৫৲
ফরিদপুর—২২৲
মাদারীপুর—৩০৲
চাঁদপুর—৪০৲
নোয়াখালি—৩৪৲
ফেনী—২৫৲
ব্রাহ্মণবাড়িয়া—২৩৲
আমতা (হাওড়া)—২০৲
বাঁকুড়া—২০৲
বর্দ্ধমান—২০৲

২৪শে জ্যৈষ্ঠ তারিখের 'নবযুগে' যে তালিকা প্রকাশিত হয় তাহাতে দেখা যায় মুন্সিগঞ্জে চাউলের দর ৩৫ টাকা, বরিশালে ২৫ টাকা, গাইবান্ধায় ২৪ টাকা, ভোলায় ২৫ টাকা এবং সন্দ্বীপে ৩০ টাকা।

চাউলের দরের এই যে ক্রমিক বৃদ্ধি আজও ইহা বন্ধ হয় নাই। এই দরের তালিকাগুলির দিকে দৃষ্টিপাত করিলে লোকের মনে যদি আতঙ্ক বা ভয় হয় তবে কি তাহা অসঙ্গত? ১৯৪৬ সালের জুন মাসে যদি ১৯৪৩ সনের জুন মাসের পুনরাবৃত্তি ঘটে তবে পরিণাম কি হইবে সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। আর সেই পরিণামের সূচনাও আরম্ভ হইয়াছে। অনশনে মৃত্যুর সংবাদ ইতিমধ্যেই নানা স্থান হইতে আসিতে আরম্ভ করিয়াছে।

বাংলার অন্ন সমস্যার কতকগুলি কারণ

'নবযুগ' বাংলার কৃষক-প্রজা দলের মুখপত্র। দেশের মাটির সহিত যাঁহাদের যোগ নিবিড়তম তাঁহারাই এই কাগজখানির পরিচালক। বাংলার আসন্ন দুর্ভিক্ষের কারণ সম্বন্ধে ১২ই জ্যৈষ্ঠ তারিখের 'নবযুগে' যে বিবরণ প্রকাশিত হইয়াছে এস্থলে তাহা উদ্ধৃত করা প্রয়োজন বোধ করিতেছি :

> ১। এই মাসে বৃষ্টি হওয়ায় পূর্ববঙ্গে আউস ধান্যের চারা নষ্ট হইয়া গিয়াছে ও পুনরায় ধান্য বপনে বিলম্ব হইতেছে। আউস ধান্য শরৎকালীন শস্য ও বাংলার অন্যতম প্রধান ফসল। ২। সরকারী গুদামে মজুত শস্যের পরিমাণ ক্রমশ কমিয়া আসিতেছে। ৩। বাহির হইতে এত অধিকসংখ্যক দুঃস্থ বাংলায় প্রবেশ করিতেছে যে, সরকারী কর্মচারিগণ অন্যান্য প্রাদেশিক সরকারকে তাঁহাদের স্ব-স্ব প্রদেশবাসী দুঃস্থদের লইয়া যাইতে অনুরোধ জানাইছেন। ৪। কোন কোন জেলায় চাউল ও আটার দর দ্রুত বৃদ্ধি পাইতেছে এবং দরিদ্রদের পক্ষে চাউল বা আটা ক্রয় ক্রমশ অসম্ভব হইয়া পড়িতেছে। এক রকমের মোটা চাউল পাওয়া যাইতেছে বটে, তবে তাহা খাওয়ার অযোগ্য।
>
> বাংলায় ছয় কোটিরও অধিক লোকের বাস। সমস্ত ভারতের উৎপন্ন চাউলের এক-তৃতীয়াংশ বাংলায় জন্মায়। এপ্রিল ও মে মাসে বাংলায় যথেষ্ট বৃষ্টি হইয়াছে। এপ্রিলের বৃষ্টিতে আউস ও আমন ধান্য বপনের উপযোগী অবস্থার সৃষ্টি হইয়াছিল কিন্তু মে মাসের বৃষ্টি ও তৎসহ প্রবল বাতাসে আউসের চারা নষ্ট হইয়া গিয়াছে। ঢাকা ও পূর্ববঙ্গের আরও কয়েকটি জেলায় মে মাসের মাঝামাঝি পর্যন্ত আউস ধানের মোট শতকরা দশ ভাগ রোপণ করা হইয়াছিল। তাহার পর ক্ষেত্রে জল জমিয়া যায়, ক্ষতির পরিমাণ কত তাহা নির্ণয় করার জন্য সরকারী কর্মচারিগণ রিপোর্ট সংগ্রহ করিতেছেন। সরকার চাষীদের মধ্যে বিনামূল্যে বীজ বণ্টনের ব্যবস্থা করিবেন বলিয়া জানা

গিয়াছে। রবি শস্যের পরিমাণও ১৯৪৫ সালের অনুরূপ হয় নাই। বর্তমান খাদ্যসঙ্কটের ইহাও একটি কারণ।

গ্রামবাসীর অবস্থা

চাউলের দর অস্বাভাবিক বৃদ্ধি পাওয়ায় গ্রামের লোকের অবস্থা কি হইয়াছে নিম্নলিখিত বিবৃতি হইতে তাহা সম্যক্ উপলব্ধি হইবে। বঙ্গীয় ব্যবস্থা-পরিষদের সদস্য শ্রীযুক্ত রজনীকান্ত প্রামাণিক তমলুক মহকুমার শোচনীয় অন্নসঙ্কট ও দুরবস্থা সম্পর্কে এই বিবৃতিটি দিয়াছেন। শুধু মেদিনীপুরের তমলুক নয়, বাঁকুড়া জেলার বহুস্থানে এবং সিরাজগঞ্জ, ঢাকা, নোয়াখালী জেলা প্রভৃতিরও অনেক এলাকায় গ্রামবাসীর অবস্থা এইরূপ দাঁড়াইয়াছে। ইহার প্রতিকারে গবর্ন্মেণ্টের কোন আগ্রহ নাই। সাহায্যদানের ব্যবস্থা অধিকাংশ ক্ষেত্রে হয় নাই, তদুপরি গত দুর্ভিক্ষে ও ঘূর্ণীবাত্যায় বিধ্বস্ত অঞ্চলসমূহে যে সব ঋণ দেওয়া হইয়াছিল তাহা এখন অনেক ক্ষেত্রে আদায়ের চেষ্টা হইতেছে এবং খাস মহলের খাজনা আদায়ও যথারীতি নিষ্ঠুর ভাবেই চলিতেছে। গ্রামের অবস্থা সম্বন্ধে গবর্ন্মেণ্টকে সচেতন করিয়া তাঁহাদের দায়িত্ব ও কর্তব্য বোধ জাগ্রত করিবার জন্য যে আন্দোলন হওয়া উচিত ছিল তাহা হয় নাই এবং হইতেছে না ইহা দুঃখের বিষয়। গ্রামের যে অবস্থা তাহাতে শুধু চাউলের দর ও খাদ্যাভাবের বিবরণ প্রকাশই যথেষ্ট নয়, গ্রামের লোকের সর্ববিধ দুর্দশার চিত্র প্রকাশিত হওয়া দরকার। আলোচ্য বিবৃতিটিতে তমলুক অঞ্চলের অধিবাসীদের অবস্থার মোটামুটি চিত্র প্রদত্ত হইয়াছে বলিয়া উহা দীর্ঘ হইলেও উদ্ধৃত হইল :

> তমলুক মহকুমার ছয়টি থানা—নন্দীগ্রাম, সুতাহাটা, মহিষাদল, ময়না, তমলুক, পাঁশকুড়া—সর্বত্রই দারুণ অন্নাভাব ঘটিয়াছে। গত দুর্ভিক্ষের সময় এই মহকুমার জনসাধারণ সর্বস্বান্ত হইয়াছিল। ঐ সময়ে সাত লক্ষ লোকের মধ্যে প্রায় ৬০ হাজার লোক মৃত্যুমুখে পতিত হয়। দুর্ভিক্ষের পরবর্তী সংক্রামক রোগের প্রাদুর্ভাব এখনও মিটে নাই, বিভিন্ন স্থানে কলেরা, বসন্ত, ম্যালেরিয়া, জনসাধারণের জীবনীশক্তি খর্ব করিতেছে। এই বৎসরও সারা মহকুমার ফসল মোটেই হয় নাই। নন্দীগ্রাম, সুতাহাটা থানার সমুদয় অঞ্চল, মহিষাদল থানার কিয়দংশে লোনাজল প্রবেশ করায় পানীয় জলের একান্ত অভাব ঘটিয়াছে। জমিগুলি লবণাক্ত হওয়ায় ফসল জন্মানোর অনুপযুক্ত হইয়াছে। পাঁশকুড়া থানার ১৭টি ইউনিয়নের মধ্যে দুই-তিনটি বাদে বাকীগুলিতে গড়ে একর পিছু ৪/০ মণের বেশী ধান হয় নাই। তমলুক ও অন্যান্য থানার অবস্থা ঐরূপ। সুতাহাটা থানার ২ নং ইউনিয়নের অবস্থা অত্যন্ত শোচনীয়। এই ইউনিয়নের পার্বতীপুর গ্রামের বিপিন দাস (৫২) অন্নাভাবে সংসারযাত্রা নির্বাহ করিতে না পারিয়া কিছুদিন পূর্বে গলায় দড়ি দিয়া আত্মহত্যা করিয়াছে। এই স্থানগুলিতে অবিলম্বে সাহায্যের ব্যবস্থা না করিলে বহুলোক মৃত্যুমুখে পতিত হইবে। এই মহকুমার জনসাধারণ জ্যৈষ্ঠের প্রথম হইতে একেবারে অন্নাভাবে পতিত হইবে। সরকারী ও বে-সরকারী ঋণের জন্য শতকরা ৯০ জন লোকের জমি বাঁধা পড়িয়াছে। অস্থাবর সম্পত্তি, থালা, বাটি ইত্যাদি কিছুই নাই বলিলে হয়। গরু, লাঙ্গল ইত্যাদিও গ্রামের মধ্যে অত্যন্ত অল্প। এ রকম অবস্থায় ব্যাপক সাহায্যের ব্যবস্থা না করিলে অচিরেই এই মহকুমার বহু অংশ জনহীন প্রান্তরে পরিণত হইবে।
>
> পার্বতীপুর গ্রামের বিপিন দাসের অন্নাভাবে আত্মহত্যার সংবাদ শুনিয়া আমি তমলুক মহকুমার কংগ্রেস কমিটির সভাপতি শ্রীসতীশচন্দ্র সামন্ত ও রিলিফ কমিটির প্রেসিডেণ্ট শ্রীঅনঙ্গমোহন দাসের সহিত উক্ত গ্রামে উপস্থিত হই। আমরা সেখানেও যখন উপস্থিত হই তখন স্থানীয় মাখনলাল রায় প্রামাণিক, শ্যামচরণ দাস, পঞ্চানন মান্না প্রভৃতি প্রায় ১৫ জন উপস্থিত ছিলেন। মৃত বিপিনের নিম্নলিখিত বিবরণ সংগ্রহ করিয়াছি। বিপিন দাস পূর্বে সঙ্গতিপন্ন ব্যক্তি ছিলেন। ক্রমাগত অজন্মা হওয়ায় সমুদয় সম্পত্তি বিক্রয় করিয়া মাত্র বার বিঘা জমি থাকে; বন্যার পর সাত বিঘা জমি অন্নাভাবে বিক্রয় করিয়া সংসারযাত্রা নির্বাহ করে। গত দুই বৎসর পর পর অজন্মা হওয়ায় বাকী পাঁচ বিঘা জমি তমলুক লোন কোম্পানীর নিকট বন্ধক দিয়া দুই শত টাকা ঋণ লইয়া সংসার চালায়।
>
> সংসারযাত্রা নির্বাহের জন্য অন্য কোন উপায়ে অর্থ সংগ্রহ করিতে না পারিয়া তিন দিন অনাহারে থাকিবার পর সে গলায় দড়ি দিয়া আত্মহত্যা করে। বর্তমানে তার পরিবারে আট জন লোক রহিয়াছে, তাহার মধ্যে দুই জন স্ত্রীলোক ও পাঁচ জন অপ্রাপ্তবয়স্ক, এক জন মাত্র সক্ষম ব্যক্তি। এই অঞ্চলে অস্থাবর সম্পত্তি কাহারও নাই বলিলেই চলে। অনেকে কাজ না পাইয়া বিদেশে কাজের জন্য চলিয়া গিয়াছে, গরু প্রভৃতি পশুর সংখ্যা অত্যন্ত অল্প, যাহা আছে তাহাও বিচালী ও কুঁড়ার অভাবে মৃতপ্রায়।
>
> প্রতিকারের উপায়—(১) অবিলম্বে রিলিফের ব্যবস্থা, (২) সর্বপ্রকার লোন আদায় স্থগিত, (৩) খাস মহলের খাজনা আদায় মকুব, (৪) ধান ভানার ব্যবস্থা, (৫) সুতাকাটা, (৬) হাওমেসিনের সাহায্যে সরিষা হইতে তৈল প্রস্তুত, (৭) নারিকেল দড়ি, পাট ও সনের দড়ি প্রস্তুত করান, (৮) বাঁতার দ্বারা আটা প্রস্তুত করান, (৯) আউস ও আমন উভয় প্রকারের বীজ ধান প্রদান করা, (১০) অরহর, ভুট্টা, বিউলী ও তুলাবীজ দেওয়ার

ব্যবস্থা করা এবং (১১) স্বল্প মূল্যে চাউল বিক্রীর জন্য দোকান খোলা।

গ্রামাঞ্চলে রেশনিঙের নমুনা

বাংলা-সরকার গ্রামাঞ্চলে "মডিফায়েড রেশনিং" প্রবর্তন করিয়াছেন এবং তদনুসারে প্রায় ১ কোটি ৩০ লক্ষ লোক রেশন কার্ড পাইয়াছে বলিয়া কৃতিত্ব জাহির করিবার চেষ্টা করিয়া থাকেন। রেশন কার্ড ইহারা পাইয়াছে সত্য কিন্তু রেশন যে কি ভাবে পায় তাহার কিছু নমুনা সম্প্রতি প্রকাশিত হইয়াছে। নিম্নে উহার দুইটি দৃষ্টান্ত দেওয়া গেল। উহা হইতেই গ্রামের লোকের দুর্দশা অনুমান করা সহজ হইবে। ১৩ই জ্যৈষ্ঠ তারিখের "ভারত" লিখিতেছেন :—

সরকারী রেশন-ব্যবস্থার উপর দেশের লোকের আস্থা বজায় রাখা কঠিন হইয়াছে। কলিকাতা এবং অন্যান্য আটটি শহরের প্রায় ৬০ লক্ষ লোককে রেশন যোগাইতে গিয়াই বাংলা-সরকার গলদঘর্ম হইয়াছেন, তাও এখানে বিলাতের ন্যায় বালক যুবা, ছাত্র শ্রমিক, প্রসূতি ও শিশু প্রভৃতি বিভিন্ন শ্রেণীর জন্য বিভিন্ন বরাদ্দ নাই এবং সেখানকার মত ডিম, দুধ, মাছ, মাংস, মাখন, চিনি প্রভৃতিও রেশন করিতে হয় নাই। চাউল, চিনি, আটা ও লবণ এই চারিটি দ্রব্য, শিশু বৃদ্ধ, রোগী ও নরনারী নির্বিশেষে সর্ব শ্রেণীর লোককে একই হারে যোগান দিতে গিয়া ইঁহারা নাজেহাল হইতেছেন। গ্রামের লোকের জন্য আছে "মডিফায়েড রেশনিং।" এই অপূর্ব রেশনিঙের একটি নমুনা এখানে দেওয়া গেল। বিক্রমপুরের একটি ইউনিয়নে ১৭০৪১ জন লোকের বাস। ইহাদের মধ্যে শিশু ও বয়স্ক লইয়া মোট ৩০৯৬৬ ইউনিট (পূর্ণ বয়স্ক ২ ইউনিট ও শিশু ১ ইউনিট হিসাবে) রেশন কার্ড চালু আছে। ১৯৪৫ সালের এপ্রিল হইতে ১৯৪৬ সালের এপ্রিল মাস পর্যন্ত এই লোকগুলিকে রেশন কার্ড মারফৎ দেওয়ার জন্য ফুড কমিটি নিম্নলিখিত দ্রব্যাদি পাইয়াছে :—

ধান—	৬৭৫।/৸০
চিনি—	৪২৯/৭৸০
কেরোসিন—	১৪২৬ টিন
কয়লা—	৫০৫/০
সরিষার তৈল—	১৭৬৸০৸৴০
নারিকেল তৈল—	৩/৩
লবণ—	১১৯২৸৭
ময়দা—	৩২/৫
শাড়ী—	৩৩৫৯ খানা
ধুতি—	৭৮২৯ ,,
মার্কিণ, শার্টিং ইত্যাদি—	২৬০২১১।০ গজ
বিছানার চাদর—	১৬ খানা
কম্বল—	১৮ ,,
ছাতা—	১৮টি
লুঙ্গি—	১০০টি

একটু হিসাব করিলেই দেখা যাইবে, এই ১৭০৪১ জন লোক বৎসরে এক সের হিসাবে চিনি, সের দেড়েক কয়লা ও আধ সেরেরও কম সরিষার তৈল পাইয়াছে। যে গবর্ণমেণ্ট বছরে এক সের চিনি বা আধ সের তেলের বেশী রেশন কার্ড মারফৎ সরবরাহ করিতে পারে না, কোন জীবিত মানুষ তাহার উপর কেমন করিয়া বিশ্বাস রাখে?

২৯শে জ্যৈষ্ঠ তারিখের "আনন্দবাজার পত্রিকা"র ঢাকার সিভিল সাপ্লাই বিভাগ হইতে ইউনিয়ন ফুড কমিটির সেক্রেটারীদের নিকট যে পত্রখানি গিয়াছে তাহার প্রতিলিপি প্রকাশিত হইয়াছে। উহাতে বলা হইয়াছে :

ইউনিয়ন খাদ্য সমিতির সেক্রেটারী মহাশয় সমীপেষু।

নিম্নলিখিত আদেশগুলি অবিলম্বে পালনের জন্য আপনাকে নির্দেশ দেওয়া হইতেছে :—

[ক] পরিবর্তিত বরাদ্দ পরিকল্পনা অনুসারে চাউল ও ধান্যের বরাদ্দ নিম্নলিখিত ভাবে হ্রাস করিতে হইবে :—

[১] চাউল প্রত্যেক বয়স্কের জন্য [৮ বৎসরের অধিক] সপ্তাহে /২ সের।

চাউল প্রত্যেক শিশুর জন্য [৮ বৎসরের নিম্ন বয়স্ক] সপ্তাহে /১ সের।

[২] ধান্য—প্রত্যেক বয়স্কের জন্য সপ্তাহে /৩ সের।

এই নির্দেশ শুধু ঢাকার জন্য নহে, অন্যান্য জেলাতেও হয়ত অনুরূপ পত্র গিয়াছে ইহা অনুমান করা অসঙ্গত নহে। দুই বেলায় এক পোয়া চাউলের ভাত খাইয়া কৃষকেরা কি ভাবে আমন ফসল জন্মাইবার চেষ্টা করিবে তাহা বুঝিবার মত ক্ষমতা বর্তমান সরকারী কর্তৃপক্ষের আছে বলিয়া মনে হয় না।

খাদ্য অপচয়ের পরিমাণ

সরকারী অব্যবস্থার ফলে খাদ্য অপচয়ের বিবরণ সংবাদপত্রসমূহে এত প্রকাশিত হইয়াছে যে নূতন কোন তথ্যই বিস্ময়কর মনে হইবে না। কিন্তু এই অপচয়ের মোট পরিমাণ সম্পর্কে একটা ধারণা থাকিলে বুঝিতে পারা যাইবে যে বর্তমান দুর্ভিক্ষ কেবলমাত্র বিধাতার অভিশাপ নহে। প্রাকৃতিক বিপর্যয় অপেক্ষা সরকারী অক্ষমতা এবং দুর্নীতিই এইজন্য অধিকতর দায়ী। এই অপচয়ের পূর্ণ বিবরণ প্রকাশিত হওয়া দরকার। প্রত্যেকটি সংবাদপত্র হইতে অপচয়ের খবরগুলি সংগ্রহ করিলে একটা আংশিক বিবরণ পাওয়া যাইতে পারে। কিন্তু সংবাদপত্রে সব খবর প্রকাশিত হয় না, এবং যাহা হয় সেইগুলিকে একত্র করাও খুব দুঃসাধ্য কাজ। সম্প্রতি "যুগান্তর" বিভিন্ন সংবাদপত্র হইতে কতগুলি প্রধান অপচয়ের সংবাদ একত্র করিয়া একটি তালিকা দিয়াছেন।

এই তালিকা মোট অপচয়ের তুলনায় অসম্পূর্ণ হইলেও ইহা হইতে অপচয়ের বিরাট্ পরিমাণের অন্তত একটা আংশিক ধারণা হইবে। আমরা "যুগান্তরে"র সম্পূর্ণ বিবরণটি নিয়ে তুলিয়া দিলাম :

জানুয়ারী—১৯৪৬

	চাউল	আটা
চেতলা	—	১৪০০ মণ

ফেব্রুয়ারী—১৯৪৬

	চাউল	আটা
দিনাজপুর	৩০,০০০	—
বিবেকানন্দ রোড	৪১,০০০	—

নাটোর হইতে প্রেরিত ২৫শে ফেব্রুয়ারীর এক সংবাদে দেখা যায় যে, স্থানীয় পাইকারী ব্যবসায়ী মেসার্স চিরঞ্জীলাল আগরওয়ালার গুদাম হইতে বিপুল পরিমাণে আটা অখাদ্য বলিয়া পরিগণিত হওয়ায় নিছাবাজারের একটি খাদে ফেলিয়া দেওয়া হইয়াছে। এই আটা ১৯৪৩ সালের খাদ্যসঙ্কটের সময় গুদামজাত করা হইয়াছিল।

ফেব্রুয়ারী—১৯৪৬

ঢাকা হইতে ৮ই ফেব্রুয়ারীর অপর একটি সংবাদে প্রকাশিত হইয়াছে। উক্ত সংবাদে দেখা যায় যে, নারায়ণগঞ্জে শীতলক্ষ্যা নদীতে বিপুল পরিমাণে অখাদ্য আটা ফেলিয়া দেওয়া হইয়াছে।

মার্চ—১৯৪৬

১লা মার্চ বাগেরহাট কংগ্রেস কমিটির সম্পাদক বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটিকে এক তারে জানাইয়াছেন যে, ৮০,০০০ মণ ধান বৃষ্টির জন্য প্রায় নষ্ট হইয়া গিয়াছে। ইহা ভিন্ন বিভিন্ন সংবাদপত্রে প্রকাশিত সংবাদে দেখা যায় যে, নিম্নোক্ত স্থানসমূহেও খাদ্যশস্য নষ্ট হইয়া গিয়াছে :—

	চাউল	আটা
বাঁকুড়া	১,৬০,০০০ মণ	—
নাটোর	—	১০০ বস্তা ২০০ মণ
মেহেরপুর	৫০০০ মণ	—
হাওড়া	—	১০০০০০ মণ
সিঙ্গুর	—	২০০০০০ মণ
কলিকাতা	—	১০০০০ মণ

এপ্রিল—১৯৪৬

	চাউল	আটা
নেত্রকোণা	—	১৪৩ মণ

মে—১৯৪৬

	চাউল	আটা
ঢাকা	৭৫০০০ মণ	—

উপরোক্ত ধান চাউল এবং আটা কেবলমাত্র ১৯৪৬ খ্রীষ্টাব্দেই নষ্ট হইয়াছে। ইহা ভিন্ন ১৯৪৫ সালের কোন্ মাসে কত খাদ্য নষ্ট হইয়াছে বিভিন্ন সংবাদপত্রসমূহ হইতে সংগ্রহ করিয়া নিয়ে তাহার একটি মোটামুটি হিসাব দেওয়া হইল :—

১৭ই ডিসেম্বর, ১৯৪৪ সাল হইতে—মে, ১৯৪৫ সাল পর্য্যন্ত অমৃতবাজার পত্রিকায় প্রকাশিত খাদ্যশস্য নষ্ট হইবার সংবাদসমূহ :

নোয়াখালি—আটা	৮৫০ মণ
কলিকাতা—আটা	৩০০০ মণ
জলপাইগুড়ি—আটা, অড়হর ডাল ইত্যাদি	২০০০ মণ
কলিকাতা—আটা এবং ময়দা	১৫০০০ মণ
শিবপুর বোটানিক্যাল গার্ডেন	৫০০০ মণ
খুলনা রেলওয়ে কলোনী—ময়দা	১৪৬০০০ মণ
মাণিকগঞ্জ—চাউল	১০০০০০ মণ

১৯৪৫ সালে অন্যান্য সংবাদপত্রে প্রকাশিত সংবাদসমূহের মোট হিসাব :

জুলাই—১৯৪৫ : আটা—১০২৬১৮ মণ। আগষ্ট—১৯৪৫ : চাউল ৬৮৪২৮ মণ, আটা ২২০০০ মণ। সেপ্টেম্বর—১৯৪৫ : ৪৫০০০০ মণ, আটা ২১৪০০ মণ ; অক্টোবর—১৯৪৫ : চাউল ৩৩৮৮২ মণ, আটা ৩৫০০০ মণ। নবেম্বর—১৯৪৫ : চাউল ২৮৫০০ মণ, আটা ৩৫২৭ মণ।

সমস্ত হিসাবপত্র পর্য্যালোচনা করিয়া দেখা যায় :—

১৯৪৬ সালের জানুয়ারী হইতে এ পর্য্যন্ত চাউল ৩১১০০০ মণ, আটা ৩১১৭৪৩ মণ নষ্ট হইয়াছে।

১৯৪৪ সালের ১৭ই ডিসেম্বর হইতে ১৯৪৫ সালে চাউল ৬৮০৮১০ মণ ও আটা ৩২১৩৯৫ মণ নষ্ট হইয়াছে।

অর্থাৎ ১৯৪৪ সালের ডিসেম্বর হইতে ১৯৪৬ সালের মে মাস পর্য্যন্ত বাংলাদেশে মোট ৯৯১৮১০ মণ চাউল এবং ৬৩৩১৩৮ মণ আটা অথবা ময়দা বিনষ্ট অথবা অখাদ্য বলিয়া পরিগণিত হইয়াছে। এই হিসাবে বাগেরহাটের ৮০০৩০ মণ ধান নষ্ট হওয়া এবং নাটোর ও ঢাকা হইতে ফেব্রুয়ারী মাসে আটা নষ্ট হওয়ার যে সংবাদ আসিয়াছে তাহাতে অধিক পরিমাণ না থাকায় ধরা হয় নাই।

সর্বশেষ গত ২৫শে মে এক সংবাদ প্রচারিত হইয়াছে যে ফেণীতে স্থানীয় সরবরাহ বিভাগের গুদাম হইতে প্রচুর পরিমাণে আটা ও ময়দা নষ্ট বলিয়া স্থানীয় হেলথ অফিসার ঘোষণা করিয়াছেন।

বিভিন্ন সংবাদপত্রে প্রকাশিত বিবরণগুলি একত্র করিয়া বাংলায় খাদ্যশস্য অপচয়ের এই লজ্জাকর চিত্র অঙ্কিত হইয়াছে। কিন্তু ইহা ছাড়া লোকচক্ষুর অন্তরালে যে কি পরিমাণ খাদ্যদ্রব্য নষ্ট হইতেছে তাহা কে বলিবে ?

কর্তৃপক্ষের আশ্বাস

যদিও সমগ্র বাংলা জুড়িয়া খাদ্যাভাব ও অনশনের তাণ্ডবলীলা সুরু হইয়া গিয়াছে তবুও কর্তৃপক্ষ বিচলিত হন নাই। বাংলা-সরকারের বড়কর্তারা ক্রমাগত আশ্বাস দিয়া যাইতেছেন যে ভয়ের কোন কারণ নাই, খাদ্যাবস্থা মোটেই আশঙ্কাজনক নহে এবং খাদ্যাভাবের সংবাদ নিছক আতঙ্ক-প্রসূত। কর্তৃপক্ষের এই সর্বনাশা মনোভাব কি অজ্ঞতা, অযোগ্যতা বা ঔদাসীন্যের ফল তাহা ভাবিবার বিষয়। গত মাসের সরকারী সাফাইয়ের নমুনাটা একবার দেখিলে ব্যাপারটা পরিষ্কার হইবে।

এক মাসেরও অল্প পূর্বে বাংলা-সরকারের সরবরাহ বিভাগের ডিরেক্টর ডি, এন, রাজন্ এক বক্তৃতায় বিশ্লেষণ করিয়া দেখান যে যদিও বাংলায় ৭৫০,০০০ টন খাদ্যশস্য ঘাটতি আছে তথাপি নৈরাশ্যের কোন কারণ নাই। কারণ এই ঘাটতির পরিমাণ অস্বাভাবিক নহে, যুদ্ধের পূর্বে ইহা অপেক্ষা বেশী ঘাটতির নজির আছে।

কিছুদিন পরে এক বেতার-বক্তৃতায় খাদ্যবিভাগের ডিরেক্টর মিঃ এস, কে, চ্যাটার্জি খাদ্যাবস্থা সম্বন্ধে আলোচনা করেন। তিনি আশ্বাসের মাত্রাকে আরও বাড়াইয়া উচ্চকণ্ঠে ঘোষণা করিলেন যে সরকার এই কথা স্পষ্ট করিয়া বলিতে চাহেন যে এই বৎসর আর দুর্ভিক্ষ হইবে না। চাউলের মূল্যবৃদ্ধি সম্পর্কে তিনি বলেন স্থানীয় আতঙ্কই এই ঘটনার কারণ। তিনি আশ্বাস দেন যে গবর্মেণ্টের হাতে যে পরিমাণ চাউল মজুত আছে, তাহাদ্বারা অনেক দিন পর্যন্ত রেশন অঞ্চলগুলির চাহিদা মিটান যাইবে। ১৯৪৩ সনের দুর্ভিক্ষের পুনরাবৃত্তি এবার কেন হইবে না তাহার নিম্নলিখিত কারণগুলি তিনি দিয়াছেন।

(১) ১৯৪৩ সালে বাংলা গবর্মেণ্টের হাতে খাদ্য প্রায় একেবারেই মজুত ছিল না। এবার তিন লক্ষ সওয়া পঁচিশ হাজার টন চাউল মজুত আছে।

(২) ১৯৪৩ সালে গবর্মেণ্টের চাউল সংগ্রহের কোন ব্যবস্থা ছিল না। এবার তাহা আছে এবং ইতিমধ্যেই তিন লক্ষ চল্লিশ হাজার টন চাউল সংগৃহীত হইয়াছে।

(৩) ১৯৪৩ সালে কলিকাতা বা জেলাগুলিতে অসামরিক সরবরাহ বিভাগ ছিল না। এবার সংগ্রহ, মজুত ও বণ্টন-ব্যবস্থার জন্য যথেষ্ট সংখ্যক কর্মচারী আছেন।

(৪) ১৯৪৩ সালে খাদ্যশস্য মজুত করিবার জন্য কোন গুদাম ছিল না, এবার তাহা আছে।

(৫) ১৯৪৩ সালে যুদ্ধের জন্য যানবাহনের সমস্যা অতি তীব্র ছিল। এবার তাহা নাই।

যুক্তিগুলি স্বাভাবিক ও সঙ্গত সন্দেহ নাই এবং সেইজন্যই আমাদের দুঃখ বেশী। আমাদের প্রশ্ন এই যে এত সব সুবিধা থাকা সত্ত্বেও চাউলের দাম বাড়িতেছে কেন এবং অনশন ও মৃত্যু আরম্ভ হইয়াছে কেন? ইহার কারণ কি জনসাধারণের আতঙ্ক না সরকারের অযোগ্যতা? যদি আতঙ্ক থাকে তবে তাহা কি অমূলক? সরকারী কর্মপ্রচেষ্টার নমুনা দেখিয়া লোকের মনে আতঙ্ক ক্রমশই বাড়িতেছে ইহাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু এই আতঙ্ককে দূর করিতে হইলে যে ব্যবস্থার প্রয়োজন এই অযোগ্য সরকার তাহা করিতে অক্ষম। যে কর্মচারীদের কথা মিঃ চাটার্জি বলিয়াছেন তাহারা দুর্নীতিপরায়ণ এবং অকর্মণ্য। যে গুদামের আশ্বাস তিনি দিয়াছেন সেগুলিতে সরকারের কর্ম-নৈপুণ্যে চাউল কেবলমাত্র পচে, যে চাউল সংগ্রহ-ব্যবস্থার কথা তিনি বলিয়াছেন, সে ব্যবস্থাতে সংগ্রহকারী এজেণ্টরা চোরাকারবার করে। ইহার পরেও লোকের মনে সরকারের প্রতি আস্থা থাকিবে কি করিয়া?

ইহার পরে দেখা যাক প্রধানমন্ত্রী মিঃ সুরাবর্দি সাহেব কি বলেন? চাঁদপুর কলেজে এক সম্বর্ধনা সভায় বক্তৃতা-প্রসঙ্গে তিনি আশ্বাস দেন যে চাঁদপুরকে চাউল দিয়া ঢাকিয়া দেওয়া হইবে। তিনি বলেন, খাদ্যপরিস্থিতি সম্পর্কে আতঙ্ক যুক্তিহীন, কেননা ঐ আতঙ্কের কোন ভিত্তি নাই। বর্তমান পরিস্থিতির কোন 'যুক্তি' নাই। দেশের খাদ্যাবস্থা প্রধান মন্ত্রীর যুক্তি অনুসারে চলে না ইহা পরিতাপের বিষয়। কিন্তু যুক্তি থাকুক অথবা নাই থাকুক মিঃ সুরাবর্দির আশ্বাস সত্ত্বেও চাঁদপুরে চাউলের দাম আজ পঁয়ত্রিশ-চল্লিশ টাকা। মিঃ সুরাবর্দি অন্যত্র বলিয়াছেন যে মূল্যবৃদ্ধি রোধ করিবার উপায় সরকারী গুদাম হইতে নিয়ন্ত্রিত দরে চাউল বিক্রয় করা। ইহা সত্য কথা সন্দেহ নাই; কিন্তু এই ব্যবস্থা কেন অবলম্বিত হইতেছে না। মিঃ চাটার্জির মতানুসারে যদি সরকারের হাতে যথেষ্ট চাউল মজুত থাকে তবে সেই চাউল বাজারে ছাড়িয়া এই মূল্যবৃদ্ধি রোধ করা হউক। কিন্তু আজ পর্যন্তও তাহা হইতেছে না।

সর্বশেষ আশ্বাস দিয়াছেন দিল্লী হইতে ভারত-সরকারের খাদ্য-বিভাগের সেক্রেটারী সর রবার্ট হাচিংস। তিনি ৭ই জুনের বক্তৃতায় বলেন যে, সরকারী সংবাদ অনুসারে মুন্সীগঞ্জে চাউলের দর ২৬ টাকা, নারায়ণগঞ্জে ২১।০, এবং ঢাকা সদরে ২১ টাকা। পূর্ববঙ্গের অবস্থা পর্যালোচনা করিয়া তিনি বলেন যে যানবাহনের অসুবিধা, জনসাধারণের আতঙ্ক এবং বৃষ্টির দরুণ আউসের ক্ষতির জন্যই এই অবস্থা ঘটিয়াছে। তথাপি তিনি আশ্বাস দেন যে বাংলাদেশের পক্ষে এবার কেন্দ্রীয় সরকারের নিকট খাদ্য ভিক্ষা করার প্রয়োজন হইবে না। বাংলা তাহার নিজের মজুত খাদ্য দিয়াই নিজ প্রয়োজন মিটাইতে পারিবে।

আসন্ন রেল-ধর্মঘট

রেল-কর্মচারিবৃন্দ আগামী ২৭শে জুন হইতে ধর্মঘট আরম্ভ করিবেন বলিয়া কর্তৃপক্ষকে নোটিশ দিয়াছেন। গত ১লা

জুন এই নোটিশ দেওয়া হয় এবং তদুপলক্ষে কলিকাতায় ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেসের সভাপতি শ্রীযুক্ত মৃণালকান্তি বসুর সভাপতিত্বে রেল-কর্মচারীদের এক সভা হয়। কর্মচারীদের দাবি লইয়া কর্তৃপক্ষের সহিত কর্মচারীদের ফেডারেশনের যে দরকষাকষি চলিতেছিল আপাতত তাহা ব্যর্থ হইয়াছে বলিয়াই মনে হইতেছে।

কর্মচারীদের দাবী মোটামুটি এইরূপ:

১। নিম্নপদস্থ শ্রমিক কর্মচারিদের বেতন বাড়াইয়া অন্যূন ২৫ টাকা করিতে হইবে।

২। ২৫০ টাকার নিম্ন বেতনের কর্মচারীদের বেতন অবিলম্বে ১০ টাকা হিসাবে বাড়াইতে হইবে।

৩। প্রত্যেক কর্মচারীকে ১০০ টাকা হিসাবে সাহায্য দান করিতে হইবে।

৪। বিভিন্ন অঞ্চলে মাগ্‌গি ভাতায় যে তারতম্য আছে তাহা বাতিল করিয়া সকলকে এক হারে ভাতা দিতে হইবে।

৫। কর্মচারীদের কাজের সময় কমাইয়া ৮ ঘণ্টা করিতে হইবে।

৬। যাহারা ছুটিতে যাইবে তাহাদের বদলি হিসাবে যত লোক এখন রাখা হয় তাহার সংখ্যা চার ভাগের এক ভাগ বাড়াইতে হইবে।

৭। ছুটি সম্বন্ধে কেরাণীরা যে সুবিধা পায় তাহা শ্রমিকদেরও দিতে হইবে।

৮। শ্রমিকদের দিন মজুরি দেওয়া বন্ধ করিয়া মাস-মাহিনা দিতে হইবে।

৯। যে সব কর্মচারী একাদিক্রমে এক বৎসর কাজ করিয়াছে তাহাদের চাকুরি পাকা করিতে হইবে।

১০। চুক্তি করিয়া শ্রমিক খাটানো বন্ধ করিতে হইবে।

১১। মীমাংসা না হওয়া পর্যন্ত লোক ছাঁটাই বন্ধ করিতে হইবে।

ইহার জবাবে রেলওয়ে বোর্ড নিম্নলিখিত প্রস্তাব করিয়াছিলেন:

১। বর্তমানে যাহাদের বেতন ১৪ টাকা আছে তাহা বাড়াইয়া ১৬ টাকা করা হইবে। প্রভিডেন্ট ফাণ্ড হিসাব করিবার সময় মাগ্‌গি ভাতার অর্ধেক বেতনের সহিত ধরা হইবে।

২। নিম্ন বেতনের কেরাণীদের সকলের বেতন ৩০ টাকা হইতে আরম্ভ হইয়া ৮৫ টাকা পর্যন্ত হইতে পারিবে। এই সামান্য বেতন বৃদ্ধিতেই রেলের ব্যয় ৩ কোটি ৭৫ লক্ষ টাকা বাড়িবে।

নিম্নপদস্থ শ্রমিক ও কেরাণী কর্মচারীদের বেতন আরও বাড়াইবার চেষ্টা সর্বতোভাবে করিতে হইবে ইহাতে বিমত থাকিতে পারে না। ১৬ টাকা বা ৩০ টাকা বর্তমান সময়ে কেন, কোন সময়েই সমর্থনযোগ্য নহে। উচ্চপদে ৩০০০ টাকা ও নিম্নপদে ১৬ টাকা বেতনের এই অন্যায় তারতম্য যত শীঘ্র দূর হয় ততই মঙ্গল। কিন্তু এ সম্বন্ধে আমরা একটি বিষয় মনে রাখা অত্যন্ত উচিত ছিল বলিয়া মনে করি। বর্তমান রেলওয়ে বোর্ড যে শ্রেণীর লোকের দ্বারা গঠিত ও পরিচালিত তাহাতে ইহাদের হাতে কর্মচারীদের সুবিচার প্রাপ্তির আশা কম। কেন্দ্রীয় ব্যবস্থা-পরিষদের গত অধিবেশনে শ্রীযুক্ত ক্ষিতীশচন্দ্র নিয়োগী এক প্রস্তাব আনিয়া দাবি করিয়াছিলেন যে ইংরেজের স্বার্থে ইংরেজ পরিচালনায় আমাদের রেলের কি অবস্থা দাঁড়াইয়াছে তাহার একটা পুঙ্খানুপুঙ্খ তদন্ত করা হউক। এরূপ একটি তদন্ত কমিটি গঠনের সিদ্ধান্তও হইয়াছিল। তারপর ভারতবর্ষের রাজনীতিক্ষেত্রে গুরুতর পরিবর্তন ঘটিয়াছে। কংগ্রেস কেন্দ্রীয় সরকারে যোগদান করিলে সমগ্র রেল বিভাগের উপর দেশবাসীর নিজস্ব অধিকার বিস্তৃত হইবে। তখন শ্রীযুক্ত নিয়োগীর প্রস্তাবিত কমিটি আরও স্বাধীনভাবে কাজ করিয়া রেলের সকল গলদ ধরিবার সুযোগ পাইবেন। আমাদের ধারণা এই ধরণের একটা ভাল তদন্ত হইলে রেলের ব্যয় বহু কোটি টাকা কমানো সম্ভব হইবে এবং নিম্ন বেতনের কর্মচারীদের বেতন শতকরা দশ টাকা কেন, তার চেয়েও বেশী বাড়ানো চলিবে। ইহার জন্য আন্দোলনই যথেষ্ট হইবে, ধর্মঘটের প্রয়োজন হইবে না বলিয়াই আমাদের বিশ্বাস। তবে ন্যায়সঙ্গত দাবি আদায়ের জন্য ধর্মঘট করিতে হইলে তাহা সমর্থনযোগ্য হইবে।

রেল-ধর্মঘটের বর্তমান সময়ে নোটিশ সম্বন্ধে আমাদের বিশেষ আপত্তি আছে। আগামী ফসল উঠিবার আগে ধর্মঘট দেশের পক্ষে ঘোর অনিষ্টকর হইবে। দুর্ভিক্ষের মুখে ধর্মঘটের দ্বারা রেল-কর্মচারীদের সুবিধা হইতে পারে কিন্তু ইহা দীর্ঘকাল স্থায়ী হইলে বহু লক্ষ লোককে অনশনে মৃত্যু বরণ করিতে হইবে। রেল-কর্মচারীদের ব্যবহারে জনসাধারণ সন্তুষ্ট নয় ইহা আমরা আগেও দেখাইয়াছি। যুদ্ধের সময়, বিশেষতঃ কলিকাতায় বোমা পড়িবার পর, লোকজনের শহর ত্যাগের সময় রেল-কর্মচারীরা যে ব্যবহার করিয়াছে তাহা ভুলিতে সময় লাগিবে। শিশু, রোগী ও স্ত্রীলোক সঙ্গে লইয়া ভ্রমণের সময় রেল-কর্মচারীদের হাতে এই সময়ে লোকে যে অহেতুক লাঞ্ছনা ভোগ করিয়াছে এবং টিকিট ক্রয় হইতে সুরু করিয়া ষ্টেশন পরিত্যাগ পর্যন্ত সহস্র অছিলায় যে ভাবে ইহারা ঘুষ আদায় করিয়াছে তাহা পুলিশী অত্যাচার ও ঘুষের চেয়ে কোন অংশে কম নয় এ-কথাটা কর্মচারীরা এবং ধর্মঘটে যে নেতারা উত্তেজিত করিতেছেন তাঁহারা ভুলিয়া না গেলেই ভাল করিবেন।

১লা জুনের সভায় সভাপতি শ্রীযুক্ত মৃণালকান্তি বসু বলেন যে, শ্রমিকদের দাবি সম্পূর্ণ ন্যায়সঙ্গত এবং উহা সকলের সমর্থন লাভ করিবে। রেল-কর্মচারীদের ন্যায্য দাবি দেশবাসী সমর্থন করিবে, ধর্মঘটের অসুবিধাও প্রয়োজন হইলে স্বীকার করিবে ইহা আমরাও জানি, কিন্তু আমাদের আপত্তি ধর্মঘটের

সময় সম্বন্ধে। যুদ্ধের সময় ধর্মঘট না করিয়া যাহারা ঠকিয়া গিয়াছে বলিয়া মনে করিতেছে, দুর্ভিক্ষের সুযোগ লইয়া ধর্মঘটের দ্বারা দাবি আদায়ের চেষ্টা তাহারা করিতে গেলে দেশের লোকে সন্তুষ্ট হইবে না—বসু মহাশয় এই দিকটা ভাবিয়া দেখিলে ভাল করিতেন। মৃণালবাবু বলিয়াছেন, রেল কর্মচারীদের এই সংগ্রাম বিত্তশালী ও সর্বহারার সংগ্রাম। (Essentially this struggle of the railwaymen was a struggle between the haves and have-nots) বসু মহাশয়ের এই বক্তৃতার তাৎপর্য্য হৃদয়ঙ্গম করিতে আমরা অসমর্থ। ভারতীয় রেল জাতীয় সম্পত্তি। এই জাতীয় সম্পত্তি দেশবাসী ভোগ করিতে পারে নাই এইজন্য যে এই সম্পত্তি পরিচালনার ভার এত দিন আমাদের হাতে ছিল না। এই দায়িত্ব অতি শীঘ্রই দেশবাসীর প্রকৃত প্রতিনিধিদের হাতে আসিতেছে। মূল প্রশ্ন এখানে বেতনের হার, জাতির প্রতিনিধিরা এই প্রশ্নের মীমাংসা করিবার সুযোগ শীঘ্রই লাভ করিবেন। রেল-কর্মচারীদের দাবি সুবিচারের দাবি, উপনিবেশ বা পরের সম্পত্তি লইয়া 'হ্যাভ্‌স' ও 'হ্যাভ-নটসের' বিরোধ বলিয়া আমরা মনে করি না।

দুর্ভিক্ষ সম্বন্ধে ধর্মঘটের নেতাদের উক্তি বিচারসহ নহে। কেহ কেহ বলিয়াছেন রেল-ধর্মঘট হইলেও দুর্ভিক্ষ আসিবে, না হইলেও আসিবে। মৃণালবাবু উক্ত সভায় বলিয়াছেন দুর্ভিক্ষের জন্য রেল-কর্মচারীরা ভয় পাইবে না, সে দাবি পরিত্যাগ করিবে না। শ্রীযুক্ত জ্যোতি বসু, শ্রীযুক্ত শিবনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত নীহারেন্দু দত্ত মজুমদার প্রভৃতি শ্রমিক নেতারাও দুর্ভিক্ষের মুখে ধর্মঘটের নিন্দা না করিয়া প্রকারান্তরে উহা সমর্থনই করিয়াছেন।

শ্রীযুক্ত মৃণালকান্তি বসু যুদ্ধের কয় বৎসর নির্বিবাদে কাজ করিয়াছেন। অন্যান্য শ্রমিক নেতাদের মধ্যে অনেকেই জেলে ছিলেন। শ্রীযুক্ত জ্যোতি বসু কমিউনিষ্ট, সুতরাং তিনি দলগত নীতি অনুসারে ইংরেজকে যুদ্ধে জয় লাভ করাইবার জন্য শ্রমিকদের যুদ্ধের মধ্যে ধর্মঘট হইতে নিরস্ত রাখিতে চেষ্টা করিয়াছেন ইহা বিশ্বাস করা যায়। কিন্তু ট্রেড ইউনিয়নের সভাপতি যে মৃণালকান্তি বসু আজ শ্রমিকদিগের সম্মুখে দাঁড়াইয়া রেল-ধর্মঘটের নেতৃপদ লাভের জন্য ব্যস্ত হইয়াছেন, তিনি শ্রমিকদের জন্য যুদ্ধের মধ্যে চেষ্টা করেন নাই কেন? ১৮৪৪ সালে রেল প্রতিষ্ঠার পর হইতে কর্মচারীরা ১০২ বৎসর যে হারে বেতন পাইতেছে তাহা বাড়াইবার জন্য ধর্মঘটের ব্যবস্থা কি আর পাঁচ মাস পর ফসল উঠিলে হইতে পারিত না? মৃণাল বাবু শুধু ট্রেড ইউনিয়নের নেতা নহেন, তিনি সাংবাদিকও। দেশের প্রকৃত অবস্থা জানিবার ও বুঝিবার সুযোগ তাঁহার আছে। ফসল উঠিবার আগে রেল-কর্মচারীদের যাঁহারা ধর্মঘটে উত্তেজিত করিতেছেন তাঁহারা দেশের দীন-দরিদ্র আতুরদিগের জন্য—যাহাদের জন্য রেল কোম্পানীর রেশন ভাণ্ডার বা হাসপাতাল কোন দিন খোলা ছিল না—কি কোনও ব্যবস্থা করা প্রয়োজন মনে করেন না? ধর্মঘটের মধ্যে খাদ্য-শস্য ও ঔষধ যাহাতে অবাধে চলিতে পারে সে ব্যবস্থা না করিয়া যদি ধর্মঘট হয় তবে বুঝিতে হইবে রেল-শ্রমিকের নেতৃবর্গ অগ্র-পশ্চাৎ বিবেচনা না করিয়া দেশের কোটি কোটি দরিদ্রের স্বার্থের বিরুদ্ধাচরণ তো করিতেছেনই, এমন কি রেল-কর্মচারীদেরই এক তীব্র গণ বিরোধিতার সম্মুখীন করিয়া তুলিতেছেন।

রেল-ধর্মঘট ও ধর্মঘটের নেতা

রেল-ধর্মঘটের নেতাদের সম্বন্ধে জনৈক প্রাক্তন রেল-কর্মচারীর নিম্নলিখিত পত্রখানি স্টেটসম্যানে প্রকাশিত হইয়াছে :

> ১৯২১ সালে বাংলাদেশে যে রেল-ধর্মঘট হইয়াছিল তাহার অভিজ্ঞতা আমার আছে। প্রায় দুই মাস এই ধর্মঘট চলিয়াছিল। শেষ পর্যন্ত উহা ব্যর্থ হয় এবং বহু কর্মচারী বেকার হয়।
>
> ধর্মঘটের নেতারা কত রকমের লোভনীয় প্রতিশ্রুতি দিয়া কর্মচারীদের ধর্মঘটে প্ররোচিত করিয়াছিলেন তাহা আমার স্পষ্ট মনে আছে। টাকার অভাবে যখন কর্মচারীদের পক্ষে নিজের এবং পরিবারের ব্যয় নির্বাহ অসম্ভব হইয়া পড়িল তখন স্বর্গীয় যতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্ত ভিন্ন আর সব নেতা কেমন করিয়া ধীরে ধীরে সরিয়া পড়িয়াছিলেন তাহাও আমি ভুলি নাই। যতীন্দ্রমোহন তাঁহার শেষ কপর্দক পর্যন্ত ধর্মঘটীদের জন্য ব্যয় করিয়াছিলেন কিন্তু প্রয়োজনের তুলনায় তাহা সামান্য বলিয়া ধর্মঘটীদের দুর্দশা মোচন তাঁহার পক্ষে সম্ভব হয় নাই। এই ধর্মঘটের শেষের দিকে দেশবন্ধু দাশ ও দীনবন্ধু এণ্ড্রুজ হস্তক্ষেপ করিতে বাধ্য হন, এতগুলি লোককে এই ভাবে বিপন্ন করিয়া তুলিবার জন্য ধর্মঘটের নেতাদের তাঁহারা ভর্ৎসনাও করিয়াছিলেন। পদচ্যুত কর্মচারীরা আবার যাহাতে কাজে ফিরিয়া যাইতে পারে সেজন্য তাঁহারা যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়াছিলেন কিন্তু সফলকাম হইতে পারেন নাই। বহু কর্মচারীকে ভিক্ষুকে পরিণত হইতে হইয়াছিল।
>
> রেল-কর্তৃপক্ষ কলিকাতায় এবং অন্যান্য স্থানে লোক সংগ্রহ করিয়া এক মাসের মধ্যেই রেল চালু করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। রেলে যাঁহারা কখনও কাজ করেন নাই এবং যাঁহারা বর্তমানে কাজ করেন না এমন বহু লোক ধর্মঘটের নেতৃত্ব করিতেছিলেন, কর্তৃপক্ষ লোক সংগ্রহ করিতে আরম্ভ করিলে ইঁহারাই সকলের আগে চাকুরি গ্রহণ করেন।
>
> বর্তমান ক্ষেত্রে নিম্নলিখিত কথাগুলি মনে রাখিলে রেল কর্মচারীরা উপকৃত হইবেন :

যাহারা ধর্মঘটের প্ররোচনা দিতেছেন ধর্মঘট ব্যর্থ হইলে তাঁহাদের কোন লোকসান নাই; রেলের সকল কর্মচারী ধর্মঘটে যোগদান করিবে না; এংলো-ইণ্ডিয়ান ও ইংরেজ কর্মচারীরা ভলাণ্টিয়ার শ্রেণীভুক্ত, সুতরাং তাহারা যোগ দিতেই পারে না। ধর্মঘট সুরু হইলে কর্তৃপক্ষ চুপ করিয়া বসিয়া থাকিবে না। তাহারা নূতন লোক নিয়োগের চেষ্টা করিবে; অসংখ্য মোটর গাড়ী ও লরী এবং এরোপ্লেন সরকারের হাতে আছে, উহার দ্বারা ধর্মঘট ভাঙিবার চেষ্টা হইবে।

রেল-কর্মচারীদের প্রতি আমাদের পরামর্শ এই যে, ধর্মঘট করিবার পূর্বে তাঁহারা যেন পণ্ডিত নেহরু, মৌলানা আজাদ এবং ডাঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় এই তিন জন নিরপেক্ষ বিচারকের নিকট তাঁহাদের বক্তব্য বলেন এবং তাঁহাদের পরামর্শে কাজ করেন।

এই পত্রে যে কঠিন সত্য উদ্ঘাটিত হইয়াছে সে সম্বন্ধে শ্রীযুক্ত মৃণালকান্তি বসু, শ্রীযুক্ত জ্যোতি বসু, শ্রীযুক্ত শিবনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত নীহারেন্দু দত্ত মজুমদার প্রভৃতি ধর্মঘটের নেতাদের বক্তব্য দেশবাসী জানিতে চাহিবে। ধর্মঘট ভাঙিলে অসংখ্য রেল-কর্মচারীর সর্বনাশের সম্ভাবনা আছে। আরও একটা কথা এই প্রসঙ্গে বিবেচ্য। রেলের মুসলমান কর্মচারীরা ধর্মঘটে যোগ দিবে না বলিয়া জানাইয়াছে। ধর্মঘট সুরু হইলে মুসলমান নিয়োগ করিয়া রেলওয়ে বোর্ড রেল চালাইতে পারিবে কিনা, এবং এই ভাবে রেল মুসলমানদের দ্বারা অধিকৃত হইলে হিন্দু কর্মচারীর স্থান আর কখনও উহাতে হইবে কিনা একথা ধর্মঘটের প্ররোচনা-দাতারা বিবেচনা করিয়াছেন কি? কলিকাতার উপকণ্ঠে টিটাগড়ে অন্ধ্র শ্রমিকদের ধর্মঘটের কি ফল হইয়াছিল সে কথা সকলেই জানে।

যাত্রীদের প্রতি রেল-কর্মচারীদের ঔদাসীন্য

কেন্দ্রীয় ব্যবস্থা-পরিষদের সদস্য শ্রীযুক্ত শশাঙ্কশেখর সান্যাল নিজের রেল-ভ্রমণের অভিজ্ঞতা বর্ণনা করিয়া বহরমপুর হইতে নিম্নলিখিত বিবৃতি দিয়াছেন:

শিয়ালদহের ১৯ নং আপ গাড়ীটিতে কোন প্রকার আলোর ও পাখার ব্যবস্থা ছিল না। পরন্তু প্রত্যেকটি কামরা হইতে অত্যন্ত দুর্গন্ধ আসিতেছিল। কামরার আসনগুলি অত্যন্ত অপরিচ্ছন্ন ছিল এবং উচ্চশ্রেণীর আসনগুলির গদিও সম্পূর্ণরূপে ছিন্নভিন্ন ছিল। রেল-কর্তৃপক্ষের নিকট এ সম্পর্কে পুনঃপুনঃ আবেদন করা সত্ত্বেও কোন প্রকার সাহায্য পাওয়া যায় নাই, এবং তাঁহারা এই বিষয়ে নির্লিপ্ত ছিলেন। আমি নিজে একবার গাড়ী থামাইবার জন্য চেন টানিয়াছিলাম, কিন্তু গার্ড গাড়ী থামান নাই। সমস্ত রাত্রি ধরিয়া গভীর অন্ধকারের মধ্যে ট্রেনটি চলিতেছিল। ইহাতে সমস্ত যাত্রীরই অত্যন্ত অসুবিধা ও ভীতির উদ্রেক হইয়াছিল।

রেলের আলো, পাখা প্রভৃতি ঠিক আছে কি না দেখা ও কামরা পরিষ্কার রাখার দায়িত্ব কি রেলওয়ে বোর্ডের সদস্যদের, না ভারপ্রাপ্ত কর্মচারীদের। বিপদসূচক চেন টানিলেও যে গার্ড গাড়ী থামায় না সেই ব্যক্তিও বেতনবৃদ্ধির জন্য ধর্মঘটে যোগদানের সঙ্কল্প প্রকাশ করিয়াছে তো? আমরা বার বার এই কথাই বুঝাইতে চাহিতেছি যে যাত্রীদের সহিত রেল-কর্মচারীদের ব্যবহার এখনও সন্তোষজনক হয় নাই; যুদ্ধের সময় দেশবাসীর সকল সুবিধা নিষ্ঠুর ভাবে উপেক্ষা ও অবজ্ঞা করিয়া টাকার লোভে ইহারা যে ভাবে ইংরেজের গোলামি করিয়া নিজ নিজ স্বার্থ সিদ্ধি করিয়াছে সেই মনোভাব আজও দূর হয় নাই। উহা সম্পূর্ণরূপে দূর না হইলে ধর্মঘটে জনসাধারণের সক্রিয় সহানুভূতি অর্জন কঠিন হইবে এবং দেশের সর্বশ্রেণীর লোকের অকুণ্ঠ সহানুভূতি না পাইলে এত বড় ভারতব্যাপী ধর্মঘট সফল হওয়া কঠিন হইবে।

বস্ত্রসংকট ও সরকারী বরাদ্দ

বাংলা-সরকারের বস্ত্র নিয়ন্ত্রণ ও বরাদ্দব্যবস্থা সম্বন্ধে আমরা বহুবার সমালোচনা করিয়াছি। এই বিভাগীয় কর্তৃপক্ষ যে তাঁহাদের কাজ মোটেই সন্তোষজনক ভাবে সম্পন্ন করিতে পারিতেছেন না সে বিষয়ে নূতন করিয়া মন্তব্য করিবার প্রয়োজন নাই। কলিকাতার অবস্থা সম্পর্কে প্রত্যক্ষ ধারণা অনেকেরই আছে। কিন্তু মনে রাখিতে হইবে কলিকাতার বস্ত্ররেশনিং ব্যবস্থাই তবু প্রদেশের মধ্যে সর্বাপেক্ষা ভাল। গ্রামাঞ্চলে এই রেশনিং-ব্যবস্থার স্বরূপ সম্বন্ধে ধারণা থাকিলে কলিকাতাবাসীরা ধারণা করিতে পারিবেন যে কলিকাতা ছাড়া বাংলার সর্বত্র কি ভয়ানক বস্ত্রসমস্যা দেখা দিয়াছে।

গত বৎসরের এপ্রিল মাস হইতে সরকার কাপড় সরবরাহের ভার নিজ হস্তে গ্রহণ করেন। কথা ছিল সকলকে দশ গজ করিয়া কাপড় দেওয়া হইবে। গত এপ্রিল মাস হইতে এ বৎসরের এপ্রিল মাস পূর্ণ হওয়া পর্য্যন্ত সরকার বিভিন্ন জেলায় যে কাপড় পাঠাইয়াছেন তাহার হিসাব হইতে দেখা যায় যে এই তের মাসে সরকার মোট ২,৬৯,৮৬৫ বেল কাপড় পাঠাইয়াছেন। কিন্তু এই বছর এপ্রিল মাসেই কাপড় গিয়াছে প্রায় ৪১ হাজার বেল। সুতরাং গত এক বৎসর সরকার জেলাগুলিতে এক লক্ষ আটাশ হাজার বেলের মত কাপড় পাঠাইয়াছেন। জেলাগুলির লোকসংখ্যা প্রায় ছয় কোটি ধরিয়া এবং প্রতি বেলে ২০০ খানা দশ গজী কাপড় ধরিলেও দেখা যায় যে গত এক বৎসরে গড়ে মাথাপিছু সাড়ে চার গজ করিয়া কাপড় পড়ে। উপরন্তু আমরা যদিও ধরিয়া লইলাম যে দশ গজী কাপড় দেওয়া হয় আসলে আট গজী বা নয় গজী

ধুতিই সাধারণত পাঠান হয়। সুতরাং প্রাপ্ত কাপড়ের পরিমাণ আসলে আরও কম। ইহারই নাম "মডিফায়েড রেশনিং"।

জমিদারী প্রথা উচ্ছেদের দাবি

জমিদারী প্রথা উচ্ছেদের দাবি আবার নূতন করিয়া উঠিয়াছে। ১৯৩৭ সালের প্রাদেশিক ব্যবস্থা-পরিষদের নির্বাচনের সময় এই দাবি কৃষক-প্রজা দল তুলিয়াছিলেন এবং মন্ত্রিমণ্ডল গঠনের পর মৌলবী ফজলুল হক এই দুরূহ কার্য কিরূপে সাধন করা যায় সে সম্বন্ধে যথাযোগ্য পরামর্শ দিবার জন্য ফ্লাউড কমিশন নিযুক্ত করিয়াছিলেন। এই কমিশনের সভাপতিপদে উপযুক্ত ভারতবাসীর পরিবর্তে সর্ ফ্রান্সিস ফ্লাউডকে চেয়ারম্যান নিযুক্ত করার প্রতিবাদস্বরূপ সৈয়দ নৌশের আলি মন্ত্রিমণ্ডল ত্যাগ করেন। ১৯৪০ সালে ফ্লাউড কমিশন রিপোর্ট দাখিল করেন। তাঁহারা জমিদারী প্রথা তুলিয়া দেওয়ার পরামর্শ দেন এবং বলেন যে, ক্ষতিপূরণ দিয়া সমস্ত জমিদারী সরকারকর্তৃক ক্রয় করিয়া লওয়া উচিত। লীগ মন্ত্রিত্বের আমলে কমিশনের সুপারিশ চাপা পড়িয়া রহিয়াছে, শুধু নির্বাচনের সময় এক-এক বার হৈচৈ হয় মাত্র।

এবার আবার জমিদারী প্রথা তুলিয়া দেওয়ার কথা উঠিতেছে এবং এবারকার দাবির বিশেষত্ব এই যে, এবার বিনা ক্ষতিপূরণে জমিদারী কাড়িয়া লওয়া হউক বলিয়া প্রচারকার্য সুরু হইয়াছে। এক দল ইহারও উপরে সুর চড়াইয়া বলিতে আরম্ভ করিয়াছেন যে, ক্ষতিপূরণ দেওয়ার প্রশ্ন যখন উঠিয়াছে তখন "জমিদারীতে যাঁহারা লাভবান হইয়াছেন সেই পক্ষভুক্ত জমিদার ও ইংরেজগণ ক্ষতিপূরণ দিবেন এবং বাংলার ক্ষতিগ্রস্ত কৃষকগণ ক্ষতিপূরণ পাইবেন।"

ফ্লাউড কমিশন ক্ষতিপূরণ দানের পরামর্শ দিলেও ব্যবস্থা-পরিষদের আগামী অধিবেশনেই বিনা ক্ষতিপূরণে জমিদারী দখলের দাবি উঠিবে এরূপ ইঙ্গিত পাওয়া যাইতেছে। ইঁহাদের মূল বক্তব্য এই যে, ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী যখন জমিদারদের সঙ্গে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত করিয়াছিলেন তখন জমিদারেরা জমির কোন দাম দেন নাই, সুতরাং আজ গবর্মেণ্ট তাঁহাদের নিকট হইতে জমি লইতে গেলে তাহার জন্য দাম দিতে হইবে কেন? তাঁহাদের সঙ্গে এই বন্দোবস্ত করা হইয়াছিল যে, তাঁহারা সরকারের হইয়া প্রজার নিকট হইতে খাজনা আদায় করিবেন এবং নির্দিষ্ট হারে সরকারী খাজনা উসুল দিবেন। কোম্পানী জমিদারের দেয় খাজনার পরিমাণ চিরদিনের জন্য নির্দিষ্ট করিয়া দিয়াছিলেন কিন্তু প্রজার দেয় খাজনা বাঁধিয়া দেন নাই। জমিদারেরা প্রজার খাজনা বাড়াইয়া এবং নূতন জমিতে প্রজা বসাইয়া এত দিন প্রচুর অর্থ উপার্জন করিয়াছেন এবং সেই অর্থ নিজেরা ভোগ করিয়াছেন। কোম্পানীর আমল হইতে এই ভাবে তাঁহারা সরকারের হইয়া যে তহশীলদারী করিয়া আসিয়াছেন বর্তমান গবর্মেণ্ট তাঁহাদিগকে সেই কার্য হইতে রেহাই দিতে চাহিলে ঐ সঙ্গে জমির মূল্যস্বরূপ তাঁহাদিগকে ক্ষতিপূরণ দিতে হইবে কেন? এই আপত্তি আপাতদৃষ্টিতে যুক্তিসঙ্গত বলিয়া মনে হইলেও উহা বিচারসহ নহে। কারণ ১৫৩ বৎসর পূর্বে যে জমিদারদের সহিত কোম্পানীর চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত হইয়াছিল তাঁহাদের মধ্যে অতি অল্পসংখ্যক কয়েকজন ভিন্ন আর সকলেরই জমিদারী বিক্রয় হইয়া গিয়াছে। নীলামে শুধু বাকি খাজনা উসুল দিয়া এই সব জমিদারী কেহ কেনেন নাই, যাঁহারা কিনিয়াছেন তাঁহাদিগকে জমির উপস্বত্ব অনুসারে অপর অস্থাবর সম্পত্তির ন্যায় খাজনার বহু গুণ টাকা মূল্যস্বরূপ দিতে হইয়াছে। সুতরাং বাস্তব অবস্থা বিবেচনা করিলে ইঁহাদিগকে ক্ষতিপূরণ না দেওয়া অন্যায় হইবে।

জমিদারী প্রথা যত শীঘ্র উঠিয়া যায় দেশের পক্ষে ততই মঙ্গল। এই কুপ্রথা দূর হইলে সাম্প্রদায়িক সমস্যা সমাধানের পথও প্রশস্ত হইবে। বাংলার অধিকাংশ জমিদার হিন্দু, তাঁহাদের নায়েব, গোমস্তা প্রভৃতিও হিন্দু। প্রজার অধিকাংশ মুসলমান। জমিদারের সহিত প্রজার সম্পর্ক অনেকটা খাদ্য-খাদক সম্বন্ধ হইয়া দাঁড়াইয়াছে। সাধারণ কৃষক গবর্মেণ্টের সাক্ষাৎ পায় না, জমিদারের নায়েব প্রভৃতিকেই তাহারা সরকারী ক্ষমতার প্রতীক বলিয়া মনে করে। জমিদারী প্রথা উঠিয়া গেলে খাজনা আদায়ের ভার সরকারের হাতে যাইবে এবং খাজনা আদায়কারী নায়েব, গোমস্তার সংখ্যা চাকুরীতে সাম্প্রদায়িক হার অনুসারে অর্ধেকের বেশী হইবে। মুসলমান নায়েব ও মুসলমান পেয়াদা সরকারী সার্টিফিকেটের জোরে মুসলমান চাষীর ঘটি বাটি বাকি খাজনার দায়ে যখন টানাটানি আরম্ভ করিবে, সরকারের স্বরূপ সম্বন্ধে মুসলমান প্রজার চোখ ফুটিবে সেই দিন। হিন্দু জমিদার, নায়েব, গোমস্তা, মহাজন প্রভৃতিকে বাদ দিয়া সরকারের মুসলমান কর্তৃপক্ষের কার্যকলাপ রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক দৃষ্টিতে বিচার করিবার সুযোগ মুসলমান প্রজা সেই দিন হইতে প্রাপ্ত হইবে।

সন্দ্বীপে নৌকাডুবি

নোয়াখালী জেলায় সন্দ্বীপ নামে একটি বৃহৎ দ্বীপ আছে। ইহার অধিবাসী সংখ্যা প্রায় দুই লক্ষ। যুদ্ধের আগে সন্দ্বীপে যাতায়াতের প্রধান উপায় ছিল চট্টগ্রাম-বরিশাল ষ্টীমার সার্ভিস। একটি ছোট লঞ্চ-জাতীয় ষ্টীমার মাঝে মাঝে নোয়াখালীর সহিত উহার যোগ রক্ষা করিত, তবে অধিকাংশ সময়েই এই ষ্টীমারটি চরে ঠেকিয়া পড়িয়া থাকিত। গত কয়েক বৎসর যাবৎ উক্ত ষ্টীমার সার্ভিসই বন্ধ হইয়াছে। নৌকা এখন সন্দ্বীপে যাতায়াতের একমাত্র উপায়। সমুদ্র অতিক্রম করিবার এই সব নৌকা অনেক সময় বিপন্ন হয়, নৌকাডুবির ফলে প্রাণহানির সংখ্যা এবং ক্ষতির পরিমাণও কম হয় না। দ্বীপের লোকদের পক্ষে বহির্জগতের সহিত যোগাযোগ রক্ষা শুধু

যাতায়াতের দিক দিয়াই দুঃসাধ্য নয়, দিনের পর দিন ডাকের অভাবে বহির্জগতের সহিত সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন অবস্থায় এখানকার লোকদের দিন কাটাইতে হয়। অথচ সন্দ্বীপ সুপারি ও নারিকেল ব্যবসায়ের একটি বড় কেন্দ্র।

নৌকাডুবির ফলে কি ভীষণ ক্ষতি হইতেছে তাহার কিছু পরিচয় দিয়ে দেওয়া গেল। স্থানীয় একজন বিশিষ্ট কংগ্রেস কর্মী আমাদের নিকট গত এক বৎসরের নৌকাডুবির যে সংক্ষিপ্ত বিবরণ পাঠাইয়াছেন অবস্থার গুরুত্ব বুঝিবার পক্ষে ইহাই যথেষ্ট বলিয়া মনে হয়। তালিকাটি এইরূপ :

১০ই এপ্রিল, ১৯৪৫ : পাঁচ জন আরোহীসহ নোয়াখালী হইতে সন্দ্বীপ আসার পথে মেঘনার মোহানার চর শিবভূঞার নিকট নৌকাডুবি। আরোহীদের প্রাণরক্ষা হইয়াছে, কিন্তু ক্ষতির পরিমাণ প্রায় দুই হাজার টাকা।

১২ই এপ্রিল, ১৯৪৫ : নোয়াখালী হইতে সন্দ্বীপ আসিবার পথে মেঘনার মোহানায় "বালুয়ার দোনার" কালবৈশাখীর ঝড়ে পড়িয়া মাঝিমাল্লা ও আট-দশ জন আরোহীসহ নৌকাডুবি। লোকজনের কোন সন্ধান মিলে নাই। ক্ষতির পরিমাণ প্রায় তিন হাজার টাকা।

৫ই মে, ১৯৪৫ : পনর-ষোল জন যাত্রী ও মালপত্রসহ কুমিরা হইতে সন্দ্বীপ আসার পথে নৌকাডুবি। চরের অতি নিকটে নৌকাডুবি হওয়ার প্রাণহানি ঘটে নাই, ক্ষতির পরিমাণ প্রায় পাঁচ হাজার টাকা।

১৩ই জুলাই, ১৯৪৫ : প্রত্যেকখানিতে প্রায় ত্রিশ জন যাত্রীসহ দুইখানি নৌকা একত্রে কুমিরা হইতে সন্দ্বীপ আসিবার পথে কূল হইতে তিন মাইল দূরে একটি নৌকা ডুবিয়া যায়। চার জনের খোঁজ পাওয়া যায় নাই। ক্ষতির পরিমাণ প্রায় চার হাজার টাকা।

৩০শে সেপ্টেম্বর, ১৯৪৫ : নোয়াখালী হইতে সন্দ্বীপ আসিবার পথে চৌদ্দ-পনর জন লোকসহ নৌকাডুবি। চরের নিকটে নৌকাডুবি হওয়ায় অনেকে সাঁতরাইয়া ডাঙায় উঠিতে সমর্থ হয় কিন্তু পাঁচ জনের কোন সন্ধান পাওয়া যায় নাই। ক্ষতির পরিমাণ প্রায় দুই হাজার টাকা।

২০শে অক্টোবর ১৯৪৫ : ১৫।১৬ জন আরোহীসহ কুমিরা হইতে সন্দ্বীপ আসিবার পথে নৌকাডুবি। একজন লোকের সন্ধান মিলে নাই, ক্ষতির পরিমাণ প্রায় দুই হাজার টাকা।

২১শে ফেব্রুয়ারী, ১৯৪৬ : পাঁচখানি ধানের নৌকা হাতিয়া হইতে সন্দ্বীপ আসার পথে ডুবিয়া যায়। তিন-চার জনের সন্ধান মিলে নাই, ক্ষতির পরিমাণ প্রায় ছয় হাজার টাকা।

২৭শে ফেব্রুয়ারী, ১৯৪৬ : হাতিয়া হইতে ধানের নৌকা সন্দ্বীপ আসার পথে ডুবিয়া যায়। দুই-তিন জন লোক নিখোঁজ, ক্ষতির পরিমাণ প্রায় হাজার টাকা।

৬ই এপ্রিল, ১৯৪৬ : দশ-বার জন আরোহীসহ নোয়াখালী হইতে সন্দ্বীপ আসিবার পথে নৌকাডুবি। চরের নিকটে জলমগ্ন হওয়ায় লোকজন সাঁতরাইয়া ডাঙায় উঠিয়া প্রাণরক্ষা করে, ক্ষতির পরিমাণ প্রায় তিন হাজার টাকা।

ইহা মাত্র এক বৎসরের বিবরণ। বহু বৎসর যাবৎ এই ব্যাপার চলিতেছে। এক-একটি বড় রকমের নৌকাডুবিতে একসঙ্গে বহু লোকের প্রাণহানিও মাঝে মাঝে ঘটিয়াছে কিন্তু কর্তৃপক্ষের নিকট ইহার প্রতিকারের জন্য বহু আবেদন-নিবেদন করিয়াও কোন ফল হয় নাই। যেমন বাংলা-সরকার, তেমনই জেলা বোর্ড, উভয়েই এ বিষয়ে সমান উদাসীন। অথচ ইহার প্রতিকার আদৌ দুরূহ নয়। বরিশাল-চট্টগ্রাম সার্ভিস খুলিয়া দিলে এবং নোয়াখালী হইতে সন্দ্বীপ যাতায়াতের জন্য দুই একটি ষ্টীমার দিলেই এই সমস্যার সমাধান হয়। বিংশ শতাব্দীর মধ্য ভাগে বাংলাদেশের এই বর্ধিষ্ণু স্থানটিতে টেলিগ্রাফ যায় নাই। টেলিগ্রাফের ব্যবস্থা করা তো দূরের কথা, ডাকের সুবন্দোবস্ত করিতেও সরকার সমর্থ হন নাই। বঙ্গীয় ব্যবস্থা-পরিষদে নোয়াখালী জেলা হইতে যে সব প্রতিনিধি নির্বাচিত হইয়াছেন তাঁহারা সন্দ্বীপের লোকদের এই দুর্দশা দূর করিবার জন্য কোন আন্তরিক চেষ্টা করেন নাই। এ সম্বন্ধে যথেষ্ট আন্দোলন হওয়া উচিত।

ডাঃ সুধীন্দ্র বসু

ডাঃ সুধীন্দ্র বসুর মৃত্যুতে প্রত্যেক শিক্ষিত ভারতবাসীই যে গভীর বেদনা অনুভব করিয়াছেন তাহাতে সন্দেহ নাই। যে কয়জন ভারতীয় দেশের ভাবধারা বিদেশে প্রচার করিবার কাজে সমগ্র জীবন আত্মনিয়োগ করিয়াছিলেন ডাঃ বসু তাঁহাদের অন্যতম। বিগত চল্লিশ বৎসর ধরিয়া তিনি আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রে মার্কিন-ভারতীয় সম্প্রীতি এবং ভারতীয় রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক উন্নতির জন্য অক্লান্ত পরিশ্রম করিয়াছেন।

ডাঃ বসুর পৈতৃক বাসভূমি ছিল ঢাকা জেলায় এবং তাঁহার প্রাথমিক শিক্ষা সমাপ্ত হয় কুমিল্লায়। কুমিল্লা ভিক্টোরিয়া কলেজের প্রাক্তন অধ্যক্ষ সত্যেন্দ্র বসু ছিলেন ডাঃ বসুর জ্যেষ্ঠভ্রাতা। বাল্যকাল হইতেই ডাঃ বসু দুঃসাহসিক অভিজ্ঞতার প্রতি আকৃষ্ট ছিলেন এবং স্কুলের পাঠ শেষ না হইতেই তিনি স্বীয় চেষ্টায় সুদূর আমেরিকায় পাড়ি দেন।

আমেরিকার আইওয়া নামক স্থানে ডাঃ বসু স্থায়ীভাবে বাস করিতে আরম্ভ করেন। ঐ স্থানে স্কুল ও কলেজের শিক্ষা সমাপ্ত করিয়া তিনি আইওয়া বিশ্ববিদ্যালয় হইতে রাষ্ট্রনীতি শাস্ত্রে 'ডক্টরেট' লাভ করেন। ছাত্রাবস্থা হইতেই ডাঃ বসু যুক্তরাষ্ট্রের দক্ষিণ ও পশ্চিম অঞ্চলসমূহে বিশেষ করিয়া ভ্রমণ করেন এবং ভারতবর্ষের সমস্যা ও ভাবধারা সম্বন্ধে বক্তৃতা করেন। এই বক্তৃতাদির ফলে ডাঃ বসুর খ্যাতি ক্রমশ বিস্তার লাভ করে এবং নানা স্থানে ভ্রমণ করিবার ফলে আমেরিকার

নাগরিক ও পল্লীজীবনের সঙ্গে তাঁহার অত্যন্ত নিবিড় যোগাযোগ স্থাপিত হয়। কিন্তু এই সময়ে তাঁহার পড়াশুনাও যথাযথ চলিতে থাকে।

১৯১৪ সালে ডাঃ বসু আইওয়া স্টেট বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক নির্বাচিত হন। তিনি প্রধানত সুদূর প্রাচ্য, মধ্য প্রাচ্য ও নিকট প্রাচ্য সম্পর্কিত সমস্যার উপরেই অধ্যাপনা করিতেন। ইহা ছাড়া আফ্রিকা ও লাটিন আমেরিকা সম্পর্কেও তিনি বক্তৃতাদি করিতেন। অধ্যাপক হিসাবে ডাঃ বসু বিশেষ খ্যাতি অর্জন করিয়াছিলেন।

আমেরিকার ভারতীয় ছাত্রদের সুখ-সুবিধার জন্য ডাঃ বসু প্রাণপণ চেষ্টা করিতেন। আমেরিকায় হিন্দুস্থান ছাত্র-সংসদ প্রতিষ্ঠায় উদ্যোক্তাদের মধ্যে ডাঃ বসু ছিলেন প্রধান। এই সংসদ হইতে একটি সাময়িক পত্রিকা প্রকাশিত হইত এবং এই সাময়িক পত্রের মারফত ডাঃ বসু ভারতবর্ষের ভাবধারা ও সমস্যাদি সম্পর্কে আমেরিকাবাসীদের সচেতন করিবার জন্য প্রভূত চেষ্টা করেন। এই চেষ্টার মূল্য যে কত গভীর তাহা সাধারণের পক্ষে অনুমান করা কঠিন হইতে পারে।

ডাঃ বসু ভারতীয় পত্রিকাদিতে নিয়মিত ভাবে প্রবন্ধ লিখিতেন। বিশেষ করিয়া 'মডার্ন রিভিয়ু' কাগজে তাঁহার সুচিন্তিত প্রবন্ধাবলী প্রায়ই প্রকাশিত হইত। এই সকল প্রবন্ধে তিনি বিশেষ করিয়া আমেরিকার রাজনীতিক ও সামাজিক রীতিনীতি সম্বন্ধে আলোচনা করেন। পরে এই সব লেখা *Fifteen Years in America* নামে একখানা ইংরেজী গ্রন্থে সংকলিত হয়।

ব্রিটিশ গবর্মেণ্ট ডাঃ বসুর এই দেশে আগমনের উপর এক নিষেধাজ্ঞা জারি করিয়াছিলেন। বহু চেষ্টার পরে এবং বিশেষ করিয়া আমাদের পরলোকগত প্রতিষ্ঠাতা-সম্পাদকের প্রচেষ্টায় তিনি এই দেশে একবার ভ্রমণ করিবার অনুমতি পান। পুনর্বার ভারতে ভ্রমণ করিবার ইচ্ছা থাকিলেও তাঁহার আর এদেশে আসা হয় নাই।

১৯২৮ সালে যখন তিনি ভারতবর্ষে আসিয়াছিলেন তখন তিনি দেশের তদানীন্তন পরিস্থিতি সম্পর্কে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা সঞ্চয় এবং বিশদ তথ্যাদি সংগ্রহ করিয়া লইয়া যান। ভারতের সর্বাঙ্গীন উন্নতির জন্য ডাঃ বসুর আজীবন সাধনা তাঁহাকে আমাদের ইতিহাসে স্মরণীয় করিয়া রাখিবে।

পরলোকে ডাঃ শশিকুমার সেনগুপ্ত

কলিকাতার প্রবীণ চক্ষু-চিকিৎসক ডাঃ শশিকুমার সেনগুপ্ত, এল এম এস, তাঁহার ৩৩।২ বিডন ষ্ট্রীটস্থ বাটীতে অকস্মাৎ হৃদ্‌যন্ত্রের ক্রিয়া বন্ধ হইয়া মৃত্যুমুখে পতিত হন। মৃত্যুকালে তাঁহার বয়স হইয়াছিল ৬৬ বৎসর। তিনি এক পুত্র ও ৭ কন্যা রাখিয়া গিয়াছেন।

ডাঃ সেনগুপ্ত ১৮৮০ খ্রীষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। ১৯০০ সালে প্রেসিডেন্সী কলেজ হইতে বি-এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। ১৯০৬ সালে এল এম এস পরীক্ষা পাস করিয়া তিনি সরকারী চাকুরী গ্রহণ করেন। ১৯১৩ সালে তিনি সরকারী চাকুরীতে ইস্তফা দিয়া এজরা হাসপাতালে চিকিৎসকের কাজ গ্রহণ করেন।

ডাঃ সেনগুপ্ত বহু জনহিতকর, সামাজিক ও রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানের সহিত জড়িত ছিলেন। তিনি একজন অক্লান্ত কংগ্রেসকর্মী ছিলেন। উত্তর-কলিকাতা জেলা কংগ্রেস কমিটির সভাপতিরূপে তিনি বহু দিন কংগ্রেসের সহিত ওতপ্রোত ভাবে জড়িত ছিলেন। অনেকগুলি দাতব্য চিকিৎসালয়ের সহিতও তিনি সংযুক্ত ছিলেন। দরিদ্র-বান্ধব ভাণ্ডারের সহিত তিনি বিশেষভাবে জড়িত ছিলেন এবং উক্ত প্রতিষ্ঠানের উন্নতির উদ্যোক্তাদের মধ্যে তিনি অন্যতম ছিলেন। ডাঃ সেনগুপ্ত দরিদ্র ও কংগ্রেসসেবীদের বিনা পয়সায় চিকিৎসা করিতেন। তাঁহার মৃত্যুতে দেশের যে ক্ষতি হইল তাহা অপূরণীয়।

পরলোকে ডাঃ বিরাজমোহন দাশগুপ্ত

কলিকাতা স্কুল অব ট্রপিক্যাল মেডিসিনের অবসরপ্রাপ্ত ডিরেক্টর রায় বাহাদুর ডাঃ বিরাজমোহন দাশগুপ্ত ঝাড়গ্রামে (মেদিনীপুর) মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছেন। তিনি গত দুই-তিন মাস কাল হৃদ্‌রোগে ভুগিতেছিলেন।

মেডিকেল স্কুল হইতে ডাক্তারী পাস করিয়া তিনি সরকারী চাকুরী গ্রহণ করেন এবং সাব-এসিস্টাণ্ট সার্জেন হন। অতঃপর তিনি কলিকাতা ট্রপিক্যাল স্কুলের প্রোটো-জুয়োলজির অধ্যাপক কর্ণেল নোলসের সহকারীর প্রোটো-জুয়ো পদে নিযুক্ত হন। কর্ণেল নোলস প্রোটোজুয়োলজি সম্পর্কে যে পুস্তক লিখিয়াছেন তাহা রায় বাহাদুর বিরাজ-মোহন দাশগুপ্তকে উৎসর্গ করেন। উক্ত বিষয়ে ডাঃ দাশগুপ্ত প্রচুর গবেষণা চালাইয়াছেন এবং তাঁহার গবেষণা প্রোটোজুয়োলজি বিভাগকে নানা ভাবে সমৃদ্ধ করিয়াছে। কর্ণেল নোলসের মৃত্যুর পর রায় বাহাদুর ডাঃ বিরাজ-মোহন দাশগুপ্ত কলিকাতা ট্রপিক্যাল স্কুলের প্রোটোজুয়ো-লজির অধ্যাপক হন এবং অবশেষে ট্রপিক্যাল স্কুলের ডিরেক্টর হন। তাঁহাকে লণ্ডন স্কুল অব ট্রপিক্যাল মেডিসিনের 'চেয়ার' অলঙ্কৃত করার জন্য অনুরোধ করা হইয়াছিল কিন্তু ভগ্ন স্বাস্থ্যের জন্য তিনি তাহা প্রত্যাখ্যান করেন। তিনি ঝাড়গ্রামে তাঁহার অবসর জীবন যাপন করিতেছিলেন।

বিষ্ণুর বরাহ- ও কূর্ম-অবতার

শ্রীযোগেশচন্দ্র রায়, বিদ্যানিধি

বরাহ-অবতার

কৃষ্ণপক্ষের রাত্রি ৩টা ৪টার সময় যখন চারিদিক নিস্তব্ধ ও চিত্ত প্রশান্ত থাকে, তখন আকাশের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে বিস্ময়াবিষ্ট হইতে হয়। নীল নভোমণ্ডলে অগণ্য তারা দীপ্তি পাইতেছে। উত্তরে দক্ষিণে, পূর্বে পশ্চিমে, ঊর্ধ্বে যেন লক্ষ লক্ষ হীরা ছড়াইয়া রহিয়াছে। এমন মানুষ নাই, যে আকাশের সে উজ্জ্বল মহিমায় মুগ্ধ না হয়। কোথাও যেন বিকটাকার মানুষ দাঁড়াইয়া আছে, কোথাও

চিত্র ১। কাল-পুরুষ নক্ষত্র

ভীষণ কুক্কুর মুখব্যাদান করিয়া আছে, কোথাও পক্ষী উড়িতেছে. কোথাও সর্প, কোথাও মৎস্য, কোথাও নৌকা, কোথাও শকট, কোথাও বৃক্ষ ইত্যাদি দ্বারা আকাশ ছাইয়া আছে। ঋগ্‌বেদের ঋষিগণ তারা-দ্বারা নানাবিধ রূপ-কল্পনা করিতেন। পৌরাণিক কল্পিত আকার অবলম্বন করিয়া উপাখ্যান রচনা করিতেন। কয়েকটি তারার যোগে কল্পিত আকারকে নক্ষত্র (Constellation) বলি।

নক্ষত্র-খচিত আকাশকে ঋষিগণ স্বর্গ বলিতেন। কেমনে স্বর্গ শূন্যে রহিয়াছে? ঋষিগণ বলিতেন, বলশালী ইন্দ্র স্বর্গকে ধারণ করিয়া আছেন। তাঁহারা বিষ্ণুর মহিমার পার দেখিতে পান নাই (ঋ ৭।৯৯)। "তিনি বৃহৎ স্বর্গকে ঊর্ধ্বে ধারণ করিয়া আছেন। তিনি সর্বত্রস্থিত ময়ূখ (খোঁটা) দ্বারা এই পৃথিবীকে ধারণ করিয়া আছেন।"

মূলে 'পৃথিবী' শব্দ আছে। এই স্থিরা পৃথিবীকে ধারণ করিবার কথা উঠিতে পারে না। এই পৃথিবী শূন্যেও নাই। ঋষিগণ নীল নভোমণ্ডলকে সমুদ্র বলিতেন। পার্থিব সমুদ্র যেমন নীল, আকাশ-সমুদ্রও তেমন নীল। এই আকাশ-সমুদ্র অর্ণব, মহার্ণব। এই অর্ণব তরণ করে বলিয়া তারার নাম তারা হইয়াছে। যেমন সমুদ্র দুইটি, একটি মর্ত্যলোকে অপরটি স্বর্গলোকে, যেমন সরস্বতী (নদী) দুইটি, একটি মর্ত্যলোকে অপরটি স্বর্গলোকে (স্বর্গঙ্গা), তেমন পৃথিবীও দুইটি, একটি মর্ত্যলোকে অপরটি স্বর্গলোকে। ঋগ্‌বেদের পৃথিবী সূক্তে (ঋ. ৫।৮৪) এক ঋষি বলিতেছেন,—"হে বিচিত্রগমনশালিনি! স্তোতৃবর্গ গমনশীল স্তোত্র দ্বারা তোমার স্তব করেন। হে অর্জুনি! তুমি শব্দায়মান অশ্বের ন্যায় বারিপূর্ণ মেঘকে উৎক্ষিপ্ত কর।" বলা বাহুল্য, এই পৃথিবী গমনশীলা. নহে, স্থিরা। অর্জুনী অর্থাৎ শ্বেতবর্ণা নয়, এখানে মেঘ-গর্জনও শুনিতে পাওয়া যায় না। সংস্কৃত ভাষায় গো শব্দের এক অর্থ পৃথিবী, কিন্তু এই পৃথিবী গমন করে না, গো নাম পাইতে পারে না। এই গো নক্ষত্র-শোভিত নভোমণ্ডল বা স্বর্গ। বিষ্ণু ইহাকেই ধারণ করিয়া আছেন, নচেৎ ইহা পড়িয়া যাইত। স্বর্গ গো; তাহার নীচের আধারও গো, পৃথিবী।

সৃষ্টির পূর্বে পৃথিবী জলমগ্ন ছিল। কৃষ্ণযজুর্বেদে আছে, প্রজাপতি বরাহ-রূপ ধারণ করিয়া পৃথিবীকে জল হইতে উত্তোলন করিয়াছিলেন। এই বরাহ দিব্য বরাহ, স্বর্গীয় বরাহ, শ্বেত বরাহ, যজ্ঞ বরাহ। ঋগ্‌বেদে রুদ্রদেব স্বর্গীয় বরাহ। তিনি আরণ্য বরাহতুল্য ভীম (ভয়ঙ্কর)। এই উপমা হইতে আর্যগণ রুদ্র-মূর্তিতে বরাহ-মূর্তি দেখিতেন। যিনি প্রজা সৃষ্টি পালন ও সংহার করেন তিনি প্রজাপতি, কাল-রূপ। বিষ্ণু, চরিষ্ণু সূর্য; যে সূর্য বর্ষচক্র পরিভ্রমণ করিতেছেন, পর্যায়ক্রমে ঋতু আনয়ন করিতেছেন, শীত গ্রীষ্ম বর্ষা দ্বারা প্রজা পালন করিতেছেন। অতএব বিষ্ণু প্রজাপতি, আর বিষ্ণু বর্ষপতি। তিনি বৎসরের ও ঋতুর আরম্ভ দেখাই-ছেন। সে সময়ে যজ্ঞ হইত বলিয়া তিনি যজ্ঞপতি, যজ্ঞেশ্বর। (বামনাবতারে বর্ণিত হইবে।) প্রতি বৎসর সূর্য বরাহের সহিত এক সূত্রে আসিতেছেন, কিন্তু সূর্য ও তারা একদা দেখিতে পাওয়া যায় না। এই কারণে সূর্যোদয়ের পূর্বে কিম্বা সূর্যাস্তের পরে দেখা হইত। যেদিন সূর্যোদয়ের পূর্বে দিব্য বরাহকে উদিত হইতে দেখা যাইত, সেদিন প্রাতে যজ্ঞ হইত, এই হেতু দিব্য বরাহের নাম যজ্ঞবরাহ হইয়াছিল। প্রজাপতি বিষ্ণু স্বর্লোকে, বরাহ স্বর্লোকে, অতএব বলিতে পারি, যে পৃথিবী উত্তোলিত হইয়াছিল, তাহাও স্বর্লোকে।

কত বৎসর পূর্বের কথা?

এই প্রশ্নের উত্তর নিমিত্ত বরাহ নিরীক্ষণ করিতে হইবে। কালপুরুষ নক্ষত্রই বরাহ। (চিত্র ১, ২। প্রত্যেক চিত্রের বাম পার্শ্ব পূর্ব দিক।) কালপুরুষ নাম বাংলা, ইহার সংস্কৃত নাম মৃগনক্ষত্র। মৃগের মস্তকে তিনটি ছোট ছোট তারা ত্রিকোণাকারে আছে (মৃগশিরা)। চারি

পদে চারিটি তারা উজ্জ্বল; সম্মুখ পদের পূর্বদিকের তারা তাম্র-বর্ণ (আর্দ্রা)। কটিতে তিনটি এক তির্যক রেখায়

চিত্র ২। মৃগ-নক্ষত্র
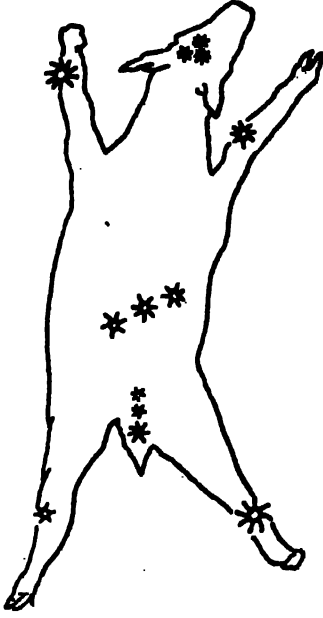
(ইষকা), পুচ্ছে তিনটি, মধ্যেরটি শুভ্র মেঘখণ্ডবৎ নীহারিকা। এই তেরটি তারায় মৃগের ও বরাহের দেহ গঠিত হইয়াছে (চিত্র ৩)।

এই নক্ষত্রের বর্তমান উদয় ও অস্তকাল লিখিতেছি।

শ্রাবণ	প্রথম	সপ্তাহে	রাত্রি	৪টায় উদয়
আশ্বিন	,,	,,	,,	১২টায় ,,
অগ্রহায়ণ	,,	,,	,,	৮টায় ,,
মাঘ	,,	,,	,,	৪টায় অস্ত
চৈত্র	,,	,,	,,	১২টায় ,,
জ্যৈষ্ঠ	,,	,,	,,	৮টায় ,,

সূর্যোদয়ের প্রায় এক ঘণ্টা পূর্বে তাহার নিকটবর্তী পশ্চিমের নক্ষত্র পূর্বদিকে দৃশ্য হইয়া উদীয়মান সূর্যরশ্মি দ্বারা অচিরে অদৃশ্য হয়। যখন দিকচক্রে উঠিতে থাকে, তখন মনে হয় নক্ষত্রটি পৃথিবীকে স্পর্শ করিতেছে। বরাহ দ্বারা পৃথিবীর উত্তোলনও সেইরূপ উদয়কালে ঘটে।

কোন্ ঋতুতে উত্তোলিত হইয়াছিল, তাহা বৈদিক গ্রন্থে কিম্বা পুরাণে লিখিত নাই। রুদ্রদেবের ঋগ্‌বেদোক্ত বিবরণ হইতে মনে হয়, বসন্ত ঋতুতে লক্ষিত হইয়াছিল। (কারণ সে ঋতুর আরম্ভে সূর্যোদয়ের পূর্বে উদয় হইত, অন্য ঋতুতে হইতে পারিত না।) এখন বসন্ত ঋতুতে ৭ই চৈত্র দিবা-রাত্রি সমান হয়, এবং সূর্যের নিকটবর্তী নক্ষত্রের উদয় ৫টায় হয়। ইহা ধরিয়া একটি মোটামুটি হিসাব করিতেছি। বর্তমানে আষাঢ় মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহের অন্তে ভোর ৬টার সময় মৃগ নক্ষত্রের উদয় হয় (যদিও দেখিতে পাওয়া যায় না)। আমরা জানি, মাস স্থির আছে ঋতু পিছাইয়া আসিতেছে। ২০০০ বৎসরে ১ মাস পিছায়। এখন আষাঢ় মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহের অন্তে মৃগনক্ষত্রের উদয় যেমন দেখিতেছি, তখন চৈত্র মাসের প্রথম সপ্তাহের অন্তে তেমন দেখা যাইত। অতএব চৈত্রের ৩, বৈশাখের ৪, জ্যৈষ্ঠের ৪, ও আষাঢ়ের ২ সপ্তাহ, একুনে ৩ মাস ১ সপ্তাহ ঋতু পিছাইয়াছে। অতএব ৬৫০০ বৎসর পূর্ব্বের ঘটনা। মোটামুটি খ্রীঃ পূঃ ৪৫০০ অব্দের কথা।

ঋগ্‌বেদে আছে, সৃষ্টির পূর্বে বিশ্বভুবন সলিলময় ছিল। পরে দেবতারা উৎপন্ন হইলেন। এই সূত্র ধরিয়া পৌরাণিক লিখিয়াছেন সৃষ্টির পূর্বে পৃথিবী জলমগ্ন ছিল। বিষ্ণু বরাহ-রূপ ধরিয়া দংষ্ট্রার দ্বারা পৃথিবী উত্তোলন করিয়াছিলেন। পৃথিবী বিস্তীর্ণা, এই হেতু জলের উপর ভাসিতে লাগিল, ডুবিল না। তারপর সৃষ্টি আরম্ভ হইল।

ঋগ্‌বেদের ঋষির উক্তির অভিপ্রায় এই,—এক সময়ে চন্দ্র সূর্য নক্ষত্র ছিল না, তখন মাত্র মহার্ণব ছিল, অর্থাৎ ত্রিভুবন নীল শূন্য আকাশ মাত্র ছিল। তখন জ্যোতিঃ পদার্থ ছিল না। পরে বরাহ অর্থাৎ মৃগনক্ষত্র উৎপন্ন হইয়াছিল। ঋগ্‌বেদে এই নক্ষত্র দক্ষ। দক্ষ হইতে আদিত্যগণ জন্মিয়াছিলেন। এই সৃষ্টিক্রম মৎস্যাবতারে দেখা যাইবে। আকাশ-সমুদ্রের সলিল বা অপ্ পার্থিব জল নয়।

পাঁজিতে লিখিত আছে, বর্তমানে শ্বেতবরাহ-কল্প চলিতেছে। কল্প এক কাল-সংখ্যা। সে সংখ্যার নাম ব্রহ্মার দিবস। শ্বেতবরাহ-কল্প, যে স্বর্গীয় বরাহ হইতে সৃষ্টির আরম্ভ হইয়াছে। সৃষ্টির কাল-সংখ্যা করিতে হইলে অর্থাৎ কত বৎসর পূর্বে সৃষ্টি আরম্ভ হইয়াছে, এই প্রশ্নের উত্তর করিতে হইলে নিশ্চয় বহু বৎসর গণিতে হইবে। বর্তমান কালে বৈজ্ঞানিকেরাও গণিয়াছেন। পাঁজির অনুমানে ও বৈজ্ঞানিকের অনুমানের ঐক্য হইবে, এমন কথা নাই। উভয়ের অভিপ্রায় একই, এই পর্যন্ত বলা যাইতে পারে। যদি একটা বৃহৎ পরিমাণ বলিতে হয়, কত শূন্য বসাইবে? এই অসুবিধা দূর করিতে ছোট জিনিস মাপিবার মাপকাঠি বা মিতি (unit) ত্যাগ করিয়া বড় মিতি গ্রহণ করা আবশ্যক হয়। পূর্বকালে আমাদের দেশের জ্যোতিষীরা কাল-সংখ্যার বিবিধ মিতি গ্রহণ করিয়াছিলেন। আধুনিক জ্যোতির্বেত্তারাও প্রয়োজনানুসারে ভিন্ন ভিন্ন মিতি ব্যবহার করেন। এদেশে দিবস, বৎসর, যুগ পরিমাণের দুইটা মান বহু প্রচলিত ছিল। একটার নাম মানুষ মান, অপরটির নাম দৈব মান। মানুষ

মান দ্বারা মানুষের ব্যবহারোপযোগী কাল গণিত হইত। বৃহৎ কাল-সংখ্যার নিমিত্ত দৈব মানের প্রয়োজন হইয়াছিল। আমাদের এক বৎসর দৈব এক দিন। আমাদের ৩৬০ বৎসর দৈব এক বৎসর, ইত্যাদি। পাঁজিতে যে সব যুগ-পরিমাণ লিখিত হয়, সে সব দৈব। এই কথা মনে না রাখাতেই অনর্থ হইয়াছে।
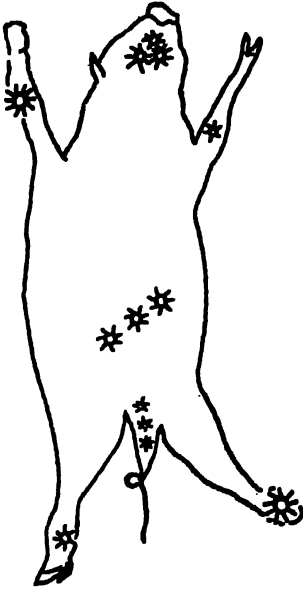
চিত্র ৩। বরাহ।

আমি উপরে মানুষ মান দ্বারা শ্বেত-বরাহের কাল-গণনা করিয়াছি। সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর, কলি এই চারি যুগ দ্বারা সে কাল ব্যক্ত করিতে পারা যায়। এক প্রকার যুগ গণনায় প্রত্যেক যুগের পরিমাণ ১০০০ মানুষ বৎসর ছিল। চারিযুগে ৪০০০ মানুষ বৎসর। এই মতে খ্রীঃ পূঃ ১৫০০ অব্দে কলিযুগের, ২৫০০ অব্দে দ্বাপরের, ৩৫০০ অব্দে ত্রেতার, ৪৫০০ অব্দে সত্য যুগের আরম্ভ হইয়াছিল। এই কলি যুগের আরম্ভে কুরুক্ষেত্র যুদ্ধ হইয়াছিল। দ্বাপরের আরম্ভে অর্থাৎ খ্রীষ্টপূর্ব্ব ২৫০০ অব্দে এক বেদ বিভক্ত হইয়া চারি স্বতন্ত্র বেদ হইয়াছিল। অন্য গণনার সহিত এই কলি ও দ্বাপরের আরম্ভকাল মিলিয়াছে। পুরাণ-মতে ত্রেতা যুগে অর্থাৎ খ্রীষ্টপূর্ব্ব ৩৫০০ হইতে ২৫০০ অব্দে ঋক্‌মন্ত্রসমূহ সংগৃহীত হইয়াছিল। আমার মতেও এই সহস্র বৎসর ঋগ বেদের অন্তিমকাল। এই তিনের ঐক্য দেখিয়া সত্য যুগের আরম্ভকাল খ্রীষ্টপূর্ব্ব ৪৫০০ অব্দ ঠিক বলিয়া মনে হয়। ইহার অন্য প্রমাণও আছে। সেকথা এখানে তুলিয়া বরাহ-অবতারকে আবৃত করিব না।

কূর্ম-অবতার

বরাহ- ও কূর্ম-অবতারের মূল একই। যখন পৃথিবী সলিলমগ্ন ছিল, তখন বিষ্ণু কূর্ম-রূপ ধারণ করিয়া পৃথিবীকে জলের উপরে স্থির রাখিয়াছিলেন। এই কল্পনার মূল তত্ত্ব যজুর্বেদে ও অথর্ববেদে আছে। সেখানে কূর্মের নাম কশ্যপ। কশ্যপ শব্দের অর্থ কচ্ছপ। অথর্ববেদে কচ্ছপ স্বয়ম্ভূ। তিনি প্রজাপতি। তাহা হইতে যাবতীয় জীবের উৎপত্তি হইয়াছে।

যে তেরটি তারা দ্বারা মৃগনক্ষত্রের দেহ গঠিত হইয়াছে, তদ্দ্বারা কচ্ছপের আকারও হইয়াছে (চিত্র ৪)। পুরাণে কশ্যপ এক ঋষি। মহাভারতের আদিপর্বে দক্ষের পঞ্চাশ কন্যা ছিলেন। তিনি চন্দ্রকে নক্ষত্রনাম্নী সাতাইশটি, কশ্যপকে তেরটি ও ধর্মকে দশটি দান করিয়াছিলেন।

যদি চন্দ্রের পত্নী তারারূপিণী হয়, তাহা হইলে কশ্যপ ও ধর্মের পত্নীও তারারূপিনী বলিতে হইবে। মৃগনক্ষত্রে তেরটি তারা গণিয়াছি। কূর্মেও সেই তেরটি দেখিতেছি, পরে মৎস্য-অবতার আলোচনার সময় দেখিব শিশুমাররূপী ধর্মেও দশটি তারা সহজে প্রত্যক্ষ হয়। অতএব কালপুরুষ নক্ষত্রই কশ্যপ ঋষি। তারা গণিয়া পত্নীর সংখ্যা হইয়াছে। তারাই পত্নী। কশ্যপের অদিতি পত্নীর গর্ভে আদিত্য দেবগণের এবং দিতি পত্নীর গর্ভে দৈত্যগণের, দনু পত্নীর গর্ভে দানবদিগের জন্ম হইয়াছে। ইঁহারা অবশ্য স্বর্গলোকে বাস করেন। কশ্যপের গন্ধর্ব অপ্সরা পশু পক্ষী সর্প বৃক্ষ প্রভৃতি অপরাপর সন্তানও স্বর্গলোকের, একটিও ভূলোকের নয়। এই তত্ত্ব না জানাতেই বেদের অনেক অংশ ও পুরাণের বহু উপাখ্যান দুর্জ্ঞেয় হইয়া রহিয়াছে। ভূলোকে যেমন পশুপক্ষী সরীসৃপ গিরি নদী বৃক্ষ ইত্যাদি আছে, স্বর্লোকেও তেমন আছে। অনুসন্ধান করিলে কয়েকটিকে নক্ষত্রের আকারে চিনিতে পারা যায়। দ্রষ্টব্য, কশ্যপের সন্তানের মধ্যে মানুষ নাই। মানুষ মানব, মনুর সন্তান কেবল এই ভূলোকেই আছে। স্বর্গলোকে পিতৃগণ থাকেন।

পুরাণে বিষ্ণুর কূর্ম-রূপ ধারণের প্রয়োজন অন্যরূপে বর্ণিত হইয়াছে। সত্যযুগে দেবাসুর মিলিত হইয়া দুগ্ধ-সমুদ্র মন্থন করিয়াছিলেন। মন্দর পর্বত মন্থান (মন্থন যষ্টি), সর্পরাজ অনন্ত বাসুকি নেত্র (মন্থন রজ্জু) হইয়াছিল। বিষ্ণু কূর্ম-রূপ ধারণ করিয়া মন্থানের অধিষ্ঠান হইয়াছিলেন। এই রূপকে স্বর্-গঙ্গা ক্ষীর-সমুদ্র, বাসুকি রবিপথ-বৃত্ত, মন্দর পর্বত ইহার অক্ষ। সমুদ্র মন্থনে উৎকট কল্পনার পরাকাষ্ঠা হইয়াছে। (মেরু পর্বত পদ্মের কর্ণিকাসদৃশ। তাহাকে স্থির রাখিতে চারি পার্শ্বে চারিটি বিষ্কম্ভ (কীলক) পর্বত আছে। পূর্ব পার্শ্বে মন্দর, উহা তুলিয়া আনিতে হইয়াছিল।)

সমুদ্রমন্থনে লক্ষ্মী ও শশী উত্থিত হইয়াছিলেন। লক্ষ্মী ক্ষীরাব্ধি-তনয়া, আমাদের মাতা; শশী মাতুল। ভিষক্-শ্রেষ্ঠ ধন্বন্তরি অমৃতপূর্ণ কমণ্ডলুহস্তে উত্থিত হইয়াছিলেন। এই কমণ্ডলু চন্দ্র। চন্দ্র সুধাময়। (কিন্তু মহাভারতে ও বিষ্ণু-

চিত্র ৪। কূর্ম।
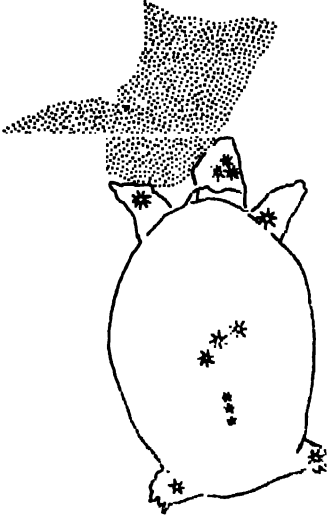
পুরাণে চন্দ্রের আবির্ভাব পৃথক্ লিখিত হইয়াছে। পরে পশু।) ঋগ্‌বেদে রুদ্রদেব ভিষক্‌শ্রেষ্ঠ। তিনি হিতকর ভেষজ জানেন। আয়ুর্বেদের ধন্বন্তরি নাম উপাধি। চন্দ্র মহেশের শিরোভূষণ। যে নক্ষত্র রুদ্রদেব, সে নক্ষত্রই লক্ষ্মীর ও ধন্বন্তরির দেহ হইয়াছে। (এখানে বিষয়টি অল্প কথায় বুঝাইবার উপায় নাই।)

সমুদ্রমন্থনদ্বারা আরও অনেক স্বর্গীয় বস্তুর উদ্ভব হইয়াছিল। কৌস্তুভ মণি, ঐরাবত শ্বেতহস্তী ও উচ্চৈঃশ্রবা শ্বেত অশ্ব আবির্ভূত হইয়াছিল। কৌস্তুভ মণি নিশ্চয় কোন উজ্জ্বল তারা। ঐরাবত ও উচ্চৈঃশ্রবা দুই নক্ষত্র দেখিয়া কল্পিত হইয়াছিল। ইংরেজী তারা-পটে ইহাদের অন্য নাম আছে। আমার মনে হয় ঐরাবত (Cassiopeia) স্বর্গঙ্গায় অবস্থিত। ভগীরথের গঙ্গা আনয়নের সময় ঐরাবত গঙ্গায় হাবুডুবু খাইয়াছিল। মহাভারতের উপাখ্যানে গরুড়-জননী বিনতা ও সর্প-জননী কদ্রু নদীর সেপারে উচ্চৈঃশ্রবা অশ্ব দেখিতে গিয়াছিলেন। সুরগঙ্গার পশ্চিম পারে কশ্যপ, সেখানেই তাঁহার ত্রয়োদশ পত্নীর বাস। অতএব বিনতা ও কদ্রু সুরগঙ্গার পূর্বদিকে উচ্চৈঃশ্রবা দেখিয়াছিলেন। বোধ হয়, জ্যোতিষের মঘা নক্ষত্র উচ্চৈঃশ্রবা। বালক কৃষ্ণ এক তালবনে এক গর্দভাকার অসুর বিনাশ করিয়াছিলেন। সে গর্দভও মঘা। ইহা অঘাসুরও বটে।

এই সকল উদাহরণ হইতে তিনটি তথ্য জানা যাইবে। (১) পৌরাণিকেরা আকাশে কেবল চন্দ্র সূর্য ও চন্দ্রের নক্ষত্র দেখিতেন না, আরও অনেক নক্ষত্র দেখিতেন। প্রাচীন তারা-পট নাই, আমরা চিনিতে পারি না। (২) একই নক্ষত্র আশ্রয় করিয়া ভিন্ন ভিন্ন উপাখ্যান রচিত হইয়াছিল। নক্ষত্রের নামও ভিন্ন ভিন্ন হইয়াছিল। এক মৃগ নক্ষত্র অবলম্বন করিয়া দশ-বারটি উপাখ্যান কল্পিত হইয়াছিল। (৩) যাহা সুরলোকের ব্যাপার, পৌরাণিক তাহা ভূলোকে আনিয়াছেন।

সমুদ্রমন্থনের পর অমৃত-প্রাপ্তির নিমিত্ত দেবাসুরের যুদ্ধ হইয়াছিল। কোন্ ঋতুতে যুদ্ধ হইয়াছিল? যখন সমুদ্র মথিত হইতেছিল, তখন ইন্দ্র বর্ষণ করিয়াছিলেন, অতএব যুদ্ধ বর্ষারম্ভে হইয়াছিল। সেদিন দক্ষিণায়ন-আরম্ভ, দেবাসুরের যুদ্ধের কালই এই। অন্য কাল অকাল। দ্বিতীয়তঃ সমুদ্র-মন্থনে লক্ষ্মীর উদ্ভব হইয়াছিল। এই লক্ষ্মী, কোজাগরী লক্ষ্মী, যাঁহাকে চারি দিক্-হস্তী স্নান করাইয়া থাকে, অর্থাৎ বর্ষাকাল আরম্ভ। আশ্বিন পূর্ণিমায় কোজাগরী লক্ষ্মী-পূজা হয়। এককালে আশ্বিন মাসে বর্ষা ঋতু আরম্ভ হইত। এখন বর্ষা ঋতু পিছাইয়া আসিয়াছে। কত প্রাচীনকালের স্মৃতি আমাদের পূজা-পার্বণে জড়িত হইয়া আছে তাহা এই একটি উদাহরণ হইতেই বুঝা যাইবে। তৃতীয়তঃ লক্ষ্মী বেদের ইড়া। তিনিও বর্ষারম্ভের দেবী। অপ্সরা উত্থিত হইয়াছিল। ইহারা বর্ষার সূচনা করে। বারুণী উঠিয়াছিল। ইহা মদ্য নয়; বরুণের অধিকার (বর্ষাকাল) আরম্ভ হইয়াছিল।

যুদ্ধের ঋতু পাইলাম। যুদ্ধ অবশ্য দিবসে হইতে পারে নাই, রাত্রিকালে হইয়াছিল। সন্ধ্যারাত্রে না ভোর রাত্রে? যে চন্দ্র মহেশের শিরোভূষণ, সে চন্দ্র পূর্ণচন্দ্র, না কলা-চন্দ্র? আমার বোধ হয় কলা চন্দ্র। নচেৎ কৃষ্ণচতুর্দশী শিবের তিথি হইত না। তবে ভোর রাত্রে, কৃষ্ণ চতুর্দশীতে যখন কলা-চন্দ্র দেখিতে পাই, তখন। অতএব অমৃতভাণ্ড চন্দ্র। পরদিন অমাবস্যা, চন্দ্র সূর্য রাহু একত্র হইয়াছে বিষ্ণু সুদর্শন চক্র-দ্বারা রাহুর শিরশ্ছেদ করিয়াছেন; নিশ্চয় প্রাতঃকালে সূর্যগ্রহণ হইয়াছিল। এই বর্ষারম্ভের দিন প্রাতঃকালে এক পূর্ণ সূর্যগ্রহণ বেদের কাল হইতে বিখ্যাত হইয়া আছে। পৌরাণিক তাহার রূপ দিয়াছেন।

মৎস্য-পুরাণে প্রতিমার লক্ষণ প্রদত্ত হইয়াছে। সেখানে বিষ্ণুর কূর্ম, বরাহ, বামন, মৎস্য, নরসিংহ, এই পাঁচ অবতারের প্রতিমার লক্ষণ বর্ণিত হইয়াছে। দেখা যাইতেছে, এককালে এই সব অবতারের পূজা হইত। প্রতিমা থাকিলে মন্দিরও ছিল বলিতে হইবে। এই পাঁচ অবতার বিষ্ণুর দিব্য অবতার। স্বর্গের ব্যাপারের নিমিত্ত বিষ্ণু এই সকল রূপ ধারণ করিয়াছিলেন। এই পাঁচের মধ্যে নরসিংহ-

অবতার-কল্পনায় কবিত্ব বা মহত্ত্ব কিছুই নাই। যে বরাহ সেই হিরণ্যকশিপু। আবার সেই সিংহমুখ নরাকার নরসিংহ। গণেশের গজানন, আর নরসিংহের ভীষণ মূর্ত্তি একই প্রদেশের কল্পনা মনে হয়।

বহুস্থানে, যেমন কুরুক্ষেত্রের সরোবরে, যমুনায়, পুরীর এক সরোবরে কচ্ছপকে বিষ্ণুর অবতার ভাবিয়া ভক্তেরা ভোজ্য দান করে। দক্ষিণ রাঢ়ে ধর্ম্মরাজ নামে গ্রামদেবতা বহু প্রসিদ্ধ। নাগবেষ্টিত কূর্ম্ম-মূর্ত্তি ধর্ম্মের প্রতিমা। নাগ, অনন্ত বাসুকি, ইহার ফণায় নারায়ণ অনন্ত শয়নে আছেন। এই নাগ সমুদ্র-মন্থনে মন্থন-রজ্জু হইয়াছিল। কূর্ম্ম মাথানীর (মন্থন যষ্টির) আধার। সমুদ্র মন্থনের এই দুই প্রাণীতে নারায়ণ স্মরণ হইতেছে। "শূন্য পুরাণে"ও ধর্ম্মের নাম নারায়ণ। যখন চারিদিক একার্ণব, তখন নারায়ণ কূর্ম্মের পৃষ্ঠে ধ্যানস্থ ছিলেন। দক্ষ, যে ধর্ম্মকে দশ কন্যা দান করিয়াছিলেন, সে ধর্ম্মকে মৎস্য অবতারে পাইব। তিনি নারায়ণের এক রূপ। তিনি ধবল বরণ, কারণ দেহ শ্বেতবর্ণ তারাময়।*

* এই প্রবন্ধের চিত্র চারিখানি এক ইস্কুলের ছাত্র শ্রীসুকান্ত বসু লিখিয়া দিয়াছে।

বিক্রমপুরে প্রাপ্ত কয়েকটি বৌদ্ধ মূর্ত্তির পরিচয়

শ্রীযোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত

বিক্রমপুরে প্রাপ্ত বহু শ্রীমূর্ত্তির পরিচয় 'প্রবাসী', 'ভারতবর্ষ' ও অন্যান্য মাসিক পত্রে দিয়াছি, এখানেও কয়েকটি মূর্ত্তির কথা বলিতেছি। 'বিক্রমপুরের ইতিহাস' প্রথম খণ্ডে বিষ্ণু, শিব ও বৌদ্ধ মূর্ত্তির চিত্র ও পরিচয় দিয়াছি—তাহা অনেকেই দেখিয়া থাকিবেন।

রত্নসম্ভব—ধ্যানী বুদ্ধ

অনেক দিন পূর্ব্বে—বেজগাঁ গ্রামের নিকটবর্ত্তী একটি পুরাতন পুষ্করিণীর পঙ্কোদ্ধার কালে 'রত্নসম্ভব' বুদ্ধ মূর্ত্তিটি পাওয়া গিয়াছিল। এই মূর্ত্তিটির মুখের দিকটা ক্ষতবিক্ষত। হয় কোদালের আঘাতে ঐরূপ হইয়াছে কিংবা অন্য কারণেও তাহা হওয়া অসম্ভব নহে। এক সময়ে বিক্রমপুরের গ্রামে গ্রামে, মাঠে, পুকুর পাড়ে, বনেজঙ্গলে যে সমুদয় প্রস্তর মূর্ত্তি অযত্নে পড়িয়া থাকিত তাহা 'নাককাটা বাসুদেব' এই সাধারণ নামে আখ্যাত হইত।

ধ্যানী বুদ্ধ মূর্ত্তি—বৈরোচন, অক্ষোভ্য, রত্নসম্ভব, অমিতাভ এবং অমোঘসিদ্ধি এই পঞ্চ নামে পরিচিত। রত্নসম্ভব মূর্ত্তিটি কৃষ্ণবর্ণ কষ্টি প্রস্তরে নির্ম্মিত। বুদ্ধগয়ার মন্দিরানুকৃতি খোদিত মন্দির মধ্যে রত্নসম্ভব ধ্যানী বুদ্ধ বিকশিত শতদলোপরি পদ্মাসনে উপবিষ্ট আছেন। দক্ষিণ হস্ত দক্ষিণ জানুর উপর বরদা মুদ্রাকারে স্থিত। বাম হস্তখানি দক্ষিণ পদতলের উপর মুক্ত ভাবে ন্যস্ত। আসন শতদলের নিম্ন ভাগে তিন জন উপাসক ও উপাসিকা। তন্নিম্নে দক্ষিণ ও বাম পার্শ্বে দুইটি নারী মূর্ত্তি—উভয়েই মাল্যধারিণী। তাহার উপরে দক্ষিণ দিকে হস্তী এবং বাম দিকে অশ্ব মূর্ত্তি খোদিত। বৌদ্ধ পুরাণানুসারে অশ্ব, তরবারিধাত্রী, কুবের, কুমারী, রত্ন, চক্র ও হস্তী হইতেছে সপ্তরত্ন। এই মূর্ত্তির বেদী দিয়ে সপ্তরত্নের অন্যতম অশ্ব ও হস্তী খোদিত আছে। মূল মূর্ত্তির উভয় পার্শ্বে কাল্পনিক জীব—অর্দ্ধ সিংহ ও অর্দ্ধ অশ্বের আকারে শোভমান।

রত্নসম্ভবের দৃষ্টি আনত। কেশ কুঞ্চিত। কেশশীর্ষ চূড়াকৃতি, তদূর্দ্ধে বজ্রচিহ্ন সুস্পষ্ট ভাবে খোদিত। গায়ে উপবীত নাই, বস্ত্র কটিদেশ হইতে আগুল্ফ পর্য্যন্ত বিস্তৃত। বাম স্কন্ধোপরি উত্তরীয় চিহ্ন। এই মূর্ত্তির সন্নিবেশ মন্দির চিহ্ন, সুগোল বাহু, প্রশস্ত বক্ষদেশ, সৌম্যশান্ত নত দৃষ্টিভঙ্গিমা সহজেই দৃষ্টি আকর্ষণ করে। রত্নসম্ভব ধ্যানী বুদ্ধ মূর্ত্তি প্রভৃতির আবির্ভাব বৌদ্ধ পুরাণে অধিক দিনের নহে। রত্নসম্ভব শব্দের অর্থ রত্ন হইতে আবির্ভূত—"born of jewels." এই পঞ্চ ধ্যানী বুদ্ধ মূর্ত্তির শক্তি হইতেছেন যথাক্রমে—বৈরোচনের—বজ্রধাত্বিশ্বরী, অক্ষোভ্যের—লোচনা, রত্নসম্ভবের—মামকি, অমিতাভের—পাণ্ডরা, অমোঘ সিদ্ধির—তারা। মূর্ত্তিটির আকার—সাড়ে তিন ফুট উচ্চে ও ২ ফুট প্রস্থে হইবে।

লোকনাথ

লেখকের বাসগ্রাম বিক্রমপুর মূলচরের একটি প্রাচীন পুষ্করিণীর পঙ্কোদ্ধার কালে তিনটি জিনিষ পাওয়া গিয়াছিল—(১) সূর্য্যমূর্ত্তি, (২) লোকনাথ মূর্ত্তি, (৩) একটি প্রকাণ্ড লৌহশৃঙ্খল ও একটি নৌকার ভগ্নাবশেষ ও কতকগুলি ভগ্ন সোপানশ্রেণীর চিহ্ন। বাল্যকালে পুষ্করিণীটির পাড়ে দুইটি বেলগাছের নীচে মূর্ত্তি দুইটি অবস্থিত ছিল। শিকলটি অযত্নে পড়িয়া থাকিতে দেখিয়াছি। সূর্য্য মূর্ত্তিটি এখনও মূলচর গ্রামেই শ্রীযুত হেমচন্দ্র সেনের বাড়ীতে এক শ্মশানোপরি রহিয়াছে। এই লোকনাথ মূর্ত্তিটি—পূর্ব্বতন অধিবাসীদের গ্রাম পরিত্যাগ করার সঙ্গে সঙ্গে পরিত্যক্ত অবস্থায় অজত্র ছিল—পরে উহা রাজসাহী বারেন্দ্র মিউজিয়মে স্থানান্তরিত হইয়াছে।

অবলোকিতেশ্বর, লোকনাথ, লোকেশ্বর নাম মহাযান বৌদ্ধগণের একান্ত প্রিয়। আমাদের এই মূর্ত্তিটির মুখাবয়ব নাসিকা ও মুখের দিকটা ভগ্ন ও ক্ষয়িত। লোকনাথদেব অর্দ্ধপর্য্যঙ্কাসনে

উপবিষ্ট। দক্ষিণ হস্তখানি দক্ষিণ জানুর উপর ন্যস্ত এবং জপ-মালা ধৃত। বাম হস্ত দ্বারা একটি সনাল বিকশিত শতদল ধৃত। কর্ণে কারুকার্য্য খচিত কুণ্ডল। কণ্ঠে রত্নখচিত তিন লহর মালা। বাহুতে বাজু। বর্ত্তমান আর্মলেটের অনুরূপ। মুকুটের গঠননৈপুণ্যও মনোরম। শীর্ষদেশে পঞ্চ ধ্যানী বুদ্ধ মূর্ত্তি। বক্ষের উপরে সুন্দর উত্তরীয়। ত্রিনেত্র, শ্বেতাভ, অতি সুন্দর মূর্ত্তি। লোকনাথ মূর্ত্তি সিংহনাদ, খশরপণ প্রভৃতি নানা নামে অভিহিত হইয়া থাকেন। এই মূর্ত্তির ধ্যান ও বর্ণনা নানা গ্রন্থে বিস্তারিত ভাবে আলোচিত হইয়াছে এবং আমিও এ সম্বন্ধে একাধিক প্রবন্ধে বিবৃত করিয়াছি। আমাদের এই মূর্ত্তিটি খশরপণ লোকনাথ নামে আখ্যাত করা যায়। লোকনাথের বাম দিকে ভ্রুকুটি। ভ্রুকুটি মূর্ত্তি চতুর্ভুজা। ত্রিনেত্রা। দক্ষিণ দিকের হস্তে বন্দন ভঙ্গিমা, তন্নিম্নের হস্ত দ্বারা জপমালা, বাম দিকের নিম্ন হস্ত দ্বারা কমণ্ডলু ধারণ করিয়া আছেন এবং বামোর্দ্ধ হস্ত ঊর্দ্ধ দিকে উত্থিত। দক্ষিণে হয়গ্রীবের মূর্ত্তি। দক্ষিণ হস্তে অভয় মুদ্রা, বাম হস্ত নিম্নাভিমুখে লম্বিত। এতদ্ব্যতীত উভয় পার্শ্বে উপাসকমণ্ডলী, অতি সুন্দর ভাবে খোদিত রহিয়াছে। লোক-নাথ দেবের পরিধানে ব্যাঘ্রচর্ম্ম। এই মূর্ত্তির গঠন ও শিল্প-নৈপুণ্য প্রশংসনীয়। বিক্রমপুরের নানা গ্রাম হইতে বিবিধ লোকনাথ মূর্ত্তি আবিষ্কৃত হইয়াছে। ঢাকা যাদুঘরে সংরক্ষিত খশরপণ অবলোকিতেশ্বর মূর্ত্তিটি অনেকের মতে বাংলা দেশের ভাস্কর্য্য শিল্পের অত্যুৎকৃষ্ট নিদর্শন। তন্মধ্যে মহাকালী গ্রামে প্রাপ্ত লোকনাথ এবং সোনারং গ্রামে প্রাপ্ত দ্বাদশভুজ লোকনাথ মূর্ত্তিটি সবিশেষ উল্লেখযোগ্য। দ্বাদশভুজ লোকনাথ মূর্ত্তিটি লেখক কর্ত্তৃক সংগৃহীত হইয়া প্রায় চল্লিশ বৎসর পূর্ব্বে বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদ চিত্রশালায় উপহৃত হইয়াছে।

পদ্মপাণি লোকনাথ

বিক্রমপুর সোনারং গ্রামে প্রাপ্ত পদ্মপাণি লোকনাথ মূর্ত্তিটি তক্ষণ শিল্পের একটি শ্রেষ্ঠ নিদর্শন। মূর্ত্তিটি কৃষ্ণবর্ণ কষ্টি প্রস্তরে নির্ম্মিত। বিকশিত শতদলোপরি দণ্ডায়মান। দক্ষিণ হস্ত অভয় মুদ্রাকারে একটি শতদলোপরি ন্যস্ত। বাম হস্ত দ্বারা মৃণালসহ বিকশিত পদ্ম ধৃত। ঊর্দ্ধে পঞ্চ ধ্যানী বুদ্ধ। নিম্নে উপাসকমণ্ডলী যুগ্ম হস্তে ও মাল্য হস্তে উপাসনারত। পদ্ম-পাণির কিরীট ও কর্ণভূষার বৈচিত্র্য এবং কারুকার্য্য সহজেই দৃষ্টি আকর্ষণ করে। পদ্মপাণি অবলোকিতেশ্বরের উভয় পার্শ্বে দুইটি নারী মূর্ত্তি। উভয়েই দণ্ডায়মানা রূপে খোদিত। দক্ষিণ দিকের মূর্ত্তির দক্ষিণ হস্তে বরদ মুদ্রা। বাম হস্ত দ্বারা মৃণালসহ ধৃত পদ্মকোরক, বাম দিকের নারী মূর্ত্তির দক্ষিণ হস্ত বন্দন-ভঙ্গিমায় উন্নত। বাম হস্ত বক্ষনিম্নে রক্ষিত। পদ্মপাণি লোকেশ্বর ত্রিনেত্র। কণ্ঠে দোদুল্যমান উপবীত। হস্ত প্রকোষ্ঠে বলয়, বাঁ-হাতে বাজু, কণ্ঠে অতি সুন্দর কণ্ঠহার।

পঞ্চ ধ্যানীবুদ্ধের শক্তির কথা পূর্ব্বে বলিয়াছি। এখানে পঞ্চ ধ্যানী বোধিসত্ত্বের নাম করিতেছি :—তাঁহারা যথাক্রমে সামন্তভদ্র, বজ্রপাণি, রত্নপাণি, অবলোকিতেশ্বর ও বিশ্বপাণি।

নেপালে এই সকল বোধিসত্ত্ব মূর্ত্তির প্রাধান্য অত্যন্ত বেশী। উত্তর-ভারতের নানা স্থান হইতে অনেক লোকনাথ মূর্ত্তি আবিষ্কৃত হইয়াছে। বিক্রমপুরেও কয়েকটি লোকনাথ মূর্ত্তি পাওয়া গিয়াছে।

অবলোকিতেশ্বর বা লোকনাথ মূর্ত্তির সংখ্যা ১০৮টির কম নহে।

মারীচি

এখানে প্রকাশিত মারীচি মূর্ত্তিটির বিক্রমপুরে প্রাপ্ত বৌদ্ধ মূর্ত্তির অন্যতম শ্রেষ্ঠ ভাস্কর্য্য নিদর্শন। তিব্বতের লামারা—মারীচি দেবীকে ঊষার প্রতীক রূপে গ্রহণ করেন। হিন্দু সূর্য্যমূর্ত্তির সহিত বৌদ্ধদের এই মারীচি মূর্ত্তির তুলনা করা যাইতে পারে। সূর্য্যমূর্ত্তিতে যেমন সপ্তাশ্ব খোদিত দেখা যায়, তাঁহার যেমন রথ ও পদবিহীন অরুণ সারথি আছেন, তেমনি মারীচি দেবীর বাহন হইতেছে সপ্ত শূকর, তাঁহার এক সারথিও আছেন। তিনিও পদবিহীন। রাহু নামে আখ্যাত।

অনেকে বলেন বজ্রবারাহী ও মারীচি মূর্ত্তির সঙ্গে কোন পার্থক্য নাই। এ অনুমান সত্য নহে—মারীচি দেবী বৈরো-চনের শক্তি মূর্ত্তি। মারীচি দেবীর মস্তির মধ্যে অবস্থিত; তন্নিম্নে পঞ্চ ধ্যানীবুদ্ধ মূর্ত্তি আছেন। মারীচির তিনটি মুখ। তিনি ত্রিনেত্রা ও অষ্টভুজা। দেবীর দক্ষিণ দিকের মুখখানি রক্তাভ, বাম দিকের মুখখানি শূকরাকৃতি ও নীলবর্ণের। দক্ষিণ দিকের চতুর্হস্তে যথাক্রমে—বজ্র, অঙ্কুশ, তীর ও সূচীমুখ অস্ত্র। বাম দিকে অশোকপল্লব পত্র, ধনু, পাশ এবং এক হস্তে তর্জ্জনী মুদ্রা। মারীচি দেবী প্রত্যালীঢ়া পদা এবং বিকশিত শতদলোপরি দণ্ডায়মানা। দেবীর চারিদিকে চারিটি দেবীমূর্ত্তি—পূর্ব্ব দিকে বার্ত্তালি, লোহিতবর্ণা এবং শূকরমুখী। চতুর্ভুজা, চতুর্হস্তে যথাক্রমে—অঙ্কুশ, অশোকপল্লব, পাশ এবং সূচীমুখো অস্ত্র। দক্ষিণে বদালি। পীতাভ, চতুর্ভুজা বর্ত্তালির অনুরূপ অস্ত্রধৃতা। পশ্চিম দিকে—বরালি, শ্বেতাঙ্গিনী তাঁহার উত্তরে রহিয়াছেন—বরাহমুখী। বরাহমুখী রক্তবর্ণা, চতুর্ভুজে যথাক্রমে বজ্র, তীর, অশোকপল্লব এবং ধনু। মারীচি মূর্ত্তি অশোককান্তা, আর্য্য মারীচি, উষ্ণীষবিজয়া মারীচি প্রভৃতি বিভিন্ন শ্রেণীর মারীচি আছেন।

বিক্রমপুরের নানা গ্রাম হইতে মারীচি মূর্ত্তি আবিষ্কৃত হইয়াছে। তন্মধ্যে দুয়ালী, পণ্ডিতসার, আটপাড়া প্রভৃতি গ্রামের মূর্ত্তি কয়টি উল্লেখযোগ্য। এখানে যে মারীচি মূর্ত্তির চিত্র প্রকাশিত হইল, এই মূর্ত্তিটি শ্রীনগর থানার অন্তর্গত আট-পাড়া গ্রামে পাওয়া গিয়াছিল এবং অনেক দিন পর্য্যন্ত কুকুটিয়া গ্রাম-নিবাসী মহেশচন্দ্র চৌধুরী মহাশয়ের বাড়ীতে ছিল—বর্ত্ত-মানে এই মূর্ত্তিটি রাজশাহী বারেন্দ্র মিউজিয়মে আছে।

এখানে যে মূর্ত্তি কয়টির চিত্র প্রকাশিত হইল, সে মূর্ত্তি কয়টি রাজসাহী বারেন্দ্র চিত্রশালায় রহিয়াছে।

ধন্যবাদ

শ্রীরামপদ মুখোপাধ্যায়

ছ'টা আটচল্লিশে ট্রেন কলকাতায় পৌঁছল। কুলির মাথায় মোট চাপিয়ে স্ত্রী আর আট বছরের ছোট ছেলেটার হাত ধরে রতন এসে ট্রাম-লাইনের ধারে দাঁড়াল। যেতে হবে তাকে শিবপুর। শিয়ালদহ থেকে শিবপুরের গাড়ি ভাড়া আট টাকার কম নয়। যুদ্ধের মরসুম নিম্নমধ্যবিত্ত গৃহস্থের মান-সম্ভ্রম-শালীনতার বোধটুকু নিঃশেষে মুছে নিয়েছে। ট্রাম আর বাস'এ চড়ে অন্তঃপুরিকারা শহরের এক প্রান্ত থেকে আর এক প্রান্ত পর্য্যন্ত খুশীমত বেড়ালেও কেউ নাকমুখ সিঁটকে এই অনাচারের বিরুদ্ধে আপত্তি তোলেন না। সে এক প্রকার ভালই হয়েছে। অর্থ যাদের বেড়েছে—তাদের বেড়েছে, নিম্নমধ্যবিত্ত শ্রেণীর তাতে কি! তীরে দাঁড়িয়ে ঢেউ গোনা বা ঢেউ দেখে উত্তেজিত হওয়া ছাড়া এ শ্রেণীর লোকেরা আর তো কিছু করে নি।

কুলি ভাড়াও লাগত না। নেহাৎ দেশে বেড়াতে গিয়ে দেশের বেগুনটা কলাটার ওপর মমতা বশতঃ বড় ও মাঝারি গোছের গোটা তিনেক মোট হয়েছে। কুলি ভাড়া বাবদ হিসেব করে দেখলে লোকসান বই লাভ এতে নেই। এখন ট্রামের কণ্ডাক্টার হৃদয়হীন হলেই বাসের মাশুল গুনতে হবে —তা য'খানা টিকিটের দামই সে ধরে নিক না কেন। আটটা টাকা দিয়ে পুরো একখানা ঘোড়ার গাড়ি ভাড়া করা সম্ভব নয়।

ট্রাম মনে হ'ল অনিয়মিত। বহু যাত্রী লাইনের দু'পাশে ভিড় জমিয়েছে। দূর থেকে দেখা যায় ট্রাম আসছে সারি সারি—কিন্তু সেগুলি বৌবাজারের বাঁক পেরিয়ে এদিকে আর এগুচ্ছে না; সুরুৎ করে ঢুকে পড়ছে আস্তানায়। যাও বা ছুটকে দু' একখানা এদিকে এল—তাদের নিশানা গালিফ ষ্ট্রীট। যাত্রী অবশ্য কিছু কমলো, তবে হাওড়ার জন্য হা-পিত্যেশ করে যারা দাঁড়িয়ে রইল—তাদের সংখ্যাই বেশি।

একজন বললে, এদিকের ট্রাম বন্ধ হয়ে গেছে।

রতন পাশের একজনকে জিজ্ঞাসা করলে, বন্ধ হ'ল কেন?

একজন হিন্দুস্থানী উত্তর দিলে, হাওড়ার পুল টুটে গেল বাবুজি।

কথাটা বিশ্বাস হ'ল না। এত বছর ধরে কত কাণ্ড আর কোটি কোটি টাকা খরচ করে পৃথিবীর অন্যতম উল্লেখযোগ্য জিনিসটির এই আকস্মিক পরিণতি—অবিশ্বাস হবারই কথা। যাই হোক, ট্রাম আসছে না। অনেকক্ষণ অপেক্ষা করে সবাই অধৈর্য্য হয়ে উঠেছে—মুটেটাও ছটফট করছে। রতন বাসের চেষ্টায় মুটে ও স্ত্রীপুত্র সমেত রাস্তার অন্য ধারে এসে দাঁড়াল।

সাধ্য কি বাসে ওঠে। পাঁচ-ছ'খানা বাস মানুষে গাদাগাদি ঠাসাঠাসি হয়ে গেল—পলক ফেলতে-না-ফেলতে। সচল ও অচল বোঝা নিয়ে এ ভিড়ে বাসে ওঠা দুঃসাধ্য। ট্রামের আশায় আবার সে এগিয়ে এল পথের এ ধারে।

একবার মনে হ'ল সত্যিই যদি ট্রাম বন্ধ হয়ে গিয়ে থাকে! কোথায় আশ্রয় নেবে সে স্ত্রীপুত্র নিয়ে! আত্মীয়-বন্ধু তো দূরের কথা—দু' দণ্ডের আলাপিত কোনও লোককে তো মনে পড়ছে না—যারা শিয়ালদহের আশেপাশে কোথাও আছে। আর বজ্জাত হ'ল এই মোট। এগুলোও যদি না থাকত!

কটমট করে একবার বউয়ের পানে চেয়ে স্বগতোক্তি করলে, এখন কি যে করি এই মোটঘাট নিয়ে!

স্ত্রী সুলতা কতখানি দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হয়েছে—তা অনুমান করা দুঃসাধ্য। চারদিকে ভিড়—ব্যস্ততা—ঠেলাঠেলি—হুড়োহুড়ি—আলো—রিকশ—মোটর—ঘোড়ার গাড়ির মিশ্র শব্দ সে আধঘোমটার ভিতর দিয়ে মৌনবিস্ময়ে হয় তো উপভোগ করছিল। স্বামী যখন সঙ্গে রয়েছেন—তখন বাড়ি পৌঁছবার দায়িত্ব তাঁরই। আর এত বড় কলকাতা শহরে একটা না-একটা উপায় হবেই। এত লোক সবাই তো দাঁড়িয়ে হায় হায় করবে না—কিম্বা বিহ্বল ভাবে এধারে ওধারে ছুটোছুটি করে বুকের ধুকপুকুনি বাড়াবে না। উপায় একটা হবেই।

রতনের স্বগত খেদোক্তিতে তার মনে হ'ল ওটা—তারই উদ্দেশে প্রয়োগ করা হ'ল। সুলতা দায়দোষ ঘাড়ে নিয়ে চুপ করে থাকবার মেয়ে নয়। সংসারের অভাব-অভিযোগ সয়ে সয়ে ওর এক কালের কোমল চিত্ত আজ রীতিমত কঠিনই হয়েছে। উত্তর-প্রত্যুত্তরে ওর পটুতা সব সময়েই প্রকাশিত হয়।

বললে, আমায় বলছো?

রতন বললে, তোমাকে বলে আর কি হবে। এই মোট-গুলো যদি না থাকতো—

সুলতা বললে, আমি নিতে বলেছিলাম মোট?

যেই বলুক—মোট হয়েছে তো? রতন উত্তর দিলে।

তা তোমাদের কলকাতায় যে নিত্য নতুন হাঙ্গামা কে জানে! মানুষ কি সুখে থাকে এখানে!

উত্তর দিলে বাদানুবাদ উত্তরোত্তর চড়বে। পথের মাঝে এমন বিপন্ন অবস্থায় দাঁড়িয়ে সেটা চালিয়ে যাওয়া পৌরুষজনক নয় ভেবে রতন চুপ করলে। মোট-সৃষ্টির দোষটা অবশ্য তার একার নয়—দু'জনের; কিন্তু দায়টা এসে পড়েছে তারই ঘাড়ে। দায়িত্ব অস্বীকার করবার সাধ্য তার নেই।

আরও পাঁচ মিনিট পরে দশখানা বাস ছেড়ে যাওয়ার পর —মোড় ঘুরে ক'খানা ট্রাম এই দিকে আসছে দেখা গেল। ট্রামের মাথায় অগ্নি অক্ষরে হাওড়া ষ্টেশনের নাম পড়ে রতন পুলকিত হয়ে উঠল।

ট্রাম কিন্তু আকণ্ঠ বোঝাই। রতনকে উপহাস করে এগিয়ে গেল। তার পর এল আর একখানা। সেখানাও লোকে ঠাসাঠাসি, চোখের সামনে দিয়ে চলে গেল। তার পরের খানা ততটা ছাপাছাপি না হলেও—পথের ভ . . ট্রামের সান্নিধ্যে এরা পৌঁছতেই পারলে না।

কিন্তু আশা জেগেছে। অগ্নি অক্ষরে হাওড়ার নিশানা নিয়ে ট্রামের পর ট্রাম আসছেই। একখানা-না-একখানাতে সে আশ্রয় পাবেই।

কুলিটার সাহায্যে পেলেও আশ্রয়। সুলতার পা ছড়ে গেল, ছেলেটা ধাক্কা খেয়ে কেঁদে উঠল চীৎকার ক'রে, রতনও মোট সামলাতে গিয়ে কিছু আঘাত পেলে। কিন্তু এ সব ক্ষুদ্র ক্ষতিতে ভ্রূক্ষেপ করলে চলবে না এখন। হাওড়ায় না পৌঁছানো পর্য্যন্ত এই আঘাত-বেদনার কথা বলাবলি করে পরস্পরকে অভিভূত করে দেবার প্রবৃত্তিও ঠিক আসছে না।

এত ভিড়ের মধ্যেও সুলতা খোকাকে নিয়ে বসতে পেলে লেডিজ সীটে, রতন মোট আগলে দাঁড়িয়ে রইল। কণ্ডাক্টার এলো—টিকেট দিলে। আশা হ'ল—হাওড়ায় পৌঁছবে তারা কোন-না-কোন সময়ে। তা হোক।

প্রকৃত ব্যাপারটা শোনা গেল—ট্রামের মধ্যে। সব তথ্য খুঁটিয়ে অবশ্য নয়। তবে মোটামুটি যা শোনা গেল তা এই:

আজ এগারোই ফেব্রুয়ারি। আই-এন-এ'র ক্যাপ্টেন রসিদের সাত বছর সশ্রম কারাদণ্ডের হুকুম হওয়াতেই হিন্দু-মুসলমান মিলে অন্যায় বিচারের প্রতিবাদ করে এক মিছিল বার করেছিল। পুলিস মিছিলের ওপর লাঠি কি গুলী চালিয়েছে। ফলে এই বিক্ষোভ। প্রথম নাকি ডালহৌসি স্কোয়ার থেকে এই হাঙ্গামা সুরু হয়—পরে সারা কলকাতায় পড়েছে ছড়িয়ে। হাঙ্গামার বেগটা ডালহৌসি স্কোয়ার থেকে লালবাজার পুলিস আপিসের পাশ দিয়ে সোজা চলে গেছে বৌবাজার পর্য্যন্ত। আর একটা বেগ শাখাপথে চিৎপুর রোড ধরে সিঁদুরেপটির মোড় পর্য্যন্ত এসে হ্যারিসন রোডের দিকে পাক খেয়ে সেন্ট্রাল এভিনিউ পেরিয়ে কলেজ ষ্ট্রীট পর্য্যন্ত এসেছে। কলকাতার উত্তর-দক্ষিণ বা অন্যান্য অংশেও বেগ কোথাও প্রবল, কোথাও বা মধ্যম আকারে প্রকাশিত হয়েছে। হাওড়া যাবার রাস্তায় যে বেগটুকু চোখে পড়ছে অর্থাৎ যে বাধা প্রত্যক্ষ হয়ে উঠল—ট্রামের মধ্যে তাই নিয়েই চলেছে আলোচনা।

রতন মনে মনে ডাকলে, হে ভগবান, হাওড়া পর্য্যন্ত ভালয় ভালয় পৌঁছে দাও। হে ভগবান—

বিপদে বিহ্বল হয়ে সে অবশ্য পূজা মানত করে বসে নি। কারণ ট্রাম যখন চালু হয়েছে তখন হাওড়া পর্য্যন্ত সে যাবেই। তার আশু গতি সম্বন্ধে দেবতাদের অনুনয় করা চলে—কিন্তু আট টাকা গাড়ি ভাড়ায় ব্যবধানকে কমিয়ে আনতে পূজা মানত করে যে-হিসাবের পরিচয় সে দেবে কেন।

কলেজ ষ্ট্রীটের মোড়ে এসে অবশ্য বুঝলে বিপদের গুরুত্ব। সংসারের হিসাব এই জনসমুদ্রে পড়ে বিপর্য্যস্ত হয়ে গেল। সারি সারি ট্রাম আছে দাঁড়িয়ে, একটাও মোড় পেরোয় নি। বাসগুলি এই ভিড় দেখে যেন ভয় পেয়ে যাত্রীদের বমি করে শূন্য গর্ভে ফিরে চলেছে শিয়ালদ'র দিকে। যাত্রীরা ভয়ে বিস্ময়ে হতাশ্বাসে বিহ্বল হয়ে পড়েছে। জনতা থেকে মুহূর্মুহু উঠছে ইনক্লাব জিন্দাবাদ ধ্বনি। সবাই বলতে লাগল—ট্রাম আর যাবে না। কিন্তু জনতা যেতে দিচ্ছে না কোন গাড়ি।

রতন ভাবলে—যত বিক্ষোভ ট্রাম বাস বন্ধ করে কি প্রকাশ করা বিধি! যারা যাচ্ছে দূর হতে দূরান্তরে—সঙ্গে রয়েছে স্ত্রী-পুত্র-পরিবার, রয়েছে মোটঘাট—তাদের অসহায় অবস্থাটা কেউ ভেবে দেখবে না? স্বৈর শাসনের বিরুদ্ধে যত খুশী বিক্ষুব্ধ হও না কেন এ দিকটাও ভুলে যাওয়া অনুচিত। হে ভগবান—সুমতি দাও ওদের। হে ভগবান—

ভাবনার মধ্যেই ট্রাম গা নাড়া দিলে। তবে বুঝি সুমতি দিলেন ঈশ্বর! প্রবল বিশ্বাসে দু'হাত জোড় করে রতন তাঁকে সকৃতজ্ঞ নতি জানালে।

অগ্রদের অনুসরণ করে এ ট্রামও মোড় পেরুলো। অকস্মাৎ জলকল্লোলে যেন বৈশাখী ঝড় এসে লাগল। এবং সেই প্রমত্ত ঢেউ গ্রাস করে ফেললে ট্রামখানাকে।

নামুন—নামুন মশাই—নামুন। হাতে লাঠি মুখে হুঙ্কার। উত্তেজিত জনতা স্বৈরাচারের সমস্ত দায়িত্ব বুঝি নিরীহ যাত্রীদের মাথায় চাপিয়ে দিয়ে সান্ত্বনা লাভ করবে।

মহিলা যাত্রী কেউ ছিলেন না। হুড়হুড় করে পুরুষযাত্রীরা নেমে গেলেন।

রতন আতঙ্কে হাত জোর করে অনুনয় করলে, দেখছেন সঙ্গে মেয়েছেলে—

একজন বললে, ওসব শুনবো না মশাই—হিন্দু মুসলমান মেয়ে পুরুষ সব এক হয়ে গিয়েছে। লাঠি না খেতে চান তো নেমে পড়ুন।

রতন তথাপি হাত জোর করে কাঁদ কাঁদ মুখে অনুনয় করতে লাগল।

এবার একজন খদ্দরধারী এগিয়ে এসে বললেন, আচ্ছা আপনি থাকুন। এখানে আমরা ছাড়ছি, কিন্তু চিৎপুরের মোড় পেরুতে পারবেন কি!

রতন কি বলতে যাচ্ছিল—ড্রাইভার পূর্ণবেগে গাড়ি চালিয়ে দিলে। কণ্ডাক্টার অভয় দিয়ে বললে স্থির হয়ে বসুন—কোন ভয় নেই।

রত্নসম্ভব—ধ্যানী বুদ্ধ

লোকনাথ

পদ্মপাণি লোকনাথ

মারীচি
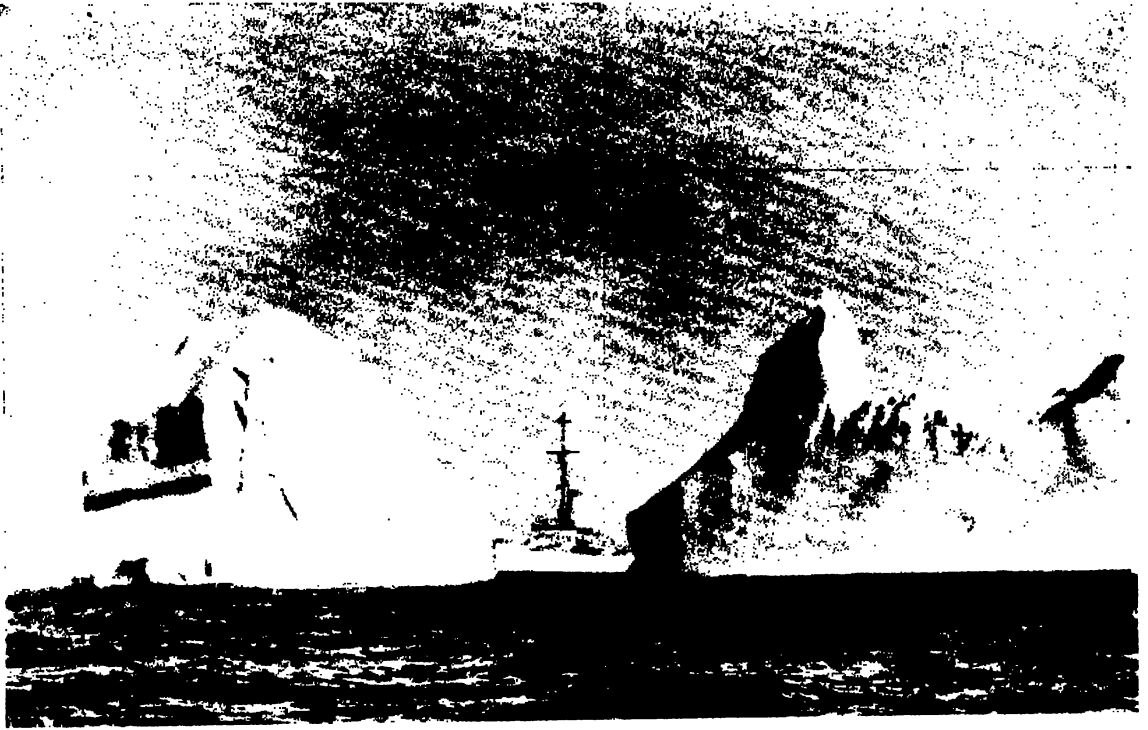
উত্তর-আটলান্টিকের দুইটি তুষার-পর্ব্বতের মধ্যবর্ত্তী তুষার-স্তূপ বিদীর্ণ করিয়া তাহো নামক
উপকূলরক্ষী 'কাটার' অগ্রসর হইতেছে

দড়ির দোলা অবলম্বন করিয়া একটি উপকূলরক্ষী জাহাজ হইতে জনৈক চিকিৎসক অন্য একটি মার্চেন্ট জাহাজে

ঈষৎ আশ্বস্ত হলেও রতন বসতে পারলে না। কণ্ডাক্টার এ দিকের কাঠের খড়খড়িগুলো উঠিয়ে দিলে। ক্ষিপ্ত জনতা ঢিল ছুঁড়লে আহত হওয়া আশ্চর্য্যের নয়।

ট্রাম চলছে দেখে পায়ে-হাঁটা যাত্রীরা ট্রাম ষ্টপেজের কাছে দাঁড়িয়ে গাড়ি থামাবার ইঙ্গিত করলে। ড্রাইভার সে ইঙ্গিত গ্রাহ্য করলে না। এ তো স্বাভাবিক অবস্থা নয় যে—স্বাভাবিক নিয়মকানুন মেনে চলতে হবে।

পূর্ণবেগে চলছে গাড়ি—থর থর করে কাঁপছে খড়খড়িগুলো—সেই তালে লাফাচ্ছে রতনের হৃৎপিণ্ড। কখন পৌছবে হাওড়া—কখন পার হবে বিপদের গণ্ডী।

বড় জংশন সেণ্ট্রাল এভিনিউ। এখানে আইন অমান্য করে গাড়িকে পূর্ণবেগে চালানোর বিপদ আছে। শান্তি-রক্ষকরা সঙীন উঁচিয়ে পাহারা দিচ্ছে পথ। সুতরাং গাড়ি থামালো। থামবামাত্রই প্রতীক্ষমান যাত্রীদলে পরিপূর্ণ হয়ে উঠলো গাড়ী।

সাহস ফিরে এল—ভয়ও হ'ল রতনের জনতা যদি গাড়ির ভিড় দেখে পুনরায় ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠে।

যদি আক্রমণ করে গাড়ি যেমন কলেজ ষ্ট্রীটের মোড়ে করেছিল। এই সিন্ধু প্রমাণ পুরুষ মানুষের ভিড়ে বিন্দুপ্রমাণ মহিলাকে আবিষ্কার করে কোন উত্তেজিত মানুষের মনেই বা সহজাত সুবিবেচনার উদয় হবে। হায় হায় ওরা কেন গাড়িতে উঠে বিপদ বৃদ্ধি করলে।

ফেব্রুয়ারির প্রথম। সন্ধ্যার মুখে শীতের প্রকোপ যথেষ্টই ছিল। তবু রতনের কপাল দিয়ে টস টস্ করে ঘাম ঝরতে লাগল। মনে মনে আরও জোরে ডাকতে লাগল ভগবানকে। গলাটা অসম্ভব রকম শুকিয়ে গেছে—বাইরে স্বর তো ফুটছেই না—মনের মধ্যেও প্রার্থনা ঠিকমত জমছে না।

আবার গাড়ি সচল হ'ল। দুই রাস্তার সংযোগস্থল ধীরে ধীরে অতিক্রম করে গতি হ'ল তার দ্রুত। ভয়কে তলায় রেখে উত্তেজনা একটু একটু করে বেড়ে উঠছে। হঠাৎ দূরশ্রুত সমুদ্রগর্জ্জন ভেসে এল কানে। কটাকট্ শব্দ। প্রচণ্ড একটা ঝাঁকানি দিয়ে গাড়িটা নিশ্চল হয়ে গেল। সঙ্গে সঙ্গে আলো-গুলো গেল নিবে। হুড় হুড় করে যাত্রীর স্রোত গাড়ী থেকে বেরিয়ে পথের ওপর আছড়ে পড়ল। সঙ্গে সঙ্গে বাইরের প্রবল গর্জ্জনটা গাড়ির ওপর ভেঙে পড়ল। রতন সুলতা ও খোকার হাত ধরে মোটগুলো পাশে রেখে শুয়ে পড়ল মেঝের ওপর। শুয়ে না পড়ে উপায় নেই। বন্ধ খড়খড়ির ওপিঠে লাঠিবৃষ্টির প্রচণ্ড শব্দ। কাঁচ ভেঙে পড়ছে—খড়খড়ি ভাঙছে। অন্ধকার গাড়ি। ভেতরে কে আছে দেখবার যো নেই। তবু ওরা অন্ধ আক্রোশে লাঠি চালিয়ে যাচ্ছে। গাড়িটা কাঁচে কাঠে ঘা খেয়ে যে আর্ত্তনাদ তুলেছে তাতে কর্ণপাত করবার অবসর কারো নেই।

আর যে আর্ত্তনাদ রতনের—সুলতার ও ছোট ছেলেটির অন্তর ঠেলে উঠছে তা কি অন্তর্যামীর কানে পৌছবে এই মুহূর্ত্তে? এই ভাবে একসঙ্গে শেষ হয়ে যাওয়ার দৃশ্যটা ও কল্পনাই করতে পারছে না। কোথায় ঈশ্বর? প্রাণপণ শক্তিতে সুলতা আর রতন শুষ্ক গলার মধ্যে ধ্বনি আনতে চেষ্টা করলে। অন্তরের প্রার্থনায় আন্তরিকতা ফিরে এল।

লাঠি চালিয়ে জনতা শ্রান্ত হয়ে পড়ল কি নতুন ট্রামগাড়ী ঠেঙানোর উৎসাহে এগিয়ে গেল—ঠিক বোঝা গেল না। কণ্ডাক্টার কাছেই ছিল। তাড়াতাড়ি দোর গোড়ায় এসে বললে, শীগ্‌গির নামুন, আর এক দল আসছে।

ছেলের হাত ধরলে সুলতা—আর মোটগুলি দু'হাতে তুলে নিলে রতন। প্রাণের দায়েও সংসারের হিসাব ওর ভুল হয় নি।

সামনেই ছিল একটা দর্জ্জির দোকান। মালিক বাঙালী। সাদরে আহ্বান জানালেন, আসুন মা, ঘরে এসে বসুন।

সুলতাকে অনুসরণ করে রতনও সেই ঘরে আশ্রয় নিলে। রতনদেরই মত কয়েকজন নিরুপায় যাত্রী, ট্রামের ড্রাইভার, কণ্ডাক্টার সেইখানে আশ্রয় নিয়েছে। এক দুয়ারি ছোট দোকান ঘর। কাটা কাপড়ের স্তূপ এ পাশে ও পাশে। দুটো আলমারি—জামার ছিট ও তৈরি জামার ভর্ত্তি। তিন চারটে সিঙ্গার মেসিন রয়েছে। কারিগররা আসন ছেড়ে দোর গোড়ায় দাঁড়িয়ে দেখছে এই অভিনব দৃশ্য। সবাই কথা বলছে একসঙ্গে, কারও কথা কেউ শুনছে না। চোখের সামনে এমন ব্যাপার ঘটলে কথা না বলে চুপ করে সে দৃশ্য দেখা ও অপরের মন্তব্য শুনে যাওয়াও কম অস্বস্তিকর নয়।

আশ্রয় পেলে বটে—আশ্বস্ত হ'ল না রতন। এই সঙ্কীর্ণ ঘর—এতগুলি বাক্‌বান লোক—ঠাসাঠাসি জামা ও ছিটের কাপড়—দপ্ দপ্ করে জ্বলছে দুটো উচ্চশক্তির বিদ্যুৎ আলো—পথের ওপর অমানুষিক কোলাহল—দম যেন বন্ধ হয়ে আসছে। দোকানের সামনেই দাঁড়িয়ে আছে নিশ্চল ট্রামগাড়ি। ইতিমধ্যে দ্বিতীয় দল এসে ট্রামখানা ঠেঙিয়ে মোড়ের দিকে এগিয়ে গেছে। হৈ হৈ করে আসছে তৃতীয় দল। এরাও ট্রাম ঠ্যাঙাবে ও রোগান আওড়াবে। লৌহ ও দারু সংমিশ্রিত না হলে দেশলাইয়ের বাক্সের মত ট্রাম যেত গুঁড়িয়ে। কিন্তু এভাবে দলের পর দল যদি ট্রামকে পিটিয়েই হল্লা বাড়ায় শান্তি রক্ষকরা কি করছে তবে? ট্রাম চালু করে এতগুলি বিপন্ন লোককে যথাস্থানে পৌছে দেওয়া ওদের কর্ত্তব্য নয় বুঝি?

চার-পাঁচ দল ট্রাম ঠেঙিয়ে চলে যাবার পর বেগ ঈষৎ মন্দীভূত হ'ল যেন। প্রৌঢ় দোকানদার (পরে নাম জানা গেল জগৎবাবু) রতনের পানে চেয়ে জিজ্ঞাসা করলেন কোত্থেকে আসছেন মশাই?

রাণাঘাট।

যাবেন কোথায়?

শিবপুর।

শিবপুর! একটু বিস্মিত হয়ে জগৎবাবু বললেন, তাই তো যাওয়াই মুশকিল!

কেন—গাড়ি কি চলবে না? শুষ্কস্বরে রতন জিজ্ঞাসা করলে।

গাড়ি! এতক্ষণ যে চলেছে এই আশ্চর্য্য। হাঙ্গামা বেধেছে দুপুর বেলায়। গুলি চলেছে—লোকও মরেছে।

বলেন কি! তবে কি আজ শিবপুর পৌঁছতে পারব না?

জগৎবাবু বললেন, ট্রাম বাসের আশা ছেড়ে দিন। একখানা রিকশ কি ঘোড়ার গাড়ি ভাড়া করে নিন। না হয় মোটগুলো দোকানে রেখে পায়ে হেঁটে যান।

এই গোলমালের মধ্যে গাড়ি ভাড়াটা মনে মনে হিসেব করে রতন অত্যন্ত কাতর হয়ে বললে, গাড়ী করে এই ভিড় ঠেলে যেতে সাহস হয় না মশায়।

জগৎবাবু বললেন, না—না পাবলিককে ওরা কিছু বলবে না। এই তো একটু আগে দু'জনকে রিকশ করে দিলাম।

রতন বললে—তা হলে ওরা ট্রাম বাস পিটুচ্ছে কেন? তাতেও তো পাবলিক যাচ্ছিল।

জগৎবাবু সে কথার উত্তর দিতে-না-দিতে আর এক দল চীৎকার করতে করতে সেন্ট্রাল এভিনিউর দিক থেকে এসে ট্রাম ঠ্যাঙাতে সুরু করলে।

তারা চলে গেলে জগৎবাবু বললেন, তবে হেঁটে যান।

না মশাই—অতদূর হাঁটতে পারব না।

কাছাকাছি কোন আত্মীয়স্বজন বা জানা শোনা লোকের বাড়ী আছে কি?

রতন মাথা নাড়লে। বিপদের সমুদ্র চারদিকে উত্তাল হয়ে উঠেছে। অল্প জানা কাউকেও মনে পড়ছে না।

জগৎবাবু বললেন, তবে আমার বাসায় থাকুন আজ রাতের মত। কাল সকালে শিবপুরে যাবেন।

মন্দের ভাল মনে করে সেই ব্যবস্থায় সায় দিয়ে রতন জিজ্ঞাসা করলে, আপনার বাসা কোথায়?

এই কাছেই—নবীন কুণ্ডুর লেনে। গোলমাল একটু কমুক, দোকান বন্ধ করে আপনাকে নিয়ে যাব।

তখন আটটা বাজতে দশ মিনিট বাকি। এমন কিছু রাত হয় নি যে উদ্বেগ বাড়বে। রাতের মত নিরাপদ আশ্রয়ের আশ্বাস পাওয়া মাত্র রতন খানিকটা সুস্থ বোধ করলে। বাড়ি থেকে খাবার তৈরি করে নিয়ে এসেছে সুলতা। এ বিষয়ে ওর বুদ্ধি-বিবেচনার অপ্রতুলতা রতন কোন দিন অনুভব করে নি। সুলতা না থাকলে ওর অল্প উপার্জ্জনের সংসারের কি অবস্থা যে হ'ত!

ছেলেটা ইতিমধ্যে গোটা দুই সুতোর কাটিম ও ন্যাকড়ার টুকরো জোগাড় করে আপন মনে খেলা সুরু করে দিয়েছে। এই নতুন পরিস্থিতিতে নতুন কৌতুকে ও হয়তো আবিষ্ট হয়ে রয়েছে। হায়—ওদের মত নিরুদ্বিগ্ন চিত্ত যদি বয়স্ক মানুষের হ'ত।

নিশ্বাস ফেলে রতন সুলতার কাছ ঘেঁসে ফিস্ ফিস্ করে বললে, শুনলে তো—আজ শিবপুরে যাবার দফা গয়া! ওঁরই বাসায় কোনমতে রাতটা কাটিয়ে দেওয়া যাক।

সুলতা বললে, তা কখন বাসায় যাবে?

দোকান বন্ধ হলে—এই ন'টা আন্দাজ।

ছেলেটা খেলা সেরে মায়ের কোলে শুয়ে পড়ে বললে, খিদে পেয়েছে।

বায়নাদার ছেলে। একবার দু'বার বলেই কাঁদবার উপক্রম করল।

পুঁটুলি খুলে—লুচি বেগুন ভাজা বার করে খোকাকে দেওয়া হ'ল। সুলতা বললে, একটু জল।

দোকানে জল নেই। আর কোথায় জল পাওয়া যাবে রতন জানে না। জগৎবাবু উঠে কোথায় গেছেন। দোকানের কর্ম্মচারীরা বিশেষ কান দিলে না কথায়।

খোকা খাচ্ছে—এমন সময় মোড়ের মাথায় দুম্ দুম্ করে শব্দ হ'ল গোটা কতক। হুড়মুড় করে লোক ছুটে এল মোড়ের দিক থেকে। জগৎ বাবুও ওই দিকে গিয়েছিলেন। ফিরে এসে বললেন, হাঙ্গামা বাড়ল দেখছি! দু'গাড়ি বোঝাই মিলিটারি এসেছে—কাদুনে গ্যাস ছাড়ছে।

এত দূরেও সূক্ষ্ম বাষ্প বাতাসে ভর করে এসে দোকান ঘরে উঁকি দিলে। সকলের চোখ আর্দ্র হয়ে উঠল।

রতন বললে, ওরা গ্যাস ছাড়ছে কেন?

ক'খানা লরি পুড়িয়ে দিলে কিনা!

ওদিকে কটাকট আওয়াজ বাড়ছে—এদিকের কোলাহলও। প্রলয় কালে বুঝি সপ্ত সমুদ্র উদ্বেল হয়ে উঠল।

দোকানের সামনে তখনও ট্রামটা দাঁড়িয়ে। দোকানের মধ্যে কণ্ডাক্‌টার আর ড্রাইভার কি করা উচিত তাই বলাবলি করছে। গাড়িটা ড্রাইভারের চার্জ্জে থাকলেও এই অকল্পিত পরিস্থিতির উদ্ভবে ওর দায়িত্বটা শিথিল হয়ে গিয়েছে। কিন্তু ক্যাশের বোঝা কাঁধে ঝুলিয়ে কণ্ডাক্‌টারের দায়িত্বটা সেই অনুপাতে বেড়েছে। হল্লাকারীদের মধ্যে অনেক গুণ্ডা বদমায়েসও সুযোগ অনুসন্ধানে মনোনিবেশ করেছে। তারা সর্ব্বপ্রযত্নে চেষ্টা করছে বিশৃঙ্খলা বাড়াতে। কোথায় নিরীহ পথচারী, কোথায় টাকার থলি নিয়ে ট্রাম বাসের কণ্ডাক্‌টার, কোন্ দোকান অরক্ষিত—এই সবের দিকে ওদের দৃষ্টি প্রখর। ওরাও দলে ভিড়ে চেঁচাচ্ছে খুব জোরে, সোডার বোতল বা ইঁট ছুঁড়ছে পুলিসের দিকে—আবার পুলিসের তাড়া খেয়ে হুড় হুড় করে পালিয়েও যাচ্ছে সকলের আগে।

সমুদ্রের ঢেউ এগিয়ে এল ট্রামের কাছে। হাতে ওদের তেলের টিন—পেট্রোল কিংবা কেরোসিন—কে জানে। সেটা উপুড় করলে ট্রামের অভ্যন্তরে।

রতন শিউরে উঠে চোখ বুজলে। ওদের উদ্দেশ্য সে বুঝতে পেরেছে। মুহূর্ত্ত পরে দাউ দাউ করে জলে উঠবে ট্রাম—সঙ্গীন উঁচিয়ে ছুটে আসবে শান্তিরক্ষকের দল। আর পথ থেকে কতটুকু দূরেই বা এই একছুয়োরি ঘর। এক ঘর কাপড়ের সঙ্গে—সপরিবারে ওরাও ভস্মীভূত হয়ে যাবে—কাল সকালে নাম উঠবে সংবাদপত্রে। ওদের নয়—এই দোকানখানির। ওরা তো পুড়ে পরিচয়চিহ্নহীন হয়ে লোকের বিস্ময় ও করুণা উদ্রেক করবে। আর আগুনে যদি বা পুড়ে না-ও মরে—দোকান থেকে পালাবার সময় শান্তিরক্ষকের গুলিতে প্রাণ দিতেই হবে। কোন সংকাজে নয়—নিতান্ত অকারণেই। পরম উত্তেজনার মধ্যে গৌরবময় মৃত্যুর সন্ধান রতনের মত লোকেরা তো কোন কালে কল্পনা করতে পারে না। অথচ স্বৈরশাসনের প্রতিবাদে দৈববশে এমনই একটি গৌরবময় মৃত্যুর অনিচ্ছাকৃত অংশীদার হয়েও তার ভাগ্যে সম্পূর্ণ লুপ্ত হয়ে যাওয়া ছাড়া কোন উপায় নেই। রতন কাঁপতে লাগল থর থর করে।

জগৎবাবু সহসা দোকান থেকে লাফিয়ে ফুটপাথের ওপর এসে চীৎকার করে বললেন, ছি-ছি! করছেন কি আপনারা! ট্রামে আগুন লাগিয়ে পুড়িয়ে মারবেন এই এক ঘর লোককে? কচি ছেলে—স্ত্রীলোক—যারা কোন দোষ করে নি—তাদেরকে! আর ট্রাম পুড়িয়ে ক্ষতিটা হবে কার! একে ট্রামের অভাবে কষ্টের সীমা নেই

জনতা শুনলে সে কথা। দেশলাই জ্বাললে না। কয়েকটি কণ্ঠে শোনা গেল, চল চল—মিলিটারি ট্রাকে আগুন দেওয়া যাক।

তার পর শ্লোগান আওড়াতে আওড়াতে মোড়ের দিকে এগিয়ে গেল জনতা।

চোখ খুলে রতন সুলতাকে বললে, ভগবানকে ডাক। আজ যদি রক্ষা পাওয়া যায়—পুনর্জন্ম মনে করো।

ন'টা বেজে গেল। ঠায় একভাবে দোকানে বসে বিপদের ঢেউ কতক্ষণ গোনা যায়। বাড়ি থেকে বেরিয়েছে বেলা চারটায়। ট্রেনের ভিড় ও শহরের হাঙ্গামা উদ্বেগ বৃদ্ধির সঙ্গে দেহে জমিয়ে তুলেছে প্রচুর শ্রান্তি। একটু হাত-পা ছড়িয়ে শোবার আকাঙ্ক্ষা প্রবল হয়ে উঠছে।

জগৎবাবুকে সে কথা বলতেই তিনি বললেন, আসুন আমার সঙ্গে—মারোয়াড়ি-বাড়িতে থাকবার ব্যবস্থা করে দিই। থাকবেন?

আপনার বাড়ি—

দেখছেন তো—সেন্ট্রাল এভিনিউয়ের মোড় পেরুনো যাবে না। ফট্ করে একটা গুলি লাগলে—ছোট ছেলে—উনি—

রতন আকুল হয়ে বললে, তাই ব্যবস্থা করে দিন মশায়। আপনি আজ আমাদের বাঁচিয়েছেন—আপনাকে কি বলে যে—

না—না—কিছুই নয় এ। মনে করুন—এমন বিপদে আমিও তো পড়তে পারতাম। আসুন। দোকানে পুঁটুলি থাক।

থাক মোটঘাট। এ সব তো মানুষের প্রাণের চেয়ে বেশি নয়। বলে সুলতার পানে ক্রুদ্ধ দৃষ্টি হেনে রতন উঠে দাঁড়াল। নিরাপত্তার সঙ্গে সঙ্গেই পুরাতন মানসিক বৃত্তিগুলি ওকে ঘিরে ফেলছে। কিংবা এই সঙ্কটে নিজেরা পরিত্রাণ পেলে অথচ অত সাধের সংগৃহীত জিনিসগুলিকে হয় তো রক্ষা করতে পারলে না এই নৈরাশ্যে ক্ষোভ ওর স্বাভাবিক ভাবেই দেখা দিয়েছে।

আশ্রয় পাওয়া গেল। কোলাপ্সিবল গেটের মধ্য দিয়ে ওরা পৌঁছল নাতিপ্রশস্ত একটি প্রাঙ্গণে। চারদিকে উঁচু পাঁচ ছ' তলা বাড়িগুলি দুর্ভেদ্য পক্ষপুটে ঘিরে রেখেছে সেই প্রাঙ্গণটিকে। প্রাঙ্গণের এদিকে ওদিকে খানচারেক মোটর—মাঝখানে জলের ফোয়ারা। ফোয়ারার বেদি ঘিরে ক'খানা বেঞ্চি পাতা আছে। তারই একখানিতে সুলতা ও খোকাকে নিয়ে রতন বসলে। আঃ—এত আরাম জীবনে ও কোন দিন অনুভব করে নি! চার পাশের বাড়িগুলির অসংখ্য গবাক্ষপথে বিদ্যুৎ আলোর তীর এসে প্রাঙ্গণটিকে ক্ষতবিক্ষত করছে—তবু কি অপরূপ শান্ত মনে হ'ল প্রাঙ্গণটিকে। উপরে ঝুলে আছে নক্ষত্রভরা নীল আকাশ—সেও আশ্চর্য্য সুন্দর। নির্বিঘ্ন পরিবেশে ত্রুটি অসমাঞ্জস্য নিয়ে খুঁত খুঁত করা মানুষের স্বভাব হ'লেও—রতনরা এতক্ষণে স্বস্তির নিশ্বাস ফেললে।

ঝরণার পাশের বেঞ্চে বসে হাত মুখ ধুয়ে আহার সারলে দু'জনে। বাড়ির কোন ছেলে এসে মিঠাই পুরি কিছু চাই কিনা জিজ্ঞাসা করলে। শোবার জন্য বন্দোবস্ত হ'ল একখানি মার্ব্বেল পাথরমণ্ডিত ঘর। কয়েকখানা কম্বলও এরা দিলে। খানিক পরে একজন বর্ষীয়সী ঝি (ভাগ্যে সে বললে এই বাড়িতে কাজ করে। নইলে তার এক গা গহনা ও পরি॰ ॰র-পরিচ্ছন্ন বেশভূষা দেখে—দাসী জাতীয় বলে অনুমান করা দুঃসাধ্য হ'ত।) বড় একটা গ্লাসে করে এক গ্লাস দুধ নিয়ে এল খোকার জন্য। এরা দস্তুরমত ভদ্র এবং অতিথিবৎসল।

শোবার আগে মনে হচ্ছিল কত না ক্লান্ত, শুয়ে কিন্তু ঘুম এল না। রাত বাড়ার সঙ্গে বাইরের হাঙ্গামা বেড়েই চলেছে। আওয়াজ হচ্ছে ফটাফট্। কাঁদুনে গ্যাস কিংবা গুলি ছোঁড়ার শব্দ। শ্লোগান···আওয়াজ একটানা।

হিন্দু-মুসলমান এক হও। ইনক্লাব জিন্দাবাদ।

শোবার পর জানালা দিয়ে আকাশের যে অংশটুকু রতনের চোখে পড়ল—তা মনোরম বটে, তবে তারাগুলো অত উঁচুতেও কেঁপে কেঁপে উঠছে—মনে হ'ল। রাজপথের ধুলোয় আত্মসম্মানের প্রতিষ্ঠায় কারা রক্তদান করে অমর হয়ে ইতিহাসের পৃষ্ঠা আশ্রয় করলে—রতনের তা অজানা রইল।

ও সুলতাকে বলল, কাল সকালে ট্রাম চললেই ট্রামে—নইলে গাড়ি করে শিবপুরে যেতে হবে।

সুলতা বললে, জিনিসগুলো যে দোকানে রইল।

রতন অন্ধকারে কটমট করে সুলতার পানে চেয়ে দাঁতে দাঁত রেখে বললে, ছুত্তোরি জিনিস—আপনি বাঁচলাম তাই যথেষ্ট নয়! আর একদিন এসে জিনিস নিয়ে যাব।

ভোর বেলায় তন্দ্রার মাঝে ট্রামের ঘর্ঘর আওয়াজ শোনা গেল। মধুর আওয়াজ। দেবতাদের স্মরণ করে রতন উঠে বসলো বিছানায়। সুলতার গায়ে ঠেলা দিয়ে বললে, ট্রাম চলছে—শীগ্‌গির ওঠ।

সুলতা উঠলে—খোকাকে ওঠালে। তাড়াতাড়ি প্রাতঃকৃত্য সেরে ওরা বাইরে এসে দাঁড়াল।

পাশেই দরজির দোকান। রতন সেদিকে চেয়ে বললে, দাঁড়াও তো—যদি মোটগুলো পাওয়া যায়।

মোট পাওয়া গেল—ট্রামও এসে পড়ল। তার পর হাওড়ার ট্রাম বদল করে ওরা নির্বিঘ্নে শিবপুরে পৌছল।

বাড়ির অত তাড়াটেরা বললে, ব্যাপার কি? কাল কোথায় ছিলে?

আর ভাই—! রতন পুরুষমহলে আর সুলতা স্ত্রীমহলে বিস্তারিত বর্ণনা সুরু করলে। আশ্চর্য্য, কাল যে পরিমাণে ভয়, উদ্বেগ, নিরাশা ওদের মনে ভারি পাথরের মত চেপে বসেছিল—আজ ঘটনাগুলিকে ফেনিয়ে, রসিয়ে করুণ ক'রে বলে সেই অনুপাতে ওরা আনন্দ ও তৃপ্তি উপভোগ করলে!

আহারাদির পর সুস্থ হয়ে রতন বললে, কাল কিংবা পরশু গিয়ে জগৎবাবু ও মারোয়াড়িকে ধন্যবাদ দিয়ে আসব। ওঁরা যা উপকার করেছেন।

সুলতা বললে, আহা—ওঁরা ভগবানের প্রেরিত!

সপ্তাহ কেটে গেল উত্তেজনায়। ট্রাম বাস ক'দিন চলল না। তার পর ট্রাম বাস চালু হতেই—রতন বললে, আজ মনে করছি—বড়বাজারের দিকে যাব। বাস্তবিক ওঁরা যা করেছেন—ওঁদের ধন্যবাদ না দেওয়া পর্য্যন্ত মন সুস্থ হচ্ছে না।

সুলতা বললে, দেখ—একটা কথা বলছিলাম।

রতন জিজ্ঞাসুদৃষ্টিতে সুলতার পানে চাইলে।

সুলতা বললে, জিনিসপত্তর সবই পৌঁছেছে—কেবল তাড়াতাড়িতে আমার চটি জোড়াটা দোকানে ফেলে এসেছি। যদি একবার জিজ্ঞাসা করে—

রতন উগ্র দৃষ্টিতে সুলতার পানে চেয়ে বললে, জানি—তোমাদের হুঁসপর্ব্ব কিছু নেই! যাব তাঁকে ধন্যবাদ দিতে—আর অভদ্রের মত বলব—মশাই আমার স্ত্রী এক জোড়া চটি জুতো ভুল করে ফেলে গেছেন—আপনাদের দোকানে—দয়া করে যদি সেটা তুলে রেখে থাকেন—! ছিঃ ছিঃ, তাই কখনো বলা যায়! ওঁরা মনে করবেন কি? ক্রোধে গর গর করতে করতে রতন বেরিয়ে গেল।

আশ্চর্য্য—সেই দোকানে পৌঁছে—জগৎবাবুর সামনে দাঁড়িয়ে—নমস্কার করে ধন্যবাদ জানানোর বদলে রতন হুবহু আবৃত্তি করলে,—মশাই আমার স্ত্রী এক জোড়া চটি জুতো ভুলে ফেলে গেছেন আপনাদের দোকানে—দয়া করে যদি সেটা তুলে রেখে থাকেন—

জগৎবাবু বিস্মিত হয়ে তাকালেন কর্ম্মচারীদের পানে। কর্ম্মচারীরা আড়চোখে রতনের পানে চেয়ে মুচকি হেসে মাথা নাড়লে। অর্থাৎ তারা জানে না।

এই আড়চোখের চাহনি ও হাসির অর্থ বুঝতে বিলম্ব হ'ল না রতনের। কর্ম্মচারীরা নিশ্চয়ই ওকে বুদ্ধিহীন ঠাউরেছে! ক্রোধে ওর মাথার ভিতর চিন্ চিন্ করে উঠল। কিন্তু নির্ব্বোধের মত ক্রোধ প্রকাশ করে ও আর একবার ওদের কৌতুক বৃদ্ধি করলে না।

একটু ম্লান হেসে আমতা আমতা করে সে বললে, আচ্ছা—আচ্ছা—তার জন্তে আর কি! না পাওয়া যায়—নাই গেল। ভারি তো এক জোড়া জুতো!

বলতে বলতে সে নেমে এল দোকান থেকে। ধন্যবাদ দেওয়া আর হ'ল না।

নাট্যকার ও নব-ছন্দ-প্রবর্ত্তক রাজকৃষ্ণ রায়

১৮৪৯—১৮৯৪

শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

অপরিচয় ও অজ্ঞতার দরুন আজিকার বাঙালী পাঠক রাজকৃষ্ণ রায়কে ভুলিতে বসিয়াছে, 'অবসর-সরোজিনী' পড়ে না বলিয়াই সে কবি রাজকৃষ্ণ রায়কে জানে না, পড়িলে "ভূতলে বাঙ্গালী অধম জাতি" প্রভৃতি জাতীয়তামূলক কবিতার কবিকে ভুলিতে পারিত না।

রাজকৃষ্ণ কেবল সুকবিই ছিলেন না, তিনি এক জন সুদক্ষ অভিনেতা ও খ্যাতনামা নাট্যকারও বটেন। তাঁহার রচনার মধ্যে নাট্যগ্রন্থের সংখ্যাই অধিক। কলিকাতার সাধারণ রঙ্গালয়—বেঙ্গল, ন্যাশনাল, বীণা ও ষ্টার থিয়েটারের জন্যই তিনি প্রধানতঃ নাট্যগ্রন্থগুলি রচনা করিয়াছিলেন। বেঙ্গল থিয়েটারে তাঁহার রচিত "এক 'প্রহ্লাদ-চরিত্র' নাটকের অভিনয়ে লক্ষাধিক দর্শক সংখ্যা হইয়াছে এবং উক্ত থিয়েটার কোম্পানি প্রায় পঞ্চাশ হাজার টাকা উপার্জ্জন করিয়াছেন।" ষ্টার থিয়েটারে অভিনীত তাঁহার 'নরমেধযজ্ঞে'র কথা এখনও অনেকে জানেন। রাজকৃষ্ণের নাট্যগ্রন্থগুলির মধ্যে পৌরাণিক নাটকের সংখ্যাই অধিক। তাঁহার প্রথম নাট্যগ্রন্থ—'পতিব্রতা' একখানি পৌরাণিক নাট্যগীতি, ১৮৭৫ খ্রীষ্টাব্দের ৩রা ডিসেম্বর প্রকাশিত হয়; তখনও গিরিশচন্দ্রের কোন নাট্যগ্রন্থ প্রকাশিত হয় নাই। প্রকৃতপক্ষে রাজকৃষ্ণকে রঙ্গালয়ে পৌরাণিক দৃশ্যকাব্য-যুগের প্রবর্ত্তক বলা যাইতে পারে।

নাট্যগ্রন্থের তালিকা

রাজকৃষ্ণ যে-সকল নাট্যগ্রন্থ রচনা করিয়া গিয়াছেন, সে-গুলির একটি কালানুক্রমিক তালিকা দিতেছি:

১। পতিব্রতা (নাট্যগীতি) ... ১৮৭৫, ৩ ডিসেম্বর
২। নাট্যসম্ভব (উপরূপক) ... ১৮৭৬, ১৫ সেপ্টেম্বর
৩। অনলে বিজলী বা সীতার অগ্নিপরীক্ষা ... ১৮৭৮, ৭ এপ্রিল
৪। দ্বাদশ গোপাল (প্রহসন) ... ১৮৭৮, ১১ জুলাই
৫। ভারত-সান্ত্বনা (কবিতাত্মক দৃশ্যরূপক) ... ১৮৭৯ (১২৮৬ সাল)
৬। লৌহকারাগার ... ১৮৮০, ২৮ জানুয়ারি
৭। তারক-সংহার ... ১৮৮০, ২০ জুলাই
৮। হরধনুর্ভঙ্গ ... ১৮৮১, ২৮ জুলাই
৯। রামের বনবাস ... ১৮৮২, ১৫ আগষ্ট
১০। যদুবংশধ্বংস ... ১৮৮৪, ১ মার্চ
১১। তরণীসেন বধ ... ১৮৮৪, ১৫ জুলাই
১২। রাজা বিক্রমাদিত্য (ঐতিহাসিক নাটক) ... ১৮৮৪, ২৫ আগষ্ট
১৩। প্রহ্লাদ-চরিত্র ... ১৮৮৪, অক্টোবর
১৪। চমৎকার ... ?
১৫। চন্দ্রহাস ... ১৮৮৮, ১৬ জুন
১৬। হরিদাস ঠাকুর ... ১৮৮৮, ২৫ জুলাই
১৭। কলির প্রহ্লাদ (ব্যঙ্গনাটক) ... ১৮৮৮, ২ সেপ্টেম্বর
১৮। কাণা কড়ি (বিদ্রূপহাসক) ... ১৮৮৮, ২৮ অক্টোবর
১৯। মীরাবাই ... ১৮৮৯ (১২৯৬ সাল)
২০। খোকাবাবু (প্রহসন) ... ১৮৯০, ২ মার্চ
২১। বেলুনে বাঙালী বিবি (প্রহসন) ... ১৮৯০, ২ মার্চ
২২। ডাক্তার বাবু (প্রহসন) ... ১৮৯০, ২৫ মার্চ
২৩। সত্যমঙ্গল বা সত্যনারায়ণ লীলা ১৮৯০, ৯ জুলাই
২৪। চতুরালী (কৌতুক-নাট্যগীতি)* ১৮৯০, ১১ জুলাই
২৫। চন্দ্রাবলী (নাট্যগীতি) ... ১৮৯০, ২৬ জুলাই
২৬। টাটকা-টোটকা (প্রহসন) ... ১৮৯০, ৯ সেপ্টেম্বর
২৭। জগা পাগলা বা জ্যান্তে মরা (প্রাহসনিক নাট্যরঙ্গ) ... ১৮৯০, ১৫ সেপ্টেম্বর
২৮। লোকেন্দ্র-গবেন্দ্র (সামাজিক ব্যঙ্গনাটক) ... ১৮৯০, ৪ অক্টোবর
২৯। জুজু। (প্রহসন) ... ১৮৯০, ৬ অক্টোবর
৩০। রাজা বংশধ্বজ ... ১৮৯১, ১৫ জানুয়ারি
৩১। হীরে মালিনী (নাট্যগীতি) ... ১৮৯১, ১৮ জানুয়ারি
৩২। লক্ষহীরা ... ১৮৯১, ২৫ জানুয়ারি
৩৩। প্রহ্লাদ-মহিমা বা প্রহ্লাদ-চরিত্র ২য় খণ্ড ... ১৮৯১, ২৮ জানুয়ারি
৩৪। নরমেধযজ্ঞ ... ১৮৯১, ১ আগষ্ট
৩৫। লয়লা-মজনু (গীতি-নাটিকা)... ১৮৯১, ১২ ডিসেম্বর
৩৬। বনবীর (ঐতিহাসিক নাটক) ১৮৯২, ৩ ডিসেম্বর

---

* রাজকৃষ্ণ ইহার "বিজ্ঞাপনে" লিখিয়াছেন :—"বাঙ্গালা ভাষায় এ পর্য্যন্ত আদৌ একখানি কৌতুক-নাট্যগীতি (Comic opera) কেহ রচনা করেন নাই, সুতরাং কোন দেশীয় থিয়েটারে অভিনীতও হয় নাই। কিন্তু অভাবটি পূরণ হওয়া উচিত বিবেচনায় আমি সর্ব্বপ্রথমে এই কমিক অপেরা 'চতুরালী' রচনা করিলাম।".

৩৭। বহুরূপ (গীতিনাট্য) ... ১৮৯২, ৩১ ডিসেম্বর
৩৮। বেনজীর—বদ্‌রেমুনীর (গীতিনাটিকা) ... ১৮৯৩, ২১ ডিসেম্বর

রাজকৃষ্ণ-গ্রন্থাবলী, ১ম-৭ম ভাগ।—রাজকৃষ্ণ রায়ের কতকগুলি নাট্যগ্রন্থ স্বতন্ত্র পুস্তকাকারে মুদ্রিত না হইয়া প্রথমে রাজকৃষ্ণ-গ্রন্থাবলীতে স্থান পাইয়াছিল। এগুলি—

১ম ভাগ (এপ্রিল ১৮৮৪): —উৎকট বিরহ—বিকট মিলন বা আগমনী-বিজয়া (ঔপহাসিক হাস্যনাট)।

২য় ভাগ (ইং ১৮৮৫):—গঙ্গা-মহিমা নাটক, বামনভিক্ষা, দশরথের মৃগয়া বা বালক সিন্ধুবধ।

৩য় ভাগ (ইং ১৮৮৮):—ভীষ্মের শরশয্যা, দুর্ব্বাসার পারণ।

৪র্থ ভাগ (ইং ১৮৮৯):—হরিহরলীলা, জন্মাষ্টমী, প্রমদ্বরা, হেঁয়ালি অভিনয়।

৫ম ভাগ (ফেব্রুয়ারি ১৮৯২):—লক্ষপতি, শ্রীকৃষ্ণের অন্নভিক্ষা, গিরিগোবর্দ্ধন, দুটি মনোচোরা।

কাব্যে ও নাটকে ভঙ্গ অমিত্রাক্ষর ছন্দের প্রবর্ত্তন

রাজকৃষ্ণের 'হরধনুর্ভঙ্গ' একখানি সুলিখিত পৌরাণিক দৃশ্যকাব্য, প্রকাশকাল ২৮ জুলাই ১৮৮১। ইহার একটি অভিনবত্ব আছে। অভিনয়-সৌকর্য্যার্থে বাংলা নাটকে ভঙ্গ অমিত্রাক্ষর ছন্দের বিরাট্ সম্ভাবনা উপলব্ধি করিয়া রাজকৃষ্ণই সর্ব্বপ্রথম এই ছন্দে 'হরধনুর্ভঙ্গ' নাটকখানি রচনা করেন। এই আভিনয়িক ছন্দের উপযোগিতা বুঝাইবার জন্য গ্রন্থের ভূমিকায় তিনি যাহা লিখিয়া গিয়াছেন, তাহা প্রণিধানযোগ্য। আমরা ভূমিকাটির কিয়দংশ নিম্নে উদ্ধৃত করিতেছি:

"দুই তিন জন সুদক্ষ অভিনেতার অনুরোধে পাঁচ-ছয় দিনের মধ্যে এই 'হরধনুর্ভঙ্গ নাটক' খানি লিখিতে হইল। তাঁহাদের অনুরোধ, নাটকখানি গদ্যে না হইয়া পদ্যে হইলে বড় ভাল হয়, অথচ পাঁচ ছয় দিনের মধ্যে লিখিয়া দেওয়াও চাই। সুতরাং এত অল্প সময়ের মধ্যে শতাধিক পৃষ্ঠায় একখানি পুস্তক অলঙ্কার-শাস্ত্র-সম্মত ছন্দে লিখিয়া শেষ করা যে কি পর্য্যন্ত দুর্ঘট, তাহা বলা বাহুল্য। এই জন্য আমি ইহার অধিকাংশ স্থলে "ভাঙ্গা অমিত্রাক্ষর ছন্দের" দিকেই অধিকতর মনোযোগ করিয়া, নির্দ্দিষ্ট সময়ের মধ্যে এক প্রকার অনুরোধ রক্ষা করিলাম।

"এ দেশে কবিবর ৺মাইকেল মধুসূদন দত্তই প্রথমে বাঙ্গালা ভাষায় অমিত্রাক্ষরচ্ছন্দ বাহির করেন। চতুর্দ্দশ অক্ষরে মিত্রাক্ষরিক পয়ার ছন্দ বাঙ্গালায় বহুদিন হইতে প্রচলিত, মাইকেল মধুসূদনের অমিত্রাক্ষরচ্ছন্দ সেই চতুর্দ্দশটি অক্ষরেই গ্রথিত। বঙ্গ-রঙ্গ-ভূমিতে উক্ত কবির মেঘনাদবধ কাব্যখানি নাটকাকারে সজ্জিত হইয়া, সর্ব্বপ্রথমে অভিনীত হয়। তাহার পূর্ব্বে বঙ্গদেশের কোন স্থলেই বাঙ্গালা অমিত্রাক্ষরছন্দের কথাবার্ত্তায় কোন নাটক অভিনীত হয় নাই। সেই প্রথম অভিনয়ের সময় আমরা অভিনেতা ও অভিনেত্রীগণের মুখে উক্ত ছন্দের উচ্চারণ ও প্রয়োগাদি যে রূপ শুনিয়াছিলাম, তাহা আজিও মনে জাগিয়া রহিয়াছে। সেই উচ্চারণ ও

রাজকৃষ্ণ রায়

প্রয়োগাদিকে আমরা মেঘনাদবধ কাব্যের নূতন ও সুন্দর অঙ্গ বলিয়া স্বীকার করি। অভিনয়কারিদিগের অভিনয়কালে মেঘনাদবধের চতুর্দ্দশাক্ষরাত্মক অমিত্রাক্ষরচ্ছন্দ, অঙ্গভঙ্গি ও বাগ্‌ভঙ্গির অধীনগত হইয়া, আমাদের কর্ণে কেমন আর একতর নূতন ছন্দের ছাঁচ গড়িয়া দিয়াছিল। তখন বোধ হইয়াছিল, যেন মাইকেলের অমিত্রাক্ষর ছন্দ হইতে আর এক প্রকার অমিত্রাক্ষর ছন্দ প্রসূত হইতেছে। সেই আভিনয়িক ছন্দের পক্ষপাতী হইয়া, আমি এক সময়ে বঙ্গ-রঙ্গ-ভূমির ভূতপূর্ব্ব অধ্যক্ষ ও অসাধারণ-নট-চূড়ামণি ৺বাবু শরচ্চন্দ্র ঘোষ মহাশয়কে, ঐ রূপ ছন্দের নাটক সৃষ্টি করিয়া অভিনয় করিতে অনুরোধ করি, তাহাতে তিনি বলেন যে, "এখন মাইকেলের অমিত্রাক্ষরই চলুক; ক্রমে ক্রমে পাকিয়া কিছু কাল পরে রঙ্গভূমির অভিনেতারা এই মাইকেলী ছন্দ হইতে আভিনয়িক ছন্দের মৌখিক কবি হইয়া অভিনয় করিতে পারিবেন।" ইংলণ্ডেও এইরূপ অবস্থা ঘটিয়াছে। শরচ্চন্দ্র বাবুর সেই কথা আমার মনে জাগিয়া ছিল। এখন দেখিতেছি, ফলেও তাহাই দাঁড়াইতে চলিল। শুভক্ষণে মধুসূদনের অমিত্রাক্ষরচ্ছন্দ দেখা দিয়াছিল, এবং অভিনয়ক্ষেত্রে অভিনীত হইয়াছিল, নহিলে আধুনিক "ভাঙ্গা অমিত্রাক্ষর ছন্দ" বাঙ্গালায় হইত কি না

সন্দেহ। এই ছন্দ আভিনয়িক নাটকের পক্ষে "জলবৎ তরল" এবং লেখকের পক্ষেও তাহাই। লোকের অনুরোধে বা নিজের ইচ্ছায় দুই চারি দিনের মধ্যে এক এক খানা বড় বড় নাটক পদ্যে লিখিতে হইলে এই "জলবৎ তরল" ছন্দই—এই অমিত্রাক্ষর-ভাঙা অমিত্রাক্ষর ছন্দই—বিশেষরূপে উপযোগী। সুতরাং এই হরধনুর্ভঙ্গ নাটকের অধিকাংশ স্থলেই ইহারই অনুসরণ করা হইয়াছে।...

"ইংলণ্ডে কোন কোন অভিনেতৃসম্প্রদায় সেক্ষপীর, বেন জনসন, অট্‌ওয়ে, ইয়ং প্রভৃতি সুপ্রসিদ্ধ নাট্যকার ও কবিদিগের ছন্দোময় নাটকের ছন্দ এইরূপ আভিনয়িক ভাঙা ছন্দে পরিবর্ত্তিত করিয়া লইয়াছেন। অভিনয়ের উপযোগী হইবে বলিয়া, তাঁহারা এই ভাঙা অমিত্রাক্ষর ছন্দের হাওয়া উড়াইয়াছেন। সেই হাওয়া যে, আমাদেরও গায়ে লাগিয়াছে, তাহা বলা বাহুল্য, কেন না ইংরাজি আমাদের বর্ত্তমান রাজভাষা।...

"মহাকবি সেক্ষপীর তদীয় জগদ্বিখ্যাত নাটকাবলীর মধ্যে গদ্য ও পদ্য উভয় ছন্দই ব্যবহার করিয়াছেন। তন্মধ্যে তাঁহার পদ্যভাগ দুই শ্রেণীতে বিভক্ত; (১) মিত্রাক্ষর ও (২) অমিত্রাক্ষর ছন্দ। মিত্রাক্ষর অপেক্ষা অমিত্রাক্ষর ছন্দের ভাগ অনেক বেশী। তিনি যে যে স্থলে মিত্রাক্ষর ব্যবহার করিয়াছেন, তত্তৎস্থলে অলঙ্কার শাস্ত্রের নিয়ম রক্ষিত হইয়াছে; কিন্তু অমিত্রাক্ষর ছন্দের স্থলে সে নিয়ম দেখিতে পাওয়া যায় না। আমরা দেখিতেছি, তাঁহার অমিত্রাক্ষর ছন্দ, মহাকবি মিল্টন প্রভৃতির অমিত্রাক্ষর ছন্দের ন্যায় নিয়মবদ্ধ নহে, অভিনয়ের উপযোগী হইবে বলিয়া নানাবিধ ছোট বড় পংক্তিতে ক্রমান্বয়ে গ্রথিত। সুতরাং উক্ত ছন্দকে আমরা ভাঙা অমিত্রাক্ষর ছন্দ বা আভিনয়িক ছন্দ বলি। উহা এরূপভাবে লিখিত হইয়াছে যে, উহাকে পদ্যাকার গদ্যও বলা যাইতে পারে। আমরা কলিকাতায় থিয়েটার রএল ও করিন্থিয়ান থিয়েটারে ইংরাজ অভিনেতৃগণ কর্ত্তৃক অভিনীত উক্ত মহাকবির 'হ্যাম্লেট্', 'ম্যাক্বেথ্', 'কিং লিয়ার', 'মাচ্ এডো এবাউট নাথিং', 'ওথেলো' প্রভৃতি নাটকগুলির আভিনয়িক বাক্যপরম্পরা শ্রবণ করিয়া বোধ করিয়াছিলাম যেন স্বাভাবিক গদ্যে কথা কহা হইতেছে। দেশীয় রঙ্গভূমিতেও সেইরূপ হওয়া উচিত।

"আমি ১২৮৫ সালে 'নিভৃতনিবাস' নামক একখানি কাব্যগ্রন্থ রচনা করিয়া প্রকাশ করি। তাহার দ্বিতীয় সর্গের কিয়দংশ এইরূপ ভাঙা অমিত্রাক্ষর ছন্দে লিখিয়াছিলাম, কিন্তু খণ্ড কাব্য প্রভৃতিতে ইহা যেন "এক ঘেয়ে" হইয়া দাঁড়ায় দেখিয়া, অধিক লিখি নাই; যাহা হউক, এ স্থলে সেই স্থান তুলিয়া দিতেছি। (মৃতপত্নীর পার্শ্বে বসিয়া উন্মত্তভাবে) বিজয় বলিতেছেন ;—

প্রিয়তমে!—মনোরমে!
উঠ উঠ, বেলা হ'ল ;
উঠ না হে,
উঠ না হে,
থাক শুয়ে—থাক শুয়ে।
আমি কি নির্দ্দয়,
হায়,
জাগাই তোমায় ভাই,
থাক শুয়ে,
উঠিও না,
খুল না খুল না আঁখি ;..."

রচনার নিদর্শন-স্বরূপ ভঙ্গ অমিত্রাক্ষর ছন্দে রচিত 'হরধনুর্ভঙ্গ' নাটকের কয়েক পংক্তি উদ্ধৃত করিতেছি :—

প্রচণ্ড রৌদ্রের তাপ ;
অগ্নিচক্র মধ্যাহ্ন তপন ;
সূর্য্যকরে বিদগ্ধ ধরণী।
ডাকে না বিহঙ্গ শাখে,
রুদ্ধকণ্ঠে বসিয়া নীরবে।
প্রকৃতির প্রভাতের হাসি নাহি আর ;
মূর্চ্ছিত হইয়া যেন আকুল-হৃদয়া।
বহি'ছে গঙ্গার বারি, ধীরি ধীরি গতি,
নির্জ্জন প্রদেশে।
তরী নাহি একখানি ;
কেমনে হ'বেন পার রাম রঘুমণি
লক্ষ্মণের সনে ?
অয়ি গঙ্গে পতিতপাবনি !
কর পার ভব-সিন্ধু-পার-কাণ্ডারীরে,
দয়াময়ি! (পৃ. ৪৪)

বাংলা নাটকে—কাব্যেও বটে—ভঙ্গ অমিত্রাক্ষর ছন্দের প্রথম প্রবর্ত্তক-রূপে যে-সম্মান রাজকৃষ্ণ রায়ের ন্যায্য প্রাপ্য' তাহা হইতে তিনি বঞ্চিত হইয়া আসিতেছেন। গিরিশচন্দ্রের জীবনীকারগণ প্রচার করিয়াছেন, "রাবণবধ নাটকে গিরিশচন্দ্রই ভাঙা অমিত্রাক্ষর ছন্দ প্রথম প্রবর্ত্তিত করেন।" কিন্তু রাজকৃষ্ণ রায়ের 'হরধনুর্ভঙ্গ' নাটকের সহিত পরিচয় থাকিলে বা ইহার প্রকাশকাল সম্বন্ধে সঠিক জ্ঞান থাকিলে, তাঁহারা কখনই এরূপ সিদ্ধান্তে উপনীত হইতেন না। 'হরধনুর্ভঙ্গ' ও 'রাবণবধ' একই বৎসরে প্রকাশিত হয়; উভয় নাটকেরই আখ্যাপত্রে প্রকাশকাল—"১২৮৮ সাল" মুদ্রিত আছে। কিন্তু তারিখ ও মাসের উল্লেখ না থাকায় কেবলমাত্র সাল দ্বারা কোন্‌খানি আগে, কোন্‌খানি পরে প্রকাশিত, তাহা নির্ণয় করা কঠিন। কঠিন হইলেও একেবারে অসাধ্য নহে। বাংলা দেশে প্রতি বৎসর যত পুস্তক মুদ্রিত হয়, মুদ্রাকরের প্রেরিত বিবরণী হইতে সেগুলির নামধাম-প্রকাশকাল-আদি সঙ্কলন করিয়া গবর্মেণ্টের বেঙ্গল লাইব্রেরি চারি কিস্তিতে 'ক্যালকাটা গেজেটে' প্রকাশ করিয়া থাকেন। আমরা

১৮৮১ খ্রীষ্টাব্দের গেজেট হইতে রাজকৃষ্ণ রায়ের 'হরধনুর্ভঙ্গ' ও গিরিশচন্দ্রের 'রাবণবধে'র সঠিক প্রকাশকাল সংগ্রহ করিয়াছি।

'রাবণবধ' পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয়—৫ নবেম্বর ১৮৮১ তারিখে। নাটক প্রচারিত হইবার পূর্ব্বেই রঙ্গালয়ে তাহার অভিনয় হইয়া থাকে—ইহাই প্রথা। 'রাবণবধ'ও পুস্তকাকারে প্রকাশের তিন মাস পূর্ব্বে—৩০ জুলাই ১৮৮১ তারিখে ন্যাশনাল থিয়েটারে প্রথম অভিনীত হয়। কিন্তু উভয় ক্ষেত্রেই রাজকৃষ্ণ গিরিশচন্দ্রের পূর্ব্বগামী। তাঁহার 'হরধনুর্ভঙ্গ' পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয়—২৮ জুলাই ১৮৮১ তারিখে এবং বেঙ্গল থিয়েটারে প্রথম অভিনীত হয় তাহারও পূর্ব্বে।

নাটকে পদ্য-পৌঙ্‌ক্তিক গদ্য

আভিনয়িক পদ্যছন্দ ছাড়া রাজকৃষ্ণ বাংলা নাটকে আরও একটি নূতন ধরণের ছন্দ প্রবর্ত্তন করিয়াছিলেন; উহা পদ্য-পৌঙ্‌ক্তিক গদ্য, যাহাকে কেহ কেহ আধুনিক কালে "গদ্য-কবিতা" বলেন। ১৮৮৪ খ্রীষ্টাব্দের আগষ্ট মাসে প্রকাশিত 'রাজা বিক্রমাদিত্য' নাটকের "বিজ্ঞাপনে" রাজকৃষ্ণ লিখিয়াছেন :—

"আমি এ দিকে ক্রমান্বয়ে হরধনুর্ভঙ্গ, রামের বনবাস, যদুবংশধ্বংস এবং তরণীসেনবধ এই চারিখানি নাটক যে ছন্দে লিখিয়াছি, উহা আভিনয়িক অমিত্রাক্ষর পদ্যছন্দ। গত ১২৮৫ সালে মৎপ্রণীত নিভৃতনিবাস কাব্যের এক স্থলে আমি ঐ ছন্দের কিয়দংশ লিখিয়াছিলাম। তখন ঐ ছন্দে বাঙ্গালা ভাষায় একখানিও নাটক প্রকাশিত হয় নাই।...

"সম্প্রতি এই 'রাজা বিক্রমাদিত্য' নাটকখানি আভিনয়িক ছন্দের পরিবর্ত্তে নূতন ধরণের গদ্যে রচিত হইল। ইহা আভিনয়িক পদ্য-পৌঙ্‌ক্তিক গদ্য। দুই এক স্থলে আভিনয়িক পদ্যছন্দও আছে, কিন্তু উহার ভাগ অতি অল্প। বাঙ্গালা ভাষায় আজ পর্য্যন্ত এরূপ পদ্য-পৌঙ্‌ক্তিক গদ্যে কোন নাটক প্রকাশিত হয় নাই। অভিনেতৃগণের পক্ষে পদ্য যেরূপ সহজ অভ্যাসের সামগ্রী, গদ্য সেরূপ নহে। এই নিমিত্ত আমি সহজে অভ্যস্ত হইবার সুবিধার জন্য এই নূতন ধরণের গদ্য নাটক লিখিলাম। আমার বিবেচনায় প্রচলিত ধরণের গদ্যাপেক্ষা এরূপ পদ্য-পৌঙ্‌ক্তিক ধরণে গদ্য নাটক লিখিলে অভিনয় ও অভিনেতৃবর্গের পক্ষে অনেকটা সুবিধা হইতে পারে। বিশেষতঃ বাগ্‌ধৃতি বা বাক্‌পূর্ত্তির (Prompting) পক্ষে এইরূপ গদ্য-পঙ্‌ক্তি যেমন অভিনয়-ব্যাঘাত-নিবারণের সুগম উপায়, টানা গদ্য-পঙ্‌ক্তিতে তেমন হইতে পারে না।"

রচনার নিদর্শনস্বরূপ আভিনয়িক পদ্য-পৌঙ্‌ক্তিক গদ্যে লিখিত 'রাজা বিক্রমাদিত্য' হইতে কয়েক ছত্র উদ্ধৃত করিতেছি :—

বিক্রম—ভর্তৃহরির ঘত সংসার-বিরাগ!
এই বিরাগের ফল "অমরুশতক" গ্রন্থ।
এই গ্রন্থে রমণী-প্রেমের কুটিল চিত্র
এবং বিবেকের মূর্ত্তি সুন্দর চিত্রিত হয়েছে।
যার লেখনী এমন গ্রন্থ রচনা করেছে,
তাকে পুনর্ব্বার সংসারী করা দুঃসাধ্য।
অনেক বল্লেম—অনেক বুঝালেম,
কিন্তু স্রোত কোন মতেই ফিরলো না।
থাক্, আর বিরক্ত করবো না।
মধ্যে মধ্যে নিজেই এসে ভর্তৃহরিকে দেখে যাবো
এখন আর এখানে বিলম্ব করবো না,
মহিষীকে ব'লে এসেছি শীঘ্রই ফিরবো,
কিন্তু রাত্রি প্রভাত হয়ে এলো,
মহিষী না জানি কতই ব্যাকুল হয়েছেন। (পৃ. ১২৭)

মালাক্কার পথে একদিন

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

শ্রীগৌরমোহন দাস দে

আরো কিছুদূর অগ্রসর হয়ে আমরা একটি গ্রামে এসে পৌঁছলাম। মাঝে মাঝে পিচ উঠে গিয়ে রাঙামাটির পথ হয়ে গেছে। দুধারেই লোকের বাড়ী। গ্রামটি ছাড়িয়ে সোজা চললাম। ক্রমে ক্রমে আমরা মালাক্কা প্রণালীর তীরে এসে পড়লাম। মালাক্কা শহর এখান থেকে সাড়ে ছয় মাইল হবে। তীরভূমির ধার দিয়ে বিরাট বিরাট অট্টালিকা উঠেছে, সবই পাশ্চাত্য ধরনের। সামনে এক-একটা ক'রে ছোট-বড় বাগান রয়েছে। একটু আগে দু'ধার থেকে বড় বড় সুন্দর বাড়ী উঠেছে। এ বাড়ীগুলো সবই চীনাদের। বাড়ীগুলো দেখে বালিগঞ্জের কথা মনে পড়ে গেল। এই সময় এখানে বর্ষাকাল কিন্তু রাস্তাঘাট যেন ঝক্‌ ঝক্‌ করছে। এ দিককার রাস্তা সুন্দর, চওড়া ও পিচঢালা।

এই জায়গাটা আমার খুব ভাল লাগল। এখান থেকে মালাক্কা প্রণালীর মধ্যে ছোট ছোট জঙ্গলভরা দ্বীপ দেখতে পাওয়া যায়—জেলেরা মাঝে মাঝে সেখানে যাতায়াত করে। জোয়ার চলে গেলে শুকনো বালুময় তীরে এরা 'পাগার' তৈরি
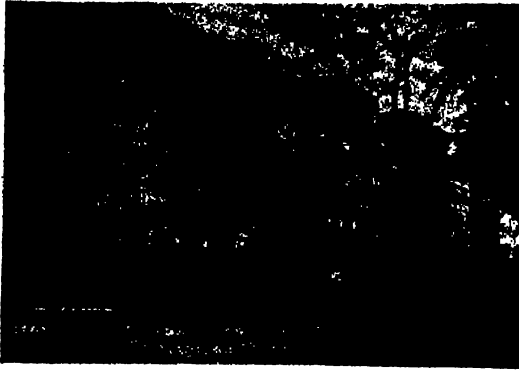
হাসপাতালের একাংশ

করে। কতকগুলো বাঁশের বেড়া তৈরি করে চারদিকে জাল দিয়ে ঘিরে দেয়। জলের দিকে একটু ফাঁক রাখে মাছ ঢোকবার জন্যে। যখন জোয়ার আসে ছোট-বড় মাছ সব ভেতরে ঢোকে। জাল ছিঁড়ে বেরিয়ে যেতে পারে না। ভাটার সময় জেলেরা মাছগুলো ধরতে পারে। এইরকম বহু 'পাগার' এখানে দেখলাম। দূরে জেলেডিঙ্গি দিয়ে জেলেরা মাছ ধরছে। একটু আগে বাঁদিকে মালয়ীদের কবর। এখানকার রাস্তা মাঝে মাঝে একেবারে প্রণালীর ধার দিয়ে এঁকে বেঁকে চলেছে, জল মাঝে মাঝে রাস্তার ওপর আছড়ে পড়ছে। মালাক্কায় ঢোকবার মুখে বড় বড় অট্টালিকাগুলো দেখে মনে হয়েছিল শহরের ভিতরেও এই রকম পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন প্রকাণ্ড অট্টালিকা দেখতে পাব। কিন্তু ঢুকেই চোখে পড়ল অত্যন্ত অপরিষ্কার ছোট-বড় বাড়ীগুলো মালাক্কা প্রণালীর ধার দিয়ে উঠেছে। এই বাড়ীগুলো সবই চীনাদের। বাইরের দরজাগুলোতে সোনালী রঙের প্রলেপ। মালয়ী এখানে খুব কম, বেশীর ভাগ অধিবাসীই চীনা। ভারতবাসী এবং সিংহলীও এখানে খুব কম। এখানকার চীনারা খুব ধনী ও ব্যবসায়ী। মনে হয় দেশটা যেন চীনাদেরই।

চীনাদের প্রায় প্রত্যেকেরই একটা করে দোকান আছে—স্বামী-স্ত্রী ছেলেমেয়ে সবাই বেচাকেনা করছে। এরা এখন মাতৃভাষা এক রকম বর্জ্জন করেছে। প্রায় সবাই মালয়ী ভাষায় কথা বলে। সাড়ে বারোটায় আমরা মালাক্কায় পৌছি, সেখানে নানা জিনিষপত্র সওদা করতে করতে একটা বেজে গেল। তার পর জিপ চালিয়ে বাঁদিকে মোড় ঘুরতে হ'ল, সামনেই একটা বড় পোল। এটা মালাক্কা নদীর উপর। পোলটা পার হয়ে সামনেই টাওয়ার ক্লক—তবে এখন ঘড়িটা অচল হয়ে রয়েছে। এর সামনেই লাল রঙের
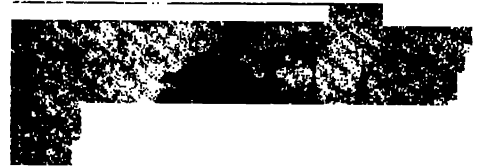
রোমান ক্যাথলিক গির্জ্জা, জানসন রোড

অনেকগুলো পুরনো বাড়ী। পেছনে পাহাড়ের ওপর পুরাতন পর্তুগীজ কেল্লা মাথা উঁচু করে রয়েছে। এখানে কিছু দেখবার নেই। শুধু কতকগুলো অস্থিকঙ্কালসার দেয়াল দাঁড়িয়ে আছে। এটি বোধ হয় তৈরি হয় খ্রী: পূ: ১৫১১-১৬০৫ অব্দের মধ্যে। আসবার পথে লাবুচিনা ক্যাম্পের মাইলতিনেক আগে এদের একটা রবার এষ্টেট দেখে এলাম। খাওয়া-দাওয়া সেরে গাড়ীর মোড় ফেরানো হ'ল একেবারে সিঙ্গাপুরের পথে। এখানে বাঁদিকে মেয়েদের কন্‌ভেন্ট, ইউরোপীয়ানদের ক্লাব, রেষ্ট হাউস, খেলার মাঠ রয়েছে। ডানদিকে মালাক্কা প্রণালীর ধারে কতকগুলো জাপানী

সুপ্রীম কোর্ট

বন্দীকে প্যারেড করিয়ে শাস্তি দেওয়া হচ্ছে। জাপানীদের বেশ সুন্দর ও বলিষ্ঠ দেহ। কিছুদূর যাবার পর ডানদিকে উঁচু প্রাচীরঘেরা জেলখানা নজরে পড়ল। একটা দোতলা কাঠের বাড়ী মাঝখানে রয়েছে, সেটায় কয়েদীরা থাকে। ডানদিকে ছোট একটা রাস্তা জেলের পাশ দিয়ে চলে গেছে। আমরা ভিন্ন একটা বড় রাস্তা ধরে সোজা বাঁদিকে চললাম। ডানদিকে একটু দূরে একটা পাহাড়ের ওপর পর্তুগীজদের আর একটা কেল্লার ধ্বংসাবশেষ রয়েছে দেখলাম। আন্দাজ আধ মাইল এগিয়ে আমরা একটা চৌমাথায় এসে পৌঁছলাম। ডানদিকে গেলে

টাউন হল, সিঙ্গাপুর

সিঙ্গাপুরের দিকে যাওয়া যায়—বাঁদিকে এগোলে পাহাড়ের কোল ঘেঁষে মালাক্কা শহরে পৌঁছানো যায়। আমরা সোজা চলে গেলাম একটা ছোট গ্রামের ভেতরে সেন মশায়ের বাড়ীর খোঁজ করবার জন্যে। সামনে একটা উঁচু পাহাড়ের পাশ দিয়ে রাস্তা চলেছে। পাহাড়টি বেশ বড়—ইটের গাঁথুনি এটাকে বেশ বৈচিত্র্যমণ্ডিত করেছে। এই পাহাড়টির নাম 'বুকিত চিনা', আর ঐ ইটের গাঁথুনিগুলো চীনাদের কবর। এই রকম দুটো পাহাড় এখানে কবরে কবরে ভরতি হয়ে গেছে, কোথায় একটুও ফাঁক নেই। তাই চীনা সম্প্রদায় ঠিক করেছে যে সমাহিত করার চেয়ে পোড়ানোই ভাল। খানিকক্ষণ পরে পাহাড়ের ওধারে Garden

আজের হিতুম, পেনাঙ্
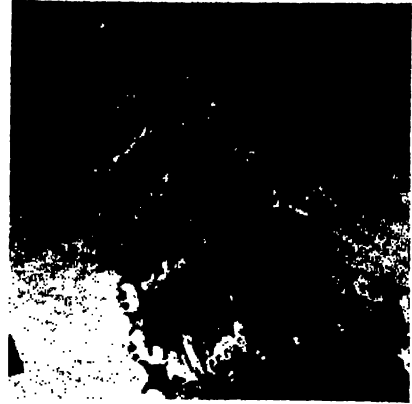
cityতে গিয়ে সেন মশায়ের বাড়ী খুঁজে বের করলাম। সেখানে আর একজন বাঙালীর সঙ্গে দেখা হ'ল। মালাক্কায় বাঙালী পরিবার খুব কম। ইতিমধ্যে সেন মশায়ের স্ত্রী আমাদের খাবারের জোগাড় করতে চাইলেন। দুপুরে রোদ খাঁ খাঁ করছে, এমন সময় বাইরে যেতে কারও ইচ্ছে হয় না। তা সত্ত্বেও কিন্তু কিছুক্ষণ পরে সেন মশায়কে নিয়ে জীপে করে বেরিয়ে পড়লাম -মালাক্কা শহর দেখবার জন্যে। জেলের পাশ দিয়ে বড় রাস্তায় এসে পড়লাম। এবার আমরা মালাক্কা শহর ও মালাক্কা হাসপাতাল দেখবার জন্যে যে পথে এসেছিলাম সেই পথেই ফিরলাম। খোলা মাঠে রোদের মধ্যে জাপানীদের সেই অবিরাম প্যারেড চলেছে। শহর পার হয়ে আমরা গ্রামের ভেতরে ঢুকলাম, ধানের ক্ষেত এখানেও রয়েছে। একটি ঘেরা চত্বরের মধ্যে বড় বড় পাঁচতলা বেশ সুন্দর সুন্দর অট্টালিকা দেখলাম। সামনে ডানদিকে বড় একটা গেট—লাল মাটির পথ চলে গেছে ভেতরের দিকে। আমাদের জীপ আস্তে আস্তে ঢুকে

বর্মা রোড

পড়ল। খানিক ঘুরে আমরা মিত্র মশায়ের বাড়ী এসে উঠলাম। তিনি বাড়ীতেই ছিলেন, আমাদের পেয়ে তাঁর খুব আনন্দ হ'ল। কিছুক্ষণ বিশ্রাম করবার পর আমরা তাঁর সঙ্গে হাসপাতাল দেখতে চললাম। খানিকটা যাবার
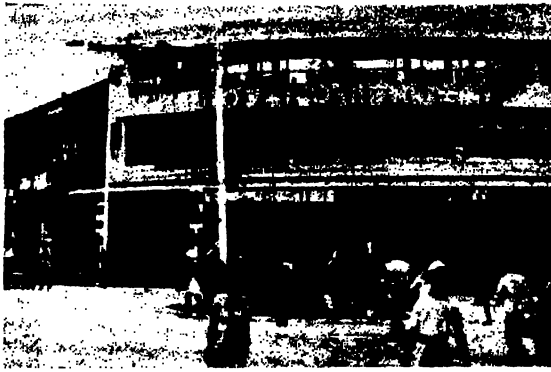
বোষ্টন এণ্ড কোম্পানির দোকান

পর দেখি সামনে একটা পাঁচতলা বাড়ী খালি পড়ে রয়েছে। মিত্র মশায়কে জিজ্ঞাসা করে জানতে পারলাম যে ওটা খালিই পড়ে ছিল অনেকদিন থেকে। জাপানীরা যখন এদেশ দখল করে ও সুদূর প্রাচ্যের উপর আধিপত্য বিস্তার করে তখন ছাত্রদের সুবিধার জন্তে সিঙ্গাপুর মেডিকেল স্কুল উঠিয়ে দিয়ে মালাক্কায় স্থানান্তরিত করে। সিঙ্গাপুরে তখন তারা মিত্রপক্ষের বোমারু বিমানের বোমাবর্ষণের আশঙ্কায় ভীত হয়ে পড়েছিল। এক অংশে দেখলাম ছেলেদের হোস্টেল, আর একটি অংশে ক্লাস। নীচে ছেলেদের মেস রয়েছে। প্রত্যেক খাবার টেবিলে নাম লেখা রয়েছে—এখনও কেউ পরিষ্কার করে নি। চীনা, সিংহলী, মালয়ী ও ভারতবর্ষীয় সব জাতির ছেলেরা এখানে পড়তে এসেছিল এই নামাবলী দেখেই বুঝতে পারলাম। এদের পড়াবার জন্তে ভাল ভাল অধ্যাপক জাপান থেকে এসেছিলেন। নূতন দু-একটি ঔষধও যুদ্ধের সময় এরা তৈরি করেছিল। এর পরে আমরা গেলাম মেডিক্যাল ওয়ার্ডে। মেঝে ও পাশের দেয়াল (সাড়ে তিন ফুট পর্য্যন্ত) রবার দিয়ে মোড়া। কেউ জোরে চললে যেন পদশব্দে রোগীদের বিশ্রাম ও শান্তির ব্যাঘাত না হয়। নার্সদের অনুমতি নিয়ে আমরা ওয়ার্ডে গেলাম। এখানে রোগীর সংখ্যা খুব কম—প্রায় সবাই গরীব মালয়ী। জাপানী আমলে এরা এখানে আসতে ভয় পেত —এখন জাপানীরা চলে যাওয়াতে একে একে এসে জুটছে। তিন শ্রেণীর কেবিন দেখলাম। নার্সগুলি সব চীনা—মালয় দেশে এদের জন্ম ; স্বাস্থ্যবতী ও বেশ কর্মঠ। জাপানী আমলে এরাই ছিল এখানকার নার্স। এদের উপর জাপানীরা কোন অত্যাচার করে নি। এখানে অনেক অষ্ট্রেলিয়ান নার্স ছিল যুদ্ধবন্দী হয়ে—তাদের প্রতি নাকি খুব খারাপ ব্যবহার করা হয়েছিল। সিঁড়ি বেয়ে আমরা পাঁচ তলার ছাদে উঠলাম। সেখান থেকে মিত্র মশায় পুরনো হাসপাতাল দেখালেন, একটা বনের মধ্যে ছোট ছোট বাংলো অনাবৃত অবস্থায় পড়ে আছে। এখান থেকে 'জোহর বারু'র পাহাড় দেখতে পাওয়া যায়, দূরে কালো পাহাড় মেঘে ঢাকা রয়েছে। হাসপাতালের নির্ম্মাণ আরম্ভ হয় ইং ১৯২৮ সালে এবং শেষ হয় ইং ১৯৩৪ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে। ওখান থেকে সার্জিক্যাল ওয়ার্ড এবং প্যাথোলোজি রুম দেখতে গেলাম। পাশেই মর্গ (পোষ্টমর্টেম রুম) রয়েছে। এই সব দেখবার পর মিত্র মশায় আমাদের চায়ের নিমন্ত্রণ করলেন।

'সিটি লাইট'—নৃত্য-ভবন
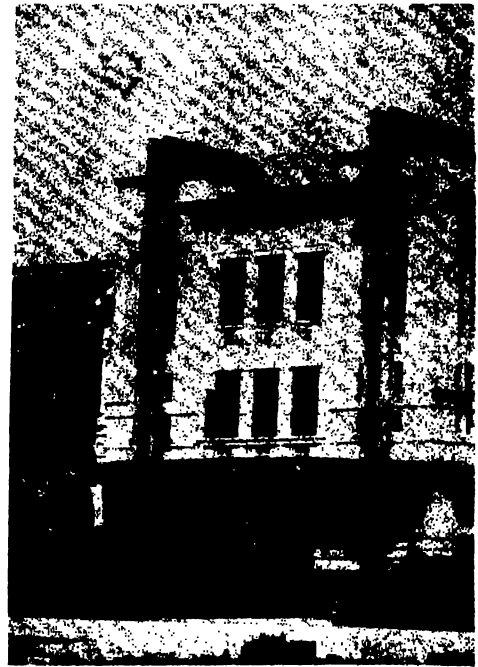
ফিরলাম বাজারের দিকে, বাজারটি শহরের এক পাশে—শাকসজী অনেক রকম নজরে পড়ল। সেখান থেকে একটু ঘুরে মালাক্কা রেলওয়ে স্টেশন। গিয়ে দেখি স্টেশনটি ঠিকই আছে—কিন্তু রেল লাইন নেই। জাপানীরা তাদের কাছে রেল লাইন পাতবার জন্ত এগুলো সব তুলে নিয়ে গেছে। আমি তাদের ওদিকে গিয়েছিলাম, কিছু কিছু নূতন রেল লাইন পাতা হয়েছে দেখেছি। শহরের মধ্যে অনেক দোকানপাট রয়েছে—ছোট ছোট রাস্তা আর সব চীনাদের দোকান। এখানে সব জিনিষ সস্তা।

আর দেরি করা যায় না—ক্যাম্পে আজই ফিরতে হবে, তাই সেন মশায়ের ওখানে খাবার জন্তে গাড়ীর মোড় ফেরান হ'ল। সেন-গৃহিণী চমৎকার হালুয়া আর কফি তৈরি করে রেখেছিলেন। খেতে বেশ লাগল। নমস্কার জানিয়ে ওঁদের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে আমরা ফিরতি পথ ধরলাম।

নব-সন্ন্যাস

শ্রীবিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়

৬

টুলু নিরতিশয় বিস্ময়ে মাষ্টার মশাইয়ের মুখের পানে একটু চাহিয়া রহিল, তাহার পর শুধু বলিল—"ব্যভিচার!"

এর আগে ধর্ম লইয়া, অন্তত তাহার ধর্ম-বিশ্বাস লইয়া এক-আধবার বিদ্রূপ করিয়াছেন—তাও মনে হইয়াছে লঘু ভাবে কখন-কখন কথা কওয়া স্বভাব বলিয়াই—একেবারে সোজাসুজি যে এতবড় আঘাতটা দিবেন, টুলু নিজের মনকে যেন বিশ্বাস করাইতে পারিতেছে না। একটু ক্ষুব্ধ কণ্ঠে প্রশ্ন করিল—"আপনি কোন্‌টাকে ব্যভিচার বললেন স্যর, তান্ত্রিক সিস্টেমটাকেই, না, সিদ্ধবাবার এই যে সমাধিপ্রাপ্তি, এই যে শুচি-অশুচি সম্বন্ধে নির্বিকার ভাব, এই যে সবকিছুর মধ্যেই তাঁর তেজের বিকাশ…"

কণ্ঠে শুধু ক্ষোভই নয়, খানিকটা আবেগও আসিয়া পড়িয়াছে, বোধ হয় একটু দৃপ্তভাবও—সামান্য হইলেও একটু বিদ্রোহ। মাষ্টার মশাই বলিলেন—"তন্ত্র সিসটেমটা সম্বন্ধে আমি কিছু বলবার অধিকারী নই টুলু। আমার জীবনে আমি ধর্মচর্চা করবার অবসর পাই নি, অন্তত এই সিসটেম অনুযায়ী ধর্ম, যাকে ক্রীড (creed) বলে, যা এক মানুষ থেকে অন্য মানুষকে আলাদা করে রাখে। তাই আমি ধর্ম সম্বন্ধে নীরব থাকাই পছন্দ করি। তবে এ প্রশ্নটা ত মনে উদয় হতে বাধ্য যে, এই প্রায় হাজার বছরের মধ্যে যে সব সাম্প্রদায়িক ধর্মের উৎপত্তি—বোধ হয় মাত্র একটির কথা বাদ দিলে—তারা আমাদের দিয়েছে কি? আমাদের যা সবচেয়ে বড় সর্বনাশ পরাধীনতা—তা থেকে আমাদের উদ্ধার করতে পেরেছে?—যা হারিয়ে, আমাদের ঘর বাঁচিয়ে, আমাদের সম্ভ্রম বাঁচিয়ে, এমন কি যে ধর্মকে সবচেয়ে বড় বলে মেনে নিয়েছি তাকে পর্যন্ত বাঁচিয়ে আমরা মানুষের মর্যাদায় সোজা হয়ে দাঁড়াতে পারি নি। বরঞ্চ দিন দিনই নতুন নতুন ক্রীডের নব নব মোহে আমরা জীবন সম্বন্ধে উত্তরোত্তর উদাসীন হয়ে গেছি, যে জীবন এত বড় একটা বাস্তব, যার মধ্যে এত বড় সম্ভাবনা রয়েছে তাকে ঠেলে রেখে…"

"কিন্তু আমরা কি মিছিমিছিই ঠেলে রেখেছি? এই বৈরাগ্যের মধ্যে দিয়ে আমরা কি একটা বড় আনন্দ অর্জন করছি না স্যর?"

আগ্রহের বাঁধা বুলি; মাষ্টার মশাই প্রশ্ন করিলেন—"কোথায়?"

"এর পরের জন্মে—পরলোকে—সেখানে আনন্দ আরও সত্য।"

মাষ্টার মশাই একটু চুপ করিলেন। তাঁহার মুখে আবার একটু হাসি ফুটিল, ব্যঙ্গের হাসি, বলিলেন—"করছিই যে, এমন বলতে পারি না, তবে করলেও সে আনন্দ আমাদের সামনে থেকে উবে যাবে টুলু—আমাদের মনের গঠনই এমন হয়ে দাঁড়িয়েছে যে আমরা যেটা হাতের কাছে পাচ্ছি সেটা ছেড়ে ক্রমাগতই একটা আরও বড়র জন্যে ব্যাকুল হয়ে উঠি।—অনেক তপস্যার স্বর্গ পেলে আমরা সেটাকেও পায়ে ঠেলে আরও একটা বড় স্বর্গের জন্যে ব্যাকুল হয়ে উঠব—আমরা অর্জনই করে যাব, পাওয়া—ভোগ করা এ চিরবৈরাগীদের ভাগ্যে কখনই জুটবে না।—যাক্, তোমার প্রশ্নের ওপর একটু অবান্তর কথা এসে পড়ল। আমি যা বলছিলাম—নতুন নতুন ক্রীডের মোহে, এত বড় সম্ভাবনার যে জীবন সেটা সম্বন্ধে আমরা একেবারেই উদাসীন হয়ে গেছি। আমাদেরই সমাজ-শরীরের অংশ ভেঙে আলাদা হয়ে গেছে, নির্বিকারভাবে চেয়ে দেখেছি। বড় বড় যাঁরা ধর্মপ্রবর্তক তাঁদের অশ্রদ্ধা করি আমার এমন ধৃষ্টতা নেই, তবে একটা কথা ঠিক যে হয় তাঁরা তাঁদের বাণীকে একেবারে যুগোপযোগী করে দিতে পারেন নি, নয় ত লোকে নিতে পারে নি; হয়ত দু'টোই একসঙ্গে সত্য। চৈতন্যের ধর্মই দেখ না—অন্তত আচণ্ডাল সবাইকে কোল দিতে বলেছিলেন তো? ও-যুগে যা সবচেয়ে অচিন্তনীয় ব্যাপার—মুসলমানকে পর্যন্ত তিনি নিজের ধর্মে গ্রহণও করেছিলেন। লোকে পারলে রাখতে? সেই জাত-পাঁত সবই রয়ে গেল—বাড়তির মধ্যে এল অভিসারের জয়জয়কার আর পুরুষদের কণ্ঠে মেয়েদের বিরহের নাকী কান্না! একে পুরুষ দেশে ছিলই কম—"

টুলু বাধা দিল, বলিল—"স্যর…"

মাষ্টার মশাইয়ের কথাগুলা ক্রমশই দ্রুত হইয়া উঠিতেছিল, যা সাধারণত হয় না; চুপ করিয়া একটু অন্যমনস্ক হইয়া রহিলেন। একটু পরে প্রশ্ন করিলেন—"কিছু বলবে?"

মাত্র বাধা দিবারই উদ্দেশ্য ছিল টুলুর, তবু প্রশ্ন করিল—"কিন্তু এতে চৈতন্য আর কি করতে পারতেন?—আপনি—'হয়ত দুটোই একসঙ্গে সত্য'—বললেন, তাই জিগ্যেস করছি।"

"এত বড় মুক্তির মন্ত্র যে দিলেন, তার সঙ্গে শৌর্যের মন্ত্র দেওয়া উচিত ছিল, কেননা শৌর্যই মুক্তিকে রক্ষা করতে পারে। যে সাহস, মনের যে বলিষ্ঠতা পেলে সমাজের এই জাত-পাঁতের বাঁধন ছিঁড়ে ফেলা যেত, সেই সাহস আরও এগিয়ে আরও বড় জিনিস এনে দিতে পারত আমাদের—আরও বড় মুক্তি। এও হতে পারে উনি ভেবেছিলেন এই মুক্তি থেকেই ওই সাহস জন্মাবে; কিন্তু মাটির দোষেই হোক, যা যে জন্যেই হোক, তা জন্মাল না।"

দু'জনেই অনেকক্ষণ চুপ করিয়া রহিলেন। বেশ খানিক-ক্ষণ পরে মাষ্টার মশাই বলিলেন—"কিন্তু আমি আগেই বলেছি আমি অনধিকারী টুলু, ধর্ম নিয়ে নাড়াচাড়া করবার অবসর আমি পাই নি জীবনে। শুনেছি সব ধর্মের সামনেটা তার খোলস মাত্র, ভেতরে অতি সূক্ষ্ম জিনিস আছে। আমার মোট বক্তব্য, তা মেনে নিলেও এ যেন গোড়া কেটে আগায় জল দেওয়া হচ্ছে। —ধরো ঐ বস্তিটা—তুমিই বললে ওরা মানুষের স্তর থেকে নেমে গেছে। আমি বলি আগে ওদের মানুষের স্তরে তুলে নিয়ে আসতে হবে—শুধু পেটের অন্ন, পরনের কাপড় আর মানুষের সাধারণ নীতিবোধ দিয়ে, তার পর ওদের ধর্ম দেওয়া আর সূক্ষ্ম তত্ত্বকথা বলা—যতক্ষণ তা না হচ্ছে, ততক্ষণ এই ধরণের ধর্ম আমার একটা অমার্জনীয় বিলাস বলেই মনে হয় টুলু। ইতিহাসের গোড়ায় দেখতে পাই যতদিন নাকি আর্যদের অতিমাত্রায় যুদ্ধবিগ্রহ নিয়ে থাকতে হ'ত, ততদিন যুদ্ধটাই ছিল সমাজ-জীবনের বড় কথা, যুদ্ধ তখন সবার সাধারণ ব্রত ছিল। যুদ্ধ কাণ্ড শেষ করে যখন সমাজ গোছাবার অবসর হ'ল তখন তাঁরা ধর্মকে শ্রেষ্ঠ জায়গা দিয়ে, যারা তাতে ব্রতী —অর্থাৎ ব্রাহ্মণদের সুদ্ধ সমাজের শীর্ষে তুলে রাখলেন। আমাদের এখন চারদিকে যুদ্ধের অবস্থা চলছে টুলু, এমন অবস্থা যে রক্ষাও করতে পারছি না ধর্মকে, এখন—"

টুলু বলিল—"কিন্তু জীবন থেকে ধর্মকেই যদি বাদ দিলাম, ঈশ্বরকেই যদি—"

মাষ্টার মশাই টুলুর পিঠে হাত দিলেন, বলিলেন—"ঈশ্বরে আর ধর্মেতে এক জায়গায় বিস্তর তফাৎ আছে টুলু—যেখানে তফাৎ আমি সেইখানটার কথাই বলছিলাম বিশেষ করে।"

কথাটা টুলুর মনে থিতাইয়া বসিবার জন্যই মাষ্টার মশাই একটু বেশি সময় লইলেন এবার। এত বড় একটা বিরুদ্ধোক্তিতেও টুলু যখন কোন প্রশ্ন করিল না, মাষ্টার মশাই নিজেই আবার আরম্ভ করিলেন—"তুমি আমায় জিগ্যেস করলে আমি তন্ত্রকে ধর্মের ব্যভিচার বললাম—কি তোমার সিদ্ধবাবার মতন তান্ত্রিককে—তাই থেকেই কথাগুলো এসে পড়ল। তোমার কথার আসল উত্তরটা আমার এখনও দেওয়া হয় নি। ব্যভিচার আমি বিশেষ করে এদেরই কীর্তিকলাপকে বলেছি।"

'এদের'—কথাটার একটু বেশি ঝোঁক দিলেন মাষ্টার মশাই। টুলু দৃষ্টি নত করিয়া শুনিতেছিল, বোধ হয় যে অবজ্ঞাটা প্রকাশ পাইল তাহার জন্যই একবার মুখ তুলিয়া চাহিল, কিন্তু মাষ্টার মশাই লক্ষ্য করিলেন এবার টুলু শিহরিয়া উঠিল না। বলিয়া চলিলেন—"এদের প্রতি আমার আক্রোশ আর ঘেন্নার অন্ত নাই টুলু; কিন্তু তা এই জন্যে নয় যে এরা গাঁজা-মদটাকে 'কারণ' বলে তাইতে ডুবে থাকে,—আমি ত বলি এদের যা জীবন তাতে এরা যত বেশি ডুবে থাকে, সংসারের ওপর এরা এদের কলুষ-দৃষ্টি যত কম দিতে পারে ততই ভাল। তার পর এরা যে অমুক অমুক লক্ষপতির গায়ে বসে জোঁকের মত রক্ত-শোষণ করছে তাতেও আমার দুঃখ নেই, কেননা সে রক্ত যত কমে সমাজের ততই কল্যাণ—আমার দুঃখ আর আক্রোশ এই জন্যে যে, তোমাদের মতন ভাবপ্রবণ যুবকদের চিন্তাশক্তিকে মোহগ্রস্ত করে একেবারে অসাড় করে দিয়ে এরা নিজেদের পসার জমিয়ে চলেছে। তোমার মতন একটা বাঙালীর ছেলে দেখলে আমার লোভ হয় টুলু—তোমাকে যে সেদিন শক্ত পায়ে বাগি-রাতির দিকে চলে যেতে দেখলাম, সে কথা আমি কখনও ভুলব না। যে সাধনা আলেয়ার পিছনে নষ্ট হ'ল, আলোর পিছনে যদি তা লাগাতে পারা যেত! আমি সেদিন সমস্ত রাত্রি এই দুঃখই করেছি। আমি অনেক সাধনাই চোখের সামনে এই ভাবে অপব্যয় হতে দেখেছি, তার আপশোষ আমার যাবার নয়। আমার আক্রোশ এদের প্রবঞ্চনার জন্যে; এরা ঐ আলেয়া পচা বিলের বিষাক্ত গ্যাস, এরা আলোর মুখোস পরে এই মোহ ঘটাবে কেন?—এই আমার নালিশ এদের বিরুদ্ধে। ছ' ফুট তিন ইঞ্চির রাঙা টকটকে লাস নিয়ে—"

মাষ্টার মশাই থামিয়া গেলেন, লক্ষ্য করিলেন এবার এত বড় মোক্ষম আঘাতেও টুলু মুখ তুলিল না। কি একটু ভাবিলেন, তাহার পর বলিলেন—"কিন্তু তোমার দেরি হয়ে যাচ্ছে টুলু, একে রাত করেই এসেছ; আর একদিন না হয়—"

টুলু মুখ তুলিয়া বলিল—"রাত একটু হোক গে না, কি আর হয়েছে?"

এই উত্তর প্রত্যাশা করিয়াই বলা কথাটা, সিদ্ধিকে সামনে যেন প্রত্যক্ষ করিয়াই মাষ্টার মশাইয়ের অন্তরটা নাচিয়া উঠিল, আবার আরম্ভ করিতে যাইতেছিলেন, টুলু হঠাৎ একটু বিদ্রোহী ভাবেই মাথা তুলিয়া প্রশ্ন করিল—"কিন্তু এঁরা প্রবঞ্চক, এঁরা যে আলেয়া এটা শেষ পর্যন্ত না দেখে জানছি কি করে স্যর? শেষ পর্যন্ত না দেখে, এঁদের ভাল ভাবে বোঝবার অভিজ্ঞতা অর্জন না করে যদি একটা অভিমত খাড়া করি যে এঁরা আমাদের বিচারশক্তিকে মোহগ্রস্ত করেছেন, তবে আমাদের খুব গর্হিত একটা মিথ্যাচরণের ভাগী হবারই সম্ভাবনা নয় কি?"

এবার মাষ্টার মশাইয়ের বিস্মিত হইবার পালা; যখন ভাবিলেন কথাগুলা টুলুর মনে বসিয়াছে—বিজয় একেবারে মুঠার মধ্যে, তখন হঠাৎ টুলু যেন একেবারে ফণা বিস্তার করিয়া দাঁড়াইল; তাঁহার মুখের সবচেয়ে রূঢ় কথাগুলি বেশ দু'টি দর্পিত প্রশ্নের মধ্যে সাজাইয়া ধরিয়া মুখের পানে চাহিয়া রহিল। প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই মাষ্টার মশাইয়ের মুখে কিন্তু হাসি ফুটিল; যেন এও একটা সুলক্ষণ, চরম পরাজয় স্বীকারের পূর্বে এটা যেন হবেই। ধীরে ধীরে বলিলেন—"টুলু, চরণদাস যা খেয়েছিল আর আজ তোমার সিদ্ধবাবা যা খেয়েছেন তার মধ্যে মূলগত কোন তফাৎ আছে?—একটুও—এতটুকু?"

টুলু যেন একটা ঘা খাইয়া সিধা হইয়া বসিল, ক্ষণেক

সেকেণ্ডও তাহার মুখে কোন কথাই সরিল না, তাঁহার শব্দ বলিল—"ওঁর ওটা মদ নয়, মন্ত্রপূত 'কারণ'।"

মাষ্টার মশাই বলিলেন—"মন্ত্রপূত 'কারণ' হলে ত উঁচুতেই তুলে নিয়ে যাবার কথা—দোতলা থেকে তেতলায়, নিচে নর্দমায় টেনে ফেলবে কেন ?"

ব্যঙ্গটার তীব্রতায় আর ভিতরে নূতন সন্দেহের অস্বস্তিতে টুনু যেন নিস্পন্দ হইয়া গেল। একটা উত্তর ভাবিয়া লইবার জন্যই স্থির দৃষ্টিতে মাষ্টার মশাইয়ের মুখের পানে খানিকক্ষণ চাহিয়া রহিল, কয়েকবার মাথা নাড়িয়া এদিক ওদিক চাহিলও, তাহার পর আবার নিরুপায় ভাবেই দৃষ্টিটা আগের জায়গায় ফিরাইয়া আনিল। মাষ্টার মশাই বলিলেন—"তুমি আবেগের মাথায় চরণদাস আর তোমার সিদ্ধবাবার সম্বন্ধে যে কথাগুলো বলেছ—মনে রেখ, দুজনের কথাই তুমি আবেগের মাথায়ই বলেছ—সেগুলো যদি আমি পাশাপাশি লিখে রাখতে পারতাম ত দেখতে তার মধ্যে বিষয়ের দিক দিয়ে একটুও তফাৎ নেই।—সেই নর্দমা, সেই পাঁকে ল্যাপটানো মাথার চুল, পরিধেয়, সেই তীব্র নেশায় অচেতন অবস্থা, সেই রক্ত চক্ষু,—একটুও কি তফাৎ আছে ? ভেবে দেখ,—এমন কি চরণদাসও তোমায় সে 'নেকালো!'—বলে তেড়েফুঁড়ে উঠল, তোমার সিদ্ধবাবাও ঠিক সেই 'নেকালো' বলেই তোমায় অভিনন্দিত করলেন।—কিন্তু বিষয়ের দিক দিয়ে, ঘটনার দিক দিয়ে এক হ'লেও, ভাবের দিক দিয়ে, আর সেই জন্যেই ভাষার দিক দিয়ে কত প্রভেদ হয়ে গেছে দেখ। তোমার বর্ণনাটা চরণদাসের বেলায় হ'ল—নেশায় বেহুঁস, সিদ্ধবাবার বেলায় হ'ল—সমাধি, অর্থাৎ যোগের চরম সিদ্ধি—সাযুজ্য। চরণদাসের চোখ হ'ল—নেশায় টকটকে লাল, গর্তের মধ্যে এক জোড়া ভাঁটার মত জ্বলছে, সিদ্ধবাবার বেলায় হ'ল—আকর্ণবিস্তৃত চোখে করুণায় চল চল দিব্য চাহনি। চরণদাসের বেলায় হ'ল—বিকৃত স্বরে তিরস্কার, আবার ঠিক সেই তিরস্কারটাই তোমার সিদ্ধবাবার বেলায় হ'ল—পরীক্ষা, দয়ার রহস্য। বিচারশক্তি যদি পক্ষাঘাতগ্রস্ত নাই হয়ে থাকে ত এমন ওলট-পালট আর কি করে হয় টুনু ? এ আলেয়ার সম্মোহন নয় ত কি ? প্রবঞ্চনা ভিন্ন একে কি বলব ?"

আর একটু চুপ করিলেন, তাহার পর বলিলেন—"এর চেয়ে চরণদাসের ব্যাপারটা বেশ স্পষ্ট, তার ব্যবহারটাও সাধু, অর্থাৎ ইংরিজিতে যাকে বলা যায় More honest; তিরস্কারটা তিরস্কার বলেই নিয়ে তুমি তার পথ ছেড়ে দাঁড়াবে এই তার অভিপ্রেত ছিল, তাকে প্রণামী দিতে গেলেও সে নর্দমাতেই ফেলে দিত দেখতে। হয়ত বলবে তোমার সিদ্ধবাবাই যে হাতে করে নিয়েছিলেন একথা তুমি আমায় কখন বললে ?...মেনে নিচ্ছি, নেন নি, না-নেওয়াই সম্ভব ও অবস্থায়; কিন্তু যাতে নর্দমায় না পড়ে, আর 'নেকালো' কথাটারও তুমি যাতে আসল অর্থ নিয়ে পৃষ্ঠভঙ্গ না দাও তার জন্যে তিনি কাছে শিষ্যদের পাহারা বসিয়ে রেখেছিলেন।"

জলটা খুব তাড়াতাড়ি বহিয়া গেলে মাটিতে বসিতে পায় না; মাষ্টার মশাই আবার চুপ করিলেন। নির্জন জায়গাটার নিস্তব্ধতাটুকু এটুকু শব্দের বিরতিতে যেন জমাট বাঁধিয়া উঠিল, শুধু খুব দূরে কয়েকটা সেকেণ্ডের জন্য একটা উৎকট শব্দে সেই স্তব্ধতা একটু ব্যাহত হইল; বোধ হয় বস্তিরই কিছু ব্যাপার, টুনু একবার মুখটা ঘুরাইল সেদিকে; আবার দৃষ্টি নত করিল। জ্যোৎস্না আরও স্বচ্ছ হইয়া উঠিয়াছে, টুনুর মুখের আলোছায়ার রেখাগুলা আরও স্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে; মাষ্টার মশাই কয়েকবারই ঘুরিয়া ঘুরিয়া দেখিলেন বাইরের আলোছায়ার সঙ্গে ভিতরেরও আলোছায়া, রেখায় রেখায় একটা অব্যক্ত বেদনা, সংসারের জ্বালা, অনুতাপ; তাহার পাশে সংশয়মুক্তি, আশার আলোক। মাষ্টার মশাই লক্ষ্য করিতে লাগিলেন এই আলোই ধীরে ধীরে যেন হইয়া উঠিতেছে জয়ী।... আরও ভাবুক ও, দরকার আরও চিন্তা।

এক সময় টুনু হঠাৎ দাঁড়াইয়া উঠিল, একটু অপ্রতিভ ভাবে হাসিয়া বলিল—"আজ উঠি তা হলে স্যর, রাত হয়ে গেছে।"

"হ্যাঁ, আমি যখন উঠতে বলেছিলাম তার চেয়ে মিনিট পাঁচেক ত বেড়েছেই রাতটা।"

—কথাটা বলিয়া মাষ্টার মশাই হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিলেন। বলিলেন—"না, ওঠো, সত্যিই হয়েছে রাত।"

দুয়ার পর্যন্ত গিয়া প্রশ্ন করিলেন "তোমায় একটু এগিয়ে দোব ?"

টুনু বলিল—"না স্যর, একলাই বেশ যাব।"

টুনু দূরে অদৃশ্যপ্রায় হইয়া গেলে ফিরিয়া আসিতে আসিতে বলিলেন—"ভালই, যতক্ষণ একলা ভাবতে পারে।"

নেপথ্যের মাষ্টার মশাইয়ের সঙ্গে আলোচনা চলিল। নিস্তব্ধতার গায়ে এবার মাত্র একজনের নিশ্বাসের শব্দ।

প্রায় আধ ঘণ্টাটাক পরে দরজায় করাঘাত পড়িল। বনমালী ভাত আনিবে, মাষ্টার মশাই উঠিয়া দরজাটা খুলিয়া দেখেন টুনু দাঁড়াইয়া। মুখে জ্যোৎস্নাটা পুরাপুরি আসিয়া পড়িয়াছে, কোনখানে এতটুকু ছায়া নাই, আর তাহার উপর সেই নিঃসংশয়তার আলোক, তাহাতেও কোথাও যেন আর এতটুকু মলিনতা নাই।

মুখের হাসিটা সেই রকম অপ্রতিভভাবেই ফুটিল কিন্তু, টুনু বলিল—"ফিরেই এলাম স্যর, রাতটা বেশিই হয়েছে মনে হচ্ছে যেন, গেলাম না আর।"

মাষ্টার মশাই ভিতরে আসিয়া বারান্দায় দাঁড়াইয়া প্রশ্ন করিলেন—"কিন্তু তোমার খাওয়া ?"

দুয়ারটা এবার খোলাই ছিল, বনমালী আসিয়া পাশে দাঁড়াইয়া বলিল—"ভাত আনলাম আজ্ঞে।"

টুলু ও মাষ্টার মশাই একবার পরস্পরের মুখের পানে চাহিলেন, তাহার পর কি যেন আশা করিয়া মাষ্টার মশাই আবার প্রশ্ন করিলেন—"কিন্তু তোমার খাওয়ার কি হবে টুলু?"

টুলু আবার অপ্রতিভ হাসি হাসিয়া একেবারে মুখের পানে চাহিয়া লইয়া বলিল—"বনমালীই তার জবাব দিয়েছে স্যর; ওর খাটুনি একটু বাড়ল শুধু।"

চরণ স্পর্শ করিবার জন্য মত হইল। মাষ্টার মশাই বলিলেন, "কিন্তু বনমালীর হাতের খাওয়া মানে চরণদাসের হাতের খাওয়া……চম্পাও বাদ পড়ছে না টুলু।"

টুলু পদধূলি মাথায় লইয়া উঠিয়া দাঁড়াইল, সেই অপ্রতিভ হাসি, বলিল—"তা হোক, কাউকেই বাদ দেওয়া চলবে না স্যর।"

৭

অনেক রাত পর্যন্ত অনেক কথা হইল। টুলু যখন শয্যাশ্রয় করিল তখন রাত তিনটা।

মাষ্টার মশাই জাগিয়াই রহিলেন। স্কুল থেকে খানচারেক বেঞ্চি আনিয়া টুলুর খাট করা হইয়াছে, মাষ্টার মশাইয়ের খুব সংক্ষিপ্ত বিছানার খানিকটা সেই খাটে গেল; তাহাতেই টুলু এত আপত্তি করিল যে মশারির কথাটা মাষ্টার মশাই একেবারে তুলিলেনই না। টুলু ঘুমাইয়া পড়িলে সেটা আস্তে আস্তে খাটাইয়া দিয়া খুব সন্তর্পণে তাহার বিছানার চারিদিকে গুঁজিয়া দিলেন। তাহার তৃপ্ত নিদ্রিত মুখের পানে মাতার মত অপরিসীম স্নেহের দৃষ্টিতে কিছুক্ষণ চাহিয়া থাকিয়া বাহিরে আসিলেন। একবার ভাবিলেন কাঞ্চনতলাটিতে গিয়া বসেন জায়গাটা দুঃখেও টানে, আনন্দেও টানে। কিন্তু টুলু হঠাৎ উঠিয়া পড়িতে পারে, তাহার কাছে থাকাই ভাল। উঠানের দুয়ার খুলিয়া মাষ্টার মশাই রাস্তায় আসিয়া দাঁড়াইলেন; ঘরটা পাশেই, টুলুর গাঢ় নিঃশ্বাসের শব্দ শোনা যাইতেছে।

বাড়ীর সামনেই রাস্তাটা লইয়া খানিকটা চৌরস জায়গা, মাষ্টার মশাই সেইটুকুর উপর পায়চারি করিয়া সমস্ত রাত কাটাইয়া দিলেন। আকাশে পাণ্ডুর এককালি চাঁদ, নিচে সমস্ত খনিচক্র ব্যাপিয়া এখানে-ওখানে আগুনের হল্কা—কোথাও কাঁচা কয়লা পোড়াইতেছে, কোথাও চিমনিগুলাই হইয়া পড়িয়াছে আগুনের পিচকারি। সাহাদের তিন নম্বর খনিটা ধরিয়া গিয়া এখনও জায়গায় জায়গায় জ্বলিতেছে—বড় বীভৎস দেখাইতেছে।

আজ নিজের সঙ্গে মাষ্টার মশাইয়ের আলাপ-আলোচনা তর্ক-বচসার আর অন্ত নাই। পায়চারি করিতে করিতে প্রশ্নের বা উত্তরের গুরুত্বে এক একবার থামিয়া যাইতেছেন, সেগুলা কখন-কখন মনে মনেই, কখন বা স্পষ্ট। একবার দাঁড়াইয়া পড়িয়া বাঁ হাতে ডান হাতের মুঠাটা চাপিয়া বলিলেন—"কিন্তু এত শীগগির ও আসবে না—কখনই না—এরা আসে না এত শীগগির এদের বিশ্বাস বা অবিশ্বাস ছেড়ে।"…বারকয়েক চিন্তিত ভাবে পায়চারি করিয়া এর উত্তরটাও পাওয়া গেল—"কিন্তু যত দেরি করে আসবে, যত ঘুরিয়ে আসবে, তত ভাল করে আসবে; তার জন্যে থাকতে হবে ধৈর্য ধরে,—নরেন দত্তকে বিবেকানন্দে দাঁড় করাতে তো কম বেগটা পেতে হয় নি,—এদের ধাতই এই যে…"

বিরাট দৃশ্যপটের গায়ে সমস্ত রাত একটা স্বগতোক্তি-অভিনয় চলিল। এক সময় দৃশ্যপটটা ধীরে ধীরে পরিবর্তিত হইয়া গেল। পূবের দিকটা আলো হইয়া উঠিয়া শুশুনিয়া পাহাড়ের নীল রেখাটাকে প্রথমে জাগাইয়া দিল। খনিচক্রের অগ্নিস্তূপগুলা স্তিমিত হইয়া আসিল।…মাষ্টার মশাইয়ের মুখে একটা প্রশান্ত দীপ্তি; রাত্রির গ্লানি শরীর মন হইতে ঝাড়িয়া সম্পূর্ণ অন্য একটা অভিনয়ের জন্য যেন প্রস্তুত হইতেছেন, এমন সময় টুলু আস্তে আস্তে বাহির হইয়া আসিয়া পাশে দাঁড়াইল, প্রশ্ন করিল—"সমস্ত রাত ঘুমোন নি স্যর?"

কখন যে ওর ঘুমের সেই গাঢ় নিঃশ্বাস বন্ধ হইয়া গেছে খেয়ালও হয় নাই, মাষ্টার মশাই বেশ একটু থতমত খাইয়া গেলেন, বলিলেন—"ঘুম…মানে—হ্যাঁ—তা, বড্ড গরম বোধ হচ্ছিল টুলু…"

অপরাধীর মত মুখের পানে চাহিয়া একটু অপ্রতিভ হাসি হাসিলেন। টুলু ক্ষুব্ধকণ্ঠে বলিল—"আপনার মশারিখানিও আমার বিছানায় টাঙিয়ে দিয়েছিলেন দেখলাম…"

মাষ্টার মশাই এবার ভালভাবেই হাসিয়া বাঁচিলেন যেন, বলিলেন—"এই দেখো!—ঘুম হচ্ছে না, তবু আমার মশারি বলে আমি গায়ে জড়িয়ে এখানে দাঁড়িয়ে থাকতাম? অধিকার জ্ঞানের এ-যে চূড়ান্ত হ'ল টুলু; ছোট ছেলেরাও এমন খুনসুটিপনা করে না বোধ হয়!"

তাহার পিঠে হাত দিয়া বলিলেন—"তুমি বাড়ি যাও এবার, দিব্যি ঠাণ্ডা আছে। আর হ্যাঁ, আজ রোববার, তিনটের সময় তুমি একবার নিশ্চয় আসবে, সেবারকার মতন যেন স্কুল-পালানে ছেলে হয়ো না। উদ্দেশ্যটাও তোমায় বলে দিই এবার,—তুমি পরিণামটা দেখেছ, কারণ একবার দেখাতে চাই তোমায়, কারণের কতকটা। মানে, একবার খনি দেখতে যাব।

তিনটার আগেই টুলু আসিয়া উপস্থিত হইল। প্রায় পাঁচটার সময় মাষ্টার মশাই তাহাকে লইয়া সাহাদের এক নম্বর খনির মুখে উপস্থিত হইলেন; স্কুলের সেক্রেটারী ম্যানেজার, তাঁহার সম্মতি পূর্বাহ্নেই লওয়া ছিল। দেখাইবার জন্য এক জন যুবক ঠিক করা ছিল—খনির কোন অধস্তন কর্মচারী—মাষ্টার মশাই ঈষৎ হাসির সহিত তাঁহার সাহায্য প্রত্যাখ্যান করিলেন, বলিলেন—"মানুষকে নামবার রাস্তা দেখিয়ে দিতে হয় না; তুমি যাও তোমার কাজে।"

দুই জনে গিয়া লিফ্‌টের খাঁচায় উঠিলেন। আরও দুই জন

উঠিল—দুলি, তাহার পর খাঁচাটি পায়ের তলায় খসিয়া যাইতে লাগিল। একেবারে নূতন অভিজ্ঞতা, টুলু যেন দম বন্ধ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল। কতকটা অভ্যাস হইলে প্রশ্ন করিল—"ছেলেটিকে সঙ্গে নিলেন না তর, আপনি নামেন নাকি এর মধ্যে মাঝে মাঝে?"

মাষ্টার মশাই বলিলেন—"হ্যাঁ, এক এক সময় ওপরের দিকে চেয়ে তোমাদের ভগবানকে বড় ডাকতে ইচ্ছে করে টুলু, তখন তাঁর নিচের রূপটাও এসে দেখি।"

—হাসিয়া বলিলেন, কিন্তু মুখটা সঙ্গে সঙ্গে কঠিন হইয়া উঠিল। টুলু আর কোন প্রশ্ন করিল না, শুধু মাঝে আর এক বার সেই কঠিন মুখের পানে চকিত দৃষ্টিতে চাহিয়া লইল।… খাঁচাটা নামিয়া চলিয়াছে, প্রতি মুহূর্তেই মনে হইতেছে এই বুঝি পা হইতে আলাদা হইয়া গেল। এ অবস্থার মধ্যেও বুকটা একবার হাঁৎ করিয়া উঠিল—জলের তোড়ের শব্দ, যেন একটা বান ডাকিয়াছে।…তখনই কিন্তু কারণটা বুঝিতে পারিল। একটু পরেই খাঁচাটা নিচের মেঝের আসিয়া ঠেকিল, চালক দরজাটা টানিয়া দিতে দুই জনে বাহিরে আসিয়া দাঁড়াইলেন।

হাতকয়েক পরিধি লইয়া গোলমত এক ফাঁকা জায়গা; কালো এবড়ো-খেবড়ো দেয়াল, মাঝে কয়েকটা কালো থামের মত, একটা বিদ্যুতের বাল্‌ব্ থেকে আলো বাহির হইয়া এ-গুলার গায়ে ঠিকরাইয়া পড়িতেছে। চোখ দুইটা একটু অভ্যস্ত হইতেই টুলু টের পাইল—সব পাথুরে কয়লা।…লিফ্‌টের রাস্তায় পা বাহিয়া এবং অন্য চারিদিকেরও দেয়াল বাহিয়া ঝরঝর করিয়া জল নামিয়া নালা দিয়া একটা সুড়ঙ্গের মধ্যে নামিয়া যাইতেছে। গুমটের সঙ্গে স্যাঁতসেতে, অদ্ভুত ধরণের এক গন্ধ, পৃথিবীর উপরে কোথাও এ গন্ধ নাই—টুলুর মনে হইল এ যেন টুঁটি-টেপা পাতালের কষ্টশ্বাস, সংক্রামকতায় যেন তাহারও দম বন্ধ হইয়া আসিতেছে। দৃষ্টি তুলিয়া দেখিল মাথার কয়েক ফুট উপরেই অন্ধকার ছাত, কয়লার চাপ একটা যে-কোন মুহূর্তেই ত উপরের ভারে নামিয়া পড়িয়া এই অবকাশটুকু বন্ধ করিয়া দিতে পারে—নিঃশব্দ মৃত্যু—আর্ত-নাদের এতটুকুও শব্দ পৃথিবীর কাছে পৌঁছিবে না।

এই চত্বরের পরের গোটাচারেক গর্ত প্রায় এই রকমই উঁচু—ঢালু হইয়া নামিয়া গেছে। সবগুলাতেই এক জোড়া করিয়া ছোট রেল পাতা, একটার মধ্যে হইতে জনতিনেক লোক একটা ট্রাক্ ঠেলিয়া তুলিল, কয়লায় বোঝাই, লিফ্‌টের কাছে দাঁড় করাইল। একটা ব্যাচ একটা ট্রাক্ খালাস করিয়া অন্য একটা গর্তের মধ্যে অদৃশ্য হইয়া গেল—সতর্ক করিতে করিতে—যদি কেহ থাকে সেই পথে; তাহাদের কণ্ঠস্বর আস্তে আস্তে মিলাইয়া গেল।…চারিদিকেই লোক—পুরুষ, স্ত্রী, ছেলে, বুড়ো—লিফ্‌ট বাহিয়া ওঠানামা করিতেছে, গর্ত-তলার মধ্যে অদৃশ্য হইয়া যাইতেছে, বাহির হইয়া আসিতেছে, সঙ্গে বেতের ঝুড়ি, গাঁইতা, গোতেল—বিটকেল চেহারা—শুধু চোখ দুইটি আর ওষ্ঠাধর ছাড়া অঙ্গে সর্বত্র কয়লার আধিপত্য। কেমন একটা ক্লান্ত, নিস্পৃহ ভাব সবার মুখে, মৃত্যুর সঙ্গে ঘর করিয়া অভ্যাসের একটা অবহেলা আছে—তবুও চোখে-মুখে একটা চাপা ভয়ের ছাপ, এ জিনিষটা টুলু সেদিনও বস্তিতে সবার মুখে লক্ষ্য করিয়াছিল—খনির কুলিকে যেন একটা আলাদা জাতই করিয়া রাখিয়াছে। অথচ এর মধ্যে হাসিও আছে, ঠাট্টাও আছে, সম্পূর্ণ এক অন্য জগৎই।

মাষ্টার মশাই বলিলেন—"এইটুকু হ'ল এখানকার গড়ের মাঠ, এইবার চল একটা সুড়ঙ্গের মধ্যে ঢুকি। দাঁড়াও, একটা লোক নিই, সব জায়গায় আবার আলো পাওয়া যায় না।"

এক জন কেরাণীগোছের লোক একটা টেবিলের সামনে বসিয়া কি একটা হিসাব লিখিয়া যাইতেছিল, তাহাকে বলিতে সেফ্‌টি-ল্যাম্প-হাতে একটি বৃদ্ধগোছের কুলি সঙ্গে দিল। টুলু একটু অপ্রসন্ন হইয়া প্রশ্ন করিল—"সে ছোকরাকে সঙ্গে নিলেন না যে তা হলে?"

মাষ্টার মশাই বলিলেন—"খনির গুণগান করতে ত আমরা নামি নি। এমন কিছু মুখ দিয়ে বেরিয়ে যেতে পারে আমার যা এদের শ্রুতিমধুর নাও হতে পারে।"

এবড়ো-খেবড়ো ঢালু পথ দিয়া নামিয়া চলিলেন। মাথার উপর খিলানটা আরও নিচু, এক এক জায়গায় এত নিচু যে, একটু কুঁজো হইয়া না গেলে বিপদ আছে; লোকটা আগাইয়া যাইতেছিল, সাবধান করিয়া দিতে লাগিল। এক এক জায়-গায় দুই ধারের দেয়ালও আগাইয়া আসিয়া গলিটাকে আরও সঙ্কীর্ণ করিয়া দিয়াছে, মাঝখান দিয়া সেই রেলপথ, এদিকে খানিকটা খাঁজের মধ্য দিয়া জলের স্রোত নামিয়া যাইতেছে। এই রকম একটা দু'ধার-চাপা জায়গায় আসিতে হঠাৎ একটা গুম্ গুম্ শব্দ উঠিল, যেন রেল বাহিয়া আসিতেছে শব্দটা, সঙ্গে সঙ্গে অস্পষ্ট সতর্কবাণীর মত—মাটির অত নিচে শব্দেরও যেন জাত বদলাইয়া গেছে।

কুলিটা ঘুরিয়া দাঁড়াইল, বলিল—"ট্রাক্ নামছে গো বাবু।"

জায়গাটা অত্যন্ত সঙ্কীর্ণ হওয়ায় অত নিজেও কি একটা জোরে বলিয়া চালকদের সাবধান করিয়া দিল। মাষ্টার মশাই তাড়াতাড়ি টুলুকে লইয়া অপেক্ষাকৃত চওড়া জায়গায় গিয়া দাঁড়াইলেন; কয়েক সেকেণ্ড পরে খালি ট্রাকটা নামিয়া গেল। ঢালুর মুখে দুই জন লোক উল্টা দিকে ঝোঁক দিয়া তাহার গতিটা সংযত করিয়া চলিতেছে।

টুলু শুষ্ক মুখে মাষ্টার মশাইয়ের দিকে চাহিল। তিনি একটু হাসিয়া বলিলেন—"অবশ্য পাশাপাশি দেয়াল ঘেঁসে দাঁড়ালে বিপদ ছিল না, তবে একেবারেই কি নিরাপদ?"

টুলু প্রশ্ন করিল—"বাড়িয়ে দেয় না কেন ফাঁকটা এখানে?"

"খুব সম্ভব জায়গাটায় শক্ত পাথরের চাই পড়ে গেছে।"

"কয়লার মধ্যে হঠাৎ শক্ত পাথরের চাই যে? আর,

থাকেই তো পথ করবার সময় কেটে ফেলে নি কেন? এ যে কুলিদের প্রাণ নিয়ে—"

মাষ্টার মশাই ঘুরিয়া দাঁড়াইলেন, হাসিয়া বলিলেন—"খনির মালিকদের জন্যে বিশেষ করে খনি নিজেকে তোয়ের করে নি, সুতরাং মাঝে মাঝে এক-আধখানা শক্ত পাথর নিজের গায়ে ওভাবে বসিয়ে নেবার তার অধিকার আছে; তার পর, খনির মালিকরাও বিশেষ করে কুলিদের বাঁচাবার জন্যেই টাকা খরচ করে মাটির ভেতর এই কাণ্ডটা করে নি, সুতরাং ওরকম এক-আধটা খুনে পাথর যদি ছেড়েই যায় তো তাদেরও অগ্রাহ্য করবার অধিকার আছে।"

সঙ্গী কুলিটা বলিল—"উটি পাষাণ পাথ্যর আজে, নড়েক নাই, ভাঙেক নাই।"

টুলু প্রশ্ন করিল, "লোক মারা পড়ে না?"

"হুঁ মরছেঁ; থেঁতো হইছেঁ—মরছেঁ, থেঁতো হইছেঁ—মরছেঁ; মরবার কি বারোন আছেঁ গো?"

বেশ নিশ্চিন্ত আর নির্বিকার ভাবে মাথা দুলাইয়া দুলাইয়া কথাগুলা বলিতে বলিতে অগ্রসর হইল।

এই সুড়ঙ্গটার গা ভেদ করিয়া অন্য সব সুড়ঙ্গও মাঝে মাঝে ডাইনে বামে চলিয়া গেছে, কোনটা অনেক দূর—অন্তত অস্পষ্ট আলোয় তাই মনে হয়, কোন কোনটা কয়েক হাত মাত্র; খোঁড়া হইতেছে, দেয়ালের গায়ে গাঁইতার চোট পড়িয়া বড় বড় কয়লার চাপ খসিয়া পড়িতেছে, সংগ্রহ করিতেছে বেশির ভাগ মেয়ে-কুলিরাই, বেতের ঝুড়িতে মাথায় করিয়া লইয়া গিয়া ট্রাকে বোঝাই করিতেছে।

একটি অল্পবয়সী স্ত্রীলোক ঝুড়িটা খালি করিয়া তাহাদেরই সামনে নিতান্ত ক্লান্ত ভাবে আসিয়া নূতন একটা সুড়ঙ্গের মুখে দেয়ালে ঠেস দিয়া এলাইয়া বসিল। গাল বসা, চোখ দুইটা কোটরের মধ্যে জ্বল জ্বল করিতেছে; ঘামে চুলগুলা পর্যন্ত ভেজা; মুখে ক্লান্তির সঙ্গে একটা অসহায় আতঙ্কের ছাপ। বক্ষ আর উদর ফুলিয়া এক হইয়া উঠিয়াছে, স্ত্রীলোকটি টানিয়া টানিয়া সমস্তটার উপর হাত বুলাইতে লাগিল, মুখটা মাঝে মাঝে যেন অসহ্য বেদনায় কুঞ্চিত হইয়া উঠিতেছে।

একটু আগাইয়া গিয়াছিল,—টুলু ফিরিয়া, আর একবার তলাইয়া দেখিয়া শঙ্কিত ভাবে বলিল—"পেটে সন্তান মেয়েটির স্যার! এদেরও খাটতে হয় নাকি?"

কয়েকজন স্ত্রীলোক মেয়েটিকে ঘিরিয়া ফেলিয়াছে, প্রশ্নাদি করিতেছে। মাষ্টার মশাই ঘুরিয়া বলিলেন—"তুমি অঙ্কে তো বড় কাঁচা ছেলে দেখছি টুলু—খালি পেটে, অর্থাৎ শুধু নিজের জন্যে যখন খাটতে হচ্ছে মেয়েদের, তখন সন্তান পেটে আরও বেশি খাটবার কথা নয় কি? দু' দু'টো জীবনের দায়িত্ব ত তার ওপর?"

সুড়ঙ্গের ভিতর দিয়া খুব মৃদু একটা ঠাণ্ডা হাওয়ার স্রোত বহিতেছে, তবু যেন নিশ্বাসের হাওয়া পাইতেছে না টুলু। সেইরূপ শঙ্কিত দৃষ্টিতে চাহিয়াই বলিল—"কিন্তু যেন শুনেছিলাম আইনে গর্ভবতী মেয়েদের খাটতে দেওয়া মানা—।"

"কিন্তু দয়া বলেও ত একটা জিনিস আছে?—যা আইনের ওপর—"

"বুঝলাম না স্যর।"

"খনির মালিক বা খুদে ম্যানেজার—এরা মানুষই ত? দয়া-ধর্ম বলে একটা জিনিস থাকতে নেই এদের? এরা আইনকে লুকিয়ে দেয় খাটতে বেচারাদের; রোজগার চাই তো?"

মেয়েটিকে ঘিরিয়া আরও কয়েকজন স্ত্রীলোক জড়ো হইয়াছে, জনকতক দাঁড়াইল বলিয়া তাহাকে আর দেখা যাইতেছে না। মাষ্টার মশাই সেই দিকে চাহিয়া একটু কি ভাবিলেন, তাহার পর আবার সামনের দিকে ঘুরিয়া পা বাড়াইয়া বলিলেন—"এসো।"

টুলু যেন স্তম্ভিত হইয়া গেছে, না ঘুরিয়াই বলিল, "কিন্তু শুনেছিলাম যেন বসে খেতে দিতে হয় ক'টা মাস—"

মাষ্টার মশাই আগাইয়া আসিয়া তাহার কাঁধে হাত দিলেন, হাসিয়া বলিলেন—"দু'রকম ভাবেই দয়া করতে হবে? তোমার আবদার কম নয় ত!—চলো, খনিতে দেখবার জিনিসের এমন অভাব নেই যে, এক জায়গায় দাঁড়িয়েই দেখতে হবে, তা ভিন্ন কিছু মেয়েলি ব্যাপার হচ্ছে, ঠিক নয়ও দাঁড়ানো।"

দু'জনেই একসঙ্গে ঘুরিয়া পা বাড়াইলেন, কিন্তু টুলুকে আবার ঠিক তেমন ভাবেই শুম্ভিত হইয়া দাঁড়াইয়া পড়িতে হইল; হাতদশেক পরেই এ সুড়ঙ্গটা আড়াআড়ি অন্য একটার সঙ্গে মিশিয়াছে, সেই তেমাথার মাঝখানে দাঁড়াইয়া চম্পা! একা নয়, পাশেই হাফ-প্যাণ্ট আর নূতন টাইলের আধ হাত পেন্সিলপরা একটি যুবক, চম্পা বেশ দুলিয়া হাসিয়া তাহার সঙ্গে কি একটা প্রসঙ্গ চালাইয়া যাইতেছে।

মাষ্টার মশাই আগাইয়া চলিয়াছেন, টুলু মুহূর্তখানেক থমকিয়া দাঁড়াইয়া আবার অগ্রসর হইল। চম্পার শাড়ি মজলাই তবে বেশ আস্ত আর সযত্নে পরা, একটা বেতের ঝুড়ি উপুড় করিয়া তাহার উপর ডান পা'টা তুলিয়া দিয়াছে, এদিকে নজর পড়িতেই ঝুড়িটা তুলিয়া লইয়া পাশ কাটাইয়া উঠিয়া আসিল; মাষ্টার মশাইকে পিছনে ফেলিয়া টুলুর পাশাপাশি হইয়া একবার মুখ তুলিয়া চাহিল, বেশ একটু হাসি-হাসি ভাব; তাহার পর হন হন করিয়া উঠিয়া গেল।

নামিয়া আসিতে যুবকটি হাত তুলিয়া মাষ্টার মশাইকে নমস্কার করিল, প্রশ্ন করিল—"মাইন্ দেখতে এসেছেন?"

মাষ্টার মশাই প্রতিনমস্কার করিয়া বলিলেন—"হ্যাঁ, এই ইনি নতুন লোক, সখ হয়েছে।"

যুবকটি হাসিয়া নমস্কার করিয়া সামনে আগাইয়া গেল, মাষ্টার মশাই তাহার উল্টা দিকে অগ্রসর হইলেন, বলিলেন—"এটি এসিস্ট্যাণ্ট ম্যানেজার।"

বিশেষ কিছু না মনে করিয়াই টুলু এক বার ঘুরিয়া দেখিল, দেখে যুবকটিও ঘাড় ফিরাইয়া তাহার পানে চাহিয়া দাঁড়াইয়া আছে, চোখের দৃষ্টি বেশ প্রীতিপূর্ণ নয়।

৮

ঘুরিয়া ফিরিয়া আরও অনেকক্ষণ দেখিয়া বেড়াইল। মনটা ক্রমেই নিঝুম হইয়া পড়িতেছে, তবুও একটা উৎকট কৌতূহল। মনে করিতে গেলে যেন বিশ্বাস হয় না যে পৃথিবীর আলো, বাতাস, গতি যেখানে একটা বিরাট্ চাপের নিচে এই রকম স্তম্ভিত সেই জায়গাটাই আবার পৃথিবীতে আলো, বাতাস, গতি জোগাইবার ভার লইয়াছে।...আরও প্রায় ঘণ্টাখানেক ঘুরিয়া মাষ্টার মশাই সঙ্গীকে প্রশ্ন করিলেন—"চরণদাস কোন-খানটায় কাজ করে জানিস ?"

বলিল জানে, একটা দিকে লইয়া চলিল এবং অপর একটা সুড়ঙ্গের মধ্যে প্রবেশ করিল। সেই হাওয়াটা থামিয়া গিয়া একটা বিশ্রী রকম গুমোট। কাজও হইতেছে না। একটু আগাইয়া গিয়া এর গা ঘুঁষিয়া আর একটা সুড়ঙ্গ। সঙ্গী তাহার সামনে আলোটা তুলিয়া ধরিল। মাষ্টার মশাই প্রবেশ করিতে যাইতেছিলেন, শঙ্কিতভাবেই বলিল—"পারবেক নি বাবু!"

না পারিবারই কথা, একেবারে অসহ্য গুমোট, তবু মাষ্টার মশাই ভিতরে পা বাড়াইয়া বলিলেন "না, পারব; এসো টুলু।"

টুলু দুই পা আগাইয়া বলিল—"স্তর, এ রকম কেন ?—এ যে !..."

সত্যই, পৃথিবীর উপরের কোন উষ্ণতার সঙ্গেই এর মিল নাই; সেখানকার উষ্ণতা তীব্র হইলে দগ্ধ করে, এ যেন টুঁটি টিপিয়া মারিতেছে, এ যেন আগুনের প্রেতমূর্তি—ধর্মভ্রষ্ট। আর একটু আগাইয়া টুলু আর্তভাবে বলিয়া উঠিল—"মাষ্টার মশাই!"

হাত দশ-বারো ভিতরের দিকে একটা লোক গাঁইতা চালাইতেছে, বন্ধ করিয়া ফিরিয়া চাহিল—ক্ষীণ বিদ্যুতের আলোয় দেখা গেল শুধু শরীরের একটা বহিঃরেখা আর এক জোড়া জ্বলন্ত চোখ।

মাষ্টার মশাইয়েরও গলার স্বর বদলাইয়া গেছে—একটা অদ্ভুত জিদ, যেন আক্রোশই; বলিলেন—"এগিয়ে এস ?"

"বেরিয়ে আসুন—আসুন বেরিয়ে !!"

নিছক প্রাণধর্মের তাগিদেই টুলু ছুটিয়া বাহির হইয়া আসিল। মাথাটা ঝিম ঝিম করিতেছে, শরীরটা কাঁপিতেছে, অবসন্ন ভাবে দেয়ালে কপালটা ঠেকাইয়া দাঁড়াইয়া পড়িল। বৃদ্ধ তাড়াতাড়ি তাহাকে জড়াইয়া ধরিয়া ফেলিল।

মাষ্টার মশাইও আসিয়া পড়িয়াছেন, সঙ্গে চরণদাস। গাঁইতাটা রাখিয়া দিয়া টুলুকে ধরিয়া ফেলিয়া বলিল—"উই-খানে চলুন আজ্ঞে, বাতাসে।"

সেদিনকার সে চরণদাস নয়, তবু কথা কহিতে মুখ দিয়া ভক্ করিয়া সুরার গন্ধ বাহির হইয়া পড়িল, টুলু মুখটা ঘুরাইয়া লইল।

দুই জনে আস্তে আস্তে বড় সুড়ঙ্গটায় লইয়া আসিল। ঠাণ্ডা, চালানি বাতাস অল্প অল্প বহিতেছে, একটু বসিয়া থাকিয়াই টুলুর শরীরটা অনেকটা স্বাতস্থ হইল; বলিল—"একটু জল পাওয়া যাবে ?"

বৃদ্ধ হাসিয়া চরণদাসের পানে চাহিল, বলিল—"চরণ-দাসের ড্যারায় সাদা জল ?—বাবু কি কয় গো চরণ ভাই!—আমি আন্‌ছি জল আজ্ঞে।"

চরণদাস কপালের ঘাম মুছিয়া বলিল "কি করি বাবু মশাই ?...পেট বড় দুশমন...যাই আজ্ঞে।"

যেন থাকিবার লজ্জা এড়াইবার জন্যই এক বার ভীত দৃষ্টিতে সুড়ঙ্গটার পানে চাহিয়া একটা সেলাম করিয়া ধীরে ধীরে চলিয়া গেল।

টুলু মাষ্টার মশাইয়ের পানে চাহিয়া প্রশ্ন করিল "আপনি আরও ভেতরে গিয়েছিলেন ?"

মাষ্টার মশাই একটু অন্যমনস্ক হইয়া পড়িয়াছিলেন, বলিলেন—"তোমায় বড্ড বেশি এফেক্ট করেছিল, না ? আমারই ভুল হয়েছিল, অতটা আন্দাজ করতে পারি নি।"

একটু হাসিয়া বলিলেন—"আমার কথা আলাদা, আমি সিজন্‌ড (seasoned), আগুনে জলে আর কিছু করতে পারে না; পোল্লাদের ছাপ মেরে দিয়েছে।"

টুলু আতঙ্কের দৃষ্টিতে চাহিয়া বলিল—"মনে করতেও আমার এখনও ভয় করছে স্তর! গরম এ রকম হয়!"

মাষ্টার মশাই বলিলেন—"সুড়ঙ্গটা এফোঁড়-ওফোঁড় না হওয়া পর্যন্ত এই অবস্থা, ভেতরে আরও ভীষণ, ওপর থেকে পাম্প-করা হাওয়াটা খেলতে পাচ্ছে না কিনা। ওঠ, যাওয়া যাক্।"

ঘটনাটুকুর স্মৃতিতে আচ্ছন্ন হইয়া টুলু মাথা নিচু করিয়া চলিয়াছে। এক সময় মুখ তুলিয়া আবার বলিল—"কি গরম স্তর! শুধু সেই কথাই ভাবছি আমি; আর দু'পা গেলেই আমার..."

মাষ্টার মশাই বলিলেন—"আমি যে প্রশ্নটা তোমার কাছে আশা করে নিয়ে গেছলাম, সেটা কিন্তু এখন পর্যন্ত পেলাম না টুলু।"

টুলু থমকিয়া দাঁড়াইয়া জিজ্ঞাসা করিল—"কি প্রশ্ন স্তর ?"

"চরণদাস ঐ সুড়ঙ্গটার মধ্যে আরও প্রায় আট-দশ হাত ভেতরে কাজ করে, তাও অন্য কাজ নয়, গাঁইতা চালানো। ভেবেছিলাম...ওর কথাটাই আগে তুলবে তুমি।"

টুলু আরও বিহ্বলভাবে দাঁড়াইয়া রহিল। নিজের সদ্য অভিজ্ঞতার উপরে চরণদাসকে লইয়া এই ব্যাপারটা যেন জুড়িবার চেষ্টা করিতেছে, কিন্তু কোনমতেই মিলাইতে

পারিতেছে না। একটা নিতান্ত অসম্ভব কাণ্ড, যা কখনই হইতে পারে না, অথচ চোখের সামনে হইয়া যাইতেছে। টুলু বলিল "তাইতো, ভেবে দেখিনি তো!—আরও আট-দশ হাত ভেতরে! হ্যাঁ, পাইতাই তো চালাচ্ছিল!"

মুখের মত মুখের পানে চাহিয়া রহিল—হিসাব ধরিতে পারিতেছে না।

মাষ্টার মশাই বলিলেন—"এরই প্রতিক্রিয়া—সেই নর্দমার ধারে যা দৃশ্য দেখেছিলে। খুব অস্বাভাবিক বলে মনে হচ্ছে?"

টুলু কোন উত্তর দিল না। সঙ্গে সঙ্গে উত্তর দিবার মত প্রশ্ন নয় বলিয়া মাষ্টার মশাই সেটার পুনরুক্তিও করিলেন না।...চিন্তা করুক ও। দুই জনে নিঃশব্দে চলিয়াছেন; সামনে বৃদ্ধ আলো লইয়া; বুড়া মানুষ বলিয়াই বোধ হয় বকা অভ্যাস, বিড়বিড় করিয়া নিজের ভাষাতেই কি মন্তব্য করিতেছে। তাহার পিছনে টুলু, মাথাটা গোঁজা, পিছনে মাষ্টার মশাই, টুলুর পানেই চাহিয়া আছেন, যেন হিসাব রাখিয়া যাইতেছেন তাহার মনের উপর কতটা চাপ দেওয়া যায়।

চড়াই বাহিয়া উঠিতেছেন। হঠাৎ গুমগুম করিয়া একটা শব্দ হইল, যেন শব্দটা পিষিয়া যাইতেছে, সঙ্গে সঙ্গেই একটা কাঁপুনি। "ভূমিকম্প!" বলিয়া উৎকট একটা চিৎকার করিয়া টুলু ঘুরিয়া দাঁড়াইল। মাষ্টার মশাই সঙ্গে সঙ্গেই হাত তুলিয়া বলিলেন—"না, কিছু ভয় নেই।"

টুলু চকিতে কৃষ্ণ দৈত্যটার যতখানি পারিল যেন এক বার শেষ দেখা দেখিয়া লইয়া সমস্ত শরীরটা কুঁচকাইয়া দাঁড়াইয়া রহিল। মাষ্টার মশাই উঠিয়া আসিয়া তাহার পিঠে হাত দিলেন, মুখে অল্প একটু আশ্বাসের হাসি।...কিছু হইল না, শুধু পাশের দেয়াল থেকে ঝুর ঝুর করিয়া খানিকটা গুঁড়া কয়লা ঝরিয়া পড়িল।

সাহস কতকটা ফিরিয়া আসিয়াছে, টুলু প্রশ্ন করিল—"কি হ'ল স্যর?"

"সম্ভবত ডিনামাইট করেছে কোনখানে।"

"এই খনিতে?"

"খুব সম্ভব?"

টুলুর চোখে ভয়টা আবার ফুটিয়া উঠিল, মাষ্টার মশাই বলিলেন—"কিন্তু পাশের কোন খনিতেও হতে পারে, কিম্বা...

টুলু উৎসুক দৃষ্টি তুলিয়া চাহিল। মাষ্টার মশাই বলিলেন—"কিম্বা তিন নম্বর খনিটায় যে আগুন লেগেছিল, বোধ হয় একটা বড় ধস্ নামল।"

—মুখের পানে চাহিয়া রহিলেন; হিসাব লওয়া চলিতেছে—কতটা বরদাস্ত করিতে পারে টুলুর আহত স্নায়ুমণ্ডলী।

টুলু বলিল—"এবার উঠবেন স্যর?

"হ্যাঁ, উঠছিই; অনেকক্ষণ হ'ল, না?

"ঘুরে ফিরে অন্য দিক দিয়ে উঠবেন, না?..."

উত্তরটা আপনিই পাওয়া গেল,—মোড় ঘুরিতে সামনেই সেই জায়গাটি যেখানে সেই আসন্নপ্রসবা স্ত্রীলোকটি বসিয়া পড়িয়াছিল। এবারে কিন্তু জায়গায়টা ঘিরিয়া লোক আরও বেশি—মাঝখানটায় স্ত্রীলোক, বাইরে বাইরে কয়েকজন পুরুষ, বেশ একটু জটলা হইয়াছে যেন। মাষ্টার মশাই টুলু আর বৃদ্ধ সঙ্গীর পাশ কাটাইয়া হন্তদন্ত হইয়া সামনে আগাইয়া গেলেন, পাশের একটা লোককে উৎসুক কণ্ঠে প্রশ্ন করিলেন—"কিরে, ব্যাপার কি?"

"খোঁকাটি হ'ল আজ্ঞে।"

"আর মা?"

—ভিড় ঠেলিয়া ভিতরে গেলেন। খাকি হাফ-প্যান্ট পরা একটি ছোকরা ডাক্তার, একটি ব্যাগ লইয়া উঠিয়া দাঁড়াইল, বোধ হয় ভদ্রলোক দেখিয়া বলিল—"ও আগেই শেষ হয়ে গিয়েছিল।...Hell!"

বিশেষ কাহাকেও লক্ষ্য না করিয়া বলিল—"ম্যানেজারবাবুকে খবর দে, ছেলেটার কি ব্যবস্থা করবেন।"

আরও বারকয়েক—"Hell! hell! নরক!" বলিয়া কপালের ঘাম মুছিতে মুছিতে উঠিয়া গেল। বোধ হয় নূতন চাকরি লইয়া আসিয়াছে।

মাষ্টার মশাই সামনে গিয়া দাঁড়াইলেন, টুলুও আসিয়া পড়িল, প্রশ্ন করিল- "কি স্যর?"

"সেই মেয়েটা প্রসব করে মারা গেছে।"

তাহার পর নিজেই এক জনকে প্রশ্ন করিলেন—"ওর স্বামী? তাকে খবর দেওয়া হয়েছে?"

একটি প্রগল্‌ভা মাঝবয়সী সাঁওতালী স্ত্রীলোক কতকটা যেন রসিকতা করিয়াই বলিল—"কুথা তাকে খবর দেওয়া হবেক গো?—উ ত হুথায়।"

—ঊর্দ্ধে অঙ্গুলি নির্দেশ করিল। মাষ্টার মশাই প্রশ্ন করিলেন—"ওপরে?"

"হঁ, খুব উপ্পোরে।"—রসিকতায় একটু হাসিয়াই উঠিল।

টের পাওয়া গেল মেয়েটির স্বামী মাসছয়েক আগে একটা দুর্ঘটনায় মারা গেছে খনির মধ্যেই। সংসারে উহার আর কেহই ছিল না।

স্ত্রীলোকটি পাশ ফিরিয়া পড়িয়া আছে। বস্ত্রে সন্ত মাতৃত্বের গ্লানি, তাহাই মুড়ে গোছগাছ করিয়া তাহাকে আপাদমস্তক ঢাকিয়া দেওয়া হইয়াছে, ঠিক যেন সংসারের যুদ্ধে ক্ষতবিক্ষত হইয়া সে বিদায় লইল। পাশেই নব শিশুটি; মিনিট ছয়েক কান্নাটা বন্ধ ছিল, একটি মুস্কাগোছের স্ত্রীলোক মুখে আঙুল দিয়া মুখটা পরিষ্কার করিয়া দিতে আবার হাত-পা ছুঁড়িয়া বেশ মুহু কান্না জুড়িয়া দিয়াছে। হৃষ্টপুষ্ট ফুটফুটে রং, মাথায় এক মাথা কুচকুচে চুল; বিদ্যুতের আলোয় এই

সুরক্ষ আবেষ্টনীর মধ্যে যেন বলবল করিতেছে। ও-ই আলোচনার বিষয় হইয়া দাঁড়াইয়াছে, ওরই পাশে যে অত বড় ট্রাজেডি, সেদিকে যেন কাহারও খেয়াল নাই। যাহা অস্বাভাবিক তাহাই মনোযোগ আকর্ষণ করে। স্বামী নাই—তাই পূর্ণ গর্ভ লইয়া খনিতে কাজ করে—সুতরাং মরিবেই, এ ত নিতান্ত স্বাভাবিক কথা, এর মধ্যে আর আলোচনার কি আছে? বৃদ্ধা স্ত্রীলোকটি গিন্নিদের ঢঙে বলিল—"আরে, চুপ কর ছাওয়াল, বাপ খেলে, মা খেলে, আবার…"

কোলে লইয়া বারদুয়েক দুলিয়া চারি দিকে চাহিয়া বলিল—"কে দুধ দিবি গো? কার মায়ে দুধ আছে গো?"

শিশুকোলে একটি স্ত্রীলোক দাঁড়াইয়া ছিল, সব মেয়েরা তাহার পানে চাহিতে সে বোধ হয় লজ্জার জন্যই ভিড়ের মধ্যে পিছাইয়া গেল, অস্পষ্ট ভাবে বলিল—"ই—স্ গো! আমার আপন ছাওয়ালই পায় না!…"

দুধ কিন্তু জোগাড় হইল। "দুধ—সয়ো, দুধ—সয়ো" বলিতে বলিতে একটি মেয়ে পিছন হইতে পুরুষ আর স্ত্রীলোকদের ভিড় ঠেলিতে ঠেলিতে বাটিতে করিয়া খানিকটা দুধ আর একটা ডাক্তার পলতে আনিয়া একেবারে সামনে আসিয়া দাঁড়াইল। উপস্থিতবুদ্ধি এবং তৎপরতার জন্যই তাহার একটু খাতির হইয়া পড়িল, সবাই জায়গা ছাড়িয়া দিল। মেয়েটি কোন দিকে খেয়াল না করিয়া সামনে বসিয়া পড়িল, এবং বৃদ্ধার নিকট হইতে শিশুকে লইয়া তাহার মুখে দুধে-ভিজান পলিতাটা পান করাইয়া দিল। টুলু স্থির বিমূঢ় দৃষ্টিতে চাহিয়া দেখিতে লাগিল—চম্পা!

মৃত্যু ছাড়িয়া জীবনের কথাই চলিল।

মাষ্টার মশাই বলিলেন—"ছেলেটিকে তোরা কেউ নে, মানুষ করতে হবে ত? যা হবার তাতো হয়ে গেল।"

মেয়েদের মধ্যে সকলে মুখ চাওয়া-চাওয়ি করিল; কোন উত্তর দিল না। মাষ্টার মশাই পুরুষদের দিকে ফিরিয়া বলিলেন,—"কি হে, একটা ব্যবস্থা করতে হবে ত?"

"চম্পা লিবে, কোল আলো করা খোকা বটেক।"

—মেয়েদের মধ্যে এক জন একটু ঠাট্টার সুরে কথাটা বলিয়া, হাসিয়া মুখটা নিজের ঘাড়ে গুঁজিয়া লইল। বেশ একটু হাসি টিপ্পনী চলিল, চম্পার মুখটা রাঙা হইয়া উঠিল। ছেলেটিকে বৃদ্ধার কোলে তুলিয়া দিতে দিতে বলিল—"চম্পা! —ইস্—মাইরি নাকি গো!"

মাষ্টার মশাই একবার সবার পানে চাহিয়া লইয়া বলিলেন—"তা হলে?…কেউ গেল খবর দিতে ম্যানেজারবাবুকে? মেয়েটির সংকারেরও ত ব্যবস্থা করতে হবে?"

পাশের একটি লোক বলিল—"গেঁইছে।"

পিছন হইতে এক জন বলিল—"তাঁকে পাবে কুথা? তিনি বর্ধমান গেঁইছেন। আসিষ্টেণ্ট বাবুকে খুঁজতে পাঠাইছি।"

কিছু করিবার নাই দেখিয়া সবাই নিস্পন্দ হইয়া রহিল। ক্ষণকাল পরে টুলু মাষ্টার মশাইয়ের পানে একটু কুণ্ঠিত দৃষ্টিতে চাহিয়া নিচু গলাতেই বলিল—"স্যর, এরা কিন্তু ছেলেটাকে নষ্ট করে ফেলবে, ম্যানেজার যদি জোর করে একটা ব্যবস্থা করেও, তার চেয়ে আমরা যদি…"

মাষ্টার মশাই ঈষৎ হাসিয়া বলিলেন—"কিন্তু আমরা যে ওদের চেয়ে আগে নষ্ট করে ফেলব টুলু—নির্ঝলা পুরুষের বাড়ি…"

"না, সেকথা বলছি না, ধরুন, এদের কাউকে যদি কিছু টাকা দেওয়া যায়? ছেলেটি আমারই…মানে…মানে…"

"অর্থাৎ তুমিই নিলে এই ত?"

টুলু আরও লজ্জিত ভাবে বলিল—"চমৎকার ছেলেটি স্যর শেষে নর্দমায় গড়াবে ত?"

মাষ্টার মশাই ঈষৎ ভ্রূ কুঞ্চিত করিয়া মুহূর্তখানেক কি ভাবিলেন, তাহার পর মেয়েদের লক্ষ্য করিয়া বলিলেন—"এই বাবু ছেলেটিকে নিলে; কিন্তু দুধ না ছাড়া পর্যন্ত সে ত রাখতে পারবে না, তদ্দিন তোরা কেউ মানুষ করে দে, বাবু টাকা দেবে।"

টুলু পকেট থেকে একটি পাঁচ টাকার নোট বাহির করিয়া মাষ্টার মশাইয়ের হাতে দিল। মাষ্টার মশাই সেটা তুলিয়া ধরিয়া বলিলেন—"আপাতত এই পাঁচ টাকা, বাবুর হাতে এখন আর নেই…"

পুরুষদের মধ্যে চাপা প্রশংসার একটা গুঞ্জন উঠিল, মেয়েরা কিন্তু একেবারেই চুপ করিয়া গেল। বেশ বুঝা গেল তাহাদের সবারই মর্যাদা সচেতন হইয়া উঠিয়াছে, অর্থের বদলে মাতৃত্বকে পণ্য করিতে বাধিতেছে; যাহার হয়ত লোভ আছে সেও এ আসরে সেটাকে প্রকাশ করিতে সঙ্কুচিতই হইল। এক জন বর্ষীয়সী সবার মুখপাত্র হইয়া যেন একটু শ্লেষ ভরে বলিল—"ট্যাকাই চাইছে নাকি গো?"

মাষ্টার মশাই বলিলেন—"তা না, একটা খরচ আছে ত? ছেলে যখন ইনি নিলেন, তখন অপরে সে খরচটা বয় কেন? —এই আর কি। আর যার কচি ছেলে আছে সেই তার নেবে ত? নিজে একটু খাওয়া-দাওয়া না করলে দুটো ছেলেকে জোগান দিতে পারবে কেন?…কি বল গো তোমরা?"

পুরুষদের সালিস মানিলেন, তাহারা সাগ্রহে অনুমোদন করিল।

ছেলেকোলে সেই স্ত্রীলোকটি সঙ্কুচিত ভাবে ভিড়ের মধ্যে পিছাইয়া যাইতেছিল, সকলে তাহাকেই ধরিল, এবং রাজীও করিল শেষ পর্যন্ত। মাষ্টার মশাই তাহাকে মিষ্ট কথা বলিয়া টাকাটা লওয়াইলেন। এ পর্বটা শেষ হইল।

মাষ্টার মশাই হাসিয়া টুলুর পানে চাহিলেন, শুধু হাসিই নয়, আরও অপূর্ব কি আছে দৃষ্টিতে। টুলু অতিমাত্র লজ্জিত

হইয়া নিজের দৃষ্টি নত করিল। মাষ্টার মশাই বলিলেন—"বেশ হ'ল টুলু, একটি নতুন জন্মের সঙ্গে তোমার বস্তির সেবা আরম্ভ হ'ল।...আর জন্মটিও অদ্ভুত, পুরনোকে যেন একেবারে মুছে দিয়ে জন্মাল।"

টুলুর চোখ দুইটি ছলছল করিয়া উঠিয়াছে,—নিশ্চয় মনের পূর্ণতার জন্যই, কিন্তু লজ্জা ঢাকিবার জন্যই সামনের এই অবলম্বনটুকু ধরিল, বলিল—"কিন্তু এ কি মুছে ফেলা যায় মাষ্টার মশাই?"

মাষ্টার মশাই স্নেহভরে টুলুর কাঁধে হাত দিলেন, বলিলেন—"না, ভুল বুঝো না টুলু, ও যে বাপ-মাকে হারিয়ে জন্মাল—সে ট্রাজেডিটা কি অস্বীকার করা যায়?...আমি ঘটনাটা প্রতীক হিসেবে গ্রহণ করে বলছি।...আর তাও বলি,—তাঁরা দু'জন ত সেইখানেই গেছেন যেখান থেকে সন্তানের ওপর তাঁদের আশীর্বাদটা আরও ফলবতী হ'তে পারে।"

টুলু বেশ বিস্মিত হইয়া মাষ্টার মশাইয়ের মুখের পানে চাহিল, তিনি যেন ছুতা করিয়াই সেটা ওদিকে ফিরাইয়া লইয়া উপস্থিত সবাইকে বলিলেন—"তা হলে এই ব্যবস্থাই রইল। তোমরা পাঁচ জন ভালোমানুষ রয়েছ স্ত্রী-পুরুষে, ম্যানেজারবাবু এলে বলো আমরা এই ব্যবস্থা করেছি, আমিও বলে দোব। এইবার মেয়েটির সৎকার—"

সবাই যেন একটা থমথমে ভাব হইতে জাগিয়া উঠিল; কয়েকজন একসঙ্গে বলিল—"কিন্তু পুলিস না এলে উঠবেক না বাবু।"

"বেশ, তা হলে আমরা এখন যাই, চল টুলু।"

দুই পা গিয়াই মাষ্টার মশাই আবার ফিরিলেন, বলিলেন—"এস টুলু, আর একটা কাজ সেরে যাই ওর মায়ের সামনেই।"

কাছে আসিয়া সবার পানে এক বার চাহিয়া লইয়া বলিলেন—"কয়লার খনিতে হীরে জন্মায়, তাই ওর নাম..."

এক জন বুড়গোছের লোক উৎসাহিত ভাবে বলিল—"হ্যাঁ, হীরেলাল থাকুক বটে, দিব্যি টুকটুকে ছাওয়াল..."

মাষ্টার মশাই হাসিয়া বলিলেন—"ওই রইল, তবে একটু বদলে। তোমাদের আমাদের যুগ যে যাচ্ছে কত্তা, আমাদের নাতিদের ও নাম পছন্দ হবে কেন? আজকাল চাই দীপক, অলক,—তোমাদের নতুন ডাক্তারবাবুর নাম দেখছ না—পুলক; ওর নাম রইল হীরক।...এস টুলু।"

উঠিয়া আসিয়া লিফ্‌টের জন্য অপেক্ষা করিতেছেন এমন সময় সেই স্ত্রীলোকটি চিৎকার করিতে করিতে ছুটিয়া আসিয়া উপস্থিত হইল—"দেখো, ছাওয়াল কেড়্যা নিলেক, আমার কাপোড় ছিঁড়্যা দিলেক, আমার জামা ছিঁড়্যা দিলেক, চুল ছিঁড়্যা দিলেক, দেখো—তুমাকো বলছে বড়া মানুষ, ট্যাকার চকমকি দেখায়! আমার ছাওয়াল দে...এই দেখো, চলো তুমরা—"

—আলুথালু কেশ, পিঠের কাছে কাপড়টা ছেঁড়া, মুখের এক জায়গায় খামচানোর দাগ।—আরও কয়েকজন স্ত্রীলোক আসিয়া উপস্থিত হইল।

মাষ্টার মশাই প্রশ্ন করিলেন—"কে?"

"উই চম্পা—চরণদাসের বিটি—দেখো তুমরা—ই মাইয়ারা সাক্ষী রইছে—"

মাষ্টার মশাই আর টুলু মুখ চাওয়াচাওয়ি করিলেন; মাষ্টার মশাইয়ের মুখে এক অদ্ভুত ধরণের হাসি। টুলু বোধ হয় নিতান্ত যান্ত্রিক ভাবেই ফিরিয়া পা বাড়াইয়াছিল, মাষ্টার মশাই তাহার হাতটা ধরিয়া ফেলিলেন, বলিলেন—"পাগল হয়েছ?"

পকেট থেকে একটা টাকা বাহির করিয়া দিয়া স্ত্রীলোকটিকে বলিলেন—"আর নেই আমার কাছে। তুই সেই পাঁচ টাকার সঙ্গে মিলিয়ে কাপড়-জামা করিয়ে নিস্।"

লিফ্‌ট নামিয়া আসিল, দুই জনে গিয়া উঠিয়া পড়িলেন।

ক্রমশঃ

হৃদয়-আসন

(খস্‌রু হইতে)

শ্রীমধুসূদন চট্টোপাধ্যায়

আমার [illegible] আসন এমনি ছোটো
তাহাতে একের অধিক হয় না স্থান,
তুমি-ই যে তাহা দখল করিয়া আছো,
করিতে কী পারি পরেরে সে আমি দান?
তুমি-ই যে মোরে চোরের মতন চুপে,
করিতেছ ভোগ নানান ছন্দে, রূপে,
তুমি সেই ধন ফিরায়ে না দিলে পরে—
চেয়ে আমি কেন পেতে যাই অপমান?
তোমারি প্রভাবে তুচ্ছ ও গৃহ-হারা
রক্ত-অশ্রু কাঁদিয়া ফিরিছে প্রাণ!

যতেক অতিথি আসিছে আমার তরে
গান গেয়ে যায় ভিক্ষাতে আমার শুধু;
যতেক কুসুম ফুটিছে আমার গাছে
দিতে চাহিতেছে ঢেলে হৃদয়ের মধু!
নাচিছে কতই, আরতি করিছে মোরে,
কাছে নিতে চায় হাত দিয়ে হাত ধরে,
আমি শুধু বলি নিঠুর হয়ে সদা—
"ফিরে যাও দূরে, হেথায় হবে না স্থান।"
তুমি-ই যে তাহা দখল করিয়া আছো,
করিতে কী পারি পরেরে সে আমি দান?

শাহ্জাদা দারাশুকোর জীবন-কাহিনী

শ্রীকালিকারঞ্জন কানুনগো

৪

যৌবনে পিতৃদ্রোহী, প্রৌঢ়ে নবীন প্রেমিক, বার্দ্ধক্যে বালস্বভাব, জাহাঙ্গীর বাদশাহ্ পিতা আকবর এবং পুত্র শাহ্জাহান অপেক্ষা ইতিহাসে নিকৃষ্ট চরিত্র। সুদীর্ঘ চা'র বৎসর কাল প্রেমের আগুনে পুড়িয়া মেহেরুন্নিসাকে পত্নীরূপে লাভ করিবার পর তিনি যেন হাতে হাতে স্বর্গ পাইলেন (মে মাস, ১৬১১ খ্রীঃ)। নবীন প্রেমের উত্তাল তরঙ্গে হাবুডুবু খাইতে খাইতে দিল্লীশ্বর "এক টুকরা রুটি ও এক পেয়ালা শরাবের দামে" হিন্দুস্থানের বাদশাহী সুন্দরী নুরজাহানের পায়ে বিকাইয়া দিলেন, গোপনে নয় নিতান্ত প্রকাশ্যে। দরবারী "ষাট হাজারী" মনসবদার সম্রাজ্ঞী "নুরমহল" (কিছুদিন পর নুরজাহান) ১৬১১ হইতে ১৬২২ খ্রীষ্টাব্দ পর্য্যন্ত অপ্রতিহত প্রভাবে সম্রাট এবং তাঁহার সাম্রাজ্য উভয়ই শাসন করিয়াছিলেন। জাহাঙ্গীর বাদশাহ্‌র বয়স বাড়িয়াছিল, দেহ অতিভোগজনিত অকালবার্দ্ধক্যগ্রস্ত হইয়াছিল, কিন্তু চিরকাল তিনি নাবালকই রহিলেন। অন্তঃপুরে নুরজাহান বেগমের পদার্পণের পর আলা হজরতের নাবালকত্ব যেন আরও বাড়িয়া গেল; বে-সরকারীভাবে নবপরিণীতা পত্নী হইলেন শাহন্‌শাহ্‌র "আতালিক" বা অভিভাবিকা। ঐতিহাসিকেরা জাহাঙ্গীর-রাজত্বের এই একাদশ বৎসরকে "নুরজাহান-চক্রের" শাসনকাল আখ্যা দিয়াছেন। এই "চক্রে"র (junta) মধ্যে ছিলেন নুরজাহানের পিতা উজীর ইতিমাদ-উদ্দৌলা, ভ্রাতা আসফ খাঁ এবং শাহ্জাদা খুর্রম। নুরজাহান মনে করিয়াছিলেন জাহাঙ্গীরের মৃত্যুর পর খুর্রমকে শিখণ্ডীর মত দিল্লী-সিংহাসনে বসাইয়া বাকী জীবন তিনিই হিন্দুস্থানে সর্ব্বেসর্ব্বা থাকিবেন। এই আশায় নুরজাহান অগ্রণী হইয়া আসফ খাঁর কন্যা ভ্রাতুষ্পুত্রী আরজুমন্দ বানু বা মমতাজমহলের সহিত শাহ্জাদা খুর্রমের বিবাহ দিলেন (৩-শে এপ্রিল ১৬১২ খ্রীঃ)। ইরাণ-সম্রাট শাহ্ ইসমাইলের বংশধর মুজঃফর হোসেনের কন্যার সহিত দুই বৎসর পূর্ব্বে (সেপ্টেম্বর ১৬১০ খ্রীঃ) খুর্রমের প্রথম বিবাহ হইয়াছিল।* রাজনৈতিক স্বার্থের প্রেরণায় নিরপরাধিনী প্রথমা পত্নীকে ন্যায্য অধিকার হইতে বঞ্চিত করিয়া খুর্রম পরবর্ত্তীকালে দিল্লীর সিংহাসন লাভ করিলেও সুখী হইতে পারেন নাই। অবজ্ঞাতা অভিমানিনীর অশ্রুর বদলে শাহ্জাহানের যে শোকাশ্রু বিধাতার বিচারে অঝোরে ঝরিয়াছিল তাজমহলের শ্বেতমর্ম্মর আজিও উহার সাক্ষ্য দিতেছে। যাহা হউক, এই বিবাহের পর শাহজাদা খুর্রম আলালের ঘরের দুলাল হইয়া উঠিলেন। গর্ভধারিণী যোধপুর-রাজকুমারী যোধাবাঈর পুত্র খুর্রম; যোধাবাঈ সম্রাট জাহাঙ্গীরের নজরে হইয়া পড়িলেন খুর্রমের "অন্যান্য" মাতৃস্থানীয়া এবং বিমাতাগণের মধ্যে একজন মাত্র; অপরপক্ষে নুরজাহান বেগম হইলেন "আসল মা"। ভাবাবেশে আলা হজরত লিখিয়া গিয়াছেন বাবা খুর্রম দাক্ষিণাত্য জয়ের উপঢৌকনস্বরূপ "আসল-মা [ওয়ালেদা-ই খোদ] নুরজাহান বেগমকে দিলেন দুই লাখ টাকা এবং অন্যান্য মা, বেগম ইত্যাদি সকলে মিলিয়া পাইলেন ষাট হাজার টাকা!" মুসলমান আমলে বিবাহাদির পর শাহী মহলে শাহ্জাদাগণের প্রবেশ অনুমতিসাপেক্ষ ছিল। পূর্ব্বাপর প্রচলিত এই রীতি ভঙ্গ করিয়া জাহাঙ্গীর বাদশাহ্ বাবা খুর্রমকে অন্দরমহলে যাতায়াত করিবার অবাধ অধিকার প্রদান করিয়াছিলেন। নুরজাহান বেগমের সম্মতি এবং বিশেষ অনুগ্রহ ব্যতীত খুর্রম এই অধিকার হয়ত পাইতেন না। কিন্তু লোকচক্ষে ইহা বিসদৃশ এবং কটাক্ষের বিষয়ীভূত হইয়াছিল। বনিতা ও কবিতার "সাধুত্ব" সম্বন্ধে ভবভূতির যুগ অপেক্ষা বাদশাহী আমলে মানুষ অধিক "দুর্জ্জন" ছিল; স্যর টমাস রো রচিত পুস্তকে খুর্রম-নুরজাহান সম্পর্কে অশোভন ইঙ্গিত আছে। সত্য মিথ্যা ভগবান জানেন; তবে সর্ব্বম্ অত্যন্তগর্হিতং।

* শাহ্জাহান-রাজত্বের অসম্পূর্ণ দরবারী ইতিহাস বাদশাহ্-নামায় লিখিত আছে, মমতাজমহলের সহিত খুর্রমের বাগ্দান হইয়াছিল, প্রথমা স্ত্রীর সহিত বিবাহের প্রায় তিন বৎসর পূর্ব্বে। ঐ স্ত্রীর গর্ভে খুর্রমের প্রথম সন্তান জন্মিল মমতাজের সহিত বিবাহের একমাস পূর্ব্বে। ১৬০৭ খৃষ্টাব্দে খুর্রমের সহিত মমতাজের বাগ্দান হইবার কোন যুক্তিসঙ্গত কারণ দেখা যায় না। নুরজাহানকে বিবাহ করিবার পূর্ব্বে সুদীর্ঘ পাঁচ বৎসরের মধ্যে পুত্রের সহিত বাগ্দত্তা কন্যার বিবাহ-কার্য্যটা নিষ্পন্ন করিবার অবকাশ জাহাঙ্গীরের হয় নাই—এইরূপ অনুমান করিবারও কোন অজুহাত নাই। সর্ব্বাপেক্ষা বিবেচ্য বিষয় জাহাঙ্গীর এমন কোন কথা তাঁহার তুজুকে উল্লেখ করেন নাই। সুতরাং সন্দেহ হয় মমতাজমহলকে প্রেমিক শাহ্জাহান দরবারী ইতিহাসে প্রথম এবং শেষ প্রণয়পাত্রী হিসাবে জাহির করিবার জন্যই এই বাগ্দান ব্যাপার উদ্ভাবন করিয়াছেন। আধুনিক ঐতিহাসিকগণ বাদশাহ্-নামাকে অভ্রান্ত জ্ঞান করিয়া আমাদিগকে বিভ্রান্ত করিয়াছেন, যথা: —

Memoirs of Jahangir, Rodgers & Beveridge, Vol. I, p. 224, *footnote*.

"the long-engaged pair . . ." (*History of Shajahan*, Banarasiprasad Saxena, p. 14).

বিনা বিচারে বিশ্বস্ত চিত্তে দরবারী ইতিহাস সম্পূর্ণ সত্য বলিয়া গ্রহণ করা নিরাপদ নহে।

৫

বন্দী খসরুকে আসফ খাঁর হাতে সমর্পণ করিয়া নুরজাহান বেগম চালে ভুল করিয়া বসিলেন, "নুরজাহান চক্রে" ভাঙন সুরু হইল। স্বার্থের সংঘাতে ভ্রাতা ভগ্নীর মধ্যে ঐক্য ও স্নেহের বন্ধন শিথিল হইতে লাগিল। শাহ্জাদা খুর্‌রম নুরজাহানের প্রভাব হইতে মুক্ত হইয়া দাক্ষিণাত্যে স্বাধীনভাবে কার্য্য করিতেছিলেন; তবে ঘন ঘন বহুমূল্য উপহার পাঠাইয়া সম্রাজ্ঞী এবং সম্রাটকে খুশ মেজাজে রাখিতেন। নুরজাহান-চক্রের প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বী খান-ই খানান আব্দুর রহিমের পৌত্রীর (শাহ্ নওয়াজের কন্যা) সহিত খুর্‌রম হঠাৎ পরিণয়সূত্রে আবদ্ধ হইলেন। নুরজাহানের বিরুদ্ধে ইহাই খুর্‌রমের প্রথম পাল্টা চাল; বাদশাহ্-নামায় আছে "কতিপয় রাজনৈতিক কারণেই" এই বিবাহ হইয়াছিল। ইহার প্রতিক্রিয়া-স্বরূপ অবজ্ঞাত শাহ্জাদা পরবেজ দরবারে আমন্ত্রিত হইলেন, এবং তাঁহার মনসব বাড়াইয়া দেওয়া হইল। এই সময় হইতে সম্রাজ্ঞীর কূটনীতি খেলার নূতন ঘুঁটি হইলেন পরবেজ।

১৬২২ খ্রীষ্টাব্দের মার্চ্চ মাসে, নুরজাহান বেগমের পিতা বিচক্ষণ বৃদ্ধ উজীর-ই আজম ইতিমাদ-উদ্দৌলার মৃত্যুর তিন মাস পরে, শাহ্জাদা খুর্‌রম প্রকাশ্যে বিদ্রোহ ঘোষণা করিলেন। দাক্ষিণাত্য, মালব এবং গুজরাটের বাদশাহী ফৌজ খুর্‌রমের বশ্যতা স্বীকার করিয়া শাহ্জাদার অধিনায়কত্বে রাজধানীর দিকে অভিযান করিল। সম্রাজ্ঞী নুরজাহান একক এবং অসহায়; পিতা মহানিদ্রার ক্রোড়ে, ভ্রাতা আসফ খাঁ পার্শ্বে কণ্টকস্বরূপ, জাহাঙ্গীরের প্রিয়তম মোসাহেব মুতামিদ খাঁ শত্রুর গুপ্তচর। চতুর্দ্দিকে অবিশ্বাস এবং ষড়যন্ত্রের ছায়া। শাহ্জাদা খুর্‌রমের প্রতি একান্ত পক্ষপাতিতা করিয়া নুরজাহান বেগম সম্রাটের পুরাতন বিশ্বস্ত যোদ্ধৃগণের অপ্রিয়ভাজন হইয়াছিলেন। শাহ্জাদা মনে করিলেন, তিনি রাজধানীর উপকণ্ঠে উপস্থিত হইলেই সুবা লাহোর, দিল্লী, আগ্রার বাদশাহী মনসবদারগণ নুরজাহান বেগমের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইবে। এইবার হিন্দুস্থানের শ্রেষ্ঠ যোদ্ধা ও কূটনীতিবিৎ পুরুষসিংহের সহিত এক তেজোদৃপ্তা নারীর শক্তিপরীক্ষা আরম্ভ হইল। শাহ্জাদা পরবেজ এবং খসরুর পুত্র দাওয়ার বকশকে সম্মুখে বাড়াইয়া নুরজাহান খুর্‌রমকে বেকায়দায় ফেলিলেন; দাওয়ার বকশের অভিভাবক সমরনিপুণ মীর্জা আজিজ এবং পরবেজের পৃষ্ঠপোষক অসুর-বিক্রম মহাবত খাঁ সম্রাজ্ঞীর সহিত শত্রুতা ভুলিয়া তাঁহার প্রধান সহায় হইলেন; আম্বেরপতি মীর্জা জয়সিংহ এবং দুর্দ্ধর্ষ পাঠান সেনাপতি খানজাহান লোদী বিপন্ন সম্রাটকে রক্ষা করিবার জন্য সসৈন্যে রাজধানী অভিমুখে যাত্রা করিল।

৬

মহাবত খাঁ ছিলেন আকবরের বিরুদ্ধে বিদ্রোহে জাহাঙ্গীরের পুরাতন বিশ্বস্ত অনুচর; হুকুম পাইলে ইবলিসকেও একহাত না দেখিয়া ছাড়িবার পাত্র নহেন। তিনি দিলখোলা সাহাবাজ সিপাহী; তাঁহার দোষ বা গুণ—মুখের উপর অপ্রিয় কথা শুনাইবার বেপরোয়া হিম্মত। তিনি একবার স্বয়ং দিল্লীশ্বরকে বলিয়া বসিয়াছিলেন, "আলা হজরত! জনানার আঁচলে দিনরাত ঝুলিয়া থাকিলে বাদশাহী ছারখার হওয়া কিছু তাজ্জব ব্যাপার নয়।" নুরজাহান বেগম মানুষ না চিনিলে পূর্ণ ষোল বৎসর জাহাঙ্গীর বাদশাহের বাদশাহী রক্ষা করিতে পারিতেন না। তিনি জানিতেন মহাবত খাঁ গোঁয়ার এবং দুর্ম্মুখ হইলেও কাজের লোক—না চটাইলে নিমকহারামি করিবে না। জাহাঙ্গীর বাদশাহের বেগাড়া বাঘ মহাবত খাঁ খুর্‌রমের সহিত সংগ্রামে অবতীর্ণা নুরজাহানের কূটনীতির যাদুগুণে সিংহবাহিনীর পশুরাজ হইয়া পড়িলেন।

দিল্লী হইতে কয়েক মাইল দূরে বিলোচপুর নামক স্থানে বিদ্রোহী খুর্‌রমের ভাগ্য পরীক্ষা হইল (এপ্রিল ১৬২৩ খ্রীঃ)। পুরাদমে যখন উভয় পক্ষের লড়াই চলিতেছিল তখন মহাবত খাঁর সহকারী সেনাপতি বিশ্বাসঘাতক আবদুল্লা খাঁ, পূর্ব্বষড়যন্ত্র অনুসারে বাদশাহী ফৌজ হইতে পৃথক হইয়া সসৈন্য শাহজাদার সহিত মিলিত হইল। এই ষড়যন্ত্রের কথা খুর্‌রমের বিশ্বস্ত সেনাপতি এবং বিদ্রোহমন্ত্রদাতা রাজা বিক্রমজিৎ ছাড়া অন্য কেহ জানিতেন না। খুর্‌রমের অগ্রগামী বাহিনীর অধিনায়ক দারাব খাঁকে এই শুভ সংবাদ প্রদানের জন্য রাজা বিক্রমজিৎ যখন ঘোড়া ছুটাইয়া চলিয়াছেন, সেই সময় বাদশাহী তোপখানার একটি গোলার আঘাতে তাঁহার প্রাণান্ত হইল। বাহিনীর পশ্চাৎ ভাগে আবদুল্লা খাঁর অপ্রত্যাশিত উপস্থিতির রহস্য খুর্‌রমের সৈন্যগণ বুঝিতে না পারিয়া পরাজয়ের আশঙ্কায় হতোদ্যম ও ছত্রভঙ্গ হইয়া পড়িল। শাহ্জাদা খুর্‌রমের সৌভাগ্যসূর্য্য পিতার অভিশাপে রাহুগ্রস্ত হইল; তিনি 'বে-দৌলত' বা দুর্ভাগার ন্যায় দাক্ষিণাত্যে পলায়ন করিলেন। মহাবত খাঁ বিদ্রোহী শাহ্জাদাকে দম ফেলিবার অবকাশ দিলেন না; বিজাপুর, গোলকুণ্ডা তাঁহাকে আশ্রয় দান করিল না।

মমতাজ এবং তাঁহার শিশুসন্তানগণকে লইয়া কয়েক হাজার বিশ্বস্ত অনুযাত্রী সহ শাহ্জাদা খুর্‌রম মহাবত খাঁর শ্যেনদৃষ্টি এড়াইয়া তৈলঙ্গ ভূমির গভীর অরণ্যানীর মধ্যে আত্মগোপন করিয়াছিলেন। অসীম বাধাবিঘ্ন অতিক্রম করিয়া তিনি অবশেষে উড়িষ্যায় উপস্থিত হইলেন। প্রাচীর দিগ্‌বাল রেখায় আবার সৌভাগ্যের মুহূর্ত্ত রাগ

তাঁহার প্রাণে নূতন আশার সঞ্চার করিল। অকর্মণ্য সুবাদার আহম্মদ বেগ বিনা যুদ্ধে উড়িষ্যা হইতে পলায়ন করিয়া রাজমহলের পথ ধরিলেন। শাহ্‌জাদা খুর্‌র‌ম দ্রুতবেগে তাঁহার পশ্চাদ্ধাবন করিয়া উল্কাবেগে রাজমহলের উপর আপতিত হইলেন। যুদ্ধে বাংলার বৃদ্ধ সুবাদার ইব্রাহিম খাঁ ফতেজঙ্গকে পরাজিত ও নিহত করিয়া খুর্‌র‌ম রাজমহলে বাদশাহীর দিবা-স্বপ্ন দেখিতে লাগিলেন। সুবে বাংলার রাজধানী ঢাকা-জাহাঙ্গীর নগর বিজয়ী শাহ্‌জাদাকে রামপালের নামকরা কলা (হয়ত অমৃতসাগর) কয়েক কান্দি ভেট পাঠাইয়াছিল। যাহা হউক কয়েকমাস পরে প্রয়োজনীয় অর্থ এবং সৈন্যবল সংগ্রহ করিয়া সুবে বিহার দখল করিবার জন্য শাহ্‌জাদা খুর্‌র‌ম রাজা ভীম শিশোদিয়াকে পাটনার দিকে প্রেরণ করিলেন। পাটনা অধিকার করিয়া তাঁহার অগ্রগামী সেনাদল বিহারের পশ্চিম প্রান্তে টোঁস (প্রাচীন তমসা) নদীতীরে শিবির সংস্থাপন করিল। শাহ্‌জাদা আসন্ন-প্রসবা মমতাজমহলকে রোহতাস্ দুর্গে রাখিয়া সুবা এলাহাবাদ ও অযোধ্যা আক্রমণের পরিকল্পনা করিতেছিলেন, এই সময়ে তাঁহার এক পুত্র লাভ হইল—নাম রাখিলেন মুরাদ-বক্‌শ।

৭

দাক্ষিণাত্যে পলায়িত খুর্‌র‌মের কোন সন্ধান না পাইয়া বিজয়ী সেনাপতি মহাবত খাঁ এবং শাহ্‌জাদা পরবেজ শত্রুর গন্তব্যস্থল সম্বন্ধে যখন জল্পনা-কল্পনা করিতেছিলেন, সেই সময় জরুরী ফরমান মারফত তাঁহারা অবগত হইলেন "বে-দৌলত" মশরিকী তিন সুবার উপর কব্জা করিয়া সুবা এলাহাবাদের জৌনপুর শহরে* ডেরা করিয়া আছে। খুর্‌র‌মকে পরাজিত এবং বৃদ্ধ খান-ই-খানান আবদুর রহিমকে গ্রেপ্তার করিয়া মহাবত খাঁ খান-ই-খানান খেতাব এবং শাহ্‌জাদা পরবেজ চল্লিশ হাজারী মনসব্ পাইয়াছিলেন। তাঁহারা নূতন উদ্যমে চল্লিশ হাজার সেনা সহ দিনরাত কুচ করিয়া বিদ্রোহপর্ব্ব সমাপ্ত করিতে চলিলেন। এই সংবাদ পাইয়া খুর্‌র‌ম জৌনপুর হইতে পশ্চাদপসরণ করিয়া বিহার প্রান্তে সৈন্য সংস্থাপন করিলেন। টোঁস বা তমসাতীরে ব্যূহবদ্ধ হইয়া উভয় পক্ষ আক্রমণের সুযোগ প্রতীক্ষা করিতে লাগিল। ইতিমধ্যে গতিক ভাল নয় দেখিয়া অনতিদূরে গঙ্গাবক্ষ হইতে শাহ্‌জাদার বাঙালী "নৌবারা" (জঙ্গী নৌকার বহর) অকস্মাৎ অদৃশ্য হইয়া গেল; কিন্তু যুদ্ধ না করিয়া খুর্‌র‌মের পলায়নের উপায় নাই। খুর্‌র‌মের সৈন্যসংখ্যা অল্প হইলেও সেনানায়কগণ সকলেই তাঁহার জীবন-মরণের সঙ্গী, রণনিপুণ এবং অসমসাহসিক যোদ্ধা। আক্রমণ আত্মরক্ষার শ্রেষ্ঠ উপায় স্থির করিয়া তিনি মহাবত খাঁর উপর হামলা করিলেন। রাজা ভীম শিশোদিয়া এবং শের খাঁর নেতৃত্বে তাঁহার অগ্রগামী সেনা বাদশাহী তোপখানা দখল করিয়া প্রচণ্ড ঝঞ্ঝাবেগে শত্রুব্যূহের কেন্দ্রস্থলে শাহ্‌জাদা পরবেজকে আক্রমণ করিল, বাদশাহী ফৌজে হাহাকার পড়িয়া গেল। শাহী ফৌজের বামভাগে নদীর পারে কিছু দূরে ছিলেন যোধপুর-পতি গজসিংহ। বিদ্রোহী খুর্‌র‌ম যোধপুরের দৌহিত্র; কিন্তু এক বৎসর পূর্ব্বে শাহ্‌জাদা পরবেজ গজসিংহের কন্যাকে বিবাহ করিয়াছেন; এই দো-টানা স্রোতে পড়িয়া চিন্তা করিতে করিতে তাঁহার প্রস্রাবের বেগ হইল। গজসিংহ পায়জামার ডোরী সবেমাত্র খুলিয়াছেন। এমন সময়ে কুম্পাবৎ গোবর্দ্ধনদাস রাঠোর ঘর্ম্মাক্ত দেহে তথায় পৌছিয়া কড়াস্বরে বলিল, "মহারাজ! সব ভাসিয়া গেল, এখন আপনার লঘুসংখ্যা করিবার সময়?"* যোধপুর রাজ কার্য্যটি না সারিয়াই নিতান্ত সপ্রতিভ ভাবে পায়জামা কসিয়া বলিলেন, "আমি দেখিতেছিলাম খবর দেওয়ার জন্য কোন রাজপুত অবশিষ্ট আছে নাকি?" মহাবত খাঁ বিচক্ষণ সেনাপতি; তিনি রাজা ভীম ও শের খাঁর গতিরোধ করিবার জন্য জটাজুট† নামক পাগলা জঙ্গী হাতী ছাড়িয়া দিলেন; এবং এই অবসরে তাঁহার সেনাবাহিনী পুনরায় ব্যূহবদ্ধ হইল। এইবার আবদুল্লা খাঁ খুর্‌র‌মের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করিয়া পলায়ন করিল। মহাবত খাঁর সহিত যুদ্ধ করিতে করিতে রাজা ভীম শস্ত্রপূত হইয়া বীরগতি লাভ করিলেন। দ্বিতীয় বার বিদ্রোহী খুর্‌র‌মের প্রায় সুনিশ্চিত জয়, পরাজয় ও পলায়নে পর্য্যবসিত হইল।

তমসার জলে খুর্‌র‌মের ক্ষীণ আশা ভাসিয়া গেল। যে পথে আসিয়াছিলেন আবার সেই পথে স্ত্রীপুত্র ও হতাবশিষ্ট অনুচরবর্গের সহিত শাহ্‌জাদা "বে-দৌলত" দাক্ষিণাত্যে পলায়ন করিলেন, মহাবত খাঁ এবং পরবেজ অন্যপথে আবার দাক্ষিণাত্যে উপস্থিত হইলেন। দুর্ভাগ্যের পুনঃ পুনঃ আঘাতে খুর্‌র‌মের অকাল স্বপ্ন ভাঙিয়া গেল; স্ত্রীপুত্রসহ হতপ্রভ জ্যোতিষ্কের ন্যায় তিনি মহারাষ্ট্রের নাসিক শহরে দিনযাপন করিতে লাগিলেন। গর্ব্বিত খুর্‌র‌ম পিতার ক্ষমা এবং নূরজাহানের করুণা ভিক্ষা করিয়া দরবারে দূত প্রেরণ করিয়াছিলেন। তাঁহার উপর হুকুম হইল, জামীন-স্বরূপ কুমার দারা এবং আওরঙ্গজেবকে

* শাহ্‌জাদা খুর্‌র‌ম ১০৩৪ হিঃ অর্থাৎ ১৬২৫ খৃষ্টাব্দের প্রথম ভাগে জৌনপুরে ছিলেন (*Vide* Amal-i-Salih Text p. 187।)

* গৌরীশঙ্কর ওঝা কৃত হিন্দী রাজপুতানেকা ইতিহাস, ৩য় খণ্ড ৮২৩ পৃ.

† Khafi Khan, *Muntakhab-ul-labab*

অগ্রে দরবারে প্রেরণ করিয়া পরে তাঁহাকে স্বয়ং হুজুরে হাজির হইতে হইবে; এবং আসীরগড়, রোহ্‌তাশ প্রভৃতি যে সমস্ত দুর্গে তাঁহার সৈন্যেরা আত্মরক্ষা করিতেছে তাহাদিগকে আত্মসমর্পণের নির্দ্দেশ দিতে হইবে।

দারা ও আওরঙ্গজেব নাসিক হইতে (সোমবার ওরা জমাদি-উস-সানী, ১০৩৫ হিঃ) দরবারে যাত্রা করিলেন; দুই লক্ষ টাকার হীরা-জহরত ও অন্যান্য সামগ্রী বাদশাহ্‌র হুজুরে পেশকশ দেওয়ার জন্য কুমারদ্বয়ের সহিত প্রেরিত হইল। খুর্‌রম পরাজিত হইয়াও বিদ্রোহের দুষ্প্রবৃত্তি ছাড়িতে পারেন নাই। তিনি ইরান্‌-সম্রাট শাহ্‌ আব্বাসের নিকট দূত প্রেরণ করিয়া প্রস্তাব করিলেন, তাঁহার সাহায্য পাইলে তিনি সফবী-বংশকে হিন্দুস্থানের বাদশাহী নজর করিতে পারেন। সন্ধির দ্বিতীয় সর্ত্ত, অর্থাৎ দরবারে উপস্থিতির আদেশ পালনে তিনি নানা অছিলায় বিলম্ব করিতে লাগিলেন। ইতিমধ্যে চলচ্চিত্রের ন্যায় হিন্দুস্থানের রাজনীতি রঙ্গমঞ্চে দৃশ্যপট সহসা তাঁহার অনুকূলে পরিবর্ত্তিত হইল।

৮

সম্রাজ্ঞী নুরজাহান খুর্‌রমের আচরণে ঠেকিয়া শিখিয়াছিলেন, কাহাকেও অতি বাড় বাড়িতে দিলেই বিপদ। খুর্‌রমকে দমন করিবার জন্য প্রয়োজন ছিল মহাবত খাঁর মত ভীমকর্ম্মা সুদক্ষ সেনাপতির; সুতরাং কাজ হাসিল হওয়ার পর হাতিয়ার কেমন করিয়া ভাঙিবেন নূরজাহান সেই চিন্তায় উদ্বিগ্ন হইয়া উঠিলেন। কিন্তু খান-ই-খানান মহাবত খাঁ তখন মোগল সাম্রাজ্যের স্তম্ভস্বরূপ (রুকন্‌উল-সুলতানত) এবং জাহাঙ্গীরের দ্বিতীয় পুত্র, দিল্লীর মসনদের ন্যায্য উত্তরাধিকারী পরবেজের আতালিক। সাম্রাজ্যের শান্তি, স্বার্থ এবং উত্তরাধিকারিত্বে ন্যায় বিচার যদি নুরজাহান বেগমের কাম্য হইত, যদি জাহাঙ্গীরের মৃত্যুর পর স্বীয় প্রাধান্য অক্ষুণ্ণ রাখিবার মত নিতান্ত সংকীর্ণ ব্যক্তিগত স্বার্থ তাঁহার রাজনীতিকে বিপথগামী না করিত তাহা হইলে তিনি পুনরায় পরবেজ এবং মহাবত খাঁর বিরুদ্ধে চক্রান্ত করিতেন না। সম্রাটের দাসীগর্ভজাত কনিষ্ঠ পুত্র অকর্ম্মণ্য শাহ্‌রিয়ারের সহিত নুরজাহান বেগম শের আফগানের ঔরসজাতা কন্যা লাডলী বেগমের বিবাহ দিয়াছিলেন। সম্রাজ্ঞী মনে করিতেন শাহ্‌জাদাগণের মধ্যে যাহাকে ইচ্ছা দিল্লীর মসনদ তাহাকেই তিনি দিতে পারেন। নিতান্ত বিপদে পড়িয়া তিনি খসরুর পুত্র দাওয়ার-বক্‌শ এবং পরবেজকে দাবা খেলার ঘুঁটির ন্যায় আগে বাড়াইয়া খুর্‌রমের বাজিমাৎ করিয়াছিলেন। মহাবত খাঁর বাহুবলে পরবেজ নুরজাহানের শিখণ্ডী শাহ্‌রিয়ার এবং আসফ খাঁর জামাতা খুর্‌রমকে ডিঙ্গাইয়া পাছে সিংহাসন অধিকার করে, এই আশঙ্কায় ভ্রাতা ভগ্নী পূর্ব্ব বিরোধ চাপা দিয়া একযোগে কার্য্য আরম্ভ করিলেন। আলা হজরত সাম্রাজ্যে সাংখ্যের পুরুষ, তাঁহাদের হাতে কলের পুতুল। মহাবত এবং পরবেজকে পরস্পর দূরে সরাইয়া একে একে দুই জনকে দমন করিবার অভিপ্রায়ে পরবেজকে দাক্ষিণাত্যে বাহাল রাখিয়া মহাবত খাঁকে সরাসরি বাংলায় বদলী করা হইল, এবং মহাবত খাঁর স্থানে খান্‌জাহান লোদী শাহ্‌জাদা পরবেজের আতালিক বা অভিভাবক নিযুক্ত হইলেন—ইনি আসলে আসফ খাঁর চর এবং নজরবন্দী শাহ্‌জাদার 'কারারক্ষক'। মহাবত খাঁ কূটনীতির মারপ্যাঁচ কিছু কম বুঝিতেন; সুতরাং তিনি অসন্দিগ্ধ চিত্তে বাংলায় চলিলেন। কিন্তু বাংলাদেশে পৌঁছিতে-না-পৌঁছিতেই দরবারে তাঁহার ডাক পড়িল, অধিকন্তু তাঁহার বিরুদ্ধে অভিযোগ হইল বহু লক্ষ টাকা তিনি সরকারী তহবিল হইতে তছরূপ করিয়াছেন; শাহান্‌শাহ্‌র হুকুম, তাঁহাকে হিসাব বুঝাইয়া দেওয়ার জন্য লাহোরে হাজির হইতে হইবে। বাদশাহী আমলে কোন আমীরকে বেকায়দায় ফেলিয়া অপমানিত ও অপদস্থ করিবার প্রয়োজন হইলেই কড়াক্রান্তি হিসাব দাখিল করিবার হুকুম হইত; কারণ যাঁহারা সেকালে দস্তুরমত আমীর তাঁহারা কোনদি-ই হিসাব রাখিতেন না, দিতেও পারিতেন না;—এই সমস্ত বাজে কাজ করিত কায়স্থ দেওয়ানজী। মহাবত খাঁ ব্যাপার বুঝিতে পারিয়া কাগজপত্র কিছু সঙ্গে লইলেন না; তাঁহার সঙ্গে চলিল বাছা বাছা পাঁচ হাজার রাজপুত সিপাহী,—সে কালের গুর্খা; হুকুম পাইলে "পিতরমপি ন জানামি"। মহাবত কোমর কষিয়া লাহোরে হাজির হইলেন; দরবারে হিসাবের কথা চাপা পড়িয়া গেল।

নুরজাহান বেগম বুঝিতে পারিলেন সিন্ধু নদের এই পারে খান্‌-ই-খানান্‌ মহাবত খাঁর সহিত হিসাব-নিকাশ নিরাপদ নয়। কিন্তু ঝিলম নদী পার না হইতেই সম্রাট জাহাঙ্গীর মহাবত খাঁর হস্তে বন্দী হইলেন। নুরজাহান এবং আসফ খাঁ সম্রাটকে উদ্ধার করিতে অসমর্থ হইয়া তাঁহার সহিত বন্দীদশা স্বীকার করিলেন। মহাবত খাঁর কোন মন্দ অভিপ্রায় ছিল না; সম্রাটের ইচ্ছা অনুসারে তিনি নিতান্ত বিশ্বস্ত চিত্তে আটক অতিক্রম করিয়া কাবুল চলিলেন। ইতিমধ্যে নুরজাহান নিশ্চেষ্ট ছিলেন না, তাঁহার প্রেরিত চরগণ মোটা বেতনে উপজাতীয় পাঠান সিপাহী ভর্ত্তি করিয়া গোপনে রাস্তায় অপেক্ষা করিতেছিল। এক দিন পেশাওয়ারের নিকট মহাবত খাঁর ভাগ্যবিপর্য্যয় ঘটিল। মহাবত খাঁ হতাবশিষ্ট তিন হাজার ফৌজ সঙ্গে লইয়া দিল্লী অভিমুখে পলায়ন করিলেন, পশ্চাতে নুরজাহান বেগম লাহোর পর্য্যন্ত তাঁহাকে দম ফেলিবার অবকাশ

দিলেন না। এইবার মহাবত খাঁকে দমন করিবার জন্ত সপ্ততিপর মুমূর্ষু বৃদ্ধ আব্দুর রহিমের ডাক পড়িল। খুর্রমের সহিত বিদ্রোহে শরীক হওয়ার অপরাধে মনসব এবং খান্-ই-খানান্ উপাধি হারাইয়া এই সময়ে আব্দুর রহিম হুমায়ুঁ-মক্‌বরার মুখোমুখী নিজের সমাধি নির্ম্মাণ করিতেছিলেন। নির্ব্বাণোন্মুখ আশা-প্রদীপের শেষ শিখায় বিভ্রান্ত হইয়া সুকবি আব্দুর রহিম একটি ফার্সি কবিতা রচনা করিয়া দিল্লীশ্বরকে ধন্তবাদ প্রদান করিলেন।

"মারা লুত্‌ফে জঁহাঙ্গীরি জে তাইদাতে রব্বানী।
দো বারঃ জিন্দগী দাদঃ দো বারঃ খান্‌খানানী।"

(অর্থাৎ খোদায় রেজামন্দী ও জাহাঙ্গীর বাদশাহ্‌র মেহেরবাণী আমাকে দ্বিতীয় বার জিন্দগী [জীবন] এবং দুই-দুই বার খান্‌খানানী বকশিশ করিয়াছে।

যাহা হউক, আখেরী লড়াই ফতে করিবার জন্ত কোমরবন্ধ কসিতেই খান্-ই-খানান্ আব্দুর রহিমের প্রাণবায়ু বহির্গত হইল। মহাবত খাঁ মিবাড়ের পথে পলায়ন করিয়া নাসিক শহরে বিদ্রোহী শাহ্‌জাদা খুর্রমের সহিত মিলিত হইলেন (সেপ্টেম্বর, ১৬২৭ খ্রীঃ)।* এইবার জাহাঙ্গীর রাজত্বের শেষ দৃশ্ত এবং শাহ্‌জাহানের রাজত্ব তথা দারাশুকোর জীবন-নাট্যের প্রথম অঙ্ক।

৯

আসফ খাঁ ছায়ার ন্তায় জাহাঙ্গীর বাদশাহ্‌র পার্শ্বে থাকিয়া সুদিনের আশায় সম্রাটের নাভিশ্বাস গণিতেছিলেন। জামাতার বিদ্রোহের পর দরবারে তিনি বিড়াল-তপস্বী সাজিয়াছিলেন,—অপদার্থ বে-দৌলত খুর্রমের কথা মুখেও আনিতেন না। দাসীগর্ভজাত অকর্ম্মণ্য শাহ্‌জাদা শারিয়ারকে দিল্লীর সিংহাসনে বসাইবার আয়োজন নূরজাহান বেগম প্রায় সম্পূর্ণ করিয়াছিলেন। কিন্তু আসফ খাঁ প্রকাশ্তে শাহ্‌জাদা খসরুর পুত্র দাওয়ার বক্‌শকে ন্তায়ের খাতিরে সম্রাটের ভাবী উত্তরাধিকারী বলিয়া মতপ্রকাশ করিলেন। সুতরাং হতভাগ্য খসরু এবং সম্প্রতি পরলোকগত শাহ্‌জাদা পরবেজের প্রতি অনুরক্ত দরবারী মনসবদারগণ সহজেই আসফ খাঁর অনুগত হইয়া পড়িল। আসফ খাঁ গভীর জলের মাছ, বাহ্যতঃ তিনি সম্রাটের সেবা ব্যতীত সর্ব্ববিষয়ে উদাসীন—কেবল ন্তায় এবং ধর্ম্মের খাতিরে সুযোগ মত খুর্রমের দুষ্কার্য্যের তীব্র নিন্দা এবং দাওয়ার বক্‌শের দাবি সমর্থন করিয়া নিজের নিঃস্বার্থ অপক্ষপাতিতা জাহির করিতেন।

১৬২৭ খ্রীষ্টাব্দের ২৯শে অক্টোবর রবিবার সম্রাট জাহাঙ্গীর কাশ্মীর হইতে ফিরিবার পথে নরলীলা সংবরণ করিলেন। বৈধব্য দশাপ্রাপ্ত শোকার্ত্তা সম্রাজ্ঞী নূরজাহান ভ্রাতা আসফ খাঁকে একবার অন্দর মহলে তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্ত কাতর অনুরোধ জানাইলেন। কিন্তু আসফ খাঁ জানিতেন ভগ্নীর অসাধ্য কাজ কিছুই নাই; সুতরাং তিনি সেই ফাঁদে পা বাড়াইলেন না। অধিকন্তু, কয়েক দিনের মধ্যেই সম্রাটের দরবারে পিতার প্রতিভূস্বরূপ নজরবন্দী, দারা, শুজা এবং আওরঙ্গজেবকে ভগ্নীর কবল হইতে উদ্ধার করিয়া সম্রাজ্ঞীকে বন্দিনী করিলেন। লাহোর দুর্গে নূরজাহানকে সতর্কভাবে কারারুদ্ধ করিয়া আসফ খাঁ বেচারা দাওয়ার বক্‌শকে একপ্রকার জোর করিয়াই প্রকাশ্ত দরবারে সম্রাট বলিয়া ঘোষণা করিলেন, তাঁহার নামে খুৎবা পাঠ এবং সিক্কা জারি হইল। ঠিক ঐ দিন ধূর্ত্ত আসফ খাঁ নিজের সাঙ্কেতিক অঙ্গুরীয় বেনারসী নামক গোলামের হাতে দিয়া তাঁহাকে কোন অজ্ঞাত স্থানে সুগোপনে প্রেরণ করিলেন।

১০

তিন মাস পরে (২১শে জানুয়ারি, ১৬২৮ খ্রীঃ) লাহোর দুর্গে আসফ খাঁ স্বীয় জামাতার কল্যাণার্থ এক অকাল বকর-ঈদ পর্ব্ব মানাইয়া দিলেন। এই ঈদের প্রথম বলি, ইতিহাসে আসফ খাঁর "বকর ঈদের মেষ শিশু" বলিয়া পরিচিত সেই হতভাগ্য দাওয়ার বক্‌শ, তাঁহার পর শাহজাদা শারিয়ার এবং এইরূপে পর পর পাঁচ জন রাজপুত্র ঐ ঈদে বলি পড়িল—তৈমুর বংশে দিল্লীর মসনদের কোন সম্ভাব্য দাবীদার আর অবশিষ্ট রহিল না। আসফ খাঁ অবশ্ত বিনা হুকুমে এই কাজ করেন নাই। রাজ্যারোহণের এক মাস পূর্ব্বে শাহ্‌জাহান এই পৈশাচিক হত্যাকাণ্ডের আদেশ দিয়াছিলেন।

শাহ্‌জাহানের সিংহাসন নিষ্কণ্টক করিয়া আসফ খাঁ দৌহিত্রত্রয়কে সঙ্গে লইয়া ২৬শে ফেব্রুয়ারি (১৬২৮ খ্রীঃ) আগ্রার অনতিদূরে আকবরের সমাধিক্ষেত্র সেকেন্দ্রার উপস্থিত হইলেন। পঞ্জিকায় [হিন্দু এবং ইউনানী জ্যোতিষ মতে গণিত] ঐ দিন রাজধানী প্রবেশের পক্ষে অশুভ ছিল বলিয়া শাহ্‌জাদাগণ সেকেন্দ্রায় অপেক্ষা করিবার হুকুম পাইলেন, কিন্তু মায়ের মন পঞ্জিকা মানে না। ২৬শে ফেব্রুয়ারি বিকাল বেলা সম্রাজ্ঞী মমতাজমহল আগ্রা ও সেকেন্দ্রার মধ্যবর্ত্তী স্থানে একটি তাঁবুর মধ্যে পুত্রগণকে দেখিবার জন্ত চলিলেন। সুদীর্ঘ তিন বৎসর নির্ব্বাসনের পর দারা ও আওরঙ্গজেবের মাতৃদর্শন হইল, পিতামহের কাছে প্রতিপালিত বালক শুজা আবার মায়ের কোলে ফিরিয়া আসিলেন।

পরের দিন আসফ খাঁকে অভিনন্দিত করিবার জন্ত মহা সমারোহে আগ্রা দুর্গে দরবার-ই-আম বসিল। দৌহিত্রগণ সহ আসফ খাঁ কুর্ণিশ করিবার পর সম্রাট মসনদের

* আমল-ই-সালেহ্‌, মূল পৃ. ২০১।

"ঝরোকা" [অলিন্দ] হইতে নামিয়া আসিয়া পুত্রত্রয়কে একে একে আলিঙ্গন করিলেন। আসফ খাঁ দীন ও দুনিয়ার মালিক শাহানশাহ্‌র "কদম্‌-বোসী" করিয়া ধন্য হইলেন। শাহ্‌জাদা দারাশুকো যথারীতি বাদশাহ্‌র দরবারে নজর এবং নিসার পেশ করিবার পর সম্রাট তাঁহাকে নগদ দুই লক্ষ টাকা বকশিশ করিয়া তাঁহার জন্য দৈনিক এক হাজার টাকা ভাতা মঞ্জুর করিলেন।

শাহ্‌জাদা দারাশুকো এই রুধিরপ্রদিগ্ধ পিতৃ-সিংহাসনের বিধিনির্দিষ্ট ভাবী উত্তরাধিকারী। এই পটভূমিকা পরবর্তী ইতিহাসের পূর্ব্বগামিনী ছায়া।

যুক্তরাষ্ট্রের উপকূল-রক্ষা বিভাগ

শ্রীনলিনীকুমার ভদ্র

যুক্তরাষ্ট্রের জলযান চলাচলোপযোগী অঞ্চলে যাবতীয় আইন প্রবর্ত্তন এবং বৈধ বাণিজ্য ব্যপদেশে অথবা প্রমোদ-ভ্রমণাদি উপলক্ষে যে সমস্ত জাহাজ জলপথে যাতায়াত করিয়া থাকে সেগুলির নিরাপত্তা বিধানই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের উপকূল-রক্ষা বিভাগের মুখ্য কর্ত্তব্য। তা ছাড়া নৌ-সৈন্য পরিপূর্ণ উপকূল-রক্ষী জাহাজ এবং ষ্টেশনগুলিকে যুদ্ধকালীন কৃত্য সম্পাদনের জন্য প্রস্তুত রাখা এবং ছোট বজরা ও ক্রাফটে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র নৌ-বাহিনী সংগঠিত করিয়া তাহাদিগকে জাতির সঙ্কট-সময়ে কি ভাবে কর্ত্তব্য পালন করিতে হয় তাহা শিক্ষাদান করাও উক্ত বিভাগের কর্ম্ম-সূচির অন্তর্ভুক্ত।

সমুদ্রযাত্রীদের অথবা মহাসমুদ্রে এবং উহার তীরবর্ত্তী অঞ্চলে ভ্রমণকারীদের ধনপ্রাণ রক্ষা ও নিরাপত্তা বিধান ছাড়া উপরি-উক্ত বিভাগকে আরও বহুবিধ দায়িত্বভার গ্রহণ করিতে হয়—যেমন, বিদেশ হইতে নিষিদ্ধ পণ্যদ্রব্যের বে-আইনী আমদানি রপ্তানি বন্ধ করা; বিশেষ বিশেষ সামুদ্রিক প্রাণী এবং মৎস্যাদির রক্ষণার্থে আইন প্রবর্ত্তন এবং তাহার প্রয়োগ, তুষার-পর্ব্বতের বিদারণকার্য্য সম্বন্ধে তত্ত্বাবধান এবং রিপোর্ট ইত্যাদি দাখিল করিবার জন্য একটি আন্তর্জাতিক রক্ষী বিভাগ পরিপোষণ এবং দুর্গত অঞ্চলে সেবাকার্য্যের ব্যবস্থা করা ইত্যাদি।

একটি উপকূলরক্ষী 'কাটারে'র নাবিকেরা গ্রীনল্যাণ্ডের উপকূল অঞ্চলস্থ একটি তুষার-পর্ব্বত বিদীর্ণ করিবার উদ্যোগ করিতেছে

১৭৯০ খ্রীষ্টাব্দের ৪ঠা আগষ্ট হইতে উপকূল-রক্ষা বিভাগের সূচনা। তখন কংগ্রেসের বিধি-অনুযায়ী প্রথমে 'রেভিনিউ-মেরিন' এবং পরে 'রেভিনিউ কাটার সার্ভিস্' নামক দুইটি বিভাগের সৃষ্টি হয়। ১৯১৫ ইংরেজীর ২৮শে জানুয়ারীর একটি আইন অনুসারে 'রেভিনিউ কাটার সার্ভিস' এবং 'লাইফ সেভিং সার্ভিস' যুক্তরাষ্ট্রের উপকূল-রক্ষা বিভাগ নামক প্রতিষ্ঠানের অন্তর্ভুক্ত হইয়া যায়। উক্ত প্রতিষ্ঠানটি আইনতঃ যুক্তরাষ্ট্রের সৈন্যবাহিনীর অঙ্গবিশেষ বলিয়া পরিগণিত।

শান্তির সময়ে ট্রেজারি বিভাগের অধীনে ইহার কার্য্য-পরিচালনা হয়, আর যুদ্ধের সময় নৌবাহিনীর অন্যতম অঙ্গ হিসাবে উহার সেক্রেটারীর আদেশানুযায়ী ঐ প্রতিষ্ঠানের বিভাগের কাজকর্ম্ম নির্ব্বাহিত হয়। ১৯৩৯ খ্রীষ্টাব্দের ১লা জুলাই তারিখে প্রেসিডেন্ট রুজভেল্টের দুই নম্বর পুনর্গঠন পরিকল্পনার অঙ্গীভূত করিয়া উপকূল-রক্ষা-বিভাগের কার্য্যধারাকে অধিকতর সম্প্রসারিত করা হয়। পূর্ব্বতন দীপ-গৃহ (Light-house) বিভাগও ইহার সহিত সংশ্লিষ্ট হয়।

যুদ্ধকালে উপকূল-রক্ষা বিভাগের কর্ম্মচারীগণ বন্দর-রক্ষক রূপে নৌ-বাহিনীতে কাজ করিয়া থাকে। তাহাদিগকে আমেরিকার উপকূল-ভাগ রক্ষা এবং সৈন্য চলাচলাদির ব্যবস্থা করিতে হয় এবং মার্কিন বাহিনী যখন শত্রু-অধিকৃত অঞ্চলে

আক্রমণ চালায় তখন বিমান হইতে অবতরণাদি ব্যাপারে তাহাদিগকে সহায়তা করিয়া থাকে।

সমুদ্রপথে যে সমস্ত ভগ্ন জাহাজ এবং পরিত্যক্ত ও বিধ্বস্ত দ্রব্য বিপত্তির সৃষ্টি করে, উপকূল-রক্ষা বিভাগ সেগুলিকে অপসারিত এবং বিনষ্ট করিয়া জলযান চলাচলের পথকে সুগম করিয়া দেয় এবং দীপ-গৃহ (Light-house) দীপ-পোত (Ligh'-ships) বয়া রেডিয়ো এবং বিবিধ প্রকার আলোক-স্তম্ভ এবং আবহ ও বেতার-কেন্দ্র স্টেশন ইত্যাদি নির্ম্মাণ ও রক্ষণাবেক্ষণ করে। তা ছাড়া উক্ত বিভাগ উত্তাল সমুদ্রে বাষ্পীয় পোতারোহী বিপন্ন নাবিকদের উদ্ধারসাধন এবং বন্যাপীড়িত অঞ্চলে সেবাকার্য্য পরিচালনাও করিয়া থাকে। গভীর সমুদ্রে পোতারোহণপূর্ব্বক মৎস্য শিকারে ব্যাপৃত নাবিকদের চিকিৎসাদির ব্যবস্থাও উক্ত বিভাগের কর্ম্ম-তালিকার অন্তর্ভুক্ত। নূতন বাষ্পীয় পোতাদি নির্ম্মাণ এবং পুরাতন জাহাজ মেরামত করা ইহার অনুমোদন সাপেক্ষ। সারেং নাবিক এবং অন্যান্য কর্ম্মচারীরা এই বিভাগের অনুমতি-পত্র এবং প্রশংসা-পত্রের জোরেই কর্ম্মে বহাল হইয়া থাকে।

যুদ্ধ-বিষয়ক কেতাবী-বিদ্যা শিক্ষাদানের নিমিত্ত মার্কিন উপকূল-রক্ষা বিভাগ নিউ লণ্ডনের কানেকটিকাটে একটি শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান স্থাপিত করিয়াছেন। এই বিদ্যালয়ের কোর্স শেষ করিতে চারি বৎসর লাগে। এঞ্জিনিয়ারিং, সমর-বিজ্ঞান, সাংকেতিক এবং বিবিধ বৃত্তিশিক্ষামূলক বিষয়সমূহ ইহার পাঠ্য-তালিকার অন্তর্ভুক্ত। নৌবিভাগে নূতন আমদানি লোকদের
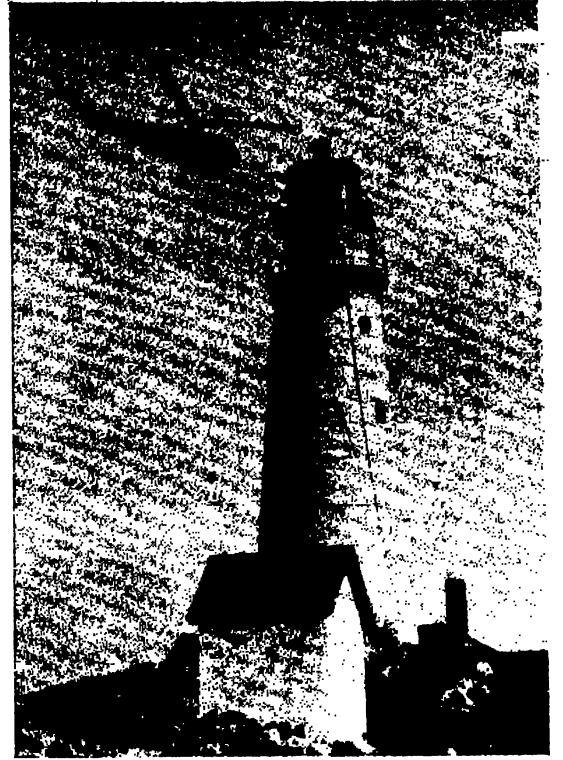
যুক্তরাষ্ট্রের বোস্টন বন্দরের দীপ-গৃহের উপর একটি মার্কিন উপকূল-রক্ষী হেলিকপ্টার

রোগাক্রান্ত জনৈক মার্কিণ নৌ-বহরশিল্পীকে একটি খাটুলিতে করিয়া সান ডিয়েগো নামক স্থানে একটি 'সি-প্লেনে' লইয়া যাওয়া হইতেছে

শিক্ষাদান, ঐ বিভাগের তালিকাভুক্ত কর্ম্মনিরত ব্যক্তিদের জন্ত উন্নত ধরণের শিক্ষা বিধান। এবং অফিসারদের জন্ত বিশিষ্ট পদ্ধতির শিক্ষা-ব্যবস্থাকল্পে বিভিন্ন স্থানে বহু শিক্ষা-কেন্দ্র প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। কর্ত্তৃপক্ষের উদ্যোগে ক্রীড়া-কৌতুক-সংক্রান্ত একটি সুপরিকল্পিত কর্ম্মপদ্ধতিও অনুসৃত হইয়া থাকে। প্রতি বৎসর একদল শিক্ষাপ্রাপ্ত ছাত্র জলপথে অভিযানে বাহির হয়। সচরাচর তাহারা বৈদেশিক বন্দরগুলিতে নোঙর করিয়া থাকে।
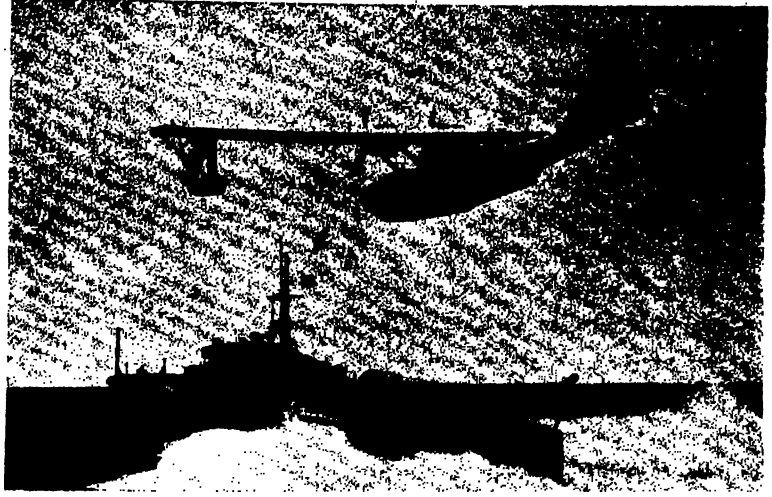
সমুদ্রে দুর্গতদের উদ্ধার করে একটি উপকূল-রক্ষী 'কাটার' এবং বিমান একই সঙ্গে অগ্রসর হইতেছে

সত্যেন্দ্রনাথের কাব্যপ্রতিভা

শ্রীকালীকিঙ্কর সেনগুপ্ত

সত্যেন্দ্রনাথের কাব্যে মানুষের স্থান

সত্যেন্দ্রনাথের কাব্যে মুখ্য স্থান অধিকার করে আছে মানুষ। মানুষের সুখদুঃখ, হাসি-কান্না, আশা-আকাঙ্ক্ষা, জয় পরাজয়ের সহিত তাঁর নিবিড় যোগ এবং গভীর পরিচয়। ভগবান মানুষকে তাঁর নিজের ছাঁচে সৃষ্টি করেছেন।—'মমৈবাংশো জীবলোকে জীব ভূতঃ—' মানুষ তাঁর অংশাবতার। 'সবার উপরে মানুষ সত্য'—এই রূপ যুগে যুগে দেশে দেশে ধর্ম্মশাস্ত্রে এবং কাব্যে মানুষই যে ভগবানের শ্রেষ্ঠ প্রেষ্ঠ এবং গরিষ্ঠ সৃষ্টি—তা স্বীকৃত, গীত এবং প্রচারিত হয়েছে। এই স্বীকৃতি মোহাবিষ্ট মনের ক্ষণিক ভাবোচ্ছ্বাস নয়—ইহা তত্ত্বদর্শী মনের সত্যকার উপলব্ধি। তুলসীদাসের 'সব ঘট বিরাজে রাম', উপনিষদের—'সদাজনানাং হৃদয়ে সন্নিবিষ্টঃ', বিবেকানন্দের—'বহুরূপে সম্মুখে তোমার, ছাড়ি কোথা খুঁজিছ ঈশ্বর? জীবে প্রেম করে যেই জন, সেই জন পূজিছে ঈশ্বর।' সত্যেন্দ্রনাথ এই চরম সত্য এবং পরম সত্যকে তাঁর অনিন্দ্য ভাষায় এবং ছন্দে রূপ দিয়েছেন—

'জগৎ জুড়িয়া এক জাতি আছে সে জাতির নাম মানুষ জাতি।
এক পৃথিবীর স্তন্যে লালিত এক রবি শশী মোদের সাথী।
'কালো আর ধলো বাহিরে কেবল ভিতরে সবারি সমান রাঙা।'

তাঁর 'কুহানাদশি' কবিতায় বারাঙ্গনা-বন্দনা, সাম্য-সাম, শূদ্র, মেথর, জাতির পাঁতি, প্রভৃতি কবিতাগুলি ব্যষ্টিগত এবং সমষ্টিগত ভাবে এই অতলস্পর্শ, অপরিমেয় মানব-তত্ত্বের রহস্যোদ্ঘাটনেই বিনিযুক্ত হয়েছে।...

এই মানবতত্ত্বই কাব্য-সাহিত্যের ভিত্তি বিধায়—Matthew Arnold কাব্যকে Criticism of Life বলেছেন। Lyallও এই দিক দিয়াই কাব্যকে minute mental dissection আখ্যা দিয়েছেন।

এই মানবতত্ত্বকে বিরাট্ এবং ব্যাপক ভাবে, প্রত্যক্ষ করেছেন রবীন্দ্রনাথ। 'ময়ি সর্ব্বমিদং প্রোতং' ক'রে সকল নরনারীর অন্তঃকরণের সুখ-দুঃখের ধুক-ধুক করা স্পন্দন তিনি নিজের হৃৎপিণ্ডের ভিতর অনুভব করেছেন যার পরিচয় পাই—'দুই বিঘা জমি,' 'পুরাতন ভৃত্য,' 'পতিতা' 'বাসবদত্তা' 'মুক্তি', 'ফাঁকি', 'নিষ্কৃতি' প্রভৃতি তাঁর বহু কবিতায়। আবার অপর দিকে রবীন্দ্রনাথ নিজকে নিখিল জগতের সকল দেশে সকল জাতির মধ্যে বিলিয়ে দিতে চেয়েছেন—তাদের বিচিত্র সুখ দুঃখের অনুভূতির অংশভাগী হবার আগ্রহে। কবির চিত্তবীণার তন্ত্রীতে তন্ত্রীতে আনন্দ-গীতি ঝঙ্কৃত হয়ে উঠেছে—

'সব ঠাঁই মোর ঘর আছে আমি সেই ঘর মরি খুঁজিয়া…
'ঘরে ঘরে আছে পরমাত্মীয় তারে আমি ফিরি খুঁজিয়া'
'ইচ্ছা করে মনে মনে…স্বজাতি হইয়া থাকি সর্ব্বলোক সনে'
'দেশ দেশান্তরে…জন্মলাভ করে লই হেন ইচ্ছা করে'

সত্যেন্দ্রনাথ এরূপ বৃহৎ বিরাট্ ব্যাপক ভাবে নিজকে বিশ্বময় বিলিয়ে দিতে পারেন নি সত্য। তাঁর অনুভূতির পরিধিও খুব বিস্তৃত নয়—তা সাধারণ মানবের সুখ দুঃখের গণ্ডীর মধ্যেই সীমাবদ্ধ। কিন্তু তিনি আপনার সহানুভূতি ও সম-

বেদনায় দেশের নর-নারীর নিত্যকার নির্যাতন মর্মে মর্মে অনুভব করেছেন। বালবিধবার দুঃখে দীর্ঘশ্বাস ফেলে তিনি বলেছেন :—

'শঙ্কার ধারা যতদূর যায়, ওগো দয়াময় তাহারো পারে
লয়ে যেয়ো এই সুখবঞ্চিত চিরলাঞ্ছিত অন্ধ তারে'

পতিতাকে আশ্বাস দিয়ে বলেছেন—

'সূর্য্য যদি না বর্জ্জন করে তোরে,
আমিও তোমারে করিব না বর্জ্জন'

সকল স্বর্গকামী পুণ্যাত্মাকে ডেকে বলেছেন—

'মন্দির কন্দর ছাড়ি এস বন্ধু এস বাহিরিয়া
স্বর্গের কামনা ভোলো প্রব্যথিত মানবের হিয়া।'

সকলকে মানুষের কাজে মানুষের মাঝে ডেকে বলেছেন—

'এস এস মানুষের মাঝে,
নরলোকে আছে কাজ স্বর্গে তুমি কি লাগিবে কাজে?'

স্বর্গের সম্পদ, স্বর্গের অমৃত কবিকে প্রলুব্ধ করতে পারে নি। রবীন্দ্র-কাব্য পর্য্যালোচনা করলে দেখা যায় সেখানে কবির ব্যক্তিগত অনুভূতি সার্ব্বজনীন এবং সার্ব্বভৌম অনুভূতির মধ্যে বিলীন এবং পরিব্যাপ্ত। 'ভাব হ'তে রূপে, এবং রূপ হ'তে ভাবে' অবিরাম আকাশবিহারী কবির আসা-যাওয়া তাঁর অনুভব, আস্বাদন, প্রকাশভঙ্গী এবং আবেদন নৈর্ব্যক্তিক এবং তাতে অর্থের চেয়ে ইঙ্গিত অনেক বড়। কিন্তু সত্যেন্দ্রনাথ তাঁর ব্যক্তিগত অনুভূতিকে সরল ভাবে এবং সরল ভাষায়—সুস্পষ্ট অর্থে সকলের পক্ষে সুবোধ্য এবং সুগোচর করে তুলেছেন। তাঁর কাব্যে প্রসাদগুণ সুপ্রচুর, 'বুঝলাম না' বলবার উপায় নাই। রবীন্দ্রনাথের গভীরতা অগাধ, অতলস্পর্শ দুরবগাহ, তিনি অরূপ রতন আশা করে রূপ-সাগরে ডুব দেন। তার উচ্চতাও দুরারোহ, প্রাংশুলভ্য। বিশেষ অধিকারীর কথা স্বতন্ত্র কিন্তু সাধারণ পাঠক উদ্বাহু হয়েও সকল সময় তার নাগাল পায় না, প্রাঞ্জলতা এবং সহজবোধ্যতার দরুণ সত্যেন্দ্রনাথের কাব্যামৃত রসাস্বাদন সাধারণ পাঠকদের পক্ষেও অনায়াসসাধ্য। তাঁর রচনা পাঠকসাধারণের চিত্তকে সুখ-দুঃখের দোলায় বিচিত্রভাবে আন্দোলিত করে।

সত্যেন্দ্রনাথের বর্ণনা

বর্ণনার দিক থেকে সত্যেন্দ্রনাথের ভঙ্গী বস্তুতান্ত্রিক এবং বহির্মুখী, রবীন্দ্রনাথের দৃষ্টি ভাবঘন এবং অন্তর্মুখী। তাঁর ভাবাবেগ প্রাণধর্ম্ম এবং সৃষ্টিশক্তি এতই প্রচুর এবং সক্রিয় যে অতি সাধারণ বস্তুতন্ত্র রচনাতেও তাঁর প্রতিভার অলৌকিক রশ্মি বিস্ফুরিত হয়ে তাকে স্নিগ্ধ-মেদুর-মাধুর্য্যে মণ্ডিত করেছে। আলঙ্কারিক ভাষায় তাঁর রীতিকে বলা যেতে পারে বৈদর্ভী রীতি, তাঁর ইঙ্গিত পদে পদে তাঁর অর্থকে অতিক্রম করে যায়, অভিধার চেয়ে ব্যঞ্জনা হয় জটিল এবং প্রহেলিকাময় এক সবতায় কাণ্ডে অত অনেক সবতা শাখা বিস্তার করে—পত্রপুষ্পফলে সকল ও সুন্দর অথচ ছায়া এবং সুরভিতে বিবিক্ত ও মনোজ্ঞ হয়ে উঠে। সত্যেন্দ্রনাথের রীতি প্রধানতঃ গৌড়ী রীতি, বর্ণনা বস্তুতন্ত্র, সঙ্কীর্ণ কিন্তু স্বধর্ম্মনিষ্ঠ, অর্থ অভিধা-প্রধান। 'কোদাল'কে তিনি সুস্পষ্টরূপে কোদাল বলেই প্রকাশ এবং প্রতিপন্ন করতে সচেষ্ট। রবীন্দ্রনাথ ভাবপ্রধান—সত্যেন্দ্রনাথ নিজের নামকে সার্থক করে সত্য-প্রধান। সত্যের তুলনায় ভাব অনেক বেশী ব্যাপক এবং বিচিত্র। সত্যের শুভ্র আলোককে সে স্বীয় প্রতিভার ত্রিকোণ স্ফটিকে (prism) প্রতিহত ও বিস্ফুরিত করে ইন্দ্রধনু রচনা করে। ভাবতন্ত্র কবির দান অকৃপণ এবং উদার। সত্য-পরতন্ত্র বা বস্তুতন্ত্র কবির দান অপেক্ষাকৃত সঙ্কীর্ণ এবং সীমাবদ্ধ। দৃষ্টান্তস্বরূপ সত্যেন্দ্রনাথের একটি বর্ণনা উদ্ধৃত করি :

'হাড় বেরুনো খেজুরগুলো, ডাইনী যেন ঝামর চুলো
নাচতেছিল সন্ধ্যাগমে লোক্ দেখে কি থমকে গেলো?
জমজমাটে জাঁকিয়ে ক্রমে রাত্রি এলো, রাত্রি এলো।

কোথাও অস্পষ্টতা নাই, এই বর্ণনা মূর্ত্তিমন্ত জীবন্ত এবং বাস্তবধর্ম্মী। সন্ধ্যার কূলে দিনের চিতা জ্বালিয়ে উর্ম্মিমুখর সাগরের পারে কোনও অপরিচিতার আলয় নির্দ্দেশ করবার স্পর্দ্ধা তার নাই।

সত্যেন্দ্রনাথ চারণ কবি

সত্যেন্দ্রনাথকে নিঃসন্দেহে বাংলার চারণ কবির আখ্যা দেওয়া যায়। তাঁর বঙ্গজননী, সিংহল, তাজ, কবর-ই-নুর-জাহান, গঙ্গাহৃদি বঙ্গভূমি, কয়াধু, মুক্তবেণী, বুদ্ধ পূর্ণিমা, আখেরী, প্রভৃতি কবিতা দেশের ঐতিহ্য কথায় উচ্ছ্বাসে এবং ভাবে কাণায় কাণায় পূর্ণ হয়ে উঠেছে।

রবীন্দ্রনাথের কাব্য অতি সূক্ষ্মতত্ত্বের বিচার-বিশ্লেষণের বিচিত্রতায় এবং অলৌকিকতায় পরিপূর্ণ হলেও তিনি একাধারে জীবনের সর্ব্ববিধ তত্ত্বের বিশ্বতত্ত্বজ্ঞ ঋষি এবং তাঁর প্রতিভার প্রকাশ সর্ব্বতোমুখী। তিনি বৈষ্ণব কবি, সুফি কবি, মরমী কবি, দরদী কবি, প্রকৃতির কবি, অপ্রাকৃতের কবি, মানবপ্রেমের কবি, বিশ্বপ্রেমের কবি।

অপর দিকে সত্যেন্দ্রনাথ Boswell-এর অনুরাগ নিয়ে এবং তদপেক্ষাও প্রশস্ততর কাব্য-প্রতিভার পরিচয় দিয়ে কবিগুরুর প্রতি তাঁর ভক্তির পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করেছেন। রবীন্দ্রনাথ নোবেল প্রাইজ পাওয়াতে 'আভ্যুদয়িক' কবিতায় তাঁর আনন্দোচ্ছ্বাস পাই :—

রবির অর্ঘ্য পাঠিয়েছে আজ ধ্রুবতারার প্রতিবাসী
প্রতিভার এই পুণ্য পূজায় সপ্তসাগর মিলল আসি।
পুণ্যে তব পুষ্ট আজি বাল্মীকি ও ব্যাসের ধারা
বিশ্ব কবি সভায় ওগো বাজাও বীণা হাজার-তারা।

প্রকৃতই রবীন্দ্রনাথ সহস্রতন্ত্রী বীণা বাজিয়েছেন। বিশ্বের কাব্যকুঞ্জকে বিচিত্র রাগরাগিণীর ঝঙ্কারে অনুরণিত করে

গেছেন। কিন্তু সত্যেন্দ্রনাথ তাঁর সপ্ততন্ত্রী বিপঞ্চিকার সাতটি যে তার সেই তার কটি বাজিয়েই তৃপ্ত হয়েছেন এবং তৃপ্তি দান করেছেন।

তাঁর মনীষী বন্দনা বা বীরপূজা (hero-worship) বিষয়ক কবিতাগুলিতে তাঁর অসংকীর্ণ ও অকৃপণ মনের অমহরা, উদারতা এবং বিশ্বমৈত্রীর স্বতঃসমুৎসারিত জাহ্নবী-ধারারই কুলু কুলু ধ্বনি শুনতে পাই। দৃষ্টান্তস্বরূপ তাঁর মনীষী মঙ্গল, বুদ্ধ পূর্ণিমা, নমস্কার, গান্ধীজী, শ্রদ্ধাহোম, বড়দিনে, বিদ্যাসাগর প্রভৃতি কবিতগুলি উল্লেখযোগ্য।

সত্যেন্দ্রনাথ দীন দরিদ্রের বন্দনা করেছেন এবং তাঁর চারণ গীতি সার্থক হয়ে উঠেছে তাঁর 'গঙ্গাহৃদি বঙ্গভূমি'র স্তুতি গানে, কণ্ঠ তাঁর মুখরিত হয়ে উঠেছে দেশের মনস্বীদের কীর্তিকথা বর্ণনে।

> ধ্যানে তোমার রূপ দেখি গো স্বপ্নে তোমার চরণ চুমি
> মূর্তিমন্ত মায়ের স্নেহ গঙ্গাহৃদি বঙ্গভূমি
> তুমি জগৎধাত্রীরূপা পালন কর পীযূষ দানে
> মমতা তোর মেদুর হ'ল মধুর হ'ল নবীন ধানে।

ব্রাউনিং-এর তীব্র ভাবাবেগ শেলির নিগূঢ় কল্পনাকুশলতা রবীন্দ্রনাথের অতীন্দ্রিয়লোকের নিবিড় ধ্যানৈকতানতা সত্যেন্দ্রনাথের কাব্যে সুপরিস্ফুট হয় নাই সত্য কিন্তু তথাপি তাঁর অবদানে অপ্রাচুর্য্য নাই। তাঁর ভাষা, বিভিন্ন বৈদেশিক ভাষা হতে চয়ন করা শব্দ-সম্পদ তাঁর বিচিত্র ছন্দ বিরচনা তাঁর উন্নত এবং অনবদ্য ভাবরাজি যে কোন দেশের যে কোন কবিকে গৌরব দান করতে পারে।

ওয়ার্ডসওয়ার্থ সম্বন্ধে বলা হয়েছে—'He uttered nothing base !' এ কথা সত্যেন্দ্রনাথের প্রতিও প্রযোজ্য। তিনি শুধু যে তাঁর রচিত কাব্যে কুরুচি এবং অশ্লীলতাকে প্রশ্রয় দেন নাই তাই নয়, তিনি যা কিছু পরিবেশন করেছেন তার দ্বারা তিনি তাঁর স্বদেশবাসীকে, তাঁর জাতিকে জাতীয়তায়, আত্মমর্য্যাদায়, স্বাধীনতায় শ্লাঘায় এবং উচ্চতর আদর্শে অনুপ্রাণিত করেছেন। অতীতের ঐতিহ্য এবং ইতিহাস, পুরাণ, আরণ্যক ইত্যাদির বিবরণ থেকে যা কিছু গ্রহণীয় ও সঙ্কলনীয় তা তিনি নিজের প্রতিভার রসায়নে রঞ্জিত করে উপস্থাপিত করেছেন। এই মৃতকল্প জাতির প্রাণ প্রতিষ্ঠায় স্বপ্নই কবিকে ভাসিয়ে নিয়ে চলেছে প্রত্যক্ষের ঊর্দ্ধে সুদূর আদর্শলোকে।

কবি ও স্বাধীন ভারতের সভাকবি

সত্যেন্দ্রনাথ রূপক ব্যাখ্যান করেন নি, এবং নরনারীর প্রেমের অথবা যৌন আকর্ষণের বিলাস বিবর্ত্ত সম্বলিত সূক্ষ্ম বিশ্লেষণ বৈচিত্র্য তাঁর কবিতায় প্রকাশ পায় নাই এ কথা সত্য, কিন্তু তিনি যা দিয়েছেন তা দার্শনিক তত্ত্বের জল্পনা-কল্পনায় পূর্ণ বা পরিপুষ্ট না হ'লেও তাকে নিছক কাব্য হিসাবে উপভোগ করার কোন বাধা হয় না। মূলতঃ মানব জীবন, কৃতী মানুষের জীবনী, নৈসর্গিক দৃশ্য, সাময়িক ঘটনা, লাঞ্ছিত নরনারীর জন্য বেদনাবোধ, ইত্যাদিই তাঁর অধিকাংশ কবিতার উৎস। হয়ত নূতন ছন্দের রচনা-কৌতূহলে রূপ ও রীতি কখনও বর্ণনীয় ভাবকে ছাপিয়ে গিয়েছে, তবলার বোল হয়ত গানের সুরকে চাপা দিয়েছে কিন্তু তবুও তাঁর প্রতিভাকে অস্বীকার করবার উপায় নাই, তাঁর উদার অন্তরের মত তাঁর সমস্ত কবিতাই ঔদার্য্যে শ্লীলতায় শালীনতায় এবং শুচিতায় পরিপূর্ণ। তিনি oriental mystic বা প্রাচ্যের ঐশ প্রেমের মরমিয়া কবি নন, কিন্তু তাঁর অনিন্দ্য ছন্দে ও কথায় স্বাধীন ভারতের যে কল্পনালোক তিনি রচনা করে গেছেন তারই সভা-কবি আখ্যা তাঁকে দিলে অসঙ্গত হয় না। তিনি প্রহ্লাদ-জননীর মুখে বলেছেন—

> কার তরে এই শয্যা দাসী রচিস আনন্দে
> হাতীর দাঁতের পালঙ্কে তোর দে রে আগুন দে।
> বিদ্রোহ নয় বিপ্লব নয় ন্যায্য অধিকার
> তীর্থ হ'ল বন্দীশালা শিকল অলঙ্কার
> খেদ কিছু নাই আর না ভরাই চিত্তে মাভৈঃ রব
> উচিত ব'লে বন্দী ছেলে এই মম গৌরব।
> কয়াধু তোর জনম সাধু মোছরে চোখের জল—
> রাজরোষেরি রোশনায়ে তোর মুখ হ'ল উজ্জ্বল।

পঞ্জাবের লাঞ্ছনার পর 'রবীন্দ্র-নমস্কারে' সত্যেন্দ্রনাথ পাশ্চাত্য সভ্যতাকে যে ধিক্কার দিয়েছিলেন, আজ সে কথা আরো কত সত্য।

> দাঁড়ায়ে প্রতীচ্য ভূমে যে ঘোষে অপ্রিয় সত্য কথা
> অযত্ন অন্তর যোগ্য পশ্চিমের দম্ভর সভ্যতা
> ছিন্নমস্তা ইয়োরোপা শোনে বাণী বজ্রাহত প্রায়
> ছিন্নমুণ্ডে শিবনেত্রে দেখে নিজ রক্তের ফোয়ারা।

রবীন্দ্রনাথ কলিকাতার অন্যতম শ্রেষ্ঠ অভিজাত পরিবারে জন্মগ্রহণ করে উত্তরাধিকার সূত্রে পেয়েছিলেন অভিজাত সম্প্রদায়ের সংস্কৃতি এবং ভাবধারা, কিন্তু তিনি দ্রষ্টা কবির তৃতীয় নেত্র এবং দরদ ও সহানুভূতি দিয়ে ব্যথিতের বেদনা উপলব্ধি করেছিলেন, আর্ত্ত মানবতার বেদনা তাঁর অন্তরকে মথিত করে তুলেছিল। সত্যেন্দ্রনাথ আরও সন্নিকটে আরও ঘনিষ্ঠভাবে দারিদ্র্যপীড়িত অস্পৃশ্য পতিত নরনারীকে দেখতে পেয়েছিলেন এবং বহু কবিতায় তিনি মনুষ্যসৃষ্ট ভেদবৈষম্যকে সর্বজন সমক্ষে কশাঘাত করতে কুণ্ঠা বোধ করেন নি :

> "এ বিপুল ভবে কে এসেছে কবে উপবীত ধরি গলে
> পশুর অধম অসুর দণ্ডে মানুষেরে তবু দলে !
> দেবতার ঘরে গণ্ডী রেখ না খোলো মন্দির দ্বার
> দেবতা কাহারো নহে তৈজস দেবভূমি সবাকার।

ছন্দোবৈচিত্র্য

বাক্য এবং অর্থের সুষ্ঠু সংযোজনায় রসসৃষ্টি হলেই তার ঐশ্বর্য্য এবং মাধুর্য্যের তারতম্যেই কাব্যের তর তম নির্দ্ধারিত

হয়। বাক্যের প্রধান অলঙ্কার ধ্বনি এবং অনুপ্রাস অর্থের প্রধান সম্পদ তার ভাব এবং ব্যঞ্জনা, তার স্পষ্ট এবং অস্পষ্ট ইঙ্গিত।

বাগ্‌বিন্যাসের প্রধান রীতি যতি ও প্রস্বরের (accent) বিন্যাসের উপর নির্ভর করে। সত্যেন্দ্রনাথ তাঁর কবিতার ছন্দের বহুবিধ প্রাচুর্য্যে এবং মাধুর্য্যে আমাদের মুগ্ধ করেছেন। কিন্তু এই ছন্দের পরীক্ষণের ফলে সমুদ্ভূত প্রত্যেকটি কবিতাই যে রসোত্তীর্ণ হতে পেরেছে তা নয়, বরং তার কতকগুলি ছন্দ তার একঘেয়ে সমাবর্ত্তনের পৌনঃপুনিকতার যে পরিমাণে মনকে অভিভূত এবং কানকে পরাভূত করে সে পরিমাণে ঠিক প্রাণকে কাব্যরসে রসান্বিত করে না। সেজন্য আধুনিক সমালোচকদের কেহ কেহ তাঁহাকে কবি না বলে শুধু ছান্দসিক বলতেও কুণ্ঠা বোধ করেন নাই। দৃষ্টান্ত স্থলে তাঁর পিয়ানোর গান, পাল্কীর গান, দূরের পাল্লা প্রভৃতির উল্লেখ করা চলে। এগুলিতে গানের সুরকে অতিক্রম করে বাদিত্রের accompaniment বা সহকারী যন্ত্রের ঔদ্ধত্য প্রকাশ হলে যে দোষ হয় সেই দোষই হয়েছে। কিন্তু তাই বলে বহু মৌলিক ছন্দ রচনা ক'রে এবং বহুবিচিত্র স্বদেশী ও বিদেশী ছন্দের আমদানী করে কাব্য-সাহিত্যকে তিনি যেরূপ বৈচিত্র্যপূর্ণ এবং সমৃদ্ধ করেছেন আধুনিক কালের সমালোচক যদি সে অপরিশোধ্য ঋণ না স্বীকার করেন তবে সে অকৃতজ্ঞতা ও অকমণীয়তার পর্য্যায়ে পড়বে। কতকগুলি ছন্দে, বিশেষতঃ হালকা পল্‌কা দ্রুতছন্দে আবৃত্তি দীর্ঘ হলে কানের যেন মুখ মেরে যায়— একটা Cloying effect হয়। এক-এক জন গায়ককেও ঠিক একই অপরাধে অপরাধী বলে মনে হয় যখন তিনি গানের আস্থায়ী অন্তরা সঞ্চারী বা আভোগের যে কোন একটি পর্দ্দা ধরে ক্রমাগত 'হুনিয়ে' এবং 'কেনিয়ে' শ্রবণেন্দ্রিয়কে বিপর্য্যস্ত এবং শ্রোতাকে বিপন্ন করে তোলেন। গানের melody বা মাধুর্য্য এবং কবিতার রস একই পর্য্যায়ভুক্ত। উভয়ই মূকাস্বাদনবৎ। শ্রোতা এবং ভোক্তার অনুমোদন ইহার কষ্টিপাথর। তাই সংশয়ে ভয়ে কবি বলেন—

"আপরিতোষাদ বিদুষাং ন সাধু মন্যে প্রয়োগবিজ্ঞানম্।"

সত্যেন্দ্রনাথ ছান্দসিক ছিলেন স্বীকার করি কিন্তু হীনার্থে নয় বিশিষ্টার্থে। তিনি যে কেবল অক্ষরবৃত্ত, মাত্রাবৃত্ত মিত্রাক্ষর বা অমিত্রাক্ষর দিয়ে chronometer বা metroneme অর্থাৎ কালমান বা তালমান যন্ত্রের মত ছান্দসিক ছিলেন তা নয়।

ছন্দোবৈচিত্র্য সৃষ্টিতে সত্যেন্দ্রনাথের প্রতিভা ছিল অনন্যসাধারণ। যাঁরা বাংলাদেশে বাউলের নাচ দেখেছেন পায়ে ঘুঙুর বেঁধে, কখনও গোপীযন্ত্র বাজিয়ে, কখনও এক হাতে একতারা অন্য হাতে ডুগি বাজিয়ে অপূর্ব্ব ছন্দের লহরী তুলতে, তাঁরাই উপলব্ধি করবেন বাংলা ভাষার ছন্দপ্রবণতা অন্য ভাষার চেয়ে কত বেশী। সত্যেন্দ্রনাথের কাব্যে বহু অপূর্ব্ব এবং বিচিত্র স্বদেশী ও বিদেশী ছন্দ অপরূপ বাহুল্য লাভ করেছে। সেই কবির নিপুণ হস্তের প্রসাধনে এবং সুরের বন্ধারে ছন্দরাজি মূর্ত্তিমন্ত এবং প্রাণবন্ত হয়ে উঠেছে।

অনুবাদ কাব্য

তাঁর অনুবাদ Fitz Gerald প্রমুখ বিখ্যাত কবিদের সমপর্য্যায়ভুক্ত বললে অত্যুক্তি করা হয় না। ধর্ম্ম সাধনায় 'আর্জ্জবং' বা ঋজুতাকে প্রথম সোপান বলা হয়েছে। সাহিত্যে সত্যেন্দ্রনাথ প্রকৃতই সত্যেন্দ্রনাথ। তিনি ঋজুতা ও সত্যবাদিতার বিজয় বৈজয়ন্তী স্বরূপ। তাঁর অনুবাদ কবিতাগুলি একই কালে অনুবাদ ও নূতন কাব্য এবং এত সহজ ও সরস যে অনুবাদ বলে মনেই হয় না, পরন্তু অধিকাংশ রচনাতেই মৌলিক রচনার আস্বাদন লাভ করা যায়।

'তীর্থ রেণু' ও 'তীর্থ সলিলে'র রহস্য-কুঞ্চিকায় দেখতে পাওয়া যায় জগতের সকল দেশের সকল প্রচলিত ভাষায় পরিচিত কবিদের কাব্য তিনি অনুবাদ করে বঙ্গভারতীকে উপহার দিয়েছেন।

রবীন্দ্রনাথ তাঁর অনুবাদ সম্বন্ধে যা বলেছিলেন তার ভাবার্থ এই যে, তাঁর এই লেখাগুলি 'মূলকে বৃন্ত স্বরূপ আশ্রয় করিয়া স্বকীয় রস-সৌন্দর্য্যে ফুটিয়া উঠিয়াছে।'

সেই স্বকীয় রস-সৌন্দর্য্যের সাধনার ধন প্রস্ফুটিত কুসুমগুলিকে অপরের নামে সংযোজিত করে সত্যেন্দ্রনাথ যে কৃতিত্বের পরিচয় দিয়ে গেছেন তা অতুলনীয়।

গীতি-কাব্য

সত্যেন্দ্র-প্রতিভার আর একটি বিশিষ্ট দিক তাঁর 'গীতি-কাব্য'। তাঁর 'সবুজ পরী' যেন রূপকথার সেই সোনার কাঠি যার স্পর্শে জেগে ওঠে ঘুমন্ত রাজকন্যা। অপর দিকে তাঁর 'নীল পরী' যেন রূপকথারই সেই ঘুম পাড়ানো রূপার কাঠি। সবুজ পরী—যৌবনের পরী, জীবনের পরী, তারুণ্যের সোমরস পানে মত্ত সে জীবন-বীণায় যৌবনের জয়গাথা গান করে। লালপরী—ইন্দ্রপুরে অবাধ গমনা—তার মানা নেই,—কিন্তু সবুজ পরীর প্রবেশে নিষেধ হয়েছে, কারণ—

"সবুজ পরী এক ঝোঁকে মানুষ রাজার পুত্রকে
বাসলো ভালো কায়মনে"

এই অপরাধ এই তো পাপ অমনি হ'ল দৈব শাপ
থাকতে হবে মর্ত্ত্যে গো মৃত্যু কীটের গর্ত্তে গো।
সবুজ পরী টলল না, শাপের ভয়ে ভুললো না
ভালো বেসেই ধন্য সে চায় না কিছু অন্য সে
চায় না যেতে স্বর্গে আর মানুষ যে প্রেম পাত্র তার।

লাল পরীর ইন্দ্র সভায় প্রবেশ নিষেধ হয় নাই, সে নিষিদ্ধ ফল আস্বাদ করে নাই। সে কিশোর লোকের অপ্সরী।

"কিশোর কিশলয় পরে তোমার পরশ সঞ্চরে"
সবুজ পরী ধরণীর বুকের পটে সবুজ তুলি বুলিয়ে সবুজ

পাখা ঢুলিয়ে পাগল আঁখির পরে তার যুগল আঁখি ঢুলিয়ে যায়।
'যাদুকরের পান্না জ্বলে তোমার হীরার আংটিতে'—সে যাদুকরী।
ঘাসের শীষে ধ ধ করে শিস্ দিয়েছ সুন্দরী
তাই উথলে হরিৎ সোনা কুঞ্জবনের বুক ভরি।
যৌবনেরে যৌবরাজ্য দেওয়া তোমার নিত্য কার্য্য
পান্না তোমা শ্যামল পত্র নিশান তৃণ মঞ্জরী।
তোমার হাতে হেম ঝারি—
সঞ্চারিছে শিরায় শিরায় সবুজ সুরের সঞ্চারী।
সবুজে তোমার দোবজাখানি আলোছায়ার সঙ্গমে
জলে স্থলে বিশ্বতলে লোটায় বিভোল বিভ্রমে।
নিখিল জীবন তোমার বশ
আলোর তুমি বুক চেরা ধন অন্ধকারের রক্তস রস।
রামধনুকের রং নিঙাড়ি, রাঙাও ধরায় মলিন সাড়ী
মরুভূমির সবজী বাড়ী নিত্য গাহে তোমার যশ।
নূতন সুরের উদগাতা
গাহ তুমি জীবন-বীণায় যৌবনেরি জয়গাথা।
ভরা দিনের তীব্র দাহে অরণ্যানী যে গান গাহে
যে গানে হয় সবুজ বনে শ্যামল মেঘের জাল পাতা।
জর্দাপরীকে বলা যায়—'the elan vital'—the dash of life—সে বিদ্যুৎপর্ণা :
মোরা উঠি পল্লবি বিদ্যুৎ লতিকায়,
নীহারিকা ছায়া ছবি মোরা নাচি ঘিরি তায়
দিয়ে যাই মন্তরে নূতনের হর্ষ, সঁপে যাই অন্তরে বিদ্যুৎ স্পর্শ,
দিয়ে যাই চুম্বন, চলে যাই উন্মন।
তাকে প্রশ্ন করুন :
"জর্দাপরী জর্দাপরী ঝিরণ জরীর ওড়না গায়—
রৌদ্রে এবং বিদ্যুতে দুই পাখনা মেলে যাও কোথায়?"
সাড়া পাবেন যাই কোথায়? হায়রে হায়—
সূর্য্যমুখী ফুলের বনে সূর্য্যকান্ত মণির তায়।
প্রশ্ন করুন—রূপবতীর রোষের মত স্বর্ণ সাঁঝে পূর্ণিমার
লাবণ্যে কার হয় সোনালি রজত অঙ্গ চন্দ্রমার?
গরবিনী উত্তর দেবে "আবার কার? এই আমার!
কুঙ্কুমেরি অঙ্গে চরণ রাঙাই উৎস জ্যোৎসনার"
প্রশ্ন করুন—
বনের ঘড়া বক্ষে তোমার জোনাক পোকার হার দুলে
আলেয়া তোর চক্ষে জ্বলে চাইলে চোখে চোখ তুলে
উত্তরে সোহাগ ভরে সে পরিহাস করে বলবে—
"চোখ তুলে? মন ভুলে?"

অহঙ্কার করে সে বলবে—
কুবের পুরীর সোনার কপাট হাসির হাওয়ায় যাই খুলে।
আমরা বলি—দুর্গমে যে রাস্তা গেছে সেই দিকে তুই দীপ দেখাস
দুঃসাহসে ধায় যে পিছে কেবল করিস্ তায় নিরাশ।
বিদ্রূপ করে চোখ বাঁকিয়ে সে বলবে—
বাস্‌রে বাস! সোনার চাষ!
অমনি কি হয়? সোনার গোলাপ হঠাৎ কারেও দেয় কি বাস?
মুগ্ধ হয়ে লুব্ধ হয়ে আমরা বলি—
এগিয়ে চলিস্ হাতছানি দিস্ পাগল করিস্ আঁখির ভার
সাধের কাঁদন জাগিয়ে ফিরিস্ দিস্‌নে ধরা ফিরাস্ পার
স্নেহ করে সেই অতিথি পরিত্যাবিনী অম্লান বদনে বলবে—
ফিরাই পায়? হায় গো হায়!
পরশমণি চায় যে আগে সকল হরষ তার বিদায়!
বুকের পাঁজর বাঁধর করে মাড়িয়ে চলে যায় সে,—আমরা অনুযোগ করে বলি—
"জর্দাপরী জর্দাপরী জরির জুতা সোনার পায়
মাড়িয়ে তুমি চলছ খালি ফুলের ডালি ডাইনে বাঁয়
সে তার পরম পারিতোষিক অপাঙ্গে বর্ষণ করে বলে—
সোনার পায় মাড়াই যায়
আমার স্বয়ম্বরের মালা, আলোকলতা তার গলায়।
এবার রূপকথার রূপার কাঠি স্পর্শ করে ঘুম পাড়াবার জন্য আসেন নীল পরী—
তার কানে সুনীল অপ্‌রাজিতা পাপড়ি দুলে জাফ্‌রাণের
পায়ে জড়ায় নূপুর হয়ে শেষ বাসরের রেশ গানের।
তাকে ডেকে কবি বলছেন 'নীল পরী গো নীল পরী,
নীল সাগরে নিচোল তোমার গগন নীলে উত্তরী।
কণ্ঠেতে নীল পদ্মমালা টিপটি নীলা কাঁচ পোকায়,
তন্দ্রা তোমার সুর্মা চোখের তন্দ্রা তোমার আল্‌তা পা'য়,
স্বপ্ন তোমার সাড়ীর আঁচল মূর্চ্ছা নিচোল নীল বরণ
ঘুম যে তোমার আলগা চুমা মরণ নিবিড় আলিঙ্গন।
ইহার উপর টীকা-টিপ্পনী করা কুমুদ-কহ্লারের প্রসাধনের মতই নিরর্থক। কবিতাপাঠ শেষ হলেও নীল পরীর পায়ের নূপুরের রেশটুকু যেন কানে বাজতে থাকে।*

---

* সত্যেন্দ্র সাহিত্যসত্রে, কবির ৬৫তম জন্মবার্ষিক স্মৃতি-বাসরে সভাপতির অভিভাষণ।

দক্ষিণ-আটলাণ্টিকে ভেলা-বক্ষে

শ্রীসন্তোষ দাশগুপ্ত

[১৯৪২-এর মার্চ মাসে নরওয়ের 'আউস্ট' নামে একখানা জাহাজ নিউইয়র্ক থেকে অস্ত্রসম্ভার নিয়ে যাচ্ছিল আফ্রিকার রণাঙ্গনের দিকে। পথে দক্ষিণ-আমেরিকা ও দক্ষিণ-আফ্রিকার মধ্যবর্ত্তী দক্ষিণ-আটলাণ্টিক মহাসমুদ্রের মাঝামাঝি জায়গায় একটি জার্মান যুদ্ধ-জাহাজের আক্রমণে জাহাজখানি বিধ্বস্ত হয়। জার্মান রেইডার জাহাজ হতে প্রবল গোলাবর্ষণে এ জাহাজটিতে এক প্রচণ্ড বিস্ফোরণ হয়, ফলে ভারতীয় রেডিও-অফিসার, লেখক, সমুদ্রে নিক্ষিপ্ত হন।]

সন্তরণ-বিদ্যায় নিপুণতা কোনদিনই আমার নেই, কিন্তু কি ভাবে ও কত দ্রুত যে দূর সমুদ্রে সরে যাচ্ছিলাম, পরে তা নিজের কাছেই খুব বিস্ময়কর বোধ হয়েছিল। বিপদে মানুষ অভিভূত হয়ে পড়ে শুনেছি; গত প্রায় সাত-আট মাস নিরন্ত মৃত্যুচ্ছায়ার নীচে থেকেও বিপরীত ভাব লক্ষ্য করেছি। সমস্ত ইন্দ্রিয়গুলো প্রত্যেক সঙ্কটকালে হয়ে ওঠে সতেজ ও সতর্ক, বুদ্ধিবৃত্তি বিনা আয়াসে কলের মত যেন এদের পরিচালিত করে। চিন্তার অবসর নেই, অথচ আপাতদৃষ্টিতে চিন্তাহীন কর্ম্মগুলির ধারা ও প্রকৃতি বুদ্ধিবৃত্তির সুচারু বিন্যাস ব্যতীত কেমন ক'রে সম্ভব বুঝে ওঠা যায় না। 'সহজাত প্রবৃত্তি' বলে বর্ত্তমান কালের মনস্তাত্ত্বিকদের প্রশ্নটার সমাপ্তি-রেখা টেনে দেওয়াও নিরর্থক।

অনেকটা দূরে একখানা র‍্যাফ্‌ট্ ভাসছে। পৃথিবীতে সেই মুহূর্ত্তে দ্বিতীয় কোন বস্তুর অস্তিত্ব নাই। নির্জীব সজীবকে প্রবল বেগে আকর্ষণ করছে। জগতের প্রতিটি অণু-পরমাণুর মধ্যে প্রচ্ছন্ন চৌম্বক শক্তি ভাসমান ঐ বস্তুটিতে প্রকট হয়ে কেন্দ্রীভূত হয়েছে।

র‍্যাফ্‌ট্-এর ওপর সাময়িক হলেও নিরাপদে বসে, এতক্ষণে আশপাশের সমুদ্রে যতদূর দৃষ্টি চলে চেয়ে দেখছি, আসলে ব্যাপারটা কি ঘটল, সঙ্গীরা কে কোথায় আছে বা নাই। এতক্ষণে বুঝলাম সমুদ্রের যে জায়গাটিতে আর এক মূর্ত্তিমতী নৃশংসতা সহস্র জিহ্বা বিস্তার করে হুস্ হুস্ শব্দ করছে, সেখান থেকে খুব দূরে আমি নাই। দেখতে দেখতে আরও কয়েকজন নিপুণ সন্তরণকারী এসে র‍্যাফ্‌টে উঠল। তৃতীয় এঞ্জিনীয়ার সেই চারুশিল্পী সুইডিস ভদ্রলোকটি আমার পাশে বসতে বসতে প্রশ্ন করলেন 'তুমি বেঁচে আছ?' যেন আমার বেঁচে থাকাটা পৃথিবীর চরম বিস্ময়! খানিক চুপ করে আবার বলে চলল, 'ব্রিজের ওপর অত শ্রাপনেল গোলার মধ্যে থেকেও কেমন করে'---হিস্-স্-স্ শব্দে আর একটি গোলা এসে আমাদের প্রায় পঁচিশ হাত দূরে বিস্ফোরিত হয়ে ওর কথাগুলোকে চাপা দিলে। আমার সম্মুখে জলের ওপর পা ঝুলিয়ে নবাগত যে নাবিকটি বসেছিল, বৃন্তচ্যুত ফলের মত সে জলের ওপর ঢুলে পড়ে গেল। কারও মুখে একটি কথা নেই, আরও বিস্ফোরণের অপেক্ষায় আছি। আর একটি লোকের সার্টের সবটাই রক্তে রঞ্জিত হয়ে গেছে। চুপ করে বসে আছে, ভাবলাম কাকে বলবে, কি-ই বা বলবে আর বলে কি ফল হবে, তাই। জিজ্ঞাসা করলাম, শ্রাপনেলের টুকরোটা লেগেছে কোথায়?

লোকটি ইংরেজী বোঝে না, ঘাড় নাড়ল। বুঝলাম, সে যে কত বড় গুরুতর আঘাত পেয়েছে এখনও তা সম্যক জানতে পারি নি। 'সুইডিসের' দৃষ্টি সেদিকে আকর্ষণ করলাম। সুইডিস্ ও নরউইজীয়ানরা একই ভাষায় কথাবার্ত্তা বলে।

'সুইডিস' ওকে বোধ হয় সেই কথাই জিজ্ঞেস করলে। ত্রস্তে লোকটি তার সার্ট পরীক্ষা করেই বিড় বিড় করে কি বলতে লাগল, অকস্মাৎ মুখখানা তার পাণ্ডুবর্ণ হয়ে গেল। পেটের ডান পাশে একটা জায়গায় সার্ট কেটে শ্রাপনেল ঢুকে গেছে। আর একটি কাঁধের কাছে। রক্ত বেরুচ্ছে কাঁধের ক্ষত দিয়ে, কিন্তু আশ্চর্য্য পেটের ক্ষতটি দিয়ে রক্ত নিঃসরণ অতি সামান্যই হচ্ছে।

আমার, 'সুইডিসে'র এবং আহত ব্যক্তির নিজের রুমালগুলো একত্র করে কাঁধের ক্ষতটি বাঁধবার চেষ্টা করলাম। বিশেষ কিছু সাহায্য যে হ'ল না সবাই বুঝছি— তবু আহতকে সান্ত্বনা দেবার একটা ক্ষীণ প্রয়াস!

হতভাগ্য সে। সমুদ্র তার লাইফ জ্যাকেটটি ভাসিয়ে রেখেছে— মৃত্যু তার মুখ থেকে জীবনের সকল চিহ্ন ইতিমধ্যে মুছে দিয়েছে। বীভৎস মুখের একটা পাশ একেবারেই নাই, জাহাজের বিস্ফোরণ-গোলার হাত থেকে বেঁচে এসেও এখন আর সে নাই।

মেসরুম-বয়টির মুখের অনেকটা পোড়া, সাঁতার কেটে এখানে আসবার সময় লোনা জলে আরও যন্ত্রণাদায়ক হয়েছে, এক পাশে বসে প্রাণপণে দহন-যন্ত্রণা সহ্য করার চেষ্টা করছে, হঠাৎ আমাকে লক্ষ্য করে বলে উঠল, আপনিও আহত স্যর?

আহত? দেখি বুকের কাছে অনেকটা স্থান জুড়ে টাটকা রক্ত! সার্ট পরীক্ষা করতে করতে বুঝবার চেষ্টা করছি, কোথাও যন্ত্রণা অনুভব করছি কিনা! বুকের একটা জায়গায় যেন কেমন একটা ছুঁচ ফোটাবার মত যন্ত্রণাও অনুভব হচ্ছে! কিন্তু অছিদ্র সার্ট। অনেক সময় এ সব অবস্থায় সার্টের কাটা জায়গাটাও নজরে পড়তে চায় না। জামা খুলে ফেললাম। আমি বুকের সম্মুখ ভাগ পরীক্ষা করছি, 'সুইডিস' পিঠ দেখছে। কোথায় কি? সমুদ্রে পতিত লোকটির রক্ত

হবে, সে আমার সম্মুখেই বসে ছিল। সম্পূর্ণ অক্ষত আমি।

আর কোন ভীতিজনক হি-স্-স্ শব্দ শুনতে পাচ্ছি না। জাহাজটির জীবনতরীগুলি কোথাও ছিটকে পড়েছে কিনা, আর কোন মানুষ সমুদ্রে ভাসছে কিনা ঘুরে ফিরে দেখছি।

জাহাজ থেকে এখানে এই সমুদ্র-বক্ষে ক্ষীণ কম্পন-রেখা পর্য্যন্ত দেখা যাচ্ছিল না। সত্যিই তাই। শিশু র‍্যাফটে সমুদ্রের ঠিক কোলের ওপর বসে এখন দেখছি জলরাশি যেন ওঠানামা করছে। দৃষ্টিশক্তি হঠাৎ অনেকখানি সীমাবদ্ধ হয়ে পড়েছে, কয়েক গজের বেশী চোখে পড়ে না। উঁচু কোন স্থান থেকে একেবারে নীচে নেমে এলে সর্ব্বক্ষেত্রেই বুঝি তাই ঘটে।

'সুইডিস' জলের ওপর থেকে ছুটো বড় লগি দেখে তুলে নিলে, দাঁড় তৈরী করবে। কোমরে ছুরি ছিল আহত লোকটির, খুলে নিয়ে সে ওটাকে দাঁড়ে রূপান্তরিত করার চেষ্টায় লেগে গেল। বোধ হয় যে, এই জলরাশির উপর এদিক-ওদিক খুশি-মত দাঁড় টেনে জীবিত কেউ ভাসছে কিনা দেখতে ওর সাধ হয়েছে।

আহত লোকটি রক্তমোক্ষণে ক্রমেই দুর্ব্বল হয়ে আসছে। চোখের উপর কেমন একটা বিভ্রান্ত ভাব ধীরে ধীরে যেন ফুটে উঠছে। ঐখানেই কোন মতে শুইয়ে দিলাম।

'সুইডিস' লগিটার ওপর ছুরির কাজ চালাতে চালাতেই জিজ্ঞেস করলে, ক্যাপ্টেন তোমার সঙ্গেই ছিল না, 'ইণ্ডিয়া ?'

হ্যাঁ, রেডিওতে খবর ছড়াবার চেষ্টা পর্য্যন্ত কেন, তার পরেও ব্রিজের ওপর আমরা এক সঙ্গেই ছিলাম। আগুন, ধোঁয়া আর সেই ভয়ানক বিস্ফোরণের পর তোমাদের প্রথম দেখলাম।

চারজনেই চুপচাপ। কি ভাবে কি হয়ে গেল আধ ঘণ্টার মধ্যে। এক ঘণ্টা আগেও পরিপাটি বিছানায় গ্রীষ্মের দিবা-নিদ্রার আরাম উপভোগ করছিলাম কিন্তু এরই মধ্যে একি দুঃস্বপ্ন দেখছি ? নিউইয়র্কে সবাই বলছিল বার বার উত্তর-আটলান্টিক সমুদ্রের নাৎসী সাবমেরিন আক্রমণের উল্লেখ করে আমরা নাকি খুবই ভাগ্যবান। তার পর নিউইয়র্ক থেকে সুরু করে প্রায় ব্রেজিল পর্য্যন্ত সেই একটানা বহু বিধ্বস্ত পোত দেখতে দেখতে এসে এ ধারণা বেশ যেন বদ্ধমূল হয়ে গিয়েছিল, আমাদের কিছু বিপত্তি হবে না। ব্রেজিল ছাড়বার দুদিন পর থেকে ত জাহাজের অবস্থান-স্থলের সংবাদ পর্য্যন্ত রেডিও বিভাগকে জানাতেও ওরা ভুলে যাচ্ছিল, কাপ্তেনও হেসে বল-ছিলেন আর এ সম্বন্ধে অতটা সাবধানী হবার কি দরকার থাকতে পারে ? দক্ষিণ-আটলান্টিক নিরাপদ স্থান।

আর এখন ? নিমেষের মধ্যে সমস্ত সৌভাগ্য কর্পূরের মত উবে গেছে। দক্ষিণ-আমেরিকা ও দক্ষিণ-আফ্রিকার মধ্যবর্ত্তী বিশাল জলরাশির প্রায় মাঝামাঝি স্থানে 'আউস্টে'র বহুকালব্যাপী বহু বারের শ্রান্তিহীন পৃথিবী-ভ্রমণ পর্ব্ব অকস্মাৎ শেষ হয়ে গেল। যে অকল্পনীয় ভীষণ বিস্ফোরণের ফলে আমি কিছুদূরে সমুদ্র-বক্ষে নিক্ষিপ্ত হয়েছিলাম সে যেন আততায়ীর আকস্মিক নিষ্ঠুর আঘাতে আউস্টের মৃত্যু-আর্ত্তনাদ। অগ্নি-কাণ্ড তখনও যেখানে চলছে সেইদিকে চেয়ে চেয়ে মনের গভীরতম প্রদেশটি জড় নির্জীব কাষ্ঠ-ইস্পাত-নির্ম্মিত যন্ত্রটির জন্য বেদনায় আলোড়িত হয়ে উঠল। জীবনমৃত্যুর সেই সন্ধি-ক্ষণে প্রাণচেতনাহীন সেই জাহাজটির জন্য বেদনা অনুভব যুক্তি-শাস্ত্রের নিয়ম মেনেছিল কি না জানি না। আউস্টের অন্তিম দুর্গতিতে বারে বারেই মনে হতে লাগল এতদিন কত দুর্য্যোগের মধ্যেও, কি পরম যত্নে আমাদের তার ক্রোড়দেশে আশ্রয় দিয়েছিল। উত্তর-আটলান্টিকের বিপুল ভঙ্গুর সহস্র সহস্র তরঙ্গ উন্মত্ত ভাবে আমাদের গ্রাস করতে ছুটে এসেছে, ক্রোড়ের শিশুদের রক্ষার জন্য স্নেহময়ী মাতার মতই ঢেউয়ের প্রচণ্ড আঘাত সে আপনার সর্ব্বাঙ্গে গ্রহণ করেছে।

র‍্যাফটে পানীয় জল নেই। আহত লোকটি জল খেতে চাইছে। এতক্ষণ ঐ কথাটি একবারও মনে হয় নি, এখন ওর জল পানেচ্ছায় সকলেরই একসঙ্গে পিপাসার সঞ্চার হ'ল। দক্ষানন মেসরুম-বয় বয়সে বালক, আঠার বৎসরের বেশী বয়স কিছুতেই হবে না, জলপানের ইচ্ছা প্রকাশ এ অবস্থায় অর্থশূন্য জেনেই চুপ করে বসেছিল। এখন প্রাণনেদে আহত লোকটির জলের আকাঙ্ক্ষা তার ধৈর্য্যের বাঁধ ভেঙে দিল, করুণ কণ্ঠে সেও বলে উঠল, ওঃ যিশুখ্রীষ্ট, একটু যদি জল দিতে।

কিন্তু জল কোথায় ? পানীয় জল। কি নিষ্ঠুরা প্রকৃতি ! কত গভীর জলরাশির ওপর বসে আছি, র‍্যাফটের গাত্রসংলগ্ন প্রথম জলকণাগুলি থেকে সুরু ক'রে হাজার হাজার মাইল উত্তরে মেরুপ্রদেশ পর্য্যন্ত জলরাশি, দক্ষিণ দিকে মাটির লেশমাত্র নাই, পৃথিবীর সকল মহাসমুদ্রের বারিধারা এসে আর এক মেরুতে একাকার হয়ে গেছে, ডানদিকে পশ্চিম-আফ্রিকার তটদেশ পর্য্যন্ত প্রায় দেড় হাজার মাইল কেবল জল আর জল, বামে পশ্চিম দিকে দক্ষিণ-আমেরিকা ও আমাদের মধ্যবর্ত্তী স্থানের দূরত্বও হাজার, বার'শ মাইল, মানব-কল্পনার অতীত এই জলরাশির উপর বসে এক গণ্ডূষ তৃষ্ণার জলের অভাব। মনে পড়ল, নিউইয়র্ক থেকে প্রায় ১০০ মাইল দূরে দেড়মাস আগে টর্পিডোর আঘাতে বিধ্বস্ত-পোত আমাদের সেই পূর্ব্ব সহচরদের কথা। এমনি করে চৌদ্দ দিন তারা ক্ষুদ্র এক জীবনতরীতে অনাহারে, জলাভাবে কাটিয়েছে। বন্দর থেকে মাত্র ১০০ মাইলের মধ্যে থাকা সত্ত্বেও কোন জাহাজই তাদের উদ্ধার করতে আসে নি, একে একে দুজন ছাড়া সকলেই মৃত্যুর কোলে ঢুলে পড়েছিল। আরও লক্ষ লক্ষ লোকের মত আমরাও নিউইয়র্কের প্রাতঃকালীন সংবাদপত্রে খবরটি পড়েছিলাম, পূর্ব্ব-সহকর্ম্মীদের জন্য সহানুভূতি হয়ত আর সকলের চেয়ে কিছু বেশীই হয়েছিল, কিন্তু যে নিদারুণ জলপিপাসার পশ্চিম-

আটলান্টিকে তারা নিশ্চিহ্ন হয়েছে, সে যে কত কষ্টকর, মর্ম্মতব তা এতটুকুও বুঝি নাই।

উপকূলের অত কাছেও উপকূলরক্ষী জাহাজগুলি ওদের সে অবস্থার কথা জানতে পারে নি। তবে ? বহু লক্ষ বর্গ মাইল ব্যাপী সমুদ্রের মাঝামাঝি স্থানে ক্ষুদ্র একটি বিন্দুতে অবস্থিত আমাদের কে দেখবে ? ঠিক এই স্থান দিয়ে আগামী কয়েকদিন বা মাসের মধ্যে মিত্রপক্ষের কোন জাহাজ যাবে কি না, কে জানে ? কোন কালেই যাবে কি না তারই বা স্থিরতা কি ? অথবা, যখন কারো চলার পথে এই বিন্দুটি চোখে পড়বে তখন আজিকার এই ক্ষুদ্র ঘটনার সকল চিহ্নই সমুদ্রে আকাশে বাতাসে বিলীন হয়ে গেছে।

আহত দু'জন বারে বারে দেখছে সমুদ্র-জলের দিকে। এ ভাবে যদি কিছুক্ষণ আরো চলে, সম্মুখে পিছনে ডাইনে বামে গভীর নীল জলের আকর্ষণ দুর্ব্বার হয়ে উঠবে, কোন দুর্ব্বল মুহূর্ত্তে বিস্বাদ লবণাক্তের কথা ভুলে যাবে। 'সুইডেন' ও আমি ওদের চোখে চোখে রাখছি, সাবধান করে চলেছি, এ জল মুখে দিয়ে অকস্মাৎ তৃষ্ণাকে যেন জটিলতর না ক'রে তোলে।

'আমরা এখন কোথায় জান ?' 'সুইডিস' প্রশ্ন করলে। লগি দুটোকে অনেকটা দাঁড়ের মত ক'রে ফেলেছে ও। একটা আমার হাতে ঠেলে দিয়ে অন্যটি দিয়ে জলের ওপর বৃত্ত সৃষ্টি করলে।

আমাদের ওপর বিমানের ও অজ্ঞাত রণতরীর আক্রমণ-কালে জাহাজ অবস্থান করছিল ১৯° ডিগ্রি পশ্চিম দ্রাঘিমা-রেখা ও ১৭° দক্ষিণ অক্ষাংশের সংযোগস্থলে। শান্ত সমুদ্রবক্ষে এত অল্প সময়ে মধ্যে সেখান থেকে বেশীদূর যাই নি নিশ্চয়, কাছাকাছিই আছি, সে কথাই বললাম।

পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তে, বিভিন্ন দেশে, বিভিন্ন সময়ে কতকগুলি মানুষ জন্মেছিল, দেশ দেশান্তরের মানুষ কেউ কাউকে জানত না, জানবার প্রয়োজনও ছিল না, রীতি, নীতি, ভাষা, সব পৃথক। সবাই ছিল ছোট ছোট এক একটি বৃত্ত-মধ্যে ; নিত্যকার জীবন সুনির্দ্দিষ্ট ধারায় অতিবাহিত কর্চ্ছিল। সবার অলক্ষ্যে মানবেতিহাসের পৃষ্ঠায় আর একটি নতুন অধ্যায় মানুষ ও জাতিসমষ্টির পরস্পরবিরোধী বাসনাগুলির সংঘাতের ফলে সংযোজিত হয়ে পড়ল—পরিণামে এল প্রচণ্ড যুদ্ধ। অনন্ত মহাসমুদ্রে ভেলা-বক্ষে জীবনমৃত্যুর সন্ধিক্ষণে বসে এমনি ধরণের নানা দার্শনিক চিন্তা মনে উদিত হচ্ছিল।

কি মনে হয় তোমার গুপ্ত ? আর কেউই নেই ?—'সুইডেন' আবার প্রশ্ন করল। সঠিক উত্তর কেমন করে দেব ? বারে বারে মনে হচ্ছে, প্রলয়ের মত জীবন শেষ বিস্ফোরণ পর্য্যন্ত কাপ্তেন ও একজন মেট আর আমি ব্রিজের ওপর একসঙ্গেই ছিলাম, অথচ সমুদ্রে নিক্ষিপ্ত হবার পর কাউকেই দেখছি না। যুক্তি বলছে ওরাও আমারই মত কোথাও উৎক্ষিপ্ত হয়ে পড়েছে। কিন্তু কোন দিকে ? ঐ অগ্নিকাণ্ডের মধ্যস্থলেই নয় তো ?

হেসে বললাম, দুশ্চিন্তার কোন প্রয়োজন নেই বন্ধু, জলভাগের যেখানটায় আছি কিছুকাল পরে কেউ কারুর জন্ত চিন্তা করবার থাকবে না।

'সুইডিসে'র আশা অপরিসীম। বললে, মানচিত্রটা তোমার মনে নেই ? কোন ছোট দ্বীপ যদি কাছাকাছি থাকে। চার্টরুমে তোমার তো সব সময়ই গতিবিধি ছিল।

তা ছিল, দক্ষিণ-আটলান্টিকের সমস্ত চিত্রটা পূর্ব্ব ও পশ্চিম দিকের স্থলভাগসমেত স্পষ্টই দেখতে পাচ্ছি। কিন্তু সে ছবি মনে আশার সঞ্চার করল না। বললাম, তাই বুঝি তুমি দাঁড় তৈরী করলে ? এ অবস্থায় অযথা হাত পা ছুঁড়ে লাভ কি ?

সুইডিস বললে, ক্ষতিটাই বা কি ? কাছাকাছি ধর দশ-পনের মাইলের মধ্যে যদি কোন ছোট দ্বীপ থাকে আমরা দু'জনে চেষ্টা করলে পৌছেও যেতে পারি ত ? আমি জবাব দিলাম, না। সে আবার বললে, সেখানে পৌছব যে নিশ্চয়, তা বলছি না, কিন্তু ভাগ্য যদি সুপ্রসন্ন হয়, পারিও ত পৌছতে। এ ভাবে চুপ করে বসে থাকার চেয়ে—

বললাম, তা হয় না। দশ-পনের মাইলের মধ্যে কোন দ্বীপ ত নেই-ই দু'শ মাইলের মধ্যেও আছে বলে মনে হয় না। যতদূর মনে পড়ছে সেণ্ট হেলেনা এখান থেকে নিকটতম স্থলভাগ—দু'শ মাইলেরও ওপর। অদৃষ্ট মানো তুমি সুইডেন ?

বললে 'মানি'

হেসে তাকে বললাম, ব্যস তবে তুমি চুপ করে বসে থাক—এ অবস্থায় অকূলের উদ্দেশে দাঁড় চালানো মানে তৃষ্ণার ধার বাড়িয়ে দেওয়া। ভাগ্য যদি সুপ্রসন্ন থাকে, দেখবে ঠিক বেঁচে যাব। আর যদি সময় হয়েই থাকে পরিশ্রম করে মরতে আমি রাজী নই।

'সুইডিস' ও মেসরুম বয় দু'জনেই হেসে উঠল।

সম্পূর্ণরূপে নিজেদের ভবিতব্যের ওপর ছেড়ে দিয়ে অপেক্ষা করা ছাড়া আর কি উপায় থাকতে পারে ? 'সুইডেন' ওর বেল্টটা খুলে ফেললে। নীচে বিচিত্র উপায়ে রক্ষিত একটি ওয়াটার-প্রুফ সিগারেট কেস বার করে নিজে একটি মুখে দিল, সকলকে একটি একটি করে দিলে। কেসটার ভেতর কয়েকটি দেশলাইয়ের কাঠি ও বারুদমাখা একটু কাগজও আছে।

'খুব হুঁসিয়ার তো তুমি' বললাম।

"হুঁ" সে বললে 'প্রায় বছরখানেক ধরে এ ভাবে চলছি সমুদ্রে। বন্দর ছেড়ে সমুদ্রে বেরুলেই সিগারেট আর কাঠি-গুলো ভরে নিই এতে।'

সিগারেটের ধোঁয়াটা বেশ ভালই লাগছে।...কি করছে ওরা এখন বাড়ীতে ? মনে মনে হিসেব করছি কলকাতার এখন সময় কত হতে পারে। এখান থেকে প্রায় সাত ঘণ্টার বেশী ব্যবধান। রাত বোধ হয় ন'টা-দশটা হবে। এখন গ্রীষ্মকাল, হিসেবমত চৈত্রমাস, গ্রীষ্মকালে না পড়লেও কার্য্যত, তাই। সন্ধ্যেই হয় প্রায় আটটার সময়। ওরা কি আহার করছে

সবাই, না তারই যোগাড়ে আছে। অথবা ঠিক আর কি হতে পারে কল্পনাতে আনতে পারছি না! বেতারে যখন আমাদের ওপর আক্রমণের সংবাদ দেবার চেষ্টা করছিলাম, আক্রমণকারীরা বেতার-তরঙ্গে বাধার সৃষ্টি করছিল। মিত্রপক্ষীয় কোন জাহাজ বা উপকূলবর্ত্তী বেতার স্টেশনগুলি এ সংবাদ সম্ভবতঃ একেবারেই পায় নি। কেপটাউনে পৌঁছবার দিন 'আউস্ট' সেখানে পৌঁছবে না। যুদ্ধের সময় এক মহাদেশ হতে অন্য মহাদেশে টাইম্‌টেবিল্‌ অনুযায়ী জাহাজ চলাচল হওয়া সম্ভব নয়, হয়ও না। পরের দিনও আমাদের জাহাজ দেখে সকলে সন্দেহ করবে, হয় ত দক্ষিণ-আটলান্টিকে আর একটি জাহাজের সলিল-সমাধি হ'ল। প্রতি দিন আশঙ্কা বেড়ে যাবে, সপ্তাহখানেক পরে তা বদ্ধমূল হবে কোন খবর নেই অন্য কোন বন্দর থেকে বা জাহাজ থেকে। কেবল্‌-এ বা বেতারে কেপটাউন, পারনামবুকো, নিউইয়র্ক ও লণ্ডনের মধ্যে অনেকগুলি সংবাদ আদান-প্রদান হবে। আরও এক মাস অপেক্ষা করবে কর্ত্তৃপক্ষ যদি কোথাও থেকে কোন নাবিকের সংবাদ পায়। তারপর যাবে সহানুভূতিজ্ঞাপক বার্ত্তা সকল নাবিকের গৃহে বহুদিন হয়ে গেছে জাহাজ আসছে না বন্দরে, সুতরাং ধরে নিতে হবে এটি শত্রু-আক্রমণে সমুদ্রপথে ধ্বংস হয়েছে, ইত্যাদি, ইত্যাদি।

তারপর প্রিয়জনদের মধ্যে কল্পনাপ্রবণ যদি কেউ থাকে, সে তাই নিয়ে মনে মনে জল্পনা সুরু করবে। শেষ সংবাদ সে নিউইয়র্ক থেকে পেয়েছিল, তাই নিউইয়র্ক ও কেপটাউনের মধ্যবর্ত্তী অখণ্ড জলরাশির ঠিক কোনখানে, কবে ও কখন প্রিয়জনের শেষ নিঃশ্বাস পড়েছিল শুধু সে খবরটির জন্য তার মন আকুলি-বিকুলি করতে থাকবে। কত বার চোখ বুলিয়ে যাবে মানচিত্রের গায়ে এই বৃহৎ অংশটির উপর, হয়ত একটা ক্ষীণ আশাও মনে জাগবে বুঝি কোন দ্বীপে এখনও বেঁচে আছে। কিন্তু এই মুহূর্ত্তে কেউ তো বুঝতেও পারছে না যে, বিপদ আমাদের গ্রাস করে ফেলেছে, মৃত্যু যেন শিকার একান্ত করায়ত্ত আছে জেনেই পরম নিশ্চিন্ত হয়ে কিছুক্ষণ অপেক্ষা করছে। আরও কিছুকাল পরে কল্পনার ধার আমাদের ধীরে ধীরে ভোঁতা হয়ে আসবে। সৃষ্টি-স্থিতি ও ধ্বংসের মূল কথা, আত্মপরিতৃপ্তির নব নব আয়োজন, স্বার্থের সংঘাত পরিজন-বিয়োগ-ব্যথা হবে দূরের অস্পষ্ট স্মৃতি··· তারপর বিস্মৃতি ও সত্যিকার মৃত্যু।

ঐ যে, ঐ যে বোম্বেটে জাহাজ··· কানাডিয়ান সেই 'বয়'টি আঙুল দিয়ে একটা দিকে আমাদের দু'জনেরই দৃষ্টি আকর্ষণ করছে। অনেক দূরে ক্ষুদ্র শ্বেতবর্ণ একটি জাহাজের মত দেখা যাচ্ছে। চেয়ে আছি সেই দিকে। এতগুলি মানুষের সকল আশা, ভবিষ্যতের সমাপ্তি-রেখা টেনেছে ও-ই নাকি? কাদের জাহাজ, জার্ম্মেনীর না জাপানের সেকথা নিয়ে কিছুক্ষণ চলল আলোচনা।

'সুইডিস' বলছে জাপানী হওয়াই সম্ভব। ওদের রণতরী-বহর জার্ম্মানীর চেয়ে বড় ও শক্তিশালী। আমার দৃঢ় ধারণা জার্ম্মানীর। দক্ষিণ-আটলান্টিকে পূর্ব্বেই নাৎসী 'রেডারে'র উপদ্রব সুরু হয়েছে। 'সুইডিস'ও সে কথা জানে, তথাপি সে জাহাজটিকে জাপানী নৌ-বহরেরই মনে করছে। পাশ্চাত্ত্যের ভীতি সশস্ত্র প্রাচ্যের ওপরই সমধিক। বোধ হয় চৌদ্দিক থাম ও সালাদিনের স্মৃতি।

জাহাজটি ক্রমেই সুস্পষ্ট দেখা যাচ্ছে, যেন এই দিকেই আসছে। উন্মুখ হয়ে বসে আছি, কি চায় ওরা, কি করবে? আরও কাছে দেখা যাচ্ছে প্রকাণ্ড স্বস্তিক পতাকা উড্ডীন, দুগ্ধ-ফেননিভ বস্ত্রের শুভ্রতার উপর ঘন কৃষ্ণবর্ণ বাঁকা স্বস্তিকা চিহ্ন। অন্তরে কেমন একটা অনুভূতি জাগল। এই জার্ম্মানীর স্বস্তিকা! যে চিহ্নের কথা ভারতে, আমেরিকায়, ইংলণ্ডে শত শত বার শুনেছি, নানা প্রবন্ধে পড়েছি, ভারতের অতীত গৌরবের সেই স্বস্তিকা কিঞ্চিৎ পরিবর্ত্তিত হয়ে জার্ম্মানীর জাতীয় পতাকা হয়েছে! নিজ চোখে দেখছি সেই নাৎসী পতাকা নাৎসী জাহাজে।

যদি ওরা আমাদের বন্দী করে? তড়িতের মত কথাটা খেলে গেল বোধ করি সকলেরই মনে! কি স্বস্তি! অবস্থা বিপাকে উন্মুক্ত আকাশের নীচে মুক্ত মানুষও সাধ করে শৃঙ্খল পরতে চায়! কানাডিয়ানটি বললে, কিন্তু বাঁচিয়েছেন, এটা জাপানী বোম্বেটে নয়।

যেন আমাদের বিদ্রূপ করেই অকস্মাৎ জাহাজটি মোড় ঘুরে একটু বাদেই আবার আমাদের চোখের অন্তরালে গেল। তবে বোধ হয় তুলবে না আমাদের। বুঝলাম মনের অন্তরতম গভীরতায় বর্ত্তমান অনিশ্চয়তার চেয়ে কিছুকালের মত শৃঙ্খলা-বদ্ধ নিশ্চয়তাও কত বরণীয় হয়ে উঠেছে।

জীবনের প্রতি ভালোবাসা যে কত সুগভীর, মৃত্যু-গহ্বরের দ্বারদেশে এসেও আলো জল ও আকাশ থেকে প্রাণরস নিংড়ে নিয়ে নিজস্ব সত্তা বজায় রাখবার কি যে বিপুল প্রয়াস, এ অবস্থায় ভিন্ন তা বোঝার চেষ্টা নিরর্থক।

একটি দীর্ঘশ্বাস ফেলে 'সুইডেন' বললে, বোধ হয় ভালোই হ'ল, বুঝলে গুপ্ত! নাৎসীরা অসহায় নাবিকদের জীবন-তরীতে ভাসতে দেখে বহু জায়গায় মেশিনগান চালিয়ে মেরেছে। ওরা নিশ্চয় আমাদের দেখে নাই।

কোথায় শুনলে এ কথা? জিজ্ঞেস করলাম।

'কেন? ইংলণ্ডের কাগজে পড় নি, আমরা সেখানে থাকতেই এ সব খবর কত বেরিয়েছে?' এ ধরণের কথা অনেক শুনেছি ইংলণ্ডে থাকতে, পড়েছিও অনেক অভিজাত পত্রিকায়। আবার বহু নাবিক যে জার্ম্মানীতে বন্দী হয়ে আছে এ সংবাদও আমার অজানা ছিল না। চুপ করে রইলাম। এক এক বার মনে হচ্ছে জলের ঠিক উপরে, অত নীচু থেকে আমরা রেডারকে দেখতে পেলাম, জাহাজের ওপর

ওদের ব্রিজ থেকে কি ওরা দেখছে না আমাদের? এত শান্ত সমুদ্রে তো জানি সু-উচ্চ স্থান থেকে কত দূর পর্য্যন্ত দৃষ্টি চলে।

দূরে কর্কশ বাষ্পীয় হুইস্‌ল্ শুনছি। কি এ? কি হচ্ছে, কোথায় আবার বাজল শিটি! যাই হোক্, সমুদ্রের এ অংশে আমরা সত্যিই একা নই। আততায়ী জাহাজটি কি করছে জানতে সবাই কৌতূহলে অধীর হয়ে উঠছে। 'সুইডেন'কে বললাম, আর একটি সিগারেট ধরাও। নাৎসীরা এখনও এখানেই আছে দেখা যাচ্ছে।

মৃত্যুকে অন্ততঃ তখনকার মত যে আবার ফাঁকি দিতে পারব, এ বিশ্বাস আমার প্রায় দৃঢ়মূল হয়ে গেছে। সিগারেটটা ধরাতে ধরাতে বললাম, 'সুইডেন'! আজকার ডিনারটি মনে আছে তো? যেন লাষ্ট সাপার! ধর, যদি এসে মেশিন-গান চালায়ই, এ হচ্ছে লাষ্ট স্মোক্।

'সুইডিস' একটু মুচকি হাসলে। জুজারটি আমাদের দিকে আসছে দেখা যাচ্ছে। যেন একটা দড়ির সিঁড়িও ঝুলছে ওটার গায়।

জাগর-স্বপ্নবিলাসী

অধ্যাপক শ্রীমন্মথনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, এম্-এস্‌সি

কোন বস্তু বা বিষয়ের অভাববোধের মূলে, কোন-না-কোন ইচ্ছা বর্ত্তমান। আর এই ইচ্ছা থেকে সেই বস্তু বা বিষয়টি পাবার চিন্তা উৎপন্ন হয়। শিশুর বেলাতেও এই নিয়ম খাটে। বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে তার অভাববোধও বাড়ে। শিশুর সকল অভাব মেটাবার সামর্থ্য পিতামাতার থাকে না। তার বায়না ও কান্না সামলান পিতামাতা বা অভিভাবকদের পক্ষে কঠিন হয়ে পড়ে, বিশেষ করে যখন কোন নতুন জিনিষ শিশুর নজরে পড়ে। "কাল পাবে, আর এক দিন কিনে দেব, বড় হলে পাবে, বড় হয়ে নিজে রোজগার ক'রে কিন্‌বে" এই ধরণের মিথ্যা কথা শুনতে শুনতে শিশুর ক্রমাগত মনোভঙ্গ হতে থাকে এবং অভিভাবকদের প্রকৃতি, শক্তি ও অভিপ্রায় সম্বন্ধে তার নিজের নানা রকম ধারণা জন্মাতে থাকে।

অভাব ও চাওয়া খুব ব্যাপক অর্থে বুঝতে হবে। খাবার, পরবার, খেলবার বা অন্য কোন জিনিষ পাবার ইচ্ছা ছাড়া বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে শিশুর অন্য অনেক প্রকার ইচ্ছা প্রতিহত হয়। তার মনে নানা ইচ্ছা জাগে, যেমন পরকে গালি দেওয়া, অন্যের জিনিষ কেড়ে নেওয়া, মারা, যখন খুশী বেড়ান, দৌড়ান, লাফান, নেড়া ছাতে বা মইয়ে উঠা, ঘোড়ার গাড়ীতে নৌকায় রেলে জাহাজে এরোপ্লেনে চড়া, ইচ্ছামত খেলা বা আড্ডা দেওয়া, পরের তোয়াক্কা না রাখা, যা বলা যায় ঠিক তার উল্টোটি করা, প্রভৃতি। ইচ্ছামত সব কাজ করা যায় না, আর অনিচ্ছা সত্ত্বেও অনেক কাজ করতে হয়,—এই দুই প্রকার অভিজ্ঞতা থেকে শিশু ব্যবহারিক জগতের স্বরূপ বুঝতে পারে। তার নিজের শক্তির পরিমাণ অন্যের তুলনায় কত কম, ক্রমে শিশুর এই জ্ঞান জন্মে।

এই হীনতাবোধ বালক-বালিকার পক্ষে দুঃখের কারণ। এ থেকে স্থলভেদে দুই প্রকারের ফল উৎপন্ন হয়। এক নিজেকে বড় ক'রে তোলবার ইচ্ছা বা উৎসাহ; অপরটি দুঃখে ম্রিয়মাণ হয়ে পিছিয়ে পড়া, "কারুর সঙ্গে প্রতিযোগিতা করতে যাব না, আমি কোন কাজের নই, বড় হতে পারব না"—এইরূপ হেয়, হেরো বা পরাজয়ের মনোবৃত্তি।

বালক-বালিকার একটি বিশেষ স্বভাব এই যে, মনের বাসনাকে কল্পনায় রঞ্জিত ক'রে নানা মনোরম অবস্থা-পরম্পরা রচনা করা ও তা থেকে আনন্দ লাভ করা। এই সব সৃষ্টি অলীক হলেও তৃপ্তি এবং সুখপ্রদ। এই প্রকারের আনন্দ-ভোগ বস্তুনিরপেক্ষ। এরূপ আনন্দ লাভের চেষ্টা দেখা যায় দুই অবস্থায়—প্রথমতঃ ঘুমের ভিতর স্বপ্নে, এবং দ্বিতীয়তঃ জেগে জেগে ভাবের ঘোরে তন্ময় হয়ে। এই শেষোক্ত অবস্থাকে জাগর-স্বপ্ন বলে। সংস্কৃত ভাষায় জাগর-স্বপ্নের অনুরূপ অনেক-গুলি ভাব-প্রকাশক শব্দ আছে, যেমন—"আশা-মোদক-চর্বণ" অর্থাৎ আশার লাড্ডু খাওয়া, "অভিত্তি-চিত্রকর্ম" অর্থাৎ ভিত্তশূন্য দেওয়ালে ছবি আঁকা, বা "ব্যোম্নি চিত্রকল্পনা" অর্থাৎ আকাশে চিত্রকল্পনা ইত্যাদি।

ঘুমের ভিতর শিশুর অতৃপ্ত ইচ্ছা স্বপ্নে চরিতার্থ হয়। বয়স্ক লোকের স্বপ্নের মধ্যেও এইরূপ পরিতৃপ্তির উদাহরণ কখনও স্পষ্টভাবে থাকে, কখনও বা গৌণভাবে দেখা যায়। দক্ষিণমেরু-আবিষ্কারীদের ভ্রমণবৃত্তান্তে দেখা যায়, যখন তারা অনশনক্লিষ্ট হয়ে প্রাণসংশয় অবস্থায় পড়েছিল, তখন তাদের সকলেই উত্তম চর্ব্যচোষ্যের স্বপ্ন দেখত। বয়স্ক লোকেদের স্বপ্নে, কামনার পরিতৃপ্তি অধিকাংশ ক্ষেত্রে অনেকটা ঘুরিয়ে হয় ব'লে স্বপ্ন দুর্বোধ্য ও কিম্ভূতকিমাকার হয়ে পড়ে। মনঃ-সমীক্ষণের দ্বারা তার মানে পরিষ্কার হয়।

জাগর-স্বপ্নের উদাহরণ পূর্ব্বপুরুষদের দিয়েই আরম্ভ করছি। ভারতীয় নীতিকথায় একটি প্রসিদ্ধ গল্প আছে। গল্পটি গ্রীক ও আরবদের দ্বারা অনূদিত হয়ে পাশ্চাত্য জগতে প্রচারিত হয়। আরব্য উপন্যাসেও এই গল্প আছে। গল্পের নায়ক হচ্ছেন ন্যাল্‌ডাস্‌কার। নাম পরিবর্ত্তিত হলেও বিষয়টি মূলতঃ ঠিকই আছে। সংস্কৃত আখ্যানটি বলছি।

একদা দেবীকোট নগরে বেদশর্মা নামে এক ব্রাহ্মণ বাস করতেন। তাঁকে কেউ বিষুব-সংক্রান্তির দিন এক সরা ছাতু দান করেছিলেন। তিনি ঐ সরা নিয়ে এক কুমোরের হাঁড়িকুঁড়ি ভরা খোকো ঘরের এক পাশে এক জায়গায় শুয়ে আধঘুমন্ত অবস্থায় ভাবতে লাগলেন—"যদি এই সরাটি বিক্রি ক'রে দশটি কড়ি পাই, তা হলে সেই কড়ি দিয়ে মাদুর ও সরা কিনে বেচব। এই রকম অনেক বার কেনা-বেচা করতে করতে লাভ হয়ে হয়ে যে টাকা বেড়ে যাবে, তাই থেকে পরে সুপারি ও কাপড়ের ব্যবসা করব। এইরূপে যখন আমার লক্ষ টাকা হাতে জমবে, তখন একটা,—একটা কেন চারটে বিয়ে করব। তার মধ্যে যেটি দেখতে খুব সুন্দরী ও যুবতী হবে, তাকেই বেশী ভালবাসব। আমার এই রকম এক-চোখমি দেখতে দেখতে সতীনেরা যখন হিংসায় জ্বলে ঝগড়াঝাঁটি করবে, তখন আমি খুব রেগে লাঠির বাড়ি তাদের এই রকম ক'রে মারব।" এই ভাবনাতে বিভোর হয়ে ব্রাহ্মণ কাছে যে লাঠিগাছটি ছিল সেটি ছুঁড়লেন। সেই লাঠির ঘায় নিজের ছাতুর সরা, আর তার সঙ্গে কুমোরের অনেক হাঁড়ি-কলসী ভেঙে চুরমার হয়ে গেল। ভাঙার শব্দে কুমোর এসে ব্যাপার দেখলে ও তিরস্কার ক'রে ব্রাহ্মণকে তার ঘর থেকে বের ক'রে দিলে।

নীতিজ্ঞ পণ্ডিত, এই আখ্যানের পর বলছেন যে, যিনি অনাগত ভবিষ্যতের চিন্তায় মগ্ন হয়ে গা ঢেলে দিয়ে আনন্দ লাভ করেন, তাঁকে কষ্টে পড়তে ও নিন্দাভাজন হতে হয়।

আর একটি উদাহরণ দিচ্ছি। এটি খুব টাটকা, গল্প নয়,—নিছক সত্য। প্রায় দুই সপ্তাহ আগে আমার একটি রোগী হঠাৎ এক দিন আমার কাছে এসে বললেন, "সম্প্রতি ৫০০ টাকা ও তার ওপরের নোট আর চলবে না, এই আদেশ বেরিয়েছে; এই রকম নোট কেনা-বেচার ব্যবসা চলছে। আমি ব্যাঙ্কের কর্ম্মচারী, আমার হাতে ক্রেতা ও বিক্রেতা দুয়েরই সন্ধান আছে। কিন্তু নিজের টাকা নেই। কিছু মবলক টাকা রোজগারের মতলব ভাঁজলুম। আমার পরিচিতা কোন লব্ধপ্রতিষ্ঠা ধনবতী অভিনেত্রীর নিকট গিয়ে লাখখানেক টাকা এনে তা দিয়ে নোট কেনার ব্যবসা করব; লাভ থেকে অভিনেত্রীকে তাঁর টাকা ফিরিয়ে দেব।" রোগী বলতে লাগলেন, "আমি যাবামাত্র যেন টাকা পাবার সুযোগ হ'ল; কিন্তু টাকা কর্ম্মস্থলে আনতে হবে, কিসে ক'রে আনব? ট্রামে বা বাসে অত টাকা নিয়ে চড়া নিরাপদ নয়, সুতরাং ট্যাক্সি ক'রে আসাই ঠিক করলুম; ট্যাক্সি চড়ে মনে হ'ল, যদি ড্রাইভার টের পায় তবে আমি তার সঙ্গে জোরে পারব না, সে পঞ্জাবী, আমাকে মেরে ফেলবে গলা টিপে।" তন্ময় ভাবের চিন্তা এখানে এসে ছেদ হয়ে গেল; দম আটকে গিয়ে মৃত্যুর বিভীষিকায় গা দিয়ে ঘাম বেরিয়ে পড়ল, হাঁপ ধরতে লাগল। এই রোগীর বেলায় জাগর-স্বপ্ন সুখে আরম্ভ হয়ে ভয় ও কষ্টে পরিণত হ'ল।

জাগর-স্বপ্ন কল্পনার ওপর প্রতিষ্ঠিত। কল্পনা মনের একটি সহজ বৃত্তি। কল্পনা ছাড়া মানুষ নাই—কল্পনা অনেক উপকারে আসে। যে চিন্তা, উদ্ভাবন ও আবিষ্কারে লাগে, তার মূলে থাকে কল্পনা; তবে কল্পনার মাত্রা কমবেশী হয় ব্যক্তি-বিশেষে। ছোটবেলায় শিশুরা কল্পনা ও বাস্তবের পার্থক্য তত বুঝতে পারে না। নিজ হীনতা বা অভাবের কষ্ট থেকে তারা অব্যাহতি পেতে চায়। এইজন্য সকলেই ছোটবেলায় সুখ বা আনন্দের কাল্পনিক ঘটনা রচনা করে, বাস্তব অবস্থাকে এড়াবার চেষ্টা করে। এইরূপ চেষ্টা থেকেই জাগর-স্বপ্নের সূচনা হয়। অনেক ক্ষেত্রে বয়স বাড়ার সঙ্গে ছেলের বহির্জগতের স্বরূপ উপলব্ধি হয় এবং জাগর-স্বপ্ন কমে যায়। আবার যারা বাস্তব ব্যাপারের সঙ্গে খাপ খাইয়ে চলতে শেখে না, তাদের মন অন্তর্মুখী বা অন্তর্বৃত্ত হয়ে পড়ে, লোকের সঙ্গে তারা মিশতে চায় না, নিজের ভাবনা নিয়েই মশগুল থাকে। এদের জাগর-স্বপ্ন বেড়েই যায়। ঘুমের আগে অথবা একলা থাকলে অথবা যে কাজে প্রতি পদে মন দিতে হয় না, সেরূপ কাজ করবার সময় জাগর-স্বপ্ন দেখা দেয়। পুরুষ অপেক্ষা মেয়েদের এবং পূর্ণবয়স্ক অপেক্ষা বালক-বালিকাদের মধ্যেই জাগর-স্বপ্ন বেশী দেখা যায়।

বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে জাগর-স্বপ্নের জটিলতা বৃদ্ধি পায় শৈশবের জাগর-স্বপ্নের বৈশিষ্ট্য এই যে, তাতে শিশুর প্রতিহত কামনা, হিংসাবৃত্তি, শক্তি প্রকাশের ইচ্ছা এবং কৌতূহল চরিতার্থ হয়। এ ছাড়া শিশুর মনে, যে-সব ভয় উৎকণ্ঠা ঘৃণা রাগদ্বেষাদির ব্যাপার গভীর রেখাপাত করেছে, সেগুলো জাগর-স্বপ্নে আত্মপ্রকাশ করে। শৈশবের পর ও যৌবনোন্মেষের মধ্যবর্ত্তী কালে যখন 'নির্জ্ঞানে'র রুদ্ধ ইচ্ছা আত্মপ্রকাশের চেষ্টা করে, তখন জাগর-স্বপ্নের প্রকৃতি কিছু পরিবর্ত্তিত হয়। এই সময় উচ্চাভিলাষের সঙ্গে নানা প্রকার বিকৃত কামেচ্ছা—যেমন, অগম্যাগমন সমকামিতা প্রভৃতি এবং সমাজ-নিন্দিত বিবিধ যৌন-ইচ্ছা জাগর-স্বপ্নে অল্পবিস্তর ছদ্ম বেশে দেখা দেয়। যৌবনোন্মেষের পরে, পূর্বোক্ত কল্পনার সঙ্গে ধর্ষণ ও মর্ষণ কামজড়িত হয়। কেহ কল্পনা করে—'আমি অতি ভয়াবহ ও রোমহর্ষণ ব্যাপারের মধ্যে নিজের ক্ষমতা প্রকাশ ক'রে অভিলষিত এক সুন্দরীকে উদ্ধার ক'রে বিবাহ করলাম।' আবার কেহ বা এমন মহত্ত্ব ও স্বার্থত্যাগের কল্পনা করে যাতে স্পষ্ট বুঝা যায় যে নিজেকে দুঃখকষ্টের মধ্যে ফেলে সে সুখ ও আনন্দ অনুভব করে।

ছোটদের পক্ষে রূপকথার বই খুব চিত্তাকর্ষক; কারণ এই সব বইয়ের গল্পের সঙ্গে নিজেদের কামনা মিলিয়ে গল্পের নায়ক-নায়িকার সঙ্গে বালক-বালিকারা একাত্মবোধ করে ও আনন্দ পায়। রোমাঞ্চকর ডাকাতের গল্প ও ভূতের গল্প অপেক্ষাকৃত বড় ছেলেমেয়েদের মনের অস্ফুট বাসনাকে উদ্বুদ্ধ করে। আবার অনেক যুবক-যুবতী নানা রকমের ডিটেক-

চিত্ত উপন্যাস আগ্রহের সঙ্গে পড়ে যে আনন্দ পায়, তার মূলেও সেই একই তদাত্মবোধ ও কাল্পনিক পরিতৃপ্তি বর্ত্তমান। অনেক উপন্যাস-লেখকের রচনা তাঁদের নিজ নিজ জাগর-স্বপ্ন-প্রসূত ; এজন্য তাঁদের বিভিন্ন গল্প একই ছাঁচে ঢালা দেখা যায়।

জাগর-স্বপ্নের যে একটা মন্দ ফল আছে তা আমরা আগেই ইঙ্গিত করেছি। কাজের মধ্যে বা পড়াশুনার সময় যে বালক-বালিকারা অন্যমনস্ক হয়, সেটা অনেক স্থলে জাগর-স্বপ্নের জন্য। জাগর-স্বপ্নের মাত্রা বেড়ে গেলে বালক-বালিকারা অন্তর্মুখ হয়ে পড়ে। আবার অন্তর্মুখতার মাত্রাবৃদ্ধির ফলে বাহ্য জগতের সঙ্গে সম্বন্ধ প্রায় ছিন্ন হয়ে যায়। এই অবস্থার উদাহরণ আমরা বহু মানসিক বিকারে দেখতে পাই। এরূপ ক্ষেত্রে কল্পনা ও বাস্তব একাকার হয়ে যায়। অতএব স্মরণ করিয়ে দিচ্ছি, জাগর-স্বপ্নের আশামোদক অধিকমাত্রায় সেবনীয় নহে।*

* অল্ ইণ্ডিয়া রেডিও কলিকাতা-কেন্দ্রে প্রদত্ত বক্তৃতা।

কঙ্কণার রাত

শ্রীসাধনচন্দ্র বসু

কঙ্কণার ঘাটে সন্ধ্যা নেমেছে। নীল আকাশে রক্ত আলোর দাগ মুছে গিয়ে ফুটে উঠেছে কালো অন্ধকার। সবুজ মাঠের শ্যামলশ্রী স্বপ্ন আলোতে ঝাপসা হয়ে উঠেছে। কঙ্কণার বাবুদের বাড়ীখানা খাঁ খাঁ করছে। বাবুরা সেখানে থাকে না। বিরাট বাড়ীখানা এক সময়কার ঐশ্বর্য্য আর আড়ম্বরের অজস্র পরিচয় নিয়ে আছে। একা বুড়ী পিসি সারা বাড়ীখানা আগলে থাকে। জনহীনতার দুঃসহ ব্যথায় ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছে বাড়ীখানা। সন্ধ্যার কালো অন্ধকারে পিসি তুলসী-তলার মাটির প্রদীপ একটা জ্বালিয়ে দেয় রোজ। লোকে বলে কঙ্কণার বাবুদের কল্যাণদীপ। কোন দিনই তার ব্যাঘাত হয় না। এক সময়ে ঐ প্রদীপ ছিল সোণার। তার আলোতে তুলসীতলার চারি পাশ উছলে পড়ত। আজ আর তার কোন চিহ্নই খুঁজে পাওয়া যাবে না। নায়েব আর গোমস্তাদের হাতে পড়ে সব নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে। আজ শুধু সেখানে মাটির প্রদীপ টিমটিম করে জ্বলে। বাড়ীর কাঠামো ছাড়া আর সব চিহ্ন লোপ পেয়ে গেছে। বাড়ীর গায়ে জন্মেছে অশ্বত্থ, আর আশ-পাশ ঝোপঝাপে ভর্তি হয়ে গেছে। বনতুলসীতে সারা ভিতরটা ছেয়ে ফেলেছে। বড় করবী গাছটা আর অশোকের ঘন পাতার গুচ্ছে আজও ফুল ধরে। চাঁপার মৃদু গন্ধ ফাঁকা বাতাসে ঘুরে মরে। কঙ্কণার বাবুদের বাড়ীর মেয়েরা নেই। তাই সে সব ফুল আজ আর কেউ তোলে না। মনে তাদের খোঁপায় সুরভিত স্বর্ণ চাঁপার মাধুরী। পুজোর দালানখানাও এক বিরাট অংশ জুড়ে রয়েছে। সেখানে নিত্য পুজারতির দিন চলে গেছে। সন্ধ্যারতিটা গিয়ে ঠেকেছে সপ্তাহে এক দিন। পুজারী কালের পরিবর্ত্তনে জরাজীর্ণ হয়ে পড়েছে। সামর্থ্যও এসেছে কমে। কোন রকমে একটা দিন কর্ত্তব্য সেরে যায়। দু-একটা ঘরে হয়ত চামচিকেরা বাসা বেঁধেছে। এক দল পায়রা সারাদিন বসে বসে ডাকে। এক সময়ে এগুলো ছিল কঙ্কণার বাবুদের পোষা। দালানের সামনে বাদুড়েরা সারাদিন ঝুলতে থাকে। কালো রাতে তাদের চোখ দুটো জ্বলে ওঠে। বাড়ীর মধ্যেই বকুল গাছটা ছায়ার আসর জমিয়েছে। লুপ্ত জনবাসের দুঃসাহসে দিন-দুপুরেও শেয়ালেরা বাড়ীর মধ্যে ঘুরে যায়। বাড়ীর আসবাব, বাসন, নানা দামী জিনিষপত্র একে একে নিজেদের জায়গা শূন্য রেখে নিঃশব্দে আত্মলোভীদের স্বার্থপরতা পূর্ণ করেছে। তবু কঙ্কণার ঘাটে সন্ধ্যা নামে। নীরব নিথর বৈকালি বাতাস থর থর করে কেঁপে ওঠে। ঝাপসা অন্ধকারে গাছের ঘন পাতাগুলো সেই কাঁপনে নড়তে থাকে। মনে হয়, এই বুঝি কঙ্কণার বাবুদের বাড়ীতে শঙ্খ-ঘণ্টাধ্বনি মুখর হয়ে উঠবে। বাড়ীর ভিতর থেকে আলো এসে উছলে উছলে এসে পড়বে বাইরে। গানের আসর গমগমে হয়ে উঠবে। আশপাশের বন লতা-পাতা চমকে চমকে উঠবে। কিন্তু কই? নিশুতি রাত নামছে, একে একে তারাগুলো ঝিকমিকিয়ে উঠছে কালো আকাশের গায়ে। নিরেট আকাশে কালো মাটির রঙের সঙ্গে মিশে আছে। থ' মেরে দাঁড়িয়ে আছে শুধু কঙ্কণার বাবুদের বাড়ী—নিঃশব্দ, নিস্পন্দ। দেখলে মনে হয় সে যেন মরে গেছে কতকাল। অন্ধকারের কালো দাগ তার গায়ে ফুটে উঠছে। সদর দরজা দিয়ে শুধু দেখা যায় জোনাকির মত একটা প্রদীপ জ্বলছে। বনতুলসীর গায়ে গায়ে জোনাকিরা ঘুরে ঘুরে বেড়াচ্ছে। সজীব প্রাণীর চিহ্ন শুধু ঐ আলোগুলো। ঝিকঝিক জ্বলছে। কঙ্কণার ঘাটে একখানা নৌকো এসে থামল। একটা লণ্ঠন সেটার ওপর জ্বলছে। শোনা গেল—'এবার নামুন, বড্ড অন্ধকার হয়ে গেল। জন-তিনেক লোক নামল তাদের অস্পষ্ট ছায়া থেকে বোঝা গেল। ঘাটের ওপর থেকে পথের দাগ আঁধারে মিশমিশ করছে। লোকের দেহ স্পষ্ট দেখা না গেলেও সচল লণ্ঠনের আলোয় তাদের চলাচল বেশ বোঝা গেল। পথ ধরে তারা এগিয়ে এল। এ নিরেট অন্ধকারে অসিতের মনটা থমথমে হয়ে উঠল। মানুষের রাজ্য ছেড়ে সে কি হাজির হয়েছে অন্ধকারের রাজ্যে। সে প্রশ্ন করল, 'আচ্ছা দারোগাবাবু,

এখানে কি লোকজনের বাস নেই।' 'আছে', উত্তর এল, 'এই ক'জন চাষাভুষো লোকই আছে। ভদ্রলোক বলতে মাত্র বাঁধা ক'ঘর।' কোন বাড়ীর চিহ্ন দেখা যায় না। জোনাকি-দের আলো ছাড়া অন্য আলো আর লক্ষ্যে পড়ে না। 'আর হাঁটতে হবে কত দূর?' অসিত প্রশ্ন করে। 'আর বেশী না', উত্তর আসে, 'বাবুদের বাড়ী ছাড়িয়ে একটু এগুলেই হরি ডাক্তারের বাড়ি। হরি ডাক্তারই আপনাকে একখানা ঘর ছেড়ে দিতে রাজি হয়েছে। সেও এক সময়ে নাকি কংগ্রেসে ছিল।' অসিত ভাবতে থাকে, সে বিপ্লববাদী সমাজতন্ত্রী। সকলে তার দিকে তাকিয়ে থাকে নীরব বিস্ময়ে। খানিকক্ষণ হাঁ করে তাকিয়ে থেকে তারা চলে যায়। আর সুশ্রী দেহ শুভ্র তরুণ কান্তির পিছনে তারা যেন বিস্ময়ের কিছু খুঁজে পেতে চায়। যখন তারা পায় না তখন নীরবে ফিরে চলে যায়। অথচ তাদেরই মত সাধারণ মানুষই সে। গ্রামেও হয়ত তার আসার আগে তার নাম ছড়িয়ে পড়েছে। সে আশ্চর্য্য হয়ে গেল হরিবাবুই তাকে আশ্রয় দেবার সাহস পেল কোথায়? রাজবন্দী সে। চলতে চলতে কখন যে কঙ্কণার বাবুদের বাড়ীর পাশ দিয়ে চলে এল তা টেরও পেল না। সে তখন চিন্তায় মগ্ন। খড়-ছাওয়া ঘরখানার সামনে এসে পড়তেই দারোগাবাবু বললেন, 'এই যে এসে গেছি।' অসিত থমকে দাঁড়াল। পথের পাশেই একটা মস্ত নারকোল গাছ অন্ধকারে মাথা তুলে দাঁড়িয়ে আছে। দারোগাবাবু হাঁক দিলেন, 'ডাক্তার-বাবু আছেন নাকি বাড়ী?' বাড়ীতে তিনি সন্ধ্যার সময় থাকেন না। এসময়ে বাজারে তাঁর ডাক্তারখানায় দাবার আসর জমে। কোন উত্তর ফিরে এল না। দারোগাবাবু আবার হাঁক দিলেন। পায়ের শব্দ শোনা গেল। দরজা খুলে গেল। মৃদুস্বরে শোনা গেল, 'ডাক্তারবাবু এখনও আসেন নি। আপনারা ভিতরে এসে বসুন।' দারোগা ইতস্ততঃ করছিলেন। অসিত স্থির ভাবে দাঁড়িয়েই ছিল। মৃদু কণ্ঠে আবার ডাক এল, 'ভিতরে আসুন। তিনি এখুনি আসবেন।' অসিত দারোগাবাবুর পিছন পিছন এগুলো। ঘরের চালাখানা ঝুলে এসে পড়েছে। সেখানা মাথায় এসে ঠেকে। অসিত মাথাটা নিচু করে নিল। লণ্ঠনের আলোয় ঘরখানাকে বেশ দেখা যাচ্ছে। খালি খাটে মাদুর পাতা। পিছনের লোকটি সেই খাটের উপর অসিতের বিছানাপত্র নামিয়ে রাখল। দারোগাবাবু বেশ ভাবিত কণ্ঠে বললেন, 'তাই ত…।' মেয়েলি কণ্ঠে উত্তর দিল, 'ডাক্তারবাবু সব বলে গেছেন। এখানে জল আছে জিরিয়ে হাত-পা ধুয়ে নিতে বলুন। আমি চা আনছি। আপনিও চা খেয়ে যাবেন।' দারোগাবাবু সব ব্যবস্থা ঠিক মত হয়েছে, উপরন্তু চায়ের ব্যবস্থা দেখে একটু বেশী মাত্রায় খুশী হয়ে উঠলেন। চায়ের তৃষ্ণা পথ চলার রহস্যে ঢাকা পড়ে-ছিল। দারোগাবাবু বললেন, 'নিন, হাত-পা ধুয়ে নিন। এখানেই আপনি থাকবেন। ডাক্তারবাবু না এলে আমি নিশ্চিন্তে যেতে পারছি না।' অসিত কোন উত্তরই দিল না। সে হাত-পা ধুয়ে নিল। নূতন জল তার হাতে অপরিচিত স্পর্শ দিল। চায়ের আয়োজন দেখে তুষ্ট হ'ল। এত সে খায় না। তবু সে খেতে লাগল। শেষে সে জানিয়ে দিল, রাত্রে তার আর কিছু লাগবে না। মৃদু আপত্তি এল, কিন্তু সে দৃঢ়তার সঙ্গে প্রতিবাদ করল। আর কোন উত্তর ফিরে এল না। সে বেশ নিশ্চিন্তে বিছানায় হেলান দিয়ে বসল। দারোগাবাবু বললেন, 'গাঁয়ে থাকা দায়। লোক নেই দুটো কথা কইবার। আপনি তবু এলেন দুটো কথা কওয়া যাবে। গাঁয়ের লোক যত সব মুখ্যুর দল। আমাকে দেখলে ত ঘরে গিয়ে খিল দেয়। হরি ডাক্তার তবু এক জন আছে। মাঝে মাঝে দুটো কথা কওয়া যায়। এত বড় একটা জমিদার বাড়ী খাঁ খাঁ করছে একজনও লোক নেই।' অসিত কোন উত্তর দিল না। সে শুধু শুনে যেতে লাগল। ঠিক সে কোন কথাই মনোযোগ দিয়ে শুনছিল না। দারোগার কথার টুকরোও কানে আসছে আর ঝিঁঝিদের ডাকও শোনা যাচ্ছে, আর সব নিস্তব্ধ। যে মেয়েটি তাদের পরিচর্য্যা করছিল সে চলে গেল। সাদা-সিধে শাড়ী-পরা মেয়েটির দিকে অসিত ভাল করে তাকায় নি। তার মুখখানার আবছা ছায়া অসিতের চোখের সামনে ঘোরাঘুরি করতে লাগল। পথে যে রাত্রে লোক-চলাচল করে তা মনে হ'ল না। নিকটেই কোন বাদাড়ে ডেকে উঠল শিয়াল। সে তীক্ষ্ণ কণ্ঠ অন্ধকারের নিস্তব্ধতা ভেঙে টুকরো টুকরো করে দিল। অনেক দূর থেকে তার সাড়া ফিরে এল। অসিতের বুক অপরিচিত শব্দে কেঁপে উঠল। সমাজতন্ত্রের বিপ্লবী পরিকল্পনায় সে মত্ত ছিল। জন-বসতির মধ্যে বসে নূতন সমাজ-সভ্যতার আলো তার মুখে উদ্ভাসিত হয়ে উঠত। কিন্তু আজ এখানে জনমনুষ্যের চিহ্ন নেই। সমাজের গঠন এখানে খুঁজে পাওয়া যাবে না। এত পরিকল্পনা এত চেষ্টা এখানে কারোরই জন্য নয়। সমাজ বলতে লোকেরা বোঝে এখানে ক'ঘর তথাকথিত ভদ্রলোকের রীতিনীতি। দেশ, পরাধীনতা, রাজনীতি এ সব শব্দ তাদের কাছে অপরিচিত। স্বাধীনতার মধ্যে নূতন আলোর সন্ধান মিলবে একথা যেন কেমন কেমন অদ্ভুত শোনাবে তাদের কানে। অসিত স্তব্ধ হয়ে ভাবতে থাকে। রাত ক্রমাগত একটু একটু করে বেড়ে চলেছে। দারোগার চোখে ঢুলুনি আসছে। মুখ বুজে বসে আছে। চোখ বুজে নীরবে বিড়ি টানছে। বিড়ির গন্ধে ঘরখানা ভরে উঠছে। অসিত মাঝে মাঝে নাক সিঁটকাচ্ছে। বিপ্লবের নূতন কোন মন্ত্র হয়ত তার মাথায় ঘোরাঘুরি করছে। দারোগাবাবু হাই তুলে বললেন, 'তাই ত ডাক্তারবাবুর এখনও ফেরার লক্ষণ নেই।' অসিত কোনই উত্তর দেয় না। দারোগাবাবু কর্তব্য হেলা করে ফেলে যেতে পারে না। অথচ অসিতের মত ভদ্র যুবককে অবিশ্বাস করতেও তার মন চায় না। আশ্চর্য্য হয়ে ভাবে এত

শান্তশিষ্ট মত্র ছেলে সরকারের কি ক্ষতি করতে পারে। তবু তার যা কাজ সে করে। এ রকম করেকবার সে দেখেছে। এদের মুখে আশ্চর্য্য নূতন কথা শোনা যায়, যা সে জীবনে শোনে নি। হঠাৎ হরি ডাক্তারের কণ্ঠস্বর শোনা গেল, 'দারোগাবাবু এসেছেন নাকি ?' তিনি সরাসরি ঘরে ঢুকে পড়েন। দারোগাবাবু সোজা হয়ে বসেন। হরি ডাক্তার অসিতের দিকে তাকিয়ে বলে, 'আপনিই নাকি ?' দারোগাবাবু সঙ্গে সঙ্গে উত্তর দেন, 'হাঁ, ইনিই।' হরি ডাক্তার দারোগাবাবুর কথায় কান না দিয়েই বলেন, 'আপনার নামটা।' অসিত বিনয়ের সঙ্গে নমস্কার করে বলে, 'আজ্ঞে আমার নাম অসিত ঘোষ।' 'ও আমার ফিরতে দেরি হয়ে গেল', হরি ডাক্তার ব্যস্ত হয়ে উঠলেন, 'আপনার খাওয়া-দাওয়া হয়েছে।' অসিত বলে, 'হ্যাঁ...হয়েছে।' 'ও আচ্ছা, আপনার বিছানাটা করে দিক। আপনি আজ শুয়ে পড়ুন, কাল সব কথা বলব আপনার সঙ্গে', হরি ডাক্তার বলে উঠল, 'দারোগাবাবুও কি আজ থাকবেন না-কি ?' দারোগাবাবু আপত্তি করে উঠেন, 'না না না, আমি শুধু আপনার জন্যেই বসে আছি।' 'তাই নাকি ? তবে এক কাপ চা খেয়ে যান', হরি ডাক্তার ভিতরে যাবার উদ্যোগ করেন। 'না, হয়ে গেছে চা খাওয়া, আমি চলি।' দারোগাবাবু চলে গেলেন, হরি ডাক্তার একটা বিরাট্ নিঃশ্বাস ফেলে বলে উঠলেন, 'উঃ এদের জ্বালায় জ্বলে মোলাম। আপনি আসবেন শুনে দারোগাবাবুও ভেবে অস্থির। শেষে আমি সব থাকার ব্যবস্থার ভার নিতে তবে রক্ষে। আমাকে অবশ্য এরা সুনজরে দেখে না। তবে বিনে পয়সার চিকিৎসার সুযোগ নিতেও ছাড়ে না। তা আপনার এখানে থাকতে অসুবিধে হবে অনেক। দেখে শুনে নেবেন। মালু...।' অসিতের দিকে ফিরে বললেন, 'মালতী এসে আপনার বিছানা করে দিক।'

মালতী এসে অনুযোগ করল, 'বাবা, উনি ভাত খাবেন না বলেছেন।' হরি ডাক্তার ব্যস্ত হয়ে উঠলেন, 'সে কি ? তা হবে না।' অসিত বেশ স্পষ্টভাবে বলল, 'না, আমি অনেক খেয়েছি আর খেতে পারব না।' হরি ডাক্তার বেশ উৎসাহিত কণ্ঠে বললেন, 'আপনারা ছেলেছোকরা মানুষ এ বয়সে যদি না খান, যাক শুয়ে পড়ুন।' অসিত আপত্তি করল, 'বিছানা আমি করে নিচ্ছি।' হরি ডাক্তার তা অগ্রাহ্য করে দিল, 'না তা হবে না, এটা আপনার নিজের বাড়ীর মত মনে করবেন।' একে একে মালতী, হরি ডাক্তার নানা উপদেশ দিয়ে চলে গেল। ফাঁকা ঘরখানায় লণ্ঠনটা জ্বলতে লাগল। মাথার ওপর ছাদটা অদ্ভুত দেখাতে লাগল। দরজার সামনে এসে অসিত দাঁড়াল। বাইরে অন্ধকার। ঝিঁঝিঁগুলো ডাকতে ডাকতে থেমে গেছে। হরিবাবুর গলা অন্দরমহলে শোনা যাচ্ছে। আলোচনা চলছে তাকেই কেন্দ্র করে। কলকাতার পথে এখনও লোক আর গাড়ী চলাচল বন্ধ হয় নি। সেখানে রাত কতই বা হয়েছে। আর এখানে সাঁঝ পেরোতেই সন্ধ্যা। আবছা গাছপালাগুলো দাঁড়িয়ে আছে। দরজাটা বন্ধ করে দিল। লণ্ঠনের আলোর মশারির পিছনে বিছানাটা অদ্ভুত দেখাচ্ছে। মশারি সরিয়ে দিতেই কতকগুলো মশা ডেকে উঠলো। অসিত সচেতন হয়ে উঠল। এদের হতে থেকে সাবধান থাকা দরকার। আলোটা মাথার কাছে এনে নিভিয়ে দিল। ঘন অন্ধকারে ঘরখানা ডুবে গেল। নিস্তব্ধতায় অসিত জেগে রইল। ঘুম আসা দায়, অপরিচিত ঘর, একটুও শব্দ নেই কোথাও। নিশাচর পাখীদের ডানার শব্দও পাওয়া যায় না। মাথার তলায় বালিশটাও কেমন চুপ করে রয়েছে। অসিত চোখ বুজে ঘুমোবার চেষ্টা করল।

একটু একটু করে আলো ফুটে উঠেছে। ভোরের ঠাণ্ডা বাতাসের স্পর্শ অসিতের ঘুম ভাঙিয়ে দিল। ভিতরে যারা জেগেছে তাদের সাড়া পাওয়া যাচ্ছে। অসিত উঠে পড়ে। কাজ তার কিছুই নেই। গ্রামের প্রতি মোহও তার নেই। হরি ডাক্তারকে প্রথম প্রথম একটু আশ্চর্য্য মনে হয়েছিল। সামনাসামনি দেখে তার সে ধারণা বদলে গেছে। কর্ম্মহীন অবসর তাকে পীড়া দিতে থাকে। পথের চলন্ত মুখরতায় তার কালকের দিন কেটে গেছে। কলকাতায় হলে এতক্ষণ তার চুপচাপ থাকার সময় থাকত না। নিজের বলা কথা-গুলোই মনে পড়তে থাকে : 'যে সংগঠন নিয়ে আজ আমরা এত মাতামাতি করছি তার প্রতি কথাটিকে কাজে পরিণত করতে হবে। অনেকেই আজ এখানে এসে দাঁড়িয়েছি, কিন্তু নিশ্চয়ই জানি ক'দিন পরে অনেকেই আর এখানে এসে দাঁড়াতে পারব না। তবু যে কয়জন থাকব সে কয়জনও অন্তত চেষ্টা করব আজকের প্রস্তাবকে কাজে পরিণত করতে। পরিবর্ত্তন আসে বিপ্লবের মধ্যে দিয়ে। আমরা চাই বিপ্লব। বিপ্লব বলতে শুধু ধ্বংসই বোঝায় না। কতকগুলো বিকৃত নীতিকে বদলে নূতন আর দৃঢ় সংগঠন আছে তার পিছনে। নিজেদের উপর চাই বিশ্বাস।' আরও কত কথা। সঞ্জীবের দীপ্ত মুখখানা ভেসে উঠে তার চোখের সামনে। সে চলে গেছে রাজসাহীতে। সে হয়ত আর যোগ দিতে পারবে না কাজে। প্রথমে সে ভেবেছিল যে গ্রামে যাবে সেখানে গিয়ে প্রচার করবে সমাজতন্ত্রের নূতন কথা। রাশিয়ার কথা গল্পের মধ্যে দিয়ে বলবে গ্রামবাসীদের কাছে। কিন্তু এখানে এসে তার মুখবন্ধ হয়ে গেছে আপনা থেকেই। হরি ডাক্তার এসে ডাক দিল, 'উঠেছেন নাকি ?' অসিত সাড়া দিল, 'হ্যাঁ।'

চায়ের পাট সেরে সে হরি ডাক্তারের সঙ্গে বেরিয়ে আসে পথে। একটু পথ পেরিয়েই করুণার বাবুদের বাড়ী। বিরাট্ বাড়ীখানা দিনের আলোতে নিজের অস্তিত্বকে জোর করে ঘোষণা করবার চেষ্টা করছে। হরি ডাক্তার বলতে থাকে, 'এই আমাদের জমিদারদের বাড়ী। ছেলেবেলায় দেখেছি কত জাঁকজমক ছিল এর। সারা বাড়ী প্রজার আর

নায়েব গোমস্তার গমগম করত। তারপর ক'বছরের মধ্যে কি যে হ'ল সব ভেসে গেল। জমিদারীও গেল। শুধু পড়ে রইল ভিটেবাড়ীখানা। জমিদারেরা গাঁ ছাড়া হয়ে চলে গেছে আজ বিশ বছরের উপর। যা-কিছু বাকি ছিল নায়েব-গোমস্তার লুটপাট করে নিয়েছে। এত বড় একখানা বাড়ী, যে আসে সে হাঁ করে তাকিয়ে থাকে। কি ছিরি ছিল আজ কি হয়েছে। শুধু এখনকার জমিদারের বুড়ি এক পিসি একা থাকে। সে আছে বলে তাই আজ ভিটের আলো জ্বলে। সে বুড়িই বা আর ক'দিন। সে গেলে আর কেউ থাকবে না।' বাড়ীটা পিছনে ফেলে তারা বাজারে এসে হাজির হয়। হরি ডাক্তারের ডাক্তারখানা। টিনের ছাওয়া একখানা ঘর। একটা খাট আর খানকয়েক বেঞ্চিপাতা। একটা ভাঙা আল-মারিতে নানা রকমের ওষুধ রয়েছে। হরি ডাক্তার বলে, 'বসুন।' বাজারের কাছেই থানা। হরি ডাক্তার দারোগা-বাবুকে খবর দিতে যায়। দারোগাবাবুকে সঙ্গে নিয়েই ফিরে আসে। দারোগাবাবু এসে রহস্যের চোখে অসিতের দিকে তাকিয়ে বলে, এ দিকে যখন এসেছেন তখন একবার থানা হয়ে যাবেন। অসিত সঙ্গে সঙ্গে উঠে পড়ে, বলে, 'চলুন, আপনার সঙ্গেই যাচ্ছি। দারোগা একটু হেসে নেয়। নিজের ক্ষমতার দম্ভকে বাজারের লোকের সামনে প্রকাশ করতে সে আত্মপ্রসাদ লাভ করে। সঙ্গে সঙ্গেই অসিতের সম্বন্ধে নানা বিস্ময়কর কথা ছড়িয়ে পড়ে। সকলে মনে মনে একটু ভীতও হয়, আশ্চর্য্য হয়ে তাকিয়ে থাকে, অসিতের চোখে নির্লিপ্তির ভাব ছাড়া আর কিছুই নেই। সে নিশ্চিন্তে চলতে থাকে দারোগার পিছনে। দারোগাবাবু বলতে থাকে, 'যে ক'দিন এখানে থাকবেন যদি একবার এদিকে ঘুরে যান ত বড় ভাল হয়। তবে সন্ধ্যার পর আর কোথায় বেরুবেন না, উত্তরের অপেক্ষা তিনি করেন না', বলেই চলেন,'কোথাই বা বেরুবেন। সন্ধ্যা না হতে হতে নিশুতি।' থানা থেকে ফিরে এসে আবার ডাক্তারখানার বসে। অপরিচিত সকলেই। হরিবাবুর সঙ্গে তার সম্বন্ধেই আলোচনা চলছিল। সে আসতেই আলো-চনার মোড় ঘুরে গেল। সে গ্রাহ্য করল না, দু-এক জন রোগীও শিশি হাতে দাঁড়িয়েছিল। তাদের দেখলেই বোঝা যায় রোগে তাদের সর্বদেহ গ্রাস করেছে। লিকলিকে হাত-পাগুলোর উপর ভর করে তারা কোন রকমে দাঁড়িয়ে আছে। তাদের অনাবৃত দেহে জীর্ণতার সুস্পষ্ট রূপ ফুটে উঠেছে। পেটটাই আকারে সবচেয়ে বেশী দীর্ঘতা লাভ করেছে। অসিত তাদের দিক থেকে চোখ ফিরিয়ে নেয়, ওকি, দারোগাবাবু আবার আসছে কেন। এবার রীতিমত হাঁপাতে হাঁপাতে আসছে। এসেই বলতে আরম্ভ করল, 'যাক আপনি বেঁচে গেলেন। এই চিঠি নিয়ে লোক এসেছে আপনাকে ছেড়ে দেওয়া হ'ল। বিকেলের ট্রেনে যান ত স্টেশনে পৌঁছে দিয়ে আসব।' হরি ডাক্তার বলল, 'তা হলে ত আপনিও বেঁচে গেলেন দারোগা-বাবু।' কোন উত্তর না দিয়েই হাঁটতে সুরু করল। হরিবাবু অসিতের দিকে উজ্জ্বল দৃষ্টিতে তাকালেন। বললেন, 'চলুন আজ আপনাকে ভাল করে খাইয়ে দিই, গ্রামের কারুর সঙ্গে আলাপ হ'ল না।" যারা বসেছিল, ওর সঙ্গে আলাপ করবার ইচ্ছা তাদের বিশেষ আছে বলে মনে হ'ল না। তাদের ভয় কাটে নি। ওর সঙ্গে আলাপ করতে গিয়ে দারোগাবাবুর সুনজরে পড়াটা কারুরই ইচ্ছা নয়।

শান্ত সন্ধ্যা নামছে করুণার ঘাটে। অসিত ঘাট পেরিয়ে এল। সঙ্গে দারোগাবাবু আছে। হরি ডাক্তার ঘাট পর্য্যন্ত এসে চলে গেছে। মালতীর অপরিচিত চোখ অসিতের মনে ভেসে উঠতে থাকে। ওপারের খেজুর গাছটার মাথা দেখা যাচ্ছে। মাত্র কাল সন্ধ্যায় অসিত করুণার ঘাট পার হয়েছিল। আজ করুণার ঘাট পিছনে দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলছে। জলো বাতাস অসিতের গায়ে অপরিচিত প্রকৃতির ছোঁয়া দিয়ে যাচ্ছে। আবার সেই কলকাতা। জনমুখর পথ ও দেখতে পায় চোখের সামনে। দূরের ট্রেন লাইনটা বেঁকে গেছে। একটু পরেই ও লাইনের সীমানা পেরিয়ে চলে যাবে। দূর আকাশের পশ্চিম গায়ে ঢলঢল সন্ধ্যার ধূসর ছায়া ঝাপসা হয়ে আসছে সবুজ মাঠের পারে। ওপারে করুণার ঘাট আর দেখা যাচ্ছে না।

পরমাণবিক শক্তির ভবিষ্যৎ

শ্রীগোপালচন্দ্র ভট্টাচার্য্য

জাপানে এটম-বোমা বিস্ফোরণের পর পরমাণুর অন্তর্নিহিত শক্তিকে ব্যবহারিক ক্ষেত্রে কাজে লাগাইবার জন্য বিভিন্ন দেশের বৈজ্ঞানিকেরা জোর গবেষণা সুরু করিয়া দিয়াছেন। জাপানের বিরুদ্ধে যেরূপ পরমাণবিক শক্তি প্রয়োগ করা হইয়াছিল, বৈজ্ঞানিকেরা মনে করেন, আগামী দশ বৎসরের মধ্যেই সেরূপ শক্তিকে নিয়ন্ত্রণ করিয়া ব্যবহারিক ক্ষেত্রে প্রয়োগ করা সম্ভব হইবে। পেট্রোল, বাষ্প, বিদ্যুতের পরিবর্ত্তে আধুনিক যান-বাহন, কল-কারখানা ইত্যাদি পরমাণুর শক্তিতে পরিচালিত হইতে পারিবে কিনা, এ সম্বন্ধে এখন কিছু বলিতে না পারা গেলেও অতি উচ্চগতিসম্পন্ন দূরপাল্লার বিমান, রকেট প্রভৃতি যে শীঘ্রই পরমাণুর শক্তিদ্বারা পরি-চালিত হইবে এ বিষয়ে বিশেষজ্ঞেরা উচ্চ আশা পোষণ করেন। দূরপাল্লার আকাশ-যান পরিচালনে যে গ্যাসোলিনের প্রয়োজন হয় তাহার পরিমাণ মত কম নহে, কাজেই গ্যাসো-

বামে—অক্সিজেন পরমাণুর অভ্যন্তর ভাগের দৃশ্য। দক্ষিণে—নিউক্লিয়াস্‌কে বড় করিয়া দেখান হইয়াছে। যোগচিহ্নিত কালো গোলকগুলি ধন-তড়িতাবিষ্ট প্রোটন, বাকীগুলি নিউট্রন

লিয়ের পরিবর্ত্তে পরমাণবিক শক্তি ব্যবহারের প্রয়োজনীয়তা বিশেষ ভাবেই অনুভূত হইতেছে। ইউরেনিয়াম পরমাণুর নিউক্লিয়াস্‌ বা কেন্দ্রীয় পদার্থ ভাঙিবার ফলে যে প্রচণ্ড শক্তি উৎপন্ন হয় তাহাতে ধ্বংসকার্য্য সম্পন্ন হইতে পারে, কিন্তু ব্যবহারিক ক্ষেত্রে মানব-কল্যাণে নিয়োজিত করিতে হইলে এই শক্তিকে যথোপযুক্তভাবে নিয়ন্ত্রণ করা প্রয়োজন। ইচ্ছামত কেমন করিয়া এই শক্তির উৎপাদন এবং নিয়ন্ত্রণ সম্ভব---তাহাই হইতেছে প্রশ্ন। এ বিষয়ে আলোচনার পূর্ব্বে জানা দরকার---'যে কোন পদার্থের পরমাণু না লইয়া এটম-বোমায় কেবল ইউরেনিয়াম পরমাণু ব্যবহার করা হয় কেন এবং এই পরমাণু হইতে শক্তি নির্গত হয়-ই বা কেমন করিয়া?'

পরমাণু সম্পর্কিত বিবিধ গবেষণার ফলে দেখা গিয়াছে---বহুবিধ উপায়ে পরমাণুর কেন্দ্রীয় বস্তুর উপর প্রতিক্রিয়া ঘটান যাইতে পারে। তাহার মধ্যে অন্ততঃ ডজনখানেক উপায়ে পরমাণু হইতে যথেষ্ট পরিমাণ শক্তি নির্গত হইয়া থাকে। পরমাণুর অভ্যন্তরে কোথায় কোন জিনিষ রহিয়াছে আজ বৈজ্ঞানিকেরা তাহার খুঁটিনাটি হিসাব দিতে পারেন। পরমাণুর অন্তর্নিহিত শক্তির কথাও তাঁহাদের অজ্ঞাত নহে। কিন্তু যাঁহারা এটম-বোমাকে কার্য্যকরী করিয়াছেন তাঁহারা কি কৌশলে নির্দ্দিষ্ট সময়ে এবং নির্দ্ধারিত স্থানে পরমাণুর নিউক্লিয়াস্‌ হইতে এই প্রচণ্ড শক্তিকে মুক্ত করিতে সমর্থ হইয়াছেন তাহাই হইতেছে প্রধান রহস্য। দ্রুতগামী ঢিল নিক্ষেপ করিয়া পরমাণুকে ভাঙিতে পারিলে তাহা হইতে শক্তি নির্গত হয়---একথাও বৈজ্ঞানিকদের অনেক দিন হইতেই জানা ছিল। কিন্তু ঢিল ছুড়িয়া অব্যর্থ লক্ষ্যভেদের ক্ষমতা থাকিলে তাঁহারা অনেক পূর্ব্বেই পরমাণুর শক্তি-সাহায্যে এঞ্জিন চালাইবার ব্যবস্থা করিতে পারিতেন। একটি পরমাণু ভাঙিবার জন্য তাঁহাদিগকে লক্ষ লক্ষ ঢিল ছুড়িতে হয়। তাহার মধ্যে দৈবাৎ এক-আধটা লাগিয়া যায় মাত্র। কারণ কোন পদার্থ আমাদের কাছে যতই নিরেট বলিয়া মনে হউক না কেন, উহার অনেকটাই শূন্যতা বা ফাঁকা জায়গা ছাড়া আর কিছুই নহে। অতি জোরালো তাড়িতিক শক্তির টানে পরমাণুগুলি খুব কাছাকাছি অবস্থান করে বলিয়া পদার্থকে নিরেট অথবা নিরবচ্ছিন্ন বলিয়া প্রতীয়মান হয়। পদার্থের পরমাণুগুলির মধ্যে বিরাট শূন্যস্থান থাকা সত্ত্বেও এটম-বোমা-নির্ম্মাতারা এমনই একটা উপায় উদ্ভাবন করিয়াছেন যাহাতে প্রত্যেকটি ঢিল বা বুলেট প্রত্যেকটি পরমাণুকে ঠিক জায়গায় আঘাত করিয়া শক্তি উৎপাদন তো করেই, অধিকন্তু প্রত্যেকটি পরমাণু হইতে দুইটি করিয়া নূতন বুলেট (নিউট্রন কণিকা) নির্গত করাইয়া আরও দুইটি পরমাণুর নিউক্লিয়াস্‌ বিদীর্ণ করিতে পারে। কেবল ইহাই নহে, বিভিন্ন প্রতিক্রিয়ার ফলে বৈজ্ঞানিকেরা এতদিন প্রত্যেকটি পরমাণু হইতে যতটা শক্তি আহরণ করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন, এই অভিনব প্রক্রিয়ায় তাহার শতগুণ অধিক শক্তি সংগ্রহ করা সম্ভব হইয়াছে।
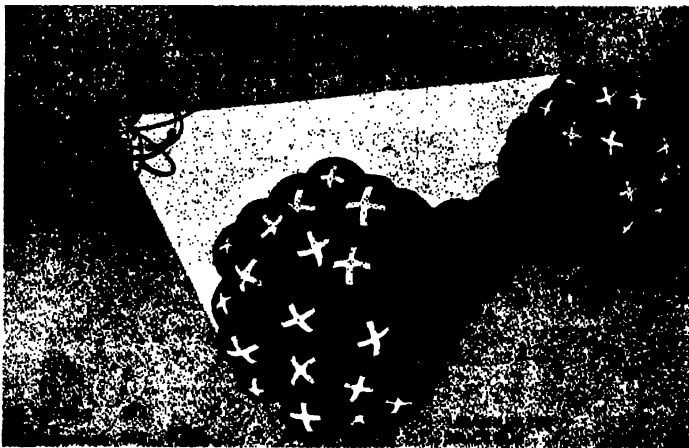
বামে—ইউরেনিয়াম—২৩৫-এর পরমাণুর অভ্যন্তর ভাগের দৃশ্য। দক্ষিণে—নিউক্লিয়াস্‌টাকে বড় করিয়া দেখান হইয়াছে। যোগচিহ্নিত কালো গোলকগুলি ধন-তড়িতাবিষ্ট প্রোটন-কণিকা। নিউট্রনগুলি মধ্যস্থলে থাকিয়া নিউক্লিয়াস্‌টাকে একটা অসমান ডাম্বেলের আকৃতি প্রদান করিয়াছে

এটম-বোমার অপরিমেয় শক্তির ইহাই মূল রহস্য।

এই শক্তির উৎস কোথায় জানিতে হইলে পরমাণুর অভ্যন্তরে কি কি পদার্থ আছে তাহা জানা দরকার। পরমাণুর কেন্দ্রস্থলে আছে—নিউট্রন নামক কতকগুলি নিস্তড়িৎ বস্তু-কণিকা আর কতকগুলি ধন-তড়িতাবিষ্ট বস্তু-কণিকা, যাহারা প্রোটন নামে পরিচিত। আর কেন্দ্রীয় পদার্থের বহির্ভাগে আছে ইলেকট্রন নামে কতকগুলি ঋণ-তড়িৎ কণিকা। ইহাদের বস্তু-পরিমাণ কিছু নাই বলিলেই চলে। সৌর-জগতে গ্রহগুলি যেমন বিভিন্ন কক্ষে সূর্য্যের চতুর্দ্দিকে ঘুরিয়া বেড়ায়, ইলেকট্রন-গুলিও সেইরূপ পরমাণুর কেন্দ্রীয়-বস্তু বা নিউক্লিয়াসের চতুর্দ্দিকে বিভিন্ন কক্ষে পরিভ্রমণ করে। কাজেই পরমাণুর গুরুত্ব বা বস্তু-পরিমাণ নিউক্লিয়াসের উপরই নির্ভর করে। পরমাণুর নিউক্লিয়াসের মধ্যে যতগুলি প্রোটন থাকিবে তাড়িতিক সাম্যাবস্থা বজায় রাখিবার জন্ম তাহাদের চতুর্দ্দিকে ততগুলি ইলেকট্রন সংগ্রহ করিয়া লইতে হইবে। রাসায়নিক প্রতিক্রিয়ার সময় এই ইলেকট্রনগুলির কক্ষ পরিবর্ত্তনের ফলেই শক্তির আবির্ভাব ঘটিয়া থাকে। কয়লা বা গ্যাসোলিন পোড়াইলে যে শক্তি পাওয়া যায় তাহা পরমাণুর শক্তি হইলেও পরমাণুর নিউক্লিয়াস্ হইতে উদ্ভূত শক্তি নহে। ইহা ইলেকট্রনের কক্ষ পরিবর্ত্তনের ফলে উদ্ভূত শক্তি। রাসায়নিক প্রতিক্রিয়ায় পরমাণুর ইলেকট্রনের কক্ষ-পথের বিশৃঙ্খলা উপস্থিত হইলে যতটা শক্তি পাওয়া যায়, পরমাণুর নিউক্লিয়াসের মধ্যে বিশৃঙ্খলা ঘটাইতে পারিলে তাহা অপেক্ষা অনেক বেশী শক্তি পাওয়া যাইতে পারে।

কোন পদার্থের প্রত্যেকটি পরমাণুর বস্তু-পরিমাণ বা গুরুত্ব যে একই হইবে এমন কোন কথা নাই। কাহারও গুরুত্ব কম, কাহারও বা একটু বেশী থাকিতে পারে। কারণ নিউক্লিয়াসের মধ্যে যে নিউট্রন থাকে একই পদার্থের প্রত্যেকটি পরমাণুতে তাহাদের সংখ্যা সমান নহে। এটম-বোমার প্রধান উপাদান ইউরেনিয়াম ঠিক এই রকমেরই একটা মৌলিক পদার্থ। ইউ-রেনিয়াম পরমাণুর প্রত্যেকটি নিউক্লিয়াসে ৯২টা প্রোটন থাকে, কিন্তু তাহাদের মধ্যে নিউট্রনের সংখ্যার পার্থক্য দেখা যায়। ইউরেনিয়ামের কতকগুলি পরমাণুর নিউক্লিয়াসের মধ্যে ১৪২টা নিউট্রন থাকে। এইগুলিকে বলা হয়, ইউরেনিয়াম—২৩৪ অর্থাৎ ৯২টা প্রোটন + ১৪২টা নিউট্রন = ২৩৪। কতকগুলি ইউরেনিয়াম পরমাণুর মধ্যে ১৪৩টা করিয়া নিউট্রন পাওয়া যায়। এইগুলিকে বলা হয়, ইউরেনিয়াম—২৩৫ অর্থাৎ ৯২ + ১৪৩ = ২৩৫। আবার কতকগুলি পরমাণুতে নিউট্রনের সংখ্যা ১৪৬ হইতেও দেখা যায়। ইহাদিগকে বলা হয়, ইউরেনিয়াম —২৩৮ অর্থাৎ ৯২ + ১৪৬ = ২৩৮। তবে সাধারণ ইউরেনিয়াম ধাতুর মধ্যে ২৩৮ ইউরেনিয়াম পরমাণুর সংখ্যাই বেশী। ইউ-রেনিয়াম—২৩৪ পরমাণু সামান্য দুই চারিটি পাওয়া যায় মাত্র। কিন্তু ইউরেনিয়াম—২৩৫-ই হইতেছে সবচেয়ে বেশী প্রয়োজনীয়। ২৩৮ হইতে "থার্মেল-ডিফিউসন" প্রথায় অপেক্ষাকৃত সহজে ইউরেনিয়াম—২৩৫ পৃথক করা যাইতে পারে। মন্দগতি নিউট্রন-কণিকা অতি সহজেই ইহার নিউক্লিয়াসকে দ্বিধা বিচ্ছিন্ন করিয়া ফেলিতে পারে। কিন্তু ইউরেনিয়াম—২৩৮-এর বেলায় নিউট্রন প্রয়োগে এরূপ ব্যাপার ঘটে না। তবে ইউরেনিয়াম
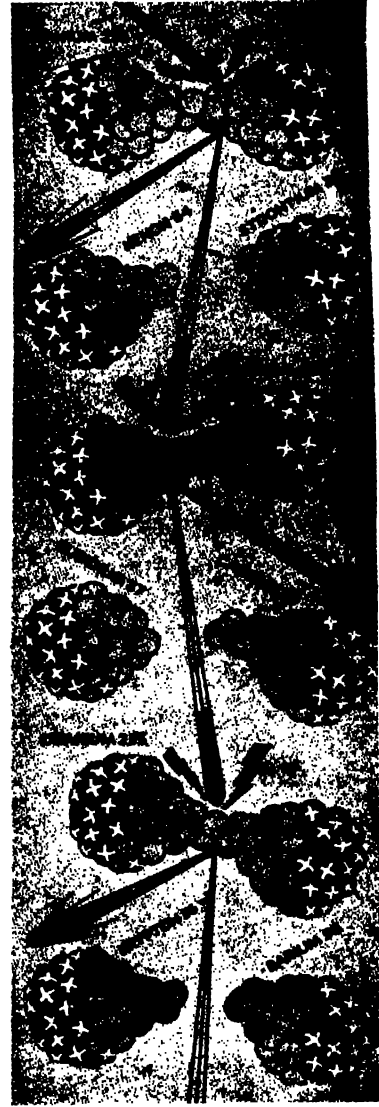
কালো রঙে চিত্রিত তীরের ফলার মত নিউট্রন-বুলেট, ইউরেনিয়াম—২৩৫ নিউক্লিয়াসের সহিত সংঘর্ষ বাধাইয়াছে। ফলে ইহা দ্বিধাবিভক্ত হওয়ায় খানিকটা শক্তিমুক্ত করিয়া সঙ্গে সঙ্গে আরও দুইটি নিউট্রন-বুলেট ছাড়িয়া দিয়াছে। এই নিউট্রন দুইটি আবার অন্য নিউক্লিয়াসকে দ্বিখণ্ডিত করিবে। ইউরেনিয়াম—২৩৫ এ ভাবে ভাঙিবার ফলে ৩৪ নম্বরের সেলিনিয়াম হইতে ৫৭ নম্বরের ল্যান্থেনাম পর্য্যন্ত বিভিন্ন পদার্থ পাওয়া গিয়াছে।
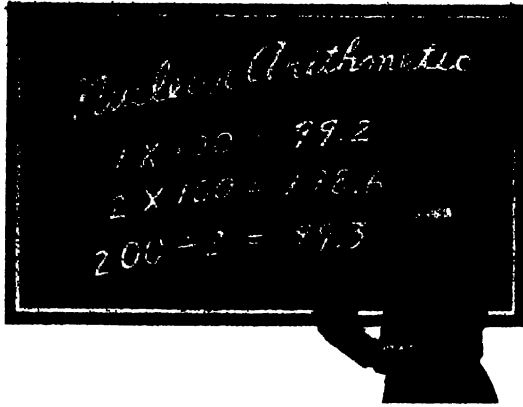
পরমাণুর নিউক্লিয়াস অর্থাৎ কেন্দ্রীয় পদার্থের ভাঙা টুকরা-গুলিকে একত্রে যোগ অথবা ভাগ করিলে তাহাদের মোট ওজন সাধারণ গণিতের নিয়ম মানিয়া চলে না। এই ওজন-হ্রাসই mass-defect নামে পরিচিত। নিউক্লিয়াস্ দ্বিধা-বিভক্ত হইবার সময় বস্তুমাত্রার এই যে সামান্ত হ্রাস ঘটে ইহাই শক্তিতে রূপান্তরিত হয়।

—২৩৮এর নিউক্লিয়াসে নিউট্রন প্রবিষ্ট করাইয়া একটা নূতন মৌলিক পদার্থ উৎপাদন করা সম্ভব হইয়াছে। এই পদার্থের নাম প্লুটোনিয়াম। ইহার তড়িন্মাত্রা ৯৪ এবং গুরুত্ব ২৩৯। প্লুটোনিয়ামেরও সহজেই ফিসন ঘটিয়া থাকে। অপেক্ষাকৃত সহজ প্রক্রিয়ায় ইহা উৎপাদন করা যায় বলিয়া হয়তো ইউ-রেনিয়াম ২৩৫ অপেক্ষা প্লুটোনিয়ামের সুবিধাই বেশী। কিন্তু কথা হইতেছে, অন্যান্য পদার্থের পরমাণুর নিউক্লিয়াস অপেক্ষা ইউরেনিয়াম—২৩৫-এর নিউক্লিয়াস এত সহজে ভাঙিয়া যায় কেন? অক্সিজেন পরমাণুর কথাই ধরা যাউক। অক্সিজেন পরমাণু ও ইউরেনিয়াম পরমাণুর নিউক্লিয়াসে প্রোটন ও নিউট্রন-গুলি কি ভাবে সজ্জিত আছে তাহা ছবি দেখিলেই পরিষ্কার বুঝা যাইবে। অক্সিজেন পরমাণুর নিউক্লিয়াসের মধ্যে আছে —৮টি প্রোটন এবং ৮টি নিউট্রন। এই প্রোটন ও নিউট্রনগুলি একটি গোলাকার পিণ্ডের মত হইয়া রহিয়াছে। এই গোলা-কার পিণ্ডটার বহির্ভাগে ৮টি ইলেকট্রন বিভিন্ন তলের বিভিন্ন কক্ষে ঘুরিতেছে। ইউরেনিয়াম—২৩৫-এর নিউক্লিয়াসে আছে—৯২টা প্রোটন আর ১৪৩টা নিউট্রন। এগুলি একসঙ্গে ডেলা বাঁধিয়া থাকিলেও একটা বলের মত গোলাকার নহে। যেন একটা অসমান ডাম্বেলের মত। এরূপ পার্থক্যের কারণ কি? নিউক্লিয়াসের অভ্যন্তরস্থ কণিকাগুলির উপর দুইটি পরস্পর বিরোধী শক্তি ক্রিয়া করিয়া থাকে। ইহাদের একটি হইতেছে, তাড়িতিক বিকর্ষণ শক্তি। এই বিকর্ষণ শক্তি প্রোটনগুলিকে পরস্পরের নিকট হইতে দূরে ঠেলিয়া দেয়। একমাত্র এই শক্তি বিদ্যমান থাকিলে নিউক্লিয়াস আপনা-আপনিই ছিন্নভিন্ন হইয়া উড়িয়া যাইত। কিন্তু তড়িতাবেশ থাকুক আর না-ই থাকুক, নিউক্লিয়াসের মধ্যে কণিকাগুলি যখন খুব কাছাকাছি অবস্থান করে তখন তাহাদের মধ্যে একটা প্রবল আকর্ষণ শক্তির প্রভাব দেখা যায়। এই আকর্ষণ শক্তিই তাড়িতিক বিকর্ষণ শক্তিকে কার্য্যকরী হইতে দেয় না। অপেক্ষাকৃত হাল্কা অক্সিজেন পরমাণুর অভ্যন্তরস্থ কণিকাগুলির মধ্যে এই আকর্ষণ শক্তি, তাড়িতিক বিকর্ষণ শক্তি অপেক্ষা অনেক প্রবল। কাজেই অক্সিজেন পরমাণুর কেন্দ্রীয় বস্তু অনেকটা নিরেট গোলকের আকার ধারণ করে। কিন্তু ইউ-রেনিয়ামের মত ভারী পদার্থের পরমাণুর কেন্দ্রীয় বস্তুতে বিকর্ষণ-শক্তি অপেক্ষাকৃত প্রবলতর। যখন এই শক্তি যথেষ্ট প্রবল থাকে তখন সামান্ত একটু অবস্থা বিপর্যয়ের ফলেই নিউট্রনের সাহায্যে সংযোগ রক্ষা করিয়া প্রোটনগুলি প্রায় সমান অংশে দুই দলে পৃথক হইয়া পড়ে এবং উভয় দলে যেন একটা টানাটানি চলিতে থাকে। এক ফোঁটা জল যেমন ছোট বড় দুইটি ফোঁটায় বিচ্ছিন্ন হইতে পারে সেইরূপ এই অবস্থায় একটা নিউট্রন, নিউক্লিয়াসে আঘাত করিলে তাহা দুই খণ্ডে বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়ে। এক টুকরা শুষ্ক-বরফ এক বাটি জলের মধ্যে ছাড়িয়া দিলে কিরূপ অবস্থা হয় তাহা অনেকেই হয়তো লক্ষ্য করিয়া থাকিবেন। শুষ্ক বরফের কিয়দংশ বাষ্পে পরিণত হইয়া যায় এবং জলের মধ্যে এমন ভাবে বুদ্বুদ উঠিতে থাকে, মনে হয় জলটা যেন ফুটিতেছে। ইউরেনিয়াম—২৩৫-এর নিউ-ক্লিয়াসের মধ্যে একটা নিউট্রন আঘাত করিলে প্রায় এইরূপই একটা ব্যাপার ঘটিয়া থাকে। নিউট্রনের সামান্ত অতটুকু বস্তু-

এটম-বোমা বিস্ফোরণের সম্ভাব্য কৌশলের পরিকল্পনা
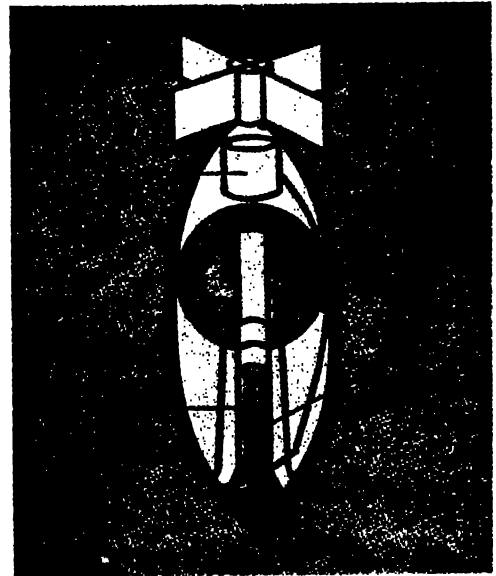
মাত্রার প্রভাবে নিউক্লিয়াস কম্পমান বেগ-শক্তি অর্জন করে।

পরমাণু-বিজ্ঞানে 'mass-defect' বলিয়া একটা কথা আছে। নিউক্লিয়াস্ দ্বিধা বিভক্ত হইবার সময় এই 'mass-defect' হইতেই প্রচণ্ড শক্তি পাওয়া যায়। 'mass-defect' ব্যাপারটা কি একটু বুঝাইয়া বলিতেছি। ধরুন আপনার ১০০টা মার্ব্বেল আছে। প্রত্যেকটা মার্ব্বেলের ওজন যদি এক পাউণ্ড হয়—তবে একত্রে ১০০টা মার্ব্বেলের ওজন ১০০ পাউণ্ড হইবে। কিন্তু এই মার্ব্বেলগুলিকে যদি নিউক্লিয়াসের অভ্যন্তরস্থ প্রোটন এবং নিউট্রনের সমধর্ম্মী বলিয়া ধরিয়া লওয়া যায়—তবে একত্রে ১০০টা মার্ব্বেলের ওজন হইবে মাত্র ৯৯'২ পাউণ্ড। অর্থাৎ প্রোটন এবং নিউট্রন ধর্ম্মী মার্ব্বেলগুলির প্রত্যেকটির এক পাউণ্ড করিয়া ওজন হইলেও একসঙ্গে ১০০টা মার্ব্বেলের ওজন কিছু কম হইবে—গাণিতিক হিসাব মত এরূপ ২০০ মার্ব্বেলের ওজন হওয়া উচিত—৯৯'২ এর দ্বিগুণ অর্থাৎ ১৯৮'৪ পাউণ্ড। কিন্তু প্রকৃত প্রস্তাবে তাহা হয় না। তখন দেখা যায় ২০০ মার্ব্বেলের ওজন হইতেছে—১৯৮'৬ পাউণ্ড। যদি এইরূপ ২০০ মার্ব্বেলকে দুই ভাগে ভাগ করা যায় তবে তখন আবার প্রত্যেক ভাগের—১০০টা মার্ব্বেলের ওজন হইবে ৯৯'৩ পাউণ্ড। পরীক্ষার ফলে নিউট্রন, প্রোটনের এরূপ ওজন বৈশিষ্ট্য বাস্তব ক্ষেত্রেই প্রমাণিত হইয়াছে। নিউক্লিয়াসের মধ্যে নিউট্রন, প্রোটনগুলি একত্রিত অবস্থায় থাকিবার সময় এই যে ওজনের হ্রাস ঘটে ইহাকেই বলা হয় mass-defect। ইউরেনিয়াম ২৩৫-এর নিউক্লিয়াস্ দ্বিধাবিভক্ত হইবার সময়ও ওজনের এরূপই পরিবর্ত্তন ঘটিয়া থাকে। সাধারণ পরমাণুর সমসংখ্যক কণিকার ওজন অপেক্ষা এই বিচ্ছিন্ন অংশের কণিকাগুলি একত্রে ওজনে কিছু ভারী হইয়া থাকে। নিউট্রন সংঘাতের ফলে ইউরেনিয়াম নিউক্লিয়াসের এই অপেক্ষাকৃত ভারী অংশগুলির অতিরিক্ত বস্তু, বেগ-শক্তিতে রূপান্তরিত হইয়া যায়। এই শক্তিই এটম-বোমাকে কার্য্যকরী করিয়া থাকে।
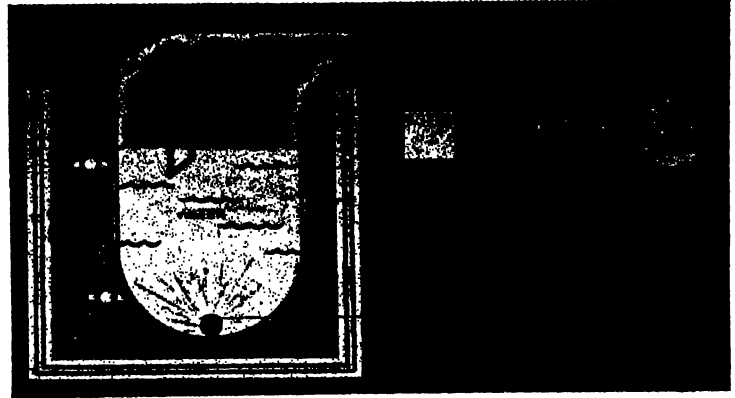
অর্দ্ধজলপূর্ণ আবদ্ধ পাত্রের তলার দিকে ইউরেনিয়াম—২৩৫-এর ভাঙন ঘটাইলে তাহা হইতে উদ্ভূত প্রচণ্ড তাপে জল বাষ্পে পরিণত হইয়া চিত্রে প্রদর্শিত উপায়ে যে কোন রকমের এঞ্জিনকে চালাইতে পারে। ক্যাডমিয়ামের সাহায্যে এই শক্তির উৎপাদন নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব

সরাসরি পরমাণু-শক্তি প্রয়োগ করিয়া ব্যবহারিক ক্ষেত্রে আপাততঃ রকেট জাতীয় আকাশ-যান পরিচালনায় ব্যবস্থা সম্ভব হইতে পারে। কারণ প্রোপেলার চালিত বিমান আর 'জেট-প্রোপেল্‌ড্' রকেটের গতি উৎপাদক কৌশল সম্পূর্ণ পৃথক। অত্যধিক চাপের গ্যাসের ধাক্কায় রকেট পরিচালিত হয়। কাজেই পরমাণু-শক্তি সাহায্যে সাধারণ এঞ্জিন অপেক্ষা রকেটকেই সহজে কার্য্যকরী করা সম্ভব হইবে। তবে সরাসরি না হইলেও কতকটা পরোক্ষ ভাবেই পরমাণু-শক্তিকে ব্যবহারিক ক্ষেত্রে কাজে লাগাইবার চেষ্টা চলিতেছে। কোন আবদ্ধ পাত্রে জলের নীচে ইউরেনিয়াম—২৩৫ অথবা প্লুটো-নিয়ামের 'ফিসন' ঘটাইলে জল উত্তপ্ত হইয়া বাষ্পে পরিণত হইবে।

জলপূর্ণ-আবদ্ধ পাত্রে ইউরেনিয়াম ও গ্রাফাইট পর পর সাজাইয়া তলার দিক হইতে পরমাণুর বিস্ফোরণ ঘটাইলে জল উত্তপ্ত হইয়া বাষ্পে পরিণত হইতে পারে। এই বাষ্পের সাহায্যে কলকারখানা পরিচালিত হইতে পারে। অথবা দেশের সর্ব্বত্র গরম জলও সরবরাহ করা যাইতে পারে

এই বাষ্পের সাহায্যে যে কোন রকমের এঞ্জিন পরিচালিত হইতে পারে। চিত্র প্রদর্শিত উপায়ে জলপরিপূর্ণ আবদ্ধ পাত্রের মধ্যে ইউরেনিয়াম ও গ্র্যাফাইট পর পর সাজাইয়া তাহাতে নিউট্রন প্রয়োগ করিলে জলকে বাষ্প বা উত্তপ্ত করিয়া প্রয়োজন মত ব্যবহার করা যাইতে পারে। ওয়াশিংটনের হ্যানফোর্ড শহরে গরম জল এবং এঞ্জিন চালাইবার বাষ্প সরবরাহ করিবার জন্য পরমাণু-শক্তি ব্যবহারের এরূপ একটি বিরাট পরিকল্পনা করা হইয়াছে।

বুনিয়াদি শিক্ষার উদ্দেশ্য ও আদর্শ

শ্রীনারায়ণচন্দ্র চন্দ

মানুষের জীবনকে কর্মক্ষেত্রের জন্য প্রস্তুত করিয়া তোলাই শিক্ষার প্রধান উদ্দেশ্য। মানুষের দেহ মন মস্তিষ্কের স্বাভাবিক বিকাশে সহায়তা করিয়া জীবন-যুদ্ধে তাহাকে জয়ী হইতে প্রস্তুত করে শিক্ষা। এইজন্য শিক্ষা-ব্যবস্থা সমাজের এক অপরিহার্য অঙ্গ, বিদ্যায়তন 'মানুষ' তৈয়ার করার আশ্রম। মানুষের রুচি ও সামর্থ্য নানা জনের নানা প্রকার, সমাজ-জীবনের কর্ম-বৈচিত্র্যেরও অন্ত নাই। তাই মানুষের জীবনের সহিত যোগ রক্ষা করিতে, মানুষকে বিচিত্র কর্মক্ষেত্রের উপযোগী করিয়া প্রস্তুত করিতে শিক্ষার বিষয়বস্তুও হইয়াছে বহু বিচিত্র। স্বাধীন দেশসমূহের শিক্ষা-বিভাগ যেদিকে যাহার অভিরুচি, যাহার মন যে বিষয়ের অনুশীলনে বেশি আনন্দ পায়, তাহাকে সেই সেই বিষয়েই বুদ্ধিশক্তি নিয়োজিত করিয়া আত্মপ্রকাশের পূর্ণ সুযোগ দান করিয়াছে।

আমাদের দেশের শিক্ষার অচলায়তনের মধ্যে প্রাণের সজীবতা নাই। শিক্ষার্থীর মানসিক শক্তি ও মনোবৃত্তি অনুযায়ী কোন শিক্ষার ব্যবস্থা তো নাই-ই, যে শিক্ষা স্কুল কলেজের মারফৎ দেশের ভাবী নাগরিকদিগের মধ্যে বিস্তার করা হইতেছে তাহাও কৃত্রিম, সমাজ জীবনের সহিত সম্পর্কচ্যুত। দেশের আশা-আকাঙ্ক্ষা বা কোন সমস্যা শিক্ষা-প্রণালীর মধ্যে মূর্ত হইয়া উঠে না; সর্বোপরি এই পুঁথি-সর্বস্ব শিক্ষা দেশের সম্পদ বৃদ্ধির সহায়তা করে না। তাহার ফলে বিদ্যা অর্জন করিয়া এদেশের যুবক বেকার হইয়া অন্নের কাঙাল, শিক্ষা-কেন্দ্রগুলি 'ভিক্ষুক তৈয়ির কারখানা' বলিয়া সমাজে অবহেলিত। যে বিদ্যা শিক্ষা করিয়া মানুষ অন্ন-বস্ত্রের সংস্থান করিতে পারে না তাহার উপর যদি সাধারণের শ্রদ্ধা না থাকে তবে বিশেষ দোষ দেওয়া যায় না।

ভারতের শিক্ষা-প্রণালীর শোচনীয় ব্যর্থতা এদেশের চিন্তাশীল লোকমাত্রকেই চিন্তাকুল করিয়া তুলিয়াছে। চল্লিশ কোটি অধিবাসীর দেশে সন্তানসন্ততির জন্য প্রকৃত শিক্ষার ব্যবস্থা করিতে যে শত শত কোটি টাকার প্রয়োজন তাহা কোথায় পাওয়া যাইবে? মহামান্য গবর্ণমেণ্টের পুলিস, সৈন্য, শাসন ও অন্যান্য বিভাগের প্রয়োজন মিটাইতেই গৌরী সেনের তহবিল কতুর হইয়া আসে; জাতিগঠনমূলক কাজের জন্য থলি ঝাড়িয়া অতি সামান্যই জোটে। অর্থের অভাবই ভারতের শিক্ষা-প্রচেষ্টার প্রধানতম অন্তরায়। উপযুক্ত পরিমাণ অর্থ, ব্যাপক শিক্ষার পরিকল্পনা এবং সেই পরিকল্পনাকে বাস্তব রূপ দিবার মত শক্তি ও সাহস সঞ্চয় করিতে না পারিলে অজ্ঞতার গুরুভারে পিষ্ট ভারতবাসীর উন্নতির কোন আশা নাই। মহাত্মা গান্ধী তাঁহার বুনিয়াদি শিক্ষা-পরিকল্পনায় দেশের এই গুরুতর সমস্যা সমাধানে নূতন পথের সন্ধান দিয়াছেন। এই শিক্ষা-পদ্ধতি মহাত্মাজীর জীবন দর্শনের অঙ্গ স্বরূপ এবং ভারতের সামাজিক ও অর্থনৈতিক জীবনের পক্ষে বৈপ্লবিক সম্ভাবনায় পূর্ণ। নিপুণ বৈদ্যের মত বর্তমান শিক্ষা-প্রণালীর মূল রোগ নির্ণয় করিয়া গান্ধীজী তাহার প্রতিকারের উপায় নির্দেশ করিয়াছেন; যথা—

১। সাত বৎসরের জন্য অবৈতনিক, আবশ্যিক, সার্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষা প্রবর্তন

২। মাতৃভাষার মাধ্যমে শিক্ষার ব্যবস্থা

৩। পুঁথিগত বিদ্যার উপর জোর না দিয়া কোন শিল্পকে কেন্দ্র করিয়া শিক্ষা দান

৪। ছাত্রগণ কর্তৃক প্রস্তুত দ্রব্যাদির বিক্রয়লব্ধ অর্থে শিক্ষকের বেতন প্রদান।

পরিকল্পনার উদ্দেশ্য ও আদর্শ

ওয়ার্ধা-পরিকল্পনার প্রধান উদ্দেশ্য শিক্ষাকে জীবনের সঙ্গে সংযুক্ত করা, শারীরিক ও মানসিক শক্তির বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে শিক্ষার্থীকে কোন বৃত্তি শিক্ষায় নিপুণ করিয়া তোলা যাহাতে সে কর্মজীবনে নিজের পরিবার প্রতিপালন ও সমাজসেবা উভয় কার্য্যেই সমর্থ হইয়া উঠে। বর্তমানের পুঁথি-কেন্দ্রিক শিক্ষায় ছাত্রগণ দৈহিক শ্রমের কোন কাজে অভ্যস্ত হইয়া ক্রিয়াসিদ্ধ (practical) হইয়া উঠে না; শুধু বুদ্ধিবৃত্তির উৎকর্ষতায় আত্মনিয়োগ করিয়া তাহারা দৈহিক পরিশ্রমকে অবজ্ঞা করিতে শেখে। ফলে শিক্ষিত এবং অশিক্ষিতের মধ্যে ব্যবধান গভীরতর হয়, উভয়ের মধ্যে পরস্পর সহযোগিতার সম্ভাবনা সুদূরপরাহত হইয়া আসে। এইরূপ অবস্থা কোন সমাজের পক্ষেই কল্যাণপ্রদ হইতে পারে না। গান্ধীজী ব্যাধির মূলে কুঠারাঘাত করিয়াছেন। তাঁহার ব্যবস্থায় দৈহিক শ্রমকে কেন্দ্র করিয়াই শিক্ষা গড়িয়া উঠিবে। ইহাতে যে শুধু

শ্রমের মর্যাদা সার্বজনীন ভাবে স্বীকৃত হইবে তাহা নয়, ছাত্রদের দৈহিক পেশী ও মানসিক সামর্থ্যের বিকাশ-সামঞ্জস্য হওয়ায় শিক্ষার্থীর সমগ্র ব্যক্তিত্ব প্রকাশের সুযোগ দেওয়া হইবে। তাহা ছাড়া পাশ্চাত্যের শিশু-মনোবিজ্ঞানবিদদের অভিমত এই যে, দৈহিক কর্মের মাধ্যমে শিক্ষাদানই শিশুর পক্ষে প্রকৃষ্ট প্রণালী।

ছেলেরা উচ্চ শিক্ষায় শিক্ষিত হইয়া চাকুরি করিয়া 'দুধে ভাতে' থাকিবে ভাবিয়া যে সব অভিভাবক ভবিষ্যতের মধুর চিত্র মনে মনে রচনা করিতেছিলেন, তাঁহাদের অনেকের কাছে ওয়ার্ধা-পরিকল্পনার উদ্দেশ্য ও আদর্শ স্পষ্ট না হওয়ায় নানাদিক হইতে, বিশেষ করিয়া উচ্চ শিক্ষিত মহল হইতে প্রতিবাদ উঠিল যে, এই শিক্ষা-ব্যবস্থা দেশকে ছুতার, মজুর, তাঁতীর দেশে পরিণত করিবে ; হাতের কাজের দিকে বেশি ঝোঁক দিলে শিল্পী হিসাবে ছাত্রগণ কুশলী হইয়া উঠিতে পারে, কিন্তু সংস্কৃতির ক্ষেত্রে ভারত সমগ্রভাবে পিছাইয়া পড়িবে। ইহার উত্তরে জাকির হোসেন কমিটি বলিয়াছেন :

The object of this new educational scheme is *not* rimarily the production of craftsmen able to practise ome craft *mechanically*, but rather the exploitation for ducative purposes of the resources implicit in craft vork. (*Basic National Education*, p. 11)

যন্ত্রপুত্তলীর মত কাজ করিতে সক্ষম শিল্পবিশারদ তৈয়ার করা নয়, শিক্ষাদান কার্যের সৌকর্যার্থে শিল্প কার্যের সহায়তা গ্রহণ করাই এই পরিকল্পনার উদ্দেশ্য। ছাত্রগণ শিল্প শিক্ষা করিবে অন্যান্য পুঁথিগত বিষয়ের সঙ্গে গৌণ শিক্ষণীয় বিষয় হিসাবে নয় ; তাহাদের শিক্ষা চলিবে বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে অর্থাৎ পর্যবেক্ষণ ও পরীক্ষণ দ্বারা তাহারা শিল্পক্রিয়ার যাবতীয় শিক্ষণীয় বিষয় জানিয়া লইবে। গান্ধীজী বলিয়াছেন, the child should learn the why and wherefore of every process. এইভাবে কাজের প্রতি ছাত্রের প্রকৃত অনুরাগ জন্মিলে তবেই পরিশ্রমের মর্যাদা সে উপলব্ধি করিতে পারিবে, কায়িক শ্রমের প্রতি তাহার অবজ্ঞা দূর হইবে এবং সুস্থ সবল বুদ্ধি ও মানসপ্রকৃতি লইয়া নূতন সমাজ গঠনের কাজে ব্রতী হইতে পারিবে।

ওয়ার্ধা শিক্ষা পরিকল্পনার ত্রুটি হিসাবে সমালোচকগণ উল্লেখ করিয়াছেন যে, মাধ্যমিক শিক্ষার কোন ইঙ্গিত ইহার মধ্যে নাই। কেহ কেহ আশঙ্কা করিয়াছেন কুটির শিল্পের প্রতি বেশী পক্ষপাত করায় বৃহৎ যন্ত্রশিল্প উপেক্ষিত হইতে পারে। প্রথমটির উত্তরে বলা যায়, বুনিয়াদি শিক্ষা প্রাথমিক স্তরের শিক্ষা। যে সাধারণ জ্ঞান, সাহিত্য, ইতিহাস, অঙ্ক, ভূগোলের মোটামুটি বিদ্যা যে-কোন নাগরিকের পক্ষে সর্বনিম্ন প্রয়োজন (minimum requirement) বলিয়া গণ্য, জনসাধারণের মধ্যে তাহা ছড়াইয়া দেওয়াই ইহার কাম্য। এই সঙ্গে এমন একটি বৃত্তি ছাত্রকে শিখাইয়া দিতে হইবে যে, সে ইচ্ছা করিলে, তাহা দ্বারাই জীবিকা অর্জন করিতে পারে। সার্জেন্ট পরিকল্পনায় বুনিয়াদি শিক্ষা ব্যবস্থা মূলতঃ গৃহীত হইয়াছে। ওয়ার্ধা পরিকল্পনায় ৭ বৎসর হইতে ১৪ বৎসর পর্যন্ত বয়সের ছাত্রছাত্রীকে শিক্ষা দিবার প্রস্তাব হইয়াছে, সার্জেন্ট পরিকল্পনায় আরো এক বৎসর পূর্বে অর্থাৎ ৬ বৎসর বয়স হইতে শিক্ষারম্ভ করিতে হইবে বলা হইয়াছে। আর ব্যবস্থা হইয়াছে যে ৫ বৎসর বুনিয়াদি ইস্কুলে পড়ার পর ১১ বছর বয়সে ছাত্রদের একটি নির্বাচনী পরীক্ষা গ্রহণ করা হইবে। তাহার ফলাফল দেখিয়া কতক তীক্ষ্ণধী ছাত্রকে মাধ্যমিক স্কুলে উচ্চ শিক্ষার জন্য পাঠান হইবে, অবশিষ্ট ছাত্রগণ বুনিয়াদি ইস্কুলের উচ্চমানে আরও তিন বৎসর পড়িয়া কোন একটি বৃত্তি জীবিকারূপে গ্রহণ করিবে।

দেশের অর্থনৈতিক সমাজ জীবন ও ভৌগোলিক পরিবেশের সহিত সামঞ্জস্য রাখিয়া জীবিকা অর্জন ও চরিত্র গঠনের উপযোগী শিক্ষাদান করাই বুনিয়াদি বিদ্যালয়ের অন্যতম প্রধান উদ্দেশ্য। জনসংখ্যার শতকরা প্রায় ৯০ জন ভারতের প্রায় ৭ লক্ষ পল্লীগ্রামে বাস করে। কাজেই ভারতের পক্ষে কল্যাণকর কোন শিক্ষা-পদ্ধতি রচনা করিতে পল্লী এবং পল্লীর সমস্যাকেই প্রধান স্থান দিতে হইবে, নতুবা ইহা প্রহসনে পর্যবসিত হইতে বাধ্য। বুনিয়াদি শিক্ষা সম্বন্ধে গান্ধীজী বলিয়াছেন :

This education is meant to transform village children into model villagers. It is primarily designed for them. The inspiration for it has come from the villages . . . Basic education links the children, whether of the cities or the villages, to all that is best and lasting in India. It develops both the body and the mind, and keeps the child rooted to the soil with a glorious vision of the future in the realization of which he or she begins to take his or her share from the very commencement of his or her career in school. (*Constructive Programme*, pp. 15-16)

ইংরেজ-শাসনকালে বৈদেশিক প্রতিযোগিতায় টিকিতে না পারিয়া ভারতের বাণিজ্য ও কুটিরশিল্প লুপ্তপ্রায় হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে পল্লীগ্রামগুলি হৃতশ্রী হইয়া পড়ে। অধিকাংশ লোকেরই একমাত্র নির্ভর হইল কৃষি। চাষ-আবাদের পর বছরের মধ্যে অর্ধেকের বেশীর ভাগ কালই চাষীর হাতে কাজ না থাকায় নিষ্কর্মা হইয়া বসিয়া থাকা ছাড়া তাহার অন্য কোন প্রকার রোজগারের উপায় থাকে না। কুটিরশিল্প বিনষ্ট হওয়ায় গ্রাম ছাড়িয়া লোক জীবিকা অর্জনের আশায় শহরে ভিড় করিতে লাগিল। কতক শহরের শ্রীবৃদ্ধি হইল বটে, কিন্তু পল্লী ভূমি দেশের যাহা শক্তিকেন্দ্র—দারিদ্র্যে জীর্ণ ও অজ্ঞান তমসায় আচ্ছন্ন হইয়া গেল। পল্লীর পুনঃসংস্কার এবং পল্লীবাসীর আর্থিক স্বাচ্ছন্দ্য ও তাহার দেহে শক্তি, মনে উদ্যম ও উন্নতির আশা ফিরাইয়া আনিতে না পারিলে এই মহাদেশ সদৃশ বিরাট দেশকে স্বরাজ-সাধনায় উদ্বুদ্ধ করা দুরাশা মাত্র। বুনিয়াদি শিক্ষা-পরিকল্পনা রচনা করিবার সময় ভারতের এই বিশাল মূক জনসংঘের কথা মহাত্মাজী বিশেষভাবে চিন্তা করিয়াছেন।

দেশের পক্ষে বৃহৎ যন্ত্রশিল্পেরও প্রয়োজন আছে। বুনিয়াদি ইস্কুলে হাতে কলমে কাজ শেখার পর ছাত্রগণ বড় কারখানার কাজ শিখিবার পক্ষে বরং অধিকতর উপযুক্ত হইবে। তাহা হইলেও ভারতের ন্যায় জনপূর্ণ দেশে প্রকৃত প্রয়োজন যন্ত্রশিল্পের সাহায্যে প্রচুর পরিমাণে মাল উৎপাদন নয়, বহুসংখ্যক লোককে কাজে নিযুক্ত রাখিয়া তাহাদিগের দ্বারা জিনিষ তৈয়ার করান—mass production নয়, production by the masses.

দ্বিতীয় মহাসমরে দেখা গিয়াছে উড়োজাহাজ হইতে বোমা-বর্ষণে শিল্পপ্রধান দেশসমূহের বৃহৎ কারখানাগুলি ধ্বংস করা সহজ। যে আণবিক বোমার প্রয়োগে যুদ্ধের গতি অকস্মাৎ অচল হইয়া পড়িয়াছিল, তাহার ভাবী সম্ভাবনার কথা চিন্তা করিয়া যন্ত্রশিল্পের দেশে কেন্দ্রবিচ্যুত শিল্পগঠনের প্রয়োজন অনুভূত হইতেছে। এই প্রসঙ্গে শ্রীমান নারায়ণ আগরওয়াল বলিয়াছেন:

"পৃথিবীর অর্থনৈতিক গতি হইতেছে কেন্দ্রবিচ্যুতি ও কুটীর-শিল্পগত সাম্য প্রতিষ্ঠার দিকে। এই ব্যবস্থা ভারতবর্ষে বহু অতীত কাল হইতে প্রচলিত ছিল। এই ব্যবস্থা পুনরুজ্জীবিত করিতে হইবে, অবশ্য আধুনিক কালের উপযোগী কিছু কিছু পরিবর্তন করিতে হইবে। পাশ্চাত্য দেশ এখন 'দানবের দাঁত' বপন করিয়া তাহার ফসল কুড়াইতেছে, আমাদের তাহা অনুসরণ করিলে চলিবে না। অর্থনৈতিক সংগঠনের এমন একটি পরিকল্পনা ভারতবর্ষে করিতে হইবে যাহা দেশের প্রকৃতি ও সংস্কৃতির সহিত সামঞ্জস্য বজায় রাখিবে। এই দেশজ ব্যবস্থার প্রথম পরিকল্পনা করিয়াছিলেন ডাঃ এনি বেশান্ট তাঁহার কমনওয়েল্থ অব ইণ্ডিয়া বিলে। গান্ধীজীও গ্রাম্য সম্প্রদায় এবং কুটীরশিল্পের উপর প্রতিষ্ঠিত ঐ অর্থনৈতিক পরিকল্পনা সমর্থন করিয়াছেন।" (গান্ধী পরিকল্পনা—পৃঃ ৭১)

কার্যতঃ মহাত্মাজীর বুনিয়াদি শিক্ষাপদ্ধতি ঐ অর্থনৈতিক পরিকল্পনাকে বাস্তব রূপ দিয়া দেশবাসীর বৃহত্তম অংশের মধ্যে নবজীবন সঞ্চারের প্রয়াস।

বুনিয়াদি শিক্ষার আর্থিক স্বয়ং-সম্পূর্ণতা (economic self-sufficiency) অর্থাৎ ছাত্রদের প্রস্তুত জিনিষ বিক্রয় করিয়া যে অর্থ পাওয়া যাইবে তদ্দ্বারা ইস্কুলের খরচ নির্বাহ করার বিষয় লইয়া বহু সমালোচনা হইয়াছে। কেহ কেহ বলিয়াছেন যে, ছাত্রদের উপার্জনের উপরই যদি শিক্ষকদিগকে নির্ভর করিতে হয় তবে ইহা অনুমান করা অসঙ্গত হইবে না যে ছাত্রগণকে শিল্পশিক্ষার মাধ্যমে অঙ্ক, ইতিহাস, ভূগোল মাতৃভাষা প্রভৃতি শিক্ষার পূর্ণ সুযোগ না দিয়া হয়ত শিক্ষকগণ তাহাদিগকে অর্থকরী কার্যেই অধিককাল নিয়োজিত রাখিবেন। জাকির হোসেন কমিটি শিক্ষকদিগকে অর্থকরী শিল্পকাজের প্রতি পক্ষপাত-প্রবণতা সম্বন্ধে সতর্ক করিয়া দিয়াছেন এবং অর্থপ্রসূ শিক্ষার বিধান ঈষৎ ক্ষুণ্ণ করিয়া বলিয়াছেন যে, ছাত্রগণ কর্তৃক উপার্জিত অনির্দিষ্ট পরিমাণ আয়দ্বারা শিক্ষকের বেতন দিবার ব্যবস্থা করা সমীচীন হইবে না। শিক্ষকগণ সরকারী তহবিল হইতে বেতন পাইবেন; ইস্কুলের উৎপাদিত জিনিসের মূল্য ট্রেজারিতে জমা দেওয়া হইবে। সার্জেণ্ট পরিকল্পনাও বুনিয়াদি শিক্ষায় ছাত্রের পরিশ্রমলব্ধ অর্থে শিক্ষার খরচ বহন করার প্রস্তাব মানিয়া লয় নাই। কেন্দ্রীয় শিক্ষা পরামর্শদাতা সমিতি বলিয়াছেন: খুব বেশি হইলেও এই আশা করা যায় যে, ইস্কুলে প্রস্তুত দ্রব্যের বিক্রয়লব্ধ অর্থে শিল্পকার্যের জন্য অতিরিক্ত মালপত্র ও সরঞ্জামের যোগাড় হইতে পারে। কিন্তু আচার্য জে. বি. কৃপালনী বর্তমান ভারতের অর্থনৈতিক, সামাজিক ও রাজনৈতিক অবস্থায় বুনিয়াদি বিদ্যালয়ের আর্থিক আত্মনির্ভরতায় উপর সর্বাধিক গুরুত্ব আরোপ করিয়াছেন। *The Latest Fad* নামক গ্রন্থে গান্ধীজীর ওয়ার্ধা পরিকল্পনার উদ্দেশ্য, আদর্শ ও মূলসূত্রগুলির ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে তিনি বলিয়াছেন যে, শিল্পগত শিক্ষা এবং বিদ্যালয়ের আর্থিক আত্মনির্ভরশীলতা বা স্বাবলম্বন পরস্পরের সহিত অবিচ্ছেদ্য ভাবে আবদ্ধ। একটিকে বাদ দিলে কিম্বা একটিকে উপেক্ষা করিয়া অন্যটিকে প্রাধান্য দিলে সমগ্র পরিকল্পনাই নিরর্থক, অচল হইয়া পড়িবে। তিনি লিখিয়াছেন:

Recently every educational conference, Central or Provincial, has recognised and recommended the principle of imparting education through craft work. But if there is any divorce between this and the principle of economic self-sufficiency, the scheme is bound to fail. If proper attention is not paid to the economic value of goods produced by the children, in course of time the value question will altogether disappear. (*The Latest Fad*, p. 69)

সম্প্রতি অনুষ্ঠিত প্রত্যেক কেন্দ্রীয় এবং প্রাদেশিক শিক্ষা সম্মেলনে শিল্পকার্যের মধ্য দিয়া শিক্ষাদানের নীতি স্বীকৃত হইয়াছে। কিন্তু এই নীতি হইতে আর্থিক স্বাবলম্বনের নীতি বিচ্ছিন্ন করিলে পরিকল্পনা ব্যর্থ হইতে বাধ্য। ছাত্রগণ কর্তৃক প্রস্তুত দ্রব্যের আর্থিক মূল্যের প্রতি নজর না দিলে কালক্রমে ইহার মূল্যের প্রশ্নই লোপ পাইবে। ক্রমে এই কাজের মধ্যে ঔদাসীনতা ও অবহেলা দেখা দিবে; বাজারের প্রতিযোগিতায় দাঁড় করাইতে হইলে যেরূপ যত্ন, অধ্যবসায় ও আন্তরিকতার সহিত বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে জিনিস উৎপাদন করিতে হইত, তাহা হইবে না। ফলে শিল্প শিক্ষা প্রাণহীন অবাস্তব কাজে পরিণত হইবে এবং শিল্প কাজকে কাঠামো করিয়া যে সর্বাঙ্গীন শিক্ষা-সৌধ গড়িয়া তোলার কথা, তাহাও স্থায়ী বা সুন্দর হইবে না। কিছু কাল পরে নূতনত্বের ঝোঁক কাটিয়া গেলে, আমেরিকা ও ইউরোপের অনেক বিদ্যায়তনে যেরূপ ঘটিয়াছে, শিল্পকাজ অপ্রয়োজনীয় ব্যয়সাধ্য ব্যাপার বলিয়া বাদ পড়িয়া যাইবে।

বুনিয়াদি বিদ্যালয়ের পক্ষে যে আর্থিক আত্মনির্ভরতা অর্জন করা—অন্ততপক্ষে ইস্কুলে প্রস্তুত দ্রব্যের বিনিময়ে প্রাপ্ত

টাকায় শিক্ষকের বেতন চালান—আদর্শবাদীর বপ্নসাধ নয়, পরীক্ষা কার্যের দ্বারা তাহা প্রমাণিত হইয়াছে। হিন্দুস্থানী তালিমি সংঘ কর্তৃক পরিচালিত সেবাগ্রাম বুনিয়াদি ইস্কুলের ১৯৪৪ সালের বার্ষিক হিসাব হইতে ইহার পরিচয় পাওয়া যাইবে। এখানে সকল বিষয়ের পুঙ্খানুপুঙ্খ হিসাব রাখা হইয়াছিল: প্রথম হইতে পঞ্চম মাস পর্যন্ত পাঁচ শ্রেণীর বিদ্যালয়; প্রত্যেক শ্রেণীতে ৩০ জন ছাত্র। ১৯৪৩ সালের জুলাই হইতে ১৯৪৪ সালের এপ্রিল পর্যন্ত দশ মাসে ইস্কুলের কাজ ২২০ দিন। শিল্প কাজ দৈনিক গড়ে আড়াই ঘণ্টা। উৎপাদিত জিনিসের মোট মূল্য পাওয়া গিয়াছিল ১২১৮৮০ অর্থাৎ প্রতি মাসে গড়ে ১২১৮৶০। শিক্ষকের বেতন জন প্রতি মাসে ২৫ টাকা ধরিলে ইস্কুল প্রায় আর্থিক স্বাতন্ত্র্য অর্জন করিয়াছিল বলিতে হইবে।

পরিকল্পনা পূর্ণ ভাবে প্রয়োগ করা হইলে অর্থাৎ সপ্তম মান পর্যন্ত চালু করা হইলে বিদ্যালয় যে স্বনিরপেক্ষ হইবে তাহাতে নিঃসন্দেহ হওয়া যায়। সেবাগ্রামে সুতাকাটা ও বয়ন প্রধান শিল্প হিসাবে গৃহীত হইয়াছে। বিভিন্ন অঞ্চলের ভৌগোলিক প্রকৃতি ও জনসাধারণের জীবনযাত্রার প্রণালী অনুযায়ী নিম্নলিখিতগুলির যে-কোন একটিকে কেন্দ্র করিয়া শিক্ষাদান চলিতে পারে:

(ক) সুতাকাটা ও বয়ন।
(খ) কাঠের কাজ।
(গ) কৃষি।
(ঘ) ফল ও সব্জীর চাষ।
(ঙ) চামড়ার কাজ।

এই শিল্পের মাধ্যমে শিক্ষা দেওয়া হইবে (১) মাতৃভাষা, (২) অঙ্ক, (৩) ভূগোল ও পৌরজ্ঞান, (৪) সাধারণ বিজ্ঞান, (৫) চিত্রাঙ্কন, (৬) সঙ্গীত ও (৭) হিন্দুস্থানী ভাষা। মেয়েরা সাধারণ বিজ্ঞানের সঙ্গে পারিবারিক বিজ্ঞান বিশেষভাবে শিক্ষা করিবে।

পাশ্চাত্ত্য দেশের ভৌগোলিক পরিবেশ এবং আর্থিক ও সামাজিক আবেষ্টনের সঙ্গে আমাদের সমাজ ও অর্থনৈতিক জীবনের মিল নাই। ভারতের ন্যায় দরিদ্র, জনবহুল, কৃষি-প্রধান দেশের পক্ষে অধিক ব্যয়সাপেক্ষ বিদ্যালয় পরিচালনার সাধ্য নাই, প্রয়োজনও নাই। কৃষি এবং কুটির শিল্পের উন্নতি সাধন করিয়া দেশবাসীর জীবনযাত্রার মান বৃদ্ধি করা, পুষ্টিকর খাদ্য, শোভন পরিচ্ছদ, পরিচ্ছন্ন স্বাস্থ্যকর বাসগৃহ, রোগ প্রতিষেধ ও সুচিকিৎসার বন্দোবস্ত করা—এক কথায় স্বাস্থ্যবান অন্তত সাধারণ শিক্ষাসম্পন্ন কর্মচঞ্চল অধিবাসী-অধ্যুষিত পল্লী গড়িয়া তোলাই দেশের অন্যতম প্রধান সমস্যা। প্রতিভাবান শিশুদের উচ্চ শিক্ষা এবং বৃহৎ যন্ত্রশিল্প শিক্ষাকে উপেক্ষা করা হইবে না কিন্তু উচ্চ শিক্ষার দিকে পক্ষপাত করিতে গিয়া প্রাথমিক শিক্ষাকে অবহেলা করিলে কিছুতেই দেশের কল্যাণ হইতে পারে না। স্বরাজ সাধনার জন্য মহাত্মাজী যে গঠনমূলক কার্যক্রমের নির্দেশ দিয়াছেন, বুনিয়াদী শিক্ষা তাহার ভিত্তিস্বরূপ। আচার্য কৃপালনী বলিয়াছেন যে, গান্ধীজী সত্য ও অহিংসার ব্রত লইয়া রাজনৈতিক জীবন সুরু করিয়া ক্রমে চরকা ও খাদি, হিন্দু-মুসলমান ঐক্য, স্ত্রী-স্বাধীনতা এবং গ্রাম্য শিল্পের পুনঃপ্রবর্তনের পরিকল্পনা করিয়াছেন। সর্বশেষে রচনা করিয়াছেন বুনিয়াদী শিক্ষার পরিকল্পনা। এই নূতন শিক্ষাপদ্ধতির উপরই তাঁহার সমগ্র জীবন-সাধনা নির্ভর করিতেছে। বুনিয়াদী শিক্ষার মধ্য দিয়াই ভারতের ভাবী নাগরিকগণ বিদেশী বণিকের শোষণমুক্ত, অন্যনিরপেক্ষ স্বয়ং-সম্পূর্ণ সমাজ গড়িয়া তুলিতে সমর্থ হইবে। ইহাই স্ব-রাজ প্রতিষ্ঠার প্রথম সোপান।

ভারতের শিক্ষা-প্রচেষ্টার অত্যাবশ্যক প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে সার্জেন্ট পরিকল্পনা যে মন্তব্য করিয়াছে তাহা প্রত্যেক ভারত-বাসীর বিশেষ প্রণিধানযোগ্য। রিপোর্টের ভূমিকায় বলা হইয়াছে:

> . . . in a country where apathy and inertia have reigned so long in the educational domain and where poverty has been the accepted excuse for leaving undone what ought to be done, a prodigious effort will be needed on the part of those responsible, both to set things going and to face the financial implications which such action will involve. Other countries, however, are already on the march towards the goal of social security and *if India continues to evade her responsibilities in this respect, she must be content to relegate herself to a position of permanent inferiority in the society of civilised nations.* (Italics ours.)

যে দেশে শিক্ষাক্ষেত্রে উদাসীনতা ও নিষ্ক্রিয়তা বহুদিন হইতে বিরাজ করিতেছে, যেখানে দারিদ্র্যের অজুহাতে কর্তব্য কাজ ফেলিয়া রাখা হইয়াছে, সেখানে দায়িত্বশীল ব্যক্তিগণকে কার্যে ব্রতী হইতে এবং উদ্দেশ্য সাধনের জন্য আর্থিক সমস্যার সমাধান করিতে অমানুষিক শ্রম স্বীকার করিতে হইবে। অন্য সকল দেশ নিজ নিজ সমাজের পক্ষে মঙ্গলজনক কার্যে আগাইয়া চলিয়াছে; ভারতবর্ষ যদি এখনও এই সম্বন্ধে তাহার দায়িত্ব এড়াইয়া চলিতে থাকে তবে বিশ্বের সভ্যজাতির সমাজে ভারতের ভাগ্যে হীনতর আসন চিরস্থায়ী হইয়া থাকিবে।

ভারতের নবজাগরণ সুরু হইয়াছে। বহুদিনের তন্দ্রাচ্ছন্ন মৃতকল্প জাতির বুকে নবজীবনের জোয়ার আসিয়াছে; দিকে দিকে তাহারই সুস্পষ্ট আভাষ। এই মহাজাতির নব উত্থানকে পরম সার্থকতার দিকে আগাইয়া লইয়া যাইবে যে বিরাট জনগণ, তাহাদের শিক্ষা-সমস্যার সমাধান বর্তমান ভারতের এক অনিবার্য কর্তব্য।

বুড়াবুড়ির তট

শ্রীজিতেন্দ্রকুমার নাগ

বাংলার পুনরুজ্জীবিত লবণ-শিল্পের প্রসার পর্য্যবেক্ষণ করিতে সমুদ্রকূলস্থিত জেলাগুলিতে ঘুরিয়া বেড়াইতে হইতেছে। কক্স-বাজারের সন্নিকটস্থ মহিষখাল দ্বীপে, পর্ব্বতোপরি প্রতিষ্ঠিত আদিনাথ দর্শন হইতে আরম্ভ করিয়া বঙ্গের পশ্চিম-সীমান্তে দিঘার নীলসাগর-জলে অবগাহন পর্য্যন্ত বাদ যাইতেছে না। এই ভ্রমণচক্রে সহসা কার্য্য উপলক্ষে ২৪ পরগণার দক্ষিণাঞ্চলে সুন্দরবনের উপকূলে বঙ্গোপসাগরের একটি বারিবাহর মোহানায় বুড়াবুড়ির তটের সহিত পরিচয় ঘটে। পাঠক জিজ্ঞাসা করিতে পারেন, এমন কি দুর স্থানে গিয়াছিলাম যে তাহার বৃত্তান্ত লিখিতে বসিয়াছি। তার উত্তরে বলিব যে, বুড়াবুড়ি হয়তো দূরত্বে শত মাইলের বেশী নয় এবং এমন কিছু দুর্গমও নয়, কিন্তু তার তীরে অতি অল্প লোকই পদার্পণ করে। অথচ সেখানে পৌঁছিলে দেখিতে পাইবেন দেড় শত বৎসরেরও অধিক পুরাতন লবণপ্রস্তুতির চিহ্ন কিরূপ বিস্তৃতভাবে পড়িয়া রহিয়াছে।

সুন্দরবন ডেস্‌প্যাচ্ সার্ভিসের ষ্টীমার বর্ত্তমানে নিয়মিত ভাবে কলিকাতার গঙ্গার ঘাট হইতে ছাড়ে। প্রায় প্রতিদিনই আর্মেনিয়ান, জগন্নাথ ঘাট ও নিমতলা ঘাট হইতে ভোর রাত্রে জাহাজ ছাড়ে। লেখক সম্প্রতি এক দিন রাত্রে গিয়া আর্মে-নিয়ান ঘাটের 'গাইয়ালা' ষ্টীমারে একটি কেবিন দখল করিয়া-ছিলেন। পরদিন প্রত্যূষে 'গাইয়ালা' একটি ফ্ল্যাট লইয়া অতি ধীরে দক্ষিণাভিমুখে যাত্রা করিল। সারাদিন গঙ্গার হাওয়া এবং সঙ্গের শুষ্ক খাবার খাইতে খাইতে যাওয়া গেল। অপরাহ্ণে কাকদ্বীপ ও সাগরদ্বীপের উত্তরাংশে শিকারপুরের মুখে বারতলা বা মুড়িগঙ্গাতে (Channel creek) পড়া গেল। সায়াহ্নের কিছু পূর্ব্বে বারতলা ছাড়িয়া 'গাইয়ালা' জাহাজ নামখানার মুখে হেতালিয়া ক্রীকে প্রবেশ করিল। নামখানা একটি ষ্টীমার ষ্টেশন। ইহার অবস্থানটি বড় ভাল লাগিল—নামখানা খাল ও হেতালিয়ার সঙ্গমস্থলে এই গণ্ডগ্রামটি সুন্দরবনের আবাদ বিস্তৃতির ফলে বেশ শ্রীসম্পন্ন হইয়াছে। ইহার পোষ্ট ও টেলিগ্রাফ আপিসের দুটি দ্বিতল ইমারৎ মুড়িগঙ্গা হইতে ভারি সুন্দর দেখাইতে থাকে। সুন্দরবন ফরেষ্ট ডিভিসনের নামখানা রেঞ্জের আপিস এবং সাপ্লাইয়ের আপিস থাকাতে নামখানার গুরুত্ব বাড়িয়াছে। নামখানা ফরেষ্ট রেঞ্জ পাথর. প্রতিমা, শিকারপুর, মলখোলা এবং কুলতলা 'ফরেষ্ট' আপিস ও সুন্দর-বনের কতকগুলি জঙ্গলের উন্মুক্ত কুপ (coupe) কন্ট্রোল করে।

নামখানা হইতে ষ্টীমার বরাবর পূর্ব্বাভিমুখে যাইতে লাগিল। হেতালিয়া খাল সরু হইলেও গভীর, সেজন্য ইহাই সুন্দরবনের জলপথে, খুলনা চাঁদপুর ও আসাম বা কাছাড় যাইবার এখন একমাত্র পথ। হেতালিয়া নদীর পূর্ব্বমুখ সপ্তমুখীতে। সপ্তমুখী বেশ চওড়া নদী, সমুদ্রের সহিত যুক্ত এবং উত্তরভাগে কোন বিশেষ মিঠা জলের নদীর সহিত সংযুক্ত নয় বলিয়া ইহার জল কম ঘোলা কিন্তু লোনা বেশী—গঙ্গার মত নহে। রাক্ষসখালি ও তমলুকের দ্বীপের (Loth.an Island) গভীর অরণ্য দুই পাশে রাখিয়া চলিয়াছি—পিছনে সূর্য্য কখন অস্ত গিয়াছে—সন্ধ্যার অন্ধকার প্রায় ঘনায়মান। সারেঙের পাশে বসিয়া উপর হইতে তমলুকের দ্বীপের শ্বাপদ-সঙ্কুল বনভূমি লক্ষ্য করিতে করিতে চলিলাম। মনে পড়িল বঙ্গের লবণশিল্প প্রসার-প্রয়াসের অন্যতম বিরুদ্ধবাদী পিট্ সাহেব এই দ্বীপটিতে লবণ-কারখানা বসাইবার কথা বলিয়া-ছিলেন। কিন্তু ইহার ঘন জঙ্গল কাটিয়া কত দিনে তা সম্ভব হইবে বলা দুরূহ। দ্বীপটি বেশ বড়, ইহা বরাবর সপ্তমুখীর পশ্চিম তীর ঘেঁষিয়া সমুদ্র পর্য্যন্ত চলিয়া গিয়াছে। আগাগোড়াই নিবিড় বন—মাঝে একটি খাল আছে—সেই খালের ধারে ধারে দুই-এক 'চেন' দূরত্বের ভিতর বাওয়ালিরা লুকাইয়া কিছু গাছ-গাছড়া নষ্ট করিয়াছে। এই অরণ্যখণ্ডকে লটে বিভক্ত করিয়া জমিদারদের আবাদ না করিতে দেওয়া সরকারের পক্ষে বুদ্ধির কাজ হইয়াছে। তাহা না হইলে এই ২৪ পরগণার অন্যতম অরণ্যসম্পদ কবে সাগর, ফ্রেজারগঞ্জ, চ্যাংনাল প্রভৃতির মত ধান্যক্ষেত্র ও লোকবসতিতে পূর্ণ হইয়া যাইত।

সপ্তমুখী হইতে রাক্ষসখালির দক্ষিণে হাবিলা ক্রীকে 'গাই-য়ালা' প্রবেশ করিল এবং প্রায় ঘণ্টা দুই পর রায়ছড়ার কিছু আগে দক্ষিণ লক্ষ্মীনারায়ণপুর খালের মুখে নামাইয়া দিল। স্থানীয় লটদারের কাছারি বাড়ীতে গিয়া উঠা গেল। পরদিন প্রভাতে একটি ছোট ডিঙ্গি করিয়া পাথরপ্রতিমায় আসিলাম। হাবিলা নদী দিয়া দেখিলাম গর্জন, গরাণ, বায়েন, গেন্দয়া প্রভৃতি কাঠ (টিম্বার বা জ্বালানির জন্য) বোঝাই করিয়া নৌকা আসিতেছে দখিনা বাতাসে পাল তুলিয়া। ইহারা আসিতেছে বেণীর ভাগ, বসিরহাট, খুলনার জঙ্গল হইতে। পাথরপ্রতিমা, বনশ্যামনগর, মাধবনগর প্রভৃতি পাশাপাশি কয়েকটি গ্রাম ঘুরিয়া মনে হইল না যে, সুন্দরবনের মধ্যে রহিয়াছি। বন কাটিয়া ধানচাষের এমন আবাদের সৃষ্টি হইয়াছে যে এদিকে সাধারণ পল্লীগ্রাম অপেক্ষাও স্থানে স্থানে বৃক্ষের একান্ত অভাব চোখে পড়ে। লোনা জলকে অবরোধ করিতে এবং শস্যভূমিতে জলসেচের ব্যবস্থা করিতে কয়েক স্থানে খাল পর্য্যন্ত বন্ধ করা হইয়াছে—ইহাতে লবণ প্রস্তুতি-বৃদ্ধির সম্ভাবনা একেবারে নষ্ট হইয়াছে। বর্ত্তমানে খাদ্যের নিতান্ত অনটন হওয়াতে এ সম্বন্ধে কোন কথা তুলিতে

সাহস হয় না। কিন্তু পূর্ব্বে যখন আবাদের সৃষ্টি হইয়াছিল তখন আমার মনে হয় অরণ্যসম্পদ এবং লবণাক্ত ভূমিকে একেবারে নিঃশেষ না করিলেই বোধ হয় ভাল হইত।

পানীয় জলের জন্ত নামখানার পর কয়দিন কোন টিউবওয়েল পাই নাই। জল ফুটাইয়া খাওয়া ছাড়া উপায় নাই। জমিদারবাবুরা প্রজা বসাইয়া নিশ্চিন্ত হইয়াছেন কিন্তু তাহাদের সুখ-সুবিধার জন্ত নলকূপ খনন করা, দাতব্য চিকিৎসালয় করা বা পথঘাট নির্ম্মাণ করা এসব বিষয়ে তাঁহাদের দৃষ্টি আজও পড়ে নাই। এই অঞ্চলে অর্থাৎ কাকদ্বীপ, সাগর এবং মথুরাপুর থানার অন্তর্গত অংশের জমিদার, লটদার এবং প্রজারা প্রায় সকলেই মেদিনীপুরবাসী।

পাথরপ্রতিমার ফরেষ্টবাবুর কাজ বাওয়ালীদের নিকট 'রয়েলটি' আদায় করিয়া ছাড়পত্র দেওয়া। ইহারা উন্মুক্ত কূপে (coupe) মার্কামারা গাছ কাটিয়া, নৌকা বোঝাই করিয়া দূরাঞ্চলে লইয়া যায়। নৌকার মালবহন-ক্ষমতা অনুযায়ী রয়েলটি দিতে হয়। বর্ম্মা হইতে কাঠের আমদানি বন্ধ হওয়ায় ইহাদের বাজার খুব গরম গিয়াছে। জ্বালানি কাঠ পর্য্যন্ত সন্নিকটস্থ বাজারে, কি খুলনায় কি কলতায় দেখিয়াছি এক শত মণের এক শত টাকা দর গিয়াছে। খুচরা বাজারে দুই টাকা পর্য্যন্ত এক মণ জ্বালানি কাঠের দাম উঠিয়াছে।

২

পাথরপ্রতিমার প্রায় পনের মাইল দক্ষিণে বুড়াবুড়ির তট একেবারে সমুদ্রের উপর—যেখানে পশ্চিম পাশে সপ্তমুখীর মোহানা এবং পূর্ব্ব দিকে জগদ্দল ও ঠাকুরাণ নদী সাগরে আসিয়া মিশিয়াছে। হাঁটাপথে গেলে কার্জন ক্রীক পার হইতে হয় বলিয়া আমরা নৌকায় গিয়াছিলাম। সেই দিন রাত্রেই খাওয়া-দাওয়া সারিয়া বোটের ছাউনির তলায় শয্যাগ্রহণ করা গেল। ভাঁটা পড়িবার সঙ্গে সঙ্গে মাঝিরা পাল তুলিয়া নৌকা ছাড়িয়া দিল। জ্যোৎস্নার আলোয় বেশ নির্বিঘ্নে সপ্তমুখীতে আসিয়া পড়া গেল। এইবার গন্তব্যপথ ছাড়িয়া ষ্টীমার দক্ষিণদিকে নদীর মোহানার উদ্দেশ্যে চলিতে সুরু করিল। সপ্তমুখী এইবার বিশেষ চওড়া হইয়া গিয়াছে—কিছুক্ষণ বেশ নিরাপদে গোঁচ মারিয়া মারিয়া নৌকাকে মন্থরভাবে সর্পগতিতে লইয়া যাইতেছিল। সহসা বাতাস বিশেষ প্রবল হইয়া উঠিল এবং ভাঁটার স্রোতের সহিত ইহার সংঘর্ষের ফলে তরঙ্গের আধিক্য এবং উচ্চতা বিশেষ উপলব্ধি হইল। চট্টগ্রামে একবার শঙ্খ-নদীতে ক্ষুদ্র একটি সাম্পানে এইরূপ অভিজ্ঞতা হইয়াছিল। মাঝি বেগতিক দেখিয়া সেবারে নৌকা কূলে ভিড়াইয়া আমাদের নামাইয়া দেয়। একণে হাজার মণী বজরাও দেখি রীতিমত লাফাইতে সুরু করিয়াছে। আরও মুশকিল হইল চন্দ্রের ক্ষীণ আলোয় মাঝিরা গন্তব্যস্থল লক্ষ্য করিতে পারিতেছিল না। সহযাত্রীরা বলিলেন, একেবারে 'বাহির'-সমুদ্রে আসিয়া পড়ার উপক্রম হইয়াছে। যাহা হউক ভাগ্যক্রমে তৎক্ষণাৎ দিক্‌নির্ণয় এবং চ্যাংমানের খাল কাঁকড়ামারীর মুখে একটি একাকী দণ্ডায়মান বিটপীর চিহ্ন নজরে পড়ায় নৌকাযাত্রীরা সকলে যেন নিশ্চিন্ত হইলেন অনেকটা। কিন্তু দুরন্ত বাতাস ও ভাঁটার গতি উত্তরকে সামাল দিয়া খাড়ির মধ্যে ঢুকিতে প্রায় আধ ঘণ্টা লাগিয়া গেল। রাত্রি তিনটায় আমরা কাঁকড়ামারি খালে কিয়দ্দূর গিয়া নৌকা নোঙর করিয়া পুনরায় নিদ্রার আয়োজন করিলাম। নৌকার হোগ্‌লার ছাউনির ফাঁক দিয়া দেখিলাম পশ্চিমে হেলিয়া-পড়া চন্দ্রের কিরণ সপ্তমুখীর নীল জলে চিকিমিকি খেলিতেছে। কিন্তু সুপ্তির আলস্যে উঠিতে আর ইচ্ছা হইল না—যদিও মন চাহিল বসিয়া বসিয়া প্রকৃতির এই মধুর দৃশ্য উপভোগ করিতে। ফাল্গুনের বাতাসও রাত্রিশেষে বিশেষ ঠাণ্ডা মনে হইতেছিল—কম্বল মুড়ি দিয়া শুইয়া পড়িলাম সংকীর্ণ শয্যাটিতে।

দিনের আলো ফুটিতেই নৌকা হইতে নামিয়া বালুময় নদীতীর দিয়া গোবর্দ্ধনপুর গ্রামে প্রবেশ করা গেল। গ্রাম বলিলে বোধ হয় ভুল হইবে—নিতান্ত কয়েক ঘর বহিরাগত কৃষকের বাসভূমি এবং দিগন্তব্যাপী শস্যক্ষেত্র। মাঝে মাঝে খাল ও পুষ্করিণী—পথ বলিতে বাঁধের উপর দিয়া বা ধানজমির আলের উপর দিয়া যে মেঠো পথ সুরু হইয়াছে তাহাই। এই পথ ধরিয়াই বুড়াবুড়ির সমুদ্রতটে পৌঁছিলাম। তটদেশ এখনও বনভূমি—আবাদ এত দূর অগ্রসর হইতে পারে নাই। এই স্থান রেভিনিউ ম্যাপে জি প্লট পঞ্চম খণ্ড (গোবর্দ্ধনপুর) এবং জি প্লট ষষ্ঠ খণ্ড নামে পরিচিত। কিন্তু ইহাদের আদি নাম যথাক্রমে বুড়া, বুড়ি। তটদেশ দিয়া ভ্রমণ চলিল না, কারণ বুড়ি একেবারে জঙ্গলপূর্ণ—গাছের শিকড়গুলির উপর অবিরাম সাগরের জল আছাড় খাইতেছে, সেজন্ত তটপ্রান্তস্থিত বৃক্ষগুলির তলা ক্রমশঃ ক্ষয় পাইতেছে। এই ষষ্ঠ খণ্ডে লবণপ্রস্তুত করিবার কারখানা বসানো চলে কি না তাহাই দেখিতে গিয়াছিলাম।

স্থানীয় অধিবাসীরা যে লোনা মাটি হইতে এখানেও ১৯৩০ সাল থেকে গান্ধী-আরউইন চুক্তির ফলে লবণ প্রস্তুত করিতেছে তাহার উল্লেখ না করিলেও চলিবে। কিন্তু বুড়াবুড়ি যে এক সময়ে শতবর্ষেরও পূর্ব্বে লবণ-শিল্পের অন্যতম কেন্দ্র ছিল তাহা বোধ করি বর্ত্তমানে কেহ বিশ্বাস করিবেন না, কারণ উত্তরদিকে আবাদ এবং দক্ষিণ দিকে নিবিড় অরণ্য—রয়েল বেঙ্গল টাইগার প্রভৃতির আবাসস্থল। মধ্যাহ্নের প্রখর রৌদ্রে দল পাকাইয়া বনের মধ্যে ঢুকিলাম। কোন পশুর সাক্ষাৎ মিলে নাই বটে, কিন্তু বহু স্থানে শতাধিক বৎসরের পুরাতন লবণ প্রস্তুতির চিহ্ন চোখে পড়িল। মলঙ্গীরা যে চুল্লীতে লোনাজল জাল দিত সেই সব চুল্লীর ধ্বংসাবশেষ এবং অসংখ্য ভাঙা ভাঁড় খুরি স্তূপাকারে মাটির গাদার সহিত পড়িয়া আছে। কবে কতকাল পূর্ব্বে মলঙ্গীরা এইগুলিকে ফেলিয়া চোখের জল ফেলিতে ফেলিতে চলিয়া গিয়াছে তাহা বলা কঠিন। তবে মনে হয়

নিষেধ আইন পাস হইবার সময় ১৭৯৩ সালে। দেখিয়া বেশ অনুমান করা যায় যে এগুলি নিমক এজেন্সী রিপোর্ট-বর্ণিত পিরামিড আকৃতির চুল্লী ছিল—যাহার উপর তিন-চারি থাক্ গোল সারিতে ভাঁড়গুলি সাজাইয়া দেওয়া হইত। এই কারনেস সম্বন্ধে পূর্ব্বে প্রবাসীতে লিখিয়াছি সেজন্য বিশদ বিবরণ দিলাম না। তাহার ছবিও ঐ সঙ্গে ছাপা হইয়াছিল। রেলিক্ হিসাবে একটি গোটা মৃৎপাত্র সংগ্রহ করিয়াছি। পূর্ব্বে ঠিকই অনুমান করিয়াছিলাম উড়িষ্যার দেবমন্দিরের ভোগ রন্ধনে যেরূপ মাটির ভাঁড় ব্যবহার হয় ঠিক সেইরূপ (u) ইউ আকারের মত। ছোট ধরণের এক একটিতে খেপে খেপে এক সের পর্য্যন্ত লোনা জল ধরিতে পারিত। যতক্ষণ না প্রায় কানায় কানায় লবণ পড়িত, জ্বাল দিবার সময় ততক্ষণ পর্য্যন্ত ইহাতে লোনা জল ঢালা হইত।

বিস্ময়ের কথা এই যে, প্রাচীন লবণ শিল্প তৎকালীন অরণ্য-পূর্ণ সুন্দরবনের একেবারে সমুদ্রতীর পর্য্যন্ত বিস্তার লাভ করিয়াছিল। কোথায় নালুয়া মথুরাপুর আর কোথায় বুড়াবুড়ির তট। ২৪-পরগণা এজেন্সীর অধীনে পশ্চিম সুন্দরবনের সমগ্র তটভূমি ও তৎসন্নিকটস্থ স্থানসমূহে লবণশিল্পের প্রসার ঘটে সম্ভবতঃ তমলুকের দ্বীপ, ধব্দি, খিজারিয়া প্রভৃতি বাদে। সাগর, ফ্রেজারগঞ্জ, বুড়াবুড়ি, বুলছরি, গুর্দ্দা এবং গোমাবার পূর্ব্ব তীরস্থিত স্থানগুলিতে রীতিমত লবণের চাষ হইত। কারণ এই সমস্ত স্থানে শুধু তার চিহ্ন পাওয়া যায় নাই বর্ত্তমানে তাহার পূর্ণ বিকাশও ঘটিয়াছে। বগ্‌খালি দ্বীপেও ইহার প্রসার ঘটিয়াছিল বলিয়া মনে হয়। আবাদের সৃষ্টি হওয়ায় সে সব চিহ্নের অস্তিত্ব নাই কিন্তু মাটি খনন করিলে তাহা পাওয়া যায়। বুড়াবুড়ির বর্ত্তমান অধিবাসীরা বনের ভিতরকার একটি খালকে বিস্কুটের খাল বলে, কারণ এই খালের ধারে এক স্থানে কোম্পানীর এজেন্সির নাকি খাদ্য-রসদের একটি কুঠি ছিল। খালের নামে বিস্কুট কথা যুক্ত থাকাতে এই কিংবদন্তী অবিশ্বাস করিলাম না।

বুড়াবুড়ি সম্ভবতঃ এক সময় জলপাই জমির মতন জঙ্গল এবং ফাঁকে ফাঁকে চরভূমিযুক্ত ছিল। চরে 'চাতর' বানাইয়া লবণের চাষ চলিত এবং বন হইতে লোনা জল জ্বাল দিবার জ্বালানি মিলিত। লোনা জল পরিস্রুতির দবারীগুলির কোন চিহ্ন নাই। চাতরগুলিও কালের স্রোতে উপর্য্যুপরি বর্ষার জলে আগাছায় পূর্ণ হইয়া আছে। মলঙ্গীদের পরিত্যক্ত এই চরে কবে আবার লবণের চাষ পুরামাত্রায় হইবে তাহা কেহ বলিতে পারে না। এডেন ও পোর্ট সৈয়দের করকচ লবণ যত দিন বঙ্গের বাজার মুঠার মধ্যে রাখিবে তত দিন নহে।

২৪-পরগণা এজেন্সী কোম্পানীর আমলে গড়ে প্রতি বৎসর ৮ লক্ষ মণ লবণ উৎপাদন করিত। ১৮৪৮ সালে এজেন্সী সিষ্টেম বন্ধ হইবার পরও কিছু দিন ইহার কাজ চলিয়াছিল এবং প্রায় সিপাহীবিদ্রোহের সময় পর্য্যন্ত সুন্দরবনে লবণশিল্পের অস্তিত্ব ছিল, তাহা ক্রমে ক্রমে বিদেশী লবণের আমদানিতে লোপ পাইতে বসে। এই এজেন্সীতে (প্লাউডনের রিপোর্ট অনুযায়ী) ৮টি হুদা ছিল যাহার আয়তন ছিল ২৭ হাজার বিঘার বেশী। হুদা বলিতে আড়ঙের বিভাগ বুঝায়। হিজলী এজেন্সী ছিল কোম্পানীর সর্ব্বাপেক্ষা বড় লবণ-ডিষ্ট্রিক্ট। ইহার ছিল ছয়টি আড়ং: ১। বীরকুল (দীঘা), ২। বাহিরমুঠা, ৩। নারায়ণ-মুঠা, ৪। এড়িং, ৫। মজনামুঠা এবং ৬। খাধরাই। এই ছয়টি আড়ঙে সর্ব্বসমেত ৮৩টি হুদা ছিল। ইহার মোট বাৎসরিক প্রস্তুতি ছিল ১১ লক্ষ মণ। এক একটি হুদা একজন হুদাদারের পর্য্যবেক্ষণে থাকিত। তাহার অধীনে চরে চরে চাতর বানাইয়া মলঙ্গীরা লবণের চাষ করিত এবং নিকটস্থ চুল্লীতে চুল্লীতে মাহিন্দ্ররা লোনা জল জ্বাল দিত।

বাংলায় ছয়টি এজেন্সী ছিল: ১। হিজলী, ২। তমলুক, ৩। ২৪ পরগণা, ৪। রায়মঙ্গল (যশোহর-খুলনা) ৫। ভুলুয়া, ৬। চট্টগ্রাম। যশোহর এজেন্সী ১৮২৬ সালে উঠিয়া যায়। ভুলুয়া ১৭৮০ সাল হইতে মাত্র ৫০ বৎসর চালু ছিল। ভোলা, নোয়াখালী, সন্দীপ, হাতিয়া, মনপুরা প্রভৃতি ইহার অন্তর্গত ছিল। ১৮১৯ সালে ওয়াল্টার বলিয়া জনৈক এজেন্ট ভুলুয়ার একটি লবণ প্রস্তুতির হিসাব দিয়াছিল তাহাতে দেখা যায় হাতিয়া ১ লক্ষ মণ, সন্দীপ ২০ হাজার মণ, বামনী ২০ হাজার এবং মেঘনার অন্যান্য দ্বীপগুলিতে প্রায় ৬০ হাজার মণ লবণ প্রস্তুত হইয়াছিল। ২০ হাজার জন মলঙ্গী এখানে কাজ করিত। মলঙ্গী কথাটি নোয়াখালিতে গালি হিসাবে বর্ত্তমানে ব্যবহার হইলেও ইহারাই এক সময় ৩ লক্ষ মণ প্রস্তুত করিয়াছিল।

রাসায়নিক কারিগর "এনজাইম"

অধ্যাপক শ্রীসুবর্ণকমল রায়

অতি ক্ষুদ্র জীবাণু হইতে আরম্ভ করিয়া যাবতীয় জীব ও গাছপালার শরীরে এনজাইম (Enzyme) নামে এক প্রকার রাসায়নিক পদার্থ পাওয়া যায়। দেহের পরিপুষ্টির ব্যাপারে ও অন্যান্য বহুবিধ রাসায়নিক প্রক্রিয়ার মধ্যে এন্‌জাইমের বহুবিধ দান আছে। উহাদের গঠন ও প্রকৃতি অনুসন্ধানের জন্য আজকাল জৈব রসায়নীগণ (organic chemists) অত্যন্ত তৎপর হইয়াছেন। পরিষ্কার রাসায়নিক পদার্থ এবং রাসায়নিক প্রক্রিয়াকে উদ্বুদ্ধ করাই ইহাদের ধর্ম্ম। কিন্তু ইহাও সত্য, উহারা নিজেদের শরীরটিকে ভাঙিয়া উক্ত প্রক্রিয়ার মধ্যে বিলাইয়া দেয় না, কেবল মাত্র উপস্থিত থাকিয়া কার্য্যের সহায়তা করে। রসায়নে এরূপ প্রক্রিয়াকে অণুবর্দ্ধণ বা কেটালিসিস্ বলে এবং এক্ষেত্রে এনজাইমটিকে বলা হয়—অণুবর্দ্ধক বা কেটালাইটিক্ এজেণ্ট। বৃক্ষলতা, জীব বা কীটাণুর নির্য্যাস হইতে এনজাইম সংগৃহীত করা যায়। এনজাইমকে পূর্ব্বে কেহ কেহ প্রাণবন্ত মনে করিত। বর্ত্তমানে রসায়নের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে সে ধারণা ভুল বলিয়া প্রমাণিত হইয়াছে। কেহ কেহ ইহাকে ফারমেণ্ট বলিয়া অভিহিত করেন, এজন্য অতি ক্ষুদ্র জীবাণুদের বলা হয় জীবন্ত ফারমেণ্ট। আধুনিক রাসায়নিক অনুসন্ধানের ফলে সপ্রমাণ হইয়াছে যে, এন্‌জাইমগুলি প্রকৃতপক্ষে এক প্রকার প্রোটিন। যদিও প্রোটিনের গঠনভঙ্গী ও অন্যান্য বহুবিধ রাসায়নিক তত্ত্ব আবিষ্কৃত হইয়াছে, তথাপি আজ পর্য্যন্ত এনজাইম সম্বন্ধে ততটা পুঙ্খানুপুঙ্খ তথ্যানুসন্ধান হয় নাই।

এন্‌জাইমগুলির প্রত্যেকের মধ্যে একটি সুন্দর গুণ প্রকটিত আছে। উহারা সকলে সমান ভাবে সকল বস্তুর উপর রাসায়নিক প্রভাব বিস্তার করিতে পারে না। উক্ত কাজ সাধন করিবার জন্য প্রত্যেকে বিশেষ বিশেষ শরীর পছন্দ করে। যেমন সমস্ত চাবি সকল তালায় প্রযোজ্য নয়, তদ্রূপ সমস্ত এনজাইম সর্ব্বক্ষেত্রে প্রয়োগ করা যায় না। যে ক্ষেত্রে একটি এনজাইম কর্ম্মতৎপর সেই ক্ষেত্রে অন্যান্য এনজাইম দর্শকমাত্র। এই কর্ম্মতৎপরতাও আবার কেটালাইটিক এনজাইমের কর্ম্মবেগ অধিক তাপে নির্ব্বাপিত হয়। এমন কি যে বস্তুটির উপর ইহাদের রাসায়নিক প্রভাব পরিচালিত হয় তাহাদের মাত্রাধিক্যে সময় সময় ইহাদের বল ক্ষীণ হইয়া পড়ে।

এনজাইমগুলিকে এক প্রকার রাসায়নিক কারিগর বলিয়া অভিহিত করা যায়। কাহারও কাহারও সমীপে কো-এনজাইম নামে আর একটি কারিগর থাকে। ইহারা সর্ব্বক্ষেত্রে একযোগে কাজ করে এবং প্রত্যেকটি রাসায়নিক ফলাফলের জন্য উহারা দায়ী।

রাসায়নিক জগতে মানুষের গবেষণাগারে কত সব অদ্ভুত কর্ম্মধারা ছুটিয়া চলিয়াছে, ইহাতে অহঙ্কারী মানুষ নিজকে পরম জ্ঞানী রসায়নী মনে করিলেও তাহার চেয়ে সেরা কোন রসায়নী আছেন। এই অজ্ঞাত রসায়নীর হাতের নিপুণ রচনার বিষয় চিন্তা করিলে তাঁহার চরণতলে মাথা আপনিই লুটাইয়া পড়ে। বিজ্ঞানী বলিতে পারেন এ সমস্ত প্রাকৃতিক রচনা সবই স্বভাবের ফল, কোন গোপন হস্তের ইঙ্গিত করা মূর্খতার পরিচায়ক। যদি তাই হয়, ঐ স্বভাবকেই আমরা প্রণাম করিব। উঁহার প্রেরণায় ক্ষুদ্র এনজাইমগণ যে রাসায়নিক প্রক্রিয়ার পুষ্টিসাধন করিতেছে তাহা অতীব অদ্ভুত ও চমকপ্রদ। যে রাসায়নিক প্রক্রিয়ার দ্বারা দেহে হজমক্রিয়া সাধিত হয় তাহার পিছনে এই এনজাইমগণ। ডায়াষ্টেজ বা এমাইলেজ নামক এনজাইমটি মণ্ট, ইষ্ট্ এবং আমাদের মুখলালা ও ক্লোমরসের মধ্যে বর্ত্তমান। ইহারা অতি নৈপুণ্যের সহিত শ্বেতসারকে শর্করায় রূপান্তরিত করে। আমরা যে খাদ্যদ্রব্য আহার করি তাহা দেহমধ্যে ক্রমশঃ এক প্রকোষ্ঠ হইতে অপর প্রকোষ্ঠে প্রবিষ্ট হয় এবং প্রত্যেক প্রকোষ্ঠে আমাদের জন্য বিশেষ বিশেষ রাসায়নিক প্রক্রিয়া চলিতে থাকে। কতকগুলি এনজাইম ঐ সমস্ত কোঠায় বসিয়া উক্ত কার্য্য সাধন করে। প্রথমতঃ, মুখগহ্বরে প্রবিষ্ট হওয়া মাত্র এমাইলেজ ও টায়ালিন নামক দুইটি এনজাইম শ্বেতসার পদার্থকে খণ্ডিত করিয়া অনেকটা শর্করায় পরিণত করিয়া পরিপাক-ক্রিয়ার পথ সহজ করিয়া দেয়। খাদ্যদ্রব্য এই প্রথম প্রকোষ্ঠ হইতে কিয়ৎ পরিমাণে রূপান্তরিত হইয়া দ্বিতীয় প্রকোষ্ঠ বা পাকস্থলীতে উপনীত হয়। সেখানে পৌঁছানো মাত্র পাকস্থলী হইতে এক প্রকার রস নিঃসৃত হইয়া ভুক্তদ্রব্যের সঙ্গে মিলিত হয়। পেপসিন্ ও রেনিন নামক এনজাইমদ্বয় এই রসের প্রধান কর্ত্তা। ইহাদের প্রধান কাজ প্রোটিন জাতীয় পদার্থকে ভগ্ন তথা হজম করিতে সহায়তা করা। পেপ্‌সিন পেঁপের রসে বর্ত্তমান। এজন্য প্রোটিন মাংস রান্না করার সময় উহাতে পেঁপের রস মিশ্রিত করিলে মাংস অতি সত্বর পক্ক হয়। আমাদের খাদ্যের দুইটি প্রধান উপাদান শ্বেতসার ও প্রোটিন এভাবে পাকস্থলী ও মুখের নিপুণ কারিগরের কেরামতিতে বহুলাংশে হজমের উপযোগী হয়।

উক্ত অর্দ্ধ পক্ক ভুক্তদ্রব্য তৎপর তৃতীয় প্রকোষ্ঠ বা ক্ষুদ্রান্ত্রে উপনীত হয়। এই স্থানে যকৃৎ হইতে পিত্তরস, অগ্ন্যাশয় হইতে অগ্ন্যাশয় পাচক রস ও ক্ষুদ্রান্ত্র হইতে ক্ষুদ্রান্ত্র রস নিঃসৃত হইয়া ভুক্তদ্রব্যের সঙ্গে সম্পূর্ণ মিশ্রিত হয় এবং উহাকে সম্যক্ পরি-

পাক করিতে সহায়তা করে। অগ্ন্যাশয় পাচকের মধ্যে তিনটি এনজাইম ট্রিপসিন, এমাইলেজ ও লাইপেজ বাস করে। এই তিনটি এনজাইম এই প্রকোষ্ঠের প্রধান কর্ম্মী। শ্বেতসার ও স্নেহ পদার্থ সম্পূর্ণ হজমের উপযুক্ত করিতে ইহারা বিশেষ পারদর্শী।

ইন্ভারটেজ নামক অপর একটি এনজাইমও মনুষ্য-শরীরে বর্ত্তমান। ইষ্ট্ ও বৃক্ষপত্রেও ইহা পাওয়া যায়। ইন্ভারটেজ ইক্ষু-শর্করাকে গ্লুকোজে পরিবর্ত্তিত করে। আমরা ইক্ষু-শর্করা গ্রহণ করি সত্য কিন্তু ইহারা গ্লুকোজের রূপ না পাইলে হজম হয় না। উক্ত ইন্ভারটেজ চিনিকে হজমের উপযুক্ত করিয়া দেয়। মল্টেজ নামক আর একটি এনজাইম মল্ট, ইষ্ট ও মনুষ্যদেহে অবস্থান করে। ইহা মল্টোজ নামক এক প্রকার শর্করাকে গ্লুকোজে পরিণত করে। রক্ত যাবতীয় গ্লুকোজকে গ্রহণ করিয়া অক্সিজেনের নিকট যাইতে দেয় এবং উদ্ভূত তাপ শরীরের তাপ ও শক্তি রক্ষা করে।

গ্লুকোজকে ভাঙিবার জন্ত জাইমেজ নামক এক প্রকার এনজাইম পাওয়া যায়। ইহাদের কাজ গ্লুকোজকে সুরাসারে পরিণত করা। জাইমেজ ইষ্টের মধ্যে প্রচুর আছে। কাজেই ইষ্টের সাহায্যেই যে মদ তৈয়ার করা সর্ব্বেব সুবিধা তাহার আর সন্দেহ নাই। ইষ্ট্ ইন্ভারটেজ ও জাইমেজ উভয়ই বহন করে। সুতরাং ইষ্ট্ চিনির সংস্পর্শে রাখিলে ইন্ভারটেজ কারিগরগণ প্রথম দফা তাহাদের কাজ সাধন করে অর্থাৎ চিনিকে গ্লুকোজে পরিণত করিয়া থাকে—তাপের দ্বিতীয় কারিগর জাইমেজগণ তাহাদের কাজ আরম্ভ করে এবং গ্লুকোজকে সুরাসারে পরিণত করিয়া অভীষ্ট ফল দান করিয়া থাকে।

বর্ত্তমানে শ্বেতসার হইতেও মদ প্রস্তুতির ব্যবস্থা হইয়াছে। সেখানে প্রথমতঃ শ্বেতসারকে মল্টের সংস্পর্শে আনা হয়। মল্টের দুইটি এনজাইম—ডায়াটেজ ও মল্টেজ তখন কার্য্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হয়। প্রথমটি শ্বেতসারকে মল্টোজ রূপ দান করে। দ্বিতীয়টি তখন মল্টোজকে গ্লুকোজে পরিণত করে। মল্টের কারিগরগণ এইখানকার কাজ শেষ করে। এখন ইষ্ট্ কারিগর জাইমেজের সহায়তা প্রয়োজন। জাইমেজ আসিয়া গ্লুকোজকে মদে পরিণত করার ভার গ্রহণ করে। সোজা কথায় বলা যায় যে, চাউল আটা ময়দা আলু প্রভৃতি শ্বেতসারযুক্ত পদার্থগুলি মল্ট ও ইষ্টের যুক্ত প্রেরণায় যে সুরাসার রূপ গ্রহণ করে তাহার রাসায়নিক প্রক্রিয়ার আসল কার্য্য সম্পন্ন করে এক দল এনজাইম।

সমস্ত এনজাইমের কথা এ ক্ষুদ্র প্রবন্ধে শেষ করা কঠিন। মোটামুটি ভাবে উহাদের শ্রেণী বিভাগ করিলে দাঁড়ায় এই:

১। এনজাইম যাহারা প্রোটিনকে খণ্ডিত করার ব্যবস্থা করে—পেপ্সিন, ট্রিপসিন ইত্যাদি।

২। যাহারা চর্ব্বিকে বিভক্ত করে—লাইপেজ।

৩। যাহারা কার্ব্বোহাইড্রেটকে আক্রমণ করে—সুক্রেজ মল্টেজ ইন্ভারটেজ সায়াটেজ ইত্যাদি।

৪। যাহারা চাকা বাঁধাইবার সহায়তা করে—থ্রমবেজ, রেণিন।

৫। যাহারা অক্সিজেনকে অপর পদার্থের মধ্যে প্রবিষ্ট করায়—অক্সিজেন।

৬। যাহারা হাইড্রোজেনকে প্রবিষ্ট করায়—রিডাকটেজ।

৭। যাহারা কার্ব্বনিক এসিড গ্যাস উদ্ধৃত করে—জাইমেজ।

৮। যাহারা বড় বড় আকারের রাসায়নিক পদার্থকে ক্ষুদ্রাকারে পরিণত করে—ল্যাকটেজ।

৯। যাহারা আভ্যন্তরিক গঠনের পরিবর্ত্তন করে—মিউটেজ।

মার্কিন ঔপন্যাসিক ডস্ প্যাসস্

শ্রীঅমরমোহন মুখোপাধ্যায়

ঔপন্যাসিকদের সাধারণতঃ দুই শ্রেণীতে বিভক্ত করা যায়। প্রথম শ্রেণীতে পড়েন তাঁরা—যাঁরা কল্পলোকের গজদন্ত-মিনারবাসী এবং যাঁদের নায়ক-নায়িকা এত বেশী স্বপ্নবিলাসী যে প্রাত্যহিক জগতের আলোড়ন ও আক্ষেপ তাঁদের জীবনে কোন স্পন্দন আনে না। দ্বিতীয় দলভুক্ত সেই সব ঔপন্যাসিক—যাঁরা ঝড়-ঝঞ্ঝাময় দৈনন্দিন জীবনের সহিত এরূপ নিবিড় ভাবে সংযুক্ত যে, আধুনিক যন্ত্রময় জীবনের দৈন্ত অভাব হতাশা এবং অত্যাচার সম্যক্‌রূপে তাঁদের উপন্যাসকে প্রভাবান্বিত করে। তাঁরা শুধু ব্যক্তি-সমাজকে দেখেনই না, সমাজের যে সমস্ত সমস্যা, যে সমস্ত অভাব-অভিযোগ সেগুলিকে লোকচক্ষুর সমক্ষে উপস্থিত করেন এবং হয়ত বা কিছু মাত্রায় নীতিবাগীশ হয়ে, সে ত্রুটিগুলির প্রতিবিধানের উপায় নির্দ্ধারণ করেন। সামাজিক অত্যাচারের বিরুদ্ধে তাঁরা করেন তীব্র প্রতিবাদ—যেমন শরৎচন্দ্র করেছিলেন। এর দ্বারা আমি একথা বলছি না যে তাঁরা সর্ব্বদা সমাজ-সচেতন হয়েই লেখেন—তাঁদের উপন্যাস সেরূপ দলগত হয়ে ওঠে না। সমাজের থেকে কোন চিন্তাশীল মনের উপর যে প্রভাব অবশ্যম্ভাবী, এই শ্রেণীর ঔপন্যাসিকেরা সেই প্রভাব-সচেতন হয়ে ওঠেন।

এই দুই শ্রেণীর ভিতর হয়ত আরও শ্রেণী বিভাগ করা যায়। এক শ্রেণীর ঔপন্যাসিক আছেন যাঁদের লেখায় লেখকের সহানুভূতি প্রকাশ পায়, অন্যান্যেরা শুধু কিছু মাত্র তীব্র অথচ পুঙ্খানুপুঙ্খ বর্ণনার দ্বারা সেই সমস্যাকে আমাদের সম্মুখে উপস্থিত করেন। এই প্রকাশ-ভঙ্গীর ভিতর লেখকের নিরীক্ষণ-শক্তির পরিচয় মেলে—চরিত্রের উপর তিনি নিজের কল্পনার পোঁচ লাগান না; ঘটনার স্রোতে চরিত্রগুলি আপনি গড়ে ওঠে, আপনি ভেঙে যায়। তাদের পিছনে কোন নীতি বা দুর্নীতি নাই, কারণ কোন্‌টা নীতি বা কোন্‌টা দুর্নীতি লেখক তার বিচারক নন। ঘটনা-পরম্পরায় চরিত্রের প্রকাশই তাঁর উদ্দেশ্য—তাদের কর্ম্মের মূল্য নির্ণয় করা তাঁর লক্ষ্য নয়। জীবনের ঘোষণা অপেক্ষা জীবনের প্রকাশ তাঁদের কাছে অধিকতর মূল্যবান।

এই শেষোক্ত দলের ঔপন্যাসিকদের ভেতর আধুনিক আমেরিকার একজন খ্যাতনামা ঔপন্যাসিকের নাম করা যায়। তিনি ডস্ প্যাসস। অবশ্য কোন উচ্চ শ্রেণীর লেখককে বিশিষ্ট দলভুক্ত করলে তাঁর প্রতি অবিচার করা হয়। সে কথা জেনেও যে প্যাসস্‌কে এক বিশেষ শ্রেণীর অন্তর্গত করা হ'ল তা শুধু তাঁর কৃতিত্বকে সহজবোধ্য করবার জন্যে।

ডস্ প্যাসস্ একজন তীক্ষ্ণ পর্য্যবেক্ষণশক্তিসম্পন্ন লেখক। তিনি শুধু সমাজে বাসই করেন না সমাজের ভেতর যে গতি আছে সেই গতির সহিত তাঁর নাড়ীর যোগ। সমাজের অত্যাচার-অনাচারের কাতর-ধ্বনি তাঁর চিন্তাশক্তিকে বেশী আন্দোলিত করেছে তাঁর মনের চেয়ে। তিনি তার অন্তস্তলে প্রবেশ করে জানবার চেষ্টা করেছেন এমনটি কেন হয়? মানুষে মানুষে কেন এত ভেদাভেদ, কেন এত স্বার্থ-পরতা—হিংসা? এর ভেতর হৃদয়াবেগের স্থান ততটা নাই যতটা আছে সমগ্র মননশক্তিকে বিক্ষুব্ধ করবার শক্তি এবং প্যাসসের সমগ্র মননশক্তি এই দৃষ্টিভঙ্গীর দ্বারা রূপায়িত হয়েছিল। তিনি ব্যক্তিগত ভাবে এই সমস্যার দ্বারা অভিভূত হন নি—সমস্ত চিন্তাশীল ব্যক্তির যেরূপ হওয়া উচিত—তিনি হয়েছিলেন সেইরূপ এবং সেইজন্য তাঁর সমস্ত রচনায় সমাজের প্রতি বিদ্রোহের বাণী বেজে উঠেছে। বহুদেশে তিনি ভ্রমণ করেছেন, মানুষকে তিনি দেখেছেন নানা দেশে, নানা বেশে ও অবস্থায়। তবুও তিনি উপলব্ধি করেছেন যে দেশকালভেদে বাহ্যিক যতই বৈষম্য থাকুক না কেন, মানুষের যে চিরন্তন অভাব-অভিযোগ, যে হাহাকার, যে ক্রন্দন তা সর্ব্বদেশের এবং সর্ব্বকালের এবং সেইজন্যে তাঁর বর্ণিত ঘটনার ভেতর, তাঁর অঙ্কিত চরিত্রের উপর "সবার উপর মানুষ সত্য তাহার উপর নাই"—এই বাণীর চিরন্তন সত্যতার ছাপ স্পষ্ট ভাবে অঙ্কিত। কি সমসাময়িক জীবনের প্রতিবিম্ব রূপে, কি শিল্পীর মননশক্তির পরিচয় রূপে, কি শিল্পীর নিছক শিল্প-প্রতিভা রূপে যে ভাবেই তাঁর রচনাকে বিচার করা হোক না কেন, তাতে এক অপূর্ব্ব কৃতিত্বের পরিচয় লাভ করা যায়।

তথাপি তাঁর সম্বন্ধে বিভিন্ন মতামত প্রকাশ করা হয়েছে। একজন বলেছেন যে তিনি নিছক কল্পনাবিলাসী এবং কল্পনার রঙীন চশমা দিয়ে তিনি সমগ্র সত্যজগৎকে দেখেছেন। আর একজন বলেন যে, তিনি আসলে রূঢ় বাস্তববাদী। তৃতীয় জনের বক্তব্য এই যে, তাঁর ভিতর আমরা উপরোক্ত দুই পরস্পর-বিরোধী দৃষ্টিভঙ্গীর সমন্বয় দেখতে পাই। এক হিসাবে হয়ত তিন জনই সত্য কথাই বলেছেন। কারণ, প্রথমতঃ কোন যথার্থ ঔপন্যাসিককে বিশেষ কোঠায় ফেলা যায় না এবং দ্বিতীয়তঃ, যে-কোন শক্তিমান লেখকের ভেতরেই আমরা ক্ষণে ক্ষণে বিভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গীর সমন্বয় দেখে তাঁর প্রতিভার বিরাটত্বের পরিচয় লাভ করি। রবীন্দ্রনাথেও কি আমরা এরূপ বহু-বিচিত্রের সংমিশ্রণ পাই না?

আমেরিকার প্রসিদ্ধ নগরী চিকাগোতে ১৮৯৬ সালে ১৪ই জানুয়ারী তারিখে ডস্ প্যাসসের জন্ম হয়। তাঁর পিতামহ ফিলাডেলফিয়া শহরে জুতা তৈরি করতেন। তাঁর পিতা বাল্যকালে রণবাদ্যকরের দলে বাদক ছিলেন—পরে অসুস্থতার জন্য সেই পদ ত্যাগ করে আপন অধ্যবসায়ের সাহায্যে করপোরেশনের ব্যবহারাজীবীর পদে উন্নীত হয়েছিলেন।

বাল্যকালে প্যাসসকে মেক্‌সিকো এবং পরে ইউরোপে নিয়ে যাওয়া হয়। সেখানে তিনি ইংলণ্ডের এক স্কুলে ভর্ত্তি হন। সেই সময়েই তাঁর যে ভ্রমণ-লিপ্সা জন্মে, তারই সাক্ষ্য পাই আমরা পরবর্ত্তী জীবনে তাঁর বহু দেশ পর্য্যটনের ভিতর। প্রথমে প্যাসসের পিতার ইচ্ছা ছিল যে তিনি আন্নাপোলিসের নৌবিদ্যালয়ে শিক্ষা লাভ করেন, কিন্তু কোন কারণ বশতঃ তা সম্ভবপর না হওয়ায় হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে যোগদান করেন এবং সেখান থেকে ১৯১৬ খ্রীষ্টাব্দে বি-এ উপাধি লাভের পর স্থপতিবিদ্যা শিক্ষার জন্য স্পেনে গমন করেন। পরে যখন আমেরিকা যুদ্ধে নামে তখন তিনি আমেরিকান মেডিকাল কোরে যোগদান করেন।

যুদ্ধ সমাপ্ত হ'লে তিনি নানা সংবাদপত্রের প্রতিনিধিরূপে ইউরোপ ও আমেরিকার নানা স্থানে গমন করেন। তবে তাঁর দৃষ্টিভঙ্গীতে এই বৈশিষ্ট্য ছিল যে তিনি সর্ব্বদাই ঘটনার মর্ম্মস্থলে প্রবেশ লাভ করতেন এবং কোন ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র ঘটনাও তাঁর দৃষ্টির অগোচর থাকত না—সেই সমস্ত সাধারণ ঘটনা যা আমরা সচরাচর লক্ষ্য করি না। ক্ষুদ্র, সাধারণ ঘটনা থেকেই তিনি অনেক সময় এরূপ মূল্যবান উপকরণ আহরণ করেছেন যা সত্যই আমাদের চমৎকৃত করে। যুদ্ধান্তে সমগ্র পৃথিবীর নূতন আন্দোলন, মানুষের অধিকারকে পুনঃপ্রতিষ্ঠায় প্রয়াসের ছোঁয়াচ লেগেছিল তাঁর এই সময়কার জীবনে।

তাঁর যুদ্ধবিষয়ক দুইখানি উপন্যাস *One Man's Initiation* ও *Three Soldiers*, যথাক্রমে ১৯১৯ ও ১৯২১ সালে

প্রকাশিত হ'ল। সুনিপুণ পুঙ্খানুপুঙ্খ বর্ণনাই এদের বৈশিষ্ট্য; কিন্তু এই বর্ণনার ভেতর এমন একটা সুমিত ছন্দ আছে যে তা স্বতঃই আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। শব্দ-চয়নে, ঘটনা-বিন্যাসে এবং বর্ণনা-নৈপুণ্যে এই গ্রন্থের স্বকীয়তা লাভ করল। অসংখ্য মানুষের যে আদান-প্রদান, তাদের সঙ্গে লেখকের যে কোন ব্যক্তিগত সহানুভূতি আছে সে কথা জানবার অবসর লেখক আমাদের না দিলেও, এ কথা আমরা বুঝলাম যে এবার আমরা এক যথার্থ শক্তিশালী লেখকের সন্ধান পেয়েছি। কোন বিশেষ ঘটনা বা কোন বিশেষ চরিত্রকে তিনি অতিশয় প্রাধান্য দেন নি। বিরাট্ জনসমুদ্রে কত মানুষই ত আসে যায়—কতটুকুই বা থাকে যেটা তাদের ব্যক্তিগত বিশেষত্ব। তবুও তারা বেঁচে আছে; অর্থোপার্জনের জন্য সর্ব্বদাই তারা যে সচেষ্ট—মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের জীবনে এই বিশেষত্বহীনতাই ত বৈশিষ্ট্য। এই বিচ্ছিন্নতা, অনুভব করেও দূরে থাকার শক্তি ডস্ প্যাসস্‌কে এক উচ্চশ্রেণীর ঔপন্যাসিকের পদে এনে দিয়েছে। সেই সময়ে প্রকাশিত তাঁর তিনখানি ভ্রমণ-গ্রন্থ *Rosinante to the Road Again, Orient Express* এবং *In All Countries* তাঁর ক্রমবর্দ্ধমান অভিজ্ঞতার নিদর্শন। তাঁর দৃষ্টি প্রসারিত হয়ে উঠেছে; স্পেন ও ইউরোপের অন্যান্য দেশের ভিতর যে নূতন চাঞ্চল্য, নূতন চেতনা উদ্দীপ্ত হয়েছে, সেগুলো যে প্যাসসের জীবনেও রেখাপাত করেছে তারই প্রমাণ পাই আমরা এই তিনখানি ভ্রমণগ্রন্থে। মানুষকে তিনি দেখলেন নানারূপে—ইউরোপের যুদ্ধের শান্তির পর যেন এক অজ্ঞাত ও নৈরাশ্য সমগ্র ইউরোপীয় সমাজকে অভিভূত করে ফেলেছে।

তাঁর লেখক-জীবনের সর্ব্বাপেক্ষা স্মরণীয় ঘটনা হ'ল ১৯২৫ সালে *Manhattan Transfer* নামক উপন্যাসের প্রকাশ। এবার তিনি আমেরিকার বৃহত্তম নগরীর নিউইয়র্কের অধিবাসীদের জীবনযাত্রা-প্রণালীর ভিতর প্রবেশ লাভ করলেন। এই নিউইয়র্কই তখন তাঁর কর্ম্মজীবনের প্রধান কেন্দ্র—এখানকার নানা সংবাদপত্রের সঙ্গে তিনি সাংবাদিক হিসাবে যুক্ত। সেখানকার অধিবাসী বিরাট্ জনসমষ্টির আচার-ব্যবহার, রীতি-নীতি, বাহ্যিক বিশৃঙ্খলা ও বিভেদের ভিতরেও যে এক অন্তর্নিহিত সামঞ্জস্য আছে, তিনি এই উপন্যাসে তার পরিচয় দিলেন। নিউইয়র্ক নগরী পৃথিবীর বিভিন্ন সংস্কৃতির মিলনস্থল হয়েও যে কোন্ অন্তর্নিহিত শক্তির বলে এগিয়ে যাচ্ছে, তারই প্রকাশ এই উপন্যাসে। নিউইয়র্কের ভাষারও এক নিজস্ব ধারা আছে, সেই সর্ব্বসাধারণের ভাষাকে তিনি সমসাময়িক হেমিংওয়ে এণ্ডার্সন প্রভৃতির মত, নূতন রূপ দিয়ে ব্যবহার করলেন। তারই ফলে প্যাসসের এই উপন্যাস নিউইয়র্কবাসীর নিজস্ব জীবনের যথার্থ আলেখ্য হয়ে উঠল।

তার পর প্রকাশিত হ'ল তাঁর পাঁচখানি সামাজিক উপন্যাস: *The 42nd Parallel* (১৯৩০); *Nineteen-ninety* (১৯৩১); *Big money* (১৯৩৫); *Adventures of a young man* (১৯৩৬) এবং *Number 1.* ১৯৪৩।

প্রথমোক্ত তিনখানি গ্রন্থ সমগ্র আমেরিকা ও ইউরোপের পটভূমিকায় লিখিত বিরাট্ উপন্যাস। আধুনিক যান্ত্রিক যুগে দেশের দূরত্ব আর মানুষের জীবনে বাধারূপে উপস্থিত হয় না; কর্ম্মোদ্যোগী মানুষের সমস্ত পৃথিবীতে আজ অবাধ গতিবিধি। বিশ্বচিন্তার আদান-প্রদানও সেই দূরত্বের সীমাকে লুপ্ত করে সমগ্র পৃথিবীকে এক রূপে আমাদের সম্মুখে উপস্থিত করে। এই যুগে মানুষ মাত্রেরই জীবনের মুখ্য উদ্দেশ্য অর্থ উপার্জ্জন করা, কারণ সকলেই জানে যে অর্থকে করতলগত করলে মানুষের শক্তি বৃদ্ধি পায়, তার পদমর্য্যাদা বাড়ে এবং সেই ক্ষমতার লোভে মানুষ নিজের অন্যান্য শক্তির কিরূপ বিনাশ ঘটায়, এই উপন্যাসত্রয়ের তাই প্রতিপাদ্য বিষয়। আমেরিকার সামাজিক জীবনের বিভিন্ন স্তর থেকে কমবেশি কুড়ি জন ব্যক্তির চরিত্র এই উপন্যাসে চিত্রিত হ'লেও তাদের মধ্যে কেউই নায়ক রূপে উপস্থিত হয় না। এই বৃহৎ উপন্যাসে, দেশকাল সমাজের রুচির বা যুগচিত্তের পরিচয় ও নানাবিধ দৃশ্যাবলীর বর্ণনাই শুধু পাই না, আমরা পাই কেমন এক জীবনদর্শন যাতে বৈচিত্র্যের ভেতর সমন্বয়ের সুর বেজে ওঠে।

তাঁর এই উপন্যাসের সঙ্গে ইউরোপের কয়েকজন শ্রেষ্ঠ ঔপন্যাসিকের রচনা-শৈলীর তুলনা করলে, প্যাসসের নিজস্ব বৈশিষ্ট্য কোথায় আরও ভাল করে তা বোঝা যাবে। এই প্রসঙ্গে প্রথমেই মনে পড়ে ডি, এইচ, লরেন্সের নাম। সমাজকে এক প্রকার নিষ্ঠুর তীব্রতার সঙ্গে বিশ্লেষণ করলেও এবং সমাজের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করলেও মনস্তত্ত্বমূলক তাঁর কতকগুলি ধারণা তাঁর সৃজনীশক্তিকে সীমাবদ্ধ করে ফেলেছিল। নরনারীর যৌন জীবনের সার্থকতাকে স্বীকার করলেও, তিনি যেন মাঝে মাঝে এই সম্পর্ককে সহজ গণ্ডীর বাইরে নিয়ে গেছেন বলেই আমাদের মনে হয়। সেই অনুভূতিরই অনুরূপ প্রকাশ দেখতে পাই ভার্জিনিয়া উল্‌ফের রচনায়। এই ব্যক্তিগত অনুভূতির চরম পরিচয় লাভ করি জয়সের ইউলিসিসের শেষ পঞ্চাশ পৃষ্ঠায় যেখানে ব্লুম তার বিগত অভিজ্ঞতাকে স্মরণ করছে। এঁরা সকলেই ব্যক্তি-সত্তাকে স্বীকার করেছেন তীব্রভাবে এবং তাঁদের বিশ্লেষণের ভিতর নূতনত্বের মোহ থাকলেও, মনে হয় যেন ব্যক্তির প্রাধান্য একটু বেশী দেওয়া হয়েছে। ব্যক্তি যে নিছক ব্যক্তি নয়—সে যে সামাজিক জীব—লোকালয়ে জন্মায়, বড় হয় এবং মরে, এ কথাটা হয়ত তিনি বিস্মৃত হয়েছিলেন এবং তারই ফলে "ইউলিসিসে"র

কাহিনী-বর্ণন আমাদের বাইরের দিকে না নিয়ে গিয়ে ভেতরের দিকেই নিয়ে যায়। তাঁদের উপন্যাসে বস্তুনিষ্ঠার চেয়ে ব্যক্তিনিষ্ঠার উপর এত বেশী প্রাধান্য যে, ক্ষণে ক্ষণে আমাদের মনে এই সংশয় উপস্থিত হয়, এদের উপন্যাসের সঙ্গে আমাদের ঠিক যোগ কোথায়। ব্যক্তিনিষ্ঠতার প্রলেপের অভাবে কোন রচনাই আর্ট পর্য্যায়ভুক্ত হয় না সত্য, কিন্তু সেই ব্যক্তিনিষ্ঠতা যখন বস্তুনিষ্ঠতাকে অতিরিক্ত মাত্রায় অতিক্রম করে, তখন রচনায় কিসের এক অভাব দৃষ্ট হয়। ডস্ প্যাসসের উপন্যাসে সে অভাব নেই; যে পরিবেশ ও যে সাংস্কৃতিক পটভূমিকায় তিনি জীবনকে দেখেন সেই জীবনের অন্তরালে তিনি এক নূতন রূপ আবিষ্কার করেন। সে যে কত বাস্তব, তা উপলব্ধি হয় তাঁর ভাষায়, অতিশয় সংক্ষিপ্ত ক্ষিপ্র সরলতায়, ভাবালুতায় এবং সতর্ক সংযমে। তাঁর রচনায় সেই ভাবানুভূতি অপেক্ষা এক সূক্ষ্ম এবং সুকুমার, অথচ দৃঢ় এবং অসংশয় অভিব্যক্তি আছে।

সেই শক্তির এক নূতন বিকাশ দেখি আমরা তাঁর ১৯২২ সালে প্রকাশিত কাব্য-গ্রন্থ *Pushcart at the Curb*এ। ১৯৩৮ সালে প্রকাশিত ভ্রমণ-পুস্তক—*Journy Between Wars*-এর ফাঁকে ফাঁকেও তাঁর এই চিত্তবৃত্তির প্রকাশ দৃষ্ট হয়। তাঁর ভ্রাম্যমাণ জীবনে মাঝে মাঝে আটলান্টিক উপকূলস্থ বাসগৃহে তিনি যে সংক্ষিপ্ত অবসর লাভ করেন, সেই সময়ে তিনি ভ্রমণ-বৃত্তান্ত রচনা করেন যার পিছনে ভ্রমণক্লান্ত পর্য্যটকের আয়েসের আমেজ নাই।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের প্রারম্ভে প্যাসসের ভ্রমণস্পৃহা পুনর্বার বলবতী হয়ে উঠল এবং তিনি যুদ্ধোদ্যমব্যস্ত সমগ্র যুক্তরাষ্ট্র পর্য্যটন করে যাবতীয় যুদ্ধ-প্রচেষ্টার সঙ্গে পরিচিত হলেন। তিনি দেখলেন বিমান ও নৌ-বিভাগের কর্ম্মক্লান্ত শ্রমিকদের, অধিকতর ফসল উৎপাদন-রত চাষীদের এবং সেই সমস্ত প্রচারকারী ও বক্তাদের যারা আমেরিকার যুদ্ধপ্রচেষ্টায় সাহায্য করছে। তাদের ভেতর তিনি এক নূতন উৎসাহ ও জীবনীশক্তির সন্ধান পেলেন যার প্রভাবে তারা নিজেদের সমস্ত কলহ ও মতভেদ বিস্মৃত হয়ে এক প্রাণে কর্ম্মে রত হয়েছে। ১৯৪৪ সালে প্রকাশিত *State of the Nation* যুক্তরাষ্ট্রের একপ্রাণতার আশ্চর্য্য চিত্র।

বিজ্ঞানের বাংলা পরিভাষা

শ্রীরমা চৌধুরী

অতি সুখের বিষয় যে, অল্পকালের মধ্যেই বাংলা ভাষা ও সাহিত্য দ্রুত উন্নতি লাভ করে জগৎসভায় স্থান পাবার উপযুক্ত হয়েছে। বাংলা-সাহিত্যের সকল বিভাগের মধ্যে কথা ও কাব্য বিভাগই সর্ব্বাপেক্ষা সমৃদ্ধ। প্রবন্ধ বিভাগ অপেক্ষাকৃত মৃদুমন্দ তালে অগ্রসর হলেও, এর সম্বন্ধেও নিরাশার কোনো কারণ নেই। এরূপ বিজ্ঞান, দর্শন, ধর্ম্ম, রাজনীতি, সমাজনীতি প্রভৃতি জটিল ও গুরুগম্ভীর বিষয়ে বাংলা প্রবন্ধ লিখবার পথে প্রধান বাধা উপযুক্ত পরিভাষার অভাব। আমরা এতকাল ধরে সমানে ইংরেজী পরিভাষায় এতদূর অভ্যস্ত হয়ে পড়েছি যে, বাংলায় এই সব কথা ভাবতে আমাদের রীতিমত কষ্টই বোধ হয়। অধিকাংশ পরিভাষা আজ পর্য্যন্ত রচিতই হয় নি, যাও বা হয়েছে তাও জনসমাজে ব্যবহৃত কমই হচ্ছে। সেজন্য একটি প্রচলিত ও অভ্যস্ত ইংরেজী শব্দের বদলে তার বাংলা প্রতিশব্দ আজও আমাদের কানে লাগে ও মনে ধরে না। যেমন, বাষ্পযান, ব্যোমযান, ত্রিভুজ, কোণ (angle), ছায়াচিত্র, হৃৎপিণ্ড, নাট্যাভিনয়, রক্তাল্পতা প্রভৃতি বলে আমরা আজও আরাম বোধ করি না, সে জন্য এই সবের ইংরেজী প্রতিশব্দই সাধারণতঃ ব্যবহার করে থাকি। কিন্তু তা সত্ত্বেও, আমাদের জাতীয়তাবোধ জাগ্রত হবার সঙ্গে সঙ্গে, আমরা ক্রমশঃ কথাবার্ত্তায় এবং প্রবন্ধাদিতে যথাসম্ভব শুদ্ধ বাংলা শব্দ ব্যবহারেরই পক্ষপাতী হচ্ছি। সেজন্য, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষ বাংলা পরিভাষা সঙ্কলনে ব্রতী হয়েছেন। বিশেষ ভাবে, প্রবেশিকা পরীক্ষা পর্য্যন্ত বাংলাই শিক্ষার বাহন রূপে গৃহীত হওয়ায়, বিজ্ঞান, ইতিহাস প্রভৃতির পরিভাষা প্রবর্ত্তন করা অত্যাবশ্যক হয়ে পড়েছে।

এস্থলে প্রশ্ন এই যে, এই পরিভাষা আমরা পাব কোথা থেকে? কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ, শ্রীযুক্ত রাজশেখর বসু, ডাঃ গিরীন্দ্রশেখর বসু, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিশেষজ্ঞগণ প্রভৃতি আমাদের অতি নিজস্ব দেবভাষা সংস্কৃতের সুবিশাল রত্নখনি থেকেই এই সব শব্দ আহরণ করে বাংলা ভাষাকে সমৃদ্ধতর করেছেন। আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস যে, এই হ'ল পরিভাষা গঠনের শ্রেষ্ঠ পন্থা। সংস্কৃতের সঙ্গে বাংলার সম্পর্ক অতি ঘনিষ্ঠ, যদিও বর্ত্তমানে অনেকে এই সত্যটিকে স্বীকার করা লজ্জার বিষয়ই মনে করেন। অন্ততঃ শব্দের দিক থেকে সংস্কৃতই বাংলার প্রাণশক্তি। বাংলার অধিকাংশ শুদ্ধ, লেখ্য শব্দই সংস্কৃত শব্দ, বা সংস্কৃত থেকে সঙ্কলিত। সে ক্ষেত্রে জ্ঞান-বিজ্ঞানের জটিল ও উচ্চ তত্ত্বাদি প্রকাশের জন্য যদি সংস্কৃতের আশ্রয়েই নব পরিভাষা রচনা করার চেষ্টা করা হয়

ত তা অতি সুবিবেচনার কাজই হবে। কারণ, খাঁটি সংস্কৃত বা সংস্কৃতমূলক শব্দ বাংলা ভাষারই নিজস্ব শব্দ, বিদেশী শব্দ নয়। যেমন—

"নীল-সিন্ধু-জল-ধৌত চরণতল
অনিল-বিকম্পিত শ্যামল-অঞ্চল,
অম্বর-চুম্বিত ভাল হিমাচল
শুভ্র-তুষার-কিরীটিনী।"

এস্থলে প্রত্যেকটি শব্দই খাঁটি সংস্কৃত, অথচ খাঁটি বাংলাও বটে। কেহই এ স্থলে বলবেন না যে আমাদের বাঙালীদের নিজস্ব বাংলা ভাষাতে জোর করে কতকগুলি অতি পুরাতন, বিদেশী শব্দ ঢোকান হয়েছে। এই একই ভাবে যদি আমরা খাঁটি সংস্কৃত বা সংস্কৃতমূলক শব্দ পরিভাষা রূপে ব্যবহার করি, তা হলে সেও হবে ফলতঃ বাংলা ভাষারই অধুনালুপ্ত, বহুকাল অনাদৃত শব্দ-সম্ভারেরই পুনরুজ্জীবন, পুনরাদর মাত্র, বিদেশী ভাষার কাছে হাত পাতা নয়। যেমন সরলীকরণ (Simplification), সমবাহু (equilateral), সন্ধিবন্ধনী (ligament), বহিঃপ্রকোষ্ঠাস্থি (radius), বাষ্পীভবন (evaporation), দ্বিকেশর (diandrous)[১] প্রভৃতি খাঁটি সংস্কৃত, অথচ শুদ্ধ বাংলাও। এই পারিভাষিক শব্দসমূহের সবগুলিই ঠিক বাংলা ভাষায় পূর্ব্বে স্থান না পেলেও, এরা বাংলা শব্দই, বিদেশী শব্দ নয়। সেজন্য সংস্কৃতের বিশাল ভাণ্ডার থেকে শব্দচয়ন করলে, তা বাংলা শব্দই হবে। সুতরাং বাংলাকে অচিরে অন্য নিরপেক্ষ, স্বাধীন ভাষায় পরিণত করতে হলে একমাত্র সংস্কৃতের সহায়তাতেই তা সম্ভব।

কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় যে, বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষ ও অন্যান্য সুধীবর্গ কর্ত্তৃক অনুসৃত পরিভাষা গঠনের এই সুচিন্তাপ্রসূত পন্থায় কেহ কেহ আপত্তি তুলছেন। তাঁরা বলেন, "বিশ্ববিদ্যালয়-প্রবর্ত্তিত বিজ্ঞানের পরিভাষা সম্বন্ধেও পুনরালোচনা ও পুনর্ব্বিচার করিবার প্রয়োজনীয়তা অনেকেই অনুভব করিতেছেন। যদিও শ্রদ্ধেয় রাজশেখর বসু মহাশয়ের পরিকল্পনার এবং তাঁহার ও কতিপয় বিশেষজ্ঞের প্রগাঢ় পাণ্ডিত্যের ফলে এই পরিভাষার সৃষ্টি, তথাপি ইহার সঙ্কলন ব্যাপারে আর একটু উদার মতাবলম্বন বাঞ্ছনীয় ছিল। যে সময় ব্ল্যাক আউট, রেশন কার্ড, ট্রেঞ্চ, কনট্রোল, সাইরেন, ইঞ্জিনিয়র, সিনেমা, রেডিও হইতে আরম্ভ করিয়া 'এটম বোমা' পর্য্যন্ত অবাধে আমাদের ভাষায় স্থান লইতেছে এবং অনেক ধর্ম্মপ্রাণ মুসলমান সাহিত্যিকের ভাবাবেগে বাংলা দেশ আরব পারস্যের পানে দ্রুত অগ্রসর হইতেছে তখন বহু যুগবিলুপ্ত প্রাগৈতিহাসিক যুগের জীবের কঙ্কালের মত শব্দসমূহ সংগ্রহের নিমিত্ত সংস্কৃত ভাষায় গহন খনির পবিত্র তলদেশ অনুসন্ধান না করিলেই বোধ করি ভাল হইত। গণিত, জ্যোতির্ব্বিদ্যা প্রভৃতি যে সকল শাস্ত্রে ভারতবর্ষের দান অতি উচ্চস্তরের এবং যাহাদের উচ্চাঙ্গের পঠনপাঠনের ব্যবস্থা অতি প্রাচীনকাল হইতেই আমাদের দেশে বিদ্যমান ছিল, সেই সব শাস্ত্রের সংস্কৃতমূলক পরিভাষা সম্বন্ধে মতদ্বৈধ থাকিতে পারে না; কিন্তু আধুনিক বিজ্ঞানের যে সকল বিভাগে আমাদের দানের বিন্দুবিসর্গও প্রায় নাই, তাহাদের পরিভাষার জন্য দেবভাষার দ্বারস্থ না হইয়া আন্তর্জ্জাতিক শব্দ হুবহু গ্রহণ করাই সমীচীন মনে হয়। ইহাতে উচ্চতর বিজ্ঞানশিক্ষার্থীদের সুবিধার সঙ্গে দেশে মৌলিক গবেষণার পথও সুগম হয়। একই কথা বার বার কণ্ঠস্থ করায় জাতীয় শক্তির বিরাট অপচয় হয় মাত্র। পরন্তু যে সব ছাত্র বেশী দূর অগ্রসর হইবে না, আন্তর্জ্জাতিক শব্দ শিখিলে তারা বরং লাভবানই হইবে। ...ভাষার শালীনতা রক্ষার জন্য আমাদের ম্যাট্রিকুলেটদিগকে চলতি আন্তর্জ্জাতিক শব্দসমূহ থেকে বঞ্চিত করে কতকগুলি অপ্রচলিত কথা শিখান লাভজনক মনে হয় না। সাহিত্যের শালীনতা ও আভিজাত্য রক্ষা সর্ব্বথা প্রশস্ত হইলেও বিজ্ঞানশিক্ষার বেলায় ইহার ব্যতিক্রম জাতির প্রাণশক্তির প্রাচুর্য্যের পরিচায়ক রূপেই গণ্য হবে। আমাদের ল্যাবরেটরিতে নিরক্ষর বাঙালী ছেলেরাও ইথর, অ্যালকোহল, স্প্রিট, পাউডার...প্রভৃতি স্পষ্ট ভাবেই বলে ও অল্প দিনেই চিনিয়া লয়।"[২]

ইহা সত্য যে, দেড় শতাধিক বৎসর ইংরেজী ভাষার ক্রোড়ে লালিত-পালিত হয়ে, বাঙালী বহু ইংরেজী শব্দই তার মাতৃভাষায় স্বভাবতঃই গ্রহণ করেছে; উর্দ্দু, ফার্সী শব্দ সম্বন্ধেও সেই একই কথা খাটে। বিশেষভাবে বিজ্ঞান প্রভৃতিতে আধুনিক যুগে বাঙালীর মৌলিক দান অল্পই বলে, এবং বাঙালী বৈজ্ঞানিকেরা জগৎসভায় তাঁদের ন্যায্য সম্মান পাবার জন্যে নিজেদের গবেষণাদি ইউরোপীয় ভাষাতেই মুখ্যতঃ লিপিবদ্ধ করেন বলে, বাংলা ভাষায় বিজ্ঞান বিভাগ বিশেষ পরিপুষ্ট নয়। অপর পক্ষে আমাদের প্রাচীন সংস্কৃত ভাষায় লিখিত বিজ্ঞানবিষয়ক গ্রন্থের সমাদর এবং প্রচারও আমাদের দেশে প্রায় নেই বললেই হয়। এই সব কারণে আমরা যে সব বিজ্ঞান-বিষয়ক শব্দাদি ব্যবহার করে থাকি, তা সবই ইংরেজী বা বিদেশী ভাষার শব্দ। কিন্তু এটা আমাদের ভুললে চলবে না যে, ইংরেজী, ফরাসী প্রভৃতি, সমভাবে উর্দ্দু-ফার্সী প্রভৃতি শব্দও বাংলা ভাষার পক্ষে বিদেশী শব্দ মাত্র। সেজন্য এই সব শব্দ যত দিন বাংলা ভাষায় থাকবে, তত দিন বাংলাকে নিজের শক্তিতে স্বাধীন ভাষা বলা যাবে কি করে? অন্য ভাষার শব্দাদি অবশ্য সব ভাষাতেই কমবেশী আছে, এবং বিদেশী শব্দকে আত্মসাৎ করে নিজের কাজে লাগানও ভাষার প্রাণশক্তিরই পরিচয় দেয় সন্দেহ নেই। কিন্তু এরও একটা সীমা আছে—সেই সীমারেখা ছাড়িয়ে গেলেই যা ছিল সজীবতার

১ 'চলন্তিকা' থেকে গৃহীত

২ বাংলা ভাষায় বিজ্ঞান-শিক্ষা—শ্রীহরগোপাল বিশ্বাস, 'ভারতবর্ষ', বৈশাখ, ১৩৫৩।

লক্ষণ, তা হয়ে দাঁড়ায় দুর্ব্বলতা মাত্র, যা ছিল স্বকীয় প্রাণশক্তির প্রাচুর্য্য, তা পর্য্যবসিত হয় কেবল অন্ধ অনুকরণেই। আধুনিক বাংলা ভাষার শব্দসম্পদ বৃদ্ধি করবার প্রচেষ্টাকালে, এই কথাটিই আমাদের বিশেষ ভাবে স্মরণীয়। বিদেশী শব্দের প্রাচুর্য্য কোন ভাষারই পক্ষে গৌরবের বস্তু নয়, বরং এ তার দুর্ব্বলতা ও দৈন্যেরই পরিচায়ক। বহু ইংরেজী ও উর্দ্দু-ফার্সী শব্দ অবশ্য বাংলা ভাষায় আমাদের অজ্ঞাতসারে, এমন কি, অনিচ্ছাসত্ত্বেও প্রবেশ লাভ করেছে। কথ্য ভাষায় এরূপ সংমিশ্রণ কেবল ক্ষমার্হ নয়, অনেক ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয়ও বটে। কিন্তু লেখ্য ভাষায়, বিশেষভাবে উচ্চ তথ্যপূর্ণ প্রবন্ধাদিতে, এরূপ 'দো আঁশ্‌লা' খিচুড়ী ভাষা যথাসম্ভব বর্জ্জন করলেই ভাল। সেজন্য আজ নূতন শব্দচয়ন কালে আমরা আমাদের অতি নিজস্ব সংস্কৃতের শব্দভাণ্ডার সামনে বর্ত্তমান থাকলেও কেন অকারণে বিদেশী শব্দকেই আমাদের মাতৃভাষাতে শাশ্বত স্থান দেব? আজ অবশ্য আমাদের সকলকেই 'রেডিও','রেশন-কার্ড', 'কন্‌ট্রোল' প্রভৃতি শব্দ ব্যবহার করতে হচ্ছে বাধ্য হয়েই, কারণ এদের বাংলা প্রতিশব্দ আজও তৈরি হয় নি। কিন্তু চিরকালই এদের আমাদের ভাষায় সাদরে স্থান দেওয়া নিশ্চয়ই বাঞ্ছনীয় নয়। কারণ, এতগুলি শব্দ যদি আমাদের ভাষায় না থাকে ত তাতে যে ফাঁকের সৃষ্টি হবে, তাকে ত ভাষার প্রাণশক্তির প্রাচুর্য্য বলে কিছুতেই ঢাকা যাবে না। সেজন্য একেবারে এক সঙ্গে হঠাৎ না হোক, ক্রমশঃ এদেরও বাংলা প্রতিশব্দের সঙ্কলন ও প্রচলন করতে হবে; এবং সে-সঙ্কলনে সর্ব্বপ্রধান দান হওয়া উচিত একমাত্র সংস্কৃতেরই, কারণ এক বিদেশী ভাষা ছাড়তে গিয়ে অপর এক বিদেশী ভাষা গ্রহণ করলে লাভ আর কি? সেজন্য বহু যুগ বিলুপ্ত হলেও সংস্কৃত শব্দসমূহই এস্থলে একমাত্র আশা-ভরসা।

সাধারণ শব্দের পক্ষে যেমন, বিজ্ঞান সম্বন্ধীয় শব্দের পক্ষেও তেমনি এই একই কথা অনেকাংশে খাটে। গণিত-জ্যোতির্বিদ্যা দু-একটি বিভাগ ছাড়া, আধুনিক পাশ্চাত্য বিজ্ঞানের অন্যান্য অসংখ্য শাখাপ্রশাখায় যদি হাজার হাজার বিদেশী পরিভাষাকেই শাশ্বত ভাবেই আমাদের ভাষায় মেনে নেওয়া হয়, তা হলে বাংলা ভাষায় বিজ্ঞান রচনা কি বৃথা প্রহসনেই পর্য্যবসিত হবে না? বিজ্ঞান ত লম্বা লম্বা প্রবন্ধ রচনা নয়—এতে প্রতি পংক্তিতেই থাকে প্রধানতঃ বহু পারিভাষিক শব্দ; এবং এই সব শব্দই যদি বিদেশী শব্দ হয়, তা হলে সেই পংক্তিটিকে বাংলা ভাষা নাম দেওয়াই কি মিথ্যা বাগাড়ম্বর মাত্র নয়? কেবল দু-একটি ক্রিয়াপদ প্রভৃতি বাংলায় জুড়ে দিয়ে সেই ভাষাকে বাংলা বলার চেয়ে, সবটাই বিদেশী ভাষাতেই লেখা ঢের ভাল নয় কি? যেমন, দুইটি গ্যাস্ 'অক্সিজেন' ও 'হাইড্রোজেনে'র মধ্যে 'ইলেক্‌ট্রিক্ কারেন্ট' 'পাস' করাইলে জলের সৃষ্টি হয়; যখন কয়েকটি 'মিনারেল' 'ক্রিষ্টালাইস্' করে, তাহারা জলের কয়েকটি 'মোলিকিউলে'র সঙ্গে যুক্ত হয়...এই জলকে 'ক্রিষ্টালাইজেশনে'র জল বলা হয় ইত্যাদি। এরূপ রচনাকে বাংলায় বিজ্ঞান রচনা বলা ত কিছুতেই চলে না।

আপত্তি হতে পারে যে, আন্তর্জাতিক বিদেশী শব্দ না জানলে মুশকিলে পড়ব আমরাই, কিন্তু অপর পক্ষে কেহই কষ্ট করে আমাদের সযত্নে রচিত বিজ্ঞানসম্বন্ধীয় পরিভাষা শিখতে আসবে না। আমাদের বর্ত্তমান দীনহীন অবস্থায় অবশ্য এ-কথা সত্য। আন্তর্জাতিক পরিভাষা আমাদের আজ ত শিখতেই হবে, ভবিষ্যতেও হবে, কারণ বর্ত্তমান যুগ আন্তর্জাতীয়তারই যুগ, এ-যুগে কূপমণ্ডূক হয়ে বসে থাকবার উপায় নেই। কিন্তু আন্তর্জাতিক পরিভাষা গ্রহণের অর্থ নয় জাতীয় পরিভাষা বর্জ্জন। অন্যান্য সভ্য, স্বাধীন দেশে জাতীয় পরিভাষা বর্জ্জন না করেই আন্তর্জাতিক পরিভাষা সুবিধার জন্য গ্রহণ করা হয়। স্বাধীন ভারতেও আমাদের সেই পন্থাই গ্রহণ করা কর্ত্তব্য। সেই উদ্দেশ্যে, আজ থেকেই ক্রমশঃ বাংলা পারিভাষিক শব্দাদি প্রণয়ন করতে আরম্ভ করা উচিত। কে বলতে পারে, হয়ত অদূর ভবিষ্যতে আমাদের বাংলা পরিভাষা জগৎসভায় স্থান পাবে, এবং সকলে তা আগ্রহ করে শিখবে। সে আশার কথা ছেড়ে দিলেও, সত্যই যদি আমরা বাংলা ভাষায় বিজ্ঞান রচনা করতে চাই ত তা হলে যথাসম্ভব বাংলা শব্দই ব্যবহার করা উচিত।

বাংলা শব্দের সঙ্গে সঙ্গে জগতে প্রচলিত বিজ্ঞানের পরিভাষা, সঙ্কেত, অঙ্ক প্রভৃতি বিদেশী ভাষাতেও যে আমাদের শিখতে হবে তা পূর্ব্বেই বলা হয়েছে। তাতে পরিশ্রম একটু বেশী হতে পারে বটে, কিন্তু "জাতীয় শক্তির বিরাট অপচয়" ত তাকে বলা যায় না। তার চেয়েও বিরাট ক্ষতি হবে যদি বাংলার বিজ্ঞানবিভাগ, শুধু আজ নয়, চিরকালই এভাবে শব্দ-সম্পদের জন্য পরমুখাপেক্ষী হয়ে থাকে। প্রবেশিকা পরীক্ষার্থীরাও অনায়াসে অত্যাবশ্যক প্রধান প্রধান বিদেশী শব্দ কণ্ঠস্থ করতে পারে। অন্ততঃ মাতৃভাষাকে বিদেশী ভাষার নিকট চিরদাসত্ব শৃঙ্খলে বদ্ধ করার চেয়ে, এইটুকু শ্রমস্বীকারে তারা নিশ্চয়ই বিমুখ হবে না।

সংস্কৃত শব্দ-ভাণ্ডার থেকে আহৃত এই সব পরিভাষা যে আজ আমাদের কাছে অদ্ভুত ও হাস্যাস্পদ লাগবে, সে ত স্বাভাবিকই। কিন্তু ব্যবহার করতে করতে ঐ বিষয়ে অভ্যস্ত আমাদের হতেই হবে। কিছুদিন আগেও ইংরেজী শিক্ষিত সমাজে বাংলায় চিঠিপত্রাদি লেখার মোটেই প্রচলন ছিল না। সেজন্য, 'Dear Sir'র জায়গায় 'সবিনয় নিবেদন' প্রভৃতির যখন প্রথম প্রচলন হয়, অনেকেই নাসিকা কুঞ্চিত করেছিলেন। আজ কিন্তু এসব কারো কানেই লাগে না। এই ভাবে, 'কৃষ্টি', 'সংস্কৃতি', 'অবদান' 'পরিবেশ' 'ধারণী' 'পৌরোহিত্য' 'কর্ম্ম-সচিব' প্রভৃতিতে আমরা ক্রমশঃ বেশ অভ্যস্ত হয়ে আসছি—যদিও কারো কারো কানে এখনও এসব ফাজলামি বলে মনে

হয়। যাহোক, এসব স্থলে আমরা আজকাল প্রায় ইংরেজী শব্দ ব্যবহার করি না। এইভাবে যে সব ছাত্র সপ্তম শ্রেণী থেকেই 'ত্রিভুজ' 'কোণ' 'দ্রাঘিমা' 'লঘিমা' প্রভৃতিতে অভ্যস্ত হচ্ছে, তাদের কাছে এসব ত মোটেই হাস্যোদ্দীপক নয়। শব্দের মূল্য তার প্রচলনে, চলন করলেই ত শব্দ চলে। কাজেই আজ অপ্রচলিত বলে এদের চিরকালই তাই রাখতে হবে, সে কোন কাজের কথা নয়। যে সব শাস্ত্রে আমাদের প্রাচীন ঋষিদের দানের কথা আমরা জানি, সে সব (গণিত, জ্যোতির্বিদ্যা প্রভৃতি) বিভাগের শব্দও ত আজ সমান অপ্রচলিত হয়ে পড়েছে, এবং এই সব বিভাগেও আন্তর্জাতিক বিদেশী শব্দ আমাদের সমান শিখতে হয়। সেজন্ত যে সব বিভাগে প্রাচীন ভারতীয়গণের দান আছে, সেই সব বিভাগেই কেবল সংস্কৃত শব্দ গ্রহণ করা হোক্ এবং যে সব বিভাগে তাঁদের দান নেই, সে সব বিভাগে হুবহু বিদেশী শব্দই গ্রহণ করা হোক্—এরূপ প্রভেদ করা কি সম্ভব? প্রথমতঃ, কোন্ কোন্ বিভাগে তাঁদের দান আছে, আর কোন্ কোন্ বিভাগেই বা নেই, সেই ত স্থির নিশ্চিত নেই। কেই বা মাথা ঘামিয়ে এই সব আদিকালের দান খুঁজে বের করছে? আমরা বর্ত্তমানে তাঁদের বিজ্ঞানে দানের সম্বন্ধে যা জানি, গবেষণা করলে তার চেয়েও আরও অনেক বেশী দানের কথা প্রমাণিত করা যায়, সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। কিন্তু বর্ত্তমানে সে অনুরোধ অরণ্যে রোদন মাত্র। দ্বিতীয়তঃ, বিজ্ঞানের কয়েকটি বিভাগে খাঁটি সংস্কৃত শব্দ, এবং অন্যান্য অধিকাংশ বিভাগে খাঁটি বিদেশী শব্দ প্রচলিত করলে, নানারকম গণ্ডগোলের সম্ভাবনা বাড়বে বলেই আমাদের বিশ্বাস। তৃতীয়তঃ, যে বিভাগে সংস্কৃত পরিভাষা গৃহীত হবে, সে বিভাগেও ত বর্ত্তমান পরিস্থিতিতে বিদেশী শব্দ না জেনে উপায় নেই। সেইজন্ত বিজ্ঞানের পরিভাষা সম্বন্ধে বিভিন্ন বিভাগের মধ্যে এরূপ আকাশ-পাতাল প্রভেদ না করে, সব বিভাগে সংস্কৃত থেকে সংগৃহীত বাংলা পরিভাষার প্রচলন করে সঙ্গে সঙ্গে সব বিভাগেই প্রয়োজন মত আন্তর্জাতিক বিদেশী পরিভাষাদির শিক্ষা-ব্যবস্থা করাই ভাল।

ন্যায়শাস্ত্র, নীতিশাস্ত্র, ধর্ম্ম, দর্শন প্রভৃতি বিভাগে আমরা সংস্কৃত থেকে সংগৃহীত বাংলা পরিভাষা ব্যবহারের পূর্ণ পক্ষপাতী। এই সব বিভাগে অবশ্য অনেক শব্দ মূল সংস্কৃতেই পাওয়া যায়, কিন্তু যা পাওয়া যায় না তা গড়ে নিতেও বেশী শ্রমস্বীকার করতে হয় না। মনস্তত্ত্ব, অর্থনীতি, রাজনীতি প্রভৃতিতেও বিশেষজ্ঞগণ বাংলা প্রবন্ধাদিতে বাংলা প্রতিশব্দই যথাসম্ভব ব্যবহার করছেন। কেবল বিজ্ঞান চিরকালই বিদেশী শব্দ ব্যবহার করে 'একঘরে' হয়ে থাকুক এ নিশ্চয়ই বাংলা ভাষার সর্বাঙ্গীণ উন্নতিকামিগণ কেহই ইচ্ছা করবেন না। সেজন্ত কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষ ও অন্যান্য বিশেষজ্ঞগণ কর্ত্তৃক সংস্কৃত থেকে বিজ্ঞানেরও পরিভাষা সংগ্রহের এই যে সাধু প্রচেষ্টা, তা আমরা সর্ব্বান্তঃকরণে সমর্থন করি। বিশিষ্ট বাঙালী বৈজ্ঞানিকগণও নিশ্চয়ই আমাদের এই মত সমর্থন করবেন।

ইংরেজী শিক্ষা, না জাতীয় শিক্ষা

শ্রীদেবেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্ত্তন-সভায় পণ্ডিত জবাহরলাল বলিয়াছিলেন, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় daring in its curriculum—পাঠ্য-ব্যবস্থায় দুঃসাহসী। ইংরেজ যখন ভারত ত্যাগ করিবার বন্দোবস্ত করিতে চলিয়াছে তখন ইংরেজী ভাষাকে তাহার উচ্চাসন হইতে নামাইবার সময় আসিয়াছে কি না তাহা পৃথিবীর অন্যতম বৃহৎ শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়কে ভাবিয়া দেখিবার জন্য অনুরোধ করিতেছি।

সর আশুতোষ বিশ্ববিদ্যালয়ে বাংলা ভাষাকে সুপ্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন। পূর্ব্বে বাংলা দেশের কলেজে ও বিশ্ববিদ্যালয়ে বাংলা ভাষার প্রবেশাধিকার ছিল না। সর আশুতোষ শিক্ষায় স্বরাজ আনিবার পথ প্রস্তুত করিয়াছিলেন। তাঁহার সুযোগ্য পুত্র ডাঃ শ্যামাপ্রসাদ প্রবেশিকা পরীক্ষা পর্য্যন্ত বাংলাকে শিক্ষার বাহন করিয়া দেশবাসীর কৃতজ্ঞতা অর্জন করিয়াছেন। কিন্তু প্রবেশিকা পর্য্যন্ত বাংলা ভাষাকে প্রাধান্য দিবার অর্থ কি ইহাই নয় যে কলেজে ও বিশ্ববিদ্যালয়ে বাংলাকে শিক্ষার বাহন করিতে হইবে?

গত কয়েক বার হইতে দেখিতেছি প্রতি পরীক্ষায় হাজার হাজার ছাত্র ইংরেজীতে ফেল হওয়ার জন্য পরীক্ষা পাস করিতে পারে নাই। বাংলা দেশে ইংরেজী ভাষায় অকৃতকার্য্য হইলে উচ্চশিক্ষার পথ বন্ধ হয় ইহা অপেক্ষা মর্ম্মান্তিক ব্যাপার কি হইতে পারে? অথচ দেশের শিক্ষাবিদ্গণ ইহার জন্য কি করিয়াছেন তাহা জানা নাই। অন্ততঃ শিক্ষা-ব্যবস্থায় কোন পরিবর্ত্তন আসে নাই। যে শিক্ষা-ব্যবস্থায় শতকরা কুড়ি হইতে ত্রিশ জন মাত্র কৃতকার্য্য হইতে পারে সে ব্যবস্থা কোন মতেই চলিতে পারে না। প্রবেশিকা পরীক্ষায় ইংরেজীতে কেন আড়াই শত নম্বর থাকিবে? আবার পাস

করিতে হইলে কেন শুধু ইংরেজীতে শতকরা ছত্রিশ নম্বর পাইতে হইবে? পরীক্ষার মান উচ্চ হইয়াছে কি না? অন্যান্য বিষয়ে যখন ছাত্রেরা অনায়াসে শতকরা ৯০।৯৫ নম্বর পাইয়া থাকে তখন তাহারা কেন ইংরেজীতে ৭০।৭৫ নম্বর পায়? ইহাতে ইংরেজী পরীক্ষকদের বিশেষ অনুদারতা সূচিত হয় কি না? ইহা সত্য কি না যে, প্রবেশিকা পরীক্ষায় ১৪।১৫ বৎসর পূর্ব্বে ৮।১০ জন করিয়া ছাত্র ইংরেজীতে শতকরা ৮০ নম্বর পাইত, কিন্তু অধুনা একজনও পায় না। কেন পায় না? অন্যান্য বিষয়ে ছাত্ররা যদি পূর্ব্বের মতই নম্বর পায় ইংরেজীর বেলায় কি তাহাদের বুদ্ধি গুলাইয়া যায়? আবার দেখি ইংরেজীতে যে সমস্ত প্রশ্ন করা হয় তাহা বহু ছাত্র বুঝে না। ইহার জন্য দায়ী কে?

আমি বিশ্বাস করি না ছাত্রদের বুদ্ধি কমিয়াছে। অবশ্য পূর্ব্বে ছাত্ররা কম সংখ্যায় পরীক্ষা দিত, এত অপরিপক্কতা দেখা যায় নাই। এখন ছাত্রসংখ্যা বেশী হওয়ায় ও বহু অশিক্ষিত পরিবারের সন্তান শিক্ষা পাওয়ায় কিছু বিচিত্র রকমের অপরিপক্কতা দেখা গিয়াছে। ইহার জন্য দায়ী ছাত্রেরা যত তাহা অপেক্ষা বেশী দরিদ্র স্কুল ও অংশতঃ বিশ্ববিদ্যালয়। অপরিণতবুদ্ধি ছাত্রদের পরীক্ষার জন্য দরিদ্র স্কুল প্রতিবারই ছাত্র পাঠাইয়া থাকে। যাহারা টেস্টে ফেল করে তাহারা পরীক্ষা দেয় কি করিয়া? বিশ্ববিদ্যালয় যে অসম্ভব রকমের পাঠ্য পুস্তকের বোঝা বালকদের দুর্ব্বল স্কন্ধে চাপাইয়া দিয়াছে তাহার জন্যই এই প্রকারের মর্ম্মান্তিক ব্যাপার অনুষ্ঠিত হইতেছে। স্কুলে হয় শুধুমাত্র পড়া, পরীক্ষায় হয় কেবল লেখা। ছেলেরা লিখিবে কেমন করিয়া? ছাত্রদের প্রথমে খোঁড়া করিয়া শেষে তাহারা চলিতে অসমর্থ বলিয়া যেন তাহাদের শাস্তি দেওয়া হইতেছে। বিশ্ববিদ্যালয় ইংরেজী পঠন-পাঠনের উন্নতির জন্য চেষ্টা করিতেছেন। তাহা অবশ্যই ভাল, কিন্তু ইংরেজীর উপর অতিরিক্ত গুরুত্ব আরোপ করিতে যাঁহারা অভ্যস্ত তাঁহারা কোন দিন এদেশের শিক্ষা সম্বন্ধে সত্যকার মঙ্গল করিতে পারিবেন বলিয়া মনে হয় না। যাহা আয়ত্ত করিতে ছাত্রদের সবচেয়ে বেশী সময় যায় অথচ সাধারণ ছেলে যাহাতেই ফেল হয় তাহা সর্ব্বথা ত্যাজ্য।

ইংরেজী ভাল না জানিলে জ্ঞানের পরিপক্কতা আসে না এ কথা অনেক উচ্চশিক্ষিত লোক আজও বিশ্বাস করেন। মনে হয় এ এক প্রকারের দুর্ব্বলতা। আমি ইংরেজীকে ছোট বলিতে চাহি না; কিন্তু বাংলাদেশে কেন ইংরেজী উচ্চ শিক্ষার বাহন হইবে? ইংলণ্ডে এক সময় ফরাসী, লাটিন ও ইংরেজী পাশাপাশি চলিত। চসারের সমসাময়িক গাওয়ার ঐ তিনটি ভাষায় তিনখানি বই লিখিয়া গিয়াছিলেন; যে ভাষা বাঁচিবে তাহাতেই তাঁহার নাম থাকিবে ইহাই ছিল তাঁহার ইচ্ছা। সকল শিক্ষিত ব্যক্তিই জানেন বেকন পর্য্যন্ত তাঁহার শ্রেষ্ঠ দার্শনিক গ্রন্থ লাটিন ভাষায় লিখিয়া গিয়াছিলেন। আজ ইংলণ্ডে ফরাসী বা লাটিন ভাষার গুরুত্ব কোথায়? এদেশের পণ্ডিতগণও এক সময় সংস্কৃতের চর্চ্চা প্রবল বেগে চালাইয়াছিলেন, বাংলা ভাষা তাঁহাদের কাছে ছিল অনাদৃত। অথচ পাদ্রীরা আসিয়া বাংলা গদ্য-সাহিত্যের প্রবর্ত্তন করেন; দেশীয় লোকেরা তাহাতে খুব উৎসাহ দেখায় নাই। আজ দেশে স্বরাজ আসিবার দিন উপস্থিত, কিন্তু দেশীয় ভাষার শিক্ষাদানের বন্দোবস্ত কেন হইতেছে না? যাহা আসিবেই তাহার জন্য বন্দোবস্ত কই? কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় সব বিষয়েই অগ্রণী, তাহাকেই এ বিষয়ে পথ প্রদর্শন করিতে হইবে। বঙ্কিমচন্দ্র ও রবীন্দ্রনাথের স্বপ্ন সার্থক হউক ইহাই আমাদের কামনা।

দেশের রাজনৈতিক অবস্থায় ইংরেজীর উপর ছাত্রদের শ্রদ্ধা কমিয়া গিয়াছে। কলেজে দেখিতেছি ইংরেজী ভাষায় বক্তৃতা বুঝিতে প্রথম প্রথম ছাত্ররা মোটেই পারে না। বি-এ, বি-এসসি; এম-এ, এম-এসসিতেও বাংলায় বক্তৃতা দিলে ছাত্রদের বুঝিবার সুবিধা। ইংরেজীতে যদি মাত্র এক শত নম্বর করিয়া দেওয়া হয় ও ভাল করিয়া পড়াইবার বন্দোবস্ত করা হয় তাহাতেও ভাল ফল ফলিবে মনে হয়। কিন্তু ইংরেজীর জন্য হাজার হাজার ছাত্রকে ফেল করিয়া শিক্ষা-ব্যবস্থা চালানো কোনক্রমেই বিধেয় নহে।

ইতিহাস, দর্শন, অর্থনীতি, রাষ্ট্রনীতি ও বিজ্ঞান প্রভৃতি বাংলা ভাষায় শিখাইলে ছাত্রেরা ভাল করিয়া বিষয়বস্তুগুলি বুঝিবে ও ভাষার অসুবিধায় তাহাদের জ্ঞান ভাসাভাসা রকমের হইবে না ও বৃথা বুদ্ধিবৃত্তির অপব্যয় হইবে না। ভাষার দুর্ব্বোধ্যতা একটা মস্ত অসুবিধা। বাংলা ভাষায় শিখাইলে সময় বুদ্ধি প্রভৃতির অপচয় হইবে না। বুদ্ধিবৃত্তির বিকাশই হইবে।

ইংরেজী সাহিত্যের উচ্ছিষ্ট লইয়া যাঁহাদের জীবন যায় ও রবীন্দ্রনাথের ভাষায় যাঁহাদের ধূলা উড়াইয়া দিন কাটে, তাঁহাদের হাত দিয়াই একদিন সত্যকারের সাহিত্য গড়িয়া উঠিবে বলিয়া আমরা আশা করি। নানা দিক দিয়া তাহাদের মনের পূর্ণ বিকাশ হইবে। দেশীয় ভাষায় পড়িয়া লিখিয়া চিন্তা করিয়া মন সুন্দর ও সার্থক হইয়া উঠিবে। বিশ্ববিদ্যালয় ইংরেজীর ব্যর্থ সাধনা ছাড়িয়া দিয়া দেশীয় ভাষায় দেশীয় মনের বিকাশ সাধনের শুভ প্রচেষ্টায় অগ্রসর হউক ইহাই আমাদের আন্তরিক কামনা। দাসমনোভাব লইয়া স্বরাজ আনিবার স্বপ্ন অন্ততঃ শিক্ষাক্ষেত্রে ভুলিবার দিন আসিয়াছে। ইংরেজী ভাষা যাঁহারা শিক্ষা দেন শিক্ষা-বিভাগে তাঁহাদেরই সম্মান বেশী। ইহাও দাস-মনোভাবের একটি প্রচণ্ড লক্ষণ। বাংলা ভাষায় বা সংস্কৃতে যাঁহারা শিক্ষিত তাঁহাদের প্রতি একটি করুণার ভাব প্রায়ই লক্ষিত হয়। অথচ ইংরেজীতে সত্যকার দক্ষতা শতকরা কয় জন শিক্ষক ও অধ্যাপকের আছে? ইংরেজী সাহিত্যে বাঙালীর মৌলিক অবদান থাকিলেও তাহার ক্ষেত্র এত সঙ্কীর্ণ যে দেশীয় শিক্ষা-

ব্যবহার ইংরেজীকে এতটা উচ্চস্থান দেওয়া চলে না। যে ইংরেজীতে স্কুল-কলেজে অধ্যাপনা চালানো হয় তাহা অধিকাংশ স্থলেই যে উচ্চ ধরণের ইংরেজী নহে তাহা বোধ করি স্বীকার করিতে কাহারও আপত্তি নাই। এ কথা বলিলে কাহারও অসম্মান হইবে না আশা করি। রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে একটি গল্প শুনিয়াছিলাম। অক্সফোর্ড কেরত ও জার্মানি-ফ্রান্স-রুশিয়া প্রবাসী জনৈক বিখ্যাত বাঙালী অধ্যাপক একই জাহাজে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে বহুদিন পরে দেশে ফিরিতেছিলেন। তিনি সাত আট বৎসর দেশত্যাগী; তাই কথা-প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথকে বলিয়াছিলেন—"এত দিনের অনভ্যাসে বাংলাটা ভুলিয়া গিয়াছি।" রবীন্দ্রনাথ সকৌতুকে তাঁহাকে বলিয়াছিলেন—বড়ই দুঃখের কথা বাংলাটা ভুলিয়াছ অথচ ইংরেজীটাও ভাল শিখ নাই।" এ কথা রবীন্দ্রনাথের মুখেই সাজে। শিক্ষকদের অধিকাংশই এই দোষে দোষী। এ সোজা কথাটা বুঝিবার দিন নিশ্চয়ই আসিয়াছে যে বিদেশী ভাষার সাহায্যে জাতীয় বা দেশীয় শিক্ষা দেওয়া চলে না। ইহাতে না ছাত্র না শিক্ষক, কাহারও ভাল হইবার আশা আছে। ইংরেজীর শিক্ষকেরা দেশীয় কৃষ্টিতে কতটুকু দান করিয়াছেন, অথচ কতটাই না পারিতেন?

দেশীয় ভাষা এই ইংরেজীর স্থান লইলে শিক্ষকেরা নূতন গ্রন্থ লিখিবেন, নূতন কথা বলিবেন, বিদেশীর কথার পুনরাবৃত্তি করিয়া তাঁহাদের শিক্ষক-জীবনকে ব্যর্থ করিবেন না। ইংরেজী ভাষা ও সাহিত্য আমাদের প্রাণের বস্তু হয় নাই, কখনও হইতে পারিবে না। সুতরাং দেশীয় ভাষার সাহায্যে দেশীয় শিক্ষার বন্দোবস্ত করা উচিত। ইহাতে সব দিকেই মঙ্গল।

শাশ্বত মোরা

শ্রীঅমলকুমার মাল

আমরা বাঁচিয়া আছি—
বোমা, মহামারী, ব্ল্যাক-মার্কেট সবারে ব্যঙ্গ করি
আমরা বাঁচিয়া আছি।
সত্য-দ্রষ্টা, সার্থক-শ্রোতা মোরা
যা-কিছু দেখেছি নিছক সত্য—যা-কিছু শুনেছি তাও
শিখি নি কেবল সত্য যা শিখিবার।
মৃত্যু আসিয়া যাচিয়া গিয়াছে শতরূপে শতবার
সে যাচনা জানি ব্যর্থ হয়েছে শুধু।
মাঝে মাঝে তাই সন্দেহ জাগে—
শাশ্বত নাকি মোরা?
বর্তমানের আমরা যাহারা এখনও বাঁচিয়া আছি।

* * *

পোড়া মাটি আর ব্ল্যাক-আউটের দেখেছি বিশ্বরূপ
অন্তর আর বাহিরের ব্ল্যাক-আউট।
মাঠে, ঘাটে, হাটে লাখে লাখে লোক আঁধারে মিশিয়া গেছে
চির-শান্তির চির-কালো আঁধিয়ারে।
মুক্তি পেয়েছে তারা—
তাদ্ধই আনন্দে আমরা কেবল বক্তৃতা করিয়াছি
নাটক, নভেল, স্লোগান লিখেছি মোরা,
আধুনিক ধাঁচে কবিতা কেঁদেছি কত
বিবৃতি, ছবি, অভিযোগ ছাপায়েছি,
কাগজে কাগজে তুলিয়াছি আলোড়ন
শ্মশানের বুকে মুক্তি-মহোৎসব।

* * *

বন্ধু!
তবু এরি মাঝে শুনি তীব্র নিনাদে সাইরেণ উঠে বাজি,
অন্তর কাঁপে—মাথার উপর শত্রুবিমান বুঝি।
কম্পিত বুকে শেল্‌টারে ঢুকে হরিনাম জপিয়াছি।
সার্থক হরিনাম—
সে নামের জোরে বাঁচিয়া গিয়াছি মোরা।
বাঁচিয়া গিয়াছি—
কেবল বন্ধু! শত্রু-মন্ত্র ব্যর্থ করিয়া নহে,
ব্যর্থ করিয়া মহাকাল মহামারী,
ব্যর্থ করিয়া লঙ্গরখানা, কেমিন রিলিফ, সরকারী শত নীতি
মৃত্যুঞ্জয়ী আমরা চিরঞ্জীব।
এক ঠাঁই স্থির—
প্রহরের পর প্রহর ধরিয়া 'কিউ' শিখিয়াছি মোরা,
আর শিখিয়াছি অন্নের দায়ে নিয়মানুবর্তিতা।
কঠিন নিয়ম, নির্মম নীতি—
সে নীতির কাছে মৃত্যু মেনেছে হার।
তাই আজিও বাঁচিয়া আছি—
ব্ল্যাক-মার্কেট, কণ্ট্রোল আর সেল্‌-ট্যাক্সের জোরে
আমরা বাঁচিয়া আছি।

ব্রিটিশ মন্ত্রী-মিশনের ঘোষণা ও তাহার প্রতিক্রিয়া

মন্ত্রী-মিশন ও বড়লাটের ঘোষণা

১। মন্ত্রী-মিশনের ভারত আগমনের অব্যবহিত পূর্ব্বে গত ১৫ই মার্চ্চ ব্রিটিশ প্রধান মন্ত্রী মিঃ এটলি বলিয়াছিলেন, ভারতবর্ষকে সত্বর পূর্ণ স্বাধীনতা লাভে সাহায্য করার আন্তরিক উদ্দেশ্য লইয়াই আমার সহকর্ম্মিগণ ভারতে যাইতেছেন। কি ধরণের শাসনতন্ত্র বর্ত্তমান সরকারের স্থলাভিষিক্ত হইবে তাহা ভারতীয়গণই স্থির করিবেন। সত্বর সেই সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে সাহায্য করাই আমাদের আকাঙ্ক্ষা।

আমি আশা করি, ভারত ও ভারতীয়গণ ব্রিটিশ সাধারণ-তন্ত্রের সহিত যুক্ত থাকিতে ইচ্ছুক। আমি বিশ্বাস করি, ইহাতে তাঁহাদের প্রচুর সুবিধাই হইবে।

ব্রিটিশ সাধারণতন্ত্রের সহিত সংযোগ রাখা বা না রাখা ভারতীয় জনগণের স্বাধীন মতামতসাপেক্ষ। ব্রিটিশ সাধারণ-তন্ত্র ও সাম্রাজ্যের মধ্যে যে সংযোগ তাহা আন্তরিকতার উপর প্রতিষ্ঠিত। ইহা স্বাধীন জনগণের স্বাধীন মিলন। আমি মনে করি, পূর্ণ স্বাধীনতার দাবি করার অধিকারও ভারতের আছে। যথাসম্ভব সত্বর ও সহজে ক্ষমতা হস্তান্তর করিতে সাহায্য করাই আমাদের কর্ত্তব্য।

সিমলা সম্মেলন

২। এই ঐতিহাসিক ঘোষণার দায়িত্বভার বহন করিয়া আমরা মন্ত্রিসভার সদস্যত্রয় ও বড়লাট—দুইটি প্রধান রাজ-নৈতিক দলকে সর্ব্ব ভারতীয় ঐক্য বা বিভাগের মূলসূত্রে একমত হইতে সাহায্য করিতে যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়াছি। নয়া দিল্লীতে সুদীর্ঘ আলোচনার পরে আমরা সিমলা সম্মেলনে কংগ্রেস ও মুসলিম লীগকে সমবেত করিতে সমর্থ হইয়াছিলাম। সম্পূর্ণ মত বিনিময়ের পরে উভয় পক্ষই যথেষ্ট ত্যাগ স্বীকার করিয়াও মীমাংসায় উপনীত হইতে চেষ্টা করিয়াছিলেন। তথাপি উভয়ের মধ্যবর্ত্তী অবশিষ্ট ক্ষুদ্র ব্যবধান দূর করা এবং কোন মীমাংসায় পৌঁছান সম্ভবপর হয় নাই। সুতরাং উভয় পক্ষের অনুমোদিত কোন সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে না পারায় আমরা সত্বর নূতন শাসনতন্ত্র প্রতিষ্ঠার যে পরিকল্পনা শ্রেষ্ঠ মনে করিয়াছি, তাহা উপস্থিত করা আমাদের কর্ত্তব্য।

৩। ভারতীয় জনগণ যাহাতে তাঁহাদের ইচ্ছামত ভবিষ্যৎ শাসনতন্ত্র গঠন করিতে পারেন, তাহার আশু ব্যবস্থা করা সাব্যস্ত হইয়াছে। এই শাসনতন্ত্র গঠনের অন্তর্ব্বর্ত্তীকালে ব্রিটিশ ভারতের শাসনব্যবস্থা অব্যাহত রাখার জন্য অন্তবর্ত্তী-কালীন সরকার গঠন করাও স্থিরীকৃত হইয়াছে। ক্ষুদ্রই হউক, আর বৃহৎই হউক, আমরা সকল শ্রেণীর প্রতিই সুবিচার করিতে চেষ্টা করিয়াছি। আমরা মনে করি, ভবিষ্যৎ ভারত শাসনের কার্য্যকরী পরিকল্পনা আমাদের এই সিদ্ধান্তের মধ্যে নিহিত আছে এবং ইহাদ্বারা ভারতের আত্মরক্ষার সুব্যবস্থা, সামাজিক, রাজনৈতিক ও আর্থিক ক্ষেত্রে অগ্রগতির পথও প্রশস্ত করা হইয়াছে।

সর্ব্বভারতীয় ঐক্য

৪। মিশনের সমক্ষে যে রাশীকৃত সাক্ষ্য উপস্থিত করা হইয়াছে তাহার পর্য্যালোচনা এই বিবৃতির উদ্দেশ্য নহে। এইস্থলে ইহা উল্লেখযোগ্য যে, মুসলিম লীগ সমর্থকগণ ব্যতীত অন্য সকলেই সর্ব্বভারতীয় ঐক্য সমর্থন করিয়াছেন।

৫। ইহা সত্ত্বেও আমরা পক্ষপাতহীন ও নিবিষ্ট মনে ভারত বিভাগের সম্ভাব্যতার কথা চিন্তা করিয়াছি। পাছে সংখ্যাগরিষ্ঠ হিন্দুগণ চিরকাল তাঁহাদের উপর শাসন চালায়, মুসলমানগণের এই ভয় ও ভাবনা আমাদের নিকট বিশেষভাবে উপস্থিত করা হইয়াছে। এই ধারণা মুসলিম জনগণের মনে এত বদ্ধমূল হইয়াছে যে, কাগজে কলমে কোন রক্ষাকবচের ব্যবস্থা করিয়া তাহা দূর করা সম্ভব নহে। ধর্ম্ম, সংস্কৃতি, বৈষয়িক ও অন্যান্য মুসলিম স্বার্থসংশ্লিষ্ট বিষয়ের ভার মুসলিম জনগণের হাতে ন্যস্ত করার ব্যবস্থা দ্বারাই ভারতের আভ্যন্তরীণ শান্তি রক্ষা করা যাইতে পারে।

পাকিস্থানের দাবি অযৌক্তিক

৬। আমরা সর্ব্বপ্রথমেই মুসলিম লীগ উপস্থাপিত সার্ব্বভৌম পাকিস্থান রাষ্ট্রের বিষয় চিন্তা করিয়াছি। এই পাকিস্থানের জন্য দুইটি অংশ:—একটি উত্তর-পশ্চিমে বেলুচিস্থান, সিন্ধু, উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ ও পঞ্জাব লইয়া এবং অপরটি উত্তর-পূর্ব্বে বাংলা এবং আসাম লইয়া দাবি করা হইয়াছিল। মুসলিম লীগ প্রথমে পাকিস্থানের নীতি স্বীকৃত হইলে পরে সীমা নির্দ্ধারণ ও আবশ্যক মত পরিবর্ত্তনের প্রস্তাব মানিয়া লইতে প্রস্তুত ছিলেন। প্রথমতঃ সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলমানগণের নিজেদের শাসনতন্ত্র নির্দ্ধারণের অধিকার ও দ্বিতীয়তঃ সংখ্যালঘিষ্ঠ মুসলিম অধ্যুষিত কোন কোন স্থান শাসন ও অর্থনৈতিক সুবিধার জন্য পাকিস্থানের অংশীভূত করার প্রয়োজনীয়তার নীতির উপরেই পৃথক ও সার্ব্বভৌম পাকিস্থান রাষ্ট্রের দাবি করা হইয়াছিল।

১৯৪১ সালের লোকগণনার সংখ্যানুপাতে উল্লিখিত ছয়টি প্রদেশে সংখ্যালঘিষ্ঠ অমুসলমানগণের সংখ্যা সামান্য নহে।

পঞ্জাব :—	
মুসলমান	১৬,২১৭,২৪২
অমুসলমান	১২,২০১,৫৭৭
উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ	
মুসলমান	২,৭৮৮,৭৯৭
অমুসলমান	২৪৯,২৭০
সিন্ধু :—	
মুসলমান	৩,২০৮,৩২৫
অমুসলমান	১,৩২৬,৬৮৩

ব্রিটিশ বেলুচিস্থান :—

মুসলমান	৪৩৮,৯৩০.
অমুসলমান	৬২,৭০১

মোট :—

মুসলমান	২২,৬৫৩,২৯৪,
(শতকরা—	৬২'০৭
অমুসলমান	১৩,৮৪০,২৩১,
(শতকরা—	৩৭'৯৩) ।

উত্তর পূর্ব্বাঞ্চল

বাংলা :—

মুসলমান	৩০,০০৫,৪৩৪.
অমুসলমান—	২৭,৩০১,০৯১

আসাম :—

মুসলমান	৩,৪৪২,৪৭৯,
অমুসলমান—	৬,৭৬২,২৫৪

মোট—মুসলমান—৩৬,৪৪৭,৯১৩, (শতকরা—৫১'৬৯) ; অমুসলমান ৩৪,০৬৩,৩৪৫, (শতকরা—৪৮'৩১)

ব্রিটিশ ভারতের অন্যত্র প্রায় ২ কোটি সংখ্যালঘিষ্ঠ মুসলমান ১৮ কোটি ৮ লক্ষ অমুসলমানের মধ্যে বাস করেন।

এই সংখ্যা হইতে দেখা যাইবে যে, মুসলিম লীগের দাবি অনুসারে পৃথক ও সার্ব্বভৌম পাকিস্থান রাষ্ট্র গঠনদ্বারা সাম্প্রদায়িক সংখ্যালঘিষ্ঠ সমস্যার সমাধান হইবে না। আমরাও পঞ্জাব, বাংলা এবং আসামের অমুসলমান সংখ্যা-লঘিষ্ঠ জেলাগুলি সার্ব্বভৌম পাকিস্থানের অন্তর্গত করার কোন যৌক্তিকতা দেখি না। পাকিস্থানের পক্ষে যে সকল যুক্তি উপস্থাপিত করা যায়, মুসলিম সংখ্যালঘিষ্ঠ জেলাগুলিকে পাকিস্থানের বাহিরে রাখার সপক্ষেও সেই সমস্ত যুক্তি করা চলে বলিয়া আমরা মনে করি। এই প্রশ্নের সহিত শিখদের স্বার্থ বিশেষভাবে জড়িত।

৭। কেবলমাত্র মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ স্থানগুলি লইয়া ক্ষুদ্রতর সার্ব্বভৌম পাকিস্থান রাষ্ট্র গঠন করিয়া কোন মীমাংসায় উপনীত হইতে পারা সম্ভব কিনা তাহাও আমরা চিন্তা করিয়াছি। মুসলিম লীগের মতে এই ধরণের পাকিস্থান সম্পূর্ণ কার্য্যকরী হইবে ; কারণ (ক) পঞ্জাবের সমগ্র আম্বালা ও জলন্ধর বিভাগ, (খ) শ্রীহট্ট জেলা ব্যতীত সমগ্র আসাম এবং (গ) কলিকাতা নগরী (যেখানে মুসলমান জনসংখ্যা শতকরা ২৩'৬ মাত্র) সমেত সমগ্র পশ্চিম বাংলা পাকিস্থানের বাহিরে থাকিয়া যাইবে। আমাদেরও দৃঢ় বিশ্বাস যে, পঞ্জাব ও বাংলার এই প্রকার বিভাগ করিয়া কোন মীমাংসা করা তথাকার অধিকাংশ অধিবাসীদের ইচ্ছা ও স্বার্থের পরিপন্থী। বাংলা ও পঞ্জাবের নিজস্ব সাধারণ ভাষা, সুপ্রাচীন ইতিহাস ও ঐতিহ্য বর্ত্তমান। বিশেষতঃ পঞ্জাবকে বিভক্ত করা হইলে যথেষ্ট সংখ্যক শিখ সীমারেখার উভয় দিকে পড়িয়া যাইবে। অতএব আমরা সিদ্ধান্ত করিতেছি যে, বৃহত্তর বা ক্ষুদ্রতর সার্ব্বভৌম ক্ষমতাসম্পন্ন পাকিস্থান সাম্প্রদায়িক সমস্যার গ্রহণযোগ্য সমাধান নহে।

অখণ্ড ভারত

৮। উপরোক্ত জোরাল যুক্তি ছাড়া আরও অনেক শাসনতান্ত্রিক, অর্থনৈতিক ও সামরিক গুরুতর যুক্তিও বিবেচ্য। ভারতের যানবাহন, ডাক ও তার বিভাগ অখণ্ড ভারতের ভিত্তিতে স্থাপিত। এই সমস্ত বিভাগ বিচ্ছিন্ন করিলে ভারতের উভয় অংশই গুরুতরভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হইবে। ঐক্যবদ্ধ ভারতের রক্ষা ব্যবস্থার পক্ষে যুক্তি আরও প্রবল। ভারতের সামরিক বাহিনীকে সমগ্র ভারতকে রক্ষা করার জন্যই একীভূত করিয়া প্রস্তুত করা হইয়াছে। দ্বিধা বিভক্ত ভারতীয় বাহিনী শুধু তাহার সুপ্রাচীন সুনাম ও সুউচ্চ কর্ম্ম-শক্তিই হারাইবে না বরং ভীষণ বিপদের সম্মুখীন হইবে। ভারতীয় নৌ ও বিমান বহরের কর্ম্মক্ষমতা কমিয়া যাইবে। প্রস্তাবিত পাকিস্থানের উভয় অংশ ভারতের দুই সুভেদ্য সীমারেখায় অবস্থিত। রক্ষাব্যবস্থার গভীরতার বিবেচনায় পাকিস্থান ভূখণ্ড অত্যন্ত অপ্রচুর।

৯। বিভক্ত ব্রিটিশ ভারতের সহিত ভারতীয় রাজন্যবর্গের সম্বন্ধ স্থাপনে গুরুতর অসুবিধার কথাও আমরা বিশেষভাবে বিবেচনা করিয়াছি।

১০। সর্ব্বশেষে প্রস্তাবিত পাকিস্থানের ভৌগোলিক সংস্থাপন ও উভয় পাকিস্থানের মধ্যবর্ত্তী ন্যূনাধিক ৭০০ মাইল দূরত্বের কথাও বিবেচ্য। উভয়ের মধ্যে সমরকালীন বা শান্তি-কালীন যানবাহন-ব্যবস্থা হিন্দুস্থানের শুভেচ্ছার উপর সম্পূর্ণ নির্ভরশীল।

১১। অতএব বর্ত্তমানে ব্রিটিশের হস্তে ন্যস্ত ক্ষমতা দুইটি সম্পূর্ণ পৃথক সার্ব্বভৌম রাষ্ট্রের হস্তে সমর্পণ করার পরামর্শ আমরা ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টকে দিতে অক্ষম।

কংগ্রেসের প্রস্তাব

১২। এই সিদ্ধান্তদ্বারা ইহা বুঝায় না যে, আমরা অত্যধিক সংখ্যাগরিষ্ঠ হিন্দুজনগণনিয়ন্ত্রিত অখণ্ড এলাকাতে মুসলমান জনগণের সংস্কৃতি, সামাজিক ও রাজনৈতিক জীবন বিপদগ্রস্ত হইবার আশঙ্কার কথা ভুলিয়া গিয়াছি। এই আশঙ্কার প্রতিকারার্থ কংগ্রেস এক পরিকল্পনা উপস্থিত করিয়াছেন। এই পরিকল্পনা অনুসারে কেন্দ্রে বৈদেশিক ব্যাপার, দেশরক্ষা ও যানবাহন ব্যবস্থাদি যথাসম্ভব কমসংখ্যক বিষয় সংরক্ষিত থাকিবে এবং ইহাছাড়া প্রদেশগুলিকে সম্পূর্ণ আত্মকর্তৃত্ব দেওয়া হইবে। এই পরিকল্পনানুসারে যদি কোন কোন প্রদেশ বৃহত্তর অর্থনৈতিক ও শাসনসংক্রান্ত পরিকল্পনার অংশ গ্রহণে ইচ্ছুক হয়, তাহারা উল্লিখিত বাধ্যতামূলক বিষয়সমূহ ছাড়া তাহাদের ইচ্ছামত অন্যান্য বিষয়ও কেন্দ্রীয় সরকারের হাতে ছাড়িয়া দিতে পারিবে।

আমাদের মতে এই পরিকল্পনা কার্য্যকরী হইলে বহুবিধ শাসনতান্ত্রিক অসুবিধা এবং বিশৃংখলা দেখা দিবে। এই পরিকল্পনা অনুসারে যে কয়জন মন্ত্রী বাধ্যতামূলক বিষয়গুলি পরিচালনা করিবেন তাঁহারা সমগ্র ভারতের নিকট দায়ী থাকিবেন; অন্যপক্ষে যে কয়জন মন্ত্রী ইচ্ছামূলক বিষয়সমূহের ভার গ্রহণ করিবেন তাঁহারা শুধু যে সকল প্রদেশ এই সমস্ত বিষয়ে একযোগে কাজ করিতে স্বীকৃত হইবে কেবলমাত্র তাহাদের নিকটই দায়ী থাকিবেন। এরূপ একটি শাসন-পরিষদ এবং আইনসভা কার্য্যকরী করা অত্যন্ত কঠিন। এই অসুবিধা আরও বেশী করিয়া দেখা দিবে যখন কেন্দ্রীয় পরিষদে কোন কোন সদস্যকে তাঁহাদের প্রদেশের সহিত সংশ্লিষ্ট নহে এরূপ বিষয়ের আলোচনায় এবং এই সম্পর্কে ভোট গ্রহণ ব্যাপারে তাঁহাদিগকে অংশ গ্রহণ করিতে দেওয়া হইবে না।

এই প্রকার কোন পরিকল্পনা কার্য্যকরী করার অসুবিধা ছাড়াও আমরা মনে করি যে, যে সমস্ত প্রদেশ কেন্দ্রীয় গবর্ণমেন্টের উপর কোন ইচ্ছাধীন বিষয়ের ভার ন্যস্ত করে নাই তাহাদের এই উদ্দেশ্যে পৃথকভাবে একত্রীভূত হইবার অধিকার অস্বীকার করা সঙ্গত হইবে না।

দেশীয় রাজ্যের কথা

১৪। আমাদের প্রস্তাব উপস্থিত করার পূর্ব্বেই আমরা ভারতীয় রাজন্যবর্গ ও ব্রিটিশ ভারতের সম্পর্ক আলোচনা করিব।

স্পষ্টই প্রতীয়মান হয় যে, ব্রিটিশ সাধারণতন্ত্রের মধ্যেই হউক বা বাহিরেই হউক, ব্রিটিশ ভারতের স্বাধীনতা লাভের পরে ভারতীয় রাজন্যবর্গের সহিত ইংলণ্ডেশ্বরের যে সম্পর্ক এতাবৎকাল বর্ত্তমান আছে, তাহা থাকা সম্ভবপর হইবে না। ইংলণ্ডেশ্বর তখন আর তাঁহার সার্ব্বভৌমত্ব রাখিতেও পারেন না, অথবা নূতন ভারত-সরকারের হাতে তাহা ন্যস্তও করিতে পারেন না। দেশীয় রাজ্যের যে সকল প্রতিনিধির সহিত আমাদের আলোচনা হইয়াছে, তাঁহারাও ইহা সম্পূর্ণ স্বীকার করেন। তাঁহারা আমাদের জানাইয়াছেন যে, ভারতীয় নৃপতিবৃন্দ ভারতের নবজাগরণ ও অগ্রগতির সঙ্গে জড়িত থাকিতে ইচ্ছুক। নূতন শাসনতন্ত্র গঠনের কালেই কি ভাবে তাঁহাদের এই শুভেচ্ছা কার্য্যকরী করা হইবে তাহা সঠিক স্থিরীকৃত হইবে। সমস্ত দেশীয় রাজ্য সম্পর্কে একই ব্যবস্থা করা হইবে তাহা মনে করার কোন কারণ নাই। এই জন্যই পরবর্ত্তী অধ্যায়ে আমরা ব্রিটিশ ভারতের প্রদেশসমূহ সম্বন্ধে যেমন বিস্তারিত আলোচনা করিয়াছি, দেশীয় রাজ্য সম্পর্কে তেমন করি নাই।

মন্ত্রী-মিশনের প্রস্তাব

১৫। আমাদের মতে যে ব্যবস্থা বিভিন্ন দলের মূল দাবির পক্ষে ন্যায্য এবং যে ব্যবস্থা সমগ্র ভারতের স্থায়ী ও কার্য্যকরী শাসন প্রণালী প্রণয়নের পক্ষে সর্ব্বাপেক্ষা উপযুক্ত, আমরা এখন তাহাই উপস্থিত করিতেছি।

আমরা প্রস্তাব করিতেছি যে, ভারতীয় শাসনব্যবস্থা নিম্নোক্ত মূল নীতির উপর প্রতিষ্ঠিত হউক :—

১। ব্রিটিশ-ভারত ও দেশীয় রাজ্যসমূহ লইয়া এক ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্র গঠিত হউক। বৈদেশিক সম্পর্ক, দেশরক্ষা ও যানবাহন বিষয়ে সর্ব্ববিধ কর্তৃত্ব এই যুক্তরাষ্ট্রের হস্তে ন্যস্ত থাকিবে ও এই সকল বিষয়ে অর্থ সংগ্রহ করার আবশ্যক কর্তৃক ইহার থাকিবে।

২। এই যুক্তরাষ্ট্রের ব্রিটিশ ভারত ও দেশীয় রাজন্যবর্গের প্রতিনিধি লইয়া গঠিত শাসন ও ব্যবস্থা-পরিষদ থাকিবে। ব্যবস্থা-পরিষদে কোন গুরুতর সাম্প্রদায়িক প্রশ্ন উত্থাপিত হইলে তাহা উপস্থিত প্রতিনিধি এবং প্রধান দুই সম্প্রদায়ের পৃথক পৃথকভাবে অধিকাংশ ভোটের দ্বারা স্থিরীকৃত হইবে।

৩। যুক্তরাষ্ট্রের হস্তে ন্যস্ত বিষয়সমূহ ছাড়া অবশিষ্ট সমস্ত ক্ষমতা প্রাদেশিক সরকারের হাতে থাকিবে।

৪। দেশীয় রাজ্যসমূহ যুক্তরাষ্ট্রের হস্তে ন্যস্ত ক্ষমতা ব্যতীত সমস্ত ক্ষমতার অধিকারী রহিবেন।

৫। প্রদেশসমূহ শাসন ও ব্যবস্থা-পরিষদ সমেত দলবদ্ধ হইতে পারিবেন এবং এই প্রকার যৌথ প্রদেশসমূহ নিজেদের সাধারণ প্রাদেশিক বিষয় স্থির করিতে পারিবেন।

৬। যুক্তরাষ্ট্র ও প্রাদেশিক যৌথ সরকারের শাসন-ব্যবস্থায় এই বিধান থাকিবে যে, ব্যবস্থা-পরিষদের অধিকাংশ ভোটের দ্বারা প্রথমে দশ বৎসর পরে এবং প্রতি দশ বৎসর অন্তর শাসন-ব্যবস্থার পুনর্ব্বিবেচনা দাবি করিতে পারিবে।

১৬। উপরোক্ত ধারায় কোন বিস্তারিত শাসনপ্রণালী লিপিবদ্ধ করা আমাদের ইচ্ছা নহে। আমরা এমন ব্যবস্থা করিতে চাই, যাহাতে ভারতীয়গণই তাঁহাদের নিজেদের জন্য শাসনতন্ত্র রচনা করিতে পারেন।

আলাপ-আলোচনা দ্বারা আমরা দেখিলাম যে, শাসনতন্ত্র রচনায় দলনীতি সম্বলিত এই প্রকার কোন প্রস্তাব উপস্থিত করা না হইলে ভারতের দুই বৃহৎ সম্প্রদায়ের শাসনতন্ত্র রচনাকারী প্রতিষ্ঠানে যোগদানের কোন আশা নাই।

১৭। অচিরেই নূতন শাসনতন্ত্র রচনাকারী প্রতিষ্ঠান কার্য্যকরী করিবার জন্য আমাদের প্রস্তাব উপস্থিত করিতেছি।

১৮। নূতন শাসনতন্ত্র রচনাকারী প্রতিষ্ঠান গঠনের প্রধানতম সমস্যা ইহাকে সঠিকভাবে সমগ্র জনগণের প্রতিনিধিস্থানীয় করা। প্রাপ্তবয়স্কের ভোটাধিকারের ভিত্তিতে নির্ব্বাচনদ্বারা প্রতিনিধি-পরিষদ গঠনই সর্ব্বোত্তম পন্থা। কিন্তু

ইহাতে নূতন শাসনতন্ত্র রচনায় অনভিপ্রেত বিলম্ব ঘটিবে। অল্পদিন পূর্ব্বে নির্ব্বাচিত ব্যবস্থা-পরিষদগুলিকে নির্ব্বাচক হিসাবে ব্যবহার করাই একমাত্র কার্য্যকরী পন্থা। ব্যবস্থা পরিষদের গঠনপ্রণালীর দুইটি ব্যাপারে ইহাও একটু শক্ত বিষয় হইয়া দাঁড়াইয়াছে। প্রথমতঃ, প্রাদেশিক ব্যবস্থা-পরিষদগুলির সভ্যসংখ্যা সর্ব্বত্র প্রদেশের সমগ্র লোকসংখ্যার অনুপাতে ধার্য্য করা হয় নাই। আসামে এক কোটি অধিবাসীর ব্যবস্থা-পরিষদে ১০৮ জন সভ্য আর বাংলার লোকসংখ্যা ইহার ছয় গুণ অথচ বাংলার ব্যবস্থা-পরিষদের সভ্যসংখ্যা ২৫০। দ্বিতীয়তঃ, সাম্প্রদায়িক রোয়েদাদে সংখ্যালঘিষ্ঠদের প্রতিনিধি সংখ্যা বাড়াইয়া দেওয়ায় কোন কোন সম্প্রদায়ের প্রতিনিধিসংখ্যা প্রদেশে তাহাদের জনসংখ্যার অনুপাতে ধরা হয় নাই, বাংলার মুসলমানদের জন্ত সংরক্ষিত আসনের সংখ্যা শতকরা মাত্র ৪৮ কিন্তু লোকসংখ্যায় তাহারা শতকরা ৫৫ জন। কিভাবে এই অসামঞ্জস্য দূর করা যায় তাহা আমরা গভীরভাবে চিন্তা করিয়াছি। আমাদের মতে ন্যায্য ও কার্য্যকরী উপায় হইতেছে:—

(ক) প্রত্যেক প্রদেশে জনসংখ্যার অনুপাতে আসন বণ্টন করা। প্রতি দশ লক্ষে একজন প্রতিনিধি নির্দ্দিষ্ট করা হইয়াছে। ইহা প্রাপ্তবয়স্কদের ভোটাধিকারের কাছাকাছি দাঁড়াইবে। (খ) প্রাদেশিক আসনগুলি জনসংখ্যার অনুপাতে বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে বণ্টন করিয়া দিতে হইবে। (গ) প্রত্যেক সম্প্রদায়ের নির্ব্বাচিত ব্যবস্থা-পরিষদের সভ্যেরা সেই সম্প্রদায়ের প্রতিনিধি নির্ব্বাচন করিবেন।

আমরা মনে করি, এই উদ্দেশ্যে সাধারণ, মুসলিম ও শিখ এই তিন প্রধান সম্প্রদায়ের বিষয় বিবেচনা করিলেই চলে। মুসলিম ও শিখ ছাড়া অন্যান্য সকলকেই সাধারণ সম্প্রদায়ভুক্ত মনে করা হইবে। অন্যান্য ক্ষুদ্র সংখ্যালঘিষ্ঠ সম্প্রদায় জনসংখ্যার অনুপাতে অতি সামান্য প্রতিনিধিত্ব পাইতে পারে। পরন্তু ইহাতে প্রাদেশিক ব্যবস্থা-পরিষদে তাঁহাদের যে গুরুত্ব দেওয়া হইয়াছিল, তাহাও নষ্ট হইবার আশঙ্কা আছে। সেজন্য বিংশ অধ্যায়ে সংখ্যালঘিষ্ঠদের বিশেষ বিষয়ে আমরা তাঁহাদের পূর্ণ প্রতিনিধিত্বের ব্যবস্থা করিয়াছি।

১৯। (১) আমরা প্রস্তাব করিতেছি যে, প্রত্যেক প্রাদেশিক ব্যবস্থা-পরিষদের সাধারণ, মুসলিম ও শিখ সদস্যেরা এক হস্তান্তরযোগ্য ভোটের দ্বারা তাঁহাদের নিজ নিজ সম্প্রদায়ের নিয়োক্ত সংখ্যক প্রতিনিধি নির্ব্বাচন করিবেন।

প্রতিনিধির তালিকা

(ক অনুচ্ছেদ)

প্রদেশ	সাধারণ	মুসলিম	মোট
মাদ্রাজ	৪৫	৪	৪৯
বোম্বাই	১৯	২	২১
যুক্তপ্রদেশ	৪৭	৮	৫৫
বিহার	৩১	৫	৩৬
মধ্য-প্রদেশ	১৬	১	১৭
উড়িষ্যা	৯	০	৯
মোট	১৬৭	২০	১৮৭

(খ অনুচ্ছেদ)

প্রদেশ	সাধারণ	মুসলিম	শিখ	মোট
পঞ্জাব	৮	১৬	৪	২৮
উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ	০	৩	০	৩
সিন্ধু	১	৩	০	৪
মোট	৯	২২	৪	৩৫

(গ অনুচ্ছেদ)

প্রদেশ	সাধারণ	মুসলিম	শিখ	মোট
বাংলা	২৭	৩৩	০	৬০
আসাম	৭	৩	০	১০
মোট	৩৪	৩৬	০	৭০

সর্ব্বমোট ব্রিটিশ ভারত ...	২৯২
দেশীয় রাজ্যের সর্ব্বোচ্চ সংখ্যক প্রতিনিধি—	৯৩
	৩৮৫

চীফ কমিশনারের প্রদেশের প্রতিনিধি হিসাবে কেন্দ্রীয় ব্যবস্থা-পরিষদের দিল্লী ও আজমীঢ়-মাড়োয়ারের প্রতিনিধিদ্বয় এবং কুর্গ ব্যবস্থাপক সভা কর্ত্তৃক নির্ব্বাচিত একজন সদস্য (ক) অনুচ্ছেদে যুক্ত হইবেন। ব্রিটিশ বেলুচিস্থানের একজন প্রতিনিধি (খ) অনুচ্ছেদে যুক্ত হইবেন।

গণ-পরিষদের প্রাথমিক কার্য্যক্রম

(২) গণ-পরিষদে জনসংখ্যানুপাতে অনধিক ৯৩ জন দেশীয় রাজ্যের প্রতিনিধি থাকিবেন। ইঁহাদের নির্ব্বাচন প্রণালী আলোচনাদ্বারা স্থিরীকৃত হইবে। প্রারম্ভে একটি সালিশী কমিটি দেশীয় রাজ্যের প্রতিনিধিত্ব করিবেন।

(৩) নির্ব্বাচিত প্রতিনিধিগণ যথাসম্ভব শীঘ্র দিল্লীতে সমবেত হইবেন।

(৪) প্রারম্ভিক সভায় কার্য্যসূচী স্থির হইবে, সভাপতি ও অন্যান্য কর্ম্মচারী নির্ব্বাচিত হইবেন এবং বিংশসংখ্যক অনুচ্ছেদে বর্ণিত নাগরিকগণের সংখ্যালঘুদের, উপজাতীয় ও সংরক্ষিত অঞ্চলের অধিকার রক্ষার্থ এক উপদেষ্টা কমিটি গঠন করা হইবে। ইহার পরে প্রতিনিধিগণ পূর্ব্বে (ক), (খ), (গ) অনুচ্ছেদে বর্ণিত তিন দলে বিভক্ত হইবেন।

(৫) প্রত্যেক দল তাঁহাদের অনুচ্ছেদে বর্ণিত প্রদেশসমূহের শাসনতন্ত্র রচনা করিবেন।— সেই সকল প্রদেশ লইয়া কোন

মণ্ডলী প্রতিষ্ঠিত হইবে কিনা এবং হইলে সেই মণ্ডলী কোন্ কোন্ বিষয়ের ভার গ্রহণ করিবেন তাহা স্থির করিবেন। নিম্নে ৮নং উপধারায় বর্ণিত ব্যবস্থানুসারে কোন প্রদেশ মণ্ডলীর বাহিরে থাকিতেও পারে।

(৬) প্রতি অনুচ্ছেদের ও দেশীয় রাজ্যের প্রতিনিধিগণ যুক্তরাষ্ট্রের শাসনতন্ত্র রচনা করিতে পুনরায় সমবেত হইবেন।

৭। যুক্তরাষ্ট্রের গণপরিষদে যদি ১৫নং অনুচ্ছেদের ব্যবস্থার কোন পরিবর্ত্তন অথবা কোন গুরুতর সাম্প্রদায়িক প্রশ্ন উত্থাপিত হয়, উপস্থিত প্রতিনিধিগণের অধিকাংশের ও দুই প্রধান সম্প্রদায়ের পৃথক্ পৃথক্ ভাবে গৃহীত অধিকাংশ ভোটের দ্বারাই তাহা স্থিরীকৃত হইবে। গণপরিষদের সভাপতি কোন প্রস্তাবে গুরুতর সাম্প্রদায়িক প্রশ্ন জড়িত কিনা তাহা স্থির করিবেন এবং যদি দুই প্রধান সম্প্রদায়ের যে কোন এক সম্প্রদায়ের অধিকাংশ প্রতিনিধি দাবি করেন তাহা হইলে ফেডারেল কোর্টের পরামর্শ লইয়া তাঁহার সিদ্ধান্ত ঘোষণা করিবেন।

৮। নূতন শাসনতন্ত্র কার্য্যকরী হইবার পর যে কোনও প্রদেশ পূর্ব্বে যে দল বা গোষ্ঠীর সহিত তাহাকে সংযুক্ত করা হইয়াছিল তাহা হইতে বাহির হইয়া আসিতে পারে। নূতন শাসনতন্ত্রের বিধান অনুযায়ী সাধারণ নির্ব্বাচনের পরেই মাত্র ব্যবস্থা-পরিষদ এই সিদ্ধান্ত করিতে পারে।

২০। নাগরিকগণ সংখ্যালঘু সম্প্রদায় এবং উপজাতীয় সংরক্ষিত অঞ্চলের অধিকার সংরক্ষণার্থ যে উপদেষ্টা কমিটি গঠিত হইবে, তাহাতে সংশ্লিষ্ট স্বার্থবিশিষ্ট সকলের প্রতিনিধিত্ব থাকিবে। মৌলিক অধিকার, সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের রক্ষা-ব্যবস্থা এবং উপজাতীয় ও সংরক্ষিত অঞ্চলের শাসন-ব্যবস্থা বিষয়ক প্রস্তাব উপদেষ্টা কমিটি গণ-পরিষদে উপস্থিত করিবেন এবং এই সকল অধিকার কোন প্রাদেশিক গোষ্ঠী অথবা ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের শাসনতন্ত্রে লিপিবদ্ধ হইবে তাহাও বলিবেন।

অন্তর্ব্বর্ত্তীকালীন গবর্ণমেন্ট

২১। বড়লাট অবিলম্বে প্রাদেশিক ব্যবস্থা-পরিষদসমূহকে তাঁহাদের প্রতিনিধি নির্ব্বাচন করিতে এবং ভারতীয় রাজন্যবর্গকে সালিশী কমিটি গঠন করিতে অনুরোধ করিবেন। আমরা আশা করি, বিষয়বস্তুর জটিলতা সত্ত্বেও যথাসম্ভব ক্ষিপ্রতার সহিত শাসনতন্ত্র রচনার কার্য্য অগ্রসর হইবে এবং মধ্যবর্ত্তী সময় অতি সংক্ষিপ্তই হইবে।

২২। ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের গণ-পরিষদ ও ব্রিটেনের মধ্যে ক্ষমতা হস্তান্তর বিষয়ে সন্ধিপত্র রচিত হওয়া আবশ্যক হইবে।

২৩। শাসনতন্ত্র রচনাকার্য্য চলিতে থাকাকালীন ভারতের শাসনকার্য্য সুষ্ঠু ভাবে চলা অত্যাবশ্যক। প্রধান প্রধান রাজনৈতিক দলের সমর্থিত এক অন্তর্ব্বর্ত্তীকালীন সরকার সত্বর প্রতিষ্ঠা করা আমরা খুবই গুরুত্বপূর্ণ মনে করি। বর্ত্তমান সন্ধিক্ষণে ভারত-সরকারের এই কর্ত্তব্য পালনে সর্ব্বাধিক সহযোগিতার প্রয়োজন। দৈনন্দিন শাসনকার্য্য চালনা ছাড়াও আমাদিগকে দারুণ দুর্ভিক্ষের কবল হইতে দেশবাসীকে রক্ষা করিতে হইবে। মহাযুদ্ধের অবসানে ভারতের পুনর্গঠন পরিকল্পনার সুদূরপ্রসারী সিদ্ধান্ত করিতে হইবে এবং বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ আন্তর্জ্জাতিক সম্মেলনে ভারতের প্রতিনিধি প্রেরণ করিতে হইবে। এই সকলের জন্য জনগণের সমর্থনপুষ্ট সরকার অত্যাবশ্যক।

বড়লাট এ বিষয়ে আলোচনা আরম্ভ করিয়াছেন। তিনি আশা করেন, শীঘ্রই জনগণের আস্থাভাজন ভারতীয় নেতৃবৃন্দের মধ্য হইতে সমর-সচিব ও অন্যান্য সমস্ত বিষয়ের ভারপ্রাপ্ত ভারতীয় সদস্য লইয়া এক অন্তর্ব্বর্ত্তীকালীন সরকার প্রতিষ্ঠা করিতে পারিবেন। ব্রিটিশ সরকার ভারত-সরকারের এই পরিবর্ত্তনের গুরুত্ব অবশ্যই সম্পূর্ণরূপে উপলব্ধি করেন এবং শাসন-কার্য্যের দায়িত্ব পালনে এবং শীঘ্র ও সহজে ক্ষমতা হস্তান্তর সম্পূর্ণ করার কার্য্যে পূর্ণ সহযোগিতা করিবেন।

মন্ত্রী-মিশনের আবেদন

২৪। ভারতীয় নেতৃবৃন্দের এবং জনসাধারণের এখন পূর্ণ স্বাধীনতা লাভের সুযোগ উপস্থিত হইয়াছে এবং তাঁহাদিগের নিকট আমাদের শেষ বক্তব্য এই:—"আমাদের, আমাদের গবর্ণমেন্ট এবং আমাদের দেশবাসীদের আশা ছিল যে, ভারতবাসীরা যেরূপ নূতন রাষ্ট্রের অধীনে বাস করিতে চান তাহার গঠনপদ্ধতি সম্পর্কে তাঁহাদের নিজেদের মধ্যে ঐক্য প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব হইবে। কিন্তু ভারতীয় রাজনৈতিক দলসমূহের এবং আমাদের পরিশ্রম ও অশেষ ধৈর্য্য ও সদিচ্ছা সত্ত্বেও ইহা সম্ভবপর হয় নাই। আমরা আশা করি যে, সর্ব্ববিধ মত গ্রহণ করিয়া এবং অশেষ বিবেচনাপূর্ব্বক আমরা আপনাদের নিকট এখন যে প্রস্তাব উত্থাপন করিতেছি তাহা অতি অল্প সময়ের মধ্যে এবং অন্তর্বিপ্লব ও অন্তরকলহ ব্যতীতই আপনাদের স্বাধীনতা অর্জ্জন করিতে সক্ষম করিবে। আমাদের প্রস্তাব হয়ত আপনাদের সকল দলকে খুশী করিতে পারিবে না, কিন্তু আমাদের সহিত আপনারাও ইহা উপলব্ধি করিবেন যে, ভারতের ইতিহাসের এই শ্রেষ্ঠ মুহূর্ত্তে রাজনীতির দিক হইতে পরস্পর সহযোগিতার একান্ত প্রয়োজন, এই প্রস্তাব যদি আপনাদের নিকট গ্রহণযোগ্য না হয় তবে দেশের অবস্থা কি দাঁড়াইবে তাহাও বিবেচনা করিতে আপনাদের অনুরোধ করিতেছি। ভারতীয় দলসমূহের সহিত একযোগে ঐক্যের জন্য চেষ্টা করিয়া আমরা এই মত পোষণ করিতেছি যে, কেবল উক্ত দলসমূহের মধ্যে আপোষের দ্বারা শান্তিপূর্ণ উপায়ে মীমাংসা করার আশা অতি অল্প; সুতরাং হানাহানি, অরাজকতা এবং গৃহযুদ্ধ অনিবার্য্য। এইরূপ শান্তিভঙ্গের ফলাফল এবং স্থিতিকাল অনুমান করা কঠিন; কিন্তু ইহা নিশ্চিত যে, ইহাতে লক্ষ লক্ষ পুরুষ, নারী ও শিশু অত্যন্ত বিপন্ন হইবে। এই অবস্থাকে

ভারতীয় জনসাধারণ, আমাদের দেশবাসী এবং বিশ্বের জনসাধারণ সমভাবে ঘৃণা করিবে।

সুতরাং আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস, যে সহযোগিতা এবং সদিচ্ছার ভাব লইয়া আমরা আমাদের প্রস্তাব আপনাদের নিকট উপস্থিত করিতেছি, আপনারাও সেই ভাব লইয়াই তাহা গ্রহণ করিবেন এবং কার্য্যকরী করিয়া তুলিবেন। যাঁহারা ভারতের ভবিষ্যৎ মঙ্গল আকাঙ্ক্ষা করেন, তাঁহাদের নিকট আমাদের এই নিবেদন যে, তাঁহারা যেন তাঁহাদের দৃষ্টিভঙ্গী নিজেদের সম্প্রদায় এবং স্বার্থের প্রতি নিবদ্ধ না রাখিয়া চল্লিশ কোটি ভারতবাসীর স্বার্থের প্রতি দৃষ্টিপাত করেন।

আমরা আশা করি, নূতন স্বাধীন ভারত ব্রিটিশ সাধারণতন্ত্রের সভ্য হওয়াই বাঞ্ছনীয় মনে করিবে। আমরা আশা করি যে কোন অবস্থাতেই আপনারা আমাদের সহিত নিবিড় বন্ধুত্বসূত্রে আবদ্ধ থাকিবেন। অবশ্য ইহা আপনাদের ইচ্ছার উপরই নির্ভর করে। এই বিষয়ে আপনাদের ইচ্ছা যাহাই হউক, বিশ্বের মহান্ জাতিপুঞ্জের মধ্যে আপনাদের ক্রমবর্দ্ধমান উন্নতি হউক এবং আপনাদের ভবিষ্যৎ উজ্জ্বলতর হউক ইহাই আমাদের কাম্য।

সাংবাদিক বৈঠকে স্যর ষ্ট্যাফোর্ডের বিবৃতি

নয়াদিল্লী ১৬ই মে—বৃহস্পতিবার সাংবাদিক বৈঠকে বিবৃতিদান প্রসঙ্গে স্যর ষ্ট্যাফোর্ড বলেন, "আপনারা উভয় নেতার বক্তৃতাই শুনিয়াছেন। তাহা ছাড়া ঘোষণাপত্রখানি আপনাদের নিকট আছে। উক্ত ঘোষণা সম্পর্কে কয়েকটি কথা ব্যাখ্যা করিবার জন্ম মন্ত্রী-মিশন এই সাংবাদিক বৈঠক আহ্বান করিয়াছেন। আগামী কল্যও এইরূপ সাংবাদিক বৈঠক হইবে। তখন আপনারা আমাদের প্রশ্নাদি জিজ্ঞাসা করিতে পারিবেন।"

তিনি বলেন, "ঘোষণাটি মাত্র মন্ত্রী-মিশনের অর্থাৎ ঘোষণাপত্র স্বাক্ষরকারীদেরই ঘোষণা নহে। উহা ব্রিটিশ গবর্ণমেন্টের ঘোষণাও বটে, ঘোষণায় ভারতের নূতন শাসনতন্ত্র সম্পর্কে কোন কথা বলা হয় নাই। উল্লিখিত বিষয়গুলি কি ভাবে কার্য্যকরী করা হইবে সে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিয়া লাভ নাই। কি ধরণের শাসনতন্ত্র রচিত হইবে তাহার নির্দ্দেশ দেওয়ার কর্ত্তা আমরা নহি। আমরা মাত্র শাসনতন্ত্রের কাঠামো সংক্রান্ত দুই-একটি মূল বিষয়ের কথা বলিতে পারি এবং জনসাধারণের নিকট উহার জন্ম সুপারিশ জানাইতে পারি। আপনারা লক্ষ্য করিবেন, আমরা 'সুপারিশ' কথাটি ব্যবহার করিতেছি। অবশ্য আপনারা প্রশ্ন করিতে পারেন, আপনারা সুপারিশই বা করিবেন কেন—ভারতবাসীর হাতে উহার ভার ছাড়িয়া দিতেছেন না কেন? আমাদের উত্তর হইতেছে যে, আমরা ভারতের সর্ব্বশ্রেণীর লোককে যত শীঘ্র সম্ভব শাসনতন্ত্র রচনাকারী প্রতিষ্ঠানের আওতায় আনিতে উদ্‌গ্রীব। বস্তুতঃ এইখানেই সর্ব্বাপেক্ষা গুরুতর বাধা রহিয়াছে। আমরা এই বাধা অপসারণ করিয়া স্বাধীনভাবে ও দ্রুত শাসনতন্ত্র নির্মাণক প্রতিষ্ঠান গঠন করিতে সাহায্য করিতেছি মাত্র।

"এখানে চূড়ান্তভাবে নির্দ্ধারিত হইয়াছে যে, ভারতবর্ষ তাহার কাম্য পূর্ণ স্বাধীনতা পাইবে। স্বাধীন ভারত বৃটিশ কমনওয়েলথের ভিতরে অথবা বাহিরে থাকিবে তাহা তাহার ইচ্ছাধীন। ভারতের পূর্ণ স্বাধীনতা লাভ যাহাতে যত সম্ভব দ্রুত সম্পন্ন হয়, তজ্জন্ত আমরা বিশেষ উদ্‌গ্রীব। ভারতবাসীরা নিজেরা যখন তাহাদের রাষ্ট্রব্যবস্থা গঠন করিবে তখনই উহা সুসম্পন্ন হইবে। কিন্তু তাই বলিয়া আমরা উহার জন্ত তত দিন অপেক্ষা করিয়া থাকিতে পারি না। নূতন রাষ্ট্রব্যবস্থা প্রবর্ত্তন করিতে অবশ্যই কিছুদিন অতিবাহিত হইবে। বড়লাট অবিলম্বে একটি প্রতিনিধিমূলক ভারতীয় গবর্ণমেন্ট গঠনের কার্য্য আরম্ভ করিয়া দিয়াছেন। আশা করা যায় যে, তিনি দ্রুত নূতন প্রতিনিধিমূলক গবর্ণমেন্ট গঠন করিতে সক্ষম হইবেন।

অন্তর্ব্বর্ত্তীকালীন সরকারের দায়িত্ব

"অন্তর্ব্বর্ত্তীকালীন যে সরকার গঠিত হইবে, তাহার দায়িত্বভার অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। খাদ্যসঙ্কটই সর্ব্বাপেক্ষা প্রধান সমস্যা। এই সমস্যার কথা মনে রাখিয়া যাহাতে ভারতীয়গণ কর্ত্তৃক শাসনভার গ্রহণের কাজটি নির্ব্বিঘ্নে সম্পন্ন হয় তাহার প্রতি লক্ষ্য রাখা একান্ত প্রয়োজন। আসন্ন দুর্ভিক্ষের সময় শাসনব্যবস্থা ও যানবাহন চলাচল ব্যবস্থাও অচল হইয়া পড়িলে ভারতের লোকেরা মৃত্যুমুখে পতিত হইবে। তাই সকল দল ও সম্প্রদায়ের মধ্যে সহযোগিতার প্রয়োজনের উপর এত জোর দেওয়া হইতেছে।

ব্রিটেন কবে ভারত ছাড়িবে

"বৃটেন ও ভারতের মধ্যে শাসনতন্ত্রগত যে সম্পর্ক এখন বিদ্যমান রহিয়াছে তাহা কবে ছিন্ন হইবে, আপনাদের মধ্যে কেহ কেহ হয়ত তাহা মনে মনে ভাবিতেছেন। বস্তুতঃ শাসনতন্ত্র গঠন করিতে কত সময় লাগিবে তাহা ভারতের উপর নির্ভর করে। কিন্তু একটা কথা খুবই সত্য, আপনারা যত শীঘ্র আরম্ভ করিয়া যত শীঘ্র উহা শেষ করিবেন, ইউনিয়ন, প্রদেশ বা আপনাদের ইচ্ছা হইলে বিভিন্ন প্রদেশ লইয়া গঠিত গ্রুপগুলির হাতে ক্ষমতা অর্পণ করিয়া তত শীঘ্র আমরা সরিয়া যাইব। ইহা কিন্তু সুপারিশ নহে—ইহা আমাদের সিদ্ধান্ত বলিয়া জানিবেন। অবিলম্বেই শাসনতন্ত্র গঠনের ব্যবস্থা গ্রহণের সিদ্ধান্ত করা হইয়াছে। কিন্তু তাই বলিয়া কি ধরণের শাসনতন্ত্র গঠিত হইবে সে সম্পর্কে আমরা কোন সিদ্ধান্ত করি নাই। দেশবাসীর প্রতিনিধিদের দ্বারা উহা নির্ণীত হইবে। শাসনতন্ত্র গঠনের কাজে যে অচল অবস্থা সৃষ্টি হইয়াছিল, তাহা অবিলম্বে এবং চিরতরে দূর করিয়া ফেলাই ইহার উদ্দেশ্য।

সুপারিশের অর্থ

"আমাদের বিশ্বাস যে, আমাদের সুপারিশের ভিত্তিতে উভয় দলই শাসনতন্ত্র-গঠন-পরিষদে যোগ দিবেন। সহজে উক্ত সুপারিশ বানচাল করা যায় এইরূপ বিধান দেওয়া থাকিলে ন্যায়সঙ্গত কাজ করা হইত না। তাই আমরা ব্যবস্থা করিয়াছি যে, উভয় সম্প্রদায়ের অধিকাংশ লোকের সম্মতি ছাড়া উহা বাদ দেওয়া যাইবে না। অর্থাৎ আমাদের সুপারিশ যে বাদ দেওয়া যাইবে না তাহা নয়, কিন্তু উহা করিতে হইলে বিশেষ অবস্থার প্রয়োজন হইবে।

তিন শ্রেণীতে বিভক্ত করার মর্ম্ম

"প্রদেশগুলিকে যে কেন তিন শ্রেণীতে বিভক্ত করা হইল সম্ভবতঃ আপনাদের মনে সে সম্পর্কে প্রশ্ন আছে। বস্তুতঃ কাজ আরম্ভ করিবার পূর্ব্বে প্রদেশগুলিকে কোন না কোন ভাবে শ্রেণীবদ্ধ করিতেই হইত। দুই ভাবে ইহা করা সম্ভব ছিল। বর্ত্তমানে যেভাবে প্রদেশগুলি রহিয়াছে হয় সেইভাবেই তাহাদের বিভিন্ন শ্রেণীতে বিভক্ত করা আর না হয়ত শাসনতন্ত্র রচনার কাজ সম্পূর্ণ হইবার পর নূতন গবর্ণমেণ্ট গঠন করিয়া তাহাদের ইচ্ছামত শ্রেণীবদ্ধ হইতে দেওয়া যাইতে পারিত। আমরা দুই কারণে দ্বিতীয় পন্থা সমর্থন করিয়াছি। প্রথমতঃ, কংগ্রেস এই ধরণের ব্যবস্থার পরামর্শ দিয়াছিলেন। তাঁহারা চাহিয়াছিলেন যে, প্রথমে সকল প্রদেশকেই আনিতে হইবে, তবে কোন প্রদেশ যদি উক্ত শাসনতন্ত্র অনুযায়ী চলিতে ইচ্ছুক না হয় তাহা হইলে তাহাকে পরে বাহির হইয়া যাইতে দিবার ব্যবস্থা রাখিতে হইবে। দ্বিতীয়তঃ, সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারার ফলে সংখ্যালঘিষ্ঠ সম্প্রদায়গুলিকে আইন সভায় যে অতিরিক্ত আসন দিবার ব্যবস্থা করা হইয়াছিল, তাহার ফলে বর্ত্তমান আইন সভাগুলিকে প্রকৃতপক্ষে প্রতিনিধিমূলক বলা যায় না।

বয়স্ক ভোটাধিকারের প্রশ্ন

"বয়স্ক ভোটাধিকার প্রবর্ত্তনের জন্য আমরা বিশেষ চেষ্টা করিয়াছিলাম। কিন্তু উহা করিতে হইলে অন্ততঃ পক্ষে দুই বৎসর সময় লাগিবে। অথচ তত দিন পর্য্যন্ত অপেক্ষা করা চলে না। উহা আপাততঃ পরিহার করা হইয়াছে। পরবর্ত্তী নির্ব্বাচনের সময় প্রশ্নটি তোলা যাইতে পারিবে।

দেশীয় রাজ্যগুলির অবস্থা

"দেশীয় রাজ্যগুলি সম্পর্কে দুই-একটি কথা বলা প্রয়োজন। নূতন শাসনতন্ত্র রচিত হইবার পর তাহাদের সার্ব্বভৌমত্ব বজায় রাখা যে সম্ভব নহে অথচ উহা যে হস্তান্তরিত করাও সম্ভব নহে তাহা পরিষ্কার বুঝা যায়। দেশীয় রাজ্যগুলি ইউনিয়নের মধ্যে থাকিয়া আলোচনা চালাইতে ইচ্ছুক বলিয়া জানাইয়াছেন। তাই আমরা উহার ভার দেশীয় রাজ্যগুলি ও বৃটিশ ভারতের অন্যান্য দলের মধ্যে আলাপ-আলোচনা দ্বারা মীমাংসা করার জন্য ছাড়িয়া দিয়াছি।

সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের স্বার্থ

"আর একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন আছে—ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সংখ্যালঘিষ্ঠ সম্প্রদায় উপজাতীয় শ্রেণী এবং শাসনসংস্কারবহির্ভূত অঞ্চল লইয়া আমরা বিশেষ অসুবিধার মধ্যে পড়িয়াছিলাম। লোকসংখ্যানুপাতে তাহাদের জন্য অধিক সংখ্যক আসনের ব্যবস্থা করা যেমন সুষ্ঠুভাবে শাসনতন্ত্র কার্য্যকরী করার দিক হইতে অসুবিধাজনক তেমনই তাহাদের জন্য সামান্য সংখ্যক আসনের ব্যবস্থা করাও নিরর্থক। তাই দুইভাবে আমরা সংখ্যালঘিষ্ঠ সম্প্রদায়ের সমস্যা সমাধান করিতে চেষ্টা করিয়াছি। বড় বড় সংখ্যালঘিষ্ঠ সম্প্রদায়গুলি [যথা মুসলমান প্রধান অঞ্চলে হিন্দু, হিন্দু প্রধান অঞ্চলে মুসলমান, পঞ্জাবের শিখ সম্প্রদায় এবং তপশীল জাতিসমূহ] শাসনতন্ত্র নিয়ামক পরিষদে তাহাদের জনসংখ্যা অনুপাতে আসন পাইবে। পক্ষান্তরে এই সকল সম্প্রদায় এবং ভারতীয় খ্রীষ্টান, এ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান, উপজাতীয় জাতি প্রভৃতির মূল স্বার্থগুলির তালিকা রচনার জন্য শাসনতন্ত্র নিয়ামক পরিষদ কর্ত্তৃক একটি পরামর্শদাতা কমিশন গঠন করা হইবে বলিয়া আমরা সুপারিশ জানাইয়াছি। —এ. পি.

সাংবাদিকদের প্রশ্নের উত্তরে ভারতসচিব

প্রশ্ন—প্রদেশগুলির যদি বিভিন্ন দল (গ্রুপ) হইতে ইচ্ছামত বাহির হইয়া আসার অধিকার থাকে তবে তাহারা কি ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্র হইতেও ইচ্ছানুযায়ী বিচ্ছিন্ন হইতে পারিবে?

ভারতসচিব উত্তরে বলেন—২ বৎসরের মধ্যে উহারা ইচ্ছানুযায়ী বাহির হইয়া আসিতে পারিবে না। তবে ১০ বৎসরের পরে তাহাদের রাষ্ট্র ব্যবস্থার সংশোধন দাবি করার অধিকার থাকিবে।

প্রশ্ন—আসামে আছে কংগ্রেসী মন্ত্রিসভা এবং বাংলায় লীগ মন্ত্রিসভা। এখন ধরুন, যদি আসাম বাংলার সহিত যুক্ত-প্রদেশ গঠন করিতে রাজী না হয়, তাহা হইলে সে কি অন্য কোন দলে (গ্রুপে) যোগ দিতে পারিবে না?

উত্তর—এই কারণেই বাহির হইয়া আসার অধিকারের কথা পরে আসে—বাহির হইয়া আসার ইচ্ছা কাজে পরিণত করার পূর্ব্বেই সমস্ত জিনিষটি ভাল করিয়া বুঝিতে হইবে।

প্রশ্ন—কোন প্রদেশ যদি তাহার নির্দ্দিষ্ট দল (গ্রুপ) হইতে অন্য দলে (গ্রুপে) যাইতে চায় তবে সে কি তাহা করিতে পারিবে?

উত্তর—এ প্রশ্নের উত্তর বিবৃতির মধ্যে দেওয়া হয় নাই। তবে গণপরিষদ যথাযোগ্য সময়ে এই বিষয়টি লইয়া আলোচনা করিবেন। এখন কোন প্রদেশের এক দল হইতে অন্য দলে যাইবার অধিকার যদি স্বীকার করা হয় এবং অপর দল যদি তাহাকে গ্রহণ করিতে রাজী না হয়, তবে একটা বিসদৃশ অবস্থার সৃষ্টি হইবে।

প্রশ্ন—কোন প্রদেশকে যে দলের অন্তর্ভুক্ত করা হইয়াছে যদি সেই দলে সে না থাকিতে চায়, তবে সে কি উক্ত দলের বাহিরে থাকিতে পারিবে ?

উত্তর—বিবৃতিতে ক, খ এবং গ এই যে তিনটি দলের কথা বলা হইয়াছে, প্রদেশগুলি আপনা হইতেই সেই দলের একটি না একটির মধ্যে পড়ে। বিবৃতিতে প্রদেশগুলিকে যে যে দলের অন্তর্ভুক্ত করা হইয়াছে, সেই দলগুলি তখন স্থির করিবে যে, কোন যুক্তপ্রদেশ গঠন করা হইবে কি না এবং হইলে তাহার শাসনতন্ত্রই বা কিরূপ হইবে। এই সব দল মিলিয়া যে যে যুক্তপ্রদেশ গঠিত হইবে তাহা হইতে কোন প্রদেশ ইচ্ছামত বাহির হইয়া আসিতে পারিবে কি না, সে প্রশ্ন উঠিবে রচিত শাসনতন্ত্রানুযায়ী আইন সভায় প্রথম নির্ব্বাচনের পর। ইহার পূর্ব্বে এ প্রশ্ন উঠে না।

প্রশ্ন—দশ বৎসর পরে কোন প্রদেশ তাহার শাসন-পরিষদের অধিকাংশ সদস্যের মতানুসারে শাসনতন্ত্র পুনর্ব্বিবেচনা করার কথা বলিতে পারে—এইরূপ ব্যবস্থার উল্লেখ করা হইয়াছে। শাসনতন্ত্র 'পুনর্ব্বিবেচনা করা'—এই কথার মধ্যে বিচ্ছিন্ন হইবার অধিকার সম্পর্কে কিছু বলা হইয়াছে কি ?

উত্তর—শাসনতন্ত্র পুনর্ব্বিবেচনা করিতে চাহিলে উহা করা যাইতে পারিবে। যে কোন প্রদেশ শাসনতন্ত্র পুনর্ব্বিবেচনা করার কথা বলিতে পারে। পুনর্ব্বিবেচনা যখন করা হইবে, তখন শাসনতন্ত্রের সব বিষয় লইয়াই আলোচনা চলিতে পারিবে।

প্রশ্ন—বিবৃতির 'খ' দলের প্রদেশগুলি মুসলমান প্রধান। তাহারা যদি সিদ্ধান্ত করে যে, যুক্তরাষ্ট্রে তাহারা যোগ দিবে না তাহা হইলে কি অবস্থা হইবে ?

উত্তর—তাহা হইলে যে সর্ত্তের উপর এই সমস্ত লোক শাসনতন্ত্র রচনার উদ্দেশ্যে মিলিত হইয়াছে, তাহা ভঙ্গ করা হইবে। সুতরাং এ সম্বন্ধে যদি বিশেষ জোর দেওয়া হয়, তাহা হইলে শাসনতন্ত্র রচনাকারী প্রতিষ্ঠান ভাঙিয়া যাইবে। যে সর্ত্তের উপর তাহারা এক হইয়াছিল, এ কথা তাহার সম্পূর্ণ বিরোধী। এখন তাহারা প্রথমে যে সর্ত্ত মানিয়া লইয়াছে পরে তাহা মানিতে অস্বীকার করিবে—এরূপ সম্ভাবনা আমরা চিন্তা করি নাই।

প্রশ্ন—বিবৃতির 'খ' দলের প্রদেশগুলি কি দশ বৎসর পরে একটি স্বতন্ত্র আত্ম-কর্ত্তৃত্ব-সম্পন্ন রাষ্ট্রগঠনের সিদ্ধান্ত করিতে পারে ?

উত্তর—শাসনতন্ত্রই যদি পুনর্ব্বিবেচনা করা হয়, তাহা হইলে ইহার সংশোধনের সকল প্রস্তাবই আলোচিত হইতে পারে। এখন কোন প্রস্তাব গ্রহণ করা হইবে কিনা তাহা সম্পূর্ণ ভিন্ন প্রশ্ন।

প্রশ্ন—ধরুন, কোন দল যদি যুক্তরাষ্ট্রের গণ-পরিষদে যোগ দিতে না চায়, তাহা হইলে তাহাদের অবস্থা কি হইবে ?

উত্তর—এটা একটা সম্পূর্ণ কল্পনার জিনিষ। কেহ যদি অসহযোগিতা করে, তখন কি করা হইবে সে সম্পর্কে পূর্ব্ব হইতেই ঠিক কোন সিদ্ধান্ত করা যায় না। তবে বিবৃতিতে যেরূপ ভাবে শাসনতন্ত্র রচনা করার কথা বলা হইয়াছে সেই ভাবেই অগ্রসর হওয়ার পূর্ণমাত্রায় অভিপ্রায় আছে। কোন ব্যক্তি বা দল যদি ইহাতে বাধা সৃষ্টির চেষ্টা করে, তখন কি হইবে সে এখন বলার জন্য আমি তৈয়ারী নাই। তবে বর্ত্তমানে বিবৃতি অনুসারেই কাজ করিয়া যাওয়ার ইচ্ছা আছে।

প্রশ্ন—বাণিজ্যশুল্ক, আয়কর এবং অন্যান্য সমস্ত কর ধার্য্য করিবার ক্ষমতা যুক্তরাষ্ট্রকে দেওয়ার অধিকার গণপরিষদের থাকিবে কি ?

উত্তর—মন্ত্রী-মিশনের বিবৃতিতে আর্থিক ব্যাপার সম্পর্কিত যে ব্যবস্থা করা হইয়াছে গণপরিষদ তাহার যে কোনরূপ ব্যাখ্যা করিতে পারে। তবে বড় রকমের সাম্প্রদায়িক প্রশ্নে উপস্থিত অধিকাংশ সদস্যের সমর্থন এবং দুইটি বৃহৎ সম্প্রদায়ের ভোটের প্রয়োজন। ইহা ছাড়া গণপরিষদ ভোটাধিক্যে যে কোন প্রস্তাব গ্রহণ করিতে পারিবে। —এ পি

কমন্স সভায় ভারত-প্রসঙ্গ আলোচনা

লণ্ডন ১৬ই মে—ব্রিটিশ মন্ত্রীমিশন ভারতে এক নূতন শাসনতন্ত্র গঠনের ব্যবস্থাকল্পে হোয়াইট পেপারের যে পরিকল্পনার খসড়া করিয়াছেন অদ্য অপরাহ্নে কমন্স সভায় ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী মিঃ এটলী তাহা কৌতূহলী সদস্যদের নিকট পাঠ করেন। উক্ত পরিকল্পনানুসারে ভারতের প্রধান দলগুলির নিকট ছয়টি প্রস্তাব উপস্থাপিত করা হইতেছে। ভারতে অবিলম্বে অন্তর্ব্বর্ত্তীকালীন সরকার প্রতিষ্ঠা করা পরিকল্পনার উদ্দেশ্য। অন্তর্ব্বর্ত্তী সরকারের দপ্তরসমূহ এমনকি সমরদপ্তরও ভারতীয় নেতৃবৃন্দের হাতে চলিয়া যাইবে।

ব্রিটিশ সরকার পরিকল্পনাটি পূর্ণ সমর্থন করিতেছেন। পরিকল্পনার অন্তর্ভুক্ত প্রস্তাবাবলীতে ক্ষুদ্র ও বৃহৎ সকল দলের লোকের প্রতিই সুবিচার করিবার চেষ্টা হইয়াছে। ভারতীয়দের দ্বারা ভারতীয়দের স্বার্থের অনুকূল এক শাসনতন্ত্র নির্দ্ধারণের ব্যবস্থা করা পরিকল্পনার লক্ষ্য। ফেব্রুয়ারী মাসে ভারতে মন্ত্রী-মিশন প্রেরণ করার সিদ্ধান্ত হয়। সেই সময় ব্রিটিশ সরকার দুইটি মূলনীতি দ্বারা অনুপ্রাণিত হইয়াছিলেন। প্রথম নীতি ছিল এই যে, ভারত ব্রিটিশ যৌথরাষ্ট্রের অন্তর্ভুক্ত থাকিবে অথবা বাহিরে থাকিবে তাহা ভারতই নির্দ্ধারণ করিবে। দ্বিতীয় নীতি হইতেছে তদুদ্দেশ্যে ভারতীয়গণ স্বয়ং এমন এক বা একাধিক শাসনতন্ত্র রচনা করিবেন যাহা ভারতের প্রধান দলগুলির সম্মতি ও অনুমোদন লাভ করিয়াছে।

মন্ত্রী-মিশনের আলাপ-আলোচনাকালে ইহা স্পষ্ট প্রতীয়মান হইয়াছে যে, ঔপনিবেশিক মর্য্যাদাই ভারতের লক্ষ্যবস্তু নহে, পূর্ণ স্বাধীনতাই তাহার একমাত্র উদ্দেশ্য।

বিরোধী দলের নেতা মিঃ চার্চিল বলেন, আমি মনে করি এই উপযুক্ত ও বিবাদময় দলিল পাঠ করিয়া প্রধানমন্ত্রী ভালই করিয়াছেন। কেবলমাত্র প্রচারের পরিবর্ত্তে ইহা পাঠ করিয়া তিনি উপযুক্ত কাজই করিয়াছেন। আমাদের সম্মুখে যে দীর্ঘ জটিল বিষয়টি উপস্থাপিত হইয়াছে, এ সম্বন্ধে অদ্য সন্ধ্যাতেই কোনরূপ মন্তব্যের চেষ্টা করা আদৌ বুদ্ধিমানের কাজ হইবে না। ১৯৪২ সালে ক্রিপস প্রস্তাব ব্যর্থতায় পর্য্যবসিত হয়। বৃটিশ প্রস্তাবের প্রস্তাবে মিঃ গান্ধী সেই সময় জবাব দিয়াছিলেন ভারত ছাড় ধ্বনি তুলিয়া। তিনি এবং কংগ্রেস তখন একটা বিদ্রোহ করার চেষ্টা করেন। এই প্রস্তাব যখন উপস্থাপিত করা হইয়াছিল তখন ভারতবর্ষের নিরাপত্তা সাংঘাতিক রকমে বিপন্ন হইয়াছিল। জাপানী আক্রমণ ও তাহার প্রত্যক্ষ ফল হইতে আত্মরক্ষার জন্য আমি তাহাদের সহিত বুঝাপড়া করিতে চাহিয়াছিলাম। কিন্তু ক্রীপস মিশন ব্যর্থ হইল। সেই বিদ্রোহের ফলে সংবাদ আদান-প্রদান ব্যবস্থা বিকল করা হয়। কিন্তু উহার উপর নির্ভর করিয়াই সম্ভাবিত জাপ আক্রমণের বিরুদ্ধে লড়িতেছিল। এই বিদ্রোহ সহজেই এবং অল্প জীবননাশের মধ্যেই দমিত হয়। ভারতবর্ষকেও বহিরাক্রমণ হইতে সাফল্যের সহিত রক্ষা করা হয়। সমস্ত চেষ্টা সত্ত্বেও আমাদের ১৯৪২ সালের প্রস্তাব অগ্রাহ্য হইবার পরও আমরা সমানে চেষ্টা করিয়া যাইতে থাকি। তার পর বৃটেনে কোয়ালিশন সরকারের অবসান হইলে পর যখন পুরাদস্তুর রক্ষণশীল সরকার গদীতে আসীন ছিলেন তখনও গত বৎসর ১৪ই জুন তারিখে তদানীন্তন ভারতসচিব মিঃ আমেরি এসম্পর্কে যে উক্তি করিয়াছিলেন তাহাও এই প্রসঙ্গে স্মরণযোগ্য। গত ফেব্রুয়ারী মাসে ভারতে মন্ত্রীমিশন প্রেরণের প্রস্তাব উত্থাপিত হইলে পর মিঃ এন্টনী ইডেন মিঃ আমেরি সেই উক্তি আবার নূতন করিয়া উদ্ধৃত করিয়াছিলেন, সেই উক্তি এই :

বিবৃতিতে স্পষ্টই বলা হইয়াছে যে, ১৯৪২ সালে মার্চ্চ মাসে যে প্রস্তাব করা হইয়াছিল তাহার সবটুকুই এখনও বলবৎ আছে। ঐ প্রস্তাবটি দুইটি মূলনীতির উপর নির্ভর করিয়া রচিত হইয়াছিল। প্রথমতঃ নিজের ভাগ্যনিয়ন্ত্রণে ভারতের পূর্ণ অধিকার কোনক্ষেত্রেই ক্ষুণ্ণ করা চলিবে না এবং বৃটিশ কমনওয়েলথের ভিতরে থাকা আর না থাকা সম্পূর্ণরূপে ভারতের মর্জ্জির উপর নির্ভর করিবে। দ্বিতীয় নীতি হইতেছে এই যে, এই স্বাধীনতা লাভের জন্য যে শাসনতন্ত্র রচনা করিতে হইবে, তাহা রচনায় কাজ ভারতের সম্পূর্ণ নিজস্ব ব্যাপার। তাই এই শাসনতন্ত্র গঠনে ভারতের জাতীয় জীবনের প্রধান দলগুলির সম্মতি থাকা আবশ্যক। আলাপ-আলোচনার মধ্যে একটা জিনিষ বেশ স্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছিল, তাহা হইতেছে এই যে এবারের এই সমস্ত আলোচনার লক্ষ্য বস্তু ছিল অবিলম্বে পূর্ণ স্বাধীনতা স্বীকার—ঔপনিবেশিক স্বায়ত্ত শাসন এবং পরে কমনওয়েলথ হইতে পৃথক হইবার অধিকার নয়। এই আলোচনার ফলাফলের গুরুত্ব এই সভার সদস্যগণ উপলব্ধি করিয়াছিলেন কিনা সে বিষয়ে আমার খুব স্পষ্ট ধারণা ছিল না—তবে বিষয়টি আমার নিকটও অনেকটা অপ্রত্যাশিত বলিয়া মনে হইয়াছিল। নূতন প্রস্তাবটির প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে মনে হইবে যেন ইহার দ্বারা ভারতের ভবিষ্যৎ শাসনতন্ত্র রচনার দায়িত্ব ভারতের রাজনৈতিক দলগুলির স্কন্ধ হইতে বৃটিশ সরকার নিজের স্কন্ধে গ্রহণ করিলেন এবং সেই কারণেই ব্রিটিশ সরকার নিজেই যেন এক বিস্তারিত পরিকল্পনা হাজির করিয়াছেন। কিন্তু এই দায়িত্ব গ্রহণ স্পষ্টতঃই অন্যায় বলিয়া অনুমিত হয়। ইহা ব্যতীত মন্ত্রী-মিশনকে যখন প্রেরণ করা হয়, তখন এই প্রকার কোন উদ্দেশ্য ছিল বলিয়া আমাদের ধারণা হয় নাই। ভারতের প্রধান দলগুলির মতের বিরুদ্ধে ব্রিটেন কর্ত্তৃক প্রস্তুত একটি শাসনতন্ত্র ব্রিটিশের অস্ত্রের সাহায্যে তাহাদের উপর যে জোর করিয়া চাপাইয়া দেওয়া চলে না সে বিষয়ে কাহারও দ্বিমত নাই বলিয়া আমার বিশ্বাস। (হর্ষধ্বনি) ভারতের সংখ্যালঘিষ্ঠ ও দেশীয় রাজ্যগুলির প্রতিও আমাদের দায়িত্ব রহিয়াছে। পরীক্ষা করিতে হইবে, এই প্রস্তাবের দ্বারা আমাদের সকল দায়িত্ব প্রতিপালিত হইয়াছে কিনা। প্রথমেই মনে পড়ে মুসলমানদের কথা। ভারতের ন্যায় এক ছোটখাট মহাদেশের মধ্যে এই সম্প্রদায় অতি শক্তিশালী। ইহাদের সংস্কৃতি রক্ষা করা ভারতের শান্তি বিধানের জন্য প্রয়োজনীয়। ইহা ব্যতীত প্রায় ৬ কোটি অস্পৃশ্য রহিয়াছে। তাহাদের কথাও বিবেচনা করিতে হইবে। ইহাদের সম্পর্কে ব্রিটিশ সরকার বহুবার প্রতিশ্রুতি দিয়াছেন। সর্ব্বশেষে দেশীয় রাজ্যেরও সহিত ব্রিটিশ সরকার ও নূতন ভারত সরকারের সম্পর্ক কি হইবে তাহাও বিবেচ্য। দেশীয় রাজ্যে ভারতের এক-চতুর্থাংশ লোকের বাস ; উহা ভারতের এক-তৃতীয়াংশ অধিকার করিয়া রহিয়াছে। বর্ত্তমানে ঐ সম্পর্ক পবিত্র চুক্তির দ্বারা আবদ্ধ এবং সম্রাটের সার্ব্বভৌম ক্ষমতার অধীন। আপাতদৃষ্টিতে ঐ সম্পর্কে বাতিল করিতে হইবে। যে কোনও অর্থ করা যাইতে পারে এমন একটি ভুয়া কথার দ্বারা এই সার্ব্বভৌমত্বের প্রশ্নকে বাতিল করিয়া দেওয়া হইবে এবং দেশীয় রাজ্যগুলি এক বেওয়ারিশ অঞ্চলে পরিণত হইবে এবং যদি উহাই হয়, তাহা হইলে ঐ চুক্তির সমস্ত দায়িত্ব বিলীন হইয়া যাইবে। এই সমস্ত সমস্যা ও শ্বেতপত্র পাঠে সদস্যদের মনে আরও যে সমস্ত প্রশ্ন উদিত হইবে তাহা বিবেচনা করিতে আরও কয়েক সপ্তাহ ধরিয়া গভীর ও ঐকান্তিক বিবেচনার প্রয়োজন হইবে। সুতরাং আমার মতে এই অবস্থায় সমগ্র বিতর্কমূলক বিষয়টি অবতারণা করা অথবা খণ্ড খণ্ড ভাবে আলোচনা করা উচিত হইবে না। অন্তর্ব্বর্ত্তী কালীন সরকার প্রতিষ্ঠা অথবা একটি মীমাংসায় উপনীত হওয়া সম্ভব হইলে কিরূপ আইন প্রণয়নের

প্রয়োজন হইবে আমরা এখন পর্য্যন্ত তাহা জানি না। নূতন শাসনতন্ত্র প্রণয়ন ও রাজার ভারত সম্রাট উপাধি বাতিল করিতে হইলেই বা কি আইন প্রণয়ন করিতে হইবে তাহাও আমরা জানি না। সুতরাং আমি বিরোধীদলের পক্ষ হইতে বলিতে চাই যে, এক নূতন পরিস্থিতির উদ্ভব হইয়াছে। দৃশ্যমান ঘটনার আলোকে আমরা এই পরিস্থিতির পর্য্যালোচনা করিতে বাধ্য এবং ভবিষ্যতে আমরা কি পন্থা গ্রহণ করিব সেই সম্পর্কে আমাদের অবাধ স্বাধীনতা রহিল।

উদারনৈতিক নেতার বক্তৃতা

উদারনৈতিক দলের নেতা মিঃ ডেভিস বলেন যে প্রধান মন্ত্রী এক উল্লেখযোগ্য বক্তৃতা করিয়াছেন। ভারতীয়রা ইহা কি ভাবে নেয়, তাহা না দেখা পর্য্যন্ত আমাদের অপেক্ষা করিতে হইবে। মিঃ ডেভিস ইহার পর অর্থনৈতিক প্রভৃতি বিষয়ে আলোকপাত করেন। মিঃ বিড (শ্রমিক সদস্য) বৃটিশ সরকারকে সম্বর্দ্ধনা জানাইয়া বলেন যে, মিঃ চার্চ্চিল এই পরিস্থিতিকে বেদনাদায়ক বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। মিঃ চার্চ্চিলের মুখ হইতে উহা আশ্চর্য্যকর কিছু নহে। ১৮৩৩ সালে লর্ড মেকলে বলিয়াছিলেন, যে দিন ভারতীয়দের হস্তে আমরা ক্ষমতা হস্তান্তরিত করিতে পারিব সে দিন ইংলণ্ডের ইতিহাসে পরম শুভদিন। আমরা আজ যাহা ভারতের জন্য করিতেছি, বহু বৎসর পূর্ব্বে তাহাই আমরা কানাডার জন্য করিয়াছি।

কমু্যনিষ্ট সদস্যের উক্তি

কম্যুনিষ্ট সদস্য মিঃ গালাচার বলেন যে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের ইতিহাস মোটেই গৌরবোজ্জ্বল নয়। ভারতের বহু খনিজ সম্পদ, বহু জনশক্তি থাকা সত্ত্বেও তাহার ১৯০৯ সাল পর্য্যন্ত একটি কামান ও বন্দুক প্রস্তুত করিবার মত ক্ষমতা ছিল না। ভারতে আজ দুর্ভিক্ষ আসন্ন, ইহাতে ব্রিটেনের কৃতিত্ব কোথায়? আমরা এখন পরিষ্কার করিয়া বুঝিতে পারিতেছি যে, প্রাচীন শাসনতন্ত্রের দিন অবসান হইয়াছে; ভারতে আজ বিপ্লব আসন্ন। আমার মনে আছে, যখন মন্ত্রী-মিশন ভারতে যাইতেছিলেন তখন মিঃ এটলি পূর্ণ স্বাধীনতার কথা বলেন; কিন্তু যখন সাম্রাজ্যবাদী সদস্যরা তাহাতে আনন্দ প্রকাশ করেন, তখন বিস্মিত হইয়াছিলাম। বুঝিয়াছিলাম, সেখানে একটা 'খেল' দেখাইতে ইহারা চলিয়াছে। ভারতে দুইটি বৃহৎ প্রতিষ্ঠান রহিয়াছে। মন্ত্রী-মিশন তাহাদের মধ্যে মিলন না আনিয়া চরম বিচ্ছেদের সৃষ্টি করিয়াছেন। জনগণের বিরুদ্ধে তাঁহারা ধনিক ও আধা-ধনিক মধ্যবিত্তদের সমর্থন লাভের চেষ্টা করিয়াছেন। আজ ভারতে দুর্ভিক্ষ আসন্ন। তাহার হাত হইতে আত্মরক্ষার জন্য সর্ব্বজনগ্রাহ্য নীতি গ্রহণ করা উচিত ছিল। সেনাবাহিনী সম্পর্কে বিবিধ কথা বলিয়া মিঃ গালাচার বলেন যে প্রথমে পূর্ণ স্বাধীনতার কথা ঘোষণা করিয়া সৈন্যাপসারণ করা উচিত, তাহার পর কংগ্রেস নেতৃবৃন্দের হস্তে ক্ষমতা অর্পণ করা উচিত। রক্ষণশীল সদস্য আর্ল উইন্টারটন প্রশ্ন করেন, মুসলমানদের কি হইবে। মিঃ গালাচার তদুত্তরে বলেন যে, কংগ্রেস সংখ্যাগরিষ্ঠদল; সে ক্ষমতা হাতে লইয়া মুসলমানদের দলে টানিবার চেষ্টা করিবে। এই উত্তরে আর্ল উইন্টারটন উচ্চ হাস্য করেন। তখন মিঃ গালাচার বলেন কংগ্রেসের হস্তে ক্ষমতা অর্পণ করা হইলে পরিস্থিতি অন্যরূপ হইত। ইহার পর অধিবেশন মুলতুবী থাকে। লর্ড সভায় উপনিবেশসচিব লর্ড এ্যাডিসন হোয়াইট পেপার পাঠ করেন। লর্ড সাইমনের এক প্রশ্নের উত্তরে লর্ড এ্যাডিসন বলেন যে, অন্তর্ব্বর্ত্তীকালীন সরকারের সময় শাসন-পরিষদের সদস্যগণ কেবল পরিবর্ত্তিত হইবে; বড়লাটের ক্ষমতা ও কর্ত্তব্য একই প্রকার থাকিবে।— রয়টার

সিমলা বৈঠক সম্পর্কে কংগ্রেস, লীগ ও মিশনের পত্রাবলী

মৌলানা আবুল কালাম আজাদ এবং মিঃ জিন্নার নিকট লর্ড পেথিক লরেন্সের গত ২৭শে এপ্রিল তারিখের পত্র :

মন্ত্রী-মিশন এবং বড়লাট যে সকল প্রতিনিধির সহিত সাক্ষাৎ করিয়াছেন, তাঁহাদের মতামত পর্য্যালোচনার পর তাঁহারা এই সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে, কংগ্রেস এবং মুসলিম লীগের মধ্যে একটা আপোষ করিবার জন্ত তাঁহাদের আরও চেষ্টা করা উচিত। তাঁহারা এই কথা বুঝিতে পারিয়াছেন যে আপোষ আলোচনার ভিত্তিস্বরূপ কোন সুনির্দ্দিষ্ট প্রস্তাব উপস্থিত না করিয়া এই দুইটি দলকে বৈঠকে আহ্বান করা নিরর্থক; সুতরাং কংগ্রেস এবং লীগের মধ্যে আপোষ-আলোচনার ভিত্তিস্বরূপ আমি নিম্নোক্ত পরিকল্পনা উপস্থাপিত করিতেছি। এই সম্পর্কে মন্ত্রী-মিশন এবং বড়লাটের সহিত আলোচনার জন্ত আমি মুসলিম লীগকে ৪জন প্রতিনিধি এবং কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটিকে সমসংখ্যক প্রতিনিধি প্রেরণ করিতে অনুরোধ করিয়াছিলাম।

ব্রিটিশ-শাসিত ভারতের ভবিষ্যৎ রাষ্ট্রতন্ত্রের খসড়া নিম্নোক্তরূপ হইবে :—

ইউনিয়ন গবর্ণমেণ্টের হাতে নিম্নলিখিত বিষয়গুলির ভার থাকিবে,—পররাষ্ট্র সম্পর্কিত ব্যাপার, দেশরক্ষা এবং যানবাহন। হিন্দুপ্রধান এবং মুসলিম-প্রধান প্রদেশগুলিকে লইয়া দুইটি পৃথক মণ্ডল (গ্রুপ) গঠিত হইবে। এইরূপ মণ্ডলীর অন্তর্ভুক্ত প্রদেশগুলি একযোগে যে সকল বিষয়ের ভার লইতে প্রস্তুত সেই সকল বিষয়সংক্রান্ত ক্ষমতা তাহাদের হস্তে অর্পণ করা হইবে। ইউনিয়ন এবং প্রাদেশিক মণ্ডলের হস্তে ন্যস্ত ক্ষমতা ব্যতীত অন্যান্য সমস্ত বিষয়ের সার্ব্বভৌম ক্ষমতা প্রাদেশিক গবর্ণমেণ্টসমূহের থাকিবে।

আমাদের মনে হয় যে, দেশীয় রাজ্যসমূহ আপোষ আলো-

চনার মধ্য দিয়া এই রাষ্ট্রব্যবস্থায় তাহাদের যথাযোগ্য স্থান গ্রহণ করিবে।

আলোচনায় ভিত্তি সংক্রান্ত এই মূলনীতি ও অন্যান্য বিষয় বর্ত্তমানে বিস্তারিতভাবে বলা আমি বাঞ্ছনীয় মনে করি না। আলোচনার মধ্য দিয়াই সমগ্র বিষয়টি পরিস্ফুট হইবে। যদি মুসলিম লীগ এবং কংগ্রেস এই প্রস্তাবের ভিত্তিতে আলোচনা চালাইতে প্রস্তুত থাকেন তাহা হইলে তাঁহাদের পক্ষ হইতে যাঁহাদিগকে প্রতিনিধি হিসাবে পাঠান হইবে তাঁহাদের নাম আমাকে জানাইতে অনুরোধ করিতেছি। এই নাম পাইবামাত্রই আমি বৈঠকের স্থান সম্পর্কে আপনাদিগকে অবহিত করিব। খুব সম্ভব সিমলাতেই আলোচনা বৈঠক হইবে।

লর্ড পেথিক লরেন্স সকাশে রাষ্ট্রপতি আজাদের পত্র :

২৮শে এপ্রিল, ১৯৪৬—আপনার ২৭শে এপ্রিল তারিখের পত্রের জন্য আপনাকে ধন্যবাদ জানাইতেছি। আপনি যে প্রস্তাবটি করিয়াছেন সে সম্পর্কে আমি কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটিতে আমার সহকর্ম্মীদের সহিত পরামর্শ করিয়াছি। তাঁহারা আমাকে জানাইতে নির্দ্দেশ দিয়াছেন যে, ভারতের ভবিষ্যৎ সম্পর্কিত সমস্ত বিষয়ে মুসলিম লীগ বা অন্য যে কোন প্রতিষ্ঠানের সহিত খোলাখুলি আলোচনা করিতে তাঁহারা প্রস্তুত আছেন। তবে আপনাকে একটা কথা বলিয়া রাখিতেছি যে, আপনি যে "মূলনীতিসমূহে"র কথা উল্লেখ করিয়াছেন যাহাতে ভবিষ্যতে কোন বিভ্রম না ঘটিতে পারে তাহার জন্য সেগুলির বিস্তারিত এবং সরল ব্যাখ্যার প্রয়োজন। আপনি অবগত আছেন যে, আমাদের কল্পনা হইতেছে স্বায়ত্তাধিকার সম্পন্ন অঙ্গরাষ্ট্রসমূহ লইয়া একটি যুক্তরাষ্ট্র গঠন করা। এরূপ যুক্তরাষ্ট্রের হাতে অবশ্যই কতগুলি মৌলিক ক্ষমতা থাকা দরকার। তাহার মধ্যে দেশরক্ষা এবং তাহার আনুষঙ্গিক ক্ষমতাগুলি অত্যন্ত গুরুতর। যুক্তরাষ্ট্র সম্পূর্ণ সংহত হওয়া চাই। উহার মধ্যে একটি কার্য্যনির্ব্বাহক পরিষদ এবং একটি ব্যবস্থা পরিষদ থাকা চাই। কথিত বিষয়সমূহ পরিচালনা করিবার জন্য যে অর্থের প্রয়োজন তাহাও যুক্তরাষ্ট্রের হাতে থাকা চাই। সুতরাং এ সমস্ত উদ্দেশ্যে রাজস্ব আদায়ের ক্ষমতা স্বাধিকার বলে যুক্তরাষ্ট্রের আয়ত্তে থাকা প্রয়োজন। সে সমস্ত কর্ম্মের অধিকার এবং ক্ষমতা না থাকিলে যুক্তরাষ্ট্র দুর্ব্বল এবং অসংহত থাকিয়া যাইবে, ফলে দেশরক্ষা এবং দেশের সাধারণ উন্নতিসাধনে ব্যাঘাত জন্মিবে ; কাজেই সাধারণভাবে বৈদেশিক ব্যাপার, দেশরক্ষার ব্যবস্থা এবং আভ্যন্তরীণ যোগাযোগের ব্যবস্থা যুক্তরাষ্ট্রের হাতে থাকা চাই—অধিকন্তু মুদ্রানীতি, বাণিজ্যশুল্কনীতি প্রভৃতি এবং ঘনিষ্ঠতরভাবে পরীক্ষা করার পর যে সমস্ত কার্য্য ঐ সমস্ত বিষয়ের আনুষঙ্গিক বলিয়া মনে হইবে, সে সমস্ত কার্য্যের ভারও থাকা চাই।

আপনি দুই পর্য্যায়ের প্রদেশের কথা উল্লেখ করিয়াছেন। এক পর্য্যায় হিন্দুপ্রধান এবং অপর পর্য্যায় মুসলিম-প্রধান। বিষয়টা পরিষ্কার বুঝিতে পারিলাম না। একমাত্র উত্তর পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ, সিন্ধু এবং বেলুচিস্থান প্রকৃত মুসলমান-প্রধান প্রদেশ-বঙ্গদেশ এবং পঞ্জাবে নামেমাত্র মুসলমানদিগের সংখ্যাধিক্য। যুক্তরাষ্ট্রের অধীনে সংযুক্ত অঙ্গরাষ্ট্র গঠন—বিশেষ করিয়া ধর্ম্ম বা সাম্প্রদায়িক ভিত্তিতে ঐরূপ সংযুক্ত অঙ্গ-রাষ্ট্র গঠন আমরা অসঙ্গত বলিয়া মনে করি। আরও দেখা যাইতেছে যে, কোনও সংযুক্ত অঙ্গ-রাষ্ট্রে কোনও প্রদেশ যোগ দিবে কি দিবে না সেই স্বাধীনতা সংশ্লিষ্ট প্রদেশকে আপনি দিতেছেন না। কোনও প্রদেশ কোনও সংযুক্তাঙ্গ রাষ্ট্রে যোগ দিতে চাহিবে কি চাহিবে না তাহার কোন স্থিরতা নাই। কোনও প্রদেশকেই তাহার ইচ্ছার বিরোধী কার্য্য করিতে বাধ্য করা সম্পূর্ণ অসঙ্গত। যুক্তরাষ্ট্রের বহির্ভূত সমস্ত ক্ষমতা এবং অসংজ্ঞিত সমস্ত ক্ষমতা প্রাদেশিক অঙ্গরাষ্ট্রগুলির উপর থাকুক, ইহাতে আমরা সম্মত আছি তবে আমরা এ-কথাও বলিয়া রাখিতেছি যে, কোনও প্রদেশ যদি যুক্তরাষ্ট্রের সহিত মিলিতভাবে অন্য কোনও বিষয় পরিচালনা করিতে চাহে সে অধিকার তাহার থাকিবে। যুক্তরাষ্ট্রের অধীনে যদি আবার সংযুক্ত রাষ্ট্রসমূহ গঠন করা যায় তাহাতে যুক্তরাষ্ট্রের সংহতি দুর্ব্বল হইয়া পড়িবে এবং অন্যান্য অনেক কারণে উহা অসঙ্গত হইয়া পড়িবে সুতরাং আমরা ঐরূপ কোন ব্যবস্থা সমর্থন করি না।

দেশীয় রাজ্যগুলি সম্পর্কে আমাদের বক্তব্য এই যে উল্লিখিত সর্ব্বসামান্য বিষয়সমূহ সম্পর্কে তাহাদিগকে যুক্তরাষ্ট্রের অঙ্গীভূত হইতে হইবে। ইহা একান্ত প্রয়োজন। কি ভাবে তাহারা যুক্তরাষ্ট্রের অঙ্গীভূত হইবে তাহা পরে বিস্তারিত বিবেচনা করা যাইবে।

আপনি কতকগুলি মূলনীতির কথা উল্লেখ করিয়াছেন কিন্তু আসল কথারই কোন উল্লেখ নাই অর্থাৎ ভারতের স্বাধীনতা ও তদানুষঙ্গিক ভারতবর্ষ হইতে ব্রিটিশ সৈন্যের অপসারণের কোন কথারই উল্লেখ নাই। একমাত্র এই ভিত্তির উপরই আমরা ভারতের ভবিষ্যৎ বা অন্তর্ব্বর্ত্তীকালীন কোন ব্যবস্থার কথা আলোচনা করিতে পারি।

ভারতের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে যে-কোন পক্ষের সহিত আমরা আলোচনা করিতে প্রস্তুত আছি বটে কিন্তু আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস এই যে, যতক্ষণ পর্য্যন্ত ভারতবর্ষে বাহিরের কোন শাসক-শক্তি বিরাজমান থাকিবে, ততক্ষণ পর্য্যন্ত সে আলোচনার মধ্যে কোন বাস্তবতা থাকিবে না।

আপনার প্রস্তাবমত যদি কোন আলোচনার ব্যবস্থা হয় তাহা হইলে আমার সঙ্গে যাইয়া সেই আলোচনায় যোগ দিবার জন্য পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু, সর্দ্দার বল্লভভাই প্যাটেল এবং খান আবদুল গফুর খান—ওয়ার্কিং কমিটির আমার এই তিনজন সহকর্ম্মীকে আমি অনুরোধ জানাইয়াছি।

২৯শে এপ্রিল তারিখে লর্ড পেথিক লরেন্সের নিকট লিখিত মুসলিম লীগ সভাপতির পত্র :

আপনার ২৭শে এপ্রিল তারিখের পত্রের জন্য ধন্যবাদ জানাইতেছি। উক্ত পত্র গতকাল প্রাতঃকালে আমি আমার ওয়ার্কিং কমিটিতে পেশ করিয়াছি। আলোচনার মধ্য দিয়া লীগ এবং কংগ্রেসের মধ্যে একটি আপোষ করিবার জন্য উভয় দলের প্রতিনিধি লইয়া মন্ত্রী-মিশন এবং বড়লাট পুনরায় যে চেষ্টা করিতেছেন, আমি এবং আমার সহকর্ম্মিগণ তাহার প্রয়োজনীয়তা সম্পূর্ণ উপলব্ধি করিতেছি। ১৯৪০ সালের লাহোর অধিবেশনে মুসলিম লীগ যে প্রস্তাব গ্রহণ করিয়াছে ও তাহার পর হইতে নিখিল-ভারত মুসলিম লীগের প্রত্যেক অধিবেশনে যে প্রস্তাব অনুমোদিত হইয়া আসিতেছি এবং গত ৯ই এপ্রিল তারিখে বিভিন্ন প্রদেশের আইন সভার মুসলীম লীগ সদস্যগণের সম্মেলনে যে প্রস্তাব অনুমোদিত হইয়াছে, আমার সহকর্ম্মিগণের ইচ্ছানুসারে তৎপ্রতি আমি আপনার মনোযোগ আকর্ষণ করিতেছি। এই প্রস্তাবের অনুলিপি এতৎসহ প্রেরিত হইল। ওয়ার্কিং কমিটি এই সম্পর্কে আপনার মনোযোগ আকর্ষণ করিতে চাহে যে, আপনার সংক্ষিপ্ত পত্রে যে প্রস্তাব করা হইয়াছে, নীতি এবং বিস্তারিত কর্ম্মপন্থার দিক হইতে বহু বিষয়ে উহার বিস্তৃত বিবরণ এবং সুস্পষ্ট ব্যাখ্যা প্রয়োজন। প্রস্তাবিত বৈঠকে বিস্তৃত বিবরণ ও ব্যাখ্যা পাওয়া যাইবে বলিয়া তাঁহারা আশা করেন। সুতরাং কোনরূপ বিরূপ মনোভাব না লইয়া এবং পূর্ব্ব হইতে কোনরূপ অঙ্গীকার না করিয়া আপোষ-আলোচনার মধ্য দিয়া ভারতীয় রাষ্ট্রতন্ত্র গঠন সমস্যার সমাধান করিবার আগ্রহবশতঃ তাঁহারা লীগের পক্ষ হইতে আলোচনায় যোগদানের নিমিত্ত অন্য ৩ জন প্রতিনিধি মনোনয়নের ভার আমার উপর দিয়াছেন। লীগ প্রতিনিধিগণের চারিটি নাম নিম্নে দেওয়া হইল :— (১) মিঃ এম এ জিন্না, (২) নবাব মহম্মদ ইসমাইল খান, (৩) নবাবজাদা লিয়াকৎ আলী খান, (৪) সর্দ্দার আবদার রব নিস্তার।

কংগ্রেস সভাপতির নিকট লর্ড পেথিক লরেন্সের পত্র :

২৯শে এপ্রিল ১৯৪৬ আপনার ২৮শে এপ্রিলের পত্রের জন্য আপনাকে ধন্যবাদ। মুসলিম লীগের প্রতিনিধিবৃন্দ ও আমাদের মধ্যে যে আলোচনা হইবে সেই আলোচনায় কংগ্রেস যোগ দিতে স্বীকৃত হইয়াছেন জানিয়া মন্ত্রিমণ্ডলের প্রতিনিধিবর্গ অত্যন্ত আনন্দিত হইয়াছেন। কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির পক্ষ হইতে আপনি যে অভিমত ব্যক্ত করিয়াছেন, তাহা আমরা বিবেচনা করিয়াছি। আমাদের মনে হয় যে, এই সমস্ত কথা সম্মেলনে আলোচনা করা যাইতে পারে। আমরা কখনও এইরূপ মনে করি নাই যে, আমার চিঠিতে যে সমস্ত সর্ত্তের উল্লেখ ছিল তাহা আগে অনুমোদন করিয়া তবে কংগ্রেস এবং মুসলিম লীগকে আমাদের আমন্ত্রণ গ্রহণ করিতে হইবে। একটা মীমাংসার ভিত্তি স্বরূপেই আমরা ঐ সমস্ত সর্ত্ত উল্লেখ করিয়াছিলাম। আমরা কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটিকে যাহা করিতে বলিয়াছি তাহা শুধু এই যে, আমাদের সহিত এবং মুসলিম লীগের প্রতিনিধির সহিত ঐ সমস্ত বিষয় আলোচনা করিবার জন্য কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটি প্রতিনিধি প্রেরণ করিতে সম্মত হউক।

অদ্য অপরাহ্নে মুসলিম লীগের উত্তর পাওয়া যাইবে বলিয়া আশা করা যায়। তাঁহারা আমাদের আমন্ত্রণ গ্রাহ্য করিবেন ধরিয়া লইয়া আমরা ইচ্ছা করিতেছি যে, সিমলাতে এই সমস্ত বিষয়ের আলোচনা হইবে। আমরা আগামী বুধবার তথায় যাইতে ইচ্ছা করি। ২রা মে বৃহস্পতিবার সকলেই যাহাতে আলোচনা আরম্ভ করা যাইতে পারে তাহার জন্য কংগ্রেসের প্রতিনিধিগণ যাহাতে যথাসময়ে সিমলায় উপস্থিত থাকেন তাহার ব্যবস্থা আপনি করিতে পারিবেন বলিয়া আমরা আশা করি।

মুসলিম লীগের সভাপতির নিকট লর্ড পেথিক লরেন্সের পত্র :

২৯শে এপ্রিল, ১৯৪৬—আপনার ২৯শে এপ্রিলের পত্রের জন্য আপনাকে ধন্যবাদ। কংগ্রেস প্রতিনিধিবৃন্দ এবং আমাদের মধ্যে যে যৌথ আলোচনা হইবে তাহাতে মুসলিম লীগ যোগ দিতে সম্মত হইয়াছে জানিয়া মন্ত্রিমণ্ডলের প্রতিনিধিগণ অত্যন্ত আনন্দিত হইয়াছেন। আপনাকে সানন্দে জানাইতেছি যে, আমি কংগ্রেসের সভাপতির নিকট হইতে একখানি পত্র পাইয়াছি। সেই পত্রে তিনি জানাইয়াছেন যে, কংগ্রেসও প্রস্তাবিত আলোচনায় যোগ দিতে ইচ্ছুক আছেন। এজন্য কংগ্রেস মৌলানা আজাদ, পণ্ডিত নেহরু, সর্দ্দার বল্লভভাই প্যাটেল এবং খান আবদুল গফুর খাঁকে প্রতিনিধি মনোনীত করিয়াছেন। আপনি মুসলিম লীগের যে প্রস্তাবের কথা উল্লেখ করিয়াছেন, তাহা আমরা বিবেচনা করিয়াছি। আমরা কখনও এরূপ কথা মনে করি নাই যে, আমার চিঠিতে যে সমস্ত সর্ত্ত রহিয়াছে, আগে সেই সমস্ত সর্ত্ত সম্পূর্ণ অনুমোদন করিয়া তবে মুসলিম লীগ এবং কংগ্রেস আমাদের আমন্ত্রণ গ্রহণ করিবে। ঐ সর্ত্তগুলিকে আমরা একটা আপোষের ভিত্তিস্বরূপ ধরিয়া লইয়াছি। আমরা মুসলিম লীগের ওয়ার্কিং কমিটিকে শুধু এই কথাই বলিয়াছি যে, তাঁহারা উহা আমাদের এবং কংগ্রেসের প্রতিনিধিদের সহিত আলোচনা করিবার জন্য প্রতিনিধি প্রেরণ করুন।

আমরা ইচ্ছা করি যে, সিমলাতে এই আলোচনা হউক। আমরা আগামী বুধবার তথায় যাইতেছি। আমরা আশা করি যে, ২রা মে বৃহস্পতিবার যাহাতে আলোচনা আরম্ভ হইতে পারে তজ্জন্য মুসলিম লীগের প্রতিনিধিবৃন্দ যাহাতে যথাসময়ে সিমলায় উপস্থিত থাকেন তাহার ব্যবস্থা আপনি করিতে পারিবেন।

সিমলায় আলোচ্য বিষয়ের তালিকা

১। সংযুক্তাদ প্রদেশসমূহ :
(ক) গঠনপদ্ধতি।
(খ) সংযুক্তাদ রাষ্ট্রে অধীনস্থ বিষয় সমূহের নির্দ্ধারণ।
(গ) সংযুক্তাদ রাষ্ট্রের স্বরূপ।
২। যুক্তরাষ্ট্র :
(ক) যুক্তরাষ্ট্রের পরিচালনাধীন বিষয়সমূহ।
(খ) যুক্তরাষ্ট্রের গঠনপদ্ধতি।
(গ) আর্থিক ব্যবস্থা।
৩। রাষ্ট্রব্যবস্থা প্রণয়নকারী পরিষদ—
(ক) উহার গঠনপদ্ধতি।
(খ) করণীয় কার্য্যসমূহ।
(গ) যুক্তরাষ্ট্র সম্পর্কে।
(ঘ) সংযুক্তাদ রাষ্ট্র সম্পর্কে।
(ঙ) প্রদেশসমূহ সম্পর্কে।

লর্ড পেথিক লরেন্সের সকাশে কংগ্রেসের সভাপতির পত্র :

৬ই মে, ১৯৪৬—গত কল্যকার সম্মেলনে যে সমস্ত আলোচনা হইয়াছে তাহা আমি এবং আমার সহকর্ম্মিবৃন্দ অবধানতার সহিত অনুসরণ করিয়াছি এবং ঐ আলোচনার গতি অনুধাবন করিবার চেষ্টা করিয়াছি। আমি স্বীকার করিতেছি যে, আলোচনাটা আমার নিকট রহস্তজনক মনে হইয়াছে। উহার অস্পষ্টতা এবং উহার কতকগুলি নিহিত তাৎপর্য্য আমাকে চিন্তাকুল করিয়া তুলিয়াছে। আমরা আপোষের একটা ভিত্তি স্থির করিবার জন্ত উপায় বাহির করিতে সর্ব্বপ্রকারে সহযোগিতা করিতে প্রস্তুত আছি বটে, কিন্তু এ যাবৎ যে ধারায় আলোচনা চলিয়াছে—তাহাতে সাফল্যের কোন আশা রহিয়াছে একথা বিশ্বাস করিয়া আমরা নিজদিগকে মন্ত্রী-মিশনকে বা মুসলিম লীগের প্রতিনিধিদিগকে প্রবঞ্চিত করিতে চাহি না। আমাদের সম্মুখে উপস্থিত প্রশ্নসমূহ সম্পর্কে মোটামুটি আমাদের মতামত কি তাহা আমি আমার ২৮শে এপ্রিল তারিখের চিঠিতে সংক্ষেপে জানাইয়াছি। দেখিতেছি যে, সেই মতামতের অধিকাংশই উপেক্ষা করা হইতেছে এবং সম্পূর্ণ একটা বিপরীত পদ্ধতি অবলম্বন করা হইয়াছে। অবশ্য আমরা একথা উপলব্ধি করি যে, আলোচনার প্রারম্ভে কতকগুলি কথা ধরিয়া লইতে হয়। নতুবা অগ্রগতি আদৌ সম্ভব নহে। কিন্তু যদি আমাদের কথা উপেক্ষা করিয়া এমন সমস্ত কথা ধরিয়া লওয়া হয় যাহা আমাদের মূল কথার সম্পূর্ণ বিপরীত, তাহা হইলে পরবর্ত্তীকালে পরস্পর ভুল বুঝিবার সম্ভাবনা রহিয়াছে।

২৮শে এপ্রিল তারিখে আমার পত্রে আমি বলিয়াছিলাম যে, আমাদের সম্মুখে আসল প্রশ্ন হইতেছে ভারতের স্বাধীনতার প্রশ্ন এবং তদানুষঙ্গিক ভারত হইতে ব্রিটিশ সৈন্যবাহিনীর অপসারণ। কেননা, যতক্ষণ পর্য্যন্ত ভারতভূমিতে বিদেশী সৈন্য অবস্থান করিবে ততদিন পর্য্যন্ত স্বাধীনতা সম্ভব হইতে পারে না। আমরা চাই সমগ্র ভারতবর্ষের স্বাধীনতা, উহা আমরা এক্ষণেই চাই, সুদূর বা অদূর ভবিষ্যতে নহে। অন্যান্য কথা—এই স্বাধীনতার আনুষঙ্গিক গণপরিষদ গঠিত হইবার পর সে সমস্ত কথা আলোচনা করা যাইবে।

গত কল্যের সভায় আমি পুনর্ব্বার এই কথা উল্লেখ করিয়াছিলাম এবং দেখিয়া সুখী হইয়াছিলাম যে, আপনি আপনার সহযোগিবৃন্দ এবং সম্মিলনীর অন্যান্য সদস্যবৃন্দ ভারতের স্বাধীনতাকে আমাদের আলোচনার ভিত্তি বলিয়া স্বীকার করিয়া লইয়াছেন। আপনি বলিয়াছিলেন যে, স্বাধীন ভারত এবং ইংলণ্ডের মধ্যে অতঃপর কিরূপ সম্পর্ক প্রতিষ্ঠিত হইবে তাহা গণপরিষদই চূড়ান্তভাবে স্থির করিবে। আপনার কথা সম্পূর্ণ ঠিক। কিন্তু বর্ত্তমানে তাহাতে কিছু আসে যায় না। বর্ত্তমানে ভারতের স্বাধীনতাকে স্বীকার করিয়া লইতে হইবে। যদি তাহাই হয় তাহা হইলে কতকগুলি পরিণাম অবশ্যম্ভাবী। গতকল্য আমরা দেখিয়াছি যে, এই সমস্ত পরিণাম উপলব্ধি করা হইতেছে না। গণপরিষদ ভারতের স্বাধীনতার প্রশ্নের মীমাংসা করিবেন না। সেই প্রশ্নের মীমাংসা এইক্ষণেই করিতে হইবে এবং করা হইয়া গিয়াছে বলিয়াই আমরা ধরিয়া লইতেছি। গণপরিষদ স্বাধীন ভারতের ইচ্ছাকেই বাস্তব রূপ দিবে। আগের কোন ব্যবস্থার দ্বারাই এই পরিষদ আবদ্ধ থাকিবে না। এই পরিষদ গঠনের আগে সাময়িক গবর্ণমেণ্ট প্রতিষ্ঠা করিতে হইবে। সেই গবর্ণমেণ্ট যতদূর সম্ভব স্বাধীন ভারতের গবর্ণমেণ্ট হইবে। সেই গবর্ণমেণ্টই অন্তর্বর্ত্তী কালের দরুণ সমস্ত ব্যবস্থা করিবে। গতকল্য আমাদের আলোচনায় এক সঙ্গে কাজ করিবে এরূপ সংযুক্ত প্রদেশসমূহের কথা বারম্বার আলোচনা করা হইয়াছে। এমন কথাও বলা হইয়াছে যে, এই জাতীয় সংযুক্ত প্রদেশসমূহের একটি করিয়া শাসন পরিষদ এবং ব্যবস্থা পরিষদ থাকিবে। এইভাবে প্রদেশ সংযুক্তির কথা এই যাবৎ আপনাদের মধ্যে আলোচিত হয় নাই। তথাপি উহা নিষ্পন্ন বলিয়া ধরিয়া লওয়া হইয়াছে। আমি পরিষ্কার বলিয়া রাখিতে চাহি যে, একাধিক প্রদেশকে সংযুক্ত করিয়া তাহার জন্ত শাসন পরিষদ ও ব্যবস্থা পরিষদের বা অখণ্ড যুক্তরাষ্ট্রের অধীনে খণ্ড যুক্তরাষ্ট্রের প্রচেষ্টা করিয়া তাহার জন্ত একটি করিয়া শাসন পরিষদ ও ব্যবস্থা পরিষদের বন্দোবস্ত করার আমরা সম্পূর্ণ বিরোধী।

আমরা আগেই আপনাকে বলিয়াছি যে, আমরা উহা মানিয়া লইতে সম্মত নহি। উহা করিতে গেলে তিন প্রকারের শাসন পরিষদ ও ব্যবস্থা পরিষদ গঠন করিতে হইবে। এই ব্যবস্থা একটা জবরজঙ্গ ব্যবস্থা। উহাতে কোন প্রকার প্রগতি সম্ভব হইবে না এবং সংহতি থাকিবে না। পরিণামে অবিরাম সংঘর্ষ চলিবে। পৃথিবীর কোন দেশেই এইরূপ ব্যবস্থা আছে বলিয়া আমরা অবগত নহি।

আমাদের দৃঢ় অভিমত এই যে, ভারতবর্ষকে খণ্ডিত করি-

বার কোন প্রস্তাব আলোচনা করিবার অধিকার এই সম্মেলনের নাই। যদি ভারতবর্ষকে দ্বিখণ্ডিত করিতেই হয় তবে সেই প্রস্তাব বর্তমান শাসন শক্তির প্রভাব হইতে মুক্ত গণপরিষদই করিবেন।

আর একটা কথা আমরা পরিষ্কার বলিয়া রাখিতে চাই, কিবা ব্যবস্থা পরিষদে আর কিবা শাসন পরিষদে বিভিন্ন দলের সদস্যসংখ্যার সাম্য থাকিলে এইরূপ কোন প্রস্তাব আমরা মানিতে রাজী নহি। আমরা বুঝিতে পারিতেছি যে, প্রত্যেক দলের এবং সম্প্রদায়ের মন হইতে সমস্ত ভয় এবং সংশয় দূর করিবার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করা উচিত। কিন্তু গণতান্ত্রিক ভিত্তিতে আমাদের রাষ্ট্রব্যবস্থা গড়িয়া তুলিতে পারিব বলিয়া আমরা আশা করি। সুতরাং কাহারও মন হইতে ভয় ও সংশয় দূর করিবার জন্য আমরা গণতন্ত্রবিরোধী কোন অবাস্তব পদ্ধতি স্বীকার করিতে পারিব না।

মুসলিম লীগের ও কংগ্রেসের সভাপতির নিকট লর্ড পেথিক লরেন্সের পত্র :

৮ই মে ১৯৪৬—এযাবৎ আলোচনার ফলে যাহা একটা আপোষের ভিত্তি হইতে পারে বলিয়া আমরা মনে করিতেছি কি করিলে তাহা প্রকৃষ্টভাবে সম্মেলনে উপস্থিত করা যাইতে পারে তাহা আমি এবং আমার সহযোগিবৃন্দ ভাবিয়া দেখিয়াছি। আমরা এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছি যে, বিষয়গুলি লিপিবদ্ধ করিয়া তাহা বিভিন্ন পক্ষের নিকট সম্মেলন পুনরারম্ভের পূর্ব্বে পাঠাইয়া দিলে সকলেরই সুবিধা হইবে। এই সমস্ত কথা গোপন থাকিবে। আমরা আশা করি যে, আজ সকালের মধ্যেই উহা আপনাদের নিকট পাঠাইতে পারিব। আজ অপরাহ্ণ ৩ ঘটিকার সময় সম্মেলনের পুনরধিবেশনের কথা আছে। এই সঙ্কীর্ণ সময়ের মধ্যেই আপনারা বিষয়গুলি ভাল করিয়া পর্য্যালোচনা করিতে পারিবেন বলিয়া মনে হয় না। সুতরাং প্রস্তাব করি যে, অদ্যকার সম্মেলন স্থগিত রাখিয়া আগামী কল্য অপরাহ্ণ ৩ ঘটিকার সময় পুনরায় সম্মেলন আরম্ভ হইবে। এই প্রস্তাবে আপনারা সম্মত হইবেন বলিয়া মনে করি। সকল দলের স্বার্থের খাতিরেই সময় তালিকার এই পরিবর্তন একান্ত প্রয়োজন বলিয়া আমরা মনে করি। আশা করি আপনারাও এই ব্যাপারে একমত হইবেন।

পেথিক লরেন্সের সেক্রেটারীর পত্র

গত ৮ই মে তারিখে লর্ড পেথিক লরেন্সের প্রাইভেট সেক্রেটারী কংগ্রেস এবং মুসলিম লীগের প্রেসিডেন্টের নিকট নিম্নোক্ত পত্র প্রেরণ করেন :

আজ সকালে আপনাদের নিকট ভারত সচিব যে পত্র প্রেরণ করিয়াছেন, তাহাতে লিখিত নথি আপনাদের নিকট প্রেরণ করিবার জন্য মন্ত্রী-মিশন আমাকে বলিয়াছেন। মিশনের ইচ্ছা হইতেছে, ইহা যদি কংগ্রেস এবং লীগ প্রতিনিধিগণ গ্রহণযোগ্য বলিয়া বিবেচনা করেন তবে তাহা আগামী বৃহস্পতিবার বেলা তিনটার সময় দিল্লীর অধিবেশনে আলোচিত হইবে।

কংগ্রেস এবং মুসলিম লীগের প্রতিনিধিদের মধ্যে মীমাংসার জন্য উক্ত নথিতে নিম্নলিখিত প্রস্তাবগুলি করা হইয়াছে :

১। একটি সর্ব্বভারতীয় যুক্তরাষ্ট্র গবর্ণমেণ্ট গঠিত হইবে এবং ইহার একটি আইন-পরিষদ থাকিবে। বৈদেশিক ব্যাপার, দেশরক্ষা, যাতায়াত ব্যবস্থা এবং মৌলিক অধিকার সম্পর্কিত দপ্তর ইহার হাতে থাকিবে। এই সকল ব্যাপারের জন্য যে অর্থ প্রয়োজন হইবে, তাহা সংগ্রহ করিবার ক্ষমতা এই গবর্ণমেণ্টের থাকিবে।

২। অবশিষ্ট সমস্ত ক্ষমতা প্রদেশগুলির হাতে থাকিবে।

৩। একাধিক প্রদেশ লইয়া একটি প্রদেশ-গোষ্ঠী গঠন করা যাইতে পারে। এই প্রদেশ-গোষ্ঠী নিজের ইচ্ছামত কতকগুলি প্রাদেশিক ব্যাপার সম্মিলিত ভাবে নির্দ্ধারণ করিতে পারে। গোষ্ঠী নিজেদের জন্য শাসন-পরিষদ এবং শাসন-পরিষদ প্রতিষ্ঠা করিতে পারিবে।

৪। যুক্তরাষ্ট্রীয় গবর্ণমেণ্টের আইন-পরিষদে মুসলিম সংখ্যাধিক প্রদেশসমূহের এবং হিন্দু সংখ্যাধিক প্রদেশসমূহের সমান সংখ্যক প্রতিনিধি থাকিবে। এই সকল প্রদেশের আইন-পরিষদ সমান সংখ্যক হিন্দু ও মুসলমান প্রতিনিধি লইয়া গঠিত হইয়াছে কিনা তাহাতে কিছু আসিয়া যায় না। যুক্তরাষ্ট্রীয় গবর্ণমেণ্টের আইন-পরিষদে দেশীয় রাজ্যসমূহের প্রতিনিধিত্ব থাকিবে।

৫। যুক্তরাষ্ট্রীয় গবর্ণমেণ্টও অনুরূপ ভাবে গঠিত হইবে।

৬। যুক্তরাষ্ট্রীয় গবর্ণমেণ্টের শাসনতন্ত্রে এবং প্রদেশ-গোষ্ঠির শাসনতন্ত্রে (যদি অবশ্য প্রদেশ-গোষ্ঠী গঠিত হয়) এইরূপ বিধান থাকিবে যে, শাসনতন্ত্র রচনার দশ বৎসর বাদে কোন প্রদেশ তাহার আইন-পরিষদের অধিকাংশের ভোটের দ্বারা শাসনতন্ত্র পুনর্ব্বিবেচনা করার দাবি করিতে পারিবে। ইহার পর প্রতি দশ বৎসর অন্তর তাহারা অনুরূপ দাবি করিতে পারিবে। শাসনতন্ত্র পুনর্ব্বিবেচনা করার জন্য মূল গণ-পরিষদের ভিত্তিতে একটি প্রতিষ্ঠান গঠিত হইবে। ইহাতে ভোটের ব্যবস্থাও অনুরূপ থাকিবে, এবং গৃহীত সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ইহার শাসনতন্ত্র সংশোধনের ক্ষমতা থাকিবে।

৭। উপরোক্ত ভিত্তিতে শাসনতন্ত্র রচনার জন্য রাষ্ট্র-ব্যবস্থা প্রণয়ন পরিষদ নিম্নোক্ত ভাবে গঠিত হইবে :

(ক) প্রত্যেকটি প্রদেশের আইন-পরিষদের মোট সদস্যের এক-দশমাংশ রাষ্ট্র-ব্যবস্থা প্রণয়ন পরিষদের জন্য নির্ব্বাচিত হইবে। আইন-পরিষদে বিভিন্ন দলের সংখ্যানুপাতে ইহারা নির্ব্বাচিত হইবে।

(খ) দেশীয় রাজ্যের জনসংখ্যার ভিত্তিতে তথাকার প্রতিনিধি প্রেরণের জন্য আমন্ত্রণ জানান হইবে। ব্রিটিশ

ভারতের প্রতিনিধিদের সংখ্যানুপাতে তাহাদের সংখ্যা নির্দ্ধারিত হইবে।

(গ) এই ভাবে গঠিত গণপরিষদ যথাসম্ভব সত্বর নয়াদিল্লীতে মিলিত হইবে।

(ঘ) গণপরিষদের প্রাথমিক অধিবেশনে সাধারণ বিষয় আলোচিত হইবার পর ইহা তিন ভাগে বিভক্ত হইবে—প্রথম ভাগ হিন্দু সংখ্যাধিক প্রদেশের প্রতিনিধিদের লইয়া, দ্বিতীয় ভাগ মুসলমান সংখ্যাধিক প্রদেশসমূহের প্রতিনিধিদের লইয়া এবং তৃতীয় ভাগ দেশীয় রাজ্যের প্রতিনিধিদের লইয়া।

(ঙ) প্রথম দুইটি উপ-পরিষদের পৃথক্ অধিবেশন হইবে। তাহারা নিজেদের প্রদেশ-গোষ্ঠীর জন্য শাসনতন্ত্র প্রণয়ন করিবে এবং ইচ্ছা করিলে গোষ্ঠীর জন্য যুক্ত শাসনতন্ত্র প্রণয়ন করিতে পারিবে।

(চ) এই ভাবে শাসনতন্ত্র রচিত হইবার পর কোন প্রদেশ তাহার গোষ্ঠী হইতে সরিয়া যাইয়া অপর গোষ্ঠীতে যোগ দিবার অথবা একেবারে পৃথক্ থাকিবার সিদ্ধান্ত করিতে পারে।

(ছ) ইহার পর ১ হইতে ৭ পর্য্যন্ত অনুচ্ছেদে বর্ণিত ব্যবস্থা অনুযায়ী যুক্তরাষ্ট্রীয় গবর্ণমেন্টের শাসনতন্ত্র প্রণয়নের জন্য সমগ্র গণপরিষদে মিলিত অধিবেশন হইবে।

(জ) সাম্প্রদায়িক সমস্যা সম্পর্কিত কোন গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার যদি যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসনতন্ত্রে থাকে তবে তাহার অনুকূলে দুইটি বৃহৎ সম্প্রদায়ের ভোট ব্যতীত তাহা গণপরিষদ কর্ত্তৃক গৃহীত হইবে।

৮। বড়লাট অবিলম্বে উক্ত রাষ্ট্র-ব্যবস্থা প্রণয়ন পরিষদ আহ্বান করিবেন। ৭ অনুচ্ছেদে বর্ণিত ব্যবস্থা অনুযায়ী এই পরিষদের কার্য্য চলিবে।

মিঃ জিন্নার পত্র

গত ৮ই মে তারিখে মুসলীম লীগের সভাপতি মিঃ জিন্না লর্ড পেথিক লরেন্সের নিকট নিম্নলিখিত পত্র প্রেরণ করেন :—

আপনার প্রাইভেট সেক্রেটারীর প্রেরিত পত্র এবং আপনার পূর্ব্বপত্রে লিখিত নথি আজ পাইয়াছি। আপনি বলিয়াছেন যে উপরিউক্ত প্রস্তাবগুলি যদি লীগ প্রতিনিধিদের গ্রহণযোগ্য হয় তাহা হইলে বৃহস্পতিবার অপরাহ্ণে ত্রিদলীয় সম্মেলনের পুনরধিবেশনে ঐ সকল বিষয় আলোচনা করা যাইতে পারে।

গত ২৭শে এপ্রিল তারিখে আপনার পত্রে নিম্নলিখিত প্রস্তাবটি লিখিত ছিল "একটি যুক্তরাষ্ট্রীয় গবর্ণমেন্ট গঠিত হইবে। বৈদেশিক ব্যাপারে দেশরক্ষা এবং যাতায়াত ব্যবস্থার ভার ঐ গবর্ণমেন্টের হাতে থাকিবে।" ভারতের প্রদেশগুলিকে দুই ভাগ করা হইবে। এক ভাগ হইবে হিন্দু সংখ্যাধিক প্রদেশগুলিকে লইয়া, অপর ভাগ হইবে মুসলমান সংখ্যাধিক প্রদেশগুলি লইয়া। উপরিউক্তি তিনটি বিষয় ব্যতীত অন্য সমস্ত বিষয়ে প্রদেশ-গোষ্ঠী দুইটি পৃথক পৃথক ভাবে নিজেদের সাধারণ বিষয়গুলি সম্পর্কে সিদ্ধান্ত করিবে। প্রাদেশিক গবর্ণমেন্টগুলির উপরিউক্ত তিনটি বিষয় ব্যতীত অন্য সমস্ত ক্ষমতা এবং অসংরক্ষিত ক্ষমতা থাকিবে।"

৫ই মে রবিবার সিমলায় ত্রিদলীয় সম্মেলনে এই বিষয়টি আলোচনার জন্য আমরা যোগ দিতে স্বীকৃত হইয়াছিলাম। ২৮শে এপ্রিল তারিখে আমি যে পত্র লিখিয়াছিলাম তাহার সর্ত্তানুযায়ী আমরা যোগদানে সম্মত হই।

ত্রিদলীয় সম্মেলনের প্রথম অধিবেশনে আপনি আপনার পরিকল্পনা ব্যাখ্যা করেন। ৫ই এবং ৬ই মে তারিখে বহু আলাপ-আলোচনার পর কংগ্রেস মাত্র তিনটি বিষয়ে এবং তজ্জন্য অর্থ সংগ্রহের ক্ষমতা লইয়া যুক্তরাষ্ট্র গবর্ণমেন্টের প্রস্তাব চূড়ান্ত ভাবে প্রত্যাখ্যান করে।

আপনার পরিকল্পনায় মুসলমান এবং হিন্দু সংখ্যাধিক প্রদেশ-গোষ্ঠী গঠন এবং তাহার জন্য দুইটি যুক্তরাষ্ট্র গঠন সম্পর্কে কংগ্রেস ও লীগের মধ্যে মতৈক্য ধরিয়া লওয়া হইয়াছে। ইহার অর্থ করা যাইতে পারে যে, দুইটি রাষ্ট্র-ব্যবস্থা প্রণয়ন পরিষদ গঠিত হইবে। এই ভিত্তিতেই আপনার পরিকল্পনায় একটি যুক্তরাষ্ট্র গঠনের কথা বলা হইয়াছে।

আপনার খসড়া পরিপূর্ণ করিবার জন্য আমাদের সম্মতি চাওয়া হইয়াছিল। কংগ্রেস খোলাখুলি ভাবে এই প্রস্তাবটিও প্রত্যাখ্যান করে। তখন মন্ত্রী-মিশনকে পরবর্ত্তী পন্থা উদ্ভাবনের জন্য ত্রিদলীয় অধিবেশন মুলতুবী রাখিতে হয়।

এক্ষণে আমাদের কাছে নূতন একটি পরিকল্পনা প্রেরণ করা হইয়াছে এবং বলা হইয়াছে যে, বৃহস্পতিবার অপরাহ্ণে ত্রিদলীয় সম্মেলনের পুনরধিবেশনে প্রস্তাবগুলি আলোচনা করা হইবে। ইহার শিরোনামায় বলা হইয়াছে, "কংগ্রেস এবং লীগ প্রতিনিধিদের মধ্যেই মীমাংসার জন্য প্রস্তাবিত সূত্র।" প্রস্তাব কাহারা করিবেন তাহা মোটেই স্পষ্ট নয়।

আমরা মনে করি, যে নূতন সূত্রগুলির সহিত আপনার ২৭শে এপ্রিল তারিখের পত্রে লিখিত সূত্রের আগাগোড়া গরমিল রহিয়াছে। ইহার মধ্য হইতে কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের উল্লেখ করিতেছি। আপনার নূতন পরিকল্পনায় ১ হইতে ৭ অনুচ্ছেদের ভিত্তিতে একটি সর্ব্বভারতীয় যুক্তরাষ্ট্র গঠন প্রস্তাবে আপনাদিগকে সম্মত হইতে বলা হইয়াছে। নূতন পরিকল্পনায় যুক্তরাজ্য গবর্ণমেন্টের অধীন তিনটি বিষয়ের সহিত আর একটি বিষয় সংযোজিত হইয়াছে। সেই বিষয়টি হইতেছে মৌলিক অধিকার। যুক্তরাষ্ট্রীয় গবর্ণমেন্ট এবং তাহার আইন-পরিষদ কর ধার্য্য করিয়া অর্থ সংগ্রহের অধিকারী কি না তাহা আপনার প্রস্তাবে স্পষ্ট হয়। আপনার নূতন প্রস্তাবে যে প্রদেশ-গোষ্ঠী গঠনের কথা বলা তাহা ঠিক কংগ্রেস-প্রতিনিধিদের মনোভাবের অনুরূপ এবং তাহা আপনার মূল প্রস্তাবের সহিত সম্পূর্ণ পৃথক। আপনি বলিয়াছেন, একটি রাষ্ট্র-ব্যবস্থা প্রণয়ন পরিষদ গঠিত হইবে। আমরা ইহাতে

কোনক্রমেই রাজী হইতে পারি না। আপনি যেভাবে রাষ্ট্র-ব্যবস্থা প্রণয়ন পরিষদ গঠনের প্রস্তাব করিয়াছেন তাহাতেও আমরা সম্মত হইতে পারি না। আপনার প্রস্তাবে আরও কতকগুলি আপত্তিকর বিষয় রহিয়াছে। আমরা প্রধান প্রধান বিষয়গুলি বিবেচনা করিতেছি বলিয়া সেগুলির দিকে নজর দিই নাই। এমতাবস্থায় আপনার নূতন প্রস্তাব আলোচনা করিয়া কোন লাভ হইবে না। কারণ ইহা আপনার মূল প্রস্তাবের সহিত সম্পূর্ণ পৃথক। ইহার পরেও যদি আগামী কল্যের অধিবেশনে আলোচনার জন্য আমাদিগকে উপস্থিত হইতে বলেন তবে অবশ্য স্বতন্ত্র কথা।

ভারত-সচিবের পত্র

৯ই মে তারিখে লর্ড পেথিক লরেন্স লীগ প্রেসিডেন্ট মিঃ জিন্নার নিকট নিম্নলিখিত পত্র প্রেরণ করেন:—আপনার পত্র আমি আমার সহকর্মীদিগকে দেখাইয়াছি। আপনার পত্রে আপনি যে সকল বিষয়ের উল্লেখ করিয়াছেন তাহার একটি একটি করিয়া উত্তর দিতেছি।

১। আপনি লিখিয়াছেন তিনটি বিষয় লইয়া কাজ করিবার জন্য এবং তদুদ্দেশ্যে অর্থ সংগ্রহের অধিকারসহ যুক্তরাষ্ট্রীয় গবর্ণমেন্ট গঠনের প্রস্তাব কংগ্রেস চূড়ান্তভাবে প্রত্যাখ্যান করিয়াছে। এ পর্য্যন্ত যে আলোচনা হইয়াছে তাহা আমার যত দূর মনে আছে আপনার একথা ঠিক নহে। একথা সত্য যে, যুক্তরাষ্ট্রীয় গবর্ণমেন্টের ক্ষমতা অতিরিক্ত সীমাবদ্ধ বলিয়া কংগ্রেস প্রতিনিধিগণ অভিমত প্রকাশ করিয়াছিলেন। এক জায়গায় আপনি স্বীকার করিয়াছিলেন যে, তাহাদের যুক্তিতে কিছু সার রহিয়াছে। কারণ আপনি বলিয়াছিলেন যে, প্রয়োজনীয় অর্থ সংগ্রহের কিছু ক্ষমতা যুক্তরাষ্ট্রীয় গবর্ণমেন্টকে অবশ্যই দিতে হইবে। কিন্তু এ সম্পর্কে কোন চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত করা হয় নাই।

ইহার পর আপনি বলিয়াছেন যে, প্রদেশ-গোষ্ঠী গঠন সম্পর্কে আমরা যে প্রস্তাব করিয়াছি তাহা আমাদের মূল প্রস্তাবের বিরোধী। আপনার এ কথা আমরা মানিতে পারি না। ইহা মূল প্রস্তাবের কিছু বিশ্লেষণ মাত্র। প্রদেশগুলি কিভাবে কোনও বিশেষ গোষ্ঠীতে যোগদান করিবে তাহাই নূতন প্রস্তাবে বলা হইয়াছে। প্রদেশ বিভাগের পক্ষে লীগ যে অভিমত প্রকাশ করিয়াছে এবং বিপক্ষ কংগ্রেস যে অভিমত প্রকাশ করিয়াছে নূতন প্রস্তাবে তাহার একটা যুক্তিসঙ্গত মীমাংসার প্রয়াস রহিয়াছে। রাষ্ট্র-ব্যবস্থা প্রণয়নের জন্য আমাদের প্রস্তাবিত পরিষদ সম্পর্কে আপনি আপত্তি করিয়াছেন। আমি আপনাকে বলিতে চাই গত মঙ্গলবারের অধিবেশনে দুইটি রাষ্ট্র-ব্যবস্থা প্রণয়ন পরিষদ মীমাংসিত উপায়ে কিভাবে কাজ করিতে পারে তৎসম্পর্কে আপনি বলিয়াছিলেন যে, সর্ব্বভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের শাসন-ব্যবস্থা প্রণয়নের জন্য দুইটি পরিষদকে মিলিত হইতে হইবে। সর্ব্বভারতে রাষ্ট্র-ব্যবস্থা প্রণয়ন কিভাবে করা যাইবে তাহা নির্দ্ধারণের জন্য দুইটি পরিষদের এক মিলিত প্রাথমিক অধিবেশন হইবে। আমরা ঠিক এই কথাই অন্য ভাবে বলিয়াছি, কাজেই আপনি যখন বলিয়াছেন যে, কংগ্রেস ঐ প্রস্তাব সম্পূর্ণরূপে প্রত্যাখ্যান করিয়াছে তখন তাহা দ্বারা কি বুঝাইতে চাহিয়াছেন তাহা আমার মোটেই বোধগম্য হইতেছে না।

পরবর্ত্তী অনুচ্ছেদে আপনি জানিতে চাহিয়াছেন আমার প্রেরিত লিপিতে কংগ্রেস ও লীগের মধ্যে মীমাংসার প্রস্তাবিত সূত্র কে প্রস্তাব করিয়াছে। ইহার জবাবে আমি বলিতে চাই, কংগ্রেস ও মুসলিম লীগের মতভেদ দূর করিবার প্রচেষ্টায় মন্ত্রী-মিশন ও বড়লাট এই প্রস্তাব করিয়াছেন।

আপনার পরবর্ত্তী আপত্তি হইতেছে মূল প্রস্তাব হইতে আমরা সরিয়া গিয়াছি। আমি আপনাকে একথা স্মরণ করাইয়া দিব যে, আমন্ত্রণ গ্রহণ করিবার সময় কংগ্রেস বা মুসলিম লীগ মূল প্রস্তাব গ্রহণ করিবে এমন প্রতিশ্রুতি দেয় নাই।

২৯শে এপ্রিল তারিখে আমি আপনাকে লিখিয়াছিলাম—"আমরা এ কথা কখনও মনে করি না যে কংগ্রেস ও লীগ কর্ত্তৃক আমাদের আমন্ত্রণ গ্রহণের অর্থ আমার পত্রে লিখিত প্রস্তাব গ্রহণ তাঁহাদের পক্ষে বাধ্যতামূলক। এই প্রস্তাব কংগ্রেস ও লীগের মধ্যে একটা মীমাংসার প্রয়াস মাত্র।

"আমরা মুসলিম লীগ ওয়ার্কিং কমিটিকে শুধু অনুরোধ করিয়াছিলাম যে এ সম্পর্কে আমাদের ও কংগ্রেস প্রতিনিধিদের সহিত আলোচনার জন্য লীগ প্রতিনিধি প্রেরণ করিতে।" ইহাই একমাত্র যুক্তিসঙ্গত মনোভাব কারণ আমাদের আলাপ-আলোচনার একমাত্র উদ্দেশ্য হইতেছে একটা মীমাংসায় পৌঁছিবার জন্য সর্ব্বপ্রকার সুযোগ গ্রহণ।

আমাদের প্রস্তাবে আমরা যুক্তরাষ্ট্রীয় গবর্ণমেন্টের অধীনস্থ বিষয়গুলির মধ্যে মৌলিক অধিকার সম্পর্কিত বিষয়টি অন্তর্ভুক্ত করিয়াছি। কারণ আমাদের ধারণা ইহা সকলের পক্ষেই কল্যাণকর হইবে। যুক্তরাষ্ট্রীয় গবর্ণমেন্টের অর্থসংগ্রহ প্রশ্নের সমগ্র তাৎপর্য্য ত্রিদলীয় সম্মেলনে আলোচিত হইতে পারিবে। আপনার পত্রের শেষ অনুচ্ছেদে আপনি বলিয়াছেন যে, অদ্য অপরাহ্ণে আহূত সম্মেলনে মুসলিম লীগ প্রতিনিধিদের উপস্থিত থাকিয়া কোনও লাভ হইবে না তবে আমরা চাহিলে আপনারা আসিতে রাজী আছেন। আমি এবং আমার সহকর্মিগণ আমাদের নূতন প্রস্তাব সম্পর্কে উভয় দলের অভিমত জানিতে চাই। কাজেই বৈঠকে যদি আপনারা আসেন তবে আমরা সন্তুষ্টই হইব।

কংগ্রেস প্রেসিডেন্টের পত্র

৯ই মে তারিখে কংগ্রেস প্রেসিডেন্ট লর্ড পেথিক লরেন্সের নিকট নিম্নলিখিত পত্র প্রেরণ করেন:—

গতকল্য কংগ্রেস ও লীগের মধ্যে মীমাংসার কতিপয়

প্রস্তাবসহ আপনি যে লিপি প্রেরণ করিয়াছিলেন তাহা আমি এবং আমার সহকর্মিগণ বিশেষ সতর্কতার সহিত বিবেচনা করিয়াছি। গত ২৮শে এপ্রিল তারিখে আমি আপনাকে যে পত্র প্রেরণ করিয়াছিলাম তাহাতে আপনার ২৭শে এপ্রিলের পত্রে লিখিত মূল আদর্শ সম্পর্কে কংগ্রেসের মনোভাব জানাইয়াছি। প্রথম ত্রিদলীয় আলোচনার পর ৬ই মে তারিখে সম্মেলনের আলোচিত বিষয়সমূহ সম্পর্কে সম্ভাবিত কোন ভ্রান্ত ধারণা দূর করিবার জন্ত আমি আপনাকে আবার লিখি।

এক্ষণে আপনার লিপিতে দেখিতেছি যে, আপনার কয়েকটি প্রস্তাব আমাদের এবং কংগ্রেসের চিরাচরিত নীতির সম্পূর্ণ বিরোধী। এইভাবে আমরা একটি জটিল অবস্থার সম্মুখীন হইয়াছি। একটি মীমাংসার জন্ত এবং শান্তিপূর্ণ ভাবে ভারতীয়দের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তরের জন্ত আমরা সর্বপ্রকার আলোচনা করিতে প্রস্তুত আছি এবং ইহার জন্ত আমরা যত দূর সম্ভব অগ্রসর হইতে রাজী আছি। কিন্তু এমন একটি সীমা আছে যাহা আমরা অতিক্রম করিতে পারি না। ভারতীয় জনগণের পক্ষে এবং স্বাধীন রাষ্ট্র হিসাবে ভারতের প্রগতির পক্ষে ক্ষতিকর কোন ব্যবস্থায় আমরা রাজী হইতে পারিব না। আমার পূর্ববর্তী সমস্ত পত্রে আমি শক্তিশালী যুক্তরাষ্ট্রীয় গবর্ণমেণ্টের উপর গুরুত্ব আরোপ করিয়াছি। আমি আরও বলিয়াছি যে উপযুক্ত রাষ্ট্র এবং আপনার প্রস্তাবিত পন্থায় প্রদেশ বিভাগ আমরা অনুমোদন করিতে পারি না। কেন্দ্রীয় শাসন-পরিষদ এবং আইন পরিষদের অসমান সংখ্যক সম্প্রদায় হইতে সমান সংখ্যক প্রতিনিধি গ্রহণে আমরা সম্পূর্ণ বিরোধী। কোন প্রদেশ বা অঞ্চল যদি ইচ্ছা করিয়া নিজেদের মধ্যে সহযোগিতা করে তবে আমরা তাহার বিরোধী হইতে চাহি না। কিন্তু তাহা সম্পূর্ণ সরকারীভাবে হইবে। আপনার প্রস্তাবে গণপরিষদের অবাধ বিচারের পথে বাধা রহিয়াছে। আমরা বুঝি না ইহা কি প্রকারে সম্ভব। আমরা এক্ষণে একটি বৃহৎ সমস্তার একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক বিবেচনা করিতেছি। সে দিকটি সম্পর্কে এখন কোন সিদ্ধান্ত করা হইলে আমরা বা গণপরিষদ অন্ত দিক সম্পর্কে যে ব্যবস্থা করিতে চাহিবে তাহা ব্যাহত হইতে পারে। আমাদের মতে একমাত্র যুক্তিসঙ্গত পন্থা হইতেছে রাষ্ট্র ব্যবস্থা প্রণয়নের জন্ত অবাধ কর্তৃত্বসম্পন্ন একটি গণপরিষদ গঠন করা। অবশ্ব সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের স্বার্থরক্ষার জন্তও কিছু পৃথক ব্যবস্থা থাকিবে। কাজেই কোন বৃহৎ সাম্প্রদায়িক সমস্তা স্বার্থসংশ্লিষ্ট দলের সম্মতিক্রমে অথবা সম্মতি না পাওয়া গেলে সালিশীর দ্বারা সমাধান করার প্রস্তাবে আমরা রাজী আছি। আপনার লিপির ৮ অনুচ্ছেদে ২টি বা ৩টি পৃথক শাসনতন্ত্র প্রণয়নের যে প্রস্তাব করা হইয়াছে তাহার ফলে সর্বভারতের জন্ত রাষ্ট্রব্যবস্থা প্রণয়ন তিনটি অসংযুক্ত গোষ্ঠীর অনুকম্পার উপর নির্ভর করিবে।

প্রথম অবস্থাতেই কোন প্রদেশের ইচ্ছার বা অনিচ্ছার একটি বিশেষ গোষ্ঠীতে যোগদান বাধ্যতামূলক করা হইয়াছে। এখন কংগ্রেসের আদর্শে অনুপ্রাণিত সীমান্ত প্রদেশকে কেন কংগ্রেস-বিরোধী গোষ্ঠীতে যোগ দিতে বাধ্য করা হইবে? আমরা স্বীকার করি যে, ব্যষ্টি বা সমষ্টির কল্যাণের জন্ত যুক্তিতর্কের বাহিরেও অনেক কিছু বিবেচনা করিতে হয়। কিন্তু যুক্তিতর্কের কথা একেবারেই উড়াইয়া দেওয়া চলে না। আজ আমরা কোটি কোটি মানুষের ভবিষ্যৎ গড়িয়া তুলিবার জন্য তৎপর হইয়াছি। এখন অযুক্তি এবং অন্যায়কে প্রশ্রয় দিলে তাহার ফল বিশেষ বিপজ্জনক হইবে।

আপনার লিপিতে লিখিত কয়েকটি বিষয়ের এক্ষণে বিবেচনা করিব এবং তৎসম্পর্কে কয়েকটি সুপারিশ করিব। যুক্তরাষ্ট্রীয় গবর্ণমেণ্টের অধীনে যে সকল বিষয় থাকিবে তাহা পরিচালনার নিমিত্ত অর্থ সংগ্রহের জন্য আপনি সেই গবর্ণমেণ্টক প্রয়োজনীয় ক্ষমতা দিবার প্রস্তাব করিয়াছেন। আমরা মনে করি এ কথা স্পষ্টভাবে বলা উচিত যে, যুক্তরাষ্ট্রীয় গবর্ণমেণ্টের নিজের অধিকার অনুযায়ী রাজস্ব সংগ্রহের ক্ষমতা থাকিবে। মুদ্রা, বাণিজ্য এবং অন্যান্য প্রয়োজনীয় বিষয় যুক্তরাষ্ট্রীয় গবর্ণমেণ্টের অধীনে থাকিবে। যুক্তরাষ্ট্রীয় গবর্ণমেণ্টের হাতে আর একটি বিষয় থাকা অতিশয় প্রয়োজন। তাহা হইতেছে জাতীয় পরিকল্পনা। কেন্দ্রেই শুধু পরিকল্পনা যথাযোগ্যরূপে গ্রহণ করা যাইতে পারে। অবশ্ব বিভিন্ন অঞ্চলে তথাকার অবস্থানুযায়ী সেই পরিকল্পনার কার্য্যে রূপ দেওয়া হইল। রাষ্ট্রব্যবস্থা ব্যর্থ হইলে অথবা অন্য কোন জনস্বার্থ সম্পর্কিত জরুরী ব্যাপারে ব্যবস্থা গ্রহণের ক্ষমতা যুক্তরাষ্ট্রের অবশ্বই থাকিবে।

শাসন-পরিষদে এবং আইন-পরিষদে অসমান সংখ্যক সম্প্রদায়সমূহ হইতে সমান সংখ্যক প্রতিনিধি গ্রহণের আমরা সম্পূর্ণ বিরোধী। ইহা অসঙ্গত এবং ইহা বহু গোলমাল সৃষ্টি করিবে। ইহার মধ্যে বিসম্বাদ এবং অবাধ প্রগতিবিরোধী প্রয়াসের বীজ রহিয়াছে। এই ব্যাপারে অথবা অনুরূপ অন্য কোন ব্যাপারে যদি মীমাংসা নাই হয় তাহা হইলে আমরা সালিশীর সিদ্ধান্ত মানিয়া লইতে প্রস্তুত আছি। ১০ বৎসর অন্তর রাষ্ট্রব্যবস্থা পুনর্বিবেচনার যে প্রস্তাব আপনি করিয়াছেন আমরা তাহা মানিতে সম্মত। কারণ, যে কোন সময়ে রাষ্ট্রব্যবস্থা সংশোধনের বিধান ইহাতে থাকিবেই। রাষ্ট্রব্যবস্থা পুনর্বিবেচনার জন্য গণপরিষদের অনুরূপ ভিত্তিতে একটি প্রতিষ্ঠান গঠনের প্রস্তাব করা হইয়াছে। কোন জরুরী অবস্থার উদ্ভব হইলে এই ব্যবস্থা করা হইবে। আমরা আশা করি ভারতের রাষ্ট্রব্যবস্থা সমস্ত প্রাপ্তবয়স্কদের ভোটের দ্বারা নির্ধারিত হইবে। ১০ বৎসর পরে ভারতবাসী সমস্ত গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নে তাহাদের মনোভাব সমস্ত প্রাপ্তবয়স্কের ভোটের দ্বারা ছাড়া অন্য কোন উপায়ে প্রকাশ করিতে রাজী হইবে না।

৭নং অনুচ্ছেদের (ক) ধারা সম্পর্কে আমরা মনে করি যে,

সকল দলের পক্ষে সুবিচারের উদ্দেশ্যে একটি মাত্র হস্তান্তরীয় ভোটের সাহায্যে (সিঙ্গল ট্রান্সফারেবল ভোট) সংখ্যানুপাতে প্রতিনিধিত্বের ব্যবস্থা করাই নির্বাচনের প্রকৃষ্টতম পন্থা।

একথা মনে রাখিতে হইবে যে, প্রাদেশিক পরিষদের নির্বাচন বর্ত্তমানে যে ভিত্তিতে হইয়া থাকে তাহাতে সংখ্যালঘিষ্ঠদের জন্য বিশেষ সুবিধার ব্যবস্থা আছে।

গণপরিষদ এক-দশমাংশ লইয়া গঠিতে হইলে সদস্যসংখ্যা একেবারেই অপর্য্যাপ্ত হইবে। সম্ভবতঃ ঐ সংখ্যা দুই শতের অধিক হইবে না, অথচ গণ পরিষদে চরম গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের অবতারণা হইবে। উহাতে আরেও অধিকসংখ্যক সদস্য থাকা সঙ্গত। আমাদের মতে প্রাদেশিক পরিষদগুলির মোট সদস্যের অন্যূন এক-পঞ্চমাংশ লইয়া গণ-পরিষদ গঠিত হওয়া উচিত।

(ঘ) ধারাটি আদৌ স্পষ্ট নহে। উহা আরও পরিষ্কার করিয়া বলা আবশ্যক। কিন্তু বর্ত্তমানে আমরা ঐ সম্পর্কে বিস্তৃত আলোচনায় যাইতে চাহি না।

(ঘ) (ঙ) (চ) (ছ) ধারাগুলি সম্পর্কে আমি ইতিপূর্ব্বেই উল্লেখ করিয়াছি। প্রাদেশিক মণ্ডল গঠন এবং গঠনপ্রণালী উভয়ই আমাদের মতে অবাঞ্ছনীয়। অবশ্য যদি প্রদেশগুলি মণ্ডল গঠনে ইচ্ছুক হয় তাহা হইলে আমরা উহা অগ্রাহ্য করিতে চাহি না। কিন্তু এই বিষয় গণ-পরিষদের নির্দ্ধারণের জন্য অবশ্যই রাখিয়া দিতে হইবে। যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে সঙ্গেই শাসনতন্ত্র প্রণয়ন করিয়া কার্য্যকরী করিতে হইবে। এই শাসনতন্ত্রে প্রদেশ ও অঙ্গরাষ্ট্রের জন্য এই বিধানের ব্যবস্থা থাকিবে। আবশ্যকবোধে প্রদেশগুলি ইহার পরিবর্ত্তন করিতে পারিবে।

(জ) ধারা সম্পর্কে এই কথা বলা চলে যে, বর্ত্তমান অবস্থায় আমরা অনুরূপ ধারা মানিয়া লইতে প্রস্তুত আছি। অবশ্য মতানৈক্য ঘটিলে বিষয়টি বিবেচনার জন্য সালিশী বোর্ডে প্রেরণ করিতে হইবে। আপনার লিপিতে উল্লিখিত প্রস্তাবের মধ্যে কয়েকটি বিশেষ ত্রুটি আমি পূর্ব্বেই উল্লেখ করিয়াছি। আমাদের প্রস্তাব অনুযায়ী উহা সংশোধিত হইলে কংগ্রেস যাহাতে উহা গ্রহণ করে তজ্জন্য আমরা সুপারিশ করিতে পারিব। কিন্তু লিপিতে যে খসড়া করা হইয়াছে উহা আমরা গ্রহণ করিতে সমর্থ নহি।

মোট কথায় লীগের সহিত আপোষের আন্তরিক ইচ্ছা সত্ত্বেও আপনার প্রস্তাবগুলিকে বাধ্যতামূলকভাবে আমরা মানিয়া লইতে পারিব না। এমন কোন বৃহত্তর অশান্তি সৃষ্টি করা সঙ্গত হইবে না যেখান হইতে আমাদের তিন দলকেই পরিত্রাণের জন্য পথের সন্ধান করিতে হইবে। স্বাধীন ও অখণ্ড ভারতের বিকাশের জন্য যদি দুইটি দলের মধ্যে কোনক্রমেই সম্মানজনক সর্ত্তে আপোষ সম্ভব না হয় তাহা হইলে অবিলম্বে একটি অন্তর্ব্বর্ত্তীকালীন অস্থায়ী গবর্ণমেণ্ট গঠন করা সঙ্গত বলিয়া আমরা মনে করি, যে গবর্ণমেণ্ট কেন্দ্রীয় পরিষদের নির্ব্বাচিত সদস্যদের নিকট জবাবদিহি করিতে বাধ্য থাকিবেন। কিন্তু গণ-পরিষদ সম্পর্কে লীগও কংগ্রেসের মতবিরোধ নিরপেক্ষ ট্রাইবুনালে প্রেরণ করিতে হইবে।

দুই দলের মত-বিরোধের মীমাংসায় জন্য পণ্ডিত জবাহরলাল নেহরু একজন নিরপেক্ষ বিচারক নিয়োগের প্রস্তাব করিলে বিচারকের মধ্যস্থতায় আপোষের সম্ভাবনা আছে অনুমান করিয়া সম্মেলন স্থগিত রাখা হয়। দুই দলের মধ্যে নিম্নলিখিত পত্র বিনিময় হয়:

জবাহরলাল নেহরুর পত্র

পণ্ডিত জবাহরলাল নেহরু গত ১০ই মে লীগ সভাপতির নিকট লেখেন—

গতকল্যকার সম্মেলনের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী আমার সহকর্ম্মিগণ একজন উপযুক্ত বিচারক মনোনীত করা সম্পর্কে যথেষ্ট বিবেচনা করিয়াছেন। আমাদের ধারণা যে, এই পদের জন্য কোন ইংরেজ, হিন্দু, মুসলমান এবং শিখকে মনোনীত করা সঙ্গত হইবে না। তাই মনোনয়নের ক্ষেত্র সীমাবদ্ধ। যাহা উচক, আমরা একটি নামের তালিকা করিয়াছি যাহা হইতে কাহাকেও মনোনীত করা যাইতে পারে। আপনি ও আপনার সহকর্ম্মীদের সহযোগিতায় একটি অনুরূপ তালিকা প্রণয়ন করিয়াছেন বলিয়া আমি অনুমান করি। আপনি ও আমি একত্রে দুইটি তালিকা বিবেচনা করিতে চাই। ইহাতে আপনার সম্মতি আছে কি? আপনার সম্মতি থাকিলে আমরা দুইজনে এই সম্পর্কে আলোচনার জন্য মিলিত হইতে পারি; এবং আমাদের আলোচনার পর আমরা যে সুপারিশ করিব তাহা আমাদের আট জন অর্থাৎ কংগ্রেসের ৪ জন প্রতিনিধি এবং মুসলিম লীগের ৪ জন প্রতিনিধি মিলিয়া বিবেচনা করিয়া দেখিয়া চূড়ান্তভাবে মনোনয়ন দিতে পারিবেন। আগামীকল্য সম্মেলন আরম্ভ হইলে সেখানে ঐ সিদ্ধান্ত উপস্থাপিত করা যাইতে পারিবে।

লীগ সভাপতির ১০ই মে-র পত্র

আপনার ১০ই মে তারিখের পত্রখানি অপরাহ্ণ ৬টার সময় পাইয়াছি। গতকল্য বড়লাট-ভবনে আপনার ও আমার মধ্যে বিচারক নিয়োগের বিষয় ব্যতীত আরও অনেক বিষয়ের আলোচনা হইয়াছিল। অল্পক্ষণ আলোচনার পর আমরা এই সিদ্ধান্তে উপনীত হই যে, গতকল্য সম্মেলনে আপনি যে প্রস্তাব করিয়াছেন উহা আপনার এবং আমার সহকর্ম্মিগণের সহিত আলোচনার পর আমরা উহার সমস্ত দিক আরও পর্য্যালোচনা করিয়া দেখিব।

আপনার প্রস্তাবের বিভিন্ন দিক পর্য্যালোচনা করিবার জন্য আগামীকল্য সকাল ১০ ঘটিকার পর আপনার সুবিধামত যে কোন সময়ে আপনার দেখা পাইলে আমি সুখী হইব।

পণ্ডিত জবাহরলালের উত্তর

গত ১১ই মে পণ্ডিত জবাহরলাল লীগ সভাপতিকে লেখেন:

গতকল্য রাত্রি ১০ ঘটিকার আপনার ১০ই মে তারিখের পত্র আমি পাইয়াছি। বড়লাট-ভবনে আমাদের মধ্যে যখন আলোচনা হইয়াছিল তখন আপনি বিচারক মনোনয়ন ব্যতীত অন্যান্য বিষয়ের অবতারণা করিয়াছিলেন কিন্তু আমি সে সম্বন্ধে আমার মতামত তখনই দিয়াছিলাম। আমার এই প্রতীতি জন্মিয়াছিল যে, বিচারক নিয়োগ ব্যাপারে আমরা একমত হইয়াছি এবং বিচারকের নাম প্রস্তাব করাই আমাদের পরবর্তী কাজ। সম্মেলনে আমাদের মধ্যে মতৈক্য হওয়ার ফলেই আমার সহকর্মিগণ উপযুক্ত ব্যক্তিদের নামের তালিকা প্রস্তুত করিয়াছেন। অদ্য অপরাহ্নে যখন সম্মেলন হইবে তখন আমরা আমাদের মনোনীত বিচারকের নাম প্রকাশ করিব, অন্ততঃপক্ষে বিচারক সম্পর্কে আমাদের মতামত জানাইব, ইহা সকলেই আশা করেন।

নিরপেক্ষ বিচারক নিয়োগের মুখ্য তাৎপর্য্য এই যে, তাঁহার সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত বলিয়া গ্রহণ করিতে হইবে। আমরা উহা মানিয়া লইতে প্রস্তুত জানিবেন। আপনার প্রস্তাব অনুযায়ী আমি অদ্য সকাল ১০ ৩০ ঘটিকায় আপনার বাসভবনে যাইয়া সাক্ষাৎ করিব।

লীগ সভাপতির পত্র

লীগ সভাপতি গত ১২ই মে পণ্ডিত জবাহরলালকে লেখেন:

আপনার ১১ই মে তারিখের পত্র পাইলাম। বড়লাট-ভবনে আপনার সহিত আমার ১৫ অথবা ২০ মিনিট কথোপকথনকালে আমি আপনার প্রস্তাবের বিভিন্ন দিক এবং তাৎপর্য্যের কথা উল্লেখ করি। আমাদের অবসরের জন্যই আলাপ হইয়াছিল। কিন্তু আপনার ও আমার মধ্যে আপনারই প্রস্তাব অনুযায়ী আপনার ও আমার পরস্পরের সহকর্মীদের সহিত বিচারক নিয়োগ সম্পর্কে আলোচনার সর্ত্ত ভিন্ন অন্য কোন বিষয়ে সর্ত্ত হয় নাই। পরদিন এই বিষয়ে আরও আলোচনার জন্য আমরা তখন আলোচনা বন্ধ রাখি।

আরও আলোচনার জন্য ১০-৩০ ঘটিকায় আপনার সাক্ষাৎ পাইলে খুশী হইব।

লীগ সভাপতির লিপি

গত ১২ই মে তারিখে মুসলিম লীগের সভাপতি লীগের সর্ব্বনিম্ন দাবী প্রস্তাবাকারে মন্ত্রী-মিশন ও কংগ্রেসের নিকট প্রেরণ করেন :—

আমাদের প্রস্তাবের মূলনীতি স্বীকার করিয়া লইতে হইবে।

১। ছয়টি মুসলমান প্রদেশকে (পঞ্জাব, উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ, বেলুচিস্থান, সিন্ধু, বঙ্গদেশ এবং আসাম) একটি মণ্ডলীর অন্তর্ভুক্ত করিতে হইবে এবং এই মণ্ডল (গ্রুপ) দেশরক্ষার জন্য আবশ্যক পররাষ্ট্র, দেশরক্ষা এবং যানবাহন ব্যতীত অন্যান্য সমস্ত বিষয় পরিচালনা করিবেন। মুসলিম প্রদেশের মণ্ডল (পরিবর্ত্তীকালে পাকিস্তান মণ্ডল বলা হইয়াছে) এবং হিন্দু প্রদেশগুলির মণ্ডলের রাষ্ট্রতন্ত্র রচনাকারী পরিষদ একযোগে পররাষ্ট্র, দেশরক্ষা এবং যানবাহন সংক্রান্ত বিষয়ের পরিচালনা করিবেন।

২। ছয়টি মুসলমান প্রদেশের জন্য একটি স্বতন্ত্র শাসনতন্ত্র রচনাকারী পরিষদ থাকিবে। ঐ পরিষদ মণ্ডলের এবং মণ্ডলের অন্তর্ভুক্ত প্রদেশগুলির জন্য শাসনতন্ত্র রচনা করিবে এবং প্রাদেশিক মণ্ডল ও কেন্দ্রীয় গবর্ণমেণ্টের (পাকিস্তান যুক্তরাষ্ট্র) জন্য ক্ষমতা নির্দ্ধারণ করিয়া দিবে। প্রাদেশিক মণ্ডল ও কেন্দ্রীয় গবর্ণমেণ্টের হস্তে ন্যস্ত ক্ষমতা ব্যতীত অবশিষ্ট সার্ব্বভৌম ক্ষমতা প্রাদেশিক গবর্ণমেণ্টের হাতে থাকিবে।

৩। শাসনতন্ত্র প্রণয়নকারী পরিষদের প্রতিনিধি নির্ব্বাচন প্রণালী এইরূপ হইবে যাহাতে পাকিস্তান মণ্ডলের প্রত্যেক প্রদেশ বিভিন্ন সম্প্রদায়ের জনসংখ্যা অনুপাতে প্রতিনিধি প্রেরণ করিতে পারে।

৪। শাসনতন্ত্র প্রণয়নকারী পরিষদ কর্ত্তৃক পাকিস্তান যুক্তরাষ্ট্র এবং প্রদেশসমূহের মণ্ডলের শাসনতন্ত্র চূড়ান্তভাবে রচিত হইলে পরে যে কোন প্রদেশ তাহার মণ্ডলের বাহিরে আসিবে কিনা তাহা নির্দ্ধারণ করিতে পারিবে। অবশ্য মণ্ডলের বাহিরে থাকা না থাকা সম্পর্কে সেই প্রদেশের জনসাধারণের মতামত গণ-ভোট সাহায্যে নির্দ্ধারিত করিতে হইবে।

৫। ইউনিয়ন গবর্ণমেণ্টে কোন আইন সভা থাকিবে কিনা তাহা শাসনতন্ত্র প্রণয়নকারী পরিষদ দুইটির যুক্ত অধিবেশনে আলোচনার বিষয় হইবে। কোন্ প্রণালীতে ইউনিয়ন গবর্ণমেণ্টের জন্য অর্থ সংগৃহীত হইবে তাহা শাসনতন্ত্র রচনাকারী পরিষদ দুইটির যুক্ত অধিবেশনে স্থিরীকৃত হইবে কিন্তু কোন অবস্থাতেই কর ধার্য্য করিয়া ঐ অর্থ সংগ্রহ করা চলিবে না।

৬। ইউনিয়ন গবর্ণমেণ্টে দুইটি প্রাদেশিক মণ্ডল হইতে সমসংখ্যক প্রতিনিধি থাকিবে। যদি আইনসভা থাকে তাহা হইলে উহাতেও সমসংখ্যক প্রতিনিধি থাকিবে।

৭। হিন্দু প্রাদেশিক মণ্ডলের এবং পাকিস্তান মণ্ডলের শাসনতন্ত্র রচনাকারী পরিষদ দুইটির অধিকাংশ সদস্য উপস্থিত থাকিয়া পৃথক্ পৃথক্ ভাবে ভোট না দিলে কোন গুরুতর সাম্প্রদায়িক সমস্যা সংক্রান্ত বিষয় যুক্ত শাসনতন্ত্র রচনাকারী পরিষদের বৈঠকে গৃহীত হইতে পারিবে না।

৮। তিন-চতুর্থাংশ সদস্য উপস্থিত না থাকিলে ইউনিয়ন গবর্ণমেণ্ট বিতর্কমূলক প্রকৃতির আইন এবং শাসন-সংক্রান্ত বিষয়ে কোন সিদ্ধান্ত করিতে পারিবে না।

৯। প্রাদেশিক মণ্ডলের এবং প্রদেশের রাষ্ট্র-ব্যবস্থায় বিভিন্ন সম্প্রদায়ের জন্য ধর্ম্ম, সংস্কৃতি ও অন্যান্য বিষয়ের মৌলিক অধিকার এবং রক্ষাকবচের ব্যবস্থা রাখিতে হইবে।

১০। ইউনিয়ন গবর্ণমেণ্টের শাসনতন্ত্রে এইরূপ বিধান রাখিতে হইবে যে, দশ বৎসর বাদে যে-কোন সময়েই কোন প্রাদেশিক গবর্ণমেণ্ট উহার আইন সভার অধিকাংশ সভ্যের

ভোটে শাসনতন্ত্রের নিয়মাবলীর পুনর্বিবেচনা দাবি করিতে পারিবে।

উপরিলিখিত নীতির ভিত্তিতেই আমরা শান্তিপূর্ণ ভাবে আপোষ-নিষ্পত্তির প্রস্তাব করিতেছি। এই প্রস্তাবের মধ্যে সমস্ত বিষয়ই নিরপেক্ষভাবে সন্নিবেশিত হইয়াছে।

কংগ্রেসের আপোষ-প্রস্তাব

গত ১২ই মে কংগ্রেসের পক্ষ হইতে আপোষের ভিত্তি-স্বরূপ নিম্নোক্তরূপ প্রস্তাব করা হয়:

১। নিম্নলিখিত ভাবে গণ-পরিষদ গঠন করিতে হইবে—

ক। প্রত্যেক প্রাদেশিক আইনসভা হইতে একটিমাত্র হস্তান্তরীয় ভোটের সাহায্যে সংখ্যানুপাতে প্রতিনিধি নির্ব্বাচন করিতে হইবে। এইভাবে নির্ব্বাচিত সদস্তের সংখ্যা পরিষদের মোট সদস্ত-সংখ্যার এক-পঞ্চমাংশ হওয়া সঙ্গত।

খ। ব্রিটিশ ভারতের প্রতিনিধি সংখ্যার অনুপাতে দেশীয় রাজ্যসমূহের প্রতিনিধি জনসংখ্যার অনুপাতে নির্ব্বাচিত হইবে। কি প্রণালীতে এই নির্ব্বাচন হইবে তাহা পরে বিবেচনা করা হইবে।

২। গণপরিষদ যুক্তরাষ্ট্রের জন্ত একটি শাসনতন্ত্র প্রণয়ন করিবে। এই শাসনতন্ত্রে নিখিল-ভারত যুক্তরাষ্ট্র গবর্ণমেন্ট ও আইনসভার ব্যবস্থা থাকিবে। পররাষ্ট্র, দেশরক্ষা, যান-বাহন, মৌলিক অধিকার, মুদ্রা, শুল্ক ও উন্নয়ন পরিকল্পনা এবং পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে পরীক্ষান্তে যে সমস্ত বিষয় ইহার সহিত সংশ্লিষ্ট বলিয়া প্রকাশ পাইবে, সে সমস্তই পরিচালনার দায়িত্ব ইহাদের থাকিবে। আবশ্যক অর্থ-সংগ্রহ এবং রাজস্ব আদায়ের জন্ত যুক্তরাষ্ট্রের প্রয়োজনীয় ক্ষমতা থাকিবে। রাষ্ট্র-ব্যবস্থা ভাঙিয়া পড়িবার উপক্রম হইলে বা জরুরী অবস্থার উদ্ভব হইলে যুক্তরাষ্ট্রের প্রতিকারমূলক ব্যবস্থা অবলম্বনের ক্ষমতা থাকিবে।

৩। এতদ্ব্যতীত অন্ত সমস্ত ক্ষমতা প্রাদেশিক গবর্ণমেন্ট ও অঙ্গরাষ্ট্রের হাতে থাকিবে।

৪। প্রাদেশিক মণ্ডল গঠন করা যাইবে এবং যে সকল বিষয়ের ভার এইরূপ মণ্ডলী একযোগে লইতে ইচ্ছুক, সেই সকল প্রাদেশিক বিষয় মণ্ডলীই নির্দ্ধারণ করিবে।

৫। নিখিল-ভারত যুক্তরাষ্ট্র গবর্ণমেন্টের জন্ত গণপরিষদ উপরিলিখিতভাবে শাসনতন্ত্র প্রণয়ন করিবার পর প্রদেশের প্রতিনিধিগণ মণ্ডল গঠন করিয়া প্রাদেশিক শাসনতন্ত্র নির্দ্ধারণ এমন কি ইচ্ছা করিলে মণ্ডলীর জন্যও শাসনতন্ত্র নির্দ্ধারণ করিতে পারিবেন।

৬। নিখিল-ভারত যুক্তরাষ্ট্রের শাসনতন্ত্রে কোন বড় রকমের সাম্প্রদায়িক সমস্যা উপস্থিত হইলে গণপরিষদে সংশ্লিষ্ট সম্প্রদায়ের উপস্থিত প্রতিনিধিদের অধিকাংশের ভোট স্বতন্ত্র ভাবে লইতে হইবে এবং কোন মীমাংসা সম্ভব না হইলে উহা সালিশী বোর্ডে প্রেরণ করিতে হইবে। কোন সাম্প্রদায়িক প্রশ্নকে গুরুতর বলিয়া বিবেচনা করিবার সময় যদি সন্দেহ উপস্থিত হয়, তাহা হইলে স্পীকার সে সম্বন্ধে নির্দ্দেশ দিবেন অথবা উহার সিদ্ধান্তের জন্য যুক্তরাষ্ট্রীয় আদালতে প্রেরণ করা যাইতে পারে।

৭। শাসনতন্ত্র রচনার ক্ষেত্রে কোন আপত্তি উত্থিত হইলে সেই বিশেষ বিষয়টি সালিশীর জন্য পাঠাইতে হইবে।

৮। শাসনতন্ত্রে যে-কোন সময় উহা সংশোধনের ব্যবস্থা রাখিতে হইবে কিন্তু ক্রমাগতই যাহাতে উহা না ঘটিতে পারে তজ্জন্যও ব্যবস্থা অবলম্বন করিতে হইবে। ইহা সুস্পষ্টরূপে উল্লেখ থাকা আবশ্যক যে, প্রয়োজন অনুভূত হইলে দশ বৎসর পরে গোটা শাসনতন্ত্র সম্পর্কেই পুনর্বিবেচনা করা যাইবে।

মুসলিম লীগের প্রস্তাব সম্পর্কে কংগ্রেস

আপোষ সম্পর্কে মুসলিম লীগ যে নীতির ভিত্তিতে প্রস্তাব করিয়াছে, উহা কংগ্রেসের প্রস্তাব হইতে এতই পৃথক্ যে, স্বতন্ত্রভাবে প্রতিটি বিষয়ের আলোচনা করা দুরূহ। এই বিজ্ঞপ্তি এবং লীগের প্রস্তাব বিবেচনা করিলেই অসুবিধাগুলি এবং আপোষের সম্ভাবনা কতদূর তাহা সুস্পষ্ট হইবে। মুসলিম লীগের প্রস্তাব সম্পর্কে আমাদের সংক্ষিপ্ত মতামত নিয়ে দেওয়া হইল:

(১) সারা ভারতের জন্য একটি মাত্র শাসনতন্ত্র রচনাকারী পরিষদ অথবা গণপরিষদ গঠন আমরা প্রকৃষ্ট পন্থা বলিয়া মনে করি। প্রদেশগুলি আগ্রহান্বিত হইলে পরে প্রাদেশিক মণ্ডল গঠন করা যাইতে পারে। যদি প্রদেশগুলি মণ্ডলী গঠন করিতে ইচ্ছুক হয় তাহা হইলে তাহা করিবার স্বাধীনতা তাহাদের থাকিবে এবং তাহারা তাহাদের শাসনতন্ত্র নিজেরাই রচনা করিতে পারিবে কিন্তু কোন অবস্থাতেই আসাম এবং উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশের লীগ প্রস্তাবিত মণ্ডলীতে স্থান হইতে পারে না, কারণ নির্ব্বাচনের ফলাফল ঐ প্রস্তাবের পরিপন্থী।

(২) প্রাদেশিক গবর্ণমেন্টের হস্তে প্রধান প্রধান বিষয়ের ক্ষমতা ন্যস্ত করিতে সম্মত হওয়া ব্যতীতও আমরা অবশিষ্ট ক্ষমতা দেওয়া সম্পর্কেও একমত হইয়াছি। তাহারা উহা ইচ্ছামত কাজে লাগাইতে পারে, এবং মণ্ডলী গঠন করিয়া কাজে চালাইতে পারে। এরূপ মণ্ডলীর চূড়ান্ত রূপ কি দাঁড়াইবে তাহা বর্ত্তমান অবস্থায় নির্ণয় করা কঠিন; কাজেই উহা প্রদেশের প্রতিনিধিদের হাতেই ছাড়িয়া দেওয়া সঙ্গত।

(৩) একটি মাত্র হস্তান্তরীয় ভোটের সাহায্যে নির্ব্বাচন করাই আমাদের মতে প্রকৃষ্ট পন্থা। আইন সভাগুলিতে বিভিন্ন সম্প্রদায়ের যত প্রতিনিধি আছেন, সেই সংখ্যানুপাতে এই পন্থায় উপযুক্ত প্রতিনিধিদের ব্যবস্থা করা সম্ভব হইবে। জনসংখ্যার অনুপাতে করিতে চাহিলেও আমাদের কোন আপত্তি নাই। কিন্তু ইহাতে যে সমস্ত প্রদেশে কোন কোন সম্প্রদায়কে বিশেষ সুবিধা দেওয়া হইয়াছে, সেখানে অসুবিধার সৃষ্টি হইবে।

(৪) কোন প্রদেশের পক্ষে মণ্ডলী হইতে স্বেচ্ছায় বাহির হইয়া আসিবার অধিকার থাকা প্রয়োজন। তেমনি কোন মণ্ডলীতে কোন প্রদেশকে যুক্ত করিবার পূর্ব্বে সেই প্রদেশের সম্মতি গ্রহণও প্রয়োজন।

(৫) যুক্তরাষ্ট্রের একটী আইন-পরিষদ থাকা অনিবার্য্য প্রয়োজন বলিয়া আমরা মনে করি। আমরা ইহাও মনে করি যে, ইউনিয়ন গবর্ণমেণ্টের রাজস্ব আদায়ের ক্ষমতা থাকাও একান্ত আবশ্যক।

(৬-৭) যুক্তরাষ্ট্রের শাসন-পরিষদে এবং আইন-পরিষদে দুইটি পৃথক প্রাদেশিক মণ্ডলীর সমসংখ্যক প্রতিনিধি রাখার আমরা সম্পূর্ণ বিরোধী। গণপরিষদে সংশ্লিষ্ট সম্প্রদায়ের অধিকাংশ সভ্য উপস্থিত থাকিয়া স্বতন্ত্রভাবে ভোট না দিলে কোন সাম্প্রদায়িক প্রশ্নের মীমাংসা হইতে পারিবে না। এই বিধানই সংখ্যা-লঘিষ্ঠদের স্বার্থরক্ষার পক্ষে শ্রেষ্ঠ রক্ষা-কবচ বলিয়া আমরা মনে করি।

(৮) লীগ ৮ নম্বরে যে প্রস্তাব করিয়াছে উহা মানিতে গেলে কোন গবর্ণমেণ্ট বা আইন সভা আদৌ চলিতে পারে না। বিশেষ করিয়া আমরা যখন প্রধান প্রধান সাম্প্রদায়িক প্রশ্ন সম্পর্কে রক্ষা-কবচের ব্যবস্থা করিয়াছি, তখন ঐ ধরণের প্রস্তাবের অর্থ সর্ব্বপ্রকার কায়েমী স্বার্থ রক্ষার ব্যবস্থা করা মাত্র। আমরা উহা আদৌ অনুমোদন করি না।

(৯) শাসনতন্ত্রে ধর্ম্ম, সংস্কৃতি এবং অনুরূপ বিষয় সম্পর্কে রক্ষা-কবচের এবং মৌলিক অধিকার সংরক্ষণের ব্যবস্থা রাখা সম্পর্কে আমরা সম্পূর্ণ একমত। আমাদের মতে এই সমস্ত বিষয় নিখিল-ভারত যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসনতন্ত্রের অন্তর্ভুক্ত হওয়া সঙ্গত, তাহা হইলে সারা ভারতে ইহা সমভাবে প্রযোজ্য হইবে।

(১০) যুক্তরাষ্ট্রের শাসনতন্ত্রে উহা সংশোধনের ব্যবস্থা অবশ্য রাখিতে হইবে। এমন কি ১০ বৎসর পরে উহার সম্পূর্ণ সংশোধনের ব্যবস্থা থাকাও আবশ্যক। কারণ তখনই কেবল সমগ্রভাবে বিষয়টি পুনর্বিবেচনা করার সুযোগ ঘটিবে। পৃথক হইবার অধিকারের কথা অন্তর্নিহিত থাকিলেও আমরা ঐ বিষয়ে উৎসাহ দিতে ইচ্ছুক নহি বলিয়া সে সম্বন্ধে কোন কিছু উল্লেখ করিব না। — এ পি

মিঃ জিন্না কর্ত্তৃক ঘোষণার সমালোচনা

সিমলা, ২২শে মে—মন্ত্রী-মিশনের প্রস্তাব সমালোচনা করিয়া মুসলিম লীগ সভাপতি মিঃ জিন্না দুই হাজার শব্দসমন্বিত একটি বিবৃতি দিয়াছেন। উহাতে তিনি বলিয়াছেন—"বড়ই পরিতাপের বিষয় যে, মন্ত্রী-মিশন মুসলিমদের সার্ব্বভৌম পাকিস্থান রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার দাবি অগ্রাহ্য করিয়াছেন। আমরা এখনও মনে করি যে, পাকিস্থানই ভারতের শাসনতান্ত্রিক সমস্যার একমাত্র সমাধান এবং পাকিস্থান স্থাপিত হইলেই কেবল স্থায়ী গবর্ণমেণ্ট গঠন এবং ভারতের দুইটি প্রধান সম্প্রদায় সমেত সকল অধিবাসীর-কল্যাণসাধন সম্ভবপর হইতে পারে।"

মিঃ জিন্না বলিতেছেন—"আরও দুঃখের বিষয় এই যে, মন্ত্রী-মিশন পাকিস্থানের বিরুদ্ধে অতি সাধারণ ও অসার বলিয়া প্রতিপন্ন যুক্তিসমূহের অবতারণা করিয়াছেন এবং তাঁহারা তাঁহাদের যুক্তিজাল এমন ভাষায় প্রকাশ করিয়াছেন, যাহাতে মুসলিম ভারত আহত বোধ না করিয়া পারিবে না। কংগ্রেসকে তোয়াজ ও তোষণ করিবার জন্যই তাঁহারা ইহা করিয়াছেন বলিয়া দেখা যাইতেছে। অন্যথায় বাস্তব অবস্থার আলোচনাকালে তাঁহাদিগকে তাঁহাদের ঘোষণায় নিম্নলিখিত উক্তি করিতে হইত না—ইহা সত্ত্বেও আমরা পক্ষপাতহীন ও পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে ভারত-ব্যবচ্ছেদের সম্ভাব্যতার কথা চিন্তা করিয়াছি। পাছে সংখ্যাগরিষ্ঠ হিন্দুগণ চিরকাল তাহাদের উপর শাসন চালায়—মুসলমানদের এই আশঙ্কার কথা আমাদের নিকট বিশেষভাবে উপস্থিত করা হইয়াছে। এই আশঙ্কা মুসলিম জনগণের মনে এমন বদ্ধমূল হইয়াছে যে, কাগজে কলমে কোন রক্ষা-কবচের ব্যবস্থা করিয়া তাহা দূর করা সম্ভব নহে। ভারতের আভ্যন্তরীণ শান্তিরক্ষা করিতে হইলে ধর্ম্ম, সংস্কৃতি, বৈষয়িক ও মুসলিম স্বার্থ-সংশ্লিষ্ট অন্যান্য বিষয়ের ভার মুসলিম জনগণের হাতে ন্যস্ত করার ব্যবস্থা করিতে হইবে।"

মিঃ জিন্না আরও বলেন—"আমরা প্রস্তাব করিয়াছিলাম যে, যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসন প্রবর্ত্তনের প্রথম ১০ বৎসর পর পাকিস্থানী প্রদেশগুলির ইউনিয়ন হইতে পৃথক হইয়া যাইবার অধিকার থাকা উচিত। এই প্রস্তাবে কংগ্রেসের তেমন কোন বড় রকমের আপত্তি ছিল না। কিন্তু মন্ত্রী-মিশনের প্রস্তাবে উহা স্থান পায় নাই। মন্ত্রী-মিশনের প্রস্তাবে যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসনতন্ত্র প্রবর্ত্তনের ১০ বৎসর পর ঐ শাসনতন্ত্র পুনর্ব্বিবেচনা দাবি করিবার অধিকারই মাত্র আমাদিগকে দেওয়া হইয়াছে।"

শাসনতন্ত্র রচনায় উদ্দেশ্যে যে ব্যবস্থা করা হইয়াছে, তাহার উল্লেখ করিয়া মিঃ জিন্না বলিতেছেন—"ব্রিটিশ বেলুচিস্থানের প্রতিনিধিকে 'খ' অনুচ্ছেদের অন্তর্ভুক্ত করা হইয়াছে কিন্তু তিনি কি প্রকারে নির্ব্বাচিত হইবেন, তাহার কোন নির্দ্দেশ নাই। যুক্তরাষ্ট্রের শাসনতন্ত্র রচনাকারী প্রতিষ্ঠানে হিন্দুদের বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠতা থাকিবে। ব্রিটিশ ভারত হইতে ঐ প্রতিষ্ঠানে মোট ২৯২ জন প্রতিনিধি নির্ব্বাচিত হইবেন, তন্মধ্যে মুসলিমদের সংখ্যা হইবে মাত্র ৭৯ জন। দেশীয় রাজ্যসমূহের জন্য ৯৩ জন প্রতিনিধির ব্যবস্থা করা হইয়াছে। ব্রিটিশ ভারতের প্রতিনিধি সংখ্যার সঙ্গে ঐ সংখ্যা যুক্ত করিলে, মুসলিমদের অনুপাত আরো কম হইবে, কেননা দেশীয় রাজ্যের প্রতিনিধিদের অধিকাংশই হইবেন হিন্দু। এইভাবে গঠিত গণপরিষদ অধিকাংশের ভোটে সভাপতি ও অন্যান্য কর্ম্মকর্ত্তা এবং মন্ত্রী-মিশনের ঘোষণায় ২০ নং অনুচ্ছেদে বর্ণিত উপদেষ্টা কমিটির সদস্য নির্ব্বাচন করিবেন। গণপরিষদের অন্যান্য কার্য্যাবলী সম্পর্কেও অনুরূপ নিয়মই প্রযোজ্য হইবে।

বিবৃতির উপসংহারে মিঃ জিন্না বলিতেছেন—"শীঘ্রই দিল্লীতে লীগ ওয়ার্কিং কমিটি ও কাউন্সিলের বৈঠক হইবে, তাঁহারা কি সিদ্ধান্ত করিবেন তাহা অনুমান করিবার কোন বাসনা আমার নাই। মন্ত্রী-মিশন ও বড়লাটের ঘোষণা পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে আলোচনান্তে যে সিদ্ধান্ত করা সঙ্গত বলিয়া তাঁহারা বিবেচনা করিবেন, তাহাই করিবেন।"

মন্ত্রী-মিশনের ঘোষণার বিস্তারিত সমালোচনা করিয়া মিঃ জিন্না বলেন— ১। মন্ত্রী-মিশন পাকিস্থানকে দুইটি ভাগে বিভক্ত করিয়াছেন, যথা 'খ' বিভাগ—উত্তর-পশ্চিম অঞ্চল এবং 'গ' বিভাগ—উত্তর পূর্ব্ব অঞ্চল, ২। দুইটি শাসনতন্ত্র রচনাকারী পরিষদের স্থলে 'ক' 'খ' ও 'গ'—এই তিনটি উপ-পরিষদকে অন্তর্ভুক্ত করিয়া একটি মাত্র শাসতন্ত্র রচনাকারী পরিষদ গঠনের কথা বলা হইয়াছে। ৩। তাঁহারা (মন্ত্রী-মিশন) ঘোষণা করিয়াছেন যে, ব্রিটিশ ভারত দেশীয় রাজ্য-সমূহের সমবায়ে একটি ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্র গঠিত হইবে। এই যুক্তরাষ্ট্র পররাষ্ট্র সম্পর্কিত বিষয়, দেশরক্ষা ও যানবাহন নিয়ন্ত্রণ করিবে এবং ঐ উদ্দেশ্যে প্রয়োজনীয় অর্থ সংগ্রহের ক্ষমতা তাহার থাকিবে।

দেশরক্ষার জন্ত যানবাহনের উপর যতটুকু ক্ষমতা থাকা প্রয়োজন যুক্তরাষ্ট্রের যানবাহন সম্পর্কিত ক্ষমতা ঠিক ততটুকুই থাকিবে এমন কোন ইঙ্গিত মন্ত্রী-মিশনের ঘোষণায় নাই। ঐ তিনটি বিষয় পরিচালনায় জন্ত প্রয়োজনীয় অর্থ সংগ্রহ কি প্রকারে করা হইবে, সে সম্পর্কেও আভাস দেওয়া হয় নাই। অর্থ সংগ্রহ সম্পর্কে আমরা এইরূপ অভিমত প্রকাশ করিয়াছিলাম যে, করধার্য্য করিয়া নহে, সাহায্য হিসাবে গ্রহণ করিয়া (অঙ্গরাষ্ট্রগুলির নিকট হইতে) ঐ অর্থ সংগ্রহ করা বিধেয় হইবে। ৪। ঘোষণায় বলা হইয়াছে—এই যুক্তরাষ্ট্রে ব্রিটিশ ভারত ও দেশীয় রাজ্যসমূহের প্রতিনিধি লইয়া গঠিত একটি শাসন-পরিষদ ও একটি ব্যবস্থা-পরিষদ থাকিবে ব্যবস্থা-পরিষদে কোন বড় রকমের সাম্প্রদায়িক প্রশ্ন উত্থাপিত হইলে তাহা উপস্থিত প্রতিনিধি এবং প্রধান দুই সম্প্রদায়ের অধিকাংশ ভোটের (পৃথক পৃথক ভাবে গৃহীত) দ্বারা স্থিরীকৃত হইবে।

কিন্তু আমরা বলিয়াছিলাম যে, যুক্তরাষ্ট্রে কোন আইন সভা থাকিবে না। তবে এই প্রশ্ন সম্পর্কে সিদ্ধান্তের জন্ত গণপরিষদের হাতেই ভার দেওয়া উচিত। যুক্তরাষ্ট্রে যদি কোন ব্যবস্থা-পরিষদ ও শাসন-পরিষদ হয় তবে পাকিস্থানী যৌথ অঙ্গরাষ্ট্রের এবং হিন্দুস্থানী যৌথ অঙ্গরাষ্ট্রের প্রতিনিধিদের ব্যবস্থা সমসংখ্যানুসারের ভিত্তিতেই করা উচিত।

আমরা আরও বলিয়াছিলাম যে, যুক্তরাষ্ট্র আইন বা শাসন সংক্রান্ত বিষয়ের বিতর্ক ব্যাপারে কোনরূপ সিদ্ধান্ত করিতে পারিবে না। তবে যদি প্রতিনিধিদের ৪ ভাগের ৩ ভাগ লোকই এইরূপ কোন সিদ্ধান্তের পক্ষে মত দেয় তাহা হইলে যুক্তরাষ্ট্র তাহা করিতে পারিবে। কিন্তু বিবৃতির মধ্যে আমাদের সমস্ত কথাই বাদ দেওয়া হইয়াছে।

যুক্তরাষ্ট্রের আইন সভায় কোন বড় রকমের সাম্প্রদায়িক প্রশ্ন উত্থাপিত হইলে তাহা উপস্থিত প্রতিনিধি এবং প্রধান দুই সম্প্রদায়ের অধিকাংশ ভোটের দ্বারা স্থিরীকৃত হইবে—ঘোষণায় এই কথটি অত্যন্ত অস্পষ্ট। কারণ প্রথমেই প্রশ্ন হইল এই যে, সাম্প্রদায়িক প্রশ্নটি বড় কিম্বা ছোট কে স্থির করিবে? আবার কোনটি যে অসাম্প্রদায়িক প্রশ্ন তাহাই বা কি ভাবে স্থির করা হইবে?

রাষ্ট্রব্যবস্থা প্রণয়নকারী প্রতিষ্ঠানের উল্লেখ করিয়া মিঃ জিন্না বলেন যে এখানে আবার ব্রিটিশ বেলুচিস্থানের প্রতিনিধিকে 'খ' বিভাগের অন্তর্ভুক্ত করা হইয়াছে। কিন্তু তাহাকে কি ভাবে নির্ব্বাচন করা হইবে সে বিষয়ে কিছু বলা হয় নাই।

প্রস্তাবিত রাষ্ট্রব্যবস্থা প্রণয়নকারী প্রতিষ্ঠানে হিন্দুরা হইবে সংখ্যাগরিষ্ঠ। কারণ উক্ত প্রতিষ্ঠানে ব্রিটিশ ভারতের প্রতিনিধিদের সংখ্যা হইল ২৯২। ইহার মধ্যে মুসলমানদের সংখ্যা হইবে মাত্র ৭৯। দেশীয় রাজ্যের সংখ্যাও যদি ধরা যায় তবে দেখা যাইবে তাহাদেরও বেশীর ভাগ প্রতিনিধি হইবে হিন্দু। সুতরাং উক্ত প্রতিষ্ঠানে মুসলমানদের শক্তি প্রকৃতপক্ষে আরও কমিয়া যাইবে।

পরিষদের চেয়ারম্যানের ক্ষমতা সম্পর্কে যে কথা বলা হইয়াছে তাহাতে ইহাই বুঝা যায় যে, চেয়ারম্যান একাই সিদ্ধান্ত করিবেন, ফেডারেল কোর্টের কোন মতামতই তিনি শুনিতে বাধ্য নহেন এবং সেই মতামতই বা যে কি তাহাও অন্ত কাহারও জানিবার প্রয়োজন নাই। কারণ চেয়ারম্যানকে ফেডারেল কোর্টের সহিত কেবলমাত্র পরামর্শ করিতে বলা হইয়াছে। যৌথ অঙ্গরাষ্ট্রসমূহ হইতে প্রদেশগুলির ইচ্ছামত বাহির হইয়া আসায় অধিকার সম্পর্কে আমরা বলিয়াছিলাম যে, এবিষয়ে জনমত সংগ্রহের ব্যবস্থা করাই উচিত।

নাগরিকগণের, সংখ্যাল্প সম্প্রদায়ের, উপজাতীয়দের এবং সংরক্ষিত অঞ্চলের অধিকার সম্পর্কে যে উপদেষ্টা কমিটি গঠনের কথা বলা হইয়াছে সে সম্পর্কে মিঃ জিন্না বলেন যে, ইহার মধ্যে একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন রহিয়াছে। যুক্তরাষ্ট্রের শাসনপরিষদ যদি অধিকাংশই ভোটের দ্বারা এই সব বিষয়ে সিদ্ধান্ত করিতে পারে এবং উপদেষ্টা কমিটির সুপারিশ যদি যুক্তরাষ্ট্রের শাসনতন্ত্রে গৃহীত হয় তাহা হইলে ফল হইবে এই যে, যুক্তরাষ্ট্র সরকারের হাতে আরও অনেক বিষয় আসিয়া পড়িবে। উহাতে যুক্তরাষ্ট্র সম্পর্কে যে মূলনীতি গ্রহণ করা হইয়াছে তাহাকে ধ্বংস করা হইবে। কারণ ইহার ফলে যুক্তরাষ্ট্র সরকারের হাতে তখন আর কেবল মাত্র ৩টি বিষয়ই থাকিবে না।

উপসংহারে মিঃ জিন্না বলেন যে, মন্ত্রী-মিশনের এই দলিলটি

পড়িবার পর এই বিষয়গুলিই আমি জনসাধারণের নিকট ঠিকভাবে দেখাইবার চেষ্টা করিয়াছি। লীগ ওয়ার্কিং কমিটি এবং কাউন্সিল যে কি সিদ্ধান্ত করিবেন সে সম্পর্কে আমি পূর্ব্ব হইতে কিছু বলিতে চাই না। তাঁহারা এই বিষয়ে বিশেষ বিবেচনা করার পর চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত করিবেন। — এ পি

কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির প্রস্তাব

মন্ত্রী-মিশনের প্রস্তাবাবলী সম্পর্কে কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির প্রস্তাবের পূর্ণ তাৎপর্য্য এখানে দেওয়া হইল—ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের পক্ষ হইতে ব্রিটিশ মন্ত্রিসভার প্রতিনিধিত্রয় এবং বড়লাট ১৬ই মে তারিখে যে ঘোষণা করিয়াছেন কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটি তাহা যত্নপূর্ব্বক বিবেচনা করিয়া দেখিয়াছেন। এতৎপ্রসঙ্গে ব্রিটিশ মন্ত্রিত্রয় এবং রাষ্ট্রপতির মধ্যে যে-সব পত্রের আদান-প্রদান হইয়াছে তাহাও যত্নপূর্ব্বক বিবেচনা করা হইয়াছে। সহযোগিতার মধ্য দিয়া শান্তিপূর্ণ ভাবে ক্ষমতা হস্তান্তর এবং স্বাধীন ও সার্ব্বভৌম শক্তিসম্পন্ন ভারতীয় রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার উপায় উদ্ভাবনের ইচ্ছা লইয়াই তাঁহারা বড়লাট এবং মন্ত্রিত্রয়ের ঘোষণা পর্য্যালোচনা করিয়াছেন। বিশ্বসভার শক্তি ও মর্য্যাদাসহ ভারতের প্রতিনিধিত্ব করিতে হইলে স্বাধীন ভারতে একটি শক্তিশালী কেন্দ্রীয় গবর্ণমেণ্ট থাকা অবশ্য প্রয়োজন। আলোচ্য ঘোষণা পর্য্যালোচনাকালে মন্ত্রী-মিশনের প্রস্তাবে অন্তর্ব্বর্ত্তীকালীন গবর্ণমেণ্ট গঠন সম্পর্কে যে কথা বলা হইয়াছে এবং মন্ত্রী-মিশনের প্রতিনিধিগণ তাহার যে ব্যাখ্যা করিয়াছেন তাহা হইতে ঐ গবর্ণমেণ্টের ভবিষ্যৎ স্বরূপ সম্পর্কে কতটা আভাস পাওয়া গিয়াছে আলোচ্য ঘোষণা পর্য্যালোচনা কালে ওয়ার্কিং কমিটি তাহার প্রতি দৃষ্টি রাখিয়াছেন। ঐ স্বরূপ এখনও অস্পষ্ট এবং অসম্পূর্ণ। সম্পূর্ণ স্বরূপ অবগত হইবার পরই উহা ওয়ার্কিং কমিটির লক্ষ্যের কতটা অনুযায়ী তাহা বিচার করিয়া একটা সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যাইতে পারে।

ওয়ার্কিং কমিটির লক্ষ্য হইতেছে (১) ভারতের স্বাধীনতা, (২) সীমাবদ্ধ হইলেও একটি শক্তিশালী কেন্দ্রীয় গবর্ণমেণ্ট, (৩) প্রদেশগুলিকে সম্পূর্ণ স্বীয় শাসনাধিকার দান, (৪) গণতান্ত্রিক ভিত্তিতে যুক্তরাষ্ট্র এবং অঙ্গরাষ্ট্রসমূহ (প্রদেশগুলি) গঠন, (৫) প্রত্যেক ব্যক্তির মৌলিক অধিকারের সংজ্ঞা নির্দ্দেশ এবং উহা রক্ষার প্রতিশ্রুতিদান। (৬) প্রত্যেককে আত্মবিকাশের সমান সুযোগ দান এবং (৭) প্রত্যেক সম্প্রদায়কে বৃহত্তর রাষ্ট্রের অন্তর্ভুক্ত থাকিয়া স্ব স্ব অভিরুচিমত জীবনযাত্রার অধিকার দান। ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের পক্ষ হইতে যে সমস্ত প্রস্তাব করা হইয়াছে তাহার সহিত উক্ত লক্ষ্যের পার্থক্য রহিয়াছে দেখিয়া কমিটি দুঃখিত, বিশেষ করিয়া অন্তর্ব্বর্ত্তীকালের জন্য যে সাময়িক গবর্ণমেণ্ট কার্য্য পরিচালনা করিবে আলোচ্য ঘোষণার ২৩ অনুচ্ছেদে সেই গবর্ণমেণ্ট সম্পর্কে একটা আভাস দেওয়া সত্ত্বেও বর্ত্তমানে গবর্ণমেণ্ট ও তাহার মধ্যে বিশেষ কোন গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্ত্তন সাধনের কথা নাই। যদি ভারতবর্ষের স্বাধীনতাই লক্ষ্য হয় তাহা হইলে সাময়িক গবর্ণমেণ্ট আইনতঃ না হইলেও অন্ততঃ কার্য্যতঃ সেই স্বাধীনতার প্রায় সমক্ষমতাসম্পন্ন হওয়া প্রয়োজন। এই সম্পর্কে যে সমস্ত বাধাবিঘ্ন রহিয়াছে তাহা দূর করিতে হইবে। দেশে দখলকারী বৈদেশিক সৈন্যবাহিনীর অবস্থিতি উক্ত স্বাধীনতার পরিপন্থী।

বড়লাট ও মন্ত্রিত্রয়ের ঘোষণায় কয়েকটি প্রস্তাব রহিয়াছে। উহাতে একটি শাসনতন্ত্র রচনাকারী পরিষদ কি ভাবে গঠিত হইবে সেই সম্পর্কে কয়েকটি সুপারিশ করা হইয়াছে। শাসনতন্ত্র রচনা ব্যাপারে এই পরিষদ সর্ব্বোচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন বটে, কিন্তু মন্ত্রী-মিশনের প্রস্তাবের কয়েকটি বিষয় সম্পর্কে ওয়ার্কিং কমিটি একমত নহেন।

যে কোন সময়েই কোন বিষয়ের রদবদল করার অধিকার গণপরিষদের থাকিবে। তবে কয়েকটি প্রধান সাম্প্রদায়িক বিষয়ে ২টি প্রধান সম্প্রদায়ের অধিকাংশের সমর্থন প্রয়োজন হইবে। প্রতি ১০ লক্ষ লোকের জন্য ১ জন করিয়া প্রতিনিধি—এই অনুপাতে গণপরিষদে প্রতিনিধি নির্ব্বাচনের কথা বলা হইয়াছে। কিন্তু দেখা যাইতেছে যে, বিভিন্ন পরিষদের ইউরোপীয় সদস্য, বিশেষ করিয়া বাংলা ও আসামের ইউরোপীয় সদস্যদের বেলায় এই নীতি মান্য করা হয় নাই। সুতরাং কমিটি আশা করেন যে, এই ত্রুটি সংশোধন করা হইবে।

ঘোষণায় বলা হইয়াছে যে, গণপরিষদের সমস্ত সদস্য প্রাদেশিক আইনসভাগুলি কর্ত্তৃক নির্ব্বাচিত হইবে। বেলুচিস্তানে কোন নির্ব্বাচিত পরিষদ নাই সুতরাং কোন মনোনীত ব্যক্তির পক্ষে সমস্ত প্রদেশের হইয়া কথা বলা অসঙ্গত হইবে, কেননা তাহাকে ঐ প্রদেশের প্রতিনিধি বলিয়া কোনমতেই গণ্য করা যাইতে পারে না।

কুর্গের ব্যবস্থাপক সভায় কয়েকজন মনোনীত সদস্য এবং কয়েকজন ইউরোপীয় সদস্য আছেন। ইঁহারা একটি বিশেষ নির্ব্বাচক মণ্ডলী হইতে নির্ব্বাচিত হইয়াছেন। ঐ নির্ব্বাচক মণ্ডলীতে ১ শতেরও কম নির্ব্বাচক আছেন। কমিটি মনে করেন যে, সাধারণ নির্ব্বাচকমণ্ডলী হইতে নির্ব্বাচিত প্রতিনিধিরাই গণপরিষদের সদস্য নির্ব্বাচনে যোগ দিতে পারেন।

মন্ত্রিত্রয়ের ঘোষণায় প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসনাধিকার এবং প্রদেশসমূহের উপর অবশিষ্ট ক্ষমতা ন্যস্ত থাকার নীতি স্বীকৃত হইয়াছে। উহাতে আরও বলা হইয়াছে যে, প্রদেশসমূহ ইচ্ছা করিলে সংযুক্ত প্রাদেশিকমণ্ডল (যৌথ অঙ্গরাজ্য) গঠন করিতে পারিবে। ইহার পরই কিন্তু এই প্রস্তাব করা হইয়াছে যে, প্রাদেশিক প্রতিনিধিগণ তিনটি ভাগে বিভক্ত হইয়া প্রত্যেকটি ভাগের প্রদেশগুলির জন্য শাসনতন্ত্র রচনা করিবেন এবং সংযুক্ত প্রাদেশিক মণ্ডলের (যৌথ অঙ্গরাজ্য) জন্য কোন স্বতন্ত্র শাসনতন্ত্র রচনা করা হইবে কি না তাহাও তাঁহারাই

স্থির করিবেন। উপরোক্ত দুই প্রস্তাবের মধ্যে যথেষ্ট পার্থক্য রহিয়াছে। দেখা যাইতেছে যে, শেষোক্ত ক্ষেত্রে প্রদেশগুলিকে প্রাদেশিক মণ্ডল গঠনে প্রায় বাধ্য করা হইয়াছে।

ইহা স্পষ্টতঃই প্রাদেশিক আত্মকর্তৃত্ব-নীতির পরিপন্থী। আলোচ্য ঘোষণাটিকে সুপারিশ মাত্র মনে করিয়া এবং ঐ ঘোষণার বিভিন্ন প্রস্তাব যাহাতে পরস্পর সঙ্গতিপূর্ণ করা হয় সেইদিকে লক্ষ্য রাখিয়া কমিটি মনে করেন যে, ঘোষণার পনের অনুচ্ছেদের অর্থ হইতেছে প্রদেশগুলিকে যে ভাগের অন্তর্ভুক্ত করা হইয়াছে—তাহারা সেই ভাগে কি না তাহা তাহারাই স্থির করিবে। এই দিক হইতে বিবেচনা করিলে গণপরিষদকে শাসনতন্ত্র রচনা ও উহাকে কার্য্যে পরিণত করা সম্পর্কে পূর্ণ ক্ষমতাসম্পন্ন পরিষদ বলিয়াই গণ্য করিতে হইবে।

ঘোষণায় দেশীয় রাজ্য সম্পর্কিত প্রস্তাব অস্পষ্ট। এই প্রশ্নের অধিকাংশই ভবিষ্যতের জন্য রাখিয়া দেওয়া হইয়াছে। ওয়ার্কিং কমিটি স্পষ্ট করিয়া বলিতে চাহেন যে, প্রাদেশিক প্রতিনিধি নির্ব্বাচন সম্পর্কে যে অনুপাত ধার্য্য করা হইয়াছে—দেশীয় রাজ্যের প্রতিনিধি নির্ব্বাচনে সেই অনুপাত যথাসম্ভব মান্য করা উচিত। কমিটি এ কথা জানিয়া বিশেষ উদ্বিগ্ন হইয়াছে যে, দেশীয় সরকার সশস্ত্র বাহিনীর সহায়তায় জনগণকে দমন করিবার চেষ্টা করিতেছেন। দেশীয় রাজ্যে সম্প্রতি যে সমস্ত অবস্থার উদ্ভব হইয়াছে তাহা বর্ত্তমানে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। এই সমস্ত অবস্থা হইতে দেখা যাইতেছে যে কতিপয় দেশীয় সরকার এবং তাহাদের উপর যাঁহারা প্রভুত্ব করিতেছেন তাঁহাদের নীতিতে কোন সত্যকারের পরিবর্ত্তন হয় নাই।

নূতন ভিত্তির উপরই সাময়িক লোকায়ত্ত গবর্ণমেণ্ট প্রতিষ্ঠিত হওয়া প্রয়োজন। গণপরিষদ যে পূর্ণ স্বাধীনতাসম্বলিত রাষ্ট্র-ব্যবস্থা প্রণয়ন করিবেন ইহা তাহারই অগ্রদূত হইবে। বর্ত্তমান অবস্থায় এজন্য আইনের প্রয়োজন নাই বটে, কিন্তু এই কথাটা স্বীকার করিয়া লইলেই ঐ গবর্ণমেণ্ট কাজ করিতে পারেন। অন্তর্বর্ত্তীকালের জন্য বড়লাট গবর্ণমেণ্টের প্রধান থাকিতে পারেন। কিন্তু ঐ গবর্ণমেণ্টকে কেন্দ্রীয় আইন সভার নিকট দায়ী থাকিতে হইবে।

ওয়ার্কিং কমিটি যাহাতে একটা সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে পারেন সেইজন্য ঐ গবর্ণমেণ্টের মর্য্যাদা, ক্ষমতা এবং গঠন-পদ্ধতি সম্পূর্ণরূপে নির্দ্দেশিত থাকা প্রয়োজন। সংখ্যালঘিষ্ঠ সম্প্রদায়সমূহের মন হইতে যাহাতে সর্ব্বপ্রকার সম্ভাবিত ভয় এবং সংশয় দূর হইতে পারে সেরূপভাবে প্রধান প্রধান সাম্প্রদায়িক সমস্যাগুলির মীমাংসা করিতে হইবে।

ওয়ার্কিং কমিটি মনে করেন যে, সাময়িক গবর্ণমেণ্ট এবং গণপরিষদ গঠনের সমস্যাগুলিকে এক সঙ্গে দেখিতে হইবে। কারণ তাহা হইলে উভয়ের মধ্যে একটা সংযোগ থাকিতে পারিবে। তাঁহারা স্বাধীন ভারত গঠনের কাজে নিযুক্ত আছেন কেবলমাত্র এই বিশ্বাসে ওয়ার্কিং কমিটি এই কাজ গ্রহণ করিতে পারেন এবং সমস্ত ভারতবাসীর সহযোগিতা চাহিতে পারেন। জিনিষটির পরিপূর্ণ রূপ না জানা অবস্থায় কমিটি কোন চূড়ান্ত মতামত প্রকাশ করিতে পারেন না। —এ পি

মন্ত্রী-মিশন ও বড়লাটের বিবৃতি

মন্ত্রী-মিশন এবং বড়লাটের মিলিত বিবৃতির পূর্ণ তাৎপর্য্য নিয়ে দেওয়া হইল :

মন্ত্রী-মিশন মুসলিম লীগের সভাপতির ২২শে মে তারিখের বিবৃতি এবং কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির ২৪শে মে তারিখের প্রস্তাব বিবেচনা করিয়া দেখিয়াছেন।

ভারতীয় নেতারা দীর্ঘ আলাপ-আলোচনার পর কোন মীমাংসায় উপনীত হইতে না পারায় মন্ত্রী-মিশন উভয় দলের মতকে মিলাইবার চেষ্টা করিয়া তাঁহাদের প্রস্তাব করিয়াছেন। মন্ত্রী-মিশনের প্রস্তাব বা পরিকল্পনাকে সমগ্র ভাবে দেখিতে হইবে। ঐ প্রস্তাব যদি গ্রহণ করা হয় এবং সহযোগিতার মনোভাব লইয়া তাহাকে যদি কাজে পরিণত করা যায় তবে উহা সফল হইবে। মিঃ জিন্নার বিবৃতি এবং কংগ্রেসের প্রস্তাবের মধ্যে যে সব প্রশ্ন তোলা হইয়াছে মন্ত্রিদল তাহার কতগুলির উল্লেখ করিয়া বলেন যে, গণপরিষদের কাজ ক্ষমতা এবং গঠন সম্পর্কে সকল কথাই ঘোষণার মধ্যে পরিষ্কার করিয়া বলা আছে। সেই অনুসারে যদি গণপরিষদ গঠন করিয়া কাজ আরম্ভ হয় তবে উহার অভিমতের উপর কোনরূপ হস্তক্ষেপ করার ইচ্ছা নাই। সার্ব্বভৌম ক্ষমতা ভারতবাসীদিগকে হস্তান্তরিত করার জন্য ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্ট পার্লিয়ামেণ্টের নিকট সুপারিশ করিবেন। তবে এ সম্পর্কে ঘোষণায় উল্লিখিত দুটি সর্ত্ত মানিয়া লইতে হইবে। তাহা হইল সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের স্বার্থ রক্ষা (বিবৃতির ২০ অনুচ্ছেদ) এবং ক্ষমতা হস্তান্তর-জনিত বিষয়সমূহ সম্পর্কে ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের সহিত চুক্তি সম্পাদন (বিবৃতির ২২ অনুচ্ছেদ)।

নির্ব্বাচনের পদ্ধতি অনুসারে কয়েকজন ইউরোপীয়ান গণপরিষদে নির্ব্বাচিত হইতে পারেন। তবে গণপরিষদে তাঁহারা যাইতে চান কি না চান সেটা তাঁহারাই স্থির করিবেন।

বেলুচিস্তানের প্রতিনিধি কোয়েটা মিউনিসিপালিটির বে-সরকারী সদস্যদের ও শাহী জিরগার মিলিত বৈঠকে নির্ব্বাচিত হইবেন।

কুর্গে ব্যবস্থাপক সভায় সমস্ত সদস্যই ভোট দিতে পারিবেন। সরকারী সদস্যরা নির্ব্বাচনে যাহাতে যোগ না দেন সেইভাবে তাঁহাদের নির্দ্দেশ দেওয়া হইবে।

প্রদেশগুলিকে ৩ ভাগে ভাগ করা এবং তাহাদের লইয়া যৌথ অঙ্গরাষ্ট্র গঠন করার কথা কেন বলা হইয়াছে তাহার কারণ সুবিদিত। পরিকল্পনাটির ইহাই হইল অন্যতম বৈশিষ্ট্য।

কেবলমাত্র বিভিন্ন দলের ঐকমত্য অনুসারেই ইহার রদ-বদল করা যাইতে পারে।

শাসনতন্ত্র রচিত হইবার পর প্রদেশগুলির গোষ্ঠী (গ্রুপ) হইতে বাহির হইয়া আসার ইচ্ছা নির্ভর করিতেছে উক্ত প্রদেশের জনসাধারণের উপর। নূতন প্রাদেশিক শাসনতন্ত্র অনুসারে যখন প্রথম নির্বাচন হইবে, তখন স্পষ্টতঃ এই গোষ্ঠী হইতে বাহিরে আসার প্রশ্নটাই সবচেয়ে বড় হইবে। নূতন শাসনতন্ত্র অনুযায়ী যাঁহাদের ভোটাধিকার থাকিবে তাঁহারাই এ প্রশ্নটির মীমাংসা করিবেন। ইহাই সত্যকারের গণতান্ত্রিক সিদ্ধান্ত। গণপরিষদে দেশীয় রাজ্যের প্রতিনিধি মনোনয়ন ব্যাপারে দেশীয় রাজাদের সহিত আলোচনা করিতে হইবে। এ বিষয়ে মন্ত্রী-মিশন কোন সিদ্ধান্ত করিতে পারেন না।

—এ. পি

গান্ধীজী কর্তৃক ঘোষণার বিশ্লেষণ

১

ব্রিটিশ গবর্মেন্টের পক্ষ হইতে মন্ত্রী-মিশন যে সরকারী ঘোষণাপত্র বাহির করিয়াছেন চার দিন ধরিয়া তন্ন তন্ন করিয়া তাহার আলোচনা-বিচার করিবার পর আমার এই বিশ্বাস রহিয়া গিয়াছে যে বর্তমান অবস্থায় ব্রিটিশ গবর্মেন্ট ভারতবর্ষের জন্য সবচেয়ে ভাল এই দলিলই প্রস্তুত করিতে পারিতেন। দলিলখানি ঠিকভাবে বুঝবার মত মন যদি আমাদের হয়, তবে দেখিব যে ইহাতে আমাদের দুর্বলতাই প্রতিফলিত হইয়াছে। কংগ্রেস ও মুসলিম-লিগ একমত হয় নাই, হইতে পারে নাই। এই সময়ে নির্বুদ্ধিতার বশে আমরা যদি এই মনে করিয়া খুশি হই যে আমাদের মধ্যে এই সব বিভেদ ব্রিটিশের সৃষ্টি, তবে সাংঘাতিক ভুল করা হইবে। আমাদের অনৈক্যের সুযোগ লইয়া নিজ কার্য সিদ্ধ করিবার জন্য মন্ত্রী-মিশন এত পথ অতিবাহিত করিয়া আসেন নাই, ইংরেজ-শাসন শেষ করিবার সবচেয়ে সহজ ও দ্রুত পন্থা বাহির করিবার জন্যই তাঁহারা আসিয়াছেন। যতদিন না তদ্বিপরীত কিছু প্রমাণ হয়, ততদিন তাঁহাদের ঘোষণা সম্বন্ধে এইরূপ বিশ্বাস রাখিবার মত সাহস আমাদের থাকা চাই। শঠের শঠতায় বিশ্বাসীর সাহস বৃদ্ধি পাইয়াই থাকে।

অবশ্য আমার সাধুবাদের অর্থ এই নয় যে ব্রিটিশের দিক হইতে যাহা সবচেয়ে ভাল মনে হয়, ভারতের দিক হইতেও তাহা সবচেয়ে ভাল, এমন কি কিছু ভাল, বলিয়া মনে হইবে। তাঁহাদের বিবেচনায় যাহা সর্বোত্তম, আমাদের পক্ষে তাহা ক্ষতিকর হওয়া সম্ভব। আমি পরে যাহা বলিতেছি, আশা করি, তাহা হইতে আমার কথার অর্থ পরিষ্কার হইবে।

দলিলখানি যাঁহাদের সৃষ্টি, তাঁহারা যাহা বলিতে চান তাহা পুরাপুরি বলিবার চেষ্টা করিয়াছেন। বিভিন্ন দলের সহিত কথাবার্তা চালাইয়া, সবচেয়ে কম যতটুকুতে পরস্পর রাজি হইয়া দলগুলি ভারতের স্বাধীনতার সনদ প্রস্তুত করিবার জন্য একত্র হইতে পারেন, মন্ত্রী-মিশন তাহা বুঝিয়া লইয়াছেন। যত শীঘ্র সম্ভব হয়, ইংরেজ-শাসন শেষ করিয়া দেওয়াই তাঁহাদের একমাত্র উদ্দেশ্য। ভারতবর্ষকে যদি তাঁহারা গৃহযুদ্ধের কাছাকাছি যায় এরূপ অন্তর্বিবাদে বিচ্ছিন্ন নহে, পরন্তু ঐক্যবদ্ধ করিয়া রাখিয়া যাইতে পারেন তবে সে চেষ্টা তাঁহারা করিবেন। যাহাই ঘটুক, ইংরেজ-শাসন তাঁহারা শেষ করিয়া দিবেন। মন্ত্রী-মিশন সিমলায় দুইটি দলকে পরামর্শ সভায় একত্র করিতে পারিয়াছিলেন, (এজন্য তাঁহাদের দিকে কতটা ধৈর্য ও কৌশলের প্রয়োজন হইয়াছিল তাহা তাঁহারাই বলিতে পারিবেন,) কিন্তু দল দুইটি একমত হইয়া কোন সিদ্ধান্তে পৌঁছিতে পারেন নাই। কিন্তু তাহাতে এতটুকুও ব্যর্থ না হইয়া তাঁহারা সিমলা হইতে ভারতের সমতলভূমিতে নামিয়া আসিলেন এবং গণপরিষদ গঠন করিয়া দিবার জন্য একটি উত্তম দলিল প্রস্তুত করিলেন। এই গণপরিষদ সর্বপ্রকার ব্রিটিশ প্রভাব হইতে মুক্ত ভারতবর্ষের স্বাধীনতার সনদ প্রস্তুত করিবেন। দলিলপত্রে বাধ্যতামূলক কিছু নাই, ইহাতে ভারতবাসীগণের প্রতি আবেদন ও পরামর্শ আছে। যেমন, প্রাদেশিক ব্যবস্থা-পরিষদগুলি প্রতিনিধি নির্বাচন করিয়া দিতে পারেন, আবার না-ও দিতে পারেন। আবার, নির্বাচিত হইবার পর প্রতিনিধিগণ গণপরিষদে যোগ দিতে পারেন, না-ও দিতে পারেন। ঘোষণাপত্রে যে কর্ম-পদ্ধতির উল্লেখ আছে গণপরিষদ বসিবার পর তাহা পরিবর্তন করিয়া নিজেদের জন্য অপর কোন পদ্ধতি স্থির করিতে পারেন। কোন্ ব্যক্তি বা দলের পক্ষে কোন্ বিষয়টি বাধ্যতামূলক হইবে তাহা নির্ভর করিবে পরিস্থিতি অনুযায়ী প্রয়োজনের উপর। অন্য কোন কারণে নহে, মাত্র গণ-পরিষদের অস্তিত্ব রক্ষার জন্যই, পৃথকভাবে ভোটদান দুইটি প্রধান দলের পক্ষে বাধ্যতামূলক হইবে। এই প্রবন্ধটি লিখিবার সময় আমি পুনরায় ঘোষণাপত্রটির একের পর এক করিয়া সকল অংশই পাঠ করিয়া এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইলাম যে ইহাতে আইনমত বাধ্যতামূলক কিছুই নাই। কেবল নিজেদের কথার মূল্য এবং প্রয়োজনের তাগিদ এই দুইটিই বাধ্যতামূলক।

ঘোষণাপত্রের সেই অংশটি বাধ্যতামূলক-যাহাতে ব্রিটিশ গবর্মেন্টের কর্তব্য সম্বন্ধে উল্লেখ আছে। আমার মনে হয় এইজন্যই মন্ত্রী-মিশনের চারজন সদস্য আগে হইতে বুঝিয়া পার্লামেন্টের উভয় বিভাগের এবং ব্রিটিশ গবর্মেন্টের পূর্ণ সমর্থন লইয়াছেন। ঘোষণাপত্রটি স্বেচ্ছায় অধিকারত্যাগের পথে প্রথম পদক্ষেপ; এজন্য মন্ত্রী-মিশন আমাদের সশ্রদ্ধ অভিনন্দনের অধিকারী। কিন্তু পরিপূর্ণ অধিকারত্যাগের জন্য আরও অগ্রসর হওয়া প্রয়োজন; তাই ঘোষণাপত্রকে আমি প্রতিশ্রুতিপত্র বলিয়া অভিহিত করিয়াছি।

অনিন্দ্য
অলকের
আকর্ষণ
রাঙাজবা
কেশতৈল
অনুরূপা কেমিক্যাল :: কলিকাতা

এই ঘোষণাপত্রের উত্তরে ভারতবর্ষ যদিও আপন ইচ্ছামত সাড়া দিতে পারিবে, তথাপি মিশন জানেন যে ভারতীয় দলগুলি সুগঠিত ও দায়িত্বজ্ঞানসম্পন্ন, এবং বাধ্যতামূলক কার্য তাঁহারা যতটা ভাল করিয়া করিতে পারেন, ইচ্ছাধীন কার্যও তাহা অপেক্ষা পূর্ণতররূপে না হোক, অন্ততঃ তুল্যভাবে করিবার শক্তিও তাঁহারা রাখেন। সুতরাং জনৈক সাংবাদিককে লর্ড পেথিক লরেন্স যখন বলেন, "ঐ ভিত্তির উপর যদি তাঁহারা একত্র মিলিত হন, তবে বুঝিতে হইবে উহাদারা মিলনের ঐ ভিত্তি তাঁহারা মানিয়া লইয়াছেন, কিন্তু প্রত্যেক দলের অধিকসংখ্যক লোক ইচ্ছা করিলে তখনও উহার পরিবর্তন করিতে পারেন," তখন তাঁহার কথা এই অর্থেই ঠিক বলিয়া মনে হয় যে ঘোষণাপত্রে লিখিত বিষয়গুলি পড়িয়া ও বুঝিয়া যাঁহারা প্রতিনিধি হইয়া আসিয়াছেন, মিশন আশা করেন যে প্রধান দলগুলি ঐ ভিত্তি পরিবর্তিত করিয়া না লইলে প্রতিনিধিগণ উহা স্বীকার করিয়া চলিবেন। দুই বা ততোধিক প্রতিদ্বন্দ্বী পক্ষ একটা বোঝাপড়া করিয়া লইবার পর একত্র মিলিত হয়। স্বয়ং নির্বাচিত মধ্যস্থ (দলগুলি মধ্যস্থ নির্বাচন করিয়া দিতে না পারিলে ঘোষণাপত্রের রচয়িতাগণ স্বয়ং মধ্যস্থ হইয়া পড়েন) মনে মনে এই ভাবেন যে ন্যূনতম কিছু লইয়া একটা প্রস্তাব উপস্থাপিত করিলে তবে বিভিন্ন দল একত্র হইবেন। এই ভাবিয়া তিনি তাঁহার প্রস্তাব উপস্থাপিত করেন ; বিভিন্ন দলের সেই প্রস্তাবের বস্তুকে নিজেদের সম্মতিক্রমে বাড়াইবার, কমাইবার অথবা একবারে পরিবর্তন করিবার অধিকার থাকে।

ঘোষণাপত্রটি এই পর্যন্ত নিখুঁত। কিন্তু বিভিন্ন 'অংশ' সম্বন্ধে কি হইবে? ভারতবর্ষে পঞ্জাবই হইল শিখদিগের একমাত্র ভূমি ; তাহারা কি আপন ইচ্ছার বিরুদ্ধে নিজেদের সিন্ধু, পঞ্জাব ও উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ লইয়া একত্রীকৃত 'অংশ'-এর অঙ্গ বলিয়া ধরিয়া লইতে বাধ্য হইবে? অথবা, উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ নিজ ইচ্ছার বিরুদ্ধে 'বি' চিহ্নিত পঞ্জাবের সহিত এবং বহুসংখ্যাধিক্যে অমুসলমান প্রদেশ হইলেও আসাম 'সি' চিহ্নিত অংশের সহিত যুক্ত হইবে? আমার মতে ঘোষণাপত্রের আবেদন বা পরামর্শ গ্রহণ করা বিভিন্ন দলের ইচ্ছাধীন বলিয়া যে উল্লেখ আছে তদনুসারে প্রত্যেক 'অংশ'-এরই ইচ্ছামত কাজ করিবার স্বাতন্ত্র্য অক্ষুণ্ণ থাকা উচিত। প্রস্তাবিত 'অংশ'-গুলির যে কোনও অঙ্গ (প্রদেশ) আপন ইচ্ছামত 'অংশ'-এ যোগ দিতে বা যোগ না দিতে পারে। 'অংশ' হইতে পরে বাহির হইয়া আসিবার যে স্বাধীনতা আছে তাহা স্বাতন্ত্র্য-রক্ষার অতিরিক্ত ব্যবস্থা বলিয়া ধরিতে হইবে ; কিন্তু ১৫ (৫) প্যারার (প্রদেশের) স্বাধীনতা বজায় রাখিবার যে ব্যবস্থা আছে, উহা কখনই তাহার পরিবর্ত বা অনুকল্প হইতে পারে না। ১৫ (৫) প্যারায় লিখিত আছে :—"শাসন-পরিষদ-ও ব্যবস্থা-পরিষদ-সম্বলিত 'অংশ'-এর সহিত যোগ দিবার স্বাধীনতা প্রদেশগুলির থাকিবে। এবং কোন্ কোন্ প্রাদেশিক বিষয়গুলি একত্র হাতে লওয়া হইবে প্রত্যেক 'অংশ' তাহা স্থির করিয়া লইতে পারিবে।" ইহা তো পরিষ্কার যে ১৯ ধারার কর্তব্য সম্বন্ধে যে প্রস্তাব রহিয়াছে (হুকুম নহে) তাহা দ্বারা ঘোষণাপত্রের রচয়িতাগণ ঐ স্বাধীনতা কাড়িয়া লইতেছেন না। ঐ ধারা অনুযায়ী ইহাই ধরিয়া লওয়া হইতেছে যে প্রাদেশিক প্রতিনিধিগণ 'অংশ'-গঠনের নীতি গ্রহণ করিবেন কি না ; তাঁহারা ঐ নীতি যদি গ্রহণ করেন, তবে প্রদেশগুলির জন্য যে বিষয় নির্দিষ্ট করিয়া দেওয়া হইবে তাহা তাঁহারা স্বীকার করিবেন কিনা, গণপরিষদের প্রথম অধিবেশনে সভাপতি তাঁহাদিগকে এইসব বিষয়ে প্রশ্ন করিবেন। প্রত্যেক প্রদেশের অন্তর্নিবদ্ধ এই স্বাধীনতা এবং ১৫ (৫) প্যারায় যে স্বাধীনতার উল্লেখ আছে তাহা অক্ষুণ্ণ থাকিবে। দুইটি প্যারার মধ্যে যে আপাত বিরোধ রহিয়াছে এবং বাধ্যতা বা হুকুম-মূলক যে দোষটির জন্য ঘোষণাপত্রের উদার ভাবটি একদম প্যাণ্টাইয়া যাইবার সম্ভাবনা রহিয়াছে তাহা এড়াইবার আর কোন পথ তো দেখিতেছি না। সুতরাং 'অংশ'-সম্পর্কীয় প্রস্তাবে এবং প্রাদেশিক-বিষয়-বণ্টন সম্বন্ধে স্বৈরাচারের আশঙ্কায় যাঁহারা বিচলিত হইতেছেন, আমি তাঁহাদিগকে এই কথাই বলিব যে আমার ব্যাখ্যা যদি ঠিক হয় তবে তাঁহাদের বিচলিত হইবার সামান্যমাত্র কারণও নাই।

কি করিয়া সবচেয়ে কম সময়ের মধ্যে স্বাধীনতা অর্জন করিতে পারা যাইবে ঘোষণাপত্রে আমাদের প্রতি তাহারই আবেদন ও পরামর্শ আছে। এই কথা ভুলিয়া গিয়া যাঁহারা তাড়াতাড়ি উহা পাঠ করিবেন উহার অনেক কথায় তাঁহাদের ধাঁধা লাগিয়া যাইবে। তার কারণও স্পষ্ট। বর্তমান বিশৃঙ্খলা হইতে যে নূতন জগৎ বাহির হইয়া আসিবে, সেই পরিবর্তনের মাঝে পরাধীন ভারত ব্রিটিশ রাজমুকুটে আর 'উজ্জ্বলতম রত্ন' হইয়া থাকিবে না। পরাধীন ভারত তখন হইবে ঐ মুকুটের গভীরতম কলঙ্ক-চিহ্ন, সে কলঙ্ক-চিহ্ন এত গভীর যে ধুলায় ফেলিয়া দিবার যোগ্য বলিয়াই বিবেচিত হইবে। পাঠক আজ আমার সঙ্গে এই আশা ও প্রার্থনা করুন যে, ব্রিটেন এবং জগতের কল্যাণের জন্য ব্রিটিশ-রাজ-শক্তির ব্যবহার ইহা অপেক্ষা যেন অনেক ভাল হয়। 'উজ্জ্বলতম রত্ন' বলিয়া যে দাবি সে তো অসঙ্গত। মিশনের প্রতিশ্রুতি-পত্রের মর্যাদা যখন পূর্ণভাবে রক্ষিত হইবে, তখন ব্রিটিশ রাজমুকুটে একটি অনুপম রত্ন শোভা পাইবে। এই রত্ন হইল সেই অধিকার, যথাবিধি কর্তব্য সম্পাদন করিলে যাহা স্বাভাবিকভাবে জন্মলাভ করে।

প্রতিশ্রুতি-পত্রকে কার্যকর করিবার জন্য অন্য অনেক বিষয়ের প্রয়োজন হইবে যাহা ঘোষণাপত্রে নাই। কিন্তু সে আলোচনা 'হরিজন'-এর পরবর্তী সংখ্যার জন্য স্থগিত রহিল।

নয়া দিল্লী, ২০-৫-৪৬

অলৌকিক দৈবশক্তি সম্পন্ন ভারতের শ্রেষ্ঠ তান্ত্রিক ও জ্যোতির্বিদ

ভারতের অপ্রতিদ্বন্দ্বী হস্তরেখাবিদ্ প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য জ্যোতিষ, তন্ত্র ও যোগাদি শাস্ত্রে অসাধারণ শক্তিশালী আন্তর্জাতিক খ্যাতি-সম্পন্ন **রাজ-জ্যোতিষী, জ্যোতিষ-শিরোমণি যোগবিদ্যাবিভূষণ পণ্ডিত শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য জ্যোতিষার্ণব** সামুদ্রিকরত্ন, এম্-আর-এ-এস্ (লণ্ডন); বিশ্ববিখ্যাত-অল-ইণ্ডিয়া এষ্ট্রোলজিক্যাল এণ্ড এষ্ট্রোনমিক্যাল সোসাইটীর প্রেসিডেন্ট মহোদয় যুদ্ধারম্ভকালীন মহামান্য ভারতসম্রাট মহোদয়ের এবং ব্রিটেনের গ্রহ-নক্ষত্রাদির অবস্থান ও পরিস্থিতি গণনা করিয়া এই ভবিষ্যদ্বাণী করিয়াছিলেন যে

"বর্ত্তমান যুদ্ধের ফলে ব্রিটিশের সম্মান বৃদ্ধি হইবে এবং ব্রিটিশ পক্ষ জয়লাভ করিবে।"

উক্ত ভবিষ্যদ্বাণী মহামান্য ভারতসম্রাট মহোদয়কে ও ভারতের গভর্ণর-জেনারেল এবং বাংলার গভর্ণর মহোদয়গণকে পাঠান হইয়াছিল। তাঁহারা যথাক্রমে ১২ই ডিসেম্বর (১৯৩৯) তারিখের ৩৬১৮ × ×-এ-২৪ নং চিঠি, ৭ই অক্টোবর (১৯৩৯) তারিখের ৩, এম, পি নং চিঠি এবং ৬ই সেপ্টেম্বর (১৯৩৯) তারিখের ডি-৩-৩৯-টি নং চিঠিসমূহ দ্বারা উহাদের প্রাপ্তি স্বীকার করিয়াছেন। পণ্ডিতপ্রবর জ্যোতিষশিরোমণি মহোদয়ের এই ভবিষ্যদ্বাণী সফল হওয়ায় ইঁহার নির্ভুল গণনা, অলৌকিক দিব্যদৃষ্টির আরও একটি জাজ্বল্যমান প্রমাণ পাওয়া গেল।

এই অলৌকিক প্রতিভাসম্পন্ন যোগী কেবল দেখিবামাত্র মানব-জীবনের ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্ত্তমান নির্ণয়ে সিদ্ধহস্ত। ইঁহার তান্ত্রিক ক্রিয়া ও অসাধারণ জ্যোতিষিক ক্ষমতা প্রভাবে ভারতের জনসাধারণ ও রাজকীয় উচ্চপদস্থ ব্যক্তিগণ স্বাধীন রাজ্যের নরপতিবৃন্দ এবং দেশীয় নেতৃবৃন্দ ছাড়াও ভারতের বাহিরের, যথা—**ইংলণ্ড, আমেরিকা, আফ্রিকা, চীন, জাপান, মালয়, সিঙ্গাপুর** প্রভৃতি দেশের মনীষিবৃন্দকে যেরূপভাবে চমৎকৃত ও বিস্মিত করিয়াছেন, তাহা ভাষায় প্রকাশ করা সম্ভব নহে। এই সম্বন্ধে ভূরিভূরি স্বহস্তলিখিত প্রশংসাকারীদের পত্রাদি হেড অফিসে দেখিলেই জানিতে ও বুঝিতে পারিবেন। ভারতের মধ্যে ইনিই একমাত্র জ্যোতির্বিদ—যিনি এই ভয়াবহ যুদ্ধ ঘোষণার প্রথম দিবসেইমাত্র ৫ ঘণ্টা মধ্যে ব্রিটিশ পক্ষের জয়লাভের ভবিষ্যদ্বাণী করিয়াছিলেন এবং আঠারজন বিশিষ্ট স্বাধীন নরপতির জ্যোতিষ-পরামর্শদাতারূপে ইনিই উচ্চ সম্মানে ভূষিত হইয়াছেন।

ইঁহার জ্যোতিষ এবং তন্ত্রশাস্ত্রে অলৌকিক শক্তি ও প্রতিভায় ভারতের বিভিন্ন প্রদেশের শতাধিক পণ্ডিত ও অধ্যাপকমণ্ডলী ভারতীয় পণ্ডিত-মহামণ্ডলের সভায় প্রভাবান্বিত হইয়া একমাত্র ইঁহাকেই **"জ্যোতিষশিরোমণি"** উপাধি দানে সর্বোচ্চ সম্মানে ভূষিত করেন। যোগবলে ও তান্ত্রিক ক্রিয়াদির অব্যর্থ শক্তি-প্রয়োগে ডাক্তার, কবিরাজ পরিত্যক্ত যে কোনও দুরারোগ্য ব্যাধি নিরাময়, জটিল মোকদ্দমায় জয়লাভ, সর্বপ্রকার আপদুদ্ধার, বংশ নাশ হইতে রক্ষা, দুরদৃষ্টের প্রতিকার, সাংসারিক জীবনে সর্বপ্রকার অশান্তির হাত হইতে রক্ষা প্রভৃতিতে তিনি দৈবশক্তিসম্পন্ন। অতএব সর্বপ্রকারে হতাশ ব্যক্তি পণ্ডিত মহাশয়ের অলৌকিক ক্ষমতা প্রত্যক্ষ করিতে ভুলিবেন না।

কয়েকজন সর্বজনবিদিত দেশ-বিদেশের বিশিষ্ট ব্যক্তির অভিমত দেওয়া হইল:

হিজ হাইনেস্ মহারাজা আটগড় বলেন—"পণ্ডিত মহাশয়ের অলৌকিক ক্ষমতায়—মুগ্ধ ও বিস্মিত।" হার্ হাইনেস্ মাননীয়া ষষ্ঠমাতা মহারাণী ত্রিপুরা ষ্টেট বলেন—"তান্ত্রিক ক্রিয়া ও কবচাদির প্রত্যক্ষ শক্তিতে চমৎকৃত হইয়াছি। সত্যই তিনি দৈবশক্তিসম্পন্ন মহাপুরুষ।" কলিকাতা হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি মাননীয় স্যার মন্মথনাথ মুখোপাধ্যায় কে-টি বলেন—"শ্রীমান রমেশচন্দ্রের অলৌকিক গণনাশক্তি ও প্রতিভা কেবলমাত্র খ্যাতনামা পিতার উপযুক্ত পুত্রেতেই সম্ভব।" সন্তোষের মাননীয় মহারাজা বাহাদুর স্যার মন্মথনাথ রায় চৌধুরী কে-টি বলেন—"পণ্ডিতজীর ভবিষ্যদ্বাণী বর্ণে বর্ণে মিলিয়াছে। ইনি অসাধারণ দৈবশক্তিসম্পন্ন এ বিষয়ে সন্দেহ নাই।" পাটনা হাইকোর্টের বিচারপতি মাননীয় মিঃ বি, কে, রায় বলেন—"তিনি অলৌকিক দৈবশক্তিসম্পন্ন ব্যক্তি—ইঁহার গণনাশক্তিতে আমি পুনঃ পুনঃ বিস্মিত।" বঙ্গীয় গভর্ণমেণ্টের মন্ত্রী রাজা বাহাদুর শ্রীপ্রসন্ন দেব রায়কত বলেন—"পণ্ডিতজীর গণনা ও তান্ত্রিকশক্তি পুনঃ পুনঃ প্রত্যক্ষ করিয়া স্তম্ভিত, ইনি দৈবশক্তিসম্পন্ন মহাপুরুষ।" কেউনঝড় হাইকোর্টের মাননীয় জজ রায়সাহেব এস, এম্, দাস বলেন—"তিনি আমার মৃতপ্রায় পুত্রের জীবন দান করিয়াছেন—জীবনে এরূপ দৈবশক্তিসম্পন্ন ব্যক্তি দেখি নাই।" ভারতের শ্রেষ্ঠ বিদ্বান ও সর্বশাস্ত্রে পারদর্শী মনীষী মহামহোপাধ্যায় ভারতাচার্য মহাকবি শ্রীহরিদাস সিদ্ধান্তবাগীশ বলেন—"শ্রীমান রমেশচন্দ্র বয়সে নবীন হইলেও দৈবশক্তিসম্পন্ন যোগী। ইঁহার জ্যোতিষ ও তন্ত্রে অনন্যসাধারণ ক্ষমতা।" উড়িষ্যার কংগ্রেসনেত্রী ও এসেম্বলীর মেম্বার মাননীয়া শ্রীযুক্তা সরলা দেবী বলেন—"আমার জীবনে এইরূপ বিদ্বান দৈবশক্তিসম্পন্ন জ্যোতিষী দেখি নাই।" বিলাতের প্রিভি কাউন্সিলের মাননীয় বিচারপতি স্যার সি, মাধবন্ নায়ার কে-টি বলেন—"পণ্ডিতজীর বহু গণনা প্রত্যক্ষ করিয়াছি, সত্যই তিনি একজন বড় জ্যোতিষী।" চীন মহাদেশের সাংহাই নগরীর মিঃ কে, রুচপল বলেন—"আপনার তিনটি প্রশ্নের উত্তরই আশ্চর্য্যজনকভাবে বর্ণে বর্ণে মিলিয়াছে।" জাপানের অসাকা সহর হইতে মিঃ জে, এ, লরেন্স বলেন—"আপনার দৈবশক্তিসম্পন্ন কবচে আমার সাংসারিক জীবন শান্তিময় হইয়াছে—পূজার জন্য ১৫৲ পাঠাইলাম।"

প্রত্যক্ষ ফলপ্রদ কয়েকটি অত্যাশ্চর্য্য কবচ, উপকার না হইলে মূল্য ফেরৎ, গ্যারাণ্টি পত্র দেওয়া হয়।

ধনদা কবচ—ধনপতি কুবের ইঁহার উপাসক, ধারণে ক্ষুদ্র ব্যক্তিও রাজতুল্য ঐশ্বর্য, মান, যশঃ, প্রতিষ্ঠা, সুপুত্র ও স্ত্রী লাভ করেন। (তন্ত্রোক্ত) মূল্য ৭।৵০। অদ্ভুত শক্তিসম্পন্ন ও সত্বর ফলপ্রদ কল্পবৃক্ষতুল্য বৃহৎ কবচ ২৯।৵০, প্রত্যেক গৃহী ও ব্যবসায়ীর অবশ্য ধারণ কর্ত্তব্য। **বগলামুখী কবচ**—শত্রুদিগকে বশীভূত ও পরাজয় এবং যে কোন মামলা মোকদ্দমায় সুফললাভ, আকস্মিক সর্বপ্রকার বিপদ হইতে রক্ষা ও উপরিস্থ মনিবকে সন্তুষ্ট রাখিয়া কর্মে উন্নতিলাভে অদ্বিতীয়। মূল্য ৯৵০, শক্তিশালী বৃহৎ ৩৪৵০ (এই কবচে ভাওয়াল সন্ন্যাসী জয়লাভ করিয়াছেন)। **বশীকরণ কবচ** ধারণে সবাই বশীভূত ও স্বকার্য সাধনযোগ্য হয়। (শিববাক্য) মূল্য ১১।০, শক্তিশালী ও সত্বর ফলদায়ক বৃহৎ ৩৭৵০। ইহা ছাড়াও বহু আছে।

অল ইণ্ডিয়া এষ্ট্রোলজিকেল এণ্ড এষ্ট্রোনমিকেল সোসাইটী (রেজিঃ)

(ভারতের মধ্যে সর্বাপেক্ষা বৃহৎ ও নির্ভরশীল জ্যোতিষ ও তান্ত্রিক ক্রিয়াদির প্রতিষ্ঠান)

হেড অফিস:—১০৫ (প্র) গ্রে ষ্ট্রীট, "বসন্ত নিবাস" (শ্রীশ্রীনবগ্রহ ও কালী মন্দির) কলিকাতা। ফোন: বি, বি, ৩৬৮৫ সাক্ষাতের সময়—প্রাতে ৮।০টা হইতে ১১।০টা। ব্রাঞ্চ অফিস—৪৭, ধর্মতলা ষ্ট্রীট, (ওয়েলিংটন স্কোয়ার), কলিকাতা।

ফোন: কলিঃ ৩১৩৯। সময়—বৈকাল ৫।০টা হইতে ৭।০। লণ্ডন অফিস:—মিঃ এম, এ, কার্টিস, ৭-এ, ওয়েষ্টওয়ে, রেইনিস পার্ক, লণ্ডন

২

সাংঘাতিক ত্রুটি

মূলত ও আইনত ব্যাখ্যা করিলে এই কথাই মনে হয় যে সরকারী ঘোষণাপত্রে চমৎকার খোলা কথা বলা হইয়াছে। তথাপি মনে হইতেছে, সাধারণে ইহার অর্থ যেরূপ বুঝিয়াছে, সরকারী ব্যাখ্যা যেন তাহা হইতে স্বতন্ত্র। আর তাই যদি সত্য হয় এবং সরকারী ব্যাখ্যাই যদি বলবৎ হয়, তবে লক্ষণ অশুভ বলিতে হইবে। ভারতবর্ষে ব্রিটিশ শাসনের দীর্ঘ ইতিহাসে সরকারী ব্যাখ্যাই সকল বিষয়ে বলবৎ হইয়াছে এবং কার্যত সেই ব্যাখ্যাই চালানো হইয়াছে। এদেশে যিনি আইনপ্রণেতা, তিনিই বিচারক, তিনিই আবার দণ্ডের প্রয়োগ-কর্তা, এ কথা ইহার পূর্ব্বে পর্য্যন্ত আমি বিনা দ্বিধায় বলিয়াছি। কিন্তু সরকারী ঘোষণাপত্রে সাম্রাজ্যবাদী এই রীতি ছাড়িয়া নূতন কথা বলা হয় নাই কি? জবাবে আমি বলিয়াছি, 'হাঁ'।

সে যাহা হউক, ঘোষণা-পত্রের ত্রুটির দিকে একবার লক্ষ্য করা যাক।

মন্ত্রী-মিশন সিমলায় সংক্ষিপ্ত কাজের পালা চুকাইয়া ১৪ই তারিখে দিল্লীতে ফিরিলেন, ১৬ই তাঁহাদের ঘোষণাপত্র বাহির করিলেন; অথচ আজও কেন্দ্রে প্রতিনিধিমূলক শাসন প্রতিষ্ঠিত হইল না, উহা দূরেই রহিয়া গেল। মনে হইয়াছিল, ঘোষণা-পত্র প্রচার করিবার আগেই তাহারা কেন্দ্রীয় গবর্মেণ্ট প্রতিষ্ঠা করিবেন। কিন্তু তাহা না করিয়া তাঁহারা আগে ঘোষণাপত্র প্রচার করিলেন, আর তারপর অন্তর্বর্ত্তী গবর্মেণ্ট গঠনের উপায় খুঁজিতে সুরু করিলেন। কেন্দ্রীয় গবর্মেণ্ট তৈয়ারী হইতে অনেক সময় লাগিতেছে; এদিকে লক্ষ লক্ষ লোক অন্নবস্ত্রের অভাবে পিষ্ট হইতেছে। ঘোষণাপত্রের এই হইল এক নম্বর ত্রুটি।

সার্ব্বভৌমত্বের প্রশ্নের কোন সমাধান হয় নাই। ব্রিটিশ-শাসন শেষ হইলেই উহারও শেষ হইবে, এই বলিলেই যথেষ্ট হয় না। কারণ, অন্তর্ব্বর্ত্তীকালে সার্ব্বভৌমত্ব যদি অবাধে চলে, তবে তার ফলে পরবর্ত্তী স্বাধীন গবর্মেণ্টের জন্ত একটি জটিল ব্যাপার সৃষ্ট হইয়া থাকিবে। অন্তর্ব্বর্ত্তী গবর্মেণ্ট স্থাপনের সঙ্গে সঙ্গে যদি ব্রিটিশের সার্ব্বভৌমত্বের অবসান করিতে না পারা যায়, তবে দেশীয় রাজ্যের জনসাধারণের কল্যাণের জন্ত সার্ব্বভৌম ক্ষমতা অন্তর্ব্বর্ত্তী গবর্মেণ্টের সহ-যোগিতায় ব্যবহার করা উচিত হইবে। জনসাধারণই স্বাধীনতা চায়। স্বাধীনতা-সংগ্রাম তাহারাই চালাইতেছে। সামন্ত-রাজগণ স্বাধীনতা চান না। তাঁহারা যে বৈদেশিক

রাজশক্তির হাতে-গড়া, একথা তাঁহারা স্বীকার না করিতে পারেন। তথাপি ইহা ঠিক যে জনগণের স্বাধীনতা দমন করিবার উদ্দেশ্যেই বিদেশী রাজশক্তি তাঁহাদের বাঁচাইয়া রাখিয়াছে। নূতন ব্যবস্থায় সার্ব্বভৌমত্ব জনগণের হইবে। জনগণ সম্বন্ধে দেশীয় রাজারা মুখে যে কথা বলেন, তাঁহাদের মনের কথাও যদি তাই হয়, তবে জন-প্রতিনিধিরা যখন সার্ব্বভৌম ক্ষমতা পাইবেন, রাজন্যবৃন্দ তখন তাহা স্বচ্ছন্দে স্বীকার করিয়া লইবেন এবং তাহার সহিত সামঞ্জস্য করিয়া চলিবেন। ঘোষণাপত্রের এই হইল দুই নম্বর ত্রুটি।

বলা হইয়াছে যে দেশের ভিতরে শান্তিরক্ষার জন্য এবং বাহিরের আক্রমণ হইতে দেশরক্ষার জন্য অন্তর্ব্বর্ত্তী কালে ভারতে ইংরেজ সৈন্য রাখা হইবে। স্বাধীনতা প্রতিষ্ঠিত হওয়া পর্য্যন্ত যদি ঐ উদ্দেশ্যে সৈন্য রাখা হয়, তবে সৈন্যদলের উপস্থিতির কারণে গণপরিষদে স্বাধীন ভারতের গঠনতন্ত্র রচনার কার্য্যে উৎসাহ শিথিল হইয়া পড়িবে, আর তথাকথিত স্বাধীনতা প্রতিষ্ঠিত হইবার পর সৈন্যদল না রাখার চেয়ে রাখার সম্ভাবনাই বেশি হইবে। ভিতরে ও বাহিরে নিরাপদ থাকিবার জন্য যে জাতি বিদেশী সৈন্য রাখিতে চায় অথবা রাখিতে বাধ্য হয়, তাহাকে কোন দিক দিয়াই স্বাধীন বলিতে পারা যায় না। সে জাতি জীর্ণ, নিস্তেজ, স্বায়ত্ত শাসনের অযোগ্য। কোথাও নত না হইয়া, একক সোজা দাঁড়াইতে পারিলেই জাতির শক্তিমত্তার কঠোর পরীক্ষা হইয়া যায়। অন্তর্ব্বর্ত্তী কালে অপরের সাহায্য না লইয়া আমাদের কোনমতে চলিতে শিখিতে হইবে। তবেই স্বাধীনতা লাভ করিয়া আমরা নিজের পায়ের জোরে হাঁটিতে পারিব। পরের মুখ-চাওয়া এখন হইতেই আমাদের ছাড়িতে হইবে।

কিন্তু এই ব্যাপারগুলি যে আজ আমাদের মনের মত হইয়া ঘটিতেছে না ইহার কারণ যাহাই হউক, ইহা আমাদেরই দুর্বলতা, ব্রিটিশ-শাসন অথবা ইংরেজ জাতির বজ্জাতি নয়। সাগরপারের দয়ার দান আমাদের জন্য নহে, আমরা যাহা পাইব যোগ্যতা-বিচারে তাহাই আমাদের প্রাপ্য। মন্ত্রীত্রয় যেরূপ ঘোষণা করিয়াছেন, সেই অনুযায়ী কাজ করিতে আসিয়াছেন। নিজেদের ঘোষণাবাক্য লঙ্ঘন করিয়া যখন তাঁহারা ইংরেজ শাসন কায়েম করিয়া রাখিবার উপায় বাহির করিবেন, তখন তাঁহাদের প্রতি দোষারোপ করিবার সময় আসিবে। ভয়ের কারণ যদিও রহিয়াছে, তথাপি তাঁহারা মুখে এক কথা বলিয়াছেন এবং মনে অন্য কথা রাখিয়াছেন এরূপ লক্ষণ রাজনৈতিক গগনে নাই।

নয়া দিল্লী, ২৬-৫-৪৬

পুস্তক-পরিচয়

[অতঃপর সমালোচনার্থ 'প্রবাসী'তে প্রতি পুস্তক দুইখানি করিয়া পাঠাইতে হইবে।—প্রবাসীর সম্পাদক]

সন্দীপন পাঠশালা—শ্রীতারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়। মডার্ন পাবলিশিং হাউস, ২৫।২ মোহনবাগান রো, কলিকাতা। মূল্য সাড়ে তিন টাকা।

সাময়িক পত্রে 'উদয়াস্ত' নামে উপন্যাসখানি প্রকাশিত হয়। ভূমিকায় গ্রন্থকার বলিতেছেন—"সন্দীপন পাঠশালাই বইখানির সঙ্গত নাম। বাংলাদেশের শিক্ষক-জীবন অবহেলিত, অনাদৃত। পাঠশালার শিক্ষক বা পণ্ডিতমশায়দের তো কথাই নাই।" বর্ত্তমানে এই অবহেলিত অনাদৃত শ্রেণীর প্রতি সাহিত্যিকগণের দৃষ্টি পড়িয়াছে; এবং সেই দরিদ্র করুণ জীবনের জীর্ণ পাতাগুলি ধীরে ধীরে উদ্ঘাটিত হইতেছে। খ্যাতিমান ঔপন্যাসিক তারাশঙ্করের রচনা চিত্তকে আকর্ষণ করিবে জানিয়াই বইখানি পড়িতে বসিয়াছিলাম। আরম্ভে মনে করিয়াছিলাম পাঠশালা সম্পর্কে জানা কথাই হয় ত নূতন ভাবে শুনিতে পাইব। পড়িতে পড়িতে মনে চমক লাগিল, এ শুধু চিত্তাকর্ষক কাহিনী নয়, উপন্যাস হিসাবে হয় ত কোথাও ত্রুটি থাকিতে পারে, শেষের দিকে আকস্মিকতার বেদনা না থাকিলেও হয় ত বঞ্চিত অখ্যাত শিক্ষক-জীবনের কারুণ্য এমনি:তই ফুটিয়া উঠিত, এ সবে কি-ই বা আসে যায়—পড়িতে পড়িতে বার বার এই কথাই মনে আসিল চিত্রগুলি কাল্পনিক নয়, জীবনের অভিজ্ঞতাপ্রসূত। কেবল গল্পের বিষয়বস্তু হিসাবেই পণ্ডিত মহাশয় এবং আনুষঙ্গিক চরিত্রগুলি কৌতূহলের উদ্রেক করে না, জীবনের স্পর্শে ইহারা জাগ্রত বলিয়াই সহানুভূতি আকর্ষণ করে। সন্দীপন পাঠশালা, পাঠশালার ছেলেগুলি এবং সর্ব্বোপরি পাঠশালার প্রতিষ্ঠাতা সীতারাম পণ্ডিত অলিখিত জীবনের সন্ধান আনিয়া দেয়। সদ্‌গোপের ছেলে সীতারামের আশা-আকাঙ্ক্ষা আনন্দ-বেদনা আমাদের মনের তন্ত্রীতে আঘাত করে। রাণী-মা—সীতারামের যেমন তেমনই আমাদেরও অন্তরের শ্রদ্ধা আকর্ষণ করেন। কৃষাণ-বউ ছোটখাট টুকিটাকি জিনিষ পাইলে আঁচলে পুরিয়া থাকে, লজ্জাবোধ কথা দূরে থাক্ একেবারে ঝঙ্কার তুলিয়া বলে, "আ, ই-বাড়ির লোব না চৌব মা তো রাজা-জামা-বলো-বধোর বাড়ীতে লোব নাকি? ইয়েতে চোখ-চৌক দিয়ো-টিও না বাপু, হ্যাঁ। বলে, তিন পুরুষ খাটছি।" এই কথা যখন বলে, কৃষাণ-বউ তখন আমাদের একান্ত পরিচিত হইয়া পড়ে। সীতারাম ছাত্রদের ভিতর দিয়া নিজের জীবন-সঞ্চিত আশাকে সার্থক করিতে চায়, লেখক দরদ দিয়া এই ছবি আঁকিয়াছেন। "সন্দীপন পাঠশালা" পাঠকের মনের দরদও জাগাইয়া তুলিবে।

পোস্টকার্ড—আমিনুর রহমান। কমলা পাবলিশিং হাউস, ৮১-এ হরিপাল লেন, কলিকাতা। দাম দুই টাকা।

ষোলটি ছোট গল্পের সমষ্টি। শুধু ছোট গল্প নয়, গল্পগুলি ছোট-ছোটও বটে। এই লঘুপক্ষ গল্পগুলি মনের উপর দিয়া সাবলীল গতিতে ভাসিয়া চলে। "পোস্টকার্ড" গুরুতর প্রশ্ন উত্থাপন করে না, লঘু হাস্যে মনকে উদ্ভাসিত করে। ভূমিকায় শ্রীসজনীকান্ত দাস লিখিতেছেন, "যে সব ব্যাপার নিয়ে এ দেশে সচরাচর কেঁদে ভাসাবার কথা, সেই সব জিনিষই ইনি হালকা হাসির তুড়ি দিয়ে উড়িয়ে দিতে প্রয়াস করেছেন দেখে খুবই ভাল লেগেছে আমার।" গল্পগুলি পাঠকদেরও ভাল লাগিবে।

শ্রীশৈলেন্দ্রকৃষ্ণ লাহা

তরুণের স্বপ্ন (১ম পর্ব)—শ্রীজলধর চট্টোপাধ্যায়। ষ্টাণ্ডার্ড বুক কোম্পানী। ২১৩, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা। দাম ৩ টাকা।

তরুণ মানবের দেশহিতে উৎসর্গীকৃতপ্রাণ এক তরুণকে লইয়া এই কাহিনী। চারিপাশে বহু চরিত্র নাটকীয় রীতিতে বিকাশ লাভ করিয়াছে। ঘটনা-সৃষ্টির দিকেও লেখকের দৃষ্টি আছে। পাত্রপাত্রীর মুখে সুদীর্ঘ বক্তৃতা, কতকগুলি চরিত্র এবং কোন কোন ঘটনাও গল্পকে স্বাভাবিক বিকাশের ধারা হইতে ভিন্নমুখী করিয়াছে। তথাপি এক শ্রেণীর পাঠকের মনে এই কাহিনী কৌতূহল জাগাইবে।

শ্রীরামপদ মুখোপাধ্যায়

রাজকন্যার ঝাঁপি—শ্রীশশিভূষণ দাশগুপ্ত। শ্রীগুরু লাইব্রেরী, ২০৪, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা। মূল্য দুই টাকা মাত্র।

সমালোচক বলে লেখকের খ্যাতি আছে। তাঁর হাত থেকে এমন সরস ব্যঞ্জনার প্রতীক নাট্য পেয়ে আমরা অধিকতর আশান্বিত হয়েছি। 'রাজকন্যার ঝাঁপি' সার্থক শিল্পসৃষ্টি। কে এই রাজকন্যা? অনেকে তাঁকে দেখেছে "মেঘের মধ্যিখানে রাঙ্‌ডেউলের চূড়োয় জানালা খুলে দাঁড়িয়ে থাকতে!" সে চূড়ো "চিন্তামণিতে গড়া, তার চারদিকে কল্পলতার দেয়াল।" কিন্তু, চিরদিন কি সে থাকবে স্বপ্নালোকে,—নেমে আসবে না জীবনে? আদর্শ সত্য হয়ে উঠবে না প্রতিদিনের সংসারে? বুঝিবা আজ নবযুগের আভাস পেয়েছি, সে আসছে আমাদের সাথী হয়ে।

রায় রামানন্দের ভণিতাযুক্ত পদাবলী—শ্রীপ্রিয়রঞ্জন সেন। সেন রায় এণ্ড কোং। ১৫, কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা। মূল্য দুই টাকা মাত্র।

পুরাতন বাংলা সাহিত্যে এখনও অনুসন্ধানের বিষয় বিস্তর। আলোচ্য পদাবলী ঐতিহাসিকগণের নিকট মূল্যবান্ উপকরণরূপে পরিগণিত হইবে। বৈষ্ণব ধর্ম্ম এবং সাহিত্য সম্বন্ধে যাঁহারা কিছুমাত্র খবর রাখেন, তাঁহারা সকলেই রায় রামানন্দের কথা জানেন। চৈতন্যদেব ইঁহার পাণ্ডিত্য, রসবোধ এবং ধর্ম্মানুরাগের প্রশংসা করিয়াছেন, মহাপ্রভুর শেষজীবনে ইনি ছিলেন নিত্যসঙ্গী। উভয়ের সরস মধুর আলোচনা শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে অমরত্ব লাভ করিয়াছে।

বর্ত্তমান গ্রন্থধৃত পদগুলির প্রামাণিকতা সম্বন্ধে সম্পাদক তাঁহার যুক্তি-গুলি ভূমিকায় সুন্দরভাবে গুছাইয়া বলিয়াছেন। স্বীয় মত অকাট্য বলিয়া তিনি দাবি করেন নাই, শুধু পণ্ডিত-সমাজে নিজের বক্তব্য নিবেদন করিয়া সত্যের প্রতিষ্ঠা চাহিয়াছেন। শ্রীযুক্ত সত্যনারায়ণ দাস উড়িষ্যা হইতে উড়িয়া অক্ষরে লেখা একখানি পুথি সংগ্রহ করেন। তদবলম্বনে এই গ্রন্থ সম্পাদিত। রামানন্দ স্বয়ং উড়িষ্যাবাসী ছিলেন। এ কারণে, পদগুলি বিশেষভাবে ঐতিহাসিকের দৃষ্টি আকর্ষণ করিবে।

শ্রীধীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়

মধ্য যুগের বাংলা ও বাঙালী—শ্রীসুকুমার সেন। বিশ্বভারতী গ্রন্থালয়, ২, বঙ্কিম চাটুজ্যে ষ্ট্রীট, কলিকাতা। মূল্য আট আনা।

মুসলমান আমলের বাঙালী সমাজের বিভিন্ন বিভাগের কিছু কিছু পরিচয় মুখ্যতঃ এই যুগের বাংলা গ্রন্থ অবলম্বনে এই পুস্তকে লিপিবদ্ধ হইয়াছে। পরিচয় অতি সংক্ষিপ্ত হওয়ায় অনেক ক্ষেত্রে ইহা কৌতূহল জাগরিত করে মাত্র, নিবৃত্ত করে না। গ্রন্থমধ্যে প্রসঙ্গতঃ উল্লিখিত কয়েকটি মন্তব্যের প্রতি সাধারণের দৃষ্টি আকর্ষণ করা যাইতে পারে। যথা—শ্রীচৈতন্যের ধর্ম্মের প্রভাবে তান্ত্রিকতার বিষ দাঁত ভাঙিয়া গেল অর্থাৎ উপাস্য উপাসকের মধ্যে ভয়-ভক্তির স্থলে বাৎসল্য-প্রীতির হৃদয়-সম্পর্ক স্থাপিত হইল (পৃঃ ৩৮)। ন্যায় ও স্মৃতি-শাস্ত্রের চর্চা ছিল ব্রাহ্মণের একচেটিয়া (পৃঃ ৪৩)। দক্ষিণ রাঢ়ে স্থানে স্থানে এখনও ভোম ও বাগ্দী-পণ্ডিতের টোল আছে (পৃঃ ৪০)। দুঃখের বিষয়, এই সকল ব্যাপক মন্তব্যের পরিপোষক বিশেষ কোনও প্রমাণ ও যুক্তির অবতারণা গ্রন্থমধ্যে করা হয় নাই। বস্তুতঃ গ্রন্থকারের প্রথম উক্তি তান্ত্রিক ধর্ম্মের বিকৃতি সম্বন্ধে কথঞ্চিৎ প্রযোজ্য হইলেও খাঁটি তন্ত্রমত সম্বন্ধে আদৌ প্রযোজ্য নয়। দ্বিতীয় উক্তির বিরোধী দৃষ্টান্তও যে কিছু কিছু না পাওয়া যায় এমন নয়—কায়স্থ কৃষ্ণমোহন ও কৃষ্ণদেবগণের স্মৃতি ও তন্ত্র বিষয়ক গ্রন্থ এখনও বর্ত্তমান আছে।

শ্রীচিন্তাহরণ চক্রবর্ত্তী

রজনী—বঙ্কিমচন্দ্র। সংক্ষেপিত বঙ্কিম-গ্রন্থমালার পঞ্চম গ্রন্থ। সম্পাদক—শ্রীবিজনবিহারী ভট্টাচার্য্য। বৃন্দাবন ধর এণ্ড সন্স। ৫, কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা। মূল্য এক টাকা।

ঋষি বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসগুলির সংক্ষেপিত সংস্করণ প্রকাশ করিয়া প্রকাশক পাঠক সাধারণের ধন্যবাদ অর্জ্জন করিতেছেন। এইরূপ শোভন সংক্ষেপিত সংস্করণের অভাব বাংলা সাহিত্যে বহু দিন যাবৎই অনুভূত হইয়া আসিতেছিল। এই গ্রন্থমালার সম্পাদক মহাশয়ের কৃতিত্বও অসাধারণ। তিনি বঙ্কিমের ভাষাকে কোথাও ক্ষুণ্ণ করেন নাই, গল্পকে অনর্থক ছাঁটিয়া বাদ দিয়া সামঞ্জস্যহীন করেন নাই। অথচ উপন্যাসটিকে সংক্ষেপিত করিয়াছেন। পড়িয়া মনে হইল মূল 'রজনী'র সহিত আসলে ইহার বিশেষ পার্থক্য নাই। এই গ্রন্থমালা দ্রুত সম্পাদিত হইলে শাশ্বত সাহিত্যের অনুরাগী বাঙালী পাঠকের একটা বড় অভাব পূর্ণ হইবে। ইচ্ছা সত্ত্বেও যাঁহারা বৃহদায়তন উপন্যাস সময়াভাবে পড়িতে পারেন না—এইরূপ সংক্ষেপিত সংস্করণ তাঁহাদের কাছে নিশ্চয়ই আদরণীয় হইবে।

যুগের যাত্রী—শ্রীখগেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য। ১১, বঙ্কিম চাটুজ্যে ষ্ট্রীট, কলিকাতা। মূল্য—আড়াই টাকা।

বাংলা-সাহিত্যের আসরে লেখক বিখ্যাত নহেন, কিন্তু তাঁহার রচনাটি পড়িয়া মনে হইল ঔপন্যাসিক হিসাবে তাঁহার খ্যাতি হওয়া উচিত। চরিত্রগুলি নিপুণ তুলিকায় চিত্রিত এবং ঘটনার গতি স্বাভাবিক। সুধীর, শঙ্কর, রুবী, প্রশান্ত প্রভৃতি চরিত্রগুলি লেখকের স্বকীয় লিখন-ভঙ্গীতে উজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছে। তবে একটা কথা বলিবার আছে—লেখকের রচনা একটু কাব্যগন্ধী। লিপি-সংযম অভ্যাস করিলে লেখকের হাত দিয়া উৎকৃষ্ট উপন্যাস বাহির হইবে—আশা করা যায়।

শ্রীফাল্গুনী মুখোপাধ্যায়

ধূসর পথের ধূলা—শ্রীগৌরাঙ্গগোপাল সেনগুপ্ত। প্রবর্ত্তক পাবলিশিং হাউস, ৬১ বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা। পৃ, ১৪৪, মূল্য দুই টাকা।

আদর্শবাদী একটি তরুণের জীবনকাহিনী অবলম্বন করিয়া এই উপন্যাসখানি রচিত। নায়ক অশোককে বাল্যকাল হইতেই আদর্শ মানুষ করিয়া গড়িয়া তুলিতে যাহা কিছু প্রয়োজন গ্রন্থকার সযত্নে তাহার সব কিছুরই অবতারণা করিয়াছেন। কাহিনী করুণ ও মধুর। নায়কের জীবনকে স্বাভাবিক ভাবে গঠন করিতে লেখকের চেষ্টার ত্রুটি নাই। গ্রন্থের উপসংহারের কাছাকাছি আসিয়া অশোকের পদস্খলন হইল। গ্রন্থখানি ঠিক রসোত্তীর্ণ হইয়া উঠে নাই। পড়িতে পড়িতে মনে হয় লেখক আদর্শবাদী শিক্ষকের আসনে বসিয়া পাঠকবর্গকে ছাত্র মনে করিয়া গল্পাকারে তাহাদের নিকট আদর্শ জীবনের একটি পরিকল্পনা উপস্থাপিত করিতেছেন।

তমসাবৃতা—শ্রীপ্রশান্তি দেবী। বান্ধবী পাবলিশার্স ২০।এ, আমহার্ষ্ট রো, কলিকাতা। পৃ, ১৫৫, মূল্য দুই টাকা।

তমসাবৃতা ছয়টি ছোট গল্পের সঙ্কলন। প্রথম গল্প 'তমসাবৃতা'য় শ্রীযুক্ত সুবোধ ঘোষের 'উচলে চড়িনু' নামক গল্পের ছায়া আছে। শেষ গল্প 'সাহসিকা'য় পড়িয়াছে শরৎচন্দ্রের শ্রীকান্তের অতি-পরিচিত দুইটি চরিত্রের প্রভাব। অবশিষ্ট চারিটি গল্প সম্পূর্ণ মৌলিক এবং সুলিখিত। প্রকাশক ভূমিকায় জানাইয়াছেন—এইটিই লেখিকার প্রথম প্রকাশিত গ্রন্থ। প্রথম পুস্তক হইলেও ইহার দুই-একটি গল্পের মধ্যে লেখিকা বিশেষ শক্তিমত্তার পরিচয় দিয়াছেন, উদাহরণ-স্বরূপ 'হাইফেন' ও 'এমন কেন হয়' এ দুটির উল্লেখ করা যায়। এগুলিতে লেখিকা মনস্তত্ত্ব বিশ্লেষণ ও ঘটনা সন্নিবেশে যে নৈপুণ্য দেখাইয়াছেন তাহা সত্যই প্রশংসনীয়।

শ্রীতারাপদ রাহা

চরকার বিপ্লবী রূপ—বঙ্গীয় প্রাদেশিক ছাত্র সংসদ, কলেজ ষ্ট্রীট মার্কেট, কলিকাতা। পৃষ্ঠা ২৪, মূল্য চারি আনা।

মহাত্মা গান্ধী ভারতের মুক্তি-আন্দোলনের নেতৃত্ব গ্রহণ করার পর হইতেই দেশে যে বিপ্লব চলিতেছে তাহার অন্যতম প্রধান কারণ চরকা। চরকা

সূতা কাটার যন্ত্র মাত্র নহে। মহাত্মাজীর মতে চরকা স্বাবলম্বন, পুরুষকার, গ্রাম সংগঠন, আত্মশুদ্ধি ও অহিংসার প্রতীক। চরকাই ব্যক্তি ও সমাজের মধ্যে সামঞ্জস্য আনিবে। প্রকৃত সাম্যবাদ (রুশীয় সাম্যবাদ নহে) অহিংস ভাবে চরকা দ্বারাই সম্ভব হইবে। আর প্রকৃত স্বরাজও চরকার দ্বারাই সম্ভব। বিংশ শতাব্দীর গর্ব্বিত সভ্য মানব আজ ক্রমান্বয়ে দুইটা মহাযুদ্ধের মধ্যে নিজেদের ধ্বংসের পূর্ব্বাভাস দেখিয়া অবিশ্বাস-মিশ্রিত বিস্ময়ে মহাত্মাজীর অভিনব পন্থা ও অস্ত্রবাণীর দিকে দৃষ্টি ফিরাইয়াছে, কিন্তু সূক্ষ্ম আত্মিক দৃষ্টির অভাবে উহার তাৎপর্য্য আজও হৃদয়ঙ্গম করিতে পারে নাই। যাহাদের অহিংসায় বিশ্বাস নাই তাহাদের নিকট চরকা স্বরাজের প্রতীক ত নহেই বরং সভ্যতার শৈশব কালের একটা ক্ষুদ্র যন্ত্র ছাড়া আর কিছু নহে। এই পুস্তিকায় ডাঃ পট্টভি সীতারামিয়া ও ডাঃ প্রফুল্ল ঘোষের মতও উদ্ধৃত হইয়াছে।

এরূপ পুস্তিকা সাধারণ্যে যতই প্রচার হয় ততই দেশের মঙ্গল হইবে।

কৃষক আন্দোলন ও মধ্যবিত্ত—৺সুশীলকুমার বসু। প্রাপ্তিস্থান :—শ্রীসুধীরকৃষ্ণ মিত্র, পাঁচিয়া, যশোহর। পৃষ্ঠা ৮৩, মূল্য ৷৶৹.

এই পুস্তকে লেখক অনতিবিলম্বে জমিদারী প্রথা তুলিয়া দিবার সপক্ষে ওকালতি করিয়াছেন কিন্তু এরূপ কার্য্যে গবর্ণমেণ্ট জমিদারগণকে বা অন্যান্য জমির মালিকগণকে কোন ক্ষতিপূরণ দিবেন কিনা সে বিষয় পরিষ্কার করিয়া বলেন নাই। অবশ্য জমিদারী-প্রথা উঠিয়া গেলে কৃষকগণ জমির মালিক হইবে। লেখকের মতে জমিদারী-প্রথা উঠিয়া গেলে যথেষ্ট পুঁজি এই সকল জমির বন্ধন হইতে মুক্তি পাইয়া শিল্পে নিয়োজিত হইবে। লেখকের মতে রাষ্ট্রপরিচালিত বড় বড় শিল্প-প্রতিষ্ঠানই বর্ত্তমান যুগের উপযোগী। মধ্যবিত্তশ্রেণী চিরকালই পুঁজিদার ও জমিদারগণের সাহায্য করিয়াছে এবং কৃষক ও শ্রমিকগণকে শোষণের সহায়ক হইয়াছে। মধ্যবিত্তের উচিত এখন হইতে কৃষক ও শ্রমিকের সহিত কাঁধ মিলাইয়া বর্ত্তমান সমাজপদ্ধতিতে বিপ্লব আনা। লেখক একটু তলাইয়া দেখিলে বুঝিতেন যে, মধ্যবিত্তেরাও সমাজে শোষিতের অংশবিশেষ। সুতরাং বর্ত্তমান পুঁজিপতির সমাজে কিরূপে মধ্যবিত্ত সরাসরি নিজের অধিকার ত্যাগ করিবে তাহা বুঝা শক্ত। দরিদ্র ও অভাবগ্রস্ত কৃষকের প্রতি লেখক যে দরদ দেখাইয়াছেন তাহার প্রতি সত্য সত্যই সকলের দৃষ্টি আকৃষ্ট হওয়া উচিত কারণ কৃষক ও শ্রমিকই সত্যিকার দেশ এবং ইহাদের উন্নতিতেই দেশের উন্নতি। কিন্তু দেশের উন্নতি যতদূর সম্ভব সকল শ্রেণীর সমবেত চেষ্টায় স্বাধীন ভারতেই সম্ভব। শ্রেণী-সংগ্রাম বর্ত্তমানে আমাদের সমতা বাড়াইবে এবং স্বাধীনতা-সংগ্রামে দেশের অগ্রগতি ব্যাহত করিবে।

দিগন্ত—শ্রীমৃণালকান্তি দাশ। বাণীচক্র ভবন,শ্রীহট্ট। প্রাপ্তিস্থান: বেঙ্গল পাব্লিশার্স, ১৪ বঙ্কিম চাটুজ্যে ষ্ট্রীট, কলিকাতা। মূল্য দুই টাকা, বোর্ড বাঁধাই আড়াই টাকা।

মৃণালকান্তি দাশের প্রথম কাব্যগ্রন্থ 'আকাশ' প্রকাশিত হইবার সঙ্গে সঙ্গেই বাংলাদেশের শ্রেষ্ঠ সমালোচক ও কাব্য-রসিকগণ মুক্তকণ্ঠে তাঁহার কবিত্বশক্তির উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করিয়াছিলেন। 'আকাশে' যে শক্তির স্ফুরণ আমাদিগকে মুগ্ধ করিয়াছিল 'দিগন্তে' তাহার ক্রমবিকাশ কবির উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে আমাদিগকে আশান্বিত করিয়া তুলিয়াছে।

মৃণালকান্তি আধুনিক কবি হইয়াও আধুনিকতার উৎকট মোহ হইতে নিজেকে কি প্রকারে মুক্ত রাখিলেন তাহা ভাবিলে বিস্মিত হইতে হয়। অন্যান্য আধুনিক কবিদেরই মত বর্তমান যুগের দুঃখবেদনা এবং জীবনের জটিলতা সম্বন্ধে তিনি সম্পূর্ণ সচেতন। পলায়নী মনোবৃত্তির পরিচয় তাঁহার কবিতায়ও পাওয়া যায় না, কিন্তু তাই বলিয়া কাব্য-রচনার নামে শব্দ লইয়া পালোয়ানী পাঁচ কষিবার উৎকট রুচির নিদর্শনও তাঁহার কাব্যে মেলে না। সপ্তবর্ণের বিচিত্র ঝঙ্কার মৃণালকান্তির কাব্যে আমরা শুনিতে পাই না। কবিতাগুলি পড়িতে পড়িতে মনে হয় যেন উদার আকাশের নীচে একটানা একতারায় উদাস রাগিণী বাজিয়া চলিয়াছে। সেই বিশ্বব্যাপী সুর-লহরী মনকে বিবাগী করিয়া সুদূর দিগন্তের পানে টানিয়া লইয়া যায়। কিন্তু আকাশবিহারী হইলেও কবি মাটির পৃথিবীর সহিত নাড়ীর গভীর যোগের কথা ভুলিয়া যান নাই। আজিকার অভিশপ্ত পৃথিবীর আর্তনাদ তাঁহারও কবিচিত্তকে বেদনায় পীড়িত করিয়া তুলিয়াছে। কিন্তু আশাবাদী কবির মনে দৃঢ় 'প্রতীতি' এই যে, এই অমানিশার অবসান একদিন হইবেই। কি গভীর আত্মপ্রত্যয়পূর্ণ তাঁহার আশ্বাস-বাণী! :—

> "আবার বসন্ত নব দেখা দেবে বাণী বর্ণময়
> উজ্জ্বল সূর্যের হবে পূর্ব্বাকাশে প্রসন্ন উদয়।
> এই রক্তে হোক আজি পরিশোধ পৃথিবীর ঋণ
> এরপর দেখা দেবে সমুজ্জ্বল স্বর্ণগর্ভ দিন।"

ধান-ক্ষেত—শ্রীরাজেন্দ্র দেশমুখ্য। মডার্ণ বুক ডিপো, জিন্দাবাজার, শ্রীহট্ট।

এই কাব্যগ্রন্থে যুদ্ধ ও দুর্ভিক্ষ এই দুই বিষয়ে লেখা কতকগুলি কবিতা আছে। অধিকাংশই গদ্যকবিতা। স্থানে স্থানে লেখকের অনায়াস কবিত্ব-শক্তির পরিচয় পাওয়া যায়।

শ্রীনলিনীকুমার ভদ্র

দেশ-বিদেশের কথা

দুর্গত বাঁকুড়া

সম্প্রতি প্রেসিডেন্সী কলেজ ইউনিয়ন সোসাইটির সমাজ-সেবা সঙ্ঘের (Social Service League) এক দল স্বেচ্ছাসেবক বাঁকুড়ার দুর্গত পল্লী অঞ্চলে গিয়া তিন শতটি গ্রামে তথ্যানুসন্ধান করিয়া যে রিপোর্ট দাখিল করিয়াছেন, তাহা হইতে সেখানকার অধিবাসীদের শোচনীয় দুরবস্থার পরিচয় পাইয়া আতঙ্কিত হইতে হয়। দুর্ভিক্ষ বাঁকুড়ায় লাগিয়াই আছে, যে সমস্ত কারণে বাঁকুড়া বঙ্গের দরিদ্রতম জেলায় পরিণত হইতে চলিয়াছে দুর্ভিক্ষ তাহার অন্যতম। সম্প্রতি অন্নবস্ত্রের অভাব সেখানে একেবারে চরমে উঠিয়াছে। তালড্যাংরা থানার অন্তর্গত নবগ্রামের স্বামি-পরিত্যক্তা একটি স্ত্রীলোক অভাবের জ্বালা সহ্য করিতে না পারিয়া, নুন খাওয়াইয়া তাহার সদ্যজাত শিশুকে মারিয়া ফেলিয়াছে। ছাতনা থানার চন্ড্রা গ্রামের এক ব্যক্তি স্ত্রী এবং তিনটি শিশু সন্তানসহ অনাহারে মৃত্যুর প্রতীক্ষা করিতেছে। দুর্ভিক্ষপীড়িত অঞ্চলের ৭৯টি ইউনিয়ন-বোর্ডের অধীনস্থ গ্রামগুলির শতকরা ৬০ জন অধিবাসী এক বেলাও পেট ভরিয়া খাইতে পাইতেছে না। ইতিমধ্যে দুর্গতরা দলে দলে আসিয়া বাঁকুড়া শহরে জড়ো হইতেছে। অবিলম্বে এই অবস্থার প্রতিকার হওয়া একান্ত আবশ্যক, কিন্তু সরকার মাথাপিছু মাত্র দুই আনা করিয়া দিতেছেন। গ্রামের প্রত্যেকটি গৃহ ভগ্ন, জীর্ণ এবং গ্রামবাসী অনেকেই গৃহহারা ও নিরাশ্রয় হইয়া পড়িয়াছে। স্কুলগুলি মেরামত করিবার জন্য অন্ততঃ ১৮০০ টাকার খরচেরই প্রয়োজন, কিন্তু সরকার এ সম্বন্ধে বিশেষ কোন চেষ্টাই করিতেছেন না। বস্ত্র-সমস্যাও সেখানে তীব্র হইয়া উঠিয়াছে। শতকরা চল্লিশ জন পল্লীবাসী ছেঁড়া ন্যাকড়া পরিয়া কোনমতে লজ্জা নিবারণ করিতেছে। বস্ত্রাভাবে স্ত্রীলোকেরা ঘরের বাহিরে আসিতে পারে না, অনেকে চট পরিধান করিতে বাধ্য হইয়াছে। কৃষককুলের অবস্থাও শোচনীয়। তাহাদের হাতে বপন করিবার উপযুক্ত বীজ নাই, উপরন্তু কৃষিকার্য্যের জন্য মজুর নিযুক্ত করিবার সঙ্গতিও তাহাদের নাই। তাহা সত্বেও কিন্তু তাহারা সরকারী কৃষি-ঋণ গ্রহণ করিতে নারাজ, কেননা গত বৎসর সরকার যে ভাবে উৎপীড়ন করিয়া পাওনা আদায় করিয়াছিলেন তাহা তাহাদিগের মনে ত্রাসের সঞ্চার করিয়াছে। তদুপরি আবার সরকারী বিধানমতে প্রত্যেক চাষী বিঘা প্রতি মাত্র এক টাকা দশ আনা কৃষিঋণ পাইবার অধিকারী, কিন্তু বিঘাপ্রতি তাহার অন্ততঃ ৫৲ টাকা পাওয়া প্রয়োজন।

বাঁকুড়ার পৌনঃপুনিক দুর্ভিক্ষের অন্যতম হেতু সেখানে যথেষ্টসংখ্যক দীঘি খাল প্রভৃতির অভাব। সেখানকার সেচ-ব্যবস্থার উন্নয়নকল্পে গবর্ণমেন্টের একটি সুনির্দ্দিষ্ট পরিকল্পনা অনুযায়ী অবিলম্বে কর্ম্মে প্রবৃত্ত হওয়া প্রয়োজন। বিশুদ্ধ পানীয় জলও বাঁকুড়ায় দুষ্প্রাপ্য, অনেক গ্রামে একটি মাত্র কূয়া পর্য্যন্ত নাই।

বাঁকুড়ার এই শোচনীয় অবস্থার প্রতিকারকল্পে গবর্ণমেন্ট এবং দেশের নেতৃবৃন্দ সকলেরই অবিলম্বে অবহিত হওয়া অত্যাবশ্যক, নতুবা আসন্ন দুর্ভিক্ষের কবল হইতে এই জেলাকে কিছুতেই রক্ষা করা যাইবে না।

অজিতকুমার বসু, এফ-আর-সি-এস

কলিকাতা স্মলকজ কোর্টের অবসর-প্রাপ্ত জজ শ্রীযুক্ত অখিলপ্রকাশ বসুর জ্যেষ্ঠ পুত্র শ্রীঅজিতকুমার বসু অস্ত্র-চিকিৎসায় অসাধারণ কৃতিত্ব অর্জন করিয়াছেন। হাইকোর্টের বিচারপতি স্বর্গত স্যর্ চারুচন্দ্র ঘোষ ইঁহার মাতামহ। অজিতকুমার ১৯৩৬ সালে কলিকাতা মেডিকেল
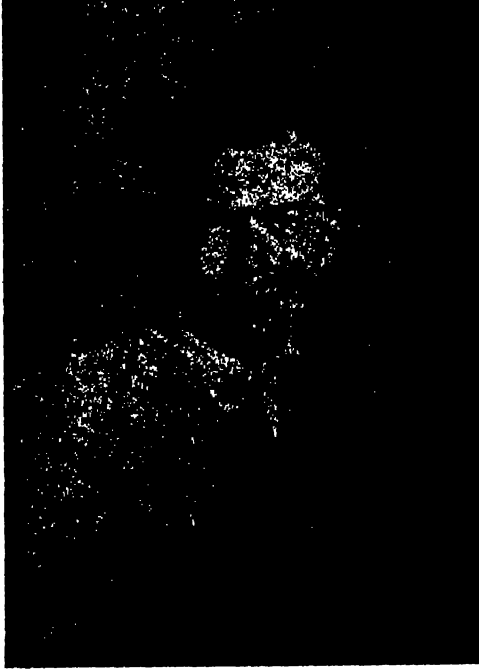
শ্রীঅজিতকুমার বসু

কলেজ হইতে সসম্মানে এম-বি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। পরে শম্ভুনাথ পণ্ডিত হাসপাতাল ও মেডিকেল কলেজ প্রভৃতি বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে রেসিডেন্ট মেডিক্যাল অফিসার, রেসিডেন্ট সার্জন প্রভৃতি দায়িত্বপূর্ণ কার্য্যে নিযুক্ত হইয়া অস্ত্রোপচার সম্বন্ধীয় প্রকৃত জ্ঞান ও প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা অর্জন করেন।

১৯৪৫ সালের জুলাই মাসে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে তিনি মাষ্টার অব সার্জারি নামক ডিগ্রি লাভ করেন। এ সম্বন্ধে তিনি যে গবেষণামূলক প্রবন্ধ লিখিয়াছিলেন তাহা অতি উচ্চাঙ্গের বলিয়া গণ্য হইয়াছিল। ঐ বৎসর সরকারী বৃত্তি পাইয়া তিনি ইংলণ্ড যাত্রা করেন এবং অল্পদিনের মধ্যেই লণ্ডনের রয়েল কলেজ অব্ সার্জনসের অস্ত্রোপচার বিষয়ক সর্ব্বোচ্চ পরীক্ষায় সসম্মানে উত্তীর্ণ হইয়া উক্ত প্রতিষ্ঠানের ফেলো নির্ব্বাচিত হন। সম্প্রতি বিদেশের বিভিন্ন হাসপাতাল পরিদর্শন করিয়া অস্ত্রোপচার সম্বন্ধে আরও ব্যুৎপত্তি অর্জন করিতেছেন।

অজিতকুমার পরলোকগত চিকিৎসক ও সাহিত্যিক রায় বাহাদুর চুণীলাল বসু মহাশয়ের পৌত্র।

পণ্ডিত দ্বারিকানাথ ন্যায়শাস্ত্রী

বিখ্যাত পণ্ডিত দ্বারিকানাথ ন্যায়শাস্ত্রী মহাশয় গত ২৮শে বৈশাখ, ৭৫ বৎসর বয়সে বরিশালে দেহত্যাগ করিয়াছেন। শাস্ত্রী মহাশয় ৪৬ বৎসর পূর্ব্বে কলিকাতা কুমারটুলীতে সার্ব্বভৌম চতুষ্পাঠী স্থাপন করিয়া

পণ্ডিত দ্বারকানাথ ন্যায়শাস্ত্রী
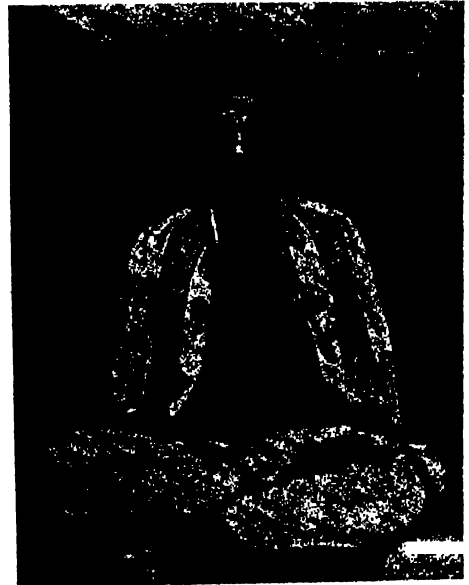
ছাত্রদের ন্যায়, সাংখ্যদর্শন, সাহিত্য, ব্যাকরণ ও ধর্ম্মশাস্ত্র শিক্ষাদান আরম্ভ করেন। ছাত্রদের খাওয়া-থাকা ইত্যাদি সংক্রান্ত যাবতীয় খরচ তিনিই নির্ব্বাহ করিতেন। ত্রিবেদীয় কাণ্ডে শাস্ত্রী মহাশয়ের মত ব্যুৎপত্তি বাংলাদেশে আর কাহারও আছে কিনা সন্দেহ। শাস্ত্রী মহাশয়ের প্রচেষ্টায় তাঁহারই চতুষ্পাঠীতে কলিকাতার প্রসিদ্ধ সংস্কৃত সাহিত্য-পরিষৎ স্থাপিত হয় এবং মৃত্যুকাল পর্য্যন্ত তিনি ঐ প্রতিষ্ঠানের সহকারী সভাপতির পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। তিনি শোভাবাজারের রাজা বিনয়কৃষ্ণ দেব বাহাদুরের সভাপণ্ডিত ছিলেন এবং সম্রাট পঞ্চম জর্জের অভিষেকে বিশেষ ভাবে নিমন্ত্রিত হইয়া দিল্লীর দরবারে উপস্থিত হইয়াছিলেন। শাস্ত্রী মহাশয় আদর্শ চরিত্রের জন্য সর্ব্বত্র সম্মানিত হইতেন।

মুদ্রাকর ও প্রকাশক: শ্রীনিবারণচন্দ্র দাস, প্রবাসী প্রেস, ১২০।২ আপার সারকুলার রোড, কলিকাতা।

প্রবাসী প্রেস, কলিকাতা
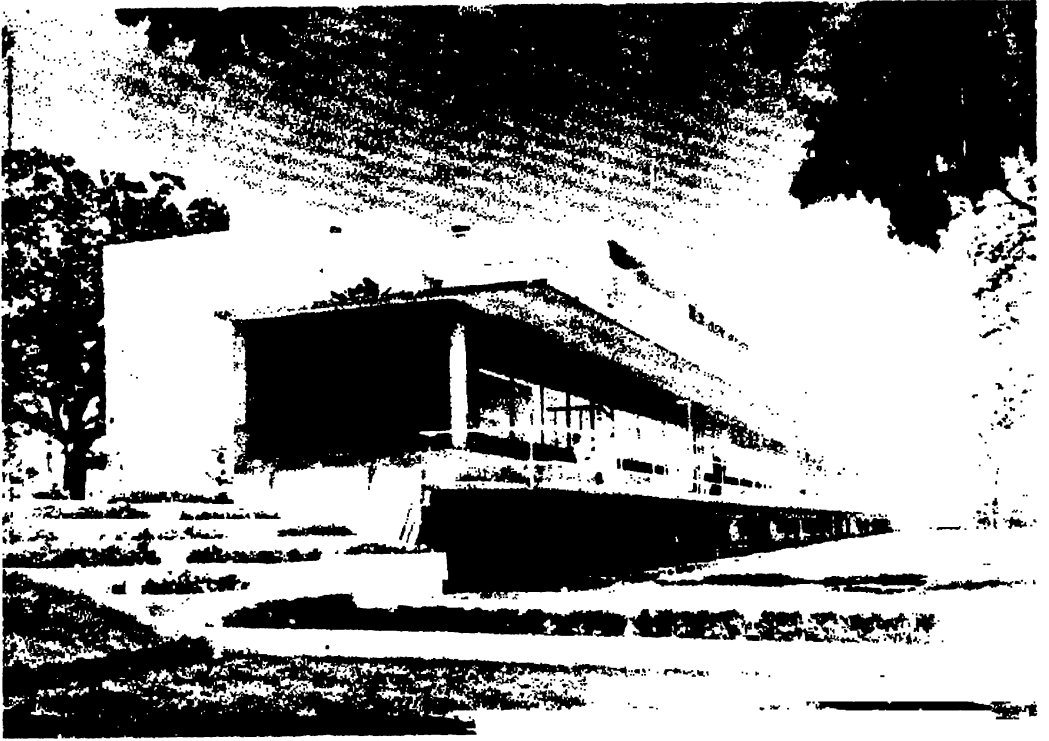
ইলিনয়সের পশ্চিম অঞ্চলে নূতন পরিকল্পনায় নির্মিত একটি
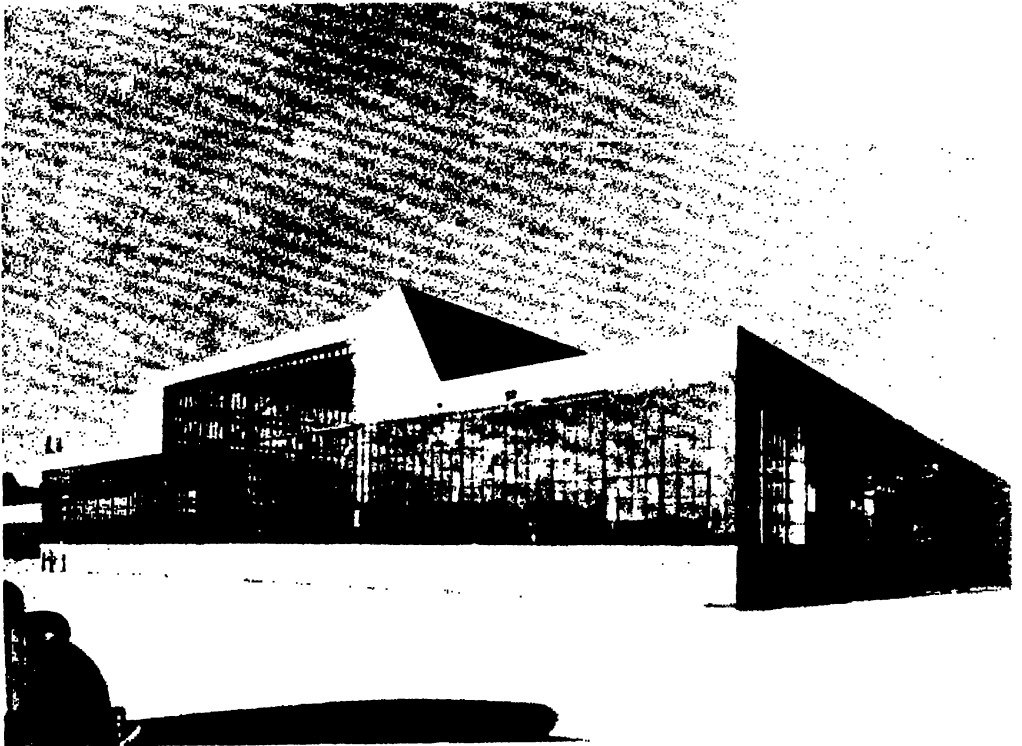
মিশিগানের ডিট্রয়টে অভিনব পদ্ধতিতে নির্মিত কাঁচের প্রাচীরযুক্ত 'ডজ ট্রাক প্লান্ট'

"সত্যম্ শিবম্ সুন্দরম্

নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ"

৪৬শ ভাগ ১ম খণ্ড | শ্রাবণ, ১৩৫৩ | ৪র্থ সংখ্যা

বিবিধ প্রসঙ্গ

বাঙালীর ভবিষ্যৎ

বঙ্গবিজেতা এক মুসলমান বাংলাদেশকে "রুটিপূর্ণ নরক" আখ্যা দিয়াছিলেন। সে তো গেল মধ্যযুগের আরম্ভের কথা। আজ এই বিংশ শতাব্দীর পঞ্চম দশকে ঐ আখ্যা আরও সার্থক হইতে চলিয়াছে। পরিবর্তনের মধ্যে এখন "রুটির" নিদারুণ অভাব। অতীত ইতিহাসের কথা ছাড়িয়া বর্তমান ও ভবিষ্যতের কথা চিন্তা করাই বিশেষ প্রয়োজন হইয়াছে, কেননা বাংলা, অর্থাৎ হিন্দু, মুসলমান, খৃষ্টান বাঙালীর বাসভূমি, যে পথে চলিয়াছে তাহাতে বাংলাদেশ থাকিতে পারে কিন্তু বাঙালীর অস্তিত্ব লোপ অসম্ভব নহে, এবং সে ঘটনা সুদূর ভবিষ্যতে ঘটিবে এ কথা ভাবিয়া মনকে আশ্বাস দেওয়া চলে না।

মাত্র পঞ্চাশ-ষাট বৎসর পূর্বে বিদ্যায়, বুদ্ধিতে ও রাষ্ট্রনীতিতে বাঙালীর স্থান ছিল সমস্ত ভারতের শীর্ষে। এই বাংলাদেশেই ভারতের স্বাধীনতার যুদ্ধের আরম্ভ হয় বিংশ শতাব্দীর মুখে। বাঙালী একলা সে যুদ্ধ চালাইয়াছিল সর্বস্ব পণ করিয়া, যে যুদ্ধের ফলে দেশের স্বাধীনতার পথ খুলিয়া যায়। তাহার পর বাঙালীর ঐশ্বর্য্য গেল বিলাসে ব্যসনে ও আলস্যে, বিত্তনাশ হইল মিথ্যা আড়ম্বরে, ভুয়া বনিয়াদি চালের অহঙ্কারে ও দেশী-বিদেশী আভিজাত্যের মর্কট-তুল্য অনুকরণে। তাহার পর চাকুরী দাঁড়াইল শিক্ষার মুখ্য উদ্দেশ্য, বিদ্যালাভ বা জ্ঞান অর্জন হইল গৌণ ব্যাপার। শিক্ষাদান গৌরবময় কার্য ছিল, উহা হইয়া দাঁড়াইল অর্থাগমের পথ। শিক্ষক ও অধ্যাপক লক্ষ্যভ্রষ্ট হইলেন, শিক্ষার্থীও শিখিল "ফাঁকি দিয়া স্বর্গ লাভে"র পন্থা। বিদ্যাশিক্ষা সাহিত্য ও জ্ঞানের স্রোতে পড়িল ভাটা। কেবলমাত্র কয়েকজন মহাপুরুষের গগনস্পর্শী ব্যক্তিত্বের ও প্রতিভার জ্যোতিতে বাংলার সুনাম রহিল বজায়। তখনও ছিল অন্যদিকে, রাষ্ট্রনীতির ক্ষেত্রে, বাঙালীর অদম্য উৎসাহ, জীবনপণ আত্মোৎসর্গ ও জ্বলন্ত স্বদেশপ্রেম।

আজ যে সবই প্রায় গিয়াছে, বাঙালীর উপর এখন বন্ধ্যতার অভিশাপ পড়িয়াছে। উপরন্তু, নিরাপদ ও অল্পপ্রয়াসে অর্থোপার্জনের লোভে সে ব্যবসা-বাণিজ্য ছাড়িয়া চাকুরীর ও ব্যবহারাজীবের যে পথ ধরিয়াছিল সে পথও এখন বন্ধ হইতে চলিয়াছে। বাঙালীর বুদ্ধি, ক্ষমতা এবং জ্ঞানের মূল্য ক্রমেই কাণাকড়িতে দাঁড়াইতেছে। স্বাধীনতা-যুদ্ধের প্রথম যুগে দেশের শাসনকর্তারা বাঙালীকে শাস্তিদানে শায়েস্তা করার জন্য নিয়ম করিলেন, "Bengalee's need not apply" বাঙালীর আবেদন মঞ্জুর হইবে না। শাসনকর্তাদিগের ইঙ্গিতে ক্লাইভ ষ্ট্রীটের শোষণকর্তারা বাঙালী আড়তদার ও বেপারীর ব্যবসা-বাণিজ্যের পথ বন্ধ করিয়া মাড়বারী ও ভাটিয়ার প্রতি হইলেন সদয়। ভিন্ন প্রদেশীয়েরা দেখিলেন বাঙালী অসহায় সুতরাং তাঁহারা বাঙালীকে সাহায্য না করিয়া লুণ্ঠনে ও শোষণে বিদেশীর অনুগত শিবাদলের কাজ করিলেন। গণ-আন্দোলন ক্রমে হইল নিস্তেজ। আজ ভারতের রাষ্ট্রনীতির ক্ষেত্রে বাঙালীর নাম কোথায়? বাঙালীর গৌরবের শেষ আশ্রয় যাহা ছিল তাহাও চলিয়াছে ধ্বংসের পথে পেশাদার রাষ্ট্রনৈতিকদের কৃপায়।

পেশাদার রাষ্ট্রনৈতিক কথাটা রূঢ়। এবং বর্তমানে বাংলার সংবাদপত্রের যে ধারা তাহাতে অপ্রিয় সত্য চাপা দেওয়াই যুক্তিসঙ্গত। কিন্তু দেশ যে অধঃপাতে চলিয়াছে সে কথা বলিবার সময় কি তখন হইবে যখন বাঙালীর নাম, বাঙালীর যশ মান সবই চিতায় উঠিবে? আজ এই দেশে কোন নেতা আছেন যাঁহার দলে এই পেশাদার রাজনৈতিক ক্রমেই প্রবল হইতে প্রবলতর হইতেছে না? এই যে সেদিন মাত্র নূতন ব্যবস্থা-পরিষদের নির্বাচনে "কংগ্রেসের জয়" "জয় হিন্দ" ইত্যাদি স্বাধীনতা যুদ্ধের জয়ধ্বনিতে দেশ মুখরিত হইয়াছিল, সে শব্দ বাতাসে মিলাইতে-না-মিলাইতে নির্বাচিত ৮৭ জন কংগ্রেসপন্থীর মধ্যে বারোটি বিশ্বাসঘাতকের গুপ্ত চক্রান্তে বিপক্ষের হাতে "আপার হাউসের" একটি আসন চলিয়া গেল, ইহাতে দেশের রাষ্ট্রনীতির আবহাওয়া কিভাবে বদল হইতেছে তাহাও কি বলিবার সময় হয় নাই?

রাষ্ট্রতন্ত্র গঠন সভার কার্যক্রমের উপর বাংলার জাতীয়তাবাদের অস্তিত্ব নির্ভর করিতেছে একথা সর্বজনবিদিত। বাঙালী

সম্প্রতি স্বাধীন হিন্দুস্থান হইতে দশ বৎসরের জন্ত নির্বাসিত হইতেছে। তাহার দাসত্ব-রজ্জুর হাতবদল মাত্র হইবে বা ভবিষ্যতে তাহার আশা ভরসা কিছু থাকিবে তাহার নিষ্পত্তি হইবে ঐ রাষ্ট্রগঠন সভায় এবং সেখানে স্বাধীন হিন্দুস্থানের কোন কথা চলিবে না। লীগপন্থীগণ একথা বুঝেন সুতরাং তাঁহাদের তালিকায় তাঁহাদের অন্যতম নায়ক সুযোগ্য সহকারী লইয়া নামিতেছেন। ঐ দলের বিরুদ্ধে বাংলার কংগ্রেস নায়কগণ কি শক্তি লইয়া যাইতেছেন তাহার বিচারের কি কোনও প্রয়োজন ছিল না?

বাংলাদেশের রাজনৈতিক অধঃপতনের কারণ

বাঙালী আজ ঘরে ও বাহিরে সর্বত্র বিপর্যস্ত। অনশন, অর্ধাশন, বস্ত্রাভাব, ঔষধের অভাব, স্থানা- ভাব যেমন ঘরে বাঙালীর নিত্য সঙ্গী হইয়া উঠিয়াছে তেমনই বাংলার বাহিরে বাঙালীর ভাগ্যেও প্রতি পদে লাঞ্ছনা ও অপমান ললাটের লিখন হইয়া দাঁড়াইয়াছে। যে বাঙালী হিন্দু একদা ঘরে ও বাহিরে সকলের নমস্য ছিল, সেই বাঙালী আজ কোথাও বা করুণা মাত্র সম্বল করিয়া টিঁকিয়া রহিয়াছে, কোথাও বা চূড়ান্ত লাঞ্ছনায় ও অপমানে পর্যুদস্ত হইতেছে।

ইহার কারণ অনুসন্ধান করিতে বেশী পরিশ্রম করিতে হয় না। বাঙালীর এই সর্বনাশের একমাত্র কারণ দলাদলি। বাংলার সহিত ফ্রান্সের অবস্থা অনায়াসে তুলনা করা যাইতে পারে। যে ফ্রান্স একদা সাম্য, মৈত্রী ও স্বাধীনতার জন্মভূমি বলিয়া বিশ্ববাসীর পরম শ্রদ্ধা ও বিস্ময়ের পাত্র ছিল, সেই ফ্রান্সের কি শোচনীয় অধঃপতনই না গত কয়েক বৎসরের মধ্যে দেখা গিয়াছে। ইহারও একমাত্র কারণ দলাদলি। ফ্রান্সের স্তায় দুর্ধর্ষ ও শক্তিমান দেশ দলাদলির যে হলাহল পান করিয়া রসাতলের অতল-গহ্বরে ডুবিতে বসিয়াছে, সেই হলাহল বাঙালীকেও ধ্বংস করিবে ইহাতে বিস্ময়ের কারণ নাই। যে বিষ স্বাধীন ও দুর্জয় শক্তির অধিকারী ফ্রান্স গিলিতে পারে নাই, স্বাধীনতার দ্বারপ্রান্তে মাত্র উপনীত বাঙালী তাহা সহ্য করিতে পারিবে না ইহা সুনিশ্চিত। ফ্রান্সের দৃষ্টান্তে সতর্ক হইবার সময় বাঙালীদের এখনও আছে। সম্প্রতি মার্কিন দেশের "ওয়ার্ল্ড ডওতার প্রেসের" বুলেটিনে ফ্রান্স সম্বন্ধে যে মন্তব্য প্রকাশিত হইয়াছে তাহা নিয়ে প্রদত্ত হইল:

"গণতন্ত্র রাষ্ট্রবিধির চেয়েও অনেক বড়। ফ্রান্সে দল হিসাবে ভোট দেওয়ার যে রীতি গড়িয়া উঠিয়াছে তাহা গণতন্ত্রবিরোধী মারাত্মক পদ্ধতিগুলির মধ্যে অন্যতম। যুদ্ধের প্রথম বৎসরে দেখা গিয়াছে ফরাসী ব্যবস্থা-পরিষদে এই প্রথায় ভোটদানই নিয়ম হইয়া দাঁড়াইয়া গিয়াছিল। দলগুলি আলাদা-ভাবে নিজেদের সভা করিত, নিজেদের অধিকাংশের ভোটে সিদ্ধান্তে উপনীত হইত, তার পর ব্যবস্থা-পরিষদের অধিবেশনে ভোটদানের সময় এক-একটি দল হইতে এক জন করিয়া দলপতি গিয়া নিজের দলের হইয়া ভোট দিয়া আসিতেন। ফ্রান্সের বর্তমান গণ-পরিষদে ভোটাভুটির সময়েও এই প্রথারই অনুসরণ করা হইতেছে।

"এই পদ্ধতির বিপদ এই যে কোন বিষয়ে কাহারও কোন বিরুদ্ধ মত থাকিলে তাহার কণ্ঠ দলীয় কমিটির বৈঠকের বাহিরে আসিবার সুযোগ পায় না (Steam-roller tactics in Committee rooms), একদেশদর্শী সিদ্ধান্তে উপনীত হইবার সম্ভাবনাই বেশী থাকে এবং এই সিদ্ধান্ত পাল্টাইবার উপায় থাকে না, দলের মধ্যে যাহারা মেজরিটি তাহারা বিরুদ্ধবাদীর অভিমত যুক্তিসঙ্গত ও ন্যায়সঙ্গত হইলেও তাহা চাপিয়া দেয় এবং যে সব নেতার পিছনে মেজরিটি আছে তাহাদের হাতে এত অপরিমিত ক্ষমতা আসিয়া যায় যে পর্দার আড়ালে ইহারা যাহা খুশী করিতে পারে, ইচ্ছা করিলে বাজারের গোল-আলুর ন্যায় ভোট কেনাবেচা করিতেও ইহাদের বাধে না। প্রকৃত গণতন্ত্রে ভোট কখনও ক্রয়-বিক্রয়যোগ্য পণ্যদ্রব্যে পরিণত হইতে পারে না।"

কুক্ষণে দেশবন্ধু দাশ মহাশয় এ দেশে পাশ্চাত্য আদর্শে রাজনৈতিক দল গঠনে সম্মতি দিয়াছিলেন। ইহার বিষময় ফল তিনি নিজের জীবদ্দশায়ই অনুভব করিতে পারিয়াছিলেন, কিন্তু প্রতিকারের সময় পান নাই। তাঁহার আকস্মিক মৃত্যু এবং শেষজীবনের মনস্তাপের প্রধান কারণ দলাদলি ইহা সর্বজনবিদিত। দেশবন্ধুর মৃত্যুর পর এই দলাদলি বাঙালীর জাতীয় জীবনে সর্বস্তরে বিস্তৃত হইয়া রাজনীতি, সমাজনীতি ও শিক্ষাক্ষেত্রকে কলুষিত করিয়াছে। সৎস্বভাব ও দৃঢ়চেতা লোকের প্রবেশ উক্ত তিনটি ক্ষেত্রেই নিষিদ্ধ হইয়াছে। সততা, সচ্চরিত্রতা, কর্তব্যনিষ্ঠা, আদর্শানুরাগ প্রভৃতি যে সব গুণ একদা বাঙালীর ভূষণ ছিল, সে সব বিসর্জন দিয়া শুধু দলের প্রতি অনুরক্তি যে দিন হইতে রাজনীতি ক্ষেত্রে প্রাধান্ত লাভের একমাত্র মাপকাঠিরূপে পরিগণিত হইয়াছে, বাংলার ধ্বংসের পথ সেই দিনই খুলিয়া দেওয়া হইয়াছে। বাংলার রাজনৈতিক ক্ষেত্রে এই পাপ এত বেশী ঢুকিয়াছে যে কংগ্রেস ছাপ দেওয়া দলের কর্তৃত্বের ফলে কলিকাতা কর্পোরেশনের নাম দাঁড়াইয়াছে "কলিকাতা চোরপোরেশন", ওরফে Calcutta Corruption! দলাদলি অন্যত্রও আছে, কিন্তু কংগ্রেসের দলাদলি অধিকতর নিন্দনীয় এইজন্ত যে এই প্রতিষ্ঠান, বিশেষ ভাবে বাংলা কংগ্রেস, প্রকৃত দেশপ্রেমিক ও সর্বত্যাগী কর্মীদের বুকের বিন্দু বিন্দু রক্তের দ্বারা গড়িয়া উঠিয়াছে। ত্যাগের দোহাই দিয়া যাঁহারা কংগ্রেস দখল করিয়া উহাকে ব্যক্তিগত ও দলগত প্রতিপত্তি ও ক্ষমতা লাভের ক্ষেত্ররূপে তৈরি করিয়া লইতে চেষ্টিত তাঁহারা ত্যাগের মর্যাদা হানি করিতেছেন, ত্যাগকে পণ্যদ্রব্যে পরিণত করিয়া উহার চূড়ান্ত অবমাননা করিয়াছেন। ব্যবস্থা পরিষদে, ব্যবস্থাপক সভায় এবং গণ-পরিষদের প্রার্থী মনোনয়নে দেখা গিয়াছে দলগত স্বার্থরক্ষাই কংগ্রেস কর্তৃপক্ষের একমাত্র লক্ষ্য। জাতির কিসে ভাল হইবে, কোন্ কাজে কাহাকে নিয়োগ করিলে দশের মঙ্গল হইবে সেদিকে তাঁহাদের স্থির লক্ষ্য কোথায়?

রুদ্ধ কক্ষে গোপনে পরামর্শ করিয়া দলপতিরা যাহা স্থির করিয়া দিবেন, দলানুগতদের তাহাই নতমস্তকে পালন করি-

বার কথা, কিন্তু তাহাও সব সময়ে হয় নাই। লোভে পড়িয়া কংগ্রেসের নির্দেশ অমান্য করিবার মত বার জন বিশ্বাসঘাতক বঙ্গীয় ব্যবস্থা-পরিষদের ৮৭ জন কংগ্রেস সদস্যের মধ্যে ইতিমধ্যেই জুটিয়াছে। দলের স্বার্থ যেখানে দেশের স্বার্থের উর্দ্ধে স্থান লাভ করে, ব্যক্তিগত আনুগত্য যেখানে দলানুরক্তির একমাত্র নির্দেশরূপে গ্রাহ্য হয়, সেখানে ইহা ঘটিবেই। কেননা স্বার্থ ও লাভের চেষ্টা দলগত হইতে ব্যক্তিগতে পরিণত হইতে দেরী লাগে না। নেতার আদর্শ সম্পূর্ণ নিষ্কাম ও তাঁহার আত্মনিয়োগ যথার্থ ভাবে অনাসক্ত না হইলে তাঁহার দলে শঠ ও খলের প্রবেশ অনিবার্য।

অস্থায়ী কেন্দ্রীয় গবর্ন্মেণ্ট গঠনে কংগ্রেসের আপত্তির কারণ

মন্ত্রিমিশন ও বড়লাট ১৬ই জুন তারিখে অস্থায়ী কেন্দ্রীয় গবর্ন্মেণ্ট গঠনের যে প্রস্তাব করিয়াছিলেন কংগ্রেস তাহা কেন প্রত্যাখ্যান করিয়াছে তাহার কারণ বিবৃত করিয়া মৌলানা আজাদ বড়লাটকে একটি দীর্ঘ পত্র প্রেরণ করেন। পত্রখানিতে এ সম্পর্কে কংগ্রেসের সমস্ত যুক্তি সন্নিবেশিত হইয়াছে বলিয়া উহার গুরুত্ব অসামান্য। সম্পূর্ণ পত্রটি নিয়ে দেওয়া হইল।

প্রিয় লর্ড ওয়াভেল,

আপনার ১৬ই তারিখের বিবৃতি পাইবার পর আমার কমিটি এই বিবৃতি সম্পর্কে আলোচনা করিয়াই এবং আপনার প্রস্তাব সম্পর্কে ও অস্থায়ী গবর্ন্মেণ্ট গঠনের জন্য আপনি বিভিন্ন সদস্যদের নিকট যে আমন্ত্রণ পাঠাইয়াছেন তৎসম্পর্কে কমিটি বিশেষভাবে চিন্তা করিয়া দেখিয়াছে। বিভিন্ন দিক হইতে আপনার মতামত আমরা বিচার করিয়া দেখিয়াছি। আলোচনা কালে আমরা আমাদের অসুবিধাগুলি আপনার নিকট উপস্থিত করিয়াছি। দুঃখের বিষয় হইতেছে এই যে, সাম্প্রতিক পত্রালাপের ফলে এই অসুবিধাগুলি আরও জটিল হইয়া উঠিয়াছে। আপনি নিশ্চয়ই জানেন যে, কংগ্রেস একটি জাতীয় প্রতিষ্ঠান এবং ভারতের সমস্ত সম্প্রদায় ও ধর্মের লোক ইহার ভিতরে আছে। ভারতের স্বাধীনতা অর্জনের জন্য এই কংগ্রেস অর্দ্ধশতাব্দীর অধিককাল ধরিয়া সংগ্রাম করিয়া আসিতেছে। জাতীয় স্বাধীনতা অর্জনের উদগ্র আকাঙ্ক্ষাই ভারতের বিভিন্ন দল ও সম্প্রদায়কে একত্র করিতে সমর্থ হইয়াছে। এই দিকে দৃষ্টি রাখিয়াই আমাদিগকে প্রত্যেক প্রস্তাব সম্পর্কে বিবেচনা করিতে হইবে। আমরা আশা করিয়াছিলাম যে অস্থায়ী গবর্ন্মেণ্ট গঠিত হইলে আমরা স্বাধীনতা লাভ করিতে পারিব। অবিলম্বে স্বাধীনতা প্রবর্ত্তন করিয়া আইনগত পরিবর্ত্তন সাধনের জন্য আমরা বিশেষ চাপ দিই নাই। আপনার অসুবিধাগুলি উপলব্ধি করিয়াই আমরা উহা করিয়াছি। স্বাধীনতা যাহাতে আসে তজ্জন্য শাসনব্যবস্থায় আমরা কিছু পরিবর্ত্তন আশা করিয়াছিলাম। এই দিক হইতে অস্থায়ী গবর্ন্মেণ্টের ক্ষমতা সম্পর্কিত বিষয়টি খুবই গুরুত্বপূর্ণ। আমাদের ধারণা ছিল যে উহা বড়লাটের শাসন-পরিষদ হইতে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র ধরণের হইবে। আপনার ৩০শে মে তারিখের পত্রে আপনি এ সম্পর্কে আমাদিগকে কতকগুলি আশ্বাস দিয়াছিলেন। কিন্তু আমরা চিন্তা করিয়া দেখিলাম যে আপনি অধিক দূর অগ্রসর হন নাই। তবে আপনার বন্ধুত্বপূর্ণ মনোভাবের কথা বিবেচনা করিয়া আপনার প্রদত্ত আশ্বাসগুলি আমরা মানিয়া লই এবং উপরোক্ত বিশেষ বিষয়টির জন্য আমরা আর অধিক চাপ না দেওয়াই স্থির করি।

অস্থায়ী গবর্ন্মেণ্ট গঠন সম্পর্কিত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের মীমাংসা এখনও হয় নাই। এই সম্পর্কে আমরা বিশেষ জোরের সহিতই ইহা বলিতে চাই যে সাময়িক ব্যবস্থা হিসাবেও আমরা 'সংখ্যাসাম্যে'র প্রস্তাব মানিয়া লইতে পারি না। আমাদের বক্তব্য হইতেছে এই যে, দেশের শাসনকার্য যাহাতে সুষ্ঠুভাবে পরিচালিত হয় এবং সংখ্যালঘু সম্প্রদায়গুলির প্রতিনিধিগণও যাহাতে ইহার ভিতরে থাকেন তজ্জন্য ১৫ জন সদস্য লইয়া অস্থায়ী গবর্ন্মেণ্ট গঠন করিতে হইবে। সদস্যদের নাম সম্পর্কে আমরা আমাদের মতামত ঘরোয়াভাবে আপনাকে জানাই। আপনার ১৬ই তারিখের তালিকায় আমরা এক ব্যক্তির নাম দেখিতেছি যিনি সরকারী কার্যে নিযুক্ত। জনকল্যাণকর কার্যের সহিত তাঁহার কোন সম্পর্ক ছিল না বলিয়াই আমরা জানি। ব্যক্তিগতভাবে তাঁহার নামে আমাদের কোন আপত্তি নাই। তবে তাঁহার নাম তালিকাভুক্ত করার পূর্বে আমাদের সহিত পরামর্শ করা উচিত ছিল। অপর এক ব্যক্তির নাম বাদ দিয়া বিবৃতিতে আপনি যে সমস্ত নাম উল্লেখ করিয়াছিলেন তাহাতে আমরা আশ্চর্যান্বিত হই। কংগ্রেস যে নামের তালিকা প্রস্তুত করিয়াছিল তাহারও কিছু পরিবর্ত্তন করা হয়। আপনি যে ভাবে নামের তালিকা প্রস্তুত করিয়াছেন তাহাতে আমাদের মনে হয় যে আপনি ভ্রান্ত পথেই সমস্যা সমাধানের চেষ্টা করিতেছেন। আমাদের একজন সহকর্মীর নামই সেখানে দেওয়া হইয়াছে। অবশ্য আপনি বলিয়াছেন যে উহার সংশোধন করা হইবে। কাজেই এ সম্পর্কে আমরা অধিক কিছু বলিতে চাই না।

আপনার তালিকার একটি প্রধান বৈশিষ্ট্য হইল এই যে, উহাতে কোন জাতীয়তাবাদী মুসলমানের নাম নাই। জাতীয়তাবাদী মুসলমানের নাম বাদ দেওয়া অত্যন্ত অসঙ্গত হইয়াছে বলিয়া আমরা মনে করি। আপনার তালিকা হইতে কংগ্রেসী দলভুক্ত এক জনের নাম বাদ দিয়া তাহার পরিবর্তে আমরা এক জন মুসলমানের নাম দাখিল করিতে চাহিয়াছিলাম। আমরা মনে করিয়াছিলাম যে, নিজেদের দলের এক জনের নাম পরিবর্ত্তন করিয়া সেস্থলে অপর এক জনকে নিয়োগ করাতে কাহারও আপত্তির কারণ থাকিতে পারে না। মুসলিম লীগের মনোনীত ব্যক্তিদের তালিকার অন্তর্ভুক্ত এক ব্যক্তি যে সীমান্ত প্রদেশের নির্বাচনে পরাজিত হইয়াছেন এবং শুধু

রাজনৈতিক কারণেই তাঁহার নাম তালিকাভুক্ত করা হইয়াছে বলিয়া আপনার দৃষ্টি আকর্ষণ করিলে আপনি নিজেই আমাকে লিখিয়াছিলেন, "যেমন অন্ত দলের আপত্তি মানিতে পারি না তেমন মুসলিম লীগকর্তৃক প্রেরিত নামের তালিকা সম্পর্কে কংগ্রেসের আপত্তি করিবার অধিকারও আমি মানিয়া লইতে পারি না। এক্ষেত্রে শুধু যোগ্যতাই বিচার করা হইবে।" কিন্তু আমরা কোন প্রস্তাব দিবার পূর্বেই আপনার ২২শে জুন তারিখের পত্র পাইয়া বিশেষ আশ্চর্য বোধ করিলাম। আপনি সংবাদপত্রের কয়েকটি বিবরণের ভিত্তিতে ঐ পত্র লিখিয়াছিলেন। কংগ্রেসী প্রতিনিধিদের মধ্যে অস্থায়ী সরকারে কংগ্রেস-মনোনীত কোন মুসলমানের নাম গ্রহণের অনুরোধ রক্ষা করিতে আপনার ও মন্ত্রী-মিশনের অসম্মতির কথা আপনি আমাদের জানাইয়াছিলেন। এই সিদ্ধান্ত আমাদের নিকট অদ্ভুত ঠেকিয়াছিল, ইহা আপনাদের উপরি-উক্ত উক্তির সম্পূর্ণ বিপরীত। একথা হইতে ইহাই সাব্যস্ত হইল যে, ইচ্ছামত নিজ প্রতিনিধি মনোনয়নের স্বাধীনতাও কংগ্রেসের নাই। ইহাকে নজীর হিসাবে ব্যবহার করা চলিবে না বলাতেও বিশেষ কিছু তফাৎ হইল না। যে কোন স্থলে, যে কোন সময় এবং যে অবস্থায় এরূপ মৌলিক আদর্শ হইতে সাময়িক বিচ্যুতিও আমরা মানিয়া লইতে পারি না।

মিঃ জিন্না তাঁহার ১৯শে জুন তারিখের পত্রে যে সকল প্রশ্ন তুলিয়াছেন ও আপনারা তাহার যে উত্তর দিয়াছেন তাহা আপনাদের ৩১শে জুন তারিখের পত্রে আমাদের জানাইয়াছেন। আমরা মিঃ জিন্নার চিঠি দেখি নাই। তিন নং প্রশ্নে তপশীলী জাতি, শিখ, দেশীয় খ্রীষ্টান ও পার্শী—এই চারটি সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের প্রতিনিধি গ্রহণের কথা উল্লেখ করিয়া জিজ্ঞাসা করা হইয়াছে যে, এই সকল জাতির সদস্যপদ খালি হইলে কাহারা তাহা পূরণ করিবে এবং সে সময় মুসলিম লীগের নেতার পরামর্শ ও অনুমোদন গ্রহণ করা হইবে কি না।

তাহার উত্তরে আপনি বলিয়াছেন, "আপাতত সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের প্রতিনিধিদের যে সকল আসন দেওয়া হইয়াছে তাহার কোনটি খালি হইলে শূন্য পদ পূরণের পূর্বে আমি স্বভাবতই প্রধান দুইটি দলের পরামর্শ গ্রহণ করিব।" সুতরাং দেখা যাইতেছে যে, মিঃ জিন্না তপশীলী জাতিসমূহকে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত বলিয়া মানিয়া লইয়াছেন এবং আপনিও এ বিষয় তাঁহার সহিত একমত বলিয়াই মনে হয়। আমাদের তরফ হইতে এই মতের বিরোধিতা করিয়া জানাইয়া দিতেছি যে, তপশীলী সম্প্রদায়কে হিন্দু সমাজের অচ্ছেদ্য অঙ্গ হিসাবেই আমরা গণ্য করিয়া থাকি। আপনার ১৫ই জুন তারিখের পত্রে আপনিও তপশীলী সম্প্রদায়কে হিন্দু হিসাবেই গণ্য করিয়াছিলেন।

আপনার প্রস্তাবে আপনি বলিয়াছেন যে, হিন্দু-মুসলমান বা কংগ্রেস-লীগের মধ্যে কোনরূপ সংখ্যা-সাম্যের ব্যবস্থা নাই। কারণ কংগ্রেসকে হিন্দুদের জন্য ছয়টি ও লীগকে মুসলমানদের জন্য পাঁচটি আসন দেওয়া হইয়াছে। হিন্দুদের ছয়টি আসনের মধ্যে একটি তপশীলীদের জন্য। আমরা এমন কোন সংখ্যালঘু সাম্প্রদায়িক দলের সহিত কোনমতেই একমত হইতে পারি না, যে দল কংগ্রেসের অন্তর্ভুক্ত তপশীলী হিন্দু বা অন্য কোন সংখ্যালঘু দলের প্রতিনিধি মনোনয়নের ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করে।

চতুর্থ প্রশ্নে তপশীলী সম্প্রদায়কে সংখ্যালঘু সম্প্রদায় বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে এবং প্রস্তাবে উল্লিখিত বিভিন্ন সম্প্রদায়ের সংখ্যানুপাত গবর্ন্মেণ্টে বজায় থাকিবে কি না, তাহা জিজ্ঞাসা করা হইয়াছে। আপনি উত্তরে বলেন যে, প্রধান দল দুইটির সম্মতি ব্যতীত সংখ্যালঘুপাতের পরিবর্তন হইবে না। এখানেও একটি সম্প্রদায়কে কোনপ্রকার সম্পর্ক না থাকিলেও অন্য সম্প্রদায়ের পরিবর্তনাদির ব্যাপারে ভেটো দিবার ক্ষমতা দেওয়া হইয়াছে। যদি সুযোগ ও সুবিধা আসে তাহা হইলে আমরা অন্য একটি সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের প্রতিনিধিও গ্রহণ করিতে পারি। উদাহরণ-স্বরূপ এ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান সম্প্রদায়ের কথা বলা যাইতে পারে। মুসলীম লীগের সম্মতির উপর ঐ সকল ব্যাপার নির্ভর করে। আমরা ইহাতে সম্মত হইতে পারি না। আমরা ইহাও বলিতে চাই যে, আপনি যে উত্তর দিয়াছেন, তাহাদ্বারা বর্ণহিন্দুর প্রতিনিধি-সংখ্যাও সীমাবদ্ধ হইয়াছে এবং উহার ফলে হিন্দুর প্রতিনিধি-সংখ্যা লীগের সমান হইয়া পড়িতেছে।

পঞ্চম প্রশ্নের উত্তরে আপনি বলিয়াছেন, "প্রধান দুইটি দলের মধ্যে কোন একটি দলের অধিকাংশ সদস্য যদি বিরোধিতা করেন, তাহা হইলে সাময়িক গবর্ন্মেণ্ট কোন বড় রকমের সাম্প্রদায়িক সমস্যা সম্বন্ধে কোন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিতে পারিবেন না। আপনি আরও বলিয়াছেন যে, আপনি কংগ্রেস সভাপতির নিকট ঐ বিষয় উল্লেখ করেন এবং তিনি বলেন যে, কংগ্রেস উহা সমর্থন করেন। এই সম্পর্কে আমি বলিতে চাই যে, ভারতীয় আইন সভায় স্থায়ী রাষ্ট্রীয় পরিকল্পনা সম্পর্কে আমরা ঐ নীতি গ্রহণ করিয়াছিলাম। বড় বড় সম্প্রদায়গুলির জনসংখ্যার ভিত্তিতে প্রতিনিধি গ্রহণ করিয়া গঠিত সাময়িক গবর্ন্মেণ্ট যদি আইন সভার নিকট দায়ী থাকেন, তাহা হইলে উহা সহজেই প্রযুক্ত হইতে পারে। অন্য কোন ভিত্তিতে যদি সাময়িক গবর্ন্মেণ্ট গঠিত হয় তাহা হইলে ঐ নীতি প্রয়োগ করা যাইবে না। ১৩ই জুন তারিখে আমি যে পত্র দিয়াছিলাম তাহাতে বলা হইয়াছিল যে, উহার ফলে শাসনকার্য্য পরিচালন অসম্ভব হইয়া পড়িবে এবং অচল অবস্থার সৃষ্টি অবশ্যম্ভাবী। মিঃ জিন্না তাঁহার পত্রে লিখিয়াছিলেন—"সদস্যসংখ্যা ১২ জনের পরিবর্তে ১৪ জন করা হইয়াছে।" অতএব অধিকাংশ মুসলমান সদস্য বিরোধিতা করিলে বড় রকমের কোন সাম্প্র-

দায়িক ব্যাপারে কোন প্রকার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা চলিবে না। তাহা হইলে দেখা যাইতেছে যে, সদস্তসংখ্যা ১২ জনের পরিবর্ত্তে ১৪ জন করার পর এই সমস্তার উদ্ভব হয় অর্থাৎ ১৬ই জুন আপনি যে বিবৃতি দেন তাহার পরই উহার সৃষ্টি হয়। এই বিবৃতিতে ঐ নিয়মের কোন উল্লেখ ছিল না। আমাদের সম্মতি না লইয়াই এই গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্ত্তন সাধন করা হইয়াছে, ইহার ফলে মুসলিম লীগ সাময়িক গবর্ন্মেণ্টে ভেটো দিবার অথবা কোন একটা কার্য্যে বাধা প্রদান করিবার ক্ষমতা পাইয়াছে।

১৬ই জুন তারিখে আপনি যে প্রস্তাব করিয়াছিলেন, তৎ-সম্বন্ধে এবং মিঃ জিন্নার প্রশ্নের উত্তরে আপনি যাহা বলিয়াছেন সেই বিষয়ে আমাদের যে আপত্তি আছে, তাহা উপরে উল্লেখ করা হইল। এই সকল ত্রুটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এবং উহার জন্ত সাময়িক গবর্ন্মেণ্টের কার্য্য পরিচালন কঠিন হইয়া পড়িবে এবং উহার ফলে অচল অবস্থার সৃষ্টি অবশ্যম্ভাবী। বর্ত্তমান পরি-স্থিতিতে অবিলম্বে যে সকল জিনিষের প্রয়োজন আপনার প্রস্তাব তাহা মিটাইতে পারে না এবং যে আদর্শ আমাদের নিকট অতি প্রিয় আপনার প্রস্তাবে সেই আদর্শও পূর্ণ হইবে না। সেইজন্ত কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটি ১৯৪৬ সালের ১৬ই জুন তারিখে আপনার বিবৃতিতে প্রস্তাবিত সাময়িক গবর্ন্মেণ্ট গঠনে আপনাকে সাহায্য করিতে সমর্থ হইতে পারিবেন না বলিয়া সিদ্ধান্ত করিয়াছেন।

১৯৪৬ সালের ১৬ই মে তারিখে প্রকাশিত বিবৃতিতে শাসনতন্ত্র-রচনাকারী পরিষদ গঠন সম্পর্কে যে প্রস্তাব করা হয় তৎসম্পর্কে কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটি ২৪শে মে একটি প্রস্তাব গ্রহণ করেন। ঐ বিষয়ে আপনার সহিত এবং মন্ত্রী-মিশনের সহিত আলোচনা ও পত্রালাপ করিয়াছি। আমার কয়েকজন সহকর্ম্মীও ঐ ব্যাপারে আপনাদের সহিত আলোচনা ও পত্রা-লাপ করেন। ঐ সকল আলোচনা ও পত্রে, প্রস্তাবে যে সকল ত্রুটি আছে আমরা তাহার উল্লেখ করিয়াছিলাম। বিবৃতির কয়েকটি বিষয়ে আমরা আমাদের অভিমতও জ্ঞাপন করিয়া-ছিলাম। আমাদের মতে দৃঢ়সঙ্কল্প থাকিয়াও আমরা আপনার প্রস্তাব গ্রহণ করিতেছি এবং আমাদের উদ্দেশ্য সাধনের জন্ত আমরা তদনুযায়ী কাজ করিতে প্রস্তুত আছি। আমরা ইহা বলিতে চাই যে, ভালভাবে সাময়িক গবর্ন্মেণ্ট গঠনের উপরই সাফল্যজনকভাবে গণপরিষদের কার্য্য পরিচালন নির্ভর করিতেছে।

বশংবদ

(স্বাঃ) এ কে আজাদ

নিখিল-ভারত রাষ্ট্রীয় সমিতির বোম্বাই অধিবেশন

কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটি অনেক বিচার বিবেচনার পর মন্ত্রী-মিশনের ১৬ই মে তারিখের প্রস্তাব গ্রহণ ও বড়লাটের ১৬ই জুন তারিখের প্রস্তাব বর্জন করিয়াছেন। বোম্বাইয়ে নিখিল-ভারত রাষ্ট্রীয় সমিতির অধিবেশনে বিপুল ভোটাধিক্যে ওয়ার্কিং কমিটির এই সিদ্ধান্ত সমর্থিত হইয়াছে। মৌলানা আজাদ প্রস্তাবটি উত্থাপন করেন এবং সর্দার বল্লভভাই প্যাটেল উহা সমর্থন করেন। মৌলানা আজাদ বলেন যে কংগ্রেস এতকাল এই দাবি করিয়া আসিতেছিল যে ভারতবাসীর হাতে ভারতবর্ষের শাসনতন্ত্র প্রণয়নের ক্ষমতা ছাড়িয়া দিতে হইবে। ব্রিটিশ গবর্ন্মেণ্ট বহু বৎসর ধরিয়া এই দাবি অস্বীকার করিয়া আসিয়াছে। আজ তাহারা চাপে পড়িয়াই ভারতবাসীর এই দাবি স্বীকার করিতে বাধ্য হইয়াছে, স্বেচ্ছায় নয়। দেশ এতদিন যাহা চাহিয়াছিল তাহাই পাইয়াছে সুতরাং গণপরিষদে যোগদানে অসম্মতি জ্ঞাপন করিলে এই দাবির কোন অর্থই থাকে না। মন্ত্রীদের ঘোষণায় ভারত বিভাগের প্রশ্নের চূড়ান্ত মীমাংসা হইয়া গিয়াছে। এই ঘোষণায় পরিষ্কার ভাষায় বলা হইয়াছে যে ভারতবর্ষ বিভক্ত হইবে না, এক যুক্তরাষ্ট্রের অধীনে অবিভক্ত থাকিবে। পণ্ডিত নেহেরু তাঁহার বক্তৃতায় বলেন, "আমরা স্বাধীনতার দ্বারে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছি। আর এক পদ অগ্রসর হইলেই আমরা আমাদের লক্ষ্যে পৌঁছিতে পারিব।" গান্ধীজী অধিবেশনের দ্বিতীয় দিনে এক বক্তৃতায় বলেন, "দীর্ঘকাল ধরিয়া আমরা সংগ্রাম করিয়া আসিতেছি। আজ গণপরিষদের দোষত্রুটি দেখিয়া ভীত হইব কেন? আমরা যদি দেখিতে পাই যে গণপরিষদের দোষত্রুটি দূর করা সম্ভব হইবে না তখন আমরা ইহার বিরুদ্ধেও সংগ্রাম করিব।" দ্বিতীয় দিবসের বক্তৃতার শেষে বিতর্কের উত্তর দান সমাপ্ত করিয়া আবেগভরে মৌলানা আজাদ বলেন, "বিজয়লক্ষ্মী আমাদের গৃহদ্বারে সমুপস্থিতা, তাঁহাকে বরণ করিয়া গৃহে স্থাপন করুন, অবহেলায় তাঁহাকে যেন ফিরাইয়া না দেন।"

ব্রিটিশ গবর্ন্মেণ্ট দয়ার দান হিসাবে ভারতবাসীকে গণ-পরিষদ গঠনের অনুমতি দিয়াছেন এ কথা মনে করা ভুল। কংগ্রেসের গত ষাট বৎসরের সংগঠন ও আত্ম-ত্যাগের ফলে আমরা গণ-পরিষদ পাইয়াছি। ব্রিটিশ জনসাধারণ ও বৃটিশ মন্ত্রীসভা এতদিনে বুঝিয়াছেন যে ভারত-বাসী স্বাধীনতা লাভের জন্ত বদ্ধপরিকর এবং এই দৃঢ়-প্রতিজ্ঞা হইতে ভারতবাসীকে বিচ্যুত করিবার শক্তি কাহারও নাই। ব্রিটিশ গবর্ন্মেণ্টের সম্মুখে আজ মাত্র দুইটি পথ আছে—হয় তাঁহাদিগকে শান্তিপূর্ণ ভাবে ক্ষমতা হস্তান্তর করিয়া সসম্মানে ভারত ত্যাগ করিতে হইবে, নতুবা আবার এক ভয়াবহ বিপ্লব ডাকিয়া আনিয়া অনাবশ্যক রক্ত-ক্ষয়ের পর অসম্মানে পদাঘাতে বিতাড়িত হইতে হইবে। পার্লা-মেণ্টারি ডেলিগেশনের সদস্তেরা ভারতে আসিয়া ইহাই বুঝিয়া গিয়াছেন এবং দেশে ফিরিয়া স্বদেশবাসীদের ঠিক এই কথাই শুনাইয়াছিলেন। ব্রিটিশ গবর্ন্মেণ্টও ইহা উপলব্ধি করিয়াই

মন্ত্রীত্রয়কে চূড়ান্ত মীমাংসা করিবার ভার দিয়াই ভারতবর্ষে পাঠাইয়াছিলেন। প্রথম পন্থা বাছিয়া লইয়া ব্রিটেন যে দূরদর্শিতার পরিচয় দিয়াছে ভারতবাসী তাহার অমর্যাদা করিতে পারে না।

গণপরিষদ আহ্বানের সময় তাহার ক্ষমতা নির্দেশ করিয়া দেওয়া সত্ত্বেও গণ-পরিষদের সার্বভৌম অধিকার লাভের দৃষ্টান্ত বিরল নয়। ফ্রান্সের ষ্টেটস্ জেনারেল আহ্বানের সময় ষোড়শ লুই উহার ক্ষমতা নানাদিক দিয়াই সীমাবদ্ধ করিয়া দিয়াছিলেন। বাঁধাবাঁধা ক্ষমতা অতিক্রম করিতে গণ-প্রতিনিধিদের উদ্যোগী হইতে দেখিয়া রাজা তাঁহাদের সতর্ক করিবার জন্য লোকও পাঠাইয়াছিলেন। গণনায়ক মিরাবো সেই রাজদূতকে বলিয়াছিলেন, "যাও তোমার প্রভুকে গিয়া বল আমরা গণ-প্রতিনিধিরূপে এখানে সমবেত হইয়াছি, বল-প্রয়োগ ভিন্ন আমাদের সরান যাইবে না।" এই গণ-পরিষদ কি ভাবে স্বাধীন ফ্রান্সের সার্বভৌম রাষ্ট্রবিধি রচনা করিয়াছিল তাহা পৃথিবীর ইতিহাসে স্বর্ণাক্ষরে লেখা আছে।

আমাদের গণ-পরিষদ সম্বন্ধে মৌলানা আজাদ এবং পণ্ডিত নেহেরু উভয়েই বলিয়াছেন যে উহাকে সার্বভৌম পরিষদে পরিণত করিবার চাবিকাঠি আমাদেরই হাতে আছে। ভারতবাসীর আত্মমর্য্যাদা-বিরোধী কোন বাধা উপস্থিত হইলে কংগ্রেস গণ-পরিষদ ভাঙ্গিয়া দিতে মুহূর্তের জন্যও দ্বিধা করিবে না মৌলনা আজাদ রাষ্ট্রীয় সমিতির অধিবেশনেই তাহা জানাইয়া দিয়াছেন। পণ্ডিত নেহেরু পরে এক সাংবাদিক সম্মেলনে বলিয়াছেন যে গণ-পরিষদের সার্বভৌম ক্ষমতা মন্ত্রী-মিশনও স্বীকার করিয়া লইয়াছেন তবে তাঁহাদের দুইটি সর্ত আছে—প্রথম মাইনরিটি সমস্যার সমাধান করিতে হইবে, দ্বিতীয় ব্রিটেনের সহিত ভারতের একটি চুক্তি সম্পাদন করিতে হইবে। পণ্ডিতজী ঐ সঙ্গেই বলিয়া দিয়াছেন যে এই দুই সর্ত পূরণের নামে আমাদের উপর কোনরূপ জোর খাটানো চলিবে না। মাইনরিটি সমস্যার সমাধান যাহাতে সন্তোষজনক হয় তাহার ব্যবস্থা আমরাই করিতে পারিব এবং করিব।

গণ-পরিষদে ভারতবর্ষের যে সব প্রতিনিধি যোগদান করিতে যাইতেছেন তাঁহাদিগকে কাহারও নিকট আনুগত্যের শপথ লইতে হইবে না, স্বাধীন ভারতের জন্য যে শাসনতন্ত্র তাঁহারা রচনা করিবেন ব্রিটেন তাহাই মানিয়া লইবে। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত থাকা অথবা উহার বাহিরে যাওয়ার চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গণ-পরিষদই গ্রহণ করিবে। ভারতীয় গণ-পরিষদকে আমেরিকা বা ফ্রান্সের গণ-পরিষদের চেয়ে কম ক্ষমতাসম্পন্ন মনে করিবার কোন কারণ নাই।

মিঃ জিন্নার জয়-পরাজয়ের হিসাব

মন্ত্রী-মিশনের ভারতে আগমনের পর মিঃ জিন্না মুসলিম লীগকে যে পথে পরিচালিত করিয়াছেন তাহার মধ্যে কেহ কেহ রাজনৈতিক বিজ্ঞতার পরিচয় পাইয়াছেন। সকলে তাহা পান নাই। মিঃ জিন্নার রাজনীতির মূল কথা এই যে, যে সময়ে কংগ্রেসকর্মীরা চরম স্বার্থত্যাগ করিয়া রাজনৈতিক ক্ষমতা অর্জনের চেষ্টা করে তাঁহার দল সে সময়ে বিদেশীর আজ্ঞাবহ হইয়া পুরস্কার লাভ করুক। স্বাধীনতা যুদ্ধে ইংরেজের সহিত কংগ্রেসের বোঝাপড়ার কথা যখনই উঠিবে তিনি তখনই আগাইয়া আসিয়া মুসলমান স্বার্থরক্ষার দোহাই পাড়িয়া কংগ্রেসের অর্জিত অধিকারের বখরা দাবি করিবেন। ব্রিটেনের রক্ষণশীল দলের হাতে যত দিন ক্ষমতা ছিল তত দিন তাঁহারা মাইনরিটি স্বার্থরক্ষার অজুহাতে মিঃ জিন্নার এই অন্যায় দাবি সমর্থন করিয়া ভারতবর্ষের রাজনৈতিক প্রগতিতে বাধা দিয়া আসিয়াছেন। বিলাতের শ্রমিকদল এই চার্চিলী নীতির প্রতিবাদ সর্বদাই করিয়াছে। নিজেদের হাতে ক্ষমতা আসিবার পর মিঃ এটলী ঘোষণা করেন যে মাইনরিটিকে আর কখনও দেশের প্রগতির পথ রোধ করিয়া দাঁড়াইয়া থাকিবার ক্ষমতা দেওয়া হইবে না। শ্রমিক মন্ত্রীত্রয় ভারতবর্ষে আসিয়া প্রথমেই পাকিস্থানের দাবিকে অযৌক্তিক, অবাস্তব ও অসম্ভব বলিয়া সরাসরি প্রত্যাখ্যান করিয়াছেন। তার পর মিঃ জিন্না মুখরক্ষার জন্য প্যারিটির দাবি তুলিলে তাহাও তাঁহারা অগ্রাহ্য করেন। লর্ড ওয়াভেল সিভিল সার্ভিস ও ইংরেজ বণিকদের পরামর্শে অস্থায়ী কেন্দ্রীয় গবর্মেণ্ট গঠনে লীগ-তোষণের চেষ্টা করিয়াছিলেন এবং তাঁহার পত্রাবলীতে যে সব তথ্য প্রকাশিত হইয়াছে তদতিরিক্ত কোন মৌখিক প্রতিশ্রুতি সম্ভবত মিঃ জিন্নাকে দিয়াছিলেন ইহাও সম্পূর্ণ অসম্ভব নহে। ১৬ই জুনের ঘোষণার অষ্টম ধারায় বলা হইয়াছিল যে বড়লাট অস্থায়ী গবর্মেণ্ট গঠনের যে প্রস্তাব করিয়াছেন কোন দল তাহা অগ্রাহ্য করিলে যাঁহারা উহা গ্রহণ করিবেন তাঁহাদের লইয়া অস্থায়ী গবর্মেণ্ট গঠিত হইবে। অস্থায়ী গবর্মেণ্টে যোগদানের আমন্ত্রণ কংগ্রেস প্রত্যাখ্যান করে, কিন্তু লীগ গ্রহণ করে। এই সঙ্কটে পড়িয়া মন্ত্রী-মিশন ১৬ই জুনের প্রস্তাবের উক্ত ধারার এক ব্যাখ্যা করিয়া অস্থায়ী গবর্মেণ্ট গঠনের প্রস্তাব বাতিল করিয়া দেন। ইহার পর মিঃ জিন্না ও লর্ড ওয়াভেলের মধ্যে যে বাগ্‌যুদ্ধ হয় তাহাতে সন্দেহ হয় চার্চিল-দলের লোক, লর্ড ওয়াভেল, সিভিল সার্ভিস ও ইংরেজ বণিকেরা একযোগে লীগের হাতে রাজনৈতিক ক্ষমতা তুলিয়া দিয়া কংগ্রেসকে ধ্বংস করিবার চেষ্টা করিতে গিয়াছিলেন, কিন্তু শ্রমিক দলভুক্ত মন্ত্রীরা এই ফাঁদে পা দিতে অস্বীকার করায় এই চাল ব্যর্থ হইয়াছে। ভারতবর্ষের ইংরেজ পরিচালিত সংবাদপত্রগুলির গত কয়েক মাসের সম্পাদকীয় মন্তব্যে লীগকে সর্বতোভাবে সমর্থনের চেষ্টা এবং লীগের সর্ববিধ সংবাদ প্রকাশের ভঙ্গী লক্ষ্য করিলে এই বিশ্বাসই সমর্থিত হয়।

মিঃ জিন্নার রাজনীতি সম্বন্ধে মুসলমান সমাজের ধারণা কিরূপ দাঁড়াইতেছে তাহারও কিছু কিছু পরিচয় মিলিতে

আরম্ভ করিয়াছে। বর্তমানে হায়দারাবাদ রাজ্যকেই ভারতবর্ষের একমাত্র পাকিস্থান বলা যাইতে পারে। প্রজাদের দশ ভাগের নয় ভাগ হিন্দু হইলেও সেখানে মুসলমানদের অপ্রতিহত প্রতাপ, নবাব মুসলমান, প্রধান মন্ত্রীও মুসলমান—উভয়েই লীগের বড় সমর্থক। ব্যবস্থা-পরিষদের অর্ধেক সদস্য মুসলমান এবং রাষ্ট্র ভাষা উর্দু। হায়দরাবাদের নূতন ব্যবস্থা-পরিষদের উদ্বোধনের জন্য মিঃ জিন্না আমন্ত্রিত হইয়াছেন। এ হেন রাজ্যের বিখ্যাত একটি উর্দু সংবাদপত্র "পায়াম" মিঃ জিন্না সম্বন্ধে যাহা লিখিয়াছে তাহার তর্জমা "নবযুগে" প্রকাশিত হইয়াছে। উহা এই :

> আমরা যেরূপ সংবাদ পাইয়াছি, তাহা যদি সত্য হয়, তাহা হইলে ইহা নিঃসন্দেহে বলা যাইতে পারে যে, লীগ কাউন্সিল কর্তৃক অস্থায়ী গবর্মেণ্ট গ্রহণে মিঃ জিন্নার সম্মতি ছিল না। কিন্তু তিনি যখন দেখিলেন যে, অধিকাংশ সদস্য উহা গ্রহণের জন্য একান্তভাবে আগ্রহান্বিত এবং সেজন্য তাঁহারা এই অজুহাত উপস্থিত করিলেন যে, পাকিস্তান অর্জনের জন্য আমাদের সম্মুখে যখন আর কোন পরিকল্পনা নাই, তখন উহা গ্রহণ করা কর্তব্য, অন্যথায় মুসলমান জনসাধারণের নিকট কৈফিয়ৎ দিবার কিছুই থাকিবে না। বিশেষত আমরা সেদিন মাত্র পাকিস্তান অর্জনের জন্য রক্তদ্বারা যে-কোন ত্যাগ স্বীকারের যে প্রতিজ্ঞাপত্রে স্বাক্ষর করিয়াছি, লোকে যখন উহার কৈফিয়ৎ চাহিবে, তখন আমরা কি জবাব দিব? কিন্তু যে বস্তু আমাদের সম্মুখে উপস্থিত হইয়াছে, উহা গ্রহণ করিলে উহাতে পাকিস্তান আছে বলিয়া আমরা মুসলমান সাধারণকে প্রবোধ দিয়া তাহাদের সম্মুখে দাঁড়াইবার একটা সুযোগ করিয়া লইতে পারিব। মিঃ জিন্নাও যখন দেখিলেন যে, তিনিও যেমন বর্তমান অবস্থা অতিক্রমের কোন প্রোগ্রাম দিতে পারিতেছেন না এবং অনুগামীদের অধিকাংশ যখন ত্যাগের পথ অবলম্বনে ইচ্ছুক নহে, তখন তিনি মন্ত্রিমিশন কর্তৃক উপস্থাপিত স্কীমের কোন কোণে পাকিস্তানের সামান্য মাত্র (উর্দুতে আছে—খফিফ সা আক্‌সা) ছায়ার সন্ধান পাওয়া যায় কিনা, তাহা অন্বেষণে প্রবৃত্ত হইলেন এবং তাহা তিনি পাইলেনও। সুতরাং লীগের জন্য অস্থায়ী গবর্মেণ্টের পদ গ্রহণের সিদ্ধান্ত গৃহীত হইল। কিন্তু কংগ্রেসের অস্বীকৃতির পর যখন বড়লাট ও মন্ত্রিমিশন দ্বিধাগ্রস্ত হইয়া অস্থায়ী গবর্মেণ্টের প্রস্তাবকে স্থগিত করিলেন, তখন লীগকে 'না ঘরকা না ঘাটকা'র দশার মধ্যে পড়িয়া যাইতে হইল। সুতরাং ইহাতে মিঃ জিন্না ক্রোধাক্রান্ত হইলে তাহাতে বিস্মিত হওয়ার কোন কারণই থাকে না। কিন্তু প্রশ্ন হইতেছে এই যে, এই ঘটনা হইতে কোন শিক্ষালাভ হইয়াছে কি না। যদি হইয়া থাকে, তবে তাহা ভবিষ্যতের জন্য কাজে লাগাইয়া উপকৃত হওয়া যাইতে পারে। আমরা খোদার দরবারে প্রার্থনা করিতেছি যে, এই ক্রোধ যেন গণপরিষদের কাজে ব্যাঘাত না জন্মায়। গণপরিষদে গিয়া সবাই যদি অবান্তর প্রশ্ন বর্জনপূর্বক ভারতের পূর্ণ স্বাধীনতার লক্ষ্য সম্মুখে রাখিয়া উহার একটা সর্বাঙ্গীন সুন্দর পরিকল্পনা প্রস্তুত করিয়া ব্রিটিশ গবর্মেণ্টের সম্মুখে উপস্থিত করিয়া বলিতে পারেন যে, আমরা আমাদের সর্ত পূরণ করিয়াছি, এখন আপনারা আপনাদের দায়িত্ব পালন করুন, তাহা হইলে প্রকৃতরূপে এই কলহ-ভঞ্জন হইতে পারে। হে খোদা, তুমি আমাদের আশা সফল করিও।

এপ্রিল মাসে নয়াদিল্লীতে অনুষ্ঠিত লীগ কাউন্সিলের সভায় মিঃ জিন্না বলিয়াছিলেন, "আজ আমরা যেখানে উপস্থিত, সেখান হইতে অগ্রসর হইতে গেলে বিপ্লবের পথে পা বাড়াইয়া রক্তদানের জন্য প্রস্তুত হইতে হয়। কিন্তু যে বস্তু আমরা পাইতেছি তাহার জন্য এক ফোঁটা ঘামও আমাদের খরচ করিতে হয় নাই।" 'নবযুগ' সংবাদ দিতেছেন যে এই সভায় ঈশ্বরের নামে শপথপূর্বক যে-কোন ত্যাগের বিনিময়ে পাকিস্থান অর্জনের প্রতিজ্ঞা-পত্রে সমবেত লীগ সদস্যবৃন্দকে সহি করানো হইয়াছিল। মিঃ জিন্না দণ্ডায়মান হইয়া উহার এক একটি শব্দ উচ্চারণ করিয়াছিলেন, সঙ্গে সঙ্গে লীগ কাউন্সিলের সদস্যেরা তাহা আবৃত্তি করিয়াছিলেন। প্রতিজ্ঞাপাঠ শেষ হইলে রক্তে প্রতিজ্ঞাপত্রে স্বাক্ষরও লওয়া হইয়াছিল। ইহার পর হইতে লীগ দলীয় সংবাদপত্রসমূহে ক্রমাগত জেহাদের কথা ঘোষণা করিয়া মুসলমান সমাজকে সাম্প্রদায়িক মোহে আচ্ছন্ন করিয়া রাখিবার চেষ্টা চলিতেছে এবং চার্চিলপন্থী আমলাতন্ত্র সাম্প্রদায়িক দ্বন্দ্বে এই ইন্ধন দান নির্বিকার চিত্তে অবলোকন করিতেছেন।

পাকিস্থান অর্জনের জন্য জেহাদ ঘোষণার প্রতিজ্ঞাপত্রে রক্তের অক্ষরে স্বাক্ষর দানের দুই মাস পরেই মন্ত্রী-মিশনের পাকিস্থানবর্জিত ঘোষণা বিচার করিবার জন্য সেই সদস্যেরাই লীগ কাউন্সিলে পুনরায় সমবেত হইলে মৌলানা হসরত মোহানী তাঁহাদিগকে প্রতিজ্ঞার কথা স্মরণ করাইয়া দেন। মৌলানী হসরত মোহানী জেহাদের কথা তুলিলে এই সব পাকিস্থানওয়ালার দল অত্যন্ত বিরক্ত হইয়া তাঁহাকে কোণঠাসা করেন এবং পাকিস্থানবর্জিত মিশনের প্রস্তাবকেই পাকিস্থান লাভের সোপান বলিয়া গ্রহণ করেন। জনৈক উৎসাহী লীগ সদস্য সভাশেষে মিঃ জিন্নাকে সম্বোধন করিয়া "হিন্দুস্থান আমরা ভাগ করিয়া পাকিস্থান অর্জন করিবই" এই কথা বলিলে জিন্না সাহেব তাহার জবাব দিয়াছিলেন, "হিন্দুস্থান টুট গয়া, মিল গয়া পাকিস্থান।" (হিন্দুস্থান ভাঙিয়াছে, পাকিস্থান মিলিয়াছে।)

ডাক বিভাগে ধর্মঘট

গত ১১ই জুলাই হইতে ডাকবিভাগের অধস্তন কর্মচারি-

গণ ধর্মঘট করিয়াছে। ধর্মঘট ক্রমেই ব্যাপক আকার ধারণ করিতেছে। ইহার ফলে দেশের সাধারণ লোকের অনেক অসুবিধার সৃষ্টি হইয়াছে এবং ক্রমেই উহা বাড়িয়া চলিতেছে। এই ধর্মঘটের পূর্বলক্ষণ বহুদিন আগেই পাওয়া গিয়াছিল সুতরাং কেন্দ্রীয় সরকার বলিতে পারেন না তাঁহারা ইহার প্রতিকারের সময় পান নাই।

ডাক-কর্মচারিদিগের অভাব-অভিযোগ মূলতঃ ঠিক। কিন্তু যেভাবে এই সকল নানা বিভাগের অভাবগ্রস্ত কর্মীদিগের অসন্তোষের সুযোগ লইয়া ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেস ও কম্যুনিষ্ট পার্টির মধ্যে দলভারী করার চেষ্টা চলিতেছে তাহাতে কাহারও মঙ্গল হইবে না। কর্মীদিগের অভাব দূর না হইলে তাহাদের পক্ষে কাজ চালান অসম্ভব ইহা সত্য কিন্তু অন্য দিকে সে সকল অভাব একদিনে দূর হওয়াও সম্ভব নহে; কেননা সমস্ত দেশ এখন দুরবস্থায় রহিয়াছে। কর্মীদিগের দাবি সেইজন্য যুক্তিযুক্ত হওয়া উচিত; অন্যথায় সে দাবি মিটান কাহারও পক্ষে সম্ভবপর হইবে না। এই বিষয়েই আমরা কর্মীদিগের নেতৃবর্গের বিবেচনায় বিশেষ অভাব দেখিতেছি। দুই পক্ষের বা বিভিন্ন দলের নেতা পরস্পরের সহিত টক্কর দিয়া দাবি উচ্চ হইতে উচ্চতর করিলে শেষ পর্যন্ত এক বিপরীত অবস্থার সৃষ্টি হওয়া ভিন্ন আর কিছুই হইতে পারে না।

আসলে দোষ দেশের উচ্চতম অধিকারিবর্গের। অন্য সকল মিত্রদেশে যুদ্ধোত্তরকালে জিনিষপত্রের মূল্য, বিশেষত খাদ্য ও বস্ত্রের মূল্য, ক্রমেই কমিয়া আসিতেছে এবং ব্ল্যাক মার্কেটের ক্রমে উচ্ছেদ ঘটিতেছে। এ দেশে এখনও ব্ল্যাক মার্কেটের পূর্ণ অধিকার বজায় রহিয়াছে, যাহার ফলে দেশের লোকের সহনশক্তি সীমা পার হইয়া গিয়াছে। মূল্য-নিয়ন্ত্রণ নামেই আছে এবং তাহাও অসম্ভব উচ্চহারে ফেলা। দেশের অবস্থা স্বাভাবিক হইতে যতই দেরী হইবে কর্মী-আন্দোলন ততই প্রখর হইবে ইহা সাধারণ কথা।

কর্মীদিগেরও বুঝা উচিত যে দেশের জনসাধারণের শতকরা ৯০ জন ঘোর অভাবগ্রস্ত হইয়া আছে। তাহাদের আরও ভার বৃদ্ধি করিলেই যে সর্বকিছু পরিষ্কার হইয়া যাইবে ইহা ঠিক নহে। তাহাদের ভার অন্য দিকে কমিলে তবে তাহারা নূতন ভার গ্রহণে সমর্থ হইবে। সুতরাং এখন সমস্ত জাতির নেতৃবর্গের সহিত পরামর্শ করিয়া, সবদিকে সামঞ্জস্য রাখিয়া নিজেদের দাবি সাধারণের নিকট উপস্থিত করা উচিত।

শ্রীমতী সরলা রায়

ডাক্তার পি কে রায়ের পত্নী সুবিখ্যাত শিক্ষাব্রতী শ্রীমতী সরলা রায় ছিয়াশী বৎসর বয়সে কলিকাতা নগরীতে পরলোকে প্রয়াণ করিয়াছেন। তাঁহার মৃত্যুতে বাংলাদেশের নারীশিক্ষা প্রসারের অপূরণীয় ক্ষতি হইল। দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশের জ্যেষ্ঠতাত সুপ্রসিদ্ধ সমাজ-সংস্কারক ও রাষ্ট্রনায়ক দুর্গামোহন দাশের ইনি জ্যেষ্ঠা কন্যা। দুর্গামোহন বন্ধু আনন্দমোহন বসু ও দ্বারকানাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের সহযোগিতায় বঙ্গ মহিলা বিদ্যালয় স্থাপন করেন। এই স্কুলই ভারতের সর্বপ্রথম মহিলাদিগের উচ্চ শিক্ষাদানের বিদ্যালয়। দুর্গামোহন তাঁহার কন্যা সরলা, অবলা ও শৈলবালাকে এই স্কুলে ভর্তি করিয়া দেন। সরলা ও বরিশালের ব্রজকিশোর বসুর কন্যা কাদম্বিনী স্কুলের পাঠে এমন কৃতিত্ব দর্শাইতে থাকেন যে, কর্তৃপক্ষগণ মনে করেন বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষা দিতে পারিলে ইঁহারা সহজে উত্তীর্ণ হইতে পারিবেন। তখন ইংলণ্ডেও বিশ্ববিদ্যালয়ের দ্বার নারী জাতির জন্য উন্মুক্ত হয় নাই। কিন্তু দ্বারকানাথ, আনন্দমোহন প্রভৃতি এমনই আন্দোলন আরম্ভ করিলেন যে, কলিকাতায় বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষ স্বীকার করিতে বাধ্য হইলেন যে বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষায় উপস্থিত হইবার যোগ্যতা এই দুই জন নারীর আছে কিনা তাহা একটি বিশেষ পরীক্ষায় ধার্য হইলে ইঁহাদিগকে এণ্ট্রান্স পরীক্ষা দিতে দেওয়া হইবে। সরলা ও কাদম্বিনী এই পূর্ব পরীক্ষায় যোগ্যতার সহিত উত্তীর্ণ হওয়াতে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের দ্বার ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের মধ্যে সর্বপ্রথম মেয়েদের জন্য উন্মুক্ত হয়। সরলা সেই হিসাবে নারীর উচ্চ শিক্ষায় পথপ্রদর্শিকা এবং সেজন্য ভারতের নারীসমাজ তাঁহার নিকট চিরকৃতজ্ঞ থাকিবে। এণ্ট্রান্স পরীক্ষায় উপস্থিত হইবার পূর্বে সরলার বিবাহ ডাক্তার পি. কে. রায়ের সহিত সম্পন্ন হওয়াতে সরলা বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষায় উপস্থিত হন নাই। সরলা কিন্তু নিশ্চিন্ত রহিলেন না। ঢাকায় তিনি একটি নারীশিক্ষা মন্দির প্রতিষ্ঠা করিয়া দেশীয় নারী-চালিত প্রথম নারীশিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সৃষ্টি করিলেন, সে আজ সত্তর বৎসর পূর্বের কথা। তিনি উত্তরকালে ব্রাহ্ম বালিকা বিদ্যালয়ের প্রথম নারী-সম্পাদিকা হইয়া স্কুলটি পুরুষ-শিক্ষকবর্জিত ও নারীপরিচালিত বিদ্যালয়ে পরিণত করিয়া আর একটি কীর্তি স্থাপন করিলেন। তাহার পর গোখলে মেমোরিয়াল স্কুল ও কলেজ স্থাপন তাঁহার অন্যতম কীর্তি। বিশ্ববিদ্যালয় তাঁহাকে প্রথম মহিলা 'ফেলো' নির্বাচিত করিয়া তাঁহার আজীবন শিক্ষা-প্রসারের চেষ্টাকে স্বীকার করিয়া উচিত কাজই করিয়াছেন। যে কয়জন মহিলা আপনাদের সংগঠনী প্রতিভার পরিচয় দিয়া প্রমাণ করিয়া দিয়াছেন যে, নারীগণও সুযোগ ও সুবিধা পাইলে সুবৃহৎ প্রতিষ্ঠান গড়িতে ও সুন্দর ভাবে পরিচালন করিতে পারেন, সরলা তাঁহাদের মধ্যে একজন প্রধান কর্মী। তিনি এমন যুগে কাজ আরম্ভ করিয়াছিলেন যখন কাজের সুযোগ পাওয়া দূরের কথা, অবরোধের বাহিরে আসাও মহিলাদের পক্ষে অত্যন্ত কঠিন ছিল, তবুও সকল বাধা অতিক্রম করিয়া তিনি অক্ষয় কীর্তি স্থাপন করিয়া গিয়াছেন।

ভারত-মার্কিণ বাণিজ্যে ভারতবর্ষ পাওনাদার

ভারতবর্ষের দুর্ভিক্ষ নিবারণের জন্য আমেরিকার নিকট গম প্রার্থনা করা হইয়াছিল। আমেরিকার নিকট চাহিবার অর্থ এই যে ঐ দেশেই সবচেয়ে বেশী খাদ্য উদ্বৃত্ত আছে, একটু চেষ্টা করিলেই আমেরিকান গবর্মেণ্ট নিজ দেশের চাষীদের নিকট হইতে গম সংগ্রহ করিয়া উহা আমাদের নিকট বিক্রয় করিলে ভারতের লক্ষ লক্ষ বুভুক্ষু নর-নারী-শিশুর প্রাণ রক্ষা হইতে পারে। ইউরোপ এবং এশিয়ার অন্যান্য দেশও আমেরিকার নিকটেই খাদ্য প্রার্থনা করিতে বাধ্য হইয়াছিল। রাজনৈতিক কারণে আমেরিকান গবর্মেণ্ট কাহাকেও খাদ্য সরবরাহ করিয়াছে, কাহাকেও বা বঞ্চিত করিয়াছে। আমাদের জন্য আর গম বেশী জোটে নাই, ভুট্টা প্রভৃতি বাজে জিনিষ দিয়া ভারতীয় প্রতিনিধিদের তুষ্ট করিবার চেষ্টা হইয়াছে।

ভারতবাসী যে খাদ্য আমেরিকার নিকট চাহিয়াছিল তাহা ভিক্ষা চায় নাই, নগদ মূল্যেই উহা আমরা ক্রয় করিতাম। ব্রিটেনের নিকট আমাদের যেমন প্রায় দেড় হাজার কোটি টাকা পাওনা আছে, আমেরিকার নিকটও তেমনি বড় কম টাকা আমাদের পাওনা নাই। গত ১৫ই জুন ওয়াশিংটনে মার্কিণ-ভারত দেনা-পাওনা সম্বন্ধে যে হিসাব বাহির হইয়াছে তাহাতে দেখা যায়—১৯৪৫ সালে আমেরিকা ভারতবর্ষ হইতে ৪৫ কোটি টাকার মাল কিনিয়াছে এবং বিনিময়ে আমাদের নিকট বিক্রয় করিয়াছে ২১ কোটি টাকার পণ্য। তার আগের বৎসর আমেরিকা ভারতবর্ষ হইতে ৩৪ কোটি টাকার মাল কিনিয়াছে এবং ১৫ কোটি টাকার বেচিয়াছে। এই হিসাব দিয়া আমেরিকার আন্তর্জাতিক বাণিজ্য বিভাগ লিখিয়াছেন, "১৯৪৬ সালের প্রথম তিন মাসের বাণিজ্যেও এই একই ধরণ চলিয়াছে। তিন মাসে ভারতবর্ষ হইতে আমেরিকায় আসিয়াছে ১৫ কোটি টাকার পণ্য, ভারতবর্ষে গিয়াছে ৮ কোটি। গত কয়েক বৎসরের হিসাবেই দেখা যায় যে বৈদেশিক বাণিজ্যের হিসাব-নিকাশে ভারতবর্ষ পাওনাদার এবং আমেরিকা দেনদার। এই হিসাবে উভয় দেশের ভ্রমণকারীদের ব্যয়, পাওনা টাকার সুদ ও লভ্যাংশ প্রভৃতি ধরা হয় নাই, হিসাব করিলে উহাতেও ভারতের পাওনাই হয়ত বেশী হইবে।"

আমেরিকা হইতে ভারতবর্ষে কি কি জিনিষ আসে তাহার কতক নমুনা দেখিলে আমেরিকার সহিত আমাদের বাণিজ্যের প্রকৃতি বুঝা যাইবে। ১৯৪৫ সালে নগদ টাকায় আমেরিকা হইতে নিম্নলিখিত তালিকায় উল্লিখিত জিনিষ ভারতে আমদানী হইয়াছে :

সিগারেট	২ কোটি ৮৮ লক্ষ টাকা
কারখানার যন্ত্রপাতি	২ ,, ২২ ,, ,,
ঔষধ	১ ,, ৬৮ ,, ,,
ইস্পাত	৯৩ ,, ,,
মদ	৮৪ ,, ,,
বৈদ্যুতিক যন্ত্রপাতি	৭৫ ,, ,,
কাগজ	৬০ ,, ,,

তালিকা দীর্ঘ করা নিরর্থক। ইহা হইতেই বুঝা যাইবে যে সমস্ত জিনিষ আমেরিকা হইতে আসে তাহার অধিকাংশ অনায়াসে আমাদের দেশেই তৈরি হইতে পারে। যন্ত্রপাতির মধ্যে অবশ্য কিছু রকমারি আছে। যুদ্ধের আগে আমেরিকা আমাদের দেশে হিসাবের যন্ত্র অর্থাৎ "ক্যালকুলেটিং মেশিন" চালাইবার চেষ্টা করিয়া ব্যর্থ হইয়া আমেরিকার বৈদেশিক বাণিজ্য বিভাগ গবর্ণমেণ্টকে রিপোর্ট দিয়াছিল যে ভারতবর্ষের কেরাণীরা মুখে মুখে হিসাবে এত দক্ষ যে সে দেশে এই যন্ত্র বিক্রয়ের আশা করা বৃথা।

ভারতবর্ষ হইতে আমেরিকা যে সব জিনিষ ক্রয় করে তাহার নমুনা দেখিলে বুঝা যাইবে যে উহার অধিকাংশই ভারতবর্ষ হইতে না লইয়া তাহাদের গত্যন্তর নাই। ১৯৪৫ সালে ভারতবর্ষ হইতে আমেরিকায় যে সব জিনিষ গিয়াছে তাহার কতকগুলির নাম এই :

চট ও থলে	১৬ কোটি ৮৬ লক্ষ টাকা
চা	৪ ,, ৭৭
কেশিউ বাদাম	৪ ,, ৭১
পশম	২ ,, ০৭
কাঁচা চামড়া	১ ,, ১৫
ট্যান-করা চামড়া	১ ,, ৮০
তুলা	১ ,, ৯৫
গালা	২ ,, ১৬

ইহা ছাড়া অভ্র ও ম্যাঙ্গানিজ টাকার হিসাবে কম হইলেও ভারতবর্ষ হইতে না লইয়া আমেরিকার উপায় নাই।

আমেরিকা ও ভারতবর্ষের মধ্যে এইরূপ বাণিজ্য চলিলেও উহাতে ভারতবর্ষের যতটা লাভ হওয়া উচিত ছিল তাহা হয় নাই। যুদ্ধের সময় ইংরেজ ভারতবর্ষের সমস্ত ডলার হস্তগত করিয়াও নিশ্চিন্ত হয় নাই, ব্রিটেনের অনুমোদন ভিন্ন ভারতবর্ষ ও আমেরিকার মধ্যে মালের দাম আদান-প্রদানের কোন উপায় ছিল না। ইংরেজের এই দালালীতে আমাদের দুই দফা লোকসান হইয়াছে। প্রথমতঃ ইংরেজের মারফৎ আমেরিকান মাল আমাদের দ্বিগুণ তিনগুণ দামে কিনিতে হইয়াছে, ইংরেজ বণিকেরা মোটা দালালী ফাঁকতালে রোজগার করিয়াছে। আমেরিকা ইহাতে বেশী আপত্তি করে নাই এই জন্য যে সে সাধারণ বাজার দরই আদায় করিয়াছে, ইংরেজের পকেট ভরিতে গিয়া আমরাই ব্ল্যাকমার্কেটের দর দিয়া মরিয়াছি। আমাদের নিকট হইতে মাল কিনিবার সময় আমেরিকা কিন্তু যথেষ্ট সেয়ানা ছিল, এখানে সে এক বিন্দুও বোকামি করে নাই। চট, চামড়া, গালা, অভ্র, ম্যাঙ্গানিজ প্রভৃতির দাম দাবাইয়া রাখিতে ভারত-সরকারকে বাধ্য করা হইয়াছে। আমেরিকান গবর্মেণ্টের স্বার্থ রক্ষার জন্য ভারত-সরকার এই সব জিনিষের দাম এমনভাবে বাঁধিয়াছেন যার ষোল আনা লাভ তাহারাই পাইয়াছে, ভারতবাসী ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে।

যুদ্ধের মধ্যে ঋণ ও ইজারা চুক্তির নামে ভারতবর্ষের ঘাড়ে বহু অনাবশ্যক খরচ চাপাইয়া দেওয়া হইয়াছে। জার্মানী ও জাপানের সহিত যুদ্ধ ইংরেজ আমেরিকার যুদ্ধ, ভারতবর্ষ উহা বাধাইতেও যায় নাই, স্বেচ্ছায় উহাতে যোগদানও করে নাই। জোর করিয়া ভারতবর্ষকে যুদ্ধে নামাইয়া তাহাকে এশিয়ার যুদ্ধের ঘাঁটিতে পরিণত করা হইয়াছে এবং ভারত-রক্ষার নামে অনাবশ্যক ব্যয়ের বোঝা তাহার ঘাড়ে চাপানো হইয়াছে। ভারতবর্ষ স্বাধীন হইলে এবং যুদ্ধে নিরপেক্ষ থাকিলে এই লাঞ্ছনা আমাদের সহিতে হইত না। আধা পরাধীন মিশরও যুদ্ধে যোগদানের ব্যাপারে যে স্বাধীনতা পাইয়াছে আমরা তাহাও পাই নাই। জাপানের সহিত আমেরিকার নিজস্ব যুদ্ধে লড়াই করিবার জন্য আমেরিকা এ দেশে লক্ষ লক্ষ সৈন্য পাঠাইয়াছে, তাহাদের জন্য অস্ত্রশস্ত্র, ট্যাঙ্ক প্রভৃতি সবই পাঠাইয়াছে, পাঠায় নাই শুধু খাবার। ইহাদের এবং ইংরেজ সৈন্যদের হাতীর খোরাক জোগাইতে গিয়া বাংলার ৫০ লক্ষ লোক দুর্ভিক্ষে মরিয়াছে। ভারতবর্ষের সমস্ত উদ্বৃত্ত ফসল ইহাদের প্রয়োজনে নিঃশেষিত হওয়ায় আবার ভারতবাসীকে এক ভয়াবহ দুর্ভিক্ষের সম্মুখীন হইতে হইতেছে। মাছ মাংস ডিম তরিতরকারি প্রভৃতি ইহাদিগকে জোগাইতে গিয়া ভারতবাসী পুষ্টিকর খাদ্যে বঞ্চিত হইয়াছে অথবা অগ্নিমূল্যে ক্রয় করিয়াছে, রেলে ইহাদের জন্য স্থান করিতে গিয়া ভারতীয় যাত্রীরা গাড়ীর পাদানিতে চড়িয়া পুরা টিকিটে ভ্রমণ করিয়াছে, ইহাদের অস্ত্রশস্ত্র চলাচলের জন্য মালগাড়ী সরবরাহ করিয়া ভারতবাসী কয়লা প্রভৃতি অত্যাবশ্যক দ্রব্যে বঞ্চিত হইয়াছে, ইহাদের বস্ত্রাভাব মিটাইতে গিয়া ভারতীয় নারীদের পর্যন্ত বিবস্ত্র থাকিতে হইয়াছে। ঋণ ও ইজারা চুক্তির লেন-দেনের হিসাবের উপর ভারত-বাসীর কোন হাত ছিল না, কাজেই সেদিক দিয়া আমাদের নিকট আমেরিকার মোটা টাকা পাওনা হইলেও সাধারণ বাণিজ্যের হিসাবে তাহা ধর্তব্য হইতে পারে না। ভারতবর্ষ ও আমেরিকার মধ্যে স্বাভাবিক বাণিজ্যে ভারতবর্ষ পাওনা-দারই আছে, থাকিবেও। দেনদার আমেরিকা ভারতবর্ষকে জাপানী যুদ্ধের ঘাঁটি করিয়া অর্থে ও অন্যান্য বিষয়ে আমাদের যে ক্ষতি করিয়া গিয়াছে তাহা স্মরণ করিয়া ভারতবর্ষের দুর্ভিক্ষ নিবারণে প্রয়োজনীয় গম আমাদের নিকট অন্তত নগদ মূল্যেও বিক্রয় করিতে রাজী হইবে বলিয়া আমাদের বিশ্বাস ছিল। আমেরিকা সে বিশ্বাস রক্ষা করে নাই।

পাটচাষীর বিপদ

পাটের সর্বোচ্চ মূল্য যে আইনের বলে বাঁধিয়া রাখা হইয়া-ছিল আগামী ৩০শে সেপ্টেম্বর তাহার মেয়াদ শেষ হইবে। এই দর যে ভাবে বাঁধা হইয়াছিল তাহাতে ষোল আনা লাভ হইয়াছে ইংরেজ মিল-মালিক এবং মারোয়াড়ী, ভাটিয়া প্রভৃতি দালালদের। ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে চাষীরা। পাটের সর্বোচ্চ দর বাঁধা থাকায় মফঃস্বলের চাষীরা মণ-করা ৭ টাকার বেশী দামে পাট বেচিতে পারে নাই। ইহাতে তাহাদের খরচ পোষানই দায় হইয়াছে, লাভ হওয়া তো দূরের কথা। তথাপি প্রতি বৎসরই চাষীরা আগামী বৎসর দাম পাইবে এই আশায় পাট বুনিয়াছে এবং প্রতি বৎসরই নিরাশ হইয়াছে। এবার পাট চাষের জন্য লাইসেন্স প্রাপ্ত জমির এক-চতুর্থাংশে পাট চাষ হয় নাই দেখিয়া মনে হইতেছে এত দিনে হয়ত নিরক্ষর চাষী-দের মনেও সুবুদ্ধির উদয় হইতেছে।

চাষীর লাভ হয় নাই বটে, কিন্তু মিল-মালিক বা দালাল-দের প্রচুর লাভ হইয়াছে। গত যুদ্ধের ন্যায় এই যুদ্ধেও চটকল-গুলি রীতিমত টাঁকশালে পরিণত হইয়াছিল। নিম্নলিখিত তালিকা হইতে চটকলসমূহের লাভের পরিমাণ বুঝা যাইবে:

চটকলের নাম	প্রদত্ত শতকরা লভ্যাংশ				
	১৯৪১	১৯৪২	১৯৪৩	১৯৪৪	১৯৪৫
হাওড়া	৭৫	৭০	৭০	৭০	৭০
ক্রেগ	১০	২০	৩০	৫০	৫০
এলায়েন্স	৪০	৪০	৪০	৬০	৫৫
বজবজ	৫৫	৫০	৪৫	৪০	৩০
গৌরীপুর	৯৫	১১০	৭০	৬০	৫০
খড়দহ	৪৫	৬০	৬০	৬০	৬০

১৯৪১ হইতে ১৯৪৫ এই পাঁচ বৎসরে ইহারা মোট মূলধনের প্রতি একশত টাকায় নিম্নলিখিত পরিমাণ টাকা লভ্যাংশ দিয়াছে:

হাওড়া	৩৫৫ টাকা
ক্রেগ	১৬০ ,,
এলায়েন্স	২৩৫ ,,
বজবজ	২২০ ,,
গৌরীপুর	৩৮৫ ,,
খড়দহ	২৮৫ ,,

এই সব মিলের শেয়ারের আসল দামের সহিত ১৯৪১ সালের ও এবারকার দর তুলনা করিলেই চটকলের শেয়ার লইয়া কি ভাবে ফাটকাবাজি চলিয়াছে তাহা বুঝা যাইবে:

চটকল	শেয়ারের আসল দাম	১৯৪১-এর শেয়ারের দাম	১৯৪৫-এর ১৪ই জুনের দাম
হাওড়া	১০৲	৪৬৷০	১৩৬৷০
ক্রেগ	৷০	১৵০	১৬৷০
এলায়েন্স	১০০৲	২৩০৲	১১৯৫৲
গৌরীপুর	১০০৲	৬৩৮৲	১৩০৩৲
বজবজ	১০০৲	২৩২৲	৭৬০৲
খড়দহ	১০০৲	৩৩৩৲	১০২০৲

এই তালিকাটি কিন্তু সম্পূর্ণ লাভের পরিচয় নহে। লভ্যাংশ

বিতরণের আগে রিজার্ভ ফাণ্ড এবং ডেপ্রিসিয়েশন ফাণ্ডে বহু টাকা সরাইয়া রাখা হয়। ইহাদের সকলের উপরে আছে কামধেনু ম্যানেজিং এজেন্টদের কমিশন। এই ম্যানেজিং এজেন্সি প্রথার ন্যায় কারখানার লাভ শোষণের ফন্দী পৃথিবীতে আর দ্বিতীয়টি নাই। এই বস্তু ভারতবর্ষে ইংরেজ বণিকদের অপূর্ব সৃষ্টি, পৃথিবীর কোন সভ্য দেশে ম্যানেজিং এজেন্সি বরদাস্ত করা হয় না। সহস্র রকমে ইহারা কারখানা হইতে লাভ আদায় করে। আপিস খরচা বাবদ একটা মোটা টাকা প্রত্যেক কারখানার নিকট হইতে আদায় হয়, তারপর প্রকাশ্যে ম্যানেজিং এজেন্সি কমিশন তো আছেই। মাল কিনিতে কমিশন, মাল বেচিতে কমিশন, যন্ত্রপাতি কিনিতে কমিশন প্রভৃতি কত রকমের উপরি যে আছে তার ইয়ত্তা নাই। এক ম্যানেজিং এজেন্টের অধীনে নানা প্রকার কারখানা থাকে, ইহাদের একের মাল অপরকে দিয়া ক্রয় করাইয়া সেদিক দিয়াও যথেষ্ট কমিশন ও লাভ আদায় হয়। ভাল চালু কোম্পানীর টাকা নূতন কোম্পানীতে লগ্নী করা ম্যানেজিং এজেন্টদের মধ্যে রেওয়াজ হইয়া দাঁড়াইয়াছিল, ১৯৩৬ সালের কোম্পানী আইন সংশোধনে তাহা বন্ধ হইয়াছে। চটকলগুলির ম্যানেজিং এজেন্টরা আইনসঙ্গত কমিশন ছাড়া কত টাকা প্রতি মিল হইতে উপরি রোজগার করেন তাহার হিসাব কোন দিন পাওয়া যায় নাই। বাংলা-সরকার গত কয়েক বৎসরের মধ্যে দুই বার দুইটি পাট তদন্ত কমিটি বসাইয়াছিলেন, দুই কমিটিই চটকলের উৎপাদন ব্যয় জানিতে চাহিয়াছিলেন, দুই বারই চটকল-মালিকেরা এই হিসাব দাখিল করিতে অস্বীকার করিয়াছেন। হিসাব পাইলে দেখা যাইত পাটের দর দ্বিগুণ বাড়াইলেও অনায়াসে চটকলওয়ালারা ন্যায্য লাভ করিয়া ব্যবসা চালাইতে পারে। ম্যানেজিং এজেন্সির উপরও আর এক বস্তু আছে সিক্রেট-রিজার্ভ। চটকলের যখন খুব লাভ হয় তখন অনেক টাকা এই রিজার্ভে ফেলা হয়, এটা ব্যালান্সশীটে দেখান হয় না। হিসাবটা শুধু পরিচালকদেরই জানা থাকে। এই টাকাটা পরে সুযোগ মত কিসে খরচ হইল অংশীদারদের বা বাহিরের লোকের তাহা জানিবার উপায় থাকে না। এই বস্তুটিও এদেশে ইংরেজ বণিকদের আমদানী জিনিষ।

পাটের উর্দ্ধতম দর ১৮৲ টাকার কাছাকাছি বাঁধিয়া রাখার পক্ষে মিল-মালিকেরদের যুক্তি এই যে তাহা না করিলে পাট লইয়া ফাটকাবাজি চলিবে, পাটের দাম বেশী বাড়িলে পৃথিবীর অনেক দেশ চট ও থলের বদলে অন্য জিনিষ ব্যবহার করিবে ইহাতে পাটের চাহিদা কমিয়া চাষীর ক্ষতি হইবে। ইহাদের তৃতীয় যুক্তি এই যে চাষীর হাতে বেশী টাকা গেলে ইনফ্লেশন হইয়া দেশের ব্যবসা-বাণিজ্যে বিপর্যয় ঘটিবে। মিল-মালিকদের তিনটি যুক্তিই বিচারসহ নহে। ফাটকাবাজি গবর্মেণ্ট আলাদা আইন করিয়া বন্ধ করিতে পারেন। মিলমালিক ও দালালদের দলের সংখ্যা মোটের উপর তিন শতের মত হইবে। ইঁহারাও নিজেরা চেষ্টা করিলে সঙ্ঘবদ্ধ হইয়া ফাটকাবাজি বন্ধ করিতে পারেন। নিজেরা এই চেষ্টা না করিয়া ইঁহারা গবর্মেণ্টকে দিয়া এমন ভাবে কাজটা করাইয়া লইতে চাহিতেছেন যাহার দ্বারা নিজেদেরই সম্পূর্ণ লাভ হয়। চাষীর ক্ষতি ধর্তব্যের মধ্যে নহে। দ্বিতীয় যুক্তি অনুকল্পের ভয় প্রদর্শন। ইহাও নিরর্থক। গত কয়েক বৎসর যাবৎ ব্রেজিলে পাট গজাইবার প্রবল চেষ্টা চলিতেছে কিন্তু সম্পূর্ণ সফল হয় নাই। যে পাট সেখানে উৎপন্ন করা সম্ভব হইয়াছে তাহার দ্বারা বড়জোর একটি মিল চলিতে পারে। ব্রেজিলের সকল সম্ভব অসম্ভব স্থানে পাট বুনিবার চেষ্টা হইয়া শেষ পর্যন্ত এই অবস্থায় ঠেকিয়াছে। আমেরিকা কাগজের থলে দিয়া চটের থলের কাজ চালাইতে গিয়া দেখিয়াছে উহাতে খরচ অসম্ভব বেশী পড়ে।

জার্মানী এবং আরও কোন কোন দেশ কাগজের থলি চালাইবার চেষ্টাও করিয়াছে। জার্মানী কানাডা প্রভৃতি কোন কোন দেশ ফসল আমদানী রপ্তানীতে সরাসরি লরী এবং সাকসন পাম্প ব্যবহার করিয়া চটের থলে এড়াইবার চেষ্টা করিয়াছে। কৃষকের বাড়ী হইতে লরীতে মালবোঝাই করিয়া রেল-ষ্টেশনে আনিয়া সাকসন পাম্পের সাহায্যে মালগাড়ীতে বোঝাই করা যায়, মালগাড়ী হইতে জাহাজে বা লরীতেও এই ভাবে তোলা যায়, কিন্তু সকল ক্ষেত্রে সকল জিনিষের বেলায় এই ফন্দী খাটিল না। গম চালান দেওয়ায় এই পন্থা কার্যকরী হইল বটে, কিন্তু ব্যর্থ হইল চিনির বেলায়। শেষ পর্যন্ত প্রভুদের বাংলার পাটচাষীরই শরণাপন্ন হইতে হইল।

যুদ্ধের মধ্যে আমেরিকা চট ও থলে ভারতবর্ষ হইতে সস্তায় কিনিয়া ব্যবসা করিয়াছে, ন্যায্য পাওনায় বঞ্চিত হইয়াছে বাংলার পাটচাষী। পাটকে যুদ্ধের উপকরণের অন্তর্ভুক্ত করিয়া আমেরিকা উহার দর বাঁধিয়াছে, ব্রিটিশ গবর্মেণ্টের সহায়তায় ভারত-সরকারকে দিয়া পাটের সর্বোচ্চ দর বাঁধাইয়া লইয়াছে, নিয়ন্ত্রিত দামে যুদ্ধের নামে থলে কিনিয়া দক্ষিণ-আমেরিকার চিনি ব্যবসায়ীদের বেচিয়া লাভ করিয়াছে। আমেরিকা, ব্রিটেন ও ভারত-সরকার মিলিয়া পাটের সর্বোচ্চ দর বাঁধিয়া দিয়া কেমন করিয়া চাষীর ক্ষতি করিয়াছেন এবং বাংলার মন্ত্রীরা ইংরেজদের ভোট হারাইবার ভয়ে কেমন উহাতে সায় দিয়া গিয়াছেন তাহার বিশদ আলোচনা আমরা পূর্বে করিয়াছি। এই ব্যাপারে একটা কথা পরিষ্কার হইয়াছে যে, পাটের অনুকল্প বাহির করিয়া পাটচাষীকে ভয় দেখাইবার চেষ্টা বৃথা ছলনা ভিন্ন আর কিছু নয়।

সর্বশেষে ইনফ্লেশনের ভয়। যুদ্ধের মধ্যে দেশের নোট প্রচলনের পরিমাণ ছয় গুণ বাড়িয়াছে এবং এই টাকার অধিকাংশই অল্প লোকের হাতে জমা হইয়াছে। ফলে

দেশের এক শ্রেণীর লোক অপরিমিত অর্থের অধিকারী হইয়া বিলাস-ব্যসনে টাকা খরচের সুযোগ পাইয়াছে অথচ দেশের অধিকাংশ লোকই অর্থের অভাবে অনশনে মরিয়াছে অথবা অর্দ্ধাশনে কাল কাটাইয়াছে। কর্মের অভাবই এই অর্থাভাবের সর্বপ্রধান কারণ। দেশের সর্বশ্রেণীর লোকের হাতে টাকা গেলে শিল্প-বাণিজ্যের উন্নতির যতটা সম্ভাবনা থাকে, অল্প লোকের হাতে টাকা আটকাইয়া গেলে তাহা হয় না। পাট বিক্রয়ের টাকা চাষীর হাতে গেলে উহা দরিদ্র ও মধ্যবিত্ত সকলের হাতে গিয়া পৌঁছিত, ফলে দেশে নূতন কারখানা প্রতিষ্ঠা এবং ব্যবসা-বাণিজ্যের অনেক সুরাহা হইত। এ দিক দিয়াও চট কলওয়ালাদের যুক্তি বিচারসহ নহে।

বাংলা-সরকার পাটের সর্বোচ্চ মূল্য নির্দ্ধারণ বিষয়ে গত ২৯শে জুন তারিখে এক মন্ত্রণা সভা আহ্বান করিয়াছিলেন। উহাতে চটকল সমিতি এবং স্বার্থসংশ্লিষ্ট অপর অনেকে উপস্থিত ছিলেন কিন্তু পাটচাষীর স্বার্থ লইয়া যাঁহারা লড়াই করিয়াছেন তাঁহারা আহূত হন নাই। বাংলা-সরকার কি করিবেন ইহা হইতে তাহার কতকটা আভাষ পাওয়া যায়। পাটচাষীর স্বার্থ রক্ষা করিতে গেলে ইংরেজদের ২৫টি ভোট হারাইবার ভয় তাঁহাদের আছে। ইংরেজদের ভোট বিরুদ্ধে গেলে মন্ত্রিত্ব টিঁকিবে না।

সর ফ্রেডারিক বারোজ ও ডিমোক্রাসি

দুর্ভিক্ষ রোধ করিবার জন্য সর্বদলীয় মন্ত্রিসভা গঠন সর্বতোভাবে সহায়ক হইবে উডহেড কমিশনের অভিজ্ঞতালব্ধ এই অভিমত অগ্রাহ্য করিয়া নূতন গবর্ণর সর ফ্রেডারিক বারোজ কেন সে চেষ্টা না করিয়া একটিমাত্র দল বিশেষের হাতে শাসনভার ন্যস্ত করিয়া নিশ্চিন্ত রহিয়াছেন এই প্রশ্ন স্বভাবতই উঠিতে পারে। গবর্ণরের পক্ষে এই যুক্তি হইতে পারে যে তিনি গণতন্ত্রসম্মত উপায়ে বৃহত্তম দলকে মন্ত্রিমণ্ডল গঠনের ভার দিয়াছেন এবং মন্ত্রিমণ্ডলের উপদেশ মানিয়া চলাই কর্তব্যবোধ করিতেছেন। বর্তমান লীগ মন্ত্রিদলের পরামর্শ মানিয়া চলিলে নিয়মতান্ত্রিক শাসনকর্তার মর্য্যাদা রক্ষা করা হয় কি না এই প্রশ্ন উঠিতে পারে। বঙ্গীয় ব্যবস্থা-পরিষদের কংগ্রেস দল এবং ইংরেজ দলের নেতা নির্বাচন সম্পূর্ণ হইবার পূর্বেই গবর্ণর বারোজ সর্ববৃহৎ দলের নেতা লীগ-নায়ক মিঃ সুরাবর্দীকে মন্ত্রিমণ্ডল গঠনের জন্য আহ্বান করেন। দৃশ্যত ইহা গণতান্ত্রিক পদ্ধতিসম্মত হইলেও বর্তমান পরিস্থিতিতে এই কার্য গণতন্ত্রের মূলনীতিবিরুদ্ধ। কারণ ইহা দ্বারা দেশের সমগ্র স্বার্থ উপেক্ষা করিয়া অযোগ্যতার জন্য সুপরিচিত একটি সাম্প্রদায়িক ও ব্যক্তিগত স্বার্থসম্বল দলবিশেষের হাতে দেশের শাসনভার অর্পণ করা হইয়াছে। মন্ত্রিমণ্ডল গঠনের পর অনির্দিষ্ট কাল ব্যবস্থা-পরিষদের অধিবেশন আহ্বান স্থগিত রাখিয়া গবর্ণর এই দুর্নীতি দমনে অসমর্থ বা অনিচ্ছুক দলটিকে চাতুরি ও কনট্রাক্ট বিলি করিয়া চোরা-কারবারীদের সাহায্যে শক্তি সঞ্চয় করিবার সুযোগ দিয়াছেন। গবর্ণরের পক্ষে যুক্তি এই হইতে পারে যে মন্ত্রীদের পরামর্শ ভিন্ন তিনি পরিষদের অধিবেশন আহ্বান করিতে পারেন না, পরিষদের কার্যপ্রণালী মন্ত্রীরা প্রস্তুত করিয়া উঠিতে পারেন নাই বলিয়াই তাঁহারা পরিষদের বৈঠক বসাইবার তারিখ নির্দ্ধারণ করিতে পারেন নাই। এই কুযুক্তির ফাঁকি বাংলাদেশেই ইতিপূর্বে দেখা গিয়াছে। গত নির্বাচনের পর দুই মাসের মধ্যে কংগ্রেসী মন্ত্রিমণ্ডলসমূহ প্রত্যেক প্রাদেশিক পরিষদের অধিবেশন আহ্বান করিয়াছেন, শুধু বাংলায় ইহার ব্যতিক্রম কেন? যেখানে মন্ত্রিমণ্ডল গঠন প্রণালী সম্বন্ধেই দেশবাসীর মনে সন্দেহ রহিয়াছে সেখানে কি অবিলম্বে মন্ত্রীদের পরিষদের অধিবেশনে উপস্থিত হইতে বাধ্য করাই গণতান্ত্রিক নীতি সম্মত হইত?

গবর্ণর বারোজ কি মনে করেন যে মন্ত্রীদের সুপারিশে চোখ বুজিয়া সহি দেওয়াই নিয়মতান্ত্রিক গবর্ণরের কাজ? বর্তমানে দেশে যে শাসনপ্রণালী প্রচলিত আছে তাহা দৃশ্যত গণতান্ত্রিক হইলেও মূলত তাহা নহে। পরিষদের গঠনপ্রণালী গণতান্ত্রিক রীতি ও নীতি উভয়েরই সম্পূর্ণ বিরোধী। খাঁটি গণতন্ত্র কখনও শ্রেণী স্বার্থ, সাম্প্রদায়িক স্বার্থ প্রশ্রয় দেয় না। জনসাধারণের ভোটে ভৌগোলিক সীমাবদ্ধ নির্বাচন কেন্দ্র হইতে প্রতিনিধি নির্বাচনই প্রকৃত গণতন্ত্র। বঙ্গীয় ব্যবস্থা-পরিষদে আসন বণ্টনে সাম্প্রদায়িক ও শ্রেণীস্বার্থ সম্পন্ন সদস্য নির্বাচনের যে অপূর্ব ব্যবস্থা করা হইয়াছে তাহার সহিত গণতন্ত্রের কোন সম্পর্ক নাই। সাম্প্রদায়িক দলবিশেষের হাতে এই শাসনতন্ত্র অনুসারে শাসনক্ষমতা ন্যস্ত হইলে সম্প্রদায় নির্বিশেষে জনসাধারণের কি ভয়াবহ লাঞ্ছনা ঘটিতে পারে, গত দুর্ভিক্ষে তাহার জলন্ত দৃষ্টান্ত দেখা গিয়াছে। বর্তমান ভারতশাসন আইনের রন্ধ্রসমূহের সুযোগ লইয়া কোন স্বার্থপর গণতন্ত্র-বিরোধী দল যাহাতে প্রতিষ্ঠা লাভ করিতে না পারে গবর্ণর ইহাই করিবেন দেশবাসী এই আশাই ন্যায়সঙ্গতভাবে করিয়া থাকে।

সবচেয়ে বড় কথা পরিষদের ইংরেজ ভোট। বিদেশীদের ২৫টি ভোটের উপর লীগ মন্ত্রিমণ্ডলকে গতবারও নির্ভর করিয়া অস্তিত্ব বজায় রাখিতে হইয়াছে, এবারও তাহাই ঘটিতেছে। ইহার জন্য লীগমন্ত্রিগণকে ইংরেজ বণিকদের নিকট দেশের স্বার্থ কি ভাবে বিক্রয় করিতে হইয়াছে এবং এখনও হইতেছে তাহার বহু নিদর্শন প্রদর্শিত হইয়াছে। বাংলার জনসাধারণের নির্বাচিত প্রতিনিধিরা বাংলাদেশ শাসন করিবেন ইহাই গণতান্ত্রিক নীতি, বিদেশী বণিকের প্রিয়পাত্র একটি বিশেষ দল বিদেশীর ভোটে আত্মরক্ষা করিয়া শাসনদণ্ড পরিচালনা করিলে তাহা আর যাহাই হউক, গণতন্ত্র হয় না। গবর্ণর বারোজ প্রকৃত গণতন্ত্রানুরাগী হইলে মন্ত্রিমণ্ডল গঠনের অব্যবহিত পরে

মন্ত্রীদের ব্যবস্থা-পরিষদের সম্মুখীন হইতে বাধ্য করিয়া ইংরেজ ভোট ছাড়া ইহারা মেজরিটি পায় কি না তাহা দেখিতে চাহিতেন। আমেরিকা ব্রিটেনের সর্বস্ব বাঁধা রাখিয়া টাকা ধার দিয়াছে, এই ঋণদানের সময় ব্রিটিশ পার্লামেণ্টের এক দশমাংশ আসন দাবি করিয়া সেখানে ৬০ জন আমেরিকান বসাইয়া তাঁহাদের জোরে চার্চিল দলকে মন্ত্রীত্বে বহাল রাখিলে গবর্ণর-ব্যারোজ কি তাহাকেও ডিমোক্রাসী বলিয়া অভিহিত করিতেন?

কর্তব্য কার্য সম্পাদনে পুলিসের অবহেলা

গত কয়েক বৎসরে বাংলাদেশে পুলিসের যে অবনতি হইয়াছে অন্য কোথাও তাহার তুলনা মিলিবে কি না সন্দেহ। কর্তব্য কার্যে অবহেলা, নিরীহদের উপর অত্যাচার, সুযোগ প্রাপ্তি মাত্র ঘুষ আদায়, দরিদ্রের স্বার্থের প্রতি নিষ্ঠুর ঔদাসীন্য বাংলার পুলিশের মজ্জাগত হইয়া উঠিতেছে এবং ইহার কোন প্রতিকার নাই। কোন কোন ক্ষেত্রে পুলিস সাধারণ গুণ্ডার ন্যায় দলবদ্ধভাবে গ্রামে হানা দিয়া গরীবের উপর অমানুষিক অত্যাচার করিয়াছে এরূপ সংবাদও প্রকাশিত হইয়াছে এবং উহারও কোন প্রতিকার বা যথাযোগ্য তদন্ত হয় নাই। সারাটা দেশ যেন অরাজক হইয়া উঠিয়াছে। ফরিদপুর জেলার চিকন্দী মহকুমা কংগ্রেস কমিটির সভাপতি বিশিষ্ট কংগ্রেসকর্মী শ্রীযুক্ত নিখিলরঞ্জন গুহ রায় পুলিস কর্তৃক কর্তব্যে অবহেলার যে দৃষ্টান্ত ১৮ই আষাঢ় তারিখের দৈনিক "ভারতে" প্রকাশ করিয়াছেন তৎপ্রতি পুলিসের ইনস্পেক্টর-জেনারেলের দৃষ্টি আকৃষ্ট হইয়াছে কি না আমরা জানি না। পুলিশের অধঃপতন যে কতখানি হইয়াছে আলোচ্য পত্রটি তাহার একটি প্রকৃষ্ট নিদর্শন। পত্রখানি এইরূপ:

> ফরিদপুর জিলার অন্তর্গত গোঁসাইরহাট থানার অধীন ইদিলপুর পরগণাতে চুরি, ডাকাতি, মেয়েচুরি, খুন ইত্যাদি দৈনন্দিন ব্যাপার হইয়া দাঁড়াইয়াছে, কোন সরকারী প্রতিকার না হওয়ায় দেশবাসীর মান, ইজ্জত, ধনপ্রাণ সমস্তই আজ বিপন্ন। উদাহরণ-স্বরূপ একটা জোড়া খুন সম্বন্ধে জানান হইল। সাত মাস পূর্বে দাসের-জঙ্গল গ্রামে (ইদিলপুর) বিগত ২৫শে নবেম্বর রাত্রি অনুমান সাড়ে ৮ ঘটিকার মধ্যে বসন্ত কাহালী নামক জনৈক ভদ্রলোকের গৃহে এক বৃদ্ধা মহিলা ও এক তরুণীকে কে বা কাহারা অতি বীভৎস রকমে হত্যা করে কিন্তু আজ পর্যন্ত এই খুনের কোন হদিশ মিলে নাই। যাহাদিগকে সন্দেহ-ক্রমে গ্রেপ্তার করা হইয়াছিল তাহাদিগকেও ছাড়িয়া দেওয়া হইয়াছে। স্থানীয় জনসাধারণের অভিযোগ এই যে, গোঁসাইরহাট থানার পুলিস, পালং সার্কেলের সার্কেল ইন্সপেক্টার কিম্বা সংশ্লিষ্ট পুলিস কর্মচারিগণ কোন অজ্ঞাত কারণে এই খুনের যথোপযুক্ত তদন্ত করেন নাই। এই হত্যা সম্পর্কে স্থানীয় পুরুষ ও মহিলাগণ নিম্ন হইতে উচ্চতম কর্তৃপক্ষের নিকট যুক্তভাবে আবেদন করিয়াছেন, জনগণ সাধারণ সভা ডাকিয়া এই ভয়াবহ ঘটনার তদন্ত ও প্রতিকার প্রার্থনায় নিম্ন হইতে উচ্চতম কর্তৃপক্ষের নিকট প্রস্তাব পাঠাইয়াছেন এবং এতদ্ব্যতীত বাংলা গবর্মেণ্ট ও উচ্চতর কর্তৃপক্ষের নিকট বহু টেলিগ্রাম ও আবেদন করা হইয়াছে। দেশবাসীর অভিযোগ এই যে, দাসের-জঙ্গল গ্রাম হইতে (ঘটনাস্থল) গোঁসাইরহাট থানা দুই মাইলের বেশী হইবে না, রাত্রি ১০ ঘটিকার সময় এই হত্যার সংবাদ থানায় দেওয়া সত্ত্বেও থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মচারী পরদিন বেলা অনুমান ১০ ঘটিকার পরে ঘটনাস্থলে আসিয়া প্রাথমিক রিপোর্টে খুনের সময় রাত্রি ৮৷৹টার পরিবর্তে রাত্রি সাড়ে ১১ ঘটিকা লিখিলেন এবং তিনি রাত্রি ৪ ঘটিকাতে ঘটনাস্থলে আসিয়াছেন এই মিথ্যা বর্ণনাতে দস্তখত করিতে এজাহারকারী ও অন্যান্য লোককে তাহাদের আপত্তি সত্ত্বেও বাধ্য করিলেন। উপযুক্ত তদন্তের দ্বারা প্রয়োজনীয় সাক্ষ্য প্রমাণ সংগ্রহের চেষ্টা পুলিস কর্মচারিগণ করেন নাই। অর্থাৎ মাটিতে হত্যাকারীদের পদচিহ্নের ছাপ নেওয়া অথবা হত্যার পরেই যে সকল গ্রামবাসী ও প্রতিবেশীগণ ঘটনাস্থলে আসিয়াছিলেন তখন তাঁহাদের নিকট হইতে কোন তথ্য সংগ্রহ কিছুই তাঁহারা করেন নাই। পুলিস কর্তৃক ধৃত যুবকদ্বয় প্রতিবেশী যে বিধবার গৃহে ছিল ও তথায় যে রক্তমাখা কাপড় পাওয়া গিয়াছিল পুলিশ তাহা লইয়া যায় নাই এবং সন্দেহভাজন স্ত্রীলোক ও পুরুষদের গৃহে পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে তল্লাসী হয় নাই। যাহারা এই খুনের সঙ্গে জড়িত বা যে লোক এ সম্বন্ধে আলোকপাত করিতে পারে পুলিস তাহাদের সম্বন্ধে গভীর ঔদাসীন্য দেখাইয়াছে। ইদিলপুর জনহিতৈষী সমিতির পক্ষ হইতে ১০খানা টেলিগ্রাম বাংলা গবর্মেণ্টের ও সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের নিকট পাঠান হইয়াছিল। এই হত্যাকাণ্ড সম্বন্ধে পুলিশের কর্তব্যে অবহেলা ও তদন্ত প্রহসন অতি রহস্যাচ্ছন্ন। দেশবাসীর বিশ্বাস, এই হত্যাকাণ্ডের প্রকৃত রহস্য বহু পূর্বেই বহুলাংশে প্রকাশ পাইয়াছে কিন্তু তথাপি সুদীর্ঘকাল ইহা চাপা পড়িয়া আছে।

বাংলা-সরকারের খাদ্য উপদেষ্টা কমিটি

বাংলাদেশের জন্য একটি সুব্যবস্থিত খাদ্যনীতি প্রণয়নের উদ্দেশ্যে বাংলা-সরকার অবিলম্বে বিভিন্ন বণিক সঙ্ঘ, কংগ্রেস, লীগ, কমিউনিষ্ট, হিন্দু মহাসভা প্রভৃতি রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধি এবং সরকারী কর্মচারী ও বিশিষ্ট কয়েকজন নাগরিককে লইয়া একটি খাদ্য উপদেষ্টা কমিটি গঠনের সংকল্প করিয়াছেন। এই কমিটি খাদ্য সংগ্রহ মজুত এবং বণ্টন সম্পর্কে সরকারকে পরামর্শ দিবেন। দুর্ভিক্ষ নিবারণের উদ্দেশ্যে সরকার যে ব্যবস্থা অবলম্বন করিবেন তৎপ্রতি জনসাধারণের সহানুভূতি ও সহযোগিতা আকর্ষণ এবং চোরাকারবার দমনে সরকারের

সহায়তা করা এই কমিটির কাজ হইবে। কমিটিতে কলিকাতার মেয়র, মিঃ ইস্পাহানী, শ্রীযুক্ত নলিনীরঞ্জন সরকার, পাঁচটি জেলাবোর্ড ও মিউনিসিপালিটির চেয়ারম্যান, বেঙ্গল চেম্বার, ইণ্ডিয়ান চেম্বার ও মুসলিম চেম্বার অব্ কমার্সের একজন করিয়া প্রতিনিধি, কংগ্রেস ও মুসলিম লীগের চারি জন করিয়া প্রতিনিধি, তপশীলী সম্প্রদায়, কমিউনিষ্ট দল, হিন্দু মহাসভা, শ্রমিক দল ও ইউরোপীয় দলের একজন করিয়া প্রতিনিধি থাকিবেন। সরবরাহ বিভাগের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী কমিটির চেয়ারম্যানের কাজ করিবেন।

এই কমিটি গঠনে বাংলাদেশের কোনও বিশেষ উপকার হইবে তাহা বলা চলে না। বাংলা-সরকারকে পরামর্শ দান ভিন্ন কমিটির আর কোন দায়িত্ব থাকিবে না; প্রদত্ত পরামর্শ মানিয়া চলিতে সরকার বাধ্য থাকিবেন কি না সে সম্বন্ধে কোন কথাই তাঁহারা বলেন নাই। কমিটির মত মনঃপূত না হইলেই মন্ত্রীরা উহা বর্জন করিবেন ইহাতে সন্দেহের কোন কারণ আমরা দেখিতেছি না।

দুর্ভিক্ষ নিবারণে সর্বদলীয় মন্ত্রিসভা যথেষ্ট সাহায্য করিতে পারে গত দুর্ভিক্ষের প্রাক্কালে তাহা উপলব্ধি করিয়াই দেশের লোক উহা দাবি করিয়াছিল। বর্তমান প্রধানমন্ত্রী মিঃ সুরাবর্দিও এই দাবি সমর্থন করিয়াছিলেন এবং সর্বদলীয় মন্ত্রিসভা গঠনের কপট প্রতিশ্রুতি দিয়াই গবর্ণর হার্বার্ট মৌলবী ফজলুল হকের পদত্যাগপত্র আদায় করিয়া ইংরেজ দলের ভোটের জোরে লীগকে মন্ত্রীর গদীতে বসাইয়াছিলেন। যে লীগ নায়কেরা সর্বদলীয় মন্ত্রিসভা গঠনের দাবিতে মৌলবী ফজলুল হককে অস্থির করিয়া তুলিয়াছিলেন, মন্ত্রীর মসনদে আরোহণ করিয়া তাঁহারাই উহা পরিহার করেন। ফলে দুর্ভিক্ষের তীব্রতা হ্রাসের যেটুকু উপায় হইতে পারিত তাহাও সম্ভব হইল না। উডহেড কমিশনও স্বীকার করিয়াছিলেন যে সর্বদলীয় মন্ত্রিসভা গঠিত হইলে দুর্ভিক্ষ নিবারণের চেষ্টা আরও ব্যাপক ও গভীর হইতে পারিত, লীগ নায়কদের বাধা দানের জন্য তাহা সফল হয় নাই। এবারও আসন্ন দুর্ভিক্ষের মুখে সর্বদলীয় মন্ত্রিমণ্ডল গঠনের দাবি উঠা সত্ত্বেও মিঃ সুরাবর্দী উহা সর্বতোভাবে এড়াইয়া চলিয়াছেন। পরামর্শ দাতা কমিটির যে রূপ প্রকাশিত হইয়াছে তাহাতে উহার পক্ষে সরকারের অক্ষমতা ও দুর্নীতি পোষণ দুইটির কোনটিই রোধ করা তো দূরের কথা, হ্রাস করাও সম্ভব হইবে না।

যুদ্ধের সময়ে ও যুদ্ধের পরে চাউলের দর

যুদ্ধের সময়ে ও যুদ্ধের পরে বাংলার কোন্ কোন্ জেলায় চাউলের দর কি ভাবে বাড়িয়াছে "যুগান্তর" তাহার একটি হিসাব দিয়াছেন। যুগান্তর লিখিতেছেন :

১৯৪৪ সালের আগষ্ট মাসে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ পুরাদমে চলিতেছে। যুদ্ধের সময় স্বভাবতই জিনিষপত্র দুর্মূল্য হইয়া থাকে। কিন্তু দীর্ঘকাল যুদ্ধ শেষ হইয়া গেলেও আজিকার বাংলার দ্রব্য-মূল্য যে কোন দিক দিয়াই হ্রাস পায় নাই তাহা প্রত্যেকেই উপলব্ধি করিতেছেন। ১৯৪৪ সালের আগষ্ট মাসে এই প্রদেশের বিভিন্ন অঞ্চলে বাঙালীর প্রধান খাদ্য চাউলের দর কোথায় কিরূপ ছিল এবং ঐ সমস্ত অঞ্চলে বর্তমানে চাউলের মূল্য কি দাঁড়াইয়াছে নিম্নে তাহার একটি তুলনামূলক হিসাব দেওয়া হইল। এই হিসাব হইতে দেখা যাইবে যে, যুদ্ধকালীন অবস্থা অপেক্ষা বাঙালী আজ অধিকতর শোচনীয় অবস্থায় পড়িয়াছে।

১৯৪৪—ঘ

	টাকা প্রতি	
	সের	ছটাক
২৪ পরগণা	২	৭
ফেণী	২	১০
সিরাজগঞ্জ	২	৭
মুন্সীগঞ্জ	২	১৪
নারায়ণগঞ্জ	২	১২
ফরিদপুর	২	৮
জলপাইগুড়ি	৩	১
হাওড়া	২	৭
যশোহর	৩	৩
টাঙ্গাইল	২	১০
নোয়াখালী	২	১২

১৯৪৬—জুন

	টাকা প্রতি	
	সের	ছটাক
২৪ পরগণা	১	১১
ফেণী	১	৪
সিরাজগঞ্জ	১	১০
মুন্সীগঞ্জ	১	৫
নারায়ণগঞ্জ	১	৮
ফরিদপুর	১	৫
জলপাইগুড়ি	২	০
হাওড়া	১	১৩
যশোহর	১	১৩
টাঙ্গাইল	২	৩
নোয়াখালী	১	২

শুধু চাউল নয়, জীবনযাত্রার প্রত্যেকটি দ্রব্য এখনও দুর্মূল্য এবং দুষ্প্রাপ্য। যুদ্ধের চাহিদা মিটিয়াছে, বিদেশী সৈন্যদের অধিকাংশই চলিয়া গিয়াছে, মালগাড়ী চলাচল প্রায় স্বাভাবিক হইয়া আসিয়াছে, তৎসত্ত্বেও কয়লা হইতে সুরু করিয়া গোলআলু পর্যন্ত প্রত্যেকটি জিনিষ এখনও অগ্নিমূল্য হইয়া রহিয়াছে। সরবরাহের ভার যাঁহাদের উপর দেশের

দরিদ্র ও মধ্যবিত্ত লোকদের দুর্দশার প্রতি তাঁহাদের দৃষ্টি যুদ্ধের সময়েও ছিল না, এখনও নাই।

সরকারী অব্যবস্থার জন্য যশোহর জেলার দুর্দশা

সরকারী সরবরাহ ও বণ্টনের অব্যবস্থায় যশোহর জেলার অধিবাসীদের কি দুর্দশা হইয়াছে 'যুগান্তরে'র নিজস্ব সংবাদদাতা তাহার বিবরণ দিয়াছেন। বাংলা-সরকার কয়েকটি ঘাট্‌তি অঞ্চলকে বাড়তি বলিয়া ঘোষণা করিয়া ভুল ধারণার সৃষ্টি করিয়াছেন এবং স্থানীয় অধিবাসীদের এই ভুলের প্রায়শ্চিত্ত করিতে হইতেছে। যশোহর জেলাকে বাড়তি অঞ্চলের অন্তর্ভুক্ত করা হইয়াছে। সংবাদদাতা জানাইয়াছেন যে আমলাদের দেওয়া ভুল তথ্যের উপর নির্ভর করিয়াই এই ঘোষণা করা হইয়াছে। আসলে গবর্মেণ্টের নিকট বর্তমান বৎসরের উৎপন্ন ফসলের কোন হিসাব নাই। কত জমিতে চাষ হইয়াছিল তাহার হিসাব আছে। গত ফসল স্বাভাবিক বৎসরের মত হইলে ২১,৯৫,২৭৮ মণ ধান উদ্বৃত্ত হইতে পারিত কিন্তু অনাবৃষ্টি ও অন্যান্য প্রাকৃতিক দুর্যোগের জন্য গত ফসলের ভয়ানক ক্ষতি হইয়াছে এবং তাহার ফলে ধান উদ্বৃত্ত হওয়া তো দূরের কথা ৪৬,২১,৫১৬ মণ কম পড়িয়াছে। সংবাদদাতার হিসাব এইরূপ :

মহকুমা	কর্ষিত জমির পরিমাণ	স্বাভাবিক বৎসর হইলে উৎপন্ন হইত	শতকরা কত ভাগ ফসল নষ্ট হইয়াছে	ফলে মোট ফসলের পরিমাণ দাঁড়াইয়াছে
সদর	৩১২৭৭৯ একর	৪৮০৯২৪৪ মণ	৪০ ভাগ	২৮৮৫৫৭১·৯ মণ
বনগ্রাম	২৪৯১৫৮ একর	৩১৩৪৭৪১ মণ	৪০ ভাগ	১৮৮০৮৪৪·৬ মণ
ঝিনাইদহ	২৫২২৬৮ একর	৩৬৮২৪৭৬ মণ	২৫ ভাগ	২৭৬১৮৫·৭ মণ
নড়াইল	১৬৭২৪৩ একর	২৮২৬৪৪ মণ	৬০ ভাগ	৯৭০৫৭৫·৪ মণ
মাগুড়া	১৭৭৫৮০ একর	২৫২৩৯৭৫ মণ	৫০ ভাগ	১২৬১৯৪৭·৫ মণ
মোট	১১৫৮৯৭৮ একর	১৬৫৭৭৬৩০ মণ		৯৭৬০৪৩৬·৪ মণ

যশোহর জেলার লোকসংখ্যা হইতেছে ১৭,৯৭,৭৯৪ জন এবং গড়ে মাথা প্রতি বৎসরে খাওয়া এবং বীজ ধানের জন্য ৮ মণ করিয়া ধরিলে বৎসরে যশোহর জেলাবাসীর প্রয়োজন মোট ১,৪৩,৮২,৩৫২ মণ। কিন্তু সঠিক হিসাবে উৎপন্ন হইয়াছে ৯,৭৬,০৪,৩৬৮ মণ ধান। সুতরাং ঘাট্‌তি পড়িয়াছে মোট ৪৬,২১,৫১৬ মণ ধান। গবর্মেণ্ট গত ফসলের ক্ষতির কোনও হিসাব না করিয়া জেলাকে বাড়তি বলিয়া ঘোষণা করায় যশোহরবাসী এক ভীষণ বিপদের সম্মুখীন হইয়াছে। গবর্মেণ্টের খাদ্য সংগ্রহ বিভাগ এ পর্যন্ত ৫১,৬৪২ মণ ধান যশোহর হইতে ক্রয় করিয়াছেন তন্মধ্যে ৩৫,৬৪২ মণ ধান তাঁহারা অন্য জেলায় প্রেরণ করিয়াছেন। আরও কত প্রেরণ করিবেন তাহা জানা যায় নাই।

আমরা বিশ্বস্তসূত্রে অবগত হইলাম যে, কিছু পরিমাণ চাউল যশোহরের সিভিল সাপ্লাই ডিপার্টমেণ্ট বাহির হইতে যশোহরে আনয়ন করিয়াছেন, তাহা বাদে খুলনা জেলা হইতে চোরাকারবারীদের দ্বারা আনীত প্রায় ১২ হাজার মণ চাউল ধরা হইয়াছে, এবং খাদ্য সংগ্রহ বিভাগ হইতে ১৬,০০০ মণ ধান সিভিল সাপ্লাই বিভাগ পাইয়াছেন, ফলে তাঁহাদের ষ্টকে নাকি ৬৫,০০০ মণ চাউল আছে। যশোহর জেলায় মোট প্রায় চারি মাসের ঘাট্‌তি আছে, ইহার প্রমাণ গত মার্চ মাস হইতেই চাউলের দর জেলায় বাড়িতে আরম্ভ করে। তখন হইতে গবর্মেণ্ট কিছু চাউল কন্‌ট্রোল দরে ছাড়েন, ফলে সাময়িক ভাবে কিছু দর কমিতে থাকে। মে মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহ হইতে গবর্মেণ্টের চেষ্টা সত্ত্বেও প্রতিটি হাটে চাউলের দর ভীষণভাবে বাড়িয়াই চলিয়াছে। প্রথমে ১০ টাকা হইতে বাড়িতে বাড়িতে আজ ২০ টাকায় আসিয়া দাঁড়াইয়াছে। হিসাব লইয়া দেখা গিয়াছে, বর্তমানে গড়ে শতকরা পাঁচ জনের বেশী লোকের ঘরে অতিরিক্ত চাউল নাই; বাকী প্রায় সবাইকে চাউল কিনিতে হইতেছে। নূতন ফসল উঠিতে এখনও আড়াই মাস বাকী, অন্ততঃ গবর্মেণ্টকে বর্তমানে দুই মাসের খাদ্য লইয়া দুর্ভিক্ষ নিবারণের চেষ্টা করিতে হইবে। দুই মাসের খাদ্য হইতেছে ২৩,৯৭,০৫৪ মণ ধান। তাই দেখা যাইতেছে গবর্মেণ্ট ৬৫,০০০ মণ চাউল লইয়া কিছুই করিতে পারিবে না। গবর্মেণ্টের পরিকল্পনা ছিল যে, দাম বাড়িলেই কিছু চাউল কন্‌ট্রোল দরে ছাড়া হইবে, ফলে দাম পড়িয়া যাইবে কিন্তু বর্তমানে এই পরিকল্পনা সম্পূর্ণভাবে ব্যর্থ হইয়াছে। গবর্মেণ্টের ভাল ষ্টক না থাকার জন্য চোরাবাজারকে বাধা দিতে পারিতেছেন না। যশোহরে এবং বনগ্রামে তাহারা চোরাবাজারে চাউল ১৭ টাকা হইতে ১৯ টাকায় বিক্রয় হইলে বাধা দিবেন না ঠিক করিয়াছেন। আজ বহু গ্রামে গরীব ক্ষেতমজুর, তন্তুবায়, মৎস্যজীবী, কৃষকদের মধ্যে ব্যাপক অনশন সুরু হইয়া গিয়াছে।

খাতকদের দুরবস্থা

কৃষকেরা কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্ক হইতে টাকা ধার করিয়াও কিভাবে মহাজনের বাড়া সুদ দিয়াও বিপদগ্রস্ত হইতেছে তাহার একটি নিদর্শন "নবযুগে" ২৬শে আষাঢ় তারিখের

সংখ্যায় প্রকাশিত হইয়াছে। ঢাকা জেলার অন্তর্গত লেবুতলা ইউনিয়ন বোর্ডের অন্তর্ভুক্ত মৌলবী কেরামত আলি নিম্নলিখিত পত্রটি লিখিয়াছেন :

"ঢাকা জেলার মনোহরদী থানার বহু দরিদ্র কৃষক প্রায় ২০ বৎসর পূর্বে নারায়ণগঞ্জ সেন্‌ট্রাল কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্ক হইতে ঋণ গ্রহণ করিয়াছিল। তাহারা এককালীন ঐ ঋণ পরিশোধ করিতে না পারিয়া প্রতি বৎসরই কিছু কিছু টাকা ওয়াশীল দিয়াছে; কিন্তু সম্পূর্ণ ঋণ পরিশোধ না হওয়ায় তাহারা ঋণ-শালিসী বোর্ডের আশ্রয় গ্রহণ করিতে বাধ্য হয়। উক্ত ঋণ আদায় ও মীমাংসার জন্ত 'মনোহরদী সেন্‌ট্রাল কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্ক স্পেশাল সালিশী বোর্ড' নামে এক বোর্ড বসিলে অনেকে সালিশী বোর্ডের নিকট না গিয়া জমি বন্ধক দিয়া বা জমি বিক্রয় করিয়া অতিকষ্টে একসঙ্গে হাল সনের সুদ সহ আসল ঋণ পরিশোধ করিয়াছে। ১৩৫০ সনের ভীষণ দুর্ভিক্ষ ও মহামারীর ফলে দরিদ্র জনসাধারণ বকেয়া সুদ পরিশোধ করিতে পারে নাই। এবারও লোকের অবস্থা অত্যন্ত শোচনীয়। এমতাবস্থায় কর্তৃপক্ষ বিশেষ অনুগ্রহ করিয়া বকেয়া সুদ সম্পূর্ণ রেহাই না দিলে হতভাগ্য খাতকগণের মুক্তির কোনই উপায় নাই। অতএব যে সকল খাতক এ পর্য্যন্ত বিভিন্ন তারিখে সুদসহ আসল ঋণের দ্বিগুণ পরিশোধ করিয়াছে বা করিবে, তাহাদিগকে উক্ত ঋণের সকল দায় হইতে অব্যাহতি দিবার জন্ত এবং সেন্‌ট্রাল ব্যাঙ্ক কোন অবস্থাতেই গ্রাম্য ব্যাঙ্ক ও খাতকগণের নিকট হইতে যাহাতে সুদসহ আসল ঋণের দ্বিগুণের অধিক দাবি করিতে না পারে, তাহার ব্যবস্থা করিবার জন্ত বঙ্গীয় সমবায় বিভাগের মাননীয় মন্ত্রীর নিকট অনুরোধ জানাইতেছি।"

মহাজনী আইন অনুসারে মহাজনেরা সুদে আসলে ঋণ দেওয়া টাকার দ্বিগুণের বেশী আদায় করিতে পারে না। ব্যাঙ্কগুলি এই আইনের অন্তর্ভুক্ত নহে এই সুযোগে কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্ক পর্য্যন্ত আসলের চেয়ে বেশী সুদ আদায় করিতেছে ইহা সমবায় ঋণদান নীতির সম্পূর্ণ বিরোধী।

গ্রামাঞ্চলে ঘুষের জাল

লীগ মন্ত্রিত্ব ও সিভিলিয়ানী রাজত্বের দৌলতে বাংলার গ্রামে গ্রামে ঘুষের জাল বিস্তৃত হইয়াছে এবং গ্রামবাসীদের পক্ষে উহা অতি ভীষণ অত্যাচারের কারণ হইয়া উঠিয়াছে। প্রিভেণ্টিভ অফিসার, পেট্রোল অফিসার, স্মাগল অফিসার, মুরগী অফিসার প্রভৃতি সহস্রবিধ 'অফিসার' লীগের দৌলতে সৃষ্টি হইয়া দলের পুষ্টিসাধন চলিতেছে এবং পুলিসের সহিত যোগাযোগে ইহাদের অত্যাচারে গ্রামের দরিদ্র ও মধ্যবিত্ত নিরীহ জনসাধারণ অতিষ্ঠ হইয়া উঠিতেছে। খানাতল্লাসীর নামে হয়রানির ভয় দেখাইয়া ঘুষ আদায়ই ইহাদের প্রধান কাম্য। শুধু পুলিস নয়, রেল ষ্টেশন ও ষ্টীমার ঘাটের কুলি, রেলের টিকিট কালেক্টার প্রভৃতির সহিতও ইহাদের হরর মত যোগাযোগ আছে। ট্রেন হইতে মাল নামাইয়া দুই টাকা মজুরি হাঁকিয়া কুলি মোট মাথায় তোলে, টিকিট কালেক্টারের নিকটবর্তী হইলেই কর্তব্যপরায়ণ টিকিট কালেক্টার তৎক্ষণাৎ মোট নামাইতে হুকুম দেন, কর্তব্যপরায়ণ প্রিভেণ্টিভ অফিসার, পেট্রোল অফিসার প্রভৃতি বর্ষার বারিবর্ষণের স্তায় প্রচুর সংখ্যায় উপস্থিত হন, ও দিকে ট্রেন বা ষ্টীমার ছাড়ে ছাড়ে। যাত্রীর পক্ষে ইহাদের প্রত্যেককে তুষ্ট করা ভিন্ন উপায়ান্তর থাকে না।

রাজসাহী জেলার আহসানগঞ্জ ইউনিয়ন বোর্ডের প্রেসিডেণ্ট মৌলবী সৈয়দ আলি মোল্লা নামক একজন গ্রাম্য মুসলমান এ বিষয়ে তাঁহার অভিজ্ঞতার কথা প্রকাশ করিয়াছেন। গ্রাম্য সরলতাপূর্ণ তাঁহার পত্রখানি অবিকল নিম্নে উদ্ধৃত হইল :

> রাজশাহী জেলার আত্রাই ষ্টেশনের নিকট আত্রাই নদীতে একজন পেট্রোল অফিসার আছেন। তিনি তিনজন ওয়াচম্যান ও তিনজন মাঝি লইয়া একটি বোটে অবস্থান করেন। অফিসার মহাশয় স্বয়ং প্রায়ই বোটে থাকেন না; সুতরাং তাঁহার অনুপস্থিতিতে ওয়াচম্যানগুলিই পেট্রোল অফিসাররূপে অর্ডার জারি করেন। কোন্ নৌকায় কি আছে, কোন্ নৌকায় রেজিষ্ট্রেশনের মাল থাকা সম্ভবপর, কোন্ নৌকা উজানী বা ভাটালী ইত্যাদি কিছুই বিচার না করিয়া সমস্ত নৌকা ঘাটে ভিড়ানর অর্ডার জারি করেন, এবং যে নৌকার দিকে একবার দৃষ্টি মেলিয়া চাহিলেই সমস্তই চোখে পড়ে এমন নৌকাও আটকাইয়া রাখা হয় এবং পাটাতনের উপর পাকা কাঁঠাল বোঝাই নৌকাগুলি আটকাইয়া রাখা হয় এবং কাঁঠাল ডাঙায় নামানোর অর্ডার দেন। অথচ মুক্ত দিবালোকে সমস্ত দেখা যায় যে, অপরাধমূলক কোন মাল নৌকায় প্রায় নাই, অবশ্য কাঁঠালের ভিতরের সম্বন্ধে জানা নাই। নোয়াখালি, বরিশাল হইতে উজানী প্রকাণ্ড নারিকেলের নৌকার সমস্ত নারিকেল নামাইতে অর্ডার করেন। তবে দেখুন, এক একটি নারিকেলের নৌকায় ৮০।৯০ হাজার নারিকেল থাকে তাহা ডাঙায় নামান কি করিয়া সম্ভবপর হইবে? মটকী বোঝাই গুড় নৌকা দিয়া যাইতেছে অথচ মটকীর দানা গুড় মাটিতে ঢালিয়া মটকী সার্চ্চ করিবেন। এইরূপ শত অত্যাচরিত বেপারীগণ নিরুপায় হইয়া, আমি স্থানীয় প্রেসিডেণ্ট হেতু আমার নিকটে আসিয়া নালিশ জানায়। আমি নিঃসন্দেহমূলক নৌকাগুলি সার্চ্চ না করিতে বহুবার অনুরোধ করিয়াছি; কিন্তু কর্ণপাত করেন নাই।
>
> প্রপীড়িত লোকগণের ও বেপারীদের দ্বারা জ্বালাতন হইয়া আমি বাংলা-সরকারের নিকট ইহার বিহিত ব্যবস্থার কামনা করি। দ্রষ্টব্য থাকে, যে ব্যাপারী বাম হস্তের ব্যবহারের সুদক্ষ ট্রেনিংপ্রাপ্ত, তাহার নৌকা আটকাইয়া রাখা বা মাল নামান হয় না।

শাহ্‌জাদা দারাশুকোর জীবন-কাহিনী

শ্রীকালিকারঞ্জন কানুনগো

দ্বিতীয় অধ্যায়

মাতৃবিয়োগ এবং বিবাহ

১

১৬৩০ খ্রীষ্টাব্দের ১লা মার্চ হইতে সম্রাট্ শাহ্‌জাহান বিদ্রোহী খান্-জাহান লোদীকে দমন এবং দাক্ষিণাত্যবিজয় অভিযান পরিচালনা করিবার জন্য সুবা খান্দেশের রাজধানী বুরহানপুর শহরে বৎসরাধিক কাল বিজয়-স্কন্ধাবার স্থাপন করিয়া আছেন; সাম্রাজ্যলক্ষ্মীস্বরূপা মমতাজ দারা জাহানারা ইত্যাদি পুত্রকন্যাগণ সহ আগ্রা হইতে তাঁহার সঙ্গেই আসিয়াছিলেন। শাহ্‌জাহানের সৌভাগ্য-সূর্য্য তখন মধ্যাহ্ন রেখায় পৌঁছিয়াছে, মন তাঁহার আনন্দে ভরপুর, কোথাও দুশ্চিন্তার কালমেঘ নাই। বিজয়শ্রী দিল্লীশ্বরের রাজ্যপ্রভাকে দ্বিগুণ উদ্ভাসিত করিয়াছে। বিদ্রোহী খান্-জাহান নিহত না হইলেও জালবদ্ধ, নিজাম-শাহী স্বাধীনতা-সংগ্রাম ব্যর্থতায় পর্য্যবসিত, বিজাপুর-গোলকুণ্ডা মোগল বাহিনীর প্রতাপে কম্পমান। বুরহান-পুরের শাহী মহলে শাহ্‌জাহান দাক্ষিণাত্য জয়ের আশু সম্ভাবনায় উৎফুল্ল, মমতাজমহল প্রাপ্তবয়স্ক পুত্র দারা ও শুজার সুখনীড় রচনার স্বপ্নে বিভোর। পুত্রদ্বয়ের বিবাহ দেওয়ার জন্য মমতাজের ব্যগ্রতা দেখিয়া শাহান্‌শাহ্ তাঁহার পরলোকগত জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা সুলতান পরবেজের কন্যার সহিত শাহ্‌জাদা দারা এবং ইরানের শাহীবংশীয় রস্তম মীর্জ্জার কন্যার সহিত শুজার সম্বন্ধ স্থির করিলেন। বাগদান সম্পূর্ণ হইল, মমতাজ বিবাহের আয়োজনে ব্যতিব্যস্ত হইয়া পড়িলেন। বিবাহের অলঙ্কার তৈজসপত্র প্রস্তুত করিবার তাগিদে আগ্রা এবং লাহোরের বাদশাহী কারখানা সরগরম হইয়া উঠিল। হিন্দুস্থানের যেখানে যাহা সর্ব্বোৎকৃষ্ট, তাহা সংগ্রহ করিবার জন্য সর্ব্বত্র উপযুক্ত লোক প্রেরিত হইল। গুজরাট, বেনারস, সুবে বাংলার মালদহ, সাতগাঁ, সোনারগাঁ, বন্দরের সেরা বন্দর সুরাট ইত্যাদি স্থান হইতে কাপড়চোপড় এবং হীরাজহরত খরিদ করিবার হুকুম হইল।*

২

এই আনন্দ ও কর্ম্মব্যস্ততার মধ্যে মঙ্গলবার ১৬ই জিলকাদ, ১০৪০ হিঃ (৬ই জুন ১৬৩১ খ্রীঃ) মমতাজ মহল শেষ শয্যা গ্রহণ করিলেন। ঐ দিন সকালবেলা হইতে পরের দিন অর্দ্ধরাত্রি পর্য্যন্ত চতুর্দ্দশ গর্ভের প্রসব যন্ত্রণা ভোগ করিয়া তিনি এক কন্যা প্রসব করিলেন। শাহ্‌জাহান মনে করিয়াছিলেন ইহা রাণীর গতানুগতিক ব্যাপার। কিন্তু প্রসবের পর অবস্থা আরও খারাপ হইল, আর আশা নাই বুঝিতে পারিয়া কন্যা জাহানারার দ্বারা তিনি স্বামীর নিকট সংবাদ পাঠাইলেন। শোকবিহ্বল সম্রাট, পুত্র কন্যা এবং পিতামাতার উপর মমতাজের হতাশ সকরুণ নিবদ্ধদৃষ্টি চক্ষুদ্বয় নিশাবসানের তিন ঘড়ী পূর্ব্বে চিরতরে মুদিত হইল।

দরবারী ঐতিহাসিকগণ শাহ্‌জাহানকে লইয়াই ব্যস্ত, সুতরাং মাতৃবিয়োগে দারার অবস্থা তাঁহারা লিপিবদ্ধ করেন নাই। সম্রাটের শোক মর্ম্মস্পর্শী ভাষায় দরবারী ইতিহাসে বর্ণিত হইয়াছে। সাত দিন তিনি রাজকার্য্য ত্যাগ করিয়াছিলেন। সুবিলাসী সম্রাট্ কয়েক বৎসর পর্য্যন্ত রঙীন বহুমূল্য পরিচ্ছদ, বিলাসব্যসন, সঙ্গীত, উৎসব-মজলিশ, এমন কি ঈদের দরবারও বর্জ্জন করিয়াছিলেন। মমতাজের শবদেহ প্রথমে তপতী (তাপ্তী) নদীর অপর পারে জৈনাবাদ উদ্যানে সমাহিত হইয়াছিল। ঐ স্থান হইতে কয়েক মাস পরে শবাধার আগ্রায় প্রেরিত হইবার পূর্ব্ব পর্য্যন্ত প্রতিদিন শাহ্‌জাহানের অশ্রুধারা অজস্র বর্ষণে মমতাজের কবর স্নিগ্ধ করিত। ইহার পরেও প্রত্যেক বৎসর জিলকাদ মাসে তিনি শাহী পোষাক ত্যাগ করিয়া সাত্ত্বিক কর্পূরধবল পরিচ্ছদ [লেবাস-ই-কাফুরী] ধারণ করিতেন। শাহ্‌জাহানের শোকের পরিমাপ করিতে গিয়া বৃদ্ধ আব্দুল হামিদ লাহোরী লিখিয়াছেন—আলা হজরতের গোঁফের মাত্র গোটা কুড়ি গাছা চুল পাকিয়াছিল, মমতাজের মৃত্যুর পর অল্পকালেই প্রায় সব সাদা হইয়া গেল।* তাজমহলের মিনার হইতে শাহানশাহ শাহ্‌জাহান এখনও চিরবিরহীর প্রেমের আজান দিতেছেন—"ভুলি নাই, ভুলি নাই, ভুলি নাই প্রিয়া।"

৩

বিশ বৎসর বয়সে মমতাজমহল শাহ্‌জাহানকে স্বামী-রূপে পাইয়া উনিশ বৎসর এক মাস ছয় দিন চক্রবাক মিথুনের অখণ্ড প্রণয় ভোগ করিয়াছিলেন। সর্ব্বসাকুল্যে তাঁহার চৌদ্দটি সন্তানসন্ততির মধ্যে মৃত্যুকালে সর্ব্বকনিষ্ঠ

---

* আমল-ই-সালেহ, মূল পৃ. ৫১১-৫১২ (Bib. Indic)

* বাদশাহনামা, প্রথম খণ্ড, পৃ. ৩৮৮

গোহর-আরা সহ সাত জন জীবিত ছিল। নগদ আশরফী, অলঙ্কার জহরত ইত্যাদিতে তিনি এক কোটি টাকার অধিক স্ত্রীধন রাখিয়া গিয়াছিলেন। মৃত্যুর পর সম্রাট্ ইহার অর্দ্ধেক দিলেন জ্যেষ্ঠা এবং প্রিয়তমা কন্যা জাহানারা বেগমকে এবং অপর অর্দ্ধাংশ অবশিষ্ট চারি পুত্র ও দুই কন্যার মধ্যে ভাগ হইল। শাহ্‌জাদীগণের শিক্ষয়িত্রী পরমবিদুষী রাজকার্য্য-নিপুণা ইরাণী মহিলা সিত্তি-উন্নিসা খানম অন্দর মহলের দেওয়ানখানার পেশকার (পেশদস্ত) এবং কুমারীগণের অভিভাবিকা নিযুক্ত হইলেন।

১৬৩২ খ্রীষ্টাব্দের ৯ই জুন বৃহস্পতিবার দুই প্রহর গতে, সুদীর্ঘ প্রবাসের পর সম্রাট্ শাহ্‌জাহান যথারীতি বিরাট শোভাযাত্রার সহিত রাজধানীতে প্রবেশ করিলেন। হস্তিপৃষ্ঠে শাহী তখ্‌তের পশ্চাদ্‌ভাগে উপবিষ্ট শাহজাদা দারা, অগ্রভাগে অর্দ্ধচন্দ্রলাঞ্ছিত (মাহচাহ-ই-রায়াৎ-ই আফর) মোগলের বিজয় কেতন, উভয় পার্শ্ব হইতে নিশারের জন্য বস্তাবন্দী দিনার দিরহম্ মুদ্রার স্বর্ণ ও রৌপ্য-বৃষ্টি। আড়াই বৎসর পূর্ব্বে (৩রা ডিসেম্বর, ১৬২৯ খ্রীঃ) এইরূপ সমারোহে মমতাজ মহলের সহিত সম্রাট্ জংযাত্রায় বহির্গত হইয়াছিলেন। শূন্য শাহীমহলে পদার্পণ করিয়া শাহ্‌জাহান বুঝিতে পারিলেন দিল্লীর বাদশাহী আজমীড় শরীফের বাৎসরিক মেলার "আড়াই দিনকা ঝোপ্‌রা"* বই কিছুই নয়। আগ্রায় প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া সম্রাট পুনরায় রাজকার্য্যে মনস্থির করিবার চেষ্টা করিলেন। কয়েক মাস পরে শাহ্‌জাদা দারা ও সুজার বিবাহের আয়োজন আরম্ভ হইল।

৪

রূপে গুণে মাতা মমতাজের প্রতিচ্ছবি জ্যেষ্ঠা শাহ্‌জাদী জাহানারা অন্যান্য ভ্রাতাভগ্নীগণের মাতৃস্থানীয়া,—জননীর প্রতিনিধি হইয়াছিলেন। শাহ্‌জাহানেরও ঐ অবস্থা, শাহান-শাহ্ বাকী জীবন এই কন্যাটির নিকট নাবালক সন্তানের যত্ন এবং মাতৃস্নেহ দাবি করিয়া বসিয়াছিলেন। জাহানারা চরিত্রগুণে দারাকেই সর্ব্বাপেক্ষা বেশী ভালবাসিতেন, ভ্রাতা ভগ্নী এক জন আর এক জনকে না দেখিয়া থাকিতে পারিতেন না। প্রাপ্তবয়স্ক হইলে মুসলমান সমাজে পুরুষ ও নারীর এমন কি ভ্রাতা ও ভগ্নীর অবাধ মেলামেশা নিষিদ্ধ ছিল। কথিত আছে, এই বাধা দূর করিবার জন্য সম্রাট আনুষ্ঠানিক ভাবে সে কালের রীতি অনুসারে জাহানারার গুলধৌত পাত্রস্থিত জল দারাকে পান করাইয়া-ছিলেন। জাহানারা এবং সিত্তি-উন্নিসা খানমের তত্ত্বাবধানে বিবাহের বিরাট আয়োজন কয়েক মাস ব্যাপিয়া চলিল। এই বিবাহে মোট ব্যয় বত্রিশ লক্ষ টাকার মধ্যে ষোল লক্ষ টাকা জাহানারা বেগম নিজের খাস তহবিল হইতে দিয়াছিলেন। বিবাহের লগ্ন নির্ণয় করিবার জন্য শাহানশাহ্ দরবারী হিন্দু ও মুসলমান জ্যোতিষীগণকে হুকুম দিলেন। হিন্দু জ্যোতিষ এবং যবন (ইউনানী) জ্যোতিষ মতে বর-কন্যার কোষ্ঠী বিচার করিয়া উভয় মতে সিদ্ধ শুভদিন ধার্য্য করা হইল।

এই দেশে হিন্দুদের মধ্যে যেমন বিবাহের পূর্ব্বদিন বরের বাড়ী হইতে "বস্ত্রালঙ্কার" কন্যার গৃহে প্রেরিত হয়, সেইকাল হইতে বর্ত্তমান পর্য্যন্ত মুসলমান সমাজে সাচখ বা হেনাবন্দী প্রেরণ করিবার প্রথা আছে। ১০৪২ হিজরীর ৮ই জমাদিউল-আওয়াল রবিবার [নবেম্বর ১৬৩২ খ্রীঃ] ১১ দণ্ড (ঘড়ী) গতে আগ্রার শাহী মহল হইতে সাচখের মিছিল বাহির হইল। নগদ একলক্ষ টাকা মূল্যের বস্ত্র অলঙ্কার ও অন্যান্য সামগ্রী লইয়া দেওয়ান-ই-কুল আল্লামা আফজল খাঁ, মীরবক্‌শী সাদিগ খাঁ, খান-ই-সামান মীর-জুমলা, মুসাবি খাঁ, প্রধান-সদর (মারাঠী "পণ্ডিত-রাও"), এবং পুরস্ত্রীগণের মধ্যে মমতাজ মহলের পিতৃষ্বসাগণ, মাতা ও তাঁহার জ্যেষ্ঠা ভগ্নী এবং সিত্তি-উন্নিসা খানম শাহ্‌জাদা পরবেজের হাবেলীতে উপস্থিত হইলেন। পরবেজের বিধবা পত্নী জাহানবানু বেগম অতি সমাদর এবং কামাল আদব কায়দা মাফিক তাঁহাদের সকলের যথোচিত অভ্যর্থনা করিলেন। বেগম সাহেবা প্রত্যেক আমীরের জন্য স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র বহুমূল্য লোভনীয় এবং নয়নপ্রীতিকর খেলাত নির্দ্দিষ্ট করিয়া বাহির বাড়ীতে পাঠাইয়া দিলেন। তাঁহার সুরুচি লৌকিকতা এবং বদান্যতায় এই ব্যাপার অতি সুষ্ঠুভাবে শাহী শান ও শৌকতের সহিত সুসম্পন্ন হইয়াছিল। মেয়ে উঠাইয়া আনিয়া বরের বাড়ীতেই সাধারণতঃ মোগল পরিবারে বিবাহ-শাদী হইত। এই জন্যই সম্রাটের শাশুড়ী এবং আত্মীয়াগণ "বস্ত্রালঙ্কারে"র সহিত মেয়ের বাড়ীতে গিয়াছিলেন; পরবেজের স্ত্রী তাঁহাদের সঙ্গে কন্যাকে বিদায় দিলেন। আসল বিবাহ সম্পন্ন হইয়াছিল ইহার তিন মাস পরে, কন্যাপক্ষে যৌতুক ইত্যাদিতে মোট ব্যয় হইয়াছিল দশ লক্ষ টাকা।

৫

বিবাহের দিন নিকটবর্ত্তী হইবার সঙ্গে সঙ্গে জাহানারা বেগম এবং তাঁহার "কার-ফর্‌মা"-(কর্ম্মাধ্যক্ষ)গণের ব্যস্ততায় শাহীমহল সরগরম হইয়া উঠিল। খরচ বাবদ শাহী খাজনা-খানা হইতে ষোল লক্ষ টাকা মঞ্জুর হইয়াছিল।

* আড়াই দিনের মস্ত তৈয়ারী ফকির মুশাফিরের কুঁড়েঘর, জনপ্রবাদ-কথিত আড়াই দিনে প্রস্তুত সুলতান ইলতুত্‌মিশের বিরাট্ মসজিদ নয়। [ওঝা-কৃত "রাজপুতানেকা ইতিহাস", Sarda's *Ajmer* P. 69]

শাহজাদী জাহানারার দরাজ নজর,—এত অল্প টাকায় মুখরক্ষা হয় না, এইজন্য নিজ তহবিল হইতে তিনি আরও ষোল লক্ষ টাকা খরচ করিলেন। ইতিহাসে এই টাকার একটা মোটামুটি হিসাব আছে; তবে মনে হয় খরচের পরেই বিবাহের ফর্দ্দ প্রস্তুত হইয়াছিল। মোট বত্রিশ লক্ষ টাকার একটা মোটা অংশ ব্যয় হইয়াছিল বাদশাহী দরবারের নজর-পেশকশ, আমীর-ওমরা, আত্মীয়-কুটুম্ব, গায়ক-বাদক, শাহী মহলের বাঁদী-গোলাম ইত্যাদির প্রাপ্য খেলাত উপহার ইনাম বখশীশের দফায়। বাদশাহী নজর নগদ এক লক্ষ টাকা, নিসার দশ হাজার এবং পেশকশের আসবাব ইত্যাদিতে খরচ হইয়াছিল এক লক্ষ পঞ্চাশ হাজার টাকা। পেশকশের হাতীর সোনার হাওদার উপর যে রাজছত্র বসান হইয়াছিল উহার মুক্তার ঝালর বাবদ খরচ সাতাত্তর হাজার টাকা। সম্রাট বিবাহ উপলক্ষ্যে প্রকাশ্য দরবারে কুমারের প্রণাম গ্রহণ করিয়া সরকারী তরফ হইতে শাহ্‌জাদাকে যে খেলাত দিবেন উহাও বিবাহের সরকারী খরচের মধ্যে ধার্য্য ছিল। এই খেলাতের জন্য একটা মদ্দা হাতী, একটি মাদী হাতী—উহাদের পায়ে জরীদার মখমলের ঝলমল আস্তরণ, এবং পৃষ্ঠে রূপার হাওদা, সোনার এবং রূপার জীনলাগাম ইত্যাদি সাজ সহ কয়েকটি আরবী, ইরাকী, তুর্কী এবং কচ্ছী* ঘোড়া। এতদ্ব্যতীত নানা রকমের "বহিল"† "রথ" ইত্যাদি যান-বাহন বোধ হয় অন্তঃপুরচারিণীগণের শোভাযাত্রায় সহিত গমনের জন্য প্রস্তুত করা হইয়াছিল। শাহ্‌জাদা দারার তরফ হইতে শাহজাদীগণ, সম্পর্কীয়া বেগম এবং "খাতুন"-দিগকে তোফা, সেলামী উপহার ইত্যাদির জন্য এক শত মূল্যবান জড়াউ তোরা,* উজীর-ই-আজম ইমিন-উদ্দৌলা আসফ খাঁর জন্য নয় প্রস্থ (তাক) খেলাত এবং নিকট আত্মীয় অভিজাতবর্গের পদমর্য্যাদা অনুসারে সাত প্রস্থ পর্য্যন্ত খেলাত এই আয়োজনের অঙ্গীভূত ছিল।

বাসর ঘরের আসবাব ও সাজসজ্জা বাবদ [*asbab wa peraya-i-hajla*] ব্যয় হইয়াছিল ছয় লক্ষ চল্লিশ হাজার টাকা। উহার মধ্যে উল্লেখযোগ্য—সোনার উপর মীনা করা এবং জহরত বসান ব্যবহার্য্য বাসনপত্র, "ছপ্পর-কত", সোনার পালঙ্ক,† জরদোজী এবং রত্নখচিত পেশগীর,‡ নানা রকমের রঙ বেরঙের ফরাশ, বর্ণসম্ভার-সমৃদ্ধ বহুমূল্য গালিচা, সুবর্ণতন্তুখচিত পুষ্পিতপট মনোরম মখমল শামিয়ানা ইত্যাদি।

৬

আয়োজন সম্পূর্ণ হইতে "সাচগ" উৎসবের পরে আরও তিন মাস লাগিয়াছিল। ২৪শে রজব শুক্রবার (জানুয়ারি ১৬৩৩ খ্রীঃ) আগ্রাদুর্গের দরবার-ই-আম প্রাসাদের বারান্দা এবং সম্মুখস্থ সুবিস্তীর্ণ অঙ্গনে উপহার ইত্যাদি বিবাহের সামগ্রী জাহানারা বেগম এবং সিত্তি-উন্নিসা খানমের উপস্থিতি ও তত্ত্বাবধানে সজ্জিত হইল। সকাল হইতে বেলা তিন প্রহর পর্য্যন্ত অন্দরমহলের দাসদাসীগণ এই ব্যাপারে ব্যস্ত, স্বয়ং সম্রাট ঐখানেই জনানা মহলের দরবারে পদার্পণ করিবেন। নিখুঁত ভাবে সমস্ত ব্যবস্থা সম্পূর্ণ হইবার পর জাহানারা বেগম পিতার নিকট উপস্থিত

---

* ছত্রপতি শিবাজীর রাজ্যাভিষেক কালে (১৬৭৬-৭৭ খ্রীঃ) অমাত্য রঘুনাথ পন্ত হনুমন্তের আদেশে ঢুণ্ডিরাজ লক্ষণ ব্যাস নামক একজন পণ্ডিত প্রচলিত 'যবন" (ফার্সী আরবী) শব্দের সংস্কৃত পরিভাষা-মূলক "রাজকোষ" বা "রাজকোষনিঘণ্টু" নামক ক্ষুদ্র পুস্তিকা রচনা করিয়াছিলেন। ঐ গ্রন্থের "চতুরঙ্গবর্গঃ" অধ্যায়ে লিখিত আছে :—

রহবাল সৈন্ধবঃ স্যাদ্ ইরাখী যাবন স্মৃতঃ।
অরব্বী স্যাৎ পারসীকঃ কচ্ছী জবন উচ্যতে।

অর্থাৎ সিন্ধুদেশীয় অশ্ব রহবাল, ইরাখী (Iraqi) অশ্ব যবন দেশজাত, অরব্বী (Arabian) বাজী পারসীক দেশজাত এবং কচ্ছী "জবন" [বিলায়েতী ?] ঘোটক। কচ্ছদেশ প্রাচীন কালে ঘোড়ার জন্য প্রসিদ্ধ ছিল কিনা জানা যায় না। ইবন বতুতা লিখিয়া গিয়াছেন হিন্দুস্থানের পশ্চিম উপকূলে কোন কোন স্থানে ঘোটকী ঋতুমতী হইলে উহাকে সমুদ্রের তীরে বাঁধিয়া রাখিত; রাত্রিকালে সমুদ্রোত্থিত সিন্ধু ঘোটকের সহবাসে যে অশ্ব শাবক উৎপন্ন হইত ঐগুলি খুব তেজস্বী হইত। কচ্ছদেশীয় ঘোড়া দেশী ও বিদেশী ঘোড়ার সংমিশ্রণে জাত অর্থাৎ "দোক্‌লা" (Cross) বলিয়া মনে হয়। কচ্ছী ঘোড়াকে "জবন" কেন বলা হইত বুঝা যায় না।

† "বহিল, বহল" শব্দের অর্থ দ্বিচক্রযুক্ত পশুবাহিত যানবিশেষ, বোধ হয় গরুর গাড়ী। দ্বিচক্রযুক্ত অশ্ববাহিত যান ছিল সে কালের রথ, এই যুগের একা। দিল্লীর গাড়োয়ানেরা একাকে "রথ" আজকালও বলিয়া থাকে; হোমর ও বেদব্যাসের দ্বিচক্রযুক্ত অশ্ববাহিত রথ কি রকম আরামপ্রদ ছিল জানা যায় না, কিন্তু এ যুগের "একার ধাক্কা" সহজে ভুলিবার নয়। "বহিল" সম্বন্ধে "রাজকোষ"-কার বলিয়াছেন—

"রথশালা তু...বহিলী মহাল ইতি কীর্ত্তিতঃ।
বহিলী স্যাৎ প্রবহণং বহিল বাজন্ত সারথিঃ।"

* "তোরা" শব্দের অর্থ ঠিক বুঝা যায় না। এই উপহার সামগ্রী এক রকমের অলঙ্কার হওয়া সম্ভব। "রাজকোষে" পাওয়া যায়—"তুরাহবতংসঃ" অর্থাৎ "তুরা" অবতংস বা অলঙ্কার বিশেষ।

† পালঙ্ক [ফাঃ পালঙ্গ] দড়ির বুনানী খাটিয়ার রাজসংস্করণ। রাজকোষকার লিখিয়াছেন, "পলংগো মঞ্চকঃ", বড় খাটিয়া মঞ্চ বা মাচ অর্থে এখনও ব্যবহৃত হয়, আগ্রা-দিল্লীর গ্রাম্য লোকেরা খাটিয়াকে মুঞ্জ (মুঞ্জ এক প্রকার ঘাসের দড়ির ছাউনীযুক্ত) বলে। উহার ছাউনী পালঙ্গ অর্থাৎ দারুময় শয্যাধার (যাহা বাংলা দেশের খাট) বাঙ্গালার বাহিরে ব্যবহৃত হয় না। স্বয়ং বাদশাহ্‌ খাটিয়া বা পালঙ্গ ব্যবহার করিতেন—অবশ্য শাহী খাটিয়ার সোনার ডাণ্ডাও রেশমের দড়ির ছাউনী থাকিত। ছপ্পর-কত হিন্দী ছপ্পর-খাট; অর্থ, মশারি বা অন্য কোন প্রাবরণ যুক্ত খাট "ছত্রপলংগো মঞ্চমণ্ডপঃ"।

‡ পেশগীর শব্দের অর্থ গামছা (towel, napkin : Steingass) হইতে পারে না। বর্ণনা দৃষ্টে অনুমান করা যায় ইহা এক প্রকার পর্দা [Hangings, tapestry ?]। মখমল প্রাবরণ বিশেষ "ইন্দ্রগোপক-মখমলঃ।"

হইয়া নিবেদন করিলেন, শাহজাদা দারার বিবাহের তৈজস সজ্জার উপর শাহানশাহ্ একবার নজর মোবারক ইনায়েৎ করিলে দাসী কৃতার্থ হইবে। দিল্লীশ্বর দরবার-ই-আম প্রাসাদে পদার্পণ করিতেই বেগম সাহেবা মসনদের সম্মুখে জমিঁবোস [ভূমি চুম্বন] ও তস্‌লীম্ জানাইলেন, এবং দেড় লক্ষ টাকার মূল্যের হীরা জহরতের নানা রকম জিনিষ পেশকশ নিবেদন করিলেন। শাহান্‌শাহ সাধারণতঃ যাহা "মাপ" করিয়া থাকেন, প্রিয়তমা কন্যার ভক্তি ও স্নেহের অর্ঘ্যজ্ঞানে উহা তিনি "কবুল" অর্থাৎ গ্রহণ করিলেন। ইহার পর মজলিসে উপস্থিত নিমন্ত্রিতা শাহজাদী বেগম খাতুন এবং আমীরগণের স্ত্রী কন্যা সকলকেই এক একটি পূর্ব্ব-নির্দ্দিষ্ট উপহার সম্রাট নিজের হাতে তুলিয়া দিলেন। ইহাদের মধ্যে কেহ কেহ নয় হইতে সাত খণ্ড (পারচা) বস্ত্রের খেলাত পাইয়াছিলেন। নয় পারচার সর্ব্বোচ্চ খেলাত পাইয়াছিলেন বোধ হয় নয়-হাজারী খান খানান্ আসফ খাঁর গৃহিণী শাহানশাহের শাশুড়ী। বাদ বাকী কেহ "তুরা", কেহ অন্যবিধ উপহার পাইলেন। দরবারের আঙিনায় এলাহি কারখানা দেখিয়া আলা হজরতের তাক লাগিয়া গেল। তিনি বেগম সাহেবার যত্ন ও সুরুচির প্রশংসা করিয়া জনানা মহলের দরবার মধ্যাহ্নে বরখাস্ত করিলেন।

ঐখানে বিকাল বেলা রাজপুরুষ আমীর উজীরগণের প্রকাশ্য দরবার আহূত হইল। প্রথমেই শাহানশাহের শ্বশুরের পালা। তিনি নয় হাজারী মনসবদার, সুতরাং তাঁহার খেলাত ও নয় প্রস্ত (তাক)। উহার মধ্যে ছিল তু[illegible]নর শাহী পরিচ্ছদ সোনার বুটেদার ফুল-তোলা চারকব ম[illegible]* বহুমূল্য রত্নখচিত তরবারি ও কাটারি (dagger) [illegible]ঞ্চিত অন্যান্য আমীরগণ প্রত্যেকেই অন্ততঃ এক প্রস্ত [illegible] ও মূল্যবান উপহার সামগ্রী পাইলেন। গুণী গায়ক, [illegible]গণও কাপড়চোপড় ইনাম খুশীর বখশিশ পাইল। সর্ব্বসমেত আড়াই লক্ষ টাকার খেলাত এই দরবারে বিতরণ করা হইয়াছিল।

পরের দিন শনিবার ২৫শে রজব কন্যাগৃহ হইতে জামাতার যৌতুক ও দানসামগ্রী শাহী মহলে প্রেরিত হইল। শাহজাদা দারার শাশুড়ী জাহান বানু বেগম সম্রাট আকবরের পৌত্রী—শাহজাদা মোরাদের কন্যা। তাঁহার স্বামী পরভেজ শ্বশুরের জীবদ্দশায় পরলোকগত না হইলে হয়ত তিনিই আজ দিল্লীর মসনদ অলঙ্কৃত করিতেন। যাহা হউক, যে সৌভাগ্য হইতে বিধিবিড়ম্বনায় জাহান বানু বঞ্চিত হইয়াছেন, কন্যা করিম উন্নিসা সেই সৌভাগ্যের অধিকারিণী হইয়া ভাবী সম্রাজ্ঞী হইতে চলিয়াছে এই আশায় স্বামীর বহুদিন সঞ্চিত রত্নভাণ্ডার উজাড় করিয়া তিনি জামাতাকে যৌতুক প্রদান করিয়াছিলেন। তাঁহার অনুরোধ অনুসারে কন্যাপক্ষের দানসামগ্রী ইত্যাদি পূর্ব্ব-দিনের মত দরবার-ই-আমের সম্মুখে সাজাইয়া রাখিবার পর জাহানারা বেগম সম্রাটকে ঐ সমস্ত জিনিষ দৃষ্টিপূত করিবার জন্য আমন্ত্রণ করিলেন।

এই ব্যাপারের দুই তিন পরে ২৭শে রজব শাহান-শাহের হুকুমে আগ্রা শহরের গরীব দুঃখী ফকিরদিগকে দশ হাজার টাকা দান খয়রাত দেওয়া হইল। পঁচিশ লাখের মধ্যে গরীবের ভাগে পঁচিশ হাজারও পড়িল না!—শাহী আমল হইতে ইংরেজ আমল পর্য্যন্ত চিরকাল বড়লোকের জন্যই মিঠাই মণ্ডা, গরীবের ভাগ্যে এঁটো পাত।

৭

উক্ত কাঙালী বিদায়ের দুই তিন দিন পরে শাবান মাসের পয়লা তারিখ (১লা ফেব্রুয়ারী, ১৬৩৩) বৃহস্পতিবার রাত্রে "হেনাবন্দী"* উৎসব। এই উৎসবের আয়োজন হইয়াছিল আগ্রাদুর্গের দরবার-ই-খাস† প্রাসাদে। মমতাজের মৃত্যুর পরও রমজানের চাঁদ উঠিয়াছে, নওরোজের নহবত বাজিয়াছে, কিন্তু শাহী মহলে ঈদ খুশরোজের উৎসব হয় নাই। পুত্রের কল্যাণার্থ এবং প্রজাসাধারণের ভারাক্রান্ত মন হইতে নির্জীব আড়ষ্টতা অপনয়নের জন্য শাহানশাহ্ হুকুম দিয়াছেন দেওয়ান-ই-খাস হেনাবন্দীর উৎসব সজ্জায় সজ্জিত করা হউক, ঐখানে অভ্যাগতগণের মজলিসে তিনি খুশী মানাইবেন। শাহী হুকুম আলাদীনের বিচিত্র প্রদীপ। আয়োজনের কোলাহলমুখর দিবসের অবসানে সন্ধ্যার অন্ধকার ঘনাইয়া না আসিতেই বিচিত্র মণিময় অসংখ্য দীপাধারের‡ রত্নচ্ছুরিত আরক্তিম আলোকচ্ছটায় শাহী

* আইন-ই-আকবরী গ্রন্থে আকবরশাহী আমলের সমস্ত রকম পোষাক, অলঙ্কার ও অস্ত্র শস্ত্রের ছবি আছে। চারকব নাতিদীর্ঘ চোগার মত পোষাক মনে হয়।

* "হেনাবন্দী" হিন্দুর বিবাহে বরের "গায়ে হলুদ" আচারের মত উৎসব। মুসলমানেরা কাঁচা হলুদের পরিবর্ত্তে হেনা বা মেহেদী পাতার রং ব্যবহার করিয়া থাকে। "হেনাবন্দী"র দরবারী মজলিসে দারা এবং তাঁহার কনিষ্ঠ ভ্রাতাগণের অনুপস্থিতি দৃষ্টে অনুমান করা যায় বরের "হেনাবন্দী" স্ত্রী আচারের শামিল, অন্দর-মহলে বরের এবং বাহির মহলে নিমন্ত্রিত পুরুষগণের হাতে মেহেদীর রং মাখান হইয়াছিল।

† ইতিহাসে দরবার-ই-খাস জনপ্রচলিত গোসল-খানা নামেই পরিচিত। গোসল-খানা বাদশাহী স্নানাগারের নিকটবর্ত্তী বলিয়াই এই নিভৃত মন্ত্রণাকক্ষকেও গোসল-খানা বলা হইত। রাজব্যবহারকোষ দ্রষ্টব্য :—

"মন্ত্রস্থানং গুসলখানা চতুষ্কং চৌক নামকং"

‡ শাহী আমলের বিভিন্ন নামের দীপাধার সম্বন্ধে রাজকোষে বলা হইয়াছে— "দীপশাখাতু সমরো ফিলসোজঃ তু দীপকঃ

* * *

মহল, জমিন-আসমান, প্রভাত গগনের অপূর্ব্ব শোভা ধারণ করিল। মীর বক্‌শী প্রভৃতি উচ্চপদস্থ আমীরগণ নিমন্ত্রিত অভিজাতবর্গকে সম্রাটের পক্ষ হইতে সম্বর্দ্ধনা জ্ঞাপন করিবার জন্য দণ্ডায়মান। বড় বড় থালা ভরিয়া কন্যাপক্ষীয় দাসদাসীগণ হেনাবন্দীর সামগ্রী মজলিসের গালিচার উপর সাজাইয়া রাখিয়া অন্তরালে আদেশের প্রতীক্ষা করিতেছে। "উদ্‌-সোজ্‌" ইত্যাদি ধূপদানী হইতে অগুরু ধূপের গন্ধে উৎসববাসর ভরপুর। নিমন্ত্রিতবর্গ অভ্যর্থিত হইয়া একে একে তাঁহাদের যথানির্দ্দিষ্ট আসনে উপবিষ্ট হইলেন। যে বিরাট শোকের পর্দ্দার অন্তরালে সঙ্গীতের মূর্চ্ছনা, নর্ত্তকীর নূপুরনিক্কণ, যন্ত্রীর অনাদৃতা বীণা দুই বৎসর যাবৎ "পর্দ্দানশীন" ছিল, এই উৎসব নিশীথে সেই বিষাদের যবনিকা অপসৃত করিবার জন্য আদিষ্ট হইয়া সমস্তই দ্বিগুণ মুখর হইয়া উঠিয়াছে। অভিমানিনী মোগল রাজলক্ষ্মীর মানভঙ্গের জন্য স্বয়ং দিল্লীশ্বর বহুদিন পরে রত্নোদ্ভাসিত সুরম্য রাজপরিচ্ছদে নাগর বেশে সজ্জিত হইয়াছেন—আজ তিনি যেন সুরসিক "সঙ্গীত-চাতুর্য্য-কলানুরক্ত"* শাহজাদা খুর্‌রম, বৃদ্ধ পত্নী-শোকাতুর শাহ্‌জাহান নহেন।

সেকালে সামাজিক ব্যাপারে মজলিসের বৈঠকে রাজা ও প্রজার মধ্যে দরবারের দুরতিক্রম্য ব্যবধান, আড়ষ্টতা ও সংকোচ ছিল না। দীনদুনিয়ার মালিক, জমিনের উপর খোদাতালার ছায়া [জিল্ল-ই-সোভানী], আলা হজরত বহু দিন পরে খুশ মেজাজে মজলিসে শরীক হওয়ায় নিমন্ত্রিত আমীর ওমরাগণের মনের দুয়ার খুলিয়া গেল। দেবসভায় নৃত্যপরা অপ্সরীর মত জোহরাতুল্য অনিন্দ্য সুন্দরী শত নর্ত্তকীর চঞ্চল নৃত্যে জমিন আসমান যেন নাচে মাতিয়া উঠিল, স্বয়ং জোহরা [Venus] ঈর্ষান্বিতা হইলেন [nahid ra-be-rashk]।† জ্যোতিষ্কসদৃশ দীপ্তিমান সুদর্শন হিন্দুস্থানী এবং তুর্কী খাদেমগণ মজলিসীগণের মেজাজ ঠাণ্ডা করিবার জন্য মাঝে মাঝে আতর ছিটাইতেছিল। কিছুক্ষণ পরে আদবকায়দা দুরস্ত বরাজী [কদ-বানু] পরিচারিকাগণ রূপের ডালা সাজাইয়া মেহেদীর রক্তরাগে মেহেমান্‌দিগকে রাঙা করিবার জন্য আসরে পা বাড়াইতেই মজলিস রঙীন হইয়া উঠিল। এই দেশের প্রথা অনুসারে মজলিসীগণের অঙ্গুলি রঞ্জিকার হেনায় রঞ্জিত এবং হস্তদ্বয় জরীর রুমালে বন্ধনদশা প্রাপ্ত হইল। ইহার পর সৌভাগ্য ও বিজয়ের মঙ্গল চিহ্নস্বরূপ স্বর্ণতন্তুখচিত পাহকঞ্চুক [ফোতা—কোমরবন্ধ] নিমন্ত্রিতবর্গের মধ্যে বিতরণ করা হইল। ইহার পর মিষ্টিমুখ, পান আতর, "শিরিণী" (মিষ্টদ্রব্য), মেওয়ার বড় বড় রেকাবীর ছড়াছড়ি [khwan dar khwan] শাহী মহলের বাহিরে যমুনার ধারে আতস বাজীর খেলা। এই ভাবে বহু রাত্রি পর্য্যন্ত শাহী মহলের ভিতরে বাহিরে আমোদ-প্রমোদ চলিল।

বৃদ্ধ ঐতিহাসিক কাম্বো পরের মুখে নিমন্ত্রণের আস্বাদ এবং হেনাবন্দী মজলিসের রূপ রস গন্ধের সন্ধান পাইয়া এই প্রমোদ-রজনীকে শব-ই-কদর বা ইসলামের সৌভাগ্য রাত্রির সহিত তুলনা করিয়াছেন।

৮

"হেনাবন্দী"র পরের দিন ২রা শাবান শুক্রবার বিবাহ-উৎসব।

ঐদিন শাহানশাহ্‌র হুকুমে শাহ্‌জাদা শুজা, আওরঙ্গজেব এবং মুরাদ বক্‌শ, খান্‌ ই-খানান্‌ আসফ খাঁ ও অন্যান্য আমীরগণ দারাকে মোবারকবাদ জ্ঞাপন এবং শোভাযাত্রাসহ বরকে শাহী মহলে আগাইয়া আনিবার জন্য দারার প্রাসাদে গিয়াছিলেন। তাঁহারা স্ব-স্ব পদমর্য্যাদা অনুসারে শাহ্‌জাদাকে বিবাহের নানাবিধ উপহার পেশ্‌কশ প্রদান করিয়া শাদীর মোবারকবাদ জানাইলেন। শাহ্‌জাদা অভ্যাগতগণের যথোচিত সৎকার এবং আনুষঙ্গিক আমোদ-প্রমোদের আয়োজন করিয়া সকলকে আপ্যায়িত করিলেন। বিকালবেলা বরের শোভাযাত্রা শাহীমহল অভিমুখে সাড়ম্বরে অগ্রসর হইল। মধ্যস্থলে রক্তবর্ণ সমুন্নত বাজী-পৃষ্ঠে "শাহ দামাদ"; অগ্র পশ্চাতে অনুযাত্রী বরাত, কেহ কেহ ঘোড়ার উপর কেহ বা পদব্রজে চলিয়াছে।

শাহ্‌জাদা দারা দেওয়ান-ই-আম মহলে শাহী মসনদের সম্মুখে কুর্ণিশ ও ভূমি চুম্বন (জর্মি-বোস) করিবার পর তাঁহাকে রত্নখচিত তরবারি, চল্লিশ হাজার টাকা মূল্যের মুক্তা ও চুনীর জপমালা (তসবী), শাহী আস্তাবলের দুইটি খাসা ঘোড়া, শাহী ফিলখানার একটি মদ্দা ও একটি মাদী হাতী সাজসমেত, মোট প্রায় চারি লাখ টাকার খেলাত প্রদান করা হইল। ইহার পর হিন্দুস্থানের রেওয়াজ মাফিক শাহ্‌নশাহ পুত্রের মস্তকে বিবাহের মুকুট [সেহ্‌রা] পরাইয়া দিলেন। বদখ্‌শানের উজ্জ্বল লাল রুবী এবং বহুমূল্য সবুজ

সাদস্তম্ভালদীপস্তু থম্বীল ইতি নামত।
উৎসোজঃ স্যাদ "দীপতরু" উদ্দানী ধূপ পাত্রকং
অর্থাৎ সম্ম (ফাঃ শামোয়া)=দীপশাখা (ঝাড়)
ফিলসোজ [পীলসোজ]=স্তম্ভদীপ (দেওয়ালগীর)
থম্বীল=কাচভাণ্ডস্থিত দীপ
উৎসোজ=[ফাঃ উদ্‌+সোজ] দীপতরু
উদ্‌-দানী=ধূমদানী।

* শাহ্‌জাহানের রাজ্যাভিষেকের লগ্ন-গণক মারাঠী পণ্ডিত সার্ব্বভৌম শাহজাহান গুণকীর্ত্তন প্রসঙ্গে লিখিয়াছেন—
"কৃপাবশাৎ সাধুজনে কৃপালুঃ সঙ্গীত চাতুর্য্যকলানুরক্তঃ।"
—শিব চরিত্র প্রদীপ [পুণা ভারত ইতিহাস-সংশোধক মণ্ডল পুরস্কৃত গ্রন্থমালা নং ৪] পৃঃ ১৩৩।

† বাদশাহ নামা ১ম খণ্ড পৃ. ৪৫৭।

পান্না খচিত এই "সেহ্‌রা"-র সহিত শাহ্‌জাহানের অতীত সৌভাগ্য এবং সুখস্মৃতি ওতঃপ্রোতভাবে জড়িত,—জাহাঙ্গীর বাদশাহ্‌ "বাবা খুর্‌রমের" মাথায় এই মুকুট পরাইয়া দিয়াছিলেন মমতাজ্‌ মহলের সহিত তাঁহার বিবাহের শুভমুহূর্ত্তে। শাহ্‌জাদা পিতাকে প্রণাম [তসলীম]* করিয়া যথারীতি তাঁহাকে ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিলেন। আসফ খাঁ প্রভৃতি উচ্চপদস্থ রাজকর্ম্মচারী এবং অন্যান্য দরবারীগণকে এই দিন পুনরায় খেলাত দেওয়া হইল।

দরবারের পর সন্ধ্যা সমাগমে বিবাহ-বাসরের আমোদ-প্রমোদ, মেহ্‌ফিল-মজলিসের বৈঠক এবং আলোক-সজ্জা। সুপ্তোত্থিতা আগ্রানগরী দীপালী ও নওরোজের প্রদীপডালা একত্র সাজাইয়া মঙ্গল আরতির আনন্দকোলাহলে মাতিয়া উঠিয়াছে। রং-বেরঙের গালিচা ও ফরাসের উপর প্রতিফলিত রত্নখচিত দীপাধার-নির্গত রশ্মি বিবাহ-আসরকে বিচিত্র বর্ণসম্ভারসমৃদ্ধ করিয়াছে। স্বর্ণ ও রৌপ্য নির্ম্মিত আধারস্থিত "শমোয়া", চেরাগ, কানুস, মশাল প্রভৃতি মনোরম দীপাধারে সজ্জিত আলোকশ্রেণী শাহীমহলের ভিতরে বাহিরে উপরে নীচে [dar wa bam] শাহানশার হুকুমে অন্ধকারের সহিত লড়াই ফতে করিয়া রাত্রিকে দিন, জমিনকে আসমান করিয়া তুলিয়াছে। অন্তঃপুরের উদ্যান-বাটিকা, "দর্শন"-গবাক্ষের পাদদেশে বালুকাভূমি, অদূরে তরীসমাচ্ছন্ন যমুনাবক্ষ কোথাও আশ্রয় না পাইয়া রাত্রির অন্ধকার দিল্লীশ্বরের দৃষ্টির বাহিরে যমুনার পরপারে আশ্রয় খুঁজিতেছে। শাহী দৌলতখানায় খুশীর বাজার সরগরম। বাহিরে নদীর কিনারায় আতশবাজীর তামাশা। আকাশের তারার সহিত 'মাহতাবী' বায়ুগুলে শশাঙ্কাঙ্কিত মোগল-কেতন প্রোথিত করিয়া দিল্লীশ্বরের বিজয় ঘোষণা এবং মোগলাই "গুল আফশান" শাহীমহলের উপর অবিরাম পুষ্পবৃষ্টি করিতেছে; উহার সহিত সমান তালে "হাওয়াই" বাজীর তারকাবৃষ্টি।

আগ্রাদুর্গের গুপ্তমন্ত্রণা-কক্ষ [খিলবতখানা] শাহ-বুরুজে বিবাহের আসরে রাত্রি দুই প্রহর ছয় ঘড়ীর পর রৌশন-চৌকীর "পাঁচ নবত" বাজিয়া উঠিল। হিন্দু এবং যবন জ্যোতিষীগণের গণনায় সর্ব্বস্বীকৃত শুভলগ্নে শাহানশাহ্‌র সম্মুখে কাজী আস্‌লাম* বিবাহের মন্ত্র পাঠ করিলেন—আসরে বর, পর্দ্দার আড়ালে পাত্রী। বরপক্ষ হইতে কাবিননামার "মোহরানা" বা বিবাহভঙ্গে কন্যাকে ক্ষতিপূরণ বাবত পাঁচ লাখ টাকা ধার্য্য করা হইল। এই পাঁচ লাখ টাকার পশ্চাতেও মমতাজ মহলের সহিত শাহ্‌জাহানের বিবাহস্মৃতি; এমন এক দিনে বহুবর্ষ পূর্ব্বে তিনি দারা জননীকে পাঁচ লাখ টাকার কাবিন কবুল করিয়াছিলেন।

৯

বিবাহের পর দুই সপ্তাহ ধরিয়া আরাম-আয়েস আনন্দ উৎসব অব্যাহতভাবে চলিয়াছিল। ছয় দিন পর ৮ই শাবান শাহজাদা দারা সপারিষদ সম্রাট ও অভিজাতবর্গকে নিজের প্রাসাদে নিমন্ত্রণ করিলেন। সম্রাটের সম্মানার্থ শাহী দৌলতখানা হইতে শাহজাদার হাবেলী পর্য্যন্ত সত্তর জরির* রাস্তা মখমলের ফরাসে ঢাকা; মখমলের উপর জরির গালিচার "পা-আন্দাজ" বা পাদ আস্তরণ; রাজা বাদ্‌শাহের ঘোড়া হাতী, পাল্কীবাহকের পা আমীরওমরা-র গৃহে যাইবার সময় মাটিতে পড়িলে বাদশাহী শান্‌ বজায় থাকে না—এই জন্যই পা-আন্দাজের ব্যবস্থা। ঐদিন শাহানশাহ-র "কদম-রঞ্জা" বা পায়ের ব্যথা নিবারণের জন্য† তাঁহার "অবতরণ-স্থান" সোনালী, রূপালী এবং দারাশাহী-লাল (purple) রেশমী জমির উপর সোনার তারের বিচিত্র সূক্ষ্ম সূচীশিল্পসমৃদ্ধ মনোরম আস্তরণের দ্বারা সজ্জিত হইয়াছিল। এই ব্যবস্থা ইংরেজ আমলে দরবারী রাস্তার উপর দেড় হাত প্রস্থ লালু কাপড়ে আসিয়া ঠেকিয়াছে।

সম্রাট্‌ ভোজসভায় সুখোপবিষ্ট হইলে শাহজাদা মোট এক লক্ষ টাকা মূল্যের নজর হুজুরে পেশ করিলেন। পেশকশের অন্যান্য মহার্ঘ সামগ্রী দৃষ্টিপ্রসাদ লাভ করিবার পর সম্রাটের উপযুক্ত বাহন একটি অশ্বরত্ন হুজুরে নিবেদন করা হইল—আসল ইরাকী ঘোড়া, গায়ে বহুব্যয় ও পরিশ্রমে প্রস্তুত সোনার জড়াউ সাজ, নাম "সর্‌-আফ্‌রাজ"। ইহার পর পিতার অনুমতিক্রমে শাহজাদা নিমন্ত্রিত আমীরগণকে খেলাত উপহার প্রদান করিয়া সম্বর্দ্ধনা জানাইলেন। নয়-হাজারী আসফ খাঁ শুভসূচক নবম সংখ্যক বস্ত্রের ডবল খেলাত ও রত্নখচিত তরবারি উপহার পাইলেন। আল্লামা আফজল খাঁ এবং অন্য তিন জন উচ্চপদস্থ আমীরকে শিরোপা (আকবরশাহী "সর্ব্ব-গাত্রী"), তুরানী "চারকব", এবং অন্যান্যকে এক এক প্রস্থ খেলাত দেওয়া হইল।

দরবারী ইতিহাস পড়িলে মনে হয় এই ব্যাপারে

---

* "শিরসা বন্দনং শিজ্‌দা প্রণাম-তসলীমা ভবেৎ
নমস্কারঃ সলামঃ স্যাদাশীর্ব্বাদো দুবা-স্মৃত। রাজকোষ।

* মাসির-উল-উমারা গ্রন্থে [তৃতীয় ভাগ, পৃ. ৮৯-৯১] এই কাজী সাহেবের জীবনী পাওয়া যায়, সুন্নী সমাজে তাঁহার অসাধারণ প্রতিপত্তি ছিল। কথিত আছে তাঁহার শিয়া-বিদ্বেষ এতই প্রবল ছিল যে অসুখের সময় এক শিয়া হেকিমের ব্যবস্থাপত্র তিনি আগুনে পোড়াইয়াছিলেন।

* এক জরির পরিমাণ ভূমি এই দেশের পৌনে বিঘার সমান।

† *bum-i-tala wa bum-i-nuqra wa bum-i-darai.*

পথসজ্জা এবং খেলাত বিতরণ ছাড়া যেন অন্য কিছুই হয় নাই। দারার বাড়ীতে বৌভাতের নিমন্ত্রণ হইতে শাহান-শাহ নিশ্চয়ই খালি পেটে ফিরেন নাই। এত বড় নিমন্ত্রণের ভোজ্যতালিকাটা ইতিহাসের পাতায় রাখিয়া গেলেও এই যুগে ভোজনবিলাসীর ঢেকুর উঠিত।* ঐতিহাসিক চিরকালই শাঁস ফেলিয়া নারিকেলের ছোবড়া চিবাইয়া আসিতেছে।

পরবেজের কন্যা দারার প্রথমা এবং প্রধানা পত্নী করিম-উন্নিসা বানু বেগম পরবর্ত্তী ইতিহাসে তাঁহার ডাকনাম নাদিরা বেগম নামে পরিচিতা। বিবাহিতা স্ত্রী ব্যতীত সে কালে রাজা বাদশাহ্‌ আমীর শাহজাদা সকলের অন্তঃপুরে একাধিক দ্বিতীয় শ্রেণীর স্ত্রী থাকিত; কাহারও তৃতীয় শ্রেণীর সন্তানজননীর উল্লেখ পাওয়া যায়, স্বয়ং আকবর বাদশাহের হারেমে এই প্রকার তিন শ্রেণীর অন্ততঃ তিন শত বেগম ছিল। জাহাঙ্গীর শাহ্‌জাহান† আওরঙ্গজেবের বিভিন্ন শ্রেণীর পত্নী, পত্নী-স্থানীয়া নারীর সংখ্যা। সঠিক লেখা না থাকিলেও ইতিহাসের পাতায় বিক্ষিপ্ত ভাবে তাঁহাদের সন্ধান পাওয়া যায়। সেকেন্দর বাদশাহের ভারত আক্রমণ কাল হইতে ইংরেজ আমলের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত হিন্দুস্থান-ইরান আরব-তুরান ইস্তাম্বুল সর্ব্বত্র হাটে বাজারে প্রকাশ্যে গরু-ছাগল উট-ঘোড়া তরী-তরকারির ন্যায় মানুষ বিক্রয় হইত। মুসলমান যুগে প্রত্যেক শহরের প্রধান বাজার বা "মণ্ডী-র এক অংশ "নাখাস"* জীবজন্ত দাসদাসী বিক্রয়ের জন্য নির্দ্দিষ্ট ছিল। এক সময়ে সাধারণ সঙ্গতিপন্ন লোকেরাও হাঁস-মুরগী বেগুন-মূলার সহিত পয়সা বাঁচিলে বাঁদী খরিদ করিয়া আনিত। সুতরাং ঐ যুগে সচ্চরিত্র, ধার্ম্মিক বিদ্বান শাহজাদা দারার অন্তপুরেও রূপসী ক্রীতদাসীর অভাব থাকিবার কথা নয়। শাহী খরিদ্দারের জন্য অন্যত্র সম্ভ্রান্ত প্রতিষ্ঠান ছিল।

"কুর্য্যাম্ হরস্যাপি পিণাকপাণেঃ—কামদেবের এই দম্ভ চিরকালই বিজয়ী হইয়া আসিতেছে। যৌবনকালে দারার গায়ে দুই একটা "পুষ্পশর" সটকাইয়া পড়ে নাই, এমন কথা নহে। ম্যানুসী সাহেব লিখিয়াছেন, শাহ্‌জাদা দারা নাকি "রণাদিল" নাম্নী এক নর্ত্তকীর প্রেমে পড়িয়া তাহাকে বিবাহ করিতে চাহিয়াছিলেন। শাহ্‌জাহান পুত্রের মতি-ভ্রম বুঝিতে পারিয়া কঠোরতা অবলম্বন করিলেন। ইহাতে শাহজাদার স্বাস্থ্যহানি এবং ভাববিকার প্রকাশ পাইল—শুকাইয়া কাঠ না হইলেও "স্রস্তং স্রস্তং কনকবলয়ং" অবস্থা। অবশেষে শাহানশাহ নর্ত্তকীকে বিবাহ করিবার অনুমতি দিয়া পুত্রকে প্রকৃতিস্থ করিলেন। সেই যুগের দিনকাল, নৈতিক আব্‌হাওয়া শরীরধারী জীবের শাশ্বত দুর্ব্বলতার কথা বিবেচনা করিলে ম্যানুসী লিখিত এই কাহিনী অসম্ভব কিংবা অবিশ্বাস্য নহে। দারার মত সুপণ্ডিত ভাবপ্রবণ "সুবোধ বালক" ফাঁদে সহজেই পড়িয়া থাকে। দারা অপেক্ষা শতগুণ দৃঢ়চেতা, নিত্য নমাজী, বিলাস ব্যসনে উদাসীন নাচ গান ললিতকলার পরম শত্রু, "শুষ্ককাষ্ঠ" তুল্য আওরঙ্গজেব পর্য্যন্ত যুগধর্ম্মে প্রেমের তুফানে হাবুডুবু খাইয়া-ছিলেন—"অন্যে পরে কা কথা?" জৈনাবাদী মহলেরও

---

* মুসলমান আমলে চারটি বিবাহের চমৎকার বিশদ বর্ণনা পাওয়া যায়; যথা আমীর খসরু বর্ণিত খিজির খাঁর বিবাহ, ইবন-বতুতা লিখিত মহম্মদ তোগলকের ভগ্নীর বিবাহ, মোগল ইতিহাসে শাহজাদা দারা এবং হরচরণ দাস-কৃত চাহার-গুলজার-ই-শুজাই গ্রন্থে নবাব সফদর জঙ্গের পুত্র শুজা উদ্দৌলার বিবাহ। মোগল সম্রাটগণের মধ্যে ফররুকসিয়ার নিতান্ত অপদার্থ হইলেও খুব ঘটা করিয়া বিবাহ করিয়াছিলেন। শাহজাদাগণের মধ্যে শাদী উপলক্ষে দারার বিবাহে খরচ হইয়াছিল বত্রিশ লক্ষ টাকা; কিন্তু একশত বৎসর পরে নবাব উজীর সফদর জঙ্গ পুত্রের বিবাহে ইহার প্রায় দেড়গুণ (৪৬ লক্ষ টাকা) খরচ করিয়া বাদশাহী শান মলিন করিয়া-ছিলেন। পাগলা বাদশাহ্‌ মহম্মদ তোগলকের ভগ্নীর বিবাহে হাসির ব্যাপার আছে। আব্বাসী সৈয়দ বলিয়া পরিচিত এক গোঁয়ার আরবী "বদ্দু"-র (বেদুইন) সহিত তিনি সুলতান-পুত্রীর বিবাহ দিয়া জাতে উঠিবার জন্য উদ্‌গ্রীব হইয়াছিলেন, "বদ্দু" বর হিন্দুস্থানী মতে দানে কন্যা গ্রহণ করিবে না, বিবাহ-বাসরে সে হঠাৎ আরবী কায়দায় বাঘের মত লাফ দিয়া কন্যা হরণ করিবার ব্যাপার অভিনয় করিয়া বসিল; শাহজাদীর অবস্থা যেন বানরের গলায় মুক্তার হার। সে যুগের সামাজিক চিত্র অঙ্কনে এই সমস্ত বিবাহ বর্ণনা ইতিহাসে অপ্রাসঙ্গিক নহে। মোগলাই আমলের রসম-রেওয়াজের নমুনা, বাদশাহী শান-শৌকতের ঝলক দারার বিবাহে পাওয়া যায়। মহম্মদ সালেহ্‌ কাম্বো বার পৃষ্ঠার এক অধ্যায়ে দারার বিবাহের আয়োজন ও উৎসব বর্ণনা করিয়াছেন (আমল ই সালেহ মূল পৃঃ ৫২২-৩৪)। বাদশাহ্‌নামার বিবরণ অপেক্ষাকৃত সংক্ষিপ্ত (মূল পৃঃ ৪৫২-৪৬০)।

† শাহ্‌জাহানের অভিজাতবংশীয়া পূর্ব্বকথিত তিন "বেগম" ব্যতীত দুইজন "মহল" বা দ্বিতীয় শ্রেণীর স্ত্রী ছিলেন, নাম আকবরাবাদী-মহল ও ফতেপুর-মহল। দিল্লীর সুপ্রসিদ্ধ ফতেপুরী মসজিদ ও অপেক্ষাকৃত কম পরিচিত আকবরাবাদী মসজিদ এই দুই মহিলার কীর্ত্তি নিদর্শন। ম্যানুসী সাহেব লিখিয়াছেন শাহ্‌জাহান নাকি মমতাজের নিকট প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন, অন্য স্ত্রীর গর্ভে তিনি সন্তান উৎপাদন করিবেন না। তিনি বাদশাহের জন্ম নিয়ন্ত্রণের কথা উল্লেখ করিয়াছেন।

* লাহোর, দিল্লী ও লক্ষ্ণৌর "নাখাস" বিশেষ প্রসিদ্ধ। লক্ষ্ণৌর "নাখাসে" আজকাল পাখীর বাজার বসিয়া থাকে। ঐখানে শকুন হইতে "বটের" [বাং-বাটুই?] সকল প্রকার চিড়িয়া পাওয়া যায়।

† Sarkar's *History of Aurangzib*, vol. I. pp. 56-59 সারাংশ :—শাহজাদা আওরঙ্গজেব বুরহানপুরে তাঁহার বড় মাসীর বাড়ী বেড়াইতে গিয়াছিলেন। সেইখানে বাগানে বেড়াইবার সময় হীরাবাই নামী মাসীর বাঁদীকে দেখিয়া তিনি "চন্দ্রাহত" হইলেন—কেহ কেহ বলেন একেবারে "মূর্চ্ছা ও পতন"। হীরাবাই বোধ হয় ইতিপূর্ব্বে মেসো খলিল উল্লাকেও বায়েল করিয়াছিল, প্রথমে তিনি ছেলের বেয়াদবী শুনিয়া অগ্নিশর্ম্মা হইলেন। যাহা হউক, মাসীর তাড়নায় বৃদ্ধ খলিল উল্লার নিকট

প্রেমে পড়িয়া তিনি শরাবের পেয়ালায় চুমুক দিতে চলিয়াছিলেন; শরিয়ত উপেক্ষা করিয়া দারার অনুগৃহীতা দাসী সুন্দরী উদীপুরীকে তিনি অঙ্কশায়িনী করিয়াছিলেন এবং শরাব খাইয়া বমি করিলেও বৃদ্ধ বয়স পর্য্যন্ত তাঁহার মোহ কাটাইতে পারেন নাই।

১০

এই প্রসঙ্গে সময়ানুক্রম ব্যাহত হইলেও দারা ও নাদিরার সন্তানগণের জন্ম-বিবরণী নিম্নে লিখিত হইল। (নাদিরা ব্যতীত অন্য স্ত্রীর গর্ভে দারার কোন সন্তান জন্মে নাই)

(১) প্রথমা কন্যা, জন্মস্থান আগ্রা; তারিখ রবিবার ১৯শে জানুয়ারি ১৬৩৪ খ্রীঃ।

জন্ম উপলক্ষে সপারিষদ সম্রাট দারার গৃহে নিমন্ত্রিত হইয়াছিলেন। তিন মাস পরে রমজানের ঈদের দিন (২১শে মার্চ্চ, ১৬৩৪) এই কন্যার মৃত্যু হয়। সন্তানের শোকে দারা লাহোর যাত্রার পথে অত্যন্ত পীড়িত হইয়া পড়িলেন। হেকিম উজীর খাঁকে লাহোর হইতে শাহজাদার চিকিৎসার জন্য ডাকা হইল। শাহী তাঁবুর নিকট দারার তাঁবু খাটাইবার হুকুম হইয়াছিল। জাহানারা বেগম দারার শুশ্রূষা করিতে লাগিলেন; স্বয়ং বাদশাহ কয়েকবার পুত্রকে দেখিতে গিয়াছিলেন এবং তাঁহার রোগমুক্তির জন্য ভিক্ষুক, ফকীর ইত্যাদিকে দান খয়রাত করিয়াছিলেন।*

২। সুলেমান শুকো, প্রথম পুত্র, জন্ম শুক্রবার ২৭শে রমজান, ১০৪৪ হিঃ (৬ই মার্চ্চ, ১৬৩৫ খ্রীঃ), দিল্লী হইতে আগ্রার পথে সুলতানপুর গ্রামে ভূমিষ্ঠ। আগ্রা শহরে সুলেমানের জন্মোৎসব উপলক্ষ্যে সম্রাট এবং এক হাজারী হইতে উর্দ্ধে সমস্ত মনসবদার ও আমীরগণ দারার প্রাসাদে নিমন্ত্রিত হইয়াছিলেন।†

৩। মেহের শুকো দ্বিতীয় পুত্র জন্ম বুধবার ২রা রবিউল আউয়াল; ১০৪৮ হিঃ (জুলাই ৪, ১৬৩৮ খ্রীঃ) পরের মাসের ৯ তারিখ মৃত্যু।

৪। পাক-নিহাদ বানু, জন্ম ২৭শে জমাদিউল আউয়াল, ১০৫১ হিঃ (২৮শে আগষ্ট, ১৬৪১ খ্রীঃ; বাদশাহনামা, দ্বিতীয় খণ্ড পৃঃ ২৪৫।

৫। মমতাজ শুকো জন্ম ৬ই আগষ্ট, ১৬৪৩ খ্রীঃ; পাঁচ বৎসর বয়সে মৃত্যু।

৬। সিপহর শুকো; জন্ম বৃহস্পতিবার ১১ই শাবান, ১০৫৪ হিঃ (৩রা অক্টোবর, ১৬৪৪ খ্রীঃ)*

দারার প্রত্যেক সন্তানের জন্মোৎসবে সম্রাট তাঁহার গৃহে পদার্পণ করিতেন, এবং উৎসবের খরচ বাবত দুই লক্ষ টাকা সরকারী তহবিল হইতে দেওয়া হইত।

৭। জাহান জেব বানু }
৮। আমল উন্নিসা }

ইহা লক্ষ্য করিবার বিষয় ১৬৪৫ খ্রীঃ হইতে ১৬৫৮ খ্রীঃ পর্য্যন্ত দারার জীবনের শেষ তের বৎসরে শাহজাদার কোন সন্তান লাভের উল্লেখ নাই। কিন্তু এই সময়ের মধ্যে প্রকৃতই তাঁহার কোন সন্তান জন্মগ্রহণ করে নাই হয়ত এমন নহে। শাহজাহানের পুত্র চতুষ্টয়ের গৃহে পুত্র কন্যা "প্রবল বন্যা"র ন্যায় আসিতেছে দেখিয়া দরবারী ঐতিহাসিক যেন পেরেশান হইয়া হাল ছাড়িয়া দিয়াছেন। দারার মৃত্যুর পর তাঁহার দুই কন্যা জীবিত ছিলেন; এক জনের নাম আমল উন্নিসা। আওরঙ্গজেব এই মেয়েটিকে বিশেষ স্নেহ করিতেন। আওরঙ্গজেবের পুত্র মহম্মদ আজমের সহিত দারার অনাথা কন্যা জানী বেগমের বিবাহ হইয়াছিল। এই জানী বেগমই সম্ভবতঃ জাহানজেব বানু। দরবারী ইতিহাসে উল্লেখ না থাকিলেও দারার মৃত্যুসময়ে এই দুই কন্যার বয়স হইতে প্রমাণিত হয় ইঁহারা সিপহর শুকোর পরে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন।

হইতে অনিচ্ছাকৃত উপহারস্বরূপ হীরাবাইকে পাইয়াও না পাওয়ার উপক্রম। হীরাবাই তানা ধরিল শরাব না খাইলে শাহজাদার আর্জ্জি মঞ্জুর হইবে না। মোহ ঘনীভূত হইলে হারাম-হালাল, চেতন-অচেতন জ্ঞান লোপ পায়। আওরঙ্গজেব অগত্যা শরাবের পেয়ালা মুখের কাছে উঠাইতেই হীরাবাই খপ্ করিয়া তাঁহার হাত ধরিয়া ফেলিল। এই হীরাবাই ইতিহাসে জৈনাবাদী মহল নামে পরিচিত।

* বাদশাহনামা ১ম খণ্ড দ্বিতীয় ভাগ, পৃঃ ৩, ৯, ১০

† ঐ " " " ৭৩-৭৪, ৪৮৪-৮৫

‡ ঐ দ্বিতীয় খণ্ড পৃঃ ১০১, ১০৪

* বাদশাহনামা ২য় খণ্ড পৃঃ ৩৮৮

নার্ভস্

শ্রীবাণী রায়

মাথার মধ্যে কে যেন হাতুড়ি দিয়ে সজোরে আঘাত করে উঠল। পা থেকে চুলের ডগা পর্য্যন্ত শিহরিত হয়ে সুমিতা জাগল। আহা, কি মধুর জাগরণ!

ছোট ভাইবোন আর ভাইপো-ভাইঝি খেলা করছে ছাদে বল নিয়ে। নিম্ন-মধ্যবিত্ত সংসারে ছোটদের নিয়মিত বৈকালে বেড়াতে নিয়ে যাবার লোক নেই, অথচ একা রাস্তায় না ছাড়বার মত ভদ্রতাটুকু আছে। সুতরাং অভাব বিশুদ্ধ বায়ু-সেবন ও ব্যায়ামের। তা পূরণের চেষ্টা হচ্ছে ছোটদের সকালে খোলা ছাদে পাঠিয়ে।

অসহ্য! এক মিনিট এ বাড়ীতে থাকা চলে না। সাত-সকালে তারই মাথার উপরে এই আস্ফালন। সারা রাত্রি ঘুম হয় না সুমিতার, ভোরের দিকে যা একটু। তা-ও এইভাবে সমাধিগ্রস্ত হ'ল। ন'টায় হাজিরের খাতায় সইটি কে করবে?

"উঃ, আঃ!" সুমিতা হাত-পা ছড়িয়ে উঠে বসল। ইচ্ছা হচ্ছে ভাই-ভাইপো নির্ব্বিশেষে গলা টিপে ধরে গোলমালের মূলোচ্ছেদ করে দেয়। অথচ এদেরি সে ভালবাসে! সে ভাল-বাসার চিহ্ন এখন কোথাও নেই।

খাট থেকে পা নামাতে হঠাৎ আঁচলে খাটের বাজুর টান লাগল। এই সব প্রকাণ্ড সেকেলে আসবাব এইটুকু পায়রার খোপে যে মানায় না সে কথা পেন্‌শনভোগী পিতা ছাড়া সবাই জানে। বড় বাড়ীর ভাড়া গুণবার ক্ষমতা না থাকলে এই মান্ধাতা আমলের আসবাবগুলি বেচে ফেলা উচিত। 'উচিত, উচিত, একশো বার উচিত!' কথা কয়টি চীৎকার করে বলে ফেলে সুমিতা কিঞ্চিৎ লজ্জিত হ'ল। আড়চোখে পার্শ্বশায়িতা পিসীর প্রতি চেয়ে মন তার আবার জ্বলে উঠল।

এইটুকু খোপে আবার ভাগীদার! সকাল সাতটা বেজে গেছে, বুড়ী টান হয়ে ঘুমোচ্ছে দেখ! তার নিজের এখনই ট্রাম-বাস্ ধরবার জন্য ছুটতে হবে হন্তদন্ত হয়ে, অথচ পিসীর মজা কি? অযথা মাটিতে পা ঘষে, কেসে, চুড়ি বাজিয়ে সুমিতা নিরপরাধা পিসীকে সুখনিদ্রা থেকে তুলবার চেষ্টা করতে লাগল। কুম্ভকর্ণের ঘুম ভেঙে পিসীর উঠবার কোন লক্ষণই দেখা গেল না। 'দিই একটা চিম্‌টি!'—হাতখানা বাড়িয়ে টেনে নিয়ে সুমিতা ভাবল, সত্যই কি আমি পাগল হলাম নাকি? বিদ্বেষের সঙ্গে একবার পিসীর প্রতি দৃষ্টিক্ষেপ করে অবশেষে সুমিতা বেরিয়ে পড়ল।

'Hail glorious sun'!—প্রতিদিন সকালে এই কথাটি সুমিতার বলা চাই-ই। কেন যে, সে তা জানে না। কিন্তু, যেন না বলতে পারলে মস্ত ক্ষতি হয়ে যাবে। আবার দরজা খুলেই সোজাসুজি সূর্য্যের দিকে তাকিয়ে কথাগুলো উচ্চারণ করবার আগে অন্ত কারুর সঙ্গে দেখা হয়ে গেলে সেদিন তত ভাল কাটবে না বিশ্বাস আছে তার। দুঃখের বিষয় দরজা খুলেই আজ মাতার পেয়ারের ঝি সুশীলার সঙ্গে চোখাচোখি হয়ে গেল। বিরক্ত মনটা বিষিয়ে উঠল সুমিতার।

আজ কপালে কি আছে কে জানে? সূর্য্য বন্দনা করবার পূর্ব্বেই দেখা হয়ে গেল শূদ্রাণীর সঙ্গে। হাত-মুখ ধুয়ে সুমিতা চায়ের টেবিলে পৌঁছল। যথারীতি চা পাত্রে ঢেলে রাখা হয়েছে—কার্ত্তিকের হিমেল বাতাসে সে চা শৈত্যময়। কত দিন বলেছে সে বৌদিদেরকে তার চা-টা টি-পটে উনুনের ধারে রেখে দেবার জন্যে। কথাটা কানে যায় না শ্রীমতীদের।

চা গরম করা চলে না। সুতরাং ঠাণ্ডাজল চা খেয়ে সুমিতা মুখ খুলল, "এর চেয়ে জল খাওয়াও ভাল। কাল থেকে তাই খাব। এত কষ্ট করে আমার জন্যে চা করতে হবে না কারোর। হাজার বার বলেছি—। নাঃ, চা খাওয়া ছাড়ব কেন? নিজে রোজগার না করলে যখন এক দিনও চলবে না, তখন রোজগারের রসদ চাই। চা, চিনি, জমানো দুধ নিজেই এনে রাখব—"

মা একটু অপ্রতিভ হলেন,—"ও বৌমা, আর এক কাপ চা করে দাও না সুমিকে। সত্যিই ত এখনই সারাদিনের মত চলে যাবে।"

মেজবৌদি ততোধিক অপ্রতিভ হয়ে চা করতে গেলেন। উনুন বন্ধ ছিল, একটু দেরি হ'ল।

ততক্ষণে সুমিতা নিজের 'খোপে' ফিরে গেছে। চুল খুলে তেল দিতে গিয়ে দেখে তেল নেই। শিশিটা আছড়ে ফেলে দিল সুমিতা—আর সহ্য হয় না। কেন জানি না, আজকাল কিছুই মনে থাকছে না। কাল আপিসে যাবার মুখে বেশ মনে করে গিয়েছিল তার বিশেষ তেলটি কেনবার কথা। ঐ তেল ভিন্ন চুল থাকে না তার মাথায়। কিন্তু পাঁচটার পরের অসম্ভব ভিড়ে-ভর্ত্তি ট্রাম-বাসের দিকে চেয়ে চেয়ে মনে হ'ল না যে বাড়ীতে কোনমতে পৌঁছনো ছাড়া অন্য কিছু তার করবার আছে। আজ দু' বছর বি-এ পাস করে সে কাজ করছে, সখে নয় বাধ্য হয়ে। সংসার সকলের রোজগার দিয়ে কোন মতে চলে।

কবে এ জোয়াল থেকে মুক্তি আসবে? কবে ভিড়ে ঠেলা-ঠেলি করে ট্রামে-বাসে ছুটাছুটির বদলে সে ঘরে বসে চায়ের কাপ হাতে আরামে নভেল পড়তে পারবে বান্ধবী মণির মত। হায় মণিমালিকা, মেয়েদের বিবাহের প্রয়োজন তুমি বুঝতে পার না। জমিদার-দুহিতা তুমি, ইচ্ছামত জীবন যাপন করবার বিলাসিতা পেয়েছ; বোঝ না কেন যেন-তেন-প্রকারেণ বিবাহ

সাধারণ মেয়েদের ঈপ্সিত। মণিমালিকা, তোমার কণ্ঠসঙ্গীতে বাংলাদেশ আজ বিমুগ্ধ। নূতন যশের সন্ধানে শীঘ্রই সাগর-পারে যাচ্ছ তুমি। বৈচিত্র্যহীন, অভাবগ্রস্ত জীবন তুমি জানবে কি করে ?

কিছুই পারি না কেরাণীগিরি ছাড়া। মাতার নারিকেল তেল মাথায় মাখতে মাখতে সুমিতা দেওয়ালে-টাঙানো আয়নার দিকে তাকাল। এই কি সে ? রুক্ষ, কর্কশ মুখভাব, বিবর্ণ চামড়া ! সারামুখে অতৃপ্তি, হতাশা মাখানো। এই কি সে সুমিতা দত্ত, যাকে দেখে সুধীর কবিতা লিখত ! যাক, ও নাম আর কেন ? ক্ষণিক বিষাদভাবটা কেটে গেল দড়াম করে স্নানাগারের দরজা বন্ধের শব্দে। মেজদা ঠিক ঢুকেছে, এখন আধঘণ্টার আগে বাথরুম পাবার উপায় নেই। মেজদার হাজিরে দশটায়, কিন্তু রোজ সুমিতার আগে বাথরুমে যাওয়া চাই। রাগে পাগলের মত সুমিতা দরজায় ধা দিতে লাগল, "বেরোও শিগগির, বেরিয়ে এস বলছি। আমার দেরি হয়ে যাবে।"

"আঃ, কি বিরক্ত করিস ? মেয়ে যেন ঘোড়ায় চড়ে এসেছে !—" মেজদার আত্মপ্রীত কণ্ঠ শোনা গেল। কিছুক্ষণ বন্ধ দরজার ভিতর-বাহিরে বিতণ্ডার পরে সুমিতা বাথরুমের অধিকার পেল।

ঘরে ফিরে এসে চুল বাঁধতে গিয়ে নিজেরই আছড়ে ফেলা শিশির কাঁচ ফুটে গেল পায়ে। "উঃ"—সহসা চিন্তামগ্নচিত্ত দৈহিক বেদনায় চমকিত হয়ে উঠল। রাগের জোরে নিজের পায়ে চপেটাঘাত করে সুমিতা টেনে খুলতে বসল কাঁচের টুকরো। নিজের ওপর করুণায় চোখে জল এসে গেছে তার। আর পারে না সে, আর পারে না প্রতিমুহূর্তে ভাগ্যের সঙ্গে মল্লযুদ্ধ করে চলতে।

ঠক্, ঠক্ ! চমকে আবার শিউরে উঠল সুমিতা। তার ভাইঝি রুণু একটা ছড়ি দিয়ে ক্রমাগত চেয়ারের হাতলে আঘাত করে যাচ্ছে খেলাচ্ছলে। নিজেকে সংবরণ করতে পারল না সুমিতা। প্রতিটি শব্দ তার মস্তিষ্কের কোষে আঘাত করে স্নায়ুমণ্ডলীকে ক্ষিপ্ত করে তোলে। রুণু কচি গালে পিসীর পাঁচ আঙুলের ছাপ নিয়ে কাঁদতে কাঁদতে নালিশ করতে গেল মায়ের কাছে। পরক্ষণেই কলহপ্রিয়া বড়বৌদির বায়স কণ্ঠ ঝঙ্কার দিয়ে উঠল, "বাচ্চা মেয়েটাকে মেরে রাগ দেখানো কেন ? আঙুলের দাগ কেটে বসেছে দেখ ! এমনই করেই মারতে হয় !—"

কি ছোটলোক বউটা ! নিজে ছেলে-মেয়েদের ঠেঙাতে ঠেঙাতে আধমরা করে ফেলে, কিন্তু অন্য কেউ কিছু বললেই কোমর বেঁধে তারস্বরে চেঁচায়। হায় ভগবান, এ ত গৃহ নয়, নরক। অসহায় ক্রোধে সুমিতা ঘুষি পাকিয়ে হাত মুঠো করল। আয়নার পাশে বড়বৌদির হাস্য-রত প্রতিকৃতির উদ্দেশে সে হাত খানিকটা উঠেই শিথিল হয়ে গেল। আবার আয়নায় মাধবী নিজের প্রতিচ্ছায়া দেখতে পেয়েছে। ক্রোধে ঘৃণায় বিকৃত, কদর্য্য মুখ। এ কি সেই সুমিতা দত্ত, সুধীর যার ছবি এঁকেছিল।

দিনের শেষ। চলন্ত ট্রামের দোদুল্যমান লোকগুলির দিকে চেয়ে সুমিতা নিশ্বাস ফেলল। অনেকক্ষণ অপেক্ষা করে তবে যদি একটু স্থান পাওয়া যায়। দাঁড়াতে সে কাতর নয়, উঠতে পারলেই হ'ল। ট্রাম এসে থামবার সঙ্গে সঙ্গে অপেক্ষমান জনপ্রবাহ যেন পাগল হয়ে ওঠে। নির্লিপ্ত দৃষ্টিতে সামনের দিকে তাকিয়ে যারা শান্তশিষ্ট ভদ্রভাবে দাঁড়িয়ে ছিল, হঠাৎ তাদের অশোভন ব্যস্ততা দেখে চমৎকৃত হতে হয়। তৃতীয় ট্রামের পেছনে কিছুক্ষণ ছুটে সুমিতা আবার নিজের জায়গায় ফিরে এসে দাঁড়াল। তার আপিসের এংলো-ইণ্ডিয়ান ষ্টেনো কেমন জল-কেটে-চলা মাছের মত লোকের স্রোত কেটে উঠে পড়ল। উঠতে পারল না সে-ই। আজ সারাটা দিন লাঞ্চ না খেয়ে কাটল। ভারি লাঞ্চ খায় সে ! 'লাঞ্চ' মানে চমৎকার কিছু নয়—টিনের কৌটোয় বাড়ী থেকে বয়ে-আনা দালদায় ভাজা ঠাণ্ডা লুচি-পরোটা, কিছু তরকারি। কোন দিন বাক্স খুলে দেখা যায় শাক-পাতার চচ্চড়িও আছে। দুর্লভ দিনে মাঝে মাঝে ভাল কিছুও থাকে, যেমন পরশু দিন 'মনোহরা' সন্দেশ ছিল। বড়দি শ্বশুরবাড়ী জনাই থেকেই পাঠিয়েছিল। নইলে সুমিতার পক্ষে লাঞ্চ কেবলমাত্র নামেই সুন্দর। আজ বড়বৌদির উপরে রাগ করে খাবারের কৌটোটা ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে সে চলে এসেছে। বাড়ী ফিরলে হয়তো সেই খাবারই খেতে হবে। পেটের মধ্যের নাড়ি বিতৃষ্ণায় মোচড় দিয়ে উঠল। গা বমি-বমি করছে কেন ? আশ্চর্য্য, সারাদিন প্রায় উপবাসে কাটিয়েও এমন অরুচির ভাব হয়। অস্থির ভাবে সুমিতা পায়চারি করে বিতৃষ্ণ ভাবটা দমন করতে চেষ্টা করল। পার্কের গাছের দিকে চেয়ে, এস্‌প্লানেডের সাজানো দোকান-গুলোর দিকে চেয়ে সুমিতা অন্যমনস্ক হবার চেষ্টা করল।

পায়চারি করবার উপায় নেই, লোকের গায়ে গা লেগে যায়। নিরুপায়ভাবে সুমিতা আবার নেমে দাঁড়াল। সহসা একটা উপায়হীন তীব্র ক্রোধে আপাদমস্তক জ্বলে উঠল। তারই মত সব কেরাণীর পাল ! ব্যস্ততা দেখে মনে হচ্ছে যেন প্রকাণ্ড ডিনারের নিমন্ত্রণ রয়েছে, যেন সভাপতিত্ব করতে হবে, যেন পার্লিয়ামেণ্টে বক্তৃতা দিতে যাচ্ছে। এক মিনিট দেরি সয় না, অসম্ভব ভিড় হলেও ঠেলে ঠেলে উঠবেই ! যেন ট্রেন ফেল হবে ! নরাকার জন্তু সব ! এখনই যদি পুলিসের গুলি চলে, এরা যে যেখানে আছে সে সেখানে ধপ্ করে পড়ে মরে, বেশ হয়। বেশ হয় ! বেশ হয় ! সুমিতা দাঁতে দাঁত পেষণ করল। কেন এরা বেঁচে আছে ? কিসের লোভে, কিসের আশায় এরা পৃথিবীতে অপদার্থের দল বাড়িয়ে চলেছে ? সহস্র সত্তা হয়ে সুমিতা এদের গলা টিপে মেরে ফেলতে চায়।

সুমিতার অসংখ্য শত্রুর মধ্যে এরা একজন। এদের জন্য সে ট্রামে উঠতে পারে না, আরাম করে ষ্টপেজের কাছাকাছি দাঁড়াতে পারে না। এদের উৎপাতে সে পায়চারি করে বিবমিষাকে দমন করতে পারছে না। গাওয়া ঘিতে ভাজা গরম লুচি আর মাংস আজ সে খাবে। যেমন করে হোক খেতেই হবে, খেতে পারলে নিশ্চয় তার ভাগ্যে একটা ভাল কিছু হবে। আঃ, যেন মুখের মধ্যে মাংসের ঝালের স্বাদ পাওয়া যাচ্ছে, যেন লুচির সুঘ্রাণ নাকে ভেসে আসছে। আজ সে বাড়ী ফিরে গরম লুচি-মাংস খাবেই। নিশ্চয় মা আপত্তি করবেন—'মাংসের যা দাম বাবা। গাওয়া ঘি-ই বা কোথায়?' আবার মনে মনে সুমি জলে উঠে মাকে গালাগালি দিতে লাগল, 'আমার বেলাতেই না। ছেলেরা বললে তো তখনই হয়। কেন আমি কি সংসারে টাকা দিই না? কত লাগবে দিচ্ছি। আমি আজ লুচি-মাংস খাবই।' চমকিত হয়ে সুমিতা দেখল সে হাতব্যাগ খুলে টাকার চামড়ার থলেটা বের করে ফেলেছে। অপ্রতিভ হয়ে ব্যাগ বন্ধ করে একবার চারপাশে তাকাল সে। কেউ দেখে নি তো? হায়, তার একটু নিভৃত চিন্তার অবকাশও নেই।

এবারের ট্রামে উঠে একটু বসবার স্থান পেলে সুমিতা। বিপর্য্যস্ত বেশভূষা সামলাতে সামলাতে পাশের ভদ্রমহিলার দিকে তাকাল। কি মোটা! বেঞ্চের এক-তৃতীয়াংশ অধিকার করে হাত-পা এলিয়ে বসেছে দেখ! নূতন লোক এলে একটু গুছিয়ে বসে সে জায়গা করে দেবে সে জ্ঞান নেই। মহারাণী অফ্ ক্যালক্যাটা! গায়ের সঙ্গে ভদ্রমহিলার স্থূল বাহু ঠেকছে। কি অস্বস্তিকর অনুভূতি। এক ধাক্কা দিয়ে সরিয়ে দেব নাকি? প্রাণপণে সুমিতা আত্মসংবরণ করে বাইরে তাকাল।

বমনেচ্ছা কেটে গেছে, কিন্তু মাথাটা ধরে উঠেছে সাংঘাতিক ভাবে। হঠাৎ বাঁ-হাতটা থর থর করে কেঁপে উঠল। হাতের দুটো আঙুল অন্য আঙুলের থেকে বিভিন্ন হয়ে টিকটিকির কাটা ল্যাজের মত লাফালাফি করতে লাগল। কি যে হয়েছে সুমিতার!

পেছন থেকে কে যেন তার গায়ে হাত দিল। কি আস্পর্দ্ধা, খুন করে ফেলব। ঘাড় ফিরিয়ে কিন্তু দেখা গেল, বছর দুইয়ের একটি বাচ্চা এক ঝি-শ্রেণীর স্ত্রীলোকের কোল থেকে তার কাপড় ধরে টানাটানি করছে। স্নেহ হ'ল না, হ'ল বিরক্তি। তার মত একটি ভদ্রমহিলার কাপড় ধরে টানবার অপরাধে ঝি-টার কোন শাসন নেই। আবার এক টান। অতি বিরক্তিতে ভ্রূ কুঞ্চিত করে সুমিতা বলে উঠল, "আঃ!" ফলে খোকার খেলার প্রবৃত্তি প্রশমিত হ'ল।

আবার মোটা মহিলার কনুয়ের খোঁচা লেগে গেল। গা শির্‌শির্ করে উঠল সুমিতার। আর সামলানো যায় না। ধীরে অথচ দৃঢ়ভাবে সুমিতা একটি শক্ত ঠেলা দিল। ভদ্রমহিলা নড়েচড়ে সোজা হয়ে বসলেন।

সহসা সুমিতার মন বেদনায় মুহ্যমান হয়ে পড়ল। সারাদিন আপিসে কেটেছে কত দুঃখে। কত অপমান, কত লাঞ্ছনা সহ্য করতে হয়েছে। নিষিদ্ধ মুখ দেখে সকালে শোবার ঘরের দরজা সে পেরিয়েছে, সূর্য্যকে অভ্যর্থনা করতে পারে নি। এত জানা কথা যে আজকের লাঞ্ছনা তার ললাট-লিখন। পাঞ্জাবী বস্ ঘরে ডেকে নিয়ে চাপাসুরে তর্জ্জন-গর্জ্জন করেছে। যে চিঠিখানাই সে লিখবে সেখানাতেই গোটা চারেক ভুল বের করে শ্রীমান্ নিজের মুরুব্বিয়ানা দেখাবেন। 'হ্যাপি' শব্দ কেটে 'গ্লাড্' বসিয়ে, 'অ্যাণ্ড'-এর বদলে 'অল্‌সো' দিয়ে দেখানো চাই যে তিনি খুব জবরদস্ত ওপরওয়ালা। বিদ্যার তো বৃহস্পতি, চাল দেখে মনে হয় চার্চ্চিল-হিটলার-ট্রুম্যানের মিশ্রণ। মিশ্র যোগ। সাধারণ ইলেক্‌ট্রিক পাখা সংক্রান্ত চিঠি নিয়ে সে কি টাই ধরে টেনে, চুলে হাত বুলিয়ে, পেন্সিল টেবিলে ঠুকে, ছাদের দিকে চোখ তুলে আলোচনা! যেন শেক্‌স্‌পীয়রের ট্রাজেডির ব্যাখ্যা হচ্ছে। কেন ওর কিছু হয় না, ঐ হ্যাবড়ানো মুখ, চ্যাপ্টা বাংলা পাঁচের? আজ অবশ্য এ তিরস্কার সুমিতার পাওনা ছিল। কথা অন্যের উত্তর দিলে যাওয়ার নিশ্চিন্ততায় সুমিতা চোখ তুলে সামনে তাকাল। সে জানত আজ এ তার পাওনা ছিল।

চোখের পাতা কেঁপে উঠল হঠাৎ। মেয়েদের বাঁ-চোখ নাচা ভাল, তার কপালে নাচল ডান চোখ। ফল শুভ নয়, প্রমাণ—"প্রমীলার বামেতর নয়ন নাচিলা"···। তার ফলে মেঘনাদের মত স্বামীর মাথা খেল প্রমীলা।

কানের কাছে ঝন্ ঝন্ করে মিলিটারি লরি চলে গেল। সমস্ত শরীর শিউরে ওঠে শব্দে। এদিকে গা ঠেসে মুটকী বসেছে দেখ! যেন আমার শরীরটি কুশন-চেয়ার। হাত জোরে মুষ্টিবদ্ধ করে সুমিতা সংযম অভ্যাস করতে লাগল। যাক, 'মহারাণী অফ্ ক্যালকাটা' এতক্ষণে নেমে গেলেন।

থেকে থেকে চোখ নাচতে লাগল। উঃ, কি খিদে পেয়েছে! সেই ফেলে আসা ঠাণ্ডা পরোটা ও চচ্চড়ি উপকরণের জন্য মন ব্যগ্র হয়ে ওঠে। যাহা পাই তাহা খাই। কিছু পেলেই হবে। ফেলে-আসা খাবারই তার।

বাড়ীর মোড়ে নামল সুমিতা। একটুক্ষণ হাঁটতে হবে। বাড়ী ফিরে দেখা যাবে নিদারুণ দিনের নিশ্চয় কোন নিদারুণ সমাপ্তি প্রতীক্ষা করে আছে নিঃসন্দেহে। ভবিষ্যৎ দুঃখের চিন্তায় সুমিতার গলার কাছে যেন শক্ত একটা পাথর উঠে এল।

আচ্ছা, কি হ'ল তার? কখনও রাগ, কখনও দুঃখ! যে কোন একটা শব্দ কানে গেলে মাথা যেন ছিঁড়ে পড়ে। কি হ'ল আমার? কি অদ্ভুত লাগছে।

'নার্ভস!' ঠিক, পিসতুতো ডাক্তারদাদা বলেছেন সুমিতার নার্ভের অবস্থা সঙ্গীন। স্নায়বিক গোলযোগ তা হলে এই

হাসিকান্নার কারণ। তাই তো নভেলের নায়িকার মত দুর্বোধ্য ব্যবহার করে যাচ্ছে সে। সত্যি, আধুনিক লেখকেরা ত এইভাবেই নারীচরিত্র আঁকেন আজকাল, ধরা-ছোঁয়া যায় না। তা হলে সবাই কি নার্ভের ব্যারামে ভুগছে, একটিও সুস্থ-স্বাভাবিক নায়িকা নেই? কিন্তু লেখকেরা জানেন কি যে তাঁরা রোগগ্রস্তা নায়িকার চিত্র অঙ্কিত করছেন। যদি তা জানবেন তবে 'নেতি-নেতি' ভাব কেন? দৃঢ় তুলির আত্ম-নিশ্চিত টান কোথায়?

আধুনিক লেখকদের মুণ্ডপাত করতে করতে সুমিতা বাড়ী এল। রকের ওপরে যথাক্রমে ছেলেমেয়েরা ফেরিওয়ালাকে ডেকে বেসাতি নামিয়েছে। দারুণ বিরক্তিতে সুমিতা সদর দরজা পার হ'ল। সামনেই মার-খাওয়া রুণু। লাফাচ্ছে দেখ? লজ্জা নেই।—"পিত্তি তোমাল তিথি। মত্ত তিথি। তিকিত আমি তাই।"

এ কি? চিঠি! চিঠি! সুধীরের চিঠি। সুধীর তাকে ভোলে নি। রুণুর হাত এড়িয়ে মাধবী ঘরে এসে চিঠি পড়ল। কায়রো থেকে সুধীর রওনা হয়েছে—ভারতবর্ষে প্রথম মুখ সে দেখতে চায় সুমিতার। আঃ!

খাটের ওপর এলিয়ে শুয়ে পড়ল সুমিতা। কি সুন্দর এই খাটখানা। বড়বৌদি কি ভাল! বিছানা পেতে রেখেছে।

ঠক্, ঠক্, ঠক্! ছেলেমেয়েরা ছাদে উঠে গেছে। নিয়মিত খেলা করছে তারা। সুমিতা স্নেহের হাসি হাসল—কি সজীব ছেলেমেয়েরা!

ঋতু-চক্র

শ্রীজীবনময় রায়

গ্রীষ্ম

কণ্ঠে জড়ায়ে বেলফুলহার, চূতমঞ্জরী কর্ণে,
মরুপ্রান্তরে বহ্নিতুফান তুলি পিঙ্গল বর্ণে,
কালবৈশাখী মহাঝড় শিরে ঘুরায়ে বজ্র অসি,
আমি বৈশাখ রুদ্রনৃত্যে ঋতুর চক্রে পশি।

বর্ষা

ঘন ঘোরনীল | জলদবরণ | জড়ায়ে,
কদম্ব রেণু | বন পথে পথে | ছড়ায়ে,
কেতকী কুসুমে আমি বিদ্যুৎপর্ণা;
ভুবন-প্লাবন ঝরাই ঝরকা-ঝর্ণা।
ডমরুছন্দে মাতি আনন্দে ঢাকিয়া সূর্য্য শশী,
বরষা আমি সে ভৈরব নাটে ঋতুর চক্রে পশি।

শরৎ

প্রভাত রবির কিরণেতে অবগাহিয়া,
লঘুভার মেঘ-শুভ্র ভেলাটি বাহিয়া,
সুনীল মানসসরসী পদ্মবনে,
চলেছি ভাসিয়া দিগন্তে আনমনে।
কুসুমিত কাশপুষ্পবসনা বালা,
কবরীতে মোর শুভ্র শেফালী মালা,
সুবর্ণ-বীণা কোলেতে লইয়া বসি,
আমি শারদীয়া বীণা ঝঙ্কারে ঋতুর চক্রে পশি।

হেমন্ত

কুহেলী-ধূসর অবগুণ্ঠনে ঢেকেছি আননখানি,
অশ্রুসজল আঁখি ছলছল কণ্ঠে নীরব বাণী;
দিগন্ত ভরি শস্যে শিহরি বায়ু ওঠে নিঃশ্বসি—
আমি হেমন্ত গোপনপন্থ ঋতুর চক্রে পশি।

শীত

আবরিয়া তনু—অবনত দনু—তুষার আচ্ছাদনে,
ঝরানো পাতার পথে চলিয়াছি কঙ্কালময় বনে
যৌবন আজি মিলাল সুদূরে কুহেলী অন্ধকারে
গোলাপের রাঙা স্বপনের মাঝে রেখে গেল আজ ...রে
রহিয়া রহিয়া তবু ক্ষণে ক্ষণে কেন হায় বারে বারে,
নবজীবনের সৃষ্টির ধ্যান বুকে উঠে উচ্ছ্বসি!
আমি হিমঋতু জরতীর বেশে ঋতুর চক্রে পশি।

বসন্ত

কুন্দমাধবীশিরীষ কুসুম হারে
সাজিয়া এসেছি পুষ্প-অলঙ্কারে
কোকিলকণ্ঠে বকুলগন্ধে আকুল কানন বীথি,
হৃদয় ভরিয়া কণ্ঠ ভরিয়া এনেছি মিলন-গীতি।
দক্ষিণা বায়ে বাসন্তী বাস আকাশে উড়িছে খসি,
আমি মাধবিকা ললিতনৃত্যে ঋতুর চক্রে পশি।

[আবৃত্তি ও বাদ্যের তালে সকলের ঘুরিয়া ঘুরিয়া নৃত্য]

গ্রীষ্ম, বর্ষা, শরৎ, হিমানী, শীত বসন্তাবর্তে,
দিবস-রাত্রি, যুগল চরণে ঘুরে ঘুরে আসি মর্ত্যে।
মোরা অমা-পূর্ণিমা যুগল অশ্বে বর্ষ-চক্রে ফিরি,
পথে ছায়া-আলোকের চামর দোলায় উদয়-অস্তগিরি।
মোরা চির পুরাতন নবীনের বেশে বার বার ফিরে আসি,
মোরা ধরণীর মাঝে বিচিত্র সাজে ফুটাই কান্না হাসি।

বাংলায় গদ্য-কবিতার সূচনা

শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

বাংলায় গদ্য-কবিতার সম্ভাবনা সম্বন্ধে কবি রাজকৃষ্ণ রায়ই সর্ব্বপ্রথম সচেতন হন। তিনি ১২৯১ সালের শ্রাবণ মাসে (জুলাই ১৮৮৪) যোগেন্দ্রনাথ বিদ্যাভূষণ-সম্পাদিত 'আর্য্য-দর্শন' পত্রে "বর্ষার মেঘ" নামে একটি গদ্য-কবিতা প্রকাশ করেন। কবিতাটির শেষে একটি পাদটীকা আছে, তাহা এইরূপ :—

"যে সকল গদ্যে পদ্যের কাব্যাত্মক ভাব থাকে, সেই সকল গদ্যের কোন কোন বিষয় এইরূপ পদ্যপৌঙ্‌ক্তিক প্রণালীতে সাজাইয়া লেখা আমার বিবেচনায় ভাষার একটি নূতন অঙ্গ। লেখা তো হইল। এখন পাঠকমণ্ডলী কি বলেন।— শ্রীরাজকৃষ্ণ রায়।"

রাজকৃষ্ণের লিখিত "বর্ষার মেঘ" কবিতাটি আমরা নিম্নে উদ্ধৃত করিলাম :-

বর্ষার মেঘ

(পদ্যপৌঙ্‌ক্তিক পদ্য-গদ্য)

১

আকাশ নীল অনন্ত নীল,
মানব-চক্ষু অনন্ত নয়···
সুতরাং আকাশ অনন্ত নীল।
দক্ষিণদিক্‌শোভিনী দিগঙ্গনার অঙ্গুলি হ'তে
ধীরে ধীরে বায়ু-স্রোতে
একখানি সূক্ষ্ম মেঘ ভাসিয়া আসিল।
সূক্ষ্ম মেঘ বলিলাম কেন?
অনন্ত নীলাকাশপটের একটি পাশে
অনন্ত সমুদ্রের তরঙ্গায়িত বক্ষে
একটি ক্ষুদ্র পত্রের ন্যায় যে মেঘ,
সে কি বৃহৎ?—না ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র।
আমিও এই কালসমুদ্রে বা কালাকাশে
তস্মাদপি ক্ষুদ্র,
বা ক্ষুদ্রতম শব্দের পর
যদি অন্য কোন বিশেষণ থাকে,
আমি তাই।
আমি, আকাশ-কোলে
ঐ ক্ষুদ্রতম মেঘের তুলনায় কালের কোলে
'নাই' বলিলেই হয়।
অহো, তবে কালের চেয়ে অনন্ত কে?—
মহান্ কে?
তা কি জান না?—ঈশ্বর।
একই কথা—যিনি ঈশ্বর, তিনিই কাল।

২

এ কি হ'ল?
এই কয়টি কথা ভাবিতে ভাবিতে
ক্ষুদ্র মেঘ বৃহৎ—বৃহত্তর হ'ল।
বামনমূর্ত্তি বিরাটমূর্ত্তিতে পরিণত হ'ল।
অহো, ক্ষুদ্র মেঘ এত বড়।
বুঝিয়াছি—
জগতে কেহই ক্ষুদ্র নয়।
ক্ষুদ্র কেন হইবে?
যিনি জগতের স্রষ্টা,
তিনি ক্ষুদ্র হইলে
জগৎ, জগদ্বাসী প্রাণী অপ্রাণী ক্ষুদ্র হইত,
সুতরাং কেহই ক্ষুদ্র নয়।
যাহাকে বৈজ্ঞানিক দার্শনিক পরমাণু বলে
তাহা না কি এত ক্ষুদ্র যে
অণুবীক্ষণ-যন্ত্র চক্ষে না ধরিলে
দেখা যায় না বোঝা যায় না,
আবার অণুবীক্ষণও কখন কখন হারি মানে
তবে বৈজ্ঞানিক আর দার্শনিকের মতে
পরমাণুর চেয়ে ক্ষুদ্রতম আর কিছুই নাই।
কিন্তু আমার বিবেচনায়
বৈজ্ঞানিক ও দার্শনিক বড় ভ্রান্ত;
নহিলে এমন কথাও কি বলে?
কি আশ্চর্য্য!
সকলের চেয়ে পরমাণু ক্ষুদ্র!
পরমাণু সর্ব্বক্ষুদ্র হ'লে
সর্ব্ববৃহৎ কে?

৩

ভাই বৈজ্ঞানিক!
একবার বেশ্ ক'রে ভেবে দেখ দেখি,—
তোমার বিজ্ঞানের পুঁজীপাটা কি লইয়া?
পরমাণু লইয়া নয়?
তোমার সূর্য্য কি?
চন্দ্র কি?
বুধ বৃহস্পতি শুক্র শনি আদি গ্রহ কি?
সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ গ্রহ ইউরেনস্ কি?
বিশ্বসংসার কি?
ব্রহ্মাণ্ডের পর ব্রহ্মাণ্ড তার পর ব্রহ্মাণ্ড—

এইরূপ অনন্ত কোটি ব্রহ্মাণ্ড,
সে সকলই বা কি ?
পরমাণু নয় কি ?
যদি পরমাণুই হ'ল,
তবে তুমি কোন্ লজ্জায়—কোন্ মুখে
পরমাণুকে ক্ষুদ্র বল ?
যদি বল যে, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পরমাণুযোগে
এই সকল বৃহৎ কাণ্ড সংঘটিত হইয়াছে,
কিন্তু পরমাণু নিজে ক্ষুদ্র,
তবে তুমি ভ্রমের অঙ্ক কসিতে খুব মজবুৎ।

ভাই, তুমি কি জান না,
যাদের সংযোগে বা একতায়
অনন্ত কোটি ব্রহ্মাণ্ড গড়িতে পারে,
তা'রা কখনো ক্ষুদ্র ?
তা'দের চেয়ে তবে বড় কে ?—ঈশ্বর।
ও একই কথা—যে ঈশ্বর সেই পরমাণু।

এই কবিতা প্রকাশের অল্প দিন পরেই রাজকৃষ্ণ রায় নাটকেও পদ্যপৌঙক্তিক গদ্যের প্রবর্ত্তন করিয়াছিলেন,—সে-কথা গত বারে বলিয়াছি।

হুগলী

শ্রীসুধীরকুমার মিত্র

পঞ্চদশ শতাব্দীতে হুগলীর অস্তিত্ব ছিল না ; হুগলীর যাবতীয় ব্যবসা-বাণিজ্য স্মরণাতীত কাল হইতে সপ্তগ্রাম নির্ব্বাহ করিত। সপ্তগ্রামের অবনতির সঙ্গে সঙ্গে পর্ত্তুগীজ বণিকদের যত্নেই এই শহরের পত্তন হয় ; পর্ত্তুগীজগণ এই স্থানে প্রতিষ্ঠিত হইয়া গোলাঘাটে একটি দুর্গ নির্ম্মাণ করেন এবং এই দুর্গ হইতেই আধুনিক হুগলী শহরের উদ্ভব হইয়াছে। ভাগীরথী তীরবর্ত্তী যে সমস্ত স্থানে ইউরোপীয় বণিকগণ উপনিবেশ স্থাপন করিয়াছিল, তন্মধ্যে এই স্থানটি সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীন। পর্ত্তুগীজদের বাণিজ্যকুঠি এই স্থানে সংস্থাপিত হইবার পূর্ব্বে ইহা একটি নগণ্য স্থান ছিল।*

হুগলী নামটি পর্ত্তুগীজদের দেওয়া নাম ; তৎকালে ভাগীরথী-তীরে বহু হোগলা গাছ জন্মাইত এবং হোগলা হইতেই হুগলী নামের উৎপত্তি হইয়াছে।

সপ্তদশ শতাব্দীর বিভিন্ন পুস্তক ও কাগজপত্রাদিতে হুগলী—ওগোলি, ওগলি, গোলিন, হিউগলি, হাগলে, গুলি প্রভৃতি বিভিন্ন নামে আখ্যাত হইয়াছে ; কিন্তু ঠিক কোন্ সময়ে যে হুগলীর উৎপত্তি হইয়াছিল, তাহা সঠিক নির্ণয় করিতে পারা যায় না।

সাড়ে-চারি শত বৎসর পূর্ব্বে তারকেশ্বরের তিন ক্রোশ দূরে দামুন্যা গ্রামে কবিকঙ্কণ মুকুন্দরাম চক্রবর্ত্তী জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার রচিত চণ্ডীকাব্যে হুগলীর পার্শ্বে ত্রিবেণী এবং ভাগীরথীর অপর পারে অবস্থিত হালিসহর, গরিফা প্রভৃতির উল্লেখ আছে ; কিন্তু হুগলীর উল্লেখ নাই। ইহা হইতে বেশ বুঝিতে পারা যায় যে তাঁহার সময়ে হুগলীর অস্তিত্ব ছিল না।

বঙ্গদেশে ১৫৩০ খ্রীষ্টাব্দে পর্ত্তুগীজগণ সর্ব্বপ্রথম বাণিজ্য বিস্তার করে ; সেই সময় ভাগীরথীর অগভীর জলে তাহাদের বড় বড় জাহাজ আনিবার সুবিধা হইত না বলিয়া তাহারা বুচিখোলার নিকটে জাহাজ নোঙ্গর করিত এবং তথা হইতে ছোট ছোট নৌকায় মাল বোঝাই করিয়া সপ্তগ্রামে প্রেরণ করিত। ইহার কিছুদিন পর হইতে গঙ্গার গতি পরিবর্ত্তিত হইতে আরম্ভ হয় এবং সরস্বতী নদীর খরস্রোত ক্রমশঃ মন্দীভূত ও মৃতকল্প হওয়ায়, সপ্তগ্রামে বাণিজ্য করা পর্ত্তুগীজদের পক্ষে বিশেষ অসুবিধাজনক হইয়া উঠে। সপ্তগ্রামে বাণিজ্য বিস্তার করিবার কয়েক বৎসর পরে ১৫৩৭ খ্রীষ্টাব্দে সাম্পায়ো নামক জনৈক পর্ত্তুগীজ হুগলীতে একখণ্ড জমি ক্রয় করেন। সেই সময় সম্রাট হুমায়ুন শের-সাহের সহিত যুদ্ধে ব্যাপৃত থাকায় ক্যাপ্টেন টাভার্স এই স্থানে একটি দুর্গ নির্ম্মাণ করেন। পর্ত্তুগীজদের এই নূতন উপনিবেশের এক দিকে নদী ও তিন দিকে বিল থাকায় বাণিজ্য বিস্তারের বিশেষ সুবিধা হইয়াছিল এবং ক্রমশঃ সপ্তগ্রামের যাবতীয় বাণিজ্য সেইজন্য এই স্থানেই কেন্দ্রীভূত হইয়াছিল।

বঙ্গদেশের প্রথম সাময়িক পত্র "দিগ্দর্শন" নামক মাসিক পত্রে ১৮১৮ খ্রীষ্টাব্দে বাংলার প্রধান নগরগুলির বিবরণ প্রকাশিত হইয়াছিল ; নিম্নে উক্ত পত্রিকা হইতে কয়েক লাইন উদ্ধৃত হইল।

"হুগলি শহর ক্ষুদ্র কিন্তু প্রাচীন পূর্ব্বে অতি বড় ছিল এখন তাহার প্রায় কিছুই নাই পূর্ব্বে সে একটা বড় বন্দর ছিল এবং ইউরোপীয় বাণিজ্যের তাবৎ হাঁসিল সেখানে দাখিল হইত এবং ইংরজীয়েরদিগের বাণিজ্যের স্থান সেই ছিল পরে

* এই প্রবন্ধের আলোক চিত্রগুলি শিল্পী শ্রীবিভূপদ কর কর্ত্তৃক গৃহীত।

সেখান হইতে কলিকাতা হইল ইংরেজীরেরা এ দেশের বিবরণ কিছু জানিতেন না তাহাতে গঙ্গানদীর নাম হুগলি নদী কহিতেন।" (দিগ্দর্শন, ৫ম ভাগ আগষ্ট ১৮১৮)

মুসলমান রাজত্বকালে হুগলী বঙ্গের দ্বিতীয় শহর ছিল এবং অনার্য্য রমণীগণের নৃত্যসহকারে গানের সময় তৎকালে হুগলী নামের উল্লেখ করা হইত। নাগর, ধানুক, টাঙ্, কোচ, পলে প্রভৃতি অনার্য্য জাতিগণ মধুর কণ্ঠে আজও এই "লাচারি" গাহিয়া থাকে। উক্ত গানের দুইটি পঙ্‌ক্তি শ্রীযুক্ত হরিদাস পালিত লিখিত মালদহের পল্লীভাষা হইতে উদ্ধৃত হইল —

"হুগলি সহড় সতী, আলেচুড়ি হাড়ওয়া।
খাকো, পাটনা সহড় চলি যায় মুরলি॥"

—সাহিত্য-পরিষৎ পত্রিকা, ১৩১৮, পৃঃ ১৭৬

পর্ত্তুগীজদিগের 'গোলিন' (Golin) নামক উপনিবেশের মধ্যে বাবুগঞ্জ, ব্যাণ্ডেল, পিপুলবাতি প্রভৃতি কয়েকটি পল্লী ছিল এবং বন্দর ছিল বলিয়াই 'ব্যাণ্ডেল' নামটির উৎপত্তি হয়। পর্ত্তুগীজদের দ্বারা হুগলী শহরের প্রভূত উন্নতি হয় এবং এই স্থানে তাহারা সর্ব্বেসর্ব্বা হইয়া উঠে। হুগলীতে আধিপত্য স্থাপন করিয়া তাহারা সপ্তগ্রামের ফৌজদারকেই অমান্য করিত। সম্রাট আকবর পর্ত্তুগীজদিগকে সুনজরে দেখিতেন বলিয়া তাহাদের ঔদ্ধত্য ও দুর্ব্বৃত্ততা চরমে উঠিয়াছিল বলিলেও অত্যুক্তি করা হয় না। ষোড়শ শতাব্দীতে রচিত 'আইন-ই-আকবরি' পাঠে জানা যায় যে সপ্তগ্রাম ও হুগলী নামক ক্রোশার্দ্ধ ব্যবহিত দুইটি বন্দরই ফিরিঙ্গিদের হস্তে ছিল।

ওলন্দাজ, ইংরেজ প্রভৃতি বণিকগণের সহিত ব্যবসায়ে বিশেষ সুবিধা করিতে না পারিয়া তাহারা অধর্ম্ম অন্যায় উপায়ে অর্থোপার্জ্জনের চেষ্টা করিতে লাগিল। তাহারা নবাবের বিনা অনুমতিতে গঙ্গার দুই পার্শ্বে অবস্থান করায়, প্রত্যেক নৌকার যাতায়াতের সময় শুল্ক আদায় করিতে লাগিল। এতদ্ব্যতীত বালক-বালিকাগণকে হরণ করিয়া দাস-ব্যবসা করিত এবং হুগলী ও নিকটবর্ত্তী গ্রামসমূহের নিরীহ প্রজাদিগের সর্ব্বস্ব লুণ্ঠন করিয়া তাহাদিগের গৃহে অগ্নিদান করিত। নরহত্যা, নারীর সতীত্ব নাশ প্রভৃতি কোন কুকর্ম্ম করিতেই তাহারা পরাঙ্মুখ ছিল না। তাহাদের অত্যাচারে প্রজাবৃন্দ 'ত্রাহি ত্রাহি' ডাক ছাড়িত এবং 'মগের মুলুক' নামক ঘৃণিত কথা তাহাদের উপলক্ষ্য করিয়াই বঙ্গভাষায় প্রবেশ করিয়াছে। ভাগিরথীতে দস্যুবৃত্তি করিত বলিয়া তৎকালে ভাগিরথীর নাম 'দস্যু-নদী' (Rogue's River) ছিল, কর্ণেল ইউল এইরূপ লিখিয়া গিয়াছেন। Hedges Diary, Vol. III, Page 208.

পর্ত্তুগীজগণ হুগলী ও বঙ্গের অন্যান্য স্থানে প্রায় শতবর্ষ যাবৎ এইরূপ অখণ্ড আধিপত্য ও দস্যুবৃত্তি করিয়াছিল। তাহারা হিন্দু-মুসলমান, স্ত্রী-পুরুষ, বালক-বালিকা যাহাদের পাইত তাহাদের নৌকায় তুলিত; নৌকায় তাহাদের হাতের 'চেটো' ছিদ্র করিয়া, ছিদ্রমধ্যে বেত ঢুকাইয়া নর-নারীকে স্তূপাকারে নৌকায় পাটাতনের নিম্নে রাখিয়া দিত এবং সকালে ও সন্ধ্যায় মুরগীকে ধান দিবার মত তাহাদের মুখের উপর কিছু ভাত ছড়াইয়া দিত। পর্ত্তুগীজদের আগমন-সংবাদ পাইলে পাছে তাহারা কূলে নামিয়া উপদ্রব করে এই ভয়ে স্থানীয় ব্যক্তিগণ কূলে আসিয়া দাঁড়াইতেন এবং তাহাদের নৌকায় লোক পাঠাইয়া দিতেন। দস্যুরা টাকা লইয়া বন্দীগণকে বিক্রয় করিয়া চলিয়া যাইত। (Journal of the Asiatic Society of Bengal, 1907, P-403)

১৬২২ খ্রীষ্টাব্দে জাহাঙ্গীরের তৃতীয় পুত্র খোরাম উত্তরকালে সম্রাট্ শাহ্‌জাহান পিতার বিরুদ্ধে বিদ্রোহী হইয়া হুগলীর পর্ত্তুগীজ শাসনকর্ত্তা মাইকেল রড্রিকের নিকট সাহায্য ভিক্ষা করিয়াছিলেন। রড্রিক তাঁহাকে সাহায্য দান করিতে অস্বীকার করেন এবং এরূপ অবজ্ঞাসূচক বাক্য প্রয়োগ করিয়াছিলেন যে শাহ্‌জাহান তাহাতে বিশেষ অপমানিত হইয়াছিলেন। তাঁহার সহধর্ম্মিণী মমতাজ বেগম পৌত্তলিক পর্ত্তুগীজদিগের উপর বিশেষ ভাবে বিদ্বেষপরায়ণ ছিলেন। যাহা হউক, শাহ্‌জাহান বঙ্গের শাসনকর্ত্তা ইব্রাহিম খাঁকে নিযুক্ত করিয়া দুই বৎসর বঙ্গাধিকারী হইয়াছিলেন এবং সেই সময় পর্ত্তুগীজদিগের অত্যাচার স্বচক্ষে দর্শন করিয়া তিনি স্তম্ভিত হইয়া যান। পরে পিতা-পুত্রে মিল হইয়া যায়।

পরবর্ত্তী কালে দিল্লীর সিংহাসনে আরোহণ করিয়া তিনি পর্ত্তুগীজদের অত্যাচার দমন করিবার জন্য দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হন এবং বঙ্গের শাসনকর্ত্তা কাশিম খাঁকে পর্ত্তুগীজদের দূরীভূত করিবার আদেশ দেন। কাশিম খাঁ বিশেষ সতর্কতার সহিত হুগলী আক্রমণের বন্দোবস্ত করেন এবং হুগলীর দুর্গ অবরোধ করিয়া জয় করিতে তাঁহার সাড়ে তিন মাস সময় লাগিয়াছিল।

১৬৩২ খ্রীষ্টাব্দে কাশিম খাঁ হুগলী অধিকার করিলে মোগলেরা পর্ত্তুগীজদের প্রধান আড্ডা হুগলী দুর্গ দখল করে। বিজিত পর্ত্তুগীজগণ কেহ মোগলের হস্তে প্রাণত্যাগ করিল এবং অনেকে গঙ্গায় অবস্থিত তাহাদের জাহাজে উঠিতে গিয়া জলে ডুবিয়া গেল। গঙ্গায় পর্ত্তুগীজদের একখানি বড় জাহাজে দুই হাজার নরনারী ধন রত্নাদিসহ উক্ত জাহাজে আশ্রয় লইয়াছিল, কিন্তু মোগলদের হস্তে আত্মসমর্পণ না করিয়া তাহারা আগুন দিয়া নিজেরাই জাহাজখানি পুড়াইয়া দেয়। চৌষট্টিখানি বড় জাহাজ, সাতান্নখানি মাঝারি জাহাজ এবং দুই শত ছোট জাহাজের মধ্যে মাত্র একখানি মাঝারি ও দুইখানি ছোট জাহাজ মোগলদের কবল হইতে পলাইতে পারিয়াছিল। সাড়ে চার হাজার পর্ত্তুগীজ নরনারী ও বালকবালিকা বন্দী হইয়াছিল, তন্মধ্যে সুন্দরী যুবতীগণকে বাদশাহ্ ও ওমরাহদিগের অন্তঃপুরে প্রেরণ করা হয় এবং বালক-বালিকাদিগকে মুসলমান ধর্ম্মে দীক্ষা দেওয়া হয়। যাহারা মুসলমান ধর্ম্ম গ্রহণ করিতে অস্বীকার করে, তাহাদিগকে কারাগারে প্রেরণ করা হয়।

হুগলী অধিকার করিয়া মোগলেরা এই স্থানে একজন 'ফৌজদার' * নিযুক্ত করেন এবং সরকারী দপ্তরখানা সপ্তগ্রাম হইতে হুগলীতে স্থানান্তরিত হয়। সপ্তগ্রামের পতনের পর হুগলী রাজবন্দর ও বঙ্গদেশে বাণিজ্যের একটি প্রধান কেন্দ্র হইয়া উঠে। জলদস্যু মগদিগের আক্রমণ হইতে হুগলী বন্দর রক্ষা করিবার জন্য হিজলীতেও একটি ফৌজদারী স্থাপিত হইয়াছিল (Hunter's Statistical Account of Bengal, Vol. III, Page 20.)। পর্ত্তুগীজদের নির্ম্মিত দুর্গ হুগলী আক্রমণের সময় মোগলরা ধ্বংস করিয়াছিল বলিয়া হুগলীর ফৌজদার মহম্মদ উল্লা এই স্থানে একটি নূতন কেল্লা নির্ম্মাণ করেন।

ক্রীতদাস ব্যবসা ও জলে দস্যুবৃত্তি পর্ত্তুগীজদিগের কলঙ্ক বলিলে অত্যুক্তি করা হয় না। তাহারা বণিক বেশে এই দেশে আসিয়াছিল ; উদ্দেশ্য এই দেশ হইতে অর্থ ও পণ্য লইয়া তাহাদের দেশকে সমৃদ্ধ করা। বহু বৎসর যাবৎ তাহারা বাণিজ্য কার্য্যে ব্যাপৃত ছিল এবং পরিণামে উক্ত দুইটি কলঙ্কে কলঙ্কিত হইলেও তাহারা আমাদের অনেক কিছু দিয়া গিয়াছে। তাহাদের ভাষা, পোষাক-পরিচ্ছদ, রীতি-নীতি এমন কি তাহাদের রক্ত পর্য্যন্ত অদ্যাপি বঙ্গদেশে বিদ্যমান, তাহা পরে উল্লেখ করিব। পর্ত্তুগীজশক্তি এই স্থান হইতে বিলুপ্ত হইবার পর বহুদিন পর্য্যন্ত তাহাদের ভাষা অন্যান্য ইউরোপীয় জাতিদের 'কথ্য-ভাষা' (Lingua Franca) বলিয়া পরিগণিত ছিল।

১৬৩০ খ্রীষ্টাব্দে হিজলী রাজ্য মোগল কর্ত্তৃক অধিকৃত হয় ; উক্ত রাজ্যের ন্যায়সঙ্গত অধিকারী কারাগার হইতে মুক্তিলাভ করিয়া ১৬৬০ খ্রীষ্টাব্দে তাঁহার রাজ্য পুনরুদ্ধার করেন। কিন্তু তাঁহার রাজ্য অধিক দিন স্থায়ী হয় নাই, কারণ হুগলীর ফৌজদার চুঁচুড়ার ওলন্দাজ বণিকগণের সাহায্যে উক্ত রাজাকে পরাজিত করেন এবং পুনরায় তিনি কারারুদ্ধ হন। হুগলীর ফৌজদার সেইজন্য সম্রাট্ আওরঙ্গজেব কর্ত্তৃক "Zeevoogd" নামক উপাধিতে ভূষিত হইয়াছিলেন এবং হিজলীর শাসনভারও তাঁহার অধীনে জনৈক 'ক্ষুদ্র-রাজা'র (Lesser Chief) উপর ন্যস্ত হইয়াছিল। (Valentin's Memoirs to Von-Den-Brooke's Map. Page 158)

ওলন্দাজ, ফরাসী ও ইংরেজ বণিকগণ যত দিন পর্য্যন্ত না নিজেদের নিজস্ব স্থান লাভ করিয়াছিল, তত দিন তাহারা হুগলীতে ব্যবসা করিয়াছিল এবং তাহার ফল স্বরূপ হুগলী বাণিজ্যসম্পদে বিশেষ সম্পৎশালী হইয়াছিল। মোগল শাসনকর্ত্তা সেই সময় হুগলীতে বসবাস করিতেন। সুলতান সুজার রাজত্বকালে তাঁহার নিকট হইতে 'ফারমান' লইয়া ইংরেজগণ হুগলীতে একটি কারখানা স্থাপন করেন এবং বঙ্গে ইংরেজদিগের এই প্রথম বাণিজ্য-কুঠী স্থাপন। বঙ্গের সুবাদারগণের অনুগ্রহে পূজোপচারে তাহাদিগকে বশীভূত করিয়া ইংরেজ ব্যবসায়ীগণ হুগলী পর্য্যন্ত মাল বোঝাই করিবার জন্য জাহাজ আনিবার অনুমতি পাইলেন। ইহার পূর্ব্বে তাঁহারা ছোট নৌকায় মাল বোঝাই করিয়া আনিয়া নদীর মুখে অবস্থিত জাহাজে বোঝাই করিয়া লইতেন। ঈষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর ডাঃ গেব্রিয়েল ব্রৌটন সম্রাট্ শাহজাহানের কন্যার চিকিৎসা করিয়া তাঁহাকে নিরাময় করিলে, সম্রাট্ ডাক্তারকে বিশেষভাবে পুরস্কৃত করিতে ইচ্ছা প্রকাশ করেন। স্বদেশহিতৈষী ডাঃ গেব্রিয়েল ব্রৌটন পুরস্কারের পরিবর্ত্তে বিনা মাশুলে বঙ্গদেশে ইংরেজদের বাণিজ্য করিবার অনুমতি চান এবং সম্রাট্ সেই অনুমতি দান করেন। তারপর কি ভাবে ইংরেজগণ বঙ্গদেশে বাণিজ্য বিস্তার করিয়া 'রাজদণ্ড' গ্রহণ করেন, জগতের ইতিহাসে তাহা এক অত্যাশ্চর্য্য ব্যাপার। ইংরেজ বণিকের সেই প্রথম কালের ইতিহাসের সহিত হুগলীর ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ আছে, কারণ এই স্থানেই ইংরেজের প্রথম বাণিজ্য-কুঠী নির্ম্মিত হইয়াছিল।

কলিকাতা স্থাপয়িতা জব চারণক প্রথমে ঈষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর এজেণ্ট হইয়া হুগলীতে ছিলেন। সায়েস্তা খাঁর শাসনকালে জব চারণকের সহিত দেশীয় ব্যক্তিগণের নানা কারণে বিবাদ উপস্থিত হওয়ায় ইংরেজগণের বিশেষ অসুবিধা হইতেছিল এবং মোগলের সহিতও ইংরেজদের সদ্ভাব ছিল না। এই সমস্ত বিষয় অবগত হইয়া কোম্পানীর ডিরেক্টরগণ মোগলের সহিত যুদ্ধ ঘোষণা করাই সমীচীন মনে করেন। যুদ্ধঘোষণা করিবার পূর্ব্বে মাদ্রাজের 'ফোর্ট-জর্জ্জের' শাসনকর্ত্তাকে সম্রাট্ আওরঙ্গজেবের নিকট হইতে 'ফরমান' গ্রহণের আদেশ দিলেন এবং গঙ্গার মধ্যস্থিত কোন দ্বীপ অধিকারের অনুমতি, হিজলীতে দুর্গ নির্ম্মাণ এবং তাঁহার কর্ম্মচারিগণ কর্ত্তৃক যাহাতে ইংরেজগণ অত্যাচরিত না হয় তদ্বিষয়ে নির্দ্দেশ দিবার জন্যও মাদ্রাজের শাসনকর্ত্তাকে আদেশ দেওয়া হয়। আদেশ প্রদানের সঙ্গে সঙ্গে ক্যাপ্টেন নিকলসনের অধীনে দশখানি যুদ্ধজাহাজ হুগলীতে প্রেরিত হয় এবং উক্ত জাহাজে বারটি করিয়া কামান এবং ছয় শত করিয়া সৈনিক ছিল।

নবাবের আদেশে ইংরেজদিগকে বিতাড়িত করা হইবে শুনিয়া জব চারণক কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া পড়িলেন ; পরে ঈষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর ডিরেক্টরগণও মোগলদের সহিত যুদ্ধ করিবেন সংবাদ পাইয়া তিনি সমাগত রণপোত ও ইংরেজ সৈন্যের সাহায্যে নবাবের তিন হাজার পদাতিক ও তিন শত অশ্বারোহী সৈন্যকে বিতাড়িত করিয়া হুগলীর ফৌজদারকে পরাভূত করেন। ইহাই ইংরেজগণের সহিত মোগলদের প্রথম সংঘর্ষ ; ১৬৮৬ খ্রীষ্টাব্দের ২৮শে অক্টোবর তারিখে হুগলীর রাজপথে এই যুদ্ধ হয় এবং ইংরেজ বণিকগণ নবাগত সৈন্যের সাহায্যে তোপ দাগিয়া হুগলী শহরের বহুলাংশ

* "The Fouzdar was the chief police officer and judge of all crimes not capital."—*Fields Regulations*, page 135.

উড়াইয়া দেন। তোপের আগুনেই হুগলীর পাঁচ শত বাড়ী এবং পণ্যরাশি-পরিপূর্ণ ইংরেজদিগের গুদামঘর পুড়িয়া যায় ফলে কোম্পানীর ৪৫ লক্ষ টাকা ক্ষতি হয়। হুগলীর ফৌজদার ইংরেজদিগের অতর্কিত আক্রমণে সন্ধির প্রস্তাব করিতে বাধ্য হন। সন্ধির সর্ত্তানুযায়ী বাংলার নবাব সায়েস্তা খাঁ ইংরেজদিগকে ক্ষতিপূরণ করিবার জন্য প্রতিশ্রুত হইয়াছিলেন।

হুগলী ইমামবাড়ার ভিতরের দৃশ্য

হুগলী যুদ্ধের পর গঙ্গার উপর ইংরেজদিগের প্রভুত্ব যথেষ্ট বাড়িয়া যায় এবং তাঁহাদের যুদ্ধজাহাজগুলি সমগ্র গঙ্গা নদী অধিকার করিয়া রাখিয়াছিল। নবাব পূর্ব্বেকার প্রতিশ্রুতি রক্ষা না করায় ১৬৮৭ খ্রীষ্টাব্দে ক্যাপ্টেন নিকলসন নবাবের হুগলীর কুঠী পুড়াইয়া দিয়া হিজলী অধিকার করেন। ইহার পর জব চারণক ইংরেজ সৈন্যকে বালেশ্বরে প্রেরণ করেন এবং বালেশ্বর অধিকৃত হয়। বিলাতের ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর ডিরেক্টর সভা হুগলী লুণ্ঠন, হিজলী অধিকার ও বালেশ্বর ধ্বংসের সংবাদ পাইয়া বিশেষ পরিতুষ্ট হইলেন কিন্তু ভারত-সম্রাট্ আওরঙ্গজেব ইহাতে কিছুমাত্র বিচলিত হন নাই। তিনি কেবলমাত্র জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, "হুগলী, হিজলী, বালেশ্বরের ন্যায় অপরিচিত স্থানগুলি কোথায়?" (মেদিনীপুরের ইতিহাস, পৃঃ ১৯৯)
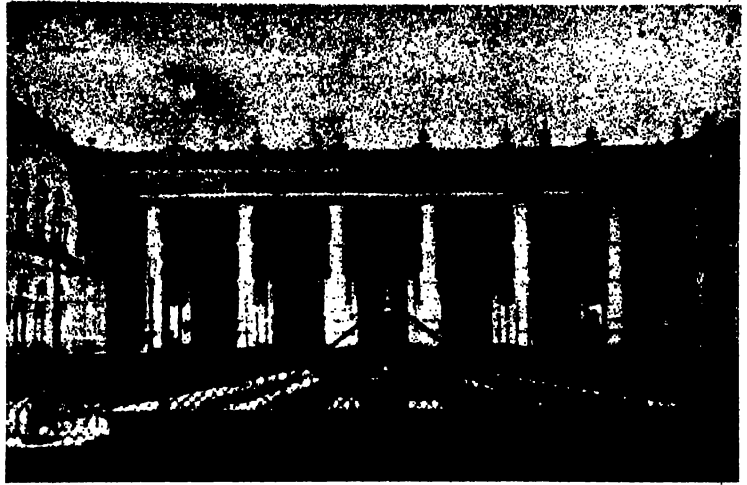
হুগলী ইমামবাড়ার সম্মুখের দৃশ্য

ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর কর্ম্মচারিগণ এযাবৎ বঙ্গদেশে মাদ্রাজস্থিত কোম্পানীর অধীনভাবে বাণিজ্য করিতেছিলেন; ১৬৮৯ খ্রীষ্টাব্দে তাঁহারা মাদ্রাজ কোম্পানীর অধীনতা-পাশ ছেদন করিয়া পূর্ণ স্বাধীনতা ঘোষণা করেন এবং কোম্পানীর অন্যতম ডিরেক্টর মিঃ হেজেস প্রথম গবর্ণর নিযুক্ত হন ও হুগলীতে তাঁহার আবাসস্থান নির্দ্ধারিত হয়। মিঃ হেজেসের পর মিঃ গিফোর্ড ইংরেজ কোম্পানীর দ্বিতীয় গবর্ণর হইয়া হুগলীতে আগমন করেন এবং হুগলী ইংরেজের ব্যবসায় কেন্দ্রস্থল ছিল। সেই সময় কোম্পানী আটাশ হাজার মণ সোরা বিলাতে প্রতি বৎসর রপ্তানি করিত।

সম্রাট্ শাহজাহানের রাজত্বকালে ডাঃ ব্রোটনের চেষ্টায় ইংরেজ বণিকগণ বঙ্গদেশে বিনা শুল্কে ব্যবসা করিবার অনুমতি প্রাপ্ত হন, তাহা পূর্ব্বে উল্লেখ করিয়াছি। এই সম্বন্ধে মহাকবি গিরিশচন্দ্র ঘোষ তাঁহার 'মিরকাশিম'* নাটকে নবাবের নিজস্ব ভাণ্ডার লুণ্ঠনের প্রাণদণ্ডাজ্ঞা রহিত করিলে উক্ত ইংরেজ ডাক্তার মিরকাশিমকে যাহা বলিয়াছিলেন নিম্নে তাহার কয়েক লাইন উদ্ধৃত করিতেছি:

"আজ আমার স্মরণ হইতেছে বাউটন নামে একজন ইংরেজ ডাক্তার সম্রাট্ সাজিহানের কন্যাকে আরোগ্য করিয়াছিলেন। বদান্য বাদসা তাঁহাকে পুরস্কার প্রার্থনা করিতে
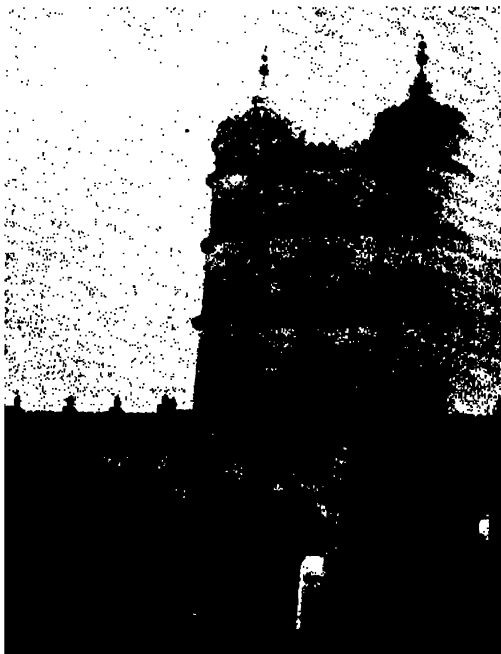
* মিরকাশিম নাটকখানি রাজরোষে পতিত হওয়ায় ইহার প্রচার বন্ধ আছে।

বলেন। বাদশাই পুরস্কারে বাউটন ক্রোড়পতি হইতে পারিতেন, কিন্তু সেই trueborn Englishman আপনার স্বার্থ না দেখিয়া বাংলায় ইংরাজের বিনাশুল্কে বাণিজ্যের সনন্দ লিখিয়া লইয়াছিলেন। আমিও ডাক্তার, আমিও নবাবের বেগমকে আরাম করিয়াছি, আর স্বদেশীর হত্যা দেখিবার নিমিত্ত আমার প্রাণদণ্ড মঞ্জুর হইল।"—'গিরিশ-প্রতিভা', পৃষ্ঠা—২১১।

ঈশানচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

শায়েস্তা খাঁর পর নবাব ইব্রাহিম খাঁ বাংলার সুবেদারী প্রাপ্ত হন ; তিনি নিরীহ প্রকৃতির লোক ছিলেন এবং তাঁহার শাসনকালে ইংরেজ বণিকগণের বিশেষ সুবিধা হয় (Wilson's *Early Annals of the English in Bengal*)। ১৬৯৫ খ্রীষ্টাব্দে শোভা সিংহ বঙ্গদেশ হইতে মোগল অধিকার উচ্ছেদ করিবার জন্য বিদ্রোহী হন এবং বর্দ্ধমানের রাজা কৃষ্ণরাম রায়কে নিহত করেন। নুরউল্লা খাঁ সেই সময় হুগলীর ফৌজদার ছিলেন এবং তাঁহাকে এই বিদ্রোহ দমন করিবার আদেশ দেওয়া হয়। তিনি সৈন্য লইয়া হুগলীর দিকে অগ্রসর হইলেন বটে, কিন্তু শোভা সিংহ আসিতেছেন শুনিয়া যুদ্ধক্ষেত্রে পরাভূত হইবার আশঙ্কায় হুগলী দুর্গে আশ্রয় গ্রহণ করেন এবং রাত্রে ফকিরের বেশে দুর্গ হইতে পলায়ন করেন। হুগলী বিদ্রোহীদের হস্তগত হয় ; অতঃপর ইব্রাহিম খাঁ চুঁচুড়ার ওলন্দাজগণের সাহায্যে হুগলী পুনরুদ্ধার করেন।

হুগলীর ফৌজদার জৈনউদ্দীন ইউরোপীয়ানদের সাহায্য করিতেন বলিয়া মুর্শিদকুলী খাঁ তাঁহাকে পদচ্যুত করিয়া ওয়ালিবেগকে হুগলীর ফৌজদার নিযুক্ত করেন। জৈনউদ্দীন ফরাসী ও দিনেমারদিগের সহায়তায় ফৌজদারের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করেন। মুর্শিদকুলী খাঁ ইউরোপীয় জাতিগুলিকে কোন পক্ষ অবলম্বন করিতে নিষেধ করেন ; কিন্তু তাহারা জৈনউদ্দীনকে সাহায্য করে। ফলে মধ্যস্থতা করিবার জন্য নবাব কর্ত্তৃক প্রেরিত দীলপত সিংহ ফরাসী কামানের গোলায় নিহত হয় (*Historical Sketches of Bengal*)। তৎপরে হাসান আলি খাঁ হুগলীর ফৌজদার নিযুক্ত হন।

১৭২৫ খ্রীষ্টাব্দে মুর্শিদকুলী খাঁর মৃত্যু হইলে তাঁহার জামাতা সুজাউদ্দীন বাংলার সিংহাসনে আরোহণ করেন। তিনি সুজা খাঁকে হুগলীর ফৌজদার নিযুক্ত করেন। সুজাউদ্দীনের মৃত্যুর পর তাঁহার পুত্র সরফরাজ খাঁ সিংহাসন প্রাপ্ত হন। ১৭৪০ খ্রীষ্টাব্দে আলীবর্দ্দী খাঁ তাঁহাকে নিহত করিয়া বঙ্গ বিহার ও উড়িষ্যার নবাব হন। এই সময় মারহাট্টারা আসিয়া বঙ্গদেশে লুটতরাজ আরম্ভ করে এবং ইহাই 'বর্গীর অত্যাচার' বলিয়া ইতিহাসে প্রসিদ্ধ। বর্গীর অমানুষিক অত্যাচারে পশ্চিম বঙ্গবাসী যেরূপ কষ্ট সহ্য করিয়াছে ইতিহাসে তাহার তুলনা নাই। বর্গীদের হাত হইতে রক্ষা পাইবার জন্য ইংরেজ বণিকগণ কলিকাতায় 'মহারাষ্ট্র-খাত' (Marhatta Ditch) খনন করিয়া সৈন্যসংখ্যা বৃদ্ধিপূর্ব্বক কলিকাতাকে সুরক্ষিত করেন। দেশে অরাজকতা বিরাজ করিতেছে দেখিয়া ভাগীরথী ও সরস্বতীর তীরবর্ত্তী গ্রামগুলি হইতে অসংখ্য নরনারী তাহাদের ধনপ্রাণ এবং নারীর সম্ভ্রম রক্ষার জন্য বিধর্ম্মী ইংরেজের শরণাপন্ন হয় এবং ইংরেজ বণিকগণের নব-নির্ম্মিত বর্গীদের অনধিগম্য কলিকাতায় আশ্রয় গ্রহণ করে। যদি হিন্দু মহারাষ্ট্রীয়গণ হিন্দু বঙ্গবাসিগণের প্রতি অত্যাচার না করিয়া কথঞ্চিৎ সাহায্য করিত, তাহা হইলে ভারতের ইতিহাস যে অন্য আকার ধারণ করিত তাহা সুনিশ্চিত। বর্গীদিগের হাত হইতে কেহই নিষ্কৃতি লাভ করিতে পারে নাই। "বর্গীরা গ্রা ও নগর পুড়াইয়া শস্যভাণ্ডারে আগুন লাগাইয়া এবং পুরুষে নাক-কান ও স্ত্রীর স্তন কাটিয়া ও সতীত্ব নষ্ট করিয়া বাংলা প্রজাকুলকে সংহার করিয়াছিল।" (Holwell's *Interesting Historical Events*. Page-153).

হুগলীর ফৌজদারের নিকট ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী খাজনা বাবদ ৩০৫ টাকা, গোবিন্দপুরের জন্য ১০ টাকা ও কলিকাতা জন্য ৩৩ টাকা করিয়া খাজনা দিত।

নবাব আলীবর্দ্দী বর্গীদের সহিত পরে সন্ধি করেন (তিনি বাৎসরিক ১২ লক্ষ টাকা করিয়া তাঁহাদের কর দিবেন তাহা হইলে তাহারা আর বাংলায় অত্যাচার করিবে ন

বর্গী সেনাপতি শিবরাও হুগলী লুণ্ঠন করেন। মীর হবিব হুগলী অধিকার করিবার জন্ত বর্গীদের সহিত যোগ দেন এবং তিনি মীর আবুল হাসান ও আবুল কাসিম নামক দুই জন বণিকের সহিত ষড়যন্ত্র করিয়া বর্গীদের সাহায্যে হুগলী কিছু দিনের জন্ত নিজ অধিকারে রাখেন।

১৭৪৮ খ্রীষ্টাব্দে হেদায়েৎ আলী হুগলীর ফৌজদার ছিলেন, সেই সময় নবাব আলীবর্দ্দী খাঁ নন্দকুমারকে হুগলীর দেওয়ানী পদ দেন। এই সময় চতুর্দ্দিকে অশান্তি ও যুদ্ধবিগ্রহের জন্ত নবাবের কাছে সকল সংবাদ পৌছিত না। হেদায়েতের সহিত নন্দকুমারের অমিল হওয়ায় তিনি উক্ত পদ পরিত্যাগ করেন। ঈষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী এই সময় হুগলীর ফৌজদারকে বার্ষিক সাতাশ হাজার টাকা রাজস্ব দিতেন (Long's *Selections*)। পরে মহম্মদ ইয়ারবেগ হুগলীর ফৌজদার নিযুক্ত হন এবং নন্দকুমারকে পুনরায় হুগলীর দেওয়ানী দেওয়া হয়। ইহার পর হইতে তিনি 'দেওয়ান নন্দকুমার' নামে অভিহিত হন। এই সময় আলীবর্দ্দী সিরাজদ্দৌলাকে তাহার উত্তরাধিকারী নির্ব্বাচিত করেন এবং সিরাজও কিছুদিন হুগলীতে থাকিয়া পুনরায় মুর্শিদাবাদে ফিরিয়া যান। ১৭৫৬ খ্রীষ্টাব্দের ৯ই এপ্রিল তারিখে নবাব আলীবর্দ্দী গতাসু হন এবং মৃত্যুকালে তিনি সিরাজদ্দৌলাকে ইংরেজ বণিকদের হইতে সাবধান থাকিতে বলেন। (Parker's *Evidence*)

সিরাজদ্দৌলা সিংহাসনে আরোহণ করিলে রাজা রাজবল্লভ ইংরেজের সহিত ষড়যন্ত্র করিয়া সিরাজের মাতৃষসা ঘসেটী বেগমের নামে বঙ্গদেশ শাসন করিবার সঙ্কল্প করেন। রাজা রাজবল্লভ তাঁহার পুত্র কৃষ্ণদাসকে সেই জন্ত বহু ধনরত্ন দিয়া ইংরেজের নিকট কলিকাতায় পাঠান। সিরাজদ্দৌলা এই সংবাদ পাইয়া কলিকাতার চারিদিকের প্রাচীর ভাঙিয়া ফেলিতে এবং কৃষ্ণদাসকে ফেরত দিতে বলেন। ড্রেক সাহেব কৌশলে কৃষ্ণদাসের কথা চাপিয়া যান এবং কলিকাতাকে প্রাচীরবেষ্টিত করা হয় নাই বলিয়া পত্র দেন। নবাব ইহাতে ক্রুদ্ধ হইয়া কলিকাতা আক্রমণ করেন এবং ইংরেজগণ পরাজিত হইয়া শিবপুর ও ফলতা নামক স্থানে পলায়ন করে।

নবাব সিরাজদ্দৌলা যে ইংরেজের সহিত যুদ্ধ করেন, ইহা তাঁহার মাতা আমিনা বেগম পছন্দ করিতেন না। কারণ আমিনা বেগম ও ঘসেটী বেগম ইংরেজের সহিত হুগলীতে ব্যবসা-বাণিজ্য করিয়া প্রভূত অর্থ উপার্জ্জন করিতেন। বাণিজ্যের পথ উন্মুক্ত রাখিতে হইলে ইংরেজের সহিত ঝগড়া করিলে চলিবে না জানিয়াই তাঁহারাও সিরাজদ্দৌলার বিরুদ্ধে দাঁড়াইয়াছিলেন। আফিম ও সোরা জলাঙ্গী দিয়া উমিচাঁদের মারফত হুগলীতে ইহাদের ব্যবসা চলিত। (বাংলার-বেগম)

মহম্মদ আলি এই সময় হুগলীর ফৌজদার ছিলেন; খোজা ওয়াজিদ নামে একজন ধনী মুসলমান বণিক সেই সময় হুগলীতে বাস করিতেন, দৈনিক এক হাজার টাকা তাঁহার ব্যয় ছিল। তিনি ফরাসী জেনারেল ল' সাহেবকে সিরাজদ্দৌলার সহিত পরিচয় করাইয়া দেন। মহম্মদ আলি বিশেষ কাজের লোক ছিলেন না বলিয়া তাঁহার পরিবর্ত্তে নবাব সেখ উমরউল্লাকে হুগলীর ফৌজদার এবং নন্দকুমারকে তাঁহার দেওয়ান নিযুক্ত করেন। কলিকাতা আক্রমণের সময় ইংরেজগণ ফলতায় পলায়ন করিয়াছিলেন তাহা পূর্ব্বেই লিখিয়াছি; নবাব ভাবিয়াছিলেন যে ইংরেজগণ আর কিছু করিবে না, সেইজন্ত তিনি তাঁহাদিগকে ফলতা হইতে
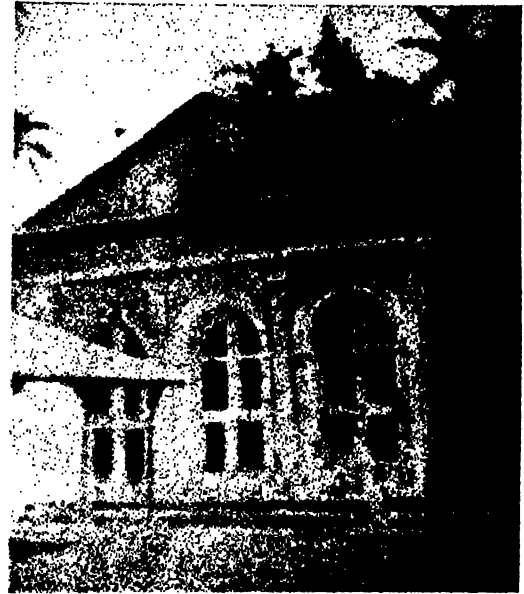
দাতা গৌরীসেন প্রতিষ্ঠিত দেব-মন্দির

বিতাড়ন করেন নাই। কিন্তু ইংরেজগণ সেই সময় ফলতায় থাকিয়া মাদ্রাজ হইতে সাহায্যের জন্ত অপেক্ষা করিতেছিল। ঠিক এই সময়ে নন্দকুমার হুগলী আসিয়া উপস্থিত হইয়াছিলেন।

অতঃপর নন্দকুমার হুগলীর ফৌজদার হন; তিনি ইংরেজদের আগমন রোধ করিবার জন্ত বজবজ দুর্গের সংস্কার ও কলিকাতার দক্ষিণে একটি নূতন দুর্গ নির্ম্মাণ এবং শিবপুরের দুর্গটিও সংস্কার করেন। দেওয়ান মাণিকচাঁদের উপর নবাব কলিকাতা রক্ষার ভার দিয়াছিলেন, কিন্তু বিশ্বাসঘাতক দেওয়ান ইংরেজের সহিত মিলিত হন এবং ইংরেজের খাহাতে খাদ্যাভাব না হয় সেইজন্ত ফলতায় হাট বসান। ক্লাইভ এই সময় সৈন্ত লইয়া মাদ্রাজ হইতে আগমন করেন; দেওয়ান মাণিকচাঁদ বজবজে গিয়া ইংরেজের সহিত যুদ্ধের অভিনয় করিয়া কলিকাতায় পলাইয়া আসিলেন, বজবজ ইংরেজ সৈন্ত দখল করিল। তাহার পর মাণিকচাঁদ হুগলীতে নন্দকুমারকে সংবাদ দিয়া মুর্শিদাবাদে নবাবকে সংবাদ দিতে চলিয়া গেল; কলিকাতা

অরক্ষিত অবস্থায় রহিল এবং ক্লাইভ সেই সুযোগে ইংরেজ সৈন্ত লইয়া অবাধে কলিকাতায় উপস্থিত হইল।

নবাব সিরাজদ্দৌলা ইংরেজ কর্তৃক কলিকাতা পুনরধিকারের সংবাদ পাইয়া হুগলী রক্ষার জন্ত নন্দকুমারকে তিন হাজার সৈন্য পাঠাইলেন; হুগলীতে নন্দকুমারের দুই হাজার সৈন্য ছিল এবং নূতন তিন হাজার, মোট পাঁচ হাজার সৈন্য দিয়া তিনি হুগলীকে সুরক্ষিত করিলেন। ১৭৫৭ খ্রীষ্টাব্দে ১০ই জানুয়ারী মেজর কিলপ্যাট্রিক ইংরেজ সৈন্য লইয়া হুগলী

বোধপ্রকাশং শব্দশাস্ত্রং
ফিরিঙ্গিনামুপকারার্থং
ক্রিয়তে হালেদঙ্গ্রেজী

A
GRAMMAR
OF THE
BENGAL LANGUAGE
BY
NATHANIEL BRASSEY HALHED.

ইন্দ্রাদয়োপি যস্যান্তং নয়যুঃ শব্দবারিধেঃ
প্রক্রিয়াস্তস্য কৃৎস্নস্য ক্ষমোবক্তুং নরঃ কথং॥

PRINTED
AT
HOOGLY IN BENGAL
MDCCLXXVIII.

বঙ্গের প্রথম মুদ্রিত পুস্তকের প্রথম পৃষ্ঠার প্রতিলিপি

আক্রমণ করিল। গোলা বর্ষণে হুগলীর কেল্লার এক স্থান ভাঙিয়া যায় এবং উক্ত স্থান দিয়া ইংরেজ সৈন্য হুগলীতে প্রবেশ করিয়া ব্যাণ্ডেল প্রভৃতি কয়েকটি স্থান লুণ্ঠন ও গ্রামে অগ্নিদান করে। নন্দকুমার যুদ্ধ করিয়া ইংরেজদিগকে হারাইয়া দেন এবং ইংরেজগণ কলিকাতায় পলাইয়া আসে। ইহার পর ইউরোপে ইংরেজ ও ফরাসীতে যুদ্ধ হয়; বাংলায় কিন্তু উভয় জাতির মধ্যে সদ্ভাব থাকিলেও ক্লাইভ মনে করিলেন যে যদি ফরাসীগণ নবাবের সাহায্য পায় তাহা হইলে বাংলায় ইংরেজগণ ধ্বংসপ্রাপ্ত হইবে সেইজন্য ক্লাইভ চন্দননগর আক্রমণ করেন। নবাবের সহিত ফরাসীদের বিশেষ প্রীতি ছিল কিন্তু ইংরেজ ও ফরাসীদের যুদ্ধে নন্দকুমার ফরাসীদিগকে সাহায্য না করায়, সিরাজদ্দৌলার নিকট সংবাদ গেল যে নন্দকুমার ইংরেজের নিকট হইতে ঘুষ লইয়া সাহায্য করিতে বিরত হইয়াছিলেন। যাহা হউক, নবাব সেই জন্য নন্দকুমারকে পদচ্যুত করেন। এই সম্বন্ধে প্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক আর্ম্মি সাহেব লিখিয়াছেন—"নন্দকুমার হুগলীর ফৌজদার থাকিলে ইংরেজ কখনও মুর্শিদাবাদ পর্য্যন্ত যাইতে পারিত না।"

পলাশীর রণক্ষেত্রে ১৭৫৭ খ্রীষ্টাব্দের ২৩ এ জুন যে যুদ্ধের অভিনয় হয় তাহাতে নবাব সিরাজদ্দৌলা রাজ্যচ্যুত ও নিহত হন। ক্লাইভ ভারতে ব্রিটিশ রাজশক্তি প্রতিষ্ঠা করিয়া মিরজাফরকে বাংলার মসনদে বসান এবং ক্লাইভের অনুমোদনে নন্দকুমার পুনরায় হুগলীর দেওয়ানী পদ প্রাপ্ত হন। মিরজাফরকে বাংলার নবাব করিলে তিনি যে টাকা ক্লাইভকে দিবার জন্য প্রতিশ্রুত ছিলেন, ক্লাইভ সেই টাকা চাহিলে তিনি তাহা দিতে অসমর্থ হওয়ায়, নবাব ক্লাইভকে হুগলী, বর্দ্ধমান ও নদীয়ার রাজস্ব আদায় করিয়া লইতে অনুমতি দেন এবং ক্লাইভ মহারাজ নন্দকুমারকে উক্ত রাজস্ব আদায়ের ভার দেন। ১৭৫৮ খৃষ্টাব্দের ১৯ আগষ্ট নন্দকুমার ঈষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর 'তহশীলদার' হন; হেষ্টিংস সেই সময় বর্দ্ধমানের রেসিডেণ্ট ছিলেন। বর্দ্ধমানের রাজা তাঁহার রাজস্ব হেষ্টিংসকে দিতেন এবং হেষ্টিংসের ঐ স্থানে অনেক উপরি পাওনা ছিল। নন্দকুমার বর্দ্ধমানের রাজাকে রাজস্ব তাঁহার নিকট হুগলীতে পাঠাইতে বলেন এবং সেইজন্য হেষ্টিংস নন্দকুমারের শত্রু হয়। ১৭৬২ খ্রীষ্টাব্দে হেষ্টিংস ও ভ্যানসিটার্ট নন্দকুমারকে দুই বার বন্দী করেন। দেশের ও দশের উপকারের জন্য তিনি প্রাণপণ চেষ্টা করেন কিন্তু হেষ্টিংসের চেষ্টায় মিথ্যা জাল মোকদ্দমায় ১৭৭৫ খ্রীষ্টাব্দের ৫ই আগষ্ট তাঁহার ফাঁসি হয়। বর্ত্তমানে কলিকাতায় যে স্থানে খিডন উদ্যান হইয়াছে, পূর্ব্বে উক্ত স্থানে মহারাজার সুবৃহৎ অট্টালিকা ছিল।

মিরজাফর ইংরেজের প্রতি বিরক্ত হইয়া চুঁচুড়ায় ওলন্দাজদিগকে ইংরেজের বিরুদ্ধে দাঁড় করাইবার চেষ্টা করেন। ইংরেজ বণিকগণ তাহা বুঝিতে পারিয়া মিরজাফরকে গদিচ্যুত করেন এবং ১৭৬০ খ্রীষ্টাব্দে মীরকাশিম নবাব হন। পরে তাহার সহিতও ইংরেজের মতানৈক্য হয় এবং ১৭৬৩ খ্রীষ্টাব্দে পুনরায় মিরজাফর নবাবের গদিতে বসেন। নবাব মীরকাশিমের শাসনকালে বর্গী-দলপতি শ্রীভট্ট পুনরায় হুগলী লুণ্ঠন করেন। (Long's *Records*, Page 261).

১৭৬৫ খ্রীষ্টাব্দের ১৪ই জানুয়ারী মিরজাফর দেহত্যাগ করিলে নন্দকুমার দিল্লীর বাদশাহের নিকট হইতে সনন্দ আনাইয়া মিরজাফরের পুত্র নাজিমউদ্দৌলাকে বাংলার সিংহাসনে বসান। ঈষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী কর্ত্তৃক মতিরাম নামক এক ব্যক্তি হুগলীর ফৌজদার এবং বসন্ত রায় নামক এক ব্যক্তি তাঁহার দেওয়ান নিযুক্ত হইয়াছিলেন কিন্তু তাঁহারা উভয়ে পরবর্ত্তীকালে কোম্পানীর দ্বারা হঠাৎ কারারুদ্ধ হন।

১১৭৬ সালে বঙ্গদেশে ভয়ানক দুর্ভিক্ষ হয়, ইহাই ইতিহাসে ছিয়াত্তরের মন্বন্তর বলিয়া প্রসিদ্ধ। ইহার পূর্ব্বে সম্রাট আকবরের রাজত্বকালে বঙ্গদেশে আর একবার ভীষণ দুর্ভিক্ষ হইয়াছিল এবং মনুষ্যগণ নরমাংস খাইয়া জীবন ধারণ করিয়াছিল বলিয়া আবুল ফজল কৃত 'আকবরনামায়' লিখিত আছে। (Akbarnama translated by H. Beveridge Vol. II, page 56) ১৭৭০ খ্রীষ্টাব্দের মন্বন্তর ইংরেজ বণিকগণ ও রেজা খাঁ সমগ্র বঙ্গের খাদ্য একচেটিয়া করিয়া দুর্ভিক্ষের সৃষ্টি করে।

এই দুর্ভিক্ষে বঙ্গদেশ শ্মশানে পরিণত হয় এবং শেয়াল কুকুর রাস্তায় বসিয়া শব ভক্ষণ করিত। লক্ষ লক্ষ নরনারী ও শিশুর মৃতদেহে গঙ্গা ভরিয়া গিয়াছিল এবং শবদাহ করিবার কোন লোক ছিল না। দুর্ভিক্ষে হুগলীর অবস্থা সম্বন্ধে মেকলে যাহা লিখিয়াছেন নিম্নে তাহার কয়েক ছত্র উদ্ধৃত করিলাম -

"Tender and delicate women whose veils had never been lifted before the public gaze, came forth from their inner chamber in which Eastern jealousy had kept watch over their beauty, threw themselves before the passerby and with loud wailing, implored a handful of rice for their children. The Hooghly rolled down everyday thousands of corps closed to the porticos and gardens of the English conquerors." *Essay on Lord Clive*, page 135.

বঙ্কিমচন্দ্র লিখিয়াছেন- "১১৭৬ সালে বাংলা প্রদেশ ইংরাজের শাসনাধীন হয় নাই, ইংরাজ তখন বাংলার দেওয়ান। তাঁহারা খাজনার টাকা আদায় করিয়া লন, কিন্তু তখনও বাঙ্গালীর প্রাণ, সম্পত্তি প্রভৃতি রক্ষণাবেক্ষণের ভার লয়েন নাই। তখন টাকা লইবার ভার ইংরাজের আর প্রাণ সম্পত্তি রক্ষণাবেক্ষণের ভার পাপিষ্ঠ, নরাধম বিশ্বাসহন্তা, মনুষ্যকুলকলঙ্ক মিরজাফরের উপর।* মীরজাফর আত্মরক্ষায় অক্ষম, বাংলা রক্ষা করিবে কি প্রকারে? মীরজাফর গুলী খায় ও ঘুমায়। ইংরাজ টাকা আদায় করে ও ডেস্‌প্যাচ লেখে। বাঙালী কাঁদে ও উৎসন্ন যায়।"—আনন্দমঠ।

এদেশীয় লেখকগণ এই দুর্ভিক্ষ সম্বন্ধে কিছুই লেখেন নাই ইহাই গভীর পরিতাপের বিষয়। জন শোর (পরবর্ত্তীকালে লর্ড টেনমাউথ) সেই সময় বঙ্গদেশে ছিলেন। তিনি অবসর গ্রহণ করিয়া এই বিষয় কবিতাকারে যাহা লিখিয়াছিলেন নিম্নে তাহা উল্লিখিত হইল :

"Still fresh in memory's eye the scene I view,
The shribelled limbs, sunk eyes and lifeless hue;
Still hear the mother's shrieks and infants moans,
Cries of despair and agonizing groans,
In wild confusion dead and dying lie;
Hark to the jackal's yell and vulture's cry,
The dog's fell howl, as midst the glare of day
They riot unmolested on their prey!
Dire scenes of horror, which no pen can trace,
Nor rolling years from memory's page efface."

—*Memoir of the life and correspondence of John Lord Teignmouth.*

হাজি মহম্মদ মহসীন

১৬৭৬ খ্রীষ্টাব্দে ইংরেজ বণিকগণ হুগলীকে "বঙ্গদেশের চাবি কাঠি" (Key of Bengal) বলিয়া বর্ণনা করিয়াছিলেন; ১৭৭০ খ্রীষ্টাব্দে দুর্ভিক্ষের পর প্রসিদ্ধ ভ্রমণকারী ষ্ট্রাভোরিনাস (Stravorinus) এই স্থান পরিদর্শন করিয়া লিখিয়াছেন যে হুগলীর মধ্যে নবাবের বাড়ি ও হস্তিশালা ভিন্ন আর বিশেষ কিছু দ্রষ্টব্য স্থান নাই। ছিয়াত্তরের মন্বন্তর হুগলীকে শ্মশান করিয়া দিয়া গিয়াছে। পর্ত্তুগীজ, মোগল, ইংরেজ, বর্গী প্রভৃতির অত্যাচার যাহা করিতে সমর্থ হয় নাই, ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর গোমস্তাগণের আত্মঘাতী নীতির ফলে হুগলীর সেই সর্ব্বনাশ সাধিত হইয়াছিল।

নবাব খাজা খাঁ হুগলীর শেষ ফৌজদার, তিনি হুগলীর মোগল দুর্গের একটি বৃহৎ অট্টালিকার মধ্যে বসবাস করিতেন।

---

* ১৭৬৫ খ্রীষ্টাব্দে মিরজাফরের মৃত্যু হয়; তাহার পর নাজিমদ্দৌলা নবাব হন এবং তৎপরে (১৭৬৬–১৭৭০) নবাব মিরজাফরের পুত্রদ্বয় সেফাউদ্দৌলা ও মুবারকউদ্দৌলা ইংরেজ কোম্পানীকে শাসনভার দিয়া পেনসন প্রাপ্ত হন। সুতরাং বঙ্কিমচন্দ্র 'মিরজাফর' শব্দটি বঙ্গের ইংরেজ তাঁবেদারী নবাব এই অর্থেই ব্যবহার করিয়াছেন বলিয়া মনে হয়।— লেখক।

১৭৯৩ খ্রীষ্টাব্দে লর্ড কর্ণওয়ালিস হুগলীর ফৌজদারের পদ তুলিয়া দেন এবং সেইজন্ত তাঁহার আর্থিক অবস্থা খারাপ হয়। তাঁহার ন্যায় বিলাসী ব্যক্তি তৎকালে বঙ্গদেশে কেহই ছিলেন না। আজও বঙ্গদেশে কোনও ব্যক্তি বাবুয়ানা করিলে তাহাকে "নবাব খাঞ্জা খাঁ" বলিয়া অভিহিত করা হয়। ১৮২১ খ্রীষ্টাব্দের ২৩শে ফেব্রুয়ারী তিনি গতাসু হইলে, তাঁহার স্ত্রী যত দিন জীবিত ছিলেন, তত দিন ইংরেজ সরকারের নিকট হইতে এক শত টাকা করিয়া বৃত্তি পাইতেন। তাঁহার পরলোকগমনের পর মোগল দুর্গের শেষ চিহ্ন পর্য্যন্ত ধূলিসাৎ করিয়া লুপ্ত করা হয় এবং দুর্গের ভগ্নস্তূপ পরে দুই হাজার টাকায় বিক্রীত হইয়াছিল।

হাজি মহম্মদ মহসীনের সমাধি-স্তম্ভ

হুগলীর প্রাচীন নিদর্শনের মধ্যে পর্ত্তুগীজদিগের নির্ম্মিত ব্যাণ্ডেল গীর্জ্জা বাংলাদেশের সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীন খ্রীষ্টীয় উপাসনাগার। ১৫৯৯ খ্রীষ্টাব্দে এই গীর্জ্জা নির্ম্মিত হয় এবং মোগল কর্তৃক হুগলী আক্রমণের সময় ১৬৩২ খ্রীষ্টাব্দে ইহা ধ্বংস করা হয়। পরে ফাদার ডি-ক্রুজ (Father De-Cruz) নামক এক ধর্ম্মযাজক দিল্লীর বাদশাহের অনুগ্রহলাভে সমর্থ হইয়া গীর্জ্জা পুনর্নির্ম্মাণ করিবার অনুমতি ও ৭৭৭ বিঘা নিষ্কর জমি প্রাপ্ত হন। ১৬৬১ খ্রীষ্টাব্দে গোমেস্ ডি সোটো (Gomes De Soto) এই ব্যাণ্ডেল গীর্জ্জা পুনরায় নির্ম্মাণ করেন। ("The protuguese in North India." Calcutta Review, 1846)

১৭৭৮ খ্রীষ্টাব্দে ইংরেজ প্রবর্ত্তিত প্রথম মুদ্রাযন্ত্র হুগলীতে স্থাপিত হয় এবং বঙ্গভাষায় প্রথম মুদ্রিত পুস্তক "A Grammar of the Bengal Language" ১৭৭৮ খ্রীষ্টাব্দে মিঃ ন্যাথেনেল ব্রাসী হালহেড (Nathaniel Brassey Halhed) কর্ত্তৃক প্রণীত হইয়া হুগলীর উইলকিন্স সাহেবের ছাপাখানা হইতে প্রকাশিত হয়। সেই সময় বঙ্গদেশে বঙ্গসাহিত্যের আলোচনা হইত না বলিয়া তিনি বঙ্গভাষার শৃঙ্খলা ও সৌন্দর্য্য সাধনের এবং ইংরেজ বণিকগণের বঙ্গভাষা শিক্ষার নিমিত্ত এই ব্যাকরণখানি রচনা করেন; কারণ সেই সময় বিচারাদি ও জমিদারী কার্য্যের যাবতীয় কাগজ-পত্র পূর্ব্বের ন্যায় বঙ্গভাষায় লিখিত হইত। সেইজন্ত ইংরেজগণ বঙ্গদেশের শাসনভার গ্রহণ করিয়া বঙ্গভাষায় অজ্ঞতার দরুণ তাহাদিগকে বিশেষ অসুবিধায় পড়িতে হইত। কোম্পানীর কর্ম্মচারিবৃন্দের অসুবিধা দূরীকরণার্থে তিনি এই পুস্তকখানি প্রণয়ন করেন। উক্ত পুস্তকের আখ্যাপত্রের প্রতিলিপি প্রদত্ত হইল।

হুগলী-নিবাসী এস. কে. ধর সর্ব্বপ্রথম দূরবীক্ষণ যন্ত্র তৈয়ারী করেন (Hooghly District Gazetteer, Page-166)। ১৮৩৩ খ্রীষ্টাব্দে আমেরিকা হইতে ভারতে বরফ আসিবার পূর্ব্বে হুগলীতে বরফ প্রস্তুত হইত; যে স্থানে বরফ তৈয়ারী হইত, উক্ত স্থানটি অদ্যাপি 'বরফ তোলার মাঠ' বলিয়া খ্যাত। ১৭৮৪ খ্রীষ্টাব্দে বঙ্গদেশে ডাক বিভাগের কার্য্য আরম্ভ হয় এবং হুগলীতে আড়াই তোলা ওজনের একখানি পত্র পাঠাইতে এক আনা এবং কাশীতে ঐ ওজনের পত্র পাঠাইতে সাত আনা ব্যয় হইত। ১৭৮৫ খ্রীষ্টাব্দে ৬ই জানুয়ারী ভ্রমণের জন্ত 'ডাক-চৌকি' খোলা হয়; উক্ত চৌকিতে জলপথে বজরা করিয়া এবং স্থলপথে পাল্‌কি করিয়া ভ্রমণের ব্যবস্থা সুরু হয়। কলিকাতা হইতে ডাক-চৌকিতে হুগলী যাইতে ৪৬।০ খরচা পড়িত। (Calcutta Gazette, 1785).

বঙ্গবিশ্রুত দাতা গৌরী সেন অষ্টাদশ শতাব্দীতে হুগলীর অন্তর্গত বালি নামক স্থানে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি সুবর্ণবণিক বংশসম্ভূত এবং তাঁহার পিতার নাম ছিল হরেকৃষ্ণ মুরারিধর সেন। তাঁহার দানশীলতার কথা বঙ্গের সর্ব্বত্র সুপরিচিত। পরের অর্থ ব্যয় বা দাতার অসাধারণ ব্যয় প্রসঙ্গে অদ্যাপি "লাগে টাকা দেবে গৌরী সেন" বলিয়া প্রবাদ বঙ্গদেশে প্রচলিত আছে। একমাত্র গৌরী সেনের প্রতিষ্ঠিত গৌরীশঙ্কর দেবের মন্দির ব্যতীত বর্ত্তমানে এই স্থানে আর কিছুই নাই, তবে গৌরী সেনের বংশধরগণ এখনও বর্ত্তমান আছেন।

ওয়ারেন হেষ্টিংসের দ্বিতীয়া পত্নী তৎকালীন বিদেশীয়

ব্যাণ্ডেল গির্জ্জার ভিতরের 'গ্রোটো'র (Grotto) দৃশ্য : ইহা বঙ্গের প্রাচীনতম ভজনাগার

সুন্দরীগণের মধ্যে সর্ব্বপ্রধান মাদাম্ গ্রাণ্ড (Madam Grand) এই স্থানে বাস করিতেন। এতদ্ব্যতীত প্রথম ইংরেজ পরিব্রাজক র‍্যালফ্ ফিচ্, পার্কাশ, হ্যামিল্টন প্রভৃতি পর্য্যটকগণ এই স্থান পরিদর্শন করিয়াছিলেন। হুগলীর সেন, মল্লিক, চৌধুরী, মিত্র প্রভৃতি কয়েকটি প্রসিদ্ধ বংশের নাম উল্লেখযোগ্য। মল্লিক বংশ খুব প্রাচীন এবং এই বংশের ব্রজমোহন মল্লিক, চৌধুরী বংশের ডাক্তার বদনচন্দ্র চৌধুরী ও মিত্র বংশের ঈশান চন্দ্র মিত্র পরবর্ত্তীকালে হুগলীর বিশেষ খ্যাতিসম্পন্ন ব্যক্তি হইয়াছিলেন। মুসলমান অধিবাসিগণের মধ্যে কাশিম মল্লিক-আলি, মির্জ্জা সালেউদ্দিন, মহম্মদ খাঁ, আশাদুল্লা প্রভৃতির নাম উল্লেখযোগ্য। (পুরাতনী—১৪৬)

হুগলীর ইমামবাড়া ভারতের অন্যতম দর্শনীয় বস্তু; ১৮৪১ খ্রীষ্টাব্দে বাংলার গৌরব হাজি মহম্মদ মহসীনের সম্পত্তির অংশ হইতে ইহার নির্ম্মাণ কার্য্য আরম্ভ হয় এবং ১৮৬১ খ্রীষ্টাব্দে তিন লক্ষ টাকা ব্যয়ে এই সুন্দর ভবনের নির্ম্মাণ কার্য্য সমাপ্ত হয়। ইমামবাড়ার সম্মুখের বৃহৎ ঘড়িটি বিলাত হইতে আনাইতে ১১৭২১ টাকা এবং গঙ্গার ধার ইট দিয়া বাঁধাইতে ষাট হাজার টাকা ব্যয় হইয়াছিল। এইরূপ সুন্দর অট্টালিকা বঙ্গদেশে তৎকালে খুব অল্পই ছিল। গঙ্গার ধারে ইমামবাড়ার গাত্রে ইংরেজী ভাষায় হাজি মহম্মদ মহসীনের দানপত্রখানি উৎকীর্ণ আছে। মহরমের সময় এই স্থানে বহু লোকের সমাগম হয়।

১৭৩০ খ্রীষ্টাব্দে দানবীর মহাত্মা হাজি মহম্মদ মহসীন হুগলীতে জন্মগ্রহণ করেন। যে কয়জন মহাত্মার আবির্ভাবে বঙ্গজননী গৌরবান্বিত মহম্মদ মহসীন তন্মধ্যে অন্যতম। বাল্য-কালে তিনি সিরাজী নামক এক পণ্ডিতের নিকট আরবী ও ফারসী ভাষা শিক্ষা করেন। তাঁহার মাতার দুই বিবাহ, প্রথম পক্ষের সন্তানের নাম মন্নু বেগম; মন্নুর পিতা আগা মোতাহার বহু সম্পত্তি রাখিয়া গতাসু হইলে মন্নুর মাতা ফৈজুল্লাকে বিবাহ করেন এবং মহসীন তাঁহার মাতার দ্বিতীয় পক্ষের সন্তান। মির্জ্জা সালাউদ্দিনের সহিত মন্নুর বিবাহ হয়, কিন্তু তিনি অল্প বয়সে বিধবা হন। ১৮০৩ খ্রীষ্টাব্দে মন্নু তাঁহার ভ্রাতা কামিনী-কাঞ্চন ত্যাগী ফকির মহসীনকে অর্দ্ধ লক্ষ টাকা আয়ের সম্পত্তি দান করিয়া যান।

১৮০৬ খ্রীষ্টাব্দে মহসীন তাঁহার যাবতীয় সম্পত্তি সৎকার্য্যে ব্যয় করিবার জন্য দানপত্র করিয়া যান। পরে উক্ত সম্পত্তির বার্ষিক আয় দেড় লক্ষ টাকায় দাঁড়াইয়াছিল। উক্ত 'মহসীন-ফণ্ড' হইতে হুগলী মহসীন কলেজ, ইমামবাড়া হাসপাতাল, হুগলীর ইমামবাড়া, বহু মক্তব ও পাঠশালা স্থাপিত হয়। ১৮১২ খ্রীষ্টাব্দের ২৯শে নবেম্বর তিনি ইহলোক ত্যাগ করেন। গঙ্গাতীরে তাঁহাকে সমাহিত করা হয়। পূর্ব্বে সমাধিস্থলে কোন আচ্ছাদন ছিল না কিন্তু ১৯০৭ খ্রীষ্টাব্দে খাঁ বাহাদুর আশ্রাফউদ্দীন আহম্মদের চেষ্টায় এবং জনসাধারণের অর্থে তাঁহার সমাধির উপর একটি সুন্দর মন্দির নির্ম্মিত হইয়াছে। মহসীনের জন্মে হুগলী ধন্য ও পবিত্র হইয়াছে এ কথা নিঃসংশয়ে বলিতে পারা যায়।*

মহসীনের সমাধি মন্দিরটি আধুনিক হইলেও একটি দর্শনীয় বস্তু; এই মন্দিরের মধ্যে ছয়টি সমাধি বিদ্যমান আছে। শ্বেত প্রস্তরের আড়ম্বর-বিহীন সমাধিগুলির শীর্ষদেশে মার্ব্বেল প্রস্তরে এক একখানি ফলক আছে এবং প্রতি ফলকের উপর মৃত ব্যক্তির পরিচয়-লিপি উর্দ্দু ভাষায় উৎকীর্ণ আছে। পুণ্যতোয়া ভাগীরথীর তীরে তরুচ্ছায়াসমাচ্ছন্ন উদ্যানের মধ্যে হাজি মহম্মদ মহসীন, তাঁহার ভগ্নীপতি সালাউদ্দীন খাঁ, ভগ্নী মন্নু বেগম, মাতা জনাব বেগম, পিতা আগা মহম্মদ মুতাহার এবং গুরুদেব সৈয়দ কামালউদ্দীন যেন এক বিছানায় শয়ন করিয়া আছেন, আর ভাগীরথীও যেন প্রতি তরঙ্গ উচ্ছ্বাসে মহসীনের পবিত্র নাম বঙ্গবাসীকে স্মরণ করাইয়া দিতেছে।

"মুক্ত বেণীর গঙ্গা যেথায় মুক্তি বিতরে রঙ্গে,
সাগর যাহার বন্দনা রচে শত তরঙ্গ ভঙ্গে,
আমরা বাঙ্গালী বাস করি সেই বাঞ্ছিত ভূমি বঙ্গে।"

* বিস্তারিত বিবরণ রায় বাহাদুর মহেন্দ্রচন্দ্র মিত্র রচিত মহসীনের জীবনীতে লিখিত আছে।

ইহার নিকটেই গঙ্গার উপর "জুবিলী-ব্রীজ" অপেক্ষাকৃত আধুনিক হইলেও এখানকার একটি দর্শনীয় বস্তু। এই সেতু লম্বায় বার শত ফুট এবং ইহা নির্ম্মাণ করিতে ইষ্ট ইণ্ডিয়ান রেলওয়ে কোম্পানীকে নয় লক্ষ টাকা ব্যয় করিতে হইয়াছিল। ১৮৩৭ খ্রীষ্টাব্দের ৪ঠা ডিসেম্বর হুগলী ব্রাঞ্চ স্কুল নামক উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয় বর্দ্ধমানের মহারাজা, স্বর্গীয় দ্বারকানাথ ঠাকুর প্রভৃতির সংগৃহীত অর্থে হুগলীর তৎকালীন জজ-ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ স্মিথ কর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত হয় এবং স্বর্গীয় ঈশানচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় এই বিদ্যালয়ের প্রথম প্রধান শিক্ষক নিযুক্ত হন। বঙ্কিমচন্দ্র তাঁহার ভ্রাতা মহেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের নিকট পড়িয়াছিলেন। ঈশানবাবু বাঙালীদের মধ্যে সর্ব্বপ্রথম 'higher graded service' পাইয়াছিলেন এবং তৎকালে ১৫০৲ বেতনে অবসর গ্রহণ করেন। হুগলী ব্রাঞ্চ স্কুল হইতে তিনি হুগলী কলেজের ইংরেজী সাহিত্যের অধ্যাপকের পদ গ্রহণ করেন। ১৮১১ খ্রীষ্টাব্দে তিনি কলিকাতায় জন্মগ্রহণ করেন।

১৭৬৯ খ্রীষ্টাব্দে হুগলীতে রাজকিশোর রায় নামক এক ব্যক্তি দেওয়ান হইয়াছিলেন। তিনি অতিশয় সম্ভ্রান্ত এবং প্রসিদ্ধ ব্যক্তি ছিলেন। তাঁহাকে লক্ষ্য করিয়া সাধক রামপ্রসাদ সেন তাঁহার কালীকীর্ত্তনের এক স্থলে লিখিয়াছেন—

"শ্রীরাজকিশোরদেশে শ্রীকবিরঞ্জন
রচে গান মহা অন্ধের ঔষধ অঞ্জন।"

ভূকৈলাসের মহারাজা উক্ত সময়ে ভারতের তীর্থগুলি পর্য্যটন করেন এবং ভারতের সমস্ত দ্রষ্টব্য স্থান ও দর্শনীয় বস্তুসমূহের বিবরণ তাঁহার আদেশে বিজয়রাম সেন 'তীর্থমঙ্গল' নামক গ্রন্থে প্রকাশ করেন। এই গ্রন্থে রাজকিশোর রায় সম্বন্ধে যাহা লিখিত আছে তাহা উল্লিখিত হইল।

"চলাচল আইলা নৌকা হুগলী সহরে।
সে রাত্রি থাকিলা কর্ত্তা নৌকার ভিতরে।
হুগলীর দেওয়ান রাজকিশোর রায়।
বজরাতে আসিয়া তাঁহে প্রণমিল পায়।
বৈদ্যের প্রধান তিনি বড় মূলবান।
এ দেশে নাহিক লোক তাঁহার সমান।
ক্ষণেক কর্ত্তার সঙ্গে আলাপ কথনে।
নৌকা হৈতে উঠি গেলা সহর ভুবনে।"

হুগলীতে আর এক জন প্রসিদ্ধ ব্যক্তি দেওয়ান হইয়াছিলেন, তাঁহার নাম কৃষ্ণরাম বসু। ১৭৩৩ খ্রীষ্টাব্দে হুগলী জেলার তড়া গ্রামে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। মাত্র পনর বৎসর বয়সে পিতার সহিত কলিকাতায় আসিয়া ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর সহিত লবণের ব্যবসা করিয়া প্রভূত অর্থ উপার্জ্জন করেন। পরে মাসিক দুই হাজার টাকা বেতনে তিনি হুগলীর দেওয়ান হন। হুগলী, যশোহর ও বীরভূম জেলায় তিনি বহু জমিদারী ক্রয় করেন এবং উক্ত স্থানগুলিতে দেবকীর্ত্তি স্থাপন করিয়া দেবসেবার জন্য বহু জমি বন্দোবস্ত করিয়া যান। মাহেশে ও পুরীতে জগন্নাথদেবের রথযাত্রার খরচের জন্য তিনি বহু অর্থ বন্দোবস্ত করিয়া যান এবং তাঁহারই প্রদত্ত দেবসেবা হইতে মাহেশের রথযাত্রা অদ্যাপি মহাসমারোহে সুসম্পন্ন হইতেছে। দানশীলতার জন্য তিনি তৎকালে বিশেষ প্রসিদ্ধ ছিলেন। ১৮১১ খ্রীষ্টাব্দে তিনি পরলোকগমন করেন। রাধানগরের যদুনাথ সর্ব্বাধিকারী মহাশয়ের রচিত 'তীর্থ ভ্রমণ' নামক গ্রন্থে (১৭৪ পৃষ্ঠা) কৃষ্ণরাম বসুর উল্লেখ আছে।

এরা

শ্রীসুবোধ রায়

আকাশ-ধরার মিতালি ইহারা সহিতে নারে,
আলোকের লাগি ফুলের পিপাসা দুর্ব্বিষহ!
সুরের দীপ্তি মরুদাহ সম দহিয়া মারে,
চাঁদের লাগিয়া সাগরে জোয়ার?—কি দুঃসহ!

এরা ভালবাসে ফুল হাতে শুধু বধিতে রুচি,
মাটি আর ইঁট লোহা-পাথরের পরশ মাগে,
কে হিসাব রাখে কোন্ ফুল ঝরে অকালে চ্যুতি?
বিধুর বিরাট কোথায় অধীর রাত্রি জাগে?

মায়ের অমল অতল স্নেহও মাপিতে চায়,
দেশের লাগিয়া জীবনাঞ্জলি—ভজন করে!
গগন মাপিতে দু'খানি আপন হাত বাড়ায়,
হার মেনে শেষে অভিশাপ দেয় বিকৃত স্বরে!

সুধাসাগরের তীরেতে বসিয়া পিপাসী এরা,
পাছে সুন্দরে দু-চোখ ভরিয়া দেখিতে পায়,
মোহ-আবরণে তাইতো এদের দৃষ্টি ঘেরা,
বিশ্ববীণায় সঙ্গীত ছাপি বেসুরা গায়!

মাটির উপরে মাটির পিণ্ড গড়িয়া তোলে,
জানে না তাহারি চাপেতে একদা চূর্ণ হবে!
যে অবধা আলো আকাশ-ভুবন ব্যাপিয়া দোলে,
সেদিনও যে হাসি ফুলের সজ্জায় ফুটিয়ে র'বে!

সৌরজগতের উৎপত্তি

শ্রীশান্তিরাম মুখোপাধ্যায়

বহু যুগ হইতে মানুষ বিশ্বাস করিয়া আসিতেছিল পৃথিবী বিশ্বের কেন্দ্র; চন্দ্র সূর্য্য সৃষ্ট হইয়াছে পৃথিবীকে আলো দিবার জন্য, চন্দ্র ও সূর্য্য মিলিয়া সাতটি গ্রহ তাহাদের রহস্যময় গতি দ্বারা প্রত্যেক ব্যক্তি, জাতি ও দেশের ভাগ্য নিয়ন্ত্রণ করিতেছে। এই সমস্ত ভাব বা মতবাদ একটা নিয়মের সূত্রে গাঁথিতে চাহিয়াছিলেন জ্যোতির্ব্বিদ টলেমি। তিনি জন্মিয়াছিলেন খ্রীষ্টপূর্ব্ব ১৪০ সালে আলেকজান্ড্রিয়াতে।

তিনি এই মত প্রচার করেন যে, পৃথিবী স্থির এবং সূর্য্য ও অন্যান্য গ্রহ পৃথিবীর চতুর্দ্দিকে আবর্ত্তনশীল। তখন লোকের মনে এই বিশ্বাস বদ্ধমূল ছিল যে, সূর্য্য প্রত্যহ প্রভাতে পূর্ব্ব দিকে উদিত হইয়া মধ্যাহ্নে ঠিক মাথার উপর উঠে এবং সন্ধ্যায় পশ্চিমে অস্ত যায়। এই মতটি টলেমি তাঁর পূর্ব্ববর্ত্তিগণের নিকট হইতে পাইয়াছিলেন, কিন্তু তাঁর পূর্ব্বেও সামোসের অধিবাসী এরিস্টারকাস উপরোক্ত মতের বিরোধী ছিলেন। তিনি মনে করিতেন যে, পৃথিবীকে লাটিমের মত তাহার অক্ষদণ্ডের চতুর্দ্দিকে ভ্রাম্যমাণ করিয়া লইলেই সূর্য্যের প্রাত্যহিক উদয় ও অস্ত আরও ভাল ভাবে বুঝানো যাইতে পারে। কিন্তু টলেমি এই মত গ্রহণ করেন নাই। ইহার ছয় শত বৎসর পরে ভারতবর্ষে আর্য্যভট্ট স্বতন্ত্র ভাবে একই কারণ দেখান, কিন্তু তাঁহার শিষ্যবর্গ, ব্রহ্মগুপ্ত ও অন্য সকলে উক্ত মতের পোষকতা করেন নাই।

অন্য দিকে কোপার্ণিকাস দেখাইলেন—গ্রহদের এই যে গতি তাহার স্বরূপ, সূর্য্যকে স্থির এবং পৃথিবী ও অন্যান্য গ্রহকে উহার চতুর্দ্দিকে বৃত্তাকারে আবর্ত্তনশীল মনে করিলেই সুস্পষ্ট রূপে উপলব্ধি হইবে। বুধ ও শুক্র পৃথিবীর পথের মধ্যেই ঘুরিতেছে ও বাকীগুলি উহার বহির্দ্দিকে ঘূর্ণ্যমান। গ্রহগুলির রহস্যময় পশ্চাদ্‌গতি জ্যোতিষে বহু কুসংস্কার বা ভ্রান্ত ধারণা সৃষ্টি করিয়াছিল, কিন্তু সেগুলি আবর্ত্তনশীল পৃথিবীর হিসাবে অন্য গ্রহগুলির আপেক্ষিক স্থান ও গতি ছাড়া আর কিছু নয়।

পৃথিবী সূর্য্যের চতুর্দ্দিকে বৎসরে একবার ও নিজের অক্ষদণ্ডের চতুর্দ্দিকে প্রত্যহ একবার ঘুরিতেছে। পৃথিবীর আহ্নিক আবর্ত্তনের দ্বারা সূর্য্যের উদয় ও অস্ত ভাল ভাবে বুঝা যায়। এই মত কোপার্ণিকাসই প্রথম নির্দ্দেশ করেন।

কোপার্ণিকাস এই সব গবেষণা শেষ করিয়া যাইতে পারেন নাই। পরে গ্যালিলিও, কেপ্‌লার ও নিউটন তাঁহার আরব্ধ কার্য্য সম্পন্ন করেন। কেপ্‌লার দূরবীক্ষণ ইত্যাদি যন্ত্র-সাহায্যে দেখাইলেন, পৃথিবী ও অন্যান্য গ্রহ সূর্য্যকে উপকেন্দ্র (focus) করিয়া সূর্য্যের চতুর্দ্দিকে উপবৃত্তাকারে (elliptical) ঘুরিতেছে। নিউটন তাঁহার বিখ্যাত মাধ্যাকর্ষণের সাহায্যে গণিত-বিজ্ঞানের দ্বারা উপরোক্ত তত্ত্বকে আরও সহজ করিয়া বুঝাইয়া দিলেন।

ইহাতে কতকগুলি প্রশ্নের উদয় হইল। সৌরজগৎ কিরূপে সৃষ্টি হইল? পৃথিবী ছাড়া অন্য কোথাও কি জীব থাকা সম্ভব?

প্রথমে বিখ্যাত জার্ম্মান দার্শনিক ক্যান্ট ও ফরাসী বিপ্লব-যুগের প্রসিদ্ধ গণিতজ্ঞ লাপ্‌লাস সৌরজগতের উৎপত্তির কারণ নির্ণয় করিবার চেষ্টা করিলেন। তাঁহাদের মতে সৌরজগৎ প্রথমে একটি বিরাট্ নীহারিকাময় বস্তু (nebular mass) হইতে উদ্ভূত হইয়াছিল। উহা স্বকীয় অংশগুলির পরস্পর আকর্ষণ-বিকর্ষণের জন্য আবর্ত্তিত হইতে লাগিল এবং বলয়াকারে উহার কতকগুলি অংশ বিক্ষিপ্ত হইল। অংশগুলি ঘনীভূত হইয়া গ্রহ ও উপগ্রহের আকার ধারণ করিল এবং কেন্দ্রীয় বা মূলবস্তু ঘনীভূত হইয়া সূর্য্যে রূপান্তরিত হইল।

লাপ্‌লাসের মতবাদ হইতে সৌরজগতের কতকগুলি বৈশিষ্ট্য পরিস্ফুট হইল, যথা—

১। গ্রহগুলি নিজ নিজ কক্ষ-পথে একই দিকে ও প্রায় একই সমতলক্ষেত্রে চলিতেছে।

২। উপগ্রহগুলি গ্রহগুলির চতুর্দ্দিকে, গ্রহগুলি যে ভাবে সূর্য্যকে পরিক্রমণ করিতেছে সেই ভাবে যাইতেছে।

৩। গ্রহ ও উপগ্রহগুলির আপন আপন অক্ষদণ্ডের চারিদিকের আবর্ত্তন ও তাহাদের কক্ষপথে পরিভ্রমণ একই দিকে।

৪। কক্ষপথগুলি প্রায় বৃত্তাকার।

লাপ্‌লাসের মতবাদের বিরুদ্ধে যে সমস্ত যুক্তি প্রদর্শন করা হয় তন্মধ্যে একটি এই যে, আবর্ত্তনশীল নীহারিকা হইতে যে অংশগুলি বলয়াকারে নিক্ষিপ্ত হইয়াছিল, তাহা একক গ্রহে ঘনীভূত হইতে পারে না, তাহারা শনিগ্রহের বলয়াকার উপগ্রহগুলির মত থাকিতে পারিত। ঐ বলয়াকার উপগ্রহগুলি যে স্থিতিশীল হইতে পারে তাহা ম্যাক্সওয়েল সাহেব ১৮৫৯ সালে প্রমাণ করিয়াছেন।

বৈজ্ঞানিক মহলে এই মতবাদ গ্রহণে সর্ব্বপ্রধান বাধা উপস্থিত হইল সূর্য্য ও অন্যান্য গ্রহের মধ্যে কৌণিক ভরবেগের পরিবেশন (distribution of angular momentum) লইয়া। কোন বস্তুর ভরবেগকে (momentum) চলতি কথায় বলিতে গেলে বলিতে হয় জিনিষটা কতটা ঘুরিল। আবর্ত্তন বেগ (spin), বস্তু (mass) ও আকারের (size) উপর কৌণিক

ভরবেগ নির্ভর করে। এখন সবচেয়ে মজার কথা এই যে, সূর্য্য ও অন্যান্য গ্রহগুলির মোট ভরবেগ এক রাখিতে হইবে। ভিতরের কোন শক্তিদ্বারা উহাকে কম বা বেশী করা সম্ভব নয়।

কিন্তু দেখা গিয়াছে সৌরজগতের শতকরা ৯৮ ভাগ ভরবেগ চারটি প্রধান গ্রহে পাওয়া যায়। চারটি ছোট গ্রহে পাওয়া যায় শতকরা ০·১ ভাগ। আর বাকীটুকু সূর্য্যের আবর্ত্তন হইতে পাওয়া যায়। লাপ্লাসের মতবাদ হইতে বুঝা যায় না কি করিয়া শতকরা ৯৮ ভাগ ভরবেগ শতকরা ১·৫ বস্তুতে (mass of the four major planets) পাওয়া সম্ভব? অঙ্ক কষিয়া প্রমাণ করা যায় যে যদি মূলবস্তুর বাহিরের অংশগুলি এত ভরবেগ পায় তাহা হইলে তাহারা ঘনীভূত হইতে পারে না। সুতরাং এই কথাটাই চিন্তা করা সম্ভব যে গ্রহগুলির ঐ ভরবেগ বাহির হইতে আসিয়াছে। এ বিষয়ে স্পেন্সার জোন্স বলেন, "The origin of the solar system must be sought in the swift catastrophic action of forces from outside" অর্থাৎ সৌরজগতের উৎপত্তিস্থল বাহিরের শক্তির অতিক্রত সংঘর্ষের মধ্যে অনুসন্ধান করিতে হইবে।

চেম্বারলেন ১৯০১ ও মোল্টনের (১৯০৫) Planetesimal মতবাদে এবং জীন্স (১৯১৯) ও জেফ্রিজের (১৯২৯) Tidal মতবাদে ধরিয়া লওয়া হইয়াছে যে উক্ত দুর্ঘটনা হইয়াছিল, সূর্য্যের খুব নিকটে অন্য একটি নক্ষত্র আসিয়া পড়িয়াছিল বলিয়া। তাঁহাদের মতে এক সময়ে সূর্য্য একটি গ্রহবিহীন বিচ্ছিন্ন তারকা ছিল। সুদূর অতীতে আর একটি একক তারা মহাব্যোমে চলিতে চলিতে সূর্য্যের অতি নিকটে আসিয়া পড়িয়াছিল। দুটি তারাই পরস্পরের পাশে দুলিতে লাগিল, পরে আবার বিচ্ছিন্ন হইয়া গেল। তাহারা উভয়ের এত নিকটে আসিয়াছিল যে সূর্য্য হইতে প্রচুর পরিমাণে বস্তু বিক্ষিপ্ত হইয়া গেল।

Planetesimal মতবাদে বিক্ষিপ্ত বস্তুর অধিকাংশই ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কণার আকারে সূর্য্যের চতুর্দ্দিকে ঘূর্ণ্যমান এবং বর্ত্তমান গ্রহগুলি ঐ ক্ষুদ্র অংশগুলির ক্রমবিকাশ মাত্র। চেম্বারলেন বিশ্বাস করিতেন যে, বৃহত্তম গ্রহটি ছাড়া অন্য গ্রহগুলি প্রায় প্রথম হইতেই পূর্ণভাবে জড় অবস্থায় ছিল। জেফ্রিজের মতে বিক্ষিপ্ত অংশগুলি প্রথম অবস্থায় বায়বীয় (gaseous) এবং অত্যন্ত উষ্ণ ছিল। বস্তুবিক্ষেপ অবিচ্ছিন্ন হইলে বিক্ষিপ্ত অংশ-সূত্রের (filament) আকারে দীর্ঘ ও সঙ্কীর্ণ পরিধির মধ্যে থাকিবে। ইহার আকার অষ্ট্রেলিয়ার আদিম অধিবাসীরা বুমেরাং নামে যে দৃঢ় কাঠার ব্যবহার করে তাহার অনুরূপ। তাপ বিকীরণের জন্য ঐ সূত্রটি শীতল হইতে লাগিল। যখন ঐ বিক্ষিপ্ত অংশটি একটি বিশিষ্ট দৈর্ঘ্যে পৌছিবে তখন উহা ঘনীভূত হইতে আরম্ভ করিবে। বিক্ষিপ্ত অংশটি তখন মূল বস্তু হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া গ্রহের আকার ধারণ করিবে। এই ভাবে বিক্ষেপ যতক্ষণ না বন্ধ হইবে ততক্ষণ গ্রহের পর গ্রহ সৃষ্টি হইতে থাকিবে। বিক্ষোভ-উৎপাদনকারী তারাগুলি দূরে অপসৃত হইলে প্রথম গ্রহগুলি নিজেদের স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করিবে এবং শেষের গুলি সূর্য্যে ফিরিয়া যাইবে।

রাসেল দেখাইয়াছেন যে, বিক্ষোভ-উৎপাদনকারী তারা, সূর্য্য ও অন্যান্য গ্রহগুলিতে ভরবেগের পরিবেশন লক্ষ্য করিলে Tidal মতবাদ গ্রহণে প্রতিকূল যুক্তির সম্মুখীন হইতে হইবে। সূর্য্যে বিক্ষোভ ও উৎক্ষেপণ (eruptions) সৃষ্টির জন্য তারকাটির সূর্য্যকে প্রায় স্পর্শ করিয়া যাইতে হইবে। ইহা যদি আকারে বস্তুপুঞ্জের সমতায় সূর্য্যের অনুরূপ হয় তাহা হইলে দশ লক্ষ মাইলের বেশী নিকটস্থ হইতে পারিবে না। ইহা হইতে অঙ্ক কষিয়া দেখা গিয়াছে যে, পৃথিবীর এক মাত্রা বস্তুর ভরবেগকে এক ধরিলে তারকাটির হইবে ০·২৫, গ্রহ-জগতের এক মাত্রা বস্তুর গড়পড়তা ভরবেগ হইবে ২·৬৬। ইহা তারকাটির ভরবেগের দশ গুণেরও বেশী। ইহা অসম্ভব।

রাসেলের সিদ্ধান্ত বিষয়ে লিট্‌লটন ১৯৩৮ সালে বলেন যে, সূর্য্য প্রথমে যুগ্মতারা ছিল এবং ইহার সঙ্গীটি একটি তৃতীয় তারার সহিত সংঘর্ষে সূর্য্য হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া যায়। তৃতীয় তারাটি আয়তনে সূর্য্য অপেক্ষা এত বড় ছিল ও তাহার গতি-বেগ এত বেশী ছিল যে তাহা হইতে গ্রহ-সৃষ্টির শক্তি প্রচুর পরিমাণ ছিল। সূর্য্যটি ঠিক এত দূরেই ছিল যে তাহা তৃতীয় তারাটির সহিত সংঘর্ষ হইতে রক্ষা পাইয়াছে কিন্তু ইহা তাহার, সঙ্গী ও অন্য তারাটির দ্বারা যে গ্রহাত্মক সূত্র (planetary ribbon) সৃষ্টি হইয়াছিল তাহা ধরিতে পারিয়াছিল।

লুইটেন (১৯৩৯) দেখাইয়াছেন, সূর্য্য গ্রহাত্মক সূত্র ধরিতে আসিলে তাহাকেও তৃতীয় তারাটি ধরিয়া লইয়া যাইবে।

ভাটনগর (১৯৪০) প্রমাণ করিয়াছেন যে, সর্ব্বাপেক্ষা সুবিধার ক্ষেত্রেও গ্রহাত্মক সূত্র তৈয়ারী করিতে হইলে তিনটিতেই বিপদময় সংঘর্ষ হইবে।

স্পিট্‌জার (১৯৩৯) বলিয়াছিলেন যে, গ্রহাত্মক সূত্র প্রস্তুত হইলেও সূর্য্যের উত্তাপে উহা সৃষ্টির এক ঘণ্টার মধ্যেই নষ্ট হইয়া যাইবে। লিট্‌লটন ১৯৪১ সালে উহার প্রতিবাদ করিয়া বলেন যে, স্পিট্‌জার তারাগুলির মাধ্যাকর্ষণ-ক্ষেত্র (gravitational field) বাদ দিয়াছেন, সেজন্য তাঁহার মতবাদ গৃহীত হইতে পারে না ইত্যাদি।

Nolkë (১৯৩০) বলেন যে, সূর্য্য ও অন্যান্য গ্রহ প্রায় একই সময়ে একটি সূক্ষ্মময় নীহারিকা হইতে উৎপন্ন হইয়াছিল। ঐ নীহারিকার একটি স্থানে জড় বস্তুর পরিমাণ অনেক বেশী ছিল ও বহু স্থানে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র আকারে বস্তু ঘন হইয়াছিল। ইহা নিঃসন্দেহ যে কতকগুলি অনুজ্জ্বল নীহারিকার সূত্র আছে কিন্তু তাহারা কি উপাদানে তৈরি ইহা অজ্ঞাত। ইহাও বলা যায় না

যে ঐ সূত্র বক্র না একই সমতল ক্ষেত্রে আছে, কিংবা তাহার অংশগুলির গতি একই ক্ষেত্রে চলিতেছে কি না।

রসগাসের (১৯৪১) মতে সম্ভবতঃ অন্ত একটি তারকার নিকট একটি অতি দ্রুত আবর্ত্তনশীল তারকা দ্বিধাবিভক্ত হইয়াছিল এবং তাহা হইতেই গ্রহ-জগৎ গঠিত হইয়াছিল। দ্বিধাবিভক্ত হইবার জন্ত যে বিশেষ (critical) আবর্ত্তন-বেগের প্রয়োজন প্রায় তদ্রূপ বেগ লইয়া নিকটগামী তারকার এই যে সংঘর্ষ ইহা প্রায় অসম্ভব ঘটনা বলিলেও চলে।

লিট্লটন (১৯৪১) বলেন যে, একটি নক্ষত্রময় বস্তুতে (stellar mass) আবর্ত্তনের স্থিতিশীলতার অভাব (rotational in stability) হইয়াছিল এবং সেই জন্ত তাহা ভাঙিয়া গিয়া গ্রহের আকার ধারণ করিয়াছিল। তিনি সূর্য্যকে একটি নিকট-সংলগ্ন যুগ্ম-তারকার দূরবর্ত্তী সঙ্গী মনে করিয়াছিলেন। ঐ যুগ্মতারা পূর্ব্বে একত্রীভূত ছিল, পরে আবর্ত্তনের অস্থিতিশীলতার জন্ত দ্বিধাবিভক্ত হইয়াছিল এবং যখন তাহারা পরস্পরের নিকট হইতে দূরে চলিয়া যাইতেছিল তখন গ্রহাত্মক তন্তু (planetary filaments) সৃষ্টি হইয়াছিল। আন্তর্নাক্ষত্রিক বস্তু (interstellar mass) বৃদ্ধির জন্ত এই সংযোগ ঘটিয়াছিল। ১৯৪০ সালেই এট্‌কিনসন এই সংযোগ হইতে পারে কিনা তাহাতে যথেষ্ট সন্দেহ প্রকাশ করিয়াছিলেন।

এই সমস্ত মতবাদের মধ্যে লক্ষ্য করিবার বিষয় এই যে, একটি কথা সবগুলি মতবাদের মধ্যেই আছে এবং তাহা হইল, গ্রহ-জগতের উৎপত্তি বহুকালান্তরের অত্যন্ত বিরল ঘটনা। ১৯৪০ সালে জেফ্রেসের কথারই পুনরাবৃত্তি করিয়া স্পেন্সার বলিলেন, "So many special assumptions are involved that the solar sy.tem bad a very narrow escape f.om nover coming into existence." অর্থাৎ, এত বেশী ঘটনা মানিয়া লওয়া হইয়াছে যে, সৌরজগৎ সৃষ্টি না হইতে হইতে সৃষ্টি হইয়া গিয়াছে। জীন্‌স (১৯২৯) হিসাব করিয়া বলিয়াছিলেন যে, সমস্ত ছায়াপথে গ্রহজগৎ সৃষ্টি হয় পাঁচ হাজার মিলিয়ন বৎসরে (৫×১০^{৯}) মাত্র এক বার।

বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের বয়স লইয়া মতভেদ আছে। দুটি সময়-মাত্রা সম্বন্ধে বৈজ্ঞানিক মহলে দুইটি মতবাদ প্রচলিত। যাঁহারা দীর্ঘ সময়-মাত্রায় বিশ্বাস করেন তাঁহারা বলেন, ছায়াপথে বস্তুর অবস্থা ও ক্ষেত্রের অবস্থান হইতে বুঝা যায় যে, বিশ্বের বয়স অন্যূন $১০^{১২}$ বৎসর। হ্রস্ব সময়-মাত্রা মতবাদে আস্থাবানেরা আপেক্ষিকতাবাদ হইতে প্রমাণ করিতে চান যে, বিশ্বের বয়স $১০^{৯}$ এবং $১০^{১০}$ বৎসরের মধ্যে হইবে। ১৯৪২ সালে হুইটেকার "বিশ্বের সুরু ও সারা"তে (Beginning & End of the World, Riddel Memorial lectures) বলিয়াছেন, বিশ্বের বয়স প্রায় ৫×১০^{১০} বৎসর হইবে।

মোটামুটি হিসাবে বলিতে হয় সাধারণ আকারের তারকা হইতে এই গ্রহসৃষ্টির সম্ভাবনা ৫×১০^{১৭} বৎসরে এক বার। প্রথম মতে তারকাগুলির বয়সের হার ৫×১০^{১২} ধরিলে এক লক্ষের মধ্যে একটি তারকা তাহার সমস্ত জীবনে গ্রহ-জগৎ পাইতে পারে, অর্থাৎ বলিতে হয় যে উপস্থিত এক লক্ষে একটি এই হিসাবে নক্ষত্রের গ্রহ-জগৎ আছে। অন্যমতে তারকাগুলির বয়সের হার ধরা হয় ৫×১০^{৯} এবং সেই হিসাবে $১০^{৮}$ একটি নক্ষত্র গ্রহ-বেষ্টিত। সুতরাং এ কথা স্বচ্ছন্দে বলা যাইতে পারে যে, গ্রহসৃষ্টি প্রায় বিরল ঘটনা।

সমস্ত আকাশ জুড়িয়া সৌরজগতের যে ছায়াপথ তাহা এণ্ড্রোমিডা নীহারিকা হইতে বড়। তাহা কুণ্ডলাকার এবং এণ্ড্রোমিডা নীহারিকারই অনুরূপ। ছায়াপথে প্রায় $১০^{১১}$ তারা আছে।

জীন্সের (১৯২৯) মতে প্রায় হাজার লক্ষ তারা সূর্য্যের নিকটে অবস্থান করিতেছে আর বাকীগুলি মহাশূন্যে দূরে ইতস্ততঃ পরিভ্রমণ করিতেছে। ঐ হাজার লক্ষ তারার মধ্যে দীর্ঘ সময়-মাত্রানুসারে প্রায় এক হাজার নক্ষত্র গ্রহ পরিবেষ্টিত এবং হ্রস্ব সময়-মাত্রানুযায়ী মাত্র একটি। অন্য তারাগুলির ব্যবধান এত বেশী যে তাহা হইতে গ্রহ সৃষ্টির সম্ভাবনা প্রায় ছাড়িয়া দিলেও চলে। প্রসঙ্গতঃ বলিতে হয় লিট্লটনের মতবাদে গ্রহসৃষ্টির সম্ভাবনা প্রায় নাই বলিলেও হয়।

সম্প্রতি জীন্‌স (*Nature*, June 20, 1942) তাঁহার পূর্ব্ব-মত সম্পূর্ণভাবে পরিবর্ত্তন করিয়াছেন। তিনি এখন বিশ্বাস করেন যে, পূর্ব্বে তিনি যাহা বলিয়াছিলেন তাহা অপেক্ষা অনেকগুণ বেশী নক্ষত্র গ্রহ-পরিবেষ্টিত। পূর্ব্বে যাহা মনে করা হইয়াছিল বিশ্বে তদপেক্ষা বহুল পরিমাণ জীবের অস্তিত্বের সম্ভাবনা বেশী। অসংখ্য তারার মধ্যে এমন সব লক্ষ লক্ষ নক্ষত্র আছে যাহা আমাদের সৌরজগতের অনুরূপ এবং তাহাদের লক্ষ লক্ষ গ্রহ প্রায় আমাদের পৃথিবীর মত। সুদূর অতীতে দ্রুত সঙ্কোচনশীল সূর্য্য ইহার বর্ত্তমান ব্যাসার্দ্ধের বহুগুণ অধিক বিস্তৃতি লাভ করিয়াছিল। ইহা তখনও অর্দ্ধ নীহারিকাময় অবস্থায় ছিল। যদি ইহার পূর্ব্ব ব্যাসার্দ্ধ এখনকার অপেক্ষা ১১ গুণ হইত তাহা হইলে গ্রহসৃষ্টির সম্ভাবনা তাঁর পূর্ব্ব-মতের সংখ্যাপেক্ষা $১১^{২}$ গুণ বেশী। তাঁহার নূতন মতবাদ এই বহুসংখ্যক সংযুক্ত গ্রহ-জগৎ রহিয়াছে— তাহাদের সূর্য্য তখনও অর্দ্ধ-নীহারিকাময় অবস্থায় ছিল।

আমাদের সূর্য্য যুরেনাসের কক্ষপথ পর্য্যন্ত বিস্তৃতি লাভ করিয়া থাকিলে গ্রহসৃষ্টির সম্ভাবনা এখন অপেক্ষা ১৭০ লক্ষ গুণ বেশী। তাহা হইলে আমাদের পূর্ব্ব হিসাব অনুযায়ী দীর্ঘ সময়-মাত্রায় প্রত্যেক তারারই ১৭০ বার সংঘর্ষ ও গ্রহ-সৃষ্টি হইত। ইহা অসম্ভব ও ধারণাতীত। হ্রস্ব সময়-মাত্রায় প্রত্যেক ছয়টি তারার মধ্যে একটি গ্রহ-পরিবেষ্টিত থাকা উচিত। দেখা গিয়াছে ইহাও ঠিক নয়।

পূর্ব্বেই ইঙ্গিত করা হইয়াছে যে, সূর্য্যের অন্তর্নিহিত শক্তি-দ্বারা নিক্ষিপ্ত বস্তু হইতে গ্রহসৃষ্টি হইয়াছে। প্রারম্ভে যদি

যথাযোগ্য উত্তেজনা (impulse) থাকিত তাহা হইলে গ্রহগুলি উপস্থিত যে ব্যবধানে রহিয়াছে সেই দূরত্বে অনায়াসে সৃষ্টি হইতে পারিত এবং কোন নিকটগামী তারকার আকর্ষণ-শক্তি তাহাদিগকে তাহাদের অধুনাতন কক্ষে ভ্রাম্যমাণ রাখিতে পারিত। ১৯৪২ সালে এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয়ের খ্যাতনামা অধ্যাপক বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় দেখাইয়াছেন, সূর্য্যের নিকটগামী একটি নক্ষত্র গতির স্থিতিশীলতা নষ্ট করিয়া দিয়াছিল। তাহাতে গ্রহগুলির ব্যবধানে বস্তু বিক্ষিপ্ত হইয়াছিল এবং তাহাতে গ্রহসৃষ্টি হইয়াছিল। সূর্য্যকে পূর্ব্বে একটি শৈবিক তারকার অংশ ধরিয়া লওয়া হইয়াছে। উহাতে বস্তু ছিল সূর্য্যের নয় গুণ বেশী ও উহা সামান্ত পরিসরের মধ্যে দুলিতেছিল। শৈবিক তারকা একটি বিশিষ্ট শ্রেণীর ও বিশেষ গুণসম্পন্ন তারকা। উহার ভিতরের স্পন্দন হেতু উহার ঔজ্জ্বল্য ও আকার কিছুকাল অন্তর বাড়ে ও কমে। ঐ কাল কয়েক ঘণ্টা হইতে কয়েক সপ্তাহ পর্য্যন্ত স্থায়ী হয়। S. Cephei নামক নক্ষত্র ঐরূপ শৈবিক নক্ষত্র এবং পাঁচ দিন অন্তর উহার ঔজ্জ্বল্য ও আকার হ্রাস ও বৃদ্ধি পায়।

উপরোক্ত শৈবিক নক্ষত্রের প্রায় সমানাকার আর একটি নক্ষত্র উহার নিকট দিয়া গমন করিলে উহার দোলন বৃদ্ধি পায়। দ্বিতীয় তারাটি খুব নিকটবর্ত্তী না হইলেও বা প্রায় স্পর্শ না করিলেও চলিবে, কিন্তু শৈবিক তারকাটির মধ্যে যথেষ্ট উৎক্ষেপ (protruberances) সৃষ্টি করিবার জন্য যতটুকু ব্যবধান প্রয়োজন ততটুকু থাকিলেই চলিবে। যতক্ষণ দোলনের পরিসর (amplitude of oscillation) ছোট থাকে, ততক্ষণ শৈবিক তারকার স্পন্দন থাকে স্থিতিশীল, কিন্তু উক্ত পরিসর বৃদ্ধি পাইলেই দোলনের স্থিতিশীলতা নষ্ট হইয়া যায় এবং জনয়িতা শৈবিক নক্ষত্র হইতে সূর্য্যের তুল্য বস্তু উৎক্ষিপ্ত হয়। আরও দেখানো হইয়াছে যে পথচারী নক্ষত্রটির গ্রহগুলিতে আবর্ত্তনের ভরবেগ পরিবেশন করিবার মত যথেষ্ট ভরবেগ থাকিবে। কবিয়া দেখান হইয়াছে সৌরজগৎকে জনয়িতা শৈবিক তারকা হইতে বিচ্ছিন্ন হইবার জন্য মাত্র উহার $\frac{1}{2}$ শক্তি লইতে হইয়াছে। শৈবিক তারকাটিরও নিজের গ্রহ থাকিবে। ভ্রাম্যমাণ তারকাটি যথন পরিমিত দূরত্বে থাকিলেই চলিবে তখন গ্রহজগতের উৎপত্তির সম্ভাবনা খুব বেশী। তাঁহার মতে বহু গ্রহ-জগৎ থাকিতে পারে।

সম্প্রতি Alfven (১৯৪৩) বলিয়াছেন গ্রহগুলি আন্তর্নাক্ষত্রিক বস্তু হইতে সৃষ্টি হইয়াছে। ঐ বস্তু বোধ হয় সূর্য্যকে এক সময় পরিবেষ্টনকারী বায়বীয় মেঘ হইতে উৎপন্ন হইয়াছিল। ঐ বায়বীয় মেঘ সূর্য্যের আকর্ষণে পরে সূর্য্যে নিক্ষিপ্ত হইয়াছিল। মাধ্যাকর্ষণের জন্য ঐ বস্তু উত্তপ্ত হইয়া যে মুহূর্ত্তে কণায় রূপান্তরিত হইল তৎক্ষণাৎ সূর্য্যের চুম্বকক্ষেত্রে উহা আবদ্ধ হইয়া গেল। ঐ বস্তুর অধিকাংশ সূর্য্য হইতে r ব্যবধানে একত্রিত হইলে মাধ্যাকর্ষণ শক্তি কণায় রূপান্তরিত হইবার শক্তির ভারসাম্য করিল। কষিয়া দেখা হইয়াছে যে ঐ দূরত্ব সূর্য্য হইতে বৃহস্পতির দূরত্বের সমান। এই মতবাদ সন্তোষজনক ভাবে সৌরজগতের গ্রহগুলির মধ্যে আবর্ত্তনের ভরবেগ পরিবেশনের মীমাংসা করিয়াছে।

Fsenkov (১৯৪৪) বলেন, সূর্য্যের জীবনেতিহাসের বিভিন্ন সময়ে নানারূপ শক্তি-উৎপাদনকারী কেন্দ্রীয় প্রতিঘাত সন্ধিসময়ে (critical periods) হইয়াছিল এবং সূর্য্যে আকস্মিক সংকোচন ঘটিয়াছিল। সেই জন্য তাহা হইতে বস্তুবিক্ষেপ হওয়াতে গ্রহের উদ্ভব হইয়াছিল।

পথের ডাক

শ্রীনীলিমা দত্ত

বাজছে ভেরী এগিয়ে চল্ পথ যে তোদের নয় সরল
রক্ত পায়ে চল্‌বি পথ রুদ্র পথের পথিক দল।
ঈশান কোণে উঠল ঝড় ডাকছে দুয়ার বন্ধ ঘর
ঝড়ের মুখে বেরিয়ে পড় ঘর-ছাড়া সব তরুণ দল।
সুখের বাঁধন ছিন্ন কর্, কাঁটার মুকুট মাথার পর
রক্তকেতন উড়িয়ে চল শঙ্কাহারা পথিক দল।
আপন হাতে গড়বি পথ, ছুটিয়ে যাবি বিজয় রথ
বজ্রনাদে এগিয়ে চল মুক্তিপথের সৈন্যদল।
শুকনো গাছে ডাকল বান, পণ ক'রে আজ অযুত প্রাণ
ঢেউয়ের দোলায় ঝাঁপিয়ে পড় মরণ-জয়ী পথিক দল।

রবীন্দ্রনাথ

শ্রীবাসন্তী চক্রবর্ত্তী

আমি যখন ছোট ছিলাম তখন প্রায়ই আমাদের পরিবারে কবি-সম্রাট রবীন্দ্রনাথের নাম শুনতাম, তখন তাঁকে দেখবার জন্তও সর্ব্বদাই খুব আগ্রহান্বিত থাকতাম। কিশোর বয়সেই তাঁর সঙ্গে পরিচিত হবার সৌভাগ্যও আমার হয়েছিল।

আমার মাতামহ রাজনারায়ণ বসু মহাশয়ের দেওঘরের বাড়ীতে রবীন্দ্রনাথ কয়েকবার গিয়েছিলেন। তিনি দাদা-মহাশয়কে খুব শ্রদ্ধা ও ভক্তি করতেন। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের সঙ্গে দাদামহাশয়ের খুব অন্তরঙ্গতা ছিল—সর্ব্বদা প্রত্যেকে প্রত্যেকের সংবাদ নিতেন ও চিঠিপত্র লিখতেন। আমার মা সেই চিঠিগুলি অতি যত্নের সহিত সংগ্রহ করে রেখেছিলেন, সেই সব চিঠির সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের দাদা দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়েরও অনেক চিঠি দেখেছি। তিনি আমার দাদামহাশয়ের অকৃত্রিম বন্ধু ছিলেন। দ্বিজেন্দ্রনাথ নানা রকমের ছবি এঁকে, মজার মজার কবিতায় চিঠি লিখতেন। মহর্ষিদেবের পরিবারস্থ অনেকেই দাদামশায়কে আত্মীয়ের মত দেখতেন।

আমি যখন স্কুলের ছাত্রী ছিলাম তখন রাজা রামমোহন রায়ের মৃত্যুবার্ষিকী উপলক্ষে কলিকাতায় যে বিরাট সভা হ'ত তাতে যোগ দিতাম। সেই উপলক্ষে রবিবাবুর সুললিত কণ্ঠের অপূর্ব্ব বক্তৃতা শুনে মুগ্ধ হয়েছি।

এক বার রবিবাবু উক্ত সভায় বক্তৃতা শেষ করে হল থেকে চলে যাচ্ছেন, এমন সময় উপস্থিত সকলে চিৎকার করে ব্যাকুল কণ্ঠে বলে উঠলেন—"একটি গান, একটি গান।" তখনই তিনি ফিরে দাঁড়িয়ে, হল ঘরটি কম্পিত করে মধুর কণ্ঠে স্বরচিত এই গানটি গাইলেন—

"কে যায় অমৃতধাম যাত্রী
আজি এ গহন তিমির রাত্রি
কাঁপে নভ জয়গানে।
আনন্দরব শ্রবণে লাগে, সুপ্ত হৃদয় চমকি জাগে
চাহি দেখে পথ পানে।
ওগো রহ রহ, মোরে ডাকি লহ, কহ আশ্বাসবাণী
যাব অহরহ সাথে সাথে, সুখে দুখে শোকে দিবস রাতে
অপরাজিত প্রাণে।"

তাঁর গলার সুরটি আজও কানে বাজছে—ভুলতে পারি নাই।

রবীন্দ্রনাথের কবিতা আবৃত্তি করে, তাঁর রচিত গান অন্তের মুখে গাইতে শুনে, আর নিজেরাও তাঁর গান গেয়ে, তাঁর সঙ্গে পরিচয় যেন দিন দিন বৃদ্ধি হতে লাগল।

একবার পূজার ছুটির সময় শরৎকালে আমরা—আমার দিদি কুমুদিনী বসু ও আমি শান্তিনিকেতনে যাওয়ার সংকল্প করলাম। দুপুরে আমরা হাওড়ায় রেলগাড়ীতে চড়ে রাত্রি ৮৷০টায় বোলপুরে পৌঁছলাম, স্টেশনে শান্তিনিকেতনের বলদ-টানা বাস আমাদের জন্ত অপেক্ষা করছিল, তাইতে উঠে আমরা গন্তব্যস্থানে পৌঁছলাম। অন্ধকার রাত্রে জোনাকীর দল আমাদের পথের চারিদিকে ঝিক্‌মিক্ করছিল, যেন আকাশের তারাগুলি গাছের মধ্যে ঘুরে ঘুরে বেড়াচ্ছে—ভারি সুন্দর লাগছিল।

রাত্রে শান্তিনিকেতনে পৌঁছেই শুনলাম আমরা নীচু-বাংলায় থাকব। সেখানে পূজনীয়া হেমলতা দেবী (ঋষিকল্প দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুরের পুত্রবধূ) আমাদের কত আদর করে বিশ্রাম ও আহারের ব্যবস্থা করলেন। আনন্দে ও শান্তিতে মন ভরে উঠল। তখন মনে হ'ল

"পুরানো আবাস ছেড়ে যাই যবে
মনে ভেবে মরি কি জানি কি হবে,
নূতনের মাঝে তুমি পুরাতন
সে কথা যে ভুলে যাই।"

হেমলতা দেবী স্নেহ ও মমতাপূর্ণ আত্মীয়ের মত এত আদর-যত্ন করেছিলেন তা কখনও ভুলিতে পারিব না। সেই দিন হতে তিনি যে স্নেহের চক্ষে আমাদের দুই বোনকে দেখেছিলেন তা এখনও অটুট আছে—এ কি কম সৌভাগ্য!

রাত্রে আহারের সময় আশ্চর্য্য হয়ে দেখলাম কবি আমাদের সঙ্গে বসেছেন। তাঁর মুখের নানা গল্প ও হাসির কথায় আহারের সময়টুকু পরম আনন্দেই কেটে গেল।

পরদিন ভোরে শরৎকালের নির্ম্মল আকাশ যখন গোলাপী আভায় রঞ্জিত ও মধুময় হয়ে উঠল তখন শান্তিনিকেতনের ছেলেদের মধুর কণ্ঠে দেবাদিদেবের বন্দনাগীতি শুনতে পেলাম সে বন্দনা বড়ই মিষ্টি লাগল।

জলযোগের পর আমরা "বড়বাড়ী"তে গেলাম। সেখানে তখন রবিবাবু বাস করতেন। আমরা সকলে মিলিত হয়ে তাঁর কাছে বসলাম। তিনি তখন "ডাকঘর" বইটি লিখেছেন কিন্তু তখনও তা মুদ্রিত ও প্রকাশিত হয় নাই। তিনি "ডাকঘর" নিজে পড়ে শুনালেন—সে যে কি সুন্দর করে পড়লেন, তা এত বছর পরেও যেন কানে বাজছে। পড়া শেষ হলে আমার দিকে চেয়ে জিজ্ঞাসা করলেন—"কেমন লাগল।"

তখনই আমি বললাম—"ও! কি সুন্দর।"

তখন বললেন—"সত্যি বলছ ত?"

আমি ত অবাক! আমার মত এমন নগণ্য লোকেরও মতামত তিনি জানতে চান।

তারপরে তিনি আমাদের দুই বোনকে গান করতে বললেন—আমরা ভাবলাম, "ওঁর রচিত গান ওঁর সামনে কি করে করি।" শেষে ভেবেচিন্তে কবি রজনীকান্ত সেন মহাশয়ের রচিত "কেন বঞ্চিত হব চরণে, আমি কত আশা করে বসে আছি পাব জীবনে না হয় মরণে"— এই গানটি গাইলাম।

রাত্রে সেখানে শারদোৎসব নাটকখানির অভিনয় দেখলাম। শান্তিনিকেতনের বালকগণ ও শিক্ষকগণ অভিনয় করেছিলেন, কি সুন্দর সে অভিনয় হয়েছিল তা বলা বাহুল্য· রবিবাবু উপস্থিত ছিলেন।

পরদিন আমরা চলে আসব। দুপুরে আহারের পর ঘরের বারান্দায় রৌদ্রে দাঁড়িয়ে চুল শুকাচ্ছি—হঠাৎ পিছন ফিরে দেখি রবিবাবু দাঁড়িয়ে আছেন, তিনি হেসে বললেন—"তোমরা চলে যাচ্ছ, তোমাদের দেখতে এলাম।"

তাঁর সৌজন্য ও শান্তিনিকেতনের আতিথ্যে আমরা কত যে তৃপ্তিলাভ করেছিলাম তা বলা নিষ্প্রয়োজন। ছেলেদের সুমিষ্ট গানের রেশ কত দিন ধরে যে কানে বাজছিল—অবাক হয়ে গেলাম। যেন কোন এক স্বপ্নরাজ্য থেকে বেড়িয়ে এলাম।

কলিকাতায় পৌঁছবার পর দেখি এক দিন তিনি আমাদের বাড়ীতে (৬নং কলেজ স্কোয়ারে) এসেছেন, বললেন… "দেখতে এলাম, তোমরা কেমন আছ? শরীর ভাল ত?…… আমরা যে কি আনন্দিত হলাম তা আর কি বলব।

এক বার রবীন্দ্রনাথ জোড়াসাঁকোয় আদি সমাজে উপাসনা করবেন, আর আমরা দুই বোনে গান করব এইরূপ স্থির হয়েছিল। সেদিন এত বৃষ্টি হয়েছিল যে কলিকাতার অনেক রাস্তাই জলে ডুবে গেল-- বিশেষভাবে ঠনঠনের রাস্তা। তবুও গাড়ী করে জলে ডোবা রাস্তার উপর দিয়ে আমরা দুই বোন পিতৃদেব কৃষ্ণকুমার মিত্র মহাশয়ের সঙ্গে সমাজে গিয়ে গান করেছিলাম। এ সামান্য কাজটুকু যে বিশেষ কিছু লক্ষ্য করবার জিনিষ তা কখনও ভাবি নাই। পরদিন রবিবাবু একটি সুন্দর চিঠি লিখে পাঠালেন—"এমন দুর্য্যোগ সত্ত্বেও যে তোমরা কর্ত্তব্য কাজ করতে এসেছিলে সেজন্য খুবই আনন্দিত হয়েছি" ইত্যাদি। আমরা ত অবাক। এমন সামান্য ঘটনাও তিনি স্মরণে রাখেন।

আমার বড় মাসিমার সেজ ছেলে (ডাঃ কৃষ্ণধন ঘোষের ছেলে, যাঁর নামে রংপুরের K. D. Canal-এর নামটি হয়েছে) অরবিন্দ ঘোষ আমাদের বাড়ীতে প্রায়ই থাকতেন। রবিবাবু অরোদাদাকে যে শ্রদ্ধা করতেন তা তাঁর কবিতা— "অরবিন্দ-রবীন্দ্রের লহ নমস্কার" পড়ে জানা যায়। এক দিন রবিবাবু অরোদাদার সঙ্গে আমাদের বাড়ীতে দেখা করতে এসেছিলেন প্রকাণ্ড মোটরে চড়ে। আমাদের ক্ষেত্র নামে মোট উড়ে চাকর ছিল। সে দৌড়ে তাঁর মোটরের কাছে গেল—ওঁর এমন সুন্দর রাজার মত চেহারা ও মস্ত মোটর দেখে, সে ভাবল ইনি কোনো রাজা হবেন—সে আমাদের কাছে ছুটে এসে বলল—এক রাজাবাবু দেখা করতে এসেছেন।

এ কথা বলেই সে আবার নীচে চলে গেল। পরে সেই উড়ে চাকরের মুখে শুনলাম যে সে সাহস করে রাজাবাবুকে বলেছিল যে তার খুব ইচ্ছা একটু মোটরে বেড়ায়। আর "রাজাবাবু"ও এই নগণ্য মূর্খ দরিদ্র ভৃত্যের আবদারটি উপেক্ষা না করে, তখনই তাকে মোটরে বসিয়ে গোলদীঘির চারধার দিয়ে ঘুরিয়ে এনে তাকে খুশী করে দিলেন।

একটু পরে দেখি রবিবাবু হাসতে হাসতে উপরে এসেছেন। এ সামান্য ঘটনা থেকে বুঝা যায় তাঁর মনটি কত কোমল ও সহৃদয়তা পূর্ণ ছিল। সে প্রাণ একটি অতি নগণ্য ক্ষুদ্রতম লোকের ইচ্ছাকেও তুচ্ছতাচ্ছিল্য করতে পারল না। আর এই রবীন্দ্রনাথই বিশ্বের দরবারে কত পূজ্য ও সম্মানিত হয়েছেন।

১৯০৮ সালে আমার পিতৃদেব কৃষ্ণকুমার মিত্র মহাশয় নির্ব্বাসন দণ্ডে দণ্ডিত হন। তখন মার শরীর অসুস্থ, তিনি মনঃকষ্টে জর্জ্জরিত। পিতৃদেবের বিশেষ বন্ধু মান্যবর সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও ভুপেন্দ্রনাথ বসু মহাশয় মার সংবাদ নিতে প্রায়ই আমাদের বাড়ীতে আসতেন। একদিন রবিবাবুও মার সঙ্গে দেখা করতে এলেন। তিনি ঈশ্বরের কৃপার কথা বলতে মাকে বললেন—

"এই চৌদ্দ মাস (নির্ব্বাসনের) যে বিশ্বাস, যে নির্ভর পেয়েছেন, তার বল আপনাকে সে বিপদ সহ্য করবার বল দেবে। আপনার পিতার (রাজনারায়ণ বসুর) যে সাধনা ছিল সে ত তাঁর সঙ্গে সঙ্গে লুপ্ত হয়ে যায় নাই; আপনার ভিতরে বংশ পরম্পরায় সে সাধনার বল থাকবেই। সেই বলই এ সময়ে আপনার কাজে লেগেছে। আমি তো আজ তাই দেখতে এলাম যে আপনারা এই দুঃখকষ্টের ভিতরে কি লাভ করেছেন। এই যে ঈশ্বরের উপলব্ধি লাভ এই বিপদের মধ্যে করেছেন, এ কি আপনাদের কম সৌভাগ্য! যারা সংসার গুছিয়ে ভাবছে যে বেশ আরামে আছি—নিজেদের ভিতরকার দৈন্য বুঝতে পারছে না, তারাই হ'ল দুঃখী। আপনাদের তো খুব সৌভাগ্য যে বিপদের দিনে ঈশ্বরকে বুঝতে পেরেছেন। আমি দেখে তৃপ্ত হলাম, যা আশা করে এসেছিলাম তা পেলাম।"

কথাবার্ত্তার পর রবিবাবুর যাবার আগে আমি কুণ্ঠার সহিত আমার অটোগ্রাফ খাতাখানি তাঁর সামনে ধরলাম, যদি তিনি কিছু লিখে দেন ত খুব সুখী হব। তিনি তখনই খাতাটি নিয়ে লিখলেন—

"আমার সকল দুঃখের প্রদীপ জেলে
দিবস গেলে করব নিবেদন,
আমার ব্যথার পূজা হয় নি সমাপন।"

১৯১৩ সালে বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ নোবেল প্রাইজ পেয়ে

ভারতমাতার মুখ উজ্জ্বল করেন। যেদিন বাংলা দেশে এই খবর এল সেদিন বাংলা দেশে যে উৎসাহ উদ্দীপনার সাড়া জেগেছিল তা বাংলার ইতিহাসে চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবে।

তখন কেহ কেহ প্রস্তাব করলেন যে স্পেশাল ট্রেন-যোগে কলিকাতা থেকে বাঙালীরা বোলপুর গিয়ে কবিকে অভিনন্দন দেবে—সকলেই আনন্দে এ প্রস্তাব অনুমোদন করেন। আমার ভগ্নীপতি শচীন্দ্রপ্রসাদ বসু যাতায়াতের বন্দোবস্ত করবার ভার নিলেন। ঠিক হ'ল যে যাত্রীদের জন্য টিকিট ছাপিয়ে বিক্রী করা হবে। বিক্রয়লব্ধ টাকা অবশ্য ইষ্ট ইণ্ডিয়ান রেল কোম্পানীকে দেওয়া হবে। এই প্রস্তাব নিয়ে যখন শচীনবাবু ইষ্ট ইণ্ডিয়ান রেলের এজেন্ট সাহেবের আপিসে গেলেন তখন এজেন্ট সাহেব বললেন যাত্রীদের ভাড়া ছাড়াও এঞ্জিনের ভাড়া মাইল প্রতি দশ টাকা দিতে হবে। শচীনবাবু এঞ্জিনের ভাড়া দিতে আপত্তি করেন। তখন এজেন্ট বললেন, ইষ্ট ইণ্ডিয়ান রেলের ইতিহাসে কখনও এমন অদ্ভুত প্রস্তাব কেহ করে নাই। তখনই শচীনবাবু উত্তর দিলেন—ভারতবর্ষের ইতিহাসেও আজ পর্য্যন্ত কেহ নোবেল প্রাইজ পান নাই।" মুখের মত জবাব পেয়ে এজেন্ট সাহেব খুশি হয়ে এঞ্জিনের ভাড়া বাদ দেবার অনুমতি দিলেন।

আমরা অনেকে মিলে স্পেশাল ট্রেনে বোলপুরে যাই। সেখানে বিকালে আমরা প্রকাণ্ড আম গাছ তলায় একত্র হই। সেদিনের অনুষ্ঠানে বিজ্ঞানাচার্য্য জগদীশচন্দ্র বসু মহাশয় অভিনন্দন পাঠ করেন। আমরা দুই বোনে গান করি। সেখানে আমরা সাদর অভ্যর্থনা ও যত্ন পেয়েছিলাম।

কলিকাতার ব্রাহ্মবালিকা শিক্ষালয়ে যখন আমি কাজ করি তখন শিক্ষয়িত্রীরা মাসে এক দিন কোন গণ্যমান্য লোককে নিমন্ত্রণ করতেন—তিনি এসে তাঁদের কিছু বলতেন। তাঁকে চীফ গেষ্ট করা হ'ত। একবার ঠিক হ'ল রবিবাবুকে "প্রধান নিমন্ত্রিত ব্যক্তি" চীফ গেষ্ট করে ডাকা হবে। তাঁকে সে কথা জানাবার ও ডাকবার ভার আমার উপর পড়ল। আমি তাঁর বাড়ীতে গিয়ে তাঁর সঙ্গে দেখা করে আমাদের অনুরোধ জানালাম। তিনি সানন্দে স্কুলে আসতে রাজী হলেন।

নির্দিষ্ট সময়ে তিনি স্কুলে এলেন। স্কুলের প্রকাণ্ড হল—মেরী কার্পেণ্টার হলে মেয়েরা সব ও আমরা শিক্ষয়িত্রীরা সম্মিলিত হলাম। লেডী অবলা বসু সেদিন আমাদের সম্মিলনে উপস্থিত ছিলেন। রবিবাবু সেদিন "নারীদের কোমল স্বভাব" বর্ণনা করে একটি সুন্দর উপদেশ দিলেন। তার পরে মেয়েরা আমার কানে কানে বলতে লাগল—"ওঁকে একটা গান করতে বলুন।" মেয়েরা বলতে সাহস পাচ্ছে না কাজেই আমি বললুম—মেয়েরা আপনার গান শুনতে চাচ্ছে—অনুগ্রহ করে যদি একটি গান করেন—কষ্ট হবে না ত?

তিনি হেসে বললেন—না না, কষ্ট হবে কেন? এই বলেই পরিষ্কার গলায় উচ্চ ও মধুর কণ্ঠে গানটি গাইলেন—

তোমার ভুবনজোড়া আসনখানি
আমার হৃদয়মাঝে বিছাও আনি
রাতের তারা, দিনের রবি, আঁধার আলোর সকল ছবি,
তোমার আকাশভরা সকল বাণী,
আমার হৃদয়মাঝে বিছাও আনি।"

আমরা সকলে মুগ্ধ হলাম তাঁর সৌজন্য দেখে। বোর্ডিংয়ের মেয়েদের বহস্তে তৈরি মিষ্টান্ন দিয়ে জলযোগের পর আমাদের সভা ভঙ্গ হ'ল। রবিবাবুর সঙ্গে সঙ্গে গিয়ে তাঁকে গাড়ীতে উঠিয়ে দিয়ে বিদায় নিলাম। ভাবলাম স্কুলের কি সৌভাগ্য—বিশ্বকবির পদধূলি এখানে পড়ল।

১৩৩৭ সালে বালকবালিকাদের প্রাচীনতম মাসিক পত্রিকা 'মুকুল' পরিচালনার ভার আমার উপর পড়ে। মুকুল পত্রিকা সম্পাদনার ভার পেয়ে আমি রবিবাবুকে এ পত্রিকায় লেখা দেবার জন্য বিশেষ ভাবে অনুরোধ করেছিলাম। সে অনুরোধ তিনি এড়াতে পারেন নি। মাসে মাসে মুকুলে কবিতা ও প্রবন্ধ লিখে পাঠিয়েছেন।

এক দিন মুকুলের জন্য একটা গল্প লিখতে অনুরোধ করবার জন্য বরাহনগরে প্রশান্তচন্দ্র মহলানবিশের বাড়ীতে যাই। তিনি তখন সেখানে ছিলেন। গিয়ে দেখি তিনি ইউনিভার্সিটিতে যে বক্তৃতা দেবেন তা লিখছেন—খুবই ব্যস্ত। তবুও দেখা করলেন ও আমার অনুরোধের উত্তরে হেসে বললেন—"বাসন্তি, তোমার হাতে মুকুল আবার তুমিও মুকুল—কি মন্ত্রই যে জান, আদায় না করে ছাড় না—আচ্ছা, মুকুলের জন্য একটা গল্প লিখে দেব। দেখ ছোটদের জন্য লেখা বড় কঠিন, ছোটদের জন্য লিখতে হ'লে ছোটদের মতই হ'তে হয়। তুমি যদি আরও অনেক আগে এই কাগজটা চালাতে তখন অনেক লেখা দিতে পারতাম। এই গল্প দেওয়াই কিন্তু শেষ লেখা হবে, বুঝলে? আর দিতে পারব না।"

আমি হেসে বললাম "শেষ লেখা হবে কেন? আরও দিতে হবে।"

অনেক দিন পরে তিনি মুকুলের জন্য একটি গল্প লিখে পাঠিয়েছিলেন।

তাঁর চরিত্রের একটু বিশেষত্ব এই ছিল যে চিঠি পেলে তার উত্তর দিতেন হাজার কাজের মধ্যেও। এই চমৎকার অভ্যাসটি তাঁকে আমাদের অতি প্রিয় করেছিল। যখনই তাঁর কাছে চিঠি দিয়েছি অবিলম্বে উত্তর পেয়েছি। সামান্য একটা খবর জানবার জন্য একবার তাঁর কাছে চিঠি লিখি।

ফরাসী দেশের বিখ্যাত সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিত অধ্যাপক সিলভাঁ লেভী পত্নীসহ ভারতবর্ষে আসেন। তাঁরা আমার স্বামীর বিশেষ বন্ধু। আমরা তখন পাতিয়ালা রাজ্যে ছিলাম। সিলভাঁ লেভীরা শান্তিনিকেতনে অনেক দিন ছিলেন। তাঁরা কোথায় আছেন জানবার জন্য রবিবাবুর কাছে চিঠি লিখি। তিনি তখনই সে চিঠির উত্তর দেন।

তিনি আমার বিবাহের সময় একটি গান রচনা করে উপহার পাঠিয়েছিলেন—সেটি সেই উৎসবে গীত হয়েছিল—তাঁর লেখা সেই গানটি আমার কাছে আছে। সে গানটি ১৩৫০ সালের জ্যৈষ্ঠ মাসের 'প্রবাসী'তে প্রকাশিত হয়েছিল—গানটি এই—

> তাঁহার অসীম মঙ্গল লোক হতে
> তোমাদের এই হৃদয় বনচ্ছায়ে
> অনন্তেরি পরশ-রসের স্রোতে
> দিয়েছে আজ বসন্ত জাগায়ে।" ইত্যাদি

তার পরে রবীন্দ্রনাথকে কত সভাতে দেখেছি ও তাঁর বৃদ্ধ বয়সেও বক্তৃতা শুনেছি—সে বক্তৃতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সিনেট হল কম্পিত করে দিয়েছিল—সে হলের শেষ প্রান্তের লোকও স্পষ্ট তাঁর কথা শুনতে পেত—তখন মাইক্রোফোনের দরকার হ'ত না। সে দিন—

> "হে মোর চিত্ত পুণ্যতীর্থে
> জাগরে ধীরে
> এই ভারতের মহা মানবের সাগর তীরে।"

এই কবিতাটি কি পরিষ্কার ও মধুর স্বরে অপূর্ব্ব ভাবের সহিত আবৃত্তি করেছিলেন, তা শুনে সকলে মুগ্ধ হয়েছিল। এমন আবৃত্তি কেহ কখন শোনে নাই।

আজ রবীন্দ্রনাথের দেহ ভস্মীভূত হয়েছে কিন্তু তাঁর অমর আত্মার ত বিনাশ নাই। যতকাল বাঙালী জাতি জীবিত থাকবে তাঁকে ভুলতে পারবে না। তাঁর গান, তাঁর সাহিত্য, তাঁর উপদেশ আমাদের জীবনে প্রেরণা দেবে। পৃথিবী হতে আমাদের এই ধূলিধূসরিত মনকে এক দিব্যলোকে নিয়ে গিয়ে পবিত্র আনন্দে প্রাণ উদ্ভাসিত করে দেবে—ঈশ্বরে বিশ্বাসী করবে।

জীবিত কালেও যেমন তিনি কত সম্মান, শ্রদ্ধা ও অকৃত্রিম প্রীতি লাভ করেছিলেন—মরণান্তেও সে সকলের অধিকারী হয়ে আছেন—তিনি এই দরিদ্র অসহায় পরপদানত জাতির গৌরবের বস্তু হয়েছিলেন—চিরকালই থাকবেন।

> "লভিয়া জনম বিশ্বে, তুমি হলে বরণের কবি,
> অমর হইয়া এঁকে গেলে অমরার ছবি,
> তুমি কি ভেবেছ কবি, ছুটি নিয়ে তুমি চলে যাবে?
> সবাকার মন থেকে ছুটি তুমি কভু কি গো পাবে?
> যত দিন ভারতের পুণ্য নাম লুপ্ত নাহি হবে
> যত দিন সবাকার বক্ষে বক্ষে প্রাণবায়ু রবে,
> তত দিন হে কবীন্দ্র সর্ব্বজন নয়নের জলে
> তোমারে স্মরণ করি শ্রদ্ধাঞ্জলি দিবে পদ তলে।"

আজ এই স্মরণীয় পবিত্র দিনে রবীন্দ্রনাথের স্মৃতি আলোচনা করবার সুযোগ পেয়ে রংপুর সারস্বত সাহিত্য-সম্মিলনীর নিকট কৃতজ্ঞ হচ্ছি। আর সূর্য্যের মত ভাস্বর বিশ্ব-কবির চরণে প্রণাম করে আমার মত ক্ষুদ্র নারীর শ্রদ্ধাঞ্জলি অর্পণ করছি।*

* রংপুর সারস্বত সাহিত্য-সম্মিলনীতে বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথের মৃত্যু-বার্ষিকী উপলক্ষে পঠিত।

দ্বীপের মেয়ে

শ্রীগোবিন্দ চক্রবর্ত্তী

খুলে দিয়ে বাতায়ন:
দেখো বেলা-শেষে কোথা দিগন্তে বাদলে ভিজিছে বন—
অথবা মেঘের ভীড়ে
কোথায় ডুবিল উঠি-উঠি তারা হঠাৎ গাঙিনী নীরে;
হঠাৎই যদি তখন
নীল বিজলীর শিহর লাগিয়া হু-হু করে ওঠে মন;
ত্রস্ত দু'হাতে রুধিয়া কপাট সে নীলে শাসন ক'রো।
তা'পর শিয়রে জ্বালিয়া প্রদীপ এ লেখাটি মেলে ধ'রো।

এ শুধু তোমারি তরে:
বিজন প্রাণের পূরবীর বাঁশী নিখিল আকাশ ভ'রে।
মধুর পুলকে সহসা উথলি হয়ত' অবাক হবে
চিরনিঠুর কি ফিরে এলো বুঝি কাঙ্ক্ষিত পরাভবে?
করো না অমন ভুল।
এ হৃদয় জেনো বিফল উজানে কভু নয় অনুকূল!

যে-কথা বলিতে চাই:
আপনারে শুধু ভালবাস তুমি আর কা'রে বাসো নাই।

যে আমার লাগি কাঁদিয়া কাঁদিয়া বহু নিশি করো ক্ষয়:
যে-আমারে স্মরি শত-বঞ্চিতা মনে মানো পরাজয়—
কম্পিত থরো থরো
যে-বেদনখানি গড়ো;
ভেবো না সে তব প্রেম।
সে শুধু বিলাসে ঘষিয়া-মাজিয়া তামারে করিছ হেম।

তুমি গো দ্বীপের মেয়ে।
চিরকাল ওই নিশ্বাস হারাবে সাগরের পানে চেয়ে।
একটুকু ঢেউয়ে যেমনি নড়িবে কোনোদিকে কোনো তীর:
নব তনুমন পলকে ধুলায় লুটে হবে অস্থির।
তা'পর উঠিয়া আঁচল ঝাড়িয়া চেনা সে' বেড়াটি ধ'রে—
পুরাণো মায়ায় মেলিবে আবার নিজেরে নূতন ক'রে।
তোমার নিয়তি এই:
এক দ্বীপ হ'তে আর দ্বীপে যাবে তার বেশী কিছু নেই।

মরম শাসন ক'রো।
পড়া শেষ হলে যতনে এ লেখা প্রদীপে ডুবিয়া ধ'রো।
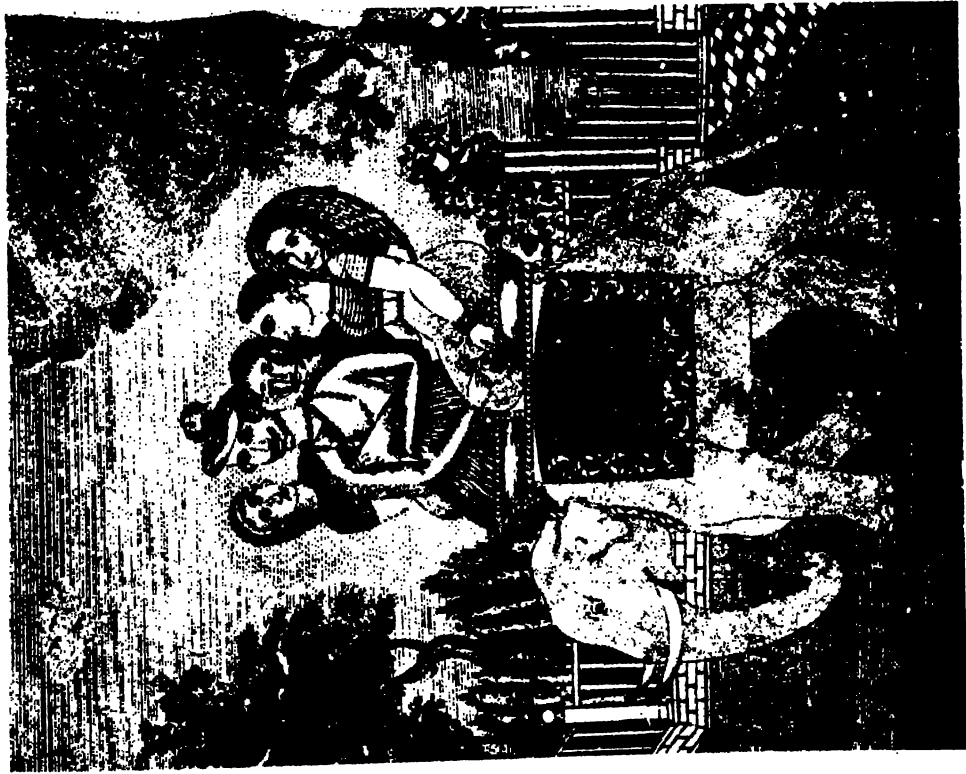
রাগ দীপক — শিল্পী :—রামচাঁদ রায়, ইং ১৮১৮

রাগ ভৈরব — শিল্পী :—রামচাঁদ রায়, ইং ১৮১৮

সুন্দরের বর্দ্ধমান প্রবেশ

শিল্পী : রামচাঁদ রায়, ইং ১৮১৮

ভগীরথ ও গঙ্গা

শিল্পী : বিশ্বম্ভর আচার্য্য, ইং ১৮২৪

বাংলার প্রাচীন ধাতু-খোদাই চিত্র

শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে বাংলা দেশে যখন মুদ্রিত পুস্তকের ব্যাপকভাবে প্রচলন সুরু হইল, তখন স্বভাবতঃই কোন কোন পুস্তক চিত্র-শোভিত করিয়া বাহির করিবার বাসনা উত্তোগী দুই-চারি জন প্রকাশকের হইয়াছিল। চিত্র-প্রতিলিপি প্রকাশের বিশেষ সুবিধা তখন বাংলাদেশে ছিল না। ষ্টীল বা কপার-প্লেট এনগ্রেভিং ইউরোপে সে-কালে বহুল প্রচারিত ছিল। এদেশে শিল্পীরাও অপেক্ষাকৃত সহজ ধাতু ও কাঠ খোদাই শিল্পেরই আশ্রয় লইয়াছিলেন। আমি ঊনবিংশ শতাব্দীর বাংলাদেশ ও বাংলা-সাহিত্য লইয়া কাজ করিতে করিতে সে-কালের কতকগুলি চিত্রিত পুস্তকের সন্ধান পাইয়াছি। এগুলিতে কাঠ এবং ধাতু উভয় ধরণের খোদাই-চিত্রই আছে। কাঠ-খোদাই চিত্রের নিদর্শন আমি ইতিপূর্ব্বে 'সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা'য় (৪৬শ বর্ষ, ২য় সংখ্যা) একটি প্রবন্ধে দিয়াছি। বর্ত্তমান প্রবন্ধে সে-যুগের কয়েকটি ধাতু-খোদাই-চিত্রের নমুনা উপস্থিত করিতেছি। এই চিত্র এবং চিত্রিত পুস্তকগুলি অত্যন্ত দুষ্প্রাপ্য, এগুলি দেখিবার সুযোগ সকলের ঘটিবে না। এই প্রতিলিপিগুলি হইতে পাঠক সে-যুগের বাঙালী শিল্পীদের শিল্পকর্ম্মের কিছু পরিচয় পাইবেন। শিল্পসৃষ্টির নিদর্শন হিসাবে এগুলির মূল্য খুব অধিক বিবেচিত না হইলেও ইতিহাসের দিক্ দিয়া এগুলির মূল্য অস্বীকার করা যায় না।

দশভুজা শিল্পী: বিশ্বম্ভর আচার্য্য, ইং ১৮২৪

সে-যুগের ধাতু-খোদাই-শিল্পীদের মধ্যে বিশেষভাবে রামচাঁদ রায়, বিশ্বম্ভর আচার্য্য, রামধন স্বর্ণকার, মাধবচন্দ্র দাস, রূপচাঁদ আচার্য্য, রামসাগর চক্রবর্ত্তী, বীরচন্দ্র দত্ত ও কাশীনাথ মিস্ত্রীর নাম পাওয়া যায়। ইঁহারা কাঠ-খোদাই শিল্পেও দক্ষ ছিলেন। বাঙালী শিল্পীদের কেহ কেহ বৈদেশিকের নিকট হইতে এই শিল্প বিষয়ে প্রাথমিক শিক্ষা লাভ করিয়া থাকিবেন।*

* কলিকাতা স্কুল-বুক সোসাইটির দ্বিতীয় বার্ষিক (১৮১৮-১৯) বিবরণের ২০ পৃষ্ঠার প্রকাশ :—

Joyce's Dialogues on Mechanics and Astronomy.... The highly creditable execution of the plates by a native artist, Casheenath Mistree, deserves particular mention, as evincing the progress already made by the natives in the elegant and useful art of engraving on copper. That art they owe to the efforts of a member of this Society, some of whose friends expressed to him how groundless

নারদ ও শিব ইং ১৮২৪

দেশীয় শিল্পীর হস্তাঙ্কিত চিত্রশোভিত প্রাচীনতম যে পুস্তকের সন্ধান আমরা পাইয়াছি, তাহা প্রথম বাঙালী সাংবাদিক গঙ্গাকিশোর ভট্টাচার্য্য-প্রকাশিত ভারতচন্দ্রের 'অন্নদামঙ্গলে'র সংস্করণ। এই পুস্তক ১৮১৬ খ্রীষ্টাব্দে কলিকাতায় মুদ্রিত হয়। ইহাতে কাঠ ও ধাতু-খোদিত ছয়খানি চিত্র আছে। এখন পর্য্যন্ত যত দূর জানা গিয়াছে, তাহাতে এইটিই সর্ব্বপ্রথম বাংলা সচিত্র পুস্তক।

এই প্রবন্ধে গঙ্গাকিশোরের 'অন্নদামঙ্গল' ছাড়া নিম্নলিখিত পুস্তকগুলি হইতে চিত্র সংগৃহীত হইয়াছে:—

১। 'গৌরীবিলাস'—হরিনাভি-নিবাসী রামচন্দ্র তর্কালঙ্কার রচিত ও ১৮২৪ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত। ইহাতে দুইখানি কাঠ-খোদাই ও চারখানি ধাতু-খোদাই চিত্র আছে। বিশ্বম্ভর আচার্য্য-কৃত দশভুজার ধাতু-খোদাই চিত্রখানি এই পুস্তক হইতে গৃহীত।

২। 'সঙ্গীততরঙ্গ'—রাধামোহন সেন দাস-রচিত ও ১৮১৮ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত। ইহাতে মুদ্রিত রামচাঁদ রায়-কৃত ছয়খানি ধাতু-খোদাই চিত্রের মধ্যে আমরা "রাগ ভৈরব" ও "দীপক রাগ"-এর প্রতিলিপি দিয়াছি। চিত্র দুইখানির বর্ণনা পুস্তকে এইরূপ দেওয়া আছে:—

ভৈরব রাগের ধ্যান ও ধারা

জয় রে। আদিরাগ শিবের বেশ।
শিব অবয়ব গুণে বিশেষ।
ভুজঙ্গনিন্দিত শিরেতে জটা।
জটায় বেড়িয়া ভুজঙ্গঘটা।
হিল্লোল কল্লোল তরঙ্গ যার।
ঝর ঝর গঙ্গা ঝরিছে তার।
ভালশোভা হরিতাল তিলকে।
সুধাংশুকলা কপালফলকে।
আসন বসন বাঘের ছালা।
ঝলমল দোলে মুণ্ডের মালা।
কোটি শশধর জিনিয়া কায়।
তাহাতে বিভূতি কলঙ্ক প্রায়।
বৃষভ বাহন করে ত্রিশূল।
অখিল ভাব ঢুলু ঢুলু ঢুল। (পৃ. ১১০-১১)

দীপক রাগের ধ্যান

পরম যুবক পরিধান রক্তবাস।

---

was the idea of proficiency in engraving being ever attainable by a native. The result is one of the numerous facts that should enlarge the hopes of those who labor for the improvement of the inhabitants of this country, and for the introduction here of the ingenious arts of

বিক্রম সেনের রাজসভায় শাস্ত্র-বিচার শিল্পী : মাধবচন্দ্র দাস, ইং ১৮২৫

তরুণ তরুণীগণ সঙ্গে রসরঙ্গে।
আরোহণ করি এক প্রমত্ত মাতঙ্গে॥
যামিনীতে ভ্রমণ পর্ব্বতসন্নিধানে।
সবাই আপনি মগ্ন আপনার গানে॥
গানের প্রভাবে মূর্ত্তিমান হুতাশন।
হুতাশনে পুড়ে পর্ব্বতের তরুগণ॥
হুহুঃ শব্দে জ্বলে অগ্নি দাবানল প্রায়।
ভ্রমণে সুগম পথ আলো করে তায়॥ (পৃ. ২১৩-১৪)

৩। 'গঙ্গাভক্তিতরঙ্গিণী'—উলা-নিবাসী দুর্গাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় রচিত ও ১২৩১ সালে (ইং ১৮২৪) প্রকাশিত। বিশ্বম্ভর আচার্য্য-কৃত "ভগীরথ গঙ্গা" চিত্রখানি এই পুস্তক হইতে গৃহীত।

৪। 'ভগবতী গীতা'—রামরত্ন ন্যায়পঞ্চানন কর্ত্তৃক ভাষা-পদ্যে রচিত ও ১২৩১ সালে (ইং ১৮২৪) প্রকাশিত। "নারদ ও শিব" চিত্রখানি এই পুস্তক হইতে গৃহীত।

৫। গুপ্তপল্লী-নিবাসী চিরঞ্জীব শর্ম্মা-রচিত 'বিদ্বন্মোদতরঙ্গিণী'র রাধামোহন সেন দাস-কৃত পদ্যানুবাদ, ১২৩২ সালে (ইং ১৮২৫) প্রকাশিত। ইহাতে "বৈষ্ণব শৈব শাক্ত হরিহরাদ্বৈতবাদী নৈয়ায়িক মীমাংসক বৈদান্তিক পৌরাণিক আলঙ্কারিক সাংখ্য পাতঞ্জলিক প্রভৃতির সভায় আগমন এবং ব্রহ্ম নিরূপণার্থে তাঁহারদিগের বিচার এবং তাহার মীমাংসা ইত্যাদি আছে।" মাধবচন্দ্র দাস-খোদিত "বিক্রম সেনের রাজসভায় শাস্ত্র-বিচার" চিত্রখানি এই পুস্তক হইতে গৃহীত।

এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন, সে-যুগের আরও অনেক পুস্তকে দেশীয় শিল্পীদের কৃত ধাতু-খোদাই চিত্রের নিদর্শন পাওয়া যায়। কৌতূহলী পাঠকের জন্য আমি এরূপ কয়েকখানি পুস্তকের নির্দ্দেশ দিতেছি; এগুলি বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদ্-গ্রন্থাগার ও রাজা রাধাকান্ত দেবের পারিবারিক গ্রন্থাগারে আছে :—

১। 'বত্রিশ সিংহাসন'—ভাষা-পদ্যে রচিত ও ১৮২৪ খ্রীষ্টাব্দে বিশ্বনাথ দেবের ছাপাখানায় মুদ্রিত। ইহাতে "শ্রীযুক্ত রাজা বিক্রমাদিত্যের নবরত্ন সভা" ও "বত্রিশ সিংহাসন" নামে বিশ্বম্ভর আচার্য্য-কৃত দুইখানি ধাতু-খোদাই চিত্র আছে।

২। 'আনন্দলহরী'—হরিনাভি-নিবাসী রামচন্দ্র বিদ্যালঙ্কার-কৃত সাধু ভাষা সংগ্রহ, ১৮২৪ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত। ইহাতে "শ্রীরাজরাজেশ্বরী" নামে রূপচাঁদ আচার্য্যের একখানি ধাতু-খোদাই চিত্র আছে।

৩। 'অন্নদামঙ্গল'—১৮২৮ খ্রীষ্টাব্দে শেয়ালদহ পীতাম্বর সেনের যন্ত্রালয়ে মুদ্রিত। ইহাতে ১০ খানি ধাতু-খোদাই চিত্র আছে। এগুলি বীরচন্দ্র দত্ত, রূপচাঁদ আচার্য্য, রামধন স্বর্ণকার ও রামসাগর চক্রবর্ত্তী কর্ত্তৃক খোদিত।

৪। 'হরিহরমঙ্গল সংগীত'—বর্দ্ধমানাধিপতি তেজচন্দ্রের আদেশে দেওয়ান পরাণচন্দ্র বা প্রাণচন্দ্র বাবু কর্ত্তৃক রচিত। ইহা গত শতাব্দীর তৃতীয় দশকে প্রকাশিত হয়। ইহাতে রামধন স্বর্ণকারের খোদিত ৭১ খানি ধাতু-খোদাই চিত্র আছে।

আধুনিক আরবী সাহিত্যের ধারা

অধ্যাপক এ. বি. মোহাম্মদ সুলতানুল আলম চৌধুরী

১৭৯৮ খ্রীষ্টাব্দে ফরাসী আক্রমণের পর হইতে মিশরের সামাজিক ও জাতীয় জীবনে আধুনিকতা ও নূতনত্বের স্রোত প্রবাহিত হইয়াছে। প্রাচ্য ও প্রতীচ্য ভাবধারার অপূর্ব্ব সম্মিলনে জাতির চিন্তাধারা এবং মন ও মস্তিষ্ক কত দূর আন্দোলিত ও প্রভাবান্বিত হইয়াছিল তাহা উত্তরকালীন আরবী সাহিত্যের বিবর্ত্তনের মধ্য দিয়া অধিকতর সুস্পষ্ট ও মূর্ত হইয়া উঠিয়াছে। এই বিবর্ত্তনের পশ্চাতে রহিয়াছে মহামতি মোহাম্মদ আলী পাশা, শহিক ইয়াযেজী, বুতরুছ আল বুস্তানী, তাহতাভী, আবদুল্লা পাশা ফিকরী ও আলি মোবারক পাশা প্রমুখ নেতৃবৃন্দ ও চিন্তানায়কদের অক্লান্ত শিক্ষা-সাধনা ও প্রচেষ্টা। ইউরোপীয় আদর্শে স্থাপিত শিক্ষানিকেতন, আধুনিক রুচিসম্মত পুস্তক প্রণয়ন ও ছাপাখানার প্রতিষ্ঠা যেমন মিশরে আধুনিকতার সূচনা করিয়াছে তদ্রূপ তথাকার সাংবাদিকতা এই আধুনিকতার জয়যাত্রাকে অধিকতর দ্রুত ও বেগবতী করিয়া তুলিয়াছে। ১৮২৮ খ্রীষ্টাব্দে সর্ব্বপ্রথম মোহাম্মদ আলি পাশা 'আল ওয়াকায়েউল মিছ্‌রিয়া' পত্রিকার প্রতিষ্ঠা করেন। পরবর্ত্তী যুগে মিশরের রাজনৈতিক ও সমাজনৈতিক আবর্ত্তন ও আল বকৃলী পাশা, ইব্রাহিম আদ্‌ দাহোকী, শেখ আলি ইউসুফ, সৈয়দ জামালুদ্দিন আফগানী ও শেখ মোহাম্মদ আবদুহ প্রমুখ মনীষিবৃন্দের সাধনা ও যত্ন আরবী সাংবাদিকতার ইতিহাসে যুগান্তর আনয়ন করিয়াছে। ১৯১৪ খ্রীষ্টাব্দে যে মিশরে মাত্র চার কি পাঁচ হাজার পত্রিকা প্রকাশিত হইত আজ সেখানে তার সংখ্যা দাঁড়াইয়াছে পঞ্চাশ হাজারেরও ঊর্দ্ধে*। পত্রিকার প্রচার ও প্রবহণ সমভাবেই বিস্তৃত ও প্রসারিত হইয়াছে।

সাংবাদিকতার এই অস্বাভাবিক উন্নতি ও বিস্তৃতি আপামরসাধারণকে ইউরোপীয় সভ্যতা ও সংস্কৃতির সংস্রবে আনিয়া দেশের জীবন ও চিন্তাধারায় নূতনত্বের বিপ্লবস্রোত প্রবাহিত করিয়া দিয়াছে। যে ছান্দিক গদ্য এত দিন আরবী সাহিত্যের শ্রেষ্ঠতম বাহন রূপে পরিগণিত হইত তাহা এখন অনেক স্থলে ভাবাতত্ত্ব, ব্যাকরণ ও অলঙ্কারের প্রভাবমুক্ত হইয়া সহজ, সরল ও সর্ব্ববোধগম্য গদ্যে পরিণত হইয়াছে, এবং বিদেশী শব্দ, কষ্টকল্পিত উপমা ও রুদ্ধ ভাষা আজ আরবী সাহিত্যের অঙ্গসৌষ্ঠব বৃদ্ধি করিয়াছে।

প্রতিক্রিয়া ও বিভিন্ন মত

আরবী ভাষার চিরাচরিত নীতির ব্যতিক্রম, ভাষার দ্রুত পরিবর্ত্তন ও বিরোধী মতবাদ ও সংস্কৃতির সংঘর্ষের ফলে আজহার বিশ্ববিদ্যালয়ের পুরাতনপন্থী মনীষিবৃন্দ বিচলিত ও চঞ্চল হইয়া উঠিলেন। তাঁহারা ইউরোপীয় ভাবাপন্ন নূতন পন্থীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করিলেন, এবং পুরাতন আরবী ভাষাকে সঞ্জীবিত করিয়া জনসাধারণের গ্রহণোপযোগী করিয়া তুলিতে চাহিলেন। নূতন পন্থীরাও পূর্ণোদ্যমে সংগ্রামে অবতীর্ণ হইলেন। উভয় পক্ষই চাহিলেন দেশের জনমত ও শুভেচ্ছা লাভ করিতে; তাঁহাদের বাদানুবাদ, তর্কবিতর্ক ও সমালোচনার ফলে দেশের সুপ্ত শক্তি জাগিয়া উঠিল এবং সাহিত্য-সাধনার মহা-কলরবে দিগ্‌দিগন্ত আবার মুখরিত হইয়া উঠিল। পুরাতনপন্থীদের শত প্রচেষ্টা সত্ত্বেও ভাষার মধ্যে পরিবর্ত্তন আসিয়া পড়িল, তদানীন্তন পত্রিকাসমূহ যথা, আল উরওয়াতুল উছ্‌কা, আল-মোকতাতফ, আল হেলাল এবং আল মনার প্রভৃতি পাঠে তাহা সহজেই অনুভূত হয়। এই সব পত্রিকার লেখকবৃন্দ আরবীর ব্যাকরণ ও চিরাচরিত নীতি অনুসরণ করিলেও, ছান্দিক গদ্যের শৃঙ্খল হইতে আরবী ভাষাকে অনেকটা মুক্ত করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন।

আরবী ভাষার এই পরিবর্ত্তনের পশ্চাতে শেখ আবদুহর প্রভাব ও দান রহিয়াছে অপরিমেয়। তাঁহার স্বপ্ন ছিল মিশরবাসীদের মন ও মস্তিষ্ককে অতীতের সংস্কার মুক্ত করতঃ ইসলামিক কৃষ্টি এবং আধুনিক বিজ্ঞানের সংযোগ ও সমন্বয় সাধন করা। এই প্রচেষ্টার বাহনরূপে তিনি যে ভাষা গ্রহণ করিলেন, তাহাও হইল অনেকাংশে অতীতের সংস্কারমুক্ত, সরল ও সর্ব্বজনবোধগম্য। তিনি ইহাও সম্ভবপর করিয়া দেখাইলেন যে, আরবী সাহিত্য ও ইসলামী শিক্ষা বিজ্ঞান অতীত সংস্কার ও সংস্কৃতির সহিত সম্বন্ধ ছিন্ন না করিয়াও আধুনিকতার সহিত সমান ভাবে পা ফেলিয়া চলিতে পারে।*

শেখ আবদুহর আহ্বানে দেশের তদানীন্তন সুধীবৃন্দ তাঁহার পতাকাতলে জমায়েত হইলেন এবং তাঁহারই আদর্শে অনুপ্রাণিত হইয়া এক সাহিত্য-সঙ্ঘ গড়িয়া তুলিলেন। তাঁহারা পুরাতন পন্থী শেখ এবং নূতন পন্থী আফেন্দীদের চরম পথ ও নীতিগুলি পরিত্যাগ করতঃ মধ্য পন্থাই অবলম্বন করিলেন। ১৯০৭ খ্রীষ্টাব্দে সৈয়দ আহমদ লুতফীর সম্পাদনায় এই দলের মুখপত্র আল জরিদা পত্রিকা প্রকাশিত হয়। তাঁহাদের উদ্দেশ্য ছিল শিক্ষা, চরিত্র-গঠন ও স্বাধীনতার বাণী প্রচারের দ্বারা মিশরের জীবন গঠন করা এবং সঙ্গে সঙ্গে ইসলামিক সংস্কৃতির সঙ্গে সম্বন্ধ ছিন্ন না করিয়া দেশের সাহিত্য, রাজনীতি ও সমাজনীতিতে পাশ্চাত্য সভ্যতার বীজ বপন করতঃ জাতির জন-

* আল-ওয়াহেদ, পৃ. ৩২৮—৩৩৩।

* *Islamic Culture*, July 1941, p. 319-320.

ধারাকে শ্রীমণ্ডিত ও শক্তিযুক্ত করিয়া তোলা।* ১৯১৪ খ্রীষ্টাব্দে রাজনৈতিক কারণবশতঃ আল জরিদা পত্রিকার প্রচার বন্ধ হইয়া গেলেও, তাহার প্রচেষ্টা বিফল হয় নাই,—তাহারই কল্যাণে আরবী ভাষা এক সর্ব্ববাদিসম্মত নূতন রূপ পরিগ্রহ করিল, যাহা উত্তর কালে আরবী সাংবাদিক জীবনের সর্ব্বত্রই সমাদৃত হইয়াছে।

অধুনা প্রতিষ্ঠিত মিশরের ফোয়াদ আউয়াল বিশ্ববিদ্যালয়ও আরবী ভাষার সংস্কার ও আধুনিকতার প্রভাব বিস্তারে যথেষ্ট সহায়তা করিয়াছে। ১৯২২ খ্রীষ্টাব্দে ডক্টর মোহাম্মদ হোসেন হায়কলের সম্পাদনায় 'আছ ছিয়াছত' পত্রিকা প্রকাশিত হয়; তাহার কল্যাণে মিশরে আধুনিকতা ও জাতীয়তার শক্তি সর্ব্বতোভাবে শক্তিশালী ও বর্দ্ধিত হইয়াছে। দেশের তদানীন্তন মনীষী ও সুধীবৃন্দ—যাঁহারা আছ্ ছিয়াছত পত্রিকাকে কেন্দ্র করিয়া সাহিত্যসেবায় অবতীর্ণ হইয়াছিলেন তাঁহারা সাহিত্যিক সমালোচনা ও আরবী ভাষার ইতিহাসের প্রতিই অধিকতর গুরুত্ব আরোপ করিয়া গিয়াছেন। এই নূতন পন্থী পণ্ডিতরাও দুইটি স্বতন্ত্র ও বিভিন্নমুখী পথ ধরিয়া চলিয়াছেন—একাধারে ডক্টর মনসুর ফাহ্মী, অধ্যাপক আহমদ আমিন ও মোস্তফা আবদুর রাজেক প্রমুখ পণ্ডিতবৃন্দ বিশ্বাস করেন যে অতীতের বৈশিষ্ট্যময় ইসলামিক সংস্কৃতির অনিষ্ট সাধন না করিয়াও আরবী সাহিত্য পাশ্চাত্যের বিরাট সাহিত্য-ভাণ্ডার হইতে প্রেরণা লাভ করিতে পারে। প্রসিদ্ধ সাহিত্যিক আব্বাস মাহমুদ আল আক্কাদ এবং খ্যাতনামা কবি ও ঔপন্যাসিক আবদুল কাদের আল মাজেনীও এই মতেরই অনুগামী। অপর পক্ষে ডক্টর তাহা হোসেন আধুনিকতার চরম নীতিরই অনুসরণ করিয়া চলিয়াছেন। তিনি চান আরবী সাহিত্যের সমালোচনায় বৈজ্ঞানিক ও ইউরোপীয় নীতির প্রবর্ত্তন করিতে। তিনি বলেন আরবী সাহিত্য সম্বন্ধে প্রাচীন পণ্ডিত ও সমালোচকদের অভিমতকে বিজ্ঞানের রশ্মালোকে পরীক্ষা না করিয়া অন্ধ ভাবে মানিয়া লইবার কোন যুক্তিসঙ্গত কারণ নাই। জীবতত্ত্ববিদ্ ও উদ্ভিদতত্ত্ববিদ্ পণ্ডিতগণ সমালোচনায় যে বৈজ্ঞানিক মানদণ্ড গ্রহণ করিয়াছেন, তাহাকে নির্ভীক ও নির্বিকার চিত্তে আরবী সাহিত্যের সমালোচনায় প্রবর্ত্তন করিতে হইবে।* তার জন্য চাই ধর্ম্মীয় ও সামাজিক সংস্কারমুক্ত, পক্ষপাতশূন্য শুদ্ধ মন। তদীয় প্রসিদ্ধ আল আদাবুল জাহেলী বা 'প্রাক্-ইসলামিক যুগীয় সাহিত্য' গ্রন্থে প্রমাণ করিয়াছেন যে প্রাক্-ইসলামিক সাহিত্যের নামে যে সাহিত্য আজ সর্ব্বত্র প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে তার অধিকাংশই অলীক ও ইসলামিক যুগে রচিত। চতুর্দ্দিকে এই পুস্তকের বিরুদ্ধে কঠোর মন্তব্য ও তীব্র সমালোচনা চলিতে লাগিল, কিন্তু শত বাধা-বিঘ্নের ভিতর দিয়াও তিনি আরবী সাহিত্য সমালোচনার মাপকাঠিতে অতীতের সংস্কারমুক্ত করিতে সচেষ্ট হইলেন। আছ্ ছিয়াছত পত্রিকার 'হাদিসুল আরবাআ' বা বুধবারের আলোচনা শীর্ষক স্তম্ভে তাঁহার সমালোচনামূলক প্রবন্ধাদি অনেক দিন ধরিয়া প্রকাশিত হইয়াছে, তন্মধ্যে তিনি উমিয়া এবং আব্বাসীয় যুগের প্রসিদ্ধ কবিবৃন্দের যথা আবু নওয়াছ, বশ্শার বিন বুরদ, মুতী বিন আয়াছ প্রভৃতির কবিতার বিভিন্ন দিক লইয়া বৈজ্ঞানিক ও স্বাধীন ভাবে আলোচনা করিয়াছেন।

যাহাই হউক ১৮৮২ হইতে এ যাবৎ মিশরে বিভিন্ন সামাজিক ও রাজনৈতিক পরিবর্ত্তনের ফলে আরবী সাহিত্যে ইউরোপীয় সভ্যতার প্রভাব সন্দেহাতীত ভাবে প্রতিষ্ঠিত হইয়া গিয়াছে।

আধুনিক আরবী কবিতা

আধুনিক আরবী কবিতার আধুনিকতা ও অভিনবত্ব তার ভাবধারা, বিষয়বস্তু ও দৃষ্টিভঙ্গীর মধ্যেই নিহিত রহিয়াছে, ছন্দ এবং গঠনের দিক দিয়া তাহা এখনও আব্বাসীয় যুগের প্রভাব মুক্ত হইতে পারে নাই। কবি আহমদ শওকীর সৃষ্টিমুখী প্রতিভার কল্যাণে কয়েকটি নূতন ছন্দের আবির্ভাব হইলেও তাহা পুরাতন ছন্দের সংস্কার বই কিছুই নয়। মিশরে থিয়েটার, ফিল্ম কোম্পানী ও বেতার-কেন্দ্র স্থাপিত হওয়ার ফলে জজল বা লোক-কবিতার প্রসার বৃদ্ধি পাইয়াছে সত্য, কিন্তু তাহা এখনও সাহিত্যের পর্য্যায়ে উন্নীত হয় নাই। পরলোকগত কবি আহমদ শওকী এবং হাফেজ ইব্রাহিম আধুনিক আরবী সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ কবি। তাঁহাদের সুদূর-প্রসারী দৃষ্টিভঙ্গী ও মিশরের অতীত গৌরবকাহিনী বর্ণনার ফলে দিগ্বিদিকে আজ জাতীয়তা ও স্বদেশপ্রেমের স্রোত প্রবাহিত হইয়াছে। এতৎসত্ত্বেও শওকী এবং হাফেজের মধ্যে মূলগত পার্থক্য রহিয়াছে;—আনন্দ এবং গৌরবের দিকটা যেমন শওকীর মধ্যে অধিক প্রকট হইয়াছে তদ্রূপ ব্যথা এবং বেদনার দিকটা হাফেজের কবিতার মধ্যে অধিকতর লীলায়িত হইয়াছে। এই প্রসঙ্গে শওকী এবং হাফেজের কবিতা হইতে দুইটি উদাহরণ উদ্ধৃত করা সম্ভবতঃ অপ্রাসঙ্গিক হইবে না। শওকী বসন্তের প্রশংসা করিয়া বলিতেছেন:—

আজারু আকবালা কুম্ বেনা এয়া ছাহি,
'হায়্যির রবিআ হাদিকাতাল আরওয়াহি।
এজমা নাদামাজ জয়কে তাহতা লেহয়াহিহি
ওয়ানজম বে ছাহাতিহি বেছাতার্ রাহি।

"মার্চ্চ মাস আসিয়াছে, হে বন্ধু এস এবং জীবনের আনন্দোদ্যান বসন্তের অভ্যর্থনা কর। আনন্দের সুরাসেবী

---

* Islam and Modernism in Egypt by C. C. Adam, p 224.

* আল আদাবুল জাহেলী ১-৫৭ পৃঃ

সকলকে তাহার পতাকাতলে জমায়েৎ কর এবং তাহার শ্যামল প্রাঙ্গণে আনন্দ শয্যা বিছৃত কর।"

হাফেজ তাঁহার অন্যতম শ্রেষ্ঠ কবিতা শেখ আবছহর শোক-গাথায় বলিতেছেন :

বাকাশ্‌ শারকু কার তাজজাত লাহল আরছ-
রাজজাতাম
ওয়া কাদাত উমুমুল কাওনে বিল আবারাতি।
ফাফিল হিন্দে মাহজুহন, ওয়াফিছ্‌ ছীনে জাজেউন
ওয়াফিমিছরা বাকিন্‌ দায়েমুল হাছারাতি।
ওয়াফিশ্‌ শামে মাফ্‌জুউন্‌, ওয়াফিল ফুরছে নাদেবুন,
ওয়াফি তু'নাছা মা শেয়তা মিন ছাফারাতি।

"প্রাচ্য আজ গভীর শোকে ক্রন্দন করিতেছে, তাহার শোকে সমস্ত জগৎ প্রকম্পিত এবং সমস্ত সৃষ্ট জগতের চক্ষু অশ্রু-ভারাক্রান্ত। ভারতেও শোকের ছায়াপাত হইয়াছে, চীনেও দুঃখের স্রোত প্রবাহিত হইয়াছে, এবং মিশরের ঘরে ঘরে চিরন্তন দুঃখ গুমরিয়া কাঁদিতেছে। সিরিয়া আজ বেদনাবিধুর, পারস্য আজ শোকগাথায় মত্ত এবং তিউনিসের দিকে দিকে আজ করুন হা-হুতাশ।"

যাহাই হউক, শওকী এবং হাফেজ মিশরের জাতীয় জীবনের গৌরবগাথা গাহিয়া সমস্ত দেশ এবং জাতিকে অতীতের মহিমায় উদ্বুদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। এতৎসত্ত্বেও তাঁহারা সম্পূর্ণ ভাবে আধুনিক নহেন। ডক্টর মোহাম্মদ হোছেন হায়কলের মতে শওকীর কবিতায় ইছলামিক এবং পাশ্চাত্ত্য দর্শনের অপূর্ব্ব সম্মিলন ঘটিয়াছে।১ কিন্তু ডক্টর তা'হা হোসেন এই মতের ঘোর বিরোধী। তিনি হাফেজ এবং শওকী উভয়কেই মধ্যযুগীয় কবিদের মধ্যেই গণনা করেন এবং বলেন যে বর্ত্তমান-কালের কবিরা না অতীতের আইন কানুন বিশ্বস্তসূত্রে মানিয়া চলিয়াছেন, না বর্ত্তমানের। তাঁহাদের পূর্ণ ভাষাজ্ঞান ও মানসিক সক্রিয়তার অভাব বর্ত্তমান আরবী কবিতার নিষ্ক্রিয়তার জন্য সর্ব্বতোভাবে দায়ী।২ তাঁহারা মিশরের জাতীয় জীবনের আশা-আকাঙ্ক্ষার ব্যাখ্যা করিলেও, পাশ্চাত্ত্য আধুনিক মহাকবিদের মত জগৎকে কোন স্মরণীয় বাণী দিয়া যাইতে পারেন নাই। জনসাধারণের জীবনধারাকে তাঁহারা পরিচালিত করিতে পারেন নাই, বরঞ্চ জনসাধারণ কর্ত্তৃক তাঁহারা পরিচালিত হইয়াছেন।৩ তবুও তাঁহাদের সাধনা ও ত্যাগ ভবিষ্যৎ কবিদের যাত্রাপথকে অধিকতর প্রশস্ত ও সুগম করিয়া দিয়াছে। পাশ্চাত্ত্য শিক্ষা ও সংস্কৃতির প্রভাবে আরবী কবিতার নূতনত্ব ও আধুনিকতার ধারা দ্রুত গতিতে প্রবাহিত হইয়াছে; মধ্যযুগের গতানুগতিক প্রথা সম্পূর্ণরূপে পরিত্যক্ত না হইলেও কবিতার স্বরূপ, বিষয়বস্তু ও সীমারেখার দিক দিয়া আধুনিক কবিতা সম্পূর্ণরূপেই আধুনিক।

১। আশ্‌ শওকীয়াত, ১ম খণ্ড, ভূমিকা।
২। হাফেজ্ব ওয়াশওকী, ২৫, ১৪০, ১৪১ পৃঃ।
৩। *Islamic Culture*, July, 1941. P. 323.

উপন্যাস ও কথা-সাহিত্য

আরবী সাহিত্যের আধুনিকতা কবিতার চেয়ে উপন্যাস ও কথা-সাহিত্যের মধ্যেই অধিকতর সুস্পষ্ট। আরবী কথা-সাহিত্য অনেক দিন ঐতিহাসিক উপন্যাস ও ইউরোপীয় ভাষার জনপ্রিয়-উপন্যাস অনুবাদেই সীমাবদ্ধ ছিল, কিন্তু পরবর্ত্তীকালে সাংবাদিকতার প্রসার ও জনপ্রিয়তা কথা-সাহিত্যের অনুশীলনকে সার্ব্বজনীন করিয়া তুলিয়াছে। প্রথমতঃ ইউরোপীয় ভাষার প্রসিদ্ধ কতিপয় উপন্যাস আরবী কথা-সাহিত্যের আদর্শ ও মানদণ্ড হিসাবে গৃহীত হইল এবং সেই আদর্শকে ভিত্তি করিয়া আরবী কথা-সাহিত্যের ক্রমবিবর্ত্তন চলিতে লাগিল। মনফলূতী, আজ-জায়য়াত এবং আল-মাজেনী প্রমুখ মনীষিবৃন্দ যথাক্রমে তাঁহাদের 'আল-আব্‌রাত' 'রফা-ইল' এবং 'ইবছুত-তবীয়া' প্রভৃতি অনূদিত গ্রন্থাবলীতে বিদেশী সাহিত্য অনুবাদের একটি আদর্শ স্থাপন করিয়াছেন। বিপুল উৎসাহ ও উদ্যমের সহিত অনুবাদ কার্য্য চলিতে লাগিল, এবং অবশেষে ডক্টর মোহাম্মদ হোসেন হায়কল, তওফিক হাকিম এবং আলমাজেনীর নেতৃত্বাধীনে কতিপয় প্রতিভাশালী লেখক ও অনুবাদক মিশরীয় জীবনের বৈশিষ্ট্য ও চিত্র-সম্বলিত মৌলিক উপন্যাস রচনায় ব্রতী হইলেন। ডক্টর তা'হা হোসেন প্রণীত 'আল-আয়য়াম' আলমাজেনী প্রণীত 'ইব্‌রাহিমুল কাতেব', তায়মুর প্রণীত 'আল আতলাল' এবং আবুহাদিদ প্রণীত 'ইবনতুল মামলুক' প্রভৃতি উপন্যাসকে বিনা দ্বিধায় মৌলিক মিশরীয় উপন্যাস নামে অভিহিত করা যাইতে পারে।

আরবী উপন্যাস ও কথা-সাহিত্যের এখনও যাত্রারম্ভ; দুর্ব্বলতা ও অসামঞ্জস্য এখনও পদে পদে। এতৎসত্ত্বেও অধ্যাপক আহমদ আমীনের যুক্তি ও গভীর দৃষ্টি শক্তি, আল মাজেনীর হাস্যরস, ডক্টর হায়কল ও তওফিক হাকিমের দার্শনিক দৃষ্টিভঙ্গী ও তাঁহাদের বিভিন্ন ও বৈশিষ্ট্যময় বর্ণনা-পদ্ধতি হইতে স্বতঃই অনুমিত হয় যে আরবী উপন্যাস সাহিত্যের ক্রমবিবর্ত্তনের ধারা এখন দ্রুত গতিতে পূর্ণতার দিকেই অগ্রসর হইতেছে। সেদিন দূরে নহে যখন আরবী আবার পৃথিবীর ভাষাসমূহের মধ্যে নিজের উপযুক্ত আসন পরিগ্রহ করিবে।

গবেষণা ও তুলনামূলক সাহিত্য

ডক্টর তা'হা হোসেন আরবী সাহিত্যে যে বৈজ্ঞানিক সমালোচনা ও গবেষণার আদর্শ স্থাপন করিয়াছেন, তাহা এখন ফলপ্রদ হইতে চলিয়াছে। মিশরের আধুনিক মনীষিবৃন্দ অতীতের সংস্কারমুক্ত শুদ্ধ বুদ্ধ মন লইয়া পাশ্চাত্ত্য মনীষিবৃন্দের অনুকরণে, সত্যানুসন্ধানে ব্রতী হইয়াছেন। তাহার ফলে কত অনাবিষ্কৃত সত্য প্রকাশিত হইয়াছে, কত সন্দেহের রহস্যজাল

ছিন্ন হইয়াছে এবং কত গৃহীত মতবাদ ধূলিসাৎ হইয়াছে। ডক্টর তা'হা হোসেন তদীয় 'আল-আদবুল-জাহেলী' পুস্তকে অকাট্য যুক্তি ও নির্ভীকতার সহিত প্রাক্-ইছলামিক যুগের সাহিত্যের বিচার ও সমালোচনা করিয়াছেন; তাহার ফলে প্রাক্-ইছলামিক যুগীয় সাহিত্যের সত্তা সংশয় পূর্ণ এবং সেই যুগের সর্ব্বজনমান্য ও শ্রেষ্ঠতম কবি ইমরুউল কায়সের অস্তিত্ব পর্য্যন্ত সন্দেহজনক হইয়া দাঁড়াইয়াছে। অধ্যাপক আহমদ আমিন তৎপ্রণীত হজরতের জীবনীতে তাঁহার জীবনের বিভিন্ন দিক বিভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গীতে বিচার করিয়াছেন। মনোবিজ্ঞান ও যুক্তির আলোকে ব্যক্তিবিশেষের জীবনী আলোচনা মধ্যযুগীয় আরবী সাহিত্যে অতীব বিরল, আধুনিকতার সংস্পর্শে তাহার যাত্রাপথ সুগম হইয়াছে। ডক্টর মোহাম্মদ হোসেন হায়কল কৃত হায়াতু মোহাম্মদ গ্রন্থে হজরত (দঃ)এর জীবনী দার্শনিক দৃষ্টি-ভঙ্গীতে আলোচিত হইয়াছে। আব্দুর রহমান বে আল-আজ্জাম তৎকৃত 'বতলুল আবতাল' গ্রন্থে হজরতের জীবনীকে তাঁহার সমসাময়িক ঘটনাবলী ও পারিপার্শ্বিকতার আলোকে আলোচনা করিয়াছেন।

আলোচনা ও তুলনামূলক গবেষণার এই নূতন মনোবৃত্তি আজ আরবী সাহিত্যের বিভিন্ন স্তরে তাহার আলোকসম্পাত করিয়াছে। ইহার ফলে আরবী সাহিত্যে মৌলিক গবেষণা ও সত্যান্বেষণের নবযুগ আরম্ভ হইয়াছে। আব্বাছ মাহমুদ আল আক্কাদ প্রণীত 'রাজ আতুআবিল আলা' ও ইবনুর রুমী ওয়া হায়াতুহু মিন শেরিহি এবং মাহমুদ শাকির প্রণীত মোতানব্বী সম্বন্ধীয় গ্রন্থ প্রভৃতি আধুনিক আরবী সাহিত্যের মৌলিক সৃষ্টি। মাহমুদ শাকির কৃত মোতানব্বী সম্বন্ধীয় গ্রন্থ শুধু মৌলিক নহে বরং প্রতিক্রিয়াশীল। প্রোক্ত গ্রন্থে তিনি প্রমাণ করিয়াছেন যে মোতানব্বী জলবাহকের পুত্র ছিলেন না; তিনি প্রসিদ্ধ সৈয়দ বংশের আলবী শাখা-সম্ভূত ছিলেন এবং মহামান্য সুলতান সায়ফুদ্দৌলার ভগ্নীর প্রেমাসক্ত হইয়াছিলেন।১ এই মতবাদ মোতানব্বী সম্বন্ধীয় চিরাচরিত সমস্ত মতবাদকে সম্পূর্ণ-রূপে ওলটপালট করিয়া দিয়াছে।

এতাদৃশ লেখা ও গবেষণা আরবী সাহিত্য জগতে নব-জাগরণের বন্যাধারা প্রবাহিত করিয়া দিয়াছে। বিভিন্ন বিশ্ব-বিদ্যালয়, শিক্ষানিকেতন, সরকারী ও বেসরকারী সাহিত্য প্রতিষ্ঠান আজ একযোগে আরবী ভাষার সংস্কার ও বিস্তার সাধনে মনোনিবেশ করিয়াছে। ১৯৩২ খ্রীষ্টাব্দে আরবী ভাষার সংস্কার সাধনের উদ্দেশ্যে মিশরে 'রয়েল ফিললজিকাল একাডেমী' স্থাপিত হয়।

আরবী ভাষার সংস্কার

আরবী ভাষার সংস্কারকল্পে প্রোক্ত ফিললজিকাল একাডেমী নিম্নলিখিত উদ্দেশ্যাবলী গ্রহণ করিয়াছে:

১। আল মোকতাতফ ১লা জানুয়ারী ১৯৩৬।

১। আরবী ভাষার মূল বৈশিষ্ট্য সংরক্ষিত করিয়া যুগের চাহিদা অনুযায়ী আরবী ভাষাকে সাহিত্যিক ও বৈজ্ঞানিক বিষয়সমূহ বর্ণনা করিতে সক্ষম করিয়া তোলা।

২। বিদেশী ও কথ্যপরিভাষাকে আরবী রূপ প্রদান করা যদি অনুসন্ধানের পরেও আরবী ভাষায় প্রোক্তরূপ প্রতিশব্দ পাওয়া না যায়।

৩। সাহিত্যিক ও বৈজ্ঞানিক পরিভাষা সম্বলিত আধুনিক অভিধান সঙ্কলন করা এবং গ্রাম্য কথ্য ভাষাসমূহকে বৈজ্ঞানিক উপায়ে পরীক্ষা করতঃ গ্রহণোপযোগী শব্দসমূহ গ্রহণ করা।১

উক্ত একাডেমীর তত্ত্বাবধানে ১১টি সাবকমিটি স্থাপিত হইয়াছে। আরবী ভাষার বিভিন্ন দিক ও পরিভাষা লইয়া আলো-চনা ও গবেষণা করাই তাহাদের উদ্দেশ্য। ১৯৩৪ খ্রীষ্টাব্দে সর্ব্বপ্রথম 'একাডেমী'র গবেষণা সম্বলিত মুখপত্র প্রকাশিত হয়। তাহার বিরুদ্ধে নানাদিক হইতে প্রতিবাদ উঠিল—জন-সাধারণের মতে একাডেমী লুপ্ত ও পরিত্যক্ত পরিভাষিক শব্দকে সঞ্জীবিত করিতে চেষ্টিত হইয়াছে, সুতরাং প্রচলিত কথ্য পরিভাষার পরিবর্ত্তে একাডেমী কর্ত্তৃক গৃহীত নূতন পরিভাষা ব্যবহার করিতে তাহারা অস্বীকার করিল।

সে যাহাই হউক, এইরূপ বাদানুবাদ সাহিত্যজগতে নূতন নয়। যে মূল উদ্দেশ্য ও ভিত্তিকে অবলম্বন করিয়া ফিললজি-কাল একাডেমী কর্ম্মে অবতীর্ণ হইয়াছে তাহা হইতেছে আরব জগতের মধ্যে ভাষাগত ও সংস্কৃতিগত সামঞ্জস্য ও একতা সংরক্ষিত করিয়া ভাষার অবনতির পথ রুদ্ধ করা। আরব রাষ্ট্রশক্তি ও সভ্যতার পতনের পর আরব জাহানের দিকে দিকে যে অবসাদ ও গ্লানির অন্ধকার নামিয়া আসিয়াছিল তাহার ফলে আরবী ভাষা বিভক্ত হইয়া ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গণ্ডীর মধ্যে স্বাধীনভাবে পরিপুষ্টি লাভ করিতে লাগিল। কিন্তু কেন্দ্রচ্যুতি ও আদর্শচ্যুতি হইল ভাষাজীবনের সঙ্কটতম অবস্থা। যে ভাষা অতীত আদর্শ মূলগত বৈশিষ্ট্য ও ঐতিহ্যকে বিসর্জ্জন দিয়া কথ্য ভাষা রূপে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গণ্ডীর মধ্যে বিকাশ লাভ করে সেই ভাষার ধ্বংস ও বিলুপ্তি অবশ্যম্ভাবী; কয়েক শতাব্দী পরে সেই ভাষার মূলগত বৈশিষ্ট্য ও সমরূপতা আবিষ্কার করা গবেষণার বিষয়বস্তু হইয়া দাঁড়ায়। জগতের ভাষার ইতিহাস ও ভাষা বিজ্ঞান এই সত্যই স্বীকার করিয়া আসিয়াছে। এই সত্যকে উপলব্ধি করিয়া ফিললজিকাল একাডেমী ভাষার সমরূপতা রক্ষার্থে যে মহান সাধনার ব্রতী হইয়াছে তাহা সর্ব্বতোভাবে প্রণিধানযোগ্য। ভাষার অস্তিত্বের জন্য যেমন জীবনী-শক্তির দরকার তদ্রূপ ভাষার স্বাস্থ্য ও সবলতার জন্য বাহ্য আবহাওয়ার দরকার। ভাষার মূলগত বৈশিষ্ট্যকে বিসর্জ্জন না দিয়া আবশ্যক মত বিদেশী শব্দও গ্রহণ করিতে

১। মাজাল্লাতু মাজমায়িললুগাতিল আরাবিয়াতিল মুলকী, ১ম খণ্ড, ২২ পৃঃ

হইবে নচেৎ তাহা অনেক স্থলে দুর্বল ও পঙ্গু হইয়া পড়িবে। এই উভয় দিকে দৃষ্টি রাখিয়া একাডেমী কর্মক্ষেত্রে অবতীর্ণ। আরবীর জাতীয়তা ও দেশাত্মবোধের মহাকল্লোলের সঙ্গে সঙ্গে আরবী ভাষাও তাল মিলাইয়া চলিয়াছে—সে দিন দূরে নহে যখন আরবী ভাষা আবার তাহার গৌরবময় আসন গ্রহণ করিবে।

নব-সন্ন্যাস

শ্রীবিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়

৯

বাহিরে আসিয়া দু'জনে গঞ্জের দিকে চলিলেন। রাত্রি বেশি না হইলেও সন্ধ্যা বেশ ভাল ভাবেই উৎরাইয়া গেছে। গভীর মৌন—অনেক দূর পর্যন্ত কোন কথাই হইল না দু'জনের। সেখান হইতে টিলার পথটা আলাদা হইয়া গেছে, তাহার কাছাকাছি আসিয়া টুলু প্রশ্ন করিল—"এর কোন উপায় নেই তার?"

কোন্‌টা যে টুলুর মনে বেশি চাপ দিবে মাষ্টার মশাই এখনও আন্দাজ করিয়া উঠিতে পারেন নাই, প্রশ্ন করিলেন—"চরণদাসের মেয়েটার ব্যবহারের কথা বলছ?"

"না; তেবে দেখলাম ওটা ভালই হয়েছে, আমিই ভুল করছিলাম। আমি বলছিলাম খনির এই সমস্ত ব্যাপারটা, আরও কত ভীষণ বোধ হয় খুঁটিয়ে দেখাও হ'ল না। বলছিলাম বুঝিয়ে দেওয়া যায় না?"

কথাটা সহজভাবেই বলিবার চেষ্টা করিল, কিন্তু বেশ বুঝা গেল এই কয়েক ঘণ্টার সমস্ত অভিজ্ঞতার আতঙ্কটা তাহার পিছনে রহিয়াছে।

মাষ্টার মশাই বলিলেন—"সেটা সম্ভব নয়।...যদি সম্ভব হ'ত তো উচিতও হ'ত না টুলু।"

টুলু থমকিয়া দাঁড়াইয়া পড়িল, বিস্মিত হইয়া প্রশ্ন করিল—"উচিত হ'ত না!"

"সভ্যতার চাকা পেছন দিকে ঘোরাতে যাওয়া অস্বাভাবিক টুলু আর সেইজন্যে বোধ হয় পাপও, যদিও এটাও সত্যি যে সভ্যতার গতি কুটিল।"

টুলু নির্বাকই দাঁড়াইয়া রহিল। মাষ্টার মশাই বলিলেন—"একটা বেয়াড়া প্যারাডক্সের মতো শোনাচ্ছে, না? বেশ, তার গতিপথের বেশ বড় বড় দুটো ল্যাণ্ডমার্ক নাও—একটা মানুষের উচ্চাশার (দুরাশারও বলা চলে) আর একটা তোমার ধর্মের। প্রথমটার নজির হিসেবে রইল ইজিপ্টের পিরামিড আর দ্বিতীয়টার—জগন্নাথদেবের মন্দির—ভাবতে পার প্রত্যেকটাতে কত লোকক্ষয় হয়ে থাকবে—কত বেদনা, কত দুঃখ, কত অত্যাচার, কত হা-হুতাশ?"

আবার নীরবে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। টিলার গোড়ার দুইটি পথের সঙ্গমে আসিয়া বলিলেন—"জগন্নাথের মন্দিরের উদাহরণটাই দিই টুলু—ঠিক এই রকম, আমাদের এই সভ্যতার দেউলটাও গড়তে অনেক কিছু লাগল—দুঃখ-কষ্ট অত্যাচার-অনাচার—বোধ হয় অনিবার্য ছিল এসব। এবার দুঃখ দিয়ে তৈরি মন্দিরে দেবতা প্রতিষ্ঠার সময় এসেছে- মানুষের আনন্দ দেবতা। আমাদের যুগের এই ব্রত, আর এই ব্রত উদ্‌যাপন করতেও খানিকটা দুঃখ আছে। সভ্যতার দেবতা আরও বেশি চান, দেউল তুলতে যা হ'ল, হ'ল, এখন তাঁর বেদী তুলতেও তো তোমাদের মতন অনেককে আত্মবিসর্জন দিতে হবে?...আজ যাও, রাত হয়েছে, বেশ ক্লান্তও আছ।"

নিজে স্কুলের টিলার পথে পা দিলেন।

প্রশ্ন যাই করুক, মাটির উপর পা দেওয়া পর্যন্ত টুলুর মনে একেবারেই একটা উল্টা স্রোত বহিতেছিল। কি আনন্দ! এই মাটি, এই বাতাস, এই আকাশ প্রতি মুহূর্ত আমাদের ঘিরিয়া আছে বলিয়াই যেন ভাল করিয়া পাওয়া যায় নাই এত দিন—কত মধুর!—কত মধুর! খনির সঙ্গে খনির সমগোত্র যাহা কিছু—দুঃখ-কষ্ট, অভাব-অভিযোগ, অত্যাচার-অনাচার সব কিছুর সঙ্গেই সম্বন্ধ ঘুচাইয়া দিল টুলু। যাহারা ইচ্ছা করিয়া জোয়াল ঘাড়ে করিবে—লোভের, মায়ার, মোহের—তাহারা তো ভুগিবেই এমন করিয়া বুদ্ধ, শঙ্কর, চৈতন্য, সবাই তো এক সুরে এই কথাই বলিয়া গেছেন। টুলু কি করিবে? না, ফিরিয়া চলো আশ্রমে, যেখানে বিরাটতর মুক্তির আলো কোন এক সুদূর অলক্ষ্য জগৎ হইতে আসিয়া পড়িতেছে। টুলু মনে মনে শিহরিয়া উঠিল—বুদ্ধ নিজের সন্তানের মায়াডোর ছিন্ন করিয়া বাহির হইয়া গেলেন, আর ও গিয়াছিল পরের সন্তানকে বুকে জড়াইতে! চমৎকার! প্রসূতি-মেয়েটির প্রশংসা করিতে হয়—নিজে মুক্ত হইয়া তাহাকে বাঁধিবার ব্যবস্থা করিয়াছিল মন্দ নয়! চম্পা বাঁচাইয়াছে তাহাকে; শত ধন্যবাদ চম্পাকে।

কিন্তু কি ভীষণ জীবন! টুলু সম্বন্ধ ছিন্ন করিয়া আসিয়াছে, খনির সঙ্গেও, বস্তির সঙ্গেও, তবু তাহাদের স্মৃতি হইতে যেন কোনমতে নিজেকে বিচ্ছিন্ন করিতে পারিতেছে না। মাষ্টার মশাই বলিয়াছিলেন—বস্তিতে তুমি পরিণামটা দেখেছ, খনির মধ্যে তার কারণটা দেখাব। সত্যই অসহ জীবন—তবু এক

যার একটু দেখার অভিজ্ঞতাতেই টুলুর যখন এই অবস্থা, যাহারা ভুক্তভোগী তাহারা সাদা চোখে এর উগ্রতাটা কি করিয়া বহন করিবে? চরণদাসের আবার এর ওপর আছে চম্পা,—নিজের কন্যা, খনি-জীবনের—আর তারই পরিণাম বস্তি-জীবনের গ্লানি মাখিয়া চোখের সামনে ডুবিয়া যাইতেছে। কি করিয়া দেখা যায় এ দৃশ্য? চম্পার কথা মনে হইতেই টুলুর দৃষ্টি যেন তাহার ছবিটির উপর নিবদ্ধ হইয়া গেল প্রত্যুৎপন্ন স্মৃতি—শিশু ভূমিষ্ঠ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই সে দুধের জন্য ছুটিয়াছে। তাহার পর সেই ছেলেকে কাড়িয়া লওয়া! এতগুলা স্ত্রীলোকের মধ্যে—এতগুলা মানুষের মধ্যেই বলা চলে, এই মেয়েটিরই একটা ব্যক্তিত্ব আছে। তবুও কষ্ট হয়, বরং সেইজন্যই বেশি করিয়া কষ্ট।···আরও একটা কথা চম্পাদের পরিবার ওরই মধ্যে ভদ্র, অবস্থাগতিকে নামিয়া গেছে। চরণদাসের সেই কথাগুলা সেই অবস্থাতেও টুলুর কানে বড় বাজিয়াছিল—"কি করি, পেট বড় দুশমন, নইলে বোষ্টমের ছেলে···" টুলু বাড়ির দিকে গেল না, ওদিকে যাইতে পা উঠিতেছে না। বস্তি আর স্কুলটা বাদ দিয়া এই দিকেই ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিল। জীবনে তাহার আজিকার মতো অভিজ্ঞতাও হয় নাই কখনও, মন এত ভারাক্রান্তও হয় নাই। অথচ ভাবটা যেন শূন্য ভার। টুলু এতদিন যা আশ্রয় করিয়াছিল—ধর্ম, তাহা হইতে সে স্খলিত—সত্যই, পৃথিবীর এই দিকটা দেখিয়া ধর্মকে মনের একটা বিলাসই বলিয়া বোধ হয়, অথচ এই ধর্ম থেকে যে মাষ্টার মশাই তাহাকে স্খলিত করিলেন, তিনিও আজ টুলুর জীবন থেকে অস্তমিত। বস্তি-জীবন আর খনি-জীবনের সঙ্গে সংস্রব ঘোচানো মানেই তো তাহার জীবনে মাষ্টার মশাইকেও অস্বীকার করা। ভালমন্দ সব হারাইয়া এ যেন একটা বিরাট শূন্যতা।

রাত হইয়া চলিয়াছে; নিতান্ত নিশিতে পাওয়ার মতই টুলু নিরুদ্দেশভাবে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। তৃষ্ণা পাইয়াছে, এই অনুভূতিটা যেন খনির মধ্যে প্রবেশ করা থেকেই ছিল, এখন ওটাকে স্বীকার করার স্পষ্ট হইয়া উঠিয়া আরও একটা অনুভূতিকে স্পষ্ট করিয়া তুলিল—ক্ষুধা, অসহ্য ক্ষুধা পাইয়াছে।

টুলু একটা কাজ, একটা অবলম্বন পাইয়া যেন বাঁচিল। পকেটে হাত দিয়া দেখিল খুচরা তিন আনা পয়সা পড়িয়া আছে। হন্ হন্ করিয়া গঞ্জের দিকে চলিল। দোকান প্রায় সব বন্ধ হইয়া গেছে, অনেক খুঁজিয়া পাতিয়া একটা মুড়ি আর ফুলুরি-বেগুনির দোকান পাওয়া গেল; দোকানি ঝুড়ি ঝাঁপ ফেলিবার ব্যবস্থা করিতেছে।···আহার্যের অপূর্ণতা জলে মিটাইয়া টুলু আবার ফাঁকায় আসিয়া দাঁড়াইল।···মুখে এক বার একটু হাসি ফুটিল—চমৎকার!—খনি-বস্তি-জীবনের যেন ছোঁয়াচ লাগিয়াছে, খাবার যা জুটিল তাহাও নেশার চাট্! বাঃ, জীবনে অপূর্ব একটা রাত্রি দেখা দিয়াছে, চিরদিন মনে থাকিবে।

তবু চিন্তাটা একটু স্বচ্ছ হইল, টুলু এটা বেশ বুঝিতে পারিল যে দু'দিক ছাড়িয়া বাঁচা চলিবে না। আর এটাও ঠিক যে আশ্রম অচল; মাষ্টার মশাইয়ের একটি কথাও ভুল নয়—ও জীবন নিজের শঠতায় আরও ভয়ঙ্কর। তবে?—আবার মাষ্টার মশাইয়েরই শরণাপন্ন হইবে?

হঠাৎ যেন একটা বিদ্যুৎ বিকাশে টুলুর মনটা দীপ্ত হইয়া উঠিল—পাওয়া গেছে—পাওয়া গেছে!—মাষ্টার মশাইয়ের পা জড়াইয়া বলিবে—আমায় অন্য পথ দেখান—চম্পার মত সর্পিণী যে পথ আগলে বেড়াচ্ছে সে পথে আমায় দেবেন না ছেড়ে।···বোধ হয় এত করিয়া বলিতেও হইবে না, আজকের ব্যাপারের পর তিনি বোধ হয় তাহার জন্য অন্য পথ বাছিয়াও রাখিয়াছেন। জানিয়া বুঝিয়া কে সাপের মুখে ফেলিয়া দিতে পারে একজনকে—অতি বড় শত্রু না হইলে?

টুলু স্কুলের পথ ধরিল।

টিলায় পা দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে কিন্তু মত গেল বদলাইয়া। এত সত্ত্বেও মাষ্টার মশাই যদি সেই বস্তির কথাই ধরিয়া থাকেন? আর সেইটেই বেশী সম্ভব নয় কি?—মাষ্টার মশাইকে তো এতদিন দেখিল···

মনটা উদগ্র হইয়া উঠিয়াছে—আজ একটা কিছু স্থিরনিশ্চয় করিয়া লইতেই হইবে। মনের আলোড়নেই একবার সিদ্ধ-বাবার কথাটা হঠাৎ উপরে আসিয়া পড়িল। টুলু একেবারে দাঁড়াইয়া পড়িল—একটা ছবি একেবারে যেন প্রত্যক্ষ করিয়া চোখের সামনে ওই দুলিতেছে—নদীর ধার—লতায় ফুলে সাজানো একখানি বাড়ি—তার দোতলার প্রশস্ত বারান্দায় কম্বলের ওপর একটি কৃষ্ণাজিনে সিদ্ধবাবা বসিয়া—গৌর কান্তির ওপর সকালের আলো আসিয়া পড়িয়াছে—দীর্ঘায়ত চোখে অপরিসীম শান্তি আর প্রসন্নতা—বিনা আয়াসেই যেন তাহা হইতে প্রসন্নতা ঝরিয়া পড়িতেছে।···টুলুর চোখ দুইটি ছলছল্ করিয়া উঠিল—সমস্ত অন্তরাত্মা দিয়া তাহার মন যেন বলিয়া উঠিল—না, আমায় মার্জনা কর, আমায় বাঁচাও, আমার যা পথ তা তোমার ঐ প্রসন্ন দৃষ্টির নিচে; আমি বুঝেছি, অনেক দেখে, অনেক ভুগে, অনেক সংশয়ের পর আমি শেষ বারের মত চিনেছি তোমায়, হে দেব, আমায় ডেকে নাও, আমায় উদ্ধার কর···

একটা অদ্ভুত শক্তি আসিয়া গেছে। সমস্ত দিনের ক্লান্ত পা দু'টায় যেন বিদ্যুৎ-প্রবাহ নামিয়াছে, মনটা এক মুহূর্তেই হইয়া উঠিয়াছে বকের পাখনার মতই হালকা—যেন কাহার আশীর্বাদেই। টুলু চড়াই ঠেলিয়া উঠিতেছে যেন ঢালু বাহিয়া নামিয়া যাইতেছে—মনটা চলিয়াছে আগে আগে, তাহার সঙ্গে পাল্লা দেওয়াই যেন দায় হইয়া উঠিয়াছে।···স্কুলের সামনে আসিয়া পায়ের জুতা দুইটা খুলিয়া লইল—ঘর্ষণের শব্দে যদি মাষ্টার মশাইয়ের ঘুম ভাঙিয়া যায়—যদি জাগিয়াই থাকেন মাষ্টার মশাই!

স্কুল অতিক্রম করিয়া আবার জুতা জোড়াটা পায়ে দিয়া

টুলু হন্‌হন্‌ করিয়া চলিতে আরম্ভ করিল। কত রাত হইবে?—ঘড়ি নাই, তবে কতকগুলা নক্ষত্রপুঞ্জের সংস্থান দেখিয়া বুঝিতে পারিল প্রায় মধ্যরাত্রি—আজকাল অনেকগুলাকে চেনে। একটা কথা মনে পড়িয়া টুলুর একটু হাসি ফুটিল—মাষ্টার মশাই এক দিন বলিয়াছিলেন—"টুলু, রাত্রির গভীরতার সন্ধান না পেলে মানুষে জীবনের গভীরতার সন্ধান পায় না।" ...বড় খাঁটি কথা, এই কটা দিনের অভিজ্ঞতা লইয়া কত বিনিদ্র রাত্রিই না তাহার কাটিল।—কি গভীরভাবেই না সে দেখিল জীবনকে! নিজেই অনুভব করে বয়সের গণ্ডী ছাড়াইয়া সে যেন কত দূর আগাইয়া গেছে—কত দূর!...কত দূর!...

স্কুলটি ডান দিকে রাখিয়া রাস্তাটা নামিয়া গেছে, তাহার পর আবার ধীরে ধীরে একটি টিলার ওপর উঠিয়াছে; প্রায় স্কুলের টিলার মতোই উঁচু, মাঝের ব্যবধানটুকু প্রায় আধ মাইল হইবে। এইখানে আসিয়া কি ভাবিয়া টুলু একবার ফিরিয়া চাহিল। খনিচক্রের অমুখ আলোকবিন্দুগুলা টিলার অন্তরালে অবলুপ্ত হইয়া গেছে—একটা দুঃস্বপ্নের মতোই। মাষ্টার মশাইয়ের বাসার মাথাটা কিন্তু দেখা যায়; আর ঐ ছায়ালিপ্ত কাঞ্চন গাছ। ঐটুকুকেই আশ্রয় করিয়া এক মুহূর্তে সব যেন আবার জাগিয়া উঠিল—খনিচক্র, দূষিত ক্ষতের মতো সর্বাঙ্গে তাহার রাঙা দাগ—বস্তি—খনি—চম্পা—চরণদাস; অন্ধকার গহ্বরে, যমের মুঠার চাপের মধ্যেই সেই মরা প্রসূতি—হীরক—মাষ্টার মশাই। সমস্ত মনটা যেন মোচড় দিয়া উঠিল—সে ছাড়িয়া আসিল?—সে ঐ পূতচরিত্র অনাড়ম্বর সন্ন্যাসীর কাছে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ নয়?—কালই তাঁহার পদস্পর্শ করিয়া চরণদাসের হাতের রান্না খাইতে রাজি হইয়া সে যুগ-যুগের একটা সংস্কার ভাঙিয়া বাহির হইয়া আসিল, তাহার পিছনে কি একটা নূতন ব্রত গ্রহণের প্রতিজ্ঞা ছিল না?

টুলু অনেকক্ষণ স্থির ভাবে দাঁড়াইয়া ভাবিল।...এক সময় সে আবার স্কুলের দিকে পা বাড়াইল। কিন্তু কয়েক পদক্ষেপ মাত্র, তাহার পর আবার দাঁড়াইয়া পড়িল। মাথার মধ্যে যেন একটা ঝড় বহিতেছে। কি সর্বনাশ!—এই রকম অনিশ্চিত মন লইয়া সমস্ত রাত এই দুইটি টিলার মধ্যে ঘড়ির দোলকের মতো তাহাকে এদিক ওদিক করিয়া কাটাইতে হইবে নাকি?

সমস্ত শক্তি দিয়া টুলু আবার ফিরিল—অস্ফুট অথচ স্পষ্ট স্বরেই ব্যাকুল ভাবে যেন সামনে কাহার মুখ চাহিয়া বলিল—"আমায় বাঁচাও, এ জীবন আমার নয়। হে গুরুদেব, টেনে নাও আমায় তোমার পানে—তোমার সমস্ত তপোবল প্রয়োগ করে টেনে নাও—হে অন্তর্যামী সিদ্ধপুরুষ!

এই দ্বিতীয় টিলা পার হইয়া টুলু আবার একটা উৎরাই ধরিয়া বালিয়াড়ির পথে নামিতে লাগিল; একবার ঘুরিয়া দেখিল প্রথম টিলাটি পর্যন্ত অন্তর্হিত। "আঃ!" বলিয়া একটা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলিল, তাহার পর যে সময়টা নষ্ট হইয়াছিল সেটাকে পর্যন্ত উসুল করিয়া লইবার জন্য গতিবেগ আরও বাড়াইয়া দিল।

সঙ্গে সঙ্গেই আকাশে বাতাসে একটা মধুর বিপর্যয় ঘটিয়া গেল: একেবারে দিক্‌রেখার উপর একটা কালো মেঘের কালি ছিল, সেইটার অন্তরাল হইতে কৃষ্ণা সপ্তমীর চাঁদ একেবারে আকাশের খানিকটা ওপরে উঠিয়া চারি দিক একটা অর্দ্ধস্ফুট জ্যোৎস্নায় ডুবাইয়া দিল; এই জ্যোৎস্নার মতোই নিতান্ত যেন কোথা থেকে একটি মৃদুমন্দ সমীরণ উঠিয়া চারি দিকে একটা পুলক-শিহরণ জাগাইয়া তুলিল, আর সব চেয়ে যা আশ্চর্য—এক অপার্থিব গন্ধ! ফুলের কথা তো দূরে, একটি তৃণ পর্যন্ত দেখা যায় না কোথাও সেই রুক্ষ ঊষর পাহাড়ের গায়ে, কিন্তু মনে হইতে লাগিল যেন কে কোথায় অলক্ষ্যে সমস্ত নন্দনকাননটা তুলিয়া আনিয়া বসাইয়া দিয়াছে।

টুলুর সমস্ত শরীর রোমাঞ্চ দিয়া উঠিল।—হে প্রভু, চিনেছি তোমায়, এই মেঘাবরিত জ্যোৎস্নার মতোই আমার সংশয়াকুল দৃষ্টিকে তুমি স্বচ্ছ করে দিয়েছ—এই আমার ফেরার পুরস্কার, এই তোমার আহ্বান। এ-ই তোমার করুণা?—এমন করেই কি নিতান্তই তোমার এই অকিঞ্চন ভক্তটির দিকে দৃষ্টি দিয়ে আছ?—তা হলে তুলে নাও আমায় আমার অন্তরের সমস্ত গ্লানি থেকে মুক্ত করে নিয়ে—আমার এই একটা দিনের সমস্ত পাপ ধুয়ে ফেলে। হে প্রভু, আমি আসছি—তোমার এই আশীর্বাদ সর্বাঙ্গে মেখে, নন্দনগন্ধস্নাত হয়ে আমি এখুনি এসে উপস্থিত হচ্ছি তোমার রাতুল চরণ তলে...

একটি পরম নির্ভরতা, পরিপূর্ণ আত্মসমর্পণ, আর প্রগাঢ় ভক্তিরসে টুলুর চক্ষু দুটি সজল হইয়া উঠিল। এত হালকা শরীর—টুলু মাটির স্পর্শ যেন অনুভবই করিতেছে না। যতই অগ্রসর হইতেছে গন্ধটা ততই স্পষ্ট, বাতাসটা যেন আরও উদ্বেল হইয়া উঠিয়াছে। ডান দিকে টিলাটা একেবারে খাড়া, সামনে কয়েক হাত পরে একটা বাঁক—কেমন যেন মনে হইতেছে বাঁকের ওদিকেই তাহার জন্য আরও অপূর্ব একটা কি অপেক্ষা করিতেছে—গুরুদেবের আরও বড় একটা করুণা, আরও সুমিষ্ট একটা আহ্বান।

টুলু আরও পা চালাইয়া দিল—কি জানি, এ সব দৈব জিনিষ যেমন হঠাৎ আসে তেমনি হঠাৎই মিলাইয়া যায় সে—

মোড় ঘুরিয়াই দেখিল অল্প দূরে দুইটি স্ত্রীলোক।...এত রাত্রে, এই জায়গায়! আগেকার পুলক আবেগের ঝোঁকেই টুলু যেন হন্ হন্ করিয়া আগাইয়া গেল, তাহার পর তাহার সারা শরীরের রক্ত যেন একযোগে সমস্ত ধমনী বাহিয়া নামিয়া গেল।...চম্পা!—আর তাহার সামনে আর একটি স্ত্রীলোক—মাঝবয়সী, গেরুয়া পরা; টুলু তাহাকে এক দিন সিদ্ধবাবার আশ্রমে হাতে কি একটা পাত্র লইয়া একটা ঘরে চলিয়া যাইতে দেখিয়াছিল।...বালিয়াড়িতে

যাইতেছে, এদিকে পিছন। চম্পার কবরী বেড়িয়া একটি টাটকা বেলফুলের মালা—তার গন্ধের সঙ্গে কি একটা মিষ্ট এসেন্সের গন্ধ মিলিয়া তাহার চারি দিকের হাওয়াটাকে যেন মাতাল করিয়া তুলিয়াছে। পরনে একটি পরিষ্কার শাড়ি, এইটিই বোধ হয় প্রথম দিন দেখিয়াছিল।

টুলুর নন্দনকানন এক মুহূর্তেই মিলাইয়া গেল।

সমস্ত মনটা যেন তোলপাড় করিয়া উঠিতেছে। প্রথমটা ভাবিল অপরিজ্ঞাত থাকিয়াই চুপি চুপি ফিরিয়া যায়। তাহার পর হঠাৎ কি মনে হইল ত্বরিত পদে আগাইয়া গিয়া বেশ স্পষ্ট, কতকটা রূঢ় কণ্ঠে প্রশ্ন করিল—"তোমরা কোথায় যাচ্ছ?"

দুই জনে ফিরিয়া স্তম্ভিত হইয়া দাঁড়াইয়া পড়িল। তাহার পর চম্পা মুখটা একটু নিচু করিয়া রাস্তার এক পাশে সরিয়া দাঁড়াইল। অপর স্ত্রীলোকটি স্থির দৃষ্টিতে টুলুর মুখের পানে একটু চাহিয়া রহিল, একটু পরেই তাহার মুখে একটা ছায়াহীন দীপ্তি ফুটিয়া উঠিল, স্পষ্ট কণ্ঠে উত্তর করিল—"কেন? সিদ্ধবাবার আশ্রমে।"

আজ বিস্ময়ের ওপর বিস্ময় উপলব্ধি করার দিন টুলুর: চম্পা পর্যন্ত আগাইয়া আসিল, প্রথম লজ্জার ঘোরটা কাটিয়া গেছে। বেশ সোজাভাবে মুখ তুলিয়া খুব অল্প একটু হাসির সঙ্গে বলিল—"কেন, আশ্রম পুরুষদেরই একচেটে নাকি?"

একটা ঝোঁকে একটু চৈতন্য হইয়াছিল, টুলুর শরীর-মন আবার যেন অসাড় হইয়া গেল।…আলো নাই—যে গন্ধ দূর থেকে এত স্পষ্ট ছিল, নাকের নিচে আসিয়া তাহা একেবারে বিলীন—বিলীন না বীভৎস?—চারি দিকে যেন নর্দমা—আশ্রমের নর্দমার সঙ্গে বস্তির নর্দমা মিশিয়া গেছে—কি করিয়া?—কি করিয়া?…

টুলুর আবার যখন সম্বিৎ হইল—দেখে দুই জনে খানিকটা দূরে আগের চেয়ে লঘু গতিতে আবার আগাইয়া যাইতেছে।

একটু কি ভাবিল, তাহার পর আবার দ্রুত, কম্পিত চরণে অগ্রসর হইল। এবার স্ত্রীলোকটি আর চম্পার মাঝামাঝি দাঁড়াইয়া চম্পার পানে মুখ ফিরাইয়া কঠিন স্বরে বলিল—"তুমি যেতে পারবে না ওখানে।"

চম্পারও মুখটা কঠিন হইয়া উঠিল, প্রশ্ন করিল—"কেন?"

"নরক…"

"স্বর্গ কোথায় পাব আমি?"

টুলু একটু ভাবিল, তাহার পর হঠাৎ যেন মনে পড়িয়া গেছে এই ভাবে দ্রুত কণ্ঠে বলিল—"হ্যাঁ—ইয়ে—বনমালী—স্কুলের চাকর, সে তোমার ঠাকুরদাদা নয়?—তার ভয়ানক অসুখ—স্কুল থেকেই আসছি আমি…"

—এমন একটা উত্তর যে তাহার মূঢ়তায় সেটা নিজেই যেন শেষের দিকে এলাইয়া গেল।

চম্পার মুখটা কিন্তু নরম হইয়া আসিল, স্থির দৃষ্টিতে চাহিয়া শুনিতেছিল, একটু স্পষ্ট করিয়া হাসিয়াই বলিল—"স্বর্গের দরজাতেই মিথ্যে?…বেশ, চলুন, যাচ্ছি।"

ফিরিয়া স্ত্রীলোকটিকে বলিল—"তাঁকে আমার প্রণাম দিয়ে দেবেন তা হলে।"

১০

রাত্রি প্রায় তৃতীয় প্রহরে মাষ্টার মশাইয়ের রাস্তার দিকের জানালায় ঘা পড়িল, প্রশ্ন হইল—"স্যার ঘুমোচ্ছেন?"

সাড়া পাওয়া গেল না। টুলু আরও কয়েক বার ডাকিল, প্রতিবারেই গলা একটু বেশি উঁচু করিয়া। খোলা জানালার গরাদে মুখটা চাপিয়া লক্ষ্য করিতেছে, একটা ছোট্ট গলা-খাঁকারির শব্দে চমকিয়া ফিরিয়া চাহিতে দেখে, বনমালী দাঁড়াইয়া। একটা চাবি বাড়াইয়া ধরিয়া বলিল—"লেন আজ্ঞে।"

টুলু ঘাড়টা একটু পিছনে টানিয়া লইয়া দেখিল সদর দরজায় তালাবন্ধ। অত্যন্ত বিস্মিত হইয়া প্রশ্ন করিল—"মাষ্টার মশাই নেই?"

বনমালী মাথা নাড়িল।

"নেই মানে?—আমার সঙ্গে টিলার নিচে পর্যন্ত এলেন। গেছেন কোথায়?"

বনমালী খুব বুদ্ধিমানের মতো ঠোঁট বাঁকাইয়া একটু হাসিল; একটা চোখ একটু বুজিয়া নিজের মাথার ডান দিকে তর্জনী দিয়া গোটা কতক টোকা মারিল, তাহার পর হাসি-শুদ্ধ এই সমস্ত ইঙ্গিতটুকুর টীকা-স্বরূপ বলিল—"একটু ক্ষ্যাপা আছে বটে; এই আছে ঘুরো দেখো…"

"নেই"—কথাটার জায়গায় একটা টুসকি বাজাইয়া দিল। আবার চাবিটা বাড়াইয়া বলিল—"লেন আজ্ঞে।"

টুলু অন্যমনস্ক ভাবে বলিল—"খোল দরজাটা।"

ঘুরিয়া সামনের দিকে চাহিয়া স্থির ভাবে দাঁড়াইয়া রহিল। চিন্তায় যেন কোন সূত্রই ধরিতে পারিতেছে না। এই কয়টা দিন ধরিয়া সমস্ত ব্যাপারগুলা যেন একটা ভোজবাজি।…মাষ্টারমশাই নাই—এর অর্থ কি?—সব-কিছুর গোড়ায় যে তিনি, তাহারই ভরসায় টুলু আজ সবচেয়ে দুঃসাহসের কাজ করিয়া বসিয়াছে—বিষধরা সর্পিণীকে সঙ্গিনী করিয়া ফিরাইয়া আনিয়াছে। এ আবার কি নূতন সমস্যায় পড়িল এখন?

বনমালী তালা খুলিয়া দরজার পাল্লা দুইটা ভিতরের দিকে ঠেলিয়া দিয়া দুই পা আগাইয়া আসিল, বলিল—"চলেন আজ্ঞে। টেলিগেরাম এল, উই সুদ্ধ সেক্রেটরি বাবুর কাছে ছুটির দরখাস্ত নিয়ে গেলুম…"

"ক' দিনের ছুটি?"

বনমালী সে কথা জিজ্ঞেস করে নাই। মাথাটা বার দুই

চুলকাইয়া, তাহাতে একটা ছোট্ট ঝাঁকানি দিয়া বলিল—"তা কি বললেক ? কিয়া দেখি দুয়ার বন্ধ, তালার মধ্যে চাবিটি। আর একবার এই রকমপারা চলে গেল বটে···পাঁচ দিন···"

মাথাটা একটু নিচু করিয়া কয়েকবার ডাইনে বাঁয়ে নাড়িয়া দিল—অর্থাৎ গতিক বেশ ভাল নয়, লোকটির মাথায় আছেই কিছু গোলমাল।

টুলু প্রশ্ন করিল—"তা তুমি সেক্রেটারি বাবুকেই জিজ্ঞেস করলে না কেন ?"

বনমালী একটু বিরক্ত হইল, বলিল—"তুমি কথাটি বুঝোক নাই বাবুমশয়, সেক্রেটারি বাবু ছিলোক নাই। উর চাকরকে দিয়ে আসুম।···কথাটি তুমি বুঝোক নাই।"

একবার বাহিরের দিকে পা বাড়াইয়া তখনই ফিরিয়া নিজের কোমরের কাপড় হইতে একটা চিঠি বাহির করিয়া বলিল—"আর ই-লেন, আপুনারও একখানা চিঠি ছিলোক।"

দিয়া বাহির হইয়া গেল।

টুলু খামের মধ্যে থেকে চিঠিটা বাহির করিয়া দেখিল—ছুটির দরখাস্ত। বনমালীকে ডাকিল, কিন্তু তখন সে চলিয়া গেছে।

ভিতরে গিয়া টুলু মাষ্টার মশাইয়ের বিছানাটা পাতিয়া লইয়া হাত পা ছড়াইয়া শুইয়া পড়িল। একেবারে চিন্তার অতলে ডুবিয়া গেছে। বনমালী নিজের বাসা থেকে দেশলাই আনিয়া আলোটা জ্বালিল, ঘরের মধ্যে আসিয়া প্রশ্ন করিল—"পাক হবে আজ্ঞে ?"

প্রশ্নটা আরও একবার করিল, কোন উত্তর না পাইয়া মাথায় দুই বার টোকা মারিয়া মাথাটি দুলাইতে দুলাইতে চলিয়া যাইতেছিল—অর্থাৎ টুলুরও মস্তিষ্কে কিছু গোলযোগ আছে—কপাটের বাহিরে পা দিতে টুলু প্রশ্ন করিল—"আমায় কিছু বললে বনমালী ?"

বনমালী ঘুরিয়া প্রশ্ন করিল—"পাক হবে আজ্ঞে ?"

"না, আমি খেয়ে এসেছি। আর রাতও তো ফুরিয়ে এল, এখন রান্না চড়ালে···ঠিক কথা, বনমালী, ভুলেই যাচ্ছিলাম, তুমি চিঠির গোলমাল করেছ।"

বনমালী রগ চুলকাইতে চুলকাইতে বিমূঢ় ভাবে চাহিয়া রহিল। টুলু বলিল—"এটা দরখাস্ত, আমার চিঠিটা তুমি চাকরের হাতে দিয়ে এসেছ।"

"এই কথাটি আছে ? তা সকালে উকে দরখাস্তটি দিয়ে এলেই উ তোমার চিঠিটি দিয়ে দিবেক, এত ভাবনা কেন গো ? চিঠি লিয়ে করবেক কি সে ?"

ওর সমস্যা-সমাধানের ভঙ্গিতে টুলুর একটু হাসি পাইল, কিন্তু সেটা চাপিয়া বলিল—"ও যাক্, আর একটা কথা জিজ্ঞেস করছিলাম···"

"বলুন আজ্ঞে।"

"চরণদাসের মেয়ে···মানে, চরণদাস তো তোমার ছেলে হয়, না ?"

"ছেলে হয় আজ্ঞে, উর মেয়ে চম্পা আমার নাতনি বটে।"

"আমি চরণদাসের কথা জিজ্ঞেস করছিলাম।"

"ছেলে বটে বাবুমশয়, ছেলে বটে।"

বনমালী চৌকির পাশে হাতের বেড়ে দুই হাঁটু জড়াইয়া উবু হইয়া বসিল, রেকর্ড বাজিয়া চলিল—"চরণদাস ছেলে বটে আজ্ঞে, আর ভাল ছেলে বটে। উ এমনটি ছিলোক নাই। ইয়া বুকের ছাতি, ইয়া হাতের কব্জি—আমি চরণদাসের মাকে বুলতাম—তুর ছাওয়াল সিংহীর বাচ্চা বটে গো। উর মা বুলত—তুর নজর গলে যাক্, আমার ছাওয়ালকে খুঁড়িছিস মিনসে।···উ রস করে বুলত আজ্ঞে—উর মা মাইয়াটি ছিলোক খুব ভালো, আমায় ভাবতাটিরপারা পত্তিভক্তি করত। রস করে বুলত—তুর নজরটি গলে যাক মিনসে···হি-হি···মাইয়াটি ছিলোক খুব ভালো আজ্ঞে। সিটি যত্তোদিন বেঁচে ছিলোক চরণকে খনির মধ্যি ঢুকতে দিলেক নাই। আমায় বুলত—তু এ ছুগমনের চাকরি থেকে খালাস হ আমি আমার চরণকে কিরাঁয়ে লিয়ে গিয়ে আবার রাইগাঁয়ে সংসারটি পাতবোক। আমার ক্ষেত, আমার গোরু-বাছুর পাঁচভূতে ভোগ করছেক, চরণ আমার আবার কেড়ে লিবেক।···কথাটা বুঝলেক নাই বাবুমশয় ?—সিটি বহুৎ-বহুৎ দিনের কথা আজ্ঞে—নোতুন খনি হৈছেঁ—আড়কাটিয়া টিপসই করিয়ে আমাদের ঘর থেকে লিয়ে এল আজ্ঞে—হপ্তাঁয় হপ্তাঁয় অ্যাত্তো ট্যাকা পাবিক—এরকম আরামে থাকবিক—নগদ ঝুকুড়ি করে ট্যাকা হাতে দিলেক আজ্ঞে—রাইগাঁ থেকে আমাদের পাঁচ জনকে ফুসলে লিয়ে এলোক—আমি, বিরিঞ্চিদাস, চন্দন বৈরিগির ছাওয়াল নিতাই, মাখন হাজরা আর অভিরাম। অভিরাম আর বিরিঞ্চি ছ'মাসের মধ্যি মারা গেলোক আজ্ঞে।···টিপসই করা কাজ কিনা বাবুমশয় ?—চরণের মা বললেক—তু খালাস হ, আমি আমার চরণকে রাইগাঁয়ে লিয়ে গিয়ে আবার সংসারটি পাতবোক। আমি খালাস হবার আগে উ নিজে খালাসটি হোল আজ্ঞে। আমি চরণদাসকে কইলাম—"তুর মা রাইগাঁয়ে ফিরলেক নারে চরণ, রাইমণির গাঁয়ে ফিরে গেলোক। সবাই বললেক—বনমালী, ধৈরয ধরো, আবার বিয়া করো। আমি বুঝলাম—এ যে কি পুত্রশোক তোমরা বুঝবেক নারে ভাই।···উর মা থাকতে কোন খিটা সাহস করত নাই বাবুমশয়। একবার ম্যানেজারবাবু লিয়েছিল চরণের টিপসই, মাগি সিংহীরপারা আপিস চড়াও হয়ে পাটা ছিঁড়িয়ে ছাওলের হাত ধরে বাড়ি লিয়ে এল—উই একাশি নম্বর। উর মা যেতে আমারও মাজা ভেঙে গেল, উকে দিয়ে টিপসই করালেক। উর চেহারার ওপর বরাবর নজোর ছিলোক আজ্ঞে, উকে নোতুন সুড়ঙে দিতে লাগলোক। চন্দনের বিটি লক্ষীর সঙ্গে উর বিয়া দিলাম। নামে লক্ষীটি কাজেও লক্ষীটি বটে। নোতুন সুড়ঙের কাজ কঠিন মেহনতের কাজ, নেশা করিয়ে রাখেক আজ্ঞে। তা লক্ষী যত্তোদিন বেঁচে ছিলোক

নেশাটি ঘরে ঢুকতে দিলেক নাই, নামে লক্ষ্মী কাজেও লক্ষ্মী বটে। বুলত তু নেশা করে ঘরে ঢুকলে ঝাঁটার চোটে তুর সাত পুরুষের নেশা ছুটিয়ে দিব বটে—হুঁ। আমি সে বাপের বিটিট নয়। নিজের কানে শোনা আজ্ঞে। দু' কম বিশ বছর বেঁচে ছিল লক্ষ্মীটি, দুটি ছাওয়াল দিলেক, আর উই চম্পা। গঞ্জভি'তে মিশনরা তিনটি বছর মাইয়া স্কুল বসালেক, চম্পা দু'টি বছর পড়লেক আজ্ঞে। তারপর ছাওয়াল দু'টি মারা গেলেক, তারপর লক্ষ্মীটি—তারপর চ—র—ণ—দা—স এ—ক—দি—ন..."

কথাগুলি ধীরে ধীরে টুলুর কানে মিলাইয়া গেল।

একটি মৃদু উত্তাপের স্পর্শে আবার এক সময় জাগিয়া উঠিল। খোলা জানালা দিয়া প্রভাত সূর্যের কিরণ মুখে আসিয়া পড়িয়াছে। বনমালী ঠিক একই ভাবে তাহার রেকর্ড ঘুরাইয়া চলিয়াছে—"আমি বললাম তা বিটিকে তু ইস্কুলে দিতে গিছলি ক্যানে? আমাদের চাষাভুষাদের মাইয়া ইস্কুলে গেলে বেয়াদবি শিখবেক না তো শিখবেক কি গো?"

আবার চোখ দুইটা বুজিয়া আসিল টুলুর। অসম্পূর্ণ নিদ্রার জড়তায় কথাগুলা একবার স্পষ্ট হইয়া আবার অস্পষ্ট হইয়া গিয়া একটা অলস সঙ্গীতের সৃষ্টি করিতেছে। এখন চম্পার কথাই চলিতেছে। রাত্রের কথাগুলা আবছা আবছা মনে পড়িতেছে—লক্ষ্মীর শাসন—চম্পার মিশন স্কুল—লক্ষ্মীর মৃত্যু—তাহার পর চরণদাস হঠাৎ যেন এদিকে কি একটা করিয়া বসিল।

টুলু জড়তাটা জোর করিয়া ঝাড়িয়া-ঝুড়িয়া উঠিয়া বসিল, বলিল—"বনমালী একটু জল তুলে দিতে পার আমায়? মুখ হাত ধুয়ে আমি একটু চান করে নিই; ঘুম হয় নি, শরীরটা বিশ্রী হয়ে রয়েছে।"

"তা দিবোক, দিবোক নাই ক্যানে গো?" বলিয়া বনমালী উঠিয়া গেল। টুলু বিছানার উপর বসিয়া বসিয়াই আবার ভাবিতে লাগিল। কাল সমস্ত দিনের ঘটনাগুলা একে একে মনে পড়িতে লাগিল; কতকগুলা একেবারে নূতন ধরণের অভিজ্ঞতায় ঠাসা—এমন একটা দিন জীবনে আসে নাই, বিশেষ করিয়া বালিয়াড়ির পথের অভিজ্ঞতা -গভীর রাত্রে। উঃ! মাষ্টার মশাই একদিন বলিয়াছিলেন—টুলু আমাদের ধর্ম থেকে অভিসার কথাটা যদি তুলে দেওয়া যায় তো সঙ্গে সঙ্গেই আমাদের বাঁকা মেরুদণ্ড অন্তত আধাআধি সোজা হয়ে ওঠে। যাক্ এটুকু দরকার ছিল প্রত্যক্ষ করা। টুলু ফিরিয়াছে একেবারেই; কিন্তু ফিরিয়াই পথ যে একেবারে অন্ধকার। কি করিবে সে? কোথায় আরম্ভ করিবে? মাষ্টার মশাই এ কি করিলেন?

চিন্তাটা একসময় অবসন্ন হইয়া ধীরে ধীরে মিলাইয়া গেল; অনিদ্রাদুর্বল মস্তিষ্ক জটিল চিন্তাটাকে যেন বেশিক্ষণ ধরিয়া রাখিতে পারিল না। বনমালী দুই বালতি জল আনিয়া উঠানে রাখিল; ঘুরিয়া ঘুরিয়া স্নানের বন্দোবস্ত করিতেছে। টুলু অন্যমনস্ক ভাবে তাহার শরীরটার দিকে চাহিয়া রহিল—মাজাটা খুব সরু, নিচের দিকটাও ছিমেই বলিতে হয়; কিন্তু মাজার উপরেই পাঁজরা বুক আর কাঁধ লইয়া শরীরের সমস্ত অংশটা ধীরে ধীরে খুব চওড়া হইয়া গেছে, বয়সের ভারে একটু বাঁকা। রংটা অল্প একটু লালচে; সর্বসাকুল্যে বনমালী যেন একটি গোখরো সাপের চক্র।

মুক্ত নেত্রে টুলু অলসভাবে অনেকক্ষণ চাহিয়া রহিল। অজ্ঞাতসারেই একটি দীর্ঘনিঃশ্বাস পড়িল,—বয়সের অনুপাতে চক্রটা ঢের বেশি শিথিল। খনির জীবন—তাহার উপর চরণদাস—তাহার উপর আবার চম্পা।

চিন্তার মোড় ঘুরিল। মাষ্টার মশাই একটা চিঠি দিয়া গেছেন, সেক্রেটরি কাছে আছে। টুলু একটু যেন আলোর আভাস দেখিতে পাইল। বনমালী গিয়া চিঠিটা আগে বদলাইয়া লইয়া আসুক।

স্নানের ব্যবস্থাটা ঠিক হইয়া গেলে বলিল—আমি ততক্ষণ নেয়েটেয়ে নিচ্ছি বনমালী, তুমি এক কাজ করো, দরখাস্তটা দিয়ে আমার চিঠিটা নিয়ে এস সেক্রেটরি বাবুর কাছ থেকে। কতক্ষণ লাগবে বলদিকিন?"

বনমালী রগ চুলকাইতে লাগিল। পথের দীর্ঘতার হিসাব করিয়া লইয়া তাহার সঙ্গে নিজের চলার আন্দাজ এবং তদুপরি সময়ের আন্দাজ মেলানো একটু সময়সাপেক্ষ তাহার পক্ষে, বেশ একটু আয়াস-সাধ্যও। টুলু সেই সময়ের মধ্যে একটু চিন্তা করিয়া লইল। নিজে গেলে কেমন হয়? কিছু দরকার হইলে জিজ্ঞাসা করিয়া লইতে পারে। কি দরকার, অথবা কিছু দরকার আছে কিনা সেটা টের পাওয়া যাইবে ওখানেই—মাষ্টার মশাইয়ের চিঠিটা পড়িয়া—কি ধরণের চিঠি—মাষ্টার মশাই কি সব কথা লিখিয়াছেন তাহা বুঝিয়া।

আসল কথা টুলু একবার দেখিতে চায় লোকটিকে। টুলু ঠিক করিয়াছে মাষ্টার মশাই চিঠিতে কিছু নির্দেশ দেন বা না দেন, তিনি না আসা পর্যন্ত কোন একটা হালকা কাজ লইয়া থাকিবে—যেমন চরণদাসের সঙ্গে দেখা করিয়া আস্তে আস্তে নেশা থেকে তাহাকে নিবৃত্ত করিবার চেষ্টা। এতে কর্তৃপক্ষের সঙ্গে সংঘর্ষের সম্ভাবনা নাই। কিন্তু আজ না থাক্, খনি-বস্তি লইয়া কাজ করিতে গেলে এক দিন সংঘর্ষ হয় তো অবশ্যম্ভাবী। তাই লোকটাকে দেখিয়া রাখিতে ইচ্ছা হইতেছে।

আর, চরণদাসকে একটু কথা বুঝিবার মতো অবস্থায় পাইতে হইলে খনিতে দেখা করা ভিন্ন তো উপায় নাই। তাহার জন্য ম্যানেজারের হুকুম দরকার। পরিচয় নাই, শুধু শুধু হুকুমের জন্য যাওয়াটাও অস্বস্তিকর। চিঠির গোলমালটি বেশ একটা সুযোগ দিয়াছে।

টুলু বলিল—"থাক্, আমি নিজেই যাচ্ছি বনমালী। তুমি

এক কাজ করো ; মাষ্টার মশাইয়ের ভাঁড়ার খোলা আছে ?"

বাসার চাবির সঙ্গে আর একটা চাবি বাঁধা ছিল, বনমালী কোমরের ঘুনসি হইতে খুলিয়া বলিল—"ই চাবিটি ভাঁড়ারের আছে বটে।"

"দেখো তো কি আছে ; রুটি, পরোটা, হালুয়া, যা হয় কিছু করে দাও একটু ; না হয় কাঠ-খোলায় দু'টো চাল ভেজেই দাও, একটু তাড়াতাড়ি।"

১১

বনমালী আয়োজনটা তাড়াতাড়িই করিয়া দিল, টুলুর জলযোগ শেষ হইলে কিন্তু বেশ একটু দেরি করিয়াই যাইতে পরামর্শ দিল, বলিল—"ম্যানেজার বাবু ওঠেন অনেক বেলায়।" টুলু যখন পৌঁছিল তখন প্রায় ন'টা।

হলদে রং-করা আমেরিকান ক্যাসানের দোতলা বাড়ি, দেয়াল, আলসে, থাম প্রভৃতির প্রান্তগুলায় কালো ধর্ডার টানা। গাড়ি বারান্দায় একটা মোটর দাঁড়াইয়া আছে। বাড়ি থেকে একটুখানি সরিয়া দুটি বড় বড় ঘর, বাড়ির সঙ্গে কড়ি-ডোর দিয়া সংযুক্ত। এরই একটি বাড়ি আপিস-ঘর, সকালের দিকে ম্যানেজারবাবু এইখানেই কাজ করেন ; দেখা-সাক্ষাৎ, নালিশ-ফরিয়াদ—সে সবও এইখানেই সম্পন্ন হয়। টুলু খবর লইয়া জানিতে পারিল একটু আগে নামিয়াছেন।

ঘর দুইটার চারি দিকেই খানিকটা করিয়া বারান্দা। সামনের বারান্দায় কড়া রোদ আসিয়া পড়িয়াছে। ঘরের সামনেই খস-খস দিয়া খানিকটা ঘেরা, দরজায় একটা সবুজ পর্দা টাঙানো। বারান্দা থেকে একটু সরিয়া একটা মাঝারি গোছের আমগাছ, তাহার ছায়ায় দাঁড়াইয়া একবার চারি দিকে চাহিয়া দেখিল—একটা লোক খুঁজিতেছে যাহাকে দিয়া খবরটা দেওয়া যায়। ঘরের ভিতরে ভারি গলায় কে কথা কহিতেছে ; নিশ্চয় ম্যানেজার।

মনে হইল এদিকটায় রোদ, আর্দালি-জাতীয় কেহ ওদিকটায় থাকিতে পারে।

তাহারই উদ্দেশে ঘুরিয়া ওদিকে যাইতেই একেবারে ম্যানেজারের সামনে পড়িয়া গেল। ম্যানেজার কে সেটা অবশ্য আন্দাজেই বুঝিল।

বারান্দার ওদিকটায় একটা ইজিচেয়ারে দুই পা তুলিয়া গা এলাইয়া পড়িয়া আছেন। পরনে বেশ ভাল করিয়া কোঁচানো ধুতি, গায়ে একটা জালিদার গেঞ্জি, তাহার নিচে সোনার একগাছা সরু চেন চিক্ চিক্ করিতেছে, দক্ষিণ বাহুতে একটা সোনার তাগা, ঢিলা সোনার চেনে আটকানো। চেয়ারের হাতলে একটি সিগরেটের টিন, ডান হাতের আঙুলে একটা জলন্ত সিগরেট।...ম্যানেজারবাবু আবার কর্তাদের বাড়ির জামাই এক দিক দিয়া।

মুখটা এই দিকে ফিরানো ; কাহার সহিত গল্প করিতেছেন, থামের-আড়ালে পড়িয়া যাওয়ায় টুলু তাহাকে দেখিতে পাইতেছে না।

দূর থেকে দেখিয়াই প্রশ্ন করিলেন—"কি চাই ?"

টুলু একটু অপ্রস্তুত হইয়া গেল, বলিল—"ম্যানেজারবাবুর সঙ্গে একটু দরকার আছে, খবর দেওয়ার কোন লোক ওদিকে না পাওয়ায় ভাবলাম..."

"উঠে আসুন ; আমিই।"

প্রথম কুণ্ঠা এড়াইয়া উঠিয়া যাইতে টুলুর যতটুকু বিলম্ব হইল, তাহার মধ্যেই আবার ওদিকে গল্প জুড়িয়া দিয়াছেন—"হুঁ, তা হলে তুই আমার কথার উত্তর দে..."

টুলু কাছে গিয়া একটু থতমত খাইয়া দাঁড়াইয়া পড়িল ; পিছনে দুইটি হাত দিয়া থামে ঠেস দিয়া দাঁড়াইয়া চম্পা। একবার মুখ ফিরাইয়া টুলুর পানে চাহিল, তাহার পর যেন কোন পরিচয়ই নাই এই ভাবে মুখটা ম্যানেজারের পানে ফিরাইয়া লইয়া সমস্ত শরীরটাতে একটু দোল দিয়া আবদারের স্বরে বলিল—"না, আমি ওসব শুনতে চাই না, যাঃ!"...

একটা চেয়ার ছিল, ম্যানেজার টুলুকে দেখাইয়া বলিলেন —"বসুন। আগে চম্পাবতীর কথাটা সেরে নিই। Ladies First—খনির বাইরে চম্পা নিজেকে লেডিই বলে কিনা... কি রে, না ?"

সিগারেটটা নিভিয়া গিয়াছিল, আবার দেশলাই জ্বালিয়া হাতের আড়াল দিয়া ধরাইতে লাগিলেন, মুখে হাসি লাগিয়া আছে।

বসিবার জন্য অবশ্য অনুমতির দরকার ছিল না টুলুর, সে দিক দিয়া তাহার মর্যাদাজ্ঞান যথেষ্ট আছে, ইদানীং কি করিয়া যেন বাড়িয়াছেও, বসে নাই এইজন্য যে হঠাৎ এমন একটা অভিনব অবস্থার মধ্যে আসিয়া পড়িয়াছে যে নিজেকে লইয়া কি করিবে যেন বুঝিতেই পারিতেছে না। চম্পাকে সে আজ অনেকটা জানে, সে দিক দিয়া বিস্ময় নাই, তবে ব্যাপারটা অন্য দিক দিয়া অত্যন্ত বিসদৃশ যেন—এত বড় খনির ম্যানেজার—আর একটা লোক আসিয়া পড়িয়াছে, তবু তো এতটুকু "কিন্তু" ভাব নাই! বরং ডাকিয়া আনিল আরও!

"হ্যাঁ, এই যে।"—বলিয়া টুলু চেয়ারটা নিজের দিকে টানিয়া লইয়া বসিয়া পড়িল। দৃষ্টিটা কোথায় রাখিবে স্থির করিতে পারিতেছে না।

চম্পা আবার শরীরে একটা মৃদু দোলা দিয়া বলিল—"আমি অত ইংরেজী জানি না, লেডি-কেডি কাকে বলে বুঝি না। আপনার যা দোষ—কথার ভাঁওতায় ফেলে আসল কাজ চাপা দেবেন—দেখে আসছি তো ?...যাঃ, আমি গরীব মানুষ, গতর খাটিয়ে খাই, আমি একটা ছেলের খরচ জোগাব কোথা থেকে ?"

চেষ্টা সত্ত্বেও টুলুর দৃষ্টিটা কে যেন টানিয়া চম্পার মুখের ওপর ফেলিল, তাহার দৃষ্টি কিন্তু ম্যানেজারের মুখের ওপর, একচুল এদিক-ওদিক নাই।

ম্যানেজার একটু হাসিয়া বলিলেন—"একটা শিশু, তার আবার খরচ! বেশ, যা লাগে দুধের দু'এক টাকা আমার কাছ থেকে নিয়ে যাস। কোম্পানী দিতে যাবে কেন? তুই দেমাক দেখিয়ে নিতে গেলি…"

এবার চম্পা অঙ্গ পরিবর্তন করিল, মানভরে মুখটা ঘুরাইয়া চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল। বোধ হয় হাতে পাকানো সিগারেট আবার নিভিয়া গেছে; ধরাইতে ধরাইতে ম্যানেজারের মুখে একটু হাসি ফুটিল, একটু চোখ তুলিয়া দেখিলেন, তাহার পর দেশলাইটা ফেলিয়া দিয়া টুলুর দিকে চাহিয়া বলিলেন- "হ্যাঁ, আপনার?…"

টুলু ক্রমেই যেন জমিয়া যাইতেছিল। এরকম অসম্ভ অবস্থায় জীবনে কখনও পড়ে নাই, যদিও ম্যানেজারের গাঢ় স্বর আর ঈষৎ রক্ত চাহনি দেখিয়া বুঝিতে পারিতেছিল সমস্ত ব্যাপারটার মধ্যে রাত্রির অসংযম-অনিয়মের একটা জের আছে, পূর্ণ প্রকৃতিস্থ একটা মানুষ নয়। নিজের কথাটুকু বলিয়া বিদায় লইবার ফাঁক একটুও না পাইয়া আরও অস্থির হইয়া পড়িতেছিল, ম্যানেজারের প্রশ্নে তাড়াতাড়ি ঘাড়টা একটু বাড়াইয়া উত্তর দিতে যাইবে, চম্পার উত্তর আসিয়া পড়িল। ঘাড়টা ঘুরাইয়া রাগ রাগ স্বরে বলিল- "দেমাক দেখলেন! ভাল করতে গেলুম- মরছিল ছেলেটা…যশের দুনিয়া তো নয়…"

ম্যানেজার মৃদু মৃদু হাসিতে লাগিলেন। টুলু আবার এক বার চেষ্টা করিল- "আমার দরকার -" বলিয়া আরম্ভও করিয়াছে, চম্পা প্রবল আব্দারে মাথা নাড়িয়া বলিল—"না, আপনাকে করে দিতেই হবে ব্যবস্থা- কোম্পানীকে দিয়ে একটা পাকারকম। আজ নয় শিশু, বাড়বে না? এক ঝিনুক দুধ খেয়েই থাকবে? তা ভিন্ন জামা আছে, বিছানা মাদুর আছে…না, আমি অত খরচ পোয়াতে পারব না…"

"গেছলি কেন ভার নিতে?"

বেশ বুঝা যায় কথা বাড়াইয়া বাড়াইয়া শুধু সংসর্গলাভের মেয়াদটা বাড়ানো।…টুলুর মনে হইতেছে নরক-যন্ত্রণা কি এই ধরণেরই একটা কিছু?

চম্পা উত্তর দিল—"চোর-দায়ে ধরা পড়ে গেছি!"

ম্যানেজার হাসিয়া বলিলেন—"গেছিস বইকি!—নিজে দিয়েছিস ধরা।"

তাহার পর হঠাৎ চেয়ারে সোজা হইয়া বসিলেন, বলিলেন,—"হ্যাঁ, এই যে, বেশ মনে পড়ে গেছে—তুই যেমন মা, শুনলাম ছেলেটার তেমনি জুটতে একটা বাপও জুটে গিয়েছিল—মাষ্টারমশাইয়ের কে এক জন আত্মীয়—বেশ টাকাওয়ালা…"

চম্পার মুখটা মুহূর্তেই রাঙা টকটকে হইয়া উঠিল, এবং এইবার তাহার দৃষ্টিটাকে কে যেন টানিয়া লইয়া গিয়া টুলুর মুখের ওপর ফেলিল—অবশ্য নিতান্ত এক খণ্ড মুহূর্তের জন্যই, তখনই চম্পা যেন আরও জোর করিয়া সেটাকে ফিরাইয়া লইল।

টুলুও আর ক্ষণমাত্র বিলম্ব করিল না, মনের অস্থিরতাটুকুকে সংযত করিবার চেষ্টা করা সত্ত্বেও যেন আপনা হইতেই দাঁড়াইয়া উঠিল, পকেট হইতে দরখাস্তের খামটা বাহির করিয়া বাড়াইয়া ধরিয়া বলিল- "ওঁর এই দরখাস্তটা, বনমালী ভুল করে এর বদলে চিঠিটা রেখে গেছে।"

ম্যানেজারের চেহারাটা ধীরে ধীরে পরিবর্তিত হইয়া গেল। এতক্ষণ মুখে চোখে যে একটা হালকা কৌতুকের ভাব ছিল, একেবারে নিশ্চিহ্ন হইয়া মুছিয়া গেল। ভ্রূ একটু কুঞ্চিত, চাহনি তীক্ষ্ণ, তাহার পিছনে ইতিপূর্বেই যেন একটা কুটিল চক্রান্ত আরম্ভ হইয়া গেছে। কয়েক মুহূর্ত টুলুর পানে চাহিয়া ধীরে ধীরে প্রশ্ন করিলেন—"আপনিই মাষ্টারমশাইয়ের আত্মীয়?"

হঠাৎ এই ভাবপরিবর্তনে টুলু একটু বিস্মিত নিশ্চয়ই হইল, তবে উত্তর বেশ সহজ কণ্ঠেই দিল; হয়তো হিসাব করিল না, না হয় জানিয়া শুনিয়াই বলিল - "আজ্ঞে হ্যাঁ; চিঠিটা আমার জন্যেই রেখে গেছেন।"

কথাটা বলিয়া মনে পড়িল, সে তো এখানকারই ব্যানার্জি কোম্পানীর বাড়ির ছেলে। কিন্তু সে তথ্যটা ম্যানেজারের জানা নাই দেখিয়া আর কি ভাবিয়া শোধরাইতে গেল না। একটু উঠিয়া দরখাস্তটা বাড়াইয়া দিয়া বলিল - "চিঠিটা কাছেই আছে আপনার?"

ম্যানেজার দরখাস্তটা হাতে লইয়া পড়িতে লাগিলেন, কিন্তু যাহা সময় লাগিতেছে তাহাতে অমন ডজনখানেক দরখাস্ত পড়িয়া শেষ করা যায়। হঠাৎ হাওয়াটা যেন গুমোট হইয়া গেছে। টুলু বেশ অস্বস্তির সঙ্গে খানিকটা অপেক্ষা করিল, তাহার পর তাহার দৃষ্টিটা আপনা হইতেই একবার চম্পার মুখের উপর গিয়া পড়িল; চম্পা ভীত উৎকণ্ঠার দৃষ্টিতে ম্যানেজারের নিচু-করা মুখের দিকে চাহিয়া আছে।

টুলু বলিল—"চিঠিটা…"

"অ্যাঁ?—এই যে।"—বলিয়া ম্যানেজার মুখ তুলিলেন। একটা মালী চৌহদ্দির দেয়ালের গোড়ায় ফুলগাছ নিড়াইতেছিল তাহাকে ডাকিয়া বাড়ীর ভিতর হইতে চিঠিটা চাহিয়া আনিতে বলিলেন। সে চলিয়া গেলে টুলুকে প্রশ্ন করিলেন —

"এখানে কি করেন?"

"করি না কিছু।"

"কত দিন হ'ল এসেছেন?"

"মাসখানেকের কমই।"

"হুঁ…"

অন্য দিকে মুখ করিয়া কি ভাবিলেন একটু, তাহার পর আবার—

"এর আগে কি করতেন ?"

টুলু বিরক্ত হইয়া উঠিতেছিল, তবু সংযতভাবেই বলিল—"তেমন কিছু নয়, পড়তাম।"

মালী চিঠিটা লইয়া আসিলে টুলু একটু হাত বাড়াইতে ম্যানেজার মালীটাকেই বলিলেন—"না, এদিকে।"

পড়া চিঠি, তবু নিজের হাতে লইয়া একবার মনে মনে পড়িয়া গেলেন। তাহার পর সেটা দরখাস্তের সঙ্গে চেয়ারের হাতলের ওপর রাখিয়া সিগারেটের টিনটা চাপা দিয়া আবার ভাবিতে লাগিলেন। টুলুর কানের গোড়া পর্যন্ত আবার রাঙা হইয়া উঠিয়াছে, বলিল—"আমার দেরি হয়ে যাচ্ছে—অনেকটা দূর..."

সংযত হইয়া বলিবার চেষ্টা সত্ত্বেও অধৈর্যটা একটু প্রকাশ হইয়াই পড়িল। ম্যানেজার বলিলেন—"চিঠি আপনাকে দিতে পারি না।"

"সে কি!—কেন ?"

দুই জনের দৃষ্টি বেশ সোজাসুজি দুই জনের মুখের ওপর, একদিকে ভ্রূকুটি, একদিকে বিদ্রোহ। ম্যানেজার বলিলেন—"ও চিঠি আমাদের দরকার।"

"আপনাদের কি দরকার জানি না, তবে চিঠিটা আমার, সবচেয়ে বেশি দরকার তো আমারই।"

এতটা উদ্ধত উত্তরে ম্যানেজার যেন অভ্যস্ত নয় এইভাবে চাহিয়া ঘাড়টা ফিরাইয়া লইলেন।

চম্পা যেন কঠিন হইয়া থামটার সঙ্গে এক হইয়া গেছে।

ম্যানেজার আবার দৃষ্টি ফিরাইয়া বলিলেন—"আপনার দরকার, একবার পড়ে নিলেই হবে, আমাদের দরকার তার পরে পর্যন্ত। দিতে পারি, কিন্তু প্রতিজ্ঞা করতে হবে পড়ে এক্ষুনি ফিরিয়ে দেবেন।"

টুলু চেয়ারের হাতলটা চাপিয়া ধরিল, বলিল—"আমি অমন প্রতিজ্ঞা করি না—নিজের জিনিস সম্বন্ধে।"

ম্যানেজার তাহার উদ্ধত দৃষ্টির পানে একটু স্থিরভাবে চাহিয়া রহিলেন, তাহার পর হঠাৎ সিগারেটের টিনটা সরাইয়া, চিঠিটা তুলিয়া লইলেন, বলিলেন—"শুনুন।"

টুলুকে আর একটুও সময় না দিয়া পড়িয়া যাইতে লাগিলেন—

"কল্যাণাস্পদেষু, আমায় নিতান্ত হঠাৎ চলে যেতে হ'ল, কেন তা এসে বলব। আপাতত এক সপ্তাহের ছুটির দরখাস্ত করেছি, কিছু বাড়াতেও পারি। তোমাকে খনিতে নিয়ে যাওয়ার উদ্দেশ্য আমার সিদ্ধ হয়েছে; কদর্যতা আর অত্যাচারের মূর্তি নিজের চোখে না দেখলে তোমার মনের দ্বন্দ্ব মিটত না, তুমি নিশ্চিত ভাবে ফিরতে না। এবার তুমি সত্যিই ফিরলে। কাজের কথায় আসা যাক—জীবনে কোন্ অদৃষ্ট শক্তির কাছ থেকে যে নির্দেশ আসে, বিধান পাওয়া যায়, বলা যায় না,—কাজ তুমি পেয়েছ, সেই অদৃষ্ট বিধানেই। তোমার কাজ তিনটি বিষয় নিয়ে হবে—বস্তিতে নেশার বিরুদ্ধে অভিযান, শিশুমঙ্গল, আর দুর্নীতির সঙ্গে লড়াই। সেই অদৃষ্ট শক্তি এই তিনটিই তোমার সামনে ধরে দিয়েছেন চরণদাস, হীরক; তৃতীয়টির নাম না করলেও বুঝতে তোমার দেরি হবে না। একটা মেয়ে সুধরে গেলে একটা জাতি সুধরে যেতে পারে এই আমার বিশ্বাস টুলু। আমি তোমার কর্মপন্থা বেঁধে দিলে বোধ হয় অন্যরকম ব্যবস্থা করতাম; কিন্তু এই বিধানের মধ্যে একটা সুবিধে এই যে এতে খনির কর্তৃপক্ষদের সঙ্গে কোন সংঘর্ষের সম্ভাবনা নেই—অন্তত আপাতত নেই—তুমি ধীরে সুস্থে কাজ করে যেতে পারবে। তারপর আবার হয়ত নতুন বিধানই পাবে সেই অদৃষ্ট শক্তির কাছ থেকে। তখন আমিও পাশে থাকব। আর সময় নেই, দশটি মাইল হেঁটে আমায় সকালে ট্রেন ধরতে হবে। তুমি এখানেই থেকো, কাজের সুবিধে হবে। বনমালীর কাছে ভাঁড়ারের চাবি দিয়ে গেলাম, ওই চাবিরই একটা তালা বাক্সয় লাগানো, তাইতে খরচপত্রের টাকা আছে। ইতি মাষ্টারমশাই।"

শেষ করিয়া ম্যানেজার টুলুর দিকে মুখ তুলিয়া চাহিলেন, বলিলেন—"এই চিঠি।"

টুলু স্থির দৃষ্টিতে চাহিয়া বলিল—"বেশ ত আপনিও সাহায্য করুন, এর মধ্যে অন্যায়টাই বা কোথায়, আর চিঠিটা না দেওয়ারই বা কি আছে ?"

ম্যানেজারের যে রক্তাভ চোখে একটু আগে হালকা রহস্যের মাদকতা লাগিয়াছিল, সে দুইটা ক্রোধে একেবারে উগ্র হইয়া উঠিল, চেয়ারে একেবারে সোজা হইয়া বসিয়া, গলা চড়াইয়া বলিলেন—"তোমার মধ্যে যে দুঃসাহস আছে তা মুখ খুলতেই টের পেয়েছি, তবে সেটা যে এত বেশি তা বুঝতে পারি নি। তুমি আমার খনির কুলিদের বিগড়াবার জোগাড় করছ—তোমাতে আর মাষ্টারমশাইতে মিলে—আর আমি তোমায় তাইতে সাহায্য করব?—I am surprised at your cheek!—তুমি—তুমি—"

"এর মধ্যে বিগড়ে দেওয়ার কি দেখলেন ?"

টুলুর কণ্ঠস্বর সংযতই, কিন্তু চোখের দীপ্তি আরও উজ্জ্বল।

ম্যানেজারের গলা আর এক পর্দা চড়িল—"সমস্তটাই বিগড়াবার ব্যাপার, I can see through the game আমি আজ ম্যানেজারি করছি না, আর এ সব ব্যাপার কি করে দাবাতে হয় ভাল রকম জানি।—সংঘর্ষ!...কদর্যতা আর অত্যাচারের মূর্তি!—দেশপ্রেমিকের দল জুটেছেন!—অত্যাচারের আসল মূর্তি দেখতে এখনও ঢের বাঁকি আছে!"

"যদি বাড়াচ্ছেনই কথা—নয় কি কদর্যতা আর অত্যাচার? —মেয়েটা যে করে বেঘোরে মারা গেল ..."

ম্যানেজার একবার হুমার দিয়ে উঠলেন, চেয়ারের দুইটা হাতল ধরিয়া আর একটু উঠিয়া বলিলেন—"But that's

none of your business!...তোমাদের তার সঙ্গে কি সম্পর্ক?—আমার খনির মজুর—আমি মালিক..."

টুনু নিজের কণ্ঠস্বরটা একটুও বিচলিত হইতে দিল না, তবে বলিবার ভঙ্গিতে তাহার মনের দৃঢ়তা অক্ষরে অক্ষরে ফুটিয়া উঠিতে লাগিল; মেরুদণ্ডটাকে আরও সিধা করিয়া লইয়া ম্যানেজারকে বাধা দিয়াই বলিল—"আপনি মজুরদের যা দেন তার বদলে খানিকটা শরীরের শক্তি পাবার অধিকারী আপনি; নিচ্ছেন কিন্তু তার স্বাস্থ্য, তার প্রাণ, তার নীতি-জ্ঞান, তার ধর্ম—মানে, মনুষ্যত্ব বলতে যা বোঝায় তার সব-টুকুই। কোন্ অধিকারে আমরা তা বুঝতে পারি না, আর বুঝতে পারি না বলে আমরা মাঝখানে গিয়ে দাঁড়াবই। আশা ছিল আমার হাতে ভগবান নিজে যে কাজটুকু তুলে দিয়েছেন তাতে আপনাদের কিছু বলবার থাকবে না, কেননা, ওদের মনুষ্যত্বের যে দিকটা তার সঙ্গে সব মানুষেরই একটা সহজ সম্বন্ধ আছে,—আপনার যেমন ওদের খানিকটা দেহের শক্তি নেবার অধিকার আছে, আমারও তেমনি ওদের মনুষ্যত্বকে জাগিয়ে রাখবার অধিকার আছে—বোধ হয় বেশি। এতে বিপদ যদি এসেই পড়ে আমি তোয়ের আছি।"

কথাগুলা এক তোড়ে এমন বলিয়া গেল, ম্যানেজারকে বাধা দেওয়ার অবসরই দিল না! বোধ হয় বিস্ময়ে ক্রোধে তাঁহার কতকটা বাকরোধের মতোও হইয়া গিয়া থাকিবে; টুনু থামিলে দাঁড়াইয়া উঠিয়া বাহিরের দিকে হাত দেখাইয়া আরও উগ্র ভাবে গর্জন করিয়া উঠিলেন—"Get out! out with you!"—"বেরিয়ে যাও!—শুধু এখান থেকে নয়, ও বাসায় পর্যন্ত তুমি আর ঢুকতে পাবে না। ও-সব আত্মীয়-টাত্মীয় আমি বুঝি না...গঞ্জডিহিতেও যদি তোমায় চব্বিশ ঘণ্টার পরে দেখি..."

মালীটা নিড়ানি হাতে ঘুরিয়া দাঁড়াইয়াছে, সোফারটা গাড়ি-বারান্দা থেকে খানিকটা আগাইয়া আসিয়া থমকিয়া দাঁড়াইয়াছে, বাড়িটার দোতলায় দুই-তিনটা জানালা খট্-খট্ করিয়া খুলিয়া গেল।...ম্যানেজারের ওঠার সঙ্গে সঙ্গে টুনুও দৃপ্ত ঋজুতায় উঠিয়া দাঁড়াইল, ঘাড়টা শুধু একটু হেলিয়া গেছে; চোখের উপর চোখ রাখিয়া সেই রকম দৃঢ় অবিচলিত কণ্ঠে বলিল—"আপনার কথায় মনে হচ্ছে কুলিদের ভয় দেখিয়ে দেখিয়ে ভয় দেখানোর একটা বদ অভ্যাস দাঁড়িয়ে গেছে আপনার। তবে শুনুন, মাষ্টারমশাই আমার আত্মীয় নয়—আত্মীয়ের চেয়ে বড় বলে আমি আলগা ভাবে তখন স্বীকার করেছিলাম; কিন্তু তবু আমি ঐ বাড়িতেই চললাম, আপনার সাধ্যি থাকে আপনি আমায় জোর করে সেখান থেকে বের করে দেবার চেষ্টা করবেন।"

যেমন অবিচলিত কণ্ঠস্বর তেমনি অবিচলিত পদক্ষেপে বারান্দা হইতে নামিয়া গেল।

সেখার আগেই সংঘর্ষ আরম্ভ হইয়া গেল।

ক্রমশঃ

ঋগ্বেদের দাস ও দস্যু

শ্রীননীমাধব চৌধুরী

ঋগ্বেদের দাস ও দস্যু সম্বন্ধে নৃতত্ত্ব-বিজ্ঞানী পণ্ডিতগণের মধ্যে প্রচলিত মত এই যে, তাহারা ভারতবর্ষের বেদ্দাইক বা প্রোটো-অষ্ট্রালয়েড গোষ্ঠীর আদিবাসী। অবৈজ্ঞানিক প্রচলিত মত এই যে, তাহারা বর্বর, অনার্য, কৃষ্ণকায় আদিবাসী। ইহা ছাড়া আরও কতকগুলি মত প্রচারিত হইয়াছে। একটি মত এই যে, ঋগ্বেদীয় দাস ও দস্যু "দ্রাবিড়" জাতীয়। এখানে প্রচলিত নৃতত্ত্ব-বৈজ্ঞানিক মতকে আলোচনার সূত্ররূপে গ্রহণ করা যাইতে পারে। অর্থাৎ ঋগ্বেদীয় দাস ও দস্যু প্রোটো-অষ্ট্রালয়েড বা সংক্ষেপে মুণ্ডা গোষ্ঠীর আদিবাসী, সুতরাং অনার্য। এই মতানুসারে racial origin বা জাতিতে, ভাষায়, কৃষ্টিতে ও ধর্মে দাস ও দস্যুগণ আর্য জাতি হইতে ভিন্ন ছিল ইহা মনে করিতে হইবে। এই প্রাক্-বৈদিক আদিবাসী-দিগকে পরাজিত ও বিতাড়িত করিয়া আর্যগণ সিন্ধু উপত্যকায় আপনাদিগের অধিকার ও সভ্যতা প্রসারিত করেন। এক শতাব্দীর অধিককাল এই মত এরূপ দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে যে, যদি এ কথা বলা হয় যে এই মতের সত্যতায় সন্দেহ উপস্থিত হইতে পারে এরূপ বহু প্রমাণ ঋগ্বেদে পাওয়া যায়, তবে তাহা অপব্যাখ্যা বলিয়া অগ্রাহ্য হইবার সম্ভাবনা। যদি এই প্রমাণের বলে মত প্রকাশ করা হয় যে ঋগ্বেদীয় দাস ও দস্যু বা তথাকথিত অনার্য, বর্বর আদিবাসী ভাষায়, কৃষ্টিতে, ধর্মে, হয়ত জাতিতেও, আর্য হইতে পারে, সে মত সহজে গ্রাহ্য হইবার সম্ভাবনা দেখা যাইতেছে না। সুতরাং প্রারম্ভে এ সম্বন্ধে সুস্পষ্ট মত প্রকাশে বিরত থাকিয়া ঋগ্বেদ হইতে কতক-গুলি প্রমাণ উপস্থিত করা হইতেছে। এই সকল প্রমাণ বিচার করিয়া কি সিদ্ধান্তে আসা সম্ভব পরে দেখা যাইবে।

বর্তমান আলোচনার গোড়ায় একটি কথা প্রসঙ্গ-ক্রমে বলিয়া রাখা দরকার। ঋগ্বেদীয় দাস ও দস্যু যে বেদ্দাইক বা প্রোটো-অষ্ট্রালয়েড গোষ্ঠীর আদিবাসী নৃতত্ত্ব-বিজ্ঞানীদিগের

এই মত অনুমান মাত্র। Racial classification সম্বন্ধে কোন সিদ্ধান্তে পৌঁছিতে হইলে যে সকল সাক্ষ্য-প্রমাণ প্রয়োজন বর্তমান ক্ষেত্রে সেরূপ কোন প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে বলিয়া দাবি করা হয় নাই, প্রমাণ পাওয়া সম্ভবও নহে। বৈদিক দাস ও দস্যুর racial origin কিরূপ এবং কেহ কেহ কাস্পিয়ান সমুদ্রের পূর্ব অঞ্চলের যে প্রাচীন Daha হইতে বৈদিক দাস ও দস্যু অভিন্ন মনে করেন সেই "অনার্য" Daha জাতির racial origin কিরূপ তাহা সঠিক নির্ণয় করিবার উপায় নাই। প্রকৃত প্রস্তাবে ঋগ্বেদীয় দাস ও দস্যু সম্বন্ধে এই প্রচলিত মতের গোড়ায় রহিয়াছে মাত্র অনুমান ইহা স্মরণ রাখা প্রয়োজন। এই অনুমান নৃতত্ত্ব-বিজ্ঞানের সূত্রমতে অনুসন্ধান প্রসূত বৈজ্ঞানিক অনুমান নহে, ইহা সাহিত্যিক মালমশলা দিয়া নৃতত্ত্ব-বিজ্ঞানের সৌধ রচনার বিলাস।

ঋগ্বেদের দাস ও দস্যু সম্বন্ধে প্রথমেই প্রশ্ন উঠে, ইহারা কি দুইটি ভিন্ন জাতি না একটি জাতি? দেখা যায় যে এই প্রশ্নটি বিশেষ ভাবে পণ্ডিতগণের দৃষ্টি আকর্ষণ করে নাই। ইন্দ্রকে কখন দাস কখন দস্যুকে ধ্বংস করিবার জন্য আহ্বান করা হইয়াছে। একটি ঋকে বলা হইয়াছে যে ইন্দ্র দস্যুদিগকে সদ্গুণ হইতে বঞ্চিত করিয়াছেন, তিনি দাসদিগকে নিন্দনীয় করিয়াছেন। এখানে দাস ও দস্যু একই শ্রেণীর শত্রুর সম্বন্ধে প্রযুক্ত বলিয়া মনে হয়। ঋগ্বেদের কতকগুলি প্রয়োগ হইতে দেখা যায় যে একই শত্রুকে একবার দাস, পুনরায় দস্যু, কদাচিৎ অসুর বলা হইয়াছে। নমুচিকে দাস ও দস্যু দুই নামেই উল্লেখ করা হইয়াছে। পিপ্রু, শুষ্ণ ও মহান অর্বুদ (মহাস্তং চিদর্বুদম্) দস্যু। ত্রিৎসু গোষ্ঠীর দিবোদাসের সহিত প্রসিদ্ধ যোদ্ধা ও বিপুল ঐশ্বর্য্যশালী শম্বরের চল্লিশ বৎসর ব্যাপী সংগ্রাম চলিয়াছিল। শম্বরকে দাস ও দস্যু উভয় নামে অভিহিত করা হইয়াছে। বৃত্রকে দাস ও দেব বলা হইয়াছে। বঙ্গৃদ, করঞ্জ ও পর্ণয়কে দস্যু ও অসুর বলা হইয়াছে। দস্যু ও দাসের ঐশ্বর্যের উল্লেখ ও ইন্দ্রাদি দেবতাকে দস্যু ও দাসকে ধ্বংস করিতে আহ্বান করিবার সময়ে উভয়ের মধ্যে কোনরূপ পার্থক্য মনে রাখা হইয়াছে বলিয়া বোধ হয় না। কিন্তু ইন্দ্রের বহু প্রসিদ্ধনামা প্রবল শত্রুকে দাস, দস্যু, অসুর কোন নামই দেওয়া হয় নাই, ইহা লক্ষ্য করিবার বিষয়। দুই জন প্রবল প্রতাপশালী শত্রুর কথা বলা যাইতে পারে। দশ রাজার যুদ্ধে যমুনা অঞ্চলের জাতিগুলি ভেদের নেতৃত্বে সুদাসের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করে। ভেদের সম্পর্কে বলা হইয়াছে, যে ইন্দ্রের স্তব করে এই ভেদ তাহারই অনিষ্ট করে। "আয়ুধ দ্বারা অপ্রাপ্ত" ভেদকে বধ করিবার জন্য ইন্দ্র বরুণকে আহ্বান করা হইয়াছে। কিন্তু ভেদকে দাস বা দস্যু কোন নামেই অভিহিত হইতে দেখা যায় না। আর এক জন প্রসিদ্ধ যোদ্ধা কৃষ্ণ। দশ সহস্র যোদ্ধা লইয়া অংশুমতী নদীর তীরে কৃষ্ণ অমিত বিক্রমে যুদ্ধ করিয়াছিলেন। সূর্যের ন্যায় দীপ্যমান "অদেব" কৃষ্ণকে দাস, দস্যু বা অসুর, কোন নামেই অভিহিত করা হয় নাই, তাঁহাকে অদেব বা অবিশ্বাসী এই মাত্র বলা হইয়াছে। ঋগ্বেদে আর্য বর্ণ ও দাস বর্ণের উল্লেখ আছে। তাহা হইতে দাস নামে অভিহিত একটি শত্রু গোষ্ঠীর অস্তিত্বের পরিচয় পাওয়া যায়। কিন্তু দস্যুদিগের বহু উল্লেখ থাকিলেও দস্যু বর্ণের উল্লেখ পাওয়া যায় না। ইহা হইতে মনে করা যাইতে পারে যে দাস ও দস্যু একই শত্রুগোষ্ঠী।

দাস ও দস্যু প্রধানদিগের বিস্তীর্ণ রাজ্য, বিপুল ঐশ্বর্য ও প্রবল পরাক্রমের উল্লেখ পুনঃপুন পাওয়া যায়। পিপ্রুর পুর-সমূহ, দাসের নবনবতি পুর, শম্বরের নবনবতি পুর, বঙ্গৃদ নামক অসুরের এক শত পুর, দস্যুদিগের লৌহনির্মিত পুর, শম্বরের এক শত প্রাচীন পুর ও প্রস্তরনির্মিত পুর, শুষ্ণের চলন্ত পুর (পুরং চরিষ্ণুম্), "অদেব" বা অবিশ্বাসীদিগের পুর প্রভৃতির বহু বার উল্লেখ করা হইয়াছে। পার্বত্য অঞ্চল ও সমতল ভূমিতে অবস্থিত দাসদিগের রাজ্য, দাসদিগের অধিকৃত গো, অশ্ব, রথ, পুর মধ্যে সঞ্চিত বিপুল ধনের বহু উল্লেখ আছে। আপনাদিগের গোধন লইয়া আর্যগণ গৌরব বোধ করিতেন, দাস ও দস্যুদিগেরও বিস্তীর্ণ গোষ্ঠ ছিল। সামরিক পরাক্রমে দাস ও দস্যুগণ আর্যগণ অপেক্ষা হীন ছিল না। শম্বরের সহিত দিবোদাসের চল্লিশ বৎসর ব্যাপী সংগ্রাম হইয়াছিল। যে দাস আপনাকে অমর মনে করিত ইন্দ্র তাহাকে ধ্বংস করিয়াছিলেন। সন্দিকগণ আপনাদিগের পরাক্রমে গর্বিত ছিলেন। নববাস্ত্ব ও বৃহদ্রথের পরাক্রম এতদূর বৃদ্ধি পায় যে ইন্দ্রকে বহু চেষ্টায় তাহাদিগকে বিনষ্ট করিতে হইয়াছিল। চুমুরি ও ধুনির ত্রিশ সহস্র সৈন্য ধ্বংস করিতে হইয়াছিল, বর্চির সহস্র সহস্র অনুচরকে পরাজিত করিতে হইয়াছিল। অন্য ঋষি বলিতেছেন, সূর্যদেব দেখিলেন যে দাসের সমকক্ষ আর্য। দাসের সমকক্ষ আর্য বলিবার অর্থ দাসের পরাক্রমের প্রশংসা কীর্তন করা।

উপরে বলা হইয়াছে যে দাস ও দস্যুদিগকে বেদ্দাইক বা প্রোটো-অষ্ট্রালয়েড বর্বর আদিবাসী বলিয়া কোন কোন নৃতত্ত্ব-বিজ্ঞানী মত প্রকাশ করিয়াছেন। তাহাদের বৈষয়িক অবস্থা ও সামরিক পরাক্রম সম্বন্ধে ঋগ্বেদ হইতে যাহা জানিতে পারা যায় তাহা হইতে এই মতের সমর্থন পাওয়া যায় কিনা তাহা বিচার্য।

দাস ও দস্যু ঋগ্বেদের আর্যগণ হইতে ভিন্ন ভাষাভাষী ছিল এই মত প্রচলিত। তাহারা বেদ্দাইক গোষ্ঠীর লোক হইলে ভাষার পার্থক্য অনেকখানি হইবার কথা। কিন্তু দেখা যায় যে তাহাদের বল, বিক্রম, ঐশ্বর্য্য সম্বন্ধে এত কথা ঋগ্বেদে থাকিলেও ভাষার পার্থক্য সম্বন্ধে বিশেষ কিছু বলা হইতেছে না। ভাষা লইয়া কটাক্ষ করা হইয়াছে এইরূপ দুইটি কথা পাওয়া যায়, যথা, মৃধ্রবাচ ও মৃধ্রবাচ। মৃধ্রবাচ শব্দটি দস্যুর সম্পর্কে ব্যবহার করা হইয়াছে, আর্য দস্যু

বলিয়া অভিহিত নহে এমন শত্রুদিগের সম্পর্কেও ব্যবহার করা হইয়াছে। মৃধ্রবাচ পদের অর্থ করা হইয়াছে শত্রুভাবাপন্ন বা অসম্পূর্ণরূপে উচ্চারিত ভাষাভাষী, of hostile or imperfect speech, এবং বধ্রিবাচ পদের অর্থ করা হইয়াছে বৃথা ভাষাভাষী, of vain speech, শত্রুতাজ্ঞাপক বা বিরুদ্ধ বাক্য ও বৃথা বা গর্বিত বাক্য যে সকল অমিত্র ব্যবহার করে তাহারা যে ভিন্ন ভাষাভাষী তাহা বলিবার কি হেতু আছে? ধর্মে আর্য এবং দাস, দস্যু প্রভৃতি শত্রুর মধ্যে বিভিন্নতা বেশ পরিষ্কার ও স্পষ্ট করিয়া নির্দেশ করা হইয়াছে—শত্রুরা অযজ্বান, অপব্রত, অব্রত, অদেব ইত্যাদি। আর্য এবং দাস ও দস্যুর মধ্যে গুরুতর ভাষার পার্থক্য থাকিলে তাহা শুধু মৃদু কটাক্ষ করিয়া উপেক্ষা করিবার কি হেতু ছিল? তারপর এই দুইটি পদই দাস ও দস্যুর অতিরিক্ত অন্যান্য শত্রুর সম্বন্ধেও প্রয়োগ করা হইয়াছে, ইহা লক্ষ্য করিতে হইবে।

আর্য এবং দাস ও দস্যুর মধ্যে ধর্মের পার্থক্য সহজেই দৃষ্টি আকর্ষণ করে। এ সম্বন্ধে অনেক কথা বলা হইয়াছে, এখানে সকল কথার উল্লেখ করা অনাবশ্যক। দাস ও দস্যুদিগের ধর্ম সম্বন্ধে ঋগ্বেদে যাহা বলা হইয়াছে তাহা হইতে এই ধর্মের বিশেষত্ব সম্বন্ধে কি জানিতে পারা যায় অনুসন্ধান করিলে দেখা যায় যে সূক্তকার ঋষিগণ এ বিষয়ে বিশেষ কিছু বলা আবশ্যক মনে করেন নাই। দাস ও দস্যুদিগের ধর্ম সম্বন্ধে positive information-এর অভাব। ইহার কারণ কি হইতে পারে বিচার্য। অঙ্গিরা কুলের সব্য ঋষি একবার কিছু বলিবার উত্তম প্রকাশ করিয়াছেন। "হে ইন্দ্র, কাহারা আর্য এবং কাহারা দস্যু তাহা অবগত হও, কুশযুক্ত যজ্ঞের বিরোধীদিগকে শাসন করিয়া বশীভূত কর।" জানা যাইতেছে যে আর্যের সহিত দস্যুদিগের ধর্মের একটি পার্থক্য তাহাদের যজ্ঞবিমুখতা ও যজ্ঞবিরোধিতা। অযজ্ঞান, অযজ্জ্বান, অযজ্যু বলিয়া তাহাদিগকে বর্ণনা করা হইয়াছে। একটি ঋকে পণি দস্যুদিগকে অকর্মা, অশ্রদ্ধান ও অমন্ত ("not honouring sacred things") বলা হইয়াছে। দাস ও দস্যুদিগকে বিভিন্ন স্থানে অব্রত, অন্যব্রত, অপব্রত ইত্যাদি বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে। তাহাদিগকে অদেব ও অদেবয়ু (অর্থাৎ যাহারা দেবতাদিগকে তাচ্ছিল্য বা ঘৃণা করে) বলা হইয়াছে। যাহারা হব্য দান করে না ও শত্রুভাবাপন্ন সেই সকল দস্যুকে ধ্বংস করিবার জন্য অগ্নিকে আহ্বান করা হইতেছে।

এখানে একটি বিষয়ের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করা প্রয়োজন। ঋষিদিগের শত্রু তালিকায় আর্য, দাস, দস্যু রাক্ষস ও যাতুধানের উল্লেখ পাওয়া যায়। পিশাচের উল্লেখও এক স্থানে আছে। ইহারা ব্যতীত কেবল শত্রু বা অমিত্র বলিয়া বর্ণিত ব্যক্তি বা গোষ্ঠীর প্রতিও কটূক্তি বর্ষণ করা হইয়াছে। ইহারা কোন্ জাতীয় শত্রু জানিবার উপায় নাই। যজ্ঞহীন, ক্রিয়াহীন, শ্রদ্ধাহীন, ব্রতহীন বা অন্যব্রত বা অপব্রতে অনুরক্ত দাস ও দস্যুদিগের প্রতি প্রযুক্ত যে সকল বিশেষণের উল্লেখ করা হইয়াছে সেই সকল বিশেষণ ঋষিদিগের সকল শ্রেণীর শত্রুর প্রতি অপক্ষপাতে প্রয়োগ করা হইয়াছে দেখা যায়। ফলে এই সকল শত্রুর ধর্মের প্রকৃত রূপ কি ছিল এবং দস্যু ও দাসদিগের ধর্মের সহিত অন্যান্য শ্রেণীর শত্রুর ধর্মের পার্থক্য কি ছিল তাহা জানিতে পারা যায় না। কয়েকটি দৃষ্টান্তের সাহায্যে এই বিষয়টি বুঝিতে চেষ্টা করা যাইতে পারে।

দাস ও দস্যুদিগের ধর্মের সম্বন্ধে উপরের নেতিবাচক বর্ণনা হইতে এই পর্যন্ত বুঝা যায় যে তাহাদের নিজস্ব একটি ধর্মমত ও অনুষ্ঠান পদ্ধতি ছিল এবং এই ধর্মে সম্ভবতঃ যজ্ঞের কোন স্থান ছিল না। সম্ভবতঃ কথাটি ব্যবহার করিবার তাৎপর্য পরে দেখা যাইবে।

দেবতা সম্পর্কে দস্যু ও দাসদিগকে দেবহীন ও দেববিরোধী বলা হইয়াছে। ঋগ্বেদে শত্রুদিগের দেবতা সম্পর্কে কয়েকটি পদ পাওয়া যায় যথা, মূরদেবা, অনৃতদেবা, মোঘদেবা ও শিশ্নদেবা। অনৃতদেব ও মোঘদেব পদ দুইটির যেরূপ প্রয়োগ দেখা যায় তাহাতে কৌতূহল উদ্রিক্ত হয়। বসিষ্ঠ বলিতেছেন - আমি মিথ্যা দেবতাগণের বা বৃথা দেবতাগণের উপাসনা করিলেও হে জাতবেদা অগ্নি! কি জন্য আমার প্রতি ক্রুদ্ধ হইতেছ? (যদি বাহমৃতদেব আস মোঘং বা দেবান অপ্যুহে অগ্নে। কি মস্মভ্যং জাতবেদো হৃণীষে দ্রোঘবাচস্তে নির্ঋথং সচন্তাম)। বসিষ্ঠের মুখে এই প্রকার স্বীকৃতি আশ্চর্যের বিষয়। কাজেই এই প্রকারের স্বীকৃতির যে সরল অর্থ হয় তাহা কাটাইবার জন্য নানারূপ উপাখ্যানের অবতারণা করা হইয়াছে। সায়নের ব্যাখ্যা এই যে রাক্ষস বসিষ্ঠের পুত্র শতকে হত্যা করিয়া আমি বসিষ্ঠ এই উক্তি করিয়া বসিষ্ঠকে বিনাশ করিবার জন্য আক্রমণ করিলে বসিষ্ঠ কয়েকটি ঋক উচ্চারণ করিয়াছিলেন। এই ঋকটি তাহার মধ্যে একটি। পরবর্তী ঋক হইতে দেখা যায় যে বসিষ্ঠের বিরুদ্ধে যাতুধানের অপবাদ প্রচারিত হইয়াছিল এবং তিনি ইহা শত্রুদিগের মিথ্যা প্রচারণা বলিয়া প্রতিবাদ করিতেছেন। এই যাতুধানদিগকে মিথ্যা ও বৃথা দেবতাদিগের উপাসক বলা হইয়াছে। দেখা যাইতেছে যাতুধান শ্রেণীর শত্রুদিগের উপাস্য দেবতার বর্ণনাও নেতিবাচক। একটি ঋকে স্ত্রী ও পুরুষ যাতুধান যাহারা বঞ্চনা দ্বারা হিংসা করে তাহাদিগকে বিনাশ করিবার জন্য ইন্দ্রকে আহ্বান করা হইতেছে। তারপরেই বলা হইতেছে মূরদেবতার উপাসকগণ ছিন্নগ্রীব হইয়া বিনাশ প্রাপ্ত হউক। এখানে যাতুধানদিগকে মূরদেবা বলা হইয়াছে। ইহার পরের ঋকে দেখা যায় যে যাতুধান রাক্ষসের বিশেষণরূপে ব্যবহৃত হইয়াছে। সুতরাং যাতুধান ও রাক্ষস উভয়েই মূরদেবতার উপাসক। মূরদেবা সায়নের মতে রাক্ষসদিগের বিশেষণ মাত্র; উইলসনের মতে worshippers of vain gods, গ্রিফিথের মতে worshippers of mad gods, কেহ কেহ বলেন worshippers of

senseless gods। যে অর্থই গ্রাহ্য হউক দেখা যাইতেছে যে ইহাও নেতিবাচক বর্ণনা।

শিশ্নদেবা পদটি লইয়া অনেক বিতর্ক হইয়াছে। দুইটি জায়গায় এই পদের প্রয়োগ দেখা যায়।

বসিষ্ঠ বলিতেছেন—হে ইন্দ্র যাতুগণ (যাতবঃ) যেন আমাদিগকে হিংসা না করে, প্রজাগণ হইতে আমাদিগকে পৃথক না করে।···শিশ্নদেবগণ যেন আমাদিগের যজ্ঞে বিঘ্ন না করে। যাতব পদের ব্যবহার হইতে অনুমান করা যায় যে যাতুধান এবং সম্ভবতঃ রাক্ষসগণ শিশ্নের উপাসক ছিল। অন্য একটি ঋকে বলা হইতেছে যে ইন্দ্র অবিচলিতভাবে শতদ্বার-বিশিষ্ট শত্রুপুরীর ধন অপহরণ করেন এবং শিশ্নদেবগণকে নিজ তেজে পরাভব করেন। শতদ্বারবিশিষ্ট শত্রুপুরী দাস ও দস্যুদিগের শতপুরী, নবনবতিপুরী, পাষাণনির্মিতপুর, চলমানপুর প্রভৃতি স্মরণ করাইয়া দেয়, ধন অপহরণের কথাও তাহাদিগকে স্মরণ করাইয়া দেয়। এখানে শত্রু বলিতে দাস ও দস্যু বুঝাইতেছে এইরূপ অনুমান করা সঙ্গত মনে হয়।

তাহা হইলে দেখা যাইতেছে দাস, দস্যু, যাতুধান ও রাক্ষস —এই সকল শ্রেণীর শত্রু শিশ্নের উপাসক ছিল। লক্ষ্য করিতে হইবে যে অনৃতদেব, মূরদেব ও মোঘদেব পদগুলি মাত্র যাতুধান ও রাক্ষসদিগের সম্পর্কে প্রয়োগ করা হইয়াছে।

শিশ্নদেবা পদটির অর্থ সায়নের মতে শিশ্নোদরপরায়ণ বা ইন্দ্রিয়পরায়ণ শত্রু। ইউরোপীয় বেদ-ব্যাখ্যাতাদিগের মতে ইহার অর্থ লিঙ্গ উপাসক। শিশ্নদেব পদটির এই অর্থ ও এই পদ দাস ও দস্যুদিগের সম্বন্ধে প্রয়োগ করা হইয়াছে এই অনুমান গ্রাহ্য করিলে বলা যাইতে পারে যে দাস ও দস্যুদিগের ধর্ম সম্বন্ধে ইহাই একমাত্র positive information, কিন্তু কিছু সন্দেহ থাকিয়া যাইতেছে। শিশ্নদেবা পদটির প্রয়োগ হইতে যে অনুমান করা হইয়াছে তাহাতে এই ফাঁক রহিয়া যায় যে শত্রু বলিতে দাস ও দস্যু ব্যতীত আর্য শত্রু ও অন্যান্য অনির্দিষ্ট পরিচয় শত্রুও বুঝাইতে পারে। অনির্দিষ্ট শত্রু, অর্থাৎ যাহারা কোন শ্রেণীর শত্রু বলা হয় নাই, ঋগ্বেদে তাহাদের সংখ্যা বিস্তর। এই প্রকার অনির্দিষ্ট পরিচয় শত্রুদিগকে অব্রহ্মা অর্থাৎ স্তুতিহীন, অনিন্দ্রা অর্থাৎ ইন্দ্রহীন, অনগ্নিত্রা অর্থাৎ অগ্নিহীন, অদেবা ইত্যাদি কটূক্তি করা হইয়াছে।

সে যাহা হউক, দাস ও দস্যুদিগের ধর্মমত সম্বন্ধে জানিতে পারা গেল যে তাহারা সম্ভবতঃ যজ্ঞ করিত না এবং লিঙ্গোপাসক ছিল। যাতুধান ও রাক্ষস বলিয়া অভিহিত শত্রুদিগের সহিত তাহাদের কি প্রকার সম্পর্ক ছিল তাহা পরিষ্কার জানিতে পারা যায় না। এখানে এই আলোচনা অবান্তরও বটে।

আর্যদিগের সঙ্গে দাস ও দস্যুদিগের কিরূপ সম্পর্ক ছিল দেখা যাউক। এই সম্পর্ককে ধর্ম সম্বন্ধীয় ও রাজনৈতিক, এই দুই অংশে ভাগ করা যাইতে পারে।

ধর্ম সম্বন্ধীয় সম্পর্কের উপরের আলোচনা হইতে দেখা গিয়াছে যে আর্য এবং দাস ও দস্যুদিগের মধ্যে বিরোধিতা ছিল। এক কথায় আর্যদিগের নিকট তাহারা ছিল বিধর্মী। বিধর্মীর ধর্মকে হীন প্রতিপন্ন করিবার চেষ্টা সকলেই করে, ঋষিগণও করিয়াছেন। কিন্তু এই সহজ ব্যাখ্যার দ্বারা দাস ও দস্যুদিগের সম্পর্কিত সমস্যার সমাধান হয় না। কারণ, দেখা যায় যে সকল শ্রেণীর শত্রুর সম্বন্ধে একই প্রকারের অভিযোগ করা হইয়াছে। দাস ও দস্যুরা বিধর্মী হইলে আর্যদিগের, এমন কি ঋষিকুলের মধ্যেও, বিধর্মী ছিল একথা না বলিয়া উপায় নাই। অদেব ও অব্রহ্মা অর্থাৎ স্তুতিহীন বা ঋত্বিকহীন আর্য, ব্রহ্মদ্বিষ অর্থাৎ স্তুতিবিদ্বেষী ঋষি, ইন্দ্রহীন ও মৃধ্রবাচ গোষ্ঠীর উল্লেখ বহু আছে। আশ্চর্যের কথা যে দেবদেবী পর্যন্ত এই ধরণের কটূক্তি হইতে অব্যাহতি পান নাই। উষা দেবীকে দ্রোহকারিণী, হিংসাকারিণী ও ইন্দ্রবিহীনা বলা হইয়াছে। এই সকল প্রয়োগ হইতে দেখা যায় যে ধর্ম-সম্পর্কিত ব্যাপারে ঋষিদিগের অন্যান্য শত্রু হইতে দাস ও দস্যুদিগের কোন পার্থক্য রক্ষিত হয় নাই। কাজেই ধর্ম-সম্পর্কিত কটূক্তিগুলি যে অনেক ক্ষেত্রে অপশব্দ কটূক্তিমাত্র এই সন্দেহ প্রবল হইয়া উঠে।

এই প্রসঙ্গে প্রশ্ন উঠে, তাহা হইলে আর্য অথবা ঋষিদিগের সহিত দাস ও দস্যুদিগের শত্রুতার প্রকৃত কারণ কি ধর্মের পার্থক্য না রাজনৈতিক?

দাস ও দস্যুদিগের সহিত যুদ্ধের কাহিনীর মধ্যে দিবোদাসের সঙ্গে শম্বরের যুদ্ধ ব্যতীত দাস ও দস্যু প্রধানগণের সহিত যুদ্ধ-বিগ্রহের যে সকল উল্লেখ দেখা যায় তাহা হইতে জানিতে পারা যায় যে অধিকাংশ ক্ষেত্রে ইন্দ্র কোন ঋষির পক্ষ হইয়া যুদ্ধ করিয়াছেন; কোন ক্ষেত্রে কোন ঋষির যজমানের পক্ষ হইয়াও ইন্দ্র যুদ্ধ করিয়াছেন। যে ভাবে বিভিন্ন মণ্ডলে এক শ্রেণীর কাহিনীর পুনঃপুনঃ উল্লেখ হইয়াছে তাহাতে মনে করা যায় যে এই সকল যুদ্ধ-বিগ্রহের কাহিনী ঋগ্বেদের পৌরাণিক কাহিনীর পর্যায়ে পড়ে। এই সকল পুনঃপুনঃ উল্লিখিত কাহিনী ব্যতীত দাস ও দস্যুদিগের অধিকৃত জল ও উর্বরা ভূমি, প্রচুর ধনপূর্ণ পুরীসমূহ, অসংখ্য গোধন প্রভৃতি অধিকার ও লুণ্ঠন করিবার জন্য যুদ্ধের উল্লেখ আছে। কিন্তু দাস ও দস্যুর অতিরিক্ত অনির্দিষ্ট পরিচয় শত্রুদিগের সঙ্গেও এই উদ্দেশ্যে যুদ্ধের উল্লেখ আছে। লুণ্ঠিত ধন ও গোধনের অংশ পাইবার জন্য ঋষিদিগের উদগ্র লোভ লক্ষ্য করিবার বিষয়।

ঋগ্বেদের যুদ্ধ-বিগ্রহের কাহিনীগুলির আলোচনা করিলে দেখা যায় যে ধন-লুণ্ঠন ও রাজ্যজয় এই সকল যুদ্ধের মুখ্য উদ্দেশ্য। যুদ্ধের এই প্রকার উদ্দেশ্যের মধ্যে কিছু নূতনত্ব বা বিশেষত্ব নাই। এই সকল যুদ্ধের দুই পক্ষ আর্য এবং দাস ও দস্যু বা যজ্ঞকারী এবং যজ্ঞবিমুখ, ইন্দ্র উপাসক এবং ইন্দ্র

বিরোধী নহে, এই সকল যুদ্ধের দুই পক্ষ ধনহীন এবং ধনশালী, রাজ্যহীন এবং রাজ্যলোভী। আরও দেখা যায় এই শ্রেণীর অধিকাংশ যুদ্ধ ঋগ্বেদীয় গোষ্ঠীগুলির পরস্পরের মধ্যে ঘটিয়াছিল। সুতরাং দাস ও দস্যুদিগকে আর্য জাতির প্রতিপক্ষ রূপে যুদ্ধ-বিগ্রহে লিপ্ত,—ঋগ্বেদ হইতে এইরূপ একটা চিত্র পাইবার আশা করা হইলে সে আশা পূর্ণ হয় না। সুদাসের সহিত দশ রাজার যুদ্ধ এবং সুশ্রবের বিরুদ্ধে বিশ জন রাজার সম্মিলিত আক্রমণ ইহার প্রমাণ। ইহার অর্থ এই যে দাস ও দস্যুদিগের সহিত বিরোধিতার কারণ রাজনৈতিক হইতে পারে কিন্তু এইরূপ বিরোধিতা ঋগ্বেদীয় গোষ্ঠীগুলির মধ্যে, এমন কি ঋষিকুলগুলির মধ্যেও ছিল। এই প্রসঙ্গে বলা কর্তব্য যে দাস ও দস্যু এবং আর্যের মধ্যে রাজনৈতিক সহযোগিতা বর্তমান ছিল ঋগ্বেদে তাহার প্রমাণ পাওয়া যায়। দাস ও আর্য শত্রুর সঙ্গে যুগপৎ যুদ্ধ করিতে অভিলাষী ঋষি সাহায্য পাইবার জন্য ইন্দ্রকে আহ্বান করিতেছেন। অনিষ্টকারী, নিধনোদ্যত দাসজাতীয় ও আর্যজাতীয় শত্রুদিগকে অপ্রকাশ রূপে বধ করিবার জন্য ইন্দ্রকে আহ্বান করা হইয়াছে। কতকগুলি সূক্তে দাস ও আর্য শত্রুর একত্র উল্লেখ পাওয়া যায়। এই সকল প্রমাণ পাইবার পরে যদি বলা যায় যে আর্য এবং দাস ও দস্যুদিগের মধ্যে বিরোধিতার কারণ রাজনৈতিক তাহা হইলে দাস ও দস্যুদিগের প্রকৃত পরিচয় প্রকট হয় না, কারণ, শত্রুদলের মধ্যে আর্য, দাস ও দস্যু সকলেই আছে।

ধর্মবিশ্বাস সম্পর্কে ও রাজনৈতিক সম্বন্ধের ব্যাপারে, উভয় ক্ষেত্রেই, দেখা যাইতেছে যে বিরোধিতা দাস ও দস্যুর মধ্যে সীমাবদ্ধ নহে, আর্যদিগের সঙ্গেও এই বিরোধিতা রহিয়াছে। তাহা হইলে শুধু দাস ও দস্যু এই নাম ছাড়া দাস ও দস্যুদিগকে আর্যদিগের বিরোধী একটা স্বতন্ত্র জাতি বা গোষ্ঠী হিসাবে দাঁড় করাইবার ভিত্তি কি হইতে পারে? কোন্ যুক্তিতে তাহাদিগকে বেদ্দাইক গোষ্ঠীর ভারতবর্ষের আদিবাসী বলিয়া গ্রহণ করিতে হইবে?

যাঁহারা দাস ও দস্যুদিগকে ভারতবর্ষের অনার্য আদিবাসী বলিয়া মনে করেন তাঁহারা racial origin-এর প্রশ্ন তুলেন; অর্থাৎ তাঁহারা নৃতত্ত্ব-বিজ্ঞানের আশ্রয় লন। এই প্রসঙ্গে যে সকল আলোচনা হইয়াছে তাহার সম্বন্ধে সংক্ষেপে বলা যায় যে পণ্ডিতগণ প্রমাণের উপর মতবাদকে দাঁড় করান অপেক্ষা মতবাদের সপক্ষে প্রমাণের অনুসন্ধানে সময় ব্যয় করিয়াছেন। এ সম্বন্ধে পূর্বের এক প্রবন্ধে (শ্বেতকায় বৈদেশিক আর্যগণের ভারত আক্রমণ, প্রবাসী, আশ্বিন ১৩৫২) কিছু বলা হইয়াছে। নৃতত্ত্ব-বিজ্ঞানের সূত্রমতে যে সকল প্রমাণের উপর বৈজ্ঞানিক সিদ্ধান্ত করা চলে ঋগ্বেদের আর্য, দাস ও দস্যু কাহারও সম্বন্ধে সেরূপ প্রমাণ পাওয়া যায় না। কৃষ্ণযোনি, কৃষ্ণগর্ভা, কৃষ্ণা প্রভৃতি পদের ব্যাখ্যা লইয়া মতদ্বৈধ আছে একথা পূর্বেও বলা হইয়াছে। এই সকল পদের ব্যবহার হইতে কৃষ্ণবর্ণ জাতির অস্তিত্ব অনুমান ও সেই জাতিকে দাস ও দস্যু নামে ভারতবর্ষের বেদ্দাইক গোষ্ঠীর আদিবাসীর সহিত অভিন্ন বলিয়া অনুমান করিলে কণ্বকুলের মত প্রাচীন ঋষিকুল ও পুরুগোষ্ঠীর মত বিখ্যাত ঋগ্বেদীয় গোষ্ঠীকেও কেন যে দাস ও দস্যুদিগের পর্যায়ে গণনা করা হইবে না তাহার সন্তোষজনক উত্তর পাওয়া যায় না। ঋগ্বেদে কণ্বকুল ও পুরুগোষ্ঠীকে শ্যামবর্ণ বলা হইয়াছে। কৃষ্ণযোনি, কৃষ্ণগর্ভা প্রভৃতি পদের প্রয়োগ স্থলে দাস ও দস্যুদিগকে এই সকল পদের সহিত যুক্ত করা হয় নাই এবং ব্যাখ্যার দ্বারা তাহাদিগকে যুক্ত করিবার চেষ্টাকে মানিয়া লইবার কোন হেতু নাই। ঋগ্বেদীয় সমাজের আর্য ও অনার্য গোষ্ঠীসমূহের যদিও অনার্য বলিয়া কোন গোষ্ঠীর উল্লেখ নাই --racial-origin সম্বন্ধে যাহা কিছু বলা হয় তাহা অবৈজ্ঞানিক অনুমানমূলক বলিয়া মনে করা যাইতে পারে।

আর্য এবং দাস ও দস্যুদিগের সামাজিক সম্বন্ধ সম্বন্ধে যেটুকু প্রমাণ ঋগ্বেদে পাওয়া যায় তাহা প্রচলিত ধারণার বিরুদ্ধে যায়। পরে এ সম্বন্ধে বলা হইতেছে।

উপরে যাহা বলা হইল তাহা হইতে দেখা যাইতেছে যে, ভাষা, ধর্ম ও রাজনৈতিক সম্বন্ধ বিচার করিলে দাস ও দস্যুদিগকে ঋগ্বেদীয় ঋষিগণের অথবা তাঁহাদের যজমানদিগের আর্য বলিয়া উল্লিখিত এবং অজ্ঞাত অনির্দিষ্ট পরিচয় শত্রু এবং ঋগ্বেদীয় গোষ্ঠীভুক্ত শত্রু হইতে স্বতন্ত্র ও বিশিষ্ট কোন জাতিভুক্ত শত্রু বলিয়া নির্দেশ করিবার কোন সন্তোষজনক সূত্র পাওয়া যাইতেছে না। সুতরাং পুরাতন সন্দেহ আবার উঠিতেছে, দাস ও দস্যু কি শত্রুর প্রতি প্রযুক্ত কটূক্তিমূলক নাম মাত্র? অথবা আর্যেতর একটি স্বতন্ত্র জাতি?

সংক্ষেপে ঋগ্বেদের আরও কয়েকটি প্রয়োগের আলোচনা করিয়া দেখা যাউক এই সন্দেহ দূর বা সমর্থিত হয় কিনা।

যজ্ঞ সম্পর্কে দাস ও দস্যুদিগকে যজ্ঞবিমুখ ও যজ্ঞহীন বলা হইয়াছে, ইহার অতিরিক্ত আর কিছু বলা হয় নাই। বরশিখ নামে একটি প্রবল পরাক্রান্ত গোষ্ঠীর উল্লেখ আছে। একটি ঋকে বলা হইয়াছে ইন্দ্রের প্রতি হিংসা দ্বারা যশোলিপ্সু হইয়া বরশিখ বংশীয়গণ যজ্ঞপাত্র ভঙ্গ করিয়াছিল। যজ্ঞপাত্র ভঙ্গ করিবার মত গুরুতর অপরাধ দাস ও দস্যুদিগের প্রতি আরোপিত হয় নাই। বর্মধারী বরশিখগণের সহিত ভরত-বংশীয় বা সৃঞ্জয় গোষ্ঠীর অভ্যন্তরীণ যুদ্ধ হইয়াছিল। ইহারা যে দাস বা দস্যু তাহা বলা হয় নাই। ইন্দ্র যজ্ঞোদ্যত দাস নমুচিকে বধ করিয়াছিলেন এইরূপ বলা হইয়াছে। যজ্ঞের চরু রন্ধনকারী ও সোমরস প্রস্তুতকারী দাসের উল্লেখ আছে। দাস ও দস্যু-প্রধানগণ আপনাদের ক্রিয়াকর্মের সম্ভবতঃ, যজ্ঞ সম্পাদনের জন্য ঋত্বিক নিযুক্ত করিতেন তাহার উল্লেখ আছে। ভরদ্বাজ বলিতেছেন, যে ইন্দ্রকে আমরা স্তুতি করি তিনি দস্যুদিগের

প্রবর্তিত ব্যক্তির (দস্যু দূতোর) স্তুতি গ্রহণ করেন না। একটি ঋকে ইন্দ্রের ধনরক্ষাকারী আর্য ও দাসের উল্লেখ করা হইয়াছে : এই সকল প্রমাণ হইতে দেখা যায় যে দাস ও দস্যুগণ কোন কোন ঋষির মতে সম্পূর্ণরূপে ক্রিয়াকাণ্ডবর্জিত, বর্ব্বর, অসভ্য শত্রু ছিল না। তবে ইহা সম্ভব যে ধর্মের যে পার্থক্য গোড়ায় ছিল, অর্থাৎ দাস ও দস্যুদিগের যজ্ঞবিমুখতা, কালক্রমে সে পার্থক্য হ্রাস পাইয়াছিল।

ইহা লক্ষ্য করিবার বিষয় সন্দেহ নাই যে বহু দাস ও দস্যু প্রধানের নাম ও তাহাদের বল, বিক্রম, ঐশ্বর্য প্রভৃতির পুনঃপুনঃ উল্লেখ করা হইলেও কোন দাস জাতির নাম ও এক পণিগণ ব্যতীত কোন দস্যু জাতির বা গোষ্ঠীর নাম উল্লেখ করা হয় নাই। ইহার কারণ কি? কারণ এই হইতে পারে যে দাস ও দস্যু বলিয়া কোন জাতি বা গোষ্ঠী ছিল না, কোন কোন ঋষি আপনাদিগের শত্রুদিগকে দাস ও দস্যু নামে অভিহিত করিয়াছেন। এই যুক্তির বিপক্ষে অন্য যুক্তি উপস্থিত করা যাইতে পারে, কিন্তু ইহার স্বপক্ষে বলিবার আরও কি আছে তাহাই এখানে দেখা যাউক।

ঘোরপুত্র কণ্ব ঋষি বলিতেছেন, দস্যু দমনকারী অগ্নির সহিত তুর্বশ, যদু ও উগ্রাদেবকে দূরদেশ হইতে আহ্বান করি : অগ্নি নববাস্ত্ব, বৃহদ্রথ ও তুর্বীতিকে এই স্থানে আনয়ন করুন। সায়নের ব্যাখ্যা মতে এই ছয় জন রাজর্ষি। কিন্তু যদু ও তুর্বশ ঋগ্বেদের দুইটি প্রসিদ্ধ গোষ্ঠী, উগ্রাদেব ইন্দ্র ও তুর্বীতি ঋষি। তিনি একবার জলমগ্ন হইবার উপক্রম হইলে ইন্দ্র তাঁহাকে রক্ষা করিয়াছিলেন। নববাস্ত্ব ও বৃহদ্রথ কে? ইন্দ্রের সঙ্গে যজ্ঞস্থানে যাঁহাদিগকে আনিবার জন্য অগ্নিকে আহ্বান করা হইতেছে তাঁহারা অবশ্য সম্মানীয় ব্যক্তি। দশম মণ্ডলের এক স্থানে ইন্দ্রের জবানীতে বলা হইয়াছে দাস জাতীয় নববাস্ত্ব ও বৃহদ্রথ নামক দুই জন শত্রু অতিশয় বৃদ্ধি পাওয়াতে আমি তাহাদিগকে ভগ্ন করিয়াছি (অহং স যো নববাস্ত্বং বৃহদ্রথং সং বৃত্রেব দাসং বৃত্রহারুজং যদ্বর্দ্ধয়ন্তম ইত্যাদি)। ষষ্ঠ মণ্ডলের একটি ঋকে বলা হইয়াছে উশনার উপকারের জন্য ইন্দ্র নববাস্ত্বকে বধ করিয়াছিলেন। দেখা যাইতেছে যে ইন্দ্রের সঙ্গে সসম্মানে যাঁহাদিগকে আহ্বান করা হইয়াছিল তাঁহাদিগকেই দাস নাম দিয়া ইন্দ্র বধ করিয়াছিলেন এইরূপ বলা হইতেছে। এই দুই জন ছাড়া যদু ও তুর্বশকেও ইন্দ্রের সঙ্গে আহ্বান করা হইয়াছিল। এই দুইটি প্রসিদ্ধ গোষ্ঠী অগ্নি, ইন্দ্র, মিত্র, বরুণ প্রভৃতি প্রধান দেবতাদিগের অনুগ্রহভাজন। বিভিন্ন কুলের ঋষিদিগের অজস্র প্রশংসা তাহাদের প্রতি বর্ষিত হইয়াছে। ঋগ্বেদে ত্রিৎসু, ভরত, সৃঞ্জয় প্রভৃতি গোষ্ঠী অপেক্ষা যদু ও তুর্বশদিগের উল্লেখ অনেক বেশী আছে। শুধু ইহাই নহে, অঙ্গিরাকুলের মত প্রাচীন, সম্মানার্হ ঋষিকুলের সহিত যদু গোষ্ঠীর কোন কোন প্রধান বৈবাহিক সম্বন্ধে আবদ্ধ ছিলেন দেখা যায়। দশম মণ্ডলের একটি ঋকে দেখা যায় যে যদু ও তুর্ব্বশকে দাস রাজা বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে। অঙ্গিরা-কুলের গর্বিত নাভানেদিষ্টের মুখে এই কথা শুনা যাইতেছে।

পূর্বে বলা হইয়াছে যে পণিগণ একমাত্র দস্যুজাতি যাহাদের নাম উল্লেখ করা হইয়াছে। পণিদিগের সম্বন্ধে অনেক আলোচনা হইয়াছে, এখানে সকল কথার উল্লেখ অনাবশ্যক। একটি ঋকে বলা হইয়াছে,—অগ্নি যজ্ঞরহিত, জল্পক, হিংসিতবাক, শ্রদ্ধারহিত, বৃদ্ধিশূন্য পণি দস্যুদিগকে বিদূরিত করেন, তিনি প্রধান হইয়া অপর যজ্ঞরহিতগণকে হেয় করেন। [ন্যক্রতূনগ্রথিনো মৃধ্রবাচঃ পণীঁর শ্রদ্ধাঁ অবৃধাঁ অযজ্ঞান্ : প্রপ্র তান্দস্যূঁরগ্নির্বিবায় পূর্বশ্চকারাপরাঁ অযজ্যূন্।] ডাঃ ম্যুইর এই ঋকের অনুবাদ করিয়াছেন :

"Senseless, false, imperfectly-speaking, unbelieving, unworshipping, unpraising Panis; these Dasyus Agni removed far off. It was he who first made the irreligious degraded."

ঋকের শেষ অংশ লক্ষ্য করিতে হইবে, পূর্বশ্চকারাপরান্ অযজ্যূন্ ; তিনি (অগ্নি) প্রধান হইয়া অপর যজ্ঞরহিতগণকে হেয় করেন। তাহা হইলে দেখা যাইতেছে যে যজ্ঞহীনদিগকে হেয় করিবার একটা বিধান ঋগ্বেদের আমলে ছিল। পণিগণ এই অপরাধে বিদূরিত হ[illegible] তাহারা যে কায়িক অর্থে বিদূরিত হয় নাই ঋগ্বেদের প্রথম মণ্ডল হইতে দশম মণ্ডলের বহু ঋকে তাহাদের পুনঃপুনঃ উল্লেখ হইতে বুঝা যায়। বিদূরিত করিবার প্রক্রিয়াটির নৈতিক অর্থ করিলে দাঁড়ায় যে পণিদস্যুগণ জাতিচ্যুত হইয়াছিল এবং তাহারা জাতিচ্যুত হইয়াছিল যজ্ঞবিমুখতার অপরাধে। কিন্তু বসিষ্ঠ পণিগণের সম্বন্ধে এই ঋকে যাহা বলিয়াছেন তাহাই তাঁহার শেষ কথা নহে : কয়েকটি ঋক পরে তিনি ইন্দ্রকে আহ্বান করিয়া বলিতেছেন, তোমার যজ্ঞে আমরাই উক্থ উচ্চারণকারী ; অন্য উক্থ উচ্চারণ করিতেছি ও তোমার হব্য দ্বারা পণিগণকেও (ধন) দান করিতেছি। শ্রদ্ধাহীন, যজ্ঞহীন বলিয়া অভিযুক্ত পণিগণের সম্বন্ধে বসিষ্ঠের মুখে এই কথা আশ্চর্য মনে হইতে পারে। ভরদ্বাজ কুলের একজন ঋষি গঙ্গার উচ্চতকূলের অধিবাসী পণিদিগের প্রধান বৃবুর বদান্যতার উচ্চ প্রশংসা করিতেছেন।

সে যাহা হউক, অগ্নির পণি ও অন্যান্য যজ্ঞহীন দস্যুগণকে হেয় করিবার কারণ জানা গেল, আর্য ও দস্যুদিগের মধ্যে পার্থক্যের যে কারণ ব্যাখ্যা করা হইয়াছে— অর্থাৎ দস্যুদিগের কুশযুক্ত যজ্ঞে অনাসক্তি,—তাহাতেও এই মত সমর্থিত হয়। দস্যুগণের যজ্ঞবিমুখতা তাহাদিগের ও আর্যদিগের মধ্যে বিরোধের হেতু। যে সন্দেহের কথা পূর্বে বলা হইয়াছে, অর্থাৎ দাস ও দস্যু বলিয়া কোন স্বতন্ত্র জাতি ছিল না, আপনা-দিগের প্রবর্তিত যজ্ঞাদি ক্রিয়া অস্বীকার করায় ঋষিগণ কতক-গুলি ব্যক্তি ও সম্প্রদায়কে দস্যু ও দাস নামে অভিহিত করিয়া-ছেন, সেই সন্দেহ প্রবল হয়। ইহার পর হঠাৎ ইন্দ্রের জবানীতে

একটি স্বীকৃতি পাওয়া যাইতেছে,—আমি সেই ইন্দ্র যে দস্যুদিগকে আর্য নাম হইতে বঞ্চিত করিয়াছে, যঃ রন্ধে আর্যং নাম দস্যবে। একটি ঋকে দস্যুদিগকে সদ্‌গুণ হইতে বঞ্চিত করিবার ও দানবদিগকে নিন্দনীয় করিবার কথা আছে। এখানে দস্যুদিগকে আর্য নাম হইতে বঞ্চিত করিয়াছি, ইহার অর্থ কি এই যে দস্যুরা বাস্তবিক আর্য, শাস্তি হিসাবে তাহাদিগকে সম্মানীয় আর্য নাম হইতে বঞ্চিত করা হইয়াছে? আর্য নাম বহন করিবার অধিকার তাহাদের থাকিলেও এই অধিকার অগ্রাহ্য করা হইয়াছে? তাহাদিগকে হেয় করিবার কথা বলা হইয়াছে; আর্য নাম হইতে বঞ্চিত করিয়া তাহাদিগকে হেয় করা হইয়াছিল ইহাই কি বুঝিতে হইবে? দাস ও দস্যুদিগের সম্বন্ধে আলোচনায় যে সন্দেহের কথা পুনঃপুনঃ বলা হইয়াছে সেই সন্দেহ যথার্থ বলিয়া দেখা যাইতেছে, ঋগ্বেদীয় প্রমাণসমূহের বর্তমান আলোচনা হইতে এ কথা বলা যায়।

আর্যজাতীয় ব্যক্তিকে যজ্ঞাদি ক্রিয়াবিমুখতা ও ঐ প্রকার অপরাধের জন্য দস্যু নাম দিয়া জাতিচ্যুত করিবার যে বিধান ঋগ্বেদের আমল হইতে প্রচলিত ছিল দেখা যায় পরবর্তীকালের বৈদিক সাহিত্য, মনুসংহিতা, মহাভারত প্রভৃতি হইতে সেইরূপ বিধানের অস্তিত্বের প্রমাণ দেওয়া যায়। ঐতরেয় ব্রাহ্মণের (৭।১৮) মতে অধিকাংশ দস্যুজাতি বিশ্বামিত্রের বংশধর। বিশ্বামিত্রের অভিশাপ হেতু তাঁহার পুত্রগণ হীন অবস্থা প্রাপ্ত হন। পুলিন্দ শবর পুণ্ড্র অন্ধ্র প্রভৃতি জাতি বিশ্বামিত্রের পুত্রগণ হইতে উৎপন্ন। উক্ত ভরত-বংশজাত বিশ্বামিত্রপুত্রগণের এই অবস্থা প্রাপ্তির কাহিনী তাৎপর্যহীন ব্যাপার বলিয়া উড়াইয়া দেওয়া যায় না। ঋগ্বেদের প্রথম সূক্তকার ঋষি মধুচ্ছন্দার আত্মীয়গণের বেলায় এই প্রকার জাতিচ্যুতি সম্ভব হইয়া থাকিলে অন্যান্য আর্যবংশীয়গণের বেলায় ইহা অসম্ভব হইবার কোন কারণ নাই। তারপর দেখা যায় যে মনুর মতে (১০।৪৫) ব্রাহ্মণাদি বর্ণ চতুষ্টয়ের মধ্যে ক্রিয়ালোপাদি কারণে যাহারা বাহ্য জাতি বলিয়া পরিগণিত হয় তাহারা দস্যু আখ্যা প্রাপ্ত হয়। মহাভারতের শান্তিপর্বে দেখা যাইতেছে, দৃশ্যন্তে মানুষে লোকে সর্ববর্ণেষু দস্যবঃ। লিঙ্গান্তরে বর্তমানা আশ্রমেষু চতুর্ষপি। দস্যুগণ চারি বর্ণ ও চারি আশ্রমের মধ্যে ছদ্মবেশে অবস্থান করিতেছে। কর্ণপর্বে দেখা যায় যে পঞ্চনদের বাহীকগণের সম্পর্কে প্রাচ্য ও দাস পদের প্রয়োগ করা হইয়াছে এবং ইহার ব্যাখ্যা স্বরূপ তাহাদিগকে অযজ্ঞান, অশুভ কর্মকারী বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে। (ব্রাত্যানাং দাসমীয়ানাং বাহীকানামযজ্বনাম ইত্যাদি) প্রাচীন ক্রিয়াকাণ্ডের বিরোধীকে যে বর্ণনির্বিচারে দস্যু বলা হইত এখানে তাহার পরিষ্কার প্রমাণ পাওয়া যাইতেছে। ঋগ্বেদের প্রমাণ হইতে দেখা যাইতেছে যে যখন চতুর্বর্ণ বিভাগের ব্যবস্থা সম্পূর্ণরূপে গড়িয়া উঠে নাই তখনও এই প্রথার অনুসরণ করা হইত।

উপরের আলোচনায় যে সকল প্রমাণের উল্লেখ করা হইল তাহা সম্পূর্ণরূপে ঋগ্বেদ হইতে সংগৃহীত, সুতরাং অতি প্রাচীন প্রমাণ। কিন্তু বৈদেশিক আর্যজাতি কর্তৃক ভারত বিজয়ের মতবাদ বৈদেশিক বেদ ব্যাখ্যাতাদিগের প্রচেষ্টায় প্রচারিত হইয়া পণ্ডিতসমাজে গৃহীত হইয়াছে। আর্যদিগের শত্রুগণ যে অনার্য বর্বর, আদিম অধিবাসী দাস ও দস্যু, ইহা ঐ মতবাদেরই একটি অংশ। স্বীকার করিতে হয় যে দাস ও দস্যু ভারতবর্ষের অনার্য বর্বর আদিম অধিবাসীরূপে চিত্রিত না হইলে আর্যদিগের, পরবর্তীকালের কোরাণ ও তরবারি, বাইবেল ও তরবারি, তুলাদণ্ড ও তরবারি পদ্ধতির সঙ্গে সঙ্গতি রক্ষা করিয়া, বেদ ও তরবারি হস্তে ভারতবর্ষ বিজয়ের প্রকাণ্ড কীর্তি অর্ধশূন্য হইয়া যায়। উপরের আলোচনা হইতে দাস ও দস্যুদিগের এই চিত্র ঋগ্বেদ হইতে কতখানি সমর্থিত হয় তাহা দেখা গিয়াছে।

এখানে প্রসিদ্ধ পণ্ডিত ডাঃ মুইরের (*Sanskrit Texts* 2-383) অভিমতের উল্লেখ করা যাইতে পারে। তিনি বলিতেছেন:

"Though it is true that some of the Arian tribes who had not adopted Brahmanical institutions were so designated (অর্থাৎ দস্যু বলিয়া অভিহিত হইত) in after times, the term Dasyu could not have been so applied in the earlier Vedic era. At that time the Brahmanical institutions had not arrived at maturity, and the tribes stigmalized by the Vedic poets as persons of a different religion must, therefore, probably have been such as had never been brought into contact with the Arians, and were, in fact, of an origin, totally distinct."

অর্থাৎ যদিও দেখা যায় যে কতকগুলি আর্যগোষ্ঠী যাহারা ব্রাহ্মণ্য ক্রিয়াকর্ম গ্রহণ করে নাই পরবর্তীকালে তাহাদিগকে দস্যু নামে অভিহিত করা হইয়াছিল, তথাপি প্রাচীন বৈদিক যুগে দস্যু পদের ঐরূপ প্রয়োগ সম্ভবপর ছিল না। বৈদিক যুগে ব্রাহ্মণ্যধর্মাদি সম্পূর্ণতা প্রাপ্ত হয় নাই। বৈদিক কবিগণ যে সকল গোষ্ঠীকে অন্য ধর্মাবলম্বী বলিয়া অপবাদ দিয়াছেন তাহারা সম্ভবতঃ পূর্বে কখনও আর্যদিগের সংস্পর্শে আসে নাই এবং প্রকৃত প্রস্তাবে তাহারা ছিল সম্পূর্ণ স্বতন্ত্রজাতির লোক। পরবর্তীকালে ব্রাহ্মণদিগের ক্রিয়াকাণ্ডের বিরোধী আর্যগোষ্ঠীকে দস্যু বলা সম্ভব হইয়া থাকিলে বৈদিক যুগে ঋষিদিগের ক্রিয়াকাণ্ডের বিরোধী আর্যগোষ্ঠীকে দস্যু অপবাদ দেওয়া অসম্ভব হইবার কোন কারণ ছিল না। ব্রাহ্মণ্যধর্মের পরিণত অবস্থা প্রাপ্তির সঙ্গে ইহার কোন যোগাযোগ নাই। তারপর অন্য ধর্মাবলম্বী বলিয়া দাস ও দস্যুদিগকে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র জাতির লোক বলিবার কোন যুক্তিসঙ্গত কারণ নাই; যে অর্থে দাস ও দস্যু অন্য ধর্মাবলম্বী অনেকখানি সেই অর্থে বহু ঋগ্বেদীয় গোষ্ঠী ও ঋষিকুলের কেহ কেহ অন্য ধর্মাবলম্বী ছিলেন।

সুতরাং এ কথা নিঃসন্দেহে বলা যায় যে দাস ও দস্যু-

দিগের যে চিত্র প্রচলিত আর্য্যবাদের অঙ্গ হিসাবে অঙ্কিত করা হইয়াছে তাহার কোন সূত্র ঋগ্বেদ হইতে পাওয়া যায় না; আর এসম্বন্ধে অন্ত যুক্তি প্রমাণ অপেক্ষা ঋগ্বেদের প্রমাণের মূল্য অনেক বেশী।

দাস ও দস্যুদিগের সম্বন্ধে আরও আলোচনার প্রয়োজন আছে। এখানে এইটুকু মাত্র উল্লেখ করা যাইতে পারে যে, রমাপ্রসাদ চন্দ মহাশয় ইঙ্গিত করিয়াছেন যে ঋগ্বেদের পণিনামক দস্যুজাতি সিন্ধু-সভ্যতার প্রতিনিধি।

উমেশ পণ্ডিত

শ্রীজগদীশচন্দ্র ঘোষ

১

চণ্ডীতলা উচ্চ প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ঘরের ভিতরে বসিয়া বৃদ্ধ উমেশ পণ্ডিত সম্মুখের মাঠের দিকে অপলক দৃষ্টিতে তাকাইয়া একমনে কি যেন ভাবিয়া চলিয়াছেন। আজ শনিবার, সকাল সকাল ছুটি হইয়া গিয়াছে। ছাত্রেরা এবং দ্বিতীয় শিক্ষক রাইচরণ পাল বাড়ী চলিয়া গিয়াছেন। চৈত্র মাস। সম্মুখের মাঠটি যেন একেবারে জ্বলিয়া পুড়িয়া আগুন হইয়া উঠিয়াছে। পাশের শুষ্ক ডোবাটির কাদার ভিতর হইতে যেন একটা দম্ আটকান বাষ্প ঠেলিয়া বাহির হইতেছে—পথের ধারের প্রকাণ্ড পাকুড় গাছটি হইতে একেবারে শেষ পত্রটি পর্য্যন্ত ঝরিয়া পড়িয়া গিয়াছে—তাহারই ডালে বসিয়া একটা চিল অনবরত ডাকিয়া চলিয়াছে। এই কাঠফাটা রৌদ্রের দিকে তাকাইয়া উমেশ পণ্ডিত কেমন করিয়া যে সেই চল্লিশ বৎসর পূর্ব্বে চণ্ডীতলায় এই ইস্কুলের সহিত তাঁহার নিজের জীবন একেবারে জড়াইয়া তাহারই অঙ্গীভূত হইয়া গিয়াছে তাহাই ভাবিয়া চলিয়াছেন। আর কয়টা দিন পরে চণ্ডীতলা উচ্চ প্রাথমিক বিদ্যালয় উঠিয়া যাইবে। উমেশ পণ্ডিত ইহা যে কল্পনাও করিতে পারেন না। ভূমিকম্পে অর্দ্ধেক পৃথিবী জলের নীচে ডুবিয়া যাওয়া বা মড়ক লাগিয়া একটা জনপদ ধ্বংস হইয়া যাওয়াও তাঁহার নিকটে ইহার চেয়ে মর্ম্মান্তিক নহে। চণ্ডীতলার ইস্কুল—উমেশ পণ্ডিতের চল্লিশ বৎসরের সাধনার ইস্কুল আজ উঠিয়া যাইবে।—ইহাই আজ বিশ্বাস করিতে হইবে উমেশ পণ্ডিতকে? আজ চল্লিশ বৎসর ধরিয়া এ অঞ্চলের অজ্ঞান অন্ধকার দূর করিল কে? গ্রামে গ্রামে এই যে চাকুরে, উকিল, ডাক্তার—এই যে সব বাবুর দল ইহাদের চোখ ফুটাইল কে? যে সব স্বদেশী ছোঁড়ার দল বক্তৃতা দিয়া জেল খাটিয়া বাহবা পাইতেছে তাহাদের মুখে বুলি ফুটাইল কে? সকলকেই না এক দিন চণ্ডীতলা উচ্চ প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ঢুকিয়া—উমেশ পণ্ডিতের পায়ের তলায় বসিয়া বিদ্যা অর্জ্জন করিতে হইয়াছে। আর আজ সেই ইস্কুল উঠাইয়া দিবার জন্য সেই অকৃতজ্ঞের দল মিলিয়া ষড়যন্ত্র করিয়াছে। না, কখনই না—উমেশ পণ্ডিত বাঁচিয়া থাকিতে তাহা হইতে দিবে না। ভাবিতে ভাবিতে উমেশ পণ্ডিত উত্তেজিত হইয়া উঠিলেন। কিন্তু বৃথাই এ উত্তেজনা—ইস্কুল ত তাঁহার সত্য করিয়াই উঠিয়া যাইবে—কোন সাধ্য নাই তাঁহার রোধ করিবার। মাত্র কয়েক শত হাত দূরে ঐ যে বড় রাস্তাটি উহারই ঐ পাশের মাঠের ভিতরে নূতন মাইনর ইস্কুলের প্রতিষ্ঠা হইবে—গতকল্যকার সভায় একেবারে স্থির হইয়া গিয়াছে। শুধু মাইনর ইস্কুলই নয়, এই মাইনর ইস্কুলকে নাকি কয়েক বৎসরের মধ্যে উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়েও পরিণত করা হইবে। গতকল্য মাণিক দত্তের বাড়ীতে চণ্ডীতলা, মহেশপুর, বাবুইখালী এই তিন গ্রামের লোক মিলিয়া সভা করিয়াছে। মাণিক দত্তের বড় ছেলে অক্ষয় একাই সাত হাজার টাকা দিবে—বাকি হাজারকয়েক টাকা কয়েকটি গ্রাম হইতে চাঁদা তুলিয়া আদায় করা হইবে। অক্ষয় তাঁহারই ত ছাত্র—এই ইস্কুল হইতে পাস করিয়া—রাজবাড়ীর ইস্কুল হইতে ম্যাট্রিক দিয়াছে—আজ বছর পাঁচ-সাত। এবার যুদ্ধের ছিড়িকে কলিকাতায় কয়েক হাজার টাকা খাটাইয়া একেবারে নাকি লক্ষপতি হইয়া উঠিয়াছে। অক্ষয়ের পিতার নামে হইবে নূতন ইস্কুল। অনাহূত উমেশ পণ্ডিত সভার এক কোণে গিয়া চুপ করিয়া বসিয়া ছিলেন। সমস্ত বক্তৃতা শুনিয়াছেন—আর ভাবিয়া চলিয়াছেন নিজের ইস্কুলটির কথা। যে ইস্কুলটি এতদিন ধরিয়া এমনি করিয়া দেশের লোককে শিক্ষিত করিয়া তুলিল, সেজন্য ত একটি লোকও কোন প্রকার কৃতজ্ঞতার ভাষা প্রকাশ করিল না। বরং এখানে যে কিছু হয় না—এমনি বক্রোক্তি করিতেও কেহ ছাড়ে নাই।

পাঁচ হাজার টাকা খরচ করিয়া পাকা পোতা গাঁথিয়া দেওয়াল দিয়া টিনের চালায় নূতন ইস্কুল-ঘর তৈয়ারি হইবার পরিকল্পনা প্রস্তুত হইয়াছে। অথচ গত বৎসর—এই খড়ের ঘরখানিতে কয়েকটি শালকাঠের খুঁটি দিবার জন্য ইস্কুলের অনেক হিতৈষীর নিকট বলিয়া-কহিয়াও গোটা চল্লিশেক টাকা উমেশ পণ্ডিত সংগ্রহ করিতে পারেন নাই। প্রতি দুই বৎসর অন্তর গ্রামের প্রত্যেক বাড়ী হইতে বাঁশ চাহিয়া আনিয়া ঘরখানি কোন প্রকারে খাড়া রাখিতে হইতেছে। আজ বছর খানে

আগে সেবার আশ্বিন মাসের ঝড়ে ঘরখানি ফেলিয়া দিয়া যায়। তারপর অন্ততঃ মাসখানেক ধরিয়া বাড়ী বাড়ী ঘুরিয়া অতিকষ্টে কিছু টাকা আদায় করিয়া পুনরায় ঘরখানি তুলিতে পারিয়াছিলেন।

ভাবিতে ভাবিতে বেলা একেবারে শেষ হইয়া আসিল। অপরাহ্ণ-সূর্য্য পশ্চিমাকাশে ঢলিয়া পড়িয়াছে। দরজার ফাঁক দিয়া রৌদ্র ঘরের ভিতরে ঢুকিয়া উমেশ পণ্ডিতের চোখেমুখে লাগিতেছে। উমেশ পণ্ডিত ভাঙা ফ্রেমের চশমাখানি কোঁচার খুঁটে মুছিয়া লইয়া ছাত্রগণের হাজিরা বহিখানি বগলে পুরিয়া ইস্কুল-ঘর হইতে বাহির হইলেন।

২

সেকালে মহেন্দ্র মৈত্র ছিলেন এ গ্রামে সকলের চেয়ে শিক্ষিত ব্যক্তি। তিনি ছাত্রবৃত্তি পাস করিয়া শহরের ইংরেজী স্কুলে কয়েক বৎসর পড়াশুনা করিয়া আসিয়াছিলেন। চল্লিশ বৎসর পূর্ব্বে মহেন্দ্র মৈত্রের সহায়তায় উমেশ পণ্ডিত প্রথম এই স্কুলটির প্রতিষ্ঠা করেন। যেদিন ইস্কুলটির প্রতিষ্ঠা হয় সেদিন কয়েকটি গ্রামের ভিতরে সাড়া পড়িয়া গিয়াছিল, উমেশ পণ্ডিতের নামও তখন লোকের মুখে মুখে ছড়াইয়া পড়িয়াছিল। আশেপাশের বিশটা গ্রামের ভিতরে একটা পাঠশালাও তখন ছিল না। লোকে কি সম্মানটাই না তাঁহাকে দেখাইত। কি দিনই গিয়াছে। প্রথম দশটি ছাত্র লইয়া ইস্কুলটি আরম্ভ হয়—আজ সেই ছাত্র বাড়িতে বাড়িতে ষাটের উপরে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে। পূর্ব্বে উমেশ পণ্ডিত একাই পড়াইতেন, ছাত্র বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে আর এক জন শিক্ষক রাখিতে হইয়াছে। যখন ইস্কুলের প্রতিষ্ঠা হয় তখন উমেশ পণ্ডিত ত্রিশ বৎসরের যুবক। তারপর চল্লিশটি বৎসরে তাঁহার মাথার উপর দিয়া কত ঝড়ঝাপ্টা চলিয়া গিয়াছে, কিন্তু তবু ইস্কুলটি তিনি ছাড়েন নাই। নিতান্ত দুর্বিপাকে না পড়িলে কোন দিন স্কুলে অনুপস্থিত পর্য্যন্ত হন নাই। এই বৃদ্ধ বয়সে নিজের একান্ত আপনার বলিতে যাহারা তাহাদের সকলকেই হারাইয়া একমাত্র বিধবা কন্যা আর চণ্ডীতলা উচ্চ প্রাথমিক বিদ্যালয় সম্বল করিয়া নির্ব্বিকার চিত্তে জীবনের দিনগুলি তিনি কাটাইয়া যাইতেছেন। চল্লিশ বৎসর ধরিয়া বারে বারে নূতন নূতন ছাত্রের ধারাপাতের সেই কড়াকিয়া, বুড়িকিয়া, শতকিয়া, বাল্যশিক্ষা আর বোধোদয় পড়াইয়া একদিনের জন্যও এতটুকু বিরক্তি তাঁহার আসে নাই। দুষ্টু ছেলের পিঠে বেত ভাঙিয়া নাড়ু গোপাল করিয়া বসাইয়া হাতের উপরে একখানা আস্ত ইট চাপাইয়া এক পায়ে দাঁড় করাইয়া—কত গাধা পিটাইয়া যে তিনি মানুষ করিয়াছেন তাহার কি ইয়ত্তা আছে! বাড়ীর সম্মুখের পথ দিয়া কৈবর্ত্তদের ছেলে কার্ত্তিক যাইতেছিল—তাহার দিকে নজর পড়িতেই উমেশ পণ্ডিত ডাকিলেন—শুনে যা তো কার্ত্তিক। কার্ত্তিক উমেশ পণ্ডিতের ছাত্রদের ভিতরে সবচেয়ে বয়সে বড় কিন্তু এখনও সে সকলের উপরের ক্লাসে উঠিতে পারে নাই। তবে তাহার বাবার নিতান্ত ধনুর্ভঙ্গ পণ যে কার্ত্তিককে সে উমেশ পণ্ডিতের স্কুলে পাস করাইবেই। উমেশ পণ্ডিত তাহাকে আশ্বাস দিয়াছেন আর বছর চারেকের ভিতরে কার্ত্তিকের পিতার মনোবাঞ্ছা তিনি পূর্ণ করিবার চেষ্টা করিবেন। তবে সঙ্গে সঙ্গে ইহাও বলিয়া দিয়াছেন কার্ত্তিক যেন একেবারে সারাক্ষণ পুঁথিপত্র লইয়া বসিয়া না থাকিয়া মাঝে মাঝে তাহার পিতার ক্ষেত-খামারের কাজে খানিকটা সাহায্য করিতে থাকে।

ভয়ে ভয়ে কার্ত্তিক তাঁহার নিকটে আগাইয়া আসিল। উমেশ পণ্ডিত সস্নেহে কার্ত্তিককে নিজের পাশে বসাইয়া তাহার গায়ে মাথায় হাত বুলাইয়া বলিলেন—বেশ ভাল আছিস্ তো কার্ত্তিক? কার্ত্তিক একেবারে আশ্চর্য্য হইয়া গেল যে উমেশ পণ্ডিতের বেতের দাগ তাহার শরীরের যেখানে সেখানে খুঁজিলেই দুই চারিটি করিয়া পাওয়া যাইবে—যাঁহার উৎপাতে তাহার দুই পাশের কানের ঠিক উপরের চুলগুলি আর ভাল করিয়া গজাইতেই পারিল না—শূয়ার, গাধা, উল্লুক প্রভৃতি মিষ্ট বুলিগুলির সহিত যে কার্ত্তিকের নিত্যকার পরিচয় আজ সেই কার্ত্তিককেই কিনা স্বয়ং উমেশ পণ্ডিত এমনি করিয়া আদর করিতেছেন? ব্যাপার কি?

উমেশ পণ্ডিত বলিতে লাগিলেন—আচ্ছা তুই বল্ দেখি কার্ত্তিক—আমাদেরই ইস্কুলে যেমন অঙ্ক আর সাহিত্য শেখায় হয় এমন আর এ মহকুমার ভিতরে কোথাও হয় কিনা? সেবারই ইস্কুল-সাব্‌ইন্‌স্পেক্টর সাহেব স্বয়ং একথা বলে যান নি?

কার্ত্তিক মাথা হেলাইয়া জবাব দিল—হাঁ তাই তো!

উমেশ পণ্ডিত বলিলেন—তবেই বোঝ্। তুই তো এত দিন ইস্কুলে পড়ছিস্—কি না জানিস্ বল্। আর সেই ইস্কুল না কি এত দিন পরে উঠে যাবে। কার্ত্তিক মহা উৎসাহের সহিত বলিয়া উঠিল—কবে পণ্ডিতমশাই?

উমেশ আপন মনেই বলিয়া যাইতে লাগিলেন—নূতন ইস্কুল হবে রে—কত টাকা তুলেছে—ওপাড়ার অক্ষয় দেবে একাই সাত হাজার টাকা।

কার্ত্তিক এবার আবার নিরুৎসাহ হইয়া বলিল—উঠেই যদি যাবে তবে কি কাজ আর একটা ইস্কুল হয়ে?

—তোদেরও তো এখন থেকে সেই ইস্কুলেই পড়তে হবে রে কার্ত্তিক?

কার্ত্তিক সবেগে মাথা নাড়িয়া প্রতিবাদ করিয়া বলিল—কার্ত্তিক কখনও সে ইস্কুলে পড়তে যাবে না পণ্ডিতমশাই—আপনি দেখে নেবেন।

৩

ইস্কুলে গিয়া ছেলেদের পড়াইতে আর মন বসে না।

একটা অঙ্ক দিয়া হয় তো চুপ করিয়া বসিয়া ঘণ্টার পর ঘণ্টা উমেশ পণ্ডিত ঝিমাইতে থাকেন। বাংলা বই পড়াইতে পড়াইতে কখনও বা মাঝখানেই পড়া বন্ধ করিয়া বলেন—আজ থাক্—কাল হবে। উমেশ পণ্ডিতের সুদীর্ঘ এই চল্লিশ বৎসর মাষ্টারী জীবনে এমন তো কোন দিন হয় নাই। সারাটা দিন ধরিয়া হাঁকে ডাকে ইস্কুলকে সরগরম করিয়া রাখিয়াছেন। কোন্ ছাত্র কতটুকু ফাঁকি দিল, না দিল তাহার কিছু মাত্র তাঁহার চক্ষু এড়াইয়া যাইত না। আর আজ সেই উমেশ পণ্ডিতের এমনি ভাবান্তরে ছাত্রেরা পর্য্যন্ত আশ্চর্য্য হইয়া উঠিয়াছে। সমস্ত ক্লাসের ছেলেরা হৈ হল্লা করিতে থাকে—উমেশ পণ্ডিত কথাটি কহেন না।

সে দিন দ্বিতীয় শিক্ষক রাইচরণ পালকে বলিলেন—বুঝেছ রাইচরণ, ইস্কুল আমাদের সত্যি করেই উঠে যাবে।

রাইচরণ অম্লান বদনে জবাব দিল—তা যাক্ না- আরো তো বড় ইস্কুল হচ্ছে।

—কিন্তু চাকরীটাও তো যাবে, সে কথা ভেবেছো তো?

—ভারি তো চাকরি—মাসিক সাত টাকা বেতন। গরু চরালেও ওর চেয়ে বেশী পাওয়া যায়।

উমেশ চুপ করিয়া গেলেন—আর কথাটি বলিবার প্রবৃত্তি হইল না।

কলিকাতা হইতে অক্ষয় বাড়ী আসিয়াছে শুনিয়া এক দিন সন্ধ্যাবেলা উমেশ পণ্ডিত তাহার সহিত দেখা করিতে গেলেন। অক্ষয় প্রণাম করিয়া সমাদর করিয়া তাঁহাকে বসাইয়া কুশল প্রশ্ন করিল। অনেক করিয়া সঙ্কোচ কাটাইয়া উমেশ বলিলেন—একটা কথা বলতে এলাম অক্ষয়। আমার ইস্কুলটা কি এত দিন পরে সত্যি করেই উঠে যাবে।

অক্ষয় জবাব দিল—আপনার ইস্কুলের তো আর দরকার নাই পণ্ডিতমশাই—মাইনর ইস্কুল হচ্ছে যে—তার পর কয়েক বছরের ভিতরে মাইনর ইস্কুলকে হাই ইস্কুলে পরিণত করতেও আমাদের ইচ্ছে আছে।

কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া পণ্ডিতমশাই বলিলেন—কিন্তু জান তো বাপু—এই শেষ বয়স—ঐ ইস্কুলটা ধরেই তো কোন রকমে বেঁচে আছি—যে কয়টা টাকা পাই তাই দিয়েই কোন রকমে—।

অক্ষয় বাধা দিয়া বলিল—আপনি ভাববেন না পণ্ডিতমশাই—চাকরি আপনার যাবে না—আপনাকে সেকেণ্ড পণ্ডিতের পদে রাখা হবে ঠিক হয়েছে। বাইরের মাষ্টার বড় একটা আমরা রাখবো না, তাতে খরচ বেশী লাগে। মহেশপুরের যতীন মিত্তিরের ছেলে প্রকাশ আই-এ পাশ করে বসে আছে—সেই হবে হেড মাষ্টার।

—যতীন মিত্তিরের ছেলে—খাঁদু?

—হাঁ সেই।

উমেশ পণ্ডিত আর কিছু না বলিয়া বাড়ী ফিরিয়া আসিলেন বটে, কিন্তু মনে তিনি এতটুকু শান্তি পাইলেন না। চাকুরী থাকিলে কি হয়? সত্যই কি, তাঁহার ইস্কুলের সহিত যে সম্বন্ধ তাহা কি এই কয়টা টাকারই সম্বন্ধ? উমেশ অনেক ভাবিয়া দেখিলেন—টাকা তিনি সত্য করিয়াই চান্ না, তিনি চান তাঁহার নিজের ইস্কুল। আর খাঁদু যে এই কয়টা বৎসর আগেও তাঁহারই ছাত্র ছিল সেই হইবে হেড মাষ্টার! তাহারই অধীনে তাঁহাকে চাকুরী করিতে হইবে? ধিক্ এই চাকুরীর! তিনি বরং ভিক্ষা করিয়া খাইবেন—তবু এ চাকুরী করিবেন না।

মিস্ত্রি আর কুলি-মজুর লাগিয়া নূতন ইস্কুল গৃহ তৈরী হইতেছে। ধীরে ধীরে মাস তিনেকের ভিতরে উমেশ পণ্ডিতের চোখের উপরে নূতন গৃহটি গড়িয়া উঠিল। চল্লিশ হাত করিয়া দুইখানা টিনের ঘর পাকা পোঁতা, পাকা দেওয়াল, কাঠের ছাদ, সমস্তই শেষ হইয়া গিয়াছে। আর পনরটি দিন পরে একটি ভাল দিন দেখিয়া প্রথম ইস্কুল বসিবে স্থির হইয়াছে।

সেদিন ইস্কুলের শেষে সকলে বাড়ী চলিয়া গিয়াছে, উমেশ পণ্ডিতও খাতাপত্র বগলে পুরিয়া যাইবার উদ্যোগ করিতেছেন। এমন সময় কার্ত্তিক ঘরে ঢুকিয়া ডাকিল, পণ্ডিতমশাই? উমেশ তাহার দিকে ফিরিয়া বলিলেন—কি রে কার্ত্তিক, তুই এখনও বাড়ী যাস্‌নি যে।

কার্ত্তিক তাঁহার কথার জবাব না দিয়া বলিল—নতুন ইস্কুল তো সত্যি করেই তা হলে হ'ল পণ্ডিতমশাই।

উমেশ পণ্ডিত তাহার দিকে ফিরিয়া বলিলেন—হ'লই তো রে কার্ত্তিক, কি আর করবো বল্, আমার কি সাধ্য যে বাধা দিই? আমার কি দুঃখু জানিস্, আমার এত দিনের সাধের ইস্কুলটি উঠে যাবে।

কার্ত্তিক বলিল—"এটাই যদি উঠে যাবে তা হলে আর, আর একটা হবে কেন? এটার কি দোষ হ'ল?"

—তবেই বোঝ্ কার্ত্তিক।

কার্ত্তিক মুখে মহাদুশ্চিন্তার ভাব টানিয়া আনিয়া বলিল—বাবা বলেছে পণ্ডিতমশাই, আমাকেও নাকি নতুন ইস্কুলে পড়তে হবে? আমি "না" বলেছিলাম। কিন্তু বাবা যে একরোখা মানুষ, বললে ইস্কুলে না গেলে পিঠের চামড়া তুলে বাড়ী থেকে তাড়িয়ে দেবে। কি হবে পণ্ডিতমশাই? উমেশ কার্ত্তিকের কথার কোন জবাব না দিয়া চুপ করিয়া কি যেন ভাবিতে লাগিলেন। হঠাৎ কার্ত্তিক পুনরায় বলিয়া উঠিল—একটা কথা বলবো পণ্ডিতমশাই?

উমেশ বলিলেন—কি কথা রে!

—কাউকে যেন বলবেন না। আচ্ছা, রাত্রে লুকিয়ে ওদের ঐ ইস্কুল ঘরে আগুন দিয়ে পুড়িয়ে দিলে হয় না?

শুনিবামাত্র উমেশ আতঙ্কে শিহরিয়া উঠিলেন—ইস্, তুই বলিস্ কি কার্ত্তিক, ও কথা কি মুখে আনতে আছে রে! আর কখনও বলিস্ নে যেন। কার্ত্তিক ক্ষুণ্ণ মনে বলিল—তা ছাড়া যে আর পথ নাই পণ্ডিতমশাই।

উমেশ বলিলেন—যা অদৃষ্টে আছে তাই হবে কার্ত্তিক আর ভেবে কি হবে বল্। চল্ বাড়ী যাই।

৪

চণ্ডীতলা উচ্চ প্রাথমিক বিভালয়ের পাঁচ জন মেম্বার লইয়া একটি কমিটি ছিল, বিপিন গাঙ্গুলী ছিলেন ইহার সেক্রেটারী। কিন্তু সকলেই ঐ নামে মাত্রই, কেহ কোন দিন ইস্কুলের দিকে ফিরিয়াও চাহিতেন না। উমেশ পণ্ডিতই দোরে দোরে ঘুরিয়া চাঁদা তুলিয়া ঘর তুলিয়াছেন, বেঞ্চ, চেয়ার তৈরি করিয়াছেন। অথচ আজ ইস্কুলের মেম্বারেরা সভা করিয়া ঠিক করিয়া ফেলিয়াছেন, যে দিন নূতন ইস্কুল প্রথম বসিবে সেই দিন এখানকার চেয়ার বেঞ্চি সমেত সমস্ত ছেলে তাঁহারা নূতন ইস্কুলে লইয়া যাইবেন। আজ ইস্কুলে গিয়া উমেশ পণ্ডিত মোটেই আর পড়াইতে মনোনিবেশ করিতে পারিলেন না। সারাটা দিন ধরিয়া কেবলই তাঁহার মনে হইতে লাগিল তাঁহারই তৈরি এই সব চেয়ার বেঞ্চি লইয়া নূতন ইস্কুল বসিবে—আর এই কয়টা দিন পরে তাঁহার ইস্কুলটি যাইবে ভাঙিয়া। ইস্কুলের ছুটির পর সারাটা বিকাল বেলা তিনি নিজের ঘরে বসিয়া চুপ করিয়া ভাবিতে লাগিলেন। মাঝে মাঝে ক্রোধে ও উত্তেজনায় অস্থির হইয়া উঠিতেছিলেন। অনেক ভাবিয়া স্থির করিলেন, এ গ্রামে আর তিনি থাকিবেন না। কিন্তু যাইবার পূর্ব্বে এমনি করিয়া নিজের ইস্কুলটি তিনি কখনও পরের হাতে তুলিয়া দিয়া যাইতে পারিবেন না। ভাবিতে ভাবিতে প্রতিহিংসায় তাঁহার দুই চোখ জ্বলিয়া উঠিল। মানুষ যেমনই চিন্তা করিয়া আত্মহত্যা করিতে যায় এমনই একটি চিন্তা তাঁহার মাথায় আসিল। সন্ধ্যার পরে গিয়া তিনি কার্ত্তিকের বাড়ী হইতে কার্ত্তিককে ডাকিয়া আনিয়া নিজের ঘরে বসাইয়া বলিলেন—তোর কথাই ঠিক কার্ত্তিক, ইস্কুল ঘরটি আজ রাত্রে পুড়াইয়া দিতে হইবে।

কার্ত্তিক উৎসাহের সহিত বলিয়া উঠিল—আমি তো আগেই বলেছিলাম পণ্ডিতমশাই যে দিই ওদের ইস্কুল ঘর পুড়িয়ে ছাই করে—সব আপদ চুকে যাক্—তা আপনিই তো রাজী হলেন না।

উমেশ বলিলেন—কিন্তু ওদের ইস্কুল নয় কার্ত্তিক—আমাদের স্কুল ঘরে আগুন দিতে হবে।

কার্ত্তিক দুই চোখ বিস্ফারিত করিয়া বলিল—আমাদের ইস্কুলে কি রকম? এ আপনি কি বলছেন পণ্ডিতমশাই?

—হাঁরে আমাদের ইস্কুলই আগুন দিয়ে পুড়িয়ে দিতে চাই। জানিস্ কার্ত্তিক, আমার এত সাধের ইস্কুল—ওরা এর সব চেয়ার বেঞ্চিগুলা নিয়ে নতুন ইস্কুল করবে। আমার জিনিষ আমি দেব না ওদের—দেব সব পুড়িয়ে।

কার্ত্তিক ভাবিয়া বলিল—কিন্তু আগুনই যখন দিতে হবে তখন ওদের ইস্কুলেই দিই না কেন পণ্ডিতমশাই?

—না রে ওরা কত কষ্ট করে—কত আশা করে করেছে তা হলে যে দুঃখ পাবে।

কার্ত্তিক বলিল—আমাদের ইস্কুল পুড়লে আমরাও তো দুঃখ পাব পণ্ডিতমশাই?

কিন্তু তোর দুঃখ কিসের রে কার্ত্তিক?

কার্ত্তিক বলিল—আমিও খুব দুঃখ পাব পণ্ডিতমশাই। না হয় আমি ভাল ছেলে নাই হলাম, কিন্তু আজ এই দশটা বছর ধরে যে ইস্কুলে পড়ছি তার উপরে একটা মায়া পড়ে যায় না?

উমেশ পণ্ডিত কার্ত্তিকের গায়ে মাথায় হাত বুলাইয়া বলিলেন—তুই তা হলে আমার দুঃখ সত্যি করেই বুঝিস্ কার্ত্তিক। কিন্তু ওরা যদি আমাদের ইস্কুল ভেঙে নতুন ইস্কুলে নিয়ে যায়—সে তো আরও দুঃখের কথা হবে রে। তার চেয়ে চল্ আমাদের জিনিষ আমরা পুড়িয়েই দিই। আমি বুড়ো মানুষ—রাত্রে ভাল করে চোখে দেখি না—তুই চালে উঠে আগুনটা দিয়ে দিবি।

কার্ত্তিক রাজী হইয়া বলিল—কিন্তু আপনাকে সঙ্গে সঙ্গে গিয়ে রাস্তার তেমাথায় ঐ আমগাছটার ঝোপের ওখানে দাঁড়াতে হবে—ঐ গাছটায় সেবার রসিক মাঝি গলায় দড়ি দিয়ে মরেছিল—আমার বড্ড ভয় করে।

খানিকটা রাত্রি হইলে উমেশ পণ্ডিত আর কার্ত্তিক এক বোতল কেরোসিন আর দেয়াশলাই লইয়া সেই আমগাছের ঝোপের নিকট আসিয়া দাঁড়াইল। খড়ের চালায় কেরোসিন ঢালিয়া দেয়াশলাই জ্বালিয়া কার্ত্তিক এক দৌড়ে উমেশ পণ্ডিতের নিকটে আসিয়া বলিল—দিয়ে এলাম পণ্ডিতমশাই। সঙ্গে সঙ্গে হু হু করিয়া আগুন একেবারে আকাশের দিকে মাথা তুলিয়া গর্জ্জিয়া উঠিল। সারা পথ ঘাট উঠিল আলোকিত হইয়া—ঘরের বাঁশের গিটগুলা ফাটিয়া বন্দুকের মত শব্দ হইতে লাগিল। সেই আগুনের দিকে চাহিয়া কার্ত্তিক এক মুহূর্ত্তে একেবারে ফুঁপিয়া ফুঁপিয়া কাঁদিয়া ফেলিয়া বলিল—ঘর যে একেবারে পুড়ে গেল পণ্ডিতমশাই। পণ্ডিতমশাইয়েরও তখন দুই চোখের জলে বুক ভাসিয়া যাইতেছে। সেদিক হইতে কোন সাড়াই কার্ত্তিক পাইল না। আর এক বার দুই হাত দিয়া পণ্ডিতমশাইকে নাড়া দিয়া কার্ত্তিক বলিল—শুনছেন পণ্ডিতমশাই। কিন্তু উমেশ তেমনি অসাড়ের মত সেই আগুনের দিকে চাহিয়া চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন। অগত্যা কার্ত্তিক ছুটিয়া গেল ইস্কুল ঘরের দিকে। ইতিমধ্যে গ্রাম হইতে হৈ চৈ করিয়া লোকজন এই দিকে ছুটিতে আরম্ভ করিয়াছে। কার্ত্তিক লাথি মারিয়া ঘরের তালা ভাঙিয়া চেয়ার বেঞ্চি টানিয়া বাহির করিতে লাগিল। ঘরখানা আর রক্ষা করা গেল না। সময়মত লোকজন আসিয়া পড়ায় চেয়ার বেঞ্চিগুলা সমস্তই বাহির করা হইল।

ঘরের চালগুলা তখনও খসিয়া পড়িয়া পুড়িয়া চলিয়াছে

কিন্তু আর কিছু করিবার নাই—লোকজন চারি পাশে শুধু জটলা করিতেছে। হঠাৎ অজয়ের নজর পড়িল কার্ত্তিকের দিকে।

—এ কি রে কার্ত্তিক, তোর সারা গায়ে কেরোসিন কেন রে? ই দিকে আয় দেখি। শুনিবামাত্র সমস্ত জনতা কার্ত্তিককে ঘিরিয়া ধরিল—কার্ত্তিক ভয়ে থর্ থর্ করিয়া কাঁপিতে লাগিল। দুই-একটা কিলচড় পড়িতেই কার্ত্তিক একেবারে সমস্ত কথা বলিয়া দিল। জনতা তখন ছুটিয়া গেল সেই ঝোপের কাছে—উমেশ পণ্ডিত তখনও তেমনি ভাবেই চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া ছিলেন—তাঁহার দেহ যেন একেবারে পাষাণ হইয়া গিয়াছে—এমনি মনে হইতেছিল।

সেখান হইতে তাঁহাকে টানিয়া আনা হইল। জনতার ভিতর হইতে গালাগালি টিট্‌কারী যে যাহা পারিল দিল—শুধু বৃদ্ধ বলিয়া আর এ গ্রামের সকলেই তাঁহার নিকটে এক সময়ে একটু আধটু লেখাপড়া শিখিয়াছে বলিয়া কেহ গায়ে হাত তুলিল না।

শেষ রাত্রির দিকে উমেশ পণ্ডিত বিধবা মেয়েটির হাত ধরিয়া চণ্ডীতলা ছাড়িয়া চলিলেন। জনদুই মুটের মাথায় দিয়া কয়েকটি মাত্র নিতান্ত দরকারী জিনিষপত্র সঙ্গে লইয়াছেন। মাইল দুই দূরে রেলষ্টেশন—সেখান হইতে ট্রেনে চাপিয়া কাশী চলিয়া যাইবেন—এ জীবনে আর কখনও এ গ্রামে ফিরিবেন না।

শুভক্ষণ

শ্রীধীরেন্দ্রকৃষ্ণ চন্দ্র

ঝঙ্কৃত করি হৃদয়-তন্ত্রী
সঙ্গীত বাজে মরমে,
চিনি নাই আমি, চিনি নাই তারে
সচকিত ভয়ে সরমে।
চুপে চুপে চুপে পবনে
এসেছিল মম স্বপনে,
অলখিত পদে অলিখিত গীতি
অবসিত মম শরমে;
চিনি নাই আমি, চিনি নাই তারে
সচকিত ভয়ে সরমে।

এসেছিল অতি মন্থর পদে
লাজ-নতা-বধূ-রাগিণী,
অলস বিলাসে নিমীলিত আঁখি
উলসিত হয়ে জাগেনি
শুভ যৌবন-লগনে
বিথারি সে সুর গগনে
শিহরি শিহরি সুদূরে মিলায়
লীলায়িত যেন নাগিনী।
আবেশে বিবশ নিমীলিত আঁখি
উলসি উলসি জাগে নি।

ফাগুন বাতাসে সুবাসে সুবাসে
ভরিয়াছে বন-বীথিকা,
আকাশে রঙের নব নব লীলা,
অরুণের এ কি রীতি গা!
বনে উপবনে কত কি
ফুটিয়াছে ফুল কেতকী,
চামেলী চম্পা, রজনী গন্ধা,
- কোথা মম কোথা গীতিকা?
সুরে সুরে সুরে সুরভিত মন,
সুরভিত বন-বীথিকা।

আধ ঘুমঘোরে, আধ জেগে আছি,
শ্রান্ত শরীর শয়নে,
ফাগুনের স্মৃতি বহে বন-বীথি
ঢুলু ঢুলু মম নয়নে।
হৃদি মম চাহে জাগিতে
রক্তিম রঙে রাঙিতে
বেলা বয়ে যায় জানিতে জানিতে
বৃথা আজি ফুল-চয়নে
এসেছিল গীতি আজি তার স্মৃতি
লেগে আছে শুধু নয়নে।

বিষ্ণুর ত্রিবিক্রম ঃ বামনাবতার

শ্রীযোগেশচন্দ্র রায়, বিদ্যানিধি

বিষ্ণুর ত্রিবিক্রম, তিন পদক্ষেপ, তাঁহার প্রধান কীর্তি, ঋগ্বেদে বহুস্থানে উক্ত হইয়াছে। প্রাচীন ভাষ্যকারেরা ত্রিবিক্রম শব্দের দুই প্রকার অর্থ করিয়াছিলেন। (১) সূর্যের উদয়-স্থানে, মধ্যগগন স্থানে, অস্ত-গমনস্থানে ; (২) পৃথিবীতে, অন্তরীক্ষে, স্বর্গে, এই তিন স্থানে তিন পদক্ষেপ। কিন্তু এই দুই অর্থ স্বীকার করিলে পূর্ণিমার চন্দ্র ও উদীয়মান নক্ষত্রকেও ত্রিবিক্রম বলিতে হয়, কারণ ইহাদেরও তিন স্থান আছে সকলেরই প্রত্যক্ষ হয়। বস্তুতঃ বিক্রম শব্দের অর্থ পদ-ক্ষেপ, পদ নহে। তিন স্থান পাইলে দুই পদ-ক্ষেপ হইতে পারে, তিন হইতে পারে না। ঋগ্বেদের বহু বহু কাল পরে ভাষ্য রচিত হইয়াছিল, তখন ঋগ্বেদের মন্ত্রের তাৎপর্য দুর্বোধ্য হইয়া পড়িয়াছিল। ইহাদের বহুপূর্বে যজুর্বেদের কালে (খ্রী-পূ ২৫০০ অব্দ) ত্রিবিক্রম উপাখ্যানের বিষয় হইয়াছিল। এখানে সহজ অর্থ করা যাইতেছে।

সূর্য বিষ্ণুর স্বরূপ। ঋগ্বেদের ঋষিগণ বলিতেন, "সূর্যের ত্রিবিধ রশ্মিদ্বারা শীত, গ্রীষ্ম, বর্ষা, উৎপন্ন হয়।" (৫।৪৭।৪)। "তিনি স্বর্গ মধ্যে নিহিত বিভিন্নবর্ণ 'অশ্ম' (প্রস্তর খণ্ড) স্বর্গলোক পরিক্রমণ করেন।" (৬,৪৭.৩)। কিন্তু সূর্যের দৈনিক পরিক্রমণদ্বারা শীত-গ্রীষ্ম-বর্ষা-ভেদ হয় না। সূর্য ঋতুবিধান করেন, কিন্তু এক দিনে করেন না, এক সম্বৎসরে করেন। সূর্য, চন্দ্র, নক্ষত্র সকলেই পূর্বদিকে উদিত ও পশ্চিমদিকে অস্তগত হয়, কিন্তু চন্দ্র সূর্যের বিশেষ গতি আছে। এক রাত্রির মধ্যেই চন্দ্রকে পশ্চিম হইতে পূর্বদিকে, তারার পাশ দিয়া অগ্রসর হইতে দেখি। সেইরূপ, সূর্যেরও পূর্বদিকে গতি আছে। এই গতি ব্যতীত তাঁহার উত্তর দক্ষিণে গতি আছে। ঋষিগণ এই দুই গতি লক্ষ্য করিয়াছিলেন। সূর্যের যে শক্তি দ্বারা এই দুই গতি হয়, যাহার ফলে ছয় ঋতু পর্যায়ক্রমে চলিয়াছে এবং পৃথিবী মনুষ্যের বাসোপযোগী হইয়াছে, সে শক্তির নাম বিষ্ণু। চরিষ্ণু সূর্য সে শক্তির আধার। যেমন, এক রামচন্দ্র কভু দশরথ-নন্দন, কভু সীতাপতি, কভু রাবণারি, কভু অযোধ্যাপতি, সূর্যও তেমন গুণ ও কর্ম ভেদে নানা নাম পাইয়াছিলেন। সূর্য কভু সবিতা, কভু মিত্র, কভু বরুণ, কভু ইন্দ্র ইত্যাদি নামে আখ্যাত হইয়াছিলেন। সবিতা শীত ঋতুর, মিত্র গ্রীষ্মের, বরুণ বর্ষার, ইন্দ্র বৃষ্টির কর্তা।

সূর্যের স্বগতি সহজে প্রত্যক্ষ হয়। দেখা যায়, মধ্যাহ্ন কালে সূর্য (পঞ্জাবে) কখনও মাথার নিকটে আসেন, কখনও বহুদূরে থাকেন। ১০।১৫ দিন অন্তর দুবস্থ দিকচক্রে সূর্যোদয় ও সূর্যাস্ত দেখিতে থাকিলে তাহাকে উত্তর হইতে দক্ষিণে এবং দক্ষিণ হইতে উত্তরে গমনাগমন
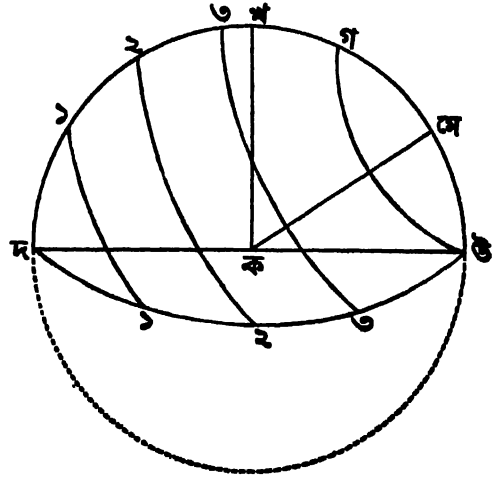
চিত্র ১। ক-লাহোর, খ-স্বস্তিক, মে-মেরু উ-উত্তর, দ-দক্ষিণ, উমেখদ-যাম্যোত্তর বৃত্ত উ ৩২১ দ-পূর্বদিক চক্র। এই চক্রে ১-৩ দক্ষিণ-উত্তর কাষ্ঠা, ২-পূর্ববিন্দু।

করিতে দেখা যায়। উত্তর-দক্ষিণে গমনের সীমা আছে, যেন সেখানে দুই কীলক প্রোথিত আছে, সূর্য অতিক্রম করিতে পারেন না। দোলায় শিশু যেমন দোল খায়, সূর্যেরও সেইরূপ দোলন দেখা যায়। উত্তর ও দক্ষিণ কাষ্ঠায় (সীমায়) সূর্যকে দিন কয়েক নিশ্চল বোধ হয়। সূর্য গতির দিক্ পরিবর্তন করেন। সূর্য উত্তর কাষ্ঠায় আসিলে, ইন্দ্র বৃষ্টি দান করেন, তখন বরুণের অধিকার আরম্ভ হয়। ঋগ্বেদে আছে, ইন্দ্র সূর্যের রথ-চক্র হরণ করিয়াছিলেন (১।১৭৫।৪ ; ৪,৩০।৪) এবং বরুণ সূর্যকে হিরণ্ময় দোলা করিয়াছিলেন (৭।৮৭.৫)। বৃষ্টি ব্যতীত কৃষিকর্ম হয় না। বর্তমান কালে যেমন ঋগ্বেদের কালেও তেমন, পঞ্জাব-নিবাসী আর্যেরা বৃষ্টির অভাব ভোগ করিতেন। তাঁহারা ইন্দ্রদেবের নিকট বৃষ্টি প্রার্থনা করিতেন। বিষ্ণু দক্ষিণায়নাদিতে আসিলে বৃষ্টি হইত, না আসিলে হইত না। এই কারণে বেদে বিষ্ণু ইন্দ্রের সখা। ঋষিগণ দেখিয়াছিলেন, বিষ্ণু উত্তর কাষ্ঠায় আসিলে বর্ষা আরম্ভ হয়। বিষ্ণু দক্ষিণ কাষ্ঠায় আসিলে হিম (শীত) ঋতুর আরম্ভ হয়। সবিতার অধিকার আরম্ভ হয়। সবিতা জলশোষক (১।২২।৫)।

সূর্যের দক্ষিণ কাষ্ঠা হইতে উত্তর কাষ্ঠায় যাইতে ১৮০

দিন লাগে, উত্তর কাষ্ঠা হইতে দক্ষিণ কাষ্ঠায় যাইতেও ১৮০ দিন লাগে, বৎসরে ৩৬০ দিন। উত্তর ও দক্ষিণ কাষ্ঠায় মধ্যস্থলে পূর্ববিন্দু। এক ঋষি বলিতেছেন (৭।৯৯।২), "হে বিষ্ণু! তুমি পৃথিবীর পূর্বদিক্ ধারণ করিয়া আছ।" 'পূর্বদিক' বিশেষ করিয়া পূর্ববিন্দু বুঝাইতেছে। পূর্ববিন্দু হইতে উত্তর ও দক্ষিণ কাষ্ঠায় যাইতে আসিতে ৯০+৯০+৯০+৯০=৩৬০ দিন লাগে। (চিত্র ১)

অতএব বিষ্ণুর তিনটি পদ (স্থান) দিকৃচক্রে প্রত্যক্ষ হয়। ঋ, ১।১৫৫।৬ মন্ত্রে ইহা স্পষ্ট উক্ত হইয়াছে। যথা—

চতুর্ভিঃ সাকংনবতিং চ নামভিশ্চক্রং ন বৃত্তং ব্যতীঁরবীবিপৎ।
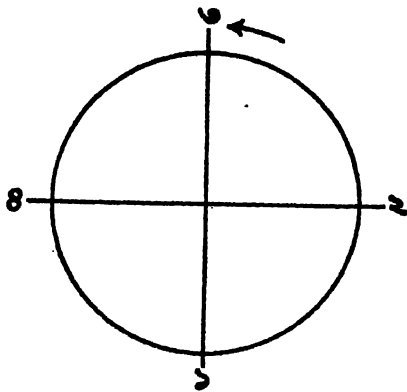
চিত্র ২। বর্ষচক্র। ১২৩৪-চারি পদ।

[ব্যতীন্ বিবিধান্ স্বভাবান্ অবীবিপৎ কম্পয়তি ভ্রময়তি—সায়ণ] বিষ্ণু গতি-বিশেষ দ্বারা বিবিধ স্বভাববিশিষ্ট চারি নামের নবতিকে (নব্বই দিবসকে) চক্রের ন্যায় বৃত্তাকারে চালিত করিয়াছেন, অর্থাৎ চারি নব্বই দিবসে বিভক্ত বর্ষচক্রকে ভ্রমণ করাইয়াছেন (চিত্র ২)। ঋষিগণ বৎসরকে চক্রের সহিত তুলনা করিতেন, সে চক্রে ৩৬০ অর. [অকারান্ত] আছে। চারি নামে অর্থাৎ চারি ঋতু নামে শীত গ্রীষ্ম বর্ষা হেমন্ত নামে বৎসর বিভক্ত করিতে পারা যায়। (সায়ণ ৪+৯০=৯৪ কাল-অবয়ব গণিয়াছেন। সে গণনার প্রমাণ দেন নাই।)

আকাশে বিষ্ণুর সে চারি পদ (স্থান) কোথায়? দিবাভাগে নভোমণ্ডলে সূর্য ব্যতীত আর কিছুই দেখিতে পাওয়া যায় না, কিন্তু রাত্রিকালে অগণ্য নক্ষত্র দ্বারা আকাশ আচ্ছন্ন দেখায়। সূর্য ও নক্ষত্র একদা দৃষ্টিগোচর হইতে পারে না, কিন্তু উষার পূর্বে কিংবা সন্ধ্যার পরে সূর্যোদয় কিংবা সূর্যাস্ত স্থানে অথবা সন্নিকটে যে যে নক্ষত্রের উদয় ও অস্ত হয়, তদ্দ্বারা সূর্যের পথ চিহ্নিত করিতে পারা যায়। নিরীক্ষণ করিবার অভ্যাস হইলে বলিতে পারা যায়, কোন্ দিন সূর্য কোন্ নক্ষত্রের নিকট ছিল। এইরূপে ঋষিগণ সূর্যের পথ চিনিয়াছিলেন এবং নক্ষত্রদ্বারা চারি বিষ্ণুপদ যুক্ত করিয়াছিলেন। প্রাচীন মিশরবাসী ও বেবিলনবাসী এই ক্রমেই বৎসরের দিন সংখ্যা ও ঋতু নিরূপণ করিত। ঋষিগণও এইরূপে বৎসরে ৩৬০ দিন ও চারি বিষ্ণুপদ নির্ণয় করিয়াছিলেন। যেদিন সূর্য উত্তর কাষ্ঠায়, সেদিন সূর্যোদয়ের অব্যবহিত পূর্বে তৎসন্নিকটে কোন্ নক্ষত্রের উদয় হইল, যেদিন মধ্য বিন্দুতে এবং যেদিন দক্ষিণ কাষ্ঠায়, সে সে দিন কোন্ কোন্ নক্ষত্রের উদয় হইল, তাহা সহজে নিরূপণ করিতে পারা যায়। যে রাত্রে মধ্য কাষ্ঠার নক্ষত্র মধ্য আকাশে সে রাত্রে উত্তর কাষ্ঠার নক্ষত্র পূর্ব দিক্চক্রের নিকটে এবং দক্ষিণ কাষ্ঠার নক্ষত্র পশ্চিম দিক্চক্রের নিকটে দেখিতে পাওয়া যায়। তিনটি পদে দুই বার পদক্ষেপ হয়, তিন বার হয় না, চারি পদ না পাইলে তিন পদক্ষেপ হইতে পারে না। ঋগ্বেদ বলিতেছেন (১।১৫৫।৫), "মনুষ্যগণ বিষ্ণুর দুই পদক্ষেপ কীর্তন করে, তাঁহার তৃতীয় পদক্ষেপ ধারণা করিতে পারে না।" (ঠিক কথা—কারণ চারিটি পদ একদা দৃষ্টিগোচর হইতে পারে না, চতুর্থ পদ বিপরীত আকাশে থাকে।) সেখানে বিষ্ণু শিপিবিষ্ট। ঋগ্বেদে (৭।১০০) সূক্তে বসিষ্ঠ ঋষি বলিতেছেন, (রমেশ দত্তের অনুবাদ),

৫। "হে শিপিবিষ্ট! অদ্য আমরা স্তুতির স্বামী ও জ্ঞাতব্য অবগত হইয়া তোমার সেই প্রসিদ্ধ বিখ্যাত নাম কীর্তন করিব। তুমি প্রবৃদ্ধ, আমি অবৃদ্ধ হইলেও তোমার স্তুতি করিব, যেহেতু তুমি রজোলোকের পারে বাস কর।"

৬। "হে বিষ্ণু! আমি শিপিবিষ্ট এই যে নাম বলিতেছি ইহা প্রখ্যাপন করা কি তোমার উচিত? তুমি সংগ্রামে অন্যরূপ ধারণ করিয়াছ, আমাদের নিকট হইতে তোমার শরীর লুক্কায়িত করিও না।"

শিপিবিষ্ট নামটি কুৎসিতার্থ। প্রশংসনীয়, স্তুতিযোগ্য বিষ্ণুর প্রতি সে অর্থ প্রয়োগ করিতে কুণ্ঠিত হইয়া যাস্ক ও পরবর্তী ভাষ্যকারেরা শিপিবিষ্ট নামের অর্থান্তর করিয়াছেন। এখানে সে সব তর্ক না তুলিয়া বলা যাইতে পারে, বিষ্ণু অদৃশ্য বা লুক্কায়িত থাকেন, তিনি রজোলোকের পারে অর্থাৎ এই অন্তরীক্ষের সে পারে থাকেন।*

* মহামতি তিলক তাঁহার *Arctic Home in the Vedas* পুস্তকে শিপিবিষ্ট নামের আলোচনা করিয়াছেন। মেরু নিকটস্থ দেশে সূর্যের উদয় কয়েক মাস হয় না। তিনি মনে করিয়াছিলেন শিপিবিষ্ট সে সময়ের সূর্য। আমি উপরে যে অর্থ করিয়াছি, সে অর্থ তাঁহার মনে হয় নাই। তাঁহার পুস্তক প্রকাশের পরে আমি তাঁহার যুক্তি-জালে মুগ্ধ হইয়া তাঁহার কল্পনা সত্য মনে করিয়াছিলাম। পরে দেখিয়াছি তিনি যে সব প্রমাণে নির্ভর করিয়াছিলেন, সে সবের অন্য সহজ ব্যাখ্যা হইতে পারে। তথাপি তাঁহার পুস্তক অগাধ পাণ্ডিত্যের জন্য চির আদরণীয় হইয়া থাকিবে।

অতএব বিষ্ণুর চারিটি পদ পাইতেছি। তিনি পদ-বিক্ষেপ দ্বারা বিশ্বভুবন পালন করিতেছেন। যেখান হইতে আরম্ভ করি, তিন প্রকার পদক্ষেপ দ্বারা রবিপথ আক্রান্ত হয়। (চিত্র ৭ পশ্চ)। ঋগ্বেদ (১।২২।১৭) বলিতেছেন, "বিষ্ণু 'ত্রিধা' তিন প্রকারে পদক্ষেপ করিয়াছিলেন।"

বিষ্ণুচক্রের চারি পদ বলিতেছি, সে সে পদ কোথায়? ঋগ্‌বেদ বলিতেছেন (৫।৩।৩), "হে রুদ্র! তোমার জন্ম অতি বিচিত্র ও মনোহর বিষ্ণুর অগম্য পদ স্থাপিত হইয়াছে।" এখানে তোমার 'জন্ম' না বলিয়া তোমার স্থানে কিম্বা তোমাতে বলিলে অর্থ আরও স্পষ্ট হয়।
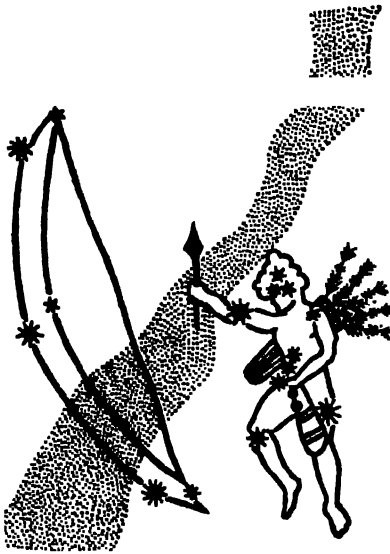
চিত্র ৩। রুদ্র।

কালপুরুষ নক্ষত্র রুদ্রের প্রতিমা (চিত্র ৩ রুদ্রের পূর্বদিকে তাঁহার পিনাক)। [যাবতীয় চিত্রের বাম পার্শ্ব পূর্বদিক। অর্থাৎ দক্ষিণ মুখ হইয়া দেখিতে হইবে।] কালপুরুষ মৃগ নক্ষত্র, ঋগ্‌বেদে এই নক্ষত্রকে ভীম মৃগ বলা হইয়াছে। মৃগ আরণ্য পশু। ভীম মৃগ ভয়ানক আরণ্য পশু, যেমন সিংহ, বন্যবরাহ, বন্যমহিষ। বিষ্ণুর এক পদ মৃগ নক্ষত্রে তাহা ঋগ্‌বেদের (১।১৫৪।২) মন্ত্রে স্পষ্ট লিখিত হইয়াছে। যথা—

প্র তদ্বিষ্ণুঃ স্তবতে বীর্যেণ মৃগো ন ভীমঃ কুচরো গিরিষ্ঠাঃ।
যস্যোরুষু ত্রিষু বিক্রমণেষ্বধিক্ষিয়ন্তি ভুবনানি বিশ্বা॥

সেই বিষ্ণু স্তুত হয়েন, যিনি বীর্যদ্বারা ভীম মৃগ, যিনি কুচর ও যিনি গিরিষ্ঠ, যাঁহার বিস্তীর্ণ তিন পাদক্ষেপে ত্রিভুবন অবস্থিতি করে।

সায়ণ ভাষ্যে ভীম মৃগ, কুচর, গিরিষ্ঠ, এই তিন বিশেষণের নানাবিধ অর্থ লিখিত হইয়াছে। রমেশ দত্ত মহাশয় অনুবাদ করিয়াছেন, "যেহেতু বিষ্ণুর তিন পদ-ক্ষেপে সমস্ত ভুবন অবস্থিতি করে, অতএব ভয়ঙ্কর, হিংস্র, গিরিশায়ী আরণ্য জন্তুর ন্যায় বিষ্ণুর বিক্রম লোকে প্রশংসা করে।"

সায়ণ ভাষ্যদ্বারা কিংবা এই অনুবাদ দ্বারা বিষয়-জ্ঞান হইতেছে না। তিনি কভু ভীমমৃগ, কভু কুচর, কভু গিরিষ্ঠ তিনটি বিশেষণ দ্বারা বিষ্ণুর তিনটি পদ বুঝাইতেছে। এক পদ ভীম মৃগে অর্থাৎ মৃগ নক্ষত্রে, এক পদ কুচরে অর্থাৎ নিম্নস্থানে (দক্ষিণ কাষ্ঠায়), আর এক পদ গিরিতুল্য উন্নত স্থানে (উত্তর কাষ্ঠায়)। তিন বিশেষণ পৃথক না বুঝিলে বিষ্ণুর ত্রিবিক্রম বুঝিতে পারা যায় না।

বিষ্ণুর ত্রিবিক্রম সূর্যের বার্ষিক গতি। বর্ষচক্রে চারিটি বিশেষস্থান আছে। সে চারিটি বিষ্ণুপদ। দুই অয়নাদি, দুই বিষুবপাত। প্রথম পদ পশ্চিম দিকচক্রের সম্মুখস্থ উত্তরায়নাদি স্থান, দ্বিতীয় পদ আকাশের দক্ষিণোত্তর রেখায় বাসন্তবিষুব স্থান, তৃতীয় পদ পূর্ব দিক্‌চক্রের সম্মুখস্থ দক্ষিণায়নাদি স্থান, এবং চতুর্থপদ পৃথিবীর নিম্নের আকাশে শারদ বিষুব স্থান। অবশ্য চারিপদ একদা দৃষ্টিগোচর হইতে পারে না। পঞ্জাবে রবিপথ মাথার দক্ষিণে থাকে। সেখানে বিষ্ণুকে বামাবর্তে পাদক্ষেপ করিতে দেখা যায়।

ঋগ্‌বেদে কোন্ কালের কথা লিখিত হইয়াছে, তাহা সহজে বলিতে পারা যায়। কারণ সেকালে মৃগ নক্ষত্রে বাসন্ত বিষুবপাত হইতে পারিত, অন্য দুই পদ থাকিতে পারিত না ইহা গণিতদ্বারা জানিতেছি। আনুষঙ্গিক প্রমাণও পাইতেছি। তদবধি মৃগ নক্ষত্রের মস্তকস্থিত কিম্বা কটিস্থিত তারা হইতে বাসন্ত বিষুবপাত প্রায় ৮৩° অংশ (ডিগ্রি) পশ্চিম দিকে সরিয়া গিয়াছে। এক অংশ সরিতে ৭২।৭৩ বৎসর লাগে। পূর্বকালে ৭৩ বৎসর লাগিত। অতএব ৮৩×৭৩=৬০৫৯ বৎসর পূর্বের, অর্থাৎ ৬০৫৯−১৯৪৫=৪১১৪ খ্রীষ্ট-পূর্বাব্দের ঘটনা। স্থূলতঃ বলিতে পারা যায়, খ্রীষ্টপূর্ব ৪০০০ অব্দে বিষ্ণুর ত্রিবিক্রম লক্ষিত হইয়াছিল।

তৎকালে কোন্ নক্ষত্রে সূর্যের দক্ষিণায়ন, কোন্ নক্ষত্রেই বা উত্তরায়ণ আরম্ভ হইত, তাহাও অক্লেশে বলিতে পারা যায়। কারণ বাসন্তবিষুবপাত হইতে ৯০° পূর্ব দিকে আসিলে দক্ষিণায়নাদি ও ৯০° পশ্চিম দিকে আসিলে উত্তরায়ণাদি অবস্থিত। এইরূপে জানা যায়, ফল্গুনী নক্ষত্রে দক্ষিণায়ন এবং ভদ্রপদা নক্ষত্রে উত্তরায়ণ আরম্ভ হইত। এই দুই নক্ষত্রের মধ্যস্থলে জ্যেষ্ঠা মূলা নক্ষত্রে শারদ বিষুব ঘটিত। পাঁজি দেখিলেও মৃগশিরা হইতে সপ্তম নক্ষত্রে পূর্বদিকে ফল্গুনী, পশ্চিম দিকে ভদ্রপদা এবং চতুর্দশ নক্ষত্রে মূলা জানা যায়। আশ্বিন মাসের
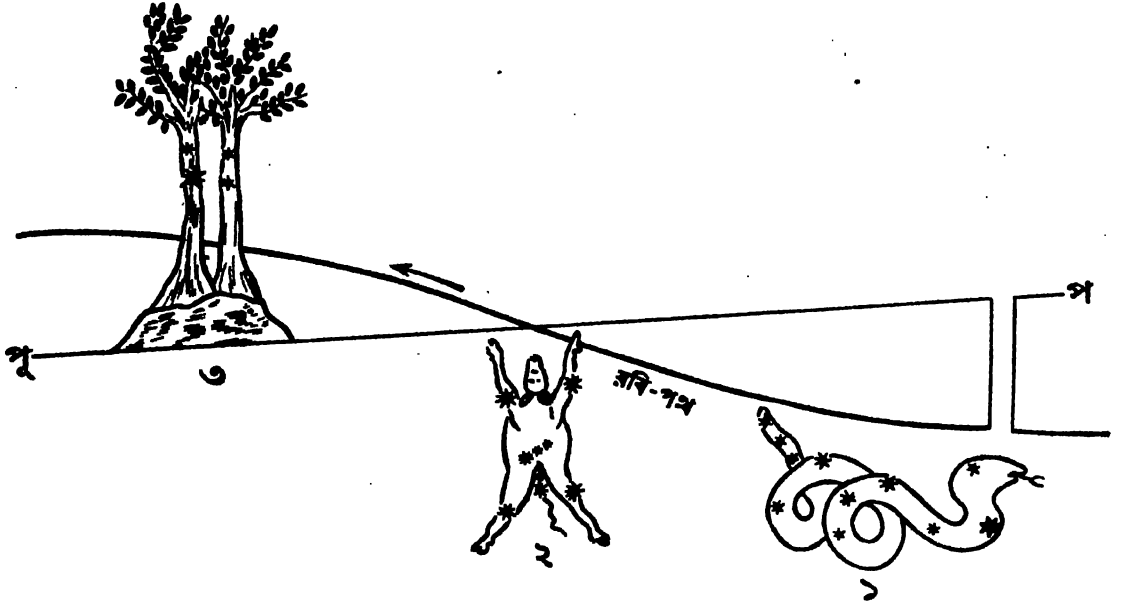
চিত্র ৪। ১-অহিবুধ্ন্য (কুচর), ২-বজ্রবরাহ (ভীম মৃগ), ৩-অর্জুনবৃক্ষ (গিরিষ্ঠ)।

মাঝামাঝি ভোর ৫টার সময় এবং ফাল্গুন মাসের মাঝামাঝি সন্ধ্যা ৭টার সময় আকাশের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে মধ্য রেখায় মৃগনক্ষত্র দেখা যায়। পূর্বদিক্‌চক্রের নিকটে যমল অর্জুন বৃক্ষের আকারে ফল্গুনী দেখা যায়। এইরূপ চৈত্র মাসের মাঝামাঝি ভোর ৫টার সময় এবং ভাদ্র মাসের মাঝামাঝি সন্ধ্যা ৭টায় মধ্যরেখায় বহু দক্ষিণে বৃশ্চিকের পুচ্ছ দেখা যায়। (বৃশ্চিক কাঁকড়া বিছা, বৃশ্চিকের পুচ্ছ মূলা নক্ষত্র।)

ঋগ্‌বেদের কালে চন্দ্রের সাতাইশ বা আঠাইশ নক্ষত্র নিরূপিত হয় নাই। তাহাদের নামও ছিল না। যে যে নক্ষত্রের প্রয়োজন হইত, যদ্দ্বারা চারি বিষ্ণুপদ জানিতে পারা যাইত, কেবল তাহাদের নাম পাওয়া যায়। কদাচিৎ তাহাদের নিকটস্থ নক্ষত্রেরও নাম পাওয়া যায়। আমরা যে যে নাম জানি, যে যে নক্ষত্র চিনি, ঋগ্‌বেদের কালে সে সে নাম ছিল না, নক্ষত্রের আকার-কল্পনাতেও প্রভেদ ছিল। এইসব নক্ষত্র দীপ্তিমান। এই হেতু ইহাদিগকে দেবতা বলা হইত। (দিব্ ধাতু দীপ্তি।) আমরা যাহাকে মৃগ নক্ষত্র বলিতেছি তাহার নাম দক্ষ ছিল। ফল্গুনীর নাম অর্জুনী ছিল, কিন্তু ইহার আকার জানি না। গিরিষ্ঠ শব্দে যাহা গিরিতে জন্মে, এমন শ্বেত বৃক্ষ মনে হয়। অর্জুন বৃক্ষের বকল শাদা, ইহার শাখা তেমন হয় না। ফল্গুনীকে যমল অর্জুন বৃক্ষ মনে করা চলে। মূলার নাম নিঋ‍র্তি ছিল। ইহা এক অসুর। ঋগ্‌বেদে এই অসুর নমুচি নামে, ও বল নামে নিহত হইয়াছিল। ইন্দ্র বধ করিয়াছিলেন। তাহাদের পুরী ছায়াপথে সমুদ্রে। পুরাণে নিঋ‍র্তি রাক্ষস, রাক্ষসেরা নদী কিংবা সমুদ্রের নিকটে বাস করিত। রাবণ বিখ্যাত রাক্ষস। ইহার পুরী সমুদ্র-বেষ্টিত। বস্তুতঃ নিঋ‍র্তিই দশ-মুণ্ড রাবণ। বলিদৈত্যও সেই। (পরে বলিতেছি) নিঋ‍র্তি শব্দ হইতে নৈঋ‍র্ত কোণ নাম হইয়াছে।

ভদ্রপদা নক্ষত্র এই নামও ছিল না। বর্তমান জ্যোতিষে যে যে তারায় ভদ্রপদা কল্পিত হইয়াছে, সে সে তারাতেও ঋগ্‌বেদের কালের ভদ্রপদা গঠিত হয় নাই। ইহার নাম অহিবুধ্ন্য ছিল। বুধ্ন্য গভীর গর্তের অহি সর্প (চিত্র ৪)। দেখা যাইতেছে কুচর বিশেষণ সার্থক। নিম্নস্থানে গর্তে চরে যে। অহিবুধ্ন্যের অহি, আর বৃত্র অহির কোন সম্বন্ধ নাই।

বিষ্ণুর ত্রিবিক্রমের এই অর্থ স্মৃতি ও পুরাণে স্বীকৃত হইয়াছে। আমরা বিষ্ণুর দোল-যাত্রা জানি। ইহা ফাল্গুনী পূর্ণিমায় অনুষ্ঠিত হয়। সে দিন সন্ধ্যার সময় বিষ্ণুমূর্তিকে দক্ষিণ মুখে রাখিয়া দোলায় স্থাপন করিয়া কয়েকবার দোলাইয়া দেওয়া হয়। অর্থাৎ সেদিন রবি দোলায় আরোহণ, দক্ষিণায়ন গতে উত্তরায়ণ আরম্ভ করিতেন। (এখন সেদিন করেন না, ৭ই পৌষ করেন। ইহাকে
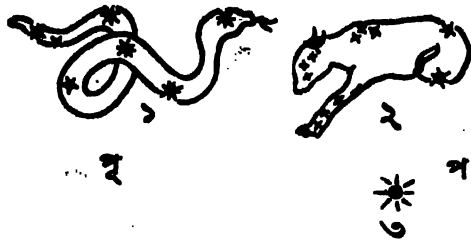
চিত্র ৫। ১-অহিবুধ্ন্য, ২-অজ একপাদ, ৩-অপাম্নপাৎ।

পৌষ শুক্ল সপ্তমী মনে করা যাইতে পারে।) সন্ধ্যাবেলা লোকে বহ্ন্যুৎসব (চাঁচর) করে। কোথাও মনুষ্যমূর্তি, কোথাও মেণ্ঢা (মেড়া) মূর্তি ভস্মীভূত হয়। লোকে বলে মেণ্ঢাসুর। প্রকৃত কথা মেণ্ঢা নয় ছাগ। পূর্ণিমার দিন চন্দ্রের বিপরীত দিকে সূর্য থাকে। চন্দ্র ফল্গুনীতে, অতএব সূর্য ভদ্রপদায় থাকে। ইহারই ছাগ মূর্তি দগ্ধ হয়, রবি ভদ্রপদা অতিক্রম করিয়া উত্তরমুখী হয়।*

* ভদ্রপদার ছাগ কোথা হইতে আসিল? আমরা ইহার নিকটস্থ এক ছাগ জানি, সেটি গ্রীক জ্যোতিষীর শৃঙ্গবান্ ছাগ, ইংরেজী নাম Capricorn. ইহার আকার অদ্ভুত। শৃঙ্গবান্ ছাগ কিন্তু দ্বিপদ। পশ্চাতের দুইপদ মৎস্য-পুচ্ছ। ইহাই আমাদের জ্যোতিষে মকর নাম পাইয়াছে। বরাহ লিখিয়াছেন, মকর মৃগাস্য। বামন পুরাণ (অঃ ৫) লিখিয়াছেন, মকর মৃগাস্য বৃষস্কন্ধ গজ-নেত্র। কিন্তু মকরের চিত্রে ছাগের অবয়ব কিছুই নাই। যদি মকরকে ছাগই মনে করি, সে ছাগ অহিবুধ্ন্য হইতে পশ্চিমে দূরে অবস্থিত। ৬০০০ বৎসর পূর্বে সেখানে উত্তরায়ণ হইতে পারিত না, অনেক পরবর্তী কালে (খ্রি-পূর্ব ৬ষ্ঠ শতাব্দে) হইত। ঋগ্বেদে 'অজ-একপাদ' নামে এক দেবতা আছেন (চিত্র ৫)। অহিবুধ্ন্যের সহিত একত্র স্তুত হইয়াছেন। পুরাণে একাদশ রুদ্রের দুই রুদ্র। অজ-একপাদ, এক-পদ-বিশিষ্ট ছাগ। এক এক নক্ষত্রের এক এক অধিপতি আছেন। পূর্ব ভদ্রপদার অধিপতি অজ-একপাদ, উত্তর ভদ্রপদার অধিপতি অহিবুধ্ন্য। ইহা হইতে মনে হয়, অহিবুধ্ন্যের নিকটে পশ্চিমে অজ-একপাদ আছে। ইংরেজী তারা পটে অহিবুধ্ন্য Cetus, অর্থ তিমি। ইহার পশ্চিমে শতভিষা নক্ষত্র। ইহারই কয়েকটি তারা লইয়া অজ-একপাদ কল্পিত হইয়া থাকিবে। শীতারম্ভে ভোর রাত্রে প্রথমে অজ-একপাদ পরে অহিবুধ্ন্য এবং ৫।৬ মাস পরে বর্ষাকালে সন্ধ্যা রাত্রে উদিত হইত। বর্ষাকালে ইহাদের সহিত অপাম্নপাৎ (জলের পুত্র) দেখা যাইত। ইংরেজী তারাপটে ইহা Fomalhaut. ভদ্রপদা নামের অর্থ, ভদ্র সুন্দর পদ যাহার, কিন্তু একটি ভদ্রপদ। পদহীন সর্প, অপরটি একপদ। এই অর্থ স্পষ্ট রাখিবার নিমিত্ত ভাদ্রপদা নাম না লিখিয়া ভদ্রপদা লিখিয়াছি। মেণ্ঢাসুরের অন্তরে এত পুরাতন ইতিহাস ছিল, পূর্বে মনে হয় নাই।

ঋগ্বেদের কালে ফাল্গুনী পূর্ণিমায় দিন শীত ঋতুর আরম্ভ হইত। এইরূপ, ভাদ্র পূর্ণিমায় রবি আবার দোলায় আরোহণ করিতেন, উত্তর হইতে দক্ষিণে গমন করিতেন, বর্ষাঋতুর আরম্ভ হইত। ভাদ্র পূর্ণিমার পরিবর্তে পাঁজিতে শ্রাবণ পূর্ণিমায় ঝুলনযাত্রা লিখিত হইতেছে। ফাল্গুনী পূর্ণিমায় দোলযাত্রা খ্রীষ্টপূর্ব ৪৫০০-২৫০০ অব্দের স্মৃতি এবং শ্রাবণ পূর্ণিমায় ঝুলন-যাত্রা পরবর্তী কালের স্মৃতি। ঋতু দুই সহস্র বৎসরে এক মাস পিছাইয়া গেল। পরবর্তী কালে ফাল্গুনী পূর্ণিমায় বসন্ত ঋতুর আরম্ভ হইত। এইরূপে ফাল্গুনী পূর্ণিমায় দোল-যাত্রা ও বসন্তোৎসব মিশিয়া গিয়াছে।
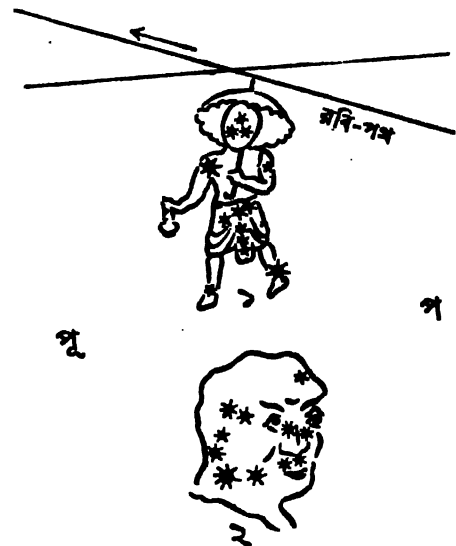
চিত্র ৬। ১-বামন, ২-বলি।

পাঁজিতে চারিটি বিষ্ণুপদ সংক্রান্তি লিখিত থাকে। জ্যৈষ্ঠ, ভাদ্র, অগ্রহায়ণ ও ফাল্গুন মাস-প্রবেশের সংক্রান্তি অর্থাৎ জ্যেষ্ঠা, ভদ্রপদা, মৃগশিরা ও ফল্গুনী, এই চারিটি নক্ষত্রে বিষ্ণুপদ থাকিত। জ্যেষ্ঠার পর মূলা নক্ষত্র, জ্যেষ্ঠা ও মূলা মিলিয়া জ্যৈষ্ঠ মাস। এতদ্দ্বারাও পূর্বোক্ত ব্যাখ্যা সমর্থিত হইতেছে। এই বিষ্ণুপদচক্র বা বর্ষচক্র বিষ্ণু-মন্দিরের শিরোদেশে স্থাপিত হয়। তদ্দ্বারা আমরা বিষ্ণু স্মরণ করি। ইহা বিষ্ণুর বিখ্যাত সুদর্শন চক্র নহে। সুদর্শন চক্র সূর্যবিম্ব, যদ্দ্বারা বিষ্ণু বর্ষচক্র চালিত করিতেছেন।

বিষ্ণুর বামনাবতার সকলেই জানেন। একদা বলি নামক দৈত্য বিক্রান্ত হইয়া ইন্দ্রাদি দেবগণকে স্বর্গচ্যুত করিয়াছিল। বলি এক যজ্ঞ করিতেছিল। বিষ্ণু বামনমূর্তি ধরিয়া বলির নিকটে ত্রিপাদভূমি যাচ্ঞা করিয়াছিলেন। বলি

চিত্র ৭। বিষ্ণুপদচক্র।

দানে স্বীকৃত হইলে বিষ্ণু একপদে স্বর্গ, দ্বিতীয়পদে মর্ত্ত্য ও তৃতীয়পদে পাতাল ব্যাপিয়া বলিকে পদতলে বদ্ধ করিলেন। ইহার অর্থ পাইয়াছি। বিষ্ণু রুদ্র স্থানে অর্থাৎ মৃগ নক্ষত্রে বামন মূর্তি ধরিয়াছিলেন। ঋগ্বেদে রুদ্রকে শিশু বলা হইয়াছে। এই উপাখ্যানে বিষ্ণু রুদ্র স্থানীয় হইয়াছেন। তাঁহার পদের নিম্নে মূলা নক্ষত্র (চিত্র ৬)। এই নক্ষত্রই বলি। রবিপথের সর্বদক্ষিণ অংশে মূলা নক্ষত্র অবস্থিত। রবিপথের বাহিরের দক্ষিণ ভাগের নাম পাতাল ছিল। পঞ্জাব হইতে দেখিলে মূলাকে বহু দক্ষিণে দেখা যায়।

বামন পুরাণ (৯২।৪০) লিখিয়াছেন, বলি যেদিন ভূমি দান করে, সেদিন চন্দ্র জ্যেষ্ঠা-মূলা নক্ষত্রে ছিলেন, অর্থাৎ সেদিন জ্যৈষ্ঠ মাসের পূর্ণিমা। অতএব সেদিন সূর্য মৃগ কিম্বা রোহিণীতে ছিলেন। তাবে বোধ হয় জ্যৈষ্ঠ পূর্ণিমায় বাসন্ত বিষুব দিন হইত।

বামন পুরাণ (৯২।২৬) আরও লিখিয়াছেন, ইন্দ্রোৎসবের দিনে বলির নামে এক মহোৎসব প্রবর্তিত আছে। এই উৎসব দীপ-দান নামে বিখ্যাত। বর্তমানে আমাদের পাঁজিতে ইন্দ্রোৎসবের দিনে বলির নামে দীপদানপূর্বক কোন উৎসব লিখিত নাই। ভাদ্র শুক্ল দ্বাদশী দিনে ইন্দ্রোৎসব হইয়া থাকে। (এখনও বাঁকুড়া জেলায় হয়। ইহার নাম ইন্দ্রধ্বজোত্তোলন) সেদিন বামন দ্বাদশীও বটে। এক কালে এইদিনে দক্ষিণায়ন আরম্ভ হইত। ইহার তিন মাস তিন দিন পরে অগ্রহায়ণ পূর্ণিমায় শারদ বিষুব দিন আসিত। দক্ষিণায়ন আরম্ভ হইয়াছে কিনা, ইহা জানিবার নিমিত্ত এক দীর্ঘ ধ্বজ (ইন্দ্রধ্বজ) উত্তোলিত হইত। ভদ্রপদা নক্ষত্রে দক্ষিণায়ন হইত, ইহা পূর্বেও পাইয়াছি। এতদ্দ্বারাও বিষ্ণুর ত্রিবিক্রমের অর্থ পাওয়া যাইতেছে।

ঋগ্‌বেদের কালে ইন্দ্র অসুরের সহিত যুদ্ধ করিতেন, জয়ী হইতেন। বিষ্ণু চন্দ্র বৃহস্পতি প্রভৃতি অন্য দেব সহায় হইতেন। কিন্তু যজুর্বেদের কাল হইতে দেব ও অসুর দুই পক্ষ হইয়া যুদ্ধ করিতেন, ইন্দ্রের প্রাধান্য হ্রাস হইয়াছিল। ঋগ্‌বেদের অন্তিম কালে কেহ কেহ ইন্দ্রের অস্তিত্বে সন্দেহ করিতেন। যেহেতু তাঁহারা পূর্বোল্লিখিত নক্ষত্রে বর্ষারম্ভ দেখিতে পাইতেন না। উপরে পাইয়াছি ফল্গুনীতে বর্ষারম্ভ হইত, যজুর্বেদের কালে মঘাতে হইত। এই হেতু উপাখ্যান রচনা দ্বারা ঋগ্‌বেদোক্তি বুঝিবার প্রয়াস হইত। রাজ্যের সীমা লইয়া যুদ্ধ, দেবগণ প্রায়ই পরাজিত হইতেন। এক পরাজয়ের পর বিষ্ণু বামনমূর্তি পরিগ্রহ করিয়া ছলনা পূর্বক অসুরগণের নিকট হইতে হৃত রাজ্য পুনঃপ্রাপ্ত হইয়াছিলেন। ঋগ্‌বেদে ইন্দ্র বল নামক এক অসুর জয় করিয়াছিলেন। বলাসুর এক বিলে গর্তে থাকিত। এই বল পুরাণে বলি, বলের বিল পুরাণে পাতাল। ইন্দ্র বলকে বিনাশ করেন নাই, পরাজয় করিয়াছিলেন। বলি ও বল একই ধাতু হইতে নিষ্পন্ন।

স্বস্তিক. [অকারান্ত] চিহ্নের উৎপত্তি কি? জৈনেরা এই চিহ্ন ব্যবহার করিতেন। তাঁহাদের আরও অপর চিহ্ন ছিল। তন্ত্রশাস্ত্রে বহুবিধ রেখাচিত্রের প্রয়োগ আছে। সে সকল চিত্রের নাম যন্ত্র। যন্ত্রের গূঢ় অর্থ আছে। স্বস্তিক. চিহ্ন তান্ত্রিক যন্ত্ররূপে ব্যবহৃত হইত কিনা, তাহা আগমবাগীশেরা বলিতে পারেন। আমার বোধ হয় বিষ্ণুপদচক্রই স্বস্তিক (চিত্র ৭)। পঞ্জাবে রবিপথ দর্শকের মস্তকের দক্ষিণে থাকে, এ কারণে স্বস্তিক বামাবর্ত। দক্ষিণাপথ হইতে দেখিলে এই কালচক্র দক্ষিণাবর্ত হইত।*

* বাঁকুড়া কেন্দুয়াদীপ-নিবাসী বালক শ্রীধরণীকুমার ভট্টাচার্য এই প্রবন্ধের চিত্র লিখিয়া দিয়াছে।

সাহিত্য-সাধক-চরিতমালা*

ডক্টর শ্রীসুশীলকুমার দে

আধুনিক বাংলা-সাহিত্যের জন্মকাল হইতে যে-সকল স্মরণীয় সাহিত্য-সাধক ইহার উৎপত্তি, গঠন ও বিকাশের ভাগ্য-বিধাতা ছিলেন, তাঁহাদের সঠিক জীবন-বৃত্তান্ত ও গ্রন্থ-পরিচয় স্বল্প পরিসরের মধ্যে সংযত ভাবে লিপিবদ্ধ করিয়া, যৎসামান্য মূল্যে প্রচার করিবার যে-সংকল্প অক্লান্তকর্মী শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় করিয়াছেন, তাহা সকল সাহিত্যানুরাগী পাঠকের নিঃশেষ প্রশংসা ও সমর্থনের যোগ্য। ১৩৪৬ সাল হইতে আজ পর্য্যন্ত সাত বৎসর ধরিয়া সেই সংকল্প সিদ্ধির পথে অগ্রসর হইয়া এখন ৫৩টি পুস্তিকায় প্রায় ৭০টি সাহিত্য-সাধকের কীর্ত্তি-কাহিনী, শুধু ঐতিহাসিকের বা সাহিত্যিকের নয়, সাধারণ পাঠকেরও সুগম্য ও সুপাঠ্য করিয়াছে। ব্রজেন্দ্রনাথের অধ্যবসায় ও অনুসন্ধিৎসার নূতন করিয়া পরিচয় দিতে হইবে না; বাংলা সাময়িক পত্রিকা ও বঙ্গীয় নাট্যশালা সম্বন্ধে তাঁহার বহুতথ্যবহুল গ্রন্থগুলি এই সকল বিষয়ে প্রামাণিক রচনা বলিয়া যথাযোগ্য প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছে। এই যুগের সাহিত্য-ইতিহাসের খুঁটিনাটি সম্বন্ধে তাঁহার মত অভিজ্ঞ ও সাবধানী গবেষক সত্যই বিরল। বর্ত্তমান সংক্ষিপ্ত রচনাগুলিও তথ্যান্বেষণের গৌরবে তাঁহার সুপ্রতিষ্ঠ খ্যাতি অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছে এবং এই সৎকার্য্যের ভার সৎপাত্রে ন্যস্ত করিয়া বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ সহৃদয় বাঙালী পাঠকমাত্রেরই ধন্যবাদের পাত্র হইয়াছেন।

বিস্তৃত জীবন-কথা বা সাহিত্য-সমালোচনা এই গ্রন্থমালার উদ্দেশ্য নয়। অধিকাংশ পুস্তিকা ৫০ পৃষ্ঠার মধ্যেই সীমাবদ্ধ; কয়েকটি ১০০ পৃষ্ঠা অতিক্রম করিয়াছে; ছোটগুলির মূল্য ছয় আনা মাত্র; বড়গুলির বার আনা। এই স্বল্প মূল্য ও সংক্ষিপ্ত পরিসরের মধ্যে, উইলিয়ম কেরী হইতে শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় পর্য্যন্ত প্রত্যেক খ্যাতনামা সাহিত্য-সাধকের জীবনী ও গ্রন্থ সম্বন্ধে যে-সকল প্রয়োজনীয় সাময়িক উপাদান বিক্ষিপ্ত ও দুরধিগম্য অবস্থায় পড়িয়া ছিল, তাহার উদ্ধার করিয়া নিখুঁত ও নিরপেক্ষ বিবরণ রচনা করাই এই গ্রন্থমালার প্রধান উদ্দেশ্য। উদ্দেশ্য বৃহৎ না হইলেও, ক্ষেত্র বৃহৎ; এবং প্রত্যেক পুস্তিকায় যে-পরিমাণ দুষ্প্রাপ্য ও প্রামাণিক তথ্য সংগৃহীত হইয়াছে, তাহা সত্যই বিস্ময়কর। এই বহুশ্রমসাধ্য রচনাগুলির প্রয়োজনীয়তা ও উপকারিতা সম্বন্ধে শুধু এইটুকু বলিলেই চলিবে যে, গত শতাব্দীর প্রায় সমস্ত উল্লেখযোগ্য লেখকদের সম্বন্ধে এরূপ তথ্যপূর্ণ ও নির্ভরযোগ্য বিবরণ এ পর্য্যন্ত প্রকাশিত হয় নাই। কয়েকজন লেখক সম্বন্ধে যে-কয়েকটি প্রচলিত জীবনীতে ও প্রবন্ধাদিতে কিছু কিছু বৃত্তান্ত পাওয়া যায়, তাহা অধিকাংশ স্থলে তথ্য ও অতথ্যে অথবা শূন্যগর্ভ উচ্ছ্বাসে ওতপ্রোত। বর্ত্তমান গ্রন্থমালা আড়ম্বরবর্জ্জিত, মিতভাষী ও কঠোর তথ্যনিষ্ঠার সহিত লিখিত।

একা শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্রনাথই প্রায় সমস্ত পুস্তিকাগুলি লিখিয়াছেন। কেবল উইলিয়ম কেরী শ্রীযুক্ত সজনীকান্ত দাসের, এবং রাধাকান্ত দেব, দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর ও রাজনারায়ণ বসু সম্বন্ধে যাহা লিখিত হইয়াছে, তাহা শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র বাগলের রচনা; এবং বঙ্কিমচন্দ্রের বিষয়ে সজনীকান্ত ব্রজেন্দ্রনাথের সহযোগিতা করিয়াছেন। কিন্তু এই দুই জন সহকারী ব্রজেন্দ্রনাথেরই আদর্শে অনুপ্রাণিত। সুতরাং এ কথা বলিলে অত্যুক্তি হইবে না যে, এই গ্রন্থমালা ব্রজেন্দ্রনাথেরই অদম্য উৎসাহ ও অক্লান্ত পরিশ্রমের ফল। তাঁহার অন্যান্য সুপরিচিত গ্রন্থগুলি ছাড়িয়া দিলেও বর্ত্তমান গ্রন্থমালার সংকল্প ও সিদ্ধি বহুকালের জন্য তাঁহার প্রধান কীর্ত্তি বলিয়া পরিগণিত হইবে, সন্দেহ নাই। বাস্তবিক তিনি একাই একটি জীবনে যাহা সুসম্পন্ন করিয়াছেন, তাহা দেখিলে তাঁহার একনিষ্ঠ ঐতিহাসিক সাধনার প্রশংসা না করিয়া থাকা যায় না।

এই গ্রন্থমালায় ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রায় সমস্ত লব্ধপ্রতিষ্ঠ ও পরিচিত লেখকদের প্রতিষ্ঠার পরিচয় নূতন করিয়া পাওয়া যাইবে। এই শতাব্দী বাংলা-সাহিত্যের একটি স্মরণীয় যুগ। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্ত্য আদর্শের সংঘর্ষের ফলে বাঙালীর ভাব ও চিন্তার ধারায় যে অভাবনীয় পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছিল, তাহার জের আজ পর্য্যন্তও শেষ হয় নাই। শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্রনাথ এই যুগের ধারাবাহিক বা পূর্ণাঙ্গ ইতিহাস লিখিবার চেষ্টা করেন নাই। কিন্তু এই যুগের প্রায় সকল সাহিত্য-সাধক সম্বন্ধে তিনি লিখিয়াছেন বলিয়া এই ইতিহাস-রচনার বনিয়াদ বা ভিত্তি প্রস্তুত করিয়া দিয়াছেন, এবং বহু অমূল্য ও অপরিহার্য্য উপাদান সংগ্রহ করিয়া সাহিত্যের ভবিষ্যৎ ঐতিহাসিকের কাজ সহজ-সাধ্য করিয়া দিয়াছেন।

ভিতরের বস্তুর সহিত বাহিরের মূর্ত্তির সামঞ্জস্য রাখিয়া ছাপা ও বাঁধাই সুদৃশ্য হইয়াছে। কিন্তু মনোহারিতা বা প্রয়োজনীয়তা সত্ত্বেও এরূপ গ্রন্থমালার কাটতি খুব বেশি নয়; লাভবান্ হইবার জন্য ইহার প্রকাশ হয়ত দুরাশা মাত্র। তবুও যাহাতে লোকসান হইয়া ইহার প্রচার বন্ধ না হইয়া যায় তাহা শিক্ষিত বাঙালী সমাজের নিকট আশা করা বোধ হয় নিতান্ত নিষ্ফল হইবে না।

---

* সাহিত্য-সাধক-চরিতমালা। শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, সজনীকান্ত দাস ও যোগেশচন্দ্র বাগল লিখিত। ১ হইতে ৫৩ সংখ্যক পুস্তক চারি খণ্ডে বাঁধানো, মূল্য ২৬৲। বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ, কলিকাতা, ১৩৪৬-৫২।

আমেরিকার অগ্রগতি—শিল্প-প্রতিষ্ঠানের গৃহাদি নির্ম্মাণে অভিনব পদ্ধতি

শ্রীনলিনীকুমার ভদ্র

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বিভিন্নমুখী অগ্রগতির বিবরণ বৎসরাবধিক কাল যাবৎ নিয়মিত ভাবে আমরা প্রবাসীতে প্রকাশিত করিয়া আসিতেছি। বৈজ্ঞানিক শক্তিকে কল্যাণ-কর্ম্মে নিয়োজিত করিয়া মানুষ যে তাহার প্রাত্যহিক জীবন-যাত্রাকে কতদূর সহজ সুন্দর স্বচ্ছন্দ ও আরামপ্রদ করিয়া তুলিতে পারে ঐ সকল প্রবন্ধ হইতে তাহার কতকটা আভাস পাওয়া যাইবে। আর্থিক সমৃদ্ধিতে আমেরিকা আধুনিক জগতে শীর্ষস্থান অধিকার করিয়াছে—বিপুল তাহার ঐশ্বর্য্য, অফুরন্ত তাহার ধন-ভাণ্ডার। অবশ্য বিগত দুইটি বিশ্বযুদ্ধে ধ্বংসযজ্ঞে বহুল পরিমাণে ঐ অর্থের অপব্যবহার হইয়াছে, কিন্তু একথা অনস্বীকার্য্য যে, বিগত দেড়শত বৎসর যাবৎ সুনির্দ্দিষ্ট বৈজ্ঞানিক পরিকল্পনা অনুসরণপূর্ব্বক জাতি-গঠনমূলক কার্য্যে অর্থের যথাযথ সদ্ব্যবহার করিয়া আমেরিকা আজ বিশ্বের জাতিপুঞ্জের মধ্যে স্বীয় আসন অভ্রভেদী মহিমায় সুপ্রতিষ্ঠিত করিয়াছে। আমেরিকার স্বাধীনতা অর্জ্জন আর ভারতবর্ষের স্বাধীনতা বিলোপ প্রায় সমসাময়িক ঘটনা। এই দেড়শতাধিক বৎসরে ভারতবর্ষ তিলে তিলে দৈন্যদশায় উপনীত হইয়া ক্রমে অবনতির নিম্নতম সোপানে আসিয়া দাঁড়াইল। আমেরিকার সঙ্গে তুলনা করিলে এদেশের অবস্থা কেন এমনটি হইল একথা স্বতঃই মনে উদিত হয়। এ সম্বন্ধে পণ্ডিত জওয়াহরলাল নেহ্‌রু তাঁহার সম্প্রতি-প্রকাশিত *The Discovery of India* নামক পুস্তকে "The Economic Background of India" শীর্ষক অধ্যায়ে বিগত দেড়শত বৎসরের ভারতবর্ষ ও আমেরিকার অবস্থার তুলনামূলক সমালোচনা করিয়া যে-সমস্ত কথা বলিয়াছেন তাহা বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য। পণ্ডিতজী বলিতেছেন—

"The independence of the United States of America is more or less contemporaneous with the loss of freedom by India. Surveying the past century and a half, an Indian looks somewhat wistfully and longingly at the vast progress made by the United States during this period and compares it with what has been done and what has not been done in his own country. It is true, no doubt that the Americans have many virtues and we have many failings, that America offered a virgin field and almost a clean slate to write upon while we were cluttered up with ancient memories and traditions. And yet perhaps it is not inconceivable that if Britain had not undertaken this great burden in India and, as she tells us, endeavoured for so long to teach us the difficult art of self-government, of which we had been so ignorant, India might not only have been freer and more prosperous but also far more advanced in science and art and all that makes life worth living."—(P. 338).

উপরের কথাগুলির মোটামুটি তাৎপর্য্য এই যে, ইংরেজ জাতি দয়া করিয়া আমাদের দুর্ব্বহ দায়িত্বভার গ্রহণ না করিলে আমরা শুধু যে মুক্ত স্বাধীন উন্নত জাতি হিসাবে পরিগণিত হইতাম তাহা নহে, শিল্প-বিজ্ঞানের ক্ষেত্রেও অনেকদূর অগ্রসর হইতে পারিতাম।

স্বাধীনতা অর্জ্জন করিবার পর হইতে আমেরিকা শুধু যে, ব্যবসা-বাণিজ্য এবং কৃষি-শিল্পের ক্ষেত্রে উন্নতিলাভ করিয়াছে তাহা নয়, তাহার সাংস্কৃতিক প্রগতিও হইয়াছে যথেষ্ট। বালক-বালিকা, স্ত্রী-পুরুষ নির্ব্বিশেষে দেশবাসীর মানসিক উন্নয়নের জন্য যুক্তরাষ্ট্রে যে কি ব্যাপক প্রচেষ্টা চলিয়াছে তাহার আংশিক পরিচয় প্রবাসীতে আমরা 'আমেরিকার বালকবালিকাদের সঙ্ঘ-জীবন', 'আমেরিকার একটি মহিলা-শিক্ষা প্রতিষ্ঠান' প্রভৃতি নানা প্রবন্ধে দিবার চেষ্টা করিয়াছি। দুনিয়ার সংস্কৃতির ভাণ্ডারে আমেরিকার অবদান উপেক্ষণীয় নয়। আমেরিকা শুধু যে, রকফেলার, কার্ণেগি, বা হেন্‌রি ফোর্ডের মত কোটি-পতি এবং শিল্প-পতিদেরই জন্মদান করিয়াছে তাহা নয়, এডিসনের মত বৈজ্ঞানিক, মার্ক টোয়েনের (স্যামুয়েল ক্লেমেন্স) মত হাস্যরসস্রষ্টা, ন্যাথানিয়েল হথর্ন, এড্‌গার এলেন পো, ও-হেনরি, সিন্‌ক্লেয়ার লুইস, পার্ল বাকের মত কথা সাহিত্যিক, জেমস রাসেল লাওয়েলের মত কবি ও সাহিত্য-সমালোচক এবং এমার্স্ন, থরো ও সাণ্ডারল্যাণ্ডের মত মনীষী এবং লংফেলো ও হুইট-ম্যানের মত কবিও সেদেশে জন্মিয়াছেন। ভারতবর্ষের সহিত স্মরণাতীত কালে যে আমেরিকার সংস্কৃতি-গত সুদৃঢ় যোগসূত্র স্থাপিত হইয়াছিল চমনলাল তাঁহার *Hindu America* নামক পুস্তকে তাহা লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। বর্ত্তমান যুগে আমেরিকার দুইজন শ্রেষ্ঠ মনীষীর মনে ভারতীয় অধ্যাত্ম-দর্শন গভীর প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল। একজন হেন্‌রি ডি থরো, গীতার ভাবধারায় অনুপ্রাণিত হইয়া মুগ্ধ বিস্ময়ে যিনি বলিয়াছিলেন—

"It is unquestionably one of the noblest and most sacred scriptures which have come down to us. . . .

I would say to the readers of scriptures, if they wish for a good book, read the Bhagvat-Geeta, . . . it deserves to be read with reverence even by yankees as a part of the sacred writings of a devout people,— . . . in comparison with the philosophers of the East we may say that modern Europe has yet given birth to none. Beside the vast and cosmogonal philosophy of the Bhagvat-Geeta, even our Shakespeare seems sometimes youthfully green and practical merely."

এ কথার তাৎপর্য্য এই:—ভগবদ্গীতা যে জগতের অন্যতম শ্রেষ্ঠ ধর্ম্মশাস্ত্র তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। ধর্ম্ম

মনে করেন, ইয়াঙ্কিদেরও শ্রদ্ধা সহকারে এই পুস্তকখানি অধ্যয়ন করা উচিত। প্রাচ্যের দার্শনিকদের সঙ্গে তুলনা করা যাইতে পারে বর্ত্তমান য়ুরোপে এমন একজনও জন্মান নাই। ভগবদ্গীতার উচ্চ দার্শনিক তত্ত্বের তুলনায়, এমনকি, শেক্সপীয়ারকে পর্য্যন্ত সময় সময় অত্যন্ত কাঁচা বলিয়া মনে হয়।

আর এক জন আমেরিকার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ মনীষী এবং জগতের অন্যতম শ্রেষ্ঠ চিন্তাবীর রাল্ফ ওয়াল্ডো এমার্সন, ভারতীয় ধর্ম্মশাস্ত্রসমূহ* যিনি গভীরভাবে অধ্যয়ন করিয়াছিলেন। ভারতীয় শাশ্বত (classical) সাহিত্যের প্রতিও তাঁহার গভীর অনুরাগ ছিল। এ বিষয়ে সাণ্ডারল্যাণ্ড তাঁহার *Eminent American's whom India should know* পুস্তকে (p. 47-48) বলিয়াছেন—

"Emerson was much interested in Indian literature; I think if he were living today he would be deeply interested in India's struggle to free herself from bondage."

ইহার তাৎপর্য্য এই :—

"সাণ্ডারল্যাণ্ড সাহেব মনে করেন যে, আজ যদি এমার্সন বাঁচিয়া থাকিতেন তাহা হইলে ভারতবর্ষের স্বাধীনতালাভের প্রচেষ্টার প্রতি তিনি সহানুভূতিশীল হইতেন।"

আধুনিক কালে স্বামী বিবেকানন্দই সর্ব্বপ্রথম আমেরিকায় ভারতবর্ষের মর্ম্মবাণী, বেদান্তের বাণী প্রচার করিয়া এই দুইটি জাতির মধ্যে সাংস্কৃতিক মিলনের ভিত্তি স্থাপন করিয়া আসেন। তাহার পর হইতে এই দুই জাতির পরস্পরকে জানিবার আগ্রহ উত্তরোত্তর প্রবর্দ্ধমান হইয়া উঠিতেছে। কিন্তু নানা প্রতিবন্ধকতার দরুন আমরা পরস্পরকে কত কম জানি, অথবা ভুল ভাবে জানি ভারতীয় পত্রিকাসমূহে প্রকাশিত তাঁহার প্রবন্ধগুলিতে পার্ল বাক তাহা বিবৃত করিয়াছেন। তাঁহার প্রবন্ধসমূহ হইতে মার্কিন জীবন, চরিত্র ও সমাজ-চিত্রের নূতন নূতন দিক আমাদের দৃষ্টির সমক্ষে উদ্ঘাটিত হইতেছে। তেমনি আমাদের সমাজের বিভিন্ন দিক এবং জাতীয় আশা-আকাঙ্ক্ষার সহিতও যাহাতে আমেরিকাবাসীর সম্যক্ পরিচয় হয়, সে বিষয়ে আমাদিগকে অবহিত হইতে হইবে।

ব্রিটিশ মন্ত্রী-মিশনের আলোচনার ফল যাহাই হোক্ না কেন একথা নিশ্চিত যে, ইংরেজ জাতিকে অদূরভবিষ্যতে ভারত 'ছাড়িতে' (quit) হইবে। স্বাধীন ভারতের প্রধান কাজ হইবে তখন গঠনমূলক কার্য্যে মনোনিবেশ করা। যান্ত্রিক সভ্যতার সহিত সম্পর্কহীন অতীতের স্বর্ণ-যুগে ফিরিয়া যাওয়ার আশা আকাশ-কুসুমের ন্যায় অলীক কল্পনা মাত্র। বর্ত্তমান যুগের সঙ্গেই আমাদিগকে সমান তালে পা ফেলিয়া চলিতে হইবে—কাজেই ভাবী মহাজাতি গঠন-কার্য্যে আধুনিক বিজ্ঞানই হইবে আমাদের প্রধান সহায়। বিজ্ঞান-লক্ষ্মীর প্রসন্ন দৃষ্টিপাতে সেদিন আমাদের দেশের শ্রী ফিরিয়া যাইবে। পণ্ডিত জওয়াহরলাল গত বৎসর যাদবপুর এঞ্জিনিয়ারিং কলেজের সমাবর্ত্তন উৎসবে বলিয়াছিলেন—স্বাধীন ভারতে এঞ্জিনিয়ার কারুশিল্পী স্থপতি বৈজ্ঞানিক ইত্যাদিরই প্রয়োজন হইবে বেশী। অনেকের মনে প্রশ্ন উঠিতে পারে যে, ভবিষ্যৎ ভারতের গঠনকার্য্যে আমরা কি পাশ্চাত্যের আদর্শ অনুসরণ করিয়া চলিব ? কিন্তু মনে রাখিতে হইবে, বর্ত্তমান যুগে যান্ত্রিক সভ্যতাকে বাদ দিয়া চলিবার যখন উপায় নাই তখন ভারতীয় সংস্কৃতির সুদৃঢ় ভিত্তির উপর জাতিকে সুপ্রতিষ্ঠিত করিয়া পাশ্চাত্য জড়বাদী যান্ত্রিক সভ্যতার নীরটুকু বাদ দিয়া ক্ষীরটুকু আমাদিগকে গ্রহণ করিতেই হইবে। ব্যবহারিক ক্ষেত্রে বিজ্ঞানের প্রয়োগ দ্বারা দেশের সম্পদ বৃদ্ধি আমেরিকা যতটা করিয়াছে আর কোন দেশ ততটা পারে নাই, সুতরাং এ বিষয়ে আমেরিকাই হইবে আমাদের আদর্শ। বৈজ্ঞানিক বুদ্ধি এবং নবাবিষ্কৃত যন্ত্রপাতির সাহায্যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র কৃষি এবং শিল্প-বিজ্ঞানে কিরূপ আশাতীত উন্নতি করিয়াছে তাহা পূর্ব্বপ্রকাশিত প্রবন্ধসমূহে আমরা দেখাইয়াছি। বর্ত্তমান প্রবন্ধে বিরাট শিল্প-প্রতিষ্ঠানসমূহের গৃহাদি নির্ম্মাণে কি অভিনব পরিকল্পনা অনুসৃত হইতেছে তাহা বর্ণিত হইবে। ভবিষ্যতে স্বাধীন ভারতে যখন সমগ্র দেশ জুড়িয়া বহুসংখ্যক বিরাট ফ্যাক্টরী, কারখানা মিল ইত্যাদি শিল্প-প্রতিষ্ঠান গড়িয়া উঠিবে তখন এই সমস্ত পদ্ধতি অনুসরণ করা আবশ্যক হইয়া উঠিতে পারে।

---

* শুধু ভারতীয় নহে সমগ্র প্রাচ্য ভূখণ্ডের বিভিন্ন দেশের সাহিত্যেও এমার্সনের অধ্যয়ন ছিল বহুবিস্তৃত। ভগবদ্গীতা হইতে তিনি আধ্যাত্মিক জীবনের খোরাক সঞ্চয় করিতেন। এ সম্বন্ধে মটিংহাম সোসাইটি কর্ত্তৃক প্রকাশিত তাঁহার *Representative man* নামক পুস্তকে সন্নিবিষ্ট "Life of Emerson" নামক প্রবন্ধে Richard Garnett বলিয়াছেন :

"His literary taste on the whole was in one sense very exclusive . . . in another very Catholic, ranging from the Bhagvat Ghita to Martial."

Works of Emerson, vol. iv, pp. lx, lxi.

'In praise of Books' নামক নিবন্ধে এমার্সন গীতা, মনুসংহিতা, উপনিষদ্, বিষ্ণুপুরাণ, এবং পারস্যের সাদীর গুলিস্তাঁর উল্লেখ করিয়াছেন। সাদী সম্বন্ধে তাঁহার একটি সুদীর্ঘ কবিতা আছে। তাহার দুইটি ছত্র এই—

'Saadi so far thy words shall reach,
Suns rise and set in Saadi's speech"

Works of Emerson, vol. iii, p. 196.

তাঁহার নিকট দেশ-কালের ব্যবধান ঘুচিয়া গিয়াছিল। প্রাচ্যের উপরিউক্ত ধর্ম্মপুস্তক এবং সাহিত্য সম্বন্ধে তিনি বলিয়াছেন :

"We call them Asiatic, we call them primeval, but perhaps that is only optical."—*Works of Emerson,* vol. vi, pp. 316-18.

তাঁহার 'Beauty', 'The transcendentalist' প্রভৃতি প্রবন্ধের প্রতিপাদ্যের সঙ্গে বেদান্তের চিন্তাধারার কিছু কিছু সাদৃশ্য দেখিতে পাওয়া যায়।

অভিনব পরিকল্পনায় নির্মিত যুক্তরাষ্ট্রের পশ্চিম উপকূলস্থ একটি শহরের 'সিটি হলে' সংশ্লিষ্ট ঢালু পথ। সিঁড়ির বদলে ঐ বর্ত্ম ব্যবহৃত হয়

করিতে পারে তাহার ব্যবস্থা করা। নির্গমন-পথ থাকিবে ঘরের ঠিক মধ্যস্থলে। বিরাট প্ল্যান্টে একটি দুটি মাত্র দরজা থাকিলে শ্রমিক ও কর্মচারীদের অনবরত এক প্রান্ত হইতে আরেক প্রান্তে আসা-যাওয়া করিতে অনেক সময় লাগে বলিয়া নূতন পরিকল্পনাকারীরা স্থির করিয়াছেন যে, প্লান্টে অনেকগুলি প্রবেশ-পথ থাকিবে।

শিল্প প্রতিষ্ঠানসমূহের গৃহাদি নির্মাণের খরচ বর্তমানে ১৯৪০ খ্রীষ্টাব্দ অপেক্ষা শতকরা ৩৫ হইতে ৪০ ভাগ বেশী। যুক্তরাষ্ট্রের বাণিজ্য-বিভাগের 'কনষ্ট্রাকশন ষ্ট্যাটিসটিক্স ইউনিটে'র প্রধানকর্তা উইলিয়াম ডবলিউ শ মনে করেন যে, ১৯৪৬ সালের শেষাশেষি ইহা শতকরা আরো আট ভাগ বৃদ্ধি পাইবে এবং ১৯৪৭-এর শেষ ভাগে ১৯৪০ খ্রীষ্টাব্দের ব্যয়ের পরিমাণ অপেক্ষা ইহার সর্ব্বোচ্চ বৃদ্ধির পরিমাণ ৫৫ হইতে ৬০ ভাগ পর্য্যন্ত হওয়ার সম্ভাবনা আছে।

ব্যয়ের হার যতই বৃদ্ধি পাক, প্রধান প্রধান কণ্ট্রাকটারগণ কিন্তু মনে করেন নূতন 'প্ল্যান্টে' যে-সমস্ত সংস্কারমূলক, উন্নত ধরণের ব্যবস্থা প্রবর্ত্তিত হইবে তাহাতে আয় এত বাড়িয়া যাইবে যে, প্লান্ট নির্মিত হওয়ার পাঁচ বৎসরের মধ্যেই ক্ষতিপূরণ হইয়া যাইবে। একজন কনট্রাক্টার মনে করেন কারখানার মালিকেরা যদি শ্রমিকদের মজুরি শতকরা সাড়ে আট ভাগ কমাইয়া দেন তাহা হইলেই নূতন পদ্ধতির গৃহনির্মাণের জন্ত আর অতিরিক্ত অর্থব্যয় করিতে হইবে না। আরো কোন কোন দিক দিয়াও ব্যয়সংক্ষেপ করা যাইতে পারে। মোটের উপর কর্তৃপক্ষ পুরনো প্লান্টের জন্য যে-টাকা খরচ করিতেছেন যদি তাহার দশ ভাগের এক ভাগ বাঁচাইতে পারেন তাহা হইলে নূতন প্লান্ট নির্মাণ করা তাঁহাদের পক্ষে অনায়াসসাধ্য হইয়া উঠিবে। শিল্প-প্রতিষ্ঠানের গৃহাদিসংক্রান্ত তথ্যানুসন্ধানের ফলে জানা গিয়াছে যে, যুক্তরাষ্ট্রের পূর্ব্বাঞ্চলের সমুদ্রতটবর্ত্তী, অভিনব পরিকল্পনায় প্রস্তুত প্লান্টসমূহের মধ্যে শতকরা ৬১টি একতলা।

বিশেষজ্ঞদের মত এই যে, একতলা গৃহ নির্মাণ করিতে মোটামুটিভাবে বহুতলাবিশিষ্ট প্লান্ট অপেক্ষা শতকরা নয় ভাগের একভাগ কম খরচ পড়ে। আপাতদৃষ্টিতে অবশ্য দেখা যায়, বহুতলা বিশিষ্ট প্লান্টের ছাদ ইত্যাদি নির্মাণে কম অর্থ ব্যয় হয়, কিন্তু মেঝে দেওয়াল এলিভেটার সোপান মঞ্চ ইত্যাদি সব কিছুতে মিলিয়া উহাতে খরচ অনেক বেশী পড়ে।

জানালাহীন প্লান্ট নির্মাণ সম্বন্ধে বিতর্কের অবসান এখনও হয় নাই। আধুনিক পরিকল্পনায় নির্মিত শতকরা

[২]

যুক্তরাষ্ট্রে শিল্প প্রতিষ্ঠানসমূহের 'প্লান্ট' ইত্যাদি নির্মাণের ব্যয় ক্রমবর্দ্ধমান হইয়া উঠায় অনাবশ্যক অংশ বর্জন করিয়া অভিনব পদ্ধতিতে গৃহাদি নির্মাণের আয়োজন ব্যাপকভাবেই চলিতেছে। নূতন গৃহগুলি যাহাতে উন্নত ধরণের বৈদ্যুতিক আলোক এবং বায়ুচলাচলের ব্যবস্থাযুক্ত এবং অপেক্ষাকৃত মজবুত ভিত্তি-সমন্বিত এবং অভ্যন্তর-ভাগ যাহাতে অধিকতর নয়নরঞ্জক বর্ণাপ্লুলিপ্ত হয়, তাহার উপরও বিশেষ জোর দেওয়া হইতেছে। নিউ ইয়র্কের 'জার্ণাল অব কমার্সে' দেখিতে পাই, দুইটি প্রধান বিষয়ে এখনো মতানৈক্য বিদ্যমান। প্রথমটি হইতেছে এক তলা বনাম বহু তলাবিশিষ্ট 'প্ল্যান্ট' নির্মাণ লইয়া, আর দ্বিতীয়টি, সেগুলিতে জানালা থাকিবে, কি থাকিবে না তৎসম্বন্ধে।

কারখানার গৃহাদি নির্মাণে নিম্নোক্ত কয়েকটি বিষয়ে কর্তৃপক্ষ বিশেষভাবে মনোযোগী হইয়া উঠিয়াছেন।

১। অপেক্ষাকৃত হাল্কা ইস্পাতের ফ্রেম ব্যবহার—জোড়া দেওয়া, বিশেষ এক ধরণের ওজনে হাল্কা এবং আয়তনে ছোট ইস্পাতের ওপর খুব জোর দেওয়া হইতেছে।

২। অধিকতর প্রসারিতভাবে খিলানসমূহ নির্মাণ করা।

৩। সাধারণ ছাদের সীমারেখার ঊর্দ্ধে পাঁচিলের যে অংশটুকু উদ্গত হইয়া থাকে তাহা বর্জন করা।

৪। বৃহত্তর কপাটের খোব বা 'প্যানেল' ব্যবহার। প্রাচীরাদি নির্মাণে ইটের বদলে কনক্রীট সিরামিক প্লাইউড প্রভৃতি ব্যবহার এবং শ্রমিকেরা কারখানা-গৃহের একপার্শ্ব হইতে অথবা নীচেকার একটি সুড়ঙ্গ দিয়া যাহাতে গৃহমধ্যে প্রবেশ

২২টি ভবন জানালাহীন। কোন কোন স্থপতি এই পরিকল্পনার সম্পূর্ণ বিরোধী, কিন্তু কাহারও কাহারও মনে আবার এই বিশ্বাস বদ্ধমূল যে, জানালাহীন গৃহই হইবে কারখানার পক্ষে অধিকতর উপযোগী, বিশেষতঃ বস্ত্র-শিল্পের প্লাণ্টসমূহে এগুলির উপযোগিতা অপরিসীম। স্থপতিগণ শতকরা ৬৫টি প্লাণ্টে ইস্পাতের ফ্রেম ব্যবহারের পক্ষপাতী। কনক্রীট ব্যবহারের কথাও তাঁহারা বিশেষভাবে চিন্তা করিতেছেন, কেননা ইস্পাত ইত্যাদি দুষ্প্রাপ্য জিনিষের উপর সরকারী বিধি-নিষেধ জারী হওয়ায় বর্ত্তমানে কনক্রীট দ্বারা বহুসংখ্যক প্লাণ্ট নির্ম্মাণ করিতে হইবে।

শতকরা ৬১টি প্লাণ্টের দেয়াল ইষ্টক-নির্ম্মিত, এবং শতকরা দশটি কনক্রীটের তৈরি। শতকরা বত্রিশটির ছাদ কাঠনির্ম্মিত, শতকরা ২৬টির ছাদ ইস্পাতে তৈরি এবং ২০টির কনক্রীট এবং সিমেণ্টে প্রস্তুত। সম্প্রতি জিপসম* ইত্যাদির অভাব হওয়ায় ছাদ নির্ম্মাণে কনক্রীট এবং সিমেণ্ট ব্যবহারের দিকে বিশেষ আগ্রহ পরিলক্ষিত হইবে।

প্রখ্যাত গৃহ-পরিকল্পনাকারীগণ বলেন যে, নূতন প্লাণ্টগুলির অভ্যন্তর-ভাগেই সবচেয়ে বেশী নূতনত্ব ও বৈশিষ্ট্য পরিলক্ষিত হইবে।

নূতন পদ্ধতিতে নির্ম্মিত গৃহগুলিতে আলোক-ব্যবস্থাও হইবে অভিনব। অনেকগুলি প্লাণ্টেই কেথোড-রশ্মি-জাতীয় এক ধরণের উত্তাপহীন আলোকের বন্দোবস্ত করা হইবে, বিশেষজ্ঞদের মতে যাহার দূরগামিতা প্রতিপ্রভ (fluorescent) আলো হইতে তিন-চার গুণ অধিক। প্রাথমিক ব্যয় অধিক হইলেও এ ধরণের আলোকে চালু রাখিবার খরচ অপেক্ষাকৃত কম। বর্ত্তমানে শতকরা ৩৯টি শিল্প-প্রতিষ্ঠানে প্রতিপ্রভ আলো ব্যবহার হয়।

বায়ু-চলাচলের ব্যবস্থার প্রতিও বিশেষ মনোযোগ দেওয়া হইবে। শিল্প-প্রতিষ্ঠানগুলিতে উত্তাপের স্বতঃনিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থার যেরূপ উন্নতিসাধন করা হইতেছে তাহাতে কেবল যে কর্ম্মীদের স্বাচ্ছন্দ্য এবং কর্ম্মক্ষমতা বৃদ্ধি হইবে তাহা নয়, জ্বালানি কাঠের খরচও ইহার দরুন প্রচুর পরিমাণে হ্রাস পাইবে। কারখানায় প্রত্যহ যে উত্তাপের অপচয় হয় তাহার ক্ষতিপূরণের জন্য যন্ত্রপাতি-সাহায্যে উত্তাপ উৎপাদনের বন্দোবস্ত করা হইবে।

পরিকল্পনাকারীগণ বলেন, প্লাণ্টগুলির অভ্যন্তর-ভাগে বহুবিধ বিচিত্র রং ব্যবহৃত হইবে। এই রঙের প্রভাব কর্ম্মী ও শ্রমিকদের মনের উপর তো বিশেষ কার্য্যকরী হইবেই, উপরন্তু ইহা তাহাদের নিরাপত্তা রক্ষার পক্ষেও সহায়কস্বরূপ হইবে। এমন ভাবে রঙের প্রয়োগ করা হইবে যাহাতে তৎসাহায্যে প্লাণ্টের নির্ম্মাণ-পদ্ধতি সহজে বোধগম্য হয় এবং রঙের দ্বারাই কারখানার ভিতরকার বিপজ্জনক স্থানগুলিও নির্দ্দেশিত করা হইবে।

বিগত বিশ্বযুদ্ধ, শিল্প-প্রতিষ্ঠানের মালিকদিগকে মনিব-শ্রমিক সম্পর্ক সম্বন্ধে গভীরভাবে চিন্তা করিতে শিখাইয়াছে। নবনির্ম্মিত ও পরিকল্পিত প্লাণ্টগুলির অধিকাংশেরই শুধু যে নিজস্ব, পান-ভোজনের স্থান থাকিবে তাহা নয়, সকল সময় 'কাফে'তে না গিয়াও শ্রমিকেরা যাহাতে খাদ্য-পানীয় পাইতে পারে সে-ব্যবস্থাও করা হইবে। উপরন্তু প্লাণ্টগুলিতে ব্যাপক ও উন্নত ধরণের স্বাস্থ্য-রক্ষার ব্যবস্থা, উপযুক্ত বিশ্রাম, ক্রীড়া-কৌতুক আমোদ-প্রমোদ ইত্যাদির যথাযোগ্য বন্দোবস্ত তো থাকিবেই। এই শেষোক্ত বিষয়গুলি এখন শিল্প-প্রতিষ্ঠানের অপরিহার্য্য অঙ্গ বলিয়া বিবেচিত হয়। কোন শিল্প-প্রতিষ্ঠানের মালিক, 'এগুলি হইলেও চলে, না হইলেও ক্ষতি নাই' এ কথা মনে করিয়া আর নিশ্চিন্ত থাকিতে পারিবেন না।

এই প্রসঙ্গে আমাদের দেশের শ্রমিকদের গৃহ-সমস্যার কথা চিন্তা করিলে স্বাধীন এবং পরাধীন দেশের পার্থক্য যে কত বেশী তাহা সুস্পষ্ট রূপে উপলব্ধি করিতে পারা যায়। বৈদেশিক বণিকদের শোষণ-নীতিই যে দেশীয় শ্রমিকদের শোচনীয় অবস্থার জন্য প্রধানতঃ দায়ী সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। যাহাদের প্রাণপাত পরিশ্রমের ফলে ইংরেজ শিল্প-পতিদের উপচীয়মান সম্পদরাশি পর্ব্বতপ্রমাণ হইয়া উঠিতেছে সেই শ্রমিকদের আহার এবং বাস-স্থান সংক্রান্ত সমস্যার প্রতি ইহারা সম্পূর্ণ উদাসীন। এ সম্বন্ধে বর্ত্তমান বৎসরের জুলাই সংখ্যা *Modern Review*তে Notes বিভাগে labour Housing problem শীর্ষক যে সম্পাদকীয় আলোচনা প্রকাশিত হইয়াছে, আমরা তৎপ্রতি দেশের শ্রমিক-হিতৈষীদের মনোযোগ আকর্ষণ করিতেছি। প্রসঙ্গক্রমে তাহাতে বলা হইয়াছে—

"Most of the big mills of the Industrial areas are owned and controlled by British traders who have done nothing to improve the living condition of the barracks attached to their mills. Things are no better in other parts of this sub-continent."

"অর্থাৎ—(কলিকাতার) শিল্প-প্রধান অঞ্চলের অধিকাংশ বড় কারখানারই মালিক ইংরেজ বণিক-সম্প্রদায়। কারখানাসংশ্লিষ্ট ব্যারাকগুলিকে উন্নত ধরণের বাসোপযোগী করিবার জন্য তাহারা বিন্দুমাত্র চেষ্টাও করেন নাই। এই বিরাট দেশের অন্যান্য অঞ্চলের শ্রমজীবীদের বাসস্থানের অবস্থাও ইহার চেয়ে কিছুমাত্র উন্নত নহে।"......উক্ত সম্পাদকীয় নিবন্ধের আরো কিয়দংশের তাৎপর্য্য নীচে দিলাম।

"কংগ্রেস শাসনাধীন প্রদেশসমূহে কিন্তু শ্রমিকদের বাসস্থানের উন্নতিকল্পে মন্ত্রীমণ্ডলী কর্ত্তৃক চেষ্টা চলিতেছে। যুক্তপ্রদেশে কংগ্রেসী মন্ত্রিমণ্ডলী কর্ত্তৃক নিযুক্ত জনৈক কর্ম্মচারী হাথরাস, শিকোহাবাদ, ফিরোজাবাদ, সাহারাণপুর, মির্জ্জাপুর, গোরখপুর, লক্ষ্ণৌ এবং কানপুর এই কয়টি প্রধান শিল্প-কেন্দ্রের

* ইহা দগ্ধ করিয়া চূর্ণ করিলে প্লাস্টার অব প্যারিস হয়।

শ্রমিকদের বাস-গৃহাদি সম্বন্ধে যে রিপোর্ট দাখিল করিয়াছেন তাহাতে শিল্প-প্রতিষ্ঠানের মালিকদের অবিচার ও ঔদাসীন্যে আতঙ্কিত হইতে হয়। অস্বাস্থ্যকর আবেষ্টনের মধ্যে বাস করায় শ্রমিকদের জীবনীশক্তি তিলে তিলে নিঃশেষিত হইয়া যাইতেছে। বিগত যুদ্ধের ফলে কড়ি বরগা ইত্যাদি লৌহোপকরণ দুষ্প্রাপ্য হইয়া উঠায় শ্রমিকদের জন্য নূতন বাসগৃহ নির্ম্মাণের সমস্যা অত্যন্ত জটিল হইয়া উঠিয়াছে।"

স্বাধীন দেশ আমেরিকায় সমস্যা সমাধানের কত নব নব বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি উদ্ভাবিত হইতেছে, আর আমরা কোথায় পড়িয়া আছি!

একাদশ শতাব্দীর রাসায়নিক প্রক্রিয়া

এম আকবর আলি, এম-এসসি

রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় বিভিন্ন দ্রব্যের আণবিক অনুপাত তথা ওজনের অনুপাত সর্ব্বাপেক্ষা বেশী প্রয়োজনীয়। আণবিক অনুপাতের তারতম্য অনুসারে প্রক্রিয়া ও উদ্ভূত পদার্থের পরিবর্ত্তন দেখা দেয়, সেইজন্যে এই আণবিক তথা ওজনের অনুপাতের উপর বিশেষ দৃষ্টি রাখা রাসায়নিকদের সর্ব্বপ্রধান কর্ত্তব্য।

অনেকেরই ধারণা রসায়ন শাস্ত্রের এই অতি প্রয়োজনীয় তথ্যটি সর্ব্বপ্রথম ল্যাভয়শায়ার এবং ব্ল্যাক আবিষ্কার করেন এবং তাঁদের আবিষ্কারের পর থেকেই রসায়নশাস্ত্র শনৈঃ শনৈঃ উন্নতির পথে অগ্রসর হয়। ইউরোপের রেনেসাঁর পরে বিজ্ঞানের সমস্ত শাখায়ই যখন নূতন উদ্দীপনা জেগে উঠে তখন বিজ্ঞানের অঙ্গ হিসাবে রসায়ন শাস্ত্রেও যে তেমনি উদ্দীপনা আসবে এতে বিস্মিত হবার কিছুই নেই। ল্যাভয়শায়ার ও ব্ল্যাকের প্রক্রিয়া এই উদ্দীপনায় ইন্ধন যোগায়। তৎকালীন অন্যান্য রাসায়নিকগণ তাঁদের এই পন্থাগুলিকে অনুসরণ করে রসায়নে নব যুগ আনয়ন করেন। তবে রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় ওজনের প্রয়োজনীয়তা সর্ব্বপ্রথম ল্যাভয়শায়ারই উপলব্ধি করেন এ ধারণা করবার কোন কারণই নেই। ল্যাভয়শায়ারের বহু পূর্ব্বেই এ বিষয়ে বৈজ্ঞানিকগণ বিশেষ ভাবেই অবহিত হন—

Special attenution may be drawn to two points in connection with the Ainu-s-Sanat. The first is the evidence supplied by Chapters III & IV of the great importance that was attached to weights in chemical operations 700 years before the time of Black & Lavoisier.—*Alchemical Equipments in the Eleventh Century* by Stapleton F. Azo.

গ্রীক বৈজ্ঞানিকগণ সমস্ত রাসায়নিক প্রক্রিয়া ও ফলাফল গোপন রাখার অজুহাতে একে আধ্যাত্মিকতার সঙ্গে জড়িয়ে দেন। আলেকজান্দ্রিয়াতে এই আধ্যাত্মিকতাকে আরও বেশী ভাবে ফাঁপিয়ে তোলা হয়। ফলে রসায়ন শাস্ত্র বিজ্ঞান রূপ পরিত্যাগ করে যাদুবিদ্যার রূপ পরিগ্রহ করে এবং যাদুবিদ্যারই অঙ্গ হয়ে দাঁড়ায়। এমনি ভাবে চলতে থাকে নবম শতাব্দী পর্য্যন্ত। বিজ্ঞান হিসাবে এর আর কোন অস্তিত্বই থাকে না। দিনে দিনে সাধু সন্ন্যাসীদের আধ্যাত্মিকতার বাণী নিয়ে এ আরও যাদুমন্ত্রের মোহজাল বিস্তার করতে থাকে। অষ্টম শতাব্দীতে এই মোহজালের উপর সর্ব্বপ্রথম আঘাত আসে জাবির ইবনে হাইয়ানের হাতে। হাতেকলমে কাজ করবার এবং প্রত্যেক কাজের ফলাফলের প্রতি লক্ষ্য করবার উপর তিনি বিশেষভাবে জোর দেন। তিনি তাঁর পুত্রকে (বা শিষ্যকে) উদ্দেশ্য করে গ্রন্থের একস্থানে বলেছেন, "রাসায়নিকের সর্ব্বপ্রধান কর্ত্তব্য হ'ল হাতেকলমে কাজ করা এবং পরীক্ষা চালান। যে হাতেকলমে কাজ না করে বা পরীক্ষামূলক কাজ না চালায় তার পক্ষে এতে সামান্য মাত্রও পারদর্শিতা লাভ করা সম্ভবপর নয়। তুমি নিশ্চয়ই পরীক্ষামূলক কাজ চালাবে যাতে পূর্ণজ্ঞান আহরণ করতে পার।" তাঁর বিভিন্ন গ্রন্থে পরীক্ষামূলক কাজ চালানর জন্য এমনি উপদেশ ও অনুপ্রেরণার সন্ধান পাওয়া যায়। অন্য এক গ্রন্থে তিনি বলেছেন, "যত বড় ব্যক্তির মতবাদই হোক না কেন যতক্ষণ পর্য্যন্ত পরীক্ষামূলক ব্যবহারিক কার্য্যদ্বারা তার সত্যতা সঠিকভাবে নিরূপিত না হচ্ছে ততক্ষণ পর্য্যন্ত একে সামান্য কথার কথা হিসেবেই ধরতে হবে। কোন বিশিষ্ট ব্যক্তির মতবাদ বলেই যে তা সত্যি হবে এমন কোন কথা নেই বরং সে সত্য মিথ্যা দুইই হতে পারে। যখন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হবে তখনই বলব তোমার এ মতবাদ সঠিক এবং সত্য।"

বলা বাহুল্য জাবিরের হাতেই রসায়ন শাস্ত্র আধ্যাত্মিকতার মোহ থেকে মুক্তি পায়। তিনিই সর্ব্বপ্রথম একে বৈজ্ঞানিক ভিত্তিতে দাঁড় করান এবং তাঁর সময় থেকেই এর উপর থেকে তন্ত্রমন্ত্রবাদের প্রভাব আস্তে আস্তে তিরোহিত হতে থাকে। তবে আণবিক বা ওজনিক অনুপাতের প্রতি তাঁর দৃষ্টি কতটুকু আকৃষ্ট হয়েছিল তা বলা সম্ভবপর নয়। সীস শ্বেত (white lead) এবং পারদার (Cinnabar) প্রস্তুত করবার বেলায় তাঁর গ্রন্থে উপাদানগুলির ওজনের কথা না থাকলেও সীসার থেকে সীসা তৈরি করতে এবং নাইট্রিক এসিড তৈরি করবার বেলায় ওজনের কথার উল্লেখ দেখা যায়।

মনে হয় বৈজ্ঞানিক এই ওজনিক অনুপাতের উপর জোর না দিলেও, তিনি এ সম্বন্ধে বিশেষ অবহিত ছিলেন। তাঁর পরে যে মুসলমান বৈজ্ঞানিকগণ এদিকে বিশেষ ভাবেই প্রবৃত্ত হন তার প্রমাণ পাওয়া যায় একাদশ শতাব্দীর অন্যতম বিখ্যাত বৈজ্ঞানিক ও রাসায়নিক আব্দুল হাকিম মোহাম্মদ বিন আব্দুল মালিক আসমালিহি আলখারিজমি আলকাথির প্রণীত "আইনুস সানা ওয়া আওনুস সানা" (Essence of the Art and aid to the workers) গ্রন্থে। গ্রন্থখানি ৪২৬ হিজরী (১০৩৪ খ্রীঃ অব্দে) বৈজ্ঞানিকের পৃষ্ঠপোষক আমীর-রইস আবুল হাসান আলি ইবনে অব্দুল্লার অনুপ্রেরণায় বাগদাদে লিখিত হয়।

রসায়ন শাস্ত্র প্রথম থেকেই স্বল্পমূল্যের ধাতুগুলিকে রৌপ্য ও স্বর্ণে পরিণত করবার অস্ত্র হিসাবেই ব্যবহৃত হয়ে আসতে থাকে। জাবির একে বিজ্ঞান হিসাবে দাঁড় করালেও বৈজ্ঞানিকদের মন যে একেবারেই সোনার মোহ থেকে মুক্ত হয়েছিল এমন মনে করবার কোন কারণই নেই। একাদশ শতাব্দীতেও এ মোহ একেবারে লোপ পেয়ে যায় নাই। আব্দুল হাকিমের গ্রন্থখানি বার্থেলোর Archeologie et Historie des sciences-এ বর্ণিত মিশরীয় গ্রন্থের কথাই স্মরণ করিয়ে দেয়। তবে মিশরীয় গ্রন্থ যেখানে শুধু কারিগর-দিগের শিক্ষা এবং সোনা প্রস্তুত করে ধনী হবার পন্থা নির্দেশ করেই ক্ষান্ত হয়েছে, এ গ্রন্থে সেখানে প্রকৃতিকে তন্ন তন্ন করে বিশ্লেষণ করে বিজ্ঞানসম্মতভাবে অনুসন্ধান করবার পন্থা নির্দেশ করা হয়েছে। বিজ্ঞানকে উন্নত করবার দৃঢ় ধারণা নিয়েই যেন গ্রন্থকার কাজে অগ্রসর হয়েছেন। গ্রন্থখানিতে প্রক্রিয়াগুলির যেভাবে বিস্তারিত বর্ণনা দেওয়া হয়েছে তাতে মনে হয় গ্রন্থকার নিজে এই প্রক্রিয়াগুলিকে পরীক্ষা করে সেই অনুসারে কাজ করেছেন এবং নিজের অভিজ্ঞতাই গ্রন্থে বর্ণনা করেছেন। আজকালকার বৈজ্ঞানিক ধারণায় উদ্বুদ্ধ মনের পক্ষে এ সমস্ত প্রক্রিয়াতে নানা বিষয়ে অযথা বাড়াবাড়ি দেখে ক্ষুব্ধ হওয়া স্বাভাবিক। কিন্তু মনে রাখতে হবে রসায়ন শাস্ত্রের তখন সবে মাত্র উন্মেষ হয়েছে। আজকালকার মত ধাতু ও যৌগিক পদার্থের (compound) বৈজ্ঞানিক পরিকল্পনা তখন পর্য্যন্ত গড়ে ওঠে নাই। বৈজ্ঞানিকগণ তখন পর্য্যন্ত এর অনুসন্ধানে হাতড়ে বেড়াচ্ছেন। এই সময়ে কতক-গুলি অযথা জিনিষের আমদানী অস্বাভাবিকও নয়, অনাবশ্যকও নয়। একটি সত্যের আবির্ভাব পথে হয়তো শত সহস্র অসত্যের আমদানী হয় কিন্তু পরিণামে তারা কালের কষ্টি-পাথরে যাচাই হয়ে আস্তে আস্তে সরে পড়ে। এই সময় রাসায়নিক সত্য নির্দ্ধারণের পথে সবে মাত্র যাত্রা সুরু হয়েছে, তাই এমনি সব অনাবশ্যক বিষয় দেখা দেবেই। তবে এই সমস্তের মধ্যস্থতায় বৈজ্ঞানিকগণ যে সত্যের পথে ধীরে ধীরে অগ্রসর হয়েছেন, সেইটিই হচ্ছে বিশেষ ভাবে লক্ষনীয়। আব্দুল হাকিমের দুই-একটি প্রক্রিয়া থেকেই এ বিষয় ভাল ভাবে উপলব্ধি করা যাবে।

গ্রন্থের সপ্তম পরিচ্ছেদে কতকগুলি রাসায়নিক প্রক্রিয়া বিশদভাবে বর্ণনা করা হয়েছে। এর একটির নাম হ'ল "শুভ্র রৌপ্য প্রস্তুত প্রণালী"। গ্রন্থকারের বর্ণনা নীচে দেওয়া গেল—

"এর পরীক্ষা হ'ল যদি তুমি এর খানিকটা তামার পাতের উপর ঢেলে আস্তে আস্তে গরম করতে থাক, তা হলে এ গলে গিয়ে মোমের মত বইতে থাকবে এবং তামার পাতটির উপরি-ভাগও রৌপ্যের মত সাদা হয়ে পড়বে। তবে এতে শুধু উপরি-ভাগই সাদা হবে, তীক্ষ্ণ প্রক্রিয়ার মত ভিতরে কোন পরিবর্ত্তনই হবে না। কিন্তু যদি তুমি জল দিয়ে পাতটিকে ভাল করে ভিজিয়ে নাও তা হলে এ ভিতরেও প্রবেশ করবে এবং পাতের অপর পিঠও রৌপ্যের আকার ধারণ করবে। এতে ভিতর ও বাহির সবটাই সাদা হয়ে যাবে।"

প্রথম স্তরের প্রক্রিয়া—

রৌপের গুঁড়া—৪ দেরহাম
মসুলের তামার গুঁড়া—১ দেরহাম
পারদ—১ দেরহাম

প্রথমে গুড়োগুলো একটা খলে (সালাইয়াহ) রাখ। তার পরে এর উপর কিছু জল ছিটিয়ে ধুয়ে নাও। এইবার পারদ মিশ্রিত কর। এখন দুই দেরহাম সালএমোনিয়া মিশিয়ে খুব ভাল করে পিষতে থাক যতক্ষণ না সমস্ত পারদের চিহ্ন নিঃশেষ হয়ে যায় এবং এটি কৃষ্ণ বর্ণ ধারণ করে। এইবার চিত্রের অনুরূপ একটি কাঁচের পাত্র নাও। সেটিকে কাদা, গোবর (গোবর কাদার এক-তৃতীয়াংশ হবে), ঘোড়ার চুল, ঘাস এবং কিছু লবণ মিশিয়ে প্রস্তুত লেই দিয়ে ভাল করে লেপে দাও। চুলগুলো ভাল করে কাঁচি দিয়ে কাটতে হবে এবং এগুলোকে মিশিয়ে একটা পাত্রে দশ দিন রেখে লেইয়ের মত করতে হবে। এই লেই দিয়ে কাঁচের পাত্রটিকে বারে বারে স্তরে স্তরে লেপে দাও। এইবার পাত্রের ভিতর রাসায়নিক দ্রব্যগুলি ঢেলে দিয়ে তার মুখটাকে লবণ, আঠা এবং কিছু ময়দা দিয়ে ভাল করে এঁটে দাও। পাত্রটির উপরেও কিছু কাদা দিতে হবে। এগুলো সব শুকিয়ে গেলে পাত্রটি একটি চুল্লীর উপর রেখে জ্বাল দিতে হবে। চুল্লীটি এক হাত উঁচু ও হাত দেড়েক চওড়া হওয়া দরকার। দেখতে হবে যেন আগুন পাত্রের সংস্পর্শে না আসে। বাতাস যাওয়া এবং ধোঁয়া বেরিয়ে আসার জন্য চুল্লীর দুই দিকে দুটি ছিদ্র থাকবে। এমনি ব্যবস্থা করার পর পাত্রটি চুল্লীর উপর বসিয়ে খুব মৃদু জ্বাল দাও। রাসায়নিক দ্রব্যটি যদি উৎক্ষিপ্ত হয়ে (sublime) পাত্রের উপরি ভাগে জড় হয় তা হলে সেগুলোকে অবশিষ্টাংশের সঙ্গে আবার মিশিয়ে দিতে হবে। সবগুলোকে আবার ভাল ভাবে পিষে এমনি ভাবে দশবার উৎক্ষেপ করাতে হবে যেন পাত্রের তলায় আর কোন কিছুই অবশিষ্ট না থাকে

বরং সবটাই উৎক্ষিপ্ত হয়ে উপরে গিয়ে জমা হয়। এটি "সাল-উদ্বিদের" পাথরের মত জমাট হয়ে যাবে।

এই প্রক্রিয়ায় সত্যি রাসায়নিক জিনিষটি কি দাঁড়িয়াছে তা বলা মুশকিল। প্রক্রিয়ার ক্রমিক ব্যবস্থা অনুসারে দেখা যাচ্ছে প্রথমে তাম্র এবং রৌপ্যের একটি এমালগাম তৈরি হয়েছে। তারপর এই এমালগামটিকে দশবার ধীরে ধীরে তাপ দেওয়ায় পারদটা সব উবে গিয়ে বোধ হয় একটি তাম্র রৌপ্যের সঙ্কর ধাতুতে (alloy) পরিণত হয়েছে। সাল-এমোনিয়া যোগ করার ফলে কিছুটা সিলভার-ক্লোরাইড এবং কিছুটা কপার-ক্লোরাইড তৈরি হয়েছে এবং এমালগাম তৈরী হওয়ার পক্ষেও সুবিধা হয়েছে। পাত্রটি সরাসরি আগুনের উত্তাপে না দেওয়াতে বোঝা যাচ্ছে, তাপ খুব বেশী উঠতে দেওয়া হয় নি। এমোনিয়াম-ক্লোরাইড-এর অনুপাত বেশী না হওয়াতে, রৌপ্য এবং তাম্রের সবটাই ক্লোরাইডে পরিণত হতে পারে নাই তা ছাড়া এমনিতেও এমোনিয়াম ক্লোরাইড অনেকটা উবে গিয়েছে। সাধারণতঃ দেখা যায় রৌপ্য ও তাম্রের সঙ্কর যদি শতকরা ৭০ ভাগ রৌপ্য থাকে তা হলে সেটিকে গলাতে ৭৭৮° তাপ দরকার। মনে হয় এই প্রক্রিয়ায় যে সঙ্কর প্রস্তুত হয়েছিল তার সবটুকু গলতে পারে নাই। সাধারণতঃ সিলভার-ক্লোরাইড ৪৬০০° এবং কপার-ক্লোরাইড ৪৩৪° উত্তাপে গলে যায়। খুব সম্ভব এই প্রক্রিয়ায় ধাতুগুলির ক্লোরাইডের একটি সমসত্ত্ব গলিত জিনিষ প্রস্তুত হয়ে পারদ এবং সাল-এমোনিয়ার বাষ্পের সঙ্গে বা এমনিতে স্ফুটনে পাত্রের তলা থেকে উপরে নীত হয়েছে।

এ প্রক্রিয়াটি বর্তমান রসায়ন শাস্ত্র অনুসারে একটু জবরজঙ্গ গোছের মনে হলেও অনেকগুলি প্রক্রিয়াই বর্তমানে অনুসৃত পন্থার মতই। এই প্রসঙ্গে ক্লোরাইড অবটিনের প্রস্তুত প্রণালীর উল্লেখ করা যেতে পারে। আরবী গ্রন্থে এর নাম দেওয়া হয়েছে "টিনের সাদা জল"। গ্রন্থকারের মতে "এর চিহ্ন হল যদি এ দিয়ে কোন পাতের উপর লেখা যায় এবং সেটিকে গরম করা যায় তা হলে লেখাটি রৌপ্যের উপর লেখার মতই মনে হবে এবং যদি কেউ একটি কাঁসার পাত গরম করে এর মধ্যে ডুবিয়ে দেয় তাহলে খোদায় মর্জিতে পাতটির ভিতর-বাহির সাদা হয়ে যাবে।" প্রক্রিয়াটি নিম্নরূপ :—

টিন—	১০ দেরহাম
বিশুদ্ধ পারদ—	২০ দেরহাম
খোরাসানের বিশুদ্ধ শুভ্র সাল-এমোনিয়া—	২০ দেরহাম

"টিনকে গলিয়ে নিয়ে ঠাণ্ডা হতে দাও। ঠাণ্ডা টিনের উপর পারদ ছড়িয়ে দাও। যতক্ষণ পর্য্যন্ত এ দুটি বেশ মিশে না যায় ততক্ষণ পর্য্যন্ত এমনি রেখে দাও। এইবার এই মিশ্রিত পদার্থটিকে আবার গরম কর এবং গরম অবস্থায় নাড়তে থাক। তারপর এটিকে একটি পাত্রে ঢেলে ঠাণ্ডা হতে দাও। এইবার এটিকে একটি খলে রেখে সাদা জল মিশিয়ে ভাল করে পেষ। পিষ্ট দ্রব্যটিকে ভাল করে ধুয়ে নিয়ে সাল-এমোনিয়া মিশিয়ে দাও। সংমিশ্রণটিকে আবার ভাল করে পিষে নিয়ে একটি মাটির মুষার (crucible) মধ্যে রাখ। মুষাটিকে ভাল করে কাদা দিয়ে লেপে দাও। তার পর এর মুখ খুব ভাল করে এঁটে এক রাত্রি ধরে ঘুঁটের আগুনে জাল দাও। ঘুঁটে এমন ভাবে সাজাতে হবে যেন মুষাটির উপরে এবং নীচে দুই হাত পরিমাণ ঘুঁটে থাকে। এইবার মুষা থেকে সংমিশ্রণটি বের করে আবার খলে ভাল করে পেষণ কর। তারপর আবার মুষাতে রেখে পূর্ব্বের মতই তিন রাত্রি আগুনে জাল দিতে থাক যেন আত্মা দেহের সঙ্গে মিশে যায়। এখন যদি এটাকে একটি গরম তামার পাতের উপর রাখ তা হলে দেহ ও আত্মার সঙ্গে মিশে ভিতরে প্রবেশ করবে। তখন এটিকে শোধনাধারে রেখে ঊর্দ্ধপাতন (sublime) করতে হবে। শোধনাধারটি যেন এক হাত দীর্ঘ ও আধ হাত চওড়া হয়। চিত্রের অনুরূপ এর ঠোঁটটি বাঁকা হওয়া উচিত। পাত্রটির অর্দ্ধেকটা এক আঙুল পরিমিত কাদা দিয়ে লেপে দিতে হবে। শোধনাধারটি তাপ করে শুকিয়ে নিয়ে চুল্লীর উপর বসিয়ে দাও। চুল্লীটি মিঠাই প্রস্তুতকারীদের চুল্লীর মত গোলাকার হওয়া উচিত। এর দুই দিকে যেন দুইটি ছিদ্র থাকে। চুল্লী এবং পাত্রটির মধ্যে যেন একটু ফাঁক থাকে। এইবার পাত্রটিতে রাসায়নিক পদার্থটি রাখ এবং অমসৃণ একটি ঢাকনা দিয়ে পাত্রটিকে ঢেকে দাও। ঢাকনার মধ্যে (পাশ থেকে তিন আঙুল দূরে) ছোট একটি ছিদ্র করে রাখ। এইবার ঢাকনা এবং শোধনাধারটি তিন আঙুল পরিমাণ কাপড় দিয়ে ভাল ভাবে এঁটে দাও। কাপড়খানা কাদা দিয়ে লেপে দিতে হবে। এইবার পাত্রটিকে খুব জাল দিতে থাক। প্রথমে ছিদ্রটি খুলে রাখবে যেন বাষ্প বেরিয়ে যেতে পারে। কিছুক্ষণ পরে ছিদ্রটি বন্ধ করে দাও। এক দিন ধরে খুব জাল দাও। এক দিন পরেও যদি দেখা যায় যে ছিদ্র দিয়ে বাষ্প আসছে তা হলে বুঝতে হবে প্রক্রিয়াটি সম্পূর্ণ হয় নাই আর যদি কোন বাষ্প না বেরয় তা হলে বুঝতে হবে যে প্রক্রিয়াটি সম্পূর্ণ হয়ে গেছে। তারপর ঠাণ্ডা হয়ে গেলে ঢাকনাটা খুলে ফেল। যেগুলা উপরে উৎক্ষিপ্ত হয়ে গেছে সেগুলিকে নীচেকার তলানির সঙ্গে নিয়ে পিষে গুঁড়ো কর এবং আবার সমান অনুপাতে পারদ নিয়ে একসঙ্গে ভাল করে পেষ। এইবার এগুলোকে আবার শোধনাধারে রেখে পূর্ব্বের মতই ঊর্দ্ধপাতন কর। প্রথম বারের উৎক্ষেপ (sublimate) কাল, দ্বিতীয় বার ফ্যাকাশে লাল, তৃতীয় বার ছাই রং, চতুর্থ বারে পাতলা ধূসর এবং পঞ্চম বারে একেবারে সাদা হবে। এখন এটিকে বের করে সযত্নে রাখ।"

এর পরে দ্রবণ (solution) করবার পদ্ধতি বর্ণিত হয়েছে। "উৎক্ষেপগুলিকে রাখার মত একটি বড় বোতল

দও। বোতলটিতে সমস্ত উৎক্ষেপগুলিকে রেখে দাও। এইবার বোতলের মুখের উপর একটি কানেল রেখে, কানেলের উপর একটা ঢাকনা দিয়ে ঢেকে রাখ। বোতলটিকে কেন্টের একটা বড় ঢাকনা দিয়ে ভাল করে ঢাক। এখন ঢাকনার উপর ঘুঁটে সাজিয়ে দিয়ে আগুন দাও, এবং এমনি ভাবেই জ্বাল দিতে থাক। প্রত্যেক সপ্তাহে ঘুঁটে বদলে দিতে হবে। চল্লিশ দিন এমনি জ্বাল দেওয়ার পর সংমিশ্রণটি গলে সাদা জল বেরিয়ে আসবে। একটি পাত্রে প্রস্তুত রৌপ্যের সঙ্গে মিশ্রান 'তীক্ষ্ণ জল' দও এবং পাত্রের অর্দ্ধেকটা এই সাদা জল দিয়ে ভরে দাও। এখন পাত্রটিকে গরম ছাইয়ের উপর বসিয়ে দাও। এমনি মৃদু আলে এটিকে সিদ্ধ হতে দাও যতক্ষণ না মিশ্রিত তরল পদার্থগুলি একেবারে মিশে যায়। এইবার উদ্ভূত পদার্থটিকে একটি তামার পাতের উপর রেখে জ্বাল দিতে হবে। এটি পাতের উপর দিয়ে বয়ে যাবে এবং অন্ত পাশ দিয়ে ফুটে বেরিয়ে সমগ্র জিনিষটিকে রৌপ্যের মত সাদা করে ফেলবে।"

বর্ত্তমানে ষ্ট্যানাস ক্লোরাইড (Stanous Chloride) এবং ষ্ট্যানিক ক্লোরাইড প্রস্তুত করতে অনুরূপ প্রক্রিয়াই অনুসৃত হয়। প্রক্রিয়াটিকে বর্ত্তমান রাসায়নিক করমুলা অনুসারে নিম্নরূপে বর্ণনা করা যেতে পারে—

$$Sn + Hg + NH_4Cl \rightarrow SnCl_2 + Sn($$
$$SnCl_2 + Hg \rightarrow HgCl_2$$
$$HgCl_2 + Ag \rightarrow \text{Ag amalgam.}$$
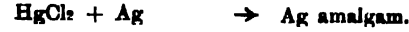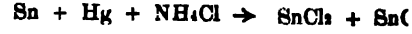
এমনি নানা প্রক্রিয়ার বর্ণনায় গ্রন্থখানি ভরপুর। এ ছাড়া সেই সময় রসায়ন বিজ্ঞানে ব্যবহৃত নানা যন্ত্রপাতির কথাও গ্রন্থকার বিশদভাবে বর্ণনা করেছেন।

আমাদের শিক্ষা সম্বন্ধে দু'চারটি কথা

শ্রীঅবনীমোহন চক্রবর্ত্তী

চীনে ও স্পেনে অভিযানকারীরা বিশ্ববিদ্যালয়সমূহকে লক্ষ্য করে করে বোমাবর্ষণ করেছিল, কারণ তারা বুঝেছিল যে, বিজিত জাতির প্রাণশক্তিকে ও চিন্তাশক্তিকে ধ্বংস করতে হলে এইটাই সর্ব্বপ্রধান লক্ষ্যবস্তু হওয়া উচিত। বিজেতা জাতির প্রথম কাজই হয় নিজেদের স্বার্থ সাধনের উপযোগী করে অধীন দেশের শিক্ষা-ব্যবস্থার পরিবর্ত্তন সাধন। আমাদের বিদেশী প্রভুরাও নিজেদের সুবিধা ও অসুবিধার প্রতি লক্ষ্য রেখে এদেশের জন্ত ব্যবস্থা করলেন একটা ওজন-করা শিক্ষা-পদ্ধতি। দেশের বৃহত্তর অংশ তা থেকে বঞ্চিত হয়ে রইল। সে বঞ্চনা জ্ঞানকৃত—পশ্চাতে রাজনীতি। শিক্ষা মানে পরীক্ষা পাস আর ফল তার চাকুরি, এর বেশী শিক্ষা সম্বন্ধে জাতি আর কিছু ভাবতে পারলে না। শিক্ষাগ্রহণের এটাই হয়ে উঠল প্রথা। ধনী-নির্ধন নির্ব্বিশেষে সবাই ছুটল চাকুরির পশ্চাতে, কেউ অর্থের গরজে, কেউ সম্মানের লিপ্সায়। গোটা দেশের লোক জীবন-প্রসাধনের দৃষ্টি হারিয়ে ফেললে। প্রাণের প্রাচুর্য্যে উজ্জ্বল আত্মপ্রকাশের চাঞ্চল্য তাদের আর রইল না। জ্ঞান চাই না, বিদ্যা চাই না; সে প্রয়োজন ছাত্রের অভিভাবকও উপলব্ধি করেন না। ছাত্রেরা চায় না জীবনকে, জগৎকে জানতে, চিনতে, বুঝতে। জাগল না সে নেশা তাদের মধ্যে যার ফলে সাধনার পথ দিয়ে দেখা দেয় বড় বড় রাজনৈতিক, দেশভক্ত, বৈজ্ঞানিক।

মুখ্য কথাই এই যে আমাদের শিক্ষার-মধ্যে সৃষ্টির প্রেরণা নেই। তাতে জীবন-গঠনের উদ্দীপনার অভাব। এ শিক্ষা যেন জীবনের শিক্ষাই নয়। নোটের বাছাই-করা উত্তর মুখস্থ করে পাস দেওয়ার অতিরিক্ত যা-কিছু সে সমস্তই ছাত্রের কাছে অবাস্তর বলে মনে হয়। আমাদের শিক্ষা-ব্যবস্থাই এ মনোভাব সৃষ্টি করে তুলেছে।

যাঁদের হাত দিয়ে শিক্ষা বিতরিত হয় তাঁরাও ছাত্রের গরজ-মত বাঁধা রাস্তায় চোখ বুজে চলে যান। ছাত্র, সমাজ, শিক্ষা-পদ্ধতি বা সরকার—কোনও তরফ থেকেই তাঁরা উৎসাহও পান না, কাজেই তাঁদের কাজ হয়ে পড়েছে রুটিনমাফিক, হয়ে পড়েছে কতকটা দিন-মজুরী গোছের। কিন্তু আসলে শিক্ষা-দান এ ভাবে চলে না। প্রকৃত শিক্ষাদান অন্তরের দান। শিক্ষা-দানের মধ্যে আছে একাধারে সৃষ্টি ও গঠনের প্রেরণা। শিল্পীর আনন্দ থেকে শিল্পের জন্ম। শিক্ষাটাকে যদি মানুষ-সৃষ্টির শিল্প বলে গ্রহণ করা হয় তবে এর মূলেও চাই আনন্দ,—স্বতঃ-উৎসারিত আনন্দ। যেখানে এই আনন্দের অভাব সেখানে মানুষ তৈরির আশাও বৃথা। কিন্তু এদেশে যাদের উপর শিক্ষাদানের ভার ন্যস্ত নানা কারণে তাঁদের চিত্ত থাকে আনন্দহীন, বিক্ষিপ্ত। তাঁরা সঙ্কুচিত, ভীত, অভাবগ্রস্ত, মানসিক শান্তিবর্জ্জিত। জীবন-সংগ্রামে পরাভূত, রোগশোক-দুঃখব্যাধি-জর্জ্জরিত অসহায় শিক্ষক-সম্প্রদায়ের হৃদয়ে আনন্দ থাকবে কি করে? দুর্ব্বলতার উৎস থেকে সবল মনুষ্যত্বের প্রেরণা আসতে পারে না, বিশুষ্ক মন রস-পরিবেশনে অক্ষম। দেশবাসীকে দেশের কল্যাণের জন্ত শিক্ষক-সমাজের দিকে দৃষ্টি ফিরাতে হবে। সমাজে সব-কিছু গড়ে ওঠে সমাজের আবহাওয়া থেকে। উপযুক্ত শিক্ষকের সৃষ্টি করতে পারে উন্নত সমাজ। সেখানে চাই অন্তরের টান। সেই আন্তরিক টানই শিক্ষককে আপন কর্ত্তব্যে উদ্বুদ্ধ করে তুলবে। শিক্ষকের ত্যাগপূত আদর্শ-জীবনের বুলি অনেকেই আওড়ান। কিন্তু নিছক ত্যাগের কথা অবাস্তবতাবাদীর উক্তি। দেশ শ্রদ্ধা দিয়ে, অর্থ দিয়ে, সম্মান দিয়ে শিক্ষকের মর্য্যাদা বাড়ালে তবে ত তিনি গড়ে তুলতে পারবেন অন্তরের আনন্দ দিয়ে, মনুষ্যত্বের আলোকে আমাদের পরিবার সমাজ ও দেশের ভবিষ্যৎ আশা-ভরসা—মাতৃভূমির মুখোজ্জ্বলকারী সন্তানদের। দেশের ছাত্র-সম্প্রদায়ও সেই শিক্ষা-পরিবেশনের মধ্যে পাবে সত্যিকার

সম্পদ ও মাধুর্য্য যাতে করে তাদের কুণ্ঠাযুক্ত মন সাগ্রহে শ্রদ্ধাভরে গ্রহণ করবে শিক্ষকের সাধনার দান ; আর চিত্ত তাদের ভরে উঠবে বৃহত্তর জীবনের রসে—যার অজস্র ধারায় দেশের মাটিতে নেমে আসবে সজীবতা, সৌন্দর্য্য ও ঋদ্ধি।

এবার শিক্ষার বিষয়বস্তু ও পদ্ধতি সম্বন্ধে কয়েকটি কথা উত্থাপন করছি।

(ক) বর্ত্তমান আবৃত্তি-মূলক শিক্ষা-পদ্ধতির পরিবর্ত্তন করে চিন্তামূলক স্বাধীন বুদ্ধির উন্মেষক শিক্ষা প্রবর্ত্তিত করতে হবে।

(খ) মাধ্যমিক বিদ্যালয়গুলিকে প্রতিদিন কুড়ি কি ত্রিশ মিনিট করে দু'টি ছুটির ঘণ্টা রেখে একটিতে কোনও শিক্ষক সমবেত শিক্ষার্থীদের সভায় দৈনিকার পত্রিকার বিশেষ বিশেষ জ্ঞাতব্য বিষয়ের সংক্ষিপ্ত আলোচনা করবেন। এজন্য দ্বিতীয় ছুটির ঘণ্টাটি নির্দ্দিষ্ট থাকাই ভাল। পরীক্ষার প্রশ্নপত্রেও সংবাদপত্র থেকে সাময়িক বিষয়ের প্রশ্ন থাকবে।

(গ) ছাত্রদের রাজনীতি শিক্ষাদান সম্বন্ধে বিশেষ অবহিত হতে হবে। আজকের দিনে রাজনীতিকে ভিত্তি করেই শিক্ষা-ব্যবস্থা প্রণয়ন করা অত্যাবশ্যক। আমাদের স্বাধীন রাষ্ট্র নেই, তাই ইংলণ্ডের পাবলিক স্কুলগুলির ন্যায় রাষ্ট্রিক আদর্শকে রূপ দেওয়ার মত শিক্ষা-ব্যবস্থা আপাততঃ আমাদের দেশে সম্ভব হবে না। নেতৃত্বের শিক্ষা, আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রের ন্যায় গণতন্ত্রের শিক্ষা এবং জার্ম্মেনী, ইটালী, রাশিয়া প্রভৃতি দেশের মত নাগরিকতার শিক্ষা প্রভৃতি বিষয়েও আমাদের চিন্তা করতে হবে। সে সব দেশে এক একটা রাষ্ট্রিক পরিকল্পনাকে রূপায়িত করে তোলা হয় মাধ্যমিক শিক্ষা-ব্যবস্থার মধ্য দিয়ে।

(ঘ) বিদ্যালয়ে সম্প্রতি যে ধরণের ধর্ম্মশিক্ষা দানের ব্যবস্থা প্রবর্ত্তিত হয়েছে, তা খুব কল্যাণকর হবে বলে মনে হয় না। এই উগ্র সাম্প্রদায়িকতার দেশে, বিদ্যালয়ে এবম্বিধ প্রথাগত ধর্ম্ম-শিক্ষা সাম্প্রদায়িকতা বৃদ্ধির সহায়ক হবে। বিদ্যালয় হবে জাতীয়তা গঠনের প্রতিষ্ঠান। তার মধ্যে রাখতে হবে অসাম্প্রদায়িক নীতি। এক স্বার্থে, একই জাতীয়তার আদর্শে সকলের জীবন ও চরিত্র গঠিত হবে। জার্ম্মানীতে হিটলারও বিদ্যালয়ে ধর্ম্মশিক্ষা-প্রবর্ত্তনের চেষ্টাকে ফলবতী হতে দেন নি। ইংলণ্ডেও সে প্রয়াস ব্যর্থ করা হয়েছে। ধর্ম্মশিক্ষার প্রতিষ্ঠান যদি আদৌ দেশে রাখতেই হয় তবে তা স্বতন্ত্র থাকাই ভাল।

(ঙ) শিক্ষার্থীদের নিয়ম-শৃঙ্খলা শিক্ষার উপর ঝোঁক দিতে হবে সবচেয়ে বেশী। সৈনিকের মত তারা যেন তা মেনে চলে। শিক্ষিত-অশিক্ষিত নির্ব্বিশেষে নিয়ম-শৃঙ্খলার মধ্য দিয়ে চলতে আমরা অনভ্যস্ত। এ অভ্যাস পরিত্যাগ করে কঠোর নিয়মানুবর্ত্তিতার ভিতর দিয়ে সমগ্র জাতিকে লক্ষ্যাভিমুখে অগ্রসর হতে হবে। আর আমাদের ছাত্রসমাজ নিয়ম ও শৃঙ্খলার প্রথম পাঠ যাতে বিদ্যালয়ে গ্রহণ করতে পারে সে ব্যবস্থা করতে হবে।

(চ) একটা বৈজ্ঞানিক আবহাওয়ায় ঘিরে রাখতে হবে তরুণ মনকে। বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গী দিয়ে দেখবে সে জগৎ ও জীবনকে। বিজ্ঞানের আলোয় জাতির যুগযুগ সঞ্চিত জড়তা ও কুসংস্কারের অন্ধকার হবে অপগত।

(ছ) দশের মঙ্গল-বোধকে জাগাতে হবে তরুণদের মনে। তাদের উদ্বুদ্ধ করে তুলতে হবে ত্যাগ ও সেবার আদর্শে। "সকলের তরে সকলে আমরা প্রত্যেকে আমরা পরের তরে" —এই হবে তাদের জীবনের মূলমন্ত্র। তাদের মনে তরুণ বয়স থেকেই জাগিয়ে তুলতে হবে নাগরিক জীবনের কর্ত্তব্যবোধ বা civic sense. মোট কথা শিক্ষাকে পুঁথিগত ও মামুলি প্রথাগত মাত্র করে না রেখে বহুমুখী ধারায় বিভিন্ন খাতে প্রবাহিত করতে হবে। তবেই হবে দেশের সর্ব্বাঙ্গীণ কল্যাণ, শিক্ষাদানের চরম সার্থকতা।

স্বরাজ হলে ত এসব দিকে আমাদের বিশেষ ভাবে মনোযোগী হতেই হবে। কিন্তু স্বাধীনতা অর্জ্জন না করা পর্য্যন্ত হতাশ হয়ে বসে না থেকে জন-জাগরণের মধ্য দিয়ে শিক্ষার রূপান্তর সাধনে আমাদের আশু অগ্রসর হওয়া দরকার—বিলম্বে দেশের অকল্যাণকেই বাড়তে দেওয়া হবে মাত্র।

—
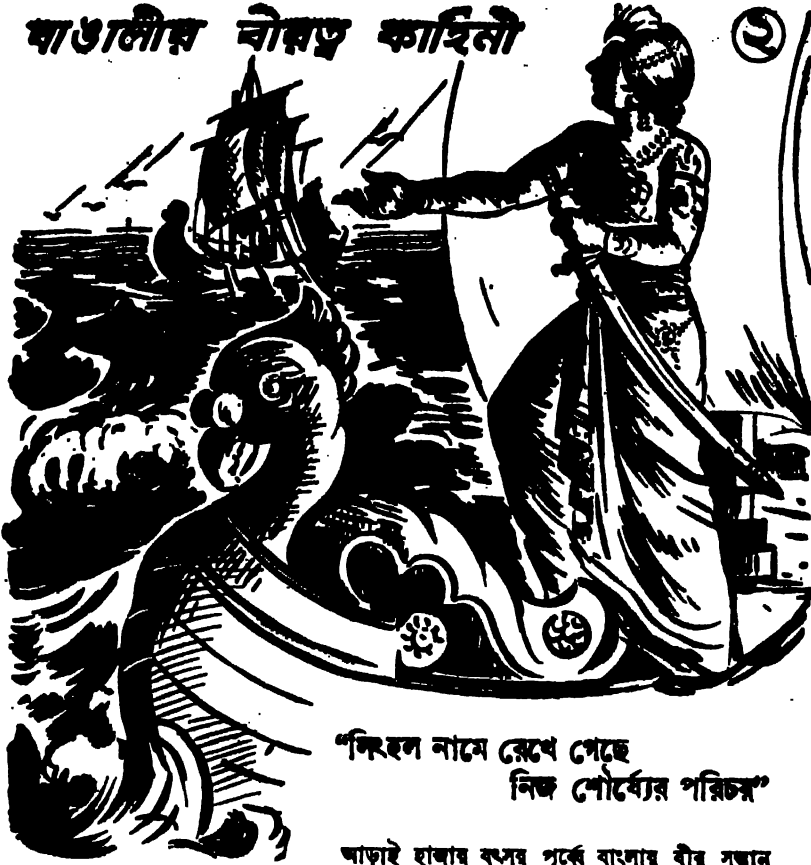
পাগল কি সত্যই বিকৃত-মস্তিষ্ক

শ্রীননীগোপাল চক্রবর্ত্তী

কোন কোন পণ্ডিত মনে করেন, আমাদের পাগল হওয়ার বড় কারণ এই যে, আমরা অতি অল্প বয়সে অনেক কিছু শিখতে আরম্ভ করি এবং শিখিও খুব তাড়াতাড়ি। পশু তার আদিম মনোভাব নিয়েই সারাজীবন কাটিয়ে দেয়। তারা কিছু শেখেও না, কিছু ভোলেও না, কিন্তু মানুষ অনেক কিছু শিখে নিজেকে অভিশপ্ত করে। মনে রাখতে হবে, কোনও কিছু শেখার চেয়ে শেখা বিষয় ভুলে যাওয়া ঢের বেশী কঠিন।

মনস্তত্ত্ববিদেরা বলেন, একই শিশু বলশেভিক, ফাসিষ্ট বা যা হয় একটা কিছু 'হওয়া'র শিক্ষা পেতে পারে। কম্যুনিষ্ট, লীগ-পন্থী বা কংগ্রেসওয়ালা হওয়া—অর্থাৎ কোনও কিছু পছন্দ করা না করা; সাহিত্য, সঙ্গীত বা বিজ্ঞানে রুচি, সিনেমার ছবি ভাল লাগা বা না লাগা— এ সব আমাদের জন্মগত নয়, শিক্ষাগত।

মনের উপর কোন কিছু জোর করে চাপাতে গেলে অনেক সময় আমাদের মস্তিষ্ক-বিকৃতি ঘটে। এটা আমাদের পারিপার্শ্বিক অবস্থার ফল—জন্মগত নয়। মনস্তত্ত্ববিদেরা এখন আর বংশগতির (heredity) প্রভাব মানেন না।

বাস্তবিক পক্ষে ঘটে এই :—মানুষের মস্তিষ্ক কতকটা ক্যামেরার মত, কিন্তু ক্যামেরার চেয়ে এর সুবিধা এই, এর একটা স্বতঃক্রিয় (automatic) স্পর্শক (sensitive) আছে। এই গ্রাহক বা স্পর্শক হচ্ছে মনের আবেগ (emotion)। এই আবেগের বশবর্ত্তী হয়ে মস্তিষ্কের ফটোগ্রাফির প্লেট বাইরের ছাপ (impression) খুব বেশী করে গ্রহণ করতে পারে। আবেগ যত বেশী হবে, মস্তিষ্ক-ক্যামেরা তত বেশী স্পর্শক (sensitive) হবে।

একটি খুব ছোট ছেলেকে যদি দশ বার করেও শেখান যায় যে, আট নয় বারাত্তর, সে পরক্ষণেই তা ভুলে যায়। কিন্তু পাশের বাড়ীর কুকুরটা একবারও যদি তাকে দেখে ঘেউ-ঘেউ করে ডাকে, তবে ঐ ছোট ছেলে তা ভুলবে না। মনস্তত্ত্ববিদেরা এ সম্বন্ধে বলেছেন, "A child without fear would be a potential corpse !"

যে 'আবেগে'র কথা বলা হয়েছে, দুর্ভাগ্যক্রমে ওটা দু-ধারী তরবারির মত। এর বশবর্ত্তী হয়ে আমরা এমন অনেক বিষয় শিখে ফেলি—যা হয়ত শিখবার কোন হেতু ছিল না। যেমন ধরুন, একটি শিশু তার হাত কেটে ফেললে। ডাক্তার এসে ইনজেকসন দিলেন, কাটা জায়গাটা হয়ত-বা সেলাই করলেন— কিন্তু দেখা গেল এর পর থেকে ডাক্তারের ব্যাগ দেখলেই রোগী ভয় পায়। এই ভাবটা চিকিৎসার সময়ে তার মনে জেগেছিল এবং সেই সঙ্গে জড়িত হয়েছিল ভয়। এর পর জীবনে অনেক দিন পর্য্যন্ত থাকবে এই ব্যাগের ভয়। এটাও ছোটখাটো রকমের পাগলামির পর্য্যায়ে পড়ে। এই ধরণের আরও অনেক ঘটনা সচরাচর ঘটে থাকে। যেমন, একটা অসৎ লোক একটি ছেলেকে লুকিয়ে যৌন-প্রবৃত্তি চরিতার্থ করতে শেখালে। এখানে যৌন-উত্তেজনা ঐ ছেলেটির মনে 'আবেগ' জাগাল, আর গ্রহণশীল (sensitized) মস্তিষ্কে সঙ্গে সঙ্গে লুকানোর ভাব অঙ্কিত হয়ে রইল। ফলে দাঁড়াল—'kleptomaniac' ব্যাধি। এই ব্যাধিগ্রস্তেরা পুলিসের চোখের উপর হাইড্‌স্ চুরি করে। এইরূপে pyromaniacদের সৃষ্টি হয়—যারা আগুন লাগাতে ভালবাসে।

একটা ছোট ছেলেকে কোনও সুড়ঙ্গের মধ্যে কুকুরের সঙ্গে রেখে দেওয়া হ'ল। এর ফল হবে আশ্চর্য্য। সে কুকুর দেখে ভয় পাবে না—ভয় পাবে সুড়ঙ্গের বা কোনও আবদ্ধ জায়গায়। এই রোগকে ডাক্তারী শাস্ত্রে claustrophobia বলা হয়েছে।

কিন্তু পাগলামির প্রকৃত স্বরূপ বুঝতে হলে আমাদের মনে রাখতে হবে—স্থির-মস্তিষ্ক লোকের মত পাগলেরও জীবনের

আসল উদ্দেশ্য—আনন্দলাভ। এই আনন্দ অন্বেষণের উপায় বা পথ সকলের এক নয়, কিন্তু সকলেই এই 'pleasure principle' দ্বারা পরিচালিত হয়।

উপরি-উক্ত ক্ষেত্রগুলিতে যে পাগলামির পরিচয় পাওয়া যায়, সেগুলিকে মানসিক উৎপীড়নজনিত 'neuroses' বলা যেতে পারে। এগুলি কিন্তু pleasure principle-এর অন্তর্গত নয়; সেইজন্য এই সব রোগীকে পাগলা-গারদে দেখা যায় না। এরা সমাজের ক্ষতি করে না এবং নিজেদের ব্যবস্থা নিজেরাই করতে পারে। যে সব লোককে আমরা পাগল বলি তারা নিজেদের তত্ত্বাবধান নিজেরা করতে পারে না এবং সমাজেরও ক্ষতির কারণ হয়। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয়, এদের কার্য্যকলাপ অনেক সময়ই অত্যন্ত ন্যায়সঙ্গত (logical) বলে আমরা মনে করতে পারব—যদি তার পিছনের মূল কারণটা অনুসন্ধান করি।

এইবার আমাদের সুখবাদ (pleasure principle) মতে ফিরে আসতে হবে। তা হলে এদের পাগলামির কারণও বুঝা সহজ হবে আমাদের পক্ষে।

সংসারে আমরা দুঃখকে এড়িয়ে সুখটাকেই গ্রহণ করতে চেষ্টা করি। অবশ্য দুঃখ যে আমরা একেবারে বরণ না করি তা নয়—তবে তার পিছনে থাকে একটা ভবিষ্যতের সুখ-সুবিধা বা গৌরব-লাভের আকাঙ্ক্ষা। তা না হলে দন্ত-চিকিৎসকের চেয়ারে গিয়েও কেউ বসত না—পুলিসের গুলির সামনে ছাত্রেরাও বুক পেতে দাঁড়াতে পারত না।

বাইরের দিকে যে কথা মনের দিকেও তাই। যে চিন্তায় সুখ হয় আমরা সেই চিন্তাই করি। এখানে অবশ্য কেউ কেউ প্রতিবাদ করে বলতে পারেন—আমাদের কতক চিন্তা ত খুব দুঃখজনকও আছে! যেমন ধরুন, কেউ আমাকে অপমান করেছে, আমি সেই কথা ভাবছি, এটাও সুখের চিন্তা নয়।

মনস্তত্ত্ববিৎ বলবেন, হ্যাঁ, এর মধ্যেও সুখ আছে। এই দুঃখের চিন্তার পিছনে আছে প্রতিশোধের চিন্তা—সেটা সুখকর। ১৯৪০ থেকে ১৯৪৪ পর্যন্ত সংসার চালাতে আমাদের দুশ্চিন্তার অন্ত ছিল না—কিন্তু এর মধ্যেই ছিল আত্মরক্ষার একটা গৌরব। অবশ্য আমাদের সব চিন্তাই যে সুখের চিন্তা সে বিতর্ক এখানে করা হচ্ছে না, এখানে এইমাত্র বলা হচ্ছে যে, মানুষের দুঃখের চিন্তা ছেড়ে সুখের চিন্তার দিকে একটা ঝোঁক আছে।

তথাকথিত সুখবাদ হচ্ছে পাগলামির রহস্য উদ্ঘাটনের চাবি-কাঠি বিশেষ। বদ্ধ পাগলদেরও আমরা দেখতে পাই, তারা সুখের চিন্তার দিকেই ঝুঁকে পড়েছে। এই হিসেবে তারা অত্যন্ত প্রকৃতিস্থ।

একটা পাগলের কথাই ধরা যাক্। কোনও ব্যক্তি dementia praecox-এ ভুগছে। এই শ্রেণীর পাগল সারানো খুব শক্ত, এমন কি, এরা সারে না বললেই হয়। এই পাগল ঘরের এক কোণে গিয়ে বসে থাকবে এবং আপন মনে বিড় বিড় করে কথা বলবে। মাঝে মাঝে এরা হাসবে এবং সংসারের উপর এদের বিশেষ একটা তৃপ্তির ভাব দেখা যাবে।

কথা বললে সে হয়ত তার কোন উত্তর দেবে না। যদি স্বেচ্ছায় কোন কথা বলে, তা হলে বুঝতে পারবেন, হয়ত তার ধারণা সে কোনও সোনার খনির মালিক, অথবা এমনও হতে পারে স্বয়ং নিজেকে হিটলার বলেই তার বিশ্বাস। শত্রুরাই তাকে আটকে রেখেছে, তুমি যদি তাকে ছেড়ে দিতে রাজী হও, সে সমগ্র জার্মান রাজ্য তোমাকে দিয়ে দিতে প্রস্তুত আছে। আমি একজন পাগলকে দেখেছিলাম, সে নিজেকে ফুড কমিটির সেক্রেটারী মনে করে দিনরাত ভাল ভাল শাড়ী, চিনি, আটা, খানির খাঁটি তেল এই সকলের পারমিট ছাড়ছে।

মনে রাখবেন, এরা কিন্তু প্রকৃতই সুখী। এরা একটা স্বপ্নরাজ্যে বাস করে। তাদের এই স্বপ্ন কিন্তু আমাদের স্বপ্নের মত নয়—এ স্বপ্ন তাদের নিরতিশয় বাস্তব। এইজন্যই তাদের ব্যাধি দুরারোগ্য। পাগল হয়ে তারা বেশ আরামেই আছে। এই রকম স্বপ্ন আমরাও যে জেগে জেগে কখনও কখনও না দেখি তা নয়, কিন্তু পার্থক্য এই এবং পরিতাপের বিষয় এই যে—আমাদের স্বপ্ন তাসের ঘরের মত মুহূর্তে ভেঙে যায় কিন্তু এই পাগলদের স্বপ্ন কখনও ভাঙে না।

যে বালক ডাক্তারের ব্যাগ কি সুড়ঙ্গ দেখে ভয় পায়, সে কখনও ও-পথ দিয়ে আর যাবে না, কিন্তু এই সব বদ্ধ পাগল লক্ষ লক্ষ টাকা, বড় বড় রাজ্য বিলিয়ে দেবে—হুকুম দেবে, বক্তৃতা করবে। এতে তাদের আনন্দ আছে এবং আছে বলেই তারা সেরে ওঠে না, উঠলেও কিছুদিন পরেই আবার পাগল হয়ে যায়।

আমাদের সকলের জীবনেরই একটা না একটা লক্ষ্য আছে। বড় বড় দার্শনিকেরা বলেন, আমরা সকলেই সুখান্বেষী—কেউ চাই ধন, কেউ যশ, কেউ শক্তি এই সব।

পাগলেরা কিন্তু জীবনের এই সমস্যার সমাধান অতি সুন্দর ভাবেই করে বসে আছে। যীশু বলেছিলেন—"The Kingdom of God is within"—অর্থাৎ "ঈশ্বরের রাজ্য তোমার নিজের ভিতরেই আছে"। পাগলেরা তাদের জীবনে এই উক্তির যাথার্থ্য অক্ষরে অক্ষরে প্রতিপন্ন করে থাকে। অর্থ চাও? জগতের শ্রেষ্ঠ ধনী তারা। শক্তি চাও? তারা কেউ নেপোলিয়ান, কেউ হিটলার। হাওড়া ব্রীজের উপর দিয়ে এরা সোজা ঈশ্বরের কাছে গিয়ে নালিশ জানাতে চায়—পারেন আপনি এতটা বিশ্বাস নিয়ে কাজ করতে? আমরা হয়ত তাদের কাণ্ড দেখে হেসে বলব—পাগল।

কিন্তু আমরা কি চাই?—সুখ। পাই কি? বড়জোর কিছু কখনও পাই, তাতে কিন্তু দুঃখ বেড়ে যায়। পাগলকে দেখুন, সে এত আত্মতৃপ্ত যে, আমাদের সঙ্গে কথা বলে সে তার সময় নষ্ট করতে পর্য্যন্ত চাইবে না। তাদের মতে, আমরাই এক একটি মহামূর্খ, বদ্ধ পাগল।

আমরা সারাজীবন অক্লান্ত পরিশ্রমে খেটে মরি, শেষ জীবনে হয়ত অন্ন-বস্ত্র-তেল-চিনির চেষ্টায় এবং অভাব-অনটন, রোগ-শোকে জর্জ্জরিত হয়ে প্রাণত্যাগ করি। পাগল কিন্তু কখনও কাজকর্ম করে না। এদের শোক-দুঃখ নেই। অধিকাংশ পাগলই আরোগ্য লাভ করে না—কারণ, সে আরোগ্য লাভ করতে চায় না। মনে প্রশ্ন জাগে পাগল কি সত্যই বিকৃত-মস্তিষ্ক?

পুস্তক-পরিচয়

চুয়াচন্দন—শ্রীশরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়। ৩৫, বাদুড়বাগান রো, কলিকাতা। মূল্য তিন টাকা।

ছয়টি গল্পের সংগ্রহ। শেষ গল্পটির নামে পুস্তকের নামকরণ হইয়াছে 'চুয়াচন্দন'। ছয়টির মধ্যে ভৌতিক গল্প দুইটি—'রক্ত খদ্যোত' ও 'মরণ ভোমরা'। 'কর্তার কীর্তি'র মধ্যে কৌতুক আছে। ঐতিহাসিক গল্প লিখিবার প্রথা একরকম উঠিয়া গিয়াছে বলিলেই হয়, গ্রন্থকার সে প্রথা বজায় রাখিয়াছেন। যে কল্পনা ইতিহাসকে প্রাণবান্ করিয়া তোলে শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়ের সে কল্পনাশক্তি আছে। 'বাঘের বাচ্ছা'র কিশোর শিবাজীর চিত্র এবং 'রক্ত সন্ধ্যা'র ভাস্কো-ডি-গামার চরিত্র অঙ্কিত হইয়াছে। শেষোক্ত গল্পে এক জাতিস্মরের মুখ দিয়া কাহিনীটি বর্ণিত। সংগ্রহের শ্রেষ্ঠ গল্প শেষ গল্প। চৈতন্যযুগের ঘটনা। শুধু যুগের নয়, এমন কি, গল্পের মধ্যে দুষ্টের ভীতি স্বরূপ, মানবীয় করুণায় উচ্ছলহৃদয়, অল্প বয়সে অপূর্ব্ব পাণ্ডিত্যের অধিকারী কিশোর নিমাই পণ্ডিতের দেখা পাই। প্রচুর আনন্দলাভের উপকরণ যোগাইয়া গল্পগুলি পাঠকের পরিতোষ বিধান করিবে।

শ্রীশৈলেন্দ্রকৃষ্ণ লাহা

ইয়োরোপা—শ্রীদেবেশচন্দ্র দাশ। মূল্য তিন টাকা। দ্বিতীয় সংস্করণ। বিশ্বভারতী গ্রন্থালয়, ২, কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা।

ইয়োরোপার অনেকগুলি প্রবন্ধ যখন 'বিচিত্রা' মাসিক পত্রিকায় একাদিক্রমে প্রকাশিত হয় তখন তরুণ লেখকের প্রথম কলমের রচনা-সম্ভারের মধ্যে শক্তিশালী পাকা হাতের পরিচয় পেয়ে সানন্দ বিস্ময় অনুভব করেছিলাম। আজ পুনরায় সমগ্রভাবে দ্বিতীয় সংস্করণ ইয়োরোপা পাঠ করে অনুভব করলাম, বইখানি নিঃসন্দেহ বাংলা সাহিত্যকে বেশ খানিকটা সমৃদ্ধতর করেছে।

ভ্রমণ এবং কাহিনী—উভয়ই যখন ইয়োরোপার আলোচ্য বস্তু, তখন হিসাব-মত বইখানিকে ভ্রমণকাহিনী বললে আপত্তি করা যায় না। কিন্তু, তৎসত্ত্বেও, যে অনির্দেশ্য তৃতীয় বস্তু ইয়োরোপাকে সাধারণ অর্থের ভ্রমণ-কাহিনীর গোত্র থেকে পৃথক করে নিয়ে গেছে, সেই তৃতীয় বস্তুতেই 'ইউরোপা'র মূল্যের বার আনা অংশ নিহিত। এমন এক নিগূঢ় অনন্যসুলভ কৌশল লেখকের অধিকারে আছে, যার দ্বারা তিনি অবলীলার সহিত নিজের চোখ দিয়ে পাঠককে দেখাতে পারেন, এবং সঙ্গে সঙ্গে নিজের হৃদয় দিয়ে পাঠককে অনুভব করাতেও জানেন। তার ফলে 'ইয়োরোপা'র ইয়োরোপ তার সকল বস্তুসম্পদ এবং বর্ণমায়া নিয়ে পরিপূর্ণ সহানুভূতির সহিত পাঠকচিত্তে ধরা দেয়; এবং তারই ফলে লেখকের সহিত চলতে চলতে কখনো আমরা পথ হারাই হাইল্যাণ্ডসের গভীর অরণ্যানীর মধ্যে, কখনো শুনতে পাই ভোরের স্কাইলার্কের উষা-বন্দনাগীতি, কখনো চোখের সামনে জেগে ওঠে হানিসাক্ল-হলিহক্-লাইলাক্ ল্যাবার্ণামের অপরূপ বর্ণসুষমা; কানে ভেসে আসে সহস্ররূপকথা-সম্পৃক্ত রাইন নদীর সুমধুর কলতান, কখনো বা রবি গ্রিন চার্লি এবং সুন্দরী হুইন মেরি তাদের অপরূপত্বের চমক লাগিয়ে নিমেষের জন্য চক্ষের সম্মুখে ফুটে উঠে মিলিয়ে যায়, এবং এই সমস্তের মধ্যে

অনুভব করি ইয়োরোপের চিত্তের এবং আত্মার সাজ স্পন্দন। হতে পারে, 'The light that never was on sea or land,' লেখক তাঁর রচনার মধ্যে সেই আলোকের খানিকটা কিরণপাত করেছেন। কিন্তু ক্ষতি কি তাতে? রসান যদি সুবর্ণকে সুন্দরতর করে থাকে তাতে আপত্তির কি আছে? যে শ্রদ্ধা এবং আনন্দের দৃষ্টি দিয়ে লেখক ইয়োরোপকে দেখেছেন সেই শ্রদ্ধা এবং আনন্দই এই রসান জুগিয়েছে।

শ্রীউপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়

অহিংসা ও গান্ধী—শ্রীঅতুল্য ঘোষ। দি ইণ্ডিয়ান এ্যাসোসিয়েটেড পাব্লিশিং কোং লিমিটেড; ৮সি রমানাথ মজুমদার ষ্ট্রীট, কলিকাতা। ১৯৪৬। মূল্য দুই টাকা। পৃঃ ১০৮।

গান্ধীজীর মতবাদ সম্বন্ধে বাংলা ভাষায় আলোচনা কম। লেখক বর্ত্তমান পুস্তিকাখানিতে, ছয় অধ্যায়ে অহিংসা সম্বন্ধে একটি সমগ্র আলোচনার চেষ্টা করিয়াছেন। বিভিন্ন অধ্যায়গুলির নাম: গান্ধীবাদ, মূলনীতি, মূল্যবোধ, অর্থনীতি, বিপ্লব ও স্বরাজ; শেষে একটি নির্ঘণ্ট আছে। 'বিপ্লব' নামক অধ্যায়ে গান্ধীজীর মতবাদের মৌলিকত্ব অতি সুন্দর ভাবে ফুটিয়া উঠিয়াছে। মূলনীতি, মূল্যবোধ এবং অর্থনীতি সম্পর্কিত অধ্যায়গুলিও ভাল, কেবল সংক্ষিপ্ত করার ফলে হয়ত কঠিন বলিয়া মনে হইতে পারে। কিন্তু বিষয়টিই কঠিন, ভাষা বা পরিবেশনের দিক দিয়া ত্রুটি হয় নাই। সাধারণ পাঠক বইখানির মধ্যে, মতে মিলুক অথবা না মিলুক, চিন্তার যথেষ্ট খোরাক পাইবেন। প্রুফে ছাপার ভুল আছে, এ সম্বন্ধে আগামী সংস্করণে আরও সতর্ক হওয়া প্রয়োজন।

শ্রীনির্ম্মলকুমার বসু

যৌন প্রবৃত্তি ও যৌন তৃপ্তি—(দ্বিতীয় সংস্করণ)—শ্রীরমেন্দ্রনাথ দে প্রণীত। আর, এল, এণ্ড কোম্পানী; মালাকারটোলা, ঢাকা। পৃঃ ২৫৬। মূল্য তিন টাকা।

বাংলা ভাষায় যৌন-তত্ত্ব সম্পর্কে যে দুই একখানা বই নজরে পড়িয়াছে তাহাতে যৌন-রহস্য সম্পর্কে সামান্য কিছু বৈজ্ঞানিক আলোচনা থাকিলেও মোটের উপর সেগুলিকে কতকটা 'পর্নোগ্রাফি'র সামিল বলিয়াই মনে হয়। এই সকল পুস্তকে যৌন-প্রবৃত্তির অভিব্যক্তি, বৈচিত্র্য এবং যৌন-পরিতৃপ্তির বিভিন্ন উপায় বা বিভিন্ন বিকৃত ঘটনার যে সকল বিবরণ থাকে, সেগুলিকে জানিবার আগ্রহেই অনেকে, বিশেষ ভাবে তরুণ-তরুণীরা, আকৃষ্ট হইয়া থাকেন বেশী। কিন্তু যৌন-তত্ত্ব বা যৌন-বিজ্ঞান আলোচনার উদ্দেশ্য ইহা নহে। সমাজ-জীবনের সুস্থতা বিধান এবং ব্যক্তিগত ভাবে দৈহিক ও মানসিক উৎকর্ষসাধনে সহায়তা করিতে হইলে কতকগুলি বিকৃত যৌন-ঘটনা বা যৌন-তৃপ্তির বিচিত্র উপায় সম্বন্ধে বিশদ আলোচনা করিলেই উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইবে না। গ্রন্থকার এক স্থলে বলিয়াছেন—"সমাজে যৌন-শিক্ষা দেওয়ার ব্যবস্থা না থাকায় যৌন-ক্ষুধা বিপথে ধাবিত হইয়া উহার তৃপ্তি খুঁজিয়া

অনিন্দ্য
অলকের
আকর্ষণ
রাঙাজবা
কেশতৈল
অনুমপা কোমক্যাল:: কালকাতা

[illegible] বয়ঃপ্রাপ্ত হইলে যখন তাহার মনে যৌন-ইচ্ছার উদ্ভব হয় তখন সে ইচ্ছার স্বাভাবিক তৃপ্তির কোন উপায় না দেখিয়া...ইত্যাদি।" কিন্তু বর্ত্তমান আর্থিক, সামাজিক এবং অন্যান্য সমস্যার প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া এই গুরুতর সমস্যা সমাধানের কোন উপায় বা ইঙ্গিত প্রদর্শিত হয় নাই। পক্ষান্তরে, জন্ম-নিরোধক উপায়সমূহ অবগত হইবার ফলে অনেক ক্ষেত্রেই যে তাহা উচ্ছৃঙ্খলতার পরিপোষক হইয়া দাঁড়াইবে, বর্ত্তমান অবস্থা বিবেচনায় এরূপ আশঙ্কা করিবার সঙ্গত কারণ আছে। এইজন্যই বৈজ্ঞানিক আলোচনার নামে বর্ত্তমানে যে ধরণে যৌন-তত্ত্ব সম্বন্ধে আলোচনা হইতেছে তাহার সহায়তায় অধিকারী, অনধিকারী নির্ব্বিশেষে ব্যাপক ক্ষেত্রে যৌন-শিক্ষার প্রচলন সমীচীন বলিয়া বোধ হয় না। সাধারণ জীবন-বিজ্ঞান এবং যৌন-বিজ্ঞান সংক্রান্ত বিভিন্ন বিষয়ে বৈজ্ঞানিক গবেষণায় যে সকল রহস্য উদ্‌ঘাটিত হইয়াছে তাহার পরিপূরক হিসাবে অথবা এই সম্পর্কিত বৈজ্ঞানিক মতবাদের যৌক্তিকতা বিশ্লেষণে, প্রমাণ-স্বরূপ যৌন ব্যাপারের স্বাভাবিক বা অস্বাভাবিক ঘটনাগুলি পরিবেশন করিলে অন্ততঃ বর্ত্তমান অবস্থায় যৌন-বিজ্ঞান আলোচনার প্রকৃত উদ্দেশ্য সাধিত হইতে পারে। এই হিসাবে আলোচ্য পুস্তকখানি সম্বন্ধে ভাল-মন্দ উভয় দিকের কথাই বলিবার আছে। তবে বইখানির নামের সঙ্গে সামঞ্জস্য রক্ষা করিয়া লেখক বিভিন্ন অধ্যায়ে যৌন-সম্পর্কিত বিভিন্ন বিষয়বস্তু অতি প্রাঞ্জল ভাবে বুঝাইয়া বলিয়াছেন। সাধারণের অজ্ঞাত অনেক বিষয় ইহাতে সন্নিবেশিত হইয়াছে। তথ্যানুসন্ধিৎসু পাঠক বইখানি পড়িয়া যৌন-সম্পর্কিত অনেক তথ্যের সন্ধান পাইবেন।

শ্রীগোপালচন্দ্র ভট্টাচার্য্য

নতুন দিনের কাহিনী—শ্রীসঞ্জয় ভট্টাচার্য্য। পূর্ব্বাশা লিঃ পি ১৩, গণেশচন্দ্র এভিন্যু। দাম দুই টাকা।

নূতন দিনের মানুষেরা সম্ভবতঃ সুকোমল বৃত্তির তারে অবলম্বিত নয়। স্বপ্ন, কল্পনা বা উচ্ছ্বাসের প্রবাহেও এযুগের কাহিনীও অনুরঞ্জিত নয়। এ যুগে বাহিরের বিশ্ব গৃহের সীমানা ভাঙিয়া দিয়াছে, সুতরাং কঠিন বাস্তবের মুখোমুখি দাঁড়াইয়া স্নেহ প্রেম লইয়া বিলাস করিবার অবসর আজিকার দিনের নরনারীদের অত্যল্প। প্রথম খণ্ডের কয়েকটি গল্পে এমনই বাস্তবানুগত্যের পরিচয় পাওয়া যায়। সরল আবেগবর্জ্জিত প্রকাশভঙ্গী সোজা মনের পর্দায় আসিয়া আঘাত করে। যদিও পুরাতন-অনুরাগী মনকে এই কাহিনীগুলি কতখানি অভিভূত করিবে তাহা অনুমান-সাপেক্ষ। কিন্তু দ্বিতীয় খণ্ডের কাহিনীগুলির মধ্যে লেখকের কবি-মন নির্লিপ্ত থাকিতে পারে নাই। প্রকৃতির সঙ্গে মিলাইয়া মানব-মনের আশ্চর্য্য বিশ্লেষণ প্রত্যেকটি কাহিনীকে রসসিক্ত ও মধুর করিয়াছে। লেখকের দৃষ্টি ও অনুভূতি কাব্যিক পরিবেশের সঙ্গে একাত্মতা লাভ করিয়াছে। প্রশ্ন হইতে পারে—বিষয়বস্তুকে অতিক্রম করিয়া লেখক যদি কাহিনীর পুরোভাগে আসিয়া দাঁড়ান তো গল্পের রস ক্ষুণ্ণ হয় কিনা। প্রশ্ন যাহাই হোক একথা সত্য যে, গল্পের মূল্য শুধু ঘটনাকে আশ্রয় করিয়া নহে—প্রকাশভঙ্গীও সে মূল্যের অংশীদার। এই কাহিনীগুলি স্বপ্ন-বিলাসবর্জ্জিত না হইলেও তাহার সৌকুমার্য্যে সাহিত্য-রসপিপাসুদের চিত্তরঞ্জন করিবে এ কথা নিঃসংশয়ে বলা যায়।

নব জাতক—শ্রীসুকুমার রায়। শ্রীগুরু লাইব্রেরী, ২০৪, কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট, কলিকাতা। মূল্য ২।০ আনা।

এই সংগ্রহের মধ্যে একখানি ক্ষুদ্র উপন্যাস ও চারিটি গল্প আছে। গল্পগুলি আমাদের ভালই লাগিয়াছে। প্রত্যেকটির মধ্যে টাইপ সৃষ্টির চেষ্টা প্রশংসনীয়, গ্রাম্য পরিবেশেও কৃত্রিমতা নাই। বিশেষ করিয়া 'হেড-মাষ্টার' গল্পের ক্ষুদ্র জালে পল্লী-পলিটিক্স-অভিজ্ঞ যে চুনোপুঁটিগুলি ধরা পড়িয়াছে সেগুলির আকৃতি-প্রকৃতি আমরা ভাল করিয়াই জানি। ক্ষুদ্র উপন্যাসখানির (বড় গল্প বলাই সঙ্গত) বিষয়বস্তু নির্বাচন ভালই হইয়াছে, কিন্তু ভাষার আড়ষ্টতা ও প্রকাশভঙ্গীর দৈন্য কাহিনীটিকে রসোত্তীর্ণ হইতে দেয় নাই।

শ্রীরামপদ মুখোপাধ্যায়

নবীনচন্দ্র জন্মশতবার্ষিক-স্মৃতি-তর্পণ—১ম ভাগ (প্রান্তবাণী প্রবন্ধাবলী চতুর্থ খণ্ড)। ডক্টর যতীন্দ্রবিমল চৌধুরী সম্পাদিত। কলিকাতা, ১৩৫৩। পৃ. ১৩৯। মূল্য ১৲।

আলোচ্য পুস্তকখানি সময়োপযোগী হইয়াছে বলিতে হইবে। ইহাতে নবীনচন্দ্রের অনেকগুলি অপ্রকাশিত রচনা সংগৃহীত হইয়াছে, এজন্য সম্পাদক আমাদের কৃতজ্ঞতা দাবি করিতে পারেন।

এই পুস্তকে নবীনচন্দ্র সম্বন্ধে যে-সমস্ত প্রবন্ধ সন্নিবিষ্ট হইয়াছে তন্মধ্যে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ডক্টর সুকুমার সেনের "নবীনচন্দ্রের পলাশির যুদ্ধ" প্রবন্ধটি ইহার গুণাপকর্ষণ করিয়াছে। ইহা আলোচ্য পুস্তকে স্থান না পাইলেই ভাল হইত। সুকুমারবাবু তাঁহার প্রবন্ধের সূচনায় লিখিতেছেন :—

"নবীনচন্দ্র সেনের পলাশির যুদ্ধ ১৮৭৫ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত বলিয়া উল্লিখিত হইয়া থাকে। আসলে ইহা ১৮৭৬ খ্রীষ্টাব্দ হইবে। কাব্যটি বিদ্যাসাগরকে উৎসর্গ করা হইয়াছিল। উৎসর্গপত্রের শেষে তারিখ পাই ১২৮২ সালের মাঘ মাসের। সুতরাং ইহা ১৮৭৬ খ্রীষ্টাব্দের জানুয়ারি-ফেব্রুয়ারি মাসের পূর্বে প্রকাশিত হয় নাই।" (পৃ. ১১৮)

লেখক যাহা বলিতেছেন, তাহা সত্য নহে। নবীনচন্দ্রের 'পলাশির যুদ্ধে'র প্রথম সংস্করণের পুস্তকের উৎসর্গপত্রের তারিখ—"১লা বৈশাখ ১২৮২" (অর্থাৎ এপ্রিল ১৮৭৫), অথচ ডক্টর সেন বলিতেছেন—মাঘ, ১২৮২ (ইং ১৮৭৬)! প্রথম সংস্করণের পুস্তক না দেখার ফলেই 'পলাশির যুদ্ধে'র প্রকাশকাল সম্বন্ধে লেখক এইরূপ মারাত্মক ভুল করিয়া বসিয়াছেন! 'পলাশির যুদ্ধ' যদি ১২৮২ সালের মাঘ মাসে (ইং ১৮৭৬) প্রকাশিত হইত, তাহা হইলে তাহার বিস্তৃত সমালোচনা ১২৮২ সালের জ্যৈষ্ঠ মাসের 'আর্য্যদর্শনে', আষাঢ় মাসের 'জ্ঞানাঙ্কুরে' ও কার্ত্তিক মাসের 'বঙ্গদর্শনে'—অর্থাৎ পুস্তক-প্রকাশের অনেক পূর্ব্বেই—কেমন করিয়া প্রকাশিত হয়? গবর্ণমেণ্টের বেঙ্গল লাইব্রেরিও 'পলাশির যুদ্ধে'র প্রকাশকাল—১৫ এপ্রিল ১৮৭৫ বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন।

সুকুমার বাবুর প্রবন্ধের অন্যত্রও তারিখের প্রতি ঔদাসীন্য লক্ষ্য করিয়াছি; তিনি লিখিয়াছেন : "হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'ভারতসঙ্গীত' কবিতায় (১৮৬৯) দেশ-প্রেমের উদ্দীপনা জ্বলিয়া উঠিল।" আমরা জানি, হেমচন্দ্রের "ভারতসঙ্গীত" ৭ শ্রাবণ ১২৭৭ (অর্থাৎ ১৮৭০) তারিখের 'এডুকেশন গেজেটে' প্রথম প্রকাশিত হয় ও ঐ বৎসরেই প্রকাশিত ১ম ভাগ 'কবিতাবলী'তে সন্নিবিষ্ট হয়।

পুস্তকে নবীনচন্দ্রের চিত্র দুইখানি আশানুরূপ মুদ্রিত হয় নাই। মুদ্রাকর-প্রমাদেরও প্রাচুর্য্য আছে।

নবীনচন্দ্র সম্বন্ধে যে কয়টি প্রবন্ধ পুস্তকে মুদ্রিত হইয়াছে তন্মধ্যে অধিকাংশই সুলিখিত।

শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

কালচক্র—শ্রীআশুতোষ মুখোপাধ্যায়। হিন্দুস্থান বুক ডিপো, ১২, বঙ্কিম চ্যাটার্জি ষ্ট্রীট, কলিকাতা। ২১০ পৃ, মূল্য—তিন টাকা।

আলোচ্য উপন্যাসখানিকে 'উদয়ের পথে'র স-গোত্র বলা যাইতে পারে। চরিত্র-অঙ্কন, সংলাপ, স্পষ্টবাদিতা, কাঞ্চন-কৌলীন্যকে আদর্শবাদের নিকট হেয় প্রতিপন্ন করা প্রভৃতি যে সকল গুণে 'উদয়ের পথে' সাধারণের কাছে সমাদর লাভ করিয়াছে—সেই সকল গুণের অনুবৃত্তি আলোচ্য উপন্যাসটিকে উপভোগ্য করিয়াছে। কাহিনীর দিক দিয়া গ্রন্থখানি চিত্তাকর্ষক হইয়াছে। নিজের মুন্সীয়ানা দেখাইতে গিয়া লেখক মাঝে মাঝে যে নাতিদীর্ঘ বক্তৃতা দিয়াছেন তাহাতে কাহিনীর স্বচ্ছন্দ গতি ব্যাহত এবং রস ও প্রসাদ-গুণ কিছু ক্ষুণ্ণ হইয়াছে। বানান সম্বন্ধে, লেখক সর্ব্বদা সতর্ক নন—যেমন—'দারিদ্র', স্বাতন্ত্র', 'ভাগ'—ইত্যাদি। মাঝে মাঝে উদ্ভট বাক্যাংশও চোখে পড়ে—যেমন 'পার্শ্বে লম্বা চওড়া বাহ্য'—৬৮ পৃ.।

শ্রীতারাপদ রাহা

ধন-বিজ্ঞানের গোড়ার কথা—শ্রীধারাধণচন্দ্র সমাদ্দার, এম. এ.। গোল্ড দুইন এণ্ড কোং লিঃ, কলেজ ষ্ট্রীট মার্কেট, কলিকাতা, পৃষ্ঠা ৪৭, মূল্য—৮০

এই ক্ষুদ্র পুস্তিকার দশটি অধ্যায়ে লেখক সরল ভাষায় অর্থনীতির মূল সূত্রগুলি আলোচনা করিয়াছেন। ধন উৎপাদনের সংজ্ঞা ও সূত্রগুলি, বাজার ও মূল্যনীতি, জাতীয় সম্পদ এবং অন্যান্য সমাজ-বিজ্ঞানের সহিত ধন-বিজ্ঞানের সম্বন্ধ প্রভৃতি বিষয় তরুণ বিদ্যার্থীদের উপযোগী করিয়া লেখা হইয়াছে। বড়ই দুঃখের বিষয় এই যে, বঙ্গ ভাষা নানাদিকে সমৃদ্ধিশালী হইলেও সাহিত্যের এই শাখা আজও যথেষ্ট পুষ্ট হয় নাই। বলিতে কি, ধন-বিজ্ঞান সম্বন্ধে কলেজে পড়াইবার মত একখানি বইও আজ পর্যন্ত বাংলা ভাষায় লেখা হয় নাই, যদিও হিন্দী ভাষায় এরূপ কয়েকখানি পুস্তক বিশিষ্ট লেখকগণ কর্তৃক লিখিত হইয়াছে। অবশ্য ইহার প্রধান কারণ এই যে, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় এখন পর্যন্ত মাতৃভাষাকে প্রবেশিকা পরীক্ষার ঊর্দ্ধে শিক্ষার বাহনরূপে প্রতিষ্ঠিত করেন নাই। ভারতে অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয় এ বিষয়ে আমাদিগকে পিছনে ফেলিয়া যাইতেছে।

ধনবিজ্ঞান ইংরেজী ভাষার মাধ্যমে না পড়িয়া মাতৃভাষার সাহায্যে শিক্ষা করিলে অপেক্ষাকৃত অনায়াসে জ্ঞান লাভ হইবে এ কথা বলাই বাহুল্য। আলোচ্য পুস্তক এ বিষয়ে প্রথম শিক্ষার্থীর বিশেষ সহায়ক হইবে। ছাত্রসমাজে এই পুস্তকের বহুল প্রচার হইবে।

শ্রীঅনাথবন্ধু দত্ত

এই বিংশ শতাব্দী—শ্রীপ্রিয়কুমার গোস্বামী। আশুতোষ লাইব্রেরী, ৫, কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা। মূল্য ১।০।

এই ষ্টীমার, এরোপ্লেন ও রেডিও টেলিগ্রাফের যুগে পৃথিবীর কোন দেশই আজ একক ও বিচ্ছিন্ন ভাবে থাকিতে পারে না। জগতের এক প্রান্তে কোন রাজনৈতিক বা অর্থনৈতিক বিপ্লব উপস্থিত হইলে সারা পৃথিবীতে তাহার প্রতিক্রিয়ার আন্দোলন অনুভূত হইবে। বিগত দ্বিতীয় মহাযুদ্ধও এই সকল বিপ্লবের প্রতিক্রিয়াস্বরূপ আত্মপ্রকাশ করিয়া আজিকার দুনিয়ার চেহারা সম্পূর্ণ বদলাইয়া দিয়াছে। এইজন্য রাজনীতি-বিষয়ক একটা মোটামুটি জ্ঞান কিশোরদের শিক্ষার অপরিহার্য্য অঙ্গ বলা যাইতে পারে। শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র বাগলের 'জগৎ কোন্ পথে' (৩য় সং) ইতিপূর্ব্বে প্রমাণ করিয়াছে যে, জগতের প্রধান দেশগুলির প্রধান প্রধান রাজনৈতিক ঘটনাগুলি সহজবোধ্য ভাবে ছেলেদের জন্য লিখিত হইলে নিশ্চয়ই তাহার আদর হইবে। এই পুস্তকেও গ্রন্থকার সেই পথ অনুসরণ করিয়া কয়েকটি সুচিন্তিত অধ্যায়ে বিংশ শতাব্দীর জগতের বর্তমান প্রকৃতি ও পরিস্থিতি সম্বন্ধে একটি স্থূল খসড়া দিতে চেষ্টা করিয়াছেন। সহজ সরল ভাষা ও বর্ণনাভঙ্গীর গুণে বইটি গল্পের মত সুখপাঠ্য হইয়াছে। গান্ধী, ষ্টালিন, রুজভেল্ট, চিয়াং কাইশেক, হিরোহিতো, মুসোলিনী ও হিটলারের কয়েকখানি সুন্দর প্রতিলিপি ও সুন্দর ছাপা কাগজ বাঁধাই পুস্তকের সৌষ্ঠব বৃদ্ধি করিয়াছে।

শ্রীবিজয়েন্দ্রকৃষ্ণ শীল

দেশ-বিদেশের কথা

সেনভূম সাহিত্য সম্মেলন

গত ১০ই জ্যৈষ্ঠ বাঁকুড়া, তিলুড়িতে সেনভূম সাহিত্য সম্মেলনের প্রথম অধিবেশন শ্রীযুক্ত সুধাংশুকুমার রায় চৌধুরীর সভাপতিত্বে সুষ্ঠু ভাবে সম্পন্ন হইয়া গিয়াছে। কথা-সাহিত্যিক শ্রীযুক্ত নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় সম্মেলনের উদ্বোধন করেন। "মধুসূদন" মণ্ডপ ও বিভিন্ন তোরণসমূহ সম্মেলনের সৌষ্ঠব বৃদ্ধি করিয়াছিল। বাংলার ভিন্ন ভিন্ন জেলা হইতে সমাগত সাহিত্যিক ও সাহিত্যানুরাগীদের সহযোগিতায় অনুষ্ঠানটি বিশেষ সাফল্যমণ্ডিত হইয়াছিল। সম্প্রতি সেনভূমে সেনভূম সাহিত্য-পরিষদ্ নামে একটি প্রতিষ্ঠান গঠিত হইয়াছে।

বাঁকুড়া নিখিল-বঙ্গীয় প্রেস রিপোর্টার্স সম্মেলন

বিগত ১১ই ও ১২ জ্যৈষ্ঠ তারিখে বাঁকুড়ায় চণ্ডীদাস চিত্র-মন্দির হলে নিখিল বঙ্গীয় প্রেস রিপোর্টার্স সম্মেলনের প্রথম অধিবেশন হইয়া গিয়াছে। শ্রীযুক্ত তারাপতি সামন্ত অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতির পদে বৃত হইয়াছিলেন। সম্মেলনের মূল সভাপতি 'দৈনিক কৃষক' পত্রিকার সম্পাদক শ্রীযুক্ত বিজয়লাল চট্টোপাধ্যায়ের অভিভাষণটি বেশ সুচিন্তিত ও সময়োপযোগী হইয়াছিল।

মুদ্রাকর ও প্রকাশক : শ্রীনিবারণচন্দ্র দাস, প্রবাসী প্রেস, ১২০।২ আপার সারকুলার রোড, কলিকাতা।

শ্রীরাধা

শ্রীনিশীথকুমার মজুমদার

প্রবাসী প্রেস, কলিকাতা

টেক্সাস ষ্টেটে অপরিক্রুত তৈল হইতে সিনথেটিক রবার তৈরি করিবার যন্ত্রের কতকগুলি অত্যুচ্চ বুরুজ
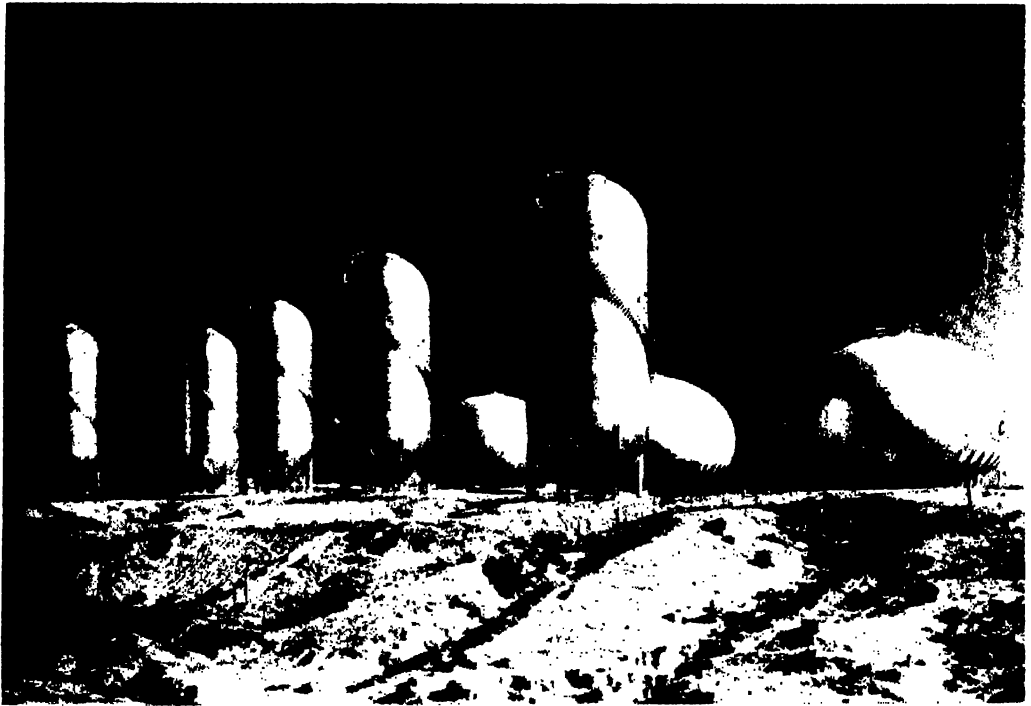
আমেরিকার দক্ষিণ-পশ্চিম অঞ্চলের একটি তৈল-কোম্পানীতে কতকগুলি অদ্ভুত আকারের ট্যাঙ্ক।
এগুলিতে পরিক্রুত তৈল সঞ্চিত রাখা হয়

"সত্যম্ শিবম্ সুন্দরম্
নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ"

৪৬শ ভাগ
১ম খণ্ড | ভাদ্র, ১৩৫৩ | ৫ম সংখ্যা

বিবিধ প্রসঙ্গ

রবীন্দ্রনাথ

রবীন্দ্রনাথের তিরোধানের পর পাঁচ বৎসর কাটিয়া গিয়াছে। বাংলা ও বাঙালী ভারতের শীর্ষে যে স্থান অধিকার করিয়াছিল সেখানে কেবলমাত্র তাঁহার শূন্য আসন পড়িয়া আছে, সে আসনে বসিবার যোগ্য ব্যক্তি কত শতাব্দী পরে আসিবে জানি না। যে উন্নতশির জ্যোতির্ময় দিব্যকান্তি মহাপুরুষ বাঙালীর গৌরব, মান, সম্ভ্রম, বিদ্যাবুদ্ধির রত্নোজ্জ্বল আধার ছিলেন, তাঁহার লোকান্তর গমনের পর আজ এ দেশের জনসাধারণ সত্য সত্যই "গত গৌরব, হৃত আসন, নত মস্তক লাজে", জগতে তাহার আত্মগরিমা বা শ্লাঘার কারণ আর কিছুই নাই। আজ বাঙালী বর্বরতার অভিশাপে অভিশপ্ত, সকল দিকেই তাহার পুঁজি কমিয়া গিয়াছে। বাংলাদেশ এখন মেকির ও ফাঁকির লীলাভূমি।

রবীন্দ্রনাথের স্মৃতিরক্ষার জন্য আবেদন-নিবেদন চলিতেছে। স্মৃতিরক্ষার প্রয়োজন আর যাহার হউক রবীন্দ্রনাথের নহে। সাহিত্যে, দর্শনে, নাট্যে, গীতে, ললিতকলায় এবং মানব সমাজের সংস্কৃতির জীবন্ত প্রবাহে তাঁহার অনুপম শতমুখী প্রতিভা যে নূতন জীবনের বিশাল উৎস যোগ করিয়া দিয়াছে তাহার খরস্রোত বাঙালী ও বাংলা ভাষা যত দিন আছে তত দিন থাকিবেই। আমাদের চেষ্টিত থাকা উচিত সেই প্রবাহপথ সরল রাখিতে, উৎসের পঙ্কোদ্ধার করিয়া, আবর্জনা দূর করিয়া নিজেদের প্রগতির পথ মুক্ত রাখিতে।

প্রগতির পথে রবীন্দ্রনাথের মূলমন্ত্র ছিল শিক্ষা। তাঁহার অটুট বিশ্বাস ছিল যে ঐ মন্ত্রেই জাতির মধ্যে নবজীবন-নবজাগরণের বোধন হইবে। তিনি দিব্যচক্ষে দেখিয়া গিয়াছিলেন যে ঐ শিক্ষার বলে বলীয়ান হইয়াই পাশ্চাত্য জগৎ তাহার আদিম অন্ধকার ও অসভ্যতা দূর করিয়া সংস্কৃতির পথে উল্কাবেগে অগ্রসর হইতে সমর্থ হইয়াছে এবং তিনি বুঝিয়াছিলেন যে রুশ দেশবাসী তাহাদের তমসাচ্ছন্ন ভবিষ্যৎকে জ্যোতির্ময় করিতে চেষ্টিত ঐ এক ইষ্ট মন্ত্রের বলে। তাঁহার নিজের পিতৃভূমির জন্য শিক্ষার ব্যবস্থার প্রয়োজন কতটা সে বিষয়ে তিনি স্পষ্ট ভাবেই "রাশিয়ার চিঠি"তে লিখিয়াছিলেন :

"আমার মত এই যে, ভারতবর্ষের বুকের উপর যত কিছু দুঃখ আজ অভ্রভেদী হয়ে দাঁড়িয়ে আছে তার একটিমাত্র ভিত্তি হচ্ছে অশিক্ষা। জাতিভেদ, ধর্ম বিরোধ, কর্মজড়তা, আর্থিক দৌর্বল্য সমস্তই আঁকড়ে আছে এই শিক্ষার অভাবকে।"

ইউরোপীয়দিগের উন্নতির সম্পর্কে ঐখানেই তিনি বলিয়াছেন :

"ওরা একদিন ডাইনী ব'লে নিরপরাধাকে পুড়িয়েছে, পাপিষ্ঠ ব'লে বৈজ্ঞানিককে মেরেছে, ধর্মমতের স্বাতন্ত্র্যকে অতি নিষ্ঠুর ভাবে পীড়ন করেছে, নিজেদেরই ধর্মের ভিন্ন সম্প্রদায়ের রাষ্ট্রাধিকারকে খর্ব ক'রে রেখেছে এ ছাড়া কত অন্ধতা কত মূঢ়তা কত কদাচার মধ্যযুগের ইতিহাস থেকে তার তালিকা স্তূপাকার ক'রে তোলা যায়—এ সমস্ত দূর হ'ল কী করে? বাইরেকার কোন কোর্ট অব ওয়ার্ডসের হাতে ওদের অক্ষমতার সংস্কারসাধনের ভার দেওয়া হয় নি, একটি মাত্র শক্তি ওদের এগিয়ে দিয়েছে, সে হচ্ছে ওদের শিক্ষা।"

"জাপান এই শিক্ষার যোগেই অল্পকালের মধ্যেই দেশের রাষ্ট্রশক্তিকে সর্বসাধারণের ইচ্ছা ও চেষ্টার সঙ্গে যুক্ত ক'রে

দিয়েছে, দেশের অর্থ উৎপাদনের ... তুলেছে, বর্তমান তুরস্ক প্রবল বেগে এই শিক্ষা অগ্রসর ক'রে দিয়ে ধর্মান্ধতার প্রবল বোঝা থেকে দেশকে মুক্ত করবার পথে চলেছে। 'ভারত শুধুই ঘুমায়ে রয়'। কেননা ঘরে আলো আসতে দেওয়া হয় নি, যে আলোতে আজকের পৃথিবী জেগে, সেই শিক্ষার আলো ভারতের রুদ্ধদ্বারের বাইরে।"

শিক্ষার অভাবে চীন দেশের কি হইয়াছিল সে বিষয়ে তিনি যাহা লিখিয়া গিয়াছেন তাহা যেন আজকার ভারতের আসন্ন সমস্যার ছবি :

"সেখানে স্বজাতীয় আত্মসম্মানবোধ শিক্ষার অভাবে দেশের জনসাধারণের মধ্যে অপ্রবুদ্ধ। তাই দেখি ব্যক্তিগত ক্ষমতা প্রাপ্তির দুরাশায় সেখানে কয়েক জন লুব্ধ লোকের হানাহানি কাটাকাটির ঘূর্ণিপাক। শিক্ষার জোরে যেখানে সাধারণ লোকের মধ্যে স্বাধিকারবোধ স্পষ্ট না হয়েছে সেখানে স্বদেশী বা বিদেশী দুরাকাঙ্ক্ষীদের হাতে তাদের নির্যাতন ঠেকাবে কিসে। সে অবস্থায় তারা ক্ষমতালোলুপের স্বার্থ-সাধনের উপকরণ মাত্র হয়ে থাকে। তুমি তোমার দেশকে ধনীর উপ-করণদশাগ্রস্ত বলে আক্ষেপ করেছিলে সেই পরের উপকরণ-দশা তাদের কিছুতেই ঘোচে না যারা মূঢ়, যারা কাপুরুষ, ভাগ্যের মুখপ্রত্যাশী, যারা আত্মকর্তৃত্বে আস্থাবান নয়।"

রবীন্দ্রনাথের চেষ্টা লেখনীবদ্ধ হইয়া থাকে নাই ইহা সর্বজন-বিদিত। অনেক আশা, অনেক আকাঙ্ক্ষা মনে লইয়া তিনি শান্তিনিকেতনে বিদ্যা-আয়তনের প্রতিষ্ঠা করেন। পরে বিশ্ব-মানবের নিকট প্রকৃত শিক্ষার ব্যবস্থার একটি বাস্তব পরিচয় দিবার জন্ত ঐ শিক্ষা-আয়তন বর্ধিত করিয়া, বিশ্বভারতী বিশ্ব-বিদ্যালয়ের স্থাপনা করিয়া, তাহার পুষ্টি এবং সংস্থানের জন্য তাঁহার শেষজীবনের শক্তিসামর্থ্য কি ভাবে তিনি উৎসর্গ করিয়া গিয়াছেন তাহা কাহারও অবিদিত নহে। আমাদের দেশের অশিক্ষিত, রোগক্লিষ্ট, ঋণভারপ্রপীড়িত কৃষকের দৈনন্দিন দুঃখময় জীবনের সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ পরিচয় ছিল। তাহাদেরই উন্নতি কামনায় তিনি শ্রীনিকেতনের স্থাপনা করেন। তাঁহার জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত তিনি এই দুই প্রতিষ্ঠানের জন্ত চিন্তিত ও ব্যস্ত ছিলেন এবং এই দুই শিক্ষাকেন্দ্রের উন্নতিকল্পে তিনি তাঁহার শক্তিসামর্থ্যের শেষসীমা পর্যন্ত চেষ্টিত ছিলেন ইহাও সকলেই জানে।

অতএব যদি তাঁহার স্মৃতিরক্ষা অর্থে তাঁহার আদর্শ উজ্জ্বল এবং তাঁহার কীর্তি অম্লান রাখাই বুঝায়, তবে ভারতের জনসাধারণের উচিত প্রথমে ঐ দুই প্রতিষ্ঠানের জীর্ণ-সংস্কার, শ্রীবৃদ্ধি এবং সংরক্ষণ। জীর্ণ-সংস্কার অর্থে এখানে ইট-পাথর চুণ-সিমেন্টের কথা বলা হইতেছে না। উহার অর্থ ঐ দুই প্রতিষ্ঠানে পরিচালনার দোষে বা অভাবে যে সকল আবর্জনা জমিয়া উহাদের ক্রমে অচল করিয়া আনিতেছে এবং ধরদৃষ্টি অধ্যক্ষের অভাবে ঐ শিক্ষায়তনগুলির কার্যক্রমের মধ্যে যে হইয়াছে, তাহার সংস্কার। ইংরাজীতে প্রবাদ আছে, নূতন সম্মার্জনীতে পরিষ্কৃতি সম্পূর্ণ হয়। বিশ্বভারতীতে অর্থের অভাব নিদারুণ সন্দেহ নাই এবং অর্থের অভাবে রবীন্দ্রনাথ উপযুক্ত শিক্ষক ও সহকর্মী রাখিতে পারেন নাই ইহাও সত্য। বিশ্বভারতী ও শ্রীনিকেতনের অভাব পূরণের পক্ষে তেরো বা চৌদ্দ লক্ষ টাকা যথেষ্ট নহে ইহাও বলা বাহুল্য। কিন্তু উপযুক্ত পরিচালনার ব্যবস্থা না হইলে উহার দশ গুণ টাকাও যথেষ্ট হইবে না এবং অন্ত দিকে সজাগ রক্ষক-সভার তত্ত্বাবধানে উপযুক্ত অধ্যক্ষ ও শিক্ষক নূতন উদ্যমে রবীন্দ্র-নাথের আদর্শকে মূর্ত ও জাগ্রত করিতে প্রবৃত্ত হইলে যে টাকা উঠিয়াছে তাহা কার্যারম্ভের পক্ষে যথেষ্ট। আমাদের মনে হয় এখন একথা বলিবার সময় আসিয়াছে যে স্মৃতিরক্ষা তহবিলের টাকা কি কাজে লাগান হইবে, তাহার রক্ষক-সভায় (ট্রাষ্টিবোর্ড) থাকিবেন কে কে এবং তাঁহারা অধ্যক্ষ নিয়োগ করিবেন কি ভাবে। আমাদের বিশ্বাস আছে যে এ বিষয়ে স্পষ্টভাবে ঘোষণা করিলে ভারতের জনসাধারণ যথাসাধ্য অর্থ-দানে কার্পণ্য করিবে না।

লীগ ও কংগ্রেস

লীগ মন্ত্রী-মিশনের মূল প্রস্তাব এবং অন্তর্বর্তীকালীন সরকার সম্পর্কীয় প্রস্তাব এই দুইকেই প্রত্যাখ্যান করিয়াছে; প্রত্যাখ্যানের সভায় এবং তাহার পরে নানা প্রকার গরম-গরম বক্তৃতা-উচ্ছ্বাস ও বাহ্বাস্ফোট হইয়াছে। সকলের ভিতরেই এক অসারতা ও অবাস্তবতার পরিচয় পাওয়া যায়। এই সকল অনুযোগ অভিযোগ এবং অভিনয়ের ভিতরে যে মূল উদ্দেশ্য রহি-য়াছে তাহা অতি সুস্পষ্ট। লর্ড কার্জনের সাম্রাজ্যবাদ প্রতিষ্ঠার পর হইতে আজ প্রায় অর্ধশতাব্দী যাবৎ এক শ্রেণীর লোক বিনা পরিশ্রমে, বিনা ত্যাগে বা চেষ্টায়, কেবলমাত্র ভারতের স্বাতন্ত্র্য ও জাতীয়তাবাদের প্রতিকূল আচরণ করিয়া, পরের অর্জিত ধন ও অধিকারের গরিষ্ঠ অংশ অন্যায় ভাবে পাইয়া আসিয়াছে। লীগের লালন-পালন ও পোষণ ঐ সাম্রাজ্য-বাদীর হস্তেই হইয়াছে এবং বিদেশী সাম্রাজ্যবাদীর ভেদনীতি অনুসারে লীগকে এ দেশের শাসক ও শোষকবর্গ পোষ্যপুত্র রূপেই গ্রহণ করিয়াছিল। দুঃখের বিষয় এই যে, কংগ্রেস একাধিকবার এই পোষ্যপুত্রের অন্যায় আব্দারে, প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ ভাবে সায় দিয়াছে। ফলে লীগ ক্রমেই পুষ্ট হইয়াছে এবং তাহার অন্যায় অধিকার বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে তাহার লালসাও সীমাহীন হইয়া পড়িয়াছে।

সাম্রাজ্যবাদ আজ পাট গুটাইতেছে, সুতরাং লীগ এখন ব্যস্ত হইয়া উঠিয়াছে তাহার অন্যায় অধিকারগুলি কায়েম রাখিবার চেষ্টায়। তাহার পিছনে রহিয়াছে ভারতের শোষকবর্গ এবং তাহাদের সহায়ক ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদী রাজকর্মচারীর

দল। মাঝে সে দল নিরাশ হইয়া পড়ে মন্ত্রী-মিশনের স্পষ্ট প্রস্তাবে। তাহার পর শেষ চেষ্টা চলে—মন্ত্রী-মিশনের অনভিজ্ঞতার অবকাশে—অন্তর্বর্তীকালীন সরকার গঠন সম্পর্কিত চক্রান্তে। কংগ্রেস সে ফাঁদে পড়িতে অস্বীকার করায় লীগ-দল ও তাহাদের পোষকগণ উৎফুল্ল হইয়া উঠে। কেননা, চক্রান্তে ঠিক হইয়াছিল যে যদি কংগ্রেস ফাঁদে পড়ে উত্তম কথা, কেননা, তাহা হইলে সে নিজের গলায় নিজেই ফাঁস পরিয়া আসিবে। যদি সে আসিতে অস্বীকার করে তবে তাহাকে পুনর্বার বনবাসে পাঠাইয়া পূর্ববৎ পোষক-তোষকের রামরাজত্ব কায়েম থাকিবে। মন্ত্রী-মিশনের দল ফাঁকি ধরিয়া ফেলায় সে আশাও ব্যর্থ হইল। বাকী রহিল বাহ্বাস্ফোট এবং দেশে মাৎস্যন্যায়ের বন্যা বহাইবার ভয় প্রদর্শন।

কংগ্রেসের সম্মুখে অত্যন্ত দুরূহ দীর্ঘ পথ রহিয়াছে। যে ভাবে এদেশ আজ পঁচিশ বৎসর যাবৎ শাসিত হইয়াছে তাহাতে রাষ্ট্র চালনায় অন্তরায় প্রতিপদেই জুটিবে। ঘুষ, অত্যাচার অনাচার ও দমননীতি যে দেশে এত দিন নির্বিবাদে চলিয়াছে, সে দেশের শাসন ও রাষ্ট্র পরিচালনা সাধারণ ভাবেই অতি কঠিন। উপরন্তু এক দল লোক যদি সঙ্ঘবদ্ধ ভাবে অরাজকতা করিবার চেষ্টা করে তবে অবস্থা কঠিনতর হইতে পারে। কিন্তু কংগ্রেসকে এই অগ্নি-পরীক্ষার সম্মুখীন হইতেই হইবে নহিলে জাতীয়তাবাদের ও স্বাতন্ত্র্যের সকল সিদ্ধান্ত ও সমস্ত আশা-ভরসা চিরদিনের মত জলাঞ্জলি দিতে হইবে। জগতের অধিকাংশ দেশ বিগত দুই দশকের মধ্যে যে পরীক্ষার ভিতর দিয়া গিয়াছে তাহার তুলনায় ভারতে কিছুই হয় নাই। সুতরাং এই পরীক্ষা আমাদের স্বাধীনতার যোগ্যতার পরীক্ষা বলিয়াই গ্রহণ করিতে হইবে। কিন্তু নিশ্চেষ্ট হইয়া দিবাস্বপ্নে দিন কাটাইলে সর্বনাশ অনিবার্য।

কংগ্রেস দেশের নেতৃত্ব গ্রহণে সক্ষম এ বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ নাই। কেননা, ১৯৪২ সালের ভারতের নেতৃহীন জনতা কংগ্রেসের উপর তাহাদের যে আস্থা ও বিশ্বাসের পরিচয় দিয়াছিল তাহাতে বহু দূর দেশের চিন্তাশীল সমাজেও এদেশ সম্বন্ধে ধারণা পরিবর্তিত হয়। আজ নেতৃবর্গের উপস্থিতিতে তাহারা সে আস্থা আরও অটল ভাবে রাখিতে পারিবে তাহাতে সন্দেহ নাই। সমস্ত দেশের শতকরা ৮০জন যদি কংগ্রেসের উপর বিশ্বাস অটল রাখিয়া দুর্গম পথে চলিতে প্রস্তুত থাকে তবে ক্ষমতা সম্বন্ধে সন্দেহের অবকাশ কোথায়? কংগ্রেসের নীতি অহিংসার ভিত্তির উপর স্থাপিত, সুতরাং অত্যাচার বা অরাজকতা শক্তির মূলে অন্য পক্ষেরই ষোল আনা হাত থাকিতে বাধ্য। এখন সমস্যা এই যে ঐরূপ অবস্থার সম্মুখীন হইলে কংগ্রেসের কর্তব্য কি? দেশ-শাসন ও বিদেশী-বিদায় এখন দুইই এক হইয়া দাড়াইতেছে, কেননা দেশ-শাসনে কৃতকার্য না হইলে বিদেশী বিদায় লইবে না। লীগ যে ভাবে চলিতেছে তাহাতে ব্রিটিশের হস্তে রাজদণ্ড থাকিয়াই যাইবে।

বাংলার বাজেট

বাংলার নূতন মন্ত্রিমণ্ডল কার্যভার গ্রহণ করিয়া প্রথম বাজেট পেশ করিয়াছেন। উহা লইয়া ব্যবস্থা-পরিষদে আলোচনা চলিতেছে। বাজেট যাঁহারা রচনা করিয়াছেন তাঁহাদের মধ্যে নূতন লোক হয়ত অনেকে আছেন, কিন্তু দল হিসাবে উহা একই। ইংরেজ-ভোটের সহায়তায় যে লীগ দল বাংলার রাজস্ব লইয়া এত দিন চূড়ান্ত বেহিসাবের পরিচয় দিয়াছেন, বর্তমান বাজেটেও তাহারই সুস্পষ্ট ছাপ রহিয়াছে। অনাবশ্যক ব্যয় বৃদ্ধি, অযথা নূতন ব্যয়ের ব্যবস্থা, ব্যয় সঙ্কোচে অনিচ্ছা এবারকার বাজেটেরও প্রধান লক্ষণ। অধিকন্তু এবার প্রদেশের উন্নতিসাধনের নামে সাড়ে দশ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হইয়াছে এবং যে ভাবে উহা ব্যয়ের হিসাব ধরা হইয়াছে তাহাতে মনে হয় উহার অধিকাংশ অর্থেরই পূর্ববৎ অসদ্ব্যয় এবং অপচয় ঘটিবে।

কয়েক বৎসর যাবৎ বাংলার বাজেটে ঘাটতির বহর দেখিয়া লোকের ধারণা হইয়াছে বাংলা বুঝি দেউলিয়া দেশ। এবারও যথারীতি দশ কোটি টাকা ঘাটতি হইয়াছে। যে প্রদেশে প্রতি বৎসর উদ্বৃত্ত রাজস্ব থাকার কথা, যেখানে করভার অনেক কমান সম্ভব, যেখানে সেল্‌স-ট্যাক্সের ন্যায় বিরক্তিকর এবং উৎপীড়নমূলক ট্যাক্স অনায়াসে তুলিয়া দেওয়া যায়, সেখানে লীগ সিভিলিয়ান হাতসাফাইয়ের ফলে বাংলা দেশ চিরদারিদ্র্যে ডুবিয়াছে, প্রতি বৎসর বিরাট ঘাটতির বোঝা ঘাড়ে লইয়া অনাবশ্যক করের টাকা গণিয়া দেওয়াই তাহার নিয়তি।

এবারকার রাজস্ব আদায় হইবে ৩২ কোটি এবং দেশ-শাসনে ব্যয় হইবে ৪২ কোটি টাকা। ব্যয়বরাদ্দের মধ্যে সিভিল সাপ্লাই প্রভৃতি সাময়িক বিভাগ ও চাউলের কারবারে লোকসান প্রভৃতি বাবদ ১০ কোটি টাকা ধরা আছে। সুতরাং স্বাভাবিক অবস্থায় এই সব উপ-বিভাগ ও সরকারী অব্যবসায় উঠিয়া গেলে পুলিস প্রভৃতি বিভাগে অসম্ভব ব্যয়বৃদ্ধি সত্ত্বেও বাংলার আয়ব্যয় সমান সমান হইবে। এই ব্যয়বরাদ্দের মধ্যে মাগ্‌গি-ভাতার অঙ্ক কম বিরাট নয়; স্বাভাবিক অবস্থায় এই সব সাময়িক ভাতা এবং অধিক ফসল বৃদ্ধির নামে কৃষি বিভাগের অপচয় প্রভৃতি বন্ধ হইলে প্রতি বৎসর বাংলায় প্রচুর অর্থ উদ্বৃত্ত থাকিবে। সেলস্‌-ট্যাক্স তুলিয়া দিলেও বেশী টাকা থাকিবে।

অনাবশ্যক ব্যয় কি ভাবে করা হইতেছে তাহার কিছু কিছু নিদর্শন দেওয়া গেল। প্রথমেই ধরিতে হয় গবর্ণরের খরচ। একটি মাত্র লোকের জন্য এই বিপুল ব্যয় দরিদ্র দেশ বহন

করিতে পারে না, করা উচিতও নয়। প্রতি বৎসর গবর্ণরের জন্ত যে সব ব্যয়বরাদ্দ করা হয় তার অনেকগুলি অনাবশ্যক বলিয়া বুঝা গেলেও উহার বিরুদ্ধে ভোট দেওয়া তো দূরের কথা, পরিষদের সভায় এ সম্বন্ধে প্রশ্ন করিবার অধিকার পর্যন্ত সদস্যদের নাই। গবর্ণরের ব্যয়ের নমুনা নিম্নে দেওয়া গেল :

বেতন	১,২০,০০০৲
ভাতা	২৫,০০০৲
মিলিটারী সেক্রেটারীর দপ্তর—(১জন মিলিটারী সেক্রেটারী, ৫ জন এডিকং, ৮ জন কেরাণী, ৩৪ জন চাপরাসী এবং আপিস খরচ ইত্যাদি)	১,৩৫,২০০৲
ডাক্তারের দপ্তর—(১ জন সার্জন, ১ জন মিলিটারী এসিস্‌টাণ্ট সার্জন, ১ জন সাব-এসিস্‌টাণ্ট সার্জন, ১ জন কম্পাউণ্ডার; ৪ জন চাপরাসী এবং ঔষধপত্র ইত্যাদি)	১৭,৮০০৲
ব্যাণ্ড	৫০,০০০৲
মেহমন্দারী	১,৪৮,৪০০৲
আসবাবপত্র এবং কার্পেট	১২,৪০০৲
পর্দা ও টেবিল ঢাকনি	৭,৫০০৲
পুরাতন আসবাবপত্র ও কার্পেট বাতিল করিয়া নূতন ক্রয়	২০,০০০৲
অন্যান্য সরঞ্জাম	১৪,১০০৲
সেক্রেটারীর দপ্তর—(১ জন সেক্রেটারী, ১ জন ডেপুটি-সেক্রেটারী, ২জন প্রাইভেট সেক্রেটারী, ১ জন এসিষ্টাণ্ট সেক্রেটারী, ১৯ জন কেরাণী, ১৩জন চাপরাসী ও আপিস খরচ)	২,২২,৭০০৲
মোটরগাড়ী এবং চাপরাসী বেয়ারাদের উর্দী প্রভৃতি—	১,৪৮,০০০৲
ভ্রমণ ব্যয়—(ইহার মধ্যে ভ্রমণকালে গরুর গাড়ী এবং কুলিভাড়া ৯০,০০০৲)—	১,৫৫,৩০০৲
মোট	১০,৭৬,৪০০৲

এইভাবে প্রতি বৎসর গবর্ণরের বেতন বাবদ ১ লক্ষ ২০ হাজার এবং তাঁহার ভাতা ও বিবিধ ব্যয় বাবদ প্রায় ৯ লক্ষ টাকা ব্যয় হয়। গত বৎসর মোট ব্যয় হইয়াছে ৯,৫৩,৭৯৭ টাকা। ইহা ছাড়াও গবর্ণরের জন্ত আরও খরচ আছে। শহরে যখন তিনি কোথাও যান তখন তাঁর যাত্রাপথের দুই পাশে প্রতি রাস্তা ও গলির মোড়ে ট্রাফিক পুলিস দাঁড় করানো হয় এবং গোয়েন্দা বিভাগের এক দল কর্মচারী তাঁহার গন্তব্যস্থলে গিয়া পাহারা দেয়। ইহাদের বেতন ও ভাতা সাধারণ রাজস্ব হইতেই দেওয়া হয় বলিয়া মনে হয়, কারণ এই খরচ গবর্ণরের বরাদ্দ হইতে দেওয়া হইবে এমন কোন পরিচয় আমরা বাজেটে খুঁজিয়া পাইলাম না।

তারপর বিরাট ব্যয় মন্ত্রী দলের। দশ জন মন্ত্রীর বেতন ২ লক্ষ ৪৯ হাজার টাকা। পার্লামেণ্টারী সেক্রেটারী ১৮ তাঁহাদের বেতন ১ লক্ষ ২৪ হাজার টাকা। প্রধান মন্ত্রীর প্রাইভেট সেক্রেটারী ১৩ হাজার টাকা। ইঁহাদের জন্ত ৩ জন কেরাণী, ৩১ জন চাপরাসী এবং ৬৭ জন অস্থায়ী কর্মচারী বাবদ আরও খরচ হইবে ৩৭ হাজার টাকা। মন্ত্রী ও পার্লামেণ্টারী সেক্রেটারীদের ভ্রমণ-ব্যয় ৯০ হাজার এবং ভাতা প্রভৃতি ২৬,৮০০ টাকা। আপিস খরচ ৫৫ হাজার টাকা। দশ জন মন্ত্রীর জন্ত এই ভাবে মোট খরচ ধরা হইয়াছে ৫,৯৯,৮০০ টাকা। প্রত্যেকটি বিভাগে ব্যয় বাড়িয়াছে এবং আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস উত্তমরূপে অনুসন্ধান হইলে দেখা যাইবে উহাদের অধিকাংশই অনাবশ্যক ব্যয়। পুলিস, শাসন বিভাগ প্রভৃতির ব্যয় অত্যন্ত বাড়িয়াছে। যেখানে এক জন সেক্রেটারী হইলেই কাজ চলিবার কথা সেখানে চার জন নিযুক্ত হইতেছেন, স্পেশাল অফিসারের হুড়াহুড়ি চলিতেছে, অতিরিক্ত ম্যাজিষ্ট্রেট, সহকারী ম্যাজিষ্ট্রেট, অতিরিক্ত পুলিস সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট, সহকারী পুলিস সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট প্রভৃতির তো ইয়ত্তা নাই। শাসন-সৌকর্য্যের নামে এই সব নিয়োগ ক্রমাগত হইতেছে অথচ ইহাতে শাসনকার্য্যের উন্নতি হওয়া তো দূরের কথা, আরও অবনতি ঘটিতেছে। সুতরাং আরও বেশী কর্মচারীর প্রয়োজন হইতেছে। এই ভাবে একটি দুঃসহ দুষ্ট চক্রের আবর্তে পড়িয়া প্রতি বৎসর ব্যয়বৃদ্ধি হইতেছে, অপচয় বাড়িতেছে এবং ফল হইতেছে দেশবাসীর করভার বৃদ্ধি ও লাঞ্ছনা।

অপচয়ের নমুনা

বাংলার বর্তমান কর্তৃপক্ষের হাতে কি ভাবে সাধারণের কষ্টার্জিত অর্থের অপচয় ঘটিতেছে তাহার সর্বোৎকৃষ্ট দৃষ্টান্ত নৌকার কারবার। জাপানী আক্রমণের ভয়ে বাংলাদেশের প্রায় দশ হাজার নৌকা ধ্বংস করা হয়। অল্প দিন পরেই ঘোষণা করা হয় যে খাদ্য সরবরাহের জন্ত বাংলা-সরকার স্বয়ং নৌকা নির্মাণ আরম্ভ করিবেন। নৌকা নির্মাণের ভার ছিল মন্ত্রী খাজা সাহাবুদ্দীন ও শিল্প বিভাগের ডিরেক্টর মিঃ সতীশ মিত্রের উপর। এই কারবারে ১৯৪৪ সালে আড়াই কোটি এবং ১৯৪৫ সালে সাড়ে পাঁচ কোটি টাকা বরাদ্দ হয়। ১৯৪৫-৪৬ সালের বাজেটে নৌকা নির্মাণে লগ্নীকৃত এই ৬ কোটি ৬৮ লক্ষ টাকা সরকারের সম্পত্তি হিসাবে দেখানো হয়। বাজেট আলোচনার সময় বহু সদস্য অভিযোগ করেন যে এই টাকা আদায় তো বহু দূরের কথা, ব্যাপার দেখিয়া সন্দেহ হইতেছে যে ইহার সবটাই লোকসান হইবে। এই নৌকা নির্মাণ কার্যে মেজর-জেনারেল ওয়েকলির উৎসাহ ছিল যথেষ্ট। এই ব্যক্তির উপরে তখন জেলায় জেলায় খাদ্য সরবরাহের ভার ছিল। এক ঝাঁক নৌকা তৈরি করিয়া ইঁহার হাতে দেওয়া হইলে দেখা গেল সেগুলি একেবারেই কাজের অনুপযুক্ত, প্যাকিং বাক্স

বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। এই নৌকাগুলি কিছুতেই চালু করা গেল না, একমাত্র কলিকাতাতেই ২৫০ খানা নৌকা জলে পচিতে লাগিল। মৌলবী আবদুল ওয়াহেদ বোকাইনগরী অভিযোগ করেন যে নৌকা তৈরির কন্ট্রাক্ট মন্ত্রিমণ্ডলীর সমর্থকদের মধ্যে বিতরণ করা হইতেছে এবং আম-জাম, শিমুল প্রভৃতি কাঠের দ্বারা তৈরি হওয়ায় নৌকাগুলি ছয় মাসের বেশী টিকিতে পারে না। নৌকা তৈরিতে লগ্নী করা টাকা যে প্রধানতঃ দলের লোক তোষণের জন্য ব্যয় হইতেছে একাধিক বক্তা তাহা প্রমাণ-প্রয়োগ সহ অভিযোগ করেন। মৌলানা আবদুল রেজ্জাক বলেন, "মন্ত্রী মহাশয়কে জিজ্ঞাসা করিতেছি যে জাপান ও ব্রিটিশের মধ্যে যে যুদ্ধ চলিতেছে এই টাকা ঐ যুদ্ধ সংক্রান্ত ব্যাপারে ব্যয় করিবেন, না তাঁহাদের দলগত ভাবে যে বহু কোম্পানী খুলিয়াছে যথা—Ganges Timber Works—Sreerampur, Shibdurga Company, Pioneer Corporation, Faridpur, U. Ali Choudhury ও মোহন মিঞা Bengal construction—Mr. Sahabuddin, North Bengal Trading & Co. আবদুল্লা মামুদ, Eagle Construction, মফিজুদ্দীন এণ্ড কোং ইত্যাদি আরও অনেক কোম্পানী যথা চলিমা মোসলেম ইণ্ডিয়া কোম্পানী এবং সেই টাকা দলগত মেম্বরদের মধ্যে ভাগ-বাঁটোয়ারা করিয়া বাদবাকী তিনি নিজের কোম্পানীতে জমা দিতেছেন?"

এই সব অভিযোগের উত্তর দান প্রসঙ্গে সিভিল সাপ্লাই মন্ত্রী মিঃ সুরাবর্দী স্বীকার করেন, "যে পরিমাণ অর্থ এই সব নৌকা তৈরির জন্য প্রয়োজন বলিয়া ধরা হইয়াছে তাহা দেখিয়া আমার মনেও একটু খটকা লাগিতেছে। (I myself feel a certain amount of hesitation regarding the building of these boats at the expense which it is considered necessary for them.)" তার পর তিনি বলেন যে এই নৌকার ব্যাপারটাতে তাঁহার মনে সংশয় আছে এবং নৌকা নির্মাণ সম্বন্ধে আনুপূর্বিক তদন্ত করিবার জন্য তাঁহারা ভারত-সরকারকে এক জন অভিজ্ঞ কর্মচারী বাংলা-দেশে পাঠাইবার জন্য অনুরোধ করিয়াছেন। নৌকা নির্মাণ অবিলম্বে বন্ধ করিবার জন্য যে দাবি পরিষদে উঠিয়াছিল, মিঃ সুরাবর্দী এই ভাবে তাহা এড়াইয়া যান এবং যাহাদের নামে উক্ত প্রকার গুরুতর অভিযোগ হইয়াছে তাহাদেরই হাতে আরও সাড়ে পাঁচ কোটি টাকা তুলিয়া দেন। ইহার পর ভারত-সরকারের তরফ হইতে ব্রিগেডিয়ার আমস আসিয়া সত্য সত্যই তদন্ত করিয়াছিলেন এবং তিনি যে রিপোর্ট দিয়াছেন বাংলা-সরকার তাহা প্রকাশ করিতে সাহসী হন নাই। যত দূর জানা যায় এই রিপোর্টে বাংলা-সরকারের, বিশেষত খাজা সাহাবুদ্দীন, সতীশ মিত্র এবং জেনারেল ওয়েকলির বিরুদ্ধে কঠোর মন্তব্য করা হইয়াছিল। যে কাঠের দ্বারা নৌকা নির্মাণ হইতেছিল তাহা দেখিয়া গোড়া হইতেই বুঝা গিয়াছে যে এ সব নৌকা জলে ভাসাইবার জন্য তৈরি হয় নাই, নৌকা তৈরি উপলক্ষ্য করিয়া টাকাটা ভাগ-বাঁটোয়ারা করাই ছিল কর্মকর্তাদের মুখ্য উদ্দেশ্য।

শিল্প বিভাগের বিতর্কের দিন শাহ্ সৈয়দ গোলাম সারওয়ার হোসেনি খাজা সাহাবুদ্দীনের নামে আরও স্পষ্টভাবে অভিযোগে আনেন। খাজা সাহেব উপস্থিত ছিলেন। হোসেনি সাহেব বলেন, "খাজা সাহাবুদ্দিনকে জিজ্ঞাসা করতে চাই যে বাংলা-সরকার ও তাহার অর্থ কি কাহারও parents' property যে তারা বাংলার কোটি কোটি টাকা এই শিল্প বিভাগের নামে জনসাধারণের স্বার্থের দোহাই দিয়ে তিনি নিজে ও নিজের আত্মীয়স্বজন, যত আছে সমস্ত কন্ট্রাক্টরী sub-contract ইত্যাদি দিচ্ছেন। যেমন খাজা সাহাবুদ্দিনের নিকট আত্মীয়, পার্লামেন্টারী সেক্রেটারী নওয়াবজাদা নছরুল্লার পত্নী ও মিঃ সৈয়দ আবদুল হলিমের (এম. এল. এ) ভগ্নী জাহানারা বেগম। মিঃ হলিমের পত্নী সুফিয়া খাতুন, মিঃ সাহাবুদ্দিনের স্ত্রী কারহাত বানু বাংলার বোট-কন্ট্রাক্টরের মধ্যে অন্যতম। মিঃ সাহাবুদ্দীনের সম্পর্কিত ভ্রাতা নওয়াবজাদা আহসান-উল্লাহ্ বোট কন্ট্রাক্টর। মিঃ এম. এ. হলিম ও মিঃ হলিমের নিকট আত্মীয় মিঃ এ রেজা, মিঃ হলিমের ভ্রাতা মিঃ সাহেব আলম হলিমের নিকট আত্মীয় নওয়াবজাদা হাফিজউল্লা, মিঃ সাহাবুদ্দীনের নিকট আত্মীয় খাজা আশরাফ বোট কন্ট্রাক্টর। মিঃ সাহাবুদ্দীনের ভাগিনের খাজা পেয়ার লেডলী। অনারেবল সাহাবুদ্দীন আর একটি কোম্পানী নিজের নামে খুলেছেন। Bengal Industry Fundএর টাকা নিয়ে তিনি আত্মসাৎ করবার জন্য তাঁর আত্মীয়স্বজন নিয়ে তাঁর স্ত্রী প্রভৃতির নামে অজ্ঞাত সমস্ত কোম্পানী গঠন করে সেই টাকাগুলি আত্মসাৎ করতেছেন। Bengal Industries-এর নামে যে টাকার বাজেট আজ এখানে উপস্থিত হয়েছে তা যদি পাস হয় তা হলে এই বাজেটের বরাদ্দ টাকা কখনও জনসাধারণের জন্য ব্যয় হবে না। তা ওঁদের স্বার্থের জন্য খরচ হবে।" খাজা সাহাবুদ্দীন ইহার উত্তরে "পরিষদের বাহিরে বলিলে দেখিয়া লইব" এই শ্রেণীর কথা বলা ছাড়া কোন জবাব দিতে পারেন নাই। তখনকার সংবাদপত্রে একাধিকবার এই ভাবে নৌকার ব্যাপারে বহু অভিযোগ হইয়াছে। শুধু কন্ট্রাক্টরী নয়, নৌকা তৈরির জন্য সাহাবুদ্দীনের জঙ্গলের কাঠ আসিতেছে এ কথাও প্রকাশিত হইয়াছিল। এই সব অভিযোগের উত্তরে খাজা সাহেব বলেন যে সংবাদপত্রে এই সব কথা প্রকাশিত হওয়ায় তিনি সে সম্বন্ধে আইনসঙ্গত ব্যবস্থা অবলম্বনের জন্য তাঁহার সলিসিটারকে জানাইয়াছেন। ১৯৪৫ সালের ২৪শে মার্চ এই উক্তি করা হয়, ইহার মধ্যে সাহাবুদ্দীনের নামে আরও অনেকবার অভিযোগ হইয়াছে

কিন্তু কাহারও নামে মামলা বা অন্যরূপে প্রতিবাদ তিনি করেন নাই।

১৯৪৫ সালের মার্চ মাসে এই সব গুরুতর অভিযোগের পরও নৌকা নির্মাণকার্য যথারীতি চলিতে থাকে। ২৯শে মার্চ মন্ত্রিমণ্ডল ভাঙিয়া যায় এবং ভারত-শাসন আইনের ৯৩ ধারা অনুসারে গবর্ণর কেসি স্বহস্তে বাংলার শাসনভার গ্রহণ করেন। নৌকা নির্মাণ-পরিকল্পনা তাঁহারও আশীর্বাদ লাভ করিয়াছিল, শ্রীরামপুরে তিনি নৌকার কারখানা পরিদর্শন করিয়াছিলেন এবং একটি রৌপ্য নির্মিত নৌকা উপহারও পাইয়াছিলেন। এক বৎসর ৯৩ ধারা অনুসারে যে শাসনকার্য চলে তাহাকে অনায়াসে সিভিলিয়ানের বেনামিতে লীগ শাসনই বলা চলে। এই সময়ের মধ্যেও নৌকা নির্মাণ বাবদ মোট ১,৫৬,৯৫,৫৬৩ টাকা খরচ হয়; কণ্ট্রাক্টরদের ১,৩৪,১৫২ টাকা আগামও দেওয়া হয়। এই শুভ কার্য পরিদর্শন উপলক্ষে কর্মচারীদের বেতন, ভাতা, আপিস খরচ প্রভৃতিতেও ৩১,৮৪,৯০৭ টাকা ব্যয় হয়। সারা বৎসরে দেড় কোটি টাকার তৈরি নৌকার মধ্যে মাত্র ৩৬,৫৪৫টাকার নৌকা বিক্রয় করা গিয়াছে। আম জাম শিমুল প্রভৃতি কাঠের দ্বারা নৌকা তৈরি করিয়া উহা বিক্রয়ের আশা বাতুলতা ইহা বার বার বলা সত্ত্বেও এই কাজ বন্ধ হয় নাই। ১৯৪৫-৪৬ সালের শোচনীয় অভিজ্ঞতাতেও বর্তমান মন্ত্রীদের চৈতন্যোদয় হয় নাই। জনমতের চাপে শেষ পর্যন্ত নৌকা তৈরি বন্ধ করিবার অভিপ্রায় প্রকাশ করা হইলেও এ বৎসর এই বাবদ আরও কিছু টাকা ছড়াইবার ব্যবস্থা করিয়া রাখা হইয়াছে। ১৯৪৬ সালের ১লা এপ্রিল হইতে ২৪শে এপ্রিল পর্যন্ত এই তিন সপ্তাহের মধ্যেও নৌকা তৈরি বাবদ ৩৫,১৩,৪৮০ টাকা খরচ হইয়াছে এবং আগামী ৩১শে মার্চ পর্যন্ত আরও ৬০,০২,৯২০ টাকা বরাদ্দ হইয়াছে। যে কার্যের আগাগোড়া সন্দেহ-জনক, বর্তমান প্রধান মন্ত্রী মিঃ সুরাবর্দী নিজেও যাহা সংশয়ের অতীত বলিয়া মনে করেন না, সেই কার্য অবিলম্বে বন্ধ না করিয়া উহাতে ৯৫ লক্ষ টাকা ঢালিবার ব্যবস্থা হইয়াছে কেন? চলতি বৎসরে এই টাকার নৌকা তৈরির জন্য ১৪,২৩,৬০০ টাকা কর্মচারীদের বেতন বাবদ ব্যয় হইবে। নৌকা-নির্মাণ খাতে শুধু কণ্ট্রাক্টর তোষণ নহে, এক দল কর্মচারী বহাল রাখিবার আয়োজনও বেশ দরাজ ভাবেই করা হইয়াছে।

সাধারণের টাকা লইয়া এই বিপুল অপচয়ের তদন্ত কি কখনও হইবে না?

রাজনৈতিক বন্দী মুক্তি

বাংলা দেশের যে সব রাজনৈতিক কর্মী দীর্ঘকালের জন্য কারাদণ্ডে দণ্ডিত হইয়াছিলেন তাঁহারা আজও মুক্তি পান নাই গবর্মেণ্টের নিকট ইহা ল্লাঘার বিষয় নহে। কংগ্রেস-শাসিত প্রদেশসমূহে কংগ্রেস কার্যভার গ্রহণ করিবামাত্র সমস্ত বন্দীর মুক্তির আদেশ দিয়াছেন এবং আমলাতান্ত্রিক কর্মচারীদের সেই আদেশ পালনে বাধ্য করিয়াছেন। ১৯৩৭ সালে যুক্ত প্রদেশে ও বিহারে মন্ত্রীরা রাজনৈতিক বন্দীদের মুক্তির আদেশ দিলে গবর্ণরেরা উহা আটক করেন। প্রতিবাদে ঐ দুই প্রদেশের মন্ত্রীরা পদত্যাগ করেন। শেষ পর্যন্ত বড়লাট লর্ড লিনলিথগো একটি মাঝামাঝি রফা বাহির করিয়া এই ব্যবস্থা করেন যে বন্দীদের সকলকে এক সঙ্গে মুক্তি দেওয়া হইবে না, এক এক জনের ফাইল দেখিয়া ধীরে ধীরে মুক্তি দেওয়া হইবে এবং ইহাতে গবর্ণরেরা বাধা দিবেন না। এই সর্তে মন্ত্রীরা পুনরায় কার্যভার গ্রহণ করেন এবং রাজনৈতিক বন্দীরাও অল্পদিনের মধ্যে মুক্তি লাভ করেন। বাংলার রাজনৈতিক বন্দীর সংখ্যা সর্বাপেক্ষা অধিক এবং বাংলাতেই মন্ত্রীমণ্ডলের সাহস ও স্বদেশপ্রেম সবচেয়ে কম। এই কারণে এখানকার মন্ত্রীরা গোয়েন্দা পুলিসের বিরোধিতা অতিক্রম করিয়া বন্দীদের মুক্তি দানে সক্ষম হইতে পারেন নাই।

এবারও কংগ্রেস প্রাদেশিক মন্ত্রিত্ব গ্রহণ করিবার দুই মাসের মধ্যে সমস্ত রাজনৈতিক বন্দী মুক্তি লাভ করিয়াছেন। গত বার যুক্ত-প্রদেশের কাকোরী বন্দীরাও মুক্তি পাইয়াছিলেন, এবার আগষ্ট-আন্দোলনে দণ্ডিত বন্দীদের সকলকে ছাড়িয়া দেওয়া হইয়াছে। যুক্ত-প্রদেশের গবর্ণর এবারও বন্দী মুক্তির আদেশে স্বাক্ষর করিতে অস্বীকার করিলে কারা-সচিব মিঃ রফি আমেদ কিদওয়াই পদত্যাগ করেন এবং পণ্ডিত গোবিন্দ-বল্লভ পন্থও মন্ত্রীসভার আদেশ কার্যে পরিণত না হইলে গুরুতর অবস্থার উদ্ভব হইবে বলিয়া গবর্ণরকে সতর্ক করিয়া দেন। পণ্ডিত পন্থের দৃঢ়তার ফলে কয়েক দিনের মধ্যেই গবর্ণরের মত পরিবর্তিত হয়। তিনি মন্ত্রীদের আদেশপত্রে স্বাক্ষর করিতে বাধ্য হন এবং বন্দীরাও মুক্ত হন।

বাংলার বর্তমান মন্ত্রীমণ্ডল গঠিত হওয়ার পর ইঁহারাও বন্দীমুক্তি ব্যাপারে পূর্ববৎ গড়িমসি করিতেছেন। তবে এবার জনমত অনেক বেশী জাগ্রত, আন্দোলনও বেশ চলিতেছে বলিয়া ইঁহারা এই গণ-দাবি একেবারে অস্বীকার করিতে পারিতেছেন না। গত ২৪শে জুলাই বঙ্গীয় ব্যবস্থা-পরিষদের বাজেট অধিবেশনের উদ্বোধন-দিবসে এক বিরাট শোভাযাত্রা বন্দীমুক্তির দাবি লইয়া পরিষদের সম্মুখে উপস্থিত হয় এবং প্রধান মন্ত্রী মিঃ সুরাবর্দিকে এই জনসমুদ্রের সম্মুখীন হইতে বাধ্য হইতে হয়। এই গণ-বিক্ষোভকে অগ্রাহ্য করিবার শক্তি তাঁহার ছিল না, সমবেত জনসমষ্টি বন্দীদের কবে মুক্তি দেওয়া হইবে তাহার একটা নির্দিষ্ট তারিখ জানিতে চাহিলে প্রধান মন্ত্রী শেষ পর্যন্ত বলেন যে ১৫ই আগষ্টের মধ্যে বন্দীদের মুক্তির আদেশ দেওয়া হইবে। এই তারিখ আগতপ্রায়, কিন্তু বন্দীরা এখনও কারারুদ্ধ। বাংলার মন্ত্রীরা বন্দীদের মুক্তির আদেশ দানে কেন সাহস পাইতেছেন না তাহা একেবারেই দুর্বোধ্য।

এই ব্যাপারে আমলাতন্ত্রের নিকটে বাধা পাইলে সমগ্র দেশ তাঁহাদের পিছনে থাকিবে ইহা নিঃসন্দেহ।

ডাক ধর্ম্মঘট

ডাক তার ও টেলিফোন ধর্মঘট শেষ হইয়াছে। ডাক ধর্মঘটের নেতৃত্বে যে বিশৃঙ্খলা দেখা গিয়াছে তাহা ধর্মঘটের নায়কদের পক্ষে যেমন গৌরবের বিষয় নহে, কর্মীদের পক্ষে তেমনি ভয়ের বস্তু। শ্রীযুক্ত মৃণালকান্তি বসু ধর্মঘটের পর এক বিবৃতিতে বলিয়াছেন, "শ্রমিক আন্দোলনকে অর্থনৈতিক ভিত্তিতে পরিচালিত না করিয়া উহাতে দলগত রাজনীতি আমদানী করিলে আন্দোলনের উপকার না হইয়া উহার মধ্যে ভেদ সৃষ্টি হইবে এবং উহাতে শ্রমিক আন্দোলনই ক্ষতিগ্রস্ত হইবে।" ডাক ধর্মঘটের প্রথম নোটিশ দেওয়ার পর ভারত-সরকার সালিশীর হাতে বিরোধ মীমাংসার ভার অর্পণে সম্মত হওয়ায় ধর্মঘটের নোটিশ প্রত্যাহৃত হয়। দেওয়ান চমনলাল ডাক কর্মচারীদের সমস্ত ইউনিয়ন লইয়া গঠিত ফেডারেশনের সভাপতিরূপে এই সালিশী স্বীকার করেন। সালিশ নিয়োগের সঙ্গে সঙ্গে ভারত-সরকারের অধীনস্থ কর্মচারীদের বেতন সম্বন্ধে অনুসন্ধান করিবার জন্যও একটি কমিশন নিযুক্ত হয়। সালিশের রায় প্রকাশিত হওয়ার পূর্বেই কয়েকটি ইউনিয়ন অধৈর্য হইয়া অল্প কয়েক দিনের নোটিশে ধর্মঘট আরম্ভ করেন। ধর্মঘটের নেতৃত্ব এবার আসে মিঃ ভালভীর হাতে, দেওয়ান চমনলালকে এই দল অস্বীকার করিতে আরম্ভ করে। মিঃ ভালভীর সঙ্গে শ্রীযুক্ত মৃণালকান্তি বসুর প্রথমে সংযোগ ও পরে নেতৃত্ব লইয়া বিরোধও ক্রমশঃ স্পষ্ট হইতে থাকে। শ্রীযুক্ত বসু তাঁহার বিবৃতিতে শ্রমিক আন্দোলনে দলগত রাজনীতি টানিবার বিরুদ্ধে যে আর্তনাদ করিয়াছেন, দেওয়ান চমনলালকে অপদস্থ করার সময় সেকথা কোথায় ছিল।

ডাক কর্মচারীদের এই ধর্মঘটের ফলে জনসাধারণের, বিশেষতঃ গরীবদের, অসহ্য কষ্ট এবং ক্ষতি হইয়াছে। এখানে ধর্মঘটের প্রয়োজন কতটা ছিল এবং এই ধর্মঘটে কর্মচারীরা বস্তুতঃ কতটা লাভবান হইয়াছে সে সম্বন্ধে সংশয় রহিয়া গিয়াছে। ধর্মঘটী ডাক কর্মচারীরা যে কাজ করিয়া যে বেতন পায় সেই ধরণের কাজ অন্য যাহারা করে তাহারা তার চেয়ে অনেক কম পায় ইহা অস্বীকার করা যায় না। আপিস ও ব্যাঙ্কের বেয়ারা, দারোয়ান প্রভৃতির বেতনের সহিত পিয়ন ও প্যাকারদের বেতন তুলনা করিলেই ইহা বুঝা যাইবে। সালিশ নিয়োগের পর গবর্ণমেণ্ট তাঁহার রায় মানিতে বাধ্য ছিলেন, অন্ততঃ তাঁহারা উহা মানিতে অস্বীকার করিবার পূর্বে ধর্মঘটের প্রশ্ন ওঠার সঙ্গত কারণ ছিল না। ধর্মঘটের ফলে সালিশের রায়ে উল্লিখিত সুবিধার অতিরিক্ত অতি সামান্যই পাওয়া গিয়াছে। বাংলাদেশে সবচেয়ে কম বেতনের পিয়ন প্রভৃতি বেতন ও ভাতা বাবদ আগে পাইত মাসিক ৪০৴, সালিশের রায়ে অতিরিক্ত পাইয়াছে মাসিক ৫।০ আনা এবং এককালীন ৬৩ টাকা; সালিশের রায়ের অতিরিক্ত গবর্ণেণ্ট দিয়াছেন মাসিক রেশনের মূল্য হ্রাস বাবদ ।৵০ আনা এবং পুরানো ভাতা বাবদ ৫৲ টাকা। ইহা হইতে দেখা যায় সালিশের রায়েই কর্মচারীরা যাহা পাইবার তাহা পাইয়াছে। তদতিরিক্ত যাহা লাভ করিয়াছে তাহা ধর্মঘটের ফলে মিলিয়াছে ইহা স্বীকার করিলেও দেখা যায় উহার পরিমাণ নগণ্য। এই সামান্য লাভ আন্দোলনের দ্বারাই হইত বলিয়া আমাদের বিশ্বাস। এই দশ আনা এবং পাঁচ টাকার জন্য ধর্মঘটের প্রয়োজন ছিল না ইহা সকলেই মনে করিবে। ইহা হইতে দেখা যায় সালিশ নিয়োগের পর তাঁহার রায় প্রকাশের বিশেষত সে সম্বন্ধে সরকারী সিদ্ধান্ত অবগত হইবার পূর্বে ধর্মঘটের কোন বিশেষ সঙ্গত কারণ ছিল না। কর্মচারীরা শেষ পর্যন্ত যেরূপ খাপছাড়া ভাবে কাজে যোগ দিয়াছে তাহাতে তাহাদের দুর্বলতাই প্রকাশ পাইয়াছে এবং অবসর পাইলেই গবর্ণেণ্ট উহার সুযোগ লইবে ইহাতে সন্দেহ মাত্র নাই। কর্মচারীদের অবস্থার উন্নতি হউক ইহা আর সকলের ন্যায় আমাদেরও কাম্য। নেতৃত্ব দখলের লোভে তাহাদের বিপথে পরিচালিত করাতেই আমাদের আপত্তি, এবং সম্প্রতি বাংলায় তাহার নমুনা স্পষ্ট দেখা যাইতেছে।

ব্যাঙ্কের কেরাণীদের দাবি

ব্যাঙ্ক কর্মচারীদের বক্তব্য এই যে, দেশের বর্তমান মহার্ঘতার দিনে তাঁহারা যে পারিশ্রমিক ও ভাতা পান তাহাতে তাঁহাদের পরিবার পোষণ করা অসম্ভব হইয়া উঠিয়াছে। তাঁহারা ঋণগ্রস্ত হইয়া পড়িতেছেন এবং দারুণ দুশ্চিন্তা তাঁহাদের দেহ ও মনের অবসাদ ঘটাইয়া তাঁহাদের কর্মশক্তিকে খর্ব করিয়া ফেলিতেছে। ব্যাঙ্কগুলি গত কয়েক বৎসরে আশাতীত অর্থ উপার্জন করিয়াছেন। অথচ যাঁহাদের পরিশ্রমে এই অর্থ অর্জিত হইয়াছে তাঁহাদের স্বাচ্ছন্দ্য বিধানের প্রতি ব্যাঙ্কগুলির পরিচালকদের কোনই দরদ নাই। এক্ষণে অবস্থা সহনাতীত হইয়া উঠায় ব্যাঙ্ক-কর্মচারীরা প্রতীকারের জন্য অস্থির হইয়া উঠিয়াছেন। ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্ক, চার্টার্ড ব্যাঙ্ক, ন্যাশনাল ব্যাঙ্ক, লয়েডস্ ব্যাঙ্ক প্রভৃতি কয়েকটি প্রতিপত্তিশালী ব্যাঙ্কের কর্মচারীরা তাঁহাদের অভাব-অভিযোগ এবং তাহার প্রতিকার-ব্যবস্থা প্রার্থনা করিয়া ইতিমধ্যেই কর্তৃপক্ষের নিকট আবেদন পেশ করিয়াছেন। নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে কোনও প্রতীকার না হইলে তাঁহারা দাবি আদায়ের জন্য যাহা সঙ্গত মনে করেন তাহা করিবেন বলিয়া স্থির করিয়াছেন।

ব্যাঙ্ক-কর্মচারীদের মোটামুটি দাবি এই—

(১) কর্মচারীদিগকে সঙ্ঘ গঠনের অবাধ অধিকার দিতে হইবে।

(২) বেতনের হার বৃদ্ধি করিতে হইবে।

(৩) সুনির্দিষ্ট নিয়ম অনুযায়ী কর্মচারীদের পদোন্নতির ব্যবস্থা করিতে হইবে।

(৪) কার্যকাল অবসানান্তে বা দীর্ঘকাল কার্য করার পর অবসর গ্রহণ করিলে পেন্সনের ব্যবস্থা করিতে হইবে।

(৫) প্রভিডেণ্ট ফাণ্ডের ব্যবস্থা করিতে হইবে।

(৬) দুর্মূল্যতার দরুন কেরাণীদিগকে মাসিক বেতনের উপর শতকরা ৩৫ টাকা এবং নিম্ন কর্মচারীদিগকে শতকরা ২৫ টাকা ভাতা দিতে হইবে।

(৭) প্রতি বৎসর দুই মাসের বেতন বোনাস দিতে হইবে।

(৮) এগার মাস কাজ করার পর এক মাস ছুটি এবং সাময়িক প্রয়োজনবশতঃ বৎসরে ১৪ দিন ছুটি দিতে হইবে।

এতদ্ব্যতীত আরও কয়েকটি ছোটখাট দাবি আছে।

কর্মচারীদের বর্তমান বেতনের হার বড় বড় ব্যাঙ্কেও এইরূপ:

কেরাণী—সি গ্রেড	৩৫৲ হইতে	৪০ টাকা
বি „	৭৫৲ „	১৫৫ „
এ „	১৫৬৲ „	২০০ „
দারোয়ান	২০৲ „	৪০ „
চাপরাসী বেয়ারা	১৮৲ „	৩৫ „

মাগ্‌গিভাতা কেরাণীরা পান বেতনের শতকরা সাড়ে বারো টাকা, তবে ২০ টাকার কম নয় এবং চাপরাসী প্রভৃতি পায় ১৩ টাকা।

ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্কে ধর্মঘট আরম্ভ হইয়াছে, অন্যান্য ব্যাঙ্কেও আন্দোলন চলিতেছে। বড় বড় ব্যাঙ্কগুলি যুদ্ধের সময় যে লাভ করিয়াছে এবং এখনও করিতেছে তাহাতে কর্মচারীদের বেতন ন্যায়সঙ্গত হারে বাড়াইতে তাহাদের কোন কষ্ট হইবে না। কেরাণীদের বেতন ৭৫ টাকা এবং চাপরাসী, দারোয়ান প্রভৃতির বেতন ৪০ টাকার কম হওয়া উচিত নয়। বহু ব্যাঙ্কে অসম্ভব মোটা বেতনে উচ্চপদে কর্মচারী নিয়োগ করা হয়। উচ্চপদের বেতন কিছু কমাইয়াও নিম্নপদস্থ কর্মচারীদের জন্য টাকা বাহির করা যাইতে পারে।

ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলন ও দেশীয় রাজ্য

ত্রিবাঙ্কুর-পরিষদে বক্তৃতা প্রসঙ্গে ঐ রাজ্যের দেওয়ান সার সি পি রামস্বামী আয়ার বলিয়াছেন যে ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলন সফল করিয়া তুলিবার জন্য ভারতীয় প্রদেশগুলির সহযোগে কাজ করিবার আন্তরিক আগ্রহ দেশীয় রাজ্যগুলিরও আছে। দিল্লীতে সম্প্রতি যে সব রাজনৈতিক আলোচনা হইয়া গিয়াছে তৎসম্পর্কে তিনি বলেন যে দেশের অন্যান্য নেতাদের মত তাঁহারও দৃঢ় বিশ্বাস যে ব্রিটিশ গবর্মেণ্ট এবার সত্যই ক্ষমতা হস্তান্তরের জন্য আগ্রহশীল। গণপরিষদ গঠন ও রাজ্যসমূহের সমস্যা আলোচনা সম্বন্ধে সার সি পি রামস্বামী যাহা বলিয়াছেন তাহা বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য এইজন্য যে এই বিষয়ে ভারতের শ্রেষ্ঠ অভিজ্ঞ ব্যক্তিদের মধ্যে তিনি অন্যতম। তাঁহার বক্তৃতার সারমর্ম নিম্নে দেওয়া হইল:

সাধারণ শাসনতান্ত্রিক অবস্থা আলোচনা প্রসঙ্গে তিনি দেশীয় রাজ্যের প্রতিনিধি এবং মন্ত্রি-মিশনের মধ্যে আলোচনার কথা উল্লেখ করেন। তিনি বলেন যে, ভারত সম্পর্কে যে বিতর্ক হইয়া গিয়াছে উহা হইতে স্পষ্টই বুঝা যায় যে, ভাবী যুক্তরাষ্ট্রে যোগদান করা বা না-করা সম্পর্কে দেশীয় রাজ্যকে অন্যান্য দলের সহিত সমান অধিকার দেওয়া হইয়াছে। ব্রিটিশ ভারতের দলগুলির প্রতিনিধিমণ্ডলী এবং দেশীয় রাজ্যের আলোচনাকারী কমিটির মধ্যে আলোচনার ফলে ভাবী যুক্তরাষ্ট্রে যোগদানের সর্তাবলী নির্ধারিত হইবে। ইহাও স্পষ্ট করিয়াই বলা হইয়াছে যে, ভারতে ব্রিটিশ শাসনের অবসানের সঙ্গে সঙ্গেই দেশীয় রাজ্যের সার্বভৌমত্ব থাকিবে না। ভারতীয় নেতৃবৃন্দের কেহ কেহ দেশীয় রাজ্যকে কোনরূপ স্বাধীনতা দিতে অনিচ্ছা জানাইয়া সুস্পষ্ট বিবৃতি দিয়াছেন। কিন্তু তাঁহারা ভুলিয়া যান যে, ভারতের বর্তমান শাসনতন্ত্র অনুযায়ী প্রদেশসমূহকে নির্দিষ্ট ক্ষমতা ভিন্নও অতিরিক্ত সার্বভৌম ক্ষমতা দেওয়া হইয়াছে এবং যে ক্ষমতা প্রদেশের নাই তন্মধ্যে কোন কোন বিষয়ে বিশেষ ক্ষমতা সর্বসাধারণের হিতার্থে কেন্দ্রের উপর ন্যস্ত করা হইয়াছে। ইহা বিশেষভাবে লক্ষ্য করার বিষয় যে, পণ্ডিত জবাহরলাল নেহরুর মত নেতৃবৃন্দও সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী দেশীয় রাজ্য সম্পর্কে প্রদেশ হইতে স্বতন্ত্র ব্যবস্থা করিতে চাহেন। দেশীয় রাজ্যের নৃপতিবৃন্দ অন্যান্যের মতই এরূপ সামঞ্জস্যপূর্ণ ব্যবস্থায় আসিতে ইচ্ছুক যাহার ফলে কেন্দ্রে দেশীয় রাজ্য এবং ব্রিটিশ ভারতের প্রদেশগুলির একযোগে কাজ করা সম্ভব হইতে পারে। দেশীয় রাজ্যমণ্ডলের কথা উল্লেখ করিয়া সার রামস্বামী আয়ার বলেন যে, দেশীয় রাজ্যে প্রতি ১০ লক্ষে এক জন করিয়া প্রতিনিধি গ্রহণের ভিত্তিতে অগ্রসর হইলে কোচিন এবং ভূপাল রাজ্য ১টি আসনের বেশী পাইবে না। কিন্তু যাহার সহিত দেশীয় রাজ্য শাসন-ব্যবস্থার কোন সম্পর্ক নাই এমন কোন লোক সেই আসন কদাচ পাইতে পারে না। গণ-পরিষদে বেসরকারী লোকদের আসন দিবার জন্য দেশীয় রাজ্যগুলিকে এমন ভাবে মণ্ডল গঠন করিতে হইবে যাহার ফলে প্রত্যেক মণ্ডলের পক্ষে ৩ হইতে ৪টি আসন পাওয়া সম্ভব হয়। তাহা হইলে শতকরা ৫০ ভাগ অথবা তদূর্ধ্ব আসন সংখ্যাও বে-সরকারী লোকদের দেওয়া যাইতে পারিবে।

কংগ্রেস-প্রদেশে নিরক্ষরতা দূরীকরণের প্রয়াস

যুক্ত প্রদেশের ব্যবস্থা-পরিষদের অধিবেশনে শিক্ষা বিভাগের জন্য ৩,১৭,৪৭,১০০ টাকার দাবি উত্থাপন করিয়া শিক্ষামন্ত্রী বাবু সম্পূর্ণানন্দ ঐ প্রদেশের শিক্ষাবিস্তারের আয়োজন সম্বন্ধে যে আশ্বাস দিয়াছেন তাহা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। সার্জেন্ট-পরিকল্পনা কবে কার্যক্ষেত্রে প্রয়োগ করিবার সময় ও সুযোগ আসিবে সেই ভরসায় বসিয়া না থাকিয়া কংগ্রেস-প্রদেশসমূহ দ্রুতগতিতে শিক্ষাবিস্তারে মনোনিবেশ করিয়াছে। বাবু সম্পূর্ণানন্দ বলেন যে যদি তাঁহাদের পরিকল্পনা যথোচিতভাবে অনুসরণ করা সম্ভব হয় তাহা হইলে দশ বৎসর পরে যুক্ত প্রদেশে একটি লোকও আর নিরক্ষর থাকিবে না।

প্রাথমিক শিক্ষা বাধ্যতামূলক করা হইবে এই কথা উল্লেখ করিয়া বাবু সম্পূর্ণানন্দ বলেন যে প্রায় ৫৪,৫০,০০০ বালক-বালিকার শিক্ষার ব্যবস্থা করা প্রয়োজন। সেইজন্য ১২,৬১২ সংখ্যক বিদ্যালয় স্থাপন এবং ৬৩,০৬০ জন শিক্ষক শিক্ষা-ব্যবস্থার ভার গ্রহণের জন্য দরকার। বিদ্যালয়গৃহ নির্মাণের জন্য প্রায় তিন কোটি পরিমাণ টাকার প্রয়োজন আছে। দশ বৎসরে এই উপায়ে বিদ্যালয়গৃহের জন্য বাৎসরিক ৩০ লক্ষ পরিমাণ টাকা এবং ৬০০০ শিক্ষকের জন্য বাৎসরিক ২০,০০০ টাকারও বেশী লাগিবে। এই বিরাট অঙ্কের টাকা এক সমস্যার কথা, বাবু সম্পূর্ণানন্দ সেইজন্য জনসাধারণের নিকট সাহায্য চাহিয়া আবেদন জানান। মাধ্যমিক শিক্ষা বিষয়ে ব্যক্তিগত সাহায্য কার্যকরী হইয়াছে বলিয়া তিনি উচ্চশিক্ষার বিদ্যালয় ও কলেজ স্থাপন উদ্দেশ্যেও ব্যক্তিগত দানের আবেদন করেন। তিনি বলেন যে আজকালকার দিনের জাতিগঠনের জন্য প্রাথমিক শিক্ষা অবশ্য প্রয়োজনীয় এবং সেইজন্য জন-হিতৈষীদের দৃষ্টি যাহাতে এদিকে পড়ে তাহার যথেষ্ট প্রয়োজন আছে।

মন্ত্রীমহাশয় বলেন যে এই প্রাথমিক শিক্ষা প্রচারের জন্য যতটা সম্ভব বে-সরকারী সমিতির সাহায্য গ্রহণ করা হইবে। সেই সমিতিগুলি অনেকটা আলীগড় শিক্ষা সমিতির মত হইবে। তাহারা নিজেদের এলাকার মধ্যে প্রাথমিক বিদ্যালয় স্থাপনের ও চালাইবার দায়িত্ব গ্রহণ করিবেন এবং এমন কি স্থানীয় গ্রাম হইতে তাঁহারা কিছু অর্থ যোগাইবেন। অভিজ্ঞ শিক্ষকের আশায় বসিয়া না থাকিয়া শিক্ষাবিস্তার ত্বরান্বিত করিবার জন্য পঞ্চাশ হাজার ছাত্রবৃত্তি পাস শিক্ষক এখনই নিয়োগ করিতে হইবে। বর্তমান অবস্থায় উপযুক্ততার চেয়ে পরিমাণের দিকেই বেশী লক্ষ্য দেওয়া প্রয়োজন হইবে। এই শিক্ষকদের নিজ গ্রামে অল্প বেতনে শিক্ষার দায়িত্ব লওয়া সহজ ও সম্ভবপর হইবে। তাহাদের মুখের বাণী হইবে 'শেখ এবং শেখাও।' এই সমস্ত বিদ্যালয়ে বনিয়াদী শিক্ষার পাঠ-পদ্ধতি অনুসরণ করা হইবে। মন্ত্রীমহাশয় জোরের সহিত বলেন যে এই বিষয়ে তাঁহাদের নীতি কোন কোন বিষয়ে ওয়ার্ধাকেও ছাড়াইয়া গিয়াছে। তিনি স্থির করেন যে মাতৃভাষা শিক্ষা বিদ্যালয়ে ও ইংরেজী শিক্ষার বিদ্যালয়ে একই নীতি অবলম্বন করিতে হইবে।

বাবু সম্পূর্ণানন্দ ঘোষণা করেন যে সরকার কর্তৃক এক সংসদ স্থাপিত হইয়াছে যাহাতে আরবী শিক্ষার আধুনিকী সংস্করণ সম্ভাবনা সম্বন্ধে অনুসন্ধান করা হয়। মৌলানা আবুল কালাম আজাদ এই সংসদের সভাপতি এবং অধ্যাপক হিমায়াতুল হাসান (বেনারস কুইন্স কলেজের শিক্ষক) এই সংসদের সম্পাদক হইতে রাজী হইয়াছেন।

ঠিক একই প্রকারের আরও একটি সংসদ সংস্কৃত শিক্ষার আধুনিকী সংস্করণের জন্য স্থাপিত হইয়াছে। এই সংসদের সভাপতিরূপে গত কংগ্রেস মন্ত্রী-মণ্ডলী ডাঃ ভগবান দাসকে সভাপতি নির্বাচন করেন। বর্তমানে সরকার বাহাদুর এই সংসদের অনুমোদিত উপায়গুলি গ্রহণ করিয়াছেন। মৌলানা আজাদ যাহার সভাপতিরূপে নির্বাচিত হন, সেই আরবী শিক্ষা সংসদও গত মন্ত্রী-মণ্ডলী কর্তৃক স্থাপিত হয়। কিন্তু সংসদ কার্যকরী হওয়ার পূর্বেই মন্ত্রী-মণ্ডলী পদত্যাগ করেন। বাবু সম্পূর্ণানন্দ মৌলানা আজাদকে পুনরায় কর্তব্যভার গ্রহণ করিতে অনুরোধ করেন এবং তিনি সম্মতি জ্ঞাপন করেন।

বক্তৃতাকালে মন্ত্রীমহাশয় ঘোষণা করেন যে বাজেটে সংস্কৃত শিক্ষার জন্য ১,১৬,০০০ টাকা এবং আরবী-শিক্ষার জন্য ৬৫,০০০ টাকা ব্যয় হইবে বলিয়া স্থির করা হইয়াছে। তিনি আক্ষেপ করিয়া বলেন যে, এই সমস্ত বিদ্যালয়ে গবেষণার পরিসর অল্প হওয়ায় ছাত্রেরা শিক্ষা সমাপনের পরে করিবার আর কিছুই খুঁজিয়া পায় না। সেইজন্যই তিনি এই বিদ্যালয়গুলির আধুনিকী সংস্করণের জন্য সংসদ স্থাপনের কথা চিন্তা করিয়াছেন।

আর বাংলায়? এখানে লীগ-মন্ত্রীদের প্রধান কর্তব্য দাঁড়াইয়াছে যেন তেন প্রকারেণ শিক্ষা সঙ্কোচ, শিক্ষার পবিত্রতা নাশ, শিক্ষাক্ষেত্রে এমন কি পাঠ্য পুস্তকগুলিতে পর্যন্ত সাম্প্রদায়িকতার বীজ বপন। মাধ্যমিক শিক্ষা বিল নিছক ভোটের জোরে পাস করাইয়া লইবার জন্য সর্ব প্রকার চেষ্টা এখন হইতেই সুরু হইয়া গিয়াছে।

খাদ্যসমস্যা সম্বন্ধে জাতীয় পরিকল্পনা কমিটি

কংগ্রেসের জাতীয় পরিকল্পনা কমিটির খাদ্য পরিকল্পনা সাব্-কমিটি যে রিপোর্ট প্রকাশ করিয়াছেন তাহাতে তাঁহারা দৃঢ়তার সহিত জানাইয়াছেন যে, বিভিন্ন খাদ্যশস্য ও অন্যান্য ফসলের প্রত্যেকটির জন্য যে পরিমাণে জমি নির্ধারিত আছে তাহাদের মধ্যে সামঞ্জস্য নাই, এই সামঞ্জস্য বিধান একান্ত আবশ্যক।

রিপোর্টে বলা হইয়াছে, "ফসল বৃদ্ধির নামে সম্প্রতি যে আন্দোলন আরম্ভ হইয়াছে তাহা আতঙ্কজনক ব্যবস্থা বলিয়া মনে হয়। কারণ দেশের কোন কোন স্থানে কেবলমাত্র

অনশনেই বহু লোক মারা গিয়াছে। 'ফসল বাড়াও' আন্দোলনের ফলে তুলা, পাট, ইক্ষু ও তৈল বীজ প্রভৃতি শিল্প সংক্রান্ত কাঁচা মাল উৎপাদনের জন্য নির্দ্ধারিত জমির পরিমাণ কতকাংশে হ্রাস পাইয়াছে। স্বাভাবিক সময়ে দেশের সমগ্র আর্থিক অবস্থার উপর ইহার প্রতিকূল প্রতিক্রিয়া হইতে বাধ্য। সুতরাং শিল্পসংক্রান্ত কাঁচা মাল ও খাদ্য ফসল উৎপাদনের জন্য যে পরিমাণ জমি নির্দ্ধারিত আছে, তাহাদের মধ্যে সর্বদা সঙ্গত-ভাবে সামঞ্জস্য রক্ষা করা একান্ত আবশ্যক। আমাদের উভয়-বিধ প্রয়োজন মিটাইবার জন্য ভারতে যথেষ্ট জমি আছে। খাদ্যশস্য উৎপাদনের জন্য যে পরিমাণ জমি নির্দ্ধারিত আছে কমিটি তাহা কোনওক্রমে হ্রাস করার সুপারিশ করেন না। বরং দেশের বহু স্থানে পার্বত্য অঞ্চলে যে দীর্ঘ সমতল জমি আছে তাহাতে চাষের ব্যবস্থা করিয়া খাদ্যশস্যের জমির পরিমাণ বৃদ্ধি করা যাইতে পারে এবং ঐ সকল জমিতে ঐ সকল অবস্থারই উপযোগী শস্যের আবাদ করা যাইতে পারে।"

রিপোর্টে আরও বলা হইয়াছে, "এদেশে বাহির হইতে খাদ্যশস্য আমদানীর আবশ্যক হইবে না।" রিপোর্টে বলা হইয়াছে যে, যদি কমিটির প্রস্তাবিত সমস্ত ব্যবস্থা যথারীতি কার্যকরী করা হয় তবে, "এদেশে দুর্ভিক্ষের কোনও আশঙ্কা থাকিবে না।" কমিটি এইরূপ অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন যে, "কোন কোন অবস্থায় রপ্তানি নিষিদ্ধ করা গেলেও" বাহির হইতে আমদানী সম্পূর্ণরূপে বন্ধ করার প্রয়োজন নাই।

পরিকল্পনাবিহীন খাপছাড়া কৃষিতে কখনও কৃষকের উপকার হয় না। ইহার দ্বারা কখনও খাদ্য অথবা অপর ফসলের অভাব ঘটিয়া উহা দুর্মূল্য হয়। ইহাতে এক দিকে দুর্ভিক্ষ হয় অপর দিকে চড়া দরে কাঁচা মাল কিনিতে বাধ্য হওয়ায় শিল্পজাত পণ্যের মূল্য বৃদ্ধি ঘটিয়া কৃষক ভিন্ন অপর সকলের ক্ষতি হওয়ার আশঙ্কা থাকে। অতিরিক্ত ফসল উৎপন্ন হইলে দুর্দশা ঘটে কৃষকের। পরিকল্পনাবিহীন কৃষিকার্যের ফলে দেশের সমগ্র অর্থনৈতিক জীবনের মূল শিথিল থাকিয়া যায়। ইহা সমগ্র দেশের পক্ষে ক্ষতিকর। বর্তমানে পাশ্চাত্য জগতের কোনও উন্নতিশীল দেশে পরিকল্পনাবিহীন খাপছাড়া ভাবে কৃষিকার্য চলিতে দেওয়া হয় না। কৃষিকার্য পরিকল্পনা যে কত সুন্দর ভাবে সাফল্যমণ্ডিত করিয়া তোলা যায়, রাশিয়া তাহার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত।

আমাদের দেশে গবর্মেণ্ট এ বিষয়ে কোন সময়েই মনোনিবেশ করেন নাই। কৃষির প্রকৃত অবস্থা উত্তমরূপে জানা না থাকায় তাঁহাদের ফসল বৃদ্ধি আন্দোলন হাস্যকর প্রহসনে পরিণত হইয়াছে এবং ইহাতে দরিদ্র করদাতাদের বহু কোটি টাকা ব্যয় হইয়াছে। কৃষিকার্যের স্বয়ং-সম্পূর্ণ পরিকল্পনা করিতে গেলে সর্বাগ্রে নির্ভুল নির্ভরযোগ্য তথ্য সংগ্রহ অত্যাবশ্যক। এদেশে মাঝে মাঝে কতকগুলি অর্ধশিক্ষিত লোক ধরিয়া তাহাদের দ্বারা চাষ-আবাদের যে 'ষ্ট্যাটিষ্টিকস্' সংগৃহীত হয় তাহাতে সংখ্যা থাকে প্রচুর, কিন্তু সত্য থাকে না। যাহাদের উপর এই কার্যের ভার দেওয়া হয় তাহারা প্রথমত নবাগত, দ্বিতীয়ত অর্ধশিক্ষিত, তৃতীয়ত ইহাদের চাকুরির কোন স্থায়িত্ব নাই কাজেই দায়িত্ববোধও নাই। অথচ এই শ্রেণীর লোকের দ্বারা সংগৃহীত তথ্যের উপর নির্ভর করিয়াই এদেশে বড় বড় রিপোর্ট রচিত হয় এবং তদনুসারে কোটি কোটি টাকা ব্যয় হয়।

এই সম্পর্কে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভূগোল বিভাগের কাজ উল্লেখযোগ্য। ইণ্ডিয়ান ষ্ট্যাটিষ্টিক্যাল ইনষ্টিটিউটের ন্যায় চিরপ্রচলিত ভুল প্রণালীতে উপরি-উক্ত শ্রেণীর লোক দিয়াই তথ্য সংগ্রহের চেষ্টা না করিয়া ইঁহারা সম্পূর্ণ ভিন্ন পথে অগ্রসর হইয়াছেন। হাইস্কুলের শিক্ষকদের সহায়তায় ইঁহারা আপাতত চব্বিশ পরগণা জেলায় জমির অবস্থা, কৃষকের এবং কৃষির অবস্থা প্রভৃতি যাবতীয় তথ্য সংগ্রহ করিয়া যে রিপোর্ট প্রকাশ করিয়াছেন তাহা সরকারী বা আধা-সরকারী রিপোর্ট অপেক্ষা বহু গুণে বেশী নির্ভরযোগ্য হইয়াছে। হাইস্কুলের ভূগোল শিক্ষকদের সাহায্যে নামমাত্র ব্যয়ে ইঁহারা এই দুরূহ কার্য সম্পাদন করিয়াছেন। চব্বিশ পরগণার পর ইঁহারা হাওড়া জেলা সম্বন্ধে অনুসন্ধানে ব্রতী হইয়াছেন। হাইস্কুলের শিক্ষক ও ছাত্রদের সাহায্যে এই তথ্য সংগ্রহ চলিলে উহা অনেক বেশী নির্ভরযোগ্য হইবে এবং ইহার জন্য শিক্ষকদের কিছু অর্থ সাহায্য করিলে তাঁহারাও সন্তুষ্ট এবং উপকৃত হইবেন। এই ভাবে একটি নির্ভরযোগ্য স্থায়ী তথ্যসংগ্রহ কেন্দ্রও অতি অল্প ব্যয়ে গড়িয়া তোলা যায়।

আমাদের দেশে সরকারের বিভাগে বিভাগে ষ্ট্যাটিষ্টিক্যাল উপ-বিভাগ খোলা রেওয়াজ হইয়া উঠিয়াছে। অথচ ব্রিটেনে ব্রিটিশ গবর্মেণ্ট সরকারী ষ্ট্যাটিষ্টিক্যাল বিভাগগুলি ক্রমশ কমাইয়া দিয়া বিশ্ববিদ্যালয়গুলিকে অর্থসাহায্য করিয়া তাহাদের দ্বারা মূল তথ্য সংগ্রহ করাইতেছেন। আমাদের দেশেও এই ভাবে হাইস্কুলগুলিকে কেন্দ্র করিয়া তথ্যসংগ্রহের ব্যবস্থা হইলে ব্যয় সঙ্কোচও হইবে, ষ্টাটিষ্টিক্সও অনেক উন্নত হইতে পারিবে।

কৃষি-সমস্যা ও বোম্বাইয়ের কংগ্রেস গবর্মেণ্ট

জুলাই মাসের ২১শে তারিখে বোম্বাইয়ের কৃষিমন্ত্রী শ্রীযুক্ত এম. এ. পাতিল প্রসঙ্গক্রমে বলেন যে বোম্বাই খাদ্য সম্বন্ধে দুই বৎসরের মধ্যেই আত্মনির্ভরশীল হইবে। ফসল বৃদ্ধির জন্য ব্যাপক ব্যবস্থা অবলম্বন করা হইয়াছে এবং শীঘ্রই ইহাকে আরও বিস্তৃত ভাবে করার আয়োজন হইতেছে। খাদ্য-দ্রব্যের চাষ আরও বাড়ান হইয়াছে। কৃষকদের চিনাবাদামের খোল, এ্যামোনিয়াম সালফেট এবং অস্থিসার অল্পমূল্যে দেওয়া হইতেছে। তাহাদের যাহাতে উন্নত ধরণের বীজ দান করা যায় সে বিষয়েও ব্যবস্থা হইতেছে।

সরকারী উন্নয়ন ব্যবস্থায় স্থির হইয়াছে যে দুই বৎসরে

মধ্যে জলসেচনের জন্ত হাজারের অধিক কূপ খনন, উন্নত ধরণের গরুবাছুরের প্রজনন ব্যবস্থা করা হইবে এবং যাহাতে শস্ত নষ্ট না হইয়া যায় সে বিষয়ে বিশেষ লক্ষ্য রাখা হইবে। এই সব উপায়ে সরকার কৃষক সম্প্রদায়ের আর্থিক অবস্থার উন্নতি করিবেন, ইহাই উদ্দেশ্ত।

কূপের দ্বারা যে জলসেচের ব্যবস্থা হইবে তাহার মোট ব্যয়ের এক-তৃতীয়াংশ সরকার বহন করিবেন এবং দুই-তৃতীয়াংশ টাকা কৃষকগণকে ঋণস্বরূপ দেওয়া হইবে। এই ঋণের টাকা কিস্তীবন্দী ভাবে পরিশোধ করিতে হইবে। ইহার জন্ত নামমাত্র সুদ দিতে হইবে। ইহা ব্যতীত সরকার পঞ্চাশ হাজার হইতে ষাট হাজার কূপ খনন ব্যবস্থা নিজেই করিবেন।

সার সরবরাহের একটি পরিকল্পনা বর্তমানে সরকারের বিবেচনাধীন আছে। প্রত্যেক মিউনিসিপ্যালিটিতে জঞ্জাল প্রভৃতি সাররূপে ব্যবহার করিবার চেষ্টা হইবে। চল্লিশটি মিউনিসিপ্যালিটি এইরূপ কার্য আরম্ভ করিয়া দিয়াছে এবং এই প্রকারে তাহাদের যথেষ্ট আয়ের উপায় হইয়াছে। গ্রামগুলিকেও এইরূপ বন্দোবস্ত করিতে বলা হইয়াছে।

চাষবাস শিক্ষার প্রসারের জন্তও উপায় উদ্ভাবন করা হইতেছে। বর্তমানে পুনাতে কেবলমাত্র একটি কৃষিকলেজ আছে। সমস্ত বোম্বাই প্রদেশের মধ্যে ইহাই একমাত্র কৃষিশিক্ষার কেন্দ্র। গুজরাট এবং কানাড়াতে সরকার দুইটি কৃষি কলেজ স্থাপনের ইচ্ছা করিয়াছেন। প্রদেশটির মধ্যে এখন মাত্র চারিটি কৃষিবিদ্যালয় আছে। প্রত্যেক কুড়িটি জেলার জন্ত একটি করিয়া উচ্চ কৃষিবিদ্যা শিক্ষালয় স্থাপনের কথা স্থির হইয়াছে। এই সমস্ত ছাড়াও, স্থানীয় কতক-গুলি কেন্দ্রে এক বৎসরের জন্ত ট্রেনিং দেওয়া হইবে। যুদ্ধকালে দেশে বহু গবাদি পশু ধ্বংস হইয়াছে; গো-সম্পদবর্দ্ধন ও সুপ্রজনন ব্যবস্থার জন্ত কৃষি-মন্ত্রী চেষ্টা আরম্ভ করিয়াছেন। গো-প্রজনন কেন্দ্র স্থাপনের জন্তও ব্যবস্থা করা হইবে। ছোট ছোট কেন্দ্রগুলিতে সরকারের নিজ ব্যয়ে বলদ সরবরাহ করা হইবে।

দুগ্ধ-উৎপাদন ব্যবস্থার প্রতি যাহাতে দৃষ্টি রাখা হয় সেজন্ত একজন কর্মচারী নিয়োগ করা হইবে। ডেয়ারীফারমিং ব্যাপারে উন্নত উপায় স্থির ও ব্যবস্থা করাই তাঁহার কর্তব্য হইবে।

গ্রাম সংস্কারের জন্য সংস্কার-সংসদ স্থাপন করা হইবে। ইহার সহিত বেসরকারী কর্মীরাও সংযোগিতা করিতে পারিবেন। প্রাদেশিক ব্যবস্থা-পরিষদের সদস্তগণ তাহাদের নিজ নিজ এলাকার পরিদর্শন করিবেন এবং সুবিধামত গ্রহণযোগ্য উন্নত পরিকল্পনা প্রস্তুত করিবেন।

এই সঙ্গে বাংলার অবস্থা তুলনীয়। এখানে গত কয়েক বৎসরে ফসল বৃদ্ধি আন্দোলনের নামে কোটি কোটি টাকা খরচ হইয়াছে, ফসল উৎপাদন কিছু মাত্র বাড়ে নাই। সরকারী গোলা হইতে প্রাপ্ত বীজে গাছ গজায় না, বাংলায় ইহা একটি প্রধান অভিযোগ। কৃষকদের জন্ত যে সার বরাদ্দ করা হয় প্রয়োজনের তুলনায় তাহা অতিশয় সামান্য। ইহারও অতি অল্প অংশই প্রকৃতপক্ষে চাষীদের হাতে গিয়া পৌঁছে। কৃষির যন্ত্রপাতি এবং গো-মহিষাদি চাষীকে সরবরাহ করিবার কোন ব্যবস্থাই নাই বলা চলে। অন্তত যাহা আছে তাহাতে চাষীর কোন উপকার হয় না। কৃষি সম্বন্ধীয় গবেষণা, প্রজনন কেন্দ্র স্থাপন প্রভৃতির নামে যে সব টাকা বরাদ্দ হইয়া থাকে সেগুলি সম্পূর্ণরূপে অপচয় হয় বলিয়াই দেশের লোকের দৃঢ় বিশ্বাস। ইহাদের কোন ফল দেখিতে পাওয়া যায় না। কৃষি বিভাগের কর্মচারীদের প্রধান কাজ চাকুরি বজায় রাখা এবং সম্ভব হইলে উপরি রোজগারের ব্যবস্থা করা; চাষীর প্রয়োজন জানিবার এবং উহা মিটাইবার আন্তরিক চেষ্টা করা হয় না। কৃষি-বিভাগ মারফত বাংলা দেশে গত কয়েক বৎসরে যে টাকা ব্যয় হইয়াছে তাহার সদ্গতি হইলে অনেক উপকার হইত।

ভারতবর্ষে জল হইতে বৈদ্যুতিক শক্তি-উৎপাদন

ভারতবর্ষে জল হইতে বৈদ্যুতিক শক্তি-উৎপাদনের যে সুযোগ রহিয়াছে পৃথিবীর বহু দেশে তাহা বিরল। এ দিক দিয়া চেষ্টা প্রায় হয় নাই বলিলেই চলে। কয়লার খনিগুলি বিদেশীর হাতে থাকায় উহাদের পরমায়ু দ্রুত ক্ষয় হইয়া আসিতেছে। কয়লার অপচয় বর্তমান হারে চলিতে থাকিলে ভারতীয় খনিগুলি আর অর্দ্ধ শতাব্দীর মধ্যেই নিঃশেষ হইবে ইহাতে সন্দেহ নাই। সুতরাং জল হইতে বৈদ্যুতিক শক্তি উৎপাদনের ব্যাপক চেষ্টা এখন হইতেই প্রয়োজন হইয়া উঠিয়াছে। ভারতবর্ষের অনেকগুলি প্রদেশ এ বিষয়ে অনেক অগ্রসর হইয়াছে, সবচেয়ে বেশী পশ্চাতে ছিল বাংলা, বিহার ও উড়িষ্যা। বাংলায় অনেক বার ব্যাপকভাবে বৈদ্যুতিক শক্তি উৎপাদন ও সমগ্র প্রদেশে সরবরাহের কথা হইয়াছে, প্রাক্তন মন্ত্রিমণ্ডলেরা অনেক বার প্রতিশ্রুতিও দিয়াছেন কিন্তু কাজ কিছুই হয় নাই। বহু আন্দোলনের পর শেষ পর্যন্ত দামোদর-পরিকল্পনায় হাত দেওয়া হইয়াছে মাত্র। কংগ্রেস-শাসিত প্রদেশগুলিতে নূতন মন্ত্রীরা কার্যভার গ্রহণ করায় অব্যবহিত পরেই এ বিষয়ে মনোনিবেশ করা হইয়াছে। এখানে উড়িষ্যার পরিকল্পনাটি দেওয়া হইল; এই ক্ষুদ্র প্রদেশটিও এ দিকে কতটা অগ্রসর হইতেছে উহা হইতেই তাহা বুঝা যাইবে,

মহানদী উপত্যকাকে কেন্দ্রীয় পূর্ত বিভাগ জল-সেচন এবং জলযান চলাচলের উন্নতি সাধনের জন্ত একটি পরিকল্পনা করিয়াছেন। কত টাকা ব্যয় হইবে তাহা এখনও স্থির হয় নাই, তবে মোটামুটি ভাবে ছয় কোটি টাকা ব্যয় হইবে আন্দাজ করা হইয়াছে"।

উদ্দেশু এই যে উড়িষ্যার মহানদীকে বাঁধ ইত্যাদির দ্বারা শৃঙ্খলাবদ্ধ করিয়া যাহাতে বন্যা নিবারণ, জল-সেচ, মাছের চাষ এবং ম্যালেরিয়া নিবারণ জাতীয় অন্যান্য কার্য সুবিধাযুক্ত করা হইবে।

প্রাথমিক কার্য ইত্যাদির জন্য কেন্দ্রীয় টেক্নিক্যাল পাওয়ার বোর্ড নানা প্রকারে অনুসন্ধান ইত্যাদি আরম্ভ করিয়াছেন। আমেরিকা এবং ব্রিটেনে নূতন যন্ত্রপাতি আনাইবার অর্ডার গিয়াছে। উড়িষ্যার ভূতপূর্ব গবর্ণর স্যর হথর্ণলুইস ১৫ই মার্চ, ১৯৪৬ তারিখে হরিকুণ্ড বাঁধের স্থাপনা কার্য করিয়া গিয়াছেন।

জানা গিয়াছে যে মহানদীতে তিনটি বাঁধ এবং তিনটি খাত হইবে। তাহা দ্বারা বৈদ্যুতিক শক্তি প্রজনন প্রচেষ্টা এবং জল-সেচ ব্যবস্থা করা হইবে। প্রথম বাঁধ হইবে সম্বলপুরের নয় মাইল উপরে হরিকুণ্ডে। দ্বিতীয় বাঁধটি নদীর ভাটির দিকে ১৩০ মাইল অগ্রসর হইয়া টিকারপাড়ার নিকটে এবং তৃতীয়টি কটকের ১০ মাইল উপরের দিকে নারাজের নিকট স্থাপিত হইবে।

এই তিনটি বাঁধে প্রায় দুই কোটি ঘন ফুট পরিমাণ জল আবদ্ধিত থাকিবে। এই জলভাণ্ডারটিকে তিনটি ভাগে বিভক্ত করা হইবে। এই জলভাণ্ডারের তলদেশের ভাগটিকে স্থায়ী ভাণ্ডার (Deadstorage) বলা হইবে, ইহাতে ৫০ লক্ষ ঘনফুট পরিমাণ জল থাকিবে এবং পলি-ভাণ্ডার হইবে। বাকী দেড় কোটি ঘন ফুটের মধ্যে এক কোটি ঘন ফুট পরিমাণ অংশের দ্বারা স্থায়ী জল-সেচন ব্যবস্থা এবং অবশিষ্ট অংশের দ্বারা বৈদ্যুতিক শক্তি প্রজনন ব্যবস্থা হইবে—ইহা উপরি ভাগের বন্যা ব্যবস্থার জন্য সঞ্চিত ভাণ্ডার হইতে গ্রহণ করা হইবে।

নারাজ বাঁধের দ্বারা যে হ্রদের সৃষ্টি হইবে তাহাকে টিকের পাড়া পর্যন্ত বর্ধিত করা হইবে এবং টিকের পাড়া বাঁধ-বেষ্টিত হ্রদকে হরিকুণ্ডের ৬০ মাইল নীচে সোনপুর পর্যন্ত বাড়ান হইবে। ইহাতে হরিকুণ্ডের নিকট হ্রদের মুখ হইতে আরম্ভ করিয়া সমুদ্র পর্যন্ত প্রায় ৩০০ শত মাইল নৌ-চলাচলের সুবিধা হইবে।

মহানদী বৎসরে প্রায় ৬ হইতে ৯ কোটি ঘন ফুট পরিমাণ জলপ্রবাহ দান করিয়া থাকে। স্থির করা হইয়াছে যে এক কোটি ঘন ফুট পরিমাণ পরিসরকে বাঁধা হইবে। ইহার ফলে বদ্বীপ অঞ্চলের বন্যা নিবারণে সুবিধা হইবে। উড়িষ্যার এবং নিকটবর্তী অঞ্চলের প্রায় ২৫ লক্ষ একর পরিমাণ জমির স্থায়ী জলসেচ ব্যবস্থা হইবে। এতদ্ব্যতীত জলশক্তি জনিত সুলভ বৈদ্যুতিক শক্তি প্রজননেরও সুব্যবস্থা সম্ভব হইবে।

এই সুলভ বৈদ্যুতিক শক্তি উড়িষ্যা এবং নিকটবর্তী অন্যান্য রাজ্যের খনিজ সম্ভারের সদ্ব্যবহার করায়, জলা জমি হইতে পাম্প করিয়া জল বাহির করায় ও জল-সেচ ব্যবস্থাকে আরও বিস্তৃত পরিসর লাভের সুযোগ প্রদান করিবে।

এই ব্যবস্থা হইতেই ব্রাহ্মণী এবং বৈতরণীর সুষম্যোগের ফলে ম্যালেরিয়া রোগের নিবারণ প্রচেষ্টা করা সম্ভবপর হইবে। বুরাবলঙ্ এবং সুবর্ণরেখা সংযুক্ত হইয়া উড়িষ্যা ও অন্যান্য নিকটবর্তী স্থানের সম্পদ হইয়া উঠিবে। হরিকুণ্ড বাঁধ যাহা প্রথমে স্থাপন করা স্থির হইয়াছে তাহার কথাই এখানে বিশেষ উল্লেখযোগ্য। যেহেতু ইহাকে লইয়া কোন রাজনৈতিক জটিলতা নাই। আশা করা যায় যে শীঘ্রই ইহার দ্বারা সুফল পাওয়া যাইবে। চূণ নিকটেই পাওয়া যায়, সিমেন্টের কল বসাইলে যথেষ্ট পরিমাণ উপকরণ পাওয়া যাইবে—তাহার ফলে এই কার্যগুলি শীঘ্র সম্ভব হইবে।

যুদ্ধোত্তর সময়ে হরিকুণ্ড বাঁধের দ্বারা পথ ঘাট ও রেলপথের উন্নতি হইবে। এই বাঁধ পার্বত্য সমতল (রকবেড) হইতে ১০০ ফুট উচ্চ এবং জলভাণ্ডারটি সমুদ্র সমতল হইতে ৬১০ ফুট উচ্চ হইবে। যে স্থানটিকে জলভাণ্ডারটি আচ্ছন্ন করিয়া রাখিবে তাহা প্রায় ১৩০ বর্গ মাইল হইবে। জল-জনিত বৈদ্যুতিক শক্তি ৫০,০০০ কিলোওয়াট ক্ষমতা পরিমাণ সাহায্য দিতে পারিবে।

খাত ব্যবস্থাটি সম্বলপুর জেলা, সোনপুর ও অন্যান্য পূর্বাঞ্চলীয় রাজ্যের প্রায় ৮০০,০০০ একর পরিমাণ জমি স্থায়ী ভাবে সেচন করিতে পারিবে। ব্যবস্থাটিকে এক প্রকার আত্মনির্ভরশীল বলা চলে। বাঁধটি কিয়ৎ পরিমাণ নির্মিত হইলেই জল-সেচনের কার্য চলিবে। বাঁধ ও খাতের কার্য একই সঙ্গে চলিবে।

ব্যবস্থাটি সম্পূর্ণ হইতে প্রায় ৫ বৎসরকাল সময় লাগিতে পারে।

যুক্তপ্রদেশের এলকোহল কারখানা

শিল্পপ্রসারে বাংলা ভিন্ন অন্যান্য প্রদেশ দ্রুতগতিতে অগ্রসর হইতেছে। যুক্ত প্রদেশের এলকোহলের কারখানা ইহার একটি দৃষ্টান্ত।

গবর্ণরী শাসনকালে যুক্ত প্রদেশের এলকোহলের কারখানার অবস্থা সঙ্গীন হইয়া উঠিয়াছিল। কংগ্রেস গবর্মেণ্ট কার্যভার গ্রহণ করিয়া উহাদের বাঁচাইবার চেষ্টা করিতেছেন। প্রত্যেক উন্নত দেশেই এই শ্রেণীর উৎপাদন-ব্যবস্থাকে গবর্মেণ্ট সর্বপ্রযত্নে সাহায্য করিয়া থাকেন। ভারতে এলকোহল উৎপাদনের উপযুক্ত কয়লা, গুড় এবং উহা সরবরাহের জন্য প্রভূত পরিমাণে ট্যাঙ্ক-ওয়াগন প্রয়োজন। এই শ্রেণীর কারখানাগুলিকে বাঁচাইবার জন্য কংগ্রেস মন্ত্রিমণ্ডলী চেষ্টা করিতেছেন, কিন্তু কেন্দ্রীয় সরকার এ বিষয়ে একেবারেই নিশ্চেষ্ট।

ভারত-সরকার ১৯৩৭ সালে গুড় হইতে এলকোহল প্রস্তুতের পরিকল্পনাকে উড়াইয়া দেন। তাঁহাদের অজুহাত ছিল ব্যয় বেশী হইবে। কিন্তু কংগ্রেস মন্ত্রিত্ব গ্রহণের পর এ বিষয় অনুসন্ধানের জন্য একটি কমিটি স্থাপন করেন ও পাওয়ার এলকোহল বিল সম্বন্ধে এক রিপোর্ট দেন। কিন্তু ভারত-

সরকারের ঔদাসীন্যে এই বিলটি বহু দিন চাপা পড়িয়া থাকে। পরে বিলটি পাস হয় এবং তখনকার মত ফ্রান্স হইতে সুদক্ষ লোক আনাইয়া কাজ আরম্ভ করিয়া দেওয়া হয়। ইহার পরেই কংগ্রেস মন্ত্রিমণ্ডলী পদত্যাগ করেন। তাহার ফলে পরবর্তী ১৮ মাস কাল পর্যন্ত কোন প্রকার কাজ অগ্রসর হয় নাই।

রোমেল যখন আলেকজান্দ্রার কাছে আসায় উত্তর-আফ্রিকায় অবস্থা সঙ্গীন হইয়া উঠে তখন সরকার বুঝিতে পারেন যে এলকোহল কারখানা হইতে প্রয়োজন মত প্রচুর পেট্রোলের অনুকল্প ইন্ধন সরবরাহ করান যাইতে পারে। এই বিষয়ে তৎক্ষণাৎ একটি আলোচনা-সভা আহ্বান করা হয়। পরে সভা এই শ্রেণীর উৎপাদন-ব্যবসায়ীদের কাঁচা মাল ও নানা রকমের প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি সরবরাহের সুবিধা করিয়া দিবার আশ্বাস দেন। যুক্ত প্রদেশ এ বিষয়ে সকলকে ছাড়াইয়া যায়। যুক্ত প্রদেশের সরবরাহ-ক্ষমতা প্রায় ৫০ লক্ষ গ্যালনের কাছাকাছি হইয়া উঠে। যুদ্ধপূর্ব সময়ের ৫০ লক্ষ গ্যালন ব্যয়ের কথা ধরিলে প্রকৃতপক্ষে উৎপাদন-ক্ষমতা প্রায় ১ কোটি গ্যালনেরও বেশী বলিতে হয়।

উল্লেখযোগ্য কথা এই যে, উৎপাদন-ব্যবস্থার প্রত্যেকটি খুঁটিনাটি যন্ত্রপাতি হইতে আরম্ভ করিয়া সকল দ্রব্যাদিই ভারতে প্রস্তুত। যদিও সরকারী ব্যবস্থায় সমস্ত মালপত্র পাওয়া যাইতেছিল তথাপি কিছু কিছু জিনিষপত্র চোরা-বাজার হইতে যোগাড় করিতে হইতেছিল। কিন্তু বর্তমানে এই প্রকারের উৎপাদন-ব্যবস্থা যে অবস্থায় আসিয়া পৌঁছিয়াছে তাহাকে বাঁচাইতে হইলে সরকারী সাহায্য প্রয়োজন।

বর্তমানে সবচেয়ে বেশী প্রয়োজন যথেষ্ট সংখ্যক ট্যাঙ্ক-ওয়াগনের। ট্যাঙ্ক-ওয়াগন কন্ট্রোলার এই ওয়াগনগুলির সরবরাহ-ব্যবস্থা ও তাহার পরিমাণ স্থির করেন। 'লসন-কমিটি' নামে খ্যাত কমিটির যে সভাপতি ওয়াগন সরবরাহের সংখ্যা নির্ধারণ করেন তিনি বার্মাশেলের সহিত স্বার্থজড়িত ব্যক্তি। তাঁহার প্রভাবও যথেষ্ট। বারংবার অনুরোধ সত্ত্বেও যে পরিমাণ ওয়াগণ পাওয়া গিয়াছে তাহাদ্বারা অর্ধেক কাজ পর্যন্ত করা সম্ভব নহে। ফলে ট্যাঙ্ক-ওয়াগনের অভাবে যথেষ্ট পরিমাণে এলকোহল সঞ্চিত অবস্থায় পড়িয়া পচিতেছে। আর একটি সমস্যা এই যে, উপযুক্ত রকমের কয়লার অভাব। গুঁড়া কয়লা ব্যবহারে উৎপাদন-ব্যয় বাড়িয়া যায়। এই সঙ্গে গুড়ের গুণানুসারে শ্রেণী বিভক্ত হওয়াও অবশ্য প্রয়োজন। যুক্তপ্রদেশ-সরকার এই বিষয়ে আইনের ব্যবস্থা করিতেছেন।

চতুর্থত, বর্তমানে এই ব্যবস্থায় ফলে যে পেট্রোল উৎপাদিত হয় তাহার গ্যালন প্রতি খরচ পড়ে দুই টাকা এক আনা, এলকোহল কারখানায় খরচ পড়ে চৌদ্দ আনা, সরবরাহের খরচ ছয় পয়সা, কেন্দ্রীয় আবগারী বিভাগে দেয় বারো আনা, তৈলব্যবসায়ীদের বিক্রয়ের ব্যয় পাঁচ আনা—সর্বশুদ্ধ দুই টাকা এক আনা। কিন্তু পেট্রোলের দাম এক টাকা চৌদ্দ আনা। সুতরাং পাওয়ার-এলকোহলের ব্যয় পেট্রোলের চেয়ে তিন আনা বেশী। তা ছাড়া পেট্রোল অপেক্ষা এলকোহল কতকটা নিকৃষ্ট। এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই যে, উপযুক্ত সাহায্য পাইলে মূল্য কমিয়া যাইবে। স্যর আর্চিবল্ড রোল্যাণ্ডস্ যুক্ত প্রদেশে আগমন করিলে এবিষয়ে বিবেচনা করিবেন বলিয়া যথেষ্ট আশ্বাস দিয়াছিলেন, কিন্তু কাজে কিছুই হয় নাই। যুদ্ধের পর সুবিধার আশায় ব্যবসায়ীরা এই সব কারখানায় প্রায় এক ক্রোর পরিমাণ টাকা ঢালিয়াছিল। যদি ইহাকে ধ্বংস হইতে দেওয়া হয় তবে উদ্বৃত্ত গুড়-ভাণ্ডার যে শুধু নষ্ট হইবে তাহা নহে ইহার সহিত যে ধনসম্পদ ব্যবসায়ব্যপদেশে ব্যয় করা হইয়াছিল, তাহারও অপচয় জাতীয় উন্নতির মূলে আঘাত দিবে। ভারতে প্রকৃতিদত্ত কাঁচামাল কাজে লাগাইতে না পারিলে বহুল পরিমাণে দ্রব্যাদি অব্যবহারে এবং অপব্যবহারে নষ্ট হইবে। এই শ্রেণীর কারখানায় উদ্বৃত্ত গুড় কাজে লাগাইয়া সহজেই ২ লক্ষ গ্যালনের বেশী এলকোহল উৎপাদন করা যাইতে পারে। ইহাতে পেট্রোলের অভাব অনেকটা ঘুচিয়া যায়।

এই শ্রেণীর কারখানাগুলিকে সাহায্য না করা হইলে প্রোডিউসার্স গ্যাসের উপর নির্ভর করিয়া চলিতে হইবে। গ্যাস মোটর ও অন্যান্য যানবাহনের এঞ্জিন যন্ত্রপাতির পক্ষে খুবই ক্ষতিকারক এবং আশঙ্কা হয় বহু মোটর গাড়ী অকর্মণ্য হইয়া যান চলাচলকে ব্যাহত করিবে।

এলকোহল কারখানা যাহাতে সাহায্য না পায় সেদিকে পেট্রোলওয়ালা এবং তাহাদের বড় মুরুব্বী ভারত-সরকারের দৃষ্টি আছে এইজন্য যে পেট্রোলের রেশন উঠিয়া গেলে এলকোহল কারখানাগুলি প্রতিযোগিতা করিবে। এই প্রতিষ্ঠানগুলি তখন বাজারে যথেষ্ট পরিমাণে 'রেক্টিফায়েড স্পিরিট' সরবরাহ করিতে পারে তাহাও ইহাদের এক বড় আশঙ্কা। যুক্ত প্রদেশের গবর্ণমেণ্ট এই নূতন শিল্পটিকে বিলাতী প্রতিযোগিতার হাত হইতে বাঁচাইবার জন্য কতটা সাহায্য করিতে পারেন তাহা বিশেষভাবে লক্ষ্য করিবার বিষয়।

কুড়িগ্রাম শহর স্থানান্তরের প্রস্তাব

মেঘনার ভাঙন হইতে নোয়াখালী জেলার সদর নোয়াখালী শহরটিকে বাঁচাইবার চেষ্টা না করিয়া বাংলা-সরকার কয়েক বৎসর যাবৎ উহার সদর অন্যত্র স্থানান্তরের চেষ্টা করিতেছেন। নদীতীরবর্তী বড় বড় শহর মাঝে মাঝে ভাঙনের মুখে পড়িয়া গেলে উহা বাঁচানো কঠিন হয় সত্য, কিন্তু সেদিকে যতটা চেষ্টা বর্তমান বিজ্ঞানের যুগে সম্ভব তাহাও করা হয় কিনা সন্দেহ। ধরলা নদীর ভাঙনের জন্য বাংলা-সরকার কুড়িগ্রাম হইতে মহকুমা সদর লালমণিরহাটে স্থানান্তরিত করিতে চাহিতেছেন। কুড়িগ্রাম প্রাচীন শহর এবং একটি বৃহৎ বন্দর। লালমণিরহাট একটি রেলওয়ে কলোনি মাত্র। কুড়িগ্রাম

শহরটিকে বাঁচাইবার উপায় থাকিলে তাহাই সর্বাগ্রে করা উচিত।

উপায় যে আছে, বিশিষ্ট সেচ-বিশেষজ্ঞ ইঞ্জিনিয়ার মিঃ কে. বি. রায় তাহা দেখাইয়াছেন। ধরলা এমন শ্রেণীর নদী, পাড় বাঁধাইয়া যাহার ভাঙন অনায়াসেই বন্ধ করা যায়। কুড়িগ্রাম হইতে ২০ মাইল উজানে ধরলার উপর একটি রেলওয়ে পুল আছে। পুল তৈয়রির জন্য নদীর দুই পাড় বাঁধানো হইয়াছে এবং তাহার পর নদীর ভাটিতে ছয়-সাত মাইল পর্যন্ত কোথাও পাড় ভাঙে নাই। কুড়িগ্রামের নিকটে পাড় বাঁধাইলে শহরের ভাঙনও নিশ্চয়ই বন্ধ করা যায়।

পরীক্ষা করিয়া দেখা গিয়াছে যে, দুই পাড়ের মধ্যে সওয়া মাইল ব্যবধান রাখিয়া পাড় বাঁধাইলে সাড়ে ছয় মাইল পর্যন্ত নদীর ভাঙন বন্ধ হইবে। কুড়িগ্রামের নিকট উজান ও ভাটিতে সাড়ে ছয় মাইল ব্যবধানে দুই স্থানে পাড় বাঁধাইলে সহরের নিকট নদীর ভাঙন আর থাকিবে না।

এই কার্যে কত ব্যয় হইবে তাহার হিসাব করাও কঠিন নয়। রেলওয়ে পুলটির পাড় বাঁধাইতে ব্যয় হইয়াছিল ৪,৬৮,৭৫০ টাকা। কুড়িগ্রামকে বাঁচাইবার জন্য দুই স্থানে পাড় বাঁধাইবার ব্যয় পড়িবে নিম্নোক্ত রূপ :

(১) নদীগর্ভের জমির দাম ২৫০ টাকা একর হিসাবে ১৬,৬৪,০০০ টাকা, (২) দুই স্থানে পাড় বাঁধাইবার ব্যয় ১০,০০,০০০ টাকা, (৩) শতকরা ৩ টাকা হারে এই টাকার উপর ১৫ বৎসরের জন্য সুদ ১১,৯০,৮০০ টাকা। মোট ৩৮,৬২,৮০০ টাকা।

গবর্ন্মেণ্ট যদি ধার করিয়াও এই টাকা ব্যয় করেন, তাহা হইলেও তাঁহারা ১৫ বৎসরের মধ্যে সুদে আসলে উহা ফেরৎ পাইবেন এবং তদুপরি আরও কিছু লাভ করিতে পারিবেন। কুড়িগ্রামের নিকট ধরলার দুই পাড়ের দূরত্ব প্রায় দুই মাইল দাঁড়াইয়া গিয়াছে। সাড়ে ছয় মাইল ব্যবধানে দুই স্থানে পাড় বাঁধাইলে এবং উভয় পাড়ের দূরত্ব আধ মাইল থাকিলে নদীগর্ভের অপর অংশ পলি পড়িয়া ১৫ বৎসরের মধ্যে অতি উর্বরা জমিতে পরিণত হইবে। এখন এই জমির দাম ২০০ টাকা একরের বেশী হইবে না, কিন্তু ১৫ বৎসর পর উহার দাম কমপক্ষে হাজার টাকা একর হইবে। এই দামে জমি বেচিয়া ১৫ বৎসর বাদে গবর্ন্মেণ্ট ৬২,৪০,০০০ টাকা সংগ্রহ করিতে পারিবেন। মোট ৬২৪০ একর জমি এইভাবে উদ্ধার হইবে। গবর্ন্মেণ্টেরও লাভ হইবে ২৩,৭৭,২০০ টাকা, জমি বিক্রয় না করিয়া পত্তনি দিলেও গবর্ন্মেণ্ট একর প্রতি দশ টাকা হারে প্রতি বৎসর ৬২,৪০০ টাকা আয় করিতে পারিবেন। এই ব্যবস্থায় কুড়িগ্রাম শহরটিও বাঁচিবে, তা ছাড়া আরও লাভ আছে। কুড়িগ্রামে পুরাতন যে ছোট গজের রেল-লাইন ছিল তাহার স্থলে কিছুদিন হইল মিটার গজ লাইন বসানো হইয়াছে। ইহাতে ৭ লক্ষ টাকা ব্যয় হইয়াছে। সহর স্থানান্তরিত হইলে কুড়িগ্রামের জলুস কমিয়া যাইবে। এই লাইন নূতন করিতে গিয়া যে বিপুল ব্যয় হইয়াছে, তাহা তুলিয়া আনাও কঠিন হইবে। অথচ পাড় বাঁধাইয়া নদীর ভাঙন বন্ধ করিলে এই সহর তো বাঁচিবেই, বাঁধানো পাড়ের নিকট ছোট পণ্টুন প্রভৃতি নির্মাণ করিয়া মাল ও যাত্রী-চলাচলেরও অনেক সুবিধা হইবে।

কলিকাতায় যানবাহন সমস্যা

কলিকাতা শহরের এক স্থান হইতে অন্য স্থানে যাতায়াতের সমস্যা ক্রমশ তীব্র হইতে তীব্রতর হইয়া উঠিতেছে। ট্রামের সংখ্যা সীমাবদ্ধ, একমাত্র বাসের সংখ্যা বৃদ্ধির দ্বারাই এই অবস্থার অনেকটা প্রতিকার অল্প সময়ের মধ্যে করা সম্ভব। কিন্তু বাসের সংখ্যাও যেন কিছুতেই বাড়িতে চাহিতেছে না। ১৮ই শ্রাবণের দৈনিক ভারতে এ বিষয়ে নিম্নোক্ত মন্তব্যটি প্রকাশিত হয়। অমৃতবাজার পত্রিকায়ও এরূপ একটি রিপোর্ট বাহির হয়। ভারতের মন্তব্য এইরূপ :

> বাসওয়ালারা বেশী সংখ্যক বাস পাইলেও সেগুলি যে রাস্তায় চালাইবে ইহার কি কোন নিশ্চয়তা আছে? পুলিস সহায় থাকিলে বাস কিনিয়া উহা ঘরে বসাইয়া রাখিয়াও যে দৈনিক চল্লিশ টাকা রোজগার করিয়া এক বছরে বাসের দামশুদ্ধ তুলিয়া ফেলা যায় সকলে তো ইহা বোঝে না।

আমাদের আশঙ্কা কলিকাতায় এই ব্যাপারই ঘটিতেছে। ১৯৪৫ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে কলিকাতার রাজপথে চালু বাসের সংখ্যা ছিল ৩১২ ; গত এক বৎসরের মধ্যে আরও ২৩৭টি বাস পথ চলিবার পারমিট সহ গবর্ন্মেণ্ট ছাড়িয়া দিয়াছেন। কিন্তু ভিড় যে-কে সেই রহিয়াছে ; কমা তো দূরের কথা, কমিবার কোন লক্ষণও নাই। বাসের সংখ্যা প্রায় দ্বিগুণ হওয়া সত্ত্বেও এই ভীড়ের কারণ কি? ইহার একমাত্র কারণ এই হইতে পারে যে, সবগুলি বাস চলিতেছে না, কতকগুলিকে নিশ্চয়ই ঘরে বসাইয়া রাখা হইয়াছে। রুট অনুসারে প্রত্যেকটি বাস আজকাল দৈনিক আট হইতে দশ গ্যালন পেট্রোল পায়। পেট্রোলের ক্রয়মূল্য দুই টাকা এবং চোরাবাজারে বিক্রয়মূল্য কম পক্ষে ছয় টাকা। সুতরাং পেট্রোলের কুপন বিক্রয় করিয়া ঘরে বসিয়া বিনা ঝামেলায় যদি দৈনিক চল্লিশ টাকা রোজগার করা যায়, তবে কোন্ মূর্খ বাসওয়ালা সবগুলি বাস পথে বাহির করিয়া ড্রাইভার, কণ্ডাক্টার প্রভৃতির বেতন এবং মেরামতি খরচা প্রভৃতির ঝক্কি পোহাইতে যাইবে? একটি মাত্র বাসের কুপন বেচিলে দৈনিক চল্লিশ টাকা, মাসে বারো শত টাকা এবং দশ মাসে বারো হাজার টাকা, অর্থাৎ বাসের দাম উশুল। আমাদের ধারণা ভালভাবে অনুসন্ধান করিলে এই রহস্যই প্রকাশ পাইবে।

কিন্তু অনুসন্ধান করিবে কে? পুলিসের সঙ্গে বাস-ওয়ালা প্রভৃতির বন্ধুত্বের কাহিনী সুবিদিত। মোটর গাড়ীর লাইসেন্স, পেট্রোলের পারমিট এবং বাস, লরী, মোটর গাড়ী প্রভৃতি পরীক্ষা করিয়া উহা ঠিক আছে বলিয়া ছাড়পত্র দানের ক্ষমতা যে বিভাগটির হাতে দেওয়া হইয়াছে সেটি তো সার্জেন্ট ও পুলিসের সোনার খনি। এই বিভাগটির প্রতি সব পুলিসের এত লোলুপ দৃষ্টি আছে যে, সকলকেই কিছুদিন করিয়া সেখানে না রাখিলে নাকি পুলিস বিভাগে শৃঙ্খলা রক্ষাই কঠিন হইয়া ওঠে।

বাসওয়ালাদের বিরুদ্ধে উপরোক্ত অভিযোগ অনুসন্ধানে সত্য বলিয়া প্রতিপন্ন হইলেও পুলিস উহাদিগকে ধরিয়া শাস্তি দানের ব্যবস্থা করিয়া উপরি আয়ের এমন চমৎকার পথটি বন্ধ করিবে এতটা আশা করা নিতান্তই কঠিন। কিন্তু বাংলা-সরকারের স্বরাষ্ট্র-বিভাগে যে যানবাহন উপ-বিভাগটি যুদ্ধের সময় গজাইয়া বর্তমানে স্থায়ী রূপ প্রাপ্ত হইয়াছে এ বিষয়ে তাঁহারাও কি স্বীয় কর্তব্য পালন করিয়াছেন? বাসের সংখ্যা প্রায় দ্বিগুণ বৃদ্ধি করা সত্ত্বেও কেন ভিড় কমিতেছে না, ইহার কারণ অনুসন্ধানের চেষ্টাও তাঁহারা করিয়াছেন কি? পেট্রোলের এই চোরাকারবার বন্ধ করা আদৌ কঠিন নহে।

বাসওয়ালার সংখ্যা খুব বেশী নয়, ইহাদের উপর কড়া নজর অনায়াসেই রাখা যায়। ট্রান্সপোর্ট বিভাগের সিভি-লিয়ান কর্তৃপক্ষ একটু তৎপর হইলেই এই পাপ বন্ধ করিতে পারেন, অবশ্য যদি পুলিস চটাইবার সাহস তাঁহাদের থাকে।

উপরোক্ত পত্রিকাদ্বয়ে এই গুরুতর অভিযোগ প্রকাশিত হইলে তৎসম্বন্ধে বাজেট আলোচনাকালে বঙ্গীয় ব্যবস্থা-পরিষদে মন্ত্রীদের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়। ইহার পর বাস সিণ্ডিকেটের সেক্রেটারীর একটি পত্র অমৃতবাজারে প্রকাশিত হয়। উহাতে তিনি বাসওয়ালাদের হইয়া লিখেন যে, বাসের সংখ্যা সম্বন্ধে উপরোক্ত তথ্য সত্য নহে। যুদ্ধের সময় শহরের ১৬৯টি বাস গবর্মেণ্ট কাড়িয়া লইয়াছিলেন। ইহার মধ্যে কতকগুলির বদলে পুরানো গাড়ী দেওয়া হয় এবং একশতটির অধিক নূতন গাড়ী ঋণ ও ইজারা আইন অনুসারে দিয়া বলা হয় যে ঐগুলিকে গ্যাসের সাহায্যে চালাইতে হইবে। গত বৎসর এক শত উনসত্তরটি নূতন বাস দেওয়া হইয়াছে, দুই শত সাঁইত্রিশটি নয়। তারপর সেক্রেটারী মহাশয় বলিতেছেন যে পারমিট পরীক্ষা করিবার ব্যবস্থা গবর্মেণ্টের আছে। কোন গাড়ী হঠাৎ এক দিন বা দু'দিনের জন্য অচল হইলে তাহার জন্য খবর দিতে হয় না বটে, কিন্তু বেশী দিনের জন্য অচল হইলেই সরকারকে জানাইতে হয় এবং অব্যবহৃত পেট্রোলের কুপন ফিরাইয়া দিতে হয়। তা ছাড়া গ্যারেজের রেজিষ্টার থাকে এবং সেই রেজিষ্টারে গাড়ীর গতিবিধির সমস্ত হিসাব লিখিয়া রাখিতে হয়, গাড়ী কম কেন [illegible] তাহাও লিখিতে হয়। সেক্রেটারী মহাশয়ের মোট বক্তব্য এই যে প্রায় এক শত বাস গ্যাসে চালাইতে হয় বলিয়া ঐগুলি ভালভাবে চালান যায় না, গ্যাসের পরিবর্তে পেট্রোল পাইলে আরও বেশী বার ঐগুলি চালানো যায়।

সিণ্ডিকেটের সেক্রেটারীর বক্তব্যের ফাঁকি ধরা কঠিন নয়। যে এক শত উনসত্তরটি বাস গবর্মেণ্টের প্রয়োজনে লওয়া হইয়াছিল সেগুলি সমস্ত ইতিমধ্যে তাঁহারা ফেরত পাইয়াছেন কি না তাহা তিনি পরিষ্কার করিয়া বলেন নাই। এগুলি এতদিনে ফেরত না পাওয়ার কোন কারণ আছে কিনা আমরা জানি না। তারপর গাড়ী অচল হওয়ার কথা। গাড়ী অচল থাকিতেছে ইহাই মূল অভিযোগ। সেক্রেটারী মহাশয় ইহা অস্বীকার করিতে পারেন নাই। শুধু বলিয়াছেন দুই তিন দিনের জন্য গাড়ী বন্ধ থাকিলে সংবাদ দিতে হয় না। কিন্তু এই দুই তি[ন] দিন কয় দিনের মধ্যে তাহা তিনি বলেন নাই। সপ্তাহে তিন দিন বন্ধ থাকিলে যদি সংবাদ দিতে না হয় তাহা হইলে তো কার্য্যসিদ্ধি হইতে পারে। গ্যারেজ রেজিষ্টার পরীক্ষা পেট্রোলের কুপন ফেরত লওয়া প্রভৃতি ব্যাপারে সরকারী ব্যবস্থার উচ্ছ্বসিত প্রশংসা তিনি করিয়াছেন। কি[ন্তু] কলিকাতা পুলিশের বিশেষতঃ মোটরযান বিভাগের ক[র্ম]চারীদের এবং ট্রাফিক পুলিসের প্রশংসা ইহাদের দোসর ভি[ন্ন] অন্য কোন লোকে বিশ্বাস করিতে রাজি হইবে না। এ[ই] দুই শ্রেণীর পুলিসের কর্তব্যে অবহেলা এবং উৎকোচ গ্র[হণ] প্রবণতা এত ব্যাপক ও গভীর যে এই জ্ঞান প্রায় প্রতি[টি] লোককে তাহার নিজের জীবনের অভিজ্ঞতারূপে অ[র্জন] করিতে হয়। পুলিস সত্য সত্যই সৎ ও কর্তব্যপরায়ণ হই[লে] এই পাপ অনায়াসে বহু পূর্ব্বেই বন্ধ হইতে পারিত।

দক্ষিণ-আফ্রিকায় ভারতীয় বিদ্বেষ

দক্ষিণ-আফ্রিকায় ভারতীয়দের ভূমি অধিকার সঙ্কুচিত ক[রিবার জন্য] যে বিল আনা হইয়াছিল তাহা পাস হইয়াছে এবং তদনুস[ারে] শহর হইতে ভারতীয় বিতাড়ন আরম্ভ হইয়া গিয়াছে। দে[শ-বিদেশে স্মা]টস গবর্মেণ্টের এই অন্যায় কার্য্যের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ হইয়াছে কিন্তু কোন কিছুতেই কর্ণপাত করা নাই। দক্ষিণ-আফ্রিকা প্রবাসী ভারতীয়েরা এই অ[ন্যায়] মানিতে অসম্মত হইয়া উহার বিরুদ্ধে সত্যাগ্রহ সুরু ক[রিয়া]ছেন। নিরস্ত্র নিরুপদ্রব সত্যাগ্রহীদের উপর এমন কি [নারী]দের উপরও নানা ভাবে অন্যায় অত্যাচার করিয়া তথা[কার] শ্বেতাঙ্গ সম্প্রদায় চরম বর্বরতার পরিচয় দান করিতে[ছে।] ভারত-সরকার দক্ষিণ-আফ্রিকা গবর্মেণ্টের এই ক[ার্য্যের] প্রতিবাদ স্বরূপ ঐ দেশের সঙ্গে বাণিজ্য সম্পর্ক ছিন্ন ক[রিয়া] দিয়াছেন। সেখান হইতে কয়লা এবং ওয়াটল গাছের ছ[াল এ] দেশে আমদানী বন্ধ হওয়ায় উহাদের আয়ের একটি প্রধা[ন পথ] সঙ্কুচিত হইয়াছে। চীনাবাদামের তেল রপ্তানী বন্ধ হ[ওয়ায়]

দেখানকার সাবানের কারখানাগুলি অচল হইবার উপক্রম হইয়াছে। দক্ষিণ-আফ্রিকার সহিত সর্বপ্রকার বাণিজ্য সম্পর্ক ছিন্ন করিয়া উহাকে ভাতে মারিবার ব্যবস্থা না করিলে স্মাটস গবর্মেণ্টের চৈতন্য সম্পাদনের আশা নাই ইহা অনায়াসেই বুঝা যায়। শুধু ভারত-সরকার নয়, পৃথিবীর সমস্ত সভ্য দেশেরই ইহাদের সহিত সকল সম্পর্ক ছিন্ন করা উচিত। স্মাটস গবর্মেণ্টের এই কার্য সম্বন্ধে সোভিয়েট রাশিয়ার বিখ্যাত পত্রিকা প্রাভদায় যে মন্তব্য প্রকাশিত হইয়াছে তাহাতে অপর দেশেও এ বিষয়ে কি ভাবে আলোচনা হইতেছে তাহা বোঝা যায়। এই সব আলোচনা সম্মিলিত রাষ্ট্র সঙ্ঘ কর্তৃক কার্যে পরিণত হইলে ইহার ন্যায় অন্যান্য অত্যাচারী দেশগুলিও সাবধান হইবার সুযোগ পাইবে। প্রাভদার মন্তব্য এইরূপ :

"৬০ বৎসর যাবৎ দক্ষিণ-আফ্রিকার ভারতীয়গণকে সামাজিক জীবনের প্রাথমিক অধিকারগুলি হইতে বঞ্চিত রাখা হইয়াছে। স্কুল এবং বিশ্ববিদ্যালয়ে তাহাদের প্রবেশের অধিকার সঙ্কুচিত করা হইয়াছে। সম্প্রতি দক্ষিণ-আফ্রিকা ইউনিয়নের পার্লামেণ্টে যে আইন পাস হইয়াছে তাহাতে ভারতীয়গণের জীবনযাত্রা দুর্বিষহ হইয়া উঠিয়াছে। ভারতীয়গণ সম্পর্কে এই বৈষম্যমূলক আইন পৃথিবীর গণতান্ত্রিক মহলে বিক্ষোভের সৃষ্টি করিয়াছে। ভারতীয় ঔপনিবেশিকগণও তৎপরতার সহিত উক্ত আইনের উত্তর দিতে দ্বিধাবোধ করেন নাই এবং ফলে ব্রিটিশ উপনিবেশ নির্যাতন ভোগ করিতেছে।

একমাত্র ৪ঠা জুলাই তারিখেই ৩ শত ভারতীয়কে জরিমানা করা হইয়াছে। তাঁহারা প্রত্যেকেই জরিমানা দিতে অস্বীকার করিয়াছেন। বর্তমানে তাঁহাদের সকল অস্থাবর সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করিবার হুমকি দেওয়া হইয়াছে।

এত করিয়াও ঔপনিবেশিক কর্তৃপক্ষ সন্তুষ্ট হন নাই। তাঁহারা বিশৃঙ্খলা সৃষ্টির সাহায্য করিতে পারে এইরূপ জনসভার অনুষ্ঠান নিষিদ্ধ করিয়া আইন প্রণয়ন করিয়াছেন। এই আইন এত অস্পষ্ট যে, কর্তৃপক্ষ যে অঞ্চল হইতে ভারতীয়গণকে উচ্ছেদ করিতে চান সেই অঞ্চলে অবস্থান করিয়া বৈষম্যমূলক আইনের নিষ্ক্রিয় প্রতিবাদ করিলেই ভারতীয়গণকে উক্ত আইন অনুসারে যথেচ্ছভাবে কঠোর শাস্তি দেওয়া চলিবে। এই আইন সম্প্রতি কার্যকরী করা হইয়াছে। ইতিমধ্যেই দক্ষিণ-আফ্রিকার বহু ভারতীয়কে, বিশেষ করিয়া সত্যাগ্রহ আন্দোলনের নেতাগণকে, সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত করা হইয়াছে। দণ্ডিত নেতাদের মধ্যে ডাঃ জি. এম. নাইকার, ডাঃ ইউসুফ দাদু, মিঃ এম. ডি. নাইডু, মিঃ সোরাবজী রুস্তমজী প্রভৃতির নাম উল্লেখ করা যাইতে পারে। ডাঃ দাদু হাজতবাসকালে একখানি পত্র লিখিতে সক্ষম হইয়াছিলেন। উক্ত পত্রে তিনি ভারতীয়গণকে দক্ষিণ-আফ্রিকার হিটলার-পন্থী বৈষম্যমূলক অন্যায় আইনের বিরুদ্ধে সংগ্রাম চালাইয়া যাইতে অনুরোধ করিয়াছেন। দক্ষিণ-আফ্রিকার কর্তৃপক্ষ নাৎসী নীতির বাস্তব প্রয়োগ করিতেছেন এবং বৈষম্যমূলক আইন প্রণয়ন দ্বারা হীনতম মনোবৃত্তির পরিচয় দিতেছেন। দক্ষিণ-আফ্রিকার বিভিন্ন শহরে ইউরোপীয়গণ ভারতীয়গণের উপর আক্রমণ চালাইয়াছে। সম্প্রতি তাহারা সত্যাগ্রহী শিবিরে সাদা পোষাকে পাহারারত একজন ভারতীয় কনষ্টেবলকে হত্যা করিয়াছে। এই রাজনৈতিক হত্যাকাণ্ডের ফলে জনসাধারণের মনে নিদারুণ ক্রোধের সঞ্চার হয়। নিহত কনষ্টেবলের শব লইয়া দুই সহস্রাধিক লোকের যে বিরাট মিছিল বাহির হইয়াছিল, তাহাতে ফাসিস্ট সন্ত্রাসবাদ ও বর্ণ-বৈষম্যের বিরুদ্ধে জনগণের তীব্র বিক্ষোভের পরিচয় পাওয়া যায়। সংখ্যালঘু ভারতীয় সম্প্রদায় অবিরাম প্ররোচনা ও গুণ্ডামির মধ্যেও সংগ্রাম চালাইয়া যাইতেছে। ভারতীয় নেতাগণ ঘোষণা করিয়াছেন যে, দমননীতির ফলে আন্দোলন দুর্বল না হইয়া তীব্রতর হইয়া উঠিবে। এদিকে দক্ষিণ-আফ্রিকার স্থানীয় অধিবাসিগণ প্রতিক্রিয়াশীল কর্তৃপক্ষের ইচ্ছার বিরুদ্ধে সংখ্যালঘু ভারতীয় সম্প্রদায়ের প্রতি সহানুভূতি প্রকাশ করিতেছে এবং ফাসিস্টপন্থী বর্ণ-বৈষম্যের ব্যবস্থা প্রয়োগের প্রতিবাদ করিতেছে।"

কারারুদ্ধ সত্যাগ্রহীদের সঙ্গেও বর্বর ব্যবহার করিতে স্মাটস গবর্মেণ্টের বাধে নাই। নাটাল কংগ্রেসের সেক্রেটারী ডারবান হইতে টেলিগ্রাম করিয়া বড়লাটকে জানাইয়াছেন যে "গত ১৫ই জুলাই দশ জন সত্যাগ্রহী এক মাস হইতে তিন মাস পর্যন্ত সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত হয়। গত রাত্রিতে আরও দশ ব্যক্তি শিবিরে প্রবেশ করায় তাহারা অত্য এক মাস হইতে তিন মাস পর্যন্ত সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত হয়। সত্যাগ্রহীদের নূতন নূতন দল রাত্রিকালে শিবির অধিকার করিতেছে। কর্তৃপক্ষ বন্দীদের প্রতি নিষ্ঠুরতার দ্বারা সত্যাগ্রহীদের মনোবল নষ্ট করার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করিতেছেন। ডাঃ দাদু নাইকার, ডাঃ গুনাম এবং মিঃ এম. ডি. নাইডুকেও লেডিস্মিথ নিউকাসল ও মারিজবার্গ জেলে স্থানান্তরিত করা হইয়াছে। স্থানীয় জেলে অপরাপর সত্যাগ্রহীগণের প্রতি সাধারণ অপরাধী অপেক্ষাও কঠোর আচরণ করা হইতেছে। কারারুদ্ধ ৮ জন সত্যাগ্রহী ভারী রেলওয়ে স্লীপার বহন করিতে না পারায় তাহাদিগকে একক্ষণে ২১ দিনের জন্য সামান্য আহার দিয়া রাখা হইয়াছে।"

পৃথিবীতে এই যে ছয় বৎসরব্যাপী প্রলয়কাণ্ড চলিয়া গেল—যাহার মূলে এক দল লোকের জাতি-গরিষ্ঠতার দম্ভ এবং দুর্বলের উপরে সবলের অত্যাচারের অধিকারে বিশ্বাস—তাহার শিক্ষা যে অসভ্য বর্বরদিগের মস্তিষ্কে প্রবেশ করিতে পারে নাই তাহাদের জগতে স্থান কোথায় সে কথা বিচার করিয়া বলিতে হয় না। যেদিন ভারতবর্ষ নিজবলে বলীয়ান হইয়া উঠিয়া দাঁড়াইবে সেদিনই তাহার সন্তানগণ এইরূপ অত্যাচার হইতে রক্ষা পাইবে। তাহার পূর্বে অত কিছু প্রত্যাশা করাই বৃথা। বিদেশে স্মাটস ও দক্ষিণ-আফ্রিকার শ্বেতাঙ্গদিগের স্বরূপ প্রকাশিত হইতেছে ইহা উত্তম, এখন দেখা যাউক ব্রিটিশ গবর্মেণ্টের ও সম্মিলিত রাষ্ট্রসঙ্ঘের এ বিষয়ে চেতনা আসিতে কত দেরি লাগে।

হসন্তের পত্র

শ্রীসুরেশচন্দ্র চক্রবর্তী

প্রশান্ত,

আধুনিক যুগের গণতন্ত্রের বয়স নিতান্ত কম নয়। ফরাসী বিপ্লবের সময় থেকে ধরলেও এর বয়স দেড়শ বছরের কিছু উপরে। গণতন্ত্র আসলে হচ্ছে গুণতন্ত্র। গণতন্ত্রের মধ্যে যে সং-বস্তুটি ও মঙ্গল-ব্যবস্থাটি নিহিত আছে তা এরই মধ্যে এবং সেইজন্যে এ কথা বলা যেতে পারে যে, গণতন্ত্র হচ্ছে গুণতান্ত্রিক। গুণের অবিসংবাদী আদর যেখানে নেই সেখানে গণতন্ত্র অর্থহীন।

এই গণতন্ত্রের আগে ছিল রাজতন্ত্র বা অভিজাততন্ত্র। এই রাজতন্ত্র বা অভিজাততন্ত্র ছিল জন্ম বা শ্রেণীর দ্বারা নিয়মিত। সুতরাং তা গুণতন্ত্রের একেবারেই ধার ধারত না। রাজার ছেলে হয়ে জন্মাতে পারলেই রাজা, অভিজাত শ্রেণীতে জন্মালেই সমাজের নেতা। ফ্রান্সের রাজা চতুর্দশ লুইর মৃত্যুর পর সমাজ-শাসনের ঐ ব্যবস্থার ভিতরের দোষ এমন উৎকট ভাবে প্রকট হয়ে উঠল যে ওর কবলে পড়ে সমাজ বা জাতির অনিবার্যভাবে মৃত্যুর দিকে এগিয়ে যাওয়া ছাড়া আর উপায় রইল না। ঐতিহাসিক কিনা জানি নে তবে গল্প আছে যে রাজা ষোড়শ লুইর সুন্দরী মহিষী মারি আন্‌তোয়ানেত্ (Marie Antoinette) যখন শুনলেন যে দেশের লোক রুটি পাচ্ছে না খেতে, তখন তিনি বলেছিলেন যে, দেশের লোক রুটি পাচ্ছে না, তারা কেক্ খেলেই তো পারে। আর ঐতিহাসিক সত্য এই যে ফুলঁ (Foulon) নামক এক উচ্চপদস্থ ভদ্রলোক, যাঁর বাস্তবের জ্ঞান রাজমহিষীর খাবার টেবিলের কেক্-প্রাচুর্যের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল না, বললেন, রুটি না খেলে দেশের লোক ঘাস খাক্। এই পরিস্থিতিরই প্রতিক্রিয়া-স্বরূপ জাতিকে বাঁচাবার জন্যে সমাজ-বুক থেকে অনিবার্য ভাবে আবির্ভাব ঘটল গণতন্ত্রের। জন্মগত বা কোন বিশেষ শ্রেণীগত ব্যবস্থার দোষ যাতে কোনো কালে প্রবেশ করতে না পারে সেইজন্য এই গণতন্ত্র হ'ল গুণতান্ত্রিক এবং এই যে গুণতান্ত্রিকতা এইটেই হচ্ছে এর কেন্দ্রগত মহাবাণী—সর্বকালের মহাবাণী বললেও অত্যুক্তি হবে না। কেননা এই মহাবাণীটি যে উচ্চতর নীতির দ্বারা নস্যাৎ হয়ে যেতে পারে তা কেউ কোনো দিন আবিষ্কার করতে পারবে না।

কিন্তু উনবিংশ শতাব্দীতে কার্ল মার্ক্স নামে এক জার্মান ইহুদী ভদ্রলোক সাধু উদ্দেশ্য নিয়ে আবির্ভূত হলেন। কিন্তু সাধু উদ্দেশ্য থাকলেই যে সত্য দর্শন হবেই হবে এমন কোনো কথা নেই। এই সাধু উদ্দেশ্যদ্বারা চালিত হয়ে তিনি এক অদ্ভুত মতবাদ প্রচার করলেন—স্রেফ টাকা আনা পাইয়ের উপর ভিত্তি ক'রে তিনি মানব-জন্ম ও মানব-জীবনের এক সংহিতা রচনা করলেন। ঠিক যেমন কেউ কেউ আজ গ্ল্যাণ্ড দিয়ে মানুষের জীবনের প্রকাশকে ব্যাখ্যা করছেন। কিন্তু বলা বাহুল্য মানব-আত্মা সম্পর্কে অর্থনৈতিক ব্যাখ্যাটা চৌদ্দ আনাই মিথ্যা, যে দু' আনা সত্য হবার সম্ভাবনা তার মধ্যেও বহু গোলমাল আছে। বিশ্বমানব একদা নিঃস্ব মানব ছিল। সেইখান থেকেই যাত্রা ক'রে সে আজিকার সুসভ্য সুন্দর সম্পৎশালী সৃষ্টিক্ষম মানুষ হয়েছে। সুতরাং তার উন্নতির পিছনে যে শক্তিই থাক না কেন সেটা স্বর্ণ রৌপ্যের শক্তি নয়। স্থূল ছেড়ে যাঁরা সূক্ষ্মে প্রবেশ করতে পেরেছেন তাঁরাই জানেন যে অর্থনৈতিক সচ্ছলতাই মানুষকে সর্বপ্রকারের দুঃখ কষ্ট থেকে পরিত্রাণ করে না। মানুষের জ্ঞান ও শক্তির উন্মেষের পিছনেও যে রহস্য আছে সেটা অর্থনৈতিক রহস্য নয়। অর্থের সচ্ছলতা একটা নিশ্চিন্ততা দিতে পারে বটে, কিন্তু সেটা পশুজগতের নিশ্চিন্ততা। ঐ নিশ্চিন্ততার মাঝে মানুষের জগৎও যদি সত্যি সত্যিই নিশ্চিন্ত হতে পারত তবে সিংহ ব্যাঘ্রের পরে পৃথিবীর বুকে মানুষের উদয় হবার কোনো তাৎপর্য থাকত না। মানুষের অন্তরলোকে যে আনন্দ-সম্ভার আছে সেই আনন্দ-সম্ভার আহরণের মধ্যেই আছে মানুষের দুঃখের আত্যন্তিক নিবৃত্তি। কিন্তু এই আনন্দ-সম্ভার কোনো অর্থনীতির মধ্যে নেই। কেননা অর্থনীতি হচ্ছে মর্ত্যনীতি। অপর পক্ষে ঐ আনন্দ-সম্ভার হচ্ছে অমৃতলোকের অবদান। মানব-জন্মের এই চরম রহস্য যারা না জানে তারা কখনও মানব-জীবনকে পরম কল্যাণের পথ দেখাতে পারবে না—তাতে প্রতিষ্ঠিত করা তো দূরের কথা।

অবশ্য কার্ল মার্ক্সের অর্থনৈতিক তত্ত্বের একটা কারণ আন্দাজ করা যায়। মার্কস্-সংহিতায় একটা কথা হচ্ছে সাম্যবাদ। এখন টাকা আনা পাইয়ের উপর মানব-জীবনকে দাঁড় করাতে না পারলে সাম্যবাদ প্রচার সহজ হয় না। কেননা মানুষে মানুষে পার্থক্য কেবল টাকা আনা পাইয়ের জন্য এটা যদি মানি তবেই বলতে পারি যে সবার টাকা আনা পাই সমান হলে সব মানুষও সমান হয়ে উঠবে। এমন সব তত্ত্ব কেবলমাত্র তাঁরাই প্রচার করতে পারেন মানব-জীবনের কোনো নিগূঢ় রহস্যই যাঁদের কাছে প্রকাশিত হয় নি, আর একমাত্র তাঁরাই মানতে পারেন যাদের কাছে অধ্যাত্মলোকের রহস্য-দ্বার কড়ে আঙুল

গলাবার মতোও ফাঁক হয় নি। মানুষের জ্ঞান শক্তি আনন্দ যে তার ব্যাঙ্ক ব্যাল্যান্সের উপর নির্ভর করে না, এটা এত স্পষ্ট ব্যাপার, যে, এ নিয়ে কোনো তর্কই উঠতে পারে না। জটিল সুসভ্য মানব-সমাজ, তার চাইতেও জটিল মানব-মন, এ সবের সকল সমস্যার শেষ সমাধান নিহিত আছে কেবলমাত্র একটু টাকা আনা পাইয়ের সহজ হিসাবের মধ্যে—এ কথা যেমন আরামের তেমনি প্রচণ্ডতম বিস্ময়ের। আহা সত্যিই যদি তাই হ'ত! মানব-সমাজের ব্যাপারটা তবে কি সহজই না হয়ে উঠত!

সে যা হোক্ পূর্বেই বলেছি যে গণতন্ত্র হচ্ছে আসলে গুণতান্ত্রিক এবং এর মধ্যেই এর সকল কল্যাণ নিহিত। কিন্তু আজ সাম্যবাদ এই গণতন্ত্রের সঙ্গে মিলিত হয়ে এর ভিতরকার মহাবাণীকে ব্যাহত করবার চেষ্টা করছে। কেননা সাম্যবাদের ঔদ্ধত্য যেখানে অনধিকারীর কোলাহল তুলেছে সেখানে গুণাগুণের হিসাবটা অস্পষ্ট হয়ে উঠবার সুবৃহৎ সম্ভাবনা। অবশ্য এ কথা নিশ্চিত জানি যে বাস্তব ক্ষেত্রে ঐ সাম্যবাদ কোনোদিনও চলবে না। হাতে-কলমে কাজ করতে গেলেই ও তত্ত্বের ভিতরকার গলদ পূর্ণভাবে প্রকট হয়ে পড়বে। তবে এ কথাও ঠিক যে ও তত্ত্ব আজ আমাদের অনেকেরই মন অধিকার করেছে এবং ওর গলদটা কেউ বুঝেই শিখবে, কেউ দেখে শিখবে আর কাউকে ঠেকে শিখতে হবে।

একালে একটা মস্ত বাজারে গুজব রটেছে এই যে, লেনিন রাশিয়াতে পূর্ণ গণতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। কথাটা ডাহা মিথ্যা। লেনিন প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন মজুরতন্ত্র—অন্ততঃ করতে চেয়েছিলেন। আর মজুরতন্ত্র অভিজাততন্ত্রেরই অপর পিঠ। অভিজাততন্ত্রের মতোই মজুরতন্ত্রও একটা বিশেষ শ্রেণীতে আবদ্ধ। অভিজাত তন্ত্রের ভিতরের কথাটা মোটামুটি এই যে সমাজ শাসন করবে ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়ের মিলিত সঙ্ঘ আর মজুরতন্ত্রের ভিতরে মোটামুটি কথাটা এই যে ও কর্তব্য করবে বৈশ্য ও শূদ্রে মিলে। এ দুই ব্যবস্থাই খণ্ডিত। কিন্তু গণতন্ত্রের ব্যাপার যেমন এক দিকে গুণতান্ত্রিক তেমনি অন্য দিকে সমগ্রকে নিয়ে। তাই প্রকৃত গণতন্ত্র বলে, বংশ কুল শ্রেণী বুঝি নে—যেখানে গুণ-যোগ্যতা-প্রতিভা দেখব সেখানেই আমার আদর। গুণীর আদর করা মানেই হচ্ছে তাকে সাধারণের থেকে পৃথক ক'রে দেখা, বিশেষ ক'রে দেখা। সুতরাং সাম্যবাদ এখানে যেমন মিথ্যা তেমনি অচল। সুতরাং প্রকৃত গণতন্ত্র ও সাম্যবাদ দুটো স্বতঃবিরোধী তত্ত্ব; বলা বাহুল্য যে সমাজ গুণের আদর করতে জানে না—কথায় এবং কাজে, তত্ত্বে এবং বাস্তবে—সে সমাজের ধ্বংস অনিবার্য। সুতরাং যে গণতন্ত্র খণ্ডিত এবং গুণতান্ত্রিক নয়, সে গণতন্ত্র অভিজাততন্ত্রের মতোই অকল্যাণের বীজকে বুকে ক'রে আছে—সুযোগ পেলেই তা অঙ্কুরিত হয়ে উঠবে। মনে রেখো, সবাই সমান আর সবাই সমান হলে ভাল হয় কিম্বা সবাই সমান হবে আশা করি—এগুলো এক কথা নয়। সবাই সমান হয়ে উঠুক এই শুভ ইচ্ছা তুমি প্রাণ ভরে করতে পার। তবে মনে রেখো, উপরের দিকে উঠে সবাই সমান হলে সেটা আনন্দেরই কথা। কিন্তু নিচের দিকে নেমে সবাই সমান হবে—এটা মানবতার বাণীও নয় এবং বিবর্তনবাদের গূঢ় তত্ত্বও নয়। এর মধ্যে আছে মানব-আত্মার স্পষ্ট পরাজয়। Quality vs. Quantity—গুণ বনাম সংখ্যা এই তর্কের মধ্যে আত্মার রাজ্য চিরকাল ঝুঁকে আছে গুণের দিকে।

কিন্তু মনে হচ্ছে যেন আজ এই সাম্যলোভী গণতন্ত্র সাংসারিক ব্যাপার থেকে সাহিত্যিক ব্যাপারে নিজেকে উন্নীত করবার চেষ্টা করছে—অর্থাৎ রাজনৈতিক রাজ্য থেকে মানুষের চিন্তা ও রূপ-রসের রাজ্যে রাজত্ব বিস্তার করতে হাত বাড়িয়েছে। ব্যাপারটা যেন কতকটা মানুষের দৈনন্দিন বাজার-খরচের হিসাব দিয়ে তার আনন্দ-সত্তার তত্ত্ব নিরূপণের চেষ্টা। এটা এত স্পষ্ট এবং এত বড় একটা অদ্ভুত কাণ্ড যে অনুপাত-জ্ঞান, যথাযথ মূল্য-বোধ, মনুষ্যত্বের ঠিকানা সব যুগপৎ একসঙ্গে না হারালে কেউ ও ব্যাপারে জিন্দাবাদ উচ্চারণ করতে পারে না। ও ব্যাপার সত্য হয়ে উঠলে মানব-সভ্যতা যে বরবাদ হবে সে সম্বন্ধে কোন ভুল নেই। কেননা মানবীয় সভ্যতার আসল হিসাবটা হচ্ছে আনন্দের হিসাব—বাজার-খরচের হিসাব কদাপি নয়। কেননা এই সৃষ্টির সবকিছুই আনন্দ থেকেই জন্মেছে, আনন্দের দ্বারাই বেঁচে আছে এবং আনন্দেই প্রত্যাগমন করছে। ঔপনিষদিক ঋষিদের এই যে নিগূঢ়তম দর্শন, এই যে পরম সত্যের উপলব্ধি, পৃথিবীর আর কোনো দেশের লোক এই দর্শন এই উপলব্ধির অধিকারী হয় নি এত বড় আনন্দের সংবাদ অন্য কোন দেশের মহাজনরা বহন করেন নি। সারা বিশ্বে ছড়িয়ে-থাকা এই আনন্দ পূর্ণতম গভীরতম সংহততম অবস্থায় ব্রহ্মে বা ঈশ্বরে বিরাজিত—এই আনন্দের কিছু অংশকে আশ্রয় করে জন্ম হয় সাহিত্য ও শিল্পকলার। এই কারণে ব্রহ্মানন্দ রস এবং সাহিত্য ও শিল্পকলার আনন্দ-রসকে এক গোত্রীয় বলা যায়। ও দুইই আপনার অহৈতুকী আনন্দ-রসে দীপ্যমান ও দীপ্তিমান।

কিন্তু আমি যদি ম্যালেরিয়াতে ভুগি এবং ব্রহ্ম আমার সেই ম্যালেরিয়া সারিয়ে দিয়ে যান তবে যেমন ব্রহ্মকে ম্যালেরিয়ার চিকিৎসক রূপে জানলেই তাঁকে শ্রেষ্ঠরূপে জানা হয় না, তেমনি সাহিত্য ও শিল্পকলা যদি রাজনৈতিক

বা সমাজনৈতিক সভায় সভাপতিত্ব করে বা অর্থনৈতিক বাজারে দালালী সুরু করে দেয় তবে সাহিত্য ও শিল্পকলার শ্রেষ্ঠ রূপটি পাওয়া হয় না। ব্রহ্মের দান করবার ক্ষমতা ম্যালেরিয়ানাশক বড়ির চাইতে অনেক অনেক গুণ বেশী এবং সাহিত্য ও শিল্পকলার কাছ থেকে আদায়ী বস্তু ডলার বা ব্যবস্থাপক সভায় উপস্থাপিত সমাজ-সংস্কারক বিলের চাইতে বহুগুণে শ্রেষ্ঠ। ব্রহ্মকে ম্যালেরিয়া রোগীর চিকিৎসকরূপে জেনে এবং সাহিত্য ও শিল্পকলাকে জমা-খরচের হিসাব-রক্ষকরূপে পেয়ে হৃষ্ট হওয়া কতকটা হীরককে কাঁচ ঠাউরে উল্লসিত হওয়ার মত। মানুষের আত্মার সামর্থ্য যখন খুব নিচু পরদায় নেমে আসে তখন সে নিচুকে উঁচু স্থানে বসিয়ে আপনার আত্মসম্মান বজায় রাখে। দুর্বল যারা তারাই প্রয়োজনকে পরম বলে জানে। কিন্তু শক্তিমানের মানদণ্ড ভিন্ন ধরণের, সে প্রয়োজনকে সহজেই অতিক্রম করে আনন্দলোকের সন্ধান করতে পারে। যে মহাজন মানুষের জীবনকে অমৃতত্বে পূর্ণ করতে পারেন তাঁর কাছ থেকে মাত্র অ্যান্টি-ম্যালেরিয়াল টনিক্‌ আশা করা কিম্বা যে বিষয় সংসাররূপ বিষবৃক্ষের বিষাক্ত ছায়ায় কাব্যরূপ অমৃত ফলের স্বাদ দিতে পারে তার কাছ থেকে মাত্র জমা-খরচের হিসাব আদায় করা বুদ্ধিমানের কাজ নয় এবং শক্তিমানের ধর্ম নয় অপিচ কীর্তিমানের বৃত্তি নয়।

অবশ্য আমি জমা-খরচকে অবজ্ঞা করছি নে, জমা-খরচের হিসাবও রাখতে হবে কিন্তু সেটা খাজাঞ্চিখানায়, সাহিত্যের আসরে বা কাব্যের বাসরে নয়। জমা খরচের কবিতা শুভঙ্করীতেই শুভ—সাহিত্য সভায় বা কাব্যের বৈঠকে তা প্রলয়ঙ্কর ব্যাপার—এমনকি সেটাকে কেলেঙ্কারী ব্যাপারও বলতে পার।

কিন্তু বলছিলাম সাহিত্য সম্পর্কে গণতন্ত্রের কথা। সাহিত্যেও গণতন্ত্র আছে। কেননা এখানে যাঁর পায়ের ধুলো নি তিনিও যদি কোন বেফাঁস কথা ব'লে ফেলেন তবে তাঁর বিরুদ্ধ সমালোচনা করার অধিকার আছে। এইখানেই সাহিত্যের আসল গণতন্ত্র। এখানে সম্রাট্‌ ও সামন্ত এক তরীতে, এমনকি বাদশা ও বান্দাও এক বজরায়—এখানে কাউকে কারো বলবার রীতি নেই—

ঠাঁই নাই ঠাঁই নাই ছোট এ তরী,
আমারি খ্যাতির ধানে গিয়েছে ভরি'।

নইলে সাহিত্যের গণতন্ত্র মানে এ নয় যে তার আসনখানি নিয়ে গিয়ে পাততে হবে বটতলাতে, যাতে করে ঐ অঞ্চলের ছিদাম মুদি, রতা নাপিত, সুবল ধোপা প্রমুখ সুধীবৃন্দ বিড়ি টান্‌তে টান্‌তে অসঙ্কোচে এসে সেই আসনের কাছ ঘেঁসে বসে যেতে পারে। বৃহৎকে ক্ষুদ্র করা, গভীরকে হালকা করা, সুউচ্চকে বামন করা সাহিত্যের ধর্ম নয়। সামান্যকে অসামান্য করা সাহিত্যের কীর্তি, অসামান্যকে সামান্য করা নয়।

ছিদাম মুদি প্রমুখ অশিক্ষিত বা অর্ধশিক্ষিত ব্যক্তিদের বোধগম্যতার সংকীর্ণ গণ্ডির মাপে যদি সাহিত্য রচনা করতে হ'ত তবে কোনোদিন কোনো কবি

এক বিন্দু নয়নের জল
কালের কপোলতলে শুভ্র সমুজ্জল
এ তাজমহল

এমন কথা লিখতে পারতেন না। কেননা তাজমহলের মত একটা সুবৃহৎ ইমারতকে যে কোন মানুষ কি ক'রে এক বিন্দু নয়নের জল বলে ভাবতে পারে, কেবল তাই নয়, ভেবে একটা বিপুল সুখ পায় এবং মানব-সমাজে এমন বহু ব্যক্তি আছেন যাঁরা ঐ কথা শুনে কেবল যে সুখ পান তাই নয়, তাঁদের শরীর রোমাঞ্চিত হয়—এ-সব ব্যাপার যে কোন্‌ যাদুবিদ্যার বলে ঘটে থাকে তার হদিস ছিদাম মুদিদের কাছে চিরকালই একটা রহস্য থেকে যেতে বাধ্য—অর্থাৎ যত দিন তাদের বর্তমান মন বুদ্ধি চিত্ত বিদ্যমান থাকবে। সাহিত্যে যাঁরা এই ধরণের গণতন্ত্রের আদর্শের কথা বলেন তাঁরা আসলে হচ্ছেন শূদ্রধর্মী। এইখানে একটা কথা বলে রাখি। শূদ্রকে অবজ্ঞা না করেও তার স্থান নির্দেশ করা যায়। শূদ্র হচ্ছে তামসিকতার প্রতীক। তার আত্মায় সেই শক্তি জাগ্রত হয় নি যে শক্তির গতি উর্ধ্ব দিকে—যে শক্তি ক্ষুদ্র থেকে বৃহতে, তুচ্ছ থেকে মহতে, স্থূল থেকে সূক্ষ্মে ক্রমাগত যেতে চাচ্ছে—যা একটা বৃহত্তর আনন্দলোকের সন্ধানে ফিরছে। মানব নামক সম্পাক্ত প্রতিজ্ঞাটির মধ্যে যে একটা চিরন্তনের গতি আছে স্বল্প থেকে ভূমার দিকে, শূদ্রের মধ্যে সেই গতি গতিশীল হয় নি। শূদ্রের দেহই নড়ে, কিন্তু মন নড়ে না। তাই শূদ্র হচ্ছে তামসধর্মী। তাই শূদ্র চায় সব কিছুকেই টেনে আপনার স্তরে নামিয়ে আনতে—আত্মশক্তিতে নিজেকে উচ্চতর স্তরে উন্নীত করতে নয়। কিন্তু মানবের মানবত্ব শেষ বিশ্লেষণে শূদ্রত্ব নয়, দেবত্ব। কেননা তার অন্তরাত্মায় যে শক্তি আছে সে শক্তির সাজাত্য মাটির সঙ্গে নয়, আকাশের সঙ্গে। সে শক্তি অগ্নিধর্মী, উর্ধ্বদিকে যার গতি—সলিলধর্মী নয়, নিচু দিকে ছাড়া যা চলতে পারে না।

শূদ্রের—এবং আর সবারও—অন্নবস্ত্রের সুচারু ব্যবস্থা খুব ভাল কথা। সেটা সমাজপতিদের পরিদর্শনীয়। অন্নং ন নিন্দ্যাৎ—অন্নের নিন্দা করবে না। অন্নং বহু কুর্বীত—বহু অন্ন অর্জন করবে। সেটা বৈশ্যদের অবশ্য-করণীয় কর্ম। কিন্তু তার চাইতে চিরকালের বড় কথা শূদ্রের—এবং আর সবারও—আত্মার উদ্বোধন—তার আত্মার শক্তিকে জাগ্রত করা; ক্ষুদ্র থেকে বৃহতে, তুচ্ছ থেকে মহতে, স্থূল থেকে

স্বর্গে যাবার যে গতির কথা পূর্বে বলেছি তার মধ্যে সেই গতি ক্রিয়াশীল হওয়া, এবং তা হবার সম্ভাবনা তত বেশি বেড়ে যাবে যত বেশি হবে সমাজ উচ্চতর চিন্তা ভাব রসানুভূতি ইত্যাদির নিকেতন—যত বেশি তাদের আসবার সম্ভাবনা থাকবে ওই সবের সংস্পর্শে—যত তারা বাস করতে পারবে একটা উচ্চতর লোকের আবহাওয়ায়। বলা বাহুল্য উৎকৃষ্ট সাহিত্য ও শিল্পকলাই এই আবহাওয়া সৃষ্টি করতে পারে, ওই বিভব দিতে পারে। মানুষের সভ্যতা অন্নবস্ত্রে এসে শেষ হয় নি, ঐখান থেকে সুরু হয়েছে মাত্র।

সুতরাং যাঁরা সাহিত্যকে বটতলায় বসিয়ে তার কানে আধপোড়া বিড়ি গুঁজে দিয়ে মনে করছেন যে জনগণের তথা বিশ্বমানবের তাঁরা একটা মহৎ উপকার করলেন, তাঁদের উপকার করবার ইচ্ছা আজ যেমন উদ্‌গ্রীব, জ্ঞানদৃষ্টি তেমন স্বচ্ছ নয়—এবং উপকার করবার সামর্থ্যও তেমন বিরাট নয়। যাঁরা মানুষকে তাঁর প্রাথমিক প্রয়োজনের মাপকাঠিতে মেপে তাকে সেইখানেই বসিয়ে রাখতে চান তাঁরা আসলে হচ্ছেন ঐ তামসধর্মী শূদ্র। মার্ক্সিজ্‌ম্‌, কমিউনিজ্‌ম্‌, সাম্যবাদ, গণ-সাহিত্যবাদ এ সবের পিছনে কাজ করছে ঐ শূদ্রত্বের তামসিকতা। যে শূদ্রত্ব বলে মাটির সঙ্গেই আমার চিরকালের আত্মীয়তা, দেহের তোয়াজেই আমার সকল সমস্যার শেষ। গদ্য কবিতার প্রতি অত্যধিক প্রবণতা থেকে আরম্ভ ক'রে নিরীশ্বরবাদের সমস্যাহীন জিজ্ঞাসাহীন জীবন পর্যন্ত, এ সমস্তের পিছনে রয়েছে শূদ্রধর্মের স্থূলের জন্ম আকৃতি। মানুষের সুন্দরবোধকে, তার সুন্দরবোধের জগৎকে ধ্বংস করতে না পারলে মানব জাতির স্থূল প্রয়োজনের ব্যবস্থা সুচারুরূপে নির্বাহ হবে না—এটা হচ্ছে ঘোর উন্মাদের প্রলাপ বাক্য। এই প্রলাপ বাক্যই আজ মানব-সভ্যতাকে অধিকার করে বসতে চাচ্ছে। এবং আশ্চর্য্য এই যে, তাতে বহুলোক উল্লসিত হয়ে উঠেছেন। আত্মার মৃত্যু এঁদের কাছে উল্লাসের ব্যাপার হয়ে উঠেছে—পাগলের যেমন নৌকা ডুবিয়ে উল্লাস। কিন্তু মানুষের শেষ বিরামের স্থান বা পরম আরামের স্থান স্থূল জগতের কোথাও নেই—সেটা আছে অন্তরে। মানুষের মধ্যে যে চৈতন্য আছে তা আপনার উৎসেরই অনুসন্ধান করছে—অনুসন্ধান করছে একটা চরম রসলোকের একটা পরম আনন্দলোকের যার ভৌগোলিক স্থিতি স্থূল জগতের কোথাও নেই। গ্র্যাণ্ড হোটেলের ডিনারের সঙ্গে রোল্‌স্‌ রয়েস্‌ কার জুড়ে দিলেও এর সন্ধান মেলে না। মানুষের খাদ্যের অনুসন্ধান যেমন দুর্নিবার এই অনুসন্ধানও তার চাইতে কম দুর্নিবার নয়। এই হিসাব যাঁরা ভুলেছেন পরম সত্তাকেই তাঁরা ভুলেছেন। জৈবধর্ম মানুষের মর্ত্ত্যের ধর্মমাত্র, কিন্তু মানুষের আত্মা অমর্ত্ত্যের অধিকারী। এ কথা যাঁরা বিস্মৃত হন তাঁরা মানব-জাতির পরম বিভবকেই বিস্মৃত হন।

সুতরাং সাম্যবাদী গণ-সাহিত্যবাদী—সাহিত্যিক যখন উৎসাহিত হয়ে এমন কথা লেখেন—

> আমি কবি ভাই কামারের আর কাঁসারীর
> আর ছুতোরের মুটে মজুরের
> —আমি কবি যত ইতরের—

তখন আমি উল্লসিত হয়ে উঠি নে। কেননা নিশ্চিত জানি কবি যদি ছুতোর কামারের কবি হয়ে ওঠেন ও তাদেরই বোধগম্যতার সীমানার ভিতরে কবিতা রচনা করতে থাকেন তবে তা দিয়ে মানব-জাতির কাব্যলোক বিশেষ উজ্জ্বল হয়ে উঠবে না। অপর পক্ষে তাতে করে যে ছুতোর কামারদের সাংসারিক জীবন উন্নত হয়ে উঠবে তাও নয়।

কিন্তু আসলে কোনো বড় কবিই তাঁর অসামান্য কবি-প্রতিভাকে অস্বীকার করে তাঁর লেখনীকে অশিক্ষিত বা অর্ধশিক্ষিত মানুষদের বোধগম্যতার সীমানায় আবদ্ধ রাখতে পারেন না, ইচ্ছা করলেও পারেন না—যেমন পারেন না বুদ্ধিমান ব্যক্তি বোকার মতো আচরণ করতে। প্রতিভাবান কবির পক্ষে পদ্যকার হওয়া তেমনি কষ্টকর, পদ্যকারের পক্ষে উচ্চদরের কবিতা রচনা যেমন অসাধ্য। যিনি যা তাঁর সেই রকমই প্রকাশ হয়—প্রকাশ হতে বাধ্য। প্রতিভা-প্রদীপ্ত কবির চিত্ত একটা রসলোকের, একটা আনন্দরাজ্যের অনুভূতি পায়, তাঁর কলমের মুখে এই রাজ্যেরই প্রকাশ হবে। কবির চোখ একটা জগতের সন্ধান পায়, সে-জগতের ভৌগোলিক স্থিতিটা সমাজনৈতিক, রাজনৈতিক বা অর্থনৈতিক জগতের কোথাও নয়—সে জগৎ যেমন রাজা মহারাজা বা নবাব নাইটের নয়, তেমনি কামার কাঁসারী বা ছুতোর মজুরেরও নয়।

আসলে কাব্য কাব্যই—তার একটা আপন রাজ্য, আপন সত্তা, আপন ধর্ম আছে। এই ধর্মপালনেই তার অস্তিত্ব তার সাফল্য। এই হচ্ছে কাব্যের আসল ও শ্রেষ্ঠ পরিচয়—তা কোনো বাদ বা "ইজম্‌"-এর লেজুড় বা আনুষঙ্গিক ব্যাপার নয়। সামাজিক কোনো বিপর্যয়েই কাব্য-ধর্মের মূল তত্ত্বে কোন বিপর্যয় ঘটে না, কেননা বিষয়টা সমাজোত্তর। সমাজের সুখ দুঃখের মাটি থেকে যে রস আহরণ করে কিম্বা কল্পলোকের আলোর রাজ্য থেকে আলোর দীপ্তি নিয়ে কবি-মন কাব্যে যে রূপ রস ও আনন্দের সৃষ্টি করে তা সমাজ-দেহের কোনোখানেই নেই। সারা পৃথিবী জুড়ে যদি আজ বন্যা মহামারী ঝড় ঝঞ্ঝা উল্কাপাত সুরু হয়ে যায় তবু কাব্যের রূপ রস আর

গন্ধের মধ্যে কোনো প্রলয় কাণ্ড ঘটবার কারণ ঘটে না, কেননা ব্যাপারটা প্রাকৃতিক সকল দুর্যোগকে অতিক্রম করে সর্ব কালের মধ্যে রয়েছে। সমাজের বিপর্যয়ে আমাদের মনে বিপর্যয় ঘটে বটে। আমাদের এই বিপর্যস্ত মনই তখন এমন সব কথা বলতে থাকে এমন সব ইডিয়লজির আবিষ্কার করে যা প্রকৃতিস্থ লোকের দ্বারা কদাপি সম্ভব নয়, এবং যে-সব না সত্য না শিব।

মানুষের প্রতিদিনের বিক্ষুব্ধ জীবন-যাত্রার অন্তরালে তার গভীরতর চেতনায় যে একটা প্রবহমান সুর, একটা দীপ্তিমান স্বপ্ন আছে সেই সুর ও স্বপ্নকে ঘিরে যে একটা চিত্ত-চমৎকারী আনন্দ-রস বাক্যে বর্ণে নৃত্যে সঙ্গীতে অভিব্যক্ত হচ্ছে বা অভিব্যক্ত হতে চাচ্ছে সেই আনন্দ-রসকে যদি আজ খাকী শার্ট ও হাফ-হাতা শার্ট পরে ওমনিবাসের ষ্টিয়ারিং হুইল ধরে বসতে হয় জনগণের হাট বাজার করবার সুবিধার জন্যে, তবে সেটাকে আর যাই বলা যাক না কেন মানব-সভ্যতার প্রগতি বলা যায় না। মানব-সভ্যতার প্রগতির আসল হিসাবটা স্থূলের হিসাব নয়, সেটা সূক্ষ্মের হিসাব। মোটর গাড়ীটা যে মানব-সভ্যতার প্রগতির পরিচয় সেটা জড় মোটর গাড়ীর জন্যে নয়, সেটা এইজন্যে যে মানুষের ধারালো বুদ্ধি ওটাকে আবিষ্কার করতে পেরেছে—কিম্বা ব্যাপারটাকে আরো সূক্ষ্ম তত্ত্বে পরিণত করে বলি যে, ওটা মানব-সভ্যতার প্রগতির পরিচয়, কেননা ওটা এই সত্য জ্ঞাপন করছে যে, মানুষের বোধি বা ইনটুইশান বিশ্ব-প্রকৃতির রহস্যের অন্তরে আরো খানিকটা প্রবেশ করতে পেরেছে। কাব্য আমাদের নিয়ে যায় বাহির থেকে অন্তরে, স্থূল থেকে সূক্ষ্মে, বুদ্ধি থেকে বোধিতে, বস্তু থেকে রসে। তাই কাব্য মানব-জাতির প্রগতির একটা মহা পরিচয়। সুতরাং কাব্যকে তার আপন ধর্ম থেকে বিচ্যুত করলে মানব-সভ্যতারই বিচ্যুতি ঘটবে।

এই সব কথাই গভীর ভাবে অনুধাবন করে দেখলে তুমি স্পষ্ট বুঝতে পারবে যে "আমি কবি ভাই কামারের" ইত্যাদি ছত্রগুলির বিশেষ কোনো সমীচীন মানে হয় না। কিন্তু সমীচীন কোনো মানে না হলেও, ওর পিছনের মতলবটা বোঝা কঠিন নয়। লেখক পৃথিবীর দুর্গতদের দুর্গতি দেখে ব্যথিত হয়ে উঠেছেন এবং তাঁদের পক্ষ হয়ে একটা কিছু করে ফেলবার জন্যে ব্যাকুল হয়ে উঠেছেন। দুর্গতদের দুর্গতিতে ব্যাকুল হওয়া খুব ভাল কথা। কিন্তু বুদ্ধিমানের মতো ব্যথিত হওয়া আরো ভাল। দুর্গতদের দুর্গতি মোচনের আসল উপায় খারাপ কবিতা লেখা নয়, বা আম ও আমড়াকে সমান জ্ঞান করা নয় কিম্বা মাত্র পৃথিবীটাকে মানুষের বিশ্ব মনে করা নয়। দেবী বীণাপাণির হাত থেকে বীণা ও পুস্তক কেড়ে নিয়ে লাঙল ও 'তাউচার' তুলে দিলে সকল সমস্যার সমাধান হবে না। আসলে দুর্গতদের দুর্গতি মোচনের পদ্ধতি ও কৌশল অন্য রকমের। এই দিক থেকে রুশ কবি মায়াকভস্কির (যাঁর অনুকরণেই সম্ভবতঃ বাংলা ঐ ছত্র কটি লেখা) এই যে কথা—

যুযুৎসু শ্রমিক

*   *   *

আমার মুখের শক্তি সবি তোমাদের—

এর একটু সুষ্ঠু অর্থ পাওয়া যায়। কবি এখানে তাঁর মুখের অর্থাৎ কলমের শক্তিকে নিয়োজিত করতে চান শ্রমিকদের কাজে, যে কাজ শ্রমিকদের সাধ্যের মধ্যে নেই। তিনি মূক শ্রমিকদের সপক্ষে হয়ে উঠতে চান বক্তা প্রচারক কর্মী। শ্রমিকদের পক্ষে ওকালতনামা গ্রহণ করবার পর তিনি নিশ্চয়ই এমন কথা ভাবছেন না—

রচিব গো মধুচক্র গুঞ্জন যাহে
আনন্দে করিবে পান সুধা নিরবধি—

আর ভাবলেই তা সফল হবে না—কেননা ও কার্যের জগৎ আলাদা, কৌশল আলাদা, মন আলাদা। মানুষের দেহের অন্নের ব্যবস্থা ও মনের বস্তুহীন আনন্দের ব্যবস্থা একই স্থানে দাঁড়িয়ে করা যায় না। বাঁশটা যখন বাঁশীই হয়ে ওঠে তখন সেটা গৃহস্থালীর কোনো কাজে লাগে না, কিন্তু এক অজ্ঞাত আনন্দ লোক তার বুকে বাসা বাঁধে। এই আনন্দ লোকের মানে ও মর্যাদা বিস্মৃত হওয়া মানুষের আপনাকেই বিস্মৃত হওয়া। কার্যক্ষেত্রের কৌশলটাকে যদি কাব্যক্ষেত্রের কৌশল বলে মনে করি তবে খনিত্র দিয়ে ক্ষৌরকার্য করবার মত অবস্থা দাঁড়ায়।

কিন্তু "আমি কবি ভাই কামারের আর কাঁসারীর" এই রকমের অসত্য দর্শন ও অসত্য ভাষণ দিয়ে দেশের আকাশ বাতাস আজ ভারাক্রান্ত হয়ে উঠল, এবং এই সকল অসত্য কথাও চিন্তার সঙ্গে যে একটা শুভ ইচ্ছা জড়িয়ে আছে সেই শুভ ইচ্ছার জোরে সে সব বহুলোকের মন প্রাণ চিত্ত অধিকার করে বসেছে। ঠিক ঐ কারণে এই সব অসত্য বেশী মারাত্মক। কেননা এর পিছনের শুভ ইচ্ছাটা আমাদের দৃষ্টি এমন ভাবে আকৃষ্ট করে রাখে যে এর অসত্যতা আর আমাদের চোখে পড়ে না। এই সব অসত্যের বিষবাষ্পে আজ দেশের বহু তরুণ-তরুণীর মননক্রিয়ার যন্ত্র পঙ্গু হয়ে উঠবার উপক্রম করেছে—আশঙ্কা, মন তাদের পাছে জন্মের মত পক্ষাঘাতগ্রস্ত হয়ে পড়ে—সূক্ষ্মবোধ তাদের জন্মের মত ছেড়ে চলে যায়। বলা বাহুল্য অসত্য থেকে মুক্ত হতে না পারলে মঙ্গলের কোন সম্ভাবনা নেই—কি মানুষের কি মানব-সভ্যতার।

কেননা গণতন্ত্র যেমন বংশতান্ত্রিক বা জন্মতান্ত্রিক নয়, তেমনি তা অন্নতান্ত্রিকও নয়। গণতন্ত্র যদি কেবল অন্নের উন্নতি ক'রে মনের অবনতি ঘটায় তবে তা মানব-সভ্যতার পক্ষে আশীর্বাদ হবে না, হবে অভিশাপ। মনের উন্নতি কেবল বিস্তারে নয়, গভীরতায়, সূক্ষ্মবোধে, অধ্যাত্ম-সত্তায়। জড় থেকে চৈতন্যের দিকে গতি—স্থূল থেকে সূক্ষ্ম সূক্ষ্মতর সূক্ষ্মতম ঐ হচ্ছে মানুষের মনের উন্নতির মাপযন্ত্র। যে তন্ত্র এই মাপযন্ত্রকে অস্বীকার করে সে তন্ত্রকে নিঃসংশয়ে কীর্তিনাশার জলে ভাসিয়ে দিতে পার। কেননা সে তন্ত্রের মধ্যে নিশ্চিতরূপে মানব-সভ্যতার মৃত্যু লুকিয়ে আছে। মানুষের দালান কোঠা মোটর এরোপ্লেন ইত্যাদিকেই যদি মানব-সভ্যতার অভিজ্ঞান বলে ধর তবে এ সবেরও জন্ম সূক্ষ্মলোকে অর্থাৎ মানুষের চিন্তার জগতে কল্পনার রাজ্যে। ইতি—

—হসন্ত।

অপরাজিতা

শ্রীদেবেশচন্দ্র দাশ

[রবীন্দ্রনাথের 'জয় পরাজয়' গল্পের রাজকুমারী]

তোমার সভার কোলাহল হ'লে সারা
একে একে যবে ডুবে যায় সব তারা,
নিশীথ গগনে আঁধার বাঁধন হারা
নামিছে যখন সেই ক্ষণটুকু লাগি
অবিকশিতা
মোর শেষ গীতি শুনাতে প্রসাদ মাগি,
অপরাজিতা।

রাজসভামাঝে আছে কত কবিদল
সাজাইতে তব উৎসব ঝলমল;
সবাই বিজয়ী, সবাই ধরণীতল
মোহিছে, লভিছে তোমার মুকুটমণি
সুপরিচিতা;
মোর সাধ শুধু শুনিতে নূপুরধ্বনি,
অপরাজিতা।

বহু দূর হতে আসে কত মধুকর,
বাতায়ন-পথে স্তবগান নির্ঝর
প্রসারিয়া উঠে কত রাগে কত স্বর,
মোর সুর নাই, গাহিতে জানি না, শুধু
অপরিমিতা
ছিল আশা আর তব আশ্বাস মধু,
অপরাজিতা।

সেদিন মুখর বর্ষা গোধূলি বেলা
রাজবাতায়নে সাজে নি প্রদীপমালা;
কি জানি সহসা তব খেয়ালের খেলা
চকিতে তোমার আঁখি-আহ্বান-বাণী
বিজলী-সিতা
জাগাল আমার অপটু হৃদয়খানি,
অপরাজিতা।

সে নিমেষ হতে নীরব আঁধার রাতে
হেরেছি লিখিত এ হৃদয়ে বেদনাতে
তোমার স্বীকার ভাষাহীন আঁখিপাতে,
সুদূর লোকের স্বপনের রাজবালা
প্রণয়ভীতা,
ঝলিছে সমুখে অমল কণ্ঠমালা,
অপরাজিতা।

তার পরে নিতি রাজসভাগৃহ তলে
গোপন বারতা বাণী-পূজারতি ছলে
রচিয়াছি লয়ে আকাশকুসুম-দলে—
জানি না অলখে গ্রহণ করেছ কি না,
হে সুচরিতা,
কবিকুল হাসে শুনিয়া সরল বীণা
অপরাজিতা।

যে গান হেথায় অবুঝের মত ফিরে
রূপ নিতে চায় তোমার চরণ ঘিরে
মানে না সভার পরিপাটি নিয়মেরে
সে গান থামিবে আজিকে রাত্রিশেষে
ভীরু নমিতা,
ধ্যানেতে হেরিয়া তোমারে বধূর বেশে,
অপরাজিতা।

যে গান গেয়েছি যে কথা রহিল বাকী
যে সুখ লভেছি যে বেদনে মুখ ঢাকি
সাধ আশা সব সাধনার ধন রাখি'
যাই সঁপি তোমা একাকে লোকের ভিড়ে,
মধুর চিতা,
সহসা স্মরিবে কখনো বা এ কবিরে,
অপরাজিতা।

সে ক্ষণটুকুরে করুণ করো না, মোর
ব্যথার আভাস না পরশে এ বিভোর
জীবনের জ্যোতি নব বিকাশের ভোর,
তুমি চেয়েছিলে তাই গেয়েছিনু গান
গোপনে গীতা,
যা কিছু লভেছি তা-ও ত তোমারি দান,
অপরাজিতা।

পৃথিবীর আবহাওয়া

শ্রীঅমিয়কুমার দত্ত, এম-এস্‌সি

প্রত্যক্ষ প্রমাণের অভাবে পৃথিবীর অতীতের আবহাওয়ার বিবরণ দেওয়া সহজ ব্যাপার নয়। এই প্রয়াসে বৈজ্ঞানিকেরা বাধ্য হইয়া আনুমানিক গবেষণায় প্রবৃত্ত হইয়াছেন—অবশ্য অনুমানটির যাহাতে বর্ত্তমানের জ্ঞানের সহিত সামঞ্জস্য থাকে তাহার দিকেও বৈজ্ঞানিকেরা যথেষ্ট দৃষ্টি রাখিয়াছেন। দেখা গিয়াছে যে পাললিক শিলার (sedimentary rocks) গঠন ও প্রকৃতি এবং তন্মধ্যস্থ জীবাশ্ম (fossils) এইগুলি আবহাওয়ার মাপকাঠি হিসাবে ব্যবহৃত হইতে পারে এবং এইগুলি দ্বারাই অতীতের আবহাওয়ার চিত্র অঙ্কনের চেষ্টা হইয়াছে।

তাপমাত্রার তারতম্য অনুসারে আবহাওয়াকে সাধারণতঃ তিন ভাগে ভাগ করা হয়—অতি উষ্ণ, নাতিশীতোষ্ণ ও অতি-শীতল। ইহাদের প্রত্যেকেরই পাললিক শিলার উপর প্রভাব বিভিন্ন।

অতি উষ্ণ আবহাওয়ায় পললের (sediments) বায়ুই একমাত্র বাহক। পরীক্ষায় দেখা গিয়াছে যে বায়ুবাহিত পললের দানাগুলি সম্পূর্ণ গোলাকার। বায়ুদ্বারা বহনকালে দানাগুলি নিজেদের মধ্যে ঘর্ষণের ফলে ঐরূপ গোলাকার অবস্থা প্রাপ্ত হয়। জল ও হিমবাহ (glacier) বাহিত দানাগুলি একটু কোণযুক্ত হয়; কারণ এ ক্ষেত্রে সব দিক হইতে সমভাবে ঘর্ষণ হওয়া সম্ভব নয়। তদ্ব্যতীত অতি উষ্ণ আবহাওয়ায় পললের দানাগুলি (বিশেষ করিয়া বায়ুকণা হইলে) সাধারণতঃ উজ্জ্বল হয়। পাললিক শিলার এলোমেলো স্তরবিন্যাস (cross bedding) এইরূপ আবহাওয়ার আর একটি বিশেষত্ব। অবশ্য এইরূপ স্তরবিন্যাস অল্প জলে সব আবহাওয়াতেই হইতে পারে কিন্তু পূর্ব্বোক্ত পাললিক শিলার আয়তন শেষোক্ত পাললিক শিলার আয়তন অপেক্ষা বেশী হইবে। সুতরাং আয়তন দেখিয়া এ ক্ষেত্রে আবহাওয়া নির্ণয় করা যাইতে পারে। অতি উষ্ণ আবহাওয়ায় কয়লাজাতীয় কোন কিছু সাধারণতঃ পাওয়া যায় না বা গেলেও তাহার পরিমাণ অতি অল্প। লবণ জাতীয় পদার্থ ও লালমাটির স্তর সাধারণতঃ উষ্ণ আবহাওয়ার পরিচয় দান করে।

নাতিশীতোষ্ণ আবহাওয়ায় প্রস্তরের ও খনিজ পদার্থের রাসায়নিক ক্ষয় হয় খুব বেশী। ফেল্‌স্পার (felspar) জাতীয় পদার্থ এইরূপ আবহাওয়ায় মাটিতে পরিণত হয়। নাতিশীতোষ্ণ আবহাওয়ায় উদ্ভিদাদি হয় খুব প্রচুর এবং সেই জন্য এইরূপ আবহাওয়ায় পাললিক স্তরে আমরা কয়লার স্তর দেখিতে পাই। প্রবালগঠিত চূণাপাথরেও নাতিশীতোষ্ণ আবহাওয়ার সাক্ষাৎ পাই।

অতি শীতল আবহাওয়ার বৈশিষ্ট্য হইল হিমবাহের সৃষ্টি এবং তাহা হইতে উদ্ভূত শিলার গঠন ও প্রকৃতি। হিমবাহবাহিত প্রস্তরগুলি কখনও আয়তন ও গুরুত্ব হিসাবে সমান নয়। এই প্রস্তরগুলি সাধারণতঃ খুব মসৃণ আর দাগকাটা। এই শেষেরটি অতি শীতল আবহাওয়ার একটি বিশেষত্ব।

প্রাণীদের মধ্যে সরীসৃপ ও শামুক জাতীয় প্রাণী এবং উদ্ভিদের মধ্যে ফার্ণ (fern) জাতীয় উদ্ভিদ আবহাওয়া নির্ণয়ে ব্যবহৃত হইতে পারে। অবশ্য এ বিষয়ে সাবধান হইতে হইবে যে জীবেরা পারিপার্শ্বিক অবস্থার সহিত অতি আশ্চর্য্য রূপে মিলিয়া যাইতে পারে— যেমন সাধারণ গণ্ডার উষ্ণ প্রদেশবাসী কিন্তু লোমশ গণ্ডার শীত প্রদেশবাসী। সেইজন্য সাধারণতঃ পাললিক শিলার উপর গুরুত্ব বেশী দেওয়া হয়। অতীতের এইরূপ শিলার রূপান্তরিত বা ক্ষয়প্রাপ্ত হইয়া যাওয়াই সম্ভব। এই কারণেই বিষয়টি অত্যন্ত দুরূহ।

এইগুলির দ্বারা পরীক্ষা করিয়া দেখা গিয়াছে যে পৃথিবীর ইতিহাসের বেশীর ভাগ সময়ে গিয়াছে নাতিশীতোষ্ণ বা ঈষদুষ্ণ আবহাওয়া। এই সাধারণ নাতিশীতোষ্ণ আবহাওয়া ছাড়া চারিটি অতি শীতল আবহাওয়ার অস্তিত্ব পৃথিবীর আবহাওয়ার ইতিহাসে পাওয়া যায়। তাহাদের মধ্যে প্রথমটি ছিল প্রাক্-কেম্ব্রিয়ানের (pre-Cambrian) প্রথমে, দ্বিতীয়টি ছিল প্রাক্‌ কেম্ব্রিয়ানের শেষে, তৃতীয়টি পার্ম্মো-কার্ব্বোনিফেরাস (permo-carboniferous) সময়ে ও চতুর্থটি প্লাইষ্টোসিন (Pleistocene) সময়ে। (কেম্ব্রিয়ান, কার্ব্বোনিফেরাস প্রভৃতি পৃথিবীর বয়সের এক একটি কাল। নিম্নের তালিকাটি হইতে উহাদের বয়স জানা যাইবে।) এগুলি ছাড়া সব সময়ই পৃথিবীর কোন-না-কোন স্থানে অল্প হৈমবাহিক আবহাওয়ার অস্তিত্ব ধরা পড়ে। এই সব অতিশীতল আবহাওয়ার মধ্যে প্লাইষ্টোসিনের আবহাওয়াই সর্ব্বাপেক্ষা সাম্প্রতিক এবং সর্ব্বাপেক্ষা ভীষণ।

প্লাইষ্টোসিনে যে সব সময়ই হৈমবাহিক আবহাওয়া ছিল তাহা নয়, কারণ ভূতত্ত্ববিদের নিকট এই সময়ের মধ্যে ঈষদুষ্ণ আবহাওয়ারও অস্তিত্ব ধরা পড়িয়াছে। তখন বরফ পড়া সুরু হইয়াছে এবং পললে জল ও হিমবাহের যুগ্মপ্রভাব দেখা দিয়াছে। বিভিন্ন ভূতত্ত্ববিদের মতে এক হইতে তিনটি এইরূপ ঈষদুষ্ণ আন্তর্হৈমবাহিক (inter-glacial) আবহাওয়া ও দুই হইতে চারিটি হৈমবাহিক আবহাওয়ার অস্তিত্ব পাওয়া যায়।

নিম্নে পৃথিবীর ইতিহাসের বিভিন্ন সময়ের একটা আবহাওয়ার তালিকা দেওয়া গেল :

কাল	বয়স	আবহাওয়া
আধুনিক বা হলোসিন (Holocene)	১৫০০০ বৎসর	আধুনিক
প্লাইষ্টোসিন (Pleistocene)	১,৫০০,০০০ "	শীতল হইতে হৈমবাহিক
প্লায়োসিন (Pliocene)	১৫,০০০,০০০ "	শীতল

মায়োসিন (Miocene)	৩০,০০০,০০০	বৎসর	নাতিশীতোষ্ণ
অলিগোসিন (Oligocene)	৪০,০০০,০০০	"	উষ্ণ হইতে নাতিশীতোষ্ণ
ইওসিন (Eocene)	৬০,০০০,০০০	"	নাতিশীতোষ্ণ হইতে উষ্ণ
ক্রিটেশাস্ (Cretaceous)	১২০,০০০,০০০	"	নাতিশীতোষ্ণ হইতে উষ্ণ
জুরাসিক্ (Jurassic)	১৫০,০০০,০০০	"	নাতিশীতোষ্ণ
ট্রায়াসিক্ (Triassic)	১৮০,০০০,০০০	"	উষ্ণ
পার্মিয়ান (Permian)	২২৫,০০০,০০০	"	হৈমবাহিক হইতে নাতিশীতোষ্ণ
কার্বোনিফেরাস (Carboniferous)	৩০০,০০০,০০০	"	হৈমবাহিক
ডিভোনিয়ান (Devonian)	৩৪৫,০০০,০০০	"	উষ্ণ হইতে নাতিশীতোষ্ণ
সাইলুরিয়ান (Silurian)	৩৭৫,০০০,০০০	"	নাতিশীতোষ্ণ
ওর্ডোভিসিয়ান (Ordovician)	৪৩৫,০০০,০০০	"	শীতল হইতে নাতিশীতোষ্ণ
কেম্ব্রিয়ান (Cambrian)	৫৪০,০০০,০০০	"	শীতল হইতে নাতিশীতোষ্ণ
প্রাক্-কেম্ব্রিয়ান (Pre-Cambrian)	১,০০০,০০০,০০০ হইতে ২,০০০,০০০,০০০	"	শেষের দিকে হৈমবাহিক

আমাদের বর্ত্তমানের আবহাওয়া ঠিক শীতল হৈমবাহিক আবহাওয়ার পরের অবস্থা। ইহাতে শীতের খুব প্রাচুর্য্য না থাকিলেও ইহাকে কখনও উষ্ণ আবহাওয়া বলা চলে না। এখনও বহু পর্ব্বতের উপরে ও মেরু-প্রদেশে বহু হিমবাহের অস্তিত্ব পাওয়া যায়। বলা যায় না যে আমাদের বর্ত্তমানের আবহাওয়া একটি আন্তর্হৈমবাহিক আবহাওয়া কিনা এবং ইহার পরই আবার একটি দ্রুতি শীতল আবহাওয়া আসিবে কিনা।

ভবিষ্যতের আবহাওয়া সম্বন্ধে বলিতে হইলে সূর্য্যের তাপ-বিকিরণ সম্বন্ধে দুই একটা কথা বলা আবশ্যক। কারণ সূর্য্যের তাপ-বিকিরণের সহিত আবহাওয়ার সম্বন্ধ নিকট। সৃষ্টির আদিমকাল হইতে সূর্য্য এখনও পর্য্যন্ত সমভাবে তাপ-বিকিরণ করিয়া আসিতেছে। এই বিকিরণে সূর্য্যের ক্ষয় হইতেছে প্রতি সেকেণ্ডে চল্লিশ লক্ষ টন। এই পরিমাণে ক্ষয় হইতে থাকিলে বেশী দিন সূর্য্যের তাপ-বিকিরণ সম্ভবপর হইবে না। শুধু সঙ্কোচনের ফলে তাপ-বৃদ্ধিহেতু এ ক্ষয়ের পূরণ হইতে পারে না। অধুনা বলা হইয়া থাকে যে বস্তুর ধ্বংসের ফলে উদ্ভূত শক্তির দ্বারা এ ক্ষয়ের পূরণ হইতেছে। সুতরাং সূর্য্যকে নিজেকে ভাঙিয়া এই শক্তি জোগাইতে হইতেছে। অতএব এমন এক সময় আসিবে যখন সূর্য্যের আর ঐরূপ শক্তি বিকিরণ করা সম্ভব হইবে না। তখন পৃথিবীতে জীবের ধ্বংস অনিবার্য্য; কারণ জীবের অস্তিত্বের পক্ষে আবহাওয়া, আর্দ্রতা, শৈত্য ও তাপের একটা নির্দ্দিষ্টতা দরকার। এ সব কয়টিই সূর্য্যের তাপের উপর নির্ভরশীল। জীব কখনই জলের বাষ্পীয় অবস্থায় অর্থাৎ ১০০° সেণ্টিগ্রেড ও জলের বরফ অবস্থায় অর্থাৎ ০° সেণ্টিগ্রেড তাপমাত্রার আবহাওয়ায় বেশীকাল থাকিতে পারে না। জীবাশ্মতত্ত্বের আলোচনায় দেখা গিয়াছে যে জীব-সৃষ্টির পর হইতে এইরূপ অবস্থা কখনই পৃথিবীর সর্ব্বত্র অধিক-কাল ব্যাপিয়া থাকে নাই। তাহা হইলে জীবের অস্তিত্ব লোপ পাইত। সৌররশ্মি বিকিরণের এই সমতা খুবই আশ্চর্য্যের বিষয়। তাই যখন সূর্য্যের ক্ষয় হেতু এই সমতা থাকিবে না তখন জীব ধ্বংস পাইবে।

নক্ষত্রের ক্রমবিকাশ (evolution) একটি স্থিরীকৃত সত্য। নীহারিকার (nebula) পদার্থ হইতে নক্ষত্রের প্রথমে সৃষ্টি হয়। পরে সঙ্কোচনের ফলে প্রথমে রক্তাভ, পরে অত্যন্ত উত্তপ্ত হইয়া উহা নীলাভ শ্বেতবর্ণ ধারণ করে। তাহার পর আবার শীতল হইতে আরম্ভ করে। তখন নীলাভ শ্বেতবর্ণ হইতে প্রথমে হলুদবর্ণ, পরে রক্তাভ ও শেষে কৃষ্ণবর্ণ ধারণ করিয়া শীতল হইয়া যায়। আমাদের সূর্য্য এখন হলুদবর্ণের অবস্থায়। ইহা রক্তাভ হইয়া শেষে কৃষ্ণবর্ণ ধারণ করিয়া শীতল হইয়া যাইবে। এখন বলা যাইতে পারে যে সূর্য্য শীতল হইতে আরম্ভ করিয়াছে। এইরূপে অনেক পরে সূর্য্যের তাপ-বিকিরণ-ক্ষমতা কমিয়া যাইবে। তখন পরিমিত তাপমাত্রা পাইবার জন্য পৃথিবীকে সূর্য্যের দিকে অগ্রসর হইতে হইবে। গতি-বিজ্ঞানের (Dynamics) আলোচনায় দেখা যায় যে পৃথিবী অন্যান্য গ্রহ ও নক্ষত্রের আকর্ষণে সূর্য্য হইতে দূরে চলিয়া যাইতেছে। তাহা হইলে ভবিষ্যতে পৃথিবীর আবহাওয়া শীতল হইবে। পদার্থবিদ্যাও আমাদের একই কথা শুনাইতেছে। তাপ-বিজ্ঞানে বলা হয় যে এমন এক দিন আসিবে যখন জগতের সমস্ত তাপ সর্ব্বত্র সমভাবে ছড়াইয়া পড়িবে। এই তাপমাত্রা এত কম হইবে যে তাহাতে জীবের অস্তিত্ব অসম্ভব। মনে হয় জীবের ভাগ্যে এই শীত-মৃত্যু অনিবার্য্য। ভবিষ্যতে এমন এক শীতল আবহাওয়া আসিবে যখন জামা কাপড় কিছুতেই শীত নিবারণ করা যাইবে না। কয়লা তত দিনে শেষ হইয়া যাইবে। সব সময়ই সর্ব্বত্র তুষারের আবরণ থাকিবে। শেষ মানব দেখিবে কিরূপে তার জাতিরা লোপ পাইল। দিনে ও রাতে সে দেখিতে থাকিবে উজ্জ্বল নক্ষত্রপুঞ্জ। অবশেষে সে এক দিন প্রায় বৃক্ষলতাশূন্য পৃথিবীতে চিরনিদ্রায় মগ্ন হইবে। অন্যান্য জীবেরও এই দশা হইবে। জানা যায় না যে এই ধ্বংস হইতে কোন মহত্তর সৃষ্টির কথা স্রষ্টার মনে জাগে কি না। তবে এ বিষয়ে একটা আশার কথা এই যে ভূতত্ত্ববিদেরা দেখাইয়াছেন, অতীতেও শীতল আবহাওয়া মধ্যে মধ্যে দেখা গিয়াছে এবং তাহা হইতে জীব ও পৃথিবী রক্ষা পাইয়াছে।

মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর ও বাংলা সাহিত্য

অধ্যাপক শ্রীআশুতোষ ভট্টাচার্য্য

রবীন্দ্রনাথ মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের আদ্যশ্রাদ্ধ-বাসরে তাঁহার প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করিয়া যে কয়েকটি কথা বলিয়াছিলেন তন্মধ্যে দেবেন্দ্রনাথের সঙ্গে বাংলা ভাষার সম্পর্ক বিষয়ে একটি সংক্ষিপ্ত উল্লেখ ছিল; মহর্ষির বিভিন্নমুখী প্রতিভার বিচিত্র গুণাবলীর সঙ্গে একত্র সাধারণ ভাবে উল্লিখিত হইয়াছিল বলিয়া আজ পর্য্যন্তও কোন সাহিত্যরসবিচারকের দৃষ্টি সে দিকে বিশেষ ভাবে আকৃষ্ট হইতে পারে নাই। কিন্তু কথাটি একেবারে উপেক্ষণীয় নহে বলিয়াই আজ দেবেন্দ্রনাথ ও বাংলা সাহিত্য সম্পর্কে আলোচনা করিতে গিয়া আমি সর্ব্বাগ্রে তাহার প্রতিই সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে চাই। রবীন্দ্রনাথ দেবেন্দ্রনাথ সম্পর্কে বলিয়াছিলেন যে তিনি "নূতন ইংরেজি শিক্ষার ঔদ্ধত্যের দিনে শিশু বঙ্গ ভাষাকে বহু যত্নে কৈশোরে উত্তীর্ণ করিয়া দিয়াছিলেন।" ইহা কেবল মাত্র পিতার প্রতি পুত্রের লৌকিক প্রশস্তি-বাচন নহে; ইহার মধ্যে একাধারে সাহিত্যিকের রসবোধ ও নিরপেক্ষ সমালোচকের সূক্ষ্ম বিচারবুদ্ধির পরিচয় পাওয়া যায়।

দেবেন্দ্রনাথের যখন আবির্ভাব হয় তখন বাংলা গদ্য সাহিত্যের শৈশব উত্তীর্ণ হয় নাই;—বাংলা গদ্য তখন পর্য্যন্তও সাহিত্যিক মর্য্যাদায় উন্নীত হইতে পারে নাই। দেবেন্দ্রনাথের পূর্ব্ববর্ত্তীদিগের মধ্যে বাংলা গদ্যে রাজা রামমোহন রায়ের নাম সাধারণতঃ উল্লেখ করা হইয়া থাকে; কিন্তু রামমোহন রায়ের মধ্য দিয়া বাংলা গদ্যের একটা সম্পূর্ণ নূতন দিকের বিকাশ হইলেও তাঁহার গদ্য-রচনার মধ্যে সাহিত্যিক ও শিল্পগত দাবি যে কিছুতেই পূর্ণ হয় নাই তাহা আজিকার দিনে কেহই অস্বীকার করিবেন না। রামমোহন বাংলা গদ্যে বিচার ও যুক্তিতর্কমূলক প্রবন্ধ-রচনায় অগ্রদূত; তাঁহার রচনায় মধ্যে সহজাত রস-স্বাচ্ছন্দ্যের অভাব ছিল; তিনি তাঁহার রচনায় অনুভূতি অপেক্ষা যুক্তিকেই অধিকতর প্রাধান্য দিয়াছেন। এই ধরণের রচনায় একটা সাময়িক ব্যবহারিক মূল্য প্রকাশ পাইলেও যে রস-বিচার সাহিত্যিক রস-পিপাসার ভিত্তি ইহাদ্বারা কিছুতেই তাহার চরিতার্থতা হইতে পারে নাই।

রামমোহনের সমসাময়িক আর একজন বাংলা গদ্য লেখকের নাম বর্ত্তমানে জনসাধারণের নিকট সুপরিচিত হইয়াছে; তিনি মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার। ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে বৈদেশিক শাসকবর্গকে এতদ্দেশীয় বিষয়াদিতে শিক্ষাদানের জন্য কলিকাতায় ফোর্ট উইলিয়ম কলেজ নামক যে প্রতিষ্ঠান স্থাপিত হইয়াছিল মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার তাহার অন্তর্গত বাংলা বিভাগের সর্ব্বাপেক্ষা প্রতিভাশালী পণ্ডিত ছিলেন। তাঁহার গদ্য-রচনা লইয়া কিছুকাল যাবৎ বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস অনুসন্ধানকারীদিগের মধ্যে আলোচনা হইতেছে। মৃত্যুঞ্জয়ের রচনার মধ্যে দুইখানি অনুবাদ, একখানি রামমোহনের রচনার অনুরূপ বেদান্তদর্শন বিষয়ক রচনা, আর দুইখানি সঙ্কলন-গ্রন্থ। কোন মৌলিক বিষয়-বস্তু লইয়া মৃত্যুঞ্জয় কোন স্বাধীন রচনায় হস্তক্ষেপ করেন নাই;—তাঁহার একটি মাত্র গ্রন্থে রচনার দিক দিয়া অনেকখানি মৌলিকতা দেখাইলেও বিষয়-বস্তুর দিক হইতে পূর্ব্বপ্রচলিত উপকরণই ব্যবহার করিয়াছেন। মৃত্যুঞ্জয়ের মধ্যে শিল্পীর প্রতিভা ছিল সত্য, কিন্তু গদ্য-রচনায় তিনি নিজে যেমন কোন স্থির আদর্শের সন্ধান লাভ করিতে পারেন নাই, তেমনই স্বকীয় প্রতিভা দ্বারা বিশেষ কোন আদর্শের প্রতিষ্ঠাও তিনি করিতে পারেন নাই। তাঁহার রচনাবলীতে তিনি কেবলই বিভিন্ন রচনা-রীতি লইয়া পরীক্ষা করিয়া গিয়াছেন। আত্মপ্রত্যয় ও আত্মনির্ভরশীলতার অভাবেই হউক, কিংবা অন্য যে-কোন কারণেই হউক তাঁহার রচনার কোন নিদর্শনকেই তিনি নিজেও চূড়ান্ত রূপে গ্রহণ করিয়া উঠিতে পারেন নাই, সকলই পাঠকের বিচার ও রসবোধের উপর ছাড়িয়া দিয়াছেন। তাঁহার এই বিচিত্র প্রয়াসের কোন কোন বিচ্ছিন্ন অংশ মাত্র শিল্পী-সুলভ শক্তির পরিচায়ক হইলেও সমগ্রভাবে তাঁহাকেও বাংলা গদ্য-সাহিত্যের শৈশবাবস্থারই প্রতিপালক বলিয়া নির্দেশ করিতে হয়। বাংলা গদ্য সাহিত্যের প্রথম যুগে রামমোহন ও মৃত্যুঞ্জয়ের নামই সর্ব্বাগ্রে উল্লেখ করিতে হয়।

কালানুক্রমিক বিচার করিতে গেলে মৃত্যুঞ্জয় ও রামমোহনের পরই মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের নাম উল্লেখযোগ্য। পরবর্ত্তী যুগের প্রধান দুইজন গদ্য সাহিত্যশিল্পী ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর ও অক্ষয়কুমার দত্ত উভয়েই মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের বয়ঃকনিষ্ঠ।

'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা'র প্রতিষ্ঠাতা রূপেই প্রথমতঃ দেবেন্দ্রনাথকে বাংলা গদ্য-রচনার সাক্ষাৎ সংস্পর্শে আসিতে হয়। 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা'র তিনি যে একজন প্রধান লেখকই ছিলেন তাহা নহে; উক্ত পত্রিকায় প্রকাশিত প্রায় প্রত্যেক প্রবন্ধই তিনি তাঁহার নিজস্ব আদর্শ অনুযায়ী সংশোধন করিয়া সহজ এবং সরল করিয়া লইতেন। তখন বাংলা গদ্য-সাহিত্যে পণ্ডিতী রীতির অপ্রতিহত প্রভাব, কিন্তু দেবেন্দ্রনাথ প্রায় প্রথম হইতেই ইহার প্রভাব হইতে সম্পূর্ণ মুক্ত থাকিয়া বাংলা গদ্য-রচনায় একটি সাবলীল ও সহজ রীতির

প্রবর্ত্তন করিয়াছিলেন। এই প্রাঞ্জলতার প্রতি দৃষ্টি রাখিয়াই তিনি প্রথম হইতেই 'তত্ত্বোধিনী পত্রিকা'র ভাষা সংশোধন করিয়া লইতেন। এমন কি পত্রিকা-সম্পাদক অক্ষয়কুমার দত্তের রচনায় সমাস-বহুলতা তাঁহার সংশোধনের দ্বারাই অনেক সহজ হইয়া পত্রিকায় প্রকাশিত হইত। এই 'তত্ত্বোধিনী পত্রিকা' ক্রমে যে কেবল তদানীন্তন ব্রাহ্মসমাজের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকিয়া একমাত্র ব্রাহ্মধর্ম্ম বিষয়ক পারমার্থিক আলোচনারই আত্মনিয়োগ করিয়াছিল তাহা নহে, ইহাতে ঊনবিংশ শতাব্দীর বাঙালীর সর্ব্ববিষয়ক শ্রেষ্ঠ মনীষারই বিকাশ দেখিতে পাওয়া যাইত। সেই যুগের শ্রেষ্ঠ গদ্য-লেখকেরাই 'তত্ত্বোধিনী পত্রিকা'র ভিতর দিয়া তাঁহাদের বিভিন্নমুখী প্রতিভার পরিচয় প্রকাশ করিতেন। এই 'তত্ত্বোধিনী পত্রিকা'র যত্নে দেবেন্দ্রনাথ তাঁহাদের প্রত্যেকের রচনার আদর্শের সঙ্গে পরিচিত হইলেও তাঁহার একটি নিজস্ব আদর্শের বৈশিষ্ট্য পূর্ব্বাপর অক্ষুণ্ণ ছিল।

দেবেন্দ্রনাথের রচনাসমূহকে দুইটি প্রধান ভাগে ভাগ করা যাইতে পারে,—প্রথমতঃ তাঁহার আত্মজীবনী ও দ্বিতীয়তঃ ব্রাহ্মধর্ম্ম বিষয়ক রচনা। 'তত্ত্বোধিনী পত্রিকা'য় তাঁহার যে সমস্ত প্রবন্ধ ও বক্তৃতাবলী প্রকাশিত হইত তাহা ক্রমে 'আত্মতত্ত্ব বিদ্যা' (১৮৫০-৫১), 'ব্রাহ্মধর্ম্মের মত ও বিশ্বাস' (১৮৫৯-৬০), 'ব্রাহ্মধর্ম্মের ব্যাখ্যান' (১৮৬০-৬১) এই সমস্ত নামে পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয়। তাঁহার আত্মজীবনীকেও সাধারণভাবে দুই ভাগে ভাগ করা যায়—প্রথমতঃ আত্মদর্শনমূলক রচনা ও দ্বিতীয়তঃ নিসর্গদর্শন মূলক রচনা। দেবেন্দ্রনাথের আত্মজীবনী নানা দিক দিয়া বাংলা সাহিত্যে একটি শ্রেষ্ঠ গ্রন্থ। প্রথমে ইহার সাহিত্যিক সার্থকতার বিষয়ে আলোচনা করিয়া পরে মহর্ষির ব্রাহ্মধর্ম্মবিষয়ক অন্যান্য রচনা সম্পর্কে আলোচনা করা যাইতেছে।

দেবেন্দ্রনাথের আত্মজীবনীতে তাঁহার ১৮ বৎসর হইতে মাত্র ৪১ বৎসর বয়ঃক্রম পর্য্যন্ত কাহিনী বিবৃত হইয়াছে। ইহাতে তাঁহার আধ্যাত্মিক ভাবের উন্মেষ হইলেও পরিপূর্ণ বিকাশ দেখিতে পাওয়া যায় না। ইহা তাঁহার জীবনের প্রথম ভাগের অভিজ্ঞতালব্ধ বলিয়াই হউক, কিংবা অন্য যে-কোন কারণেই হউক, ইহার উপলব্ধি একেবারেই বাস্তব জীবন-নিরপেক্ষ নহে। বাস্তব জীবন ও প্রত্যক্ষ জগতের সঙ্গে ইহার সম্পর্ক অতি নিবিড় বলিয়াই ইহার সাহিত্যিক আবেদনও তাঁহার অন্যান্য রচনা অপেক্ষা সার্থক হইয়াছে বলিতে হইবে। বাস্তব জীবনকে ইহার মধ্যে যে ভাবে বিশ্লেষণ করিয়া দেখিবার প্রবৃত্তির পরিচয় পাওয়া যায়, কিংবা প্রত্যক্ষ জগৎ সম্বন্ধেও ইহার মধ্যে যে রকম কৌতূহলের পরিচয় আছে—আধুনিক বাংলা সাহিত্যে ইহার পূর্ব্বে এই প্রকার দৃষ্টিভঙ্গি আর কোন রচনার মধ্যেই দেখিতে পাওয়া যায় না। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ বাংলা সাহিত্যে আধুনিক যুগে কেবল আত্মচরিত রচয়িতাদিগের মধ্যেই যে শুধু সর্ব্বপ্রথম তাহাই নহে, মানব-জীবন ও তাহার পারিপার্শ্বিক জগৎকে প্রত্যক্ষ করিবার মধ্যে তাঁহার যে একটি পরম বস্তুনিষ্ঠার পরিচয় পাওয়া যায় তাহা সেই যুগের বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে নিতান্ত বিস্ময়কর বলিয়াই মনে হয়। সাহিত্য-বিচারে মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের আত্মজীবনীর তিনটি দিক আছে—একটি ভাষার দিক, দ্বিতীয় ভাবের দিক ও তৃতীয় ব্যবহৃত উপকরণের দিক। ইহাদের প্রত্যেকটির মধ্য দিয়াই দেবেন্দ্রনাথের সহজ প্রত্যক্ষতা ও পরম বস্তুনিষ্ঠ দৃষ্টিভঙ্গির পরিচয় প্রকাশ পাইয়াছে বলিয়াই সাহিত্য-বিচারে ইহা তাঁহার পরবর্ত্তী আধ্যাত্মিক জীবনের যে-কোন রচনা অপেক্ষাই শক্তিশালী।

ইহার ভাষা নিতান্ত সহজ, অথচ একটা পূর্ণতর আধ্যাত্মিক জীবনের ভিত্তি স্থাপনের পক্ষে সম্পূর্ণ উপযোগী। ভাষার প্রাঞ্জলতা ও প্রত্যক্ষতার নামে তাঁহার পূর্ব্ববর্ত্তী দুই একজন লেখক যেমন নিতান্ত গ্রাম্যতার প্রশ্রয় দিয়াছিলেন, ইহার মধ্যে তাহার লেশমাত্র নাই; তাঁহার আধ্যাত্মিক বোধই সাহিত্য-রচনায় তাঁহার শিল্পবোধের কার্য্য করিয়াছে। তাঁহার ভাষার প্রাঞ্জলতার নিদর্শন-স্বরূপ তাঁহার আত্মজীবনী হইতে উদ্ধৃত করা যাইতে পারে—

"দিদিমা আমাকে বড় ভালবাসিতেন। শৈশবে তাঁহাকে ব্যতীত আমিও আর কাহাকেও জানিতাম না। আমার শয়ন, উপবেশন, ভোজন, সকলই তাঁহার নিকট হইত। তিনি কালীঘাট যাইতেন, আমি তাঁহার সহিত যাইতাম। তিনি যখন আমাকে ফেলে জগন্নাথ ক্ষেত্রে ও বৃন্দাবনে গিয়াছিলেন, তখন আমি বড়ই কাঁদিতাম।"

নির্ম্মল হৃদয়ের সহজ অভিব্যক্তিই এই অপূর্ব্বসুন্দর ভাষা, সেইজন্য ইহা এত স্বচ্ছ ও প্রত্যক্ষ। অন্তরের নিতান্ত সহজ অনুভূতি বলিয়াই এই ভাষা অতি সহজে এই ভাবে মর্ম্মস্থল স্পর্শ করিতে পারে—

"তিনি প্রতিদিন অতি প্রত্যূষে গঙ্গাস্নান করিতেন এবং প্রতিদিন শালগ্রামের জন্য স্বহস্তে পুষ্পের মালা গাঁথিয়া দিতেন। কখনো কখনো তিনি সংকল্প করিয়া উদয়াস্ত সাধন করিতেন; সূর্য্যোদয় হইতে সূর্য্যের অস্তকাল পর্য্যন্ত সূর্য্যকে অর্ঘ্য দিতেন। আমিও সে সময় ছাদের উপরে রৌদ্রেতে তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে থাকিতাম।"

দেবেন্দ্রনাথ তাঁহার প্রথম মৌলিক রচনার মধ্যেই যে কি ভাবে তাঁহার নিজস্ব ষ্টাইলের সন্ধান পাইয়াছিলেন তাহা তাঁহার উদ্ধৃত আত্মজীবনীর এই প্রথমাংশ হইতেই বুঝিতে পারা যাইবে। ইহা দেবেন্দ্রনাথের সাহিত্যিক প্রতিভার অন্যতম প্রধান বিস্ময়। এমনকি বঙ্কিমচন্দ্রকেও সর্ব্বপ্রথম ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের রচনা-রীতিকে অনুসরণ করিয়া সাহিত্যক্ষেত্রে প্রবেশ করিতে হয়, এবং তাঁহার সাহিত্য-সাধনা অনেক দূর

অগ্রসর হইলে পর তিনি তাঁহার নিজস্ব ষ্টাইলের সন্ধান পান। কিন্তু দেবেন্দ্রনাথ তাঁহার নিজস্ব ষ্টাইল লইয়াই বাংলা মৌলিক সাহিত্য রচনার ক্ষেত্রে প্রবেশ করেন। রচনার ষ্টাইলই রচয়িতার প্রতিভার বিশিষ্ট নিদর্শন। বাংলা রচনায় দেবেন্দ্রনাথই সর্ব্বপ্রথম একটি পূর্ণাঙ্গ বিশিষ্ট ষ্টাইলের স্রষ্টা; ইহার পূর্ব্বে একমাত্র মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কারের মধ্যে ইহার আংশিক ও অপূর্ণ উন্মেষ মাত্র দেখা গিয়াছিল। ষ্টাইল সাহিত্য-রচনায় কৈশোর ও যৌবনেরই রূপ, শৈশবের রূপ নয়—দেবেন্দ্রনাথ সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের পূর্ব্বোদ্ধৃত উক্তির সার্থকতা এখানেও বুঝিতে পারা যাইবে।

পূর্ব্বে বলিয়াছি, দেবেন্দ্রনাথের আত্মজীবনীর দুইটি সুস্পষ্ট বিভাগ অনুভব করা যায়—একটির মধ্যে তাঁহার আত্মদর্শনের পরিচয়, আর একটির মধ্যে নিসর্গ দর্শনের পরিচয় পাওয়া যায়। যে অংশে তাঁহার আত্মদর্শনের পরিচয় পাওয়া যায় তাহার মধ্যেও এমন একটি নিপুণ পর্য্যবেক্ষণ-শক্তির পরিচয় আছে যাহার বাস্তব মূল্য সাহিত্যের দিক দিয়া অপরিসীম। তিনি তাঁহার আধ্যাত্মিক হৃদয়ের আশা-আকাঙ্ক্ষাগুলিকেও মর্ত্ত্য-পরিবেশের মধ্যেই প্রত্যক্ষ করিতেছেন। পরিদৃশ্যমান বিশ্ব-জগতের প্রত্যক্ষলোকে তিনি তখন পর্য্যন্তও তাঁহার আত্মার আকাঙ্ক্ষিত বস্তুকে সন্ধান করিয়া ফিরিতেছেন। সংসারের ক্ষুদ্রতম বস্তুর মধ্যেও তিনি সেই অণু হইতে অণু এবং মহান্ হইতেও মহান্ শক্তিকে সন্ধান করিতেছেন, সেইজন্য তাঁহার উচ্চ আধ্যাত্মিক দৃষ্টির সম্মুখেও ক্ষুদ্রের ক্ষুদ্রতা উপেক্ষিত হইতেছে না, মানবাত্মার স্বাভাবিক ক্রন্দনও অশ্রুত থাকিতেছে না। তাঁহার আত্মজীবনীর মধ্যে যে বিষয়টি সর্ব্বাপেক্ষা গভীর ভাবে অন্তর স্পর্শ করে তাহা এক্ষণে উল্লেখ করিতেছি। তিনি লিখিতেছেন—

"দিদিমার যখন মৃত্যুকাল উপস্থিত, তখন আমার পিতা এলাহাবাদ অঞ্চলে পর্য্যটন করিতে গিয়াছিলেন। বৈদ্য আসিয়া কহিল, 'রোগীকে আর গৃহে রাখা হইবে না।' অতএব সকলে আমার পিতামহীকে গঙ্গাতীরে লইয়া যাইবার জন্য বাড়ীর বাহিরে আনিল। কিন্তু দিদিমা আরও বাঁচিতে চান, গঙ্গায় যাইতে তাঁহার মত নাই। তিনি বলিলেন যে, 'যদি দ্বারকানাথ বাড়ীতে থাকিত, তবে তোরা কখনই আমাকে লইয়া যাইতে পারতিস নে।' কিন্তু লোকে তাহা শুনিল না। তাঁহাকে লইয়া গঙ্গাতীরে চলিল। তখন তিনি কহিলেন, 'তোরা যেমন আমার কথা না শুনে আমাকে গঙ্গায় নিয়ে গেলি, তেমনি আমি তোদের সকলকে খুব কষ্ট দিব, আমি শীঘ্র মরিব না।' গঙ্গাতীরে লইয়া একটি খোলার চালাতে তাঁহাকে রাখা হইল। সেখানে তিনি তিন রাত্রি জীবিত ছিলেন।"

আধ্যাত্মিক জীবনে উদ্বুদ্ধ হইয়াও এখানে পিতামহীর গঙ্গাযাত্রার কোন রকম পারমার্থিক উদ্দেশ্য সন্ধান করিবার পরিবর্ত্তে যে তিনি মুমূর্ষু বৃদ্ধার অন্তরের মানবিক আকাঙ্ক্ষারই একটি পরম সহানুভূতিপূর্ণ পরিচয় প্রকাশ করিয়াছেন তাহাই লক্ষ্য করিবার বিষয়। তাঁহার আত্মজীবনীর যে অংশকে আত্মদর্শনমূলক বলিয়া অভিহিত করা হইয়াছে তাহার সর্ব্বত্রই তাঁহার আত্মদর্শনের এই নিতান্ত মানবিক দিকটিরই সহজ প্রকাশ দেখিতে পাওয়া যায়। এই পরম মানবিক অনুভূতি দ্বারাই তাঁহার রচনার সাহিত্যিক পরিচয় পরিপূর্ণতা লাভ করিয়াছে।

আত্মজীবনীর আর এক অংশকে নিসর্গ-দর্শনমূলক বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ তাঁহার আধ্যাত্মিক জীবনের সমগ্র প্রেরণাই এই নিসর্গলোক হইতেই লাভ করিয়াছিলেন বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। প্রকৃতি হইতে উচ্চাঙ্গের আধ্যাত্মিক প্রেরণা লাভ করিবার দৃষ্টান্ত ধর্ম্ম-সাধনার ইতিহাসে বিরল নহে, কিন্তু দেবেন্দ্রনাথের বিশেষত্ব এই যে, প্রকৃতির বাস্তব পরিচয় সম্পর্কে তাঁহার একটি শিশু-সুলভ কৌতূহল চিরদিনই বর্ত্তমান ছিল। যে লিপি-কুশলতা ও পর্য্যবেক্ষণ-শক্তির জন্য সঞ্জীবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের 'পালামৌ' ভ্রমণ-বৃত্তান্ত বাঙালী পাঠকের নিকট এত সমাদর লাভ করিয়াছে, দেবেন্দ্রনাথের নিসর্গ-দর্শনমূলক রচনার মধ্যেও তাহার পরিচয় পাওয়া যায়। যে প্রকৃতি সুন্দরী, যে প্রকৃতি ভীষণা, যে প্রকৃতি রহস্যময়ী তাহার নিগূঢ় অন্তরে প্রবেশ করিয়া তাহাকে প্রত্যক্ষগোচর করিয়া বিশ্লেষণ-পূর্ব্বক দেখিবার যে একটি প্রবৃত্তি তাঁহার ছিল তাহা বাংলা সাহিত্যে দুই একজন ব্যতীত আর কাহারও মধ্যে দেখিতে পাওয়া যায় না। ইহাও তাঁহার সৌন্দর্য্য-সন্ধানী বাস্তব দৃষ্টিভঙ্গিরই পরিচায়ক। তাঁহার নিকট প্রকৃতি কেবল-মাত্র অতীন্দ্রিয় রহস্যলোকেরই অনুভূতিসার ছিল না, তিনি পঞ্চেন্দ্রিয় দ্বারা রূপ-রস-শব্দ-গন্ধময়ী প্রকৃতির বিচিত্র আস্বাদ লাভ করিয়া ধন্য হইয়াছেন। উজ্জ্বল আলোক, ফুলের গাঢ় রঙ্‌ তিনি ভালবাসিতেন; বিরাট্ হিমালয়ের নিবিড় অরণ্যভূমির মধ্যেই এই রকম আলো ও রঙের খেলা দেখিয়া তিনি মুগ্ধ হইয়াছেন—

"পথে আসিতে আসিতে একটা বনের মধ্যে প্রবেশ করিলাম। দেখি যে মৃগয়াশীল রাজকুমার রত্নকুণ্ডল, হীরার কণ্ঠি, মুক্তার মালা ও দিব্য বস্ত্র পরিধান করিয়া বন হইতে বনান্তরে বিচরণ করিতেছেন। সূর্য্যের আভাতে তাঁহার সেই নবীন মুখমণ্ডল দীপ্তি পাইয়া অতীব শোভা ধারণ করিয়াছে। তাঁহাকে আমার বোধ হইল যেন একটি বনদেবতা। এই তাহাকে দেখিতেছি, এই সে বনের মধ্যে ডুবিয়া গেল; এই সে কাছে, এই সে দূরে; এই নীচে, এই পর্ব্বতের উপরে। তাহার পরে আমি অতি কষ্টে একটা ভাঙা সঙ্কীর্ণ পথ আরোহণ করিয়া নির্ব্বিঘ্নে সিমলায় উপস্থিত হইলাম।"

"সিমলার উপরের পথে দেখি যে, সেই ফাল্গুন মাসেও

তথায় বরফ পড়িয়া রহিয়াছে। বৃক্ষলতা সকল শুষ্ক ও নীরস। বাঁশের অসার কঞ্চি শুষ্ক বাতাসে তাহারা ঝন্ঝন্ করিতেছে। চৈত্র মাসও শেষ হইল, ফুলে ফুলে সকল ভূমি একবারে মনোহর উদ্যানভূমি হইয়া উঠিল।"

আর একটি সংক্ষিপ্ত বর্ণনা এখানে উদ্ধৃত করিতেছি—

"অরুণোদয়ে প্রভাতে আমি যখন সেই বাগানে বেড়াইতাম, যখন আফিমের শ্বেত, পীত, লোহিত ফুল সকল শিশির জলের অশ্রুপাত করিত, যখন ঘাসের রক্তকাঞ্চন পুষ্পদল উদ্যানভূমিতে জরির মছ্‌নদ বিছাইয়া দিত, যখন স্বর্গ হইতে বায়ু আসিয়া মধুবহন করিত,...তখন তাহাকে আমার এক গন্ধর্ব্বপুরী বলিয়া বোধ হইত।"

তাজমহলের একটি সংক্ষিপ্ত বর্ণনায় তিনি লিখিতেছেন,—

"আমি তাজের একটা মিনারের উপর উঠিয়া দেখি, পশ্চিম দিক সমুদয় রাঙা করিয়া সূর্য্য অস্ত যাইতেছে। নীচে নীল যমুনা। মধ্যে শুভ্র, স্বচ্ছ তাজ সৌন্দর্য্যের ছটা লইয়া যেন চন্দ্রমণ্ডল হইতে পৃথিবীতে খসিয়া পড়িয়াছে।"

এমন সুনিপুণ সৌন্দর্য্যসন্ধানী দৃষ্টির পরিচয় সমগ্র বাংলা সাহিত্যেও খুব সুলভ নয়। হিমালয়ের রত্ননিকেতনের মধ্যে প্রবেশ করিয়া তাহা হইতে তিনি মুঠি মুঠি রত্ন সংগ্রহ করিয়াছেন এবং তাঁহার আত্মজীবনীর ভিতর দিয়া এই রত্নমুঠি পাঠকদিগকে উপহার দিয়াছেন। বাংলা-সাহিত্যে তাঁহার এই দানের তুলনা নাই।

মার্জ্জিত হাস্যরসবোধ দেবেন্দ্রনাথের আর একটি বিশিষ্ট গুণ ছিল। তাঁহার আত্মজীবনী তাহারই স্পর্শে স্থানে স্থানে অপূর্ব্ব রসোজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছে। সুকঠিন সংযমের মধ্য দিয়া ইহার বিকাশ হইলেও এই রসবোধ যে তাহার মনে কত গভীর ছিল তাহা আত্মজীবনীর দুই একটি দৃষ্টান্ত হইতেই বুঝিতে পারা যায়। একটি এখানে উল্লেখ করিতেছি। সিপাহী বিদ্রোহের সময় সিমলায় গুর্খার আক্রমণ হইবে শুনিয়া সকলেই যখন প্রাণ লইয়া পলাইতে লাগিল তখন তিনি তাঁহার এক জন পরিচিত বাঙালী ভদ্রলোকের নিকট গিয়া দেখিলেন, "তিনি দেওয়ালের চুণ লইয়া কপালে দীর্ঘ কোঁটা করিয়াছেন। গলা হইতে উপবীত বাহির করিয়া চাপকানের উপর পরিয়াছেন। চক্ষু রক্তবর্ণ মুখ মলিন। আমাকে দেখিয়াই বলিলেন, গুর্খারা বামুন মানে।"

লোকচরিত্রে সুনিপুণ অভিজ্ঞতার পরিচয়ও দেবেন্দ্রনাথের আত্মজীবনীর আর একটি বিশিষ্ট গুণ। লোকচরিত্র অঙ্কনে এমন বাস্তব দৃষ্টিভঙ্গি বাংলা সাহিত্যে ইহার পূর্ব্বে আর দেখিতে পাওয়া যায় নাই। ছোট বড় যে সমস্ত চরিত্রকেই তিনি প্রত্যক্ষ করিয়াছেন তাহাদের প্রত্যেকেরই বাস্তব প্রকৃতিটি আত্মজীবনীতে তাঁহার বর্ণনা-গুণে মূর্ত্ত হইয়া উঠিয়াছে।

এখন দেবেন্দ্রনাথের ধর্ম্মবিষয়ক রচনাগুলির সংক্ষিপ্ত আলোচনা করিয়াই এই প্রবন্ধের উপসংহার করিব। দেবেন্দ্রনাথের পূর্ব্বে রামমোহন রায় বাংলা গদ্যে উপনিষদ ও তাঁহার দর্শনশাস্ত্র বিষয়ক আলোচনার সূত্রপাত করেন। কিন্তু দেবেন্দ্রনাথের পূর্ব্ববর্তী এই সকল বিষয়ক আলোচনায় একান্ত ভাবে আত্মপ্রত্যয় ও আত্মানুভূতি-নিরপেক্ষ শাস্ত্রজ্ঞানের উপরই নির্ভর করা হইত। সেইজন্য এই ধরণের আলোচনা একমাত্র নীরস তথ্য পরিবেশনেই সীমাবদ্ধ ছিল। কিন্তু দেবেন্দ্রনাথ "আত্মপ্রত্যয়সিদ্ধ-জ্ঞানোজ্জ্বলিত বিশুদ্ধ হৃদয়"কেই ব্রহ্মের "পত্তন-ভূমি" করিলেন। হৃদয়ের সঙ্গে তাঁহার ঈশ্বরবাদের যোগ স্থাপিত হওয়াতে তাঁহার এই ধরণের আলোচনা মানুষের বাস্তব অনুভূতির স্পর্শ লাভ করিয়া সরস ও চিন্তাকর্ষক হইয়া উঠিল। 'ব্রাহ্মধর্ম্মের ব্যাখ্যানে' তিনি ঈশ্বরের সর্ব্বত্র প্রকাশমান প্রাণ-রূপ অনুভব করিয়া বলিতেছেন—

"যেমন আমার উপরে তাঁহার চক্ষু, সেইরূপ সর্ব্বত্রই তাঁহার চক্ষু; সর্ব্বত্রই তাঁহার হস্ত—বৃক্ষের পত্রে, পক্ষীর পতত্রে; সমুদ্রের গাম্ভীর্য্যে, পর্ব্বতের উচ্চতায়। সকল শক্তির অভ্যন্তরে তাঁহার শক্তিরই প্রভাব; সেই প্রাণের অধিষ্ঠানে জগৎ জীবিত রহিয়াছে।"

সৌন্দর্য্যবোধ হইতেই তাঁহার আধ্যাত্মিক বোধের প্রেরণা আসিয়াছিল বলিয়া তাঁহার আধ্যাত্মিক বিষয়ের আলোচনাও এমনই ভাবে রস-শিল্পের নিপুণ স্পর্শে সঞ্জীবিত হইয়া উঠিয়াছে। তাঁহার কবি-মনকে তাঁহার আধ্যাত্মিক মন কিছুতেই আচ্ছন্ন করিতে পারে নাই বলিয়াই তাঁহার আধ্যাত্মিক অনুভূতি মাত্রই এমনই সহজ ও সরস। পরিদৃশ্যমান বিশ্ব-জগৎকে উপেক্ষা করিয়া তাঁহার আধ্যাত্মিক দৃষ্টি দুর্নিরীক্ষ্য আদর্শ-লোকে নিবদ্ধ হয় নাই, তাঁহার আধ্যাত্মিক দৃষ্টি জাগতিক সত্য দ্বারাই আচ্ছন্ন ছিল; সেইজন্যই তিনি বিশ্বজগতের সৌন্দর্য্যের মধ্যে আত্মার প্রসাদ লাভ করিয়া ধন্য হইয়াছেন।*

---

* ঢাকা পূর্ব্ব-বাংলা সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের ষোড়শাধিক শততম মাঘোৎসবে মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের স্মৃতিসভায় পঠিত।

বিপরীত

শ্রীবিভূতিভূষণ গুপ্ত

স্বামী-স্ত্রীতে অতি সাধারণ কারণে একটা খণ্ডযুদ্ধ হইয়া গেল। কারণ সামান্য। বিপ্রদাস বন্ধু ইন্দ্রনীলের সহিত বিদেশ ভ্রমণে যাইবে, স্ত্রী মায়া সঙ্গী হইতে চায়। আপত্তিটা তার সেইখানে। কিন্তু মায়া মনে করে তার এলোমেলো-স্বভাব স্বামীকে একাকী বিদেশে যাইতে দেওয়া মানে সজ্ঞানে তার অনিষ্ট করা। যাহা সে প্রাণ গেলেও পারিবে না। বিপ্রদাস মনে করে, মায়ার এটা বাড়াবাড়ি। মায়া বলে, এ কথা বলিতে বিপ্রদাসের লজ্জা পাওয়া উচিত ছিল—নইলে যোগ্যতা যে তার কতখানি তাহা না জানে কে?

ব্যাপারটা হয়ত এইখানেই শেষ হইয়া যাইত যদি না বিপ্রদাস ভিতরে ভিতরে ইহা লইয়া অত্যন্ত অসন্তুষ্ট হইত এবং এই অসন্তুষ্টি সে কথায় প্রকাশ না করিলেও তার চলায় ফেরায় এমন কি প্রতিটি কাজে উগ্রভাবে প্রকাশ পাইতে লাগিল যাহা সাংসারিক আবহাওয়াকে ভারাক্রান্ত করিয়াই শুধু ক্ষান্ত হইল না, তাহার নিজের মনকেও একটা অস্বস্তিকর অনুভূতি আচ্ছন্ন করিয়া রাখিল।

স্বামীর এই অকারণ উত্তেজনা কিছুদিন যাবৎ মায়া লক্ষ্য করিয়া আসিতেছে কিন্তু নিরর্থক চেঁচামেচি করিতে ভালবাসে না বলিয়াই সে নীরব ছিল অথচ এমনি চুপ-চাপ করিয়াই বা কত দিন থাকা যায়। স্বামীকে একান্তে পাইয়া মায়া একটু ঘুরাইয়া প্রশ্ন করিল, তোমার শরীরটা কি ভাল যাচ্ছে না?

বিপ্রদাস মুখ তুলিয়া চাহিল, কহিল, কেন বল তো? আমার শরীর খারাপের কিছু দেখেছ নাকি?

মায়া পরিপূর্ণ দৃষ্টিতে স্বামীর মুখের প্রতি চাহিল, দু'চোখে তার নীরব ভর্ৎসনা। কিন্তু মুখে কহিল, না হলেই বাঁচি। বেশী কথা কোন দিনই সে বলে না—বলিতে ভালবাসে না বলিয়াই বলে না। অকারণ মাখামাখি করাকে সে সযত্নে এড়াইয়া চলে। এই লইয়া বহু অনুযোগ তার ভাগ্যে জুটিয়াছে। এমনকি স্বামীর তরফ হইতেও আসিয়াছে বহু পরিহাসের রূপ ধরিয়া কিন্তু স্ত্রীর স্বাধীন ইচ্ছাকে স্বামিত্বের জবরদস্তির কাছে কোন দিনই এতটুকু অবনমিত হইতে হয় নাই। তাহাতেই মায়া আজ রীতিমত বিস্মিত হইল বিপ্রদাস যখন একটু তিক্ত কণ্ঠেই কহিল, এ তোমার অকারণ ভাবপ্রবণতা।

মায়া মৃদু কণ্ঠে কহিল, অস্বীকার করছি না, কিন্তু তোমার অন্ততঃ তা নেই এ বিশ্বাস আমার ছিল। নইলে কি এমন হয়েছে যার জন্য...

বাধা দিয়া বিপ্রদাস কহিল, সে বিশ্বাস নেই বুঝি এখন?

মায়া সহজ গলায় কহিল, এ প্রশ্ন তুমি নিজেকেই ক'রো। সে আর দাঁড়াইল না, নিঃশব্দে প্রস্থান করিল।

ঝগড়াঝাটি যে স্বামী-স্ত্রীতে ইতিপূর্ব্বে হয় নাই তাহা নহে। বরং কারণে-অকারণে একটু বেশী মাত্রায়ই হইয়া থাকে, কিন্তু তাহা মিটিয়া যাইতেও বেশী দেরি হয় নাই। হয় একটু হাসি নয় খানিক চোখের জল। আজ কিন্তু এর কোনটাই প্রবেশ-পথ পায় নাই। দেখা দিয়াছে উভয় উভয়কে বিশ্লেষণ করিয়া দেখিবার জন্য বিচারলিপ্সা—যাহা নিরর্থক আবহাওয়াটাকে জটিল করিয়া তুলিল।

বিপ্রদাস মনে করিল, মায়ার ইহা অন্যায় জবরদস্তি—তার শান্তিপ্রিয় স্বভাবের সুযোগ লওয়া।

কয়েক মুহূর্ত্তেই মায়া পুনরায় ফিরিয়া আসিল এবং কোন প্রকার ভূমিকা না করিয়াই কহিল, কিছুদিন থেকে তোমার যে কি হয়েছে সে তুমিই জান, অথচ মুখ ফুটে কিছু বলবেও না। আমার সত্যিই আর এ সব ভাল লাগে না।

বিপ্রদাস কহিল, আমিও ঠিক ঐ প্রশ্নই তোমায় করব ভেবেছিলাম কিন্তু বলে কোন লাভ নেই জেনেই চুপ করে আছি। কথাটা তুললে বলেই বলতে হ'ল।

স্বল্পভাষী মায়ার আজ কি হইয়াছে জানি না, সহসা সে বারুদের মত জ্বলিয়া উঠিয়া তীব্র কণ্ঠে কহিল, কি দেখেছ তুমি আমার, শুনি? কি অন্যায়টা করেছি আমি! নিজের যোগ্যতার তো বালাই নেই—তা আর জয়ঢাক পিটে দশজনাকে না জানালেও চলত। এই যে হাড় কাঁপুনে শীত, পরেছে কোটের নীচে একটা সোয়েটার, বেঁধেছে গলাবন্ধটা! ষড়যন্ত্র করে আমাকে...কথাটা মায়া শেষ করিতে পারিল না। গলাটা ঈষৎ কাঁপিয়া উঠিল কিন্তু মুহূর্ত্তেই নিজেকে সামলাইয়া লইয়া পুনরায় কহিল, বিয়ের পর থেকে অনেক কিছুই দেখলাম প্রতিবাদ আমি কোন দিন করি নি এখনও করছি না কিন্তু তুমি আমার এত বড় বিশ্বাসকে ভেঙে দিও না। আমার স্বপ্ন আমার কল্পনাকে মিথ্যে হতে দিও না।

বিপ্রদাস বিস্ময়ে হতবাক্ হইয়া গেল। এ কেমন অভি-যোগ। এর সূত্র কোথায়? বিদেশ ভ্রমণে সঙ্গে লইতে আপত্তি করার সহিত যে এই অভিযোগের কোথায় যোগাযোগ রহিয়াছে ইহা সে কিছুতেই বুঝিয়া উঠিতে পারিল না। বিপ্র-দাস বোকার মত চাহিয়া রহিল। তার মিতভাষী স্ত্রীর এই আকস্মিক প্রগল্ভতায় সে এতই বিহ্বল হইয়া পড়িয়াছে যে, একটা প্রতিবাদ করিতে পর্য্যন্ত ভুলিয়া গেল।

একটু থামিয়া মায়া পুনরায় বলিয়া চলিল, কত বড় দুর্ভাগ্য আমাদের বল তো। বিয়ের পরে আমাদের একটা নূতন পরি-বেশের মধ্যে এসে পড়তে হয় অথচ এই নূতন সংসারের অসংখ্য দাবি মেটাতে গিয়ে কখনও যদি এতটুকু ক্রটিবিচ্যুতি

হয় তোমরা তা সহ্য করবে না। কিন্তু এ কথা তোমরা একবারও ভেবে দেখ না যে, স্নেহ-ভালবাসা অথবা কর্ত্তব্যের সহজবুদ্ধি মানুষের মনে আপনি দেখা দেয় না। আদান-প্রদানের ভিতর দিয়েই তা জন্ম নেয়—তার স্বাভাবিক গতি প্রাণ পায়। তোমরা শিখেছ শুধু চোখ রাঙিয়ে সবকিছু আদায় করতে।

বিপ্রদাস এতক্ষণে কথা কহিল, নিরর্থক অনেক বাজে কথা তুমি বকে গেছ যার প্রতিবাদ করতে যাওয়াকেও আমি নীতি-বিরুদ্ধ মনে করি কিন্তু আর নয় তুমি অনেক দূর এগিয়ে গেছ।

মায়া কঠিন হইয়া উঠিল, কহিল, না অনাবশ্যক একটা কথাও আমি বলি নি—এগিয়েও যাই নি নইলে এত বোকা আমি নই যে কিছুই বুঝি না। কিসের জন্য তুমি এমনি করে এড়িয়ে চলতে চাও। এমন ত তুমি কোন দিন ছিলে না।

এই নিরর্থক অভিযোগে বিপ্রদাস বিরক্ত হইয়া উঠিল, কিন্তু শান্ত কণ্ঠেই কহিল, সেইখানেই মস্ত ভুল হয়ে গেছে। কিন্তু যে ভুল এক বার করেছি তা আর দ্বিতীয় বার করব না এ কথাটা আমার ভাল করেই জেনে রেখ।

স্বামীর এমনি দৃঢ় কণ্ঠস্বর ইতিপূর্ব্বে মায়া আর শুনিয়াছে বলিয়া তার মনে পড়ে না। মায়া আর মুহূর্ত্ত সেখানে দাঁড়াইল না—ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল।

ঘটনাটা না ঘটলেই ছিল ভাল। বিপ্রদাস ভাবিতে বসিল। কিন্তু মায়ার মনে এ অদ্ভুত চিন্তাধারা স্থান পাইল কেমন করিয়া—যাহা সুস্থও নয় সহজ সুন্দরও নয়। স্বামীকে সে কি অবিশ্বাসের চোখে দেখিতেছে?

মায়ার চিন্তাধারা কিন্তু বিপরীত পথে অগ্রসর হইয়া চলিল। তার মতে বিপ্রদাস স্ত্রীকে এড়াইয়া চলিতে চায়, নইলে একাকী বিদেশ ভ্রমণের কথা সে ভাবিতে পারিল কেমন করিয়া। কেমন করিয়া সে ভুলিয়া গেল অতীতের বহু স্মরণীয় ঘটনার কথা যা রজনীর নিস্তব্ধতায় তারা দু'জনে রচনা করিত। যে কল্পনা তাদের কল্পলোক হইতে স্বর্গলোক পর্য্যন্ত অবিচ্ছেদ্যভাবে অগ্রসর হইয়া যাইত, দু'জনার আলাদা অস্তিত্বের কথা পর্য্যন্ত যারা ভুলিয়া থাকিত, সে দিনের সে বাক্যছটা, কানে কানে কথা কওয়া···দু'জনার মধ্যে সহজ-ভাবে নিজেদের হারিয়ে ফেলা এ সবই কি শুধু কথার কথা? এই ক'টি গোনা বছরের মধ্যেই কি সব শেষ হইয়া গিয়াছে? মায়া যতই ভাবিতে চায় সব কেমন গোলমাল হইয়া যায়।

মায়াকে পুনরায় এদিকে আসিতে দেখিয়া আলনা হইতে চাদরটা টানিয়া কাঁধের উপরে ফেলিয়া বিপ্রদাস ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল।

মায়া অদূরে দাঁড়াইয়া স্বামীর অপস্রিয়মাণ মূর্ত্তির প্রতি এক দৃষ্টে চাহিয়া রহিল এবং অকস্মাৎ ক্রোড়ে নিদ্রিত শিশুপুত্রকে সজোরে বুকের মধ্যে চাপিয়া ধরিল। শিশুপুত্র নিদ্রিত অবস্থায় ককাইয়া কাঁদিয়া উঠিল। মায়া চমকাইয়া উঠিল। আহা বেচারা···তেমন লাগে নি ত। স্বামীর প্রতি অভিমান সে মুহূর্ত্তের জন্য ভুলিয়া গেল।

* * *

বিপ্রদাস ডাকিল, ইন্দ্র আছ···ইন্দ্রনীল···

ইন্দ্রনীল সাড়া দিল, এস ভাই তোমার কথাই ভাবছিলাম—বাড়ী থেকে প্রায় ঘণ্টা দুই আগে বেড়িয়েছি···কথা বলিতে বলিতে ঘরে প্রবেশ করিয়া বিপ্রদাস মুহূর্ত্তের জন্য ঘরের চতুর্দ্দিকে ইতস্ততঃ দৃষ্টি বুলাইয়া লইয়া কহিল, কিন্তু এ সব কি—ঘরে ডাকাত পড়েছিল নাকি? আপাতত বিপ্রদাস তার নিজের কথা ভুলিয়া গেল। বস্তুতঃ ঘরের অবস্থা তখন এক জীবন্ত বিশৃঙ্খলা। এখানে একটা ট্রাঙ্ক খোলা, ওখানে একটা সুটকেস কাত হইয়া আছে—এখানে কিছু জামা সেখানে কিছু কাপড়।

বিপ্রদাস পুনরায় একই প্রশ্ন করিল।

ইন্দ্রনীল গম্ভীর কণ্ঠে কহিল, সে বরং ছিল ভাল—নিরুপায় জেনে সহ্য করে যেতাম। এ তা নয়—মৃদুলা···আমার স্ত্রী পিত্রালয় যাবেন।

বিপ্রদাস হাসিয়া কহিল, তা না হয় যাবেন কিন্তু তাতে ঘরের উপর দিয়ে এমন ঝড় বয়ে যাবে কেন?

ইন্দ্রনীল যেন একটু অপ্রস্তুত হইল কিন্তু মুহূর্ত্তের মধ্যেই সে ভাবটা কাটাইয়া উঠিয়া সহজ গলায় কহিল, আমার প্রশ্নও সেইটেই কিন্তু তার জবাব দেবে কে?

বিপ্রদাস সঠিক কিছুই আন্দাজ করিয়া উঠিতে পারিল না, জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে ইন্দ্রনীলের মুখের প্রতি চাহিয়া রহিল।

ইন্দ্রনীল কহিল, ও তুমি বুঝবে না বিপ্র আর সেইজন্যেই তোমার স্ত্রী-ভাগ্যের আমি হিংসা করি।

কিছুক্ষণ পূর্ব্বে যে এই কথাটাই বিপ্র বার বার চিন্তা করিয়াছে তাহা আর প্রকাশ করিল না। বরং সে যেন একটু অন্যমনস্ক হইয়া পড়িল কিন্তু সে মুহূর্ত্তের জন্য। নিজেকে সামলাইয়া লইয়া বন্ধুর প্রতি দৃষ্টি ফিরাইয়া সে নিজেও একটু অপ্রস্তুত হইল।

ইন্দ্রনীল দেওয়ালের প্রতি একাগ্র দৃষ্টিতে চাহিয়া চাহিয়া একজোড়া টিকটিকির লড়াই দেখিতেছে আর দরজার পাশে দাঁড়াইয়া আছে শ্রীমতী মৃদুলা—রীতিমত রণং দেহি মূর্ত্তিতে।

ব্যাপারটা যে অনেক দূর গড়াইয়াছে ইহা বিপ্রদাস অনুমান করিল এবং নিজে সে কতকটা অন্যমনস্ক না থাকিলে দেখিতে পাইত যে মৃদুলার গম্ভীর মুখের আড়ালে খানিকটা মৃদু হাসি খেলিয়া গেল।

কোন প্রকার ভূমিকা না করিয়া মৃদুলা যথাসম্ভব সহজ কণ্ঠে কহিল, আচ্ছা ঠাকুরপো, আপনারা আমাদের কি মনে করেন বলুন ত। বাক্স, বিছানা না আপনার কাঁধের ঐ চাদরখানা? যখন যেমন খুশী বেঁধে ছেঁদে অথবা কাঁধের

উপর ফেলে দিয়ে চললেই হ'ল ! আমাদের কোন মতামতেরও দরকার নেই।

কথাগুলি যে কাহাকে লক্ষ্য করিয়া বলা হইয়াছে তাহা বুঝিয়াই ইন্দ্রনীল তেমনি স্থির হইয়া বসিয়া আছে, দৃষ্টি তখনও দেওয়ালে নিবদ্ধ। টিকটিকি দুইটা যদিও অদৃশ্য হইয়া গিয়াছে। কিন্তু কথাগুলি বিপ্রদাসকেও কতকটা বিঁধিল। সে মৃদু হাসিবার চেষ্টা করিয়া কহিল, আপনাদের ইচ্ছাতেই ত সংসারের সবকিছু হয়ে থাকে মৃদুলা দেবী।

মৃদুলা অপূর্ব্ব ভঙ্গীতে বিপ্রদাসের প্রতি চোখ তুলিয়া চাহিল। শ্লেষপূর্ণ কণ্ঠে কহিল,—এত বড় নির্জ্জলা মিথ্যেটা না বললেও পারতেন ঠাকুরপো। আপনাদের ইচ্ছে দিয়েই আমাদের ইচ্ছেকে সৃষ্টি করতে চান এর এতটুকু ব্যতিক্রম হলেই আপনারা বেসামাল হয়ে পড়েন। শুধু তর্কই করবেন না ঠাকুরপো। সত্যকে অস্বীকার করলেই তা মিথ্যে হয়ে যায় না।

মৃদুলা থামিল, একটুখানি হাসিল, পরমুহূর্ত্তেই গম্ভীর কণ্ঠে কহিল—ঘরের অবস্থাটা দেখেছেন ত ? বন্ধুকে জিজ্ঞেস করেছিলেন সে আমি জানি এবং কি উত্তর পেয়েছেন তাও আমি শুনেছি। কিন্তু সে সত্যি মিথ্যের হিসাব-নিকাশ না হয় থাক।

ইন্দ্রনীলের স্থির দেহটা একটু যেন নড়িয়া চড়িয়া উঠিল। মৃদুলা পুনরায় বলিতে লাগিল, অন্যায়টা কোথায় আপনিই বলুন ত। আপনার বন্ধুর ইচ্ছে আপনাদের বিদেশ ভ্রমণের আমি সঙ্গিনী হই—আমার ইচ্ছে এই সুযোগে একবার বাপের বাড়ী থেকে ঘুরে আসি। এমনিতে সংসার ফেলে ত নড়বার উপায় নেই। নাম করলেই অসংখ্য অজুহাত—তার উপর আপনাদের মাথাধরা, পেটব্যথা—ঠাকুর চাকরের চুরি এমনি কত রকমের বিপত্তি এসে যে পথ রোধ করে দাঁড়ায় তার আর কত হিসেব আপনাকে দেব। তাই বলেছিলাম, তোমার কাপড় চোপড়গুলো যা আমার ট্রাঙ্কে আছে বের করে নাও। উনি এমনি করেই তা বের করে নিয়েছেন—বলিতে বলিতে অকস্মাৎ থামিয়া একটু লজ্জিত কণ্ঠেই মৃদুলা কহিল—ঐ দেখুন শুধু নিজের কথাই বকে যাচ্ছি—একটু বসুন চা করে নিয়ে আসছি ঠাকুরপো। মৃদুলা চলিয়া গেল।

ইন্দ্রনীলের দেহে প্রাণ আসিল—কণ্ঠে যোগাইল ভাষা, কহিল—বুঝলে বিপ্রদাস এই নিয়েই আমাকে ঘর করতে হয়।

বিপ্রদাস কতখানি বুঝিল তা সে-ই জানে কিন্তু মনের পর্দায় যেন তার নিজ সংসারের একখানি সুস্পষ্ট ছবি রূপ পরিগ্রহ করিয়াছে। অন্যমনস্ক ভাবে সে উত্তর দিল—কি বলছিলে তুমি ?

ইন্দ্রনীল কহিল—বলছিলাম আমার সহধর্ম্মিণীর কথা। কি করা যায় বল ত ?

বিপ্রদাসও এমনি এক সমস্যার সমাধান করিতেই এখানে আসিয়াছিল। কে জানিত যে এখানে আসিয়া তাহাকে এক বিপরীত প্রশ্নের সম্মুখীন হইতে হইবে।

ইন্দ্রনীল কহিল—হঠাৎ যে মৃদুলার কি হ'ল সে-ই জানে। আজ সকাল পর্য্যন্তও তার মত পরিবর্ত্তনের কোন আভাস দেয় নি। সন্ধ্যাবেলা আপিস থেকে ফিরেই এই খণ্ডপ্রলয়ের সম্মুখীন হতে হয়েছে। একটু থামিয়া ইন্দ্রনীল পুনরায় বলিতে লাগিল, বায়ু পরিবর্ত্তনে যাব—যেখানে স্ত্রীর সাহচর্য্যই সব থেকে মূল্যবান এ কথাটা মৃদুলা কিছুতেই বুঝবে না। অথচ ওরাই আবার বড় গলায় বলেন, ভালবাসাটা মেয়েদেরই একচেটিয়া— আমাদের যা-কিছু সব—

কথাটা ইন্দ্রনীল শেষ করিতে পারিল না। মৃদুলা পুনরায় দেখা দিয়াছে। সঙ্গে আছে ভৃত্য, হাতে তার কিছু আহার্য্য এবং চায়ের সাজসরঞ্জাম। হাতের আহার্য্য টিপয়ের উপর নামাইয়া রাখিতেই মৃদুলা ইঙ্গিতে ভৃত্যকে চলিয়া যাইতে বলিয়া স্বামীর অসমাপ্ত কথার সূত্র ধরিয়া কহিল, মিথ্যে বড় বড় কথা ব'লো না। তোমাদের কথায় আর কাজে যে কতখানি সামঞ্জস্য তা আর আমার জানতে বাকী নেই। খুব ত ভালবাসা বাসা করে বক্তৃতা করছিলে কিন্তু জিজ্ঞেস করি ভালবাসার কতটুকু তোমরা বোঝ—তার কতটুকু মর্য্যাদা তোমরা দাও ?

ইন্দ্রনীল পুনরায় বোবা হইয়া গিয়াছে। কিন্তু বিপ্রদাস কহিল, এটা কি নিতান্তই এক তরফা হয়ে যাচ্ছে না মৃদুলা দেবী ?

মৃদুলা তেমনি মৃদু অথচ শান্ত কণ্ঠে কহিল, মোটেই নয় ঠাকুরপো। মুখের জোরে আপনারা বিশ্ব জয় করেন—অন্তরের যোগ সেখানে বড় কম তাই পলকেই তা ভেঙে যায় এবং সহজেই আবার জোড়া লাগে।

বিপ্রদাস কহিল, যদি তাই আপনারা সত্য বলে জেনে থাকেন তবু কেন সেই পুরুষের—

তার মুখের কথা টানিয়া লইয়া মৃদু হাসিয়া মৃদুলা কহিল, পুরুষের কাছে ধরা দেয় এই ত ? ঠাকুরপো এই আত্মদানের মধ্যেই যে নারী-জীবনের শ্রেষ্ঠ পাওয়া। তা ছাড়া মেয়েরা আপনাদের মত অকশাস্ত্রে অত পণ্ডিত নয় যে—

বিপ্রদাস মৃদু মৃদু হাসিতে লাগিল। সেই দিকে দৃষ্টি ফিরাইয়া মৃদুলা কহিল, আপনি হাসছেন কেন ?

বিপ্রদাস তেমনি হাসিমুখেই কহিল, যদি আপনার কথাই ঠিক হয়, অর্থাৎ পুরুষের কাছে হারমানারই যদি—

মৃদুলা হাসিমুখেই কহিল, আত্মবঞ্চনা আর আত্মদান কি আপনি এক মনে করেন ?

বিপ্রদাস সহজ ভাবেই মৃদুলাকে মানিয়া লইয়া কহিল, কিন্তু অকশাস্ত্রে যখন সত্যিই আপনারা পণ্ডিত নন তখন আর অত চুলচেরা হিসেব করতে যাইবা গেলেন।

ইন্দ্রনীল এতক্ষণে যেন একটা কথা কহিবার মত বিষয়-বস্তু পাইয়াছে। সে সবেগে বারকয়েক মাথা নাড়িয়া কহিল, তুমি যথার্থ কথা বলেছ বিপ্র। তা ছাড়া একথাটা তুমি বুঝছ না কেন মৃদুলা যে, বিপ্র আমার বন্ধু হলেও তার স্ত্রীর একলার উপর এই বিদেশে দু'জনার ঝক্কি চাপান ন্যায়সঙ্গত হবে না, তার উপর তার কোলে একটি ছোট ছেলে। মানে আমাদের আবার সব দিক ভেবে কাজ করতে হয় কি না।

ইন্দ্রনীলের কথার ধরণে মৃদুলা খিল খিল করিয়া হাসিয়া উঠিল।

ইন্দ্রনীল একটা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলিয়া কহিল—বুঝলে বিপ্র—মৃদুলা হেসেছে…আমি বেঁচেছি।

মৃদুলা তার গলার স্বর অনুকরণ করিয়া কহিল—থাক আর ন্যাকামি করতে হবে না।

মৃদুলা প্রস্থান করিল।

*　　　*　　　*

ইহার পরের ঘটনা অতিশয় সংক্ষিপ্ত :—

ইন্দ্রনীল কহিল—সেই রাজীই যখন হলে তখন মিথ্যে এত কাণ্ড কেন করলে মৃদুলা।

মৃদুলা হাসিয়া কহিল—অকশাস্ত্রে পণ্ডিত নয় যে—

আর বিপ্রদাস সোজা মায়াকে জানাইয়া দিয়াছে যে, সে ঠিকই বুঝিয়াছে। তার মত অগোছালো লোকের একলা বিদেশ ভ্রমণে যাওয়ার শুধু স্বপ্ন দেখাই উচিত। মায়া স্বামীর কথা ঠিক যেন বুঝিয়া উঠিতে পারে নাই এমনি ভাবে তার মুখের প্রতি কিছুক্ষণ চাহিয়া থাকিয়া মৃদু কণ্ঠে কহিল—তোমার জিনিষপত্র আমি আলাদা গোছগাছ করে রেখেছি। তা ছাড়া ভেবে দেখলাম তোমার যখন ঝণিয়েছে…আর মিথ্যে কতকগুলি টাকার অপব্যয়—

বিপ্রদাস আদর করিয়া স্ত্রীর গাল টিপিয়া দিল, কহিল—অভিমান বুঝি ?

মায়া এক হাতে বিপ্রদাসের হাত সরাইয়া দিয়া কহিল…থাক—ওর ডাগর দুটি চোখ অশ্রু ভারাক্রান্ত হইয়া উঠিল।

বিপ্রদাস কহিল—তুমি…পাগল…তুমি পাগল…

*　　　*　　　*

মাদ্রাজ মেল ছুটিয়া চলিয়াছে ওয়ালটেয়ারের পথে। মায়া একমুখ হাসিয়া জিজ্ঞাসা করিল—এত সহজে কেমন ক'রে এ সম্ভব হ'ল মৃদুলা।

মৃদুলা একমুখ হাসিয়া কহিল—তোর টেলিফোন পেয়েই মাথায় একটা মতলব এল…খানিক অভিনয়…কতকগুলি বড় বড় কথার সৃষ্টি…তার পরে এক পেয়ালা চা কিছু মিষ্টিযোগ…বাস্। শুধু খাঁটি প্রেম দিয়েই পুরুষকে দিয়ে কাজ করান যায় না—মাঝে মাঝে একটু অভিনয়, একটু অন্ত কিছুরও দরকার হয় মায়া—মৃদুলা এবং মায়া প্রাণ খুলিয়া হাসিতে লাগিল।

পাশের কামরায় দুই বন্ধু তখন নিরুদ্বেগে সিগারেট টানিতেছে…তাদের মনেও আর কোন ক্ষোভ নাই।

গাঁয়ের মাটির পরশ আর কি পাবে ?

শ্রীঅপূর্ব্বকৃষ্ণ ভট্টাচার্য্য

বকের পাখীরা দিগবলয়ের গায়ে গায়ে রেখা টানে
তরীখানি বেয়ে চলেছি দুজনে সুদূর গাঁয়ের পানে।
মন্থর মেঘ উদার আকাশে বিছায় কাজল পাখা
বর্ষার নদী দুকূল হারায়ে চলে ;
ধানের ক্ষেতের আশে পাশে কাঁপে তরুপল্লব শাখা
নীলাম্বরের তলে।

বয়ে যায় স্রোত,—ভক্তের মত মনে হয় গাছটাকে
অশথের ডালে বসে আছে বক, চমকে মেঘের ডাকে।
খড়কুটো কত ভেসে চলে যায় ধূসর ফেনার সাথে
ঢেউয়ের দোলায় দুলিছে মোদের তরী।
তটভূমি আর পড়ো'ক চোখে উদাস মলিন প্রাতে
উড়িছে বাদল-পরী।

যাত্রা মোদের কাল রাতে সুরু কাকজ্যোছনায় নেয়ে,
তার বনানীর মর্ম্মরধ্বনি তখন গিয়েছে থেমে,
ঘাটের কিনারে কেতকী বনের পেয়েছি সম্ভাষণ
ফুলমঞ্জরী বয়েছে পথের 'পরে।
ধ্যানে সমাহিত রজনীরে করে জোনাকিরা আরাধন
নির্জ্জন বালুচরে।

গত রজনীর মন-মধুরা ভুলিতে পারি না আর
সমুখে বকের সঙ্কেত আসে ভয় হয় অনিবার।
দূরের ঘাটেতে ভিড়িবে কি এই ক্ষুদ্র তরণীখানি !
হয়তো যাত্রা হেথায় ফুরায়ে যাবে,
অশ্রুমাল্য বিনিময় করি আমরা দুইটি প্রাণী,
গাঁয়ের মাটির পরশ আর কি পাবে ?

যুক্তরাষ্ট্রের দক্ষিণ-অঞ্চলস্থ লুইশিয়ানা ষ্টেটের একটি তৈলের কারখানায় গ্যাসোলিন উৎপাদক তিনটি যন্ত্র

২৪ ইঞ্চি ব্যাসযুক্ত পৃথিবীর দীর্ঘতম তৈল-নালিকা। যুক্তরাষ্ট্রের দক্ষিণ-পশ্চিম অঞ্চলস্থ টেক্সাস ষ্টেট হইতে নিউইয়র্ক সিটি হইয়া ফিলাডেলফিয়া পর্য্যন্ত প্রসারিত এই তৈল-নালীর ভিতর দিয়া প্রত্যহ ৩০০,০০০ ব্যারেল তৈল চালনা করা হয়

ক্যাম্প-স্কুলে মেয়েরা নিজের নিজের কাজ করছে

ইংলণ্ডের সাগর-তীরের একটি শহরের খোলা হাওয়ার ক্যাম্প স্কুল

ইংলণ্ডের কিশোর আন্দোলন

শ্রীরঞ্জিত সিংহ

ইংলণ্ডের কিশোর আন্দোলন নতুন রূপ পরিগ্রহণ করে বর্তমান যুদ্ধের গোড়ার দিকে। যুদ্ধের আগেই ইংলণ্ডের বিভিন্ন অঞ্চলে ১৪ থেকে ২০ বছরের ছেলেমেয়েদের নিয়ে 'জাতীয় কিশোর আন্দোলন' (National youth Movement) সুরু হয়। গ্রামে ও শহরে 'জাতীয় কিশোর প্রতিষ্ঠান'সমূহ গড়ে উঠে। তন্মধ্যে ব্রিগেড্‌স্ ক্লাব, বয়-স্কাউট ও গার্ল গাইড প্রভৃতির নাম প্রসিদ্ধ। এইসব সঙ্ঘ ও প্রতিষ্ঠানের কাজের সুবিধার জন্য এগুলির কর্তৃত্বাধীনে 'জাতীয় কিশোর সমিতি' সংগঠিত হয়। এতদ্ব্যতীত আরও যে সব যুদ্ধকালীন কিশোর প্রতিষ্ঠান আছে, সেগুলির অন্তর্ভুক্ত ১৬ থেকে ১৭ বছরের ছেলেমেয়েরা দেশের সেবায় আত্মনিয়োগ করে। ১৯৩৯ সালে বর্তমান যুদ্ধের আরম্ভে স্কটল্যাণ্ডে ১৪ থেকে ২০ বছরের প্রত্যেক ছেলেমেয়ে কিশোর সঙ্ঘে যোগ দেয়। ১৯৪১ সালে ইংলণ্ডের ১৬ থেকে ১৮ বৎসর বয়সের বালকবালিকারা ভিন্ন ভিন্ন স্থানে 'জাতীয় কিশোর সমিতি' গড়ে তোলে এবং নতুন ভাবে কিশোর আন্দোলন সুরু করে। বর্তমানে তাদের ১৩টি কিশোর সঙ্ঘ আছে। মাঝে মাঝে যাবতীয় সঙ্ঘসমূহের মহাসম্মেলনের অধিবেশন হয়। সেগুলোর নাম নীচে দেওয়া গেল :—

১। জাতীয় কিশোর সঙ্ঘ, ২। জাতীয় নারী সঙ্ঘ, ৩। ওয়াই. এম. সি. এ, ৪। ওয়াই. ডব্লিউ. সি. এ, ৫। বয়-স্কাউট সঙ্ঘ, ৬। গার্ল গাইড সঙ্ঘ, ৭। জাতীয় কিশোর কৃষি-প্রতিষ্ঠান, ৮। ওয়েল্‌স্ ছাত্র-সঙ্ঘ, ৯। দি বয়েজ ব্রিগেড, ১০। দি চার্চ-ল্যাড্‌স্ ব্রিগেড, ১১। নারী বান্ধব সমিতি, ১২। দি গার্লস্ লিগ্‌ড্রি, ১৩। দি গার্লস্ লাইফ ব্রিগেড।

এইসব সঙ্ঘের কিশোর দলের পরিচালনার ভার জাতীয় কিশোর সমিতির উপর। ১৯৪১ সালের সুরু থেকেই বিদ্যালয়ের সহস্র সহস্র ছাত্রছাত্রী কিশোর সঙ্ঘে যোগদান করে। তাদের জন্য সর্বসমেত ১৭ রকম কাজের পরিকল্পনা করা হয়। প্রত্যেক দলের নিজস্ব কোয়াড ও দলনেতা আছে। দেশে যখন সমরানল প্রজ্বলিত হয়ে উঠল তখন সেখানকার ছেলেমেয়েরা

ইংলণ্ডের ক্যাম্প-স্কুলে ছেলেরা ক্ষেতের কাজ করছে

হাসিমুখে কর্তব্যকঠিন মৃত্যুর পথকে বরণ করে নিলে।

ইংলণ্ডের কিশোর সেবা দলের (Youth Service Corps) প্রধান উদ্দেশ্য হ'ল, প্রত্যেকটি সভ্য ছেলেবেলা থেকেই যাতে দেশের ও দশের প্রতি কর্তব্য সম্বন্ধে সচেতন হয়, তাদের তদনুযায়ী শিক্ষা প্রদান। এদের মধ্য থেকেই কেউ কেউ যোগ্যতার পরিচয় দিয়ে দলনেতা হিসাবে নির্

ইংলণ্ডের ছেলেদের আনন্দ-কেন্দ্র

নিজ প্রতিষ্ঠানের পরিচালনার ভার গ্রহণ করে। দলনেতারা গ্রামে ও শহরে ঘুরে ঘুরে প্রাচীরপত্র ইত্যাদির সাহায্যে প্রচার-কার্য্য করে এবং ১৪ থেকে ২০ বছরের ছেলেমেয়েদের নিয়ে কিশোর সঙ্ঘ গড়ে তোলে। মাঝে মাঝে বিদ্যালয়সমূহে গিয়ে ছাত্র ও শিক্ষকদের নিয়ে আলোচনা সভা বসিয়ে নিজেদের আদর্শ ব্যাখ্যা করে ও সকলের সমক্ষে সঙ্ঘের কর্মতালিকা উপস্থাপিত করে। সব জায়গাতেই সভ্যেরা নিজেরাই অগ্রণী হয়ে দল গঠন করে। নিজেদের ভিতর থেকেই তারা নেতা নির্বাচন করে। দলপতির বয়স ১০ থেকে ২০ বছরের মধ্যে হওয়া চাই। সহকারী নেতা নির্বাচন করাও হয়ে থাকে। প্রত্যেক সভ্যের কাছে কিশোর দলের 'ব্যাজ' থাকে। সঙ্ঘের সম্পাদকেরা বিভিন্ন দলের নেতার নিকট থেকে কাজের হিসাব নেয়। এবার তাদের কাজের নমুনা দেওয়া যাচ্ছে।

(ক) 'হোম-গার্ডে'র কর্মীদের কাজ হ'ল জামা কাপড় পরিষ্কার করা, মোজা ও গেঞ্জী বোনা, ব্লেক-বোতা ও বালির বস্তা সাজানো, সংবাদ-দাতার কাজ, সৈন্যদের জন্য গল্পের বই ও পত্রিকা সংগ্রহ করা, কারখানার কুলিদের জন্য শাক-সব্জি সরবরাহ করা, কম্বল বোনা, নৌ-বিহারের জন্য গানের রেকর্ড যোগাড় করা, ক্লাবে ক্লাবে নাচ গান জল্‌সার আয়োজন করা ইত্যাদি।

(খ) দেশরক্ষার আংশিক দায়িত্বভার যাদের উপর ন্যস্ত হয় তাদের করণীয় হচ্ছে—প্রাথমিক চিকিৎসাদির ব্যবস্থা, আগুন নেবানো, সংবাদদাতার কাজ, আশ্রয়-স্থান তৈরি করা, বোমাবিধ্বস্ত অঞ্চলের লোকেদের সাহায্য করা, রেড-ক্রসের কাজ, ছোটদের উপহারের জন্য খেলনা ও পুতুল তৈরী করা, চিঠিপত্র আদান-প্রদানের কাজ প্রভৃতি।

(গ) যারা গ্রামের চাষাদের সঙ্গে কাজ করে তাদের ক্ষেতে চৌকি দেওয়া, ফসল কাটা, আলু ও গাজরের চাষ করা, মুরগী ও হাঁস প্রভৃতির জন্য খাদ্য সংগ্রহ করা, গো-শালার তত্ত্বাবধান, বনজঙ্গল সাফ করা প্রভৃতি বিবিধ কর্মে লিপ্ত হতে হয়।

(ঘ) যারা ঘর-গৃহস্থালির কাজ করবে তাদের উদ্যান-রচনা ও ছেলেমেয়েদের দেখাশোনার ভার নিতে হয়। তা ছাড়া হোটেল ও দোকানের কাজ, সৈন্যদের জন্য ফলমূল সংগ্রহ করা, হাসপাতালে নার্সের কাজ, আশ্রিত শিশুদের তত্ত্বাবধানের দায়িত্বও তাদের গ্রহণ করতে হয়।

(ঙ) যারা কারখানার কাজ করবে তাদের কর্তব্য হ'ল ছেঁড়া কাগজ, লোহা ও টিনের টুকরো, কাঁচের বোতল, ভাঙা গ্রামোফোন রেকর্ড ও রেডিওর ব্যাটারি ইত্যাদি জড় করা, ওয়ার-বণ্ড বিক্রী করা, লাইব্রেরি ও পাঠাগারের কার্য্য-পরিচালনা, দুধ, খাবার ও সংবাদপত্র বিলি করা, পুলিস বিভাগের সাহায্য করা, বিদ্যালয়সমূহে সন্ধ্যাকালীন ক্লাসে নাচ গান অভিনয় ও বক্তৃতার আয়োজন করা, ক্রীড়া-প্রতিযোগিতার ব্যবস্থা করা, স্কোয়াড নেতাদের পরিচালিত করা ইত্যাদি।

২

ইস্কুলের ছেলেমেয়েদের সামরিক শিক্ষাদানের জন্য ১৯৪২ সালে কয়েকটি সমিতি গড়ে ওঠে। তন্মধ্যে ১২ বছর বয়সের ছেলেমেয়েদের নৌ-বিদ্যা শিক্ষাদানের জন্য একটি সঙ্ঘ গঠিত হয়। একে বলা হয় (ক্যাডেট কোর্স)। তা ছাড়া ১৬ বছর বয়সের ছেলেমেয়েদের জন্য হোম গার্ড বিভাগ খোলা হয়, ১২ থেকে ১৮ বছরের ছেলেমেয়েদের জন্য বিমান-বিদ্যা শিক্ষার ব্যবস্থা করা হয়।

তারপর ১৯৪২ সালের একটি আইন অনুযায়ী ইংলণ্ডের ১৪ থেকে ১৮ বছরের মেয়েদের নিয়ে যে সকল 'জাতীয় নারী শিক্ষা সঙ্ঘ' গড়ে ওঠে, তৎসমুদয়ের প্রত্যেক সভ্যকে নিয়মিত-ভাবে স্বাস্থ্যরক্ষার নিয়ম, প্রাথমিক চিকিৎসা-প্রণালী, হাতের কাজ, চিঠিপত্র বিলি করা, ব্যায়ামাদি ও কেরাণীর কাজ শেখানো হয়। দেশরক্ষার কাজে নিযুক্ত যেসব ১৬ বছরের ছেলে ও ১৮ বছরের মেয়ে মাসে ২৪ ঘণ্টা হিসাবে কাজ করে, তাদের শিক্ষার ব্যবস্থা আলাদা।

ইংলণ্ডের ছেলেমেয়েরা ১৪ বছর বয়সে স্কুল থেকে বেরিয়ে ব্যবসা-বাণিজ্য শিক্ষার জন্য বিভিন্ন শহরে সরকারী শিক্ষা-কেন্দ্রে চলে যায়। সাধারণতঃ পাঁচ মাস শিক্ষার সময়। কারখানার কাজ শিখতে লাগে দুই মাস।

ইংলণ্ডের কৃষি আন্দোলন ব্যাপকভাবে সুরু হয় ১৯২১ সাল থেকে। তখন থেকেই দেশের নানা অংশে বহু কিশোর কৃষি-প্রতিষ্ঠান গড়ে ওঠে। বর্তমানে প্রায় ৫০০ কৃষি-প্রতিষ্ঠানের সভ্য সংখ্যা ২০ হাজার। এই আন্দোলনের উদ্দেশ্য ১১-১২ বছরের ছেলেমেয়েদের মনকে দেশের কৃষি সম্বন্ধে সজাগ করে তোলা। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে এইসব প্রতিষ্ঠানের সহযোগিতা পরোক্ষভাবে যুদ্ধ-প্রচেষ্টাকে সাফল্যমণ্ডিত করবার পক্ষে কতকটা সহায়কস্বরূপ হয়েছিল।

স্কুলের ছেলেরা একমনে গল্প শুনছে

স্কুলের ছাত্রেরা যাতে ক্ষেতের কাজে চাষাদের সহায়তা করতে পারে, সেজন্য ১৯৪২ সালে বিশ্ববিদ্যালয়ের তরফ থেকে প্রায় ৫০০ 'ক্যাম্প' করা হয়। এইসব শিবিরে স্কুলের ছাত্র ও শিক্ষক, বয়-স্কাউট ও গার্ল গাইডরা অবস্থান করে। সপ্তাহে ৩৬ ঘন্টা তাদের কাজ করতে হয়। ছেলেদের শ্রম-মূল্য ঘন্টায় আট আনা, মেয়েদের ঘন্টায় সাত আনা।

ইংলণ্ডের প্রায় প্রত্যেক স্কুলেই মেয়েদের জন্য নার্সিং শিক্ষার ব্যবস্থা আছে। নার্সারি ইস্কুলের কাজ ও হাসপাতালের কাজ করবার জন্য তাদের আলাদা শিক্ষায়তন আছে। ইংলণ্ডে যুদ্ধ-প্রচেষ্টায় সহযোগিতার জন্য ১৬ থেকে ১৮ বছরের ছেলেমেয়েদের নিয়ে এক বিরাট 'জাতীয় কিশোর সংঘ' (*The National As ociation of B ys' Clubs*) গড়ে ওঠে। ১৯৪০ সালের গোড়া থেকে এই আন্দোলন সুরু হয়। এইসব প্রতিষ্ঠানে ব্যায়ামচর্চা, নাচ, গান, অভিনয় ইত্যাদি হয় এবং হাতের কাজও শেখানো হয়ে থাকে। সেগুলোতে সবরকম খেলাধূলোর ব্যবস্থা, পাঠাগার ও শিক্ষার যাবতীয় উপকরণ থাকে। 'জাতীয়-নারী-পরিষদ' নামে মেয়েদেরও একটি প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠেছে। সাকল্যে এদের প্রায় ৫০টি ইউনিয়ন আছে, ক্লাবের সংখ্যা ২৪০টি। ১৯৪১ সালের পর থেকে এইসব প্রতিষ্ঠানের কর্মসূচীর অদল-বদল হয় এবং যুদ্ধ-প্রচেষ্টায় সাহায্যের জন্যে এরা কিশোর কৃষি-প্রতিষ্ঠান, রেড-ক্রশ ও নারী-প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে সহযোগিতা সুরু করে।

ইংলণ্ডের ওয়াই-ডবলিউ-সি-এ ১১-১৪, ১৪-১৮ বছরের মেয়েদের নিয়ে গঠিত এক বিরাট প্রতিষ্ঠান। এগুলোর বিভিন্ন কেন্দ্রস্থ ক্লাবসমূহে সভ্যদের জন্য নির্দোষ আমোদ-প্রমোদের ব্যবস্থা আছে—অভিনয়-কেন্দ্র এবং ছেলেমেয়েদের জন্য খেলাধূলোর সবরকম ব্যবস্থাও সেগুলোতে বিদ্যমান।

ইংলণ্ডের ওয়াই. এম. সি-এর সভ্যেরা বর্তমানে কৃষি-প্রতিষ্ঠানের সাহায্যে ব্যাপৃত। ছুটির সময়। সেই সময় এরা দল বেঁধে নিকটস্থ গ্রামে গিয়ে চাষাদের সঙ্গে ক্ষেতে কাজ করে এবং তাদের জীবনযাত্রা-প্রণালীর সঙ্গে পরিচিত হয়।

৩

যাবতীয় কিশোর আন্দোলনের ভেতর বয়-স্কাউট ও গার্ল গাইড আন্দোলনই সবচেয়ে প্রসার লাভ করেছে, ইংলণ্ডেই এর উদ্ভব। এই আন্দোলনের প্রবর্তক লর্ড ব্যাডেন পাওয়েল গত মহাযুদ্ধের সময় ইংলণ্ডে এই আন্দোলনের সূচনা করেন। ১৯৪১ সালে যুদ্ধ-প্রচেষ্টায় সাহায্যের জন্য প্রায় ৬০ হাজার বয়-স্কাউট পুরস্কারস্বরূপ ন্যাশনাল সার্ভিস ব্যাজ পেয়েছে। আজকের দিনে তাদের সবচেয়ে বড় কাজ হ'ল গ্রামাঞ্চল থেকে ওষুধপত্র জোগাড় করা এবং চাষীদের ক্ষেতের কাজে সাহায্য করা। তা ছাড়া সি-স্কাউট আর এয়ার-স্কাউটরা দেশরক্ষায় সাহায্য করছে। বয়-স্কাউটদের উপার্জিত অর্থের শতকরা ৭৫ ভাগ দেশের কাজে ব্যয়িত হয়।

গার্ল গাইডদের প্রধান কাজ হাসপাতালে রোগীদের এবং আহত সৈন্যদের সেবা-শুশ্রূষা করা। তা ছাড়া হোমগার্ড ডবলিউ-ভি-এস এবং এ-আর-পি দলের সঙ্গে এদের ঘনিষ্ঠ যোগ আছে।

প্রকৃতপক্ষে ১৯০৭ সাল থেকে এই বয়-স্কাউট আন্দোলন সুরু হয়। তখন প্রত্যেক স্কুলের ছেলেমেয়েরা স্কাউট-ক্যাম্পে যোগ দেয়। ১৯১০ সালে এর সভ্য-সংখ্যা দাঁড়ায় ১২৪,০০০। তারপর প্রথম মহাযুদ্ধের সঙ্গে সঙ্গে এই বয়-স্কাউট আন্দোলন পৃথিবীর সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ে।

প্রথম মহাযুদ্ধের পর ১৯২০ সালে ইংলণ্ডের বয়-স্কাউটদের যে আন্তর্জাতিক 'জাম্বুরী' হয় তাতে বয়-স্কাউট সঙ্ঘের

বোমা-বিধ্বস্ত শহরের চীনা ছেলেরা ইতিহাস পড়ছে

করা ছাড়াও প্রত্যেক ছাত্র-ছাত্রী চাষীদের নানাভাবে সাহায্য করে। সেজন্য রুশ-বার বছরের ছেলেমেয়েদের স্কুল থেকে কিছুকালের জন্য ছুটির ব্যবস্থা করা হয়। কোন কোন স্কুলে আবার এইজন্য পায়োনিয়ার কোর ও ল্যাণ্ড ক্লাব আছে। এগুলোর সভ্যেরা গ্রামে গ্রামে ঘুরে দেশের কৃষি-শিল্পের উন্নয়নের চেষ্টা করে। ইংলণ্ডের গ্রামাঞ্চলে 'পিগ ক্লাব'গুলি খাদ্য-উৎপাদনের কাজে বিশেষভাবে সাহায্য করে।

অধিনায়ক লর্ড ব্যাডেন পাওয়েল ২৩টি বিভিন্ন দেশের ছেলে-মেয়েদের সম্বোধন করে বলেছিলেন :—

"ভ্রাতৃগণ, আমি তোমাদের খুশীমনে কাজ করতে বলছি। ভুলোনা যে, পৃথিবীর নানা দেশের লোকের ভাবে, ভাষায়, আচার-ব্যবহারে পার্থক্য আছে। এই যুদ্ধ থেকে আমরা বুঝতে পেরেছি যে যখন কোন সবল দেশ দুর্ব্বল দেশের ওপর অত্যাচার চালায় তখন তার ফল ভাল হয় না। এই 'জাম্বুরী' থেকে আমরা শিখেছি যে, পরস্পরের আদান-প্রদানের ভেতর দিয়েই একটা উন্নত আদর্শবাদের উৎপত্তি হয় ও পারস্পরিক সহানুভূতি ও প্রীতি জন্মায়। এস আমরা এই স্কাউট আন্দোলন পৃথিবীময় ছড়িয়ে দিই, সবাইকে বন্ধু করে নিই। ভবিষ্যতে পৃথিবীর মানুষেরা সবাই সুখে ও শান্তিতে বাস করুক।"

৪

বর্ত্তমান যুদ্ধে খাদ্য-উৎপাদনের কাজে ইংলণ্ডের স্কুলসমূহ বিশেষভাবেই সহযোগিতা করেছে। প্রত্যেক স্কুলের নিজস্ব ক্ষেত ও বাগান আছে। সেই সব বাগান ও ক্ষেতের ফুল ফল ও শাক-সব্জি যুদ্ধরত সৈনিকদের জন্য সরবরাহ করা হ'ত। যে সমস্ত স্কুলে আগে শুধু ফুলের বাগান ছিল যুদ্ধকালে সে-গুলোকে চাষ-আবাদের উপযোগী করে তোলা হয়েছিল। এই সব স্কুলে যতটুকু খাদ্য উৎপাদন করা হয়, তা থেকে আগে স্কুল ক্যান্টিনের প্রয়োজনমত পৃথক করে রাখা হয়, বাকিটুকু বাইরে পাঠানো হয়। প্রত্যেক ছাত্রের নিজস্ব ক্ষেত ও বাগান আছে। মুরগী, ছাগল, হাঁস, খরগোস, গরু, ভেড়া প্রভৃতি পশুপক্ষী প্রতিপালনের ব্যবস্থাও আছে। অনেক স্কুলে সারা বছর আলুর চাষ হয়। নিজ নিজ স্কুলের বাগানে ও ক্ষেতে কাজ

১৯৩৪ সালের পর থেকে ইংলণ্ডের 'বি. এস এ. এসে'র উদ্যোগে ৭০০টি নৌ-বিদ্যা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের গোড়াপত্তন হয়। আজকের ইংলণ্ডের প্রত্যেক স্কুলেই হাতের কাজ একটি প্রধান শিক্ষণীয় বিষয়। ১৯৪৩ সালে ইংলণ্ডের ছাত্রছাত্রীদের জন্য যে যুদ্ধোত্তর শিক্ষা-পরিকল্পনা করা হয় তাতে সকল ছাত্র-ছাত্রীকে সমান সুযোগ দেবার প্রস্তাব করা হয়। তাদের 'চতুর্থ বার্ষিকী পরিকল্পনা' অনুযায়ী ঠিক হয় যে, ইংলণ্ডে সাধারণতঃ তিন শ্রেণীর স্কুল থাকবে : প্রাথমিক বিদ্যালয়, উচ্চ বিদ্যালয় ও শিল্প বিদ্যালয়। ৫ থেকে ১৪ বছরের ছেলেমেয়েদের জন্য বাধ্যতামূলক শিক্ষার ব্যবস্থা করা হবে। ১৬ বছর বয়সে (আগে ছিল ১৫ বছর) স্কুলের শিক্ষা শেষ করতে হবে। জুনিয়র শিল্প স্কুলে ১৩ থেকে ১৬ বৎসর বয়স্ক ছাত্রদের শিক্ষার ব্যবস্থা করা হবে। ১৯ বছর বয়সে কলেজে যোগদান করতে হবে। সরকারী স্কুল ছাড়াও অনেক বে-সরকারী শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান থাকবে, বোর্ডিং স্কুল ও পাবলিক স্কুলে নির্বাচিত ছাত্রদের নেওয়া হবে। স্কুলের কার্য্য নির্ব্বাহের দায়িত্ব-ভার থাকবে স্থানীয় শিক্ষা-সমিতির ওপর। প্রত্যেক স্কুলের জন্য আলাদা ডাক্তার, নার্স, খাবার ব্যবস্থা ও খেলা-ধুলোর সরঞ্জাম থাকবে। ছুটির সময় শহরের ছেলেমেয়েদের নিয়ে খোলা হবে ক্যাম্প-স্কুল। যাদের মায়েরা দিন রাত কারখানা ও ক্ষেতের কাজে ব্যস্ত থাকে তাদের ২-৫ বছরের শিশুদের জন্য প্রতিষ্ঠিত হবে শিশু-সদন। এইসব নার্সারি স্কুল শনিবার ও রবিবারে খোলা থাকবে। নতুন ভাবে 'কিশোর-দল' গড়তে হবে এবং বয়-স্কাউট, গার্ল গাইড, গার্লস্ ক্লাব প্রভৃতি বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের পরিচালনার ভার যুবকদের হাতেই ছেড়ে দেওয়া হবে। ১৯৪৫-৪৬ সালে সেদেশে শিক্ষার জন্য বছরে ৫৫ লক্ষ পাউণ্ড খরচ করবার কথা। এমনি ভাবে গড়ে উঠবে এক নূতন পৃথিবী, উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ।

৫

বিগত মহাযুদ্ধে আহত সৈন্যদের সেবা-শুশ্রূষার জন্য ১৪ বছর বয়সের প্রায় ৪০০,০০০ ছাত্র নিয়ে গড়ে উঠেছে 'ক্যাডেট-কোর' আর ১৪ বৎসর বয়স্কা ১৩০,০০০ লক্ষ মেয়ে নিয়ে গঠিত হয়েছে 'জাতীয়-নারী-শিক্ষা-সংঘ'। সাধারণের অর্থ-সাহায্যে এদের কাজ সুষ্ঠু ভাবে নির্ব্বাহিত হয়।

ইংলণ্ডের কোন কোন স্কুলের ছাত্রেরা সকলে মিলে সোভিয়েট রাশিয়া কিম্বা আমেরিকার ইতিহাস, দেশ-বিদেশের অর্থনৈতিক অবস্থা ও সংস্কৃতির কথা নিয়মিত ভাবে অধ্যয়ন করে। মাসের শেষে তারা 'আমেরিকা উইক' অথবা 'রাশিয়ান ডে' প্রতিপালন করে। কোন স্কুলে আবার কয়েক মাস ধরে হয়ত বা চেকোশ্লোভাকিয়া সম্বন্ধে অধ্যয়ন-অধ্যাপনা চলে। তারপর 'চেকোশ্লোভাকিয়া কলিং' নাম দিয়ে প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করা হয়। তা ছাড়া দেশ-বিদেশের ছাত্র ও অধ্যাপকদেরও তাদের আসরে ডাক পড়ে।

কোন কোন শহরে প্রাথমিক স্কুলের শিক্ষকদের মধ্যে 'সিটিজেন্স্ অফ দি ওয়ার্ল্ড' নামে এক আন্দোলন সুরু হয়েছে। সেই সব স্কুলের শিক্ষকেরা সোভিয়েট রাশিয়া, আমেরিকা, মহাচীন, নরওয়ে, চেকোশ্লোভাকিয়া প্রভৃতি দেশের গণ্যমান্য জননায়কদের সঙ্গে ছুটির দিন কাটিয়ে আসেন।

যুদ্ধের দরুন ইংলণ্ডের যে সব শহরের স্কুল-গৃহ বোমাবর্ষণে ধ্বংস হয়েছিল—সেই সব স্কুলের ছাত্রদের জন্য গ্রামাঞ্চলের নিরাপদ জায়গায় নতুন স্কুল খোলা হয়েছিল। মাঠের ধারে কি নদীর তীরে তাদের স্কুল বসত, অথবা শহর অঞ্চলের ভাঙা বাড়ীর তলায়—গির্জ্জার 'হলে', ও হোটেলে স্কুলের কাজ হ'ত। সেইখানেই তাদের খাওয়া-থাকার ব্যবস্থা করা হয়েছিল।

যুদ্ধের পর থেকে ইংলণ্ডে ক্যাম্প-বোর্ডিং-স্কুল খুব জনপ্রিয়তা লাভ করেছে। দেশ-বিদেশের ছেলেমেয়েদের সঙ্গে মেলামেশার সুবিধার জন্যে নানা স্থানে তাদের ক্যাম্প পড়ে। সেই সব 'হলি ডে ক্যাম্পে' লেখাপড়া এবং অন্যান্য কাজও চলতে থাকে। প্রকাণ্ড জায়গা জুড়ে তৈরি হয় কাঠের স্কুল-বাড়ী—তার মধ্যেই তাদের ক্লাস ঘর, ড্রিল্-শেড, খাবার ঘর, রান্নার ঘর, শিক্ষক-মহল, শোবার ঘর ও হাসপাতাল। 'জাতীয়-ক্যাম্প-প্রতিষ্ঠানে'র তরফ থেকে এদের ব্যয়ভার বহন করা হয়। শহরের মেয়েদের এই সব ক্যাম্প-স্কুল খুব ভাল লাগে—শহরের আবর্জনাময় ও ধোঁয়াটে আবহাওয়া থেকে হঠাৎ মুক্ত আকাশের তলে দাঁড়িয়ে তাদের আনন্দের সীমা থাকে না।

ভোর সাতটায় তাদের ঘুম ভেঙে যায়। তার পর মুখ-হাত ধোওয়া ও প্রাতর্ভোজন। খাবার পর মেয়েদের ঘরদোর ও বিছানা পরিষ্কার করতে হয়। সকাল নয়টা থেকে বারোটা পর্য্যন্ত স্কুল। বারোটায় মধ্যাহ্ন ভোজন। তার পর কিছুক্ষণ ছুটি। দুপুর বেলা মেয়েদের ভ্রমণ, খেলাধুলো ও বাগানের কাজ। বিকেল চারটায় চা-জলখাবার। পাঁচটা থেকে সাতটা পর্য্যন্ত আবার স্কুল। সাতটার পর নৈশভোজন ও ছোটদের ঘুমাবার সময়। তার পর সাড়ে আটটা পর্য্যন্ত মেয়েদের সেলাই, বই পড়া ও গান।

ছেলেদের ক্যাম্প-স্কুলেও অনেকটা এই নিয়ম। শুধু তাদের জন্য আলাদা ফুটবল ও ক্রিকেট-খেলা ও জিম্‌নাসিয়ামের ব্যবস্থা থাকে। আজ এই সব স্কুলের ১৬০,০০০ লক্ষ শিক্ষক অক্লান্ত পরিশ্রম ও অপরিসীম উৎসাহের সঙ্গে ইংলণ্ডের কিশোর সমাজের দেহমন ও আত্মার উন্নতির জন্য অক্লান্ত ভাবে পরিশ্রম করছেন।

পরমাণুর পরিণতি

নছিমউদ্দিন আহমদ, এম. এস্‌সি

অতি প্রাচীন কাল হইতেই মনীষীরা জড়ের (matter) চরম স্বরূপ সম্বন্ধে চিন্তা করিয়াছেন। গ্রীস দেশে, ভারতবর্ষে অতীতে দার্শনিক চিন্তাধারা অতিশয় উৎকর্ষলাভ করিয়াছিল। তৎকালেই মনীষীরা মনে করিতেন জড়ের চরম উপাদান এক অচ্ছেদ্য, অভেদ্য, নিরেট পরমাণু যাহা আমাদের সমস্ত ইন্দ্রিয়ানুভূতির বাহিরে। দৃশ্যমান জগতে সবকিছুই পরমাণুপুঞ্জে গঠিত। ক্ষিতি, অপ্, তেজ ইত্যাদি বিভিন্ন মৌলিক পদার্থ প্রথমতঃ এই সমস্ত অদৃশ্য পরমাণু হইতে গঠিত হইয়াছে; অতঃপর এই সমস্ত মৌলিক পদার্থযোগে জড়জগতের সৃষ্টি।

অতীতের এই পরমাণুতত্ত্বের ভিত্তি ছিল দার্শনিক যুক্তি ও বিশ্বাস, কোন বাস্তব পরীক্ষা হইতে ইহা উদ্ভূত হয় নাই। অতঃপর ইউরোপে পরীক্ষা ও পর্য্যবেক্ষণসঞ্জাত বিজ্ঞানের উৎপত্তি হয়। তখন হইতে মনীষীরা পরীক্ষা ও পর্য্যবেক্ষণ পূর্ব্বক সৃষ্টির বিভিন্ন বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐক্যের সন্ধানে কায়মন নিযুক্ত করেন। এই প্রচেষ্টা ও পর্য্যবেক্ষণের ফলে ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে বৈজ্ঞানিক ডালটন তাঁহার বিখ্যাত পরমাণুবাদ প্রকাশ করেন। ডালটন-প্রবর্ত্তিত পরমাণুবাদকেই প্রথম বৈজ্ঞানিক পরমাণুবাদ বলা হয়। ডালটনের মতে সমস্ত মৌলিক পদার্থ ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র পরমাণুপুঞ্জে গঠিত; পরমাণু অচ্ছেদ্য ও অভেদ্য এবং পদার্থের চরম উপাদান; একই মৌলিক পদার্থের সমস্ত পরমাণু আকৃতি প্রকৃতি সর্ব্ব বিষয়ে একই প্রকার কিন্তু বিভিন্ন মৌলিক পদার্থের পরমাণু বিভিন্ন প্রকার। বিভিন্ন মৌলিক পদার্থের পরমাণু আপন আপন শক্তি প্রভাবে পরস্পরের সহিত মিলিত হইয়া বিভিন্ন যৌগিক পদার্থের সৃষ্টি

করে। বহুদিন ধরিয়া বিজ্ঞান-জগতে ডালটনের পরমাণুবাদ একচ্ছত্র স্থান অধিকার করিয়াছিল এবং তাহারই উপরে রসায়নের বিভিন্ন বিচিত্র সৌধ গড়িয়া উঠিয়াছে। ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগে বিজ্ঞান-জগতে আলোড়ন দেখা দিল। ১৮৯৭ খ্রীষ্টাব্দে বিজ্ঞানী সার জে. জে টমসন ইলেকট্রন (electron) আবিষ্কার করেন। একটি প্রায় বায়ুশূন্য পাত্রে বিদ্যুৎ-চালনা করিয়া টমসন এক আশ্চর্য্য রশ্মির সন্ধান পাইলেন এবং বিস্তর গবেষণা ও পরীক্ষার ফলে স্থির নিশ্চিত হইলেন যে এক চরম ক্ষুদ্র না-ধর্মী (negative) বিদ্যুৎ-কণাসমষ্টির সহযোগে এই প্রবাহের সৃষ্টি এবং সমস্ত পদার্থের পরমাণুর অভ্যন্তরেই এই বিদ্যুৎ-কণার অবস্থিতি। ইহারই নাম দেওয়া হইল ইলেকট্রন। টমসন মোটামুটি হিসাব করিয়া দেখিতে পাইলেন যে পদার্থের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা লঘুতার হাইড্রোজেন, পরমাণুর প্রায় আঠারো শত ভাগের এক ভাগ ইলেকট্রনের ওজন।

ইলেকট্রন আবিষ্কারের ফলে ডালটন-প্রবর্ত্তিত পরমাণুর শাশ্বত রূপ ভাঙিয়া গেল। বৈজ্ঞানিক জগৎ কিন্তু সহজে তাঁহার আবিষ্কার মানিয়া লইতে চাহিল না। টমসন তখন তাঁহার এক শিষ্য উইলসনকে ডাকিয়া ইলেকট্রনের ছবি তুলিতে বলিলেন। এই প্রতিভাশালী ব্যক্তিটি তখন ইলেকট্রন-সন্ধানে প্রবৃত্ত হইলেন এবং অনেক পরিশ্রম ও পরীক্ষার ফলে তাঁহার বিখ্যাত যন্ত্রটি (cloud chamber) আবিষ্কার করিলেন। এই যন্ত্রটির নির্ম্মাণ-কৌশল ও ব্যবহার-বিধি এরূপ অদ্ভুত যে ইহার ভিতর দিয়া ইলেকট্রন ধাবিত হইলে মুক্তামালার মত জলবিন্দু-পথের সৃষ্টি হয়। ক্যামেরা সহযোগে অল্প সময়ে সেই পথের ছবি তোলা যায় এবং সেই সুন্দর ছবি হইতে ইলেকট্রনের সত্তা ও স্থিতি প্রমাণিত হয়। উইলসন-আবিষ্কৃত এই যন্ত্রটির পরবর্ত্তীকালে অনেক সংস্কার ও উন্নতি সাধিত হইয়াছে এবং পরমাণু-জগতের রহস্য উদ্ঘাটনে উহা একটি অপরিহার্য্য উপকরণ হইয়া দাঁড়াইয়াছে।

ইলেকট্রনের সহিত কি পরিমাণ না-ধর্মী বিদ্যুৎ জড়িত আছে তাহার একটা মোটামুটি মান নিরূপণ করেন টমসন নিজে। পরে বিজ্ঞানী মিলিক্যান একটি তৈলবিন্দুকে বিদ্যুৎ প্রযুক্ত করিয়া বৈজ্ঞানিক কৌশলে তাহা হইতে ইলেকট্রনের বিদ্যুৎ-পরিমাণ নিরূপণ করেন (oil drop method)। ইহা ছাড়া ইলেকট্রনের বিদ্যুৎ-মান নিরূপণের আরও বহুবিধ উপায় আবিষ্কৃত হইয়াছে। রঞ্জন-রশ্মি প্রয়োগেও ইলেকট্রনের বিদ্যুৎ-মান নিরূপণ সম্ভবপর এবং বর্ত্তমানে এই উপায়ে নির্ণীত মানই সর্ব্বাপেক্ষা নির্ভুল ও যথার্থ মান হিসাবে বিবেচিত হয়। ইলেকট্রনের ওজনও বর্ত্তমানে নির্ভুলভাবে নিরূপিত হইয়াছে। উহা হাইড্রোজেন গ্যাসের পরমাণুর প্রায় আঠারো শত চল্লিশ ভাগের এক ভাগ বলিয়া স্বীকৃত হইয়াছে।

টমসন পরমাণুর গঠন সম্বন্ধে যে মতবাদ প্রচার করেন তাহা এইরূপ:—সম্পূর্ণ পরমাণুটি একটি গোলাকার হাঁ-ধর্মী (positive) বিদ্যুৎযুক্ত জড়পিণ্ড এবং তাহার অভ্যন্তরে স্থানে স্থানে ইলেকট্রন অবস্থান করে।

এই সময়ে তেজস্ক্রিয় পদার্থের (radio-active elements) আবিষ্কার হয়। ১৮৯৬ খ্রীষ্টাব্দে ফরাসী বৈজ্ঞানিক হেনরি বেকারেল দেখিতে পাইলেন যে ইউরেনিয়াম নামক ধাতু বা উক্ত ধাতুঘটিত পদার্থ হইতে অনবরত ইলেকট্রন রশ্মি বিনির্গত হইতেছে। ইহার অল্পকাল পরে বিখ্যাত মহিলা বিজ্ঞানী মাদাম কুরী পলোনিয়াম ও রেডিয়াম ধাতু আবিষ্কার করেন। ইহা ছাড়া থোরিয়াম, অ্যাক্টিনিয়াম ইত্যাদি আরও অন্যান্য তেজস্ক্রিয় ধাতু আবিষ্কৃত হইয়াছে। কুরী, রাদারফোর্ড, সডি প্রভৃতি বৈজ্ঞানিকগণ এই ক্ষেত্রে অনেক গবেষণা করিয়া ইহাদের ধর্ম্ম ও গুণাগুণ ব্যাপকভাবে নির্ণয় করিয়াছেন। তেজস্ক্রিয় পদার্থ ক্ষণস্থায়ী এবং ইহাদের পরমাণু অনবরত ভাঙিয়া ক্রমশঃ বিভিন্ন পদার্থের পরমাণুতে রূপান্তরিত হয়। এই সমস্ত তেজস্ক্রিয় পদার্থ হইতে তিন প্রকার রশ্মি বিকীর্ণ হয়:—(১) আলফা কণা (α-particle), ইহারা হিলিয়াম নামক গ্যাসের ইলেকট্রন বিচ্যুত পরমাণুকেন্দ্র; (২) বিটা কণা (β-particle), ইহা ইলেকট্রন; (৩) গামা রশ্মি (γ-ray) ইহা রঞ্জনরশ্মির মত প্রবাহ। এই সমস্ত কণা বা রশ্মি বিকিরণ করিয়া তেজস্ক্রিয় পদার্থগুলি ক্রমশঃ স্থায়ী সীসকে পরিণত হয়।

তেজস্ক্রিয়-পদার্থ-নিঃসৃত আল্‌ফা-কণাসমূহ খুবই বেগবান এবং ইলেকট্রন হইতে অনেকগুণ ভারী; কাজেই বিজ্ঞানী রাদারফোর্ড ভাবিলেন, পদার্থের পরমাণুর অভ্যন্তরে ইহাদিগকে ছুঁড়িয়া মারিয়া পরমাণুর অনেক তথ্য সংগ্রহ করা যাইবে। বিভিন্ন পদার্থের ভিতর দিয়া তেজস্ক্রিয়-পদার্থ-নিঃসৃত বেগবান আল্‌ফা-কণা প্রেরণ করিয়া তিনি দেখিতে পাইলেন যে এই সমস্ত কণা পরমাণুর ইলেট্রন-প্রাচীর ভেদ করিয়া বহুদূর পর্য্যন্ত প্রবেশ করিয়া কোথায় যেন এক শক্ত পদার্থে প্রতিহত হইয়া ঠিকরাইয়া বিভিন্ন পথে বাহির হইয়া আসে। আল্‌ফা-কণা নিজেও ওজনে এবং শক্তিতে কম নয়; কাজেই যাহার সহিত সংঘাত হইয়া পথ পরিবর্ত্তন হইল তাহাও নিশ্চয়ই শক্ত কিছু হইবে। এই ভাবে পরীক্ষা করিয়া রাদারফোর্ড সিদ্ধান্ত করিলেন যে টমসন-প্রবর্ত্তিত পরমাণুতত্ত্বের সংস্কার সাধন দরকার। তিনি এই মতবাদ প্রচার করিলেন যে পরমাণু-গোলকের অধিকাংশ স্থান ফাঁকা; কেন্দ্রে রহিয়াছে হাঁ-বিদ্যুৎ-ধর্মী মূল জড়পিণ্ড আর চতুর্দ্দিকে ইলেকট্রনগুলি ঘুরিতেছে।

অতঃপর পরমাণু-জগতে প্রবেশ করিলেন বিজ্ঞানী বোর (Bohr)। তিনি দেখিলেন রাদারফোর্ড প্রবর্ত্তিত পরমাণুবিজ্ঞান বস্তুজগতের নীতিাবলীর সহিত মিল খায় না। কেন্দ্রে হাঁ-ধর্মী বিদ্যুৎ এবং বাহিরে না-ধর্মী বিদ্যুতের পরস্পরকে আকর্ষণ

করিয়া মিলিত হওয়া স্বাভাবিক কিন্তু তাহা হয় না কেন? তাহা ছাড়া ইলেকট্রন যখন ঘুরিতে থাকে তখন তাহা হইতে ক্রমাগত শক্তির বিকিরণ হওয়া দরকার, ফলে ইলেকট্রনগুলির গতিবেগ ক্রমশঃ হ্রাস হইয়া পরমাণু-বিন্যাস ভাঙিয়া পড়িবে এবং পরমাণুর অস্তিত্বই বিচ্ছিন্ন হইবে। বোর তখন স্থায়ী পরমাণু-বিন্যাস গঠনের জন্য বিজ্ঞানী প্ল্যাঙ্ক-প্রবর্তিত কোয়ান্টাম থিওরি প্রয়োগ করিলেন। ইতিপূর্বে বিজ্ঞানীরা মনে করিতেন যে, শক্তি একটানা ভাবে বিকীর্ণ হয়। কিন্তু প্ল্যাঙ্ক বলিলেন যে শক্তি খণ্ড খণ্ড ভাবে একক বা বহু-সংখ্যক এককে (quanta) বিকীর্ণ হয়। ইলেকট্রন যখন জড়কেন্দ্রের চতুর্দিকে ঘুরিতে থাকে তখন উহাতে একটি বহির্মুখী শক্তির (centrifugal force) উদ্ভব হয়। কোন স্থায়ী পথে ঘুরিতে হইলে এই উদ্ভূত শক্তি এবং ইলেকট্রন ও কেন্দ্রস্থ হাঁ-ধর্মী বিদ্যুতের আকর্ষণসঞ্জাত শক্তিকে পরস্পর সমান ও বিপরীতমুখী হইতে হইবে। গতি-বিজ্ঞানের এই নিয়ম ও প্ল্যাঙ্ক-প্রবর্তিত কোয়ান্টাম থিওরি প্রয়োগে বোর পরমাণুর যে স্বরূপ নির্দেশ করিলেন তাহা এইরূপ :—সহজ ও সাধারণ অবস্থায় পরমাণু-কেন্দ্রের বাহিরে যতগুলি ইলেকট্রন থাকিবে তাহার সমপরিমাণ হাঁ-ধর্মী বিদ্যুৎ কেন্দ্রস্থ জড়পিণ্ডে থাকিবে; ফলে সমস্ত পরমাণুটি তাড়িতশক্তিশূন্য (neutral) রহিবে। বহির্দেশে ইলেকট্রনগুলি বিভিন্ন বেগে বিভিন্ন চক্রপথে পরিভ্রমণ করে, যেমন সৌরজগতের কেন্দ্রে সূর্য্যের চতুর্দিকে গ্রহগুলি পরিভ্রমণ করে (চিত্র দ্রষ্টব্য)। ইলেকট্রনের কক্ষপথগুলি যেন বিভিন্ন শক্তির সোপানস্বরূপ। ইলেকট্রনগুলি কক্ষ পরিবর্তনের ফলে পরমাণু-কর্তৃক শক্তি বিকীর্ণ অথবা শোষিত হয়। পরমাণুর এই কল্পিত চিত্রদ্বারা বোর হাইড্রোজেন পরমাণুর বর্ণালী (spectrum) যথারীতি ব্যাখ্যা করিতে সমর্থ হইলেন; কিন্তু গোলযোগ বাধিল যখন এই চিত্র হিলিয়াম পরমাণু অথবা আরও ভারী ওজনের পরমাণুক্ষেত্রে ব্যবহার করা হইল। এই সমস্ত সঙ্কট ও জটিলতার হাত এড়াইবার জন্য সমারফেল্ড, উহলেন-বেক প্রমুখ বিজ্ঞানী বোর-প্রবর্তিত পরমাণুচিত্রের অনেক পরিবর্তন সাধন করেন; তাহাতে এই সমস্ত পরমাণুর বর্ণালীর ব্যাখ্যা অনেকখানি সহজ হইয়া যায়।

১৯১৬ খ্রীষ্টাব্দে আমেরিকার বৈজ্ঞানিক গিলবার্ট এন. লুই পরমাণুর এক নূতন চিত্র প্রকাশ করিলেন; তাঁহার চিত্রের বিশেষত্ব ইলেকট্রনগুলির অবস্থিতি। তিনি বলিলেন পরমাণুর ইলেকট্রনগুলি ঘনাকার গলিপথে (cubical shell) পরিভ্রমণ করে। তিন বৎসর পরে আরভিং ল্যাংমুইর গিলবার্ট-প্রকাশিত চিত্রের একটু পরিবর্তন সাধন করেন; তিনি বলেন ইলেকট্রনগুলি এক-কেন্দ্রিক গলিপথে (concentric shell) পরিভ্রমণ করে। পদার্থের রাসায়নিক ক্রিয়া ব্যাখ্যা করিতে গিয়া তিনি এইরূপ চিত্রের প্রবর্তন করেন।

পরমাণুর বোর-সমারফেল্ড চিত্র অথবা গিলবার্ট-ল্যাংমুইর চিত্র কোনটিই যথেষ্ট হইল না। ইতিমধ্যে বিজ্ঞান জগতে আবার প্রবল আলোড়ন সুরু হইল। ১৯২৪ খ্রীষ্টাব্দে ফরাসী
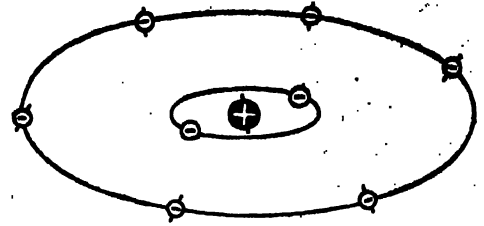
বোর-কল্পিত পরমাণু

বৈজ্ঞানিক দে-ব্রোগলী প্রচার করিলেন যে গতিশীল ইলেকট্রন তরঙ্গগুণসম্পন্ন অর্থাৎ তরঙ্গে যে সমস্ত গুণ আরোপ করা যায় ইলেকট্রনেও সেই সমস্ত গুণ আরোপ করা সম্ভবপর। তরঙ্গ প্রতিফলন (reflection), প্রতিসরণ (refraction) প্রভৃতি গুণ সর্বাণত; সুতরাং ইলেকট্রনও প্রতিফলিত অথবা প্রতিসৃত হইতে পারে। ১৯২৭ খ্রীষ্টাব্দে ডেভিসন ও গার্মার এবং ১৯২৮ খ্রীষ্টাব্দে জি. পি টমসন ব্রোগলীর এই মতবাদ পরীক্ষা দ্বারা প্রমাণিত করিলেন। অতঃপর বিজ্ঞানী শ্রোয়ডিঙ্গার দে-ব্রোগলী প্রবর্তিত মতবাদের পরিবর্তন সাধন করিয়া যে গণিত বিজ্ঞানের সৃষ্টি করিলেন তাহাকে ওয়েভ-মেকানিক্স্ বলা হয়। পরমাণুর রহস্য উদ্ঘাটনে এই গণিতের ব্যাপক ব্যবহার করা হইয়াছে, তাহাতে পরমাণুর অনেক জটিলতর সমস্যার মীমাংসা হইয়াছে এবং এ বিষয়ে অনেক নূতন আলোক পাত হইয়াছে। পরমাণুর ওয়েভ-মেকানিক্স্ চিত্র হইতে বোর-প্রবর্তিত পরমাণু চিত্র সহজেই বাহির হইয়া আসে।

পরমাণু-কেন্দ্র কি কি বস্তু দ্বারা গঠিত তাহা এখন পর্য্যন্ত সম্পূর্ণ ভাবে জানা যায় নাই। আমরা দেখিয়াছি তেজস্ক্রিয় পদার্থ হইতে আলফা-কণা, বিটা-কণা, এবং গামা-রশ্মি বাহির হয়। এই সমস্ত পদার্থের কণা বা রশ্মি বিকিরণ এবং ইহাদের কণভঙ্গুরত্ব বিজ্ঞানীরা এ যাবৎ আয়ত্তে আনিতে পারেন নাই; তাপ, চাপ ইত্যাদি বহুবিধ বৈজ্ঞানিক প্রক্রিয়া প্রয়োগ করিয়াও বৈজ্ঞানিকেরা ইহাদের ভঙ্গুরত্ব রোধ করিতে অথবা বৃদ্ধি করিতে তিলমাত্র সমর্থ হন নাই। উদ্ভূত কণা বা রশ্মি তেজস্ক্রিয় পদার্থের কেন্দ্রে অবস্থান করে অথবা অন্য কোন প্রক্রিয়ার ফলে উৎপন্ন হয় তাহা এখন পর্য্যন্ত যথার্থভাবে জানা যায় নাই।

পরমাণু-কেন্দ্র সম্বন্ধে বিশদভাবে জানিতে হইলে কেন্দ্র-দুর্গের প্রাচীর ভাঙিয়া ভিতরে প্রবেশ করিতে হইবে, নতুবা সমস্ত অপরিজ্ঞাত থাকিবে। বিংশ শতাব্দীর বিজ্ঞানের তাই চরম লক্ষ্য হইয়াছে পরমাণুর রহস্য পুরাপুরিভাবে অবগত হওয়া। রাদারফোর্ড বহুপূর্বে এই প্রচেষ্টা করিয়া এই সিদ্ধান্তে আসিয়াছিলেন যে জড়কেন্দ্র শক্ত সুদৃঢ় পদার্থে গঠিত। বহুবিধ ধরিয়া আলফা-কণা দ্বারা পরমাণুকেন্দ্র

আক্রমণ করিয়া অবশেষে ১৯১৯ খ্রীষ্টাব্দে রাদারফোর্ড আবিষ্কার করিলেন আলফা-কণা নাইট্রোজেন গ্যাস পরমাণুকে আঘাত করিয়া দুইটি বিভিন্ন পদার্থের সৃষ্টি করে—একটি প্রোটন বা ইলেকট্রন বিচ্যুত হাইড্রোজেন পরমাণু, আর একটি গুরুভার অক্সিজেন পরমাণু। রাদারফোর্ডের এই পরীক্ষায় প্রমাণিত হইল যে মৌলিক পদার্থ অপরিবর্তনীয় নহে; এক মৌলিক পদার্থ হইতে অন্য মৌলিক পদার্থের উদ্ভব সম্ভবপর। রাদারফোর্ড এই ধরণের আরও অনেক পরীক্ষা করিয়াছেন এবং প্রতি ক্ষেত্রে অন্ততঃ একটি প্রোটন পাইয়াছেন।

রাদারফোর্ড-প্রদর্শিত পথে আরও অনেক বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা করিয়া চলিলেন। ১৯৩০ খ্রীষ্টাব্দে বিজ্ঞানী বোথে (Botho) দেখিতে পাইলেন বেরিলিয়াম নামক ধাতব পদার্থকে আলফা-কণা দ্বারা আঘাত করিলে প্রোটনের পরিবর্তে এক প্রকার অদ্ভুত রশ্মি বাহির হইয়া আসে যাহা পদার্থের বহুদূর পর্য্যন্ত অবাধে চলিয়া যাইতে পারে। তিনি মনে করিলেন সম্ভবতঃ উহা এক প্রকার গামা-রশ্মি, কারণ গামা-রশ্মির পদার্থ ভেদ করিবার ক্ষমতা প্রবল। অতঃপর ১৯৩২ খ্রীষ্টাব্দে কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ে বিজ্ঞানী চ্যাডউইক (Chadwick) পরীক্ষা দ্বারা স্থির করিলেন যে উদ্ভূত রশ্মি গামা-রশ্মি নহে, ইহা এমন এক প্রকার কণা-সমষ্টি যাহাদের জড়মান (mass) প্রোটনের হাইড্রোজেন পরমাণু-কেন্দ্র সমান কিন্তু প্রোটনে যেমন ইলেকট্রনের সমান অথচ বিপরীত পরিমাণ ধন-ধর্ম্মী বিদ্যুৎ থাকে এই সব কণাতে সেরূপ কোন প্রকার বিদ্যুৎ নাই—ইহারা বিদ্যুৎশূন্য (neutra')। চ্যাডউইক ইহাদের নামকরণ করিলেন নিউট্রন। পরবর্ত্তীকালে অন্যান্য উপায়েও নিউট্রন উৎপন্ন করা সম্ভবপর হইয়াছে।

নিউট্রন আবিষ্কারের তিন সপ্তাহ পূর্ব্বে মার্কিন বিজ্ঞানী উরী গুরুভার হাইড্রোজেন (heavy hydrogen) আবিষ্কার করেন। ডালটনের মতানুসারে এক মৌলিক পদার্থের সমস্ত পরমাণু একই প্রকার কিন্তু ১৯১৩ খ্রীষ্টাব্দে বিজ্ঞানী অ্যাস্টন তাঁহার ভরলিপি-যন্ত্রের (mass spect graph) সাহায্যে দেখাইলেন যে নিয়ন গ্যাস দুই প্রকার পরমাণুর সমবায়ে গঠিত। সাধারণ হাইড্রোজেনের ওজন যদি ১ ধরা হয় তাহা হইলে সেই মাপকাঠিতে এই দুই প্রকার পরমাণুর ওজন যথাক্রমে ২০ ও ২২ এবং সাধারণতঃ যে নিয়ন গ্যাস দেখা যায় তাহার ওজন এই দুইয়ের গড়। এইরূপ দুই প্রকার পরমাণুকে একস্থানিক (isotope) বলা হয়। পরে দেখা গিয়াছে প্রায় অধিকাংশ মৌলিক পদার্থ কয়েক প্রকার একস্থানিক পরমাণু-সমবায়ে গঠিত। একই মৌলিক পদার্থের বিভিন্ন একস্থানিক পরমাণুগুলির ওজন বিভিন্ন হইলেও উহাদের কেন্দ্রস্থ বিদ্যুৎ-পরিমাণ অথবা বহিঃস্থ ইলেকট্রন সংখ্যা সমান, এবং যেহেতু ইহাদের উপরেই মৌলিক পদার্থের রাসায়নিক গুণাগুণ নির্ভর করে সেইজন্য কোন মৌলিক পদার্থের বিভিন্ন একস্থানিক পরমাণুগুলি রাসায়নিক প্রক্রিয়াদ্বারা সহজে পৃথক করা যায় না। এইজন্য বহুবিধ যান্ত্রিক উপায়ে সাধারণতঃ ইহাদিগকে পৃথক করা হয়।

গুরুভার হাইড্রোজেন সাধারণ হাইড্রোজেনের একস্থানিক পরমাণু; সাধারণ হাইড্রোজেনের ওজনের মাপকাঠিতে ইহার ওজন ২ এবং সাধারণ হাইড্রোজেনের সহিত ইহা অতি অল্প মাত্রায় বর্ত্তমান থাকে (চারি হাজার ভাগে প্রায় এক ভাগ মাত্র)। পরবর্ত্তীকালে উরী কার্ব্বন ও নাইট্রোজেনের কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ একস্থানিক আবিষ্কার করিয়াছেন। গুরুভার হাইড্রোজেন এবং কার্ব্বোন ও নাইট্রোজেনের একস্থানিক চিকিৎসা-শাস্ত্রে ব্যাধি-সংগ্রামে এবং জীববিজ্ঞানে প্রভূত ব্যবহার হইতেছে।

পরমাণুকেন্দ্রের দুর্গ-প্রাচীর ভেদ করিবার জন্য বিজ্ঞানীদের আলফা-কণা ছাড়া আরও প্রোটন নিউট্রন ও ডিউটিরণ (ইলেকট্রন বিচ্যুত গুরুভার হাইড্রোজেন পরমাণু অর্থাৎ গুরুভার হাইড্রোজেন পরমাণুকেন্দ্র) জুটিল। বিজ্ঞানীরা তখন চিন্তা করিতে লাগিলেন কি ভাবে এই সকল কণার গতিবেগ বর্দ্ধিত করিয়া বন্দুকের গুলীর মত ইহাদিগকে পরমাণুকেন্দ্রে প্রবেশ করানো যায়। এই চিন্তা ও প্রচেষ্টার ফলে বিজ্ঞানী লরেন্স সাইক্লোট্রন যন্ত্রটি আবিষ্কার করেন যাহার সাহায্যে অধিক সংখ্যক কণা প্রবলবেগে পরমাণুকেন্দ্রে নিক্ষেপ করা সম্ভবপর হইয়াছে। গত মহাযুদ্ধের অব্যাহতি পূর্ব্বে আমেরিকার বার্কলী নামক স্থানে এক বিরাট সাইক্লোট্রন যন্ত্র নির্ম্মাণ আরম্ভ হয় এবং যুদ্ধের মধ্যে তাহার নির্ম্মাণকার্য্য শেষ হইয়াছে। সম্ভবতঃ আণবিক বোমা আবিষ্কার কার্য্যে ইহার ব্যাপক ব্যবহার হইয়াছে।

এই সাইক্লোট্রন দ্বারা তাড়িত ও তেজস্ক্রিয় পদার্থে উদ্ভূত কণা সহযোগে বিভিন্ন মৌলিক পদার্থের পরমাণুকেন্দ্র ভেদ করার প্রবল চেষ্টা হইয়াছে, ফলে অনেক মৌলিক পদার্থের কেন্দ্রস্থ খবর বিশদভাবে জানা গিয়াছে। এক মৌলিক পদার্থকে অন্য মৌলিক পদার্থে রূপান্তরিত করা সম্ভবপর হইয়াছে। এই সমস্ত পরীক্ষার ফলে কৃত্রিম তেজস্ক্রিয় পদার্থের (artific al radic-elements) উদ্ভব সম্ভবপর হইয়াছে। ১৯৩৩ খ্রীষ্টাব্দে ফ্রান্সের প্রসিদ্ধ রেডিয়াম ইন্‌ষ্টিটিউটে আইরেন কুরী ও তাঁহার স্বামী জলিয়ট (যশস্বিনী মাদাম কুরীর কন্যা ও জামাতা) প্রথম কৃত্রিম তেজস্ক্রিয় পদার্থ আবিষ্কার করেন। তাঁহারা দেখিলেন যে এলুমিনিয়ম ধাতব পদার্থকে আলফা-কণাদ্বারা আঘাত করিলে এক প্রকার ফসফরাস পরমাণু ও নিউট্রন কণার উদ্ভব হয়। এই প্রকার ফসফরাস সাধারণতঃ দেখিতে পাওয়া যায় না এবং ইহা সাধারণ ফসফরাসের একস্থানিক। এই উদ্ভূত ফসফরাসের আয়ু ক্ষণস্থায়ী ও স্বাভাবিক তেজস্ক্রিয় পদার্থের মত ইহা অল্পকাল পরে সিলিকন নামক ভিন্ন এক প্রকার পরমাণুতে রূপান্তরিত হয়। কৃত্রিম তেজ-

ক্রিয় ফসফরাস ছাড়া পরে কৃত্রিম তেজস্ক্রিয় সোডিয়াম ও আরও কতিপয় কৃত্রিম তেজস্ক্রিয় মৌলিক পদার্থ আবিষ্কৃত হইয়াছে। এই সমস্ত কৃত্রিম তেজস্ক্রিয় পদার্থ জীব-বিজ্ঞান ও চিকিৎসা শাস্ত্রে ব্যাপক ভাবে ব্যবহৃত হইতেছে।

উক্ত একই সালে (১৯৩২ খ্রীষ্টাব্দ) মার্কিণ বিজ্ঞানী এণ্ডারসন আর একটি নূতন মৌলিক কণা আবিষ্কার করিলেন। ইতি-পূর্ব্বেই মহাজাগতিক রশ্মি (cosmic ray) আবিষ্কৃত হইয়াছিল। আকাশের কোন সুদূর প্রান্ত হইতে এক অভিনব রশ্মি প্রতি মুহূর্ত্তে পৃথিবীতে নামিয়া আসিতেছে। কোথায় এর উৎপত্তি বিজ্ঞানী এ পর্য্যন্ত তাহার কোন সঠিক সন্ধান দিতে পারেন নাই। নানা মুনি নানা মত প্রকাশ করিতে-ছেন। তবে এই মহাজাগতিক বা কশমিক রশ্মি যে পৃথিবীর সৃষ্টিরহস্যের এক নূতন বার্ত্তা আমাদের কাছে বহন করিয়া আনিতেছে সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। 'ক্লাউড চেম্বার' যন্ত্র সাহায্যে এণ্ডারসন এই সমস্ত রশ্মির গতিপথের ছবি তুলিয়া তৎসম্পর্কে গবেষণা করিতেছিলেন। চৌম্বক ক্ষেত্রে (magnetic field) যন্ত্রটি রাখিয়া ছবি তুলিয়া এণ্ডারসন দেখিতে পাইলেন যে কণাপথের কতকগুলির বক্রতা ইলেকট্রন-পথের সম্পূর্ণ বিপরীত কিন্তু অন্যান্য দিক দিয়া ইহারা ইলেকট্রন-পথেরই ন্যায়। কাজেই যে সকল কণাদ্বারা ঐ সমস্ত পথের সৃষ্টি হইয়াছে তাহারা সম্পূর্ণ ইলেকট্রনের অনুরূপ, শুধু বিদ্যুৎ-মানের দিক দিয়া সম্পূর্ণ বিপরীত অর্থাৎ এক একটি কণা ইলেকট্রনের সমান হাঁ-ধর্ম্মী বিদ্যুৎ বহন করে। এই সমস্ত কণাকে পজিট্রন নাম দেওয়া হইল অর্থাৎ ইহারা হাঁ-ধর্ম্মী ইলেকট্রন। বিজ্ঞানী ব্ল্যাকেট, লেনিনগ্রাডের স্কোবেলজিন (Skobelzyn) এবং বিজ্ঞানী দম্পতি কুরী-জলিয়টও স্বতন্ত্র-ভাবে এই কণাটি আবিষ্কার করেন।

এই কণা আবিষ্কারের বহু পূর্ব্বে বৈজ্ঞানিক ডিরাক তাঁহার দুরূহ গাণিতিক প্রক্রিয়াদ্বারা জগৎকে জানাইয়াছিলেন যে, এরূপ একটি কণার অস্তিত্ব সম্ভবপর। পরে কণাটি আবিষ্কৃত হইলে ডিরাক প্রচারিত তত্ত্বের সত্যতা সম্বন্ধে আর কোন সন্দেহ রহিল না। এণ্ডারসনের আবিষ্কারের পরে মহা-জাগতিক বা কশমিক রশ্মি ছাড়া আরও বিভিন্ন পজিট্রন-উৎস আবিষ্কৃত হইয়াছে; তন্মধ্যে কৃত্রিম তেজস্ক্রিয় পদার্থসমূহ হইতে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক পরিমাণে পজিট্রন নিঃসৃত হয়।

একই ব্যক্তি (এণ্ডারসন) এই মহাজাগতিক বা কশমিক রশ্মি গবেষণাকালে আবার আর একটি নূতন মৌলিক কণা আবিষ্কার করিলেন (১৯৩৭ খ্রীষ্টাব্দ)। তিনি দেখিতে পাইলেন যে কশমিক রশ্মিতে ইলেকট্রনের সমান বিদ্যুৎ-সম্পন্ন এক প্রকার কণা বর্ত্তমান রহিয়াছে। কিন্তু ইলেকট্রন অপেক্ষা ইহাদের পদার্থ ভেদ করিবার ক্ষমতা প্রবল। এণ্ডারসন ইহাদের নামকরণ করিলেন 'মেসন' অর্থাৎ মাধ্যমিক ভরসম্পন্ন কণা, কারণ ইহাদের ভর (mass) সাধারণতঃ ইলেকট্রন ও প্রোটনের ভরের মাঝামাঝি। হাঁ-ধর্ম্মী ও না-ধর্ম্মী দুই প্রকার মেসন আবিষ্কৃত হইয়াছে। এই সমস্ত কণার উৎপত্তি পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলে, মহাজাগতিক বা কশমিক রশ্মির ন্যায় সুদূর নভোমণ্ডলে নহে। কাজেই উহারা পরমাণুর অংশ, তবে কি ভাবে উহারা জন্মলাভ করে তাহা এখনও সঠিকভাবে নিরূপিত হয় নাই। আবিষ্কারের দিক দিয়া পজিট্রনের সহিত মেসনের সম্পূর্ণ সাদৃশ্য রহিয়াছে। পজিট্রনের ন্যায় মেসনের অস্তিত্ব সম্বন্ধেও আবিষ্কারের পূর্ব্বে (১৯৩৫ খ্রীষ্টাব্দ) বিজ্ঞানী য়ুকাওয়া (Yukawa) ভবিষ্যদ্বাণী করিয়াছিলেন। মেসন আবিষ্কৃত হইলে য়ুকাওয়ার ভবিষ্যদ্বাণীর গুরুত্ব সকলে বুঝিতে পারিল।

পজিট্রন ও মেসন উভয় প্রকার কণাই অত্যন্ত ক্ষণস্থায়ী। জন্মলাভের কিয়ৎক্ষণ পরেই উহারা অন্যান্য পদার্থের সহিত মিলিত হইয়া নিজেদের স্বাধীন সত্তা হারাইয়া ফেলে।

১৯৩৪ খ্রীষ্টাব্দে ইটালীয় বৈজ্ঞানিক ফার্ম্মী ভাবিলেন মৌলিক পদার্থ মোট ৯২টি কেন? ৯২ নম্বরের মৌলিক পদার্থ ইউরেনিয়ামের পর আর কোন মৌলিক পদার্থ সৃষ্টি করা কি অসম্ভব? ইতিপূর্ব্বেই ফার্ম্মী পরমাণুকেন্দ্র ভাঙনকার্য্যে নিউট্রন ব্যবহার করিতেছিলেন। নিউট্রনের কোন বিদ্যুৎ না থাকায় পদার্থ ভেদ করিবার সময় উহা কোনরূপ বিকর্ষিত না হইয়া অবলীলাক্রমে পরমাণুর বহুদূর পর্য্যন্ত প্রবেশ করিতে পারে। এই নিউট্রন সাহায্যে ফার্ম্মী অনেক পরমাণুকেন্দ্র ভাঙিতে পারিয়াছিলেন। তিনি এখন ভাবিলেন নিউট্রন দ্বারা ইউরেনিয়াম তেজস্ক্রিয় পরমাণুকেন্দ্রে আঘাত করিলে কি হয় দেখা যাক। আঘাতের ফলে তিনি কতকগুলি নূতন মৌলিক পদার্থের সন্ধান পাইলেন; তিনি সেইগুলির নাম দিলেন ট্রান্সইউরেনিক (Transuranic)। তিনি মনে করিলেন এই মৌলিক পদার্থগুলির পরমাণুকেন্দ্র ইউরেনিয়াম অপেক্ষা বেশী পরিমাণ হাঁ-ধর্ম্মী বিদ্যুৎ ও ভরমানসম্পন্ন।

১৯৩৮ খ্রীষ্টাব্দে বার্লিনের কাইজার উইলহেলম ইনষ্টিটিউটে বিজ্ঞানী হান ও ষ্ট্রাসম্যান ফার্ম্মীর পরীক্ষার পুনরাবৃত্তি করিলেন, কিন্তু ফার্ম্মীর মত ট্রান্সইউরেনিক মৌলিক পদার্থ না পাইয়া তৎপরিবর্ত্তে যে দুইটি মৌলিক পদার্থ পাইলেন তাহারা হইতেছে ব্যারিয়াম ও ক্রিপটন এবং তৎসহ দেখিতে পাইলেন যে সেগুলি হইতে প্রবল শক্তি বিকীর্ণ হয়। তাঁহা-দের এই পরীক্ষার ফলে বিজ্ঞানীদের কৌতূহল প্রবলভাবে উদ্দীপ্ত হইল। তাঁহারা ভাবিলেন পরমাণুকেন্দ্রের অপরিমিত শক্তি উদ্ধার করিয়া কাজে লাগাইবার একটা সন্ধান পাওয়া গেল। তখন জার্ম্মানী, ইংল্যাণ্ড, আমেরিকা প্রভৃতি দেশে ব্যাপকভাবে বিশিষ্ট বৈজ্ঞানিকেরা এই কার্য্যে মনোনিবেশ করিলেন। ইতিমধ্যে মহাযুদ্ধ আরম্ভ হইয়া ধীরে ধীরে প্রচণ্ড হইয়া উঠিল, তখন এই আণবিক শক্তিকে যুদ্ধাস্ত্র হিসাবে ব্যবহার করা যায় কি না তাহাই ইংলণ্ড, আমেরিকা প্রভৃতি

যুদ্ধরত শক্তিশালী জাতিসমূহের চিন্তার বিষয় হইয়া দাঁড়াইল। ইতিমধ্যে ইটালী, জার্মানী ও জার্মান-অধিকৃত দেশসমূহ হইতে ফার্মী, মহিলা বিজ্ঞানী মেইটনার, বোর প্রভৃতি বিশিষ্ট বৈজ্ঞানিকগণ আমেরিকার যুক্তরাজ্যে পলাইয়া গিয়া আশ্রয় গ্রহণ করিলেন এবং যুক্তরাষ্ট্র তাঁহাদের বৈজ্ঞানিক প্রতিভা ও গবেষণার সুযোগ গ্রহণ করিল। ১৯৪০ খ্রীষ্টাব্দে ইংলণ্ডের রাষ্ট্রপতিরা সমরলিপ্ত ইংলণ্ড আণবিক গবেষণার জন্য নিরাপদ নয় মনে করিয়া তথাকার গবেষণা-নিরত বিশিষ্ট বৈজ্ঞানিকদিগকে মার্কিন বৈজ্ঞানিকদিগের সহযোগিতা করিবার জন্য আমেরিকায় পাঠাইয়া দিলেন। আমেরিকার কর্ণধারগণও ঐ ব্যাপারে রাশি রাশি অর্থ ঢালিলেন। অতঃপর তাঁহারা পরমাণু-কেন্দ্রের শক্তিকে আণবিক বোমা হিসাবে ব্যবহার করিতে সমর্থ হইলেন এবং ক্ষিপ্রগতিতে যুদ্ধের যবনিকা টানিয়া দিলেন।

বিজ্ঞানীরা দেখিতে পাইলেন ইউরেনিয়াম মৌলিক পদার্থ তিনটি একস্থানিক পরমাণুর সমন্বয়ে গঠিত। একটির ওজন ২৩৮ এবং ইহার পরিমাণই সর্ব্বাপেক্ষা বেশী (শতকরা প্রায় ৯৯·৩ ভাগ), দ্বিতীয় একস্থানিকের ওজন ২৩৫ (শতকরা ০·৭ ভাগ), আর একটির ওজন ২৩৪ এবং অতি অল্প পরিমাণে পাওয়া যায় (শতকরা ০·০০৮ ভাগ)। আণবিক বোমা সৃষ্টি-কার্য্যে প্রথম দুই প্রকার ইউরেনিয়াম খুবই প্রয়োজনীয়। ইহাদের মধ্যে ২৩৫ ওজনের ইউরেনিয়াম আবার বেশী কার্য্যকরী; কারণ নিউট্রন দ্বারা একবার ইহার পরমাণু ভাঙিতে পারিলে ভগ্নাবশেষ আবার নিউট্রন উৎপন্ন করিয়া পুনরায় ধ্বংসকার্য্য সাধন করিতে থাকে, এবং যতই ধ্বংস চলিতে থাকে ধ্বংসকারী নিউট্রনের ততই বৃদ্ধি হইতে থাকে এবং আরও প্রবলবেগে ধ্বংস চলিতে থাকে; যতক্ষণ পর্য্যন্ত মূল পরমাণুসমূহ প্রায় শেষ হইয়া না যায় ততক্ষণ পর্য্যন্ত ধ্বংসলীলা বন্ধ হয় না। এই প্রকার প্রক্রিয়াকে বিজ্ঞানে শৃঙ্খল-প্রক্রিয়া (chain-reaction) বলে। ইহার সুবিধা এইটুকু যে, একবার প্রক্রিয়া আরম্ভ করিয়া দিলেই হইল তারপর আপনা হইতে প্রক্রিয়া চলিয়া আপনা হইতেই শেষ হইবে। ২৩৫ ওজনের একস্থানিক ইউরেনিয়ামে নিউট্রনের শৃঙ্খল-প্রক্রিয়ায় যে অভাবনীয় শক্তির উদ্ভব হয় তাহার অস্তিত্ব শুধু নক্ষত্রলোকেই কল্পনা করা যায়। মাটির পৃথিবীতে তাহার কিরূপ সর্ব্বনাশা ফল ঘটিতে পারে জাপানের হিরোসিমো শহরেই আমরা তাহার পরিচয় পাইয়াছি।

এই ইউরেনিয়াম (২৩৫) সাধারণ ইউরেনিয়ামে অতি অল্প পরিমাণে থাকায় তাহা পৃথকী-করণ খুবই জটিল ব্যাপার। একস্থানিক পরমাণু পৃথক করিবার বিভিন্ন উপায় আবিষ্কৃত হইয়াছে। গত যুদ্ধ আরম্ভের পূর্ব্বে জার্মানীতে ক্লুসিয়াস নামক একজন পদার্থবিদ্ একটি বিশেষ কার্য্যকরী উপায় (Thermal diffusion method) উদ্ভাবন করেন। এই উপায়ে অল্প সময়ে প্রভূত পরিমাণ একস্থানিক পরমাণুকে পৃথক করা যায়। আণবিক বোমা সৃষ্টিকার্য্যে যতটা পরিমাণ ইউরেনিয়াম (২৩৫) সম্ভবতঃ এইরূপ কোন প্রক্রিয়ায় পৃথক করা হইয়াছিল।

আঘাতকারী নিউট্রন কোন্ পদ্ধতিতে আণবিক বোমার ব্যবহৃত হইয়াছে তাহা এখনও আমেরিকার গোপন তথ্য। রেডিয়াম ও বেরিলিয়াম একত্রে রাখিলেই সহজে নিউট্রন উৎপত্তি হয় কিন্তু ইহা খুবই ব্যয়সাধ্য, তবে আমেরিকার পক্ষে ইহা অসম্ভব নাও হইতে পারে। আর একটি সহজ উপায়—গুরুভার হাইড্রোজেন গ্যাসে ক্ষিপ্রগামী ডিউটিরন ছুঁড়িয়া মারিলে নিউট্রনের উৎপত্তি হয়। ইহাতে অপেক্ষাকৃত অল্প শক্তি দরকার হয়। কিন্তু যে যন্ত্রপাতি ও সাহায্য দরকার হয় আণবিক বোমায় কি ভাবে তাহার ব্যবস্থা হইতে পারে তাহা আমাদের অজ্ঞাত। মোট কথা এইরূপ কোন অপরিজ্ঞাত পদ্ধতিতে আণবিক বোমায় নিউট্রন ব্যবহৃত হইয়াছে।

আণবিক শক্তিকে শিল্পকার্য্যে ব্যবহার করা সম্ভবপর কিনা সে সম্পর্কে আমেরিকায় ব্যাপক গবেষণা ও প্রচেষ্টা চলিতেছে। বিজ্ঞানীরা দেখিতে পাইয়াছেন যে মধ্যম শক্তি-সম্পন্ন নিউট্রন দ্বারা ভারী ইউরেনিয়াম (২৩৮) পরমাণু-কেন্দ্রকে আঘাত করিলে প্রথমতঃ ইউরেনিয়াম পরমাণু নিউট্রনকে সবল ভাবে সম্পূর্ণরূপে গ্রাস করিয়া ওজনে বৃদ্ধি পায় কিন্তু কোন ভাঙন (fission) ঘটে না। এই বর্দ্ধিত ওজনের (২৩৯) ইউরেনিয়াম পরমাণু ক্ষণস্থায়ী। ইহা হইতে পর পর বিটা-কণা বাহির হইয়া ইহা প্রথমতঃ এক প্রকার অতি ক্ষণস্থায়ী মৌলিক পদার্থে রূপান্তরিত হয়, তৎপর অপেক্ষাকৃত স্থায়ী আর এক প্রকার মৌলিক পদার্থে রূপান্তরিত হয়। বৈজ্ঞানিকেরা প্রথমটির নাম দিয়াছেন নেপচুনিয়াম (Neptunium) এবং দ্বিতীয়টির নাম দিয়াছেন প্লুটোনিয়াম (Plutonium)। বৈজ্ঞানিকেরা দেখিয়াছেন এই প্লুটোনিয়াম ইউরেনিয়ামের (২৩৫) প্রায় সমগুণসম্পন্ন এবং নিউট্রন দ্বারা ইহার পরমাণু ভাঙিয়া একই প্রকার প্রবল শক্তি উৎপাদন সম্ভবপর। তাহা ছাড়া অপেক্ষাকৃত সহজ প্রক্রিয়ায় ইউরেনিয়াম হইতে প্লুটোনিয়াম পৃথক করা সম্ভব—ইউরেনিয়াম ২৩৫ পৃথক করা যেরূপ কষ্টসাধ্য সেরূপ নহে। আণবিক বোমা নির্ম্মাণ কার্য্যে সম্ভবতঃ ইউরেনিয়াম ২৩৫ এবং প্লুটোনিয়াম ২৩৯ দুই-ই ব্যবহৃত হইয়াছিল। ইউরেনিয়াম ২৩৮ হইতে প্লুটোনিয়াম উদ্ভবকালে এবং প্লুটোনিয়ামের ভাঙনকালে যে শক্তি উৎপন্ন হয় তাহা শিল্পকার্য্যে ব্যবহৃত হইতে পারে।

১৯০৫ খ্রীষ্টাব্দে বিশ্ববিখ্যাত বিজ্ঞানী আইনষ্টাইন তাঁহার সুপ্রসিদ্ধ আপেক্ষিক তত্ত্ব (Theory of Relativity) প্রচার করেন। সেই তত্ত্বের একটি মূল বাক্যমতে জড় ও শক্তির

পরস্পর রূপান্তর সম্ভবপর। কি পরিমাণ জড়ের বিলয়ে কি পরিমাণ শক্তির উদ্ভব হইতে পারে আইনষ্টাইন তাহার একটি হিসাব দিয়াছেন। আইনষ্টাইনের এই আবিষ্কারের ফলে ঊনবিংশ শতাব্দীর জড় ও শক্তির পার্থক্য লোপ পাইয়াছে। তাহাদের একীকরণের ফলে ঊনবিংশ শতাব্দীর জড় ও শক্তির নিত্যতাবাদ বিংশ শতাব্দীতে জড়-শক্তির নিত্যতাবাদে পরিণত হইয়াছে অর্থাৎ বিশ্বজগতে জড় ও শক্তির সমষ্টি চিরকাল একই পরিমাণ থাকিবে।

পরমাণুকেন্দ্র ভাঙনের ফলে যে শক্তির উদ্ভব হয় সে শক্তি জড়ের সামান্ত পরিমাণ বিলয়ের ফলে উদ্ভূত হয়। আইনষ্টাইনের গণনামতে যদি মাত্র এক পাউণ্ড বালি বা মাটিকে শক্তিতে রূপান্তরিত করিয়া ছাড়িয়া দেওয়া যায় তাহা হইলে তাহা ধ্বংসশক্তিতে দশ লক্ষ টন ডিনামাইটের সমান প্রবল হইবে। আণবিক বোমা বিস্ফোরণের ফলে যে শক্তির উৎপত্তি হয় তাহাতে আইনষ্টাইনের হিসাবমতে এক হাজার ভাগের এক ভাগ জড়ও শক্তিতে পরিণত হয় কিনা সন্দেহ। পৃথিবীর পরীক্ষাগারে যদি কোন দিন জড়ের শক্তিতে সম্পূর্ণ রূপান্তর সাধন সম্ভবপর হয় সেদিন বিশ্বপ্রকৃতি কোন্ রূপ পরিগ্রহ করিবে তাহা কল্পনার বিষয়।

আমরা দেখিলাম পরমাণুরাজ্যে প্রবেশ করিয়া বৈজ্ঞানিকগণ এযাবৎ ইলেকট্রন, পজিট্রন, প্রোটন, নিউট্রন, হাঁ-ধর্মী মেসন ও না-ধর্মী মেসন এই কয়টি মৌলিক কণার সন্ধান পাইয়াছেন। পরমাণুরাজ্যে এই সমস্ত কণার অবস্থান এবং উৎপত্তিতত্ত্ব তাঁহারা নির্দেশ করিয়াছেন। তাঁহারা বলেন পরমাণুকেন্দ্রে রহিয়াছে প্রোটন ও নিউট্রন এবং বহিঃপ্রদেশে ইলেকট্রন। একটি প্রোটনের বিদ্যুৎমান ইলেকট্রনের বিদ্যুৎমানের সমান ও হাঁ-ধর্মী। যেহেতু নিউট্রন বিদ্যুৎশূন্য সেইজন্ত বহির্দেশে যতগুলি ইলেকট্রন থাকিবে কেন্দ্র প্রদেশেও সেই সংখ্যক প্রোটন থাকিয়া সম্পূর্ণ পরমাণুকে সাধারণ অবস্থায় তড়িৎশূন্য রাখিবে। নিউট্রন এবং প্রোটন একত্রে পরমাণুর ভর নির্দিষ্ট করে। কেন্দ্রে প্রোটনের সংখ্যা ঠিক থাকিয়া নিউট্রনের সংখ্যা কমবেশী হওয়াতে মৌলিক পদার্থের একস্থানিক বিভিন্ন পরমাণুর উৎপত্তি হয়। গুরুভার হাইড্রোজেনের পরমাণুকেন্দ্রে একটি প্রোটন ও একটি নিউট্রন থাকে সেইজন্ত ইহার ওজন সাধারণ হাইড্রোজেনের ওজনের দ্বিগুণ কিন্তু প্রোটনের সংখ্যা উভয় ক্ষেত্রে এক থাকায় রাসায়নিক গুণাগুণের দিক দিয়া উহারা অনুরূপ, এইজন্ত উহাদিগকে একস্থানিক পরমাণু বলা হইয়াছে।

পরমাণুকেন্দ্রে আলফা-কণা স্বাধীন সত্তা হিসাবে থাকে কিনা বিজ্ঞানীরা সে সম্বন্ধে এখনও নিশ্চিত হইতে পারেন নাই। দেখা গিয়াছে, ইলেকট্রন বিচ্যুত হিলিয়াম গ্যাসের পরমাণু অর্থাৎ হিলিয়াম গ্যাসের পরমাণুকেন্দ্র আর আলফা-কণা একই পদার্থ। একটি আলফা-কণা দুইটি প্রোটন ও দুইটি নিউট্রনের সুদৃঢ় সমন্বয়ে গঠিত। তেজস্ক্রিয় পদার্থ হইতে আলফা-কণা নিঃসৃত হয়; সম্ভবতঃ গুরুভার তেজস্ক্রিয় পদার্থের কেন্দ্রে নিউট্রন-প্রোটন মিলিত হইয়া আলফা-কণা স্বাধীন সত্তা হিসাবে বর্তমান থাকে।

বিজ্ঞানীরা নির্দেশ দিয়াছেন যে, কেন্দ্রস্থ প্রোটন ও নিউট্রনের মধ্যে একটা আকর্ষণী শক্তি রহিয়াছে (exchange force)। এই শক্তির সৃষ্টি হয় নিউট্রন ও প্রোটনের পারস্পরিক রূপান্তরে। কেন্দ্রে কোন ইলেকট্রন, পজিট্রন, মেসন বা গামা-রশ্মি থাকে না। উহারা তথায় সৃষ্টি হইতে পারে। টমসন যে সমস্ত ইলেকট্রন রশ্মি আবিষ্কার করিয়াছিলেন সেগুলি পরমাণুর বহির্দেশ হইতে নির্গত হয়। তেজস্ক্রিয় পদার্থ হইতে যে সমস্ত বিটা-কণা নির্গত হয় তাহাদের মধ্যে কতকগুলি বিভিন্ন বেগসম্পন্ন কণা-গুচ্ছ বর্তমান থাকে। রাদারফোর্ড ইহাদের উৎপত্তি ব্যাখ্যা করিতে গিয়া বলেন যে কেন্দ্রে উৎপন্ন গামা-রশ্মি বহিঃপ্রদেশে ইলেকট্রনমণ্ডলী কর্তৃক শোষিত হইয়া এই সমস্ত বিভিন্ন বেগসম্পন্ন বিটা-কণা গুচ্ছের (B-ray spectrum) সৃষ্টি করে। কিন্তু ইহা ছাড়াও একপ্রকার একটানা গতিসম্পন্ন বিটা-কণা প্রবাহ (B-ray continuum) তেজস্ক্রিয় পদার্থ হইতে উদ্ভূত হয় যাহার ব্যাখ্যা করিতে গিয়া বিজ্ঞানী পাউলী একটি নূতন মৌলিক কণার অস্তিত্বের কল্পনা করেন—তিনি ইহার নাম দিয়াছেন নিউট্রিনো। ইহাতে কোন বিদ্যুৎ নাই এবং ইলেকট্রন অপেক্ষা ইহার ভর এত কম যে ইহার কোন ভর নাই বলিলেও চলে। এরূপ ধরণের কণা এযাবৎ আবিষ্কৃত হয় নাই।

টমসন-কর্তৃক ডালটন-পরমাণু-বুদ্বুদ ভাঙিবার পর প্রায় অর্দ্ধ শতাব্দী অতিবাহিত হইয়াছে। ইতিমধ্যেই পরমাণু ভগ্নাবশেষে অনেক মৌলিক কণার সন্ধান পাওয়া গিয়াছে, কিন্তু ইহাই আবিষ্কারের শেষ নহে; আরও কয়েক প্রকার মৌলিক কণার সন্ধান পাওয়া যাইতে পারে, যথা—পূর্ব্ববর্ণিত নিউট্রিনো, না-ধর্মী প্রোটন দ্বিগুণ ভার-সম্পন্ন নিউট্রন, গুরুভার হাইড্রোজেনের স্থায় গুরুভার হিলিয়াম এবং আরও অনেক কিছু। এই সমস্ত মৌলিক কণা এখনও পাওয়া যায় নাই বলিয়াই তত্ত্বান্বেষী বিজ্ঞানীরা তাঁহাদের গাণিতিক প্রক্রিয়ার প্রয়োজন বোধে উহাদের অস্তিত্ব কল্পনা করিতে ছাড়েন নাই। ইতিমধ্যে আইনষ্টাইন নক্ষত্রলোক ও পরমাণুলোকের সমস্ত ঘটনা এক সর্ব্বব্যাপী তত্ত্বের দ্বারা ব্যাখ্যা করিতে গিয়া তাঁহার গাণিতিক প্রক্রিয়ায় নিউট্রনের এবং এক অদ্ভুত ভরশূন্য বৈদ্যুতিক পরমাণুর (electrical atom of zero mass) কল্পনা করিয়াছেন যাহাদের অস্তিত্বের কোন সন্ধান এখনও পাওয়া যায় নাই।

বিজ্ঞান এখন বৈদ্যুতিক যুগ ছাড়াইয়া আণবিক যুগে প্রবেশ করিয়াছে। এখনও পরমাণু-রহস্ত সম্পূর্ণ উদ্ঘাটিত হয় নাই। পদার্থ-বিজ্ঞান হয়ত বহুদিন পরমাণুরাজ্যে ঘুরিয়া বেড়াইবে, কবে তথা হইতে বাহির হইয়া অন্ত পথে ধাবিত হইবে কেহই তাহা এখন বলিতে পারে না।

রাষ্ট্র ও রাজা

শ্রীসূর্য্যপ্রসন্ন বাজপেয়ী চৌধুরী

কালচক্রের অগ্রগতির সহিত মানব-সমাজে বিভিন্ন আদর্শের সৃষ্টি হয়। সমাজের আদর্শ, শিক্ষার আদর্শ, রাষ্ট্রের আদর্শ, রাজার আদর্শ, 'উপসম্পদা'র আদর্শ—সকল ক্ষেত্রেই বহু পরিবর্ত্তন সাধিত হয়। এই আদর্শের পরিবর্ত্তন মানব-সমাজের চিরন্তন সাধনার ফল। জ্ঞানের আলোকে মানুষ ঐ সকল আদর্শকে বিচার করে দেখে এবং নিজের জীবনে উপলব্ধি করতে সমুৎসুক হয়। এমনই ভাবে নানা পরিবর্ত্তনের ভিতর দিয়ে যুগে যুগে আদর্শগুলির রূপান্তর সাধন হয়।

রাষ্ট্র ও রাজা এ দুটি কথা বর্ত্তমানকালে সাধারণতঃ আমাদের দেশে যে অর্থে প্রযুক্ত হয় আগেকার দিনে সেরূপ ছিল না। পৌরাণিক কালের কথা আলোচনা না করে আমরা যদি শুধু বৌদ্ধ-যুগের ভারতবর্ষের ইতিহাস অনুধাবন করি, তা হলেই দেখা যাবে যে রাষ্ট্র ও রাজা (রাষ্ট্রপতি) সম্পর্কে এখন যে সব আদর্শ পাশ্চাত্ত্যে শিকড় গেড়ে বসেছে, রাশিয়া ও আমেরিকার রাষ্ট্র-ব্যবস্থায় যে নবতম রূপ আমাদের বিস্ময়ের উদ্রেক করছে ভারতবাসীর নিকটে আসলে তা আদৌ অভিনব নয়। ঐতিহাসিক আলোচনায় এটাই প্রমাণিত হয় যে, অনুরূপ নিয়ম-পদ্ধতির উপর ভিত্তি করেই প্রাচীন ভারতে রাষ্ট্রসমূহের গঠন হয়েছিল।

Buddhist India গ্রন্থে (পৃ ২২) লেখা আছে যে গৌতম বুদ্ধের সমকালীন ভারতে এগারোটি প্রজাতন্ত্র রাজ্য ছিল। সেগুলির নাম : (১) শাক্যরাজ্য—রাজধানীর নাম কপিলাবস্তু, (২) ভাগরাজ্য—রাজধানী সুংসুমার পাহাড় (৩) বুলিয়ো রাজ্য—রাজধানী সজ্জকল্য, (৪) কলামো—রাজধানী কেশপুত্ত, (৫) কোলিয়ো রাজ্য—রাজধানী রামগ্রাম, (৬) মল্লরাজ্য—রাজধানী কুশীনারা, (৭) দ্বিতীয় মল্লরাজ্য—রাজধানী পাওয়া, (৮) তৃতীয় মল্লরাজ্য—রাজধানী কাশী, (৯) মৌর্য্যরাজ্য—রাজধানী পিপ্পলিবন, (১০) বিদেহ রাজ্য—রাজধানী মিথিলা, (১১) লিচ্ছবী রাজ্য—রাজধানী বৈশালী।

পূর্ব্বে এই রাজ্যগুলি বর্ত্তমান গোরক্ষপুর, বস্তী এবং মুজঃফরপুর জিলা ও বিহারের কিয়দংশ জুড়িয়া অবস্থিত ছিল। এই সব প্রজাতন্ত্র রাজ্যের মধ্যে আটটির বিশদ বিবরণ পাওয়া যায় না। মল্লরাজ্যগুলির মধ্যে তিনটির সম্বন্ধে প্রয়োজনীয় তথ্য ও বিবরণাদি পাওয়া যায়। মল্লদের এই তিনটি রাজ্যের রাজধানী কুশীনারা (কসিয়া গোরখপুর), পাওয়া (রাজগৃহের নিকটবর্ত্তী) ও কাশীতে অবস্থিত ছিল। এই এগারোটি প্রজাতন্ত্র রাজ্যের মধ্যে শাক্য, বিদেহ ও লিচ্ছবী রাজ্য অপর রাজ্যগুলির চেয়ে উন্নত ও বিখ্যাত ছিল।

বিদেহ ও লিচ্ছবী কালক্রমে একটি যুক্ত (amalgamated) রাজ্যে পরিণত হয় এবং তার নূতন নামকরণ হয় বজ্জী (বজ্জী)।

এই প্রজাতন্ত্র রাজ্যগুলির মধ্যে একটির সহিত অপরটির প্রায়শঃই বিবাদ-বিসংবাদ ও যুদ্ধবিগ্রহ লেগে থাকত। 'কুনাল জাতক' গ্রন্থে দেখা যায় যে একদা শাক্য ও কোলিয়ো রাজ্যের মধ্যে তুমুল যুদ্ধ হয়েছিল। উভয় রাজ্যই জলসেঁচ-ব্যবস্থার উন্নতিকল্পে রোহিণী নদীর জলরাশি নিজ নিজ রাজ্যে প্রবাহিত করে নিয়ে যাবার চেষ্টা করে আর তাই থেকে এই যুদ্ধের সূচনা হয়।

রাজতন্ত্র শাসিত রাজ্যগুলির রাজা ও রাজকুমারগণ প্রজাতন্ত্র রাজ্যগুলির রাষ্ট্রনায়কদের বা প্রধানগণের মেয়েদের বিবাহ করাকে অত্যন্ত গৌরবজনক মনে করতেন। 'ভদ্দশাল জাতকে' দেখা যায় যে, কোশলের রাজা পসেন্দী শাক্য প্রজাতন্ত্র-শাসিত রাজ্যের নায়কের নিকটে আবেদন জানিয়েছিলেন যে তিনি যেন তাঁর এক কন্যাকে তাঁর সঙ্গে বিয়ে দেন।

'একপন্ন জাতকে' লিচ্ছবী রাজ্যের রাজধানীর বিশদ বর্ণনা আছে। তাতে পাই ঐ নগরীর চতুষ্পার্শ্বে তিনটি বৃহৎ ইষ্টক-বেষ্টনী ছিল এবং তার প্রত্যেকটি এক এক মাইল ব্যবধানে নির্ম্মিত হয়েছিল। প্রত্যেক বেষ্টনীতে যাতায়াতের জন্য অনেকগুলি বৃহৎ দ্বার ও তদুপরি বিরাটকায় গুম্বজ বিদ্যমান ছিল।

প্রজাতন্ত্র রাজ্যসমূহের মধ্যে শাক্য-রাজ্য ছিল সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। কালক্রমে ঐ রাজ্যের নাম দেশকালের সীমা অতিক্রম করে দূর-দূরান্তরে প্রচারিত হয়েছিল। এই রাজ্যেই গৌতম বুদ্ধের জন্ম হয়। আজ সমগ্র জগতের এক-তৃতীয়াংশ অধিবাসী তাঁর শিষ্যশ্রেণীভুক্ত। গৌতম বুদ্ধের জন্মস্থান বলে শাক্য-রাজ্যের নামটি আজও কালজয়ী হয়ে বেঁচে আছে।

এই প্রজাতন্ত্র রাজ্যেই গৌতমবুদ্ধের প্রারম্ভিক শিক্ষা সম্পূর্ণ হয়েছিল। *Buddhist India* গ্রন্থে (১৯,২২ ও ৪১ পৃঃ) আছে যে, তাঁর পিতা শুদ্ধোদন এই রাজ্যের রাষ্ট্রপতি বা 'প্রধান' ছিলেন। রাজ্যের জনসংখ্যা ছিল দশ লক্ষ, পরিধি ৫০০ মাইল। বর্ত্তমান নেপাল রাজ্যের 'তরাই'য়ের পূর্ব্বপ্রান্তে শাক্য-রাজ্য অবস্থিত ছিল। এর রাজধানী ছিল কপিলাবস্তু। এই রাজ্যের শাসনকার্য্য এক সংসদ দ্বারা সম্পন্ন হ'ত। এই সংসদের অধিবেশনাদি এক বিশাল ভবনে অনুষ্ঠিত হ'ত যাকে বলা হ'ত 'সংথাগার'। বহু বৃদ্ধ, প্রৌঢ় ও যুবক এই সংসদের সভ্যশ্রেণীভুক্ত ছিল। সকলে মিলে দেশের প্রতিনিধিস্বরূপ একজন সভাপতি নির্ব্বাচিত করত, তাকে 'রাজা' আখ্যা দেওয়া হ'ত।

সুতরাং দেখা যাচ্ছে যে তখন রাজা কথাটি ভিন্নার্থ-দ্যোতক ছিল।

বজ্জিদের রাজ্য এক বিরাট প্রজাতন্ত্র রাষ্ট্ররূপে বিদ্যমান ছিল। এই প্রজাতন্ত্র রাজ্য আটটি ভিন্ন ভিন্ন জাতির লোকের

সমবায়ে গঠিত হয়েছিল। এই যুক্তরাষ্ট্রের রাজধানী ছিল বৈশালী। এই সম্মিলিত জাতিসঙ্ঘের মধ্যে দুইটি জাতি বহুমানাস্পদ ও উন্নত বলে বিবেচিত হ'ত—তারা হচ্ছে 'লিচ্ছবী' ও 'বিদেহ' জাতি।

বিদেহ প্রথমে একটি রাজতন্ত্র-শাসিত রাজ্য ছিল। রামায়ণে ও উপনিষদে উল্লিখিত রাজর্ষি জনক এই বিদেহ রাজ্যের অধিপতি ছিলেন। ২৩০০ মাইল ব্যাপী ভূখণ্ড জুড়িয়া এই রাজ্য অবস্থিত ছিল। গোড়ার দিকে লিচ্ছবীদের মধ্যে এই নিয়ম ছিল যে, তারা নিজেদের মধ্য থেকে তিন জন লোক নির্ব্বাচন করে যাবতীয় শাসনকার্য্যের ভার তাদের হাতে সমর্পণ করত। এই তিন প্রধানকে 'অগ্রণী' বলে অভিহিত করা হ'ত। লিচ্ছবীদের এক মহাসঙ্ঘ ছিল। সকল বয়সের লোক এই সঙ্ঘের সদস্য হতে পারত, তারা নিজ নিজ অধিকার অনুযায়ী রাজকার্য্য পরিচালনে সহায়তা করত। "একপন্ন জাতক" ও "চুল্ল কলিঙ্গ জাতকে" এই সঙ্ঘের সদস্য-সংখ্যা ৭৭০৭ বলে উল্লেখ আছে। এই সঙ্ঘের নায়কদের 'রাজা' বলে অভিহিত করা হ'ত। এই রাজারা শুধু রাজসভায় বসে আইন প্রণয়ন, সমস্যাদির আলোচনা ও প্রস্তাব পাস করেই ক্ষান্ত থাকতেন না ; তাঁরা রাজ্যসংক্রান্ত সমুদয় জটিল বিষয়ের মীমাংসা, সৈন্য-সামন্তদের তত্ত্বাবধান এবং রাজ্যের আয়-ব্যয় ইত্যাদির হিসাব পর্য্যালোচনা করতেন। মোটের উপর সুষ্ঠুভাবে রাজ্য পরিচালনা ও শাসন, সংরক্ষণ এবং নিয়ন্ত্রণ ইত্যাদি যাবতীয় দায়িত্বভার এই সভার উপর ন্যস্ত ছিল। এই সভা থেকে নয় জন বিশিষ্ট সদস্য নির্ব্বাচন করে আর একটি বিশেষ কার্য্যনির্ব্বাহক সমিতি (Executive Council) গঠন করা হ'ত এবং এই নয় জন প্রধানকে 'গণ-রাজানঃ' বলে অভিহিত করা হ'ত। এঁরা সমস্ত জনগণের প্রতিনিধি বলে পরিগণিত হতেন।

'ভদ্দশাল জাতকে' বর্ণিত আছে যে এই সকল সদস্যের নির্দ্দিষ্ট প্রথানুযায়ী জলাভিষেক করা হ'ত ও 'রাজা' পদবীতে ভূষিত করা হ'ত।

Ancient India as described by Megasthenes বইখানিতে (৪৩ পৃ) উল্লিখিত আছে যে, মেগাস্থিনীস যখন ভারতবর্ষে আসেন তখন কতিপয় প্রধান প্রধান নগর প্রজাতন্ত্র-প্রণালী অনুসারে শাসিত হ'ত এবং এমন কয়েকটি জাতি ছিল যারা কোন রাজার শাসনাধীনে ছিল না। নিজেদের শাসন এবং দেশরক্ষা ইত্যাদি ব্যাপারে তারা ছিল সম্পূর্ণ স্বাধীন। ঐ পুস্তক থেকেই (১৪৩ ও ১৪৪ পৃ.) জানা যায় যে, ভারত অভিযান কালে আলেকজাণ্ডারকে পঞ্জাব ও সিন্ধু প্রদেশে বহু প্রজাতন্ত্র রাজ্যের অধিবাসীদের সঙ্গে যুদ্ধ-বিগ্রহে লিপ্ত হতে হয়েছিল। নিম্নে সে সকল প্রজাতন্ত্র রাজ্যের সংক্ষিপ্ত পরিচয় দেওয়া যাচ্ছে :

(ক) আরট্ট (বা অরাষ্ট্রক)

তৎকালে উত্তর-ভারতে যে কয়েকটি জাতি প্রজাতন্ত্র রাজ্য বা স্ব-রাজ্য প্রতিষ্ঠিত করেছিল তন্মধ্যে একটি জাতির নাম আরট্ট বা অরাষ্ট্রক। লুঠতরাজ ও চুরি ডাকাতি করে এরা জীবিকা অর্জ্জন করত। এদের কোন রাজা ছিল না। মৌর্য্য বংশীয় চন্দ্রগুপ্ত এদের সহায়তায় কয়েকটি যুদ্ধে জয়ী হয়েছিলেন। *Invasion of India by Alexander* গ্রন্থে (৩৮ ও ৪০৬ পৃ.) Mc Crindle বলেছেন যে, অরাষ্ট্রকদের সহায়তা না পেলে চন্দ্রগুপ্ত ভারতে একচ্ছত্র রাজ্য গঠনে কিছুতেই সফলকাম হতে পারতেন না।

(খ) মালব ও ক্ষুদ্রক

মালব ও ক্ষুদ্রকের উল্লেখ মহাভারতেও দেখা যায়। কৌরবদের সহিত মিলিত হয়ে তারা যুদ্ধ করেছিল। আলেকজাণ্ডারের সহিত এই দুই জাতির প্রচণ্ড সংঘর্ষ হয়েছিল।

এদের অন্য নাম মল্লোই ও অক্সীড্রাকই* ; এদের মধ্যে প্রজাতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত ছিল এবং এরা বিক্রমশালী ও রণনিপুণ ছিল। এদের বাসস্থান রাবী, চেনাব ও ব্যাস নদীর তীরবর্ত্তী অঞ্চলে ছিল।

(গ) ক্ষত্রিয়

ক্ষত্রিয়গণ কোন রাজার অধীনে ছিল না। এদের মধ্যে অগ্রণী নির্ব্বাচিত হ'ত। এদের নিজস্ব নৌবাহিনী ছিল, আলেকজাণ্ডারের বিজয়লাভের পর এরা তাঁকে অনেকগুলি ভারতীয় পোত উপঢৌকন দিয়েছিল।†

এতদ্ব্যতীত অগ্রসৃসই অর্জুনায়ণ ও বৃষ্ণি মাধবের আর কতিপয় প্রজাতন্ত্র রাজ্যের উল্লেখও পাওয়া যায়।

এই সব রাষ্ট্রের ইতিহাস ও শাসনপদ্ধতি ইত্যাদি আলোচনা করলে দেখা যাবে যে, এরা একনায়কত্বের অধীনে ছিল না। পালি টেক্সট সোসাইটি কর্ত্তৃক প্রকাশিত 'আয়ারঙ্গ সুত্ত' (বা আচারঙ্গ সূত্রে) এই সব বিষয়ের বিশদ বর্ণনা রয়েছে। তাতে ভিক্ষু ও ভিক্ষুণীদের পক্ষে নিষিদ্ধ দেশসমূহেরও উল্লেখ আছে। প্রসঙ্গক্রমে বলা হয়েছে, যে রাজ্য অরাজক, যে রাজ্যের রাজা অল্পবয়স্ক, যেখানে দুই জন রাজা আছেন অথবা যেখানে প্রজাতন্ত্র বিদ্যমান ভিক্ষু-ভিক্ষুণীদের পক্ষে সে সকল দেশে গমন করা অনুচিত।

'অবদান জাতক' নামক বিখ্যাত গ্রন্থেও প্রজাতন্ত্র রাজ্যের উল্লেখ পাওয়া যায়। তাতে এক জায়গায় লিখিত আছে যে, একবার কতিপয় সওদাগর বাণিজ্য ব্যপদেশে দক্ষিণ দেশে গমন করেছিল। ঐ দেশবাসিগণ তাদের দেশে কিরূপ রাজ্য-শাসন-প্রণালী বিদ্যমান, সেকথা জিজ্ঞেস করলে ব্যবসায়ীরা

* *The Modern Review*, May, 1933 p 438.

† *Invasion of India by Alexander*—Mc Crindle.

বলেছিল—"কেচিদ্দেশ গণাধীনা, কেচিদ্রাজ্যাধীনা" অর্থাৎ—কতকগুলি গণতন্ত্র ও কতকগুলি রাজতন্ত্র রাজ্য আমাদের দেশে আছে।

বৌদ্ধ ভারতে এইরূপ গণতন্ত্র রাষ্ট্রের আধিক্য দেখা যায়। সুবিখ্যাত 'বিনয়পিটক' গ্রন্থে যে সমস্ত গণপরিষদের বিবরণ পাওয়া যায়, সেগুলির সঙ্গে আমাদের দেশের এবং পাশ্চাত্ত্যের বিভিন্ন পরিষদ, সভা ও সঙ্ঘ যথা—ইংলণ্ডের পার্লামেন্ট, ভারতীয় কেন্দ্রীয় পরিষদসমূহ প্রভৃতির সাদৃশ্য আছে। এই সব সঙ্ঘে বহু সদস্য নির্ব্বাচিত হতেন। তাঁদের নানা উচ্চপদে নিযুক্ত করা হ'ত। এঁদের স্ব স্ব নির্দ্দিষ্ট স্থানে নিয়ে গিয়ে বসাবার জন্তে এক জন উচ্চ কর্ম্মচারী ছিলেন, তাঁকে বলা হ'ত 'আসন প্রজ্ঞাপক'।

সভার অধিবেশনে প্রায় সকল সভ্য উপস্থিত থাকতেন। যে সভ্য সভায় প্রস্তাবাদি উত্থাপন করতেন তাঁকে নোটিশ দিতে হ'ত, এই নোটিশকে বলা হ'ত 'জ্ঞপ্তি'। সভাপতি তখন প্রস্তাবটি সভায় উপস্থাপিত করে সভ্যদের মতামত জানতে চাইতেন। তখন সভ্যগণ আলোচনা ও বাদানুবাদ করে সেই প্রস্তাব সমর্থন বা প্রত্যাহার করতেন—এই আলোচনা, বিতর্ক ও বাদানুবাদকে বলা হ'ত 'কর্ম্মবাচ্য'। একাধিক বার প্রস্তাব উপস্থিত করবার—'জ্ঞপ্তি দ্বিতীয়,' 'জ্ঞপ্তি চতুর্থ' ইত্যাদি বিভিন্ন নাম ছিল।

সভার মতামত (ভোট) নেওয়ার ব্যবস্থা ছিল এবং তার আগে সভ্যদের মধ্যে তর্ক-বিতর্ক হ'ত। ভোট লওয়ার প্রথা ছিল নিম্নলিখিত রূপ: এক এক রকম মতের জন্য এক এক রকমের রঙীন শলাকা সভ্যদের হাতে দেওয়া হ'ত এবং তাঁরা তাই দেখিয়ে তাঁদের মতামত জ্ঞাপন করতেন। যে সদস্য নির্ভীক ও নিরপেক্ষ মতাবলম্বী তাঁকে 'শলাকা গ্রাহক' পদে নিযুক্ত করা হ'ত, তিনি সদস্যদের মধ্যে শলাকা বিতরণ করতেন,—অর্থাৎ শলাকা ছিল তখনকার 'ভোটিং টিকিট'।

প্রকাশ্য ভাবে ও আবশ্যক বোধে, গোপনেও ভোট লওয়া হ'ত। কোন সদস্যের পক্ষে সভায় উপস্থিত হওয়া সম্ভবপর না হলে তিনি স্বীয় মত লিখে পাঠিয়ে দিতেন, এই লিখনকে বলা হ'ত 'ছন্দ'।

নির্দ্দিষ্টসংখ্যক সভ্য উপস্থিত না হ'লে 'কোরামে'র অভাবে সভার অধিবেশন হত না। যাতে সভার কোরাম হয় তার জন্তে নানারূপ বিধিবদ্ধ নিয়মাবলী ছিল। বিভিন্ন প্রকার কার্য্যের জন্তে বিভিন্ন সংখ্যক সদস্যদের কোরামের ব্যবস্থা ছিল। সাধারণতঃ সভায় কুড়ি জনের উপস্থিতিতে কোরাম হ'ত। কোন বিশেষ অধিবেশনে মাত্র চার জন সভ্য উপস্থিত থাকলেই কোরাম হ'ত। কোরাম ব্যতীত সভা হলে তা অসম্পূর্ণ ও বিধি-বহির্ভূত বলে নাকচ করা হ'ত। সভাপতি, সদস্য, এবং বিশেষ সদস্য ব্যতীত 'অনপূরক' বা হুইপও বিদ্যমান ছিল। সভায় কোরাম ঠিক রাখার জন্য ও সদস্যদের একত্রিত করার জন্য হুইপের উপর কঠোর আদেশ ছিল। প্রস্তাব পাশ, ভোট গ্রহণ, কোরাম, ভোট প্রদান ইত্যাদি যাবতীয় প্রথাই তখন ছিল। গণতন্ত্র রাজ্যে ও সঙ্ঘে এই সকল নিয়ম প্রতিপালিত হ'ত। আধুনিক শাসনতন্ত্রে এগুলির প্রয়োগ-পদ্ধতি ঠিক আগেকার মতই আছে শুধু নামগুলিই পরিবর্তিত হয়েছে।

এ সমস্ত বিষয় বিশদ ভাবে 'বিনয়পিটক' গ্রন্থে লিপিবদ্ধ আছে। এই বইখানির ইংরেজী অনুবাদও বেরিয়েছে।

মনে হয় গৌতম বুদ্ধকে এই সকল শব্দ ও সঙ্ঘ-গঠন-প্রণালী তাৎকালিক গণতান্ত্রিক ও রাজতান্ত্রিক দেশগুলি থেকে গ্রহণ করতে হয়েছিল। রাষ্ট্রের ও রাজার যে আদর্শ বৌদ্ধযুগে ভারতবর্ষে প্রচলিত ছিল তা সম্পূর্ণরূপে দেশকালপাত্রোপযোগী ছিল বলেই মনে হয়। বর্ত্তমানে পাশ্চাত্ত্যে রাষ্ট্রের যে আকার আমরা দেখছি নাম ও রূপের দিক দিয়ে প্রাচীন ভারতের সঙ্গে তার পার্থক্য থাকতে পারে, কিন্তু এতদুভয়ের মধ্যে যে মূলগত ঐক্য বিদ্যমান তাতে সন্দেহ নেই।

স্পর্শ

শ্রীদিলীপ দে চৌধুরী

চুপি চুপি এসে দাঁড়ালে আমার পাশে—
আঁখি তুলে শুধু তাকালে মুখের পানে
এমন শান্ত নিরালা এ অবকাশে
কেন এলে তুমি একাকিনী এইখানে?
তোমার দু'চোখে না-বলা কথার ভিড়,—
থরথর কাঁপে অসহায় ঠোঁট দুটি;
ডুবো নাবিকের মত খোঁজে কোন তীর—

প্রথম প্রেমের তীব্র লাজ ওঠে ফুটি।
কি চাহ জানি না, না চাওয়ার অভিমানে
শুধু পাশে এসে মুখপানে চেয়ে থাকা—
প্রাণে মোর কি যে মদির-স্বপ্ন আনে,
তুমি আর আমি—আধখানি চাঁদ বাঁকা।
সুখের পরশে তোমার ও মুখখানি
হঠাৎ আমার বুকেতে লুকালে রাণি।

নব-সন্ন্যাস

শ্রীবিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়

১২

বালিয়াড়ির অর্দ্ধেক পথ হইতে চম্পা টুলুর সঙ্গে ফিরিল। টুলু সামনে, চম্পা হাতচারেক পিছনে। স্তব্ধ রাত্রি, চারিটি পায়ের শব্দ ছাড়া আর কোন শব্দই নাই কোথাও, শুধু চম্পার শাড়ি পায়ে এক এক বার বেশি জড়াইয়া গিয়া একটা মৃদু খস্ খস্ শব্দ করিতেছে।...প্রায় ক্রোশখানেক পথ অতিক্রম করিতে যে সময়টা লাগিল তাহাতে চাঁদ আকাশে আরও উঠিয়া আসায় জ্যোৎস্নাটা আরও স্পষ্ট হইয়া উঠিল। রাত্রির গভীরতার সঙ্গে সঙ্গে হাওয়াটাও আর একটু চঞ্চল হইল, খানিকটা জায়গা লইয়া চম্পার কবরীর মালার গন্ধের আবর্ত্ত সৃষ্টি করিয়া চলিল।

সমস্ত পথ দুই জনের মধ্যে আর একটি কথাও হইল না। স্কুলের টিলায় উঠিয়া টুলু মাষ্টারমশাইয়ের বাসা ছাড়াইয়া স্কুলের সামনে গিয়া দাঁড়াইল, ফিরিয়া প্রশ্ন করিল—"বনমালীকে ডেকে দেব?"

চম্পা অল্প একটু হাসিয়া বলিল—"তার যে অসুখ করে নি এটা না দেখলেও বিশ্বাস হবে আমার।"

টুলু বিদ্রূপটা গ্রাহ্য করিল না, আবার প্রশ্ন করিল—"তাহ'লে?"

"আমি বাসায় ফিরে যাব; বস্তিতে।"

"সঙ্গে যাব?"

চম্পা মুখটা একটু ঘুরাইয়া লইল, একটু হাসিয়া বলিল—"পুরুষ হলে বলতাম সঙ্গে যেতে।" সঙ্গে সঙ্গে ঘুরিয়া নিজের কথাটার টিকা হিসাবেই যেন বলিল—"পুরুষ মানুষকে এরকম মিথ্যে বলতে কখনও শুনি নি, তাই...বেশ, এইবার আমি যাই।"

টুলু অনেকক্ষণ একভাবে দাঁড়াইয়া রহিল, তাহার পর মাষ্টারমশাইয়ের জানালার কাছে আসিয়া ডাকিল—"স্যর, ঘুমোচ্ছেন?"

টিলা হইতে নামিয়া চম্পা বস্তির পায়ে-হাঁটা পথটা ধরিল—যেটার উপর দিয়া টুলু প্রথম দিন বস্তিতে যায়। রাস্তার খানিকটা একটা খোয়াইয়ের ধার দিয়া গেছে—প্রায় একটি ক্ষুদ্র নদীর মতো; কিনারায় একটা চ্যাটালো পাথরের উপর চুপ করিয়া বসিয়া রহিল। ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছে, শরীরের চেয়ে মনের ক্লান্তি অত্যন্ত বেশি। নানা রকম চিন্তা মনে আসিতেছে—কোনটা মিষ্ট, কোনটা তিক্ত, কোনটা আবার তিক্ত হইয়াও মিষ্ট—সবগুলারই একটা মোহ আছে; কোনটাকেই কিন্তু মনের মধ্যে বেশিক্ষণ ধরিয়া রাখিবার প্রবৃত্তি হইতেছে না। একটা ধরে আবার ছাড়ে, আবার নূতন একটা ধরে, এই ভাবে মনটা ক্রমে বড় বেশি আলোড়িত হইয়া উঠিল এবং এক সময় অহেতুকভাবেই চোখ ছাপাইয়া অশ্রু নামিল।...চম্পা মুছিল না, সমস্ত মনটাকে দুইটি ধারার মধ্যে ভাসাইয়া দিয়া কোলে দুইটি হাত জড়ো করিয়া নীরবে বসিয়া রহিল। অনেকক্ষণ গেল, কখন্ সে ধারা দুইটি বন্ধ হইয়া গেছে জানিতেও পারে নাই। সম্বিৎ হইতেই একবার চোখ দুইটা মুছিয়া লইয়া নড়িয়া-চড়িয়া বসিল। শরীর-মন বেশ হাল্কা বোধ হইতেছে।

এর পর চিন্তা বেশ একটা স্পষ্ট গতি লইল, কিন্তু বিপরীত-মুখী। মুখটা ধীরে ধীরে কঠিন হইয়া উঠিল। খানিকক্ষণ এই ভাবেই গেল, তাহার পর সে কবরী হইতে মালাটা খুলিয়া লইয়া আস্তে আস্তে দুই হাতে লুফিতে লাগিল—মুখটা অত্যন্ত কঠিন হইয়া উঠিতেছে, ঠোঁটের কোণ এক এক বার হইয়া উঠিতেছে কুঞ্চিত। চম্পা হঠাৎ হাত দুইটা আল্‌গা করিয়া দিল, মালাটা নীচে পড়িয়া যাইতে দুই-পা দিয়া সেটাকে নির্মম ভাবে চাপিয়া ধরিল...বেশ লাগিতেছে, অধরের উপর ওষ্ঠটা চাপিয়া বসিয়াছে।...চম্পা উঠিয়া দাঁড়াইল; দু'পায়ে কচলানো মালাগাছটা ডান পা দিয়া গভীর অবজ্ঞাভরে খোয়াইয়ের মধ্যে নিক্ষেপ করিয়া শিলাখণ্ড হইতে নামিয়া পড়িল।

খোকা হীরকের জন্য মনটা হঠাৎ বড় ব্যাকুল হইয়া উঠিয়াছে। চম্পা হন-হন করিয়া বস্তির পানে চলিল। অনুভব করিল বুকটা কিসে যেন উদ্বেল হইয়া উঠিয়াছে—মায়ের বুক হবে কি এই রকম তোলপাড় করিয়া উঠে? পা চালাইয়া দিল আরও জোরে। বস্তির ছিয়াত্তর নম্বর বাসায় হীরক থাকে, সেই মেয়েটিরই কাছে—টুলু টাকা দিবার ব্যবস্থা করিয়া যাহার কাছে গচ্ছিত রাখিয়াছিল। ঝগড়ার উত্তেজনাটা কাটিয়া গেলে চম্পা বাসায় আসিয়া তাহারই হাতে পায়ে ধরিয়া আবার রাজী করিয়াছিল—মেয়েটি ভাল, প্রচুর দুধ, আর শরীরে কোন রোগ নাই; সেটা বেশি দরকারী কথা। আরও সুবিধা, ওর বাসাটাও একাশি নম্বরের কাছে। ব্যবস্থা হইয়াছে, চম্পা যখন খুশি লইয়া আসিবে, যখন খুশি দিয়া আসিবে, টাকাটা দিবে সে-ই—মাসে পাঁচটি করিয়া; টুলুর কাছে বা কাহারও কাছেই ও হাত পাতিতে পারিবে না। চম্পা বলে—"আমার হীরাকে ট্যাকা দিয়ে কে কিনবেক গো?—ইস্, বড়া লোক, ট্যাকার চকমকি দেখায়!"

মেয়েটির সঙ্গে ভাব করিয়া 'মিতিন' পাতাইয়াছে, সব পাকা বন্দোবস্ত।

বস্তির ভিতরে পা দিতেই খোকার কান্না কানে গেল। দুইটা ছেলের কান্নার প্রভেদটা খুব বেশি—হীরকের বয়সই ত মাত্র এই কয়েক ঘণ্টা। এক রকম দৌড়াইয়াই ছিয়াত্তর

নবরের বারান্দায় উঠিয়া দুয়ারে ধাক্কা দিয়া ডাকিল—"মিতিন গো, উঠবিক নি ?...মিতিন গো !"

মেয়েটি আগেই উঠিয়াছে, হীরকের কান্না একেবারে থামে নাই, তবে অনেকটা চাপা পড়িয়াছে, ক্ষুধায় খুব বেশি রাগিয়া উঠিয়াছিল, এখন স্তন মুখে পড়ায় গেঙাইতেছে এবং এক-এক বার মুখটা সরাইয়া লইয়া গলা ছাড়িয়া দিবার চেষ্টা করিতেছে। দুধের প্রাচুর্যে গেঙানিটাও এক-এক বার বেশি অস্পষ্ট হইয়া যাইতেছে।

দ্বিতীয় বার ডাকে মেয়েটি উত্তর করিল—"ওঠা করেছি গো, তোর ছাওয়ালটি দজ্জাল বটেক ! রা—গ দেখ্ খো ছাও-য়ালের ! অঃ !"

"দুয়ারটি খোল তুই আগে।"

মেয়েটি হীরককে বুকে লইয়াই উঠিয়া দরজা খুলিয়া দিল। চম্পা তাহাকে এক রকম কাড়িয়া লইয়াই নিজের বুকে সজোরে চাপিয়া ধরিয়া বলিল—"উ উর মা'টিকে দেখে নাই গো, কাঁদবেক নাই ? তুই দুধ দিস তো মা'টি হয়্যা গেঁইছিস্ আর কি !—ই—স্ গো ! নে, দুধ দে, আমি নিয়া যাব। মা'টি ছেড়ে কি করে থাকবেক গো ? তুর আপপুন ছাওয়ালটি পারেক ?"

ফিরাইয়া দিয়া একটু অপেক্ষা করিয়া রহিল। একটু হালকা রহস্যও হইল ; বেশভূষা লইয়া চম্পার সঙ্গে সাক্ষাতে কেহ আলোচনা করিতে সাহস করে না ; তবে এ মেয়েটির সাহস বাড়িয়াছে একটু। 'মিতিন' হইয়া অবধি একটা ঘনিষ্ঠতা হইয়াছে, তাহার সঙ্গে স্বার্থের এই যোগ, ও না হইলে অচল, জানে একটু প্রশ্রয় পাইবেই। অবশ্য আসল ব্যাপারের কিছু ভাঙিল না চম্পা। হীরকের দুধ খাওয়া শেষ হইলে তাহাকে ঢাকিয়া ঢুকিয়া বুকে চাপিয়া লইয়া চলিয়া গেল।

দরজায় কুলুপ লাগাইয়াই দিয়াছিল। চরণদাস ছোট বারান্দাটিতে উনানের কাছে পড়িয়া। রাত্রি প্রায় শেষ হইয়া আসিয়াছে ; ওর নেশাও পাতলা হইয়া আসিয়াছে, দুয়ার খোলার শব্দে জড়িত কণ্ঠে প্রশ্ন করিল—"কে বটে ?"

চম্পা কোন উত্তর না দিয়া ভিতরে চলিয়া গেল। চরণ হাতে ভর দিয়া একটু উঠিয়া আর একটু রুক্ষভাবে প্রশ্ন করিল—"কে বটে ?—কে বটে গো ?"

চম্পা ভিতর থেকে উত্তর করিল—"আমি, চুপ করে পড়ে থাক্ ক্যানে, রাত দুপুরে চিচ্চার না।"

চরণদাস ঘাড়টা গুঁজিয়াই কথাগুলার অর্থ গ্রহণ করিবার চেষ্টা করিল খানিকক্ষণ, তাহার পর তর্কের ভঙ্গিতে নিজের ডান হাতটা উল্টাইয়া বিড়বিড় করিতে লাগিল—"রাত তিন পহরে চিচ্চার না।—ই আমার আপ্পুন বাসা নয় ! যার খুশি ঢুকবেক—আমার আপ্পুন বাসাটি নয় !..."

খুব রাগিয়া উঠিবার চেষ্টা করিয়া ঝিমাইয়া পড়িল। একটু পরে আবার একটু সচেতন হইয়া উঠিয়া বলিল—"চম্পাটি বটেক গো ? কুথা গেঁইছিলি ?"

চম্পা হীরককে বিছানায় শোওয়াইয়া ভিজা বালিশ, হাত দিয়া বিছানাটা টানিয়া টানিয়া মসৃণ করিয়া দিতে দিতে ধমকের স্বরে বলিল—"তু ঘুমা ক্যানে। কুথা যাবে চম্পা ? তুর আপ্পুন ঠিকানা নাই বটে !"

হীরককে বুকের মধ্যে টানিয়া লইয়া চুপ করিয়া পড়িয়া রহিল, বিড় বিড় করিতে করিতে চরণদাস আবার নিদ্রামগ্ন হইয়া পড়িল।

এই কয়েক ঘণ্টার ব্যবধানে হীরককে যেন আবার নূতন করিয়া পাইয়াছে চম্পা, ক্রমাগতই চাপিয়া চাপিয়া ধরিতে লাগিল, বুকের সমস্ত উত্তাপ দিয়া। সন্তানের মতই ও যেন টুলু আর চম্পার মধ্যে একটা সেতু—এই অনুভূতিটাই অতি-নিবিড় একটি মমতার আকারে হীরকের উপর যেন উপচাইয়া পড়িতে লাগিল। না কোন সম্বন্ধ থাক্, টুলুর স্পর্শ পর্যন্ত নাই থাক্ হীরকের গায়ে। তবু ঐ যে টুলু তাহাকে গ্রহণ করিয়া-ছিল ঐটুকুতেই তাহার মনের স্পর্শ যেন পাওয়া যায় সদ্যজাত এই শিশুটির মধ্যে। ঠিক তাহারই মতই একটি স্নেহের ধারা, একটি সন্তানের মায়াই তো টুলুর বুক থেকে উৎসারিত হইয়া হীরককে অভিসিঞ্চিত করিয়াছিল ? চম্পা নিজের স্নেহ দিয়া সেইটিকে অনুভব করিতে লাগিল ; —মাঝখানে হীরা, তাহার ওদিকে আছে টুলু, এদিকে চম্পা নিজে। এ কি এক অপূর্ব অভিনব অনুভূতি !—যাহাদের এই সম্বন্ধ তাহারা সন্তানের মধ্যে এইভাবে দুই দিক থেকে দুইটি স্নেহের ধারায় আসিয়া মেশে নাকি ?—চমৎকার ত !—চমৎকার !—কত নিগূঢ় ভাবে মিষ্ট হীরক—দুই জনের সঞ্চিত স্নেহে ! যেন অন্ত পাওয়া যায় না। অন্ত পাওয়ার জন্যই—এ অতলের তল পাওয়ার জন্যই যেন চম্পা হীরককে বুকের মধ্যে চাপিয়া ধরিতে লাগিল।

তাহার পর এক সময় বালিয়াড়ি থেকে ফুল পর্যন্ত সমস্ত ঘটনাটুকু চোখের সামনে জাগিয়া উঠিল। চম্পা সমস্তটাই যেন স্পষ্টভাবে দেখিতেছে এইভাবে বাহিরের দিকে চাহিয়া রহিল। বারান্দার পথে নক্ষত্রখচিত এক ফালি আকাশ, তাহার গায়ে সমস্তটুকু যেন একখানি চিত্রের আকারে আঁকা রহিয়াছে। নীরব নির্জনতার মধ্য দিয়া টুলু চলিয়াছে—সমস্ত শরীরটি একটা লাঠির মত সোজা, মাথাটা একটু সামনে নোয়ানো। জ্যোৎস্নায় ভরা আকাশ, বাতাস গন্ধে যেন মাতাল হইয়া উঠিয়াছে—টুলুর পিছনে হাত কয়েকের মধ্যেই বিলাস-সজ্জায় একটি যুবতী।—স্থির, দৃঢ়পদে টুলু চলিয়াছে, দীর্ঘ পথের মধ্যে একটি কথা বলিল না, একবারটি ফিরিয়া চাহিল না।...এত বড় বিস্ময় চম্পার অভিজ্ঞতায় জীবনে আর ঘটে নাই। আকাশলগ্ন ছবিটির দিক হইতে দৃষ্টি ফিরাইতে পারিতেছে না।

এই পৌরুষকে চম্পা দিল কিনা বিকায় !

হীরকের চারিদিকে বাহুবন্ধনটা আপনি কখন শিথিল হইয়া গেছে। তাহার সুপ্ত চোখ দুইটির উপর দৃষ্টি রাখিয়া চম্পা ধীরে ধীরে উঠিয়া বসিল। মনটা যেন এক জায়গায় দাঁড়াইয়া

রহিয়াছে, তাহার পর সেটা একেবারেই বিপরীত একটা চিন্তার ধারার গড়াইয়া চলিল। নিজেকে যেন অত্যন্ত অশুচি বোধ হইতেছে। মনে হইতেছে টুনুর মনের স্পর্শে এই নিষ্পাপ শিশু যেন আরও শতগুণ পবিত্র হইয়া উঠিয়াছে, ইহাকে স্পর্শ করা চলিবে না তাহার,—দেহ দিয়া তো নয়ই, এমন কি মনের ক্ষীণতম আকাঙ্ক্ষাটুকু দিয়াও না।

দুয়ারটা ভেজানোই ছিল, আস্তে আস্তে খুলিয়া চম্পা আবার বাহিরে আসিল, চায় না যে একটু কোন শব্দ হয় আর বুড়ো চরণদাসের কচ্‌কচানি আরম্ভ হইয়া যায়। কথা কহিতেই কেমন একটা নিস্পৃহতা বোধ হইতেছে। ছিয়াত্তর নম্বরের দরজায় আবার করাঘাত করিল—"মিন্তিন গো! হেই মিন্তিন!"

মেয়েটির নিজের শিশু উঠিয়াছে, জাগিয়াইছিল—"ম—র্ ক্যানে!" বলিয়া দরজাটা খুলিয়া দিল; প্রশ্ন করিল—"কি বটেক? খোকাটি কুথা?"

"ঘুমাচ্চে, তু নিয়া আসবি চল্।"

"নিয়া আসবি চল্। ঘুমাচ্চে তো ঘুমাক, তুও ঘুমাগা। এক রাতের হাওয়াল টাকে টাকে শেষ করবেক গো! বড়ো মা হইঁছে।"

"তু চল্ বটে; আমি ঘুমাব, উ চিচ্চারে উঠারে দিবেক।"

"তা এনে দে, আমার আপ্‌ন খোঁকাটি চিঁচাচ্চে।"

"তু যা মিন্তিন, হেঁই গো, যা। উটি বড়ো কচি বটে, ভয় লাগে। তু যা গো, আমি তুর খোকাকে দেখছিঁ..."

ঘরের মধ্যে ঢুকিয়া তাহাকে একটু ঠেলিয়াই বাহির করিয়া দিল। মেয়েটি ঘাড় ফিরাইয়া একটু দাঁড়াইল, ভ্রূকুটির সঙ্গে একটু হাসিয়া বলিল—"ম—র ক্যানে! না বিয়াঁয়ে কানাইয়ের মা হবেক গো! ঢং!..."

মিন্তিন চলিয়া গেলে চম্পা একটা তর্জনী দাঁতে চাপিয়া চৌকাঠের ওপর স্থিরভাবে দাঁড়াইয়া রহিল; শিশুটি চীৎকার করিতেছে, হুঁস নাই। মিন্তিন বারান্দায় উঠিয়া সেকথা বলিলও, তবুও হুঁস নাই যেন চম্পার, তর্জনী দাঁতে কামড়াইয়া সামনের দিকে চাহিয়া আছে। বড় অনিশ্চিত মেজাজ মেয়েটার, বিশেষ করিয়া এই রকম হঠাৎ গুম হইয়া গেলে কেহ আর ঘাঁটাইতে সাহস করে না। মিন্তিন পাশ কাটাইয়া চলিয়া যাইতেছিল, চৌকাঠ ডিঙাইতেই চম্পা ঘুরিয়া তাহার কাঁধে মুখ গুঁজিয়া হু-হু করিয়া কাঁদিয়া উঠিল, বলিল—"তু উকে ফিরায়েঁ নে গো মিন্তিন, উ আমার কাছে বাঁচবেক নাই, আমার শরীলের পাপ, আমার মনের পাপ উকে পুড়ায়েঁ ফেলবেক, ছাইটি করে দিবেক—উ হীরাটি বটে, উতে পাপটি সইবেক নাই গো মিন্তিন, তু উকে ফিরায়েঁ নে..."

১৩

উঠিতে অনেক বেলা হইয়া গেল। একটা স্বপ্ন দেখিতেছিল, দুঃস্বপ্ন কি সুখ-স্বপ্ন ঠিক বুঝিয়া উঠিতে পারিতেছে না, ঠিক যেমন কালকের রাত্রিটা সুখের ছিল কি দুঃখের তাহারও মীমাংসা করিয়া উঠিতে পারে নাই। উঠিয়া, দুই হাতে হাঁটু দুইটি জড়াইয়া চুপ করিয়া বিছানার উপর বসিয়া রহিল। কেমন একটা অলস, উদাস ভাব মনটা অধিকার করিয়া রহিয়াছে, কোন চিন্তার গোড়া বসিতেছে না।

আজ আর কাজে যাইবে না। অনেক বেলাও হইয়া গেছে, তাহা ভিন্ন শরীরটাও একেবারে ভাল নাই। কাজে না যাওয়া স্থির করার সঙ্গে একটি চিত্র স্পষ্ট হইয়া উঠিল মনে—অ্যাসিষ্টান্ট ম্যানেজার পরেশবাবু তাহাকে খুঁজিতেছে। ঠিক যে নাম ধরিয়া ডাকাডাকি এমন নয়, ছুতানাতা করিয়া এ-সুড়ঙ্গ ও-সুড়ঙ্গ ঘুরিয়া বেড়ানো, যেখানে যেখানে চম্পার থাকা সম্ভব। আজ যত বেলা বাড়িবে, আরও অধীর হইয়া ঘুরিবে। ...চমৎকার একটি পুলকানুভূতি, আজকের স্বপ্ন কিম্বা কাল রাত্রের অনুভূতির মত ধোঁয়াটে কিছু নয়; বেশ স্পষ্ট একটি বিজয়ের আনন্দ একটুর মধ্যেই চম্পার অবসাদগ্রস্ত মনটাকে সচেতন করিয়া তুলিল; চম্পা যেন হারানো নিজেকে ফিরিয়া পাইল।

নিতান্ত স্বাভাবিক নিয়মেই এই বিজয়ের পাশে কালকের রাত্রের পরাজয়ের স্মৃতিটা আসিয়া মনের একটা কোণ দখল করিয়া ফেলিল। টুনুর একটি নির্দেশে বালিয়াড়ির পথ হইতে ফেরা থেকে স্কুলের টিলার উপর তাহার নিকট হইতে বিদায় লওয়া—একটা একটানা পরাজয়।...চম্পার চোখ দুইটা ধীরে ধীরে প্রদীপ্ত হইয়া উঠিল—নিজের দীপ্তিতেই যেন জ্বালা করিতেছে। বুকের মধ্যে একটা আহত সর্পিণী যেন গর্জাইতেছে। বিজয় চাই, খুব বড় একটা বিজয় দিয়া এই পরাজয়ের গ্লানিটা মুছিয়া ফেলিতে না পারিলে স্বস্তি নাই—একেবারেই স্বস্তি নাই।...টুনু? না, বেশ বুঝা যায় ওখানে পরাজয়ই যেন বাঁধা; টুনু যেন একটা বাজিকরের যষ্টি; ঋজু, শুভ্র, শুষ্ক একখানি হাড় যেন—দেখাও দরকার হয় না, চিন্তাতেই সর্পিণীর চক্র দুইয়া আসে।...আনত মুখ, পিঠের শিরদাঁড়াটি একেবারে সিধা, জ্যোৎস্নাপ্লুত মধ্যযাম রজনীতে দীর্ঘপথ বাহিয়া টুনু চলিয়া আসিল—পিছনে অভিসার-সজ্জায় চম্পা।...আগুনের মধ্য দিয়া যে শীকর-স্নানের স্বচ্ছন্দতায় উঠিয়া আসিতে পারে তাহাকে পরাভূত করিবার অস্ত্র চম্পার তূণীরে নাই।

তবুও বিজয় চাই, বড় একটা; যৌবনের মর্যাদায় কঠিন আঘাত লাগিয়াছে।...

অনেকক্ষণ একভাবে চিন্তা করিয়া চম্পা একটা পন্থা আবিষ্কার করিল, খুব নূতন না হোক, তবু বিশিষ্ট।

চম্পা হাত মুখ ধুইয়া প্রসাধন করিল, খুব হালকা, স্বল্প, কিন্তু অমোঘ রহস্যটা ওর অধিকার করা আছে। চরণদাস অনেক পূর্বে কাজে গেছে, দরজায় একটা কুলুপ আঁটিয়া বাহির হইয়া পড়িল।

ম্যানেজার রতিকান্তবাবুকে বরাবর একটু রহস্যময় বলিয়া বোধ হইয়াছে চম্পার। লোকটি সাহাদের জামাই, প্রায় মাস ছয়েক হইল এখানে আসিয়াছেন। বয়স চল্লিশের দু'এক বছর উপর বলিয়াই মনে হয়; সুপুরুষ, শৌখীন, আর চম্পা এইটুকু পর্যন্ত জানিয়াছে যে জিভটা বেশ একটু আলগা। তবে সে আলগাপনার একটা বিশিষ্টতা আছে—অত্যন্ত মুক্ত। চম্পা, আরও কয়েকটি মেয়ে, খনিচক্রের মধ্যে যাহাদের সুনাম নাই, আর যাহারা সুনামের জন্য মাথাও ঘামায় না, সবার সামনেই তাহাদের সঙ্গে একটু-আধটু হালকা রহস্য করিতে রতিকান্তের —ম্যানেজার হইয়াও, কর্তাদের বাড়ির জামাই হইয়াও— বাধে না—খনির মধ্যে, খনির বাহিরে, যেখানেই হোক। একটু পানদোষও আছে, যাহার জন্য সকাল থেকে খানিকটা কাটিয়া রাত্রির সঙ্গে জুড়িয়া লইতে হয় রতিকান্তকে। কিন্তু লোকটি অত্যন্ত রাশভারি, কাজের কথা আসিয়া পড়িলে একেবারে অন্য মানুষ হইয়া পড়িবার একটা বিস্ময়কর ক্ষমতাও আছে। ম্যানেজারের হাল্‌কা রহস্য কান পাতিয়া, অল্প একটু হাসিয়া শোনা যায়, কিন্তু উত্তর দিতে সাহস হয় না, কিম্বা উত্তরে সামান্যও একটু সীমা লঙ্ঘন হইল কিনা সে বিষয়ে নিজের দিক থেকেই খুব বেশি লক্ষ্য রাখিতে হয়।

আর একটা কথা, অ্যাসিষ্টান্ট ম্যানেজার পরেশবাবুর মত তো নয়; একেবারে সর্বময় কর্তা, খুবই উচ্চে অবস্থিত, তাই ম্যানেজার রতিকান্তবাবুর কথা খুব বেশি মনেই হয় নাই কখনও চম্পার। আজ কিন্তু বিশেষ করিয়া সেইজন্যই তাঁহার কথা আগে মনে পড়িল।

একটা ওজুহাত চাই দেখা করিবার, চমৎকার ওজুহাত পাওয়া গেছে হীরককে লইয়া। বাঃ! হীরক, চম্পা ভাল-মানুষি করিয়া না হয় ওঁদের খনির দারিদ্র্য ভারই লইয়াছে, তাহার খরচ জোগাইবে কোথা হইতে?—নিজের পেটই চলা দায় এই বাজারে; একটা ব্যবস্থা না করিলে চলে? করিতেই হইবে একটা ব্যবস্থা।

বেশ অনুকূল অবস্থায় পাওয়া গেল ম্যানেজারবাবুকে। চতুর শিল্পীর মতোই চম্পা এই আনুকূল্যকে কাজে লাগাইয়া আনিতেছিল, এমন সময় টুলু আসিয়া উপস্থিত হইল। চম্পা একবার ফিরিয়া দেখিয়া নিজের কথা চালাইয়া গেল; ম্যানে-জারকে দেখাইল টুলুকে চেনেই না, টুলুকে দেখাইল—আমি লোকটা যে কে দেখিয়া রাখ, আর কতদূর পর্যন্ত আমার দৌড়। ওর সামনেই ম্যানেজার টুলুকে তাকায় চম্পার সাহস যেন আরও বাড়িয়া গেল, আরও একটু পা চালিয়াই অভিনয় আরম্ভ করিয়া দিল।

তাহার পর আসিল মাষ্টারমশাইয়ের দরখাস্ত। ম্যানে-জারের মুখের উপর থেকে সমস্ত লঘুতা নিরবশেষ হইয়া মুছিয়া গেল। চম্পা পড়িয়া রহিল একেবারে দূরে। ম্যানেজার দরখাস্তটা পড়িতেছেন—মত দুটি, সময় যাহা লইতেছেন তাহাতে অমন এক ডজন দরখাস্ত পড়িয়া শেষ করা যায়। প্রগল্‌ভা চম্পা নিশ্চুপ হইয়া শঙ্কিত দৃষ্টিতে লক্ষ্য করিতে লাগিল —মুখের কোথায় কোন্ রেখাটুকু কি ভাবে ফুটিতেছে বা মিলাইতেছে। পরিচয় আরম্ভ হইল। চম্পা থামের গায়ে ঠেস দিয়া ক্রমে যেন অসাড় হইয়া যাইতেছে; দারোগার মত এজাহারে টুলু অসহিষ্ণু হইয়া উঠিতেছে—চম্পা চকিত তির্যক দৃষ্টিতে একবার চাহিয়া দেখিল।...অসহিষ্ণুতা স্পষ্ট বিদ্রোহে গিয়া দাঁড়াইল; চিঠি ফিরাইয়া দেওয়ার কথায় টুলু চেয়ারের হাতল চাপিয়া দৃপ্ত কণ্ঠে উত্তর করিল—"আমি অমন প্রতিজ্ঞা করি না, নিজের জিনিষ সম্বন্ধে।"

...মনটা প্রস্তুত হইয়া আসিয়াছে তবু চম্পা যেন একবার চমকিত হইয়া টুলুর পানে ফিরিয়া চাহিল।

তাহার পর আসিল মাষ্টারমশাইয়ের চিঠি, চম্পা এই প্রথম টুলুর আসল পরিচয়টা পাইল। তাহার কঠিন শরীরটা ধীরে ধীরে শিথিল হইয়া আসিতেছে, কি অদ্ভুত সে অনুভূতি যেন বুঝিয়া ওঠা যায় না; কয়েকবারই অবাধ্য দৃষ্টিটা টুলুর ওপর গিয়া পড়িল—মাষ্টারমশাইয়ের কথাগুলা তাহাকে যেন এক অপূর্ব নূতন আলোয় উদ্ভাসিত করিয়া দিতেছে। কোথাকার দেবদূত! এ কি অভিনব ব্রত লইয়া অবতরণ তাহার! তাহার ললাট ঘিরিয়া এ কি অপার্থিব বর্ণচ্ছটা!...তাহার পর চিঠির সেই কথাটি—"তৃতীয়টির নাম না করলেও চিনতে তোমার দেরি হবে না" কে সেই তৃতীয়া, চম্পা মুহূর্তেই চিনিয়া লইল। এর পরেই, কিছু একটা ভাবিতে পারার পূর্বেই সেই চরম কথা কয়টি—"একটা মেয়ে শুধরে গেলে একটা জাতি শুধরে যেতে পারে—এই আমার বিশ্বাস টুলু।"

চম্পার মনে হইল এক মুহূর্তেই কে যেন তাহার শরীরে শত বৃশ্চিকের জ্বালা ঢালিয়া দিয়া সঙ্গে সঙ্গে অমৃতের প্রলেপ লাগাইয়া দিল। সমস্ত শরীরটা রোমাঞ্চ দিয়া দিয়া উঠিতে লাগিল, কি একটা অসহ্য সুখ-দুঃখের অনুভূতিতে চম্পা ঘাড়টা অন্য দিকে ফিরাইয়া লইল। এদিকে আর চেতনা নাই, মনে হইতেছে রোমাঞ্চে রোমাঞ্চে সমস্ত শরীরটাকে কাঁপাইয়া হাল্‌কা করিয়া কে যেন—কি যেন তাহার মধ্যে থেকে আলাদা হইয়া যাইতেছে, সে নিজেই যেন পাথরের মত ভারী, কিসের থেকে হইয়া যাইতেছে পৃথক, পুলকের অসহনীয়তায় চোখ দুইটি আসিতেছে বুজিয়া।

চেতনা হইল ম্যানেজার যখন একেবারে উগ্র হইয়া একটা কি ইংরেজী বলিয়া উঠিয়াছেন। চম্পার সমস্ত শরীরটা তখন আবার কঠিন হইয়া উঠিল। তাহার পর স্পষ্ট বচসা—এক দিকে উগ্র হুঙ্কার, এক দিকে অবিচলিত, ধীর, নির্ভীক কণ্ঠে উত্তর—অধিকারের তারতম্য লইয়া টুলুর সেই দীর্ঘ বক্তৃতা। চম্পার সঙ্গে ম্যানেজারও যেন স্তম্ভিত হইয়া গেছেন—অবশ্য দুই জনে দুই ভাবে। চম্পার কানে যেন লাগিয়া আছে— "আমারও তেমনি ওদের মনুষ্যত্বকে জাগিয়ে রাখবার অধিকার

বোধ হয় আরও বেশি।”…চম্পার চোখ দুইটি আবার বুজিয়া আসিল।

তাহার পর ম্যানেজারের সেই প্রায় লাফাইয়া উঠিয়াই ইংরেজীতে হুকার। একটা উৎকট আশঙ্কায় চম্পা আপনা হইতেই সামনে এক পা আগাইয়া গেল; স্ত্রী-সুলভ অনুপ্রেরণাতেই দু'জনের মধ্যে নিজেকে নিক্ষিপ্ত করিতে গিয়া তখনই আবার টানিয়া লইল।

টুলু স্পর্ধিত বিক্রমে ম্যানেজারের আস্ফালনের উত্তর দিয়া বারান্দা হইতে নামিয়া গেটের দিকে অদৃশ্য হইয়া গেল। চম্পা যেন চোখ না তুলিয়া পারিল না;—বালিয়াড়ি থেকে ফেরার পথের সেই ঋজু, নিস্পন্দগতি—এতটা আবেগ, তবু তাহার চেয়ে এতটুকুও দ্রুত নয়।

টুলু চলিয়া গেলে দু'জনেই খানিকক্ষণ নির্বাক হইয়া রহিল। অভিনয়ের আসর গেছে ভাঙিয়া, কিন্তু পা উঠিতেছে না বলিয়া চম্পা যাইতে পারিতেছে না। ম্যানেজার স্থির-দৃষ্টিতে এক দিকে চাহিয়া আছেন, গাঢ় নিঃশ্বাস, বুকটা ওঠা-নামা করিতেছে। একটু পরে ঘুরিয়া চাহিয়া প্রশ্ন করিলেন—“এরই কাছ থেকে তুই ছেলেটাকে কেড়ে নিয়েছিলি?”

চম্পা উত্তর করিল—“হ্যাঁ”

“যা, মাসহারা বরাদ্দ হয়ে যাবে ছেলেটার।”—বলিয়া ম্যানেজার উঠিয়া পর্দা ঠেলিয়া ঘরের মধ্যে চলিয়া গেলেন। দাঁতে-পেষা একটা ইংরেজী শব্দ চম্পার কানে আসিয়া বাজিল।

পথটা পরিষ্কার হওয়ায় চম্পা যেন বাঁচিল। ছুটিতে ইচ্ছা করিতেছে, তবু খুব সংযত পদক্ষেপেই গেট পর্যন্ত রাস্তাটা অতিক্রম করিল, পার হইয়া কিন্তু গতি যতটা সম্ভব দ্রুত করিয়া দিল। বাজারের পিছন দিয়া একটা পায়ে-হাঁটা পথ গঞ্জের উঁচু দিকে চলিয়া গেছে, আগাছার পাশ দিয়া, কয়েকটা খোয়াই পার হইয়া, কয়েকটা ছোট ছোট টিলা অতিক্রম করিয়া। লোকচলাচল খুব কম। চম্পা সেই পথ ধরিয়া চলিল। বাজার পিছনে ফেলিয়া পথটা বড় রাস্তার সঙ্গে মিশিয়াছে, তাহার পর সেটা অতিক্রম করিয়া বস্তির দিকে চলিয়া গিয়াছে। বড় রাস্তাটা বালিয়াড়ির পথ; স্কুল ডাহিনে রাখিয়া পাশ দিয়া নামিয়া গেছে। এই চৌমাথার উপর আসিয়া চম্পা একটু দাঁড়াইয়া পড়িল। একবার নিজের শাড়িটার দিকে দৃষ্টি নত করিয়া দেখিল; কি একটা দ্বিধায় পড়িয়া গেছে। বহুদূরে স্কুলটা দেখা যায়, একবার সেই দিকেও দৃষ্টি তুলিয়া দেখিল, তাহার পর আরও দ্রুতপদে বস্তির পানে চলিল; ত্রস্ততার জন্য শরীরটা কাঁপিতেছে। ঘর খুলিয়া খুব ক্ষিপ্রতার সঙ্গে বস্ত্র পরিবর্তন করিয়া লইল; যেটা পরিল সেটা ওর বস্তুরখাটার শাড়ি—মোটা, একটু খাটো; কয়লার দাগ ও থাকিতে দেয় না; তবু বেশ মলিন।…আবার দরজায় কুলুপ দিয়া স্কুলের পথ ধরিল।

বস্তি হইতে বাহির হইয়া বাজার থেকে স্কুল পর্যন্ত প্রায় সমস্ত রাস্তাটা দেখা যায়। চম্পা আগাগোড়া একবার দেখিয়া লইল। টুলুকে খুঁজিতেছে। চম্পা হাঁটাপথে নিজে যে রেটে আসিয়াছে তাহাতে বড় পথ ধরিয়া টুলু কখনই তাহার আগে পৌঁছিতে পারে না।…টুলুকে দেখা গেল,—যে চৌমাথাটা চম্পা এইমাত্র অতিক্রম করিয়া আসিল, তাহার কাছাকাছি আসিয়া পড়িয়াছে। চম্পা একরকম ছুটিলই বলা চলে। একটা ছোট টিলা সামনে খানিকটা আড়াল করিয়া রাখিয়াছে, সেটা যতক্ষণে অতিক্রম করিল, টুলু ততক্ষণে চৌমাথা পার হইয়া স্কুলের দিকে খানিকটা অগ্রসর হইয়া গেছে। চম্পা পা চালাইয়া একটুর মধ্যে ধরিয়া ফেলিল, পিছন হইতেই বলিল—“শুনুন।”

টুলু ফিরিয়া একেবারে নিশ্চল হইয়া দাঁড়াইয়া পড়িল। মিনিট কুড়িও হয় নাই বোধ হয়, এর মধ্যে চেহারায় আর বেশে এত পরিবর্তন—সে নিজের দৃষ্টিকে যেন বিশ্বাস করিতে পারিতেছে না। চম্পা বলিল—“আমি চম্পাই, চরণদাসের আর মেয়ে নেই।…ইয়ে, আপনি ও বাড়িতে কোনমতে আর ঢুকবেন না।”

টুলু উত্তর না দিয়া চাহিয়াই রহিল, আগে চেহারা আর বেশের জন্য বিস্ময় ছিল, এখন আবার কথার জন্যও; ভ্রূ দুইটা শুধু আরও কুঞ্চিত হইয়া উঠিল।

চম্পা বলিয়া চলিল—“ঢুকবেন না আপনি ওবাড়িতে। বড় ভীষণ লোক ও; এমনিই এক রকম, চেনা যায় না, কাজের বেলায়—মানে, নিজের কাজ হাসিল করতে এমন কিছু নেই যা ও করতে পারে না—আমরা এই ছ-মাস থেকে দেখছি—কত ব্যাপার দেখেছি—এক একটার কথা মনে হলে শিউরে উঠতে হয়—যাবেন না আপনি—ও যে কত ভয়ঙ্কর!…

রোদে, আবেগে চম্পার মুখ সিঁদুর হইয়া উঠিয়াছে; কপালের চুল ঘামে ভিজিয়া কপালে, কানের গোড়ায় সাঁটিয়া সাঁটিয়া গেছে, চোখে একটা উগ্র আতঙ্ক, সেই সঙ্গে গভীর মিনতি।

টুলু শান্ত কণ্ঠে বলিল—“যতই ভীষণ হোক ও, আমায় যেতেই হবে ও-বাড়িতে।”

চম্পা অসহায় দৃষ্টিতে একবার এদিক ওদিক চাহিল, কোন পথিককেও যদি পায় তো যেন নিজের সাহায্যে টানে। চারিদিক নির্জন, চম্পা আরও মিনতির কণ্ঠে বলিল—“না, যাবেন না, কোন মতেই যাবেন না।”

“তুমি তো শুনলেই ওখানে, খুন হওয়াকে আমি ভয় করি না, তার জন্যে আমি তৈরিই আছি।”

“হাঁ, শুনেছি; কিন্তু সে রাগের মাথায় বলেছিলেন বলে…খুন হওয়াকেও যদি ভয় করেন না বলছেন, তা হলে…”

"তার চেয়ে একটা বড় জিনিষ আছে, আমি সেইটেকে ভয় করি।"

"কিন্তু খুন হওয়ার চেয়ে আর বেশি ভয়ের কি আছে? মানুষের..."

উত্তেজনায় কাঁপিতেছে। টুলু বলিল—"ভেবে দেখলে নিজেই কোন সময় বুঝতে পারবে সেকথা; এখন তোমার মন বড় চঞ্চল রয়েছে। আমায় যেতে দাও চম্পা, তুমি বাড়ি ফিরে যাও।"

চম্পা নিজের নামের এই প্রথম উচ্চারণে যেন সামান্ত একটু অন্তমনস্ক হইয়া গেল। তাহার পর আরও ব্যাকুলভাবে সামনের দিকে গিয়া কতকটা পথ-আগলানো গোছের করিয়া দাঁড়াইয়া বলিল—"না, যাবেন না—কোন মতেই না—মাষ্টারমশাই পর্যন্ত বাসায় নেই যে..."

টুলু প্রশ্ন করিল—"আমার পথ আগলাচ্ছ তুমি?"

"যাবেন না, দয়া করে যাবেন না; এই পায়ে ধরছি আপনার।"

একটু ঝুঁকিতেই টুলু দুই পা পিছাইয়া গেল। চম্পা সোজা হইয়া মুহূর্তকয়েক মুখের দিকে চাহিয়া রহিল, চোখের দৃষ্টিতে একটু কি পরিবর্তন হইয়াছে। তাহার পর বেশ ভাল ভাবেই মুখোমুখী হইয়া দাঁড়াইয়া বলিল—"হ্যাঁ, আগলাচ্ছি পথ। আমি নোংরা, আমি নরক, আমায় না ছুঁয়ে, আমায় না মাড়িয়ে তো আপনি যেতে..."

অতিমাত্র উত্তেজনায় একটু অসম্বৃত হইয়া গেছে, ভারী শাড়ির আঁচলটা গড়াইয়া মাটিতে ঠেকিতেই টুলু শান্তভাবে সেটা তুলিয়া চম্পার দিকে একটু বাড়াইয়া ধরিয়া বলিল—"নোংরা, না-ছোঁওয়া—এসব কোন কথাই নয় চম্পা। আসল কথা, আমার যেতেই হবে ও বাসায়। সত্যি, একজন মেয়েছেলেকে ঠেলে তো আমি যেতে পারব না; আমার অনুরোধ তুমি পথ ছেড়ে দাও আমার।"

চম্পা নিজের পয়াভরটা ডান হাতে তুলিয়া লইল। আরও যেন অসহায় হইয়া গেছে। কোন উপায় নাই দেখিয়া ব্যাকুলভাবেই শান্ত হইয়া গেছে একটু; আঁচলটা যথাস্থানে তুলিয়া দিয়া বলিল—"কেন যাবেন বলুন আপনি?"

টুলু এবার তর্কের মোড় ফিরাইল, যদি এই দিক দিয়া বোঝানো যায় এই অশিক্ষিতা মেয়েটাকে; বলিল—"না গিয়ে কোথায় যাব?—এখানে..."

চম্পা সঙ্গে সঙ্গে স্থিরদৃষ্টি মুখে রাখিয়া বলিল—"আপনি ব্যানার্জি বাবুদের ভাইপো; ম্যানেজারবাবু জানেন না বলে, আর কেউ..."

হঠাৎ থামিয়া গেল; দৃষ্টিটা কিন্তু মুখ থেকে সরাইল না। টুলু বলিল—"বেশ, তা হলে আসল কথাটা বলি—যদিও বলার দরকার নেই, কেননা এক্ষুণি ম্যানেজারবাবুর ওখানে শুনলে—মাষ্টারমশাই আমায় এই বাসায় থাকতে বলে গেছেন, তাঁর কথা..."

চম্পা ভিজিতেছে; আবার বাধা দিয়া বলিল—"কিন্তু মাষ্টারমশাই জানতেন না তো যে ব্যাপারটা এই রকম হবে; দাদু চিঠিটা ভুল করে দিয়ে গিয়েছিল বলেই তো এই অবস্থাটা দাঁড়িয়েছে?"

টুলুর মুখটা শান্ত; কিন্তু ভিতরের শান্তি হারাইতেছে; তবু একবার চেষ্টা করিল, বলিল—"তা হলেও—তাঁর হুকুম..."

চম্পা বিজয়িনীর মতোই একটু সিধা হইয়া দাঁড়াইয়াছে; আর কি—হইয়া আসিল তো; বলিল—"বাঃ, তিনি না জেনে হুকুম দিয়েছেন বলে আপনি জেনে শুনে এগিয়ে যাবেন?—আপনার যা সর্বনাশ তা থেকে কোন মতেই ফিরবেন না?"

টুলুর দৃষ্টি হঠাৎ যেন অগ্নিবর্ষী হইয়া উঠিল, কতকটা গর্জন করিয়াই বলিল—"মেয়েদের একটা বড় অস্ত্র অযথা তর্ক, তুমি তাই ধরেছ চম্পা; কিন্তু জিগ্যেস করি—কেউ কি ফেরে নিজের সর্বনাশ থেকে?—তুমি ফিরেছ?—কাল তোমার সর্বনাশের একেবারে মধ্যিখান থেকে তোমায় ফিরিয়ে এনেছিলাম আমি, কিন্তু এলে কি করে?—আবার কি তুমি নেমে যাও নি?—বলো, কথা কইছ না কেন?—আজ এই একটু আগে ম্যানেজারের ওখানে যে..."

নিজেকে সংযত করিয়া লইল; সঙ্গে সঙ্গে চম্পার পাশ কাটাইয়া স্কুলের টিলার দিকে পা বাড়াইয়া বলিল—"যাও, পথ ছেড়ে দাও আমার।"

ক্রমশঃ

সোভিয়েট রাষ্ট্রের জাতি-সমস্যা এবং তাহার সমাধান

অধ্যাপক শ্রীসুধাংশুবিমল মুখোপাধ্যায়

ষোলটি রাষ্ট্র-সমবায়ে গঠিত সোভিয়েট যুক্তরাষ্ট্র বহু বিভিন্ন জাতির বাসভূমি। উত্তরে মেরুপ্রদেশ হইতে দক্ষিণে ভারত-সীমান্ত পর্য্যন্ত এই বিশাল রাষ্ট্রের বিস্তার। রুশীয়, উক্রেনীয়, শ্বেত রুশীয়, উজবেক, জর্জীয়, কাজাক, আজারবাইজানীয়, তুর্কমেনীয়, ইয়াকুত, বুরিয়াট, তাজিক, ইহুদী, পোল, মেনসি, ওসেটিয়, লেজঘিন, গ্রীক, তাতার, কালমুক, চুকচি, ইয়ুকাঘির, এলিয়ুট প্রভৃতি বিভিন্ন জাতি এই যুক্তরাষ্ট্রের অধিবাসী। ইহাদের মধ্যে ভাষা, আচার-ব্যবহার এবং সংস্কৃতিগত যথেষ্ট পার্থক্য বিদ্যমান।

প্রাক্-বিপ্লবযুগে দারিদ্র্য, অজ্ঞতা, কুসংস্কার এবং অভাব-

অনটন ছিল এই সমস্ত জাতিগুলির নিত্যসহচর। অন্তহীন দুঃখ-দারিদ্র্যের মধ্যে ইহাদের জীবন অতিবাহিত হইত। লেনিনের কথায় জার-শাসিত রুশিয়া ছিল একটি বিরাট 'প্রিজন অব নেশনস' (Pri on of Nations)। সেই যুগে একমাত্র রুশীয় ব্যতীত রুশিয়ার অন্য সমুদয় জাতিকেই বিদেশীয় বলিয়া গণ্য করা হইত। এই শেষোক্তগণের কোনপ্রকার রাষ্ট্রিক বা অর্থনৈতিক স্বাধীনতা ছিল না। রুশীয়গণের মধ্যেও মুষ্টিমেয় কয়েক জন মাত্র রাজনৈতিক এবং অর্থনৈতিক স্বাধীনতা ভোগ করিত। জনসমষ্টির বৃহত্তর অংশ ছিল প্রায়-দাস পর্য্যায়ভুক্ত।

অ-রুশীয় জাতিগুলি নানা ভাবে উৎপীড়িত এবং শোষিত হইত। প্রতিক্রিয়াপন্থী বিরূপ রাজশক্তির অবিচার, উৎপীড়ন এবং শোষণ এবং অসাধু ব্যবসায়ীগণের প্রতারণা ইহাদের জীবনকে বিষময় এবং দুর্ব্বিষহ করিয়া তুলিয়াছিল। দীর্ঘকাল নিজেদের স্বাধীনতা রক্ষার বিফল প্রয়াস করিয়া ককেসাসের পার্ব্বত্য অধিবাসিগণ পর্ব্বতের দুর্গম অংশে আশ্রয় গ্রহণ করে। মধ্য-এশিয়ার পার্ব্বত্য অঞ্চলের বহু কিরঘিজ, তাজিক এবং অন্যান্য অধিবাসী তাহাদের দৃষ্টান্ত অনুসরণ করে। মধ্য-এশিয়া এবং ককেসাসের অধিবাসিবৃন্দ বার বার জাতীয় স্বাধীনতা উদ্ধারের প্রয়াস পাইয়াছে। আর প্রতিবারই জার-সরকার কঠোর হস্তে সে বিদ্রোহ দমন করিয়াছেন। মুক্তি-কামী অগণন শহীদের উষ্ণ শোণিতে মাতা ধরিত্রীর বক্ষ রঞ্জিত হইয়াছে। কিন্তু ঐকান্তিক স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষা মৃত্যুঞ্জয়ী। তাই দেখিতে পাই যে জার-শাসিত রুশিয়াতে অত্যাচরিত জাতিসমূহের কোন না কোনটির বিদ্রোহ ছিল প্রায় নিত্য-নৈমিত্তিক ঘটনা।

জাতীয় স্বাধীনতা আন্দোলনকে ধ্বংস করিবার জন্য জার-সরকার কোন প্রকার চেষ্টা বা অপচেষ্টার ত্রুটি করেন নাই। সমস্ত উপায় যখন ব্যর্থ হইল, তখন সরকার প্রধানতঃ ভেদ-নীতির উপর জোর দিলেন। ইহুদীর বিরুদ্ধে রুশীয়, আজার-বাইজানীয়ের বিরুদ্ধে আর্মেনীয়, এক কথায় এক জাতির বিরুদ্ধে অন্য জাতিকে উস্কাইয়া দিয়া এবং পরস্পরের প্রতি সন্দেহ এবং বিদ্বেষের বীজ বপন করিয়া জার-সরকার জাতীয় স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষাকে বিপথগামী করিবার চেষ্টা আরম্ভ করিলেন এবং তাহাতে বহুলাংশে সফলকামও হইয়াছিলেন। এই প্রসঙ্গে স্বতঃই মনে পড়ে ভারতবর্ষের কথা। এখানেও কি আমাদের চক্ষুর সম্মুখে একই দৃশ্যের অভিনয় হইতেছে না? পাকিস্থান, শিখিস্থান এবং অন্যান্য বহুবিধ সম্ভব এবং অসম্ভব 'স্থানের' যে দাবি আজ ভারতবর্ষের স্বাধীনতাকে বিলম্বিত করিয়া দিতেছে তাহার মূলেও ত রহিয়াছে সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষ এবং অবিশ্বাস। তৃতীয় পক্ষ কি এই বিদ্বেষ এবং অবিশ্বাসের বীজ বপন করিয়া তাহাকে বহুযত্নে শাখাপল্লবিত করিয়া তোলে নাই? যে উৎকট প্রাদেশিকতা আজ ভারতবর্ষের জাতীয় জীবনকে প্রায় বিপর্য্যস্ত করিয়া তুলিয়াছে তাহার মূল কারণই বা কি? তুলনীয়—

The British rulers helped the Indians to become abnormally conscious of their differences. By dwelling on these differences we persuaded ourselves and for a time we persuaded some Indians that rule was indispensable. Even now when events have driven us to promise its early end this theme of our sacred duty to the minorities constantly recurs in our official statements. —*Subject India* by H. N. Brailsford.

বৃহদায়তন প্রত্যেক রাষ্ট্রে চিরকালই সংখ্যালঘু সম্প্রদায়-সমূহের সমস্যা (Minority problem) আছে। প্রত্যেক রাষ্ট্রই বিভিন্ন উপায়ে এই সমস্যা সমাধানের প্রয়াস পাইয়াছে। সীমান্তের পরিবর্ত্তন (Frontier revision), সংখ্যালঘু সম্প্রদায়সমূহের সর্ব্বপ্রকার বৈশিষ্ট্যের বিলোপ সাধন করিয়া সংখ্যাধিক সম্প্রদায়ের সহিত তাহাদের একীকরণ এবং কোন কোন ক্ষেত্রে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়গুলির সম্পূর্ণ ধ্বংস সাধন করিয়া সমস্যার সমাধানের চেষ্টা হইয়াছে। সমস্যা কিন্তু রহিয়াই গিয়াছে।

পূর্ব্বেই উল্লেখ করা হইয়াছে যে জারের আমলে একমাত্র রুশীয় ভিন্ন সাম্রাজ্যের অধিবাসী অন্য সমস্ত জাতিকেই alien বা বিদেশীয় বলিয়া গণ্য করা হইত। ইহাদের জাতীয় ভাষার চর্চা নিষিদ্ধ ছিল। ইহাদের মধ্যে শিক্ষা বিস্তারের কোন চেষ্টা করা হইত না এবং ইহাদের শিল্পোন্নতির পথকে সর্ব্বপ্রকারে বিঘ্নসঙ্কুল করিয়া রাখা হইয়াছিল। উজবেকিস্থান, কাজাকস্থান, খকিরিয়া, আর্মেনিয়া, জর্জিয়া প্রভৃতি অঞ্চলের সমস্ত কাঁচামাল রুশিয়াতে রপ্তানি হইত। রাষ্ট্রের অন্তর্গত কোন প্রদেশের শিল্পোন্নতি এবং স্থানীয় শ্রমজীবী সম্প্রদায়কে রুশীয় একাধিপত্যের পরিপন্থী বলিয়া মনে করা হইত।

স্বীয় কর্তৃত্ব অক্ষুণ্ণ রাখিবার জন্য জার-সরকার সাম্রাজ্যের সর্ব্বত্র সামন্ত প্রথার (Feudalism) পৃষ্ঠপোষকতা করিতেন। ইহার ফলে প্রত্যেক প্রদেশেই গৃহশত্রুর আবির্ভাব হইয়াছিল। দৃষ্টান্তস্বরূপ বোখারার আমিরের কথা বলা যাইতে পারে। সরকারের ক্রীড়নক এই মীরজাফরের দল জাতীয় গৌরব এবং উন্নতি অপেক্ষা শ্রেণী-স্বার্থকেই বড় মনে করিত। ইহাদের সহিত ভারতের দেশীয় রাজন্যবৃন্দের তুলনা চলিতে পারে। জাতীয় স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষাকে বিভ্রান্ত এবং ব্যর্থ করিয়া দিবার উদ্দেশ্যে জার-তন্ত্র আর একটি অস্ত্রও ব্যবহার করিত। রাষ্ট্রের অন্তর্ভুক্ত জাতিগুলির দুঃখকষ্টের জন্য পরস্পরকে দায়ী করিয়া কৃত্রিম প্রাদেশিক সীমা নির্দ্দিষ্ট করিয়া একই জাতির লোকের দুই বা ততোধিক প্রদেশে বাসস্থান নির্দ্দিষ্ট করিয়া জার-সরকার জাতি-বৈরের সৃষ্টি করিতেন এবং সযত্নে তাহাকে বাঁচাইয়া রাখিতেন। আবার কোথাও বা ব্যাপক হত্যাকাণ্ডের (pogrom) অনুষ্ঠান করিয়া স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষাকে দমন করিবার চেষ্টা করা হইত।

ইহুদী, উজবেক, আজারবাইজানীয় এবং অন্যান্য বহু জাতিকে পূর্ব্বে সরকারী কর্ম্মে নিযুক্ত করা হইত না। বিশেষ করিয়া ইহুদীদিগের উপর সর্ব্বাপেক্ষা অধিক বৈষম্যমূলক ব্যব-

হার করা হইত। তাহাদিগকে মধ্য-রুশিয়া, তদানীন্তন রাজধানী সেণ্টপিটার্সবুর্গ এবং অন্যান্য কোন কোন নগরে বাস করিতে দেওয়া হইত না। রুশিয়ার অন্যতম শ্রেষ্ঠ চিত্রশিল্পী লেভিটান। তিনি ইহুদী এই অপরাধে মস্কো হইতে নির্ব্বাসিত হইয়াছিলেন। ইহুদীগণের কৃষিকার্য্য করিবার অধিকার ছিল না। মস্কো এবং সেণ্টপিটার্সবুর্গের উচ্চ এবং বিশ্ববিদ্যালয়সমূহে ইহুদী ছাত্রসংখ্যা মোট ছাত্রসংখ্যার শতকরা ৩ ভাগ এবং অন্যান্য নগরে শতকরা ৫ ভাগের অধিক হইতে পারিত না।

স্বেচ্ছাচারী জারতন্ত্রের যুগে বিভিন্ন জাতি-সমবায়ে গঠিত বিশাল রুশ সাম্রাজ্যের বিরাট জনসমষ্টি যথা জার, ভূম্যধিকারী ও যাজক সম্প্রদায় এবং বণিকগণ কর্ত্তৃক সমভাবে শোষিত এবং উৎপীড়িত হইত। প্রতিকার দূরের কথা, অধিকাংশক্ষেত্রে প্রতিবাদ করিবার অধিকারও তাহাদের ছিল না। সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত বিভিন্ন জাতির মধ্যে শিক্ষা-প্রচারের কোন বন্দোবস্তই জারের যুগে করা হয় নাই। অন্তহীন অজ্ঞান অন্ধকারে ইহাদিগকে নিমজ্জিত করিয়া রাখাই ছিল জার-সরকারের নীতি। প্রাক্-বিপ্লব কিরঘিজিয়াতে লিখনপঠনক্ষম লোকের সংখ্যা ছিল প্রতি শতে অর্দ্ধজন। কাজাকস্থান, কিরঘিজিয়া এবং আর্মেনিয়া প্রভৃতি প্রদেশের কোথাও একটি কলেজ বা বিশ্ববিদ্যালয় ছিল না। প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সংখ্যাও ছিল নগণ্য। জাতীয় ভাষায় শিক্ষাদান নিষিদ্ধ ছিল। এই সমস্ত অঞ্চলে প্রচলিত ভাষায় কোন গ্রন্থ প্রকাশিত হইত না। অ-রুশীয় জাতিগুলির সৃজনী প্রতিভাকে সর্ব্বপ্রকারে চাপিয়া রাখা হইত। উক্রেন, জর্জ্জিয়া, আর্মেনিয়া, কিরঘিজিয়া প্রভৃতি প্রদেশের লোক-শিল্প এবং জাতীয় সংস্কৃতি চর্চ্চার অভাবে ধ্বংসপ্রাপ্ত হইয়া বিস্মৃতির অতল গর্ভে তলাইয়া গিয়াছিল। উক্রেনবাসীদিগের নিজস্ব রঙ্গালয় প্রতিষ্ঠা করিবার অধিকার ছিল না। রাষ্ট্রে প্রচলিত প্রায় ৫০টি ভাষার কোন বর্ণমালা ছিল না।

১৯১৭ সালের অক্টোবর-বিপ্লব রুশিয়া তথা বিশ্বের ইতিহাসের এক নব যুগের সূচনা করে। এই বিপ্লবের ফলে জার-তন্ত্রের অবসান এবং রুশীয়গণ কর্ত্তৃক সাম্রাজ্যের অধিবাসী অন্যান্য জাতির উপর অত্যাচারের পরিসমাপ্তি ঘটে। এই বিপ্লবের ফলেই আবার জার-শাসিত রুশিয়ার প্রত্যেকটি জাতি আত্ম-নিয়ন্ত্রণের অধিকার লাভ করে।

১৯১৭ সালের ১৫ই নভেম্বর লেনিন এবং ষ্টালিনের যুক্ত স্বাক্ষরে প্রচারিত "ডিক্লারেশন অব রাইটস অব দি পিপলস অব রাশিয়া"তে স্বীকার করা হইল যে—

১। ভূতপূর্ব্ব রুশ সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত প্রত্যেক জাতি পরস্পরের সমান এবং সার্ব্বভৌম ক্ষমতা পরিচালনার অধিকারী।

২। ইহাদের প্রত্যেকের আত্ম-নিয়ন্ত্রণের এবং রুশিয়া হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া সার্ব্বভৌম রাষ্ট্রগঠনের অধিকার আছে।

৩। কোন জাতি বা ধর্ম্মসম্প্রদায় কোন বিশেষ অধিকার ভোগ করিবে না। কোন জাতি বা সম্প্রদায়ের প্রতি কোন বৈষম্যমূলক ব্যবহারও করা হইবে না।

৪। সংখ্যালঘু জাতিগুলির স্বাধীন বিকাশের অধিকার থাকিবে।

১৯২২ সালে গৃহযুদ্ধের অবসান এবং রুশিয়ার আভ্যন্তরীণ ব্যাপারে হস্তক্ষেপকারী শক্তিসমূহের পরাজয়ের পর মস্কোতে আহূত "অল-ইউনিয়ন কংগ্রেস অব সোভিয়েটস"-এর অধিবেশনে সর্ব্বসম্মতিক্রমে সোভিয়েট যুক্তরাষ্ট্র-গঠনের সিদ্ধান্ত গৃহীত হইল। এই যুক্তরাষ্ট্রে যোগদান ভূতপূর্ব্ব রুশ সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত প্রদেশগুলির পক্ষে ইচ্ছামূলক বলিয়া ঘোষিত হইল। যোগদান করিবার পরও প্রদেশগুলির রাষ্ট্র হইতে বিচ্ছিন্ন হইবার অধিকার সুস্পষ্টভাবে স্বীকৃত হইল। প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখ করা যাইতে পারে যে যুদ্ধ, বিপ্লব এবং গৃহ-যুদ্ধের ফলে বিধ্বস্ত সামাজিক এবং অর্থনৈতিক জীবনের পুনর্গঠন, আন্তর্জাতিক পরিস্থিতির অনিশ্চয়তা এবং বহিঃশত্রুর আক্রমণ নিরসনের জন্যই সোভিয়েট যুক্তরাষ্ট্র গঠনের প্রয়োজনীয়তা অনুভূত হইয়াছিল।

অক্টোবর-বিপ্লবের পররাষ্ট্রের কোন জাতিরই আর বিশেষ কোন অধিকার বা অক্ষমতা (disability) রহিল না সত্য, কিন্তু জার-তন্ত্রের অনুসৃত নীতির ফলে বিভিন্ন জাতির মধ্যে যে অর্থনৈতিক এবং সাংস্কৃতিক বৈষম্যের সৃষ্টি হইয়াছিল তাহা রহিয়াই গেল। এই অবস্থার অবসান ঘটাইবার জন্য রাষ্ট্রনায়কগণ বদ্ধপরিকর হইলেন। অনতিদীর্ঘকালের মধ্যে তাঁহারা বহুলাংশে কৃতকার্য্যও হইয়াছেন।

সোভিয়েট রাষ্ট্রে এমন বহু জাতি রহিয়াছে যাহারা বলশেভিক বিপ্লবোত্তর কিঞ্চিদধিক পাদ শতাব্দীর মধ্যে মধ্যযুগীয় অনুন্নত অবস্থা হইতে একেবারে আধুনিক অবস্থাতে উত্তীর্ণ হইয়াছে। সুদূর এবং দুর্গম পল্লী অঞ্চলসমূহেও শিক্ষা এবং সংস্কৃতির বিস্তার এবং বিকীরণ ঘটিয়াছে। সোভিয়েট যুক্তরাষ্ট্রের অধীন প্রতিটি সাধারণ-তন্ত্র অভাবনীয় দ্রুতবেগে সর্ব্বাঙ্গীন উন্নতি লাভ করিয়াছে। ইহাদের খনিজ সম্ভার নিজেদের এবং সমগ্র যুক্তরাষ্ট্রের সমৃদ্ধি সাধন করিয়াছে। প্রতি বৎসরই নূতন নূতন জায়গায় স্বর্ণ, দস্তা, কয়লা, ম্যাঙ্গানীজ, টিন, লৌহ, সীসা, গন্ধক প্রভৃতি খনিজ সম্পদের সন্ধান পাওয়া যাইতেছে। কাজাকস্থানের কয়লা, তামা এবং সীসা, ট্র্যান্সককেসিয়ার ম্যাঙ্গানীজ, কিরঘিজিয়ার কয়লা, ককেসাসের অন্তর্গত উত্তর-ওসেসিয়ার দস্তা এবং চেচেনো ইঙ্গুসেটিয়ার ও বস্‌কিরিয়ার তৈল সম্পদ আজ তত্তৎ প্রদেশের শিল্পোন্নতির মূলীভূত কারণ।

খুব বেশী দিনের কথা নয় যখন কাজাকস্থানের খনিজ সম্পদকে কোন কাজে লাগানো যাইত না, প্রাক্-বিপ্লব যুগে এই অঞ্চলে কোন রেলপথ ছিল না। ১৯২৮-৩২ সালে নির্ম্মিত টার্কসিব কাজকস্থানের সর্ব্বপ্রথম রেলপথ। তুর্কী-

স্থান এবং সাইবেরিয়ার সংযোগ সাধন করিয়া এই রেলপথ একটা বিরাট অনগ্রসর অঞ্চলে নব যুগের সূচনা করিয়াছে। মৃতপ্রায় এই অঞ্চল আজ প্রাণের প্রাচুর্য্যে উচ্ছল হইয়া উঠিয়াছে। অক্টোবর-বিপ্লব উজবেকিস্থানেরও অর্থনৈতিক জীবনে যুগান্তর ঘটাইয়াছে। এই প্রদেশে অনেকগুলি বড় বড় কাপড়ের কল প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে এবং উন্নত ধরণের জলসেচ-প্রণালীর প্রবর্ত্তন করিয়া ইহার তুলার চাষেরও যথেষ্ট উন্নতি সাধন করা হইয়াছে।

পূর্ব্বে বাকুই ছিল আজারবাইজানের একমাত্র শ্রমশিল্প-কেন্দ্র। এই বাকু বরাবরই তৈলের আকরের জন্ত প্রসিদ্ধ। কিন্তু জারের আমলে এই তৈল সম্পদের যথেষ্ট অপচয় ঘটিত। খনির স্ফীতোদর মালিকগণ প্রচুর লাভ করিতেন সত্য, কিন্তু দেশের জনসাধারণ দিন কাটাইত অনশন এবং অর্দ্ধাশনে। সোভিয়েট-তন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হইবার পর এই আজারবাইজানের রূপ একেবারে বদলাইয়া গিয়াছে। বহু নূতন নূতন শিল্প-প্রতিষ্ঠার ফলে আজারবাইজান সমৃদ্ধিশালী হইয়া উঠিয়াছে। এদিকে পূর্ব্বে আজারবাইজানের খনিসমূহ হইতে যে পরিমাণ তৈল উত্তোলিত হইত, বর্ত্তমানে তাহা অপেক্ষা তিন গুণেরও বেশী তৈল উত্তোলিত হয়।

এ দিকে আর্থিক উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে কৃষিরও উন্নতি সাধিত হইয়াছে। যৌথ কৃষিকার্য্যের ফলে গ্রামগুলির রূপান্তর ঘটিয়াছে। আধুনিক বৈজ্ঞানিক কৃষি-পদ্ধতি প্রবর্ত্তিত হইয়াছে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ আরম্ভ হওয়ার অব্যবহিত পূর্ব্ববর্ত্তী বৎসরে উক্রেনের কৃষিক্ষেত্রসমূহে সর্ব্বমোট ৮৮,০০০ কলের লাঙ্গল ব্যবহৃত হইত। ঐ বৎসর বায়েলোরুশিয়ার যৌথ এবং সরকারী কৃষিক্ষেত্র সমূহে ৮১,০০০ কলের লাঙ্গল, ৪,০০০ শস্ত মাড়াইবার কল, ৪,০০০ ট্রাক এবং ১২০০ শণ তুলিবার কল ব্যবহৃত হইত। ঐ একই বৎসরে কিরঘিজিয়া, তারতারিয়া এবং আজারবাইজানের কৃষিক্ষেত্রসমূহে যথাক্রমে ৩,৬৯৪, ৬,৮৮৫ এবং ৫,৫৬২টি কলের লাঙ্গলের সাহায্যে চাষের কাজ চলিত।

উন্নত ধরণের কৃষি-পদ্ধতি প্রবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে নূতন নূতন ফসলের চাষও আরম্ভ হইয়াছে। উক্রেনে ধান্তের চাষ প্রবর্ত্তিত হইয়াছে। ট্র্যান্স-ককেসিয়াতে আজকাল প্রচুর পরিমাণে চা এবং লেবুজাতীয় ফল উৎপন্ন হয়। গৃহপালিত পশুকুলেরও যথেষ্ট উন্নতি সাধিত হইয়াছে। সোভিয়েট যুক্তরাষ্ট্রের মেষ হইতে এখন প্রথম শ্রেণীর পশম উৎপন্ন হয়।

শিল্প এবং কৃষির উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে নিপুণ কর্ম্মীরও সৃষ্টি হইয়াছে। কাজাকস্থানের অধিবাসীদের মধ্যে পূর্ব্বে একজনও কামার, এঞ্জিনীয়র অথবা চিকিৎসক ছিল না। কিন্তু আজ অবস্থার পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে। কাজাকস্থানে একটি বুদ্ধিজীবী সম্প্রদায়ের সৃষ্টি হইয়াছে। এই পরিবর্ত্তন কেবল কাজাক-স্থানেই সীমাবদ্ধ রহে নাই। ককেসাস, মধ্য-এশিয়া এবং সুদূর উত্তরে অবস্থিত প্রদেশসমূহেরও এই প্রকার রূপান্তর ঘটিয়াছে।

সোভিয়েট-তন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর নারীর অবস্থারও পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে। রাষ্ট্রে এবং সমাজে তাহার মর্য্যাদার আসন স্বীকৃত হইয়াছে। পূর্ব্বে রুশিয়াধীন এশিয়ার কন্যা-বিক্রয় প্রথার বহুল প্রচলন ছিল। নারীহরণ ছিল প্রায় নিত্যনৈমিত্তিক ঘটনা। অপরিচিত পুরুষের মুখদর্শন নারীর পক্ষে গুরুতর অপরাধ বলিয়া বিবেচিত হইত। আজার-বাইজানের মেয়েদিগকে 'চাদরা' এবং তাজিকস্থান ও উজবেকিস্থানের মেয়েদিগকে ঘোড়ার লোমে প্রস্তুত 'চভ্‌চন' দ্বারা মুখমণ্ডল আবৃত করিয়া রাখিতে হইত। রুশ সাম্রাজ্যের প্রাচ্য প্রদেশসমূহে নারীর কোনও অধিকারই স্বীকৃত হইত না। তাহাদিগকে স্বামী, পিতা অথবা ভ্রাতার মন যোগাইয়া চলিতে হইত। সোভিয়েট রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার পর এই সমস্ত অঞ্চলের নারীরা যুগযুগান্তের বন্ধন হইতে মুক্তিলাভ করিয়াছে। সোভিয়েট আইন নারী পুরুষে সমদর্শী। তাই আজ নারীদের মধ্যেও রাজনৈতিক কর্ম্মী, চিকিৎসক, এঞ্জিনীয়র, বিমান-পরিচালিকা, শিক্ষাব্রতী এবং কৃষিবিশেষজ্ঞের অভাব নাই।

রাষ্ট্রের অন্তর্ভুক্ত বিভিন্ন অনুন্নত অঞ্চলগুলির মধ্যে শিক্ষার বিস্তার এবং সংস্কৃতির উন্নতি ঘটাইতে সোভিয়েট সরকার চেষ্টার ত্রুটি করেন নাই বা করিতেছেন না। রাষ্ট্রের সর্ব্বত্র প্রাথমিক শিক্ষা অবৈতনিক এবং বাধ্যতামূলক করা হইয়াছে। হিসাব করিয়া দেখা গিয়াছে যে সোভিয়েট রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার পর কুড়ি বৎসরের মধ্যেই আজারবাইজান, তুর্কমেনিয়া, উজবেকি-স্থান, কাজাকস্থান, আর্মেনিয়া এবং কিরঘিজিয়াতে বিদ্যালয়-গামী ছাত্রের সংখ্যা যথাক্রমে ৩৫, ৩১, ৫৩, ৫৮, ৬৮ এবং ১৭২ গুণ বাড়িয়া গিয়াছিল।

জার-শাসিত রুশ সাম্রাজ্যের মুষ্টিমেয় বিশ্ববিদ্যালয় এবং উচ্চতর বৈজ্ঞানিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলির সব কয়টিই রুশিয়াতে অবস্থিত ছিল। সাম্রাজ্যের অধীন অনেক প্রদেশের নিকট তাহাদের অস্তিত্ব পর্য্যন্ত অপরিজ্ঞাত ছিল। আর ১৯৩৮-৩৯ সালে দেখা যায় যে বায়েলো রুশিয়াতে ২২টি, আজার-বাইজানে ১৩টি এবং কাজাকস্থানে ১৯টি উচ্চতর শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান গড়িয়া উঠিয়াছে। ঐ বৎসর উক্রেনে ১৩৯টি বিশ্ববিদ্যালয় এবং বৈজ্ঞানিক শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান ছিল। আর প্রাক্-বিপ্লব যুগে এই সংখ্যা ছিল মাত্র ১৫। ১৯৩৮-৩৯ সালে জার্ম্মেনীর লোকসংখ্যা উক্রেনের দ্বিগুণ ছিল। অথচ সেই সময়কার জার্ম্মেনীতে উক্রেন অপেক্ষা অনেক কম উচ্চতর শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান ছিল।

সোভিয়েট সরকারের অনুসৃত নীতি রাষ্ট্রের অন্তর্গত প্রত্যেক জাতির সৃজনী প্রতিভার বিকাশ এবং জাতীয় শিল্পের পরিপুষ্টি সাধন করিয়াছে। সোভিয়েট যুক্তরাষ্ট্রের প্রত্যেকটি জাতির সৃষ্ট মানস-সম্পদ আজ সোভিয়েট ভূমির সম্পত্তি। উক্রেন, জর্জিয়া এবং আর্মেনিয়ার কবি এবং সাহিত্যিক-দিগের রচিত সাহিত্য সমগ্র জাতির সম্পদ। পক্ষান্তরে রুশীয়

এবং বিশ্ব-সংস্কৃতির মন্দির-দ্বার আজ প্রত্যেক সোভিয়েট নাগরিকের নিকট উন্মুক্ত হইয়াছে। সোভিয়েট সংস্কৃতির উপর এই সংস্কৃতির প্রভাবকে অস্বীকার করিলে সত্যের মর্য্যাদা লঙ্ঘিত হইবে। পুস্কিন, ডারউইন, সেক্সপীয়র, টলষ্টয়, মার্কস প্রভৃতির রচনাবলী সোভিয়েট রাষ্ট্রে প্রচলিত বিভিন্ন ভাষায় অনূদিত হইয়া অসাধারণ জনপ্রিয়তা অর্জ্জন করিয়াছে।

সোভিয়েট ভূমি বহু জাতি, ভাষা এবং সংস্কৃতির মিলন-ক্ষেত্র। অথচ অক্টোবর-বিপ্লবের পর সে দেশে যে অভিনব সংস্কৃতির গোড়াপত্তন হইয়াছে, তাহা কোন বিশেষ 'জাতীয়' সংস্কৃতি নহে। এই সংস্কৃতিতে রাষ্ট্রের সমস্ত জাতিরই জাতীয় বৈশিষ্ট্য বিদ্যমান। জার শাসনের লক্ষ্য ছিল একমাত্র রুশীয় ভিন্ন সমস্ত জাতীয় সংস্কৃতির বিনাশ। আর সোভিয়েট সরকার করিয়াছেন সমস্ত সংস্কৃতির সমন্বয় সাধন।

জাতি, ভাষা এবং সংস্কৃতিগত পার্থক্যের সমস্যা ভারতবর্ষেও বিদ্যমান। এই অজুহাতেই ভারতবর্ষে কেহ কেহ পরস্পর হইতে সম্পূর্ণ বিভিন্ন বিযুক্ত 'স্থান' গঠনের ধুয়া তুলিয়াছেন। কিন্তু প্রশ্ন এই যে, যদি বিভিন্ন পূর্ব্বপুরুষ হইতে উদ্ভূত, বিভিন্ন ভাষাভাষী এবং বিচিত্র সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যের উত্তরাধিকারী সোভিয়েট ভূমির অধিবাসিবৃন্দের স্ব-স্ব বৈশিষ্ট্য সম্পূর্ণ রূপে অক্ষুণ্ণ রাখিয়াও একই রাষ্ট্রের অধীনে বাস করা অসম্ভব না হয়, ভারতবর্ষেই বা তাহা সম্ভব হইবে না কেন? উত্তরে যদি বলা হয় যে সমাজের অর্থনৈতিক কাঠামোর পরিবর্ত্তন, প্রভুত্বপ্রয়াসী তৃতীয় পক্ষের অর্থাৎ জার এবং জারের আশ্রিত ও সাহায্যপুষ্ট ভূম্যধিকারী এবং ধর্ম্মযাজক সম্প্রদায়ের উচ্ছেদসাধনের ফলেই যাহা একদা অসম্ভব বলিয়া মনে হইয়াছিল রুশিয়াতে তাহা বাস্তবে পরিণত হইয়াছে, তবে স্বার্থবান শ্রেণী ভ্রূকুটি করিতে এবং রাজার আইন চোখ রাঙাইতে পারে কিন্তু সত্যের দেবতা প্রসন্নই হইবেন।

সোভিয়েট রাষ্ট্রের অন্তর্বর্ত্তী প্রত্যেক জাতি ঠিক একই প্রকার রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক এবং সাংস্কৃতিক অধিকার ভোগ করে। সোভিয়েট রাষ্ট্রবিধির ১২৩ সংখ্যক বিধানে এই অধিকারসাম্যের নীতি স্বীকৃত হইয়াছে। তুলনীয়—

Equality of rights of citizens of the U.S.S.R., irrespective of their nationality or race, in all spheres of economic, state, cultural, social and political life, is an indefeasible law.

Any direct or indirect restriction of the rights of, or conversely, any establishment of direct or indirect privileges for, citizens on account of their race or nationality, as well as any advocacy of racial or national exclusiveness or hatred and contempt, is punishable by law

সোভিয়েট যুক্তরাষ্ট্রের অন্তর্গত প্রত্যেকটি সাধারণতন্ত্র সমান মর্য্যাদা এবং অধিকার ভোগ করে। ইহাদের প্রত্যেক শাসনতন্ত্রই স্বকীয় বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী গঠিত হইলেও সোভিয়েট-বাদের সহিত তাহাদের কোন মৌলিক প্রভেদ নাই। প্রত্যেক সাধারণতন্ত্রের সোভিয়েট যুক্তরাষ্ট্র হইতে বিচ্ছিন্ন হইবার এবং স্বাধীনভাবে স্বকীয় বৈদেশিক সম্পর্ক নিয়ন্ত্রিত করিবার অধিকার আছে। কোন সাধারণতন্ত্রের সম্মতি ব্যতীত তাহার সীমান্তের পরিবর্ত্তন বা অধিকারে হস্তক্ষেপ করা চলে না।

সোভিয়েট যুক্তরাষ্ট্রের ব্যবস্থা-পরিষদ "দি সুপ্রীম সোভিয়েট অব দি ইউ. এস. এস. আর" দুইটি কক্ষে বিভক্ত। এই কক্ষ দুইটি 'সোভিয়েট অব দি ইউনিয়ন' এবং 'সোভিয়েট অব ন্যাশনালিটিজ' নামে অভিহিত হয়। সোভিয়েট রাষ্ট্রের অধীন প্রত্যেক সাধারণতন্ত্র (Union Republic), স্বায়ত্তশাসন ক্ষমতাসম্পন্ন সাধারণতন্ত্র (autonomous republic), স্বায়ত্তশাসন ক্ষমতাসম্পন্ন অঞ্চল (autonomous region) এবং কোন বিশেষ জাতি অধ্যুষিত অঞ্চল (national area) 'সোভিয়েট অব দি ন্যাশনালিটিজ'এ যথাক্রমে ২৫, ১০, ৫ এবং ১ জন প্রতিনিধি পাঠাইবার অধিকারী। আজারবাইজানের অধিবাসী সংখ্যা কিঞ্চিদধিক ৩০ লক্ষ এবং উক্রেনের অধিবাসী সংখ্যা ৩ কোটির উপর হইলেও ইহারা প্রত্যেকেই 'সোভিয়েট অব দি ন্যাশনালিটিজ'এ পঁচিশ জন করিয়া সদস্য পাঠাইবার অধিকারী। ইহার ফলে এক দিকে যেমন ইহাদের পরস্পরের সহিত সমতা স্বীকৃত হইয়াছে, তেমনই আবার যুক্তরাষ্ট্রের ব্যবস্থা-পরিষদে ইহাদের বিশেষ স্বার্থ রক্ষার ব্যবস্থাও হইয়াছে।

এই ভাবে সোভিয়েট রাষ্ট্র তাহার অধিবাসী বিভিন্ন জাতির মধ্যে মৈত্রী স্থাপন করিয়াছে। শোষক শ্রেণীর অস্তিত্ব জাতি-বৈরের একমাত্র না হইলেও প্রধান কারণ। শোষণের ফলেই প্রধানতঃ জাতি এবং সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষের আগুন জ্বলিয়া উঠে। সর্ব্বপ্রকার দাসত্বের শত্রু এবং আন্তর্জ্জাতিক ভাবধারার বাহক শ্রমজীবী শ্রেণীর হাতে ক্ষমতা আসিবার ফলে রাষ্ট্রিক, সামাজিক এবং অর্থনৈতিক জীবনে পারস্পরিক সহায়তার নীতি গৃহীত হওয়ায় এবং রাষ্ট্রের অধিবাসী সমস্ত জাতির সাধনায় সৃষ্ট মানস-সম্পদের প্রচার এবং প্রসারের জন্য সোভিয়েট ভূমির অধিবাসী প্রতিটি জাতির মনোজগতে বিরাট বৈপ্লবিক পরিবর্ত্তন সাধিত হইয়াছে। পরস্পরের প্রতি সন্দেহ এবং অবিশ্বাস দূরীভূত হইয়া তাহাদের মধ্যে মৈত্রী এবং প্রীতির এক মধুর সম্পর্ক গড়িয়া উঠিয়াছে। ইহারই ফলে বিশ্বের রাজনৈতিক রঙ্গমঞ্চে একটি অভিনব দুর্ব্বার রাষ্ট্রের অভ্যুদয় হইয়াছে। বিশ্বের দৃষ্টি আজ তাহারই দিকে নিবদ্ধ। সে দৃষ্টিতে রহিয়াছে ঈর্ষ্যা, বিস্ময় এবং হয়ত বা কতকটা শ্রদ্ধা।

আমাদের উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়

শ্রীমনোজমোহন রায়, এম-এ

বর্তমানে শিক্ষা-সংক্রান্ত বিষয় নিয়ে বিভিন্ন সাময়িক পত্রিকাদিতে আলোচনা হচ্ছে। এ সময়ে এমন কয়েকটি কথা সাধারণের গোচরে আনতে চাই যা যাঁরা শহরে ও গ্রামে শিক্ষকতা করেন নি তাঁরা জানেন না। এ প্রবন্ধ যদি সামান্যতম উদ্দেশ্য সাধন করতে পারে তা হলে আমার লেখা সার্থক হবে। এতে শিক্ষালয়ের দোষগুলোই প্রদর্শিত হচ্ছে সত্য; কিন্তু আশাবাদী না হলে এ প্রবন্ধ লিখতে বসতাম না। কলিকাতা শহরে শিক্ষকতা করার অভিজ্ঞতা থাকলেও আমি গ্রাম্যবিদ্যালয়গুলো সম্বন্ধেই বিশেষ ভাবে আলোচনা করব এবং সাধারণ ভাবেই বক্তব্য বলব—কোন নির্দিষ্ট প্রতিষ্ঠানের প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে একথা কেউ না মনে করেন।

বিদ্যালয়-গৃহ

প্রথমেই ধরা যাক, বিদ্যাশিক্ষার আলয়টিকে। বিশ্ববিদ্যালয় বা গভর্ণমেণ্ট যতই না ছাত্র প্রতি আট থেকে দশ বর্গফুট স্থানের নির্দেশ দিন এবং বিভিন্ন শ্রেণীতে সংখ্যানির্দেশ করে বিভাগ বা 'সেকশন' করার ব্যবস্থা করুন, কার্যক্ষেত্রে আমরা যে সব কক্ষে পড়িয়ে থাকি তার অধিকাংশ অস্বাস্থ্যকর। পল্লীগ্রামের পথে শীতকালে যাতায়াত অপেক্ষাকৃত সহজ বলে যে সব স্কুলে পরিদর্শক শুভ-পদার্পণ করেন তাঁরা শীতেই আসেন, সুতরাং বর্ষায় ও গ্রীষ্মে ছাত্রেরা কি অসুবিধা ভোগ করে তা তাঁরা বুঝতে পারেন না, তা ছাড়া স্কুল-কর্তৃপক্ষ এক আধ দিনের জন্ত বিশেষ ব্যবস্থা করে ত্রুটি চাপা দিয়ে থাকেন; সরকারী সাহায্যপ্রাপ্ত স্কুলগুলোই সাধারণতঃ বৎসরে একবার পরিদর্শিত হয়। বর্তমানে যে সব বাড়ী তৈরি হয়েছে সেগুলোর মধ্যেও গলদ রয়েছে, পুরাতন বাড়ীগুলোর তো কথাই নেই। বাস্তবতঃ নতুন বাড়িগুলো সুদৃশ্য হলেও তার সকল কক্ষ ব্যবহার্য নয়—এমন ঘরেও ক্লাস নেওয়া হয় যেখানে হাওয়া চলাচল দূরের কথা প্রয়োজনীয় আলোও প্রবেশ করে না। আজকাল 'L' বা তৃতীয় বন্ধনীর আকারে যে বাড়িগুলো তৈরি হয় তার অধিকাংশ ক্ষেত্রে কোণের ঘরগুলো অব্যবহার্য, তবু তাতেই ক্লাস বসে। সেই সব ঘরে চার-পাঁচ ঘণ্টা আবদ্ধ থাকলে ছাত্রদের স্বাস্থ্য ভাল থাকতে পারেই না। ক্লাস ফাইভ বা ক্লাস সেভেনে সাধারণতঃ বেশী ছাত্র হয়—যথাক্রমে ৩০ ও ৪০-এর বেশী ছাত্র হলেই 'সেকশন' করা রীতি, কিন্তু সেজন্ত অতিরিক্ত এক বা দু'জন শিক্ষক দরকার অথচ ছাত্রসংখ্যা এত বেশী হয় না যাতে উপযুক্ত বেতন পাওয়া যায়—কাজেই কর্তৃপক্ষ 'সেকশনের' হাত এড়িয়ে যান—মাইনেতে সুবিধা পায় যারা তাদের নাম খাতায় থাকে না কিংবা খাতায় ত্রিশ জন বা চল্লিশ জনের বেশী ছাত্রকে উপস্থিত করা হয় না। তার ফল এই হয় যে, ছোট ঘরে বেশী ছাত্রকে বসতে হয়। তার উপর বারান্দা যদি না থাকে, রোদ ও জল থেকে আত্মরক্ষা করবার জন্ত ছাত্রেরা যদি জানালা বন্ধ রাখে—তা হলে স্বাস্থ্য ভাল থাকতেই পারে না। বর্ষায় স্যাঁৎসেঁতে ঘরে, শীতে অতিরিক্ত ঠাণ্ডা ঘরে, গ্রীষ্মে অতিরিক্ত গরমে ছাত্রদিগকে 'নাজেহাল' হতে হয়। এমন খুব কম স্কুলই আছে যার বেশীর ভাগ ঘর আলো-হাওয়াযুক্ত, আর গ্রামে পচা ডোবার দুর্গন্ধ এড়িয়ে স্কুলগৃহ বিদ্যমান এ দৃষ্টাস্ত কচিৎ দেখা যায়। এর উপর বহু স্কুলে নিয়মিত ঝাঁট পড়ে না—ইন্‌স্পেক্টর যে যে স্থানের স্কুল পরিদর্শন করেন সেই সেই স্থানে তবু বৎসরে একবার সারা স্কুলটা পরিষ্কার করা হয়, অন্যত্র তাও নয়। এক স্কুলে গিয়ে প্রত্যহ ঝাঁট দেবার কথা বলায় চাকর বললে, "অত কম মাইনেতে এত কাজ করা যায় না—সকাল বিকেল ও ছুটির দিনে না খাটলে খাব কি? মাঝে মাঝে ঝাঁট দিই—নহলে ছেলেরা ত সব সময়ে থাকে—ঝাঁট দেব কখন" ইত্যাদি। স্কুলগৃহে পানীয় জলের ব্যবস্থার অভাবেও ছাত্রদের স্বাস্থ্যহানি হয়—গ্রামে টিউব ওয়েলের ব্যবস্থা আজকাল হয়েছে বটে, কিন্তু নলকূপটি একবার খারাপ হলে মুশকিল—গাফিলতি, আলস্য, ইত্যাদি নানা কারণে—অপেয় জল পান করে ছাত্রদের স্বাস্থ্য নষ্ট হয়—তারা রোগে ভোগে।

স্কুল কর্তৃপক্ষ

স্কুল কর্তৃপক্ষের অবিবেচনা হেতু বিভিন্ন বিষয়ে বহু লেখালেখি হয়ে থাকে—আর্বিট্রেশন বোর্ডের কার্যতালিকা দেখলেই তা সহজে বোঝা যায়। শিক্ষকদের হাতে শিক্ষার গর্ব—অশিক্ষিত বা অর্ধশিক্ষিত ধনী ব্যক্তি ম্যানেজিং কমিটির মেম্বর হয়ে কর্তৃত্ব করতে এলেই সংঘাত বাধে। গরীব শিক্ষক অর্থগৌরবের প্রাধান্যের উপরে তাঁর বিদ্যাগৌরবের স্থান দিতে ব্যগ্র—ধনী "অথরিটি" টাকার জোরে কর্তৃত্ব করতে চান। অনেক ক্ষেত্রে ম্যাট্রিকুলেশন মাত্র পাস কেউ কেউ প্রধান শিক্ষকদের বাজে সমালোচনা করেন। পরস্পরের মধ্যে সৌহার্দ্যের অভাবটাই দুঃখের কারণ হয়। ধনীর ধনের প্রয়োজনীয়তা শিক্ষকের ভোলা উচিত নয় এবং বর্তমানে শিক্ষকদের জন্য সহানুভূতিশীল হওয়া, বিদ্যার প্রকৃত সম্মান দেওয়া, সকলের উচিত।

শিক্ষক

শিক্ষক সম্বন্ধে লিখতে সঙ্কোচ বোধ হয়। প্রধান শিক্ষকের

সঙ্গে বহুক্ষেত্রে সহকারী শিক্ষকদের বনিবনাও হয় না। প্রধান শিক্ষক অন্যান্য দিক উপেক্ষা করে কেবলমাত্র তাঁর পদগৌরব বজায় রাখবার দিকেই দৃষ্টি রাখেন, তাতে মোটেই সুফল পাওয়া যায় না। গ্রামের স্কুলে প্রধান শিক্ষককে খুব বেশী খাটতে হয়। সাধারণতঃ ৮টা ক্লাসে ১০ জন শিক্ষক—তাঁরই মধ্যে একজন কেরাণী। কেরাণীর কাজ বন্ধ না রাখলে অন্যান্য শিক্ষকের সঙ্গে প্রধান শিক্ষককে বর্ত্তমানে প্রায় সমান খাটতে হয়। এতগুলো বিষয় পড়াতে হবে—একজন শিক্ষক অনুপস্থিত থাকলে ত কথাই নেই, না থাকলেও প্রধান-শিক্ষককে সাত 'পিরিয়ডে'র মধ্যে পাঁচ পিরিয়ড খাটতেই হবে। শহরের স্কুলে বা যেখানে ছাত্র-সংখ্যা বেশী থাকায় আটটা ক্লাসের জায়গায় সেকশন করে দশ-বারোটা হয়েছে—সেখানেই প্রধান শিক্ষক বেশী অবসর পান, নইলে আটটা ক্লাসের দশ জন শিক্ষকের স্কুলে তিনি না খাটলে স্বার্থপরতা প্রকাশ পায়—সহকারী শিক্ষকদের তা চক্ষুশূল হয়। একে বর্ত্তমান বাজারে আর্থিক তারতম্যে সহজেই সহকর্মীদের মধ্যে ঈর্ষার সঞ্চার হয়—তার উপর যদি প্রধান শিক্ষক পরিশ্রম করতে কুণ্ঠিত হন তা হলে মনান্তিক অন্যায় হয়। বড় বড় স্কুলের দৃষ্টান্ত দেখে পল্লীর সাধারণ স্কুলের প্রধান শিক্ষকেরা অবস্থা জটিল করে তোলেন। সহকর্মীদের প্রতি দরদের অভাব—কর্ত্তৃপক্ষদের কাছে তাঁদের অভাব-অভিযোগ জানিয়ে তা দূর করার ব্যবস্থা না করা—অসন্তোষ প্রকাশ পূর্ব্বক নির্দ্দেশ দেওয়া বা আজ্ঞা করা, স্বেচ্ছাচারিতা ইত্যাদি নানা কারণে প্রধান শিক্ষক অন্যান্য শিক্ষকের অপ্রিয় হয়ে থাকেন। এতে করে দলাদলির উৎপত্তিও হয়ে থাকে। মতান্তরকে মেনে নিতে আমরা পারি না, মন কষাকষি এসে যায়। শিক্ষায়তনে শিক্ষাব্রতীদের মধ্যে এ ধরণের ব্যাপার যে কিরূপ অশোভন ও দুঃখজনক তা বলে শেষ করা যায় না। এ ছাড়া শিক্ষার মান খারাপ হওয়ার জন্য শিক্ষকদের নিজেদের শিক্ষারও গলদ প্রচুর থাকে। একজন গ্রাজুয়েট শিক্ষক ছুটি চেয়ে দরখাস্ত দিয়েছেন তাতেও ভাষা ও ব্যাকরণ ঘটিত মারাত্মক ভুল। এ ধরণের দৃষ্টান্ত বিরল নয়। অভিজ্ঞ এবং সুদক্ষ শিক্ষকের সংখ্যা নিতান্তই মুষ্টিমেয়। শিক্ষাব্রতী মাত্রকেই মনে রাখতে হবে যে, যোগ্যতা অর্জ্জন না করা পর্য্যন্ত বৃত্তি হিসাবে শিক্ষকতা অবলম্বন করা নিতান্ত অসমীচীন। পল্লীগ্রামের স্কুলের ম্যাট্রিকুলেট শিক্ষকগণ প্রায়ই স্থানীয় লোক হন। ইউনিভার্সিটিতে ন্যূনপক্ষে ২৫৲ টাকা বেতন নির্দ্ধারিত হলেও ১৯৪২ সালেও কোনো কোনো ম্যাট্রিকুলেট শিক্ষক ১০৲ টাকা মাইনেতে মাষ্টারী করেছেন, এখনও ১৮।২০৲ টাকা বেতনে চাকরি করছেন। এটা বাড়িয়ে বলা নয়—এ হচ্ছে নিষ্ঠুর সত্য। পঞ্চাশের মন্বন্তরেও মাগ্‌গি ভাতা বাবদ কিছু নিয়ে এঁদের একাহারী থাকতে হ'ত। কোন রকমে সকাল-সন্ধ্যায় ছাত্র পড়িয়ে গ্রাসাচ্ছাদনের ব্যবস্থা করতেন। এ বাজারেও সাধারণতঃ গ্রাজুয়েট শিক্ষককে ৪০।৪৫৲ টাকার বেশী দেওয়া হয় না। এই স্বল্প-বেতনভোগীদের দ্বারা শিক্ষকতা কার্য্য সুষ্ঠুভাবে নির্ব্বাহিত হতে পারে না। যোগ্য ব্যক্তি এত কম মাইনেতে মাষ্টারী করতে চান না, নিতান্ত আর কিছু না পেলেই তবে শিক্ষকতা অবলম্বন করেন, কাজেই স্থানীয় লোক দিয়ে কাজ চালানোর দিকে কর্ত্তৃপক্ষ দৃষ্টি দেন তাতে খরচ কম হয় এবং শিক্ষকদের উপর জোর চলে। এই সব ব্যাপারে সকলে সজাগ না হলে শিক্ষকদের বাঁচোয়া নেই। একেই ত বর্ত্তমান শিক্ষা-পদ্ধতিতে গলদের অন্ত নেই—কম করে ন'দশ বছরের পরিশ্রমের ফলেও শতকরা নব্বই জন ছেলে কি বাংলা কি ইংরেজীতে শুদ্ধ করে একখানা পত্র পর্য্যন্ত লিখতে পারে না—অ আ ক খ পড়ার সঙ্গে সঙ্গে যদিও এ বি সি ডি শেখে। বিদেশী ভাষার কথা ছেড়েই দিলাম কিন্তু মাতৃভাষাতেও তাদের যে কি শোচনীয় অজ্ঞতা তা পরীক্ষার খাতাগুলো দেখলেই বুঝতে পারা যায়। শহরের কয়েকজন ছাত্রকে দেখে বা গ্রামাঞ্চলের বিশেষ মেধাবী ছাত্রকে দেখে অনেকের ভুল ধারণা থাকতে পারে, কিন্তু যাঁরা মাষ্টারী করেন বা ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষার পরীক্ষক তাঁরা আসল কথা জানেন। প্রায় অর্দ্ধ লক্ষ ছাত্র কলিকাতা-বিশ্ববিদ্যালয়ের গত ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষায় পরীক্ষার্থীরূপে উপস্থিত হয়েছিল, এর মধ্যে দু' তিন হাজারকে কোন রকমে ভাল বলে চালানো যায়। পল্লীতে পড়ার আবহাওয়া নেই বললেই হয়, ছাত্রেরা নামমাত্র স্কুলে আসে। পরীক্ষার সময়ই যা একটু পড়ার ঝোঁক দেখা যায়। বহু ছাত্র উত্তরাধিকারসূত্রে কিছু পায় না—বেশীর ভাগ ছাত্রেরই কোন লক্ষ্য নেই—কোনরকমে ম্যাট্রিকুলেশন পাস করাই তাদের কাম্য। নানা রকম বিরুদ্ধশক্তির সঙ্গে শিক্ষকদের লড়াই করতে হয় সত্য, তবু এমন অবস্থার মধ্যেও ছাত্রদের যেটুকু শিক্ষা হতে পারত উপযুক্ত শিক্ষকের অভাবে তাও হয় না। বাড়ীতে ছাত্রদের যত্ন নেবার ব্যবস্থা না থাকলে বর্ত্তমান শিক্ষাপদ্ধতিতে বিশেষ কাজ হবে না। শহরে বহু ছাত্রের গৃহশিক্ষক থাকে—গ্রামে ঠিক তার উল্টো অবস্থা। গ্রামে শিক্ষকদের কাছে যে সব ছাত্র বাড়ীতে পড়ে, তাতে বিশেষ কিছু শিক্ষা হয় না; কারণ সেখানেও পাঠশালা বসে যায়। মাইনে কম দেয় বলে শিক্ষককে অনেকগুলি ছাত্রকে একত্রে পড়াতে হয় আর স্কুলের শিক্ষক ছাড়া গ্রামে অন্য গৃহ-শিক্ষকও পাওয়া যায় না। ম্যাট্রিক পরীক্ষার্থীদের কোর্স দু-বছরে শেষ করতে হলে তাড়াহুড়ো করতেই হয়। ইংরেজীর কথাই ধরি: ৭টা গদ্যাংশ, ১৯টা পদ্য, দুটো দ্রুত পঠনের বই, একটা পুরো নভেল জাতীয় বই, একধার করে রিডিং পড়তেই ক্লাসে দুটো বছর কেটে যায়—ভাল করে পড়াতে গেলে কি হয় ভুক্তভোগীরাই বোঝেন। শিক্ষকদের অজ্ঞতাই যেমন শুধু নয়, শিক্ষকতার নানা অসুবিধাও তেমনই লক্ষণীয়।

শিক্ষককে তার শ্রমের প্রকৃত মূল্য ও মর্যাদা যত দিন না দেওয়া হবে, "শিক্ষকতা করি" একথা বলতে মন হতে সংকোচের ভাব যত দিন না দূরীভূত হবে—বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠ্য-তালিকা যত দিন যথোপযুক্তভাবে পরিবর্তিত না হবে, তত দিন এ রকম অবস্থা চলতে বাধ্য। শিক্ষকেরও সংসার আছে—২০।২৫৲ টাকায় সংসার চলে না এবং নীচের ক্লাসে পড়াতে হয় বলে ম্যাট্রিকুলেশন পাসই যথেষ্ট মনে করা উচিত নয়। ট্রেনড্‌ গ্রাজুয়েটদের দরকার ঐ নীচের ক্লাসেই। বিশেষ ধৈর্য, বুঝাবার বিশেষ দক্ষতা, শিশুমনস্তত্ত্ব সম্বন্ধে উপযুক্ত জ্ঞান ইত্যাদি থাকলেই তবে নীচের ক্লাসে শিক্ষা দেওয়া যায়। "ম্যাট্রিক-টিচার" রাখার কোন যৌক্তিকতা আছে বলে মনে হয় না এবং একজন লোকের দুবেলা পেট পুরে খাবার খরচও যদি শিক্ষক না পান তা হলে পড়ানো যে খারাপ হবেই তা বলা বাহুল্য।

পাঠ্য পুস্তক

পাঠ্য পুস্তক নির্বাচন এক বিরাট্‌ সমস্যা। উপরের দু-ক্লাসের বই বিশ্ববিদ্যালয় ঠিক করে দেন—সে বিষয়ে অনেক কিছু বলবার থাকলেও সাধারণতঃ প্রধান শিক্ষক নিশ্চিন্ত থাকেন। নীচের ক্লাস নিয়েই যত গণ্ডগোল। পল্লীর অধিকাংশ স্কুলে পাঠ্যপুস্তকের তালিকা প্রায় একই থাকে। ছাত্রের অভিভাবকগণ বই কিনে দিতে অপারগ। পুরাতন বই চেয়ে নিয়ে বা কম দামে কিনে দেবেন ইত্যাদি কারণ দেখিয়ে কমিটি নির্দেশ দেন নতুন বই পাঠ্যতালিকাভুক্ত করার প্রয়োজন নেই। প্রথম সংস্করণের বই ও তৃতীয় সংস্করণের বইয়ে অনেক সময় এত তফাৎ দেখা যায় যে দু'রকম বই বললেই হয়—শিক্ষকদের পক্ষে পড়ানো প্রায় অসম্ভব হয়ে ওঠে। প্রকাশকেরা দয়া করে যে বই পাঠান তা ছাড়া বই আমরা পাই না—নামকরা বইয়ের জন্ত লিখে পাঠালেও পাওয়া যায় না। অধিকাংশ স্কুলে পাঠ্য পুস্তক কিনবারও সামর্থ্য নেই, লাইব্রেরির জন্তে বই কেনা ত দূরের কথা। ইউনিভার্সিটির প্রকাশিত বই কেনাই অনেক সময় দুষ্কর হয়ে ওঠে। গত চার বছর ত কাগজের দুর্ভিক্ষের জন্ত স্কুলে বই পাঠানো বন্ধ আছে বললেই হয়। কাজেই হাতের কাছে আমরা যে, বই পাই তাই চালাতে হয়। বিস্মিত হতে হয় ভেবে যে, যিনি "গৌরীশঙ্কর" ও "এভারেষ্ট" অভিন্ন মনে করেন তিনি কোন্‌ দুঃসাহসে ভূগোল লিখতে বসেন এবং শিক্ষা-বিভাগই বা তার অনুমোদন করেন কেমন করে। ইংরেজী ও বাংলা বইয়ের ভুলের কথা না বলাই ভাল। স্কুলে প্রচলিত বাংলা বইগুলোর লেখাগুলো সুনির্বাচিত নয়।

স্কুলের আয়

দু-এক ক্ষেত্রে স্কুলকে ব্যবসা-ক্ষেত্রে পরিণত করা হয়েছে শোনা যায় বটে কিন্তু মিশনারি, গবর্ণমেণ্ট, ও কলিকাতার কয়েকটি স্কুল ছাড়া অধিকাংশ স্কুলই কমিটির মেম্বরদের চাঁদা বা সাধারণের দানের উপর নির্ভর ক'রে থাকে। ছাত্র-দত্ত বেতনে সব খরচ কুলায় না। কমপক্ষে দেড়শ জন ছাত্র থাকলে একটা হাই স্কুল করা যায় কিন্তু ঐ দেড়শ' জন ছাত্রের মাইনের উপর নির্ভর করলে যুদ্ধপূর্ব যুগে মফস্বলের স্কুলে সাধারণতঃ শিক্ষকদের যে বেতন দেওয়া হ'ত তার বেশী দেওয়া যেতে পারে না। প্রধান শিক্ষককে ৫০৲ টাকা ও সর্বনিম্ন শিক্ষকের বেতন দশ টাকা—কথাটা মোটেই কাল্পনিক নয়। কমপক্ষে যে বেতন তা লিখে ঐ রকম বেতন নিতে হয়, কোথাও বা বাকি টাকা যেন স্কুলকে শিক্ষকগণ দান করছেন এই রকম লিখিয়ে নেওয়া হয়। ছাত্রদের অনেকে কম বেতনে পড়ে—বেতন না কমালে পড়া ছেড়ে দেবে কি না, অন্ত বিদ্যালয়ে যাবে কি না ইত্যাদি দিক বিবেচনা করে মাইনের ব্যবস্থা করতে হয়—অবস্থাপন্ন লোকেরাও ছেলেদের মাইনে কমাবার জন্ত দরখাস্ত করে, কম মাইনেতে পড়তে পাওয়া যে অগৌরবের সে ধারণাই নেই। বরং বলে থাকে, অধিকাংশ গভর্ণমেণ্ট এইডেড্‌ স্কুলে মাইনে এক রকম আদায় করা হয়—সময় খাতায় অন্ত রকম দেখানো হয়। ইন্‌স্পেক্টর আসার দিন কয়েক জনকে আসতে বারণ করা হয়। অর্থাভাবে অধিকাংশ স্কুলে রিজার্ভ ফণ্ড, ভাল লাইব্রেরি নেই, প্রভিডেণ্ট ফণ্ড যা আছে তারও অনেক কিছু ভুয়ো।

পাঠ্য ও পাঠ্যাতিরিক্ত বিষয়

গ্রামে বহু ছাত্রকে দু'তিন মাইল, কখনও কখনও পাঁচ-ছয় মাইল প্রত্যহ যাতায়াত করতে হয়, গ্রীষ্মে বর্ষায় তাদের কষ্ট বর্ণনাতীত। তার উপর সুনির্বাচিত পাঠ্য পুস্তকের অভাবে এবং উপযুক্ত শিক্ষক ও পড়ার পরিবেশের অভাবে মফস্বলের স্কুলের ছাত্রদের অবস্থা অতীব শোচনীয়। দেড়শ' থেকে দুশ' জন ছাত্রের স্কুলে আট দশ জন মাত্র ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়, তন্মধ্যে দু'এক জন ছাত্র মাত্র উচ্চশিক্ষা লাভ করতে যায়, বাকি ছাত্রদের শিক্ষার সমাপ্তি এখানেই, সেই শিক্ষা যদি প্রকৃত শিক্ষা হ'ত খেদ থাকত না। কিন্তু খুব কম ছাত্রই প্রকৃত শিক্ষা পায়। কাজেই এইরূপ শিক্ষা দেওয়া ও নেওয়া পণ্ডশ্রম ছাড়া আর কি! পাঠ্যাতিরিক্ত বিষয়েও শুভলক্ষণ দেখা যায় না। অধিকাংশ ছাত্রেরই স্বাস্থ্য খারাপ। উপযুক্ত আলোহাওয়া খেলে এমন ঘর না থাকায় সুপেয় জলের অভাবে, টিফিনের ব্যবস্থা না থাকায় এবং সর্বোপরি স্বাস্থ্য-রক্ষায় কোন চেষ্টা না থাকায় ছাত্রদের স্বাস্থ্যহানি হচ্ছে। স্কুলে নামমাত্র ড্রিল হয়, গ্রীষ্ম বর্ষায় ড্রিল প্রায়ই বাদ যায়, যখন সকালে স্কুল বসে তখন সময়াভাবের অজুহাতে ড্রিল বন্ধ থাকে, শীতের দিকে যা হয় সেও নীচের চার শ্রেণীতে, তাও সপ্তাহে মাত্র দু'পিরিয়ড, কাজেই ড্রিলের মধ্য দিয়ে স্বাস্থ্যলাভের আশা করা যায় না। ব্রতচারী, স্কাউট-সিস্টেম, ম্যানুয়েল ট্রেনিং ক্লাস প্রভৃতি যে কয়টির ব্যবস্থা অতি

অল্পসংখ্যক স্কুলে আছে, সেখানে কিছু হয়, নইলে অন্যত্র কিছু হয় না। একটি মাত্র ব্যাপারে ছাত্রদের মধ্যে ও দু'এক জন শিক্ষকের মধ্যে উৎসাহ দেখা যায়, তা ফুটবল খেলা। গ্রামের ছেলেরা ভ্রমণ, পুকুরে সাঁতার কাটা, ইত্যাদি দ্বারা কোন রকমে স্বাস্থ্য বজায় রাখে। যে সব স্কুলে স্পোর্টস্ হয় তার সংখ্যাও অল্প আর স্পোর্টস্ দু'চার দিনের ব্যাপার মাত্র। ছাত্রদের স্বাস্থ্যের প্রতি আমরা উদাসীন, বরং একথা বলাই সঙ্গত যে, সেদিকে কোন ব্যবস্থা না ক'রে পাঠ্য পুস্তকের ভার চাপিয়ে তাদের স্বাস্থ্যহানির হেতু হয়ে দাঁড়াচ্ছি আমরা। কোন আমোদ-প্রমোদেরও বড় একটা ব্যবস্থা নেই। পারিতোষিক বিতরণ উৎসবে (তাও সকল স্কুলে ব্যবস্থা নেই) আবৃত্তি অভিনয় আমরা করিয়ে থাকি—সে এত কম সময়ের জন্তে যে তা না বলাই ভাল। কোথাও বাইরে নিয়ে যাবার ব্যবস্থা নেই—হাতে লেখা পত্রিকা, বিতর্ক সভা ইত্যাদির পরমায়ু অতি অল্প। যে শিক্ষকের উৎসাহে এগুলো আরম্ভ হয় শেষ পর্যন্ত দেখা যায় এ সমস্তের পেছনে তিনি ছাড়া দ্বিতীয় ব্যক্তি কেউ নেই, কাজেই সে সবের অকাল মৃত্যুই হয়ে থাকে। আমাদের ছাত্রেরা কি হতে পারে, কি কি পন্থা খোলা রয়েছে তাই তারা জানে না। মন্তেসরি, ক্রয়বেল্‌স্, পেস্‌তালৎসি প্রভৃতির ধরণে পঠন-পাঠন কোন দিন প্রবর্তিত হতে পারে আমাদের দেশে এ যেন স্বপ্ন মনে হয়। খেলাধূলার মধ্যে, আমোদ-আহ্লাদের আবহাওয়ায়, স্বতঃস্ফূর্ত ভাবে যে প্রাণের আনন্দে শিক্ষা সে শিক্ষার ব্যবস্থা কি হবে না? শহরে অভিজাত সমাজে, যেটা একটু আধটু চলতে আরম্ভ করেছে, তা কত দিনে গ্রামে গ্রামে পৌঁছুবে?

এ প্রবন্ধে সংক্ষেপে আমাদের বর্তমান অবস্থার ইঙ্গিত দিলাম মাত্র। স্বাধীন ভারতে শিক্ষা ব্যাপার পরিচালনা করবেন যাঁরা তাঁরা যেন এ সব দিকে লক্ষ্য রাখেন এই কামনা।

গ্রীষ্মমণ্ডলে সাম্রাজ্যবাদী শোষণের একটি দিক

শ্রীঅনাথবন্ধু দত্ত

বিষুব রেখার উভয় পার্শ্বের দেশগুলি লইয়া গ্রীষ্মমণ্ডল। আজ পর্য্যন্ত এই মণ্ডলের অধিবাসিগণই সর্ব্বপ্রকারে বেশী লুণ্ঠিত হইয়াছে। এখানে প্রকৃতির দান যেমন অফুরন্ত লোকেরাও সেই অনুপাতে অলস ও উদ্যমহীন। ইউরোপের জাতিগুলি এই মণ্ডলের ভূভাগগুলি (আফ্রিকা ও দক্ষিণ-আমেরিকার অবস্থিত) নিজেদের মধ্যে ভাগ করিয়া লইয়াছে, প্রকৃতির সম্পদ বেপরোয়া লুণ্ঠন করিতেছে ও দেশের আদিম লোকদিগকে নির্দ্দয়ভাবে খাটাইয়া ও অত্যাচার করিয়া মৃত্যুর ও ধ্বংসের মুখে ঠেলিয়া দিতেছে।

রবার

গ্রীষ্মমণ্ডলে প্রচুর বৃষ্টি হয়। বৎসরে ৬০ হইতে ২০০ ইঞ্চি বারিপাত হইয়া থাকে। অনেক স্থলে ঘন বৃক্ষরাজি ও লতাগুল্ম ঠেলিয়া প্রবেশ করা অসম্ভব। বৎসরের বারো মাসই এই সকল দেশ গরম থাকে এবং ইহাদের আবহাওয়া স্যাঁৎসেতে। এই সকল দেশে বহুরকমের গাছ জন্মিয়া থাকে এবং প্রায় ১০০ রকম গাছ হইতে এক প্রকার রস নির্গত হয় যাহা হইতে রবার প্রস্তুত করা চলে। অবশ্য রবার সংগ্রহের জন্য হিভিয়া ব্রেসেলিয়েন্সিস্ নামক বৃক্ষের ত্বকের নির্য্যাস রসই সংগৃহীত হইয়া থাকে। দক্ষিণ-আমেরিকার আমেজন নদীর জঙ্গলে এই গাছ প্রচুর পরিমাণ ছিল এবং এইস্থানেই সর্ব্বপ্রথমে বেপরোয়া ভাবে রবার সংগ্রহ ও আদিম লোকের উপর অত্যাচার সুরু হয়। রবার দ্রব্যটি বহুকাল হইতে জানা থাকিলেও বাইসাইকেল ও আরও পরে মোটর গাড়ী আবিষ্কারের পর হইতেই ভয়ানকভাবে ইহার চাহিদা বাড়িয়া গিয়াছে।

আমেজন নদীর এক করদ-নদী পুটুমেও নদীর অববাহিকায় এই রবার সংগ্রহ গোড়ায় সুরু হয়। একদল কলম্বিয়ার ঔপনিবেশিক ইণ্ডিয়ান দ্বারা এই কার্য্য আরম্ভ করে। নানারূপে অত্যাচার করিয়া ইণ্ডিয়ানদিগকে এই রবার সংগ্রহে বাধ্য করা হইত। এবং কোন ইণ্ডিয়ানই এই কার্য্য হইতে রেহাই পাইত না। ইণ্ডিয়ানগণও এই অত্যাচারের ফলে বেপরোয়া ভাবে রবার সংগ্রহ করিত। রস বাহির করিবার জন্য গাছের ছাল কাটিয়া, ডাল এমন কি গাছ পর্য্যন্ত কাটিয়া ফেলিত। কিন্তু ইহাতেও পুঁজিপতিরা খুসি ছিল না। আরও লাভের জন্য গভীরতর বনে ইণ্ডিয়ানগণকে জোর করিয়া পাঠান হইত। ইহাতে লাভ বাড়িল বটে, কিন্তু বলিভিয়া ও পেরুর অঞ্চলের বহু রবার বৃক্ষ বহুলাংশে নির্ম্মূল হইয়া গেল এবং সেই সঙ্গে ইণ্ডিয়ানগণের সংখ্যা ঐ অঞ্চলে ৫০,০০০ হাজার হইতে কমিয়া ১০,০০০ দাঁড়াইল।

ব্রেজিল অঞ্চলের রবার সংগ্রহের রীতি একটু অদ্ভুত ধরণের ছিল। প্রথমে ইণ্ডিয়ানগণকে রবার সংগ্রহের যন্ত্রাদি ও খাদ্য ধারে দেওয়া হইত। দ্রব্যাদি যখন যাহা দরকার তাহাও কোম্পানীর নিকট হইতে লইতে হইত। রবার সংগৃহীত হইলে তাহা হইতে এই সকলের মূল্য কাটিয়া লওয়া হইত। ফল এই হইত যে তাহাদের দেনা কখনও পরিশোধ হইত না। পলায়নের পথ ছিল একমাত্র কোম্পানীর জিনায়, সুতরাং সে

দিকও বন্ধ। এইরূপে জঙ্গল ও কোম্পানীর দাসত্বে তাহাদের জীবনের অবসান হইত। ব্রেজিল অঞ্চলের রবার এখন আর মালয়ে উৎপন্ন রবারের সহিত প্রতিযোগিতায় সক্ষম হইতেছে না। বেপরোয়া ধ্বংসের উপর যে উৎপাদনের ভিত্তি ছিল তাহা ধ্বসিয়া গিয়াছে। পুঁজিপতিরা এখন জঙ্গলের অন্যান্য দ্রব্যাদি বিশেষভাবে ব্রেজিলদেশীয় বাদাম সংগ্রহে মন দিয়াছে। ব্যাঙ্ক অফ্ ব্রেজিল চেষ্টা করিয়াও আর রবার ব্যবসা বাঁচাইতে পারিতেছে না। দাম ও উৎপন্ন রবারের পরিমাণ অসম্ভব রকম হ্রাস পাইতেছে।

আফ্রিকা মহাদেশে রবার উৎপাদনের কাহিনীও কম করুণ নহে। মধ্য আফ্রিকার কঙ্গো অধিত্যকায় যে ধ্বংসের লীলা চলিতেছে তাহা রুশিয়া ব্যতীত সমগ্র ইউরোপ খণ্ডের মত একটা বিরাট দেশব্যাপী। এখানেও বহু রবারবৃক্ষ ও কয়েক প্রকার লতা হইতে রবার সংগৃহীত হয়।

এখানে বেলজিয়মবাসিগণ নানা অমানুষিক অত্যাচার দ্বারা নিগ্রোদিগকে জঙ্গল হইতে রবার সংগ্রহে বাধ্য করে। প্রাণের দায়ে নিগ্রোশ্রমিকেরা গাছ ও লতা কাটিয়া অর্থাৎ জঙ্গল নির্মূল করিয়া রবার-রস সংগ্রহ করে। আরও অদ্ভুত যে নিগ্রোগণকে তাহাদের দেশের একমাত্র ব্যবসা রবার ও হস্তিদন্তের কারবার করিতে দেওয়া হয় না। এমন কি তাহাদিগকে চাষ-বাস করিতেও দেওয়া হয় না কারণ তাহা হইলে শ্রমিক মেলে না। ফলে সে দেশের গ্রাম ও কৃষি ধ্বংসপ্রাপ্ত হইয়াছে। গত প্রায় ত্রিশ বৎসরের ধনতান্ত্রিক উৎপাদন ব্যবস্থায় জনসংখ্যা দুই কোটি কমিয়া ৮৫ লক্ষে পরিণত হইয়াছে। এই ধ্বংসের ভিত্তির উপরেই প্রথম মহাযুদ্ধের পূর্ব্বে কঙ্গো উপনিবেশ স্থাপিত হইয়াছিল এবং কোম্পানীর অংশীদারগণ লাভে ফাঁপিয়া উঠিয়াছিল।

কঙ্গো ও আমেজন অঞ্চলে যে উপায়ে রবার উৎপন্ন হয় তাহা দ্বারা কখনও ব্যবসা স্থায়ীভাবে বৃদ্ধি পাইতে পারে না। তাই আজ উভয় স্থানেই রবার উৎপাদন প্রতিযোগিতার মুখে অসম্ভব রকম কমিয়া গিয়াছে।

এখন রবারবৃক্ষের চাষের বিষয় দেখা যাউক। চাষের প্রশস্ত ক্ষেত্র উষ্ণমণ্ডলে স্থাপিত। মালয় উপদ্বীপ, জাভা, সুমাত্রা ও বোর্ণিও প্রভৃতি স্থান রবার চাষের উত্তম স্থান। ব্রেজিল হইতে রবার বীজ আনাইয়া লণ্ডনের কিউ উদ্যানে বৃক্ষ জন্মান হয়। পরে সেই বৃক্ষের বীজ মালয় অঞ্চলে পরীক্ষার জন্য আনিয়া সুফল পাওয়া যায়। দেখা গেল ব্রেজিল অপেক্ষা মালয় দেশ রবার চাষের পক্ষে উপযুক্ত ও লাভজনক। ১৯১০ সনে এখানে ১১,০০০ টন রবার উৎপন্ন হইয়াছিল, ঐ বৎসর জঙ্গলা রবারের পরিমাণ ছিল ৮৩,০০০ টন। ১৯১৪ সনে জঙ্গলা রবারের উৎপাদন আরও অনেক কমিয়া গেল এবং চাষের রবারের পরিমাণ উহা ছাড়াইয়া ৭০,০০০ টনে পৌছিয়াছে। বর্ত্তমানে পৃথিবীর রবার সরবরাহের দশ ভাগের নয় ভাগ আসে চাষের রবার হইতে। এই উৎপাদনে প্রথম স্থান লইয়াছে ব্রিটেন অধিকৃত মালয় দেশ ও দ্বিতীয় স্থান ওলন্দাজ পূর্ব্বভারতীয় দ্বীপগুলি।

জঙ্গলে যে ভাবে রবার সংগ্রহ হয় চাষের রবার অবশ্য সে ভাবে সংগ্রহ হয় না, এজন্য অপচয় অনেক কম হয়। এখানে কার্য্য অপেক্ষাকৃত সুশৃঙ্খল ভাবে হয়। এখানে ধনতান্ত্রিক উৎপাদনের পরবর্ত্তী স্তরের দোষগুলি লক্ষ্য করা যায় যথা—বেপরোয়া প্রতিযোগিতা, অতিরিক্ত উৎপাদন এবং মূল্যের অত্যধিক উত্থান-পতন।

যখন দেখা গেল রবার চাষের ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল তখন ইংরেজের মূলধন মালয় দেশে ও ওলন্দাজের মূলধন ওলন্দাজ পূর্ব্বভারতীয় দ্বীপপুঞ্জে বর্দ্ধিত হইল। হাজার হাজার তামিল শ্রমিককে দক্ষিণ-ভারত হইতে ও জাভাবাসিকে এই সকল রবার চাষের জন্য নেওয়া হইল। একদল চীনাও আসিয়া রবার চাষের কাজ সুরু করিয়া দিল; আবার দেশীয় লোকের ছোট ছোট রবারের বাগান তৈরি হইল। এই সকল বাগানে গাছগুলি ঘন ঘন রোপিত হইয়া থাকে এবং এই গাছ হইতে রবারও বেশী সংগৃহীত হয়। চীনা ও দেশীয় লোকের বাগানগুলি ইউরোপীয়েরা প্রীতির চোখে দেখে নাই।

রবারের দাম ভয়ানক ভাবে চারি বৎসর চড়িয়া থাকায় ১৯১৪ সন নাগাদ ইংরেজ, ওলন্দাজ, চীনা ও দেশীয় রবার উৎপাদক বিশ লক্ষ একর জমিতে নূতন রবার গাছ পুঁতিল। ইহার ছয়-সাত বৎসর পরে এই সকল গাছ হইতে রবার উৎপন্ন হইতে আরম্ভ হইলে দেখা গেল উৎপাদনের তুলনায় চাহিদা মোটেই বাড়ে নাই, ফলে সর্ব্বাপেক্ষা চড়া দামের $\frac{1}{১৮}$ অংশে দাম কমিয়া আসিল। ইংরেজেরা উৎপাদন কমাইতে চাহিল। কিন্তু ওলন্দাজেরা তাহাতে রাজী হইল না।

ইংরেজের চেষ্টায় ফল হইল। দাম বাড়িলে উৎপাদন বাড়ান হইত এবং দাম কমিলে গাছ হইতে অল্প রবার সংগৃহীত হইত। কিছুকাল ভালই চলিল। ১৯২৬ সনে রবারের বাজার এতই ভাল হইল যে রবারের ব্যবসা মালয়ের অন্য সকল ব্যবসা ছাপাইয়া উঠিল। উৎপাদন নিয়ন্ত্রীকরণ এলাকার বাহিরে বোর্ণিয়ো ও সুমাত্রার বহু দেশীয় উৎপাদক বেশ কিছু লাভ করিল এবং নূতন নূতন বৃক্ষ চাষ করিয়া যখন আবার বেশী মুনাফা পাইবে আশা করিয়াছিল তখন অপ্রত্যাশিতভাবে দাম কমিয়া গেল।

ইংরেজ গবর্ণমেন্ট আবার উৎপাদন নিয়ন্ত্রণ করিতে চেষ্টা করিল, কিন্তু এবারেও ওলন্দাজেরা ইংরেজের সঙ্গে যোগ দিল না। ১৯২৮ সনে ইংরেজেরা নিয়ন্ত্রণ তুলিয়া দিল। ফলে প্রথম মহাযুদ্ধের সময় যাহার দাম এক শত টাকা ছিল তাহার দাম এক টাকায় নামিয়া আসিল। অনেক চেষ্টার পর ১৯৩৪ সনে ইংরেজ ও ওলন্দাজ উভয় গবর্ণমেন্ট উৎপাদন নিয়ন্ত্রীকরণে রাজী হইল এবং দেশী উৎপাদকগণের উপর রপ্তানী কর বসাইয়া রবারের দাম বাড়াইতে সক্ষম হইল।

এইরূপ বেপরোয়া রবার উৎপাদনের ফল হইল অপচয়। লাভের আশায় উৎপাদন এত বাড়িয়া যায় যে মূল্যের পতন অনিবার্য্য হয়, কারণ উৎপন্ন রবারের এক-চতুর্থাংশের বেশী চাহিদা তখন থাকে না। কাজে কাজেই এই উৎপাদন অনর্থক হইয়া পড়ে।

ইহার ফল ইউরোপীয়, চীনা ও সুমাত্রার উৎপাদনকারী-গণের পক্ষে যেমন অশুভ, তামিল ও জাভার শ্রমিকগণের পক্ষে ততোধিক মর্ম্মান্তিক। শ্রমিক সংখ্যা ১৯১০ ও ১৯২০ সনের মধ্যে ৭,০০,০০০ হইতে ৩৩,৫৮,০০০তে বাড়িয়া যায়। যখন মন্দা পড়িল নূতন শ্রমিক আনা বন্ধ হইল, এবং দুই বৎসর পর্য্যন্ত শ্রমিকের সংখ্যা কমিল। ১৯২৬ হইতে আবার তাহাদের সংখ্যা বাড়িয়া চলিল। আরও চারি বৎসরে সংখ্যা প্রায় ৫০,০০,০০০-এর কাছাকাছি হইল। ১৯৩২ সনের মন্দা দেখা দিলে হাজার হাজার তামিল ভারতে ফিরিয়া গেল।

রবারের দামের উঠানামার সহিত এই বিদেশী চুক্তিবদ্ধ ভারতীয় শ্রমিকের মালয়ে আসা-যাওয়ার যে কি মর্ম্মান্তিক সম্বন্ধ তাহা বুঝা খুব শক্ত নহে।

বর্ত্তমানে বিগত মহাযুদ্ধের ফলস্বরূপ মালয়ে ভারতীয় শ্রমিকের অবস্থা চরম দুর্দ্দশায় পৌঁছিয়াছে। সাম্প্রতিক খবরে জানা যায় যে সমস্ত দিনের মজুরীতে একজন শ্রমিকের দুই পেয়ালা চায়ের মূল্য মাত্র হইয়া থাকে। ভারত-গবর্ণমেণ্টের এজেণ্ট-জেনারেল কার্য্যতঃ শ্রমিকগণের বিশেষ কিছুই করিতে পারেন না, কারণ রবার-বাগানের মালিকগণের স্বার্থের প্রতি-কূলে যাওয়া তাঁহার সাধ্যাতীত। যত দিন না উৎপাদনের বর্ত্তমান পদ্ধতি পরিবর্ত্তিত হইতেছে, তত দিন শ্রমিকগণের অবস্থার পরিবর্ত্তন হইবে বলিয়া আশা করা যায় না। কাঁচা মালের মত তাহাদের শ্রমমূল্য ও চাহিদা মিটাইবার অনিশ্চিত টানাটানির মধ্যে দোদুল্যমান থাকিবে।

ইক্ষু

গ্রীষ্মমণ্ডলে আর একটি খাদ্যদ্রব্য উৎপাদন হয় ইক্ষু হইতে। আমেরিকার কিউবা দ্বীপ ইক্ষু উৎপাদনে বহুদিন প্রধান স্থান অধিকার করিয়া আছে। উহার নীচেই জাভার স্থান। ইহার পর নাম করিতে হয় পোর্টোরিকো, ফিলিপিন ও হাওয়াই দ্বীপের। ভারতবর্ষের উৎপাদন পরিমাণ প্রচুর হইলেও বিদেশী বাণিজ্যে ইহার স্থান নাই।

দুইটি ভৌগোলিক কারণে কিউবা ইক্ষুচাষের জন্য বিখ্যাত হইয়াছে, যথা, জমির উর্ব্বরতা ও অনুকূল আবহাওয়া। ইহা ছাড়া চিনির প্রধান খরিদ্দার গ্রেটব্রিটেন ও যুক্তরাষ্ট্রের সন্নিকট বলিয়া কিউবা চিনি যোগানদারের প্রকৃষ্ট স্থান। মে হইতে নভেম্বর মাস পর্য্যন্ত খুব বৃষ্টির সময় ইক্ষু গাছ বাড়িতে থাকে এবং যখন বৃষ্টি কমিয়া যায় তখন কাটিবার সময় আসে। এই সকল দেশে বার মাসই গ্রীষ্মকাল এবং কখনও তুষারপাত দেখা যায় না। ইক্ষুর গাছ কাটিয়া লওয়া হয় কিন্তু মূলে হাত দেওয়া হয় না। মূল হইতে পুনরায় গাছ গজায়। এইরূপে একই মূল হইতে দশ-বার বৎসর পর্য্যন্ত ইক্ষু গাছ জন্মিয়া থাকে।

ইক্ষুর চাষ ও চিনি প্রস্তুত কিউবার অধিবাসিগণের আর্থিক জীবন নিয়ন্ত্রিত করে বলা চলে। কিন্তু ধনতন্ত্রের নির্ম্মম উৎপাদন-ব্যবস্থা কিউবা ও জাভা উভয় স্থানে নানা অনর্থের সৃষ্টি করিয়াছে। অর্থনৈতিক শোষণই অবশ্য এই সকল দুর্দ্দশার কারণ।

গত প্রথম মহাযুদ্ধে (১৯১৪-১৮) ইউরোপের বীট চিনির ব্যবসায় একেবারে বিপর্য্যস্ত হয়। কারণ বীট চিনির উৎপাদনক্ষেত্র জার্ম্মানী, চেকোস্লোভাকিয়া ও পোল্যাণ্ড যুদ্ধ-ক্ষেত্রে পরিণত হইয়াছিল। যুদ্ধের সময় কিউবার ইক্ষু-চিনির ব্যবসায়ীরা অত্যন্ত লাভ করে। যুদ্ধ শেষ হইলে ইউরোপের দেশে দেশে আবার বীটের চাষ সুরু হয় যদিও ইহার চাষের খরচ ও চিনি উৎপাদন ব্যয় ছিল খুব বেশী। প্রত্যেক দেশের গবর্ণমেণ্ট পুঁজিপতিগণকে অর্থ সাহায্যদ্বারা ও শুল্কের প্রাচীর তুলিয়া সাহায্য করিল। জনসাধারণকে সস্তায় ইক্ষু চিনি ব্যবহার করিতে বাধা জন্মাইল। ফলে ইউরোপে লোকে চড়া দামে চিনি কিনিতে বাধ্য হইল এবং কিউবার চিনির ব্যবসায় ও ইক্ষু চাষে মন্দা দেখা দিল। কিউবার চিনির দাম যুদ্ধ সময়ের পূর্ব্ব মূল্যের এক-পঞ্চমাংশে নামিয়া আসিল। ইহাতেও লাভ হইতেছিল, সুতরাং পুঁজিপতিরা কিউবার ইক্ষুর চাষ আরও বাড়াইতে লাগিল। ১৯২৫ সনে ইউরোপে বীটের চাষ ভাল হইয়াছিল সুতরাং কিউবার চিনির চাহিদা কমিয়া গেল। পুরাতন মজুত ও নূতন চিনির সরবরাহ মিলিয়া বাজারে এত চিনি জমিল যে বিক্রয় করা শক্ত হইল। দাম কমিয়া এক-চতুর্থাংশ হইল। প্রকৃতির দয়ায় দুর্দ্দশা আরও বাড়িল, কারণ ১৯২৯ সনের ভাল আবহাওয়ার জন্য ইক্ষুর ফসল খুব ভালই হইয়াছিল। উৎপাদন কমাইয়া দাম বাড়াইবার চেষ্টা করা হইল। প্রথমতঃ কিউবা পরে কিউবা ও জাভা উভয়ে মিলিয়া উৎপাদন কমাইয়া দিল। কিন্তু ইহাতেও সুফলের আশা রহিল না কারণ চিনির খরিদ্দার গ্রেট ব্রিটেন (ব্রিটিশ সাম্রাজ্য) ও যুক্তরাষ্ট্র উভয়েই নিজ নিজ এলাকায় চিনি উৎ-পাদন করিতেছিল। জাভা ও কিউবার উৎপাদন দুই-তৃতীয়াংশ কমান হইল। বাড়্‌তি চিনি দাঁড়াইয়াছিল ১০,০০,০০০ লক্ষ টন, চারি বৎসরে পাঁচ ভাগের চারি ভাগ কমান হইল।

প্রত্যেক দেশ বেশী দাম দিয়া নিজের এলাকার চিনি খাইবে ইহাতে আর্থিক যুক্তি অপেক্ষা রাষ্ট্রিক যুক্তি বেশী। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যে চিনি প্রস্তুত করিলে তাহার মূল্য কিউবার চিনি অপেক্ষা দ্বিগুণ বেশী পড়ে, তাহা সত্ত্বেও ইংলণ্ড, দক্ষিণ-আফ্রিকা ও অষ্ট্রেলিয়া সাম্রাজ্যের চিনি আমদানী করিতে লাগিল। যুক্ত-রাষ্ট্রও এই একই কারণে পোর্টোরিকো, হাওয়াই ও ফিলি-

পিনের চিনি ব্যবহার করিতে লাগিল যদিও ইহার দাম কিউবার চিনি অপেক্ষা শতকরা পঞ্চাশ টাকা অধিক।

এইরূপে কিউবার ইক্ষুচাষের সর্ব্বনাশ হইল এবং হাজার হাজার একর ভাল জমি চাষের অভাবে জঙ্গলাকীর্ণ হইল। এখন দেখা যাউক অন্য স্থানে ইক্ষুর চাষ বাড়িয়া সাধারণের উপকার হইয়াছে কিনা? পোর্টোরিকো ১৮৯৮ সালে যুক্তরাষ্ট্রের অধীনে আসে। মার্কিন চিনির কোম্পানীগুলি সমুদ্রতটের নিকটবর্ত্তী ইক্ষুর ক্ষেত্রগুলি ক্রমে ক্রমে কিনিয়া লয়। সাধারণ লোকেরা ভূমিহীন মজুর মাত্র। তাহারা আমেরিকার কোম্পানীর অংশীদারগণের লাভ যোগাইবার জন্য অপর কোন কৃষিকার্য্য না করিয়া ইক্ষুক্ষেত্রে বা চিনির কলে কাজ করিতে বাধ্য হইল। তাহারা নিজেরা চাষের জন্য জমি চাহিলে তাহাদিগকে পার্ব্বত্য অনুর্ব্বর জমি দেখান হইল, কারণ উর্ব্বর জমিগুলি সমস্তই চিনি-কোম্পানীর হাতে। এই অনুর্ব্বর জমিতে চাষ করিয়া গরীবের সন্তান-সন্ততি লইয়া পরিবার পালনের সম্ভাবনা ছিল না। চিনির কোম্পানীর অংশীদারের লাভ বাড়িয়াই চলিতে লাগিল। ফলে এক দিকের লাভ আর এক পক্ষের দুঃখ ও দুর্দ্দশার কারণ হইল।

কোকো

গ্রীষ্মমণ্ডলের আর একটা ব্যবসার কোকোর চাষ। কোকোর আদিম বাসস্থান আমেরিকা। একপ্রকার ফলের বীজ হইতে কোকো সংগৃহীত হয়। ব্রেজিলের বেহিয়া নামক ষ্টেট হইতে যথেষ্ট পরিমাণ কোকো রপ্তানী হয়। আফ্রিকার গোল্ডকোষ্ট হইতেই অবশ্য সর্ব্বাপেক্ষা বেশী রপ্তানী হয়। পূর্ব্বে জার্ম্মান-অধিকৃত টোগো ও কেমেরুন দেশে ম্যাণ্ডেটবলে অধিকার লাভ করিয়া গ্রেট ব্রিটেন কোকোর ব্যবসায়ে নিজেদের আধিপত্য বাড়াইয়াছে। ইহাতে জার্ম্মান পুঁজি-পতির ক্ষতি হইয়াছে, কারণ কোকোর চাহিদার পরিমাণ যুক্তরাষ্ট্রের পরই জার্ম্মানীতে সর্ব্বাপেক্ষা বেশী।

পৃথিবীর দুই-তৃতীয়াংশ কোকো আফ্রিকায় জন্মে। ব্রিটেন, ফ্রান্স ও পর্ত্তুগাল এই তিন সাম্রাজ্যবাদী জাতি ইহার মালিক। কোকো গরম দেশের জিনিষ এবং এই সকল দেশের অধিবাসীরা জাতিতে নিগ্রো। কোকোর উৎপাদন চুক্তিবদ্ধ বা বাধ্যতামূলক শ্রমদ্বারা কলঙ্কিত।

সর্ব্বাপেক্ষা নির্ম্মম প্রথা পর্ত্তুগীজের অ্যানগোলা এবং প্রিন্সিপি দ্বীপের কোকোর বাগানে দেখা যায়। নিগ্রো শ্রমিকদিগকে এই সকল স্থানে পশ্চিম আফ্রিকা হইতে আমদানী করা হয়। হাজার হাজার লোককে একবার এখানে আনিয়া ফেলিলে আর তাহাদের পরিত্রাণের উপায় থাকে না। এখানে বস-বাসের অবস্থা এরূপ ভয়ানক যে এই সকল শ্রমিকের বার্ষিক মৃত্যুর হার হাজার করা একশতে উঠিয়াছিল। যখন এই অত্যাচারের বিরুদ্ধে কতকগুলি আমেরিকান ও ইউরোপীয় কোম্পানী কোকো বর্জ্জন করিল তখন এই সকল অবস্থার সংস্কারের প্রতিশ্রুতি দেওয়া হইল। কিন্তু অনুসন্ধানে জানা যায় যে এখনও সেখানে বেগার প্রথা বিদ্যমান।

কফি

গ্রীষ্মমণ্ডলের আর একটা বিশেষ পানীয় কফি। উচ্চ-ভূমিতে—সমুদ্র হইতে ২০০০ হইতে ৬০০০ ফুট উচ্চে—যেখানে গ্রীষ্মের মাত্রা একটু কম, বৃষ্টিও কিছু কম সেখানে কফি বৃক্ষ ভাল জন্মে।

পৃথিবীর তিন-চতুর্থাংশ কফির গাছ ব্রেজিলের দক্ষিণ-পূর্ব্ব প্রদেশের মালভূমিতে রহিয়াছে। কিছু দিন হইল ব্রেজিলের প্রাধান্য কিছু কমিয়াছে, তবুও পৃথিবীর শতকরা ৬০ হইতে ৭০ অংশ কফি ব্রেজিল হইতে আসে। কিউবার পক্ষে চিনি যেমন ব্রেজিলের পক্ষে কফিও তেমনি, দেশের আর্থিক জীবনের সহিত ওতপ্রোতভাবে গ্রথিত। এখানে ব্যবসায়ের বিপর্য্যয় অবশ্য আর্থিক জাতীয়তার (economic nationalism) জন্য নহে, অত্যধিক উৎপাদনের জন্য।

কফিচাষ গোড়া হইতেই অবাঞ্ছনীয় উপায়ে চলিয়াছে। মুনাফা অল্প কয়েকজন বড়লোকের পেটে যায়, তাহারা আবার দেশ ছাড়িয়া ইউরোপের বড় বড় রাজধানীতে বাস করে। এই সকল বাগানে স্থানীয় লোক এবং অন্য দেশ হইতে নবাগত (immigrants) শ্রমিকেরা কাজ করে। ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রায় শেষ পর্য্যন্ত এই সকল বাগানে ক্রীতদাসেরা চাষ করিত। এখন 'কোলোনো' প্রথায় কাজ চলে। প্রথাটি এইরূপ। জমি কোলোনোদের অর্থাৎ কুলীদের মধ্যে ভাগ করিয়া দেওয়া হয়। প্রত্যেকেই নিজ নিজ জমি চাষের জন্য দায়ী থাকে। ইহাদের জমিতে কোন অধিকার নাই, লাভের অংশীদারও নহে এবং ইহাদের মজুরীও নিতান্ত কম।

প্রবাসী পুঁজিদারের স্বার্থ কেবলমাত্র ব্যবসায়ের মুনাফায়, এইজন্য যেনতেন প্রকারে লাভ বজায় রাখিবার জন্য তাহারা গবর্ণমেণ্টকে দিয়া অস্বাভাবিক উপায়ে ব্যবসা চাঙ্গা রাখিবার পক্ষে এরূপ চেষ্টা করায় যাহাতে তাহাদের লাভ বজায় থাকে কিন্তু সর্ব্বসাধারণের স্বার্থের হানি হয়। এই ব্যবস্থার নাম ভেলোরাইজেশন। কোন কোন বৎসর খুব কফি জন্মায় কিন্তু পরের বৎসর মাত্র উহার অর্দ্ধেক কফি পাওয়া যায়। এইরূপে বৎসরের পর বৎসর উৎপাদনের বাড়তি কমতি নিবারণের জন্য, ব্যবসায়ীগণ এক দিকে যেমন উৎপাদন নিয়ন্ত্রণ করিতে যত্নবান হইল অন্য দিকে তেমনি বাড়তি কফি ধরিয়া রাখিবার জন্য গবর্ণমেণ্টের সহিত ব্যবস্থা করিল। উদ্দেশ্য এই ব্যবস্থায় দাম বাড়িলে তখন কফির উৎপাদন বৃদ্ধি করিবে।

কিন্তু ব্যবস্থা অব্যবস্থায় পরিণত হইল। কফি ব্যবসায়ীরা বিক্রয়ের দর চড়াইয়া দিয়া অত্যধিক মুনাফার জন্য ব্যগ্র হইল। অতিরিক্ত লাভের আশায় আবার চাষ বাড়াইয়া চলিল। মুনাফার টাকা অত্যধিক লাভের জন্য কফি চাষে নিয়োগ করিল। ১৯২৭ সন হইতে উৎপাত সুরু হইল। ঐ বৎসর দ্বিগুণ ফসল

হইল। অতিরিক্ত কফি গুদামজাত করা হইল এবং ব্যবসায়ীরা সরকারী ব্যাঙ্ক হইতে মোটা কর্জ্জ পাইল। বাগান বাড়িয়া চলিল। মনে হইল ব্যবসায় সুদিন আসিয়াছে। পরের বৎসর ১৯২৮ সনে ফসল কম হইল বটে, কিন্তু তাহাও খুব বেশী, আবার নূতন বাগানের কফি বাজারে আসিতে লাগিল। ১৯২৯ সনে আবার প্রচুর কফি ফলিল। অবিক্রীত কফি গুদামে আর ধরে না এরূপ অবস্থা। সরকারী টাকায় কফি কিনিয়া মজুত রাখার প্রথা ভোলেরাইজেশন ভাঙিয়া পড়িল। ১৯৩৬ সনে আবার কফির ফসল ভয়ানক বাড়িল যাহা পূর্ব্বের বাড়তিকে ছাড়াইয়া গেল। এবারে ব্যবস্থা করা হইল যে মজুত কফির কতক নষ্ট করা প্রয়োজন। কিন্তু এ কার্য্যে ব্যক্তিগতভাবে ব্যবসায়ীগণকে বিশ্বাস করা যায় না, কারণ তাহারা হয়ত কফি নষ্ট করিবে না। অবশেষে গবর্ণমেণ্টই এই বিষয়ে হাত দিল এবং ব্যবস্থামত কফি পোড়াইয়া নষ্ট করা হইতে লাগিল। তিন বৎসরে ৩,০০,০০,০০০ কোটি বস্তা পোড়াইয়া ফেলা হইল। এই পরিমাণ কফিদ্বারা সমস্ত পৃথিবীর লোকের দেড় বৎসর চলিত। এখনও প্রতি বৎসর কফির এই ধ্বংসলীলা চলিতেছে। ইহাই উৎপাদনের নামে অপচয়—বে-পরোয়া ধনতান্ত্রিক উৎপাদনের অবশ্যম্ভাবী ফল।

পাম অয়েল

গ্রীষ্মমণ্ডলের আর একটি বিশেষ দ্রব্য পাম অয়েল। ইহা পশ্চিম-আফ্রিকার সমুদ্রকূলে সেনিগাল হইতে কঙ্গো পর্য্যন্ত সমগ্র দেশে প্রচুর পরিমাণ পাওয়া যায়। ইউরোপীয় ব্যবসায়ী-গণের চাপে স্থানীয় নিগ্রোগণ নানারূপ গর্হিত উপায়ে পাম অয়েল সংগ্রহ করিতে বাধ্য হয়। অবশ্য ইহাতে নিগ্রো-গণের ক্ষতিই ভবিষ্যতে বেশী হইবে, কারণ পাম অয়েল তাহাদের প্রধান খাদ্যের অন্যতম। ফল ও ফলের বীজ উভয় হইতে তৈল নিষ্কাষিত হয়। গাছের ফল সংগ্রহ করিয়া এরূপ বেপরোয়াভাবে তৈল নিষ্কাষিত করা হয় যে ইহাতে অনেক অপচয় হইয়া থাকে। যতটা তৈল সংগ্রহ হয় তাহা অপেক্ষা বেশী নষ্ট হয়। নিগ্রোরা ইহা সমুদ্রতটে লইয়া গিয়া জাহাজ ভর্ত্তি করে। অতঃপর ইহা চালান হইয়া ইংলণ্ড ও ফ্রান্সের সাবান, মারগারীন ও মোমবাতির কারখানায় বা দক্ষিণ-ওয়েল্সের টিনপ্লেট কারখানায় যায়।

মনঃসমীক্ষকের কৌতূহলোদ্দীপক অভিজ্ঞতা

অধ্যাপক শ্রীমন্মথনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

আমি প্রায় বিশ বছরের উপর প্রায়োগিক মনঃসমীক্ষণের (Psychoanalysis) চর্চ্চা করছি। মনঃসমীক্ষণ কার্য্যে যে সব কৌতূহলোদ্দীপক অভিজ্ঞতা হয়েছে তার সম্বন্ধে কিছু বলব।

মনঃসমীক্ষণ, মনোবিদ্যা বিষয়ে একটি অভিনব প্রণালী। ইহা প্রায় ৫০ বছর পূর্ব্বে ফ্রয়েড কর্ত্তৃক আবিষ্কৃত হয়। ইহা দ্বারা দুঃসাধ্য ও জটিল বহুবিধ মানসিক বিকৃতির চিকিৎসা করা যায়। রোগীকে বন্ধ অন্ধকার ঘরে চোখ বুজে বিছানার ওপর সম্পূর্ণ ভাবে অঙ্গপ্রত্যঙ্গ এলিয়ে দিয়ে শুতে বলা হয়। রোগীকে নির্দ্দেশ দেওয়া হয় যেন তিনি নিঃসঙ্কোচে, তাঁর মনে যা আসে সব কথা বলে যান। মনঃসমীক্ষক অর্থাৎ Psycho-analyst এমন ভাবে বসেন, যেন তিনি রোগীর সর্ব্বাঙ্গ লক্ষ্য করতে পারেন অথচ রোগী তাঁর মুখ দেখতে না পান। সমীক্ষক রোগীর সব কথা একটি খাতায় লিখে নেন। এরূপ অবস্থায় রোগী যে সব কথা বলেন, তা বিচার করে তা থেকে মনঃসমীক্ষক রোগীর মনের অন্তর্নিহিত গোপন কথা ধরতে পারেন। রোগীর মনের অজ্ঞাত ভাবের সমাধান করতে পারলে রোগ সারে। এই ব্যাপার দৈনন্দিন চলে। এই হ'ল মনঃসমীক্ষণের প্রধান পদ্ধতি।

মনঃসমীক্ষণ-চিকিৎসার এক সর্ত্ত এই যে রোগীর মনে যে কথাই আসুক না কেন অকপটে তাই বলতে হবে, কিন্তু কার্য্য-ক্ষেত্রে দেখা যায় যে এই প্রতিশ্রুতি রক্ষা করতে রোগী বিশেষ কুণ্ঠা বোধ করে। বাধার মূল কারণ প্রধানতঃ দ্বিবিধ। প্রথম, ব্যক্তিগত এবং নিজের সহিত সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির গোপনীয় যৌন-জীবনের ঘটনা। বিকৃত প্রবৃত্তি ও নানাবিধ সমাজবিরুদ্ধ ব্যাপার বিষয়ক রহস্য প্রকাশে অনিচ্ছা। দ্বিতীয় বাধা রোগীর অজ্ঞাতসারে উপস্থিত হয়। শারীরিক পীড়ায় রোগী কায়মনো-বাক্যে নীরোগ হবার চেষ্টা করে। কিন্তু মানসিক রোগের এক বৈশিষ্ট্য এই যে রোগী নিজেই আরোগ্য লাভের পথে বাধা সৃষ্টি করে। মনে হয় যেন সে রোগ আঁকড়ে আছে, ছাড়তে পারছে না।

আমাদের মনের সব বিষয় সর্ব্বদা জ্ঞানগোচরে থাকে না। যা জ্ঞানগোচরে নাই, চেষ্টা করলে তার খানিকটা মনে করতে পারি সত্য, কিন্তু তা ছাড়া মনের একটি বৃহত্তর অংশ আছে যাকে 'নির্জ্ঞান' বলে। চেষ্টা করলেও এই নির্জ্ঞানে কি আছে তা মনে ধরা দেয় না। এই নির্জ্ঞান ক্ষেত্র আমাদের যাবতীয় আদিম অসামাজিক সহজ প্রেরণার উৎস। নানাবিধ যৌন কামনা উহার মূল মন্ত্র। শিশুর প্রথম পাঁচ-ছয় বছরের জীবনের ঘটনাগুলির উপকরণ নিয়ে নির্জ্ঞান মনের অবয়ব অনেকাংশে গঠিত হয়। শৈশবের ঘটনা আমরা প্রায় সবই ভুলে যাই। মনঃসমীক্ষক দেখেছেন যে নির্জ্ঞানে মাতাপিতার প্রতি কামভাব থাকে। এই নির্জ্ঞান হতে আমাদের অজ্ঞাত

যাবতীয় সহজ প্রবৃত্তি সঞ্জাত ইচ্ছারও উৎপত্তি হয়। নির্জ্ঞানের অসামাজিক ইচ্ছা স্বপ্নে কখনও কখনও স্পষ্ট ভাবে এবং জাগ্রতাবস্থায় পরিবর্তিত আকারে ছদ্মবেশে প্রকাশিত হয়।

নির্জ্ঞানের বৈশিষ্ট্য না বুঝলে, নির্জ্ঞানের যবনিকা উন্মোচন করা যায় না। নির্জ্ঞানের ইচ্ছা অনেক সময় প্রতীক বা symbol অবলম্বনে প্রকাশ পায়। নির্জ্ঞানে যৌন কামনা-মূলক প্রতীকের বাহুল্য দেখা যায়। ভাষাগত এবং জাতি ও দেশগত প্রভেদ থাকলেও প্রতীকের অর্থের পরিবর্তন দেখা যায় না।

দেড় বছর হতে আরম্ভ করে পাঁচ-ছয় বছরের মধ্যে মানব-শিশুর মনে তার পিতামাতা বা তৎস্থানীয় ব্যক্তির প্রতি একটি যৌন আকর্ষণমূলক ভালবাসা জন্মে এবং তা প্রতিরুদ্ধ হওয়ায় বিদ্বেষের উৎপত্তি হয়। এই ভালবাসা ও বিদ্বেষ পরে নির্জ্ঞানে চলে যায়। মাতাপিতার প্রতি কামভাবকে Œdipus Complex বলে। গ্রীক পুরাণে কথিত আছে, Œdipus পরিচয় না জেনে নিজের বাপকে হত্যা করেন ও মাকে বিয়ে করেন। এই কামচেষ্টার সহিত নির্জ্ঞানে সম ও বিসমলৈঙ্গিককামিতা (Homosexuality and Heterosexuality) সক্রিয় বা কর্তৃভাব ও সেব্যমান বা ভোগ্যবৃত্তিভাব (activity and passivity) এবং পুংবৎ ও স্ত্রীবৎ ভাবও দেখা যায়। পরিবারের মধ্যে পিতা মাতা ও অভিভাবকবর্গের এবং বৃহত্তর বহির্জগতের সংস্পর্শে এসে শিশুর মনের এই সকল কামভাব সংযত হয় ও তার স্বার্থপরতার সঙ্কোচ ঘটে। সঙ্গে সঙ্গে তার ব্যবহারিক জ্ঞানও বাড়তে থাকে। তার মনে ভালমন্দ হিতাহিত ও ধর্মজ্ঞানের আদর্শস্বরূপ বিবেকের উৎপত্তি হয়; এই বিবেক সামাজিক আচার-ব্যবহার, ব্যক্তিগত বাহ্যিক আচরণাদি নিয়ন্ত্রিত করে।

বিচক্ষণ লোকে মানুষের বাহ্যিক ভঙ্গী ও হাবভাব লক্ষ্য ক'রে তার তৎকালীন মানসিক ভাবের সন্ধান পেয়ে থাকেন। আমাদের দেশে একটি চলিত শ্লোক আছে—

"আকারৈরিঙ্গিতৈর্গত্যা চেষ্টয়া ভাষণেন চ
নেত্রবক্ত্রবিকারৈশ্চ লক্ষ্যতে অন্তর্গতং মনঃ।"

অর্থাৎ মনুষ্যের আকার, ইঙ্গিত, গমনভঙ্গী, কর্মচেষ্টা, বাক্য-প্রকাশিত ভাবধারা এবং চক্ষু ও মুখের বিকারে তাহার অন্তর্গত মন ধরা পড়ে। মনঃসমীক্ষকের কাছে প্রত্যেক অঙ্গভঙ্গীর ও শরীর-চেষ্টার মানে আছে। একটি উদাহরণ দিচ্ছি।

মনঃসমীক্ষণ কালে এক দিন একটি যুবকের কথা শুনছিলাম। অল্পক্ষণ পরে হঠাৎ তার কথা বন্ধ হয়ে গেল এবং সে ক্রমাগত তার ডান চোখ রগড়াতে লাগল। আমি বললাম, "কিছু দেখবার চেষ্টা হচ্ছে কি? মনে যা উঠছে বলে যাও।" সে বললে, "দরজাতে চাবির ছিদ্র।" আমি বললাম, "চাবির ফুটো দিয়ে কিছু দেখছ কি?" সে তখন বলল, "দেখব কি? চাবির ছিদ্র দিয়ে কে যেন আমার চোখে একটা শলাকা ফুটিয়ে দিতে আসছে।" আমি তখন তাকে বললাম—"হয়ত তুমি এমন কিছু দেখতে চেয়েছিলে, যেটা তোমার বিবেকের মতে দেখা উচিত নয়।" আমার কথা শুনে যুবকটি আবিষ্টের মত বাল্যকালের এমন একটি কাহিনী বর্ণনা করলে যাতে তার রোগের আসল রহস্য পরিষ্কার হয়ে গেল। সে চার-পাঁচ বছর ক্রমাগত রোগে ভুগছিল। রোগের নানাপ্রকার লক্ষণ তার শরীরে পরিলক্ষিত হয়েছিল। বহুদিন ধরে তার হৃদযন্ত্রের বৈকল্যের চিকিৎসা করা হচ্ছিল। এপেণ্ডিসাইটিস্ ও হার্ণিয়া রোগ হয়েছে মনে করে, চিকিৎসকের পরামর্শ মত তাকে অস্ত্রোপচার করাও হয়েছিল; কিন্তু কিছুতেই আসল রোগের উপশম হয় নাই। চলাফেরা করতে গেলে তার কোমরের নীচে, পৃষ্ঠদেশে অসহ্য যন্ত্রণা হ'ত।

সমীক্ষণের ফলে প্রকাশ পেল যে, সে বাল্যকালে দরজার ছিদ্রের মধ্য দিয়ে তার কোন নিকট আত্মীয় এক দম্পতির যৌন সম্ভোগের ব্যাপার দেখতে চেষ্টা করেছিল। একবার টুলের ওপর টুল সাজিয়ে তাতে চড়ে পার্টিশন দেওয়ালের ওপর মুখ রেখে যখন সে আড়ি পাতছিল তখন ঘরের ভিতর থেকে স্বামী-স্ত্রী তাকে দেখতে পায় ও তাড়া করে। দ্রুতপদে পালাবার সময় পড়ে গিয়ে সে গুরুতর আঘাত পায়; এই ঘটনা সাত বছর বয়সে ঘটেছিল। আঘাত-জনিত ব্যথা ক্রমে সেরে যায় কিন্তু বহুকাল পরে কোমরের কষ্ট দেখা দেয়। বাল্যকালের দুষ্কর্মের জন্ত বিবেক দংশন থেকেই তার রোগের উৎপত্তি। রোগী নিজের অজ্ঞাতসারেই রোগ-যন্ত্রণা সৃষ্টি করে নিজেকে শাস্তি দিচ্ছিল। বি-এ পাস করার পর চব্বিশ-পঁচিশ বছর বয়সের সময় আমার কাছে সে আসে এবং লুপ্ত স্মৃতি উদ্ধার হওয়ায় রোগমুক্ত হয়। মনঃসমীক্ষণের সাহায্যে দেড় বছর বয়সের স্মৃতি পর্যন্ত নির্জ্ঞান হতে নির্গত হয় ও যৌবন, কৈশোর এবং বাল্যের কামজীবনের ইতিহাস ব্যক্ত হয়ে পড়ে।

মনঃসমীক্ষণকালে একদিন ঐ রোগীর অবাধ ভাবধারা পরম্পরা পর্য্যালোচনা করে আমার ধারণা হয় যে, জন্মের সময় সম্ভবতঃ তাকে সাঁড়াশী দিয়ে মাতৃকুক্ষি হতে বার করতে হয়েছিল। আমি উক্ত মন্তব্য প্রকাশ করতে বিশেষ কুণ্ঠাবোধ করি, কারণ এ রকম ব্যাপার রোগীর অজানা থাকলেও যে সমীক্ষণে ধরা পড়ে তা আমি কোথাও পড়িনি। রোগী বিস্মিত হয়ে বললে, এরূপ কথা শুনেছে বলে তার মনে পড়ে না। পরদিন সে বাড়ীতে সন্ধান করে এসে বললে আমার কথাই ঠিক। এই ব্যাপারটি আমাকে খুব বিস্মিত করেছিল।

আর এক রোগী আমার কাছে আসেন। তিনি একটি লোক সঙ্গে না নিয়ে রাস্তার বার হতে পারতেন না; একলা রাস্তায় বার হলেই হার্ট ফেল করে প্রাণবিয়োগ হবে, এরূপ আশঙ্কা তাঁর হ'ত। তাঁর চিকিৎসা করতে গিয়ে আমার অনেক বিস্ময়কর অভিজ্ঞতা হয়েছিল। একদিন তিনি আমার

ঘরে ঢোকবার সময়, হঠাৎ হাপুরুৎ নিশ্চল হয়ে দাঁড়িয়ে গেলেন আর আমাকে বললেন, "আপনাকে যেন ভয়ানক হিংস্র বাঘের মত মনে হচ্ছে।' আমি অনেক অভয় দেবার পর তিনি আস্তে আস্তে আমার ঘরে এসে নিজ স্থানে বসলেন। তাঁর মনে কিছু দিন ধরে তখন অত্যন্ত পিতৃদ্বেষের ভাব চলছিল। সমীক্ষকের উপর সেই বিদ্বেষ আরোপ করে তিনি ভয়ে অভিভূত হয়েছিলেন।

সমীক্ষক রোগীর নিকট পিতৃপ্রতিম হয়ে পড়েন। ঐ দিবস রোগীর পিতৃস্থানীয় কোন ব্যক্তির সহিত পূর্ব্ব বিদ্বেষের আলোচনা হয়; ফলে তাঁর মনে যে আতঙ্ক হয়েছিল তিনি তা আমার নিকট বর্ণনা করেন। মনের নিরুদ্ধ ভাব প্রকাশ করে তিনি অনেকটা শান্তি পেলেন।

এই ব্যক্তির মাতার প্রতি তাঁর কামভাব বিলুপ্ত হয়ে যাবার পূর্ব্বে একটা আশ্চর্য্য ব্যাপার প্রত্যক্ষ হয়েছিল। প্রায় দু'মাস ধরে তিনি প্রত্যহ বলতেন, "জাগ্রত অবস্থায় কে যেন তাঁকে ভূত বা ব্রহ্মদৈত্যের মত সর্ব্বদা ভয় দেখাচ্ছে ও তাড়না করছে।" মাতার প্রতি কামভাব থাকলে, পিতা ভয়ের কারণ হন। ভূত, ব্রহ্মদৈত্য প্রভৃতি বৈরী পিতার প্রতীক।

আর একবার তিনি আমার ঘরে এমন অস্থিরতার সহিত এপাশ-ওপাশ এবং উঠাবসা করতে থাকেন যে, আমি তাঁকে লক্ষ্য করে বুঝতে পারি যে তিনি গর্ভিনীর প্রসববেদনার অভিনয় করছেন। পুরুষের নির্জ্ঞানে যে স্ত্রী ভাব থাকে, রোগীর আচরণে তাই প্রকাশ পেয়েছিল।

বহুদিনের কথা, একবার একটি রোগীকে দেখবার জন্য আমাকে তাঁদের বাড়ি যেতে হয়েছিল। গিয়ে দেখি একটি যুবকের হাত-পা শিকল দিয়ে বেঁধে রাখা হয়েছে, পাঁচ-ছয় মাস যাবৎ নাকি সে এমনই ভাবে শৃঙ্খলাবদ্ধ অবস্থায় আছে। রোগী নাকি বড়ই দুর্দ্দান্ত। আমি বললুম, "বন্ধন খুলে দেওয়া হোক, না হলে কোন কথাই হবে না।" তার আত্মীয়েরা বললেন, "সেটা নিরাপদ নয়, কেননা রোগী প্রহার করতে পারে।" তাঁরা আত্মরক্ষার জন্য একটা মোটা লোহার শিক নিয়ে দাঁড়িয়েছিলেন, বললেন, "ও আপনাকে মারতে পারে, সাবধানে থাকবেন।" অবশেষে তাঁরা আমার কথা শুনে শিকল খুলে দিলেন। হঠাৎ আশ্চর্য্য প্রতিক্রিয়া দেখলুম। তার প্রতি আমার বিশ্বাসের পরিচয় পেয়ে সে অকস্মাৎ শ্রদ্ধা ও অনুরাগে অভিভূত হয়ে আমার সঙ্গে কথা বলল। শেষে জানতে পারি পরদিন বাড়িতে সে কোন গোলমাল করে নি। নিজের ইচ্ছায় গঙ্গা মদনমোহন কালী দর্শন করে আসে। তাকে আর বেঁধে রাখতে হয় নি। মাস দুয়েক পর তার পাহারাদারকে বিদায় করা হ'ল। মনঃ-সমীক্ষণের ফলে সে এখন আরোগ্য লাভ করেছে এবং নিজের চেষ্টায় জীবিকা পর্য্যন্ত অর্জ্জন করছে।

নিভৃতে রহস্যপূর্ণ গোপনীয় কথার আলোচনার ফলে রোগীর মনে ক্রমে ক্রমে সমীক্ষকের প্রতি নানাবিধ অপূর্ব্ব ভাবের সঞ্চার হয়। পিতামাতার সম্বন্ধে বাল্যকালের নানা নিরুদ্ধ মনোভাব সমীক্ষকের উপর সংক্রামিত হয়। এই আরোপকে transference বা সংক্রমণ বলে। রোগীর নিকট কখনও বা সমীক্ষক অতিসাধু ব্যক্তি, এবং হিতকারী বলে শ্রদ্ধাপূর্ণ ব্যবহার পান। ইহাকে positive transference বলে। আবার কখনও বা রোগীর তরফ থেকে ঠিক বিপরীত আচরণ সমীক্ষকের ভাগ্যে জোটে। তিনি রোগীর নিকট নিরতিশয় সন্দেহভাজন, দুশ্চরিত্র ও লম্পট ব্যক্তি বলে প্রতীত হন এবং তাঁর প্রতি রোগী নানাবিধ তাচ্ছিল্য প্রদর্শন ও গালিবর্ষণ করতে থাকে। এই দ্বিতীয় অবস্থাকে negative transference বলে।

বিচক্ষণ সমীক্ষক দুই অবস্থাতেই মনোবিকারের সমস্যা সমাধানের প্রভূত উপাদান সংগ্রহ করতে পারেন। রোগী পিতৃস্থানীয় সমীক্ষকের উপর কখনও সমকামিতা প্রকাশ করে এবং কখনও সমীক্ষক রোগীর নিকট বি-সমকামিতার পাত্র বলিয়া প্রতীত হন। আমাকে পিতৃপ্রতীক ছাড়া দুই-চারিটি স্থলে রোগী, মাতা ও প্রণয়িনী প্রতিমারূপে দেখেছে। যে সমীক্ষণে এরূপ আরোপণ অভ্যাস হয় না, তাহাতে সুফল ফলতে অনেক বিলম্ব হয়।*

* অল্-ইণ্ডিয়া রেডিও কলিকাতা কেন্দ্রে প্রদত্ত বক্তৃতা।

জিজ্ঞাসা

শ্রীরাণী চট্টোপাধ্যায়

স্বপ্নের বলাকা ছিলো মনে মোর। তারা উড়িবারে
বারে বারে মেলে ছিলো পাখা, পদ চিহ্ন আঁকা
অনেক কবির চলা পথে। অদৃষ্টে কোথায়
শৃঙ্খল জড়ায়ে গেল পায়ে।

আমার আকাশে ছিলো তারা। তব অন্ধকার
আশা ছিলো পথ চিনিবারে।—(মধু-মদ মাখা
অনেক কবির চলা পথে।)—সে পথ কোথায়
মিলাইল অন্ধ মেঘ-হারে।

দূর্ব ছলে ছিলো একদিন। তখন যৌবন;
মত্ততার ভালো বেসেছিনু। ছিল আশা,
আমিও গাহিব কিছু গান। দুড়াইব কিছু ভালোবাসা।
সে আশা দুরাশা।

কাঁটার কাঁটায় ঘেরা পথ হারা মত্ত মোর মন।—
আজো সেথা পদচিহ্ন আঁকা। আশা নয়, শুধুই জিজ্ঞাসা।

মমতাহীন মৃত্যু

শ্রীঅনুপম বন্দ্যোপাধ্যায়

আমাদের পাশের বাড়ীটা অনেক দিন খালি ছিল। প্রায় মাস চারেক হবে। হঠাৎ সেদিন দেখি চুনকাম সুরু হয়েছে। বুঝলাম ভাড়াটে কেউ আসছে নিশ্চয়ই। দিনচারেক বাদে পাশের বাড়ীর গেটের কাছে একটা ট্যাক্সি এসে থামল। আমি ছাদে দাঁড়িয়ে। কৌতূহল অস্বাভাবিক নয়। দু'জন মাঝবয়সী ভদ্রলোক নামলেন। বয়স চল্লিশ থেকে পঞ্চাশের মধ্যেই হবে। যত দূর অনুমান করলাম, তাঁরা ভাই হবেন বলেই বোধ হ'ল। বয়স্কা এক স্ত্রীলোক নামলেন মাথায় দীর্ঘ ঘোমটা টেনে। ঐ দুই ভায়েরই এক জনের স্ত্রী বোধ হয়। মেয়েও নামল এক জন। যৌবনের তীর ছুঁয়ে ছুঁয়ে চলেছে ওর বয়স। খানিক পরে একটা বাসে করে নানান জিনিষ এসে হাজির—বাক্স-পেঁটরা থেকে হাঁড়িকুড়ি সব।

কয়েকটা দিন চলে গেছে। পাশাপাশি দুই বাড়ী। অপরিচয়ের কুয়াশা কাটিয়ে পরিচয়ের যোগসূত্র এখনও গাঁথা হয় নি। ভাবছি, একদিন গিয়ে আলাপ করে আসা যাবে। ভাবনাটাকে কাজে রূপায়িত করবার সুযোগ হয়ে উঠছে না, আপিসের কাজের চাপে। তাই ভাবনা আপন গণ্ডীতেই রুদ্ধ হয়ে রয়েছে।

রবিবারের সকাল। বাগানে বসে খবরের কাগজের পাতায় চোখ বুলাচ্ছি। ষ্টোভের আওয়াজ কানে আসছে বাড়ীর ভেতর থেকে—চায়ের জল চাপিয়েছে বিনতি।

কাগজের পাতা ওল্টাচ্ছি। হঠাৎ গেট খোলার শব্দ হতেই, চোখ গেল গেটের কাছে। পাশের বাড়ীর নবাগত ভদ্রলোক। মামুলি পোশাক। মাথায় কাঁচাপাকা চুল এলোমেলোভাবে ছড়ানো। পা খালি। কাগজ এক পাশে সরিয়ে রেখে, সাদরে আহ্বান করলাম—আসুন, আসুন।

—ক'দিন থেকেই ভাবছি আপনাদের সঙ্গে এসে আলাপ করি, কিন্তু এখন অবধি হয়েই উঠল না।

—হয়ে উঠবে না, তা জানি। তাইত নিজেই ইনিসিয়েটিভ্ নিয়ে দেখা করতে এলাম।—বলতে বলতে তিনি পাশের চেয়ারটায় বসলেন।

—এজন্যে ধন্যবাদ।

—নিশ্চয়ই। সে আর একবার বলতে, এক-শ বার। বাগানের চার দিকে তিনি চোখ ফেরালেন। সকালে রোজ বাগানের হাওয়া খান নাকি?

জানালাম—হ্যাঁ।

—গুড্ হ্যাবিট। কিন্তু তার চেয়ে ভাল মর্ণিং ওয়াক। আর তার চেয়ে ভাল মাইলটাক দৌড়ানো।

হেসে বললাম—কলেজে পড়ার সময় ওসব করতাম। এ বয়সে আর পোষায় না।

জবাবে তিনি কটমট করে আমার দিকে তাকালেন। হঠাৎ এই ক্রুদ্ধ দৃষ্টির কারণ বুঝতে পারলাম না। অন্যায় ত কিছুই বলা হয় নি।

প্রশ্ন করলেন—বয়স কত?

—আটাশ।

—বেশ। হাইট্?

—পাঁচ ফুট সাত কি আট ইঞ্চি হবে।

মাথা নাড়লেন তিনি।—উঁহু, হবে-টবে বললে চলবে না। একেবারে পারফেক্ট হতে হবে। ওয়েট্?

—দু-মাস আগে এক-শ দশ পাউণ্ড ছিল।

—ছিল বললে হবে না। এখন কত?

জবাব দিলাম—ঠিক বলতে পারলাম না। ওর কিছু কমবেশি হবে হয়ত।

—ভেরি ব্যাড্, ভেরি ব্যাড্। প্রত্যেক মাসে এক বার করে এসব মেজার করে রাখা উচিত। এখুনি চলুন আমাদের বাড়ী; সব মেজার করে নোব। চলুন।

—ইয়ে,—আমতা আমতা করে জানালাম—এখন নয়।

আবার তিনি কটমট্ করে তাকালেন।—কেন?

—মানে, আমার একটু কাজ রয়েছে।

—কাজ! এর চেয়ে বড় কাজ আর কি আছে?

সভয়ে বললাম—তা জানি। তবু, মানে…

—নো আরগুমেন্ট। তবে থাক্।

এত সহজে নিষ্কৃতি হতে দেখে হাঁফ ছেড়ে বাঁচলাম। কিন্তু বেশীক্ষণের জন্য নয়। একটু বাদেই শোনা গেল, কিন্তু থাকলে তো চলবে না। তোমার হেল্‌থ্ সাউণ্ড নয় মোটেই। আটাশ বছর বয়েস, পাঁচ ফুট আট ইঞ্চি হাইটে এক-শ দশ পাউণ্ড ওয়েট! ভেরি ব্যাড্। তোমার আণ্ডার-ওয়েট।

প্রশ্ন করলাম—আপনি কি করে জানলেন?

—বিশ্বাস হচ্ছে না? চল, তোমায় আমি চার্ট দেখাচ্ছি। চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ালেন।—এস, কাম্ অন্…

বাধা দিলাম—না না, এখন নয়। মানে…

—অল রাইট—তিনি আবার বসলেন।

বসতেই সাহস এনে বললাম—আমার হেল্‌থ্ ত খারাপ নয়।

ভদ্রলোক তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকালেন।—নয়? কি করে জানলেন?

—অসুখ-বিসুখ হয় নি অনেকদিন।

—হয় নি বলেই ত হেল্‌থ্ খারাপ।—তিনি হাসলেন। —এ কোন মুহূর্তে হতে পারে। দেহের মধ্যে টি. বি.,

টাইফয়েড, নিউমোনিয়া, ইনফ্লুয়েঞ্জা সব রোগেরই জার্ম ঘুরছে কিলবিল করে। হতে কতক্ষণ একটা রোগ। হেল্‌থ্‌ সম্বন্ধে কোন রকম নেগলেক্ট আমি সহ্য করতে পারি না।

—আমি কি নেগলেক্ট করছি ?

—অফ কোর্স। আর যাতে সেটা না করেন তাই আবার দেখা দরকার এ্যাজ এ ট সিটিজেন্‌, এ্যাজ এ দেবার। দাঁড়ান, উঠে দাঁড়ান…

চমকে উঠলাম।—দাঁড়াব ?

—নিশ্চয়ই দাঁড়াবেন।—দাঁড়ালাম ভয়ে ভয়ে।

—ভাটস্‌ রাইট। তিনি মনে মনে খুশি হয়েছেন বুঝলাম। —নিন্‌ এবার দশটা ডন্‌ আর দশটা বৈঠক মারুন।

আদেশ শুনে ঢোক্‌ গিললাম। বলে কি ভদ্রলোক! বহু কষ্টে বললাম—ইয়ে, মানে ডন্‌ বৈঠক!

—বেশী নয়, দশ আর দশ কুড়ি। তার পর উইকলি পাঁচটা করে বাড়ালেই চলবে।

বাপ্‌রে বাপ! ঘেমে উঠলাম। ডন্‌-বৈঠকের হাত থেকে এখন কি করে ছাড়া পাই ? হঠাৎ দেখি চায়ের পেয়ালা হাতে চাকরটা এদিকেই আসছে। তাই দেখে ধড়ে প্রাণ এল। চেয়ার টেনে আবার বসলাম।—নিন্‌, চা খাওয়া যাক। হরি, আর এক কাপ নিয়ে আয়।

তিনি ভুরু কুঁচ্‌কে বললেন—চা ?

—হ্যাঁ।

—না, চা চলবে না। সকালে ছোলা ভিজিয়ে খেতে হবে; তার পর এক পো কাঁচা দুধ। ব্যস।

—কিন্তু চা যে এতদিনের অভ্যেস।

—কোনো আরগুমেন্ট নয়। ব্যাড হ্যাবিট, ছাড়তে হবে। চলুন, ডায়েটের একটা লিষ্ট আপনাকে দিচ্ছি…

সভয়ে বললাম—এখন থাক্‌। মানে…

—আচ্ছা থাক্‌। পরেই হবে।—বলতে বলতে হঠাৎ তিনি হুড়মুড় করে চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ালেন।

অবাক হয়ে প্রশ্ন করলাম—কি হ'ল ?

—শুনতে পাচ্ছেন না ?

—কি শুনব!

—বিউগল বাজছে।

—বিউগল বাজছে! কোথায় ?

—হলদিঘাটে। আজ সেখানে রাজপুত সোল্‌জারদের মাস্‌ প্যারেড আছে। রাণা প্রতাপও আসবে।…বাজল কত বলুন তো ?

জবাব দিলাম—সাড়ে সাতটা।

—দশ মিনিটে পৌঁছানো যাবে না ? কি বলেন ?

হাসি চেপে বললাম—তা যাবে।

—তা হলেই হ'ল। ক্যাপটেন্‌ মাই ধি পাংচুয়াল।—ভদ্রলোক দ্রুত বেরিয়ে গেলেন।

এতক্ষণে আমিও বাঁচলাম। চায়ের পেয়ালায় আরামের চুমুক দিয়ে চাঙ্গা হয়ে উঠলাম। ভাগ্যিস্‌ ভদ্রলোকের হলদিঘাটে প্যারেডের কথা মনে পড়ে গেল! নইলে ডন-বৈঠকের হাত থেকে মুক্তি বোধ হয় কিছুতেই পাওয়া যেত না। সেই সঙ্গে সকালের চা খাওয়াটাও মাটি হ'ত।

বিকেলের দিকে আপিস থেকে বাড়ী ফিরছি। পাশের বাড়ীর গেটে চোখ পড়তেই দেখি, সেই ভদ্রলোক দাঁড়িয়ে। দেখেই বুকটা কেঁপে উঠল। হনহন করে চলতে সুরু করলাম তাঁর দৃষ্টি এড়াবার জন্যে। কিন্তু ফল হ'ল না। নজর পড়তেই ডাক্‌লেন—শুনছেন ?

আসতেই হ'ল। এগিয়ে এলাম ভয়ে ভয়ে।—বলুন।

স্বরটা নীচু করে বললেন—একশোটা টাকা হবে ?

কুতূহলী হয়ে শুধালাম—কেন বলুন ত ? কি দরকার ?

—তাকে দিতে হবে। একটু বাদেই সে আসবে। রোজই এই সময় সে আসে; একশ টাকা ধার নিয়ে যায়। তাকে রোজ একশ করে টাকা দিতে দিতে আমি সর্ব্বহারা হলাম। টাকা কি আমার কম ছিল! দেখো, আজ কিছু নেই। ছেঁড়া জামা-কাপড়, জুতো নেই পায়ে।

ভদ্রলোকের পোশাকও দেখি তাই,—ছেঁড়া, ময়লা। প্রশ্ন করলাম—সে কে ?

তিনি আমায় ধমকে উঠলেন—ইস্‌, আস্তে আস্তে…

চাপা গলায় আবার প্রশ্ন করলাম—সে কে ?

তিনি চারদিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকালেন। তার পর কানের কাছে মুখ এনে রুদ্ধস্বরে বললেন—রাণা প্রতাপসিংহ।

জানালাম তেমনি ক্ষীণ স্বরেই—সে ত মারা গেছে।

—মারা গেছে! তুমি কি করে জানলে ?

—জানি। আমি যে দেখে এলাম।

—কে, কে তাকে মারলে ?—চেঁচিয়ে উঠলেন ভদ্রলোক। তুমি ? কি দিয়ে মারলে ? বিষ ? তলোয়ার ? তোমায় আমি এরেষ্ট করলাম। কোর্ট মার্শাল হবে এখুনি। কাম্‌ অন্‌।—তিনি হাত ধরলেন।

—উত্তেজিত হবেন না। আমি মারি নি।

—তবে ?

—তার নেচারল ডেথ্‌ হয়েছে। হলদিঘাটের যুদ্ধে হেরে পালিয়ে যান। সেখানে তাঁর মৃত্যু হয়।

তিনি সাবধান করে দিলেন—আস্তে আস্তে, চারদিকে স্পাই ঘুরে বেড়াচ্ছে। খুব সাবধান।…প্রতাপ তবে মারা গেছে ?

—হ্যাঁ।

—তবে তো আমিই এখন রাজপুত আর্মির জেনারেল। নয় কি ?

—নিশ্চয়ই।

—আমার এখন তাই রেসপন্‌সিবিলিটি। চুপ করে তিনি কি যেন ভাবতে লাগলেন। পালাবার এই সুযোগটার সদ্‌ব্যবহার করব কিনা ভাবছি, এমন সময় আমার ডাক এল—গোলো…জয় হ'ল! এই রে, আবার সকালের কথা মনে পড়েছে বুঝি! ভয়ে ভয়ে শুধালাম—কি?

—মেবারের আজ ঘোর দুর্দিন। ইয়ং ম্যান্‌, আজ তোমার আমি হেল্প চাই। পাব কি বন্ধু?

—নিশ্চয়ই।

—থ্যাঙ্ক ইউ। প্রতাপ মরলেও চিতোর মরে নি, রাজপুত মরে নি। আমি আকবরের সঙ্গে ওয়ার ডিক্লেয়ার করলুম। এই নাও চিঠি; মেবারের দূত হয়ে আকবরের কাছে চলে যাও। কুইক, কুইক।

—নিশ্চয়ই।—তাড়াতাড়ি পা চালালাম।

রাতে খাবার সময় মিনতি বললে—জান, পাশের বাড়ীর ওদের সঙ্গে আজ আলাপ হ'ল।

—কেমন লোক ওরা?

—বাড়ীর যে কর্ত্তা, তার নাম ভূতনাথবাবু। লোকটির মাথা বেশ খারাপ। আমায় দেখেই বললে কি না, সেলাম ঝাঁসির রাণী।—মাগো, আমি ত লজ্জায় মরি!

হেসে উঠলাম।—বেশ ভালই বলেছে।

মিনতি জানালে—অমন ভাল বলায় আমার দরকার নেই।

—কেন মাথা খারাপ হয়েছে জান?

—ভূতনাথ বাবুর ছোট ভাই শিবনাথবাবুর স্ত্রী বলছিলেন, এক মাসের মধ্যেই ওঁর স্ত্রী আর দু'দুটো বড় ছেলে মারা যায়। পাগল নাকি সেই থেকেই।

—কি অসুখ হয়েছিল?

—তা জানি না। তবে বউ নাকি টি-বিতে মারা যায়।

—আর ছেলেপুলে নেই?

—একটা ছেলে, সে যুদ্ধে গেছে। মেয়েটা কাছেই আছে। ভারি চমৎকার মেয়ে, নাম কৃষ্ণা। বাপকে খুব ভালবাসে। ওরই জন্যে ভূতনাথবাবুকে কোন মেন্টাল হস্‌পিটালে দেওয়া মুশকিল। বলে, ওখানে থাকলে বাবা আর বাঁচবে না। উনি নাকি বড় ডাক্তার ছিলেন; লাষ্ট ওয়ারে গিয়েছিলেন লড়তে।

আমি বললাম—ভূতনাথবাবুর সঙ্গে আলাপ হয়েছে আমার। আজ সকালে এসেছিলেন।

—কি বললেন তোমায় দেখে? মিনতি সাগ্রহে প্রশ্ন করে।

—রাজা-টাজা কিছু নয়।

—তবে?

—এক্সারসাইজ করতে বললেন। বহুকষ্টে তার কাছ থেকে মুক্তি পেয়ে এখন আমি মেবারের দূত।

—সে আবার কি!

—সে অনেক।—ভদ্রলোকের মাথা খারাপ হ'লেও তেমনতারাপ কিছু নয়, বরং মমতা জাগে।

—আমার ত কৃষ্ণা মেয়েটাকে দেখলে বুক ফেটে যায়। আহা রে—

কিসের যেন ছুটি। আপিস বন্ধ। বারান্দায় বেতের চেয়ারে দেহ এলিয়ে হ' পেনি দামের একটা ডিটেক্‌টিভ নভেল পড়ছিলাম। হঠাৎ রাস্তায় চোখ পড়তে দেখি ভূতনাথবাবু এ-দিকেই আসছেন। পোশাকে নূতনত্ব কিছু নেই। রুমাল দিয়ে নাক চেপে অতি সন্তর্পণে তিনি হাঁটছেন।

কাছে আসতেই বই বন্ধ করলাম। শুধালাম—কি ব্যাপার? নাকে কি হ'ল?

চাপা গলায় জানালেন—হাওয়ায় কিলবিল করে জার্ম্‌স ঘুরে বেড়াচ্ছে। একবার ফাঁক পেয়ে যদি নাকে ঢুকে যায় ত সর্ব্বনাশ!

—কিসের জার্ম্‌স?

—জানেন না? টি-বি, টি-বি।

হেসে বললাম—অমন করে নাক চেপে থাকলে কি দিয়ে নিশ্বাস নেবেন? দম বন্ধ হয়ে মারা যাবেন যে!

—দাঁড়ান ভেবে দেখি। ভূতনাথবাবু গভীর মনোযোগের সঙ্গে কি যেন ভাবলেন। তারপর বললেন—সত্যিই ত আমার এটা মনে ছিল না। মেনি থ্যাঙ্কস্‌।—নাক থেকে রুমাল ছেড়ে পাশের চেয়ারে বসলেন।

খানিক বাদে বললেন—আপনি মশাই বেশ লোক। খুব ভাল লাগে আপনাকে।

—এ ত ভাল কথাই।

—আপনি দেখছি সবকিছুই বোঝেন।

সায় দিলাম—তা বুঝি।

—কি পাস করেছেন?

—বি-এস্‌সি।

—ভাল, ভাল। খুশি হয়ে মাথা নাড়লেন ভূতনাথবাবু।

—বিয়ে কি হয়েছে?

—তা হয়েছে।

কোন কাজে মিনতি আমার খোঁজে বাইরে এসেছিল। ভূতনাথবাবুকে আমার পাশে দেখে, তাড়াতাড়ি ভেতরে চলে গেল। মিনতি চলে যেতেই, তিনি প্রশ্ন করলেন—ঝাঁসির রাণী?

—হ্যাঁ।

—এটা কি তবে ঝাঁসির রাণীর প্যালেস?

—তাই।

ভূতনাথবাবু কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে আবার প্রশ্ন করলেন এখানে কোন টি-বির জার্ম্‌-টার্ম্‌ নেই ত?

—মোটেই না।

—ঠ্যাঙ্কস্‌ রাইট। আমি যেখানে থাকি, সেখানে কিল-বিল করছে টি-বির জার্ম্‌স।—তারপর চারদিকে তীক্ষ্ণ দুটি

নিক্ষেপ করে চাপা গলায় প্রশ্ন করলেন—ঝাঁসির রাণী আবার কি যুদ্ধে নামবেন ? সে সম্বন্ধে কিছু জানেন ?

—না।

—জেনে নেবেন। জেনে নিয়ে আমার হেড কোয়ার্টারে আজই খবর দেবেন। ভুলবেন না। আচ্ছা, এখন আমি চললাম ; বিশেষ জরুরি কাজ আছে। চেয়ার ঠেলে উঠে দাঁড়ালেন।

—কি কাজ ?

—দেখা করতে হবে তার সঙ্গে।

—কে সে ? রাণা প্রতাপ ?

—না, না।—তিনি মাথা নাড়লেন।—নেলসন।

—নেলসন ! তিনি ত মারা গেছেন।

—বিশ্বাস করো না। ওসব এনিমি প্রোপাগ্যাণ্ডা। নেলসন রোজ আমার সঙ্গে দেখা করতে আসে। ওর সঙ্গে আমার একটা সিক্রেট ট্রিটিও হয়ে গেছে। এই যে আমার একটা ছেলেকে যুদ্ধে পাঠালাম, নেলসনই ত পাঠাতে বললে। ভূতনাথবাবু চলে গেলেন।

কটক অবধি গিয়ে আবার ফিরে এলেন।—হ্যাঁ একটা কথা, ঝাঁসির রাণীকে আমার সেলাম দিও।

বিকেলের দিকে নিমন্তির খোঁজে পাশের বাড়ী গিয়েছিলাম। ড্রয়ারের চাবিটা দরকার।

গেট খুলে ভেতরে ঢুকতেই, ভূতনাথবাবুর সঙ্গে দেখা ! বারান্দার চেয়ারে বসে রয়েছেন চুপচাপ। আমায় দেখে শুধালেন—কে, কে তুমি ?

—আমি, চিনতে পারছেন না ?

একটু ভেবে বললেন—ঠিক। কোথায় যেন তোমায় দেখেছি।

বললাম—দেখেছেন বই কি। পাশের বাড়ীতেই থাকি আমি।

—না, না। তোমায় দেখেছি পলাশীতে।

পলাশীর কথা উঠবে আশা করি নি। একটু অবাক হয়ে গেলাম।

—পলাশী !

—হ্যাঁ, এবার তোমায় চিনেছি। তুমি মীরজাফর।

—না না, আমি মীরজাফর নই।

—নও ? তবে কে তুমি ?

—আমি, আমি···ভাবতে ভাবতে নামটা চট করে মনে এল—আমি মোহনলাল।

—মোহনলাল !—খুশিতে ভূতনাথবাবুর মুখ ঝলমল করে উঠল।

বললাম—হ্যাঁ।

—কাছে এস মোহনলাল, কাছে এস। যুদ্ধের কি খবর ? অমুনি জবাব দিলাম—যুদ্ধে ইংরেজের হার হয়েছে।

কথা শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গেই তিনি আমাকে জড়িয়ে ধরলেন। বললেন—তুমি বীর মোহনলাল, তুমি বীর।

ভূতনাথবাবুর আলিঙ্গন থেকে অনেক কষ্টে নিজেকে ছাড়িয়ে এক পাশে সরে গেলাম। তিনি কি যেন বলতে যাচ্ছিলেন, এমন সময় বাদলবাবু এসে হাজির হলেন। বাদলবাবু দু'বাড়ীরই মালিক। বাদলবাবু আসতেই তাঁর দৃষ্টি গেল সেদিকে। আমি রেহাই পেলাম।

বাদলবাবুকে প্রশ্ন করা হ'ল—কে তুমি ? ইংরেজের দূত ? সন্ধির কোন প্রস্তাব নিয়ে এসেছ নিশ্চয়ই। সন্ধি হবে না।

প্রশ্নগুলো শুনে রীতিমত ঘাবড়ে গেলেন বাদলবাবু। তবু অনেক কষ্টে নিজেকে সামলে নিয়ে বললেন—আমি ইংরেজের লোক নই, আর সন্ধির প্রস্তাব নিয়েও আসি নি।

—তবে ?

—শিবনাথবাবুর খোঁজে এসেছি। তিনি আছেন ?

—তাকে কি দরকার ?

—ভাড়াটার জন্যে এসেছিলাম।

—ভাড়া !—ভূতনাথবাবু কি যেন ভাবলেন। কিসের ভাড়া ?

—এই বাড়ীটার।

—কেন ?

বাদলবাবু বলেন—বাড়িটা আমার।

—তাতে কি ?

—তাতেই তো সব। আপনাদের থাকতে দিয়েছি।

—বেশ।

—তাই ভাড়া চাই।

—ও, তাই বলুন।—ভূতনাথবাবু মাথা দোলালেন।—আপনি বাড়িটা যে আমাদের দান করেছেন, সে দান নিঃস্বার্থ নয়। দানের বদলে প্রতিদান চান।

—আজ্ঞে হ্যাঁ ! বাদলবাবু মুখ বাঁকালেন।

—কিন্তু ভাই তুমি তো জান আমাদের কিছু নেই। ছেঁড়া পোশাকে ঘুরে বেড়াই। রাণাকে ধার দিয়ে আমরা সর্ব্বহারা।

বাদলবাবু ভয়ানক চমকে উঠলেন।—রাণা, রাণা কে !

—রাণা প্রতাপসিংহ।

বাদলবাবু হেসে ফেললেন।—প্রথমে ভেবেছিলাম আপনি বুঝি ঠাট্টা করছেন, এখন বুঝছি সত্যিই আপনার মাথা খারাপ।

—কি বললেন, মাথা খারাপ ?—ভূতনাথবাবু লাফিয়ে উঠলেন।—পকেট থেকে একটা ছুরি বার করে এগিয়ে গেলেন বাদলবাবুর দিকে।—দোষ নাকি বুকে ঘাঁ ক'রে বসিয়ে, মশাই ?

ছুরি দেখে আঁতকে উঠে বাদলবাবু আঁ আঁ করে উঠলেন। সর্ব্বনাশ ! ছুটে গিয়ে ভূতনাথবাবুর হাত ধরে ফেললাম। বাধা পেয়ে তিনি ফিরে তাকালেন। তুমি কে ?

—করছেন কি ? ভূতকে মারবেন ?

—কেন, তাতে কি ?

—ভূত যে অবধ্য।

—আরে হ্যাঁ, তাই তো। তুমি খুব মনে করিয়ে দিলে। এখুনি এক কেলেঙ্কারি করছিলাম আর কি! থ্যাঙ্কস্।—তারপর বাদলবাবুর দিকে চেয়ে বললেন—যাও, তুমি মুক্ত।

আমিও বাদলবাবুর কানে কানে বললাম—পালান মশাই, পালান। হাঁ করে কি দেখছেন ? আর কোন সময় আসবেন।

বাদলবাবু অনেকটা দৌড়েই পালালেন।

দিন কয়েক পর। রাত এগারোটা হবে। বিছানায় শুয়ে আছি, ঘুমটা সবে এসেছে, হঠাৎ দরজায় ধাক্কা পড়ল। ধড়মড় করে উঠে বসলাম।

—কে ?

চাপা গলায় জবাব এল—আমি, নবাব। দরজা খোল।

উঠে দরজা খুলে দিলাম। ভূতনাথবাবু ভেতরে এলেন। ভেতরে ঢুকে দরজা বন্ধ করলেন।

—তুমি দিব্যি আরামে ঘুমোচ্ছিলে মোহনলাল। এদিকে আমাদের যে সর্ব্বনাশ হয়ে গেল।

—কি হ'ল ?

—পলাশীর যুদ্ধে আমাদের হার হয়েছে।

—কি করে জানলেন ?

—পলাশী থেকেই ত আমি পালিয়ে আসছি মোহনলাল। দেখছ না কি রকম হাঁপাচ্ছি। মীরজাফর বিশ্বাসঘাতকতা করেছে।

এমন সময় রুদ্ধ দ্বারে আবার আঘাত পড়ল সজোরে। সে শব্দে চমকে উঠে ভূতনাথবাবু দেওয়ালের দিকে পিছিয়ে গেলেন। শুধালাম আমি—দরজা ঠেলছে কে ?

শিবনাথবাবুর গলা শোনা গেল—আমি, অপূর্ব্ববাবু। দাদা এসেছে কি এখানে ?

বুঝলাম ভূতনাথবাবু অনেকক্ষণ থেকেই বাড়ী-ছাড়া। খোঁজাখুঁজি সুরু হয়ে গেছে। জবাব দিলাম—হ্যাঁ।

—তবে দরজা খুলুন।

দরজা খুলতে যাব, চেঁচিয়ে উঠলেন ভূতনাথবাবু, খবরদার। দরজা খোলো না।

—কেন ?

—গলা শুনেও চিনতে পারলে না, ও কে ?

—না তো। কে ?

—মীরজাফর। খোঁজ পেয়ে এখানে হাজির হয়েছে। একা এসেছে ভেবেছ ? মোটেই নয়। সঙ্গে উমিচাঁদ, ক্লাইভ আছে। ঢুকেই আমাদের বন্দী করবে।

—আপনি কি ভয় পেলেন ?

ভূতনাথবাবু জোরে হেসে উঠলেন।—ভয় ? বাংলার নবাব সিরাজের ভয় ? শোনো, আমি দরজা খুলছি। তুমি বন্দুক ধরে রেডি হয়ে থাকো। ওরা ঢুকলেই, ব্যস্…

আমি বললাম—সেই ভালো।

ভূতনাথবাবু এগিয়ে এসে দরজা খুললেন। শিবনাথবাবু ঘরে ঢুকেই ডাকলেন—দাদা—

—উঁহু। তোমার ও ছলনায় ভুলছি না মীরজাফর। মোহনলাল, বন্দী কর। একাই এসেছ ? তোমার সাহস আছে দেখছি।

শিবনাথবাবু বললেন—আমি মীরজাফর নই।

—নও ? বিশ্বাস কি ?

—দাদা, ঘরে চলো।

—আমার এই অসহায় অবস্থা দেখে তুমি কি পরিহাস করছ মীরজাফর ? আমার ঘর নেই, সাম্রাজ্য নেই। সব হারিয়ে আমি পালিয়ে এসেছি পলাশীর প্রান্তর থেকে।

—আমার ঘরে চল।

—তোমার ঘরে ? শত্রু-শিবিরে ? বন্দী হয়ে ?

—তুমি তো বন্দী নও নবাব।

—নই ? কি বিশ্বাস।

শিবনাথবাবু তাঁরের কাছে এগিয়ে গিয়ে বললেন—বিশ্বাস কর। কোরান ছুঁয়ে বলছি।

তাকে এগোতে দেখে তিনি কয়েক পা পিছু হটে গেলেন। নিত্যসঙ্গী ছুরিটা তাড়াতাড়ি পকেট থেকে বার করে বললেন—সাবধান মীরজাফর কাছে এগিয়ো না। তোমায় আমি খুব চিনি। আর এক পা এগোলেই হাতের এই তলোয়ার…

হাবভাব দেখে শিবনাথবাবু আর কিছু বলবার সাহস পেলেন না। চুপচাপ দাঁড়িয়ে রইলেন।

আমি এবার এগিয়ে এলাম।—নবাব—

—কে ?—ফিরে তাকালেন।

—মোহনলাল।

—ও, মোহনলাল। একে বন্দী কর।

ভূতনাথবাবুকে এ অবস্থায় ঠাণ্ডা করা শক্ত। কি কর্ত্তব্য ভাবছি। ঠিক এমনি সময় কৃষ্ণা ছুটে এল।

—বাবা—

—কে, নবাবনন্দিনী ? আয় মা কাছে আয়।—ভূতনাথবাবু জড়িয়ে ধরলেন মেয়েকে।

কৃষ্ণা বললে—বাবা ঘরে চল…

—ঘর তো নেই মা। বাংলার নবাব আজ ভিখিরি।

—বেশ তো, ভিখিরির কুটিরেই আমরা থাকব।

—তবে, তাই চল।

কৃষ্ণা বাপকে ঘর থেকে নিয়ে গেল। যাবার সময় শিবনাথবাবু বলে গেলেন, আর ত ঘরে রাখা চলে না—ভেঞ্জারাস্ হয়ে পড়েছে। পরশু সোমবার আছে, সেদিনই রেখে আসব হাসপাতালে। আপনি কি বলেন ?

জানালাম, হ্যাঁ, তাই করুন। তবে কথা...

—ওরই জন্যে ত কিছু করা মুশকিল।

—বুঝিয়ে বললে ও কি রাজী হবে না? ওর বাপ যদি ভাল হয়ে ফিরে আসে, খুশী ত সবচেয়ে বেশী ওরই হবে। ও চায় না কি বাপ তার ভাল হোক?

—এ বিষয় আমি ঢের বুঝিয়েছি।

—আচ্ছা আমি কাল একবার ট্রাই করে দেখব।

—দেখুন।

বিকেলে আপিস থেকে ফিরে জলখাবার খাচ্ছি। মিনতি বললে—শুনেছ?

—কি?

—দুপুরে আজ খবর এসেছে, যে ভূতনাথবাবুর যে ছেলেটা যুদ্ধে গিয়েছিল প্রেন-ক্র্যাশে মরে গেছে।

—সে কি! ভূতনাথবাবু খবর পেয়েছেন?

—তা জানিনে না। পেয়েছে বোধ হয়।—মিনতি নিজের কাজে চলে গেল। খেতে পারলাম না আর। খিদে মরে গেল। মিষ্টি চা মুহূর্তে তেঁতো হয়ে উঠল।

উঠে গেলাম। বাইরে, বাগানে একা বসে ভূতনাথবাবুর কথাই ভাবছি; একটু বাদে তিনি নিজেই এসে হাজির।

—শুনেছেন মশাই?

—বললাম, হ্যাঁ।

—কে বললে?

—সকলেই বলছে। এসব কথা বলবার লোকের কি অভাব হয়?

—দ্যাট্স রাইট। ভূতনাথবাবু সায় দিলেন। এই দেখুন, কি লিখেছে নেলসন।

—কি?

—পড়ে দেখুন।

তিনি একটা কাগজ এগিয়ে দিলেন। তাতে কিছুই লেখা নেই। শুধু হিজিবিজি কালির দাগ।

—পড়তে পারছেন না? লিখেছে, হি ওয়াজ এ ব্রেভ্ সোলজার।—বলেই হঠাৎ তিনি কেঁদে উঠলেন।

তার কান্না দেখে আজ সত্যিই আশ্চর্য্য হলাম। শুধালাম, কি হ'ল? কাঁদছেন কেন?

—কাঁদব না? আমার ছেলে মরে গেল যে! কার জন্যে আর বেঁচে থাকব?

—আপনার মেয়ে রয়েছে ত।

—কে, নবাবনন্দিনী?

—হ্যাঁ।

—তুমি বুঝি জান না, মা আমার ভিখারিণী সেজেছে। মা আমার ভিখারিণী সেজেছে। বলতে বলতে উঠে দাঁড়ালেন।

শুধালাম—কোথায় চললেন?

—অনেক দূরে। নেলসন আমার জন্যে প্লেন নিয়ে হাজির হবে, তাতে করে খোকাকে দেখতে যাব।—খানিক গিয়ে আবার ফিরে এলেন তিনি। বললেন—কেউ যদি নবাবের খোঁজ করে, বলে দিও যে বাংলার নবাব মারা গেছে।

ভূতনাথবাবু চলে গেছেন। বাগানে আবার আমি আগের মতই একা বসে। মনটা বেদনায় ভরপুর। সময়ের খেয়াল নেই। সন্ধ্যা শেষ হয়েছে, তারায় তারায় ভরে গেছে রাতের আকাশ।

হঠাৎ ব্যস্তভাবে শিবনাথবাবু হাজির হলেন।

—দাদাকে দেখেছেন?

—কই, না তো।

—এখানে আসে নি?

—এসেছিলেন। তা প্রায় দু'ঘণ্টার ওপর হবে।

—তাই তো! কোথায় গেল!

উদ্‌ভ্রান্তের মত তিনি পথে নামলেন। আমিও সঙ্গ নিলাম, প্রায় সারাটা রাত খোঁজাখুঁজি চলল। কোথাও পাওয়া গেল না। শেষে ষ্টেশন থেকে খবর পাওয়া গেল, কে এক বাঙালী ভদ্রলোক নাকি ট্রেনে কাটা পড়েছে।

ছুটে গেলাম আমরা। ভূতনাথবাবুই। চেনা শক্ত। মাথাটা একপাশে ছিটকে পড়েছে। পা দুটো থেঁৎলে গিয়েছে।

সব শুনে মিনতি বলে উঠল—আহা রে!

পাশের বাড়ীর অসহায় মেয়েটার আকুল কান্না তখনও বাতাসে ভেসে বেড়াচ্ছে। ওর কান্নার চেয়েও আমার বুকে আঘাত হানছে ভদ্রলোকের শেষ কথাগুলো—বলে দিও যে বাংলার নবাব মারা গেছে।

যুক্তরাষ্ট্রের পেট্রোলিয়াম শিল্প

শ্রীনলিনীকুমার ভদ্র

ছিয়াশী বৎসর হইল আমেরিকার পূর্ব্ব-উপকূলস্থ পেন্‌সিলভানিয়া ষ্টেটের টিটস্‌ভিল অঞ্চলে পেট্রোলিয়ামের উৎস আবিষ্কৃত হইবার পরই বর্ত্তমান পেট্রোলিয়াম শিল্পের প্রবর্ত্তন হয়। এই দীর্ঘ-কালের মধ্যে সমগ্র পৃথিবীর পেট্রোলিয়াম-ভাণ্ডারের শতকরা ষাট ভাগ যুক্তরাষ্ট্রে উৎপন্ন হইয়াছে। বস্তুতঃ, যুক্তরাষ্ট্রে পেট্রোলিয়ামের বিদ্যমানতার উপযোগী পার্ব্বত্য অঞ্চল সমগ্র পৃথিবীর মধ্যে শতকরা পনর ভাগ মাত্র। মধ্য-প্রাচ্য, সোভিয়েট ইউনিয়ন এবং ইষ্ট ইণ্ডিজ দ্বীপমালা পেট্রোলিয়ামের অন্যান্য প্রধান ভাণ্ডার বলিয়া পরিগণিত।

প্রাগ্‌ যুদ্ধ পৃথিবীতে প্রতি বৎসর ২০,০০০ বেরেল পেট্রোলিয়াম খরচ হইত, অর্থাৎ পৃথিবীর লোকসংখ্যার অনুপাতে মাথাপিছু এক বেরেল করিয়া লাগিত। যেহেতু যুদ্ধোত্তর-বহু লোকের জীবনযাত্রার মান উন্নততর হইবে বলিয়া আশা করা যাইতেছে সেইজন্য প্রতি বৎসর উপরোক্ত পরিমাণ অপেক্ষা তৈলের চাহিদা কয়েক গুণ বেশী বাড়িয়া যাওয়ার সম্ভাবনা।

উৎস হইতে উত্তোলিত অপরিস্রুত তৈলকে (Crude oil) বিশোধন করিয়া বিভিন্ন পেট্রোলিয়াম-পদার্থে পরিণত করিবার জন্য যুক্তরাষ্ট্রে প্রায় চারি শতটি তৈল বিশোধনাগার আছে, সেগুলিতে আন্দাজ ১১০,০০০ জন রাসায়নিক, এঞ্জিনীয়ার এবং অন্যান্য সুদক্ষ ও অভিজ্ঞ কর্ম্মী নিযুক্ত আছেন।

মধ্য-পশ্চিম যুক্তরাষ্ট্রের একটি তৈল-ক্ষেত্রে অগ্নিকাণ্ড

গোড়ার তৈল পরিস্রাবণের পদ্ধতি ছিল খুবই সহজ, সরল। তখন অপরিস্রুত তৈল পাম্প করিয়া একটি নলাকার বকযন্ত্রে নিক্ষেপ করণান্তর উত্তপ্ত করা হইত। ঐ তৈলের তাপ ক্রমবর্দ্ধমান হইবার সঙ্গে সঙ্গে প্রথমে নীচেকার ফুটন্ত তৈলাংশকে বাষ্পাকারে পরিণত করিয়া, একটি যন্ত্রের সাহায্যে উহাকে ঘনীকৃত করা হইত। তৎপর অপেক্ষাকৃত কম উদ্‌বায়ী (volatile) অংশসমূহকে পরিস্রুত করা হইত এবং যে পর্য্যন্ত না পরিস্রাবণযোগ্য সমুদয় বস্তু অপসৃত হইত সেই পর্য্যন্ত এই প্রক্রিয়া চলিতে থাকিত। তখনকার দিনে যন্ত্রসমূহের ক্রটিবিহীন বিভিন্ন পদার্থ প্রায়ই অতিরিক্ত পরিমাণে উপচাইয়া পড়িত। তৈলের বিভিন্ন অংশসমূহকে সুষ্ঠুভাবে পৃথকীকরণের জন্য সাম্প্রতিক তৈল-বিশোধনাগারসমূহে এক ধরণের বুরুজ স্থাপিত হইয়াছে এবং হইতেছে। এই সমস্ত বুরুজে তৈল পরিস্রুতিতে যে মূলনীতি অনুসৃত হয় তাহা নিম্নলিখিত রূপ। যদি বিভিন্ন ফোট-বিন্দু (boiling point) বিশিষ্ট দুই বা ততোধিক পদার্থ একই সঙ্গে পরিস্রুত হইতে থাকে তাহা হইলে নিম্নতম ফোট-বিন্দুবিশিষ্ট পদার্থটি সরাসরি বুরুজের একেবারে উপরিভাগে,—যেখানে তাপমান সর্ব্বাপেক্ষা কম—উঠিয়া আসিবে; পক্ষান্তরে উচ্চতম ফোটবিন্দুযুক্ত পদার্থটি বুরুজের নিম্নভাগে, সর্ব্বোচ্চ তাপমান সম্বলিত স্থানেই থাকিয়া যাইবে।

এমনিভাবে তৈল যথারীতি বাষ্পীকৃত হইবার পর তাহা ঋজু, দীর্ঘ বুরুজের নিম্নাংশে পরস্পর সমান্তরালভাবে স্থাপিত কতকগুলি আধারে (tray) রাখা হয়। অপরিস্রুত তৈলের যে ফুটন্ত অংশের তাপমান নিম্নতম তাহা বাষ্পাকারে উত্থিত হইয়া বুরুজের উচ্চতলে, অপেক্ষাকৃত নিম্ন তাপমান সমন্বিত স্থানে সংস্থাপিত আধারগুলিতে গিয়া জমাট বাঁধে, আর যে অংশ সর্ব্বোচ্চ ফোট-বিন্দু সম্বলিত তাহা নিম্নতম-তলস্থ পাত্রগুলিতে গিয়া ঘনীকৃত হয়।

প্রত্যেক বেরেল অপরিস্রুত তৈল হইতে অধিকতর পরিমাণে গ্যাসোলিন পাইবার উদ্দেশ্যে বিদারণ (cracking) প্রক্রিয়া অনুসৃত হয়। এই প্রক্রিয়া দ্বারা মৌলিক তৈলাণু-গুলিকে (original oil molecules) ভাঙিয়া নিয়ন্ত্রিত তাপ এবং চাপের (heat and pressure) যথাযথ প্রয়োগ দ্বারা ইচ্ছানুযায়ী স্বতন্ত্র পদার্থে পরিণত করা হয়। উক্ত প্রক্রিয়া কালে, কখন কখন আণবিক গঠনে (molecular structure)

যুক্তরাষ্ট্রের দক্ষিণ-পশ্চিম অঞ্চলস্থ ওকিয়াহোমা ষ্টেটের 'ওয়াইল্ডকেট' নামক একটি দলের লোকেরা একটি তৈল-কূপ খনন করিতেছে

পরিবর্তন সাধনের উদ্দেশ্যে কোন যোগবাহী পদার্থ (catalyst) বা রাসায়নিক দ্রব্য ব্যবহৃত হয়। ঐ পদ্ধতিকে যোগবাহী বিদারণক্রিয়া (catalytic cracking) বলা হয়।

পরিস্রাবণ প্রক্রিয়ার বহু প্রকার-ভেদ আছে। যে-সমস্ত সর্ব্বাঙ্গসম্পূর্ণ 'প্লাণ্টে' পেট্রোলিয়ামের যাবতীয় আনুষঙ্গিক দ্রব্যাদি প্রস্তুত করিবার উপযোগী যন্ত্রপাতি বিদ্যমান, সেগুলিতে শতকরা ১০০ ভাগ অপরিশ্রুত তৈলকেই ব্যবহার্য্য পদার্থে পরিণত করিবার ব্যবস্থা আছে। তন্মধ্যে কতকগুলি হইতেছে (১) বিমানের গ্যাসোলিন চর্ব্বি বা তৈলাদি (Lubricants), (২) মটর গ্যাসোলিন ও লুব্রিক্যাণ্ট, (৩) কেরোসিন, (৪) শিল্প-প্রতিষ্ঠানের হাল্কা জ্বালানি, (৫) বিবিধ প্রকার অঙ্গরাগ, (৬) ক্রিম, (৭) নানাপ্রকার মলম. (৮) ছাদের উপকরণাদি, (৯) বহু প্রকার তৈল এবং (১০) সিন্থেটিক রবার ইত্যাদি।

বর্ত্তমানে যুক্তরাষ্ট্রের পেট্রোলিয়াম শিল্প-প্রতিষ্ঠানসমূহে ৬৫০,০০০ হইতে ৭০০,০০০ জন কর্ম্মী নিযুক্ত আছে। কর্ম্মী-দের ব্যাপক অভিজ্ঞতা এবং দক্ষতার ফলে সেখানে ঐ শিল্পের প্রভূত উন্নতি সাধিত হইয়াছে। যুদ্ধকালে মার্কিন সৈন্যবাহিনী এবং মিত্রশক্তির সম্মিলিত বাহিনীকে তৈল সরবরাহ করিবার উদ্দেশ্যে পৃথিবীর বৃহত্তম তৈল-নালিকা নির্ম্মিত হইয়াছিল। যুক্তরাষ্ট্রের তৈল-ভূমি, দক্ষিণ-পশ্চিম অঞ্চলস্থ টেক্সাস ষ্টেট হইতে পূর্ব্ব-আটলাণ্টিক উপকূলস্থ তৈলপ্রধান অঞ্চল নিউইয়র্ক সিটি-ফিলাডেলফিয়া পর্য্যন্ত ১৪০০ মাইল জুড়িয়া এই সুদীর্ঘ তৈলনালী প্রসারিত।

বাংলাদেশে আউশ ধানের আবাদ

শ্রীহরগোপাল বিশ্বাস, এম-এস্‌সি

খবরের কাগজে আসন্ন খাদ্যসঙ্কটের বিষয় যতই দেখছি ততই হতাশ হয়ে পড়ছি। তারপর খাদ্য রেশনের বরাদ্দ কমে গিয়ে যে মাত্রায় দাঁড়াচ্ছে তাতে অনির্বাণ জঠর-জ্বালায় সর্বদা অন্নচিন্তা ভিন্ন অন্য চিন্তা করবার ক্ষমতা থাকবে বলে মনে হয় না। সেই নিদারুণ অবস্থা আসার আগেই মনে যে চিন্তা জেগেছে তা এখানে প্রকাশ করতে চাই।

কেউ কেউ মন্তব্য করছেন পদ্মার চরে ব্যাপক ভাবে আউশ ধানের চাষ করলে খাদ্য-সমস্যার অনেকটা সমাধান হতে পারে। জানি না, কয়জনের পদ্মার চর এবং সেই চরে উৎপন্ন আউশ ধানের চাষ সম্বন্ধে অভিজ্ঞতা আছে। ইচ্ছা করলেই পদ্মার চরে আউশ ধানের আবাদ বাড়ানো যায় না। অধিকাংশ নূতন চরই চক্‌চকে বালিতে পড়ে ওঠে। সেখানে ধান দূরে থাকুক কোন প্রকার ঘাসও জন্মাতে পারে না। কয়েক বৎসর এই চর ভেঙে না গেলে প্রত্যেক বর্ষার পর উঁচু হয়ে উঠতে থাকে এবং কাশ ও খুনো ঘাস জন্মালে ক্রমে ক্রমে মাটি পড়ে ঐ চর চাষের উপযোগী হয়ে ওঠে। পদ্মার গভীর খাতে পলিমাটিযুক্ত নূতন চর কদাচিৎ দেখা যায়। দশ-বিশ মাইলের মধ্যে হয়ত দুই-তিন বর্গমাইল ধান-চাষের উপযুক্ত উর্বর জমি উঠে থাকে। তখন যাদের জমি ঐ জায়গায় ছিল সাধারণতঃ সেই সব প্রজারা জমিদারকে নজর-সেলামী দিয়ে ঐ জমি বন্দোবস্ত করে ধানচাষ সুরু করে দেয়। বলা বাহুল্য, এবার যেখানে অপর্যাপ্ত ধান উৎপন্ন হ'ল পর বৎসর হয়তো সেখানে বালি পড়ে জমি নষ্ট হয়ে গেল। নদীর জলের ধারে উত্তম পলিমাটি সংযুক্ত চরে চাষীরা যে ধানের আবাদ করে তাকে তারা জলি ধান বলে। সম্ভবতঃ জল্‌ধি কথা থেকে এই জলি কথাটি এসেছে। চাষের পদ্ধতি অনুসারে জলি ধানের চার প্রকার নামকরণ করা হয়ে থাকে। যেমন রোয়া জলি, লেপা জলি, টৈপা জলি এবং নাদ্না জলি। পৌষের শেষ এবং মাঘের প্রথম অংশ জলিধান চাষের প্রকৃষ্ট সময়। উর্বর পলিযুক্ত চর সাধারণতঃ খুব ধীরে ধীরে ঢালু হয়ে বেশী জলে নেমে যায়; সুতরাং হাঁটুজল পর্য্যন্ত জায়গাতেও যদি ভাল মাটি থাকে তবে চাষীরা বুকের নীচে কলাগাছ রেখে জলের মধ্যে রোয়া ধানের চারা লাগিয়ে দেয়। মাটি এত থলথলে যে কলাগাছে ভর না রাখলে মানুষ পাঁকের

মধ্যে তলিয়ে যায়। জলের ঠিক উপরেই কাদার মধ্যে চাষীরা কলা গাছে ভর রেখে বীজ-ধান ছড়িয়ে হাত দিয়ে ঘর নিকানোর মত লেপে দেয়—এই কারণে এরূপ জমির ধানকে বলে লেপা জলি। এই থলথলে কাদার ঠিক উপরেই যেখানে মানুষ কোনওরূপে বসতে পারে সেখানে চাষীরা আঁচল ভরে বীজধান নিয়ে সার বেঁধে ধান টিপে টিপে দিতে থাকে। একে বলে টৈপা জলি। এর উপরে শুকনো মাটিতে সাধারণ ভাবে হাল-গরু জুড়ে চাষ দিয়ে ধান ছিটিয়ে বুনতে হয়। একে চাষীরা লাঙ্গলা জলি বলে। অবশ্য এরূপ জমিতে চাষ দিতেও খুব বেগ পেতে হয়। কারণ দিয়েট এঁটেল মাটি শুকানোর সময় তার ভিতর থেকে বাষ্প বের হবার কালে জমিতে বড় বড় ফাটলের সৃষ্টি হয়। এর মধ্যে খুব সাবধানে হল-চালনা করতে হয়, তবু ফাটলের মধ্যে পা পড়ে গিয়ে অনেক সময় গরু জখম হয়ে থাকে। সুতরাং জলি ধানের চাষ অনেকটা সোজা হলেও এটা যে বেশ কষ্টসাধ্য ব্যাপার তা সহজেই বুঝা যাচ্ছে। সুবিধার মধ্যে এই যে বীজ-ধান বোনা বা ধানের চারা রোপণ করার পর আর বিশেষ কোন যত্ন নেবার দরকার হয় না। ধানের চারাগুলি বড় হয়ে উঠলে তার মাঝে মাঝে কাশঝাড় বা বুনো ঘাস চারা দেখা দিলে সেগুলি উপড়ে তুলে ফেলে দিলেই চলে।

এখন এই জলি-ধান চাষের প্রধান বিঘ্নের কথা বলা যাচ্ছে। যদিও আগে আগে মাঘ-ফাল্গুনের বৃষ্টির জল পেয়ে চাষ দিয়ে বোনা বীজ-ধান অঙ্কুরিত হ'ত এবং নীচের জমির চারাগুলিও সতেজ হয়ে বেড়ে উঠত, কিন্তু গত কয়েক বৎসর থেকে এই সময় বৃষ্টি না হওয়ায় তা হতে পারছে না। ধানগাছ তাড়াতাড়ি বেড়ে বৈশাখ মাসের মধ্যে না পাকলে বৈশাখ থেকে পদ্মার জল বেড়ে ওঠায় এই সব অতি নীচু জায়গার ধান ডুবে নষ্ট হয়ে যাবার সম্ভাবনা খুব বেশী। এদিকে চৈত্রের শেষে বা বৈশাখের প্রথমে ধানগাছ ফীত হওয়ার সময় সুবৃষ্টি না পেলে কৃষকের সকল মেহনত পণ্ড হয়ে যায়। গত বৎসর তালবেড়ে, শিলাইদহ ও হাসিমপুরের নীচে পদ্মার চরে জলি ধান প্রথমতঃ খুব ভাল দেখা গেলেও ফীত হবার সময় বৃষ্টি না পাওয়ায় ধানের ফলন মোটেই ভাল হয় নাই। সময়মত বৃষ্টির জল পেলে এই সব চরে জলি ধানের ফলন সত্যব বেশী হয়। বিঘা প্রতি ২০ মণ ধান প্রায়ই ফলতে দেখা যায়। ইটালি দেশে বিজ্ঞানসম্মত উপায়ে চাষের ফলে বিঘা প্রতি গড়ে সাড়ে আঠার মণ ধান ফলে থাকে এবং পৃথিবীর মধ্যে ঐ দেশের ধানের ফলনই সবচেয়ে বেশী। ভারতবর্ষে গড়পড়তা বিঘা প্রতি ধানের ফলন মাত্র সাড়ে পাঁচ মণ। এই অতি উর্বর চরের জমিকে চাষীরা আদর করে বলে "আমাদের জমি ডাক দিলে কথা কয়।" কিন্তু সময়মত বৃষ্টি না হলে জমির এত কাছে পদ্মার অপর্যাপ্ত জল থাকা সত্ত্বেও চাষীকে খালি হাতে ঘরে ফিরতে হয়। তাদের সকল পরিশ্রম নিরর্থক হয়ে যায়—আশা নিরাশায় পর্যবসিত হয়। শুনতে পাই হল্যাণ্ডে সমুদ্র-তীরে পর্যন্ত বাঁধ দিয়ে লোকে চাষবাস করে। অপর্যাপ্ত ফসল ফলিয়ে সুখে-স্বচ্ছন্দে দিন কাটায় কিন্তু আমাদের দেশে হাতের কাছে জল থাকতেও আমরা সে জল কাজে লাগাতে পারি না—ফলে না খেয়ে অথবা আধ-পেটা খেয়ে আমাদের দিন কাটাতে হয়। চরের চাষীরা জমিতে জল দিয়ে ফসল ফলানোর কথা ভাবতেই পারে না। তারা চাতকের মত আকাশের পানে চেয়ে থাকে, সময়মত দৈব যদি মুখ তুলে চান তবে অঢেল ফসল পায় নতুবা তাদের চোখের সামনেই ধানগাছগুলি শুকিয়ে নেতিয়ে যেতে থাকে—থোড় ধানের শীষ অল্প একটু বেরিয়েই গাছ তামাটে রং ধরে মরে যেতে থাকে। কোনও প্রতিকারের চেষ্টা তারা করে না—এর যে প্রতিকার করা যায় তা ভাবতেও তারা পারে না। সবই অদৃষ্ট আর ভগবানের হাত ভেবে সকল প্রকারের কষ্ট এমনকি মৃত্যু পর্যন্ত তারা বিনা প্রতিবাদে বরণ করে নেয়। কিন্তু বুদ্ধিবৃত্তিসম্পন্ন মানুষের তো এত সহ্য করা শোভা পায় না। আগে অনাবৃষ্টির দরুন শস্যহানি পাঁচ-দশ বৎসরে একবার ঘটত কিন্তু এখন যখন এটা নিত্যনৈমিত্তিক ব্যাপারের মধ্যে দাঁড়াচ্ছে, অজন্মা খাদ্যাভাব যখন লেগেই আছে তখন এর প্রতিকার করতেই হবে। বিজ্ঞানের সামান্য সাহায্য নিয়ে অনাবৃষ্টির ভ্রূকুটি-ভঙ্গি সহজেই এড়ান যেতে পারে। গবর্ণমেণ্ট একটু মনোযোগী হলেই বাংলার পদ্মার চরে যে সব জলি ধানের জমি আছে তাতে প্রচুর শস্য উৎপাদনের ব্যবস্থা করতে পারেন। যুদ্ধের সময় এদেশে অনেক ট্রেলর-পাম্প এসেছে। ৩০ অশ্বশক্তিবিশিষ্ট একটি পাম্পে ঘণ্টায় দুই গ্যালন পেট্রল দরকার হয় এবং তাতে ঘণ্টায় ত্রিশ হাজার গ্যালন জল তোলা যায়। এরূপ একটি পাম্পের দামও মাত্র হাজার পাঁচেক টাকা। এখন চৈত্র মাস থেকে বৈশাখ জ্যৈষ্ঠ পর্যন্ত যদি কয়েকটি ট্রেলর-পাম্প মোটর-লঞ্চে করে মালদহ থেকে আরম্ভ করে মেঘনার মোহনা পর্যন্ত পদ্মার মধ্যে ঘুরে যেখানে যেখানে জলিধানের জমিতে জলের দরকার সেখানে গবর্ণমেণ্ট থেকে জল দেবার ব্যবস্থা হয় তবে ঐ ধান এত বেশী জন্মাতে পারে যে তাতে বহু লক্ষ লোকের অন্ন-সংস্থান হতে পারে। ঐ সব নূতন চরের বিস্তার সাধারণতঃ বেশী নয় বলে ঐ পাম্পের সাহায্যে জল দেওয়ার খুবই সুবিধা। তারপর পদ্মাতীরস্থ অপেক্ষাকৃত উঁচু চরে বৃষ্টির অভাবে চৈত্রের শেষে যেখানে ধান বুনা যাচ্ছে না অথচ দেরিতে বুনলে যে সব অমুচ্চ চরের ধান আষাঢ়ের শেষে ডুবে নষ্ট হবার যথেষ্ট সম্ভাবনা সে সব স্থানে পাম্পের সাহায্যে জল সেচন করলে খুব ভাল ফসল হতে পারে। শুধু পদ্মা নদী কেন বাংলা দেশের বহু নদী-সন্নিহিত অমুচ্চ উর্বর চরগুলিতে এই ভাবে জল সেচনে আউস ধানের চাষ খুব ভাল ভাবে করা যেতে পারে এবং তাতে দেশের

অগণিত চাষী ও অভাব ভুক্তভোগীদের অন্নাভাব মিটতে পারে। এ বিষয়ে এত দিন সরকারের দৃষ্টি পড়ে নাই তাই আক্ষেপ করে বলতে হয় এদেশের নিরক্ষর চাষীদের সঙ্গে সঙ্গে সরকার বাহাদুরও মরণ-বাঁচন সমস্যায় দৈবের পানে চেয়েই দিন কাটাচ্ছেন।

বাংলায় চাষীরা নিরক্ষর হলেও নেমকহারাম নয়। উপকার পেলে প্রতিদান দিতে তারা কুণ্ঠিত হয় না। সুতরাং গবর্ণমেণ্ট যদি ঐ উপায়ে জলসেচের ব্যবস্থা করে তাদের ধানের ফলন বাড়িয়ে দিতে পারেন তবে ঐ দফায় গবর্ণমেণ্টের যে খরচা হবে উপকৃত চাষীদের নিকট চাঁদা করে অনায়াসেই তা আদায় করা যাবে। চরের জমি চাষের একটি মস্ত বড় সুবিধা এই যে এই সকল জমিতে কোনও সার দিতে হয় না। তারপর উন্মুক্ত প্রান্তরে চাষীদের বাস বলে তাদের মধ্যে ম্যালেরিয়ার প্রকোপ খুবই কম। পদ্মার টাটকা ইলিশ মাছ প্রভৃতি খেতে পায় বলে তাদের শরীরও সাধারণতঃ নীরোগ ও বলিষ্ঠ। একমাত্র জলসেচনের সুব্যবস্থা হলেই চরের চাষীদের সচ্ছলতা বৃদ্ধি করা যেতে পারে এবং তাদের উৎপন্ন উদ্বৃত্ত থাকে দেশের বহু লোকের খাদ্যাভাব দূর করা যেতে পারে।

এর পর নদী থেকে দূরে এবং বার্ষিক প্লাবনে যে সব মাঠ ডোবে না সেখানে আউশ ধান চাষের কথা বলা যাচ্ছে। সুবৃষ্টি পেলে এবং গোশালার সার প্রভৃতি মাঝে মাঝে দিলে ঐ সব মাঠেও ধান ভালই জন্মে। কলকাতার নিকটেই রাণাঘাট মহকুমায় প্রচুর আউশ ধান জন্মে এবং আড়ংঘাটা ষ্টেশন থেকে ঐ ধান বিভিন্ন স্থানে চালান যায়। এই সব স্থানে প্লাবনের পলি পড়ে না, সুতরাং জমিতে সার দেওয়া আবশ্যক— তারপর এই সব স্থানে ম্যালেরিয়ার প্রকোপও খুব বেশী। সুতরাং এই অঞ্চলে সন্তোষজনকভাবে আউশ ধানের চাষ করতে হলে তিনটি বিষয়ের প্রতি মনোযোগ দেওয়া দরকার— জলসেচনের ব্যবস্থা করা, উপযুক্ত সার সুবিধা দরে সরবরাহ করা এবং ম্যালেরিয়া নিবারণ করা। দেশে সাময়িক বৃষ্টি যখন ক্রমশই দুর্লভ হয়ে পড়ছে তখন এই সব স্থানে খাল ও বড় পুকুর কেটে বা মাঝে মাঝে মাঠের মধ্যে নলকূপ বসিয়ে উপযুক্ত পাম্পের সাহায্যে ক্ষেত্রে জলসেচনের ব্যবস্থা করতে হবে। সার সম্বন্ধে বক্তব্য এই যে, ভারতীয় কৃষিবিভাগের গবেষণায় স্থিরীকৃত হয়েছে যে এদেশের অধিকাংশ জমিতে পটাশ এবং ফস্‌ফেট সারের ঘাটতি বিশেষ নাই, প্রধান অভাব হচ্ছে নাইট্রোজেনযুক্ত উদ্ভিদ-খাদ্যের। এমোনিয়াম সালফেট এই শ্রেণীর সস্তা সার। পাথুরে কয়লা থেকে কোক তৈরির সময় অন্যান্য বস্তুর সঙ্গে যে এমোনিয়া গ্যাস জন্মে তা থেকে এমোনিয়াম সালফেট তৈরি করা যায়। আমাদের দেশে এই উপায়ে বার্ষিক ২৬ হাজার টন মাত্র এমোনিয়াম সালফেট তৈরি হয়ে থাকে। গত যুদ্ধের আগে বার্ষিক ৭৬ হাজার টন এমোনিয়াম সালফেট বিদেশ থেকে আসত। কিন্তু ভারতবর্ষের মত বিরাট দেশের পক্ষে এই পরিমাণ সার নিতান্তই অকিঞ্চিৎকর। বিঘাপ্রতি সাড়ে বার সের এমোনিয়াম সালফেট প্রয়োগে ধানের ফলন শতকরা ৩৩ অংশ বাড়ান যায় বলে জানা গিয়েছে। আজকাল সকল সভ্যদেশেই সুবিখ্যাত জার্মান রাসায়নিক হাবারের উদ্ভাবিত উপায়ে বাতাসের নাইট্রোজেন থেকে লক্ষ লক্ষ টন এমোনিয়াম সালফেট তৈরি হচ্ছে এবং তার সাহায্যে পর্যাপ্ত খাদ্যশস্য উৎপাদনের ব্যবস্থা হচ্ছে। ভারত গবর্ণমেণ্ট সম্প্রতি ধানবাদের নিকট কারখানা স্থাপন করে বার্ষিক ৩৫ লক্ষ টন এমোনিয়াম সালফেট ঐ উপায়ে প্রস্তুত করার পরিকল্পনা করেছেন। এতে দেশে খাদ্যশস্য উৎপাদনের যথেষ্ট সহায়তা হবে বলে আশা করা যায়।

এর পরে ম্যালেরিয়া নিবারণের কথা। বাংলাদেশের যে সব উঁচু গ্রামে বর্ষার জল প্রবেশ করে না সে সব গ্রাম ম্যালেরিয়ার ডিপো বলে সকলেই জানেন। এ সব গ্রামে কৃষকেরা বর্ষার পরেই ম্যালেরিয়ায় আক্রান্ত হয়, অনেকে প্রাণ হারায়। যারা বেঁচে থাকে তারাও প্লীহা যকৃতের ব্যাধিতে পীড়িত হয়ে ফাল্গুন মাস পর্যন্ত এর জের টানে। সুতরাং আউশ ধান কাটার পর রবিখন্দের চাষ করা অনেকের পক্ষেই সম্ভব হয় না। এই সময় জমিতে তিন-চার বার চাষ দিয়ে মটর, ছোলা প্রভৃতি বুনলে জমি পরিষ্কার থাকে, চাষীর ডালের সংস্থান হয়, আর এই সব শস্যের চাষ হেতু ব্যাক্টিরিয়ার ক্রিয়ায় জমিতে নাইট্রোজেনযুক্ত সার সঞ্চিত হয় কিন্তু রোগক্লিষ্ট চাষী এ সুযোগ নিতে না পারায় জমিতে কাশ, দূর্বা প্রভৃতি ঘাস গজিয়ে উঠে পরবর্তী ধানের ফসলেরও বিঘ্ন ঘটায়। মধ্য ও পশ্চিম বাংলার অনেক গ্রামই ম্যালেরিয়ার প্রকোপে প্রায় বিধ্বস্ত হয়ে গেছে, ফলে চাষীর অভাবে অনেক উর্বর জমি ক্রমশঃ পতিত জমিতে পরিণত হচ্ছে। শুনা যায়, ব্রহ্মদেশের যুদ্ধে সৈন্যপ্রেরণের পূর্বে বিমানপোত থেকে মশক-বিধ্বংসী ডি-ডি-টি নামক পদার্থ ছিটিয়ে দেওয়াতে প্রেরিত সৈন্যদের মধ্যে ম্যালেরিয়া দেখা যায় নাই। অনুরূপ উপায়ে বাংলার ম্যালেরিয়া-প্রধান গ্রামগুলি থেকে মশক তথা ম্যালেরিয়া দূর না করলে চাষীর অভাবে দেশের অনেক ভাল জমি অনাবাদী পড়ে থাকবে, ফলে লক্ষ লক্ষ লোককে অভাব-যন্ত্রণা ভোগ করতে হবে। খাদ্যশস্য-সমাধানের যে উপায়গুলির উল্লেখ করা হ'ল আশা করি গবর্ণমেণ্ট সেগুলি অবিলম্বে কার্যে পরিণত করবেন। *

---

* অল ইণ্ডিয়া রেডিও কলিকাতা-কেন্দ্রে পঠিত।

মহারাষ্ট্রে নারী

শ্রীঅমিতাকুমারী বসু

মহারাষ্ট্রে নারীর স্থান অনেক বিষয়েই বাঙালী নারীর চেয়ে শ্রেষ্ঠ। মহারাষ্ট্রে পর্দাপ্রথা অতি সীমাবদ্ধ। সে দেশে কঠোর পর্দাপ্রথা শুধু জায়গীরদার, সর্দার প্রভৃতি সম্ভ্রান্ত ক্ষত্রিয়-শ্রেণীর মধ্যে দেখা যায়। রাজপরিবারের মধ্যে এই পর্দাপ্রথার আরও কড়াকড়ি। মহারাণী-সাহেবা ও রাজ-অন্তঃপুরের অন্যান্য নারীরা কখনও জনসাধারণের দৃষ্টিগোচর হন না। মহারাণী-সাহেবা যখন মোটরে করিয়া বেড়াইতে যান, তখন সুবৃহৎ বহু মূল্যবান গাড়ীর জানালা নেটের পর্দাদ্বারা ঢাকা থাকে; যখন চার ঘোড়ার গাড়ীতে যান তখনও তাঁহার জানালা রঙীন চিত্রকরা চিকে ঢাকা থাকে। কখনও দেখা যায় যে মহারাণী-সাহেবার শূন্য গাড়ী চলিয়া যাইতেছে, অথচ পথিকেরা সন্ত্রস্ত হইয়া স-সম্ভ্রমে সেলাম ঠুকিতেছে, কারণ মহারাণীকে কেহ দেখিতে পায় না, তাঁহার গাড়ী দেখিলেই তিনি যাইতেছেন ধরিয়া লয়। মহারাণী-সাহেবা যখন রাজধানী হইতে অন্য শহরে যাতায়াত করেন তখন মন্ত্রী, সেনাপতি ও বিশিষ্ট রাজকর্ম্মচারীরা তাঁহাকে সম্বর্দ্ধনা করিতে ষ্টেশনে যান, কিন্তু দুঃখের বিষয় মহারাণীর দর্শন লাভ কাহারও ভাগ্যে ঘটে না। কারণ রেল হইতে নামিবার সময় চোপদার ও সান্ত্রীরা রেলের কামরার দরজায় সুবৃহৎ মশারি ধরিয়া দাঁড়াইয়া থাকে। মহারাণী তাহার আড়াল দিয়া মোটরে উঠেন। মন্ত্রী, সেনাপতি ও অন্যান্য কর্ম্মচারীরা মহারাণীকে না দেখিয়াই কুর্নিশ করিয়া থাকেন।

বহু বৎসর পূর্ব্বে একবার মহিলাদের এক বিশেষ সভায় মহারাণীকে সভানেত্রী করা হইয়াছিল। আমিও সেই সভায় উপস্থিত ছিলাম। মহারাণী আসিবার নির্দ্দিষ্ট সময়ে চারিদিকে হৈ চৈ মহা কলরব পড়িয়া গেল। নকীব মহারাণীর আগমন-বার্ত্তা ঘোষণা করিলে মহিলাদের ও শিশুদের কলরব শান্ত হইল, অভ্যর্থনাকারিণীরা শশব্যস্তে মহারাণী-সাহেবাকে আনিতে ছুটিলেন, ব্যাণ্ড বাজিয়া উঠিল, মোটরের দরজার দু-পাশে চোপদারেরা মূল্যবান রেশমী বস্ত্র ধরিয়া হলের দরজা পর্য্যন্ত দাঁড়াইয়া রহিল, মহারাণীসাহেবা তাহার আড়ালে থাকিয়া সালু-বিছানো রাস্তা দিয়া হলে প্রবেশ করিলেন। এই দৃশ্যটা আমার কাছে বড়ই কৌতুকপূর্ণ মনে হওয়ায় তাহার স্মৃতি এখনও জাগ্রত আছে।

রাজরাণী কঠোর পর্দার আড়ালে থাকিলেও রাজভগিনী কোন পর্দা মানেন না। সদর রাস্তা দিয়া ঘোড়ায় চড়িয়া মহারাজের সহিত প্রাতর্ভ্রমণে বাহির হইয়া থাকেন। পর্দা-প্রথাওয়ালা সর্দার ও জায়গীরদার-গৃহিণীরাও সকলের সামনে বাহির হন না। আধুনিক যুগে তাঁহাদের প্রধান যান মোটর। তবে নগরবিশেষে ঘোড়ার গাড়ীতে বা বলদটানা ছপূড় গাড়ীতেও যাতায়াত করেন। সেই সব গাড়ীর জানালায় রঙীন চিক্ ফেলিয়া রাখা হয়, এবং আশপাশে দুই জন সিপাহী থাকে। ভিতরে আরোহিণী ও সঙ্গে খাস-দাসী। যে গৃহে ধনাঢ্য গৃহিণী পদার্পণ করিবেন, সেই গৃহে চাপরাসীরা গাড়ী হইতে নামিয়া গৃহিণীর আগমন-সংবাদ জানাইবে, গৃহের পুরুষেরা শশব্যস্ত হইয়া অন্যত্র সরিয়া গেলে তবে ভদ্রমহিলা গাড়ী হইতে নামিয়া সেই গৃহে প্রবেশ করিবেন। গৃহস্বামী বা গৃহের কোন পুরুষ মহিলাদিগকে কথাবার্ত্তায় বা সৌজন্যে আপ্যায়িত করিতে আসিবেন না। তবে আজকাল পাশ্চাত্ত্য শিক্ষার প্রভাবে দু-চারটি পরিবার আধুনিক সভ্যতার অনুসরণকারী; স্ত্রীলোকেরা পর্দা উঠাইয়া দিয়াছেন ও প্রকাশ্য ভাবে চলাফেরা করেন এবং সকলের সঙ্গে কথাবার্ত্তা বলিয়া থাকেন। মারাঠা দেশে পর্দা থাকিলেও ঘোমটার বহর নাই। সে দেশের পর্দানশীনা নারীরা বাঙালী ও মাড়োয়ারী পুর-ললনাদের মত সুদীর্ঘ ঘোমটা দিয়া মুখ ঢাকিয়া রাখেন না। বরং তাঁহাদের সামান্য ঘোমটা মুখচন্দ্রমার সৌন্দর্য্যই বৃদ্ধি করিয়া থাকে।

উপরে বর্ণিত সমাজের স্বল্পসংখ্যক নারীদের মধ্যে ছাড়া মহারাষ্ট্রে পর্দা-প্রথার চলন নাই। অন্য সমাজের নারীরা মুক্ত ভাবে চলাফেরা করেন। ব্রাহ্মণ স্ত্রীলোকেরা মাথায় ঘোমটা পর্য্যন্ত দেন না। নিম্নশ্রেণীর স্ত্রীলোকেরা সর্ব্বদেশেই অবাধে চলাফেরা করে, কিন্তু মহারাষ্ট্রে সর্ব্বশ্রেণীর মহিলাদের মধ্যে, বিশেষ করিয়া ব্রাহ্মণদের, পর্দার অভাবটা লক্ষ্য করিবার বিষয়। প্রকাশ্যে তাহাদের এমন সহজ সুন্দর সরল গতি যে তাহাতে নিন্দনীয় কিছুই নাই। পুরুষদের আচরণও প্রশংসনীয়। রাস্তায় দলে দলে কত বয়সের কত রকমের মহিলা চলাফেরা করেন কিন্তু কোন পুরুষ কোন রূপ অভদ্র আচরণ বা অশিষ্ট ব্যবহারে মহিলাদের মর্য্যাদা ক্ষুণ্ণ করে না।

মহারাষ্ট্রীয় মহিলাদের পোশাকেরও বৈশিষ্ট্য আছে। তাঁরা আমাদের দেশের মত সেমিজ পেটিকোট পরেন না। তাঁদের আসল পোশাক হইল আঠারো হাত রঙীন শাড়ী। তার আঁচল খুব চটকদার। তাঁরা শাড়ী কাছা দিয়ে পরেন এবং গায়ে চোলী দেন। চোলী অনেকটা আমাদের ব্লাউজের মত কিন্তু শুধু বক্ষদেশ আবৃত করিয়া রাখে, পিঠের ও পেটের কিছু অংশ অনাবৃত থাকে। তবে আজকাল ভদ্রবংশীয়ারা আমাদের মতই পুরাপুরি ব্লাউস পরিতে আরম্ভ করিয়াছেন। মহারাষ্ট্রীয় মহিলারা সর্ব্বদা রঙীন শাড়ীই পরেন, তারা সাদা শাড়ীর পক্ষপাতী নন, কিন্তু কয়েক বৎসর যাবৎ পোশাকের কিঞ্চিৎ পরিবর্ত্তন হইতেছে। স্কুল-কলেজের শিক্ষিতা মেয়েরা কাছা দিয়া শাড়ী পরিবার বিশেষ পক্ষপাতী নয়, তাহারা

বাঙালীদের ন্যায় সুন্দর পাড়ওয়ালা সাদা শাড়ী এবং ব্লাউস পেটিকোট পরিতে আরম্ভ করিয়াছে, তাই আধুনিক বাঙালী ও মহারাষ্ট্রীয় মহিলায় বিশেষ কোন পার্থক্য বোঝা যায় না।

মহারাষ্ট্রীয় নারীরা, কিশোরী, তরুণী, বৃদ্ধা সবাই, খোঁপায় ফুল গুঁজিতে ভালবাসে এবং রোজই স্নানান্তে প্রসাধন করিয়া খোঁপায় একটি গোলাপ, নয়ত এক গুচ্ছ বেলী বা চামেলী বা একটা চাঁপা, নিদেনপক্ষে এক টুকরা কেয়া পাতা গুঁজে করিয়া দিবেই। তাহাদের কর্ণভূষণ আমাদের দেশীয় দুল বা দুল জাতীয় না হওয়ায় বৈষম্য লক্ষিত হয়। তাহারা পাঁচটি মুক্তা-বসানো সোনার ফুল কানে পরে। যাহারা খুব ধনী তাহারা মূল্যবান পাঁচটি হীরা-বসান ফুল, আর মধ্যবিত্তেরা নকল মুক্তার ফুল পরিয়া থাকে। তাহাদের গয়না প্রায় আমাদের দেশের মতই। মহারাষ্ট্রীয় রমণীরা অন্যান্য রমণীদের মতই অলঙ্কারপ্রিয়, হাতে কাঁকন চুড়ি, গলায় হার, কানে ফুল, নাকে নাকছাবি, তবে আমাদের দেশের মত নোলক নাই তার পরিবর্ত্তে নথের খুব প্রচলন আছে। নথ এয়োস্ত্রীর একটা লক্ষণ, বিশেষ বিশেষ শুভানুষ্ঠানে গৃহিণীদের মুক্তা-বসানো নথ পরিতেই হয়, এবং বিবাহে নথ যৌতুক দিতে হয়। আমাদের দেশে সধবার চিহ্ন হাতের নোয়া, ঐ দেশে সধবার চিহ্ন মঙ্গলসূত্র। মঙ্গলসূত্র হইল এক রকম ছোট ছোট কাল পুঁতি সুতায় গাঁথিয়া গলায় পরিবার জন্য তৈরি হার, অবস্থাপন্ন মেয়েরা সোনা দিয়া গাঁথিয়া ও ছোট লকেট লাগাইয়া হারটিকে সুদৃঢ় করিয়া গলায় ধারণ করে। ঐ দেশে সিঁথিতে কেউ সিঁদুর পরে না, কিন্তু কুমারী ও সধবা উভয়েই কপালে সিঁদুরের কোঁটা দেয়, কাজেই একমাত্র মঙ্গলসূত্র দিয়া কুমারী ও সধবা-বিধবার পার্থক্য বোঝা যায়। দেশস্থ ব্রাহ্মণ মহিলারা কপালে খুব বড় সিঁদুরের কোঁটা পরে, কোকনস্থ ব্রাহ্মণীরা কিঞ্চিৎ ছোট কোঁটা পরে।

ঐ দেশে সধবার ও বিধবার পোশাকে কোন পার্থক্য নাই। যে শ্রেণীর এবং যে বয়সেরই বিধবা হউক না কেন, অন্যান্য সধবাদের মত বস্ত্রালঙ্কারে শোভিতা থাকে, শুধু গলার মঙ্গলসূত্র ও কপালে সিঁদুরের কোঁটা সধবা বিধবার প্রভেদ বুঝায়। ঐ দেশে খাদ্য বিষয়েও সধবা বিধবার কোন পার্থক্য নাই। মহারাষ্ট্রে ব্রাহ্মণ-সমাজ নিরামিষভোজী কিন্তু তাহারা পেঁয়াজ রসুন খায়, কাজেই ব্রাহ্মণ বিধবা মহিলাদেরও সেই একই খাদ্য।

ক্ষত্রিয়-সমাজ আমিষভোজী, তাহাদের বিধবারাও আমিষ-ভোজী। বিধবা হইলে আমাদের দেশের বিধবাদের মত নিরামিষ খাইতে হইবে এমন কোন বিধান তাহাদের নাই। সধবা-বিধবার একই খাদ্য, একই পোশাক, বিধবাদের জন্য কোন বিশেষ ব্যবস্থা করিতে হয় না। আমাদের দেশের বিধবাদের আহারে আমিষ নিষিদ্ধ আছে, তাহার উপর মসুর ডাল, কলাই ডাল, পেঁয়াজ, রসুন ইত্যাদিও বর্জ্জন করা হয়।

বাংলাদেশে দেখা যায় যত আচার-নিয়ম, যত রকম সংযম-শিক্ষা, তার অধিকাংশই শুধু বিধবাদের জন্য, মহারাষ্ট্রে সে-রকম নয়। বাংলায় প্রতি হিন্দুগৃহে সধবা ও বিধবার পার্থক্য সতত দৃষ্টিগোচর হয়। আশ্চর্য্যের বিষয় বাঙালী ছাড়া মারাঠি, মাদ্রাজী, গুজরাটি কাহারও মধ্যে বিধবার জন্য এই কঠোর নিয়ম ও কৃচ্ছ্রসাধনের বিধান দেখি না।

মহারাষ্ট্রে সধবাবিধবার খাদ্য, পোশাক ও অলঙ্কারে বিশেষ কোন বৈষম্য না থাকায় বিধবাদের জীবনযাত্রা ক্লেশদায়ক হয় না। বর্ত্তমানে মহারাষ্ট্রে বিধবা মহিলারা সিঁদুর না দেওয়ার বিরুদ্ধেও আন্দোলন করিতেছেন। কিছু কাল পূর্ব্বে নাসিকে বিধবারা একত্র হইয়া হল্দি কুমকুম (ইহা এয়োস্ত্রীদের জন্য) অনুষ্ঠান করিয়াছে এবং কপালে সিঁদুরের কোঁটা পরিয়া বৈধব্যের এই পার্থক্য দূর করিতে চেষ্টা করিয়াছে। বোম্বাইয়ে কপালে সিঁদুর পরা বিধবা দেখা যায়। তাহারা বলে, 'আমরা জনসমাজে আমাদের রক্ষক নাই একথা কেন জানাইব?' তবে মহারাষ্ট্রীয় গোঁড়া ব্রাহ্মণ-সমাজে এক প্রথা অনুসারে বিধবারা মস্তক মুণ্ডন করে, গায়ে কোন অন্তর্বাস ধারণ করে না, একখানা পাড়হীন লালশাড়ী দিয়া আপাদমস্তক আবৃত রাখে। আমাদের দেশের শ্বেতবসনা ও তাহাদের রক্তবসনা প্রায় একই রকমের।

দৈনন্দিন কর্ম্মজীবনে মহারাষ্ট্রীয় নারীদের বাহিরের জগতের সঙ্গে সংযোগ স্থাপিত হয়। মহারাষ্ট্রের বহু স্থানে নিতান্ত জলাভাব, মারাঠি বধূরা বা কন্যারা হয় মাইলের পর মাইল পথ ভাঙিয়া নদী হইতে জল আনিতেছে, নয়ত গ্রামের কূয়া হইতে দড়ি টানিয়া জল তুলিতেছে। সপ্তাহে দুই দিন করিয়া গ্রামের মেয়েরা শহরে মাখন ও তরিতরকারী বিক্রয় করিতে আসে, ক্রোশ ক্রোশ পথ ভাঙিয়া মধ্যাহ্নে একটা ভারি জোয়ারের রুটি একটু আচার সহযোগে খাইয়া দিনান্তে হাসিমুখে বাড়ী ফিরিতেছে। মহারাষ্ট্র পার্ব্বত্য দেশ, কাজেই পথ অতিক্রম করা অতি কষ্টসাধ্য। মধ্যবিত্ত ঘরের বৌঝিদেরও দেখা যায় হ্রদে বা নদীতে গিয়া তাহাদের আঠারো হাত শাড়ী কাচিতেছে, রাস্তার পাশে বা পাড়ার কাহারও বাড়িতে গিয়া টিউবওয়েল হইতে পাম্প করিয়া কলসী কলসী জল ভরিতেছে। কখনও কেহ কেহ থলে হাতে করিয়া বাজার করিয়া আসিতেছে। তাহাদের আহারে বিশেষ বাহুল্য নাই, কাজেই তাহাদের রন্ধন সংক্ষিপ্ত থাকায় সময়াভাব হয় না। বিকালে ধনী দরিদ্র অধিকাংশ গৃহের স্ত্রী-পুরুষ ও ছেলেমেয়েরা ভ্রমণে বাহির হইয়া যায়। এই বৈকালিক ভ্রমণ মেয়েদের জীবনে বৈচিত্র্য আনে, স্বাস্থ্য আনে। মুক্ত বায়ু মেয়েদের দেহ ও মন উভয়েরই উৎকর্ষ সাধন করে।

এ ছাড়া মেয়েদের আরও বহু আনন্দের উপাদান আছে। পূজা-পার্ব্বণ উপলক্ষে বস্ত্রালঙ্কারে সাজিয়া গুজিয়া দেবালয়ে যাওয়া একটা মহা আনন্দের ব্যাপার। যে-কোন বড় উৎসব

(যেমন দেওয়ালী, সংক্রান্তি, শিবরাত্রি, আষাঢ়ে একাদশী ইত্যাদি) উপলক্ষ্যে মেয়েদের শাড়ী ও অলঙ্কার দেখিবার মত। বড় মন্দিরের অঙ্গন নানা বর্ণের নানা বয়সের মহিলায় পূর্ণ হইয়া যায়। তাহাদের কাছা দেওয়া রঙীন শাড়ী, রঙীন আঁচল আর পুষ্পমাল্যশোভিত খোঁপা নওরোজ হাটের সৃষ্টি করে। মেয়েরা কেহ মন্দির প্রদক্ষিণ করিতেছে, কেহ পূজা দিতেছে, কেহ বা পরিচিতা বান্ধবীর দর্শন পাইয়া গল্পে-সল্পে ব্যস্ত, কেউ বা পার্শ্ববর্তী দোকান হইতে খেলনা, কাপড়-চোপড় ইত্যাদি কিনিতেছে, সকলেরই মনে আনন্দ ও উৎসাহ। তা ছাড়া কোনো কোনো উৎসব উপলক্ষ্যে মেয়েদের মধ্যে নাচের প্রচলন আছে। বিবাহ বা অন্ত কোন শুভ অনুষ্ঠানে ভদ্রঘরের বৌঝিদের "ফুগরী" নাচ ও গান হয়; দুই জন মেয়ে হাতে হাতে ধরিয়া এই নাচ নাচে। ইহা বড় সুন্দর ও শ্রমসাধ্য। গৌরীপূজা অর্থাৎ আমাদের দুর্গাপূজা উপলক্ষ্যে মাসাবধি মেয়েদের নাচগান চলিতে থাকে। সাধারণতঃ উচ্চ শ্রেণীদের মধ্যে আজকাল এই নাচ কম। কিন্তু মধ্যবিত্ত ও নিম্নশ্রেণীদের মধ্যে এই নাচগান খুব চলে। প্রচুর উৎসাহে তাহারা রাতের পর রাত গানের সঙ্গে সঙ্গে ফুগরী ও অন্যান্য নাচ পুরাদমে নাচিয়া থাকে। শুধু যে ছোট মেয়েরাই নাচে তাহা নহে, বড়দেরও বেশ উৎসাহ দেখা যায়। সাধারণ শ্রেণীর মেয়েরা ফুগরী নাচ, ব্যাং নাচ, ঝুলা নাচ, ঘোড়া নাচ ইত্যাদি নাচিয়া থাকে। প্রত্যেক নাচেই খুব পরিশ্রম হয়। নাচিবার আগে মেয়েরা গানের সুরে কবিতা আবৃত্তি করে ও তারপর নাচিতে থাকে এবং নাচের মধ্যে মধ্যে 'ফুই ফুই' করিয়া মুখে বলিতে থাকে। আজকাল 'ভগিনী'-সমাজের বার্ষিক উৎসব উপলক্ষ্যে সম্ভ্রান্ত মহিলারা ফুগরী নাচ ও 'ফুই ফুই' নাচ নাচিয়া থাকেন এবং নাচে কৃতিত্বের জন্ত পুরস্কার পান।

এই নাচগুলি বিশেষ দর্শনীয়। আমি পাড়ার মেয়েদের নিকট হইতে কয়েকটি নাচের সঙ্গে যে গান গাওয়া হয় তাহা সংগ্রহ করিয়াছিলাম। সে গানের বিষয় গৃহস্থ-ঘরের দৈনন্দিন কাজ ও ঘটনা। বৌ দই হইতে মাখন তুলিতেছে, দইয়ের হাঁড়িটা উল্টাইয়া দই মাটিতে গড়াইয়া পড়িয়া গেল, শাশুড়ী দেখিয়া খুব বকিতে লাগিল; বৌ তুলা ধুনিতে তুলা রৌদ্রে দিল, হাওয়ায় তুলা উড়িয়া গেল—ইত্যাদি ছোট ছোট কৌতুকপ্রদ গল্প-গানের মধ্য দিয়া বলিয়া দেয় ও তারপর মেয়েরা 'ফুই ফুই' করিতে করিতে নাচিতে থাকে। এ সব নাচ বাস্তবিকই উপভোগ্য।

বর্ষায় যখন নূতন জল নদীর কূল ছাপাইয়া চারিদিক ডুবাইয়া দেয়, তখন দেখা যায় দলে দলে বৌঝিরা তাহা দেখিতে ছুটিয়াছে। তা ছাড়া কবে কোথায় শোভাযাত্রা হইবে মেয়েরা তাহার খবর রাখে এবং শোভাযাত্রা দেখিতে যায়। এইভাবে তাহাদের জীবনে সাধারণ ও বিশেষ আনন্দের অভাব নাই। স্ত্রী-স্বাধীনতা থাকায় তাহাদের জীবনের গতি সহজ স্বচ্ছন্দ ও তাহারা নিজ নিজ ব্যক্তিত্ব বিকাশের সুযোগ পায়। মহারাষ্ট্রীয় নারীর ব্যক্তিত্বের কথা বলিতে গেলে কৃষক ও শ্রমিক শ্রেণীর মেয়েদের আর্থিক স্বাধীনতার উল্লেখ করিতে হয়। মেয়েরা গ্রাম হইতে শহরের বাজারে গিয়া যে শাকসব্জী, মাখন ইত্যাদি বিক্রয় করে, তাহার আয় সাধারণতঃ মেয়েদেরই থাকে—এটা তাহাদের নিজস্ব স্ত্রী-ধন। তাহাতে পুরুষের অধিকার নাই। স্বাধীনতার মধ্যে বর্দ্ধিত হইয়া মহারাষ্ট্রের নারীরা দেহ ও মনের স্বাস্থ্যের অধিকারিণী হয়। আর আমাদের দেশের বৌঝিরা সারাদিন গৃহের হাড়ভাঙা খাটুনী খাটিয়া গলদ্ঘর্ম, তাহাতে না আছে বিশ্রাম, না আছে আনন্দ। আমি অবশ্য ধনীদের কথা উল্লেখ করিতেছি না, কারণ সর্ব্ব দেশেই বড়-লোকের ঘরের মেয়েরা আনন্দ ও বিলাসের অধিকারিণী।

মহারাষ্ট্রের পুরানো শহরগুলিতে বাড়ীঘর বড় বিশ্রী, বড় জনতা পূর্ণ, রাস্তাঘাট অতি নোংরা, ঘরে সূর্য্যালোক বা মুক্ত-বায়ু অবাধে চলাফেরা করিতে পারে এরূপ ব্যবস্থা খুব কম। নূতন শহর ও আধুনিক রুচি অনুযায়ী বাড়ীগুলি অবশ্য স্বাস্থ্য-বিজ্ঞানসম্মত। কিন্তু এই ধরণের বাড়ীঘরের এখনও বহুল প্রচলন হয় নাই। তাই দেখা যায় পর্দা প্রথাওয়ালা সর্দার-গৃহিণীদের মধ্যে বহু নারী ক্ষয়রোগে অকালমৃত্যু বরণ করেন, কারণ তাঁহারা মুক্তবায়ু ও সূর্য্যালোকহীন গৃহে চিক পর্দা ফেলিয়া এক রকম অসূর্য্যম্পশ্যা হইয়া থাকেন। শহরের বাকী অধিবাসিনীরা যদি তাহাদের মত পর্দানশীনা হইয়া থাকিত, বাড়ীর বাহিরে মুক্ত বায়ুতে অবাধে চলাফেরা করিতে না পারিত, তবে তাহাদেরও পরিণাম প্রায় একই হইত।

স্বাস্থ্যের এই দিকটা বড় শহরের অধিবাসিনীদের পক্ষেও খাটে। কারণ বড় শহরে, যেমন বোম্বাইয়ে সাধারণ মধ্যবিত্ত গৃহস্থ ও নিম্নশ্রেণীর লোকেরা হয় বড় বাড়ীর এক-একটি ক্ষুদ্র অংশে নয়ত বস্তিতে বাস করে। কিন্তু দেখা যায় বিকালে উচ্চ, মধ্য, নিম্ন সব শ্রেণীরই শত শত নারী—যে যার উৎকৃষ্ট সাজে সজ্জিত হইয়া সমুদ্রের উপকূলে বেড়াইতেছে বা বসিয়া গল্প-গুজব করিতেছে। আমাদের দেশে এই জিনিষটির বড়ই অভাব। অবশ্য ধনীদের ও নিম্ন শ্রেণীদের কথা আলাদা, কারণ আমাদের দেশেও বোষ্টমী বাউরী ইত্যাদি নিম্ন শ্রেণীর নারীরা প্রকাশ্য ভাবে চলাফেরা করে। কিন্তু মধ্যবিত্ত ঘরের বৌঝিরা একরূপ বন্দিনী। বোম্বাই ও কলিকাতার এই পার্থক্য বিশেষ ভাবে দেখা যায়; বোম্বাইয়ের চৌপাটিতে নারীর সংখ্যা পুরুষের সংখ্যা হইতে কম নয়।

পূর্ব্বে আমাদের প্রদেশে অনেকের ধারণা ছিল যে ভারতের সর্ব্বত্রই বোধ হয় এই রকম অবস্থা, শুধু একমাত্র বিলাতেই নারী স্বাধীন। কিন্তু ভারতেরই এক প্রান্তে খাঁটি হিন্দুর মধ্যে যে এমন স্ত্রী-স্বাধীনতা থাকিতে পারে তাহা নিজের চোখে দেখিবার পূর্ব্বে বিশ্বাস হয় নাই। মহারাষ্ট্র হইতে যে এই বিষয়ে আমাদের অনেক শিক্ষার আছে তাহাতে সন্দেহ নাই।

নাৎসী ক্রুজারে

শ্রীসন্তোষ দাশগুপ্ত

(দক্ষিণ-আটলান্টিকে ভেলাবক্ষে ভাসমান হইবার পর লেখক আক্রমণকারী নাৎসী ক্রুজারে বন্দী হন। আটলান্টিকে তাঁহার অভিজ্ঞতার কাহিনী আষাঢ় সংখ্যা 'প্রবাসী'তে প্রকাশিত হইয়াছে।)

মাত্র কয়েক বৎসর পূর্ব্বে প্রথম মহাযুদ্ধের সময় ডাউনিং ষ্ট্রীটের পরোক্ষ নির্দ্দেশে নানা বর্ণে, নানা চিত্রে সুশোভিত ও বহু বিচিত্র কাহিনীতে অলঙ্কৃত যে অপরূপ 'জার্ম্মান' কথা ও কাহিনী সংবাদপত্র নামক মিথ্যার বেসাতির বিক্রেতাগণ জনসাধারণের মধ্যে পরিবেশন করছিল, যুদ্ধের অবসানে তার সকল তথ্যই উদ্‌ঘাটিত হয়েছিল। তারপর একদা সহসা 'পন্‌সন্‌বি' রাষ্ট্র-নৈতিক ধুরন্ধরদের যুদ্ধকালীন সকল মিথ্যাচার সূর্য্যালোকে তুলে ধরলে সকলেই বোধ হয় ভেবেছিল, ভবিষ্যতে মানুষ আর কোন দিনই এ ধরণের কাহিনী বিশ্বাস করবে না। সেদিনের সে আলোড়নের সময় মিথ্যা-জালের ঊর্ণনাভেরা কথঞ্চিৎ বিচলিত হলেও বিন্দুমাত্র হতাশ হয় নি। সামান্য কিছু সরে গিয়ে কিছুকাল অপেক্ষার পর স্বভাবসিদ্ধ নিপুণতার সঙ্গে পুনরায় সূক্ষ্ম জাল বুনতে তৎপর হ'ল, মক্ষিকাকুল আবার জালে পড়তে সুরু করল।

নিজের দেশে বৈদেশিক উৎপীড়নজনিত শোচনীয় অবস্থার কথা চিন্তা করে নাৎসীরা জার্ম্মানীতে তাদের প্রতিপক্ষ বহু লোককে বন্দী করে অকথ্য অত্যাচার-উৎপীড়ন করছে, যুদ্ধের পূর্ব্বে এ সংবাদে আমি খুব আশ্চর্য্যান্বিত হই নি। বন্দীনিবাস-গুলোতে অসহায় বন্দীদের নাৎসীরা অনেক ক্ষেত্রে হত্যা পর্য্যন্ত করেছে, এ খবরেও বিদেশীদের উপর খড়্গহস্ত হবার প্রয়োজন বুঝি নাই। পাশ্চাত্ত্যের অন্যান্য জাতি যেভাবে এ সকল ঘটনাকে দেখছে সেই দৃষ্টিভঙ্গি দিয়ে দেখা আমার পক্ষে সম্ভবপর হয় নি, জার্ম্মানীর রাষ্ট্র-জগৎ ও অর্থনৈতিক জীবন থেকে ইহুদীদের উৎসন্ন করার কাহিনীও আমাকে ততটা অভিভূত করতে পারে নি, কেননা নিজ বাসভূমিতে সহস্র চক্রান্তে বাঙালীকে কিভাবে উৎসন্ন করা হচ্ছে সে চিন্তাই আমার সমগ্র চৈতন্যকে আচ্ছন্ন করে রেখেছিল।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের যবনিকা উত্তোলিত হ'ল, চতুরঙ্গ এ যুদ্ধে চলল জলে স্থলে আকাশে শত্রু বিমর্দ্দনের সহস্র অভিযান। অসাধু, অসভ্য সোভিয়েট অকস্মাৎ আলাদীনের প্রদীপের স্পর্শে হয়ে গেল সাধু সুসভ্য। এক অঘটনঘটনপটিয়সী ঐন্দ্রজালিক প্রক্রিয়ায় যেন একটা অভিনব ব্যাপার ঘটে গেল। পন্‌সন্‌বি স্মৃতির পর্দা থেকে মুছে গেল, গত যুদ্ধকালের মিথ্যাচার সব মিথ্যাচারের ধূলিতে গৃহকোণে চাপা পড়ে গেল। জার্ম্মান নাগরিক ভাল কিনা, ব্যক্তি হিসাবে প্রত্যেক জার্ম্মানই অত্যাচারী, না, নাৎসীরাই কেবল বর্ব্বর—এ জিজ্ঞাসার জবাব হ'ল একমাত্র মৃত জার্ম্মানই ভাল এই চমকপ্রদ তথ্যে। যুদ্ধের প্রয়োজনে নয় পরন্তু নিছক রক্তলোলুপতার জন্যই জার্ম্মানরা সর্ব্বত্র বেপরোয়া হত্যাকাণ্ড চালাচ্ছে একথা কাগজে, চিত্রে, বেতার-তরঙ্গে সর্ব্বত্র অবিশ্রাম ধ্বনিত হতে লাগল। সর্ব্বত্রই নাৎসী বিভীষিকা, জার্ম্মান বিভীষিকা।

চেয়ে আছি ঐ স্বস্তিকার দিকে, ডেকের উপর দেখা যাচ্ছে নাৎসী নৌ-সৈন্যেরা দাঁড়িয়ে আছে রেলিঙের উপর ভর দিয়ে। একটু আগেও লক্ষ্য-সাধনে যে নির্ম্মমতা প্রত্যক্ষ করেছি, অপরিচিত অজ্ঞাত কিন্তু বহুশ্রুত তার প্রতীক দক্ষিণ-আট-লান্টিক বক্ষে গর্ব্বোন্নত সেই কৃষ্ণ স্বস্তিক-পতাকা ক্রমেই কাছে আসছে। শ্বেতবর্ণ সমুদ্রচারীর মধ্যেই আছে পৃথিবীর সকল নৃশংসতা ও ভীষণতা— রক্ত মাংসে গঠিত নাৎসীরূপ সব! তাই নাৎসীরা মেশিনগান চালাতে পারে বলে সুইডিস যে সন্দেহ প্রকাশ করেছিল ইতিপূর্ব্বে শুনেও কখনও তা বিশ্বাস করি নি। তথাপি কখন কোন মুহূর্ত্তে আপনার অজ্ঞাতে সংশয় বুঝি বাসা বেঁধেছিল, চোখের দৃষ্টিকে যত দূর সম্ভব তীক্ষ্ণ করে লক্ষ্য করবার চেষ্টা করছি কোনও ধরণের আগ্নেয়াস্ত্র এই ভেলার দিকেই মুখব্যাদান করে আছে কিনা।

আরো, আরো কাছে এসেছে ছদ্মবেশী নাৎসী ক্রুজার। কোন আগ্নেয়াস্ত্রই চোখে পড়ছে না, ওপর থেকে কিশোর-বয়স্ক অনেকগুলি সৈনিক— পরণে ছোট ছোট হাফ প্যান্ট, গেঞ্জী, কোমরবন্ধে পিস্তল, আমাদের দিকে চেয়ে রয়েছে। অমানুষিকতার কোন ইঙ্গিতই পাচ্ছি না এদের চোখে, মুখে বা হাবভাবে।

শক্ত দড়িতে বাঁধা একটি 'বয়া' জাহাজ থেকে নিক্ষিপ্ত হ'ল আমাদের ভেলার উপর, ওপর থেকে ওরা ইসারা করছে ভেলাটিকে দড়ি দিয়ে বেঁধে ফেলতে। কয়েক মিনিটের মধ্যে 'সুইডিস' ও আমি দড়ির সিঁড়ি বেয়ে ক্রুজারে উঠলাম। দক্ষ্যানন মেসরুম বয় ও আহত লোকটির দড়ি ধরে উঠবার ক্ষমতা নেই, ভেলাতেই রয়েছে। সিঁড়ির কাছেই একজন নাৎসী অফিসার দাঁড়িয়ে, মধ্যবয়স্ক পাতলা চেহারা, ক্রুয়েলের রাউণ্ড হেডদের মত মুণ্ডিতমস্তক, চিবুকে কয়েক-গাছি শ্মশ্রু। দুর্গত উদ্ধার-পর্ব্বের ভারপ্রাপ্ত কর্ম্মচারী বলে বোধ হ'ল, আমরা কিছু বলবার পূর্ব্বেই ওদের দিকে চেয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, আহত?

সব যেন প্রস্তুতই ছিল, খড় খড় শব্দে ডেক ঘুরল, কপিকলে লাগানো মস্ত এক গদী আঁটা চুবড়ি নেমে গেল ভেলার কাছে, আগেই দু'জন বলিষ্ঠ জার্ম্মান নাবিক নীচে নেমে গিয়েছিল, সযত্নে ওদের দু'জনকে চুবড়ির ভেতর শুইয়ে দিলে, আবার একটু খড় খড়—চুবড়ি ওপরে উঠে গেল হাসপাতালে।

ডেকের ওপর এক দিকে চেয়ার টেবিল পাতা। চেয়ারে বসে আছে এক নাৎসী কর্মচারী,তার সামনে দাঁড়িয়ে আমাদেরই জাহাজের ক্যাপ্তেন ও আরো জনকয়েক লোক। মাথা নেড়ে পরস্পরকে অভিনন্দন জানাতে হ'ল। এক সারিতে সবাই দাঁড়িয়েছি, চেয়ারে উপবিষ্ট লোকটি এক এক করে সবার নাম, ধাম, গোত্র পরিচয় নিচ্ছে। আমার ধাম 'ক্যালকাটা' শুনে জায়গাটা বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের কোন স্থানে হদিস পেলে না, বুঝিয়ে দিতেই হো হো করে সশব্দে হেসে শুধরে দিলে, 'ওঃ কালকুত্তা, কালকুত্তা'? ডাক্তার এলেন, অঙ্গ থেকে সকলেরই খুলে ফেলতে হ'ল সকল আবরণ, আণ্ডার-ওয়ার পর্য্যন্ত শুধু স্থানচ্যুত নয়, শরীরের সঙ্গে সকল সম্বন্ধ বিবর্জ্জিত হয়ে লজ্জার মাথা খেয়ে এক পাশে পড়ে রইল। নানা দেশের, নানা জাতির এই বিচিত্র দিগম্বরদের শরীর পরীক্ষা করতে লাগলেন নাৎসী চিকিৎসক অতি সাবধানে, মাথার চুল থেকে পায়ের চেটো পর্য্যন্ত সর্ব্বাঙ্গে কোথাও কোন ব্যাধি আত্মগোপন করে আছে কিনা। চিরদিনই শুনেছি খুঁটিনাটি বিষয়েও সতর্ক সজাগ দৃষ্টি জার্ম্মান সেনাপতিমণ্ডলীর বৈশিষ্ট্য। সংখ্যা হিসাবে প্রায় শূন্যে বিলীয়মান অতি ক্ষীণ ভগ্নাংশেও সতত দৃষ্টি না থাকলে যে গোটা অঙ্কটাই কষতে ভুল হয়ে যায়, এ শিক্ষা জীবনের প্রতি বিভাগে প্রয়োগ করতে ওরা যত্নশীল। পরিচ্ছদের বাহার নাই। আকাশপ্রমাণ অজ্ঞতা ঢেকে নিজেকে জাহির করবার যে ব্যর্থ প্রয়াস নিয়ত এক শ্রেণীর অফিসারদের মধ্যে ধরা পড়ে তাদের রুক্ষ ব্যবহারে ও কপট গাম্ভীর্য্যে এ লোকটিতে তার একান্ত অভাব। সহজ সাধারণভাবে সকলের বুকগহ্বর পরীক্ষা করছেন, নিতান্ত ভদ্রভাবেই শ্বাস-প্রশ্বাস নিতে বলছেন, কোন কথা তাঁর কেউ না বুঝলে ঠিক যেমনটি তিনি চান নিজেই বার বার সেই রকমটি দেখিয়ে দিচ্ছেন।

যে একাগ্রতা নিয়ে প্রত্যেক বন্দীর প্রতিটি অঙ্গ ডাক্তার যেন জগৎ-সংসার ভুলে গিয়ে পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে পরীক্ষা করছিলেন, তাতে সুস্থ মানুষের পক্ষে বিরক্ত না হয়ে থাকা অসম্ভব।

তারপর এল গামলা গামলা গরম জল। গরম জল দিয়ে কি হবে ভাবছি, এমন সময় এক জন জার্ম্মান নাবিক সাবান তোয়ালে নিয়ে এসে আমাদের হাতে দিয়ে ভাল করে স্নান সেরে নেবার ইঙ্গিত করলে।...আরো কিছু জল হলে ভাল হ'ত—চাওয়া সঙ্গত হবে কিনা ইতস্ততঃ করছি—লোকটি জিজ্ঞাসা করলে, আরো চাই কিনা?—আবার এল গরম জল।

নাৎসী জুজার

আমার সঙ্গীরাও চাইলে। ক্লান্তি বা বিরক্তি নেই লোকটির, মধ্যে মধ্যে নিজেই ইসারা করে তোয়ালে দিয়ে ভাল করে গা ঘষতে বলছে, গামলা গামলা আরো জল এনে দিচ্ছে। বন্দীদের জন্যে এই বারবার যাওয়া-আসায় মিথ্যা অপমানবোধের বালাই নাই, নাৎসী যুদ্ধজাহাজটিতে ঠিক এই মুহূর্ত্তে তাকে যে নির্দ্দিষ্ট কাজের ভার দেওয়া হয়েছে, নিষ্ঠার সঙ্গে তা করে যাচ্ছে।

ঠায় দাঁড়িয়ে এদিক ওদিক চেয়ে জাহাজটির অস্ত্রসজ্জা লক্ষ্য করবার চেষ্টা করছি, কিছুই চোখে পড়ে না। ঘণ্টা দুই আগেও অনল-বৃষ্টি করছিল যে সব কামান কোথায় সেগুলো? বিমানই বা কোথায় রেখেছে? 'ক্যাটাপুল্ট' বা জাহাজ থেকে বিমান নিক্ষেপের মঞ্চই বা কই? হয়তো সি-প্লেন এদের সঙ্গে আছে, কিন্তু কোন কামানই ত দেখছি না! নিতান্ত নিরাপদ সওদাগরী জাহাজ যেন, বাইরে থেকে কার সাধ্য বোঝে, এটা ছদ্মবেশী জুজার। পরে জেনেছিলাম এমনই একটি জাহাজের সঙ্গে সংঘর্ষে অষ্ট্রেলিয়ান জুজার 'সিডনী' ভারত-মহাসাগরে জলমগ্ন হয়েছিল। স্বস্তিকা পতাকাও কেবল 'সংঘর্ষে'র সময় উড্ডীন করা হয়। নজরে পড়ল, ব্রিজের ওপর দাঁড়িয়ে তখনও ফটোগ্রাফাররা বহ্নিমান্ 'আউট্রে'র ফটো নিচ্ছে। বহু সহস্র মাইল দূরে শত্রু-জাহাজ ধ্বংস করলে তার প্রমাণও বোধ হয় দিতে হবে বার্লিনে।

মুণ্ডিতমস্তক নাৎসী লেফটেনান্ট তাঁর অনুগমন করতে ইসারা করলেন,—বললেন, এবার এস সবাই তোমাদের নব বাসস্থানে।

মুখ ফিরিয়ে শেষ বারের মত দেখে নিলাম 'আউট্রে'র চিতা।

*　　*　　*　　*

জুজারের পেটের ভেতর জলরেখার নীচে এক কক্ষে

আমাদের বাসস্থান নির্দিষ্ট হয়েছে। নিম্নতম ডেক থেকে কয়েক ধাপ সিঁড়ি এসেছে এই ঘরে—চব্বিশ ঘণ্টা বৈদ্যুতিক আলো জ্বলে। বহির্জগতের সঙ্গে এই কক্ষটি সম্বন্ধহীন।

আমরাই প্রথম আশ্রিত নই, আরো দুটি নিমজ্জিত জাহাজের প্রায় সকল নাবিক রক্ষা পেয়েছিল, তারাও রয়েছে এখানে। একদল সাত দিন সাত রাত্রি ইতিমধ্যে এখানে কাটিয়েছে, দ্বিতীয় দল তিন দিন তিন রাত্রি। খান পাঁচ-ছয় বেঞ্চ টেবিল পাতা সারা ঘরে, পায়া ও মঞ্চগুলোর সম্বন্ধ অবিচ্ছেদ্য নয়, প্রয়োজন হলে অবয়বগুলি খুলে এক পাশে রাখা যায়, অর্থাৎ কোলাপ্‌সিবল্‌ বা বিচ্ছেদ্য। তখন টেবিল-গুলোতে খেলা চলছে—সতরঞ্চ, ড্র্যাক্‌ট্‌ বা তাস। এক টেবিলে তুমুল কোলাহল চলছে, সকালের উদ্বৃত্ত রুটির অংশ নিয়ে দু'জনে ঝগড়া করছে। পাঁচ-ছয় ধাপ সিঁড়ির মুখে ওপরে ঝাঁপের কাছে একটি লোক দাঁড়িয়ে আছে।

নাৎসী কর্মচারীটি বাগ্‌যুদ্ধরত বীরদ্বয়কে দেখে আর একটি বন্দীকে জিজ্ঞাসা করলে, ওরা অমন করছে কেন?—হাত কচলে লোকটি বললে, একটু ঠাট্টা-তামাশা করছে নিজেদের মধ্যে, ঝগড়া নয় স্যার!

এ লোকটি এখানে মোড়ল নিযুক্ত হয়েছে, একটি ইংরেজ জাহাজের কাপ্তেন। নবাগতদের দেখে বন্দীদের মধ্যে তার স্বাতন্ত্র্য দেখাবার চেষ্টা একান্ত হয়ে দেখা দিল। আমার সহকারী কানাডিয়ানটি এক ফাঁকে কানে কানে বলল, চেইন-গ্রেভদের সর্দার! নবাগত আমরা পুরাতনদের কাছে এখানকার রীতিনীতি শিখছি। দেয়ালে আঁকা বিজ্ঞপ্তিতে সব লেখাই আছে।

ছুরি, কাঁটা-চামচে, পেয়ালা, বাটি ইত্যাদি একটি করে সবাইকে দেওয়া হ'ল। তারপর এল হ্যামক, চাদর, কম্বল, প্যান্ট, মোজা, সার্ট বিতরণের পালা। সকল পর্ব্ব শেষ হতে হতে ঝাঁপের মুখে বাঁশী বেজে উঠল—সন্ধ্যাহারের সময় হয়েছে। কালো রুটি, চর্ব্বির মাখন, হ্যাম, কফি। চার-পাঁচ ঘণ্টা পূর্ব্বেকার আহার মনে পড়েছে। কি শক্ত রুটি এ, ছুরি দিয়ে কাটতে চায় না, গুঁড়ো হয়ে যায়। একখণ্ড মুখে দিয়ে হাত গুটিয়ে বসলাম, খাওয়া অসাধ্য। 'পুরাতনে'রা পরম উৎসাহে আহারক্রিয়াটি উপভোগ করছে। নিরীহ ভালমানুষ এক ইংরেজ ইঞ্জিনীয়ার—নাম ধরা যাক 'ক', বললে রুটি তো খারাপ নয়, প্রথম এক-আধ দিন কষ্ট হবে, পরে দেখো খেতে বেশ লাগবে।

আমি খাব না শুনে তিন জন পূর্ব্বাগত হাত বাড়িয়েছে সেই রুটির দিকে—আমাকে দাও, আমাকে দাও। রুটি নিয়ে আবার তুমুল ঝগড়া চলল তিন জনের মধ্যে অকথ্য কুকথ্য ভাষায়! ঝগড়া থামে না, আর এক টেবিলে মহা গণ্ডগোল বেধে গেছে, ওদের প্রাপ্য ভাগ্য মাখনের অংশ থেকে ওরা নাকি অন্যায় ভাবে বঞ্চিত হয়েছে। মাখনটুকু নিয়ে টেবিলে টেবিলে দেখিয়ে বেড়াচ্ছে, সবার কাছে অনুযোগ করছে। আমাকে নিরপেক্ষ ভেবেই বুঝি অনুরোধ করল ওদের পাশের টেবিলের যাদের আজ বণ্টন করবার পালা ছিল তাদের সঙ্গে এদের অংশের কতখানি পার্থক্য তা দেখতে। সেদিকে চেয়ে দেখি চারিটি স্বার্থপর মূর্ত্তিমান ক্ষুধা যেন বসে আছে, নির্ব্বিকার চিত্তে, ওদের কাঁটা ছুরি চলছে, গ্রাহ্যও করছে না এদের কথা। আবেদনকারীরা আমাদের সমর্থন পাবার জন্য আবার বললে, 'তোমাদেরও কত কম দিয়েছে দেখ।' সত্যিই তাই। নতুন এই পরিবেশে কি ভাবে চলতে হবে বুঝলাম। সভ্যজগ-তের রীতিনীতি এখানে অচল, সামান্য আঘাতেই শিষ্টাচারের মুখোস খুলে গেছে, বললাম জাহান্নমে যাও সব, কে পাচ্ছে বা না পাচ্ছে সেই বুঝুক, কাল সকাল থেকে আমার বরাদ্দের ষোল আনা চাই। আমাদের বরাদ্দের প্রায় অর্দ্ধেক রুটি ও মাখন সেই টেবিলের বণ্টনকারীরা আত্মসাৎ করেছিল। ওদেরই একজন বললে, তুমি তো যা দিয়েছি তাই খেতে পারলে না।

'পারি বা না পারি সে আমি বুঝব, আমার ভাগ চাই, না খেতে পারলে স্থানবিশেষে ফেলে দেব।' নাকিসুরে চিবিয়ে চিবিয়ে ওখান থেকে কে বলে উঠল 'খাবার জিনিষ ফেলে দিলে ওরা শাস্তি দেয়।'

বিশ্রী স্বরটা অনুসরণ করে দেখি সেই মোড়ল! বললাম, শাস্তি দেবার আবেদনকারীটি এখানে কে শুনি? প্রশ্নটা এড়িয়ে আবার তেমনি নাকিসুর কানে ভেসে এল, এটা বন্দী-ঘর, চালাকী চলবে না এখানে।—আমার দিক থেকে জবাব গেল, হুঁ, ঠিক কথা আজ রাতের ভেতর পরকীয় অভ্যাস যদি না যায় তোমার তো কাল সকালে চালাকি চলবে না। মনে থাকবে?

'ক' চেপে হাসল। আমাদের জাহাজের কাপ্তেন নিম্নস্বরে বললেন—ইতর, চোর!

কারো কাছে দেশলাই নেই, রাখা নিষিদ্ধ। নাৎসীরা সিগারেট দিয়েছে সপ্তাহে পঞ্চাশটি হিসাবে। আমার মাখন-টুকু আর এক জনকে দিয়ে তার কফির অর্দ্ধেক নিয়েছি, নিজের তো আছেই। কফির সঙ্গে সঙ্গে যদি ধূমপানও করতে দিত। 'ক'কে বললাম, সিগারেট দেয় অথচ আগুন দেয় না আবার কি রকম? 'ক' উত্তর দিলে, দেখে, ওদের খুশিমত এসে ওরা আগুন ধরিয়ে দেয় সিগারেটে।

এক জন প্রহরী ভিতরে এসেছে; খাচ্ছি না দেখে জিজ্ঞাসা করল ইঙ্গিতে, খাচ্ছি না কেন? শরীর ভাল নেই বোঝাবার চেষ্টা করলাম, বুঝল কিনা ওই জানে। এ-ই সময় কোন অনুরোধ করবার। সিগারেট মুখে দিয়ে আগুন চাইছি ওর কাছে। লোকটি হেসে কি বলে চলে গেল। কফির পেয়ালটায় আস্তে আস্তে এক একবার চুমুক দিচ্ছি, একটু তাম্র-কূটের ধোঁয়ায় বুঝি শারীরিক, মানসিক ক্লান্তি দূর হয়ে যেত।

খাওয়া শেষ হয়ে গেছে। জগ, গেলাস, বল দিয়ে মেঝ, টেবিল, বেঞ্চি সব পরিষ্কার করবার ধুম পড়ে গেল। পালা করে সবাইকে করতে হয় এ কাজ। নাৎসীরা অপরিচ্ছন্নতা একেবারে পছন্দ করে না। দু'দিন আগে যে তিন জনের পালা ছিল, টেবিল পরিষ্কার প্রক্রিয়াটি সুচারুরূপে তারা করে নি, ময়লা লেগে ছিল কোন কোন স্থানে, তাই শাস্তি পেয়েছিল নাৎসীদের কাছে, দু'দিন ধূমপান করতে পারে নি।

এক কোণ থেকে হঠাৎ ঘড়র ঘড়র একটা শব্দ হতে লাগল, একটু পরেই অপরিচিত কণ্ঠে ও ভাষায় সমস্ত কক্ষটি মুখরিত হয়ে উঠল। দেওয়ালের গায়ে রেডিও লাউড স্পীকার লাগান আছে এক ধারে, এতক্ষণ লক্ষ্য করি নি। বার্লিন রেডিও থেকে ইংরেজী প্রোগ্রাম শুনছি, চার্চিল-রুজভেল্ট সৌরমণ্ডল হতে এখন হিটলারের সৌরজগতে এসে পড়েছি। ইংরেজী ভাষীরা বলছে, যত সব মিথ্যা কথা। কোন কথা শুনতে চায় না ওরা। বি. বি সি. ছাড়া অন্ত কারও কথা শুনতে ভীষণ আপত্তি। কানে আঙুল দিতে বাকী থাকে। ভারতবর্ষের শত্রুদের সকল কথাও যদি এমনি করেই বিশেষ করে ভারতীয় 'শিক্ষিতে'রা শুনতে রাজী না হ'ত—ভাবি।

নাৎসী প্রহরীটি আবার এসেছে, এদিক ওদিক চেয়ে চেয়ে দেখছে। 'ক' এসে বলল, আগুন দিতে এসেছে; বোধ হয় তোমাকে খুঁজছে।—রেডিও চলছে, নানা কণ্ঠের গুঞ্জন হচ্ছে, বঙ্কগুলির মধ্যে লম্বা একফালি জায়গায় দু'জন পায়চারি করছে, ইস্পাতের একটা থাম ধরে এক জন চুপচাপ দাঁড়িয়ে আছে, কি ভাবছে অনুমান করা খুব শক্ত নয়—ওর তিন দিন হয়েছে। ছোট ঘরটি যেন্নো হাট, জিনিষের অভাব পূরণ করছে কথার বেসাতীতে—নরক গুলজার।

সাত দিনের অভিজ্ঞ 'ক'কে জিজ্ঞাসা করি, এ ঘরে এই অবস্থায় ক্রমান্বয়ে সাত দিন আছ—সূর্য্য, আলো, আকাশ, সমুদ্র না দেখে? কি করে, কেমন করে আছ?

রোজই নিয়ে যায় ওপরে দু'বেলা দু-ঘণ্টার জন্ত। 'ক' আশ্বাস দিলে।

আজও গিয়েছিলে তো?

'না, তোমাদের নিয়ে ব্যস্ত ছিল কি না, তাই।'

'নতুবা নিয়ে যায় তো রোজ?'

'দু-এক দিন বাদও যায়। তখন বোধ হয় নতুন শিকারের খোঁজ পেয়ে থাকে, বা নিজেরই কোন বিপদ সম্ভাবনা।

'কানাডা' এসে পাশে বসল—বলল, তোমার একটা জিনিষ দেব। ও সিগারেট খায় না, বাক্সটি হাতে দিল। তার পর হেসে বলল, নিঃস্বার্থ ভাবে নয় কিন্তু। তুমি যে জিনিষটি খেতে পছন্দ কর না আমাকে দেবে।

এ হাটেও বিনিময় চলছে; অর্থ আবিষ্কারের পূর্ব্ব যুগের পদ্ধতিতে। পনীর আমি কোনদিনই পছন্দ করি না বোধ হয় তাই চাইছে। বললাম, বেশ তো পনীর যখন দেবে তুমিই নিয়ো।

তাড়াতাড়ি সে বললে, না, না তা বলছি না, যদি তুমি নিজে না খাও, তবেই দিয়ো। সবার সমান অবস্থা এখানে। এই সামান্ত আহার থেকে সত্যিই আমি তোমায় বঞ্চিত করতে চাই না।

এক-শ সিগারেটের মালিক আমি। একটির পর একটি চলছে, সিঁড়ির ওপর প্রহরীটি দশটি আঙুল দেখিয়ে বলল, ধূমপানের আরো দশ মিনিট সময় আছে। আর এক জন আমাদের কাছে এসে বসল, জাহাজের রেডিও অফিসার—ইংরেজ ভদ্রলোক মোড়লের বিপরীত স্বভাব, ভদ্র, বিনয়ী। আরও দু'জন এল, তারাও রেডিও বিভাগের। জিজ্ঞাসা করলাম, তোমাদের ওপর আক্রমণ হয়েছিল কোথায়? কোন খবরই তো পাই নি তোমাদের সম্বন্ধে। দক্ষিণ-আটলান্টিক রেইডার জাহাজ আবার বেরিয়েছে খলে পাকা খবরও পাই নি কখনও।

বললে, খবর দেবার সুযোগ হয় নি একেবারেই। কোথেকে হঠাৎ একটা বিমান এসে এরিয়েলের তার ছিঁড়ে দিয়ে গিয়েছিল। দ্বিতীয় জাহাজের ওরাও সেই একই কথা বলে।

কত দিন আমাদের এ ভাবে থাকতে হবে বলেছে কিছু নাৎসীরা? জিজ্ঞেস করলাম।

'কিছু না, বোধ হয় জার্মেনীতে না পৌঁছান পর্য্যন্ত'।... উত্তর দিল সে।

কিন্তু জার্মেনীতে যাবে এখন কেন? কতকগুলি বন্দীকে জার্মেনীতে পৌঁছে দেবার চেয়ে অনেক গুরুত্বপূর্ণ কাজ নিয়ে রেইডার বেরিয়েছে।...ক্ষীণ আশার সঞ্চার হয়। দক্ষিণ-অ্যাটলান্টিকেই নিশ্চয় ঘুরে বেড়াবে এ জাহাজ এখনও কিছু-কাল আরও শিকারের অন্বেষণে। এর চেয়ে শক্তিশালী সুবৃহৎ কোনও মিত্রপক্ষীয় রণতরীর সঙ্গে শেষ পর্য্যন্ত দেখাও হতে পারে এর।

কানাডা বলে, আজ দুপুরের সেই নরক থেকে বেঁচেছি বটে, কিন্তু বিপদ এতটুকু কমে নি।

ইংরেজটি, নাম তার ধরা যাক্ 'স' ওর উক্তি সমর্থন করলে, হ্যাঁ, আরও মুশকিল, জলরেখার ঠিক নীচেই আমরা। মিত্র-পক্ষীয় কোন সাবমেরিণ বা রণতরী যদি টর্পেডো ছোঁড়ে। ভীষণ ভীতির মধ্যে রয়েছে ওরা, নিরাপদে শত্রুর দেশে কোন যুদ্ধবন্দী শিবিরে পৌঁছুতে চায়। ওদের বলি, কিন্তু সমুদ্রে যত বেশী দিন থাকা যাবে মুক্তির সম্ভাবনাও তত বেশী। এক বার এঙ্গিসের দেশে পৌঁছুলে কয়েক বৎসরের ধাক্কা।

কথা বলতে ভাল লাগছে না আর। ভারত যুদ্ধে জাপানী অগ্রগতির সহস্র অপ্রিয় সম্ভাবনা মস্তিষ্কের চিন্তাস্রোতগুলির আনাচে কানাচে জড়িয়ে পড়ছে। কানাডাকে বললাম, দিন গুনছিলাম রোজ কতদিনে ভারতে পৌঁছুব, নিয়তির কি পরিহাস দেখ এখন এইখানে, এই অবস্থায়!

একটা বাঁশী বেজে উঠল। হুড়মুড় করে সব উঠে পড়ল। বেঞ্চ, টেবিল সব কতকগুলি কাষ্ঠখণ্ডে রূপান্তরিত হয়ে গেল দেখতে দেখতে। ঘরটির সঙ্গে সংযুক্ত আর একটি ছোট ঘর এতক্ষণ বন্ধ ছিল। খুলে গেল। গোটান হ্যামক, চাদর কম্বল স্তূপীকৃত হয়ে আছে সেখানে। দু'জন ভেতরে ঢুকে পড়ল। এক একটি বিছানা তুলছে আর উপরে লেখা নম্বর চেঁচিয়ে পড়ছে। নম্বর অনুযায়ী সবাই নিচ্ছে আপন আপন বিছানা। ঘরটি আমার পছন্দ হ'ল, দু'জন শুতে পারে। কানাডা ও আমি সেখানেই মেঝের উপর হ্যামক, চাদর বিছিয়ে শুয়ে পড়লাম।

আজ সকালে উঠে কে ভেবেছিল সন্ধ্যায় এখানে এই অন্ধকার গৃহে, রুক্ষ, অমার্জিত বহু লোকের মধ্যে ধারণাতীত এই অবস্থায় এসে পড়ব! একটু যদি নিরিবিলিও থাকত! পাশেই জাহাজের তেলের এঞ্জিন করছে গব্, গব্, গব, মেঝে কাঁপছে থর্, থর্, থর্, কোথায় নিয়ে চলেছে আমাদের! পৃথিবীর কেউ জানে না, দক্ষিণ-আটলান্টিকে এই মুহূর্তে ইস্পাতের এক দৈত্য মাটির মানুষের কতখানি ব্যথা বেদনা পুঞ্জীভূত করে ছুটে বেড়াচ্ছে।

পাশে বিছানায় কেমন একটা চাপা শব্দ হচ্ছে। সন্তর্পণে কানাডা কি যেন গোপন করার চেষ্টা করছে। 'কানাডা, ঘুমিয়েছ?'

'না।'

ও অমন করছে কেন জিজ্ঞাসা করতে সঙ্কোচ হয়, কারণটা নিজের ভেতরেই খুঁজে পাওয়া যায়। দুর্ব্বলতা সবারই আছে, হঠাৎ ও বলে, কি ভীষণ জীবন এ বল ত।

'উপায় কি? সবই সহ্য হয়, এও হয়ে যাবে।' বলছি বটে, কিন্তু কথাগুলি যেখান থেকে বেরুচ্ছে, সেখানে ঘন অন্ধকার।

বিশ্রী, কর্কশ বাঁশীর শব্দে ঘুম ভেঙে গেল। উঠতে ইচ্ছে করে না একেবারেই। আর একটু যদি···বাঁশী বারে বারে বাজছে। অন্ধকার কুঠরি, তেমনি আলো জ্বলছে। মোড়ল বলছে, এই উঠ সব তাড়াতাড়ি। কি ক্ষতি হ'ত ওদের আমাদের আর একটু শুতে দিলে!

উঠতে হ'ল। বন্দীর ইচ্ছা অনিচ্ছা নেই। সামান্ত বিছানা পরিপাটি করে গুটিয়ে গুছিয়ে রাখতে হ'ল।

সিঁড়ির কাছে এক একটা গামলা নিয়ে সারি বেঁধে দাঁড়িয়েছি। উপর থেকে পরিষ্কার গরম জল দিচ্ছে মুখ, হাত, পা ধোবার জন্ত। দু' রকমের সাবান দিয়েছে কালই সমুদ্র জল ও ভাল জলের জন্ত। আগেই যারা জল পেয়েছে ব্রুস, পাউডার দিয়ে দাঁত মাজছে। আমাদের ত নেই! 'ক'কে জিজ্ঞাসা করলাম, এ সব সরঞ্জাম ওরা পেল কোথায়?

'কেন, তোমাদের দেয় নি?'

'না ত।'

'চেয়ে নিও যখন লেফটেনান্ট আসবে।' দন্তমার্জ্জনী পাউডার নিজের থেকে খানিক দিয়ে বললে, আমার ব্রুসটা ব্যবহার করতে পার।

সে কি! এক ব্রুস দু'জনে! আমি আশ্চর্য্য হয়ে বলি।

'না, আমি ব্যবহার করি নি এক দিনও। ব্রুস এনে দিতে দিতে হেসে বলে।

তোয়ালে? তোয়ালে ত কাল স্নানের পর ফেরত নিয়েছে। আবার জিজ্ঞেস করি 'ক'কে। বললে, না, দেয় নি, দেবেও না। রুমাল দিয়ে সবাই তোয়ালের কাজ সারে। রুমালও নেই আমার, সুইডিস, কানাডীয়েরও সেই দশা। শেষ পর্য্যন্ত ওদের আর মুখ ধোয়া হ'ল না। গায়ের গেঞ্জি খুলে সাবান দিয়ে ধুয়ে নিয়ে তোয়ালের অভাব পূরণ করলাম। বাঃ দেয়ালের গায়ে ছোট ছোট আয়নাও যে আঁটা রয়েছে! প্রহরীর কাছে চিরুণী চাইলাম, ও ভাঙা আধখানা চিরুণী এনে দিল। আশ্চর্য্য! দুর্ভাগ্যের যে চিত্রটি মুখের ওপর অঙ্কিত দেখব ভেবেছিলাম ঠিক তেমনটি প্রতিচ্ছবি পাওয়া গেল না, অথচ এক রাত্রির মধ্যে আমার সঙ্গীদের কত পরিবর্ত্তন হয়ে গেছে!

নিত্যকার অভ্যাস মত সিগারেট মুখে দিয়েই রেখে দিলাম। কোন অভ্যাস রাখা বা না রাখাও যে অপরের কর্তৃত্বাধীন! কোলাহল সুরু হয়ে গেছে। লোকগুলি কি চুপ করে থাকতে জানে না? আস্তে কথা বলতেও কি শেখে নি কোন দিন? বিরক্ত হয়ে উঠছি ওদের ওপর।

প্রাতঃকালীন আহার এল—কালো রুটি, পনীর, জ্যাম, কফি। টেবিলগুলো থেকে এক জন করে প্রতিনিধি উঠে গেল বণ্টনস্থানে। উদ্গ্রীব হয়ে সকলে দেখছে সমান ভাগ হয় কিনা। তবু কিছু চেঁচামেচি, কথা-কাটাকাটি হয়, সকলের সাক্ষাতেই বণ্টনকারীরা নিজেদের জন্ত কিছু বেশী রাখে।

অনেকটা রুটি পড়ে রইল, পনীর কানাডাকে দিলাম। রুটির ওর আর প্রয়োজন নেই, অনেকটা উদ্বৃত্ত আছে, বললে, দেবে কেন কাউকে, রেখে দাও, বারটার আগেই খিদে পেলে চিবোবে! না, অধিকন্ত ক্ষুধা আমার এখানে হবে না। লুব্ধ দৃষ্টিতে দু'জন চেয়ে আছে, তাদের দিলাম। বললাম, ভাগ করে নাও দু'জনে। 'ধন্তবাদ।' ভাবলাম চুলোয় যাক্ তোমাদের ধন্তবাদ, ফেলে দিতে গেলে আবার উঠতে হবে তাই!

পরিষ্কারের পালা এবার। টেবিল, বেঞ্চি, মেঝে সব ঘষে মেজে ঝকঝকে করতে হবে। নাৎসীরা অনেক কিছু উপকরণ দিয়ে গেল। মুশকিল মেঝে পরিষ্কার করবার সময়। দাঁড়াই কোথা এতগুলি লোক? সে সমস্যা পূর্ব্বাগতেরা আগেই সমাধান করেছে। যাদের পালা তারা যেখানে দাঁড়িয়ে জল ছড়াচ্ছে সবাই গিয়ে তারা পেছনে ভীড় করে দাঁড়ায়। তারপর একদিকটা হয়ে গেলে অন্তত্র। সারা মেঝে ধুতে ঘরের লোক-

গুলিকে লাফিয়ে লাফিয়ে স্থান পরিবর্তন করতে হ'ল অনেকবার।

শুকনো কাপড় বদার পর্ব্ব শেষ হলে টেবিল, বেঞ্চগুলি পূর্ব্ব রূপ ফিরে পেল। ব্ল্যাকট বেরুল, সতরঞ্চ চলল, তাস এল—বাজার বসল আবার। ধূমপানের জন্ত অস্থির সকলে, কেউ কেউ গিয়ে দাঁড়িয়েছে প্রহরীর কাছে, সম্মতি মিলল না, আপন আপন স্থানে ফিরে এসে বসল। অনেকেই প্রতিজ্ঞা করেছে এই সুযোগে ধূমপানই ছেড়ে দেবে, দু-এক জন ছেড়েও ছিল শুনলাম দু-এক দিনের জন্ত, আবার সুরু করেছে পরে চেষ্টা করবে বলে।

দেওয়ালে একটা হাতে লেখা নাৎসীদের দেওয়া ক্যালেণ্ডার ঝুলছে, তারই খণ্ডগুলো এপ্রিল মাসের ১লা পর্য্যন্ত পেন্সিলে কাটা। এক জন আজকের তারিখ চিহ্নিত করতে গিয়ে থমকে দাঁড়াল। আজ কত তারিখ, কাল কেটেছিল কিনা মনে নেই। দিন রাত একাকার হয়ে গেছে। শোবার সময় মনে করে সে দিনের তারিখ চিহ্নিত না করলে পরে ঠাওর করা যায় না মাসের ক'দিন কেটেছে। আমরা সভ আগত, বাইরের স্মৃতি এখনও লুপ্ত হয় নি, তাই বলতে পারলাম এক বার ঘুমিয়েছি এখানে এসে, বুধবার আগে ছিল ৩রা এপ্রিল, এখন তবে ৫ঠাই হবে। আর দু'দিন বাদে আমরাও দিবারাত্রিহীন কালে ডুবে যাব।

লেফটেনান্ট এসেছেন, সঙ্গে আমাদের দেশের কুস্তিগীরদের মত দেখতে খালি গায়ে একটি লোক। তার বগলে কিছু কাপড়-চোপড়, হাতে লম্বা লম্বা দড়ি। নাম ধরে নবাগত কয়েকজনকে ডেকে কিছু কাপড়-চোপড় দিল—আর একটি করে সার্ট, গেঞ্জী, প্যান্ট, মোজা, চিরুনী, টুথ ব্রাস, টুথ পাউডার। বললেন, এগুলি আমাদেরই হ'ল, কিন্তু বিছানাপত্তর ধার দিয়েছে যত দিন এখানে অতিথি আছি তত দিনের জন্ত, অন্যত্র যাবার সময় বুঝিয়ে দিয়ে যেতে হবে।

বিতরণ শেষ হলে জিজ্ঞাসা করলেন কাঁরো কিছু বলবার আছে কিনা। সবাই চুপ করে আছে। আবার বললেন, কোন অসুবিধে, অভিযোগ থাকলে বলতে পার।

বললাম, এঞ্জিনের পাশেই ঘর, হাওয়া এতটুকু নেই, গরমে প্রাণ হাঁপিয়ে উঠছে।

'কেন? বাতাস আসছে না?' অনুচ্চ সেলিঙে মোটা মোটা লোহার নলগুলির মুখে হাত দিয়ে পরীক্ষা করতে লাগলেন। বাইরে থেকে ঘরে হাওয়া খেলবার ব্যবস্থা। ভদ্রলোক, দেখছি বলে ওপরে উঠে গেলেন। একটু পরেই ঘরে ঠাণ্ডা বাতাস পাচ্ছি। লেফটেনান্ট ফিরে এসে বললেন, এবার?

"হুঁ অনেক ধন্তবাদ।"

লেফটেনান্ট বললেন, সময় কাটানো এখানে খুব শক্ত। তা এক কাজ কর, দিবারাত্রি চামড়ার জুতো পরে থাকা অসুবিধে, দড়ি দিয়ে স্যাণ্ডেল বানিয়ে নাও। সঙ্গের লোকটিকে বললেন দড়ির জুতো বোনা শিখিয়ে দিতে।

এক জন জিজ্ঞাসা করল, আজ ওপরে নিয়ে যাবেন না স্যর?

ভদ্রলোক উত্তর দিলেন না।—'সিগারেট স্যর?'

'আচ্ছা, সিগারেট খেতে পার। পরে দেখি যদি সুবিধা হয় ওপরে যাবে।' প্রহরীকে সিগারেটে আগুন দিতে বললেন। খাওয়া দাওয়া সম্বন্ধে কিছু সময় গল্প করে ওপরে চলে গেলেন।

কি চমৎকার এই লোকটি, অনেকে বলে। কামারাডির্‌-সুইডিস সার মেয়। আমি বললাম, ক্যাম্প জার্মানও ভাল হয়।

কেউ ঝিমুচ্ছে, কেউ দড়ির জুতো বুনছে, কেউ তাস খেলছে, গল্প করছে। যন্ত্রাহত দুটি লোক এক কোণে শুয়ে রয়েছে, আঘাতের স্থানে ওষুধ দিয়ে ব্যাণ্ডেজ বাঁধা। এক জন অন্তমনস্ক হয়ে হুমড়ী খেয়ে গিয়ে পড়েছে আর এক জনের ওপর। লোকটি ওর বাপান্ত করছে। অপরাধী ক্ষমা চাইছে তার ভুলের জন্ত, কিন্তু আহতের মুখ দিয়ে খারাপ কথার তুবড়ী ছুটছে। লাগে নি, কিন্তু লাগতে তো পারত। এই যে লাগতে তো পারত সে সম্ভাবনা রীতিমত একটা শোকের বস্তু হয়ে দাঁড়িয়েছে। ওর পাশেই শায়িত লোকটি ওকে চুপ করতে বলছে। কে কার কথা শোনে। দেখতে দেখতে ভিড় জমে গেল সে স্থানে। আহত ও অপরাধী উভয়ের প্রতি সহানুভূতি দেখিয়ে দুটো দল দাঁড়িয়ে গেল। গোলমাল এমন অবস্থায় এসে পৌঁছেছে যে সাঁপের মুখে জার্মান প্রহরী নেমে এসে ব্যাপার কি জানতে চাচ্ছে।

অম্লান বদনে দু' পক্ষই বলে উঠল, আহতদের ক্ষত স্থানে ভীষণ যন্ত্রণা হচ্ছে। দু'জনই তখন ওঃ ওঃ করছে। প্রহরী ডাক্তারকে খবর দিতে গেল।

এক জন হঠাৎ আবিষ্কার করেছে তার মুখধোয়া সাবান ও সিগারেটের বাক্স হস্তান্তরিত হয়েছে। সকলকে শাসাচ্ছে তার জিনিষ জায়গায় রেখে দেওয়া হোক। সবাই বলছে, নিজের সম্পদ ছাড়া অপরের খড়কুটোও তারা ছোঁয় না, দেখাচ্ছেও সাবান সিগারেট বার করে। কিন্তু সবই যে একই রকম দেখতে, বুঝবে কেমন করে। কেউ কেউ দেখাতেও গররাজী, বলছে যাও ভাগো হিঁয়াসে। মোড়ল বলছে, কে নিয়েছ দিয়ে দাও। দেখে, তারই জাহাজের এক খালাসীর কাছে দু' টুকরো সাবান। 'এই টম্ তুমি নিয়েছ।' টম্ নামের স্বত্বাধিকারী হুঙ্কার দিয়ে বলে, যাও, যাও, মাতব্বরী করতে হবে না, জার্মানদের চাকর।

আরো কিছু সময় চলত, ডাক্তার এসে পড়েছেন প্রায় ভাল হয়ে উঠেছে যারা হঠাৎ সে দু'জন একই সঙ্গে ওঃ ওঃ করছে কেন তার কারণ অনুসন্ধান করতে।

সিগারেটের ধোঁয়ায় ঘর ভরে গেছে। দেড় ঘণ্টারও ওপর ধূমপান চলছে, এখনও থামাবার আদেশ আসে নি। একটির পর একটি চালিয়ে অনেকেই ক্লান্ত। তবু আগুন বাঁচিয়ে

রাখা হচ্ছে মুখে মুখে। অন্ততঃ এক জনেরও মুখে জলন্ত সিগারেট থাকা চাই। যে ক্লান্ত হলে চেঁচিয়ে বলে, নিভিয়ে ফেলেছি এখন, কার চাই আগুন। দু-তিন জন ছুটে যায়।

বারটা প্রায় বাজে, মধ্যাহ্নের আহারের অপেক্ষায় আছি। যোকল ও আর দু'জন সিঁড়ির কাছে দাঁড়িয়ে আছে প্রহরীর ইঙ্গিতের অপেক্ষায়। খাঁপ পর্য্যন্ত নাৎসীরা খাবার পৌঁছে দেয়।

আবার গুঞ্জন, চেঁচামেচি, বণ্টনকারীর চৌর্য্য, কদর্য্য শব্দের অভিধান রচনা, পেয়ালার, ডিসের, ছুরি, কাঁটা, চামচের টুং-টাং। সুপ, শূকরমাংস, আলু, পেঁয়াজ, শাক— আহারটা জমে উঠেছে, ওরা রীতিমত উপভোগ করছে। এক জন নাৎসী এসে বলল, আরো যদি চাও পাবে। আরো এল, প্রয়োজনের অতিরিক্ত।...ধরমর সুপ, রুটির গুঁড়ো...আবার ধোয়া-মোছা।...সিগারেট? হ্যাঁ, চলতে পারে...মহাস্ফূর্ত্তি।

বেঞ্চের ওপর, টেবিলের ওপর, মেঝের ওপর অনেকেই ঘুমুচ্ছে, দু-চার জন চুপচাপ বসে আছে দেয়ালে ঠেস দিয়ে, নিম্নস্বরে কেউ কেউ কথা বলছে। জার্ম্মান প্রহরী এক বার এসে দেখে গেল, বোধ হয় আশ্চর্য্য হয়েছে গুঞ্জন অকস্মাৎ একেবারে থেমে যাওয়াতে।

...আবার কোলাহল। ঘণ্টাতিনেক বিশ্রামে ফুসফুসগুলি চাঙ্গা হয়ে উঠেছে। উদ্বৃত্ত রুটির পেষণ ক্রিয়ায় অনেকগুলি মুখ নড়ছে। তাস, ড্র্যাফ্‌ট্‌, দাবা, হাসি, চীৎকার—সঙ্গে সঙ্গে অগ্রমধুর।

চব্বিশ ঘণ্টা হ'ল এখানে এসেছি। কালকের মত থাম ধরে একটি লোক দাঁড়িয়ে আছে—অন্য কোন দূরের জগতে চেয়ে আছে যেন। পাশেই এঞ্জিনটা ক্লান্তিহীন ভাবে চলছে—গর্, গর্, গর্।

হিন্দী ভাষায় লিঙ্গপ্রকরণ

শ্রীজগদীশচন্দ্র দে

আমাদের রাষ্ট্রীয় ভাষা হিন্দীই হোক আর হিন্দুস্থানীই হোক, সে ভাষার ব্যাকরণ যে হিন্দী ব্যাকরণকেই প্রধানতঃ অনুসরণ করিয়া চলিবে, তাহা একরূপ ধরিয়া লওয়া যায়।

হিন্দীর ব্যাকরণের লিঙ্গপ্রকরণ আয়ত্ত করা অন্য ভাষাভাষীর পক্ষে, বিশেষতঃ আমাদের পক্ষে অত্যন্ত অসুবিধাজনক হইবে। একটা কথা আছে ইংরেজীর উচ্চারণ আর সংস্কৃতের লিঙ্গ-প্রকরণ বিশেষ কোন ধরাবাঁধা নিয়ম মানিয়া চলে না, তাহারা আভিধানিক। কিন্তু হিন্দী লিঙ্গপ্রকরণের জটিলতার তুলনায় সংস্কৃত লিঙ্গপ্রকরণের জটিলতা কিছুই নহে। সংস্কৃত ব্যাকরণে তবু ক্লীবলিঙ্গ বলিয়া একটা লিঙ্গ আছে এবং বহু শব্দ তাহার অন্তর্গত। কিন্তু হিন্দীতে নপুংসক বলিয়া একটা লিঙ্গের নাম থাকিলেও নপুংসক লিঙ্গবোধক শব্দ খুঁজিয়া পাওয়া ভার।

অন্য ভাষাভাষীকে হিন্দী বলিতে বা লিখিতে গিয়া লিঙ্গ-বিভ্রাটের জন্য কত অসুবিধায় পড়িতে হয়, ভুক্তভোগী ছাড়া অপরে তাহা অনুমান করিতে পারিবে না। হিন্দীতে বিশেষণ-পদ, সম্বন্ধ-পদ ও ক্রিয়া-পদ বিশেষ্যপদের লিঙ্গের অনুরূপ হইবে। কাজেই কোন্ শব্দটি কোন্ লিঙ্গ তাহা না জানা থাকিলে পদে পদে অশুদ্ধি ঘটিবে।

হিন্দী ব্যাকরণের লিঙ্গপ্রকরণ সম্বন্ধে অবশ্যজ্ঞাতব্য কয়েকটি বিষয়ের আলোচনা করা যাইতেছে।

১। "পুরুষবোধক সংজ্ঞাওঁকো ব্যাকরণ মেঁ পুল্লিঙ্গ আওর স্ত্রীবোধক সংজ্ঞাকো স্ত্রীলিঙ্গ কহতে হ্যাঁয়।" (পুংলিঙ্গকে পুল্লিঙ্গ বলা হয়। হিন্দী ব্যাকরণেও পুল্লিঙ্গ দেখিতেছি)।

এটি হইল সাধারণ সূত্র। লড়কা—লড়কী, ঘোড়া—ঘোড়ী, বাঘ—বাঘিন ইত্যাদি প্রাণীবাচক শব্দের বেলায় এই সূত্র প্রযোজ্য।

২। তাহার পরেই বলা হইয়াছে:

"হিন্দী মেঁ প্রাণিবাচক সংজ্ঞাওঁকে সমান অপ্রাণিবাচক সংজ্ঞাএঁভী পুল্লিংগ বা স্ত্রীলিংগ হোতী হ্যাঁয়।"

পুং—কপড়া (কাপড়), ঘর, পথর (পাথর), পানী পেড় (গাছ)।

স্ত্রী—টোপী, ছত (ছাদ), ওস (শিশির), জড়।

৩। "কঈ এক মনুষ্যেতর প্রাণিবাচক সংজ্ঞাএঁ কেবল পুল্লিংগ য়া স্ত্রীলিংগ হোতী হ্যাঁয়।"

পুং—ভেড়িয়া (নেকড়ে), চীতা, উল্লু (পেঁচা), কছুআ (কচ্ছপ), খটমল (ছারপোকা)।

স্ত্রী—চীল, কোয়ল, তিতলী (প্রজাপতি), মক্‌খী (মাছি), জোঁক।

৪। (ক) সাধারণতঃ অকারান্ত শব্দ পুংলিঙ্গ। অনাজ (ফসল), ঘর, সির (শির), গাঁব (গাঁও)।

(খ) ঊনবাচক শব্দ ব্যতীত আকারান্ত কতকগুলি শব্দ পুং-লিঙ্গ। কপড়া, পৈসা (প্যায়সা), গন্না (আখ), আটা, মাথা।

(গ) ভাববাচক শব্দের শেষে পন বা পা থাকিলে তাহা পুংলিঙ্গ হইবে। লড়কপন (ছেলেমি), বুঢ়াপা (বার্দ্ধক্য)।

(ঘ) ক্রিয়াবাচক শব্দ পুংলিঙ্গ। আনা (আগমন), জানা (গমন), সোনা (শয়ন) ইত্যাদি।

(ঙ) আন ভাগান্ত কৃদন্ত পদ পুংলিঙ্গ। লগান, নহান, পিসান, উঠান, ইত্যাদি। ব্যতিক্রম—পহচান (চেনা), উড়ান, মুস্ক্যান (মুচকি হাসা)—ইহারা স্ত্রীলিঙ্গ)।

৫। (ক) সাধারণত ঈকারান্ত পদ স্ত্রীলিঙ্গ। চিট্ঠী, নালী,

খেতী, মিট্টি (মাটি), টোপী। ব্যতিক্রম—পানী, ঘী, জী, দহী, মোতী—ইহারা পুংলিঙ্গ

(খ) আঈ ভাগান্ত ভাববাচক শব্দ স্ত্রীলিঙ্গ। ভলাঈ, বুরাঈ, উঁচাঈ, পিসাঈ, বুনাঈ।

(গ) ইয়া ভাগান্ত পদ স্ত্রীলিঙ্গ। খটিয়া, ডিবিয়া, চুড়িয়া, পুড়িয়া, টিলিয়া, ডলিয়া।

(ঘ) উকারান্ত পদ স্ত্রীলিঙ্গ। বালু, দারু (মদ), লু, ঝাড়ু, গেরু। ব্যতিক্রম—আলু, আঁসু (অশ্রু), টেসু (পলাশ), নিম্বু (লেবু)—ইহারা পুংলিঙ্গ।

(ঙ) ত কারান্ত পদ স্ত্রীলিঙ্গ। রাত, ছত (ছাদ), বাত (কথা, ঘটনা), লাত (লাথি), ভীত (ভিত্তি)। ব্যতিক্রম—ভাত, দাঁত, খেত, সূত—ইহারা পুংলিঙ্গ।

(চ) স কারান্ত পদ স্ত্রীলিঙ্গ। প্যাস (পিপাসা), মিঠাস, কাঁস, সাঁস (শাশুড়ী)। ব্যতিক্রম—কাঁস, বাঁস (বাঁশ), নিকাস ইহারা পুংলিঙ্গ।

(ছ) ন কারান্ত কৃদন্ত পদ স্ত্রীলিঙ্গ। জলন, সহন, রহন, ইত্যাদি।

(জ) ভাববাচক শব্দের শেষে ট, বট বা হট থাকিলে স্ত্রীলিঙ্গ হইবে। ঝংঝট (ঝঞ্ঝাট), সজাবট (সাজগোজ), ঘবরাহট (ঘাবড়ান)।

৬। (ক) যে সকল উর্দু শব্দের অন্তে 'আব' আছে, সেগুলি পুংলিঙ্গ। গুলাব, জুলাব, হিসাব, জনাব, অসবাব (আসবাব) ইত্যাদি। ব্যতিক্রম—কিতাব, শরাব, তাব (তাপ)—ইহারা স্ত্রীলিঙ্গ।

(খ) যে সকল উর্দু শব্দের অন্তে 'আর', 'আন' বা 'আল' আছে, সেগুলি পুংলিঙ্গ। বাজার, ইশ্‌তিহার, সবাল (সওয়াল) হাল, মকান ইত্যাদি। ব্যতিক্রম—দুকান, সরকার, তকরার (বিবাদ)—ইহারা স্ত্রীলিঙ্গ।

(গ) পরদা, গুস্‌সা (গোসা), রাস্তা, চশমা, কিস্‌সা (কাহিনী) ইত্যাদি আকারান্ত উর্দু শব্দ পুংলিঙ্গ।

(ঘ) ঈকারান্ত উর্দু শব্দ স্ত্রীলিঙ্গ। গরীবী, ঈমানদারী, গরমী, সরদী, বীমারী, চালাকী।

(ঙ) শ কারান্ত উর্দু শব্দ স্ত্রীলিঙ্গ। নালিশ, কোশিশ (চেষ্টা), লাশ, তলাশ, মালিশ। ব্যতিক্রম—তাশ, হোশ (হুঁস)—ইহারা পুংলিঙ্গ।

(চ) হবা (হাওয়া), দবা (দাওয়া), সজা (সাজা), জমা, দুআ প্রভৃতি আকারান্ত উর্দু শব্দ স্ত্রীলিঙ্গ। ব্যতি—দগা পুংলিঙ্গ।

(ছ) তস্‌বীর (ছবি), তকদীর (ভাগ্য), তদবীর, তহসীল, তকসীল, জাগীর প্রভৃতি ঈর বা ঈল ভাগান্ত উর্দু শব্দ স্ত্রীলিঙ্গ।

৭। অর্থভেদে কতকগুলি অপ্রাণীবাচক পুংলিঙ্গ শব্দের তালিকা নিম্নে দেওয়া হইল :

(ক) দেশ, পর্বত ও সমুদ্রের নাম—ভারতবর্ষ, নেপাল, হিমালয়, লাল সমুদ্র, কালা সাগর।

(খ) গ্রহগণের নাম—সূর্য, চন্দ্র, বুধ, বৃহস্পতি, শুক্র, শনি। ব্যতি—পৃথ্বী, স্ত্রীলিঙ্গ।

(গ) সময়বোধক কয়েকটি শব্দ—বর্ষ, মাস, দিন, সপ্তাহ, পাখ (পক্ষ), পল। ব্যতি—সাঁঝ, রাত, ঘড়ী (ঘন্টা), বেলা (বেলা)—স্ত্রীলিঙ্গ।

(ঘ) ধাতুর নাম—তাঁবা, পীতল, কাঁসা, লোহা, সোনা, রূপা। ব্যতি—চাঁদী, স্ত্রীলিঙ্গ।

(ঙ) রত্নসমূহের নাম—হীরা, পন্না, নীলম, মোতী, মূঁগা, মাণিক। ব্যতি—মণি, চুন্নী স্ত্রীলিঙ্গ।

(চ) গাছের নাম—পীপল, বড়, সাগৌন (সেগুন), কদম্ব, পাকর, জামুন (জাম)। ব্যতি—নীম, ইমলী, বেরী (বদরী) স্ত্রীলিঙ্গ।

(ছ) শস্যাদির নাম—গেঁহু (গম), চাবল (চাওল), বাজরা, মটর, চনা (চানা)। ব্যতি—অরহর, মূঁগ, মসূর স্ত্রীলিঙ্গ।

(জ) তরল পদার্থ—ঘী, তেল, পানী, দহী, দুধ। ব্যতি—কাঁজী স্ত্রীলিঙ্গ।

(ঝ) ই, ঈ, এবং ঋ এই তিনটি বর্ণ স্ত্রীলিঙ্গ, এই তিনটি ছাড়া অপর বর্ণ সকল পুংলিঙ্গ।

৮। অর্থভেদে কতকগুলি অপ্রাণীবাচক স্ত্রীলিঙ্গ শব্দের তালিকা নিম্নে দেওয়া হইল :

(ক) নদী ও হ্রদের নাম—গঙ্গা, যমুনা, নর্মদা, চিল্কা।

(খ) তিথির নাম—পরিবা (প্রতিপদ), দুজ (দ্বিতীয়া), চৌথ, পূনোঁ (পূর্ণিমা) অমাবস, (অমাবস্যা)।

(গ) নক্ষত্রের নাম—অশ্বিনী, ভরণী, কৃত্তিকা ইত্যাদি।

(ঘ) মশলা প্রভৃতির নাম—লৌংগ (লবঙ্গ), ইলায়চী, সুপারী, কেসর, দালচীনী। ব্যতি—কপূর, তেজপাত পুংলিঙ্গ।

(ঙ) খাদ্যদ্রব্যের নাম—রোটি, পুরী, কচৌরী, খীর, দাল, খিচড়ী। ব্যতি—ভাত, লড্‌ডু, হলুআ পুংলিঙ্গ।

৯। আত্মা, কলম, বিনয়, গড়বড় (গোলমাল), বর্ফ, ঘাস, সমাজ, চলন প্রভৃতি কতকগুলি শব্দ উভয় লিঙ্গ।

১০। হিন্দীতে কতকগুলি তৎসম এবং প্রায় সমস্ত তদ্ভব শব্দের লিঙ্গ নির্ণয় লইয়া সবচেয়ে বেশী অসুবিধায় পড়িতে হয়। অগ্নি ও রাশি পুংলিঙ্গ এবং বস্তু, আয়ু ও জয় ক্লীবলিঙ্গ হইলেও হিন্দীতে ইহারা স্ত্রীলিঙ্গ। দেবতা ও তারা স্ত্রীলিঙ্গ হইলেও হিন্দীতে ইহারা পুং লিঙ্গ। তন্তু, বাহু ও বিন্দু পুংলিঙ্গ হইলেও উহাদের অপভ্রংশ তাঁত, বাঁহ, ও বুঁদ শব্দ স্ত্রীলিঙ্গ।

১১। সোডা, কেমরা (ক্যামেরা), কামা (comma), এলজবরা (Algebra), প্রভৃতি আকারন্ত ইংরেজী শব্দ হিন্দীতে পুংলিঙ্গ। আবার কংপনী (company), কমেটি (committee), চিমনী, পিনী, লায়ব্রেরী, জামেট্রী (Geometry) প্রভৃতি ঈকারান্ত ইংরেজী শব্দ স্ত্রীলিঙ্গ। কাপুরেন্দ

(conference), ট্রেন, সাইকল, ফীস স্ত্রীলিঙ্গ ; কিন্তু কোট, বুট, বয়র প্রভৃতি শব্দ পুংলিঙ্গ।

১২। পর্ণকুটী স্ত্রীলিঙ্গ, কিন্তু আনন্দভবন পুংলিঙ্গ। আগরা পুংলিঙ্গ, কিন্তু দিল্লী স্ত্রীলিঙ্গ।

১৩। আমরা ভেড়াকে পুংলিঙ্গ ধরিয়া স্ত্রীলিঙ্গে ভেড়ী করি, কিন্তু হিন্দীতে ভেড়ার স্ত্রীলিঙ্গ ভেড়। ভৈঁসা পুংলিঙ্গে, স্ত্রীলিঙ্গে ভৈঁস।

১৪। সাঁড় (ষাঁড়) পুংলিঙ্গ ; ইহা হইতে দুইটি স্ত্রীলিঙ্গ শব্দ হয়, দুইটিরই অর্থ ভিন্নার্থবাচক—সাঁড়নী (উঁটনী), সাঁড়িয়া (উটের বাচ্চা)।

মনবিহঙ্গ

শ্রীপঞ্চানন চক্রবর্ত্তী

হৃদয় কারার বন্দী বিহগ মাথাকুটে নিরবধি
কেন সে বেদনা অন্ত পাইবে তার।
মনবিহঙ্গ তবুও মত্ত, হিমাচল অম্বুধি,
অবিরাম ছুটে নিমিষে হবে কি পার ?

ক্লান্ত আলসে বেদনা-বন্দী দেহ-পিঞ্জর মোর,
সন্ধ্যা বাতাস, ফুল-সুগন্ধে কয়ে' ওঠে হাহাকার ;
ওরে নির্ম্মম এত আলো গান সব হয়ে যাবে ভোর,
মনবিহঙ্গ তবুও মত্ত, নিমিষে হবে কি পার ?

মেঘমন্দ্র, সুনিবিড় নভে দুর্ব্বার ঝটিকার,
হাহাকার ওঠে, শ্যাম-অরণ্যে কাঁদে বনমর্ম্মর ;
বেদনাবন্দী দেহপিঞ্জর, ঘন ঘন মূরচ্ছার ;
মনবিহঙ্গ অবিরাম ছুটে নাহি ভয় নাহি ডর।

ওরে বিহঙ্গ ! চঞ্চল পাখী তারুণ্যে ভরা প্রাণ,
বাধা না মানিস, লুটেপুটে নিস দুর্দ্দাম দুর্ব্বার ;
ক্ষুধাতুর তুই গতিপথে দিস নব জাগরণী গান,
ঘন তমসায় পার হয়ে যাস দুস্তর পারাবার।

শৃঙ্খলহীন, রে, চিরনবীন, মনবিহঙ্গ মোর,
অসীমের সাথে মিতালীর তরে, করে বুঝি আঁখিলোর।

দক্ষিণ-খানপুরের প্রত্ন-সম্পদ

শ্রীবিজয়গোপাল বসু

খানপুর খুলনা-বাগেরহাটের অন্তর্গত একটি ঐতিহাসিক পল্লী। ইহার পরিমাণ অনুমান হয় বর্গমাইল। চক্রশ্রী-দুর্গাধ্যক্ষ খুয়াজিম খেগের বীরত্বের এবং প্রভুভক্তির স্মারক চিহ্ন স্বরূপ, তাঁহার অধ্যুষিত ভূখণ্ডকে "খানপুর" নামে অভিহিত করা হইয়াছে। "খান" পারস্য শব্দ—সেনাপতি অর্থ-সংজ্ঞক। খানপুর গ্রামটি স্বাধীন বাংলার বীর-স্মৃতি বহন করিতেছে।

এই গণ্ডগ্রাম বর্তমানে চারি ভাগে বিভক্ত হইয়া বিভিন্ন নাম ধারণ করিয়াছে।—দক্ষিণ-খানপুর, উত্তর-খানপুর, পার-মধুদিয়া এবং রণভূমি। দক্ষিণ-খানপুর রাজা বসন্ত রায় এবং মহারাজ প্রতাপাদিত্যের চক্রশ্রী দুর্গের সান্নিধ্যে অবস্থিত।

এই দক্ষিণ-খানপুরে বহু পুরা কীর্তি-চিহ্ন বিদ্যমান। প্রাচীন রাজপথ, রাজবাড়ী, প্রকাণ্ড দীর্ঘিকা, বেদের পুকুর, তেলির পুকুর, বাজাদারের পুকুর, বাবর্চির পুকুর, ঘটক ভিটা, নাপিত ভিটা, বামুন ভিটা, বেদের মাঠ, হাতিবেড়ের পুকুর প্রভৃতি অতীত ঐশ্বর্য্যসূচক নিদর্শনসমূহ অদ্যাপি ঐতিহাসিকের হৃদয় পুলকপূর্ণ করে, মন আনন্দমগ্ন করে, এবং চিন্তাধারা কল্পনাময় করে।

রাজার আশ্রয়ে সাধু-সন্ন্যাসিগণ স্বচ্ছন্দে বাস করেন। পূর্ব্বে ভগবচ্চিন্তান্বিত জনহিতব্রতীদের যাহাতে অন্নচিন্তা-জনিত ক্লেশ না হয় তজ্জন্য নিষ্কর ভূমি আদি প্রদান করিয়া ভূমিপতিগণ ধর্মকর্মের উৎসাহবর্দ্ধন করিতেন। হাতী যেখানে থাকিত তাহার নাম হাতিবেড়। হাতিবেড়ের পার্শ্ববর্তী কুড়ি বিঘা পরিমিত সন্ন্যাসীর মাঠ আজিকার দিনে বিশেষ প্রভাব চক্ষে দৃষ্ট হয়। সংসারত্যাগী, দেবোপম কোন সাধুসজ্জন এক-কালে এখানে ধ্যানধারণা করিতেন এবং রাজা এই জমি তাঁহাকে উৎসৃষ্ট করিয়াছিলেন।

নদীপরিবেষ্টিত, দ্বীপসদৃশ ভূখণ্ডের প্রাকৃতিক শোভায় রাজা বসন্ত রায় ষোড়শ শতাব্দীতে রাজকার্য্য পরিচালন জন্য দক্ষিণ-খানপুরে প্রাসাদ নির্ম্মাণ করেন। মধ্যে মধ্যে তিনি এখানে বাস করিতেন, তাঁহার পুত্রগণও থাকিতেন।

সমগ্র বঙ্গের স্বাধীনতা বিঘোষিত করিয়া মহারাজ প্রতাপাদিত্য যখন সিংহাসনে অধিরোহণ করিলেন তখন চক্রশ্রীর গৌরবগরিমা অধিকতর বর্দ্ধিত হয়। মহারাজ দুর্গ পরিদর্শনার্থ আগমন করিয়া খুল্লতাত-নির্ম্মিত বাটীতে অবস্থিতি করিতেন। সপ্তদশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে (১৬১০-১১ খ্রীষ্টাব্দে) মহারাজের পতন হইলে, বসন্ত রায়ের পুত্র রমাকান্ত এখানে স্থায়ী ভাবে বাস করেন। ইতিহাসপ্রসিদ্ধ কচু রায় তাঁহার বৈমাত্রেয় ভ্রাতা। ঐশ্বর্য্যশালী খানপুর রাজবাটী অধিকার

করায় কছু রায় ইঁহাকে দেশস্থ অন্ত সম্পত্তির অধিকার হইতে বঞ্চিত করেন। রঘাকান্তের পর প্রতাপের ভ্রাতুষ্পুত্র মুকুটমণি এই প্রকৃতিসুন্দর স্থানে বাস করিতে থাকেন। তখন মোগল সৌভাগ্যরবি অস্তগমনোন্মুখ। সুতরাং মুকুটমণি খানপুরকে সমৃদ্ধ নগরীতে পরিণত করিবার প্রয়াস পান। স্থানে স্থানে জলাশয়ের চিহ্ন তখনকার দিনের এক একটি বস্তির পানীয় জলের আধার সূচিত করে। প্রয়োজনীয় সমস্ত জিনিষই এখানে সুলভ ছিল। প্রান্তদেশে পণ্যদ্রব্য ক্রয়-বিক্রয়ের জন্য যে গঞ্জ প্রতিষ্ঠিত ছিল, উত্তরকালে দুগ্ধ-ব্যবসায়ীদের আধিক্য হেতু তাহা "ঘোষের হাট" নাম ধারণ করে।

মগদস্যুদের অত্যাচারভয়ে মুকুটমণি এই স্থান পরিত্যাগ করিয়া দুই ক্রোশ উত্তরে উৎকুল গ্রামে বসতি স্থাপন করেন।

তাহার সঙ্গে সঙ্গে দক্ষিণ-খানপুরও হতশ্রী হইয়া পড়ে। এই জনপদ অচিরকাল মধ্যে একরূপ জনশূন্য হইয়া যায়। যাহারা অবশিষ্ট রহিলেন নিদারুণ অর্থকৃচ্ছ্রতায় স্থানান্তর গমন তাঁহাদের অসাধ্য ছিল। পরিত্যক্ত স্থান এখন জলময়—পুষ্করিণীগর্ভে কৃষিকার্য্যের স্থল এবং কিঞ্চিদবশিষ্ট রাজপথ শ্বাপদকুলের স্বচ্ছন্দ বিচরণভূমি।

ঊনবিংশ শতাব্দীতে কোম্পানীর রাজত্বকালে খানপুরের ঐতিহাসিকতায় মনোহারিত্বে এবং উর্ব্বরতায় মুগ্ধ হইয়া শ্বেতাঙ্গ বণিকগণ এখানে নীলের চাষ এবং ব্যবসায় করেন। তাহার স্মৃতির ক্ষীণ অবশেষ এখনও গত বৈভবের কথা স্মরণ করাইয়া দেয়।

বিংশ শতাব্দীতে স্থানীয় ভূম্যধিকারী—গোবরডাঙ্গার বিখ্যাত মুখোপাধ্যায় বংশীয়গণ এই ঐতিহাসিক ক্ষেত্রের নষ্ট সমৃদ্ধির উদ্ধারের জন্য এখানে একটি ধর্ম্মাধিকরণ গঠন করেন। কিছুকাল এই প্রতিষ্ঠানটি আড়ম্বরের সহিত কার্য্য করিয়াছিল। কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয় বর্ত্তমানে কালের অভিসম্পাতে ইহাও বিগতশ্রী।

প্রাচীন কালের গ্রাম্য দেবতার পূজাস্থান কালীবাড়ী নামে পরিচিত। তথায় সপ্তাহে দুই দিন করিয়া হাট বসিয়া থাকে। গ্রামবাসিগণের উদ্যোগে প্রতি বৎসর বিশেষ জাঁকজমকের সহিত বারোয়ারি পূজা হইয়া থাকে। এতদুপলক্ষ্যে কবিগান হয়।

দক্ষিণ-খানপুরের অধিবাসিগণ নিজগ্রামে একটি উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস-চ্যান্সেলর, গুরুসদয় দত্ত-প্রতিষ্ঠিত "ব্রতচারী" শিক্ষাকেন্দ্রের শিক্ষকগণ, মহকুমাপতি ও অন্যান্য রাজ-কর্ম্মচারী এবং দেশস্থ অপরাপর শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিদের সাময়িক শুভাগমন প্রাণহীন নগরীর হৃদয়ে স্পন্দনের সঞ্চার করিতেছে।

পুস্তক-পরিচয়

নাট্য-সাহিত্যের ভূমিকা—শ্রীবিভাস রায় চৌধুরী। দি বুক এম্পরিয়ম লিমিটেড, ২২।১ কর্ণওয়ালিস স্ট্রীট, কলিকাতা। পরিবর্ধিত দ্বিতীয় সংস্করণ—মূল্য তিন টাকা।

শ্রীযুক্ত বিভাস রায় চৌধুরী এম্-এ-র লেখা "নাট্য-সাহিত্যের ভূমিকা" বইখানি পড়িয়া বিশেষ খুশী হইয়াছি। এই রকম একখানি বইয়ের আবশ্যকতা বাঙালী পাঠকমহলে—বিশেষতঃ ছাত্রমহলে—বহুদিন ধরিয়া অনুভূত হইতেছিল; বিভাস বাবুর বই সেই আবশ্যকতা বহুল পরিমাণে মিটাইয়াছে। ইহাতে নাটকের পূর্ণ ও সর্বাঙ্গীণ আলোচনা আছে—আধুনিক সাহিত্য-চর্চার রীতি অনুসারে বিভিন্ন দিক্ হইতে নাট্য-সাহিত্যের বিচার ও বিশ্লেষণ অতি উপাদেয় ভাবে করা হইয়াছে। নাটকের যে বিষয় এবং প্রকাশগত বৈচিত্র্য আধুনিক সাহিত্যে আমাদের বিস্ময় উৎপাদন করে, সেই বৈচিত্র্য ভারতীয়, গ্রীক প্রভৃতি একটি জাতির প্রাচীন সাহিত্যে সমগ্রভাবে মিলে না। এইজন্য নাটকের সম্পূর্ণাঙ্গ আলোচনা, সর্বজন বা বিশ্বগ্রাসী আধুনিক সাহিত্যের (ইংরেজী প্রভৃতি ভাষার সাহিত্যের) আধারেই সম্ভবপর হয়। গ্রন্থকার প্রায় সমগ্রভাবে বিভিন্ন প্রকারের নাটকের প্রসঙ্গ করিয়াছেন। প্রাচীন গ্রীক 'ত্রাগোইদিআ' বা 'ট্রাজেডী' অর্থাৎ দুঃখময় নাটক, শেক্স্পিয়রের বিভিন্ন রসের নাটক, সংস্কৃত রোমান্টিক কমেডী বা রসকলাসময় মিলনাত্মক নাটক, এইরূপ নানা নাটকীয় প্রকারভেদ অনুধাবন না করিতে পারিলে নাটকের রসের আস্বাদন অপূর্ণ থাকিয়া যায়। সব কথার সঙ্গে একটু আধটু পরিচয় নাট্যামোদীর নিকট বিশেষভাবে অপেক্ষিত। শ্রীযুক্ত বিভাস রায় চৌধুরী মহাশয়ের নাতিবৃহৎ এই বইখানিতে বাঙালী পাঠক সংক্ষেপে জানিবার ও চিন্তা করিয়া দেখিবার জন্য নাটক সম্বন্ধে মুখ্য কথাগুলি পাইবেন। এই বইয়ের দ্বিতীয় সংস্করণ অল্পকালের মধ্যে আবশ্যক হওয়ায় বোঝা যায় যে, এই বইয়ের দ্বারা একটি অভাব পূরণ হইয়াছে। পরিবর্ধিত দ্বিতীয় সংস্করণ আশা করি আরও লোকপ্রিয় হইবে।

শ্রীসুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়

স্বদেশী গান (২য় সংস্করণ)। কংগ্রেস-সাহিত্য-সঙ্ঘের পক্ষ হইতে শ্রীঅমরনাথ বসু কর্তৃক সম্পাদিত। প্রকাশক—ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েটেড পাবলিশিং কোম্পানি লিঃ, ৮সি রমানাথ মজুমদার স্ট্রীট, কলিকাতা। পৃ. ৫২, মূল্য আট আনা।

বাংলায় দেশানুরাগের গান রচিত হইতে আরম্ভ হয়—প্রকৃতপক্ষে, কংগ্রেসের অগ্রদূত—চৈত্রমেলা বা হিন্দুমেলার সময় হইতে (এপ্রিল ১৮৬৭)। মেলার জন্য রচিত এবং মেলায় গীত স্বদেশী গানগুলি চৈত্রমেলার ২য় ও ৩য় বার্ষিক বিবরণে মুদ্রিত হইয়াছিল। এই সকল গানের মধ্যে অন্ততঃ দুইটি—সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুরের "মিলে সবে ভারত-সন্তান" ও মেলার সম্পাদক গণেন্দ্রনাথ ঠাকুরের "লজ্জায় ভারত-যশ গাহিব কি করে"—বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য। গানগুলি জনপ্রিয় হওয়ায় মেলার প্রতিষ্ঠাতা নবগোপাল মিত্র সেগুলি একত্র করিয়া, 'স্বদেশানুরাগোদ্দীপক সঙ্গীত' নামে প্রকাশ করেন (ফেব্রুয়ারি ১৮৭৮)। এই হিন্দুমেলার যুগে দ্বারকানাথ গঙ্গোপাধ্যায়ও 'জাতীয় সঙ্গীত' নামে একটি স্বদেশী গানের সংগ্রহ প্রকাশ করিয়াছিলেন (ফেব্রুয়ারি ১৮৭৬)। অতঃপর বঙ্গভঙ্গ-আন্দোলনের সময় অনেকগুলি স্বদেশী গানের সংগ্রহ প্রচারিত হয়; দৃষ্টান্তস্বরূপ ১৯০৫ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত যোগীন্দ্রনাথ সরকারের দুই ভাগ 'বন্দে মাতরম্', জলধর সেনের 'জাতীয় উচ্ছ্বাস', যোগেন্দ্রনাথ শর্মার 'স্বদেশ সঙ্গীত' ও ১৯০৮ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত শ্রীনলিনীরঞ্জন সরকারের দুই ভাগ 'বন্দনা'র উল্লেখ করা যাইতে পারে।

গত বৎসর সাময়িক-পত্রে পড়িয়াছিলাম, নব-প্রতিষ্ঠিত কংগ্রেস-সাহিত্য-সংঘ একটি পুণ্যকর্মে হস্তক্ষেপ করিয়াছেন, তাঁহারা সমগ্র জাতীয় সঙ্গীতের একটি সংগ্রহ সংকলন করিতেছেন। দেখিতেছি, তাঁহারা বোধ হয় সে সঙ্কল্প বর্জন করিয়াছেন এবং "স্বল্প পরিসরের মধ্যে সুপরিচিত অল্প কয়েকটি গান মাত্র একত্র করিয়া" আলোচ্য পুস্তকখানি প্রকাশ করিয়াছেন। এরূপ করিয়া তাঁহারা ভাল করিয়াছেন, কি মন্দ করিয়াছেন, বলিতে পারি না। তবে "এই সংগ্রহটি যে কোন দিক দিয়াই সম্পূর্ণতার দাবি করে না" ইহা সত্য। কিন্তু তবুও আমাদের মনে হয়, আরও দু-একটি অতি-সুপরিচিত গানের অভাবই এই স্বল্প-পরিসর পুস্তকের গুণাপকর্ষণ করিয়াছে। কংগ্রেসে গীত কয়েকটি গান এই পুস্তকে মুদ্রিত হইয়াছে; এমন কি, "বন্দে মাতরম্" গানের যে অংশটুকু কংগ্রেসে গাওয়া হয়, তারকা-চিহ্নিত করিয়া পাদটীকার সাহায্যে সম্পাদক সযত্নে তাহার প্রতি আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছেন।

কিন্তু এই কংগ্রেসেই গীত অন্ততঃ দুইটি অতি-সুপরিচিত গান যে কেমন করিয়া কংগ্রেস-সাহিত্য-সংঘ-প্রচারিত 'স্বদেশী গানে' স্থানলাভে বঞ্চিত হইল, তাহা বুঝিয়া উঠা কঠিন। আমি দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুরের "মলিন মুখচন্দ্রমা ভারত তোমারি" অথবা মনোমোহন বসুর "দিনের দিন সবে দীন হয়ে পরাধীন" প্রভৃতি সর্বজনপরিচিত স্বদেশী গানের কথা ছাড়িয়াই দিতেছি; যে-দুইটি গানের কথা বলিতেছি, তাহার একটি চৈত্রমেলা ও কংগ্রেসে সগৌরবে গীত, সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুরের "মিলে সবে ভারত-সন্তান, একতান মনপ্রাণ, গাও ভারতের যশোগান,"—যে গানটির সম্বন্ধে একদা সাহিত্য-সম্রাট্ বঙ্কিমচন্দ্র 'বঙ্গদর্শনে' (চৈত্র ১২৭৯) লিখিয়াছিলেন :—
"এই মহাগীত ভারতের সর্বত্র গীত হউক। হিমালয়-কন্দরে প্রতিধ্বনিত হউক! গঙ্গা যমুনা সিন্ধু নর্মদা গোদাবরী-তটে বৃক্ষে২ মর্মরিত হউক! পূর্ব পশ্চিম সাগরের গম্ভীর গর্জনে মন্দ্রীভূত হউক! এই বিংশতি কোটি ভারতবাসীর হৃদয়-যন্ত্র ইহার সঙ্গে বাজিতে থাকুক!" অপর গানটি ১৯০১ সালে কলিকাতায় অনুষ্ঠিত কংগ্রেসে গীত সরলা দেবী রচিত "অতীত-গৌরব-বাহিনি মম বাণি! গাহ আজি 'হিন্দুস্থান'! মহাসভা-উন্মাদিনি মম বাণি! গাহ আজি 'হিন্দুস্থান'!"

সম্পাদক বাংলা গানের সংগ্রহের মধ্যে যখন দুই-তিনটি হিন্দী-উর্দু গানও সন্নিবিষ্ট করিয়াছেন, তখন বঙ্গভঙ্গ-আন্দোলনের সময় সর্বত্র গীত এবং কংগ্রেস-মঞ্চ হইতে ধ্বনিত, 'হিতবাদী'-সম্পাদক কালীপ্রসন্ন কাব্য-বিশারদের "ভেইয়া দেশ্ কা এ কেয়া হাল্" নামক সুপরিচিত হিন্দী গানটিও পুস্তকে মুদ্রিত করিলে ভালই করিতেন। গানটি একাধিক স্বদেশী গানের সংগ্রহে স্থান পাইয়াছে, দৃষ্টান্তস্বরূপে সরস্বতী লাইব্রেরি-প্রকাশিত স্বরাজসঙ্গীত 'অর্ঘ্যে'র নাম করা যাইতে পারে।

"এক সূত্রে বাঁধিয়াছি সহস্রটি মন" গানটি সর্বপ্রথম জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'পুরুবিক্রম' নাটকের ২য় সংস্করণে মুদ্রিত হইয়াছিল, এই কারণেই বোধ হয়, গানটির রচয়িতা হিসাবে জ্যোতিরিন্দ্রনাথের নাম বর্তমান পুস্তকে মুদ্রিত হইয়াছে। জ্যোতিরিন্দ্রনাথের নাটকে রবীন্দ্রনাথের অনেক গান স্থান পাইয়াছে; আলোচ্য গানটিও যে রবীন্দ্রনাথের, তাহা আমরা কবির মুখেই শুনিয়াছি এবং এ সংবাদ সাময়িক-পত্রেও প্রকাশিত হইয়াছে। 'স্বদেশী গানে'র পরবর্তী সংস্করণে এই ভুলটির সংশোধন বাঞ্ছনীয়।

আশা করি, আগামী সংস্করণে সম্পাদক পুস্তকখানি পূর্ণাঙ্গ করিবার চেষ্টা করিবেন।

শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

মরা নদী—শ্রীপৃথ্বীশচন্দ্র ভট্টাচার্য। গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স, ২০৩।১।১ কর্ণওয়ালিস স্ট্রীট, কলিকাতা। দাম তিন টাকা।

গ্রন্থকার সুলেখক। ছোট গল্প লিখিয়া পৃথ্বীশচন্দ্র সুখ্যাতি অর্জন করিয়াছেন। বর্তমানে তিনি উপন্যাসে হাত দিয়াছেন। "মরা নদী" উপন্যাস। বিষয়-বস্তু একটু নূতন ধরণের। ভূমিকায় গ্রন্থকার লিখিতেছেন, "হিন্দুসমাজ আগে যাহাদিগকে অনুন্নত রাখিয়া, যাহাদের উপর নির্ভর করিয়া শক্তিশালী ছিল, আজ তাহারা নাই, তাই সমাজ-শৃঙ্খলার তাসের ঘর ভাঙিয়া গিয়াছে।...কন্যাপণ-প্রথা হেতু দরিদ্র ব্যক্তি বিবাহ করিতে পারে নাই অথবা বিপত্নীক বা অনূঢ় অবস্থায় কোন বাল-বিধবার সহিত গৃহ নির্মাণ করিয়াছে। সমাজ তাহার গৃহকে অস্বীকার করে নাই, কোন রকম একটা অজুহাতে ক্ষমা করিয়াছে। কিন্তু উহার সন্তানকে কখনও স্বীকার করে নাই—তাই হিন্দু-পল্লী ক্রমশঃ পোড়ো ভিটায় পরিণত হইতে চলিয়াছে।" কিন্তু মত প্রতিষ্ঠা করিতে গিয়া গ্রন্থকার কোথাও কাহিনীকে ব্যাহত করেন নাই। অভিজ্ঞতার উপর নির্ভর করিয়াছেন বলিয়া চরিত্রগুলি জীবন্ত হইয়া উঠিয়াছে। যাঁহাদের পল্লীজীবনের সহিত সাক্ষাৎ পরিচয় আছে তাঁহাদের নিকট গুরুচরণ, রসিক, কুসুম অথবা দিগম্বরী কেহই অপরিচিত নয়; বিরাট কৃষক-সম্প্রদায়-ভুক্ত ইহারা সকলেই পল্লীর আপন। বালবিধবা কুসুমের করুণ কাহিনী মনের উপর ছাপ রাখিয়া যায়। উপন্যাসখানি প্রকৃতপক্ষে শেষ হইয়াছে ২৩২ পৃষ্ঠায়, ইহার পর আর কয় পৃষ্ঠায় যে আকস্মিকতার অবতারণা করা হইয়াছে তাহা হয়ত ছোট গল্পে কখনও কখনও চলিতে পারে, উপন্যাসে তাহা পরিহার্য। কুসুম-চরিত্রের পরিণতির পক্ষে ইহা আবশ্যক নহে। শুধু যে সমাজ-দরদীই পুস্তকখানির মধ্যে প্রচুর চিন্তার খোরাক পাইবেন তাহা নহে, পাঠক নূতন বিষয়-বস্তুর আস্বাদনাতে যথেষ্ট আনন্দ পাইবেন।

বিংশ শতাব্দীর বিশ্ব—শ্রীজগদানন্দ বাজপেয়ী। রঞ্জন পাবলিশিং হাউস, ২৫।২ মোহনবাগান রো, কলিকাতা। মূল্য এক টাকা।

কবিতার বই। কবিতাগুলি জাতীয়তামূলক, বন্দীনিবাসে রচিত, এবং মোটেই গতানুগতিক নয়। আজিকার ছন্দহীনতার দিনে লেখকের ছন্দ এবং মিলের উপর আধিপত্য দেখিয়া আনন্দিত হইতে হয়। কবিতা স্বচ্ছন্দ গতিতে প্রবহমাণ; সেগুলি শুধু আবেগময় নয়, তাহাদের মধ্যে চিন্তাশক্তির পরিচয় পাওয়া যায়। লেখকের দৃষ্টি তীক্ষ্ণ, তাঁহার কৌতুকবোধ আছে এবং তিনি বিদ্রূপ করিতেও জানেন।

দেশের মাটিতে নাহি রয় যদি মানস-তরুর মূল
ফোটে ছুনিয়ার অকূল তরঙ্গে অলীক বকফুল।

কবির প্রতি তিনি বলিতেছেন,

নিপীড়িত নর-আত্মার ব্যথা কণ্ঠে গুমরে রুদ্ধ-বাক্
হে কবি, তোমার বাঁশরী-রন্ধ্রে মৌন সে ব্যথা মুক্তি পা'ক।

"জগতের অন্তু-গৃহ" জ্বালাময় কবিতা। "ডায়ালেক্টিক ডুয়েট গান" উপভোগ্য। "বিংশ শতাব্দীর বিশ্ব" পাঠকের মনে প্রেরণা এবং আনন্দের সঞ্চার করিবে।

লুকিয়ে থাকে প্রেম—শ্রীচিত্রিতা দেবী। অর্চনা পাবলিশিং, ৮ বি রমানাথ সাধু লেন, কলিকাতা। দাম দেড় টাকা।

দশটি ছোট গল্পের সমষ্টি। প্রথম গল্পের নামে পুস্তকের নামকরণ হইলেও প্রায় সব কটি গল্পের অন্তর্নিহিত বার্ত্তা নামটিকে সার্থক করিয়াছে। আজকাল সাময়িক পত্রে অবিরাম গতিতে গল্পের বন্যা বহিয়াছে, তৎসত্ত্বেও ভাল ছোট গল্প পাইলে সাহিত্য-রসিকের মন উৎফুল্ল হইয়া উঠে। ছোট গল্পের ক্ষেত্রে নবাগতা এই লেখিকার নিজস্বতা আছে। "রাজার ঐশ্বর্য্যের জঞ্জালের মধ্যে লুকিয়ে থেকে যে প্রেম বীরকে দিয়ে করিয়ে নেয় কঠিন সাধনা, সেই প্রেমই কবিকে দিয়ে বাঁশী বাজিয়ে শোনায় তার প্রিয়াকে।"—প্রথম গল্পের চরিত্রগুলির মধ্যে চিরদিনের এই সত্যটি জীবন্ত হইয়া উঠিয়াছে। প্রত্যেক গল্পেই কিছু-না-কিছু বৈশিষ্ট্য আছে, কিন্তু শেষ গল্প "নারী"তে আনন্দ-বেদনা-স্নেহ-উৎকণ্ঠা-আশা-আকর্ষণময় বৈপরীত্যে অপরূপ মায়ের প্রাণ অতি সূক্ষ্ম নৈপুণ্যে অঙ্কিত হইয়াছে। গল্পগুলি পাঠকের চিত্তকে আনন্দিত করিবে।

শ্রীশৈলেন্দ্রকৃষ্ণ লাহা

ইতিহাসের শিক্ষা ও ভারতের রাজনৈতিক কর্ম্মসূচী—কুমার শ্রীবিমলচন্দ্র সিংহ, এম্. এ., এম্. এল. এ। প্রাপ্তিস্থান—ডি, এম্, লাইব্রেরী, কলিকাতা, পৃষ্ঠা ১৪৮, মূল্য ৩৲ টাকা।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের শেষে সমস্ত জগতে যে বৈপ্লবিক পরিবর্ত্তন দেখা দিয়াছে এবং দেশে দেশে যে জনজাগরণ প্রবল হইয়া উঠিয়াছে তাহার সহিত ভারতবর্ষের সম্পর্ক কি এবং ঐতিহাসিক দৃষ্টিতে ইহাদের মূল্য ও সার্থকতাই বা কি, এক কথায় বর্ত্তমান পরিস্থিতির বাস্তবতা ও এই বাস্তবতার ভিত্তিতে ভবিষ্যতের পথ-নির্দ্দেশের সন্ধান লওয়াই গ্রন্থকারের আলোচনার উদ্দেশ্য। জগতে কোন জিনিষই হঠাৎ সম্ভব হইয়া উঠে না, ইহা বৈজ্ঞানিক সত্য। বিপ্লবও ক্রমবিকাশেরই একটি রূপমাত্র—যদিও এই বিকাশের গতি খুবই দ্রুত। লেখক ইউরোপের নানা দেশ, বিশেষ ভাবে আয়ার্ল্যাণ্ড ও এসিয়ার চীনের সহিত ভারতের ভাগ্যের ও প্রগতির তুলনা করিয়া খুব নিপুণ ভাবে এই উভয় দেশেই সাম্রাজ্যবাদীর লীলাখেলার অদ্ভুত সামঞ্জস্য দেখাইয়াছেন। আয়ার্ল্যাণ্ডের ও ভারতবর্ষের পাকিস্থানী পার্টিসন যুক্তির কি আশ্চর্য্য মিল! প্যালেষ্টাইন, ইন্দোচীন মালয় ও জাভা সর্ব্বত্রই সাম্রাজ্যবাদীর একই কূটনীতি। আজ সাম্রাজ্যবাদের অন্তর্দ্বন্দ্ব তাহার নিজের ধ্বংসের কারণ হইয়াছে। কিন্তু গণশক্তির আঘাত না আসিলে যে আরও বহুকাল সাম্রাজ্যবাদী শোষণ চলিবে ইহাতে সন্দেহ নাই। লেখক বলেন, "ইতিহাসের শিক্ষা হতেই আমরা দেখি যে সাম্রাজ্যবাদ আপনা আপনি যায় একথা কখনও সত্য নয়। বিপ্লব স্বতস্ফূর্ত্ত হবে এ কথা ভুল, জনমত উদ্বুদ্ধ হয়েছে বলে আজ যে কথা উঠেছে সে জনমত প্রকৃত বৈপ্লবিক কিনা সে কথা না বুঝে তার উপর ভরসা করা চলে না।" নানাদেশের বৈপ্লবিক

অনিন্দ্য
অলকের
আকর্ষণ
রাঙাজবা
কেশতৈল
অনুরূপা কেমিক্যাল :: কলিকাতা

আন্দোলন হইতে ভারতবর্ষ শিক্ষালাভ করিয়াছে, নিজের দুঃখ, দৈন্য এবং শোষণ হইতেও সে শিখিয়াছে। আজ ভারত বিপ্লবের পথ বাছিয়া লইয়া থাকিলে (হউক তাহা অহিংস) ইতিহাসের দ্বারাই এই পথের নির্দেশ দিয়াছে। পুস্তকে উদ্ধৃত বহু ইংরেজী বাক্যের অনুবাদ না দেওয়ায় ইংরেজী অনভিজ্ঞ পাঠকের অসুবিধা হইবে। আশা করি ভবিষ্যৎ সংস্করণে এই ত্রুটি দূর করা হইবে। এরূপ সময়োপযোগী অথচ যুক্তিপূর্ণ এবং চিন্তামূলক গ্রন্থ চিন্তাশীল পাঠকের মানসিক খোরাক যোগাইবে ইহাতে আমাদের সন্দেহ নাই। আশা করি এরূপ গ্রন্থের বহুল প্রচার হইবে।

কচুরী পানা—রায় শ্রীদেবেন্দ্রনাথ মিত্র বাহাদুর প্রণীত। প্রাপ্তিস্থান—গ্লোব নার্শারি, শ্যামবাজার, কলিকাতা, পৃষ্ঠা ৪২, মূল্য ।০ আনা।

গ্রন্থকার এই ক্ষুদ্র পুস্তিকায় কচুরী পানা সংক্রান্ত সকল বিষয় অতি সরল ভাষায় বর্ণনা করিয়াছেন। কচুরী পানা বাংলাদেশের শস্য ও স্বাস্থ্য কি ভাবে নষ্ট করিয়েছে তাহা কাহারও অজ্ঞাত নাই। এই বিষয়ে দেশের গবর্ণমেণ্ট সজাগ হইয়াছেন। কিন্তু সাধারণের উৎসাহপূর্ণ সহযোগিতা না পাইলে গবর্ণমেণ্টের পক্ষেও ইহাকে নির্মূল করা সম্ভব নহে। কোন বৈজ্ঞানিক উপায়েও ইহাকে ধ্বংস করা সম্ভব হয় নাই। দক্ষিণ ও উত্তর আমেরিকার উষ্ণতাপ্রধান দেশসমূহে পর্য্যাপ্ত কলকব্জা ও রাসায়নিক পদার্থের সাহায্যেও ইহার ধ্বংস সাধন সম্ভব হয় নাই। লেখকের মতে ইহার বিনাশের একমাত্র উপায় "তোলো আর মারো"—এই সনাতন আদিম পদ্ধতি। কচুরী পানাকে ধ্বংস করিয়া ইহা হইতে জমির একপ্রকার সার প্রস্তুত করা যাইতে পারে। কিরূপে ইহা করা যায় লেখক সুন্দরভাবে তাহা বর্ণনা করিয়াছেন এবং চিত্র দ্বারা বুঝাইয়া দিয়াছেন। পুস্তকের প্রথমে কাজী নজরুল ইস্‌লামের 'কচুরী পানা' শীর্ষক গানটি দেওয়া হইয়াছে। পুস্তকের শেষে পতিতপাবন বন্দ্যোপাধ্যায় লিখিত "কচুরী পানার ছড়া" বইখানিকে সরস ও সুন্দর করিয়াছে। নিতান্ত প্রচার-পুস্তিকা হইলেও ইহাতে সাহিত্যরস আছে এবং এইজন্যই এরূপ গ্রন্থের বহুল প্রচার বাঞ্ছনীয়। বাংলার প্রত্যেক গৃহে ও গ্রন্থাগারে ইহা আদৃত হওয়া উচিত।

শ্রীঅনাথবন্ধু দত্ত

সেরা লিখিয়েদের সেরা গল্প—(প্রথম খণ্ড) শ্রীসুধাংশুকুমার গুপ্ত, কমলা পাবলিশিং হাউস, ৮-১এ, হরিপাল লেন, কলিকাতা। মূল্য ১৲ টাকা।

বিদেশের শ্রেষ্ঠ পাঁচজন সাহিত্যিকের শ্রেষ্ঠ পাঁচটি গল্প বাংলার কিশোর-কিশোরীদের জন্য অনুবাদ করিয়া এই পুস্তিকায় সন্নিবিষ্ট করা হইয়াছে; অধিকন্তু গল্পগুলির লেখকদের সংক্ষিপ্ত জীবনীও

প্রত্যেকটি গল্পের উপরিভাগে ভিন্ন কালিতে মুদ্রিত করিয়া প্রকাশক সৌন্দর্য্যবোধের পরিচয় প্রদান করিয়াছেন। গল্পগুলি সুনির্ব্বাচিত, সু-অনুবাদিত এবং সচিত্র। ছাপা ও বাঁধাই অতি সুন্দর। আমরা দ্বিতীয় খণ্ডের অপেক্ষায় রহিলাম।

জাপানের বন্দী—শ্রীসুশীলকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, ৯নং কুটিঘাট রোড।

"সাম্রাজ্যবাদী জাপানের বীভৎস অত্যাচারের কাহিনী" লইয়া লিখিত ছোটদের উপন্যাস। লেখক গল্পটিতে যথেষ্ট গতিবেগ দান করিয়াছেন তাঁহার রচনাভঙ্গীর বৈশিষ্ট্য দ্বারা। স্থানে স্থানে অতিশয়োক্তি এবং একদেশদর্শিতা দৃষ্ট হইলেও পরাধীনতার ব্যথা-বেদনা এবং ভারতের আশা-আকাঙ্ক্ষার অনেক কথাই মনকে নাড়া দেয়। কয়েকটি চরিত্রের দৃঢ়তা ও তেজস্বিতা প্রশংসনীয়।

কথা চয়ন—সম্পাদক—শ্রীরঞ্জিতকুমার চট্টোপাধ্যায়, ১২, হরিতকী বাগান লেন, মূল্য পাঁচ সিকা।

বাংলার বিখ্যাত কয়েকজন গল্পলেখকের গল্প এবং কয়েকটি নবীন লেখকের রচনা দিয়া এই কথা-চয়নখানি গ্রথিত হইয়াছে। গল্পগুলি পড়িয়া ভাল লাগিল। বাংলায় ছোট গল্পের আদর ক্রমশঃ বাড়িতেছে। এ সময় এইরূপ সংকলন-গ্রন্থ-প্রকাশ বাঞ্ছনীয়। প্রচ্ছদপট ও মুদ্রণ সুচারু।

শ্রীফাল্গুনী মুখোপাধ্যায়

মন্ত্র-মুখর—শ্রীনারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়। প্রগতি প্রকাশনী, ১৮, পটলডাঙ্গা ষ্ট্রীট, কলিকাতা। দাম দুই টাকা।

মন্ত্র-মুখরের কাহিনী কোন মহৎ বা বৃহৎ চরিত্রকে অবলম্বন করিয়া গড়িয়া উঠে নাই। ক্ষুদ্র কয়েকটি চরিত্র, খণ্ড খণ্ড কতকগুলি ঘটনা, বহির্মুখী ও অন্তর্মুখী দুটি পথের কেন্দ্রস্থলে অনগ্রসর জেলার অনগ্রসর মহকুমা-শহর নিশ্চিন্ত নগর এই লইয়া কাহিনী। একদিন এই শহরের গতানুগতিক জীবন-প্রবাহে আগষ্ট-আন্দোলনের প্রচণ্ড ঢেউ আসিয়া আঘাত করিল। নেতৃহীন গণ-বিদ্রোহে শহরের রূপ বদলাইয়া গেল। মুহূর্ত্তের মধ্যে সমস্ত চরিত্র, ঘটনা, অন্তর্মুখী ও বহির্মুখী দুটি পথ সেই অগ্নিলীলার মুক্তিকামী ভারতবর্ষের মর্ম্মবেদনাকে উদ্ভাসিত করিয়া দিল। এই বহ্নি-বেদনাময় শক্তিকে প্রগাঢ় নিষ্ঠার সঙ্গে লেখক উপন্যাসে চিত্রিত করিয়াছেন। তীক্ষ্ণ পর্যবেক্ষণশক্তি, বলিষ্ঠ প্রকাশভঙ্গি ও গভীর অনুভূতির গুণে উপন্যাসটি সজীব ও সার্থক হইয়াছে।

নীলালক্তক—শ্রীফাল্গুনী মুখোপাধ্যায়। দেবশ্রী সাহিত্য-সমিধ; ৯৯এ, তারক প্রামাণিক ষ্ট্রীট, কলিকাতা। দাম আড়াই টাকা।

নীলালক্তকের গল্পগুলি পড়িলে স্বতঃই মনে হয়—গল্প শুধু বিষয়বস্তু নির্ব্বাচনের গুণে রস-সৃষ্টির পর্য্যায়ে উন্নীত হয় না। লেখকের সংবেদনশীল মন, সাবলীল প্রকাশভঙ্গি ভাষার প্রসাধন-পারিপাট্য রসোত্তীর্ণ গল্পের অন্যতম উপাদান। এই সংগ্রহের অধিকাংশ গল্পে এই কয়টি উপকরণের কোন না কোনটি বিদ্যমান। 'নীলালক্তক' ও 'লেখকের স্ত্রী' গল্প দুটির করুণ রস বিশেষভাবেই মনকে নাড়া দেয়।

দেবী চৌধুরাণী—সংক্ষেপিত বঙ্কিম-গ্রন্থমালা। আশুতোষ লাইব্রেরি, ৫নং কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা। মূল্য এক টাকা।

পূর্ব্বপ্রকাশিত গ্রন্থগুলির মত এটিও সুসম্পাদিত, এবং সমাদর লাভ করিবে।

শ্রীরামপদ মুখোপাধ্যায়

বীরত্বের রাজটীকা—(দ্বিতীয় সংস্করণ) শ্রীযোগেশচন্দ্র বাগল। এস. কে. মিত্র এণ্ড ব্রাদার্স, ১২, নারিকেল বাগান লেন, কলিকাতা। মূল্য ১৷৹ আনা।

শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র বাগলের 'জগৎ কোন্ পথে', 'সাহসীর জয়যাত্রা' প্রভৃতি পুস্তক বাংলার কিশোর-কিশোরী-মহলে যে কিরূপ সমাদর লাভ করিয়াছে সেগুলির সংস্করণ-বাহুল্যই তাহার প্রমাণ। বীরত্বের রাজটীকাও কিশোর-কিশোরীদের জন্য লেখা দেশাত্মবোধ উদ্দীপক আর একখানি গ্রন্থ। মাত্র ২।৩ বৎসরের মধ্যে ইহারও প্রথম সংস্করণ নিঃশেষিত হইয়া যাওয়ায় এখানিতেও যে লেখকের পূর্ব্বকৃতিত্ব অক্ষুণ্ণ রহিয়াছে তাহা বুঝিতে পারা যায়। তরুণ মনকে জাতীয়তার আদর্শে অনুপ্রাণিত করা যোগেশ-বাবুর লেখনী পরিচালনার অন্যতম উদ্দেশ্য। দেশ ও জাতির ভবিষ্যৎ যাহাদের উপর নির্ভর করিতেছে, যোগেশবাবুর এই সমস্ত পুস্তক দ্বারা বাংলার সেই কিশোর-কিশোরীদের মনে জাতীয়তার বীজ উপ্ত হইতেছে, ফলে পরোক্ষভাবে স্বাধীন ভারতের বনিয়াদ গঠনের প্রাথমিক কার্য্যও সম্পন্ন হইতেছে।

যোগেশবাবুর 'বীরত্বের রাজটীকা' কিশোর-পাঠ্য গ্রন্থসমূহের মধ্যে

বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিবে। ইহাতে রাবেয়া, জোয়ান অব্ আর্ক, মাদাম চিয়াং কাই-শেক, রাণী দুর্গাবতী, চাঁদ সুলতানা, রাণী অহল্যাবাঈ, রাণী ভবানী, কস্তুরবাঈ গান্ধী, সরোজিনী নাইডু, অরুণা আসফ আলী, লক্ষ্মী স্বামীনাথন—দেশবিদেশের এই বার জন মহীয়সী মহিলার জীবন ও কৃতির কথা সুনিপুণভাবে বর্ণিত হইয়াছে। আজাদ হিন্দ ফৌজের ক্যাপ্টেন লক্ষ্মী পরিচালিত ঝান্সীর রাণী বাহিনীর কথা এবং ১৯৪২ সালের আগষ্ট আন্দোলনের নায়িকা অরুণা আসফ আলীর কাহিনী বর্ত্তমান পরিবর্দ্ধিত সংস্করণে সংযোজিত হইয়াছে। ইহাতে পুস্তকখানি বিশেষ সময়োপযোগীও হইয়াছে।' বীরত্ব কথাটি যোগেশবাবু ব্যাপক অর্থে ব্যবহার করিয়াছেন। যে-সমস্ত নারী যুদ্ধক্ষেত্রে অবতীর্ণা হইয়া শত্রু নিধন করিয়াছেন—তাঁহাদের বীরত্ব কাহিনী তিনি যেমন আবেগময়ী ভাষায় বর্ণনা করিয়াছেন, সহিষ্ণুতা, রাজ্যশাসনে দক্ষতা, প্রজানুরঞ্জন, বদান্যতা প্রভৃতি সদ্গুণাবলী যে সকল বরাঙ্গনার ললাটে রাজটীকা আঁকিয়া দিয়াছে তাঁহাদের পুণ্যচরিত-কথাও তেমনি আমাদের শুনাইয়াছেন। ঐতিহাসিকের তথ্যানুগত্য এবং সত্যনিষ্ঠার পরিচয় পুস্তকটির ছত্রে ছত্রে সুপরিস্ফুট। কল্পনার রং চড়াইয়া লেখক সত্যকে বিকৃত করিয়া তোলেন নাই, ফলে ইহা জীবন-চরিতই হইয়াছে, জীবনোপন্যাস হয় নাই। যোগেশবাবুর পুস্তকের আর একটি বৈশিষ্ট্য পুস্তকে বর্ণিত চরিত্রগুলির সমসাময়িক ঐতিহাসিক ঘটনাবলীর নিপুণ বিশ্লেষণ এবং সংক্ষিপ্ত বর্ণনা। জোয়ান অব আর্ক, দুর্গাবতী, চাঁদবিবি বা লক্ষ্মীবাঈয়ের অভ্যুদয় কার্য্য-কারণ সম্পর্ক-নিরপেক্ষ আকস্মিক ঘটনা নহে। জাতির চরম প্রয়োজনেই দেশের ঘোর দুর্দ্দিনে ইঁহাদের আবির্ভাব হইয়াছিল। সেই প্রয়োজনটি কি তাহা 'দুর্গাবতীর জৌহর' প্রভৃতি কোনো কোনো অধ্যায়ে সুন্দর ভাবে ব্যাখ্যাত হইয়াছে। আমাদের সবচেয়ে ভাল লাগিয়াছে 'জোয়ানের চেয়েও বড়' এবং 'দুর্গাবতীর জৌহর' নামক দুইটি অধ্যায়। এই কাহিনী দুটি সাহিত্য-রসে ভরপুর, পড়িতে পড়িতে মনে অতীত হয় ইতিহাসের পৃষ্ঠা হইতে দুর্গাবতী আর চাঁদবিবি ভারতের হিন্দু-মুসলমান এই উভয় জাতির নারী-শক্তির যুগল-প্রতীক যেন রক্তমাংসের জীব হইয়া আমাদের চোখের সামনে পাশাপাশি আসিয়া দাঁড়াইয়াছেন। এই বহু চিত্রশোভিত, ঐতিহাসিক তথ্যপূর্ণ এবং সাহিত্যরসাপ্লুত পুস্তকখানি বর্ত্তমান সংস্করণেও যে পাঠিকা ও পাঠক মহলে আশাতীত সমাদর লাভ করিবে তাহাতে সন্দেহ নাই।

শ্রীনলিনীকুমার ভদ্র

বাংলার বাইরে—শ্রীউপেন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী। ৯১বি, সিমলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা। ২০৩ পৃষ্ঠা, মূল্য ৩৲ টাকা।

পুস্তকের শিরোভাগে গ্রন্থকার লিখিয়াছেন, ইহা উপন্যাসের ছাঁচে ঢালা ঐতিহাসিক তথ্যপূর্ণ ভ্রমণ-কাহিনী। যাঁহারা ভ্রমণ-কাহিনী পড়িতে ভালবাসেন, তাঁহারা ইহা পড়িয়া তৃপ্তিলাভ করিবেন। গ্রন্থকার অথবা পুস্তকের নায়ক শিক্ষকতা, ইংরেজী পত্রিকার সম্পাদকতা ও নোটবুক লেখা প্রভৃতি কার্য্য-ব্যপদেশে বাংলার বাহিরে নানাস্থানে ঘুরিয়াছেন। মুঙ্গের, কাশী, এলাহাবাদ, দিল্লী, আগ্রা, মথুরা, বৃন্দাবন, লক্ষ্ণৌ প্রভৃতি সুপরিচিত স্থানগুলির সংক্ষিপ্ত বর্ণনার মধ্যে পাঠককে আকৃষ্ট করিবার মত নূতন কিছুই নাই। কিন্তু জয়পুরে অবস্থানকালে তিনি রাজপুতানার যে সকল

প্রসিদ্ধ প্রাচীন স্থান দর্শন করিয়াছেন, তাহাদের ঐতিহাসিক তথ্যপূর্ণ বিবরণই এই পুস্তকের বিশেষত্ব। জয়পুর রাজ্যের অতীত ও বর্ত্তমানকালের ইতিহাস, জয়পুরে বাঙালীর প্রভাব ও কীর্ত্তিকলাপ, আজমীর, ভরতপুর রণথম্বর দুর্গ, বিরাট্‌পুর বা বৈরাট, সম্বর হ্রদ, কোটা, টঙ্ক, বুন্দি প্রভৃতি রাজপুতানার ঐতিহাসিক স্থানগুলির বর্ণনা কৌতূহলোদ্দীপক হইয়াছে। গ্রন্থের অনেক স্থানে হিন্দুস্থানী ভাষার প্রয়োগ পশ্চিমদেশীয় আবহাওয়ার সৃষ্টি করিয়াছে। বাংলার বাহিরে কচ্ছ উষর সুদূর পশ্চিমের দেশগুলির বর্ণনা পড়িয়া পাঠক বেশ একটু নূতনত্ব ও বৈচিত্র্যের সন্ধান পাইবেন।

প্রাচ্যবাণী-মন্দির-প্রবন্ধাবলী (১ম ও ২য় খণ্ড)—প্রাচ্যবাণী-মন্দিরের যুগ্ম-সম্পাদক যতীন্দ্রবিমল চৌধুরী সম্পাদিত। প্রাচ্যবাণী-মন্দির ৩, ফেডারেশন ষ্ট্রীট, কলিকাতা। প্রত্যেক খণ্ডের মূল্য ১৲ টাকা।

সংস্কৃত-সাহিত্যের চর্চা ও দর্শনাদি প্রাচ্য-বিদ্যাসমূহের আলোচনা ও অনুশীলনের সাহায্যে ভারতীয় সংস্কৃতির পুনরুজ্জীবন ও প্রচারের উদ্দেশ্যে প্রতিষ্ঠিত প্রাচ্যবাণী-মন্দির হইতে যে সকল সুধী ও বিদ্বজ্জনের রচনা সংগৃহীত হইয়াছে তাহাই খণ্ডে খণ্ডে পুস্তকাকারে প্রকাশ করিয়া সম্পাদক মহাশয় আমাদের ধন্যবাদভাজন হইয়াছেন। সাধারণ মাসিক পত্রিকায় অবশ্য এ সকল বিষয়ের আলোচনা প্রায়ই থাকে, কিন্তু বিশেষ ভাবে আমাদের প্রাচীন ঐতিহ্য ও ভাবধারার সহিত পরিচিত হইবার সহায়ক প্রবন্ধাবলীর একত্র সমাবেশ এই ধরণের প্রচেষ্টা দ্বারাই সম্ভব। প্রথম খণ্ডে সন্ধ্যা ভাদুড়ীর 'দেবতা উষা'র ঋগ্বেদের সূক্ত সহিত বাংলা কবিতানুবাদ, ডক্টর চৌধুরীর 'যুগপ্রবর্ত্তক রামমোহন', বিদুষী রমা চৌধুরীর 'সুফী মনস্তত্ব', অধ্যাপক তমোনাশ, শচীভূষণ ও যোগেশচন্দ্রের নবীন সেনের কাব্যালোচনা এবং পণ্ডিত কোকিলেশ্বর শাস্ত্রীর 'দার্শনিক ভ্রমজ্ঞান ও অধ্যাসবাদ' উল্লেখযোগ্য। দ্বিতীয় খণ্ডে ডক্টর সুকুমার সেনের 'পাঁচালীর উৎপত্তি', মণীন্দ্রমোহনের 'চর্য্যার সাহিত্যিক মূল্য', এবং সুকবি জীবেন্দ্রকুমার ও কামিনীকুমারের কাব্য-সমালোচনা উপভোগ্য হইয়াছে, হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়ের 'গৌড়ীয় বৈষ্ণব-সাধনা' ও সম্পাদকের 'গৌড়ীয় বৈষ্ণবদের সংস্কৃত-সাহিত্যে দান' প্রবন্ধটি এই খণ্ডের সর্ব্বোৎকৃষ্ট ও সর্ব্বশ্রেষ্ঠ রচনা। স্বর্ণকমল ভট্টাচার্য্য লিখিত বিখ্যাত স্বদেশী গান-রচয়িতা ত্রিপুরার কবি কামিনীকুমার ভট্টাচার্য্য (১২৭৮—১৩৫০) সম্বন্ধে প্রবন্ধ সাহিত্যিকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করিবে। আমাদের দুর্ভাগ্য তিনি 'সুধনা' ভিন্ন অন্য কোন কবিতার বই প্রকাশ করেন নাই। প্রবন্ধ-লেখক যদি এই প্রতিভাবান কবির অপ্রকাশিত কবিতা সকল সম্পাদিত করিয়া প্রকাশের ব্যবস্থা করেন, বঙ্গসাহিত্য তাঁহার নিকট কৃতজ্ঞ থাকিবে। সুযোগ্য কবির উপযুক্ত সমাদর দেশবাসী অবশ্যই করিবে।

শ্রীবিজয়েন্দ্রকৃষ্ণ শীল

"বৃক্ষ ইব দিবি স্তব্ধ—"

এ. এন. এম. বজলুর রশীদ

গভীর নিশীথে একা হেরিলাম বাতায়নে আসি—
অষ্টমী চাঁদের আলো সকরুণ উঠিছে উদ্ভাসি'
মাধবীর লতাকুঞ্জে শিমুলের শাখায় শাখায়—
সদ্যফোটা যূথী-ফুলে দুটি গুচ্ছ রজনীগন্ধায়
নিমীলিত পত্রপুটে—তৃণদলে শোভন সুন্দর
শিশির পড়িছে ঝরি—তন্দ্রাহীন ক্লান্ত নিশাচর,
একাকী পাখীর ডাক—অকস্মাৎ পক্ষবিধুনন
সুগভীর নিশীথেরে স্তব্ধতর করে ক্ষণে ক্ষণ।
দূরে দিক্‌প্রান্তে একা অশ্বত্থের দীর্ঘতর ছায়া
দিগন্তরেখায় পটে বিলম্বিত—সমুদ্রার কায়া
রহস্যে গভীর ঘন—স্বপ্নসম মনে হয় থাকি,
বৃক্ষের মতন তুমি স্তব্ধ স্থির পরম একাকী,
একান্ত একেলা তুমি ; চারিদিক অন্তহীন গতি
নক্ষত্রের আবর্ত্তন কক্ষপথে— কোথায় বিরতি ?
তৃণাঙ্কুর ঊর্দ্ধপানে মেলিয়াছে বীজের পতাকা—
জন্ম-মৃত্যু ফুলে-ফলে অমৃতের যাত্রাপথ আঁকা—
আত্মা চিরপলাতকা—এ চলার নিত্যসঙ্গী আমি
বিচিত্র প্রকাশে রূপে অনুভব করি দিবাযামী—
স্তব্ধ শান্ত তুমি একা বৃক্ষসম পরম একাকী
তুমি রবে চিরদিন—আর কিছু রহিবে না বাকী।

জীবনমোহন বসু

বিক্রমপুরের অন্তর্গত মালখানগরের বসু-বংশের কালীচন্দ্র বসু মহাশয়ের পুত্র জীবনমোহন বসু ১৮৮৫ সালের ১৫ই জুন কৃষ্ণনগরে জন্মগ্রহণ করেন। সুবিখ্যাত মনমোহন ঘোষ ও লালমোহন ঘোষ তাঁহার মাতুল ছিলেন। কলিকাতা প্রেসি-ডেন্সী কলেজে পাঠ সমাপ্ত করিয়া জীবনমোহন বিলাত যাত্রা করেন এবং তথায় এডিনবরা বিশ্ববিদ্যালয়ে পদার্থবিদ্যা ও গণিত-শাস্ত্রে এম-এ উপাধি লাভ করেন। দেশে ফিরিয়া আসিয়া তিনি প্রেসিডেন্সী কলেজে গণিত-শাস্ত্রের অধ্যাপক নিযুক্ত হন তৎপর শিবপুর ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজে বদলি হন। সেখানে অনেক বৎসর গণিত-শাস্ত্রের অধ্যাপনা করেন এবং কিছুকালের জন্ত উক্ত কলেজের অধ্যক্ষের পদও লাভ করেন। অবশেষে রাজসাহী কলেজের অধ্যক্ষ নিযুক্ত হন এবং উক্ত পদ হইতেই অবসর গ্রহণ করেন। প্রথম জীবনে তিনি ‘এভিয়েশন’ সম্বন্ধে গবেষণা করেন। তাহা বিলাতের ‘নেচার’ কাগজে প্রকাশিত হইয়া বৈজ্ঞানিক মহলে বিশেষ সমাদর লাভ করিয়াছিল। বিগত জানুয়ারী মাসে তিনি পরলোক-গমন করিয়াছেন। সৌজন্ত, কর্তব্যনিষ্ঠা, সচ্চরিত্রতা ইত্যাদি নানা গুণের জন্ত সকলে তাঁহাকে শ্রদ্ধা করিত।

জীবনমোহন বসু

গোষ্ঠবিহারী দে

'ইষ্টার্ণ টাইপ ফাউণ্ডারী এণ্ড ওরিয়েণ্টাল প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্ লিমিটেডে'র প্রধান-পরিচালক গোষ্ঠবিহারী দে ১২ই শ্রাবণ ৮২ বৎসর বয়সে পরলোকগমন করিয়াছেন।

তিনি একজন ধর্মপ্রাণ, ভগবদ্ভক্ত ও ত্যাগী ব্যক্তি ছিলেন, তাঁহার গভীর ঈশ্বরানুরাগ এবং সহজ, সরল ও আড়ম্বরহীন জীবন-যাপন প্রণালী সকলকেই বিশেষভাবে মুগ্ধ করিত। তিনি তাঁহার স্বভাবসিদ্ধ নম্রতা, সৌজন্য এবং বদান্যতার জন্য সকলের শ্রদ্ধা অর্জ্জন করিয়াছিলেন। লোক-চক্ষুর অন্তরালে তাঁহার গোপন দান বহু অভাবগ্রস্ত লোকের দুঃখ মোচন করিয়াছে। তিনি এক জন গ্রন্থকারও ছিলেন। তাঁহার রচিত বহু পুস্তকের মধ্যে "প্রিণ্টার্স গাইড" বইখানি সুধী-সমাজে বিশেষভাবে সমাদৃত হইয়াছে। মুদ্রণ সম্বন্ধীয় এইরূপ পুস্তক বাংলা ভাষায় আর দ্বিতীয়টি নাই। অল্পদিন হইল যুবকবৃন্দকে সহজে ও আধুনিক বৈজ্ঞানিক উপায়ে মুদ্রণ-কার্য্য শিক্ষা দিবার জন্য কলিকাতায় প্রধানতঃ তাঁহারই উদ্যোগে ইষ্টার্ণ স্কুল অফ প্রিণ্টিং নামে একটি শিক্ষাকেন্দ্র প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে।

গোষ্ঠবিহারী দে

পথ

শ্রীশৈলেন্দ্র বিশ্বাস

গ্রাম ছেড়ে দূর শহরে যাবার পথ
রোদে পোড়া যত কালো কালো ঘাসে ঢাকা,
কত লোক গেছে এই পথে পায়ে হেঁটে,
অনেক আশার স্বপ্নে এ পথ আঁকা।

কত লোক গেছে, কত লোক আজও যায়,
কত কামনায় মুকুল এ পথে ফোটে,
তৃপ্তিবিহীন অনেক আত্মা আজো
সাধ্যাতীতের সন্ধানে শুধু ছোটে।

যারা যায় তারা ফিরে আসে নাকো কভু,
আশার নেশায় হারায়ে যে যায় কোথা,
যারা আসে তারা ধরে আসে নব রূপ,—
প্রাচীন বর্ম্ম জানাতে না পারে ব্যথা।

যারা যায় তারা সমুখ-যাত্রাকালে
করে শুচির হাজারো অঙ্গীকার,
ফিরে এসে তারা মৃত্যু-মলিন মুখে
নিজ আত্মারে করে যে অস্বীকার।

দিন আসে যায়, রাত্রিও যায় চলে,
যাত্রীর ভিড় বেড়ে ওঠে ক্রমে ক্রমে,
গ্রাম ছেড়ে দূর শহরে যাবার পথে
ব্যর্থ আশার কঙ্কাল ওঠে জমে।

মুদ্রাকর ও প্রকাশক : শ্রীনিবারণচন্দ্র দাস, প্রবাসী প্রেস, ১২০।২ আপার সারকুলার রোড, কলিকাতা।

প্রতীক্ষমাণা

শ্রীবৈদ্যনাথ দাস

প্রবাসী প্রেস, কলিকাতা]

ম্যালেরিয়া নিয়ন্ত্রণকল্পে মশকের উৎপত্তিস্থানে ডিডিটি চূর্ণ প্রয়োগ
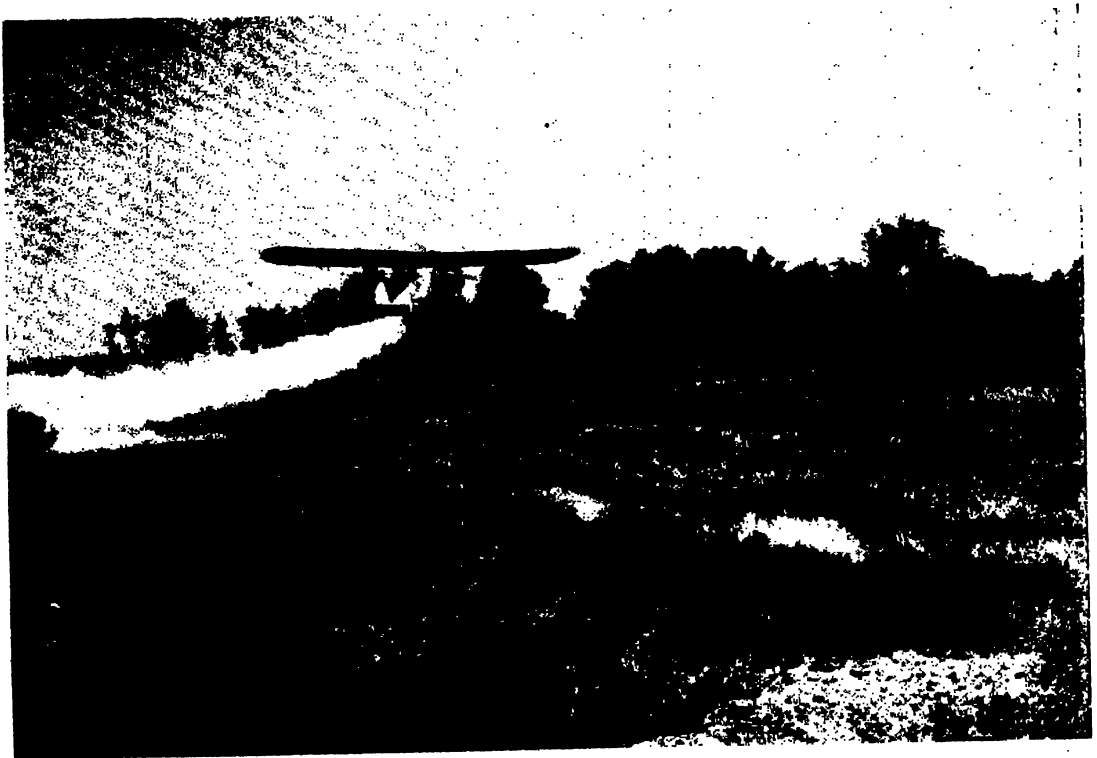
বিমান হইতে মশকের উৎপত্তিস্থানে তরলীকৃত ডিডিটি নিক্ষেপ

"সত্যম্ শিবম্ সুন্দরম্
নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ"

৪৬শ ভাগ ১ম খণ্ড | আশ্বিন, ১৩৫৩ | ৬ষ্ঠ সংখ্যা

বিবিধ প্রসঙ্গ

নূতন জাতীয় গবর্মেণ্ট

মুসলিম লীগের অযৌক্তিক ও অবাস্তব দাবি পূরণ অসম্ভব বুঝিয়া ব্রিটেনের শ্রমিক গবর্মেণ্ট শেষ পর্যন্ত কেন্দ্রীয় সরকার গঠনের ভার কংগ্রেসের হাতেই অর্পণ করিয়াছেন। পণ্ডিত জবাহরলাল নেহেরুর নেতৃত্বে ভারতবর্ষের প্রথম জাতীয় সরকার গঠিত হইয়াছে। ভারতের স্বাধীনতা লাভের পথে ছোট বড় অনেক বিঘ্ন এখনও বিদ্যমান রহিয়াছে। জাতীয় সরকার গঠনের দ্বারা বৃহত্তম বিঘ্নগুলির মধ্যে প্রধান একটি দূর হইয়াছে বটে, কিন্তু আরও অনেক বাধা রহিয়া গিয়াছে। ভারতীয় সিভিল সার্ভিসে সাম্রাজ্যবাদের প্রতিনিধিস্বরূপ যে সব কর্মচারী রহিয়া গিয়াছে, লীগের পিছনে থাকিয়া তাহারা দেশে অশান্তি সৃষ্টিতে সাহায্য করিবে তাহার বহু লক্ষণ ইতিমধ্যেই দেখা গিয়াছে। ভারতবর্ষ পদানত রাখিবার জন্য ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদীরা সাম্প্রদায়িকতার যে বিষ এ দেশের জাতীয় জীবনে প্রবেশ করাইয়াছে তাহাকে আরও উগ্র করিয়া তুলিয়া স্বাধীনতা লাভের পথ কণ্টকিত করিবার জন্য এবার সাম্রাজ্যবাদী ইংরেজ ও সাম্প্রদায়িকতাবাদী লীগ মিলিত শক্তি প্রয়োগ করিতে চাহিবে। লর্ড কার্জন ও লর্ড মিণ্টো হইতে সুরু করিয়া লর্ড আরউইন, লর্ড লিনলিথগো পর্যন্ত বহু বড়লাট লীগের সাম্প্রদায়িকতাবাদ দেশে কায়েম করিবার জন্য চেষ্টার ত্রুটি করেন নাই। বর্তমানে লর্ড ওয়াভেল লীগের গুণ্ডামির অজস্র প্রমাণ পাইয়াও দেশে অশান্তি ও দাঙ্গার আগুন জ্বালাইবার জন্য লীগের ষড়যন্ত্র ভাঙিতে অগ্রসর হন নাই। সাম্প্রদায়িকতার যে বিষ ইংরেজের আমদানী, তাহা দূর করিবার দায়িত্ব ইংরেজেরই। কিন্তু উহা না করিয়া এদেশের বড়লাট এবং ইংরেজ আই-সি-এস ও আই-পি-এস-এর কর্মচারীরা নিষ্ক্রিয় পক্ষপাতিত্বের দ্বারা এই পাপ দূরীকরণে কংগ্রেস এবং বিলাতের শ্রমিক গবর্মেণ্টের মিলিত চেষ্টায় বাধা দিতে আরম্ভ করিয়াছেন।

সাম্প্রদায়িকতার কলুষ হইতে দেশকে মুক্ত করিবার জন্য কংগ্রেস দীর্ঘকাল যাবৎ বহু চেষ্টা করিয়াছে। বহু দূর পর্যন্ত নত হইয়া কংগ্রেস মিঃ জিন্নার সহিত আপোষ করিতে চাহিয়াছে। কংগ্রেসের আপোষের প্রত্যেক চেষ্টাকে মিঃ জিন্না দুর্বলতা বলিয়া ধরিয়া লইয়া তাঁহার দাবি প্রতি ধাপে ক্রমাগত এমন ভাবে চড়াইয়া আসিয়াছেন যে মিলনের পথ তিনি অসম্ভব করিয়া তুলিয়াছেন। মিঃ জিন্নার সহিত আপোষের চেষ্টার জন্য কংগ্রেসকে দেশবাসীর নিকট অনেক অপ্রিয় মন্তব্য সহিতে হইয়াছে, কিন্তু মিঃ জিন্নাকে তুষ্ট করা সম্ভব হয় নাই। এখন একথা স্পষ্ট বুঝা গিয়াছে যে, তাঁহাকে সন্তুষ্ট করা কাহারও সাধ্যায়ত্ত নয়। "বদান্যতা"র স্থান তাঁহার নিকট নাই। মাইনরিটির কর্তা হইয়া তিনি সমগ্র দেশের উপর একচ্ছত্র কর্তৃত্ব করিতে চাহেন। কংগ্রেস দেশের তিন-চতুর্থাংশের প্রতিনিধিরূপে কেন্দ্রীয় সরকার গঠন করিলে তিনি উহাকে একদলীয় শাসকত্ব বলিয়া অভিহিত করেন। কিন্তু তিনিই ১৬ই জুনের বড়লাটের প্রস্তাবের নিজের মনোমত ব্যাখ্যা করিয়া এক-চতুর্থাংশের প্রতিনিধি রূপে সমগ্র ভারতের উপর কর্তৃত্ব করিবার জন্য কেন্দ্রীয় সরকার গঠন করিতে পারিলেন না বলিয়া ক্ষুব্ধ হন। মুসলমানের জন্মগত অধিকারের নামে তিনি লীগের একচ্ছত্র দাবি করিতে পঞ্চমুখ কিন্তু হিন্দুর জন্মগত অধিকার স্বীকারে তিনি পরাঙ্মুখ। অপরের ন্যায্য প্রাপ্য হইতে অন্যায় ভাবে গায়ের জোরে ও গলার জোরে অতিরিক্ত সুবিধা আদায় করিয়া নিজের পাওনা বাড়াইয়া লইবার যে চেষ্টা তিনি ক্রমাগত করিয়া আসিতেছেন তাহা কখনও সফল হইতে পারে না। জন্মগত অধিকার মুসলমানের যেমন আছে, হিন্দু, শিখ, পার্শী, জৈন, খ্রীষ্টান প্রভৃতি অপর সকলেরও ঠিক তেমনি আছে—মিঃ জিন্না ইহা হৃদয়ঙ্গম করিতে অনিচ্ছুক। কংগ্রেসকে যথাসাধ্য ঠেকাইয়া লীগকে তুষ্ট করিবার জন্য অনুরোধ জানাইয়া এ দেশে ও

বিদেশে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদী সংবাদপত্রসমূহে যে প্রচারকার্য্য চলিতেছে তাহার অন্তরালবর্ত্তী প্রকৃত অভিসন্ধি বুঝিয়া উঠা কঠিন নয়। এই মনোভাব অবসানের দিন আসিয়াছে। দেশের আপামর জনসাধারণের প্রতিনিধি কংগ্রেসকে এবার কঠোর হইতে হইবে। কাহারও কোন দাবি দেশের সমগ্র বৃহত্তর স্বার্থের বিরোধী হইলে তাহাতে কঠিন ভাবে বাধা দিতে হইবে। প্রয়োজন হইলে প্রতিক্রিয়াশীলদের সংযত করিবার জন্ত অপ্রিয় কঠোরতাও অবলম্বন করিতে হইবে। সাম্রাজ্যবাদী ও সাম্প্রদায়িকতাবাদী দুষ্টবুদ্ধিপ্রণোদিত লোকেরা দেশে যে অশান্তির আগুন জ্বালাইতে আরম্ভ করিয়াছে তাহা দমন করিবার জন্ত কংগ্রেসকে এখনই অগ্রসর হইতে হইবে।

ভারতবর্ষের প্রথম জাতীয় সরকারের প্রধান মন্ত্রী পণ্ডিত জবাহরলাল নেহেরু এবং তাঁহার সহকর্মীদের আমরা আন্তরিক অভিনন্দন জানাইতেছি। জাতীয় সরকারের ভার যাঁহারা গ্রহণ করিয়াছেন তাঁহারা দেশের আজীবন সেবক, দেশবাসীর শ্রদ্ধা ও বিশ্বাসের পাত্র। যোগ্যতম ব্যক্তিদের লইয়াই গবর্মেণ্ট গঠিত হইয়াছে, এর চেয়ে ভাল মনোনয়ন আর হইতে পারিত বলিয়া আমরা মনে করি না। দপ্তর বণ্টন হইয়াছে এই ভাবে:

পণ্ডিত জবাহরলাল নেহেরু—বৈদেশিক ও কমনওয়েলথ বিভাগ

সর্দার বলদেব সিংহ—দেশরক্ষা

সর্দার বল্লভভাই প্যাটেল—স্বরাষ্ট্র, প্রচার ও বেতার

ডাঃ জন মাথাই—অর্থ

মিঃ আসফ আলি—যানবাহন

বাবু রাজেন্দ্রপ্রসাদ—কৃষি ও খাদ্য

শ্রীজগজীবনরাম—শ্রমিক

সার শাফাৎ আহমদ খাঁ—শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও ললিতকলা

সৈয়দ আলি জাহির—আইন, ডাক ও বিমান

শ্রীশরৎচন্দ্র বসু—খনি, বিদ্যুৎ ও পূর্ত্ত

শ্রীরাজাগোপালাচারিয়ার—শিল্প ও সরবরাহ

কুবেরজি হর্ম্মুসজি ভাবা—বাণিজ্য।

জাতীয় সরকার বড়লাটের পূর্ব্ববর্ত্তী শাসন পরিষদের অনুরূপ হইবে না। প্রাক্তন শাসন পরিষদের সদস্যদের কোন মিলিত দায়িত্ব তো ছিলই না, ব্যক্তিগত দায়িত্বও ছিল না। জাতীয় সরকারের ব্রিটিশ ক্যাবিনেটের ন্যায় কেন্দ্রীয় পরিষদের নিকট যুক্ত দায়িত্ব এবং ব্যক্তিগত দায়িত্ব উভয়ই থাকিবে। বড়লাটের ভিটো পাওয়ার ব্যবহৃত হইবে না এ ব্যবস্থা তাঁহাদের পক্ষে করা কঠিন হইবে বলিয়া মনে হয় না। তবে বড়লাটের নিজস্ব দায়িত্ব বলিয়া যে সব বিধি ভারত-শাসন আইনে আছে এবং দেশীয় রাজ্যের প্রতি তাঁহার যে সব কর্ত্তব্য আছে—তাহার উপরে নেহেরু গবর্মেণ্টের কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হইতে হয়ত কিছুদিন বেশী সময় লাগিবে। জাতীয় সরকার কার্য্যভার গ্রহণ করিয়াই পুরাতন সাম্রাজ্যবাদী নীতি পরিহার করিয়া নূতন ভাবে নব আদর্শে কাজ আরম্ভ করিয়াছেন। বহু অসুবিধা ও বাধাবিঘ্ন তাঁহাদের সম্মুখে রহিয়াছে, তবে দৃঢ় ও কঠোর কার্য্যের দ্বারা তাহা অতিক্রান্ত হইতে পারিবে।

কলিকাতায় লীগের "প্রত্যক্ষ সংগ্রাম"

কলিকাতায় লীগের "প্রত্যক্ষ সংগ্রাম" উপলক্ষে যে ভয়াবহ হত্যাকাণ্ড, লুণ্ঠন ও অগ্নিদাহ হইয়া গিয়াছে, আধুনিক জগতের ইতিহাসে তাহার তুলনা মেলা ভার। ২৯শে জুলাই বোম্বাইয়ে মুসলিম লীগ কাউন্সিলের অধিবেশন হয় এবং ঐ অধিবেশনে মন্ত্রী-মিশনের প্রস্তাব গ্রহণ করিয়া লীগ যে সিদ্ধান্ত করিয়াছিল তাহা প্রত্যাহার করিয়া "প্রত্যক্ষ সংগ্রাম" ঘোষণা করা হয়। সংগ্রাম আরম্ভ করিবার জন্ত ভারতের সর্বত্র ১৬ই আগষ্ট তারিখ সংগ্রাম দিবসরূপে ঘোষিত হয়। সিভিল ওয়ারের ভয় দেখানো চলিতে থাকে এবং বিশেষভাবে হিন্দু ও জাতীয়তাবাদী মুসলমানদের বিরুদ্ধেই বিষোদ্গার আরম্ভ হয়। ব্রিটিশ গবর্মেণ্টের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করিবার কথা হইলেও উহা যে প্রকৃতপক্ষে কংগ্রেস এবং হিন্দুদের বিরুদ্ধেই আরম্ভ হইবে কয়েকদিনের মধ্যেই লীগ-নেতাদের বক্তৃতা ও বিবৃতি এবং লীগ পরিচালিত পত্রিকাসমূহের মন্তব্য হইতেই সুস্পষ্ট হইয়া ওঠে।

বাংলায় ও সিন্ধুতে লীগ-মন্ত্রিসভা বিদ্যমান। এই দুই মন্ত্রিসভা ১৬ই আগষ্ট সরকারী ছুটি ঘোষণা করেন। সিন্ধুর গবর্ণর লীগের পরম অনুরক্ত হইলেও তিনি ঝুনা সিভিলিয়ান, ছুটির তাৎপর্য তিনি হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিয়াছিলেন। দাঙ্গা বাধিতে দেওয়ার ইচ্ছা তাঁহার ছিল না বলিয়া তিনি ছুটি ঘোষণায় আপত্তি করেন এবং সিন্ধুর চীফ সেক্রেটারীর কর্ত্তব্যবোধ লীগ-প্রীতির নীচে একেবারে তলাইয়া যায় নাই বলিয়া তিনি ছুটি বাতিল করিয়া দেন। এই অপমান হেদায়তুল্লা মন্ত্রিসভা নীরবে পরিপাক করিতে বাধ্য হন। বাংলার গবর্ণর নবাগত। তাঁহার পরামর্শদাতা সিভিলিয়ান কর্মচারী বা মন্ত্রী কাহারও মধ্যেই কর্ত্তব্যপরায়ণ লোক নাই, কাজেই সুপরামর্শের অভাবে এবং অনভিজ্ঞতার দরুন তিনি ছুটি মঞ্জুর করিয়া বাংলায় অশান্তির আগুন লাগাইবার পথ করিয়া দেন। বাংলার জাতীয়তাবাদী নেতৃবৃন্দ এবং সংবাদপত্রসমূহ সুরাবর্দী মন্ত্রিসভার উদ্দেশ্য বুঝিতে পারিয়া এই ছুটির তীব্র প্রতিবাদ করেন। আইন-পরিষদের ইংরেজ নেতাও উহার বিরুদ্ধে কঠোর মন্তব্য করিয়া ছুটি বাতিল করিতে অনুরোধ করেন। কিন্তু শুভ পরামর্শ মন্ত্রীরা শুনিলেন না।

১৬ই আগষ্টের "প্রত্যক্ষ সংগ্রাম" উপলক্ষে দাঙ্গা বাধাইবার জন্য লীগ বহু পূর্ব হইতেই প্রস্তুত হইতেছিল। লীগ-নেতাদের বক্তৃতা ও বিবৃতি এবং লীগ-পত্রিকাসমূহের মন্তব্য হইতে প্রয়োজনীয় অংশ উদ্ধৃত করিয়া দৈনিক "ভারত" তাহা প্রমাণ করিয়াছেন। লক্ষ লক্ষ উত্তেজনাপূর্ণ প্রচারপত্রও বিলি করা হয়। একটি উর্দু পুস্তিকায় লেখা হয়:

"এই রমজান মাসে ইসলাম ও কাফেরদের মধ্যে প্রথম প্রকাশ্য যুদ্ধ আরম্ভ হয়। এই মাসেই মুসলমানেরা জেহাদ ঘোষণার এবং কাফের হত্যার অনুমতি লাভ করে। এই মাসেই ইসলাম বিজয়গৌরবে ভূষিত হয়। এই রমজান মাসেই আমরা মক্কায় জয়লাভ করি এবং পৌত্তলিকদের নিশ্চিহ্ন করিয়া দেই। এই মাসেই ইসলামের বনিয়াদ স্থাপিত হয়। আল্লার ইচ্ছায় পাকিস্থান লাভের উদ্দেশ্যে জেহাদ আরম্ভ করিবার জন্য নিখিল-ভারত মুসলিম লীগ এই রমজান মাস ঠিক করিয়াছেন।"

কলিকাতা জেলা মুসলিম লীগের সেক্রেটারী মহম্মদ ওসমানের স্বাক্ষরে এই পুস্তিকাটি প্রচারিত হয়। এই মিঃ ওসমান কলিকাতার মেয়র। ১৬ই আগষ্টের পূর্বে রাত্রিতে লীগের স্বেচ্ছাসেবকেরা কুচকাওয়াজ করিয়াছে, জেহাদের কথা ঘোষণা করিয়া লরীযোগে মুসলমান পাড়াগুলিতে প্রচার-কার্য করিয়াছে এবং "লড়কে লেঙ্গে পাকিস্থান" ধ্বনি সমস্বরে চীৎকার করিয়া পাড়ার হিন্দুদের ত্রস্ত করিয়া তুলিয়াছে।

১৬ই শুক্রবার ভোর না হইতেই জেহাদ ঘোষণাকারীদের দল পথে পথে বাহির হইয়া পড়ে এবং কাহারও দোকান একটু খানি খোলা দেখিলেই তাহা বন্ধ করিবার জন্য জিদ করে। দোকান লুঠ এবং দোকানের লোকদের প্রহার ও ছুরিকাঘাতও ভোর না হইতেই সুরু হইয়া যায়। মাণিকতলা, রাজাবাজার, মেছুয়াবাজার, টেরিটিবাজার, বেলগাছিয়া প্রভৃতি মুসলমান-প্রধান অঞ্চলগুলিতেই প্রথমে হিন্দুদের উপর আক্রমণ সুরু হয়। লীগ-নেতারা দাঙ্গার পরে সাফাই গাহিয়া বলিতে আরম্ভ করিয়াছেন যে কলিকাতায় লীগ হিন্দুদের এক-চতুর্থাংশ, সুতরাং এখানে লীগ প্রথম আক্রমণ আরম্ভ করিতেই পারে না। কিন্তু দাঙ্গা আরম্ভ হওয়ার স্থান ও কাল লক্ষ্য করিলেই দেখা যায়, যে সব স্থলে প্রথম আরম্ভ হইয়াছে সে সব স্থানেই হিন্দুরা সংখ্যায় নগণ্য। এই সব স্থানে হিন্দুরা আক্রমণ আরম্ভ করিবার চেষ্টা করিতেই পারে না। সর্বপ্রথমে লীগের লোকেরা মাণিকতলার মোড়ে এক গোয়ালাকে প্রহার করে, তাহার দুধ রাস্তায় ঢালিয়া দেয় এবং দুধভাণ্ড প্রভৃতি ভাঙিয়া দেয়। তখন ভোর প্রায় ৬টা। তার পর দেশবন্ধু মিষ্টান্ন ভাণ্ডার নামক একটি খাবারের দোকান লুঠ করে এবং দোকানের লোকদের প্রহার করে। পুলিস প্রথম হইতেই ছিল নিরপেক্ষ দর্শক। চক্ষের উপর লুণ্ঠন ও ছুরি লাঠির দ্বারা আঘাত দেখিয়াও তাহারা সম্পূর্ণ নিষ্ক্রিয় থাকে।

সারাটা সকাল এই ভাবে গুণ্ডামি, লুটপাট চালাইয়া লীগের যোদ্ধারা শোভাযাত্রা সহকারে গড়ের মাঠের সভায় যাইতে আরম্ভ করে। ভোর না হইতেই যাহারা পথে বাহির হইয়াছে এবং শোভাযাত্রায় যোগ দিয়া সভাক্ষেত্রে অগ্রসর হইয়াছে তাহাদের প্রত্যেকের হাতেই লাঠি, ছোরা, তরবারি প্রভৃতি কোন-না-কোন অস্ত্র ছিল। লীগ নেতারা অস্ত্র বহনের কথা সম্পূর্ণরূপে অস্বীকার করিয়াছেন কিন্তু বহু ফটোগ্রাফে উহার প্রত্যক্ষ প্রমাণ রহিয়াছে। দাঙ্গা উপলক্ষে লীগ-নেতারা মিথ্যা ভাষণে যে অসাধারণ কৃতিত্ব দেখাইয়াছেন তাহার তুলনা পৃথিবীর কুত্রাপি মিলিবে কিনা সন্দেহ। শোভাযাত্রীদের সঙ্গে উর্দুতে "জেহাদের ফরমান করিতে হইবে" এরূপ কথা লেখা বহুসংখ্যক পতাকা ছিল। ময়দানের সভায় কাফের হিন্দুদের বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষণা করিয়া জ্বালাময়ী বক্তৃতা দেওয়া হয়। সভার পর জেহাদের সৈনিকেরা বিভিন্ন দলে বিভক্ত হইয়া হিন্দুর দোকান লুণ্ঠন ও হিন্দু হত্যা আরম্ভ করে। চৌরঙ্গি এবং ধর্মতলার যে সব অংশ গবর্ণমেন্ট হাউস হইতে দেখা যায় সেই সব স্থানে বড় বড় লাঠি লইয়া জেহাদের সৈনিকেরা হিন্দুর দোকানপাট ভাঙিয়া লুঠ করে। চৌরঙ্গি ধর্মতলায় প্রায় মোড়ে কে. সি. বিশ্বাসের বন্দুকের দোকান লুঠ হয়। লালবাজারে পুলিসের প্রধান ঘাঁটি হইতে কয়েক গজ মাত্র দূরে একটি ঘড়ির দোকান লুঠ হয় এবং উহার প্রায় দুই কার্লঙের মধ্যে পোলক ষ্ট্রীটে এবং টেরিটি বাজারে অনেক হিন্দু দোকানদার, দারোয়ান ও পথচারী নিহত হয়। গুণ্ডাদের সঙ্গে লাঠি, ছোরা, তরবারি তো ছিলই, প্রচুর পরিমাণে পেট্রোল এবং কেরোসিন তেলও ছিল এবং লরী ও গাড়ীর অভাবও ছিল না। শহরের যে সব স্থানে মুসলমানেরা সংখ্যায় কম, সেই সব স্থানে লরীযোগে লোক পাঠাইয়া স্থানীয় মুসলমানদের শক্তিবৃদ্ধি করা হইয়াছে। সন্ধ্যার মধ্যেই শহরের উত্তর-দক্ষিণ পূর্ব-পশ্চিম সর্বত্র আগুন জ্বলিয়া উঠে। সর্বত্র মুসলমানেরা আক্রমণ চালাইতে থাকে এবং আক্রান্ত হিন্দুরা পুলিসকে টেলিফোন করিয়া ও সম্মুখে পুলিস দেখিলে তাহাদের নিকট সাহায্য প্রার্থনা করিয়া একই উত্তর পাইতে থাকে—রাজনৈতিক ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করিবার হুকুম নাই। পুলিস সম্বন্ধে গুণ্ডাদের মনোভাব ছিল যেন "পুলিস আমাদের লোক, কিছু বলিবে না।" নরহত্যা, লুণ্ঠন, গৃহদাহ প্রভৃতি পুলিসের চক্ষের উপর ঘটিয়াছে। বাধা দেওয়া তো দূরের কথা, কোন কোন ক্ষেত্রে পুলিস এবং সার্জেণ্টরা লুঠের মালের ভাগ আদায় করিয়াছে।

১৬ই আগষ্টের পর

১৬ই আগষ্ট সন্ধ্যার মধ্যেই হিন্দুরা উপলব্ধি করিল যে পুলিসের সাহায্য তাহারা পাইবে না। ধন, প্রাণ ও নারীর সম্মান রক্ষা করিতে হইলে সঙ্ঘবদ্ধ ভাবে আত্মরক্ষার ব্যবস্থা নিজেদেরই করিতে হইবে। কর্তৃপক্ষের ওজুহাত—পুলিস সংখ্যায় কম ছিল, এত বড় দাঙ্গা নিবারণের শক্তি তাহাদের ছিল না। ভাল কথা, কিন্তু পুলিস একেবারেই কেন বাহির হইল না তার কোন কৈফিয়ৎ কেহ দেন নাই। ১৬ই সকালে অবস্থা আয়ত্তের বাহিরে যায় নাই, ময়দানের সভা পর্যন্তও এমন অবস্থা ছিল যে পুলিস চেষ্টা করিলে গুণ্ডার দলকে সংযত

করিতে পারিত। বোম্বাইয়ে দাঙ্গা নিবারণ করিতে গিয়া পুলিসের উর্ধ্বতন কর্মচারীরাও অনেকে আহত হইয়াছেন কিন্তু কলিকাতায় বড় অফিসার তো দূরের কথা একটি কনেষ্টবলের পিঠে পর্যন্ত একটি আঁচড় লাগে নাই। ১৭ই সকাল হইতে হিন্দু-পাড়ায় আক্রমণ হইলে হিন্দুরা সম্মিলিত চেষ্টায় তাহাতে প্রথমে বাধা দান পরে পাল্টা আক্রমণ আরম্ভ করিল। ১৭ই এবং ১৮ই এই দুই দিন আক্রমণ ও পাল্টা আক্রমণ ভয়ানক ভাবে চলিতে থাকে, ১৮ই সন্ধ্যা নাগাদ গুণ্ডারা বুঝিতে পারে যে হিন্দুরা মারিতে আরম্ভ করিয়াছে, আর বেশী দূর অগ্রসর হইলে বেহাদে পরাজয় বরণ করিয়াই ঘরে ফিরিতে হইবে। ১৭ই হইতে পাল্টা আক্রমণের তীব্রতা বৃদ্ধি হয়, তখনই লীগ মন্ত্রীরা মিলিটারী বাহির করিবার জন্য ব্যাকুল হইয়া উঠেন। তাঁহাদের অনুরোধ রক্ষিত হয়, মুসলমানেরা যে সব স্থানে আক্রান্ত হইয়াছিল সেখানে মিলিটারি মোতায়েন হয়; পড়িয়া থাকে মুসলমান পরিবেষ্টিত হিন্দু জনসাধারণ। অবশেষে রবিবার সন্ধ্যা নাগাদ পাল্টা জবাবের নমুনা দেখিয়া লীগ-নেতাদের চৈতন্য কতকটা জাগ্রত হয়; সংগ্রাম বন্ধের জন্য তাঁহারা চেষ্টা আরম্ভ করেন। আইন ও শৃঙ্খলা রক্ষার ভার প্রধান মন্ত্রীর হাত হইতে সামরিক কর্তৃপক্ষের হাতে চলিয়া যাওয়াও লীগের হতাশার অন্যতম কারণ। সোমবার ১৯শে অবস্থা অনেকটা আয়ত্তে আসে।

এই তিন দিনের হত্যাকাণ্ডে চয় হইতে আট হাজার লোক নিহত হয়; ১৫ হইতে ২০ হাজার আহত হয় এবং প্রায় পাঁচ হইতে সাত কোটি টাকার সম্পত্তি লুণ্ঠিত হয়। লুণ্ঠিত সম্পত্তির মধ্যে শতকরা ৯০ ভাগই হিন্দুর।

এবার সুরু হইল লীগের মিথ্যাভাষণের পালা। মিঃ জিন্না, নবাবজাদা লিয়াকৎ আলি, বঙ্গীয় প্রাদেশিক মুসলিম লীগ প্রভৃতি সকলেই হত্যাকাণ্ডের দায়িত্ব কংগ্রেসের ঘাড়ে চাপাইবার জন্য বিবৃতি প্রচার সুরু করিলেন। মুসলমানেরা নিরস্ত্র ও শান্ত ছিল, তাহারা মোটেই আক্রমণ করে নাই, হিন্দুরাই তাহাদের মারিয়া শায়েস্তা করিয়াছে, হাতে মারিবার পর বয়কট করিয়া আবার ভাতে মারিবার ব্যবস্থা করিতেছে, হতাহতদের মধ্যে চার ভাগের তিন ভাগই মুসলমান ইত্যাদি প্রচারকার্য সুরু হইয়াছে এবং এখনও চলিতেছে। প্রত্যক্ষ সংগ্রামের নামে মুসলমানদের নাচাইয়া যাঁহারা ঘরের বাহির করিয়াছিলেন, পাল্টা আক্রমণে তাহাদের দুর্দশা দেখিয়া লীগ-নেতারা তাঁহাদের সকল দায়িত্ব অস্বীকার করিয়াছেন অথবা তাঁহাদের প্রত্যেক রাজনৈতিক কাজে মিথ্যার আশ্রয় গ্রহণের ন্যায় এখানেও তাঁহারা উহাই করিতেছেন কিনা তাহা বুঝা মুশকিল। তবে এ কথা ঠিক যে কলিকাতায় সংগ্রাম আরম্ভ করিবার দায়িত্ব যাঁহাদের, যাঁহারা এই সংগ্রাম শান্তিপূর্ণ থাকিবে না বলিয়া প্রকাশ্যে ঘোষণা করিয়াছিলেন তাঁহারা সংগ্রামের পর উহার দায়িত্ব অস্বীকার করায় তাঁহাদের চূড়ান্ত নৈতিক পরাজয় প্রকটিত হইয়াছে। নিরপেক্ষ ও চিন্তাশীল মুসলমানেরা অনেকেই লীগ-নেতাদের এই ভীরুতা ও পরাজয় লক্ষ্য করিয়াছেন।

কংগ্রেসের সম্বন্ধে লীগ যাহা বলিয়াছে তাহাতে আমাদের মনে হয় প্রকারান্তরে বঙ্গীয় প্রাদেশিক রাষ্ট্রীয় সমিতির প্রশংসাই করা হইয়াছে। বহুদিন যাবৎ বাংলা কংগ্রেস দারুণ নিষ্ক্রিয়তার পরিচয় দিয়া আসিয়াছে, দলাদলি লইয়া তাহার নেতারা সব সময়ে ব্যস্ত। কলিকাতায় হত্যাকাণ্ড সাধনের আয়োজন পূর্ব হইতে করিতে হইলে যে সঙ্ঘশক্তি ও কর্মকুশলতার প্রয়োজন বর্তমান কংগ্রেস কমিটির তার বিশ ভাগের এক ভাগও আছে আমরা ইহা মানিতে প্রস্তুত নহি। না বুঝিয়া লীগ নিজের অজ্ঞাতসারে ইঁহাদের যে প্রশংসা করিয়া বসিয়াছেন তার জন্য কংগ্রেস কমিটির কৃতজ্ঞ থাকা উচিত।

ওয়ার্কিং কমিটির প্রস্তাব

"মুসলিম লীগের 'প্রত্যক্ষ সংগ্রাম' দিবস পালন উপলক্ষে কলিকাতায় গত ১৬ই আগষ্ট এবং তাহার পরবর্তী কয়েক দিন যে সকল ঘটনা ঘটিয়া গেল, ওয়ার্কিং কমিটি তাহার বিবরণ অতীব দুঃখের সহিত পাঠ করিয়াছেন। কলিকাতায় ধন-প্রাণের যে গুরুতর ক্ষতি হইয়াছে, বিশেষ করিয়া আত্মরক্ষায় অসমর্থ নর নারী ও শিশুদিগকে যে পাশবিক ভাবে হত্যা করা হইয়াছে, ওয়ার্কিং কমিটি তাহার তীব্র নিন্দা করিতেছে। সম্প্রদায় এবং দল নির্বিশেষে নির্যাতিত নরনারীর প্রতি কমিটি সমবেদনা জ্ঞাপন করিতেছে। তাহাদিগকে সাহস, সহনশীলতা ও ধৈর্যের সহিত অবস্থার সম্মুখীন হইবার জন্য কমিটি অনুরোধ জানাইতেছে।

লীগ ও বাংলা-সরকারের ভূমিকা

২৯শে জুলাই তারিখে মুসলিম লীগ কাউন্সিল 'প্রত্যক্ষ সংগ্রামে'র সিদ্ধান্ত করিয়া একটি প্রস্তাব গ্রহণ করে। এই প্রস্তাবের সমর্থনে কয়েকটি উত্তেজনামূলক বক্তৃতা দেওয়া হয়; ইহার পর লীগের দায়িত্বশীল সদস্য এবং মন্ত্রিগণ এমন কতকগুলি ভাষণ, বিবৃতি ও প্রচারপত্র প্রকাশ করিতে থাকেন এবং লীগের সংবাদপত্রগুলি এমন সমস্ত প্রবন্ধ লেখেন যাহার ফলে বহু মুসলমান ক্ষিপ্ত হইয়া উঠে।

বহু প্রতিবাদ সত্ত্বেও বাংলা-সরকার ১৬ই আগষ্ট ছুটির দিন বলিয়া ঘোষণা করেন। ইহার ফলে এই ধারণাই সৃষ্টি হয় যে, ১৬ই আগষ্ট দিবস পালনের সহিত সরকারও সংশ্লিষ্ট এবং যাহারা ইহাতে যোগ দিবে না তাহারা গবর্মেণ্টের নিকট হইতে কোন সাহায্য পাইবে না।

দেখা যায় লীগ শোভাযাত্রীদের সহিত লাঠি, তলোয়ার, বল্লম, ছোরা, কুঠার প্রভৃতি ছিল। ১৬ই আগষ্ট সকাল হইতেই তাহারা এই সকল অস্ত্রশস্ত্রের ভয় দেখাইয়া দোকানদারদিগকে দোকান বন্ধ করিতে আদেশ দেয়। যে কেহই দোকান বন্ধ

করিতে অস্বীকার করিয়াছে বা ইতস্ততঃ করিয়াছে শোভাযাত্রীরা তাহাদিগকে নির্দয়ভাবে প্রহার করিয়াছে। সকাল হইতেই ছুরিমারা এবং লুণ্ঠন চলিতে থাকে। বহু জায়গায় গুণ্ডারা বন্দুক পর্যন্ত ব্যবহার করে। ইহার পর নিতান্ত পাশবিক ভাবে নরহত্যা এবং ব্যাপকভাবে লুণ্ঠন ও গৃহাদিতে অগ্নিসংযোগ চলিতে থাকে। এই নরহত্যা, লুণ্ঠন ও অগ্নিকাণ্ড তিন-চারি দিন সমানে চলিতে থাকে। ফলে সহস্র সহস্র লোক নিহত হয় এবং কোটি কোটি টাকার সম্পত্তি লুণ্ঠিত ও ভস্মীভূত হয়।

১৬ই আগষ্ট কোন পুলিস এবং ট্রাফিক পুলিস পর্যন্ত একরূপ ছিলই না। মহরম এবং অন্যান্য শোভাযাত্রা ব্যাপারে যে অতিরিক্ত পুলিস নিয়োগ করা হইয়া থাকে, তাহাও ঐ দিন করা হয় নাই। পুলিস শেষ পর্যন্ত আসিলেও তাহারা শান্তিপূর্ণ নাগরিকদিগকে কোন সাহায্যই করে নাই। থানাসমূহের ভারপ্রাপ্ত কর্মচারীদের নিকট বারবার সাহায্যের জন্য আবেদন করা হইলেও তাঁহারা তাহাতে কর্ণপাত করেন নাই। ফলে জনগণকে যথাসাধ্য আত্মরক্ষা করিতে হয়। প্রথম দুই দিন নৈশ চলাচল সম্পর্কে নিষেধাজ্ঞা জারি করা সত্ত্বেও তাহা কার্যকরী হয় নাই। জনসাধারণ কোন যানবাহন পায় নাই, কিন্তু গুণ্ডারা মোটর লরী ব্যবহার করে। অগ্নিসংযোগ করিবার জন্য অবাধে পেট্রল ব্যবহার করা হয়। ঘরবাড়ী, আসবাবপত্র এবং অন্যান্য দ্রব্যাদি ধ্বংস ও ভস্মীভূত হয়। গুণ্ডারা যতদূর সম্ভব বহু জিনিষপত্র লইয়া যায়। মৃতদেহে রাজপথ সমাকীর্ণ হইয়া যায়। বহু মৃতদেহ এবং মুমূর্ষু ব্যক্তিকে ভূগর্ভস্থ পয়ঃপ্রণালীতে অথবা নদীতে নিক্ষেপ করা হয়। এই তাণ্ডবলীলা চলার পরও শান্তি ফিরাইয়া আনিবার জন্য সৈন্যবাহিনীকে আহ্বান করা হয় নাই। কোন কোন স্থানে পুলিস পর্যন্ত লুণ্ঠনে যোগ দেয়।

প্রথমে এই ভাবে নরহত্যা, লুণ্ঠন ও অগ্নিকাণ্ডের পর হিন্দু এবং অন্যান্য লোকেরা প্রতিহিংসাপরায়ণ হয় এবং যেখানে সম্ভব সেখানেই তাহারা প্রতিশোধ গ্রহণ করে। ফলে বহু মুসলমান নিহত হয়।

পরস্পরের এই হত্যা ও অমানুষিক বর্বরতার মধ্যেও দেখা গিয়াছে যে হিন্দুরা দুর্গত মুসলমানদিগকে আশ্রয় দিয়াছে এবং মুসলমানরাও বিপন্ন হিন্দুদিগকে আশ্রয় দিয়াছে।

দাঙ্গার বিস্তৃতি

ওয়ার্কিং কমিটি উদ্বেগের সহিত লক্ষ্য করিতেছে যে অন্যান্য স্থানেও সাম্প্রদায়িক অসম্প্রীতি বৃদ্ধি পাইয়াছে এবং দাঙ্গাহাঙ্গামা হইয়াছে। ফলে ঐ সকল স্থানেও বহু নরহত্যা হইয়াছে। সকলেই আশঙ্কা করিতেছে ইহা আরও বিস্তৃত হইতে পারে। সময় থাকিতে যদি ইহা প্রতিরোধ না করা যায় তবে এই দাঙ্গাহাঙ্গামা আরও ছড়াইয়া পড়িতে পারে। ইহা নিবারণ করা প্রত্যেক নাগরিকের কর্তব্য। শান্তিরক্ষা করা এবং শান্তিপূর্ণ নাগরিকদের রক্ষা করা প্রত্যেক গবর্মেণ্টের কর্তব্য।

তদন্ত করা প্রয়োজন

দাঙ্গাহাঙ্গামার গুরুত্ব বিবেচনা করিয়া কমিটি মনে করে যে, ১৬ই আগষ্টের পূর্বের ঐ দিনের ও তাহার পরের কয়েক দিনের ঘটনাবলী সম্পর্কে এবং দাঙ্গার পূর্বে ও পরে গবর্মেণ্টের অবলম্বিত ব্যবস্থা সম্পর্কে তদন্ত করিবার জন্য জনসাধারণের আস্থাভাজন একটি নিরপেক্ষ ট্রাইব্যুনাল নিয়োগ করা প্রয়োজন।

ওয়ার্কিং কমিটি মনে করে যে, বাংলা-সরকার শান্তি রক্ষা এবং শান্ত নাগরিকদের ধনপ্রাণ রক্ষা ব্যাপারে চূড়ান্ত ব্যর্থতার পরিচয় দিয়াছেন। ওয়ার্কিং কমিটির বিশ্বাস, যে আঘাত হানা হইয়াছে তাহা শুধু দেহের উপরই নয়, মানুষের আত্মা এবং আত্মমর্যাদার উপরও বটে। এই আঘাত মুছিতে দীর্ঘ দিন লাগিবে। তথাপি জনগণের নিকট কমিটির আবেদন, তাহারা যেন গত কয়েক দিনের মর্মান্তিক ঘটনাবলী ভুলিয়া যায় এবং পরস্পরকে ক্ষমা করে; বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে শুভেচ্ছা ও সৌহার্দ্য পুনঃস্থাপনের জন্য তাহারা যেন এই ভয়াবহ অভিজ্ঞতার সদ্ব্যবহার করে। ওয়ার্কিং কমিটি মনে করে, ভয় দেখাইয়া এবং হিংসাশ্রিত কার্যকলাপের দ্বারা সাম্প্রদায়িক সমস্যার সমাধান করা যায় না। পারস্পরিক বোঝাপড়া, সৌহার্দ্যপূর্ণ আলোচনা এবং প্রয়োজন ক্ষেত্রে উভয় পক্ষের গ্রহণযোগ্য সালিশীর দ্বারাই শুধু এই সমস্যার সমাধান করা যাইতে পারে।"—এ পি

কলিকাতার দাঙ্গা সম্বন্ধে চিন্তাশীল মুসলমানদের অভিমত

কলিকাতার দাঙ্গার পর উহা লইয়া নানা জনে নানা ভাবে আলোচনা করিয়াছে। এই দাঙ্গায় গুণ্ডাশ্রেণীর মুসলমানেরা লুঠের মাল হস্তগত করিয়া কিছু সুবিধা করিয়া লইয়াছে কিন্তু সাধারণ মুসলমানের ইহাতে অশেষ ক্ষতি হইয়াছে। কংগ্রেসকে জব্দ করিবার জন্য সাম্প্রদায়িক অশান্তি সৃষ্টি করিয়া দাঙ্গা যাহারা বাধাইতেছে তাহারা মুসলমান জনসাধারণের হিতাকাঙ্ক্ষী নহে, অনেকেই উহা বুঝিয়া প্রকাশ্যে এই কথা প্রচার করিতে সাহসী হইতেছেন। বর্তমান ঘোর দুর্যোগের মধ্যে ইহা আশার লক্ষণ। দাঙ্গার পর বাংলার মুসলমান ছাত্র ও যুবকদের নিকট আবেদন জানাইয়া বঙ্গীয় আজাদ মুসলমান ছাত্র ফেডারেশনের সাধারণ সম্পাদক মিঃ এম আনিসুজ্জমানের একটি বিবৃতি 'যুগান্তর' পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছে। উহাতে তিনি লিখিতেছেন:

> আমি এই বিবৃতিতে হিন্দু সমাজকে উদ্দেশ্য করিয়া কিছু বলিব না। মাত্র মুসলমান জনসাধারণকে—বিশেষ

করিয়া মুসলমান ছাত্র ও যুবক সম্প্রদায়কে কয়েকটি প্রশ্ন করিতে চাই। লীগপন্থী মুসলমান ভাইগণ ও উঁহার নেতৃবৃন্দ দাঙ্গার দায়িত্ব যতই অন্ত কোন প্রতিষ্ঠান বা সম্প্রদায়ের স্কন্ধে চাপাইবার চেষ্টা করুন না কেন, একথা প্রত্যেক নিরপেক্ষ সজ্জনব্যক্তি অকপটে স্বীকার করিবেন যে, দাঙ্গার জন্ত মুসলিম লীগের নেতৃবৃন্দই একমাত্র দায়ী। এইরূপ দাঙ্গা চালাইবার জন্ত লীগের নেতৃবৃন্দ ১৬ই আগষ্টের পূর্ব হইতে বহু বিবৃতি ও প্রচারণা প্রকাশ্যভাবেই প্রচার করিতেছিলেন। ১৬ই তারিখের পূর্বে নাজিমুদ্দীন সাহেব, সোহরাওয়ার্দী সাহেব, মওলানা আকরাম খাঁ সাহেব—এমন কি জিন্না সাহেব পর্যন্ত বিবৃতি ছাপিয়া লীগপন্থী মুসলমানগণকে এইরূপ একটি হিংসাত্মক কার্যে প্ররোচিত করিয়াছিলেন। এমন কি ইসলামের পবিত্র "জেহাদের" নাম ভাঙাইয়াও তাহাদিগকে উত্তেজিত করা হইয়াছে। ১৬ই আগষ্ট তারিখের "আজাদে" মওলানা মহম্মদ আকরাম খাঁর স্বনামে লিখিত এক ঘোষণা প্রকাশিত হয়। উহাতে বলা হইয়াছে যে, অদ্য ১৮ই রমজান। এই দিন হজরত মহম্মদের (দঃ) নেতৃত্বে মুসলমানগণ কাফেরদের বিরুদ্ধে মদিনায় "জেহাদ" করিয়া যুদ্ধ করেন। আজও সেই ১৮ই রমজান, অতএব মুসলমানগণ অদ্য "জেহাদের" জন্ত প্রস্তুত হও ইত্যাদি ধর্মের দোহাই দিয়া নানা ভাবে মুসলমানগণকে দাঙ্গা-হাঙ্গামায় উত্তেজিত করা হইয়াছে। শুনা যায়, লীগ-মুসলমান গুণ্ডাদিগকে (যাহাদের অনেকে গ্রেপ্তার হইয়াছে) এই বলিয়া আশ্বাসও দিয়াছিল যে, বর্তমান বাংলার শাসনক্ষমতা লীগের করায়ত্ত। অতএব গুণ্ডাগণ খুশীমতন হিন্দুর দোকানপাঠ লুণ্ঠন, মারামারি, কাটাকাটি করিলে তাহাদের ভবিষ্যতে কোন বিপদাশঙ্কা নাই, কারণ মন্ত্রীরা পুলিসকে নিরস্ত্র করিয়া রাখিবে। ফলেও যে তাহাই হইয়াছে ইহা কোন নিরপেক্ষ বিবেকবান ব্যক্তি অস্বীকার করিতে পারিবেন কি? আমরা দেখিয়াছি, ময়দানে সভায় যাইবার জন্য মিছিলকারী লীগওয়ালারা ছোরা ও লাঠিসহ সশস্ত্র হইয়া অবলীলাক্রমে রাস্তার উভয় পার্শ্বস্থ হিন্দুর দোকানসমূহ লুণ্ঠন করিতে করিতে যাইতেছে। আমরা আরও দেখিয়াছি—সশস্ত্র পুলিস ইহা দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া দেখিয়াছে আর মনের আনন্দে হাসিয়াছে।

হানাহানিতে লাভ কাহার?

এই হানাহানিতে লাভ কাহার হইল, এই ভাবে পাকিস্থান অর্জনই বা কতদূর সম্ভব হইল, রাজনীতির নামে নারী-নির্যাতন, গৃহদাহ, লুঠতরাজ ও গুণ্ডামি করিয়া মুসলমান সমাজের কি উপকার হইল—এই সব প্রশ্ন তুলিয়া মিঃ আমিনুজ্জমান বলিতেছেন "বর্তমান দাঙ্গা সংঘটিত করাইয়া লীগ নেতৃবৃন্দ কতদূর সমাজের উপকার করিলেন? যাহাদের রাজনৈতিক দূরদৃষ্টি এত অল্প তাহারা কোন্ মুখে ভারতের দশ কোটি মুসলমানের নেতৃত্বের বড়াই করেন?" তারপর তিনি লিখিতেছেন:

মুসলমান যুবকদিগকে চিন্তা করিতে অনুরোধ করিতেছি যে, পাকিস্থানী লড়াইয়ে নেতারা তাঁহাদিগকে ধ্বংসের কোন্ অতল তলে লইয়া যাইতেছেন তাহা কি তাঁহারা এখনও অনুভব করিতে পারেন নাই? নেতারা যে দাঙ্গা-হাঙ্গামায় তাঁহাদিগকে প্ররোচিত করিয়াছিলেন সে দাঙ্গার পরিণাম কি হইল তাহা তাঁহারা চিন্তা করিয়াছেন কি? তাঁহারা হয়ত বলিবেন—হিন্দুর দোকানপাট, বাড়ীঘর লুঠ হইয়াছে, হিন্দুর মেরুদণ্ড চূর্ণ হইয়াছে, এইবার সে পাকিস্থান প্রস্তাবে আর বাদ সাধিতে সাহস পাইবে না। কিন্তু আমি বলিব, না হিন্দুর মেরুদণ্ড পূর্বাপেক্ষা আরও দৃঢ়তর হইয়াছে। ঘুমন্ত সাপকে খোঁচা মারিয়া ফণা উত্তোলন করান হইয়াছে। বর্তমান দাঙ্গায় তাহার চূড়ান্ত প্রমাণ হইয়া গিয়াছে, আর সামাজিক মেরুদণ্ড চূর্ণ হইয়াছে মুসলমানের। হিন্দুর কমলালয়, জহরলাল পান্নালাল, ভালিয়া প্রভৃতি লক্ষপতি কোটিপতিদের দোকান লুণ্ঠিত হইয়াছে। কিন্তু তাহাতে হিন্দু সমাজের কি কোন ক্ষতি হইয়াছে? এই সমস্ত প্রতিষ্ঠানের মালিকদের লক্ষ লক্ষ টাকা ইন্সিওর করা রহিয়াছে। অতএব তাহারা দুই-এক মাসের মধ্যেই আবার পূর্ববৎ দাঁড়াইয়া যাইবে। কিন্তু মুসলমানের ক্ষতির পরিমাণ অপূরণীয়। মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ই সমাজ বা জাতির মেরুদণ্ড। সেই মধ্যবিত্ত কলিকাতাবাসী মুসলমান আজ কোথায়? বিহারী ও পঞ্জাবী মুসলমানরা গুণ্ডামী ও লুঠতরাজ করিয়া অনেক কিছু লুটিয়াই সরিয়া পড়িয়াছে। আর হিন্দুর মার খাইয়াছে বাঙালী মধ্যবিত্ত মুসলমান। মুসলমান বিড়ি-পান-সিগারেট-ওয়ালার, হোটেলওয়ালার, ছোটখাটো থালা বাসনের দোকানওয়ালার, ছোট কাটা-কাপড়ওয়ালার, মনোহারী দোকানওয়ালার, ফলওয়ালার যথাসর্বস্ব পরে এক এক করিয়া লুণ্ঠিত হইয়াছে। ইহারা কি আর কমলালয় বা তদনুরূপ অন্যান্ত হিন্দু প্রতিষ্ঠানের মতন দাঁড়াইতে পারিবে? পানবিড়িওয়ালা বাদে এই সমস্ত দোকান প্রায় সবই বাঙালী মুসলমান মধ্যবিত্তের। এই ছোট-খাটো ব্যবসায়ী মুসলমান মধ্যবিত্ত সম্প্রদায় আজ সর্বহারা হইয়া কপালে হাত দিয়া কাঁদিতেছে। তাই আজ কলি-কাতার আত্মনির্ভরশীল ব্যবসায়ী মধ্যবিত্ত বাঙালী মুসলমান বিলুপ্ত হইল। ইহাতে সমাজের যে অপূরণীয় ক্ষতি হইল তাহা জিন্না সাহেব হইতে আরম্ভ করিয়া সোহরাওয়ার্দী, নাজিমুদ্দীন, মঃ আকরাম খাঁ, ওসমান প্রমুখ সমাজ-দরদী(?) মুসলিম নেতারা ভাবিয়াছেন কি? তাঁহাদের আরম্ভ

ইহা ভাবিয়া দেখিবার প্রয়োজন নাই; কারণ এই সমস্ত নেতার (?) প্রয়োজন আজ আর সমাজের নাই। ইহাদিগকে সমাজের পুরোভাগ হইতে বহিষ্কার করিতে পারিলে সমাজের মঙ্গল হইবে। ধর্মের দোহাই দিয়া এই দাঙ্গায় মুসলমানগণকে উত্তেজিত করান হইয়াছে। কিন্তু ধর্মের নামে অধর্মের এত বড় লীলাখেলার অনুষ্ঠান পৃথিবীর ইতিহাসে আর আছে কিনা তাহা একবার মুসলমান যুবকদিগকে চিন্তা করিয়া দেখিতে অনুরোধ করিতেছি। নিরীহ নাগরিকের জীবন সংহার, তালাবদ্ধ দরজা ভাঙ্গিয়া দোকান লুণ্ঠন, নারীর পবিত্র দেহে ছুরিকাঘাত এ কোন্ ধর্মসম্মত? এই সমস্ত বিষয়ে এছলামের যে কঠোর নির্দেশ রহিয়াছে তাহা তাঁহারা ভুলিয়া গিয়াছেন কি? আমাদের আল্লাহ্ পবিত্র কোরআনে বলিয়াছেন, "যে ব্যক্তি একজন নিরীহ (সে যে কোন ধর্মাবলম্বীই হউক না কেন) মানুষের প্রাণ সংহার করে সে দুনিয়ার সমস্ত মনুষ্য জাতির জীবন-সংহারের অপরাধে অপরাধী। আর যে এক জন বিপন্ন মানুষের জীবন রক্ষা করিয়াছে সেই মহৎ, সমস্ত মনুষ্য জাতির জীবনরক্ষার পুণ্যভাগী।" এই দৃষ্টান্ত অনুসরণ করিয়া চলিলে আজ যে অসংখ্য নাগরিকের জীবন বিপন্ন হইল ইহার জন্য কি লীগ-নায়করা সমস্ত মনুষ্য জাতির জীবন-সংহারের পাপ অর্জন করেন নাই?

বাংলার প্রধান মন্ত্রীর দুই রূপ

বাংলার প্রধান মন্ত্রী যে দ্বৈতনীতি অনুসরণ করিয়া চলিয়াছেন দেশের শান্তি ও শৃঙ্খলার উপর তাহার ফল বিষময় হইয়াছে এবং গবর্মেণ্টের উপর জনসাধারণের আস্থা ক্রমশঃ আরও কমিয়া আসিতেছে। ১৬ই আগষ্ট গড়ের মাঠের সভায় মিঃ সুরাবর্দী প্রত্যক্ষ সংগ্রামের প্রস্তাব উত্থাপন করেন। প্রত্যক্ষ সংগ্রাম উপলক্ষে আইন অমান্য সুরু করিবার প্রস্তাব যিনি তুলিয়াছেন, তিনিই প্রদেশের আইন ও শৃঙ্খলা রক্ষার ভারপ্রাপ্ত প্রধান মন্ত্রী। ইহার কয়েক দিন আগে তিনিই এক বিবৃতিতে ঘোষণা করেন যে কংগ্রেস লীগকে বাদ দিয়া কেন্দ্রীয় সরকার গঠন করিলে বাংলাদেশ বিদ্রোহ ঘোষণা করিবে এবং কেন্দ্রীয় সরকারকে কর দেওয়া বন্ধ করিবে। সিন্ধুতে মিঃ গজদারও অনুরূপ বিবৃতি দিয়াছিলেন। কিন্তু মিঃ গজদারের সহিত মিঃ সুরাবর্দীর পার্থক্য এই যে, প্রথমোক্ত ব্যক্তির সহিত গবর্মেণ্টের কোন সম্পর্ক নাই, দ্বিতীয় ব্যক্তি প্রাদেশিক স্বরাষ্ট্র বিভাগের ভারপ্রাপ্ত প্রধান মন্ত্রী। বাংলার প্রধান মন্ত্রীর দ্বৈত রূপের এখানেই শেষ নয়। দাঙ্গার অব্যবহিত পরে তিনি স্বদেশে ও বিদেশে পরস্পর বিরোধী দুই প্রকার বিবৃতি দিয়াছেন। ২২শে আগষ্ট তিনি বাংলার জনসাধারণকে উদ্দেশ করিয়া বলেন:

"প্রথমেই বলিয়া রাখি যে, এবারকার (অর্থাৎ ১৬ই আগষ্ট তারিখের প্রত্যক্ষ সংগ্রাম দিবসের) অনুষ্ঠান উপলক্ষে এই বিরাট নগরীকে যে সাম্প্রদায়িক দুর্গতি ভোগ করিতে হইল তাহার জন্য কাহাকেও দোষের ভাগী করিবার সময় এখনও আসে নাই। কোনও এক ব্যক্তিই —বিশেষ করিয়া গবর্মেণ্টের মধ্যে নাই এমন কোনও এক ব্যক্তিই—এই শোচনীয় ব্যাপার সম্বন্ধে পূর্ণ তথ্য অবগত নহে, সুতরাং কি ভাবে এবং কেন এই দাঙ্গা আরম্ভ হইল সে সম্বন্ধে কোনও রায় দিতে পারে না।

"কিবা গবর্মেণ্ট আর কিবা নাগরিকবর্গ এখন উভয়ের পক্ষেই প্রথম কাজ হইতেছে পারস্পরিক সদ্ভাব এবং আস্থার পুনঃ প্রতিষ্ঠা করা। আমি এজন্য খুবই খাটিতেছি। আপনারা সকলেই নিশ্চয়ই লক্ষ্য করিয়াছেন যে, স্বস্তির ভাব ফিরিয়া আসার লক্ষণ দেখা যাইতেছে। আমি মাঝে মাঝে শান্তি সম্মেলন ডাকিয়াছি, তাহাতে বিভিন্ন দলের নেতারা যোগ দিয়াছেন, সে সমস্ত সভায় বর্তমান অবস্থার কথা আলোচিত হইয়াছে। আপনারা সকলেই বোধ হয় জানেন যে, গতকল্য সম্মেলনে স্থির হইয়াছে, সকলে শান্তির চেষ্টায় শহর ঘুরিয়া বেড়াইবেন এবং লোককে আহাম্মকের মত গুণ্ডামি, লুঠ ও নরহত্যা হইতে বিরত থাকিতে বলিবেন। ইহাতে যে চমৎকার সাড়া পাওয়া গিয়াছে তাহাতে আমরা বড়ই আপ্যায়িত হইয়াছি।

* * *

"এ সম্পর্কে আমি বর্তমানে কিছুই বলিতে চাহি না। কারণ ইহাতে শান্তি স্থাপনে ব্যাঘাত হইতে পারে। প্রকৃত পক্ষে যাহারা শান্তি কামনা করে ও শান্তি স্থাপনের চেষ্টা করে তাহারা আমার বিরুদ্ধে যত খুশী নালিশ করিতে পারে। শান্তি প্রতিষ্ঠা হইলে আমি সকল নালিশের ঠিক ঠিক উত্তর দিতে এবং আসল ব্যাপার প্রকাশ করিতে পারিব।"

ঐ দিনই তিনি বিদেশী সাংবাদিকদের এক সম্মেলন আহ্বান করেন। সেখানে তিনি যাহা কিছু বলেন তাহা ভারতবর্ষের কুত্রাপি প্রকাশিত হইবে না ইহাই ছিল তাঁহার সর্ত। সুতরাং এখনও উহার বিস্তৃত বিবরণ জানা যায় নাই। দৈনিক ভারতের নিউ ইয়র্কস্থ সংবাদদাতা উক্ত বক্তৃতার একখণ্ড নকল প্রেরণ করায় ৩০শে আগষ্ট তারিখের 'ভারতে' উহার সারাংশ প্রকাশিত হয়। ঈদের সময় কোন হাঙ্গামা হইবে না এই মত ব্যক্ত করিয়া সুরাবর্দী বলেন:

"ঈদের পূর্বেই শহরের অবস্থা স্বাভাবিক হইয়া যাইবে বলিয়া আমি মনে করি। কিন্তু ভারতে অন্তর্বর্তী সরকার গঠনের সহিত জড়িত রাজনৈতিক পরিস্থিতির দরুন ঐ শান্তি বেশী দিন টিকিবে বলিয়া আমার মনে হয় না।"

তিনি কলিকাতার সাম্প্রতিক হাঙ্গামার জন্য হিন্দুদের

উপর দোষারোপ করেন। মিঃ সুরাবর্দী বলেন হিন্দুরাই কলিকাতাব্যাপী সাম্প্রদায়িক সংগ্রাম সুরু করিয়াছেন এবং ভারতের এক সম্প্রদায়কে অপর সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে উত্তেজিত করার জন্য ব্রিটিশ সরকার দায়ী।

'হিন্দু কংগ্রেস' নাকি সংগ্রামের সুযোগ খুঁজিতেছিল এবং সহজেই বুঝা যায় যে, তাহারাই হাঙ্গামা সুরু করিয়াছে। কংগ্রেস নাকি বাংলার মন্ত্রিসভার মুখে চুণ-কালি দিবার জন্য হাঙ্গামা বাধাইয়া বাহিরে ঐ নিন্দাবাদ প্রচারের পক্ষে একটা সুবিধাজনক অবস্থা সৃষ্টির চেষ্টায় ছিল।

হিন্দু-মুসলমান বিরোধের জন্য ব্রিটিশ সরকারকে দায়ী করিয়া মিঃ সুরাবর্দী বলেন, "ব্রিটিশ সরকার, মন্ত্রী-মিশন এবং বড়লাট ভারতীয় স্বাধীনতা সমস্যা সম্পর্কে হিন্দু ও মুসলমানকে লইয়া ইচ্ছাকৃত ভাবে হেলা-খেলা করায় বিদ্বেষ ভাব বিশেষ বৃদ্ধি পাইয়াছে।"

"'প্রত্যক্ষ সংগ্রাম' দিবসে মুসলমানগণ শান্তিপূর্ণ থাকিতে কৃতসঙ্কল্প হইয়াছিল এবং লড়াইয়ের জন্য একেবারে প্রস্তুত ছিল না। প্রথম সংঘর্ষে একজন হিন্দুও নিহত বা আহত হয় নাই। মুসলমানরাই শুধু নিহত বা আহত হইয়াছে।

"ব্রিটিশরা হিন্দু ও মুসলমানদের মধ্যে এমন বিদ্বেষ সৃষ্টি করিয়াছে যে, নূতন পথ খাতলাইবার জন্য তাহাদের এদেশে থাকিতেই হইবে। ব্রিটিশের ভারত ত্যাগের কোন ইচ্ছাই নাই।"

লীগের এই দ্বৈত নীতি সমগ্র দেশের পক্ষে গভীর অকল্যাণের কারণ হইতে বাধ্য, হইয়াছেও তাই। প্রত্যক্ষ সংগ্রাম উপলক্ষে আইন অমান্য আরম্ভ করিতে হইলে সর্বাগ্রে লীগের উচিত ছিল ব্যবস্থা পরিষদ বর্জন এবং মন্ত্রিত্ব পরিত্যাগ। কিন্তু তাঁহারা প্রথম হইতেই উহার বিপরীত আচরণ করিয়া আসিতেছেন। মন্ত্রীরা নিজেদের কথা ও মন্তের দ্বারা গুণ্ডা-শ্রেণীর মুসলমানদের বুঝিতে দিয়াছেন যে হিন্দুর প্রাণনাশ, হিন্দুর সম্পত্তি লুণ্ঠন প্রভৃতিই প্রত্যক্ষ সংগ্রামের মূল কথা। ইহা বুঝিয়াই গুণ্ডাশ্রেণীর লোকেরা দাঙ্গা আরম্ভ করিয়াছে। কলিকাতা এবং পূর্ববঙ্গের, বিশেষতঃ ঢাকার ঘটনায় দেখা গিয়াছে মন্ত্রীরা কঠোর হস্তে আইন প্রয়োগ করিয়া গুণ্ডা-মুসলমানদের দমন করিতে এখনও অনিচ্ছুক। কলিকাতায় নির্বিচারে প্রমাণ-প্রয়োগের প্রতি লেশমাত্র লক্ষ্য না রাখিয়া অতি নিম্নশ্রেণীর মুসলমানদেরও অভিযোগে ভদ্র হিন্দুদের পর্যন্ত বেপরোয়া ভাবে গ্রেপ্তার করা হইতেছে, অথচ হিন্দুরা নরহত্যার গুরুতর অভিযোগ করিয়াও অপরাধীদের গ্রেপ্তার করাইতে পারিতেছে না। ঢাকার প্রথমটা দাঙ্গাকারী ও দাঙ্গার সমর্থক মুসলমানদের উপর কঠোর ব্যবস্থা অবলম্বন করায় এবং বেশী করিয়া পাইকারী জরিমানা ধার্য করায় দাঙ্গার প্রকোপ অনেকটা কমিয়া আসিতেছিল। সম্প্রতি ঢাকার ম্যাজিষ্ট্রেট কলিকাতায় ঊর্দ্ধতন কর্তৃপক্ষ কর্তৃক আহূত হইয়া আসিয়াছিলেন। তিনি ফিরিয়া যাওয়ার পর পূর্ব অনুসৃত নীতি পরিবর্তিত হয়। মুসলমানকে আহত করার অভিযোগে যেখানে হিন্দুদের উপর পাঁচ হাজার টাকা জরিমানা ধার্য হয়, হিন্দু হত্যার অভিযোগে সেখানে মুসলমানদের জরিমানা হয় মাত্র তিন শত টাকা। মুসলমানদের মধ্যে প্রচারকার্য চলিতেছে যে জরিমানার টাকা আদায় হইবে না, বা আদায় হইলেও তাহা ফেরত দেওয়া হইবে। ইহাতেও গুণ্ডাশ্রেণীর দুষ্প্রবৃত্তি বাড়িয়া গিয়াছে।

বাংলার বর্তমান মন্ত্রীদের এই যে দ্বৈত নীতি ১৬ই আগষ্ট হইতে সুরু হইয়াছে, এখনও তাহা অব্যাহত ভাবেই চলিতেছে। লীগের জন্মাবধি অতি পরিষ্কার ভাবে দেখা গিয়াছে যে মুসলমান গুণ্ডারা সরকারের ও পুলিসের সমর্থন না পাইলে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গায় কখনও বেশী দিন টেঁকে না। লীগের অন্যায় ও অযৌক্তিক আবদার গগনস্পর্শী হইয়াছে সরকারী সমর্থন লাভের ফলে। গবর্মেণ্টের শাসন-যন্ত্র পিছনে থাকে বলিয়াই লীগ দেশের অনিষ্ট করিয়া সাম্রাজ্যবাদী ইংরেজের সহায়তা করিতে পারে। এখনও লীগের অন্তরালে রক্ষণশীল সিভিলিয়ান ও পুলিস কর্তৃপক্ষ যে ভাবে অকস্মাৎ গণতন্ত্রের প্রতি পরম শ্রদ্ধাবান হইয়া লীগ-মন্ত্রীদের দ্বৈত নীতি এবং তাঁহাদের সকল অন্যায় কার্য সমর্থন করিয়া চলিয়াছেন তাহাতে বুঝিতে কষ্ট হয় না যে লীগকে শিখণ্ডী করিয়া রক্ষণশীল দলের স্তম্ভ-স্বরূপ সিভিলিয়ানতন্ত্র কর্তৃক বিলাতের শ্রমিক দল ও কংগ্রেসের শুভপ্রচেষ্টা ব্যর্থ করিয়া দিবার চেষ্টা চলিতেছে। "দাঙ্গার জন্য হিন্দু কংগ্রেস দায়ী" এই ঘৃণ্য মিথ্যার লেশমাত্র প্রমাণ লীগের নেতৃবর্গ কোন কিছুই দিতে পারেন নাই। উচ্চকণ্ঠে মিথ্যার প্রচার যাহাদের মূলনীতি সেই দলের কোনও ধর্মের দোহাই দেওয়া আশ্চর্য। অথচ এই ধর্মের দোহাই এঁদের একমাত্র সম্বল।

দাবির উগ্রতা অবাস্তব

মিঃ আনিসুজ্জমান মুসলমান যুবকদিগকে বর্তমান নেতৃত্বের ব্যর্থতা, নেতাদের বিষময় অদূরদর্শিতা ও "অভূতপূর্ব অর্বাচীনতা" লক্ষ্য করিয়া ভবিষ্যতের জন্য নূতন করিয়া গড়িয়া উঠিবার জন্য অনুরোধ জানাইয়াছেন। তিনি বলিতেছেন, "চার্চিলের মন্ত্রণা যে নেতৃত্বের নির্দেশ দেয় সে নেতৃত্ব দূরে নিক্ষেপ করিয়া সমাজকে নূতন করিয়া ঢালিয়া সাজিতে হইবে। এই নেতৃত্ব আজ সমাজকে কোন্ পূতিগন্ধময় স্তরে নামাইয়াছে তাহা চিন্তা করিয়া ভবিষ্যতের জন্য সতর্ক হইতে হইবে। শুধু দশ কোটি মুসলমানের নয়, চল্লিশ কোটি মনুষ্য সন্তানের শোষক সেই ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে যে লড়াই, সেই লড়াই-ই প্রকৃত জেহাদ।"

বিভিন্ন সংবাদপত্রে এই ধরণের চিন্তাশীল ও দূরদর্শী মুসলমানদের লিখিত পত্র প্রকাশিত হইয়াছে। তন্মধ্যে দেরাদুন হইতে লিখিত মিঃ কে. এফ. ইব্রাহিমের পত্রখানি নিয়ে প্রদত্ত হইল। উহা ষ্টেটসম্যান পত্রে প্রকাশিত হয়।

"আমি লীগারও নই, জাতীয়তাবাদী মুসলমানও নই। আমি নিতান্তই সাধারণ মুসলমান, সত্য কথা বুঝিতে চাই। মুসলমানেরা সমগ্র ভারতের জনসংখ্যার এক চতুর্থাংশ মাত্র ইহা বাস্তব সত্য। সকলকে যাহা দেওয়া হয় তার এক-চতুর্থাংশ পাইলেই আমাদের সন্তুষ্ট থাকা উচিত। আমরা নিজেদের জন্য যে ভাবে প্রাপ্যের অতিরিক্ত দাবি করিতেছি, অপরকে কি আমরা তাহাই দিতে পারিব? ক্যাবিনেট মিশনের প্ল্যানের 'বি' গ্রুপের শিখদের কি আমরা অন্যত্র যাহা আদায় করিব সেই অনুপাতে সুবিধা দিতে রাজী হইব? যতই সাম্প্রদায়িক দরদ আমার মধ্যে থাকুক না কেন, মিঃ জিন্না যখন প্যারিটির কথা বলেন আমার সমগ্র অন্তরাত্মা তাহা শুনিলে বিদ্রোহী হইয়া উঠে। প্যারিটি আদায় করিয়া মিঃ জিন্না তাঁহার সুর আরও চড়াইয়া বাঁধিয়াছেন, তিনি ভুলিয়া গিয়াছেন যে সুর চড়াইয়া সর্বোচ্চ গ্রামে বাঁধিতে গেলেই উহা ছিঁড়িবার সম্ভাবনা বেশী থাকে।

"সংখ্যাগরিষ্ঠ হিন্দুরা তাহাদের ন্যায্য প্রাপ্যের বহুলাংশ স্বেচ্ছায় ছাড়িয়া দেওয়ায় যেখানে সন্তুষ্ট হওয়া উচিত ছিল, লীগ-নেতারা সেখানে সাম্প্রদায়িকতার বিষ ছড়াইতে আরম্ভ করিয়াছেন। বড় বড় নেতারা নিশ্চিন্ত আরামে বদ্ধ ঘরে বসিয়া হুকুম দিতে পারেন, মরিবার সময় মরে নিরীহ এবং রাজনৈতিক জ্ঞানবিবর্জিত মুসলমান।

"কলিকাতার হত্যাকাণ্ডে তাঁহার সম্প্রদায়ের কি দুর্দশা হইয়াছে তাহা জানিয়াও মিঃ জিন্না শিক্ষালাভ করিতে চাহিতেছেন না ইহা কি দুঃখের বিষয় নয়? লীগ-নেতাদের প্ররোচনায় মুসলমানেরাই সম্ভবতঃ দাঙ্গা সুরু করিয়াছিল, কিন্তু পরে তাহারাই হাজারে হাজারে মরিয়াছে ইহা তো অস্বীকার করিয়া লাভ নাই? ছোরা নাচাইয়া আমাদের কি লাভ হইয়াছে? লীগ ছুরি মারিতে গেলে বিপক্ষ দলও ছুরি মারিতে পারে এবং হইতেছেও তাই। ইহাতে সারাটা দেশে গৃহযুদ্ধ সুরু হইয়া যাইবে এবং নির্বিরোধী হিন্দু মারমুখো হইয়া আক্রমণ আরম্ভ করিবে। গুণ্ডামির প্ররোচনা বন্ধ করিয়া সাধারণ মানুষকে বাঁচাইবার সময় আসিয়াছে।"

দাঙ্গায় সব মুসলমান যোগদান করেন নাই বহু ঘটনায় তাহা প্রমাণিত হইয়াছে। কিন্তু তাঁহারা সঙ্ঘবদ্ধ ভাবে প্রকাশ্য প্রতিবাদ করিলে এবং সাধারণ মুসলমানকে এই দ্বন্দ্বের বিফলতা ও বিপদ বুঝাইয়া দিতে অগ্রসর হইলে সুফল ফলিতে পারিত, কিন্তু তাহা অনেকে করিতে সাহসী হন নাই। বর্তমান লীগ মন্ত্রিত্ব না ভাঙিলে বাঙালী হিন্দুর যেমন আশঙ্কার কারণ রহিয়াছে, বাঙালী মুসলমানের বিপদের সম্ভাবনাও তেমন কম নয়। সুতরাং এই দলকে অপসারিত করিয়া হিন্দু মুসলমান উভয়ের সমান বিশ্বাসভাজন মন্ত্রীমণ্ডল গঠনের কার্যে চিন্তাশীল মুসলমানদেরই আগাইয়া আসিতে হইবে। এখনও শুধু মুসলমান বলিয়াই বর্তমান মন্ত্রিসভা ইঁহাদের সমর্থন পাইতে থাকিলে দেশের সকল সম্প্রদায়েরই মঙ্গল সুদূরপরাহত হইবে।

বাংলায় উন্নয়ন পরিকল্পনা

বোম্বাই, যুক্ত প্রদেশ প্রভৃতিতে কংগ্রেসী মন্ত্রীদের উদ্যোগে প্রদেশবাসীর শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও আর্থিক উন্নতি সাধনের জন্য পরিকল্পনা প্রস্তুত করিয়া কি ভাবে উহা কার্যে পরিণত করা হইতেছে তাহার সংক্ষিপ্ত পরিচয় অন্যত্র দেওয়া হইয়াছে। ক্ষুদ্র উড়িষ্যার মন্ত্রীরাও নবীন উদ্যমে জনসাধারণের স্থায়ী কল্যাণ সাধনের চেষ্টায় আত্মনিয়োগ করিয়াছেন। বাংলার অবস্থা আগে যাহা ছিল এখনও তাহাই আছে। বাংলার যাঁহারা গবর্মেণ্টের কর্ণধার জনসাধারণের কল্যাণের চেয়ে ব্যক্তিগত ও সাম্প্রদায়িক স্বার্থ তাঁহাদের নিকট অনেক বড়। অন্যান্য প্রদেশের দেখাদেখি এখানেও অনেক বড় বড় পরিকল্পনা প্রস্তুত হইয়াছে, কিন্তু তার কোনটির সহিত কোনটির সামঞ্জস্য নাই। পুলিসের বাড়ী তৈরি হইতে সুরু করিয়া গবাদি পশুর উন্নতি প্রভৃতি সব কিছুই উহার মধ্যে আছে।

বাংলার পরিকল্পনায় সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য বিষয় অর্থব্যয়। এই পরিকল্পনাসমূহ যখন পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয় তখনই আমরা উহা লইয়া আলোচনা করিয়াছি। উহা কার্যে পরিণত করিবার নামে একজন ডেভেলাপমেণ্ট কমিশনারের পদ সৃষ্ট হইয়াছে এবং যিনি বাংলার ও ভারতবাসীর স্বার্থের বিরুদ্ধাচরণ ও সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষ প্রচারে আজীবন সহায়তা করিয়াছেন এমন এক জন ইংরেজ সিভিলিয়ানকে ঐ পদে নিযুক্ত করা হইয়াছে। সম্প্রতি এই ডেভেলাপমেণ্ট কমিশনার কলিকাতার রোটারী ক্লাবে বাংলাদেশের উন্নয়ন পরিকল্পনার ব্যাখ্যা করিয়া বক্তৃতা করিয়াছেন। যথারীতি সিভিলিয়ান কায়দায় তিনি প্রথমেই দেখাইয়াছেন যে পরিকল্পনা কার্যে পরিণত করিতে হইলে প্রথমেই একটি ডেভেলাপমেণ্ট বোর্ড গঠন এবং এই বিভাগে লোক নিয়োগ আবশ্যক। দীর্ঘকাল যাবৎ বাংলা-সরকার যে কোন বিভাগে উন্নয়ন বলিতে কর্মচারী বৃদ্ধি বুঝিয়া থাকেন। এই কর্মচারী বৃদ্ধি রাজনৈতিক কারণে অপরিহার্য। দল রাখিতে গেলেই দলের লোককে সন্তুষ্ট করিতে হয়, তার জন্য চাকুরি দিতে হয়; চাকুরি খালি না থাকিলে নূতন চাকুরি সৃষ্টি করিতে হয়। নূতন চাকুরি সৃষ্টির সবচেয়ে বড় অজুহাত প্রদেশের উন্নতির নামে পরিকল্পনা প্রণয়ন। ডেভেলাপমেণ্ট কমিশনার দেখাইয়াছেন যে বাংলার পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার

মোট ১৬০ কোটি টাকা ব্যয় হইবে। আপাততঃ হুগলী জেলার পোলবা থানায় এবং ঢাকা জেলার কালীগঞ্জ থানায় উন্নতি সাধনের পরীক্ষা আরম্ভ হইবে। যশোহর জেলাতেও কিছু কাজ সুরু হইবে। এই সব পরীক্ষা সফল হইলে তারপর সমগ্র প্রদেশের উন্নয়ন কার্য আরম্ভ হইবে। ইতিমধ্যে পরিকল্পনার মধ্যে পুলিস ও সরকারী কর্মচারীদের ঘর-বাড়ী তৈরি, বেতন বৃদ্ধি, চাকুরির সংখ্যা বৃদ্ধি—সেগুলি অবশ্যই চলিতে থাকিবে। ডেভেলাপমেন্ট বিভাগের চাকুরিগুলিও খালি থাকিবার সম্ভাবনা নাই।

নৌকা-বিভাগের কীর্তি

নৌকা তৈরি করিয়া নদীমাতৃক বাংলার মাঝি ও মৎস্যজীবীদের উদ্ধার করিবার যে স্কীম বাংলা-সরকার রচনা করিয়াছিলেন তাহা উন্নয়ন-পরিকল্পনার নামেই করা হইয়াছিল। একমাত্র নৌকা তৈরি ব্যাপারেই জনসাধারণের প্রায় ৮ কোটি টাকা অপচয় হইয়াছে। এই কার্যে এখনও সরকারী নৌবহরের মাঝিমাল্লাদের বেতন প্রভৃতি বাবদ অপচয় চলিতেছে। পরিকল্পনার নামে কোটি কোটি টাকা বাংলার লীগ মন্ত্রীদের হাতে পড়িলে তার কি গতি হইবে, নৌকা-বিলাসের ইতিহাস তাহার শ্রেষ্ঠ নিদর্শন। মাদারীপুরে এ বিষয়ে সম্প্রতি একটি মামলায় ম্যাজিষ্ট্রেট যে রায় দিয়াছেন তাহা হইতেই লীগ-রাজত্বে দেশের উন্নতিসাধনের নমুনা বুঝা যাইবে।

খুলনার সিভিল সাপ্লাই আপিসের নৌকাবিভাগের কাজী সেকেন্দার আলি নামক জনৈক মাঝির প্রতি মাদারীপুরের ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ জি এন মণ্ডল দুই মাস সশ্রম কারাদণ্ড এবং দুই শত টাকা জরিমানার আদেশ দেন। রায়দান-প্রসঙ্গে ম্যাজিষ্ট্রেট খুলনার সিভিল সাপ্লাই আপিসের নৌকা বিভাগের বিরুদ্ধে তীব্র মন্তব্য করিয়া বলেন যে, আদালতের শমন অগ্রাহ্য করিয়া এবং প্রামাণ্য কাগজপত্রাদি সরাইয়া রাখিয়া নৌকা-বিভাগ মামলার প্রথম হইতে শেষ পর্যন্ত আসামী সেকেন্দার আলির অপরাধ গোপন করিবার চেষ্টা করিয়াছে। ইহা হইতে স্পষ্টই মনে হয় আসামীর সহিত উক্ত বিভাগের ভারপ্রাপ্ত কর্মচারীদের যোগাযোগ আছে। সিভিল সাপ্লাই আপিসের কর্মচারীদের আচরণ সম্বন্ধে ম্যাজিষ্ট্রেট বলিয়াছেন :

"শিলচর থানার দারোগার অনুরোধে খুলনার থানার সাব-ইন্সপেক্টর আবদাস সোভান খুলনার ৪নং ঘাটের কয়েকজন অফিসারকে জিজ্ঞাসাবাদ করেন ও তাহাদের ট্রিপ-বুক লইয়া যাইতে চাহেন কিন্তু নৌকা বিভাগের ভারপ্রাপ্ত কর্মচারী ঐ হিসাববহি অর্পণ করিতে অস্বীকার করিয়া বলেন যে, উহা ডিপার্টমেন্টের সব সময়ে দরকার, তবে মামলার সময় উহা উপস্থিত করা হইবে। কিন্তু এই দলিল উপস্থিত করিবার জন্য শমন প্রেরিত হইলে উক্ত আপিসে শমনে উল্লিখিত নামে কোন ব্যক্তি নাই বলিয়া শমনটি ফেরত আসে। ইহার পর সাক্ষীর বিরুদ্ধে গ্রেপ্তারী পরোয়ানা জারী করা হইলে তিনি আদালতে হাজির হন কিন্তু উক্ত ট্রিপ-বুক উপস্থিত করেন নাই। খুলনার সিভিল সাপ্লাই বিভাগে ট্রান্সপোর্টেশন ও ষ্টোরেজ বিভাগের সহকারী ডাইরেক্টর মিঃ কোহেন জানান যে ঐ খাতাটি হারাইয়া যাইবার আশঙ্কায় ইন্সপেক্টরের হস্তে উহা দেওয়া হয়। তদনুযায়ী ঐ ট্রিপ-বুকসহ আদালতে উপস্থিত হইবার জন্য মিঃ কোহেনের উপর শমন জারী করা হয়, কিন্তু মিঃ কোহেন নিজের দায়িত্ব এড়াইয়া খুলনার সিভিল সাপ্লাই দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত কর্মচারী মিঃ কে কে. লাহিড়ীর উপর দায়িত্ব চাপাইয়া দেন। বহু দ্বিধা-সঙ্কোচের পর মিঃ লাহিড়ী আদালতে হাজির হইয়া বলেন যে, উল্লিখিত খাতাটি নৌকা বিভাগের ভারপ্রাপ্ত কর্মচারী মিঃ এস. এম. আমেদের হেফাজতে আছে। মিঃ আমেদের নামে শমন জারী করা হইলে সাব-ইন্সপেক্টর মিঃ এ. কে. এম. ফজলুল হক যোগার হিসাবের খাতার ন্যায় একটি বাজে খাতা আদালতে উপস্থিত করেন। তদন্তকালে যে অংশে আসামীর ও পুলিস কর্মচারীর স্বাক্ষর ছিল এই খাতায় তাহার চিহ্নমাত্রও ছিল না। এই ফজলুল হক কিংবা ইন্সপেক্টর সত্যেন বিশ্বাসের হস্তে ইতিপূর্বে এই খাতা দেওয়া হয় নাই। নৌকা-বিভাগের মিঃ এস. এম. আমেদ এক চিঠিতে জানান যে, আসামী কাজী সেকেন্দর হয়ত খাতা হইতে উহা ছিঁড়িয়া ফেলিয়াছে। তদন্তকারী পুলিস কর্মচারীকে পুনরায় আদালতে উপস্থিত হইতে বলা হয়, তিনি বলেন যে তদন্তকালে ঐ বাজে খাতায় তিনি সহি করেন নাই। তখন মিঃ এস. এম. আমেদের নামে শমন এমন কি গ্রেপ্তারী পরোয়ানা পর্যন্ত বাহির করা হয় কিন্তু খুলনার নৌকা-বিভাগে ঐ নামের কোন কর্মচারী না থাকায় পরোয়ানা জারী করা যায় নাই। নৌকা-বিভাগের ভারপ্রাপ্ত কর্মচারীর যদি কোন সন্ধান না পাওয়া যায় তবে স্বতঃই সন্দেহ জাগে যে এ বিভাগের অস্তিত্ব আছে কিনা। ১৯৪৫-এর জুলাই হইতে ১৯৪৬-এর জুন পর্যন্ত এই মামলা চলে, কিন্তু ইহার সহিত সংশ্লিষ্ট অফিসারদের আদালতে উপস্থিত করা সম্ভবপর হয় নাই। এই অফিসারদিগকেও যদি আসামী করিয়া এই মামলা চালান হইত তবেই ফরিয়াদী পক্ষ সঙ্গত কার্য করিতেন।

ফরিদপুরের দায়রা জজ ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেটের রায় অনুমোদন করিয়া মন্তব্য করেন যে সিভিল সাপ্লাই বিভাগের বেয়াড়া কার্যকলাপ সম্বন্ধে দীর্ঘ ও তীব্র মন্তব্য করিয়া ম্যাজিষ্ট্রেট সঙ্গত কাজই করিয়াছেন।

দুর্ভিক্ষ নিবারণ সম্বন্ধে মার্কিন মিশনের অভিমত

মার্কিন দুর্ভিক্ষ মিশন ভারতের খাদ্যাবস্থা পর্যবেক্ষণের পর এক সাংবাদিক সম্মেলনে তাঁহাদের মতামত জ্ঞাপন করেন। বিখ্যাত খাদ্যতত্ত্বজ্ঞ ও অর্থনীতিবিদ ডাঃ থিয়োডর শুলজ মিশনের বক্তব্য ব্যক্ত করেন।

তাঁহারা বলেন, ভারতে জনপ্রতি মাত্র ১২ আউন্স খাদ্য

বরাদ্দ হইয়াছে। ভারতবাসী এই ভাবে আত্মনির্ভরশীল হইবার চেষ্টা করিতে গিয়া অনশনের প্রান্তে আসিয়া পৌঁছিয়াছে। ভারত অন্যান্য দেশের নিকট হইতে যে পরিমাণ খাদ্য চাহিয়াছে তাহার প্রয়োজনের তুলনায় তাহাকে কোনমতেই অতিরিক্ত বলা চলে না।

তাহার উপর কোন কোন অঞ্চলে সাময়িক খাদ্যাভাব মিটাইবার জন্য কিছু মাল হাতে মজুদ রাখা প্রয়োজন। বাংলার খাদ্যসংক্রান্ত অব্যবস্থার কুফলও উহাদ্বারা লাঘব করা যাইতে পারে।

দক্ষিণ-ভারত, পশ্চিম-ভারত এবং যুক্তপ্রদেশে খাদ্য সংগ্রহ ও খাদ্য-বণ্টনের সুব্যবস্থা দেখিয়া মার্কিন মিশন চমৎকৃত হইয়াছেন। পৃথিবীর যে কোন দেশের তুলনায় ঐ সকল প্রদেশের ব্যবস্থা উন্নততর। অপর কোথাও এত ভাল সরকারী নিয়ন্ত্রণব্যবস্থা নাই। যুক্তপ্রদেশে খাদ্যসংগ্রহের কার্য্য আশাতিরিক্ত ভাবে সফল হওয়ায় মাল গুদামজাত করার ব্যাপার এক সমস্যায় দাঁড়াইয়াছে, সহস্র সহস্র দেশবাসী যে কংগ্রেসী সরকারকে সর্বতোভাবে সাহায্য করিতেছেন মার্কিন মিশন তাহার যথেষ্ট প্রমাণ পাইয়াছেন।

ডাঃ গুল্ড আরও বলেন যে বাংলার খাদ্যসংগ্রহ ব্যবস্থা তেমন সুনিয়ন্ত্রিত বা কার্যকরী নহে। পঞ্জাব এবং সিন্ধুতে প্রয়োজনের অতিরিক্ত খাদ্য থাকিলেও খাদ্যসংগ্রহ ব্যবস্থা সন্তোষজনক বা ত্রুটিশূন্য নহে। কিন্তু সমস্ত দেখিয়া শুনিয়া মিশন স্পষ্টই বুঝিয়াছেন যে ভারত-সরকার যতটুকু দাবি করিয়াছেন বিদেশ হইতে অন্ততঃপক্ষে ততটা খাদ্য পাঠান নিতান্তই আবশ্যক।

মিশন আমেরিকাতে এই বিষয় প্রচার করিয়া জনমত জাগ্রত করিবেন।

আমেরিকাতে যথাযোগ্য সংবাদ ও তথ্যাদি পৌঁছায় নাই বলিয়াই ভারতের সাহায্য প্রাপ্তিতে বিঘ্ন ঘটিয়াছে। ওয়াশিংটনের খাদ্য-সম্মেলনে ভারত ৪০ লক্ষ টন খাদ্য দাবি করাতে আমেরিকা আশ্চর্য হইয়া গিয়াছিল। তাহারা বুঝিতেই পারে নাই যে সত্যই এতটা দরকার। আমেরিকা মনে করিয়াছিল যে ভারতের খাদ্যাভাবের কথা অনেক বাড়াইয়া বলা হইয়াছে। তাহার উপর দুর্ভিক্ষ না হওয়ায় তাহাদের ঐ ধারণা আরও বদ্ধমূল হইল। আমেরিকা জানিতেই পারিল না যে ভারতবাসী আহারের মাত্রা অর্দ্ধাশনের পর্যায়ে নামাইয়া আনিয়া মন্বন্তর হইতে রক্ষা পাইয়াছে।

মিশন কি ভাবে জনমত জাগ্রত করিবেন তাহাও ডাঃ গুল্ড বর্ণনা করেন। তাঁহাদের দলে কয়েকজন খ্যাতনামা সাংবাদিক এবং এক জন ফটোগ্রাফার ছিলেন। তাঁহারা যে পাঁচ হাজার ফটো তুলিয়াছেন সেগুলি লিখিত বিবরণসহ আমেরিকার সমস্ত সংবাদপত্রে প্রকাশিত হইবে। তাহা হইলেই মার্কিন জনসাধারণ বুঝিবে ভারতবাসী কত সামান্য ও নিকৃষ্ট খাদ্য খাইয়া কোনমতে প্রাণ ধারণ করিতেছে।

রাজনৈতিক কারণে জাপানে ভারত অপেক্ষা অনেক বেশী খাদ্য পাঠান হইতেছে এ কথা অস্বীকার করিয়া ডাঃ গুল্ড বলেন যে সেখানে মাথাপিছু বরাদ্দ খাদ্যের পরিমাণ এত কম যে মানুষ কোনমতে বাঁচিয়া থাকিতে পারে। খাদ্যের পরিমাণ আর একটু কম হইলেই তাহাদের জীবন বিপন্ন হইবে। মহাত্মা গান্ধী, মৌলানা আজাদ, পণ্ডিত নেহরু এবং মিঃ জিন্না সকলেই তাঁহাকে বলিয়াছেন যে খাদ্য-বণ্টনের ব্যাপারে জাপান এবং অপর সকল দেশকেই সমদৃষ্টিতে দেখিতে হইবে। মিশনের কার্যে পূর্ণ সহযোগিতার জন্য তিনি ভারতের সংবাদপত্রগুলির প্রতি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করেন।

সিভিল সার্ভিস

ভারতীয় সিভিল সার্ভিস দেশের স্বাধীনতার পথে দীর্ঘকাল যাবৎ যে সব অন্তরায় সৃষ্টি করিয়া আসিয়াছে তাহা এখন ইতিহাসের বস্তু। কংগ্রেস ভারত-শাসনের ভার গ্রহণ করিবার সঙ্গে সঙ্গে সাম্রাজ্যবাদের এই স্তম্ভ ভাঙিবার আয়োজন করিয়াছেন। প্রথমেই তাঁহারা আদেশ দিয়াছেন তাঁহাদের আগেকার কোন সেক্রেটারী বড়লাটের নিকট ফাইল পেশ করিতে পারিবে না। এখানেই থামিলে চলিবে না, ভারতবাসীর নিকট নবলব্ধ স্বাধীনতার বাস্তব ফল পৌঁছাইয়া দিতে হইলে এবং এই স্বাধীনতা স্থায়ী করিতে হইলে সাম্রাজ্যবাদের স্তম্ভস্বরূপ চক্রান্তকারী সিভিল সার্ভিস ভাঙিয়া দিয়া উহাকে নূতন করিয়া গড়িতে হইবে ইহাও কংগ্রেসনায়কেরা উপলব্ধি করিয়াছেন। প্রধান মন্ত্রীরূপে পণ্ডিত জবাহরলাল নেহরু তাঁহার প্রথম বেতার-বক্তৃতায় জানাইয়াছেন যে ভারতবর্ষের শাসনযন্ত্রের এখন যে অবস্থা তাহাতে আর মেরামতের দ্বারা উহাকে সচল রাখিবার উপায় নাই বর্তমান শাসনযন্ত্র ভাঙিয়া ফেলিয়া উহাকে নূতন করিয়া গড়িতে হইবে।

এই দুরূহ কার্য সাধন করিতে হইলে সর্বাগ্রে সিভিল সার্ভিসের উপর হস্তক্ষেপ করিতে হইবে ইহা তাঁহারা বুঝিয়াছেন। তাঁহাদের সম্মুখে এখন সমস্যা প্রধানতঃ তিনটি —(১) ভারত-সচিব কর্তৃক নিযুক্ত সিভিলিয়ানদের অবসর গ্রহণের জন্য ‘কুইট নোটিশ’ দেওয়ার তারিখ নির্দ্ধারণ, (২) যাহারা অবসর গ্রহণ করিবে তাহাদের পেন্সনের আনুপাতিক হার এবং যাহাদিগকে কর্মচ্যুত করা হইবে তাহাদের ক্ষতিপূরণের পরিমাণ নির্দ্ধারণ এবং (৩) সিভিল সার্ভিসের নূতন পরিচালন-ব্যবস্থা প্রণয়ন। যে সব সিভিলিয়ান ২২ বৎসরের অধিককাল কাজ করিয়াছেন তাঁহাদের নিকট ইতিমধ্যেই এই মর্মে নোটিশ গিয়াছে যে ১৯৪৬ সালের ৩১শে ডিসেম্বরের মধ্যে তাঁহারা অবসর গ্রহণ করিতে প্রস্তুত আছেন কিনা তাহা যেন তাঁহারা জানাইয়া দেন। এই তারিখকেই ‘কুইট

সোর্টিশে'র দিন ধরা যাইতে পারে কিনা তাহা বিবেচনা করা হইতেছে। জাতীয় ভারত-সরকার কর্তৃক রচিত নূতন সর্তে ইঁহারা কাজ করিতে প্রস্তুত থাকিলে তাহাও তাঁহাদিগকে জানাইতে বলা হইতেছে।

বর্তমানে সিভিল সার্ভিসে মোট ১০৭৪ জন কর্মচারী আছেন। তাঁহারা বিভিন্ন প্রাদেশিক গবর্মেণ্টের অধীনে কাজ করেন। শতকরা ১৫ হইতে ২০ জনকে কেন্দ্রীয় সরকারের অধীনে রাখা হয়। ভবিষ্যতে প্রাদেশিক সরকারের অধীনস্থ নবগঠিত সিভিল সার্ভিসের উপর কেন্দ্রীয় সরকারের হাত থাকিবে কি না, থাকা উচিত কিনা তাহা লইয়া এখনও তর্ক চলিতেছে। এ সম্বন্ধে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত এখনও হয় নাই। কেন্দ্রীয় এবং প্রাদেশিক উভয় সিভিল সার্ভিসের উপর কেন্দ্রীয় গবর্মেণ্টের কিছু ক্ষমতা না থাকিলে অর্থনৈতিক এবং অন্তবিধ পরিকল্পনা প্রণয়ন ও উহা কার্যে পরিণত করা কঠিন হইয়া উঠিবে। ইহা বুঝিয়াই বিষয়টি বিশেষভাবে বিবেচনা করা হইতেছে।

কংগ্রেস গবর্মেণ্টে কর্মচারীদের বেতন

নেহরু মন্ত্রী-সভা সরকারী কর্মচারীদের মোটামুটি চারি ভাগে ভাগ করিতে চাহিতেছেন এবং তাহাদের জন্য নিম্নোক্তরূপ বেতনের হার নির্ধারণের কথাও বিবেচনা করিতেছেন। এই হার প্রবর্তিত হইলে বর্তমানে উচ্চ ও নিম্ন পদে বেতনের যে অস্বাভাবিক বৈষম্য প্রচলিত আছে তাহা দূর হইবে। ইহাতে কর্মচারীদের মধ্যে যে অসন্তোষ এখন আছে তাহাও দূরীভূত হইবে। বেতনের প্রস্তাবিত হার এইরূপ,

বেহারা—	৩০৲	৫৲	১০০৲
কেরাণী—	১০০৲	১০৲	২৫০৲
দ্বিতীয় শ্রেণীর কর্মচারী—	২৬০৲	২৫৲	৭৫০৲
প্রথম শ্রেণীর কর্মচারী—	৪৫০৲	৫০৲	১৫০০৲

বর্তমান সময়ে প্রচলিত পিয়ন, দপ্তরী প্রভৃতির নিয়োগ রহিত করা হইবে। ফাইল এবং কাগজপত্র বহনের জন্য প্রাথমিক শিক্ষায় শিক্ষিত বেহারা বহাল করা হইবে।

প্রত্যেক কেরাণীকে কার্যভার গ্রহণের পূর্বে ছয় মাসের ট্রেনিং গ্রহণ করিতে হইবে। স্টেনোগ্রাফার এবং ব্যক্তিগত সহকারিগণকে কেরাণী হিসাবে বেতন ব্যতিরেকেও অধিক ৫০৲ হইতে ১৫০৲ মাসিক বৃত্তি দেওয়া হইবে।

দ্বিতীয় শ্রেণীর কর্মচারিগণকে প্রাদেশিক সিভিল সার্ভিসের সমান ধরা হইবে। প্রথম শ্রেণীর কর্মচারীগণকে ভারতীয় সিভিল সার্ভিসের সমান বলিয়া ধরা হইবে।

বর্তমানে ভারত-সরকারের এক জন এসিস্ট্যাণ্ট এক জন তহশীলদারের চেয়ে বেশী মাহিনা পাইয়া থাকে। কিন্তু দুই শ্রেণীর কর্মচারীর কাজের মধ্যে পার্থক্য নাই।

সরকারী কর্মচারীদের বেতনের ভবিষ্যৎ হার কি হওয়া উচিত তাহা নির্ধারণের জন্য ভারত-সরকার 'পে কমিশন' নিযুক্ত করিয়াছেন। 'পে-কমিশন' বর্তমান জাতীয় সরকার কার্যভার গ্রহণের পূর্বেই গঠিত হয়। এখন উহার চিন্তা ও কর্ম প্রণালী পরিবর্তিত হইবে বলিয়া আশা করা যায়। ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর আমলে বেতনের যে বৈষম্যমূলক হার নির্ধারিত হইয়াছিল বর্তমান অবস্থায় তাহাই আঁকড়াইয়া ধরিয়া থাকিবার কোন প্রয়োজন নাই। উহা সম্পূর্ণরূপে বর্জন করিয়া ভারতবাসীর সর্বশ্রেণীর লোকের জীবনযাত্রার মানের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া বেতনের হার স্থির করা কর্তব্য। অন্য দিকে একথাও ঠিক যে যাহাদের হাতে যাবতীয় রাষ্ট্রীয় কার্যচালনার ভার থাকিবে তাহাদের সমস্ত শক্তি ও বুদ্ধি বিবেচনা যাহাতে অব্যাহত ভাবে রাষ্ট্র পরিচালনায় নিযুক্ত থাকিতে পারে সে দিকে সরকারের দৃষ্টি থাকা উচিত। বাসস্থল যানবাহন ও জীবন যাপনের অন্যান্য সুবিধার যথাযথ ব্যবস্থা প্রথম হইতেই তাহাদের জন্য করা উচিত। বিদেশে বড় বড় শিল্প প্রতিষ্ঠানে সকল প্রকার কর্মপরিচালক (একজিকিউটিভ) এই রূপে সংসার চালনায় সহায়তা পাওয়ায় তাহাদের সমস্ত ক্ষমতা যথাকার্যে নিয়োজিত হয়।

বোম্বাই সরকারের পুনর্গঠন পরিকল্পনা

বোম্বাইয়ের পরিকল্পনা-সচিব মিঃ এল. এম. পাতিল কংগ্রেস সরকারের পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা প্রস্তুত করিয়াছেন। বোম্বাই পরিষদে তিনি বলেন, প্রদেশের প্রত্যেকটি গ্রামে সমগ্র বৎসর ধরিয়া জল সরবরাহের ব্যবস্থা উহার অন্যতম অঙ্গ। কংগ্রেস মন্ত্রিসভা আড়ম্বরপূর্ণ পরিকল্পনা প্রণয়নের বিলাসে মগ্ন থাকিতে পারেন না। তাঁহাদের যতটুকু কাজ করিবার শক্তি আছে শুধু ততটুকু লইয়াই তাঁহারা কথা বলিতে পারেন। পানীয় জল সরবরাহের জন্য যে সকল অঞ্চলে জলকষ্ট আছে তাহার হিসাব লওয়া হইতেছে। যেখানে জলকষ্ট সবচেয়ে বেশী সেখানেই প্রথমে কার্য আরম্ভ হইবে। কূপ বা পুষ্করিণী খনন, টিউবওয়েল এবং বাঁধের ব্যবস্থা যেখানে যেমন প্রয়োজন সেখানে ঠিক সেইরূপই করা হইবে। জরুরী কাজ পরিকল্পনা প্রণয়ন শেষ হইবার পূর্বেই আরম্ভ করিয়া দেওয়া হইয়াছে। বড় বড় শিল্পগুলিকে রাষ্ট্রীয় সম্পত্তিতে পরিণত করার ব্যবস্থাও এই পরিকল্পনার অন্তর্গত।

কুটীর-শিল্প ও ছোট ছোট শিল্প প্রতিষ্ঠার জন্য মন্ত্রিসভা প্রথমেই চেষ্টা করিতেছেন। কিন্তু বড় বড় শিল্প প্রতিষ্ঠার বে-সরকারী প্রচেষ্টায়ও তাঁহারা সাহায্য করিবেন। কাগজ, কাঁচ, এলুমিনিয়াম, সিমেণ্ট, সাইকেল, মোটর এবং সকল রেশমের কারখানা খুলিলে বোম্বাই সরকার তাহার মূলধনের কিয়দংশ যোগাইবেন এবং নির্ধারিত হারে লভ্যাংশ দিবেন বলিয়া ঘোষণা করিয়াছেন। ঐ সকল প্রতিষ্ঠানে বিদেশীয় মূলধন থাকিতে পারে, কিন্তু কারখানা ও ব্যবসায় পরিচালনায় অধিকার বাধ্যতামূলক ভাবে ভারতীয়দের হাতে রাখিতে

হইবে। সার এম. বিশ্বেশ্বরায়া মোটর নির্মাণের কারখানা খুলিতে চাহিলে বোম্বাইয়ের কংগ্রেস সরকারই সর্বপ্রথম তাঁহাকে সাহায্যের প্রতিশ্রুতি দেন। বে-সরকারী ব্যক্তিদের উদ্যোগে মোটর, সাইকেল এবং কাগজের কারখানা খুলিবার প্রস্তাব মন্ত্রিসভার নিকট আসিয়াছে এবং তাঁহারা বিবেচনা করিতেছেন।

মিঃ পাতিল বলেন, পুনর্গঠনের পরিকল্পনা ১৫ই সেপ্টেম্বরের মধ্যে প্রণয়ন করিয়া ভারত-সরকারের নিকট প্রেরণ করা যাইবে বলিয়া মন্ত্রিসভা মনে করেন।

পুনর্গঠন বাবদ মোট ৬০ হইতে ৭৫ কোটি টাকা ব্যয় হইবে বলিয়া অনুমান করা যাইতেছে। ভারত-সরকার এক কালীন সাহায্য হিসাবে ২০ কোটি টাকা দিবেন বলিয়া বোম্বাই সরকার আশা করিতেছেন। পুনর্গঠন সম্পর্কে লিখিত বিবরণীতে মিঃ পাতিল বলিয়াছেন, পাঁচ বৎসরের মধ্যে কার্যে পরিণত হইবে এই হিসাবে পরিকল্পনা প্রস্তুত করা প্রয়োজন। প্রত্যেক বৎসরে কতটা কাজ হইবে তাহাও পূর্বেই স্থির করিয়া ফেলা দরকার। উদাহরণ-স্বরূপ বলা যাইতে পারে যে প্রথম বৎসরে কয়টি কূপ বা পুষ্করিণী খনন, কয়টি বাঁধ নির্মাণ, কয়টি খাল খনন, কয়টি হাসপাতাল বা বিদ্যালয় স্থাপন করা হইবে তাহা স্থির করিয়া কাজ আরম্ভ করিতে হইবে। তাহার পর বৎসরে বৎসরে পরিকল্পনা অনুযায়ী কাজ শেষ করার উপযুক্ত দপ্তর এবং কর্মী ও কর্মপন্থা গড়িয়া তুলিতে হইবে।

গ্রাম্য জীবনের সহিত পরিচিত গ্রামের অভাব-অভিযোগ বুঝিতে সমর্থ এবং গ্রামবাসীদের প্রতি সহানুভূতিশীল অর্থাৎ গ্রামবাসীদের সহিত একাত্মবোধসম্পন্ন ব্যক্তিদের কর্মী হিসাবে বাছিয়া লইয়া শিক্ষা দিতে হইবে। গ্রাম এবং গ্রাম্য সমস্যাই বর্তমান পরিকল্পনার মুখ্য বিষয়। সেইজন্য শিক্ষার্থী নির্বাচনের দিকে বিশেষ দৃষ্টি দেওয়া প্রয়োজন। সম্ভবপর হইলে গ্রামাঞ্চল হইতে শিক্ষার্থী আনিয়া এবং উপযুক্ত শিক্ষার পর পুনরায় তাহাদের গ্রামে পাঠাইয়া দিয়া তাহাদেরই উপর পরিকল্পনার অন্তর্গত বিভিন্ন বিষয় কার্যে পরিণত করার ভার দিতে হইবে। পরিকল্পনাটির সর্বাঙ্গীন সাফল্য মূলতঃ শিক্ষাদানের সুব্যবস্থার উপর নির্ভর করিবে। এজন্য আমাদের বহু সংখ্যক কর্মীকে শিক্ষিত করিয়া লইতে হইবে। কাজেই বিজ্ঞান, শিল্প, কৃষি ও অন্যান্য পেশাদারী ও কার্যকরী শিক্ষা-ব্যবস্থার প্রসারসাধনও কর্মতালিকার অন্তর্ভুক্ত করা হইয়াছে।

পরিকল্পনাটিকে কার্যকরী করিতে হইলে প্রচুর অর্থের প্রয়োজন। সরকারের বর্তমান আয় হইতে হয়ত ব্যয় সঙ্কুলান করা যাইবে না। কিন্তু তাহাতে নিরাশ হইবার কিছু নাই। সরকার এই কাজ শেষ করিবেন বলিয়া বদ্ধপরিকর হইয়াছেন। সেজন্য তাঁহারা নূতন কর ধার্য্য করিয়া বা ঋণ করিয়া অর্থ সংগ্রহ করিবেন। কংগ্রেস-সরকার কিছুতেই দমিবেন না।

যুক্তপ্রদেশে বিদ্যুৎ সরবরাহ

উড়িষ্যার পর যুক্তপ্রদেশেও গ্রামে বিদ্যুৎ সরবরাহের আয়োজন আরম্ভ করিয়াছেন। যুক্তপ্রদেশের যানবাহন-সচিব হাফিজ মহম্মদ ইব্রাহিম জলবিদ্যুৎ প্রভৃতির কারখানা নির্মাণের জন্য ৫,৫২,৭২,৪০০ টাকা ব্যয়-বরাদ্দের প্রস্তাব উত্থাপন করিয়া কংগ্রেসী মন্ত্রিসভার পরিকল্পনা ব্যাখ্যা করেন। এই পরিকল্পনা অনুযায়ী কাজ হইলে পাঁচ বৎসরের মধ্যে যুক্তপ্রদেশের প্রভূত আর্থিক উন্নতি হইবে। প্রত্যেক গ্রামে বিদ্যুৎ সরবরাহের ব্যবস্থা হইবে এবং প্রতি মাত্রা বিদ্যুতের মূল্য এক পাই অপেক্ষাও কম পড়িবে। জলসেচের সুবিধা পাইলে চাষের জমির পরিমাণ বাড়িয়া দ্বিগুণ হইবে।

মন্ত্রীমহাশয় বলেন, নেয়ার বাঁধ নির্মিত হইলে গাড়োয়াল কাশ্মীরের ন্যায় স্থানে পরিণত হইবে। শিল্প ও কৃষির উন্নতির ফলে ঐ অঞ্চল সুখৈশ্বর্য্যের আকর হইবে। দুইটি বড় এবং কয়েকটি ছোট বাঁধ নির্মাণ বর্তমান বৎসরেই আরম্ভ হইবে। মীর্জাপুর জেলার রিহিন্দ বাঁধ তৈয়ারী হইলে ১,৬৫,০০০ কিলোওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদন হইবে এবং ৫,৭৩,০০০ একর জমী সেচের সুবিধা পাইবে। বালিয়া, বারাণসী, জৌনপুর, গোণ্ডা, গাজীপুর, আজমগড়, মীর্জাপুর, গোরক্ষপুর, বস্তি, বাহরাইচ, ফয়জাবাদ, সুলতানপুর, প্রতাপগড়, রায়বেরিলী, এলাহাবাদ, কানপুর, উনাও, ফতেগড়, বান্দা, হামিরপুর এবং ঝাঁসি জেলা এই পরিকল্পনা দ্বারা উপকৃত হইবে।

তাহার উপর টিউবওয়েল ও পাম্প খাল খননের ব্যবস্থাও করা হইয়াছে। গোগরা, রাপ্তি এবং গণ্ডক খাল পরিবর্ধন করা হইবে। নিম্নমুখী কয়েকটি খাল খননের ফলে রায়বেরিলী প্রভৃতি জেলায় আরও ১,৩৫,০০০ জমি সেচের সুবিধা হইবে। পার্বত্য গাড়োয়াল জেলায় নেয়ার বাঁধ নির্মাণে সাত-আট বৎসর লাগিবে, কারণ উহার জন্য বিদেশ হইতে বহু যন্ত্রপাতি আমদানী করা প্রয়োজন।

কয়েকজন এঞ্জিনীয়রকে হাতেকলমে শিক্ষার জন্য আমেরিকা পাঠানো হইয়াছে এবং তাঁহারা দুই-তিন মাসের মধ্যে ফিরিয়া আসিলেই কাজ আরম্ভ হইবে।

নেয়ার বাঁধ নির্মিত হইলে ৭৫,০০০ কিলোওয়াট বিদ্যুৎ উৎপন্ন হইবে এবং ৩৩,৮০,০০০ একর জমিতে জলসেচন করা চলিবে। মজুত জল দ্বারা গ্রীষ্মকালের সচরাচর শুষ্ক খালগুলিকে পূর্ণ করিয়া রাখিবার ব্যবস্থা এই পরিকল্পনাটির বিশেষত্ব। পরিকল্পিত ছোটখাট বাঁধগুলির মধ্যে সরযূ বাঁধ ২০,০০,০০০ এবং মদক বাঁধ ২৪,০০০ একর জমি সেচের ব্যবস্থা করিবে।

রিহিন্দ অঞ্চল রাসায়নিক সার প্রভৃতির কাঁচা মাল, এলুমিনিয়াম এবং কাগজ তৈয়ারীর উপযুক্ত তৃণে পরিপূর্ণ। সেইজন্য যুক্তপ্রদেশের কংগ্রেসী সরকার বাঁধের নিকট ঐ সকল শিল্পের কারখানা নির্মাণের সিদ্ধান্ত করিয়াছেন।

আর্থিক উন্নতি সম্বন্ধে রিজার্ভ ব্যাঙ্কের দায়িত্ব

মাদ্রাজে স্থানীয় ব্যাঙ্কগুলির দ্বাদশ বাৎসরিক সাধারণ সভায় রিজার্ভ ব্যাঙ্কের সভাপতি আলোচনা প্রসঙ্গে উৎপাদক দ্রব্যগুলির আমদানীর দিকে বিশেষ নজর দেওয়ার কথা বলেন।

সার চিন্তামন বলেন যে যদিও গবর্মেণ্ট মূল্যবৃদ্ধি নিয়ন্ত্রণ করিবার জন্ত নানারকমে চেষ্টা করিয়াছেন তথাপি এ পর্যন্ত (অর্থাৎ জুন মাসে যে বৎসর শেষ হইয়াছে,) কোন প্রকার দাম কমিবার লক্ষণ দেখা যাইতেছে না। ইহার প্রধান কারণ আমাদের একান্ত প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদির অভাব।

তিনি আশা করেন যে এ্যাংলো-আমেরিকান ঋণচুক্তি কার্যকরী হইবার পর যে সমস্ত অঞ্চলে ষ্টার্লিং প্রধান মুদ্রা নহে সেই অঞ্চলে উৎপাদক দ্রব্যের অর্থাৎ যন্ত্রপাতির সরবরাহের সুযোগ-সুবিধা কিঞ্চিৎ বাড়িবে। তিনি বলেন যে ভারতের কৃষিশিল্পগত উন্নতির কার্যে ব্যাঙ্কগুলি যথেষ্ট সাহায্য করিতে পারে। তাহারা লাভজনক ব্যবসায়গুলিতে সহায়তা করিয়া দেশের ধনসম্পদ বাড়াইতে পারে।

তিনি জোর দিয়া বলেন যে যুদ্ধকালীন অর্থনৈতিক চালের জন্তই বর্তমানে টাকা এত সস্তা হইয়া পড়িয়াছে। পৃথিবীর প্রায় সমস্ত দেশ বর্তমানে টাকার দাম সস্তা রাখিবার চেষ্টাই করিতেছে। তাহাদের উদ্দেশ্য এই যে টাকা সস্তা থাকিলে জনসাধারণের ঋণভারের চাপ কম থাকিবে, এবং নানাপ্রকার উৎপাদন উদ্দেশ্যে টাকা খাটান সম্ভব হইবে। কিন্তু বাস্তবিক পক্ষে প্রত্যেক দেশের অর্থনৈতিক প্রকৃতির সহিত সস্তা টাকাকে খাপ খাওয়াইয়া পরে সস্তা টাকা চলিত রাখা উচিত কিনা তাহা চিন্তা করা উচিত।

'ব্রেটনউড চুক্তি'র আলোচনা প্রসঙ্গে তিনি বলেন যে ভারত সেই সম্বন্ধে সহযোগিতা করিতে রাজী আছে। সমস্ত দেশ অর্থনৈতিক সমস্তার নিরসন ব্যাপারে অনুকূল পোষকতা করিতে সম্মত ও দায়িত্বশীল থাকা প্রয়োজন।

নিখিল বিশ্ব অর্থভাণ্ডার সমস্ত দেশের টাকা জমা রাখিয়া অর্থনৈতিক বিশৃঙ্খলা ও অনিশ্চিত অবস্থাকে স্বাভাবিক হইতে সাহায্য করিবে। ইহা যুদ্ধোত্তর সময়ের উন্নতিবিধানের জন্ত যে অর্থ প্রয়োজন হইবে, সে বিষয়েও সাহায্য করিবে। ব্রেটনউড ব্যবস্থার তিনটি উদ্দেশ্য বিশেষ উল্লেখযোগ্য। প্রথমতঃ, যাহাতে দেশের মধ্যে ক্রয়-বিক্রয়মূল্যের স্বাভাবিক অবস্থা আসে; দ্বিতীয়তঃ, বৈদেশিক মুদ্রা বিনিময় যাহাতে সুবিধা-জনক হয় এবং তৃতীয়তঃ দেশ-বিদেশের মধ্যে একটা অর্থ-নৈতিক সাম্য স্থাপন করা।

ব্রিটেনের আমেরিকার নিকট ঋণ গ্রহণ সম্বন্ধে তিনি বলেন যে বর্তমানে ব্রিটেন তাহার যুদ্ধকালীন আর্থিক অবস্থার সংশোধন, এবং এশিয়ার ডলার পুলের ব্যবস্থা করিয়া দিবার সামর্থ্য অর্জন করিয়াছে। ডলার পুলের কথা উল্লেখ করিয়া তিনি বলেন যে যুদ্ধকালীন অবস্থা পরিচালনের জন্ত আমেরিকা যে ডলার সম্পদ দিয়া সাহায্য করিয়াছিল, তাহার সহিত ভারতবর্ষও অন্তান্ত মিত্রদেশের ভার জড়িত। কিন্তু যুদ্ধ-প্রচেষ্টা জনিত কার্যগুলি শেষ হইবার পরে ভারতে নিজস্ব ব্যয়ের জন্ত ঋণের টাকার বরাদ্দ ভারতবর্ষ পাইবে কিনা তাহা একটি গুরুতর চিন্তার বিষয়।

আমদানী নিয়ন্ত্রণ সম্বন্ধে আলোচনা প্রসঙ্গে তিনি বলেন, বর্তমানে আমদানী নিয়ন্ত্রণ ষ্টার্লিং সঞ্চয়ের প্রতিবন্ধকতা করিতেছে এবং ভবিষ্যতের ষ্টার্লিং সঞ্চয়ের পথকে কণ্টকাকীর্ণ করিয়া তুলিতেছে। আমদানী নিয়ন্ত্রণের ফলে উৎপাদন কমিবে, এবং উহার ফলে বর্ধিত মূল্য না কমিয়া দেশের অর্থ-নৈতিক উন্নতি ব্যাহত হইবে। ভারতের ষ্টার্লিং ব্যালান্স সম্বন্ধে আলোচনায় তিনি বলেন যে রিজার্ভ ব্যাঙ্কের হাতে এখন এই ষ্টার্লিং সঞ্চয়ের বৃদ্ধি ও নিয়ন্ত্রণের ক্ষমতা আসিয়াছে। ইহাতে সুফললাভের সম্ভাবনা আছে।

সার চিন্তামন ব্যাঙ্ক ব্যবসায়ের কতকগুলি অন্যায় ও ক্ষতিকর অভ্যাসের কথাও উল্লেখ করেন। যে সমস্ত ব্যাঙ্ক তাহাদের ব্যবসা বাড়াইবার জন্য অন্যান্য এলাকায় শাখা স্থাপন করিয়াছে তাহাদের মধ্যে কয়েকটি এলাকায় পূর্ব হইতেই অন্যান্য ব্যাঙ্ক স্থাপিত আছে। এক একটি স্থানে প্রচুর ব্যাঙ্ক গঠিত হওয়ায় আপাতঃ দৃষ্টিতে ব্যাঙ্কিং প্রথার উন্নতি হইতেছে বলিয়া মনে হয়। কিন্তু ইহার ফলেই ব্যাঙ্ক ব্যবসায়ে অন্যায় ও ক্ষতিকর প্রতিযোগিতার অবসর ঘটিয়া থাকে।

এই প্রকার অন্যায় ব্যবস্থা অবলম্বনের ফলে ভারতের ব্যাঙ্কিং উন্নতির যথেষ্ট ক্ষতি হইয়াছে। এখনও পর্যন্ত এই সমস্ত ব্যাপারের সংশোধন ও উন্নতি করিবার যথেষ্ট অবসর ও সুযোগ আছে। যাহাতে অযথা শাখা স্থাপন না হয় সে দিকে লক্ষ্য রাখিতে হইবে। যাহাতে অনুরোধ-উপরোধে অন্যায় ভাবে একাউণ্ট স্থানান্তরিত না হয় তাহাও রোধ করিতে হইবে। শেষ পর্যন্ত, গবর্মেণ্ট রিজার্ভ ব্যাঙ্কের হাতে পরিদর্শন ব্যবস্থার জন্য যে সমস্ত ক্ষমতা দিয়াছেন, তাহা যথার্থরূপে ব্যবহৃত না হওয়ায় ব্যাঙ্কের এবং সঙ্গে সঙ্গে সাধারণ ব্যবসা-বাণিজ্যের যথেষ্ট ক্ষতি হইয়াছে। সার চিন্তামন দেশমুখের অধিনায়কত্বে রিজার্ভ ব্যাঙ্কের সাহায্যে দেশের আর্থিক অবস্থার যতটা উন্নতি এত দিনে হওয়া উচিত ছিল তাহা হয় নাই ইহা দুঃখের বিষয়।

শ্রমিক আন্দোলনে কংগ্রেসের নির্দেশ

কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটি শ্রমিক সংক্রান্ত ব্যাপারে দেশকে বহু প্রকার নির্দেশ দিয়াছেন। ১৯২৮ সালে মহাত্মা গান্ধী এক শ্রমিক সম্মেলনে বলিয়াছিলেন যে আমরা শ্রমিকদিগকে যাহা প্রদান করিব প্রতিদানে লাভ রূপে তাহার অনেক বেশী ফিরিয়া আসিবে। গত কিছু কাল হইতে শ্রমিকগণ জনসাধারণের সহানুভূতি অর্জন করিতে সমর্থ হইয়াছে। এমনকি সময়

সময় তাহারা এত ক্ষমতাশালী হইয়া উঠিতেছে যে সামান্ত কারণেই তাহারা ধর্মঘট করিতেছে। ফলে যুদ্ধোত্তর সময়ে এই প্রকার ধর্মঘটের ফলে কাপড়ের কলেই প্রায় ৭০ লক্ষ গজ কাপড় কম বোনা হইয়াছে। বর্তমান বৎসরে বোম্বাইয়ে ও অন্যান্য প্রদেশে যে পরিমাণে ধর্মঘট হইয়াছে তাহা কলকারখানায় উৎপাদন-ব্যবস্থার পক্ষে বিশেষ ক্ষতিকর।

কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির মন্তব্য অনুসারে বলিতে হয় যে জীবন-ধারণ ব্যয়ের যুদ্ধজনিত বৃদ্ধি ইহার একটি কারণ। তাহার উপর আবার বেতন ও বাজারের জিনিষপত্রের দামের বৈষম্য অবস্থাকে আরও সঙ্গীন করিয়া তুলিয়াছে। ভবিষ্যতে এই বেতন ও বাজারের দাম সম্বন্ধে একটা সুনিশ্চিত ব্যবস্থা করা একান্তই কর্তব্য। শ্রমিকগণের ধর্মঘটের অধিকার আছে সত্য কথা, কিন্তু তাহার একটা সীমা আছে তাহা ভুলিলে চলিবে না। কোন কোন সময়ে অতি তুচ্ছাতিতুচ্ছ ব্যাপারে ধর্মঘট করা হইয়া থাকে। বোম্বাইয়ের কোন কারখানার মালিকের কন্যার বিবাহ উপলক্ষ্যে জলপানী না দেওয়ায় যে ধর্মঘট করা হইয়াছিল, ইহা সমর্থন করা যায় না। এই সমস্ত ব্যাপার হইতে শ্রমিকসঙ্ঘ যে অযথা বিপথগামী হইতেছে তাহার একটা পরিস্ফুট আভাস পাওয়া যায়।

মহাত্মা গান্ধীর মতে কোন ব্যক্তিগত অথবা সম্প্রদায়গত স্বার্থের দিকে লক্ষ্য না দিয়া রাজনীতি অথবা অন্য কোন উন্নত উদ্দেশ্য লইয়া চলিতে হইবে এবং শ্রমিকগণের অজ্ঞতার সুযোগ গ্রহণ করিলে চলিবে না। হরিজন পত্রিকায় তিনি বলিয়াছেন যে এ বিষয়ে গবর্ন্মেন্টের কেবলমাত্র কংগ্রেসের নির্দেশই গ্রহণ করা কর্তব্য।

কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির নির্দেশানুসারে, দেশের জীবিকার রীতিনীতি অনুসারে অর্থনৈতিক দিক বিচার করিয়া শ্রমিকগণের ন্যূনতম বেতন ধার্য্য করিয়া দেওয়া হউক ইহাই বাঞ্ছনীয়। সমগ্র দেশের শ্রমিকগণের সংখ্যা গণিলে দেখা যায় যে প্রায় ৩০ লক্ষ শ্রমিক আছে, কিন্তু তাহাদেরই উপার্জিত অর্থের মুখ চাহিয়া আছে প্রায় ৪ কোটি পরিজন। বর্তমানে ধর্মঘট প্রথা সরকার অথবা যাহারা লোক খাটায় তাহাদের বিরুদ্ধে শ্রমিকের হাতের অস্ত্র হইয়া দাঁড়াইয়াছে। ওয়ার্কিং কমিটি চান না যে, যে সমস্ত ধর্মঘটের প্রকৃত প্রয়োজন নাই তাহাকে জনমত সমর্থন করুক। কংগ্রেস আরও অধিক পরিমাণে শ্রমিক সম্বন্ধীয় ব্যাপারে অনুসন্ধান করিয়া তাহাদের প্রয়োজনীয় ধর্মঘট ইত্যাদির ঔচিত্য স্থির করিয়া দিবে। এ বিষয়ে দেশীয় শ্রমিকগণের দৃষ্টি আকৃষ্ট হইলে শ্রমিকগণ যে সমাজ-বিরোধী পথের দিকে অগ্রসর হইতেছে তাহার একটা সুরাহা হইবে। বিশেষ করিয়া যাহারা শ্রমিকগণকে ভাঙাইয়া আপনাদের স্বার্থ সিদ্ধি করিতেছিল, তাহারাও সংযত হইতে পারিবে।

কংগ্রেস ও লবণ-কর

২৫ বৎসর ধরিয়া কংগ্রেস লবণ-কর রহিত করিবার অক্লান্ত চেষ্টা করিয়াছে। যখনই হাতে ক্ষমতা আসিয়াছে কংগ্রেস এই কর নিষিদ্ধ করিয়া দিবার চেষ্টা করিয়াছে।

লবণ আমাদের সাধারণ জীবন যাপনের একান্ত প্রয়োজনীয় দ্রব্য হওয়ায় তাহার উপর যে শুল্ক ভার আরোপ করা হয় তাহা অত্যন্ত দরিদ্র লোকেরা পর্যন্ত এড়াইতে পারে না। এই কর স্থাপন ও সেই সম্বন্ধীয় অন্যান্য বৈষয়িক ব্যবস্থার জন্যই লবণ তৈয়ার করা চাষীদের অবসর সময়ের জীবিকা অর্জনের উপায় হইয়াছিল, তাহাও আর এখন সম্ভবপর নাই। তাহার ফলে আমদানী লবণের পরিমাণও বাড়িয়া গিয়াছে।

মহাত্মা গান্ধী গত ২রা সেপ্টেম্বর প্রার্থনা সভায় বলিয়াছেন যে, কংগ্রেসের কার্যের দ্বারা সবচেয়ে দরিদ্র এবং সবচেয়ে দূরবর্তী গ্রামগুলিও যেন অনুভব করিতে পারে যে স্বাধীনতার সূত্রপাত হইয়াছে। তিনি আরও বলিয়াছেন যে, নূতন সরকারের প্রধান কর্তব্যই লবণ-করের উচ্ছেদ সাধন।

কেন্দ্রীয় সরকারের আয়ব্যয় তালিকায় এই লবণশুল্ক রোধ করিলে যে পরিবর্তন হইবে তাহা আগ্রহ করিবার মত নহে। ১৯৪৬-৪৭ সালের মোট লবণ-কর হিসাবে ৯,৩০ লক্ষ টাকা পাওয়া গিয়াছে। তাহার মধ্যে সরকারী লবণ বিক্রয়ের দ্বারা ৫২'৫৬ লক্ষ টাকা এবং ১৫২'১৫ লক্ষ টাকা লবণের শুল্ক হিসাবে পাওয়া গিয়াছে। লবণ বিভাগটির জন্য যে ১৩১'৭৩ লক্ষ টাকা খাটে লবণ-শুল্ক উঠাইয়া দিলে তাহার আর প্রয়োজন থাকিবে না। সুতরাং হিসাবে দেখা যায় যে ৬ কোটি টাকার অধিক আয় কমিবে না। বাৎসরিক সমগ্র আয়ব্যয় তালিকায় মোট আয় ২১৯'২৭ কোটি টাকার অঙ্কের তুলনায় এই ৬ কোটি টাকা সামান্যই।

মাদক দ্রব্যের উপর যে কর স্থাপিত আছে, সে বিষয়ে আলোচনা করিলে দেখা যায় যে ভারতবর্ষের এক দরিদ্র হরিজন শ্রেণী ও অন্যান্য শ্রেণীর সামান্য কিছু অংশ ছাড়া ধর্মবুদ্ধির প্রেরণায় অবস্থাপন্ন সমাজে পান-অভ্যাস এক রকম নাই। সুতরাং যে কর আদায় করা হইয়া থাকে তাহার একটা মোটামুটি অংশ যাহারা পান-অভ্যস্ত নহে, এমন জনসাধারণের জন্য ব্যয়িত হইয়া থাকে। এই কর রহিত করিয়া দিলে ন্যায়সঙ্গত কাজই করা হইবে। ১৯৩৮-৩৯ সালে যে মোট ৮৪'৭৪ কোটি টাকা আয় হইয়াছিল তাহার মধ্যে আবগারী কর আদায় হইয়াছিল ১৩'৫ কোটি টাকা। ১৯৪৬-৪৭ সালের প্রাদেশিক কর ২০৩'৫৪ কোটি টাকা হিসাব করা হইয়াছে তাহার ৪৩'১৬ কোটি টাকা আবগারী কর হইতে পাওয়া যাইবে। গভীর ভাবে চিন্তা করিলে দেখা যায় যে যদি আবগারী শুল্কের ব্যবস্থা একেবারেই তুলিয়া দেওয়া যায়, তাহা হইলেও অন্যান্য কর হইতে মোট আয় ১৯৩৮-৩৯ সালের দ্বিগুণ হইয়া দাঁড়ায়।

প্রথম কংগ্রেস মন্ত্রিমণ্ডলী গঠিত হইবার পরে মাদ্রাজে সালেম জেলায় আবগারী কর রহিত করিয়া দেওয়া হয়। কিছু দিনের মধ্যে আরও দুই-তিনটি প্রদেশে অনুরূপ ব্যবস্থার প্রচলন করা হয়। কংগ্রেস মন্ত্রিত্ব ত্যাগ করার পর চারিটি জেলাতেই আবার আবগারী কর বসান হয়। পুনরায় ক্ষমতা পাইবার পর এপ্রিল মাসে মাদ্রাজের কংগ্রেস মন্ত্রিমণ্ডলী আবার সেই কর নিষিদ্ধ করনের ব্যবস্থা পুনঃপ্রবর্তন করেন। শ্রীযুক্ত রাজাগোপালাচারীর নেতৃত্বে প্রদেশের সর্বত্র আবগারী

কর তুলিয়া দেওয়ার দাবি করা হয়। শেষ পর্যন্ত মাদ্রাজ-সরকার স্থির করিয়াছে যে বর্তমান বৎসরে ৮টি জেলায় এবং আগামী দুই-তিন বৎসরের মধ্যে সমগ্র প্রদেশে এই ব্যবস্থা পাকা করিয়া দেওয়া হইবে। নবগঠিত ভারত-সরকারের অর্থ-সচিব ডাঃ মাথাইয়ের অন্যতম প্রধান কর্তব্য হইবে, যথাশীঘ্র সম্ভব এই ব্যবস্থার প্রবর্তন করা। কেন্দ্রীয় সরকার হইতে প্রদেশে গৃহীত আয়করের পরিমাণ যথেষ্ট পরিমাণে বাড়িয়া গিয়াছে। ১৯৩৮-৩৯ সালে যে প্রাদেশিক আয়কর ৪ কোটি টাকার কিছু বেশী ছিল, তাহা বর্তমান বৎসরের হিসাবে প্রায় সওয়া বাইশ কোটি টাকার পরিমাণ হইয়া দাঁড়াইয়াছে। তাহা ছাড়া যুদ্ধের সময় প্রাদেশিক সরকারের যে ব্যয়স্ফীতি জন্মিয়াছিল যুদ্ধোত্তর সময়ে এখন সেই পরিমাণের টাকা এই কর রহিতকরণের জন্য ব্যয় করা যাইতে পারে।

যাহাই হউক, লবণ-কর হ্রাস করাইবার এবং যত শীঘ্র সম্ভব একেবারেই তুলিয়া দেওয়া একান্ত প্রয়োজন হইয়া দাঁড়াইয়াছে। তাহার জন্য অর্থনৈতিক অথবা অন্য কোন কারণ বাধাস্বরূপ হইতে পারিবে না কংগ্রেসী মন্ত্রীদের কার্যকলাপে ইহাই সুস্পষ্ট ভাবে দেখা যাইতেছে।

ভারতবর্ষে যক্ষ্মা নিবারণ চেষ্টা

যুদ্ধের দরুন যক্ষ্মা নিবারণের প্রচেষ্টা ব্যাহত হইয়াছিল। এখন সরকার ও বেসরকারী প্রতিষ্ঠানসমূহ পুনরায় এই কাজে হাত দিয়াছেন। ভারত-সরকার ডাঃ বিশ্বনাথকে যক্ষ্মা সংক্রান্ত বিষয়ের উপদেষ্টা নিযুক্ত করিয়াছেন। টিউবারকিউলোসিস এসোসিয়েশন অব ইণ্ডিয়ার মেডিক্যাল কমিশনার বর্তমানে যে কার্য করেন তাহা ভারত-সরকারের নিজস্ব কর্মচারী দিয়া করাইবার জন্য ভোর কমিটির সুপারিশ অনুযায়ী এই ব্যবস্থা হইয়াছে।

যুক্তপ্রদেশের জনস্বাস্থ্য-সচিব শ্রীমতী বিজয়লক্ষ্মী পণ্ডিত এই বিষয়ে অগ্রণী হইয়াছেন। তিনি ডেরাডুন ও পাওরী গাড়োয়ালে দুইটা যক্ষ্মা চিকিৎসালয় ও হাসপাতাল স্থাপনের সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। টিউবারকিউলোসিস এসোসিয়েশনের বিশেষজ্ঞ ডাঃ বেঞ্জামিন তাঁহার আমন্ত্রণক্রমে যুক্তপ্রদেশ পরিভ্রমণ করিয়া হাসপাতাল নির্মাণের পক্ষে সর্বোৎকৃষ্ট স্থান নির্ধারণ করিয়া দিবেন।

বাংলা-সরকার ৫০০ শয্যাযুক্ত একটা মার্কিণ সামরিক হাসপাতাল ক্রয় করিয়া যক্ষ্মা চিকিৎসাগার স্থাপন করিতেছেন। লাহোরে যক্ষ্মা রোগের বিশেষ প্রকোপ থাকা সত্ত্বেও পঞ্জাব-সরকার এ বিষয়ে কিছু করিতেছেন বলিয়া জানা যায় নাই।

যক্ষ্মা নিবারণকল্পে যে সকল প্রাদেশিক সরকার ভোর কমিটির সুপারিশ পালন করিবেন তাঁহাদের সর্বতোভাবে সাহায্য করিবার জন্য টিউবারকিউলোসিস এসোসিয়েশন প্রাদেশিক শাখাগুলিকে নির্দেশ দিয়াছেন। ভারত-সরকারের জনস্বাস্থ্য দপ্তরের নবপ্রতিষ্ঠিত প্রচার বিভাগ এবং টিউবারকিউলোসিস এসোসিয়েশন জনসাধারণকেও যক্ষ্মা রোগ সম্পর্কে সচেতন ও সাবধান করিয়া দিবার জন্য একসঙ্গে ভারতব্যাপী ব্যাপক প্রচার চালাইবার ব্যবস্থা করিতেছেন। এই উদ্দেশ্যে তাঁহাদের মধ্যে আলাপ-আলোচনা চলিতেছে। সংবাদপত্রে বিজ্ঞাপন ও বেতার-বক্তৃতার মারফত এসোসিয়েশন ইতিমধ্যেই প্রচার কার্য আরম্ভ করিয়া দিয়াছেন। অধিকাংশ স্থানেই সদাশয় ব্যক্তিবর্গ বিজ্ঞাপনের ব্যয়ভার বহন করিয়া থাকেন।

কিন্তু এ সকল ব্যবস্থাই প্রয়োজনের তুলনায় নিতান্ত অকিঞ্চিৎকর। যথার্থ প্রতিকারের জন্য ইহার বহুগুণ কাজ করা প্রয়োজন। যতটা হিসাব পাওয়া গিয়াছে তাহা হইতে দেখা যায় যে ভারতবর্ষে প্রতিদিন ১৫০০ লোকের যক্ষ্মা রোগে মৃত্যু হয়। তাহাদের মধ্যে অধিকাংশের বয়স ১৫ হইতে ৩৫ বৎসরের মধ্যে। এই রোগে বৎসরে পাঁচ লক্ষ লোকের জীবনান্ত হয়। ইহার পাঁচ গুণ লোক যক্ষ্মারোগগ্রস্ত হয়।

বাংলাদেশে যক্ষ্মার প্রকোপ অত্যন্ত বেশী। বাংলার সর্বত্র দুর্ভিক্ষের অনুরূপ অবস্থা বর্তমান থাকায় বহু লোক অনশন ও অর্ধাশনে দুর্বল হইয়া পড়ে। ফলে তাহাদের জীবনী শক্তি ও যক্ষ্মা-প্রতিষেধ-ক্ষমতা ক্ষীণ হইয়া যায় এবং এই কারণে তাহারা সহজেই যক্ষ্মাক্রান্ত হয়। এ সম্পর্কে নির্ভরযোগ্য তথ্য ও সংখ্যাজ্ঞানের অভাব সমস্যাটিকে আরও দুরূহ করিয়া তুলিয়াছে। বর্তমানে যক্ষ্মাক্রান্তদের জন্য সমগ্র ভারতে মোট ১২৪টি চিকিৎসাগার এবং ৭০টি হাসপাতাল আছে। তাহাতে মোট ৬০০০ রোগী থাকিতে পারে। ইহা ভারতবর্ষের প্রয়োজনের তুলনায় একেবারেই নগণ্য।

যক্ষ্মা-বিশেষজ্ঞের সংখ্যা ৯০ অপেক্ষা অধিক নয়। অবশ্য আরও প্রায় ৩০০ জন যক্ষ্মা চিকিৎসার সংক্ষিপ্ত পাঠ লইয়াছেন। পাশ্চাত্য দেশে যক্ষ্মারোগে বৎসরে যত জনের মৃত্যু হয় গড়ে তাহার তিন গুণ লোকের চিকিৎসার ব্যবস্থা থাকে। অন্ততঃ পক্ষে বাৎসরিক মৃত্যুর সমসংখ্যক লোকের জন্য চিকিৎসার ব্যবস্থা সর্বত্রই আছে। ভারতে প্রত্যেক ৬০,০০০ যক্ষ্মারোগীর মধ্যে মাত্র এক জন হাসপাতালে ভর্তি হইতে পারে কারণ সেখানে তাহার অধিক স্থান নাই। অথচ ৫০,০০০ অধিবাসী সম্বলিত প্রত্যেক নগরে একটি করিয়া যক্ষ্মা হাসপাতাল থাকা একান্ত প্রয়োজন। তাহাতে গ্রামাঞ্চলের লোকেও চিকিৎসার সুযোগ পাইবে।

যক্ষ্মা রোগে বৎসরে যত জনের মৃত্যু হয় শুধু এত জনের উপযুক্ত চিকিৎসালয় ও হাসপাতালে ততগুলি শয্যার ব্যবস্থা করিতে বাৎসরিক প্রায় ৫০ কোটি টাকা ব্যয় পড়িবে। কিন্তু শুধু একটি রোগের প্রতিকারে এত অর্থ ব্যয় করা শক্ত। বর্তমানে সেই স্থানে যক্ষ্মা চিকিৎসায় বৎসরে মাত্র ৬৫ লক্ষ টাকা খরচ হয়।

যক্ষ্মারোগের সংক্রমণরোধের জন্য ভোর কমিটি নিম্নলিখিত সুপারিশ করিয়াছেন—

(১) সংক্রামক রোগীদের লোকালয় হইতে বিচ্ছিন্ন স্থানে রাখিয়া চিকিৎসার দ্বারা সংক্রামণ রোধ।

(২) রোগীদের সহিত এক গৃহে যাহারা বাস করে নিয়মিত ভাবে তাহাদের স্বাস্থ্য পরীক্ষা।

(৩) এবং রোগ মুক্তির পর বাসের জন্য পৃথক বাড়ি স্থাপন

বিষ্ণুর মৎস্য-অবতার

শ্রীযোগেশচন্দ্র রায়, বিদ্যানিধি

মৎস্য পুরাণে লিখিত আছে, একদিন রবিনন্দন মনু পিতৃ-তর্পণ করিতেছিলেন। তাঁহার হস্তে জলের সহিত এক শফরী পড়িয়াছিল। মনু দয়াপরবশ হইয়া শফরীকে তাঁহার করক (কমণ্ডলু, বড়মুখ ঘটী) মধ্যে রাখিলেন। এক অহোরাত্রের মধ্যে শফরী বৃহৎ হইয়া উঠিল। মনু মৎস্যকে অলিঞ্জরে (জালায়), পরে কূপে, সরোবরে, গঙ্গায়, শেষে সমুদ্রে নিক্ষেপ করিলেন। মৎস্য সমুদ্র ব্যাপিয়া উঠিল। মৎস্যের ক্রমবর্ধমান বৃহৎ কলেবর দেখিয়া মনু ভীত হইলেন। মৎস্য-রূপী ভগবান্ কহিলেন, অচিরকালে সশৈল-কাননা মেদিনী জলমগ্ন হইবে। তুমি এক নৌকা নির্মাণ করিবে। প্রলয় উপস্থিত হইলে তুমি যাবতীয় জীবকে নৌকায় রক্ষা করিবে। আমার শৃঙ্গে নৌকা বন্ধন করিবে। পরে প্রলয়-অন্তে সর্বচরাচরের প্রজাপতি হইবে। তুমি কৃত যুগের আদ্যে মন্বন্তরাধিপ হইবে।

মৎস্য যেমন কহিয়াছিল, কিয়ৎকাল পরে প্রলয় উপস্থিত হইল। চরাচর দগ্ধ ও ভস্মীভূত হইল, প্রভূত বারিবর্ষণ দ্বারা একার্ণব হইল। মনু নৌকায় উঠিয়া সমুদ্রে ভাসিতে লাগিলেন। এক ভুজঙ্গম ভাসিতেছিল। মনু ভুজঙ্গ-রজ্জুর দ্বারা সর্বভূতকে আকর্ষণপূর্বক সেই নৌকায় তুলিলেন এবং নৌকাকে মৎস্য-শৃঙ্গে বন্ধন করিলেন।

মৎস্য-পুরাণে এই উপাখ্যানের শেষ পর্যন্ত নাই, আর যাহা আছে তাহাও স্থানে স্থানে অসংবদ্ধ ও অসঙ্গত হইয়াছে। মনে হয় আদি উপাখ্যানে কেহ নূতন যোগ করিয়াছিলেন।

মহাভারতের বনপর্বে (১৮৬ অঃ) আছে, মনু নৌকা-নির্মাণ ও সমস্ত বীজ গ্রহণপূর্বক নৌকায় আরোহণ করিয়া তরঙ্গ-সঙ্কুল মহাসাগর সলিলে ভাসিতে লাগিলেন। মনুকে চিন্তিত জানিয়া মৎস্য তথায় আবির্ভূত হইল। মনু মৎস্যের শৃঙ্গে নৌকার রজ্জু বন্ধন করিলেন।

মৎস্য নৌকা টানিয়া সমুদ্রে বিচরণ করিতে লাগিল। অনন্তর হিমালয়ের এক উন্নত শৃঙ্গের নিকটে নৌকা আসিলে মনু সেই শৃঙ্গে নৌকা বন্ধন করিয়া রাখিলেন। এই নিমিত্ত অদ্যাপি হিমালয়ের ঐ শৃঙ্গ নৌ-বন্ধন শৃঙ্গ বলিয়া কথিত আছে। ইহার পরে বৈবস্বত মনু স্থাবর জঙ্গম দেবাসুর মানুষ প্রভৃতি প্রজাবর্গ ও লোক সকল সৃষ্টি করিলেন। (মহাভারতের বর্ণনাতেও নূতন শ্লোক যোজিত হইয়াছিল। মৎস্য পুরাণ ও মহাভারত সমস্ত বীজ সংগ্রহ করিয়া নৌকায় তুলিয়াছেন। কিন্তু শেষে দেখিতেছি একমাত্র মনু জীবিত ছিলেন।)

শতপথ ব্রাহ্মণে এই উপাখ্যানের মূল আছে। মাত্র একা মনু নৌকায় আরোহণ করিয়া রক্ষা পাইয়াছিলেন।
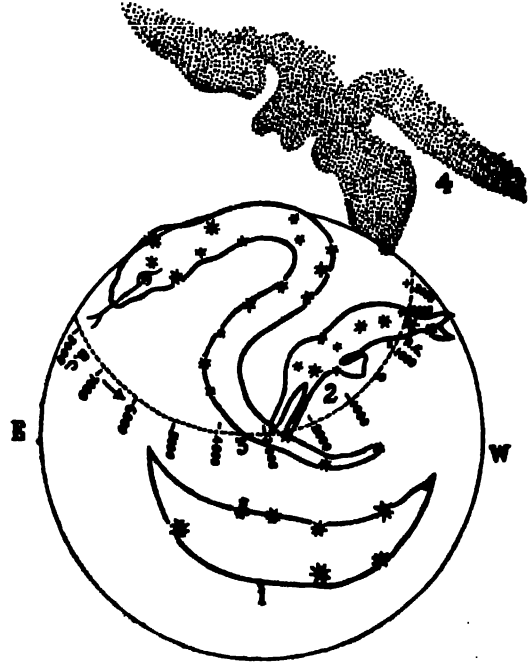
চিত্র ১। দিব্য নৌ, ২-শিশুমার, ৩-অজগর, ৪-সরস্বতী লাহোর পঞ্জাবের মধ্যস্থল মনে করিয়া খ্রী-পূ ৩০০০ অব্দের গো-লোক প্রদর্শিত হইয়াছে। বিন্দুময় বৃত্ত, মেরুভ্রমণ পথ। কোন্ কালে মেরু আকাশে কোথায় ছিল, তাহা অবাধ দেখিলে বুঝিতে পারা যাইবে।

তিনি নৌকায় সমস্ত বীজ স্থাপন করেন নাই। উক্ত ব্রাহ্মণে "উত্তরগিরি"তে নৌ-বন্ধনের উল্লেখ আছে। অথর্ব বেদেও হিমালয়ের উচ্চ শৃঙ্গে মনুর অবতরণের উল্লেখ আছে। উত্তরগিরি অর্থে পৌরাণিক হিমালয় বুঝিয়াছেন, এবং যাহা দিব্য ব্যাপার তাহাকে পার্থিব করিয়াছেন। শতপথ ব্রাহ্মণ রচনার কাল খ্রীষ্ট পূর্ব ষোড়শ শতাব্দ। অথর্ব বেদের কাল খ্রীষ্টপূর্ব পঞ্চবিংশ হইতে বিংশ শতাব্দ। অতএব অন্ততঃ সে সময় হইতে এই উপাখ্যান প্রচলিত আছে।

কেহ কেহ মনে করিয়াছেন, একদা পঞ্জাবে বহুব্যাপী ভীষণ জল-প্লাবন হইয়াছিল। তাহা দেখিয়া অথবা স্মরণ করিয়া এই উপাখ্যানের উৎপত্তি হইয়াছে। কেহ কেহ বলিয়াছেন, এই দেখ, হিমালয়ের নৌ-বন্ধন শৃঙ্গ, এই দেখ মনুর অবতরণ স্থান। যাহা প্রত্যক্ষ হইতেছে তাহা নিশ্চয় অতীতের সাক্ষী।

একথা সত্য, সিন্ধু দেশ বারম্বার জলপ্লাবিত হইয়াছিল। পুরাণে আছে, কৃষ্ণের রাজধানী দ্বারকা জলমগ্ন হইয়াছে।
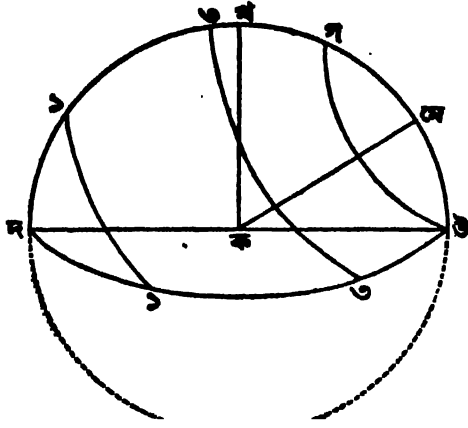
চিত্র ২। 'ক'-লাহোর, 'খ'-স্বস্তিক (শিরোবিন্দু)
'উ'-উত্তর, 'দ'-দক্ষিণ, 'মে'-মেরু,
উ, মে খ দ—যাম্যোত্তরবৃত্ত, উ মে গ—গো-লক,
১ ১-রবির দক্ষিণপথ,
৩ ৩-রবির উত্তর পথ,
দ ১ ১—অধঃস্বর্গ, পুরাণে নাম 'পাতাল'

এই পৌরাণিক কিম্বদন্তী সত্য বলিয়া মনে হয়। মোহন-জো-ডেরোর প্রাচীন অধিবাসীরা গৃহ ও নগর নির্মাণে দক্ষ ছিলেন। কিন্তু জলপ্লাবন হইতে নগর রক্ষা করিতে পারেন নাই। তথাকার আবিষ্কৃত পুরাকৃতি দেখিয়া প্রাজ্ঞেরা বলিয়াছেন সে নগর লবণাক্ত জলে প্লাবিত হইয়াছিল। আমার মনে হয়, নগরটি সিন্ধু নদের খাড়ীতে অবস্থিত ছিল। দুই কারণে সমুদ্রজল বৃদ্ধি পাইয়া সে দেশ ডুবাইয়া দিতে পারিত। (১) আরব সাগরে বাতাবর্ত সঞ্জাত হইয়া সমুদ্রের তরঙ্গ খাড়ির দুই কূল ডুবাইয়া দিতে পারিত। (২) সিন্ধু দেশের দক্ষিণে সমুদ্রে বাড়বানল আছে। পুরাণে ইহার উল্লেখ আছে। ইহাও সত্য। অল্প দিন হইল দুইটি নূতন দ্বীপ উত্থিত হইয়াছে। কিন্তু কোথায় সিন্ধুনদের মুখ, আর কোথায় বা হিমালয়ের শৃঙ্গ! সমুদ্রতরঙ্গ কদাপি সিন্ধু দেশ অতিক্রম করিয়া পঞ্জাবে উঠিতে পারিত না। পঞ্জাবের উত্তরাংশ এখন যত উচ্চ পূর্বকালে তদপেক্ষা বহু উচ্চ ছিল। অবিরল বারিবর্ষণ হইলেও জল দাঁড়াইতে পারিত না। এইরূপ ভূসংস্থান চিন্তা না করিয়া বিজ্ঞজনও উদ্‌ভ্রান্ত হইয়াছেন। কোনও উপাখ্যানের অংশ মাত্র গ্রহণ করিয়া তাহার তত্ত্বানুসন্ধান সমীচীন নয়। উপাখ্যানের সে মৎস্য কোথায়? মনু একা রক্ষা পাইয়াছিলেন। জীবকুল কোথা হইতে জন্মিল?

ঋগ্‌বেদে এই মৎস্যের নাম শিংশুমার, সংস্কৃতে শিশুমার, বাংলায় শিশুক। শিশুক গঙ্গায়, ব্রহ্মপুত্রে ও সিন্ধুনদে দেখিতে পাওয়া যায়। কিন্তু ঋগ্‌বেদের শিশুমার এই সব নদীর শিশুমার নয়। ঋগ্‌বেদের শিশুমার আকাশ-সমুদ্রের শিশুমার-রূপী নক্ষত্র, প্রতি রাত্রে উত্তরাকাশে দেখিতে পাওয়া যায়। শিশুমারের পুচ্ছে যে তারা আছে, বর্তমানকালে তাহার দৈনিক আবর্তন নাই। সে তারা ধ্রুব (নিশ্চল), কিন্তু এই তারা চিরদিন ধ্রুব ছিল না। ভূ-গোল স্বীয় অক্ষে আবর্তিত হইতেছে। সেই হেতু দিবা-রাত্রি ঘটিতেছে। ভূ-পৃষ্ঠকে যেখানে ভূ-অক্ষ ভেদ করিয়াছে সে স্থানের নাম মেরু। উত্তর দিকের মেরুর নাম সুমেরু। অক্ষকে বর্ধিত করিলে আকাশের যে স্থান স্পর্শ করে, তাহার নামও মেরু। পৃথিবীর অক্ষের এই আকাশস্পর্শী মেরু চিরদিন একই তারার নিকট থাকে না। ইহা মৃদু গতিতে আকাশে পূর্ব হইতে পশ্চিমদিকে বৃত্তপথে ভ্রমণ করিতেছে (চিত্র ১)। একবার পরিভ্রমণ করিতে ২৬১২৭ হাজার বৎসর লাগে। মেরু যখন যে তারার নিকট উপস্থিত হয়, তখন সে তারা ধ্রুব হয়। মেরুর বৃত্তপথে কিংবা সন্নিকটে অতি অল্প তারাই আছে। বর্তমান কালে একটি পাইতেছি। আর খ্রী-পূ ৩০০০ অব্দে ঋগ্‌বেদের আর্যগণ একটি পাইয়াছিলেন। সে তারা শিশুমারের তুণ্ডাগ্রে অবস্থিত। (চিত্র ১)।

মৎস্যাবতার বুঝিতে হইলে উত্তরাকাশের কয়েকটি নক্ষত্র চিনিতে হইবে। সেখানে সাতটি তারায় সপ্তর্ষি নামে একটি নক্ষত্র আছে। সর্ব পূর্ব দিকের তারার নাম মরীচি, তাহার পরের তারা বশিষ্ঠ। বশিষ্ঠের সন্নিকটে একটি ক্ষুদ্র তারা আছে, নাম অরুন্ধতী। সপ্তর্ষির সর্ব পশ্চিমের দুই তারার নাম ক্রতু ও পুলহ। উত্তর দিকের তারার নাম ক্রতু। দক্ষিণ দিকের পুলহ। ক্রতু ও পুলহ এক রেখা দ্বারা যোগ করিয়া উত্তর দিকে বাড়াইলে বর্তমান ধ্রুব তারা স্পর্শ করে। পূর্ব দিকস্থ মরীচি তারা হইতে উত্তর দিকে বর্তমান ধ্রুব পর্যন্ত রেখা করিলে সে রেখা প্রাচীন ধ্রুব তারার নিকট দিয়া যাইবে। এই প্রাচীন ধ্রুব তারা বশিষ্ঠ তারার নিকটবর্তী। উভয়ের অন্তর মাত্র ১১° অংশ। প্রাচীন ধ্রুবের নিকটেও একটি ক্ষুদ্র তারা আছে। বড় তারাটি বৈবস্বত মনুর অধিষ্ঠান। এই তারাকে মনু বলিতে পারি। ক্ষুদ্রটি ইলা, মনুর দুহিতা। ইংরেজী তারাপটে মনুতারার নাম Alpha Draconis। প্রাচীন মিশরবাসী এই তারাকে 'থুবন' বলিত। মনু-তারা ও বর্তমান ধ্রুব তারার মধ্যে শিশুমার অবস্থিত। মনু-তারার উত্তরদিকে প্রথমেই দুইটি তারা দেখিতে পাওয়া যায়। সেই দুই তারার বড়টির ঋগ্‌বেদোক্ত নাম যম, ছোটটির নাম যমী। যমের অপর পার্শ্বেও একটি ছোট

তারা আছে। পুরাণে নানা নাম আছে। যেমন নারায়ণ ও নর, নারায়ণ ও লক্ষ্মী। একই তারা কিংবা নক্ষত্র সকল উপাখ্যানে একই নাম পায় নাই। শিশুমারে দশটি তারা সহজে গণিতে পারা যায়। ইহারা শিশুমাররূপী ধর্মের পত্নী।

৮ই ফেব্রুআরি ভোর ৫টার সময় মনু তারা ও মরীচি তারা যামোত্তর বৃত্তে (meridian) দেখা যাইবে। তদনন্তর প্রতি মাসে দুই ঘণ্টা পিছাইতে পিছাইতে ৮ই জুলাই রাত্রি ৭টায় দেখা যাইবে। সেদিন ৬ ঘণ্টা পরে রাত্রি ১টায় পশ্চিম দিকে দেখা যাইবে। এই সঙ্কেত ধরিয়া অন্যান্য মাসে কখন কোন্ দিকে দেখা যাইবে তাহা অক্লেশে নিরূপণ করিতে পারা যাইবে। বঙ্গদেশ হইতে সপ্তর্ষিকে বার মাস দেখিতে পাওয়া যাইবে না। ২৫ অক্ষাংশের (Latitude) উনস্থান হইতে মনুতারাকেও দেখিতে পাওয়া যাইবে না।

জল-প্লাবনের উপাখ্যান বুঝিতে হইলে স্মরণ রাখিতে হইবে, ঋগ্বেদের ঋষিগণ সপ্তর্ষি নক্ষত্রে নৌকার সাদৃশ্য দেখিতেন। ইহা অশ্বিদ্বয়ের নৌ। অন্য এক স্থানে ইহা অশ্বিদ্বয়ের শকট। পুরাণে সপ্তর্ষি শকট শিবিকা, (দোলা, ডুলি), তাম্রচূড় (কুক্কুট), ও শিখণ্ডী (ময়ূর)। ঋগ্বেদের কাল হইতে প্রাচীনেরা মনে করিতেন, মেরু বা সুমেরু সর্বোচ্চ। ঋগ্বেদে সে স্থান তৃতীয় স্বর্গে। তৃতীয় স্বর্গের বিশেষ বিবরণ পরে দেওয়া যাইতেছে। এক্ষণে শতপথ ব্রাহ্মণ অনুসারে জল-প্লাবন লিখিতেছি।—মৎস্য যে বৎসর নির্দেশ করিয়া দিয়াছিল, মনু সেই বৎসর নৌকা নির্মাণ করিয়া এবং প্রবাহ উত্থিত হইলে, তাহা আশ্রয় করিয়াছিলেন। মৎস্য তাঁহার নিকটে ভাসিতে লাগিল। তিনি তাহার শৃঙ্গে নৌকার রজ্জু বন্ধন করিলেন এবং তাহার দ্বারা উত্তরগিরির উপরে গমন করিলেন। মৎস্য বলিল, আপনি বৃক্ষে নৌকা বন্ধন করুন। জল যত নীচে নামিয়া যাইবে, আপনিও তত নীচে নামিবেন। তিনি তত নামিয়াছিলেন, সেই জন্য উত্তরগিরির নাম মনুর অবতরণ। প্রবাহ সমস্ত প্রজাকেই বহিয়া লইয়া গিয়াছিল, কেবল এক মনু অবশিষ্ট ছিলেন।

এখানে সপ্তর্ষি নৌকা, উত্তরগিরি আকাশের সর্বোচ্চ স্থান। যে বৃক্ষে নৌকা-বন্ধন হইয়াছিল, শিশুমার সেই বৃক্ষ (পরে পশ্য)। শিশুমারের বুকের পাখনা তাহার শৃঙ্গ। মৎস্য পুরাণ লিখিয়াছেন, নৌকার নিকটে এক ভুজঙ্গম ভাসিতেছিল। মনু তাহাকে নৌ-বন্ধনের রজ্জু করিয়াছিলেন। ইহাও ঠিক। মনু তারা অজগররূপ নহুষের পুচ্ছে অবস্থিত। রাজা যযাতির পিতা নহুষ। অগস্ত্য ঋষির শাপে অজগর হইয়া আকাশে দীপ্যমান আছেন (চিত্র পশ্য)।

শিশুমার বিষ্ণুর অবতার। ঋগ্বেদে আছে, (১০।৮২।২) বিশ্বকর্মা যিনি, তাঁহার মন বৃহৎ, তিনি নিজে বৃহৎ, তিনি

চিত্র ৩। ঊর্ধ্বমূল অশ্বত্থ। ১-মনুতারা সর্বোচ্চ। ২-যম।
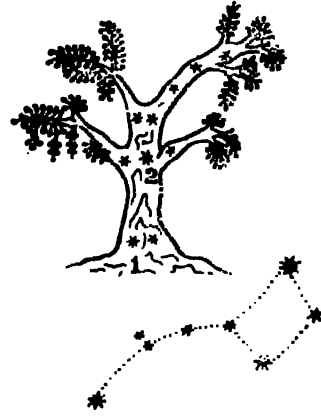
নির্মাণ করেন, ধারণ করেন, সর্বশ্রেষ্ঠ, এবং সকল অবলোকন করেন, সপ্ত ঋষির পরবর্তী যে স্থান তথায় তিনি একাকী আছেন, বিদ্বান্‌গণ এইরূপ কহেন। যিনি আমাদিগের জন্মদাতা পিতা, যিনি বিধাতা, যিনি বিশ্ব-ভুবনের সকল ধাম অবগত আছেন, যিনি একমাত্র, অথচ সকল দেবের নাম ধারণ করেন, অন্য তাবৎ ভুবনের লোকে তাঁহার বিষয়ে জিজ্ঞাসা-যুক্ত হয়। যিনি ইহা সৃষ্টি করিয়াছেন তাঁহাকে তোমরা বুঝিতে পার না, তোমাদিগের অন্তঃকরণ তাহা বুঝিবার ক্ষমতা প্রাপ্ত হয় নাই।

ঋগ্বেদের ঋষিগণ স্বর্গের তিন ভাগ কল্পনা করিতেন। অধঃ মধ্য ঊর্ধ্ব (৪।৫৩.৫)। ঊর্ধ্ব স্বর্গ তৃতীয় স্বর্গ, ইহার বিশেষণ 'উত্তম' 'পরম' (৭।৩০)। সে স্থানই উৎ-তম, ঊর্ধ্বতম। যে স্থান ঊর্ধ্বতম, বিষ্ণুর 'পরম' পদ, পরম স্থান। এই কথাই পুরাণ লিখিয়াছেন। সেইখানেই বিষ্ণুর পরম পদ, সূরিগণ ধ্যান যোগে দেখিতে পান। সপ্তর্ষির অপর পারে কি আছে? আমরা দেখিতেছি, শিশুমার। সেখানে শিশুমার-রূপী ভগবান আছেন। শিশুমার বটপত্র সদৃশ। মহার্ণবের সলিলে নারায়ণ বটপত্রে শয়ন করিয়া থাকেন। পুরাণে আছে, নার—জল, নার অয়ন আশ্রয় যাঁর তিনি নারায়ণ। অন্য ব্যুৎপত্তি নরের অয়ন গতি যিনি, শিশুমার নাগের ফণা সদৃশও বটে, সে নাগ অনন্ত। নারায়ণ অনন্তশয়নে থাকেন।

বিষ্ণুপুরাণ লিখিয়াছেন, ঋষিদিগের ঊর্ধ্বে উত্তর দিকে যেখানে ধ্রুব অবস্থিত, তাহাই বিষ্ণুর ভাস্বর তৃতীয় পদ (২।৮।৯৩)। পুনশ্চ, দিব্য লোকে ভগবান হরির শিশুমারাকৃতি তারাময় রূপ আছে। উত্তানপাদ রাজার পুত্র ধ্রুব প্রজাপতি নারায়ণের আরাধনা করিয়া শিশুমারের

পুচ্ছে অবস্থিত আছে (২।৯।১,৪) সেই শিশুমারের উত্তর হনু উত্তানপাদ অধঃ হনু যজ্ঞ, মস্তক ধর্ম, হৃদয় নারায়ণ (২।১২।৩১)।*
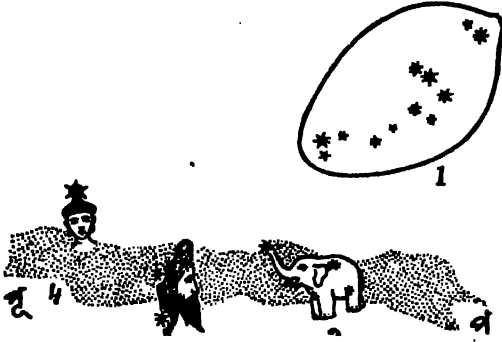
চিত্র ৪। ১-শ্বেতদ্বীপ, ২-স্বর্গদ্বারে ঐরাবত, (cassiopeia) ৩-নারদ, (perseus) ৪-ব্রহ্মা, (capella)

ঋগ্‌বেদে শিশুমার একবৃক্ষ রূপে কল্পিত হইয়াছে। সে বৃক্ষের উপরে বসিয়া যমদেব অন্য দেবতাদিগের সহিত পান করেন (১০।১৩৫।১) অথর্ববেদে সে বৃক্ষ অশ্বত্থ। সেখানে যমের সহোদরা ভগিনী যমীও আছেন। ঋগ্‌বেদের যম-যমী সংবাদে (১০।১০) যমী যমকে বলিতেছেন, "বিস্তীর্ণ সমুদ্র-মধ্যবর্তী এই দ্বীপে, নির্জন প্রদেশে তুমি আমার সহচর।" তৃতীয় স্বর্গে দেবগণের আলয়। সেখানে পুণ্যাত্মা পিতৃগণও বাস করেন। সেখানে সর্বদা আলোক আছে। বিস্তীর্ণ নদী [সরস্বতী] আছে। নাগ লোক [অজগর] আছে, বৈবস্বত রাজা (যম) আছেন। তথায় ইচ্ছানুসারে বিচরণ করিতে পারা যায় এবং সকল কামনা নিঃশেষে পূর্ণ হয় (৯।১১)।*

এই অশ্বত্থ বৃক্ষই কি ভগবদ্গীতার অশ্বত্থ? ভগবদ্গীতায় "ঊর্দ্ধমূলম্ অধঃশাখমশ্বত্থং প্রাহুরব্যয়ম ছন্দাংসি যস্য পর্ণানি যস্তং বেদ স বেদবিৎ॥ (১৫।১) ভগবান বলিতেছেন, যে অশ্বত্থের মূল উর্ধ্বদিকে, যাহার শাখা অধোদিকে, যাহার পত্র বেদস্তোত্র, সে অশ্বত্থ অব্যয়। ইহা যিনি জানেন, তিনিই বেদবিৎ। টীকাকারেরা এই শ্লোকের বহুবিধ অর্থ করিয়াছেন। কিন্তু অশ্বত্থটি যে বেদোক্ত অশ্বত্থ, তাহাতে সন্দেহ হইতে পারে না। কারণ যিনি সেই অব্যয় অশ্বত্থকে জানেন, তিনিই বেদবিৎ।

অশ্বত্থের মূল মহুতারায় উর্ধ্বদিকে, শাখা অধোদিকে শাখা প্রতিদিন মূলকে প্রদক্ষিণ করে। এই অদ্ভুত অশ্বত্থের কল্পনা মর্ত্ত্যের অশ্বত্থ হইতে আসিতে পারে না।

পুরাণেও সুমেরু অতিশয় উচ্চ। সুমেরুর শিখরের চতুষ্পার্শ্বে দেবগণের আলয়। সেখানে সর্বদা আলোক। বেদোক্ত তৃতীয় স্বর্গই গো-লোক, সর্বদা আলোকময় স্থান। তৃতীয় স্বর্গের নক্ষত্রের উদয়াস্ত নাই।

পুরাণে এই শিশুমারের নাম শ্বেতদ্বীপ। একদা দেবর্ষি নারদ শ্বেতদ্বীপে নারায়ণের আদি মূর্তি সন্দর্শন করিতে গিয়াছিলেন। মহাভারতের শান্তি পর্বে (অঃ ৩৩৬) এই পুরাতন ইতিহাস বর্ণিত আছে। যথা, পূর্বে সুমেরু পর্বতে সপ্ত মহর্ষি অবস্থান করিতেন। তাঁহারা লোকের হিতকর বিষয় সমুদয় পর্যালোচনা করিয়া, বেদ-সম্মত এক উৎকৃষ্ট ধর্মশাস্ত্র প্রস্তুত করেন। পূর্বকালে উপরিচর নামে হরিভক্তিপরায়ণ এক নরপতি ছিলেন। তিনি সূর্যমুখ-নিঃসৃত পঞ্চরাত্র শাস্ত্র অবলম্বনপূর্বক বিষ্ণুর অর্চনা ও রাজ্য পালন করিতেন। ব্রহ্মার পুত্র হরিভক্তিপরায়ণ নারদ, সেই শাস্ত্র জানিতেন। একদিন তিনি গন্ধমাদন পর্বতে ধর্মের পুত্র নরনারায়ণকে তপস্যা করিতে দেখিলেন। তিনি আশ্চর্যান্বিত হইলেন, নরনারায়ণ ঈশ্বরের দুই রূপ, তাঁহারা কাহার উপাসনা করিতেছেন? শুনিলেন, তাঁহারা তাঁহাদের পিতার উপাসনা করিতেছেন। শ্বেতদ্বীপে তাঁহা-

---

* বিষ্ণুপুরাণ ধ্রুবকে শিশুমারের পুচ্ছে বসাইয়াছেন। একবার নয়, দুই স্থানে দুই বার। পুচ্ছস্থিত তারা বর্তমান কালের ধ্রুব বটে, পূর্ব কালের নয়। খ্রীষ্টাব্দের আরম্ভে এই তারা মেরু হইতে ১১° অংশ, পঞ্চম শতাব্দে ৮° অংশ দূরে ছিল। অতএব ইহা ভ্রমণ করিত। পুরাণকারও লিখিয়াছেন, ধ্রুব নিজে ভ্রমণ করে। চন্দ্র সূর্য নক্ষত্র বাতরজ্জুর দ্বারা ধ্রুবে আবদ্ধ হইয়া ভ্রমণ করে। গ্রহগণের আশ্রয় স্থানকে নারায়ণ স্বয়ং হৃদয়ে ধারণ করিয়াছেন। সূর্যাই একমাত্র জগতের আধার। সেই সূর্যের আশ্রয় স্থান ধ্রুবে ভগবান আছেন। কিন্তু এই উক্তির সহিত অন্য উক্তির বিরোধ হইতেছে। (১) পুরাণ পূর্বে বলিয়াছেন, সপ্তর্ষির উত্তরে উর্ধ্বে ধ্রুব অবস্থিত। (২) ধ্রুব উপাখ্যানে উত্তানপাদ রাজার পুত্র ধ্রুব বিষ্ণুর আরাধনা করিবার পূর্বে সপ্তর্ষিকে দেখিয়াছিলেন। ধ্রুবের ভক্তিতে তুষ্ট হইয়া বিষ্ণু তাহাকে সপ্তর্ষিদিগের উপরি ভাগে ধ্রুব স্থান দিয়াছিলেন। আচার্য উশনা এই শ্লোক বলিয়াছেন, সপ্তর্ষি ধ্রুবকে অগ্রে করিয়া স্থিত রহিয়াছেন। ধ্রুবের মাতা ও তারকা হইয়া নিকটে অবস্থান করিতেছেন (১।১২)।

পুরাণে আরও এক অসঙ্গতি দেখিতেছি। লিখিত আছে, শিশুমারের পুচ্ছস্থিত ধ্রুবসহ চারিটি তারার উদয়াস্ত নাই। বিষ্ণুপুরাণ উত্তর ভারতে, বোধ হয় মথুরা অঞ্চলে প্রণীত হইয়াছিল। সেখানে সমুদায় শিশুমারের উদয়াস্ত হইত না। খ্রীষ্টাব্দের আরম্ভে মেরু হইতে মহুতারা ১৬° অংশ ও পঞ্চম শতাব্দে ১১° অংশ দূরে ছিল। অতএব মথুরা হইতে দেখিলে সমগ্র শিশুমার প্রত্যেক রাত্রে দৃষ্টিগোচর হইত।

* উপরে লিখিয়াছি, ঋগ্‌বেদের ঋষিগণ স্বর্গের তিন ভাগ করিতেন। অধঃ, মধ্য, উর্ধ্ব। কিন্তু সীমা বলেন নাই। দ্বিতীয় স্বর্গে, অর্থাৎ মধ্য স্বর্গে সবিতা বিচরণ করেন। উর্ধ্ব স্বর্গ তৃতীয় স্বর্গ। (চিত্র ২)। বোধ হয় অধঃ স্বর্গ রবির দক্ষিণ পথের দক্ষিণ ভাগে। লাহোরের অক্ষাংশ ৩২°। ইহাকে পঞ্জাবের মধ্য স্থল ধরিলে, উত্তর দিক্ চক্র হইতে উর্ধ্ব দিকে ৩২°+৩২°=৬৪° পর্যন্ত তৃতীয় স্বর্গ মনে হয়। অধঃ স্বর্গ দক্ষিণ দিক্‌চক্র উর্ধ্ব দিকে ৩৫° অংশ থাকে। তদনুসারে চিত্র ২ লিখিত হইয়াছে। এই রূপে মধ্য স্বর্গ ১৮০°—৯৮°=৮২° অংশ পাওয়া যায়।

দের উপাস্য আদিনারায়ণের আলয় আছে। নারদ সুমেরু পর্বতের শিখর হইতে বায়ুকোণে দেখিলেন, ক্ষীরসমুদ্রের উত্তর দিকে শ্বেতদ্বীপ রহিয়াছে। দ্বীপবাসীরা অদ্ভুত। তাঁহাদের প্রাকৃতিক স্থূল দেহ নাই। শব্দাদি গ্রহণের ইন্দ্রিয় নাই। তাঁহারা নিশ্চেষ্ট, সুগন্ধযুক্ত, চন্দ্রের ন্যায় দীপ্তিমান্। তাঁহাদের দেহ বজ্রাস্থির ন্যায় সুদৃঢ়। মস্তক ছত্রাকার। তাঁহাদিগের মুখ চারিটি, ক্ষুদ্র দন্ত ষাইটটি, দীর্ঘ দন্ত আটটি। তাঁহারা সেখানে ভগবান নারায়ণের অর্চনা করিতেছেন। দেবর্ষি নারদ একাগ্রচিত্তে সেই নির্গুণ বিশ্বময় নারায়ণের স্তব পাঠে প্রবৃত্ত হইলেন তাঁহার দিব্য চক্ষু হইল। কোন কোন পণ্ডিত স্বর্গলোকের শ্বেতদ্বীপকে মর্ত্যে আনিয়াছেন। সত্য বটে, সুমেরু দুইটি, ক্ষীরোদ সাগরও দুইটি, একটি স্বর্গে, একটি মর্ত্যে। মর্ত্যের সুমেরু পশ্চিম হিমালয়ের উত্তরে, মর্ত্যের ক্ষীরোদ সাগর আরল হ্রদ, তাহাতে অক্সাস্ নদী পড়িয়াছে। এই নদীর অপর নাম 'ষীর দরিয়া.' ক্ষীর সাগর। হিমালয়ের পশ্চিম ভাগ হইতে এই ক্ষীরোদ সাগর বায়ু কোণেই বটে। আকাশের ছায়া-পথ ক্ষীরোদ সাগর। এই ক্ষীরোদ সাগর কূর্ম অবতারে মথিত হইয়াছিল। জ্যোতিষে ব্রহ্মহৃদয় নামে এক উজ্জ্বল তারা আছে। ইহার পূর্বতন নাম ব্রহ্মা। দেবর্ষি নারদ ব্রহ্মার মানস পুত্র। ব্রহ্মা তারা হইতে অদূরে নারদ নক্ষত্র থাকা সম্ভব। সেখান হইতে শিশুমার বায়ু কোণে অবস্থিত বটে (চিত্র ৪)। নরনারায়ণ, ধর্মের পুত্র। শিশুমারই ধর্ম। মর্ত্যের শিশুমারের দেহ দেখিয়া শ্বেতদ্বীপবাসীর দেহ কল্পিত হইয়াছে। শিশুমারের দেহ মসৃণ, উজ্জ্বল, স্পন্দহীন। আশ্চর্যের বিষয় শিশুকের মুখের নীচের পাটিতে ৬০টি ছোট ছোট দাঁত আছে।*

ঋগ্‌বেদে জলপ্লাবন ও তদনন্তর সৃষ্টি অন্য আকারে উক্ত হইয়াছে। সেখানে শিশুমার উত্তানপদ্ নাম পাইয়াছে। যথা—(১০।৭২।৩)। দেবোৎপত্তির পূর্বতন কালে, অবিদ্যমান হইতে বিদ্যমান বস্তু উৎপন্ন হইল। পরে উত্তানপদ্ হইতে দিক সকল জন্মগ্রহণ করিল।

উত্তানপদ্ হইতে পৃথিবী জন্মিল, পৃথিবী হইতে দিক্‌সকল জন্মিল, অদিতি হইতে দক্ষ জন্মিলেন, দক্ষ হইতে আবার অদিতি জন্মিলেন।

হে দক্ষ! অদিতি যে জন্মিলেন তিনি তোমার কন্যা। তাঁহার পশ্চাৎ দেবতারা জন্মিলেন। ইঁহারা কল্যাণ-মূর্তি ও অবিনাশী, দেবতারা এই বিশ্বব্যাপী জলমধ্যে অবস্থিত থাকিয়া মহোৎসাহ প্রকাশ করিতে লাগিলেন। তাঁহারা যেন নৃত্য করিতে লাগিলেন। সেই হেতুতে প্রচুর ধূলি উদয় হইল।

চিত্র ৫। উত্তানপদ। ১-মঘুতারা।

আমি এই উক্তির অর্থ এইরূপ বুঝিয়াছি। দেবতারা উৎপন্ন হইবার পূর্বতন কালে এই বিশ্ব সলিলময় ছিল। প্রথমে উত্তানপদ্ জন্মগ্রহণ করিল। উত্তানপদ্ (বা উত্তানপাদ) যাহার পদদ্বয় উত্তান, বিস্তৃত (চিত্র ৫) ইহার মস্তকে মঘুতারা, পদে বর্তমান ধ্রুবতারা। ধ্রুব উপাখ্যানের ধ্রুব এই উত্তানপাদের পুত্র। উত্তানপদ্ হইতে দিক্‌সকল জন্মিল। শিশুমার উত্তর দিকে অবস্থিত। এই হেতু উত্তানপদ্ দেখিলে সকল দিক্ জানিতে পারা যায়। কতকাল পূর্বের কথা? যে কালে অদিতি হইতে দক্ষ জন্মিয়াছিলেন। দক্ষ কাল-পুরুষ নক্ষত্র বা মৃগ নক্ষত্র। অদিতি মৃগ নক্ষত্রের পূর্ব দিকের বট্‌তারা-সমন্বিত পুনর্বসু নক্ষত্র (চিত্র ৬)। প্রথমে পশ্চিমস্থ দক্ষের উদয় হয়। পরে পূর্বস্থিত অদিতির। এই পূর্বাপর জন্মহেতু দক্ষ পিতা, অদিতি কন্যা। কিন্তু দক্ষ সপ্ত আদিত্যের মধ্যে এক আদিত্য। অদিতি সকল আদিত্যের মাতা। এই হেতু অদিতি হইতে দক্ষ জন্মিলেন। এককালে অদিতি হইতে আরম্ভ করিয়া পর পর ছয় ঋতু ও ঋতুর কর্তা আদিত্য কল্পিত হইয়াছিল। প্রথমে আদিত্যগণ, পরে অন্য দেবতা জন্মিয়াছিলেন। আদিত্যগণই প্রধান দেবতা। সূর্য আদিত্যের আধার। দেখা যাইতেছে, অতি প্রাচীন কালের কথা স্মৃত হইয়াছে। সেকাল ৮০০০ বৎসরের কম হইবে না। সে সময় কিন্তু মঘুতারা ধ্রুব হয় নাই। খ্রীষ্টপূর্ব ৩৫০০ হইতে ২৫০০ অব্দ পর্যন্ত মঘুতারা ধ্রুব হইয়াছিল। বাস্তবিক খ্রী-পূ ২৮০০ অব্দে মঘুতারার নিকটে মেরু আসিয়াছিল। ইহার পূর্বে ও পরে পাঁচ ছয় শত বৎসর নিকটে ছিল, ভ্রমণ বুঝিতে

* মহাভারতে 'নারদ পঞ্চরাত্রে'র এই ইতিহাস লেখা আছে। আমি নারদ পঞ্চরাত্র দেখি নাই। শুনিয়াছি ইহা একটি তন্ত্রশাস্ত্র। উপরিচর বসু চেদি দেশের রাজা ছিলেন। তিনি ভারত যুদ্ধের পূর্বে ছিলেন। ইতিহাসটি পুরাতন হইতে পারে কিন্তু উপাখ্যান পুরাতন নয়। ইহাতে কল্কি এক অবতার।

পারা যাইত না। ইনি বৈবস্বত মনু। ইঁহার নামে বৈবস্বত মন্বন্তর নামে কাল গণনা প্রচলিত ছিল। এই কালের মধ্যে বৈবস্বত মনুর অধিকার আরম্ভ হইয়াছিল। এই মন্বন্তরের অষ্টাবিংশ দ্বাপরে ভারত-যুদ্ধ হইয়াছিল। আমি যত দূর বুঝিয়াছি, খ্রী-পূ ৩২৫৬ অব্দে বৈবস্বত মন্বন্তর আরম্ভ হইয়াছিল।

আর্য পিতামহগণ নক্ষত্র দেখিতেন কি? যদি দেখিতেন, কি দেখিতেন, কি ভাবিতেন? বরাহ মৎস্য কূর্ম বামন, বিষ্ণুর এই চারি দিব্য অবতার আলোচনায় তাহার কিঞ্চিৎ উত্তর পাইয়াছি। দেখা গিয়াছে, বৈদিক গ্রন্থে এই চারি অবতার কল্পনার মূল আছে। পুরাণে-দেব ঋষি মনুষ্য, এই তিন অবলম্বন করিয়া উপাখ্যান রচিত হইয়াছে। দেব সম্বন্ধে উপাখ্যান বেদ-সম্মত। পৌরাণিক নিজের কল্পনা-বলে লিখেন নাই। আরও দেখা গিয়াছে, পুরাণ দ্বারা বেদের সংক্ষিপ্ত উল্লেখের অর্থ পাওয়া যায়।

উক্ত চারি অবতারের যে ব্যাখ্যা করা গিয়াছে, তাহা সম্পূর্ণ নূতন। ইহা সহজ সরল ও প্রাচীন কালের যন্ত্র জ্যোতিষিক জ্ঞানের অনুযায়ী। আকাশে নক্ষত্র নিরীক্ষণ করিলে, পিতামহগণের চিত্ত-গতি সম্যক্ হৃদয়ঙ্গম হইবে। নানাবিধ উপাখ্যান প্রচলিত ছিল। পুরাণে কিছু আছে, নচেৎ তাহাও শুনিতে পাইতাম না।

অবতার-প্রসঙ্গে বৈদিক কৃষ্টির কাল নির্ণয় করা গিয়াছে। সূর্য চন্দ্র নক্ষত্র কাল-প্রবোধক যন্ত্র। যেখানে এই যন্ত্র দেখিতে পাওয়া যায়, সেখানে কালও জানিতে পারা যায়। যন্ত্র দেখিয়া কাল পাইতে কিছু মাত্র কষ্ট নাই।

পশ্চিম দেশীয় বেদ-পাঠীদিগের বিদ্যার, পরিশ্রমের, অধ্যবসায়ের, সমাহরণ-নৈপুণ্যের তুলনা নাই। কিন্তু আমরা যাঁহাদের প্রণীত পুস্তক পাঠ করি, তাঁহারা এই যন্ত্রকে অবহেলা করিয়াছেন, অন্বেষণ করেন নাই। কেহ দেখাইয়া দিলে দেখিতে পান না, দেখিতে পাইলেও বিশ্বাস করেন না। কিন্তু তাঁহারা যে কাল শুনাইতেছেন, সেটা যে তাঁহাদের কল্পনা মাত্র, তাহাও বুঝিতে পারেন না। এই প্রবন্ধের অন্তর্গত ধ্রুবতারা ধরিয়া একটা উদাহরণ দিতেছি।

বহুকাল পূর্বে জার্মান প্রোফেসর যাকোবি লিখিয়াছিলেন, বৈদিক বিবাহে ধ্রুব-দর্শন বিহিত ছিল। অতএব বৈদিক কালে ধ্রুব তারা জানা ছিল। পূর্বকালে মাত্র একটি তারা ধ্রুব হইতে পারিত। সে তারা খ্রী-পূ ৩০০০ অব্দে ধ্রুব হইয়াছিল। অতএব ইহাকে বেদের কাল বলিতে হইবে।

আমেরিকার প্রোফেসর হুইটনি জ্যোতির্বেত্তা ও বেদ-পাঠক ছিলেন। কিন্তু তিনি ভারতীয়ের প্রতি বিমুখ ছিলেন। তিনি উত্তর করিলেন, একটা আচার ('folk-lore') প্রমাণ হইতে পারে না। প্রোফেসর ম্যাক্‌ডোনেল
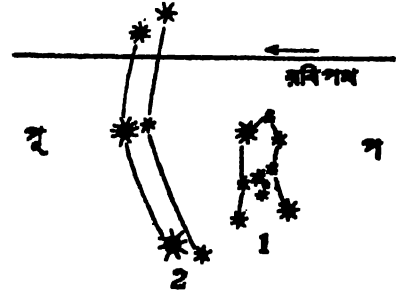
চিত্র ৬। ১-দক্ষ, ২-অদিতি।

নির্বাক রহিলেন। প্রোফেসর কীথ মেরু ভ্রমণ পথের বহুদূরবর্তী একটা তারার নাম করিয়া তর্কটি চাপা দিলেন। প্রোফেসর উইণ্টারনীৎস তাঁহার বিশ্ববিদ্যালয়ের জ্যোতিবিদ্যার প্রোফেসরকে একটা তারা নির্দেশ করিতে অনুরোধ করিলেন। আর বোধ হয় বলিয়া দিলেন খ্রী-পূ দশম কি একাদশ শতাব্দে ধ্রুব হইতে পারিত, এমন তারা খুঁজিয়া বাহির করুন। ইনি দুইটি তারার নাম করিলেন, কিন্তু এত সূক্ষ্ম, চর্মচক্ষুর প্রায় অগোচর।

আমরা জানি, অদ্যাপি ব্রাহ্মণের বিবাহে বধূকে বর ধ্রুব দর্শন করাইয়া বলেন, তুমি পতিগৃহে ধ্রুব হইয়া থাক। আমরা জানি, উত্তরাকাশে ধ্রুব আছে, এই বিশ্বাসে এই বিধি চলিয়া আসিতেছে। যাঁহারা ইহাতে তুষ্ট হইলেন না, তাঁহারা অরুন্ধতী-দর্শনও বিহিত করিয়াছেন। যদি বিবাহে ধ্রুব-দর্শন বিধি না থাকিত, এই প্রবন্ধের বিষয়সমূহ বুঝিবার নিমিত্ত ধ্রুব-দর্শন আবশ্যক হইত। পশ্চিম দেশীয় বিদ্বানেরা সে দিক দেখেন নাই।*

---

* এই প্রবন্ধের চিত্র-লেখক শ্রীধরণীকুমার ভট্টাচার্য এক ইস্কুলের ছাত্র। অনেক ইস্কুলে চিত্র-লিখন শিখাইবার ব্যবস্থা আছে, কিন্তু অনাদৃত। শত ছাত্রের মধ্যে মাত্র দুই তিন জন কিছু কিছু শিখে। জন্মদত্ত অঙ্কুর ব্যতীত চিত্র লিখিতে পারা যায় না। আমি এখানে চিত্রকর পাই নাই। যদি বা দুই এক জন আছেন, কেহ অবসর পাইলেন না, কেহ চিত্র না দেখিয়া লিখিতে পারেন না। বহু অন্বেষণের পর প্রথমে সুকান্ত বসুকে পাইয়াছিলাম। কিন্তু সে চিত্র সমাপ্ত করিবার অবসর পাইল না, কলিকাতা চলিয়া গেল, তখন তাহার সহপাঠী ধরণীকুমারকে পাইয়াছি। তাহাকে না পাইলে অবতার প্রবন্ধ ছাপা হইতে পারিত না। দুই জনই শান্ত, বিনীত, ধরবুদ্ধি, এখন তারাপটে তারা দেখাইয়া আকৃতি খুঁজিতে বলিলে স্বচ্ছন্দে দেখিতে পায়। দুঃখ হইতেছে তাহাদের আর শিক্ষা বাড়িবার সুযোগ হইবে না।

নব-সন্ন্যাস

শ্রীবিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়

(১৪)

মনটা এই যে একটা নূতন ধাক্কা খাইল, আবার গুছাইয়া লইতে সময় লাগিল চম্পার। যে চায় না, যাহার কাছে অনাদর তাহার কাছ থেকে দূরে সরিয়া যাইতেই চাহিল সে—কতকটা অভিমানে, কতকটা আক্রোশেও; আদর ত তাহার চারিদিকে ছড়ান রহিয়াছে, তবে এ অকিঞ্চনবৃত্তি কেন? অনেকক্ষণ এই কথাটাই রহিল মনে স্পষ্ট হইয়া, তাহার পর কখন যে ধীরে ধীরে মিলাইয়া গেল টেরও পাইল না। একটা উদ্বেগেই মনটা রহিল ভরিয়া—টুলু আজ নিতান্তই বিপন্ন, বিপদটা যে-কোন আকারেই আজ রাত্রে উপস্থিত হইতে পারে, অথচ লোকালয় থেকে অতটা দূরে সে প্রায় একাই। সবচেয়ে ভাবনার কথা বিপদ সম্বন্ধে সচেতন নয় টুলু—চম্পা অত করিয়া পারিলও না সচেতন করিতে; এখন একমাত্র উপায় ওর বিপদকে যদি কেহ আপন বিপদ করিয়া লয়। কে লইবে আপন করিয়া?

অভিমান, আক্রোশ সব গেল উবিয়া, এই প্রশ্নটির চারিদিকে মনটা ঘুরপাক খাইতে লাগিল। কখন যে টুলুর বিপদ চম্পার আপন বিপদ হইয়া গেছে বুঝিতেও পারিল না, শুধু সকালের চেয়ে আরও একটা তীব্রতর উৎকণ্ঠায় মনটা অস্থির হইয়া উঠিল,—কি করা যায়? কি করিয়া বাঁচানো যায় টুলুকে এই নিদারুণ সঙ্কটে? সে ত স্ত্রীলোক, অসহায়, কি করিবে?

লোকের দরকার; বেশ সুস্থ সবল পুরুষ মানুষের। কিন্তু ম্যানেজারের বিরুদ্ধে দাঁড়াইবে কে?...বিকাল হইয়া গেছে, আর সময়ই বা কোথায়? অন্ধকার একটু গাঢ় হইয়া আসিলেই টুলুর পাশে লোক থাকা দরকার; কে যাইবে, কাহাকে রাজী করা যায়?

মনের অস্থিরতায় চম্পা কয়েক বার ভিতর-বাহির করিল, তাহার পর তাহার মনে পড়িল চরণদাসের কথা। একটা অবলম্বন পাইয়া মনটা কতকটা যেন সুস্থির হইল—কেন যে চরণদাসের কথা গোড়াতেই মনে পড়ে নাই...কিন্তু চরণদাসকেই বা কি বলিয়া লইয়া যাওয়া যায়?

ঘরের চৌকাঠের ওপর চুপ করিয়া বসিয়া চম্পা ভাবিতে লাগিল, তাহার পর এক সময় হঠাৎ তাহার টুলুর কথা মনে পড়িয়া গেল—বালিয়াড়ির পথে চম্পাকে ফিরাইয়া আনিবার জন্য মিথ্যা রচনা করিয়া বলিতেছে—"হ্যাঁ—ইয়ে—বনমালী—স্কুলের চাকর—তোমার ঠাকুরদাদা নয়?—তার ভয়ানক অসুখ—স্কুল থেকেই আসছি আমি..."

—যতি, ভঙ্গি,—সমস্ত প্রত্যেকটি কথা অক্ষরে অক্ষরে মনে আছে চম্পার, যেমন তাহার অন্য সব কথাও আছে মনে গাঁথিয়া। একই মিথ্যা—এক জনের মুখে যদি দোষের না হয় ত অন্য জনের মুখেই বা হইবে কেন? চম্পা ঐ মিথ্যাকেই বুনিয়াদ করিয়া তাহার ইতিকর্তব্যের একটি পরিপূর্ণ রূপ গঠন করিয়া লইল।

সন্ধ্যার একটু আগে খনিতে নামিয়া সে চরণদাসের সুড়ঙ্গের সামনে দাঁড়াইয়া ডাকিল—"একবার বাইরে আস্‌বিক নাই?"

গাঁইতা রাখিয়া চরণদাস সুড়ঙ্গের মুখে আসিয়া দাঁড়াইল, কপালের ঘাম আঙুল দিয়া ঝাড়িয়া ফেলিয়া বলিল—"তুকে আজ সমস্ত দিন দেখি নাই ক্যানে গো? কাজে আসিস নাই, আমার ভাত আনিস নাই; আমি বাজার যেঁয়ে মুড়ি আনায়ঁ খেলাম বটে।"

চম্পা একটু রাগের ভান করিয়া বলিল—"বাপের অসুখ, তুর কাজের ঘটা পড়ে গেঁইছে বটে, একজনকে রইতে ত হবেক উখানে?..."

"বুড়ার অসুখ! কই জানতে ত পারি নাই!"

"তু গাঁইতো চালা ক্যানে, জানতে পারবিক। সমস্ত দিনটি আমার নড়ে বৈস্‌তে দিলেক নাই, বিকালে একটু ঘুমোলেক, তুরে খবর দিতে আঁইছি তাড়াতাড়ি।"

চরণদাস গাঁইতা রাখিয়া সদ্যসদ্যই বাহির হইয়া আসিতেছিল, চম্পা বারণ করিল, কেননা তাহার একটু সময় দরকার, চরণ সঙ্গে গেলে তাহার উদ্দেশ্য সিদ্ধি হইবে না। বলিল—এর পর বেশিরকম ছুটি লইবার দরকার হইতে পারে, আপাতত সে যেন নিজের ডিউটিটুকু সারিয়াই আসে, বিশেষ ভয়ের কারণ নাই, চম্পা আগাইয়া যাইতেছে। সুড়ঙ্গের মুখের কাছটিতে চরণদাসের সুরার বোতলটি রাখা থাকে, ডিউটির মধ্যে অর্ধেকের কিছু উপরটা শেষ করে, তাহার পর বাসার পথে সেটাকে দোকান থেকে পূর্ণ করিয়া লয়—রাতের খোরাক, দোকানে যেটুকু খাইয়া লয় সে ত আলাদা।... চম্পা বোতলটি তুলিয়া লইল, একটু কড়া চোখেই বাপের দিকে চাহিয়া বলিল—"আমি ইটি সঙ্গে নিলাম বটে, তু আজ দোকানেও থাকিক নি; বুড়া মরছে,...রাতে ডাক্তারবদ্যি ডাকতে সে ত আমি যাবেক নাই?"

মেয়ের দৃষ্টির সামনে চরণ স্পষ্টই একটু সঙ্কুচিত হইয়া গেল যেন, আমতা আমতা করিয়া বলিল—"তু যাবিক ক্যানে গো?...তা নিয়া যা ক্যানে বোতলটা, দোকানে যাবেক ..তে একটু আছে বটে, যেন নষ্ট করিস নাই, ফুরাল

যাবেক নাই, তু নষ্ট করিস নাই—লক্ষী বিটিট আমার···চম্পা বিটিট···"

বস্তিতে আসিয়া একেবারে হিরাভর মধ্যে গিয়া উপস্থিত হইল। মিতিন কাজে বাহির হয় না, শিশুটি বড্ডই ছোট; অবশ্য ওর চেয়েও ছোট শিশু লইয়া বস্তিতে অনেককে গতর খাটাইতে হয়, কিন্তু মিতিনের স্বামী প্রহ্লাদ লোকটা ভাল,—নেশাটেশার দিকে খুব কম, আর স্ত্রীর খুব অনুগত, ফলে উপার্জন যা করে তার প্রায় সবটুকুই ঘরে ওঠে, এই রকম সব অসময়ের জন্ত কিছু সঞ্চয়ও হয়।

চম্পা মিতিনের নিকট হইতে একটা রাতের জন্ত প্রহ্লাদকে চাহিয়া লইল,—ঠাকুরদাদার বড্ড অসুখ, বাপকে লইয়া যাইতেছে, তবে একেবারে নির্জন জায়গা, গঞ্জ থেকে অতটা দূর, অন্তত দু'জন পুরুষও না থাকিলে ভরসা হয় না, ধরো রাত তিন পহরে হঠাৎ ডাক্তার-বৈদ্য ডাকিতে হইল, চরণদাসকে বাহিরে যাইতে হইল, একা স্ত্রীলোক রোগীর শিয়রে বসিয়া কি করিয়া কাটাইবে চম্পা?

—একটা পুরুষ বাড়ির মধ্যে কোথাও যদি পড়িয়াও থাকে, একটা ভরসা থাকে মনে।

গোছালো মেয়ে সবদিকেই গোছালো হয়, সব দিকেই দৃষ্টি রাখিয়া চলে,—মিতিন চম্পার মুখের ওপর স্থির দৃষ্টি রাখিয়া সবটুকু শুনিল, সোজা 'না' বলিল না, তবে মাষ্টারমশাইয়ের কথা তুলিল, টুলুরও,—দুই জন পুরুষ তো রহিয়াছেই কাছে, কতটুকুই বা দূর স্কুল আর মাষ্টারমশাইয়ের ডেরায়?

চম্পা মুহূর্তখানেক মুখটা ঘু· ক ভাবিয়া লইল, মাষ্টারমশাইয়ের অনুপস্থিতির কথা আর বলিল না, বলিল—ওরা বড়মানুষ, কথায় কথায় টাকার চকমকানি দেখায়, গরীবের ডাকে ওরা যদি সাড়া দিত তো দুনিয়া উল্টাইয়া যাইত। এমনি ভারি তো ভরসা, তাহার উপর ছেলে কাড়িয়া লইয়া চম্পা আবার ওদের শত্রু করিয়া তুলিয়াছে। চম্পা অভিমানের সঙ্গে একটু বিদ্রূপ মিশাইয়া বলিল—কপালটি ভাঙলে এমনিটি হয় গো মিতিন, ভাল লোককে দুশমন বানালাম বটে, নিজের মিতিন মুখ ঘুরায়েঁ নিবেক নাই? তুর ভয় লাগে তুর বরকে কেন্থ্যা লিবোক, আঁচলে বেন্ধে রাখ্ ক্যানে; কপালটি ভেঙেছে আমার, বুড়া মরবেক, এ সময় কে আপ্‌ন হবেক গো?

মিতিন মনে মনে হিসাব করিল; যে সত্যই কাড়িয়া লইতে পারে সে যখন চাহিয়া লইতেছে তখন রাজী হওয়াই সুবুদ্ধির কাজ নয় কি? যুদ্ধের ভাবের চেয়ে শান্তির ভাবই ভাল, মানুষের একটা বর্ণজ্ঞান তো আছেই? হাসিয়া বলিল, "তা যাবে গো এত কথা ক্যানে? পাঠাইয়েঁ দিবেক রাইরের মুখে; আসুক ক্যানে, খাইয়া-দাইয়া যাবেক, কেন্থ্যা লিবেক তো ভয় কি আছে গো?"

যে হিসাবের ওপর চালায়, একটা রাতের খোরাক তাহার হিসাবের বাইরে পড়ে না, চম্পাও লোভটুকুর রাস্তা খুলিয়াই রাখিল, হাসিয়াই বলিল—"রাইরের মুখে যাবেক তো সুখাবুড়ির ভাত ক্যানে খেতে যাবেক? রাইরের তো সবখানিই কলঙ্ক, ই কলঙ্কটা ক্যানে মাথ পেতে লিবেক গো?"

দুটি লোক হইল, প্রহ্লাদ আবার একটা লোকের মতো লোক। চম্পা হীরককে লইয়া একটু ঘাঁটাঘাঁটি করিল, সমস্ত রাত দেখিতে আসিতে পারিবে না, বার বার কত করিয়া বলিয়া দিল। বলিল—"একটু জেগেঁ ঘুমাস গো মিতিন, তুর ঘুমটি না চওলাটি বটে—উর মা কাছে থাকবেক নাই, তু একটু জেগেঁ ঘুমাস বটে।"

সমস্ত দিনের নানা রকমের আবেগ মনে যেন একটা চাপ বাঁধিয়া রহিয়াছে, হঠাৎ চোখ দুইটি ছল ছল করিয়া উঠিল, গলা ভারী হইয়া উঠিল, হীরকের ছোট বুকে মাথাটা রাখিয়া চম্পা চুপ করিয়া পড়িয়া রহিল, বার দুই তিন একটু ফোঁপানির শব্দ হইল। মেয়েরা বোঝে—এই সব ভুল পথে হঠাৎ অশ্রুর পেছনে অনেক কথা লুকানো থাকে, মিতিন কিছু বলিল না।

একবার বাসায় গিয়া কিছু চালডাল আলু আর কয়েকটা টুকিটাকি লইয়া দোরে তালা আঁটিয়া চম্পা স্কুলের পথে বিদায় হইল। যখন পৌঁছিল, অন্ধকার একটু গাঢ় হইয়াছে। স্কুলের হাতাটা দেয়াল দিয়া ঘেরা, তাহার একপাশে বনমালীর বাসা। দুইটা পাশাপাশি ঘর, নিচু ছাত, সামনে একটা বারান্দা। একটা ঘরে বনমালী রান্না করে, একটায় থাকে। কটকটা ভেজানো ছিল, চম্পা প্রবেশ করিয়া যখন বাসার সামনে উপস্থিত হইল, বনমালী হাতে একটা ডেমি লইয়া রান্নাঘরের দিকে যাইতেছিল, উনান ধরিয়াছে, এইবার রান্নার ব্যবস্থা করিবে।

চম্পাকে দেখিয়া থমকিয়া দাঁড়াইল, একে দৃষ্টিশক্তি কমই তাহার উপর হাতে ডেমিটা থাকায় একটু আলো-আঁধারি গোছের হইয়াছে, প্রশ্ন করিল—"কে বটে?"

চম্পা উত্তর করিল—আমি চম্পা।

বনমালী আলোটা চম্পার মুখের দিকে একটু বাড়াইয়া ধরিল, ঠাহর করিয়া দেখিয়া বিস্মিতভাবে একটু মাথা নাড়িয়া বলিল—"হুঁ তাইতো বটে; তা রাত-বিহারে? একা আইছিস নাকি? খবর কি আছে গো? চরণদাস···"

চম্পা বারান্দায় উঠিয়া আসিল, ভ্রূ দুইটা কুঞ্চিত করিয়া গম্ভীরভাবে বনমালীর পানে চাহিয়া বলিল—"খবর থাক্, তুর না শক্ত বেমারি হইছেঁ, তু রান্নার তরে যাচ্ছিস!

ঠাকুরদাদার দুর্বলতা নাতনীর ভাল রকমই জানা, তাহারই ভরসায় সন্ধ্যা হইতে এত তোড়জোড়; বনমালী একেবারে ভ্যাবাচাকা খাইয়া গিয়া অপলকনেত্রে চম্পার পানে চাহিয়া রহিল, খানিকক্ষণ বাক্‌স্ফূর্তিই হইল না। অবস্থাটা স্পষ্টভাবে বুঝিবার জন্ত মাথার ডান দিকটা কয়েকবার চুলকাইয়া লইল, তাহার পর বলিল:

—শক্ত বেমারি। কৈ, আমি তো জানি নাই বটে।"

—"তু জানলে রান্না করতে যাস? তুর মাথায় কিছু আছে যে জানবিক?"

বনমালীর আরও গোলমাল হইয়া যাইতে লাগিল, একটু কম্পিত হস্তে টেমিটা জানালার খাঁজে রাখিয়া দিয়া বলিল—তুকে কে বুললে?"

চম্পা একটু মুখঝামটা দিয়াই বলিল—"কে বুললে সেই কথাটি এখন বলো বুড়াকে। কেউ বুললেক নাই তো রাত-বিহারে আইছিঁ কি করে তাই ভাব ক্যানে।"

সত্যই তো কেহ না বলিলে চম্পা আসিবেই বা কেন, আর অসুখ না হইলে কেহ বলিতেই বা কেন যাইবে? বন-মালীর মাথাটা আরও গুলাইয়া গেল, মূঢ় দৃষ্টিতে চম্পার পানে চাহিয়া প্রশ্ন করিল—"তা হলে?"

"তা হলে শুয়ে থাক যেয়েঁ, বেমারিতে পাক করে কোন দেশে শুনেছিঁস? আমি পাক সেরে তুকে দেখছিঁ। বাবাকে আসতে বুলেছিঁ, পেল্লাদ আসবেক, উ দুজনে রাত্তিরে আসবেক বটে। তুর শুধু বুক হাঁইপাঁই করছেঁ কি মাজাতেও বিঁধা আছে বটে?"

আবার দুই জনের রাত্রে কাছে থাকিবারও ব্যবস্থা হইয়াছে। ব্যাপার এতটা সঙ্গীন দেখিয়া বনমালীর মুখ আরও শুকাইয়া গেল, একটা হাত বুকে একটা হাত কোমরে দিয়া বলিল—"মাজাতেও তো রইছেঁ ব্যথা, —হুঁ, রইছে, বটে—রইছেঁ..."

চম্পা আবার মুখঝামটা দিয়া বলিল "রইছেঁ তো রাঁধ যেয়েঁ।...আর ইদিকে।"

টেমিটা লইয়া পাশের ঘরে বনমালীর সংক্ষিপ্ত বিছানাটা ঝাড়িয়া-ঝুড়িয়া দড়ির খাটটাতে ভাল করিয়া বিছাইয়া দিল, বনমালী উঠিয়া শয়ন করিলে বলিল—"বাবা, পেল্লাদ এলে মাজার বিধাঁর কথাও বুলচি, লুকাবিক নাই, দেখি তোর হাতটা।"

বনমালী বাড়াইয়া ধরিলে নাড়ীটা টিপিয়া বলিল—"নাড়িতে বেগ রইছেঁ। বুড়া হ'ল, আপ্‌নার অসুখ বুঝে না; দেখবো না গো।"

বনমালী একটু হতাশ ভাবেই বলিল—"বাঁচবোক নাই? —হ্যাঁরে চম্পা?"

"মরতিস; আর বাঁচবিক নাই ক্যানে? সবাই তো এসে গেলাম, চিকিচ্ছাটি সুরু হয়ে গেল; আর বাঁচবিক নাই ক্যানে?...সুজির সেক দিব, বাড়িতে আটা আছে বটে—?"

"টুনু বাবুটি রুটি খায়—উই যে মাষ্টারমশায়ের কে হয় বটে—উর তরে আটা আনছিঁ..."

চম্পার ভ্রূ-যুগল কুঞ্চিত হইয়া উঠিল, প্রশ্ন করিল—"উর পাক তুই করিস? তুর হাতে খায়?"

বনমালী বলিল—"খাবেক নাই? আমি বোষ্টমের গো, খাবেক নাই? ডোম আছি, না, চাঁড়ালটি আছি গো?—খাবেক নাই ক্যানে?"

চম্পা একটু অন্যমনস্ক হইয়া গেছে, খানিকক্ষণ চুপ করিয়া কি ভাবিল, তাহার পর একটু অন্যমনস্ক ভাবেই বলিল—"না, উরা বামুন, তাই বুলছিলাম, খায় না সবার হাতে।"

আরও একটু চুপ করিয়া বাহিরের পানে চাহিয়া রহিল, তাহার পর দৃষ্টিটা ফিরাইয়া আনিয়া বলিল—"উরা আমাদের ঘেন্না করে যে—চাঁড়ালটি না হই, নিচু জাত বটে তো গো?"

তাহার পর হঠাৎ একটা কথা মনে পড়িয়া যাওয়ায় সচকিত হইয়া উঠিয়া বলিল—"তু একটু র', আমি আসছি।"

হঠাৎ সকালের কথা মনে পড়িয়া গেছে, ম্যানেজারের সেই রুদ্রমূর্তি; চম্পা তাড়াতাড়ি স্কুলের গেট খুলিয়া বাহিরে আসিয়া দাঁড়াইল, বুকটা ধড়াস্ ধড়াস্ করিতেছে। সন্ধ্যা উৎরাইয়া গেছে, অন্ধকার এখন ম্যানেজারের সহায়, এর মধ্যে কিছু হইয়া যায় নাই ত? নিঃশব্দে একটি জীবনের শিখা নির্বাপিত করিয়া অন্ধকারের মধ্যে মিশিয়া যাইবার মত মানুষের অভাব নাই ম্যানেজারের। চম্পা অতিমাত্র চঞ্চল হইয়া উঠিল, রাস্তায় নামিয়া অন্ধকার ভেদ করিয়া নিজের দৃষ্টিকে যত দূর পারিল প্রসারিত করিয়া দিল, কেহ কাজ শেষ করিয়া চলিয়া যাইতেছে না ত?...কেহ আসিতেছে না ত ঐ উদ্দেশ্যে? কিছুদূর পর্যন্ত নামিয়াও গেল। তাহার পর ফিরিয়া আসিয়া মাষ্টারমশাইয়ের বাসার দিকে অগ্রসর হইল। রাস্তার ধারের ঘর থেকে একটা ক্ষীণ আলোর রেখা রাস্তার উপর আসিয়া পড়িয়াছে; চম্পা পা টিপিয়া টিপিয়া অগ্রসর হইল, তাহার পর খুব সন্তর্পণে জানালার পাল্লা আর চৌকাঠের ফাঁক দিয়া ঘরের মধ্যে উঁকি মারিয়া দেখিল। টুনু চিৎ হইয়া শুইয়া গভীর অভিনিবেশে কি একখানা মোটা বই পড়িতেছে। চম্পা ধীরে ধীরে একটি স্বস্তির নিঃশ্বাস মোচন করিল, তাহার পর সেই সংকীর্ণ অবকাশের মধ্য দিয়া অনেকক্ষণ ধরিয়া দেখিল। কি দেখিল সে-ই জানে, এক সময় নিচু হইয়া জানালার সামনেটা অতিক্রম করিয়া দেয়ালের বাহিরে বাহিরে চারিদিকটা ঘুরিয়া আবার স্কুলের দিকে চলিয়া আসিল। একটা পাহারা শেষ করিয়া আবার ফটকের সামনে দাঁড়াইয়া ভাবিতে লাগিল।

টুনু তাহা হইলে খায় বনমালীর হাতে। ছেলেবেলায় মিশন স্কুলে ব্রাহ্মণদের বিরুদ্ধে অনেক কথা শুনিয়াছিল; ওসব লইয়া উত্তর জীবনে মাথা না ঘামাইলেও টুনু ব্রাহ্মণ হইয়াও যে খায় ওদের হাতে এ সংবাদটাতে ওর মনটা তাহার প্রতি শ্রদ্ধায় ভরিয়া উঠিল। টুনু বিশিষ্ট, আরও বিশিষ্ট হইয়া উঠিল চম্পার চোখে; ও যেন এক-আকাশ তারার মধ্যে চাঁদ; এ চাঁদ শুধু বিশিষ্টই নয়, বড় আপন, বড় নিকটের, হাত বাড়াইলেই যেন পাওয়া যায়।...টুনু তা হলে চম্পার হাতে খাইবে।...

একটা অব্যক্ত পুলক বুকে করিয়া চম্পা রন্ধনের যোগাড় করিতে গেল। কিন্তু আয়োজন বেশিদূর অগ্রসর হইবার আগেই টুলু যে কত দূর তাহার হঠাৎ মনে পড়িয়া গেল। কাল রাত্রিশেষের সেই অনুভূতিটা আবার কোন্ দিক দিয়া আসিয়া পড়িয়াছে, সেই নিজেকে অশুচি বলিয়া মনে হওয়া, যাহার জন্য হীরক টুলুর মনের স্পর্শ পাইয়াছে বলিয়াই চম্পা তাহাকে বুক দিয়া জড়াইয়া ধরিতে পারিল না তখন। অনুভূতিটা হয়তো স্থায়ী হইতে পারিতেছে না, কিন্তু সময়ে অসময়ে কয়েকবারই উঁকি মারিয়া গেছে চম্পার মনে।...

খুব উৎসাহের সঙ্গে তাড়াতাড়ি কুটনা কুটিল, মশলা বাটিল, আটা মাখিল,—টুলুকে রাঁধিয়া দিবে আজ...তাহার পর রুটি বেলিয়া ভাজিতে যাইবে, হাত-পা গুটাইয়া চুপ করিয়া ভাবিতে লাগিল। বনমালীর হাতে থাক, কিন্তু চম্পার-বনমালীতে যে আকাশ-পাতাল প্রভেদ ; টুলু তপঃভ্রষ্ট হইবে। চম্পা মনকে অন্ত ভাবেও যে বুঝাইতে চেষ্টা না করিল তেমন নয়, কিন্তু যেন সাহস হইল না অগ্রসর হইতে।

বনমালীকে আবার উঠাইল, বনমালী কলের মানুষ, ওর মাথার মধ্যে সুকৌশলে একটা আইডিয়া প্রবেশ করাইয়া দিতে পারিলেই হইল। রহস্যটা চতুরা নাতনীর ভালরকমই জানা আছে। বনমালীকে বুঝাইল, তাহার হঠাৎ মনে পড়িয়া গেছে বামুনের রান্না করিয়া দেওয়া এসব রোগের একটা বড় চিকিৎসা। সুতরাং বনমালী একবার বুকে হাত দিয়া, একবার কোমরে হাত দিয়া রুটি সেঁকিয়া, তরকারি করিয়া দুধটুকু জ্বাল দিয়া দিল। শেষ হইলে চম্পা চোখের ওপর চোখ রাখিয়া প্রশ্ন করিল—"কি বুলিস—একটু ভাল বোধ হইছেঁ না ?"

বনমালী আর একবার বুকে আর কোমরে হাত দিয়া রোগের অবস্থাটা অনুভব করিল, মাথা নাড়িয়া বলিল—"হুঁ, আধাআধি কাবার হইছেঁ বেমারিটা গো।"

"হবেক নাই ? যা দিয়া আয় ক্যানে। পুছ করলে বুলবি তু বাসাঁয় একাটি আছিস, বামুনকে মিছা বুলবিক নাই।" নাতনীর হাতে পড়িয়া বনমালীর আজ সত্য মিথ্যায় জট পাকাইয়া গেছে, একটু মাথা চুলকাইয়া চম্পাকে যেন একটা অস্পষ্টতার মধ্য দিয়া দেখিতে দেখিতে বলিল—"মিছা কেন বুলতে যাবো গো ? বুলবো একাটি আছি বটে।"

"দিয়াঁ আয়, তুও দুখানা খ্যাতে দিয়াঁ শুয়াঁ পড়বি, বুকে পিঠে সুজির সেঁক দিয়া দিব।"

চরণদাস আর প্রহ্লাদ যখন আসিল, চম্পা তখন তাহাদের জন্য রন্ধনে ব্যস্ত। বনমালী তখন নাতনীর হাতের সেবা পাইয়া গাঢ় নিদ্রায় মগ্ন। চম্পা বাপকে জানাইল, অবস্থাটা খুবই খারাপ হইয়াছিল, এখন লক্ষণ ভাল, রোগী ঘুমাইতেছে।

আহার করিয়া ওরা দুই জনে স্কুলের বারান্দায় শুইয়া রহিল ; চম্পার যতক্ষণে আহার শেষ হইল, ততক্ষণে ওরাও গাঢ় নিদ্রায় অচৈতন্য।

নিদ্রা গেল না শুধু চম্পা। ওর মন অনেকটা প্রশান্ত—সবল সুস্থ পুরুষ রক্ষী, তা ভিন্ন চম্পাও তো সর্বস্ব পণ করিয়া বসিয়া আছে, হঠাৎ কিছু ঘটিতে দিবে না টুলুর উপর। টুলু নিশ্চিন্ত হইয়া ঘুমাক্।

আহার শেষ করিয়া ফটকের মুখে একটা শিলাখণ্ডের উপর আসিয়া বসিল, দিনের বেলা যখন স্কুল হইতে থাকে বনমালী এইখানটায় বসিয়া দ্বার রক্ষা করে। চম্পা সমস্ত রাত বসিয়া রহিল, গঞ্জের পথ বাহিয়া কখন কে আসে সেই অপেক্ষায়—নিশ্চিন্ততার মধ্যেও একটা উদ্বেগ বুকে লইয়া। এদিকটা বেশ গেল, তাহার পর গভীর রাত্রে দেখা গেল দুইটি লোক চড়াই বাহিয়া উঠিয়া আসিতেছে। চম্পার সমস্ত চেতনা যেন দুইটি চক্ষে আসিয়া জড়ো হইয়াছে ; বুকের ঢিপ-ঢিপানিটা এত বাড়িয়া উঠিল যে শব্দটা যেন স্পষ্ট শোনা যায়। উহারা আগাইয়া আসিলে চম্পা উঠিয়া থামের আড়ালে দাঁড়াইল...ও লোকটার হাতে ওটা কি যেন ?—একবার মনে হইল চরণদাস আর প্রহ্লাদকে ডাকিয়া তোলে, তাহার পর আবার কি ভাবিয়া অসহ্য উৎকণ্ঠা লইয়া দাঁড়াইয়াই রহিল, নিশ্চিত বিপদের সামনে যেন সম্মোহিত হইয়া গেছে। লোক দুইটা কাছাকাছি আসিয়া পড়িতে আরও একটু আড়ালে চম্পা গেল। ভয়ে উৎকণ্ঠায় এমন সংযম হারাইয়াছে নিজের ওপর, বোধ হয় ডাকিয়াই ফেলিত ওদের, কিন্তু ঠিক এই সময় চরণদাস ডাকিয়া উঠিল—"চম্পা আছিস্ ?"

কিছু নয়, ওর একটা অভ্যাস—বস্তিতে নেশার মধ্যে নিতান্ত যান্ত্রিক ভাবেই এক আধবার ঐ রকম চেঁচাইয়া ওঠে,—মেয়ের খোঁজ নেয়। সাড়া পাইয়া চম্পার যেন সম্বিৎ ফিরিয়া আসিল শরীরে, স্তব্ধ ভাবে আড়ালে দাঁড়াইয়া দেখিতে লাগিল।

স্কুল পার হইয়া লোক দুইটি আগাইয়া চলিল, চম্পা আবার অন্তরাল হইতে বাহির হইয়া এক পা এক পা করিয়া ফটকের বাহিরে আসিল, তাহার পর নীচু হইয়া চৌহদ্দির দেয়াল ঘেঁষিয়া অগ্রসর হইল।...না, ভয়ের কিছু নয়, বাসা পারাইয়া উহারা আগাইয়া গেল ; একবার ফিরিয়াও চাহিল না এদিকে, ভিন গাঁয়ের লোক, নিজের কাজে যাইতেছে উহারা—ওদিককার ঢালু পথে অনেকখানি নামিয়া গেলে চম্পা ধীরে ধীরে ফিরিয়া গেল। কি ভীষণ কয়েকটা মুহূর্তই যে কাটিল।

ফিরিবার সময় জানালা আর চৌকাঠের অবকাশ-পথে আবার ঘরের মধ্যে একবার উঁকি মারিয়া দেখিল—আলোটা সেই রকম জ্বলিতেছে, টুলু চিৎ হইয়া শুইয়া আছে, নিদ্রায়ত বুকের ওপর সেই মোটা বইখানা, তাহার উপর দুইখানা হাত, নিশ্চিন্ত নিদ্রায় নবকটিই ধীরে ধীরে ওঠা-নামা করিতেছে।

চম্পা আস্তে আস্তে আসিয়া আবার সেই শিলাখণ্ডটির উপর বসিল। সমস্ত রাত কাটিল এই বিচিত্র প্রহরায়।

একেবারে ভোরে—অন্ধকারের গহ্বর থেকে শুশুনিয়া পাহাড় যখন অল্প একটু আত্মপ্রকাশ করিয়াছে, চম্পা গিয়া চরণদাস আর প্রহ্লাদকে তুলিয়া দিল এবং তাহারা কাজে বাহির হইয়া গেলে নিজেদের উপস্থিতির সমস্ত চিহ্ন মিটাইয়া দিয়া চম্পাও বস্তির পথে অগ্রসর হইল।

উঠিয়া বিস্ময়ের ঘোর কাটিতে বনমালীর বেশ খানিকটা সময় লাগিল।...হঠাৎ কি হইয়াছিল?—চম্পা...চরণ...প্রহ্লাদ...কোমরে ব্যথা...কোথায় সে সব? কোমরটা টিপিয়াও দেখিল—নাঃ, কোথায় কি? মাষ্টারমশাইয়ের বাসায় যখন গেল, টুলুকে হাত মুখ নাড়িয়া বলিল—"কাল রেতে খাসা এক স্বপ্ন দিখলাম গো বাবু মশায়—বুকেই বিথা! মাজ্জায়ই বিথা। মরবার পারা হইছি; চম্পা আলেক সেক দিলেক মুজি খিপারে...কুথা আর বিথা গো? এই তো চলা ফিরাটি করছি বটে যেন "সাঁইতাড়ার কুমার বাহাদুর।"

হাত দুইটা সামনে চিতাইয়া ধরিয়া একটু হাসিল। সেদিন সন্ধ্যায় চম্পা আসিলে তাহাকেও বলিল—কাল স্বপ্ন দেখিল তাহার যেন বেমারি—চম্পা আসিয়াছে—আজকের মতই সেক দিল ইত্যাদি।

চম্পা ঈষৎ হাসির সহিত চোখ ঘুরাইয়া ঘুরাইয়া শুনিল, মাথায় নূতন একটা আইডিয়া আসিয়াছে, বলিল—"তা আর টুলু বাবুকে বলিস নাই তুই, স্বপ্নের কথা বললে ফলে যায় বটে, শেষে বুক আর মাজার বিথাঁয় কেলেশ পাবিক।"

বনমালী ক্রমান্বয়ে সাত দিন এই রকম স্বপ্ন দেখিল।

(১৫)

একাদিক্রমে সাত দিন কোন রকম সাড়াশব্দ না পাওয়ায় চম্পা মনে মনে উদ্বিগ্ন হইয়া উঠিল। এসব ব্যাপারে ম্যানেজারের এত দেরি হয় না, তবে এই নিশ্চেষ্টতার কারণটা কি? ...একবার একটু খোঁজ না লইলে চলে না; ভয়ঙ্কর লোকের আওয়াজ-আস্ফালনের চেয়ে মৌনই বেশী ভয়ঙ্কর যে।

প্রথমে কিন্তু সোজা ম্যানেজারের কাছে গেল না, গেল এসিষ্ট্যান্ট পরেশবাবুর কাছে। এর বাসাটা খনির কাছাকাছি। চাকর বামুন লইয়া একলাই থাকে, এখনও বিবাহ করে নাই। প্রকৃতিটা চাপা, ম্যানেজারের প্রকৃতির উল্টা। ম্যানেজার অন্তর থেকে বিশেষ কিছু চায় না বলিয়া যেমন তাহার ব্যবহারটা বেপরোয়া, এসিষ্ট্যান্ট তেমনি অন্তর থেকেই বেশি চায় বলিয়া একটা অন্তরাল রচনা করিয়া চলিতে চায়—বেশ একটা ঢাক-ঢাক গুড়-গুড় ভাব আছে। একটা নূতন অভ্যাস হইয়াছে সন্ধ্যার সময় একটু সুরা সেবন—খুব সামান্যই। কিন্তু সেটা এখনও প্রকাশ পাইতে দেয় নাই, পাছে প্রকাশ পায় এইজন্য প্রভাবটুকু একেবারে না কাটিয়া গেলে বাসার বাহির হয় না।

রহস্যটুকু জানা আছে শুধু চম্পার।

সন্ধ্যার সময় সে গিয়া উপস্থিত হইল। পরেশ এই সময়টা বাড়ীর ভিতরেই থাকে, আগন্তুক বুঝিয়া বাহির হয় বা হয় না, চাকরের মুখে চম্পা আসিয়াছে শুনিয়া বাহির হইয়া আসিল, প্রশ্ন করিল—"তুই? এ রকম অসময়ে যে!" বারান্দার থামের গায়ে পা দুইটা ঠেকাইয়া একটা চেয়ারে বসিল। চম্পা পাশের থামটা ঠেস দিয়া দাঁড়াইল হাত দুইটা পিছনে করিয়া, হাসিয়া বলিল—"আমার এই সময়, বড়মানুষের সময়ে আর গরীবের সময়ে কখনও মিল হতে পারে?—গতর খাটিয়ে ফুরসৎ হবে তবে তো আসতে পারব?"

"হুঁ! তারপর? আসবার উদ্দেশ্যটা কি? কোন কাজ আছে?"

"শোন কথা ম্যানেজারবাবুর—কাজ না থাকলে এসেছি! ...কাজ মানে গরীবের খোড়া রোগ, শুনেছেন তো একটা হাঙ্গাম করে বসেছি, সেদিন বধনদাসের বৌটা একটা ছেলে প্রসব হয়ে মারা গেল, কেউ ঘেঁসে না দেখে নিজের ঘাড়ে তুলে নিলুম, এখন..."

পরেশ চোখ দুইটা তুলিয়া বাধা দিয়া বলিল—"ঘেঁসবে না কেন?—মাষ্টারমশাইয়ের ভাইপো না কে হয় সেই তো ছেলেটাকে নিয়েছিল, ব্যবস্থাও করেছিল, তুই-ই বরং হৈ-হল্লা করে পেয়াদের বৌয়ের কাছ থেকে কেড়ে নিলি ছেলেটাকে—তাই তো শুনলাম।"

পরেশের পক্ষে ঘটনাটার একটা বিশেষ তাৎপর্য আছে, স্থির দৃষ্টিতে মুখের পানে চাহিয়া রহিল। চম্পা সুযোগটা ছাড়িল না, চোখে চোখ রাখিয়াই বলিল—"কোথাকার এক জন কে ট্যাকা দেখিয়ে খনি থেকে আমাদের একটা ছেলেকে নিয়ে যাবে, মুখ বুজে সয়ে যেতে হবে?...আমি তো..."

অনুসন্ধিৎসু দৃষ্টি দিয়া যাহা খুঁজিতেছিল যেন পাইয়াছে পরেশ, আবার বাধা দিয়া কতকটা সন্তুষ্টভাবে বলিল—"বেশ, ঘাড়ে তুলে নিয়েছিস তারপর?"

"ঐ তো বললুম—গরীবের খোড়া রোগ; নিলুম তো ঝোঁকের মাথায়, কিন্তু ওসব ছাপা কি আমরা সামলাতে পারি? বলে নিজের পেটই চলে না। তাই বড়কর্তাকে ধরেছিলাম একটা ব্যবস্থা করে দিতে কোম্পানী থেকে; বললেনও দোব, কিন্তু কই, সাত দিন হয়ে গেল এখনও তো কিছু টের পেলাম না, তাই জিগ্যেস করতে এসেছিলাম আপনাকে যদি কিছু বলে থাকেন..."

এটা গেল ভূমিকা, দেখা করিয়া কথা পাড়িবার একটা অছিলা।

পরেশ বলিল—"কই না তো।"

চম্পা একটু চুপ করিয়া রহিল, তাহার পর বলিল—

"তা হলে হয় নি বেস হুকুমটা। মানুষের একটা কাজ থাক তবে তো ; এত বড় তিন তিনটে খনি চালানো।...আবার শুনছি একটা নতুন উপদ্রব আরম্ভ হয়েছে..."

"কি ?"

প্রশ্নটা করিয়া পরেশ একটু উৎসুক দৃষ্টিতেই চাহিয়া দেখিল চম্পাও তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাহার পানে চাহিয়া আছে। চোখা-চোখি হইতে সহজ বিস্ময়ের কণ্ঠে বলিল—"ঐ মাষ্টারমশাইয়ের ভাইপো না কে একদিন বড়কর্তার বাসায় গিয়ে হুমকি দিয়ে এসেছে আপনি কিছু জানেন না ?"

দৃষ্টি আবার সেই রকম সুতীক্ষ্ণ, প্রশ্নে ঠাসা ; পরেশ বেশ সহজভাবেই বলিল—"কই না তো ! ওঁকে হুমকি দিয়ে গেল, অথচ কিছু ব্যবস্থা করলেন না যে ?...কবেকার কথা ?"

এই পর্যন্তই দরকার চম্পার, টের পাওয়া গেল কথাটা পরেশ পর্য্যন্ত অগ্রসর হয় নাই। এর পর বাড়াইতে গেলে তাহার নিজের সেখানে উপস্থিতির কথাটা আসিয়া পড়িবে, নানা কারণে যেটা আপাতত চায় না চম্পা ; প্রসঙ্গটা ঘুরাইয়া লইয়া বলিল—"তা হ'ল বইকি ক'দিন ; মরুকগে আদার ব্যাপারী, আমার জাহাজের খবরে দরকার কি ?...আসলে যার জন্যে আসা,—ছেলেটার একটা ব্যবস্থা একটু করিয়ে দিতে হবে আপনাকে..."

"তোর আব্দারই যখন শুনলেম না..."

"ঠাট্টা রাখুন..." বলিয়া চম্পা একটু চুপ করিয়া গেল, কি যেন একটু ভাবিয়া লইল, তাহার পর বলিল—"আমার আব্দার তো ওঁর শুনবার কথাও নয়, যিনি দয়া করে শুনেন তাঁর কাছে তাই করে গেলাম।"

আর দাঁড়াইল না, "এবার যাই, অনেক গুনো কাজ ফেলে এসেছি।...ভুললে চলবে না কিন্তু"—বলিয়া নামিয়া গেল।

পরেশ একটু বিস্মিত হইল। এর আগেও আসিয়াছে চম্পা কোন একটা ছুতানাতা লইয়া, এত তাড়াতাড়ি কখনও চলিয়া যায় নাই, এমন হঠাৎ তো নয়ই। কয়েক দিন হইতে তাহার মধ্যে একটা যেন পরিবর্তন লক্ষ্য করিতেছে।

ম্যানেজার রতিকান্তের সহিত দেখা হইবে সকালে দিনের আলোয়। রাত্রিটা চম্পার বড় অশান্তিতে কাটিল। বনমালীর বধ রচনা আর তাহার পর কটকের ধারে বসিয়া সেই ঠার পথের দিকে চাহিয়া পাহারা—এসবের মধ্যে একটা প্রশ্ন তাহার মনটাকে বড়ই উদ্বিগ্ন করিয়া রাখিল—ম্যানেজার এসিষ্ট্যাণ্টকে কিছু বলেন নাই কেন ? শাস্তি, প্রতিশোধ, কিংবা কোন চক্রান্তে এসিষ্ট্যাণ্টকে প্রায়ই বলেন, স্ত্রীসুলভ কৌতূহল মিটাইবার জন্যই পরেশের নিকট হইতে কত খবর কতবার পাইয়াছে চম্পা এর আগে ; এবার এত গোপনের চেষ্টা কেন ? চক্রান্তটা কি এতই গভীর ? প্রতিশোধটা কি এবার এতই ভীষণভাবে লইতে চায় ম্যানেজার ?"

সকালে আবার সেই জায়গাটিতেই সাক্ষাৎ হইল। ম্যানেজার নিবিষ্টচিত্তে একটা কাগজ পড়িতেছিলেন, শুধু নিবিষ্টই নয়, বেশ যেন চিন্তিতও—ভ্রূ দুইটা কুঞ্চিত হইয়া রহিয়াছে, চম্পার উপস্থিতি সত্ত্বেও কোন খেয়াল হইল না।

চম্পা নিজের জায়গায় নিজের ভঙ্গীতে হাত পিছনে রাখিয়া থামে ঠেস দিয়া দাঁড়াইতেই দৃষ্টি পড়িল। তখন আবার কাগজটা পাশে রাখিয়া আগেকার মতো সরস লঘুতার সঙ্গেই আরম্ভ করিলেন—"চম্পাবতী যে, কি মনে করে হঠাৎ শুভাগমন ?" চম্পা 'শুভাগমন' কথাটার কাটান্ দিয়া একটু হাসিয়াই বলিল—"খিরক্ত আপনি হবেন জেনেশুনেও আসতে হয়, সেবারে বদনদাসের ছেলেটার খোরপোষের একটা ব্যবস্থা করে দেবেন বললেন কোম্পানি থেকে, তা আজ পর্যন্ত..."

ম্যানেজার চোখ দুইটা একটু তুলিয়া প্রশ্ন করিলেন—"তার দরকার আছে আর ?"

চম্পার বুকটা ধক্ করিয়া উঠিল, দুইটা ঢোঁক গেলার পর তবে প্রশ্নটা কণ্ঠ দিয়া বাহির হইল—"কেন—ওকথা বললেন যে ?"

"খোরপোষের ব্যবস্থাটুকু হওয়া নিয়ে বিষয়, কোম্পানিকেই যে করতে হবে এমন তো কোন কথা নেই।"

অনেক কষ্টে চম্পা মুখের সহজ ভাবটা ধরিয়া আছে, একটা উত্তর দিয়া হেঁয়ালিটাকে স্পষ্ট করিয়া লইতে যেন সাহস হইতেছে না। ইজিচেয়ারে ঘাড়টা এলাইয়া দিয়া ম্যানেজার মিঠে টানে একটা সিগারেট ফুঁকিতেছেন, দৃষ্টিটা চম্পার মুখের ওপর। হেঁয়ালিটা তিনি নিজেই আর একটু স্পষ্ট করিয়া দিলেন, বলিলেন—"খোরপোষের সঙ্গে যেখানে প্রাণের টান সেখানেই সেটা বরং বেশি মিষ্টি নয় কি ?"

যেন অমানুষিক চেষ্টায় চম্পা মুখে এবার একটু হাসিও টানিয়া আনিল, উত্তর করিল—"সেই ভরসাতেই তো আপনার কাছে আসা, এখানে আপনিই সবার বাপ-মা, আপনার চেয়ে বেশি দরদ কার কাছে আশা করা যায় ?"

ম্যানেজারের মুখেও হাসি ফুটিল, টোকা মারিয়া সিগারেটের ছাইটুকু ঝাড়িয়া ফেলিয়া বলিলেন—"শোন্ চম্পা, গাছের খাবি আবার তলারও কুড়ুবি তা হয় না।...আমি যদি বাপমা হই-ই তো সে সরকারী বাপ-মা, নিজের বাপ্ মা যখন ওর রয়েছে..."

"বিপদের সামনাসামনি হইয়া এ অন্তরালটুকু চম্পা আর সহ্য করিতে পারিতেছে না, যেন স্পষ্ট রূপটাই দেখিয়া লইবার জন্য ব্যাকুলকণ্ঠে বলিল—"আমার নিয়ে একি করছেন আপনি ?—আপনার দাসীর দাসী হবারও যুগ্যি নই আমি—কি বলবেন স্পষ্ট করেই বলুন—কি কথা শুনেছেন আমার সম্বন্ধে ?—জানেনই তো আমার শত্রুর অভাব নেই..."

"স্পষ্ট কথা তুই যদি বুঝেও না বুঝিস আমি কি করব ? তুই আবার মাষ্টারমশাইয়ের বাসায় সেই ছোঁড়াটার সঙ্গে..."

চম্পা এমনভাবে চাহিয়া চোখ দুইটা হঠাৎ ম্যানেজারের

মুখের ওপর ফেলিল যে সব শেষের কদর্য কথাটা তাঁহার মুখে যেন আটকাইয়া গেল ; পরের ব্যাপারটুকু চম্পাই সামলাইয়া লইল, ইঙ্গিতে যেটুকু কদর্যতা প্রকাশ পাইল সেটা যেন গা-সওয়া বলিয়া গ্রাহের মধ্যেই আনিল না ; দুটি পরমুহূর্তেই খুব সহজ করিয়া লইয়া একটা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলিয়া বলিল—"তাই বলুন ! আমি তো ভয়ে কাঁটা হয়ে গেছলাম—আবার নতুন করে কে আপনার কাছে কি লাগিয়েছে, শত্রুর তো অভাব নেই । তা আমি স্কুলে ক'দিন থেকে তো যাচ্ছি—ঠাকুরদাদাটা ক'দিন ধরে অসুখে পড়ে গেছে, বিশেষ করে রেতের বেলা হয় বাড়াবাড়ি। যাচ্ছি ক'দিন থেকে—বাবাকে ডেকে নিই, কখন কি হয়, একলা মেয়েমানুষ ।···তা এর মধ্যে মাষ্টারমশাইয়ের বাসায় তাকে ঢুকিয়ে কে আপনার কাছে কলাও করে কেচ্ছা গড়ে নিয়ে এসে লাগালো ? বদনদাসের ছেলেটাকে নিয়ে কি কাণ্ড একচোট হয়ে গেল তার সঙ্গে, আর কেউ না জানুক, আপনি তো জানেন ।···আপনার কাছে সেদিন ওরকম দাবড়ানি খেয়ে সে রইলো কি ভাগলো তাও জানি না । বলিহারি মাথা লোকের !"

ম্যানেজার চেয়ারে সেই রকম ধাড়টা এলাইয়া দিয়া স্থির প্রশংসার দৃষ্টিতে চাহিয়া আছেন । মুখে অল্প একটু হাসি—ভাবটা যেন—হ্যাঁ, সেয়ানা মেয়ে বটে !···এটা বেশ বুঝিতে পারা যায় স্পষ্ট ধরা পড়িয়া চম্পা তাহার কৌশল বদলাইয়া ফেলিয়াছে, কত শীঘ্র যে, আর কত নিখুঁত ভাবে সেইটিই তাঁহার আশ্চর্য বোধ হইতেছিল। শোনার সঙ্গে সঙ্গে, প্রশংসার পাশে পাশে একটা সংকল্পও তাঁহার স্থির হইয়া উঠিতেছিল···এ মেয়েকে হাতছাড়া করা চলিবে না ।

সোজা হইয়া বসিয়া বলিলেন···"শোন্ চম্পা, তুই হাজার বুদ্ধিমতী মনে করিস নিজেকে—না হয় স্বীকার করে নিলাম, তাই···কিন্তু আমার ওপরও কি টেক্কা দিয়ে যাবি ? তবে দেখ যেতে পারছিস কিনা···তোর ঠাকুরদাদার অসুক-টসুক, তোর ভাঁওতা—ও একটা আধপাগলা, পুরো পাগল হতে হতে মাঝখানে থেমে গেছে···কি করে···ওর মাথায় যদি ঢুকিয়ে দেওয়া যায় তুই বীর হনুমান তো ছাত থেকে লাফ দিয়ে মরবে, আর যদি বলা যায় তুই একটা কোলের শিশু, এই সবে জন্মেছিস, তো হাত পা ছুঁড়ে ওয়াওঁ ওয়াওঁ কান্না সুরু করে দেবে ; তুই নাতনী, সেটা জানিস, কিন্তু আমিও তো ঐ স্কুলের সেক্রেটারি । থাক্ !···শুধু তোর বাপ আসে না, পেল্লাদ সাধু আসে, কেন তাও বলব ?"

চম্পা একটু হাসিয়া কতকটা অবহেলাভরে বলিল—"বলুন ।···পেল্লাদের নামটা আমার ছেড়ে গেছল বটে । মাথায় ঠিক থাকে তবে তো···"

"ছেড়ে যায় নি ;—মাথায় ঠিক বেশি রকম আছে বলেই ঢুকিয়েছিলি । যাক সে কথা । ওরা আসে ওই ছোঁড়াটাকে পাহারা দিতে···।"

চম্পা একেবারে খিল-খিল করিয়া হাসিয়া উঠিল, অল্প একটু গা নাড়া দিয়াই বলিল—"আমার বেয়াদবি হয়ে যাচ্ছে আপনার সামনে, দোষ নেবেন না ; কিন্তু আপনার চর চমৎকার খবর দিয়েছে আপনাকে ! বাবা আর পেল্লাদ দুলেই ঠাকুরদার বারান্দায় শুয়ে থাকে !"

ম্যানেজারের দৃষ্টিটা আবার নূতন করিয়া সপ্রশংস হইয়া উঠিল, তাহার সঙ্গে একটু মোহও আছে, রূপের সঙ্গে বুদ্ধির বিদ্যুৎস্ফুরণ দেখিলে যেটা আসিয়াই পড়ে।—চম্পা একটা অভিনয় করিল বটে, খাসা ! কিন্তু চম্পার এ সব কথার উপর মন্তব্য না করিয়া নিজের কথার জের ধরিয়াই বলিলেন—"আর তুই সমস্ত রাত স্কুলের দরজায় থাকিস জেগে বসে ।"

চম্পার হাসি-হাসি ভাবটা যেন দপ করিয়া নিভিয়া গেল ; সেও কিন্তু ক্ষণিক, অভিনয়ও ছাড়িল না । মুখটাকে চেষ্টা করিয়া আরও বিষণ্ণ করিয়া লইয়া বলিল—"আপনার মাথার মধ্যে যখন ঢুকে গেছে—পাহারা দেবার জন্যই এই ব্যবস্থা—যার জন্যে আমার মতন একটা অসহায় মেয়েছেলেকেও মস্ত বড় একজন মন্ত্রী বলে আপনি ধরে নিয়েছেন, তখন আমি আর কি বলব ? তর্ক যতটুকু করতে হ'ল, তাইতেই তো যথেষ্ট বেয়াদবি হয়ে গেছে ।···ছেলেটার সম্বন্ধে আর কোন আশা নেই তা হলে ?"

"তুই যতটুকু আশা করে আছিস তার চেয়ে লাখো গুণ বেশি ব্যবস্থা করে দোব তোর ছেলের ।"

চম্পা অতিমাত্র আশ্চর্য এবং কতকটা বিমূঢ় হইয়া মুখের পানে একটু চাহিয়া থাকিয়া বলিল···"আপনার দয়া, কিছু করতে হবে আমায় ?"

"কিছু না ; যেমন আছিস তেমনি থাকতে হবে, শুধু আর একটু ভাল করে ।"

"বুঝলাম না ।"

"এখন শুধু রাত্তিরে থাকিস, দিনেও স্কুলে থাকবি ; স্কুলে বলি কেন ?—মাষ্টারমশাইয়ের বাসায় ।"

চম্পা যেন একটু চমকিত হইয়া উঠিল, প্রশ্ন করিল—"কেন ?"

"কেন, তা নিজেই ভেবে দেখলে বুঝতে পারবি । এখন নাও যাস, মাষ্টারমশাই ফিরে এলেও গেলে চলবে ।"

"চম্পার সমস্ত শরীরটা ভিতরে ভিতরে শিহরিয়া উঠিল । ম্যানেজারের হাসিটা হইয়া উঠিয়াছে বীভৎস, দৃষ্টিতে যেন একটা বিষের নীলাভা ঠিকরাইয়া পড়িতেছে ; চম্পা অনেকক্ষণই চোখ ফিরাইতে পারিল না । কিন্তু সে খেলায় নামিয়াছে, পিছাইয়া গেল না, যে এত বড় ভুল করে, এত বড় একটা সুযোগ শত্রুর হাতে তুলিয়া দেয় সেও বুদ্ধির গুমর করে।

সত্যই তাহার একটু হাসি পাইল, সেইটাকেই কাজে লাগাইয়া একটু লজ্জার অভিনয় করিয়া বলিল—"আপনার যেমন হুকুম—আমি ওখানে গিয়া উঠিলেই যদি আপনাদের কোন উপকার হয়…"

চম্পা চলিয়া গেলে ম্যানেজার আবার ভ্রূ কুঞ্চিত করিয়া খবরের কাগজে মনঃসংযোগ করিলেন, একটা খবরে সকাল থেকে তাঁহাকে বড় অন্যমনস্ক করিয়া তুলিয়াছে—একেবারে দূরে কাতরাসগড় অঞ্চলে খনির কুলি-মজুরদের মধ্যে একটা খুব বিশ্রী রকম গুলতান আরম্ভ হইয়াছে—শীঘ্রই একটা চরমে আসিয়া দাঁড়াইবে এরূপ আশঙ্কা হয়।

এটুকু সাধারণ; ম্যানেজারের পক্ষে যা অসাধারণ, বিশিষ্ট—যাহার জন্ম ভ্রূকুঞ্চন তাহা এই যে একজন আধা-সন্ন্যাসী গোছের লোক এর মূলে।…লোকটি মাঝবয়সী, গৌরবর্ণ, শীর্ণ, মাথায় বড় বড় চুল; সপ্তাহখানেকও আসে নাই; কিন্তু এরই মধ্যে কুলিমজুর-মহলে অগাধ প্রতিপত্তি।

খুব চিন্তিত ম্যানেজার,—লোকটির সঙ্গে সেই নিরীহ বন্ধ বাক্—মাষ্টারমশাইয়ের খুব একটা মিল পাওয়া যাইতেছে না?

(১৬)

ম্যানেজারের নিকট হইতে চলিয়া আসিতে এবারেও চম্পার যেন পা উঠিতেছিল না। একটা মোক্ষম হার হইয়াছে। অবশ্য সে হারটা স্বীকার করিল না, অভিনয়টা করিয়াই গেল, এবং আজকের দাবার চালে শেষ জয়টা রহিল তাহারই; তবুও এই সমস্ত সপ্তাহব্যাপী পরাজয়ের সঙ্কোচটা তাহার পা দুটিকে যেন আড়ষ্ট করিয়া রাখিলই খানিকটা পর্যন্ত; আসিতে আসিতে মনে হইতে লাগিল ম্যানেজারের বক্র হাসি এবং বিদ্রূপে ভরা দুটি চোখের দৃষ্টি তাহাকে পিছন হইতে বিদ্ধ করিতেছে।

কোন রকমে গেটের বাহির হইয়া এদিক দিয়া অনেকটা স্বস্তি অনুভব করিল; তখন বিস্ময়ের সঙ্গে চিন্তা আসিয়া উপস্থিত হইল, এত সব কথা—প্রত্যেক খুঁটিনাটিটি পর্যন্ত ম্যানেজার জানিতে পারিল কি করিয়া!

সমস্ত রাত্রি জাগিয়া আজকাল দিনের বেলা শরীরে কিছু থাকে না, সেইজন্য রান্নার হাঙ্গামটা আর রাখে না। মিতিনকে চাল-ডাল সব দিয়া আসে, সে-ই নিজের রান্নার সঙ্গে নামাইয়া দেয়। অন্য দিন চম্পা এই সময়টা ঘুমায়, আজ কিন্তু চিন্তায় তাহার ঘুম হইল না।…কি করিয়া টের পাইল ম্যানেজার, তাহার সারা রাত বসিয়া পাহারা দেওয়াটি পর্যন্ত!

ভাবিয়া ভাবিয়া তাহার এক সময় যেন মনে হইল উত্তরটা পাওয়া গেছে। বনমালীর মস্তিষ্কের যে দুর্বলতার উপর তাহার সমস্ত ব্যবস্থাটুকু গড়া সেই দুর্বলতাই ম্যানেজারও কাজে লাগায় নাই তো? চম্পার যা কিছু সব, সন্ধ্যা হইতে শেষ রাত্রি পর্যন্ত। তাহার পর আর সমস্ত দিন ওদিক মাড়ায় না; রাত্রও থাকে, খনিতে কাজও আছে; তাহা ভিন্ন যাহা সবচেয়ে দরকারী কথা—ওর ইচ্ছা নয় যে টুনু জানুক বনমালীর সঙ্গে চম্পা কোন রকম সংস্রব রাখিয়াছে—যাওয়া-আসা করে, কেননা এর আগে তাহাকে কখনও দেখে নাই ওখানে। এই দিনের বেলা তাহার অনুপস্থিতিতে বনমালীকে বাসায় ডাকিয়া লইয়া, মন্ত্রমুগ্ধ করিয়া সমস্ত কথা বাহির করিয়া লয় নাই তো ম্যানেজার? বনমালীর স্বপ্নে টুনু কোন সন্দেহ করে নাই, কেননা টুনুর ও রকম একটা সম্ভাবনার কথা মনেই হয় নাই; ম্যানেজার অনেক কথা জানে, তাহা ভিন্ন বাহ্যিক ঔদাসীন্যের পিছনে চম্পার সহানুভূতিটা যে টুনুর দিকেই এটুকু ধরিয়া ফেলা তাহার পক্ষে মোটেই অসম্ভব নয়; সুতরাং বনমালীর স্বপ্ন যে আদতে কি সেটাও ধরিয়া লইতে তাহার বিলম্ব হইবার কথা নয়।

আহার করিয়া শরীরটা একেবারেই ভারী হইয়া পড়িল, তাহা ভিন্ন রোদও অত্যন্ত কড়া, একটা ঘুম দিয়া চম্পা স্কুলের দিকেই পা বাড়াইল। এসিষ্ট্যান্ট ম্যানেজার পরেশবাবু বাঁচিয়া থাক্, খনিতে হাজরি সম্বন্ধে ওর তত ভাবনা নাই।

স্কুলের রাস্তা আর বস্তির মাঝামাঝি যে একটা ছোট টিলা আছে সেটার গোড়ায় আসিতে হঠাৎ স্কুলের দিকে নজর পড়ায় চম্পা থমকিয়া দাঁড়াইয়া পড়িল। একটি লোক স্কুলের দেয়ালের বাহিরের দিকে পাশে পাশে আসিয়া রাস্তার ধারে দাঁড়াইল, তাহার পর যেন খুব সন্তর্পণেই একবার এমুড়ো-ওমুড়ো চারিদিকটা দেখিয়া লইয়া রাস্তার উপর উঠিয়া পড়িয়া খুব সহজ পদক্ষেপে গঞ্জের দিকে অগ্রসর হইল।

বড় আশ্চর্য বোধ হইল চম্পার। স্কুলের পিছন দিকে একটা ছোট দোর আছে, যে-কোন কারণে হোক লোকটা যে সেই দোর দিয়া বাহির হইয়াছে ইহাতে আর সন্দেহ নাই।

টিলার উপর একটা বাঁকড়া-ঝোঁকড়া বুনো কুলের গাছ, তাহার গায়ে কি একটা লতা উঠিয়া বেশ একটি আড়ালের সৃষ্টি করিয়াছে; চম্পা তাহার পাশটিতে বসিয়া নিরীক্ষণ করিতে লাগিল। রাস্তাটা প্রায় দুই শত গজ দূর দিয়া চলিয়া গেছে, লোকটা একটু কাছে আসিলে চম্পার বিস্ময় আরও বাড়িয়া গেল,—রাত্রে দেখা, তবু চলার ভঙ্গি এবং আরও দু-একটা বিষয়ে মনে হইল, প্রথম রাত্রে এবং পরে আরও তিন রাত্রে যে দুটি লোককে স্কুলের সামনে দিয়া চলিয়া যাইতে দেখিয়াছিল এক দিন, একটু অসাবধানতার জন্য নিজেও হঠাৎ যাহাদের দৃষ্টিগোচর হইয়া পড়িয়াছিল, এ তাহাদেরই মধ্যে এক জন। চম্পা তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে চাহিয়া রহিল—যতই কাছে আসিতেছে লোকটা ততই চম্পার সন্দেহটা কাটিয়া যাইতেছে। আবার এদিকে একটা ভয় লাগিয়া আছে—লোকটা যদি বস্তির পায়ে-হাঁটা এই পথে নামে, চম্পার আত্মগোপনের

কোন উপায়ই থাকিবে না।—কয়েকটা অসহ মুহূর্ত—সমস্ত মন ছুইটি চক্ষে জড়ো করিয়া হাত পা যেন সিঁটকাইয়া বসিয়া রহিল চম্পা। দুইটা রাস্তার সঙ্গম যতই কাছে আসিতেছে ততই তাহার চৈতন্য তীব্র হইয়া উঠিতেছে—চম্পা ওর ধাপ গুনিতে লাগিল—লোকটা ঠিক চৌমাথার কাছে আসিয়া মুহূর্তখানেক ইতস্তত করিল—কোন্ দিকে যাইবে যেন স্থির করিতে পারিতেছে না, একবার ছমছমে দৃষ্টিতে চারিদিকে চাহিল—চম্পার বুকটা ধড়াস ধড়াস করিতেছে—তাহার পর সোজা গঞ্জের দিকেই অগ্রসর হইল।

একটা টানা দীর্ঘনিশ্বাস পড়িল চম্পার, যতক্ষণ লোকটাকে দেখা গেল স্থিরনেত্রে তাহার দিকে চাহিয়া রহিল। সে বাজারের মোড়ে অদৃশ্য হইলেও একটু বসিয়া রহিল ওই দিকে চাহিয়াই—যদি লোকটা কোন কারণে ফেরে—কোনও কারণে —এ ধরণের লোকের পক্ষে যেন সবকিছুই সম্ভব…তাহার পর বেশ একটু সময় দিয়া ফুলগাছের আড়াল হইতে সরিয়া আসিয়া স্কুলের দিকে অগ্রসর হইল।

বড় রাস্তায় উঠিয়া চম্পাও ঠিক ঐ লোকটির পদ্ধতিই অবলম্বন করিল, সামনে পিছনে একবার ভাল করিয়া দেখিয়া লইল, তাহার পর মাষ্টারমশাইয়ের বাসাটা যাহাতে স্কুলের আড়ালে পড়িয়া যায় এইভাবে রাস্তার ডানদিক ঘেঁষিয়া দ্রুতপদে অগ্রসর হইল। স্কুলের কাছে আসিয়াও সে ঐ লোকটার মতোই দেওয়ালের পাশে চলিয়া গেল এবং সেই ভাবেই আড়ালে-আড়ালে অগ্রসর হইয়া পিছনের ছোট ফটকটি দিয়া স্কুলে প্রবেশ করিল।

—চম্পা এড়াইতেছে টুলুকে।

স্কুল আজকাল সকালে; বনমালী বোধ হয় এতক্ষণ দাওয়ায় বসিয়া তামাক সেবন করিতেছিল, দরজার চৌকাঠে সেটাকে ঠেস দিয়া রাখিয়া ঘরের মধ্যে যাইবে, চম্পা প্রবেশ করিতে করিতে বলিল, "তু কেমনটি আছিস বটে গো?"

বনমালী বেশ একটু ধাঁধায় পড়িয়া স্থিরনেত্রে তাহার মুখের পানে চাহিয়া রহিল। দিনের বেলায় রাত্রের সমস্ত ঘটনাকে স্বপ্ন বলিয়া মনে করিতে এমন অভ্যস্ত হইয়া পড়িয়াছে যে চম্পাকে চোখের সামনে দেখিয়া সময়টা দিন কি রাত্রি, এ স্বপ্নের চম্পা কি বাস্তব যেন গোলমাল হইয়া যাইতেছে তাহার; একটু ঠাহর করিয়া থাকিয়া বলিল, "চম্পা দেখি তো?"

তাহার পর দুপুরটা যেন সর্বাঙ্গ দিয়া বেশ ভাল রকম অনুভব করিয়া প্রশ্ন করিল, "এত দুপুরে আইছিস যে?"

"শোন কথা বুড়ার! দুপুরে তো রোজ দিন আইছি, তু কুথায় বেরেঁ বসে থাকিস তাই দেখাটি হয় না।"

—কথাটা বলিয়া খুব তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে মুখের পানে চাহিয়া রহিল।

বনমালী অনেকক্ষণ মাথার ডান পাশটা চুলকাইল—স্মৃতি খুঁড়িয়া যেন কি বাহির করিবার চেষ্টা করিতেছে, হার মানিয়া বলিল, "কুথা যাই গো?"

"তা ভাব্ ক্যানে, তু যাবি আর আমি বুলব?…তুদের সেক্রেটারির বাঁসায় যাস্ নাই তো? আর কুথায় যাবি?"

বনমালী আবার খননকার্য আরম্ভ করিল, তাহার পর মাথা নাড়িয়া বলিল, "সিক্রেটিরির বাঁসায় কেন যাব গো? কি দরকার আছে বটে?"

তাহার পর ওখানে যে যায় না, তাহার প্রমাণটা হঠাৎ মনে পড়িয়া গেল, বলিল, "আমি উখানে যাই তো কে তুর শ্বশুরটির সঙ্গে তুর বিয়ার কথাটি কয় গো?…"

চম্পা একেবারে শিহরিয়া প্রশ্ন করিয়া উঠিল—"আমার শ্বশুর? কে বটে?"

"হ, তুর শ্বশুর। ছিল না-তো হবেক, কথাটি চলবে। এতক্ষণটি তো ছিল গো, তু দেরি করলিস নাতো দিখতিস—দিখতিস শ্বশুরকে—কেমন বাবরি চুল, কেমন বুকের ছাতি; কেমন টানা চোখ; ডান পা'টি একটু ছোট বটেক; তা তুর বরের পা ছোট লয়, ভাবনা ক্যানে গো? আমি তল্লাস লিইছি, তু সমান পা পাবি বটে…"

নাতনির সঙ্গে রসিকতায় বনমালীর মুখে হাসি ফুটিল, পা লইয়া শ্বশুর আর বরের প্রভেদটা নানা রকমে সরস করিয়া তুলিবার চেষ্টা করিতে লাগিল।

চম্পা কাঠ হইয়া গেছে। ঐ লোকটা, রাত্রে এই পথে এক জন সঙ্গী লইয়া যে নিতান্ত নির্লিপ্তভাবে হন হন করিয়া চলিয়া যায়, এই মাত্রই যে স্কুলের দেওয়াল ঘেঁষিয়া বাহির হইয়া আসিয়া গঞ্জের পথে নামিয়া গেল। বনমালী দুপুরে ম্যানেজারের কাছে যায় কিনা জানিয়া লইয়া ওর কথাই কৌশলে তুলিতে যাইতেছিল চম্পা, প্রসঙ্গটা আপনিই, আর অদ্ভুত আকারে আসিয়া উপস্থিত হইল। লোকটা তাহা হইলে কোন নিগূঢ় কারণে তাহার বিবাহের অছিলায় এখানে জমাইয়া বসিয়াছে। ম্যানেজার যখন বনমালীকে বাসায় ডাকে না তখন এ লোকটি যে তাহারই চর তাহাতে আর তাহার সন্দেহ রহিল না। নিজের মূঢ়তায় তাহার একটু হাসিও পাইল—অমন কাগুলোক ম্যানেজার, তাহাকে সে এত বোকা ভাবিলই বা কি করিয়া যে বনমালীকে দিনের বেলায় বাসায় ডাকিয়া এসব কথা আলোচনা করিতে যাইবে?

এইবার দরকার "শ্বশুরে"র রহস্য ভাল করিয়া ভেদ করা। বনমালীকে নিজের রেকর্ড ঘুরাইয়া যাইতে দিয়া চম্পা মনে মনে চিন্তা করিতে লাগিল; এক সময় বাধা দিয়া প্রশ্ন করিল, "তা শ্বশুরের সঙ্গে তুর রোজ কি কথাটি হয় বটে; তুর তো একটি নাতনি গো?"

বনমালী হাসিয়া বলিল—"নাতজামাইও একটিই হবে বটে তু ডর করিস ক্যানে? বিয়ার কথা যে গো নাব কথাটি

হবেক, তবে তো ? তারা ঘর, স্কুল, বিটি—ই সবের খবর লিবেক তবে তো ?"

"তুদের বিটি তো সেহেঁ৷ বিটি গো, তমলে কেটি বিয়া দিবেক তাই ক' ?"

বনমালী একটু কি ভাবিল, তাহার পর কিরূপ দক্ষতার সঙ্গে যে সে বিবাহের কথাবার্তা চালাইয়া যাইতেছে বর্ণনা করিয়া চলিল। একটা স্বপ্ন দেখে বনমালী; সেইটাকে চম্পার ভাবী শ্বশুরের কাছে সত্য বলিয়া চালাইয়া দিয়াছে। আজই না হয় বনমালী বিষ হারাইয়া ঢোঁড়া সাপ হইয়া বসিয়াছে, নয় তো বিবাহ দিতে দিতে মাথার চুল পাকিল,—বোনেদের বিবাহ দিল, চম্পার বাপখুড়া পিসিদের বিবাহ দিল, আর আজ চম্পার শ্বশুরের কাছে হার মানিয়া যাইবে ?··· বনমালী একটা স্বপ্ন দেখে আজকাল,—প্রতি রাতেই সেইটেকে বেশ গুছাইয়া-গুছাইয়া সত্য বলিয়া চালাইয়া দিয়াছে। বলিয়াছে, আরে কর্তা ওসব যা শুনিয়াছ একেবারে ভুলিয়া যাও—গেরস্তর মেয়ে, তায় সমর্থ মেয়ে, খনিতে গতর খাটাইয়া খাইতে হয়, ও ধরণের পাঁচ রকম কথা রটেই, তা বলি চম্পা কি সেই ধরণের মেয়ে নাকি ? এই তো অথর্ব হইয়াছে, বনমালীর শরীরটা সন্ধ্যা হইতেই বিগড়াইয়া থাকে, তা রোজ সন্ধ্যা হইতেই চম্পা আসিয়া ঠাকুরদাদার হেপাজতে লাগিয়া যায়—রান্না করা, বিছানা পাট করা, খাওয়ানো, সেক দেওয়া, সুজির সেক—সে সেবা এক দেখবারই জিনিষ! বাড়িতে বাপের জন্ত সব ব্যবস্থা করিয়া রাখিয়া আবার এতটা পথ অতিক্রম করিয়া আসিয়া ঠাকুরদাদার হেপাজত—চম্পার মতন মেয়ে আর হয় নাকি ? এতটা পথ একা আসে শুনিয়া পাছে চম্পার শ্বশুরের মনে কোন খটকা লাগে বনমালী সে পথও মারিয়া রাখিয়াছে। আরে ছিঃ, গেরস্তর মেয়ে চম্পা—হলধর বোষ্টমের বংশের মেয়ে—মহাপ্রভু যখন বৃন্দাবনে যান যে হলধর তাঁর জলের ঝাড়ি বহিত—সেই চম্পা কি সন্ধ্যার পর এতটা পথ কখনও একা আসিতে পারে ? সঙ্গে থাকে ওর বাপ চরণদাস আর পাঁচ-ছ' জন তাহার বন্ধু—চম্পার দিকে কেউ চোখ তুলিলে সেই চোখসুদ্ধ তার ধড়টা তখনি মাটিতে লুটাইতে থাকিবে না ? সমস্ত রাত সবাই এইখানে দেয় পাহারা। অবশ্য পাহারার এত আছেই বা কি ? চম্পা কি সেই ধরণের মেয়ে যে তাহাকে অষ্টপ্রহর পাহারার মধ্যে রাখিতে হইবে ? চম্পার শ্বশুর ওসব যাহা শুনিয়াছে নিছক মিথ্যা—বদ লোকেদের কিছু একটা লইয়া থাকা চাই তো ? ঐ সব মিথ্যা রটনা লইয়া থাকে, কি আর করিবে ? রাত্রিটি শেষ হওয়া আর চম্পা বাপ আর তাহার সাথীদের সঙ্গে বস্তিতে নিজের বাসার চলিয়া যায়—সেখানকার পাট আছে, তাহার পর খনির কাজ আছে—হ্যাঁ, ঐ একা মেয়ে! ছু-দুখানা সংসার, তারপর আবার খনিতে ঐ হাড়ভাঙা খাটুনি সব একলাটি সামলাইয়া যাইতেছে। আর রূপের কথা ? 'নিজের নাতনী, কত আর তারিফ করিবে বনমালী—একটু কথাবার্তা অগ্রসর হোক, এইখানেই ডাকাইয়া আনিয়া এক দিন দেখাইয়া দিবে; সব মিলাইয়া বৌ যে হইবে সে আর দেখিতে হইবে না। বিবাহ যে এত দিন হয় নাই—অথচ এত বয়স হইল—চম্পাই বলে বাপকে কেহ দেখিবার নাই, ঠাকুরদাদাও বুড়া হইল, বিবাহ করিবে না; বোষ্টমের মেয়ে, বিবাহ যে করিতেই হইবে তাহার মানে কি ? আসলে তাহাও নয়, ভাল পাত্র—মানে, চম্পার উপযুক্ত পাত্র পাওয়া যাইতেছে না—বাপের ফুরসত নাই, বনমালীও অথর্ব হইয়াছে, শরীরের সে জুৎ নাই যে বাহির হইয়া একটু খুঁজিয়া পাতিয়া দেখে এইবার এই ভাল পাত্র পাওয়া গেছে—বনমালীই ছাড়িবে নাকি ? ঘাড় ধরিয়া নাতনীর বিবাহ দিবে···

ছেলের বাপেরও খুব তারিফ করে বনমালী—অতিশয় ভাল লোক। ওরকম সচরাচর দেখা যায় না, কত রকম গল্প করে, এদিককার কথা তো আছেই, স্কুলের, এমন কি মাষ্টারমশাইয়েরও, টুলুরও—যাদের সঙ্গে কোন সম্বন্ধই নাই। রোজ খোঁজটুকু লওয়া আছে—কোথায় আছেন মাষ্টারমশাই, কবে আসিবেন, কোন চিঠি আসে কিনা, টুলু সমস্ত দিন কি করে, কি করিয়া খাওয়া-দাওয়া হয় বেচারীর—চম্পার শ্বশুর কোন রকম সাহায্য করিতে পারে কিনা তাহাকে···এই সব নানা কথা শুধু টুলুবাবুর কাছে বলিতে মানা আছে—বিয়ের কথা পাঁচ কানে তুলিতে নাই কিনা। তা বনমালী চম্পার কাছেই বলিল আর এত দিন ত বলে নাই, আজই বলিল—কথাটা পাকা হইয়া আসিয়াছে ত ? আর চম্পা ত টুলু নয়। আর সর্বোপরি কনের ঠাকুরদাদা বলিয়া কি ভক্তি বনমালীর ওপর! আসিয়াই সাষ্টাঙ্গ হইয়া একটি প্রণাম, পায়ের কাছে একতাল বিষ্টুপুরের এক নম্বর তামাক রাখিয়া—প্রথম দিন, একটি টাকা দর্শনী সমেত···না বিশ্বাস হয় চম্পা নিজের চক্ষেই দেখুক না।

বনমালী উঠিয়া গেল। এতক্ষণ ধরিয়া যা কিছু বলিল সমস্তই যেন বাস্তব প্রমাণ হাজির করিতেছে এই হিসাবে বলিতে বলিতে গেল—"হ, তু দেখ না গো, বুলবি ঠাকুরদাদা বুড়া হইছে, মিছা বলছে—ই ট্যাকা দেখ, ই তামাক দেখ গমকে ঘরটি মাৎ কর্যা দিছেঁ বটে।"

(ক্রমশঃ)

তেলীমন্দির (হাজারিবাগ)

রামগড় হইতে রাজরপ্পার পথে প্রাচীন শিবমন্দির (হাজারিবাগ)

সোনাম্রুত নদীপদে (হাজারিবাগ রোড)

বেণুবন (হাজারিবাগ।

হাজারিবাগ ভ্রমণ

শ্রীপরিমল গোস্বামী

(প্রথম পর্ব)

আজকের দিনে অন্ততপক্ষে ইউরোপ ভ্রমণ না লিখলে ভ্রমণ-কাহিনী লেখার চেষ্টা ব্যর্থ হ'তে বাধ্য। কিন্তু পাঠক বিশ্বাস করুন, বহুবার ইউরোপ যাবার চেষ্টা করেছি কিন্তু পারি নি।

যুদ্ধ শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গে আমরা কয়েকজন বন্ধু মিলে আলোচনা করছিলাম যুদ্ধপিষ্ট মনকে এইবার অন্তত কয়েক দিনের জন্যে শহরের বাইরে নিয়ে ছেড়ে দেওয়া দরকার। এত দিন কথায় কথায় গর্তে প্রবেশ ক'রে ক'রে প্রাণ হাঁপিয়ে উঠেছে, নিয়ন্ত্রিত অন্নবস্ত্রে, নিয়ন্ত্রিত চলাফেরায়, কয়েদীর মতো জীবন কাটানো গেছে, এবারে মুক্তিদিবস পালন করা দরকার।

মাসতিনেক ধরে আলোচনা করা গেল কোথায় যাওয়া যায়। পৃথিবীর ম্যাপ খুলে ভাল ভাল জায়গা চিহ্নিত করেছি তিন মাস ধরে, কিন্তু কোনো সিদ্ধান্ত হয় না। অবশেষে ম্যাপখানা যখন ক্ষতবিক্ষত হয়ে এল, কোনো জায়গার নাম আর স্পষ্ট পড়া যায় না, তখন ঠিক হ'ল হাজারিবাগ যেতে হবে। যুক্তিগুলো ছিল সবই হাজারিবাগের অনুকূলে। কিন্তু সে সব যুক্তির স্বরূপ প্রকাশ করবার আগে আমি এই ভ্রমণ-কাহিনী আদৌ লিখছি কেন তার অনুকূলে কিছু যুক্তি দেওয়া প্রয়োজন। কারণ সর্বজনপরিচিত স্থানের ভৌগোলিক বিবরণেও অভিনবত্ব থাকবার কথা নয়, অতি পরিচিত পথ-যাত্রাতেও অভিনবত্ব কিছু নেই। কিন্তু আমরা যারা একসঙ্গে এই অতি সাধারণ ভ্রমণ সাঙ্গ করেছি, সেই আমরা বিহারের মাটি-জল-হাওয়া-অরণ্য-পথ-প্রান্তরের সঙ্গে মিশে যদি একটি গল্প রচনা করি, তা হলে তা হবে নিতান্তই আমার নিজস্ব নিবেদন, যা কোনো টাইম-টেবল, গাইড-বুক বা ইতিহাসে পাওয়া যাবে না। সুতরাং এটাকে ভ্রমণকাহিনী হিসাবে না দেখে শুধু কাহিনী হিসাবে দেখলে এর মধ্যে অসঙ্গতিও হয় তো কিছু পাওয়া যাবে না।

এই কাহিনীর উপকরণ যোগাচ্ছেন আমার সঙ্গীরা। সুবিধার জন্যে তাঁদের নামমাত্র উল্লেখ করছি, এবং এ কাহিনীতে তাঁরা ব্যক্তিগত ভাবে দেখা দেবেন না, দেখা দেবেন নৈর্ব্যক্তিক চরিত্ররূপে। তা ছাড়া রাম, শ্যাম, যদু, মধু, নামও তো মানুষেরই নাম।

হাজারিবাগ যাওয়া স্থির করলাম তার প্রধান কারণ স্থানটি ইউরোপের মতো বহু দূরে নয়। দ্বিতীয়ত সেখানে র‍্যাশন-প্রথা নেই। তৃতীয়ত হাজারিবাগ রোড স্টেশনের প্রায়-সংলগ্ন একটি দখল-উপযোগী খালি বাড়ি আছে, এবং সে বাড়ির কলকাতা-বাসী মালিক শ্রীযুক্ত বিশ্বাসের কাছ থেকে সুধাংশুপ্রকাশ ইচ্ছে করলেই চাবি চেয়ে নিতে পারেন। আরও আকর্ষণ ছিল। আমাদের সঙ্গী রবির বাড়ি ছিল হাজারিবাগ শহরে —আমারও নিমন্ত্রণ ছিল দ্বিজেনবাবুর বাড়িতে, সুতরাং শহরে গেলেও নিরাশ্রয় হব না এ কল্পনাটি ভাল লাগল।

রোড স্টেশনের খালি বাড়িতে গিয়ে নিজেদেরই রান্না ক'রে খেতে হবে এই হ'ল ব্যবস্থা। কিন্তু যুদ্ধোত্তর পৃথিবীতে প্রাচুর্যের প্লাবন বয়ে যাবে, চার্চিলের যুদ্ধকালীন এই ভবিষ্যদ্বাণী সত্ত্বেও হাজারিবাগের মতো জায়গায় গিয়ে হঠাৎ যদি চাল ডাল না পাই এই আশঙ্কায় সুধাংশুপ্রকাশ নির্দেশ দিলেন সঙ্গে অন্তত এক দিনের মতো চাল ডাল ও চিনি নিয়ে যেতে হবে। যাবার তারিখ ঠিক করা হ'ল ১২ এপ্রিল শুক্রবার। সুধাংশু-প্রকাশ রেল-কম্পানির লোকদের কাছ থেকে সন্ধান নিয়ে জেনেছেন শুক্রবার দিন বোম্বে মেলে ভিড় কিছু কম থাকে। তার কারণ শুক্রবার দিন মাড়োয়ারী সম্প্রদায় নাকি স্থানান্তরে প্রায় যান না।

রাত আটটায় সুধাংশুপ্রকাশ এক কীটনে চেপে আমাদের বাড়ির সম্মুখে এসে হাজির হলেন। আমি ব্যাগ বিছানা নিয়ে বেরিয়ে এসে দেখি সে এক মহাকাণ্ড! সুটকেস্ আর তাঁর বিছানার বাণ্ডিলে ইতিমধ্যেই সে গাড়িতে স্থানাভাব ঘটেছে। কোনো রকমে সব ঠেলেঠুলে একটুখানি জায়গা করা গেল। আমার বিছানা ব্যাগ উটের পিঠের শেষ বোঝার মতো সসঙ্কোচে চাপানো গেল সেই উচ্চপৃষ্ঠাকার বোঝার উপর।

জিজ্ঞাসা করলাম, "এ সমস্ত কি ?"

সুধাংশুপ্রকাশ গম্ভীর সুরে বললেন; "র‍্যাশন, বাসন এবং বসন।"

জিজ্ঞাসা করলাম, "কত দিনের ?"

সুধাংশুপ্রকাশ বললেন, "যথাস্থানে গিয়ে দেখো।"

ট্রেনের মধ্যে ভিড় মোটামুটি ভালই হ'ল, কিন্তু তখনও অসহ্য নয়। আমি এবং রবি দু'বিছানা এক করে তাতে বসলাম। কিরণকুমার এবং সুধাংশু পৃথক বিছানা ক'রে দু'খানি বেঞ্চি দখল করলেন। বিছানা বিছিয়ে নেবার মতো অবস্থা তখনও ছিল। কিন্তু যতই সময় যাচ্ছে ততই ভিড় বাড়ছে, এবং পৌনে দশটায় আমাদের দু'জনের এক বিছানা আধ-বিছানায়, এবং দশটায় সেই আধ-বিছানা সিকি-বিছানায় পরিণত ক'রে দু'জনে অত্যন্ত সঙ্কুচিত ভাবে এক পাশে চাপা পড়লাম। সুধাংশু এবং কিরণকুমার গাড়িতে উঠেই শুয়ে পড়েছিলেন এবং ভান করতে করতে সত্যিই ঘুমিয়ে পড়ে-ছিলেন। যাত্রীরা আশ্চর্য রকমের ভদ্র মনে হ'ল, তাঁরা নিজেরা তাঁদের মালপত্রের উপর বসে রইলেন, অনেকে

দাঁড়িয়ে রইলেন, অনেকে দুরন্ত দুটি যাত্রীর পাশ দিয়ে গায় ঘেঁষে বসে গেলেন, তবু এঁদের উঠিয়ে দিলেন না।

যুদ্ধের শেষ তিন বছরের মধ্যে কখনও ট্রেনে চড়বার সুযোগ হয় নি, শুনেছিলাম ট্রেনে ওঠা যায় না। এতদিন পরে যুদ্ধোত্তর ভিড় দেখলাম। অবস্থা এর চেয়ে তখন কত খারাপ ছিল কল্পনা করা শক্ত হ'ল। প্রতিদিনের জীবনযাত্রায়, পথে ঘাটে, ট্রামে বাসে ট্রেনে, সর্বত্র চরমতম দুর্দশা ভোগ আমাদের জাতিগত শিক্ষা, শুধু আমরা এর প্রতিকার-চেষ্টার অসুবিধাটুকু ভোগ করতে চাই না।

গাড়ি ছুটে চলেছে যোগ্যে মেলোচিত বেগে। আধ ঘণ্টা আন্দাজ পরে সুধাংশুর ঘুম ভেঙে গেল। তিনি চোখ বোজা অবস্থাতেই নিজের কৃতিত্ব স্মরণ ক'রে বেশ গর্বের সঙ্গে আমাকে ডেকে বললেন, "বলেছিলাম না, শুক্রবারে ভিড় কম হয়?" বলে আবার ঘুমিয়ে পড়লেন। শাস্ত্রে একেই বোধ হয় বলে মোহ। আমি তাঁর মোহভঙ্গের চেষ্টা করলাম না।

রবি এবং আমি পাশাপাশি। আমরা দুজনেই ক্ষীণকায়। যাত্রীর চাপে আমাদের উভয়ের দেহাস্থি পরস্পরকে বিঁধতে লাগল, এবং ট্রেনের ঝাঁকানিতে মনে হ'ল যেন তা থেকে খট্ খট্ শব্দ হচ্ছে। কিন্তু তবু আমরা চেষ্টা করছি যাতে ঘুমের ভিতর দিয়ে এই অবস্থাটি উত্তীর্ণ হয়ে যেতে পারি। আমার ব্যাগের মধ্যে ছিল আমার ক্যামেরা, সেটাকে কোলের উপর চেপে রেখে ঘুমানোর চেষ্টা করলাম বসে বসেই। সাফল্যও কিছু লাভ হ'ল। এইভাবে মাঝে মাঝে ঘুমোচ্ছি, মাঝে মাঝে জাগছি। গাড়ি বর্ধমান ছাড়বার সময় মনে হ'ল এইবার দম বন্ধ হয়ে মারা যাব। একখানি গাড়িতে এত ভিড় সত্যই অসহ্য। কিন্তু নিত্য যাদের গাড়ি চড়া অভ্যাস, তারা এই অবস্থাকে অত্যন্ত স্বাভাবিক ভাবেই নিতে পারে ব'লে মনে হ'ল। যেখানে এক ইঞ্চি সরা অসম্ভব ব'লে মনে হচ্ছিল সেখানে ভিড়-অভ্যস্ত যাত্রীর চলাফেরার কৌশল দেখে বিস্মিত হলাম। ঘটনাস্থল আসানসোল। সেখানে ফেরিওয়ালাদের একজন 'কেলা' 'কেলা' ক'রে চীৎকার করতেই তার চতুর্গুণ বেশি তীব্রস্বরে হঠাৎ আমার পায়ের নীচে থেকে কে 'কেলা' 'কেলা' ক'রে চেঁচিয়ে উঠল। চেয়ে দেখি একটি মাথা বেরিয়ে আসছে বেঞ্চির নীচে থেকে। মাথাকে অনুসরণ ক'রে একটি দেহ বেরিয়ে আসতে লাগল কচ্ছপের ভঙ্গীতে। কি আশ্চর্য কৌশলে ভদ্রলোক বেঞ্চির নীচে প্রবেশ ক'রে এতক্ষণ ঘুমোচ্ছিলেন তা দেখি নি। তিনি বেরিয়ে এলেন আর এক যাত্রীর পিঠের উপর দিয়ে। উঠে দাঁড়ালেন একজনের পায়ের উপর। তাঁর দ্বিতীয় পদক্ষেপ হ'ল আর একজনের পিঠের উপর। তারপর বাংকের শিকল ধ'রে ঝুলতে ঝুলতে শূন্য পথে তিন জন যাত্রীর মাথা ডিঙিয়ে দুখানা পা নামালেন এক জনের ঘাড়ে। সেখান থেকে দরজা ধ'রে, দরজার পাশে দাঁড়ানো যাত্রীদের মধ্যে গিয়ে দাঁড়ালেন।

কলাওয়ালা দাঁড়িয়ে ছিল, তাকে জিজ্ঞাসা করলেন, "জোড়া কত?"

"জোড়া চার পয়সা।"

কলা হাতে নিয়ে ভদ্রলোক কিছুক্ষণ পরীক্ষা ক'রে বললেন, "এই কলা চার পয়সা? দু পয়সা হবে?"

কলাওয়ালা কোনো কথা না বলে কলা ফিরিয়ে নিয়ে আবার 'কেলা' ধ্বনি তুলে এগিয়ে যেতে লাগল। ভদ্রলোকটিও পূর্বভঙ্গীর সবগুলো অনুকরণ ক'রে ফিরে এলেন যথাস্থানে এবং বেঞ্চির নীচে অদৃশ্য হয়ে গেলেন। একটা গণ্ডগোলের অপেক্ষা করছিলাম, কিন্তু দেখলাম কোনো যাত্রীই ভদ্রলোককে কিছু বললেন না।

আমরা ভোর পাঁচটায় হাজারিবাগ রোডে এসে পৌঁছলাম। ট্রেনের মধ্যে আমরা দেখেছি বাঙালী যাত্রীরা অধিকাংশই হিন্দি বলায় বেশ অভ্যস্ত। কিন্তু ভাল হিন্দি জানি বা না জানি, আমরা বাংলাদেশের মধ্যে থেকেও যে কোনো উপলক্ষ্যে হিন্দি বলবার চেষ্টা করি, বাইরে এলে তো কথাই নেই। সেটা হিন্দি হয় কিনা তা অবশ্য ভাষাভিজ্ঞ বলতে পারেন, কিন্তু সেটা বাংলা নয় ব'লে আমরা তাকেই হিন্দি ব'লে জানি। বাঙালী উড়িষ্যায় গিয়ে ওড়িয়াদের সঙ্গেও হিন্দি বলতে চেষ্টা করে, দার্জিলিঙের পথে বাঙালীর সঙ্গেও বাঙালী হিন্দি বলতে চেষ্টা করেছে দেখেছি। সুতরাং হাজারিবাগে এসে এখানকার লোকদের সঙ্গে আমরা যে বাংলা বলব না এ এক রকম নিশ্চিত। রবি কিরণকুমারকে আগে থাকতেই সাবধান ক'রে দিলেন এই ব'লে যে যদি তাঁকে হিন্দি বলতেই হয় তা হলে তাঁর নিজস্ব হিন্দিকে একটু পরিবর্তন করা দরকার হবে। কারণ তাঁর মুখে ইতিপূর্বে দু-একবার আমরা হিন্দি শুনেছিলাম।

কিন্তু হাজারিবাগে এসে আমরা সবাই এ বিষয়ে জব্দ হয়ে গেলাম।

যে বাড়িতে এসে উঠলাম, সে বাড়ির রক্ষক বুধনকে আগে থাকতেই চিঠি দেওয়া ছিল। ভোরবেলা আমরা সেখানে পৌঁছে বুধনকে ডাকতে লাগলাম। ডাক শুনে বেরিয়ে এল তার দশ-বারো বছরের একটি ছেলে এবং তার মতোই আরও দুটি ছেলে। রাত্রে এরাই বাড়ি পাহারা দেয়। বুধনের ছেলে আমাদের হাতে ঘরের চাবি দিল, আমরা গৃহ প্রবেশ করলাম। এদের সঙ্গে হিন্দি বলতে গিয়েই আমরা প্রথম নিরাশ হই। আমাদের কথার উত্তরে তারা প্রত্যেকেই পরিষ্কার বাংলায় সব বলতে লাগল—একেবারে বাঙালী ছেলের মত। অথচ তারা সবাই বিহারী এবং হাজারিবাগের বাসিন্দা। এর পর থেকে কোথায়ও আর হিন্দি বলবার সুযোগ আমাদের হয় নি।

কিছুক্ষণ বিশ্রাম ক'রে আমরা চা খেয়ে এলাম স্টেশনের স্টল থেকে। তার পর রান্নার আয়োজন। সুধাংশুপ্রকাশ

তাঁর ভাণ্ডার উন্মুক্ত করলেন। চাল ডাল আলু পেঁয়াজ ডিম রুটি মাখন নানাবিধ মশলা তেল নুন লঙ্কা থালা বাটি গেলাস কেটলি চা চিনি জ্যাম জেলি বিস্কুট একে একে বেরোতে লাগল তাঁর সুটকেস্ আর বিছানার বাণ্ডিল থেকে। পর পর জিনিস-গুলো সাজিয়ে রাখতে অর্ধেক-ঘরের জায়গা লাগল। সুটকেস্‌টি যেন গণপতির ম্যাজিক বক্স। তা থেকে সর্বশেষ নিষ্কাশিত হ'ল প্রকাণ্ড একখানা ছুরি।

রান্নার জন্যে বাদবাকী সব জোগাড়ের ভার ছেলে ছুটির ঘাড়ে চাপিয়ে আমরা বেড়াতে বেরুব পরামর্শ করতে লাগলাম। বাড়িটি স্টেশনের বিপরীত দিকে—কিন্তু মাঝখানে পাহাড়ের মতো রেললাইন বরাবর উঁচু ঢিবি থাকাতে স্টেশনটি এখান থেকে দেখা যায় না। সুতরাং ঐ ঘেরা জায়গাটিতে অস্বস্তি বোধ হওয়ায় তাড়াতাড়ি বেরিয়ে পড়লাম। গ্রীষ্মকাল হওয়া সত্ত্বেও এখানে বেশ শীত করছিল, পথের দুধারের ঘাস শিশিরে ভেজা, বেশ ঠাণ্ডা হাওয়া বইছে। বাড়ির পিছন দিকে মুখনের বাড়ি। সেখান থেকে খোলা মাঠের দৃশ্য অতি চমৎকার। সেই দিকে চাষের জমির আলের উপর দিয়ে দিয়ে যেতে বেশ লাগছিল।

চাষের কাজ (হাজারিবাগ)

ঘণ্টাখানেক বেড়িয়ে বাড়ি ফিরে এলাম। কিন্তু এই বেড়ানোর ফল হ'ল অতি বিস্ময়কর। প্রত্যেকেই ক্ষিদের কাতর হয়ে পড়েছি এরই মধ্যে। বিনাবাক্যব্যয়ে রুটি মাখন ইত্যাদি একেবারে মধ্যাহ্ন ভোজনের মতো পেটভরে খেয়ে তবে কিছু শান্ত হলাম।

জায়গার গুণে খিদে বাড়ে এটা প্রচলিত কথা। কিন্তু জায়গার গুণ এত অল্প সময়ের মধ্যে মানুষের পাকস্থলীতে এমন উগ্রভাবে প্রকট হয় কি ক'রে তা ভেবে দেখবার মতো। একটা ইনকিউবেশন পীরিয়ডও তো থাকা দরকার। আমার মনে হয়, শুধু জায়গার গুণ বললে অর্ধেক সত্য বলা হয়। কারণ, নতুন পরিবেশে প্রতিদিনের অত্যন্ত একঘেয়ে জীবনের বাইরে এলে নতুনকে গ্রহণ করবার জন্যে ক্ষুধাতুর মন অত্যন্ত সক্রিয় হয়ে ওঠে, এবং তারই ফলে যেমন দুইই সম্পূর্ণ বদলে যায়, দুইয়েরই স্বাস্থ্য ফিরে আসে—এবং একটু বেশি পরিমাণেই আসে নতুনত্বের প্রথম ঝোঁকে। নইলে চারজন শহরবাসী পরিমিত-ভোজী ব্যক্তি তাদের এক 'দিনের' পুরো র‍্যাশন একবেলায় একেবারে কণাহীনভাবে নিঃশেষ ক'রে ফেলল কি ক'রে? এরই ফলে নতুন জায়গার নৈসর্গিক, ঐতিহাসিক এবং সাংস্কৃতিক পরিচয় গ্রহণের কথা সম্পূর্ণ বিস্মৃত হয়ে আমাদের চার জনের মনে সমস্বরে যে] ঐকতান বেজে উঠল তার স্বতঃস্ফূর্ত আবেগকে ধ্বনিত ও বিস্তারিত হতে দেখা গেল একই দিকে—হাজারিবাগ রোডের চালের আড়তের দিকে।

ভাগ্য প্রসন্ন হয়ে উঠল। আমরা এসেছি এ খবর যাদের জানবার তারা কি ক'রে জেনে ফেলেছে। কাঠওয়ালী এল কাঠ বেচতে, তরকারিওয়ালী এল তরকারি বেচতে—ঘরে বসে সব মিলতে লাগল এবং আমরা রাত্রের জন্যে সমস্ত ব্যবস্থাই পাকা করে ফেললাম যা-কিছু দরকার সব কিনে। ভাবনা রইল মাছের, কিন্তু মাছও এসে গেল বাড়ির উপরেই। রুইমাছ দেখে কিরণকুমার উচ্ছ্বসিত ভাবে প্রশ্ন করলেন "সের কেত্‌না কর্কে?" মাছওয়ালা জবাব দিল, আজ্ঞে একটি মাছ আছে, দু'সের হবে, আড়াই টাকা লাগবো। পরিষ্কার বাংলা কথা।

তার মানে মাছ-বিক্রেতা বাঙালী; গোমো থেকে এসেছে মাছ বেচতে।

কেরোসিন তেলের জন্যে দোকানে একখানি আবেদন-পত্র পাঠিয়ে দিলাম। ঐ সঙ্গে ইংরেজী বাংলা সব রকম খবরের কাগজও কিনতে পাঠানো গেল। তেল পাওয়া গেল, কিন্তু খবরের কাগজের বদলে পেলাম একখানা চিঠি। বাংলায় লেখা। বেশ বড় চিঠি। এজেন্ট লিখছেন, "আজকের কাগজ পড়া মানে কাল কলকাতায় যা পড়েছেন তাই, সুতরাং কেন অকারণ কাগজ কিনবেন।" এইটিই হ'ল সে চিঠির মূল কথা। এজেন্ট নিশ্চয় ছোকরাদের কাছে শুনেছেন যে আমরা সেই দিনই কলকাতা থেকে এসেছি। কিন্তু তাঁর যে কথাটি লেখা উচিত ছিল তা হচ্ছে এই যে কাগজ সবই ফুরিয়ে গেছে, একখানাও নেই। পরদিন অবশ্য কাগজ পাওয়া গিয়েছিল।

রান্না শেষ করতে করতে বেলা দুটো বেজে গেল। রাত্রের জন্যেও মাছ ডাল তরকারি রান্না ক'রে রাখা হ'ল। রান্না শেষে স্নান। ইঁদারার জল কনকনে ঠাণ্ডা। আমার বরাবর গরম জলে স্নান করা অভ্যাস, ঠাণ্ডা জলে স্নান করলেই সর্দি, কিন্তু এখানে গরম জলের অসুবিধা হওয়ায় অগত্যা সেই ঠাণ্ডা জলেই স্নান করতে হ'ল। ইতিমধ্যে পেটে এমন আগুন জ্বলে উঠেছে যে খেতে বসবার আগে স্বাস্থ্যবিধি চিন্তা করবার সময় ছিল না। সে এক আশ্চর্য ব্যাপার! পাঁচ মিনিটের মধ্যে এক হাঁড়ি ভাত শেষ হয়ে গেল এবং ঐ সঙ্গে রাত্রের জন্যে যা কিছু রান্না হয়েছিল তারও চিহ্নমাত্র রইল না, এবং খাওয়া শেষ করতে না করতে রাত্রের চিন্তায় ব্যাকুল হয়ে উঠলাম।

আকাশে একটু একটু ক'রে মেঘ জমছিল, বেলা চারটে আন্দাজ সময়ে জোর বৃষ্টি আরম্ভ হ'ল। বাড়ির বাইরে পাহাড়ের জন্যে দৃষ্টি অত্যন্ত সীমাবদ্ধ, আশেপাশের বাড়িগুলোতে জনমানবের চিহ্ন নেই, এমনি সময়ে রীতিমতো প্রবাস-জনোচিত মনোভাবের উদয় হয়। আবহাওয়া ছিল তার সম্পূর্ণ অনুকূল। নিজেকে সত্যই নির্বাসিত মনে হচ্ছিল সে সময়। সে অনুভূতিতে বেদনা ছিল, কিন্তু আনন্দও ছিল। পাশের বাড়ির একমাত্র পেঁপেগাছগুলোর পাতা দেয়ালের উপর মাথা তুলে বৃষ্টির ছন্দে নাচাচ্ছিল—সমস্ত পার্থিব প্রকৃতির মধ্যে তখন ঐটুকুই মাত্র আমরা দেখতে পাচ্ছিলাম।

কিন্তু এমনি সময়েও একটি গভীর নৈরাশ্য একটি মাত্র বৃহৎ প্রশ্নের আকারে সবারই চিত্তকে উতলা ক'রে তুলল, সবারই মনে এক প্রশ্ন—এ বেলা খাওয়া হবে কি?

এমন সময় কোত্থেকে এক ছাগশিশু দৌড়ে এসে ঢুকে পড়ল আমাদের ঘরে। আমাদের মানসিক প্রতিক্রিয়া কি হ'ল প্রকাশ করা বাহুল্য মাত্র। কিরণকুমার এক লাফে বিছানা থেকে উঠে দরজা বন্ধ ক'রে দিলেন। এমন বৃষ্টির দিনে এই বস্তুই আমরা যেন মনে মনে প্রার্থনা করেছিলাম। মধ্য-কলকাতাবাসী রবি মধ্যাহ্ন-রবির মতো দীপ্ত হয়ে উঠলেন আনন্দের উগ্রতায়। সুধাংশুপ্রকাশ খুব বিরক্তির সঙ্গে বললেন আমি কিন্তু মশলা বাটতে পারব না, কিরণ যদি রাজি থাকে তা হলে রান্না করতে রাজি আছি। রবি বললেন, বুধনকে বললেই সে সব ক'রে দেবে—হত্যা থেকে মশলা বাটা সব।

কাজটা যে এত সহজ তা আমাদের কারও মাথায় আসেনি। তাড়াতাড়ি আরও পর্ব শেষ ক'রে ফেলবার জন্যে রবি অধীর হয়ে উঠলেন। এমন সময় বুধনের কণ্ঠস্বর।

"ছাগল বাচ্চাটা গেল কোথায়?"

রাত বারোটায় সেদিন এক বাটি ডাল দিয়ে চার জনে এক হাঁড়ি ভাত খেয়েছিলাম, খারাপ লাগে নি কিছু।

পরদিন খুব সকালেই আবার বৃষ্টি সুরু হ'ল, সকালে আর বেড়ানোর আশা রইল না। মেঘ কাটতে কাটতে বেলা দশটা বেজে গেল। কিন্তু হাওয়া ঠাণ্ডা ছিল ব'লে অত বেলাতেও বেরিয়ে পড়লাম। প্রথমে গেলাম বাজারের দিকে। বাজারের চেহারা বৈশিষ্ট্যহীন, বিশেষ ভাল লাগছিল না, তবে ক্রমাগত ঘুরে বেড়ানোতে ক্লান্তিও ছিল না কিছু। বাজার থেকে বেরিয়ে রেল-লাইন পার হয়ে ধানোয়ার রোডের মুখে এসে খানিকটা চুপচাপ বসে থাকা গেল। সেখানে বড় বড় গাছের নীচে বিশ্রামরত কয়েকটি লোককে দেখা গেল—তারা ময়ূরের পালক বিক্রি করতে যাচ্ছে। সঙ্গে একশটি পালকের এক একটি আঁটি। দাম বলল দু'টাকা আঁটি। কলকাতায় বোধ হয় ওগুলো একশটি পনেরো বিশ টাকা। শুনলাম ধানোয়ার রোড এখানকার সবচেয়ে প্রশস্ত এবং পরিচ্ছন্ন পথ। দীর্ঘও কম নয়। কিন্তু তখন আর সে পথে যাওয়া সম্ভব ছিল না। বেলা তখন সাড়ে এগারোটা। ফিরে গিয়ে রান্না ক'রে খেতে হবে। বাজার থেকে চাল এবং ডাল আনিয়ে রাখা হয়েছিল, তরকারি বাড়ির উপরেই কেনা ছিল, মাছ আর সেদিন জুটল না। কিন্তু তাতে কোনো অসুবিধা হয় নি।

সাত-আট দিনের জন্যে বাইরে এসে আমরা সাত-আট মাসের আনন্দ ঐ অল্প দিনের মধ্যে উপভোগ করে নেবার জন্যে প্রস্তুত হলাম। প্রথমেই খাওয়া-শোওয়ার সময় সম্পূর্ণ বদলে দিয়ে মনে হতে লাগল যেন আমরা একেবারে নতুন জীবন লাভ করেছি। শুধু হাওয়া পরিবর্তন নয়, সমস্ত অভ্যাসের পরিবর্তন। দুদিনেই সমস্ত দেহে একটা সজীবতা অনুভব করতে লাগলাম—একটা নতুন শক্তি, একটা নতুন কর্মোদ্যম এবং উৎসাহ, যা এত অল্প সময়ে লাভ করা যায় কিনা জানা ছিল না।

সেই দিন বিকেলে আবার ঝড়বৃষ্টি। আকাশ পুঞ্জ পুঞ্জ

কালো মেঘে ছেয়ে গেছে। বিদ্যুৎ সমস্ত আকাশে সাপের মত খেলে বেড়াচ্ছে। ঝড় উঠে এল অতি প্রবল বেগে। এমন প্রবল ঝড় বহুদিন দেখি নি। সমস্ত আকাশ জুড়ে একটা করুণ ক্রন্দনধ্বনি—বাঁশির করুণ সুরের মত একটানা বেজে চলেছে। ঝড়ের গর্জনে, বৃষ্টির শব্দে, বিদ্যুতের আঁকাবাঁকা শিখায় মন মেতে উঠল। হাজারিবাগ রোডের সেই পাকস্থলীপীড়ক আবহাওয়া সহসা যেন সেই মুহূর্তে পার্থিব সব কিছুকে সেই ঝড়ের মুখে উড়িয়ে দিল। কিরণকুমার বহুকাল পরে চীৎকার করে রবীন্দ্রনাথের বর্ষশেষ কবিতা আবৃত্তি করতে লাগলেন।

শিবমন্দিরের নিকট-দৃশ্য (হাজারিবাগ)

রাত্রি আটটার ঝড়বৃষ্টি থেমে গেল। সুধাংশুপ্রকাশ প্রস্তাব করলেন এইবার একটা নতুন পথে বেড়ানো যাক। খানোয়ার রোড নয়—অন্য একটা পথ এবং সেই পথে একটি নদীতে গিয়ে পৌঁছান যায়। আকাশে ভাঙা মেঘের ফাঁকে ফাঁকে চাঁদ দেখা দিচ্ছে—পথে কিছু কিছু জল জমেছিল—কিন্তু সে অতি সামান্য। আমরা স্টেশনের ওভারব্রিজের কাছ থেকে সোজা পূব দিকে রওনা হলাম। দু'মিনিটের মধ্যে হঠাৎ যেন একটা নতুন রাজ্য আবিষ্কৃত হ'ল সেই পুরানো জায়গায়। এমন অপূর্ব সুন্দর পথ থাকতে আমরা দিনের বেলা বৃথা ঘুরেছি বাজারের দিকে। পথের দুধারে বাড়িগুলো ছবির মত সাজানো। চাঁদের আলোয় বাড়ির গায়ে লেখা নামগুলো পড়া যাচ্ছিল, সমস্তই বাংলায় লেখা, বাঙালীদের বাড়ি। প্রায় প্রত্যেক বাড়িতেই লতাকুঞ্জ, ফুলের গাছ এবং দীর্ঘ ইউক্যালিপটাস গাছের সারি, সেই ঝাপসা চন্দ্রালোকে অপরূপ মনে হচ্ছিল। এই দূর দেশে এত বড় একটা বাংলা পথে চলতে মন পুলকিত হয়ে উঠল।

পথের শেষে একটি বাঁক ঘুরেই উন্মুক্ত প্রান্তরে গিয়ে পড়লাম। উঁচুনীচু জমি। পথের ধারেই গভীর খাল, বর্ষার স্রোত বয়ে যায় তার ভিতর দিয়ে। বহু দূর বিস্তৃত প্রান্তর, ঘন জঙ্গলপূর্ণ। যে পথে চলছিলাম সে পথটি বেশ প্রশস্ত, গোরুর গাড়ির চাকার চাপে গর্ত হয়ে তাতে জল জমেছে। রাত্রি নটা, পথ সম্পূর্ণ জনশূন্য। যত এগিয়ে চলেছি ছোট ছোট শালগাছের ভিতর দিয়ে, ততই যেন জঙ্গলের গভীরতা বাড়ছে। আবৃছা চাঁদের আলোয় সমস্ত জগৎ স্বপ্নাচ্ছন্ন। আমরা অবিরাম এগিয়ে চলেছি, কিন্তু পথের শেষ কোথায়? কিন্তু শেষ না থাক আমরা চলা থামাব না, আমাদের মন সেই স্বপ্নে ডুবে গেছে, আমরা যেন ঘুমন্ত অবস্থায় হেঁটে চলেছি জনহীন অরণ্যপথে।

রবি বললেন, "এই দিকটায় খুব বাঘ চলাফেরা করে সেই জন্যে এ সময়ে এ পথে কেউ চলে না।"

হঠাৎ স্বপ্ন ভেঙে গেল। চাঁদের আলো দ্রুত মলিন হয়ে এল আমাদের চোখে। বিনা বাক্যব্যয়ে উল্টো দিকে ফিরলাম। কিন্তু এ পথের মায়া মনকে অধিকার করেই রইল সর্বক্ষণ এবং পরদিনই বিকেলে আবার রওনা হলাম সেদিকে। সোনাসুত বা স্বর্ণসূত্র নদী আমাদের লক্ষ্যস্থল হ'ল। পূর্বদিন জ্যোৎস্নায় আলোয় পথের ধারে বাড়িগুলোর যে সৌন্দর্য দেখেছিলাম, দিনের আলোয় আর তা তেমন অপূর্ব সুন্দর মনে হ'ল না। সৌন্দর্যের অনির্বচনীয়তা স্পষ্ট প্রত্যক্ষবস্তুতে প্রায় থাকে না। সব বস্তুরই অবশ্য একটা নিজস্ব সৌন্দর্য আছে কিন্তু সৌন্দর্যসৃষ্টিতে বস্তু যেখানে মনের উপকরণমাত্র, তার বিশুদ্ধ উপকরণরূপের মধ্যে মনোহারিত্ব লুপ্ত হয়ে যাবার সম্ভাবনাই বেশি।

আমরা এই পথের শেষে একটি বাঁক ঘুরে যখন অরণ্যপথে গিয়ে পড়লাম সে আর এক অভিজ্ঞতা।

উঁচু নীচু জমির উপর দিয়ে, ছোট ছোট শালগাছের মধ্যে দিয়ে, সম্পূর্ণ ফাঁকা জায়গায় এসে উঠলাম। বহু দূর সমতল ভূমি, প্রকাণ্ড পথ। পথের পাশে জোড়া অশ্বত্থ গাছ। পথের ডান দিকে যে অরণ্য ছিল একটু দূরে, ক্রমেই তা কাছে এসে পড়ল, এবং আমরা বড় রাস্তা ছেড়ে ধীরে ধীরে ঘন অরণ্যে প্রবেশ করলাম। সে পথও বেশ পরিচ্ছন্ন। দুধারের ঝোপও খুব নিবিড় নয়, পথের দুধারে ছোট ছোট কুলজাতীয় কাঁটা গাছ। প্রকাণ্ড যে পথটি আমরা ছেড়ে এলাম সে পথ দূর দিগন্তে গিয়ে মিশেছে। সে পথের শেষে দিগন্ত-বলয় ঘিরে সবুজের সমুদ্র। দূরে ছোট ছোট পাহাড়। কোথাও লোকালয়ের চিহ্ন দেখা যায় না। যদি সেই জনহীন শব্দহীন স্থানে বসে কেউ কল্পনা করে সে লক্ষ বছর পূর্বের পৃথিবীতে ফিরে গেছে তা হলে তা অসম্ভব মনে হবে না। কালের চিহ্নহীন প্রকৃতির উদার বুকে এই সীমাহীন মুক্তি মনকে অভিভূত না করে পারে না। বিশ্ব কি বিরাট, আর তার বুকে মানুষ কত ছোট, কত অসহায়, এই বিস্মৃত সত্য এমনি অবস্থায় হঠাৎ অত্যন্ত স্পষ্ট হয়ে ওঠে। এটা খুবই স্বাভাবিক, কারণ শহরে থেকে আমরা প্রতি মুহূর্তে চার দিক দেখে শুনে হিসেব করে এক এক ধাপ এগিয়ে চলি, একটু অন্যমনস্ক হবার উপায় নেই, প্রতি পদে ধাক্কা সামলে চলতে হয়, এবং এই নিয়ন্ত্রিত চলাই আমাদের প্রকৃতিগত। কিন্তু এখানে কোনো বিধিনিষেধ নেই, পথে শুয়ে থাক, ঘুমিয়ে থাক, অথবা ছুটোছুটি করে বেড়াও কেউ ঘণ্টা বাজাবে না; কোথাও কোনো নোটিস্ নেই—একেবারে দিগন্তবিস্তৃত স্বাধীনতা। এ রকম অবস্থা হঠাৎ কল্পনা করাই কঠিন। বিশ্বপ্রকৃতির এমন উদার রূপ সমস্ত সত্তা দিয়ে ঠিক এমনভাবে আর কখনও উপলব্ধি করি নি, শালবনের এমন নিঃসঙ্গ নির্জনতার মধ্যেও আর কখনও প্রবেশ করি নি।

সূর্য প্রায় অস্তগামী, সমস্ত পরিমণ্ডলে এক অনির্বচনীয় প্রশান্তি। আমরা সবাই নীরবে এগিয়ে চলেছি বর্ণহীন নদীর দিকে। নদীটি এ সময়ে একটি ক্ষীণকায় ধারামাত্র। বর্ষায় এর যতখানি বিস্তার হয় ততখানির জন্যে বিছানা পাতা আছে। নদীপথ-রেখা শালবনের বুক চিরে এঁকেবেঁকে দৃষ্টির আড়ালে চলে গেছে। ক্যামেরাটি সঙ্গে ছিল বটে, কিন্তু অরণ্যের এই অনুভূতিসাপেক্ষ সৌন্দর্যে ছবি নেবার মতো দুঃসাহস তার হয় নি। অরণ্যে প্রথম প্রবেশ-পথেই একখানি ছবি নিয়ে-ছিলাম।

কিছুক্ষণ চুপচাপ বসে থেকে সন্ধ্যার মুখে উঠলাম সেখান থেকে। বেরিয়ে এসে খোলাপথের ধারে একটু না বসে পারা গেল না। সৌন্দর্যের অতিভোজে মন আমাদের অবসন্ন। সে অবস্থায় শহরে ফিরে যেতে ইচ্ছা হচ্ছিল না। আমরা একেবারে শুয়ে পড়লাম সেখানে।

কাঠবোঝাই গোরুর গাড়িগুলো সমস্ত দিনের শেষে ঘরে ফিরছে। চাকা ঘোরার সঙ্গে এক রকম তীক্ষ্ণ করুণ একটানা শব্দ হচ্ছে তা থেকে। মজুরের দল কাঠকাটার কাজ শেষ করে দূর অরণ্য থেকে ফিরছে দলে দলে। এদের ঝাপসা মূর্তি আকাশের বুকে আঁকা হচ্ছে একের পর এক। মেঘের বাধা কাটিয়ে চাঁদও দৃশ্যমান হয়ে এল।

ঘণ্টাখানেক বিশ্রাম করলাম এখানে শুয়ে। দূরে বিলীয়-মান গোরুর গাড়ির চাকার শব্দ তখনও কানে আসছে। মজুরেরা তখনও ঘরে ফিরছে সে পথে। তাদের কোলাহল, গাড়ির চাকার করুণ শব্দ, এখানকার জল-মাটি-আলো-হাওয়ার সঙ্গে একসুরে বাঁধা। আমরা এখানে বেসুরো। আমাদের শহরে পোষাক যেন এখানকার সহজ সুরের তাল কেটে দিচ্ছে।

এই উপলব্ধি সেদিনকার সত্য উপলব্ধি।
এখানকার বাঘের ভয়ও অত্যন্ত সত্য।

(আগামীবারে শেষ পর্ব)

কান পেতে শুনি

শ্রীহিরন্ময় তরফদার

পার্থের ঘুম এখনো কি ভাঙে নাই ?
কৃষ্ণার বেণী ধুলায় লুটায়ে রবে।
'নিজবাসভূমে পরবাসী' দাস হ'য়ে,
দাবির অন্ন আজো খুঁটে খেতে হবে ?

ভুলের ফসল অনেক হয়েছে বোনা ;
লাভের কোঠায় শূন্য পড়েছে বাকি।
ফাঁকির ফাঁকেতে ইঁদুরে লুটিল সোনা—
কুরুকুল সাথে এখনো আপোষ নাকি ?

পাশায় চালেতে রাজনীতি চালে যারা :
এখনো করুণা গলিছে তাদের তরে ?
চল্লিশ কোটি দধিচীর কঙ্কালে
দেখো নি বজ্র কি জ্বালায় জ্বলে মরে ?

জ্বলুক, জ্বলুক ; আরো হোক দাউ দাউ—
ধর্ম্য সাগর আজি হবে থৈ-থৈ !
কান পেতে শুনি জোয়ারের কোলাহল :
কুরুক্ষেত্র অদূরে ডাকার ওই।।

তারকনাথ গঙ্গোপাধ্যায়

১৮৪৩-১৮৯১

শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

১৮৪৩ খ্রীষ্টাব্দের ৩১এ অক্টোবর (১৬ কার্ত্তিক ১২৫০) তারিখে নদীয়া জেলার অন্তর্গত (বর্ত্তমান যশোহর জেলার বনগ্রাম মহকুমার অধীন) বাগআঁচড়া গ্রামে এক প্রাচীন সম্ভ্রান্ত পরিবারে তারকনাথের জন্ম হয়। তাঁহার পিতার নাম মহানন্দ গঙ্গোপাধ্যায়।

শিক্ষা; বিবাহ

ছয় বৎসর বয়সে গ্রামস্থ পাঠশালায় তারকনাথের হাতে-খড়ি হয়। ইহার দুই বৎসর পরে তিনি মাতৃহীন হন, কিন্তু মাতার অভাব তাঁহার জেঠাইমা-ই পূরণ করিয়াছিলেন। তারকনাথ পাঠশালার পাঠ সাঙ্গ করিয়া দশ বৎসর বয়সে ইংরেজী লেখাপড়া শিখিবার জন্ত কলিকাতায় আগমন করেন। তিনি জ্যেষ্ঠতাত-পুত্র অম্বিকাচরণের ভবানীপুরের বাসায় থাকিয়া স্থানীয় লণ্ডন মিশনরী সোসাইটির স্কুলে প্রবিষ্ট হন।

ছাত্রাবস্থায় ১৪ বৎসর বয়সে তারকনাথের বিবাহ হইয়াছিল। পাত্রী—নিস্তারিণী দেবী, ২৪-পরগণার চৌড়া-নিবাসী রাজনারায়ণ চক্রবর্ত্তী নামে এক দরিদ্র পূজারী ব্রাহ্মণের কন্তা।

১৮৬৩ খ্রীষ্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে তারকনাথ লণ্ডন মিশনরী সোসাইটির স্কুল হইতে এনট্রান্স পরীক্ষা দেন। তিনি পরীক্ষায় প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হইয়া চৌদ্দ টাকা জুনিয়র বৃত্তি লাভ করিয়াছিলেন।*

১৮৬৪ খ্রীষ্টাব্দে তারকনাথ পিতার ইচ্ছানুক্রমে ডাক্তারি শিখিবার জন্ত মেডিক্যাল কলেজে প্রবেশ করেন। মেডিক্যাল কলেজে তখন দুইটি বিভাগ ছিল; একটি বাংলা-বিভাগ, অপরটি ইংরেজী-বিভাগ। প্রবেশিকা-পরীক্ষোত্তীর্ণ ছাত্রেরা ইংরেজী-বিভাগে প্রবেশাধিকার পাইত। তারকনাথ বৃত্তিধারী ছাত্র ছিলেন বলিয়া বিনা-বেতনে পড়িবার অধিকার পাইয়াছিলেন। অক্ষয়চন্দ্র সরকার বলিয়াছেন,—

"আমি ও তারকবাবু যৌবনে কলিকাতা হিন্দু হোষ্টেলে থাকিতাম। আমি প্রেসিডেন্সি কলেজে আইন পড়িতাম, তারকবাবু মেডিক্যাল কলেজে ডাক্তারি পড়িতেন। তারকবাবুকে মেডিক্যাল কলেজের পাঠ্য পুস্তক পড়িতে অতি অল্প সময়ই দেখিতাম। তিনি অধিকাংশ সময়েই হয় ডিকেন্সের কোন উপন্তাস, না হয় মেকলে কিম্বা গিবনের ইতিহাস পড়িতেছেন। তাঁহার অসাধারণ জ্ঞান-তৃষ্ণা ছিল। এজন্ত আমরা অনেক সময়
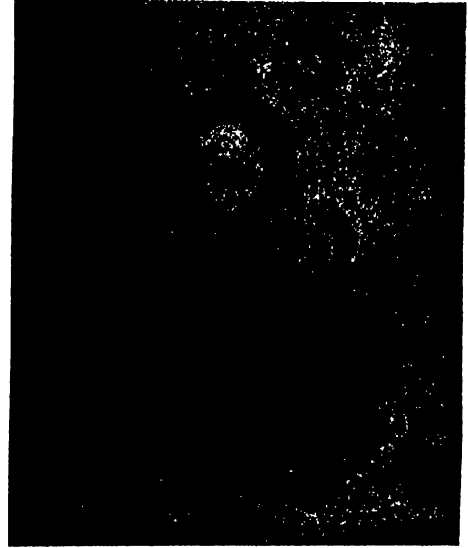
ডাঃ তারকনাথ গঙ্গোপাধ্যায়

বিদ্রূপ করিতাম, আমাদের বন্ধুদের মধ্যে রাসবিহারী (স্যর রাসবিহারী ঘোষ) তারকবাবুকে বলিতেন, তুমি ডাক্তার হবে, তোমার ইতিহাস ও সাহিত্য পড়ার দরকার কি? তারকবাবু বলিতেন, সকল বিষয়ে জ্ঞান থাকা ভাল। এই কথা শুনিয়া রাসবিহারী ঠাট্টা করিয়া বলিয়াছিলেন, তুমি বামুনের ছেলে তোমাদের কাজ হচ্ছে তিনটি—উনুনে ফুঁ, কানে ফুঁ ও শাঁকে ফুঁ।"*

পাঁচ বৎসর পরে ১৮৬৯ খ্রীষ্টাব্দে তারকনাথ পরীক্ষায় দ্বিতীয় বিভাগে উত্তীর্ণ হইয়া এল্. এম্. এস্. উপাধি লাভ করেন।

সরকারী চাকুরী

ডাক্তারী পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইবার পর তারকনাথ ১৮৬৯ খ্রীষ্টাব্দের ৬ই জুলাই তারিখে অতিরিক্ত অ্যাসিষ্টাণ্ট সার্জ্জন-রূপে সরকারী কর্ম্মে যোগদান করেন। জীবনের শেষ দিন পর্য্যন্ত দীর্ঘ ২২ বৎসর কাল তিনি এই কর্ম্ম খ্যাতির সহিত সম্পাদন করিয়া গিয়াছেন। তিনি কোন্ পদে কোথায় কত দিন কাজ

---

* General Report on Public Instruction…for 1863-64, Appendix C.

* সুরেশচন্দ্র সমাজপতি: "তারকনাথ গঙ্গোপাধ্যায়"—'সাহিত্য', শ্রাবণ ১৩২১।

করিয়াছিলেন, সরকারী বিবরণের সাহায্যে তাহার হিসাব দিতেছি :—

স্থান	পদ	নিয়োগকাল
কলিকাতা	ইন্‌স্পেক্টর-জেনারেল অব সিবিল হস্‌পিটালের দিয়ন্ত্রণে অতিরিক্ত (Supernumerary) অ্যাসিষ্টাণ্ট সার্জন (৩য় শ্রেণী)	... ৬ জুলাই ১৮৬৯
দার্জিলিং	দার্জিলিং-কেন্দ্রের ডেপুটি সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট অব ভ্যাক্‌সিনেশন্ (অস্থায়ী)	...১৯ জুলাই ১৮৭১
ঐ	ডেপুটি সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট অব ভ্যাক্‌সিনেশন্	...৩০ অক্টোবর ১৮৭২
জলপাইগুড়ি	অ্যাসিষ্টাণ্ট সার্জন (৩য় শ্রেণী) ডিসপেনসরি	... ১৪ আগষ্ট ১৮৭৭
যশোহর	ঐ (৩য় শ্রেণী) দাতব্য ঔষধালয়	... ২৮ মে ১৮৭৮
ঐ	ঐ (২য় শ্রেণী) ঐ	... ১৩ নবেম্বর ১৮৭৯
শাহাবাদের বক্‌সার	ঐ ঐ বক্‌সার সেনট্রাল জেলের চিকিৎসক	...১৪ জানুয়ারি ১৮৮২
ঐ	ঐ (১ম শ্রেণী) ঐ	... ১৬ মে ১৮৮৭ ।*

'স্বর্ণলতা' রচনা

তারকনাথ যখন মেডিক্যাল কলেজের ছাত্র, সেই সময়ে বঙ্কিমচন্দ্রের 'দুর্গেশনন্দিনী' প্রকাশিত হয় (ইং ১৮৬৫)। 'দুর্গেশনন্দিনী' রোমান্স। বাস্তবপ্রিয় তারকনাথ রোমান্স পাঠ করিয়া তৃপ্তিলাভ করিতে পারেন নাই। তিনি লিখিয়াছেন :—

"গ্রন্থকারেরা লোকের মনের কথা টের পান এবং ইচ্ছা হইলে সকল স্থানেই গমনাগমন করিতে পারেন। নহিলে সুন্দর বকুলতলায় বসিয়া কি ভাবিতেছিলেন, ভারতচন্দ্র রায় তাহা কি প্রকারে জানিতে পারিলেন; এবং মাইকেলই বা কি প্রকারে পরলোকের বৃত্তান্ত অবগত হইলেন? এবং তদপেক্ষাও দুর্গম যে মুসলমানের অন্তঃপুর, বঙ্কিম বাবু কি প্রকারে তথায় উপস্থিত হইয়া ওসমান ও আয়েসার কথোপকথন শুনিতে পাইলেন? এ ভিন্ন গ্রন্থকারদিগের আরও একটি শক্তি আছে, অর্থাৎ ইচ্ছা হইলেই অসম্ভবকে সম্ভব করিতে পারেন। এটি বড় সাধারণ শক্তি নহে। এ শক্তি না থাকিলে অনেক গ্রন্থকার মারা যাইতেন। বিষ্ণুশর্ম্মা তো একেবারে বোবা হইতেন। কিন্তু এই শক্তিটি ছিল বলিয়াই লঘুপতনক ন্যায়শাস্ত্রের বিচার করিতেছে এবং চিত্রগ্রীব অবোধ কপোতদিগকে উপদেশ দিতেছে। এই শক্তির প্রভাবেই বঙ্কিম বাবু আড়াই শত বৎসর পূর্ব্বে এক যবনতনয়ার মুখ হইতে অনুন্নত ইউরোপীয় সুসভ্য জাতীয় কামিনীগণের ভাষা অবলীলাক্রমে নির্গত করাইয়াছেন।"
—'স্বর্ণলতা,' ২য় পরিচ্ছেদ।

বাস্তব ঘটনার উপর ভিত্তি করিয়া বাঙালী সমাজের চিত্র অঙ্কনের সঙ্কল্প এই সময়ে তারকনাথের মনে উদিত হয়। এই সঙ্কল্প তিনি অদূর ভবিষ্যতে কার্য্যে পরিণত করিয়াছিলেন।

ভ্যাক্‌সিনেশন্-সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট-রূপে তারকনাথের কার্য্য ছিল—উত্তর-বঙ্গের জেলাগুলি পর্য্যটন করিয়া অধীন কর্ম্মচারী-বর্গের কর্ম্মের তত্ত্বাবধান করা। এই উপলক্ষে তাঁহাকে নানা শ্রেণীর লোকের সহিত দেখাশুনা ও মেলামেশা করিতে হইয়াছে; তিনি লোকচরিত্র সম্বন্ধে বিচিত্র অভিজ্ঞতা অর্জ্জন করিতে পারিয়াছিলেন। তাঁহার প্রথম উদ্যম 'স্বর্ণলতা' উপন্যাস প্রধানতঃ এই অভিজ্ঞতারই ফল। কি অবস্থায় 'স্বর্ণলতা' রচিত হয়, সে-সম্বন্ধে প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় লিখিয়াছেন :—

"সরকারী কার্য্যে তাঁহাকে গ্রাম হইতে গ্রামান্তরে পর্য্যটন করিতে হইত এবং এই সময়েই স্বর্ণলতা রচিত হয়। পল্লীগ্রামে ঘোড়ার গাড়ী যোটে না, সুতরাং গোরুর গাড়ীই ভরসা। মধ্যাহ্নে পথিমধ্যে কোনও বৃক্ষচ্ছায়ায় আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছেন; কিয়দ্দূরে তাঁহার পাচক ব্রাহ্মণ সদ্য-নির্ম্মিত ইষ্টকের চুল্লীতে হাঁড়ি চাপাইয়াছে। ডাক্তার বাবু গোরুর গাড়ীর তলায় শতরঞ্চ বিছাইয়া বসিয়া স্বর্ণলতা লিখিতেছেন। স্বর্ণলতার অধিকাংশ এই-রূপে গোরুর গাড়ীর তলায় রাজপথের উপর রচিত হইয়াছিল।"

১৮৭৩ খ্রীষ্টাব্দের ৭ই জুলাই 'স্বর্ণলতা' রচনা শেষ হয়। ইহার অধিকাংশ চরিত্রই যে বাস্তব ভিত্তির উপর গঠিত, তারকনাথের ডায়েরি বা দৈনন্দিন-লিপিতেও তাহার উল্লেখ আছে; তিনি লিখিয়া গিয়াছেন :—

Finished my tale in the evening at about 8 p.m. It was melancholy pleasure to see it completed as I was to part company with my friends for ever. Monday, 7th July, 1873.

Some characters of my novel are from the real life. . . . My friend Suresh and Paresh two figures under the name of Ramesh and Debesh. 11th July 1873.*

তারকনাথ ও 'জ্ঞানাঙ্কুর'

'স্বর্ণলতা'র প্রথম খণ্ড শ্রীকৃষ্ণ দাস-সম্পাদিত 'জ্ঞানাঙ্কুর' পত্রের প্রথম বর্ষে (আশ্বিন ১২৭৯-ভাদ্র ১২৮০, ইং ১৮৭২-৭৩) ধারাবাহিক ভাবে প্রকাশিত হয়; রচনায় লেখকের নাম ছিল না। 'জ্ঞানাঙ্কুর' রাজশাহী বোয়ালিয়া হইতে প্রকাশিত হইত, তথায় শ্রীকৃষ্ণ দাসের সোনা-রূপার দোকান ছিল। তারকনাথের প্রভাবেই তিনি পত্রিকাখানি প্রচার

* History of Services of Officers holding Gazetted Appointments under the Government of Bengal, July 1891.

* "তারকনাথ গঙ্গোপাধ্যায়"—'সাহিত্য', ফাল্গুন ১৩২৯

করিয়াছিলেন। প্রথম বর্ষের 'জ্ঞানাঙ্কুর' দ্বৈভাষিক (ইংরেজী-বাংলা) ছিল; ইহার প্রথম দুই সংখ্যা স্থানীয় মুদ্রাযন্ত্রে মুদ্রিত হয়। তারকনাথের নিয়মিত সাহায্য ও সুপরামর্শে 'জ্ঞানাঙ্কুর' অচিরে সুনাম অর্জন করিয়াছিল। এই 'জ্ঞানাঙ্কুরে'র পৃষ্ঠায় রবীন্দ্রনাথের প্রাথমিক রচনা—'বনফুল,' 'প্রলাপ' ও প্রথম গদ্য-রচনা প্রকাশিত হইয়াছিল (৪র্থ বর্ষ, ১২৮২-৮৩ দ্রষ্টব্য)। তারকনাথের নির্বন্ধাতিশয্যে ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রথমে 'জ্ঞানাঙ্কুরে'র জন্যই তাঁহার 'কল্পতরু' রচনা করিয়াছিলেন। ইন্দ্রনাথ ছিলেন তারকনাথের অন্তরঙ্গ বন্ধু, উভয়ে একই বৎসরে এনট্রান্স পাস করেন। ১৮৭১-৭৬ খ্রীষ্টাব্দে ইন্দ্রনাথ দিনাজপুরে ওকালতি করিতেন। কার্য্যব্যপদেশে দিনাজপুর যাইতে হইলে তারকনাথ অগ্রে বন্ধুকে দর্শন দিতেন। ইন্দ্রনাথ লিখিয়াছেন:—

> "১২৭৯ কি ১২৮০ সালে তৎকালীন দার্জ্জিলিঙ বিভাগের ডেপুটি সুপারিন্টেণ্ডেন্ট অব ব্যাক্সিনেশন্ আমার প্রিয় সুহৃদ্ 'স্বর্ণলতা' প্রভৃতি গ্রন্থপ্রণেতা যশস্বী ৺তারকনাথ গঙ্গোপাধ্যায় কার্য্য উপলক্ষে যখন দিনাজপুরে আইসেন, তখন সাহিত্য সম্বন্ধে বহু আলাপ তাঁহার সঙ্গে হইত। 'স্বর্ণলতা'র এক কি দুই অধ্যায় মাত্র তখন লেখা হইয়াছে এবং রাজসাহীর বাবু শ্রীকৃষ্ণ দাসের 'জ্ঞানাঙ্কুর' পত্রে তাহা প্রকাশিত হইয়াছে। তারকনাথ আমাকে আপন রচনা দেখাইলেন, এবং 'জ্ঞানাঙ্কুরে' লিখিতে অনুরোধ করিলেন। সেই অনুরোধের ফলে ১২৮০ সালের বৈশাখ মাসের শেষ ভাগে কি জ্যৈষ্ঠ মাসের প্রারম্ভে আমি 'কল্পতরু' লিখি।...'কল্পতরু' রাজসাহী গেল, শ্রীকৃষ্ণ দাস মহাশয় পুস্তক পাওয়া সংবাদ দিলেন; তাহার পর তাঁহার সঙ্কট উপস্থিত হইল,—পুস্তক 'জ্ঞানাঙ্কুরে' প্রকাশিত না হইলে তারকনাথ চটিবেন, হয়ত আমিও চটিব; প্রকাশিত হইলে শ্রীকৃষ্ণ বাবুর নিজের অপ্রিয় কার্য্য হইবে। অতএব শ্রীকৃষ্ণ বাবু "ন যযৌ ন তস্থৌ" হইলেন। এদিকে আমিও তাগাদা আরম্ভ করিলাম; প্রায় ৫।৬ মাস কি তদধিক কাল পরে, শ্রীকৃষ্ণ বাবু বিনয়পূর্ণ এক পত্রে আমাকে জানাইলেন যে, 'কল্পতরু' উপাদেয় গ্রন্থ বটে, কিন্তু তাহা "ব্রহ্মের" নিন্দাসূচক, কেমন করিয়া তাহা 'জ্ঞানাঙ্কুরে' প্রকাশিত হইতে পারে। আমি কৃতার্থ হইলাম, শ্রীকৃষ্ণ বাবুকে অভয় দিলাম, 'কল্পতরু' ফিরিয়া পাইলাম।" ('বঙ্গভাষার লেখক,' পৃ. ৭৫৪-৫৫)

'স্বর্ণলতা'র কল্যাণে 'জ্ঞানাঙ্কুরে'র গ্রাহক-সংখ্যা দ্রুত বৃদ্ধি পাইয়াছিল। 'স্বর্ণলতা'ই 'জ্ঞানাঙ্কুরে' প্রকাশিত তারকনাথের একমাত্র রচনা নহে; তাঁহার গল্প-প্রবন্ধাদি আরও অনেক রচনা ইহার পৃষ্ঠা অলঙ্কৃত করিয়াছিল। তারকনাথ কাব্যানুরাগীও ছিলেন; ভারতচন্দ্রের 'অন্নদামঙ্গল' এক সময়ে তাঁহার প্রিয় পাঠ্য ছিল, ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের কবিতা তাঁহাকে আনন্দ দান করিত। তিনি নিজেও কবিতা রচনা করিতে পারিতেন। সরকারী কার্য্যে কলিকাতা হইতে বন্ধুবান্ধবহীন সুদূর প্রবাসে আসিয়া প্রথমটা তিনি নিজেকে নিতান্ত নিঃসঙ্গ মনে করিতেন। "প্রিয়জন-বিরহে তারকনাথ আলেকজাণ্ডার সেল্‌কার্কের বিজনোক্তির অনুবাদ করিয়াছিলেন। এই কবিতা 'জ্ঞানাঙ্কুরে' প্রকাশিত হইয়াছিল। তারকনাথ লিখিতেছেন:—

> কোথা বিজনতা তব সে মোহন বেশ—
> যে বেশ ধারণ করি, কবি-চিত্ত লও হরি
> এবে কেন কিছু তার নাহি হেরি লেশ?"*

একবার তিনি বন্ধুগৃহে এক গানের মজলিসে বিদ্যাসুন্দরের "মাতনি তোর জন্তে ভেবে ভেবে বাঁচি নে" সুরে সদ্য-সদ্য একটি গান রচনা করিয়া উকীল-প্রধান শ্রোতাদের আনন্দবর্দ্ধন করিয়াছিলেন। গানটি এইরূপ:—

> মক্কেল তোর জন্তে ভেবে ভেবে বাঁচি নে।
> পথপানে চেয়ে থাকি তবু তুই আসিস্ নে।
> ভাবি বুঝি অন্ত বাড়ী গেলি তুই আমায় ছাড়ি
> আমার বুঝি উনুনে হাঁড়ি জীবনে আর চড়ে না।†

'কল্পলতা' সম্পাদন

সরকারী কার্য্যে যশোহরে অবস্থানকালে তারকনাথ নিজে 'কল্পলতা' নামে একখানি মাসিক-পত্র সম্পাদন করিতে আরম্ভ করেন। ইহা ভবানীপুর হইতে তাঁহার জ্যেষ্ঠতাত-পুত্র ভুবনচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায় কর্তৃক প্রকাশিত হইত। 'কল্পলতা'র প্রথম সংখ্যার প্রকাশকাল ১৮৮১ খ্রীষ্টাব্দের আগষ্ট মাস। আমরা এই মাসিক-পত্রিকার পুরাতন সংখ্যাগুলি দেখি নাই; তবে ইহা যে তৃতীয় বৎসরেও (ইং ১৮৮৩) পদার্পণ করিয়াছিল, বেঙ্গল লাইব্রেরি-সঙ্কলিত তালিকায় তাহার উল্লেখ পাইয়াছি। 'কল্পলতা'য় তারকনাথের 'হরিষে বিষাদ' উপন্যাসখানি প্রথমে ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হইয়াছিল।

গ্রন্থপঞ্জী

'স্বর্ণলতা'র সাফল্যে উৎসাহিত হইয়া তারকনাথ আরও কয়েকখানি উপন্যাস লিখিয়াছিলেন। তাঁহার রচিত পুস্তকগুলির একটি কালানুক্রমিক তালিকা দিতেছি:—

১। **স্বর্ণলতা** (সামাজিক উপন্যাস)। ১২৮১ সাল (২৮ এপ্রিল ১৮৭৪)। পৃ. ২৭৫।

গ্রন্থকারের জীবদ্দশায় ইহার সাতটি সংস্করণ হইয়াছিল। ১৮৮২ খ্রীষ্টাব্দে 'ক্যালকাটা রিভিউ' ইহার সমালোচনা প্রসঙ্গে

---

* ইন্দ্রপ্রকাশ বন্দ্যোপাধ্যায়: 'বঙ্গসাহিত্যের এক পৃষ্ঠা,' পৃ. ৫৮।

† সুরেশচন্দ্র নন্দী: "তারকনাথ গঙ্গোপাধ্যায়"—'সাহিত্য', ফাল্গুন ১৩২৯।

লিখিয়াছিলেন—'স্বর্ণলতা'ই বাংলার একমাত্র খাঁটি উপন্যাস, বঙ্কিমের বইগুলি উপন্যাস নহে,—কাব্য।

"This is the only true novel we have read in Bengali, Babu Bankim Chandra's works being poems, not novels."

'স্বর্ণলতা' একাধিক বার ইংরেজীতে অনূদিত হইয়াছে। বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ ইহার একটি প্রামাণিক সংস্করণ প্রকাশে হস্তক্ষেপ করিয়াছেন।

২। **ললিত সৌদামিনী** (গল্প)। ১২৮৮ সাল (১৬ এপ্রিল ১৮৮২)। পৃ. ৪৪।

ইহা প্রথমে ১২৮২ সালের অগ্রহায়ণ-মাঘ সংখ্যা 'জ্ঞানাঙ্কুর ও প্রতিবিম্বে' প্রকাশিত হয়।

৩। **হরিষে বিষাদ** অথবা নায়ক-নায়িকাশূন্য উপন্যাস। ১২৯৪ সাল (২ সেপ্টেম্বর ১৮৮৭)। পৃ ৩৩৮।

৪। **তিনটি গল্প**। ললিত সৌদামিনী, সুখ ও দুঃখ এবং নিধিরাম। ১২৯৫ সাল (২৭ অক্টোবর ১৮৮৯)। পৃ. ৯৪।

৫। **অদৃষ্ট** (সামাজিক উপন্যাস)। ১২৯৯ সাল (২৭ সেপ্টেম্বর ১৮৯২)। পৃ. ৩১৫।

বিধিলিপি (উপন্যাস):—প্রমথাচরণ সেন-প্রবর্তিত 'সখা'র (মার্চ ১৮৯১-সেপ্টেম্বর ১৮৯১) এই উপন্যাসখানির ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ পর্য্যন্ত প্রকাশিত হইয়াছিল। তারকনাথের মৃত্যুতে ইহা অসম্পূর্ণ রহিয়া যায়।

রঙ্গালয়ে স্বর্ণলতা

তারকনাথের জীবিতকালে কলিকাতার সাধারণ-রঙ্গালয়ে 'স্বর্ণলতা'র নাট্য-রূপ—'সরলা' প্রদর্শিত হয়। 'স্বর্ণলতা'র প্রথমাংশ অবলম্বন করিয়া রসরাজ অমৃতলাল বসু এই নাট্য-রূপ রচনা করেন। ষ্টার থিয়েটার কর্ত্তৃক 'সরলা'র প্রথম অভিনয় হয়—১৮৮৮ খ্রীষ্টাব্দের সেপ্টেম্বর মাসে। অপরেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় 'রঙ্গালয়ে ত্রিশ বৎসর' পুস্তকে লিখিয়াছেন:—

"এই সরলা নাটকের অভিনয় নাট্যজগতে একটা যুগান্তর আনে। ইহার পূর্ব্বে এরূপ ধরণের সামাজিক নাটক বাংলার কোন রঙ্গমঞ্চে অভিনীত হয় নাই। সরলার অভিনয় প্রায় এক বৎসর সমান ভাবেই চলিয়াছিল, এবং ষ্টার-সম্প্রদায় এই পুস্তকে প্রভূত অর্থ উপার্জন করিয়াছিলেন।" (পৃ. ১১২)

"এ পর্য্যন্ত বঙ্গরঙ্গমঞ্চে যত উপন্যাস নাটকাকারে পরিবর্ত্তিত হইয়া অভিনীত হইয়াছে, এক স্বর্গীয় তারকনাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের 'স্বর্ণলতা' ভিন্ন কোন উপন্যাসকেই দর্শকগণ তেমন ভাবে গ্রহণ করেন নাই—যেমন বঙ্কিমচন্দ্রকে আগ্রহের সহিত গ্রহণ করিয়াছেন।" (পৃ. ১৪৯)

পত্নীবিয়োগ; মৃত্যু

শেষ-জীবনে তারকনাথ স্ত্রীপুত্র-পরিবেষ্টিত হইয়া বকসারে বাস করিতেছিলেন। এইখানে অবস্থানকালে তাঁহার স্ত্রী-বিয়োগ হয়।

"তারকনাথ 'স্বর্ণলতা'তে বিধুভূষণের যে চিত্র আঁকিয়াছিলেন সেই চিত্র তাঁহার গৃহে ফুটিয়া উঠিল। তারকনাথের পত্নী সুন্দরী ছিলেন না বলিয়া তারকনাথ কোনো দিন তাঁহাকে লইয়া সুখী হইতে পারেন নাই। এবং অধিকাংশ সময়েই তাঁহাকে দেশে রাখিয়া নিশ্চিন্ত থাকিতেন। বহুদিন পরে বকসারে তাঁহাদের মিলন হইয়াছিল। কিন্তু অভাগিনী সরলা যেমন বিধুভূষণকে দেখিবার জন্য প্রাণ ধারণ করিয়া ছিল তেমনি তারকনাথের পত্নী অল্পকাল বকসারে বাস করিবার পর পতিপুত্র পশ্চাতে ফেলিয়া স্বর্গারোহণ করিলেন। ইহার পর তারকনাথের পিতৃবিয়োগ হইল। মানসিক অবসাদ দূর করিবার নিমিত্ত তারকনাথ পুনরায় সুরার আশ্রয় গ্রহণ করিলেন।" (ইন্দুপ্রকাশ বন্দ্যোপাধ্যায়: 'বঙ্গসাহিত্যের এক পৃষ্ঠা', ১৩১৪ সাল, পৃ. ৫৯)

১৮৯১ খ্রীষ্টাব্দের ২২এ সেপ্টেম্বর তারিখে পক্ষাঘাত রোগে তারকনাথের মৃত্যু হয়। বকসারের বিখ্যাত রামরেখাঘাটে তাঁহার নশ্বর দেহ বিলীন হইয়াছে।

তারকনাথ সদাপ্রফুল্ল, বিনয়ী ও মিষ্টভাষী ছিলেন—সর্ব্বোপরি ছিলেন রহস্যপটু। প্রভাতকুমার লিখিয়াছেন:—

"চল্লিশ বৎসর বয়সের পূর্ব্বে তাঁহার স্ত্রী-বিয়োগ ঘটিয়াছিল, কিন্তু তিনি দ্বিতীয় বার দারপরিগ্রহ করেন নাই। কেহ এ বিষয়ে অনুরোধ করিলে বলিতেন—"ক্ষেপেছ; বুড়ো বয়সে কি মুগ্ধবোধ ব্যাকরণ তৈয়ারি ক'রে যাব?" মুগ্ধবোধ ব্যাকরণটা কি রকম, জিজ্ঞাসা করিলে হাসিয়া আওড়াইতেন:—

মুকুন্দং সচ্চিদানন্দং প্রণিপত্য প্রণীয়তে।

মুগ্ধবোধং ব্যাকরণং পরোপকৃতয়ে ময়া।

তিনি বড় বড় গবর্ণমেণ্টের কর্ম্মচারী অপেক্ষা সামান্য বেতনভোগী কেরাণী প্রভৃতির প্রতি সমধিক অনুরক্ত থাকিতেন। বলিতেন, ডেপুটি, মুনসিফ্, সবজজ্ প্রভৃতি শ্রেণীর লোক বড় অহঙ্কারী। 'হরিষে বিষাদে' ডাক্তার বাবুর বাটিতে নিমন্ত্রিতা মহিলা-মহলে এক কোন্দল বাধিয়াছে। মুনসিফ্ বাবুর স্ত্রী বলিতেছেন,—"ডেপুটি আবার হাকিম; আরসুলা আবার পাখী—আ আমার পোড়া কপাল!" ('দাসী', আগষ্ট ১৮৯৬)

তারকনাথ ও বাংলা-সাহিত্য

বঙ্কিমচন্দ্র 'আলালের ঘরের দুলালে'র সমালোচনা করিতে বসিয়া বলিয়াছিলেন, বাংলা ভাষা ও সাহিত্যকে প্যারীচাঁদ চরম দুর্গতি হইতে রক্ষা করিয়াছেন; কারণ, তিনিই সর্ব্বপ্রথম বাঙালী লেখক যিনি বৈদেশিক বা ভিন্ন-ভাষার সাহিত্যের আশ্রয় গ্রহণ না করিয়া স্বদেশ ও স্বসমাজ হইতেই রচনার উপকরণ সংগ্রহ করিয়াছিলেন। প্যারীচাঁদ মিত্র সামাজিক চিত্র মাত্র অঙ্কিত করিয়াছিলেন, উপন্যাস রচনা করেন নাই।

স্বদেশ ও স্বসমাজ হইতে উপকরণ লইয়া প্রথম সার্থক উপন্যাস রচনার কৃতিত্ব তারকনাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের ; প্রকৃতপক্ষে তাঁহার 'স্বর্ণলতা'ই বাংলা দেশের প্রথম সামাজিক উপন্যাস। এই একটি মাত্র উপন্যাসের দ্বারাই তারকনাথ যশস্বী হইয়াছিলেন। ইংলণ্ডীয় কবি গ্রে যেমন তাঁহার বিখ্যাত 'এলিজি' কাব্যের সাহায্যে ইংরেজী কাব্য-সাহিত্যে চিরদিনের প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছেন, তারকনাথও তেমনি তাঁহার 'স্বর্ণলতা'র সাহায্যে বাংলা-সাহিত্যে স্থায়ী আসন প্রাপ্ত হইয়াছেন। এইটিই তাঁহার প্রথম রচনা। বিস্ময়ের বিষয় এই যে, তাঁহার পরবর্ত্তী আর কোনও রচনাই স্থায়ী গৌরব লাভ করিতে পারে নাই।

'স্বর্ণলতা' দীর্ঘকাল ধরিয়া বাঙালী সমাজকে হাসাইয়াছে, কাঁদাইয়াছে, সমাজের অনেক গ্লানি ও কালিমা দূর করিবার সহায় হইয়াছে. সেকালের ঈর্ষাদিগ্ধ কলহপরায়ণ কুসংস্কার-মণ্ডিত সমাজের এমন বাস্তব জীবন্ত চিত্র আর কেহ তেমন ভাবে অঙ্কিত করিতে পারেন নাই। ইহার কারণ তাঁহার জীবনীর মধ্যেই খুঁজিয়া পাওয়া যায়—তিনি তাঁহার বাস্তব অভিজ্ঞতা ও ভূয়োদর্শন হইতে এই উপন্যাস রচনা করিয়াছিলেন। যাহা দেখিয়াছিলেন, যথাযথভাবে তাহা লিপিবদ্ধ করিবার আশ্চর্য্য শিল্প-প্রতিভা তাঁহার ছিল। 'স্বর্ণলতা'র বাস্তব অভিজ্ঞতার এই সুষ্ঠু প্রয়োগ ঘটিয়াছিল বলিয়াই বাংলা দেশ সরলার সুখ-দুঃখে পাগল হইয়া উঠিয়াছিল, 'স্বর্ণলতা'র যাবতীয় চরিত্রকে বাস্তব ও জীবন্তজ্ঞানে সমাজের অন্তর্ভুক্ত করিয়া লইয়াছিল ; আজও পর্য্যন্ত গদাধরচন্দ্র ও নীলকমল আমাদের প্রিয় পরিচিত গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত হইয়াই আছে। এই বাস্তবমুখিতার জন্যই 'সরলা' নাটক দীর্ঘকাল ধরিয়া বাঙালী দর্শককে মুগ্ধ করিয়াছিল। তারকনাথের পর আরও অনেকে মধ্যবিত্ত হিন্দু বাঙালী সমাজের চিত্র সাফল্যের সহিত অঙ্কিত করিয়াছেন, কিন্তু 'স্বর্ণলতা'র গৌরবকে কেহ ক্ষুণ্ণ করিতে পারেন নাই।

দ্বন্দ্ব

শ্রীসুবোধ রায়

মন্থর আষাঢ়-দিন,—বর্ষণ-মুখর,
সারাদিন অবিশ্রান্ত বৃষ্টি ঝর ঝর।
ব'সে আছি বাতায়নে ; ভিজে ছাট আসে
জলতরঙ্গের ধ্বনি ভাসিছে বাতাসে।
দিনান্তের মন্দিরেতে আঁধার ঘনায়,
আকাশ মুখর আজি পৃথ্বী-বন্দনায়।
দীর্ঘ আষাঢ়ের বেলা—বর্ষণ-মুখর।

স্বর্গ্যে ও সমুদ্রে মিলি' কি যাদুমন্তর
জাগায়ে তুলিল আজি ধরণীর বুকে!
তাহারি আবেগ তৃণ-পল্লবের মুখে।
জীবনের সঙ্গীতের ধারা চারিধারে,
স্পন্দিত যা' বিশ্ববীণে মল্লার-ঝঙ্কারে।
এ-বর্ষণ পুন যেথা বাধাবন্ধহারা,
প্রমত্ত তাণ্ডবনৃত্যে জাগাইয়া সাড়া
অট্টহাস্যে ছিন্ন করি' তীরের শৃঙ্খল
ধেয়ে চলে অন্ধবেগে উন্মাদ, চঞ্চল ;
সহসা থামিয়া যায় জীবনের গান,
ভীত ত্রস্ত অসহায় ধরণীর প্রাণ
ক্ষণতরে কেঁপে ওঠে,—তার পরে হায়
প্রলয়-পয়োধিতলে কোথায় মিলায়!

এই ছায়াছবি হেরি জীবনের পটে,
মিশ্ররাগিণীর খেলা সম্পদে সঙ্কটে।
প্রেম যবে আপনার সীমা নাহি মানে,
ভাসায় দয়িতজনে প্লাবনের টানে,
কামনার পঙ্ককুণ্ডে দুর্গতি তাহার
জাগায় সবার প্রাণে ভয়ের সঞ্চার।
মাতৃস্নেহ—জীবনের সুধারসধারা,
সেও যবে সংযমের পুণ্যসীমাহারা,—
সর্ব্বগ্রাসী মোহরূপে আনে অকল্যাণ,
সন্তানেরে গ্রাসে তাহা রাহুর সমান।

কে ঘুচাবে এই দ্বন্দ্ব—মিলাবে সংশয়?
বিধাতৃতে ক্ষণে ক্ষণে স্থান-বিনিময়!
এপারে কাঁদিছে চখা,—ওপার দুস্তর,
এ-মিথুন লাগি' কোথা সেতু-যবনিকা?

উন্নতি

শ্রীরামপদ মুখোপাধ্যায়

১

চন্দ্রকুমাররা আসতেই পাড়ার মধ্যে একটা সাড়া পড়ে গেল। এই সঙ্কীর্ণ প্রায়ান্ধকার মুখচোরা গলিটার পরম সৌভাগ্যই বলতে হবে। স্বাস্থ্যনাশের অনুকূল প্রতিবেশ সৃষ্টি করে পিঠাপিঠি এতগুলি বাড়ি গলিটাকে দু'ধার থেকে গলা টিপে মারবার ষড়যন্ত্র করলে হালের পৌর-আইনে অবশ্য বাধতো। এই গলি আর এই সব বাড়ি সুতানুটি গোবিন্দপুরের স্মৃতি জাগিয়ে তোলে বলেই আইনের পাশ কাটিয়ে এখনো বেঁচে রয়েছে। জন্মভিটার মমতা আর সস্তা ভাড়া দুটোই অধিবাসীদের আর সব বিষয়ে উদাসীন করে রেখেছে। এবং পৌর-ব্যবস্থাও এখানে অত্যন্ত কৃপণ। রাস্তার মেরামতি কাজ কত বছর হয় নি বলা কঠিন। দুটি মাত্র গ্যাসের আলো চারবার-পাক-খাওয়া গলির মধ্যে কোথায় ছড়িয়ে ছিটকে পড়েছে তা বুঝাই দুষ্কর। কলে জলের ধারা ক্ষীণ, গৃহস্থের অনুযোগ অহোরাত্র চলছেই—সেই সঙ্গে ময়লা জলের ফুটো ট্যাঙ্ক বেয়ে হড় হড় করে জলের ধারা পথ ভাসিয়ে নোনা-ধরা দেওয়াল রসিয়ে তুলছে। এমন গলির মধ্যে চন্দ্রকুমার বসু কোন্ সুখসুবিধার জন্য বাড়ি ভাড়া নিলেন—সেই আলোচনাই প্রতিবাসী মহলে প্রবল হয়ে উঠেছে।

হরিসাধনবাবু বাজারের থলেটা টিনঘেরা কালি বারান্দার মুখে নামিয়ে রন্ধনরতা বিমলাকে বললেন, শুনেছ—মিত্তিরদের বাড়িতে নতুন ভাড়াটে এল।

কৃশতনু বলেই বিমলা অতি সঙ্কীর্ণ স্থানটিতে বসে চার পাশে রান্নার সরঞ্জাম নিয়ে কোন রকমে দু'বেলা পাকশাক করেন। শহরের সৌকর্য্যার্থে বড় পথের ধারে পুরোনো সব কৃষ্ণচূড়া পাকুড় গাছ কাটিয়ে লোহার বেড়া ঘিরে বকুল কিংবা নাম-না-জানা গাছ লাগানো হয়েছিল—প্রায় পঁচিশ-ত্রিশ বছর আগে। হরিসাধনের স্মৃতিতে সেই লোহায়-ঘেরা আর সঙ্কুচিত শাখার চারাগুলি ভেসে ওঠে—বিমলা যখন একদিকে দেওয়াল আর একদিকে রেলিঙের সঙ্গে টিন লাগানো জায়গাটার বসে দু'বেলার অন্ন-আয়োজনের ব্যবস্থা করেন। অবশ্য দেওয়ালের শাসনে বিমলা অমন কৃশতনু লাভ করেন নি; শহরের জল-হাওয়ার 'অম্বল' রোগের সৃষ্টি হয়ে তাঁকে কাবু করেছে এমন ভাবে।

যাই হোক, খবরটা শুনে তিনিও যথেষ্ট বিস্মিত হলেন। অত্যন্ত ভঙ্গীতে সন্তর্পণে ঘাড় ফিরিয়ে বললেন, মিত্তিরদের বাড়ি! বল কি—কার এমন ভূতে ধরেছে যে এক গাদা টাকা খরচ করে ওই বাড়ি ভাড়া নেবে!

নিলে তো। হরিসাধন উবু হয়ে বসলেন সেই বারান্দায়। দুঁড়িদার লোক—সরু বারান্দায় দু'ধারে আর ফাঁক রইল না। বসে বললেন, যারা এসেছে—মস্ত বড়লোক। ঝি—চাকর—রাঁধুনী—দারোয়ান—আর মোটর আছে। মোটরটা অবিশ্যি গলির মধ্যে ঢুকলো না—বড় রাস্তায় দাঁড়িয়ে আছে।

তা কত ভাড়া দেবে ওরা?

শুনলাম তো দু'শো।

দু'শো? একটা ঢোক গিলে বিমলা বললেন, তা কপাল ভাল মিত্তিরগিন্নির। দেনার দায়ে মাথা বিকানো—তবু মাস মাস একটা মোটা আয় হ'ল তো।

হরিসাধন বললেন, আয়ই হোক—আর যাই হোক দেনা শোধ করা চাট্টিখানি কথা নয়।

একটা সাঁ সাঁ আওয়াজ হওয়ায় বিমলা মুখ ফিরিয়ে দেখলেন—তরকারির জল কমে গেছে। তাড়াতাড়ি কড়াটা তিনি নামিয়ে নিলেন।

হরিসাধন বললেন, কুচো চিংড়ি আছে—বেছে দেব নাকি?

দাও। তা হাঁ গা—বলছ ওদের মোটর আছে—কিন্তু এই গলিতে ঢুকবে কি করে!

বাইরে শম্ভুদের গ্যারাজটা ভাড়া নেবে।

তা কি করে কর্তা? বড় জমিদার না চাকরে?

কি জানি, চালচলন দেখে তো মনে হয়—জমিদার।

বিমলা কড়ায় লঙ্কা ফোড়ন দিয়ে মুখ মচ্‌কে বললেন, হাঃ—জমিদার! মিত্তিররাও তো বলতো জমিদার—তার পর…

হাঁচির চোটে কথাটা আর শেষ হ'ল না।

২

গলিটার আর একটু পরিচয় আবশ্যক। বড় রাস্তা থেকে সোজা পূব মুখে হাত ত্রিশেক গিয়ে দক্ষিণে সে প্রথম পাক খেয়েছে। পূব মুখের ঐ হাত ত্রিশেক জমির দুধারে শুধু খোলার বস্তি। কাঠের কাজ, টিনের কাজ, বুরুশ তৈরির কাজ—এই সবে গলিটা সকাল থেকে সন্ধ্যে পর্য্যন্ত শব্দ-মুখর হয়ে থাকে। রাত্রিতেও এ গলিতে যারা ভিড় জমায়—তাদের পাশ কাটিয়ে ভিতরের দিকে যাওয়ায়—সম্ভ্রান্ত মানুষের সঙ্কোচ জাগবারই কথা। এ সব দুর্নীতি দমনের প্রয়াস যে অতি শুচি-বায়ুগ্রস্ত দু-এক জন ভাড়াটে ইতিপূর্ব্বে না করেছিলেন তা নয়—কিন্তু বেশীর ভাগ বাসিন্দাই এটাকে দুর্নীতি বলে মনে করেন না। কেননা—ঐ নিম্নস্তরের মানুষগুলি এদের যথেষ্ট শ্রদ্ধা দেখিয়ে চলে—আপদ-বিপদে এদের মত প্রতিবেশীও বিরল। মেয়েগুলি পেটের দায়ে দেহকে পণ্য করলেও—হৈ হৈ হট্টগোল—ভদ্রমানুষের সুখশান্তিকে কোন দিন বিঘ্নিত করেনি। থাকতে থাকতে সবই গা-সহা বা ধাত-সহা হয়ে যায়। যেমন কৃপণ আলো—অমেরামতি রাস্তা—অপ্রচুর

জল—স্যাঁতসেঁতে অন্ধকারমাখা বাড়িগুলি—টিন পেটার হৃদয়-বিদারক শব্দ ও সকাল সন্ধ্যায় দমবন্ধ করা ধোঁয়া দিনযাপনের সঙ্গে বেমালুম মিশে গেছে।

গলিটা দ্বিতীয় বার পাক খেয়েছে—উমাপদদের বৈঠকখানার গা ঘেঁসে। এইখান থেকে ভদ্র পাড়া আরম্ভ। সেখান থেকে পশ্চিমে হেলেছে ইন্দুভূষণদের বাড়িটা ঘিরে। চতুর্থ বারের পাকে হরিসাধন ও অতুলদের বাড়ি দুটোকে ডাইনে বাঁয়ে রেখে গলিটা শেষ হয়েছে—মিত্তির-বাড়ির সামনে। ওঁরা এককালে জমিদার ছিলেন—আর রাস্তাটা হয় তো ওঁরাই তৈরি করেছিলেন। অন্তঃপুরের মর্য্যাদা হানি ঘটবে বলে বাড়ির খানিকটা অংশ নষ্ট করে গলিটাকে এপারের বড় রাস্তা পর্য্যন্ত হয় তো টেনে আনেন নি। যা হোক, মর্য্যাদা তাঁদের শেষ পর্য্যন্ত থাকে নি। দেনার দায়ে লক্ষ্মীর আসন টলে উঠতেই—বাড়িটা ভাড়া দিয়ে পাড়া ছেড়েছেন মিত্রগোষ্ঠী।

সাধারণত নতুন ভাড়াটেদের স্থায়ী বাসিন্দারা প্রীতির চক্ষে দেখে না। তাদের ধনপ্রবাদ এদের ক্রমশঃ দূরেই সরিয়ে দেয়; আবার কৌতূহল টানে নিকটে। মানুষ সম্বন্ধে মানুষের কৌতূহল অনেক সময় ভদ্রতার সীমা লঙ্ঘন করে। যার প্রতি উপেক্ষা তাকে নীচুতে নামাবার উপকরণ না পেলে মন তৃপ্ত হয় না।

চন্দ্রকুমার এ কথা জানতেন বলেই বুঝি ধনীর মর্য্যাদা নিয়ে প্রতিবেশীদের নিজের বৈঠকখানায় আহ্বান করলেন না, নিজেই পথের মাঝে আলাপ জমালেন একে ওকে তাকে ধরে।

নিত্য অভ্যাস মত বাজারের থলি নিয়ে হরিসাধন বাড়ির বার হতেই চন্দ্রকুমারের সঙ্গে চোখোচোখি হয়ে গেল। চোখোচোখি হতেই চন্দ্রকুমার প্রথমে হাত উঠিয়ে মৃদু হাসির সঙ্গে অত্যন্ত মিষ্ট স্বরে বললেন, নমস্কার। বাজারে যাচ্ছেন?

হরিসাধন কৃতার্থ হয়ে বললেন, হাঁ। আপনি—

হেসে বললেন চন্দ্রকুমার, আমিও চলেছি বাজারে। চলুন—একসঙ্গে গল্প করতে করতে যাওয়া যাক। পরশু এলুম অথচ কারো সঙ্গে আলাপ করতে পারি নি—সেজন্ত কিছু মনে করবেন না।

না—না—মনে করবো কি। আপনার মত লোক যে—ইত্যাদি বিনয় বাক্যগুলি অগোছালো ভাবে নির্গত হ'ল হরিসাধনের রসনা থেকে।

চলতে চলতে চন্দ্রকুমার বললেন, কর্পোরেশন ভারি নেগলেক্ট করছে এই গলিটাকে। আপনারা রিপোর্ট করেন না কেন?

রিপোর্ট। করুণ হেসে বললেন হরিসাধনবাবু, দু-এক বার যে হয় নি তা নয়—কিন্তু কেই-বা শোনে।

আচ্ছা যাতে শোনে তার ব্যবস্থা আমি করবো। কাউন্সিলারদের না ধরলে কোন ব্যবস্থাই হবে না। আমার বন্ধু দু-এক জন আছেন—

পুলকিত হয়ে উঠলেন হরিসাধনবাবু। বললেন, লোকের মত লোক না এলে পাড়ার উন্নতি হয় কখনও? করুন—তাই করুন।

চন্দ্রকুমার বললেন, আর গলিতে ঢুকবার মুখে ওই বস্তিগুলো ভারি নোংরা। কি করে সহ্য করেন আপনারা টিন পেটাদের শব্দ।

হরিসাধন সস্মিত মুখে চেয়ে রইলেন চন্দ্রকুমারের মুখের দিকে। অর্থাৎ সহ্য না করে উপায় কি।

চন্দ্রকুমার বললেন, কাল সন্ধ্যার সময় আসছিলাম গলি দিয়ে—চার-পাঁচটা মেয়ে সেজে-গুজে দাঁড়িয়ে রয়েছে দেখলাম ওই গ্যাস-পোষ্টের নীচে। এ সব তো ভাল নয়।

হরিসাধন অপ্রতিভ মুখে বললেন, ওরা কোন রকম গোলমাল করে না।

না-ই করুক, কণ্ঠে জোর দিয়ে চন্দ্রকুমার বললেন, ভদ্রলোকের পাড়ায় এ সব ভাল কি? আপনিই বলুন—আপনার জামাই কি বেয়াই যদি সন্ধ্যে বেলায় এদিকে আসেন আর এই সব দেখেন তো লজ্জায় আপনার মাথা কাটা যায় না কি?

হরিসাধন নিজের মান-সম্ভ্রমকে এমন উগ্র করে কোন দিন দেখেন নি। ওঁর জামাই বেয়াই সন্ধ্যাবেলায় যে এ গলিতে আসেন নি কিংবা এই নীতিকলুষিত আবহাওয়া নিয়ে কোন দিন মৃদু অনুযোগ করেন নি—তা নয়, কিন্তু হরিসাধনের মাথাটা লজ্জায় নুয়ে পড়ে নি। বরং মাথা উঁচু করে বলেছেন, কি করবো বেয়াই—পিতৃ-পুরুষের ভিটে ছেড়ে যাব কোথায়? ওরা আছে এক দিকে—আমরা আছি এক দিকে। ওদের তুলে দেবার আইন ত আমাদের হাতে নেই।

সে কথা কিন্তু চন্দ্রকুমারের সামনে বললেন না। আত্মীয়-কুটুম্বের অনুযোগের চেয়ে ওঁর প্রশ্নটাতেই হরিসাধনের মাথা নীচু হয়ে পড়ল। নরম গলায় বললেন, তা লজ্জা কি আর হয় না, কিন্তু কি করব বলুন—

চন্দ্রকুমার দৃঢ়কণ্ঠে বললেন, আচ্ছা—এরও প্রতিকার করা যাবে। নিজেরা না হয় ঘা খেয়ে খেয়ে শক্ত হয়েছি—কিন্তু ছেলেমেয়েরা? তাদের চরিত্র-গঠনের মুখে আমাদের খুব সাবধান হওয়া উচিত নয় কি?

প্রবল বেগে মাথা নেড়ে হরিসাধন বললেন, নিশ্চয়—নিশ্চয়।

৩

উমাপদদের জীর্ণ বৈঠকখানা ঘরে প্রত্যহ সন্ধ্যায় পয় পাশার আড্ডা বসে। রাত বারটা অবধি চলে কচে-বা দু-তিন-নয়ের চীৎকার। চীৎকার না হলে গলিটার মর্য্যাদা বুঝি বজায় থাকে না। দ্বিতীয় বাঁকের মোড়ে এই বৈঠকখানা। তারপরেই গ্যাস-পোষ্টের নীচের দেহোপজীবিনী যে ক'টি মেয়ে নিজেদের গুছিয়ে নিয়ে নিঃশব্দে প্রতীক্ষা করে—তারাও চমকে ওঠে আড়ি-মারার চীৎকারে। নির্ব্বাপিত দীপ

দোতলা ঘরের জানালাগুলির পাশে এরা এক-এক বার মুখ তুলে তাকায়, নিজেদের মধ্যে কি সব বলাবলি করে। কখনও হাসে—কখনও দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে। এদিকে পাশার আসর সরগরম হয়ে ওঠে—নানান গল্পে—মন্তব্যে। কোন দিন খেলাটা সংক্ষিপ্ত হয়ে গল্পটা হয় দীর্ঘ, কোন দিন বা গল্পের সঙ্গে সঙ্গে চলে খেলা। তবে প্রতিদিনই সামান্য গল্প-গাছা হবার পর খেলা আরম্ভ হয়।

খানিকটা গল্প হয়ে যাবার পর পাশার ছক কোলের কাছে টেনে নিয়ে উমাপদ বললেন, এইবার এক বাজী হোক।

অতুল্য দে বললেন, দূর ছাই—রাখ তোমার পাশা। আজ চন্দ্রকুমারবাবু কি বললেন জান?

চন্দ্রকুমার! মুখখানা হুচলো করে কিসের আঘ্রাণ টেনে নিয়ে ইন্দুভূষণ বললেন, হাঁ—চন্দ্রকুমার, ঐ মিত্তির-বাড়ির ভাড়াটে। লোকটার পয়সা আছে—অহঙ্কারের লেশমাত্র নেই। আজ সকালে আমার বাড়িতে এসে আলাপ করে বললেন—

উমাপদ বললেন, জানি। আমার বৈঠকখানায় উঁকি মেরে বললেন, পাশার আসর বসে বুঝি। বেশ বেশ, একদিন এসে—

অতুল্য উষ্ণ হয়ে বললেন, তোমার ত পাশা বই আর চিন্তে নেই। উনি কিন্তু পাড়াটার উন্নতি করতে চান। এরই মধ্যে দিব্যি একটা প্ল্যান করেছেন। আমায় বললেন, দেখুন দিকি—এই রকম চেহারার একটা পল্লী হলে আদর্শ পল্লী হয় কিনা। গলিতে ঢোকবার মুখেই ছোট্ট এক-টুকরো বাগান—যেখানে এখন খোলার বস্তি রয়েছে।

হরিসাধন বললেন, হাঁ—হাঁ—আমাকেও বলেছেন—এসব দুর্নীতি চলবে না। ওদের উঠিয়ে দেবেন ওখান থেকে।

কেন, ওরা আবার কি দোষ করলে? এক জন প্রশ্ন করতেই বাদানুবাদ ঝাঁজাল হয়ে উঠল।

সকলের মুখেই চন্দ্রকুমারের নাম, তাঁর সুখ্যাতি, তাঁর অমায়িক ব্যবহার ও প্রতিবেশীর হিত কামনার কথা অজস্র উৎসারিত হয়ে সেদিনের পাশার আসরটা জমতে দিলে না। কিন্তু সেজন্য কেউ এতটুকু মনঃক্ষুণ্ণ হলেন না।

উমাপদ পাশার ছক কোলে করে এই বাদানুবাদ শুনছিলেন। ঘড়িতে টং টং করে এগারোটা বাজতেই অভ্যাস-মত সচকিত হয়ে উঠলেন। জিজ্ঞাসা করলেন, কি করেন ভদ্রলোক?

ইন্দুভূষণ বললেন, বিজনেস। মস্ত বড় আয়রণ মার্চেন্ট কিনা।

৪

দু'মাস পরে হরিসাধনবাবু বাজারের থলেটা সঙ্কীর্ণ রান্নাঘরের সামনে রেখে উবু হয়ে বসে ডাকলেন, ওগো—শুনছো?

বিমলা তখন ডাতের ফেন গালছিলেন; পিছন ফিরে না তাকিয়েই বললেন, বল।

আজ খোলার বস্তিতে নোটিশ লট্‌কে গেল। এক মাসের মধ্যে বস্তিকে বস্তি সাফ।

বস্তির লোকজনেরা যাবে কোথায়?

কেন, পৃথিবীর আর কোথাও কি জায়গা নেই। যাক না ওরা যেখানে খুশী। আমাদের গলিটা নোংরা করে থাকবার ওদের এক্তিয়ার কি।

হরিসাধনের বিরক্তিপূর্ণ মন্তব্যে বিমলা মুখ ফিরিয়ে বললেন, চন্দ্রকুমার বাবুই বুঝি এই সব করছেন।

তা না ত কার এত ক্ষমতা। যাই বল—পাড়ায় একজন বড়লোক না থাকলে পাড়ার উন্নতি হয় না।

বিমলা সে কথার উত্তর না দিয়ে বললেন, কাল ওঁর বড় মেয়ে দুপুরে বেড়াতে এসেছিল। বললে—বাবার ভাল লেগেছে পাড়াটা।

হরিসাধনের মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল, বললেন, লাগবে না! পাড়ার লোকগুলি কেমন ভাল। আমি বড় গলা করে বলছি—এ পাড়ার মত প্রতিবেশী শহরের কোন পাড়াতেই নেই।

বিমলা বললেন, মিত্তিররা নাকি বাড়ি বিক্রী করবে বলে খদ্দের খুঁজচে। চন্দ্রবাবুর মেয়ে তো বললে—বাবা সব চেয়ে চড়া দাম দিয়েও বাড়িখানা কিনবেন।

ভাল—ভাল। উনি স্থায়ীভাবে পাড়ায় থাকলে কত না উন্নতি হবে পাড়ার! আত্মপ্রসাদে মাথা দুলিয়ে হরিসাধন হেসে উঠলেন।

বিমলা বললেন, ঠাকুর-দেবতার ওপরও ওদের ভক্তি খুব। মেয়েটি বলছিল—বাড়িটা কেনা হয়ে গেলে বাবার ইচ্ছে এইখানে দুর্গোৎসব করেন।

আহা মায়ের যদি ইচ্ছে হয়—তা হলে মা আসবেন বইকি এই পাড়ায়। এ যে মায়ের চেনা জায়গা। আহা—সে কত-দিন হ'ল—এই মিত্তির বাড়িতে মা আসতেন! আমরা তখন ছোট। নতুন কাপড় পরে যেতাম ঠাকুর দেখতে।

অতীতের স্মৃতিতে হরিসাধন গদগদ হয়ে উঠলেন।

৫

উন্নতির প্রথম সোপানে পা দিল গলিটা। যাদুকরের যাদু-দণ্ডের ছোঁয়া পেয়ে অধিবাসীসমেত খোলার বস্তিগুলো এক দিন অদৃশ্য হ'ল। ফাঁকা জমিটা কার দখলে এল—কেউ জানলে না। রাস্তার প্রথম বাঁকটা অদৃশ্য হতেই উমাপদদের বৈঠকখানা প্রচুর আলো ও হাওয়ায় ভরে উঠল।

আঃ—ইচ্ছে করে সারাটা রাত তোমার বৈঠকখানায় বসে পাশা চালি! হরিসাধন তাকিয়াটার ওপর কাত হয়ে পড়ে আরামের নিশ্বাস টানলেন।

অতুল্য বললেন, ঐখানে ফুলবাগান হলে দিব্যি ফুলের গন্ধ আসবে। তোমার বরাত ভাল উমাপদ।

উমাপদ বললেন, আমার কেমন বেসুরো লাগছে ভাই। বাড়িতেও এরা বলছিলেন, টিন পেটা—কাঠ পেটা এ সবের শব্দ শুনে শুনে এমন অভ্যেস হয়ে গিয়েছে যে দুপুরটা কেমন ফাঁকা-ফাঁকা বোধ হয়।

তাহলে তোমার পাশার আসরও জমবে না। অতুল্য হেসে উঠলেন শব্দ করে।

আর শুনেছ—চন্দ্রকুমার বাবুই মিস্তির-বাড়িটা কিনে নেবেন ঠিক হয়েছে। যা দর উঠবে—তার চেয়ে এক হাজার বেশী অঙ্গীকার করেছেন উনি।

মিস্তিরের ভাগ্যি ভাল।

যা হোক—গৃহপ্রবেশে ভাল-মন্দ খেয়ে মুখ বদলান যাবে—কি বল? হরিসাধন রসিকতার চেষ্টা করলেন।

ইন্দুভূষণ বললেন, সে বুঝি জান না? পরশুই চন্দ্রবাবু আমায় বললেন—বাড়িটা কেনা হয়ে গেলে আপনাদের পাঁচ জনকে নিয়ে এক দিন আমোদ-আহ্লাদ করব।

হা হা করে হেসে উঠলেন হরিসাধন বাবু। কেমন বলেছিলাম কি না। বলেছি মানুষের চালই আলাদা। পাড়াটার হাল যদি এক বছরে বদলে না দেন উনি—ত কি বলেছি!

৬

হরিসাধনের ভবিষ্যদ্বাণী মিথ্যা হ'ল না। গলিটা অতঃপর দ্রুত উন্নতির ধাপগুলি অতিক্রম করতে লাগল। আরও চারটে ল্যাম্পপোষ্ট এল—রাস্তার আবলের জলবাহী পাইপের পরিবর্তন হ'ল। তারপর একদিন জরাজীর্ণ বাড়ি-মালিকদের ওপর নোটিশ জারি হ'ল। ইমারতগুলি নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে সুসংস্কৃত না হলে পথচারীর প্রাণহানির দায়িত্ব বহন করতে হবে মালিকদের।

উমাপদ প্রমাদ গুণে বললেন, হ'ল ত! এবার আলো আর হাওয়া খেয়ে প্রাণ ঠাণ্ডা কর সবাই।

দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে অতুল্য বললেন, তাই ত, এ যে হিতে বিপরীত হ'ল হে! এ রকম উন্নতি আরম্ভ করলে কারও ভিটেমাটি বজায় থাকবে কি?

ইন্দুভূষণ বললেন, আমি সেই কালেই বলেছিলাম ভাই—খাল কেটে কুমীর ডেকে এনো না—এনো না—

উমাপদ খিঁচিয়ে উঠলেন, আমরা ডেকেছিলাম? বলেছিলাম গলায় কাপড় দিয়ে হাতজোড় করে—দয়াময় প্রভু—এ গলিতে এসে আমাদের উদ্ধার কর!

হরিসাধন বললেন, চল সকলে মিলে ওঁর কাছে যাই। বলিগে উন্নতিতে কাজ নেই চন্দ্রবাবু, আমরা বেশ আছি।

ইন্দুভূষণ বললেন, উন্নতির নেশা চাগলে রক্ষে নেই। শেষ পর্য্যন্ত না পৌছে যে রেহাই পাব তা ভেব না।

যাই হউক চন্দ্রকুমার বাবুর কাছেই চল।

৭

সমস্ত শুনে একমুখ হেসে চন্দ্রকুমার বললেন, মশাই, কালের গতি সামনে না পেছনে? দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের আওতার থেকে পলাশীর স্বপ্ন দেখলে চলে কখনও! যা আপনাদের তিনপুরুষের সাধ্যে হয় নি—একার ক্ষমতায় তাই সম্ভব করেছি। এতে সহায় না হয়ে বাধা দেওয়াটা সত্যিই লজ্জার নয় কি? কর্পোরেশনের আইন ভাঙবার সাধ্য আমার নেই। বেশ ত, বেচে মেরামত করান বাড়ি-ঘর-দোর। পাড়ার শ্রী ফিরে যাক, মা-লক্ষ্মী হাসতে থাকুন।

ইন্দুভূষণ বললেন, টাকা—টাকা পাব কোথায় আমরা?

টাকা! উচ্চহাস্য করে উঠলেন চন্দ্রকুমার। টাকার জন্ত ভাবনা কি। কত টাকা দরকার আপনাদের বলুন? আমি যখন রয়েছি—বলে আর একবার অমায়িক ভাবে হাসলেন।

বাড়ি ফিরে এসে উমাপদ রাগ করে বললেন, যায় যাক ভদ্রাসন—ঋণ করে বাড়ি মেরামত করাব না। শেষ পরে ওই মিস্তিরদের দশা হবে।

অতুল্য বললেন, বেনা দুনিয়াশুদ্ধ লোক করছে—আমার শোধও দিচ্ছে। তা বলে এক কথায় বাড়ি ছেড়ে চলে যাওয়াও মূর্খতা নয় কি?

হরিসাধন বললেন, ঠিক বলেছ অতুল্য।—আমাদের অবস্থা চিরদিনই যে এই রকম থাকবে তার মানে কি।

উমাপদ বললেন, কলম পিষে লাখ টাকার স্বপ্ন তোমরা দেখতে চাও—দেখ, আমি দেখছি একটিই পথ। আজ ভিটে বেচে যে ক'টা টাকা পাব তাই দিয়ে অন্ত কোথাও একখানা ঘর হয়ত বাঁধতে পারব, কোন পাড়াগাঁয়েও—কিন্তু দেনা করলে—

অতুল্য ও হরিসাধন প্রাণপণ যত্নে উমাপদকে বোঝাতে লাগলেন।

উমাপদ মাথা নেড়ে বললেন, না ভাই, নিজের বুদ্ধিতে ফকির হওয়া ভাল ত পরের বুদ্ধিতে আমীর হওয়া কিছু নয়। আমি বাড়ি বিক্রী করে দেব।

মাসখানেকের মধ্যে উমাপদরা বাড়ি বিক্রী করে পাড়া ছেড়ে চলে গেলেন। পথের দ্বিতীয় বাঁকটা ঘুচল।

তারপর তৃতীয় বাঁকটাও ঘুচল অত্যন্ত আকস্মিক ভাবে। ইন্দুভূষণ উমাপদর পদাঙ্ক অনুসরণ করে অবশ্য নয়—বাড়িটা ছাড়তে বাধ্য হইলেন।

৮

চতুর্থ বাঁকটাও হয়ত অবিলম্বে ঘুচত, কিন্তু হরিসাধন ও অতুল্য নবসমৃদ্ধ গলিটার অবাধ আলো-হাওয়া দেখে প্রলুব্ধ হয়ে উঠলেন। তা ছাড়া বৃদ্ধ বয়সে অন্য কোথাও গিয়ে নূতন করে ঘর গুছিয়ে বসবার সাহসও ওঁদের ছিল না।

চন্দ্রকুমার বললেন, না না, যাবেন না আপনারা। আপনারা গেলে কাকে নিয়ে থাকব পাড়াতে! বলুন কত

টাকা চাই। ভাল করে ভিৎ পত্তন করে নতুন করে তুলুন ইমারত। বাঁচার মত বাঁচুন।

তাই হ'ল। সম্পূর্ণ নতুন হয়ে বাড়ি দুখানা আকাশে মাথা তুলে দাঁড়াল। দু'পাশের আলো এসে তাকে কোলে টেনে নিলে, বায়ুর দাক্ষিণ্যে দেহমন পুলকিত হয়ে উঠল।

দুই বন্ধুতে গলিতে ঢুকবার মুখে প্রায়ই বলেন, দেখ দেখ কেমন দেখাচ্ছে। কি সুন্দর!

হরিসাধন বললেন, সেদিন বেয়াই এসেছিলেন। বললেন, বাঃ এ যে স্বর্গে বাস করছেন বেয়াই। কি ছিল—কি হয়েছে!

সত্যি উমাপদটা কি বোকা! অতুল্য হাসলেন।

৯

চওড়া রান্নাঘরের মধ্যেই সেদিন বাজারের থলে রেখে হরিসাধন একখান পিঁড়ি টেনে নিয়ে বসলেন, বললেন আজ ভাল করে দই ইলিস রাঁধ দেখি। গঙ্গার টাটকা ইলিস—আর চিনি পাতা দই নিয়ে এলাম।

বিমলা হাসি মুখ ফিরিয়ে বললেন, তার চেয়ে কাঁচা ঝাল দিয়ে রাঁধি কি সেদ্ধ করি।

যা তোমার খুশী। বলে হরিসাধন বাজারের থলিটা মেঝের উপুড় করলেন। রজতবরণ নধর ইলিস মাছটা মেঝের পড়তেই লাল অক্সাইডের মেঝেটা হেসে উঠল সেই মুহূর্তে। মুগ্ধ লোভাতুর দৃষ্টিতে সেইদিকে চেয়ে হরিসাধন বললেন, কি সুন্দর মাছটা। দেখ—

বিমলা মাছটার পানে চেয়ে মুগ্ধ দৃষ্টিতে বললেন, সত্যিই সুন্দর! কত নিলে?

বল দেখি? বলে পরম স্নেহে মাছটার গায়ে হাত বুলিয়ে হরিসাধন অভিভূত হয়ে গেলেন। এমন সময় জানালা দিয়ে একটা দমকা বাতাস আসতেই একখানা কাগজ উড়ে এসে মাছটার গায়ে পড়ল।

বিমলা তাড়াতাড়ি বললেন, এই দেখ ভুলো মন! কাগজটা এইমাত্তর গন্ধ নিয়ে এল। বললে জরুরি, দেখতে হ'ল।

সেই হাতেই কাগজখানা তুলে নিলেন হরিসাধনবাবু।

বিমলা বললেন, আঃ, আঁশ করলে ত! তোমার ঘটে যদি একটুও বুদ্ধি আছে!

হরিসাধন উলটে-পালটে তখন কাগজখানা দেখছেন। আদালতের মোহরযুক্ত নোটিশ। না পড়েও এর মর্ম্মটি বলে দিতে পারেন তিনি। ইন্দুভূষণের হাতেও একদিন এই রকম কাগজ একখানা এসেছিল। তাঁর চোখের দৃষ্টিতে মূঢ়তা ও বেদনা সেদিন এমনই ঘন হয়ে ফুটেছিল। হরিশ—শশী—অচিন্ত্য আরও অনেক স্বপ্ন-স্বগভোগী চন্দ্রকুমারের অধমর্ণেরা এই রকম বিজ্ঞপ্তি পেয়েছিলেন একে একে। তারপর? তারপর গলিটার আরও উন্নতি হয়েছে। তৃতীয় বাঁকটাও ওর ঘুচে গিয়ে প্রশস্ত রাজপথ থেকে সরল বাহু মেলে নির্দ্দেশ করছে হরিসাধন ও অতুল্যদের বাড়ী দুখানাকে। এ বাধাও শীঘ্র ঘুচবে। এই বাহু আরও প্রসারিত হবে। হরিসাধন স্পষ্ট বুঝলেন, পরাণুগ্রহে যে বাড়ি পথের লক্ষ্যে এসে দাঁড়িয়েছে—তাকে নেপথ্যে পাঠাবার জন্যই এই পরোয়ানা। এই বাড়ি দুখানার পিছনে যে নবনির্ম্মিত প্রাসাদ চন্দ্রকুমারকে বুকে নিয়ে সগৌরবে আকাশে মাথা তুলে দাঁড়িয়েছে—সে-ই এগিয়ে আসছে সামনে। অতঃপর পথকে সেই দেবে নির্দ্দেশ। বলবে পথকে, তোমার সাধনা শেষ হয়েছে—আমি এসেছি। চেয়ে দেখ সবাই—আমি এসেছি।

কি গো—অমন থ' মেরে রইলে যে? কিসের কাগজ ওখানা? বিমলা বিস্ময়ে প্রশ্ন করলেন।

হরিসাধন কোন কথা না বলে কাগজখানা হাতে করে দ্রুত বাড়ির বাইরে এসে দাঁড়ালেন।

পথে অতুল্যের সঙ্গে দেখা। তাঁর হাতে ঐ জাতীয় একখানা কাগজ মুখে দুশ্চিন্তার কালিমা।

মুখোমুখি দাঁড়ালেন দুই বন্ধু। কারও মুখ দিয়ে কথা বার হ'ল না। বলবার কথা ছিলই বা কি! কাগজের মারফত গলিটা তার নবজন্মের খাজনা পাঠিয়ে দিয়েছে। একটানা বাতাসের মারফত কাগজ দুখানা পতর পতর শব্দে তাই ঘোষণা করতে লাগল।

স্বাধীন ভারতের শিক্ষাসমস্যা

শ্রীব্রজসুন্দর রায়

স্বাধীন ভারতের শিক্ষাসমস্যার সমাধান এখন প্রধান চিন্তার বিষয়। এই সম্বন্ধে চিন্তা বহুকাল পূর্ব্বে, বিশেষতঃ ১৯০৫ খ্রীষ্টাব্দ হইতে, গভীর ভাবেই করিতেছি। বঙ্গভঙ্গের প্রতিবাদস্বরূপ যে জাতীয় শিক্ষা এবং জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের জন্ম স্বর্গগত রাজা সুবোধচন্দ্র মল্লিক মহাশয় এক লক্ষ টাকা দান করিয়াছিলেন এবং যে দানকে ভিত্তি করিয়া একটি জাতীয় শিক্ষা-পরিষৎ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল, আজ অন্ততঃ বঙ্গদেশবাসীদিগকে সেই কথা স্মরণ করাইয়া দিতেছি।

সেই সময় বাংলাদেশে যে একটা নূতন প্রেরণা আমাদিগকে উদ্বুদ্ধ করিয়াছিল, সেই সম্বন্ধে সন্দেহ নাই। আমরা স্বাধীনতার স্বপ্ন দেখিয়া অনেক কাজ করিয়াছিলাম, অনেক মার খাইয়াছিলাম, ক্ষতি স্বীকারও করিয়াছিলাম, এখন

সেই সমস্ত সার্থক মনে হইতেছে। মঙ্গলময়ের মঙ্গলবিধানে সব কার্য্যই ফলপ্রদ হইয়াছে। এই দেশে তখন অনেকগুলি জাতীয় বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। এখনও বানরীপাড়াতে একটি তাহার সত্তা রক্ষা করিয়া বর্ত্তমান আছে। স্বর্গীয় হরদয়াল নাগ মহাশয় চাঁদপুরে একটিকে বহু দিন বাঁচাইয়া রাখিয়াছিলেন। রংপুরের জাতীয় বিদ্যালয়টি বিশেষ গৌরবের স্থান অধিকার করিয়াছিল। সেই বিদ্যালয়ে কি কি বিষয় কিভাবে পড়ান হইত, সেই সম্বন্ধে কিছু খবর পাঠককে দিব। ইহাতে বুঝা যাইবে স্বাধীন ভারতের শিক্ষাকে কোন্ আদর্শে গড়িতে হইবে। শিক্ষা সম্বন্ধে ইংরেজদের দানটি স্বীকারপূর্ব্বক আমাদিগকে প্রগতিমূলক শিক্ষার ব্যবস্থা করিতে হইবে।

আমাদের ভারতে যে সমস্ত বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, তাহাতে শিক্ষালাভ করিয়া অধিকাংশ লোক গবর্ণমেণ্টের বা অন্য প্রতিষ্ঠানসমূহের অধীনতায় হাকিমী, কেরাণীগিরি, ওকালতি, ডাক্তারী ইত্যাদি কার্য্যের জন্য যোগ্যতা লাভ করিতেছেন। শিল্প, বাণিজ্য, কৃষি প্রভৃতি বিষয়ে দেশের উন্নতিবিধানের জন্য কেহ বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবেশ করেন না; যাঁহারা স্বাধীন বৃত্তি অবলম্বন করেন, যথা আমাদের মাড়োয়ারী বন্ধুগণ, তাঁহারা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিশেষ ধার ধারেন না। ইংরেজী ভাষা ও ইংরেজী সাহিত্যে জ্ঞানলাভ করিয়া আমরা ইংরেজ বনিয়া যাইবার স্বপ্নই দেখিতাম। বড় বড় উকীল, ব্যারিষ্টার, ডাক্তার, অধ্যাপকগণ সকলেই গবর্ণমেণ্টের চাকর হইবার জন্য ব্যগ্র থাকিতেন। আমাদের টোলের অধ্যাপকগণ এবং মাদ্রাসার জবরদস্ত মৌলবীগণও ইংরেজ শাসকগণের অনুগ্রহাকাঙ্ক্ষী হইয়া উঠিয়াছেন। আমাদের মেয়েরাও ইংরেজ মহিলারূপে পরিণত হইবেন, এই মনোভাব আমরা পোষণ করিতাম। জাতীয় শিক্ষায়তনে আমরা এই দাসসুলভ মনোগতির সমালোচনা করিতাম, এবং এই মনোভাব যাহাতে পরিবর্ত্তন করা যায়, তদ্বিষয়ে চিন্তার অনুকূল গ্রন্থাদি পাঠের ব্যবস্থা করিতাম।

জাতীয় শিক্ষা-পরিষদের অধীন স্কুলসমূহে বাংলা ভাষাকে শিক্ষার বাহন (medium) করা হইয়াছিল এবং ইংরেজী ভাষাকে compulsory second language রূপে শিক্ষা দেওয়া হইত। ইতিহাস, ভূগোল, অঙ্ক প্রভৃতি বাংলা ভাষায় শিক্ষা দেওয়া হইত। ইতিহাস শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে পৌরাণিক গল্পগাছার কথাও কিছু কিছু বলা হইত। ভারতের ও ইংলণ্ডের ইতিহাস উভয়ই এমন ভাবে পড়ান হইত, যাহাতে ছাত্রগণ ইতিহাসের মূল সত্যগুলি বুঝিতে পারে। এই সমস্ত বিষয় বেলা এগারোটা হইতে বিকাল ৪টা পর্য্যন্ত অধ্যাপিত হইত। কিন্তু প্রাতে ছাত্রগণকে মধ্যে মধ্যে কাঠের ও লোহার কাজ শিক্ষা দেওয়া হইত। এই কাজের ভার ছিল এক জন সুদক্ষ মিস্ত্রী এবং এক জন foreman mechanic পাস শিক্ষকের উপর। তাঁতের কাজ শিক্ষা দেওয়ার চেষ্টা রংপুরে কিছু করা হইয়াছিল। জাতীয় বিদ্যালয়ের ছাত্রগণ গবর্ণমেণ্টের অধীনে চাকুরী পাইবে না, সুতরাং তাহারা যাহাতে কোন ব্যবসায় বা কোন শিল্পকার্য্য অবলম্বন করিয়া জীবিকা অর্জ্জন করিতে পারে তাহার জন্য চেষ্টা করা হইত। অনেক সময় ছাত্রগণ ভবিষ্যতে তাহারা কি করিবে জিজ্ঞাসা করিলে, তাহাদিগকে বলা হইত, "তোমার অস্ত্র শাণিত কর; অস্ত্র ধারাল হইলে সব জিনিষ তাহা দ্বারা কাটা যায়; তোমরাও প্রখর জ্ঞানবুদ্ধি-দ্বারা দেশের সব কাজ করিতে পারিবে।" এখন ত দেখিতেছি সেই সময় উপস্থিত, যখন আমাদের বংশধরেরা আর ইংরেজের "গোলাম" সাজিবার সুবিধা পাইবে না; তাহাদিগকে দেশের "সব কাজ" করিতে হইবে। তাহারা হবে স্বাধীন মানুষ। তাহারা যাহাতে স্বাধীন কোন বৃত্তি অবলম্বন করিতে পারে তদুপযোগী শিক্ষা তাহাদিগকে দিতে হইবে। স্বাধীন দেশসমূহে যে ভাবে শিক্ষার ব্যবস্থা করা হইয়াছে এবং যেভাবে সকল বালক-বালিকাকে স্বাবলম্বী করিয়া তোলার চেষ্টা হইতেছে, তদ্বিষয়ে মনোযোগ দিতে হইবে। প্রায় এক শত বৎসরে গঠিত চাকুরীজীবীর মনোবৃত্তির গঠন তিন কি চার পুরুষ ধরিয়া চলিতেছে। তাহার পরিবর্ত্তে স্বাধীন মানুষের মনোভাব প্রতিষ্ঠিত হইবে। এই পরিবর্ত্তন কি ভাবে ঘটাইতে হইবে, তদ্বিষয়ে আমার ৪৪ বৎসরব্যাপী শিক্ষাদান-কার্য্যের অভিজ্ঞতা হইতে কিঞ্চিৎ নিবেদন করিতেছি।

আমাদের নূতন শিক্ষা-ব্যবস্থায় প্রত্যেক বালক যাহাতে তাহার নাগরিকের কার্য্য (civil এবং military duties) সম্পন্ন করার জন্য প্রস্তুত হইতে পারে, তাহার ব্যবস্থা করিতে হইবে। জীবিকা সংগ্রহ পশুপক্ষীও করে, কিন্তু মানুষ সমাজে বাস করে। সমাজের পরিস্থিতি রক্ষা করা ও এই পরিস্থিতিকে অগ্রগতি করিয়া উন্নতির সোপানে আরূঢ় করিয়া দেওয়ার জন্য সকলেই চেষ্টা করিবে। ইহাই বাঞ্ছনীয়। তজ্জন্য তাহার নৈতিক চরিত্র-গঠনের আবশ্যকতা রহিয়াছে। উদার ভাবে সার্ব্বভৌমিক ধর্ম্মতত্ত্ব সম্বন্ধে কিছু কথা না বলিয়া নৈতিক উপদেশ দেওয়া সম্ভব নহে। সুতরাং সময় সময় এই সব বিষয় সম্বন্ধেও ছাত্রগণের সহিত আলোচনা করার প্রয়োজন রহিয়াছে। মতবিশেষের পোষক সাম্প্রদায়িক ধর্ম্মকথা না বলিয়াও মানবমাত্রের অন্তরে যে বিশ্বাস নিহিত রহিয়াছে, সেই সম্বন্ধে উপদেশ দেওয়া যায়। শ্রেষ্ঠ মানবগণ সর্ব্বদাই এই ভাবের ধর্ম্মের কথা আজকাল বলেন। অল্পবয়স্ক বালকবালিকারাও এই সব কথা বুঝিতে পারে। ধ্রুব এবং প্রহ্লাদের উপাখ্যান হইতে আমরা এই শিক্ষাই লাভ করি। পূর্ব্বে অষ্টম বর্ষবয়স্ক বালককে উপনয়ন দীক্ষাদান করিয়া ঈশ্বর চিন্তা করিতে শিক্ষা দেওয়া হইত। এখনকার আট বৎসরের বালক পূর্ব্বের আট বৎসরের বালক অপেক্ষা অধিক বিকশিত বলিয়াই আমাদের বিশ্বাস। বালক-বালিকারা বারো-তেরো বৎসর বয়স পর্য্যন্ত এক শিক্ষাই লাভ করিবে, ইহাই সমীচীন মত। বারো হইতে পনেরো কি ষোল পর্য্যন্ত বালিকাদিগকে কিঞ্চিৎ পৃথক ভাবে শিক্ষা দিতে হইবে।

আধুনিক শিক্ষাতে বৈজ্ঞানিক তত্ত্বসমূহ শিক্ষাদানের ব্যবস্থা করিতে হইবে। মৌখিক বক্তৃতাদ্বারা বিজ্ঞানের অনেক কথা অতি সহজে বালক-বালিকাদিগকে বলা যায়। রংপুর জাতীয় বিদ্যালয়ে একজন বিজ্ঞানশিক্ষক নিযুক্ত করা হইয়াছিল। তিনি একটি Syllabus প্রস্তুত করিয়াছিলেন। তাহা অবলম্বন করিয়া নিয়ত প্রত্যেক শ্রেণীর ছাত্রদিগকে উদ্ভিদতত্ত্ব, স্বাস্থ্যতত্ত্ব, কৃষিতত্ত্ব ইত্যাদি বিষয়ে গল্প বলিতেন। ছেলেরা বাড়ী হইতে ফুল এবং পাতা লইয়া আসিত, তাহাদের পাপড়ি গণনা করিত, পাতার ছবি অঙ্কিত করিত, পশুপক্ষীরও ছবি অঙ্কিত করান হইত, তাহাদিগকে দূরত্ব অনুমান করার জন্য একটি Chain ব্যবহার করা হইত, ওজন অনুমান করার জন্য একটি বাটখারা ও ইট-পাটকেল ব্যবহার করা হইত; aim করা শিক্ষাদানের জন্য কিছু দূরে প্রোথিত একটা লৌহদণ্ডকে ইটের টুকরা দিয়া তাক করিতে শিক্ষা দেওয়া হইত, তাহাদিগকে বৃক্ষারোহণেও অভ্যস্ত করা হইত। ইন্দ্রিয়গুলি ব্যবহার করিয়া পর্য্যবেক্ষণের অভ্যাস গঠন সম্বন্ধে কথা বলা হইত। প্রত্যেক শনিবার সন্ধ্যার সময় মিলিত হইয়া ছাত্রগণ সমাজতত্ত্ব, ধর্মতত্ত্ব, নীতিতত্ত্ববিষয়ক প্রশ্নসমূহের আলোচনা করিত। একজন শিক্ষক বসিয়া তাহাদের আলোচনা শুনিতেন এবং আলোচনা যাহাতে প্রশ্নের সমাধান সম্বন্ধে ঠিক পথে চলে, ইহা দেখিতেন। ছাত্রগণকে এই সব সম্বন্ধে উপযোগী পুস্তক পাঠ করিতেও উপদেশ দেওয়া হইত। ইহাতে ছাত্রগণের মধ্যে স্বাধীন চিন্তার উদ্রেক দেখা যাইত। তাঁহাদের মধ্যে কেহ কেহ এখন প্রসিদ্ধ গ্রন্থকার হইয়াছেন। স্বাবলম্বী হইতে শিক্ষা দেওয়াই শিক্ষার প্রধান উদ্দেশ্য হওয়া উচিত। তাহাদিগকে পরীক্ষা পাস অপেক্ষা জ্ঞানার্জনে এবং স্বাধীনভাবে চিন্তা করিতে উৎসাহ দেওয়া হইত। আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপকগণের মধ্যে কেহ কেহ এই শিক্ষা-প্রণালীর উচ্ছ্বসিত প্রশংসা আমাদের নিকট করিয়া স্বকীয় ঋণ স্বীকার করিয়াছেন।

প্রত্যেক স্কুলে যদি একটি Radio রাখার ব্যবস্থা করা যায়, তাহা হইলে দেশের সমস্ত স্কুলের ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণীর বালকদিগকে নানা বিষয়ের তত্ত্ব বিশেষজ্ঞগণের দ্বারা সপ্তাহে বা পক্ষে এক দিন বলাবার ব্যবস্থা খুব ব্যয়সাধ্য হইবে না। সিনেমাগুলিতেও সপ্তাহে বা পক্ষে এক দিন শিক্ষাবিষয়ক ছবি প্রদর্শনের ব্যবস্থা করিয়া শিক্ষার গতিকে দ্রুত পরিচালিত করা যায়। পরীক্ষা করার রীতি পরিবর্ত্তিত হওয়া প্রয়োজন। সার্টিফিকেটের মূল্য আছে, কিন্তু কিভাবে পরীক্ষা গ্রহণ করার পর সার্টিফিকেট দিতে হইবে, তদ্বিষয়ে চিন্তা করা আবশ্যক।

গবর্ণমেণ্ট অধ্যাপকগণের দ্বারা সমস্ত স্কুলপাঠ্য গ্রন্থাদি মুদ্রিত করিবেন, এবং ছাত্রছাত্রীগণকে বিনা মূল্যে বা স্বল্প মূল্যে এই সব গ্রন্থাদি দেওয়ার ব্যবস্থা করিবেন। শিক্ষাদান করার জন্য অর্থ সংগ্রহ করিতে হইবে। ধনীলোকদিগের ধনের একটা অংশ বাজেয়াপ্ত করিয়া এই মহৎ কাজ করিলে কিছুই অন্যায় হইবে মনে করি না। জমিদারগণের জমিদারী কাড়িয়া লওয়ার ত ব্যবস্থা হইতেছে। অন্য প্রকার সম্পত্তির অংশও কাড়িয়া লইয়া দেশের আপামর সকলকে শিক্ষাদান করিতে হইবে, লোকের স্বাস্থ্যের উন্নতি করিতে হইবে। খাদ্য উৎপাদনের জন্য যদি ধনী লোকের ধনের একটা অংশ কাড়িয়া লওয়া হয়, তাহাতে অন্যায় করা হইবে না। শত্রুর সঙ্গে যুদ্ধের সময় ত "forced loans" লওয়া হইয়াছে। অজ্ঞতা অসুরের বা দুর্ভিক্ষ এবং মহামারীরূপ অসুরের সহিত যুদ্ধে যদি "Benevolence"-এর ন্যায় কিছু কিছু ধন কাড়িয়া লওয়া হয়, তাহাতে পাপ হইবে না। গবর্ণমেণ্ট নিজে যদি চোর না হন এবং টাকাটা দেশের কাজে ব্যয় করেন, তবে দেশের লোকেরা আনন্দের সহিত সঞ্চিত ধনের একটা অংশ দান করিবে। ইংলণ্ড এবং আমেরিকাতে যে ভাবে Death Duty আদায় করা হয় এখানেও তাহা করা যাইতে পারে।

আমাদের শিক্ষামন্ত্রিগণ যদি অভিজ্ঞ শিক্ষক, শিক্ষিকা এবং অধ্যাপক, অধ্যাপিকাগণের সহিত পরামর্শ করিয়া দেশকে তুলিয়া ধরার জন্য লক্ষ্য করেন, তাহাতে সুফল হইবে বিশ্বাস করি। শিক্ষাদানের উত্তম ব্যবস্থা যাহাতে ঘটান যায়, তদ্বিষয়ে আমাদের সকলকেই চেষ্টা করিতে হইবে। এখন ত চাকুরীর বা গোলামির জন্য উদ্গ্রীব হইতে হইবে না। যাহাতে দেশের প্রকৃত শিক্ষা লাভ হয়, তদ্বিষয়ে চিন্তা করিতে হইবে। যুদ্ধবিদ্যাও সকল যুবককেই শিখাইতে হইবে। তজ্জন্যও বিপুল আয়োজন প্রয়োজন। Bank Balance বাড়ানো আর আমাদের সাম্প্রতিক প্রয়োজন নহে। দেশরক্ষা, মানুষকে মনুষ্যপদবীতে উন্নত করা ও দেশের চেহারা বদলাইয়া স্বাধীনতা মন্ত্রের সাধক সকলকে করিয়া দেওয়া আমাদের উদ্দেশ্য হইবে।
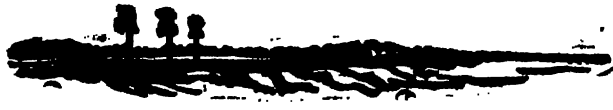
হটী বিদ্যালঙ্কার

শ্রীদীনেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য

ভারতীয় বিদুষী রমণীগণের নামকীর্ত্তনকালে আমরা পৌরাণিক যুগের গার্গী, মৈত্রেয়ী প্রভৃতি এবং ঐতিহাসিক যুগের মণ্ডন-মিশ্রপত্নী উভয়ভারতী, অহল্যাবাই, রাণীভবানী প্রভৃতির উল্লেখ করিয়াই গৌরব বোধ করিয়া থাকি। কিন্তু বঙ্গবিদুষী হটী বিদ্যালঙ্কারের সহিত কাঁহারও তুলনা হয় না। ভারতীয় স্ত্রী-শিক্ষার ইতিহাসে তিনি একাকিনী এক বিশিষ্ট আসন অধিকার করিয়া আছেন। বঙ্গদেশে টোল চতুষ্পাঠির গৌরবময় যুগে যোজনা দেবী,* জয়ন্তী দেবী,† প্রিয়ম্বদা দেবী, আনন্দময়ী প্রভৃতি মহাবিদুষী মহিলার অসদ্ভাব ঘটে নাই। কিন্তু শঙ্কর তর্কবাগীশ, জগন্নাথ তর্কপঞ্চানন প্রভৃতি মহাপণ্ডিতগণের সম-সময়ে কাশীধামে বসিয়া "বিদ্যালঙ্কার" উপাধি গ্রহণপূর্ব্বক রীতিমত চতুষ্পাঠি করিয়া যিনি নানাদেশীয় বহু ছাত্রকে নব্য-ন্যায়াদি দুরূহ শাস্ত্র পড়াইয়াছিলেন, তাঁহার কীর্ত্তি যেমন এক দিকে অনন্যসাধারণ তেমনই তৎকালীন বিদ্বৎসমাজের কুসংস্কার-হীন উদারতাও অপর দিকে তাঁহার জীবনকাহিনী বিশেষ ভাবে সূচিত করে। এই বিদুষী রমণীর সম্বন্ধে যাহা কিছু জ্ঞাত হওয়া যায় তাহাই শ্রদ্ধাসহকারে প্রকাশিত হওয়া উচিত এবং শ্রদ্ধেয় শ্রীযুত ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁহার সম্বন্ধে যাবতীয় সংবাদ প্রকাশ করিলেও ('সংবাদপত্রে সেকালের কথা', প্রথম খণ্ড, ২য় সংস্করণ, পৃ. ৪০৮) বর্ত্তমান প্রবন্ধে তাহার পুনরালোচনা দ্বারা স্মৃতিরক্ষা সূচিত হইল।

পাদ্রী ওয়ার্ড সাহেবের সুবিখ্যাত 'হিন্দু' গ্রন্থের প্রথম সংস্করণ রচনাকালে হটী বিদ্যালঙ্কার জীবিত ছিলেন। তাঁহার জীবদ্দশায় লিখিত বিবরণটি অবিকল উদ্ধৃত হইল:—

I am informed that at present there is a female philosopher at Benares, whose name is Hutee Vidyalunkara. She was born in Bengal, her father was a koolinu bramhun; her husband also was a koolinu. It is not the practice of the koolinu bramhuns, when they marry the daughters of koolinus, to take these wives to their own houses, but they stay with their parents. Thus it was with Hutee. Her father being a learned man instructed his daughter in the knowledge of several shastrus; he particularly taught her the sungskritu grammar, and the kavya shastrus. However ridiculous the notion may be, that if a woman pursue learning she will become a widow, the husband of Hutee left her a widow. Her father also died; and in consequence she fell into great distress. In these circumstances, like many others, who are tired of the world, he went to reside at Benares. Here she pursued learning afresh, and got some little knowledge of the smritee and other shastrus. At length she began to teach others, and obtained a number of pupils, who came to her from different parts; so that she is now universally known in those parts by the name of Hutee Vidyalunkara, viz. learning is her ornament.

(*Account of the Writings, Religion and Manners of the Hindoos*, Vol. I, Jan. 1811. p. 195-6.)

লক্ষ্য করিতে হইবে উক্ত বিবরণের দুই স্থলেই সাহেব হটীর উপাধি "বিদ্যালঙ্কারা" বলিয়া লিখিয়াছেন—ইহা বহু-ব্রীহি-নিষ্পন্ন স্ত্রীলিঙ্গ শব্দ। উক্ত গ্রন্থের পরবর্ত্তী সংস্করণে কিন্তু "বিদ্যালঙ্কার" (পুংলিঙ্গ) উপাধিই পাওয়া যায়—ষষ্ঠীতৎপুরুষ সমাসে তাহাও বিশুদ্ধ বটে।

ওয়ার্ড সাহেবের এই গ্রন্থ ১৮১১ খ্রীষ্টাব্দে মুদ্রিত হইলেও প্রথম খণ্ডের প্রকৃত রচনাকাল কিছু পূর্ব্ববর্ত্তী। কারণ, তৎকালে জগন্নাথ তর্কপঞ্চাননও জীবিত ছিলেন (Vol. I, p. 200) এবং দ্বিতীয় খণ্ডে (p. 315) ১৭২৯ শকাব্দের (১৮০৭ ৮ খ্রীঃ) পঞ্জীর উল্লেখ দৃষ্ট হয়। তৃতীয় খণ্ডে (p. 251 *f. n*) জগন্নাথের মৃত্যুসম্বাদ লিখিত হইয়াছে। সুতরাং প্রথমাংশের রচনাকাল ১৮০৬-৭ সন বলিয়া নিঃসন্দেহে ধরা যায় এবং তৎকালে হটী বিদ্যালঙ্কার জীবিত ছিলেন। পক্ষান্তরে গ্রন্থের দ্বিতীয় সংস্করণ শ্রীরামপুর হইতে ১৮১৮ সনের জানু-য়ারি মাসে যে প্রকাশিত হয় তন্মধ্যে (pp. 598-99) হটী বিদ্যালঙ্কারের বিবরণে লেখা আছে—A few years ago, there lived… অর্থাৎ ১৮১৭ সনের কয়েক বৎসর পূর্ব্বেই

---

* কলাপপরিশিষ্টের টীকাকার সুবিখ্যাত গোপীনাথ তর্কাচার্য্যের মাতা এবং পশুপতি আচার্য্যদিগের পত্নী। প্রচলিত প্রবাদ অনুসারে তিনি স্বামীর অনুপস্থিতিতে চতুষ্পাঠীর ছাত্রদের অধ্যাপনা করিতেন। তিনি রাঢ়ীয় শ্রেণী, শাণ্ডিল্যগোত্র এবং প্রায় ১৫২৫ খ্রীঃ বিদ্যমান ছিলেন।

† হরিদেব শাস্ত্রী রচিত "ভারতের শিক্ষিত মহিলা" নামক গ্রন্থে (১৩১৭) কোটালিপাড়া সমাজের এই তিন জন বিদুষীর বিবরণ মুদ্রিত হয়। জয়ন্তী দেবী (বৈজয়ন্তী নহে) স্বামীর সহিত একযোগে "আনন্দলতিকা" নামক কাব্যগ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন (১৫৮৩ শক)। উক্ত গ্রন্থ কলিকাতা সংস্কৃত সাহিত্য-পরিষৎ হইতে মুদ্রিতপ্রায়। 'অর্চ্চনা' পত্রিকায় (দশম খণ্ড, পৃ. ১৪-১৯) জয়ন্তী দেবীর জীবনী দ্রষ্টব্য।

তিনি স্বর্গতা হইয়াছিলেন। লক্ষ্য করিতে হইবে, উক্ত গ্রন্থের তৃতীয় সংস্করণের প্রথম দুই খণ্ড ১৮১৭ সনে লণ্ডনে মুদ্রিত হইলেও এবং তাহার উৎসর্গপত্রে ভুল ১৮১৫ সন লিখিত থাকিলেও তৃতীয় সংস্করণের শেষ দুই খণ্ড উক্ত শ্রীরামপুর সংস্করণের পুনর্মুদ্রণ মাত্র বটে (১৮২০ সনে) এবং যে অংশে হটী বিদ্যালঙ্কারের বিবরণ আছে তাহা ১৮১৭ সনেই রচিত—তৎপূর্ব্বে নহে। এতদনুসারে হটী বিদ্যালঙ্কারের মৃত্যুকাল নিঃসন্দিগ্ধ রূপে প্রায় ১৮১০ সন নির্ণয় করা যায়। ফলে তিনি জগন্নাথ তর্কপঞ্চাননের সমসাময়িক ছিলেন সন্দেহ নাই। ব্যাকরণ ও স্মৃতিশাস্ত্র ব্যতীত তিনি যে দুরূহ নব্যন্যায়শাস্ত্রেও পঠন-পাঠনা করিয়াছেন, ওয়ার্ড সাহেব তাঁহাকে 'দার্শনিক' (philosopher) বলায় তাহা সূচিত হয় এবং নব্যন্যায়ের শেষ পরিণতির যুগে তাঁহার এই কৃতির সর্ব্বাপেক্ষা গৌরবাত্মক ও আশ্চর্য্যজনক। তাঁহার পরিচয় সম্বন্ধে এই মাত্র জানা গিয়াছে যে তাঁহার পিতা রাঢ়ীয় শ্রেণীর কুলীন ব্রাহ্মণ ছিলেন এবং বর্দ্ধমান জেলার "সোঞাই" গ্রামে তাঁহার বাড়ী ছিল। সোঞাই গ্রামে এক সময়ে বহু পণ্ডিত বিদ্যমান ছিলেন। সেখানে অনুসন্ধান করিয়া হটীর পিতৃকুল ও পতিকুলের সঠিক পরিচয় উদ্ধার করা যায় কিনা চেষ্টা করা উচিত।

'শান্তিপুর-পরিচয়' গ্রন্থের ২য় ভাগে (১৩৪৯ সন) লিখিত হইয়াছে (পৃ. ২৮৩-৪) শান্তিপুরের সুবিখ্যাত গোস্বামী ভট্টাচার্য্য হটী বিদ্যালঙ্কারের নিকট শাস্ত্রীয় উপদেশ গ্রহণ করিয়াছিলেন এবং হটীও শান্তিপুরনিবাসিনী ছিলেন, যদিও তাঁহার পূর্ব্বনিবাস ফরিদপুর জেলায় ছিল। আমরা অনুসন্ধানে জানিয়াছিলাম ইহা নিষ্প্রমাণ প্রবাদ মাত্র। গোস্বামী ভট্টাচার্য্য কাশীধামে অধ্যয়ন করেন নাই, হটীও দেশে থাকিতে অধ্যাপনা করেন নাই এবং তাঁহার পিত্রালয় ত নহেই, পতিগৃহও শান্তিপুরে ছিল কি না তাহার কোনই প্রমাণ নাই। ওয়ার্ড সাহেব স্পষ্টাক্ষরে লিখিয়াছেন হটী কোন কালেই পতিগৃহে বাস করেন নাই।

আমরা ঐ সময়ের একজন মাত্র "হটী দেব্যা" নামক ব্রাহ্মণ বিধবার নাম দেখিয়াছি। নবদ্বীপাধিপতি কৃষ্ণচন্দ্র ১১৬৬ সনে বেলপুখরিয়া নিবাসী "দয়ারাম ন্যায়ালঙ্কার"কে ভূমিদান করেন (নদীয়া কালেক্টরীর ৪১০৮৩ সংখ্যক তায়দাদ দ্রষ্টব্য)। ১২০২ সনে ঐ ভূমির দখলকার ছিলেন দয়ারামের স্ত্রী "শ্রীমতী হটী দেব্যা"। তিনি হটী বিদ্যালঙ্কার হইতে অভিন্ন হইলেও হইতে পারেন।

কালক্রমে বঙ্গদেশে, বিশেষতঃ রাঢ় অঞ্চলে হটী বিদ্যালঙ্কারের নাম প্রবাদবাক্যে পরিণত হইয়াছিল। ১৮৪৯ সনে সিনিয়র স্কলারশিপ্ পরীক্ষায় বাংলা প্রবন্ধের বিষয় ছিল "ভারতবর্ষীয় স্ত্রীজাতির বিদ্যাশিক্ষার ফল বর্ণনা কর।" উৎকৃষ্ট পাঁচটি উত্তর মুদ্রিত হইয়াছে, তন্মধ্যে 'হুগলী বিদ্যালয়ে'র গোপালচন্দ্র ভট্টাচার্য্যের প্রবন্ধের এক স্থলে আছে—"একণে স্ত্রীলোকদিগের উৎকৃষ্ট কর্ম্মাভাবে যে কাল বাসনে ও নিদ্রায় ও কলহে ক্ষেপণ হয় তাহা কাব্যশাস্ত্রাদির বিনোদেতে যাইবে, এবং তন্মধ্যে অনেকে হটীর তুল্যা বিদ্যালঙ্কার হইবেন।" (Rep. of the General Committee of Publ. Instr., 1848-49, App. E, p. CCXLVI.)

"সখা" নামক মাসিক পত্রিকার অষ্টম খণ্ডে (১৮৯০ খ্রীষ্টাব্দের আগস্ট সংখ্যা, পৃ ১২৩-৫) গগনচন্দ্র হোম বর্দ্ধমান জিলার 'কলাইঝুটি' গ্রাম নিবাসী অপর এক আধুনিক "হটু বিদ্যালঙ্কারে"র জীবনী লিখিয়াছিলেন। নারায়ণদাস নামক এক বৈষ্ণবের চিরকুমারী এই কন্যার প্রকৃত নাম "রূপমঞ্জরী" এবং ১২৮২ সনের ১৫ পৌষ প্রায় ১০০ বৎসর বয়সে তিনি স্বর্গতা হন। তিনি কাশীর দণ্ডীদের নিকট অধ্যয়ন করিয়া দেশে আসিয়া পুরুষের ন্যায় শিখা ও উত্তরীয় ধারণ করিতেন এবং সাহিত্য ও বৈদ্যক শাস্ত্রের উপদেশ দিতেন। বলা বাহুল্য তিনি প্রথম হটী বিদ্যালঙ্কারের সহিত অভিন্ন নহেন এবং তাঁহার প্রচলিত নাম ও উপাধি পূর্ব্বতন মহাবিদুষীর স্মৃতি বহন করিয়া গৌরবান্বিত হইয়াছে।

এ কিসের আলোড়ন

শ্রীসুধীরকুমার নন্দী

পুকুরের ঐ কালো ঘোলা জলে জীবনের আয়োজন ?
এ কিসের আলোড়ন ?
বাহির গাঙেতে জোয়ার এসেছে জানি,
কলকুলুকল ভেসে এসেছিল অস্ফুট সেই বাণী,
—শুনি কান পেতে ; দেখি চোখ মেলে, নির্জীব নীল জলে
গোপনে কিসের এত আয়োজন চলে ?
কোন্ নালাপথে, কোন্ সে বেতারে মৃতযুগ অবশেষে,
জীবনদেবতা এলো নটরাজ বেশে ?

আধমরা যত মানুষের বুকে, মুমূর্ষু ঘোলা জলে
বন্যার মত দুরন্ত বেগে বাঁধভাঙা কেন চলে ?
এস এস নটরাজ,
এ মরা পুকুরে, মানুষের বুকে হানো আগুনের বাজ
জ্বলুক, পুড়ুক, খাক হ'য়ে যাক, উড়ো ছাই উড়ে যাক্
বাঁধ দেওয়া জল এবার মুক্তি পাক্,
জন্ম লভুক নতুন মানুষ নতুন মাটির কোলে
ভরুক আকাশ জীবনের কলরোলে।

ঐতিহাসিক আলোচনায় নূতন দৃষ্টি

শ্রীহরিদাস মুখোপাধ্যায়

সকল দেশে সকল যুগে জীর্ণ পুরাতনের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ আসে তরুণের কণ্ঠ থেকে। বিদ্রোহ করতে না পারলে নূতন সৃষ্টি অসম্ভব। সৃষ্টির জন্য সকলের আগে বিদ্রোহের প্রয়োজন। বিদ্রোহ নূতনের আগমনের পথকে সুগম করে। আজ যুগসন্ধিক্ষণে চারদিক থেকে আমাদের কানে ভেসে আসছে এই সৃষ্টিমূলক বিদ্রোহের সুর। আমাদের দেশের ঐতিহাসিক আলোচনার ক্ষেত্রেও সে সুর ধ্বনিত।

সাধারণতঃ "ইতিহাস" বললে সূচিত হয় এমন একটা বিদ্যা বা বিষয় যেখানে অতীত কাহিনী ও ঘটনার কালানুক্রমিক সমাবেশ রয়েছে। এই কাহিনী ব্যক্তিকে কেন্দ্র করে হতে পারে বা সমষ্টিকে কেন্দ্র করে হতে পারে। এই ঘটনা জাতিকে ঘিরে হতে পারে বা রাষ্ট্রকে ঘিরে হতে পারে। মোট কথা এই বিচারে ইতিহাসের প্রধান কারবার অতীত ঘটনা ও কাহিনীকে অবলম্বন করে। দেশের শিক্ষিত মহলের প্রায় অধিকাংশ ব্যক্তিই অনুরূপ ধারণা পোষণ করে চলেছে। এই ধারণার বিরুদ্ধে আজকাল নানা কণ্ঠেই প্রতিবাদ শোনা যায়।

জীবনকে বুঝবার প্রয়াস চলেছে মানুষের কত বিচিত্র পথে, কত বিচিত্র ধারায়। মানুষ যে ছবি আঁকে, কবিতা লেখে, কাব্য সৃষ্টি করে, দর্শন রচনা করে, এদের সকলের মধ্য দিয়েই চলেছে তার জীবনকে উপলব্ধির প্রয়াস। ইতিহাসেও এর ব্যতিক্রম হয় না। ইতিহাসের ভেতর আমরা কোন্ ধরণের জীবন সন্ধান করি? সন্ধান করি "অতীত জীবন,"—তা ব্যক্তিগত হোক বা সমষ্টিগত হোক। এখন প্রশ্ন উঠছে "জীবন" মানে কি? "জীবন" বললেই কতকগুলি ঘটনার সমষ্টি বুঝায়, যদিও ঘটনার সমষ্টিই জীবন নয়। জীবন বললেই বুঝতে হবে দুটি জিনিষ; প্রথমতঃ, কতকগুলি ঘটনা; দ্বিতীয়তঃ, ঘটনাবলীর পশ্চাতে নিহিত শক্তি। দার্শনিক পরিভাষায় প্রথমটিকে বলতে পারি "ফ্যাক্টস্" (Facts), দ্বিতীয়টিকে "ফোরসেস্" (Forces)। এই দুইকে মিলিত করে "জীবন"। ঘটনাগুলি জীবনের বহিঃপ্রকাশ মাত্র। তাদের বীজ রয়েছে অন্তরের গভীরে। মানবমনের সুগভীর আশা, আকাঙ্ক্ষা, আবেগ ও উন্মাদনা সর্বদাই তাকে ঠেলে নিয়ে চলেছে কর্মের পথে। কর্মের ভেতরই রূপায়িত হয়ে ওঠে অন্তরের আশা ও আবেগগুলি। তাই কর্মের উৎস আবিষ্কার করতে হলে আমাদের যেতে হবে মানবমনে, তার তন্ন তন্ন বিশ্লেষণ করতে হবে। এই বিশ্লেষণ যেখানে নেই, সেখানে আমরা জীবনকেও যথার্থভাবে স্পর্শ করতে পারি না।

ইতিহাস আমরা পাঠ করি অতীত জীবনধারাকে বুঝবার জন্য একথা যদি সত্য হয়, তবে স্বীকার করতেই হবে যে, ইতিহাসের ভেতর অতীত ঘটনাবলীর কালানুক্রমিক সমাবেশের সঙ্গে সঙ্গে থাকা চাই তাদের বিস্তৃত বিশ্লেষণ। নচেৎ আলোচনাটা আর "ইতিহাসে"র জাতে উঠবে না, হয়ে থাকবে প্রত্নতত্ত্বের অন্তর্গত। প্রত্নতত্ত্বের কর্মক্ষেত্র অতীত কাহিনী সংগ্রহের মধ্যেই সীমাবদ্ধ, কিন্তু ইতিহাসের ক্ষেত্র তার চেয়ে অনেক বেশী বিস্তৃত। প্রত্নতত্ত্বকে ভিত্তি করে ঐতিহাসিক তার আলোচনা সুরু করলেও, উভয়ের কর্মক্ষেত্র এক নয়। প্রত্নতাত্ত্বিকের পক্ষে অতীত ঘটনাবলীর সঠিক বিবরণই যথেষ্ট বা একমাত্র কাজ। কিন্তু ঐতিহাসিকের নিকট ঘটনাবলীর কালানুক্রমিক সমাবেশটাই গৌণ; তাঁর প্রধান কারবার ঘটনা-বৈচিত্র্যের ভিতর যোগ-সূত্র-স্থাপন এবং অন্তর্নিহিত শক্তি-ধারার বিশ্লেষণ। ইতিহাস লিখতে হলে প্রত্নতত্ত্ববিশারদ হওয়া চাই-ই, যদিও প্রত্নতত্ত্ববিশারদ হলেই কোনো গবেষক ঐতিহাসিক হয়ে দাঁড়ান না। আমাদের দেশে বর্তমানে যাঁরা "ঐতিহাসিক" নামে গণ্য ও পরিচিত, তাঁরা অধিকাংশ ক্ষেত্রেই প্রকৃত বিচারে ঐতিহাসিক নন—তাঁরা প্রত্নতাত্ত্বিক। সেই সকল গবেষকের পাণ্ডিত্য-প্রতিভার প্রতি বিন্দুমাত্র অশ্রদ্ধা প্রদর্শনও বর্তমান লেখকের উদ্দেশ্য নয়। ঐতিহাসিক এক শ্রেণীর পণ্ডিত; প্রত্নতাত্ত্বিক ভিন্ন শ্রেণীর—এ কথাই কেবল পূর্বে উল্লিখিত হয়েছে। ছোট-বড়র প্রশ্ন বর্তমানক্ষেত্রে সম্পূর্ণ অবান্তর।

ইতিহাসের সুপ্রচলিত সংজ্ঞার বিরুদ্ধে নূতনের বিদ্রোহ কোথায় ও কেন, তা পূর্বেই উল্লিখিত হয়েছে। এবার অন্য এক অসম্পূর্ণতার দিকে দৃষ্টি দেওয়া যাক। আমাদের দেশে সচরাচর আজও শিক্ষিত মহলের ধারণা যে, 'ইতিহাস' বিজ্ঞান-পর্যায়ভুক্ত হবার যোগ্য নয়। এ দেশের পণ্ডিতদের গবেষণা-প্রণালীর ধারা বিচার করলে দেখা যায়, তাঁদের ঐতিহাসিক লেখায় আজও বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গীর একান্ত অভাব। ইউরোপেও জ্ঞানের ক্ষেত্রে এক দিন ইতিহাসের এ দুর্গতি ছিল। দার্শনিক কার্ল মার্কসের (১৮১৮-১৮৮৩) সময় থেকে ইতিহাসের এই দুর্গতি-মোচন হয়েছে বলা চলে। মার্কসের পূর্ব পর্যন্ত পণ্ডিত-সমাজের বিচারে ইতিহাসটা ছিল শুধু ঘটনা-কঙ্কালের প্রাণহীন স্তূপ। মার্কস তাঁর তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে অবলোকন করলেন ঘটনা-স্তূপের ভিতর জীবনের অস্তিত্ব, আবিষ্কার করলেন কাহিনীর সমারোহের ভিতর বিচিত্র শক্তিধারার লীলা। এ ভাবে তিনি ইতিহাসকে ষোলকলায় ভূষিত একটা সামাজিক বিজ্ঞানের মূর্তিতে প্রতিষ্ঠিত করলেন। এ কথা সত্য, মার্কস আবিষ্কৃত সকল ঐতিহাসিক সূত্র পরবর্তীকালে পণ্ডিতগণ কর্তৃক স্বীকৃত ও গৃহীত হয় নি। নানা কণ্ঠ থেকে তাঁর প্রবর্তিত আলোচনা—

প্রণালীর বিরুদ্ধে প্রতিবাদ এসেছে। এই প্রতিবাদ শুনেছি মনীষী রার্ট্রাণ্ড রাসেলের "ক্রীডম্ এণ্ড অরগেনাইজেশন্" ("স্বাধীনতা ও সংঘ," লণ্ডন, ১৯৩৪) গ্রন্থে, আবার আমাদের বিনয়কুমার সরকারের "ভিলেজেস্ এণ্ড টাউন্স্ অ্যাজ সোশ্যাল প্যাটার্ন্স্" (পল্লী ও শহরের সামাজিক গড়ন, ১৯৪১) পুস্তকে*। উদাহরণ বাড়িয়ে লাভ নেই। তবু সকল দিক বিচার করে একথা স্বীকার করতেই হবে যে, আধুনিক জগতে বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিতে ঐতিহাসিক আলোচনার ক্ষেত্রে মার্কস আদি গুরু।

পূর্বেই বলা হয়েছে, ইতিহাস একটা বিজ্ঞান। অন্যান্য বিজ্ঞানের মত এই শাস্ত্রেরও বিবিধ সূত্র বা নিয়ম বর্তমান। এ কথা সত্য, জড় বিজ্ঞানের নিয়মাবলী যে পরিমাণে সঠিক ও সুনির্দিষ্ট, ইতিহাসের সূত্রগুলি ততটা সঠিক ও সুনির্দিষ্ট নয়। অর্থশাস্ত্র, রাষ্ট্রশাস্ত্র ইত্যাদির মত ইতিহাসও অন্যতম সামাজিক বিজ্ঞান। সামাজিক জীব হিসাবে সংঘবদ্ধ মানুষের অতীত জীবন আলোচনাই এর লক্ষ্য।

বস্তুনিষ্ঠ বিচারে ইতিহাসের ভেতর সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য সূত্রের নাম: "বিশ্বশক্তির সদ্ব্যবহার"।† একটা জাতির উত্থান বা পতন বিশ্বশক্তির সদ্ব্যবহারের ক্ষমতার উপর বহুলাংশে নির্ভরশীল। এক জন ব্যক্তির জীবন-বিকাশ যেমন নির্ভর করে ব্যক্তিগত ও সামাজিক উভয়বিধ শক্তিধারার উপর, তেমনি একটা জাতির উন্নতি—আর্থিক, সামাজিক, রাষ্ট্রিক ইত্যাদি যে কোন ধরণেরই হোক না কেন,—নির্ভর করে দেশী ও বিদেশী শক্তিগুলির উপর। চারপাশের শক্তিকে যে সদ্ব্যবহার করতে পারে, তারই উন্নতি ঘটে; যে পারে না, তার বিলুপ্তি অনিবার্য।

দ্বিতীয়তঃ সমাজ স্থির ও নিশ্চল নয়। ধাবমান পৃথিবী মহাকালের যাত্রাপথে অবিরত পরিবর্তিত হচ্ছে। নূতন নূতন শক্তি সামাজিক গড়নে সৃষ্ট হচ্ছে এবং আত্মপ্রতিষ্ঠা লাভ করছে; অন্য দিকে দুর্বল পুরাতন শক্তিগুলি নূতনের প্রচণ্ড আঘাতে বিধ্বস্ত ও বিপর্যস্ত হচ্ছে। এই অবস্থায় যে মানুষ বা জাতি জীর্ণ পুরাতনকে বর্জন করে সবল নতুনকে বিচক্ষণতাবে গ্রহণ করতে পারে, পৃথিবীতে তারই সাফল্য সুনিশ্চিত। কাজেই ইতিহাসের দ্বিতীয় সূত্র অহর্নিশ "পরিবর্তন"।

তৃতীয়তঃ, পরিবর্তন সমগতিতে সর্বদা অগ্রসর হয় না। কখনও দ্রুতগতিতে পরিবর্তন আসে, কখনও আবার মন্থর গতিতে পরিবর্তন দেখা দেয়। প্রথম প্রণালীতে যে পরিবর্তন, তার নাম বিপ্লব (Revolution)। দ্বিতীয় প্রণালীতে যে পরিবর্তন তার নাম বিবর্তন (Evolution)। পরিবর্তনের সময় নবজাত বা নবজাগ্রত শক্তিগুলিই যে কেবল ক্রমপরিণতি লাভ করে তা নয়, মাঝে মাঝে আকস্মিক ভাবে নূতন নূতন শক্তিও আবির্ভূত হয়। তখনই মানব-জীবনে বা ইতিহাসের রঙ্গমঞ্চে সুরু হয় বিপ্লবের অভিনয়। "ফান্ডামেন্টাল্ প্রবলেমস্ অব মার্কসিজম্" গ্রন্থে (পৃঃ ৯৫-১০৬) রাশিয়ান পণ্ডিত প্লেখানভ্ এ বিষয়টি অতি সুন্দর ভাবে আলোচনা করেছেন।

চতুর্থতঃ, পরিবর্তনের মূল ধাপগুলি সকল দেশেই একরূপ। মানবজাতি মূলতঃ এক। পৃথিবীর বিভিন্ন অংশে মানবজাতি বিভিন্নভাবে আত্মবিকাশের পথে অগ্রসর হয়। কিন্তু অভি-ব্যক্তির মূলগত ধাপগুলি স্থানীয় বৈচিত্র্য সত্ত্বেও সকল দেশেই মোটামুটিভাবে একরূপ। তবে এ কথা সত্য যে, অভিব্যক্তির স্তরগুলি অতিক্রম করতে সকল দেশের একরূপ সময় নাও লাগতে পারে।

পঞ্চমতঃ, সকল পরিবর্তনের মূলে কেবলমাত্র একটা শক্তি, আর্থিক বা যৌন বা আধ্যাত্মিক শক্তি—কাজ করে না। মানুষ মূলতঃ বহুনিষ্ঠ জীব। বিচিত্র আশা-আকাঙ্ক্ষার সুর তার রক্তের কণায় কণায়। অন্তরের এই বৈচিত্র্য-ভরা আকাঙ্ক্ষা ও আবেগগুলি তার জীবনকে, ইতিহাসের ধারাকে সর্বদাই বিভিন্ন মাত্রায় প্রভাবিত করে চলেছে।

ইতিহাসে আরও অনেক সূত্র আছে। তবে পূর্বোক্ত সূত্রগুলিই বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। বস্তুনিষ্ঠ আলোচনায় দেখা যায় যে, কোন দৈবশক্তির প্রভাবে ঐতিহাসিক অভিব্যক্তি ঘটে না। ইতিহাসের ধারায় আর্থিক, রাষ্ট্রিক ও সামাজিক শক্তির সঙ্গে সঙ্গে নৈসর্গিক (Geographical) শক্তিও কমবেশি প্রভাব বিস্তার করে চলেছে। তা ছাড়া, মানুষের সৃষ্টিধর্মী মনেরও একটা প্রভাব আছে। মানুষ পারিপার্শ্বিক অবস্থার হাতে নিছক যন্ত্র নয়। চারি পাশের বিভিন্ন প্রকারের শক্তি অনুকূল বা প্রতিকূল আবহাওয়া সৃষ্টি করে বটে, কিন্তু এ সবের সদ্ব্যবহার করা বা না-করা নির্ভর করে মানুষের ইচ্ছা ও শক্তির উপর। অবশ্য এই ইচ্ছা এবং শক্তিও আবার অনেকাংশে পূর্ববর্তী আর্থিক-সামাজিক আবেষ্টনীর দ্বারা নিয়ন্ত্রিত ও গঠিত। তবুও মানুষের আত্মার স্বাধীনতা বা ব্যক্তিত্বের স্বরাজ ঐতিহাসিক আলোচনায় স্বতন্ত্রভাবে স্বীকারযোগ্য।

এই নির্দেশিত বিজ্ঞান-সম্মত পন্থায় ইতিহাস-আলোচনা এখনও এদেশে সুরু হয় নি। বোধ হয় তার সময়ও এখন উপস্থিত হয় নি। প্রাচীন ভারত-বিষয়ক গবেষণা এদেশে যথার্থভাবে সুরু হয়েছে বহুদিনের কথা নয়। এ পর্যন্ত অতি-সামান্য তথ্যই আবিষ্কৃত হয়েছে। অসংখ্য তথ্য ও কাহিনী আজও অন্ধকারের গর্ভে প্রচ্ছন্ন রয়েছে। কাজেই যে প্রত্নতত্ত্বকে

* বর্তমান লেখক-প্রণীত "বিপ্লবের পথে বাঙালী নারী" গ্রন্থের তৃতীয় ও চতুর্থ অধ্যায় এই প্রসঙ্গে পঠিতব্য। বইখানি মার্কস বিরোধী বিশ্লেষণের সাক্ষ্য বহন করছে।

† *The Science of History and Hope of Mankind*—Benoy Sarkar.

আশ্রয় করে ঐতিহাসিক তার ব্যাখ্যা বা বিশ্লেষণ আরম্ভ করতে পারেন, সেই ভারতীয় প্রত্নতত্ত্বই আজ পর্যন্ত যথেষ্ট পরিমাণে সমৃদ্ধ হয়ে ওঠে নি। কাজেই যথার্থ ঐতিহাসিক আলোচনা এ দেশে বর্তমানে না-হওয়া মোটেই অস্বাভাবিক নয়। এই কথাটা সকলেরই সুস্পষ্টভাবে স্মরণ রাখা দরকার। তবে সেই সঙ্গে আবার এ কথাও মনে রাখা প্রয়োজন যে, প্রত্নতত্ত্ব আর ইতিহাস এক বিদ্যা নয়, আর বর্তমানে যা ইতিহাস নামে অভিহিত তা প্রকৃতপক্ষে ইতিহাসও নয়। বর্তমানের এই অভাব ও অসম্পূর্ণতার সম্বন্ধে আজ প্রত্যেক উন্নতিকামী ব্যক্তিরই সজাগ হওয়া একান্ত প্রয়োজন।

"মানুষের অধিকারে বঞ্চিত করেছ যারে…"

অধ্যাপক শ্রীসুধাংশুবিমল মুখোপাধ্যায়

আধুনিক ইতিহাসে দক্ষিণ-আফ্রিকার স্থান বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। পৃথিবীতে প্রতি বৎসর মোট যে পরিমাণ স্বর্ণ উত্তোলিত হয় তাহার প্রায় অর্ধাংশ দক্ষিণ-আফ্রিকার খনিসমূহ হইতে উত্তোলিত হইয়া থাকে। কাজেই ইহার সমৃদ্ধি অনেকের ঈর্ষ্যার কারণ। এই দক্ষিণ-আফ্রিকা আবার প্রাচ্য এবং পাশ্চাত্যের একটি প্রধান সংযোগস্থল এবং মিলনক্ষেত্র। সুতরাং সমাজনীতির দিক হইতেও ইহার একটি বিশেষ গুরুত্ব রহিয়াছে।

দক্ষিণ-আফ্রিকা প্রধানতঃ তিনটি বিভিন্ন এবং বহুলাংশে বিরোধী জাতি এবং সংস্কৃতির মিলনভূমি। ইহাদের মধ্যে একটি পাশ্চাত্য সভ্যতা। প্রতিদ্বন্দ্বী সমস্ত কিছুকে ধ্বংস করিয়া নিজের পূর্ণ প্রতিষ্ঠার প্রয়াস ইহার প্রধান বৈশিষ্ট্য। দ্বিতীয়টি ভারতীয় সভ্যতা। পূর্বোক্ত পাশ্চাত্য সভ্যতার সহিত সংঘর্ষে আত্মরক্ষার চেষ্টা করিয়াই ইহা সন্তুষ্ট। তৃতীয়টি স্থানীয় বান্টু সভ্যতা। অন্যকে জয় করিবার মত ক্ষমতা বা প্রবৃত্তি ইহার নাই। কাজেই ইহার বর্তমান অবস্থা অনেকটা হিন্দু পুরাণোক্ত ত্রিশঙ্কুর মত।

দক্ষিণ-আফ্রিকার রাষ্ট্রক্ষমতা আজ শ্বেতজাতির কবলিত। শক্তিমদমত্ত শ্বেতাঙ্গসমাজ নব নব বিধান প্রবর্তিত করিয়া অশ্বেতকায় জাতিসমূহকে ক্রমশঃ পঙ্গু করিয়া পরিণামে একেবারে ধ্বংস করিতে বদ্ধপরিকর। স্থানীয় অধিবাসী অপেক্ষা ভারতীয়গণের প্রতিই ইহাদের আক্রোশ বেশী বলিয়া মনে হয়। ইহার কারণও খুব দুর্বোধ্য নহে। প্রথমতঃ, দক্ষিণ-আফ্রিকা প্রবাসী ভারতীয়গণের অনেকেই বংশ-পরম্পরায় শ্রমিক হইলেও পাশ্চাত্য সভ্যতা অপেক্ষা বহু বিষয়ে উন্নততর একটি সভ্যতার উত্তরাধিকারী। দ্বিতীয়তঃ, প্রবাসী ভারতীয় সম্প্রদায় অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে শ্বেতাঙ্গগণের প্রতিদ্বন্দ্বী।

১৯১০ সালে নাটাল, অরেঞ্জ ফ্রী ষ্টেট, ট্রান্সভাল এবং কেপ এই প্রদেশ চতুষ্টয়ের সমবায়ে দক্ষিণ-আফ্রিকা যুক্তরাষ্ট্র (Union of South Africa) গঠিত হয়। জেনারেল বোথা এই নবপ্রতিষ্ঠিত যুক্তরাষ্ট্রের প্রথম প্রধান মন্ত্রী হইলেন।

অশ্বেতকায়দের প্রতি দক্ষিণ-আফ্রিকা-সরকারের নীতি এবং ব্যবহার শ্বেত সভ্যতার একটি অবিস্মরণীয় অপকীর্তি। মানব-বিদ্বেষ এবং সঙ্কীর্ণতার অকুণ্ঠ নির্লজ্জ প্রকাশ এবং মিথ্যা প্রতিশ্রুতি ইহার ইতিহাসের প্রতিটি পৃষ্ঠাকে কলঙ্কিত করিয়া রাখিয়াছে। সভ্যতার নামে 'প্রচণ্ড অন্যায়' 'বলের বন্যায়' বার বার ধর্মকে ভাসাইয়া লইয়া গিয়াছে। আর এই অভিজ্ঞতা কেবল দক্ষিণ-আফ্রিকাই অর্জন করে নাই। শ্বেতজাতি এবং সংস্কৃতি যেখানে অশ্বেত জাতি এবং সংস্কৃতির সংস্পর্শে আসিয়াছে সেখানেই বারবার এই একই কাহিনীর পুনরাবৃত্তি ঘটিয়াছে।

১৮৪০ সালে কেপ প্রদেশের ইংরেজ শাসনকর্তা নাটাল অধিকার করিবার পর মহারাণী ভিক্টোরিয়ার এক ঘোষণা-পত্রে প্রতিশ্রুতি দেওয়া হইল যে নাটালে অনুসৃত ইংরেজ নীতি বর্ণ, ধর্ম এবং সংস্কৃতি নিরপেক্ষ হইবে।

"There shall not be in the eye of the law any distinction or disqualification whatever founded upon mere distinction of colour, origin, language or creed, but the protection of the law, in letter and in substance, shall be extended impartially to all alike." No. 20 of 1870.

১৮৭০ সালের বিংশতিতম আইনে নাটাল-সরকার প্রতিশ্রুতি দিয়াছিলেন যে যদি কোন চুক্তিবদ্ধ ভারতীয় শ্রমিক চুক্তির মেয়াদ উত্তীর্ণ হইবার পর বিনা ব্যয়ে ভারতবর্ষে প্রত্যাবর্তন করিবার অধিকার ত্যাগ করে, তাহা হইলে তাহাকে নাটালে জমি ক্রয় করিয়া স্থায়ীভাবে বসবাস করিতে দেওয়া হইবে। নাটাল এবং দক্ষিণ-আফ্রিকা-যুক্তরাষ্ট্র-সরকার কিন্তু পরবর্তী কালে বার বার মহারাণীর ঘোষণাপত্র এবং উল্লিখিত আইনের মর্য্যাদা লঙ্ঘন করিতে দ্বিধা করেন নাই।

১৮৬০ সালের কয়েক বৎসর পূর্ব হইতে শ্রমিক-দুর্ভিক্ষের জন্য দক্ষিণ-আফ্রিকার উদ্যান-উপনিবেশ (Garden-colony) নাটালের অর্থনৈতিক জীবনে ঘোরতর বিপর্য্যয় ঘনাইয়া আসিয়াছিল। নাটালের অস্তিত্ব বিপন্ন হইয়া পড়িয়াছিল। এই সময় নাটাল-সরকারের বিশেষ অনুরোধে ভারত-সরকার নাটালের ইক্ষুক্ষেত্রসমূহে নিয়োগের জন্য ভারতবর্ষ হইতে

চুক্তিবদ্ধ শ্রমিক পাঠাইতে সম্মত হইলেন। এই ভাবে বর্ত্তমান যুগে ভারতবর্ষের সহিত দক্ষিণ-আফ্রিকার সম্পর্ক স্থাপিত হইল। ইহার পর কতিপয় ভারতীয় ব্যবসায়ীও নাটালে গিয়া ঘর বাঁধিলেন। তাহারই ফলে নাটালে ভারতীয় সমস্যার সূত্রপাত হইল। ট্রান্সভালেও কিছু কিছু ভারতীয় বসবাস করিতে আরম্ভ করিলেন। কেপ প্রদেশের প্রতি ভারতীয়গণ কোনদিনই আকৃষ্ট হন নাই। এই কেপ প্রদেশেই কিন্তু প্রবাসী ভারতীয় সম্প্রদায় দক্ষিণ-আফ্রিকা ইউনিয়নের অন্যান্য প্রদেশের তুলনায় সদয় এবং সম্মানজনক ব্যবহার পাইয়া থাকেন। ১৮৯১ সালে বিধিবদ্ধ একটি আইনের বলে অরেঞ্জ ফ্রি ষ্টেটে ভারতীয়গণের প্রবেশ এবং বসবাস সম্পূর্ণরূপে নিষিদ্ধ হইয়া যায়।

দক্ষিণ-আফ্রিকা ইউনিয়নের ভারতীয় অধিবাসীর হার প্রতি শতে ২.৯ জন। ১৯০৬ সালের আদমসুমারিতে দেখা যায় যে, দক্ষিণ-আফ্রিকার প্রবাসী ভারতীয়গণ সংখ্যায় ২১৯৮৯১ জন, ইহাদের মধ্যে ১৮৩৬৪৬ জন নাটালের, ২৫৫৬১ জন ট্রান্সভালের এবং ১০৬৯২ জন কেপ প্রদেশের বাসিন্দা।

ভারতীয়গণ স্বেচ্ছায় দক্ষিণ-আফ্রিকায় যায় নাই। দক্ষিণ-আফ্রিকা নিজের প্রয়োজনে নানা প্রলোভন দেখাইয়া তাহাদিগকে ডাকিয়া নিয়াছিল। প্রবাসী ভারতীয়গণ আজ দক্ষিণ আফ্রিকার সামাজিক এবং অর্থনৈতিক জীবনের অপরিহার্য্য অঙ্গ। ক্রয়-বিক্রয় এবং ব্যবসায়ের ক্ষেত্রে প্রতিযোগিতার ফলে বিচলিত শ্বেতাঙ্গ সম্প্রদায় আজ এই সমস্ত কথা বিস্মৃত হইয়াছে এবং ছলে বলে কৌশলে যে ভাবেই হোক, ভারতীয়গণকে দক্ষিণ-আফ্রিকা হইতে বিতাড়িত করিতে চাহে। অশ্বেতকায়দিগকে সর্ব্বপ্রকারে শোষণ এবং নিস্পেষণ করিয়া শ্বেতাঙ্গদিগের স্বার্থসংরক্ষণ এবং তাহাদিগের স্ফীতোদরের অধিকতর স্ফীতিসাধন দক্ষিণ-আফ্রিকা সরকারের অন্যতম মূলমন্ত্র এবং ইহার অনুসৃত নীতির অন্যতম প্রধান উদ্দেশ্য।

সম্পদের দিনে দক্ষিণ-আফ্রিকা ভারতীয়গণের নিকট তাহার ঋণের কথা বেমালুম ভুলিয়া গেলেও এই ঋণের পরিমাণ কিন্তু মোটেই উপেক্ষণীয় নহে। শ্বেতাঙ্গদিগের নিজেদের উক্তিতেই এই সত্যের স্বীকৃতি রহিয়াছে। ১৮৮৫ সালের জানুয়ারী মাসে 'নাটাল মার্কারি'তে (Natal Mercury) সম্পাদকীয় মন্তব্য করা হয় যে, ভারতীয় শ্রমিকদিগের সহায়তা ব্যতীত নাটালে কফি চাষ সম্ভব হইত না।

"Had it not been for the coolie labour, we should not hear of coffee plantations springing in all hands and of the prosperity of the older ones being sustained."

স্যর লিজ হুলেট দক্ষিণ-আফ্রিকার প্রধান শর্করা-ব্যবসায়ী। ১৯১০ সালে দক্ষিণ-আফ্রিকা ইউনিয়ন গঠিত হওয়ার পূর্ব্বে নাটাল ব্যবস্থা-পরিষদে তিনি মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিয়াছেন যে, ভারতীয়গণের প্রাণপাত পরিশ্রমের ফলেই নাটালের সমুদ্রোপকূল সমগ্র দক্ষিণ-আফ্রিকার মধ্যে একটি প্রধান সমৃদ্ধিশালী অঞ্চলে পরিণত হইয়াছে।

"The condition of the colony before the immigration of Indian labour was one of gloom. The condition then was such that it threatened to extinguish the vitality of the country, and it was only by the help of the Government assisting immigration of labour that the country began at once to thrive. The coast has been turned into one of the most prosperous parts in South Africa. They could not find in the whole of the Cape and the Transvaal what they could find in the coast of Natal—ten thousand acres of land in one plot and with one crop—and that was entirely due to the importation of Indians. Durban was built up absolutely by the Indian population."—Sir J. Leige Hulett in the Natal Legislative Assembly in 1903.

কিন্তু কার্য্যকালে শ্বেতাঙ্গ শাসকসম্প্রদায় এই উপকারের কথা মনে রাখা প্রয়োজন মনে করে নাই। ১৮৮৫ সালে ট্রান্সভাল সরকার আইন করিলেন যে অতঃপর ভারতীয়-গণ তাঁহাদের জন্য নির্দ্দিষ্ট অঞ্চল ব্যতীত অন্যত্র বসবাস করিতে পারিবেন না (Law 3 of 1885, Transvaal)। এই সময়েই ট্রান্সভাল-প্রবাসী ভারতীয়গণ সর্ব্ববিধ নাগরিক অধিকার হইতে বঞ্চিত হইলেন। কিছুদিন পরে এই আইনের বিধান অধিকতর প্রতিক্রিয়াশীল করিয়া ভারতীয়গণকে সমস্ত রাজ-নৈতিক অধিকার হইতেও বঞ্চিত করা হইল। স্থির হইল যে অতঃপর ভারতীয়গণের কোন স্থাবর সম্পত্তিতে অধিকার থাকিবে না। বিভিন্ন রাস্তা, সংরক্ষিত অঞ্চল এবং মহল্লায় ভারতীয়গণকে শ্বেতাঙ্গ সমাজ হইতে পৃথক্ করিয়া রাখিবার ব্যবস্থা হইল। ইহার ঠিক দশ বৎসর পর ১৮৯৫ সালে নাটাল-সরকার আইন করিলেন যে, যে সমস্ত ভারতীয় শ্রমিকের চুক্তির মেয়াদ উত্তীর্ণ হইয়াছে তাহারা যদি ভারতবর্ষে ফিরিয়া না যায় অথবা পুনরায় চুক্তিবদ্ধ হইতে সম্মত না হয়, তাহা হইলে তাহাদিগকে জন প্রতি বার্ষিক তিন পাউণ্ড হারে কর দিতে হইবে (Law 17 of 1895, Natal)। অন্যথায় কারা-দণ্ড ভোগ করিতে হইবে অথবা ভারতবর্ষে ফিরিয়া আসিতে হইবে। এই আইনের ফলে বহু প্রবাসী ভারতীয় পরিবার ধ্বংস-প্রাপ্ত হয় এবং স্ত্রী ও পুরুষ এই উভয় জাতীয় শ্রমিকের নৈতিক অধঃপতন ঘটে (resulted in breaking up families

and driving men to crime and women to a life of shame—G. K. Gokhale)। পর বৎসর অর্থাৎ ১৮৯৬ সালে নাটালের ভারতীয়গণকে আইনের বলে ব্যবস্থা-পরিষদে সদস্য নির্ব্বাচনের অধিকার হইতে বঞ্চিত করা হইল। ১৮৯৭ সালে ভারতীয়গণের পক্ষে শ্বেতাঙ্গিনীর পাণিগ্রহণ অপরাধ বলিয়া ঘোষিত হইল (Law 3 of 1897, Natal)।

বিংশ শতাব্দীর প্রথম কয়েক বৎসরে দক্ষিণ-আফ্রিকা-প্রবাসী ভারতীয়গণের অধিকার খর্ব্ব করিবার জন্য পর পর অনেকগুলি আইন প্রণয়ন করা হয়। ১৯০৭ সালে ভারতীয়-গণের ট্রান্সভালে প্রবেশ সম্পূর্ণভাবে নিষিদ্ধ হইল (The Immigration Act No. 15, 1907)। এই বৎসরই আর একটি আইনের বলে ব্যবস্থা হইল যে, অতঃপর ট্রান্সভাল-প্রবাসী প্রত্যেক ভারতীয়কেই সরকারী দপ্তরে নিজের নাম রেজিষ্ট্রী করিতে হইবে। এই আইন অমান্যের শাস্তি ছিল অনধিক ১০০ পাউণ্ড জরিমানা, অথবা অনধিক তিন মাস কারাদণ্ড (The Asiatic Land Amendment Act, 1907)। পর বৎসর আবার আইন করা হইল যে, ট্রান্সভালের ভারতীয়গণকে স্ব-স্ব নাম রেজিষ্ট্রী করিতে এবং সর্ব্বদা ছাড়পত্র (pass) সঙ্গে রাখিতে হইবে (Act 36 of 1908)। এই অবমাননাকর আইন, নাটালের ইণ্ডেঞ্চারযুক্ত ভারতীয় শ্রমিকদিগের উপর জনপ্রতি বার্ষিক তিন পাউণ্ড কর এবং আরও কতকগুলি বৈষম্যমূলক ও অপমানজনক ব্যবস্থার অবসান ঘটাইবার জন্য মহাত্মা গান্ধীর নেতৃত্বে দক্ষিণ-আফ্রিকায় সত্যাগ্রহ সংগ্রাম আরম্ভ হইল। পশুবলের বিরুদ্ধে আত্মিক বলের এই সংগ্রাম ইতিহাসের একটি অতুলনীয় এবং অনন্যপূর্ব্ব ঘটনা, এই সংগ্রামে পরিণামে আত্মিক বলই জয় লাভ করিল। ১৯১৪ সালে স্মাট্স-গান্ধী চুক্তির পর ইণ্ডিয়ান রিলিফ এক্ট (Indian Relief Act, 1914) বিধিবদ্ধ হইল। দক্ষিণ-আফ্রিকা-সরকার কর্ত্তৃক তিন পাউণ্ড কর প্রত্যাহৃত এবং হিন্দু ও মুসলমান মতে বিবাহের বৈধতা স্বীকৃত হইল।

১৮৯৭ সালে নাটাল-সরকারের আদেশে ভারতীয়গণের নাটাল প্রবেশ নিষিদ্ধ হইয়া যায়। যে সমস্ত ভারতবাসী পূর্ব্ব হইতেই নাটালে ছিলেন, তাঁহাদের গতিবিধিও এই সময় হইতে কঠোরভাবে নিয়ন্ত্রিত হইল। বিশেষ অনুমতিপত্র ব্যতীত তাঁহাদের ট্রান্সভাল প্রবেশের উপায় রহিল না। কেপ প্রদেশে এত দিন পর্য্যন্ত প্রবাসী ভারতীয়গণের প্রতি অপেক্ষাকৃত উদার এবং সম্মানজনক ব্যবহার করা হইতেছিল। ফলে সেখানেও উগ্র ভারতীয় বিদ্বেষ আত্মপ্রকাশ করিল এবং ১৯০৬ সালে ভারতীয়গণের ঐ প্রদেশে প্রবেশ নিষিদ্ধ হইয়া গেল।

দক্ষিণ-আফ্রিকার শ্বেতাঙ্গ সম্প্রদায়ের মুখপাত্রগণ খোলাখুলি ভাবেই স্বীকার করেন যে ভারতীয়গণকে চিরকাল অর্দ্ধদাস পর্য্যায়ভুক্ত করিয়া রাখিতে তাঁহারা কৃতসঙ্কল্প। এই প্রসঙ্গে কিন্তু মার্শাল স্মাটসের একটি বক্তব্য বিশেষ উল্লেখযোগ্য। ১৯২১ সালের 'ইম্পিরিয়াল কনফারেন্সে' গৃহীত একটি প্রস্তাব দক্ষিণ-আফ্রিকা প্রবাসী ভারতীয়গণের পৌর অধিকার স্বীকার করিবার অনুকূলে মত প্রকাশ করিল। স্মাটস এই প্রস্তাবের বিরোধিতা করেন এবং বলেন,

"The whole basis of our particular system in South Africa rests on inequality…it is the bed-rock of our constitution…you cannot deal with the Indians apart from the whole position in South Africa; you cannot give political rights to the Indians which you deny to the rest of the coloured citizens in South Africa."

অর্থাৎ (বর্ণ এবং জাতি) "বৈষম্য দক্ষিণ-আফ্রিকার সামাজিক সংগঠনের ভিত্তি…এই বৈষম্যই তাহার রাষ্ট্র-যন্ত্রেরও ভিত্তি। সমগ্রভাবে দক্ষিণ-আফ্রিকার অবস্থা পর্য্যালোচনা না করিয়া কেবলমাত্র ভারতীয়গণ সম্বন্ধে কোন ব্যবস্থা করা চলিবে না। ভারতীয়গণকে রাজনৈতিক অধিকার প্রদান করিলে দক্ষিণ-আফ্রিকার অন্যান্য অশ্বেতকায় জাতিসমূহকেও অনুরূপ অধিকার দিতে হইবে।"

প্রথম বিশ্বযুদ্ধকালে (১৯১৪-১৮) দক্ষিণ-আফ্রিকায় ভারতীয় বিদ্বেষ সাময়িকভাবে মন্দীভূত হইয়াছিল। কিন্তু যুদ্ধান্তে দ্বিগুণ-তেজে ভারতীয় বিদ্বেষ দ্বিগুণ বেগে জ্বলিয়া উঠিল। একটির পর এক করিয়া ভারতীয়দিগের মর্য্যাদাহানিকর এবং তাহাদের স্বার্থের পরিপন্থী আইন বিধিবদ্ধ হইতে লাগিল। ১৯১৯ সালে আদেশ করা হইল যে ট্রান্সভালের ভারতীয়গণ কোন যৌথ ব্যবসায়-প্রতিষ্ঠানের অংশীদার হইতে পারিবেন না (Act 37 of 1919)। ১৯২৪ সালে নাটালের ভারতীয়-গণকে মিউনিসিপ্যালিটির সদস্য নির্ব্বাচনের অধিকার হইতে বঞ্চিত করা হইল। ১৮৯৬ সালে যখন নাটাল-প্রবাসী ভারতীগণকে পার্লামেন্টের ভোটাধিকার হইতে বঞ্চিত করা হয় তখন কিন্তু স্পষ্ট প্রতিশ্রুতি দেওয়া হইয়াছিল যে তাহাদের মিউনিসিপ্যাল ভোটাধিকারে কোনদিনই হস্তক্ষেপ করা হইবে না। দক্ষিণ-আফ্রিকার শ্বেতাঙ্গ শাসকগণ বোধ হয় সব সময় প্রদত্ত প্রতিশ্রুতির মর্য্যাদা রক্ষা করা প্রয়োজন মনে করেন না।

১৯২৪ সালে দক্ষিণ-আফ্রিকা সরকারের স্বরাষ্ট্র সচিব মিঃ ডানকান ইউনিয়ন পার্লামেন্টে কুখ্যাত 'ক্লাস এরিয়াস' বিল উপস্থিত করিলেন। নাটাল-প্রবাসী ভারতীয়গণকে বসবাস, ব্যবসায় ও ভূমির অধিকার হইতে বঞ্চিত করা, ট্রান্সভাল প্রবাসী ভারতীয়গণের অর্থনৈতিক জীবন পঙ্গু এবং বিকল করিয়া দেওয়া এবং সমগ্র দক্ষিণ আফ্রিকায় ভারতীয়গণের প্রবেশাধিকার কঠোরভাবে নিয়ন্ত্রিত করা প্রস্তাবিত আইনের মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল। ইউনিয়ন পরিষদের নির্ব্বাচন আসন্ন হইয়া পড়ায় এই বিতর্কমূলক আইনের প্রস্তাব পরিত্যক্ত হইল। নির্ব্বাচনান্তে নবগঠিত মন্ত্রিমণ্ডলে ডাঃ মালান স্বরাষ্ট্র

বিভাগের ভারপ্রাপ্ত হইলেন। নির্ব্বাচনের প্রাক্কালে পরিত্যক্ত ডাবকানের প্রস্তাবকে (Murderous Bill) সামান্য সংশোধিত আকারে এবং ভিন্ন নামে পুনরায় পরিষদের বিবেচনার জন্য পেশ করা হইল। ইহাই মালানের 'এরিয়াস রিজার্ভেসন বিল' (Areas Reservation Bill, ৭ ৫) । ইহাতে প্রস্তাব করা হইল যে অতঃপর নগর অঞ্চলে এশিয়াবাসিগণ কেবল মাত্র তাহাদের জন্য নির্দ্দিষ্ট বিশেষ অঞ্চলসমূহ ব্যতীত অন্যত্র বসবাস, ব্যবসায় এবং বিষয়সম্পত্তি ক্রয় করিতে পারিবে না। এই প্রস্তাব প্রবাসী ভারতীয় সমাজে তীব্র বিক্ষোভের সঞ্চার করিল। এই বিক্ষোভের ঢেউ ভারতবর্ষেও আসিয়া পৌঁছিল এবং ভারত-সরকারের পক্ষে আর নিশ্চেষ্ট থাকা সম্ভব হইল না। ফলে ১৯২৭ সালে কেপটাউনে দক্ষিণ-আফ্রিকা এবং ভারত-সরকারের প্রতিনিধিমণ্ডলী এক গোল টেবিল বৈঠকে সমবেত হইলেন। এই বৈঠকে আলাপ-আলোচনার ফলে 'কেপটাউন চুক্তি' (Cape Town Agreement) সম্পাদিত হয়। 'এরিয়াস রিজার্ভেসন বিল' পরিত্যক্ত হইল সত্য, কিন্তু জীবনযাত্রার পাশ্চাত্য মান রক্ষা করিবার উদ্দেশ্যে দক্ষিণ-আফ্রিকা সরকারের সর্ব্বপ্রকার বৈধ এবং ন্যায়সঙ্গত উপায় অবলম্বন করিবার অধিকারও স্বীকৃত হইল ("to use all just and legitimate means for the maintenance of western standars of life." Article I, Cape Town Agreement)।

পাঁচ বৎসর পর ১৯৩২ সালে 'ট্রান্সভাল এশিয়াটিক ল্যাণ্ড টেনিউর এক্ট', ১৯৩২, অথবা 'মালন এক্ট' (Transvaal Asiatic Land Tenure Act, 1932 or Malan Act) দ্বারা ভারতীয়গণের ট্রান্সভালে বাস এবং ব্যবসায়ের অধিকার বিশেষ ভাবে খর্ব্ব করিবার ব্যবস্থা হয়। এই আইনে বলা হইল যে—

১। ভারতীয়গণ জোহান্সবার্গের র‍্যাণ্ড অঞ্চলে বসবাস এবং জমি দখল করিবার অধিকারী নহে।

২। যে যে স্থানে ভূগর্ভ হইতে স্বর্ণ উত্তোলিত হইবে বলিয়া সরকার ঘোষণা করিবেন তন্মধ্যে কোনও স্থানে ভারতীয়গণ বাস করিতে বা ভূমি অধিকার করিতে পারিবেন না।

৩। মিউনিসিপ্যালিটিসমূহ ইচ্ছা করিলে ভারতীয়গণের বসবাসের জন্য পৃথক অঞ্চল নির্দ্দিষ্ট করিয়া দিতে পারিবে।

৪। যে সমস্ত ভারতীয় 'স্বর্ণাঞ্চলে' (Gold area) ব্যবসায় করিতেছেন তাঁহাদিগকে পাঁচ বৎসর পরে উঠিয়া যাইবার নোটিশ দেওয়া হইবে।

৫। ভারতীয়গণের স্থাবর সম্পত্তি অর্জ্জনের বা তাহার মালিক হওয়ার অধিকার থাকিবে না ("must have no right to make or own fixed property")।

৬। ভারতীয়গণ কতকগুলি নির্দ্দিষ্ট অঞ্চল ব্যতীত অন্যত্র ব্যবসায় করিতে পারিবে না।

১৯৩৪ সালে এই আইন সংশোধিত করিয়া ভারতীয়গণের ভূমি সংক্রান্ত অধিকার আরও সঙ্কুচিত করিয়া দেওয়া হইল।

১৯৩২ সালে ইউনিয়ন সরকার কর্ত্তৃক নিযুক্ত ফিথাম কমিশনের রিপোর্টের ভিত্তিতে ১৯৩৬ সালে ট্রান্সভাল এশিয়াটিক ল্যাণ্ড টেনিউর এমেণ্ডমেণ্ট এক্ট বা "ইউ.টাকোর্ট এক্ট" বিধিবদ্ধ হইল। এই আইনে ব্যবস্থা হইল যে উক্ত কমিশন কর্ত্তৃক অনুমোদিত অঞ্চলসমূহে ভারতীয়গণের সম্পত্তি অর্জ্জন এবং ভোগের পরিপূর্ণ অধিকার থাকিবে। স্বরাষ্ট্রসচিব কর্ত্তৃক অনুমোদিত অঞ্চলসমূহেও ভারতীয়গণের অনুরূপ অধিকার থাকিবে। কিন্তু স্বরাষ্ট্রসচিবের অনুমোদন ব্যবস্থা-পরিষদের সমর্থন সাপেক্ষ থাকিবে। এতদতিরিক্ত অন্য কোন অঞ্চলে ভারতীয়গণের সম্পত্তিতে স্থায়ী অধিকার থাকিবে না।

এই আইনের ফলে বৃটিশের ভারতবাসীর কিছু উপকার হইল সত্য, কিন্তু ট্রান্সভাল-প্রবাসী ভারতীয়গণকে, তাঁহারা যে শ্বেতাঙ্গগণ অপেক্ষা নিম্নস্তরের এই কথাটি পরিষ্কার ভাবে বুঝাইয়া দেওয়া হইল। ভারতীয়গণের সম্পত্তির অধিকার খর্ব্ব করিবার চেষ্টা ট্রান্সভালে নূতন নহে। ১৮৮৫ সালে সর্ব্বপ্রথম এই চেষ্টা করা হয়। ১৯২৪ এবং ১৯২৫ সালে ব্যবস্থা-পরিষদে ভারতীয়গণের ভূসম্পত্তির অধিকার খর্ব্ব করিবার প্রস্তাব উপস্থাপিত হইলেও শেষ পর্য্যন্ত তাহা পরিত্যক্ত হয়। কিন্তু ১৯৩৬-এর 'ট্রান্সভাল এশিয়াটিক ল্যাণ্ড টেনিউর এমেণ্ডমেণ্ট এক্ট' বিধিবদ্ধ হইবার ফলে প্রবাসী ভারতীয়গণের ভূসম্পত্তিতে অধিকার সঙ্কোচের নীতি জয়যুক্ত হইল।

ইহাতেও দক্ষিণ-আফ্রিকার শ্বেতাঙ্গগণের মনস্তুষ্টি হইল না। এদিকে ভারত-সরকার অনুসৃত ক্লীবের নীতি ইউনিয়ন সরকারের স্পর্দ্ধা এবং ঔদ্ধত্যকে উত্তরোত্তর বাড়াইয়া তুলিতেছিল। ১৯৪৩ সালে ইউনিয়ন পার্লামেণ্ট কর্ত্তৃক কুখ্যাত 'পেগিং এক্ট' বিধিবদ্ধ হইল। ব্যবস্থা হইল যে এই আইন বিধিবদ্ধ হইবার সময় ভারতীয়গণ যে যে অঞ্চলে বাস করিতেছে, পরবর্ত্তী তিন বৎসরের মধ্যে তাহার বাহিরে অন্য কোথাও তাহারা ভূসম্পত্তি ক্রয় করিতে পারিবে না। পর বৎসর নাটাল ভারতীয় কংগ্রেসের তরফ হইতে কয়েক জন প্রতিনিধি ফিল্ড মার্শাল স্মাটসের সহিত দেখা করিয়া তাঁহাকে 'পেগিং এক্ট' রদ করিয়া দিবার অনুরোধ জানাইলেন। তাঁহারা পরামর্শ দিলেন যে ইউরোপীয় এবং এশিয়াবাসিগণের বাসস্থানের জন্য লাইসেন্স দেওয়ার ব্যবস্থা হোক এবং এতদুদ্দেশ্যে একটি কমিটি গঠন করা হউক।

ফিল্ড মার্শাল স্মাটস চতুর এবং বহুদর্শী ব্যক্তি। তিনি দেখিলেন যে ভারতীয় প্রতিনিধিবর্গ প্রকৃত প্রস্তাবে 'পেগিং এক্টে'র মূলনীতি মানিয়া লইতে স্বীকৃত আছেন। তিনি এই সুযোগ হাতছাড়া করিলেন না। নাটাল ভারতীয় কংগ্রেসের কয়েকজন প্রতিনিধিকে লইয়া তিনি প্রিটোরিয়াতে এক বৈঠক করিলেন। বৈঠকে আলোচনার

ফলে 'প্রিটোরিয়া চুক্তি' সম্পাদিত হয়। ইহার পর সরকারী ভাবে ঘোষণা করা হইল যে, নাটাল প্রাদেশিক আইন পরিষদের অর্ডিন্যান্সের বলে বাসস্থানের লাইসেন্স দিবার জন্য দুই জন ভারতীয় এবং দুই জন ইউরোপীয় সদস্য লইয়া একটি বোর্ড গঠিত হইবে। অপর এক জন আইনজ্ঞ ইউরোপীয় প্রস্তাবিত বোর্ডের চেয়ারম্যান হইবেন। উল্লিখিত অর্ডিন্যান্স বিধিবদ্ধ হইবার পর সরকারী ঘোষণাপত্র দ্বারা ডারবানে 'পেগিং এক্টে'র প্রয়োগ স্থগিত রাখা হইবে।

"It was agreed that the situation would best be met by the introduction of an ordinance into the Natal Provincial Council. This ordinance would provide for the creation of a board consisting of two European and two Indian members under the chairmanship of a third European, who will be a man of legal training. The object of the legislation will be to create machinery for the board to control occupation by the licensing of dwelling in certain areas; and the application of the Pegging Act in Durban to be withdrawn by a proclamation on the passing of this ordinance."—*The Tyranny of Colour* by P. S. Joshi, p. 330.)

সদ্য বিধিবদ্ধ "এশিয়াটিক ল্যাণ্ড টেনিউর এণ্ড এশিয়াটিক রিপ্রেজেন্টেশান এক্ট" (Asiatic Land Tenure and Asiatic Representation Act) বা 'ঘেটো এক্ট' (Ghetto Act) দক্ষিণ-আফ্রিকায় ভারতবাসী-কর্ত্তৃক কৃত উপকারের সর্ব্বশেষ এবং অভিনব প্রতিদান। এই আইন দ্বারা প্রকৃত প্রস্তাবে 'পেগিং এক্ট' রদ করিয়া কেবলমাত্র কয়েকটি নির্দ্দিষ্ট অঞ্চল ব্যতীত অন্যত্র ভারতবাসিগণ কর্ত্তৃক সম্পত্তি অর্জ্জন বা অধিকার নিষিদ্ধ হইয়াছে। 'ঘেটো এক্টে'র প্রয়োগক্ষেত্র 'পেগিং এক্ট' অপেক্ষা অধিকতর ব্যাপক। শেষোক্তটি কেবল মাত্র ডারবানেই প্রযোজ্য ছিল। পক্ষান্তরে 'ঘেটো এক্ট' নাটালের সমুদয় পল্লী এবং নগর অঞ্চলে প্রযোজ্য। পেগিং এক্টের বিধান অনুযায়ী কেবলমাত্র ভারতবাসী এবং ইউরোপীয়গণের মধ্যেই স্থাবর সম্পত্তি সংক্রান্ত যাবতীয় লেনদেন নিষিদ্ধ ছিল। কিন্তু 'ঘেটো এক্টের' বিধান অনুযায়ী ভারতবর্ষীয় এবং দক্ষিণ-আফ্রিকার অন্য সমস্ত জাতির—ইউরোপীয়, বান্টু, মালয়, চীনদেশীয়, মিশ্রজাতি ইত্যাদি—মধ্যে স্থাবর সম্পত্তি সংক্রান্ত যাবতীয় চুক্তি ইত্যাদি অবৈধ বলিয়া ঘোষিত হইয়াছে। নাটাল এবং ট্রান্সভাল প্রবাসী ভারতীয়গণকে এই আইনের দ্বারা ১৫০ জনের অধিক সদস্যে গঠিত ইউনিয়ন পার্লামেন্টে তিন জন শ্বেতাঙ্গ প্রতিনিধি নির্ব্বাচন করিবার অধিকার দেওয়া হইয়াছে। নাটাল প্রবাসী ভারতীয়গণও এই আইনের ফলে প্রাদেশিক আইন-পরিষদে কয়েকজন শ্বেতাঙ্গ প্রতিনিধি নির্ব্বাচনের অধিকার লাভ করিয়াছে। এই অন্যায় এবং অপমানজনক আইনের বিরুদ্ধে ভারতীয়গণ ডাঃ নাইকার এবং ডাঃ দাদুর নেতৃত্বে সত্যাগ্রহ আরম্ভ করিয়াছে। সমগ্র বিশ্বের শোষিত এবং উৎপীড়িত মানব সমাজের সজাগ উৎসুক দৃষ্টি আজ দক্ষিণ-আফ্রিকার প্রতি নিবদ্ধ হইয়া রহিয়াছে। অতীতে সত্যাগ্রহ সংগ্রাম দক্ষিণ-আফ্রিকায় জয়শ্রী মণ্ডিত হইয়াছে। 'ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি ঘটে'—বর্ত্তমান ব্যাপারে এই উক্তির সত্যতা প্রমাণিত হইয়াছে।

দক্ষিণ-আফ্রিকা প্রবাসী ভারতীয়গণকে পদে পদে যে সমস্ত অপমান এবং অসুবিধা ভোগ করিতে হয়, সে কথা সবিস্তারে বলা বর্ত্তমান প্রবন্ধে সম্ভব নয়। অর্দ্ধ-শতাব্দীরও অধিককাল তাহাদিগকে সামাজিক জীবনের প্রাথমিক অধিকারগুলি হইতে বঞ্চিত করিয়া রাখা হইয়াছে। দক্ষিণ আফ্রিকার মিউনিসিপ্যাল পুস্তকাগার এবং সন্তরণ-বাপীসমূহে ভারতীয় এবং স্থানীয় অধিবাসীগণের প্রবেশ নিষিদ্ধ। ইউরোপীয় পরিচালিত হোটেল এবং রেস্তোরাঁগুলির মধ্যে ২।১টি ব্যতীত অন্যগুলিতে ভারতীয় এবং দেশীয় লোকদিগকে খাদ্য পরিবেষণ করা হয় না। দক্ষিণ-আফ্রিকার কোথাও প্রবাসী ভারতীয়গণের কোন বৃত্তি-শিক্ষার ব্যবস্থা নাই। তাঁহারা কেবলমাত্র শিক্ষকতা করিবার জন্য বিশেষ শিক্ষা পাইতে পারেন। নাটাল বিশ্ববিদ্যালয় কলেজে কোন ভারতীয় ছাত্র অথবা ছাত্রীকে ভর্ত্তি করা হয় না। প্রবাসী ভারতীয়গণের আগ্নেয়াস্ত্র ব্যবহারের অধিকার নাই। ১৯২৫ সালে বিধিবদ্ধ 'কালার বার এক্টের' বলে ইউরোপীয় ভিন্ন অন্য কোন শ্রমিককে বাষ্প এবং বিদ্যুৎ পরিচালিত যন্ত্র ব্যবহার করিতে দেওয়া হয় না। দোকানপাটে সমস্ত শ্বেতাঙ্গ ক্রেতাকে বিদায় করিবার পর তবেই ভারতীয় ক্রেতার প্রতি মনোযোগ দেওয়া হয়। অতি অল্পসংখ্যক আপিস এবং ব্যবসায়-প্রতিষ্ঠানেই ভারতীয়গণকে বৈদ্যুতিক 'লিফ্‌ট্' ব্যবহার করিতে দেওয়া হয়। ভারত-সরকারের দক্ষিণ-আফ্রিকাস্থিত প্রাক্তন 'এজেন্ট-জেনারেল'গণের অন্যতম স্যার রেজা আলি স্বয়ং এই বৈষম্যমূলক ব্যবহার এক জন ভুক্তভোগী। ট্রাম এবং বাসের শ্বেতাঙ্গ-চালক এবং টিকেট বিক্রেতাগণ খুশীমত যে-কোন অজুহাতে ভারতীয়দের স্ব-স্ব যানে উঠিতে দিতে অস্বীকার করে। ট্রেনগুলির ভোজনকক্ষে ভারতীয়গণের প্রবেশাধিকার নাই। ডাক ও পুলিস কর্ম্মচারিগণ ভারতীয়দিগের প্রতি কোন প্রকার সৌজন্য প্রকাশ দূরে থাক, সাধারণ ভদ্রতা প্রদর্শন করাও নিষ্প্রয়োজন মনে করে। অতি সাধারণ একজন ইউরোপীয়ও বিশিষ্ট ভারতীয়গণকে চোখ রাঙাইতে বা অপমান করিতে বিন্দুমাত্র দ্বিধা করে না। উচ্চতর সরকারী কার্য্যে, সিভিল সার্ভিস এবং ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগে কোন ভারতীয়কে নিয়োগ করা হয় না। কোন ভারতীয় দক্ষিণ-আফ্রিকা ইউনিয়নের কোথাও রাসায়নিক বা হিসাব পরীক্ষকের ব্যবসায় করিতে পারেন না। সাধারণ ভ্রমণস্থান,

সমুদ্রকূল, সরকারী-দপ্তর, ট্রেন, ট্রাম, শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান ইত্যাদি সর্বস্থানেই ভারতীয়দিগের প্রতি বৈষম্যমূলক ব্যবহার করা হয়। দক্ষিণ-আফ্রিকায় বহুস্থানেই ইউরোপীয় এবং অন্য দেশীয়দিগের জন্য পৃথক পৃথক যানবাহনের ব্যবস্থা রহিয়াছে। কি বিশ্ববিদ্যালয়, কি যানবাহন সর্বত্রই ভারতীয়গণকে ইউরোপীয়গণ হইতে স্বতন্ত্র করিয়া রাখিবার ব্যবস্থা হইয়াছে। সরকারী চাকুরীতে নিযুক্ত ভারতীয়গণ সমপদস্থ ইউরোপীয়গণ অপেক্ষা কম বেতন পাইয়া থাকেন।

"Herrenvolk" অর্থাৎ বিধাতৃনির্দিষ্ট শ্রেষ্ঠ জাতির অস্তিত্বের কথা বিশ্বাস করিবার দিন চলিয়া গিয়াছে। আজ বিশ্ব-সভ্যতার এক সঙ্কটময় যুগ-সন্ধিক্ষণ। আমাদের পরিচিত পুরাতন পৃথিবীর রূপ অতি দ্রুত পরিবর্তিত হইয়া যাইতেছে। দক্ষিণ-আফ্রিকা-সরকারের অনুসৃত নীতিকে কোনক্রমেই যুগোপযোগী বলা চলে না। যুগধর্মবিরোধী নীতির অনুসরণে বিপ্লব অবশ্যম্ভাবী হইয়া উঠে। দক্ষিণ-আফ্রিকায় শ্বেতাঙ্গ-শাসক-গোষ্ঠী যদি এখনও তাঁহাদের বর্ণ-বৈষম্যমূলক নীতির মৌলিক পরিবর্তন না করেন, তাহা হইলে কি হইবে ভাবিতেও শরীর শিহরিয়া উঠে। ইঁহাদের অদূরদর্শিতা এবং অবিমৃষ্যকারিতার ফলে বহুজন-আশঙ্কিত তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধের প্রথম স্ফুলিঙ্গ দক্ষিণ-আফ্রিকাতেই আত্মপ্রকাশ করিবে কিনা কে জানে। আর এই যুদ্ধের ফলে শ্বেত শাসক এবং অশ্বেত শাসিত উভয়েই 'চিতাভস্মে সবার সমান' হইবে কিনা তাহাই বা কে জোর করিয়া বলিবে।

অমৃতের হেথা আসন পাতা

শ্রীধীরেন্দ্রকৃষ্ণ চন্দ্র

অমৃতের তৃষা জেগেছিল যাহা জীবনের সেই আদিম প্রাতে,
জেগেছিল যাহা কল্লোল-সুরে, জেগেছিল যাহা সুরভি-সাথে,
পেয়েছিল যারে নীলের প্রান্তে, ঊর্মি-শোভিত বালুর কোলে,
মত্ত-মধুপ-গুঞ্জন-মৃদু কান্ত কোমল কুসুম-দোলে,
পেয়েছিল যারে রক্তিম রাগে রঞ্জিত নব উষার তীরে,
স্নেহ ও প্রেমের বেদনায় গলা ঝরে' ঝরে' পড়া অশ্রু-নীরে,
সে তৃষা আজিকে কোথায় হারায়, জেগে ওঠে হায় রক্ত-নেশা,
তাই ঢেকে যায় কালকূট-ভরা কালো মেঘে ঘন অন্ধ-নিশা।

আকাশের আলো মুছিয়া গেল কি, পঙ্কে ভরিল জল-স্থল ?
পাপিয়া-কণ্ঠ স্তব্ধ হ'ল কি, আকাশে উড়িল গৃধিনী-দল ?
জ্যোৎস্নার বুকে কে মাখালো মসী, কে মাখালো মসী মায়ের স্নেহে ?
রুধিরের প্রতি লালসা জাগালো, দানবে জাগালো মানব-দেহে ?
মানুষের সাধ তাহার সাধনা দানবে আজি কি হরিয়া লবে ?
তুমি আর আমি মাতিয়া উঠিব মৃত্যুর মহা-মহোৎসবে ?
আমার দেবতা তোমার দেবতা তোমার আমার রক্ত চায় ?
নহিলে তাদের মিটিবে না তৃষা ? সাধিয়া লব কি সে সাধনায় ?

দিকে দিকে জাগে হিংস্র বাঘিনী, নাগিনী ছড়ায় মরণ-বিষ,
বীভৎসতায় তাণ্ডবে ধরা ভ'রে ওঠে তাই অহর্নিশ।
সুধাকর আজ বিতরে কি সুধা, মেঘেরা বরিষে অমিয়-ধারা ?
কুসুমের বুকে মধুর গন্ধ ছুটিয়া চলে কি বাঁধন-হারা ?
মাটির আড়াল সরায়ে আজো কি সবুজের শোভা জাগিয়া ওঠে ?
আজো কি হেথায় দেবতার পায় মানুষের মাথা আবেগে লোটে ?
দেবতারা আজ বাঁচিয়া আছে কি ? মানুষেরা আজ বাঁচে কি তাই ?
যে দিকে তাকাই অসুরেরা নাচে, দেবতা অথবা মানুষ নাই।

মানুষ মরেছে, ভুলেছে তাহার চিরসাধনার অমৃত বাণী,
ভুলেছে সীমার ঊর্দ্ধে অসীম চির-আরাধ্য আকাশখানি ;
ভূলোক ভুলেছে আলোক হইতে অ-লোকের পথে যাত্রা তার,
সে পথ রুদ্ধ করিয়া থাকে না দিবস অথবা অন্ধকার ;
সে পথে রুদ্র ডমরু বাজে না, শিবের পূজায় নাই সতী ;
শত দীপ তুলি' সে পথে আঁধার আলোকেরে করে সন্ধ্যারতি ;
ক্ষণেকের তরে থাম এই পথে, ক্ষণেকের তরে নোয়াও মাথা ;
ক্ষণেকের তরে চেয়ে দেখ শুধু অমৃতের হেথা আসন পাতা।

সংক্রামক-ব্যাধি প্রতিষেধক ডিডিটি

শ্রীনলিনীকুমার ভদ্র

বিগত বিশ্বযুদ্ধে এক দিকে যেমন প্রাণঘাতী মারণাস্ত্রসমূহ আবিষ্কৃত হইয়া অগণিত লোকের প্রাণহানির হেতু হইয়াছে, অন্য দিকে তেমনই এমন সব রাসায়নিক এবং অন্যবিধ পদার্থও উদ্ভাবিত হইয়াছে যাহা যুদ্ধোত্তর কালেও মানবের অশেষ কল্যাণ সাধন করিতেছে। এই সমস্ত পদার্থের পরীক্ষণ প্রয়োগাদি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে তৎপরতার সহিত অনুষ্ঠিত হইয়াছে এবং হইতেছে।

'ডিডিটি' যুদ্ধকালে আবিষ্কৃত এমনই ধরণের একটি শক্তিশালী কীটপতঙ্গ-বিনাশক পদার্থ। ম্যালেরিয়া-প্রতিষেধে ইহার কার্য্যকারিতা অপরিসীম। বাংলাদেশ তথা ভারতবর্ষে ম্যালেরিয়ার প্রকোপ অত্যন্ত বেশী। সমগ্র ভারতবর্ষে প্রতি বৎসর লক্ষাধিক লোক ম্যালেরিয়ার আক্রমণে মৃত্যুমুখে পতিত হয়। এই ব্যাধি এদেশবাসীর জীবনীশক্তি তিল তিল করিয়া হরণ করিতেছে। সুতরাং ম্যালেরিয়া নির্ম্মূল করিবার জন্য এদেশে যাহাতে ব্যাপক ভাবে ডিডিটির প্রয়োগ হয় সেজন্য সরকার এবং জনস্বাস্থ্য-রক্ষা বিভাগের (Public Health Department) বিশেষভাবে মনোযোগী হওয়া উচিত।

ডিডিটি একটি যৌগিক পদার্থ। ইহা ডাইক্লোরো-ডাই-ফিনাইল—ট্রাইক্লোরো-থেন এই তিনটি শব্দের সংক্ষিপ্ত রূপ। ১৮৭৪ খ্রীষ্টাব্দ হইতে ইহার কথা বৈজ্ঞানিক মহলে জানা ছিল। ১৯৩৯ খ্রীষ্টাব্দে ডক্টর পল লেদার এবং ডক্টর পল মুলার নামক দুই জন সুইস রাসায়নিক আবিষ্কার করেন যে, ইহা একটি পতঙ্গবিনাশক রাসায়নিক দ্রব্য—বিশেষতঃ মশক-কুল ধ্বংস করিবার পক্ষে ইহা ব্রহ্মাস্ত্র স্বরূপ। তখন হইতেই ম্যালেরিয়া নিবারণে ইহার প্রয়োগ আরম্ভ হয়। বিষুবরেখার ২৫ অংশ উত্তর এবং ২৫ অংশ দক্ষিণ দিকস্থ অঞ্চলেই ম্যালেরিয়ার প্রাদুর্ভাব বেশী দেখা যায়।

মশক শুধু যে ম্যালেরিয়ার বাহক তাহা নয়, ইহারা পীত জ্বর এবং গোদ প্রভৃতি ব্যাধিও সংক্রামিত করিয়া থাকে। এই সমস্ত সংক্রামক রোগের বাহন মশককুল ধ্বংস করায় ডিডিটির জুড়ি নাই। তা ছাড়া অন্যান্য লোকক্ষয়কারী রোগ-বীজাণু-বাহক কীট-পতঙ্গাদিও ডিডিটি প্রয়োগে সম্পূর্ণরূপে বিনষ্ট হইয়া থাকে। মোট কথা কীট-পতঙ্গবিনাশক পদার্থের মধ্যে ইহাকে শ্রেষ্ঠতম বলিলে অত্যুক্তি হয় না। বিগত কয়েক বৎসরব্যাপী পরীক্ষণের ফলে ডিডিটি সম্বন্ধে যে সকল তথ্য আবিষ্কৃত হইয়াছে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বহুসংখ্যক সরকারী এজেন্সি সাধারণের উপকারার্থে তাহা প্রকাশিত ও প্রচারিত করিতেছেন।

যুদ্ধকালীন প্রয়োজনে ডিডিটি বহুল পরিমাণে ব্যবহৃত হইয়াছে, যুদ্ধোত্তরকালে কোন কোন ক্ষেত্রে ডিডিটির প্রয়োগ যাহাতে ফলপ্রদ হইতে পারে তৎসম্বন্ধেও প্রচুর গবেষণা ও পরীক্ষণ হইয়াছে। এই সমস্ত গবেষণার ফলে দেখা গিয়াছে যে, সাবধানতার সহিত প্রয়োগ করিলে উষ্ণরক্ত বিশিষ্ট (Warm blooded) প্রাণীদের দেহে ডিডিটির বিষক্রিয়া প্যারিস গ্রিন বা সোডিয়াম ক্লোরাইড অপেক্ষা বেশী পরিলক্ষিত হয় না, পক্ষান্তরে, শীতলরক্ত-বিশিষ্ট (Cold blooded) প্রাণীদের দেহে একবার মাত্র ডিডিটি প্রয়োগ করিলে তাহাদের মৃত্যু অনিবার্য্য। কতকগুলি গাছগাছড়ার উপরেও ইহার আশ্চর্য্যজনক প্রতিক্রিয়া পরিলক্ষিত হইয়া থাকে।
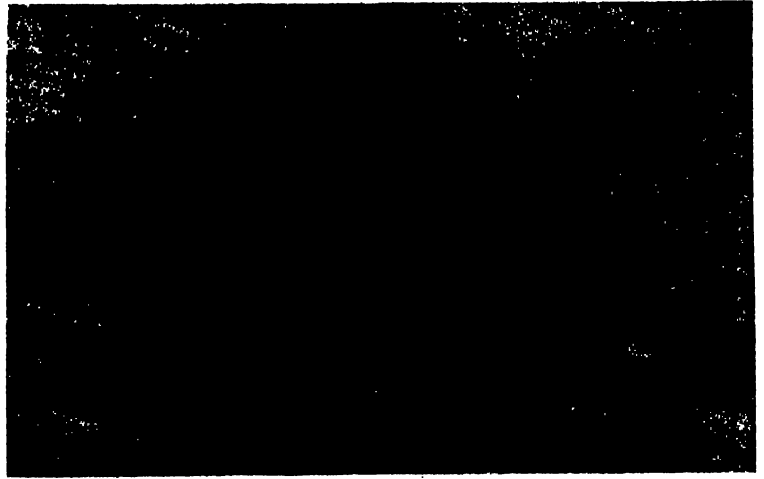
ম্যালেরিয়াবাহী মশকের উৎপত্তি নিবারণকল্পে শ্রমিকগণ কর্তৃক একটি জল-নির্গমের খাতের নিকটস্থ আগাছার জঙ্গল পরিষ্কার

ডিডিটি এক ধরণের শ্বেতবর্ণ, স্বচ্ছ পদার্থ। জীবদেহের বাহিরে এবং ভিতরে উভয়ত্রই ইহার বিষক্রিয়া হইয়া থাকে এবং বৈজ্ঞানিকগণের সিদ্ধান্ত এই যে, ইহা স্নায়ুমণ্ডলীর উপর ক্রিয়া করিয়া থাকে। ইহার বিশিষ্ট ধর্ম হইতেছে স্থায়ী বিষক্রিয়া। কেননা ইহা দ্রব্যাদির গায়ে বা প্রাণিদেহে আঠার মত লাগিয়া থাকে এবং সপ্তাহের পর সপ্তাহ, মাসের পর মাস ব্যাপিয়া ইহার কার্য্যকারিতা বিদ্যমান থাকে।

ক্ষেতে অথবা বাগানে ডিডিটি প্রয়োগকালে বিশেষ

সাবধানতা অবলম্বন করা আবশ্যক। মাছ, সাপ, কাঁকড়া প্রভৃতি অন্যান্য শীতল রক্তবিশিষ্ট প্রাণীর পক্ষে সামান্য পরিমাণ ডিডিটির বিষক্রিয়াও মারাত্মক। একবার পরীক্ষা ব্যপদেশে একটি পুকুরের উপর ডিডিটি প্রয়োগ করা হইয়াছিল, ফলে কয়েক মিনিটের মধ্যে পুকুরের সমস্ত মাছ মরিয়া যায়।

তরিতরকারির বাগানে ডিডিটি প্রয়োগ করিয়া দেখা গিয়াছে যে, ইহার ফলে বিলাতি বেগুন, গোধূমাদি শস্য, সিম, প্রভৃতির বৃদ্ধি ও পরিপুষ্টির ব্যাঘাত জন্মে এবং কোয়াশ, শশা এবং তুঁত ও তরমুজ খরমুজ প্রভৃতি গাছপালা মরিয়া যায়।

গৃহস্থ-পরিবারে ছারপোকা, মশা, মাছি ইত্যাদির বিনাশ-সাধনে ডিডিটির অমোঘ শক্তি দেখা গিয়াছিল, কিন্তু আরসুলা, পিঁপীলিকা ইত্যাদির ক্ষেত্রে এ ধরণের অন্যান্য যৌগিক পদার্থ

ডিডিটিকে তরল বিন্দুতে পরিণত করিয়া তাহা দ্বারা ঘরের পর্দার মশক বিনাশ। মশককুলের হাত হইতে রক্ষা করিবার জন্য কোনো কোনো প্রাণীদেহেও ইহা তরল বিন্দু আকারে প্রয়োগ করা হয়

প্রয়োগে যেমন, তদপেক্ষা বেশী প্রতিক্রিয়া দেখা যায় নাই। জমির উপর এক বার মাত্র ইহা প্রয়োগ করিলে দুই মরসুমের কীটপতঙ্গাদি বিনষ্ট হইয়া যায়।

বৈজ্ঞানিকগণ মনে করেন যে, ডিডিটিকে তরল বিন্দুতে পরিণত করিয়া ব্যাপক ভাবে প্রয়োগ করিলে জ্বর, ডেঙ্গু, টাইফাস, আমাশয়, কলেরা, প্লেগ প্রভৃতি কীট-পতঙ্গবাহিত ব্যাধিসমূহকে নিয়ন্ত্রিত করিবার সুব্যবস্থা হইতে পারে।

ডিডিটি আবিষ্কৃত হইবার পূর্ব্বে উকুনবাহিত টাইফাস রোগ প্রতিবেধের কোনও পন্থা মানুষের জানা ছিল না। ঐ রোগ

শ্রমিকগণ কর্তৃক বনাঞ্চলে একটি জল-নির্গম-খাত নির্ম্মাণ
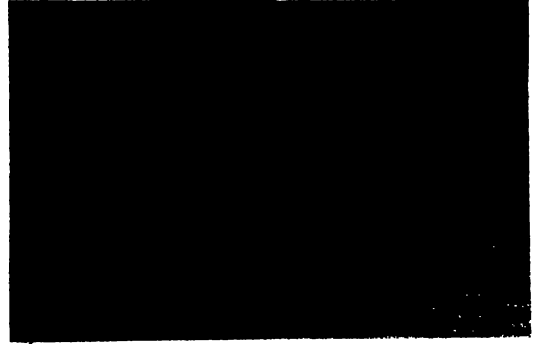
কোনও দেশে দেখা দিলে সেখানকার অধিবাসীদের অবস্থা শোচনীয় হইয়া দাঁড়াইত, শতকরা চল্লিশ জন লোক এ ব্যাধির কবলে মৃত্যুমুখে পতিত হইত। কথিত আছে যে, প্রথম বিশ্ব-যুদ্ধকালে এবং তাহার অব্যবহিত পরে সবসুদ্ধ পাঁচ লক্ষ রুশীয় এই রোগে মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছিল। নেপলসে যখন টাই-ফাস রোগ দেখা দেয় তখন যুক্তরাষ্ট্রের ওরল্যাণ্ডো, ফ্লোরিডার কৃষি গবেষণা-বিভাগের ডিরেক্টর সমভিব্যাহারে মার্কিন যুক্ত-রাষ্ট্রের টাইফাস কমিশন ডিডিটি পাউডারে ভর্ত্তি অনেকগুলি পাত্রসহ সেখানে গিয়া উপস্থিত হয়। (ওরল্যাণ্ডোর কৃষি-গবেষণাগারেই ডিডিটি সম্বন্ধে প্রচুর গবেষণা হয় এবং পরী-ক্ষণাদি দ্বারা ইহার কার্য্যকারিতা প্রমাণিত হয়—এমনই ভাবে সেখানে সামান্য একটি রাসায়নিক ফরমূলা হইতে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কীটপতঙ্গবিনাশক পদার্থ উদ্ভাবিত হয়।) উপরি-উক্ত মিশনের নেপলসে উপস্থিতির পূর্ব্বেই ৬০ জন রোগীকে হাসপাতালে ভর্ত্তি করা হইয়াছিল। সকলেই মনে করিয়াছিল যে, এই মহামারীর সময় অন্ততঃ ৫০০ জন প্রত্যহ এই ব্যাধিতে আক্রান্ত হইবে, কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় তেমনধারা কিছু ঘটিল না।
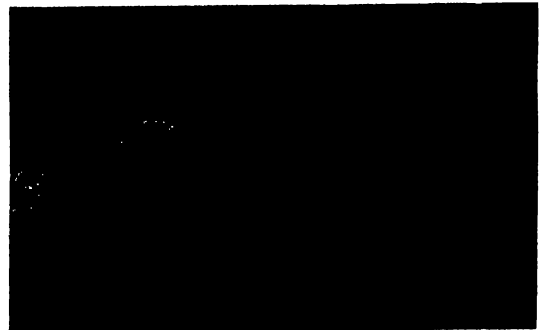
তরলীকৃত ডিডিটিতে পূর্ণ একটি পেয়ালা। একটা গোটা পরিবারকে মশকের হাত হইতে রক্ষা করিবার পক্ষে এই ধরণের দুই পেয়ালা ডিডিটিই যথেষ্ট

কমিশন ৩০০,০০০ জন নেপলসবাসীর পায়জামার উপরে, জামার হাতার এবং কলারের নীচে ডিডিটি চূর্ণ লেপিয়া দিলেন। এই চূর্ণ নেপলসের সমস্ত উকুন ধ্বংস করিল। দুই মাসের মধ্যে উক্ত শহর সম্পূর্ণ রূপে সংক্রামক টাইফাস ব্যাধির কবল-মুক্ত হইল। পৃথিবীর ইতিহাসে এই সর্বপ্রথম টাইফাস মহামারী মানুষের নিকট পরাজয় স্বীকার করিল—মানুষ তাহার সংক্রামণকে প্রতিরোধ করিল একমাত্র ডিডিটির সাহায্যেই।

রামায়ণে সঙ্গীতের কথা

স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ

রামায়ণের যুগে সঙ্গীতের প্রচলন ছিল কি-না? এ প্রশ্ন করার সাধারণতঃ কোন সার্থকতা দেখা যায় না বটে, কিন্তু সঙ্গীতের ক্রমবিকাশ তথা ঐতিহাসিক ধারা অনুশীলন করলে দেখা যায়, পৃথিবীর আদিম যুগ থেকে আজ পর্যন্ত সঙ্গীতের রূপ ও গতি অব্যাহতই রয়েছে—তা সে যে আকারেই হোক। বৈদিক সামগানে নানা স্বরের প্রচলন হয়েছিল। আর্চিক, গাথিক, সামিক, স্বরান্তর, ঔড়ব, ষাড়ব ও সম্পূর্ণ রূপের ভিতর দিয়ে রূপায়িত হলেও সঙ্গীত বিভিন্ন সময়ে ভিন্ন ভিন্ন রূপেই আত্ম-প্রকাশ করেছে। রামায়ণের যুগেও তার একটি বৈশিষ্ট্য ও বিকাশের অভিব্যক্তি অবশ্যই ছিল। তাই ঐতিহাসিক দৃষ্টির দিক দিয়ে তখনকার সমাজও সঙ্গীতকে কি ভাবে গ্রহণ করেছিল এ বিষয় অন্তত আলোচনা ক'রে আমাদের দেখা উচিত।

সঙ্গীতের গোড়াকার কথা ছেড়ে দিলেও সঙ্গীতের কৌলিন্য, ঐশ্বর্য ও পদ-মর্যাদার পরিচয় পাই আমরা প্রাতিশাখ্য ও বিশেষ ক'রে শিক্ষার ভেতরেই। শিক্ষার পর রামায়ণ, তারপর মহাভারত, (১) হরিবংশ ও পুরাণের যুগ। রামায়ণের যুগে সঙ্গীতের অভিব্যক্তি ও রূপ কি রকম ছিল এ বিষয়ে অনুসন্ধান ক'রে দেখলে দেখা যায়, সঙ্গীতের অনুশীলন ও প্রচলন সে সময়ে যেমনই থাকুক না কেন, রামায়ণ মহাকাব্যে অন্ততঃ সঙ্গীতের আশানুরূপ পরিচয় আমরা কিছুই পাই নি। তারপর একথাও আমরা স্বীকার করি যে, ভারতীয় সঙ্গীতের ধারা যেভাবে সমাজের ভেতর দিয়ে ক্রমিক উন্নতির স্তরকে অবলম্বন ক'রে বিকাশ লাভ করেছে, রামায়ণের যুগে সে বিকাশের গতি ও রূপের কিছু বৈলক্ষণ্য হয়েছিল এবং সত্যি ক'রে বলতে গেলে সঙ্গীতের অনেক-কিছুরই পরিপূর্ণ মূর্তির কোন আভাস তখন আমরা পাই নি। অথচ রামায়ণের প্রণয়নকর্তা মহামুনি বাল্মীকি সঙ্গীতবিদ্যায় বিশেষ পারদর্শী ছিলেন, আর সে-পারদর্শিতার পরিচয়ও তিনি দিয়েছেন লব ও কুশকে রামায়ণ-গান শিক্ষা দেবার সময়ে। অবশ্য এই লব ও কুশ সম্বন্ধে পাশ্চাত্য পণ্ডিতদের ভেতর বেশ একটা মতদ্বৈধও আছে এই নিয়ে যে, এরা সত্যিকারই শ্রীরামচন্দ্রের পুত্র ছিল, কি বিভিন্ন দেশভ্রমণকারী 'গাথা'-গায়কই মাত্র ছিল? অনেকে আবার এদের ঐতিহাসিক অস্তিত্ব-বিষয়েও সন্দিহান হয়ে থাকেন।(২)

মোট কথা, রামায়ণের যুগে সমাজে ভারতীয় সঙ্গীতের আলোচনা যে ছিল একথা নানা দিক থেকে বিচার ক'রে দেখলে তা স্বীকার করতেই হয়। তাই আশ্চর্যের বিষয় যে, রামায়ণ-প্রণেতা বাল্মীকি নিজে গান্ধর্বকলায় সুপণ্ডিত হয়েও তাঁর লেখার ভেতর সঙ্গীতের খুঁটিনাটির কোন পরিচয় কেন দিলেন না! রহস্য বা উদ্দেশ্য তাঁর এ না-দেওয়ার বিষয়ে যাই থাকুক না কেন, আমরা কিন্তু বলি—ঐতিহাসিক ও সত্যানুসন্ধিৎসুদের দরবারে এজন্যে তিনি কম বড় অপরাধী হন নি।

১। পণ্ডিতদের ভেতর কিন্তু যথেষ্ট মতভেদ আছে এই নিয়ে যে, রামায়ণ আগে—কি মহাভারত আগে? আমরা অবশ্য এই ঐতিহাসিক আলোচনায় বর্তমানে যোগ দেব না।

২। প্রোঃ উইণ্টারনিজ্ বল্‌তে চেয়েছেন যে, লব ও কুশের কাহিনীকে রামায়ণিক আখ্যানে পরে জুড়ে দেওয়া হয়েছে ('interpolated') এবং শুধু লব ও কুশই নয়, এ রকম অনেক যাযাবর-বৃত্তিসম্পন্ন গায়কেরা রামায়ণের যুগে ছিল যাদের আবার রাজা-রাজড়াদের সভাগায়ক ইত্যাদি রূপেও দেখা যায়। এ. হপ্‌ট্‌ম্যান, প্রোঃ জেকবি, প্রোঃ লেভি ও প্রোঃ হপকিন্‌স্ প্রভৃতি মনীষীদের অভিমতও তাই। প্রোঃ উইণ্টারনিজ এ সম্বন্ধে বলেছেন:

"Thus it is related in the *Ramayana*, though in a late, interpolated song, how the two sons of Rama, Kusha and Lava travelled about as wandering singers and recited in public assemblies the poem learned from the poet Valmiki" (—Vide *A History of Indian Literature*, vol. I, p. 315.)

হপ্‌ট্‌ম্যানও লব ও কুশকে "travelling singers called *Kushilavas*" ব'লে অভিহিত করেছেন যারা আবার সাধারণের কাছে বাঁশীর সঙ্গে স্বর মিলিয়ে 'গাথা' গান করত। প্রোঃ জেকবি বলেছেন:

"The names Kusha and Lava were invented as a kind of etymological interpretation of the word *Kushilava*. * * who sang epic songs to the accompaniment of the lute." প্রোঃ উইণ্টারনিজ প্রণীত *A History of Indian Literature*, vol. I, p. 315 দ্রষ্টব্য।

রামায়ণকে অনেকে বলতে চান নাকি আধ্যাত্মমূলক সাহিত্য, শ্রীরামচন্দ্রের মহিমা ও গুণকীর্তনেই কেবল ভরপুর। কিন্তু সত্যিকার ভাবে আলোচনা করলে এটা মোটেই অস্বীকার করা যাবে না যে, রামায়ণ সাহিত্য একটি ইতিহাসও বটে। রামায়ণের যুগে সমাজ, সাহিত্য, কলা, ভাস্কর্য, রাজনীতি, শিক্ষা, দর্শন, ধর্ম ও আচারপ্রণালী সব-কিছুরই পরিপূর্ণ অভিব্যক্তি আমরা পেয়ে থাকি; কেবলই হেঁয়ালী ও রূপকথার এর পাতা ভর্তি নয়। তারপর অনেকে যাঁরা আবার রামায়ণের ঐতিহাসিকতাকে কোন রকমে মানতে রাজী হন, তাঁদের মতে হ'ল রামায়ণ-মহাকাব্য একখানি বই, যাতে আছে অসভ্য ও সুসভ্য এ দুটি জাতের মাত্র হাটি, লড়াই, সভ্যতা ও ধর্ম-পরিচয়ের কথা। মানুষেরা ছিল সুসভ্য জাত (আর্য) ও রাক্ষসেরা ছিল অসভ্য (অনার্য); এদের ভেতর ক্রমাগতই লেগে থাকত প্রতিদ্বন্দ্বিতা ও যুদ্ধ। অবশ্য 'অসভ্য' বলতে তাঁরা বুঝে থাকেন মাত্র তাদের যাদের বুদ্ধি ও সংস্কৃতির কোন বিকাশের পরিচয় পাওয়া যায় না। কিন্তু এখনকার অনেক পণ্ডিতের অভিমত হ'ল আবার সম্পূর্ণ ভিন্ন। আর্য ও অনার্য জাতি বলতে মোটেই বোঝায় না তাদের যাদের আমরা বলি মানুষ বা রাক্ষসবংশীয়। অনার্যরা ('non-Aryans) এসেছিল ভারতেরই বাইরে থেকে; সংস্কৃতি, শিক্ষা বা সভ্যতা তাদের নিজেদের বলতে কিছুই ছিল না। যাযাবরের মতই তারা বাস করত এখানে সেখানে ঘুরে-ফিরে 'আর্য' তথা আদিম সুসভ্য ভারতবাসীদের সঙ্গে যুদ্ধ-বিগ্রহ ক'রে। রাক্ষসেরাও ছিল কিন্তু এদেশেরই লোক। দেব, মনুষ্য ও রাক্ষস এ তিন বংশের ভেতর তারা ছিল রাক্ষস-বংশের অন্তর্ভুক্ত।(৩) রাক্ষসেরাও যুদ্ধ করতে জানত। তাদের উন্নত সমাজ ছিল, সমাজ-শাসন ছিল, নিয়মশৃঙ্খলা ও শান্তির আবহাওয়া ছিল। রাক্ষসদেরও হৃদয় ছিল; দয়া, মায়া ও প্রত্যুপকার দেওয়ার দায়িত্ব-জ্ঞান ছিল। তাদেরও রাজা ছিল এবং রাষ্ট্র ছিল। তারাও তপস্যা করতে জানত এবং তপস্যায় সন্তুষ্ট ক'রে দেবতাদের নিকট থেকে বর-ভিক্ষা পেয়েছে; সুতরাং অসভ্য তারা মোটেই ছিল না। তবে অসভ্য ছিল সুসভ্য ও প্রতিবেশী উত্তরদেশবাসীদের জ্ঞান ও গরিমার তুলনায় এই মাত্র যা বলা যায়।

সত্যি কথা বলতে কি, রামায়ণের যুগে রাক্ষসেরা ছিল আমাদেরই মতন মানুষ; জ্ঞান, বীর্য ও গরিমায় বরং আমাদের (তথাকথিত মনুষ্যজাতির) চেয়েও তারা ছিল উন্নত। সুতরাং আর্য ও অনার্যের যুদ্ধ—এ মিথ্যা-কাহিনীর অংশীদার কি মানুষ কি রাক্ষস কেউই ছিল না; কেননা রাজা রাবণই তার সাক্ষ্য বা উদাহরণ। দয়া, ধর্ম, তপস্যা, সাম-দান-ভেদ-দণ্ড-নীতিজ্ঞান, শিল্প ও ভাস্কর্যের চরম উন্নতি সাধনে প্রচেষ্টা, বিজ্ঞানের সম্মান প্রদর্শন—এ সকল বিষয়েই রাক্ষসরাজ অগ্রণী ছিলেন। রাজা দশরথের কাহিনী ও তাঁর রাষ্ট্রগৌরব; শ্রীরামচন্দ্রের সত্যনিষ্ঠা; সীতার আদর্শ নারীচরিত্র ও পতিভক্তি; ভরত, লক্ষ্মণ ও শত্রুঘ্নের ভ্রাতৃভক্তি, শ্রদ্ধা ও আত্মত্যাগের জলন্ত নিদর্শন—এ সবই আবার উন্নত আর একটি ভারতীয় সমাজের পরিচয় দান করে। হনুমানের বীর্য, কর্তব্যপরায়ণতা ও দাস্যভক্তি; সুগ্রীব ও অঙ্গদের বুদ্ধিচাতুর্য, কলানৈপুণ্য ও বীরত্ব প্রভৃতি তথাকথিত মধ্যভারতীয় অসভ্য সমাজেরই(?) আবার কলঙ্ক দূর করেছে। রামায়ণের যুগে দেশ এবং দশের চিন্তা ও জ্ঞানের পরিণতি রামায়ণ পরিপূর্ণভাবেই বরং অঙ্কিত করেছে। আর সেজন্যেই বলছি যে, সঙ্গীতের বেলায়ও তাই; রামায়ণ-রচয়িতা ঠিক সঙ্গীতের কথাকেও একেবারে অবহেলা করতে পারেন নি। কিন্তু তা হলেও একথা সত্যি যে, সঙ্গীত সম্বন্ধে যতখানি আলোচনা করা দরকার অন্ততঃ ঐতিহাসিকদের জানার আগ্রহকে নিবৃত্তি করার মতন ততখানি প্রচেষ্টা রামায়ণকার মোটেই করেন নি, সাধারণ পরিচিতির আলেখ্যই তিনি এঁকে গেছেন মাত্র।

রামায়ণকে দেখা যায় সাতটি পরিচ্ছেদে ভাগ করা হয়েছে, আর রামায়ণকার সে পরিচ্ছেদগুলির নাম দিয়েছেন 'কাণ্ড' ব'লে। যেমন—(১) বালকাণ্ড, (২) অযোধ্যাকাণ্ড, (৩) অরণ্যকাণ্ড, (৪) কিষ্কিন্ধ্যাকাণ্ড, (৫) সুন্দরাকাণ্ড, (৬) যুদ্ধকাণ্ড ও (৭) উত্তরাকাণ্ড। এই কাণ্ডগুলির ভেতর বিশেষ ক'রে সঙ্গীতের আলোচনা পাই আমরা বালকাণ্ডে সামান্য, অযোধ্যা-

৩। বাস্তবিক 'রাক্ষস' বলতে আমরা সাধারণত 'অসুরই' বুঝে থাকি। 'অসুর' কথাটি কিন্তু আগে অর্থাৎ বৈদিক যুগে দেবতাদের উদ্দেশ্যেই ব্যবহৃত হ'ত। ঋগ্বেদের ৯-ম মণ্ডল পর্যন্ত দেখা যায়, 'অসুর' বলতে সেখানে 'দেবতা'কেই বোঝাচ্ছে। বরুণ ও ইন্দ্র—এঁরাও সব 'অসুর' নামেই অভিহিত হতেন; যেমন বরুণাসুর, ইন্দ্রাসুর, অর্থাৎ বরুণদেবতা, ইন্দ্রদেবতা। ঠিক ঠিক লক্ষ্য করলে দেখা যায় যে, ঋগ্বেদের ১০-ম মণ্ডলেই এই শব্দ বা কথাগুলির বিপর্যয় দেখা দিয়েছে। মোক্ষমূলার প্রমুখ পণ্ডিতেরাও স্থির করেছেন যে, ঋগ্বেদের ১০-ম মণ্ডল লেখা হয়েছে ১ম—৯ম মণ্ডলের অনেক পরে। অসুর ও দেবতা শব্দ নিয়ে পারসিক ধর্মে (Persian religion) দেখা যায় ঠিক বিপরীত। সেখানে 'অসুর' অর্থাৎ 'অহুর' শব্দ দেবতার পরিবর্তে ব্যবহৃত হয়, যেমন 'অসুর মহবন' থেকে 'অহুর বা আহুর মজদ।' নামকরণ করা হয়েছে। আর 'দেও' বা 'দেবতা' শব্দে তাদের বোঝায় ভূত বা অপদেবতাকে। সুতরাং রামায়ণে যে রাবণকে অসুরাধিপ বলা হয়েছে সেও সম্পূর্ণ আর্য-সংস্কৃতিসম্পন্ন নৃপতি ব'লেই মনে করা হয়েছে যদিও আর্য-সংস্কৃতি ও ধর্মের মধ্যে সব আবার ভাগ ও ভিন্নতা ছিল। তা ছাড়া প্রাচীন সংস্কৃত সাহিত্যে ও এমন কি সঙ্গীতশাস্ত্রেও 'অসুর'কে আর্যদেরই একটি clan (বংশ) বা Tribe-এর অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। মোট কথা অসুর বা রাক্ষস অনার্য কোন জাতি বা শাখার মোটেই অংশবিশেষ ছিল না, অসুর আর্যদেরই একটি শাখা মাত্র, যাদের সংস্কৃতি ও সভ্যতা দেবতা ও মানুষদেরই অনুরূপ, যদিও ভিন্ন ভিন্ন ছিল।

কাণ্ডে ও উত্তরাকাণ্ডে কিছু বেশী, আর অপরাপর কাণ্ডে খুব সামান্য। যেমন বালকাণ্ডে আছে,

"গায়ন্ত্যো নৃত্যমানাশ্চ বাদয়ন্ত্যস্তু রাঘব।
আমোদং পরমং জগ্মুর্বরাভরণভূষিতাঃ।"(৪)

এখানে নৃত্য, গীত ও বাদ্যের কথাই বলা হয়েছে, শুধু গান বা গীতের কথা বলা হয় নি। সুতরাং একথা ঠিক যে, সঙ্গীতের সমবেত রূপ বলতে নৃত্য, গীত ও বাদ্যের পরস্পর মিলন, যা আমরা বুঝি, রামায়ণের যুগেও তার কোন পরিবর্তন হয় নি। তবে এটাও ঠিক যে, 'সঙ্গীত' এই পরিভাষা নৃত্য, গীত ও বাদ্য বা নাট্য-শাস্ত্রকার ভরতের গীত, বাদ্য ও নাট্যের সমবেত রূপের প্রতিনিধিরূপে তখনও ঠিক দেখা দেয় নি। 'গান্ধর্ব'-সঙ্গীতের কথাও রামায়ণে নেই বললেই চলে, কেবল দু'এক জায়গায় তার উল্লেখ মাত্র ছাড়া।

তার পর ৭৩ সর্গে যেখানে শ্রীরামচন্দ্রের বিবাহ ও ধনুর্ভঙ্গ হচ্ছে সেখানে বলা হয়েছে আবার,

"পুষ্পবৃষ্টির্মহত্যাসীদন্তরিক্ষাৎ সুভাস্বরা।
দিব্যদুন্দুভিনির্ঘোষৈর্গীতবাদিত্রনিঃস্বনৈঃ।
ননৃতুশ্চাপ্সরঃ সংঘা গন্ধর্বাশ্চ জগুঃ কলম্।"(৫)

এখানেও "গীতবাদিত্র" ও "ননৃতুঃ" কথাগুলির উল্লেখ থাকায় বর্তমান(৬) "সঙ্গীত" কথারই প্রতিধ্বনি করা হয়েছে মাত্র। তা ছাড়া 'দুন্দুভি' বা 'দেবদুন্দুভি' তখনকার দিনে বেশ একটা পরিচিত বাদ্যযন্ত্র ছিল একথাই বোঝা যায়। নৃত্যকারীদের ভেতর অপ্সরা ও গন্ধর্বরাও ছিলেন। অপ্সরারা নৃত্যশীলা চঞ্চলা ও গন্ধর্বগণ গীত ও বাদ্যে সুনিপুণ ছিলেন।

এর পরই অযোধ্যাকাণ্ডের ভেতর পাই আমরা সঙ্গীতের একটু বিশদ রূপের পরিচয়। তবে এটাও ঠিক যে, এ বিশদতার অর্থ কেবল পরিচিতি বা বর্ণনামাত্রেই পর্যবসিত; সাঙ্গীতিক কোন ঔপপত্তিক (theoretical) বিষয় নিয়ে আলোচনা মোটেই করা হয় নি। এই অযোধ্যাকাণ্ডে পাই আমরা "মনঃকর্ণসুখাবাচ"(৭)। বা "শুশ্রাব" মানে "রাগ"-এর(৮) কথা বা স্বরসমষ্টির বিকাশ দিয়ে লোকের চিত্তরঞ্জন ক'রে থাকে। দেব, দানব, গন্ধর্ব, কিন্নর ও নাগবংশীয় শিল্পীদের উল্লেখও পাওয়া যায়।(৯) ভিন্ন ভিন্ন গায়কসম্প্রদায়ের পরিচয়ও রামায়ণে দেওয়া হয়েছে; যেমন "গায়কাঃ * * নিগদন্তঃ পৃথক্ পৃথক্।"(১০) এ থেকে গানের রীতি বা পদ্ধতি যে প্রাতিশাখ্য-যুগের মতন অনেকাংশে ছিল তাও সহজে অনুমান করা যায়। রামায়ণে শ্রুতির কথাও আছে, অর্থাৎ গায়কসম্প্রদায় রামায়ণের যুগে শ্রুতিবিভাগকে বেশ সাবধানতার সঙ্গেই রক্ষা ক'রে চলতেন এবং সেজন্যে তাঁরা শ্রুতিজ্ঞানে পারদর্শীই ছিলেন বলা যায়। রাজাদের উদ্দেশে 'স্তব' বা গুণকীর্তনের প্রথা তখনও ছিল। রামায়ণের যুগে রাজারা গায়কসম্প্রদায়কে 'স্তাবক'শ্রেণী বা চারণদলভুক্ত ক'রে নিজেদের রাজসভায় বৃত্তি দিয়ে রাখতেন, আর এরকমের রীতির অনুসরণ করাটাও তখনকার দিনে রাজাদের পক্ষে অন্তত গৌরবের বিষয়ই ছিল।(১১) কেননা ৬৫ সর্গের ৬ শ্লোকেই উল্লেখ করা হয়েছে: "আশীর্গেয়ং চ গাথানাং পূরয়ামাস বেশ্ম তৎ।" এখানে "গাথা" বলতে আশীর্বাদজ্ঞাপক গানকেই বোঝায়। টীকায়ও বলা হয়েছে: "গাথানাং কেবলগায়কানামাশীর্গেয়মাশীর্বাদ-প্রধানং গানম্। যদ্বা গাথা রাজ্ঞাং চরিত্রাদিপ্রতিপাদিকা-স্তামাশীর্বাদঘটিতং গানমিত্যর্থঃ।" সুতরাং রাজা বা সম্রাটদের সভায় স্তাবক বা চারণদলের বৈগুণ্য মোটেই রামায়ণের যুগেও ছিল না একথা বুঝতে হবে।(১২)

বীণার প্রচলন তখন বেশীই ছিল। বীণা ও বেণু (বংশ) শুধু রামায়ণের যুগেই নয়, বৈদিক যুগেও গান, গীতি বা গাথার প্রধান সহায়ক ছিল।(১৩) ব্রাহ্মণের যুগে শততন্ত্রী, এমন কি সহস্র-তন্ত্রীর উল্লেখ পাওয়া যায়। মৃদঙ্গের কথাও নূতন নয়।(১৪) তবে বেদ, রামায়ণ, মহাভারত বা পুরাণের যুগে মৃদঙ্গ বললে মৃৎ+অঙ্গ বা মাটি দিয়ে তৈরি বাদ্যযন্ত্রই বোঝাত। মার্গ তথা অভিজাত গানে, বিশেষতঃ শেষের দিকে মোগল রাজত্বের আমলে মৃদঙ্গে কাঠের প্রচলন হয়েছিল ব'লেই আমাদের অন্তত ধারণা।

৪। রামায়ণ (পুণা সং), ৩২ সর্গ, ১৩ শ্লোঃ

৫। ঐ ৭৩ সর্গ, ৩৭-৩৮ শ্লোঃ

৬। 'বর্তমান' বলতে এখানে বুঝতে হবে সঙ্গীতমকরন্দ যখন 'সঙ্গীত' এই শব্দটি গীত, বাদ্য ও নৃত্য—এ তিনের সমবেত রূপ হিসাবে প্রথম প্রচলন করলেন। সঙ্গীতমকরন্দের সময় ৭ম ও ১১শ শতাব্দীর মাঝামাঝি এটাই অনুমান।

৭। রামায়ণ, অযোধ্যাকাণ্ড, ৬ সর্গ ১৪ শ্লোঃ

৮। পরবর্তী সঙ্গীতশাস্ত্রে "রঞ্জকঃ স রাগ" বা "যো রঞ্জকো জনচিত্তানাং স রাগঃ" বলা হয়েছে (রাগবিবোধ ৪।১ ও তার টীকা দ্রষ্টব্য)। এই রাগ আবার স্বরসমষ্টিরই রূপ ছাড়া আর কিছু নয়। 'স্বর' অর্থেও সঙ্গীতশাস্ত্রকাররা বলেছেন: "মনঃ স্বতো রঞ্জয়তীতি" বা "স্বতো রঞ্জয়তি শ্রোতৃচিত্তং"(রাগবিবোধ ১,১৪ ও টীকা দ্রষ্টব্য)।

৯। রামায়ণ, অযোধ্যাকাণ্ড, ৫০ সর্গ ১৪ শ্লোঃ

১০। ঐ ৬৫ সর্গ ২ শ্লোঃ

১১। ঐ ঐ ৩ শ্লোঃ

১২। প্রোঃ উইন্টারনিজও উল্লেখ করেছেন:

"The authors, reciters and preservers of this heroic poetry were the bards, usually called *Sutas*, who lived at the courts of kings and recited or sang their songs at great feasts in order to proclaim the glory of the princes. They also went forth into battle, in order to be able to sing of the heroic deeds of the warriors from their own observations."—Vide *A History of Indian Literature*, vol. I, p. 315.

অযোধ্যাকাণ্ডে ৯২ সর্গে অপ্সরা ও গন্ধর্বদের আবার বিশেষ ক'রে নাম করা হয়েছে। যেমন,

"আহ্বয়ে দেবগন্ধর্বাবিশ্বাবসুহাহাহুহূন্।
তথৈবাপ্সরসো দেবগন্ধর্বৈশ্চাপি সর্বশঃ॥(১৫)

এখানে বিশ্বাবসু, হাহা, হুহু এঁরা সকলে গন্ধর্ব ও সঙ্গীত-বিশারদ ছিলেন। ৯১ সর্গের ৪৬ শ্লোকে নারদ ও তুম্বুরুর কথাও উল্লেখ করা হয়েছে: "নারদস্তুম্বুরুর্গোপঃ"। এই নারদ ও তুম্বুরু গন্ধর্বদের ভেতর প্রধান ছিলেন, কেননা রামায়ণকার নিজেই স্বীকার করেছেন: "এতে গন্ধর্বরাজানো।" এখানে সঙ্গীতবিশেষজ্ঞা অপ্সরাগণেরও নাম করা হয়েছে, যেমন ঘৃতাচী, বিশ্বাচী, মিশ্রকেশী, অলম্বুশ (অলম্বুষা?), নাগদন্তা, হেমা, পুণ্ডরীক, বামনা প্রভৃতি। এই অপ্সরাদের সঙ্গীতের আচার্য ছিলেন গন্ধর্বরাজ তুম্বুরু, কেননা "সর্বাস্তুম্বুরুণা সার্ধমাহ্বয়ে সপরিচ্ছদাঃ" কথাগুলি থেকেই তাঁর আভাস পাওয়া যায়। রামায়ণের ৯১ সর্গের ৪৭ শ্লোকে আবার উল্লেখ করা হয়েছে:

"অলম্বুষে মিশ্রকেশী পুণ্ডরীকাথ বামনা।
উপনৃত্যন্ত ভরতং ভরদ্বাজস্য শাসনাৎ॥"

এখানে ভরত ও ভরদ্বাজের নামের উল্লেখ থাকার জন্যে তুম্বুরুর শিক্ষকতা করার কোন বাধা নেই। "ভরতং ভরদ্বাজস্য" বলতে ভরতের নাট্যশাস্ত্র ও ভরদ্বাজের লিখিত কোন নাট্যগ্রন্থের শাসনই বুঝতে হবে। ভরত আবার পাঁচ জন ছিলেন, যেমন বৃদ্ধভরত, নন্দীভরত ইত্যাদি। কিন্তু এখানে 'ভরত' বলতে প্রসিদ্ধ ভরত নাট্যশাস্ত্রকারকেই ইঙ্গিত করা হয়েছে। তবে ভরদ্বাজের নাট্যগ্রন্থ আমাদের এখন দৃষ্টিগোচর হয় নি।

নৃত্যসঙ্গীতের প্রচলনও রামায়ণের যুগে ছিল, যেমন "নৃত্যন্তশ্চ হসন্তশ্চ" কথাগুলি অপ্সরাদের সম্বন্ধে উল্লিখিত হলেও "গায়ন্তশ্চৈব সৈনিকাঃ" (১৬)—সৈনিকেরাও যে নৃত্যগীতে যোগদান করত তা বোঝা যায়।

রামায়ণের উত্তরাকাণ্ডে সঙ্গীতের কথা সাধারণভাবেই উল্লেখ করা হয়েছে। যেমন ৪২ সর্গে দেখা যায়, রামচন্দ্র কুশাসনে উপবেশন ক'রে সীতাদেবীকে মধু, মাংস ও বিবিধ সুমিষ্ট ফল পরিবেশন করছেন, আর নৃত্যগীতবিশারদ অপ্সরা ও কিন্নরেরা নাচ গান ক'রে রামচন্দ্র ও সীতার চিত্তবিনোদন করছে।(১৭) তারপর ৭১ সর্গের বর্ণনায় সাঙ্গীতিক রহস্যের ভাব একটু সুপরিস্ফুটই বলা যায়। সেখানে লব ও কুশ দু'ভাই গান করছেন: "তস্রাব রামচরিতং।" হাতে তাঁদের বীণা, ত্রিস্থান অর্থে মন্দ্র, মধ্য ও তার—এই তিন স্থানযুক্ত ক'রে ("ত্রিস্থান করণান্বিতম্") এবং তাল, লয় ও মান রেখে ("সমতাল সমন্বিতম্") তাঁরা উত্তম পদযুক্ত "গীতি" (১৮) বা "গাথা" গান করছেন।

এর পরই পাই আমরা ৮৪ সর্গের বিবরণ। যেমন বলা হয়েছে,

"তাং স শুশ্রাব কাকুৎস্থঃ পূর্বাচার্যবিনির্মিতাম্।
অপূর্বাং পাঠ্যজাতিং চ গেয়েন সমলঙ্কৃতম্॥"

এখানে "পূর্বাচার্য" অর্থে টীকাকার বলেছেন: "ভরতেন" অর্থাৎ নাট্যশাস্ত্রকার ভরত।

এই ভরতের সময় নিয়ে কিন্তু পণ্ডিতেরা ঠিক এখনো একমত হতে পারেন নি। ডাঃ এম্. কৃষ্ণমাচারিয়ার বলেছেন: "Scholars assign the work (*Natyasutra*) variously to the period 2nd century B. C. to 2nd century A. D." প্রোঃ এস. কে. দে-র মতে নাট্যশাস্ত্র সম্পূর্ণভাবে শেষ হতে ৮ম শতাব্দীর (8th century A.D.) শেষ পর্যন্ত নিয়েছিল। (২০) অবশ্য প্রোঃ দে মহাশয় র‍্যাপসনের অভিমতই হুবহু উল্লেখ করেছেন বলতে হবে।(২১) শ্রদ্ধেয় হনুগুরু কৃষ্ণচারিয়ারের মতে 'জাতিগান' যখন সমাজে প্রচলিত ছিল তখন, অর্থাৎ খৃষ্টপূর্ব ২০০ থেকে ৪০০ খ্রীষ্টাব্দের

১৩। সোমনাথ তাঁর রাগবিবোধের টীকায় (২ ৪-৫) উল্লেখ করেছেন: "ব্রহ্মণৌ বীণাগাথিনৌ গায়তঃ ব্রাহ্মণোঽন্যো গায়েদিতি।" যাজ্ঞবল্ক্যস্মৃতি "বীণাবাদনতত্ত্বজ্ঞ" ব'লে বীণার প্রচলন স্বীকার করেছেন। ঐতরেয় আরণ্যকে (৩।২) "অথ খল্বিয়ং দৈবী বীণা ভবতি * * মানুষী বীণা ভবতি", বলে বীণার প্রচলনের কথা স্পষ্ট উল্লেখ করেছেন।

১৪। রামায়ণ, অযোধ্যাকাণ্ড, ৮৮ সর্গ ৮ শ্লোঃ; ৯২ সর্গ ২৬ শ্লোঃ।

১৫। ঐ ঐ ৯১ ১৩ শ্লোঃ

১৬। রামায়ণ, অযোধ্যাকাণ্ড ৯১ সর্গ ৬২ শ্লোঃ

১৭। "কুশাস্তরণসংস্তীর্ণে রামঃ সংনিষসাদ হ।
সীতামাদায় হস্তেন মধুমৈরেয়কং শুচি।
পায়য়ামাস কাকুৎস্থঃ শচীমিব পুরন্দরঃ।
মাংসানি চ সুমিষ্টানি ফলানি বিবিধানি চ॥"

রামচন্দ্রকে ইন্দ্রের সঙ্গে ও সীতাকে শচীদেবীর সঙ্গে তুলনা ক'রে রামায়ণকার স্বীকার করতে কুণ্ঠাবোধ করেন নি যে, তখনকার যুগে মধু ও মাংসভক্ষণের প্রথা বিশেষভাবেই সমাজে প্রচলিত ছিল, বিশেষতঃ রাজবর্গের ভেতর তো বটেই। "মধুমৈরেয়কং" শব্দ দুটির অর্থ করতে গিয়ে টীকাকার বলেছেন: "মৈরেয়কং মধু মৈরেয়কসংজ্ঞকং মধু মদ্যম্."

১৮। এখানে "গান্ধর্ব" গানকেই বোঝাচ্ছে।

১৯। "শুশ্রাব রামচরিতং তস্মিন্ কালে যথা কৃতম্। তন্ত্রী-লয়সমাযুক্তং ত্রিস্থানকরণান্বিতম্। সংস্কৃতং লক্ষণোপেতং সমতাল-সমন্বিতম্"

২০। আর এক জায়গায় প্রোঃ দে "4th century A. D."-ও বলেছেন।

২১। Vide Rapson: *Art on Indian Drama* in Encyclopaedia of Religion and Ethics, vol. V, p. 886.

সময়ে ভরত তাঁর 'নাট্যশাস্ত্র' রচনা করেছিলেন। পপ্‌লি (H. A. Popley) আবার ভরতের কাল ৬ষ্ঠ শতাব্দীর গোড়াকার দিকে বল্‌তে চেয়েছেন। কৃষ্ণচারিয়ার রামায়ণ ও মহাভারতের সময় নির্ণয় করেছেন ১০০০-৫০০ খ্রীষ্টপূর্বে। পপ্‌লি স্থির করেছেন খ্রীষ্টপূর্ব ৪০০ থেকে ২০০ খ্রীষ্টাব্দের ভেতর। অবশ্য এসব সিদ্ধান্তের পক্ষে ও বিপক্ষে অনুশীলন প্রচেষ্টার এখনো ইতি হয় নি। ডাঃ রাঘবন ভরতের সময় খ্রীষ্টপূর্ব দ্বিতীয় শতাব্দীই স্থির করেছেন। এম্. এস্. রামচন্দ্রের মতে আবার ৫ম শতাব্দীতে (Circ. 5th Century A.D.)। মিঃ ষ্ট্রাঙ্গয়েজ সাহেবও একবার সিদ্ধান্ত করেছেন ৭ম শতাব্দীতে, আবার নানা কারণ দেখিয়ে বলেছেন:

"There is a slight probability that it (*Natyasastra*) belongs to the late 5th Cent."(২২)

মোট কথা, নাট্যশাস্ত্রকার ভরতের পরেই অভিনয়দর্পণকার নন্দীভরত বা নন্দীকেশ্বরকে নাট্যকলা সম্বন্ধে আলোচনা করতে আমরা দেখি।(২৩) নন্দীকেশ্বরের পরই বৃহদ্দেশীকার মতঙ্গ। মতঙ্গের সময় অনেকে ৯ম শতাব্দী বলে থাকেন। ডাঃ রাঘবন ও মিঃ রামচন্দ্রের মতেও তাই। রামায়ণের অরণ্যকাণ্ডেই কিন্তু এই মতঙ্গের নামের উল্লেখ পাওয়া যায়; যেমন "ঋষেস্তত্র বিধানাং তচ্চ কাননম্।" মহাভারতের সভাপর্বেও তাই: "অগস্ত্যোঽথ মতঙ্গশ্চ"। মতঙ্গ কিন্তু নাট্যশাস্ত্রকার ভরতের অনেক পরের লোক। মতঙ্গের সময় অনেকে আবার নির্দ্ধারণ করতে চেয়েছেন ৪র্থ শতাব্দীতে রচিত একখানি তামিল বইয়ের ওপর নির্ভর ক'রে খ্রীষ্টীয় ৩য় শতাব্দী।(২৪) কিন্তু এ নির্দ্ধারণ সম্পূর্ণ আনুমানিক। মোট কথা, ভরতের সময় আমরা অনুমান করি খ্রীষ্টপূর্ব দ্বিতীয় ও তৃতীয় শতাব্দীর মাঝামাঝি সময়ে। তারপর ভরত যে রামায়ণের যুগেরও অনেক আগেকার গ্রন্থকার এ বিষয়েও কোন সন্দেহ নেই; কেননা মতঙ্গের কথাই শুধু যে রামায়ণে পাওয়া যায়—তা নয়ই; নারদ, তুম্বুরু এঁদের নামেরও উল্লেখ আছে। তা ছাড়া রামায়ণের অযোধ্যাকাণ্ডেই দেখা যায়,

"এতে গন্ধর্বরাজানো ভরতস্যাগতো ভৃশঃ।

* * *

উপনৃত্যন্ত ভরতং ভরদ্বাজস্য শাসনাৎ।"২৫

প্রথম "ভরতস্য" শব্দের চেয়ে শেষোক্ত "ভরতং ভারদ্বাজস্য শাসনাৎ" কথাগুলির ভেতর "ভরতং" শব্দটি নিঃসন্দেহে নাট্যশাস্ত্রকার ভরতকেই নির্দেশ করছে; সুতরাং রামায়ণের টীকাকরের মন্তব্য: "পূর্বাচার্যেন ভরতেন নির্মিতম্" কথাগুলি যুক্তিযুক্ত বলেই আমরা মনে করি।

তারপর ঐ ৮৪ সর্গের ২য় শ্লোকে "পাঠ্যজাতিং" কথাটিরও সার্থকতা আছে। রামায়ণের সময়ে জাতিগানের যে প্রচলন ছিল তা এ থেকেই প্রমাণ হয়।(২৬) শুধু তাই নয়, রাগ ও রাগিণীদের রূপ ও বৈচিত্র্যের অভিব্যক্তি তখনও ঠিক হয় নি এটাই বোঝা যায়। রামায়ণ-টীকাকার "পাঠ্যজাতি" সম্বন্ধে বলেছেন: "পাঠ্যজাতিং পাঠস্য গেয়স্য জাতিং ষড়জাদিস্বররূপমিতি * *।" জাতি ছিল ১৮টি।(২৭) একথা ভরত, দত্তিল, মতঙ্গ এঁরা সকলেই স্বীকার করেছেন। এই জাতিগান আবার গ্রামভেদে বিভক্ত ছিল। কিন্তু রামায়ণে 'গ্রাম' বা 'জাতি'দের নামের কোন উল্লেখই পাওয়া যায় না; অথচ মহাভারতে 'গান্ধারগ্রাম'-এর উল্লেখের কথা স্পষ্টই পাওয়া যায়। কাজেই মনে হয়, রামায়ণকার এসব নিয়ে মাথা ঘামাবার মোটে চেষ্টাই করেন নি।

যাই হোক, এসব কথা ছেড়ে দিলেও রামায়ণের ভিন্ন ভিন্ন জায়গায় সঙ্গীতের উল্লেখ পাওয়া যায়। রাবণরাজও সঙ্গীতশাস্ত্রে বিশেষ ব্যুৎপন্ন ছিলেন; কেননা তাঁর রাজসভায় গায়কদলের অভাব ছিল না। তবে এ কথা অতি সত্যি যে, রামায়ণের আগে নাট্যশাস্ত্রকার ভরতেরও—এমন কি বৃহদ্দেশীকার মতঙ্গের ও শিক্ষাকার নারদের অস্তিত্ব প্রমাণিত হ'লে রামায়ণ মহাকাব্যে সঙ্গীতের রূপ ও অভিব্যক্তি আমরা যেভাবে পাবার আশা করতে পারি রামায়ণকার সে আশা আমাদের পরিপূরণ করতে মোটেই পারেন নি, এবং এ না-পারার কারণও যে কি থাকতে পারে তা অনেক সময় আমরা নির্ণয় করতে অক্ষম। মহাভারতে সঙ্গীতের রূপের যে অভিব্যক্তি পাওয়া যায়, রামায়ণে তার চেয়ে যথেষ্ট অস্পষ্ট বললেই চলে। অথচ রামায়ণের আগে ও পরে বৈচিত্র্য ও রূপের দীনতা সঙ্গীতে মোটেই ছিল না। অনেক পণ্ডিতেরই অভিমত যে, অনেক ওলটপালটের ভেতর দিয়ে এসে নতুন বহু-কিছুর সমাবেশ

২২। Strangways: *The Music of Hindostan*, p. 105.

২৩। ডাঃ রাঘবন বলেছেন, কাব্যমালা সংস্করণের যে ভারতীয় নাট্যশাস্ত্র পাওয়া যায় তার শেষভাগের নাম 'নন্দীভরত'। মিঃ রাইস্ মহীশূর ও কূর্গের ক্যাটালগে নাকি নন্দীভরতের একখানি সঙ্গীতের গ্রন্থেরও সন্ধান পেয়েছিলেন। তার পর এই নন্দীকেশ্বরই যে ভরত এও একটি মতের প্রচলন আছে। নন্দী প্রণীত 'ভরতার্ণব' নামেও একখানি বইয়ের উল্লেখ পাওয়া যায়।

২৪। শাস্ত্রী: অভিনয়দর্পণ, পৃঃ ৮/০

২৫। রামায়ণ, অযোধ্যাকাণ্ড ৯১ সর্গ ৪৬-৪৭ শ্লোঃ

২৬। মিঃ পপ্‌লিও তাঁর *Music of India* পুস্তকে উল্লেখ করেছেন: The *Ramayana* also mentions the *jatis*." কিন্তু দুঃখের বিষয় রামায়ণকার কোন 'জাতি' বা 'জাতিগান'-এর কথা বা রূপ কিছুই উল্লেখ করেন নি।

২৭। "জাতয়োঽষ্টাদশৈব।"—নাট্যশাস্ত্র

মাত্রই হয়েছে রামায়ণের বর্ত্তমান রূপ। প্রো: উইন্টারনিজ এ বিষয়ে আলোচনা করেছেন হল্ট্‌স্‌ম্যান, প্রো: জেকবি, প্রো: হপ্‌কিন্স, প্রো: লেভি, প্রো: ভাণ্ডারকর প্রভৃতি মনীষীদের মতামত নজির হিসাবে তুলে।(২৮) তাছাড়া প্রো: উইন্টারনিজ নিজেই বলেছেন :

"There can be no doubt at all the original poem ended with Book VI, and that the following Book VII is a later edition." "There can be no doubt that whole of Book VII of the *Ramayana* was added later to the work ; * * the whole of Book I cannot have belonged to the original work of Valmiki. * *. In Books II to IV, apart from a few passages which are doubtless interpolated."

প্রো: সি. ভি. বৈদ্য তাঁর *The Riddle of the Ramayana* এবং প্রো: ওয়েবারও তাঁর *Uber das Ramayana* (ABA, 1870) প্রবন্ধে এই দিয়ে আলোচনা ক'রে অনেকটা এ রকমেরই সিদ্ধান্ত করেছেন। বাস্তবিক নির্ণয়সাগর প্রেস থেকে মুদ্রিত ও পণ্ডিত বাসুদেব লক্ষণ-শাস্ত্রী পণশীকর-সম্পাদিত রামায়ণের সংস্করণে (১৯০৯) দেখা যায়, প্রক্ষিপ্ত-সর্গেরও বহু উল্লেখ আছে।(২৯) সুতরাং এদিক দিয়ে মনে করা যায় যে, এত সব পরিবর্ত্তন ও পরিবর্দ্ধনের ভেতর থেকে সঙ্গীতের ওপর কালের সুবিচারের দৃষ্টিও শিথিল হওয়া কিছু অস্বাভাবিক নয়। তবে সূক্ষ্ম বিচার ও সত্যাসত্য নির্ণয়ের দায়িত্ব গ্রহণ করতে পারেন এ বিষয়ে এক মাত্র ঐতিহাসিকগণই, আমাদের পক্ষে রামায়ণকারের মৌনতা ও ঔদাসীন্যের নজির দেখিয়ে দিয়ে সন্তুষ্ট থাকাই সমীচীন।

২৮। Vide *A History of Indian Literature*, vol. I, pp. 493-497.

২৯। রামায়ণম্ (নির্ণয়সাগর সং), পৃ০ ৩০৩, ৪৩৩, ১০০৮-১০১৫, ১০৭০-১০৮০

প্রমথ চৌধুরী

শ্রীশৈলেন্দ্রকৃষ্ণ লাহা

সম্রাটের পাশে ওই স্বর্ণাসন যাঁর,
নব প্রতিভায় তাঁর উদ্ভাসিত দিক।
নূতন পথের দৃপ্ত সাহসী পথিক,
তোমায় নির্দ্দেশ গুরু, করেছি স্বীকার।
দেখেছি প্রদীপ্ত প্রভা মধ্যাহ্নে তোমার,
দ্বিধাহীন, অকুণ্ঠিত, প্রকাশে নির্ভীক,
ব্যক্ত করিয়াছ যাহা বুঝিয়াছ ঠিক,
সুতীক্ষ্ণ তীরের মত সে কথার ধার।
স্নেহে সুকোমল তুমি তেজে সমুজ্জ্বল,
সমানই যে তব করে অসি ও লেখনী,
কখনো বা কবি তুমি, কভু বীরবল,
রচনা কুসুম কভু, কখনো অশনি।
তুমি এক, অদ্বিতীয় সাহিত্যের ঋষি,
তোমারে প্রণাম করি, প্রমথ চৌধুরী।

স্বপ্নশেষ

শ্রীআশুতোষ সান্যাল

এ জীবনে স্বপ্ন যত দলে দলে আসিল ছুটিয়া,—
চুপে চুপে এলো তারা—চুপে চুপে গেল বাহিরিয়া!
ঘটা ক'রে আসে নাই—ছটা হাসি' দিক্‌চক্রবালে,
ওরা যেন বনফুল—ফুটেছিল বনের আড়ালে।
উতল-তটিনী-জলে টলমল জলবিম্বপ্রায়—
নিমেষের তরে ওরা ছলিতে কি আসিল আমায়?
কুহকিনী নারী যেন দিয়া কণ-অঞ্চল-আভাস,—
বিথারি' অধরপ্রান্তে কুন্দরুচি মন্দলীলা হাস—
গেল শুধু আঁখিকোণে কামনার থরথর হানি;
কেন এলো—কেন গেল আমি তাহা নাহি—নাহি জানি!
কল্পনা-মলয়-স্পর্শে হিল্লোলিত মন-উপবন,—
তারি মাঝে করি' পিক মুহূর্ত্তের মৃদু কুহরণ—
গেল উড়ে চিরতরে পরিপূর্ণ মধুমাসে হায়,—
এসেছিল যদি পিক—কেন উড়ে গেল পুনরায়?
যদি এলো অমারাতি নিয়ে তার সান্দ্র অন্ধকার—
কোন্ প্রয়োজন ছিল এই শুভ্র মধু-জোছনার?
আর একবার যদি ও-চঞ্চল স্বপনের দল
আসিয়া পরায়ে দিত চোখে সেই মায়ার কাজল!
ভুলাইয়া দিত যদি রুক্ষ-তপ্ত বস্তুর সংসার—
আত্মার স্পন্দন মোর—অবিশ্রাম ব্যর্থ অভীপ্সার
পক্ষপ্রসারণ! যদি মনোবনে কুহরিত পিক,—
অপূর্ব্ব আলোকে যদি হাসিয়া উঠিত চারিদিক!
কে খুলিল আঁখি মোর তীক্ষ্ণ জ্ঞানাঞ্জন শলাকায়,—
আর কি আসিবে মোর স্বপ্নদল ফিরে পুনরায়?
শিয়রে জাগিছে সদা রক্ত-আঁখি বাস্তব জীবন—
সম্মুখে পশ্চাতে মোর—এ-সংসার-কণ্টকের বন।
আর তবে ফিরে আর পলাতক স্বপন আমার,
অলস কল্পনা-স্রোতে এ-জীবন-তরণী আবার
ভেসে যাক্ দুলে দুলে পাল তুলে নিরুদ্দেশ পানে
এ বসুধা হ'তে দূরে—বহু দূর জোয়ারের টানে।

(নাটিকা)

শ্রীকুমারলাল দাশগুপ্ত

পশ্চিমের কোন প্রাচীন শহরের এক পুরনো বাড়ী, তারই দোতলায় একটা ছোট্ট অন্ধকারময় ঘর ; উত্তর দিকে একটা জানালা সেটা বন্ধ, দক্ষিণ দিকে একটা দরজা—সামনে একটু সরু বারান্দা, তার সঙ্গে নীচে নামবার সিঁড়ি। সেই অন্ধকার ঘরের এক দিকে কয়েকটা ছোটবড় মাটির হাঁড়ি আর এক দিকে একখানা জীর্ণ খাটিয়া—তার উপরে ময়লা বিছানা পাতা, ঘরময় আবর্জ্জনা আর পোড়া বিড়ির টুকরো।

বন্ধ জানালার ওপাশে ঘেঁসাঘেঁষি আর একখানা বাড়ী আর একখানি জানালা—জানালার ধারে একটি তরুণী। তরুণীকে দেখা যাবে না, তরুণীর কথা হবে নেপথ্য থেকে।

খাটিয়ায় শুয়ে একটি লোক বিড়ি টানে, একটু পরে বিড়ি ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে উঠে বসে। সে রোগা কালো, দেহের কোথাও সৌন্দর্য্যের লেশমাত্র নাই—তার নাম অপূর্ব্ব।

নেপথ্যে—তুমি আছ।

অপূর্ব্ব—না, নেই।

নেপথ্যে—(হেসে) কি করছো ?

অপূর্ব্ব—চোখ বুঁজে বসে আছি।

নেপথ্যে—ক্ষমা ক'রো, আমি তোমার বিশ্রামের ব্যাঘাত করলাম।

অপূর্ব্ব—নিশ্চিন্ত হও, আমি বাইরে চোখ দুটো বন্ধ করে আছি বটে, কিন্তু ভিতরের চোখ মেলে চেয়ে আছি।

নেপথ্যে—কোন্ দিকে চেয়ে আছ ?

অপূর্ব্ব—অতীতের দিকে।

নেপথ্যে—কি দেখছো ? পৃথিবীর শৈশব—একটা অত্যুষ্ণ বস্তুপিণ্ড শূন্যে ঘুরপাক খাচ্ছে ?

অপূর্ব্ব—অতদূরে নয়।

নেপথ্যে—তবে কি দেখছো মানুষের পূর্ব্বপুরুষ শাখা থেকে শাখান্তরে আনন্দে লম্ফ প্রদান করছে ?

অপূর্ব্ব—(হেসে) এই গত আষাঢ় মাসের প্রথম দিনটির দিকে চেয়ে আছি।

নেপথ্যে—ঐ দিনে আমরা এ বাড়ীতে আসি, মনে পড়ে তোমার ?

অপূর্ব্ব—মনে পড়ে।

নেপথ্যে—সারা বাড়ীতে এই ঘরখানা আমার পছন্দ হ'ল, পূবের জানালা খুললাম, আকাশ চোখে পড়লো, উত্তরের জানালা খুললাম, একটা কৃষ্ণচূড়ার গাছ চোখে পড়লো, দক্ষিণের জানালা খুললাম, চোখে পড়লো সরু গলির ওপাশে জরাজীর্ণ তোমার বাড়ীটা।

অপূর্ব্ব—তুমি বললে কি পুরনো বাড়ী, যেন বৌদ্ধযুগে তৈরি হয়েছিল।

নেপথ্যে—বন্ধ জানালার আড়াল থেকে তুমি বললে বাড়ীটা প্রাচীন হলেও বাসীন্দারা প্রাচীন নয়।

অপূর্ব্ব—কথাটা বলেই মনে হ'ল অন্যায় করেছি।

নেপথ্যে—তুমি ক্ষমা চাইলে, এমনি করে আমাদের পরিচয় সুরু হ'ল।

অপূর্ব্ব—তারপরে এক এক দিন করে কয়েক মাস কেটে গেল।

নেপথ্যে—আর আমাদের পরিচয় নিবিড় হতে নিবিড়তর হ'ল।

অপূর্ব্ব—অথচ আমরা কেউ কাউকে দেখলুম না।

নেপথ্যে—কি কঠিন তোমার পণ, জানালা কিছুতেই তুমি খুলবে না। আমার মন যে আর বাধা মানতে চায় না, যদি একটিবার এক মিনিটের জন্যে খুলতে তা হলেও আমি খুশি হতুম।

অপূর্ব্ব—আর সাতটা দিন তোমাকে ধৈর্য্য ধরে থাকতেই হবে, জানো তো তুমি কি আমার প্রতিজ্ঞা ? যত দিন এ উপন্যাস লেখা শেষ না হবে তত দিন আমার অজ্ঞাত বাস চলবে। এ তো লেখা নয় এ যেন আমার সাধনা, আমি এমন এক চরিত্র সৃষ্টি করব যা দেখে বাংলা দেশ—বাংলা কেন

খোলা চুল পড়েছে কাঁধের উপর

সমগ্র পৃথিবী অবাক হবে। এই সুদূর পশ্চিমে এত দিন তো লুকিয়ে আছি এরই জন্যে।

নেপথ্যে—তা জানি। তোমার লেখা প্রায় শেষ হয়ে এলো জেনে সুখী হলুম, সাতটা দিন আমি অপেক্ষা করতে পারব।

অপূর্ব্ব—(একটু হেসে) হ্যাঁ, প্রায় শেষ হয়ে এলো, শেষের অধ্যায় লেখা চলছে।

নেপথ্যে—সত্যিই, তোমার এ উপন্যাসখানা চমৎকার হবে, সম্পূর্ণ নতুন ধরণের হবে। উপন্যাসের নায়ক বাসব এক অদ্ভুত সৃষ্টি—স্বাস্থ্যহীন, রূপহীন, সহায়হীন, সম্পদহীন, অহরহ চরম দারিদ্র্যের সঙ্গে সে সংগ্রাম করে চলেছে।

অপূর্ব্ব—তবু সে হার মানতে চায় না! আমি বাসবের বাইরেটা যেমন করেছি দুর্ব্বল, ভিতরটা তেমনি করেছি সবল, বাইরেটা যেমন করেছি কুরূপ ভিতরটা তেমনি করেছি অপরূপ, শরীর তার রূগ্ন ভিখিরীর মত কদর্য্য কিন্তু মন তার রাজপুত্রের মত মনোজ্ঞ সুন্দর।

নেপথ্যে—চমৎকার।

অপূর্ব্ব—স্থান হতে স্থানান্তরে সে ছুটে চলেছে—ভাবছে বুঝি এখানে নয় ওখানে, বুঝি ওখানে নয় আরো কোনোখানে তার সফলতা তার জয় কিন্তু একে একে সবখানে তার বিফলতা, তার পরাভব।

নেপথ্যে—চমৎকার।

অপূর্ব্ব—তরঙ্গসঙ্কুল অকূল সমুদ্রের মাঝখানে নিমজ্জমান মানুষের কূল পাবার প্রচেষ্টা যেমন মর্ম্মান্তিক, যেমন করুণ বাসবের এ সংগ্রামও তেমনি মর্ম্মান্তিক, তেমনি করুণ।

নেপথ্যে—আহা।

অপূর্ব্ব—তুমি 'আহা' বলছ, সত্যিই 'আহা' বলছ? এক দিন আমার এ বই পড়ে পৃথিবীর নরনারীর চোখ থেকে জল ঝরে পড়বে। আর সাতটা দিন পৃথিবীকে অপেক্ষা করতে হবে। (নিঃশব্দে হাসে)

নেপথ্যে—আর সাতটা দিন, তারপরে তুমি জানালা খুলবে আমি পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ সাহিত্যিককে দেখে ধন্য হব। মনে থাকে যেন—সাতটা দিন।

অপূর্ব্ব—তোমার এত অধৈর্য্য কেন?

নেপথ্যে—আমার এ অধৈর্য্যের কি যথেষ্ট হেতু নাই? তোমার হয়তো আমাকে দেখবার ইচ্ছে হয় না কিন্তু তোমাকে দেখবার ইচ্ছে যে আমার কত প্রবল তা তুমি কেমন করে জানবে?

অপূর্ব্ব—তোমাকে দেখবার জন্যে আমি অত অধীর নই কেন জান?

নেপথ্যে—হয়তো আমার সম্বন্ধে তোমার তেমন কৌতূহল নাই, আমি তো অসাধারণ নই, আমি যে একেবারে সাধারণ।

অপূর্ব্ব—না, তা নয়—তোমাকে আমি দেখেছি, কল্পনার চোখে দেখেছি। (উঠে গিয়ে বন্ধ জানালার ফাঁক দিয়ে দেখে)

নেপথ্যে—বলো, কল্পনার চোখে তুমি আমাকে কেমন দেখেছ!

অপূর্ব্ব—(ফিরে এসে) সুন্দর, ভারি সুন্দর। খোলা চুল পড়েছে কাঁধের উপর, দুটি চোখ স্বপ্নাতুর, সুকুমার অধরে একটু-খানি হাসির রেখা, চাঁপার মত গায়ের রং তার, তন্বী সে, নীল রঙের শাড়ি মানিয়েছে ভারি চমৎকার।

নেপথ্যে—কি আশ্চর্য্য, আমি যে সত্যিই নীল রঙের শাড়ি পরেছি! কিন্তু তবুও তুমি কল্পনায় আমাকে যত সুন্দর দেখেছ সত্যিকার আমি তত সুন্দর নই।

অপূর্ব্ব—না, আমার ভিতরের চোখ ভুল দেখে নি, তুমি সুন্দর, তুমি খুব সুন্দর।

নেপথ্যে—তুমিও খুব—খুব সুন্দর।

অপূর্ব্ব—(চমকে উঠে) তুমি কি আমাকে দেখেছ?

নেপথ্যে—দেখেছি বৈকি—কল্পনার চোখে দেখেছি।

অপূর্ব্ব—কি রকম দেখেছ?

নেপথ্যে—দেখেছি দীর্ঘ, ঋজু, সবল গৌরবর্ণ দেহ, উন্নত ললাটে প্রতিভার আভা, চোখে উদার দৃষ্টি।

অপূর্ব্ব—(উঠে শীর্ণ নুয়ে পড়া দেহকে ঋজু করবার চেষ্টা করে) না, সবটা মেনে নি, দীর্ঘও বটে, ঋজুও বটে তবে গায়ের রংটা ঠিক গৌর বলা চলে না।

নেপথ্যে—তা না চলুক, তুমি সুন্দর, খুব সুন্দর।

অপূর্ব্ব—হয়তো তোমার কথাই ঠিক—আমি সুন্দর। (একখানা দুর্ব্বল হাত চোখের সামনে তুলে ধরে) সবল, দীর্ঘ, ঋজু, গৌরবর্ণ—এইখানেই শেষ নয়, আরো আছে।

নেপথ্যে—আরো কি ?

অপূর্ব্ব—(ম্লানভাবে হেসে) উচ্চকুল, উচ্চশিক্ষা, অর্থ, যশ।

নেপথ্যে—তুমি ভাগ্যবান।

অপূর্ব্ব—সে কথা বলতে পার—যা কিছু শ্রেয় এবং শ্রেয় ভগবান তা যেন আমাকে অকাতরে দিয়েছেন।

নেপথ্যে—আমার অন্তর বার বার বলেছে তুমি সাধারণ নও।

অপূর্ব্ব—(নিঃশব্দে হেসে) তোমার অন্তর সত্যি কথাই বলেছে আমি অসাধারণ, আমি অনন্ত।

নেপথ্যে—তুমি আরো উপরে উঠবে—হয়তো এত উপরে উঠবে যে আমরা তোমার কাছে পৌঁছতে পারব না।

অপূর্ব্ব—ঠিক—আমার কাছে সবাই পৌঁছতে পারে না। আমি এত (খুব আস্তে) নীচে।

(কাছাকাছি কোথাও ঘড়িতে তিনটে বাজে)

নেপথ্যে— এখন আমাকে যেতে হবে।

অপূর্ব্ব—এলেই যেতে হয়—গেলে কিন্তু আবার আসতে হয়।

নেপথ্যে—কবে আসতে ভুল হয়েছে—বলো !

অপূর্ব্ব—(হেসে) বলতে পারলাম না।

নেপথ্যে—তুমি আবার চোখ বোঁজো।

অপূর্ব্ব—আচ্ছা।

(অপূর্ব্ব আবার শুয়ে পড়ে)

পটক্ষেপ

২য় দৃশ্য

স্থান একই, কাল সকাল, খাটিয়ার উপর উঁচু হয়ে বসে বিড়ি টানে অপূর্ব্ব। নেপথ্যে জানালা খোলার আয়োজন হয়।

অপূর্ব্ব—তুমি !

নেপথ্যে—(হেসে) না, আমি নই।

অপূর্ব্ব—অনেকক্ষণ তোমার সাড়া পাই নি।

নেপথ্যে—আমি এলে যে তোমার লেখায় ব্যাঘাত হয় !

অপূর্ব্ব—তোমার সাড়া না পেলেই আমার লেখা এগোয় না।

নেপথ্যে—এটা কি সত্যি কথা ?

অপূর্ব্ব—সত্যি কথা, তুমি যে আমার উৎসাহের উৎসমুখ। তোমার কাছে আমি অনেক ঋণী, সে কথা পাঠকসমাজে আমি স্বীকার করব।

নেপথ্যে—দেনাপাওনার হিসেব পরে হবে। তোমার লেখা পেলেই সব ঋণ শোধ হয়ে যাবে।

অপূর্ব্ব—আহা, এত সহজে যদি সবার ঋণ শোধ করতে পারতাম !

নেপথ্যে—ওসব কথা থাক—এখন বলো কি লিখছিলে ?

অপূর্ব্ব—কি লিখছিলাম ? (নিঃশব্দে হেসে) লিখছিলাম অন্ধকার ঘরটিতে জীর্ণ খাটিয়ার উপর উবু হয়ে বসে বাসব বিড়ি টানছে আর ভাবছে, এক মহা সমস্যায় পড়েছে সে। এক বেলা খাবার মত একমুঠো চা'ল তার ঘরে আছে—এ বেলাই তা শেষ করে দেবে না সঞ্চয় করে রাখবে! গত দিনের অনশনক্লিষ্ট উদর যুক্তি মানতে রাজী হচ্ছে না, বলছে 'এখনই—আর দেরি নয়।' কিন্তু তারপরে ?

নেপথ্যে—তারপরে যাই হোক—এখন তোমার ঐ করুণ কাহিনী লেখা বন্ধ কর, উঃ, কি অহরহ অন্নচিন্তা ! কলম রেখে একবার বাইরের দিকে তাকাও, অন্ততঃ একটিবারও তাকাও।

অপূর্ব্ব—কেন বল তো ?

নেপথ্যে—দেখ আজ আকাশ কত নীল, আলো কত স্বচ্ছ।

অপূর্ব্ব—(আকাশ সে দেখতে পায় না, চোখের সামনে তার একটা ভাঙা পুরনো প্রাচীর, সেই প্রাচীরের দিকে তাকিয়ে) আহা, আকাশ কত নীল, চোখ ফেরাতে পারছি না।

নেপথ্যে—আর ঐ মেঘ, সাদা মেঘ !

অপূর্ব্ব—(প্রাচীরের দিকে তাকিয়ে) আর ঐ সাদা মেঘ, অলস, মন্থর মেঘ—নীলপটভূমির উপরে—এখানে ওখানে সাদার সমাবেশ সুন্দর !

নেপথ্যে—নীল সমুদ্রের বুকে যেন পাল-তোলা নৌকো !

অপূর্ব্ব—(প্রাচীরের দিকে তাকিয়ে) অসীম অবসরের নীল সরোবরের বুকে যেন রাজহংস ভেসে বেড়াচ্ছে।

নেপথ্যে—আর এই স্বচ্ছ আলো !

অপূর্ব্ব—(অন্ধকার ঘরের দিকে তাকিয়ে) অপূর্ব্ব, আজ যেন পৃথিবীর কোথাও এতটুকু অন্ধকার নাই !

নেপথ্যে—কোথাও যেন এতটুকু নিরানন্দ নাই !

অপূর্ব্ব—ভয় নাই, ভাবনা নাই, রোগ নাই, শোক নাই, ক্ষুধা নাই, তৃষ্ণা নাই ! কিন্তু আর বেশীক্ষণ তো আলোর সন্তরণ করতে পারছি নে, এইবার অন্ধকারে ডুব মারতে হবে—আবার লেখা সুরু করতে হবে।

নেপথ্যে—আর কত দিন তুমি অন্ধকারে থাকবে, কবে আলোর এসে দাঁড়াবে ?

অপূর্ব্ব—দুটো দিন, আর দুটো দিন, তারপরে আশ্বিনের প্রথম দিনে তোমাতে আমাতে দেখাশুনো হবে।

নেপথ্যে—শরতের প্রভাতে আমরা মুখোমুখি দাঁড়াব !

অপূর্ব্ব—আলো পড়বে তোমার খোলা চুলে!

নেপথ্যে—আলো পড়বে তোমার উন্নত ললাটে!

অপূর্ব্ব—এইবার আমি লিখতে সুরু করি, তুমি অনুমতি দাও।

নেপথ্যে—তুমি লেখো, আমি এইখানেই বসে থাকবো, চুপ করে বসে থাকবো, যখন আবার পড়ে শোনাবে তখন শুনবো।

অপূর্ব্ব—সে বেশ হবে, তাই বোসো।

(অপূর্ব্ব নিঃশব্দে ঘর থেকে বেরিয়ে দরজা বন্ধ করে দেয়, তারপরে বারান্দায় ছোট উনুনে আগুন ধরায়। কয়লা থেকে প্রচুর ধোঁয়া উঠে অন্ধকার হয়ে যায়, অপূর্ব্ব বসে বসে হাঁপায় আর কাশে। খানিক পরে যখন উনুন ধরে ওঠে তখন সে দরজা খোলে, একটা হাঁড়ি এনে উনুনে চাপায় তারপরে আবার খাটিয়ার উপর গিয়ে বসে)

অপূর্ব্ব—এখনও কি বসে আছ?

নেপথ্যে—যেতে চাইলেও যে যেতে পারি না! বলো কি লিখলে?

অপূর্ব্ব—লিখলাম বাসবকে শেষে উদরের আবদারই মেনে নিতে হ'ল, তারপরে উঠে গিয়ে সে উনুনে আগুন দিল। কয়লা থেকে কালো ধোঁয়া কুণ্ডলী পাকিয়ে উঠতে লাগল, সেই দিকে তাকিয়ে সে নির্জীবের মত বসে থাকলো। বাসবের যেন মনে হ'ল তারই মত অগণিত হতভাগাদের পুঞ্জীভূত হতাশা পৃথিবীর বুকের ভেতর থেকে কুণ্ডলী পাকিয়ে উঠে আসছে, তাতে ঘর ভরে গেল, বাড়ী ভরে গেল, ক্রমে ক্রমে শহর, প্রান্তর অবশেষে যেন সমস্ত পৃথিবী অন্ধকার হয়ে গেল—সুখ দুঃখ, অতীত ভবিষ্যৎ অবলুপ্ত হ'ল, সময়ের গতি যেন থেমে গেল।

নেপথ্যে—তারপরে?

অপূর্ব্ব—তারপর সেই গভীর অন্ধকারের মধ্যে হঠাৎ সে যেন আলোর ক্ষীণরেখা দেখতে পেলো, ক্রমে সে আলো উজ্জ্বল হতে উজ্জ্বলতর হয়ে উঠল আর সেই আলোর মাঝখানে বাসব দেখতে পেলো একটি তরুণী মূর্ত্তি—খোলা চুল পড়েছে কাঁধের উপর, দুটি চোখ ব্যথাতুর, সুকুমার অধরে একটুখানি হাসির রেখা, চাঁপার মত গায়ের রং তার—তন্বী সে—

নেপথ্যে—তারপরে?

অপূর্ব্ব—তারপরে সেই অপূর্ব্ব আলোয় ঘর ভরে গেল, বাড়ী ভরে গেল, ক্রমে ক্রমে শহর, প্রান্তর, অবশেষে যেন সমস্ত পৃথিবী আলোয় ভরে গেল।

নেপথ্যে—বাসব বুঝি তরুণীকে ভালবাসে?

অপূর্ব্ব—ভালবাসে, খুব ভালবাসে, কিন্তু সে ভালবাসা তার ভাঙা পাঁজরের নীচে চাপা পড়ে আছে—প্রকাশ পায় নি।

নেপথ্যে—কি করুণ! তারপরে?

অপূর্ব্ব—তারপরে বাসবের যখন ধ্যান ভাঙে তখন সে দেখে তার উনুন জ্বলে যাচ্ছে; একটা হাঁড়িতে শেষমুঠো চাল চাপিয়ে দিয়ে সে ভাবতে বসে।

নেপথ্যে—কি ভাবে সে?

কি ভাবে? সমস্ত ভাবনার কেন্দ্র তখন তার ঐ হাঁড়িটার মধ্যে!

(সিঁড়িতে জুতোর আওয়াজ হয়, নীচে থেকে কে যেন উপরে উঠে আসে—ডাকে)

আগন্তুক—অপূর্ব্ববাবু, ও মশাই ঘরে আছেন কি?

নেপথ্যে—কে যেন ডাকছে তোমাকে।

অপূর্ব্ব—হ্যাঁ, আমাকেই ডাকছে, দেখি কে এলো এমন অসময়ে, কার এমন অসীম সাহস!

(ঘর থেকে বেরিয়ে দরজা বন্ধ করে দেয়)

আগন্তুক—এই যে ঘরেই আছেন, ভাড়াটা দেবার কথা ছিল আজ, সেকথা নিশ্চয়ই মনে আছে।

অপূর্ব্ব—নিশ্চয়ই মনে আছে।

আগন্তুক—তা হলে দিয়ে দিন, তিন মাসের ভাড়া।

অপূর্ব্ব—মনে থাকলেও ভাড়া আজ দিতে পারছি নে।

আগন্তুক—দিতে পারবেন না? তামাশা হচ্ছিল তা হলে? ভাড়া আজ দিতেই হবে।

অপূর্ব্ব—দিতে পারব না, টাকা নেই।

আগন্তুক—টাকা নেই? তিন মাসের ঘরভাড়া ছ'টা টাকা তাও তোমার যোগাড় হ'ল না। বুঝেছি ব্যাপারটা (চেঁচিয়ে) তুমি জোচ্চোর।

অপূর্ব্ব—অত চেঁচাবেন না, আমি জোচ্চোর নই। টাকা থাকলে আপনাকে দিয়ে দিতাম, বোধ হয় আজকালের ভেতরেই আপনার দেনা শোধ করে দেব, তা না পারলে ১লা আশ্বিন থেকে ঘর ছেড়ে দেব।

আগন্তুক—(আরো চেঁচিয়ে) টাকা তুমি যা দেবে তা বুঝতে পেরেছি, ঘর ছেড়ে দাও, সেই ভাল।

অপূর্ব্ব—টাকা না দিতে পারলে ঘর ছেড়ে দেব।

আগন্তুক—(চিৎকার করে) ঘর ছেড়ে না দিলে ঘাড় ধরে বার করে দেব, বুঝলে? ঘাড় ধরে বার করে দেব। (প্রস্থান)

(অপূর্ব্ব দরজা খুলে ঘরে ঢোকে)

অপূর্ব্ব—কি বিপদ!

নেপথ্যে—কে লোকটা? কি বলছিল?

অপূর্ব্ব—কে লোকটা? কল্পনা করতে পার কে লোকটা?

নেপথ্যে—(হেসে) বন্ধু, আত্মীয়।

অপূর্ব্ব—পারলে না।

নেপথ্যে—পুলিশ, বাড়ীওলা, কাবলীওলা।

অপূর্ব্ব—পারলে না।

নেপথ্যে—আমি পারব না তুমি বলো।

অপূর্ব্ব—কাগজের রিপোর্টার।

নেপথ্যে—রিপোর্টার ! কি আশ্চর্য্য !

অপূর্ব্ব—খুবই আশ্চর্য্যের বিষয় ! কেমন করে খবর পেল আমি এইখানে লুকিয়ে বই লিখছি ? এরা হচ্ছে সেই শ্রেণীর জীব যাদের ঘ্রাণশক্তি অত্যন্ত প্রখর ।

নেপথ্যে—কিন্তু অত চ্যাচাচ্ছিল কেন ?

অপূর্ব্ব—কে চ্যাচাচ্ছিল ?

নেপথ্যে—রিপোর্টার ।

অপূর্ব্ব—রিপোর্টার নয়, চ্যাচাচ্ছিলাম আমি । আমি বড্ড চটে গিয়েছিলাম, চটবারই কথা, জগৎকে আমি হঠাৎ অবাক করে দিতে চাই, আমার এই সৃষ্টির খবর আমি শেষ পর্য্যন্ত গোপন রাখতে চাই—কিন্তু এরা তা করতে দেবে না ।

নেপথ্যে—কিন্তু গলার আওয়াজ তো তোমার নয়, কেমন একটা মোটা কর্কশ গলা !

অপূর্ব্ব—(হেসে) রাগলে আমার গলার আওয়াজ ঐ রকম হয়ে যায়, ঐ রকম কর্কশ আর মোটা । আমি ভয়ঙ্কর রেগে গিয়েছিলাম । আমার খ্যাতি আছে সে বিষয়ে সন্দেহ নাই কিন্তু তাই বলে কি আমার গোপন কিছু থাকবে না !

নেপথ্যে—যথেষ্ট শিক্ষা ওর হয়ে গেছে । তুমি ওকে ঘাড় ধরে বার করে দিতে চাচ্ছিলে !

অপূর্ব্ব—ঘাড় ধরতে চেয়েছিলাম কিন্তু ধরি নাই, কেননা প্রস্থানটা অতি দ্রুতবেগেই করেছিল ।

নেপথ্যে—(হেসে) আমার খুব হাসি পাচ্ছে, ঘটনাটা ঘটলো খুবই হাস্যকর ।

অপূর্ব্ব—আমার তেমন হাসি পাচ্ছে না কারণ (হঠাৎ চোখ পড়ে উনুনে বসান হাঁড়িটার উপর) ওঃ…

নেপথ্যে—কি হ'ল !

অপূর্ব্ব—(ব্যস্ত হয়ে) গল্প করে অনেকক্ষণ কাটলো, এখন আবার লিখতে হবে ।

নেপথ্যে—কিন্তু আধঘণ্টার বেশী আমরা গল্প করি নি ।

অপূর্ব্ব—(হেসে) বোধ হয় ভুলে গেছ বাসব উনুনে ভাত চাপিয়েছে, সেটা হতে আধঘণ্টার বেশী সময় লাগা উচিত নয় !

নেপথ্যে—(হেসে) তা হলে লেখ, আমি চলি !

অপূর্ব্ব—তুমি চলে যাবে সেটাও যে ইচ্ছে করে না ।

নেপথ্যে—মাত্র আর একটা দিন, তারপরে তোমার আমার মাঝখানে কিছুরই ব্যবধান থাকবে না ।

অপূর্ব্ব—তা হলে কালকে এসো—লেখা পড়ে শোনাবো (হাঁড়ির দিকে তাকিয়ে একটু ব্যস্ত ভাবে) কালকে, দুপুর বেলা ।

নেপথ্যে—আচ্ছা, আমি চলি । (অপূর্ব্ব উঠে এসে তাড়াতাড়ি উনুন থেকে হাঁড়িটা নামায়)
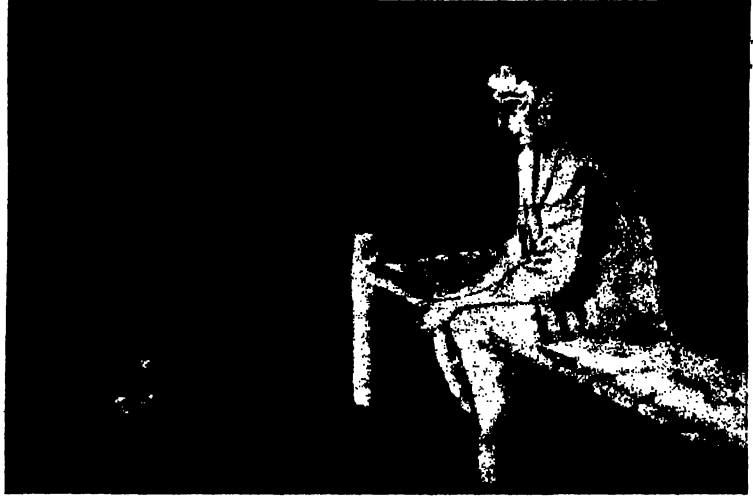
"সমস্ত ভাবনা কিন্তু ঐ হাঁড়িটার মধ্যে"

পটক্ষেপ

৩য় দৃশ্য

একই স্থান, কাল দুপুর ; অপূর্ব্ব ক্লান্তভাবে ঘরময় ঘুরে একটা বিড়ি খোঁজে—পায় না—শেষে কোণ থেকে আধখানা পোড়াবিড়ি তুলে নেয়, কিন্তু দেশলাই খুঁজে পায় না—নাই । অবশেষে খালি হাঁড়িগুলো নাড়াচাড়া করে, একটা হঠাৎ পড়ে গিয়ে সশব্দে ভেঙে যায়—

নেপথ্যে—কি ভেঙে ফেললে ?

অপূর্ব্ব—তুমি কি ২৪ ঘণ্টা জানালার কাছে বসে থাক ?

নেপথ্যে—থাকতে ইচ্ছে করে কিন্তু থাকতে পারি কই—কি ভাঙলে ?

অপূর্ব্ব—পড়ে গিয়ে ভেঙে গেল ।

নেপথ্যে—জিনিষটা কি ?

অপূর্ব্ব—হঠাৎ হাত থেকে পড়ে গিয়ে চুরমার হয়ে গেল ।

নেপথ্যে—কি ?

অপূর্ব্ব—দামী—খুব দামী ।

নেপথ্যে—লোকসান হয়ে গেল ! কি ওটা ?

অপূর্ব্ব—খুব সখের ।

নেপথ্যে—আচ্ছা ! কিন্তু জিনিষটা কি ?

অপূর্ব্ব—আবার, আবার ক্যামেরাটা ! যাক্ গে, যা যাবার তা যাবেই।

নেপথ্যে—তবুও ত সখের জিনিষটা গেল।

অপূর্ব্ব—একটা গেল—আর একটা আসবে (খাটিয়ার উপর বসে) কি ভয়ঙ্কর ক্লান্তি বোধ করছি।

নেপথ্যে—খুব খাটছ বোধ হয়।

অপূর্ব্ব—খুব, রাত দিন, খাবার সময় পর্য্যন্ত পাচ্ছি না। আর যে সময় নাই—শেষের অধ্যায়ের শেষ ক'খানা পাতা লিখছি।

নেপথ্যে—কি লিখছ ?

অপূর্ব্ব—শোন, লিখছি—দীর্ঘ ছত্রিশ ঘণ্টা বাসব অনাহারে রয়েছে—অবসাদে সমস্ত শরীর যেন ভেঙে পড়ছে, খিদে বোধ কমে গেছে—পিপাসায় আকণ্ঠ শুকিয়ে যাচ্ছে, বারংবার জল খেয়েও সে পিপাসা যেন মিটছে না (উঠে গিয়ে জল খায়)।

নেপথ্যে—দুর্দ্দশার শেষ সীমায় পৌঁছেছে।

অপূর্ব্ব—দুর্দ্দশার চরম সীমায় পৌঁছেছে বাসব। শীর্ণ শরীর আরও শীর্ণ হয়েছে, চোখ দুটো কোটরে ঢুকেছে, মাথার মধ্যে একটা ঝিঁঝি পোকা নিরবচ্ছিন্ন ডেকে চলেছে (মাথায় হাত দেয়)। কেমন হচ্ছে ?

নেপথ্যে—বেশ।

অপূর্ব্ব—কিন্তু ভেঙে পড়লে ত চলবে না, এখনও যে সংগ্রামের শেষ হয় নাই ! সে ওঠে, একটা বিড়ি খোঁজে, ঘরময় খোঁজে, পায় না, কোণ থেকে আধখানা পোড়াবিড়ি তুলে নেয়। কিন্তু ধরাবে কি দিয়ে ? দেশলাই খালি ! একটা ক্রোধ, একটা অন্ধ ক্রোধ মনের মধ্যে ঘনাতে থাকে—বিড়ির টুকরো ছুঁড়ে ফেলে দেয়।

নেপথ্যে—তারপরে।

অপূর্ব্ব—তারপরে আসে চিন্তা—খামখেয়ালী চিন্তা, এলোমেলো চিন্তা—অনশনক্লিষ্ট মস্তিষ্কের যুক্তিহীন চিন্তা। কি করবে সে ? কোন কি উপায় নাই ? চেষ্টার ত ত্রুটি করে নাই—তবুও তার অন্ন জোটে না কেন ? একে একে অনেক পথই সে ঘুরে দেখে এল—আরও কি দেখা বাকি আছে ? না—আর নেই—কোন দিকে কোন পথ নাই, বাসব খাটিয়ার উপর এলিয়ে পড়ে।

নেপথ্যে—শেষের দিকটা বড় সুন্দর হচ্ছে—তারপরে ?

অপূর্ব্ব—তারপরে প্রহর কেটে যায়—বাসবের পাকস্থলীর তলদেশ থেকে একটা অত্যন্ত অপ্রীতিকর অনুভূতি ধীরে ধীরে সর্ব্বাঙ্গে ছড়িয়ে পড়ে। একটা কিছু করতেই হবে তাকে—একটা পথ আবিষ্কার করতেই হবে তাকে—দুই হাতে মাথাটা চেপে ধরে সে ভাবতে থাকে। হঠাৎ সে উঠে বসে—পেয়েছে পথ, আবিষ্কার করেছে উপায়, সে চুরি করবে।

নেপথ্যে—চুরি !

অপূর্ব্ব—হাঁা, চুরি। এতক্ষণ এমন সহজ উপায়টা তার মনে হয় নাই, কি আশ্চর্য্য ! সহজ, খুব সহজ, চুরি করবে সে—বাঁচতে হবে তাকে। উত্তেজিত হয়ে ওঠে বাসব—উঠে দাঁড়ায়, তার পা কাঁপতে থাকে। বড়ই দুর্ব্বল বোধ হচ্ছে আজ। পারবে সে চুরি করতে ? চুরি করতে যে শক্তির দরকার সে শক্তি কোথায় তার ? আবার বসে পড়ে বাসব।

নেপথ্যে—মনস্তত্ত্বের দিক দিয়ে চমৎকার হচ্ছে।

অপূর্ব্ব—সত্যি বলছো চমৎকার হচ্ছে ? বেশ, শোন—আবার বসে পড়ে বাসব, আবার ভাবতে থাকে। এই বার সে পেয়েছে, তারই উপযুক্ত পথ সে পেয়েছে—শক্তির প্রয়োজন নাই, বিদ্যার প্রয়োজন নাই, বুদ্ধির প্রয়োজন নাই—অথচ পেট ভরে খেতে পাবে—ভিক্ষা করবে সে !

নেপথ্যে—সুন্দর, ছবি খুব বাস্তব হচ্ছে !

অপূর্ব্ব—বাস্তব হতেই হবে—আমি যে বাস্তবের পূজারী। শোনো—বাসব আপনার শীর্ণ হাতখানা বাড়িয়ে দিয়ে বলে 'একটা পয়সা দাও—গরিবকে একটা পয়সা দাও'। এই তো—ঠিক পারবে সে। চেহারা হয়েছে ভিখারীরও অধম—পথে দাঁড়ালেই হ'ল। না খেয়ে আর মরতে হবে না—বেশ খানিকটা নিশ্চিন্ত হয়ে সে বসে।

নেপথ্যে—শেষ পর্য্যন্ত বাসবকে দিয়ে ভিক্ষে করাবে ?

অপূর্ব্ব—না, ভিক্ষে করাব না, বাসব ভিক্ষে করতে পারে না। ওটা তার মনের সাময়িক দুর্ব্বলতা—ওটা কেটে যাবে। তুমি তো জানো আমি বাসবের বাইরেটা যেমন করেছি দুর্ব্বল, ভিতরটা তেমনি করেছি সবল, শরীর তার রুগ্ন ভিখারীর মত কদর্য্য কিন্তু মন তার রাজপুত্রের মত সতেজ সুন্দর। ভিতরে সেই রাজপুত্র বুক ফুলিয়ে সোজা হয়ে দাঁড়ায়—মরবে তবু সে ভিক্ষা করবে না।

নেপথ্যে—তারপর ?

অপূর্ব্ব—এই পর্য্যন্ত, এর পর আর লেখা হয় নাই। এখন তুমি বলো শেষটা কি রকম করি।

নেপথ্যে—আমি বলবো ?

অপূর্ব্ব—হ্যা, তুমি বলো বাসব বাঁচবে না মরবে। কোন্‌টা সুন্দর, সুসঙ্গত, স্বাভাবিক হবে—জীবন, না মরণ ?

নেপথ্যে—জীবন না মরণ, কঠিন প্রশ্ন। আর্টের দিক দিয়ে দেখতে গেলে বাসবকে মেরে ফেলাই সুন্দর হবে।

অপূর্ব্ব—ঠিক বলেছ, মরণই সুন্দর, তাই হবে, বাসব মরবে। আর একটা কথা তোমাকে জিজ্ঞাসা ক'রবো, বল তো মরবার আগে বাসব তার গুপ্ত প্রেম ব্যক্ত করবে কিনা ?

নেপথ্যে—এটা আরো কঠিন প্রশ্ন।

অপূর্ব্ব—বল তো বাসব যদি তার তরুণী প্রিয়াকে গিয়ে বলে 'ওগো তোমাকে আমি ভালবাসি' তা হলে কি উত্তর সে পাবে ? তরুণী কি তাকে ভালবাসবে বলো।

নেপথ্যে—বলা খুব মুশকিল।

অপূর্ব্ব—আমি সহজ করে দিচ্ছি—মনে করো তুমি হচ্ছ সেই তরুণী ; বাসব—রুগ্ন, শীর্ণ, কদাকার, একটা ভিখারীর চেয়েও অধম বাসব যদি এসে তোমাকে বলে 'আমি ভালবাসি তোমাকে' তা হলে কি উত্তর তুমি দেবে ? তুমি কি বাসবকে ভালবাসতে পারবে ?

নেপথ্যে—মাগো—ভাবতেও যে গা শিউরে ওঠে ! কাব্যে হয়তো সম্ভব হয় কিন্তু বাস্তব জগতে হয় না।

অপূর্ব্ব—ঠিক বলেছ, বাস্তব জগতে সম্ভব হয় না, অতএব বাসবের প্রেম শুধুই থাকবে। এই বার লেখার কথা বন্ধ থাক—অন্য কথা হোক—নীল আকাশের কথা, সাদা মেঘের কথা

নেপথ্যে—মনে আছে, কাল তুমি জানালা খুলবে !

অপূর্ব্ব—মনে আছে—খুব মনে আছে, সে কথা কি ভুলতে পারি ? কাল তুমি আর আমি মুখোমুখি দাঁড়াব।

নেপথ্যে—ভোরের আলো পড়বে তোমার ললাটে।

অপূর্ব্ব—পড়বে তোমার খোলা চুলে।

নেপথ্যে—সারারাত আমার ঘুম হবে না।

অপূর্ব্ব—আমি খুব ঘুমোবো—নিশ্চিন্ত হয়ে ঘুমোবো।

নেপথ্যে—আজকের মত বিদায়

অপূর্ব্ব—বিদায়।

(অন্ধকার ঘর আরো অন্ধকার হয়ে আসে)

পটক্ষেপ

৪র্থ দৃশ্য

স্থান একই, কাল—প্রায় ভোর হয়ে আসে, উত্তরের জানালাটা খোলা। ক্রমে অন্ধকার কমে আসে, আরো কমে আসে, উত্তরের জানালাটা দিয়ে একটু আলো ঘরে ঢোকে, তার পরে আরও একটু আলো ঢোকে—এই বার খাটিয়াখানার উপর আলো এসে ছেলে পড়ে। বিছানায় লুটিয়ে আছে অপূর্ব্ব—দেহে প্রাণ নাই। আলো পড়ে তার ললাটে।

ও পাশের জানালাটা আস্তে খুলে যায়, একটি তরুণীর মুখ এগিয়ে আসে। হঠাৎ সেই সুন্দর মুখে ভয়ের চিহ্ন ফুটে ওঠে, তার পরে ফুটে ওঠে ঘৃণার চিহ্ন। জানালাটা আবার আস্তে বন্ধ হয়ে যায়।

পটক্ষেপ

আলোচনা

"বাংলার প্রাচীন ধাতু-খোদাই চিত্র"

শ্রীযোগেশচন্দ্র রায়, বিদ্যানিধি

শ্রাবণের প্রবাসীতে শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় সপাদ শত বৎসর পূর্ব্বের মুদ্রিত পুস্তক হইতে সাতখানি চিত্র দেখাইয়াছেন। যাহা লিখিত পুথীতে পাই না, তাহা এই সাতখানি চিত্র হইতে পাইতেছি। কেশ, বেশ, আসন, মুখ কেমন ছিল, তাহা প্রত্যক্ষ হইতেছে। আমি দশভুজার চিত্রের জন্ত শিল্পী ও ব্রজেন্দ্রবাবুকে ধন্যবাদ করিতেছি। ইহাতে মহিষাসুরের যে চিত্র আছে, বহুদিন হইতে আমি তাহা খুঁজিতেছিলাম। আমরা মহিষ-মর্দ্দিনী দুর্গার পূজা করি। কিন্তু বর্ত্তমান কালের প্রতিমায় মহিষ দেখিতে পাই না। দেখি এক ভীষণ-মূর্ত্তি-ডাকাত। একটি ছোট মহিষ-মুণ্ড নিকটে স্থাপিত হয়। কিন্তু কোন্ মহিষের ছিন্নমুণ্ড, তাহার নিদর্শন নাই। পুরোহিত মহাশয় যে ধ্যান আবৃত্তি করেন, তাহার সহিত প্রতিমার কিছুমাত্র ঐক্য নাই। ধ্যানে আছে মহিষের শিরশ্ছেদ হইলে তাহার কণ্ঠ হইতে খড়্গ খেটক-ধর দিভুজ অসুর বহির্গত হইয়াছিল ; নিরাজ মহিষ মহিয়া গেল। শিল্পী বিশ্বম্ভর আচার্য চিত্রে তাহাই দেখাইয়াছেন। এই চিত্র তিনি ধ্যান হইতে লইয়াছেন, কি তৎকালে এইরূপ প্রচলিত ছিল, তাহা বুঝিতে পারিতেছি না। বোধ হয় কোন কোন দশভুজা প্রতিমায় এইরূপ মহিষাসুর নির্ম্মিত হইত। শিল্পী তৎকালের পক্ষে একেবারে নূতন কল্পনা আনিতে সাহসী হইতেন না। মহিষাসুরের মূর্ত্তি-নির্ম্মাণে চারি অবস্থা ঘটিয়াছে। প্রথম অবস্থায় পূর্ণবিয়ব মহিষ, দ্বিতীয় অবস্থায় ঊর্দ্ধাঙ্গ মহিষের, নিম্নাঙ্গ মানুষের ; তৃতীয় অবস্থায় ঊর্দ্ধাঙ্গ নর, নিম্নাঙ্গ মহিষ, চতুর্থ অবস্থায় সম্পূর্ণ নর। প্রথম ও দ্বিতীয় অবস্থায় প্রতিমা আবিষ্কৃত হইয়াছে। দ্বিতীয় অবস্থায় অনুরূপ প্রতিমা নরসিংহ ও বরাহ প্রতিমায় আছে। ঊর্দ্ধাঙ্গ সিংহ বা বরাহ, নিম্নাঙ্গ নর। তৃতীয় অবস্থায় প্রতিমা কিম্বা চিত্র আমি দেখিতে পাই নাই। বিশ্বম্ভর আচার্য-কৃত চিত্রদ্বারা সে অভাব পূর্ণ হইল।

অপর চিত্রের মধ্যে রাগ ভৈরবের চিত্র জীবন্ত দেখাইতেছে। ধ্যানের সহিত সুন্দর ঐক্য আছে। শিল্পীর নাম রামচাঁদ রায়। রামচন্দ্র দাস কৃত "রাজা বিক্রম সেনের রাজসভা" চিত্রে আকৃতিগুলি মন্দ হয় নাই। কিন্তু পরিপ্রেক্ষণের (perspective) অভাব ঘটিয়াছে।

অসমীয়াদের রন্ধন ও ভোজন-পদ্ধতি

শ্রীবিজয়ভূষণ ঘোষ চৌধুরী

সেকালের হিন্দুপরিবারে শুধু নিজের অথবা নিজের পত্নী-পুত্র-পরিজনাদির রসনা পরিতৃপ্তির উদ্দেশ্যে কোনও সুস্বাদু অন্ন, ব্যঞ্জন প্রস্তুত করিবার প্রথা প্রচলিত ছিল না; পরন্তু প্রত্যেক শ্রদ্ধাবান্ গৃহস্থকেই দেবদেবী, পিতৃগণ এবং অতিথিবৃন্দের তৃপ্তির উদ্দেশ্যে ভোজ্যাদি নিত্য নিয়মিত ভাবে প্রস্তুত এবং অর্পণ করিতে হইত। গৃহিণী শুদ্ধ সংযত দেহ এবং মন লইয়া অতি শুচিতার সহিত পাক-শালায় প্রবেশ করতঃ নিজের সাধ্যানুসারে ষড়্রস-সমন্বিত সুস্বাদু নানাবিধ অন্নব্যঞ্জন, পিষ্টক, পরমান্ন প্রভৃতি প্রস্তুত করিতেন; গৃহ-কর্ত্তা যথাকালে সেই ভক্ষ্য-ভোজ্যাদি ইষ্টদেব-দেবী এবং পিতৃগণকে নিবেদন করিতেন। তাহার পর গৃহাগত ব্রহ্মচারী, সন্ন্যাসী এবং অন্যান্য অতিথিকে নিয়মিত ভিক্ষা প্রদান ও ভোজন করাইয়া সর্ব্বশেষে পীড়িত বা অক্ষম নরনারী হইতে কুকুর, শৃগাল ও কীট-পতঙ্গ পর্য্যন্ত যাবতীয় জীবকে অন্নজল দ্বারা যথাসাধ্য পরিতুষ্ট করিয়া তবে নিজেরা অবশিষ্ট খাদ্যের অংশ গ্রহণ করিতেন। মৎস্য, মাংস, 'কৃশর' (খিচুড়ী), পায়স এবং পিষ্টকাদি সুস্বাদু খাদ্য কেবলমাত্র নিজের রসনা পরিতৃপ্তির উদ্দেশ্যে প্রস্তুত করানো অতিশয় পাপজনক বলিয়া বিবেচিত হইত। "যে ব্যক্তি শুধু আত্মতৃপ্তির জন্যই খাদ্যদ্রব্য প্রস্তুত করে, সে কেবল পাপ করে" —এইরূপ শাস্ত্রের আদেশ প্রচলিত ছিল। প্রত্যেক গৃহস্থের পক্ষেই ভোজ্যবস্তু নিত্য দেবদেবী, পিতৃগণ এবং অতিথি প্রভৃতিকে শ্রদ্ধার সহিত প্রদান করা অবশ্যকর্ত্তব্য বলিয়া নির্দ্দিষ্ট ছিল। সেগুলিকে ঋষিরা যথাক্রমে দেবযজ্ঞ, পিতৃযজ্ঞ, নৃযজ্ঞ এবং বলিবৈশ্বদেব নামে পরিচিত করিয়াছেন। পুরাতন সদাচারসমূহ বর্ত্তমান সময়ে সমাজ হইতে অন্তর্হিত হইলেও জনসাধারণের স্মৃতি এখনও সেগুলিকে সম্পূর্ণ ভাবে ভুলিতে পারে নাই; তজ্জন্যই বাংলার পাড়াগাঁয়ের লোকে এখনও কোনও বৃহৎ ভোজন ব্যাপারকে "যগ্যি" (যজ্ঞ) এবং যে বাড়ীতে তাহা হয়, তাহাকে "যগ্যিবাড়ী" (যজ্ঞবাটী) বলিয়া থাকে। হিন্দুর গৃহে পাকশালা এখনও পর্য্যন্ত যজ্ঞ-শালার স্থান অধিকার করিয়া রহিয়াছে বলিয়া অশুচি অবস্থায় তথায় প্রবেশ করা নিষিদ্ধ হইয়াছে।

আধুনিক সুসভ্য সমুন্নত সমাজে যাহাই দেখা যাউক, প্রকৃতি যে নারীর উপর তাহার পুত্র-কন্যা পরিজনাদির আহার সংগ্রহ এবং প্রস্তুত করিবার গুরু-দায়িত্ব ভার অর্পণ করিয়াছেন, দেশ-বিদেশের আদিম বা অসভ্য বলিয়া পরিচিত জাতি-সমূহের সামাজিক ব্যবহার প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে, তাহা উজ্জ্বল-রূপে বুঝিতে পারা যায়। সেই সকল সমাজের যুবকেরা এবং বলিষ্ঠ পুরুষেরা সময়ে সময়ে শিকারের দ্বারা নানাবিধ পশু-পক্ষীর মাংস অথবা মৎস্যাদি সংগ্রহ করিলেও বনভূমির অযত্ন-সম্ভূত ফলমূলাদি সংগ্রহ নারীর পক্ষে নিত্যকার্য্য বলিয়া গণ্য হইয়া থাকে; সংগৃহীত খাদ্যদ্রব্যগুলিকে অগ্নির সাহায্যে ভোজনের উপযোগী করিয়া প্রস্তুত করাও যে তাঁহারই কর্ত্তব্য, তাহা বলাই বাহুল্য। সভ্যতার ক্রমবিকাশের সহিত মানব-সমাজে মৃগয়ার অতিরিক্ত পশুপালনের প্রথা অন্যতর জীবিকা রূপে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে গবাদি পশুর দুগ্ধ দোহন এবং দুগ্ধ হইতে তক্র, দধি, নবনীতাদি খাদ্যদ্রব্য প্রস্তুতের দায়িত্ব নারীই গ্রহণ করিয়াছেন। সভ্যতার অধিকতর ক্রমো-ন্নতির সহিত কৃষিকার্য্যের প্রচলন হইলে ফলমূল শাকসব্জী ও শস্যাদি হইতে নানাবিধ খাদ্যদ্রব্য প্রস্তুত করিবার কার্য্য নারীই করিয়া আসিতেছেন। পাকপ্রণালী গোড়ায় খাদ্য-দ্রব্যকে কেবল কোমল করতঃ ভোজন এবং পরিপাক করিবার সাহায্যের উদ্দেশ্যেই সৃষ্টি হইয়াছিল কিন্তু সভ্যতার উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে উহা ক্রমশঃ এক উন্নত শিল্পবিদ্যায় পরিণত হইয়াছে।

এক এক দেশে একই খাদ্যদ্রব্য নানাবিধ উপায়ে প্রস্তুত এবং ব্যবহৃত হইয়া থাকে। আবার একই দেশে ভিন্ন ভিন্ন পরিবারের মধ্যে ভিন্ন ভিন্ন প্রকারের পাকপ্রণালী ও পরি-বেশনের পদ্ধতি প্রচলিত আছে। দেশের জলবায়ু, অধিবাসী-বর্গের ধর্ম্মবিশ্বাস, বংশগত অভ্যাস, স্বাস্থ্যতত্ত্ব রন্ধনবিদ্যার অভিজ্ঞতা—বিশেষ বিশেষ রুচি ইত্যাদি কারণে একই জাতীয় আমিষ, নিরামিষ খাদ্যদ্রব্য অসংখ্য প্রকারে প্রস্তুত এবং ব্যবহৃত হইয়া থাকে। পশ্চিম অঞ্চল হইতে আগত জনপ্রবাদ "আপরুচি খানা" (নিজের যেমন রুচি, তেমনি খাও) অনেক সময় গ্রহণীয় হইলেও সামাজিক আচার-ব্যবহারের প্রভাবে সর্ব্বত্রই মানুষকে পরের রুচির দ্বারা পরিচালিত হইতে হয়। মানব-সমাজে প্রচলিত ভোজ্য-দ্রব্যের বিভিন্নতার বিষয়ে বিশদ আলোচনা বর্ত্তমান প্রবন্ধে সম্ভব নয়। দুই-একটি দৃষ্টান্ত কেবল দিগ্‌দর্শনস্বরূপ প্রদর্শিত হইতেছে।

কোন পর্য্যটক বাংলাদেশের পশ্চিমাংশ হইতে পূর্ব্বাভি-মুখে চলিতে চলিতে যদি স্থানীয় লোকের গৃহে আতিথ্য স্বীকার করিতে করিতে ক্রমশঃ ধীরে ধীরে অগ্রসর হন, তিনি দেখিবেন যে, অন্ন প্রায় একরূপ থাকিলেও ব্যঞ্জনের আস্বাদ বিভিন্নরূপে পরিবর্ত্তিত হইতেছে; লঙ্কা-মরিচের ব্যবহার অধিক

হইতে হইতে অবশেষে পূর্ব্বপ্রান্ত শ্রীহট্ট এবং চট্টগ্রামে ব্যঞ্জন একেবারে "লঙ্কাময়" বা "মরিচময়" হইয়া গিয়াছে।

পূর্ব্ববঙ্গের ব্রহ্মচর্য্য ব্রতচারিণী বিধবা ভদ্র মহিলাগণের নিত্য ব্যবহার্য্য ডাইল এবং ব্যঞ্জনে লঙ্কা-মরিচের এরূপ আধিপত্য যে ভোক্তাকে "চোখের জলে, নাকের জলে" ভাসিতে হয়, "হা—হা হুহু—হু" করিতে বাধ্য হইয়া থাকে। অথচ খ্রীষ্টীয় পঞ্চদশ শতাব্দের অন্তিমাংশে পোর্ত্তুগীজ জাতির এদেশে আগমনের পূর্ব্বে উক্ত মুখরোচক বস্তুটির অস্তিত্ব আমাদের দেশের কেহ জানিতেন না। তামাকুর মত লঙ্কা-মরিচও বিদেশের আমদানী। আমাদের সংস্কৃত ভাষায় প্রাচীন সাহিত্যে উহাদের কোনও উল্লেখ পাওয়া যায় না। এই দুইটি জিনিষ আমেরিকা হইতে স্পেনিশ এবং পোর্ত্তুগীজদের দ্বারা আনীত, গত পঞ্চদশ-ষোড়শ শতাব্দীতে আমদানী জিনিষ—অথচ ঐ দুইটিই পৃথিবী জয় করিয়া বসিয়াছে।

সভ্য জাতির অপেক্ষা অসভ্য জাতির রন্ধন-প্রণালী অনেকটা সরল ও স্বাভাবিক সুতরাং স্বাস্থ্যকর হইয়া থাকে। উহারা আমিষ এবং নিরামিষ উভয় প্রকারই খাদ্য প্রধানতঃ আগুনে দিয়া (সেঁকা) অথবা জলে সিদ্ধ করিয়া আহার করিয়া থাকে।

সভ্যতার উন্নতির সহিত অথবা উন্নততর জাতির সংস্পর্শ এবং অনুকরণ-প্রবৃত্তির প্রভাবে প্রত্যেক জাতির মধ্যে বেশভূষার উৎকর্ষ বর্দ্ধনের সহিত পাকবিদ্যার পারিপাট্য ও জটিলতা বাড়িতে থাকে।

বিদেশী বিজেতৃ জাতির (মুসলমান এবং য়ুরোপীয়) সংসর্গে আসিবার পর হইতে নগরবাসী ধনী তথা শিক্ষিত বাঙালী হিন্দু পরিবারে "মোগলাই খানা" "ফরাসী রান্না" বেশ চলিয়াছে। আধুনিক উন্নত নাগরিকগণ (গৃহে না হইলেও) হোটেল এবং রেস্তোরাঁ প্রভৃতি ভোজনালয়ে ঐ সকল বস্তুর (হিন্দুর ধর্ম্মশাস্ত্র বিরুদ্ধ হইলেও) আস্বাদ গ্রহণ করিয়া থাকেন।

এখন আমরা অসমীয়া হিন্দুপরিবারে সর্ব্বদা প্রচলিত পাক-পদ্ধতির কয়েকটি বিশেষত্বের পরিচয় প্রদান করিবার প্রয়াস করিতেছি। বাঙালীদিগের সহিত ঘনিষ্ঠভাবে পরিচিত হইবার পূর্ব্বে আসামের ভদ্র পরিবারে যে স্বদেশী পাকপ্রণালীর প্রচলন ছিল, তাহা তাঁহাদের দেশের জলবায়ু এবং পুরুষানুক্রমিক রুচির অনুকূল—সম্ভবতঃ অধিকতর উপযোগী ও স্বাস্থ্যকর ছিল। গত এক শত বৎসরের মধ্যেই ইংরেজ শাসন প্রবর্ত্তনের প্রভাবে জল স্থল উভয় পথেই যাতায়াতের সুবিধা হওয়ার ফলে প্রতিবেশী বাংলাদেশের অধিবাসীদিগের সহিত অসমীয়াগণের সম্পর্ক ঘনিষ্ঠতর হইতেছে এবং সঙ্গে সঙ্গে বাংলার আচার-ব্যবহার, বেশভূষা, রন্ধন-ভোজনাদির যাবতীয় রীতিনীতি আসাম প্রদেশে অনুসৃত হইতেছে। যথা-তত্রের অসমীয়া ভদ্রগৃহের আসবাব, সাজসজ্জা, ধরণধারণ যেরূপ বঙ্গবঙ্গের হুবহু নকলে পরিণত হইয়াছে, তদ্রূপ অসমীয়া ভদ্রমহিলার পাকপ্রণালীও বৈশিষ্ট্য হারাইয়া নবীনা বঙ্গনারীর রন্ধন-পদ্ধতির সহিত একাকার হইয়া পড়িয়াছে। এমনকি, নগর হইতে দূরে অবস্থিত পল্লীগ্রামে না গেলে প্রকৃত বা খাঁটি অসমীয়া-রন্ধন বিদ্যার নিদর্শন পাওয়া কঠিন ব্যাপার হইয়াছে।

বাংলা ও উড়িষ্যা প্রদেশের মত আমাদের নগরগুলিতে প্রধানতঃ গৃহলক্ষ্মীরাই পাকশালায় রন্ধনাদি করিলেও সেখান হইতে দূরবর্ত্তী পল্লীগ্রামের উচ্চশ্রেণীর অসংখ্য বিবাহিত হিন্দু সাধারণতঃ স্বহস্তে নিজ নিজ রন্ধনকার্য্য সম্পন্ন করিয়া ভোজন করিয়া থাকেন। আসামের রন্ধন-প্রণালী বিশেষরূপ বৈচিত্র্যহীন, অনেকটা সাদাসিধে ধরণের এবং সৌখীনতার অপেক্ষা স্বাস্থ্যরক্ষার অধিকতর অনুকূল বলিয়া বোধ হয়। তবে বড় বড় নগরে যে সমস্ত সুসভ্য বা সুশিক্ষিত অসমীয়া হিন্দুপরিবারে য়ুরোপীয় অথবা বঙ্গদেশীয় পদ্ধতি প্রবেশলাভ করিয়াছে তাহার প্রভাবে যে স্থানে মহিলারা পতি-পুত্রাদির সুবিধা বা স্বাস্থ্যের জন্য পাকশালার পরিশ্রম স্বীকার করা হীনতাসূচক কাজ মনে করিয়া থাকেন, তথায় বেতনভুক্ পাচক অথবা পাচিকাই গৃহিণীর সেই পুরাতন দায়িত্বভার গ্রহণ করিয়াছে। এইরূপ পরিবারে বিশুদ্ধ দেশীয় পাকপ্রণালী নির্ব্বাসিত হইয়াছে এবং তাহার স্থানে মগ, মাদ্রাজী বা মুসলমান বাবুর্চিদিগের প্রবর্ত্তিত মোগলাই, ফরাসী, ইংরেজী বা কারসী প্রভৃতি উন্নততর সভ্যভব্য রন্ধন-পদ্ধতি রাজত্ব করিতেছে।

নগরবাসিনী বাঙালীর মেয়েরা সময়বিশেষে স্নান না করিয়া কেবল পূর্ব্ব রাত্রির শয্যাবস্ত্র পরিবর্ত্তন করিয়া পাকশালায় প্রবেশপূর্ব্বক রন্ধন করিয়া থাকেন; কিন্তু পল্লীগ্রামের কোনও অসমীয়া হিন্দু মহিলা স্নান না করিয়া কদাচ তাহা করেন না। মাসিক স্ত্রীধর্ম্মের সময়ে ছয় দিন পর্য্যন্ত তাঁহারা পাকশালায় অথবা গোশালায় প্রবেশ করেন না কিংবা কোনও ব্যক্তিকে কোনও প্রকার খাদ্যদ্রব্য অথবা জল দেন না। বাংলা দেশের অধিকাংশ নগরে শিক্ষিত ভদ্র পরিবারে অনেক সময়ে পাকশালায় প্রবেশপূর্ব্বক স্বতন্ত্রভাবে ফুটন্ত ফুটার যে প্রথা দৃষ্ট হয় তাহা আধুনিক এবং পল্লীগ্রামের উচ্চশ্রেণীর হিন্দু গৃহস্থ মাত্রেরই নিকট ঘৃণ্য। এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য—গোশালার সহিত আধুনিক রন্ধনশালার সম্বন্ধ অত্যন্ত কম অথবা লুপ্ত হইয়া গিয়াছে বলিলেও হয়।

ব্যঞ্জনের মশলা—মুখরোচক, সুন্দর, সুগন্ধ করিবার উদ্দেশ্যে তাহাতে তৈল, ঘৃত, হরিদ্রা (অথবা কুঙ্কুম বা জাফরান) এবং নানাবিধ মশলা সংযুক্ত করিবার প্রথা প্রচলিত হইয়াছে। পরিমিত মশলা ব্যবহারের দ্বারা ভোজন-

খাদ্যদ্রব্যের বিকৃতি অথবা গুণহানি হয় না। পরন্তু উহার দ্বারা খাদ্য অধিকতর রুচিকর ও সহজপাচ্য হইয়া থাকে; কিন্তু উহাদের অধিকতর ব্যবহারে প্রকৃত প্রভাবে স্বাস্থ্যহানি ঘটিয়া থাকে। অসমীয়া ভদ্রমহিলারা রন্ধনের সময়ে প্রধানতঃ নিম্নলিখিত মশলাগুলি ব্যবহার করেন, যথা:—গোলমরিচ, সরিষা, ধনে, আদা, তেজপাতা, 'জনী' (জোয়ান), হিং এবং জাবরাং (জাফরাং নহে)। প্রয়োজনানুসারে এই মশলাগুলি ভিন্ন ভিন্ন ভাবে ব্যবহৃত হয়। আসামে যে গোলমরিচের ব্যবহার আছে, তাহা বাংলাদেশের গোলমরিচ অপেক্ষা আকারে ছোট। আসামের ব্রহ্মপুত্র উপত্যকা অঞ্চলে জিরার ব্যবহার নাই এবং তাঁহাদের ব্যঞ্জনে ঝালের ব্যবহার কিছু কম। উপর-আসাম ও মধ্য-আসামের মহিলারা বাটা মশলার পরিবর্তে সাধারণতঃ মশলার গুঁড়া রন্ধনে ব্যবহার করেন। নিম্ন আসামে অনেক ক্ষেত্রে মশলা শিলে পিষিয়া তরকারিতে দেওয়া হয়। যাহা হউক, উক্ত "জাবরান্" নামক মশলাটি ভুটানের পাহাড়ে জন্মে। ভুটিয়াদিগের নিকট হইতে উহা ক্রয় করা হয়। মাংস রাঁধিবার সময়ে অসমীয়া মহিলারা ইহার ব্যবহার খুবই করেন। কাঁচা অবস্থায় জাবরান্ এরূপ বিষাক্ত দ্রব্য যে, খাইলে প্রাণহানি হইয়া থাকে।

কামরূপ অঞ্চলের অধিকাংশ ভদ্র পরিবারের মধ্যে একটু বেশী সিদ্ধ করা ভাত খাওয়ার প্রচলন দেখিতে পাওয়া যায়। আমরা দেখিয়াছি—উপর-আসাম ও মধ্য-আসামের লোকেরা এত গলা ভাত খান না। তাঁহারা বাঙালীদিগের মত সাধারণতঃ একটু শক্ত ভাত খাইতে পছন্দ করেন। ভাতের সহিত ক্ষার খাওয়া অসমীয়া হিন্দুদিগের প্রারম্ভিক ভোজন। ইহার বিষয় নিম্নে বিবৃত করা হইল:—

তৈল ও লবণ আসাম প্রদেশের মধ্যে বড়পেটা এবং মাজুলি অঞ্চলে ও উত্তর-লখিমপুর মহকুমার গোঁসাই গাঁও, ডাহুয়াখানা, তিলাহি ও নারায়ণপুরে প্রচুর সরিষা জন্মে। বড় বড় নগরে তেলের কলের প্রচলন হইয়াছে। মধ্য আসাম ও উপর-আসামের পল্লীবাসিনীরা "গছঘাল" ও "বাঁধাঘাল" নামক দেশীয় ঘানি হইতে প্রস্তুত যে বিশুদ্ধ সরিষার তৈল ব্যবহার করেন, অসমীয়ারা তাহাকে "পকাতেল" বলেন। সরিষা ভাজিয়া একটু গরম থাকিতে ঘানিতে দিয়া তৈল বাহির করে বলিয়া এই তৈল হইতে এমন একটি গন্ধ বাহির হয়, যাহা পল্লীবাসী অসমীয়াদিগের বেশ তৃপ্তিকর হইলেও অনভ্যস্ত বাঙালীর নিকট রুচিজনক হয় না। বিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভেও নিম্ন-আসাম ও মধ্য-আসামে ভুটিয়া লবণ (ভুটানের পাহাড়-জাত লবণ) ব্যবহৃত হইত, কিন্তু উপর-আসামে উহা দুষ্প্রাপ্য ছিল। লখিমপুর জেলার জয়পুর মৌজায় এবং ডিব্রুগড় মহকুমার কোন কোন স্থানে, শিবসাগর জেলার গোলাঘাট ও অন্যান্য কতকগুলি অঞ্চলে লবণাক্ত জলের উৎস আছে। অসমীয়ারা ইহাকে "লোণপুং" বলেন। সেই সকল স্থানের লোকে বাঁশের চোঙায় লোণা জল পুরিয়া আগুনে ফুটাইয়া লবণ প্রস্তুত করিয়া থাকে।

ব্রহ্মপুত্রের জলে লৌহ থাকায় অসমীয়ারা ক্ষার খাইয়া থাকেন। ইহার ব্যবহার দ্বারা কোষ্ঠকাঠিন্য দূর হইয়া থাকে। অসমীয়ারা কলা ও কলার বাকল পুড়াইয়া ক্ষার প্রস্তুত করেন। এতদ্ব্যতীত 'কলম শঠ' (কচুর ডাঁটা) প্রভৃতি জলজ উদ্ভিদ হইতে তিন-চারি রকম ক্ষার তাঁহারা প্রস্তুত করেন। কামরূপে উহাকে গটা ক্ষার বা "খরমা ক্ষার" বলা হয়। কামরূপ ও তেজপুর অঞ্চলের অনেকে ব্যঞ্জনে হলুদের পরিবর্তে ক্ষার ব্যবহার করেন। উজনী আসামের পল্লীগ্রাম-গুলিতে এখনও হলুদের ব্যবহার নাই। সেখানকার অসমীয়ারা হলুদকে "রং" বলেন। তাঁহারা বলিয়া থাকেন—"ব্যঞ্জনে রং নাই বা করলাম।" যাহা হউক ক্ষার খাওয়া অসমীয়াদিগের একটা বৈশিষ্ট্য বলা যাইতে পারে। তাহারা লাইশাক (সরিষা শাক), উরাহি (উচ্ছে) ও বেঙেনার (বার্তাকুর) ব্যঞ্জনে, কলাই দাইলে ক্ষার সংযোগ করেন। বাঙালীরা মধ্যে মধ্যে যেমন তিক্ত ব্যঞ্জনাদি ব্যবহার করিয়া থাকেন, ব্রহ্মপুত্র উপত্যকাবাসীরা তদ্রূপ মধ্যে মধ্যে ক্ষার খাইয়া থাকেন। ত্রিপুরা, কুচবিহার, রংপুর ও জলপাইগুড়ি অঞ্চলের অধিবাসী-দিগের মধ্যেও ন্যূনাধিক ক্ষারের প্রচলন আছে। অসমীয়ারা ক্ষার খান বলিয়া তাঁহাদের কোন কোন বাঙালী বন্ধু "ক্ষার খোয়া অসমীয়া" বলিয়া পরিহাস করিয়া থাকেন। যাহা হউক অসমীয়ারা কলমী শাককে 'কলম' বলেন। তাঁহারা হেলঞ্চ ও কলমী শাক রৌদ্রে শুষ্ক করিয়া পুড়াইয়া ছাই করিবার পর উহাকে বাঁশের চুপড়িতে ভর্তি করেন। অতঃপর ঐ চুপড়ির নিম্নে একটি থালা রাখিয়া দেওয়া হয় এবং ছাইয়ের মধ্যভাগ একটু "খালা" করা হয়। খালার মধ্যে পরিমাণমত যে জল ঢালিয়া দেওয়া হয়, তাহা ছাইগুলিকে ভিজাইয়া নিম্নস্থ থালায় আসিয়া সঞ্চিত হয়। এই সঞ্চিত জলকে "ক্ষার" বলে। কলার ক্ষার অপেক্ষা কলমী ও হেলঞ্চের ক্ষার উৎকৃষ্ট। কামরূপের চাড়াল জাতীয় লোকেরা পূর্ব্বোক্ত "গটা ক্ষার" প্রস্তুত করে। উহাও সর্ব্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট এবং লবণশূন্য।

অসমীয়ারা ভাতের সহিত "তেল ক্ষারণি" খাইয়া থাকেন। তেলের সহিত ক্ষার মাখাইয়া ইহা প্রস্তুত করা হয়। "তেল ক্ষারণি" খাইলে নাকি দেহে চর্ব্বি জমিতে পারে না। অসমীয়া হিন্দু মহিলারা "আধ ক্ষরিয়া" নামক এক প্রকার ব্যঞ্জন করিয়া থাকেন। উহা 'টেঙা' (টক)ও নহে, ক্ষারও নহে। আধ শব্দে আধা বা অর্দ্ধেক এবং "ক্ষরিয়া" শব্দে ক্ষার বুঝায়। কিন্তু এরূপ অর্থ করিলে আধ ক্ষরিয়ার কোন মানে হয় না। অসমীয়াদিগের মধ্যে "মূলার আধ ক্ষরিয়া"র বেশ প্রচলন আছে।

অসমীয়া হিন্দুদিগের সমাজে কলাইয়ের দাইলের প্রচলন অধিক। ইহাকে তাঁহারা 'মাটিকলাই' বলেন। তাঁহাদের

মধ্যে তাল্না বা ঘণ্টোর প্রচলন নাই। সেখানকার কোনও মহিলা এই দুইটি রাঁধিতেও জানেন না। আসামে পটলের চাষ নাই। তবে সে দেশের জঙ্গলে স্বভাবজাত এক রকম পটল পাওয়া যায়। উহা আকারে ছোট এবং উহার শতকরা প্রায় ৩০টি তিক্ত হয়। বন্য পটলের শাঁস নাই, বীজ অধিক—খাইতে পটলেরই মত এবং কতকগুলি ব্যতীত অন্যান্যগুলি সুস্বাদু। কুচবিহার রাজ্যের স্থানে স্থানে এই বুনো পটল পাওয়া যায়। জঙ্গলের পটলের গাছ ও পাতা কবিরাজেরা ঔষধে ব্যবহার করিয়া থাকেন। অসমীয়া মহিলারা তরকারিতে বুনো পটল ব্যবহার করেন। আসামে পোস্ত-দানার বেশ প্রচলন আছে। আফিঙের আর একটি নাম পোস্ত। উহার বীজের নাম পোস্তদানা। প্রায় এক শত বৎসর পূর্ব্বে আসামে আফিঙের চাষ ছিল। সুতরাং সে দেশে পোস্তদানা যথেষ্ট জন্মাইত এবং লোকের ব্যবহার্য্য ছিল। আসামে পাঁপরের (ইহা সংস্কৃত পর্পট শব্দের অপভ্রংশ) প্রচলন নাই। মুগ বা মাসকলাইয়ের দাইল ইহার প্রধান উপাদান।

আসামের ব্রহ্মপুত্র উপত্যকা অঞ্চলে কচি কচুপাতা হইতে অনেক রকম ব্যঞ্জন প্রস্তুত করা হয়। অসমীয়া মহিলারা এই এক কচুপাতা হইতেই 'খাল' এবং টক ব্যঞ্জন প্রস্তুত করেন। কচুপাতা সিদ্ধ করিয়া উহাতে লবণ ও অম্ল সংযোগ করিলে 'টক' এবং আদা, গোলমরিচ, লঙ্কাবাটা বা লঙ্কার গুঁড়া, লবণ দিলেই খাল হইল। অসমীয়ারা ভাতের সঙ্গে ভাজা ও সিদ্ধ কচু খাইয়া থাকেন। কচুর ডাঁটাও ভিন্ন ভিন্ন প্রণালীতে রাঁধিবার ব্যবস্থা দেখিতে পাওয়া যায়। অসমীয়ারা লাইশাক (সরিষা শাক) খুব খান। এই শাকের কয়েকটি প্রকারভেদ আছে যথা :—বেরলাই, টকৌলাই, চীনালাই প্রভৃতি।

অসমীয়া হিন্দুরা পাটগাছকে "মরা গাছ" বলেন। সমগ্র আসামে তিন প্রকার পাটের চাষ হয়, যথা :—মিঠা মরা, টৌকা মরা ও তিতা মরা। তিতা মরা শব্দের অর্থ তিক্ত পাট। অসমীয়া মহিলারা তিক্ত পাটের (নালিতার) শুষ্ক পাতা হইতে একপ্রকার তিক্ত ব্যঞ্জন প্রস্তুত করেন। এই ব্যঞ্জনকে তাঁহারা "সোকোতা" বলেন। এই সোকোতা আমাদের 'সুক্তপাতা' এবং পূর্ব্ববঙ্গের 'নালিতার পাতা'। সোকোতা খাইলে নাকি পিত্তাধিক্য প্রশমিত হয়। উত্তর-বঙ্গে ও পূর্ব্ববঙ্গে যত পাট উৎপন্ন হয়, সে 'কলের' (গাছের) পাতার আস্বাদ তিক্ত; উহার পাতা শুকাইয়া রাখিলেই 'সুক্তপাতা', 'সোকোতা' বা 'নালিতার পাতা' হয়। পশ্চিম বঙ্গের হুগলী, হাওড়া, ২৪ পরগনা অঞ্চলে ঐরূপ পাট জন্মে না—দেশের দোকানে কিনিতে পাওয়া যায়। আমাদের দেশের পাটের সহিত পূর্ব্ব বা উত্তর-বঙ্গের পাটের (সিরাজগঞ্জী পাটের) প্রভেদ আছে। আমাদের দেশের (পশ্চিম বঙ্গের) পাটের শুঁটী লম্বা এবং পাতা তিক্ত নহে। তিক্ত পাটের শুঁটী প্রায় গোলাকার। সংস্কৃত ভাষায় তিক্ত পাটকে 'নাড়িচা' বা 'নালিতা' এবং আমাদের দেশে 'নালিতা' বলে। কামরূপ অঞ্চলে এক রকম ছোট জাতের মিষ্ট পাতার পাট শুধু শাক খাইবার উদ্দেশ্যেই চাষ করা হয়। উহাকে "ভোগাপাট" বলে। ভোগা—মিষ্ট বা উৎকৃষ্ট।

অসমীয়া হিন্দুরা কম পরিমাণে ঝোল ব্যবহার করেন। মৎস্যের ঝোলে যথেষ্ট তরকারি দেওয়া হয়। তাঁহারা ঝোলকে "আঞ্জা" বলেন।

মধ্য-আসাম ও উপর আসামের হিন্দুরা ভাতের সহিত ঘি-চিনি আহার করিয়া ভোজন সমাপ্ত করেন। যাঁহারা ঘি-চিনির ব্যয়ভার বহন করিতে অক্ষম, তাঁহারা দই-গুড় খাইয়া সেই উদ্দেশ্য (মধুরেণ সমাপয়েৎ) সিদ্ধ করিয়া থাকেন। ভাতের সঙ্গে ঘি এবং চিনি ব্যবহার খুব পুরাতন এবং এখনও আগ্রা প্রদেশে (মথুরা, ইটা, আগ্রা প্রভৃতি জেলায়) সম্পন্ন ব্যক্তি-দিগের বাড়ীতে নিত্য ব্যবহৃত হইতেছে।

মৎস্যের মধ্যে পিঠিয়া মাছ অসমীয়াদিগের প্রিয় খাদ্য। আসামের বড় বড় নদীতে ও বিলে এই মাছ পাওয়া যায়। পিঠিয়া মাছ এত বড় হয় যে, একটি লোক উহাকে বহন করিতে পারে না। এই মাছের আকার অনেকটা বুগেল মাছের মত এবং উহার মাথাটা রুই মাছের মত। পিঠিয়া মাছের আঁশ খুব বড় হয়। ব্রহ্মপুত্রে ইলিশ মাছ পাওয়া যায়, কিন্তু উহার তেমন স্বাদ নাই। আসামে বাগদা চিংড়ী দুষ্প্রাপ্য। "শালে বুলে" বলিয়া আসামে একটি কথার প্রচলন আছে। ইহার অর্থ—বুলা ও শোল মাছ দিয়া রান্না তরকারি উৎকৃষ্ট। আসামবাসী হিন্দুরা বুগেল, শাল ও শিঙ্গী মাছ খান না। এতদ্ব্যতীত যে সকল মৎস্য তাঁহাদের অভক্ষ্য সেগুলির নাম, যথা :—কুটকাশাল, মরশাল, নাদিনী। সিরিকা, দেরিয়া, গরুয়া, বাঘনী, দুমচা, ভেচেঙ্গী, বেম ও কারিয়া।

অম্ল দিয়া মাছের গা চিরিয়া ফেলিবার পর 'খাগা' (টুকরা টুকরা করিয়া) কাটা হয়। এইরূপ করাকে "কচি দিয়া" বলে। দরঙ জেলা হইতে উপর-আসাম পর্য্যন্ত পল্লী-গ্রামে প্রত্যেক পরিবারেই "কচি দিয়া" মাছ রাঁধা হয়। তজ্জন্য অসমীয়ারা বলেন, "মাছের গা ভাল করিয়া চিরিয়া না দিলে উহাতে লবণ, তৈল ও মশলা ভালরূপে প্রবেশ করে না—উহা খাইলে সোয়াদ পাওয়া যায় না।"

মধ্য-আসাম ও উপর-আসামে হরিদ্রা এবং লবণসংযুক্ত মৎস্য কলাপাতায় মুড়িয়া আগুনের মধ্যে কিছুক্ষণ রাখিবার পর বাহির করিয়া খাওয়া হয়। ইহাকে "পাতত দিয়া" বলে। ঐ দুই অঞ্চলে অনেকে লবণসংযুক্ত মৎস্যকে বংশশলাকায় বিদ্ধ করিয়া অগ্নিতে সেঁকিয়া ব্যবহার করেন। কেহ কেহ বা ঐ সেঁকা মৎস্য আবার সর্ষপ তৈলে ভাজিয়া লন। এইরূপে প্রস্তুত করাকে "খরকাটি দিয়া" বলে। কুচবিহারে রাজবংশী

জাতির মধ্যে আমরা "পাতত দিয়া" ও "খরকাটি দিয়া"র প্রচলন দেখিয়াছি। কোচবিহারে এই দুইটিকে যথাক্রমে "পাতত করা" ও "খরিকাটি" বলে।

অসমীয়া ভদ্র-মহিলারা সাধারণতঃ পেঁপিয়া কলের অথবা 'কোমরা'র (কুমড়ার) টুকরা দিয়া মাংস রাঁধিয়া থাকেন। অসমীয়ারা পায়রাকে কপৌ বলেন। তাঁহারা বেশ তৃপ্তির সহিত উহার মাংস ভক্ষণ করিয়া থাকেন। কিন্তু কেহই পায়রার ডিম খান না। অসমীয়ারা এক জাতীয় বড় পায়রাকে 'পরঘুমা' এবং হরিয়েলকে 'হাইঠা' বলেন। এই দুই জাতীয় পায়রার মাংস খাইতে খুব সুস্বাদু। পরঘুমা ও হরিয়েল (green pigeon) খুব গভীর জঙ্গলে থাকে। মাজুলি অঞ্চলের নদীতটে "নাকরধের কচুয়া" নামক এক জাতীয় পক্ষী আমরা দেখিয়াছি। উহার আকৃতি হাঁসের মত। কোনও অসমীয়া হিন্দু ইহার ডিম খান, কিন্তু মাংস খান না। 'বালিঘোড়া' নামক এক জাতীয় বড় পক্ষী মাজুলী অঞ্চলের নদীর চড়ায় সচরাচর দৃষ্ট হয়। এই পক্ষী দেখিতে সুন্দর। আকারে ইহা পশ্চিম বঙ্গের শালিক পাখী অপেক্ষা কিছু বড়। উচ্চ শ্রেণীর অসমীয়া হিন্দুরাও ইহার ডিম খাইতে ভালবাসেন, কিন্তু ইহার মাংস কেহ খান না।

আসামে অসভ্য জাতির লোকেরা 'নলছুরার' নামক কূর্মবিশেষের মাংস খায়, কিন্তু কোনও শ্রেণীর হিন্দু তাহা খায় না। কিন্তু সেখানকার সকল শ্রেণীর হিন্দু ইহার ডিম ভক্ষণ করিয়া থাকে। উজনী আসামের কোনও শ্রেণীর হিন্দু কর্কট খান না।

অসমীয়ারা ভাদ্র মাসে উদ্গত কচি "বাঁশের কোঁড়া" (সংস্কৃত 'বংশকরী') ঢেঁকিতে কুটিয়া ভিন্ন ভিন্ন প্রণালীতে গাজ, পকা গাজ, খরিচা, পকা খরিচা প্রস্তুত করিয়া ভোজন করেন। পকা গাজ শুকাইয়া লইলে খরিচা হয়। কামরূপের দক্ষিণ দিকস্থ পার্ব্বত্য অঞ্চলে এবং উজনী আসামে গজের প্রচলন অধিক। কামরূপে ইহার প্রস্তুত-প্রণালী অতি অল্প লোকে জানেন।

অসমীয়ারা বলিয়া থাকেন—টক না খাইলে তাঁহাদের শরীর ভাল থাকে না। আসাম অঞ্চলে যত রকম টক ফল পাওয়া যায়, ভারতের আর কোনও দেশে তত নাই। সে দেশে 'থেকেরা' নামক টক ফল খান নাই এমন লোক বিরল। অসমীয়ারা বলেন—এই ফল খুবই উপকারী; এমন কি ইহার দ্বারা 'প্রবাহিকা' (রক্ত আমাশয়) এবং কফসংযুক্ত ব্যাধি (নিউমোনিয়া) রোগেরও উপশম হইয়া থাকে। বাড়ীতে ভাল মাছ আসিলে অসমীয়া মহিলারা অম্লসংযুক্ত মৎস্যের ব্যঞ্জন (মাছের অম্বল) রাঁধিতে ভালবাসেন। অসমীয়ারা টকের ব্যঞ্জনে মিষ্ট ব্যবহার করেন না। যাহা হউক, কুচবিহার অঞ্চলে থেকেরাকে থৈকল এবং সংস্কৃত ভাষায় 'অম্লবেতস' বলে। রঙ্গপুর জেলায়ও প্রচুর থৈকল জন্মে। আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্রে অম্লবেতসের উল্লেখ আছে।

অসমীয়া হিন্দু মহিলারা সরিষার সহিত কয়েকটি মশলা মিশ্রিত করিয়া চাটনি জাতীয় কয়েক প্রকার উত্তম আস্বাদযুক্ত দ্রব্য প্রস্তুত করিয়া থাকেন। উহাদের মধ্যে একটির নাম "কাঁহুদী" (আমাদের কাসুন্দী এবং উত্তরবঙ্গে ইহাকে 'কাসন' বলে), আর একটির নাম 'খারলী' এবং আর একটির নাম 'বেহুরাই'। অসমীয়ারা রান্না করা মাংস এবং পান্তা ভাতের সহিত 'বেহুরাই' মিশ্রিত করিয়া খাইতে ভালবাসেন।

পূর্ব্বে বলা হইয়াছে যে, টক না খাইলে অসমীয়াদিগের শরীর ভাল থাকে না। ইহার কারণ আমরা অবগত নহি। আমরা দেখিতে পাই—রাঢ়ে 'টক', পূর্ব্ববঙ্গে ঝাল এবং মাদ্রাজ প্রদেশে 'টক এবং ঝাল' (তেঁতুল ও ঝাল) একত্র ব্যঞ্জনে ব্যবহার করে। মাদ্রাজে লঙ্কা এবং তেঁতুল একত্র গুলিয়া ভাতে মাখিয়া খায়, ঘিও মিশায়। 'রাঢ়' অঞ্চল কড়া জায়গা (ভিজা নহে—শুষ্ক) বলিয়া সেখানকার লোকে টক খায়; পূর্ব্ববঙ্গের মাটি স্যাঁৎসেঁতে বলিয়া 'ঝাল' খুব খায়—এরূপ যুক্তি চলে না, কেন না মারবাড়ের মরুভূমিতেও লোকে এত লঙ্কা খায় যে, আমরা খাইলে মারা যাইব। ইহা সনাতন অভ্যাস ভিন্ন আর কিছুই নহে। অধিকাংশ মানুষের স্বভাবেই রজোগুণের আধিক্য; সেই জন্য বেশীর ভাগ লোকেই মাছ মাংস, বেশী ঝাল, বেশী টক, তামাক, গাঁজা, মদ ইত্যাদি রজোগুণের উদ্দীপক দ্রব্য খাইতে স্বভাবতঃই ভালবাসে। পেঁয়াজ, রশুন প্রভৃতি বিশ্রী দুর্গন্ধযুক্ত জিনিস, ডোরিয়ান নামক মালয় দেশের অতি দুর্গন্ধ ফল, শুকনা মাছ, শুকনা মাংস, Caviare নামক এক রকম শুকনা মাংস (যাহার এক গ্রামের মূল্য এক গিনি), কাশ্মীরের হ্রদের চীরশিঙল, মাছের লোণা এবং শুকনা ডিম, পনীর প্রভৃতি জিনিষ পৃথিবীর অনেক লোক আদর করিয়া খায়। "মানুষের রুচিই বিচিত্র"—এই কথা ছাড়া ইহার আর অন্য উত্তর নাই।

সোভিয়েট কৃষি-উন্নয়নে বিজ্ঞান

অধ্যাপক শ্রীজিতেন্দ্রচন্দ্র মুখোপাধ্যায়

কৃষকের জীবনের সঙ্গে বিজ্ঞানের যোগাযোগ প্রায় সর্ব দেশেই খুব কম, জার-শাসিত রাশিয়াতেও তার ব্যতিক্রম ছিল না। শিল্পক্ষেত্রে বিজ্ঞানের প্রয়োগ সামান্য কিছু থাকিলেও কৃষিকার্য ছিল বিজ্ঞানের সত্তায় অপাঙ্‌ক্তেয়। প্রাগৈতিহাসিক যুগের কৃষক যে পদ্ধতিতে হলচালনা করিয়া বীজবপন ও শস্য আহরণ করিত বহু সহস্র বর্ষ পরেও মানুষ প্রায় সেই পদ্ধতিকেই অনুসরণ করিয়া চলিয়াছে, বিজ্ঞান তাহাকে নূতন কোন পন্থা দেখায় নাই—এ কথা বলিলে খুব ভুল বলা হইবে না। মানুষের জীবনের অন্যান্য ক্ষেত্রে বিজ্ঞানের প্রভাবে যে পরিবর্তন আসিয়াছে কৃষি-পদ্ধতিতে তেমন কিছু হয় নাই। সোভিয়েট রাষ্ট্রের অধীনে বিজ্ঞান মানব-গোষ্ঠির এই উপেক্ষিত অংশীদারের দিকে দৃষ্টি দিয়াছে এবং তাহারই ফলে বসুমতীর ভাণ্ডার হইতে প্রচুর উপকরণ সংগ্রহ করা হইতেছে। সোভিয়েট বিজ্ঞানীরা জানেন—প্রকৃতির নিকট হইতে মানুষ কোন অনুগ্রহ প্রত্যাশা করিতে পারে না, প্রকৃতি স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া কোন দানই দিবে না, তাহার নিকট হইতে ছিনাইয়া লইতে হইবে।

সোভিয়েট শাসনতন্ত্র প্রতিষ্ঠার সঙ্গে সঙ্গে স্বল্পকাল মধ্যে কৃষিকে বৈজ্ঞানিক ভিত্তির উপরে প্রতিষ্ঠিত করিয়া তাহাকে নব রূপ প্রদান করিবার জন্য রাশিয়ায় নানা প্রতিষ্ঠান গড়িয়া উঠিয়াছে। বর্তমানে সোভিয়েট রাশিয়ায় চৌদ্দ হাজার বৈজ্ঞানিক কর্মী কৃষিগবেষণায় নিযুক্ত আছেন। এতদুদ্দেশ্যে ৯০টি গবেষণাগার, ৩৬৭টি পরীক্ষাকেন্দ্র এবং বহুসংখ্যক শাখা-প্রতিষ্ঠান-সম্বলিত ১০৭টি পরীক্ষামূলক কৃষিক্ষেত্র আছে। এতদ্ব্যতীত সম্মিলিত কৃষি-প্রতিষ্ঠানের অধীনে প্রায় বিশ হাজার ছোট ছোট লেবরেটরী আছে, যেখানে বহুবিধ গবেষণার কার্য হইয়া থাকে।

কৃষি-উন্নয়ন ব্যাপারকে কয়েকটি বিভিন্ন কার্যে ভাগ করা যাইতে পারে, যেমন— ভাল বীজ বাছাই, জমির উর্বরতা বৃদ্ধি, উদ্ভিদের জীবনধারা পরিবর্তন ও নিয়ন্ত্রণ; জৈব উপদ্রব দূরীকরণ, উন্নতধরণের কৃষিযন্ত্রাদি নির্মাণ। সোভিয়েট রাষ্ট্রে ইহার প্রত্যেকটি কার্য বৈজ্ঞানিক প্রথায় পরিচালিত হইয়া অভাবনীয় সাফল্যলাভ করিয়াছে।

১৯৩৮ খ্রীষ্টাব্দের বিবরণীতে জানা যায় যে সেই সময় সম্মিলিত কৃষি-প্রতিষ্ঠানের অধীন ভূমির শতকরা ৭০টিতে উন্নত শ্রেণীর বীজ বপন করা হইত। বীজ পরীক্ষার্থ রাষ্ট্রের অধীন দেড় হাজারের অধিকসংখ্যক পরীক্ষামূলক কৃষিক্ষেত্র আছে সেখানে বীজসংগ্রহ ও পরীক্ষা-কার্য চলিতেছে এবং এই উপায়ে সর্বদাই ভাল বীজ বপনের দিকে দৃষ্টি দেওয়া সম্ভব হইতেছে।

প্রাকৃতিক নিয়মানুযায়ী উদ্ভিদের জীবন বড় সৌখীন, বিশেষ করিয়া শস্য ও ফলমূলের উদ্ভিদগুলির। ইহাদের প্রত্যেকটির জন্য যথোপযুক্ত ভূমি, আবহাওয়া, রৌদ্রবৃষ্টি, শীতাতপ দরকার। কোন বিষয়ে কোন ত্রুটি ঘটিলে উদ্ভিদের জীবন সংক্ষিপ্ত হইয়া আসিবে কিংবা উৎপাদিকা শক্তি ব্যাহত হইবে। সকল শস্য সব দেশে হয় না, বৎসরের বিশেষ সময়ে নির্দিষ্ট শ্রেণীর শস্য জন্মিয়া থাকে, ইহাই প্রকৃতির ব্যবস্থা। বিজ্ঞান এই রীতিতে হস্তক্ষেপ করিয়া এখানে অদ্ভুত পরিবর্তন সাধন করিয়াছে। এই বিষয়ে কয়েকজন বিজ্ঞানীর কার্য উল্লেখযোগ্য।

এক জাতীয় প্রাণী বা উদ্ভিদের সঙ্গে অপর জাতীয় প্রাণী বা উদ্ভিদের যৌনমিলন ঘটাইলে যে ছানাগাছ বা বীজ উৎপন্ন হয় তাহাকে বর্ণসঙ্কর বলা হয়। বংশানুকৃতি নিয়মানুযায়ী সন্তান পিতা ও মাতা উভয়েরই গুণের অধিকারী হইয়া থাকে। মানুষ চেষ্টাদ্বারা বা কৃত্রিম উপায়ে এই প্রকার বিরুদ্ধ মিলন ঘটাইয়া নানাপ্রকার মিশ্রজাতীয় নবতম প্রকৃতিবিশিষ্ট উদ্ভিদ বা প্রাণী সৃষ্টি করিয়াছে, ইতিপূর্বে যাহাদের স্বাভাবিক অস্তিত্ব ছিল না। পার্বত্য অঞ্চলে যে সকল উদ্ভিদ জন্মে সেইগুলি তদ্দেশীয় কঠিন মাটি, শীতাধিক্য প্রভৃতি প্রাকৃতিক পরিবেশে বর্ধিত হইতে অভ্যস্ত, আবার সমভূমির বৃক্ষলতাদির পারিপার্শ্বিক সম্পূর্ণ পৃথক। এইজন্য বিভিন্ন অঞ্চলের উদ্ভিদের প্রকৃতিগত পার্থক্য রহিয়াছে। রাশিয়ার পরলোকগত আই. ভি. মিচুরীন প্রমাণ করিয়াছেন যে, অনুকূল পরিবেশাধীনে বর্ণসঙ্কর উদ্ভিদকে যে-কোন বৈশিষ্ট্য প্রদান করা যায়। তিনি সাইবেরিয়া, কানাডা ও অন্যান্য পার্বত্য প্রদেশের উদ্ভিদের সঙ্গে রাশিয়ার দক্ষিণ-অঞ্চলের সমতল ভূমিজাত উদ্ভিদের মিলন ঘটাইয়া নানা জাতীয় বর্ণসঙ্কর উদ্ভিদ সৃষ্টি করিয়াছেন। এই সকল উদ্ভিদে পার্বত্য অঞ্চলের উদ্ভিদের মত কঠিন আবহাওয়া-সহনশীলতা, ব্যাধির প্রকোপ হইতে আত্মরক্ষার স্বভাবজাত ক্ষমতা সবই বিদ্যমান থাকে, উপরন্তু দক্ষিণ অঞ্চলের উদ্ভিদসুলভ গুণ, যেমন ফলের স্বাদ, বর্ণ, আকৃতি প্রভৃতিরও কোন পরিবর্তন ঘটে না। তিনি প্রায় ৩০০ প্রকার নূতন ফল সৃষ্টি করিয়াছেন। এই সকল আবিষ্কারের ফলে ফলবান বৃক্ষের চাষ ক্রমশঃ রাশিয়ার দক্ষিণ দিক হইতে উত্তরাংশে মেরু-প্রদেশের দিকে বিস্তৃত হইতেছে এবং এতাবৎকাল যেখানে ফলের চাষ সম্ভব ছিল না সেখানেও প্রচুর ফলোৎপাদন করা হইতেছে। উদাহরণ-স্বরূপ বলা যাইতে পারে যে, জেনীচেক অঞ্চলে ১৯১৭ খ্রীষ্টাব্দে কোন ফলের বাগানই ছিল না, এখন সেখানে সহস্রাধিক একর জমিতে ফলের চাষ হইতেছে এবং ঐ পরিমাণ ভূমিতে দ্রাক্ষাক্ষেত্রও রহিয়াছে। পশ্চিম ককেশাস

অঞ্চলের বেলাভূমিতে নূতন করিয়া অম্লস্বাদ ফল (লেবু, কমলালেবু) এবং চায়ের চাষ করা সম্ভব হইতেছে এবং এই কৃষি উত্তরোত্তর প্রসারলাভ করিতেছে। জর্জিয়া অঞ্চলের লেবু-জাতীয় ফল গোটা দেশের প্রয়োজন মিটাইতেছে। এই সম্ভাবনার মূলে রহিয়াছে মিচুরিনের আবিষ্কার ও তাঁহার সহকর্মী ও অনুগামীদের বৈজ্ঞানিক সাফল্য।

সোভিয়েট-কৃষির এই প্রকার উন্নতিবিধানে লিসেন্‌কো (Lysenko) নামক বিজ্ঞানীর অবদানও উল্লেখযোগ্য। তিনি আবিষ্কার করেন বর্ষজীবী উদ্ভিদদের জীবনধারা স্তরে স্তরে বিকশিত হয়। প্রথম দুইটি স্তর কাটে উত্তাপ ও আলোর ক্রিয়ার ভিতর দিয়া। লিসেন্‌কো বপনের পূর্বে বীজকে গৃহাভ্যন্তরে উত্তাপে রাখিয়া দেখিলেন যে ইহারই ফলে বীজ হইতে চারা বাহির হইবার কাল দুই-তিন দিন আগাইয়া যায় এবং প্রতি একরে উৎপন্ন শস্যের পরিমাণ ৯০ হইতে ১৮০ পাউণ্ড পর্যন্ত বর্দ্ধিত হয়। এই প্রক্রিয়ার নাম 'ভারনা-লিজেশন' (Vernalisation)। এক্ষণে রাশিয়ায় ব্যাপক-ভাবে এই প্রক্রিয়া অবলম্বন করা হইয়া থাকে। সিট্‌সিন (Tsitsin) নামক একাডেমী অব সায়ান্সের এক জন সভ্য আর একটি নূতন তথ্য আবিষ্কার করেন। তাঁহার তথ্যের গোড়ার কথা কৃষিজাত উদ্ভিদের সঙ্গে বন্য উদ্ভিদের (আগাছা) মিলন ঘটানো। ইহাদ্বারা নানারকম অভিনব জিনিষ উৎপন্ন হইয়াছে। গমের চারার সঙ্গে বন্য 'কৌচ' ঘাসের মিলন সঞ্জাত একপ্রকার বীজ-গম পাওয়া যায়, তাহা হইতে যে চারাগাছ জন্মে তাহা বর্ষজীবী নহে, একবার বীজ বপন করিলে তাহাতে সাত-আট বৎসর শস্য উৎপন্ন হইয়া থাকে। প্রকৃতিতে এমনি ধরণের গুণসম্পন্ন কোন গমের অস্তিত্ব ছিল না। এই দীর্ঘজীবী গমের আরও অনেক গুণ আছে—অনাবৃষ্টিতেও ইহাদের বৃদ্ধি ও শস্যোৎপাদিকা শক্তি অব্যাহত থাকে। এতদ্ব্যতীত আরও নানা প্রকার অসম মিলনদ্বারা বিভিন্ন গুণ-সম্পন্ন নানা বীজগম উৎপন্ন করা হইয়াছে। ইহার ফলে যেখানে কখনও গমের চাষ সম্ভব ছিল না সেই সব অঞ্চলেও গমের চাষ করা হইতেছে। মধ্য-রাশিয়ায় 'রাই' ভিন্ন অন্য কোন শস্য জন্মিত না, সেখানে এখন গম জন্মে। গমের রুটি রাশিয়ায় এককালে ভোজনবিলাসীদেরই বিশেষ খাদ্য ছিল, চাষার ভাগ্যে তাহা কদাচিৎ জুটিত। এখন গমের রুটি কৃষকের অপরিহার্য খাদ্য, কারণ যে-সব অঞ্চলে ইতিপূর্বে গম উৎপাদনের উপযুক্ত আবহাওয়া ছিল না, বিজ্ঞানের সহায়তায় গমকে সেই আবহাওয়ার উপযুক্ত করিয়া লওয়া হইয়াছে এবং এখন গম সর্বত্রই সুলভ হইয়াছে।

শিল্পোন্নয়ন-প্রচেষ্টার ফলে উত্তমেরু অঞ্চলে কয়লা, লৌহ প্রভৃতি খনিজ পদার্থ আবিষ্কৃত হইয়াছে এবং তাহাতে ঐ অঞ্চলের গুরুত্ব বাড়িয়া গিয়াছে। এতাবৎকাল ঐ অঞ্চলে লোকের বসতি ছিল কম, কিন্তু খনিজসম্পদ আবিষ্কৃত হইবার পর খনিসম্পর্কিত কার্যে সেখানে নূতন নূতন শিল্প-প্রতিষ্ঠান কারখানা ইত্যাদি গঠিত হইতেছে এবং মানুষের বসতি ক্রমশঃ বর্দ্ধিত হইতেছে। এই কারণে খাদ্যসামগ্রী ও শস্যাদির চাহিদা বাড়িতেছে। প্রয়োজনের তাগিদে ঐ অঞ্চলে চাষাবাদ প্রয়োজন হইয়া পড়িয়াছে। গবেষণার ফলে মেরু অঞ্চলে চাষযোগ্য নূতন রকমের বার্লি, ওট, আলু ও অন্যান্য মূলজাত খাদ্য, শাকসব্জী, ঘাস ইত্যাদি উদ্ভাবিত হইয়াছে। ইয়াকুতিয়া রিপাবলিকের অধীন অঞ্চলগুলিতে প্রায় বার মাস বরফ পড়ে, সেখানেও নূতন পদ্ধতিতে কৃষিকার্য করা হইতেছে। ওর্জনিকিজ (Orjonikidze) সম্মিলিত কৃষি-প্রতিষ্ঠান যেখানে অবস্থিত সেখানে বার্ষিক গড় তাপমাত্রা ৯° মাত্র। এই স্থানেও প্রতি একরে ২২ টন বাঁধাকপি উৎপন্ন করা হইয়া থাকে। ঐ সব অঞ্চলে কৃষি যে আদৌ সম্ভব এ কথা পঁচিশ বৎসর আগে কেহ কল্পনাও করে নাই। দেশের পরিপার্শ্বিক উদ্ভিদের পক্ষে সহনীয় করিবার ব্যবস্থায় ব্যাপক সাফল্য পরিলক্ষিত হইতেছে। যে দেশে যে শস্য জন্মানো কোনক্রমেই সম্ভব ছিল না সেখানে সেই শস্য জন্মাইবার উপায় যেন বিজ্ঞানীর হাতের মুঠার মধ্যে আসিয়াছে। পর্বতশৃঙ্গ, তুষারক্ষেত্র বা অরণ্য-প্রদেশ,—বৈজ্ঞানিক কৃষি সর্বত্র অভিযান সুরু করিয়াছে; কিউবান অঞ্চলে এক্ষণে চাউল, উত্তর-ককেশাস ও ইউক্রেন অঞ্চলে তুলার চাষ হইয়া থাকে। ৪৮° উত্তর অক্ষাংশ অঞ্চলে (অর্থাৎ ঐ রকম শীতল স্থানে) পৃথিবীর অন্য কোন দেশেই তুলার চাষ সম্ভব হয় নাই—সোভিয়েট রাশিয়া তাহাতেও সাফল্য লাভ করিয়াছে। আজেরবাইজান ও তুর্কমেনিয়ায় নূতন ধরণের মিশরীয় তুলার চাষ হইতেছে; লম্বা আঁশওয়ালা আমেরিকান তুলার চাষও রাশিয়ায় ব্যাপকভাবে করা হইয়া থাকে। এতদ্ব্যতীত বিভিন্ন গুণবিশিষ্ট নানা জাতের আলু সৃষ্টি করা হইয়াছে,—কোনটি গ্রীষ্মকালে বপনোপযোগী, কোনটি বা পরজীবী, তন্মধ্যে কীটের আক্রমণ হইতে আত্মরক্ষা করিতে সমর্থ, সর্বোপরি সকল জাতের আলুরই উৎপাদন-হার বর্দ্ধিত হইয়াছে। বীট হইতে চিনি তৈয়ারী করা হয়—নূতন ধরণের বীট উৎপন্ন করা হইতেছে, যাহাতে চিনির ভাগ বেশী থাকে। এই প্রকার সকল কৃষিরই উন্নতি করা হইয়াছে। প্রাকৃতিক বিবিধ প্রতিবন্ধকতাকে জয় করিয়া মানুষ আজ শস্যোৎপাদনকে একান্তভাবে স্বীয় করতলগত করিতে সমর্থ হইয়াছে। উদ্ভিদের সুপ্রজনন বিদ্যা (genetics), প্রাকৃতিক নির্বাচন রীতি (Selection) ও বীজ হইতে অঙ্কুরোদ্গম-বিষয়ক গবেষণা দ্বারা বিজ্ঞানী এই সকল অসম্ভবকে সম্ভব করিয়াছেন। সংমিশ্রণ উদ্ভিদের বংশগতিকে পরিবর্তিত করানো, প্রাকৃতিক পরিবেশকে ক্রমে সহনীয় করিয়া তোলা ও উৎপাদিকা শক্তি বৃদ্ধি করানোই এই জাতীয় গবেষণার লক্ষ্য।

কৃষিকে কীটপতঙ্গের উপদ্রব হইতে রক্ষা করাও

এতদ্বিষয়ে অন্যতম কার্য। নানাজাতীয় কীটপতঙ্গ উদ্ভিদের বীজ, গাছ, পাতা ও কন্দমূলকে বিনাশ করে এবং শস্যে মড়ক লাগায়। সোভিয়েট গবেষণাগারে নানাপ্রকার ব্যবস্থাদ্বারা এই সকল উপদ্রব নিবারণের উপায় উদ্ভাবিত হইতেছে। নানারকম রাসায়নিক পদার্থ ও বহুপ্রকার পরজীবী কীটাণুদ্বারা শস্যের শত্রুকে বিনাশ করিবার সহজ ব্যবস্থা অবলম্বিত হইয়া থাকে।

কৃত্রিম ও রাসায়নিক সার প্রদান করিয়া জমিকে উর্বর করিবার ব্যবস্থা নির্ধারণ অপর এক দল কৃষি-রসায়নবিদের কার্য। এমোনিয়া-ঘটিত পদার্থকে সার হিসাবে ব্যবহার করা এতৎসম্পর্কে উল্লেখযোগ্য। সম্প্রতি উদ্ভিদের খাদ্যব্যবস্থাকে নিয়ন্ত্রণ করিবার (dieting) উপায় আবিষ্কৃত হইয়াছে। উপযুক্ত কালে গাছকে বিভিন্ন সময়ে যথাপ্রয়োজন খাদ্য প্রদান করিলে গাছের পুষ্টি ও বৃদ্ধি হয়। এক্ষণে ব্যাপকভাবে এই উপায়ে গাছের পরিচর্যা করিয়া শস্যোৎপাদনের পরিমাণ বাড়ানো হইতেছে। জারের আমলে দেশের প্রতি একর জমিতে গড়ে এক চামচ খনিজ সারও দেওয়া হইত না। প্রভূত পরিমাণে খনিজ সার পাইবার ব্যবস্থা হওয়ায় এক্ষণে এই অবস্থার পরিবর্তন ঘটিয়াছে। ১৯১৩ খ্রীষ্টাব্দে দেশে যে পরিমাণ রাসায়নিক সার উৎপন্ন হইত ১৯৩৭ খ্রীষ্টাব্দে সে তুলনায় দশ গুণ সার দেওয়া হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত নবোদ্ভাবিত ব্যাকটিরিয়া সার (Bacterial fertiliser) সোভিয়েট কৃষির অন্যতম উল্লেখযোগ্য উপাদান। মটরশুঁটি জাতীয় কতকগুলি উদ্ভিদ আছে, উহারা বাতাস হইতে খাদ্য হিসাবে নাইট্রোজেন সংগ্রহ করিবার জন্য শিকড়ে কতকগুলি গুটিকাতে একজাতীয় ব্যাকটিরিয়া পোষণ করে। উদ্ভিদেরা নিজেরা বাতাসের নাইট্রোজেনকে আত্মস্থ করিতে পারে না। ব্যাকটিরিয়াগুলি বাতাস হইতে নাইট্রোজেন মুক্ত করিতে সমর্থ। এইরূপে ব্যাকটিরিয়ার মধ্যবর্তিতায় বাতাসের নাইট্রোজেন উদ্ভিদের দেহে স্থান পায়। রাশিয়ায় এই প্রকার পরোক্ষভাবে গাছে সার দিবার ব্যবস্থা আছে। 'ব্যাকটিরিয়া' সাররূপে পরিচিত নাইট্রাজিন (Nitragin) ও এজোটোজেন (Azotogen) উল্লেখযোগ্য।

তারপর কৃষিযন্ত্রের কথা। প্রাক্-সোভিয়েট রাশিয়ায় কৃষিযন্ত্র বলিলে বুঝাইত একখণ্ড কাঠের লাঙ্গল, যাহার ফালে কোন রকমে মাটিতে আঁচড় কাটা যাইত। কিন্তু এই অবস্থার আমূল পরিবর্তন ঘটিয়াছে। ১৯৩৮ খ্রীষ্টাব্দে সোভিয়েট য়ুনিয়নে প্রায় ৫ লক্ষ কলের লাঙ্গল চলিত। এই যান্ত্রিক কৃষি প্রবর্তনের ফলে অনাবৃষ্টির বিরুদ্ধে সংগ্রাম করা সহজ হইয়াছে। কলের লাঙ্গলে মাটিতে নয়-দশ ইঞ্চি গভীর চাষ করা সম্ভব। যন্ত্রের সাহায্যে ক্ষেত্রে অনেক বেশী নিড়ানি দেওয়া সম্ভব। কৃষির সৌকর্যার্থে নানাপ্রকার যন্ত্র উদ্ভাবিত হইয়াছে। বীজ বপন করিবার সময় যন্ত্রের সাহায্য লওয়া হয়, ইহা বীজের অঙ্কুরোদ্গমে সহায়তা করিয়া থাকে। শস্য-আহরণের জন্যও কতকগুলি সুবিধাজনক যন্ত্র নির্মিত হইয়াছে—যেগুলির উদ্দেশ্য একাধারে কৃষকের শ্রমলাঘব করা এবং শস্যকেও নির্দোষরূপে ও লাভজনক পরিমাণে সংগ্রহ করা। তুলা, আলু, বীট প্রভৃতি প্রত্যেকটি শস্য আহরণের জন্য ভিন্ন ভিন্ন ব্যবস্থা আছে।

গবাদি গৃহপালিত পশুপালনের উন্নত ব্যবস্থা করাও সোভিয়েট কৃষি বিভাগের অন্যতম কার্য। এই ব্যাপারও রাশিয়ায় এখন পরিপূর্ণভাবে বৈজ্ঞানিক নিয়মাধীন। মিশ্র প্রজননদ্বারা নানাবিধ সঙ্কর জাতীয় পশুর সৃষ্টি হইয়াছে। একটি মাত্র উপযুক্ত পুরুষ পশু হইতে গৃহীত পুং-জননবীজ দ্বারা বহু সংখ্যক স্ত্রী-পশুর গর্ভাধান কার্য (artificial insemination) সম্পন্ন করা হইয়া থাকে। একটি ভাল জাতের ষাঁড় এই ভাবে প্রতি বৎসর ১৫০০ গাভীতে সন্তান উৎপাদন করিতেছে, একটি ভেড়া এক বৎসরে ১৫০০০ শাবকের জন্মদান করিতেছে। এই প্রকার কৃত্রিম প্রজনন ব্যবস্থা দ্বারা ক্রমশঃ গবাদি পশুর বংশগত উন্নতি হইতেছে। হীনবীর্য, দুর্বল, অলস, অপুষ্ট পশু রাশিয়ায় নাই বলিলেই চলে। ১৯৩৮ খ্রীষ্টাব্দে সোভিয়েট য়ুনিয়নের অধীন পাঁচ কোটি গবাদি পশুর কৃত্রিম গর্ভাধান করা হইয়াছিল।

সোভিয়েট রাশিয়ায় এই বৈজ্ঞানিক কৃষিপদ্ধতি দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে অগ্নিপরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া স্বীয় উপযোগিতা সপ্রমাণ করিয়াছে। রাশিয়ার সর্বাপেক্ষা উর্বর প্রদেশ, ইউক্রেন ও কিউবান ১৯৪২ খ্রীষ্টাব্দে শত্রুকর্তৃক অধিকৃত হইয়াছিল। কিন্তু তৎসত্ত্বেও সে দেশে শস্যাভাব দেখা দেয় নাই। নূতন অঞ্চলে নূতন অকর্ষিত ভূমিতে চাষাবাদের ব্যবস্থা করা হইয়াছিল। এই ব্যবস্থার সাফল্যে বিজ্ঞানের দানও কম নয়। নূতন ধরণের বীজ সরবরাহ করিয়া তাহা বপনের পর অপেক্ষাকৃত অল্পকাল মধ্যে শস্য আহরণ ব্যবস্থা প্রভৃতি দ্বারা যুদ্ধজনিত ক্ষতি খুব শীঘ্রই পূরণ করা সম্ভব হইয়াছিল। শান্তিকালে যে ব্যবস্থাগুলি গবেষণার ফলে জানা গিয়াছিল আপৎকালে তাহা জাতিকে মহাসঙ্কট হইতে উদ্ধার করিয়াছে। পনর শত বৈজ্ঞানিক বক্তা ও কর্মী গ্রামাঞ্চলে কৃষককে নানা প্রকার নূতন পদ্ধতি বিষয়ে নিরন্তর শিক্ষা দিয়াছেন।

সোভিয়েট রাশিয়ায় সামান্য কৃষকের জীবনের সঙ্গেও বিজ্ঞান অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত হইয়া রহিয়াছে। প্রকৃতির সঙ্গে মানুষের নিত্য যে সংগ্রাম চলিতেছে রাশিয়ায় সেই সংগ্রামে কৃষকের পাশে আসিয়া দাঁড়াইয়াছেন বিজ্ঞানী। প্রকৃতির খেয়ালখুশীতে চাষীর জীবনে নিত্য জোয়ার-ভাটা খেলিতেছে, কখনও প্রাবৃটের মেঘভার দর্শনে প্রাণে তাহার আনন্দের স্রোত বহিয়া যায়, দারুণ গ্রীষ্মে আবার কখনও বা তাহার হৃদয়ের সকল সরসতা ঊষর মরুভূমিতে রূপান্তরিত হয়। সেই একান্ত অসহায়, দেশে দেশে উপেক্ষিত, নিরানন্দ কৃষকের সেই মনোমরুভূমিতে রসের বন্যা প্রবাহিত করিয়াছেন বিজ্ঞানী। তাই জনগণ আজ সেখানে বিজ্ঞানের সৃজনীশক্তিতে মুগ্ধ, বিজ্ঞানের কল্যাণীমূর্তি আজ মাঠে মাঠে উদ্ভাসিত।

বুদ্ধদেবের প্রতিমূর্ত্তি

শ্রীযোগানন্দ ব্রহ্মচারী

ভগবান্ বুদ্ধের বহুবিধ প্রাচীন প্রস্তরমূর্ত্তি পাওয়া গিয়াছে, তন্মধ্যে পদ্মাসনস্থ ধ্যানীমূর্ত্তির সংখ্যাই সমধিক দৃষ্ট হয়। আচার্য্য শঙ্করের সমসাময়িককালেও বুদ্ধদেবের পদ্মাসনস্থ ধ্যানীমূর্ত্তি বহুল সংখ্যায় দৃষ্ট হইত। দশাবতারের বর্ণনা প্রসঙ্গে নবম অবতার বুদ্ধদেবের বর্ণনায় আচার্য্য শঙ্কর লিখিয়াছেন—

ধরাবদ্ধপদ্মাসনস্থাঙ্ঘ্রি যষ্টির্নিয়ম্যানিলং ন্যস্তনাসাগ্রদৃষ্টিঃ।
য আস্তে কলৌ যোগিনাংচক্রবর্ত্তী স বুদ্ধঃ প্রবুদ্ধোঽস্তুনিশ্চিন্তবর্ত্তী॥

'যিনি বুদ্ধরূপে অবতীর্ণ হইয়া পৃথিবীতে বদ্ধপদ্মাসনে উপবেশন করতঃ প্রাণসংযম ও নাসাগ্রে দৃষ্টি স্থাপন করিয়া উপবিষ্ট ছিলেন এবং যিনি যোগিগণের অগ্রগণ্য হইয়া কলিযুগে আবির্ভূত হইয়াছিলেন, সেই বুদ্ধরূপী ভগবান্ আমাদিগের চিত্তে অধিষ্ঠান করুন।'

পদ্মাসনস্থ ধ্যানীমূর্ত্তিসমূহের মধ্যেও কিঞ্চিৎ বিভিন্নতা দৃষ্ট হয়। এই মূর্ত্তিসমূহের কোনটিতে উভয় হস্ত উভয় জঙ্ঘার উপর, কোনটিতে দক্ষিণ হস্ত ভূমিস্পর্শমুদ্রায়, কোনটিতে তর্কমুদ্রায়, আবার কোনটিতে সম্মুখে উত্তোলিত উভয় হস্তের কয়েকটি অঙ্গুলি সংযুক্ত অবস্থায় থাকে। কোন মূর্ত্তির মস্তকে দীর্ঘকেশ চূড়াকারে বদ্ধ থাকে—উহা দেখিতে অনেকটা উষ্ণীষের ন্যায়, আবার কোন মূর্ত্তি কেশবিহীন—মুণ্ডিত। বুদ্ধদেবের উত্তমাঙ্গ শিরঃপ্রদেশে যে জটাজুট ছিল, সে সম্বন্ধে প্রমাণ পাওয়া যায়। যথা ;—

"শান্তং সদা প্রাণিবধাতিভীতং
বৃহজ্জটাজুট-ধরোত্তমাঙ্গম্।
তথাংসলগ্ন গৈরিক গৌরবস্ত্রম্
যোগীশ্বরং বুদ্ধমহং ভজেয়ম্॥"

আবার এরূপ প্রমাণেরও অভাব নাই যে, তাঁহার শিরঃপ্রদেশ মুণ্ডিত ছিল। সুন্দরিকাভারদ্বাজসুত্তে ভারদ্বাজ ব্রাহ্মণ বুদ্ধদেবকে 'মুণ্ডা' বা 'মুণ্ডী' বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। নেপাল ও তিব্বতে বুদ্ধমূর্ত্তিসমূহ মুণ্ডিত দৃষ্ট হইলেও, অস্মদ্দেশে এমন প্রাচীন বুদ্ধমূর্ত্তি এখনও অনেক আছে যাহাতে কেশগুলি চূড়াকারে বদ্ধ অবস্থায় উষ্ণীষের ন্যায় প্রতিভাত হয়।

কমালগঢ়ী, ইলোরা প্রভৃতি স্থানে উষ্ণীষযুক্ত বহু বুদ্ধমূর্ত্তি দৃষ্ট হয়। বৌদ্ধমতে "বুদ্ধপ্রতিমা উষ্ণীষযুক্ত। উষ্ণীষযুক্ত শির দ্বাত্রিংশৎ মহাপুরুষ-লক্ষণের অন্যতম। বুদ্ধঘোষের ব্যাখ্যানুসারে বোধিসত্ত্বের মস্তকের গঠন স্বভাবতঃ উষ্ণীষের আকারে ছিল।" ডক্টর শ্রীযুক্ত বেণীমাধব বড়ুয়া মহোদয় বুদ্ধঘোষের এইরূপ কল্পনাকে অসঙ্গত বলিয়া অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন, "ধ্যানস্থ হইলে মস্তকের শীর্ষভাগ উন্নত দেখায়। বুদ্ধপ্রতিমায় আমরা যে উষ্ণীষ বা উন্নত আকার দেখি, তাহা সমাধিস্থ অবস্থায় বুদ্ধের লোকোত্তর বিহার।" (উদ্বোধন, বৈশাখ, ১৩৪৮, ১৮০ পৃঃ)। ডক্টর বড়ুয়া মহোদয়ের এই সিদ্ধান্তও নির্ব্বিচারে গ্রহণ করা যায় না, কারণ সমাধি অবস্থায় মস্তকের শীর্ষভাগ উন্নত দেখাইবার সংবাদ অন্য কোন মহাপুরুষের জীবনীতে আমরা পাই নাই। কোন শাস্ত্রগ্রন্থেও ঈদৃশ উল্লেখ দৃষ্ট হয় নাই। দীর্ঘকেশ চূড়াকারে বাঁধিয়া রাখাতেই মস্তক উষ্ণীষযুক্ত বোধ হইত—এই সিদ্ধান্তই সমীচীন।

অস্মদ্দেশে কোন কোন বুদ্ধমূর্ত্তি যজ্ঞোপবীত চিহ্নিত দৃষ্ট হয়। এই যজ্ঞোপবীত বুদ্ধমূর্ত্তির কণ্ঠদেশের নিম্নে মাল্যাকারে চিহ্নিত থাকে। হিন্দুশাস্ত্রে এতাদৃশ যজ্ঞোপবীত ধারণকে 'নিবীত' বলে। এই কারণে ব্রহ্মাণ্ডপুরাণ ও পদ্মপুরাণ নামক হিন্দুপুরাণদ্বয়ে বুদ্ধপূজার জন্য নির্দ্দিষ্ট শালগ্রামশিলার লক্ষণ সম্বন্ধে বলা হইয়াছে :—

"অঙ্গুষ্ঠদ্বয়সংযুক্তং চক্রহীনং যথা ভবেৎ।
নিবীতবুদ্ধসংজ্ঞং স্যাদ্ দদাতি পরমং পদম্॥"

উক্ত শ্লোকে বুদ্ধদেবকে 'নিবীত' অর্থাৎ 'মাল্যাকারে উপবীতধারী' বলা হইয়াছে। বামস্কন্ধ হইতে দক্ষিণ কুক্ষি পর্য্যন্ত লম্বমান উপবীতধারী বুদ্ধমূর্ত্তিও দেখা যায়। মালদহ জেলায় গৌড় ধ্বংসাবশেষের মধ্যে গুমটি নামক একটি বাদশাহী আমলের গৃহাভ্যন্তরে গবর্ণমেণ্ট-প্রতিষ্ঠিত ক্ষুদ্র একটি মিউজিয়ম আছে। উক্ত মিউজিয়মের প্রাচীন প্রস্তর-মূর্ত্তিসমূহের মধ্যে বুদ্ধদেবের একটি কষ্টি-প্রস্তরনির্ম্মিত মূর্ত্তি দৃষ্ট হয়। ঐ মূর্ত্তির মস্তক কেশবহুল ও গাত্র, বাম স্কন্ধ হইতে দক্ষিণ কুক্ষি পর্য্যন্ত লম্বমান যজ্ঞোপবীত ভূষিত ; দক্ষিণ হস্ত ভূমিস্পর্শমুদ্রায় অবস্থিত। চীন, নেপাল, তিব্বতের বুদ্ধমূর্ত্তিতেও 'উপবীত' কচিৎ দেখা যায়। বোধিসত্ত্ব অবলোকিতেশ্বর মূর্ত্তিতেও যজ্ঞোপবীত প্রায় সর্ব্বত্রই দেখা যায়। বুদ্ধদেব যজ্ঞ-বিধির নিন্দা করিয়াছিলেন, অথচ তাঁহার মূর্ত্তিতে যজ্ঞোপবীত ; বোধিসত্ত্ব অবলোকিতেশ্বর বৌদ্ধদেবতা—তাঁহার মূর্ত্তিতেও যজ্ঞোপবীত। বিচিত্র ব্যাপার নহে কি ?

ভারতীয় হিন্দুগণ তাঁহাদের দেবদেবীমূর্ত্তিকে যজ্ঞোপবীত ভূষিত করিতে অভ্যস্ত। বুদ্ধদেব ভারতীয় হিন্দুগণের নিকট নারায়ণের অবতাররূপে পূজিত হন। সুতরাং হিন্দুগণ তাঁহাদের বুদ্ধনারায়ণকেও যজ্ঞোপবীত ভূষিত করিয়া পূজা করেন। আর শাক্যক্ষত্রিয়কুলে জন্মগ্রহণ হেতু তাঁহার ক্ষত্রিয়োচিত উপনয়ন সংস্কার হইয়াছিল, ইহা সুনিশ্চিত। ভারতে প্রস্তুত বুদ্ধমূর্ত্তিসমূহেই যজ্ঞোপবীত দেখা যায়। এখন-কার হিন্দুগণ যেরূপ বুদ্ধদেবকে কেবলমাত্র বৌদ্ধগণের দেবতা বলিয়া মনে করেন, বুদ্ধপরবর্ত্তী যুগের হিন্দুগণ কিন্তু সেরূপ

করিতেন না। তাঁহারা বুদ্ধপ্রচারিত ধর্ম্মকে সার্ব্বভৌম হিন্দু-ধর্ম্মেরই একটি শাখা বলিয়া মনে করিতেন এবং হিন্দু বৌদ্ধ নির্ব্বিশেষে আপন আপন ভাবে বুদ্ধদেবের পূজা করিতেন। এখন হিন্দুদের মধ্যে যেমন কেহ বিষ্ণুভক্ত, কেহ শিবভক্ত, কেহ সূর্য্যোপাসক, প্রাচীন ভারতে ঠিক সেইরূপ হিন্দুদের মধ্যে, এমনকি একই পরিবারে, কেহ বিষ্ণুভক্ত, কেহ বুদ্ধভক্ত ছিলেন। এক কথায় তৎকালের হিন্দুগণ বৌদ্ধধর্ম্মকে সনাতন ধর্ম্মের একটি শাখা বলিয়াই মনে করিতেন এবং বৌদ্ধমতাবলম্বী ভারতীয় হিন্দুগণ কর্ত্তৃকই চীন, তিব্বত, নেপাল, ব্রহ্ম প্রভৃতি দেশে বৌদ্ধধর্ম্ম প্রচারিত হইয়াছিল। বুদ্ধদেব যজ্ঞে পশু-হননের বিরোধী ছিলেন। যজ্ঞকে যে তিনি একেবারে উড়াইয়া দিয়াছেন, এমন নহে। তবে তিনি হিংসাশ্রিত যজ্ঞ অপেক্ষা অহিংসাশ্রিত যজ্ঞের উপাদেয়তা বর্ণনা করিয়া উত্তরোত্তর দানাদিরূপ উৎকৃষ্ট যজ্ঞসমূহ দেখাইয়া শেষে বলিয়াছেন যে শীল, সমাধি ও প্রজ্ঞারূপ যজ্ঞই সর্ব্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট এবং মহাফলপ্রদ। (১) এরূপ কথা যে শুধু বুদ্ধদেবই বলিয়াছেন, তাহা নহে। পরন্তু বেদে এবং অন্যান্য হিন্দুশাস্ত্রেও এই প্রকার উক্তি দেখা যায় এবং যাগযজ্ঞাদির প্রতি অশ্রদ্ধার ভাব দৃষ্ট হয়। (২) জপযজ্ঞকে অধম বলা হইয়াছে, হিন্দু-শাস্ত্রে এরূপ প্রমাণেরও অভাব নাই। যথা-

উত্তমো ব্রহ্মসদ্ভাবো ধ্যানভাবস্তু মধ্যমঃ।
অধমা জপযজ্ঞস্তু বাহ্যপূজাধমাধমা ॥

বুদ্ধদেবের প্রকৃত মূর্ত্তি কিরূপ ছিল, ইহা জানিবার কোন উপায় নাই। ঐতিহাসিকগণ বলেন যে, বুদ্ধদেবের তিরোভাবের অন্যূন পাঁচ শত বৎসর পরে কুষাণ যুগে সর্ব্বপ্রথমে বুদ্ধদেবের প্রস্তরমূর্ত্তি নির্ম্মিত হয়। মহারাজ কনিষ্কই নাকি সর্ব্বপ্রথমে বুদ্ধমূর্ত্তি প্রস্তুত করাইয়াছিলেন। সুতরাং কুষাণ যুগের সময় হইতে পরবর্ত্তী বুদ্ধমূর্ত্তিসমূহকে বুদ্ধদেবের দেহের প্রতিকৃতি বলিয়া গ্রহণ করা যায় না। ঐ মূর্ত্তিগুলি ভাস্করের স্বীয় মনোভাবের অভিব্যক্তি মাত্র। মহাযান বৌদ্ধশাস্ত্রে আছে যে, গৌতমবুদ্ধ ১২ হাত (মতান্তরে ১৮ হাত) লম্বা ছিলেন। এই বৈজ্ঞানিক যুগে এরূপ অসম্ভব ব্যাপার যে কেহই বিশ্বাস করিবেন না, ইহা সুনিশ্চিত। সিংহলে কাণ্ডির দন্ত-মন্দিরে বুদ্ধদেবের যে দন্ত আছে, উহা এরূপ বৃহৎ যে দেহধারী মনুষ্যের দন্ত বলিয়া বিশ্বাস করা যায় না। স্থানে স্থানে যে বুদ্ধপদসমূহ আছে ঐ সকলও বৃহত্ত্বে মানুষের আকারোচিত নহে। বুদ্ধদেবের দেহের প্রতিকৃতি কিরূপ ছিল, জানিবার উপায় না থাকিলেও বৌদ্ধধর্ম্মশাস্ত্র পাঠে জানা যায় যে তাঁহার দেহে বাহ্য ৩২টি মহাপুরুষ-লক্ষণ, ৮০টি অনুভিজ্ঞান এবং দুই চরণে ২১৬টি মাঙ্গল্য লক্ষণ ছিল। তাঁহার কণ্ঠস্বর ছিল সিংহনাদের ন্যায় গম্ভীর ও সুস্পষ্ট। তাঁহার প্রকৃতি এত ধীর, গম্ভীর ও শান্ত ছিল যে, তিনি যেখানেই যাইতেন সেখানেই সমস্ত কোলাহল নিবৃত্ত হইয়া মহাসাগরের ন্যায় প্রশান্ত ভাব ধারণ করিত।

১। দীঘনিকায়, কূটদন্তসুত্তে রাজা মহাবিজিতের যজ্ঞ-বর্ণনা প্রসঙ্গে বুদ্ধোক্তি দ্রষ্টব্য।

২। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় ৪র্থ অধ্যায়ের ২৮, ৩২, ৩৩, ৩৮, ৩৯ শ্লোকে দ্রব্যাদির যজ্ঞ অপেক্ষা জ্ঞানযজ্ঞের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপাদিত হইয়াছে। ঋগ্বেদ (১০-৮২-৭) মুণ্ডক উপনিষদ্ (১-২।৭) ও শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় (২-৪২, ৪৫) বৈদিক সকাম যাগযজ্ঞাদির প্রতি অশ্রদ্ধা দৃষ্ট হয়।

প্রেমসাধনা

শ্রীদেবেশচন্দ্র দাশ

এখনো দিয়ো না কিছু; অন্তরালে আরো কিছু দিন
অলখে দাঁড়ায়ে থেকো, মরীচিকা দূরপ্রান্তে লীন
হয়ে যাক দুরান্তরে, এনো না প্রসাদ-ডালা দীন
কোণে যেথাকার, কোন খেয়ালী নিমেষে
অমর ক'রো না মোরে তুলে ভালবেসে
বাসন্তী কুসুমসম অনুপম হেসে
সুধা ভরি পাতে
অনন্তের সাথে
রাতে।

দূরে
রাজো স্বপ্নপুরে;
উষার নূপুরে
জাগে নি আলোর ছন্দ, ঘুচে নাই তম,
আসে নি মহেন্দ্রক্ষণ, হয় নি সময়,
আজিও টলে যে মন, তব বরাভয়
এখনো সাজে না মোরে, পূজাশেষে সব বাসনাই
পারি নি আহুতি দিতে, ধ্যান মোর সাঙ্গ হয় নাই;
চাহিতে পারি না কিছু, হে চিন্ময়ী, দূরে থেকো তাই।

সংস্কৃতির স্বরূপ

অধ্যাপক শ্রীব্রজেন্দ্রলাল সাহা, এম-এ

মানুষ চির অতৃপ্ত জীব। পৃথিবীতে আবির্ভাবের প্রথম মুহূর্ত থেকে বর্ত্তমান কাল পর্য্যন্ত মানবের অতৃপ্তি ঘোচে নাই। নবজাত মানবশিশুর ক্রন্দনধ্বনিতে তার ভবিষ্যৎ জীবনের নিরবচ্ছিন্ন অতৃপ্তিই সূচিত হয়। এই অতৃপ্তি মানুষের ব্যক্তিগত জীবনকে যেমন অবস্থা থেকে অবস্থান্তরে ঠেলছে, তেমনি মানব সভ্যতাকে রূপ হতে রূপান্তরে পরিবর্ত্তিত করছে। মানব সভ্যতা কোথাও যেন স্তব্ধ হয়ে দাঁড়াতে চায় না। এক শতাব্দীর মানুষ বহু চেষ্টায় প্রচুর প্রাণশক্তি ব্যয় করে সভ্যতার যে ইমারত গড়ে তোলে, পরবর্ত্তী যুগের মানুষ তাকে নির্ম্মম ভাবে ভেঙে নূতন ইমারতের ভিত্তি স্থাপনে প্রবৃত্ত হয়।

অবিরত সংগ্রামের ভেতর দিয়ে মানুষ যে অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করে, আপাততঃ তাকেই জীবনের গ্রহণীয় সত্য বলে মেনে নেয়। কিন্তু এই সঞ্চয়ের মূলে একটা ফাঁকি থেকে যায়—কারণ মানুষ ভবিষ্যৎকে স্পষ্ট ভাবে বুঝতে পারে না। পরবর্ত্তী কালে পূর্ব্ব-সঞ্চিত ফাঁকি ধরা পড়ে। কিন্তু মানুষের সংগ্রাম একেবারে ব্যর্থ হয় না; ফাঁকির সঙ্গে মানুষের অভিজ্ঞতায় শাশ্বত-কল্যাণকর উপাদানও কিছু কিছু এসে যায়। চলমান বিশ্ব-মানব আপন সঞ্চয়ের থলি হাতে নিয়ে অবিরত চলছে—সম্মুখে যা পায় প্রথমে তাই সে নির্বিচারে থলিতে তুলে রাখে। সে কেবল বহুমূল্য রত্নই সঞ্চয় করে না—অপ্রয়োজনীয় নুড়ি-পাথরও সে ভ্রমবশতঃ তুলে রাখে। মানবের সঞ্চয়-ভাণ্ডারে যা মঙ্গলকিরণবর্ষী মহার্ঘ রত্ন তাই তার সংস্কৃতি।

"সংস্কৃতি" শব্দ আমরা দুই ভাবে প্রয়োগ করি—কখনও ব্যক্তির সঙ্গে, কখনও বা জাতি অথবা যুগের সঙ্গে। যেমন, যখন আমরা বলি,—"তিনি সংস্কৃতিবান ব্যক্তি", তখন আমরা বুঝি,—উল্লিখিত ব্যক্তি শিক্ষা বা চর্চ্চা দ্বারা তাঁর বোধশক্তি, আচার-ব্যবহার এবং রুচির উৎকর্ষসাধন করেছেন। আবার যখন বলি—"ভারতীয় সংস্কৃতি বা প্রাচীন যুগের সংস্কৃতি", তখন আমরা ভারতের কিংবা প্রাচীন যুগের মানব-গোষ্ঠির পূর্ব্বোক্ত উৎকর্ষ বুঝে থাকি।

কোন এক বিশেষ মানব-গোষ্ঠির সমষ্টিগত জীবনে নানা দিক থেকে কতকগুলি বৈশিষ্ট্য লক্ষিত হয়। ঐ বৈশিষ্ট্যগুলি জাতির জীবন-ব্যবস্থাকে অনেকাংশে নিয়ন্ত্রিত করে; এবং সেই বৈশিষ্ট্যগুলির মূলবীজ কতকাংশে লুক্কায়িত থাকে জাতির ধমনীতে—রক্তে।

মানুষ যে সব সময় হিসাব ক'রে চলতে পারে তা নয়। চলার স্বতঃস্ফূর্ত্ত আবেগে, বংশানুক্রমে মানুষ তার জীবনের প্রতিটি দিনকে নানা ঘটনায় পূর্ণ ক'রে দেয়। বিচিত্র ঘটনা-বলীর প্রধান প্রধান ঘটনাগুলি সঙ্কলিত হয় ইতিহাসের মূল্যবান পৃষ্ঠাসমূহে। ইতিহাসের ঘটনাক্রমের তাৎপর্য্য বিচার ক'রে জাতির জীবন-প্রবাহের গতি ও প্রকৃতি উপলব্ধি করা যায়।

জীবনের প্রধানতম সমস্যা জীবনধারণের উপকরণ সংগ্রহ। সৃষ্টির যাবতীয় জীব জীবিকা নির্ব্বাহের চেষ্টায় নিরন্তর নিজ নিজ শক্তির বেশীর ভাগ নিয়োজিত করছে। মানুষের জীবনে সে সমস্যা অনেক বেশী জটিল। সেইজন্যই মানুষের উপজীবিকা বিচিত্রতর। উপজীবিকা দুই প্রকারের। কতকগুলি উপজীবিকা অবলম্বনে মানুষ প্রত্যক্ষভাবে খাদ্য অথবা জীবিকার অন্যান্য উপকরণ প্রস্তুত করে। আবার কতকগুলি উপজীবিকার বিনিময়ে মানুষ জীবনধারণের প্রয়োজনীয় উপকরণ সংগ্রহ করে। সর্ব্বপ্রকার উপজীবিকার মূলে একই প্রেরণা। জীবন-সংগ্রামের যে অনিবার্য্য তাগিদে কর্ম্মকার কাস্তে প্রস্তুত করে, তন্তুবায় কাপড় বুনে, ঠিক সেই জাতীয় তাগিদেই বৈজ্ঞানিক বিজ্ঞানের সাধনা করেন—সাহিত্যিক রূপসৃষ্টি করেন। বিজ্ঞান, দর্শন, সাহিত্য, চারুকলা ইত্যাদি—মানুষের মানস-সম্পদ। ইহাদের সাধনা উপ-জীবিকার পর্য্যায়ভুক্ত। বৈজ্ঞানিক, দার্শনিক, সাহিত্যিক—সকলেই নিজ নিজ সাধনার বিনিময়ে সমাজের কাছে জীবন-ধারণের প্রয়োজনীয় উপকরণ প্রত্যাশা করেন। মানুষের সমাজ-ব্যবস্থাও উপজীবিকার সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্পর্কযুক্ত। আমরা কোন বিশেষ সমাজ-ব্যবস্থাকে স্বীকার করে নি' এইজন্য যে, ঐরূপ ব্যবস্থা আমাদের জীবিকা নির্ব্বাহের প্রতিকূল নয়। সমাজগঠনের মূলেও আছে বাঁচবার উপকরণ সংগ্রহের প্রয়োজন-বোধ। মানুষের পক্ষে সমাজে বাস করাই জীবিকা-অর্জ্জনের সহজতর পথে প্রথম পদক্ষেপ।

আসল কথা এই যে, আমরা বাঁচতে চাই। বাঁচবার ব্যাকুল বাসনা আমাদিগকে কর্ম্মে প্রবৃত্ত করে—কর্ম্মের বেদী-মূলে আমরা জীবনকে উৎসর্গ করি। জীবনকে আনন্দময় ও মাধুর্য্যমণ্ডিত করবার জন্য আমরা চারুকলার আশ্রয় নি'। জীবন-সংগ্রামকে সাফল্যমণ্ডিত করবার জন্য আমরা সমাজে বাস করি। এই ভাবে, আমাদের অজস্র কর্ম্ম, শিল্পকলা এবং সমাজব্যবস্থার ভিতর দিয়ে সমষ্টিগত জীবনের পূর্ণ রূপ অভিব্যক্ত হয়। প্রত্যক্ষভাবে জীবনের উপকরণ প্রস্তুতকারী বিবিধ কর্ম্ম, আনন্দবিধায়িনী বিবিধ প্রচেষ্টা এবং সমাজ-ব্যবস্থার ভিতর দিয়ে আমরা একটা সুপরিণত বোধশক্তি লাভ করি। এই বোধশক্তি আমাদের ব্যক্তিগত এবং সমষ্টিগত আচার-ব্যবহার এবং রুচিকে প্রভাবান্বিত করে। অতএব, মানুষ চর্চ্চাদ্বারা তার অভিজ্ঞতালব্ধ বোধ-শক্তির কতখানি উৎকর্ষসাধন করেছে তাই হবে সংস্কৃতির আলোচনার মুখ্য উদ্দেশ্য। 'উৎকর্ষ' কথাটা সম্বন্ধে একটু আলোচনা করা

দরকার। যেহেতু বাঁচবার আকাঙ্ক্ষাটা সমগ্র মানব-গোষ্ঠির মনে অত্যন্ত প্রবল, যেহেতু মানুষ জীবনের জটিল সমস্যাগুলোকে অধিকতর সরল করবার মানসেই যুগে যুগে উন্নততর সমাজ-ব্যবস্থা কামনা করে— অতএব তাই উৎকৃষ্ট যা মানব জাতির সার্বগ্রিক কল্যাণের অনুকূল। কোন জাতির সংস্কৃতির আলোচনায় যে যে বিষয়ের প্রতি লক্ষ্য রাখা উচিত, তা এই :

(১) আলোচ্য জাতির প্রাণকেন্দ্রে বিশ্বহিতকর কোন্ কোন্ বীজ নিহিত রয়েছে ?

(২) সেই জাতির ইতিহাসের ধারা মানবের কোন্ কল্যাণকে সূচিত করে ?

(৩) সেই জাতি জীবনধারণের সমস্যার সমাধান করবার জন্য যে উপায় অবলম্বন করেছে, তা বিশ্বমানবের পক্ষে কতদূর কল্যাণকর। তারা জীবনে কতখানি শ্রী প্রতিষ্ঠা করতে পেরেছে ? তাদের সমাজ-ব্যবস্থা জীবন সংগ্রামকে কতখানি সাহায্য করে ?

(৪) সঙ্গে সঙ্গে আর এক দিকে আলোচনার ধারা প্রধাবিত হয়—জাতির সমগ্র জীবন-স্রোতের দোষ-ত্রুটির দিকে। জাতির মনকে সচেতন করে দেবার জন্যই দোষ-ত্রুটির আলোচনার প্রয়োজন।

মাঝে মাঝে দেখা যায়, কোন রাষ্ট্রশক্তি বা সঙ্ঘশক্তি সংস্কৃতির আলোচনায় উৎসাহিত হয়—এবং সেই উৎসাহের পেছনে একটা বিশেষ উদ্দেশ্য থাকে : যেমন, জাতিকে "সঙ্কীর্ণ জাতীয়তাবোধে" ভাবিত করা। যে জাতীয়তাবোধ কোন জাতিকে অপর মানব-গোষ্ঠির উপর অত্যাচার ও শোষণে উৎসাহিত করে, তাই সঙ্কীর্ণ জাতীয়তাবোধ। ঐরূপ আদর্শ পূর্ণাঙ্গ হয় না। ঐরূপ স্থলে আংশিক সত্যকে বড় করে দেখানো হয়—অথবা অসত্যকে সত্য বলে প্রমাণ করবার চেষ্টা করা হয়।

সংস্কৃতির আলোচনায় ভিত্তি-ভূমি হবে সত্যনিষ্ঠা—নিরপেক্ষ ও সত্যসন্ধানী হবে সংস্কৃতির সমালোচকের মন। স্বীয় বংশপরিচয় সম্বন্ধে ভাবতে গিয়ে অভিজাত রক্তের সংস্রব আবিষ্কার করতে পারলে আমরা আনন্দিত হই, কিন্তু বিজ্ঞানসম্মত উপায়ে অনুসন্ধান করতে গিয়ে যদি রক্তধারায় অবাঞ্ছনীয় উপাদান আবিষ্কৃত হয়, তবু যাতে মনে দৌর্বল্য না আসে, এরূপ ভাবে মনকে প্রস্তুত করতে হবে। আবার তাক্ লাগিয়ে দেবার অর্দ্ধ-চেতন প্রেরণায় কেবল অবাঞ্ছনীয় উপাদানের অস্তিত্ব সম্বন্ধে অনুমান করাও সমভাবেই দূষণীয়।

সংস্কৃতির আলোচনায় আরও বিঘ্ন আছে। জাতির সমষ্টিগত ব্যক্তিত্ব আমাদিগকে জাতির যাবতীয় প্রচেষ্টা সম্বন্ধে একটা অন্ধ অনুরাগ ও সশ্রদ্ধ মনোভাব পোষণ করতে উৎসাহিত করে। যখন সমাজদেহের দোষ-ত্রুটি সম্বন্ধে আলোচনা করা যায়—অথবা জাতির সামগ্রিক বোধশক্তি, আচার-ব্যবহার ও রুচির উৎকর্ষ সম্বন্ধে নগ্ন সত্যকে ব্যক্ত করা যায়, তখন জাত্যভিমান নির্মম ভাবে আহত হয়। অতএব সংস্কৃতির সমালোচকের পক্ষে সত্যকে প্রীতিকর রূপে প্রকাশ করতে পারলে ভাল হয়। তাঁর আলোচনায় মনে যেন এই বিশ্বাস দৃঢ় হয় যে, তিনি কেবল পাণ্ডিত্যই প্রকাশ করেন না, তিনি জাতির কল্যাণকামী। সংস্কৃতির সম্যক্ আলোচনার ফলে কল্পনা-বিলাসিতা পরিহার করে আমরা যেন একটা বাস্তব দৃষ্টিভঙ্গী লাভ করি, মানবের ব্যাপক জীবন-সংগ্রামকে শ্রদ্ধা করতে শিখি এবং বিশ্বের জীবনপ্রবাহের সঙ্গে যেন একটা ঘনিষ্ঠ আত্মীয়তা অনুভব করি।

অদৃশ্য লিপি

মুনি শ্রীকান্তি সাগর

ভারতবর্ষের পক্ষে ইহা এক সৌভাগ্যের বিষয় যে পুরাতন সংস্কৃতি ও পুরাতত্ত্বের ন্যায় অত্যন্ত জটিল বিষয়ের প্রতি ভারতীয় বিদ্বানগণের মনোযোগ প্রতিদিন বিশেষরূপে আকৃষ্ট হইতেছে। ভারতের সাংস্কৃতিক উত্থানের ইহা এক শুভ লক্ষণ। প্রত্যেক দেশ ও সমাজের উত্থানের মূলগত তত্ত্ব প্রাচীন ঐতিহ্যে নিহিত আছে—যে সমস্ত ঐতিহ্য আজ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গ্রামে অত্যন্ত অব্যবস্থার মধ্যে নিজের অস্তিত্ব রক্ষা করিতেছে। ভারতের পুনরুত্থান ভারতীয় পুরাতত্ত্বের অধ্যয়ন ও অন্বেষণের উপরেই বিশেষভাবে নির্ভর করিতেছে। পুরাতত্ত্ব মানব-জাতির সমক্ষে এমন এক সজীব চিত্র উপস্থিত করে যাহা তাহার পূর্ব বিভূতির স্মৃতি আনয়ন করিয়া বিগত ও লুপ্তপ্রায় আধ্যাত্মিক ও জাগতিক বৈভবের প্রতি শ্রদ্ধার ভাব আনয়ন করে।

আমরা এখানে মুঘল যুগের এমন এক নূতন লিখন-প্রণালীর পরিচয় দিবার ইচ্ছা করি যাহা ভারতীয় লিপি-কৌশলের উৎকর্ষের পরিচয় প্রদান করিতেছে। সপ্তদশ শতাব্দীতে 'রোহণখেড়' নামক এক উন্নতিশীল নগর ছিল। প্রাচীন সংস্কৃত, প্রাকৃত এবং আরবী ও ফারসী ইতিহাসে 'রোহিণীখণ্ড', 'রোহণগিরি', 'রোহণাবাদ' ইত্যাদি নামে ইহার উল্লেখ পাওয়া যায়। এই নগর খান্দেশ ও বেরারের ঠিক সীমান্তে অবস্থিত। নিজাম ষ্টেটের সীমাও এই স্থানের অল্প দূরেই আরম্ভ হইয়াছে। অতএব সপ্তদশ শতাব্দীতে প্রাদেশিক

সীমা রক্ষার জন্য এই নগরের একটি বিশিষ্ট মর্যাদা ছিল। মুঘল ও মারাঠাদিগের প্রধান প্রধান যুদ্ধসমূহ এই স্থলেই ঘটিয়াছিল। তৎকালীন ইতিহাস-গ্রন্থে এই সকল অবগত হওয়া যায়। ১৯৩৯ সালের মার্চ মাসে এখানে এক দিন অবস্থান করিবার সৌভাগ্য আমাদের হইয়াছিল, এখানকার মুঘল শিল্প-কলার সহিত বিশেষভাবে যুক্ত পুরাতন নিদর্শনসমূহ দেখিয়া ইহা স্বতঃই প্রতীত হইয়াছিল যে এই নগর কোন এক সময়ে নিশ্চয়ই উন্নতির উচ্চ শিখরে আরোহণ করিয়াছিল। নগরের সন্নিকটে এক বিশাল মসজিদ নির্মিত আছে। নির্মাণকালসূচক কোন লিপি সেই মসজিদে প্রাপ্ত না হওয়ায় ইহার নির্মাণের সময় নির্দেশ করা সম্ভব নহে। কিন্তু ইহার নির্মাণকৌশল ও প্রচলিত জন-শ্রুতি হইতে এইরূপ অনুমান করা যাইতে পারে যে খ্রীষ্টীয় সপ্তদশ শতাব্দীর পরে ইহার নির্মাণ-কাল হইতে পারে না। এইরূপ কথিত আছে যে, আওরঙ্গজেবের এক কন্যা এখানে অবস্থান করিতেন এবং এইখানেই তাঁহার মৃত্যু হয়। হইতে পারে যে তাঁহারই স্মৃতিরক্ষাকল্পে এই মসজিদ নির্মিত হইয়াছিল।

উক্ত মসজিদের নির্মাণকৌশল উচ্চাঙ্গের। ইহার শিল্প-চাতুর্য্যপূর্ণ অংশগুলি এখন পর্য্যন্তও সুরক্ষিত আছে। ভিতরের নমাজ পড়িবার স্থান, মূল স্থান ও আশপাশের প্রস্তরের 'জালি'-গুলির স্থাপত্যকলা গুজরাতে প্রচলিত মুঘল-কলার স্পষ্ট প্রভাব প্রকাশ করিতেছে। প্রাচীর-গাত্রে বিভিন্ন প্রকারের পুষ্প ও লতা উৎকীর্ণ আছে যাহা সুস্পষ্টরূপে নির্দিষ্ট নির্মাণ-সময়ের সমর্থন করিতেছে। এরূপ শিল্পকলাপূর্ণ অট্টালিকা দেখিয়া স্বতঃই প্রশ্ন জাগে যে এত সুন্দর শিল্পকলাপূর্ণ মসজিদ এমন কোন্ ব্যক্তি প্রস্তুত করাইয়াছিলেন যিনি ইহাতে 'কোরানের' 'আয়ত'গুলিও খোদিত করান নাই? উত্তরে জনৈক মুসলমান জানাইলেন যে কেবলমাত্র কোরানের 'আয়ত'ই নহে কিন্তু মহাকবি হাফেজের কবিতাগুলিও কৌশলে লিখিত আছে।

আমরা আশ্চর্য হইয়া বলিলাম যে, এখানে কেবলমাত্র পাষাণ ভিন্ন অন্য কিছুই দৃষ্টিগোচর হইতেছে না। কিন্তু সেই মুসলমান ভদ্রলোক যেমনই প্রাচীরের গাত্রে জল সিঞ্চন করিতে লাগিলেন তেমনি অঙ্কিত লিপিগুলি চোখের সামনে ভাসিয়া উঠিল। যে যে স্থল জলের দ্বারা সিক্ত হইতে লাগিল সেই সেই স্থলেই লিপি প্রকট হইয়া উঠিল। জল শুষ্ক হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই লিপিগুলিও বিলুপ্ত হইল। সেই ভদ্রলোকের নিকট অবগত হইলাম যে কোরানের বিশেষ বিশেষ 'আয়ত' এইখানে লিখিত আছে। এই লেখনকলা এত সুন্দর, স্পষ্ট ও চিত্তাকর্ষক যে দেখিতে দেখিতেও চক্ষু ক্লান্ত হয় না। এক একটি 'আয়তে'র চারি দিকে অত্যন্ত মনোহর সীমা-রেখাগুলি পৃথক্ পৃথক্ রূপে অঙ্কিত আছে। এই লিপিগুলিতে পীত, কাল, সবুজ ও রক্ত বর্ণের মসীর সংযোগ হওয়ায় ইহা প্রাণবন্ত হইয়া উঠিয়াছে। এ প্রকার লিপি-কৌশল ইতিপূর্ব্বে আর কখনও আমাদের দৃষ্টিগোচর হয় নাই। এই লিখন-পদ্ধতি দেখিলে স্পষ্টই অনুমান হয় যে অদ্য হইতে তিন শত বৎসর পূর্ব্বের ভারতের লেখন-কলা কত উন্নতি লাভ করিয়াছিল।

এখন প্রশ্ন এই যে, এই প্রকারের লিখন-প্রণালী ভারতে কোন্ সময় হইতে কোন সময় পর্য্যন্ত প্রচলিত ছিল; এবং কোন্ কোন্ স্থলে এই পদ্ধতির বিকাশ হইয়াছিল। এই সমস্ত প্রশ্নের উত্তর ভারতের গুপ্তগুলির অনুসন্ধানের উপর নির্ভর করিতেছে। প্রাচীন সাহিত্য এই বিষয়ে মৌন; কিন্তু কতকগুলি বিচ্ছিন্ন হস্তলিখিত পত্র প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে যাহা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। যদিও সেই সমস্ত পত্রে আমাদের প্রশ্নের সম্পূর্ণরূপে সমাধান হয় না, তথাপি সেইগুলি দ্বারা কতকাংশে আলোকপাত অবশ্যই হয়। এই প্রকারের গুপ্ত লিপি লিখিতে মোম, 'সিরখাটা' (?) ও তিলের তেলের বিশেষ দরকার হয়। লিখিবার সময় প্রস্তরের নিম্নে অগ্নি জ্বালিয়া উত্তপ্ত করিয়া রাখা আবশ্যক। কয়েক ঘণ্টা পরে লেবুর রসের দ্বারা সেই প্রস্তরটিকে ধৌত করিয়া প্রাচীরের গাত্রে লাগানো হয়। আমরা এই সমস্ত জিনিষের সহিত সাবান মিশ্রিত করিয়া এমন কয়েকটি পত্র লিখিয়াছিলাম বিচক্ষণ গুপ্তলিপি-পাঠকও যাহার পাঠোদ্ধার করিতে সমর্থ হন নাই। আশা করি এই সম্বন্ধে বিজ্ঞান ও পুরাতত্ত্ববেত্তাগণ বিস্তৃত ভাবে আলোচনা করিয়া প্রকাশ করিবেন।

সঙ্গীত

শ্রীঅশ্বিনী পাল

আমার অন্তর মাঝে যে সমুদ্র দিবানিশি ঊর্ম্মি-নৃত্য করে,
আজ বহুকাল ধরে,
শুনিবারে বুঝিবারে সেই তব সঙ্গীত মহান,
রাখিবে না আজি তার মান?
নয়ন সম্মুখে মোর ভাসি,
তব বাণী-ছন্দ দিয়ে মোর বক্ষবীণা-তারে বাজাবে না বাঁশী?
নাচাইয়া কাঁপাইয়া
উচ্ছাসিয়া ঝঙ্কারিয়া,
আমার পরাণ,
ধ্বনিয়া উঠুক তব মহা-গীত-গান।
যেখানে রাতের বুকে জ্বলে শত তারা,
নীল-সিন্ধু-বক্ষ পরে উঠে ঢেউ নাচে আত্মহারা,
আজি সে সঙ্গীত-রব,
করে দেয় সর্ব্ব প্রাণ শান্তিময় আনন্দ-নীরব।

হিন্দুবিবাহ-সংস্কার

শ্রীমণীন্দ্রনাথ কাব্যতীর্থ, ভাগবতশাস্ত্রী

যাঁহারা নূতন দিনের আবাহন করিতে গিয়া নূতন আদর্শের প্রতিষ্ঠার জন্য অসম্মান ও অখ্যাতির বোঝা লাভ করিয়াছেন তাঁহাদিগকে অকুণ্ঠচিত্তে ধন্যবাদ দিতেছি। কারণ তাঁহারা সমাজের মঙ্গলের জন্যই চিন্তা করিয়াছেন বা করিতেছেন।

অনেকেই হিন্দু আইন সংস্কারের শুভ বুদ্ধিতে সমাজের কল্যাণ কামনায় এযাবৎ নানাপ্রকার আলোচনা করিয়াছেন, সন্দেহ নাই। আমি ইহার একটি অংশের মাত্র আলোচনা করিতেছি—যে অংশটি আমাদের সর্ব্বদিক হইতেই সর্ব্বাপেক্ষা প্রয়োজনীয় এবং সামাজিক জীবনের একমাত্র উন্নতির কারণ। ইহা হিন্দু বিবাহ।

এক দিন ছিল যখন দেশ সম্পূর্ণরূপে হিন্দুদের দ্বারাই শাসিত হইত। ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতের প্রভাবে রাষ্ট্রের ও সমাজের প্রতিটি কাজ সম্পন্ন হইত। ব্রাহ্মণের পরামর্শ না লইয়া রাজা যুদ্ধক্ষেত্রে শত্রুর সম্মুখীন হইতেন না। এক কথায় বলিতে গেলে তখন দেশ ছিল সম্পূর্ণভাবে ব্রাহ্মণ-শাসিত। এই যুগে ব্রাহ্মণের প্রভাবে, অনুষ্টুপের শ্লোকে নানা পুরাণ-উপপুরাণের দোহাইয়ের তিলকাঙ্কিত প্রচুর বিধি সমাজে প্রচলিত হইতে লাগিল। কেহ সমাজের উন্নতির জন্য দূরদৃষ্টি প্রকাশ করিলেন, পাণ্ডিত্যাভিমানী কেহ তাহা অস্বীকার করিলেন। দেশের গগন-পবন তর্কজালে সমাচ্ছন্ন হইল। তাহাতে সমাজের নিখিল কল্যাণ-বুদ্ধি অতিদূরে ভাসিয়া গেল। সমাজ জ্ঞানের পথ হইতে নামিয়া অন্ধভাবে আনুষ্ঠানিক পথ বাছিয়া লইল। মত-উপমতের বিরোধে সে আর অতীতের দিকে ফিরিয়া তাকাইবারও অবসর পাইল না। পুরাণশাসিত দেশ অনুকূল প্রতিকূল সংখ্যাতীত বিধিতে পরিপূর্ণ হইতে লাগিল। শাস্ত্রের যথার্থ উদ্দেশ্য চাপা পড়িয়া রহিল; আর কেহ তাহার সন্ধান করিবার প্রয়োজনীয়তাও বোধ করিল না। গুণগত শ্রেণী বিভাগ বা বর্ণগত স্বধর্ম্ম বিভাগেরও আর সামঞ্জস্য রক্ষিত হইল না। বিচারহীন আচরণের বিড়ম্বনায় অজ্ঞানের অন্ধকারে দেশ সমাচ্ছন্ন হইল।

বিশেষ করিয়া কিয়ৎপরবর্ত্তী মুসলমান যুগে ভাঙনের এই নির্ম্মমতা আরও কতকটা স্পষ্ট হইয়া উঠিল। কিন্তু বর্ত্তমান ইংরেজ শাসন-প্রভাবিত সমাজে আর কোন বন্ধনই নিজেকে বাঁধিয়া রাখিতে পারিল না—দিনান্তে কুসুমের মত মলিন বিবর্ণ হইয়া সকল কিছুই খসিয়া পড়িল। মুসলমান যুগে যাহা ঘটিয়াছিল তাহার প্রতিদ্বন্দ্বী ছিল হিন্দুর সামগ্রিক সত্তারূপ, আর ইংরেজ শাসনে তাহার সামগ্রিক স্বরূপকে অস্বীকার করিয়া খণ্ডরূপের স্বাতন্ত্র্যকে শাসনতন্ত্রেও মর্য্যাদা দিয়া হিন্দুর পৌনঃপুনিক ধ্বংসের পথ প্রশস্ত করা হইয়াছে। একান্ত পরাধীন দেশে দানবের শৃঙ্খলে যে সর্ব্বনাশ আরম্ভ হইয়াছে তাহার আর তুলনা মিলিবে না। প্রকৃত শাস্ত্রশাসন স্বল্প-অনুষ্টুপের অনেক অতীতে পড়িয়া রহিল। এ যুগের সমাজকে আজিকার বাস্তব-জীবনের দুর্য্যোগে এতটুকু সাহায্যও সে করিতে পারিল না। বাস্তব-জীবনের কঠোর সংঘর্ষে কয়েকটি মুহূর্ত্তমাত্র কোনও প্রকারে বাঁচিয়া থাকিবার তীব্র ব্যস্ততায় 'কোথায় যাইতেছি' তাহা ভাবিবারও অবসর আজি নাই। কেবল 'পৈতৃক পুঁজাখানি যা'হোক্ করিতে হইবে' এই কথাটির মত শাস্ত্র নির্দ্দেশের মাঝে সাংস্কারিক অনুষ্ঠানের গড্ডলিকাপ্রবাহ চলিতে লাগিল। এক অনুষ্ঠানেই ভিন্ন ভিন্ন গ্রামে, এমন কি একই পল্লীর ভিন্ন ভিন্ন গৃহে পর্য্যন্ত আর কোনই মিল রহিল না। সমাজ যুক্তিহীন 'কুলাচার' আর 'লোকাচারে' ভরিয়া গেল। শাস্ত্রের শাসনে এই যে বিপ্লব ইহার ভাঙন আজ পর্য্যন্ত সমানভাবেই চলিয়াছে। যুগধর্ম্মের প্রয়োজনে সমাজের নূতন পদক্ষেপটি বিবেচনা করিয়া আর কোনও শাস্ত্র-বিধি রচিত হইল না। অতীত শতাব্দীর সহিত বর্ত্তমান শতাব্দী আর মিলিতেছে না। আমরা শুধু এই ভাঙনের বুকে নিশ্চেষ্ট বসিয়া রহিলাম, সর্ব্বনাশের একটা প্রবল স্রোতে গা ঢালিয়া ভাসিয়া চলিলাম। নড়িবার এতটুকু চেষ্টাও কি করিব না, পার্শ্বপরিবর্ত্তনের আয়াসটুকুও কি স্বীকৃত হইবে না? আজ নূতন দৃষ্টিভঙ্গীর সহিত পুনর্গঠনের শুভলগ্ন সমুপস্থিত। আবার পুরাতন শাস্ত্রের নূতন ব্যবস্থায় সমাজ-সংসার সমৃদ্ধ-সুন্দর হইয়া উঠুক, উন্নতির সকল সম্ভাবনায় তাহার প্রাণশক্তি সুপ্রতিষ্ঠিত হোক—এই ধারণায় আজ নব-স্মৃতির বিষয় আলোচনা করিতেছি।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি, আমার বক্তব্য হিন্দুবিবাহ, বিশেষতঃ বাংলার হিন্দুবিবাহ। কারণ সমগ্র ভারতের মধ্যে বাংলাই একমাত্র দেশ যাহা অত্যন্ত ভাবপ্রবণ এবং যে-কোনও বৈশিষ্ট্যকে সে একান্তভাবে আপন করিয়া অতি দ্রুত গ্রহণ করিতে পারে। হিন্দুবিবাহ-প্রণালীর সম্যক্ প্রতিপালনে সমাজ যে পরিমাণ প্রভাবিত, অন্য কোনও সংস্কারের দ্বারা আর তেমন নহে। ফলে বিবাহ-প্রণালীর উন্নতিতে সমাজের, দেশের উন্নতি—অবনতিতে ঘোর অবনতি ঘটিবেই, এবং এই নিশ্চয়তাকে এড়াইবার আর কোনও উপায় কাহারও জানা আছে বলিয়া এতাবৎকাল সভ্য সমাজে কোনই প্রমাণ-প্রয়োগ পাওয়া যায় নাই।

হিন্দুবিবাহ তথা বাংলার হিন্দুবিবাহ আজ সম্পূর্ণতঃ উদ্দেশ্যবিহীন, অস্বীকৃতির বিপ্লবে নিয়ত অশান্তিজর্জ্জর এবং মাত্র ইন্দ্রিয়-যজ্ঞের উপহার-স্বরূপ হইয়া দাঁড়াইয়াছে। বর্ত্তমান বিবাহে ভোগের অস্থিরতা ও তারল্য ভিন্ন অন্য কিছুই দৃষ্ট

হইতেছে না। কল্যাণকর একনিষ্ঠতার তথা একনিষ্ঠা অর্জনের ক্ষমতার অভাবে সামাজিক বন্ধন শিথিল হইতে শিথিলতর হইয়া পড়িতেছে। জীবনে নানা অপূরণীয় সমস্তা দেখা দিয়াছে। সাহিত্যের পাতায় পাতায় তাহার অগ্রগতি নিরোধের বার্তা এই সমস্তাকেই আশ্রয় করিয়া প্রকাশ পাইয়াছে।

নরনারীর সম্মিলিত জীবনের একমাত্র উদ্দেশ্য হইতেছে এক চরম 'লক্ষ্যে' পৌঁছানো। সমাজের সেবাধর্ম সাধনই এই চরম লক্ষ্য, তাহার সর্ব্বাঙ্গীণ উন্নতি বিধানই ইহার ব্রত। "পুত্রার্থে ক্রিয়তে ভার্য্যা, পুত্রপিণ্ড প্রয়োজনম্" প্রভৃতির অন্তর্নিহিত অর্থই হইতেছে, সমাজ-সেবার আদর্শকে অক্ষুণ্ণ রাখা। ইহার ব্যতিক্রমই হইতেছে পাপ, অকল্যাণ। তাই সমাজসেবার বিরুদ্ধ প্রণালী যাহাতে সমাজকে শুধু আঘাত করাই চলে; সমাজের কল্যাণের, উন্নতির পথের যাহা সহায়ক নয়, তাহাকেই যুগে যুগে দৃঢ় ভাবে ব্যভিচার বলা হইয়াছে। যাহারা সমাজবিরোধী এই অকল্যাণকর ব্যভিচার করিয়া সমাজকে অস্বীকার করিতে চাহিয়াছে, তাহাকে আহত করিয়াছে, শুধু সমাজের কল্যাণের জন্য প্রায়শ্চিত্তের নামে সেই ব্যভিচারকে পুনরায় সমাজে স্ব-পদারূঢ় করিবার বিধি রচিত হইয়াছে। সামাজিক উন্নতির জন্য, অধিকতর সেবা-লাভের জন্য তাই পৌরুষের নিকট কুলেরও পরাজয় হইয়াছে। মহাভারতে :—

"সূতো বা সূতপুত্রো বা যো বা তবাম্যহম্।
দৈবায়ত্তং কুলে জন্ম মদায়ত্তং তু পৌরুষম্।

বলিয়া কুন্তীর কানীন পুত্র কর্ণের যে ক্ষত্রিয় বীর্য্যের পরিচয় পাই, সমগ্র মহাভারতে তাহা তুলনারহিত, সুস্পষ্ট হইয়াই আছে। দানশীলতায়, মহাপ্রাণতায়, ক্ষাত্রধর্ম্মের পরিপালনে, তাঁহার আদর্শ যেন যে কোনও মহাভারতীয় ব্যক্তির আদর্শের ঊর্দ্ধস্তরে ধ্রুবনক্ষত্রের ন্যায় অচলোজ্জ্বল হইয়াই রহিয়াছে। তাঁহার জন্ম সম্বন্ধে ক্ষণিকের ঘৃণা প্রকাশের অবসরও আমরা খুঁজিয়া পাই না। তাঁহার ব্যক্তিগত গুণগুলি যেন এক কল্পনাতীত লোকে আমাদের লইয়া উপস্থিত করে।

অসংখ্য শাস্ত্র প্রণয়নে পণ্ডিতজনশিরোমণি ব্যাসদেবের সমাজসেবায় আত্মোৎসর্গে তাঁহার জন্মক্ষণের দিকে তুলিয়াও চাহি না, শ্রদ্ধা-অকুণ্ঠিত চিত্তে 'কুমারবিদ্যায়তপত্রনেত্রম্' বলিয়া প্রণামই করি। অত কিছু ভাবিতেই মন যেন বিদ্রোহী হইয়া উঠে। ইহাকে আমাদের মন কোন দিনই ব্যভিচার বলিয়া ভাবিতে পারে নাই। শাস্ত্রে কুমারী কালে ঋতুমতিত্বই যেখানে বহুনিন্দিত পাপ বলিয়া কীর্ত্তিত সেখানে সেই অবস্থায় সন্তান প্রজনন যে কিরূপ মহত্তর পাপ বলিয়া গ্রাহ্য হওয়া উচিত ছিল তাহা চিন্তা করাও কষ্টকর হইয়া উঠে। যম বলিয়াছেন :—

"কন্যা দ্বাদশবর্ষাণি যাহপ্রদত্তা গৃহে বসেৎ।
ব্রহ্মহত্যা পিতুস্তস্যা ইত্যাদি।

অর্থাৎ—যে পিতার গৃহে দ্বাদশবর্ষ পর্য্যন্ত অবিবাহিতা কন্যা বাস করে তাহার (পিতার) ব্রহ্মহত্যাজনিত পাপ হয়।

অঙ্গিরা বলিয়াছেন :—

"প্রাপ্তে তু দ্বাদশবর্ষে যদা কন্যা ন দীয়তে।
তদা তস্যাস্তু কন্যায়াঃ পিতা পিবতি শোণিতম্।

এইরূপ অবিবাহিতা দ্বাদশবর্ষবয়স্কা কন্যা সম্বন্ধে মার্কণ্ডেয়—

"মাসি মাসি রজস্তস্যাঃ পিতা পিবতি শোণিতম্।

অন্যত্র

"মাতা চৈব পিতা চৈব জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা তথৈব চ।
ত্রয়স্তে নরকং যান্তি দৃষ্ট্বা কন্যাং রজস্বলাম্।

অত্রি এবং কাশ্যপ ঋষিও বলিয়াছেন :—

"পিতুর্গেহে চ যা কন্যা রজঃ পশ্যত্যসংস্কৃতা।
ভ্রূণহত্যা পিতুস্তস্যাঃ সা কন্যা বৃষলী স্মৃতা।"

এইরূপ কন্যার বিবাহও নিন্দিত হইয়াছে :—

"যস্তু তাং বিবহেৎ কন্যাং ব্রাহ্মণো জ্ঞানদুর্ব্বলঃ।
অসম্ভাষ্যো হ্যপাংক্তেয় সজ্ঞেয়ঃ বৃষলী-পতিঃ।"

অনেক গ্রন্থেই এইরূপ কন্যায় বিবাহের অনুরূপ নিন্দাই কীর্ত্তিত হইয়াছে। কিন্তু বিস্ময়ের বিষয় এই প্রমাণ বা নিন্দাশ্রুতিগুলিকে যদি মহাভারতেরও পূর্ব্ববর্ত্তী বিবেচনা করা যায় তবে বহুনিন্দিত ঋতুমতিত্ব তো দূরের কথা; পিতৃগৃহে কন্যাকালে সন্তানপ্রজনন এবং তৎপরে সেই কন্যার (?) বিবাহের উদাহরণগুলিও একান্ত সুলভ হইয়া উঠে কিরূপে? বিস্ময়ের বিষয়, কোনও শক্তিশালী ব্যবস্থাপক স্মার্ত্তের বিধান সেদিন পাওয়া গেল না। যাহাতে ব্যাসদেব, কর্ণ প্রভৃতি সমাজপতিত অপাংক্তেয় হইতে পারেন। পরন্তু এই কানীন কর্ণ দানশীলতায়, ব্যক্তিত্বের পূর্ণতায়, সত্যবাদিতায় শৌর্য্যে মহাভারতের একটি বিশিষ্ট স্থানই অধিকার করিয়া আছেন। আর ব্যাসদেব? পরবর্ত্তী সমাজের চলিবার পথ তিনিই নির্দ্দিষ্ট করিয়া বাঁধিয়া দিলেন, যে পথ অস্বীকার করিবার মত দুঃসাহস আজ পর্য্যন্ত কাহারও হইল না। আসল কথা হইতেছে, সেবাবুদ্ধির সাধনায় সমাজের কল্যাণ ও উন্নতি।

মনুস্মৃতি পাঠে আমরা ক্ষেত্রজ সন্তান, দেবর কর্ত্তৃক সুতোৎপত্তি প্রভৃতি বিধি দেখিতে পাই—যাহা শাস্ত্রীয় বলিয়া সমাজ এক দিন গ্রহণ করিয়াছিল। কিন্তু বর্ত্তমান সমাজ কি আজ এই সব বিধি গ্রহণ ত দূরের কথা, অসঙ্কোচে চিন্তাও করিতে পারেন? অথচ তৎকালীন সমাজ-ব্যবস্থায় সামাজিকেরা অসঙ্কোচেই এই সব বিধি পালন করিতেন—সন্দেহ নাই। শাস্ত্রীয় হইলেও আজ উহা আমাদের যেমন চিন্তারও বাহিরে তেমনিই লজ্জাজনক। দেখা যায়, কালক্রমে এই সব বিধি সমাজে সম্পূর্ণরূপে নিষিদ্ধ হয় এবং এই সব অবৈধ বিধি পালনে কঠোর প্রায়শ্চিত্তেরও ব্যবস্থা হয়। এখন আরও বেশী প্রমাণ বা আলোচনা গ্রহণ না করিয়াও আমরা
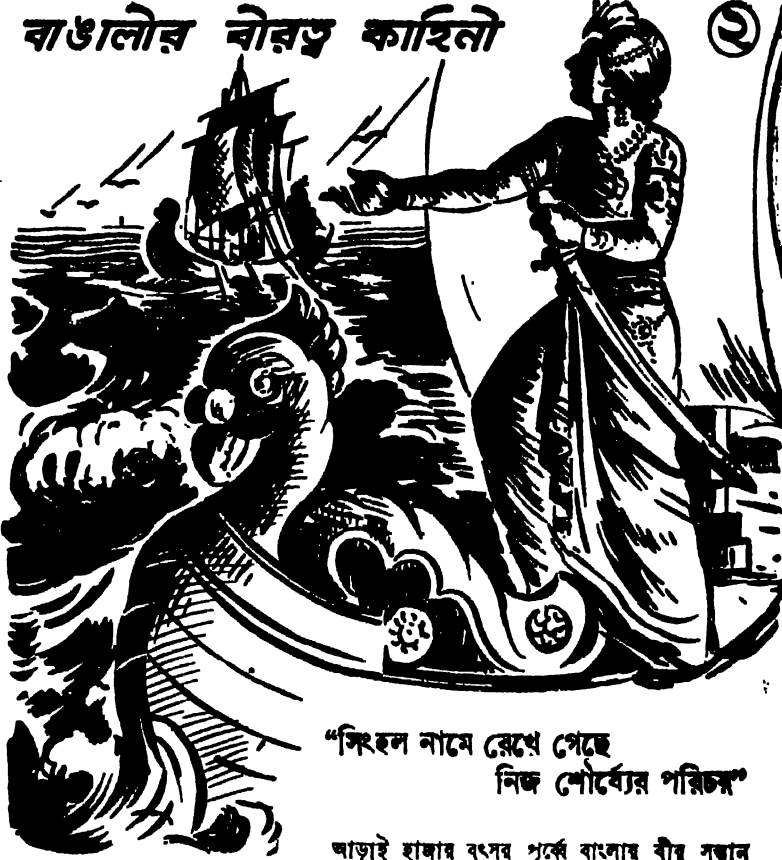
বুঝিতে পারি যে, এক দিন যাহা সমাজের কল্যাণকর বলিয়া বিবেচিত হইত তাহাই কালে অমঙ্গলজনক বলিয়া সমাজ কর্ত্তৃক পরিত্যক্ত হইল। হিন্দুধর্ম্মের এই উদারতাপূর্ণ বৈশিষ্ট্যের জন্যই হিন্দু আজ হিন্দু বলিয়া অন্ততঃ দাবি করিবার পূর্ণাধিকার রাখিতে পারিয়াছে।

যে দৃষ্টিভঙ্গীর সাহায্যে সমাজে অতীতে এক দিন তাহারই কল্যাণ কামনায় অনেক বিধি ভাঙিয়া যাইত, অনেক বিধি গড়িয়া উঠিত, আজও সমাজের কল্যাণ কামনায় সেই দৃষ্টিভঙ্গীর সাহায্যে বর্ত্তমান সমাজে সেইরূপ পরিবর্ত্তনের অনস্বীকার্য্য প্রয়োজন উপস্থিত হইয়াছে। কি করিলে আজিকার সমাজ শুধু সবল হইতে পারে, তাহার প্রতি স্তরে একটি সক্রিয় শুভবুদ্ধির মঙ্গলস্পর্শ তাহাকে সুন্দর করিয়া তুলিতে পারে, সকল সাম্প্রদায়িকতার একান্ত ঊর্দ্ধে নিজের মঙ্গলময় সরল পথে পরিচালিত হইতে পারে, তাহার জন্য বিশেষ করিয়া ভাবিবার এবং তদনুযায়ী কর্ত্তব্য সুসম্পন্ন করিবার শুভক্ষণ আজ উপস্থিত হইয়াছে। আমাদের শিক্ষা-সভ্যতা যে আমাদের ভাঙিয়া চুরিয়া বিচ্ছিন্ন করিয়া বিলুপ্তির পথে লইয়া যাইতে পারে নাই আজ তাহাই আমাদের প্রমাণ করিতে হইবে।

সমাজে এক দিন যাহা বৈধ ছিল তাহা যখনই নিষিদ্ধ হইল তখনই উহা অবৈধ অর্থাৎ ব্যভিচাররূপে গণ্য হইয়া থাকে, হইয়াছেও তাহাই। এখনও যে সমাজে কানীনপুত্র, ক্ষেত্রজ পুত্র বা দেবরপুত্রাদির অভাব রহিয়াছে এ কথা ঠিক করিয়া বলা চলে না। তবে উহাকে সমাজ প্রকাশ্যে বা অপ্রকাশ্যে এখন সঙ্গত বলিয়া স্বীকার করে না। অনেক ছোট-বড় বংশের প্রতিষ্ঠা যে ইঁহাদের দ্বারা হয় নাই অথবা ইঁহারাই যে অনেক বংশের বংশরক্ষক আদিপুরুষ নন এ কথা কে বলিবে?

শাস্ত্রে অ-ঋতুমতী কন্যারই বিবাহ-ব্যবস্থা বৈধ। ঋতুমতী কন্যার বিবাহ বিষয়ে যেরূপ নিন্দাশ্রুতি আছে তাহা প্রথমেই উল্লিখিত হইয়াছে। এই সব কথা জানিয়া শুনিয়া কি ঋতুমতী কন্যার বিবাহ দিতে কোনও পিতার মনে উৎসাহের সঞ্চার হইতে পারে? অথচ সমাজে এখন কি চলিতেছে? কয়জন পিতা গৌরী, রোহিণী বা 'কন্যা' দানের ফল লাভ কামনায় দ্বাদশ বৎসরের নিম্নে পাত্রীকে পাত্রস্থ করিতে পারিতেছেন? বর্ত্তমান সমাজে যে সব পারিপার্শ্বিক কারণে অ-ঋতুমতী বালিকার বিবাহ সম্পূর্ণরূপে অসম্ভব হইয়া উঠিয়াছে তাহা কি অস্বীকার করিয়া এড়াইয়া চলা যাইতে পারে? স্মৃতি-শাস্ত্রানুসারে বিবাহ হইতেছে সবর্ণের মধ্যে, অসগোত্রে, তথা অসপ্রবরে। এই বিধির দ্বারাই বুঝা যাইতেছে যে, কোনও দিন সমাজে ইহার বিপরীত বিধিও চলিয়া থাকিবে। পূর্ব্বে যে সমাজে অসবর্ণ বিবাহ বৈধ ছিল তাহার বহু নিদর্শন আছে। মনুসংহিতায়:—

"যদি স্বাশ্চাপরাশ্চৈব বিন্দেরন্ যোষিতো দ্বিজাঃ।
তাসাং বর্ণক্রমেণ স্যাজ্জ্যৈষ্ঠ্যং পূজা চ বেশ্ম চ॥
নবম অধ্যায়, ৮৫ শ্লোক।

অর্থাৎ দ্বিজগণ (ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য) যদি সজাতীয়া বা বিজাতীয়া স্ত্রী গ্রহণ করেন তবে তাহার জ্যেষ্ঠতা অনুসারে সম্মান ও আবাস-স্থান নিরূপণ করিবে। এইরূপ বিবাহে অধম বংশ হইতে গৃহীত স্ত্রীগণ যে 'অমান্য' ছিলেন তাহাও নহে। মনু বলেন:—

"অক্ষমালা বশিষ্ঠেন সংযুক্তাধম যোনিজা।
শারঙ্গী মন্দ পালেন জগামাভ্যর্হণীয়তাম॥" ৯.২৩

নিকৃষ্ট বংশে জাতা অক্ষমালা এবং শারঙ্গী যথাক্রমে ঋষি বশিষ্ঠ ও মন্দপালের সহিত বিবাহসূত্রে আবদ্ধ হইয়া পরম মান্যা হইয়াছিলেন। আরও—

"এতাশ্চান্যাশ্চ লোকেঽস্মিন্নপকৃষ্ট প্রসূতয়ঃ।
উৎকর্ষং যোষিতঃ প্রাপ্তাঃ স্বৈঃস্বৈর্ভর্ত্তৃগুণৈঃশুভৈঃ।
মনু ৯।২৪

অর্থাৎ ইঁহারা (অক্ষমালা শারঙ্গী প্রভৃতি) এবং আরও অনেকে (সত্যবতী প্রভৃতি) অপকৃষ্ট যোনিজা হইলেও নিজ নিজ স্বামী-গুণে উৎকর্ষ লাভ করিয়াছিলেন। অনুলোম বিবাহ বৈধ বলিয়া ইহাকে সমর্থন করিলেও উহাও যে একপ্রকার অসবর্ণ বিবাহ সে সম্বন্ধে কোনও সন্দেহ নাই। মনু-বচনান্তরেও দেখা যায়—

"পাণিগ্রহণ সংস্কারঃ সবর্ণাস্বুপদিশ্যতে।
অসবর্ণাস্বয়ং জ্ঞেয়ো বিধিরুদ্বাহকর্ম্মণি॥
শরঃক্ষত্রিয়য়া গ্রাহ্যঃ প্রতোদোবৈশ্যকন্যয়া।
বসনস্য দশা গ্রাহ্যাঃ শূদ্রয়োৎকৃষ্ট বেদনে॥"

অর্থাৎ সবর্ণা বিবাহেই কেবল পাণিগ্রহণ সংস্কার উপদিষ্ট হইল। অসবর্ণার বিবাহ-কর্ম্মে এই বিধি যে-ব্রাহ্মণের ক্ষত্রিয়া পত্নী শর গ্রহণ, বৈশ্যা পাচুনী, এবং উৎকৃষ্ট জাতির ভার্য্যা হইলে শূদ্রের কন্যা বস্ত্রের দশা গ্রহণ করিবে। (অসবর্ণা
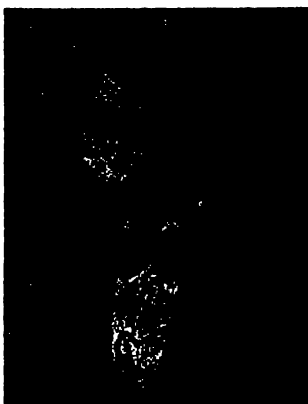
বিবাহে পাণিগ্রহণ সংস্কার নাই এখানে ইহাই প্রমাণিত হইল।) কাজেই অনুলোম বিবাহও যে শাস্ত্রের দৃষ্টিতেই বৈধ এবং অসবর্ণা বিবাহ বলিয়াই গ্রাহ্য ছিল তাহাতে প্রমাণান্তরের প্রয়োজন নাই। প্রতিলোম অসবর্ণ বিবাহে বর্ণসঙ্করত্ব বিবেচনা হেতু নিন্দনীয় থাকিলেও সমাজ উহাকে অস্বীকার করিতে পারে নাই। ইহাদের জন্যই স্বতন্ত্র শ্রেণী বা সম্প্রদায় গঠন করিয়া হিন্দুর সামগ্রিক শক্তিকে আরও দুর্ব্বল করা হইয়াছে মাত্র। পরন্তু বৃহন্নারদীয় পুরাণে—

"দ্বিজানামসবর্ণাসু কন্যাসূপযমস্তথা।"

বলিয়া কলিতে দ্বিজ (ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য)-গণের অসবর্ণা কন্যা বিবাহ নিষিদ্ধ হইয়াছে। ইহাতে স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে, অখিল শাস্ত্র বিনিন্দিত পাপ কলিযুগের পূর্ব্বেই সকল শাস্ত্রে অধিকতর প্রশংসাপ্রাপ্ত পুণ্যময় দ্বাপরাদি যুগে অসবর্ণা বিবাহ-বিধি সমাজগ্রাহ্য ছিল। উহা যদি তৎকালীন ধর্ম্মপথের বিঘ্নস্বরূপ বিবেচিত না হইয়া থাকে তবে আজ একই সংস্কৃতি-বিশিষ্ট একই শিক্ষা সভ্যতাপ্রাপ্ত হিন্দুগণের সামগ্রিক কল্যাণের পথে কেন অধর্ম্ম, পাপ তথা অবৈধ বলিয়া বিবেচিত হইবে?

সবর্ণ বলিলে আমরা একই সংস্কৃতি বিশিষ্ট সম্প্রদায়কেই বুঝি। শাস্ত্রের উদ্দেশ্যও তাহাই। একই সংস্কৃতি, একই শিক্ষার মধ্যে পারস্পরিক আত্যন্তিক মিলনটি যাহাতে বিরুদ্ধ সংস্কৃতির সংঘর্ষে উদ্দেশ্যহীন, ব্যর্থ হইয়া না উঠে সেইজন্যই সবর্ণ বিবাহ প্রচলিত হইয়াছে। বস্তুতঃ বিবাহ সংস্কৃতিমূলকই হওয়া উচিত। এইজন্যই কালে অসবর্ণ শব্দস্থলে সবর্ণ শব্দ উপস্থিত হয়।

সগোত্র বিবাহে যে দোষ নাই, ইহা বৈজ্ঞানিকদের মত। বর্ত্তমান বিজ্ঞানের যুগে সাম্প্রতিক সমাজগঠনে প্রাচীন স্মৃতির দোহাই দিয়া বিজ্ঞান-ভিত্তিকে উপেক্ষা করা চলে না। বিবাহ সংস্কৃতিগত হইলে বরং সাংস্কৃতিক উৎকর্ষের জন্যই উহা স-গোত্র হওয়াই উচিত। কারণ একই গোত্রের সাংস্কৃতিক ধারা অনেকটা বেশী রকমেরই একরূপ হইবে। তবে স-গোত্র বিবাহে আরও কতকগুলি বিধিনিষেধের প্রয়োজন আছে যাহা পরে আলোচিত হইবে।

বর্ত্তমান সমাজে যে সবর্ণ বিবাহ হইতেছে, উহা যদি সংস্কৃতিমূলকই হয় তবে এখন আর কেবল ব্রাহ্মণ ব্রাহ্মণের, ক্ষত্রিয় ক্ষত্রিয়ের তথা বৈশ্য বৈশ্যের এবং শূদ্র শূদ্রের সবর্ণ হইতে পারে না। শাস্ত্রে যে সব কর্ম্ম ও আচরণ বর্ণগত কর্ত্তব্য বলিয়া নির্দ্দিষ্ট ছিল, জীবনযাত্রার পরিবর্ত্তনে যে কারণেই হোক না কেন এখন প্রায়ই তাহা আর কেহই করিতে পারিতেছেন না। আজিকার ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়াদি সংস্কৃতির দিক
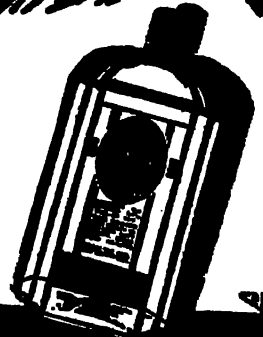
হইতেই একবর্ণে পরিণত হইয়াছে। শিক্ষায়, সভ্যতায়, রুচি ও জীবিকা অর্জন প্রচেষ্টায় পরস্পরের মধ্যে আর পার্থক্যের ভগ্নাংশটুকুও দেখা যাইতেছে না। এইরূপ সাংস্কৃতিক লক্ষণে ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য একই সবর্ণত্ব বহন করে, এবং একথাও স্বাভাবিক যে, ব্রাহ্মণ যদি ব্রাহ্মণের, ক্ষত্রিয় ক্ষত্রিয়ের এবং বৈশ্য বৈশ্যের সবর্ণ হয় তবে 'দ্বিজ' (ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য) কেন সামগ্রিকভাবে দ্বিজের সবর্ণ হইবে না? ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য ইহাদের দ্বিজ এই একত্বে গ্রহণের ফলে আজ আর সংস্কৃতিগত পার্থক্যের কোনই ব্যতিক্রম দৃষ্ট হয় না, বস্তুতঃ সবর্ণ শব্দের অর্থই হইতেছে সংস্কৃতিগত ভাবধারার সমতা।

মোটের উপর শিক্ষায়, সভ্যতায়, প্রতিটি আচরণে, এমন কি চিন্তাধারার একতায় আমরা যেখানে এক হইয়া গিয়াছি সেইখানেই প্রকৃত সবর্ণত্ব তাহার নির্দিষ্ট বিশিষ্ট মর্য্যাদা লাভ করিয়াছে। এবং এইরূপ 'সবর্ণ' গ্রহণের ফলে শাস্ত্রনির্দিষ্ট সবর্ণবিবাহের সংস্কার ঠিকই থাকিবে। অসগোত্রের বৈচিত্র্যও রক্ষিত হইবে। ইহাতে যাঁহারা ব্যভিচার আসিবে বলিয়া মনে করিতে পারেন তাঁহাদের সম্পর্কে উত্তরের কতকাংশ এই প্রবন্ধের গোড়ার দিকেই দেওয়া হইয়াছে এবং উপসংহারের প্রথমেও কতকটা দিয়াছি।

পূর্ব্বে সংস্কৃতির তারতম্য হেতুই অনুলোম প্রথানুসারে অসবর্ণ-বিবাহ প্রচলিত ছিল। আজিকার প্রস্তাব, সংস্কৃতির সমতার জন্যই অনুলোম ও বিলোমের সবর্ণত্ব গ্রহণ করিয়া বৈবাহিক সম্বন্ধকে পারস্পরিক মর্য্যাদা দান করিবার। পাশ্চাত্য শিক্ষার ফলে বর্ত্তমানে দেশ অনেকটা উদার হইয়াছে। ইহার দরুন মন্ত্র ও আচারের মধ্য দিয়া অনুষ্ঠিত না হইয়াও স্ত্রী-পুরুষের মিলন হইতেছে। ইহাকে 'ঐচ্ছিক' সংজ্ঞা দিলেও কোথাও কোথাও ইহার ফল শাস্ত্রীয় বিবাহের পরিণতি অপেক্ষা অশুভ দেখা যাইতেছে না। অবশ্য এখানে তথাকথিত 'সবর্ণত্ব রক্ষিত না হইলেও সংস্কৃতির মর্য্যাদা রক্ষিত হইতেছে। না হইলে ইহার পরিণাম অশুভই হইত।

দেবো মুনির্দ্বিজোরাজা বৈশ্যঃ শূদ্রো নিষাদকঃ
পশু ম্লেচ্ছোঽপি চণ্ডালো বিপ্রাঃ দশবিধাঃ স্মৃতাঃ।

অত্রি সংহিতা।

মহর্ষি অত্রি উপরোক্ত দশ প্রকারের ব্রাহ্মণের কথা বলেন। কাজেই দেখা যাইতেছে ব্রাহ্মণের সংস্কৃতি বা সবর্ণত্ব ব্রাহ্মণের সহিতই হইবে, একথা সামান্য ভাবে বলা চলে না। বিশেষ ভাবে বলিতে গেলে,—স্মৃতি অনুসারেই মুনি-ব্রাহ্মণ মুনি-ব্রাহ্মণের, নিষাদ-ব্রাহ্মণ নিষাদ-ব্রাহ্মণেরই সবর্ণ হইতে পারে। ইহার বিপরীত হইলে সমান সংস্কৃতির অভাবেই যে-কোনও ব্রাহ্মণ যে-কোনও ব্রাহ্মণের সবর্ণ হইতে পারে না। অথচ সমাজে কি চলিতেছে? ব্রাহ্মণের পুত্রকন্যার সহিতই ব্রাহ্মণের পুত্রকন্যার বিবাহ নিষ্পন্ন হইতেছে। কন্যার পিতা, নিষাদ-ব্রাহ্মণ না চণ্ডাল-ব্রাহ্মণ অথবা বর বা বরের পিতা

মুনি-ব্রাহ্মণ না দেব-ব্রাহ্মণ কোন পক্ষই তাহা বিচার করিবার প্রয়োজন বোধ করেন না। নির্ব্বিরোধে এবং অসংকোচে এক ব্রাহ্মণের পুত্রের সহিত অপর এক ব্রাহ্মণের কন্যার তা সে যে ব্রাহ্মণই হউক না কেন—বিবাহ সম্পন্ন করিতেছেন। কিন্তু এখানে কি সবর্ণ বিবাহ সম্পন্ন হইল? ইহা কি অসবর্ণ বিবাহ বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইবে না? শাস্ত্রের এবং জীবনযাপন-প্রণালীর উদ্দেশ্য চিন্তা করিলে একথা নিঃসন্দেহেই বলা চলে যে ইহাও অসবর্ণ-বিবাহ। সমাজে এখনও সবর্ণ-বিবাহের ছদ্মনামে অসবর্ণ-বিবাহ চলিয়া যাইতেছে।

এখন অবশিষ্ট শূদ্র সম্বন্ধে আমার বক্তব্য বলিয়া এই প্রবন্ধ শেষ করিতে চাই।

বর্ত্তমান সমাজের অবস্থা দেখিয়া ভবিষ্যৎ কল্যাণের জন্যই যে প্রস্তাব করা হইল, উহারই অনুকূলে এখন এই কথা বলা চলে যে, সমাজে মাত্র দুইটি সম্প্রদায় বা শ্রেণী স্বীকৃত হইবে—একটি দ্বিজ এবং ইহারা পরস্পর সবর্ণ। দ্বিতীয়, শূদ্র—যাহারা অশিক্ষিত, অজ্ঞানী, অপরিষ্কার অপরিচ্ছন্ন ভাবে জীবনযাপন করিতে ভালবাসে, বিকৃতরুচি বা রুচিহীন এবং সতত সমাজের কল্যাণ-বিরোধী কর্ম্মে আসক্ত। তথাকথিত ব্রাহ্মণাদির মধ্যেও শূদ্র লক্ষণে লক্ষিত ব্যক্তি থাকিলে তিনিও শূদ্র হইবেন এবং বৈবাহিক সম্বন্ধে শূদ্রের সবর্ণ অবশ্যই শূদ্রই হইবে। তবে ইহা সত্য যে, কালক্রমে শিক্ষা-সভ্যতার সাধনায়, দ্বিজ-সম্প্রদায়ের অবিরাম আন্তরিক চেষ্টা ও যত্নের ফলে এই অনুন্নত শূদ্র সম্প্রদায়ও দ্বিজত্বের অধিকারী হইবেন। সমগ্র সমাজ শিক্ষিত সভ্য হইবে,— দেশের উন্নতি হইবে।

যাঁহারা জ্ঞানী-গুণী, স্বদেশ এবং স্বজাতির কল্যাণকামী তাঁহাদের নিকট আমার অনুরোধ, তাঁহারা যেন কিঞ্চিৎ ধৈর্য্যের সহিত এই প্রস্তাবটিকে বিচার করেন। আমি তাঁহাদের যুক্তিপূর্ণ মতামত চাহিতেছি।

পুস্তক-পরিচয়

রামচরিতমানস— (গোস্বামী তুলসীদাসকৃত রামায়ণ) শ্রীসতীশচন্দ্র দাসগুপ্ত কর্তৃক সঙ্কলিত ও অনূদিত। খাদি প্রতিষ্ঠান, ১৫, কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা। দ্বিতীয় সংস্করণ, ১৩৫২ ফাল্গুন। মোট ছয় শত পৃষ্ঠা, মূল্য ছয় টাকা।

গোস্বামী তুলসীদাসজীর রামচরিতমানস এশিয়ার সাহিত্যে এক বিশিষ্ট আসন অলঙ্কৃত করিয়া আছে। আমাদের দেশের বহু হিন্দু ইহা নিয়মিত পাঠ ও শ্রবণ করিয়া থাকেন। ইহাকে আশ্রয় করিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের কৃতী ছাত্রেরা গবেষণামূলক সন্দর্ভ লিখিয়াছেন। ইহার সমগ্র-পাঠ বা পারায়ণ ভক্ত হিন্দুরা ব্রতবিশেষ অনুষ্ঠানের মত ভক্তিশুদ্ধ চিত্তে সম্পন্ন করেন। কাব্যহিসাবেও ইহার সৌন্দর্য ও মাধুর্য সর্বজনবিদিত।

বাংলাদেশে তুলসীদাসী রামায়ণের আদর আছে। একাধিক অনুবাদ বাজারে পাওয়াও যায়। কিন্তু অনলস অতন্দ্রিত কর্মনায়ক সতীশবাবু মূল রামচরিতমানস বঙ্গাক্ষরে মুদ্রিত করিয়া ও সঙ্গে সঙ্গে প্রতি শ্লোকের সরল বঙ্গানুবাদ দিয়া বাঙ্গালী পাঠককে মূলের আস্বাদ গ্রহণ করিবার সুযোগ দিয়াছেন। ভাল বাঁধা, ভাল ছাপা। বড় ও স্পষ্ট হরপ—পাঠকরা পড়িবার সময়ে অবশ্যই সতীশ বাবুর প্রতি মুক্তকণ্ঠে অন্তরের কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিবেন। ইহাতে বঙ্গসাহিত্যের অকৃত্রিম সেবা করা হইয়াছে এবং হিন্দীভাষাভাষীদের সহিত সৌহার্দ্যের সেতু বিরচিত হইয়াছে। ভূমিকায় রামায়ণের প্রধান প্রধান চরিত্রের গুণকীর্তন করিয়া ও বিষয়সূচী দিয়া সতীশ বাবু পাঠকের রসাস্বাদনে সাহায্য করিয়াছেন।

দুই-একটি বিষয়ে সতীশবাবুর দৃষ্টি আকর্ষণ করি। মূল যখন দেওয়া হইয়াছে, সঙ্গে সঙ্গে ব্যাকরণের একটি কাঠামো এবং হিন্দীতে প্রযুক্ত বিশেষ কতকগুলি শব্দের তালিকা পুস্তকের শেষে দিলে ভাল হইত না কি? ছাপাইবার সময় 'তুলসিকামাল' ও 'তুলসিকা মাল' বাঙ্গালী পাঠকের পক্ষে অসুবিধার সৃষ্টি করিতে পারে। কোনও কোনও জায়গায় শুদ্ধ অনুবাদ হইতে অর্থগ্রহণ করা কঠিন, 'নেগীরা নেগ-জোগ পাওয়া পাইল' (২৪১ পৃঃ)—অবশ্য 'নেগী', 'নেগজোগ' ইহাদের অর্থ এই প্রসঙ্গে দিয়াছেন, তাহা হইলেও অনুবাদ সহজ বাংলায় করিলেই শোভন হইত। ১৫৩ পৃঃ 'কপটী মুনিপদ রহি মতি লীনী' অনুবাদ মূলের সহিত সঙ্গত হয় নাই বলিয়া মনে হইল।

রামচরিতমানসের বহুলপ্রচার কামনা করি, তাহাতে বাংলার বহুবিধ কল্যাণ হইবে।

শ্রীপ্রিয়রঞ্জন সেন

রোড ব্যাক—এরিখ মারিয়া রেমার্ক। অনুবাদক—কুমারেশ ঘোষ। রীডার্স কর্ণার, ৫, শঙ্কর ঘোষ লেন, কলিকাতা। দাম—আড়াই টাকা।

মাত্র একখানি বই লিখিয়া পৃথিবীব্যাপী যশ অর্জন করিয়াছেন—এমন সৌভাগ্যবান বিরল লেখকদের মধ্যে এরিখ মারিয়া রেমার্ক অন্যতম। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের এই জার্মাণ সৈনিক—তখনও তাঁহার বয়স আঠারো পূর্ণ হয় নাই—পুরা চার বৎসর রণক্ষেত্রে থাকিয়া সৈনিক জীবনের কঠোর অভিজ্ঞতা অর্জন করেন। যুদ্ধ-বিরতির এগারো বৎসর পরে ১৯২৯ সালে তাঁর 'অল কোয়ায়েট অন দি ওয়েষ্টার্ণ ফ্রন্ট' বইখানি প্রকাশিত হয়। সঙ্গে সঙ্গে বইখানি পৃথিবীর বহু ভাষায় অনূদিত

হওয়ার রেমার্ক জগদ্বিখ্যাত হইয়া পড়েন। ইহার দুই বৎসর পরে 'রোড ব্যাক' বইখানি প্রকাশিত হয়।

'অল কোয়ায়েট' রণক্ষেত্রে সৈনিক-জীবনের নির্মমতা—নীতিহীনতা ও যুদ্ধের পাশবিকতার বাস্তব চিত্র ফুটিয়াছে; 'রোড ব্যাকে' পাই রণনির্জ্জিত হতোদ্যম বিকলাঙ্গ সেই সব ঘরে-ফেরা সৈনিকের উত্তর-জীবনের অসহায় অবস্থার চিত্র। কয়টি বৎসর কঠোর সামরিক জীবন যাপনের পর পরিবর্ত্তিত রাষ্ট্র ও সমাজব্যবস্থার সঙ্গে ইহারা খাপ খায় নাই—পৌর-আচারে ও প্রথায় প্রায় বাতিল হইয়া গিয়াছে এই হতভাগ্যেরা। অথচ সুস্থ ও স্বচ্ছন্দ ভাবে বাঁচিয়া থাকিবার দাবি ইহাদের কাহারও চেয়ে কম নহে। যুদ্ধ এবং যুদ্ধোত্তর কালের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা-প্রসূত এই ধরণের বাস্তব কথাচিত্র বিশ্বসাহিত্যে বিরল।

দুইখানি বইয়ের মধ্যে খণ্ড খণ্ড কতকগুলি ছবি পাওয়া যায়। চিত্রগুলি দোষত্রুটি শূন্য নয়—কোন কোনটি তো রীতিমত কদর্য্য, তথাপি এর মূল্য অনস্বীকার্য্য; এই খণ্ড-চিত্রগুলিকে একসূত্রে গাঁথিয়া—ক্ষমতা-লোভী মানুষের নগ্ন স্বার্থের প্রতি অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া ও যুদ্ধের অন্তর্নিহিত অর্থকে সুস্পষ্ট করিয়া রেমার্ক বিশ্বশান্তির ইঙ্গিত করিয়াছেন। এই চিত্র যুদ্ধের প্রতি মানুষের ঘৃণাবোধকে স্বতঃই বাড়াইয়া দেয়। যতদিন যুদ্ধাকাঙ্ক্ষী মানুষের চক্রান্তে পিতৃভূমির গৌরব-সৃষ্টি অব্যাহত ভাবে চলিবে—ততদিন রেমার্ক তাঁর স্মরণীয় বই দুখানির মধ্যে অমর হইয়া থাকিবেন—দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের অন্তে একথা আমরা মর্ম্মে মর্ম্মে অনুভব করিতেছি।

রেড ব্যাক বইখানি ছায়ানুবাদ হইলেও—ইহাতে মূলের রস বজায় আছে। ঝরঝরে ভাষা, প্রাঞ্জল অনুবাদ। অনুবাদকের কৃতিত্ব এর মধ্যে যথেষ্ট। বইখানি সুধী সমাজে সমাদৃত হইবে।

ভাই বোনেদের আসর—শ্রীবিজয়কুমার গঙ্গোপাধ্যায়। সরস্বতী সাহিত্য-মন্দির। সোনারপুর, ২৪ পরগণা। দাম এক টাকা।

ভাই বোনেদের আসরের গল্পগুলি (একটি বাদে; মোট অবাস্তব এ্যাডভেঞ্চার জাতীয়।) আমাদের ভালই লাগিয়াছে। আশ্বাসের কথা—বাঙ্গালী ছেলের জীবনে যে সব বাস্তব এ্যাডভেঞ্চারের সুযোগ কোনকালেই ঘটে না—বৈদেশিক রীতিতে তাহাই উগ্র পানীয়ের মত পরিবেশন করিয়া সুকুমারমতি ছেলেদের মস্তিষ্ক উত্তপ্ত করিয়া তুলিবার প্রয়াস এগুলিতে নাই। লেখকের গল্প-রচনার ভঙ্গিটি ভারি মিষ্ট। কৌতুক-বিস্ময়-উপদেশ মিশ্রিত এই ছোট গল্পগুলি লেখক দরদী মন লইয়া ছোটদের আসরে পরিবেশন করিয়াছেন। এইরূপ পুস্তকের বহুল প্রচার বাঞ্ছনীয়।

শ্রীরামপদ মুখোপাধ্যায়

ভারতের পণ্য—শ্রীকালীচরণ ঘোষ প্রণীত। ৬ বি এ্যাণ্টন রোড, কলিকাতা। পৃষ্ঠা ৬৬, মূল্য ৪।০।

গ্রন্থকার ভারতের পণ্য সম্বন্ধে পূর্ব্বে দুই ভাগ গ্রন্থ প্রকাশিত করিয়াছেন, বর্ত্তমান গ্রন্থ ঐ পর্য্যায়ের তৃতীয় ভাগ। এই খণ্ডে খনিজ পণ্য—লৌহ, টংষ্টেন, ক্রোমাইট, ভানেডিয়ম, ম্যাঙ্গানিজ, মলিবডেনম। টাইটেনিয়ম, নিকেল এবং কয়লার বিষয় আলোচিত হইয়াছে। অবশ্য এই খণ্ডে ভারতের সমস্ত খনিজ পণ্যের আলোচনা শেষ হয় নাই। গ্রন্থকার চতুর্থ খণ্ডে অবশিষ্টগুলির আলোচনা করিবেন এরূপ ভরসা দিয়াছেন।

বড়ই দুঃখের বিষয় যে আমাদের দেশের শিক্ষিত ব্যক্তিগণও দেশের সম্পদ সম্বন্ধে অনেক সময় সঠিক সংবাদ রাখেন না এবং যাঁহারা এই বিষয়ে তথ্যাদি জানিতে চাহেন তাঁহারাও কোন এক স্থানে এই সকল জ্ঞাতব্য না পাইয়া নিরাশ হন। শিক্ষার্থী ও ব্যবসায়ী উভয়ের পক্ষেই তথ্যজ্ঞান বিশেষ প্রয়োজনীয়। ভারতের খনিজ সম্পদের তথ্যগুলি নানা পুস্তকে, সরকার কর্ত্তৃক প্রকাশিত নানা পুস্তিকায় ও সাময়িক পত্রে এরূপ-ভাবে ছড়াইয়া আছে যে বহুপরিশ্রমে এগুলি সংগ্রহ করিয়া সাজাইয়া রাখিলে তাহা সাধারণ পাঠকের কার্য্যোপযোগী হয়। বর্ত্তমান গ্রন্থকার এই দুরূহ কার্য্য অতি নিপুণভাবে সম্পূর্ণ করিয়া বঙ্গভাষাকে সমৃদ্ধ করিয়াছেন। ভারতবাসী হিসাবে আমরা লৌহ, ম্যাঙ্গানিজ এবং কয়লা এই তিনটি খনিজ দ্রব্যের বিষয়ে জানিতে বিশেষ উৎসুক। লেখক আমাদের সে আশা পূর্ণ করিয়াছেন। লৌহ সম্বন্ধে এত কথা আছে যে সকল শ্রেণীর পাঠকই ইহাতে নিজেদের জ্ঞাতব্য বিষয় পাইবেন। প্রত্যেক অধ্যায়ে উৎখাতন, উৎপাদন, আমদানী রপ্তানীর যতদূর সম্ভব সাম্প্রতিক হিসাব দেওয়া হইয়াছে। পৃথিবীর অন্যান্য দেশের সহিত তুলনামূলক যে তথ্যাদি দেওয়া হইয়াছে তাহাতে পাঠকের চোখ খুলিবে। এই পুস্তকের বহুল প্রচার বাঞ্ছনীয়।

শ্রীঅনাথবন্ধু দত্ত

হাওয়ার নিশানা—শ্রীচিত্তরঞ্জন রায়। প্রকাশক শ্রীনিকুঞ্জ পত্রী। ৯এ, কার্ত্তিক বোস লেন, কলিকাতা। মূল্য তিন টাকা।

একখানি সমাজ-রাষ্ট্রনৈতিক উপন্যাস। গ্রন্থকার নবীন—তথাপি তাঁহার পুস্তকখানি পড়িয়া মনে হইল, সাধারণ উপন্যাস যে ভাবে লিখিত হয়, ইহা সে শ্রেণীর লেখা নহে। গভীর চিন্তাশীলতার সঙ্গে অন্তরের আবেগপ্রবণতা যুক্ত হইয়া বইখানিকে উপভোগ্য করিয়াছে—সঙ্গে সঙ্গে পাঠকের মনকে উদ্বুদ্ধ করিবার মত প্রেরণার শক্তিও সঞ্চারিত করিয়াছে। লেখকের ভাষা সতেজ এবং সাবলীল। দুঃখের বিষয়, বইখানিতে ছাপার ভুল অনেক বেশি। বাঁধাই ও প্রচ্ছদপট মনোরম।

শ্রীফাল্গুনী মুখোপাধ্যায়

অনিন্দ্য
অলকের
আকর্ষণ
কেশতৈল
অনুপমা কেমিক্যাল :: কলিকাতা

সচল কবিতা—শ্রীকেশবলাল দাস। প্রকাশক—অমৃতবর্ধন। ১১৫ এ, আমহার্ষ্ট স্ট্রীট, কলিকাতা। মূল্য দেড় টাকা।

লেখকের পূর্ববর্তী কাব্যগ্রন্থ 'মন্দারমালা' সম্বন্ধে প্রবাসীর সমালোচক মন্তব্য করেছিলেন, "এরূপ কবিতা এ যুগে অচল।" কবি তাই ক্ষুব্ধ হয়ে এবারে 'সচল কবিতা' লিখেছেন। তাঁর ধারণা, তিনি "স্বভাব-কবি গোবিন্দদাসের" মত "পাড়াগেঁয়ে কবি" বলেই সমালোচক তাঁকে উপেক্ষা করেছেন। ঐ সমালোচনা তাঁকে নিরুৎসাহ করে নি, নূতন কাব্যের প্রেরণা দিয়েছে, এতে সমালোচক সুখী হবেন। 'সচল কবিতা'র একটু নমুনা:

> "এখন বিষম জ্বালা
> বড় দুঃখে গেঁথেছিনু মন্দারমালা
> কিন্তু সচল কবিতা ছাড়ে না মোরে
> পড়েছি সংকট ঘোরে।
>
> চল কবিতা মোরা লোকালয় ছাড়ি
> উঠি মোর মানস গাড়ী
> যাব সেই দেশে
> নবীন বেশে
> যেথা আছে হেন লোকজন
> যারা জানে না নিন্দা, ধারে না ঈর্ষার গুঞ্জন।"

দাগ—পথিক প্রণীত। পোঃ মন্দারপুর, বীরভূম। মূল্য আড়াই টাকা।

বিভিন্ন ভাবের কয়েকটি কবিতা। অসাধারণ নহে, কিন্তু সুরচিত। ভাষায় ও ছন্দে পারিপাট্য আছে।

সামাজিক চুক্তি [প্রথম খণ্ড]—শ্রীননীমাধব চৌধুরী এম্-এ। প্রাপ্তিস্থান—ডি, এম্. লাইব্রেরী। ৪২, কর্ণওয়ালিস স্ট্রীট, কলিকাতা। মূল্য ২০ টাকা।

লেখকের অনূদিত 'মোপাসাঁর গল্প' সুধীজনের প্রশংসা পেয়েছে। সম্প্রতি মূল ফরাসী থেকে রুসোর 'Contrat Social'-এর বাংলা অনুবাদ প্রকাশ করে তিনি বাংলা ভাষার সম্পদ্ বৃদ্ধি করছেন। চিন্তাপূর্ণ রচনায় বাংলাসাহিত্য এখন দরিদ্র। বিদেশের চিন্তানায়কগণের ভাব ও আদর্শের সঙ্গে পরিচয় হলে আমাদের মননশক্তি বাড়বে। সে দিক থেকে এরূপ গ্রন্থের উপযোগিতা যথেষ্ট। দুঃখের বিষয়, লেখকের কৃত অনুবাদ আংশিক, অসম্পূর্ণ। ভূমিকায় তিনি উল্লেখ করেছেন, অনূদিত অন্যান্য অংশ নষ্ট হয়ে গিয়েছে। অনুবাদ সম্পূর্ণ করবার চেষ্টা করা সমীচীন বলে মনে হয়।

শ্রীধীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়

সপ্ত সমুদ্রের রণাঙ্গনে—শ্রীসন্তোষকুমার দাশগুপ্ত। দাসগুপ্ত এণ্ড কোং, ৫৪।৩ কলেজ স্ট্রীট, কলিকাতা। মূল্য আড়াই টাকা।

বিগত বিশ্বযুদ্ধে রুশ জার্মান যুদ্ধের প্রাক্কালে লেখক রেডিয়ো অফিসার রূপে আউট মাবক একখানা নরওয়েজীয়ান জাহাজে করিয়া আটলান্টিক রণাঙ্গনের পথে যাত্রা করেন। দীর্ঘ পাঁচ মাস সমুদ্রে বিচরণ করিয়া তিনি ইংলণ্ডে গিয়া পৌঁছেন। সেখান হইতে যান উত্তর আটলান্টিকের সমরাঙ্গনে। তারপর 'মিত্রশক্তির অস্ত্রগৃহ' নিউইয়র্কে পৌঁছেন এবং পশ্চিম মধ্য ও দক্ষিণ আটলান্টিকের রণাঙ্গন সম্বন্ধে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা অর্জ্জন পূর্ব্বক দেশে প্রত্যাবর্ত্তনের পথে শত্রুপক্ষের রেইডারের আক্রমণে দক্ষিণ-আটলান্টিক ভেলাবক্ষে ভাসমান হন। সপ্ত সমুদ্রের রণাঙ্গনে তাঁহার সেই রোমাঞ্চকর, বিচিত্র অভিজ্ঞতার কাহিনী তিনি সমালোচ্য পুস্তকটিতে ছয়টি অধ্যায়ে বর্ণনা করিয়াছেন। বিষয়বস্তুর দিক দিয়া বর্ত্তমান পুস্তকটি বাংলা-সাহিত্যে অভিনব। সমুদ্রবক্ষের রণাঙ্গন সম্বন্ধে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতামূলক পুস্তক বাংলা-সাহিত্যে আর একখানিও নাই। লেখক চিন্তাশীল, এবং যুদ্ধের গতি-প্রকৃতি সম্বন্ধেও বিশেষভাবে ওয়াকিফহাল। আক্রমণকারী এবং আক্রান্ত জাতির লোকদের মনস্তত্ত্ব বিশ্লেষণে তিনি জায়গায় জায়গায় বিশেষ নৈপুণ্যের পরিচয় দিয়াছেন। আর একটি জিনিষ তাঁহার লেখার ভিতর দিয়া বিশেষভাবে ফুটিয়া উঠিয়াছে তাহা লেখকের জ্বলন্ত দেশানুরাগ। ভারতের অতীত গৌরব সম্বন্ধে লেখক যেমন সচেতন তেমনি বর্ত্তমান অবনত ও পরাধীন অবস্থায়ও ভারতবাসী যে অন্যান্য স্বাধীন দেশের অধিবাসীদের চেয়ে হীন নয়, পৃথিবীর নানা দেশ ঘুরিয়া তিনি এই সত্যকে মর্ম্মে মর্ম্মে উপলব্ধি করিয়াছেন। পুস্তকখানিতে বিশ্লেষণ অপেক্ষা বর্ণনার আধিক্য থাকিলে সাধারণ পাঠকের পক্ষে অধিকতর উপভোগ্য হইত। পুস্তকের দুইটি ত্রুটি বিশেষভাবে চোখে পড়ে—প্রথমতঃ বহু স্থানে উদ্ধৃতির আতিশয্য। "A writer's best friend is not his pen but his eraser".—অনেক শ্রেষ্ঠ লেখকের এই কথাগুলি মনে রাখিলে লেখক লাভবান হইবেন। পুস্তকের দ্বিতীয় ত্রুটি হইতেছে ইহার ছত্রে ছত্রে বানান ভুলের ছড়াছড়ি এবং শব্দের অপপ্রয়োগ—যেমন সাধারন, বল্গাড়ম্বর বর্ণশঙ্কর, ধ্বংশ ইত্যাদি ভূরি ভূরি উদাহরণ দেওয়া যাইতে পারে। দক্ষিণ-আটলান্টিকে লেখকের ভাসমান হইবার পরবর্ত্তী ঘটনা তিনি প্রবাসীতে লিখিয়াছেন। 'সপ্তসমুদ্রে'র রণাঙ্গনের দ্বিতীয় পর্ব্বের জন্য পাঠক সম্প্রদায় সাগ্রহে প্রতীক্ষা করিবে।

শ্রীনলিনীকুমার ভদ্র

অক্ষয়কুমার বড়াল—সাহিত্য-সাধক-চরিতমালা—৫৮—শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়। বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ, ২৪৩।১ আপার সারকুলার রোড, কলিকাতা।

অক্ষয়কুমার বড়াল ১৮৬০ খ্রীষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন এবং ১৯১৯ খ্রীষ্টাব্দে উনষাট বৎসর বয়সে পরলোকগমন করেন। অক্ষয়কুমারের জীবন ঘটনাবহুল বলা যায় না, কিন্তু তিনি যে কবিত্বশক্তির অধিকারী ছিলেন তাহা সাধারণ নয়। প্রমথ চৌধুরী তাঁহাকে জাত-কবি আখ্যা দিয়াছেন। শ্রেষ্ঠ কবিদের রচনাবলীর মধ্যেও যে যথেষ্ট তারতম্য বিদ্যমান তাহা আমরা অনেক সময়েই লক্ষ্য করি, কিন্তু অক্ষয়কুমারের রচনার মধ্যে কবিত্বহীন পঙ্‌ক্তি আবিষ্কার করা দুঃসাধ্য বলিয়াই মনে হয়। তাঁহার রচনা অসংখ্য নয়, কিন্তু যাহা কিছু তিনি রচনা করিয়াছেন তাহাই কাব্যরসিক মনের উপভোগ্য হইয়া উঠিয়াছে। কবিদের মধ্যে এমন শব্দশিল্পী অল্পই দেখা যায়।

"এ জীবনে পূরিত সকল,
সে যদি গো আসিত কেবল!
গানে বাকি সুর দিতে ফুলে বাকি তুলে নিতে
স্বপ্ন বাকি হইতে সফল—
সে যদি গো আসিত কেবল।"

এইটুকু উদ্ধৃতি হইতেই বড়াল-কবির কবিত্বের অনেকখানি বুঝা যাইবে। রবীন্দ্রনাথের মত তিনিও বিহারীলালের কাব্যশিষ্য ছিলেন। রবীন্দ্রনাথের সমসাময়িক হইয়াও অক্ষয়কুমার আপন কবিত্বের স্বাতন্ত্র্য বজায় রাখিয়াছিলেন।

চরিতকার অক্ষয়কুমারের সংক্ষিপ্ত অথচ জ্ঞাতব্য জীবনীর সহিত যে সুনির্বাচিত কবিতাগুলি গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত করিয়াছেন তাহা পাঠকের আনন্দ বিধান করিবে।

শ্রীশৈলেন্দ্রকৃষ্ণ লাহা

পথের দেখা—শ্রীশান্তা দেবী। কমলা বুক ডিপো, ১৫, বঙ্কিম চ্যাটার্জ্জি ষ্ট্রীট, কলিকাতা। পৃ. ১৪০। মূল্য দেড় টাকা।

আটটি গল্পের সংগ্রহ। প্রথম গল্পটির নাম 'পথের দেখা'। লেখিকা সাহিত্য সৃষ্টিদ্বারা ইতিপূর্ব্বে প্রভূত যশ অর্জ্জন করিয়াছেন, —'পথের দেখা' তাঁহার সেই যশ আরও বর্দ্ধিত করিবে। ইহার প্রতিটি গল্পেই পরিণত লেখনীর ছাপ সুপ্রতিষ্ঠিত। 'সন্তান,' 'মানসী' ও 'ছুটি' নামক গল্পে নারীহৃদয়ের যে চিত্র অঙ্কিত হইয়াছে—কোন পুরুষ লেখকের দ্বারা উহা সম্ভব হইত কি না সন্দেহ! 'উপহার' নামক গল্পে লেখিকা এক নূতন ধরণের কৃতিত্বের পরিচয় দিয়াছেন। চিত্রজগতে 'কমার্শিয়াল আর্ট' বলিয়া এক বিশেষ ধরণের শিল্প আছে—বিজ্ঞাপন ও প্রচারকার্য্যেই উহার সার্থকতা; সাহিত্যসৃষ্টিতেও এই ধরণের শিল্প যে কত উচ্চস্তরের হইতে পারে—'উপহার' গল্পটি তাহার প্রকৃষ্ট নিদর্শন। এই গল্পের ভিতর দিয়া সুকৌশলে গডরেজ কোম্পানীর লোহার সিন্দুকের যে প্রচারকার্য্য সাধিত হইয়াছে,—উহার জন্ত লেখিকার নিকট কোম্পানীর চিরকৃতজ্ঞ থাকা উচিত। 'পথের দেখা,' 'জীবে দয়া' ও 'পথবাসিনী'ও সম্পূর্ণ রসোত্তীর্ণ ও উপভোগ্য হইয়াছে। গ্রন্থ—মোটা ইম্পেরিয়াল কাগজে ছাপা—বাঁধাই সুন্দর।

শ্রীতারাপদ রাহা

বোধন বাঁশী—শ্রীদুর্গাপ্রসাদ সাহ। পরাগ পাবলিশার্স, ১৬৯ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা। মূল্য এক টাকা।

কবিতার বই। দেশের নিদারুণ শোচনীয় বিপর্য্যস্ত বিধ্বস্ত বর্ত্তমান অবস্থা লক্ষ্য করিয়া যে সকল হৃদয়বান সুধী নীরবে অশ্রুপাত করিতেছেন এবং এই চরম দুর্গতির প্রতিকার-মানসে দেশকে জাগাইয়া তুলিতে বোধনের বাঁশী বাজাইতেছেন, লেখক তাঁহাদেরই সমগোত্রী। তিনি অখ্যাত পল্লীগ্রামের শিক্ষকমাত্র এবং এই তাঁহার সাহিত্যসাধনার প্রথম প্রদর্শন হইলেও তাঁহার দলিত বিদীর্ণ হৃদয় মথিত করিয়া সহজ ছন্দে যে বোধন-বাঁশীর সুর ধ্বনিত হইয়াছে তাহা সহজেই মর্ম্ম স্পর্শ করে।

জয়শ্রী—শ্রীদেবব্রনাথ ভট্টাচার্য্য, বি. এ.। প্রকাশনী, ১৫।৭ শ্যামাচরণ দে ষ্ট্রীট, কলিকাতা। মূল্য দেড় টাকা।

ছন্দশ্রীর পর 'জয়শ্রীর' কবির দ্বিতীয় কাব্যগ্রন্থ। 'জয়শ্রী'র কবিতাগুলি কবির কাব্যসাধনাকে জয়যাত্রার পথে আগাইয়া দিয়াছে। কবি তাঁহার সকল বাসনা-কামনা ও আনন্দ-বেদনা ভগবানের চরণে সমর্পণ করিয়া শান্তি লাভ করিয়াছেন ও নবীন আশার আলোকে চলার পথে যাত্রা শুরু করিয়াছেন। ভাবের সঙ্গে তাল রাখিয়া ছন্দ পূর্ণতর রূপ ধারণ করিয়া কবির 'জয়শ্রী'কে শ্রীমণ্ডিত করিয়াছে।

জয় সুভাষ—শ্রীপ্যারীমোহন সেনগুপ্ত। প্রকাশক—গ্রন্থকার, ৪২-বি শশীভূষণ দে ষ্ট্রীট, কলিকাতা। মূল্য আট আনা।

নেতাজী সুভাষচন্দ্রের প্রতি শ্রদ্ধানিবেদন উপলক্ষে কতকগুলি রণোন্মাদনা ও দেশপ্রেমমূলক কবিতার সমষ্টি। গ্রন্থকার আজাদ হিন্দ ফৌজের বিখ্যাত গানটির একটি সুন্দর বঙ্গানুবাদ করিয়াছেন। জয় সুভাষ, গান্ধীজী, মুক্তির অভিযান, রণসঙ্গীত, মন্বন্তর, বীরের দল প্রভৃতি কবিতাগুলি তরুণ-হৃদয়ে উদ্দীপনার সঞ্চার করিবে। পরবর্ত্তী সংস্করণে এই ধরণের কবিতার সংখ্যা আরও বাড়াইলে বইটি স্থায়ীভাবে ছাত্রগণের মধ্যে দেশাত্মবোধ জাগ্রত করিতে সহায়তা করিবে। কিশোরগণের নিকট সুকবি প্যারীমোহনের কবিতার নূতন করিয়া পরিচয় দেওয়া অনাবশ্যক।

সুভাষ-প্রশস্তি—শ্রীপ্রশান্তকুমার মজুমদার কাব্যনিধি। প্রকাশক—শ্রীযতীন্দ্রনাথ দত্ত, ১১ বলরাম দে ষ্ট্রীট, কলিকাতা। মূল্য দশ আনা।

সুভাষ-প্রশস্তি উপলক্ষে ইহার পূর্ব্বাংশে কয়েকটি দেশানুরাগ-মূলক সহজ সরল কবিতা সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। পুস্তকের শেষাংশে আজাদ হিন্দ ফৌজের প্রতি নেতাজীর বাণীর একটি প্রাঞ্জল বঙ্গানুবাদ প্রদত্ত হইয়াছে।

শ্রীবিজয়েন্দ্রকৃষ্ণ শীল

বাংলা ভাষায় অ-বাংলা শব্দ

শ্রীজগদীশচন্দ্র দে

আরবী, ফার্সী, উর্দু ও হিন্দী ভাষার বহু শব্দ বাংলা ভাষায় নিত্য আমরা ব্যবহার করিতেছি। ঐ সকল অ-বাংলা শব্দের অধিকাংশই আমাদের হাতে পড়িয়া স্ব-রূপ পরিবর্ত্তন করিয়া ফেলিয়াছে। অনেক শব্দের অ-কার স্থানে আ-কার, উ-কার স্থানে ও-কার হইয়াছে; অনেকগুলির 'শ' স্থানে 'স', 'ই' স্থানে 'য়' হইয়াছে; আবার অনেকগুলি শব্দের যুক্তাক্ষর ভাঙিয়া আমরা আমাদের মত করিয়া চালাইয়া লইয়াছি। এইরূপ আরও অনেক পরিবর্ত্তন হইয়াছে। 'অহসান' হইয়াছে 'আসান', 'গুলাম' হইয়াছে 'গোলাম', 'নকশা' হইয়াছে 'নকসা', 'আঙ্গিনা' হইয়াছে 'আয়না', 'সির্ক' হইয়াছে 'স্রেক'। কিন্তু রূপ পরিবর্ত্তনে সবচেয়ে বাহাদুরি দেখাইয়াছে 'জিঙ্গির', 'লোকসান' 'সখ' ইত্যাদি শব্দগুলি। 'জিঙ্গির'-এর আদি রূপ 'জিক্র', 'লোকসান'-এর আদি রূপ 'নুকসান' আর 'সখ'-এর আদি রূপ 'শৌক'। মোগলের হাতে পড়িয়া খানা খাইয়া জাতিচ্যুত হওয়ার মত বেচারা অ-বাংলা শব্দগুলি আমাদের হাতে পড়িয়া কি অপরূপ সাজেই না সজ্জিত হইয়াছে!

হিন্দী ভাষায় বাংলা ভাষার চেয়ে অনেক বেশি আরবী, ফার্সী ও উর্দু ভাষার শব্দ চলিতেছে। উচ্চারণের বেলায় হিন্দী ভাষাভাষীরা কোন কোন শব্দে একটু আধটু পরিবর্ত্তন করিলেও লেখার সময় তাহারা আসল শব্দটিই লেখে। এজন্য প্রাচীন ও আধুনিক হিন্দী গ্রন্থাদি পড়িলে বাংলায় রূপান্তরিত শব্দগুলির আসল রূপ চিনিতে কষ্ট হয় না। আমি ঐরূপ অনেকগুলি শব্দ সংগ্রহ করিয়াছি এবং বর্ণানুক্রমিক ভাবে সাজাইতে চেষ্টা করিতেছি। অকার হইতে আরম্ভ করিয়া কয়েকটি শব্দের আলোচনা আজ করিব। শব্দের শেষে আ, ফা, উ, হি, যথাক্রমে আরবী, ফার্সী, উর্দু ও হিন্দী বুঝিতে হইবে।

অ-বাংলা শব্দ	বাংলা রূপ	অ-বাংলা শব্দ	বাংলা রূপ
অংগুঠী—হি	আংটি	অজ্ঞা—হি	আজ্ঞা
অংগুর—ফা	আঙুর	অতর—ফা	আতর
অন্দাজ—ফা	আন্দাজ	অদব—আ	আদব
		অদা—আ	আদায়
অক্ল, আকিল—আ	আক্কেল	অদালত—আ	আদালত
		অকেলা, বেলা—হি	আবলা
অখাড়া—হি	আখড়া	অধেলী—হি	আধুলি
অখীর—আ	আখের	অনন্নাস—হি	আনারস
		অনাজ—হি	আনাজ
অগবান, উচ্চারণ—অগোয়ান—হি	আগুয়ান	অনাড়ী—হি	আনাড়ী
		অফসোস—ফা	আপশোষ
অগাউ—হি	আগোয়া	অবীর—আ	আবীর
অচানক—হি	আচমকা	অভী—হি	এবে
অচার—ফা	আচার	অমড়া—হি	আমড়া
অচ্ছা—হি	আচ্ছা	অমলা—আ	আমলা
অজনবী—আ	আজগুবী	অমানত—আ	আমানত
অজব—আ	আজব	অমীন—আ	আমীন
অটক—হি	আটক	অমীর—আ	আমীর
অটকন—হি	আটকান	অরক—আ	আরক
অটুট—হি	অটুট	অরজী—আ	আর্জী
অড়ত, আঢ়ত—হি	আড়ত	অলকতরা—আ	আলকাতরা
		আপস—উ	আপোষ
অলবত্তা—আ	আলবৎ	আবকারী—ফা	আবকারী
অলবান—আ	আলোয়ান	আবদার—ফা	আবদার
(উঃ—আলোয়ান)		আবনূস—ফা	আবলুস
অলহদা—আ	আলাদা	আবরু—ফা	আবরু